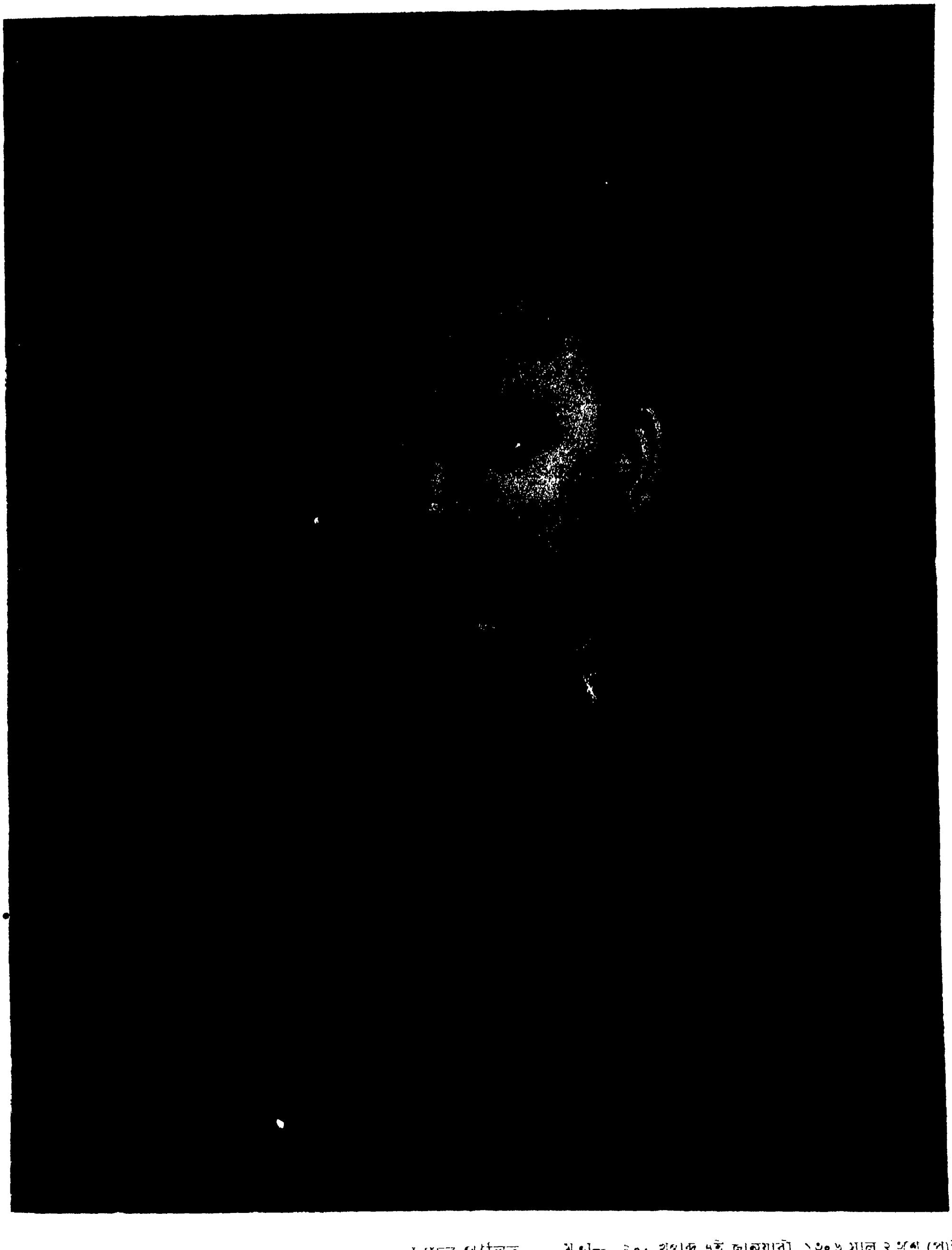


জন্ম—১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ

বলদেব পালিত

মৃত্যু—১৯০০ খৃষ্টাব্দ ৭ই জানুয়ারী, ১৩০৬ সাল ২৩শে পৌষ

ভারতবর্ষ

সূচিপত্র

ত্রয়োবিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ ১৩৪৩—জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৪

লেখ সূচি—বর্ণানুক্রমিক

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত

ভারতবর্ষ

সচিত্র মাসিক পত্র

চতুর্বিংশ বর্ষ

দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ ১৩৪৩—জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৪

সম্পাদক—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

—২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—

চিত্র সূচি মাসানুক্রমিক

বহুবর্ণ চিত্র

ফাল্গুন—১৩৪৩

বহুবর্ণ চিত্র

চৈত্র—১৩৪৪

বহুবর্ণ চিত্র

বৈশাখ – ১৩৪৪

বহুবর্ণ চিত্র

জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৪

বহুবর্ণ চিত্র



দ্বিতীয় খণ্ড | চতুর্বিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

যুধিষ্ঠিরের সময়

মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধবৎসর

মহাভারত জগতে অতুলনীয় গ্রন্থ। ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট বা বিশাল গ্রন্থ পৃথিবীতেই দেখা যায় না। ইহাতে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প ও কলা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে। তাহা আবার যুক্তি ও উদাহরণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে এইটুকু মাত্র বলিলেই চলিতে পারে যে, 'মানুষেব প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ই মহাভারতে আছে।' তাই কবি স্বয়ং বলিয়াছেন—"যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ"; ইহার অনুবাদে বাঙ্গালীও বলিয়া থাকে "যা' নাই ভারতে, তা' নাই ভারতে।" তা'রপর ইহার ভাষা প্রাঞ্জল ও মধুর, ভাবও মনোহর এবং বৈচিত্র্যময়। সর্ব্বাপেক্ষা ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে এই গ্রন্থ ইতিহাস হইলেও ঋষিপ্রণীত বলিয়া হিন্দু ইহাকে আপ্তবাক্য ধর্ম্মগ্রন্থ মনে করে, ধর্ম্ম উদ্দেশ্যে পাঠ করে এবং পঞ্চম বেদ বলিয়া স্বীকার করে; আর জগতের সকল সম্প্রদায়ের লোক ইহার আদর করে এই জন্য যে ইহা সকল প্রকার জ্ঞানের আকর এবং ভারতের প্রাচীন চিত্র দেখিবার পক্ষে বিশাল আলেখ্যপট।

এহেন মহাভারত গ্রন্থের নায়ক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং প্রতিনায়ক কুরুরাজ দুর্য্যোধন। সুতরাং ইঁহাদের চরিত্র জানিবার জন্য যেমন আকাঙ্ক্ষা ও কৌতুক জন্মে, তেমন সময় জানিবার জন্যও আকাঙ্ক্ষা ও কৌতুক জন্মিয়া থাকে। কিন্তু সেই সময়-নিরূপণ সম্বন্ধে বহুতর মতভেদ আছে; তবে তাহাতে কোন দুঃখ বা আক্ষেপ করিবার কারণ নাই। কেন না দুই এক শতাব্দী পূর্ব্বের ঘটনা নিয়াই যখন মতভেদ হইতে দেখা যায়, তখন বহু শতাব্দী পূর্ব্বের ঘটনা নিয়া যে মতভেদ হইবে তাহাত সম্পূর্ণ সম্ভবপর। তা'রপর এ বিষয়ে যতগুলি প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাও পরস্পর-বিরোধী। অতএব যুধিষ্ঠির প্রভৃতির সময়-নিরূপণ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করিতে হইলে প্রথমে ইহাই আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, পরস্পর-বিরোধী প্রমাণগুলির মধ্যে কোন প্রমাণ প্রবল এবং কোন প্রমাণ দুর্ব্বল। প্রমাণের প্রবলতা

বা দুর্ব্বলতা জানিবারও ইহাই সমীচীন উপায় যে—যে উদ্দেশ্যে যে শাস্ত্র বা যে গ্রন্থ রচিত, সেই বিষয়ে সেই শাস্ত্র বা সেই গ্রন্থই প্রবল প্রমাণ, অপরগুলি দুর্ব্বল প্রমাণ। ইহার উদাহরণও আমরা এইরূপ দেখিতে পাই; আত্মা বা অধ্যাত্ম বিষয় নিরূপণের জন্য বেদান্তশাস্ত্র রচিত; সুতরাং সে বিষয়ে বেদান্তশাস্ত্রই প্রবল প্রমাণ। ধর্ম্মনিরূপণের জন্য স্মৃতি-শাস্ত্র রচিত; অতএব ধর্ম্মনিরূপণ সম্বন্ধে স্মৃতিশাস্ত্রই প্রবল প্রমাণ। শব্দব্যুৎপাদনের জন্য ব্যাকরণশাস্ত্র প্রণীত; সুতরাং সে বিষয়ে ব্যাকরণ শাস্ত্রই প্রবল প্রমাণ। এইরূপ আরও বহুতর উদাহরণ দেখা যায়। অতএব কুরু-পাণ্ডবের ইতিহাস বিবৃত করিবার জন্য মহাভারত রচিত হইয়াছিল বলিয়া কুরু-পাণ্ডব সম্বন্ধে কোন বিষয় নির্ণয় করিতে হইলে মহাভারতকেই প্রবল প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। অতএব আমরাও এই নিয়মের অনুসরণ করিয়াই যুধিষ্ঠিরের সময়-নিরূপণ সম্বন্ধে প্রথমে মহাভারতের বচনই উদ্ধৃত করিলাম।

১। "অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ।
সমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরু-পাণ্ডবসেনয়োঃ॥"
(মহাভারত—আদিপর্ব্ব দ্বিতীয় অধ্যায় ১৩ শ্লোক)

কলি ও দ্বাপরযুগের সন্ধিকাল অত্যন্ত সূক্ষ্ম; তাহাতে অষ্টাদশদিনব্যাপী যুদ্ধ হইতে পারে না। অতএব দুর্গাপূজায় অষ্টমীর শেষ দণ্ড এবং নবমীর প্রথম দণ্ড, এই দণ্ডদ্বয়াত্মক কাল যেমন সন্ধিপূজার একটি কাল বলিয়া পরিভাষিত হইয়াছে (১) এবং দিনের শেষ অর্দ্ধ-মুহূর্ত্ত ও রাত্রির প্রথম অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত, এই মুহূর্ত্তাত্মক কাল যেমন সায়ংসন্ধ্যার একটী কাল বলিয়া পরিভাষিত আছে (২) তেমন এখানেও দ্বাপর যুগের শেষ কতটুকু এবং কলিযুগের প্রথম কতটুকু, এমন একটী কালকেই দ্বাপর ও কলির 'অন্তর' নামে পরিভাষিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তবে সেকাল কতটুকু তাহা আমরা অন্য একটী পরিভাষা দ্বারা ধরিয়া লইতে পারি। সে পরিভাষা এই—"সংখ্যাঽনাদেশে শতম্।" অর্থাৎ কোন সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে শত সংখ্যা ধরিতে হইবে। এই হিসাবে দ্বাপরের শেষ ৫০ বৎসর এবং কলির প্রথম ৫০ বৎসর এই এক শত বৎসর কালকেই দ্বাপর ও কলির অন্তর কাল বলিয়া ধরা যাইতে পারে(৩)। কিন্তু শাস্ত্রে যুগসন্ধ্যা বা যুগসন্ধ্যাংশ বলিয়া যে সুদীর্ঘকালের পরিভাষা করা আছে (৪) তাহা ধরা যাইতে পারে না। কারণ তত দীর্ঘকাল ধরিলে যুদ্ধের প্রকৃত কাল বুঝিবার জন্য অন্য প্রমাণের সাহায্য লইতে হয় বলিয়া বক্তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না; বিশেষতঃ তাহা হইলে, অবশ্যই মহর্ষি "অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে" এইরূপ না বলিয়া নিঃসন্দেহার্থ "সন্ধ্যাকালে চ সম্প্রাপ্তে" এইরূপই বলিতেন। অতএব এইক্ষণ উক্ত মহাভারতের বচনটীর এইরূপ অর্থ দাঁড়াইল যে, দ্বাপর ও কলিযুগের মধ্যবর্ত্তী এক শত বৎসরের অনধিক সময়ের মধ্যে কুরুক্ষেত্রে কুরুসৈন্য ও পাণ্ডবসৈন্যের যুদ্ধ হইয়াছিল। (৫)

(১) "অষ্টমীনবমীসন্ধৌ তৃতীয়া খলু কথ্যতে। তত্র পূজ্যা ত্বহং পুত্র! যোগিনীগণসংযুতা॥ অষ্টম্যাঃ শেষদণ্ডশ্চ নবম্যাঃ পূর্ব্ব এব চ। অত্র যা ক্রিয়তে পূজা বিজ্ঞেয়া সা মহাফলা॥" তিথিতত্ত্বধৃত কালিকাপুরাণ।

(২) "উপাস্তে সন্ধিবেলায়াং নিশায়া দিবসস্য চ। তমেব সন্ধ্যাং তস্মাত্তু প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥" ব্যাসসংহিতা। "হ্রাসবৃদ্ধি চ সততং দিনরাত্র্যোর্যথাক্রমম্। সন্ধ্যামুহূর্ত্তমাখ্যাতা হ্রাসে বৃদ্ধৌ সমা স্মৃতা॥" যাগিবাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

(৩) "সংখ্যাঽনাদেশে শতম" এই শত শব্দ দ্বারা কেহ একশত মাস বা দিন ধরিতে চাহিলেও তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কেন না তাহাতে কোন বস্তুক্ষতি হয় না।

(৪) " দ্বে সহস্রে দ্বাপরে তু সন্ধ্যাংশৌ তু চতুঃশতে। সহস্রমেকং বর্ষাণাং দিব্যং কলৌ প্রকীর্ত্তিতম্॥ দ্বে শতে চ তথান্যে বৈ সংখ্যাতঞ্চ মনীষিভিঃ। " মৎস্য পুরাণ ১৪৮ অধ্যায়। বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতা গ্রন্থেও এই জাতীয়ই লিখিত আছে। ইহার অর্থ—দেবপরিমাণের দুই হাজার বৎসরে দ্বাপরযুগ, তাহার সন্ধ্যা ঐ পরিমাণে দুইশত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও ঐরূপই দুইশত বৎসর। আবার দেবপরিমাণের একহাজার বৎসরে কলিযুগ, তাহার সন্ধ্যা ঐ পরিমাণে একশত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও ঐরূপই একশত বৎসর। মনুষ্যের ৩৬০ বৎসরে দেবতাদের ১ বৎসর হয়। এই হিসাবে মনুষ্য পরিমাণে দ্বাপরযুগের সন্ধ্যা ৭২০০০ বৎসর এবং মনুষ্য পরিমাণে কলিযুগের সন্ধ্যা ৩৬০০০ বৎসর। এই হিসাবে দ্বাপর ও কলি এই উভয়ের সন্ধ্যাকাল মনুষ্য পরিমাণে ১০৮০০০ একলক্ষ আটহাজার বৎসর।

(৫) এই বিষয়ে মহাভারতের আরও কতকগুলি বচন প্রমাণরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। পাণ্ডবগণের বনবাসের ঠিক মধ্য সময়ে হনুমান ভীমসেনের নিকট 'যুগধর্ম্ম' বলিবার উপক্রমে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের বর্ণনা কলিযুগের অবস্থা বর্ণনার পরে বলিয়াছেন—

২। সেই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত ভারত-বর্ষের সর্ব্বত্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মধ্যে একটী কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছে যে, 'দ্বাপর যুগের শেষে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল।' এই কিংবদন্তীও উক্ত মহাভারতের বচনটীর সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছে। পুরুষ পরম্পরায় এই কিংবদন্তী চলিয়া আসিবার কারণ এই যে, এ যাবৎ ভারতবর্ষে যত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ একটী প্রধান ঘটনা এবং সেই যুদ্ধই ভারত-বর্ষের অবনতির প্রথম ও প্রধান কারণ। কেন না, সেই যুদ্ধে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত বীরই নিহত হইয়াছিলেন; যে দুই চারিজন অবশিষ্ট ছিলেন তাঁহারাও বিষাদে মৃতপ্রায় থাকিয়াই অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাহাতে উপযুক্ত শিক্ষক না থাকায় উপযুক্ত যুদ্ধশিক্ষা না পাইয়া ক্ষত্রিয়জাতি অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই জন্যই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের পরে আর "নারায়ণ" ও "ব্রহ্মশির" প্রভৃতি ভীষণ অস্ত্রের নামও শুনা যায় নাই। তারপর কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজারা সেই যুদ্ধে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আর ব্রাহ্মণপ্রতিপালক লোক ছিল না। সুতরাং ব্রাহ্মণেরা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী অর্থ উপার্জ্জনের জন্যই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাহাতে আর তাঁহাদের পূর্ব্বের ন্যায় অধ্যাত্মবিষয় প্রভৃতি আলোচনা করিবার অবসর ছিল না। এই জন্যই সেই কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধের পূর্ব্বে রচিত 'পূর্ব্বমীমাংসা' এবং 'উত্তরমীমাংসা' দর্শনের পরে আর গভীর গবেষণা-পূর্ণ কোন মূল-শাস্ত্র রচিত হইয়াছিল বলিয়া শুনাও যায় না; কেবল পূর্ব্বরচিত শাস্ত্রগুলির উপরে ভাষ্য, টীকা ও টিপ্পনী এবং তাহার সংগ্রহ-গ্রন্থ রচিত হইয়া আসিতেছে দেখা যায়। অতএব সেই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধই যে ব্রাহ্মণজাতিরও অবনতির কারণ ইহা বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইবে। আবার সেই যুদ্ধে ভারতের প্রায় সকল প্রতাপশালী রাজাই নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া জলে ও স্থলে সর্ব্বত্রই দস্যু ও তস্করের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল; তাহাতেই সমুদ্রযাত্রা ও দূর-তীর্থ-পর্য্যটন প্রভৃতি নিষিদ্ধ হইয়াছিল (৬)। সেই কারণেই বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্য নষ্ট হওয়ায় বৈশ্য জাতিরও সেই সময় হইতেই অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু একমাত্র শূদ্রজাতি যথাস্থানে থাকিলেও উপরের তিনটী জাতিই অবনতির দিকে ধাবিত হওয়ায় সম্পূর্ণ হিন্দুজাতিই ক্রমশঃ অবনত হইয়াছিল। অতএব বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধই ভারতবাসী হিন্দুর প্রথম ও প্রধান অবনতির কারণ। সুতরাং যে বিপদ উপস্থিত হওয়ায় চিরকালের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং যে রোগ উৎপন্ন হওয়ায় শরীরটী চিরকালের জন্য স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়ে, সেই বিপদ এবং সেই রোগের উৎপত্তির দিন যেমন চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে, সেইরূপ কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের সময়ও ভারতবাসীর চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তাহাতেই ভারতবর্ষে পুরুষ-পরম্পরায় এই কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছে যে, 'দ্বাপরযুগের শেষে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল।'

কাশ্মীরদেশবাসী রাজতরঙ্গিণীপ্রণেতা কহ্লণ মিশ্রও প্রতিবাদের উপক্রমে ১১৪৮ খৃষ্টাব্দে (৭) এই কিংবদন্তীর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"..... ভারতং দ্বাপরান্তেঽভূদ্বার্ত্তয়েতি বিমোহিতাঃ।"

(রাজতরঙ্গিণী—প্রথম তরঙ্গ—৪৯ শ্লোকাংশ) অর্থাৎ দ্বাপরযুগের শেষে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল এইরূপ

"এতৎ কলিযুগং নাম নচিরাৎ প্রতিপৎস্যতে।"

(সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণ, বনপর্ব্ব ১২৩ অ, ৩৯ শ্লোক) ইহারই নাম 'কলিযুগ' এবং এই যুগ অচিরকাল মধ্যেই প্রবৃত্ত হইবে। (অনুবাদ)

অর্থাৎ এই সময় হইতে কিঞ্চিদধিক সাত বৎসর পরে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ও কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছিল।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বলিয়াছেন—

"সংক্ষেপো বর্ত্ততে রাজন্! দ্বাপরেঽস্মিন্নরাধিপ!"

(সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণ, ভীষ্মপর্ব্ব ১০ অ, ১৫ শ্লোক) "নরনাথ! রাজা! এখন এই দ্বাপর যুগের অল্পই অবশিষ্ট আছে।" (অনুবাদ)

(৬) সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্। তীর্থসেবাতিদূরতঃ। এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ। নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥"—'স্মাহতত্ত্বধৃত আদিত্য পুরাণ।

(৭) রাজতরঙ্গিণী-প্রথমতরঙ্গ-৫২ শ্লোক—"লৌকিকেঽব্দে চতুর্ব্বিংশে শককালস্য সাম্প্রতম্। সপ্তত্যাভ্যধিকং যাতং সহস্রং পরিবৎসরাঃ॥" রাজতরঙ্গিণী রচনা করিবার সময়ে কাশ্মীরাব্দ ২৪ এবং শকাব্দ ১০৭০ অতীত হইয়াছিল। শকাব্দের সহিত ৭৮ যোগ করিলে খৃষ্টাব্দ হয়। সুতরাং ১০৭০ + ৭৮ = ১১৪৮।

কিংবদন্তী দ্বারা অনেক লোকই মোহিত। বঙ্কিমবাবুও এই কিংবদন্তী শুনিয়া তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রে লিখিয়া গিয়াছেন যে, "ভরসা করি এই সকল প্রমাণের পর আর কেহই বলিবেন না যে, মহাভারতের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল।" সুতরাং প্রায় আট শত বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীরের কহ্লণ এবং অনধিক পূর্ব্বে বঙ্গের বঙ্কিম এই কিংবদন্তী স্বীকার করায় ইহা যে দীর্ঘকাল হইতে ভারতের সর্ব্বত্র চলিতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

৩। এই কিংবদন্তী এবং উক্ত মহাভারতের বচন দুইটী অনুসারে এই পর্য্যন্ত জানা গেল যে, দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধি-সময়ে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল। এখন কল্যব্দ কত তাহা জানিতে পারিলেই সাধারণভাবে যুধিষ্ঠিরের সময় জানা যাইবে। ভাস্করাচার্য্য তাঁহার সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থে কালমানাধ্যায়ে কল্যব্দের বিষয় বলিয়া গিয়াছেন—

"যাতাঃ ষণ্মনবো যুগানি ভমিতান্যন্যদ্‌যুগাঙ্ঘ্রিত্রয়ং
নন্দাদ্রীন্দুগুণাস্তথা শকনৃপস্যান্তে কলের্বৎসরাঃ।"(৮)

দ্বিতীয় পাদের স্থূলার্থ—শকাব্দ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কলিযুগের ৩১৭৯ বৎসর অতীত হইয়াছিল।

প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী মকরন্দ কারও বলিয়াছেন—

"শাকো নবাগেন্দুকৃশানুযুক্তঃ কলের্ভবত্যব্দগণো যুগস্য॥"(৯)

যখন কলিযুগের ৩১৭৯ বৎসর অতীত হইয়াছিল, তখন শকাব্দ আরম্ভ হইয়াছিল।

এখন হিসাব করিয়া দেখা যাউক বর্ত্তমান সময়ে কল্যব্দ কত হয়। বর্ত্তমান সময়ে ১৮৫২ শকাব্দ (১৯৩০ খৃষ্টাব্দ) চলিতেছে। সুতরাং উক্ত কল্যব্দের ৩১৭৯ সংখ্যার সহিত *শকাব্দের ১৮৫২ যোগ করিলেই বর্ত্তমান কল্যব্দ পাওয়া যাইবে; ৩১৭৯+১৮৫২=৫০৩১। অতএব জানা গেল যে আজ হইতে পাঁচ হাজার একত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে (অর্থাৎ* খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩১০১ অব্দে) কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছিল; সুতরাং বর্ত্তমান কল্যব্দ ৫০৩১ (১০)। এখন পূর্ব্বোক্ত মহাভারতের বচন ও কিংবদন্তী অনুসারে এইটুকু জানা গেল যে উক্ত কল্যব্দ আরম্ভের অনধিক পূর্ব্বে বা সেই বৎসরে কিংবা তাহার অনধিক পরে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল।

৪। এখন যুধিষ্ঠিরের প্রকৃত সময় জানা অত্যন্ত সহজ হইয়া আসিয়াছে। কেন না মহারাজ যশোধর্ম্মদেব বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার (১১) অন্যতম রত্ন জগদ্বিখ্যাত মহাকবি কালিদাস ৩০৬৮ কল্যব্দে (১২) (খৃষ্টজন্মের ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে) তাঁহার "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" (১৩) গ্রন্থের দশমাধ্যায়ে লিখিয়া গিয়াছেন—

"যুধিষ্ঠিরো বিক্রমশালিবাহনৌ নরাধিনাথৌ বিজয়াভিনন্দনঃ।
ইমেঽনু নাগার্জ্জুনমেদিনীবিভুর্বলিঃ ক্রমাৎ ষট্ শকারকা
নৃপাঃ" ॥১১০॥

যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন, বিজয়াভিনন্দন, নাগার্জ্জুন এবং বলি এই ছয় জন রাজা ক্রমশঃ শকাব্দ-(লৌকিক গণনাব্দ) প্রবর্ত্তক।

তৎপরে লিখিয়াছেন—

"যুধিষ্ঠিরাদ্বেদযুগাম্বরাগ্নয়ঃ কলম্ববিশ্বেহভ্র-খ-খাষ্টভূময়ঃ।
ততোঽযুতং লক্ষচতুষ্টয়ং ক্রমাদ্ধরা-দৃগষ্টাবিতি
শাকবৎসরাঃ" ॥১১১॥

(৮) শকনৃপস্য শকাব্দস্য, অন্তে আরম্ভাদৌ, নন্দাদ্রীন্দুগুণাঃ কলেবৎসরাঃ, তথা যাতাঃ। নন্দাঃ ৯, অদ্রয়ঃ ৭, ইন্দুঃ ১, গুণাঃ ৩, অঙ্কস্য বামাগতিরিতি ৩১৭৯।

(৯) যদা কলের্যুগস্য নবাগেন্দুকৃশানুযুক্তঃ অব্দগণো ভবতি, তদা শাকঃ শকাব্দারম্ভঃ। নব ৯, অগাঃ পর্ব্বতাঃ ৭, ইন্দুঃ ১, কৃশানবঃ ৩, অঙ্কস্য বামা গতিরিতি ৩১৭৯।

(১০) আধুনিক পঞ্জিকাসমূহে এই কল্যব্দই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(১১) "ধন্বন্তরি-ক্ষপণকামরসিংহ-শঙ্কু বেতালভট্ট ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥"
জ্যোতির্ব্বিদাভরণ ২২ অধ্যায় ১০ শ্লোক।

(১২) বর্ষৈঃ সিন্ধুরঃ দর্শনাম্বরঃ-গুণৈর্যাতে কলৌ সম্মিতে
মাসে মাধবসংজ্ঞিতে চ বিহিতো গ্রন্থক্রিয়োপক্রমঃ।
নানাকালবিধানশাস্ত্রগদিতজ্ঞানং বিলোক্যাদরাৎ
ঊর্জ্জে গ্রন্থসমাপ্তিরত্র বিহিতা জ্যোতির্ব্বিদাং প্রীতয়ে॥"
জ্যোতির্ব্বিদাভরণ ২২ অধ্যায় ২১ শ্লোক

"সিন্ধুরঃ (পুং) হস্তী" শব্দকল্পদ্রুমঃ। সিন্ধুর ৮, দর্শন ৬, অম্বর ০, গুণ ৩, 'অঙ্কস্য বামাগতিঃ' এই নিয়মে ৩০৬৮। কালিদাসের এই সময় সম্বন্ধে আমার টীকা ও বঙ্গানুবাদের সহিত প্রকাশিত মালবিকাগ্নিমিত্র ও অভিজ্ঞানশকুন্তল প্রভৃতি গ্রন্থের মুখবন্ধে বিস্তৃতভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে।

(১৩) "জ্যোতির্ব্বিদাভরণকালবিধানশাস্ত্রং
শ্রীকালিদাসকবিতো হি ততো বভূব।"...

জ্যোতির্ব্বিদাভরণ ২২ অধ্যায়। এই অধ্যায়ে বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে।

এই জ্যোতির্ব্বিদাভরণের "সুখবোধিকা" নাম্নী টীকা অনুসারে এইরূপ অর্থ জানা যায়—যুধিষ্ঠির হইতে ৩০৪৪ বৎসর, বিক্রমাদিত্য হইতে ১৩৫ বৎসর, শালিবাহন হইতে ১৮০০০ বৎসর, বিজয়াভিনন্দন হইতে ১০০০০ বৎসর, নাগার্জ্জুন হইতে ৪০০০০০ বৎসর এবং বলি হইতে ৮২১ বৎসর —এই ভাবে গণনাব্দ চলিয়াছিল, চলিতেছে এবং চলিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যুধিষ্ঠিরাব্দের ৩০৪৪ বৎসর অতীত হইলে বিক্রমাব্দ বা বিক্রম সংবৎ আরম্ভ হইয়াছে ; তাহাতে এখন আর সর্ব্বত্র যুধিষ্ঠিরাব্দ চলে না ; আবার এই বিক্রমাব্দের ১৩৫ বৎসর অতীত হইলে শকাব্দ বা শালিবাহনাব্দ আরম্ভ হইবে, তখনও আর এ বিক্রমাব্দ সর্ব্বত্র চলিবে না ইত্যাদি। এখন যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহনের ঐ অব্দসংখ্যা-গুলি যোগ করিলে কি হয় তাহা দেখা যাউক—

যুধিষ্ঠিরাব্দ	৩০৪৪
বিক্রমাব্দ	১৩৫
শকাব্দ বা শালিবাহনাব্দ (বর্ত্তমান)	১৮৫২
	৫০৩১

এখন দেখা যাইতেছে যে—পূর্ব্বে যে কল্যাব্দ ৫০৩১ জানা গিয়াছে, যুধিষ্ঠিরাব্দও অবিকল তাহাই ৫০৩১।

সম্ভবতঃ এ বিষয়ে জগতের সকল মনস্বীই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় "নবরত্ন" বলিয়া বিখ্যাত যে নয় জন পণ্ডিত ছিলেন তাঁহারা পণ্ডিতমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয়ই ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আবার কালিদাস কবিত্বে যেমন সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তেমন জ্যোতিষশাস্ত্রেও অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন ; তাহা তাঁহার "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" গ্রন্থ দেখিলে এবং কাব্যগ্রন্থগুলি পর্য্যালোচনা করিলে প্রমাণিত হইবে (১৪)। তা'রপর জ্যোতির্ব্বিদাভরণ গ্রন্থ যে সেই নবরত্ন সভায় আলোচিত, সম্মত ও আদৃত হইয়াছিল, তাহাতেও কোন সন্দেহ করিবার কারণ নাই। অতএব যুধিষ্ঠিরের সময়-নিরূপণ সম্বন্ধে প্রাচীন বা অর্ব্বাচীন যত রকম প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে এই জ্যোতির্ব্বিদা-ভরণোক্ত প্রমাণের গুরুত্ব যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সে সম্বন্ধে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। তবে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে কালিদাস মহাকবি এবং অসাধারণ জ্যোতিষী ছিলেন বটে, কিন্তু বেদব্যাস প্রভৃতির ন্যায় ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি ছিলেন না। সুতরাং তিনি যুধিষ্ঠিরাব্দ বা বিক্রমসংবৎ চলিতেছিল বলিয়া তাহার কথা লিখিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সময়ে দূর ও সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত শকাব্দ প্রভৃতির কথা তিনি লিখিয়া গেলেন কি করিয়া ? যদিও এ বিষয় পর্য্যালোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে তথাপি আমরা সংক্ষেপে একথা বলিতে পারি যে, অসাধারণ জ্যোতির্ব্বিৎ কালিদাস জ্যোতিষ গণনার সাহায্যেই জ্যোতির্ব্বিদাভরণে ঐ শকাব্দ প্রভৃতির কথা লিখিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও জ্যোতিষিকদিগকে দূর ভবিষ্যৎ গণনা করিতে দেখা যায় এবং সে গণনাও ফলের সঙ্গে মিলিয়া থাকে।

৫। সে যাহা হউক এখনও এই সন্দেহ রহিয়াছে যে, "যুধিষ্ঠিরাব্দেদযুগাম্বরাগ্নয়ঃ" এই জ্যোতির্ব্বিদাভরণের লেখা দ্বারা যুধিষ্ঠির হইতে যে ৩০৪৪ বৎসর পাওয়া যাইতেছে, তাহা যুধিষ্ঠিরের জন্ম হইতে বা তাঁহার রাজ্যলাভ হইতে অথবা তাঁহার স্বর্গারোহণ হইতে ধরা হইয়াছিল ? এই সন্দেহ ভঞ্জনেরও পর্য্যাপ্ত প্রমাণই রহিয়াছে। ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে (১৫) গুজরাটের চালুক্যবংশীয় রাজা দ্বিতীয় পুলিকেশী রবিকীর্ত্তি নামক কোন কবি দ্বারা (১৬) রচনা করাইয়া কতকগুলি শ্লোক একখানি শিলাফলকে উৎকীর্ণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন ; তাহার মধ্যে এই দুইটী শ্লোক দেখা যায়—

(১৪) "· ছায়া হি ভূমেঃ শশিনো মলত্বেনারোপিতা শুদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ॥" রঘুবংশ ১৪ সর্গ, ৪০ শ্লোক এই বিষয়টা যুক্তি দ্বারাও নিরূপিত হইতে পারে।

"গ্রহৈস্ততঃ পঞ্চভিরুচ্চসংশ্রয়ৈরসূর্য্যগৈঃ সূচিতভাগ্যসম্পদম্।"

রঘুবংশ ৩য় সর্গ, ১৩ শ্লোক।

"অঙ্গারও রাসিং বিঅ অণুবক্কং পড়িগমণংণ করেদি।"

মালাবিকাগ্নিমিত্র, ৩য় অঙ্ক।

(১৫) ৫৫৬ শকাব্দে এই শিলালিপি খোদিত হইয়াছিল, ইহা এই শিলালিপি হইতেই জানা যাইতেছে এবং শকাব্দের সহিত ৭৮ যোগ করিলে খৃষ্টাব্দ হয় ইহাও দেখা গিয়াছে। অতএব ৫৫৬ + ৭৮ = ৬৩৪ খৃষ্টাব্দ জানা গেল।

(১৬) রবিকীর্ত্তি নামক কোন কবি যে এই শ্লোকগুলি রচনা করিয়া-ছিলেন, তাহা এই শিলালিপিতেই আছে।

"ত্রিংশৎসু ত্রিসহস্রেষু ভারতাদাহবাদিতঃ।
সপ্তাব্দ-শত-যুক্তেষু গতেষ্বব্দেষু পঞ্চসু॥
পঞ্চাশৎসু কলৌ কালে ষট্‌সু পঞ্চশতাসু চ।
সমাসু সমতীতাসু শকানামপি ভূভুজাম্॥" (১৭)

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ হইতে ৩৭৩৫ বৎসর অতীত হইলে এবং শকাব্দের ৫৫৬ বৎসর অতীত হইলে এই শিলাফলক উৎকীর্ণ হইল।

ইহাতে বুঝা গেল যে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইতে যখন ৩৭৩৫ বৎসর, তখন শকাব্দের ৫৫৬ বৎসর ছিল। অতএব ৩৭৩৫ হইতে ৫৫৬ বাদ দিলে ৩১৭৯ থাকে; ঐ ৩১৭৯ যুধিষ্ঠিরাব্দেই শকাব্দ আরম্ভ হইয়াছিল ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়া আসিয়াছি। সুতরাং এখন এই যুধিষ্ঠিরাব্দ এবং শকাব্দ যোগ করিয়া দেখা যাউক কি হয়—

যুধিষ্ঠিরাব্দ	৩১৭৯
বর্ত্তমান শকাব্দ	১৮৫২
	৫০৩১

বর্ত্তমান ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কল্যব্দও ৫০৩১ ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। অতএব এই শিলালিপি অনুসারে নিঃসন্দেহে জানা যাইতেছে যে, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ শেষ হইবার পরদিন অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভের দিন হইতেই যুধিষ্ঠিরাব্দ আরম্ভ হইয়াছিল।

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ শেষ হইবার পরদিনই যে যুধিষ্ঠির রাজা হইয়াছিলেন তাহা বুঝিবার কারণ এই যে—"সপ্ত-বিত্তাগমা ধর্ম্মা দায়োলাভঃ ক্রয়ো জয়ঃ…" এই মনুবচন অনুসারে জয়কেও একটী স্বত্বের কারণ বলিয়া জানা যায়, অর্থাৎ জয় হইলেই বিজিত দ্রব্যে বিজেতার স্বত্ব জন্মে। সুতরাং যুদ্ধে জয় হওয়ার পরেই রাজ্যে যুধিষ্ঠিরের স্বত্ব জন্মিয়াছিল।

এইক্ষণ মহাভারত হইতে উদ্ধৃত "অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে" —ইত্যাদি বচন, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচলিত উল্লিখিত চিরকিংবদন্তী, ভাস্করাচার্য্য ও মকরন্দ-কারের কল্যব্দ নিরূপণ, কালিদাসের জ্যোতির্ব্বিদাভরণ এবং গুর্জ্জররাম দ্বিতীয় পুলিকেশীর শিলালিপি—এই কয়টী বিষয়ের অভূতপূর্ব্ব সামঞ্জস্য দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের এই সময় নিরূপণ সম্বন্ধে সন্দেহ না থাকায় বস্তুতই হৃদয় অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছে এবং আনন্দে উদ্বেলিত হইতেছে। সে যাহা হউক এখন সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, আজ হইতে ৫০৩১ বৎসর পূর্ব্বে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল এবং সেই বৎসরেই যুধিষ্ঠিরাব্দ এবং কল্যব্দ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল।

"তবে একমাসে বা একদিনে যুধিষ্ঠিরাব্দ এবং কল্যব্দ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল না। ইহার প্রমাণ ভারত-সাবিত্রীতে পাওয়া যায়। (১৮)

"হেমন্তে প্রথমে মাসি শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশীম্।
প্রবৃত্তং ভারতং যুদ্ধং নক্ষত্রে যমদৈবতে॥
… … … …
অমাবস্যান্তু মধ্যাহ্নে নিহতঃ শল্য এব চ।
অমাবস্যান্তু সন্ধ্যায়াং রাজা দুর্য্যোধনো হতঃ॥"

বেদে অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসকে হেমন্ত ঋতু বলা হইয়াছে, আর যমদৈবতনক্ষত্র ভরণী (১৯)। সুতরাং অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীর দিন ভরণী নক্ষত্রে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তী অমাবস্যার দিন মধ্যাহ্নকালে শল্য রাজা এবং সন্ধ্যাকালে কুরুরাজ দুর্য্যোধন ধরাশায়ী হইয়াছিলেন। অতএব মুখ্যচান্দ্র অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যাতে যুদ্ধ শেষ হইয়াছিল, তাহার পরদিনই পৌষ মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদে যুধিষ্ঠির রাজা হইয়াছিলেন এবং সেই দিন হইতেই যুধিষ্ঠিরাব্দ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল; আর সেই পৌষমাসের শুক্লপ্রতিপদ হইতে দেড়মাস অর্থাৎ ৪৫ দিন পরে মাঘী পূর্ণিমায় কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া সেই মাঘী পূর্ণিমা হইতেই কল্যব্দ গণনা চলিয়া

(১৭) এই শ্লোক দুটির ব্যাখ্যা—ভারতাৎ আহবাৎ কুরুপাণ্ডবীয়াদ যুদ্ধাৎ পরম্. ইতঃপূর্ব্বঞ্চ ত্রিসহস্রেষু সপ্তাব্দশতযুক্তেষু ত্রিংশৎসু পঞ্চসু চ অব্দেষু গতেষু সৎসু; শকানাং ভূভুজামপি পঞ্চশতাসু পঞ্চাশৎসু ষট্‌সু চ সমাসু বৎসরেষু, সমতীতাসু সতীষু, কলৌ কালে ইদমুৎকীর্ণমিত্যর্থঃ।

(১৮) ভারতসাবিত্রী যে কোন্ গ্রন্থের অন্তর্গত তাহা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তবে ইহা যে আর্ষ এবং প্রমাণিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কেন না, অনেক স্থানে শ্রাদ্ধে এই ভারতসাবিত্রী পঠিত হইয়া থাকে এবং ভীষ্মপর্ব্বে ১৭ অধ্যায়ে ২য় শ্লোকের টীকায় নীলকণ্ঠ ইহার অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(১৯) "…সহাশ্চ সহস্যশ্চ হৈমন্তিকাবৃতুঃ" তিথিতত্ত্বধৃত শ্রুতিঃ।" অশ্বি-যম-দহন-কমলজ-শশি-শূলভৃদদিতি-জীব-ফণি-পিতরঃ…" ইত্যাদি জ্যোতিষবচন অনুসারে ভরণী যমদৈবত নক্ষত্র।

আসিতেছে। মাঘী পূর্ণিমাতেই যে কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছিল তাহার প্রমাণ তিথিতত্ত্বধৃত বিষ্ণুপুরাণের বচন—

"বৈশাখমাসস্য তু যা তৃতীয়া নবম্যসৌ কার্ত্তিক শুক্লপক্ষে।
নভস্যমাসস্য তমিস্রপক্ষে ত্রয়োদশী পঞ্চদশী চ মাঘে॥
এতাঃ যুগাখ্যাঃ কথিতাঃ পুরাণৈরনন্তপুণ্যাস্তিথয়শ্চতস্রঃ।"

অতএব একই বৎসরে পৌষী শুক্ল প্রতিপদে যুধিষ্ঠিরাব্দ এবং তৎপরবর্ত্তী মাঘী পূর্ণিমাতে কল্যব্দ আরম্ভ হইয়াছিল।

সুতরাং যুধিষ্ঠির দ্বাপরযুগের শেষ দেড়মাস এবং কলিযুগের প্রথম অবস্থায় রাজত্ব করিয়াছিলেন ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। অতএব আধুনিক পঞ্জিকাকারগণ যে যুধিষ্ঠিরকে দ্বাপরের শেষ রাজা এবং কলিযুগের প্রথম রাজা বলিয়া লিখিয়া থাকেন, তাহাও ইহা দ্বারা সমর্থিত হইল।

পঞ্চ পাণ্ডব এবং দুর্য্যোধনের জন্ম ও মৃত্যুর সময়

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অনেক মনস্বী যুধিষ্ঠিরের সময় নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া আপন আপন মতানুসারে সুদীর্ঘ এক এক শতাব্দী বা তদন্তর্গত একটীমাত্র বৎসরই নিরূপণ করিয়া চরিতার্থ এবং সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়া গিয়াছেন; কিন্তু আমাদের সে শতাব্দী বা তাহার অন্তর্গত একটী বৎসরমাত্র নিরূপণ করিলে চলিবে না। কারণ আমরা মহাভারতের যথাস্থানে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন এবং দুর্য্যোধনের কোষ্ঠী সন্নিবেশিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি; তাহাতে যুধিষ্ঠির প্রভৃতির জন্ম সম্বন্ধীয় বৎসর, মাস, দিন, এমন কি দণ্ড পর্য্যন্ত আমাদের নিরূপণ করা আবশ্যক; তবে তাহা অসম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। কেন না মহাভারত যুধিষ্ঠির প্রভৃতির ইতিহাস; সুতরাং তাহাতে উঁহাদের প্রায় সমস্ত বৃত্তান্তই পাওয়া যায়।

যুধিষ্ঠির যে বৎসর রাজা হইয়াছিলেন সে বৎসরের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি; এখন সেই সময়ে তাঁহার ও ভীম প্রভৃতির কত বৎসর করিয়া বয়স হইয়াছিল ইহা জানিতে পারিলেই অনায়াসে তাঁহাদের জন্ম বৎসর জানা যাইবে; তা'রপর মহাভারতের আদি পর্ব্ব ১১৭ অধ্যায়ে উঁহাদের জন্ম-সন-তিথি এবং লগ্ন প্রভৃতি কোষ্ঠী করিবার উপকরণ প্রায় সমস্তই সুস্পষ্ট পাওয়া যায়। সুতরাং উঁহাদের কোষ্ঠী করা দুষ্কর হইবে বলিয়া মনে হয় না। সে যাহা হউক, যুধিষ্ঠির যখন রাজা হইয়াছিলেন তখন তাঁহার ও ভীম প্রভৃতির কত বৎসর করিয়া বয়স হইয়াছিল ইহাই এখন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক। মহাভারত আদিপর্ব্ব ১২০ অধ্যায়ে (মুম্বয়ী নির্ণয়সাগরযন্ত্রে মুদ্রিত পুস্তকে আদিপর্ব্ব ১৩৪ অধ্যায়ে এই কয়টী বচন দেখা যায়—

"পাণ্ডবানামিহায়ুষ্যং শৃণু কৌরবনন্দন!।
জগাম হাস্তিনপুরং ষোড়শাব্দো যুধিষ্ঠিরঃ॥১০॥
ভীমসেনঃ পঞ্চদশো বীভৎসুর্ব্বৈ চতুর্দ্দশঃ।
ত্রয়োদশাব্দৌ চ যমৌ জগ্মতুর্নাগসাহ্বয়ম্॥১১॥
তত্র ত্রয়োদশাব্দানি ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ সহোষিতাঃ।
ষণ্মাসান্ জাতুষগৃহান্মুক্তা জাতো ঘটোৎকচঃ॥১২॥
ষণ্মাসানেকচক্রায়াং বর্ষং পাঞ্চালকে গৃহে।
ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ সহোষিত্বা পঞ্চবর্ষাণি ভারত॥১৩॥
ইন্দ্রপ্রস্থে বসন্তস্তে ত্রীণি বর্ষাণি বিংশতিম্।
দ্বাদশাব্দানথৈকঞ্চ বভূবু দ্যূর্তনির্জ্জিতাঃ॥১৪॥
ভুক্ত্বা ষট্‌ত্রিংশতং রাজন্! সাগরান্তাং বসুন্ধরাম্।
মাসৈঃ ষড়ভির্মহাত্মনঃ সর্ব্বে কৃষ্ণপরায়ণাঃ॥১৫॥
রাজ্যে পরীক্ষিতং স্থাপ্য দিষ্টাং গতিমবাপ্ন বন্।
এবং যুধিষ্ঠিরস্যাসীদায়ুরষ্টোত্তরং শতম্॥১৬॥

এই বচনগুলির মর্ম্মার্থ—যুধিষ্ঠিরের ১৬ বৎসর, ভীমের ১৫ বৎসর, অর্জ্জুনের ১৪ বৎসর এবং নকুল ও সহদেবের ১৩ বৎসর বয়সের সময় তাঁহারা জন্মস্থান শতশৃঙ্গপর্ব্বত (হিমালয়ের অংশ বিশেষ) হইতে হস্তিনারাজধানীতে গমন করেন। সেখানে তাঁহারা দুর্য্যোধন প্রভৃতির সঙ্গে ১৩ বৎসর বাস করেন, পরে জতুগৃহে যাইয়া ৬ মাস থাকিয়া তথা হইতে চলিয়া যান; পথে ঘটোৎকচের জন্ম হয়; তৎপরে তাঁহারা একচক্রাপুরীতে ৬ মাস থাকিয়া দ্রুপদ রাজার ভবনে ১ বৎসর থাকেন; তথা হইতে আসিয়া আবার হস্তিনায় দুর্য্যোধন প্রভৃতির সঙ্গে ৫ বৎসর থাকিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে যাইয়া ২৩ বৎসর অতিবাহিত করেন; তৎপরে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া ১২ বৎসর বনবাস এবং ১ বৎসর অজ্ঞাতবাস করেন; (তাহার পর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যুধিষ্ঠির রাজা হন) তৎপরে তিনি ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন। তদনন্তর তাঁহারা পরীক্ষিতকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া মহাপ্রস্থান করেন। তৎপরে যুধিষ্ঠির ৬ মাসে

স্বর্গলোকে যাইয়া উপস্থিত হন। আর ভীম প্রভৃতি সকলেই স্বর্গে যাইবার পথে পর্ব্বত হইতে পতিত হন। এই হিসাবে স্বর্গারোহণ করিবার সময়ে যুধিষ্ঠিরের ১০৮ বৎসর ৬ মাস বয়স হইয়াছিল।

হস্তিনায় উপস্থিত হইবার সময়ে যুধিষ্ঠির প্রভৃতির যে উক্তরূপই বয়স হইয়াছিল, তাহা আদিপর্ব্ব—প্রথম অধ্যায়ের ৭৭ শ্লোকটী পর্য্যালোচনা করিলেও বুঝিতে পারা যায়। যথা—

"ঋষিভিশ্চ তদা নীতা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ প্রতি স্বয়ম্।
শিশবশ্চাভিরূপাশ্চ জটিলা ব্রহ্মচারিণঃ ॥৭৭॥

মুনিরা নিজেরাই দুর্য্যোধন প্রভৃতির নিকটে তখন ব্রহ্মচারী, জটাধারী ও সুন্দরাকৃতি সেই বালক কয়টীকে নিয়া গেলেন ॥৭৭॥

উপনয়ন না হইলে ব্রহ্মচারী হয় না; অথচ ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন একাদশ বৎসরে বিহিত (২০)। সুতরাং নকুল ও সহদেবের একাদশ বৎসরে উপনয়ন হইলে এবং তাহার পর এক বৎসরের কিছু অধিক কাল সেই পর্ব্বতে থাকিয়া পাণ্ডু পরলোকগমন করিলে নকুল ও সহদেবের ১৩ বৎসর বয়স হয়; তাহাতে যুধিষ্ঠিরের ১৬, ভীমের ১৫ এবং অর্জ্জুনের ১৪ বৎসর বয়সই দাঁড়ায়।

সে যাহা হউক, উক্ত বচনগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া ইহাই বুঝা যায় যে, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সময়ে যুধিষ্ঠিরের ৭২, ভীমের ৭১, অর্জ্জুনের ৭০ এবং নকুল ও সহদেবের ৬৯ বৎসর বয়স হইয়াছিল (২১)। তাহার পর জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের নিয়ম আছে যে, বয়স হিসাবে যে বৎসর, মাস বা দিন লিখিত হয়, তাহা অতীতই ধরিতে হয়। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে যুধিষ্ঠির প্রভৃতির যথাক্রমে ৭২, ৭১, ৭০ ও ৬৯ বৎসর এবং কয়েক মাস ও দিন অতীত হইয়াছিল। ওদিকে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে অগ্রহায়ণ মাসে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ এবং পরবর্ত্তী মাঘী পূর্ণিমায় কলিযুগ ও কল্যব্দ আরম্ভ হইয়াছিল; আবার আদিপর্ব্বেরই ১১৭ অধ্যায়ের সুস্পষ্ট বচন ও যুক্তি অনুসারে জানা যায় যে জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমায় যুধিষ্ঠিরের, চৈত্র মাসের শুক্লাত্রয়োদশীতে ভীম ও দুর্য্যোধনের এবং ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমায় অর্জ্জুনের জন্ম হইয়াছিল (২২)। এখন ইহা জানা গেল যে সেই জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমায় যুধিষ্ঠিরের ৭২ বৎসর, চৈত্র মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে ভীমের ৭১ বৎসর এবং ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমায় অর্জ্জুনের ৭০ বৎসর বয়স হইয়াছিল; তখন তাঁহারা অজ্ঞাতবাস হইতে মুক্ত হইয়া দুর্য্যোধনের সহিত সন্ধির চেষ্টা করেন এবং তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে থাকেন; তাহাতে আষাঢ় মাস হইতে অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাদ্বাদশী পর্য্যন্ত সময় অতীত হয়। তাহার পর অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লত্রয়োদশীতে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া আঠার দিনের দিন অমাবস্যাতে জয়লাভ করেন; তাহার পরদিন পৌষী শুক্লপ্রতিপদে যুধিষ্ঠির রাজা হন এবং তৎপরবর্ত্তী মাঘীপূর্ণিমাতে কলিযুগ ও কল্যব্দ আরম্ভ হয়। সুতরাং এই হিসাবে নিম্নে যুধিষ্ঠির প্রভৃতির জন্ম ও মৃত্যুর সময় লিখিত হইল।

১। কল্যব্দ আরম্ভের ৭২ বৎসর, ৭ মাস, ২৯ দিন পূর্ব্বে (৩১৭৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) জ্যৈষ্ঠ মাসে, পূর্ণিমা তিথিতে, দিনের বেলা ১৬ দণ্ড সময়ে শতশৃঙ্গপর্ব্বতে যুধিষ্ঠিরের জন্ম এবং ৩৭ কল্যব্দে (৩০৬৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) স্বর্গারোহণ হইয়াছিল।

২। কল্যব্দ আরম্ভের ৭১ বৎসর, ১০ মাস, ২ দিন পূর্ব্বে (৩১৭৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) চৈত্র মাসে, শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে, দিনের বেলা ১৬ দণ্ড সময়ে শতশৃঙ্গপর্ব্বতে ভীমসেনের জন্ম এবং ৩৭ কল্যব্দে (৩০৬৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) মৃত্যু।

(২০) "গর্ভাষ্টমেঽষ্টমে বাব্দে ব্রাহ্মণস্যোপনয়নম্। রাজ্ঞামেকাদশে সৈকে বিশামেকে যথা কুলম্॥" যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

(২১) এই বয়সে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি বৃদ্ধ এবং অক্ষম হইবারই সম্ভাবনা; এরূপ ধারণা করা সঙ্গত নহে। কারণ উহাদেরই পিতামহ ভীষ্ম এবং দ্রোণ প্রভৃতি যথানিয়মে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ইহা মহাভারতেই দেখা যায়। আর এক কথা—ভীমের পুত্র ঘটোৎকচ, ঘটোৎকচের পুত্র অঞ্জনপর্ব্বা। এই অঞ্জনপর্ব্বা ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া দ্রোণপর্ব্বে লেখা আছে। সুতরাং যাহার পৌত্র মহাযোদ্ধা, তাহার বা তাহার সমবয়স্ক ভ্রাতাদের বয়স যে ৭০ বৎসরের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তারপর ইয়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মাণ সেনাপতি হিণ্ডেন-বার্গেরও ৮২ বৎসর বয়স ছিল বলিয়া শুনা যায় এবং বর্ত্তমান সময়েও ঐরূপ বয়সের অনেক লোককেই সমস্তকার্য্যক্ষম দেখা যায়।

(২২) এই আদিপর্ব্বের ১১৭ অধ্যায়ে নকুল ও সহদেবের জন্ম-মাস প্রভৃতির কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং উহাদের কোষ্ঠী দেওয়া যাইবে না।

৩। কল্যব্দ আরম্ভের ৭১ বৎসর, ১০ মাস, ২ দিন পূর্ব্বে (৩১৭৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) চৈত্রমাসে, শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে, রাত্রি ৬ দণ্ড সময়ে হস্তিনা রাজধানীতে দুর্য্যোধনের জন্ম এবং কল্যব্দ আরম্ভের দেড়মাস পূর্ব্বে (৩০২৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) রণক্ষেত্রে মৃত্যু (২৩)।

৪। কল্যব্দ আরম্ভের ৭০ বৎসর ১০ মাস ২৯ দিন পূর্ব্বে (৩১৭২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) ফাল্গুনমাসে, পূর্ণিমা তিথিতে, দিনের বেলা ২১ দণ্ড সময়ে, শতশৃঙ্গপর্ব্বতে অর্জ্জুনের জন্ম এবং ৩৭ কল্যব্দে (৩০৬৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) মৃত্যু।

৫। কল্যব্দ আরম্ভের ৬৯ বৎসর পূর্ব্বে (৩১৭১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) শতশৃঙ্গপর্ব্বতে নকুল ও সহদেবের জন্ম এবং ৩৭ কল্যব্দে (৩০৬৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) মৃত্যু (২৪)।

অদ্য ৫০৩১ কল্যব্দের, ১৮৫২ শকাব্দের এবং ১৩৩৭ সালের ১৯শে অগ্রহায়ণ (১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর)। সুতরাং অদ্য হইতে ৫১০৩ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হইয়াছিল। এই নিয়মে ভীম প্রভৃতিরও গণনা করিতে হইবে।

(২৩) "যস্মিন্নহনি ভীমস্তু জজ্ঞে ভরতসত্তম ! দুর্য্যোধনোঽপি তত্রৈব প্রজজ্ঞে বসুধাধিপ !॥" আদিপর্ব্ব ১১৭ অধ্যায় ২১ শ্লোক। ইহাতে জানা যায়—ভীম ও দুর্য্যোধনের এক তারিখেই জন্ম—মধ্যাহ্ন সময়ে ভীমের জন্ম সেখানেই লিখিত আছে. আর যুক্তি দ্বারা জানা যায় যে সেই রাত্রিতে তুলা লগ্নে দুর্য্যোধনের জন্ম হইয়াছিল। তত্রত্য ভারত-কৌমুদী টীকায় যুক্তি দ্রষ্টব্য।

(২৪) নকুল ও সহদেবের জন্ম মাস প্রভৃতি মূলে লিখিত নাই বলিয়া তাহা লেখা গেল না। সুতরাং ইঁহাদের কোষ্ঠীও দেওয়া যাইবে না।

দ্বৈরথ

"বনফুল"

(৯)

আদার ব্যাপারীর পক্ষে জাহাজের খবর রাখাটা যতদূর হাস্যকর জাহাজের ব্যাপারীর পক্ষে আদার খবর রাখাটা ততদূর নহে। কাহারো কাহারো নিকট ইহাই হয়ত বিস্ময়ের বস্তু। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাহাজ লইয়া যাঁহার কাঁরবার, আদা-জাতীয় সামান্য দ্রব্য সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় পাইলে আমরা স্বভাবতঃই তাঁহার প্রতিভার সর্ব্বতোমুখী প্রসার দেখিয়া মুগ্ধ এবং বিস্মিত হই।

চালভাজা খাওয়াটা এমন কোন বিশেষত্বের পরিচায়ক নহে—কিন্তু যখনই আমরা শুনি অমুক মহারাজাধিরাজ চালভাজা খাইতে ভালবাসেন—কিম্বা আমেরিকার অমুক কোটিপতি সুন্দররূপে জুতা বুরুষ করিতে পারেন অমনি আমরা চমৎকৃত হইয়া যাই।

সুতরাং জমিদার উগ্রমোহন সিংহের প্রকাণ্ড জমিদারীর সুদক্ষ ম্যানেজার অঘোরবাবুকে রুম্নির সহিত ছেলেমানুষের মত লুকোচুরি খেলিতে দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইতে পারেন।

অঘোরবাবুর শিশুমনস্তত্বে যে এতখানি পারদর্শিতা ছিল—তাহা বোধ করি তিনি নিজেও জানিতেন না। কিন্তু 'ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে' নীতির অনুসরণ করিয়া তিনি শিশুমনোরঞ্জনে নিজেকে একান্তভাবে নিয়োগ করিয়াছেন এবং আবিষ্কার করিয়াছেন যে জটিল মকোদ্দমার জয়লাভ করিতে হইলে যে ধরণের বুদ্ধিকৌশল প্রয়োজন শিশুহৃদয় জয় করিতে হইলে সে সবের প্রয়োজন হয় না বটে, কিন্তু ইহাতেও কৌশলের প্রয়োজন আছে—যদিও তাহা বিভিন্ন জাতীয়। সুতরাং লুকোচুরি, কানামাছি প্রভৃতি খেলার আশ্রয় লইতে হইয়াছে এবং ইহাতে তিনি কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। রুম্নি ঝুম্নি অঘোরবাবুকে লইয়া সমস্ত দিন হৈ চৈ করিতেছে।

অঘোরবাবু আয়োজনের কোন ক্রটি করেন নাই। সম্মুখস্থ তিনটি বড় বড় বৃক্ষে তিনটি দোল্না টাঙান হইয়াছে। রুম্নি ঝুম্নি এবং অঘোরবাবু তিনজনে পাল্লা দিয়া তাহাতে দোল খাইয়া থাকেন। কোথা হইতে একটি

বাঁদর ছানাও তিনি জোগাড় করিয়াছেন। নিম গাছটার শিকড়ের সঙ্গে শিকল দিয়া বাঁধা আছে। এই জীবটির নানাবিধ মুখভঙ্গী রুম্‌নি ঝুম্‌নির পক্ষে পরম কৌতুকের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। খরগোসটি ত আছেই। তাহার জন্য নূতন একটি খাঁচাও নির্ম্মিত হইয়াছে। দুই জোড়া পারাবতও জুটিয়াছে। তাহাদের বক্‌বকম্ ধ্বনিতে কাছারি বাড়ীর প্রাঙ্গণ মুখরিত।

অঘোরবাবু লোকটিকে দেখিলে মনে হয় না যে তাঁহার মধ্যে এতটা তরল মনোবৃত্তি প্রচ্ছন্ন ছিল। ভদ্রলোকের গায়ের বর্ণ ঘোর কালো। মুখখানা লম্বা গোছের। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় পাথরের তৈরি। অভিব্যক্তিবিহীন মুখের উপর মনের কোন ছাপ নাই। একজোড়া ঝোলা তামাটে রঙের গোঁফ থাকাতে আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাকে আরও ভয়ঙ্কর এবং বেরসিক বলিয়া বোধ হয়। অঘোরবাবু একজন তান্ত্রিক কালী-সাধক। এখনও মধ্যে মধ্যে চামা-প্রান্তরস্থিত মহাকালীর মন্দিরে গিয়া অমাবস্যায় তিনি কালীপূজা করেন। কিন্তু তিনি যে এমন নিখুঁতভাবে মোরগের ডাক ডাকিতে পারেন তাহা এতকাল কেহ জানিত না। শুধু মোরগ কেন, মুখে চাদর ঢাকা দিয়া বিড়াল ও কুকুরের ঝগড়া তিনি এমন সুন্দরভাবে দেখাইতে পারেন যে রুম্‌নি ঝুম্‌নির বিস্ময় ও শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না।

কিন্তু এত সত্ত্বেও রুম্‌নি ঝুম্‌নি অঘোরবাবুকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছে—'বাবার কাছে কবে ফিরে যাব—বল না!' স্তোকবাক্যে অঘোরবাবু অপটু নহেন সুতরাং দিন মন্দ কাটিতেছিল না। এত অজস্র আমোদপ্রমোদ রুম্‌নি ঝুম্‌নির জীবনে এই প্রথম।

সেদিন প্রাতঃকালে কুমীর-কুমীর খেলা হইতেছিল। অঘোরবাবু প্রাঙ্গণের মাঝখানে হামাগুড়ি দিয়া কুম্ভীর সাজিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার চক্ষু দুইটি অর্দ্ধ মুদিত। রুম্‌নি ঝুম্‌নি প্রাঙ্গণস্থিত একটি উচ্চ চৌতারাকে ডাঙ্গা কল্পনা করিয়া তদুপরি দাঁড়াইয়া ছিল এবং সুযোগ মত কুম্ভীর-রূপী অঘোরবাবুকে খোঁচা দিয়া ছুটিয়া পলাইতেছিল। অঘোরবাবুও তাহাদের ধরিতে না পারার ভান করিয়া ছদ্ম ক্রোধে হাঁউ মাউ করিয়া গর্জ্জাইতেছিলেন এবং তাহা দেখিয়া রুম্‌নি ঝুম্‌নি কলহাস্যে লুটাইয়া পড়িতেছিল। খেলা বেশ জমিয়াছে এমন সময় ভিখন তেওয়ারি আসিয়া সংবাদ দিল যে খরগোসটি পলাইয়াছে—খাঁচার দরজা খোলা ছিল।

অকস্মাৎ এই মর্ম্মান্তিক সংবাদ শ্রবণে সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। অঘোরবাবু এমন একটা মুখভাব করিলেন যেন জমিদারীর একটা মৌজা বেদখল হইয়া গিয়াছে। তিনজনেই ঘটনাস্থলে অবিলম্বে গেলেন এবং আশে পাশে খুঁজিয়া দেখিতে লাগিলেন।

রুম্‌নি হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"এই যে এই বাক্সটার পেছনে রয়েছে। ওই যা—আবার পালাল—"

খরগোস ঘর ছাড়িয়া প্রাঙ্গণে নামিয়া সোজা ছুট দিল। অঘোরবাবু, ভিখন তেওয়ারি, রুম্‌নি ঝুম্‌নি সকলেই দৌড়িয়া একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর ভিখন তেওয়ারি অভিমত প্রকাশ করিল যে উহাকে খুঁজিয়া পাওয়া এখন মনুষ্যের সাধ্যাতীত—সুতরাং সে চেষ্টা করা বৃথা। মংলু মাঝিকে খবর দিয়া সে মালকাইনদের জন্য আবার 'খর্‌হা' সংগ্রহ করিয়া দিবে। এ জঙ্গলে খরগোসের অভাব নাই। অঘোরবাবুর দিকে ফিরিয়া সে অনুমতি ভিক্ষা করিল যে হুজুর যদি হুকুম দেন তাহা হইলে সে এখন 'ভান্‌সা ঘরে' অর্থাৎ রান্নাঘরে ফিরিয়া যায়—কারণ সে 'অধন্' অর্থাৎ ভাতের জল চড়াইয়া আসিয়াছে। অঘোরবাবু অনুমতি দিলেন। ভিখন তেওয়ারি চলিয়া গেলে রুম্‌নি বলিল—"ও যাক্‌গে। আমরা আর একটু খুঁজে দেখি চল—"

ঝুম্‌নি তৎক্ষণাৎ তাহার সমর্থন করিয়া বলিল—"ও নিশ্চয়ই এইখানে কোথাও আছে। অতটুকু বাচ্চা খরগোস্ কি আর বেশী দূর দৌড়ুতে পারবে? নিশ্চয়ই হাঁপিয়ে পড়ে কাছাকাছি কোন ঝোপঝাপে লুকিয়ে আছে—"

অঘোরবাবু প্রতিবাদ করিলেন না। কহিলেন—"যা বলেছ দিদিমণি, আর একটু খুঁজেই দেখা যাক্—" কুম্ভীর সাজিয়া হামাগুড়ি দিয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা এ কার্য্য তাঁহার অধিক মনোরম বলিয়া বোধ হইল। সুতরাং তাঁহারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে নিবিড়তর জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। নিবিড় জঙ্গল মনুষ্য-বিরল হইলেও শব্দ-বিরল নহে। বনের নিজস্ব একটা ধ্বনি আছে।

তাহা ছাড়া নানাবিধ পাখীর ডাক। "ঘুগ্ ঘুগ্ ঘুগ্ ঘুগ্" —অজ্ঞাতনামা এক পাখী অবিশ্রান্ত ডাকিয়া চলিয়াছে। তাহার সঙ্গে তাল রাখিয়া আর একটি অজানা পাখী ভিন্ন গ্রামে ডাকিতেছিল—"ক্রে-কট্,—ক্রে-কট্—ক্রে-কট্।" বনের মধ্য হইতে সামান্য একটু ফাঁকা জায়গায় আসিতেই তাহারা দেখিল যে চকিত এক পক্ষী-দম্পতি দ্রুতধাবনে নিকটস্থ একটা ঝোপে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অঘোরবাবু বলিলে—"একজোড়া তিতির—"

সহসা ঝুম্‌নি বলিয়া উঠিল—"দেখ দেখ কেমন সুন্দর ফুল—"

রুম্‌নিও মুগ্ধকণ্ঠে কহিল—"চমৎকার! কিসের ফুল ওগুলো?"

অঘোরবাবু বলিলেন—"ও একটা পরগাছার ফুল—"

প্রকাণ্ড একটা বৃদ্ধ বৃক্ষের উপর একটা দুঃসাহসিনী পরগাছা লতা উঠিয়া স্তবকে স্তবকে সুন্দর ফুল ফুটাইয়া হাসিতেছে—যেন বৃদ্ধ ঠাকুরদাদার কাঁধে চাপিয়া অলঙ্কৃতা নাতিনী আবদার জুড়িয়া দিয়াছে।

"ওখানে ওটা সাদা রঙের কি?"

বস্তুতঃ একটা সাদা চুনকাম-করা ঘরের দেওয়ালের খানিকটা অংশ দেখা যাইতেছিল। রুম্‌নি জিজ্ঞাসা করিল —"ওটা কি দাদু"—

"ওটা যমঘর—"—বলিয়াই অঘোরবাবু বলিলেন "ও এমনি একটা ঘর—বনের মধ্যে করা আছে—ও এমন কিছু নয়—চল এবার ফেরা যাক্।"

রুম্‌নি বলিল—"চল না ওটা দেখে আসি—"

ঝুম্‌নি বলিল—"হ্যাঁ চল!"

অঘোরবাবু মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু মুখে বলিলেন "চল। ওতে দেখবার আর কি আছে? তার চেয়ে চল গিয়ে এখন কুমীর কুমীর খেলি গে।"

রুম্‌নি ঝুম্‌নি কিন্তু ছাড়িল না। ঘর তাহাদের দেখাইতেই হইল। সত্যই ঘরটিতে দেখিবার বিশেষ কিছু ছিল না। ঘরের বিশেষত্ব শুধু এই যে তাহার চারিদিকেই পাকা দেওয়াল দিয়া ঘেরা—খুব উঁচু দেওয়াল এবং ঘরের একটি যে দ্বার আছে তাহাও লৌহের এবং তালা বন্ধ। জানালা একটিও নাই।

রুম্‌নি বলিল—"এটাতে কি হয়?"

"কিছু নয়—তোমার দাদুর অমনি সখ হয়েছিল।"

অঘোরবাবু এই ঘন জঙ্গলে অবস্থিত ঘরটির ইতিহাস গোপন রাখিলেন। স্বয়ং উগ্রমোহন সিংহ, অঘোরবাবু এবং ভিখন্ তেওয়ারি ছাড়া যম-ঘরের প্রকৃত পরিচয় কেহ জানিত না। জমিদারীর অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ মনে করিত উহাতে বাবুর শিকারের আসবাবপত্রাদি বন্ধ থাকে।

তাহারা তিনজনে ফিরিতেছিল—এমন সময় ভিখন তেওয়ারি আসিয়া খবর দিল যে মৃণ্ময় ঠাকুর আসিয়াছেন এবং অঘোরবাবুর মোলাকাৎ ভিক্ষা করিতেছেন।

(১০)

অঘোরবাবু আসিয়া মৃণ্ময় ঠাকুরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে নমস্কার করিলেন। এতকাল অবশ্য মৃণ্ময় ঠাকুরই অঘোর-বাবুকে নমস্কার করিয়া আসিয়াছেন। কারণ অঘোরবাবু জমিদারীর মহামান্য ম্যানেজার এবং মৃণ্ময়ঠাকুর সামান্য একজন প্রজা মাত্র। চাকা কিন্তু ঘুরিয়া গিয়াছে। উগ্রমোহনবাবুর নাতিনীদ্বয়ের সঙ্গে মৃণ্ময়ঠাকুরের ছেলেদের বিবাহ হইবে—সুতরাং মৃণ্ময়ঠাকুরকে এখন সামান্য প্রজারূপে গণ্য করা চলিবে না।—অঘোরবাবু তাহা বুঝিলেন এবং বুঝিয়াই শ্রদ্ধাভরে নমস্কার করিলেন। ইহার উত্তরে মৃণ্ময়ঠাকুর কিন্তু যাহা করিলেন তাহা এতই অপ্রত্যাশিত যে রুম্‌নি ঝুম্‌নি ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। মৃণ্ময়ঠাকুর অঘোরবাবুর পাদদেশে দড়াম্ করিয়া পড়িয়া হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

অঘোরবাবু রুম্‌নি ঝুম্‌নিকে ভিতরে যাইতে বলিয়া শশব্যস্তে মৃণ্ময়ঠাকুরকে দুই হাত ধরিয়া তুলিলেন এবং বলিলেন—"ছি, ছি, এ কি করলেন আপনি!"

"বাঁচান আমাকে ম্যানেজারবাবু—আর ত বেশী দিন বাকী নেই। কোন উপায় আর ভেবে পাচ্ছি না—"

"কিসের উপায়?"

"বাঁচবার। এ বিয়ে আমি দিতে চাই না অঘোরবাবু। আপনি কোন উপায় করে এ থেকে উদ্ধার করুন আমাকে।"

অঘোরবাবুর প্রস্তরবৎ মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া মৃণ্ময়ঠাকুর আশা বা নিরাশা কিছুরই আভাস পাইলেন না। অঘোরবাবু কেবল বলিলেন—"মাল্লিকের যখন এই

অভিপ্রায়—তখন আমি আর কি করতে পারি। ষ্টেটের যদি কোন ব্যাপার হত আমি কিছু হয়ত করতে পারতাম। কিন্তু এ-সব বিবাহ ব্যাপারে আমার কোন কথা চল্‌বে না। আপনার আপত্তিটা কি?"

মৃণ্ময়ঠাকুর মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। তাঁহার বিস্ফারিত ও অবিস্ফারিত উভয় চক্ষেই সংশয়াকুল দৃষ্টি দেখিয়া অঘোরবাবু আবার বলিলেন—"অবশ্য আমাকে যদি বলতে বাধা থাকে শুনতে চাই না আমি—কিন্তু উগ্রমোহন-বাবুর সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপন করা কোন দিক থেকেই ত অবাঞ্ছনীয় মনে করি না।"

মৃণ্ময়ঠাকুর বলিলেন—"গঙ্গাগোবিন্দের বংশ পরিচয় সব জানেন আপনি? গঙ্গাগোবিন্দ নিজে অবশ্য লোক ভাল—পণ্ডিত সজ্জন লোক—কিন্তু গঙ্গাগোবিন্দের পিতামহ নাকি সমাজে পতিত হয়েছিলেন—তাঁর দুশ্চরিত্রা এক বিধবা মেয়েকে ঘরে স্থান দিয়েছিলেন বলে!"

অঘোরবাবুর প্রস্তরবৎ মুখমণ্ডল কঠিনতর হইল। তিনি সংক্ষেপে বলিলেন—"আসল কথাটা কি বলুন দেখি? কোথা থেকে এসব গুজব আপনার কানে এল! গঙ্গাগোবিন্দ উগ্রমোহনবাবুর ভাগ্নীজামাই তা জানেন?"

মৃণ্ময়ঠাকুরের বিস্ফারিত চক্ষুটি অসহায়ভাবে অঘোর-বাবুর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল।

অঘোরবাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথা থেকে এসব বাজে কথা শুনলেন আপনি?"

একটা ঢোক গিলিয়া মৃণ্ময়ঠাকুর বলিলেন—"কথাটা বলবেন না যেন উগ্রমোহনবাবুকে। পৃথ্বীশপুরের কালীপদ পুরোহিত আমাকে বলছিলেন। তিনি এদিককার একটা প্রাচীন লোক। তাঁর কথা সহজে অবিশ্বাস করা—"

মৃণ্ময়ঠাকুর কথা শেষ করিতে পারিলেন না।

অঘোরবাবু মৃণ্ময়ঠাকুরকে বলিলেন—"আপনি বসুন ওখানে। ভিখন তেওয়ারি—"

ভিখন তেওয়ারি আসিতেই তিনি হুকুম দিলেন—"চারিজন সিপাহী এখনই পৃথ্বীশপুরে পাঠাইয়া কালীপদ পুরোহিতকে ডাকাইয়া আনিবার বন্দোবস্ত কর।"

ব্যাপারটা যে ঠিক এতদূর চট্ করিয়া গড়াইয়া যাইবে মৃণ্ময়ঠাকুর তাহা ভাবেন নাই। তিনি তাড়াতাড়ি অঘোরবাবুর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—"আহা, পুরোহিত মশাইকে আবার কেন কষ্ট দেবেন—এত বেলায়। আমার কথাটা শুনুন শেষ পর্য্যন্ত।"

নিষ্পলক এক জোড়া চক্ষু মৃণ্ময়ের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া ধীরকণ্ঠে অঘোরবাবু বলিলেন—"আপনি বিষধর সাপ নিয়ে খেলা করছেন। বুঝে সুঝে করবেন।"

মৃণ্ময়ঠাকুর এইবার তাঁহার শেষ চালটি চালিলেন—অর্থাৎ পকেট হইতে একখানি একশত টাকার নোট বাহির করিয়া অঘোরবাবুর হাতে দিতে গেলেন।

বিস্মিত অঘোরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"এর মানে কি?"

মিনতি করিয়া মৃণ্ময়ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—"অতি দরিদ্র আমি! এর বেশী আর আমার সামর্থ্য নেই! দয়া করে ভেঙে দিন্ বিয়েটা! আপনি ইচ্ছে করলে সবই পারেন। উগ্রমোহনবাবু আপনার পরামর্শ কখনো অগ্রাহ্য করেন না।"

কথাটা ঠিক। কিন্তু ইহাও ঠিক যে অঘোর চক্রবর্ত্তী উগ্রমোহন সিংহের সুযোগ্য ম্যানেজার। উগ্রমোহনের আত্মসম্মানলাঘবকারী কোন পরামর্শ আজ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহাকে দেন নাই। মৃণ্ময়ঠাকুরের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন "আপনি আমাকে যে অপমান করলেন এখনই তার উপযুক্ত জবাবদিহি আপনাকে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে করতে হত!—কিন্তু আপনি রুম্‌নি ঝুম্‌নির শ্বশুর হবেন আপনার শারীরিক অপমান আমি কোরব না। আপনি স্থির হয়ে বলুন দেখি কি আপত্তি আপনার? সত্যই কি গঙ্গাগোবিন্দের পিতামহ সম্বন্ধে ও-কথা শুনেছিলেন আপনি?"

মৃণ্ময়ঠাকুর বলিলেন—"হ্যাঁ শুনেছিলাম বৈ কি। কালীপদ পুরোহিতের কাছেই শুনেছিলাম। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, আমার আসল আপত্তি তা নয়। আসল আপত্তিটা হচ্ছে গিয়ে যে আমার ছেলেদের আমি অন্যত্র সম্বন্ধ করেছি—তারা হাজার পাঁচেক টাকা দেবে—গয়না পত্তর দেবে—তাছাড়া দু'শ বিঘে জমি লিখে দেবে বলছে।"

অঘোরবাবু শুনিয়া নীরব হইয়া রহিলেন—তাঁহার পাথরের মত মুখ পাথরের মত হইয়াই রহিল—কোনরূপ ভাবান্তর ঘটিল না। তিনি দক্ষিণ করতল দিয়া কেবল তাঁহার তামাটে গোঁফ জোড়া অকারণে গুছাইতে লাগিলেন।

তাঁহাকে এরূপভাবে নীরব থাকিতে দেখিয়া মৃণ্ময়ঠাকুর মনে করিলেন—অঘোরবাবু বুঝি বা তাঁহার যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং বিস্ফারিত চক্ষুটিতে আরও একটু মিনতির ভাব ফুটাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—

—"আপনি বুদ্ধিমান লোক। আমাদের মত গরীবের সুখ দুঃখ বুঝবেন আপনি। উগ্রমোহনবাবুর কাছে মুখ ফুটে কিছু চাইতে পারব না ত আমি। তিনি যা দেবেন আমাকে মাথা পেতে নিতে হবে। অথচ কমলাক্ষবাবু—"

"কমলাক্ষ? কোন কমলাক্ষ? চন্দ্রকান্তবাবুর ম্যানেজার?"

তিনটি প্রশ্ন যেন তিনটি গুলির মত অঘোরবাবুর মুখ হইতে বাহির হইল। অন্যমনস্কতার জন্য অসাবধানে কমলাক্ষবাবুর নামটা মৃণ্ময়ঠাকুরের মুখ দিয়া ফস্কাইয়া বাহির হইয়া পড়াতে তিনি একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন এবং সামলাইবার জন্য বলিলেন—"না, না, এ অন্য কমলাক্ষ। অর্থাৎ—"

অঘোরবাবু ব্যাপারটা আগাগোড়া বুঝিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু বাহিরে তিনি মাত্র বলিলেন—"ও" এবং তাহার পর সস্মিত মুখে মৃণ্ময়ঠাকুরের দিকে চাহিয়া আবার বলিলেন—"এটা অবশ্য আপনি ওয়াজিব কথাই বলেছেন। মালিকের সঙ্গে দেখা হলে আমি এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করব। আমার বিশ্বাস টাকার জন্য কিছু আটকাবে না। টাকার জন্য উগ্রমোহনবাবু কখনও পিছপাও হয়েছেন জানেন?"

মৃণ্ময়ঠাকুর সভয়ে বলিলেন—"না, না, অমন কাজও আপনি করবেন না! তাঁর কাছে মরে গেলেও আমি পণের কথা বলতে দেব না আপনাকে। উগ্রমোহনবাবু হলেন জমিদার, পিতৃতুল্য—তাঁর সঙ্গে কি আর পণ নিয়ে দর কসাকসি করা সাজে আমার? আপনি বরং বাবুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলে মতটা পাল্‌টে ফেলুন। বড়লোকের খেয়াল বই ত নয়—খড়ের আগুন—হুহু করে জ্বলে ওঠে আবার তখনি নিভে যায়। বুঝলেন? মানে আপনি যদি মত দেন তাহলে আমি সেই মেয়ে দুটিকে আজই সন্ধ্যের সময় আশীর্ব্বাদ করি। সেই রকমই কথা আছে কিনা—অর্থাৎ—"

অঘোরবাবু কেবল বলিলেন—"আসুন আমার সঙ্গে—" উপরে উঠিয়া গেলেন। কাছারী বাড়ীর পিছন দিকে গিয়া অঘোরবাবু একটি ঘরের তালা উন্মোচন করিতে লাগিলেন।

মৃণ্ময়ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন—"এধারে এলেন যে?"

অঘোরবাবু একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন—"গোপনীয় পরামর্শ সব অমন খোলা জায়গায় বসে করা ঠিক নয়। ভিতরে আসুন।"

মৃণ্ময়ঠাকুর ভিতরে গেলেন। ঘরের ভিতরটায় কেমন যেন একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ। অনেকদিন অব্যবহৃত মাটির ঘরে সাধারণতঃ যেরূপ হয়। অঘোরবাবু বলিলেন —"আপনি একটু বসুন। আসছি আমি" বলিয়া তিনি বাহিরে আসিয়া চট্ করিয়া শিকলটা লাগাইয়া দিয়া তালা দিতে দিতে বলিলেন—"চুপ করে বসে থাকুন। চেঁচাবেন না। মালিক না আসা পর্য্যন্ত একটু কষ্ট হবে।"

রুম্‌নি ঝুম্‌নির ভাবী শ্বশুরের বিস্ফারিত চক্ষুটি অন্ধকারে আরও বিস্ফারিত হইয়া গেল।

(১১)

অঘোরবাবু ফিরিয়া আসিতেই রুম্‌নি ঝুম্‌নি আসিয়া তাঁহাকে ধরিল "—ও কে এসেছিল? সেদিন আমাদের আশীর্ব্বাদ করে গেল ওই না? কে বল না দাদু! ও কে?"

অঘোরবাবু সংক্ষেপে বলিলেন—"ও শ্বশুর।"

খরগোস, পারাবত প্রভৃতির মত শ্বশুরও ঠিক সমজাতীয় একটি পোষ্য জীব কিনা ইহাই বোধ হয় তাহারা ভাবিতেছিল, এমন সময় ঘোড়ার খুরের শব্দে বনভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল এবং ঘর্ম্মাক্ত কলেবর ফেনায়িত-মুখ একটি অশ্বোপরি উগ্রমোহন সিংহ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। রুম্‌নি ঝুম্‌নি আনন্দে কলরব করিয়া উঠিল—অঘোরবাবু প্রণাম করিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সঙ্গে যে সহিস আসিয়াছিল তাহাকে লক্ষ্য করিয়া উগ্রমোহন বলিলেন—"খেলনা বাঁশী এসব কোথা রেখেছিস্ বার কর।" রুম্‌নি ঝুম্‌নির দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন —"কই তোদের চোখ্ ত ফোলা দেখ্‌ছি না!"

—"চোখ ফুলবে কেন শুধু শুধু"—বলিয়া তাহারা হাসিয়া ফেলিল। উগ্রমোহনবাবু বিরস-বদনে তাহাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আমি কত আশা করে আসছি

যে গিয়ে দেখ্‌ব আমার বিরহে কেঁদে কেঁদে তোদের চোখ ফুলে গেছে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়ছে!"

"ভারি বয়ে গেছে আমাদের। নিজে ত বেশ আমাদের ঘুম পাড়িয়ে রেখে পালিয়ে গেলেন—সেদিন রাত্তিরে!"

সহিস কয়েকটি সুদৃশ্য পুতুল, দুইটি বাঁশী প্রভৃতি আনিয়া রাখিতেই রুম্‌নি ঝুম্‌নি তাহা লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়িল এবং সেই সুযোগে অঘোরবাবু উগ্রমোহনের নিকট নিম্নস্বরে কহিলেন—"গোপনীয় কিছু নিবেদন করবার আছে আমার—"

"কি ব্যাপার!" বলিয়া পিছনের বারান্দার দিকে উগ্রমোহন ও অঘোরবাবু অগ্রসর হইয়া গেলেন।

সমস্ত কথা আনুপূর্ব্বিক শুনিয়া উগ্রমোহন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্রোধে তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া গেল এবং বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে তিনি ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কার হুকুমে তুমি রুম্‌নি ঝুম্‌নির ভাবী শ্বশুরকে এত বড় অপমান করবার সাহস করলে?"

মৃতা কমলার বৈবাহিকের এই দুর্দ্দশায় তাঁহার নিজেরই যেন আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হইতেছিল। অঘোরবাবু যেন এইরূপ একটা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। তিনি উগ্রমোহনকে চিনিতেন। তাই মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—"আমার অপরাধ হয়েছে তা স্বীকার করছি। কিন্তু ওঁকে অপমান আমি করি নি। ওঁকে আট্‌কে রাখতে বাধ্য হয়েছি এই জন্য যে—তা না হলে আজই সন্ধ্যায় উনি কমলাক্ষের নির্ব্বাচিত দুটি পাত্রীকে আশীর্ব্বাদ করে আসতেন। হুজুরই আমাকে হুকুম দিয়ে গিয়েছিলেন যে মৃণ্ময়ঠাকুর যদি আসেন তাহলে তাঁর ব্যবহার অনুযায়ী যথোচিত ব্যবহার যেন আমি করি। আপনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা আমাকে দিয়েছিলেন বলেই—"

উগ্রমোহনের যদিও সত্যই কিছু বলিবার ছিল না তথাপি তিনি তিক্তকণ্ঠে বলিলেন—"হ্যাঁ, যথোচিত ব্যবহারই করেছ দেখ্‌ছি।" কিন্তু মৃণ্ময় ঠাকুরের স্পর্দ্ধায় এবং তাহাতে চন্দ্রকান্তের গন্ধ পাইয়া উগ্রমোহন যেন ক্ষেপিয়া গেলেন। বিস্ফারিতচক্ষু ওই ব্রাহ্মণটাকে আছড়াইয়া মারিয়া ফেলিলে যেন তিনি শান্ত হন!

অঘোরবাবুকে বলিলেন—"এতই করেছ যখন—তখন বাকীটুকুও সেরে ফেল! ওই শালগাছের গুঁড়িতে ওকে বেঁধে আগা-পাছতলা চাব্‌কে ওকে দূর করে দাও। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে দূর করে দাও। ওরকম অন্ত্যজের ছেলেদের সঙ্গে আমি রুম্‌নি ঝুম্‌নির বিয়ে দেব না।"

অঘোরবাবু একবার নিষ্পলকনেত্রে প্রভুর দিকে তাকাইলেন এবং মৃদুস্বরে বলিলেন—"আপনি কিন্তু ছেলে-দুটিকে আশীর্ব্বাদ করে পাকা কথা দিয়ে এসেছেন।"

এমন সময়ে রুম্‌নি ঝুম্‌নি কলরব করিতে করিতে আসিয়া কহিল "—ও দাদু—দেখ্‌বে এস—কে এসেছে!"

উগ্রমোহন গিয়া দেখিলেন—স্মিতমুখে গঙ্গাগোবিন্দ দাঁড়াইয়া আছেন।

গঙ্গাগোবিন্দের এই আগমন আকস্মিক হইলেও অপ্রত্যাশিত নয়। তাহার কারণ স্বয়ং উগ্রমোহনই গঙ্গাগোবিন্দকে খবর পাঠাইয়াছিলেন যে রুম্‌নি ঝুম্‌নির জন্য চিন্তা নাই—তাহারা যম-জঙ্গলে অঘোরবাবুর কাছে সুখেই আছে। বিবাহের প্রসঙ্গটা অবশ্য তিনি সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়াছিলেন। শুভকর্ম্ম একেবারে সম্পন্ন করিয়া তিনি গঙ্গাগোবিন্দকে খবর দিবেন ইহাই স্থির ছিল। গঙ্গাগোবিন্দ উগ্রমোহনের পদধূলি লইয়া হাসিমুখে কহিল—"এরা এখানে বেশ আমোদেই আছে দেখ্‌ছি। কিন্তু আমার আর একা থাকতে ভাল লাগছে না; এদের আজ নিয়ে যাব ভাব্‌ছি।"

রুম্‌নি ঝুম্‌নি প্রাঙ্গণস্থ পারাবতগুলিকে খাদ্য বিতরণ করিবার নিমিত্ত ছুটিয়া চলিয়া গেল। তাহারা চলিয়া গেলে উগ্রমোহন বলিলেন—"হ্যাঁ, নিয়ে যাবে বৈকি। তবে আজ নয়—একেবারে ২৪শে মাঘ নিয়ে যেও।"

গঙ্গাগোবিন্দ সস্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ চুপ্‌চাপ্‌। তাহার পর গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন—"একটা কথা শুনলাম—খুব সম্ভবতঃ গুজব ওটা—কিন্তু শুনলাম যখন, তখন আপনাকে বলাই ভাল—"

উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি কথা?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া গঙ্গাগোবিন্দ শেষে বলিয়াই ফেলিলেন—"শুনলাম নাকি আপনি রুম্‌নি ঝুম্‌নির বিবাহ ঠিক করে ফেলেছেন—নিমাইনগরের মৃণ্ময় ঠাকুরের ছেলেদের সঙ্গে। এটা এতই অসম্ভব ব্যাপার—"

তাহার কথা শেষ না করিতে দিয়া উগ্রমোহন বলিলেন —"অসম্ভব মোটেই নয়। যা শুনেছ তা ঠিক। আগামী ২৩শে মাঘ বিবাহ হবে। আশীর্ব্বাদ করা হয়ে গেছে।"

গঙ্গাগোবিন্দ কথাগুলি শুনিয়া কি যে বলিবেন তাহা ভাবিয়া না পাইয়া অসংলগ্নভাবে বলিলেন—"আমি কিছু—তার মানে—"

উগ্রমোহন শুধু বলিলেন—"আমি যা ভাল বুঝেছি তা করেছি। এখন তুমি যা ভাল বোঝ তা করতে পার!"

গঙ্গাগোবিন্দ কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—"আমার এ বিবাহে অমত আছে।"

"বেশ। তোমার অমতেই বিবাহ হবে—তার কারণ এতে আমার মত আছে। মৃণ্ময় ঠাকুরের অবস্থা ভাল—তার ছেলে দুটিও ভাল—আমার বিচারবুদ্ধি অনুসারে এ বিবাহ মঙ্গলেরই হবে।"

গঙ্গাগোবিন্দ তবু কিছু বলেন না দেখিয়া উগ্রমোহন আবার বলিলেন "মঙ্গলেরই হোক্—আর অমঙ্গলেরই হোক্—যখন কথা দিয়েছি তখন এ বিবাহ হবেই।"

গঙ্গাগোবিন্দ এইবার কথা বলিলেন—"আপনি বেশী বলশালী—আমি দুর্ব্বল। সুতরাং শক্তি সংগ্রহ না করে আপনার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা—কারণ আপনার একমাত্র যুক্তি দেখ্‌ছি শক্তি। তাহলে এইবার আমি উঠি। যদি পারি আপনার কথার জবাব আর একদিন দেওয়া যাবে!"

উগ্রমোহন বলিলেন—"তোমাকে যদি এখন যেতে না দেওয়া হয়?"

গঙ্গাগোবিন্দের মুখে একটু হাসি ফুটিল। ধীরভাবে তিনি বলিলেন—"এই ধরণের একটা কিছু আপনার নিকট প্রত্যাশা করছিলাম। আপনি আমাকে বলপ্রয়োগ করে ধরে রাখবার চেষ্টা করতে পারেন—কিন্তু আমিও যতক্ষণ প্রাণ থাকবে চলে যাওয়ার চেষ্টা করব। আমি দুর্ব্বল—অবশ্য মরে যেতে পারি। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করব এখানে না থাকার—"

বলিয়া গঙ্গাগোবিন্দ উঠিয়া দাঁড়াইতেই উগ্রমোহন অঘোরবাবুকে বলিলেন—"আমার হুকুম—একে যেন কোন-ক্রমে এখান থেকে যেতে না দেওয়া হয়—"

বজ্রাহতের ন্যায় গঙ্গাগোবিন্দ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল এবং তিনি দাঁত দিয়া নীচের ঠোঁটটাকে কামড়াইয়া ধরিলেন।

ঠিক এমনি সময় রুম্‌নি ঝুম্‌নি ছুটিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল—"ও দাদু,—ও বাবা—দেখ্‌বে এস দুটো পায়রা কেমন মারামারি করছে। কি ভয়ঙ্কর রাগী—"

"তাই নাকি—" বলিয়া উগ্রমোহন নাতিনীদ্বয়ের সহিত বাহিরের দিকে চলিয়া গেলেন। বাহিরে গিয়া তিনি ডাকিলেন—"অঘোর শুনে যাও।"—অঘোরবাবুও বাহিরে গেলেন।

নিম্নস্বরে অঘোরবাবু ও উগ্রমোহন নানাবিধ জল্পনা করিতে লাগিলেন। অঘোরবাবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"মনে করুন, উনি যদি জোর করে চলে যেতে চান—তাহলে—"

উগ্রমোহন উত্তর দিলেন—"জোর করে তুমি ধরে রাখ্‌বে। এখানে পঞ্চাশজন সিপাহী আছে—"

অঘোরবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

উগ্রমোহন আরও বলিলেন—"ওকে দিয়েই আমি সম্প্রদান করাব।"

রুম্‌নি আসিয়া বলিল—"দাদু আমাদের খরগোসটা পালিয়ে গেছে, জান?"

উগ্রমোহন হাসিয়া বলিলেন—"বাঁচা গেছে।"

ঝুম্‌নি বলিল—"মংলুকে বলে আর একটা আনিয়ে দাও—"

উগ্রমোহন বলিলেন—"মংলু কে?"

অঘোরবাবু উত্তর দিলেন—"মংলু একজন সাওতাল মাঝি। তাকে আর দরকার হবে না—আমাদের সহিসকে বলে দিলেই হবে। এই এখনি বলে দিচ্ছি—ওরে পচ্‌না—"

পচ্‌না সহিস আসিয়া সেলাম করিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইতেই অঘোরবাবু বলিলেন—"একটা খর্‌হার বাচ্চা চাই। ঘোড়াকে দানা পানি দিয়েছিস্?"

পচ্‌না সসম্ভ্রমে উত্তর দিল যে জামাইবাবু ঘোড়া লইয়া এইমাত্র একটু হাওয়া খাইতে গিয়াছেন।

গঙ্গাগোবিন্দ মেধাবী লোক এবং চন্দ্রকান্তের বন্ধু। উগ্রমোহনের অশ্ব লইয়াই সে বনত্যাগ করিয়াছে এবং প্রমাণ করিয়া গিয়াছে—"বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য—" অঘোর-বাবুও উগ্রমোহন পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া

রহিলেন। উগ্রমোহন অঘোরবাবুকে বলিলেন—"এইবার তুমি পেন্সন নাও। তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি ক্রমশঃই কমে যাচ্ছে।"

অঘোরবাবু কিছুই বলিলেন না। তাঁহার প্রস্তরবৎ মুখ প্রস্তরবৎই রহিল। মনে মনে কিন্তু তিনি গঙ্গাগোবিন্দের এই পলায়নে খুসীই হইলেন। তিনি গঙ্গাগোবিন্দকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন।

পিতার আকস্মিক অন্তর্ধানে রুম্নি ঝুম্নি অবাক হইয়া গেল। অঘোরবাবু তাহাদের বুঝাইলেন যে একটা জরুরি দরকারে তিনি গিয়াছেন—কাল হয়ত আসিবেন। ক্রমশঃ সন্ধ্যা হইল। রুম্নি ঝুম্নি ঘুমাইল।

উগ্রমোহন তখন বলিলেন—"মৃণ্ময়কে ডাক—চল, ওই উত্তরদিকের ঘরটায় যাওয়া যাক্—।"

মৃণ্ময় ঠাকুর যখন আসিল তখন সে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। তাহার দুই চক্ষুতে দরবিগলিত অশ্রুধারা। উগ্রমোহন তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—"তুমি যা করেছ—তোমাকে কেটে পুঁতে ফেলা উচিত। তা আমি করব না। যা বলছি তাই কর—" বলিয়া তিনি অঘোরবাবুকে দোয়াত, কলম এবং কাগজ আনিতে বলিলেন—। দোয়াত, কলম এবং কাগজ আসিলে তিনি বলিলেন—"মায়া কান্না ছেড়ে এখন যা বলি তাই লেখ! জোচ্চর বদমায়েস কোথাকার! কলম নাও—লেখ—" মৃণ্ময় ঠাকুর লেখনী ধারণ করিয়া উগ্রমোহনের নির্দ্দেশ অনুযায়ী লিখিলেন—

কল্যাণবরেষু,

বাবা—অজয়, বিজয়—তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবা। অত্র যম-জঙ্গল কাছারিতে আসিয়া আমি বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়া বিধায় বাটী ফিরিতে পারি নাই। এখনও চলচ্ছক্তিরহিত অবস্থায় আছি। তোমরা অতি শীঘ্র এই পত্রবাহকের সহিত চলিয়া আসিবা। তোমার মাতাঠাকুরাণীর আসিবার দরকার নাই। তোমরা আসিলে আমি তোমাদের সঙ্গে ফিরিয়া যাইব। আসিতে কদাচ অন্যমত করিবা না। আশীর্ব্বাদ জানিবা। ইতি

আশীর্ব্বাদক মৃণ্ময় ঠাকুর

পত্র লইয়া আটজন সিপাহী নিমাইনগর যাত্রা করিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হইয়াছে। সমস্ত বন পূর্ণ করিয়া ঝিল্লি-ধ্বনি। দুই একটা নিশাচর পাখীর ডাক—তীব্র তীক্ষ্ণ শব্দে অন্ধকারকে যেন চিরিয়া ফেলিতেছে। ব্রহ্মহৃদয় নক্ষত্রটি শিরীষ গাছের মাথার উপর দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি অগ্নিকুণ্ড। তাহার চতুর্দ্দিকে কয়েকজন সিপাহী বসিয়া অগ্নি সেবা করিতেছে। অঘোরবাবু নিজঘরে বসিয়া সন্ধ্যা-বন্দনা করিতেছেন—রুম্নি ঝুম্নি নিদ্রামগ্ন। মৃণ্ময় ঠাকুরের দুর্দ্দশা ঘুচাইয়া উগ্রমোহন সিংহ তাঁহাকে উত্তরদিকের ঘরটায় শুইতে দিয়াছেন। ভদ্রভাবে বিছানা করিয়া দেওয়া হইয়াছে—দ্বারে কিন্তু সশস্ত্র প্রহরী। মৃণ্ময় ঠাকুর ঘুমাইতেছেন কি না ভগবান জানেন—তাঁহার কিন্তু উভয় চক্ষুই মুদ্রিত।

মাঝের ঘরটায় উগ্রমোহন সিংহ রহিয়াছেন। তাঁহার নগ্নকায়—পরিধানে শুধু কৌপীন। ভিখন তেওয়ারির সহিত তিনি কুস্তী লড়িতেছিলেন। এই শীতের সন্ধ্যাতেও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া দর দর করিয়া ঘাম ঝরিতেছে। উগ্রমোহনের ইহা একটি বিলাস। তাঁহার সিপাহীদের মধ্যে অন্ততঃ পঁচিশ ত্রিশ জন কুস্তিগীর পালোয়ান আছে এবং তাহারা প্রভুর সহিত কুস্তি লড়িতে পাইলে নিজেদের কৃতার্থ মনে করে। অদ্য সন্ধ্যায় তিনি ভিখন তেওয়ারিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছেন। দুইজনে বীর বিক্রমে মল্ল যুদ্ধে উন্মত্ত প্রায়।—বাহিরে বনানীশীর্ষে শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ অস্তাচলগামী। অনেকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর উগ্রমোহন ভিখন তেওয়ারিকে 'চিৎ' করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চিৎ মানেই জিৎ। ভিখন তেওয়ারি উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রভুর পদধূলি লইল—উগ্রমোহন অমনি তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—"সাবাস্"। বাহিরে কে মৃদুস্বরে ডাকিল—"হুজুর"

উগ্রমোহন গায়ে একটা কম্বল চাপা দিয়া ভিখন তেওয়ারিকে দ্বার খুলিতে আদেশ দিলেন। দ্বার খুলিলে উগ্রমোহন সিংহ দেখিলেন যে নিমাইনগরে যে আটজন সিপাহী গিয়াছিল তাহারা ফিরিয়াছে। তাহাদের বার্ত্তা এই আজ সকাল হইতে মৃণ্ময় ঠাকুরের পুত্রদ্বয়কে পাওয়া যাইতেছে না। (ক্রমশঃ)

বঙ্গীয় কুটীর শিল্প ও সরকারী সহযোগ

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষাল

বিদেশীয় বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নানা কারণে বঙ্গীয় শিল্পের অবনতি ও অধঃপতন ঘটিতে থাকে। ফলে বাঙ্গালার তন্তুবায়, কর্ম্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি সকলে আপন আপন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যান্তর গ্রহণ করিয়াছে। যাহারা নিতান্ত মায়াবশতঃ পৈতৃক ব্যবসায়টুকু ছাড়িতে পারে নাই, তাহারাও ক্রমশ ইহা ছাড়িবার উপক্রম করিতেছে। বিগত পঞ্চাশ বৎসরকাল ধরিয়া এই সকল শিল্পীর পুত্রসকল চাকরীকে জীবনের লক্ষ্য করিয়া যথাসর্ব্বস্ব ব্যয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি সংগ্রহ করিতেছে। ফলে বহুসংখ্যক বি-এ ও এম-এ ডিগ্রীধারী—beg most respectfully to offer myself—ব'লে সরকারী ও বেসরকারী অফিসের দ্বারে 'ধন্না' দিতেছে।

বেকার সমস্যা সমাধানের জন্যই সম্প্রতি বাঙ্গালার সরকারী তরফ হইতে শিল্পোন্নতির চেষ্টা চলিতেছে। সৌভাগ্যের বিষয় ইহার ফলে অনেকগুলি শিল্পের পুনরুদ্ধার হইয়াছে এবং কতকগুলি লুপ্তপ্রায় শিল্পেরও উন্নতি দেখা যাইতেছে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে বঙ্গীয় কুটীর-শিল্প ও তদুন্নতিকল্পে সরকারী প্রচেষ্টা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বাঙ্গালার কুটীর-শিল্প বলিতে প্রধানতঃ বস্ত্রশিল্পকেই বুঝায়। এই শিল্পে বাঙ্গালা একদিন জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল। ঢাকার মস্‌লিন সুদূর রোমে এক সময় Ventus textilis বা Nebula নামে বিক্রীত হইত। (১)

পরে ট্যাভার্নিয়রের আমলেও ইহা জগদ্বিখ্যাত ছিল। তখন ত্রিশ হাত লম্বা ও দুই হাত চওড়া একখণ্ড সাধারণ মস্‌লিনের ওজন মাত্র তিন বা চারি তোলা ছিল। (২)

দুর্ভাগ্যের বিষয় এ বস্ত্র-শিল্প আজ লুপ্ত। মিলের কাপড়ে বাজার ছাইয়া রাখিয়াছে বটে কিন্তু তবুও তন্তুবায়-সম্প্রদায় নির্জ্জন পল্লীতে পেটজোড়া পিলে ও বুকভরা কফ লইয়া আজও পৈতৃক তাঁত চালাইয়া অন্নসংস্থান করিতেছে। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও দশের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; লোকের রুচি দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইতেছে সুতরাং সাবেক যন্ত্রে প্রস্তুত সাবেক ধরণের কাপড় এখন আর ক্রেতার নজরে ধরে না।

শিক্ষার অভাব ও প্রাচীন যন্ত্রপাতির পরিচালনায় দিন দিন প্রতিযোগিতায় এই শিল্পের অবনতি ঘটিতেছে। এ কারণ বঙ্গীয় সরকারী শ্রমশিল্পবিভাগ কর্ত্তৃক ভ্রাম্যমান্ শিক্ষকদল গঠিত হইয়াছে। এই সকল শিক্ষক গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া উন্নত প্রণালীর যন্ত্রাদি প্রদর্শন ও বয়ন সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষাদান করিতেছেন। প্রাচীন যন্ত্রের সহিত এই সকল উন্নত আধুনিক যন্ত্রাদি ব্যবহার করিলে বহু পরিশ্রমের লাঘব হয় এবং বস্ত্রাদিও অধিকতর সুন্দর হইয়া থাকে। সরকারী শিল্পবিভাগের সহায়তায় শ্রীরামপুরে এক বয়ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ে সর্ব্বসম্প্রদায়কে বিশেষতঃ তন্তুবায়দিগকে যন্ত্রের সহিত বয়ন, রঞ্জন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয়।

মিলের কাপড়ের কাটতি বাজারে যতই হউক না কেন তাঁতের কাপড়ের আদর কখনও কমিবে না। শান্তিপুরের ধুতি ও ফরাসডাঙ্গার শাড়ী বাঙ্গালার নরনারীর চির-আদরের। কাজেই তাঁতের সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া যাহাতে সুন্দর ও সুদৃশ্য বস্ত্র অল্প পরিশ্রমে প্রস্তুত হইতে পারে তদ্বিষয়ে তন্তুবায়সম্প্রদায়কে সচেষ্ট হইতে হইবে।

এস্থলে শিল্পবিভাগীয় ভ্রাম্যমান্ শিক্ষকদল দ্বারা উপদিষ্ট ও উপকারপ্রাপ্ত হুগলী জেলার রাজবলহাট নামক স্থানের তন্তুবায়দিগের কথা কিছু বলিব। রাজবলহাট ও তৎ-সন্নিহিত গ্রামগুলি তন্তুবায়প্রধান। এই সকল গ্রামে প্রতি বৎসর কয়েক লক্ষ টাকার তাঁতের কাপড় প্রস্তুত হয়। ভ্রাম্যমান্ শিক্ষকদলের উপদেশে এই সমস্ত তন্তুবায়

(১) Schoff. 63
(২) Tavernier's travels. Ball's Edition. Book II. Chapter XII.

এক্ষণে উন্নতপ্রণালীর যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিখিয়াছে এবং বর্ত্তমানে সুন্দর ও সুদৃশ্য কাপড় অতি অল্প খরচেই প্রস্তুত করিতেছে।

বস্ত্রশিল্পের ন্যায় রেশম-শিল্পের জন্যও প্রাচীন বঙ্গ সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল।

আলিবর্দ্দি খাঁর রাজত্বকালে মাত্র মুর্‌শিদাবাদ জেলা হইতেই ৮৭½ লক্ষ টাকা রেশম বিক্রয়ের জন্য মুর্‌শিদাবাদ কোষাগারে সঞ্চিত হইত। তৎকালে অন্যান্য জেলাগুলিতেও যথেষ্ট পরিমাণে রেশম উৎপন্ন হইত।

পরে 'পেব্রিন' নামক একপ্রকার মারাত্মক ব্যাধির জন্য রেশমী গুটীপোকার মৃত্যু ঘটে। ইহা দূর করিবার জন্য নানা দেশে নানাপ্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়াছে কিন্তু বঙ্গে ইহার জন্য কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় রেশম উৎপাদন অনধিকমাত্রায় ঘটিতে থাকে। ইহার উপর চীন ও জাপান হইতে অত্যধিক সস্তায় নকল রেশম আমদানী হওয়ায় এই শিল্পের দ্রুত অবনতি হইয়াছে। সরকারী শিল্পবিভাগ এই অবনতির কারণ লক্ষ্য করায় সম্প্রতি বিদেশাগত রেশমের উপর শুল্ক নির্দ্ধারিত হইয়াছে। শিল্প-বিভাগ আরও প্রকাশ করেন যে আমাদের রেশম শিল্পিগণ রেশম রঞ্জনে ও শুক্ল-করণে (bleaching) বিশেষ পটু নহে। এই সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষাদান জন্য রাজসাহী, বীরভূম প্রভৃতি স্থানে শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে। মুর্‌শিদাবাদে একটী সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং এই সমিতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রেশম উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বহরমপুরে সম্প্রতি আধুনিক সরঞ্জমাদিযুক্ত রেশম কারখানা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইয়াছে। সরকারী শিল্পবিভাগ হইতে বগুড়ার লুপ্তপ্রায় এণ্ডী শিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। ইহার উন্নত প্রস্তুত-প্রণালীর প্রচার সম্বন্ধে যত্ন লওয়া হইয়াছে এবং ভারতের নানা স্থানে ইহার বিক্রয়-কেন্দ্র স্থাপন জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

হুগলীর চিকণের কথা আজ বাঙ্গালার নরনারীর নিকট একরূপ অজ্ঞাত। বঙ্গের ভগিনীগণ সুদূর নরওয়ের হার্ডেঙ্গাপ্রদেশস্থ সূচী-শিল্পের কথা জানেন; অথচ দুঃখের বিষয় যে হুগলীর চিকণ-শিল্পের খবর অনেকেই রাখেন না। অথচ হুগলীর এই সূচী-শিল্প এককালে আফ্রিকা, আমেরিকা দেশেও সবিশেষ আদৃত হইত। অশিক্ষিত মুসলমান শিল্পিগণ বস্ত্রের উপর এই সুদৃশ্য সুমনোহর নক্সা তুলিয়া এককালে বৎসরে প্রায় লক্ষাধিক টাকা উপায় করিয়াছে। জাপানী মালের অত্যধিক আমদানী এই শিল্পনাশের অন্যতম কারণ। হুগলীর কলেক্টর ম্যাক্‌ফার্‌সন মহোদয়ের সাহায্য না পাইলে এই চিকণ-শিল্প একেবারে লুপ্ত হইত।

সম্প্রতি সরকারী শিল্পবিভাগের সহায়তায় হুগলীতে চিকণ-শিল্পিগণ দ্বারা এক সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতির সাহায্যে আধুনিক রুচি অনুযায়ী শিল্পের প্রবর্ত্তন হইতেছে। ভবিষ্যতে এই শিল্প তাহার অতীত সমৃদ্ধি ফিরিয়া পাইবে আশা করা যায়।

হস্তীদন্তের উপর নক্সা ও কারুকার্য্য এতদ্দেশীয় এক প্রাচীন শিল্প। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের এক্‌জিবিশনে কয়েকটী দ্রব্য বঙ্গ হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। তথায় এই সমস্ত দ্রব্যের যথেষ্ট সুখ্যাতি ও সমাদর হইয়াছিল। হস্তীদন্তের উপর কারুকার্য্যের কয়েকটী নমুনা এখনও মুর্‌শিদাবাদের নবাবমহলে ও কাশিমবাজারের রাজবাটীতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই লুপ্ত-শিল্পের পুনরুদ্ধার জন্য একটী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। শিল্পবিভাগ প্রস্তুত দ্রব্যাদির বিক্রয় ভার গ্রহণ করিয়াছে।

অতঃপর মৃৎশিল্পের উল্লেখ আবশ্যক। বাঙ্গালার কুম্ভকারগণ হাঁড়ি, কলসী, সোরাই ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ফুলের টব, টালী, প্রতিমা প্রভৃতি গঠনে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। বঙ্গের গোপেশ্বর পাল, ক্ষিতীশচন্দ্র পাল প্রভৃতি মৃৎশিল্পী শুধু বঙ্গে কেন সমগ্র ভারতে বিখ্যাত।

বর্ত্তমানে কৃষ্ণনগরের 'এস্, সি, পাল এণ্ড কে, সি, পাল' নামক মৃৎশিল্প-প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় মৃৎশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছে। এই শিল্পোন্নতির জন্য সরকারী শিল্প-বিভাগের কার্য্য বিশেষ প্রশংসনীয়। এই বিভাগের প্রচেষ্টায় মৃত্তিকানির্ম্মিত দ্রব্যের চিক্কণতাবৃদ্ধি ও ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। আধুনিক 'চাক' (চক্র) ও 'পোণ' (উনান) দ্বারা যথেষ্ট শ্রমের ও ব্যয়ের লাঘব হইতেছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগেও বাঙ্গালা দারু-শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। তাম্রলিপ্ত বা সপ্তগ্রামের বন্দরের সমুদ্র-

পোত বঙ্গদেশেই নির্ম্মিত হইত। প্রাচীন চন্দনকাষ্ঠের দরজা, জানালা বা কারুকার্য্যখচিত পেটিকা, কৌটা ইত্যাদি দেখিয়া সত্যই বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। কালচক্রের আবর্ত্তনে বাঙ্গালার সে শিল্প আজ লুপ্ত। আজ 'ল্যাজারসের' আসবাব বাঙ্গালীর গৃহসজ্জার উপকরণ—মেহগিনি ও টিক শাল ও সেগুনের স্থান অধিকার করিয়াছে। এই শিল্পোন্নতির জন্য বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ বহু চেষ্টা হইতেছে। বহু সহরে 'আর্টিজেন স্কুল' স্থাপিত হইয়াছে। যাদবপুরের কলেজ অব্ ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড টেকনোলজি ও প্রবর্ত্তকসঙ্ঘের চেষ্টাও ধন্যবাদার্হ। কাষ্ঠশিল্প দিন দিন উন্নত হইতেছে।

বাঙ্গালার কর্ম্মকার বঙ্গবাসীর নিত্য প্রয়োজনীয় দা, কাস্তে, লাঙ্গলের ফলা, কুঠার প্রভৃতি চিরকালই প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে নদীয়া জেলার সেনহাট নামক স্থানের কর্ম্মকারগণ যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। বর্দ্ধমান জেলার কাঞ্চননগর নামক স্থানে প্রেমচাঁদ মিস্ত্রী ছুরী, কাঁচি, ক্ষুর প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য কারখানা স্থাপন করেন। এই কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদি যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে বটে কিন্তু বিদেশীয় দ্রব্যের আমদানীর জন্য এই শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই।

সরকারী শিল্পবিভাগ প্রদত্ত শিক্ষা লাভ করিয়া কয়েকজন যুবক ছুরী, কাঁচি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছে। এই বিভাগ হইতে অস্ত্রোপচারের যন্ত্রাদি নির্ম্মাণপ্রণালীও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। উপযুক্ত অধ্যবসায় ও উদ্যম থাকিলে বঙ্গীয় যুবকগণ এই শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারিবেন।

সরকারী শিল্পবিভাগ হইতে কয়েকটী নূতন শিল্প যথা—ছাতা, সাবান, খড়মের বৌল, বোতাম ও কাচের দ্রব্যাদি প্রস্তুতের প্রণালীও শিক্ষা দেওয়া হয়।

তৈজস নির্ম্মাণ বহু বঙ্গবাসীর উপজীবিকা। খাগড়াই বাসন, কাঞ্চননগরের থালা বঙ্গে চিরকালই সমাদৃত। বর্ত্তমান অর্থকষ্টের দিনে আলুমিনিয়ম, এনামেল প্রভৃতির বহুল প্রচারে এই শিল্পের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। শিল্পবিভাগের অনুসন্ধানের ফলে সম্প্রতি নূতন রকমের এক প্রকার কাংস আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব খুব কম কিন্তু স্থায়িত্বে ইহা পুরাতন কাংস হইতে কোন অংশে কম নহে। ভ্রাম্যমান্ শিক্ষক দল নূতন ধরণের যন্ত্রে এই নবাবিষ্কৃত কাংস দ্বারা তৈজসাদির নির্ম্মাণ-প্রণালী গ্রামে ও সহরে প্রদর্শন করিতেছেন। অনেকেই এই শিল্প শিক্ষা করিতেছেন। এক্ষণে দেশের লোকের সাহায্য ও সহানুভূতি পাইলেই শিল্পটী পুনরায় উন্নত হইবে।

বঙ্গীয় স্বর্ণকার বা মণিকারের কার্য্যও উপেক্ষণীয় নহে। যাঁহারা বলিবেন নিরন্ন বাঙ্গালীর আবার অলঙ্কারাদির প্রয়োজন কি—তাঁহাদিগকে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। তাঁহাদিগকে শুধু বিশ্বকবির এই ছত্রটী স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি—

"অপ্রসন্ন প্রেয়সীর মুখ সব সুখ সব হাসি
লুপ্ত করি দেয়।"

আজকাল ঝটকা, পৈছে, তাবিজ, মনোমোহিনী মলের যুগ আর নাই বটে তবুও ব্রেস্‌লেট্, ক্রেস্‌লেট্, আর্ম্মলেট্, ব্রোচ্, মফ্‌চেন প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তাও যে নিতান্ত কম নহে তাহা সংসারী মাত্রেরই জানা আছে।

কুটীরশিল্পের মধ্যে ধামা, ঝুড়ি, কুলা ইত্যাদির নির্ম্মাণ কার্য্যও ধর্ত্তব্য। বাঁশের ও বেতের কাজে বহু দরিদ্রের অন্নসংস্থান হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে সুদৃশ্য উন্নতপ্রণালীর শীতলপাটি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সকল শিল্প যাহাতে সমভাবে সচল থাকে তৎপ্রতি দেশবাসীর লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

বঙ্গীয় সরকারী শিল্পবিভাগ বর্ত্তমানে চর্ম্মশিল্পোন্নতির ব্যবস্থা করিয়াছে। দেশীয় চর্ম্মকার নির্ম্মিত জুতা তাদৃশ ভাল না হওয়ায় বাটা প্রভৃতি বিদেশী ব্যবসায়ীসকল প্রতি বৎসর অজস্র টাকার মাল বিক্রয় করিয়া থাকে। সম্প্রতি বঙ্গীয় সরকারী শিল্পবিভাগ কর্তৃক উপযুক্ত শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই শিক্ষালয়ে মধ্যবিত্ত ভদ্রসন্তানগণ চামড়ার কার্য্য শিখিবার সুযোগ পাইবেন। অনেকে ইহাকে হীন কর্ম্ম বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন কিন্তু পরের গোলামী অপেক্ষা স্বাধীনভাবে জুতা প্রস্তুত করা যে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ-কার্য্য তাহা বুদ্ধিমানমাত্রেই স্বীকার করিবেন। ভ্রাম্যমান শিক্ষকদল চর্ম্মকারপ্রধান স্থানে জুতা প্রস্তুতপ্রণালী শিক্ষা দিতেছেন। বাঙ্গালী এখনও উৎকৃষ্ট চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্যের জন্য বিদেশের মুখ চাহিয়া থাকে। মধ্যবিত্ত যুবকগণ এ

কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলে লাভবান্ ভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না। এ কার্য্যে বিশেষ মূলধনেরও আবশ্যক নাই। উপযুক্ত শিক্ষা, উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি থাকিলেই বাঙ্গালী চর্ম্মশিল্পে যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারিবেন।

কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়ের উপরই শিল্পোন্নতি নির্ভর করে; এ কারণ ভারতের মধ্যে ও বহির্ভাগে বাঙ্গালার কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যাদির বিক্রয় ভার শিল্পবিভাগ লইয়াছে। এ বিষয়ে দেশের লোকেরও সম্পূর্ণ সহানুভূতি থাকা চাই। যিনি প্রকৃত দেশকে ভালবাসেন তাঁহার নিকট দেশীয় শিল্পীর যত্নের বস্তু কখনই উপেক্ষিত হইবে না—আশা করা যায়।

সরকারী প্রচেষ্টার ফলে শিল্পশিক্ষার পথ সুগম হইয়া উঠিয়াছে। এই দুর্দ্দিনে বাঙ্গালার ভরসা, বাঙ্গালার মান, বাঙ্গালার প্রাণ তরুণ যুবকদল যদি চাকরির মোহ পরিত্যাগ করিয়া এই সকল শিল্পকার্য্যে আত্মনিয়োগ করে তবে বেকার সমস্যা দূরীভূত হইবে, জীবনযাত্রার দুর্গমপথ কুসুমাস্তীর্ণ হইয়া উঠিবে।

সহরবাসী অনেকেই বলেন যে বর্ত্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে কুটীরশিল্পোন্নতি অপেক্ষা কল-কারখানার প্রসার আবশ্যক। বাঙ্গালার মত জনবহুল প্রদেশে কলকারখানার বিস্তৃতি আদৌ সমীচীন নহে।

কল কারখানা দ্রুতগতিতে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিবে বটে কিন্তু অপরদিকে ইহা দ্রুতগতিতে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব নষ্ট করিবে। নৈতিক চরিত্রনাশে মানুষকে পশুর অধম করিয়া তুলিবে। বর্ত্তমানে বঙ্গের উন্নতি ও সমৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে ইহার কুটীরশিল্পের উপর নির্ভর করিতেছে। আশা করি কর্ম্মপ্রাণ যুবকগণ বর্ত্তমান অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে তৎপর হইবেন।

"প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান্ হে, জাগ্রত ভগবান্।"

হংস-বলাকা

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

(৬)

ক'দিন পল্লীর নির্জ্জনতার পর আবার ক'লকাতার কর্ম্ম-কোলাহল। পথে মোটর-বাস-ট্রাম ঘোড়ারগাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ, আর মেসে বিভিন্ন ঘরে বিভিন্ন জটলা—কোথাও সঙ্গীত, কোথাও পাশা খেলা।

পরের দিন যথাসময়ে স্কুলে গিয়ে দেখে স্কুল বন্ধ। দারোয়ান জানালে সেক্রেটারীর মায়ের শ্রাদ্ধ। সকল মাষ্টারই সেখানে গেছেন, সুকুমারকেও যাবার জন্ত হেড মাষ্টার ব'লে গেছেন। সেক্রেটারীর মায়ের শ্রাদ্ধ আজকেই বটে। সুকুমারের স্মরণ ছিল না। সেও সেক্রেটারীর বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল।

সেক্রেটারীর বাড়ী ঢুকতে গেটের মুখেই রমেশের সঙ্গে দেখা।

—স্কুল হয়ে আসছেন বুঝি?

সুকুমার উত্তর দিলে, হ্যাঁ। আমি ভুলে গিয়েছিলাম। অনর্থক খানিকটা ঘুরলাম। আরও একটা দিন থেকে এলেও পারতাম।

রমেশ হেসে বললে, তাতে কিন্তু একটা দিনের মাইনে কাটা যেত।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। এই তো ক'দিন পরেই বড় দিনের ছুটি। মিছিমিছি···

—তা বটে।

একটু আগেই হেড-মাষ্টারের সঙ্গে দেখা। চাদরখানা কোমরে জড়িয়েছেন। দেখতে কন্তা-কর্ত্তার মতো লাগছে। খুব ব্যস্তভাবে সেক্রেটারীর সঙ্গে পরামর্শ করছেন। সেক্রেটারী দুজনকে দেখামাত্র হাতজোড় ক'রে অভ্যর্থনা করলেন।

মধুর হেসে বললেন, আমার কিন্তু সহায়-সম্বল বলতে যা কিছু সব আপনারা। এ বাড়ীতে যা কিছু কাজ-কর্ম্ম হয়েছে সব আপনাদের হাত দিয়েই। নিন্দেও কখনও হয়নি। এবারও…

—কি যে বলেন! হেড-মাষ্টার হা হা ক'রে হাসলেন, —এ কি আমাদের পরের বাড়ী নাকি? বেশ!

ব'লে এদের দুজনের মুখের দিকে পর্য্যায়ক্রমে চাইলেন।

তারপর বললেন, আপনাদের কথাই ভাবছিলাম। যদুপতিবাবু, পণ্ডিত মশাই আর আশুবাবু রয়েছেন রান্নার তদারকে। অশ্বিনীবাবু আর শিববাবু শ্রাদ্ধমণ্ডপে আছেন। আপনারা এলেন ভালই হ'ল। একবার মিষ্টান্নভবনে গিয়ে খবর দিয়ে আসতে হবে যে সন্দেশের বায়না দু'মণ নয়, তিন মণ। একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

তাদের সম্মতির অপেক্ষা না ক'রেই হেড-মাষ্টার সেক্রেটারীর দিকে চেয়ে বললেন, এই তো সন্দেশের ব্যবস্থা হয়ে গেল। আপনি শ্রাদ্ধমণ্ডপে যান। এদিকে আমরা যখন রয়েছি তখন কোনো ভাবনা নেই। এমনিতেই অনেক দেরী হয়ে গেছে। আরও সকালে বসা উচিত ছিল। কেবল পুরোহিতের জন্য…যান, আর দেরী করবেন না।

হেড-মাষ্টার একাই একশো; যেন ঝড়ের মতো ছুটোছুটি করছেন। মুখে খই ফুটছে।

—তাহ'লে আপনারা আর দেরী করবেন না সুকুমার-বাবু। এখনই খবরটা না দিয়ে এলে সন্ধ্যের মধ্যে জিনিস দিতে পারবে কি না সন্দেহ। ওদের আবার টেলিফোন নেই। না হলে…

সেক্রেটারী বললেন, আমার গাড়ীখানা কি ফিরেছে মাষ্টার মশাই? তাহ'লে গাড়ীখানা নিয়ে…

বাধা দিয়ে হেড-মাষ্টার বললেন, গাড়ী? গাড়ী কি হবে? এই তো মির্জ্জাপুরের মোড়। পায়ে-পায়ে খুব যেতে পারবেন!

—দেখুন, যদি কষ্ট না হয়…

সেক্রেটারী শ্রাদ্ধমণ্ডপের দিকে চ'লে গেলেন। হেড-মাষ্টারও আর একদিকে যেন কাকে ডাকবার জন্য ব্যস্তভাবে চ'লে গেলেন। আর এরা দুজন বাইরে এসে পরস্পরের মুখপানে চেয়ে হেসে ফেললে।

সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, আমরা স্কুলের মাষ্টার, না সেক্রেটারীর মহলের গোমস্তা ঠিক করতে পারছেন?

—কিছু কিছু।

—বেশ!

রমেশ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বললে, কিন্তু মনে করুন যদি আমাদের উপর মিষ্টি মাথায় ক'রে বয়ে আনবার হুকুমই হ'ত, কি করতে পারতাম আমরা?

—তা তো বটেই।

—এইটুকুই যে কত কষ্টে যোগাড় হয়েছে তাও তো মনে আছে?

—আছে বই কি!

—তবে আসুন, আমরা সেই অনুগ্রহের জন্যই ভগবানকে ধন্যবাদ দিই।

সুকুমার হেসে বললে, শুধু ভগবানকে নয়, সেই সঙ্গে ওঁদের দুজনকেও।

নিশ্চয়, নিশ্চয়!

অতি দুঃখেও দুই বন্ধু হেসে ফেললে।

মিষ্টান্ন-ভবনে খবর দিয়ে ফেরবার পথে রমেশ জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা—আপনার তো দেশে জমি-জায়গা আছে বলছিলেন না?

—আছে। কেন বলুন তো?

—তাহ'লে…

—Back to Village?

—হ্যাঁ।

—মরেছেন! ওটা আর একটা ভাঁওতা।

—কি রকম?

—চাষ-বাসের কোনো খবরই রাখেন না তো? বেশ। তাহ'লে আমার কাছে শুনুন।

ব'লে সুকুমার রমেশকে সামনের একটা পার্কে নিয়ে গেল। শীতের দুপুর বেলা। পার্ক নির্জ্জন, রোদও গায়ে লাগে না। একটা ঝোপের আড়ালে নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়ে দুজনে ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসল। গল্পের উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টির জন্যে দু'পয়সার চীনাবাদামও কেনা হ'ল। কিছুক্ষণ সময় কাটানও প্রয়োজন। তাড়াতাড়ি ফিরে গেলে আবার হয়তো নতুন ফরমাস চাপবে। তার চেয়ে পার্কে বসে থাকা ঢের ভাল।

সুকুমার বলতে লাগল :

—আমাদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে মুরুব্বিরা যে সব এ্যামেচার উপদেশ দেন সে সব শুনবেন না। আমার বাড়ী পাড়াগাঁয়ে, আমি জানি সেখানকার সত্যি অবস্থা কি। চোখ মেলে দেখেন নি, সেখানকারই কামার-কোমর-তাঁতি-নাপিত-ছুতোর ধোপা হুড় হুড় ক'রে ক'লকাতার দিকে ঠেল দিচ্ছে? দশ-পনেরো বছর আগে এদের দেখেছিলেন?

—এত দেখিনি।

রমেশের হাঁটুতে একটা চাপড় দিয়ে সুকুমার বললে, তবে? এরা এল কেন? কি দুঃখে? দেশের মাটি ছেড়ে আসতে ওদের কত অনিচ্ছা সে আমি জানি। সেখানে দুবেলা-দু'সন্ধ্যে যদি শাকান্নও জুটত, কিছুতে বিদেশে পা দিত না।

—শাকান্নও জোটে না বলতে চান?

—তাও জোটে না। কত দুঃখে ওরা ঘরের বাইরে পা দেয় জানেন না। গেল বছর আমাদের গ্রামের একটি ছোকরা আমার সঙ্গে ক'লকাতায় আসে। সে কি দৃশ্য! ওর বিধবা পিসিমা কাঁদতে কাঁদতে আগে আগে চলেছে যাতে ছেলের চোখে অশুভ কিছু না পড়ে। কোন বুড়ী শূন্য ঘড়া কাঁখে নিয়ে কেবল রাস্তায় পা দিয়েছে তাকে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভেতর ঢোকান হ'ল। কে জলভরা কলসী নিয়ে আসছে তাকে বাঁদিকে করা হ'ল। এমনি কত কি! আর ওর যাবতীয় আত্মীয়া ওর সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে আসছে, আর এক কথা একশো বার ক'রে মনে পাড়িয়ে দিতে দিতে আসছে। গ্রামের এবং আশ-পাশের দশখানা গ্রামের যতগুলি দেবতা আছেন তাঁদের পুষ্পে, বিল্বপত্রে আর চরণ-তুলসীতে ছোকরার চাদরের খুঁট ফুলে এতখানা হয়েছে।

সুকুমার হাত দিয়ে ফোলার পরিমাণ দেখিয়ে হাসলে। তারপর বলতে লাগল :

—মাঠের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত তারা ফোঁপাতে ফোঁপাতে এল। আর কি কথা না বললে, কি উপদেশই না দিলে! সেইখানে ছোকরা যখন তাদের কাউকে প্রণাম ক'রে আর কারো প্রণাম নিয়ে বিদায় নিলে—শোকের ভারে তাদের দেহ তখন কেঁপে কেঁপে উঠছে। ছোকরারও চোখ শুকনো ছিল না। আমি একরকম জোর ক'রেই তাকে ঠেলতে ঠেলতে ষ্টেশনে নিয়ে এলাম। মেয়েরা সেইখানেই বোধ হয় ট্রেণ না অদৃশ্য হওয়া পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল।

সুকুমার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

—ট্রেণ ছাড়তে ছোকরা হঠাৎ কি ভেবে একেবারে মেয়েমানুষের মতো ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে উঠল। আমার পা দুটো জড়িয়ে ধ'রে বলতে লাগল, আমাকে এইখানে নামিয়ে দাও দাদাঠাকুর। অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে, আমি ক'লকাতা যাব না। ঘরে না খেয়ে ম'রে প'ড়ে থাকব সেও ভালো। কত ক'রে তবে তাকে শান্ত করি।

সুকুমার একটা চীনাবাদামের খোসা ছাড়িয়ে টপ্ টপ্ ক'রে দুটো বাদাম মুখে ফেললে।

চিবুতে চিবুতে আকাশের দিকে চেয়ে বললে, এমনি দুঃখে মানুষ ঘর ছাড়ে; বুঝলেন রমেশবাবু, সহজে নয়।

রমেশ কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলে না।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করলে, চাষেও কি কিছু হয় না?

উদাসীনভাবে সুকুমার উত্তর দিলে, আমাদের দেশে চাষ মানে তো আকাশবৃত্তি। না আছে খাল, না আছে পুকুরে জল। দেবতা যদি জল দিলে তো হ'ল, নয় তো নয়।

একটু ভেবে আবার বললে, তাও যদি ফশলের দর থাকত। যা কিছু হয়ও, দরের অভাবে তাতে জমিদারের খাজনা দিয়ে চাষার নিজের মেহনতের মজুরী পোষায় না। এই হ'ল দেশের সত্যিকার অবস্থা। শহরে ব'সে যারা গ্রামে ফিরে যাওয়ার উপদেশ দেয় তাদের কথা বিশ্বাস করবেন না।

সুকুমার চুপ করলে।

বেলা তিনটে বাজে। ফিরিঙ্গিদের ক'টা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ইতিমধ্যেই আয়ার সঙ্গে এসে মাঠে ছুটোছুটি লাগিয়েছে। আর দেরী করা সঙ্গত হবে না। হেডমাষ্টার নিশ্চয়ই কে কি করছে তার খবর রাখছেন।

রমেশ উঠে বললে, আর গল্প নয় সুকুমারবাবু। টের পেলে কিন্তু বিপদ হবে।

—হাঁ। তখন আবার পুঁটলি বেঁধে back to village.

দু'জনেই হেসে উঠে পড়ল।

এবারে সব মাষ্টারে মিলে একটা নতুন নিয়ম স্থির করলেন। সেটা এই যে, যিনি যে ক্লাসে যে বিষয় পড়ান তাঁকে সেই ক্লাসের সেই বিষয়ের পরীক্ষক করা হবে না। আজকাল রমেশে আর সুকুমারে খুব ভাব হয়েছে। স্কুলে দুজনে সর্ব্বক্ষণ একসঙ্গে থাকে। রমেশের সঙ্গে অবশ্য প্রবীণ শিক্ষকদের কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু বয়সের মিলের জন্যে সুকুমারের সঙ্গে কথা ব'লে আর গল্প ক'রে সে আনন্দ বেশী পায়। সেই জন্যে অন্য শিক্ষকদের কাছ থেকে ধীরে ধীরে স'রে এসেছে। আরও একটা উদ্দেশ্যও আছে। সুকুমারের মারফৎ হেড-মাষ্টারের প্রীতি আকর্ষণ ক'রে একখানি বিজ্ঞানের বই লেখার সঙ্কল্পও তার মনে আছে। অনেকটা লেখাও হয়েছে এখন হেড-মাষ্টার মশাই অনুগ্রহ করলেই তাঁর নামে বইখানা ছাপিয়ে কিঞ্চিৎ অর্থপ্রাপ্তি হ'তে পারে।

পরীক্ষার বিষয় নিয়ে সুকুমার আর রমেশ প্রথমে আপত্তি ক'রেছিল। কিন্তু প্রবীণ শিক্ষকদের মিলিত চীৎকারে তা আর টেঁকেনি। ওরা অবশ্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আপত্তি করেনি। ওদের আপত্তির বিষয় ছিল এই যে, যিনি যে ক্লাসে যে বিষয় পড়ান তিনি সেই ক্লাসে সেই বিষয়ে ছেলেদের উপযোগী ক'রে যেমন প্রশ্ন করতে পারবেন এমন বাইরের লোকে পারবে না। সে আপত্তি এই ভাবে খণ্ডিত হ'য়েছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তো বাইরের লোকেই প্রশ্ন পত্র তৈরি করবেন। কথাটা ঠিক। ওদেরও এ নিয়ে বিশেষ কোনো জেদ ছিল না। বিশেষ ক'রে রমেশের তো নয়ই। কারণ এ স্কুলে বিজ্ঞানের শিক্ষক একমাত্র সেই। তার বিষয়ে আর কেউ দন্তস্ফুট করতে পারবেন না। ওরা আর এ নিয়ে বিশেষ আপত্তি করলে না।

সুকুমারেরও এই সময় অনেক ঝঞ্ঝাট চেপে গিয়েছিল। তার ছাত্র দুটির পরীক্ষা আসন্ন। তারা ছেলেও ভালো। সুতরাং মাষ্টারকে যথেষ্ট খাটিয়ে নেয়। পরীক্ষার পূর্ব্বে অন্য শিক্ষকদের অবশ্য ক্লাসের খাটুনি নেই বললেই হয়। কিন্তু তার কমেনি। সে যা পড়িয়েছে তা আবার সমানে পুনরাবৃত্তি করতে হয়। সকাল থেকে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত এই পরিশ্রম করার পর তাকে কোনোদিন বারোটা, কোনোদিন একটা পর্য্যন্ত রাত জেগে প্রুফ দেখতে হয়। ইতিহাসের বইখানা সে হেড-মাষ্টারকে দিয়ে দিয়েছে। সেইখানা ছাপা আরম্ভ হয়েছে। প্রুফও সে ভালো দেখতে জানে না। এই উপলক্ষে নতুন শিখেছে। সেজন্যও অনেকটা অসুবিধা হয়।

সুকুমার আরও একটা ঝঞ্ঝাট বাধিয়েছে। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে অধ্যয়নের সময় সুলেমান কররাণি এবং দাউদ শা'র আমলের কতকগুলো ঘটনা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেইগুলো নিয়ে এবং আরও কিছু ঘেটে সে 'মোগলের বঙ্গ-বিজয়' নামে একটা বড় প্রবন্ধ লিখে ফেলে। সেটা কিছু কাল 'ভারত-দীপিকা' আফিসে প'ড়ে থাকার পর গেল মাসে প্রথম দফা প্রকাশিত হয়। 'ভারত-দীপিকা' কাগজ বড় হ'লেও অপরিচিত লেখকের প্রথম লেখা খুব অল্প লোকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দ্বিতীয় দফা বেরুতে সুধীসমাজে তার আদর হয়। লেখাটার মধ্যে কিছু মৌলিকতা আছে। তারও চেয়ে লক্ষ্য করবার বিষয় লেখকের নিরপেক্ষতা। লেখাটার মধ্যে সেকালের ইতিহাস সম্বন্ধে কোনো নতুন মত প্রচারের প্রয়াস নেই। কোনো প্রতিপাদ্য প্রমাণের উদ্দেশ্য নিয়েও মুখবন্ধ আরম্ভ করেনি। পুরোণো প্রামাণ্য বইতে এ সম্বন্ধে যে ঘটনা সে পেয়েছে তাই পরের পর সাজিয়েছে। সে সমস্ত ঘটনার কতক জানা, কতক অজানা। সুকুমার শুধু এইটে স্মরণ রেখেছিল যে, তাতে যারা অংশ নিয়েছিল তারা নাটকের চরিত্র নয়, রক্ত মাংসের মানুষ। আর সেকালের মানুষও একালের মানুষের মতোই দোষে-গুণে জড়ান। তাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে বিশুদ্ধ বাংলা ব্যবহারের দায়িত্ব ঐতিহাসিকের নয়। সে নিরপেক্ষ এবং বিচ্ছিন্ন দৃষ্টি নিয়ে তাদের দেখেছে, স্থান কাল পাত্র ও ঘটনা সংস্থান থেকে সম্ভবপর অনুমান সংগ্রহ ক'রেছে এবং পরবর্ত্তী ফলাফলের সঙ্গে সেই সকল অনুমানের সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস পেয়েছে। এর বেশী আর কিছুই করেনি। সে পাঠানেরও পক্ষ নেয়নি, মোগলেরও পক্ষ নেয়নি এবং উপসংহারে দাউদ শা'র দুর্ভাগ্যে বিগলিত হয়ে তাঁর পক্ষে কি ভাবে অগ্রসর হওয়া সঙ্গত ছিল, এতকাল পরে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সদুপদেশ বর্ষণ ক'রে নিজের রাজনীতিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করেনি।

তার লেখার এই গুণ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আর এই সূত্রে একদিন অভাবিতরূপে বিখ্যাত বাংলা

দৈনিকপত্র 'রত্ন-প্রভাকরের' সম্পাদক মনোমোহনবাবুর সঙ্গে তার পরিচয় হয়ে গেল। মনোমোহনবাবুর মতো লোকের সঙ্গে কোনোদিন কোনো কারণে তার পরিচয় হ'তে পারে একথা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। সুতরাং এই সৌভাগ্যে সে যে উল্লসিত হয়ে উঠবে এ আর বিচিত্র কিছু নয়।

কিন্তু সে তো জানে না, দৈনিক কাগজের ক্ষুধা কি প্রচুর! শুধু তাই নয়, খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার। যে কোনো বিষয়ে যে কোনো প্রবন্ধ দৈনিক কাগজ বিনা দ্বিধায় ছাপতে পারে। এইভাবে প্রত্যহ বহু প্রবন্ধ তার দরকার। বাংলা দেশের অধিকাংশ কাগজই লেখককে টাকা দেওয়া পছন্দ করেন না। সেজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই "cheapest is the best"—কারণ তাঁরা জানেন, বাংলার পাঠকদেরও খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে বিচার নেই। তাদের কাছে 'দারা-সেকোর নিকট শাজাহানের পত্রাবলী'ও যা, 'বৈষ্ণব সাহিত্যে মায়াবাদ'ও তাই। 'বাগর্থ-বিজ্ঞান' এবং 'বীমায় লগ্নী প্রথা' উভয় সম্বন্ধেই তাদের সমানই আগ্রহ। তাতে একটা সুবিধা এই হয়েছে যে, যে কোনো বিষয় সম্বন্ধে ভালো-মন্দ যা হোক কোনো লেখাও যখন ভাণ্ডারে থাকে না, তখন হাতের কাছে যা কিছু একখানা সাময়িক পত্র থেকে দু'কলমের মতো একটা কিছু কেটে ছাপতে দিলেও চ'লে যায়।

এ সমস্ত না জানা থাকায় মনোমোহনবাবু যখন তার প্রবন্ধের ভূয়সী প্রশংসা ক'রে 'রত্ন-প্রভাকরের' জন্য লেখা চাইলেন সে তখন হাতে স্বর্গ পেল।

জিজ্ঞাসা করলে, কি নিয়ে লিখব?

—যা খুশী।

যা খুশী লেখবার মতো মাল-মশলা তার কাছে কিছুই ছিল না। দাউদ খাঁ একটি প্রবন্ধেই নিঃশেষ হয়ে গেছেন। এ সম্বন্ধে আর কখনও তাকে কিছু লিখতে হবে, কিম্বা সেজন্য কেউ তাকে অনুরোধ করতে পারে—তা সে ভাবেও নি। ভাবলে একটা প্রবন্ধেই সব শেষ না ক'রে কিছু বাকি রেখে দিত। তাছাড়া ও প্রবন্ধটাও 'ভারত-দীপিকার' মতো বড় কাগজ যে সত্যি সত্যিই ছাপবে এমন আশাও করেনি। বস্তুত পক্ষে যেদিন ছাপা প্রবন্ধটা তার চোখে পড়ে সে নিজেই সবচেয়ে বেশী বিস্মিত হয়েছিল। কেমন অদ্ভুত লেগেছিল। তার নিজের নাম উপাধি সমেত ছাপার অক্ষরে ওইভাবে বেরুতে পারে—এ যেন সে চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিল না।

কিন্তু নাম ছাপানর নেশা এখন তাকে পেয়ে বসেছে। দাউদ খাঁ সম্বন্ধে আর কোনো বলবার মতো কথা তার জানা নেই, মনাইস খাঁ সম্বন্ধেও না। অন্য কোনো কথা নিয়েও সে ইতিপূর্ব্বে বিশেষ কিছু ভাবেওনি, গবেষণাও করেনি। তবু মনোমোহনবাবুর মতো একজন লোক যখন নিজে তাকে অনুরোধ ক'রেছেন, তখন লিখতেই হবে। নইলে অভদ্রতা হয়। হয়তো তিনি ভাববেন, একটা প্রবন্ধ লিখেই ছোকরার মাথা গরম হয়ে গেছে। ভাবা বিচিত্র নয়।

সে স্থির করলে, তার সংগৃহীত মাল-মশলা থেকে মনাইস খাঁ সম্বন্ধে যে সব ঘটনা ঝড়তি-পড়তিতে মূল প্রবন্ধ থেকে বাদ গিয়েছিল তাই নিয়ে একটা যেমন তেমন প্রবন্ধ আপাতত দাঁড় করান হবে। তার পরে সামনেই ছেলেদের পরীক্ষার পড়া তৈরির জন্যে যে ছুটি হবে, সেই ছুটিতে আরও গবেষণা ক'রে একটা ভালোমত প্রবন্ধ দিয়ে মনোমোহন-বাবুকে খুশী করবে। এ ছাড়া আর উপায় নেই।

এই স্থির ক'রে সে একটা প্রবন্ধ লিখলে; দিনে ছেলে পড়িয়ে এবং রাত্রে প্রুফ দেখার পরেও যেটুকু সময় পায় সেই সময়ে। লেখাটা তেমন ভাল হ'ল না। সান্ত্বনা রইল, পরের লেখাটা ভাল হবে। কিন্তু 'রত্ন-প্রভাকরে' ওটা বেরিয়ে যাবার পর সে আর ছুটি হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলে না। দাউদ খাঁ সম্বন্ধে অনাবশ্যক যে সব মাল-মশলা ছিল তাই দিয়েই আর একটা প্রবন্ধ লিখে ফেললে এবং তার অব্যবহিত পরেই আরও একটা।

অবশেষে 'অবকাশ' কাগজে তাকে খেতাব দিলে 'মোগলাই সুকুমার' এবং তার লেখাগুলোর মধ্যে যে কিছুমাত্র মৌলিক গবেষণা নেই—ও সব যে যে-কোনো স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে আরও ভাল ক'রে লেখা আছে তাও জায়গা জায়গা তুলে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে; অর্থাৎ সুকুমার বিখ্যাত হয়ে গেল।

কিন্তু সে অত বুঝল না। ভাবলে 'অবকাশের' এই গালাগালির পরে তার আর লোকসমাজে মুখ দেখান

চলবে না। ট্রামে-বাসে যেখান যাবে লোকে কেবলই তাকে আঙুল দেখাবে আর আড়াল থেকে পরিহাস ক'রে ডাকবে, মোগলাই সুকুমার। কিন্তু দিনের পর দিন গেল তবু তার স্কুলের মাষ্টাররা পর্য্যন্ত তাকে একদিন ঠাট্টা করলে না। সুকুমার লাজুক মানুষ। সে নিজে কোনোদিন নিজের লেখা সম্বন্ধে কাকেও কিছু বলেনি। সুতরাং তাকে 'মোগলের বঙ্গ-বিজয়ের' লেখক ব'লে কেউ সন্দেহ করেনি। হয়তো তাঁরা প্রবন্ধটা কেউ পড়েনও নি। সেইটেই বেশী সম্ভব। কারণ মাষ্টারীর একটা সুবিধা এই যে তাঁরা প্রায়শই বাজে জিনিস পড়ার প্রয়োজন অনুভব করেন না।

কিন্তু মন সত্ত্বেও তার রোখ চ'ড়ে গেল এবং পরীক্ষার পূর্ব্বে স্কুল বন্ধ হওয়ামাত্র চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ ও শিখজাতি সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ একটা প্রবন্ধ লেখবার জন্য আহার-নিদ্রা বন্ধ ক'রে দিলে।

(ক্রমশঃ)

বিক্রমপুরে প্রাপ্ত সদাশিব মূর্ত্তি

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রায় ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে সীতাহাটি গ্রামে বল্লাল-সেনের একখানা তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছিল। সে সময়ে ঐ তাম্রশাসনখানা লইয়া বেশ একটু আলোচনা চলিয়াছিল। বল্লালসেনের সেই তাম্রশাসনখানার যাঁহারা পাঠোদ্ধার করেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধাভাজন সুহৃদ শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তারকবাবু ১৩১৭ সালের "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"য় উহার পাঠ প্রকাশ করেন। স্বর্গীয় ঐতিহাসিক অক্ষয়-কুমার মৈত্র এবং বন্ধুবর সুপণ্ডিত অধ্যাপক ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাকও বল্লালসেনের এই তাম্রশাসনখানির একটি পাঠ ১৩১৮ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার "সাহিত্য" পত্রে মুদ্রিত করেন। * ইংরাজীতেও অনেকে এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেন ও পাঠ প্রকাশ করেন, আমরা এখানে আর তাহার উল্লেখ করিলাম না। আর আমার বক্তব্য ও তাম্রশাসনখানা সম্বন্ধে নহে, পাঠকগণকে ঐ তাম্রশাসন-খানির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া—উহার উপরস্থ রাজমুদ্রার মধ্যবর্ত্তী সদাশিব মূর্ত্তির কথা বলিব।

কিছুদিন হইল বিক্রমপুরের অন্তর্গত আপরকাঠি নামক গ্রামে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত সদাশিবমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ঃ এখন বিক্রমপুর চিত্রশালায় আরিয়াল গ্রামে আছে।

বল্লালসেনের তাম্রশাসনের মুদ্রামধ্যস্থ সদাশিবমূর্ত্তির চিত্র তারকবাবুর প্রবন্ধের সহিত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার সঙ্গে আমাদের প্রকাশিত সদাশিব মূর্ত্তির সাদৃশ্য সহজেই অনুভূত হইবে। সদাশিব মূর্ত্তির ধ্যান নানারূপ দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাঁহার হস্তস্থিত দ্রব্যাদিও বিভিন্নরূপ দেখা যায়। আমরা এখানে তাঁহার কয়েকটি ধ্যান উদ্ধৃত করিলাম; উহার সহিত কৌতূহলী পাঠক মূর্ত্তির প্রকাশিত চিত্র মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

ধ্যানঃ—

মুক্তাপীতপয়োদমৌক্তিকজবাবর্ণৈর্মুখৈঃ পঞ্চভিঃ
ত্র্যক্ষৈরঞ্জিতমীশমিন্দুমুকুটং পূর্ণেন্দুকোটিপ্রভম্।
শূলং টঙ্ক-কৃপাণ-বজ্র-দহনান্ নাগেন্দ্র-ঘণ্টাঙ্কুশান্
পাশং ভীতিহরং দধানমমিতাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে॥

শ্রীযুক্ত গোপীনাথ রাও তাঁহার Elements of Hindu Iconography, VOL. II. Pt. ii app. p. 187এ সদাশিবের যে ধ্যানের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এইরূপ :—

বদ্ধপদ্মাসনং শ্বেতং স্থিতং পঞ্চাস্য সংযুতম্।
পিঙ্গলাভজটাচূড়ং দশদোর্দণ্ড মণ্ডিতম্॥
অভয়ং চ প্রসাদং চ তথা শক্তিং ত্রিশূলকম্।
খট্বাঙ্গং দক্ষভাগস্থৈর্বহন্তং করপল্লবৈঃ॥ •

* সাহিত্য ২২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।

ভুজঙ্গং চাক্ষমালাং চ ডমরু নীলপঙ্কজম্ ।
বীজাপূরং চ বামস্থৈর্বহন্তং সুপ্রসন্নকম্ ॥

বায়ুপুরাণে রহিয়াছে :—

পঞ্চবক্ত্রো বৃষারূঢ় প্রতিবক্ত্রং ত্রিলোচনঃ ।
কপালশূলখট্টাঙ্গী চন্দ্রমৌলিঃ সদাশিবঃ ॥

ধ্যানে আছে সদাশিবের পঞ্চাস্য থাকিবে, কিন্তু আমরা



সদাশিব বিক্রমপুর মিউজিয়াম, আড়িয়ল

যে মূর্ত্তিটির চিত্র প্রকাশ করিলাম তাহাতে পঞ্চমুখ নাই।

সদাশিব মূর্ত্তি দশভুজ হইয়া থাকে। আমাদের মূর্ত্তিটিও দশভুজ। তাঁহার দশভুজে যথাক্রমে শূল, টঙ্ক, কৃপাণ, বজ্র, ঘণ্টা, অঙ্কুশ, পাশ, অক্ষমালা এবং অভয়মুদ্রা প্রভৃতি রহিয়াছে। মূর্ত্তির মস্তকোপরি জটামণ্ডিত মুকুট। ললাটে ত্রিনয়ন। অপর দুইটি নয়ন আকর্ণ বিস্তৃত। সদাশিব পদ্মের উপর পদ্মাসনে বা বদ্ধ পর্য্যঙ্কাসনে ধ্যানমগ্ন। প্রসন্ন নত দৃষ্টি। কণ্ঠে মাল্য দোদুল্যমান। ঊর্দ্ধে চালির দুইদিকে কিন্নর বা অপ্সর যুগল। সদাশিবের মুখমণ্ডলে সুগম্ভীর ধ্যানের ভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সদাশিবমূর্ত্তি বাঙ্গালাদেশে খুব বেশী পাওয়া যায় নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ চিত্রশালায় * এবং বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় ও সদাশিবমূর্ত্তি আছে। বন্ধুবর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের নিকট ধাতু-নির্ম্মিত একটি অতি সুন্দর ক্ষুদ্র সদাশিবমূর্ত্তি আছে। তিনি ঐ মূর্ত্তিটি কুমিল্লা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার কিংবা পরিষদের সংগৃহীত মূর্ত্তির সহিত আমাদের এই চিত্রের মূর্ত্তিটির বিশেষ প্রভেদ নাই।

বল্লালসেনের তাম্রশাসন আরম্ভ হইয়াছে ১। ওঁ নমঃ শিবায় ॥ সন্ধ্যাতাণ্ডব-সন্বিধান বিলসন্নান্দী নিনাদোর্ম্মিভি —নির্ম্মার্য্যাদর—২। সার্দ্ধবো দিশতুবঃ প্রেয়োঽর্দ্ধনারীশ্বরঃ। যস্যার্দ্ধে ললিতাঙ্গ হার-বলনৈরর্দ্ধে চ ভীমো ৩। দ্ভটের্ণাট্যারম্ভ-রয়ৈর্জ্জয়ত্যভিনয়-দ্বৈধানুরোধ শ্রমঃ। হর্ষোচ্ছালপরিপ্লবো নিধিরপাং ইত্যাদি।

ওঁ নমঃ শিবায় ॥ (১)

১। যাঁহার একার্দ্ধের মনোহর অঙ্গ-সঞ্চালনে এবং অপরার্দ্ধের ভীমোৎকট নৃত্যারম্ভবেগে দ্বিবিধ অভিনয় সঞ্জাত কায়ক্লেশ জয়যুক্ত হইতেছে—সন্ধ্যাতাণ্ডবনৃত্যে বিকশিত আনন্দ নিনাদ-লহরীলীলার অকূল রসসাগর [সেই] অর্দ্ধ-নারীশ্বর মহাদেব আপনাদের মঙ্গল বিধান করুন। যাঁহার অভ্যুদয়ে—হর্ষাতিশয্যে সঞ্চালন প্রাপ্ত হইয়া মহাসাগর চঞ্চল হয় ইত্যাদি। *

এখানে আমরা দেখিতে পাইলাম যে বল্লালসেনের এই তাম্রশাসনে মুদ্রার লাঞ্ছন সদাশিব এবং ইষ্টদেবতা অর্দ্ধনারীশ্বর-দেব দুইয়েরই উল্লেখ আছে। সদাশিবমূর্ত্তি এবং অর্দ্ধ-

* স্বর্গীয় সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার লিখিত—Eastern Indian School of Medi eval Sculpture P. 109 এ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় যে মূর্ত্তিটি আছে তাহার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

* শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দবাবুর অনুবাদ।

নারীশ্বর মূর্ত্তি বাঙ্গলাদেশে কেন ভারতবর্ষেই খুব কম পাওয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে আমরা বিক্রমপুরে—সদাশিব-মূর্ত্তি এবং অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি দুই মূর্ত্তিই পাইতেছি। আমি প্রায় বাইশ তেইশ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমপুরের পুরাপাড়া গ্রাম হইতে একটি অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ঐ মূর্ত্তিটি এক্ষণে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত রাজসাহী মিউজিয়মে আছে। এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে আমি সামান্যভাবে 'ভারতবর্ষে' (ভারতবর্ষ ১ম বর্ষ ২য় খণ্ড পৌষ ১৩২০) আলোচনা করিয়াছিলাম। তারপর অনেকে নানাপ্রবন্ধে নানাভাবে আমার আবিষ্কৃত. ঐ মূর্ত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

আমার ছাত্র স্নেহভাজন শ্রীমান জয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সদাশিবের আলোকচিত্রখানি আমাকে পাঠাইয়া দিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

হিন্দুধর্ম কি ?

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

ভাদ্রের ভারতবর্ষে "ভারতের ধর্ম সমস্যা" নামক প্রবন্ধে শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম-মতের সীমা নির্দেশ সম্বন্ধে বহু তথ্য সম্বলিত একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে লোকগণনার (census) সময় কাহাকে হিন্দু বলা হইবে, কাহাকে হিন্দু বলা হইবে না, ইহা নির্দ্ধারণ করা অনেক সময় দুরূহ হয়। কারণ হিন্দুর লক্ষণ কি এ বিষয়ে সন্তোষজনক নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায় না।

হিন্দু এই শব্দ দুই বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে, হিন্দু জাতি এবং হিন্দুধর্ম। যতীন্দ্রবাবু তাঁহার প্রবন্ধে হিন্দুধর্মের লক্ষণ সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন। আমরাও তাহাই করিব। হিন্দুধর্মের লক্ষণ কি—এ বিষয়ে যতীন্দ্রবাবু অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সকল মত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে কোনও নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তাহার কারণ এই বলিয়া বোধ হয় যে ইঁহারা মূলের অন্বেষণ না করিয়া সম্মুখে যাহা দেখা যায় তাহাই পরীক্ষা এবং আলোচনা করিয়াছেন। আধুনিক প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মমতের মূল অন্বেষণ করিলে ধর্মসমস্যার সু-মীমাংসা হইতে পারে।

আমরা যাহাকে আজকাল হিন্দুধর্ম বলি প্রাচীনকালে তাহাকে সনাতন ধর্ম অথবা কেবলমাত্র ধর্ম শব্দে অভিহিত করা হইত। এই সনাতনধর্মের কতকগুলি বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। এক একজন আচার্য্য এক একটি সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত অথবা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যথা, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য মধ্বাচার্য্য। পরবর্ত্তী যুগে হিন্দুধর্মে যে সকল সাধু মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই কোনও নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। যথা, শ্রীচৈতন্যদেব নিজকে মধ্ব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াছেন। বিভিন্ন আচার্য্যের প্রচারিত মতের মধ্যে অবশ্য কিছু কিছু প্রভেদ আছে। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে সকল আচার্য্যেরই মত এক। যে সকল বিষয়ে সকল আচার্য্যের মত এক—সেগুলিকে সনাতনধর্ম বা হিন্দুধর্মের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এই সাধারণ লক্ষণগুলি এইভাবে নির্দ্দেশ করা যায় :—বেদ বা শ্রুতি কোনও ব্যক্তি বিশেষের রচনা নহে। বেদ ঈশ্বরপ্রণীত, এজন্য অভ্রান্ত। কিন্তু বেদের প্রকৃত ধর্ম অবগত হওয়া দুরূহ। কারণ ইহার ভাষা কঠিন এবং ভাব অনেকস্থলে গভীর। বেদের মর্ম যাহাতে সহজে জানা যায় এজন্য বেদজ্ঞ ঋষিগণ রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ এবং ধর্মশাস্ত্র (যথা মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা) এই সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে কোনও কোনও স্থলে আপাততঃ বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল বিরোধ সামঞ্জস্য করিবার জন্য ঋষিগণ মীমাংসা শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। এই সকল ধর্মগ্রন্থের প্রকৃত অর্থ মীমাংসাশাস্ত্রনির্দিষ্ট প্রণালীতে অবগত হইলে বলিতে পারা যায় প্রত্যেক ব্যক্তির কখন কি কর্ত্তব্য। ইহাই ধর্ম. বা হিন্দুধর্ম। সকল আচার্য্যের এই মত। প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহা হইলে কি বিষয়ে আচার্য্যদের মধ্যে মতভেদ? মতভেদ এই সকল বিষয়ে : ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের স্বরূপ কি ? জীবের স্বরূপ কি ? ঈশ্বর, জীব ও জগতের মধ্যে কি সম্বন্ধ ? ঈশ্বর লাভ করিবার উপায় কি ? ঈশ্বরলাভ করিলে জীবের কিরূপ অবস্থা হয় ? শঙ্করাচার্য্য বলেন যে ব্রহ্ম নির্গুণ ; প্রকৃতপক্ষে জীব ও ব্রহ্মে কোনও প্রভেদ নাই ; অজ্ঞানহেতু জীব নিজকে সুখী দুঃখী বলিয়া মনে করে ; জ্ঞান হইলে জীব নিজকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারে। রামানুজ বলেন যে ব্রহ্ম অনন্ত কল্যাণগুণের আধার ; জীব ব্রহ্মের অংশ ; সুতরাং জীবও ব্রহ্ম এক নহে। এই সকল বিষয়ে মধ্বাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য প্রভৃতির মতেও কিছু কিছু প্রভেদ আছে। এই প্রকার মতভেদের কারণ এই যে বিভিন্ন আচার্য্যগণ বেদের কোনও কোনও বাক্যের বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু বেদ যে অভ্রান্ত এবং পুরাণ, ইতিহাস ও ধর্মশাস্ত্রে যে বেদের উপদেশগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে এ বিষয়ে সকল আচার্য্যই এক মত।

ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ সম্বন্ধে বিভিন্ন আচার্য্যের মধ্যে কিছু মতভেদ থাকিলেও মতের ঐক্যও কিছু আছে। সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; অনন্ত কাল ধরিয়া জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় চলিয়া আসিতেছে; ঈশ্বরই জগতের উপাদান করেন, পুণ্যবান ব্যক্তি মৃত্যুর পর স্বর্গে যায়, পাপী নরকে যায় স্বর্গ ও নরকের নির্দ্দিষ্ট ভোগের অবসান হইলে তাহারা পৃথিবীতে আসিয়া আবার জন্মগ্রহণ করে; প্রত্যেক জীব নিজ কর্মফল ভোগ করে এবং ঈশ্বরলাভ করিলে মোক্ষ হয়—এই সকল কথা সকল আচার্য্যই স্বীকার করেন। কারণ এ সকল কথা বেদাদি শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে মতভেদের কোনও অবসর নাই। সুতরাং এই সকল তত্ত্বকে হিন্দুধর্মের সর্বসাধারণ মৌলিক তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করা যায়। যে ধর্মে এই সকল কথা মানা হয়না, তাহাকে হিন্দুধর্ম বলা যায়না।

যতীন্দ্রবাবু তাঁহার প্রবন্ধে বিচার করিয়াছেন—বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ব্রাহ্ম, আর্য্যসমাজকে হিন্দু বলা উচিত কিনা। এ বিষয়ে তিনি হিন্দুসভা ও হিন্দুমিশনের মত উল্লেখ করিয়াছেন; যে সকল ধর্মের উৎপত্তি ভারতবর্ষে সে সকল ধর্মকেই হিন্দুধর্ম বলা উচিত। কিন্তু এই ব্যবস্থাটি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বিশ্বাস না থাকিলে তাহাদিগকে এক ধর্মের মধ্যে অন্তর্গত করা যায় না। ধর্মের কোথায় উৎপত্তি হইয়াছে তাহা একটি আকস্মিক ঘটনা (accident)। ধর্মের মতগুলির উপরেই ধর্মের স্বরূপ নির্ভর করে। ভারতবর্ষে যদি বিপরীত মতযুক্ত ধর্মপ্রচার হয় তাহা হইলে তাহাকে এক ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন হয়না। খৃষ্টানধর্ম বাইবেলের উপর প্রতিষ্ঠিত; মুসলমানধর্ম কোরাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাইবেলের বা কোরাণের কোনও কোনও অংশের ব্যাখ্যা লইয়া মতভেদ হয় এবং তাহা হইতে খৃষ্টান ও মুসলমানধর্মেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু সকল খৃষ্টান বাইবেল মানেন, সকল মুসলমান কোরাণ মানেন। সেই প্রকার সকল হিন্দুর হিন্দুধর্মশাস্ত্র মানা প্রয়োজন—যদিও শাস্ত্রবাক্যের ব্যাখ্যা বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্নরূপে করিতে পারেন। খৃষ্টানধর্মের লক্ষণ নির্দেশ করিতে হইলে বলিতে হইবে যে ইহা বাইবেলের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্যালেষ্টাইনে যে ধর্মপ্রচার হইয়াছে তাহাই খৃষ্টানধর্ম, এরূপ নির্দেশ করা যায়না। কারণ প্যালেষ্টাইনে ইহুদিধর্মও প্রচার হইয়াছে; ইহুদিধর্ম ও খৃষ্টানধর্ম এক নহে। সেই প্রকার আরবদেশে যে সকল ধর্ম প্রচার হইয়াছে সে সকল ধর্মের সাধারণ নাম মুসলমান ধর্ম—ইহা বলাও ভুল হইবে। কারণ হজরৎ মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বে আরবদেশে মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত ছিল এবং মূর্ত্তিপূজাকে কিছুতেই মুসলমানধর্ম বলা যায় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে ভারতবর্ষে যে সকল ধর্মপ্রচার হইয়াছে সে সকল ধর্মকে হিন্দুধর্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়না। বেদ-পুরাণ-স্মৃতির উপর যে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাকেই হিন্দুধর্ম বলিতে হইবে।

শিখ ধর্মও বেদপুরাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিখ ধর্মে নিরাকার ঈশ্বরের পূজার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু মূর্ত্তি পূজাকে নিন্দা করা হয় নাই; শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারকে অস্বীকার করা হয় নাই। হিন্দু তীর্থের মহিমাও শিখধর্মে স্বীকার করা হইয়াছে। গুরু নানক বহু হিন্দু তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। রণজিৎ সিংহ জ্বালামুখীর মন্দিরটি অমৃতসরের মন্দিরের ন্যায় সুবর্ণরঞ্জিত করিয়াছিলেন। রণজিৎ সিংহের সমাধি মন্দিরে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছিল। আধুনিক কোনও কোনও শিখ সম্প্রদায় মূর্ত্তি পূজা এবং হিন্দুধর্মের বিরোধিতা করেন ইহা সত্য। কিন্তু গুরু নানকের এরূপ কোনও অভিপ্রায় ছিল না—যে হিন্দুধর্ম বর্জন করিতে হইবে বা হিন্দুধর্মশাস্ত্র পরিত্যাগ করিতে হইবে। হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীদের সাহচর্য্যেই বাল্যে নানকের হৃদয়ে ধর্মভাব প্রস্ফুটিত হইয়াছিল।

বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে বেদের প্রামাণিকতা স্বীকার করা হয় নাই। এজন্য ইহাদিগকে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত বলা যায় না।

শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস বেদ পুরাণ প্রভৃতি হিন্দুধর্মশাস্ত্রের প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়াছেন এজন্য তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম হিন্দুধর্মের অন্তর্গত বলিতে হইবে।

ব্রাহ্মধর্মে বেদ ও পুরাণের প্রামাণিকতা অস্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত বলা যায় না। আর্য্য সমাজ বেদের প্রামাণিকতা স্বীকার করিলেও পুরাণ, ইতিহাস (অর্থাৎ রামায়ণ ও মহাভারত) এবং ধর্মশাস্ত্র (যথা মনুসংহিতা) এই সকল গ্রন্থের প্রামাণিকতা স্বীকার করেন নাই। এ জন্য আর্য্য সমাজ হিন্দুধর্মের মূল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে যদিও আর্য্য সমাজ বেদের প্রামাণিকতা স্বীকার করেন তথাপি ধর্ম এবং সমাজ বিষয়ে আর্য্য সমাজের সিদ্ধান্ত সকল ব্রাহ্ম সমাজের সিদ্ধান্ত হইতে অভিন্ন এবং বাল্মীকি, বেদব্যাস, মনু প্রভৃতি বেদজ্ঞ ঋষিগণের সিদ্ধান্তের বিরোধী।

কোল সাঁওতাল ভীল প্রভৃতির ধর্ম মূলতঃ কিম্বদন্তীর উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুদের সংস্পর্শে আসিয়া তাহারা হিন্দুর আচার ব্যবহার এবং পূজা ও বিশ্বাস কিছু পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু তাহারা হিন্দুধর্মশাস্ত্র সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছে ইহা বলা যায় না। এজন্য তাহাদিগকে হিন্দুধর্মাবলম্বী বলা ঠিক হইবে না। চণ্ডাল প্রভৃতি জাতি এ যাবৎ হিন্দুধর্মশাস্ত্র মান্য করিয়াছেন এজন্য তাঁহাদিগকে হিন্দু বলাই সঙ্গত।

আজকাল অনেকে হিন্দু শাস্ত্রের প্রামাণিকতা অবিশ্বাস করেন। তাঁহারা প্রকৃত হিন্দুধর্ম অনুসরণ করেন না। তবে হিন্দুর সন্তান বলিয়া তাঁহাদের জাতি অনুসারে হিন্দু বলা হয়। অনেক তথাকথিত খৃষ্টান বাইবেল বিশ্বাস করেন না। তাঁহারাও প্রকৃত খৃষ্টধর্মাবলম্বী নহেন।

উপন্যাস

অন্ত্যেষ্টি

শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

ছয়

অবশেষে 'ভ্যান্‌গার্ড' উঠিয়া গেল। তেল না থাকিলে কতকাল আর জ্বলিবে! এতদিন ক্ষণে ক্ষণে উস্কাইয়া কোনগতিকে চলিতেছিল। আজ সলিতার শেষ প্রান্তটুকুও নিঃশেষ হইয়া শিখাটী নিবিয়া গেল।

কাহারো দুই মাস, কাহারো তিন মাস, কাহারো বা চার মাস কি তাহারো বেশী—বাকী মাহিনা মারিয়া দিয়া 'ভ্যানগার্ড' মরিয়া গেল। তপেশের ভাগ্য ভাল, তাহার মাত্র এক মাসের পাওনা অনাদায় ছিল।

এতদিন শ'খানেক লোকের কষ্টে হউক, দুঃখে হউক, দুইবেলা কিছু-না-কিছু মুখে গুঁজিবার সংস্থান ছিল। আজ কে কোথায় ছড়াইয়া পড়িল কে জানে!

তপেশের টিউসন আছে। মাঝে মাঝে গল্প বেচিয়া টাকাও কিছু কিছু পায়। আবার দেনাও আছে, মুদীও পায়, বাড়ীভাড়াও দু'মাসের বাকী দাঁড়াইয়া গেছে।

চাকুরী নাই! আবার পুনর্মূষিকঃ।

সংসার চলিতেছে কেমন করিয়া সে ইতিহাস থাক্‌। লিখিতে গেলে অনেক কিছুই লিখিতে হয়।

নরেনবাবুর ছোট ছেলেটার মৃত্যু হইয়াছে। মনোরমার সে কি গগনভেদী চীৎকার!

শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করা হইয়াছিল। শেষ চেষ্টা! সাত দিন জ্বরে ভুগিবার পর মৃত্যুর পূর্ব্বদিন আসিল ডাক্তার।—হ্যামহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের এক ডিস্‌পেন্সারীতে সকালে বিকালে এ্যাটেণ্ড করেন। সদ্য পাশ-করা এম-বি। আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন; আয়ু নাই, রাখিবে কে।

চাতালে একটা মাদুরের উপর বালিশে মাথা রাখিয়া মরা ছেলেটা যেন ঘুমাইয়া আছে। ঠোঁটের কোণে কিসের এক বিরক্তি চিহ্ন: মা-পিশিমার ভাত ধরাইবার চেষ্টায় তাহার কতদিনের সেই আপত্তিসূচক মুখভঙ্গির মত।

মাসের শেষ। শেষকৃত্যের জন্য ক্যাশবাক্স হইতে একটী কানাকড়িও বাহির হইল না। তপেশ ও রতনবাবুতে মিলিয়া বিপদ উদ্ধার করিয়া দিল।

"দেশ-মুকুরে" তপেশ এখন প্রতি মাসে একটী করিয়া লেখা কাটায়। "মর্ম্মবাণী" মাসিক তাহার একখানি উপন্যাস নিয়াছে, প্রতিমাসে ধারাবাহিক বাহির হইতেছে। মূল্য বাবদ এককালীন ত্রিশটী টাকাও পাইয়াছে। টিউসনের মাহিনা আবার দু'মাস বাকী পড়িয়া গেছে।

তপেশের বেশী দিন বেকার থাকিতে হইল না। দেশ-বিখ্যাত বাঙ্গলা দৈনিক 'বিশ্ববাণী'তে সহকারী-সম্পাদকের কাজ জুটিল। একেবারে প্রুফ-রীডার হইতে সব্‌-এডিটর।

'ভ্যান্‌গার্ডের' পড়ন্ত অবস্থার সুযোগে 'বিশ্ববাণী' বহু পূর্ব্বেই ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল। আজ উহার মৃত্যুতে একেবারে জাঁকিয়া বসিয়াছে। দেশের অন্যান্য কাগজের কর্ত্তৃপক্ষরা 'বিশ্ববাণীর' বিক্রি-সংখ্যার পরিমাণ শুনিয়া চক্ষু কপালে তোলেন।

সুদূর পল্লীগ্রামেও 'বিশ্ববাণী' পৌছায়। বাঙ্গালা সংবাদপত্রের এত অল্পদিনে এতখানি সাফল্য কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। দুই পয়সায় এত কাগজ দিবে কে! মেস হোটেল, মুদী বেনে, মনোহারী দোকান—সকলের কাছেই প্রত্যহ সকালে একখানি করিয়া 'বিশ্ববাণী'। গৃহস্থ ঘরেও আজকাল 'বিশ্ববাণীর'ই আদর। ব্যাটাছেলেরা খবর

পড়ে; মেয়েরা সময়-অসময়ে রাতদুপুরে কোলের ছেলের দুধ-বার্লিও গরম করিতে পারে; ঘুঁটের খরচও কম লাগে; মাসান্তে শিশি-বোতলওয়ালা ডাকিয়া সামান্য কিছু ঘরেও আসে।

'বিশ্ববাণী'! ভারত-বিখ্যাত জাতীয় বাঙ্গালা দৈনিক!

তপেশ ম্যানেজারের নিকট যাইয়া কর্ম্ম-প্রার্থী হইল। জানাইল সে একজন সাহিত্যসেবী। ম্যানেজার গম্ভীর হইয়া জানাইলেন, সংবাদপত্র-সেবা সাহিত্যচর্চ্চা নয়; সুতরাং একমাস তপেশকে শিক্ষানবীশ থাকিতে হইবে, অবশ্য ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে হইবে না। বর্ত্তমানে ৩০৲ করিয়া পাইবে। কাজ শিখিলে ৪০৲ টাকায় প্রথম নিয়োগ।

পরদিনই তপেশ নূতন কাজে যোগদান করিল।

দেশ বিখ্যাত দৈনিক 'বিশ্ববাণী'। জনমত গঠন করে সে। গণশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিবার গুরু দায়িত্ব ইহারই স্কন্ধে। এই পবিত্র ব্রতে "বিশ্ববাণী" সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। আপনার মতামতের চশমা জোড়া জনগণের চোখে আঁটিয়া দিতে পারিয়াছে। অসংখ্য পাঠক ইহারই কথায় কখন হাসে, কখন কাঁদে, নাচে-কুঁদে, ফুঁপিয়া থামিয়া যায়, রুষিয়া মিয়াইয়া পড়ে। 'বিশ্ববাণী' জনসাধারণকে তাহার বিজয়রথের অশ্বযূথ করিতে চায়; বল্‌গা থাকিবে তাহারই হাতে, ইচ্ছামত কশিবে, ছাড়িবে, আবার প্রয়োজনে আল্‌গা করিয়া দিবে।

'বিশ্ববাণী'র ক্ষমতা অসীম! সাহিত্যের সর্ব্ববরেণ্য রথীকে সে কালীর আঁচড়ে ঘায়েল করিয়া দেয়। আবার কলমের একটী খোঁচায় রাতারাতি হাতুড়েকে বহুদর্শী ও অসামান্য করিয়া তোলে। বিরুদ্ধদলের নেতৃগণের জনসভার ওজস্বিনী বক্তৃতা পরদিন সংবাদপত্রের স্তম্ভে অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া যায়, আবার স্বপক্ষের চুনোপুঁটির মফস্বল সফরও বড় বড় হরফে ফুটিয়া ওঠে কাগজের শীর্ষদেশে; ঠিক পরদিনই হয়ত ইটালী ও জার্ম্মাণীর রুদ্ধকণ্ঠ জনগণের নিরুপায় অদৃষ্টে বিগলিত হইয়া সম্পাদকীয় মন্তব্যে শোক-প্রকাশও করে। কোনদিন বা উপরে সম্পাদক মহাশয় টেবিলে উপুড় হইয়া চুটাইয়া লিখিতেছেন, বাঙ্গলা বাঙ্গালীর জন্য—রাস্তায় জল-দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহে দীপ-জ্বালা পর্য্যন্ত সমস্ত আনাচ-কানাচ ক্ষুধিত বাঙ্গালী দিয়া ভরিয়া না তুলিলে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী; নীচে তখন পিপে-ভুঁড়ি দোলাইয়া হিন্দুস্থানী দারোয়ানজি বাঁ হাতের তালুতে খৈনি ঘষিতেছেন, আর তাহার চারিদিকে বিহারী সাইকেল-পিয়নের ছোট্ট বাহিনীটী দাঁড়াইয়া আছে প্রসাদের আশায়।

'বিশ্ববাণী' বহুর সেবা করে। তাই সে বহুরূপী। কখনো সে বৈষ্ণব—শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাকীর্ত্তনে পঞ্চমুখ; করুণায় কাতর, প্রেমে বিগলিত, সর্ব্বজীবে সমদর্শী। কখনো আবার শক্তিপূজায় রুদ্র-ভৈরব—একদিনেই কালীঘাটে ডজন দেড়েক ছাগ বলি দিয়া দল বাঁধিয়া ভুরিভোজন করে। রাজনীতিতে কখনো সে স্বরাজী, কখনো "গান্ধীজি", কখনো "সমাজতন্ত্র কি জয়"। যে-নেতাকে কাল তুলিয়াছিল মাথায়, আজ তাহার মুণ্ডপাত করে। দুদিন আগেই তাহার চোখে যে ছিল কুচক্রী ভণ্ড, আজ সে-ই দেশের একমাত্র নেতা।—তরুণের অগ্রদূত! 'বিশ্ববাণী' সমগ্র দেশের মুখপাত্র কি না! বারো জনের মন রাখিতে হয়, তাই তাহার বাজারী মনোবৃত্তি, তাই বহুধা নিষ্ঠা!

পঞ্চাশ-হাজারী "বিশ্ববাণী"র হাতে জাতীয় অভ্যুত্থানের পাঞ্চজন্য। তপেশের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল! সে শুধু চাকুরীই করিবে না, দেশসেবার ব্রতে বেশী না হউক্ অন্ততঃ অণুতম পরিমাণ অংশ-ও গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে।

তপেশ কাজ করে। আপনার নির্দ্দিষ্ট টেবিলে বসিয়া ইংরাজী সংবাদগুলি অনুবাদ করে।—কত কি সংবাদ—মুসোলিনীর বজ্রনির্ঘোষ হইতে আরম্ভ করিয়া তিনদিন উপবাসী মাতার নিজহস্তে সন্তান হত্যা। তারপর লাগ-সই হেডিং-সাব্‌হেডিং করিয়া দেয়।

ক্রিং ক্রিং করিয়া ফোন বাজিয়া উঠে। সহরের সংবাদ কুড়াইয়া লন ভারপ্রাপ্ত সহ-সম্পাদক। ঘণ্টায় ঘণ্টায় উর্দি-পরা চাপরাসী আসে, 'রয়টার', 'এ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেস', 'ইউনাইটেড্ প্রেসের' সংবাদ-সংগ্রহ লইয়া। সহ-সম্পাদকের দল ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া অনুবাদে লাগিয়া যায়। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ব্যভিচার, নারীহরণ, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, যুদ্ধোপকরণ, নিরস্ত্রীকরণ-বৈঠক, হাজার-মাইল-বিমান-প্রতিযোগিতা, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের সাড়ম্বর অধিবেশন—সমগ্র বর্ত্তমান-দুনিয়া কেন্দ্রীভূত ঐ নাতি-প্রশস্ত ঘরখানির মধ্যে।

নিউস্-এডিটর চিঠিপত্র, প্রতিবাদ, অভিযোগ ও বিবিধ সংবাদ লইয়া ব্যস্ত। গত একমাসের খুঁটিনাটি সমস্ত সংবাদ তাহার নখদর্পণে। নিতান্ত বাজে সংবাদও ভুল করিয়া দ্বিতীয়বার ছাপা হইবার জো নাই। কখনো কখনো অপর কাহারো সহিত প্রয়োজনীয় কথা সারিতে সারিতেই লিখিয়া যান, কখনো বা একহাতে ফোন্ ধরিয়া আর এক হাতে কলম লইয়া ছুটিয়া চলেন। নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি অতি মাত্রায় সচেতন। সদাহাস্য লোকটি মাঝে মাঝে কেমন যেন বেখাপ্পা-রকমে কর্কশ হইয়া পড়েন। তবে সুখের কথা, এই মাত্রাহীন অবস্থাটা বেশীক্ষণ থাকে না।

পাশের ঘরে প্রুফ-রীডাররা উচ্চৈঃস্বরে প্রুফ্ পড়িতেছে। তাহাদের মধ্যে কার্ল মার্ক্সের materialistic interpretation of history সম্বন্ধে আধ ঘণ্টা আলোচনা করিতে পারে এমন লোকেরও বিদ্যমানতা বিচিত্র নয়। প্লেটো হইতে রুশো হইয়া লাস্কি পর্য্যন্ত রাজনৈতিক ভাবধারার মোটামুটি ইতিহাস জানা আছে এমন যুবকও দু'একটী মিলিবে। সম্পাদকের হঠাৎ একদিনের অনবধানতাপ্রযুক্ত ভাষাগত ক্রুটী ধরিবার মতো অশিষ্টেরও অভাব নাই। এমন প্রুফ্-পড়ুয়াও আছে যাহারা ষত্ব-ণত্ব সন্ধি-সমাসের সূত্রগুলি আজও গড় গড় করিয়া মুখস্থ বলিয়া যায়।

সহ-সম্পাদকদের মধ্যে যুবকের সংখ্যাই বেশী। বুদ্ধি-প্রখর, চিন্তাপ্রবণ, তরুণ মস্তিষ্কজীবী! এরা শ্বশুরের পয়সায় কি বাবার টাকায় হার্ডিঞ্জ হষ্টেলে থাকিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রি-লাভ করে নাই। প্রায় সবই দরিদ্র মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে; পরের ছেলে পড়াইয়া স্বোপার্জ্জিত অর্থে জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছে—শিখিয়াছে কম নয়। এদেশে-ওদেশে মানুষের ইতিহাসে কোথায় কোন ছন্দপতন, কাহার কি জারিজুরি—কে কবে-কেন-সব কিছু প্রশ্নেরই সুস্পষ্ট উত্তর তাহাদের জানা আছে। তাহাদের সংশয়ের চুলচেরা সূক্ষ্মতার গাঁজিয়াওঠা অবস্থায় ধীরে ধীরে স্থূল বিশ্বাসের দানা বাঁধিতেছে। এদের ব্যথা গুরু, কথা লঘু; অভাব বেশী, ক্ষোভ কম; স্বভাব ভাল, তর্ক করে না। আপন আপন কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া শ্রান্তদেহে বাসায় ফিরে।

সংবাদপত্র আপিসের সর্ব্বাপেক্ষা করুণার পাত্র সম্পাদক ও তাহার সহযোগীরা। ডাহিনে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ; বাঁদিকে বে-সরকারী মালিকপক্ষ; সম্মুখে অর্দ্ধ-শিক্ষিত, স্বল্প-শিক্ষিত, অশিক্ষিত বিরাট গণদেবতা। দুদিকের মন জোগাইয়া, সম্মুখের নাড়ীনক্ষত্র ভাল করিয়া বুঝিয়া, পা টিপিয়া টিপিয়া সতর্ক হইয়া চলিতে হয়। লিখিতে তাহারা অনেক কিছুই জানে, শুধু কিসের অভাবে আসল প্রসঙ্গে আসিয়াই বোবা। বিষবৃক্ষের আমূল উৎপাটনে অক্ষম বিধায় অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন, হরিজন উন্নয়ন, গ্রাম-উদ্যোগ পরিকল্পনা প্রভৃতি ডাল-পালা-ছাঁটা সমস্যা-সমাধানে রোজ রোজ এক কথাই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বিনাইয়া বাড়াইয়া ভাষার কেরামতি দেখায়।

তপেশের চাকুরী-জীবন আজকাল বেশ কাটিতেছে। রাত জাগিতে হয় না। সকালে লেখা লইয়া ব্যস্ত থাকে। দুপুরে আপিস। সন্ধ্যায় বন্ধুমহলে আলাপ-আলোচনায় কাটায়।

মঞ্জুলী আজকাল কেমন যেন গম্ভীর হইয়াছে।—কেমন এক আত্মসমাহিত ভাব।

দুপুর বেলা সে কাঁথা শেলাই করে। ঘরে শাশুড়ী নাই, ননদ নাই, একটা জা-ও না। সুতরাং এই অত্যাবশ্যক আয়োজন তাহার নিজেকেই সারিয়া রাখিতে হইবে। অবশ্য নরেনবাবুর বিধবা বোন সুমতিও দু'খানা কাঁথা শেলাইয়ের ভার নিয়াছে।

মঞ্জুলী কাঁথা শেলাই করে। লাল, নীল, কালো সুতা-গুলি যেন কাহার পদচিহ্ন আঁকিয়া চলে। মঞ্জুলীর মন-প্রাণ-নিঙড়ানো মমতাই যেন হাতের আঙুলে অনাগতের আগমনী গাহিয়া যায়—জোড়াতালি দেওয়া ছেঁড়া-কাপড়ের বুকে-পিঠে। প্রাণের মধ্যে সে উপলব্ধি করে বুঝি আর একটী প্রাণ; দেহের অভ্যন্তরে আর কাহারো দেহ; তিলে তিলে যেন কোন তরুণ অতিথি ছন্দে-সুরে নিশ্বাস-প্রশ্বাসে বাড়িয়া উঠিতেছে; নাড়িতে নাড়িতে যেন তাহারই আসন্ন প্রতীক্ষা; রক্তে রক্তে তাহার-ই অস্তিত্বের সাড়া।

আজকাল মঞ্জুলীর মুখের রঙ একটু ফ্যাকাশে। বেশ ফর্সা দেখায়। সুমতি বলে, দেখিতে না-কি সুন্দর হইয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া মনোরমা মন্তব্য করিয়াছে, মজুর ছেলে হইবে। লবঙ্গ লক্ষণ দেখিয়া প্রতিবাদ জানাইয়াছে, মেয়ে হইবে।

মঞ্জুলীর সারা দেহে অব্যক্ত আগমনী!

রাত্রে স্বামী-স্ত্রীও মাঝে মাঝে কি সন্তান হইবে তাহার ভবিষ্যৎবাণী করে। প্রথমে মঞ্জুলীর কেমন এক লজ্জা বোধ হইত, কিন্তু দুদিনেই গর্ভস্থ সন্তান সম্বন্ধে সে সহজ হইতে শিখিয়াছে।

তপেশ বলে, মেয়ে হইলে আপত্তি কি। মঞ্জুলী প্রতিবাদ জানায়, বিধাতা করুন—মেয়ে যেন হয় না। দরিদ্র বাঙ্গালী ঘরে মেয়ে হওয়া যে কত বড় দুর্ভাগ্যের কথা সে সম্বন্ধে মঞ্জুলী বেশ দু'কথা শুনাইয়া দেয়। তপেশও পাল্টা জবাবে নরনারীর সমানাধিকার সম্বন্ধে সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় ভাষায় এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া ফেলে। উভয়েই মনের খাঁটি খবর গোপন করিয়া যায়। তপেশ চায় ছেলেই। মেয়ে হইলেও মঞ্জুলীরই শুধু আপত্তি নাই।

ছেলে হইলে কি নাম রাখা হইবে তাহাও একপ্রকার স্থির হইয়া গেছে। 'অরুণাংশু' উভয়ের সম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

মেয়ে যদি হয়, মঞ্জুলীর ইচ্ছা দু'অক্ষরে নামাকরণ হইবে। তপেশের মতে তিন অক্ষরের নামই ভাল—পরে দু-অক্ষরে তাহারই একটা ডাকনাম রাখা চলে। অবশেষে 'লেখা', ' রেখা', 'রেবা', 'বেলা', 'প্রীতি', 'মীরা', এবং 'সুজাতা', 'অণিতা', 'অণিমা', 'নীলিমা', 'সান্ত্বনা', 'নন্দিতা' প্রভৃতির মধ্যে বিস্তর বাছাবাছির পর স্থির হইয়াছে 'গীতা' ও 'অঞ্জলি' এই দুই নামের যে কোনটী পরে ভাবিয়া চিন্তিয়া রাখা যাইবে।

মঞ্জুলীকে লইয়া বাড়ীতে আজকাল হাসি-কৌতুকের বিরাম নাই।

নরেনবাবুর তামাকের কল্কের 'গুল' প্রায়ই অদৃশ্য হয়। মনোরমা হাসিয়া বলে, "সাবধান মঞ্জু, গৃহস্থ কিন্তু বড় সজাগ। শেষে একদিন হাতে-নাতে চুরি ধরা পড়বে।"

উনুনের পোড়ামাটি খাওয়ার গুপ্ত কথা সুমতি সেদিন ব্যক্ত করিয়া দিয়াছে। সকলে মিলিয়া কি হাসাহাসি সেদিন।

আর একদিন ঘরে চাল মাপিতে আসিয়া মঞ্জুলী একমুঠা মুখে পুরিয়া মুট মুট করিয়া চিবাইতে লাগিল। ভাবিয়াছিল স্বামী ঘুমাইয়াছে। তপেশের কাছে ধরা পড়িয়া মঞ্জুলীর সে কি লজ্জা!

সুমতি পাঁজি দেখিয়া সাধের এক শুভদিন স্থির করিল। দু' ঘরের দুই গৃহিণী সাধোপলক্ষে দু'খানি কাপড় দিলেন।

সাধের দিন কি সুন্দরই দেখাইল মঞ্জুলীকে। চোখে কাজল। পরণে নূতন লালপেড়ে শাড়ী। চোখদুটীতে প্রশান্ত উদাসী দৃষ্টি। কপালে সিঁদুরের টিপ, সম্মুখে ঘৃতের প্রদীপ। বড় একটা থালায় মিষ্টান্ন। দেবী যেন পূজা গ্রহণ করিতেছেন। তপেশের হঠাৎ মনে পড়িল, বনবাসের পূর্ব্বে রাঘব-সমীপে অন্তঃসত্ত্বা জানকীর কথা।··· আজকালকার মেয়েরা চোখে কাজল পরে না কেন?··· বাঃ, কি সুন্দর মঞ্জুর ডাগর চোখদুটী! মনে হয়, ওখানে যেন ছায়া পড়িয়াছে আর একজোড়া না-দেখা চোখের।

কোথাও কোন ত্রুটি নাই। যে আসিতেছে তাহার জন্য এই দারিদ্র্যের মধ্যেও আয়োজনের অভাব নাই। না ডাকিতেও যে আসে—ফিরাইবার উপায় নাই বলিয়া বরণ করিয়াই তাহাকে লইতে হয়।

তপেশ নিয়মিত আপিস করে। রোজ সকালে একখানি 'বিশ্ব-বাণী' আসে।

আজকাল বাড়ীর মেয়েরাও দুপুরে খবরের কাগজ পড়ে। লবঙ্গও মাঝে মাঝে 'বিশ্ব-বাণী' চাহিয়া আইন-আদালত ও মফঃস্বল সংবাদের পাতায় চোখ বুলায়, বায়স্কোপে কোন নূতন বই আসিতেছে কিনা দেখিয়া লইয়া মাহিনার তারিখের দিন গুনে।

নরেনবাবু ছোট ছেলের মৃত্যুর পর এক মাসের ছুটী লইয়াছে। দশ বছর ব্যাঙ্কের চাকুরী জীবনে এই প্রথম দীর্ঘ বিশ্রাম। সকালে ছেলে-মেয়েটাকে পড়ায়। খানিকক্ষণ খিচ্ খিচ্ করিয়া আট বছরের ছেলেটার পিঠে উত্তম মধ্যম দু'চারঘা বসাইয়া দেয়। রোগা ছেলেটা পড়া বলিতে না পারার দুঃখে কাঁদিতে থাকে।

মেয়ে রেণুকণাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া আনা হইয়াছে। সে 'বঙ্গশ্রী নারী শিক্ষায়তনে' ক্লাস ফোরে পড়িত। আজ এই উৎসবের চাঁদা, কাল অমুক দিদিমণির বিদায় অভিনন্দন, পরশু মেয়েরা সব বোটানিকাল গার্ডেনে চড়াইভাতি করিবে সেজন্য মাথা পিছু চার আনা, স্কুলের বার্ষিক অধিবেশনে প্রত্যেক মেয়েকে চওড়া লাল-পেড়ে বাসন্তী রঙের শাড়ী পরিয়া যাইতে হইবে, দুদিন বাদেই আবার মেয়রের স্কুল

পরিদর্শন উপলক্ষে ফিরোজা রঙের কাপড়ে আড়াই ইঞ্চি বেগুনে বর্ডার চাই। নিত্য নূতন বায়না! এত করিলে আর গরীবের মেয়ের পড়া চলে! রেণুকণা স্কুল ছাড়িয়া এখন ঘরেই পড়ে বাবার কাছে, আর মাকে সাহায্য করে সংসারের কাজে।

প্রথম দিন মেয়েটার সে কি কান্না! ক্লাসের বন্ধুদের কথা বলিয়া মায়ের সঙ্গে ঝগড়া। চামেলী-দিদিমণি বলিয়াছেন, এবার আর সে অঙ্কে কাঁচা নাই। বড়দিদিমণি আশ্বাস দিয়াছেন, ফার্ষ্ট হইতে পারিলে ডবোল প্রোমোসন দিবেন। উলুপী-দিদিমণি বলিয়াছেন, এবার ছোরাখেলা ও ল্যাজিম খেলায় রেণুই ফার্ষ্ট হইবে। 'প্রলয় নাচন নাচলে যখন' গানের সবটা সে এখন এস্রাজে তুলিতে পারে। মায়ের সঙ্গে মেয়ের সে কি কোঁদল। মাতা আশ্বাস দিলেন, পিতার কাছে সুপারিস করিবেন। মেয়ে থামিল, কিন্তু বুঝিয়া লইল—এই শেষ।

দশটা পাচটা রুটিন-জীবনের মসীজীবীর আর সময় কাটিতে চায় না। নরেনবাবু ভাবে, লম্বা ছুটী লইয়া কোন লাভ নাই। দুপুরে খাইয়া দাইয়া খানিকক্ষণ ঘুমায়, তপেশদের ঘর হইতে 'বিশ্ব-বাণী'খানা আনাইয়া পড়ে। তারপর কোনদিন একা একাই তাস খেলে, কোন দিন চার পয়সা দামের সোলোমনস্ চার্ট লইয়া প্রশ্ন ধরিয়া অদৃষ্ট পরীক্ষা করে।

সন্ধ্যার পর পাড়ার ৩নং বাড়ীর রকের প্রাত্যহিক বৈঠকে যোগদান করিয়া এক পয়সার সাপ্তাহিকে প্রকাশিত যত সব কেচ্ছাকাহিনীর বিচার-বিতর্ক শোনে। মাঝে মধ্যে দু'একটী মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সে ও যে একটা লোক—এক কোণে বসিয়া আছে এবং শুধু শ্রোতাই নহে সে-প্রমাণও দেয়।

মঞ্জুলীর বর্ত্তমান অবস্থায় তপেশ তাহাকে দু'বেলা রাঁধিতে দেয় না। শীতের দিন। এ বেলার রাঁধা ডাল-তরকারীতে ওবেলা চলে। শুধু দু'জনের ভাতটা ফুটাইয়া লইতে হয়। মঞ্জুলীর যেদিন শরীর ভাল থাকে না, তপেশ দোকান হইতে রুটি কিনিয়া আনে।

দেখিতে দেখিতে একমাস কাটিয়া গেল। আজ তপেশ ম্যানেজারকে স্মরণ করাইয়া দিবে, এক মাস পরে তাহাকে পাকাপাকি নিযুক্ত করিবার কথা। তপেশের স্মরণ করাইতে হইল না। ম্যানেজারই ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ম্যানেজার ননীমাধব দত্ত। 'বিশ্ব-বাণীর' এতখানি প্রাধান্তের মূলে রহিয়াছে তাঁহার পাটোয়ারী মস্তিষ্কের দান। কহিলেন, "তপেশবাবু, I am sorry to let you know, আপনাকে রাখা সম্ভব হ'ল না।"

তপেশ যেন আকাশ হইতে পড়িল।

—"আমাদের এখানেই অনেককাল কাজ করেছেন বিনয়বাবু, তিনি আবার ফিরে আস্‌তে চান। আমাদেরও একজন অভিজ্ঞ লোকেরই দরকার—রাতের কাজের জন্য। আপনার যা স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখতে পাচ্ছি, আপনাকে দিয়ে তা' হবে না।"

তপেশ কহিল, "আজ্ঞে আমার নাইট্ ডিউটী দেবার অভ্যেস আছে।"

"আপনার থাকতে পারে, আমরা তো আপনাকে মেরে ফেলতে পারি না। আপনার এখন প্রয়োজন হেল্‌থ ভাল করা।"

"আজ্ঞে, সে জন্যই তো চাকুরীর প্রয়োজন। টাকা হ'লে দুদিনেই খেয়ে দেয়ে শরীর ভাল হয়ে যাবে। জেনারেল হেল্‌থ আমার খারাপ নয়।"

ম্যানেজার গম্ভীর হইয়া উত্তর করিলেন, "স্বাস্থ্য ভাল হ'লেই আসবেন, নিশ্চয় আপনাকে নেব, এখন নয়। আমরা চাই সুস্থ সবল iron-man। We must see to the interest of the paper."

খাঁটি স্পার্টান্ আদর্শ! তপেশ মনে মনে ভাবিল, সম্পাদকীয় বিভাগকে কুস্তীর আখড়ায় পরিণত করার এই মহান্‌সংকল্পে তাহার শুভেচ্ছা জানায়। কিন্তু মুখে অতি করুণকণ্ঠে কহিল, "এ দুর্দ্দিনে একবার বেকার হ'লে শিগ্‌গির তো কোন চাকুরী জুটবে না। আমি খাব কি? স্বাস্থ্য যে আরো যাবে ভেঙ্গে।"

"আমাদের সে কথা ভাবলে চলবে না তপেশবাবু। আপনি তো একা নন, হাজার হাজার ছেলের আজ এই সমস্যা। 'বিশ্ব-বাণী' আর ক'জনকেই বা প্রোভাইড করতে পারে।"

"তা হ'লে—"

"কাল থেকে আপনি আর আস্‌বেন না। এই এক

মাসের কাজের জন্য আপনাকে ৪০৲ দিচ্ছি। এতে ২।৩ মাস চাকুরী খুঁজবার প্রভিসন্ হবে।"

"আজ্ঞে আমি বিবাহিত, এ টাকা আমার এক মাসেই খরচ হয়ে যাবে। আমার কথাটা একবার—"

"বিবাহিত আপনি! এই দুর্দ্দিনে এত অল্প বয়সে!"

তপেশ মাথা নোয়াইল।

"—খেতে দেবার সংস্থান না করে বিয়ে করার মতো irresponsibility যাদের আছে তাদের দিয়ে দেশের কোন কাজ-ই হবে না"—ননীমাধব দত্ত গরম হইয়া উঠিলেন। কারণে-অকারণে মাঝেমধ্যে উগ্র হইয়া ওঠা তাঁহার স্বভাবের একটী বিশিষ্ট লক্ষণ। দেশসেবার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া তিনি আজীবন অবিবাহিতই রহিয়া গেলেন। সংসারে বাস করিয়া এ বড় কম স্বার্থত্যাগের কথা নয়। চরিত্রগঠনের দুরূহ ব্রতে ননীমাধববাবু জয়ীই হইয়াছেন। প্রকৃতি কিন্তু অন্য দিক দিয়া তাহার প্রতিশোধ তুলিয়া লইয়াছে। ননীবাবুর তিরিক্ষি মেজাজে কর্ম্মচারিগণ তটস্থ। তাঁহার সারা দেহমনে এক উগ্র রুক্ষতা। একবার গরম হইলে নরম হইতে অনেকটা সময় নেয়।

তপেশ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কথাটা একবার দয়া করে ভেবে দেখুন, আমি একজন নগণ্য সাহিত্যিকও—"

"না।"—একটী মাত্র শব্দ! একটী মাত্র! দুনিয়ার কাজ চলে এই একটী মাত্র কথায়। কলমের একটী আঁচড়ে!

ম্যানেজার কাগজ টানিয়া কি লিখিয়া তপেশের কাছে ছুড়িয়া দিয়া কহিলেন, "নিয়ে যান উপরে আপিসে। আপনার একমাসের পাওনা সব বুঝে নিন। কাল থেকে আপনার প্রয়োজন নেই।"

তপেশ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

৪০৲ টাকা পকেটে গুঁজিয়া 'বিশ্ববাণী' আপিসের গেটটা পার হইয়া তপেশ একবার পিছনে ফিরিয়া তাকাইল, যদি—এমন তো হইতে পারে—একটা বেয়ারা আসিয়া তাহাকে বলে, ম্যানেজারবাবু ডাকিতেছেন। কিন্তু কেহই ডাকিল না। ননীমাধববাবুর মন ননীতে গড়া নয় যে অত ঠুন্‌কো ঘটনায় গলিয়া পড়িবে। একটা রূঢ় কঠোরতার উত্তাপে দেশমাতৃকার চরণতলে উৎসর্গীকৃত দেহ মনকে যে পিটাইয়া পিটাইয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন।

তপেশ ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিয়াছে। সংসার কেমন করিয়া চলিবে! টিউসন আগেভাগে ছাড়িয়া দিয়া ভাল করে নাই; কতদিনে আবার একটা জুটিবে কে জানে। গল্প লিখিয়া তো আর প্রতি মাসেই টাকা পাওয়া যায় না। সে বাদেও তো বাঙ্গালা দেশে অসংখ্য লেখক আছে। আর লেখায় খুব বেশী খাটিলেও গড়ে মাসে পনের টাকার বেশী ঘরে আসিবে না।

কলেজ স্কোয়ারে ঢুকিয়া তপেশ একটা বেঞ্চে বসিয়া পড়িল। বুক ঠেলিয়া উঠিতে চায় এক অভিমান, না অপমান? অভিযোগ, না বিক্ষোভ?—অথবা পৃথক করিয়া কোনটাই নহে, সবগুলি জড়াইয়া এমন এক অসহ অন্তর্জ্বালা। যার কোন আভিধানিক ভাষা নাই।

মনে মনে যেন সে চীৎকার করিয়াই বলিল:—আমার মূল্য তুমি না-ই বা বুঝিলে 'বিশ্ব-বাণীর' ম্যানেজার। কি আসে যায় তাহাতে। কিন্তু পঞ্চাশ বছর পরে তুমি বড় জোর একটা নাম মাত্র, এক'শ বছর বাদে কে-ই বা চিনিবে তোমায়, দু'শ বছর পরে তুমি এক শূন্যতা। আমি সেদিন একটা বিন্দুও তো বটে। সেদিনের জনসাধারণও হয়ত আমাকে না জানিতে পারে, না পড়িতে পারে আমার অপটু নগণ্য দান; কিন্তু সেদিনের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের এক মেধাবী ছাত্র তাহার পি-এইচ্-ডি উপাধির জন্য দুই শত পৃষ্ঠার যে এক থিসিস্ লিখিবে তাহাতে রবীন্দ্রযুগের গদ্য-রূপের বিস্তৃত আলোচনা করিতে যাইয়া শক্তিশালী কথাশিল্পীদের ভাষারীতির কিছু কিছু বলিতে বলিতে যখন অক্ষম অপটু লেখকদের ত্রুটি কোথায় দেখাইতে যাইবে, তখন, ননীমাধব দত্ত!—সেই তখন দুই চারিজন সগোত্রের সঙ্গে আমারও নামোল্লেখ থাকিবে। হায়! তুমি তখন কোথায়!

কল্পনার উত্তাপ লাগিয়া তপেশের বিক্ষুব্ধ মন অনেকটা হালকা হইয়া আসিল। গায়ের ঝাল আকাশকুসুম মিটান ছাড়া আর কোন উপায় নাই যে। ননীমাধব দত্ত তো কেবল 'বিশ্ববাণী'তেই নয়;—বিশ্বজোড়া সহস্র সহস্র আরো নির্দ্দয়, শতগুণে আরো হিংস্র ননীমাধব দত্ত অগুন্তি তপেশের মুখের গ্রাস লইয়া কেমন সহজ স্বচ্ছন্দ টেনিস্ বল খেলিতেছে!

তবু আপাতত এই অনেকাংশে ভাল নবীমাধব দত্তের উপর মনে মনে এক হাত না নিলে অসহায় তপেশের সান্ত্বনা কোথায়! বিপুল উৎসাহে সে আবার সুরু করিল। সেই যুগের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বশেষ পরীক্ষায় (তখন ইহাকে নিশ্চয়ই এম-এ বলা হইবে না, আর মাতৃভাষাই তখন অধিকসংখ্যক উচ্চশিক্ষার্থীর স্পেসাল সাব্‌জেক্ট্‌) বাঙ্গালা ভাষার ফার্ষ্ট্‌ পেপারের দিন পরীক্ষার হলে বসিয়া "নিম্নলিখিত লেখকগণ কোন যুগে কি বৈশিষ্ট্য লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল :—" এই প্রশ্নের উত্তর লিখিতে বসিয়া একটী সুস্থ সবল মেধাবী ছেলে আমার জন্ম-মৃত্যুর সময়টা সঠিক স্মরণ করিতে না পারিয়া হাতের কলম কামড়াইতেছে। এত করিয়া সে পরীক্ষার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা ও ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের মোটা মোটা বইগুলি বারবার পড়িয়াছে, আর শেষকালে সুচতুর অধ্যাপক কতকগুলি অখ্যাত লেখকের সম্বন্ধে ঠকানো প্রশ্ন করিয়া তাহার পড়াশুনার দৌড় জানিতে চাহিতেছে! ছেলেটী ভাবিতেছে—তপেশ লাহিড়ী? ১৯১৪ সনের মহাযুদ্ধের আগে না পরে? না, পরেই হইবে। তাহার লেখায় কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না, কিন্তু তাহাকে বস্তুতান্ত্রিক লেখকগোষ্ঠীর মধ্যেও ফেলা যায় না। আর কিছু লিখিবার সে ভাবিয়া পাইল না। না পাইবারই কথা। বাঙ্গালা সাহিত্যের রবীন্দ্র-যুগ সম্বন্ধে সাত শত পৃষ্ঠার মোটা বইখানির পাতায়ও উহার বেশী দু'একটা লাইন মাত্র আছে। আমি বাঁচিয়া আছি সেদিন পর্য্যন্ত অন্তত গুটিকয়েক পরীক্ষার্থীর খাতায় অথবা অতীত সংস্কৃতির গবেষণার মধ্যে। তুমি তখন কোথায় 'বিশ্ব-বাণীর' ম্যানেজার! কত বিশ্ববিখ্যাত সংবাদপত্র তখন প্রত্যহ প্রাতে বাহির হয়। তোমার 'বিশ্ব বাণীর' হয়ত তখন কোন অস্তিত্বই থাকিবে না।

তপেশ হাসিয়া উঠিল, উন্মাদের হাসি। ম্যানেজারের আছে কলম, তাহার আছে একটী বেশী—কলম ও কল্পনা। তপেশ ভাবিল, এখন একটু ভাব-বিলাস করিলে ক্ষতি কি! তাহাতে দুঃখ যদি ক্ষণকালের জন্যও খানিকটা ভুলিতে পারা যায়, দোষের কি এমন! ইহা ছাড়া আর উপায়ই বা কি! আছে কি তাহার! তপেশ আবার দম চড়াইল :—

আজ হইতে দুই শতাব্দী পরে—তুমি নবীমাধব দত্ত যাহার জন্য সুনিয়ন্ত্রিত কুমার-জীবন উৎসর্গ করিয়াছ বলিয়া মনে করিতেছ—সেই ভারতবর্ষ তখন স্বাধীন—জগতের শীর্ষস্থানে। তোমাদের 'বিশ্ব-বাণী' আপিসটা এখন যেখানে সেখানটায় এক মস্ত বড় প্রাসাদতুল্য ইমারত। সেখানে বাঙ্গালা সাহিত্যের মিউজিয়ম বা literary gallery বা ওরকম একটা কিছু। রোজ রোজ কত লোক দেখে, দেশ-বিদেশের কত পর্য্যটক আসে। প্রবেশ-মূল্য থাকিবে। তুমি নবীমাধব দত্ত পুনর্জন্ম লাভ করিয়া তখন যদি এদেশে জন্মগ্রহণ কর, 'বিশ্ব-বাণী'র ম্যানেজার বলিয়া দর্শনী ছাড়া ঢুকিতে দেওয়া হইবে না। তুমি যেখানে বসিয়া আজ কর্ম্মচারীদের উপর হিট্‌লারী হুকুম চালাইতেছ সেখানকার একটী সুপ্রশস্ত ঘরে সাজানো রহিয়াছে—যুগে যুগের ছোট-বড়-মাঝারি সাহিত্য-সেবীদের ব্যবহৃত কলম, ফাউন্টেন্-পেন, দোয়াত, দোয়াত-দানী, তাহাদের ব্যবহৃত টেবিল, চেয়ার, দু' একটী অসমাপ্ত লেখার পাণ্ডুলিপি, আরো কত কি! তোমাদের রোটারী লৌহদানবটা আজ যেখানে রাতদিন ঘর্ঘর করে, সেখানে এক মস্ত বড় হল্‌ঘরে আলমারীতে আলমারীতে সারি সারি সুবিন্যস্ত রহিয়াছে—বড়ু চণ্ডীদাসেরও পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালা ভাষার ধারাবাহিক সম্পদ-সঞ্চয়। একটী আলমারীর কোণে আমারো খানকয়েক নগণ্য দান স্থান পাইয়াছে সসম্মানে। সেদিন একবার ঐ বইয়ের পাতার অক্ষর পঙ্‌ক্তির মধ্য হইতে আমি তোমার কথা স্মরণ করিব নবীমাধব দত্ত! নিশ্চিন্ত থাকিয়ো, তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনিব না; অন্যায় তুমি কিছুই কর নাই, তোমার আমলের দুনিয়ার ক্ষমতাক্ষিপ্ত দশজন যেমন করে, তুমিও তাহাই করিয়াছ মাত্র—অভিমানও জানাইব না। আমি সেদিন তোমাকে একটু করুণা করিব মাত্র। শুধু স্মরণ করিব, মহাকালের বুকে সামান্য একটা দিনের গুটিকয়েক মুহূর্ত্ত একটা সংক্ষিপ্ত না'। সেদিন অসীম শূন্যতার মধ্য হইতে তুমি আমারই কৃপায় ক্ষণিকের একটু আয়ুরাশিস্ পাইবে। তুমি আর আমি—

তপেশের কল্পনার তার ছিঁড়িয়া গেল। একটী ভিখারী হাত পাতিল, "বাবু একটা পয়সা।"

তপেশ পকেটে হাত দিল। তিনটী পয়সা আছে। ভিখারীকে একটি দিয়া উঠিয়া পড়িল। কল্পনার বাতাস লাগিয়া মনের মেঘভার অনেকখানি কাটিয়া গিয়াছে।

পথ চলিতে চলিতে ভাবিল—আমি মানুষ, দুঃখদৈন্যকে ভয় করিলে চলিবে না আমার। এই কলিকাতা সহরে কত ছেলে যে ওবেলার খাবারের পয়সা কোথা হইতে আসিবে সেই চিন্তায় এবেলাই অস্থির। আমার তবু এখনো ৪০৲ পকেটে আছে। তপেশ হাত দিয়া বুক-পকেটে নোটগুলির অস্তিত্ব পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

পথে মুদীর দোকানে যাইয়া পাওনা ১৩৲ সব শোধ করিয়া দিল। মুদীর হিসাব পরিষ্কার রাখা ভাল! বাড়ীওয়ালার সঙ্গে দেখা করিয়া দু' মাসের বাড়ী ভাড়ার ২০৲ টাকাই মিটাইয়া দিল। মুদীর দোকান ও বাড়ী ভাড়া ভবিষ্যতে মাস দুই বাকী ফেলিয়া রাখা অসম্ভব হইবে না।

হাতে রইল এখন সাত টাকা। 'দেশ-মুকুরে'র একটা লেখা এমাসেই বাহির হইবার আশা আছে। কোন রকমে মাসখানেক চলিবেই। তপেশের সহসা মনে পড়িল, মঞ্জুলী যে আসন্নপ্রসবা। তাই তো! এখন টাকার যে খুবই প্রয়োজন! বাড়ীওয়ালাকে আর এক মাসের ভাড়া এখন না দিলেও চলিত। ভুল হইয়া গেল!

আবার মনে পড়িল, আজ সকালেই বাহির হইবার সময় মঞ্জুলীর শরীরটা কেমন-কেমন দেখিয়া আসিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি বাসার দুয়ারে আসিয়া জোরে কড়া নাড়িল।

দুয়ার খুলিল সুমতি। প্রশ্ন করিল, "আপনি কি হাসপাতাল থেকে আস্‌ছেন?"

তপেশ কিছু বুঝিতে না পারিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

"দাদার সঙ্গে আপনার দেখা হয় নি? তিনি আপনার আফিসে গেছেন।"

"আমি আজ সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছি। ব্যাপার কি বলুন না।"

"আপনি আজ বেরিয়ে যাবার পরই দিদির ব্যথা ওঠে। আমি আর দাদা গাড়ী করে তাকে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের হাসপাতালে রেখে এসেছি। দাদা দুবার করে খোঁজ করেছেন, তখনও কিছু হয় নি।"

হাসপাতালে পৌঁছিয়া তপেশ খোঁজ নিয়া জানিল, মঞ্জুলী একটী মৃত সন্তান প্রসব করিয়াছে। বিপদ কাটিয়া গেলেও এখনো যথেষ্ট শঙ্কা আছে। তপেশ একবার তাহাকে দেখিতে চাহিল। হেড্‌নার্স জানাইয়া দিল, এখন দেখা মিলিবে না। তপেশ কিছু আঙ্গুর-বেদানা কিনিয়া দিতে চাহিল। "আজ কিচ্ছু নয়। কাল থেকে" বলিতে বলিতে হেড্‌নার্স গড্‌গড্‌ করিয়া চলিয়া গেল।

তপেশ ধীরে ধীরে হাসপাতালের বাহিরে আসিল। মৃতের জন্য দুঃখ করিবার সময় তাহার নাই। যাহা কিছু চিন্তা এখন মঞ্জুলীর জন্য। দুঃখ—তপেশ ভাবিল—প্রথম সন্তানের জন্য দুঃখ? মোটেই না। সে বরং স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। আবার সে বেকার। পকেটের টাকা সাতটা একসঙ্গে বাজাইয়া দেখিল।······দুঃখকষ্ট তাহাদের দুজনেরই গা-সওয়া হইয়া গেছে। কোমল কুঁড়িটী রৌদ্রের রুদ্রদাহনে দুদিনেই শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িত! ভালই হইয়াছে! মরিয়া-জন্মিয়া বাঁচিয়া গেছে সে!

তপেশ বাসায় ফিরিল। রকের উপর নরেনবাবুর স্ত্রী মনোরমা, সুমতি, লবঙ্গ, ছোট্ট মেয়ে ঐ রেণুও বসিয়া আছে তপেশের আসার প্রতীক্ষায়।

তপেশ ধীরে ধীরে আসিয়া রকের একপাশে বসিল। দুঃসংবাদ শুনিয়া সকলের মুখে সমস্বরে সমবেদনা। সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, মঞ্জুলীর আজ কতখানি খোয়া গেছে। লবঙ্গলতিকাও আজ বিদ্বেষ ভুলিয়া চাপা গলায় দুঃখ প্রকাশ করে! মঞ্জুলীর বেদনা যত অথৈ হউক, কম করিয়াও এ-বেদনা, এই ব্যর্থতা, এ অপমান আজ তাহাদের সকলের-ই। তাহার সামনে বসিয়া ঐ সাদা-থান-পরিহিতা সুমতি—এমন কি এই এগার বছরের মেয়ে রেণুকণাও—প্রত্যেকে—তাহাদের প্রত্যেকে, রক্তে রক্তে গিঁঠায় গিঁঠায়, অন্তরে অন্তরে, জানিতে-অজানিতে এক একটি মা! মঞ্জুর অনাস্বাদিত পেয়ালা মুখের কাছে ছুঁইতে না ছুঁইতে পিছলাইয়া পড়িয়া চুরমার হইয়া গেছে। তাহার অস্তিত্বের সুরভিত নির্য্যাস উবিয়া গেল মৃত্যুর বাতাসে! প্রাণহীন রূপায়িত আকাঙ্ক্ষা! মরিয়াই জন্মিয়াছে সে—জন্মিয়া অকালে মরিবার শোক বাঁচাইয়া গেল! বেশ হইয়াছে!

তপেশ ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল ঘরে। মঞ্জুলী নিজের হাতে শেলাই করা ছোট ছোট কাঁথাগুলি নিজেই ট্রাঙ্কের উপর ভাঁজ করিয়া সাজাইয়া রাখিয়া গেছে। তপেশ

কাঁথাগুলির ভাঁজ খুলিয়া ক'খানা আছে গুণিল, লাল নীল কালো সূতার ফোঁড়গুলি লক্ষ্য করিল, তারপর যেমন ছিল তেমনি সাজাইয়া রাখিয়া বিছানায় যাইয়া শুইয়া পড়িল।

বেদনা মঞ্জুলীর, তাহার কি!

সাতদিন পর বিকালে তপেশ ডাফ্‌রিণ হাসপাতালে গেল। আজ মঞ্জুলীকে খালাস দিবে।

মিনিট পনের ব্যগ্র অপেক্ষার পর মঞ্জুলী আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। রুক্ষ কেশ, শুষ্ক অধর, রক্তশূন্য পাণ্ডুর মুখ! সারা দেহে দুঃসহ তপশ্চরণের করুণ চিহ্ন! আনতমুখী। ভাল করিয়া চাহিতে পারে না। মহা অপরাধীর মত মঞ্জুলী আসিয়া তপেশের সম্মুখে দাঁড়াইল।

দাঁড়াইবার স্তব্ধ ভঙ্গীটীও যেন ব্যর্থতারই রূঢ় রূপায়ন! মুখময় পরাজয়ের ব্যথিত ছাপ। সংহত আপাদশির রিক্ততারই কেমন যেন এক রেখা-চিত্র। পরণের শাড়ী-খানিও যেন ঐ শরীরব্যাপী ফ্যাকাশে শীর্ণতাকে কাঁদিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছে! সে যেন নিদাঘের একখানি বিগতবৈভব শোকার্ত্ত প্রান্তর!

নার্স ইংরাজীতে তপেশকে বলিল, "সৌভাগ্যক্রমে প্রসূতি বেঁচে গেছে। খুব সাবধানে রাখবেন। এখন পুষ্টিকর খাদ্যাদির একান্ত প্রয়োজন। ভাইব্রোনা অবশ্য খাওয়াবেন।—ভাইব্রোনা।"

তপেশ ডাকিল, "চল মঞ্জু! বাইরে রিক্‌শা দাঁড়িয়ে।"

দুষ্মন্তের রাজদরবার হইতে প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার মত ম্লানমুখী মঞ্জুলী নীরবে যাইয়া ফুটপাতের কাছে রিক্‌শাটায় উঠিল।

রাস্তায় স্বামী-স্ত্রী, কাহারও মুখে কথা নাই। শুধু রিক্‌শা চলিয়াছে—ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্।

বাসার দোর গোড়ায় পৌঁছিল। মনোরমা, অরুণ, সুমতি ও বেণুকণা আসিয়া দুয়ারের কাছে দাঁড়াইল।

বন্ধু সুমতির দুঃখই যেন বেশী। সে-ও আজ বিষাদময়ী। মঞ্জুলীকে ধরিয়া ধীরে ধীরে ভিতরে লইয়া গেল।

রিকশাওয়ালার ভাড়া মিটাইয়া দিয়া তপেশ ঘরে আসিল। চাহিয়া দেখিল, বাক্সের উপর কাঁথা ক'খানি তেমনি সাজানো!

মঞ্জুলী নীরব। বিছানার এককোণে মাথা নোয়াইয়া বসিয়া আছে অসহায় শিশুর মত। অপরাধীর মত সলজ্জ আড়ষ্টভাব। স্বামীর মুখের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিতে পারে না।

তপেশ তাহার পাশে গিয়া বসিল। আস্তে তাহার একখানি বিশীর্ণ হাত মুঠির মধ্যে লইয়া কহিল, "দুঃখ করো না মঞ্জু!"

মঞ্জুলীর নিশ্চল স্তব্ধতা এতক্ষণে ফাটিয়া পড়িল তপেশের সান্ত্বনা-বাক্যে। স্বামীর কোলে মুখ গুঁজিয়া সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"ও কি! ছি! কাঁদতে নেই···কথা শোন লক্ষ্মীটী।"

"ওগো, সে যে দেখ্‌তে তোমারই মতো হয়েছিল!"—স্বামীর কোলে মুখ লুকাইয়া মঞ্জুলী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তপেশ তাহার ম্লান রুক্ষ বিস্রস্ত এলোচুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে ভারী গলায় কহিল, "কেঁদো না মঞ্জু! আবার হবে।"

(ক্রমশঃ)



সঙ্গীত

বৃন্দাবনীসারঙ্গ

তেতালা

কে শোভিছে তোমার চরণ-তলে মা,
শুভ্র জ্যোতিতে নাশিছে তিমির রাশি,
কোটি সূরয মরে লাজে।
তোমার মহিমা আজো বুঝিতে পারে না কেহ,
তাই মহাযোগী পড়ে আছে শব সাজে॥

সুর ও কথা ঃ— সঙ্গীত-নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি ঃ— গীত-সাগর শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

০ ১ ২´ ৩

র্সা -া না প্া | মা রা মা পা | না না র্সা না | র্সা -া মপা নর্সা |
কে - শো ভি ছে তো মা র চ র ণ ত লে - মা৹ ৹৹

র্রা র্সা না পা | মা রা মা পা | না না র্সা না | র্সা -া -া -া |
৹ কে শো ভি ছে তো মা র চ র ণ ত লে - - -

পা র্সা না পা | মা পা মা_রা | রা মা পা রা | মা রা রা সা |
শু ৹ ভ্র জ্যো ৹ তি তে ৹ না শি ছে তি মি র রা শি

ন্া সা রা মা | পা না মা পা | মপা নর্সা র্রা -া | র্সর্রা র্সনা পমা পা ||
কো ৹ টি সূ র য ম রে লা৹ ৹৹ - - জে৹ ৹৹ ৹৹ ৹

{মা পা না পা | না না র্সা র্সা | র্সা স্া র্রা না | র্সা র্সা র্সা র্সা} |
তো মা র ম হি মা আ জো বু ঝি তে পা রে না কে হ

না র্সা র্রা র্মা | র্রা র্সা না র্সা | না র্সা র্রা র্সা | র্রর্সা নর্সা না_পা ||
তা ই ম হা যো গী প ড়ে আ ছে শ ব সা৹ ৹৹ জে ৹

* বৃন্দাবনীসারঙ্গ, ঔড়ব জাতি গ ও ধ বর্জ্জিত, রী—বাদী, প—সংবাদী।
ঠাট—সা রা মা পা না র্সা।

তান +

২´ ৩
১। ন্‌সা রমা পনা মপা | নর্সা র্রা র্সনা পনা |
আ॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ আ॰ ॰॰ ॰ ॰॰

২´ ৩
২। র্র্রা র্সরা র্রর্সা নপা | মপা নর্সা র্রর্সা নর্সা |
আ॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ আ॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰

॰ ১ ২´ ৩
৩। ন্‌সা রমা রা পা | -া -া -া -া | মরা পমা নপা -া | র্সা -া না পা
আ॰ ॰॰ ॰ ॰ - - - - আ ॰ ॰

॰ ১ ২´ ৩
মপনা মপা মা রা | -া -া -া -া | রমা পনা র্সর্রা র্মর্মা | র্রর্সা নপা মপা নর্সা |
আ॰॰ ॰॰ ॰ ॰ - - - - আ॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ আ॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰

॰ ১ ২´ ৩
৪। ন্‌সা ররা সরা মমা | রমা পপা মপা ননা | মপা নর্সা র্রর্মা রর্সা | নর্সা র্রসা নপা মপা |
আ॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ আ॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ আ॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ আ॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰

অন্তরার তান—

॰ ১ ২´ ৩
৫। মা পা না পা | না মা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্রা না | র্সা র্সা র্সা র্সা |
তো মা র ম হি মা আ জো বু ঝি তে পা রে না কে হ

তান—

॰ ১ ২´ ৩
মপা নর্সা র্রা -া | -া -া -া -া | র্সনা পনা র্সা -া | -া -া -া -া |
আ॰ ॰॰ ॰ - - - - - আ॰ ॰॰ ॰ - - - - -

॰ ১ ২´ ৩
নর্সা র্রর্মা র্রা -া | -া -া র্সর্সা -া | পনা র্সর্রা র্সনা পমা | রমা পর্সা -া -া |
আ॰ ॰॰ ॰ - - - ॰॰ - আ॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ আ॰ ॰॰ - -

॰ ১
মা পা না পা | না না র্সা র্সা |
তো মা র ম হি মা আ জো ইত্যাদি সমস্ত গাইতে হইবে।

+ "কে শোভিছে তোমার" পর্য্যন্ত গাইয়া ১ম ও ২য় তান ধরিতে হইবে এবং "কে শোভিছে তোমার চরণ তলে" পর্য্যন্ত গাইয়া ৩য় তান ও ৪র্থ তান ধরিতে হইবে।

গ্রাফোলজী ও মানুষের চরিত্র

শ্রীরণজিৎচন্দ্র সান্যাল

মানুষের চরিত্রের সমস্ত জটিল রহস্য জানা যায়—এই হেতু Graphology অর্থাৎ হস্তাক্ষর অনুশীলনতত্বের একটা বিশেষ মূল্য আছে; অবশ্য এ সম্বন্ধে আমাদের অধিকাংশের ভাল ধারণা নাই কারণ গ্রাফোলজী শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে ভারতের শিক্ষিত সমাজগুলিতে এ পর্যান্ত বিস্তার বা প্রাধান্য লাভ করেনি। এই তত্বের প্রথম প্রচারক হিসাবে Abbe Michon নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন—সকল দেশের হস্তলিপি-বিশেষজ্ঞদের স্মৃতিপথে।

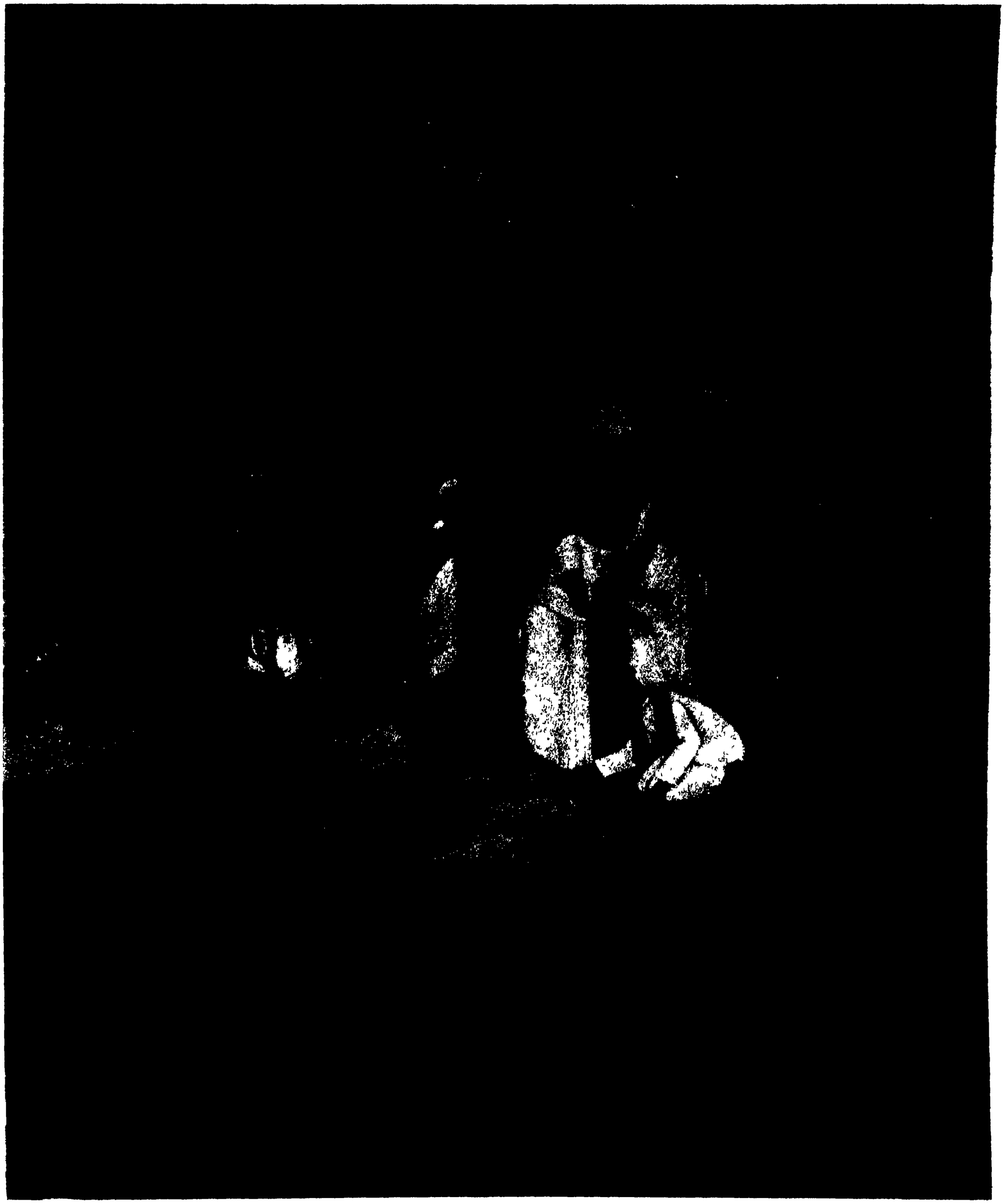
প্রবন্ধের ভূমিকায় বিষয়টির সৃষ্টি-বৈচিত্র্য (origin) সম্বন্ধে কিছু জানা ভাল। মানুষের হাতের লেখায় তার চরিত্রের একটা আভাস পাওয়া যায় এই ধারণা মানুষের মনে স্থান পেয়েছিল মধ্যযুগে (middle age)। যদিও তার সঠিক সময় অনুসন্ধান করা এখনও প্রায় অসম্ভব বলে গণ্য। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে হয় রোমান সম্রাট Augustusএর কথা—তাঁর রাজত্বকালে একজন পণ্ডিত সম্রাটের অদ্ভুত হাতের লেখা দেখে কৌতূহল প্রকাশ করেছিলেন। এই অনুমানের উপর নির্ভর করে বলা যায় যে সম্ভবতঃ সম্রাট Augustusএর সময় গ্রাফোলজী সম্বন্ধে মানুষের মনে একটা ধারণা এসেছিল। সম্রাটের হাতের লেখা সম্বন্ধে উপরোক্ত পণ্ডিতের কতকগুলি অনুশীলনমূলক অভিমত সম্রাটের চরিত্রের সাথে সম্পূর্ণ মিলে গিয়েছিল। যদিও গ্রাফোলজী চর্চ্চার সূত্রপাত এই রোমান সম্রাটের সময় হয়েছিল কিন্তু দেখা গেল—রোমান রাজ্যের ধ্বংশের সাথে রুদ্রদেবের সংহারলীলার তালে এই বিষয়টি কিছু-কালের জন্য লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ইতিহাসের সাহায্যে জানা যায় যে রোমান যুগের ধ্বংশের সাথে সংগ্রাম করে সাহিত্য এবং অক্ষর-বিজ্ঞান স্থায়ী হতে পারেনি, কেবলমাত্র কয়েকটি ধর্ম্মগ্রন্থই প্রাচীন সাহিত্যের জলন্ত নিদর্শন অতীতের সাক্ষী হয়েছিল। সম্ভবতঃ এই জন্যই রোমান যুগের শ্রেষ্ঠ সম্রাট Charlemagne যখন শাসন ক্ষমতা লাভ করেন সে সময় তিনি সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন।

৮০০ খৃষ্টাব্দের পর বহুকাল পর্য্যন্ত churএর Swiss Cathedral লোকচক্ষুর অগোচর থেকে ইতিহাসের সংরক্ষক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সেখানকার কতকগুলি ষ্টেট documentএর সাথে সম্রাট Charlemagneর সই করা এক কাগজ পাওয়া গিয়েছিল। এর পর বহুকাল পর্য্যন্ত ধর্ম্মযাজকরাই প্রাচীন সাহিত্য এবং ভাষা বিজ্ঞানকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

১৬০২ খৃষ্টাব্দে Baldo নামক কোনও ইয়োরোপীয় দার্শনিক এবং অধ্যাপক মানুষের চরিত্রের সাথে হাতের লেখার সামঞ্জস্য আবিষ্কার করে আমাদের স্মৃতিপথে অমর হয়ে রয়েছেন। তিনি—A treatise upon ascertaining human character নামক এক প্রবন্ধে যুক্তির সাহায্যে এই দেখাতে সমর্থ হলেন যে হাতের লেখা মানুষের ব্যক্তিত্বেরই একটা রূপ এবং এরই মধ্যস্থতায় মানুষের অন্তরের পরিচয় জানা সহজ। এই দার্শনিক অধ্যাপকের মৌলিক মতবাদ এবং থিয়োরীগুলি সমসাময়িক শিক্ষিত সমাজে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করে। এই থিয়োরী গুলির সাথে জনসাধারণ পরিচিত হতে পারে এই উদ্দেশ্যে প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে Petrus Vellius নামক একজন ছাত্র ল্যাটিন ভাষায় একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন—গ্রাফোলজী বিষয়টির মৌলিক এবং কার্য্যকরী থিয়োরীগুলি Baldo লিখিত বইগুলি হতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁরই সমসাময়িক একজন অস্ত্র-চিকিৎসার অধ্যাপক একই বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেছিলেন; দুঃখের বিষয় তাঁর মৃত্যুর সাথে তাঁর গবেষণার ফলাফলগুলি লুপ্ত হয়ে গেল।

Baldoর নামও অবশ্য বিলুপ্ত হয়ে যেত যদি ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে Abbe Michon তাঁর প্রতিভাবলে Baldর মতবাদগুলিকে মার্জ্জিত করে প্রচার ব্যবস্থা না করতেন। তিনি ঐ থিয়োরীগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তাশক্তির আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং সেগুলির পরিচয় যাতে জনসাধারণ লাভ করতে পারে এই আশায় অনেক রকম উপায় অবলম্বন করেছিলেন। যদিও এ কথা স্বীকার করতে হবে যে গ্রাফোলজী সৃষ্টি এবং প্রচারের মূলে Baldoর দান শ্রেষ্ঠ, কিন্তু এও মনে রাখতে হবে যে Baldo এবং Michonএর পরবর্ত্তী কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তির গবেষণা গ্রাফোলজীর ইতিহাসে স্থান লাভ করতে পারে, কারণ তাঁদের পরিশ্রমের জন্যই বিষয়টি বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত সমাজে একটা প্রাধান্য লাভ করেছে। তাঁরা বিষয়টিকে নানাভাবে বিভিন্ন থিয়োরীর সাহায্যে চিন্তা করেছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে Leibnitz নামক একজনের নাম প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। তার পর ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে Grohmann নামক একজন জার্ম্মাণ পণ্ডিত এক নূতন থিয়োরী ধরে চলেছিলেন যা গ্রাফোলজী এবং 'ফিসিওগ্নমী' অর্থাৎ মানুষের মুখের ভাব প্রকাশের সাহায্যে চরিত্র নির্ণয় পন্থার সামঞ্জস্য সম্বন্ধে আমাদের মনকে সচেতন করেছিল। তাঁর অনুশীলন রীতি এতখানি মৌলিকত্বে পূর্ণ ছিল যে তিনি হাতের লেখার সাহায্যে লেখকের চোখ এবং শরীরের রঙ্ পর্য্যন্ত বলে দিতে পেরেছিলেন।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে Herr Henz নামক একজন জার্ম্মাণ ভদ্রলোক হাতেকলমে গ্রাফোলজীর চর্চ্চা করেছিলেন। তাঁর লিখিত chiro-gramatomancy নামক একটি বই গ্রাফোলজী সম্বন্ধে একটি ভাল বই হিসাবে সুপরিচিত। প্রায় এই সময় Lavator নামে আর একজন এই



বিদায়

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে সমর্থ হলেন যে মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সাথে গ্রাফোলজীর এক যোগাযোগ রয়েছে; কারণ মানসিক পরিবর্ত্তনের সাথে মানুষের হাতের লেখার মধ্যেও একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। এই সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্য তিনি গ্রাফোলজী এবং ফিসিওগনমীর চর্চ্চা একসাথে আরম্ভ করেছিলেন। প্রমাণের সাহায্যে তিনি এই আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন যে দেশভেদে মানুষের শারীরিক গঠনের মধ্যে যেমন বিভিন্নতা আছে তেমনি হাতের লেখার মধ্যেও প্রত্যেক দেশে বিভিন্নতা দেখতে পাওয়া যায়।

কবিবর এড্‌গার ওলান্‌পো এই বিষয় সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি তাঁর সংগৃহীত কতকগুলি সই নিয়ে চরিত্র বর্ণনা করে পর পর কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, যদিও প্রবন্ধ রচনার সময় তিনি কোনও বিশেষ মতবাদের সাহায্য না নিয়ে তাঁর সহজাত প্রতিভা এবং বিচারবুদ্ধির সাহায্যে চরিত্র অনুশীলন করেছিলেন। অতঃপর ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ম'শিয়ে Boudenet, Bishop of Amiens, Archbishop of Cambray ইত্যাদি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা ফ্রান্সে একটি গ্রাফোলজীকাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

হাতের লেখার সাহায্যে চরিত্র স্থির করবার যুক্তিযুক্ত মতবাদগুলি ম'শিয়ে Desbaralles লিখিত The Mysteries of Handwriting নামক বইয়ে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। যথেষ্ট ইচ্ছা থাকা সত্বেও এই মূল্যবান বইটি আমি সংগ্রহ করতে পারিনি; এই বইটির মতবাদগুলি Michonএর থিয়োরীগুলির রূপান্তর মাত্র। Michonএর সার্ব্বভৌমত্ব লাভের আরেকটি প্রধান কারণ—তিনি গ্রাফোলজী বিষয়টিকে মৌলিক গবেষণার সাহায্যে এমন উন্নত স্তরে এনেছিলেন যে বিষয়টি বিজ্ঞানক্ষেত্রে Psychology বিষয়ের সমতুল্য বলে স্বীকার করা হয়েছে। তাঁর লিখিত বইগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—The system of Graphology, A method of Graphological study, The History of Napolion determined from his handwriting—ইত্যাদি বইগুলি এবং হয়ত অল্প ভবিষ্যতেই এই বইগুলি দুষ্প্রাপ্য হ'বে। গ্রাফোলজীর ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে ম'শিয়ে Jeminএর নাম বিশেষভাবে মনে হয়; কারণ তাঁরই সাহায্যে এই বিষয় সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল সম্পূর্ণ মিটেছিল। এই ভদ্রলোকের লেখা কতকগুলি বই John নামক ইংরাজ ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

মানুষের হাতের লেখা নিয়ে চর্চ্চা করবার সময়ে প্রথমেই বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রতিভাবান্ মনীষীদের হাতের লেখা সংগ্রহ করা দরকার মনে হয়। এক্ষেত্রে এমন চিঠিপত্রাদি সংগ্রহ করা ভাল, যা লেখক কর্ত্তৃক স্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় লিখিত হয়েছে। ব্যবসাক্ষেত্রে বা কোনও বিশেষ স্বার্থ নিয়ে লেখা চিঠি পত্রাদির কোনও graphological মূল্য নাই; কারণ সেক্ষেত্রে লেখকের মানসিক বৃত্তি একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। এ ছাড়া আরেকটি বিষয় আমাদের লক্ষ্য করতে হবে, সেটি হচ্ছে—কলমের এবং নিবের স্বাভাবিক অবস্থা। কুশী, অত্যন্ত পাতলা বা ভোঁতা যে নিব, সে নিবের লেখার কোনও অনুশীলন হয় না। এ ছাড়া লেখকের মানসিক উত্তেজনার দিকেও সচেতন থাকা দরকার।

কোনও মানুষের বাস্তবিক চরিত্র যদি হাতের লেখার সাহায্যে বিচার করতে হয় তাহলে আবশ্যক হবে সেই ব্যক্তির পর পর কয়েক বৎসরের হাতের লেখা—কারণ দেখা গিয়েছে মানুষের বয়স বৃদ্ধির সাথেও লেখার মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন আসে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে সম্রাট নেপোলিয়নের হাতের লেখা'র মধ্যে বহু বৎসর পর্য্যন্ত কোনও পরিবর্ত্তন দেখা যায় নি; এ সাথে আমরা জানি যে নেপোলিয়নে'র উচ্চশ্রেণীর উদ্ভাবনী ক্ষমতা (creative power) এবং বীরত্ব পৃথিবীর নাট্যশালায় সমানভাবে অভিনয় করে গিয়েছে। হাতের লেখার বিচারের সময় প্রথমে লেখার বিশিষ্টতা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করে নেওয়া ভাল এবং সে ধারণা সম্পূর্ণ হওয়া চাই, তারপর লেখার উৎকৃষ্টতা এবং অপকৃষ্টতা বিচারের সময় আসে।

উৎকৃষ্ট বা প্রথম শ্রেণীর হাতের লেখা অল্প চেষ্টাতেই ধরা যায় যেহেতু এই ধরণের লেখা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুপাঠ্য—একদিকে সামান্য বাঁকা এবং অত্যধিক পেঁচ-টানবর্জ্জিত হয়ে থাকে। সাধারণ বা মধ্যম শ্রেণীর হাতের লেখার অনেক ধরণ আছে। মনস্তত্বের দিক্ দিয়ে বিচার করতে গেলে একজন সাধারণ মানসিক বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি কোনও জটিল বিষয় সম্বন্ধে তৎপর চিন্তা বা যুক্তিসঙ্গত চিন্তা করতে পারে না; যদি কোনও ক্ষেত্রে কোনও জটিল বিষয় সম্বন্ধে দ্রুত সিদ্ধান্ত করতে গিয়ে তার মস্তিষ্কের উপর চাপ পড়ে তাহলে পরিণাম স্বরূপ তা'র চিন্তার মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হতে পারে। সাধারণ অর্থাৎ মধ্যমশ্রেণীর হস্তাক্ষর শ্রেণীবিভাগ করবার প্রধান থিয়োরী—এই শ্রেণীর হাতের লেখা অপাঠ্য, অপরিষ্কার এবং অক্ষরগুলির মধ্যে সু-ছাঁদের অভাব দেখ্‌তে পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য এই শ্রেণীর হাতের লেখার সাহায্যে এমন কোনও ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয় না যা প্রথম শ্রেণীভুক্ত। অপকৃষ্ট বা অবনত মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির হাতের লেখা কার্য্যতঃ সর্ব্বাপেক্ষা সহজ—কারণ এই শ্রেণীর হাতের লেখার মধ্যে এমন একঘেয়ে vertical অক্ষর চোখে পড়ে যা কখনও কোনও বুদ্ধিমান লোকের হাতের লেখায় দেখতে পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে হাতের লেখার শ্রেণীবিভাগ করে লেখার সাথে সম্বন্ধযুক্ত লেখকের বুদ্ধিবৃত্তি বা intellect বিচার করবার পর লেখকের graphological অনুশীলনমূলক মানসিক ক্ষমতা, চিন্তাশক্তি এবং লেখার মধ্যে পরিস্ফুট বিশেষ চরিত্র-প্রকাশক চিহ্নগুলি ধরা সহজ হয়ে আসে। এই বিশেষ চিহ্নগুলি লেখার মধ্যে অনেকবার দেখতে পাওয়া যায় এবং এর দ্বারা আমাদের এই বুঝতে হবে যে চিহ্নগুলি স্বতঃ লিখিত। যদিও একই মানুষের লেখার মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব-প্রকাশক চিহ্ন পাওয়া যায়। হয়ত একজনের হাতের লেখা অনুশীলন করে প্রকাশ হোলো তা'র স্বার্থপরতা এবং নীচতা—কিন্তু বাস্তব জীবনে সে হয়ত উদারচিত্ত; এক্ষেত্রে graphologistকে বিপদে পড়তে হয়।

বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে সমর্থ হলেন যে মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে গ্রাফোলজীর এক যোগাযোগ রয়েছে ; কারণ মানসিক পরিবর্তনের সাথে মানুষের হাতের লেখার মধ্যেও একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্য তিনি গ্রাফোলজী এবং ফিসিওগনমীর চর্চা একসাথে আরম্ভ করেছিলেন। প্রমাণের সাহায্যে তিনি এই আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন যে দেশভেদে মানুষের শারীরিক গঠনের মধ্যে যেমন বিভিন্নতা আছে তেমনি হাতের লেখার মধ্যেও প্রত্যেক দেশে বিভিন্নতা দেখতে পাওয়া যায়।

কবিবর এড্‌গার ওলান্‌পো এই বিষয় সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি তাঁর সংগৃহীত কতকগুলি সই নিয়ে চরিত্র বর্ণনা করে পর পর কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, যদিও প্রবন্ধ রচনার সময় তিনি কোনও বিশেষ মতবাদের সাহায্য না নিয়ে তাঁর সহজাত প্রতিভা এবং বিচারবুদ্ধির সাহায্যে চরিত্র অনুশীলন করেছিলেন। অতঃপর ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে মঁশিয়ে Boudenet, Bishop of Amiens, Archbishop of Cambray ইত্যাদি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা ফ্রান্সে একটি গ্রাফোলজীকাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

হাতের লেখার সাহায্যে চরিত্র স্থির করবার যুক্তিযুক্ত মতবাদগুলি মঁশিয়ে Desbaralles লিখিত The Mysteries of Handwriting নামক বইয়ে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। যথেষ্ট ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এই মূল্যবান বইটি আমি সংগ্রহ করতে পারিনি ; এই বইটির মতবাদগুলি Michonএর থিয়োরীগুলির রূপান্তর মাত্র। Michonএর সার্ব্বভৌমত্ব লাভের আরেকটি প্রধান কারণ—তিনি গ্রাফোলজী বিষয়টিকে মৌলিক গবেষণার সাহায্যে এমন উন্নত স্তরে এনেছিলেন যে বিষয়টি বিজ্ঞানক্ষেত্রে Psychology বিষয়ের সমতুল্য বলে স্বীকার করা হয়েছে। তাঁর লিখিত বইগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—The system of Graphology, A method of Graphological study, The History of Napolion determined from his handwriting—ইত্যাদি বইগুলি এবং হয়ত অল্প ভবিষ্যতেই এই বইগুলি দুষ্প্রাপ্য হ'বে। গ্রাফোলজীর ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে মঁশিয়ে Jeminএর নাম বিশেষভাবে মনে হয় ; কারণ তাঁরই সাহায্যে এই বিষয় সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল সম্পূর্ণ মিটেছিল। এই ভদ্রলোকের লেখা কতকগুলি বই John নামক ইংরাজ ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

মানুষের হাতের লেখা নিয়ে চর্চ্চা করবার সময়ে প্রথমেই বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রতিভাবান্ মনীষীদের হাতের লেখা সংগ্রহ করা দরকার মনে হয়। এক্ষেত্রে এমন চিঠিপত্রাদি সংগ্রহ করা ভাল, যা লেখক কর্ত্তৃক স্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় লিখিত হয়েছে। ব্যবসাক্ষেত্রে বা কোনও বিশেষ স্বার্থ নিয়ে লেখা চিঠি পত্রাদির কোনও graphological মূল্য নাই ; কারণ সেক্ষেত্রে লেখকের মানসিক বৃত্তি একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। এ ছাড়া আরেকটি বিষয় আমাদের লক্ষ্য করতে হবে, সেটি হচ্ছে—কলমের এবং নিবের স্বাভাবিক অবস্থা। কুশ্রী, অত্যন্ত পাত্‌লা বা মোঁটা যে নিব, সে নিবের লেখার কোনও অনুশীলন হয় না। এ ছাড়া লেখকের মানসিক উত্তেজনার দিকেও সচেতন থাকা দরকার।

কোনও মানুষের বাস্তবিক চরিত্র যদি হাতের লেখার সাহায্যে বিচার করতে হয় তাহলে আবশ্যক হবে সেই ব্যক্তির পর পর কয়েক বৎসরের হাতের লেখা—কারণ দেখা গিয়েছে মানুষের বয়স বৃদ্ধির সাথেও লেখার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে সম্রাট নেপোলিয়নের হাতের লেখা'র মধ্যে বহু বৎসর পর্য্যন্ত কোনও পরিবর্তন দেখা যায় নি ; এ সাথে আমরা জানি যে নেপোলিয়নে'র উচ্চশ্রেণীর উদ্ভাবনী ক্ষমতা (creative power) এবং বীরত্ব পৃথিবীর নাট্যশালায় সমানভাবে অভিনয় করে গিয়েছে। হাতের লেখার বিচারের সময় প্রথমে লেখার বিশিষ্টতা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করে নেওয়া ভাল এবং সে ধারণা সম্পূর্ণ হওয়া চাই, তারপর লেখার উৎকৃষ্টতা এবং অপকৃষ্টতা বিচারের সময় আসে।

উৎকৃষ্ট বা প্রথম শ্রেণীর হাতের লেখা অল্প চেষ্টাতেই ধরা যায় যেহেতু এই ধরণের লেখা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুপাঠ্য—একদিকে সামান্য বাঁকা এবং অত্যধিক পোঁচ-টানবর্জ্জিত হয়ে থাকে। সাধারণ বা মধ্যম শ্রেণীর হাতের লেখার অনেক ধরণ আছে। মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়ে বিচার করতে গেলে একজন সাধারণ মানসিক বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি কোনও জটিল বিষয় সম্বন্ধে তৎপর চিন্তা বা যুক্তিসঙ্গত চিন্তা করতে পারে না ; যদি কোনও ক্ষেত্রে কোনও জটিল বিষয় সম্বন্ধে দ্রুত সিদ্ধান্ত করতে গিয়ে তার মস্তিষ্কের উপর চাপ পড়ে তাহলে পরিণাম স্বরূপ তা'র চিন্তার মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হতে পারে। সাধারণ অর্থাৎ মধ্যমশ্রেণীর হস্তাক্ষর শ্রেণীবিভাগ করবার প্রধান থিয়োরী—এই শ্রেণীর হাতের লেখা অপাঠ্য, অপরিষ্কার এবং অক্ষরগুলির মধ্যে সু-ছাঁদের অভাব দেখতে পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য এই শ্রেণীর হাতের লেখার সাহায্যে এমন কোনও ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয় না যা প্রথম শ্রেণীভুক্ত। অপকৃষ্ট বা অবনত মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির হাতের লেখা কার্য্যতঃ সর্ব্বাপেক্ষা সহজ—কারণ এই শ্রেণীর হাতের লেখার মধ্যে এমন একঘেয়ে vertical অক্ষর চোখে পড়ে যা কখনও কোনও বুদ্ধিমান লোকের হাতের লেখায় দেখতে পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে হাতের লেখার শ্রেণীবিভাগ করে লেখার সাথে সম্বন্ধযুক্ত লেখকের বুদ্ধিবৃত্তি বা intellect বিচার করবার পর লেখকের graphological অনুশীলনমূলক মানসিক ক্ষমতা, চিন্তাশক্তি এবং লেখার মধ্যে পরিস্ফুট বিশেষ চরিত্র-প্রকাশক চিহ্নগুলি ধরা সহজ হয়ে আসে। এই বিশেষ চিহ্নগুলি লেখার মধ্যে অনেকবার দেখতে পাওয়া যায় এবং এর দ্বারা আমাদের এই বুঝতে হবে যে চিহ্নগুলি স্বতঃ লিখিত। যদিও একই মানুষের লেখার মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব-প্রকাশক চিহ্ন পাওয়া যায়। হয়ত একজনের হাতের লেখা অনুশীলন করে প্রকাশ হোলো তা'র স্বার্থপরতা এবং নীচতা—কিন্তু বাস্তব জীবনে সে হয়ত উদারচিত্ত ; এক্ষেত্রে graphologistকে বিপদে পড়তে হয়।

বিদেশীয় লোকের হাতের লেখা বিচার করবার সময় সে দেশের অবস্থা এবং ব্যক্তি বিশেষের পারিপার্শ্বিক রীতি সম্বন্ধে প্রথমেই জানা দরকার, কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে যে এইগুলি মানুষের হাতের লেখার উপর প্রভাব বিস্তার করে। ১৬শ বা ১৭শ শতাব্দীর সাথে বর্ত্তমান সময়ের যেমন অনেক অমিল আছে তেমনি হাতের লেখার মধ্যেও অমিল রয়েছে। হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করে থাকেন যে মানুষের হাতের লেখার উপর সময় ও দেশের অবস্থা এবং যুগের একটা প্রভাব থাকে এবং এই জন্যই কোনও গত শতাব্দীর হাতের লেখা বিচার করে সে সময়ের দেশের অবস্থা সম্বন্ধে এবং সে লেখাটির ঐতিহাসিক সময় অনায়াসে বলা সম্ভব। Victorian যুগের প্রথম অবস্থায় মহিলারা—ডান্ দিকে বাঁকা লেখার পক্ষপাতী ছিলেন ; এই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা আমরা তাঁদের মানসিক উত্তেজনার বিষয় একটা আভাষ পাই। উপরন্তু ইতিহাসের সাহায্যেও প্রমাণ করা যায় যে বাস্তবিক মনস্তত্বের দিক্ দিয়ে বিচার করলে Victorian যুগের মহিলারা অপেক্ষাকৃত উত্তেজক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ছিলেন, সাহিত্যের দ্বারাও একথা স্বীকার করা হয়েছে।

গ্রাফোলজীর কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে একজন ইংরাজ গ্রন্থকার বলেছেন—It is our own handwriting that confronts us in the book of life. As it is expedient to learn of our failings in time to correct them in order that the fewer errors may mar the pages in future. এই কথাগুলিই হোলো এই বিষয়ের প্রধান পরিচয়।

ছলনাময়ী

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আপনার কথা অনেক বলেছি, আর কিছু বলিব না
এমনি নীরব কতদিন আর থাকিবে ছলনাময়ী ?
ভালবাস বলে' মনের প্রবোধে মোরে আর ছলিব না
এ ভালবাসার কিছু নাই দাম, মিথ্যা সে হ'ল জয়ী।

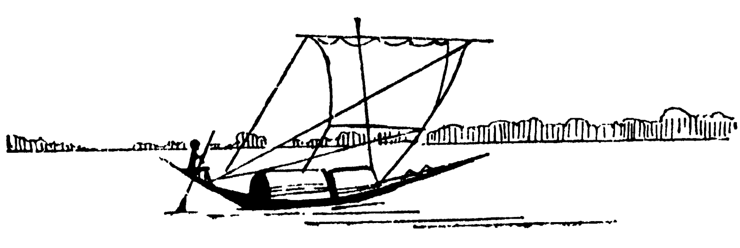
তোমায় আমায় দেখা হ'ল সখী কোন্ সে তেপান্তরে
কতদূর হ'তে এসেছিলে তুমি, কতদূর হ'তে আমি,
যাত্রাপথের কোন্ সে পাথেয় রেখেছিনু অন্তরে,
প্রিয়তমা বলে ডেকেছিনু তোমা, তুমি বলেছিলে স্বামী !

মনে আছে মোর, সূর্য্য তখন অস্ত গিয়েছে সবে
গোধূলি বেলার মলিন মাধুরী দেখিনু তোমার মুখে
দ্বিধা বিজড়িত কণ্ঠে কহিলে—"মালাখানি মোর লবে ?"
বিজয়মাল্য পরিয়া গলায় তোমারে ধরিনু বুকে।

আকাশে তখন ফুটিয়া উঠিছে দু'টি কি একটি তারা,
দ্বিতীয়ার চাঁদ পূর্ব্ব গগনে কেবল দিতেছে দেখা
সুদীর্ঘ পথ বাহিয়া চলিনু তোমাতে আত্মহারা
তখন কে জানে বিধাতা লিখিছে এ হেন ভাগ্য লেখা।

আজি সখী তুমি চিনিতে পার না, দূর হ'তে চেয়ে থাক,
তোমার নয়নে বিস্ময়মাখা আমি কি অপরিচিত ?
পৃথিবীরে তুমি চিনিতে পারনি,—আমারেও জাননাক
মনের কপাট খুলিলে না যেন সন্দেহ-আকুলিত।

তুমি জাননাক' আপনার মন, তাই এ বিড়ম্বনা
তোমারে কাঁদায় নিশিদিনমান আমারে এড়ায়ে চলে,
হায় হতভাগী, আপনারে কেন এহেন প্রবঞ্চনা,
বাসনার ঢেউ উদ্বেল যদি হৃদয়-সিন্ধু তলে।



মৌনী বাবা

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

অলকা-তিলকা-সজ্জিত কপোল, জটাজুটবিভূষিত মস্তক, ভস্মাচ্ছাদিত অঙ্গ, ধূম্রারক্তনেত্র, চিমটাকম্বলকমণ্ডলুধারী, কৌপীনোপরিবাঘছালপরিহিত সাধু ও সন্ন্যাসী তোমরা বোধ হয় সকলেই দেখিয়াছ। তাঁহাদের কেহ বিরিঞ্চি বাবা, কেহ ধৃতরাষ্ট্র বাবা, কেহ মৌনী বাবা, কেহ সাধু বাবা, কেহ বা শুধুই বাবা! কিন্তু সংসারে বাস করে, স্ত্রীপুত্র লইয়া ঘর করে, ধুতিকামিজ পরে, জুতা পায়ে দেয়, আফিসে চাকরী করে, অথচ মৌনী বাবা, ইহা তোমরা বোধহয় দেখ নাই। আমিও একাধিক দেখি নাই, একটিমাত্র দেখিয়াছি এবং সেই একটির কথাই লিপিবদ্ধ করিয়া আজ আমার মসীকলঙ্কিতমুখ লেখনী ধন্য করিতেছি। শোন তবে মৌনী বাবার গল্প।

১

গণেশ লোকটি দেখিতে রোগা ও পাকসিটে গোছের, কিন্তু তাহার গায়ের জোর অসামান্য, মনের জোর তার চেয়েও বেশী এবং মনের জোরে ও গায়ের জোরে তাহার প্রায়ই মল্লযুদ্ধ হয়; কেহ কাহাকেও হারাইতে পারে না। গণেশ লোকটি ক্ষীণকায়, ক্ষীণজীবী অথচ পরিশ্রম করিতে পারে অসাধারণ। বিপদে লোককে অভয় দিতে এবং লোকের আপদে তুড়কি লাফ খাইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতে তাহার জোড়া দেখি নাই। তাহার মেজাজটা সকল সময়ে ভাল থাকে না বটে, কিন্তু যখন ভাল থাকে, তাহার মুখের হাসি মিলায় না, অধরের কন্যাকুমারিকা হইতে কর্ণের হিমাচল পর্য্যন্ত গণেশের হাসি উচ্ছ্বসিত। আমি যে-গ্রামে বিবাহ করিয়াছি, গণেশের বাস সেই গ্রামে; আমার সঙ্গে তাহার পরিচয় আমার বিবাহের রাত্রিতে। বিবাহান্তে তৃষ্ণায় বরের ছাতি ফাটিতেছে, কুটুম্ব স্বজনগণ ডাবের জল খাইবার জন্য বরকে খুবই পীড়াপীড়ি করিতেছেন, বরও না বলিতেছে না, অথচ ডাব আসি আসি করিতেছে, কিন্তু আসিতেছে না! হঠাৎ দৃষ্ট হইল, ধৃষ্ট ডাব বৃক্ষশির হইতে বরের প্রীত্যর্থে এতক্ষণেও নামিয়া আসে নাই শুনিয়া গণেশ রুষ্ট হইয়া একলাফে নারিকেল গাছের নীচে পৌঁছিল এবং গোটা চার পাঁচ হেঁচকায় ধৃষ্টদের ঘাড়ে মোচড় দিয়া ধুপ ধাপ শব্দে আছড়াইয়া ধৃষ্টতার সাজা দিয়া দিল। যেন তাহাতেও তাহার রাগ কমিল না, পাট-কাটা দা দিয়া কচা-কচ্ শব্দে কাটিয়া কুটিয়া তবে সে থামিল। আমার পরমারাধ্য পিতৃদেবের মনে কোন গূঢ় অভিসন্ধি ছিল কি-না জানি না, তিনি, পঞ্চাশ জন বলিয়া দেড়শত জন বরযাত্রী লইয়া গিয়া আমার শ্বশুর মহাশয়ের মুখ ও বুক শুকাইয়া দিয়াছিলেন। এই দেড়শত জনের মধ্যে একশত সাড়ে বিয়াল্লিশ জন সহুরে লোক, অজীর্ণের আসামী, পঞ্চাশজনের খাদ্যসামগ্রীতেই তাঁহাদের বাইরণের সোডার তল্লাশ করিতে হইতেছিল। আর কিছুতেই শ্বশুর মহাশয় জব্দ হইলেন না, সবই কুলাইয়া গেল, মাছের কালিয়াটায় কেবল টান পড়িল। গণেশ বলিল, কুছ পরোয়া নেহি! বলিয়া তাহারই বয়সী একজন যুবককে সঙ্গে লইয়া একটা দোঁড়া জাল ঘাড়ে ফেলিয়া সামনের পুকুরটায় নামিয়া গেল রাত্রি বারটায়, রাত্রি একটায় ভিয়ান ঘরে কালিয়ার গামলায় মাছের কালিয়া টলমল করিতে লাগিল। গণেশের নামে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। পল্লীগ্রামে তখনও রাজনীতির ঝড়ো হাওয়া প্রবেশ করে নাই, তাই, নহিলে ছেলেরা শুণ্ডবিহীন গণপতিকে ইন্দুরের পৃষ্ঠ হইতে নিজেদের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া জয় গণেশজীকি জয় রবে গ্রাম ফাটাইয়া চৌচির করিত। আমি গণেশের সঙ্গে আলাপ এবং ভাব করিয়া লইলাম।

বিকালে বর-ক'নে বিদায়ের সময় বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ মধ্যে কলহ বাধিয়া গেল। বরপক্ষ দলেও ভারী, দমেও ভারী। পঞ্চাশের স্থানে তিনপঞ্চাশ আসিয়াছে, কাজেই তাহারা দলে ভারী; আর তাহারা ইচ্ছা করিলে সদ্যঃ বিবাহিতা ক'নেকে অবহেলে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেও পারে, ইহাতে বুঝিতে হয় যে তাহারা দমেও ভারী। ব্যক্তিগত বচসা যখন জীবিত-মৃত পূর্ব্বপুরুষ পর্য্যন্ত পৌঁছিল

এবং পিরাণের আস্তিনের সঙ্গে যখন ছাতা ও লাঠির প্রতি মনোযোগ দিবার অবস্থা ঘটিল, তখন সেই না-কাল না-ফরসা বেঁটে রোগা পাকাটে লোকটা হঠাৎ রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইল মাটী ও শিকড়শুদ্ধ একটা ত্রিশহস্ত পরিচিত বাঁশ আস্ফালন করিতে করিতে। সে কথা বলিল একটি ছত্র, বাঁশটা ঘুরাইল পঞ্চাশবার, চক্ষু দুইটা বিস্ফারিত ও বিঘূর্ণিত হইল একশত পঞ্চাশবার। খাঁটী হিন্দি বলিল, মারকে হাড্ডি চুর চুর করেগা।

হাড্ডি অর্থাৎ হাড়ের উপর মায়া অল্পবিস্তর সকলেরই আছে; বিশেষ করিয়া যাহারা ত্রিশ পার, তাহারা জানে, হাড় ভাঙ্গিলে জোড়া লাগিবে না, মায়াটা তাহাদের কিছু বেশী। বর পক্ষের লম্ফ-ঝম্ফ কমিয়া আসিতেছিল, তাঁহারা চটপট কোমলে নামিলেন। আমিও গণেশের হাতটা চাপিয়া ধরিলাম, গণেশ বাঁশটা ফেলিয়া দিল, চক্ষুর প্রসারণ-সঙ্কোচন বিঘূর্ণন শুদ্ধ করিল। বর-ক'নে চলিয়া গেল।

গণেশ কাজ-কর্ম্ম করে না, তাহার বাড়ীর লোক তজ্জন্য বড়ই অসন্তুষ্ট। গণেশ বলে, চাকরী করিবার ফুর্স‍ৎ কোথায়? গ্রামের নিকট ও দূরবর্ত্তী গ্রাম সমূহের বেওয়ারিশ শব দাহ না করিলে দুর্গন্ধে লোক মরিয়া গ্রাম উৎসন্ন যাইবে, কাজেই সে কাজটা সে ছাড়িতে পারে না; গ্রামে ঐ একটি মাত্র যাত্রার দল, জেলাময় তাহার গাওনা, সে দলের পাণ্ডা হইবার লোক একজন জুটিলেই গণেশ ছুটি পায়; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত একটি প্রাণীও দায় ঘাড়ে লইতে আসিল না, এত সাধের যাত্রার দলটিকে সে উঠাইয়া দিতে পারে না; বাঙ্গালা দেশের পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য ক্রমশঃই অবনত হইয়া পড়িতেছে, ওলাউঠা, বসন্ত, বেরিবেরি, সম্প্রতি দেখা দিয়াছে ঝিন্‌ঝিনিয়া—এক এক চোটে গ্রাম উজাড় করিতে চেষ্টা করে, তখন বারোয়ারী কালীপূজা, বারোয়ারী শীতলা ও ওলাবিবির পূজা দিয়া কোনমতে গ্রামগুলিকে যে রক্ষা করা হয়—সে সবের চাঁদা সাধে কে? গণেশ। বাঁশঝাড়ে কোপ দেয় কে? গণেশ। আটচালা বাঁধে কে? ঐ গণেশ। প্রতিমা বিসর্জ্জনের শোভাযাত্রার সঙ্গে নাচে কে? ঐ গণেশ। সবাই যে বলে গণেশ সহরে যা, চাকরী বাকরী কর। বেশ, না হয় গণেশ সহরে গেল, একটা চাকরীও জুটাইল এবং করিতে লাগিল; কিন্তু গ্রামটি যখন ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে তখন ঠেকাইবে কাহার সহধর্ম্মিণীর কোন্ সহোদর, সে হিসাবটা কেই সঙ্গে লোক দেয় না কেন! না বাপু না, সোনার গ্রামখানিকে শ্মশান হইতে দিতে সে পারিবে না।

কিন্তু গণেশ বিয়ে করে না কেন? গ্রামের লোকের এ দুঃখটাও বড় কম নয়। ঘন ঘন শ্বশুরবাড়ী আসা ও থাকার সম্পর্কে গণেশের সঙ্গে আমার বিশেষ সম্প্রীতি ঘটিয়াছিল। গ্রামের লোক আমাকে ধরিয়া পড়িল, ছোঁড়াটার বিয়েতে মতি করাইয়া দিতে হইবে। কাজটা সহজ নয়। ক্ষুধা নাই এমন জীব চরাচরে নাই। যৌবন-কালে ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লী সহরের নাড্ডুতে কাহারও অরুচি থাকে এ বিশ্বাস আমার নাই; বরং রাজধানীর স্বাদু পদার্থটির মাত্রাধিক্যেও লোকের অরুচি হয় না, আমার ইহাই বিশ্বাস। গণেশ যদি স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম হয়, আমি কি করিব? তবু, বলিলাম। সে যে উত্তর দিল, তাহা প্রকৃতপক্ষে অভাবনীয় এবং অভিনব। সাধারণতঃ ঐরূপ অনুরোধের এইরূপ জবাবই মিলে যে, বিয়ে ত করিব, খাওয়াইব কি! গণেশ সেদিকও মাড়াইল না, ম্লানমুখে বলিল, জামাই, আমার যোগ্য ক'নে পাইতেছি না। হাসিলাম, হাসিবার কথা, হাসিব না?

কিন্তু গণেশ গম্ভীরভাবে বলিল, তুমি দাও না, জামাই, একটি দেবগণের মেয়ে, এখুনি বিয়ে করি। নরগণও চলবে না, রাক্ষসগণও হবে না, দেবগণ চাই, পার দিতে?

গ্রামের লোককে সে কথা জানাইলাম। তাহারা ক'নে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহারা নরগণ পাইল, রাক্ষস-গণও পাইল কিন্তু দেবগণ পাইল না; দূর দূরান্তরে খোঁজ চলিতে লাগিল, আশ্চর্য্য, তল্লাটে দেবগণ কন্যা একটিও নাই। গণেশ বলিল, জামাই, খোঁজ করতে আমি কি আর কসুর করিছি হ্যা, ক'নে পাই নে ত করি কি! আসল কথা তোমায় খুলে বলি শোন, আমার রাক্ষসগণ, রাক্ষসগণ ক'নে আমার সঙ্গে থাপ খাবে না; লড়াই হবে; নরগণ ক'নেও চলবে না, আমি তাকে খেয়ে ফেলব। আর বারবার টোপর প'রে বর সাজা, ভাল নয়; তুমি কি বল?

—কিন্তু এখনকার লোকে এ সব মানে না।

—আমি খুব মানি, জামাই।

—কেউ যখন মানে না, তখন তুমিই বা মানবে কেন?

—সবাইয়ের সঙ্গে আমার তফাৎ আছে। বুড়ো বয়স

পর্য্যন্ত তাস পাশা খেলে, মড়া পুড়িয়ে, বারোয়ারীর চালা বেঁধে বাপের ভাত কেউ মারে না, আমি মারি। আরে, সবাই বলে চাকরী কর। কেন রে বাপু? বাপ-ঠাকুরদা যে এক মাঠ ক্ষেত ভূঁই রেখে গেল, সে তবে কিসের জন্যে? আমার বাপ, তার বাপ, তার বাপ, তারও বাপ—কেউ কোনদিন চাকরী করল না, বসে খেয়ে গেল, আমিই বা কেন চাকরী করব!

—জমি জিরাত বাড়বে ব'লে!

—বাড়বে না কচু! আমি যাব চাকরী করতে আর পাঁচ শা···য় নেবে সব ভোগাভুগি দিয়ে।

ইহার পক্ষে ও বিপক্ষে যত তর্কই উত্থাপিত করি না কেন, যাহার খাইবার ও পরিবার সংস্থান আপনা হইতেই হইয়া আছে, তাহাকে রেহাই দিতে আমার অন্ততঃ আপত্তি হইল না।

—তা যেন হোল, কিন্তু বিয়েটার কি হয়?

—মেয়ে দাও, বিয়ে করি।

ভরসা দিলাম, দিব, তিষ্ঠ! আমার মেয়ে হইলে নিশ্চয়ই দেবগণ হইবে, যেহেতু আমার স্ত্রীর ধারণা আমি শাপভ্রষ্ট দেবতা; আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে আমার ধারণাটা ঠিক কি—তাহা না-হয় নাই বলিলাম, তবে তিনি যে শেফালিকা (তাঁহার নাম) ঘোষ না লিখিয়া শ্রী (মতী নয়) শেফালিকা দেবী লিখিতেছেন, ইহাতে আমার পূর্ণ সমর্থন না থাকিলেও আপত্তি যে করি নাই তাহা সুনিশ্চিত। আমি দেব এবং তিনি দেবী অতএব এতদুভয়ের সুখমিলনে যে সুকন্যা জন্মগ্রহণ করিবে সে নিশ্চয়ই দেবগণ যুক্তা হইবে, আর গণেশ যদি ততদিন অপেক্ষা করে, আমি তাহার আক্ষেপ মিটাইয়া দিব। ধীরপ্রকৃতি গণেশ রাজী হইয়া গেল; বুঝিলাম, তাহার তাড়া নাই। সুখবরটা স্ত্রীকে দিলাম এবং বলিলাম, একটি সুকন্যার জননী হওয়া নিতান্ত দরকার, তবে ব্যস্ততার প্রয়োজন নাই, কারণ, জামাই হাতছাড়া হইবে না। তিনি বলিলেন, গলায় দড়ি। কাহার, তাহা বুঝিলাম না; বুঝিবার চেষ্টা করাও সমীচীন বলিয়া মনে হইল না।

কিছুদিন পরে শ্বশুরবাড়ী আসিয়া স্ত্রীর মুখে শুনিলাম, মালঞ্চ গ্রামে দেবগণসম্পন্না একটি ক'নের সন্ধান মিলিয়াছে। দুই একদিনের মধ্যেই গণেশ ক'নে দেখিতে যাইবে।

আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম, ম্লানমুখে কহিলাম, ইস্।

স্ত্রী বলিলেন, ইস্ করলে যে!

বলিলাম, ভাবী জামাইটি হাতছাড়া হয়ে গেল।

স্ত্রী ভদ্রলোক, ভদ্রকন্যা, ভদ্রপত্নী, তাঁহার সেই এক কথা, গলায় দড়ি।

কাহার গলায় দড়ি—সে সমস্যা পূরণ এবারও হইল না। তবে আশাভঙ্গজনিত অপরাধের বোঝাটা স্ত্রীর স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া বলিলাম, তোমার জন্যই ত অমন জামাইটি হাতছাড়া হল!

স্ত্রী রুষ্ট হইয়া বলিলেন, আমার দোষটা কি হল শুনি?

—তোমার দোষ এই যে এখনও মেয়ে হল না!

এবার আর তিনি গলায় দড়ি বলিলেন না, কারণ বোধহয় নিজের গলায় দিতে হইবে আশঙ্কায়! অধিকতর রুষ্ট হইয়া কহিলেন, দেখ, বেশী চালাকি কর যদি—

চালাক অপবাদ আমার শত্রুতেও কোনদিন দেয় নাই। হ্যাঁগা, স্কুল মাষ্টার কখনও চালাক হয়? তাহারা ফিচেল হইতে পারে, শয়তানও হইতে পারে, ধূর্ত্ত হইতেও আটকায় না, কিন্তু চালাক তাহারা কোনদিনই নয়! কাজেই যে বস্তুর একান্তই অভাব তাহাই অর্থাৎ চালাকী প্রকাশের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ঘটিতে পারে ভাবিয়া আমি বহির্বাটীতে চলিয়া গেলাম। তখন সকাল হইয়া গিয়াছে।

দেখি গণেশ। গণেশ বলিল, জামাই, কাল অনেক রাত্তিরে শুনলুম তুমি এসেছ, তখন নিধে গরাইয়ের বিধবার সৎকার করতে যাচ্ছিলুম, তাই আর আসা হয় নি। তা কেমন আছ?

দুই চার কথার পর গণেশ বলিল, জামাই হাত দেখতে জান?

হাত দেখিতে জানিতাম না, অনেক বিদ্যার সঙ্গে ও বিদ্যাটাও অনায়ত্তই ছিল, কিন্তু সে কথা বলিলাম না। বলিলে গণেশের অভিসন্ধিটা অজানাই থাকিয়া যাইত; বলিলাম, কিছু কিছু জানি বৈ কি!

—দেখ ত, বলিয়া গণেশ দক্ষিণ করতল অগ্রসর করিয়া দিল।

হাত দেখিতে না-জানি, হাত দেখাইতে আমরা খুবই অভ্যস্ত ছিলাম। আমাদের হেড মাষ্টারের বন্ধু সুরেশ বিশ্বাস মাঝে মাঝে কর্ম্মখালির সন্ধান লইতে স্কুলে আসিত এবং

হেড মাষ্টার হইতে ইনফ্যান্ট মাষ্টার—ইন্ফ্যান্ট ক্লাশের মাষ্টার—সকলেই তাহার দিকে মুলো বাড়াইয়া দিতেন। একবার একজন মাষ্টারকে সে বলিয়াছিল, you have got to fly from Dacca. কথাটা ফলিয়া যায়। অবশ্য সে বায়ুরথে উড়িয়া গিয়াছিল কিম্বা অন্য কোন যানের সাহায্য লইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না, তবে তাহাকে স্কুলের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হইয়াছিল, ইহা ঠিক; তদবধি করকোষ্ঠি-বিচারক সুরেশের গণনায় সকলেই অবিচলিত আস্থা-সম্পন্ন। স্কুলমাষ্টারী না পাইয়া সুরেশ কিছুদিন সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক হইয়াছিল, কাগজ উঠিয়া গেলে একটা ইন্সিওরেন্স কোং খুলিয়াছিল, সেটি ৵ত্ব লাভ করিলে উল্টাডিঙ্গীতে পাটের আড়ত-পটির কাছে জ্যোতিষ গণনালয় খুলিয়াছে; শুনিয়াছি, বেশ পশার করিয়া ফেলিয়াছে। ভাগ্যকে যাহারা অন্বেষণ করে, তিনি তাহাদের হাতে ধরা দেন; অভাগা স্কুলমাষ্টারদের পানে কেহই চায় না। হাত লইয়া সুরেশ দু'চারবার টিপিয়া ঘাড় নাড়িত ও বলিত, বাঃ বেশ 'কলার'টি ত! কখনও কখনও কাহারও কাহারও 'কলার'টির নিন্দাও করিত। তাহার ধরণ ধারণগুলি আমার মনে ছিল।

বলিলাম, গণেশের হাতের কলারটি ত বেশ!

গণেশ প্রশ্ন করিল, তার মানে?

তার মানে, তবেই ত মুস্কিল! মানে যে কি তাহা জানিতাম না, কিন্তু এখন জানি-না বলিলে সব পণ্ড হয়। বলিলাম, হাতের রং ভাল হলে রেখা ভাল হয়। তা, তুমি কি জানতে চাও, বল?

—দেখ ত, বিয়ের রেখাটা!

—হুঁ।

রুটী সেঁকার মত তাহার শুকনো হাতখানা এপিঠ ওপিঠ করিয়া উল্টাইয়া, ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, বিবাহ আসন্ন।

গণেশ প্রসন্নমুখে বলিল, একটা সম্বন্ধ এসেছে, দেবগণ···

আমি বলিলাম, এই ত রেখাও স্পষ্ট!

গণেশ বলিল, ঐটে নাকি বিয়ের রেখা? তবে যে লোকে বলে, এইটে বিয়ের দাগ!

এই সারিয়াছে! ও সুরেশ! তুই কোথারে!

গণেশ তাহার হাতটা কাৎ করিয়া ধরিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলির নিম্ন পার্শ্বদেশে যে দাগ তাহাই দেখাইল।

বটেই ত! এই সামান্য ভুলটা যে কিরূপে করিয়া বসিলাম। ছিঃ! কচি ছেলেও জানে, বিবাহের দাগ, আমিও জানিতাম, অথচ প্রয়োজনের সময় উল্টাপাল্টা করিয়া ফেলিলাম! ছেলেদের পরীক্ষা দেওয়া আর কি! জানে সব, পরীক্ষা দিবার সময় উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাইয়া বসে!

তাড়াতাড়ি বলিলাম, ইটালীদেশের জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, এইটা বিয়ের রেখা।—নিজের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট রেখাটা দেখাইলাম।

গণেশ ইটালীর মুসোলিনী বা জার্ম্মেণীর হিটলারের খবর রাখিত না, সহজেই বিশ্বাস করিল, বলিল, ওঃ। তা' কি বুঝছ?

হেড মাষ্টারের বন্ধু সুরেশের অনুকরণে অনেকক্ষণ গবেষণা করিবার পর প্রশ্ন করিলাম, তোমার বয়সটা ঠিক কত বল ত?

—একত্রিশ।

—একত্রিশ! দাঁড়াও। এই হল পঁচিশ, ত্রিশ, পঁয়ত্রিশ, চল্লিশ—হাঁ, ত্রিশ হইতে একত্রিশের মধ্যে বিবাহ, নির্ঘাৎ!

—ঠিক দেখছ।

—স্পষ্ট।

গণেশ বলিল, আচ্ছা ছেলেপুলে ক'টা বল ত!

আবার বিপদ! এবার সহজেই বিপদ কাটাইয়া উঠিলাম, বলিলাম, ছেলেপুলের কথা আজকাল বলা শক্ত।

—কেন?

—দেখছ না দেশশুদ্ধ লোক জন্মনিরোধ কর, জন্মনিরোধ কর—ব'লে চেঁচাচ্ছে। খোদার উপর খোদকারী করছে। দেশকে রসাতলে পাঠাবার চেষ্টা করছে।

গণেশ বলিল, তা যা বলেছ জামাই! খবরের কাগজ খুলেছ কি ওরই বিজ্ঞাপন! আরে, দেশের লোক কমিয়ে লাভটা কি হবে বল্ ত শুনি! কথায় বলে ধনবল, জনবল! জনবল না থাক্লে কখন ধনবল হয়?—পাগল আর কি! ওসব আমি কোনদিন মানিনে জামাই···

পাছে ছেলেপুলের সংখ্যা নির্ণয় করিতে বলে, তাড়াতাড়ি তাহার হাতটা নামাইয়া দিয়া বলিলাম, মেয়েটি দেখতে কেমন?

—মন্দ নয়; গেরস্থ ঘরের মেয়ে যেমন হয়, পাঁচপাচি!

—দেবগণ ত?

—হ্যাঁ।

—তবে আর দেরী কর না।

গণেশ বলিল, মা ১৯শে বোশেখ দিন ঠিক করেছে।

আনন্দ প্রকাশ করিলাম।

এক বৎসর পরে শ্বশুরালয়ে গিয়াছি, স্ত্রীকে আনিতে। গণেশ খবর পাইয়া আসিয়া হাজির। গণেশের বিবাহিত জীবনটা সুখের হয় নাই, এ সংবাদ আমার সুশীলা পত্নী পত্রযোগেই দিয়া রাখিয়াছিলেন। 'কলাবৌটি' কিছু খর প্রকৃতির; কলহে তাঁহার জোড়া নাই। গণেশের মা দুর্গাঠাকুরাণী কাশী পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন; গণেশ থালা ঘটি বাটী ভাঙ্গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছে। এ সকল সংবাদ পূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম।

গণেশ হাতটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, জামাই হাতটা দেখ ত!

ঐ রে! মুখটি কাঁচুমাচু করিয়া বলিলাম, হাত দেখা ছেড়ে দিইছি গণেশ!

—কেন, ছাড়লে কেন জামাই?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, সে এক মস্ত করুণ ইতিহাস গণেশ। বলতে গেলে আমার বুক ভেঙ্গে যায়। একজনের সম্বন্ধে একটা কথা বলে ফেলে, না গণেশ, আমার চোখে জল আসছে!

গণেশ বোধহয় আমার চোখের আসি-আসি জল দেখিয়া ফেলিল, করুণকণ্ঠে কহিল, তবে থাক্।

বাঁচিয়া গেলাম। বলিলাম, আচ্ছা গণেশ, স্ত্রীর সঙ্গে তোমার নাকি বনি বনাও হচ্ছে না?

গণেশ বেবাক্ কবুল করিল, না।

—কেন?

—মেজাজ খারাপ।

—কার? তোমার, না স্ত্রীর?

গণেশ চক্ষুর ইঙ্গিত দ্বারা বুঝাইয়া দিল যে, তাহার স্ত্রীর মেজাজ খারাপ।

আমি বলিলাম, কিন্তু আমি শুনেছি, তোমারই মেজাজ বেশী খারাপ।

গণেশ গরম হইয়া বলিল, আমি কি সে কথা অস্বীকার করছি না কি জামাই? আমার রাক্ষসগণ, মেজাজ ত খারাপ হবেই।

আমি বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া বলিলাম, রাক্ষসগণ হলে মেজাজ খারাপ হয় নাকি?

—হতেই হবে।—বলিয়া সে একটুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, কিন্তু দেবগণের মেজাজ যে এত বদ হয়, তা ত জানতুম না।

—দেবগণ কার?—তোমার স্ত্রীর?

—হাঁ। কেন তোমার মনে নেই, সেই তুমি হাত দেখে বলে দিলে, একত্রিশ বছরে বিয়ের রেখা, তাই ত আমি তাড়াতাড়ি ওকে বিয়ে ক'রে ফেললুম।

ও বাবা! সব দোষ এ-যে আমারই ঘাড়ে চাপাইতে চায় দেখি। ভয়ে ভয়ে চুপ করিয়া রহিলাম।

গণেশ বলিল, আজ তোমাকে হাত দেখাতে চাইছিলুম কেন জান?

—কেন?

—আমি সন্ন্যাস নোব মনে করছি। তাই জানতে চাই সন্ন্যাস-যোগের কথা হাতে আছে কিনা!

যোগ-বিয়োগের দিক দিয়াও গেলাম না, বলিলাম, বনিয়ে নেওয়া কি একেবারেই অসম্ভব গণেশ?

—একেবারে অসম্ভব জামাই, একেবারে অসম্ভব। এই কালকের রাত্রের ব্যাপারটাই দেখ না। যাত্রার দল নিয়ে তিনদিন আগে পাঁচপাড়ায় গেছলুম, তিনদিন সেখানে গাওনা ছিল, খুব ভাল গাওনা হল, পাঁচপাড়ার বাবুরা পাঁচটা মেডেল দিয়েছেন, আমাকে একখানা শাল, কাল রাত দশটায় ফিরলুম। ফিরে দেখি, খুড়তুত ভাইটি বিদেশ থেকে এসে চণ্ডীমণ্ডপে শুয়ে আছে। আমায় দেখেই প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো নিতে গিয়ে পড়ে গিয়ে, গেল ভোঁচকানী লেগে মূর্চ্ছা। মুখ শুকনো, পেটটা ঢুকে গেছে, ধুঁকছে, যেন পাঁচ সাতদিন খায় নি। জিজ্ঞেস করলুম, খেয়েছিস্? কেঁদে ফেল্লে। অন্দরে গিয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলুম, কেব্‌লা কখন্ এসেছে? বললে, কাল। বললুম খেয়েছে? বল্লে, জানি নে। জানিনে? বুঝছ জামাই, ব্যাপারখানা তুমি বুঝছ? আমার খুড়তুত ভাই না হয়ে ওনার খুড়তুত ভাই হলে রাত দুপুরেও পুকুরে-জেলে নামত,

বুঝছ ত? বললুম, খেতে দিতে পার নি? বললে, না পারি নি! সাতগোষ্ঠীর কুটুম কাটুমকে গেলাতে আমি পারব না। বলে রান্নাঘরে আমার জন্যে ভাত বাড়তে গেল। আমি করলুম কি, একখানা চ্যালা কাঠ নিয়ে হাঁড়ীতে এক ঘা, থালা বাসনে আর এক ঘা! গিয়ে শুয়ে পড়লুম। তারপর সমস্ত রাত, অন্ধকারে ও দেখায় কিল, আমি দেখাই ঘুঁসি; ও বাঁধে কোমর, আমি বাঁধি মালকোঁচা; ও দেখায় রাঙ্গা চোখ, আমি করি দন্ত কিড়ির-মিড়ির; ভোর রাত্রে ও নিয়ে এল বঁটি, আমি আনলুম দা। এই করতে করতে সকাল হয়ে গেল, বললে, রাঁধবে না, আমাকে উনুনের পাঁশ দেবে; আমি বললুম, তোর হাতে খাব না. সন্ন্যাসী হব। তারপর, তোমার কাছে আসছি।

হাসিব অথবা কাঁদিব মনে মনে সেই গবেষণা করিয়া, কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই কহিলাম, গণেশ, তবু বনিয়ে চলতেই হবে। হিন্দুঘরের স্ত্রী, ত্যাগ করা ত চলে না। নিজে একটু নরম সরম হয়ে মানিয়ে চল, তা ছাড়া উপায় কি!

—সে চেষ্টার আমি কসুর করি নে জামাই! বুনো মোষ কিছুতেই বশ মানে না।

—তিনি যদি বুনো মোষ হ'ন, তুমিও বুনো শূয়র। তিনি শিঙ নাড়েন, তুমি গজদন্ত দেখাও।

গণেশ হাসিয়া ফেলিল, বলিল, তা যা বলেছ জামাই!

একটু থামিয়া আবার বলিল, আদরও ত কম করি নে জামাই। দেখ না পূজোর সময় তিন ভরি সোনার হার গড়িয়ে দিলাম। বললে কি জান? গিল্টীর নয় ত? শুনে, আমার গেল মাথা খারাপ হয়ে, একটানে হারটাই ছিঁড়ে ফেললুম।

—বেশ করলে!

—আচ্ছা—রাগ হয় না, তুমিই বল ত জামাই?

—তা যে একটু হয় না, তা বল্‌তে পারি নে। তবুও বনিয়ে নিয়ে চলতে হবে গণেশ! এ ত আর মুসলমান খৃষ্টান নয় যে তাল্লাক দিলে বা ডাইভোর্স করলেই হয়ে গেল। বোঝা যখন বইতেই হবে, বুঝলে না?

—তুমি কখন পাড়াকুঁদুলী দেখেছ জামাই? দেখ নি? তারা যখন ঝগড়া করবার লোক পায় না তখন হাওয়ার সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়ে দেয়। আমার ঠাকরুণটিও দিন রাত প্যাঁচ কষছেন কি করে পায়ে পা বাধিয়ে আমার সঙ্গে এক পক্কড় লড়বেন। আমার হাড় জ্বালাতন মাস পোড়াতন হয়ে উঠেছে জামাই। মাঝে মাঝে সত্যিই ইচ্ছে হয়, যে-দিকে দু'চোখ যায় পালাই!

গণেশের কথাগুলার ভিতর দিয়া এমন একটি করুণ সুর ধ্বনিত হইতেছিল যাহাতে তাহার কোন কথা অবিশ্বাস করা অসম্ভব হইয়া পড়িতেছিল। চুপ করিয়া রহিলাম।

একটু পরে গণেশ বলিল, জামাই, তোমাদের সহরে একটা চাকরী বাকরী দিতে পার? চুলোর ছাই দেশ ছেড়ে পালাই, খাটি-খুটি, মাস গেলে বাড়ীতে ওদের টাকা পাঠিয়ে দিই। খিচি-মিচি আর সহ্য হয় না।

গণেশ চাকরী করিতে বিদেশে যাইবে ইহা কল্পনা করাও শক্ত। তাহার যাত্রার দল অচল হইবে; বেওয়ারিশ-মড়ারা রাস্তার ধারে পড়িয়া পচিবে; গ্রামের ওলাউঠা, বসন্তে রক্ষাকালী পূজা বন্ধ হইবে, গণেশের গ্রাম ছাড়িয়া যাওয়া চলিতেই পারে না। সেই কথাই বলিলাম।

গণেশ করুণ মুখে কাতরকণ্ঠে বলিল, সত্যি জামাই, গ্রাম ছাড়তে আমার বড় কষ্ট হবে; কিন্তু সারাজীবন ঘরের লোকের সঙ্গে দাঙ্গা লড়াই করেই বা বাঁচি কি ক'রে বল?

আমাদের স্কুলে ড্রিল মাষ্টারের পদটি খালি ছিল। চেষ্টা করিলে গণেশকে লওয়া সম্ভব হইতেও পারে।

গণেশ ঢাকায় আসিয়া কর্ম্মগ্রহণ করিল। আমার বাসার কাছেই স্কুলের একটা মেস্ ছিল, তাহাতে বাসা লইল। বলা বাহুল্য সে একলাই আসিয়াছে। সকাল সন্ধ্যা আমার বাড়ীতে বসিয়া গল্প-গুজব করে; দুই একদিন মুখ বদলাইবার জন্য তাহার গ্রামের মেয়ের হাতের রান্না খাইয়া যায়, আমার গৃহিণীও তাহার গ্রাম্য গণেশ দা'কে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া পরম তৃপ্তি অনুভব করে। জামাই হইলে গণেশ যে ইহার অধিক আদর পাইত না, একদিন সে কথা বলায় ভদ্রগৃহিণী তাঁহার সেই অনড়-অচড় কথাটাই আমায় শুনাইয়া দিলেন, এবার যেন বুঝা গেল, আমাকেই দড়িটা গলায় দিতে বলিতেছেন!

৩

সত্য বলিতেছি প্রথম দিনকতক গণেশের মুখ দেখিলে আমার দুঃখ হইত। গ্রামের মাটী হইতে গাছপালা জন-

মানব কুকুরশেয়ালটা পর্য্যন্ত যেন দিনরাত তাহাকে ডাকিতেছে, গণেশ তাহাদের সেই আকুল আহ্বান যেন স্বকর্ণে শুনিতে পাইতেছে। গণেশ আমার স্ত্রীর নিকট বলিয়াছে, রাত্রে তাহার ঘুম হয় না। বালিশে মাথা রাখিলেই সারা গ্রামখানা গণেশ-গণেশ করিয়া ডাকিতে ডাকিতে তাহার সামনে আসিয়া ফ্যাল্-ফ্যাল্ চোখে চাহিয়া থাকে। আমার বুদ্ধিমতী স্ত্রী তাহাকে বৌ আনিতে উপদেশ দিয়াছেন। মোল্লারা মসজিদ পর্য্যন্তই দৌড়িতে পারে।

সাধারণ লোকে যাহাকে dutiful বা কর্ত্তব্যপরায়ণ বলে, গণেশ তাহার অধিক। স্কুলের সে ড্রিল মাষ্টার, ড্রিল করাইয়াই সে খালাস, কিন্তু গণেশ তাহার অনেক বেশী কাজ করিত। যে-কোন মাষ্টারের যে কোন কাজ বাকী পড়িয়া থাকিত, গণেশ স্বেচ্ছায় তাহা চাহিয়া লইয়া করিয়া দিত। যে কোন ক্লাশের যে-কোন বিষয়ের শিক্ষক অনুপস্থিত হইলে, গণেশ সেই ক্লাশ লইতে যাইত এবং শিক্ষা-সম্বন্ধীয়, পুস্তক-সম্বন্ধীয় গল্প করিয়া ছেলেদের তুষ্ট করিয়া আসিত। কাজে কর্ম্মে যখন লিপ্ত থাকিত, লক্ষ্য করিতাম সে বেশ থাকিত, অবসরকালেই যত বিপদ। তাহার উজ্জ্বল নয়নদ্বয় ম্লান হইয়া আসিত, মুখের চেহারা বদলাইয়া যাইত, ভাব ভঙ্গী হইতে প্রাণের স্পন্দনটুকু লুপ্ত হইত। আমার সুগৃহিণী বলিতেন, গণেশ-দা কথা শুনবে না ত! কিন্তু আমি বুঝিতাম, সেই পানা-পুকুর, সেই বন-জঙ্গল, সেই যাত্রার দল, সেই বেওয়ারিশ মড়ারা, অসহায় রোগীরদল তাহাকে ঘন ঘন ডাক দিতেছে।

জুন মাসে আমাকে দু' মাসের জন্য বরিশালের স্কুলের অস্থায়ী প্রধান-শিক্ষকের পদে উন্নীত করিয়া বদলি করা হইল। খবর শুনিয়া মাষ্টারদের মধ্যে কেহ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, কেহ বক্ষঃ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন, কেহ বা দেঁতো হাসি হাসিলেন। দেখিলাম, গণেশের চক্ষু ছল ছল করিতেছে, সে আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া পড়িল।

যাইবার দিন বলিলাম, গণেশ, মন খারাপ কর না যেন। তোমার ত সকলের সঙ্গেই ভাব হয়ে গেছে, আর দু' মাস বই ত নয়, আমি ফিরে আসছি। লক্ষ্মী, মন খারাপ কর না।

গণেশ ভেউ-ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল, সেজন্যে মন খারাপ করছি নে জামাই। দু' মাস কেন, তুমি বরাবরের জন্যে হেড মাষ্টার হলেই ত আমাদের আহ্লাদ জামাই। তাতে মন খারাপ করব কেন? আমি যে বড় বিপদে পড়েছি জামাই—তুমি ছাড়া—বলিয়া সে আবার কাঁদিয়া উঠিল।

—কি বিপদ?

—এই দেখ, বলিয়া গণেশ তাহার পিরিহানের জেব হইতে একখানি রেজেষ্ট্রি চিঠি বাহির করিয়া দিল।

খুলিয়া দেখি, তাহার স্ত্রীর লেখা। চিঠিখানা পড়িয়া স্তম্ভিত হইলাম। কোন ভদ্র নারী, ভদ্র-স্ত্রী যে এরূপ পত্র লিখিতে পারে চোখে না দেখিলে—কোন অতিবড় সত্যবাদী লোক তামা তুলসী গঙ্গাজল হাতে লইয়া শপথ করিলেও, বিশ্বাস করিতাম না। পত্রখানি উদ্ধৃত করিয়া নারীর কলঙ্কের পরাকাষ্ঠা ছাপার হরফে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি হয় না। মোদ্দা কথা এই যে, গণেশের স্ত্রী নিশ্চিত-রূপে বুঝিয়াছে যে গণেশ সহরে অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের—শাঁখিনী ডাকিনীদের সহিত নানারূপ বৈধ ও অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তাহাকে অবহেলা করিতেছে। শীঘ্রই সে ইহার প্রতিকার উপায় চেষ্টা করিবে। রেজেষ্ট্রি চিঠি তাহারই নোটীশ।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না। গণেশ চিঠিখানি হাতে লইয়া হতবুদ্ধির মত বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, গণেশ, কি করবে?

গণেশ ম্লান হাসিয়া বলিল, সামনে রাজার জন্মদিনের ছুটী আছে, গিয়ে নিয়ে আসি।

—সেই ভাল!

গণেশ কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, ভাল যে কত, সে আমিই বুঝছি জামাই।

৪

এক বৎসর পরে আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম। গণেশ আমাদের জন্য ষ্টেশনে দাঁড়াইয়াছিল।

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, গণেশের স্ত্রী এইখানেই আছে। মাসখানেক হইল তাহার একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

আমার গৃহিণী হর্ষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, দেখলে গণেশদা, আমার পরামর্শ শুনে ভাল হল কি-না।

গণেশ কোন কথা বলিল না।

নিরিবিলি পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, গণেশ, এখন আর ঝগড়া-ঝাঁটি হয় না তো?

—না।

দুই হাতে গণেশের দুই হাত চাপিয়া ধরিলাম। সত্য সত্য বড় আনন্দ হইল। গণেশের মত উচ্চ-মন উদার-হৃদয় ব্যক্তির দাম্পত্য জীবনে যে সুখশান্তির লেশমাত্র ছিল না ইহাতে কার প্রাণে না কষ্ট হইত? যে শুনিত, সেই দুঃখ অনুভব করিত।

বলিলাম, ছেলেমেয়ে হলেই অতি উগ্রস্বভাব স্ত্রীলোকের প্রকৃতিও নরম হয়, মনস্তত্ত্ববিদেরা তাই বলেন। ছেলেটিই তোমার ঘরে শান্তি এনেছে বলতে হবে। ছেলের নাম রাখ, শান্তিপ্রকাশ।

গণেশ চুপ করিয়া রহিল।

একদিন ক্লাস শেষ করিয়া আফিস ঘরে আসিয়া দেখি, শিক্ষকগণ গণেশকে লইয়া পড়িয়াছেন। গণেশ ভোর ৬টায় স্কুলে আসে, বেলা সাড়ে নটায় একবার থাইতে যায়, আবার সাড়ে দশটা বাজিবার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসে এবং রাত্রি দশটার আগে স্কুল হইতে যায় না। তাহারই নির্ব্বন্ধাতিশয্যে স্কুলের দ্বিতীয় কেরাণীটির মৃত্যু হইলেও কেরাণী লওয়া হয় নাই—গণেশই সেই কাজও করিতেছে এবং তজ্জন্য অতিরিক্ত বেতনের দাবীও তাহার নাই। শিক্ষকগণের সমক্ষে এই সমস্যা জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে বাসায় স্ত্রী-পুত্র থাকিতেও গণেশ বাসায় থাকিতে বিমুখ কেন? গণেশ বলিতেছে, সে কাজ-পাগল, কাজ লইয়াই ভাল থাকে। ইহাতে তাহার স্ত্রী-পুত্রের আপত্তি হইবে কেন?

আমাকে সকলে সালিশ মানিলেন। আমি বলিলাম, ও পাগলের কথা ছেড়ে দাও। ওটা বদ্ধ পাগল।

দুই একদিন পরে সদরালাবাবুর কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া ফিরিবার সময় স্কুলের আফিস ঘরের জানালায় আলো দেখিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম। বুঝিলাম, গণেশ দ্বিতীয় কেরাণীর কাজ করিতেছে; গিয়া তাহাই দেখিলাম। আমাকে দেখিয়া গণেশ চমকিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, একটু হাসিয়া আবার রেজেষ্টারীতে রুল টানিতে লাগিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, গণেশ বাড়ী যাবে না?

গণেশ ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল, এগারোটার সময় যাই।

—খাও কখন্?

—ফিরে গিয়ে।

—তার মানে, প্রায় বারটা। এত রাত পর্য্যন্ত বাড়ীর লোককে হাঁড়ী নিয়ে বসিয়ে রাখ ত!

—বসে থাকতে দায় পড়েছে। হেঁসেলে সকালের ভাত ঢাকা থাকে, গিয়ে পিদিম জ্বালি, খাই, শুয়ে পড়ি।

—তোমার স্ত্রী কি করেন?

—জানি নে।

—জান না কেন?

—বোধহয় ঘুমোয়।

—তোমার ছেলে?

—কোনদিন ঘুমোয়, কোনদিন জেগে থাকে, কাঁদে, আমি গিয়ে কোলে নিয়ে ভুলোই।

—তোমার স্ত্রী ওঠেন না?

—কি জানি, দেখি নে ত!

—তোমরা কি আলাদা ঘরে শোও?

—হাঁ।

আর একটা প্রশ্ন মনে জাগিয়াছিল, কিন্তু করিলাম না, কারণ গণেশের সঙ্গে আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব থাকিলেও গণেশ বড় সমীহ করিয়া কথা বলিত। অন্য প্রশ্ন করিলাম—কতদিন এ ব্যবস্থা হয়েছে?

গণেশ বলিল, ঢাকায় এসে পর্য্যন্ত।

জিজ্ঞাসা করিলাম, স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা আছে ত?

গণেশ বলিল, না।

যা ভাবিয়াছি, তাই! বলিলাম, কতদিন?

—এখানে এসে পর্য্যন্ত।

—একটু আধটু···

—একদম না।

—একদম না?

—একদম না!

গণেশ নিবিষ্ট চিত্তে রুল টানিতে লাগিল। একটি বড় বা একটি ছোট না হয়, কোনটি বাঁকাচোরা না হয়, কোনটি মোটা সরু নয়—অতি সন্তর্পণে, অতীব সযত্নে রুল টানিতে লাগিল। যেন কিছুই হয় নাই। আমি তাহার মুখের পানে চাহিয়া আকাশ পাতাল, স্থাবর জঙ্গম, ম্যাপ, গ্লোব, রুল, ব্লটিংপ্যাড, ঘড়ি, পিতলের পেটা

ঘণ্টা, জলের কুঁজো, এনামেলের গেলাস সব ভাবিতে লাগিলাম।

গণেশ হঠাৎ মুখ তুলিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, আমার স্ত্রীরও রাক্ষসগণ, জান জামাই ?

'গণে'র কথাটা মনে ছিল না, হঠাৎ মনেও পড়িল না; নির্ব্বাক চাহিয়া রহিলাম।

গণেশ বলিল, বিয়ের সময় ওদের লোকেরা বলেছিল, দেবগণ। মনে আছে ত ? সেই যে তোমায় হাত দেখাতে গেলুম।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে বটে !

—ওরা মিছে কথা ব'লে আমার ঘাড়ে ঐ রাক্ষসগণ মেয়ে চাপিয়ে দিয়েছে। এবার ঢাকা আসবার সময় ওর পোটম্যাণ্টোর ভেতর থেকে ওর ঠিকুজি বেরিয়ে পড়ল। কিছুতেই দেখাবে না, জোর ক'রে কেড়ে নিয়ে দেখি, রাক্ষসগণ।

—তাতে কি ?

—তুমি কি বলছ জামাই ? আমারও রাক্ষসগণ, ওরও রাক্ষসগণ। চুলোচুলি ত হবেই।

—ওসব আজকাল কেউ মানে না।

—মানে না বলেই ত এত দুঃখ।

দু'জনেই অনেকক্ষণ নীরব, তারপর গণেশই নীরবতা ভঙ্গ করিল। বলিল, কথা কইলেই বিপদ, হাতাহাতি লেগে যায়। যাই কেন বলি না, তার উল্টো মানে হয়ে পড়ে। আমার সব কাজ খারাপ, আমার সব কথা মিথ্যে, আমার সব বন্ধু বদ, আমার স্কুল বদ, আমার মাষ্টারী বদ, ছাত্র বদ,আমি বদ, আমার খাওয়া বদ, শোওয়া বদ, আমার মা-বাপ বদ, যদি বলি না, বদ নয়, অমনি ঝাঁ-কড়াক্কড়, ঝাঁ কড়াক্কড় ! তাই কথা বন্ধ ক'রে এক রকম আছি মন্দ নয়। চান্ ক'রে পিঁড়িতে বসি, যেদিন ভাত পাই খাই, যেদিন না পাই, স্কুলে চলে যাই। রাত্রেও গিয়ে যেদিন দেখি ঢাকা থানা মাটীতে নামান আছে খুলে যা পারি খাই, যেদিন দেখি ঢাকা সিকেয় তোলা, সেদিন চুপচাপ শুয়ে পড়ি।

—তেমনও হয় নাকি ?

—প্রায়ই হয়।

—কথা কওনা বলেই ওরকম হয়, কথা ক'য়ে দেখ, রোজ গরম ভাত থাকবে।

—তা জানিনে, কিন্তু চুলোচুলি হবে যখন, তুমি সামলাতে আসবে জামাই ?

নেপোলিয়ঁা বা নেলসন নই, যুদ্ধের নামে রক্ত ধমনী মধ্যে নৃত্য করে না, তাই চুপ করিয়া রহিলাম।

গণেশ বলিল, রাক্ষসগণে রাক্ষসগণে মিলন হলে ঐ-ই হয় জামাই। শাস্ত্রবাক্য মিথ্যে হয় না।

অদম্য কৌতূহলের প্রবাহ তরঙ্গ তুলিতেছিল, নিবারণ করিতে পারিলাম না। বর্ষার খরস্রোতকে বাঁধ দিয়া কভু কি আটকান যায় ? বলিলাম, আচ্ছা গণেশ, তোমাদের চলে কি করে ?

গণেশের মুখটা হঠাৎ আরক্ত হইয়া উঠিল দেখিয়া মনে মনে লজ্জানুভব করিয়া আমার বক্তব্যটা ঘুরাইয়া এইভাবে ব্যক্ত করিলাম—কেউ ত কারু সঙ্গে কথা কও না, সংসার চলে কেমন করে ?

গণেশ তাচ্ছিল্যভরে কহিল, চলে যায় ! ভারি ত সংসার, তার আবার চলা আর অচলা। শুধু দুঃখ এই, ছেলেটা বোবা !

—সত্যই দুঃখের কথা কিন্তু ইহাই স্বাভাবিক ; বলিলাম, তবু ধর, সংসারের জিনিষপত্তর—কোন্ দিন কোন্‌টা চাই, কি আনতে হবে—

—কেন ? ওটা আর এমন শক্ত কি জামাই। ধর, তেল ফুরিয়েছে, গিন্নী দুম্ ক'রে তেলের কেঁড়েটা বার ক'রে দিয়ে বলে গেলেন, তেল নেই। আমি তেল কিনে রান্না ঘরের দরজার কাছে দুম ক'রে বসিয়ে বলে দিলুম, সরসের তেল আড়াই পোয়া। ধোপা ছিল না, কাপড়চোপড় বড্ড ময়লা হয়েছিল, আমি যখন রান্নাঘরে খেতে বসতুম, বাইরের রোয়াকে দাঁড়িয়ে তিনি তখন রাজ্যের মুখপোড়া কাপড়কাচাদের যমরাজের মুখে তুলে দিতেন ; এক একদিন আমাকেও যে তাদের সহযাত্রী করতেন না, তা নয়। নতুন জায়গা, সহর দেশ, যাকে তাকে ডেকে ত আর কাপড়-চোপড় দিতে পারি নে, ক'দিন তাই ধোপা খুঁজতে দেরী হয়ে গেছল।

—ধর, তোমার দু'টি ভাত চাই, তুমি কি করবে ?

—চাইলেই হল আর কি ! চাইব না।

—চাইবে না ?

—না। প্রথম প্রথম দু' একদিন ভুল ক'রে চেয়ে ফেলেছিলুম জামাই। দুপ্ দাপ্ শব্দ ক'রে রান্নাঘরে ঢুকে খটাস্ ক'রে হাঁড়ীটাই দিলে সামনে বসিয়ে। হাঁড়ীটা ভাঙ্গল, আমাকেও ভয়ে ভয়ে উঠে যেতে হল।

—এই দু'বছরের মধ্যে তোমার কি অসুখ-বিসুখ করে নি ?

—কেন করবে না ? তুমিও বরিশাল গেলে, আমারও চৌরঙ্গী বাত, শয্যা নিতে হল।

—কি খেতে, কে সেবা করত ?

– কেন, স্কুলের মালী তারণ।

—তুমি বাড়ীতে ছিলে না ?

—না।

—বল কি।

—তোমার কাছে মিথ্যে বলব কেন জামাই !

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

গণেশ বলিল, মাসখানেক পরে যখন বাড়ী ফিরলুম, শুনলুম তিনি দগ্ধানন ভগবানের মুখে অগ্নি সংযোগ ক'রে দুঃখু জানাচ্ছেন কেন তিনি তাঁর সুখের বৈধব্য ঘটালেন না !

বঙ্কিমের বিষবৃক্ষের দত্তবাড়ীর দেবেন্দ্রকে যে লোক পাঠকের নিকটে সুপরিচিত দেবেন্দ্র দত্তে পরিণত করিয়াছিল, সেই হৈমবতীকে আমার পুনঃ পুনঃ মনে পড়িতেছিল, ভাবিতেছিলাম, শুধু কল্পলোকে নয়, বাস্তবজগতেও হৈমবতীর অভাব নাই।

গণেশ আবার বলিল, দু' একদিন কথার জবাব দিয়ে দেখিছি, লড়াই সুরু হয়ে যায়, পাড়ার লোক জমে যায়, আলসেয় আলসেয় পাশের বাড়ীগুলোর মেয়েরা উঁকি-ঝুঁকি দেয়—দেখে শুনে এইখেনে চাবিকাটি দিইছি। ঠিক করি নি জামাই ? বলিয়া সে ঠোঁটদুখানার উপরে গোটা দুই তিন অঙ্গুলি স্থাপন করিল।

কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা বেঠিক আমার মত মূঢ়ের পক্ষে বলা সুকঠিন, আমিও মুখে চাবিকাঠি দিয়াছিলাম।

গণেশ বলিল, অনেক ভেবেচিন্তে দেখিছি জামাই, চুপ থাকাই ঠিক ; বোবার শত্রু নেই।

আরও এক বৎসর কাটিয়াছে, গণেশের জীবনযাত্রার বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। তেমনই ভোর ৬টায় স্কুলে আসে, সাড়ে ন'টায় যায়, আবার সাড়ে দশটায় আসিয়া রাত্রি এগারটায় ফিরে। আমাকে গোপনে বলিয়াছে, দীর্ঘ দুই বৎসর কালের মধ্যে একটি কথাও সে বাড়ীতে কয় নাই।

জানি না গোপনে আর কাহাকেও কথাটা সে বলিয়াছিল কিনা অথবা আমার গৃহিণী Secret betray গোপনতার অপব্যবহার করিয়াছেন কিনা, স্কুলের শিক্ষকগণ গণেশের নামকরণ করিয়াছেন, মৌনীবাবা !

তৃতীয় বৎসরে দেখিলাম, গণেশ বোবা ছেলেকেও অভিনিবেশ সহকারে রুল টানা শিখাইতেছে। চতুর্থ বৎসরে যে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম, তাহা অভাবনীয়। গণেশ স্কুলেও কথাবার্ত্তা কয় না। ড্রিল্ করাইতে 'ওয়ান্', 'টু', 'থ্রি' এবং 'রাইট', 'লেফট' এই শব্দ কয়টি ছাড়া অন্য কথা সে আদৌ বলে না। পঞ্চম বৎসরে ড্রিল মাষ্টারী ছাড়িয়া দিয়া শুধু কেরাণীগিরি করিতেই চাহিয়াছিল, আমি রাজী হই নাই—কেরাণীর মাহিনা অনেক কম। গণেশ 'ওয়ান্', 'টু', 'থ্রি' করিতে লাগিল—খুব অনিচ্ছার সহিত। ইদানীং চুলগুলাও একটু বড় বড় রাখিয়াছে, যে জামাটা গায়ে দেয়, সেটার রঙ কতকটা বাদামী, কতকটা গেরুয়া—ছাত্রদলও গোপনে মৌনী-মাষ্টার-মহাশয় বলিতে সুরু করিয়াছে।



হিজলীর নিমক-মহালে

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ

মুসলমান আমলে যে স্থানটী হিজলীর নিমক-মহাল বলে পরিচিত ছিল, সেটী এখন মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে কাঁথি মহকুমার সঙ্গে মিলিয়ে গেছে। বর্ত্তমানে হিজলী বলে কোন জেলা নেই—আর তৎকালীন প্রসিদ্ধ নিমক-মহাল বলতেও বিশেষ কিছু নেই—নিমকি খালও শুকিয়ে গেছে—আছে কেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নির্ম্মিত Salt Departmentএর দ্বিতল

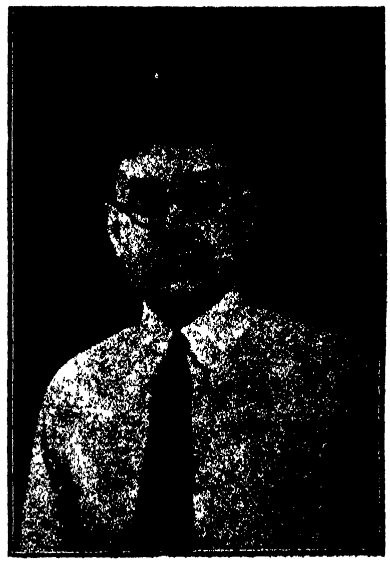


নোনা মাটি সংগ্রহ

অট্টালিকা—যা উপস্থিত কাঁথির মহকুমা হাকিমের বাসস্থানের কাজে লাগ্‌ছে। তবে নিমক-মহালের নূন তৈরী আবার নূতন করে ছড়িয়ে পড়েছে। এবার ছুটীটাতে সাগরের নির্জ্জন উপকূলে এই নূন তৈরীর অন্যতম আড্ডা দাদনপাত্র নামে একটী গ্রামে নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করতে যাওয়া গেছ্‌ল সখ করে। গ্রামে গ্রামে হাইকিং করা রোগটা এখনও ছাড়েনি; তাই ক্যামেরা ঘাড়ে নিয়ে সোলার টুপি মাথায় দিয়ে শর্ট আর রাফ্ শুটিং শু পায়ে দিয়ে দক্ষিণ মেদিনীপুরের উত্তপ্ত রোদে এবং নোনা ভিজে হাওয়ায় তথাকথিত হিজলীর নিমক-মহালের চরে চরে ঘুরে ছুটীটা কাটিয়ে দেওয়া গেল।

যে গ্রামে আস্তানা বাঁধা গেছ্‌ল সেখানে বেশীদিন থাকলে হিজলীর detention campএর সুখটা কিছু আন্দাজ করা যেতে পারত।

কতটুকুই বা দূর এই কাঁথি, কিন্তু destinationএ



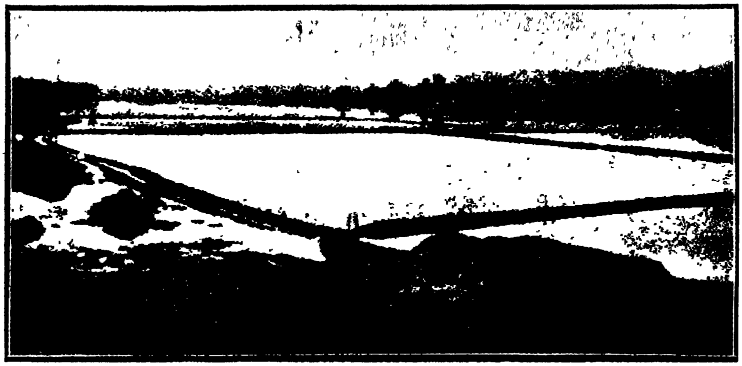
লেখক—শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ

পৌঁছলাম প্রায় ২৪ ঘণ্টার পর। হিল্লী ডিল্লী নয়, একেবারে জন্মভূমি শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিরই এক অংশে। সিনেমা "হলে" পয়সাগুলো না দিয়ে গোধূলিসজ্জের খেয়াল হল seasonএর শেষ হাইকিং লবণক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে সারতে হবে।

তথাস্তু; একজন ইয়ং সভ্য জুট্‌ল—প্রভাত মিত্র—সবে প্রেসিডেন্সি থেকে ফার্ষ্ট আর্ট দিয়ে বিলাতী কায়দায় "ভ্রমণে বিদ্যালাভ" এই নীতি অনুসরণ করছে। রাশিয়ার মত

ষ্টেট্ থেকে বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে বন্দোবস্ত ত নেই—তবু ভায়া U. T. C.র মেম্বার—অভ্যাস ছিল বলেই দুর্গম পথে তাকে টানতে ভরসা হল।

ইঞ্জিনীয়ার সৌরেন দত্ত, আর আমার ভ্রাতা ললিতও দলে জুটে পড়ল; তাদেরও লবণ প্রস্তুতি লক্ষ্য করবার ইচ্ছা ছিল। আর আমার ছিল ঘোরার খেয়াল—সাউথপোলাও নয় বা কাম্‌সকাট্‌কাও নয়—একেবারে কাঁথির সমুদ্রকূলে—যেখান থেকে বঙ্কিমবাবুর কপালকুণ্ডলার জন্ম।



নোনা জলের কন্‌ডেন্সিং ট্যাঙ্ক

ভোরবেলা কাঁথি রোড ষ্টেশনে ১টা টাকা ভাড়া দিয়ে বাসে করে ৩৬ মাইল পথ ভেঙ্গে কাঁথি সহরে উপস্থিত। পূর্ব্বে কখনও আসিনি—আর আমাদের এদিককার কজনই বা বিনা কাজে এখানে আসেন? অথচ কাজের খাতিরে কাঁথির কত লোক কলকাতায় আসেন এবং কতজন কলকাতায় এসে আর ফেরেন নি—দেশের মায়া কাটিয়ে বাড়ী গাড়ী করে সহুরে হয়েছেন।

সহরটা দেখে বড় দুঃখ হল—কোম্পানীর আমলেও দেশের লবণশিল্প যতদিন উন্নত ছিল এই কাঁথির একটা importance ছিল; শ্রী ছিল—আয়তন ছিল—বর্দ্ধিষ্ণু জনসংখ্যা ছিল। এখন সহরের প্রকৃতপক্ষে কোন সৌন্দর্য্যই চোখে পড়ল না। কোনও আকর্ষণই নেই; তার ওপর পুলিসের অত্যাচারে জর-জর—লোকের কথাবার্ত্তায়ও যেন সে মাধুর্য্য আর নেই। বাঙ্গালী বাঙ্গালীকে বিশ্বাস করতে চায় না—অচেনা অজানা দেখ্‌লে ভয় পায়—বুঝি বা গোয়েন্দা। এর উপর অর্থসঙ্কট—দেশ এবং দেশবাসীকে যেন রুষ্ট করে দিয়েছে।

কার্‌ফিউ অর্ডার এখনও বর্ত্তমান রয়েছে, আমরা রাত্রি যাপনের আইডিয়া ত্যাগ করলাম। তিন ঘণ্টার বেশী থাকলে পুলিসে রিপোর্ট করতে হবে—তাই সদলবলে থানায় একবার হাজিরা দিয়ে আসা গেল। পুলিসকে মুখগুলি দেখিয়ে বলে এলাম "ভয় নেই, আমরা হাইকিং করতে বেরিয়েছি।"

সহরে প্রবেশ করে প্রথম চোখে পড়ল—বাজারে প্রচুর পরিমাণে ঝুড়ি ঝুড়ি পরিষ্কার সাদা নুন বিক্রী হচ্ছে—এক একজনের দুই এক ঝুড়ি নুনই জীবিকা; নোনা খালাড়ি থেকে প্রস্তুত করে মার্কেটে ২।১ পয়সা সেরে বিক্রয় করে সংসার চালায়—ধান জমি থেকে চাষও দেয়—তবে এই থেকে লাভ বেশী। আকাশের খেয়াল—জল না হলে অজন্মা হবে—কিন্তু সমুদ্রের নোনা জলের ত অভাব হবে না।

দ্বিতীয় জিনিষ লক্ষ্য করলাম—ডাকঘরের সামনে চৌরাস্তায় চায়ের দোকানে বসে। বাঙ্গালা দেশেরই সহর। সামনে ছাতা পুঁতে তার ছাওয়ায় জুতো সেলাই



কাঁথির সমুদ্র

করছে বাঙ্গালী মুচি—একটা দুটো হয়ত বেহারী আছে, কিন্তু কলকাতার মত নয়। দোকানপত্তর ব্যবসাবাণিজ্য মোটের উপর বাঙ্গালীর হাতেই রয়েছে—মাড়োয়ারী হিন্দুস্থানী কম। তবে জিনিষপত্তর সব পাওয়া যায় না—

সাধারণের মোটামুটী আবশ্যক এতেই মিটে যায়। সকাল-বেলা বেহারী আহির এসে দুধ দিয়ে যায় না—বাঙ্গালী গোয়ালা বা মুসলমান গোয়ালা। বাস সার্ভিস বেশীর ভাগ বাঙ্গালীর—সিণ্ডিকেট হয়েছে শুনে সুখী হলাম। পাঞ্জাবী না হোক—হিন্দুস্থানী বাসওয়ালারাও আছে, তারা



জল নিকাশের কল—পা দিয়ে চালাচ্ছে

কিন্তু ব্যবসায়ে পাকা, যা সুন্দর ব্যবহার করলে—তাতে সিণ্ডিকেটের নিকট এই ভারতবর্ষ মারফৎ জানাচ্ছি যে বাঙ্গালী ড্রাইভার এবং কন্‌ডাক্টারকে যেন একটু মিষ্টভাষী হতে বলেন; কারণ বার কয়েক এদের ব্যবহারটা খুব প্রীতিকর লাগ্‌ল না। যাক্ ভবিষ্যতে বাঙ্গালীর আধিপত্য বাঙ্গালার সহরে যেন না কমে যায় এই প্রার্থনাই করি।

পুলিসের কথা ছেড়ে দিন, পাহারাওয়ালা একধার থেকে সব বেহারী—কর্ম্মচারী অবশ্য প্রায় সবই বাঙ্গালী। আমরা যে সময় ছিলাম তখন মিষ্টার এস-কে-সেন ছিলেন এস, ডি, ও। খাসমহল অফিস, আর একসাইজ ও সল্ট্ ডিপার্টমেণ্ট—এই দুটীরই কাজ স্বভাবতঃই এখানে বেশী।

সকালবেলা দুটী অন্নলাভের জন্য একটী প্রবাসী-গৃহে এসে বিশ্রাম নেওয়া গেল। ভারী সুন্দর শীতল খড়ের ছাউনি মাটীর কুটীরখানি, তার দাওয়াতে মাদুর পেতে শর্ট-শার্ট খুলে দেশী পরিচ্ছদ এঁটে বিশ্রাম করা গেল, তারপর খালি গায়ে গামছা মাথায় দিয়ে প্রখর রৌদ্রে নিকটস্থ পুষ্করিণীতে জলকেলি এবং স্নানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া গেল। চৈত্র মাসের শুষ্ক ঋতু—জল সস্তা নয়। বিস্তর টিউবওয়েল হয়েছে তাই নিস্তার।

হোটেলের ম্যানেজার চার আনা করে পয়সা নিলে; টাট্‌কা মৎস্য এবং উচ্ছে পিঁয়াজ সংযোগে অন্নের ব্যবস্থা মন্দ করে নি। কাঁথি সহরের ব্রাহ্ম-মন্দির এবং প্রভাত-কুমার কলেজ উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্মমন্দিরটী বেশ বড় গোছের, পরিষ্কার এবং সুন্দর। টাউন-হলের মত মাসে মাসে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ছাড়াও অন্য লেক্‌চার হয়ে থাকে। বাহিরে সব জায়গারই মত—দিব্যি ভাল মাদুর পাতা। টানা পাখা—আলোর ঝাড়—পাশ্চাত্য প্রভাব নেই—আভি-জাত্যের চিহ্ন আছে।

প্রভাতকুমার কলেজের সম্প্রতি সহরের পশ্চিম কোণে বালিয়ারীর উপর নূতন গৃহ নির্ম্মাণ হচ্ছে। মহকুমা সহরের এটা একটা বিশেষত্ব, আর একটী বিশেষত্ব নীহার প্রেস এবং তার সংবাদপত্র 'নীহার'।

কাঁথির হাসপাতালে শীতলপ্রসাদ মাইতি ওয়ার্ড ছাড়া একটী সিল্‌ভার জুবিলি ওয়ার্ড খোলা হয়েছে—ভালই বলতে হবে। এর কাছে একটী গুরু-ট্রেণিং স্কুল আছে। তার উপর মধ্যম শ্রেণী বাঙ্গালীর বাস বেশী বলে ছেলে-



সল্ট এঞ্জিনিয়ার—সৌরেন্দ্র দত্ত

মেয়েদের স্কুল গোটাকতক ত আছেই। মোক্তার উকিলের সংখ্যা সব জায়গারই মত, কম ত নয়ই—তবে কাজকর্ম্ম এখানের কাছারীতে নেহাৎ অল্পও নয়। মামলা করাটা দক্ষিণের মত এখানেও একটা ব্যাধি বলে মনে হল।

গরমের সময়ও কাঁথির অদূরস্থিত সমুদ্র থেকে দুরন্ত

বাতাস এসে বৃক্ষবহুল সহরটাকে অল্প ঢাকা রাখবার চেষ্টা করে। এর পথ দিয়ে চল্‌তে সুউচ্চ বৃক্ষরাশির মধ্যে লক্ষ্য পড়ে—অভ্রভেদী অষ্ট্রেলিয়ান ঝাউ; তার কাঠির মত পাতাগুলোর মধ্য দিয়ে হাওয়া চলাচল করে ভারী



একটা গ্রাম

শান্তিদায়ক মৃদু শব্দ করে—দাওয়ায় বসে বিশ্রাম করবার সময় এই শব্দটী ভারী ভাল লাগে। এটা ঘনবনের শির-শিরণির অপেক্ষা অন্য প্রকৃতির।

কাঁথি থেকে বেরিয়ে পড়া গেল দক্ষিণমুখো রামনগরের পথ ধরে। বাস চলাচলও করে—floatএ নদী পারাপার করে। শস্যশ্যামলা পল্লীর ভিতর দিয়ে চলে গেলাম সাতমাইল, পিছাবনী খাল পর্য্যন্ত। অশিক্ষিত দেশের মত আমাদের কাঁথির পাড়াগাঁয়ে বাঙ্গালী যে মিথ্যা বিলাতী পোষাককে সেলাম ঠোকে না এ ভাল। তবে ক্যামেরার দিকে হাঁ করে চাওয়া, আর বাবু আমার একটা ছবি তুলে দেবেন বলা—এ স্বভাব আছে।

বাস্তবিক এদিককার পল্লীগ্রামগুলি দেখলে চক্ষু জুড়িয়ে যায়; গৃহস্থদের সৌন্দর্য্যবোধ আছে—প্রত্যেকেই ভদ্রাসন, ধান্যক্ষেত এবং নিজ নিজ গ্রামের প্রতি যত্ন এরা করে দেখলাম। বাঙ্গালা দেশের অনেক পল্লীর শ্রীহীনরূপে যে ব্যথা পেয়েছিলাম এখানে সেটা পাইনি। প্রত্যেক গাঁয়ে টিউবওয়েল আছে—পানীয় জলের জন্য একেবারে হা হা করে না। খড়ের ছাউনি ঘরগুলি দূর থেকে এত সুন্দর দেখায়। সুবিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের মাঝ দিয়ে পাকা রাস্তা দিয়ে চল্‌তে এই জিনিষটাই বেশী লক্ষ্য পড়েছিল। গ্রামকে এরা ভোলেনি—যতই কল্‌কাতা সহরে চাকরী করতে আসুক্‌। তবে এদের হাটে দেখলাম ভাল চাল এরা উৎপন্ন করতে পারে না। হাটে বিলাতী জিনিষ বেশী ত চলেই না, তবে সস্তা জাপানী জিনিষ প্রবেশ করেছে।

প্রতি গৃহস্থের প্রায় শাকসব্‌জীর বড় বড় বাগানের ঝোঁক আছে এবং বাহিরে চালান দেয় না—নিজেদের হাটেই বিক্রী করে; তবে দর কমায় না—সম্ভবতঃ কাঁচা পয়সার লোভে এরা পয়সাটা বেশী চিনেছে। দক্ষিণ মেদিনীপুরের এই গ্রামগুলি সবদিকেই উন্নতি করলেও বিদ্যাশিক্ষা বিস্তৃতির জন্য বিশেষ কিছু করেছে বলে মনে হয় না। পাঠশালা স্কুল আরও বাড়ান উচিত।



বেঙ্গল সল্ট কোম্পানীর কারখানা

পিছাবনী খালের ধারে এসে থমকে দাঁড়াতে হল; এখন সন্ধ্যা—রাত্তিরে আর পথ চলা নিরাপদ নয়। খালের কোলে এপারেই রতনপুর বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম; সেখানেও পূর্ব্বের মত পথের ধারেই প্রবাসী-গৃহে রাত্রিযাপন করতে হল।

মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়ে টর্চ্চ নিয়ে গ্রামে আড্ডা দিতে ঢোকা গেল। গাজনের আয়োজন চলেছে—শানাই ঢোল বাজিয়ে বাড়ী বাড়ী চাঁদা আদায় হচ্ছে, আমাদের খালি পায়ে খাঁকি প্যান্ট্ দেখে এ ওর কানে বলে "কলকেতার বাবু"—জানে না ত, যে আট মাইল হেঁটে জুতো পরে আমাদের পায়ের কি অবস্থা হয়েছে।

এরা শিবের ভক্তই বেশী, তাই রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ অপেক্ষা শিবমন্দিরই চোখে পড়ে। পিছাবনী হতে কিছু দূরে চন্দনেশ্বর—সেখানে গাজনের মেলা বসে—যাত্রীর আসা যাওয়ার বিরাম নেই। গ্রামে একটী বারওয়ারীতলায় আবার পালা গান চলেছে—শিবের বিবাহ—চারপাশের বিশ পঁচিশটা গ্রামের লোক দেখতে আসছে।

রাত্রির অন্ধকার কাট্‌ল দাওয়ায় বিছানা পেতে—মনে হল কোয়ার্টারের পোর্টিকোতে খাট পেতে শুয়েও এমন আনন্দ পাইনি। রাত্রি ১২টার সময় অর্দ্ধচন্দ্রের উদয় শুয়ে শুয়ে দেখতে পেলাম। থেকে থেকে ভুর ভুর করে পল্লীগ্রামের ফুলগন্ধসৌরভ ভেসে আসে ঠাণ্ডা বাতাসে। নিশুতি রাত্রের প্রহরী কোথা থেকে একটী সারমেয় মাথার কাছে এসে বসে মাঝে মাঝে পথিক দেখে ডাক ছাড়ছিল।

সকালবেলা খাল পার হয়ে পিছাবনী থেকে আরও ৬।৭ মাইল পায়ে হাঁটা পথ ধরা গেল—সাগরতীরে আমাদের কচিসংসদের আড্ডা গাড়তে। ধান্যক্ষেত্রের আলের উপর দিয়ে কোথাও বা বাঁধের উপর দিয়ে পিছাবনীর ধারে ধারে গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে কাঁথির বিশাল বাঁধ dylerএ আসতে রৌদ্রে সোলার টুপি তেতে উঠ্‌ল—পকেটে ক্যামেরাও ঘেমে উঠ্‌ল। সঙ্গে কুলির মাথায় হাভারথাকে ছিল খাদ্য—তাই খেতে খেতে—আর গ্রাম আক্রমণ করে পেঁপে এবং ডাব সংগ্রহ করে সেবন করতে করতে পথ ভাঙ্গতে কষ্ট হয় না; বিশেষ যখন দল থাকে—সে পথ হোক না দুর্গম, হোক না উত্তপ্ত ছায়াবীথিহীন।

উচ্চ বাঁধের উপর হতে দেড় মাইল দূরে চিক্ চিক্ করছে সমুদ্রের জল দেখা গেল—বেশী গভীর নয় বলে শব্দ কানে আসে না। জায়গাটাকে বলে পুরুষোত্তম সহর, এইবার উপকূলের কর্দ্দমাক্ত নিম্নভূমি পার হতে হবে। জুতো মোজা খুলে হাতে নিয়ে হাঁটু ভোর কাদা, কোমর ভোর জল এবং আগাছাবিশিষ্ট উত্তপ্ত শুষ্ক ভূমি ভেঙ্গে—রোমাঞ্চকর expeditionএর মত বাকি দেড় মাইল পথ চলতে লাগলাম।

ভাগ্য ভাল, জোয়ার তখনও আসেনি এবং বেঙ্গল সল্ট্ কোম্পানী খাদ এবং খালবিলের উপর সাঁকো নির্ম্মাণ করিয়েছেন—তাই দুর্গম পথের কষ্ট একটু অন্তত লাঘব হয়েছে। এই পিছল পথে সন্তর্পণে যেতে যেতে মনে হল—হিজলীর এই চরেই নিমকমহালের শত শত মলঙ্গীরা একশত বৎসর আগে নিমক্ প্রস্তুত করে এর নির্জ্জনতা, নীরবতা ভঙ্গ করে রাখত। কিন্তু আজ তা নাই, যা আছে তাহা কঙ্কাল মাত্র। তখন এই বাঁধের পাশেই জলপাই বন হতে কাঠ সংগ্রহ করে শতমুখী চুল্লীতে মৃৎ পাত্রে নোনা জল ফুটিয়েই মলঙ্গীদের লবণ প্রস্তুত হত।

সমুদ্রের কোলে দাদনপাত্র গ্রামে বেঙ্গল সল্ট্ কোম্পানীর ফ্যাক্টরীতে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের বানপ্রস্থ আশ্রমে আমরা সদলবলে যখন উপস্থিত হলাম তখন বেলা এক প্রহর।

প্রথমে অনুভব করলাম এখানকার বায়ুর গতি—বাতাসিয়াকেও হার মানায়—উইণ্ডমিল বসালে বোধহয় সারা মেদিনীপুরকে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা যায়। তার সঙ্গে গ্লাইড্ করতে পেলে ঘণ্টায় ৫০।৬০ মাইল উড়ে আসা যায়। যতই নোনা হোক্, উন্মুক্ত এবং বিশুদ্ধ—মাঝে মাঝে তার দুরন্ত দাপাদাপি বিরক্তিকর হলেও স্বাস্থ্যকর।

জোয়ারে সমুদ্র এগিয়ে এল—ঢেউগুলি নিকটে আসতে গর্জ্জন স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। নিম্নতর ভূমি চর খাল বিল জোয়ারের জলে ভেসে গেল। সাগর এখানে যতই অগভীর হোক অবগাহনের লোভ সামলান দায়।

বেঙ্গল সল্ট্ কোম্পানীর লবণের কারখানা এবং স্থানীয় কুটীর শিল্পে লবণ প্রস্তুত—এই দুটাই এখানে লক্ষ্য করবার। হাসানাবাদ, সুন্দরবন, চট্টগ্রাম, চব্বিশপরগণা প্রভৃতি জায়গায় গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর ঘরে ঘরে নোনামাটী থেকে নুন তৈরী হচ্ছে, শুল্ক দিতে হয় না—তাতে খাবার দরকার যেটুকু তার। এখানে এটা খুব বেশী রকম।

প্রথমতঃ এরা সমুদ্রতীরবর্ত্তী মেঠো নিম্নভূমি—যা প্রায়ই creekগুলি দিয়ে জোয়ারের জলে ভেসে যায়—সেই সমস্ত জায়গা শুষ্ক হয়ে গেলে তার উপরকার নোনা মাটী চেঁচে

তাই থেকে পরিশ্রুত (lixiviate) করে তীব্র নোনা জল বার করে সেইটে ফুটিয়ে নুন বার করে। মাটীর ফিল্টার 'গাড়ী' প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়—মাঝে মাঝে ঢিবি করে রাখা নোনা মাটী—সেই মাটী এনে এর উপর চাপিয়ে সাদা জল ঢেলে ছোট ছোট ছেলেরা পর্য্যন্ত চুইয়ে চুইয়ে নোনা জল (brine) কলসী করে নিয়ে যাচ্ছে। বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে এই নোনা জল জ্বাল দিয়ে সুন্দর নুন তৈরী হয়—ধব্ধবে বিলাতী টেব্ল সল্টের মত। খুচ্রো দেড় পয়সা করে সের কিনতে পাওয়া যায়।

সকলেই প্রায় বাড়ীতে নুন তৈরী করে। দাদনপাত্রে এসে অনেকটা রবিনসন্ ক্রুশোর দেশে আসা গেছে মনে হত। প্রকৃতপক্ষে সভ্যতা হতে ছিন্ন। বালিয়াড়ী চরের মাঝে এক মোহানার মুখে উচ্চভূখণ্ডের উপর গোটা পাঁচেক ঘর গৃহস্থ নিয়ে এই ক্ষুদ্র গ্রাম। বাঁধের এদিকে ধান হয় না, হয় কেবল নুন আর কয়েকটা ফল-পাকড়—পানীয় জলের অভাব একটু আছে, কারণ সব নোনা—সাদা জল বাঁধের ওপার থেকে আনতে হয়।

সকালবেলা বেড়াতে গিয়ে দেখতাম জেলেরা ধরছে সমুদ্রের মাছ—খাল বিলে চুনো মাছ ধরছে গ্রামের মেয়েরা আঁচলে করে—কেউ কেউ কাদা পাঁকে ধরে বেড়াচ্ছে কাঁকড়া।

বড় গরীব এরা—কোম্পানীর কারখানা হতে তবু অনেকে খেটে রোজগার করবার সুবিধা পাচ্ছে। কেউ কেউ নৌকা করে জোয়ারের সময় পারাপার করে পয়সা রোজগার করে।

এই রকম স্থানে আমাদের আস্তানা—খড়ের ছাউনি দিয়ে ঘর নির্ম্মাণ হল, পাটা দিয়ে হল বেঞ্চি তৈরী—মাচা করে হল খাটিয়ার সৃষ্টি—খড়ের হল বিছানা। যেন সাউথ-সীর এক দ্বীপে উপনিবেশ করতে আসা গেছে। চারিদিকে নোনা জল—পরিষ্কার পানীয় জল বাঁধের ওপারে দু-মাইল দূর থেকে আনিয়ে নিতে হত, তা না হলে কেবল ডাব।

বেঙ্গল সল্টের চিমনিগুলি দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে—মণ মণ লবণ প্রস্তুত হচ্ছে—সেদিন আবার মেদিনীপুরের অ্যাডিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্টুয়ার্ট সাহেব ওদের ফ্যাক্টরী দেখতে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে দলে ভিড়ে কারখানার নুন তৈরীর পদ্ধতিটা দেখে নেবার সুবিধা হল।

মোহানার মুখে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাঁধ দিয়ে কতকগুলি shallow ট্যাস্ (condenser) নির্ম্মাণ করে রৌদ্র হাওয়ার সাহায্যে সামুদ্রিক জলকে ঘন করে তার লবণ ভাগ অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে নিয়ে সর্ব্বশেষে সেই ব্রাইনকে বড় বড় ফারনেসে ফুটিয়ে নুন তৈরী হচ্ছে। সমস্ত ফ্যাক্টরীটা পুরুষোত্তমপুরের প্রায় বিশ একার জায়গার উপর। পাশ দিয়ে চলে গেছে খাল সাগরের মোহানা পর্য্যন্ত—জোয়ারের সময় ওই খাল দিয়ে নৌকাযোগে নুন শালিমার বা উলুবেড়িয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ষ্টোরে যত নুন জমা হয়—এক্সাইজ্ থেকে তার শুল্ক আদায় করে নিয়ে যায়।

বিকেলে এই জনহীন স্থানে সাগরের বালুচর আর আকাশের চাঁদ ছাড়া আর সঙ্গী কে? তারই বক্ষে শায়িত হয়ে অবিরাম শুন্তাম ফেনিল উর্ম্মিমালার আছ্ড়ে পড়ার কলরোল। যেদিকে চাই সব ফাঁকা—অনন্ত অসীম ওই পাণ্ডু নীল আকাশ, এই নীলাভ সাগরের জল। বেড়িয়ে ফিরে ঢুকতাম ক্ষুদ্র পল্লীর মোড়লের ঘরে—তাদের সঙ্গে মিতালি করতে। শুনতাম তাদের গল্প—"সে কত বছর আগে হঠাৎ সাগর-দেবতা ভীষণ রুদ্র হয়ে ওঠেন; বিকট ভয়াবহ মূর্ত্তি ধরে বাণ ডেকেছিল—হুড় হুড় করে জল ঢুকল বালিয়াড়ী ভেদ করে—দূরে প্রকাণ্ড বাঁধটার গলা পর্য্যন্ত জল রহিল কদিন—সব পালাল নৌকা করে—যারা পালাল তারা মল—গরুবাছুর গেল ভেসে—বাড়ী-ঘরদোর গেল ভেসে—মাটীর ঘরের খড়ের ছাউনি নিয়ে ঝড়ের সে কি তাণ্ডব নৃত্য। পনের দিন বাদে জল গেল সরে—ওরা ফিরে এসে দেখ্লে—গ্রামের আর চিহ্ন নেই, কেবল কতকগুলি খুঁটী।"

এমনটী অবশ্য আর হয় না; তবে প্রতি বৎসর আসে চৈতের কোটাল, ভাদ্রের কোটাল—আসে মাছমেছুনির কোটাল—তাদের এরা ভয় করে না—সাঁতার জানে, পারাপারের নৌকা আছে, ছিপ আছে মাছ ধরবার, আর কোমরভরা জল পার হওয়া অভ্যাসও আছে। আমাদের কল্কাতার ছেলেরা বিদেশের expeditions ফিলমেই দেখে, কিন্তু এরা দেখে নিজের চোখে—অনুভব করে পদে পদে।

বহ্বারম্ভে

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

মনিয়া এবং সোনামাঝি—

বেশ স্বচ্ছন্দে ও সুখে তারা বাস করত এ কথা বলা ভুল হবে। বিয়ে হয়েছে নাকি পাঁচ বছর—এর মধ্যে কতবার মারামারি, কাটাকাটি এবং ছাড়াছাড়ি হয়েছে তার ইয়ত্তা নাই; আশ্চর্য্য এই যে মিটমাট হতেও বেশী দেরী হয় নি।

যখন ঝগড়া বাধে তখন কে যে কার কত নিন্দা করবে তার ঠিক পায় না। সোনামাঝি মনিয়ার হাজার খুঁত বার করে—কেবল আকৃতিরই নয়, প্রকৃতিরও—আবার মনিয়াও ঠিক তাই।

সাহঙ্কারে সে বলে—এ নাকি নেহাৎ বানরের গলায় মুক্তার মালা ঝুলানো হয়েছে। কোথায় সে—আর কোথায় সোনামাঝি—রূপে গুণে হাজার হাত তফাৎ। নেহাৎ নাকি তার কপাল মন্দ, তাই এসে পড়েছে সোনামাঝির ঘরে, নচেৎ সে তো যেত কেষ্টর ঘরে। কেষ্টর সঙ্গেই তো তার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল—হঠাৎ কি একটা কাণ্ড ঘটে, তাই তার বিয়ে হয় সোনামাঝির সঙ্গে। এ যেন হয়েছে সোনামাঝির বামন হয়ে চাঁদ ধরা—যে কেউই ওকে দেখে এ কথা বলবে। সোনামাঝির আছে কি? যেমন কালো ভূতের মত চেহারা—হঠাৎ দেখলে ভয় হয়—তার পরে ঘরেও তো খাওয়ার অবস্থা তেমনি।

সোনামাঝি এত কথা গুছিয়ে বলতে পারে না, রাগে শুধু ফোঁস ফোঁস করে, ছোট ছোট চোখ দুটো লাল হয়ে উঠে বন বন করে ঘোরে—

সে কেবল বলে, "হুঁ, মাগীর বদমায়েসী আমি সব বুঝেছি। বেশ তো—যাক না ওর সেই কেষ্টর কাছে, আমি কি যেতে মানা করছি?"

মনিয়া আড়চোখে তাকায়, বলে—"মরণ আর কি? পরিবারকে চলে যেতে বলতে লজ্জা করে না? গলায় দড়িও জোটে না—?"

লোকে দেখতে পায় এত ঝগড়া বিবাদের পর আবার তাদের ভাব হয়ে গেছে। সোনামাঝি আবার মাছ তরকারী বাজার হতে নিয়ে আসে, তার সঙ্গে থাকে একখানি লালপেড়ে শাড়ী—

খুসি মুখে আর ধরে না, তবু মনিয়া বলে, "আবার শাড়ী কেন? পয়সাগুলো গায়ে কামড়াচ্ছিল বুঝি, খরচ করে প্রাণ সার্থক হল—না? আচ্ছা বাপু, কেন এত খরচ করা—কেনই বা রোজ এই বড় বড় মাছ, বাজারের সেরা তরকারী-পাতি আনা—একদিন একটু কম আনলে কি ক্ষতি হয়।"

সবাই জানে—মাসে তিন চার বার এ রকম ঘটনা ঘটে থাকে। কাপড় প্রতিবারে না এলেও মাছ তরকারী প্রতিবারই এসে থাকে।

(২)

হঠাৎ একদিন এসে পড়ল কেষ্ট—যাকে নিয়ে মনিয়ার গর্ব্বের শেষ নাই। সব সময় তাকে সে ভুলেই থাকে, ঝগড়ার সময় কেমন করে যে তাকেই মনে পড়ে যায় এবং তার লুপ্ত ভালোবাসা ডালপালাসহ জেগে ওঠে তাই আশ্চর্য্য।

কেষ্ট এই গ্রামেই কি কাজে এসেছিল, মনিয়াকে একবার দেখার লোভ সে সামলাতে পারে নি; তাই একদিন "মণি" বলে ডেকে সে এসে দাঁড়াল।

মাত্র দুদিন আগে ঝগড়াটা মিটেছে, এদের দুজনের মধ্যে ভাবের এখন অন্ত নেই। সারাদিন সোনামাঝি লাইনে পাহারা দেয়, রেলগাড়ী যাওয়া আসার সময় লাল নীল নিশান দেখায়। এ নিয়ে মনিয়ার গর্ব্বের সীমা ছিল না। সে সকলের কাছে গর্ব্ব করতো তার স্বামী কি যে-সে লোক—সে পাখা না দেখালে গাড়ী চলে না, আবার তার হাতের অন্য রংয়ের পাখা দেখালে লাট-সাহেবের গাড়ী পর্য্যন্ত থেমে যায়।

সোনামাঝি তখন বাড়ী ছিল না—সে সময় কেষ্টকে

আহ্বান করাও চলে না—অথচ ফিরানোও যায় না। মনিয়াকে বাধ্য হয়ে তাকে গ্রহণ করতে হলো।

তাদের ঝগড়ার কথা এবং তাকে নিয়ে মনিয়ার অহঙ্কারের কথা কেষ্ট শুনেছিল, তাই জিজ্ঞাসা করলে, "কেমন আছিস মণি, ভালো আছিস তো?"

মনিয়া জানালে—সে খুব ভালই আছে।

কেষ্ট বললে, "তবে যে লোকে বলে সোনামাঝি নাকি তোকে ভারি যন্ত্রণা দেয়, নিত্য নাকি তোকে বাড়ী হতে তাড়িয়ে দেয়—?"

অকস্মাৎ স্বামীর গর্ব্বে মনিয়া স্ফীত হয়ে উঠল—"ও কথাটী বলো না দাদা, ওর নামে অত বড় নিন্দে আমি করতেও পারব না, সইতেও পারব না। আমার শ্বশুরের ভিটে, স্বামীর ভিটে, এখান হতে আমায় একচুল নড়াবে কে, কার ক্ষমতা? ওর সাধ্যি আছে আমায় তাড়াতে?"

কেষ্ট থতমত খেয়ে বললে, "তা বটেই তো, তা বটেই তো; সত্যি কি কেউ তা পারে? তবে শুনলুম কিনা—তোরই গাঁয়ের লোক বলছিল—"

বাধা দিয়ে মনিয়া বললে, "ওরা আর বলবে না, ওরা কি আমাদের সইতে পারে? গাঁয়ের লোক চায়—ঝগড়া ঝাঁটি হয়ে আমরা তফাৎ হয়ে যাই—কিন্তু তাই হতে পারে দাদা? তুমিই বল না ভাই, সেই যে সাতটা পাকের বাঁধন, তা কি এক কথায় আল্‌গা হয় গো—?"

কে জানে কেন, কেষ্ট খুসি হতে গিয়েও খুসি হতে পারলে না।

রাত আটটা পর্য্যন্ত ডিউটি দিয়ে বাড়ী ফিরে সোনামাঝি কেষ্টকে দেখে ভারি খুসি হয়ে উঠল। সেদিন খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল ভালো; কাজেই পরিপাটি করে খাওয়ানোও হল।

আশ্চর্য্যের কথা—তার একটী বারও মনেও হয় নি—ঝগড়া হলেই এই লোকটীর কথা নিয়ে তার স্ত্রী অহঙ্কার করে এবং যখন তখন এর বাড়ীতে চলে যাওয়ার ভয় দেখায়।

(৩)

মাস দুই তিন বেশ সুখেই কাটল—যা কখনো হয় নি। পাশের লোকেরা একটু সন্দিগ্ধ হল—এর মানে কি? সোনামাঝি এবং মনিয়া এমন নিরুপদ্রবে শান্তিময় চিত্তে বাস করতে পারে, এ যেন একেবারেই আশ্চর্য্য।

হঠাৎ একদিন শোনা গেল চীৎকার। এবং এবারকার চীৎকার বেশ জোর গলায়, মনে হয় যেন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

পাড়ার লোকে দেখতে পেলে বলিষ্ঠ দেহ সোনামাঝি দুইটী বলিষ্ঠ হাতের মধ্যে মনিয়াকে তুলে বাড়ীর বাইরে নিয়ে আসছে—আর মনিয়া দুই হাতে তার মাথার তেল-চকচকে লম্বা চুল চেপে ধরে দুই পা আছড়াচ্ছে।

মনিয়ার মুখেরও বিরাম নাই—গালাগালিতে সমস্ত পাড়া সে মাতিয়ে তুলছে, তাতে সোনামাঝির ভ্রূক্ষেপ নাই। দুই হাতে সে যে চুল ধরে টানছে, নাকে মুখে খামচাচ্ছে, তাতেও সোনামাঝির দৃষ্টিপাত নাই।

মনিয়া চীৎকার করছে—"আমায় ছাড় শিগ্‌গীর, নইলে তোকে রক্তারক্তি করে ছাড়ব—ছাড় শিগ্‌গির—"

কিন্তু সোনামাঝি ছাড়ল না।

নিরুপায় মনিয়া অভিশাপ দিতে সুরু করলে "মর মর হতভাগা, তোর নির্ব্বংশ হোক, যমের দক্ষিণ দোরে যা, এক্ষুণি যম তোকে ডেকে নিক।" তখন সে সোনামাঝির চুল ছেড়ে দিয়ে আঙ্গুল মটকাতে সুরু করেছে—হে ধর্ম্ম, হে যম, হে আকাশের তেত্রিশকোটি দেবতা, তোমরা দেখ, যে আমায় এমন করে মারছে—তার শাস্তি দাও—"

নির্ব্বিকার সোনামাঝি তাকে পথে নামিয়ে দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ফিরে গিয়ে দরজায় খিল দিলে।

মনিয়া দরজায় গিয়ে কয়েকবার ধাক্কা দিলে—সোনামাঝি কোন উত্তর দিলে না। ফুলতে ফুলতে মনিয়া বললে "আচ্ছা থাক, তোকে যদি জব্দ করতে না পারি, আমার নাম মণিই নয়। এই প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছি—তোকে কাঁদাব—কাঁদাব—কাঁদাব, দাঁতে কুটো নিয়ে আমার কাছে তোকে দাঁড় করাবই করাব—তবে আমার নাম মণি।"

ভিতর হতে সোনামাঝির গর্জ্জন শোনা গেল "কখনও না, তোর মুখ আমি দেখব না, কাঁদতে আর দাঁতে কুটো করতে আমার বয়ে গেছে।"

মনিয়া বললে, "বয়ে যায় কিনা দেখব—এই আমি চললুম কেষ্টর বাড়ী—তোকে জব্দ করবই এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

সে রাগে লম্বা পা ফেলে চললো।

(৪)

কেষ্ট উকিলের মুহুরী। সহরেই প্রায় থাকে, কখনও কখনও বাড়ী আসে। সহরের খবর রাখে—সেইজন্যই মেয়েদের ওপর পুরুষের অত্যাচারের কথা শুনলে সে রেগে আগুন হয়।

মনিয়ার নির্য্যাতনের কথা শুনে সে আগুন হয়ে উঠল —"অ্যাঁ, এত বড় আস্পর্দ্ধা সেই ছোটলোকটার, ইস্ত্রিকে কোলে করে বাইরে ফেলে দিয়ে আসা—যেন কাপড়ের বোঁচ্‌কা পেয়েছে আর কি ? তুমি কিছু করতে পারলে না মণি—তাকে মারতে পাবলে না ?"

মনিয়া চোখ মুচছিল—ফোঁস করে উঠলো, "হ্যাঁ, মারা বড় মুখের কথা কি না ? সে কি তোমার মত টিকটিকি গো যে একটা ধাক্কা দিলে দশহাত দূরে ছিট্‌কে পড়বে ? গায়ে যেন হাতীর জোর—"

বলতে বলতে নিজের অজ্ঞাতেই সে জিভ কেটে ফেললে, কথাটাকে সামলে নিয়ে বললে, "না, হাতীর জোর নয়—তবে গায়ে যে জোর আছে একথা মানতেই হবে। ওই জোয়ান লোক, ওকে মারা তো চুলোয় যাক, ধাক্কা দিয়েও এক পা সরাতে পারি নি।"

কেষ্ট বললে "চেঁচিয়ে লোক জড় করলে না কেন—তা হলেও তো জব্দ করা যেত।"

মনিয়া বড় দুঃখেই হাসলে, "আ আমার পোড়া কপাল, তা কি আর করি নি ? লোকজন কেউ কি সামনে এলো গা, সবাই দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল—"

বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর আবার সজল হয়ে উঠল, বললে, "আমি কখনো এ অপমান সইব না, কখনো না। আমায় কি না কাপড়ের বোঁচ্‌কার মত কোলে করে এনে রাস্তার ওপর ধপাস্‌ করে ফেলে দিয়ে পালালো ? গতরটা একেবারে গুঁড়ো হয়ে গেছে গো, আমি বলে তাই আজও সয়ে যাচ্ছি। ভগবান আছেন, তিনি দেখছেন, তিনিই বিচার করবেন। দুদিন না যেতে আবার যেন ছুটে আসতে হয়, আমার পায়ে ধরে খোসামোদ করতে হয়।"

কেষ্ট বললে, "অত করবার দরকার কি—তুমি নালিশ করে দাও। যে স্বামী রোজ মারধর করে, রোজ বাড়ী হতে তাড়িয়ে দেয়—আবার তার বাড়ীতে যাওয়ার দরকার ? নালিশ করলে তুমি যেখানেই থাকো—তোমায় মাস মাস খোরাকির টাকা পাঠাতেই হবে, বাছাধনের চালাকি বার হয়ে যাবে। আজকালকার দিনে ইস্ত্রির গায়ে হাত তোলা—কি সর্ব্বনাশের কথা।"

মনিয়া তখনই রাজি, সে নালিশ করবেই—এতে তার অদৃষ্টে যা ঘটবার তাই ঘটবে।

(৫)

বিনা পয়সায় দাসীটি পাওয়া যাবে—কাজেই উকিল-বাবু বেশ খুসিই হয়ে উঠলেন—বললেন, "তা বেশ, আমিই সব করে দেব - তবে কথা হচ্ছে বাপু, আমি যেমন ফি নেব না, তেমনি তোমায় চিরকাল আমার বাড়ী থাকতে হবে।"

স্বামীকে জব্দ করবার নেশায় মনিয়া সে প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল।

উকিলবাবু বললেন, "তোমায় কিন্তু আরও প্রমাণ দিতে হবে, তোমার স্বামীর চরিত্র কেমন ?"

মনিয়া উত্তর দিলে, "খুব ভালো গো উকিল বাবু, সে বিষয়ে অমন লোক আর দুটি দেখতে পাওয়া যাবে না। একটা দিন কোন মেয়ের পানে চায় না, মেয়ে দেখলে কোথায় পালাবে ঠিক পায় না।"

উকিলবাবু মাথা নাড়লেন, বললেন, "উহু, ওটি বললে চলবে না বাছা, তোমায় বলতে হবে তোমার স্বামীর স্বভাব খারাপ সেই জন্যেই তোমায় মারধোর করে—বার করে দেয়।"

মনিয়ার মুখ একেবারে শুকিয়ে গেল, কাতর চোখে তাকিয়ে সে বললে, "এত বড় মিথ্যে কথাটা তার নামে বলব বাবু ?"

উকিলবাবু বললেন, "বলতেই হবে, নইলে মোকদ্দমা চলবে না, তাকে শাস্তি দেওয়াও হবে না। সে তোমায় মিছিমিছি এত নির্য্যাতন করে, তুমি একটা মিছে কথা বলতে পারবে না ?"

মনিয়া ভাবতে লাগলো—

কেষ্ট বললে, "ভাবছো কেন মণি, বাবুর কথায় রাজি হও—নইলে সে আহাম্মকটাকে কোনমতে জব্দ করা যাবে না। আর তুমি কি জানো—সত্যি সোনামাঝি খুব ভালো লোক ? ভালো হলে কি সে নিত্যি এ রকম করে বউ

মারতে পারে—ঘর হতে বার করে দিতে পারে? ওকে আমি বেশ চিনি, ওর মত ধূর্ত্ত লোক আর দুটি মেলা ভার। তুমি বরং যদি দেখতে চাও—আমি দেখাতেও পারি।"

মনিয়া ঘেমে উঠল—ক্ষীণ কণ্ঠে সে প্রতিবাদ করতে চাইলে, কিন্তু ভাষা ফুটল না।

মামলা রুজু হয়ে গেল—

(৬)

কেষ্ট বুঝালে—"মামলাটা আগে হয়ে যাক না মণি, তারপর পালাতে কতক্ষণ? এই তো কয়টা দিন পরেই শেষ হবে, তোমার মাসোহারার বন্দোবস্তটা হয়ে গেলেই তোমার যেখানে খুসি গিয়ে থাকবে।"

বিশুষ্ক মুখে মনিয়া বললে, "মাসোহারা কত করে পাওয়া যাবে—?"

কেষ্ট বললে, "তা পাঁচ সাত টাকা করে পাবি, ওতে তোর দিন বেশ চলে যাবে।"

মনিয়া খানিক চুপ করে থেকে বললে, "ও তো মাত্র বার টাকা মাইনে পায়, সাত টাকা আমায় দিলে ও খাবে কি, পরবে কি?"

কেষ্ট হো হো করে হেসে উঠল—"তবু তার জন্য ভাবনা—মরে যাই আর কি? তার নামে নালিশ করা হল—তবু সে কি খাবে পরবে—সেই নিয়ে মাথা ঘামানো। মরুক না সে আহাম্মকটা, তাতে তোমার কি মনিয়া?"

সাপের লেজে পা দিলে সে যেমন ফোঁস করে ফণা ধরে দাঁড়ায়, মনিয়াও তেমনি করে দাঁড়াল; রুখে উঠে বললে, "তাই বটে রে মুখপোড়া, সে মরবে আর আমি বেঁচে থাকব, তোরা তাই ভেবেছিস—না? কেন সে মরবে, তোরা মর, যম তোদের নিক। আমাকে ভুলিয়ে এনে তার নামে নিন্দে অপবাদ দিয়ে নালিশ করিয়ে—হে মা কালী, হে মা দুর্গা, তুমিই এর বিচার কর—"

বলতে বলতে সে কেঁদে ভাসিয়ে দিলে।

কেষ্ট একেবারে থ হয়ে গেল—

দম নিয়ে বললে, "আমি নালিশ করিয়েছি, তুই করিস নি? তুই নিজেই তো এসে বললি সে তোকে বাইরে বার করে দিয়েছে—"

মনিয়া গর্জ্জে উঠে বললে, "দিয়েছে বেশ করেছে, তুই কেন আমায় তার নামে নালিশ করতে বললি—কেন বললি নে—সে ভিক্ষে করে চুরিডাকাতি করেও আমার খোরাকি দেবে, না দিতে পারলে তার জেল হবে? তোর ইচ্ছে সে জেলে যাক, সে মরে যাক, আমাকে তোর ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখবি—না? বেরো—বেরো মুখপোড়া, দূর হ এখান হতে—"

কাছেই একটা কাঠ পড়েছিল, সেইটা ঘুরিয়ে তুলতেই রোগা ও অতি দুর্ব্বল কেষ্ট লম্বা লম্বা পা ফেলে মুহূর্ত্তে উধাও হয়ে গেল।

(৭)

উকিলবাবু আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন—আসামী তাঁর বাড়ীতে এসে জুটেছে। কেষ্ট কোথায় উধাও হয়ে গেল, তার আর খোঁজ পাওয়া গেল না।

নাক পর্য্যন্ত ঘোমটা টেনে মনিয়া স্বামীর পরিচয় দিলে, "এই ইনি এসেছেন বাবা, আমাকে ছেড়ে ওর একটা দিন কোথাও থাকবার যো আছে—না আমিই ওকে ছেড়ে থাকতে পারি? বড় ভালো মানুষ, এত অত্যাচার করি—সব সয়ে যায়। সেদিনে দোষ ছিল আমার; মানুষটা তেতে পুড়ে এসে ভাত চাইলে, আমি ভাত দেই নি, উল্টে খুব ঝগড়া করেছি, তাই ও আমায় রাগ করে বাইরে ছেড়ে দিয়েছিল, মারেও নি—ধরেও নি।"

আসামী আমূল দুই পাটি দাঁত বার করে হাত কচলাতে কচলাতে বললে, "তাই কি হয় হুজুর—পরিবারকে কেউ কখনো মারতে পারে? ওঁরা হচ্ছেন ঘরের লক্ষ্মী, ওঁদের গায়ে হাত দিলে আমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে যে। এক-দিন নয় দুদিন নয়, পাঁচটী বচ্ছর আমাদের এমনি ধারা চলছে বাবু, ও কোন দিন নালিশ করতে আসে নি। গাঁয়ের লোক সবাই এ সব ব্যাপার জানে, তারা জানে—আমাদের ঝগড়া আপনিই মিটে যায়। এবারে যত ফেঁসাদ বাধিয়েছে ওই হরেকেষ্টটা, মেয়েমানুষ দেখে ভুলিয়ে এনে একেবারে নালিশ করিয়েছে। সেটা গেল কোথায়—হাতের কাছে পেলে একবার দেখে নেব—"

সে এত জোরে হাত দুখানা শূন্যে ছুড়লে—যা দেখে উকিলবাবুরই ভয় লেগে গেল।

মনিয়া উকিলবাবুর পা দুখানা জড়িয়ে ধরে কাঁদ কাঁদ

সুরে বললে, "সব মিটে যাবে তো বাবা, ওর কিছু হবে না তো?"

সোনামাঝি মনের কষ্টে গর্জ্জে উঠে বললে, "দেখুন বাবা, যদি জেলে যেতে হয়, আমার পরিবারকে সুদ্ধু ওখানে দিতে হবে; নইলে একা মেয়েমানুষ পেয়ে হরেকেষ্টটা আবার ওকে দিয়ে কি কাণ্ড করাবে কে জানে? আমার পরিবারকে নিয়ে আমি জেলে যাব, যমালয়ে যাব—নরকে যাব—একা কিছুতেই যাব না।"

ব্যাপার গুরুতর—

সোনামাঝির বিশাল চেহারার পানে তাকিয়ে উকিলবাবু ঘেমে উঠেছিল, কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, "সব মিটে যাবে, কোন ভয় নেই! তোমরা আজ বাড়ী যাও, মোকদ্দমার দিন দুজনেই এসো, আমি সব ফাঁসিয়ে দেব।"

মহানন্দে উকিলবাবুর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে দুজনে বাড়ীর পথে রওনা হল।

বলা বাহুল্য মামলা মিটে যেতে এক মিনিটও দেরী হয় নি এবং আদালত সুদ্ধ লোক পরম কৌতুকের সঙ্গে ব্যাপারটা দেখেছিল।

নিধনপুর তাম্রশাসন এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থ ও বৈদ্যগণের পদবী

শ্রীব্রজসুন্দর বিদ্যাবিনোদ এম্‌-এ ও শ্রীরাজমোহন নাথ বি-ই

প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাধিপতি ভাস্করবর্ম্মার প্রপিতামহ ভূতিবর্ম্মা আনুমানিক ৫০০ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন ব্রাহ্মণকে তাম্রলিপি দ্বারা ব্রহ্মোত্তর ভূমি প্রদান করেন; কিন্তু কালচক্রে ঐ তাম্রলিপি নষ্ট হইয়া যাওয়ায় ঐ ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ রাজদত্ত সনদ পুনঃপ্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন। ৬০৭ খৃষ্টাব্দে মহারাজাধিরাজ ভাস্করবর্ম্মা যখন বর্ত্তমান উত্তরবঙ্গান্তর্গত পূর্ণিয়া জেলার সন্নিকটস্থ কর্ণসুবর্ণ বাসরে (Camp) গমন করিয়াছিলেন, তখন ব্রাহ্মণদিগের আবেদনানুসারে কৌশিকানদীর তীরে চন্দ্রপুরীবিষয়ান্তর্গত ময়ূরশাল্মলাগ্রহার নামক বিস্তীর্ণ ভূভাগখণ্ড দুই শতাধিক ব্রাহ্মণের মধ্যে বিভাগ করিয়া তাম্রপত্রে নূতন দানপত্র উৎকীর্ণ করিয়া দিবার জন্য তিনি আদেশ প্রদান করেন। চন্দ্রপুরীবিষয়াধিপতি শ্রীক্ষীকুণ্ড ভূমির সীমা বিভাগ করেন এবং বিচারপতি জনার্দ্দন স্বামী, উকীল হরদত্ত ও কায়স্থ দুন্দুনাথ প্রভৃতির সমক্ষে তাম্রশাসনের মুসাবিদা হয় এবং পরে উহা কালিয়াসেক্যকার তাম্রপত্রে উৎকীর্ণ করেন।—এই সুদীর্ঘ তাম্রশাসনের ছয়খানি ফলক শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমান্তর্গত পঞ্চখণ্ডের সন্নিকটে নিধনপুর নামক স্থানে গৃহভিত্তি খনন করিবার সময় একজন মুসলমান কৃষক প্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীহট্টের সুসন্তান সুপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম্‌-এ মহোদয় লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করিয়া ১৩১৯ সালে সুধীসমাজে প্রকাশ করিয়াছেন এবং তদবধি এই বিষয়ে নানা গবেষণামূলক প্রবন্ধ সময়ে সময়ে বিবিধ পত্রে প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীহট্ট মুরারীচাঁদ কলেজের অধ্যাপক ডক্টর কিশোরীমোহন গুপ্ত এম্‌-এ. পি-এইচ্‌-ডি (লণ্ডন) এই তাম্রশাসনের উপর নির্ভর করিয়া ১৯৩১ ইং সনের সেন্সাস্‌ রিপোর্টে [Census of India—1931—vol III Assam, part I] (১) বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা শ্রীহট্টের জাতিসমূহের মূলোৎপত্তির নিরাকরণ করিয়া একটী সুদীর্ঘ ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; সরকারের অনুমত্যনুসারে প্রবন্ধটী আবার—Indian Historical quarterly নামক ত্রৈমাসিক পত্রের ১৯৩১ ডিসেম্বর সংখ্যায়ও প্রকাশিত হইয়াছে।

তাম্রশাসন অস্থাবর সম্পত্তি; স্থান পরিবর্ত্তনের সময় গৃহস্থের সঙ্গে সঙ্গে দেশান্তরিত হওয়া কিম্বা অবস্থা বিপর্য্যয়ে বিক্রীত বা তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া স্থানান্তরিত হওয়া কিছুই

(১) Assam Census Report—part I—Appendix c, page xxii—'On some castes and caste-origins in Sylhet' by Prof K. M. Gupta, Ph. D. (Lond) of M. C. College, Sylhet.

বিচিত্র নহে। সম্প্রতি কামরূপের অন্তর্গত ডিগারু নামক স্থানে পার্ব্বত্য-জাতীয় একজন মিকিরের নিকট নয়খানি তাম্রলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।(২) বহু বৎসরাবধি এই লিপিগুলি গৃহদেবতারূপে পূজিত হইয়া বিপদাপদ অসুখবিসুখের সময় এই মিকির পরিবারে শান্তি প্রদান করিতেছিল। কিন্তু এই মিকিরের পূর্ব্বপুরুষ এই ডিগারুতে কখনও ছিল না, আর এই লিপিগুলিও যে কি করিয়া তাহার পরিবারে আসিল সে বিষয়ে কোন কিম্বদন্তী নাই। নশ্বর জগতে ভূমির স্বত্ব চিরস্থায়ী করিবার প্রয়াসী অধিকাংশ তাম্রলিপিরই পরিণতি এইরূপ।

রাজার রাজধানী মধ্য-আসাম—দানপত্র লিখার স্থান উত্তরবঙ্গ এবং বর্ত্তমানে উহা পাওয়া গেল পূর্ব্ব-শ্রীহট্টে। নিধনপুর-লিপির পাঠোদ্ধারক পণ্ডিত বিদ্যাবিনোদ ও Early History of Kamrup প্রণেতা রায়বাহাদুর কনকলাল বড়ুয়া প্রমুখ মনীষীগণের মতে তাম্রশাসনোল্লিখিত ভূমিখণ্ড প্রাচীন কামরূপের পশ্চিমাঞ্চলে বর্ত্তমান উত্তরবঙ্গের সন্নিকটেই অবস্থিত ছিল।—কালচক্রে লিপিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণদের কোনও বংশধর অবস্থা বিপর্য্যয়েই হউক বা রাজনৈতিক বিপদ্‌পাতেই হউক বংশের স্মৃতি সঙ্গে লইয়া প্রাচীন ব্রাহ্মণাধ্যুষিত পঞ্চখণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মানের (Burmese) অত্যাচারে বিতাড়িত—কত কামরূপবাসী বর্ত্তমানেও করিমগঞ্জের সন্নিকটে ও কাছাড় জেলার কয়েক স্থানে বসতি করিয়া আছে; বঙ্গদেশের নানা স্থানেও ঐরূপ কামরূপীর নিদর্শন পাওয়া যায়। ডক্টর গুপ্ত এই সব যুক্তির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া স্বতঃসিদ্ধান্তভাবে ধরিয়া লইয়াছেন যে—"Find spot of a copper plate charter is almost invariably the locality of the grant made therein," এবং এই সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া তিনি শ্রীহট্টের কুশিয়ারা নদীকে কৌশিকী, চন্দ্রপুর গ্রামকে চন্দ্রপুরী, গাঙ্গবিলকে গাঙ্গনী এবং মউরাপুরকে ময়ূরশাল্মলাগ্রহার ক্ষেত্র ধরিয়া শ্রীহট্ট ভাস্করবর্ম্মার রাজ্যান্তর্গত ছিল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, নাথসিদ্ধা মৎস্যেন্দ্রনাথের সহিত তন্ত্রোক্ত চন্দ্রদ্বীপ ও কামাখ্যা—এই স্থানদ্বয়ের নাম সংশ্লিষ্ট থাকায় তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে—শ্রীহট্ট সহিত সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ ["Eastern Bengal includiug Sylhet belong to Kamrup"] কামরূপের অধীন ছিল। এই মূলভিত্তির উপরেই ডক্টর গুপ্তের প্রবন্ধ লিখিত।

আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণার বিচারে ডক্টর গুপ্তের এই সিদ্ধান্ত অবান্তর বলিয়া বিবেচিত হওয়াই সম্ভব, এই প্রবন্ধে সেই বিষয়ে আলোচনা করার স্থান নাই।

সে যাহা হউক, নিধনপুর তাম্রশাসনের দানপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণের নামগুলিতে একটা বিশেষত্ব আছে। নাম বলিতে আমরা আজকাল তিনটী অংশ বুঝি—প্রথম মূল নাম, দ্বিতীয় পাদান্ত, তৃতীয় পদবী। তাম্রলিপির ব্রাহ্মণগণের সকলের নামের পদবী স্বামী, পাদান্ত দাস, দেব, ঘোষ, সেন, দাম, পালিত, কুণ্ড, মিত্র, ভূতি প্রভৃতি। নিম্নে তাম্রলিপির দানপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণদিগের নামের একটি তালিকা দেওয়া হইল; সকল নামের অন্তেই স্বামী পদবী আছে:—[অধিকাংশের গোত্রের নামও সঙ্গে দেওয়া হইল।]

পাদান্ত-ঘোষ—বিষ্ণুঘোষ, বেদঘোষ, মনঘোষ, রুদ্রঘোষ
[কাত্যায়নী গোত্র]

„—দত্ত—অর্কদত্ত, তুষ্টিদত্ত, ঈশ্বরদত্ত, কর্কদত্ত, মেরুদত্ত,
[ভারদ্বাজ গোত্র]

„—দেব—দামদেব, ঘোষদেব, নন্দদেব, চক্রদেব, হর্ষদেব, জনার্দ্দনদেব, ভবদেব, সর্ব্বদেব, গোমিদেব, অর্কদেব
[যাস্ক ও ভারদ্বাজ]

„—দাম—ঋষিদাম, শুভদাম, শাশ্বতদাম [কাশ্যপ গোত্র]

„—সোম—ধ্রুবসোম, বিষ্ণুসোম, বকুলসোম, ধৃতিসোম, খণ্ডসোম [কৌণ্ডিন্য ও গৌতম]

„—নাগ—প্রবরনাগ, অপনাগ, তোষনাগ, হস্পিনাগ, হরিনাগ, দিবাকরনাগ, অদ্ভুতনাগ, স্বষ্টনাগ
[বারাহ ও কৃষ্ণাত্রেয় গোত্র]

„—সেন—মধুসেন, প্রমোদসেন, ঘোষসেন, ধনসেন, সোমসেন [গার্গ্য]

„—পালিত—বিষ্ণুপালিত, শুচিপালিত, মিত্রপালিত, অর্থপালিত [ভারদ্বাজ]

„—মিত্র—ভাস্করমিত্র, মধুমিত্র, সাধারণমিত্র, সাধুমিত্র, ধৃতিমিত্র [গৌতম]

(২) Vide—"Digaroo-plates" by R. M. Nath B. E.—in the Journal of the Assam Research Society, Vol IV—No 1, page 22, April 1936.

কুণ্ড—যজ্ঞকুণ্ড, যশঃকুণ্ড, শ্রদ্ধকুণ্ড, নারায়ণকুণ্ড, ঈশ্বরকুণ্ড [শৌনক]

বসু—সোমবসু, শ্রীবসু [প্রাচেতস]

ভূতি—শনৈশ্চরভূতি, যশোভূতি, নরেন্দ্রভূতি, রেণুভূতি, বীরভূতি, প্রমোদভূতি, বিষ্ণুভূতি, নন্দভূতি, [অগ্নিবেশ্য ও কৌশিক]

„—দাস—শ্রদ্ধদাস, পদ্মদাস, চন্দ্রদাস

„—ঈশ্বর—যাগেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, দিব্যেশ্বর, বুধেশ্বর, জাতেশ্বর, অঙ্গেশ্বর, ধৌতেশ্বর, জহ্নীশ্বর, নন্দেশ্বর [আলম্বায়ন]

„—ভট্টি—গতিভট্টি, তেজভট্টি, দামভট্টি, মেধভট্টি, রুদ্রভট্টি [শৌনক]

„—পাল—গায়ত্রীপাল, যজ্ঞপাল, গোপাল।

ইহা ছাড়া শুধু একপদী বহুনামও আছে—যথা—বপ্পস্বামী, অর্কস্বামী ইত্যাদি।

আধুনিককালে শ্রীহট্ট এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থ ও বৈদ্যগণের পদবী—ঘোষ, দত্ত, দেব, দাম, পালিত, পাল ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যাইতেছে কায়স্থ ও বৈদ্যের পদবীর অন্তে "স্বামী" যুক্ত করিয়াই সপ্তম শতাব্দীর ব্রাহ্মণের পদবী হইত—আর পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণদিগের নামের পদান্তই কায়স্থবৈদ্যদের পদবীরূপে পরিণত হইয়াছে। প্রথিতনামা ঐতিহাসিক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর বলেন যে গুজরাট অঞ্চলে নাগর ব্রাহ্মণদের মধ্যে অদ্যাপিও ঘোষ, বসু, দত্ত, মিত্র প্রভৃতি পদবী প্রচলিত আছে এবং বিশ্বকোষকারও বলেন যে কটক, মেদিনীপুর ও দাক্ষিণাত্যের কোনও কোনও বৈদিক ব্রাহ্মণদের মধ্যে অদ্যাপিও কর, ধর, রথ, নন্দী, দাস, পতি, ভদ্র প্রভৃতি পদবী ব্যবহৃত হয়।

এইরূপ ঘটনা হইতে ডক্টর ভাণ্ডারকর সিদ্ধান্ত করেন যে নাগর ব্রাহ্মণগণই কালক্রমে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ ও বৈদ্যজাতিরূপে পরিণত হইয়াছে। (৩) রায়বাহাদুর কনকলাল বড়ুয়া ইহা হইতে স্বতঃই প্রমাণিত করিতে চান যে মিথিলা হইতে আর্য্যসভ্যতা প্রথমে কামরূপে আসে এবং তথা হইতে আর্য্যগণ ক্রমশঃ দক্ষিণে গৌড়, গঙ্গার উত্তর ও দক্ষিণতীর এবং সমতটে বসতি বিস্তার করেন। (৪) ডক্টর গুপ্ত এই বিষয়ে আরও একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

নাগর ব্রাহ্মণদিগের আদি বাসস্থান পাঞ্জাব প্রদেশের সপাদলক্ষ পর্ব্বত (Sewalik Range) ; সেখান হইতে তাঁহারা ক্রমশঃ মিথিলায় আসিয়া বসতি স্থাপন করেন এবং কামরূপাধীশ্বর ভূতিবর্ম্মা এই মিথিলা হইতেই তাঁহাদিগকে আনয়ন করিয়া কামরূপ ও শ্রীহট্টে ভূমি প্রদান করিয়া বসতি স্থাপন করাইয়াছেন। শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণেরা নিজকে যে 'সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ' বলেন—উহা নাগর ব্রাহ্মণদের 'সপাদলক্ষে'র অপভ্রংশ মাত্র। এই নাগর ব্রাহ্মণরা অনুলোম বিবাহ করিতেন। অন্ত্যজজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান ব্রাহ্মণ হয় না, আবার মাতুল জাতিতেও পতিত হয় না। সুতরাং এই সন্তানগণ মধ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ কায়স্থ ও বৈদ্যজাতির সৃষ্টি করিয়াছে এবং পুত্রেরা পিতার পাদান্ত ঘোষ, মিত্র প্রভৃতি পদবীরূপে গ্রহণ করিয়াছে ; আর পিতৃগণ মানরক্ষার্থ ক্রমশঃ পূর্ব্ব পদবী ত্যাগ করিয়া "স্বামী" এবং তদর্থক ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া নিজের পার্থক্যটুকু বজায় রাখিয়াছেন। কিন্তু শ্রীহট্টের কোন কোন অতিকর্ম্মা অনুলোমী সন্তানগণ এই 'স্বামী' ও 'গোস্বামী' পদবীর উপরও দাবী করিতে ছাড়েন নাই ; ডক্টর গুপ্তের মতে সেইজন্যই ইদানীন্তনকালেও শ্রীহট্টের কোন কোন কায়স্থ ও বৈদ্যদের মধ্যে 'স্বামী' ও 'গোস্বামী' পদবী ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া সম্ভবত নাগর ব্রাহ্মণদের শিষ্যগণও নাকি গুরুর পদবী গ্রহণ করিয়া নিজকে কৃতার্থ বোধ করিতেন। ভাণ্ডারকর বলেন, পঞ্চদশ শতাব্দীতে শ্রীহট্টের একজন ব্রাহ্মণের পদবী নাকি 'নাগর' ছিল। (৫)

বড়ই আক্ষেপের কথা—গুরুশিষ্যের কথা উল্লেখ করিতেও ডক্টর গুপ্ত বোধহয় লক্ষ্য করেন নাই যে—বর্ত্তমান যুগে শ্রীহট্ট ও বঙ্গদেশে কায়স্থ ও বৈদ্যদের মধ্যে যে 'স্বামী' বা 'গোস্বামী' পদবীর ব্যবহার আছে উহা ভূতিবর্ম্মার নাগরদের দান নহে, উহা বৃন্দাবনের রসিক-নাগর শ্রীকৃষ্ণের দাস প্রভু চৈতন্যের অনুগ্রহ ; আর পঞ্চদশ শতাব্দীতেও শ্রীহট্টের ঈশান 'দাস' (জাতি মাহিষ্য ?) ঐ একই রসিকনাগরের অনুগ্রহে "ঈশান নাগর" নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। (৬)

(৩) Indian Antiquary, March 1932, p 52.
(৪) Early History of Kamrup page 93.

(৫) Indian Historical Quarterly, 1930, p 60.
(৬) "ওরে ঈশানদাস তোরে করি বড় স্নেহ।
মোর তুষ্টি হয় তুঞি করিলে বিবাহ॥"
—ঈশান নাগর কৃত অদ্বৈত-প্রকাশ

পুরাতত্ত্ববিৎ মনীষীগণের যুক্তি অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কেননা তাঁহাদের মূলভিত্তি প্রাচীন তাম্রশাসনের বিবরণের সহিত বর্ত্তমান অবস্থার সামঞ্জস্য; কিন্তু তথাপি একটী প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। ভূতিবর্ম্মা বা ভাস্কর-বর্ম্মার অনুগৃহীত নাগর ব্রাহ্মণগণ অনুলোম বিবাহ দ্বারা যে কুমারীগণকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন, তাহাদের পিতৃ-পিতামহের পদবী কি ছিল? নিশ্চয়ই এতদ্দেশে তখনও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং পার্ব্বত্য জাতীয় লোক বর্ত্তমান ছিল এবং যদিই অনুলোম বিবাহ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধ হইয়াছিল, তাহা হইলে নাগর ব্রাহ্মণ সন্তানগণ ঐ সমস্ত জাতির মধ্য হইতেই নিজ সঙ্গিনী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শ্বশুর পক্ষের কোনও পদবী তখন ছিল কি?

এই অনুসন্ধানে আমরা প্রাচীন তাম্রশাসন ও প্রস্তরলিপির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের নানা স্থানের প্রাচীন ব্যক্তিগণের নাম সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিব এবং সঙ্গে সঙ্গে বেদ, পুরাণ ও প্রাচীন কাব্যেরও সাহায্য গ্রহণ করিব।—

(১) চতুর্থ খৃষ্টাব্দে মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের প্রয়াগস্তম্ভে আর্য্যাবর্ত্তের নৃপতিগণের নাম—রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্ম্মা, গণপতিনাগ, নাগসেন, অচ্যুতানন্দ, বলবর্ম্মা।

(২) ৪৮২ খৃষ্টাব্দে গুপ্তরাজ হস্তিনের তাম্রশাসনে ভূমিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণের নাম—দেবস্বামী, সর্ব্বস্বামী, বপ্পস্বামী, কুমারদেব, বিষ্ণুদেব, দেবনাগ, কুমারসেন, দেবমিত্র, মাতৃশর্ম্মা, অগ্নিশর্ম্মা।

(৩) ৫১২ খৃষ্টাব্দে গুপ্তনৃপতি মহারাজ সর্ব্বনাথের তাম্রশাসনে ভূমিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণের নাম—বিষ্ণুনন্দি, স্বামিনাগ পুত্র বণিজ শক্তিনাগ, কুমারনাগ, স্কন্দনাগ।

(৪) ৮ম খৃষ্টাব্দে রাজগৃহনিবাসী ব্রাহ্মণ হিমমিত্র স্বীয় পুত্র বিশ্বরূপের সহিত শোণনদতীরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ বিষ্ণুমিত্রের কন্যা উভয়ভারতীর বিবাহ দেন। (মাধবাচার্য্যকৃত শঙ্করবিজয়—৩য় অধ্যায়)

এই যুগেই কামরূপে কুমারিল ভট্ট ও অভিনব গুপ্ত নামে দুই বিখ্যাত ব্রাহ্মণের নাম শুনিতে পাওয়া যায়।

(৫) ৯ম খৃষ্টাব্দে কামরূপাধিপতি বলবর্ম্মা প্রদত্ত তাম্রশাসনে উল্লিখিত ব্রাহ্মণগণের নাম—মালাধর, দেবধর, শ্রুতিধর।

(৬) ১০ম ও ১১শ খৃষ্টাব্দে কামরূপাধিপতি রত্নপাল ও ইন্দ্রপাল কর্ত্তৃক প্রদত্ত ভূমিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণ—দেবদত্ত, বীরদত্ত; বাসুদেব, কামদেব; হরিপাল, শবরপাল।

আরও প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের নামও পাদান্তের নিদর্শন খৃঃ পূঃ ১ম ও ২য় শতাব্দীর কঙ্কালিটিকার প্রস্তরলিপি, মথুরার প্রস্তরলিপি ও সাঁচীস্তূপের খোদিত লিপিতেও পাওয়া যায়।—বজ্রনন্দি, রোষনন্দি (সৌবর্ণিক); ধামঘোষ, ভদ্রঘোষ; শিবযশঃ, ফল্গুযশঃ (নর্ত্তক); বাচক সিংহ, বণিক সিংহ; নবহস্তী, বরণহস্তী; গ্রহসেন, শিবসেন; সঙ্ঘরক্ষিত, দিশারক্ষিত; উপেন্দ্রদত্ত, হিমদত্ত; বুদ্ধমিত্র, অহিমিত্র; শুয্যল বিশ্বসিক, বকমিহির বিশ্বসিক; ইন্দ্রপাল, যশঃপাল; বুদ্ধদাস, জয়দাস; অগ্নিদেব, অশ্বদেব; যজ্ঞসোম, ব্রহ্মসোম (ভিক্ষু); ধর্ম্মগুপ্ত, অর্হদগুপ্ত; ঘৃতকুণ্ড। (৭)

সৌবর্ণিক—রোষনন্দির পুত্র নন্দীঘোষ; নবহস্তীর কন্যা গ্রহসেনের পুত্রবধূর সন্তানগণ শিবসেন, দেবসেন, শিবদেব। উপেন্দ্রদত্তের স্ত্রী বায়ুদত্তা, ভগিনী হিমদত্তা। যজ্ঞসোমের স্ত্রী সোমদত্তা, পুত্র ব্রহ্মস্বামী।

মৃচ্ছকটিক প্রকরণে ব্রাহ্মণ চারুদত্তের পুত্র রোহসেন।

ক্ষত্রিয়—কাশীরাজ জয়ৎসেন অশ্বরক্ষকের স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করেন; গুজরাটের কোট্টরাজ আভীর শ্রেষ্ঠী বসুমিত্রের স্ত্রীর প্রতি আসক্ত ছিলেন। (বাৎস্যায়নের কামসূত্র) শাল্বরাজ দ্যুমৎসেন; ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা; শিশুপালের পিতা দমঘোষ; ঋগ্বেদের রাজা—দিবোদাস। মহাভারতের যুগে—সহদেব, বসুদেব, ভগদত্ত, বৃহদ্রথ, জয়দ্রথ; কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন। পরবর্ত্তীকালে—হর্ষবর্দ্ধন, যশোবর্দ্ধন; বিক্রমাদিত্য, শিলাদিত্য; বলভদ্র, উগ্রসেন, চক্রদত্ত।

গন্ধর্ব্বরাজ—বিশ্বাবসু, অর্ব্বাবসু, পরাবসু।

মহর্ষি—মন্দপাল, বামদেব, শুকদেব, বিশ্বামিত্র; সন্ন্যাসী উপগুপ্ত, ভিক্ষু ভদ্রঘোষ, সাধক নাগার্জ্জুন; ভিক্ষু ব্রহ্মসোম, শিলভদ্র।

(৭) এই সব পাদান্তযুক্ত নামের উল্লেখযুক্ত প্রস্তরলিপির বিবরণ নিম্নলিখিত গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। Epigraphica Indica—Vol I no 35, Vol II, no 5, 9, 18, 29, 32, 34, 37, 35, 138, 127, 145, 155, 156, 153, 160, 162, 165; Vol X, no, 17 13, 19, Vol VI no 8; J. A. S. B. Vol 39, part I, page 128; Indian Antiquary Vol 21, page 246.

আধুনিককালে—কামরূপে—মিলাদেব গোস্বামী, মিত্রদেব মোহন্ত, ভোগদত্ত হাজারিকা ; বঙ্গদেশে—দুর্গাদাস লাহিড়ী ; সত্যদাস গোস্বামী (বৈদ্য)।

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে অতিপ্রাচীন কাল হইতেই ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সকলের নামের সহিত ঘোষ, মিত্র, সেন প্রভৃতি নামের পাদান্ত বা ছন্দরূপে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইত। প্রাচীনকালে কোনও পদবী ব্যবহৃত হইত না ; আজকালও পাঞ্জাব অঞ্চলে শুধু নামই আছে, যথা—দেবীদয়াল, রমেশচন্দ্র, মোহনলাল, কিশনচাঁদ।

নিধনপুর তাম্রশাসনের নামের তালিকায় দেখা যায় যে প্রায় একই গোত্রীয় সম্ভবতঃ একই পরিবারের লোকদের নামের ছন্দ বা পাদান্ত একপ্রকার। নামের কোনও বিশেষ পাদান্তের প্রতি পরিবার বিশেষের আসক্তির নিদর্শন আজকালও দেখা যায়। বঙ্গের কোনও প্রথিতনামা মনীষীর সকল পুত্রেরই নামের পাদান্ত "তোষ"; পুত্রও অনেকগুলি ছিলেন, সেইজন্য কোনও সংবাদপত্রের রসিক সম্পাদক লিখিয়াছিলেন,—অভিধান মতে "তোষ" যুক্ত সমস্ত নামই ত শেষ হইল, এখন আর একটী সন্তান হইলে নাম "তক্তপোষ" রাখিতে হইবে। অপর একজন খ্যাতনামা ব্যক্তির সকল পুত্রেরই নামের পাদান্ত "প্রসাদ"; অপর আর এক পরিবারে দেখা যায—পিতামহের সময় প্রিয় ছিল "ঈশ্বর", পিতার দিনে ছিল "মোহন", আর বর্ত্তমান কালে দুই পুরুষ যাবৎ "রঞ্জন"ই চলিতেছে। কবিগুরুর পরিবারে কয়েক পুরুষ ধরিয়াই "নাথ"-প্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আসাম প্রবাসী একজন বাঙ্গালী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর পরিবারে সকলেরই নামের পূর্ব্বপদ "রাম" হওয়া চাই :—রামকৃষ্ণ, রামচরণ, রামসিন্ধু, রামজীবন—ভাবী বংশধরগণের নামকরণে যাহাতে বেগ পাইতে না হয়, সেইজন্য তাঁহার ৺পিতৃদেব 'রাম'যুক্ত নামের একখানি দীর্ঘ তালিকাও লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন।—কিন্তু পরিবার বড় হইয়া পড়িল—কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ করিতে তিনি বিপদেই পড়িলেন ; অতঃপর শান্তিনিকেতনে রবিঠাকুরের আশ্রয় নিয়া পুত্রের "রাম-রোচন" নামকরণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। খ্যাতনামা এক অসমীয়া পরিবারে আজ চার পুরুষ ধরিয়া "লাল" পাদান্ত চলিতেছে।

প্রাচীনকালে বঙ্গদেশ, শ্রীহট্ট ও কামরূপে জাতিবিভাগ ছিল কি না—সেই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার স্থান এই প্রবন্ধ নহে। ডক্টর গুপ্ত বলেন, খৃঃ ৫০০ হইতে ১১০০ অব্দ পর্য্যন্ত শ্রীহট্ট তথা কামরূপ (অবশ্য তাঁহারই মতে নোয়াখালি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কসবা প্রভৃতি) অঞ্চলে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থদের মধ্যে জাতিগত কোনও পার্থক্য ছিল না—যদিও ব্যবসাগত একটা সীমারেখা ছিল। (৭ক) গৃহ্যসূত্রগুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও চতুর্থ খৃষ্টাব্দে রচিত বাৎস্যায়নের কামসূত্রে (৮) জাতি না হউক, কর্ম্মবিভাগানুসারেও এক দীর্ঘ তালিকা দেখিতে পাই :—

সুবর্ণকার মণিকার বৈকটিকনীলীকুসুম্ভরঞ্জক-রঞ্জক নাপিত মালাকার গন্ধিক সৌবিক (শুঁড়ি) গোপাল-তাম্বুলিক বৈদ্য মহামাত্র—প্রভৃতি।

যখন ব্যবসায়ের মধ্যে এইরূপভাবে এতটা শ্রেণী বিভাগ হইতেছিল, তখনই বোধ হয় ব্রাহ্মণরা নিজেদের পবিত্র ব্যবসায়ের পার্থক্য নির্দ্দেশের জন্য নামের সহিত—স্বামী, আচার্য্য ও পণ্ডিত যোগ করিয়াছিলেন ; কেহ কেহ হয়ত কিছুই করেন নাই—নাম যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গেল। বঙ্গদেশ কাব্য ও সৌন্দর্য্যের দেশ ; ব্রাহ্মণদের অনুকরণে ব্রাহ্মণেতর জাতিরাও স্বীয় পরিবারের প্রিয় ও পরিচায়ক পাদান্তটী নামের অন্তে রাখিয়া মধ্যে সৌন্দর্য্য-বোধক রাম, চন্দ্র, মোহন, কুমার প্রভৃতি একটি ছন্দ যোগ করিতে লাগিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে কোনও পার্থক্য পছন্দ করেন নাই—এখন তাহাদের নামের পাদান্ত শর্ম্মা, ভট্টি বা ভট্ট, ঘোষ, পালিত প্রভৃতি পদবীরূপে পরিণত হইল। কাশ্মীর ও পাঞ্জাব অঞ্চলে ব্রাহ্মণেরা 'পণ্ডিত' শব্দযোগে নিজের পার্থক্য বুঝাইতেছেন।

এরূপ পরিবর্ত্তন অল্পদিনের মধ্যে হয় নাই। সূত্রপাত মনুসংহিতার দিনে। (৯) মনুসংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায় ৩২

(৭ক) স্কন্দপুরাণের মতে নাগর ব্রাহ্মণদের গোত্র—গোভিল, বৌধায়ন, বাশিষ্ট প্রভৃতি।

(৮) "The conclusion is inevitable that the Kamasutra was composed about the middle of the 3rd century A. D.—Prof H. C. Chakladar's Social life in Ancient India—Page 33.

(৯) Vincent Smithএর মতে মনুসংহিতার রচনা কাল খৃঃ পূঃ ২০০ হইতে খৃঃ অঃ ২০০ মধ্যে।

শ্লোকে ও বিষ্ণুপুরাণে এই বিষয়ে একটু ইঙ্গিত পাওয়া যায় :—

"শর্ম্মবদ্‌ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্রাজ্ঞঃ রক্ষা সমন্বিতম্‌।
বৈশ্যস্য পুষ্টি সংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্যসংযুতম্‌॥"—মনু
"শর্ম্মবদ্‌ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মেতি ক্ষত্রসংযুতম্‌।
গুপ্তদাসাত্মকম্‌ নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥"—বিষ্ণু

তারপর ধীরে ধীরে বিষয়টা বর্ত্তমানের পরিণতি লাভ করিল—বোধ হয় আরও অনেক পরে। তাই যামল সংহিতায় দেখিতে পাই—

"শর্ম্মাদেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মাত্রাতা চ ভূভুজঃ।
ভূতিদত্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ॥"

আমরা দেখিতে পাইতেছি—প্রাচীনকালের গুপ্তনৃপতি বা একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কামরূপাধিপতিগণ হইতে ভূমি-প্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণের পদবী ভাস্করবর্ম্মার ব্রাহ্মণগণের পদবীর অনুরূপ। সকল ব্রাহ্মণই নাগর ব্রাহ্মণ ছিলেন না, অথবা কঙ্কালিটিলা, মথুরা বা সাঁচীস্তূপে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ সকলেই পতিত নাগর ব্রাহ্মণ বা তাহাদের অনুলোম বিবাহের সন্তানও ছিলেন না।

মোট কথা ঘোষ, নন্দি, বসু, মিত্র প্রভৃতি প্রথমে নামের পাদান্তরূপে ব্যবহৃত হইত ও পরে পদবীরূপে পরিণত হইয়াছে এবং এইগুলি ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ কাহারও এক-চেটিয়া সম্পত্তি ছিল না এবং এখনও থাকিবার কোনও কারণ নাই। নামের ছন্দ বা পাদান্ত যে ক্রমশঃ পদবীরূপে পরিণত হয়, তাহার প্রমাণ আধুনিক কালেও দেখিতেছি। চন্দ্র, কুমার ও প্রসাদ ইতিমধ্যেই পদবীরূপে দাঁড়াইয়াছে; যথা—কালীপ্রসন্ন চন্দ্র, বিষ্ণুপদ কুমার, উমাশঙ্কর প্রসাদ। আবার আদিত্য (গোপেশচন্দ্র আদিত্য), অর্জ্জুন (গোপেন্দ্রকিশোর অর্জ্জুন বি, এ), বর্দ্ধন (তারাকিশোর বর্দ্ধন) তারণ (মহিমচন্দ্র তারণ), ভদ্র (সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র), শ্যাম (কৃষ্ণসুন্দর শ্যাম) লালা (রবীন্দ্রনারায়ণ লালা), পতি (দ্বিজেন্দ্রলাল পতি) প্রভৃতি পদবী শ্রীহট্ট ও পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত আছে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই যে "তোষ", "রঞ্জন", "মোহন" ও "ঈশ্বর" পদবীরূপে ব্যবহৃত হইবে না—এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না।

স্কন্দপুরাণ নাগর-কাণ্ডে—সর্ব্বপ্রথম নাগর ব্রাহ্মণদের উল্লেখ পাই। ইন্দ্র হিমালয়ের পুত্র রক্তশৃঙ্গ পর্ব্বত দ্বারা পাতালে হাটকেশ্বর শিবমন্দিরে যাইবার গহ্বর পথ বন্ধ করিয়া দেন এবং ঐ পর্ব্বতের উপর "চমৎকার" নামক এক রাজা "চমৎকারপুর" নামক রাজ্য স্থাপন করিয়া সেখানে বেদবেদাঙ্গপারগ বহু ব্রাহ্মণের বসতি স্থাপন করান। কাল-ক্রমে সেই স্থানে সর্পের উপদ্রব হওয়াতে বহু ব্রাহ্মণ সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন; কতক পলায়ন করেন এবং অবশিষ্ট কয়েকজন অনন্যোপায় হইয়া শিবভক্ত "ত্রিজাতক" নামক তপস্বী ব্রাহ্মণের পরামর্শে 'ন-গর" [গর = বিষ; নগর = বিষ নাই] এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সর্পের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পান। সেই সময় হইতেই চমৎকারপুরের নাম হইল—'নগর' এবং তৎস্থানবাসী ব্রাহ্মণেরা "নাগর ব্রাহ্মণ" নামে খ্যাত হইলেন। (স্কন্দপুরাণ ৯ম অধ্যায় ৪১।৪২; ১১৬শ অধ্যায় ৭৬-৭৯]

বাৎস্যায়নের কামসূত্রে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ দেশে "নগর-ব্রাহ্মণ"গণ পুষ্পপ্রদানচ্ছলে রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অনেক অনভীপ্সিত কর্ম্ম করিতেন।

ঐতিহাসিকগণের মতে স্কন্দপুরাণ নিতান্ত আধুনিক—কেহ কেহ মনে করেন ইহার রচনাকাল নবম শতাব্দীর পূর্ব্বে নয়। এই পুরাণে উল্লিখিত মৎস্যেন্দ্রনাথকে পণ্ডিতগণ ১০ম খৃষ্টাব্দের লোক বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। (১০) সুতরাং এই স্কন্দপুরাণেই উল্লিখিত নাগর ব্রাহ্মণগণকে কি করিয়া পঞ্চম শতাব্দীতে স্থান দেওয়া যায় বুঝিতেছি না।

সে যাহা হউক, স্কন্দপুরাণে নাগর-ব্রাহ্মণদের ৬২টী গোত্রের নাম আছে। নিধনপুর তাম্রশাসনে ব্রাহ্মণদের ৪১টী গোত্রের নাম আছে; তন্মধ্যে মাত্র ২৫টী স্কন্দপুরাণের তালিকার সহিত মিলে, বাকী ষোলটার নাম স্কন্দপুরাণে নাই। এই ষোল গোত্রীয় ব্রাহ্মণরা তাহা হইলে নাগর ব্রাহ্মণ নন ইহা নিশ্চিত—যদিও তাহাদের নামের সহিত যথাবৎ ঘোষ, মিত্র, নাগ প্রভৃতি পাদান্ত যুক্ত রহিয়াছে।(১১)

(১০) অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত "কৌলজ্ঞান নির্ণয়"—ভূমিকা ১৬ ও ৩২ পৃষ্ঠা।

(১১) ষোল গোত্রের নাম—প্রাচেতস, যাস্ক, গৌর ত্রেয়, আল্লায়ন, বারাহ, বৈষ্ণবৃদ্ধি, কৌটিল্য, কবেস্তর, অগ্নিবেশ্য, জাতূকর্ণ, পৌত্রিমাষ্য, পৌর্ণ, সাবর্ণিক, শালঙ্কায়ন, পাস্কল্য, শাকটায়ন।

শুধু নামের পাদান্ত বা পদবী ধরিয়া জাতি বা পিতৃপুরুষের বংশের মূলানুসন্ধান সকল সময় বোধ হয় খুব যুক্তিযুক্ত হয় না। মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গীনাথ প্রভৃতি 'নাথ' পাদান্তযুক্ত সিদ্ধাগণ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। বিগত শতাব্দীতেও 'নাথ' পাদান্তযুক্ত—পরন্তু "ঠাকুর" পদবীযুক্ত একজন সিদ্ধপুরুষ বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিবারে বর্ত্তমানে 'নাথ' পাদান্তযুক্ত ও "ঠাকুর" পদবীযুক্ত আরও কয়েকজন খ্যাতনামা পুরুষ বিদ্যমান আছেন; এদিকে আবার বঙ্গদেশ ও শ্রীহট্টে "নাথ" পদবীযুক্ত অসংখ্য লোকের বাস। ডক্টর গুপ্তের যুক্তিমত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারের সহিত মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ তথা শ্রীহট্ট ও বঙ্গদেশীয় 'নাথদের' কোনওরূপ ঐতিহাসিক সম্বন্ধের পরিকল্পনা করিতে গেলে ইহার মূলে যে কোনও সত্য থাকিবে না—একথা বোধ হয় না বলিলেও চলে।

প্রয়াগে গঙ্গাস্নান

শ্রীমোহিনীমোহন রায়

আমার সহধর্ম্মিণী, না পত্নী—কারণ উভয়ের ধর্ম্ম মতের কিঞ্চিৎ বিরোধ আছে এবং অনেক তর্ক-বিতর্কও ওই মহাপুরাতন জটীল বিষয় লইয়া হইয়া গিয়াছে; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোনও শেষ মীমাংসা হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হ'বার আশাও বড় অল্প—অতএব পত্নী বলাই শ্রেয়। তিনি বহুদিন হইতে আমাকে একটা উপরোধ ক'রে আস্‌ছেন যে আমি কোনও একটা গল্প লিখি এবং কোনও মাসিক-পত্রিকায় তাহা ছাপাই এবং তিনি ছাপার অক্ষরে আমার গল্পটা পড়েন। আমি বহুবার তাঁকে বলিয়াছি—দেখ গো আমার অত পয়সা নাই; গিন্নি বহুবার আমার ওজর শুনিয়া একদিন একটু কোপের ভণিতা করিয়া বলিলেন—দেখ, মিছে ওজর ক'রোনা—এতে এত বেশী পয়সার কি দরকার—দু পয়সার ফুলস্কেপ কাগজে বেশ বড় গল্প লেখা যায়; তোমার যদি এই দুটো পয়সা আমার জন্য বাজে খরচ ব'লে মনে হয় আমি বাজার খরচ থেকে তোমায় দেবোখন। কিন্তু আমার আসল বিপদ তো আর গিন্নি বোঝেন না যে আমার লেখা গল্প ছাপাইতে হইলে আমায় একখানি নিজের মাসিক পত্রিকা বাহির করিতে হইবে—অপর কেহ ছাপাইবে না। গিন্নির আমার পাণ্ডিত্য এবং গল্প লেখার ক্ষমতায় যতই কেন আস্থা থাক না, আমি নিজে তো আমার কিম্মত জানি। একদিন অনেক অনুরোধের পর মনের দুঃখে বলিয়া ফেলিলাম—দেখ গিন্নি, আমার বড়ই বানান ভুল হয় এবং আমার ভাষাটাও বহুকাল বিহারে বাস করার দরুণ একটু হিন্দি ছাচের বাংলা হ'য়ে প'ড়েছে। গিন্নি একগাল স্বস্তির হাসি হেসে বল্লেন—ও হরি!! তুমি এই ভয়ে পেচুচ্চ? তুমি বুঝি আজকাল চোক্ বুজে পড়? আমি বল্লাম যে, ও রকমটাও হয় নাকি? গিন্নি কৃত্রিম কোপ সহকারে বল্লেন—তা না তো আর কি! চেয়ে পড়লে কি আর এ-কথা ব'লতে। আমি বল্লাম কেন? গিন্নি বল্লেন—বানান বিভীষিকা ব্যাকরণ বিভীষিকা ও-সব আর কিছুই নাই, আর হাতের লেখা একটু ধরে ধরে লিখো—আর নেহাৎ না পার আমাকে দিও আমি লিখে দেবোখন। গিন্নি উৎসাহ দিয়ে বল্লেন, তুমি লিখেই দেখ না; আমার বোধ হয় ঠিক ছাপবে। গিন্নির এই কথায় আমি যেন একটু উৎসাহিতও বোধ ক'রলাম। গিন্নি আমায় আর একটা বিষয়ে একটু সতর্কও করে দিলেন, দেখ তুমি যে রকম কাচা খোলা লোক, কোনও বে-ফাঁস কথা যেন লিখ না—গল্পটা যেন বেশ সুরুচি-সম্পন্ন হয়; আমি বল্লাম সে আর ব'লতে—আমি খুব সতর্ক থাকব। এইবার আসল বিপদ, গল্প পাই কোথা—কাকে উপলক্ষ ক'রেই বা লিখি। যদি কোনও কল্পিত লোকের নাম দিয়া লিখি, আর যদি দুর্দ্দৈববশতঃ অতর্কিতে যদি কোনও বে-ফাঁস কথা লিখে ফেলি—যা গিন্নি পূর্ব্বাহ্নেই ভয় করে'ছেন, আর এও জানা আছে যে মানুষ অনেক সতর্কতা সত্ত্বেও অনেক বে-ফাঁস কাজ করে' ফেলে—আর যদি আমার গল্পের কল্পিত লোকের নাম কোনও আসল লোকের নামের সঙ্গে মিলে

যায় এবং যদি নেহাৎ দৈব দুর্ব্বিপাকে আমার গল্পের প্লটটা তাঁহার জীবনের কোনও ঘটনার সঙ্গে আংশিক ভাবেও মেলে—তবেই সেরেচে—সাংঘাতিক ব্যাপার, অনিবার্য্য defamation case এবং তার সঙ্গে একটা damage সুট। না বাবা, ও পথ মাড়িয়ে কাজ নাই। নিজের কথাই লেখা থাক—এক আধটা বে-ফাঁস কথা বেরিয়ে পড়লেও damage বা defamationএর ভয় তো নাই। সেই ভাল—নিজের কথাই লিখি। আমি একজন স্বনামধন্য উকিল, বছর পনের যাবৎ মতিহারিতে (বিহারের চাম্পারণ জেলার সদর Station) প্র্যাকটিস করচি; দিন কোনও রকম ক'রে চলে যাচ্চে; আমার নাম শ্রীমোহিনী-মোহন রায় (উপাধি বোস) বয়স বাহান্ন বৎসর উত্তীর্ণ হব হব; সংসারে গৃহিণী, দুই কন্যা—(বড়টী বিবাহিতা), পাঁচটি পুত্র। সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রের বয়স আট বৎসর এবং ইহার বড় আমার ছোট মেয়ে। আমার ছোট মেয়ে একটু বিশেষ রকম সঙ্গীতানুরাগিণী এবং আমার এক হাকিম বন্ধুর অনুগ্রহে মা সরস্বতীর কিছু কৃপা লাভ কোরেছে; একদিন আব্দার ক'রে ব'সল বাবা—চলনা Allahabad All India Music Conference দেখে আসি। গিন্নিও সুবিধে পেয়ে মেয়ের দিকে ভিড়ে গেলেন—বল্লেন চলই না—একটু আমাকেও পুণ্য করিয়ে নিয়ে এস, প্রয়াগে সঙ্গমে স্নান করে আসি। আমিও অনেক ওজর আপত্তি সত্বেও মা ও মেয়ের আগ্রহাতিশয্যে শেষে রাজি হইলাম। বলা বাহুল্য যে ছোট খোকাও সঙ্গে যাবে—যাক্‌, ভবতি চ ভাব্যম্‌ বিনা বিযত্নেন। যাত্রার যথাযোগ্য আয়োজন কোরে দুর্গা নাম জপ ক'রে আমরা অর্থাৎ আমি, আমার গৃহিণী, ছোট কন্যা এবং ছোট খোকা B & N. W. রেল কোম্পানীর কল্যাণে দশ ঘণ্টার রাস্তা একুশ ঘণ্টায় সেরে একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে এসে ওঠা গেল। এখানে এই ভদ্রলোকের বিষয় দু একটী কথা না বলিলে তাঁহার প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞতা ও অবিচার করা হ'বে। ভদ্রলোক আমার মতিহারিস্থ এক নিকট প্রতিবেশীর শ্বশুর, নামটী আর প্রকাশ করিলাম না—তিনি কুণ্ঠিত হ'তে পারেন। এলাহাবাদে বহুদিন যাবৎ বাস, সংসারটী ছোট—তিনি নিজে, তাঁহার গৃহিণী, একটী পুত্র বছর তেইশ বয়স, রেল সংক্রান্ত কোনও আপিসে চাক্‌রী ক'রে! তাঁদের আদর, যত্ন এবং অতিথি-বৎসলতায় আমাদের অষ্টাহব্যাপী এলাহাবাদ প্রবাস-জীবনের একটী নিবিড় সুখময় chapterএ পরিণত হ'য়েছিল—যা জীবনে ভুলতে পারবো না। ওই তিনজন যেন আমাদের সুখে রাখার জন্য পরস্পর competition লাগিয়ে দিয়েছিলেন—কিন্তু এ-রকম আড়ম্বরশূন্য ভাবে যে তাহা আমাদের বোধগম্যই হয় নাই। আমাদের মনে হ'ত যেন আমরা কতদিনের পরিচিত নিকট আত্মীয়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি ওই পরিবারটীর সুখের দিন দীর্ঘস্থায়ী করেন। Music Conference সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই বলিব না। প্রথম কারণ, সঙ্গীত সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করবার মত বিশেষজ্ঞ আমি নই—দ্বিতীয় কারণ, অনেক মাসিকপত্রে ওই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এইটুকু বলিলেই চলিবে যে ওস্তাদদের musical কস্‌রতে আমি খুব বিজ্ঞের মত মাথা নাড়তাম ও এক আধটা বে-ফাঁস মন্তব্যও প্রকাশ ক'রে ফেলতাম—যাহার ফল আমায় বিশেষ রকমে ভোগ ক'রতে হ'য়েছে। একদিন একজন ওস্তাদ একটী তিলক-কামোদ গান আলাপ ক'রছিলেন; আমার কি দুর্ব্বুদ্ধি হ'ল—আমার মেয়েকে অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, হারে সুধা, এটা আশাবরি নয়? মেয়ে আমার সঙ্গীত সম্বন্ধে সুগভীর জ্ঞানের পরিচয় রাখে, হেসে চুপি চুপি বল্লে—না বাবা এটা তিলক-কামোদ। আমার জিজ্ঞাসা করবার কি দরকার ছিল—আমি একবার উৎকণ্ঠিতনেত্রে পাশের চেয়ারের দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখলাম যে তাঁরা রাগিণীর আলাপের মাধুর্য্যে তন্ময়—আমি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলাম—যাক্‌, এ যাত্রা মানটা রক্ষে হ'যেছে, সাবধান! আর মুখটি খোলা নয়, ঠোঁট দুটি চেপে চুপে থাক—একান্ত না পার মাঝে মাঝে সিগারেট খাও। আর একটা বিপদ একদিন হ'য়েছিল। আমাদের পেছনের লাইনে ঠিক পিছনেই ইউ-পির এক ভদ্রলোক সস্ত্রীক ব'সতেন এবং বোধ হয় আমার ঘাড়নাড়ার বহর দেখে আমাকে একটা প্রকাণ্ড সঙ্গীতজ্ঞ ব'লে ঠাউরে রেখেছিলেন। সেই ভদ্রলোক একদিন হঠাৎ excited ভাবে আমাকে একটু গায়ে হাত দিয়ে আমার মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে—তখন একজন বাঙ্গালী artist গাইছিলেন—কে ঠিক মনে নাই—জিজ্ঞাসা করলেন—"কেঁও জনাব ইঅহ্‌ কৌন সি

গিণী গা রহে হাঁায়, জবান সে ওয়া-কিফ নেহি হোনে সে মেঁ নেহি আতা হ্যায়! আপ তো জরুর সমঝতে হ্যাঙ্গে?" এই সর্ব্বনাশ করলে—সেরেছে, মুহূর্ত্তের মধ্যে আমি ঘামিয়া উঠিলাম—উপস্থিত বুদ্ধি যোগাল, বল্লাম "জনাব এত্না দূর হম লোগ হাঁায়—কুছ ভি নেহি শুনাই আতা হ্যায়।" এর উপর আর কথা চলে না, ভদ্রলোক নিরস্ত হ'লেন—আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। সত্য কথা ব'লতে কি, আমার মত সুর-কানা লোক বোধ হয় আর দ্বিতীয় নাই—আমার কানে সব সুরই এক রকম ঠেকে। যাক্ Music Conference দেখে আমার কন্যা খুব খুসী হইল। গিন্নী এইবার বল্লেন—তোমাদের Conference এবার শেষ হ'ল তো, এইবার আমাদের সঙ্গমে স্নান করতে হ'বে। তার পরদিন আমাদের hostএর ছেলেটীকে guide করিয়া প্রাতে আমরা দু'খানি টাঙ্গা ভাড়া করিয়া ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং অনেক হজ্জাহজ্জি করিয়া এক টাকায় একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া যমুনার উপর দিয়া সঙ্গম অভিমুখে যাত্রা করিলাম। মনে করিয়াছিলাম এ সময়ে ভিড়ের কোনও সম্ভাবনা নাই—ধীরে-সুস্থে সঙ্গম স্নান সারা যাবে। ও হরি! সঙ্গমে পৌঁছে দেখি লোকে-লোকারণ্য। যাক্ উপায় কি—যখন এতটা এসেছি সঙ্গম স্নানটা তো কোনও রকম ক'রে সমাধা ক'রতে হ'বে। বৃদ্ধ বয়সে (স্থবির না হ'লেও semiতো বটেই) এই পুণ্য অর্জ্জনের সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। মাঝিরা বল্লে ডাঙ্গায় নৌকা ভেড়ান অসাধ্য—নৌকা থেকেই একেবারে জলে নেমে স্নান সারতে হ'বে—more easily said than done—কিন্তু উপায় কি—এছাড়া আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। দেখলাম—ব্যাপার দেখে গিন্নির মুখখানি শুকিয়ে আম্সীর আকার ধারণ ক'রেছে এবং অতি বিপন্ন দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে আছেন। এরকম critical momentএ আমি স্বামী হ'য়ে যদি পত্নীর পুণ্যার্জ্জনে সাহায্য না করি তো আমার পাপের বোঝা বেড়ে যাবে। অতএব যা থাকে কপালে ভেবে—গামছাখানা কোমরে জড়িয়ে অতি সন্তর্পণে নৌকা হইতে জলে নামিয়া পড়িলাম—জল এক বুক মাত্র—তবে টান্ বড় জোর। এইবার আমি সঙ্গমের পবিত্র জলে এক নিশ্বাসে তিন ডুব। আমার নির্ব্বিঘ্নে স্নান দেখে গিন্নি একটু ভরসা পেলেন এবং মুখের শুখ্নো ভাবটা একটু পরিবর্ত্তিত হ'ল। গা মুছিয়া এবং পুনরায় গামছা কোমরে জড়াইয়া ছোট খোকাকে স্নান করাইয়া নৌকায় তুলিয়া দিয়া গিন্নিকে বলিলাম এইবার এস; গিন্নিও প্রথমে আমার স্কন্ধে ভর করিয়া পরে আমার দেহের উপর দিয়া গড়াইয়া সঙ্গমের পবিত্র জলে দাঁড়াইলেন ও বাঁ হাতে প্রাণপণ শক্তিতে আমার বাম হস্ত ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে এক নিশ্বাসে তিন ডুব এবং পুনরায় নিশ্বাস লইয়া আরও তিনটি ডুব দিলেন—উদ্দেশ্য আমার পুণ্যের চেয়ে দ্বিগুণ পুণ্য অর্জ্জন করা—তারপর অল্পবিস্তর দান, দক্ষিণা, জলমিশ্রিত দুগ্ধ ঢালা ইত্যাদি important formalities সারিলেন। এইবার নৌকায় উঠিবার এবং কাপড় ছাড়িবার পালা। এইবার সমূহ বিপদ। নামবার সময় তো কোনও রকম করিয়া আমার হাতের এবং দেহের উপর দিয়া গড়াইয়া নামিয়া পড়িয়াছেন—নৌকার কিনারাটা তাঁর গলার কাছে, ভিজা কাপড়ে তাঁর পক্ষে জল থেকে লাফাইয়া নৌকায় ওঠা অসম্ভব! অতএব কোলে করিয়া তোলা ছাড়া উপায় কি—এখন সমস্যা কার কোলে ওঠেন। এইবার ওই ঠাণ্ডা জলে দাঁড়িয়ে এবং ছয়টি ডুব দিয়া স্নানের পরও তাঁহার কপালে ঘাম দেখা যাচ্ছিল। এক আমার কোল, না হয় তো মাঝির কোল—wise as she is—she chose mine অতি সঙ্কোচের সঙ্গে আমায় বল্লেন—তবে নাও কোন রকম ক'রে টেনে হিঁচড়ে তোল। অবশ্য অতি সঙ্কোচের সহিত আমার গলাটা বাঁ হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন—আমিও ততোধিক সঙ্কোচের সহিত দুহাত দিয়ে তাঁহাকে জড়িয়ে ধরে জল থেকে উৎক্ষিপ্ত ক'রে সন্তর্পণে নৌকায় স্থাপিত করলাম। পরে আমিও নৌকায় উঠিয়া কাপড় ছাড়িলাম ও নৌকার ছইয়ের মধ্যে গিয়া বসিয়া একটু নিশ্চিন্ত হইলাম। ভাবলাম বিপদটা একরকম মন্দ কাট্ল না—এই হাটের মাঝখানে—যাক্গে—আমার গিন্নিও ওই টল্টলায়মান নৌকার উপর কন্যার সাহায্যে কাঁপ্তে কাঁপ্তে মাথা ঠুক্তে ঠুক্তে কোনও রকম করিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন পর্ব্ব সমাধা করিলেন। মাতার স্নানের বিভ্রাট দেখিয়া কন্যা স্নান ক'রে পুণ্য সঞ্চয় ক'রতে flatly অস্বীকার ক'রলে। আমিও বল্লাম—বেশ বেশ, সেই ভাল—বলে একটু জল তার গায়ে মাথায় ছড়িয়ে দিলাম।' কাপড়টা

ছেড়ে গিন্নি মাত্র নৌকার ছইয়ের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন, এমন সময় একটী ঘটনা ঘটিল—তাহা যেমন আকস্মিক, তেমনি অভাবনীয়। জনকুড়িক পশ্চিমা-যাত্রী বোঝাই একখানি নৌকা আসিয়া আমাদের নৌকায় জোরে ধাক্কা দিল। ফলে আমাদের নৌকা এমনভাবে কাত হইল যে গিন্নি টলিয়া পড় পড় হইয়া আমার কন্যার মাথার উপর জোরে ভর দিলেন, কন্যাও—যদিও সে বিশেষ নিৰ্জ্জীব নয়—মায়ের এই অতর্কিত আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে পারিল না—গড়াইয়া গেল। ফলে গিন্নিও ভারচ্যুত হইয়া একেবারে আমার কোলে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন—আমিও কিংকৰ্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলাম—আমরা সকলেই তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। নিমেষের মধ্যে এই বিপর্য্যয় কাণ্ডটি ঘটিয়া গেল। যখন আমি সম্বিৎ পাইয়া প্রকৃতিস্থ হইলাম তখন দেখি যে গিন্নি নিশ্চিন্ত মনে আমার কোলে বসিয়া আছে; কন্যা সুধা গড়াইয়া খোকার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া আছে। খোকা দেওয়াল ঠেসিয়া বসিয়াছিল বলিয়া স্থানচ্যুত হয় নাই···আর আমাদের guide active young man কোনও রকম করিয়া টাল্ সাম্‌লাইয়া লইয়াছে—স্থানভ্রষ্ট হয় নাই। মাল্লার মধ্যে একজন নৌকার উপর একেবারে কিনারায় দাঁড়াইয়া কাপড় ছাড়িতেছিল—একেবারে complete summer-sault খাইয়া—একজন মোটা সোটা ভুঁড়িওয়ালা মাড়ওয়ারি—আমাদের নৌকার পাশে নিশ্চিন্ত মনে পুণ্য অর্জ্জন করিতেছিল—তাহার ঘাড়ের উপর পড়িয়া দুজনেই কিয়ৎক্ষণের জন্য জলের মধ্যে অদৃশ্য হইল। যখন দুজনে পরস্পরের নিবিড় আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইয়া জলের উপরে দেখা দিল—সে দৃশ্য বর্ণনা ক'রতে সাহস হয় না—মাল্লার সম্পূর্ণ বাবা-আদমের অবস্থা—কারণ সে বেচারা কাপড় ছাড়িবার উদ্দেশ্যে কাপড়ের গ্রন্থিগুলি মাত্র শিথিল ক'রেছিল এমন সময় ধাক্কা এবং summer-sault। দ্বিতীয় মাল্লাটা অতি ক্ষিপ্রতার সহিত তাহার পাগড়ীটা তাহার উলঙ্গ বন্ধুর গায়ে ফেলিয়া দিল। জ্ঞান রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়াই গিন্নি লজ্জায় মুখ লাল করিয়া কোল হইতে নামিয়া বসিলেন। সুধাকেও খোকা ঠেলিয়া তুলিয়া দিল। এইবার সেই মোটা মাড়ওয়ারী এবং অৰ্দ্ধনগ্ন মাল্লা—এই দুর্ঘটনার মূল কারণ পশ্চিমা-যাত্রী-বোঝাই নৌকার মাঝিকে পরস্পরের ভাষায় মধুর সম্ভাষণ করিতে করিতে মারিতে উদ্যত হইল। দেখিলাম এইবার ব্যাপারটা আশঙ্কাজনক ভাবের দিকে গড়াচ্ছে। অনেক চেঁচামেচি ও বকাবকির পর ঠাণ্ডা করা গেল। মাল্লার কাপড় ও গামছা দুই পাওয়া গেল, স্রোতে ভাসিয়া নিকটস্থ এক স্নানার্থীর পায়ে জড়াইয়া গিয়াছিল। যাক্ সঙ্গম স্নানটা কোন রকম করিয়া সারা গেল। ফেরত রাস্তাটা গিন্নি আর আমার দিকে মুখ তুলে চাইতে পারেন নি। আমি মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে তাঁর মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়াছিলাম; তাঁহার মুখ মাঝে মাঝে লাল হইয়া উঠিতেছিল—হবেই তো—হাটের মাঝখানে ছেলেমেয়ের সাম্‌নে কি ঘেন্না—but under totally uncontrolable circumstances। এখনও মাঝে মাঝে একান্তে গিন্নিকে জিজ্ঞাসা করি—যে আর একবার প্রয়াগে স্নান ক'রতে যাবে না—মুখখানা লাল হ'য়ে ওঠে বটে, কিন্তু পরক্ষণেই হেসে বলে—বেশতো চল না—কি সাংঘাতিক ধর্ম্মানুরাগ ও পুণ্যার্জ্জন স্পৃহা।

আমি জানি আমার গল্পের merit কিছুই নাই, তবে যে মাসিক-পত্রিকার উদ্দেশে ও আশায় এ গল্পটী লেখা তাহার সম্পাদক মহাশয় বয়সে প্রাচীন ও বড় দয়ার শরীর এবং বড়ই ধৰ্ম্মভীরু—কোনও পতিপ্রাণা সাধ্বী স্ত্রীর অভিসম্পাতের ভয় তাঁর নিশ্চয়ই আছে। সম্পাদক মহাশয়ের ধৰ্ম্মজ্ঞানই আমায় এ গল্পটী ছাপানর সম্বন্ধে একমাত্র আশা। আমার উদ্দেশ্য পূর্ব্বেই বলেছি।

অলমতি বিস্তরেণ।



বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

(আলোচনা)

ব্রহ্মপ্রবাসী

...অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ব্রহ্মদেশে এসেছিলেন। জানিনে তিনি ...বৎসর এদেশে ছিলেন ; তবে তাঁর লেখাগুলি দেখ্‌লে মনে হয় ...নি যে কয়দিন ছিলেন তারই মধ্যে এ দেশবাসীর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ...য় পড়েছিলেন ; তাদের ভাল দিক্‌গুলো অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা উপভোগ ...রেছিলেন। সচরাচর এদেশে যে সব ভারতবাসী আসেন—তাঁরা ...ধিকাংশ সময় এসে থাকেন অন্নসংস্থানের চেষ্টায়। এ দেশের লোকের ভাল দিকগুলো হয়ত সব সময়ে তাঁরা দেখ্‌তে পান না। বিশেষতঃ বেশী দিন থাক্‌তে থাক্‌তে এদের জীবনের ভাল মন্দ দুই দিক দেখে দেখে তাঁরা এত অভ্যস্ত হয়ে যান যে তার মধ্য থেকে নিছক ভাল গুণগুলো বেছে নেওয়া শক্ত হয়ে পড়ে। অজিতকুমার এ দেশবাসীর ভাল গুণগুলি "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" প্রবন্ধে (কার্ত্তিক ১৩৪৩ এর ভারতবর্ষে) লিপিবদ্ধ করে এ দেশবাসীর বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

এই সূত্রে তিনি ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতবাসীর প্রতি ঔদার্য্য ও সহানুভূতি প্রকাশে বিশেষ কার্পণ্য করেছেন। যদি কোন দিন কোন অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিত এদেশে এসে ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয় ও ব্রহ্মবাসীদিগের অর্থনৈতিক জীবনের অনুসন্ধান করেন তাহলে তিনি হয় ত এই সমস্যার যথার্থ মীমাংসা কিছু করতে পারবেন। ভারতবাসী এদেশে বিদেশীর ন্যায় "শাসন ও শোষণ-নীতি" অবলম্বন করে 'ইংরেজ-প্রভু' হয়ে রয়েছেন—অজিতকুমারের এই উক্তি যথাযথ যুক্তিদ্বারা সমর্থন-সাপেক্ষ—কেবল মন্তব্য প্রকাশই যথেষ্ট নয়

ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙ্গালীদের সম্বন্ধেও অনুযোগ করেছেন যে তাঁরা ব্রহ্মবাসীদের সাথে মেশেন না এবং এই দেখে তিনি দুঃখিত হয়েছেন। কিন্তু অজিতবাবু যে লিখেছেন 'তারা (ব্রহ্মবাসীরা) আমাদের সাথে মিশ্‌তে চায় কিন্তু অনেক কালা বাঙ্গালী কতকগুলি উদ্ভট কথা বলে তাদের নিকট হতে দূরে সরে থাকার ভাণ দেখান (৭৬৯ পৃঃ শেষ পংক্তিত্রয়) এ মন্তব্যের সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না এবং মনে হয় ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙ্গালীরা এতে দ্বিমত হবেন না। "ব্রহ্মবাসীরা আমাদের সাথে মিশ্‌তে চায়" এর পরিচয় আমি আমার প্রায় পনর বৎসর কাল ব্রহ্মপ্রবাসে কিছুই পাইনি, যদিও অধিকাংশ সময় আমি রেঙ্গুনের বাইরে কাটিয়েছি। রেঙ্গুনেও যাঁরা ২৫।৩০ বৎসর বাস করেছেন তাঁদেরও কোন ব্রহ্ম পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হতে দেখিনি। রেঙ্গুনের বাইরেও অনেক বাঙ্গালী পরিবার দেখেছি—যাঁরা ২৫।৩০ বৎসরেরও বেশী এদেশে বসবাস করেছেন—কিন্তু তাঁদেরও কোন এক পরিবারের সঙ্গে কোন ব্রহ্ম পরিবারের ঘনিষ্ঠতা হয়নি। এর কারণ আমার মনে হয় এদেশের লোক আমাদের প্রতি বাইরের আচরণে উদাসীন এবং ভিতরে ভিতরে বিরূপ। অবশ্য এটা আমি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর বিষয়ে বলছি। আর বিশেষত এই ভাবটা দক্ষিণ ব্রহ্মের আবহাওয়ারও গুণ হয়ত। অজিতবাবু তাঁর উত্তরব্রহ্মের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি ছিলেন দু চার দিনের অতিথি—তাঁর প্রতি ঔদার্য্য ও সহানুভূতি দেখানো ব্রহ্মবাসীর পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু আমাদের প্রতি তাদের ব্যবহারে বৈগুণ্য না থেকে যেতে পারে না—কারণ আমরা অতিথি নই—আমরা তাদের অন্নের নিরবচ্ছিন্ন অংশীদার—আমাদের প্রতি তাদের বিরাগ ও অনুদারতার কারণ সহজেই বোঝা যায়।

যাই হোক যে বিষয়ে বিশেষ করে লেখবার জন্য প্রবৃত্ত হয়েছি সে হচ্ছে অজিতবাবুর ব্রহ্মভাষাজ্ঞান। প্রবন্ধের কোন জায়গায় তিনি বলেন নি- ব্রহ্মভাষা তিনি কতটা জানেন বা জানেন না। তবে তাঁর বিবৃতি পড়ে মনে হয় তিনি ব্রহ্মভাষাও কিছু কিছু আলোচনা করেছিলেন—এমন কি বোধ হয় ঐ ভাষাতেই এ দেশবাসী কারো কারো সঙ্গে অবলীলাক্রমে কথা বল্‌তে ও তাদের কথা বুঝ্‌তে পারতেন (ভারতবর্ষ কার্ত্তিক ১৩১৩, ৭৬৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। সেই জন্যই হয়ত তিনি ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়—বিশেষ করে বাঙ্গালীকে ব্রহ্মভাষায় "কালা" শব্দের উৎপত্তিগত অর্থ বুঝ্‌তে উপদেশ দিয়েছেন এবং নিজে তার ব্যাখ্যাও করেছেন। তিনি লিখেছেন :—

"বর্ম্মীরা ভারতবাসীকে 'কালা' বলে উল্লেখ করে বলে অনেকে ঈর্ষান্বিত হন ; (ঈর্ষান্বিত কেন হবেন ? এর মধ্যে ঈর্ষার কি আছে ?—লেখক) কিন্তু তারা এত নির্লিপ্ত হয়ে থাক্‌তে চান যে এই কথাটি পর্য্যন্ত তলিয়ে বুঝবারও তাদের ইচ্ছা নেই। ভারতবাসীর বর্ণ কাল বলে ব্রহ্মবাসীরা 'কালা' শব্দ ব্যবহার করে না ; বর্ম্মী ভাষায় 'কালা'-শব্দ লিখ্‌তে হলে 'কুলা" লিখে থাকে। 'কূ' শব্দের অর্থ সাঁতার দেওয়া এবং 'লা' শব্দের অর্থ আসে। কূ-লা শব্দের অর্থ যে সাঁতরিয়ে আসে অর্থাৎ যারা কালাপানি পার হয়ে আসে তারাই কালা। আমাদের দেশে যে কালা আদমী কথাটি বলা হয়, সে কেবল সাহেবদের 'কলার্ড' শব্দের অপভ্রংশ ; ব্রহ্মবাসীর নিকট সাহেবও কালা।"—(ভারতবর্ষ কার্ত্তিক ১৩৪৩, ৭৭০ পৃঃ)

অজিতবাবু 'কালা' শব্দের যে অর্থ উপরে দিয়েছেন, তা তিনি কোথায় পেলেন তা বলেন নি—বোধহয় শোনা কথার উপর নির্ভর করে লিখেছেন। আমিও এক সময়ে ঐরূপ ব্যাখ্যা শুনেছিলাম—কিন্তু ভাষা

শেখবার পরে জানলাম—ঐ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। প্রথমতঃ বর্ম্মী ভাষায় যে বানান-যোগে ঐ শব্দটি লেখা হয় তা আমাদের অক্ষরে লিখ্‌লে দাঁড়ায় "কুলাঃ"। অজিতবাবু যে বানান (কুলা) লিখেছেন তা ভুল। "কুলাঃ" শব্দটি বর্ম্মী কথা নয়—পালি কথা। অনেক পালি কথা বর্ম্মী ভাষায় ব্যবহৃত হয় তা বলাই বাহুল্য। বর্ম্মী ভাষার গঠন প্রণালী অনুসরণ করে এই শব্দটিকে বিভক্ত করে "কু"—"লাঃ" করলে ধাতুগত কোন অর্থ হয় না, বর্ম্মায় 'কু' ধাতুর অর্থ আরোগ্য করা, ঔষধ দেওয়া অর্থাৎ চিকিৎসা করা (to give medicine, assist in recovery from sickness—Judson.) লাঃ শব্দের অর্থ mule এবং লাঃ ধাতুর অর্থ to proceed from a starting place to some boundary···Judson—আরো ২১।টি মানে আছে কিন্তু কখনও উপসর্গহীন ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং অজিতবাবু "কালা" শব্দের যে বানান ও উৎপত্তিগত বা ধাতুগত অর্থ দিয়েছেন তা ঠিক নয়। Judsonএর অভিধান হচ্ছে এখন পর্য্যন্ত প্রামাণিক গ্রন্থ—"কুলাঃ" অর্থাৎ উচ্চারণানুযায়ী "কালা" শব্দটির অর্থ এইরূপ আছে :—

কুলাঃ (Pali) n. a race; one whose race is distinctly marked, a person of caste, a nation of any country west of Burma.

সুতরাং সংস্কৃত "কুল" শব্দের পালি অপভ্রংশ হচ্ছে কুলাঃ"। 'কুল' বল্‌তে আমরা যেমন বুঝি বংশ, গোত্র, গৃহ, সমাজ, জাতি, বর্ণ ইত্যাদি, (চলন্তিকা দ্রষ্টব্য)—তেমনি "কুলাঃ" শব্দের মূলগত অর্থও তাই। কিন্তু আজকাল "কুলাঃ" বা "কালা" শব্দের সাধারণ অর্থ হচ্ছে ভারতবাসী। এ শুধু আমার নিজের মস্তিষ্কপ্রসূত নয়—কয়েকজন পালি ও বর্ম্মাভাষায় পারদর্শী ব্রহ্মবাসীর সঙ্গে আলাপ করে তাঁদেরও এইরূপ মত জেনে লিখলাম।

কিন্তু মূলগত অর্থ যাই হোক না কেন, ব্রহ্মবাসী যখন কোন ভারতবাসীকে 'কালা' বলে উল্লেখ করে তখন কোন ভারতবাসীরই বংশ, জাতি বা বর্ণের গৌরব বৃদ্ধি হয় না। ব্রহ্মবাসী ঘৃণার সঙ্গেই সেটা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি প্রয়োগ করে এবং কুলী মজুর প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর ভারতীয়দের উপর প্রেম একটু বেশী হলে আরো একটি শব্দ জুড়ে দিয়ে বলে "খেঃ কালা"—খেঃ অর্থে কুকুর। অজিতবাবু শুনে হয়ত দুঃখিত হবেন—কিন্তু বেশীদিন এদেশে বাস করায় "ফুলের মতন দেশটাকে নষ্ট করা"র সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসী কাঁটার ঘাও কম খাচ্ছে না। সাহেবদের প্রতিও ব্রহ্মবাসী 'কালা' শব্দ প্রয়োগ সময়ে সময়ে করে বটে—কিন্তু সামান্য আর একটি কথা যোগ করে দিয়ে—তারা সাহেবদের বলে "কালাফিউ" অর্থাৎ "শাদা কালা"—শাদা বিদেশী। সাধারণতঃ শুধু "বোঃ" কথা দিয়েই সাহেবদের উল্লেখ করে।—"বোঃ" কথাটি লিখতে গেলে লেখে "বোল্"—পালি "বল" শব্দ থেকে এসেছে—অর্থ হচ্ছে military officer—এখন শুধু সাহেব। আমাদের দেশের 'কালা আদমী' কথাটা ইংরেজি 'colured' শব্দ থেকে এসেছে কিনা জানিনে—তার বিচার পণ্ডিতগণ করবেন। কিন্তু 'কালা' কথাটি কি আমাদের দেশে ইংরেজের বা সাহেবদের আসার আগে ছিলনা? থাক্ অবান্তর কথা!

শ্রীযুক্ত অজিতকুমার বঙ্গ সংস্কৃতি প্রভৃতির অনেক পরিচয় এ দেশে পেয়ে সে সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেছেন। অজিতবাবুর ন্যায় অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি যদি সত্যই এদেশের পুরাতন ইতিহাসের দ্বার উদ্ঘাটন করে ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্রহ্মদেশের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক যোগ বিচারে তৎপর হন তার থেকে সুখের বিষয় নেই। কিন্তু ২।৪ মাস এদেশে বেড়িয়ে ২।৪ জায়গায় কয়েকটা জিনিষ দেখে তার পর ইংরেজের লেখা পুঁথির উপর নির্ভর করে প্রবন্ধ লিখে ছাপিয়ে দিলে তা সাধিত হবে না। যদি তাঁর সত্যই এদেশের প্রতি এবং প্রাচীন ঐতিহাসিক গবেষণার প্রতি টান থাকে, তা হলে এদেশে এসে বাস করে, বর্ম্মা ও পালিভাষা ভাল শিখে—যথারীতি গবেষণায় প্রবৃত্ত হলেই তিনি যথার্থ দুই মহাদেশের সত্যকার সংস্কৃতির পরিচয় পাবেন এবং কল্যাণ সাধন করতে পারবেন। এদেশে উপাদান যথেষ্ট আছে—সে সব যথাযথ বিচার ও ব্যবহার করে গবেষণায় তৎপর হবার মত লোকের অভাব। যে সব বাঙ্গালী আমরা এদেশে আছি—আমরা সবাই আছি নিজের নিজের ধান্দায়—আমাদের না আছে অনুসন্ধিৎসা, না আছে গবেষণা করার মত শিক্ষা, না আছে উদার সহানুভূতিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি। সেই জন্য চাই যথার্থ শিক্ষিত, গবেষক, অনুসন্ধিৎসু নীরব কর্ম্মী—যিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে নিরন্তর আপনার সাধনার আলোকে অন্তর্দীপ জ্বেলে রাখবেন—যিনি আপন জীবন, জ্ঞান ও জিজ্ঞাসা দ্বারা দুই মহাদেশবাসীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করে মৈত্রী স্থাপনে সহায়তা করতে পারবেন—তাহলেই বলার যথার্থ সার্থকতা হবে "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—" এবং তাহলেই আমাদের আর অপমানে হতে হবেনা এদের সবার সমান।

আমাদের আশা শ্রীযুক্ত অজিতকুমারের দ্বারা এই মহাব্রত উদ্‌যাপন সম্ভবপর হবে।



দেশী না বিদেশী বীমা কোম্পানী?

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বিভিন্ন বীমা-বিবরণী হইতে জানা যায় যে, গত ১৯০৫ সালে যে সকল দেশী ও বিদেশী বীমা কোম্পানী ভারতবর্ষে কাজ করিতেন তাহাদের সর্ব্ব সাকল্যে নূতন বীমার কাজ হইয়াছিল ৮ কোটি টাকা মাত্র। ১৯৩৩ সালে সেই নূতন বীমার কাজ দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৩৩ কোটি টাকা। গত দুই বৎসরে বিভিন্ন উন্নতিশীল কোম্পানীর যে বার্ষিক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে ভারতবর্ষে নূতন বীমার কাজ বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমানে ন্যূনকল্পে দাঁড়াইবে মোট-মাট ৪৫ কোটি টাকা।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে বীমার কাজ বিশেষভাবে উন্নতিলাভ করিয়াছে। কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর সাকল্য-বীমার পরিমাণের তুলনায় ভারতবর্ষ অনেক পিছাইয়া আছে। নিম্নের তালিকা হইতে তাহা বেশ বুঝা যাইবে :—

দেশ	মাথা পিছু বীমা
আমেরিকা	২,৩০০৲
ক্যানাডা	১,৩০০৲
নিউজিল্যাণ্ড	১,১০০৲
অষ্ট্রেলিয়া	৯০০৲
গ্রেটবৃটেন	৭০০৲
জাপান	৭০০৲
ভারতবর্ষ	৬৲

সমগ্র পৃথিবীর সর্ব্ব-সাকল্যে জীবন-বীমার পরিমাণ দাঁড়াইতেছে ১০,১০০ কোটি টাকার উপর। ইহার মধ্যে ভারতীয় কোম্পানীগুলির জীবন-বীমার পরিমাণ মাত্র ৩০ কোটি টাকা। অথচ ভারতবর্ষের জনসংখ্যা সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যার ১/৫ অংশ; সুতরাং ভারতীয় বীমার ভবিষ্যৎ প্রসার ও পরিমাণ বৃদ্ধির অবকাশ এখনো যথেষ্ট রহিয়াছে। এ অবস্থায় জীবনবীমা সম্পর্কে প্রত্যেক শিক্ষিত ও উপার্জ্জনক্ষম ভারতবাসীর যত্নবান হওয়া উচিত। যেদিকে আমাদের শক্তি নিয়োজিত করিবার সুযোগ আছে, সেদিকে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

ভারতবাসীর আর্থিক অস্বচ্ছলতা

এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে ভারতীয় বীমা বিস্তারের যথেষ্ট অবকাশ থাকিলেও ভারতবাসীর আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুণ যথোপযুক্ত সুযোগের অভাব রহিয়াছে। যে দেশের অধিকাংশ লোকই সঙ্গতিসম্পন্ন নহে, এমন কি অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে জীবন যাপন করিতেছে এমন লোকের সংখ্যাও যে দেশে নিতান্ত কম নহে; সমৃদ্ধ দেশের তুলনায় সে দেশে কখনই আশানুরূপ জীবন-বীমা হইতে পারে না। নিম্নের তালিকা হইতে ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থার একটা পরিচয় পাওয়া যায় :—

দেশ	মাথা পিছু সম্পত্তির পরিমাণ	মাথা পিছু গড়পড়তা আয়
আমেরিকা	৭,৬১১	২,০৮০
গ্রেট-বৃটেন	৮,৫৩৬	১,১৩৬
ক্যানাডা	৫,৩১৪	১,৬০৮
জাপান	১,২২৫	১,৮০৪
ভারতবর্ষ	২২৫	১০৩

এইভাবে ভারতীয় আর্থিক-বিবৃতি হইতে দেখান যাইতে পারে যে ১/৬ হইতে ১/৩ অংশ ভারতবাসী প্রায় এক প্রকার অনশনেই দিনপাত করিতেছে; কারণ ভারতবর্ষের প্রধানতম শস্যের উৎপন্ন-মূল্যে সমগ্র ভারতবাসীর কোন রকমে উদরপূর্ত্তির প্রয়োজনীয় খাদ্যের মাত্র ৭০ ভাগ ক্রয় করা যাইতে পারে। যে ভারতবাসীর মধ্যে শতকরা ৯০ জনের অধিক কৃষিজীবী বা কৃষি-সংক্রান্ত পেশার উপর নির্ভরশীল এবং যাহাদের মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যাধিক্য ভয়াবহ এবং শোচনীয় তাহাদের মধ্যে জীবন-বীমার প্রচার বা প্রসারের কাজ একান্তই সুকঠিন। খাইয়া পরিয়া এমন

কিছু উদ্বৃত্ত থাকে না, যাহা দ্বারা সাধারণ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের পক্ষে প্রয়োজন মত জীবন-বীমা করিয়া দুর্দ্দিনের জন্য সঞ্চয় করা চলে। তবুও একথা ঠিক যে জনসংখ্যার অনুপাতে আর্থিক অবস্থার বিশেষ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এখনো ভারতবর্ষে যথেষ্ট জীবন-বীমা হয় নাই; তবে আশা এই যে সম্প্রতি স্বদেশী বীমা কোম্পানীগুলির সুসংবদ্ধ প্রচারকার্য্যের ফলে ভারতবাসীদের মধ্যে জীবন-বীমার প্রয়োজন ও সার্থকতা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উপলব্ধ হইতেছে এবং সাধারণ শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে জীবন-বীমার প্রতি অনুরাগ ও ঔৎসুক্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে।

বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করিবার অন্তরায়

কিন্তু জীবন-বীমার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নটি স্বভাবতই মনে আসিবে যে দেশী কি বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করিব? কারণ বিদেশী কোম্পানীগুলির মধ্যে সুবৃহৎ ও সুপরিচালিত সমৃদ্ধিসম্পন্ন কোম্পানীর অভাব নাই। কাজেই সাধারণতঃ আমাদের মন এই সকল বিদেশী কোম্পানীগুলির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করিবার পক্ষে প্রত্যেক দেশেরই কতকগুলি বাধা বা অসুবিধা ভোগ করিবার আশঙ্কা আছে।

এই সম্পর্কে গত জুন মাসের 'ইনসিওরেন্স ওয়ার্ল্ড' পত্রিকায় যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করিলে নানাবিধ অনর্থ উপস্থিত হইতে পারে। অষ্ট্রীয়ার 'ফিনিক্স ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী' ইউরোপের সর্ব্ববৃহৎ তিনটি কোম্পানীর অন্যতম। এই কোম্পানী নিজের দেশ ছাড়াও জার্ম্মাণী, রুমানিয়া, জেকোশ্লোভেকিয়া প্রভৃতি দেশেও বীমার কাজ করিত। সম্প্রতি এই কোম্পানী 'ফেল' হইয়াছে। এজন্য অষ্ট্রিয়া গবর্ণমেণ্ট নিজের দেশের বীমাকারিগণের স্বার্থরক্ষার জন্য ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা করিয়াছেন; রুমানিয়া ও জার্ম্মাণীর প্রচলিত আইনানুসারে তদ্দেশীয় বীমাকারীর দায় মিটাইবার উপযুক্ত টাকা গবর্ণমেণ্টের হেপাজতে রাখিবার বন্দোবস্ত থাকায় জার্ম্মাণী ও রুমানিয়ার বীমাকারিগণেরও ক্ষতি হইল না। কিন্তু মুস্কিল হইল জেকোশ্লোভেকিয়ার। সেখানকার গবর্ণমেণ্টের হাতে এইরূপে টাকা আমানত রাখিবার আইন না থাকায় জেকোশ্লোভেকিয়ার বীমাকারিগণকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল। ভারতবর্ষেও এইরূপ কোন আইন নাই অর্থাৎ ভারতবর্ষে ব্যবসায় করিতেছে এমন সব বিদেশী কোম্পানীগুলিকে ভারতীয় বীমা-আইন অনুসারে এদেশীয় বীমাকারিগণের দায় মিটাইবার উপযুক্ত টাকা ভারত গবর্ণমেণ্টের কাছে জমা রাখিতে হয় না। ইহা হইতেই বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলিতে বীমা করিবার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় সূচিত হইতেছে। অবশ্য ভারতীয় কোম্পানী-আইনের সংশোধিত ব্যবস্থায় যাহাতে বীমা আইন সম্পর্কে বিদেশী কোম্পানীগুলির প্রতি প্রযোজ্য উক্ত প্রকার আইন প্রণীত হয় তাহার জন্য বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে, ফল কি হইবে বলা যায় না।

বর্ত্তমানে ইউরোপীয় দেশে চারিদিকে যেরূপ রণ-সজ্জা দেখা যাইতেছে, ইতিপূর্ব্বেই একাধিক স্থানেই যে প্রকার অপ্রত্যাশিতভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ হইল তাহাতে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ সমগ্র বা আংশিকভাবে লিপ্ত হইয়া পড়িলে আমাদের দেশে বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলির মধ্যে সবগুলি যে টিকিয়া থাকিবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কাজেই ভারতবাসীর পক্ষে বিদেশী কোম্পানীতে জীবন-বীমা করা কখনই সমীচীন হইতে পারে না। বিশেষতঃ বিদেশী কোম্পানীগুলি আমাদের ভারতীয় কোম্পানীগুলির সহিত যেরূপ সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্যও দেশী কোম্পানীতে বীমা করিবার জন্য আমাদের বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। নিম্নে আমরা কয়েকটি বিভিন্ন জাতির অভিমত উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করিতেছি।

বিদেশী বীমাবিদের অভিমত

গত ২৭শে আগষ্ট তারিখে বোম্বাই-এর তাজমহল হোটেলে ভারতীয় বীমা-প্রতিষ্ঠান-সঙ্ঘের যে একাদশ বার্ষিক সভা হয়, তাহাতে উক্ত সভার সভাপতি মিঃ ডব্লিউ মিলার্ড বলেন—

"আজ আমাদের প্রধান সমস্যা বিদেশী কোম্পানীর প্রতিযোগিতা। বহু পুরাতন ও সুপ্রতিষ্ঠিত বিদেশী কোম্পানী সঙ্ঘবদ্ধভাবে আমাদের সহিত প্রতিযোগিতায়

নামিয়াছে। ভারতীয় বীমা কোম্পানীর সংখ্যা বেশী নহে—একথা আমি স্বীকার করি; কিন্তু এদেশে যে পরিমাণ বীমা হয় তাহার সবটা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আমাদের আছে, সুতরাং ভারতীয় বীমাকারিগণের নিকট আমাদের অনুরোধ যে ভারতীয়গণ যেন ভারতীয় বীমা কোম্পানীতেই বীমা করেন।”

দেশ-নেতার অভিমত

স্বদেশী বীমা কোম্পানীতে বীমা করার সার্থকতা সম্পর্কে আমাদের দেশের একজন সর্ব্বজনমান্য নেতা বলিয়াছেন—

“As we also see practically that generally foreigners select only their companies for contributions and at the same time secures our enlistment very easily through their agencies even by extracting from us enhanced rates of premiums ; if we do not realise our weakness at least at this enlightened stage of national aspirations and select only Indian Companies for contribution, we are only ignoring our cause to the benefit of our exploiters.”

অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখিতে পাই—বীমা করিবার বেলায় বিদেশীযগণ নিজেদের দেশের কোম্পানীতেই বীমা করিয়া থাকেন এবং এজেন্টের মারফতে বর্দ্ধিত প্রিমিয়ামের হারে আমাদের নিকট হইতেও বীমা সংগ্রহ করিয়া থাকেন। আজ এই নবজাগ্রত জাতীয় আশাআকাঙ্খার দিনে আমাদের এই দুর্ব্বলতা বুঝিয়া যদি একমাত্র আমাদের দেশের বীমা-কোম্পানীতেই বীমা না করি, তাহা হইলে আমাদের মূল উদ্দেশ্যকে অবহেলা করিয়া আমাদের শোষণকারীদিগকেই লাভবান করা হইবে।

বিদেশী পত্রিকার অভিমত

বিদেশী বীমা কোম্পানীতে বীমা করিবার অযৌক্তিকতা সম্পর্কে বিদেশীয়গণের মুখপত্র, বিদেশীয়গণের দ্বারা পরিচালিত ইংরাজী দৈনিক ষ্টেট্সম্যান পত্রে গত ১৯১৬ সালের ২০শে অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।—

“One great drawback to assuring with a Foreign Office is the possibility of difficulties arising in case of war between Great-Britain and the country of the company with which the policy is effected. The Company may have the most honourable intentions of fulfilling its obligations in their entirety to its policy-holders, whatever their nationality might be, but their hands might be tied by their Government in such a way as would prevent them from giving effect to their wishes. The representatives of British Companies in neutral countries found themselves in a very unpleasant situation during the last War, by reason of the fact that they were prohibited from making payments of any description to policy-holders whose nationality was that of a country with which we were at war—an eventuality that had not been foreseen either by the offices or by the many Germans and others who have confided their interests to British Offices and paid their premiums—in some cases for many years—with due regularity. Many cases of individual hardship were thus created which the Company would have been willing to avoid but they were powerless to do so. ALL THIS POINTS TO THE ADVISABILITY OF PEOPLE EFFECTING THEIR ASSURANCE POLICIES WITH COMPANIES OF THEIR OWN NATIONALITY.”

অর্থাৎ:—বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করার একটা প্রধান অসুবিধা হইল এই যে, যে দেশের কোম্পানীতে বীমা করা যায় সেই দেশের সঙ্গে যদি গ্রেট বৃটেনের যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে নানা অন্তরায় ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। বীমাকারীরা যে দেশের লোকই হন না কেন, তাঁহাদের প্রতি দায়িত্ব সর্ব্বাংশে পালন করিবার সদিচ্ছা কোম্পানীগুলির থাকিলেও তাহাদের গভর্ণমেণ্টের বিধিব্যবস্থায় সে ইচ্ছা কার্য্যকরী নাও হইতে পারে। বিগত যুদ্ধের সময় যে দেশের সঙ্গে আমরা যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছিলাম সেই দেশের বীমাকারীর দাবীর কোন টাকা পরিশোধ করিতে গভর্ণমেণ্টের নিষেধ থাকায় নিরপেক্ষ দেশগুলিতে বৃটিশ বীমা কোম্পানীর প্রতিনিধিবর্গকে বিশেষ অপ্রীতিকর অবস্থা

পড়িতে হইয়াছিল। যেমন এই সকল কোম্পানী, তেমনি বহু জার্ম্মেণীবাসী এবং অপরাপর বহু ব্যক্তি পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখেন নাই যে এইরূপ সঙ্কট অবস্থার উদ্ভব হইবে। বৃটিশ কোম্পানীগুলিতে তাঁহাদের স্বার্থ বজায় থাকিবে এই বিশ্বাসেই তাঁহারা নিয়মিতভাবে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে বহুদিন ব্যাপী প্রিমিয়াম দিয়া আসিয়াছিলেন। এইরূপে অনেক ব্যক্তিগত অসুবিধা ও ক্ষতি হইয়াছিল কিন্তু তাহা দূর করিবার ইচ্ছা থাকিলেও কোম্পানীগুলির সেবিষয়ে কোন ক্ষমতা ছিল না। **এই ঘটনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় প্রত্যেকেরই নিজ দেশীয় কোম্পানীতে বীমা করা উচিত।**

উপসংহার

আর্থিক ভারতবর্ষকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিশালী করিয়া আত্মস্বতন্ত্র করিতে হইলে সমগ্র দেশীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি মমত্ব ও কর্ত্তব্যবোধকে সর্ব্বদা জাগ্রত রাখিতে হইবে। ভারতবর্ষে দেশাত্মবোধের উন্মেষ হইয়াছে অনেক দিন। আজ দুঃখে দারিদ্র্যে ও অভাব অপমানের বিড়ম্বনায় ভারতবাসী যে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িতেছে, তাহার একমাত্র কারণ অর্থনৈতিক-ক্ষেত্রে সমগ্র দেশ ও জাতি হিসাবে তাহার একাত্মবোধের অভাব। যে সঙ্কটস্থলে আজ আমরা উপনীত হইযাছি, তাহাতে আত্মমুখী হওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় নাই।

মূক প্রেম

শ্রীসত্যেন্দ্রভূষণ বিশ্বাস

আমার বাল্যবন্ধু ডাক্তার বনেট অনেকবার তা'র রিওমস্থিত বাড়ীতে বেড়াতে আসতে অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছে। আমারও বহুদিনের ইচ্ছা ওভার্ণের চতুঃপার্শ্বস্থ দেশগুলো একবার দেখব—কিন্তু যাই যাই ক'রে এ পর্য্যন্ত যাওয়া হ'য়ে ওঠে নি। তাই এই গ্রীষ্মে একবার যাব বলে মনস্থ ক'রে বসলুম।

আমি সকালবেলাকার ট্রেণে গিয়ে সেখানে পৌছলুম ডাক্তার আমার জন্য ষ্টেশনেই অপেক্ষা কচ্ছিল। ধূসরবর্ণের পাজামা আর পিঙ্গলবর্ণের টুপিতে সজ্জিত আমার বন্ধুটীকে সেদিন তার বয়সের চেয়েও কচি বোধ হচ্ছিল। সে আমাকে সাগ্রহে অভ্যর্থনা ক'রল—যেমন গ্রামস্থ লোকরা সহরপ্রত্যাগত লোকদের টাট্‌কা এবং সঠিক খবরের আশায় সচরাচর অভ্যর্থনা ক'রে থাকে। সে আমার সম্মুখস্থিত নাতিদীর্ঘ অনুচ্চ পর্ব্বতটা গর্ব্বস্ফীত অঙ্গুলিসঙ্কেতে নির্দ্দেশ ক'রে বলল :

"এই হচ্ছে ওভার্ণ!"

বিশ্রাম, জলযোগ এবং ধূমপানান্তে সে আমাকে নিয়ে বেরুল সহর দেখাতে। সাবেক ধরণের পরিপাটি ছোট্ট সহরটী—দেখে আমি প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারলুম না। এক সময় ডাক্তার আমাকে অপেক্ষা ক'রতে বলে হঠাৎ একটা বাড়ীতে ঢুকে পড়ল। বলে গেল শুধু :

"রোগী দেখতে যাচ্ছি।"

আমার সম্মুখস্থিত অনুচ্চ আবছায়া অন্ধকারপূর্ণ বাড়ীটার ভয়াবহ পারিপার্শ্বিকতা প্রথমটা আমার ভেতর বেশ আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। নীচের তলার সব বড় বড় জানালাগুলো বন্ধ—আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, হয় ভিতরস্থিত লোকগুলো বাইরের পৃথিবীটার সাথে পরিচিত হ'তে অনিচ্ছুক অথবা পরিচিত হওয়া তা'দের পক্ষে বিপজ্জনক।

ডাক্তার যখন বেরিয়ে এল, আমি তা'র নিকট এই কথা বলতেই সে বলল :

"তোমার অনুমান ঠিক। হতভাগিনী বন্দিনীকে কখনও জানালার বাইরে তাকাতে দেওয়া হয় না। সে এক পাগ্‌লী···উঃ, সে এক অত্যদ্ভুত—অনন্যসাধারণ তা'র জীবনেতিহাস বলব—শুনতে চাও?"

আমি তা'কে অনুরোধ ক'রলুম, সে ব'লে চলল :

"কুড়িটী বছর আগেকার কথা—এই গৃহের অধিবাসীর একটী শিশু-কন্যা ছিল। সব কিছুই প্রথমে তা'র ছিল স্বাভাবিক এবং সাধারণ। কিন্তু তা'র অনন্যসাধারণতা

পরিলক্ষিত হ'ল ক্রমে। দেহের অনুপাতে তা'র বুদ্ধির বিকাশ হ'ল না। আবার যা-ও বা সে হাট্‌তে শিখল, কথা বলতে সে মোটেই শিখল না। প্রথমে আমি তা-ই ভেবেছিলাম মেয়েটা বুঝিবা হাবা-কালাই হ'ল; কিন্তু এ ভুল আমার ভেঙ্গেছিল, কারণ শীগ্‌গীরই আমি বুঝতে পারলুম যে সে শুন্‌তে পায় সবই—দোষের মধ্যে কেবল বোধশক্তিটাই তা'র নেই। একটা আচম্‌কা শব্দে সে চম্‌কে উঠত, কিন্তু বুঝতে পারত না কেন শব্দটা হ'ল।"

"বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে সে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হ'তে লাগল, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ তার আর হ'ল না। তার ভেতর উত্তেজনা এবং চিন্তাশক্তি স্ফুরিত ক'রতে আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রেছিলাম—কিন্তু সবই হ'য়েছিল বৃথা। বেশী আর কি বলব, সে তা'র মাকে দেখেই চিনতে পারত না—মা আর কন্যার সম্বন্ধ বিষয়ে তা'র জ্ঞান মোটেই সজাগ ছিল না। উজ্জ্বল আবহাওয়া তা'র ভেতর আনন্দ প্রবাহ আনত, আর অনুজ্জ্বল দেখে সে ক'রে উঠত ভীষণ আর্ত্তনাদ, যেমন মৃত্যু-বিভীষিকা-ভীত কুকুরগুলো ক'রে থাকে।"

"সে একটী ছোট্ট কুকুর ছানার মত ঘাসের ওপর গড়াগড়ি দিতে ভালবাসত এবং সূর্য্য-কিরণ যখন জানালা গ'লে ঘরের ভেতর এসে পড়ত সে তখন আনন্দে হাততালি দিত। সে তা'র মা এবং আমার মধ্যে, তা'র বাবা এবং কোচোয়ানটার ভেতর—কোনও পার্থক্য রাখত না।"

"আমি ছিলুম জনক-জননীর অদ্বিতীয় সুহৃদ। তাদের মনো-বেদনায় আমার হৃদয়টা ছিল সহানুভূতিপূর্ণ—তা-ই আমি প্রায়ই তাদের দেখতে যেতাম। এক বিকেলে যখন তাদের সাথে যাচ্ছিলাম, লক্ষ্য ক'রলাম বার্থা (বালিকাটীর নাম) যেন একরকম খাদ্যের চেয়ে অন্য আর একরকম খাদ্যে প্রাধান্য দিচ্ছে। বয়স তখন তা'র সবে বার, কিন্তু মাথায় সে ছিল আমার চেয়েও বড় এবং দেহের পূর্ণতা তা'র প্রায় অষ্টাদশবর্ষীয়া বালিকারই অনুরূপ।"

*　　*　　*

"একদিন আমি হঠাৎ মনস্থির ক'রে বসলুম—তার এই লোলুপতা নিয়েই আমার পরীক্ষা আরম্ভ ক'রতে হবে এবং দেখতে হবে এ-দ্বারা তার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয় কি না। যদি-ই সে একরূপ খাদ্য হ'তে অন্যরূপ খাদ্যের পার্থক্য বুঝতে পারে, হউক সে সামান্য—কিন্তু তবুও তো কিছু লাভ। তা-ই একদিন আমি তার সামনে রাখলুম দুটো প্লেট—একটা ঝোলের এবং আর একটা ক্ষীরের—খুব মিষ্টি। আমি প্রথমে তা'কে স্বাদ নেওয়ালুম প্রথমটার এবং তারপর দ্বিতীয়টার—অবশেষে দু'টোর একটা পছন্দ ক'রে নিতে তাকে বাধ্য করালুম··সে বেছে নিলে ক্ষীরের প্লেটটা।"

"আমি তাকে লোভী ক'রে তুল্‌লুম এত—যে সে আর কিছুই ভাবতে পারত না, কেবল খাওয়া আর খাওয়া। সে ক্রমে বিভিন্ন রকমের খাদ্য চিনে ফেলল এবং দেখিয়ে দিত কোন্‌টা সে চায়। যদি তার পছন্দসই খাদ্যগুলো তার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হ'ত তবে সে খুব কাঁদত। তারপর আরম্ভ ক'রলুম তাকে সময়ের জ্ঞান দিতে; সবচেয়ে পীড়াদায়ক ব্যাপার—ঘড়ির কাঁটাটা ঠিক কখন কোথায় গিয়ে পৌঁছুলে ওটা বেজে উঠবে এবং আমরা সবাই গিয়ে খাওয়ার ঘরে সমবেত হ'ব। এর পর সে চেয়ে থাকৃত ঘড়িটার দিকে, ঐ ঘূর্ণায়মান কাঁটা দুটার দিকে——ঘণ্টার পর ঘণ্টা এবং যখন ওটা খাওয়ার নির্দ্দিষ্ট সময়ের অঙ্কে এসে পৌঁছুত, তখন তার আরম্ভ হ'ত দুর্দ্দমনীয় প্রতীক্ষা—কখন আবার ওটা বেজে উঠবে এবং বাড়ীর সবাইকে সঙ্কেত ধ্বনি জানাবে। একবার কেউ মনোযোগী হ'য়ে ঘড়িটায় চাবি না দেওয়াতে ওটা গিয়েছিল বন্ধ হ'য়ে, ফলে সে ক্রোধাতিশয্যে ওর ওপর এমনই প্রতিশোধ নিল যে কাঁচটা চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল।

"কিন্তু এত ক'রেও তখন আমরা তা'কে ব্যক্তিগত বিভিন্নতা শেখাতে পারি নি এবং এখন আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে একমাত্র অনুরাগের অনুপ্রেরণা ব্যতিরেকে এ প্রচেষ্টা আমাদের কোনরূপেই সফলকাম হ'তে পারত না—কারণ এর প্রমাণ আমরা পরে পেয়েছি।"

*　　*　　*

"ক্রমে সে একটী উজ্জ্বল, সুন্দরী নারীতে পরিণতি-প্রাপ্ত হ'ল—নারীত্ব বিকাশের একটী অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ। —নীল দুটী চোখ, লাল ছোট্ট ছোট্ট দুটী ঠোঁট, সোনালী চুল—কিন্তু যতই হোক্, ভেনাস নয়, ভেনাসের শুধু প্রতিমূর্ত্তি।"

"একদিন সকালবেলা তার বাবা আমার বাড়ী এসে হাজির। আমার নমস্কারের প্রতি উত্তর না দিয়েই তিনি কতকটা কুণ্ঠার সহিত বললেন :

"তোমার সাথে আমি একটা গুরুতর বিষয়ের আলোচনা ক'রতে চাই।···আচ্ছা, তুমি কি ভেবে দেখেছ···তুমি কি ভেবে দেখেছ যে আমরা বার্থার বিয়ে দিতে পারি ?"

"বিস্ময়ের প্রথম অবস্থা কেটে গেলে আমি একরূপ চীৎকার ক'রেই ব'লতে বাধ্য হ'লুম যে 'ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।'

"'আমি জানি ডাক্তার'—উত্তরে তিনি বললেন—'তুমি যা' বলবে। কিন্তু ভেবে দেখ···এ-ও তো হ'তে পারে—ভেবে দেখ···ওর মাতৃত্ব···ও সন্তানবতী হ'লে···একটা জাগরণও তো আসতে পারে। কে জানে ?—হয় তো এই সুযোগই ওর জাগরণের অপেক্ষায় আছে।'

"আমি ঠিক ক'রে উঠতে পারলুম না এর পরে কি বলব। কারণ তার প্রস্তাবে যথেষ্ট যুক্তি ছিল। আমি জীবজন্তুর ভেতর ভালভাবে লক্ষ্য ক'রে দেখছি, কি ক'বে বাৎসল্য অনুভূতি তাদের বুদ্ধি প্রখরতর ক'রে তোলে—কি ক'রে মুরগী ধূর্ত্ত শেয়ালের ওপর টেক্কা মেরে চলে, কি ক'রে বিড়ালী কুকুরের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র অভিযান চালায়। তা'ছাড়া তখনও আমার মনে একটা জলন্ত দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার ছোট্ট একটা কুক্কুরী ছিল এবং ওটা এমন আহাম্মকই ছিল যে শিকারে ওর দ্বারা কোন কাজই চলত না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—যেই ওটার বাচ্চা হ'ল, ওর বুদ্ধি গেল অদ্ভুত রকমে বেড়ে—যে কোনও কুকুরের সাথেই সে তখন টেক্কা মেরে চ'লতে পারে।"

"সেই ঘটনা মনে পড়ার সাথে সাথেই আমার আগ্রহ হ'ল বার্থার বিবাহিত জীবন দেখতে—বিবাহিত জীবনে তা'র সত্যসত্যই কিছু পরিবর্ত্তন হয় কি না। তাই আমি উত্তরে তা'র পিতাকে বললুম :

"হয় তো আপনার কথাই ঠিক··চেষ্টা ক'রে দেখুন, যদি পারেন।···কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে কোনও পুরুষ এ প্রস্তাবে রাজী হ'বে কি না।

"তিনি রুদ্ধশ্বাসে বললেন :

"পেয়েছি—রাজী হয়েছে।"

আমি একেবারে বিস্মিত হ'য়ে গেলুম। জিজ্ঞাসা না ক'রে থাকতে পারলুম না :

"কে সে ?—আমাদের চেনা কেউ ?

"চেনা।—উত্তরে তিনি বললেন।

"এঁ্যা !··কে ? নাম কি তা'র ?

"গাস্তোন—আমাদের গাস্তোন।···এখন তোমার মত হ'লেই···।

"নিশ্চয়। আনন্দাতিশয্যে আমি আর একটু হ'লেই চীৎকার ক'রে উঠেছিলুম। খুব ভাল, আমার এতে কোনও অমত নেই।

"হতভাগ্য পিতা যাবার সময় আমার হাত ঝেঁকে বলে গেলেন—

"আস্‌ছে মাসেই তা'হলে···।'

* * * *

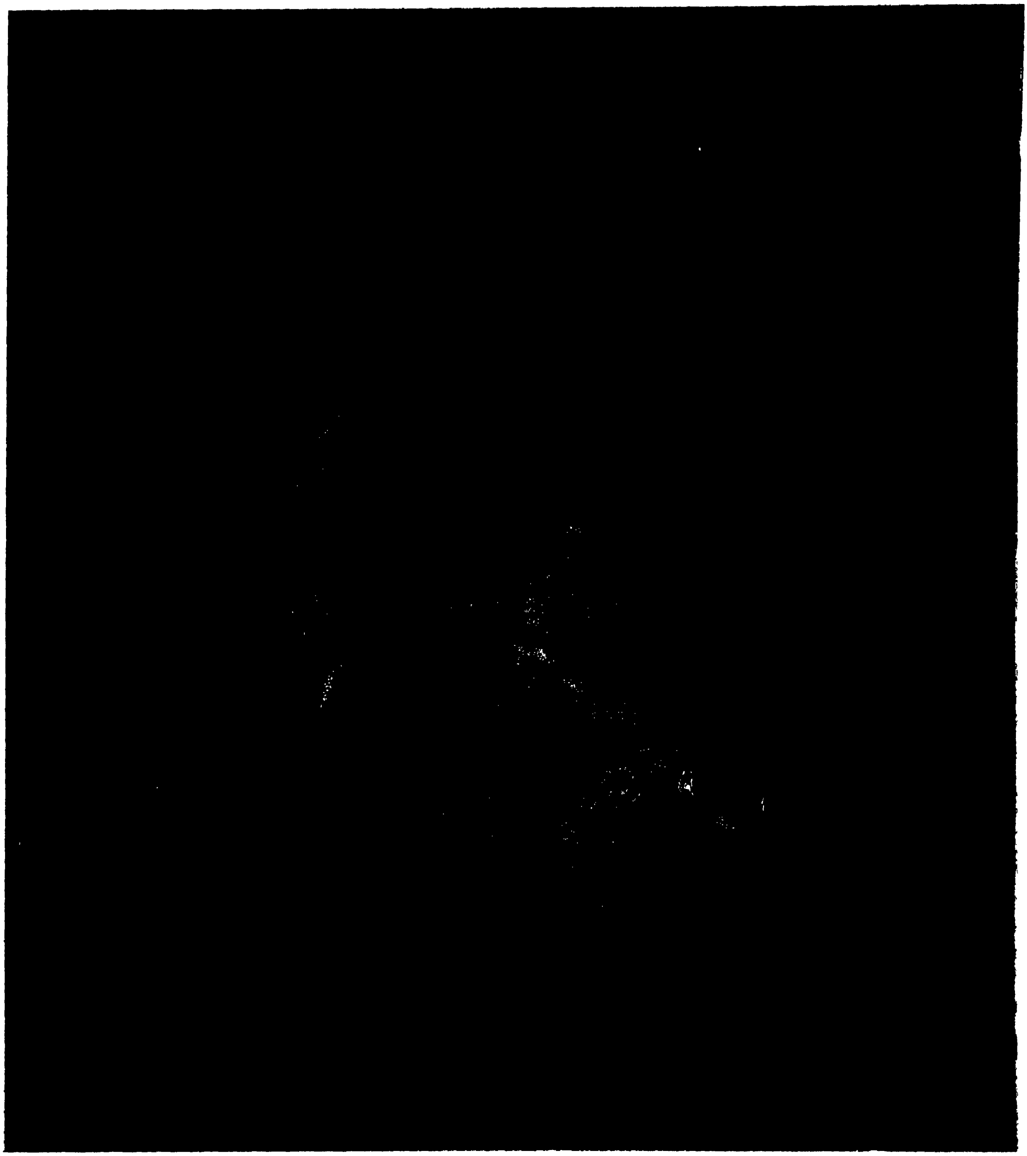
"গাস্তোন, সদ্বংশজাত আমাদের প্রতিবেশী যুবক। ধনদৌলত জুয়ো খেলে উড়িয়ে এবং অবশেষে ঋণপাশে আবদ্ধ হ'বে এই রকমই একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।"

"কার্য্যতঃ সে পেয়েও গেল সুবিধামত।"

"সে স্বাস্থ্যবান এবং সুন্দর চেহারার যুবক। আমি ভাবলুম, স্বামীর কর্ত্তব্য সমাপনান্তে তা'কে কিছু কিছু মাসহারা দিলেই সে সন্তুষ্ট হ'বে। সে একদিন বার্থার সাথে পরিচিত হ'তে এল এবং আমার মনে হ'ল সে ওকে খুসী ক'রতে পেরেছে। কারণ, তার জন্য ফুল এনে দেওয়ায়, তার হস্ত চুম্বন করায় এবং তার পদতলে বসে আদর করায় সে কোনও রকম আপত্তি উত্থাপন করে নি। কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য ক'রলুম, তাকে এটুকু প্রাধান্য দিলেও সে তাকে অন্যান্য ব্যক্তি হ'তে স্বতন্ত্র পর্য্যায়ে ফেলতে সেদিনও পারে নি।"

"বিয়ে হ'য়ে গেল।"

"তুমি এখন অনুমান ক'রতে পার আমার আগ্রহ কোন্ সীমায় গিয়ে পৌঁচেছিল! বিয়ের পরদিনই আমি গেলুম বার্থাকে দেখতে; আশা—যদি তার মুখে চোখে কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষ্য ক'রতে পারি। কিন্তু বৃথা, সেই ঘড়ি আর খাওয়া—আর কিছুকেই যেন সে প্রাধান্য দিতে রাজী নয়। আর গাস্তোনকে লক্ষ্য ক'রলুম, মনে হ'ল—সে



অস্ত্রধারী রাজপুত

শিল্পী—শ্রীযুক্ত [illegible]

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

যেন তার প্রেমে মস্‌গুল্—সর্ব্বদাই তাকে খুটিনাটি নিয়ে বিরক্ত কচ্ছে আর খেলছে, যেমন আমরা বিড়াল ছানার সাথে খেলে আমোদ অনুভব ক'রে থাকি।"

"কিন্তু ক্রমে তার ভেতর আমি একটু একটু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য ক'রলুম। লক্ষ্য করলুম, সে কেবল তার স্বামীকে অন্যান্য ব্যক্তি হ'তে স্বতন্ত্র করে নি, কিন্তু সে তার নিকট অধিকতর প্রিয় হ'য়ে উঠেছে এবং তার হাসি আর কথাগুলো সেই মিষ্টি খাদ্যের মতই লোভনীয় হ'য়ে উঠেছে। তার চোখ দু'টী গাস্তোনের প্রতিটী গতিবিধি অনুসরণ ক'রে চলে। সে এলেই আনন্দে বার্থা হাততালি দিয়ে ওঠে, মুখখানি তার গভীর পরিতৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে। সে তাকে ভালবেসেছে, দেহে এবং প্রাণে—সেই জীব-সুলভ মূক কৃতজ্ঞতা নিয়ে।"

"এদিকে যেই বার্থার অনুরাগ বেড়ে চলল, ওদিকে গাস্তোন হ'য়ে উঠল ক্লান্ত। এ বাড়ীতে গতিবিধি তার এল ক্রমে কমে, দিনের বেলা সে একরকম আসতই না—রাত্রিতে আসত কেবল শুতে। সেই তার আরম্ভ হ'ল দুঃখের দিন। সকাল—সন্ধ্যা সে ব'সে থাকত তার প্রতীক্ষায়—খাওয়া-দাওয়া তার গেল চুকে। দিন দিন সে দুর্ব্বল এবং কৃশ হ'য়ে চলল।"

"সে আর কিছুই ভাবত না—কেবল গাস্তোন এবং এই চিন্তাই তার হ'ল কাল।"

"কিছুদিন বাদে সে এবাড়ীতে শোওয়াও ছেড়ে দিল, সারারাত্রি অন্য কোথাও কাটিয়ে সে অতি প্রত্যুষে বাড়ী ঢুক্‌ত। এসে সে দেখত, বার্থা তখনও তার অপেক্ষায় জানালার ধারে ব'সে আছে—চোখ দু'টো তার নিবদ্ধ ঘড়ির দু'টো অলস কাঁটার ওপর···। সে তার প্রতিটী সতর্ক ইন্দ্রিয় দ্বারা দূরবর্ত্তী অশ্বের ক্ষিপ্র পদধ্বনি শুন্‌ত। সে তা'র ঘরে ঢুকতেই নীরব অঙ্গুলী নির্দ্দেশে ঘড়িটা দেখিয়ে, সে যেন বলতে চাইত : 'দেখ, তোমার কত দেরী!' অবশেষে গাস্তোন এই অদ্ভুত, ঈর্ষাপরায়ণ নারীর প্রেমে ভীত হ'য়ে উঠ্‌ল।"

"এক সন্ধ্যায় সে তাকে ভীষণ মার মারল।"

"আমার ডাক পড়ল।···এসে আমি দেখলুম—রাগে, দুঃখে এবং অনুশোচনায় সে মর্ম্মান্তিক কান্না কাঁদছে। কি অব্যক্ত দুঃখ এদের—এই ভাষাহীন প্রাণীদের, যাদের আমরা মোটেই বুঝি না!"

"আমি তাকে শান্ত ক'রতে মরফিয়া দিলুম এবং তাকে এই দয়া-মায়াহীন স্বামী নামধারী পশুটার মুখদর্শন ক'রতে নিষেধ ক'রে দিলুম।"

* * * *

"অবশেষে তার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘট্‌ল। প্রতিটী রাত সে তার জন্য অপেক্ষা ক'রে বসে থাকত এবং প্রতিটী দিন তা'র পথ চেয়ে কাটাত···। আজকাল সে এত কৃশ হ'য়ে গেছে যে হঠাৎ কেউ তাকে দেখে চিনতে পারবে না।··· চোখ দু'টো কোটরগত, দৃষ্টি ক্ষীণ, চালচলন অস্থির—দেখে পিঞ্জরাবদ্ধ পশু বলে ভ্রম হয়। যদি তাকে এখন রাস্তায় তাকাতে দেওয়া হয় তবে সেই লোকটার কথা তার মনে আসবে···তাই জানালাগুলো বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। আহা, হতভাগ্য পিতামাতা! তাদের কথা একবার ভেবে দেখ দেখি।"

কথা বলতে বলতে আমরা পাহাড়টার শীর্ষদেশে উপনীত হয়েছিলাম। ডাক্তার আমাকে সেখান থেকে ছোট্ট সহর, সুদূরবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম, সবুজ প্রান্তর এবং সীমান্তরালবর্ত্তী অভ্রভেদী পর্ব্বতাবলী লক্ষ্য ক'রতে বলল।··· ডাক্তার অনেক কিছুরই বর্ণনা দিয়ে চলেছিল, কিন্তু আমার মন সেদিকে মোটেই ছিল না। আমি কেবল ভাবছিলাম সেই উন্মাদিনীর কথা, যা'র বঞ্চিত আত্মা—মনে হচ্ছিল—আমার আশে পাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রে বসলুম :

"তা'র স্বামীর কি হ'ল?"

ডাক্তার আমার এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন শুনে যেন আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। সে কিয়ৎক্ষণ ইতস্তত ক'রে উত্তর ক'রল :

"বার্থার স্বামী?—বেশ আছে। মাসে মাসে টাকা পাচ্ছে—আর তা ছাড়া যথেষ্ট নরনারীর সাথে সে আজ পরিচিত।"

আমরা নিশব্দে বাড়ী ফিরে এলুম। রাস্তায় আমাদের পাশ দিয়ে একটা কুকুর-যান দ্রুত চ'লে যেতেই ডাক্তার আমার হাতটায় একটা ঠেলা মেরে বলল :

"ঐ—ঐ সেই লোকটা।"

আমি নেম্‌দা নির্ম্মিত ধূসরবর্ণের অযত্ন-ন্যস্ত টুপিটার প্রান্তভাগ এবং একজোড়া বলিষ্ঠ কাঁধ দেখতে পেলুম। কুকুর-যানটা বার্থার স্বামীকে নিয়ে ধূলোর মেঘে অদৃশ্য হ'য়ে চলে গেল।

ভারতীয় সঙ্গীতের যুগবিভাগ

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

সৃষ্টিকাল হইতে অদ্যাবধি ভারতীয় সঙ্গীতের এই সুদীর্ঘ অস্তিত্বকাল আমরা প্রধানতঃ চারিটি যুগে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথমতঃ বৈদিক হইতে পৌরাণিক যুগ বা তথাকথিত প্রাগৈতিহাসিক যুগ। দ্বিতীয়তঃ মধ্যযুগ বা হিন্দুরাজত্ব কাল। তৃতীয়তঃ মুশলমান যুগ বা মুশলমান রাজত্বকাল। চতুর্থতঃ বর্ত্তমান যুগ বা ইংরেজ রাজত্বকাল।

দেশের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত কিরূপে সঙ্গীতের আকৃতি ও প্রকৃতির পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে আমরা প্রথমে তাহাই আলোচনা করিব। সভ্যতার পরিবর্ত্তনই সভ্যতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিবর্ত্তনের একটি বিশিষ্ট হেতু। জাতির অন্তর্নিহিত জ্ঞান ও কর্ম্ম শিক্ষা এবং সাধনার সাহায্যে বিকশিত হইয়া সভ্যতাকারে পরিণত হয়। রাজবিধানে এই সভ্যতা প্রচারিত ও পরিচালিত হইয়া থাকে। যে শিক্ষা ও সাধনা সভ্যতাবিকাশের প্রধান সহায়ক তাহা রাষ্ট্রীয় নিয়মেই দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং সভ্যতা গঠনে ও সভ্যতার প্রকৃতি পরিবর্ত্তনে রাজাই প্রধান অবলম্বন। নিয়তির তমসাচ্ছন্ন নেপথ্য হইতে বিচিত্র বেশভূষা গ্রহণ করিয়া কাল যখন প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে বিবিধ ভূমিকায় অভিনয় করিতে থাকে তখন কর্ত্তব্যের ইঙ্গিতে রাজাই তাহার প্রযোজক ও অধিনায়ক—'রাজা কালস্য কারণম্'। ভারতীয় সঙ্গীতের প্রকৃতি পরিবর্ত্তনেও রাজারই পূর্ণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

অনাদিকাল হইতে জগতে দুইটি সভ্যতা চলিয়া আসিতেছে। একটি ধর্ম্ম ও মোক্ষমূলক, অপরটি অর্থ ও কামমূলক। ভারতীয় সভ্যতা স্বভাবতঃ ধর্ম্মমুখী ছিল। আপাদমস্তক জীবদেহকে প্রাণ যেরূপ সজীব করিয়া রাখে সেইরূপ এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা এদেশের আপামর সাধারণ ধর্ম্মেই অনুপ্রাণিত হইত। সে অনুপ্রাণনার ভগ্নাবশেষ এখনও এদেশে পরিলক্ষিত হয়। এই পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের যুগেও এদেশের লোক ধর্ম্মের নামে মুগ্ধ হয়। দুর্ভাগ্যের দ্বারা নিরন্তর লাঞ্ছিত হইয়াও মানুষ যেমন প্রাণের মমতা ছাড়িতে পারে না সেইরূপ ধর্ম্মের নামে বহু বিড়ম্বনা সহ্য করিয়াও ভারতীয় সমাজ এখনও ধর্ম্মমুগ্ধতা ছাড়িতে পারে নাই। আদি যুগে ভারতীয় সভ্যতা যখন সকল উপকরণে সুশোভিত ছিল—ব্রহ্মচর্য্যমূলক শিক্ষা, ত্যাগমূলক নিষ্কাম সাধনা, অলৌকিক যোগবিভূতি প্রভৃতি অনন্যসাধারণ সম্পদ তখন এদেশকে এক বিস্ময়কর গৌরবের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইহার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য, চিত্র ও সঙ্গীত—এক কথায় ইহার চতুঃষষ্ঠিকলা জগতে অনুপমেয় বলিয়া আজিও সুবিখ্যাত। যে সঙ্গীত অন্যান্য দেশের ধারণায় সাময়িক চিত্তবিনোদনের উপকরণ মাত্র, এদেশের বিজ্ঞানে তাহা নানা অসাধ্য সাধনেরও একটি বিশিষ্ট উপাদান বলিয়া ব্যাখ্যাত। অনন্ত বিশ্বের যেখানে যে জীব বাস করে, মনুষ্য পশুপক্ষী কৃমিকীট পতঙ্গ অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গম বিশ্বজীব নাদাত্মক। নাদই এই বিচিত্র জগতের অন্তস্তলে যোগসূত্রস্বরূপ। এই নাদ শ্রুতি, স্বর ও মূর্চ্ছনাদির সাহায্যে বিভিন্ন রাগবাচক গীতরূপে পরিণত হয় এবং সঙ্গীতনিপুণ আচার্য্যের প্রয়োগকৌশলে বিভিন্ন রসের সৃষ্টি করিয়া পরিশেষে নাদের অভিব্যঞ্জনায় সর্ব্বজীবকে প্রভাবিত ও মুগ্ধ করিয়া তুলে। ইহাই এদেশের প্রাচীন সিদ্ধান্ত। নাদসাধক প্রাচীন ঋষিগণ এইরূপেই সামঝঙ্কারে প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিপুঞ্জকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া জগতে অসাধ্য সাধন করিতেন। অনাবৃষ্টিতে ধারাসম্পাত, দুর্ভিক্ষে শস্য সম্ভার প্রভৃতি আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত লোককল্যাণকর সমৃদ্ধিসমূহ এই নাদ-সাধনারই অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে তাঁহারা প্রাপ্ত হইতেন। এইরূপে বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পৌরাণিক যুগ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘকাল অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ন্যায় বিজ্ঞান-সমুজ্জ্বল সঙ্গীতকলারও একটি সমৃদ্ধ যুগ। আমরা এই যুগকেই 'প্রাগৈতিহাসিক' যুগ নামে অভিহিত করিলাম।

তৎপর কালপ্রভাবে যখন ভারতগগনের নক্ষত্রস্বরূপ ঋষিগণ একে একে অস্তমিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের

জ্ঞান-জ্যোতি অন্তর্হিত হইল। এদিকে জ্ঞানবিজ্ঞানের অলৌকিক আনুকূল্যে বঞ্চিত হইয়া রাজশক্তিও খর্ব্ব হইয়া পড়িল, তখন খর্ব্বশক্তি রাজন্যমণ্ডলী তাৎকালিক মনীষিগণের সাহায্যে আর্যজ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়া সে দুর্ভেদ্য অন্ধকারেও বিভিন্ন কেন্দ্রে আলোক বিকীরণ করিতেছিলেন। তখনও ঋষিগণের জ্ঞানধারার ফলস্বরূপ অমূল্য গ্রন্থরাজি লুপ্ত হয় নাই। ভরত, নারদ, মতঙ্গ প্রভৃতি সঙ্গীতাচার্য্যগণের গ্রন্থ সম্প্রদায়-পরম্পরার সাহায্যে তখনও দুর্লভ হয় নাই। মধ্য-যুগের প্রবীণ সঙ্গীত-গ্রন্থকার শার্ঙ্গদেবও পূর্ব্ব যুগীয় ভরত, নারদ প্রভৃতি সঙ্গীতাচার্য্যগণের গ্রন্থ-সাগর মন্থন করিয়া তাহারই সার সঙ্কলনরূপে 'সঙ্গীত-রত্নাকর' রচনা করিয়াছিলেন। শার্ঙ্গদেব বলিয়াছেন,

সদা শিবঃ শিবা ব্রহ্মা ভরতঃ কশ্যপো মুনিঃ।
মতঙ্গো যাষ্টিকো দুর্গা শক্তিঃ শার্দ্দূল কোহলঃ॥
বিশাখিলো দন্তিলশ্চ কম্বলোঽশ্বতর স্তথা।
বায়ুর্বিশ্বাবসু রম্ভার্জ্জুন নারদ তুম্বরাঃ॥
আঞ্জনেয়ো মাতৃগুপ্তো রাবণো নন্দিকেশ্বরঃ।
স্বাদির্গুণো বিন্দুরাজঃ ক্ষেত্ররাজশ্চ রাহুলঃ॥
রুদ্রটো নান্যভূপালো ভোজ ভূ বল্লভ স্তথা।
পরমর্দ্দীচ সোমেশো জগদেক মহীপতিঃ॥
ব্যাখ্যাতারো ভারতীয়ে লোল্লটোদ্ভট শঙ্কুকাঃ।
ভট্টাভিনবগুপ্তশ্চ শ্রীমৎকীর্ত্তিধরোঽপরঃ॥
অন্যে চ বহবঃ পূর্ব্বে যে সঙ্গীতবিশারদাঃ।
অগাধ বোধমন্থেন তেষাং মত পয়োনিধিম্॥
নির্ম্মথ্য শ্রীশার্ঙ্গদেবঃ সারোদ্ধারমিমং ব্যধাৎ॥

(সঙ্গীত-রত্নাকর ১ম অধ্যায় ১ম প্রকরণ
১৫—২০ শ্লোক)

শার্ঙ্গদেবের কথা হইতে ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে কালমাহাত্ম্যে মানবসমাজ ব্রহ্মচর্য্যাদি অভাবে দেহ ও মনে ক্রমে হীনশক্তি হইয়া পড়িলেও ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাচীন আদর্শ তখনও অক্ষুণ্ণই ছিল। নতুবা শার্ঙ্গদেব মার্গীগীত ও মার্গীতাল সম্বন্ধে সুশৃঙ্খল ও বিধিবদ্ধরূপে যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন তাহার কোন প্রয়োজনীয়তাই ঘটিত না। যাহা হউক এই যুগটিকেই আমরা মধ্যযুগ বা হিন্দু রাজত্বকাল বলিয়া উল্লেখ করিলাম।

নিয়তির পট পরিবর্ত্তনে সে যুগও অন্তর্হিত হইল। ভারত সাম্রাজ্য মুঘল নরপতিগণের করায়ত্ত হইল। শান্তি-প্রিয় সঙ্গীতাচার্য্যগণ কিছুকাল এই নবপ্রবাহে আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস স্বীকার করিয়াও শিষ্যপ্রশিষ্য-পরম্পরাক্রমে বাদশাহগণের বিলাসপ্রবণ চিত্তের পরিতৃপ্তি সাধনে বাধ্য হইলেন। বিশুদ্ধ প্রাচীন স্বর সন্নিবেশ আপাত-মনোরম নব নব পরিবর্ত্তনে রূপান্তরিত হইয়া রাজভোগের উপকরণে পরিণত হইতে লাগিল। এই যুগকেই আমরা মুশলমান যুগ আখ্যা প্রদান করিলাম।

মুশলমান যুগেও বাদশাহগণের একান্ত অনুরাগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় কলাবিদ্‌গণ উৎসাহিত হইতেন এবং ভোগোচিত কারুকার্য্যে এই চারুকলার সমৃদ্ধিসাধনে নিরত ছিলেন। সে সময়ে প্রাচীন বিশুদ্ধিরক্ষার সুযোগ ও অবসর না থাকিলেও সঙ্গীতের বাহ্য চাকচিক্য এবং প্রাণোন্মাদক সম্পদের অভাব ছিল না। কিন্তু দেখিতে দেখিতে এই যুগও চলিয়া গেল, আসিল চতুর্থ বা বর্ত্তমান যুগ। এ যুগে দেশের রাজা ইংরেজ। বৈদেশিকতায় ইংরেজ মুশলমানরাজগণের সমতুল হইলেও ইংরেজী সভ্যতা অনুরঞ্জনায় অতুলনীয়, কাজেই সকল প্রকারে রিক্ত মোহাচ্ছন্ন জাতিকে নবাগত সভ্যতার বিদ্যুজ্জালরঞ্জিত দীপ্তি অন্তরের অন্তস্তলে অনুরক্ত ও মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। দুইটি জাতির মিলনে পরস্পর যেরূপ আদানপ্রদান সম্ভাবিত ছিল এক্ষেত্রে তাহা যেন ঘটিল না। দীর্ঘকাল অবধি পরোপজীবী, হৃতসর্ব্বস্ব এই জাতির বিনিময় করিবার মত তখন কিছুই ছিল না; তাই শুধু অবিচারিত আত্মদানে প্রতীচীর যাহা কিছু সম্মুখে পাইল তাহাই সোল্লাসে গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়িল। ফলে রাজার জাতি অনুচিকীর্ষু পদানত এই জাতির নিকট গ্রহণযোগ্য সভ্যতার উপকরণ কিছুই পাইলেন না। এইভাবে রাজাজ্ঞায় বঞ্চিত হইয়া দেশের শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতকলা বৃন্তচ্যুত ফুলের মত পথের ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। রাজদ্বারে উপেক্ষিত দেবভোগ্য এই চারুকলা অবশেষে একটু আশ্রয়ের জন্য নৃত্যোপজীবিনী বারবিলাসিনীর দুয়ারে ভিখারিণী হইয়া দাঁড়াইল। অতি বড় দুঃখেই কবি গাহিয়াছিলেন,—

"বিনাশ্রয়ং ন জীবন্তি পণ্ডিতা বনিতা লতাঃ।"

যাহা হউক অতঃপর আমরা যথাশক্তি দেখাইতে প্রয়াস করিব—বিভিন্ন যুগে ভারতীয় সঙ্গীতের আকৃতি ও প্রকৃতি কিরূপ ছিল এবং কিরূপ ব্যাপক প্রভাবে সঙ্গীত ভারতবর্ষে স্বাধিকার প্রচার করিয়া উল্লেখযোগ্য একটি বিদ্যা ও চারুকলারূপে পরিণত হইয়াছিল। * (ক্রমশঃ)

* বিগত অগ্রহায়ণ সংখ্যা ভারতবর্ষে "ভারতীয় সঙ্গীত" প্রবন্ধের প্রকাশিত অংশের নাম—"ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাচীনতা।" ভাঃ সঃ

মলয়-যাত্রী

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল

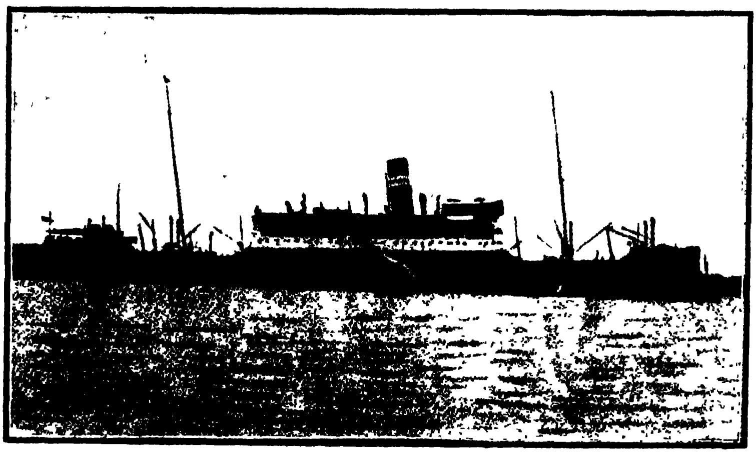
মধুর মলয়—কবিতার উৎস—যার কুহক স্পর্শে তরুণের মন শুকনো পাতার মর্ম্মর-নিক্কণে নাচের ছন্দে স্পন্দিত হয়—সেই মলয়ের জন্মভূমিতে করা যায় তীর্থ-যাত্রা—পূজার অবকাশে। পরিশ্রান্ত মন আর কর্ম্ম-কাতর দেহ নেচে উঠলো। চালাও পান্‌সী।

অবশ্য পান্‌সী চড়ে কেউ কালাপানির বুকের ওপর সাগর-দোলার উৎসব-গরিমা চায় না—মানুষ নেহাৎ বে-থাপ্পা আর মরিয়া না হলে। তাই যাত্রা করলাম—রয়েল মেল ষ্টীমার 'কারাপারা'য়। কারাপারা সাত হাজার কত টনের জাহাজ—নেহাৎ কলার ভেলা নয়। তবে কুইন মেরীর আমলে তার সম্ভ্রান্ততা অত্যধিক একথা হবে অত্যুক্তি। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম—মলয়-হিল্লোলের উৎপত্তি-স্থল দেখতে যাবে?

—গেলে তো ছাইভস্ম খেতে হ'বে জাহাজে। উঁহু!

যৌবনে এ-রকম বুক-ভাঙ্গা প্রত্যুত্তর মনের মধ্যে কি সব নিরুৎসাহের ছবি আঁক্‌তো এ বয়সে তার কল্পনাও করতে পারি না। বিশুদ্ধ মলয়-বাতাস তার ওপর বিরহ-ব্যাকুলতা! কিন্তু এ যুগে প্রত্যাখ্যান লাগলো মিঠা। কারণ সারা পথ নিজেরও স্ত্রীর তত্ত্বাবধান করতে হলে ঋষি-বাক্য মানবার সৌভাগ্য হ'ত না—পথে নারী বিবর্জ্জিতা।

কারাপারায় উপর শ্রেণীতে সাহেব যাত্রীর প্রায় সমান-সংখ্যক বাঙ্গালী যাত্রী ছিল—আউট্রাম ঘাটেই সে সত্য উপলব্ধি ক'রে আশ্বস্ত হ'লাম। কি জানি য়ুরোপীয়েরা মিশবে কি না—আর সারা পথ আমরা দু-জনে—আমি আর আমার ভাই অনিল—"একলা" যাব—তাতে যাত্রাটা হবে এক ঘেয়ে—এই রকম একটা দুর্ভাবনা মনের মধ্যে এক একবার জাগ্‌তো যাত্রার পূর্ব্বে। তখন ভারতীয় জাহাজে বসে গণিব লহর-মালা ইত্যাদি—অন্ততঃ দু'একটা গল্প লিখে ফেল্‌ব জলধর দাদার খেদমতের জন্য।



কারাপারা জাহাজ

কারাপারার ১৬ই অক্টোবরের যাত্রা প্রমোদ-যাত্রা বলে ঘোষিত হ'য়েছিল—মাশুলও হ'য়েছিল হ্রাস। সে ক্ষেত্রে জাহাজে আমোদ-আহ্লাদই হ'বে প্রচুর এ কল্পনার উচিত ছিল মনের মধ্যে জেগে ওঠা যাত্রার পূর্ব্বাহ্নে। সবাই পরিশ্রান্ত—উৎসব-প্রয়াসী, কাজেই যাত্রীদের মধ্যে মেলা-মেশা হ'ল অবাধ। তার ফলে সাগরের অসীমতার ছবি রঙিয়ে ওঠবার পূর্ব্বেই গল্পের ও বিতর্কের প্রসঙ্গ হ'ল অফুরন্ত।

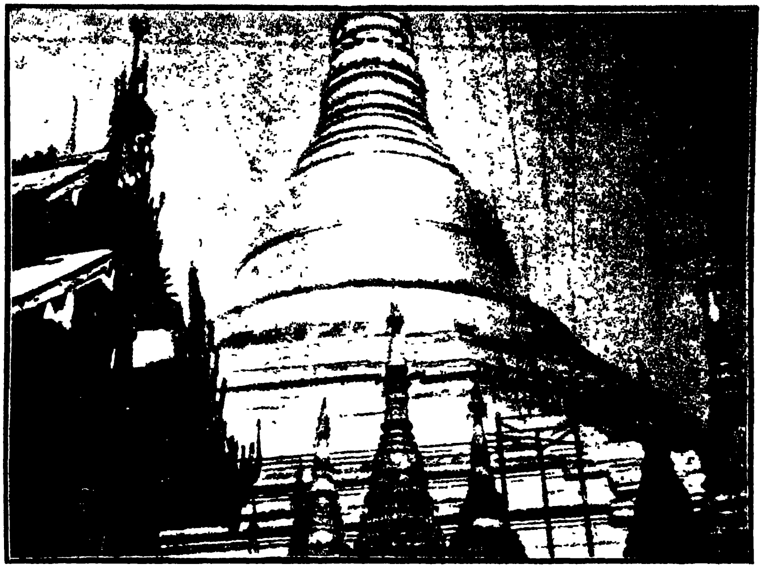
বিতর্ক আর বিরোধ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় আমাদের জাতীয় স্বভাব। সাহেবরা গল্প করে বাস্তবকে আঁকড়ে ধ'রে। যার কথা জোগায় না সে বীয়ারের গ্লাসকে আঁকড়ে ধরে অপরের গল্প শোনে, আর মুচ্‌কে হাসে। কিন্তু আমাদের কল্পনা-প্রবল মন জাহাজের গতি থেকে আরম্ভ ক'রে শুশুক কামড়ায় কি না, এই সব বিবিধ জটিলতা নিয়ে দীর্ঘকালব্যাপী তর্ক চালাতে পারে। আর তর্কে জয়ী হয়

সে, ধৃষ্টতা যার সর্ব্বাধিক আর জ্ঞান যার অল্প। মান লজ্জা ভয়, তিন থাকতে নয়—প্রণয়-বাসরের মত তর্কসভায় সার্থক নীতি। এমন বিজ্ঞ আমাদের মধ্যে ছিল যারা জাহাজের ধোঁয়া দেখে বল্‌তে পারত জাহাজ ঘণ্টায় কত নট্ চলছে। কিন্তু নটের সঙ্গে মাইলের কি সম্পর্ক—সেটা নিয়ে তুমুল বাক্-যুদ্ধ বাধত—যতক্ষণ জাহাজের কোনো কর্ম্মচারী না বলে দিত—নয় ফার্লঙে এক নট্। যখন মানুষ কর্ম্মজীবনকে দেশে ফেলে রেখে বিদেশ যাত্রা করে, তখন এরূপ আচরণ অপ্রীতিকর নয়—নীতি-বাদী বা সমাজ-হিতৈষী কিছু ব'লে সে কথা গ্রাহ্য করবার কোনো সুযুক্তি নাই। দার্শনিকের মতে জীবনটাই যখন তুচ্ছ তখন ছুটির দিনে মাঝে মাঝে ডেকে দাঁড়িয়ে তুচ্ছ তর্ক করা—মহাপাতক কিসে।



রেঙ্গুনে স্বোয়ে ডাগনে একটি মন্দিরের চূড়ায় চমৎকার কাঠের কাজ

কালাপানি ভোরের আলোয় সত্যই কালো—গভীর মসী-ঘন। তারপর যখন রবির রশ্মি তার বিশাল দেহকে সমুজ্জল করে—সাগরের রঙ্ তখন হয় স্বচ্ছ-নীল। 'ক্রমে সে গাঢ় সবুজ ব'লে মনে হয় দূরে—কিন্তু অদূরে নীল-সিন্ধু-জল উল্লসিত উচ্ছ্বসিত—জাহাজের অগ্রগতিতে ঢেউগুলি



রেঙ্গুনে স্বোয়ে ডাগন প্যাগোডার স্বর্ণচূড়া

নিরুপায় ভাঙ্গে দু'ধারে। কিন্তু এবার সমুদ্র আমাদের ঠকিয়েছিল। শান্ত শিষ্ট সাগর—তরঙ্গহীন বিক্ষোভ-বিহীন। মাঝে মাঝে এক একটা উড়ুক্কু মাছ একঘেয়ে রঙের-গরীমাকে সজীব করছিল জাহাজের আশে পাশে উড়ে।

কারাপারায় ভোজনের ব্যবস্থা ছিল মনোরম। কিন্তু কারাপারার অপার কারায় বসে স্পেনের বিদ্রোহ বা উড়ো মাছের মনস্তত্ত্ব আলোচনা করলে কারও হজম-শক্তির সাধ্য থাকে না ভোজ্যকে কায়দা করবার। কাজেই ডেকের ওপর খেল্‌তে হয়। কারাপারার কাপ্তেন ওয়েলস্ থেকে আরম্ভ করে সহকারী কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় অবধি আমাদের জাহাজী-খেলা শিক্ষা দিতে যত্নবান ছিলেন। যার ফলে কয়েট, ডেক-টেনিস প্রভৃতি খেলায় সর্ব্বদাই আমরা মত্ত থাকতাম। ২৪ ঘণ্টায় জাহাজ কতদূর যাত্রা করেছে তার উপর প্রায় প্রত্যহ লটারি হত। কাপ্তেন নিজে প্রতিদিন আমাদের সঙ্গে টেনিস্ খেলতেন। জাহাজের ডাক্তার পাল মহাশয় যতটা বাক্য-রসিক তার অনুপাতে ক্রীড়া-দক্ষ নন।

জাহাজের কর্ম্মচারীদের সৌজন্য বড় মনোরম। চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার ওয়ালেস সাহেব অতি যত্নে একজন দক্ষ সহকারীকে দিয়ে আমাদের জাহাজ চালাবার কল-কব্জা বুঝিয়ে দিলেন, আর কাপ্তেন সাহেব শিখিয়ে দিলেন চুম্বক



রেঙ্গুনের স্বোয়ে ডাগনের প্রাঙ্গণে একটি মন্দির

প্রভৃতির বিশেষত্ব। প্রকৃতপক্ষে এ শিক্ষালাভ করতে পরিশ্রম করতে হয় বহুদিন—পুঁথিগত বিদ্যার প্রয়োজন হয় না খুব বেশী। একটানা চার ঘণ্টা কম্পাসের দিকে তাকিয়ে নক্সা দেখে মাঝে মাঝে অঙ্ক কষতে হয় জাহাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে হ'লে। ধীরতা পরিশ্রম সাহস আর একাগ্রতা যার আছে সে এ কাজ শিখ্‌তে পারে। হিসাব রেখে বা হিসাব পরিদর্শন ক'রে প্রবাসে যারা সওদাগরী দপ্তরে দেহ-মন উৎসর্গ করে—সেই জাতের ছেলে নীল সাগরের বিশুদ্ধ হাওয়ায় কেন জাহাজ চালাতে শিখ্‌তে পারবে না—তার কোনো কারণ নাই। এ-শিক্ষা বাঙ্গালীর পাবার উপায় নাই—কিন্তু পাবার উপায় তরুণদের পক্ষ থেকে সংগ্রহ করবার কেহ প্রবল চেষ্টা করেছে—সে সমাচারও কোনো দিন পাই নি। আমাদের বিরাট আন্দোলন, বেকার-সমস্যা প্রভৃতি একজোট হ'য়ে যদি আদা-জল খেয়ে লাগে, তা'হ'লে আমাদের তরুণরা জাহাজ চালাতে পারে না—এ কলঙ্কের কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। কর্ম্ম-ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ জাতীয় জীবনের নিরাময়তার একমাত্র উপায়।

অবশ্য কলেজ বা স্কুল ছেড়ে কেহ কাপ্তেন হ'তে পারে না। কোনো পরাধীন জাতের ছেলের পক্ষে কোনো নূতন বৃত্তি শিখ্‌তে গেলে বেশী অধ্যবসায় আর পরিশ্রমের আবশ্যক। একেবারে নিম্নশ্রেণীতে প্রবেশ কর্ত্তে হ'বে—দড়ি টান্‌তে হ'বে, কুলির মত খাট্‌তে হবে। পরে উন্নতি অনিবার্য্য। ইঞ্জিন-ঘরে যে সব ইংরাজের ছেলে কাজ করে তাদের দেখলে আর চীফ্-ইঞ্জিনিয়রের উপর ঈর্ষা হয় না। রেলগাড়ীর ইঞ্জিন যে চালায়—সে মুক্ত বাতাসের—মুক্ত আকাশের স্পর্শ ও সান্নিধ্য উপভোগ করে। গোটানো ছবির মত দৃশ্যপট তার সামনে খুলে যায়—রেলগাড়ীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে। যে জাহাজের ইঞ্জিন চালায়—সে তপ্ত চুলার ধারে একদৃষ্টে মিটারের দিকে আর আদেশ-যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে থাকে সমুদ্রের গর্ভে। উপরের চোঙা দিয়ে হাওয়া



রেঙ্গুনে স্বোয়ে ডাগনে বুদ্ধের মহা-পরিনির্ব্বাণ

আসে। ভীম-দর্শন যন্ত্র-অসুরকে নিয়ন্ত্রিত করবার মতন সাহস ও দক্ষতা বজায় রাখবার জন্য—নিরন্তর তাকে থাকৃতে হয় শশব্যস্ত।

বাঙ্গালী সহকারী আছে ইঞ্জিন-ঘরে। এরা চট্টগ্রামের অশিক্ষিত মুসলমান—ফায়ারম্যান খালাসী প্রভৃতি। অতি ভীষণ কাজ জাহাজের চুলাগুলাতে ইন্ধন জোগান। কারাপারায় এক সঙ্গে অনেকগুলা বড় বড় বয়লার জ্বলে। মিনিটে মিনিটে অগ্নি-কক্ষের দ্বার খুলে শভেল করে তাতে কয়লা দিতে হয়। গন্‌গনে আগুনের কাজ—জাহাজের অন্তর প্রকোষ্ঠে—ভীষণ কষ্ট-সাধ্য। তাদের হাতের গোড়ায় বালতীতে পানীয় জল আছে—মগ্‌ আছে। এক একবার কয়লা দিচ্চে আর এরা এক এক মগ জলপান করচে। দেশের লোক দেখে তুষ্ট হ'য়ে তারা আমাদের সেলাম করলে।

এদের সারেঙ্‌ আছে—জিজ্ঞাসা করলাম—সারেঙ্‌ সাহেব আগুনঘরের খালাসী-দের উপরের খালাসীদের চেয়ে বেতন বেশী তো।

—না সাহেব। বেশী নয়। যারা ফায়ারম্যান তারা একটু বরং কম পায়—তবে ডিউটী কম। এদের খাট্‌তে হয় অল্প সময়।

চীফ্‌ ইঞ্জিনীয়ার ওয়ালেস সাহেব জিজ্ঞাসা: করলেন—আমাদের পরিশ্রম সম্বন্ধে কি ধারণা হল ?

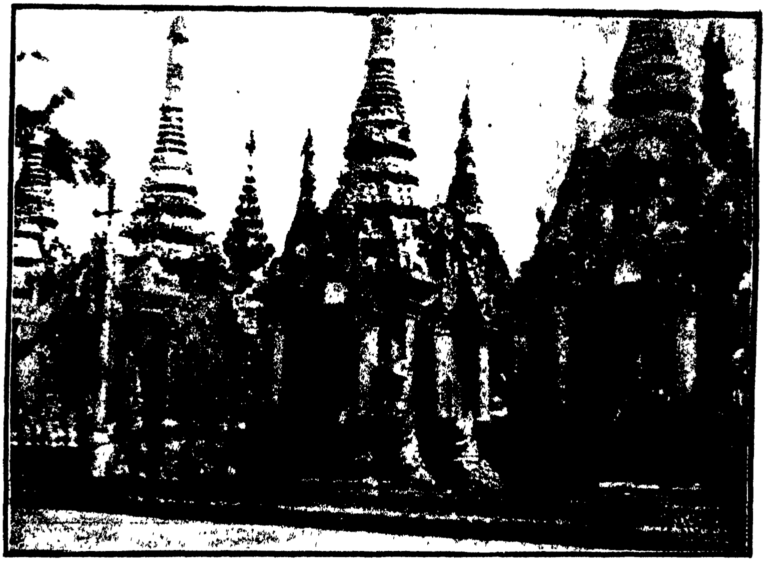
স্পষ্ট কথা বললাম।

—এর পর মনে হয় আমাদের ফী-গুলি জুয়াচুরির পয়সা।

স্কট্‌লাণ্ড হাসে কম, কথা কয় অল্প। কিন্তু যখন হাসে বা বাক্যালাপ করে তখন ফুটে উঠে প্রাণের হাসি—অন্তরের ভাষা। সে হোঃ হোঃ ক'রে হেসে বললে—তোমাদের কত বিদ্যা শিখ্‌তে হয়—আইনের নজীর মুখস্থ করতে হয়।

যদি কল-কব্জাকে আয়ত্তের ভিতর রাখা বিদ্যা না হয় তো রামের ধন শ্যাম নিলে তাদের কলহে একপক্ষে মিশে গিয়ে মস্তিষ্কের গুণ্ডামী কিসে অধিক বিদ্যা তা বুঝলাম না। যাক্‌—আত্মগ্লানি!

চট্টগ্রাম আর গোয়া না থাকলে ভারতবর্ষের জাহাজ-কোম্পানীদের কাজ চলে না। আমাদের খালাসীরা সকল কাজ জানে—জাহাজকে ফিট্‌-ফাট্‌ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। জাহাজের ভিতর কোথাও একটু কুটা থাকে না—ময়লা থাকে না। এরা সর্ব্বদা জাহাজ মাজা-ঘষা করছে। ডেকের আরোহীরা স্থানাভাবে মালের বস্তার মত প্যাক হ'য়ে শুয়ে থাকে—কিন্তু জাহাজ অপরিষ্কার করতে পায় না। শুনলাম পানের রঙে জাহাজ ময়লা হয় বলে জাহাজে পানের দোকান থাকে না। ডেকের যাত্রীদের জন্য খাবার বিক্রী হয়। গোয়ার লোপেজ, গোমেস, ভাজ



রেঙ্গুনে স্বোয়ে ডাগনে প্রধান মন্দিরের চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির

জামাই-আদরে যাত্রীদের খাওয়ায়—তাদের ঘর দ্বার পরিষ্কার করে। মিষ্ট-কথার প্রত্যাশা করে এরা—আর মিষ্ট ব্যবহার তাদের নিজেদের।

সাগরকে মনে হয় অসীম—তার অপার অসীমতা মনকে স্তম্ভিত করে। মানুষের নিবিড় আনন্দের লুকানো উৎস অসীমকেই ফোটাতে ব্যস্ত। তাই চক্ষু যখন বাধা পায় প্রাসাদ বা বনানীর—তখন প্রাণ চায় আরও দেখতে। পাহাড়ের উপর উঠ্‌লে সে আনন্দের ছায়া আসে—নীলাম্বুর মাঝে ভাসমান আধারে দাঁড়িয়ে তার আভাস উল্লসিত করে প্রাণকে। কিন্তু তুষ্টি বিশ্বজননীর উপাধি—অতুষ্টি

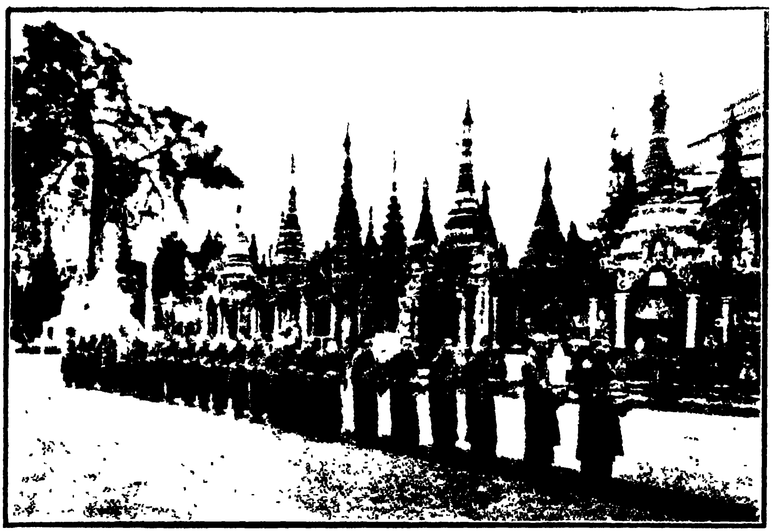
বেচোরা মানুষের আজন্ম-লব্ধ সম্পদ। এই অতুল অপারের মাঝে মনে হয় ইন্দ্রিয়গুলা অসহায়—তাদের কাজ হচ্চে কল্পনাকে উত্তেজিত করা মাত্র। সেই অফুরন্ত বিস্তৃতির কতটুকুই বা পড়ে দৃষ্টির পথে—দিক্‌-চক্রবালে একটা নীল প্রাচীর—আশমানি নীল আর সিন্ধু-নীলের মিলন-রেখা।

সজীবতার যেখানে বাহুল্য—সেখানেই কেবল নিরালার ছবি প্রাণকে অপ্রাণ-বহুল প্রকৃতির কোলে আহ্বান করে। কিন্তু আমার বিশ্বাস সে আহ্বান শোনে না আমাদের অন্তরের অতি গভীর স্তর। গভীর হৃদয়ের সহজ-বৃত্তি সন্ধান করে প্রাণের স্পন্দন। তাই বিশাল সাগরের মাঝে প্রাণের সাড়া পেলে জীব চঞ্চল হয়। স্ফূর্ত্তির উত্তেজনা ফুটে ওঠে তার গতিতে, তার দৃষ্টিতে। একটা কচুরি পানা বা ভ্রাম্যমান শৈবাল যখন অজানার রহস্যকে আয়ত্ত করবার পরিকল্পনায় নিজেকে বিরাটের মাঝে ভাসিয়ে দেয়—তার অনুভূতি স্পষ্ট কি না জানি না। কিন্তু তাকে জাহাজের আশে-পাশে দেখ্‌তে পেলে সকল আরোহী উত্তেজিত হয়। আর আগন্তুক যদি হয় একটা পাখী—কিম্বা মাছ, তা হ'লে জাহাজে অন্য প্রসঙ্গ থাকে না। ঠিক বিচিত্রতার সন্ধানে মানুষ এমন করে না—তার অন্তরাত্মা চায় প্রাণ দেখ্‌তে। এ-ধারণার স্বপক্ষে আরও একটা কারণ আছে। সমুদ্রের পথে যখন দ্বীপ বা উপকূল দেখা যায়—প্রথম সন্ধানের বস্তু হয় জীবন।

—বলুন তো মশায় এ দ্বীপে মানুষ আছে?

—মাছ ধরবার জন্য লোক আসে নৌকায়। তবে স্থায়ী অধিবাসী আছে বলে মনে হয় না।

শেষে জানবার ইচ্ছা হয়—বাঘ আছে কি না—হরিণ, ছাগল পাখী নিদেন সাপ কিম্বা গো-সাপ সে নির্জ্জন দ্বীপে বাস করে কি না। যদি প্রমাণ হয় দ্বীপ প্রাণ-হীন, তা হলে সে পথিকের চিত্ত আকর্ষণ করে না।



স্বোয়ে ডাগনের একটি দৃশ্য

—রেঙ্গুন-নদী—

উষার আলো পথ দেখিয়ে আমাদের নিয়ে গেল রেঙ্গুন নদীর মধ্যে। সে ইরাবতীর এক শাখা। গঙ্গার জলের মত তার জল মাটিমাখা ঘোলা। জাহ্নবীর মত সে খর-প্রবাহ। কিন্তু সাগর ছেড়ে নদীতে প্রবেশ ক'রে আগন্তুক গঙ্গার ডান দিকে যেমন নিবিড় বনানী দেখতে পায়—সে দৃশ্য রেঙ্গুন নদীর কূলে নাই। কারণ ভাগীরথীর বাম কূলে সাগরের মিলন-ক্ষেত্রে সুন্দরবন। পরপারে বাগান আর চষা জমী দেখা যায় বালীয়াড়ির পিছনে।

বর্ম্মার প্রবেশ-পথে দু-কূলে চষা জমি—ধানের ক্ষেত। ভোরের আলোয় হাসি-মুখে তরুণ ধানের শীষ আমাদের শুভাগমন প্রার্থনা করলে। যেন বাঙ্‌লা দেশের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। সেই মাঠ—সেই ক্ষেত। মাটির কূল—কূলের ভাঙ্গন। গাল উড়ছিল ঝাঁকে ঝাঁকে, আর শঙ্খচীল।

যখন পল্লীর মাঝে মাঝে একটা বুদ্ধ মন্দির জেগে উঠ্‌ছিল তখন মোহ ভাঙ্‌ছিল—এরা তো বাঙ্‌লা দেশের

শিব-মন্দির নয়—মসজিদ নয়। ভিন্ন ধরণের গড়ন এদের স্বোয়ে ডাগনের মত—দেবতার রাজ-ছত্রের প্রতীক।

মাঠে গরু চরছিল—চার-পেয়ে গরু। রাখাল কাজ করছিল—কৃষক ধানের নাচন দেখছিল—তবে বুঝ্‌তে পারলাম না বাঙালী কৃষকের মত ভাবছিল কিনা—পাকা ধান বেচে কোন্ উকীলের পেট ভরিয়ে নিজের পেটের প্লীহাকে বাড়বার অবসর দেবে। মাত্র ভূ-পর্য্যটক আমরা, সে-সব গভীর মনস্তত্ত্বের দিক থেকে তাদের যাচাই করলাম না।

একজন বল্লেন—এরা বড় আয়েসী। ভারতবর্ষ থেকে কুলী এসে বর্ম্মীর কৃষি-কার্য্য করে দেয়।

তাতে কার নিন্দা হ'ল বুঝলাম না—বর্ম্মীর, না ভারতবাসীর। কি জঞ্জাল! রাজ্যের লোকের কুলির কাজ করে মরে কেন তারা—যাদের বাবুরা মুখে লম্বা লম্বা কথা বলে। ইংরেজ পরের দেশে গিয়ে জজীয়তী করে, সওদাগরী করে, রেল বানায়, সেতু নির্ম্মাণ করে। আর পোড়া কপাল নিয়ে তেলেগু আর বেহারী সারা বিশ্বে শ্রমিক সেজে ঘুরে বেড়ায় কেন?

একজন বল্লে—এদের দেশে বাঙালী জজ আছে, ডাক্তার আছে—আর আছে উকীল আর কেরাণী। মুসলমান বাঙ্গালী ব্যবসাদার আছে।

আসল টাকাটা লোটে কারা?

—আজ্ঞে তা যদি বল্লেন—সিন্ধী ভাটিয়া আর চেটী। মাড়োয়ারী চেষ্টা করছে—তবে এরা তো বাঙ্গালীর মত এত নরম নয়—এদের ঘাল করতে পারছে না।

—আর বাঙ্গালী!

জাহাজ নোঙ্গর করবার অনতিবিলম্বে নমুনা পেলাম। সিন্ধীর আর চেটীর সরকাররূপে সে জাহাজে এলো মাল নামাতে—সরিষার তেল যা পেশাই হ'য়েছে বাঙ্‌লা দেশে মাড়োয়ারীর কলে।

আর এলো বাবু—ধুতি-পরা সার্ট-পরা।

—আইনন্দ বাজার নেবেন? অমরত বাজার? ভারতবর্ষ?

—আপনি রেশম আর প্যাগোডা আর চুণী আর কাঠের পুতুল না বেচে খবরের কাগজ বেচেন কেন? পরিশ্রম তো সমান— লাভ বেশী।

—কি করব বাবু—বাপের পয়সা নাই।

বাপের পয়সা নাই! বাপের পয়সা নাই! কে জানে চিত্তরঞ্জন এভিনিউর প্রাসাদ-স্বামীরা বাপের কত পয়সা নিয়ে কাপড় বেচতে আরম্ভ করেছিল।

—রেঙ্গুন—

বন্দরে নামবার চাঞ্চল্য কেবল যাত্রীদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না—কাজ বাড়ে জাহাজের কর্ম্মচারীদের। রেঙ্গুন পৌছিবার বহুপূর্ব্বে প্রভাতের আলোকে উজ্জ্বল স্বোয়ে-ডাগন প্যাগোডার স্বর্ণ-চূড়া আমাদের আকর্ষণ করছিল। আর সব ফুটে উঠ্‌ছিল ছবিতে পরে—স্বোয়ে ডাগন রেঙ্গুনের সোণার চূড়া।

পাইলট্ উঠেছিল নদীর মুখে। প্রাতরাশের সঙ্গে জাহাজ দিলে রেঙ্গুনের অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আর মান-চিত্র সব আরোহীকে। পুলিস এলো—পার্শার হীল সাহেব তাদের মিষ্টভাষে তুষ্ট করছিল যাতে রূঢ় বাক্য ব'লে তারা যাত্রীদের কোমল মনে ব্যথা না দেয়। আর তোয়াজ করছিল কাষ্টম্‌স্ কর্ম্মচারীকে। আমরা একে একে তাদের কাছে গেলাম। হীল সাহেব চতুর উকীলের মত "লিডিঙ্" প্রশ্ন করে তাদের কাছে প্রমাণ করে দিলে আমরা বিনা-শুল্কে মাল আমদানী করতে ব্রহ্মে আসিনি—আর চোরা গোপ্তা বন্দুক নাই আমাদের কাছে। একজন সাহেবের একটা রিভলভার ছিল। পার্শার পূর্ব্বাহ্নে তার পাশ হাতে রেখেছিল—তার অব্যাহতি হ'ল। ডাঃ পাল একমুখ হাসি নিয়ে বর্ম্মী ডাক্তারের কাছে প্রমাণ ক'রে দিলে আমরা এক একটি ভীম। একজন মেয়ে-ডাক্তার মেয়েদের স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে সদালাপ করলেন আরোহিণীদের সঙ্গে। শেষে সাহেবের শিশুকন্যা শীলাকে আদর করে নেমে গেলেন। শীলা ছিল জাহাজের স্নেহের কেন্দ্র-স্থল। তার বাপ বল্‌ত—শীলা ভাড়া দেয়নি কিন্তু সবার চেয়ে অধিক মজা লুটছে সে। সত্য কথা। সবাই তার গাড়ি ঠেল্‌তো, আর সকলকে দেখে সে হাস্‌ত। তার চোখের রঙ্ ঠিক সমুদ্রের জলের মত—নীল।

ভূ-পর্য্যটক মুরুব্বিয়ানার মেজাজ নিয়ে দেশ দেখে—আর দেশের লোক সম্বন্ধে সে নিজেকে ভাবে বিচারক। মিস্ মেয়ো থেকে কারাপারার মুকানী পর্য্যন্ত সকলের

মনের এক ভাব—লীলারঙ্গে স্বর্গ ছেড়ে তারা পৃথিবীতে এসেছে—লোকের দুর্ব্বুদ্ধির প্রমাণ সংগ্রহের জন্য।

কিন্তু যাদের রসিকতা আর লেখার যশ প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে পরের দুর্ব্বলতা নিয়ে পরিহাস ক'রে—তারাও স্বোয়ে-ডাগনের নিন্দা করবার দুঃসাহস দেখায় নি। রাডিয়ার্ড কিপ্লিঙ্, অলডুস হাক্সলিও এই বৌদ্ধ মন্দিরের সুখ্যাতি করেছে। খণ্ডভাবে এর প্রত্যেক অংশের কারুকার্য্য যেমন মনোরম—অখণ্ডভাবে তেমনি সে দৃষ্টি-সুখকর।

স্বোয়ে-ডাগনের ফটকে আমাদের ধরলে এক পাণ্ডা। জুতা খুলে রাখলাম এক ফুলওয়ালীর দোকানে। সিঁড়ি বয়ে উঠ্‌তে লাগলাম। একটা অচলের উপর এই প্রাচীন মন্দির প্রতিষ্ঠিত—যেমন নীলাচলে জগন্নাথদেবের মন্দির।

প্রতি পদে অপর্য্যাপ্ত শিল্পের নিদর্শন। কাঠের কাজে বর্ম্মী প্রসিদ্ধ। কিন্তু তার শিল্পের চরম উৎকর্ষ এই মন্দিরের প্রত্যেক অংশ। সোজা উঠে পৌছিলাম সেখানে যেখানে কিম্বদন্তীর মতে প্রভুর দন্ত সমাধিলাভ করেছিল। অনেক মূর্ত্তি আছে এই প্রধান মন্দিরে। কাষ্ঠমূর্ত্তিই অধিক। সবাই সোনার পাতে মোড়া।

সিঁড়ির দুদিকে দোকানের সারি আছে—ভিখারী আছে। মাঝে একপার্শ্বে একটা বাজার আছে—সেখানে নাপ্পি থেকে অমিতাভের মূর্ত্তি অবধি সবই বিক্রী হয়। অপরদিকে আছে কতকগুলা যাত্রীদের থাকবার বাড়ী। যারা ফুলওয়ালীর দোকানে জুতা রাখে না তারা জুতা হাতে নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করে। কিন্তু জুতা খোলা চাই প্রত্যেকের – এ নিয়ম অনিবার্য্য।

এতে নাসিকা-কুঞ্চনের কারণ নাই। কারণ এত পরিচ্ছন্নতা ভারতবর্ষের মধ্যে কতকগুলি জৈন মন্দির ব্যতীত অতি অল্প ধর্ম্মভবনেই দেখেছি। প্রত্যেক বর্ম্মীর সাধনা পরিষ্কার বেশ-ভূষা করা। তাদের গরীবদের স্ত্রীলোকরাও ধব্‌ধবে লুঙ্গি পরে। মুখে মাথে তানাখা—শিক্ষিতেরা বিলাতী পাউডার মাখে। কিন্তু তাদের পরিচ্ছন্নতা যে অতীব প্রশংসনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বেদীর সামনে আছে মাদুর পাতা। পূজার্থিনীরা সেখানে নতজানু হ'য়ে বসে পূজা করছে—নিঃশব্দে। ভিখারীরা এদের পা ধরে টানে না—পাণ্ডারা এদের শোষণ করবার জন্য মনকে দেবতার কাছ থেকে তুলে তাদের দান করলে কি ফল হয় সে গবেষণায় সন্নিবিষ্ট করে না। ছুঁৎ-মার্গকে নিষ্কণ্টক রাখবার জন্য বর্ম্মী ও চীনে চারিদিকে জল ঢেলে কাদা করে না—আর মহাপ্রসাদ গ্রহণ ক'রে ভাঙ্গা ভাঁড় ফেলে প্রাঙ্গণকে দুর্গম করে না। ফুলগুলিও চট্‌কানো নয়—দোলন-চাঁপা, গোলাপ আর গাঁদা। বেদীর সম্মুখে অনেক চীনামাটির ফুলদান আছে। ভক্তেরা তাতে ফুলের ছড়ি বসিয়ে দিয়ে প্রাঙ্গণে বাহির হয়।

স্বোয়ে ডাগনের প্রাঙ্গণ পুরীর শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই বিস্তৃত প্রাঙ্গণেরও চারিদিকে তোরণ আছে। প্রাঙ্গণে অসংখ্য মন্দির, আর ততোধিক বুদ্ধ মূর্ত্তি। মহা-পরিনির্ব্বাণ মুদ্রায় শায়িত প্রকাণ্ড মূর্ত্তি বড় চিত্তাকর্ষক।

একটা বড় হল আছে। বুদ্ধের নামে যারা ইষ্টলাভ করে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে উপহার এনে মন্দিরে স্মরণ চিহ্ন রেখে যায়। এ-যাদুঘরে অনেক সোণা রূপা পাথর ও কাঠের পদার্থ আছে। আর অনেক ঘড়ি আছে। আর আছে একটা রূপার স্পোর্টিঙ্ কাপ! কোনো ছেলে দৌড়-প্রতি-যোগিতায় সেটাকে লাভ ক'রে প্রভু বুদ্ধ লাগি উৎসর্গ করে গেছে! মিথ্যা মামলা জিতে কে কি দান করেছে তা ধরতে পারলাম না।

প্যাগোডার বিস্তৃত প্রাঙ্গণে শ্যামরাজের উৎসর্গ করা মন্দির আছে—চীনা ভক্তদের মন্দির আছে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম এখনও সজীব—কারণ সবাই মিলে পরিশ্রম ক'রে মন্দিরকে পরিষ্কার করে—জীর্ণ-সংস্কার করে। বৌদ্ধেরা মানুষের সঙ্ঘগত মঙ্গল চায়—তাই পাণ্ডাকে ঘুষ দিয়ে ধনীরা নিজেদের দর্শন করবার জন্য অপরের নিগ্রহ করে না—যেমন করে তারা কাশী গয়া পুরী আর ভুবনেশ্বরে। তবে কালীঘাটে মার খেয়ে ধাক্কা খেয়ে পকেটের টাকা বাঁচিয়ে যারা মন স্থির ক'রে মাতৃ-আরাধনা করতে পারে—ভক্তের মধ্যে তারা শ্রেষ্ঠ। চীনে মন্দিরে কিম্বা বর্ম্মী ফায়ায় ধাক্কাধাক্কি নাই। ব্রহ্মে মন্দিরকে বলে—ফায়া। ফায়ার প্রাঙ্গণে মন্দিরশ্রেণীর সম্মুখে বৌদ্ধ-ভিক্ষু বা ফুঙ্গিরা ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে সার বেঁধে নিঃশব্দে চলে শ্রদ্ধার দান পাবার আশায়।

রেঙ্গুন সহর কলিকাতার মত বিস্তৃত নয়—কিন্তু সৌধমালায় বিভূষিত। এখানে পাঁচ মিনিট ঘুরলে

দারুণ অভিমান অভিভূত করে বাঙ্গালীকে। প্রথমতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রে এত অর্থ লুটে নিচ্চে এদেশে পাঁচ ভূতে—তাদের মধ্যে এক ভূত বাঙ্গালী নয় কেন? অভিমান অবশ্য অন্যায়। যে নিজের দেশে দোকান-পাট করে না—ব্যবসা-বাণিজ্যকে মনে করে হীন—সে অকস্মাৎ চকচকে পরিষ্কার ব্রহ্মদেশের রাজধানীতে গিয়ে অর্থ অনর্থ সংগ্রহ ক'রে কেন হাতকে করতে যাবে কলুষিত। বর্ম্মী স্ত্রীলোকগুলা বেশ সুন্দরী—ক্ষণভঙ্গুর মৃণালের মত মনে হয় তাদের দেহ। তাদের দেশে বেশ ফুল ফোটে, আর তাদের লেক—আহাঃ ঢাকুরের হ্রদ তার হীন অনুকরণ। চারিদিকে উঁচু গড়ানে জমির সানুদেশে ঘুরে বেড়াচ্চে লেকের তরল সুষমা—মাঝের দ্বীপগুলা পাহাড়ের ঢিপি। এই সৌন্দর্য্যের মধ্যে বাস ক'রে বর্ম্মী পরিশ্রম আর প্রতিযোগিতার পথ বর্জ্জন করেছে। আর কৃষ্টি আর আর্টের সাধক বাঙ্গালী কিনা তেল আর চাল আর ছাই-ভস্ম স্পর্শ করে তুচ্ছ কাঞ্চন-বিলাসী হবে। বাড়-বাড়ন্ত হোক—পোযে নৃত্য আর ওরিয়েণ্টাল ডান্স। জঠর-জ্বালা তো আছেই—কিন্তু সে শিল্প আর চারু-কলার মনের মত সৌষ্ঠব সম্পাদন করে না কস্মিনকালে।

আর দুঃখ হয় আমাদের মিউনিসিপালিটীর কথা স্মরণ ক'রে। বর্ম্মীরা স্বায়ত্ত শাসনের সাধনায় ঝগড়া করে কিনা জানি না। কিন্তু তারা একটা কাজ করে। করদাতার পয়সার সদ্ব্যবহার ক'রে পথ-ঘাট পরিষ্কার করে, মেরামত করে। পথে আবর্জ্জনা নাই—মোটরে বসে আরোহীর সেই দশা হয় না—কুলোয় চড়ে ডালের যে দশা হয়। পথের ধারে শিশুদের খেলবার বাগান—কুষ্ঠ-রোগী আর সংক্রামক ব্যাধি-গ্রস্ত গৃহহীন অশেষ রোগের বীজাণু জীবাণু সে গুলাতে বিস্তার করে না যে কার্য্য অবাধে তারা করে উত্তর কলিকাতার উদ্যানে।

দেশ-ভক্ত বন্ধু বল্লেন—এদের ছোট সহর পরিষ্কার রাখা আর কি শক্ত?

তার পর যে তর্ক উঠ্‌লো তা লিপিবদ্ধ করলে—মানহানির দায়ে কারাবাস অনিবার্য্য।

(ক্রমশঃ)

কবিতা

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতার
অর্থ ওরা চায়;
করে' যায় মোরে তাই রূঢ় উপহাস।
নিঃসঙ্গ এ জীবনের সুবিস্তীর্ণ শূন্য অবকাশ
পরিপূর্ণ হোয়ে ওঠে যে অনর্থ স্বপনের দুঃখে আর সুখে,
অহৈতুক উচ্ছ্বাসের যে লহরী জাগে সকৌতুকে,
যে ফুল বিকাশে স্মিত মর্ম্ম আপনার—
দাম নাই তার।
অকারণ
তবু সারা মন
হাসে কাঁদে কাল্পনিক মায়ালোকে বসি';
আমার আকাশে তবু রহস্যের আসে চতুর্দ্দশী।
অন্তর-বীণায় যেন অনন্ত সপ্তকে শুধু বাজে অবিরাম
বেদনানন্দের কোনো নৈর্ব্যক্তিক বিরাট প্রণাম;
প্রাণের অমৃত-হ্রদে করে ঝলমল
কবিতা-কমল॥



বায়ুর স্বরূপ

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায় এম-এস্-সি

বায়ু সমুদ্রে পৃথিবী নিমজ্জিত। যেদিকে তাকাই আনাচে কানাচে সর্ব্বত্র ইহার আনাগোনা। এত কাছে, এত আপন প্রাণের প্রাণ আর কেহ আছে কিনা জানি না। ইহা গন্ধহীন, ধার-করা গন্ধ নিয়া লোকের মনোরঞ্জন করে। বর্ণহীন তাই অদৃশ্য ; অসীম তাই নিরাকার। এই অনন্ত, অপার, বায়ু-সাগর কবি, মহাকবিদের মস্ত ভাবের সামগ্রী। মেঘের জটা মস্তকে ধারণ করিয়া ইহার গৌরব। সে যে কি গৌরব মুকুট—তাণ্ডবনৃত্যে তাহার পরিচয়। ঝড়, ঝঞ্ঝা, বাত্যা—এগুলি উহার রুদ্রমূর্ত্তি। এত শান্ত নির্দ্দোষ বায়ুরাশি, তাহাকেও আবার ঐ মূর্ত্তিতে ধ্বংসলীলায় যোগ দিতে হয়। বায়ুর উন্মত্ত প্রলাপে যে বিপর্য্যয় সাধিত হয় তাহা কল্পনাতীত। মহানগরীও একদিনে ধূলিসাৎ হইতে পারে—ক্ষণভঙ্গুর বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার পরিচয় এইখানে। বায়ুর এরূপ অদম্য উৎসাহ দেখিয়া একদিন সভ্য অসভ্য জাতিগণ আকাশে দৈত্যপুরী নির্দ্দেশ করিতেন। উহাদের ভীমগর্জ্জন, যুদ্ধ, কলহ ও ক্রোধের ফল ঐ ঝঞ্ঝা বাত্যা, মেঘগর্জ্জন, বিদ্যুৎচমক ইত্যাদি। আজ সেই পৌরাণিক কল্পনার বেড়াজাল অনেকটা ছিন্ন ভিন্ন তাহাদের বুদ্ধির ঝুলি একেবারেই নিঃশেষিত। বিজ্ঞান বুদ্ধি উহাতে নূতনতার সংযোগ করিয়া অনেক কিছু চমকপ্রদ, বিশ্বাসযোগ্য বার্ত্তার অবতারণা করিয়াছে। এরূপ বিচারসঙ্গত কথার সূত্রপাত করেন গ্রীকগণ। বহু যুগ পূর্ব্বে তাহাদের উর্ব্বর মস্তিষ্কে অনেক কিছু সৌন্দর্য্যের ছাপ পড়িয়াছিল। তখন তাহারা বায়ুকে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এক প্রকার হাল্কা অদৃশ্য বস্তু বলিয়া। তাহাদের মতে উহা ছিল বস্তুবিশেষের আণবিক পরিণতি। এরিষ্টটল্ (Aristotle) ভিট্রিভিয়াস (Vitrivius) প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিকগণ এদিকে গবেষণা করিয়াছেন। এমন কি বায়ু যে একটা বস্তু—যেমন ইট পাথর এবং উহাদের ন্যায় তাহারও গুরুত্ব (weight) আছে ইহা উহারাই প্রথম প্রমাণ করিয়াছেন।

গ্রীকদের জ্ঞানপ্রদীপ নিবিয়া গেলে প্রায় দ্বিসহস্র বৎসরব্যাপী একটা অজ্ঞানতার আবরণ পৃথিবীকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে। তারপর আরম্ভ হয় আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রতিভার বিজয় দুন্দুভি। রাসায়নিকের স্কন্ধে পতিত হয় বায়ুর স্বরূপ নির্ণয় করিবার দায়িত্ব। সাধক, পাগল, বৈজ্ঞানিক তাহার কর্ত্তব্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে—আজ বায়ুমণ্ডলের হিসাব নিকাশ সম্পূর্ণ পরিষ্কার ; বিশ্ববাসীর দরবারে তাহা পেশ করা আছে, যে কেহ উহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারে।

বায়ুমণ্ডল যে কয়েকটী রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা গঠিত তাহাদের মধ্যে নেত্রজন (Nitrogen), অম্লজান (Oxygen), জলবাষ্প (water vapour) ও অঙ্গারাম্লজান (carbon dioxide) প্রধান। এতদ্ব্যতীত ওজোন (Ozone), জলজান (Hydrogen) হিলিয়াম (Helium) প্রভৃতি অনেকগুলি পদার্থও বর্ত্তমান, কিন্তু ইহাদের মাত্রা এত কম যে উহারা কেবলমাত্র নামের গৌরব বহন করিয়া থাকে। কার্য্যক্ষেত্রে উহাদের কতটুকু মর্য্যাদা আছে বলা কঠিন। প্রধান চারিটী পদার্থের মধ্যে নেত্রজানের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী (শতকরা ৭৭½ ভাগ) ; তৎপর অম্লজন (২০ ভাগ) জলীয়বাষ্প (১'৪ ভাগ) ও অঙ্গারাম্লজান ('০৩ ভাগ) প্রভৃতি গ্যাসগণ তাহাদের সামান্য পুঁজি নিয়া একে একে আসিয়া দাঁড়ায়। কেহ কেহ বলেন পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে ৫০০ মাইল পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল অবস্থিত, আবার একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের মতে ২০০ মাইল পর্য্যন্তই ইহার মোটামুটি স্থিতি। ৬০ মাইল পর্য্যন্ত আকাশের স্বরূপ আমরা সহজেই নির্ণয় করিতে পারি এবং সাগরবক্ষ হইতে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতের উচ্চতা নির্ণয় করিলে দেখা যায় ৬ মাইলএর উপরে তাহা উঠে না। এই ৬ মাইলব্যাপী বায়ুস্তরে সাধারণতঃ উক্ত চারিটী পদার্থই বর্ত্তমান, উচ্চতর ভূমি হইতে সময়ে সময়ে একটু ওজোন নামিয়া আসে। তৎপর ৩০ মাইল ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত যে বায়ুসাগর তাহাতে আছে কেবলমাত্র নেত্রজান, অম্লজান ও ওজোন। ৬০ মাইলএর উপরে জলজান ও হিলিয়াম ব্যতীত অন্য কোন মৌলিক পদার্থের অবস্থান ধরা যায় নাই। রাসায়নিক দৃষ্টিতে বায়ুমণ্ডলের স্বরূপ একপ্রকার ইহাই। কিন্তু উহাকে আরও ভাল করিয়া জানিতে হইলে উক্ত প্রধান চারিটী গ্যাসের প্রকৃতি সম্যক পর্য্যালোচনা করা একান্ত দরকার।

বায়ুতে নেত্রজনের মাত্রাধিক্য হইলে কি হইবে—ওখানে অম্লজানকেই আমরা শ্রেষ্ঠাসন দিয়া থাকি। প্রকৃতপক্ষে ইহাই আমাদের প্রাণের প্রাণ। প্রাণপ্রদীপ হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় প্রদীপের ইহাই একমাত্র রসদ। ইহার অভাবে কোন অগ্নুৎপাদন করা প্রায়শঃ অসম্ভব। অগ্নির পরিচয়ই অক্সিজেনের কল্যাণে। কাহার তুলাদণ্ডে এই গ্যাসগুলীর মাত্রা স্থিরীকৃত হইয়াছিল জানি না, কিন্তু এরূপ পরম কল্যাণকর বিধিব্যবস্থা দেখিয়া বিস্ময়ই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে এরূপ অপরিবর্ত্তনীয় বন্দোবস্ত দেখিয়া এক অনন্ত অপার শক্তির কথাই মনে হয়। সেখানে অক্সিজেনের মাত্রা খুব বেশী হইবার কোন ব্যবস্থা নাই, তাহাতে অকল্যাণ হইবারই বেশী সম্ভাবনা। ইহার মাত্রাধিক্য হইলে প্রাণপ্রদীপ অতি দ্রুত জ্বলিয়া যায়—ফলে জগতে অল্পায়ুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। আবার কম হইলেও মুস্কিল—নেত্রজনের পক্ষে প্রাণ সংরক্ষণ করা অসম্ভব। যাহার যেরূপ স্বভাবগত ধর্ম্ম—একা নেত্রজন প্রাণশক্তির পরম শত্রু। একক হিসাবে উভয়েই বিষম ফল প্রসব করিয়া থাকে। এই জন্যই অম্লজানের সহিত নেত্রজনকে

পরিমাণ মত গাঁথিয়া দেওয়াতে দশদিক রক্ষা হইয়াছে। অম্লজানকে আমরা নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করি ; উহা শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া যত প্রকার দূষিত পদার্থ নষ্ট করে এবং শেষে অঙ্গারাম্লজান (carbon dioxide) রূপে আকাশে নির্গত হয়। ইহারই তৎপরতায় দেহের তাপশক্তি রক্ষা পাইয়া থাকে।

বায়ুস্থ অঙ্গারাম্লজানেরও বিশ্বদরবারে অনেক কিছু দেওয়ার আছে। বিশ্বকর্ত্তা অযথা উহাকে আকাশের গায়ে ভাসিতে দেন নাই। কর্ত্তব্যের বোঝা স্কন্ধে নিয়া উদ্ভিদ্‌জগতের কাছে উহাকে আত্মাহুতি দিতে হয়। অম্লজানের ন্যায় ইহা এ সমাজের প্রাণ। সূর্য্যকিরণের কল্যাণময় পরশে বৃক্ষাদি লতাপাতা অঙ্গারাম্লজানকে দ্বিধা বিভক্ত করে অঙ্গার উহাদের শরীর গঠনে নিযুক্ত হয়, মুক্ত অম্লজান বায়ুতে আশ্রয় লাভ করে। বায়ুর সাম্যতা রক্ষা করিবার ইহাই কৌশল। প্রাণীজগৎ অম্লজানকে পান করে, অঙ্গারাম্লজানকে মুক্ত করিয়া দেয় ; অপরদিকে বৃক্ষাদি লতাপাতা অঙ্গারাম্লজানকে পান করে, অম্লজানকে ছাড়িয়া দেয় ; চক্রীর চক্র সুন্দর ঘুরিতে থাকে—বায়ুর অঙ্গহানি হওয়া দূরে থাকুক, চিরন্তন সত্য সমন্বয়-বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হয়। এজন্যই পশুপক্ষী, মনুষ্য, অম্লজান গ্রহণ করিলে প্রকৃতির ভাণ্ডারে উহার উন হয় না ; আবার যদিও অঙ্গারাম্লজান উহাদেরই দ্বারা আকাশে বিচ্ছুরিত হয় তথাপি বৃক্ষাদি দ্বারা দ্বিধা বিভক্ত হওয়াতে মাত্রাধিক্যের প্রশ্ন কাহাকেও উৎপীড়িত করে না। প্রাণী জগতের নিকট অঙ্গরাম্লজান অতীব বিষাক্ত পদার্থ, এজন্য ইহাকে বায়ুতে সন্নিবেশ করিতে যাইয়া ব্যবস্থাপক অতি সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। এখানে একটা কথা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—দেখা যায় বৃক্ষাদির কর্ত্তব্য অম্লজানকে রাসায়নিক শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া—কাজেই যেখানে গাছপালা ও অপর্য্যাপ্ত সূর্য্যকিরণ বর্ত্তমান সেখানে ইহার আবির্ভাবও বেশী, গাছপালাকে বাদ দিয়া জীবসমাজের কথা ভাবা সমীচীন মনে হয় না।

জলীয় বাষ্প বায়ুতে থাকিয়া জীবজন্তু বৃক্ষাদির অজস্র কল্যাণ সাধন করিতেছে। দৈনিক আবহাওয়ার উপর উক্ত বাষ্পাবরণের একটা বিশেষ প্রতিক্রিয়া আছে। বাষ্পাভাবে বায়ুমণ্ডলের তাপ প্রায় ২৪ ডিগ্রি নামিয়া যাইত। তাহাতে শীতপ্রধান দেশের অবস্থা হইত বিশেষ সঙ্কটাপন্ন, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অবস্থাও নেহাৎ আরামপ্রদ হইত না। এই বাষ্পনিচয় পৃথিবীকে কম্বলের ন্যায় ঘিরিয়া রাখিয়াছে, এজন্য পৃথিবী শৈত্যাধিক্য ও গ্রীষ্মাধিক্য হইতে মুক্ত। ইহা অতিশয় হাল্‌কা বলিয়া প্রায় সব সময়ই উর্দ্ধপ্রদেশে অবস্থান করে সেখানে সুবিধামত জমাট বাধিয়া মেঘে পরিণত হয় ও কল্যাণময়ের আশীর্ব্বাদ নিয়া ধরা পৃষ্ঠে পতিত হয়। জলবাষ্প বায়ু হইতে যদি হাল্‌কা না হইত তবে এক অদ্ভুত দৃশ্য পৃথিবীর বুকে প্রকাশ পাইত। জীবজন্তু দিন-রজনী এক কুয়াসাসাগরে নিমজ্জিত থাকিয়া একে অপর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িত, চক্ষু থাকিয়াও মানুষ চোখের মর্ম্ম বুঝিত না—একটা হট্টগোল চতুর্দ্দিকে বিরাজ করিত। মানুষ যতই তাহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার গর্ব্ব করুন, এ সমস্ত সামান্য বিধিব্যবস্থার ইঙ্গিত দেখিয়া সকলকেই বিস্মিত ও পুলকিত হইতে হয়। প্রকৃতির গবেষণাগারে যে কি অসীম চাতুর্য্য, কল্পনায়ও তাহার কূল পাওয়া যায় না।

বায়ুতে যতগুলী রাসায়নিক উপকরণ আছে তন্মধ্যে অম্লজানকে শ্রেষ্ঠাসণ দেওয়া হয় সত্য, কিন্তু নিখুঁত বিচারকের কাছে কাহারও মর্য্যাদা কম মনে হয় না। প্রত্যেকের একটা বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেই বৈশিষ্ট্যের মূল্য ও গভীর। একটির অভাবে বিশাল উদ্দেশ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে, অপরটীর মহিমা নিস্তেজ হইয়া যায়। বায়ুতে নেত্রজনের স্থানও অতি উচ্চে। উহার স্বভাবে কর্ম্মচাপল্য (Chemical activity) নাই সত্য, কিন্তু এক গোপন পথে ইহা বিধাতার অভিলাষ পূর্ণ করে। সাধারণ মানুষের নিকট ইহার প্রাধান্য ধরা পড়ে না এ জন্যই। নেত্রজন জলজান উভয়ই প্রাণী জগতের প্রাণ। নেত্রজনকে বাদ দিয়া কোন পুষ্টিকর খাদ্য হয় না। খাদ্যের শ্রেষ্ঠত্বের বিচার উহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কিভাবে বায়ু-সমুদ্র হইতে ইহা উদ্ভিদ্ ও প্রাণীজগতে আনাগোনা করে তাহা রসায়নের এক রহস্যময় কাহিনী। আকাশ জুড়িয়া যাহার রাজত্ব পৃথিবীর বক্ষে আবার তাহারই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। বায়ুতে বিদ্যুৎ চমকে আমাদেরই কল্যাণের জন্য। দরকারমত বিশ্বযন্ত্রী বিরাট বৈদ্যুতিক যন্ত্রে চাবি টিপিয়া ধরেন—আর আকাশে হয় এক রাসায়নিক ঢেউ—নেত্রজন ও অম্লজান সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ এবং বৃষ্টিসংযোগে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়। নেত্রজনকে ধরাপৃষ্ঠে বাঁধিবার জন্য একদল কারিকরও আছে, উহারা ভূগর্ভে বাস করে এবং সুযোগ বুঝিয়া বায়ু হইতে উহাকে কোন কোন উদ্ভিদ পদার্থে প্রবিষ্ট করায়। এরূপ দ্বিবিধ পদ্ধতিতে নেত্রজন মাটিতে আসিয়া স্থান পায়। ভূগর্ভস্থ কারিকরদের আলস্য নাই, উহাদের চেষ্টায়ই নেত্রজন বৃক্ষাদি লতাপাতায় স্থান লাভ করে এবং ক্রমে আহারীয় পদার্থরূপে জীব-জন্তুর পুষ্টিসাধন করে। ক্ষুদ্র জীবাণুদের কার্য্যকাহিনী চিন্তা করিলেও বিস্ময়ে আপ্লুত হইতে হয়। দুনিয়ায় কেহই অকর্ম্মণ্য জীবন যাপন করে না। বিশ্বসংসার চালনার জন্য কল্যাণময়ের প্রত্যেক বিধিব্যবস্থা কৌশলে পূর্ণ। কোথাও একবিন্দু ক্রটি বা গলদ নাই। অতি ক্ষুদ্র কীট হইতে অতি বুদ্ধিমান মানুষ পর্য্যন্ত প্রত্যেকের জন্য তিনি একই ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন! ধর্ম্মের নামই সেবাধর্ম্ম। পরের জন্য জীবনযাপন করাই প্রকৃতপক্ষে স্ব স্ব জীবন সার্থক করা।

ইহাই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। গোপন হস্তের কাজ বলিয়া নেত্রজনকে আমরা তত কার্য্যকরী বলিয়া মনে করি না। ইহা যেমন গোপন পথে ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হয়, সেরূপ গোপনেই বায়ুতে ফিরিয়া যায়। গাছপালা, পশুপক্ষীর শরীর ধ্বংসপ্রাপ্তির সাথে সাথে কীটাণুগুলী আবার উহাকে উর্দ্ধে যাইবার পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। বিশাল আবর্ত্তনের একবিন্দু দাম নেত্রজনকেও দিতে হয়।

বায়ুর আধুনিক তরল পরিণতি বিজ্ঞান রাজত্বে এক জয়স্তম্ভ। ইহাকে জলবৎ তরল দেখিতে পাইলে কাহার না বিস্ময় উৎপাদিত হয়। ঠিক্ যেন ছলছল্ জল। বায়ুকে এ অভিনবাবস্থায় পৌঁছিতে অনেক উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে। বায়ু মণ্ডলের চাপ ২০০ ডিগ্রিতে বর্দ্ধিত করিয়া এবং ক্রমাগত ঠাণ্ডা লাগাইয়া বায়ুর এবংবিধ অবস্থান্তর করা সম্ভব

হইয়াছে। ইহা তরলরূপে পরিণত হয়—১৮০° ডিগ্রিতে অর্থাৎ উহার তাপমান বরফ হইতে ১৮০° ডিগ্রি নিম্নে অবস্থান করে। বরফের শীতে মানুষ জড়সড়, এ দুরন্ত শীত নিশ্চয়ই এক কল্পনা রাজ্যের ছবি মানুষের পক্ষে জমাট শত্রু। তরল বায়ু এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। এক ফোঁটা হাতে লইলে হাত ছিন্নভিন্ন হয়, ইহার জমান শক্তি পাহাড় পর্ব্বত পর্যন্ত উলটপালট করিয়া দিতে পারে। ইহা বরফের উপর টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকে, শৈত্যাধিক্য হেতু ইস্পাত পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠে ঠিক্ যেন কাগজে অগ্নিসংযোগ করা হইল। অদ্ভুত প্রাকৃতিক লীলা। চরম শীত ও চরম গ্রীষ্ম উভয়ের মধ্যে একই ধর্ম্ম প্রকাশিত। যত বিরুদ্ধ ভাবের হাওয়া চলুক না কেন, চরমে সবই এক সমন্বয় ক্ষেত্রে আসিয়া মিলিত হইবে। এক দুই, দুই এক—ইহাই সত্য। তরল বায়ুর পেছনে আছে এক বিরাট বৈজ্ঞানিক অভ্যুদয় ও বিশাল তত্ত্ববারিধি। ইহাতে গবেষকের তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত হইল।

রাসায়নিক চক্ষুতে বায়ুর চরিত্র চিত্রিত হইল। যে কেহ ইহার রূপমাধুরী উপভোগ করিয়া সন্তুষ্ট হইবেন। শরীরের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ইহার পবিত্রতারই স্বাস্থ্য অটুট রাখা সম্ভব হয়। প্রকৃতির সেরা দান—ইহাতে তাহার পূর্ণ প্রকাশ—পূজা যত্ন ইহাকেই করিতে হয়। হিন্দুশাস্ত্রে এজন্যই বায়ুকে যথোচিত মর্য্যাদা দেওয়ার জন্য পূজা পার্ব্বণের রীতি আছে। নির্ম্মল বায়ু উপভোগ করিয়া বিশ্ববাসী ধন্য হউক ইহাই প্রার্থনা।

কে বলিয়া দিবে ?

শ্রীবিমল সেন

'তারা মেটার্নিটি হস্পিট্যাল।'

এখানকার সবার চেয়ে বড় এবং সেরা হাসপাতাল এটি। সহরের অনেক স্ত্রীলোক সময়কালে এখানে আসিয়া, শেষে ক্ষুদ্র একটি শিশু বুকে লইয়া, ভবিষ্যতের হাজার রঙীন স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে নিজ গৃহে ফিরিয়া যায়।

আবার এ নিয়মের ব্যতিক্রমও হইয়া থাকে। কেহ হয়ত আসিয়া জীবিত অবস্থায় আর ফিরিয়া যায় না; কেহ অতি অল্প সময়ের মাতৃত্বের স্মৃতি লইয়া শূন্য বুকে অশ্রু-ভরা চোখে ফিরিয়া যায়। কেহ হয়ত যাইবার সময়ে পুনপুন ভাবে—আহা, মেয়ে না হইয়া যদি একটি ছেলে হইত!

বর্ষাকাল। রাত্রি প্রায় দুইটা বাজিয়াছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। বাহিরে সকলে ঘুমের ঘোরে চেতনা হারাইয়াছে! শুধু এ হাসপাতালের অনেকে তখনও জাগিয়া। নিশব্দে সকলে যে যাহার কাজ করিয়া যাইতেছে।

ওয়ার্ডগুলির উজ্জ্বল আলো নিবাইয়া দিয়া [illegible] আলো জ্বালা হইয়াছে। প্রসূতিরা সবাই ঘুমাইয়া। মধ্যে মধ্যে নিজের ছোট দোলনার ভিতর নড়িয়া উঠিয়া পৃথিবীর নবাগত অতিথিরা অশান্তভাবে কাঁদিয়া উঠিতেছে।

উপরে কোণের দিকে 'লেবার ওয়ার্ড'। সেই স্থানেই ঐ ক্ষুদ্র অতিথিরা প্রথম ধরা-পৃষ্ঠে নামিয়া আসে। গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ঐ ঘর হইতে মধ্যে মধ্যে প্রসূতিদের অপরিসীম বেদনার কাতরোক্তি ভাসিয়া আসিতেছে।

কি সে দারুণ অসহনীয় বেদনা! কে যেন ইহাদের অভিশাপ দিয়াছিল। অভিশাপই বটে!

মানুষ আজ বিজ্ঞানের সাহায্যে সে বেদনা অনেকখানি লাঘব করিতে সমর্থ হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাহা খোদার উপর খোদকারি। অধিকাংশ সময়ে বিধাতার উহা পছন্দ হয় না; তিনি মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া থাকেন।

নীচের এক ঘরে আফিস। ঘরের এক কোণে পর্দ্দা-ঘেরা একটি 'বেড'। পাশে কাঁচের টেবিলে 'অ্যান্টিসেপ্টিক্' লোশন তোয়ালে প্রভৃতি রহিয়াছে। অন্য দিকে তন্দ্রা-জড়িত চোখে একটি নার্স চেয়ারে বসিয়া। সম্মুখের টেবিলে কাগজ-পত্র, হাসপাতালে দাখিল করিবার ফর্ম্ম্ প্রভৃতি সাজান। নার্সের হাতে একটি গল্পের বই—ছোট ছোট প্রেমের গল্প।

রাত্রে প্রসব-বেদনা লইয়া যাহারা আসে, তাহাদের হাসপাতালে ভর্ত্তি করাই ঐ নার্সের কাজ। এই হাসপাতালে বহু স্ত্রীলোক আসিয়া থাকে। নার্সদের বই পড়িবার অবসর অত্যন্ত অল্প।

কিন্তু আজ অনেকক্ষণ কেহ আসে নাই। সন্ধ্যা

হইতে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল ; এখন উহা প্রবল বেগে পড়িতে লাগিল। শুধু তাহারই একটানা শব্দ। আর কাহারও সাড়া পাওয়া যায় না। আফিস-ঘরের এক কোণে আয়া বসিয়া ঝিমাইতেছে।

বৃষ্টির গানে এবং প্রেমের গল্পের প্রভাবে নার্সের মন ভারী হইয়া উঠিল। বাহিরের শূন্য বারান্দার দিকে একবার চাহিয়া লইয়া ভাবিল—আজ ঐ ছেলেটা মাত্র দুইবার এদিকে আসিয়াছে! এখন হয়ত নিজের ঘরে অঘোরে ঘুমাইতেছে। তাহার আর কি ? পুরুষ বৈ ত নয়!

'ছেলেটা' এখানকার মেডিক্যাল কলেজের একটি ছাত্র। এ হাসপাতালে ডিউটি দিতে আসিয়াছে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নার্সের চোখ দুটি সজল হইয়া উঠিল। সামনের টেবিল হইতে এক টুকরা কাগজ লইয়া লিখিল—

'এই অন্ধকার রাত ; ঝম্ ঝম্ করে কেমন বৃষ্টি নেমেছে ; একটিও 'পেসেণ্ট' আসছে না—এমন সময়ে ওখানে একলা কি করছ ? বড় বিশ্রী লাগছে—এসো না, একটু গল্প-গুজব করি, লক্ষ্মীটি!'

কাগজখানা ভাঁজ করিয়া নিদ্রাতুর আয়াকে ডাকিতে উঠিয়াই বাহিরে গাড়ীর শব্দ তাহার কাণে আসিল। নিশ্চয়ই কোন 'পেসেণ্ট' আসিয়াছে।

হতাশভাবে চিঠিটা পকেটে রাখিয়া, নার্স আয়াকে ডাকিয়া তুলিল।

বাহিরে বৃষ্টি আরও জোরে নামিয়াছে। নার্স গিয়া চেয়ারে বসিতেই একটি যুবক নিতান্ত ব্যস্ত উদ্বিগ্ন ভাবে আসিয়া দাঁড়াইল। পরণের ময়লা জামা-কাপড় বৃষ্টিতে ভিজিয়া গিয়াছে। চোয়াড়ে বিশ্রী চেহারা। কাঠির মত দেহ। আসিয়াই দম্ লইয়া বলিল—নার্স, একটি রোগী এনেছি। ব্যথায় নড়তে পারছে না। শীগ্‌গীর আনবার ব্যবস্থা করুন···গাড়ীতে আছে—হাঁটতে পারবে না···শীগ্‌গীর······

নার্স শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল—কতক্ষণ 'পেন' আরম্ভ হয়েছে ?

—অনেকক্ষণ।···কথা কইবার সময় নেই নার্স। এখুনি হয়ত হবে···

নার্স আয়াকে বলিল—বেয়ারাদের ডাকো। 'ষ্ট্রেচার' নিয়ে যেতে হবে।

অনতিবিলম্বে 'ষ্ট্রেচারে' করিয়া রোগিনীকে সেই ঘরে লইয়া আসা হইল। বেদনায় একেবারে মুমূর্ষু অবস্থা। পা এবং মুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে। বয়স কুড়ি-একুশ হইবে। ক্ষীণ কাতরোক্তিতে ঘর ভরিয়া উঠিল।

দেখিয়াই নার্স বুঝিতে পারিল, 'লেবার পেন' আরম্ভ হইয়াছে। প্রসব হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না। 'আর্জেণ্ট কেস্'। এখনি ইহাকে 'লেবার ওয়ার্ডে' পাঠাইতে হইবে।

ক্ষিপ্রহস্তে একখানা ফর্ম্ম বাহির করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—রোগিণীর নাম ?

—সুশীলা বাই।

—প্রথম পোয়াতি ?

—হ্যাঁ, নার্স!

—স্বামীর নাম ?

যুবক গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া জানাইল—দুর্গাপ্রসাদ।

তাবপর নিজেকে দেখাইয়া বলিল—আমারই স্ত্রী।

—ঠিকানা ?···কি কাজ কর ?

এ প্রশ্ন শুনিয়া লোকটি যেন আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। উৎকণ্ঠা-ভরা চোখে দূরে রোগিণীর দিকে চকিতে একবার চাহিয়া লইয়া চাপাকণ্ঠে জবাব দিল—৭নং 'গ্রীণ হাউস' —ভুলেশ্বর। পোষ্ট-আফিসের পিয়ন আমি।

বলিয়াই সে যেন কাণ খাড়া করিয়া দাঁড়াইল। রোগিনী কিছু বলে কি না, তাহাই যেন সে শুনিতে চেষ্টা করিতেছিল।

ভুলেশ্বর এ অঞ্চল হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে—শহরের ভিতর অবস্থিত।

ফর্ম্মে আরও যাহা কিছু লিখিবার ছিল লেখা হইলে, রোগিণীকে তৎক্ষণাৎ ষ্ট্রেচারে করিয়া বেয়ারারা সোজা 'লেবার ওয়ার্ডে' লইয়া চলিল।

স্বামীটি রোগিণীর মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল—আমি রাত্তিরটা এখানেই থাকব'খন। কোন ভয় নেই ; ভর্ত্তি করা হয়ে গেছে, আর কি!

অস্ফুটকণ্ঠে রোগিণী কি বলিল শোনা গেল না।

বেয়ারারা চলিয়া গেলে লোকটি আবার আফিসে আসিয়া নার্সকে জিজ্ঞাসা করিল—আমাকে কি এখন এখানেই থাকতে হবে ?

নার্স বলিল—আর্জেন্ট্ কেস—থাকাই ত উচিত। …ঐ যে, ঐ ঘরে বসতে পার।

—কোন বিপদের আশঙ্কা নেই ত নার্স? হাত-পা' অত ফুলেছে কেন?

—বলা যায় না। 'কেস্' সাধারণ নয়। কিছু গোলমাল হতে পারে। তবে হাসপাতালে ভয়ের কিছু নেই।

স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া লোকটি বলিল—যাক, ভালয় ভালয় ওকে যে এখানে এনে তুলতে পেরেছি·· ভয়ানক ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।···আমি তাহলে ঐ ঘরে গিয়ে বসছি নার্স।

বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

* * * *

'লেবার ওয়ার্ড।' বড় একটি ঘর। চারি কোণে পর্দ্দা-ঘেরা চারিটি 'বেড্।' একটাতে একজন স্ত্রীলোক দারুণ বেদনায় থাকিয়া থাকিয়া গগনভেদী আর্ত্তনাদ করিয়া ভগবানকে স্মরণ করিতেছে। আর একটি 'বেড'-এর 'পেসেণ্ট' এইমাত্র সন্তান প্রসব করিয়া নির্জ্জীবের মত পড়িয়া আছে। তৃতীয় 'বেড'-এর 'রোগীর' তখনও 'পেন' দেখা দেয় নাই। ভয়ার্ত্ত চোখে, কান খাড়া করিয়া, ঐ চীৎকার শুনিতেছে এবং হয়ত ভাবিতেছে অনতিবিলম্বে তাহাকেও ঐ বিষম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

চতুর্থ 'বেড'টি খালি পড়িয়া।

সম্মুখের বারান্দায় টেবিলের সামনে বসিয়া 'লেবার ওয়ার্ডে'র সিষ্টার কাজ করিতেছিল। টেবিলের কাছে দুইজন ডাক্তার এবং কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র বসিয়া। 'রোগী' আসিলে পালা অনুযায়ী তাহারা কাজে লাগিয়া যায়। অনেকক্ষণ হইল কেহ আসে নাই; তাই সকলে নিশ্চিন্ত মনে গল্প করিতেছিল।

নবাগতা রোগিণীটিকে সেখানে লইয়া আসিলে সিষ্টার দেখিয়াই ব্যস্তভাবে একটি ছেলেকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—ষ্টুডেণ্ট, শীগ্গির তৈরি হয়ে নাও। 'আর্জেন্ট কেস' এসেছে।

ছেলেটি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। সাবান এবং 'লোশন'-এ হাত ধুইয়া, আলখাল্লা পরিয়া যখন সে ফিরিয়া আসিল, তখন রোগিণীকে 'বেড'-এ শোয়ান হইয়াছে। সিষ্টার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সাহায্যকারিণী একজন নার্সও আসিল।

'পেসেণ্ট'-দের প্রথমে পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়—প্রসবকালে মাতার কিংবা শিশুর কোন বিপদের সম্ভাবনা আছে কি না; সহজভাবে প্রসব হইবে কি না ইত্যাদি।

কিছুক্ষণ পরীক্ষা করিয়াই ছেলেটি শঙ্কিতকণ্ঠে বলিল—ডাক্তারকে ডাক সিষ্টার। এ 'কেস' সুবিধার নয়।

ডাক্তারেরা আসিল। সকলেই একবার করিয়া পরীক্ষা করিল।

ওয়ার্ডের প্রধান ডাক্তার বলিল—সিষ্টার, শীগ্গীর 'অপারেশন থিয়েটার' তৈরি কর। আমি সবাইকে খবর দিচ্ছি।

সেই মুহূর্ত্তে সারা 'ওয়ার্ডে' যেন ঝড় বহিল। সিষ্টার দুইজন নার্সকে সঙ্গে লইয়া ছুটিয়া গেল 'অপারেশন থিয়েটার' ঠিক করিবার জন্য। টেবিল ঠিক করা, অপারেশনের যন্ত্রপাতি ফুটন্ত জল হইতে তুলিয়া সাজাইয়া রাখা, 'ড্রেসিং'-এর জিনিষ-পত্র দেখা ইত্যাদি সব যেন হু হু করিয়া সুসম্পন্ন হইতে লাগিল। ওয়ার্ডের ডাক্তার দ্রুতপদে আসিয়া দাঁড়াইল ইলেকট্রিক বেল্-এর সুইচ-বোর্ডের কাছে। মস্ত বড় কাঠের বোর্ডে সারি সারি সুইচ সাজান। একটির নীচে লেখা 'চীফ মেডিক্যাল অফিসার'। অন্যটিতে 'অ্যাসিষ্টেণ্ট মেডিক্যাল অফিসার'; একটিতে 'মেট্রন'; আর একটাতে 'ষ্টুডেণ্টস্'।

সুইচ টিপিলে ইহাদের ঘরে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিবে।

ডাক্তার এক এক করিয়া সব কয়টি সুইচ টিপিয়া দিল।

—সকলেই ব্যস্ত, সবার চোখেই আতঙ্কভরা দৃষ্টি; সবারই মুখে এক কথা···কেস কঠিন।

দৌড়-ঝাঁপের অন্ত নাই।

অন্য সব কাজ স্থগিত হইয়া গেল।

অত্যন্ত কঠিন অপারেশন। সাধারণভাবে প্রসব হইবার উপায় না থাকিলে পেটে অস্ত্রোপচার করিয়া শিশুকে বাহির করা হয়।

সহজে ইহাতে হাত দেওয়া হয় না। তাই কচিৎ কখনও এ অপারেশন হইলে সারা হাসপাতালে সাড়া পড়িয়া যায়। চীফ মেডিক্যাল অফিসার হইতে ষ্টুডেণ্টরা অবধি সকলে ছুটিয়া আসে।

ঐ গভীর রাত্রে একসঙ্গে সকলের ঘরে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ঘুম হইতে উঠিয়া কোন প্রকারে 'এনল' গায়ে দিয়া সকলে 'লেবার ওয়ার্ডের' দিকে ছুটিল।

এ যেন ঠিক জেলখানার পাগ্‌লা ঘণ্টি।

দেখিতে দেখিতে 'লেবার ওয়ার্ড' লোকে ভর্ত্তি হইয়া গেল।

চীফ-মেডিক্যাল-অফিসার আসিয়া রোগিণীকে পরীক্ষা করিয়া তৎক্ষণাৎ উহাকে অপারেশন টেবিলে লইয়া যাইবার আদেশ দিয়া নিজে তৈয়ারি হইতে ছুটিলেন।

অপারেশন তাঁহাকেই করিতে হইবে।

*　　*　　*　　*

'অপারেশন থিয়েটার'। যন্ত্রের সাহায্যে প্রসব করাইতে হইলে কিংবা 'সিজেরিয়নের' প্রয়োজন হইলে এই ঘরেই করা হইয়া থাকে।

নাতিদীর্ঘ একটি ঘর। পরিষ্কার ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। মাঝখানে অপারেশন টেবিল। ঘরের চাবিটা সার্চ্চ লাইটের আলো টেবিলের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

সারি সারি সাদা আলমারিতে কদাকার সব যন্ত্রপাতি সাজান।

সিষ্টার অপারেশন-টেবিলের নিকটে আর একটি ছোট টেবিলে ছুরি-কাঁচি প্রভৃতি ফুটন্ত জলের ভিতর হইতে তুলিয়া সাজাইয়া রাখিতেছে! কেহ ব্যাণ্ডেজের কাপড়গুলি ঠিক করিতেছে। 'অ্যানেস্‌থেটিষ্ট' নিজের ঔষধ-পত্র এবং গ্যাস সিলিণ্ডার লইয়া ব্যস্ত। মেট্রন চেঁচামেচি করিয়া সকলকে হুকুম দিতেছে।

অপারেশন থিয়েটার লোকে ভরিয়া গিয়াছে। কিন্তু সবাই নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া। সবার মুখেই যেন উৎকণ্ঠার ছায়া।

টেবিলের উপর রোগিণী শুইয়া। বেদনায় প্রায় সংজ্ঞাহীন। এত সব যন্ত্রপাতি এবং এতগুলি লোকের উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টির সামনে পড়িয়া কোন আশু বিপদের আশঙ্কায় সে যেন আরও এলাইয়া পড়িয়াছে।

বাহিরে অবিশ্রাম বারিপাতের শব্দ তখনও একই ভাবে চলিয়াছে।

চীফ-মেডিক্যাল-অফিসার হাত ধুইতে ধুইতে অ্যাসিস্‌টেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন—পেসেণ্টের স্বামী কি উপস্থিত আছে এখানে? তাকে খবর দিয়েছ?

সবাই ব্যস্ত। এ কথাটা কেহ খেয়াল করিয়া দেখে নাই। তৎক্ষণাৎ একটি নার্স ছুটিল, আফিসে খোঁজ করিতে।

কিন্তু রোগিণীর স্বামীকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। আফিসের নার্স জানাইল, সে 'ওয়েটিং-রুমে বসিয়া ছিল—কখন উঠিয়া গিয়াছে কেহ জানে না।

আর অপেক্ষা করা চলে না। চীফ-মেডিক্যাল-অফিসার এবং তাঁহার তিনজন সাহায্যকারীরা হাত ধুইয়া, আলখাল্লা পরিয়া, কাপড়ের মুখোসে মুখ ঢাকিয়া তৈরি হইয়া দাঁড়াইলেন। বাহিরে তাঁহাদের শুধু চোখ দুইটা দেখিতে পাওয়া যায়।

অ্যানেস্‌থেটিষ্ট নিজের কাজ আরম্ভ করিলেন।

রোগিণীর নাকের উপর কাপড়ের 'মাস্ক্‌' রাখিয়া তাহার উপর ফোঁটা ফোঁটা 'ক্লোরোফর্ম্ম' ঢালা হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রোগিণীর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া গেল। অ্যানেস্‌থেটিষ্ট্‌ তাহার চোখের পাতা একবার স্পর্শ করিয়া বলিলেন—রেডি সার, আরম্ভ করুন।

অপারেশন আরম্ভ হইল। ডাক্তার ক্ষিপ্রগতিতে শিশুর দুই পা ধরিয়া টানিয়া বাহির করিয়া আনিলেন। রক্তের ধারা বহিতে লাগিল। চক্ষের নিমেষে নাড়ী কাটিয়া, শিশুটিকে মেট্রনের হাতের 'ট্রে'র উপর রাখিয়া দেওয়া হইল।

ডাক্তারের হাত দুইটা তখন যেন কলের মত দ্রুতগতিতে কাজ করিতে লাগিল। শিয়রের নিকটে উপবিষ্ট অ্যানেস্‌থেটিষ্ট্‌কে উদ্দেশ্য করিয়া ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন—

—How is she?

অ্যানেস্‌থেটিষ্ট্‌ জবাব দিলেন—নাড়ী বড় দুর্ব্বল মনে হচ্ছে।

*　　*　　*　　*

কিন্তু ছেলে এখনও শ্বাস গ্রহণ করে নাই। একবারও কাঁদে নাই। হার্ট দ্রুত চলিতেছিল, তবু সে নিজে নির্জীবের মত পড়িয়া। নীলবর্ণ দেহ। হাত পা শক্ত, ঈষদুন্মুক্ত চোখ দুটি ঘোলাটে।

মেট্রন বুড়ী তাহাকে লইয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে। যত নার্স এবং সিষ্টার ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া। সবাই এক বাক্যে বলিতেছে—কি সুন্দর ছেলেটা!

কেহ বলিতেছে—বাঁচলে হয়, এখনও ত দম্ নিলে না।

মেট্রন একটি নূতন নার্সকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—এ অবস্থাকে কি বলে জান? 'অ্যাস্‌ফিক্‌শিয়া নিয়োনেটোরম্'। প্রসব হতে দেরি লাগলে কিংবা অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটলে বাচ্চার এই অবস্থা হয়ে থাকে। দেখে রাখ—প্রায়ই এমন 'কেস' পাবে।

বলিয়া মেট্রন শিশুটির দুই পা ধরিয়া নীচু মুখে কিছুক্ষণ ঝুলাইয়া রাখিল। দেহের পশ্চাদ্‌ভাগে ধীরে ধীরে চড় মারিল।

কিন্তু কোন ফল হইল না। তখন তাহাকে পুনবায় শোয়াইয়া দিয়া গায়ে এবং মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা দেওয়া হইল। মেট্রন এ কাজ প্রায় নিত্য করিতেছে। এতক্ষণে শ্বাস লওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখনও যখন তাহার কোন লক্ষণ দেখা গেল না—শিশুর গায়ের রঙ ক্রমশঃ ফ্যাকাসে হইয়া উঠিতে লাগিল—তখন মেট্রন শঙ্কিত ভাবে বলিল—এতে হবে না। 'মিউকাস্ ক্যাথিটর' আনো শীগ্‌গীর · অক্সিজেন সিলিণ্ডার'টাও আনতে বল।

'মিউকাস্ ক্যাথিটর' একটি নলের মত যন্ত্র। মেট্রন প্রথমে কাপড় দিয়া শিশুর মুখের ভিতরটা পরিষ্কার করিয়া দিল। তারপর ক্যাথিটরের এক দিক তাহার গলার ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়া অন্যদিকে নিজে মুখ দিয়া, শ্বাসনলির ভিতরে সঞ্চিত লালা টানিয়া বাহির করিতে লাগিল।

তারপর আরম্ভ হইল—'আর্টিফিসিয়াল রেস্‌পিরেশন্'। যখন দম্ বন্ধ হইয়া আসে, তখন এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস গ্রহণ করান হইয়া থাকে।

কিন্তু তবু শিশু শ্বাস গ্রহণ করিল না।

সবাই উদ্বিগ্ন। আহা যদি না বাঁচে! এত ব্যথা সহিয়া জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া যে তাহাকে পৃথিবীর বুকে লইয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছে—ঐ যে অপারেশন টেবিলের উপর এখনও যাহার অসাড় দেহ এলায়িত—তাহার এই ক্ষুদ্রতম পুরস্কারটুকুও কি ভগবান কাড়িয়া লইবেন? অপারেশনের কঠোর ধাক্কা সামলাইয়া সে কি এই কথাই শুনিবে যে, তাহার একটি ফুটফুটে খোকা হইয়াছিল কিন্তু বাঁচিয়া নাই?

মেয়েদের মন ব্যথিত হইয়া উঠিল।

ধীরে ধীরে শিশুর নাকের কাছে অক্সিজেন ছাড়া হইল। মেট্রন শিশুর কনুই ধরিয়া, একবার মাথার দিকে তুলিয়া পরক্ষণে আবার সেই হাত দিয়া তাহার বুকের পার্শ্বে ঘন ঘন চাপ দিতে লাগিল।

একবার··দুইবার···পাঁচবার···দশবার···

সহসা শিশুটি যেন খাবি খাইয়া জোরে একবার নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া আবার স্থির হইল। মেট্রন উত্তেজিত-ভাবে বলিয়া উঠিল—হয়েছে, হয়েছে—দম নিয়েছে।

মেয়েরা আরও ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল।

যে মুহূর্ত্তে শিশুটি প্রথম শ্বাস গ্রহণ করিল, ঠিক সেই সময়ে অপারেশন টেবিলের কাছেও বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। একজন ডাক্তার ক্ষিপ্রহস্তে রোগিণীর গায়ে ইন্‌জেকশন্ দিয়া দিল। অ্যানেস্‌থেটিষ্ট হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া রোগিণীর মাথার কাছে আসিয়া ঘন ঘন তাহার বুকের পাশে চাপ দিতে লাগিলেন।

ওখানেও 'আর্টিফিসিয়াল রেস্‌পিরেশন্' চলিয়াছে।

কিন্তু মেট্রন এবং তাহার নিকটে আর যাহারা ছিল, তাহাদের ঐদিকে নজর দেবার অবসর নাই—প্রয়োজনও নাই। যাহার কাজ, তাহারাই করিতেছে। তাহার কাজ শিশুটাকে বাঁচাইয়া তোলা।

আরও বার কয়েক বুকের উপর চাপ দিতে শিশু চোখ মেলিয়া চাহিল। দুই একবার খাবি খাইয়া, শেষে স্বাভাবিক-ভাবে শ্বাস গ্রহণ করিতে লাগিল।

কিন্তু অপারেশন টেবিলে রোগিণীর তখন শ্বাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

মেট্রন এবং নার্সদের মুখে হাসি ফুটিল। যাক বাঁচিয়াছে ছেলেটা! শিশুটি এইবার তারস্বরে চীৎকার করিয়া যেন তাহার পৃথিবীতে আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিল।

সঙ্গে সঙ্গে ঐ টেবিলের হতভাগিনীর হার্টের গতিও বন্ধ হইয়া গেল।

ডাক্তারেরা হাল ছাড়িয়া দিলেন। 'আর্টিফিশিয়াল রেস্‌পিরেশন' বন্ধ করা হইল।

এ হাসপাতালে এরূপ দুর্ঘটনা পূর্ব্বেও অনেকবার ঘটিয়াছে। নূতন কিছুই নহে।

তবু মেট্রনের চোখ অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। শিশুটি তখন তাহার হাত-পা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করিয়া চীৎকার করিতেছিল। তাহার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ধরা গলায় বলিল—Silly brute ! look, what you have done to your poor mother.

নার্সদের মধ্যে কেহ কেহ রুমাল বাহির করিয়া চোখ মুছিল।

ঈশ্বরের কি বিচিত্র বিধান ! একজন না জানি কোন্ কুহেলি-ঘেরা লোক হইতে ধূমকেতুর মত পৃথিবীর বুকে আসিয়া তাহার নূতন দাবী প্রচার করিতেছে ; আর ঠিক সেই সময়ে এই নবাগত অতিথির জন্য স্থান ছাড়িয়া যাইতে হইল—তাহারই ভাগ্যহীনা মাতাকে—হয়ত বা সেই অজানা লোকের শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে। একটিবার সে তাহার প্রথম সন্তানের মুখদর্শনও করিতে পাইল না।

ঐ শিশুটিও বা কত বড় হতভাগা ! জন্মাইবার সঙ্গে সঙ্গে সে মাতৃহীন।

* * * *

পরদিন। শিশুটিকে ছোট একটি দোলনায় রাখা হইয়াছে। অনেকক্ষণ চেঁচামেচি করিয়া এখন সে শান্ত-ভাবে ঘুমাইতেছে।

তাহার দুঃখিনী মাতাও ঘুমাইতেছে—'কোল্ড রুমে'। কিন্তু তাহার ঘুম আর কখনও ভাঙ্গিবে না।

'লেবার ওয়ার্ডে' আবার সব নীরব নিস্তব্ধ। সিষ্টার টেবিলের সম্মুখে বসিয়া হাসপাতালের বিরাট রেজিষ্টারে লিখিতেছে—

Patient No.—১৭২৫

Name—সুশীলাবাই।

Para—প্রথম পোয়াতি।

Age—১৯ বৎসর।

Name of the husband—দুর্গাপ্রসাদ।

Occupation—পিয়ন।

Address—৭নং গ্রীন হাউস—ভুলেশ্বর।

তারপর লিখিল—'সিজেরিয়ন' করা হইয়াছিল। কিন্তু রোগিণী মারা গিয়াছে।

এমনি সময়ে একজন বেয়ারা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। রোগিণীর মৃতদেহ 'কোল্ড-রুমে' লইয়া যাইবার পূর্ব্বে আর একবার তাহার স্বামীর খোঁজ করা হইয়াছিল। কিন্তু তখনও তাহাকে পাওয়া যায় নাই। হয়ত তাহার বাড়ী ফিরিয়া যাইবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল ; কাহারও দেখা না পাইয়া না জানাইয়াই চলিয়া গিয়াছে। তাই এই দুর্ঘটনার কথা জানাইয়া অবিলম্বে হাসপাতালে আসিতে বলিবার জন্য ঐ বেয়ারাকে পাঠান হইয়াছিল।

সিষ্টার মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হল ?

বেয়ারা বলিল—কিছু গোলমাল আছে বলে মনে হচ্ছে সিষ্টার। ৭নং গ্রীণ হাউসে দুর্গাপ্রসাদ নামে কেউ থাকে না। অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি—কিন্তু ও নামের কেউ কখনও নাকি ও-বাড়ীতে ছিল না।

সিষ্টার বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। আর একবার রেজিষ্টারে লেখা ঠিকানা মিলাইয়া দেখিল—না ঠিকানা যাহা দেওয়া হইয়াছিল ঠিকই আছে।

সত্যই গোলমেলে ব্যাপার।

মেট্রনকে সংবাদ দেওয়া হইল। চীফ-মেডিক্যাল-অফিসার শুনিয়া ভুলেশ্বর পোষ্ট-অফিসে ফোন্ করিলেন। পোষ্ট মাষ্টার জানাইল—দুর্গাপ্রসাদ নামে কোন পিয়ন সেখানে নাই।

দুই দিন গত হইয়া গেল। কিন্তু দুর্গাপ্রসাদ আসিল না।

ঈশ্বর জানেন, কোথা হইতে ইহারা আসিয়াছিল।

ঈশ্বরই জানেন, ইহারা সত্যই স্বামী-স্ত্রী ছিল কি না। হয়ত ছিল না। কোন লম্পট ব্যভিচারী পুরুষ ঐ অসহায়া স্ত্রীলোকটিকে ভুলাইয়া আনিয়া এই অবস্থা করিয়া শেষে ফেলিয়া পলাইয়াছে।

হয়ত বা স্বামী-স্ত্রীই ছিল। কিন্তু কেনই বা স্বামীটা আত্ম-গোপন করিল, আর কেনই বা ভগবান এইভাবে ঐ হতভাগিনীকে সরাইয়া লইয়া গেলেন—ইহার জবাবও তিনিই দিতে পারেন। হাসপাতালের লোকরা আজও তাহার কুল-কিনারা খুঁজিয়া পায় নাই।

* * * *

ইহার আরও দিনকয়েকের পর হাসপাতালের এক 'বেড'-এ বসিয়া আর একটি নারী ঐ মাতৃহীন শিশুটিকে বুকে করিয়া আদর করিতেছিল। বার বার দোলা দিয়া

জিজ্ঞাসা করিতেছিল—খোকা পেট ভরেছে?—আচ্ছা, এখন ঘুমোও দিকি।

এই নারীটিও হাসপাতালে আসিয়াছিল প্রসব হইতে।

পূর্ব্বে তিন তিনবার মৃত সন্তান প্রসব করিয়া এখন তাহার মাতৃত্বের স্পৃহা তীব্রতর হইয়াছে। কিন্তু এবারও তাহার গর্ভে ছিল একটি মৃত শিশু।

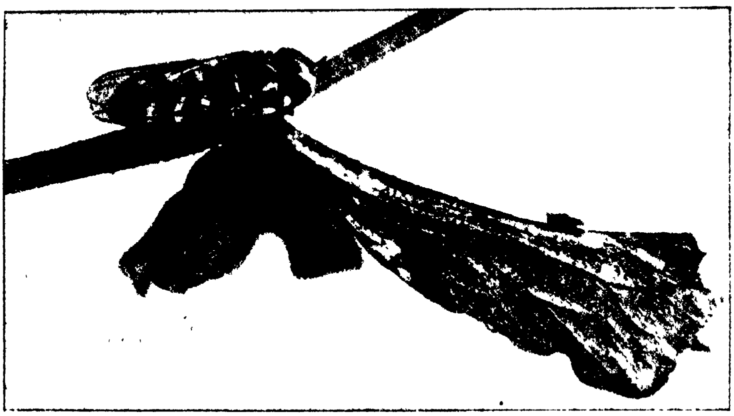
কিন্তু আজ সে একটি ফুটফুটে সুন্দর ছেলে পাইয়া আত্মহারা। ছেলেটা বয়োপ্রাপ্ত হইয়া হয়ত বুঝিতেও পারিবে না—কে ছিল তাহার পিতা, কে ছিল তাহার অভাগিনী মাতা এবং কিভাবে কোথায় তাহার জীবন-প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে।

সে চিরদিন ভুল বুঝিয়া যাইবে। ঈশ্বরও চিরদিন একটু করিয়া মুচকি হাসিবেন। কিন্তু কেন? তাহা কে বলিয়া দেবে?

রক্ষক ও ভক্ষক

শ্রীনরেন্দ্র দেব

কীট পতঙ্গের মধ্যে কে শত্রু কে মিত্র সেটা নির্ণয় করা নিতান্ত সহজ-সাধ্য নয়। বাগানের মালীরা সাধারণত গাছপালায় পোকামাকড় দেখলেই নির্ব্বিচারে মেরে ফেলে। বিশেষ করে তারা যদি কৃমি-জাতীয় কীট বা কীরা দেখতে পায় তাহ'লে শুঁয়া পোকার বা ঐ জাতীয় কোনো অনিষ্টকর কীটের বাচ্ছা ভ্রমে সর্ব্বাগ্রে সেগুলিকে বিনাশ করে। কিন্তু এমন নির্ব্বিচারে পতঙ্গকুল সমূলে নির্ম্মূল না ক'রে তারা যদি একটু দেখে শুনে চিনে বুঝে তাদের কীটমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে তা'হ'লে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নেই! অবশ্য পোকা চিনে মারতে হ'লে বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে তাদের একটু বেশী সময় লাগবে, কিন্তু তা' লাগলেও সেটা যে তাদের সময়ের অপব্যয় হবে না এটাও ঠিক। কারণ শত্রু ভেবে অনেক সময় তারা পরম মিত্রদেরও হত্যা ক'রে বাগানের প্রকৃতপক্ষে অনিষ্টসাধনই করে। বাগানের গাছপালায় এমন অনেক পোকা থাকে যারা ফলফুলের শত্রু কীট পতঙ্গদের ধ্বংস ক'রে মালীর চেয়েও মালিকের অধিক উপকার করে।



ভোমরা (Hover-fly)

তৃণশষ্প ও ফুলের কেয়ারীতে যে অজস্র শামা পোকা (Green-fly) দেখতে পাওয়া যায়—এরা সোজাসুজি মানুষের কোনো ক্ষতি না ক'রলেও পরোক্ষভাবে করে। মটর ফুলের (sweet peas) পরম শত্রু এরা! কিন্তু এদের আক্রমণ থেকে আবার মটর ফুলগুলিকে বাঁচিয়ে রাখে ঘুরঘুরে ভোম্‌রার (Hover-fly) বাচ্ছারা। শামা পোকার আক্রমণ কোনো মালীই ঠেকাতে পারে না। অথচ ফুলি-ভোম্‌রাদের সুব্যবস্থায় অচিরে তারা সবংশে নিধন প্রাপ্ত হয়।

ভোম্‌রার সবচেয়ে প্রিয় পানীয় হ'চ্ছে ফুলের মধু! যে বাগানে ফুল ফুটে আছে ভোম্‌রা সেখানে ঘুর ঘুর ক'রে উড়বেই। কালো ও ফিকে হলদের ডোরাকাটা ফুলি

ভোমরার দল যখন তাদের অতি দ্রুত পক্ষ সঞ্চালনের গুণে দীর্ঘকাল শূন্যে অবস্থান করে তখন ভারি সুন্দর দেখায়। মাঝে মাঝে বাজপাখীর মত তীরবেগে ক্ষেতের মধ্যে নেমে ফুলের বুকে ছোঁ মেরে যতটুকু পারে মধু আস্বাদন ক'রে নেয়। দিনের আলো যতক্ষণ থাকে—চলে তাদের ফুলে ফুলে



ভোমরার ডিম (স্বাভাবিক আকার অপেক্ষা ষাটগুণ বর্দ্ধিত চিত্র)

আনন্দ বিলাস, আমোদ আহ্লাদ—চলে তাদের ক্ষণিকের প্রণয়প্রসঙ্গ ও তার সঙ্গে রঙ্গলীলা এবং আহারবিহার। সন্তানাদিও হয়। ভ্রমরবালারা সন্তানসম্ভবা হ'লেই সর্ব্বাগ্রে মটর ফুলের কেয়ারীর প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ে বিশেষ করে—যেখানে শামা পোকার প্রাদুর্ভাব সেখানেই তারা বেশী রকম ঘোরা ফেরা করে। লতায় পাতায় ফুলে ফলে যেখানেই একটি শামা পোকা তাদের নজরে পড়ে সেখানেই তারা অবিলম্বে একটি ডিম পেড়ে রেখে উড়ে যায়। উড়ে যায় আবার অন্য ফুলের চারার বুকে ঐ একই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে।

ফুলবাগানের সখ যাঁদের খুব বেশী তাঁরা কেউ কেউ হয়ত এটা লক্ষ্য ক'রে থাকবেন যে শামা পোকার আত্ম-জোৎপাদন শক্তি বা সন্তান-প্রসবের ক্ষমতা অতি অসাধারণ! একটি শামা পোকা সারাদিনে খুব কম হ'লেও অন্ততঃ কুড়িটি বাচ্ছা দেয়। এই বাচ্ছাগুলির সবই কিন্তু মেয়ে। তারা অবিলম্বে পরিণত-বয়স্কা হ'য়ে ওঠে এবং স্বীয় জননীদের অনুকরণে আত্মজোৎপাদন শক্তির গুণে দৈনিক বিংশাধিক সন্তান প্রসব ক'রতে সুরু ক'রে দেয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সেগুলিরও আবার প্রত্যেকটি হয় মেয়ে! এমনি ক'রে তাদের পরের পর প্রায় বিশ পঁচিশ পুরুষ কেবল মেয়েই জন্মাতে থাকে, সারা গ্রীষ্মকালটা আর পুত্র-সন্তানের মুখ দেখতে পায় না তাদের বংশের বিশ পুরুষের মধ্যে কেউ। শরৎকালে তাদের যে বাচ্ছা হয় তারাই প্রথম পুরুষ হ'য়ে জন্মায় এবং এই পুরুষ সংসর্গের ফলে যাদের সন্তান সম্ভাবনা হয় তারা কিন্তু আর জীবন্ত বাচ্ছা প্রসব না করে তখন থেকে ডিম পাড়তে সুরু করে! তারপর শীতে এই ডিম থেকে আবার জন্মগ্রহণ করে আত্মজোৎপাদনশক্তি-বিশিষ্ট মেয়ে-শামা পোকার দল! এমনি ক'রে ঘুরে ঘুরে চলে তাদের জন্ম-জন্মান্তরের জীবন রহস্য!—

সুতরাং এটা এখন বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল যে শীতের শেষের অর্থাৎ বসন্তের ও গ্রীষ্মের যত শামা পোকা—তারা প্রত্যেকেই প্রতিদিন বিংশাধিক সন্তান প্রসবে সক্ষম। এই সত্যের উপর ভিত্তি ক'রেই রেয়োমুর সাহেব (Mr. Reaumur) হিসাব ক'রে বলেছেন যে যদিও মাত্র পনেরো

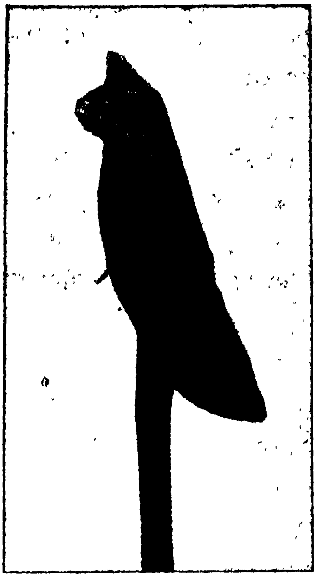


ভোমরা-কীরা (ডিমফুটে ভোমরার বাচ্ছা নির্গত হয় এমনি কীটের আকারে) (ষাটগুণ বর্দ্ধিত চিত্র)

থেকে কুড়ি দিন মাত্র এদের জীবনের মেয়াদ, কিন্তু এই স্বল্প আয়ুষ্কালের মধ্যেই এক একটি শামা পোকা যে পরিবার রেখে যায় তাদের জনসংখ্যা—৫৯০,৪৯০০০০০ পাঁচশত নব্বুই কোটী ঊনপঞ্চাশ লক্ষের কম নয়!

এই বৃহৎ পরিবারের আহারের ভাবনা এদের মায়েদের

ভাবতে হয় না, কারণ—দুতিন সপ্তাহের বেশী তারা বাঁচে না! ভোমরাদের কিন্তু বাচ্ছার জন্য কিঞ্চিৎ দায়িত্ব



বাচ্ছা ভোমরা শিকার ধ'রছে



ধৃত শিকার মুখে তুলেছে



শিকারের জীবনী-রস শোষণ করছে



নিঃশেষিত-প্রাণ শিকার দূরে নিক্ষেপ করছে

বোধ আছে দেখা যায়! শামা পোকাদের সমস্ত খবরই বোধ হয় তাদের জানা আছে, নইলে যেখানে যেখানে শামা পোকা দেখে বেছে বেছে সেইখানেই তারা ডিম পাড়ে কেন? শামা পোকার উপনিবেশে ডিম পেড়ে তারা এই একটা বিষয়ে সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়, যে তার বাচ্ছা ডিমফুটে বেরিয়ে খাদ্যাভাবে মরবে না।

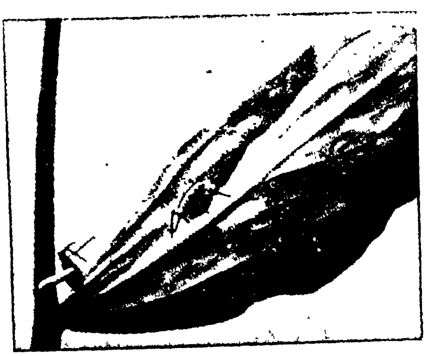
এক একটি শ্যামা পোকা ততদিন অসংখ্য হ'য়ে উঠবে।

ভোমরা মেয়ে ডিম পেড়ে যাবার তিন দিনের মধ্যেই



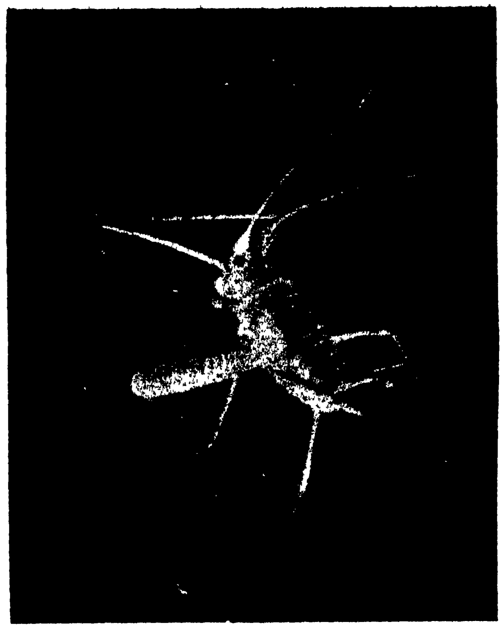
মটর ফুলে কয়েকটি শামা পোকা ও ভোমরার ডিম (বর্দ্ধিত আকারে)

ডিম ফুটে বেরিয়ে পড়ে ছোট্ট একটি ক্বমির আকারের কীরা! গায়ের রং তাদের ঈষৎ পীতাভ শ্বেত! যখন



ভোমরার বাচ্ছার শামা পোকা আক্রমণ (চারগুণ বর্দ্ধিত চিত্র)

দেহ তাদের সম্পূর্ণ লম্বা করে অর্থাৎ নিজেকে তারা পূর্ণরূপে বিস্তৃত করে, তখন তাদের দৈর্ঘ্যের মাত্রা এক ইঞ্চির ষোল ভাগের একভাগ মাত্র! কিন্তু একটি তিলের চেয়েও আকারে ক্ষুদ্র এই ভোমরা শিশুর সাহস ও শক্তি অসাধারণ! ততোধিক অসাধারণ এদের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা! মহীরাবণের পুত্র অহিরাবণের ভূমিষ্ঠ হয়েই পিতৃ-শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধের কথা রামায়ণে পড়া ছিল, কিন্তু সত্যই যে প্রাকৃত জগতে এ ব্যাপার ঘটতে পারে—এ যে একেবারে নিছক কবি কল্পনা নয়—এ সম্বন্ধে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় কোনোদিনই ছিল না! কিন্তু এই ঘুরঘুরে ফুলি ভোমরার বাচ্ছাদের



শামা পোকা ও ভোমরার বাচ্ছা (ষাটগুণ বর্দ্ধিত চিত্র)

কাণ্ড দেখে ওসব পৌরাণিক ঘটনাকে আর কিছুতেই অবিশ্বাস করা চলে না!

ডিমফুটে বেরুবামাত্র ভোমরা-শিশু শিকার-সন্ধানে অভিযান সুরু করে দেয়। লতায় পাতায় ডালে ডালে ফুলে ফলে এদের বুকে হেঁটে বিচরণ চলে। সামনে শামা পোকা যদি পড়ে তাহ'লে আর রক্ষে নেই! মুহূর্ত্তের মধ্যে এই ক্ষুদ্র রাক্ষস তার চেয়েও বৃহৎ আকারের শামা পোকাকে কামড়ে ধ'রে শরীরের প্রান্তদেশের উপর ভর দিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে ওঠে! পোকাটিকে মুখে করে নিয়ে শূন্যে

তুলে ধ'রে বিজয় আস্ফালন করে। আকারে তিলের চেয়েও ছোট্ট হ'লে কি হবে, তেজে বীর্য্যে ও সাহসে এই ক্ষুদ্র কীট বহু হিংস্র পশুকেও লজ্জা দিতে পারে। এদের শিকার-চিত্র ও অন্যান্য বিবরণ বেশ বর্দ্ধিত আকারে এই প্রবন্ধে দেওয়া হয়েছে। মূল আকারের অপেক্ষা প্রত্যেক চিত্র প্রায় ষাট গুণ বড় করা হয়েছে।

শামা পোকাটাকে এমনি শূন্যে তুলে প্রায় ঘণ্টাখানেক উঁচু হয়ে থাকে এই অন্ধ ভ্রমরশিশু এবং ধীরে ধীরে তার শরীরের সমস্ত রসভাগ নিশেষে শোষণ ক'রতে থাকে! শামা পোকা আকারে যদিও ভ্রমর শিশুর চেয়ে চতুর্গুণ বড় এবং এই ক্ষুদ্র রাক্ষসের কবল থেকে উদ্ধার পাবার জন্য যদিও তারা প্রাণপণেই হাত পা ছোঁড়ে, আত্মরক্ষার চেষ্টায় অনেকক্ষণ ধরেই ছট্‌ফট্ করে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র বাচ্ছার বজ্র-কামড় কিছুমাত্র শিথিল ক'রতে পারে না। সমস্ত রস-ভাগের শোষণ সমাপ্ত ক'রে শুষ্ক খোলসটা সে দূরে নিক্ষেপ করে অল্পক্ষণ মাত্র বিশ্রাম নেয়। তারপর আবার চলে তার শিকার সন্ধান। জন্মের প্রথম দিনেই খুব কম হ'লেও অন্ততঃ চার পাঁচটা শামা পোকা এরা খাবেই এবং যত দিন দিন বড় হতে থাকে এদের ভোজন সংখ্যাও আশ্চর্য্যভাবে বাড়তে থাকে। দশদিন ধ'রে ক্রমাগত চলে তার এই নৃশংস ভাবে শামা পোকা শিকার ও শোষণ!



ভোমরা-বাচ্ছার গুটি রূপ

প্রথম দিনে তারা থাকে শিকারে অনভিজ্ঞ কিন্তু দ্বিতীয় দিনেই তারা হয়ে ওঠে একেবারে শিকারে সুদক্ষ। অথচ সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হ'চ্ছে—এই বাচ্ছাগুলোর তখনও চোখ ফোটে না! এরা শিকার অভিযানে যখন তরুলতার ডালে ডালে ফুলের পাতায় পাতায় বুকে হেঁটে ঘুরে বেড়ায় তখন ডাইনে বাঁয়ে উপরে নীচে আশে পাশে চারিদিকে মাথা চালতে চালতে চলে। তার ফলে শামা পোকার সঙ্গে তাদের মাথা ঠোকাঠুকি হ'তে বেশীক্ষণ সময় লাগে না। শামা পোকার স্পর্শ পাবামাত্র এরা ত্রিশূলের মত এদের কঠিন ত্রিফলা জিহ্বা নির্গত করে শামা পোকাকে বিঁধে ফেলে এবং শূন্যে তুলে নেয়!



নবজাত ভ্রমর

ভোমরা বাচ্ছাগুলোর এই 'কীরা' অবস্থায় গায়ের রং হয় সবুজ, পিঠের উপর লম্বা সাদা একটা ডোরা দেখা যায়। প্রান্তদেশ রক্তবর্ণ। ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় এরা প্রতি মিনিটে একাধিক শামা পোকা ভক্ষণ করে! ক্ষুধার্ত্ত যে এরা কখন নয় সেটাও ঠিক বোঝা যায় না, কারণ দিবা-রাত্রই দেখা যায় এরা শিকার সন্ধানে মুখ বাড়িয়ে বাড়িয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং শামা পোকার বংশ

ধ্বংসকার্য্যে ব্যাপৃত রয়েছে। সারাদিন ও সারারাত্রি ধ'রে তারা এই শামা পোকা ভোজনের উৎসব বেশ উৎসাহের সঙ্গেই চালিয়ে যায়; ফলে ফুলবাগানের মালিকরা ফুলের মুখ দেখতে পান, নইলে তাঁরা বাগানে মালী রেখে কীটনাশক আরকাদি ব্যবহার করে এবং গাছের তলায় ধোঁয়া দিয়ে পোকা তাড়াবার যে সব ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছেন তার কোনোটাই কাজের ব'লে মনে হ'ত না! রক্তবীজের ঝাড় এই শামা পোকার সংখ্যাতীত উৎপত্তি বাধা পায় একমাত্র এদেরই এই দানবীয় ধ্বংস-লীলার গুণে!

অথচ পূর্ব্বেই বলেছি এরা 'কীবা' অবস্থায় থাকে সম্পূর্ণ অন্ধ। চলে ফিরে ছুটে বেড়াবার যে প্রধান অঙ্গ পা, তা'ও এদের থাকে না। বুকে হেঁটে চলে এরা দেহকে ক্রমাগত কুঞ্চিত ও প্রসারিত ক'রতে ক'রতে। শরীবের দু'পাশেব অর্থাৎ বুকের তলায় দু'টি ধাবে চর্ম্মের কর্কশ অংশের সাহায্যে এরা ফুলের বোঁটায় পাতাব গায়ে নিজেদের দেহটা লট্‌কে বা আট্‌কে রাখতে পারে। কাজেই চলে হেঁটে বেড়াতে এদের অসুবিধা আছে অনেক, কিন্তু তা' সত্ত্বেও এরা যে রকম সত্বর নড়ে-চড়ে বেড়ায় তা' যথার্থই আশ্চর্য্যজনক!

মাথাটা তুলে তুলে বাড়িয়ে ধরাটা এদের যেন একটা প্রকৃতিগত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে! মাথাটি যখন বাড়ায় তখন মনে হয় ঠিক যেন কোনো জানোয়ার তার—ক্রমশঃ সরু হযে এসেছে এমনিতর—একটা শুঁড় অবিরত বাড়াচ্ছে! মাথা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে তাদের মুখ থেকে সেই ত্রিশূলের ফলাটা বিদ্যুৎবেগে! দূর থেকে মনে হয় যেন ওদের মাথাটাই ত্রিশূল-শৃঙ্গ! এই ত্রিশূল ফলকে পত্র পৃষ্ঠ ভেদ করে সেই পাতায় সে লটকে ফেলে তার দেহের মাথার দিকটা, তারপর টেনে গুটিয়ে নিয়ে আসে তার শরীরের পশ্চাদংশ! এত বেশী গুটিযে নেয় যে পিছনটি এসে একেবারে তাদের নাকে নয় মাথায় ঠেকে যায়! কাজেই দেখায় যেন খাড়া করে রাখা একটি গোল রিঙের মত! মনে হয় বুঝি বাচ্ছাটা এইবার ডিগবাজী খাবে! কিন্তু ডিগবাজীর বদলে সে চক্ষের নিমেষে শুঁড়ের মত বাড়িয়ে দেয় আগের দিকে তার মাথাটা!—এমনি ক'রে গুটিয়ে গুটিয়ে পাক খেতে খেতে চলে তার অফুরন্ত চলা! তার হালচাল দেখে কেবলই মনে হয় সে যেন সর্ব্বদাই অত্যন্ত শশব্যস্ত হয়ে ঘুরছে! কি আহারান্বেষণে টহলমারায়, কি শিকার অভিযানে, সবসময়েই এই ক্ষুদ্র কীটের ব্যস্ততার যেন অন্ত নেই!

কিন্তু সমস্ত জারিজুরি চলে তার মাত্র দশদিন! দশদিন দশরাত্রি ধ'রে মিনিটে মিনিটে সে একাধিক শামা পোকা নিঃশেষ ক'রে খায়! তার এই রাক্ষুসে ভোজনপর্ব্ব চলে মাত্র এই দশদিনই। তারপর তার সেই প্রলয় ক্ষুধার শান্তি হয়। সে তখন মুখের সেই ত্রিশূল ফলক কোনো ফুলের বোঁটায় বা গাছের পাতায় গেঁথে নিজেকে লট্‌কে দিয়ে দশদিন অনাহারে সেখানে ঝোলে! এই সময় তার সেই কেঁচোর মত বা কৃমির মত নরম দেহটি ক্রমে খড়খড়ে শক্ত হয়ে ওঠে। গায়ের রং তার বদলে গিয়ে সোনালী পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করে! দশদিন এইভাবে কেটে যাবার পর হঠাৎ একদিন সেই শক্ত খোলস বা গুটি ফেটে সে বেরিয়ে পড়ে। এবার দেখা দেয় এক নূতন রূপে!—সেই কৃমি বা কেঁচোর আকার বদলে সে হয়ে ওঠে চমৎকার ঝক্‌ঝকে একটি হলদে ও কালো ডোরাকাটা ঘুর্‌-ঘুরে ভ্রমর! (Hover-fly)

প্রতি পুষ্পকুঞ্জ ও সব্জীবাগের কত বড় বন্ধু যে এই ঘুবঘুরে ভোম্‌রার বংশধরেরা এ যারা জানে না তারা কৃমিকীটের মত কদাকার এই পোকা ফুল তরুতে বিচরণ করছে দেখলে নিশ্চয়ই সেগুলিকে মেরে ফেলবে! ফলে তাদের ক্ষতির আর অবধি থাকবে না! অপরিচয়ের দোষে অজ্ঞানতা ও মূঢ়তা বশতঃ বাগানের প্রকৃত বন্ধুকে শত্রু ভ্রমে হত্যা ক'রে পরে তাদের অশেষ অনুতাপ ক'রতে হবে। শামা পোকার যে অসংখ্যহারে অগণিত বৃদ্ধি দেখা যায়, তাতে অনন্ত উৎপত্তি যদি অবাধে দীর্ঘকাল চলে তাহলে পৃথিবীর বক্ষের বিশাল শ্যামাঞ্চলখানি অনতিবিলম্বে অগণিত জীবন্ত শামা পোকায় রূপান্তরিত হবে অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে আর তৃণশস্প তরুলতার চিহ্নমাত্র থাকবে না। তার ফলে জাগতিক কোনো জীবেরই আর আহার্য্য জুটবে না! সমস্ত সৃষ্টি অনাহারে লোপ পাবে।

এই দুর্ঘটনা থেকে পার্থিব প্রাণীদের রক্ষা করবার জন্য প্রকৃতির সতর্কতার আর অন্ত নেই! কেবলমাত্র যে এই শামা পোকা এবং ঘুর-ঘুরে ভোমরার ব্যাপারই জগতে খাদ্য খাদক সম্বন্ধের একটা সুফলপ্রসূ লক্ষ্য সপ্রমাণিত ক'রছে তাই নয়, উদ্ভিদ্ ও প্রাণী-জগতের মধ্যে এইরূপ আরও নানা রক্ষক ও ভক্ষকের সম্বন্ধ বিচার ক'রে দেখলে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে যেতে হয়। সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় যে এ জগতের চারদিকে কিভাবে প্রণালীবদ্ধ হ'য়ে অহরহ চলেছে, প্রকৃতির সেই পরম রহস্যের পরিচয় পেয়ে মানুষ অভিভূত হ'য়ে পড়ে!

বাংলা বানানের একটি নিয়ম

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য এম-এ

বাংলায় যে সমস্ত সংস্কৃত শব্দ প্রচলিত আছে তাহাদের বানানে "রেফের পর ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব" হইবে কিনা এই বিষয়ে মতভেদ দেখা গিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "বাংলা বানানের" যে "নিয়ম" প্রচারিত হইয়াছে তাহাতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে "যদি শব্দের ব্যুৎপত্তির জন্য আবশ্যক হয় তবেই রেফের পর দ্বিত্ব হইবে—অন্যত্র দ্বিত্ব হইবে না; যেমন, কার্ত্তিক, কিন্তু কর্তা, ইত্যাদি। কেহ কেহ শব্দের ব্যুৎপত্তি-সন্ধানের পরিশ্রম লাঘবের জন্য হিন্দী মারাঠীর নজীর দেখাইয়া বলিয়াছেন, ('ভারতবর্ষ' ভাদ্র, ১৩৪৩ সন, 'বাংলা বানানের নিয়ম'—শ্রীগোবর্দ্ধন দাস শাস্ত্রী) "বাংলা ভাষায় কোনখানেই রেফের পর দ্বিত্ব লেখা হবে না।"

সংস্কৃত বানানের জন্য এই বিষয়ে পাণিনির একটি সূত্র আছে যে "রহাদ্‌যপোদ্বিঃ"। কিন্তু সূত্রটি বড় ব্যাপক। ইহার অর্থ এই যে র্‌ হ্‌ পরে থাকিলে 'যপ্‌' অর্থাৎ শ, ষ, স ব্যতীত সমস্ত ব্যঞ্জনেরই বিকল্পে দ্বিত্ব হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না; সংস্কৃত শব্দগুলি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে রেফযুক্ত হইয়া কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বর্ণেরই নিয়মিত দ্বিত্ব হইতেছে ও কতকগুলি বর্ণের নিয়মিতভাবে দ্বিত্ব বর্জ্জন করা হইতেছে। এই বিষয়েও একটি সুন্দর নিয়ম অনুসৃত হইতে দেখা যায়। নিয়মটি এই—

(১) 'ক' বর্গের কোন রেফ-যুক্ত বর্ণ দ্বিত্ব হয না; যেমন, 'অর্ক', 'মূর্খ', 'স্বর্গ', 'অর্ঘ'।

(২) 'চ' বর্গের রেফ-যুক্ত দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণকে দ্বিত্ব হইতে দেখা যায় না, যেমন, 'মূর্ছা', 'নির্ঝর'।

(৩) 'ট' বর্গের অনুনাসিক ব্যতীত কোন বর্ণকে রেফ-যুক্ত হইতেই দেখা যায় না। তবে একটি অর্ব্বাচীন 'সংস্কৃত' শব্দ পাইয়াছি যেমন 'দার্ঢ্য' (চৈতন্যচরিতামৃত)।

(৪) 'ত' বর্গের দ্বিতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ রেফ-যুক্ত হইলে দ্বিত্ব হয় না, যেমন, 'অর্থ', 'নির্ধন', কর্ণ, 'দুর্নাম'; তবে 'ধ'র ব্যতিক্রম আছে, যেমন, 'অর্দ্ধ'।

(৫) 'প' বর্গের প্রথম দ্বিতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ রেফ-যুক্ত হইলে দ্বিত্ব হয় না; যেমন, 'সর্প', 'গর্ভ', 'কর্ম' 'ফ' কদাচ রেফ-যুক্ত হয় না।

(৬) 'র' ব্যতীত সমস্ত অন্তস্থ বর্ণই রেফ যুক্ত হইলে দ্বিত্ব হইয়া থাকে, যেমন, 'আর্য্য', 'দুর্ল্লভ'।

অতএব দেখা যাইতেছে যে পাণিনির এত ব্যাপক বিধান থাকা সত্ত্বেও কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বর্ণই কেবল সংস্কৃত বানানে রেফযুক্ত হইলে দ্বিত্ব হইতেছে। বিচার করিলে দেখা যাইবে যে এখানে ধ্বনি-তত্ত্বমূলক (Phonological) একটি কারণ নিহিত আছে। ব্যাকরণ কিম্বা প্রচলিত রীতির নির্দ্দেশের অপেক্ষা ধ্বনিতত্ত্বের বিচার দ্বারা বানানকে নিয়মিত করিলে বর্ণাশুদ্ধির হাত হইতে অনেক সময় রক্ষা পাওয়া যায়। ধ্বনিতত্ত্ব বা উচ্চারণতত্ত্বের এই নিয়ম যে কোন মহাপ্রাণ বর্ণ রেফ-যুক্ত হইলে দ্বিত্ব হইতে পারে না, কারণ ইহার উচ্চারণ অসম্ভব। উল্লিখিত সংস্কৃত বানানের রীতি হইতেও দেখা যায় যে কোন মহাপ্রাণ বর্ণ রেফ-যুক্ত হইয়া দ্বিত্ব হয় না। কণ্ঠ্যবর্ণের দ্বিত্ব না হওয়ারও হয়ত উচ্চারণ গতই কোন কারণ আছে। অনুনাসিকের মধ্যে একমাত্র 'ম' বাংলায় আসিয়া ব্যাপকভাবে দ্বিত্ব হইতেছে, যেমন, কর্ম্ম, ধর্ম্ম, কিন্তু সংস্কৃতে ইহাও দ্বিত্ব হইত না; অতএব সংস্কৃতের বিধান মত দেখা যাইতেছে যে রেফ যুক্ত হইলে অনুনাসিকও দ্বিত্ব হইতে পারে না। এখন সংস্কৃতের দ্বিত্বের ব্যবহার হইতে এই প্রকার সূত্র করা যাইতে পারে যে "রেফ-যুক্ত হইলে 'চ' ও 'ত' বর্গের প্রথম ও তৃতীয়বর্ণ, 'প' বর্গের তৃতীয়বর্ণ ও 'য' 'ল' দ্বিত্ব হইবে, অন্যত্র দ্বিত্ব হইবে না।" বাংলায় প্রচলিত সংস্কৃত শব্দগুলির বানানেও বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্তও প্রায় এই নিয়মই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, অতএব বর্ত্তমান বানানকে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে এখন হইতেই যদি এই সংস্কৃতের নিয়মই গ্রহণ করি তবে প্রচলিত রীতির উপরও আঘাত করা হইবে না—অথচ একটি সুসঙ্গত ও সহজসাধ্য নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া বানানের ভবিষ্যৎ ব্যভিচারের আশঙ্কা হইতেও নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারি।

যাঁহারা এই দ্বিত্ব বর্জ্জনের পক্ষপাতী তাঁহাদের বিরুদ্ধে একটি প্রধান যুক্তি এই যে এই দ্বিত্ব শব্দের উচ্চারণের সহায়ক। ইহা একেবারে নিরর্থক ও যথেচ্ছ নহে। কারণ একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে রেফযুক্ত অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণে একটু ঝোঁক বা জোর আসিয়া পড়ে। আমরা দরজা উচ্চারণ করিতে 'জ'তে যতখানি জোর দিই তদপেক্ষা বেশি জোর দিই যখন 'দুর্জন' উচ্চারণ করি। সেইজন্যই জকে দ্বিত্ব করিয়া এইস্থলে 'দুর্জ্জন' লিখাই বিধেয়। ইহাতে উচ্চারণের যেমন সহায়তা হয়, তেমনি প্রচলিত রীতির প্রতিও নিষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

এই দ্বিত্বের রীতি উদ্ভবের আর একটি কারণ থাকিতে পারে। মনে হয় মূল সংস্কৃতে দ্বিত্বের এই বিধান আদৌ ছিল না। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে প্রাকৃতের প্রভাববশত সংস্কৃতেও এই রীতি প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত বানানে প্রাকৃতের প্রভাবের কথা আমরা সকলেই জানি; ইহাও তাহারই অন্যতম নিদর্শন। কারণ এই দ্বিত্ব প্রাকৃতের ব্যঞ্জন সমীকরণের রীতি (Assimilation of Consonants) হইতে উদ্ভূত।

স্বরূপ দেখা যাউক, যেমন সংস্কৃত 'দুর্লভ' প্রাকৃতে 'দুল্লহ' হইল। অতপর পুনরায় যখন দেশে সংস্কৃতের প্রাধান্য বিস্তৃতিলাভ করিতে লাগিল তখন প্রাকৃত 'দুল্লহ'ই ক্রমে 'দুল্লভ' ও 'দুর্ল্লভ' হইয়া সংস্কৃত-রূপ প্রাপ্ত হইল এবং উচ্চারণের সাহায্যকারী বলিয়া 'ল'এর এই দ্বিত্বকে রক্ষা করা হইল।

এখন রেফ যুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ত্যাগ করিলে যে অসুবিধার কারণ হইবে তাহার উল্লেখ করা যাউক। প্রথমতঃ ইহা দ্বারা উচ্চারণের মর্য্যাদা রক্ষা পাইবে না; দ্বিতীয়ত বাংলায় আজ সহসা বানানের একটা নূতন নিয়ম গ্রহণ করিয়া বসিলে পূর্ব্ববর্তী বানানের সহিত বর্ত্তমান বানানের বৈসাদৃশ্য হেতু প্রথম শিক্ষার্থীদিগের নিকট ইহা অত্যন্ত অসুবিধাজনক বলিয়া মনে হইবে। কারণ মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বানানের যে রীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাদের পুস্তকাদি হইতে সে রীতি আর পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই। অতএব বর্ত্তমান সময়ে বানানের কোন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে ঐ সমস্ত বাংলা-ভাষার স্রষ্টাদিগের অনুসৃত বানানের প্রণালীর উপরই তাহার ভিত্তিস্থাপন করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। আমি যে সূত্রের উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে উভয়কূল রক্ষা হয় বলিয়াই মনে হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এই বিষয়ে বানানের যে "নিয়ম" প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধেও কয়েকটি যুক্তি আছে। তাঁহারা বলিতে চান যে "যদি শব্দের ব্যুৎপত্তির জন্য আবশ্যক হয় তবেই রেফের পর দ্বিত্ব হইবে।" কিন্তু এই বিধানটি অত্যন্ত অস্পষ্ট। কারণ শব্দের ব্যুৎপত্তি সন্ধান যেমন সহজ-সাধ্য নহে আবার তেমনি কোন বিশেষ শব্দের ব্যুৎপত্তি লইয়াও মুনিদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। অতএব এই নিয়মে সাধারণ লেখকদিগের যেমন ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী তেমনি পণ্ডিতের লড়াইও অপরিহার্য্য। এতদ্ব্যতীত প্রচলিত বাংলা বানানের নিয়মের মূলেও ইহা কুঠারাঘাত করিতেছে। তারপর কতকগুলি শব্দের জন্য যখন দ্বিত্বের বিধান রক্ষাই করা হইল তখন ইহাদ্বারা কোন ব্যবহারিক সুবিধাও হইবে না; কারণ ছাপাখানায় সমস্ত অক্ষরই রক্ষা করিতে হইবে।

কোন নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিতে হইলে আদ্যোপান্ত ওলট্ পালট্ করা অপেক্ষা পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত প্রথাকে নিয়মিত করিয়া লওয়া সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত। ইহাতে ভবিষ্যৎ উচ্ছৃঙ্খলতার পথ যেমন রুদ্ধ হইয়া যায়, বর্ত্তমানের কার্য্যও অত্যন্ত সহজ হইয়া পড়ে। বাংলা বানানের নিয়ামকগণ এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন কি?

অনাদৃত

শ্রীঅদ্বৈতকুমার সরকার

অতি যতনে পুঁতিয়া দ্বারে ফুলের চারা এনে
পুত্রসম পালন করি গন্ধ দিবে জেনে।
অতর্কিতে তারই কাঁটা বিঁধিল মোর পায়
সারাটি দিন কাঁদিনু বসি গভীর যাতনায়।
বাহির-আঙনে তরুটী হোথা বাড়িল নিজে নিজে
ভুলেও কভু খুঁজিনি ওর সার্থকতা কি-যে!
তাতিয়া রোদে ক্লান্তি-বোধে বসিনু তারই ছায়ে
বেদনা মুছি শিশুরে ঘুম পাড়া'ল যেন মায়ে।

আহ্বান

শ্রীননীগোপাল গোস্বামী বি-এ

"অসীমে সসীমটুকু করিবারে দান,
ত্যজিয়া পাষাণ মূল আয় ছুটি নদীকূল"
গরজি গম্ভীরে সিন্ধু করিছে আহ্বান।

"আমার প্রশান্ত অঙ্কে জুড়াইতে প্রাণ,
শ্রান্ত ক্লান্ত জীবগণ, ক্ষান্ত দিয়ে আয় রণ"
মরণ নীরবে স্নেহে করিছে আহ্বান।



গল্প

ছেঁড়া ডায়েরীর দু'এক পাতা

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিক শীল

সকাল হইতেই আজ মনের অবস্থা কেন যে এত বিশ্রী হইয়া আছে বলিতে পারি না, তবে একথা সত্য যে মুর্শিদাবাদের নির্জ্জন উপান্তে লালগোলায় বদ্‌লি হইয়া অবধি আমার মনে এতটুকু শান্তি ছিল না। কোলাহলপ্রিয় শহুরে জীবন যেন হাঁপাইয়া উঠে। তাহার উপর নূতন স্থানে আসিয়া নানাবিধ সাংসারিক অসুবিধার আবেষ্টনে মন আরো আকুল হইয়া উঠিয়াছে। চাকর—গোয়ালা—ধোপা ঠিক করিতেই অনেকখানি উৎসাহ নষ্ট হইয়া যায়।···

রেল কোম্পানীর সরকারী ডাক্তার বলিয়া প্রতিবেশি-বৃন্দ অভ্যর্থনা করিলেন মন্দ নয়। সরকার প্রদত্ত লাল রংএর পাকা বাংলোয় শুভাগমনের পরদিনই ষ্টেশনমাষ্টার একটী বৃহৎ রুই মাছ পাঠাইয়া তাঁর উদারচিত্তের, তথা বন্ধুত্ব-প্রিয়তার নমুনা জানাইয়া দিলেন। গৃহিণীর গোলগাল-ভারী মুখখানি হাসির রেখায় আরো একটু ভারী হইয়া উঠিল। অপাঙ্গে একটী কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ভর্ৎসনা-জড়িত স্বরে বলিয়া উঠিলেন—তবে না বলেছিলে অজ্‌ পাড়াগাঁ?—ভদ্দর লোক মোটে নেই বললেই চলে?· প্রতিকূলে জবাব দিয়া অনর্থক কলহের সৃষ্টি করিতে মন সরিল না—মৃদু হাসিয়া আপোষে মিট্‌মাট করিয়া লইলাম।

ইহার দিন দুই পরে পুনরায় উপঢৌকন আসিল স্থানীয় জমিদারের বাটী হইতে। নানাবিধ শাক সবজি এবং সুবৃহৎ এক ছড়া পাকা কলা। গৃহিণীর তখনকার রসনার অবস্থার কথা না জানিলেও সেদিন কিন্তু তিনি বেশ একটু ক্রূরভাবেই আমাকে আক্রমণ করিলেন।

অবশ্য ইহার পশ্চাতে খুব ছোট্ট একটী ইতিহাস আছে; সেদিন পর্য্যন্ত গোয়ালা বা ধোপার কোন সন্ধান করিতে না পারিয়া অতিরিক্ত তাগাদায় বিরক্ত হইয়া মাত্র কিছু পূর্ব্বে আমিই বলিয়াছি—তোমায় ত বলেই এনেছি, এ-হতভাগা দেশে লোকজনের সাক্ষাত মিলবে না। না পাবে কারুর দেখা, না পাবে কিছু খাবার জিনিষ! আর তাহার অব্যবহিত পরেই জমিদার-বাটীর এই বিরাট উপহার!—গৃহিণীর ত বিরক্ত হইবারই কথা। তবে আজ মাত্রাটা একটু বেশী কড়া। অবশ্য একথাও সত্য, লোক ঠিক করিবার জন্য আমি বিশেষ কোন প্রকার চেষ্টাই করি নাই। কিন্তু তাই বলিয়া স্ত্রী হইয়া আমাকেই কটূক্তি করিবে, মন যেন কিছুতেই তাহা বরদাস্ত করিতে পারিল না—অকারণেই রক্ত গরম হইয়া উঠিল।

·· তরকারীপূর্ণ পাত্রটী নামাইয়া জমিদারের চাকর তখনো দাঁড়াইয়াছিল। আমার ভিত্তিহীন ক্রোধ বাহির হইবার অন্য রাস্তা খুঁজিয়া না পাইয়া নিতান্ত অযথাই তাহার উপর গিয়া পতিত হইল। রোষ-কষায়িত লোচনে তাহাকেই বলিলাম—কোন্ ভেজা? লে' যাও উ চিজ্‌।· বলিয়া ধুতির উপরেই কোট চাপাইয়া ক্রোধভরে ডাক্তারখানার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম।

এই অভূতপূর্ব্ব সংঘটনে সেই চাকরটী যত না বিস্মিত হইল, আমার গৃহিণী বোধ করি হইলেন ততোধিক। কেন না দ্বারের বাহিরে পা বাড়াইবার পূর্ব্বে তাঁর ভয়মাখা কণ্ঠের অস্পষ্ট আওয়াজ শুনিলাম—'ও আর নিয়ে যেতে হবে না বাছা, ও থাক্। বাবুর আজ মেজাজ্‌ একটু খারাপ আছে বুঝলে? তুমি রেখে যাও আমি বুঝিয়ে বলবখ'ন।

মনে মনে না হাসিয়া পারিলাম না। মনে পড়িল, আমার এই স্ত্রীর অবিবাহিত জীবনের কথা! শুনিয়াছি তখন তিনি বেথুন কলেজের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী—অসহযোগ আন্দোলনে একদিন তিনিই উন্মত্তা হইয়া নিশানহস্তে আর কয়জন বন্ধুর সহিত পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন—তখন

কণ্ঠে ছিল তেজপূর্ণ সঙ্গীত—"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায় ?"···

কথাটা মনে পড়িয়া হাসি-ও পাইল, দুঃখ-ও হইল। হায় নারী, তোমার স্বপ্নময় জীবনের সে-কুহেলিকা আজ কোথায় ? বাস্তবের চাপ তাহাকে কোথায় উড়াইয়া দিয়াছে ? বাঙ্গালীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমরা স্বাধীন হইতে চাও ?···স্ত্রীজাতির এই প্রহেলিকাময় দুরাশার কথা ভাবিয়া না হাসিয়া পারিলাম না। হাসি পাইল, আর কাহারো নিকট না হইলে-ও স্বামীর নিকট তোমাদের শক্তি কি ভাবে শৃঙ্খলিত! তাহাদের ভ্রূকুটীর একটী আঘাতে তোমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন কোথায় ভাসিয়া যায় ?

সরকারী ডাক্তার হইলে কি হয় ? লোকজনের বসতি না থাকায় রোগীপত্র নাই বলিলেই চলে। এই একঘেয়ে জীবন ভাল লাগে না।

সেদিন বসিয়া আছি, আমার প্রত্যহের নিয়মিত ও বাতিকগ্রস্ত রোগী গুজরান্ সিংএর মোটা কণ্ঠস্বরে সচকিত হইয়া উঠিলাম। তাহার বাঁধাধরা পদ্ধতিতে সে অভিবাদন জানাইল—গুড্ মর্ণিং ডাক্তার সাব!' কি জানি কেন, তাহার সাহচর্য্য আমার ভাল লাগে না। আজ প্রায় তিন-মাস যাবৎ আমি এখানে আসিয়াছি এবং সে আজ প্রায় দুইমাসের কাছাকাছি আমার নিকট নিত্য হাজিরা দিয়া যাইতেছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহার ঐ বিশাল বপুতে রোগের অস্তিত্ব বাহির করিতে সমর্থ হই নাই। অথচ দিনে দুইবার সকল সময়ে সম্ভব না হইলে-ও, প্রত্যহ একবার করিয়া অন্ততঃ তাহার বুক পরীক্ষা করিয়া দেখা চাই-ই চাই।

কাঁচা পাকায় মিশ্রিত সুবৃহৎ শ্মশ্রুরাজিমণ্ডিত এবং জ্বলন্ত ভাঁটার ন্যায় গোল গোল চোখবিশিষ্ট তাহার মুখের পানে তাকাইলে আতঙ্ক ও বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়।—এইরূপ সুপুষ্ট মুখওয়ালা লোকের কোন প্রকার ব্যাধি থাকিতে পারে, তাহা ভাবিতে পারা যায় না। কিন্তু হাজার হইলে-ও আমি কেরাণী। আইনের বিরুদ্ধে কাজ করিবার কোন উপায়ই আমার নাই। তাই সময় সময় নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলে-ও মুখে প্রকাশ করিবার মত সৎসাহস ও ভাষা খুঁজিয়া পাইতাম না।

সেদিন-ও সাংসারিক বিশৃঙ্খলতা উপলক্ষ করিয়া গৃহিণীর সহিত শেষ রাত্রে এক পশ্লা বাক্-বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তাই মনের অবস্থা অনেকটা বর্ষণোন্মুখ জলভরা থম্থমে মেঘের আকার ধারণ করিয়াছিল। গুজ্রান্ সিংএর অভিবাদনে সাড়া দিতে ইচ্ছা হইল না, মৃদু ঘাড় নাড়িলাম মাত্র।···

টেবিলের দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত পালিশ করা বেঞ্চখানিতে গুজরান্ আসিয়া সশব্দে বসিয়া পড়িল। আমার মুখের পানে তাকাইয়া সে কি বুঝিল বলিতে পারি না, কিন্তু একটী-ও কথা বলিল না। আরো কিছু সময় অতিবাহিত হইলে বেঞ্চখানির আর এক প্রান্তে সরিয়া গিয়া ব্যবহারজীর্ণ একখানি কালো রঙ এর নোটবই বাহির করিয়া নিবিষ্ট-চিত্তে কি-যেন লিখিতে লাগিল। আমার মনের অবস্থা এমনই বিশ্রী হইয়াছিল যে তাহাকে ও সম্বন্ধে একটী কথা পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল না।

আগত রোগী কয়টীকে একটীর পর একটী বিদায় করিয়া দিলাম, গুজরানের লেখা তখনো বন্ধ হয় নাই। ক্লোরোফরম্, আইডিন্ প্রভৃতি নানাবিধ ঔষধের আবহাওয়ায় মনের মালিন্য অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। গুজরানের কলম তখনো কাগজের বুকে বাঁধনহারা জলের মত ছুটিয়া চলিয়াছে। মনে বড় কৌতূহল হইল—এই অবসরপ্রাপ্ত পাঞ্জাবীপ্রবরের এমন কি বৈষয়িক দলিলের খসড়া করিবার প্রয়োজন হইল, যে ডাক্তারখানা গৃহেই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া সে এতদূর মাতিয়া উঠিয়াছে ?—রকমারি রোগীর আর্ত্তনাদে তাহার হাতের কলম বিরত হয় নাই ?·· মুখে একটীও শব্দ না করিয়া চুপে চুপে তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়াইলাম।

···পরিষ্কার গোটা গোটা অক্ষরে বাঙ্লা লেখা! আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সে-যে এত ভাল বাঙ্লা লিখিতে পারে, এ-যেন আমার কল্পনার বাহিরে। আজ দুই মাসের উপর তাহার সহিত পরিচয়, অথচ আমি তার কোন সংবাদই রাখিতাম না, তাই অকারণে মনের মধ্যে অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। শুনিয়াছি বটে গুজরান্ বাংলা সাহিত্যে মেডেল প্রভৃতি পাইয়াছিল।···আমার একটী নিদারুণ দুর্ব্বলতা ছিল; বাঙ্গালী ব্যতীত যে-কোন

ভিন্ন জাতীয় লোক বাঙ্‌লা লিখিতে বা পড়িতে জানিলে কি জানি কেন শ্রদ্ধায় তাহার প্রতি মন নুইয়া পড়িত—আমার বড় ভাল লাগিত।···

উষ্ণীষের উপর মৃদু নিশ্বাসের শব্দে গুজরান্ সচকিত হইয়া উঠিল। পিছনে ফিরিয়া আমার দিকে তাকাইয়া নিতান্ত বিসদৃশভাবে বারেকের জন্য সে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তে নিরতিশয় ক্ষিপ্রহস্তে খাতাখানি মুড়িয়া খাকি রঙ্-এর বোতাম আঁটা পকেটের মধ্যে পুরিয়া ফেলিল।···পরে দেওয়ালে ঘড়ির দিকে চাহিয়া ঈষৎ শান্ত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—ওঃ বহুৎ দের্ হো' গ্যয়···হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া জামার বোতাম খুলিতে খুলিতে বুক দেখাইয়া বলিল—ডাক্তার সাব, দেখিয়ে ত!

তার এই আচরণ একটা অদ্ভুত কুহেলিকার মত আমার বোধ হইল। অন্য সময় হইলে 'আর্টিষ্টিক ফাজ্‌লামি' মনে করিয়া হয়ত তাহার উপর চটিয়া আগুন হইয়া উঠিতাম; কিন্তু আমার অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতায় সে তখন অনেকখানি প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। শান্তকণ্ঠে বলিলাম—আপনি অত ভাল বাঙ্‌লা জানেন অথচ আমার সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলেন কেন বাবুজী—? বসুন, আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। বলিয়া নিজের চেয়ারের দিকে অগ্রসর হইলাম।

চেয়ার দখল করিয়া বসিবার পূর্ব্বেই কাগজ ছেঁড়ার শব্দে অতিমাত্রায় সচকিত হইয়া উঠিলাম। ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের মত খাতাখানিকে বোতাম ছিঁড়িয়া পকেট হইতে বাহির করিয়া সে ফড়াৎ করিয়া ছিঁড়িয়া চার-পাঁচ টুক্‌রা করিয়া ফেলিল।···

আমার মনে অনেকগুলি ভাবের একত্র সমাবেশ হইলেও তাহার এতখানি 'সেন্টিমেন্টালিটি' পছন্দ হইল না—মনে মনে ঈষৎ বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। চুপ করিয়া চেয়ারে বসিয়া রহিলাম।

গুজরান্ ধীরে ধীরে আমার কাছে অগ্রসর হইয়া ঈষৎ বিকৃত বাঙ্‌লা ভাষায় বলিল—ডাক্তার সাহেব, আমায় মাপ করবেন। আপনি নিশ্চয়ই আমার ব্যবহারে বিরক্ত হয়েচেন। তা হবারই কথা। খানিকটা আবোল তাবোল্ লিখছিলুম, দরকার লাগবে না তাই ফেলে দিলুম। কিছু মনে করবেন না।

তাহার এই অহেতুক সম্ভ্রমের কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না। মনে নানাবিধ কৌতূহলের সৃষ্টি হইলেও মুখে বলিলাম—নাঃ, কি আর মনে করবো? লোকের ত অনেক কিছুই প্রাইভেট্ থাকে?

কি জানি কেন, এই উক্তিতেও তাহার মুখের বর্ণের যথেষ্ট পার্থক্য দেখা গেল। মুখখানি অতিমাত্রায় আরক্ত করিয়া পার্শ্বস্থিত বেঞ্চখানি সশব্দে দখল করিয়া বলিল—আপনি তাহলে লুকিয়ে সব দেখেছেন বুঝি?···সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতের মুঠি কঠিন হইয়া উঠিল—বৃহদাকার চক্ষু দুটী লৌহ-গোলকের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল।

জনমানবহীন পল্লীপ্রান্তে তাহার এই প্রকার অদ্ভুত আচরণে ভীত হই নাই একথা বলিলে মিথ্যা বলা হয়। কিন্তু তাহার এই পরিবর্ত্তনশীল ব্যবহারে আমি যে প্রকার বিস্মিত হইয়াছি, আমার চল্লিশবয়স্ক প্রৌঢ়জীবনে বোধ করি এইরূপ সংঘটন এই প্রথম। তাহাকে শান্ত করিবার মানসে সুস্থকণ্ঠে কহিলাম-'আপনার কি কষ্ট হচ্চে? ওরকম করচেন কেন বলুন ত?

মুখে একটী-ও কথা না বলিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে আমার পানে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ উঠিয়া খপ্ করিয়া আমার একখানি হাত ধরিয়া বলিল—মাফ্ কিজিয়ে ডাক্তারসাব; হামারা ভুল হুয়া থা!··

তাহার হাত আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে আমার তখনকার অবস্থা বর্ণনা করিয়া অতিমাত্রায় গৌরবান্বিত হইবার সৎ-সাহস আমার নাই; তবে প্রকৃতই তাহাকে শান্ত দেখিয়া পরম পুলকে কহিলাম—না, না—কি আর করেছেন আপনি?···

চির-প্রথামত সুবিশাল ছাতি ফুলাইয়া সে আমার সম্মুখে দাঁড়াইল। লম্বা 'চেষ্ট-পিস্' লাগাইয়া আমি-ও তাহার বুকের উপর 'ষ্টেথস্-কোপ্‌টা' চাপিয়া ধরিলাম। প্রশস্ত বুকের তিন চার স্থানে চোঙ্‌টা ঘুরাইয়া মৃদু হাস্যের সহিত বলিলাম—আপনি কি ভয় পেয়েছেন মিঃ সিং? —'রেশ্‌পিরেশন্' অতো 'হারিড্' কেন?···এতক্ষণ যে দৌড়-ঝাঁপ করেন নি আমিই ত তার জ্বলন্ত সাক্ষী।

আমার এই সরল কথায়ও তাহাকে একটু বিচলিত দেখিলাম। কিন্তু তখনি সামলাইয়া জোর করিয়া শুষ্ক হাসির রেখা টানিয়া বলিল—আপনাদের সবাই ভয় করে

ডাক্তারসাব। কখন কাকে কত বড় অসুখের নাম শুনিয়ে দেবেন, কে জানে ?…

…নিতান্ত সহজ এবং স্বাভাবিক সুর। হাসিয়া কহিলাম—এই কথা ? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ; আমি আজও খুব ভাল করে আপনার হার্টের অবস্থা দেখেছি ; এখনো হেসে খেলে অন্ততঃ পাঁচ বছর নির্ব্বিবাদে সে কাজ করতে সক্ষম থাকবে।—অবিশ্যি এই ভাবে যদি শরীরের প্রতি লক্ষ্য রাখেন।

আশ্চর্য্যের কথা, আমার মন্তব্যে উল্লসিত হওয়া দূরে থাকুক, তাহার গুরুগম্ভীর তামাটে মুখখানি যেন ঈষৎ ম্লান হইয়া গেল। একটী বিপুল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—পাঁ—চ বরষ !

তাহার ভাব-বৈলক্ষণ্যের জ্বালায় অতিষ্ঠ হইয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। কোয়াটার্সে যাইবার জন্য চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলাম। গুজরান্ ধীরে ধীরে উঠিয়া একটা লম্বা সেলাম ঠুকিয়া চলিয়া গেল।

· কম্পাউণ্ডার জানালা বন্ধ করিতে লাগিল। হঠাৎ আমার কি খেয়াল হইল, টেবিলের তলা হইতে 'ওয়েষ্ট-পেপার বাস্কেটটা' টানিয়া বাহির করিলাম। গুজরানের আজ তারিখের সকল প্রকার বিসদৃশ আচরণ ঐ জীর্ণ খাতাখানিকে কেন্দ্র করিয়া জোট্ পাকাইয়া দিয়াছে কি না জানিবার জন্য বিশেষ কৌতূহল হইল। গুরুতর অন্যায় জানিয়াও হঠাৎ মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—খানিকটা অয়েল পেপার আর গাম্ আমার বাসায় দিয়ে আসবেন ত কম্পাউণ্ডারবাবু ! সেই বিখণ্ড খাতাখানি তুলিয়া পকেটে পূরিলাম।

বিকালের দিকে ডাক্তারখানার কাজ নিতান্তই অল্প ;—সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই বন্ধ হইয়া যায়। আজ কম্পাউণ্ডারবাবুকে টেবিল-ল্যাম্পটী ঠিক করিয়া রাখিতে বলিয়া সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়া গেলাম। সমস্ত বিকালটী সেই বিখণ্ড খাতাখানি ঠিক করিতেই কাটিয়া গিয়াছে ; তখনো মাথা টিপ্-টিপ্ করিতেছে। কিন্তু কৌতূহল এবং ঔৎসুক্য এমনই উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে যে ঠেকাইয়া রাখা দায়।

·· ডিস্পেন্সারী ঘরের দরজাটী বন্ধ করিয়া খাতাখানি খুলিয়া বসিলাম। কি জানি, খেয়ালী গুজরান্ এই অবসরে আবার যদি আসিয়া পড়ে !

…তারিখ ও বার দেওয়া পর পর লেখা, কিন্তু অনেক পরিশ্রম করিয়াও গোড়া খুঁজিয়া পাইলাম না। হয়ত বা অন্য কাগজের সহিত মিশিয়া হারাইয়া গিয়াছে ! গোলমাল হওয়াও বিচিত্র নহে। যে স্থান হইতে সংস্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি সেই স্থানটীই খুলিয়া বসিলাম।

মঙ্গলবার, ১৭ জুন।—কান্তিলাল সিং, বেশ ছেলেটী—স্বভাবটী আরো মিষ্টি। · ঘরে স্ত্রী প্রভৃতি নিয়ে অত অল্প বেতনে চলা অসম্ভব। ওকে একটা প্রোমোশনের জন্য রেকমেণ্ড করতে হবে। আজ ওর বুড়ো বাপকে নিয়ে সাক্ষাৎ করতে এসেছিল। আলাপ হোল ; আমারই এক বন্ধুর বন্ধু—বেশ লোক। আমাদের গাঁয়ের পাশেই ওঁদের বাড়ী। আগামী-কাল তার স্ত্রী প্রভৃতিকে নিয়ে বেড়াতে আসতে বলেছি।

শুক্রবার, ২০ জুন।—কাল কান্তিলালরা এসেছিল, কাজের ঝঞ্ঝাটে পরশু আসতে পারে নি। বৃদ্ধ আসেন নি, কান্তিলালই শুধু তার স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিল। লালি মায়ীর ভারী আহ্লাদ ! সে বলে—কান্তিলাল খুব আচ্ছা আদ্‌মি। খুব আচ্ছা গানও গাইতে পারেন। · সত্যিই তাই, কান্তিলালের গান আমারও বড় মিঠা লাগে। ও যখন গান গায়, মনে হয় ওর মুখে চোখে যেন বেহেস্তের আলো এসে পড়েছে। লালি মায়ীকে শেখালে মন্দ হয় না, অবশ্য ও যদি রাজি হয়। ··

শনিবার, ২৮ জুন।—অনেক বলে কয়ে কান্তিলালকে রাজী করেছি। সাঁচ্চা বাত্। সরম লাগবারই কথা ! ·· বড় আচ্ছা ছোক্‌রা আছে।

রবিবার, ২৯ জুন।—কই, লালির ত একটুও সরম দেখলুম না ! কান্তিলালই কথা বলতে পারছিল না—লজ্জায় সিঁদুরের মতো লাল হয়ে যাচ্ছিল।…অজানা অপরিচিত লোকের সঙ্গে লালি এমনভাবে কথা বলতে পারবে আমার ধারণাই ছিল না। বেটী ঠিকই বলেছে ; ভায়ের আবার বোনের কাছে সরম কেন ?…কান্তিলাল তবু কোন জবাব দিলে না, শুধু একটু হাসলে।…

আমিই বললুম—লালি ত খুব জবর বাত বলেছে

কান্তিলাল। ও তোমার বহিন্। কাল থেকে সন্ধ্যার সময় কিংবা কিছু পরে তোমার অবসর মত এসে এক আধ ঘণ্টা ওকে গান শিখিয়ে যেও।

মুখে কিছু না বলে, সেলাম করে সে চলে গেল।

সোমবার, ৩০ জুন।

সকালে বাইরের ঘরে পা দিতে না দিতেই কান্তিলাল শুষ্কমুখে এসে হাজির হোল।—কি খবর কান্তিলাল?—কুছ্ নেই বাবুজী—বলে সে অপরাধীর মত মাথা চুলকাতে লাগল।

আমার মুখে ওর নামের ডাক শুনে লালি ছুটে বাইরের ঘরে এসে উপস্থিত হোল। আমি বললুম—চা লে' আও।…বড় বড় চোখ দুটো মেলে কান্তিলালের দিকে চেয়ে সে পরম পুলকিত হয়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল!

…কান্তিলাল ডাকল—বাবুজী!

তার গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে তার পানে তাকালুম। নতমুখে সে বলে চলল—আমার মাপ করবেন; কাল রাত-ভোর ভেবেচি, কাজটা ঠিক হবে না বাবুজি। লালি বহিনের স্বামী এতে রাগ করতে পারেন।

বিসদৃশভাবে চমকে উঠলুম। বললুম—কাহে? তেমনি নম্রকণ্ঠে মাথা চুলকাতে চুলকাতে সে বলল—এই সি হাম্‌রা মন লেতা হৈঁয়।…

গর্জ্জন করে উঠলুম—কুছ্ পরোয়া নেহি।…ওর স্বামীর সম্পর্ক আজ পাঁচ বছর কেটে গেছে। সেও ওর কোন খোঁজ করে না, আমরাও না।…

গরম চায়ের পেয়ালা নিয়ে লালি এসে প্রবেশ করল। আমরা কথা বন্ধ করতে বাধ্য হলুম। তার সামনে পেয়ালা রেখে হাসতে হাসতে লালি বলল—আজ ক'টায় আসবেন?

একবার আমার মুখের পানে চেয়ে কান্তিলাল বলল—সাত, সাড়ে সাত বাজে।…

৮ জুলাই, মঙ্গলবার।

বিষম সন্দেহ ছিল, কান্তিলাল সহজে রাজী হবে না। কিন্তু কাল আড়ালে দাঁড়িয়ে ওর গান শুনেছি এবং শেখাবার কায়দাও দেখলুম। হাঁ, ভারী আচ্ছা গায় ছোক্‌রা।…

২৩ জুলাই, বুধবার।

হুকুম এসেছে তিন সপ্তাহের জন্য সান্তাহারে যেতে হবে, লালি কিছুতেই যেতে রাজী নয়। বলে—কান্তিলালের বউ এসে বাসায় থাকবে, আর কান্তিলাল ত আছেই।

…ভেবেছিলেম কান্তিলাল আপত্তি করবে—কিন্তু সেও বিশেষ আপত্তি করল না, তাই রক্ষে।

যাবার সময় কান্তিলালের বাবাকে একটু নজর রাখতে বলে গেলুম। বুড়ো খুসি হয়ে রাজি হয়ে গেল।…

২৪ আগষ্ট, রবিবার।

লালির যথেষ্ট উন্নতি হয়েচে, সে এখন দু-চারখানা গান বেশ ভাল গাইতে পারে। কান্তিলালের কেরামতী আছে। এত অল্প সময়ে এমন ভাবে শেখানো সোজা কথা নয়।

২৮ আগষ্ট, বৃহস্পতিবার।

কান্তিলাল আজকাল কাজের দিকে বড় ফাঁকি দিচ্ছে। সান্তাহার থেকে ফিরেই তার এ ডিফেক্ট চোখে পড়েছিল। তখন কিছু বলিনি, কিন্তু ক্রমেই যেন বেড়ে যাচ্ছে মনে হয়।…

৪ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার।

আজ পে-ডে অর্থাৎ মাইনের দিন। টাকাটা নিয়েই কান্তিলাল ক'লকাতায় যাবার জন্য ছুটী চাইলে, কাল ভোরে ফিরবে।…

৬ সেপ্টেম্বর, শনিবার।

সকালে লালি একটা হোয়াইটওয়ের মস্ত মোড়ক নিয়ে আমায় দেখালে। কান্তিলাল তাকে দুর্গাপূজা উপলক্ষ করে উপহার দিয়েছে।…অনেক টাকার জিনিষ।

কান্তিলালকে জিগেস করলুম: এসব কেন? সে বললে—আমার যখন বহিন্, তখন দিতে বাধা কি?

১৭ সেপ্টেম্বর, বুধবার।

৺পূজার ধুমধাম লেগে গেছে। কাল থেকে অফিস বন্ধ। লালি ঠিক করেছে এবারে কলকাতায় যেতে হবে এবং কান্তিলাল আর তার বৌকে সঙ্গে নিতে হবে। বেলা দশটার আগেই কান্তিলালের বাপের আদেশ নিয়ে এসে আমায় জানালে।…

সন্ধ্যাবেলা কান্তিলাল এল। আজ যেন তার চোখ দু'টো একটু কি রকম! অন্যান্য দিনের মত আজ সাক্ষাৎ হতে নমস্কারও করলে না। হাসতে হাসতে বললে—আজ তোমায় একটা গজল শেখাব লালি।···

তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সেরে লালি হার্মোনিয়ম নিয়ে বসল। আমি সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়ে গেলুম।···

একটু অসময়েই ফিরতে হোল, কাজ ছিল একটা। এসে দেখি সদরদরজা ভেজান এবং ভেতরের ঘর-ও আবছা অন্ধকার।—গানের কোন শব্দ নাই।···কান্তিলাল এর মধ্যে চলে গেছে আজ?···

ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। দেখি দুজনে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে আছে—দুজনার চোখেই জল টল্-টল্ করছে। হ্যারিকেনটা হার্মোনিয়মের ওপর মিট্‌মিট্ করে জ্বল্‌ছে।··

গম্ভীর স্বরে ডাকলুম—লালি! মায়ি!

ধড়্‌মড়্ করে চমকে উঠে—কান্তিলালের হাতখানা চেপে ধরে সে বলে উঠল—নেহি, ভাইয়া নেহি।

১৯ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার।

আজ সকালেও কান্তিলাল বিরক্ত করতে ছাড়েনি। বলে—ক'লকাতায় না হয় আর কোথাও চলুন। বললুম—তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে যাও না! আমাদের যাওয়া ঘটে উঠবে না কান্তিলাল।···

সন্ধ্যাবেলা সে গান শেখাতে এল। আমি ইচ্ছা করেই বারণ করিনি; তবে অলক্ষ্যে দৃষ্টি রেখেছি।···বিশ্বাস হয় না!—কান্তিকালের মত ছেলে, তার পক্ষে এ কি সম্ভব? না না আমারই নিশ্চয় ভুল হচ্ছে!··

· চুপে চুপে জানালার পাশে এসে দাঁড়ালুম। খানিকটা আগেই গান থেমেছে। কান্তিলালের আওয়াজ পেলুম—···কাল ঠিক ন'টায় তৈরী থাকবে একদম।···ঐ যে আমগাছের নীচে ডিস্‌ট্যান্ট সিগ্‌ন্যালের পোষ্ট, পাশেই পয়েন্টস্‌ম্যানের খালি গুম্‌টিটা পড়ে আছে—ঐটের ভেতর। ন'টা পঁচিশ মিনিটে গাড়ী ছাড়বে।

লালি কিছু বললে কি না ঠিক শুনতে পেলুম না, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে হার্মোনিয়াম্ বেজে উঠল।

···শরীরের রক্ত টগ্‌বগ্ করে ফুটতে লাগল।—যেন শিরা ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়বে।

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে এবার-ও কোন কথা না বলে বাইরের দিকে চলে গেলুম।

· হাঁ, দুনিয়ায় অসম্ভব বলে কিছুই নাই বটে!—ভাল ফুলগুলোতেই পোকা বেশী থাকে!···বেওকুফ্! বেইমান্!···

২১ সেপ্টেম্বর, রবিবার।

উঃ, কাল ছিল যেন আমার কাল-রাত্রি। সন্ধ্যা হবার আগে থেকেই কতবার যে ঘড়ির দিকে তাকিয়েছি তা বোধ করি গুণে বলতে পারব না। আর বারবার দেখেছি লালির মুখের দিকে। আমার বেটী—আমার মা-হারা বেটী!—না-না, থুক, সে কাফের!···কিন্তু আশ্চর্য্য, তার মুখপানে দেখে যদি একটু বোঝবার যো থাকে। কি আশ্চর্য্য!—এ-ও কি সম্ভব?

···আটটা বাজবার পর থেকেই তাকে যেন একটু অতিমাত্রায় বিচলিত দেখলুম—সে ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে।

কি খেয়াল হোল বললুম—মায়ি, আজ আফিসে একটা কাজ ভুল করে এসেছি, সে টুকু সেরে আসি। ফিরতে বোধ হয় ঘণ্টাখানেক দেরী হবে। আজ কান্তিলাল আবার আসে নি কি না! আজকাল বড্ড ফাঁকি দিতে আরম্ভ করেছে।···গান শেখাতে-ও ত এল না দেখছি আজ।

কান্তিলালের নামে স্পষ্ট দেখলুম—তার মুখখানা মড়ার মত শাদা হয়ে গেল।

বললুম—তুমি খাবার ঠিক করে বসে থেক, আমি এলে একসঙ্গে খাব।···সে কি বললে ঠিক বুঝতে পারলুম না, কিন্তু দেখলুম মুখখানা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলে।

·· দাসত্বের খতিয়ানে নাম লেখাবার পর বহুদিন চলে গেছল, কিরীচখানার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম; লালির অলক্ষে একবার খাপ্ থেকে টেনে বের করে দেখলুম।—কৈ, যৌবনের সেই গরমদিনের মত ওটা তো সে-রকম ঝল্‌মল্ করে উঠ্‌লো না? অনেক দিনের অব্যবহারে ওর লেলিহান স্পৃহা যেন অনেকটা ম্লান হয়ে গেছল। · টপ্ করে পকেটের মধ্যে পুরে নিয়ে বাইরের ঘরে চলে গেলুম। গিয়ে জুতোর উল্টো পিঠে বারকয়েক মেজে নিলুম।

···ঘর থেকে বেরোতে যাচ্ছি, লালির মা'র ছবিখানা

নজরে পড়ে গেল—ছবিটা যেন ফুড়্-ফুড়্ করে কেঁপে উঠ্‌ল—চোখ দুটো আবেশে বন্ধ হতে চায়!···তখনি সামলে নিয়ে মৃদু হেসে বেরিয়ে পড়লুম।

··বাইরে যেন কার পায়ের আওয়াজ পেলুম। হাঁ, ঠিক তাই। খাপ্ থেকে কিরীচখানা খুলে মুঠির ভেতর শক্ত করে চেপে ধরলুম। ভেজান গুম্‌টির দ্বারের ওপর মৃদু টোকার আওয়াজ হোল—বিবি!—লালিযা!

ভেতর থেকে টোকা দিয়ে মুঠিটা আরো একটু শক্ত করে নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে দিলুম।

···ধাঁ করে দরজা ঠেলে কান্তিলাল ঢুকে পড়ল। উন্মত্ত ব্যাঘ্রের মত তার ওপর লাফিয়ে পড়লুম।—হাত একটু-ও কাঁপল না—বহুদিনের উপবাসী কিরীচখানা বিনা দ্বিধায় তার বুকের ভেতর অনেকখানি ঢুকে গেল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—শয়তান!—বেইমান!

কান্তিলালের প্রকাণ্ড টর্চটা হাতের বাঁধন শিথিল হয়ে সশব্দে মাটীতে পড়ে গেল। · বারেকের জন্য জ্বেলে দেখলুম, রক্তের স্রোতে স্নান করে পরপারের জন্য সে নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছে।—চোখ দুটো ধীরে ধীরে মুদে আসছে। তাকে টেনে একপাশে সরিয়ে তারই কাপড়ে কিরীচখানা মুছে নিলুম।

অদূরে ষ্টেশনে ঢং ঢং করে গাড়ী আসবার ঘণ্টা পড়ল। দরজায় ফের টোকার আওয়াজ পেলুম। ঘৃণায় ভুরু দুটো কুঁচ্‌কে উঠ্‌ল—দাঁতে দাঁতে ঠুকে গেল! লালির মা'র সদ্য দেখা ছবিখানা বারেকের জন্য স্মৃতির দ্বারে ফুটে উঠল। কিরীচখানা শক্ত করে আর একবার চেপে ধরলুম।

· দরজা খুলে গেল। আর একবার বাঘের মতো লাফিয়ে উঠলুম—সঙ্গে সঙ্গে কিরীচ ছুটে তার-ও বুকে চেপে বসে গেল। ·

অনেক জোরে ঠোঁট চেপেছিলুম, কিন্তু কিছুতেই পারলুম না—ঠেলে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—ভগবান!

কণ্ঠস্বরে চিনতে পেরে লালি বলে উঠল—এ্যাঁ! বাবুজী! তুমি?—আঃ।

তার এই স্বস্তির নিশ্বাসের কোন হেতুই খুঁজে পেলুম না! হাতের টর্চটা জ্বেলে ফেললুম।···সদ্য ছিন্ন লতার মত সে লুটিয়ে পড়েছে—বুকের নীচে রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে।···

চাইতে পারলুম না—মুখ ফিরিয়ে নিলুম। লালি আমার দিকে হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে আসতে লাগল। কাপড়ের ভেতর থেকে অতিকষ্টে একখানা ছোট ভোজালি, একটা ছোট্ট মোড়ক, আর একখানা ভাঁজকরা কাগজ আমার পায়ের কাছে রাখল; পরে মৃত্যুজড়িত স্বরে ধীরে ধীরে বলতে লাগল—বিশ্বাসঘাতকের ঠিক শাস্তিই দিয়েছ বাবুজী। তা বলে আমায় ভুল বুঝ না। তোমার বেটী আমি—তোমার কাছেই যে আমার সমস্ত শিক্ষা বাবুজী! তুমি জেনেছিলে ভালই হয়েছে, নৈলে আজ আমাকেই ও-কাজটা করতে হোত। একান্ত না পারলে ঐ মোড়কটার—। কথা শেষ হোল না। স্পষ্ট দেখলেম—তার মৃত্যু-করাল পাংশু মুখে-চোখে বারেকের তরে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল।

সমস্ত দুনিয়া আমার পায়ের নীচে দুলতে লাগল।—জোর করে ঠোঁট কামড়ে চেপে থাকলে-ও ফের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—হা ভগবান—

· কিরীচখানা টেনে বের করতেই রক্তের ফিন্‌কি ছুটে আমার মুখের ওপর এসে পড়ল!—গরম টগ্‌বগে রক্ত! উঃ যেন আগুনের ফলকি! সঙ্গে সঙ্গে লালি আমার চিরতরে থেমে গেল।

৩রা অক্টোবর, শুক্রবার।

কাল শেষ রাত্রে কি বিশ্রী স্বপ্ন দেখলুম! লালি মায়ি এসেছে—ওর মা-ও এসেছে ওর পিছু পিছু। লালি আমায় ডাকছে—বাবুজী, বাবুজী! ওর মা অনুযোগ করছে—আমার লালিকে বিনা দোষে মারলে কেন?···

কি জবাব দেব? আমি ভয় পেয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলুম। লালি এসে মুখ চেপে ধরল, মুখ মুছিয়ে বলল—না বাবুজী, না। তুমি ত ঠিকই করেছ! শয়তানের সাজা হওয়াই ত দরকার।

·· তারপর কি হোল মনে নেই। ঘুম ভেঙ্গে গেল একটা শেড্‌কুলির চীৎকারে—জরুরি 'তার' আয়া হুজুর!

তারপর আর লেখা নাই, কিম্বা হারাইয়া গিয়াছে ঠিক বোঝা গেল না। মনটা বড় ভারী হইয়া উঠিয়াছে—নিবিষ্ট-

চিত্তে খাতাখানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিলাম। হঠাৎ আজকের তারিখের একটা লেখা নজরে পড়িয়া গেল। তাহা হইলে সম্ভবত ইহাই সে আজ লিখিতেছিল।

১৩ মার্চ্চ, শনিবার।

মা লালি আমার! কতদিন এ-খাতা আর ছুঁইনি, কিন্তু কাছ ছাড়াও করিনি। ভয় হয় পাছে কেউ জানতে পারে। অথচ আমার এই পাপের কথা চাপা থাকে এ-ও আমার ইচ্ছা নয়।

...তোমার সেই ফিন্‌কি দিয়ে বুকের রক্তছোটা আজো আমার চোখের ওপর যেন নেচে বেড়ায়। হা খোদা! কত বড় ভুল তোমায় আমি বুঝেছিলুম, মা!... তুই যে আমারই বেটী, ভুলেই গিয়েছিলুম।

...প্রত্যহই চেষ্টা করি, আমারই বুকের রক্ত দিয়ে ও-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি, কিন্তু কিছুতেই তা সম্ভব হচ্চে না। এ যে পাষাণের চেয়ে কঠিন হয়ে গেছে!...কত কিল মেরেছি—ইঁট দিয়ে ঠুকেছি, কিছুতেই কিছু হয়নি। ডাক্তার সাহেবকে রোজ দেখাই—বেশ বুঝতে পারি, উনি বিরক্ত হন। কিন্তু আমি যে তাড়াতাড়ি তোমাদের কাছে-

তারপর আর পড়া একপ্রকার দুঃসাধ্য। এখানে টুকরাগুলি ঠিক মত আঁটিতে পারা যায় নাই।

মনের অবস্থা নানাবিধ কারণে এমন বিশ্রী হইয়া উঠিয়াছিল যে আর চেষ্টাও করিলাম না।

ডিস্পেন্সারীর ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া ন'টা বাজিয়া গেল; কান্তিলালের ন'টার 'এন্‌গেজমেণ্টের' কথা মনে পড়িয়া সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়া উঠিল।

দুম্-দুম্ করিয়া দ্বার ঠেলার শব্দে শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম —ডাক্তারবাবু—ডাক্তারবাবু!

দ্বার খুলিতেই একটী কুলি ব্যস্ত কণ্ঠে কহিল—এখনি চলুন, বাবুজীর বড় অসুখ।

বিস্ময়ের স্বরে কহিলাম—কার?—গুজরান্ সিং-এর? সে ত আজ সকালে-ও এসেছিল?

যাইতেই শুষ্ক অথচ হাস্যজড়িত কণ্ঠে গুজরান্ কহিল—আইয়ে ডাক্তার সাব, সেলাম। খাতাখানি অতদিন রেখেছিলুম, আজ আর না ছিঁড়লেই হোত।

তাহার পাশেই একটা দু'মনি বাটখারা এবং সম্মুখের নর্দ্দমা টাট্‌কা কাঁচা রক্তে রক্তাক্ত দেখিয়া আমার কিছুমাত্র বুঝিতে বাকী রহিল না! কহিলাম—কি হয়েছে বলুন ত?

গুজরান্ পুনরায় হাসিল, মৃদুকণ্ঠে কহিল—আমি সব বলে যাচ্ছি, দয়া করে একটু লিখে যান। আইন বড় কড়া কি না। আজ খাতাখানা থাকলে আপনার হাতে তুলে দিলেই সব মিটে যেত। যাক্, আজ একটু কষ্ট করুন। বলিতে বলিতে তাহার একটা কাসি আসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি রক্ত বাহির হইয়া গেল।

বাধা দিয়া বলিলাম—আমি আপনার সেই ছেঁড়া খাতা জুড়ে নিয়ে সমস্ত কথাই পড়েছি বাবুজী। আপনার সমস্ত দুঃখের কথাই আমি জানি। আপনি একটু বিশ্রাম করুন, আমি টপ্ করে গিয়ে একটা ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্চি।

উঠিবার চেষ্টা করিলাম। হাত চাপিয়া গুজরান্ কহিল না ডাক্তারসাব, আর নয়। বহুৎ দিন হয়ে গেল, আজ আমায় ছুটী দিন। ঐ দেখুন লালি আর ওর মা আমায় নিতে এসেছে—বলিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেওয়ালের দিকে চাহিল।...

পরক্ষণে আর এক ঝলক্ রক্ত উঠিয়া গুজরান্ চিরতরে থামিয়া গেল।

স্থানুর ন্যায় আমি নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলাম।



বলদেব পালিত

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ্-আর্-ই-এস্

ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে যখন রাজধানী কলিকাতাতে মধুসূদন, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র প্রতীচ্য কাব্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্যে অভিনব ছন্দ এবং অভিনব ভাব ও ভাষার প্রবর্ত্তন করিয়া স্বদেশীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন, সেই সময়ে সুদূর প্রবাসে দানাপুরে একজন একনিষ্ঠ বাণীসেবক সংস্কৃত সাহিত্যের অনন্তভাণ্ডার হইতে রত্নরাশি আহরণ করিয়া মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন; অপূর্ব্ব লিপিনৈপুণ্যসহকারে সংস্কৃত নানাবিধ ছন্দে কাব্যরচনা করিয়া দেখাইয়াছিলেন প্রতীচীর নিকট আমাদের ঋণী হইবার প্রয়োজন নাই, বঙ্গভাষার "মাতৃ-কোষে রতনের রাজি।" ইংরাজীর মোহে মুগ্ধ বাঙ্গালী যদি কখনও প্রতীচ্য আদর্শ ত্যাগ করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শে সাহিত্য পুনর্গঠনের চেষ্টা করে, তাহা হইলে বলদেব পালিতের নাম অন্যতম অগ্রণীরূপে পূজিত হইবে। কিন্তু তাহা হইবার নহে এবং অর্দ্ধ-বিস্মৃত কবি বলদেব পালিতের নাম ক্রমশঃ ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইবার সম্ভাবনাই অধিক। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ তাঁহার নামের সসম্মান উল্লেখ না করিলে তাঁহাদের ইতিহাস নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে; কারণ তিনি কেবল স্বীয় রচনাদ্বারাই তাঁহার কবি শিষ্যগণকে একটি নূতন পথ দেখাইয়া যান নাই, তাঁহার প্রেরণায় উৎসাহে ও উপদেশে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন পর্য্যন্ত অনেকেই উপকৃত হইয়াছেন, অভিনব কাব্য-রচনা দ্বারা মাতৃভাষাকে ঐশ্বর্য্যশালিনী করিয়াছেন। কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন তদীয় "নির্ঝরিণী" নামক গীতি-কাব্যের দীর্ঘ উৎসর্গ-পত্রের একস্থানে "বঙ্গসাহিত্যকণ্ঠহার কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু বলদেব পালিত মহাশয়"কে উদ্দেশ করিয়া তাই লিখিয়াছিলেন—

"কিন্তু তুমি কবিবর
যে মদিরা দেছ ঢেলে প্রাণের ভিতর;
সদ্য-ছিন্ন ছাগমুণ্ড ভূমিতে পড়িয়া
উরধে উঠিতে চায় নাচিয়া নাচিয়া—
সেই সে মদিরাযোগে তেমতি আমার
অদ্যাপি এ ক্ষীণ দেহে তাড়িত সঞ্চার।

*　　*　　*　　*

সকলি তোমারি গুণে, তাই দেব ও চরণে
ধোয়াবে এ দাস আজ "নির্ঝরিণী"-জলে,
ভকতি-কুসুম আর শ্রদ্ধা-বিল্বদলে।
বিরহিণী কোকশ্রেণী মেখলা ইহার,
বিকল মরাল ইথে দেয় গো সাঁতার,
ধুতুরা ও রক্তজবা ভাসে ইথে রাত্রি-দিবা,
"নির্ঝরিণী"-জল মোর নয়নের ধার!
তবু দেব,
করিও গ্রহণ পূজা, করিও গ্রহণ,
দিও এ ভকত জনে, দিও গো চরণ।"

কেবল কবি বলিয়া নহে, বাঁকীপুরের প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজের ইতিহাসেও পালিত মহাশয়ের নাম চিরদিন বরণীয় থাকিবে। আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে সংক্ষেপে ইঁহার জীবন ও সাহিত্য-সেবার পরিচয় দিতে মনঃস্থ করিয়াছি।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বলদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বিশ্বনাথ হালিসহরের নিকটবর্ত্তী কোণাগ্রামের পালিতবংশোদ্ভূত। অনুমান ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কিশোরবয়স্ক বিশ্বনাথ তাঁহার মাতুলালয় চন্দননগর হইতে দানাপুরে পলাইয়া আসেন। তখন দানাপুরে বহু বাঙ্গালী ক্যান্টনমেণ্ট ও কমিশেরিয়েটে কার্য্য করিতেন এবং বিশ্বনাথও কমিশেরিয়েটে একটি সামান্য কার্য্য পাইয়াছিলেন। বিশ্বনাথ কলিকাতার দক্ষিণস্থ রাজপুরের জমিদার রাজচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের অন্যতম প্রদৌহিত্রীকে বিবাহ করেন। দানাপুরে বিশ্বনাথের চেষ্টায় একটি কালীবাড়ী ও তৎসংলগ্ন অতিথিশালা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি সকলেরই প্রীতি আকৃষ্ট করেন। ১৮৪১-২ খৃষ্টাব্দে বিশ্বনাথ কমিশেরিয়েটের

গোমস্তা হইয়া কাবুল অভিযানে গমন করেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ সৈন্য কাবুল পরিত্যাগ করিয়া ভারতে প্রত্যাগমন করিবার সময় পথিমধ্যে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়। সৈন্যদলের সহিত বিশ্বনাথও নিহত হন।

বিশ্বনাথ মৃত্যুকালে তাঁহার ১২টী সন্তানের মধ্যে দুইটি মাত্র পুত্র ঈশানচন্দ্র ও বলদেব এবং চারিটি কন্যা রাখিয়া যান।

বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সন্তানগণের ভরণপোষণ ও শিক্ষার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। বলদেব তাঁহার ভগিনীপতি রাজকৃষ্ণ মিত্রের বাঁকীপুর সব্জীবাগ পল্লীর বাসায় অবস্থান করিয়া গুল্জার্বাগের কোন বিদ্যালয়ে বাল্যশিক্ষা লাভ করেন। বলদেব মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির জন্য তিনি শিক্ষকগণের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।

বলদেব ছাপরার মধুসূদন মিত্রের ভ্রাতা মহেশচন্দ্র মিত্রের কন্যা ভগবতীকে বিবাহ করেন এবং কিছুদিন মধুসূদনের সাহায্যে ছাপরায় একটি কার্য্য পাইয়া তথায় নিযুক্ত থাকেন। অতঃপর তিনি দানাপুরে মিলিটারী পেন্সন পে অফিসে তৃতীয় কেরাণীর পদ প্রাপ্ত হন। অধ্যবসায় ও কর্ম্মকুশলতাগুণে তিনি শীঘ্রই প্রধান কেরাণীর (হেড ক্লার্ক) পদে উন্নীত হন। সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্বেই তিনি হেড-ক্লার্কের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বলদেব অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে জানিতেন। তিনি লোকহিতকর নানা সৎকার্য্যে মুক্তহস্তে দান করিতেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে দানাপুরে তিনি একটি মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয় পরে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য-প্রাপ্ত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। উহার বর্ত্তমান নাম দানাপুর বলদেব একাডেমী। তাঁহারই অর্থে তাঁহার পুত্র যদুনাথ ও জামাতা তিনকড়ি ঘোষ বাঁকীপুরে 'টি-কে ঘোষের একাডেমী' নামে এক স্কুল এবং গয়া ও আরায় আর তিনটি স্কুল স্থাপন করেন। তিনি বহু ছাত্রের আশ্রয়দাতা ছিলেন। অতিথি অভ্যাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে কথনও তিনি বিমুখ করিতেন না।

দানাপুরে কোনও বাঙ্গালী ভ্রমণোদ্দেশ্যে গেলে তিনি সাদরে নিজগৃহে লইয়া যাইতেন। দীনবন্ধু মিত্র কার্য্যব্যপদেশে তথায় গেলে বলদেববাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। বর্ত্তমান লেখকের পিতামহ 'হিন্দুপেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী'র প্রবর্ত্তক-সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে যান এবং কয়েকদিন বলদেববাবুর আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন। রসরাজ অমৃতলাল বসু যৌবনে যখন বাঁকীপুরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকরূপে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন তখন তিনিও বলদেব-বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করেন।

বলদেব বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ না পাইলেও গৃহে নিজ চেষ্টায় আজীবন নানাশাস্ত্রে জ্ঞানার্জ্জন করেন। তিনি ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস ও ব্যবস্থাশাস্ত্র উত্তমরূপে পাঠ করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য পাঠে মনোযোগী হন। তিনি বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ এবং কালিদাস প্রভৃতি সংস্কৃত কবিগণের প্রায় সমুদায় গ্রন্থই যত্নসহকারে পাঠ করিয়াছিলেন। যখন মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন করেন তখন বলদেব বিবিধ সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গালা কাব্য রচনা করা সম্ভব কিনা তাহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সংস্কৃত অলঙ্কার বিষয়ক অনেক গ্রন্থ পাঠ করিলেন এবং ইলিয়াড অডিসি প্রভৃতি কাব্যের গ্রীক ও ল্যাটিন মূল ছন্দ ও তাহার ইংরাজী অনুবাদের ছন্দ প্রভৃতির আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি এই সময় হইতে সংস্কৃত ছন্দে কবিতা রচনার চেষ্টা করেন। তাঁহার কাব্যগুলির পরিচয় পরে যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে।

বলদেব কবিরাজী ও হোমিওপ্যাথি উভয়বিধ চিকিৎসা-শাস্ত্রও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি বিনামূল্যে বাড়ী বাড়ী রোগী দেখিয়া ঔষধ বিতরণ করিতেন।

এইবার আমরা বলদেবের সাহিত্য-সেবার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। বলদেব সর্ব্বসমেত পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, যথা

(১) কাব্যমঞ্জরী (১২৭৫)
(২) কাব্যমালা (১২৭৬)
(৩) ললিত কবিতাবলী (১২৭৭)
(৪) ভর্তৃহরি (১২৭৯)
(৫) কর্ণার্জ্জুন কাব্য ১ম ভাগ (১২৮২)

কর্ণার্জ্জুন কাব্য ২য় ভাগের পাণ্ডুলিপি কোনও আত্মীয় পড়িতে লইয়া গিয়া প্রত্যর্পণ করেন নাই এবং এক্ষণে উহার উদ্ধারের কোনও আশা নাই।

'কাব্যমালা'র নাম-পত্রে গ্রন্থকারের নাম মুদ্রিত হয় নাই। 'ললিত-কবিতাবলী'র নাম-পত্রে 'কাব্যমালা রচয়িতৃ-প্রণীত ও প্রকাশিত' এই কথাগুলি মুদ্রিত আছে। এই কাব্য দুইখানি আদিরসাত্মক বলিয়া বোধ হয় গ্রন্থকার স্বীয় নাম প্রকাশে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিলেন।

'কাব্যমালা' গ্রন্থখানি আধুনিক রুচি বিগর্হিত ও অশ্লীল বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক (বঙ্গদর্শন ১২৭৯ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায়) অতি কঠোরভাবে সমালোচিত হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন: "কাব্য মিষ্টান্নের ন্যায় আশু মধুর। এ মিঠাইয়ের ময়রা কে, তাহা গ্রন্থে প্রকাশ নাই। আমরা জানিও না। জানিতে পারিলে তাঁহার দোকানে কখনও যাইব না। তাঁহার দ্রব্যগুলিন একে তেলে ভাজা, তায় বাশী। তিনি নাম পত্রে বররুচি হইতে কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন

—চতুরানন।

অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ॥

কিন্তু যখন আমাদিগের হাতে তাঁহার গ্রন্থ পড়িয়াছে তখন তাঁহার কপালে বিধাতা তাহাই লিখিয়াছেন—ইত্যাদি ইত্যাদি"।

সংস্কৃত আদিরসাত্মক কবিতার অন্যতম অনুবাদক মদনমোহন তর্কালঙ্কারও উপরিলিখিত কারণে যথোচিত কবিসম্মান লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু বলদেবের অন্যান্য গ্রন্থগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। "ললিত কবিতাবলী"র সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র (বঙ্গদর্শন পৌষ ১২৭৯) লিখিয়াছিলেন:—

"এ কবিতাগুলি ভাল। কাব্যমালা যে ঘোরতর দোষে দূষিত এ গ্রন্থে সে দোষ নাই; কদাচিৎ বিন্দুপাত হইয়াছে মাত্র। কবিতাগুলিও মধুর। সংস্কৃত ছন্দোবন্ধে সকল কবিতাগুলিই লিখিত। উপজাতি মালিনী প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গালা কবিতা রচনা কত কঠিন তাহা অনেকেই জানেন। লেখক সে দুরূহ ব্যাপারে যে অনেকদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহা ক্ষমতার মন্দ পরিচয় নহে। অথচ কবিতা মধুর ও সরস হইয়াছে।"

আমরা এই গ্রন্থ হইতে উপজাতিছন্দে রচিত "শিশির" শীর্ষক কবিতাটি উদ্ধৃত করিতেছি:—

(১)
লোধ্র-প্রসূনে* বনরাজি শোভে;
প্রফুল্ল কুন্দে জনচিত্ত লোভে;
ক্রৌঞ্চী-স্বনে† প্রান্তর শব্দ যুক্ত
প্রনষ্ট অম্ভোজ হিম প্রযুক্ত॥

(২)
চণ্ডাংশুমালে‡ উদয়ের কালে,
সমস্বরে কুজ্ঝটিকার জালে;
কিঞ্চিৎ পরে ভাস্কর উগ্রভাবে
হরে কুয়াসা স্বকর প্রভাবে॥

(৩)
মন্দপ্রতাযুক্ত বিলোকি চাঁদে
হিমাশ্রু পাতে নিশি নিত্য কাঁদে
তারাসমূহে গগনে বিলুপ্ত
হ্রদে যথা কৈরব-জাল গুপ্ত॥

(৪)
শয্যাগৃহে নাগর নাগরীরে
নিশামুখে§ যায় লয়ে অধীরে
অর্দ্ধস্ফুট প্রেক্ষণ॥ মন্থপানে
মনঃ সমৎকণ্ঠিত কামবাণে॥

(৫)
শীতোপলক্ষে মদন প্রসঙ্গে
পরস্পরাঙ্গে পরিরম্ভ রঙ্গে
গ্রীবা সমালিঙ্গিত বাহুপাশে
কবি প্রমোদে "উপজাতি" ভাষে॥

কাব্যমঞ্জরীর নাম-পত্রে কবির নাম মুদ্রিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' (পৌষ ১২৭৯) সমালোচনা প্রসঙ্গে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন:—

"এই কবিতাগুলির মধ্যে অনেকগুলি উত্তম। স্থানে স্থানে কবিত্বের পরিচয় আছে। গ্রন্থকার যে একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি অনেক স্থানে তাহারও পরিচয় আছে। অনেক স্থানে নবীনত্বের অভাব লক্ষিত হয়।

এই কবি কিছু রূপকপ্রিয়। অনেকগুলি কবিতাই এই অলঙ্কার বিশিষ্ট। এই রূপ কাব্য, এ পর্য্যন্ত কখন

* পুষ্প † কোঁচবক ‡ সূর্য্য § সন্ধ্যাকাল ॥ চক্ষু

অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য মধ্যে গণিত হয় নাই, হইতে পারেও না। কাব্যমঞ্জরী মধ্যস্থ সেরূপ কাব্যগুলিও অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য যাইতে পারে না। তথাপি সেগুলি সুমধুর এবং সুপাঠ্য হয়। 'কবিতার জন্ম' ইত্যাভিধেয় কাব্যখানি আমাদিগের বিশেষ প্রীতিকর হইয়াছে।

কাব্যগুলি সকলই প্রায় নীতিগর্ভ। আদিরসের সংস্রব মাত্র নাই।

'কবিতার জন্ম' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"কবিতার অধিষ্ঠান, হয়ে দেখ যে যে স্থান, ত্রিদিব তথায় আবির্ভাব,
পদন্যাসে সুকোমল, ফুটে শত শতদল, শোভা ধরে সমস্ত স্বভাব।
নিন্দিয়া তরুণ রবি, তব নন্দিনীর ছবি, পিকবর জিনিয়া সুস্বর ;
রূপে আর সুধাভাষে, ভুলে লোকে অনায়াসে হইবে উহার অনুচর।"

ভর্ত্তৃহরি কাব্যখানিও বঙ্কিমচন্দ্রের অভিনন্দন লাভ করিয়াছিল। এই সমালোচনাটি উদ্ধৃত করিলেই গ্রন্থের যথাযথ পরিচয় দেওয়া হইবে।—

"ভর্ত্তৃহরির বিষয়ে যে কিম্বদন্তী আছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। ভর্ত্তৃহরি নামে রাজা এক অনন্তযৌবনপ্রদ ফল প্রাপ্ত হয়েন। আপনি তাহা ভক্ষণ না করিয়া প্রাণাধিকা মহিষীকে দেন। আবার মহিষীর প্রাণাধিক আর একজন, তিনি ঐ ফল সেই উপপতিকে দিলেন। উপপতির প্রাণাধিকা এক কুরূপা বারাঙ্গনা। সে সেই বারাঙ্গনাকে দিল। বারাঙ্গনা এ ফল ভক্ষণের উপযুক্ত পাত্র কাহাকেও না দেখিয়া উহা রাজাকেই দিল। রাজা সবিশেষ বুঝিতে পারিয়া রাজ্য ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যাবলম্বন করিলেন।

এই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বলদেববাবু এই কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সকল বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করা কবির উদ্দেশ্য নহে। তাহার মধ্যে কয়েকটি স্থান বাছিয়া লইয়া চিত্রিত করিয়া তিনি কাব্য সম্পূর্ণ করিয়াছেন। তিন সর্গে চারিটি মাত্র চিত্র। প্রথম রূপবতী মহিষী, দ্বিতীয় অসতী মানময়ী, তৃতীয় সদাশয়া বারাঙ্গনা, চতুর্থ বিরাগী বনবাসী রাজা। এই চারিটি চিত্রই চিত্রনিপুণের হস্ত লিখিত। যেমন চিত্রকর বর্ণবৈচিত্র্য সাধন দ্বারা চিত্রের উজ্জ্বলতা সাধন করে কবি তাহাও করিয়াছেন। রূপবতী অঙ্গনার সঙ্গে, কুৎসিতা বারাঙ্গনার বৈষম্য ; অসাধ্বী রাজমহিষীর সঙ্গে সদাশয়া বারাঙ্গনার বৈষম্য ; অবন্তী নগরীর উজ্জ্বল শ্রীর সহিত, বিষম বৈন্ধ্যারণ্যের বৈষম্য ; সিংহাসনারূঢ় সম্রাট ভর্ত্তৃহরির সঙ্গে বাণপ্রস্থ ভর্ত্তৃহরির বৈষম্য। এই বৈষম্য গুণে চিত্রগুলিন বিশেষ মনোহর হইয়াছে। নচেৎ বলদেববাবু যেরূপ উজ্জ্বল বর্ণের বাহুল্য করেন, তাহাতে রঙ্গ জ্বলিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল।

এই কাব্যগ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত অপূর্ব্ব ব্যবহৃত সংস্কৃত ছন্দে রচিত। পূর্ব্ব কবিগণ দুই একটি সামান্য ছন্দ ভিন্ন সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালায় প্রায় ব্যবহার করেন নাই। সম্প্রতি 'ললিতকবিতাবলী' প্রণেতা এবং বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য নব্য কবিগণ উহা ব্যবহার করিয়াছেন। বলদেববাবু ইহাতে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ গঠন, তাহাতে সংস্কৃত ছন্দ ভাল বসে না। লেখকের বিশেষ শক্তি ভিন্ন ইহা শ্রুতিসুখদ হয় না। বলদেববাবু সেই শক্তি দেখাইয়াছেন ; ইহাতে ইনি যে বাঙ্গালা কবিতার বিশেষ উপকার করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মালিনী, উপজাতি প্রভৃতিতে বাঙ্গালা কবিতা যেমন স্থানে স্থানে মধুর এবং ওজোগুণ বিশিষ্ট হইয়াছে, তেমনি অনেক স্থানে দুর্বোধ্য হইয়াছে। * * * আমরা নিম্নে কয়েকটি মালিনী এবং কয়েকটি বংশস্থবিলের কবিতা ভর্ত্তৃহরি কাব্য হইতে উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে আমাদিগের কথিত দোষ গুণ সকলই প্রমাণীকৃত হইবে।

মালিনী

ফুলসম সুকুমারী, দীর্ঘকেশা কৃশাঙ্গী,
অচপলতড়িতাভা সুন্দরী গৌরকান্তি,
মধুর নববয়স্কা পদ্মিনী অগ্রগণ্যা,
যুবক নয়নলোভা "কামিনী কামশোভা।"
বিকচ জলজতুল্য স্মের উৎফুল্ল আস্য ;
ভ্রমরকচয় তাহে ভৃঙ্গশোভা প্রকাশে
স্খলিত চিকুরবন্ধ ব্যাপিয়া পৃষ্ঠদেশে,
পতিত বিমল তল্পে নিন্দিয়া মেঘমালা।
সুতনু অনতিবক্রা ভ্রূলতা দীর্ঘরেখা ;
প্রণয়-সলিলপূর্ণ স্নিগ্ধ নীলাব্জ নেত্র ;

জিনি মধুকরপালী পক্ষ্মরাজী বিশাল।
নয়নতট অপাঙ্গে, কজ্জলে উজ্জ্বলাভা ॥"

বংশস্থবিল

তথায় ভীমাসিত-বর্ম্ম ভূষিত,
প্রচণ্ড আভাময় চক্র মস্তকে,
সবিদ্যুতাগ্নি প্রলয়োন্মুখাভ্রবৎ
কৃপাণপাণি প্রহরি-ব্রজে ভ্রমে।
মহীধরাকার শরীর পীবর,
প্রমৃষ্ট-ভিন্নাঞ্জন-সন্নিভ-দ্যুতি,
অজস্র আস্ফালিত কর্ণমণ্ডল,
প্রকাণ্ড দন্ত ক্ষমবপ্রভেদনে।
ইতস্ততশ্চালিত শুণ্ড ভীষণ,
প্রচণ্ড বজ্রোপম বৃংহিত ধ্বনি,
বিরাজিছে তোরণ-পার্শ্ব শোভিয়া
প্রভিন্ন-যূথ প্রতিবদ্ধ শৃঙ্খলে।
সমীপবর্ত্তী পটমণ্ডপে স্থিত,
প্রযত্নতঃ রক্ষকবর্গ সেবিত,
বনায়ু দেশী কত শুক্ল ঘোটকে
গভীর হ্রেষায় খনে ক্ষুরে ক্ষিতি।"

কর্ণার্জ্জুন কাব্যের আখ্যান বস্তু মহাভারত হইতে গৃহীত একথা না বলিলেও চলে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে উহার প্রথম খণ্ড মাত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। শেষ খণ্ডটি এক্ষণে উদ্ধারের উপায় নাই। কাব্যখানি প্রধানতঃ পয়ারেই লিখিত।

এই কাব্যের অনেক স্থলেই কবি অদ্ভুত লিপি কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। কর্ণের উক্তি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

এতকাল যে মিত্রের প্রীতি-নিবন্ধন
অতুল ঐশ্বর্য্য ভুঞ্জিয়াছি নিরন্তর;
তার কাছে অকৃতজ্ঞ হইব কেমনে?
দুঃসময়ে যে গাভীর সুদুর্ল্লভ ক্ষীর
পান করি' ক্ষুধা তৃষ্ণা করেছি নির্ব্বাণ,
পারি কি বেচিতে তারে মাংসাশী শবরে?
যে তরুর ফলভোগে বর্দ্ধিত শরীর,
যার স্নিগ্ধ ছায়া-তলে জুড়া'য়াছি প্রাণ,
কি প্রকারে দিই তারে কাঠুরিয়া করে?
এতকাল যেইজন এই ভুজ-দ্বয়
অবলম্ব যষ্টি বলি' জ্ঞান করে মনে;
সহায় যাহার আমি বিদিত সংসারে:
আমার সাহসে যেই, পরিহরি' ভয়,
দুর্জ্জয় পাণ্ডব-সঙ্গে সমুৎসুক রণে;
আশালতাচ্ছেদ তার করি কি প্রকারে?
যদ্যপি শতধা হয় মস্তক আমার,
ইহকাল পরকাল নষ্ট যদি হয়,
তথাপি তাহারে আমি ত্যজিতে না পারি;
যত দোষে দোষী বন্ধু, শত গুণ তার
যদিও সে হয় দোষী, তবু এ হৃদয়
থাকিবেক আজীবন আজ্ঞাধীন তারি।
যদিও কলঙ্ক-পূর্ণ চন্দ্রের বদন,
যথাকালে প্রতি রাত্রি না হয় উদিত,
তথাপি তাহারে হেরি ফুটে ইন্দীবর;
ধ্রুব তারকের প্রেমে নিয়ত মগন
চৌম্বক শলাকা কভু নহে বিচলিত:
যদিও তাহারে আস ঢাকে জলধর।

এই কাব্যখানি কিছুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষার্থিনীদের পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

বলদেব ৩২।৩৩ প্রকার সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গালা কবিতা রচনা করিয়া অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

বলদেব ইংরাজী কবিতা রচনারও অভ্যাস করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি তিনি মেঘদূতের একটি ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক হরেস হেম্যান উইলসনের অনুবাদ মূলানুগত হয় নাই বলিয়া ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ন্যাশন্যাল ম্যাগেজিনে তিনি কালিদাসের ঋতু সংহার হইতে বর্ষা বর্ণনের একটি সুললিত ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। পাঠকগণকে তাঁহার ইংরাজী পদ্যরচনা শক্তির পরিচয় প্রদানের জন্য উহা হইতে প্রথম ও শেষ অনুচ্ছেদদ্বয় উদ্ধৃত হইল :—

Delight of swains, the Rainy season, dear,
Comes like a king; the dripping clouds appear
His rutting el'phants; flashing lightnings fly.
His flags; and thunders sound his drums on high.

* * * *

Gifted with virtues manifold and bright,
Life of all creatures, woman-kind's delight,
Unchanging friend of ev'ry twig and plant,
May this sweet season all thy wishes grant.'

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বলদেব ৭৫৲ টাকা মাসিক পেন্সনে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি নানা লাভজনক উপায়ে টাকা খাটাইয়া যথেষ্ট বিত্তশালী হইয়াছিলেন। তিনি নানা লোকহিতকর কার্য্যে আপনাকে উৎসর্গ করেন।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে ৭ই জানুয়ারি (২৩শে পৌষ ১৩০৬ বঙ্গাব্দ) দিবসে কবি বলদেব ওষ্ঠব্রণ রোগে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে একখানি 'কালিদাসের গ্রন্থাবলী' দৃষ্ট হইয়াছিল।

পশ্চিমের যাত্রী

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বের্লিন

খ্রীষ্টান ধর্ম প্রথমটা ইহুদীদের ধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত হ'লেও অন্য পাঁচটা ধর্মের মত এটাও একটা পাঁচ-মেশালী ব্যাপার। ইহুদী একেশ্বরবাদিতা আর ইহুদীদের সব পৌরাণিক গল্প খ্রীষ্টান ধর্মের প্রধান আধার (আবার ইহুদীদের কতকগুলি পৌরাণিক গল্প বাবিলনের পুরাণ থেকে নেওয়া); তার উপরে এল গ্রীকদের দর্শন, logos বা শব্দব্রহ্ম-বাদ, অবতার-বাদ, আর ইরাণীয়দের মিত্র-দেবতার পূজার অঙ্গীভূত কতকগুলি মতবাদ আর অনুষ্ঠান (যীশুর রক্তে মানুষের পাপ ধুয়ে যায়, মানুষ নিষ্পাপ হ'য়ে যায়—এই ভাবটী ইরাণীদের মিত্র-পূজা থেকে নেওয়া); এগুলি মিলে হ'ল আদিম খ্রীষ্টানী বা প্রথম যুগের খ্রীষ্টানী। কেউ কেউ অনুমান করেন, বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের আদর্শও এই প্রথম যুগের খ্রীষ্টানীতে গভীর প্রভাব বিস্তার করে, তাতে খ্রীষ্টান ধর্মেও ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের একটা বড় স্থান হয়। ধীরে ধীরে রোমান সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার লাভ ক'রতে লাগ্‌ল; যেমন যেমন মিসর, সিরিয়া, এশিয়া-মাইনর, গ্রীস, ইটালি প্রভৃতি দেশের লোকরা নিজেদের পৈতৃক ধর্ম ছেড়ে এই নোতুন ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হ'য়ে এটীকে গ্রহণ ক'রতে লাগ্‌ল, তেমন তেমন তাদের পূজিত দেবতাদের স্থানও ছদ্মরূপে খ্রীষ্টানধর্মে হ'তে লাগ্‌ল; ইহুদীদের ঋিক্থ পুরাণ বা শাস্ত্র প্রোক্ত একেশ্বরবাদ কার্যতঃ একটা কথার কথা হ'য়ে দাঁড়াল। সমগ্র পূর্ব ভূমধ্যসাগরের দেশগুলিতে এক জগন্মাতা আদ্যাশক্তির পূজা প্রচলিত ছিল; মিসরে তিনি Ast অস্ত্ বা Isis ইসিস্ নামে খ্যাত ছিলেন, সিরিয়ায় Ashtoreth আশ্‌তোরেথ নামে, বাবিলনে Innanna ইন্নান্না বা Ishtar ইশ্‌তার নামে, আর এশিয়া-মাইনর ও গ্রীক জগতে Ma মা বা Cybele (Kubele) কুবেলে নামে তিনি পরিচিত ছিলেন; ইটালীতে আর রোমান জগতেও তাঁর পূজা প্রচারিত হয়; তাঁর পূজা খ্রীষ্টান ধর্মে যীশুর মা :দেবমাতা মেরীর পূজা রূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। মিসরীয়, সিরীয়, এশিয়া-মাইনরীয়, গ্রীক ও রোমান অন্য অন্য বহু দেবতা নূতন রূপ গ্রহণ ক'রে খ্রীষ্টান ধর্মের নানা angel বা ফেরেশ্‌তা বা দেবদূত আর নানা সন্ত বা সিদ্ধপুরুষ হ'য়ে দেখা দিলেন—নামে-মাত্র একেশ্বরবাদী গ্রীক ও রোমান খ্রীষ্টানীতে এঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেলেন। ইহুদীদের কল্পিত অজ্ঞাতরূপ ব্রহ্মস্বরূপ Yahweh যাহ্‌বেহ্ বা Jehova যেহোবা-রও রূপ-কল্পনা হ'ল—খ্রীষ্টানী Trinity বা ঈশ্বরের ত্রিত্ব স্বরূপ God the Father, God the Son ও God the Holy Ghost—এদের তিন-জনের মূর্তি মধ্যযুগের খ্রীষ্টান জগতে কল্পিত হ'ত। মূর্তি-পূজা পূর্ববৎ বাহাল রইল, গ্রীক জগতে চিত্র-পূজা নোতুন ক'রে এল। এহেন খ্রীষ্টান ধর্ম-ভাব নাম-মাত্র একেশ্বরবাদিতা আর তার কার্যতঃ বহুদেবপূজা নিয়ে দক্ষিণ ইউরোপের গ্রীক ও লাতীন-সভ্যতার সহায়তায় উত্তর ইউরোপ জয় ক'রলে। জর্মান জা'তের ধর্ম আর দেবজগৎকে যখন দক্ষিণ ইউরোপের খ্রীষ্টান ধর্ম আর দেবজগৎ এসে হটিয়ে দিলে, তখন এক রোমান-জগতের সভ্যতার সঙ্গে সাযুজ্য লাভ ছাড়া যথার্থ আধ্যাত্মিক লাভ উত্তর ইউরোপের জরমানদের কতটা হ'য়েছিল তা বিচার-সাপেক্ষ। খ্রীষ্টান মতবাদ আর খ্রীষ্টান দেবতাদের জগৎ জরমানরা তাদের নিজেদের দেবতাদের স্থানে স্থাপিত ক'রলে; ইটালির খ্রীষ্টানদের প্রভাবের ফলে, আর প্রাচীন রোমের নামের জোরে, রোমের প্রধান পাদরি বা ধর্মযাজক পোপ হ'য়ে দাঁড়ালেন পশ্চিম ইউরোপের ধর্মজগতের একচ্ছত্র সম্রাট্; ক্রমে এদের সাহস বেড়ে গেল, সারা জগতের ধর্মজগতের উপরও এই একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের দাবী এঁরা ক'রতে লাগলেন। আমাদের মধ্যেও যেমন "জগৎগুরু" উপাধি নেওয়া হয়। রোম থেকে আগত খ্রীষ্টান উপদেশকেরা কয় শতাব্দী ধ'রে প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে জরমানদের মধ্যে থেকে তাদের পূর্বপুরুষদের নিকটে প্রকটিত বা তাদের দ্বারা কল্পিত দেবতাদের ভুলিয়ে দিয়ে,

তাদের স্থানে খ্রীষ্টান দেবতাদের আসন পাকা ক'রে তোলবার চেষ্টা ক'রলে—আর এ কাজে তারা প্রায় পূর্ণরূপে সমর্থও হ'ল। Woden, Friyo, Thunor, Tiw, Nerthus, Baldr প্রভৃতি দেবতাদের জায়গা Jehova, Maria, Christ আর Michael, Raphael, Gabriel প্রভৃতি দেবদূতেরা, আর এ সিদ্ধপুরুষ আর ও সিদ্ধপুরুষ, এ সিদ্ধা রমণী আর ও সিদ্ধা রমণী দখল ক'রে নিলেন; Loki-র স্থান নিলেন শয়তান, Jotun বা রাক্ষসদের স্থান নিলে শয়তানের অনুচরেরা; জরমান বীর Weland, Sigurd বা Siegfried, Guudahari বা Gunnar, Hagen প্রভৃতি, আর বীরাঙ্গনা Gudrun, Brynhild প্রভৃতি—এঁদের স্থানে ইহুদী পুরাণোক্ত Joseph, Moses, David প্রমুখ ব্যক্তিগণ প্রতিষ্ঠিত হলেন। সারা ইউরোপময় যে রোমান সভ্যতার জয়-জয়কার হ'য়েছিল, খ্রীষ্টান ধর্ম সেই রোমান সভ্যতার সঙ্গে সংযুক্ত হ'য়ে প্রায় সমস্ত ইউরোপকে মধ্যযুগে যে এক ছাঁচে ঢেলে ফেল্‌লে জরমান জাতিও সে ছাঁচের বাইরে থাকতে পার্‌লে না। তারপরে রোমান-খ্রীষ্টানী সভ্যতাকে অবলম্বন ক'রে, জরমান জাতি মধ্যযুগে ফরাসী, ডচ্, ইটালীয় প্রভৃতিদের মতন নিজেদের একটা বড় শিল্প আর সাহিত্য গ'ড়ে তুল্‌লে—গথিক বাস্তরীতি আর ভাস্কর্য, চিত্রবিদ্যা আর অন্য শিল্প। এই নূতন শিল্পরীতিতে সবটুকুই রোমানদের দেওয়া উপাদান ছিল না—জরমান জাতির নিজস্ব উপাদানও অনেকটা ছিল; সেটুকুকে "গথিক" উপাদান বলা হয়। রোমান-খ্রীষ্টান সভ্যতায় অন্ধবিশ্বাস আর গোঁড়ামি ছিলও যথেষ্ট। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য আর শিল্পের সঙ্গে পঞ্চদশ শতকে পশ্চিম ইউরোপের পুনঃ পরিচয় হ'ল, তাতে ইউরোপের চিত্তের পুনর্জাগৃতি ঘটল; এই পুনর্জাগৃতির ফলে খ্রীষ্টানী অন্ধবিশ্বাস আর গোঁড়ামির প্রকোপ অনেকটা ক'মে গেল। বিশেষতঃ জরমান জাতি আর জরমানদের জ্ঞাতি ডচ্, ইংরেজ আর স্কান্দিনেভীয়দের মধ্যে। উত্তর ইউরোপের এই সব জরমানীয় জাতির মধ্যে রোমের ধর্মগুরু পোপের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরম্ভ হ'ল। Protestant বা রোমের বিরুদ্ধে "প্রতিবাদী" খ্রীষ্টান মতের উদ্ভব হ'ল জরমান ধর্মোপদেশক Martin Luther মার্টিন লুটরের শিক্ষায়। খ্রীষ্টান ধর্ম থেকে রোমের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যকে—আর রোমান খ্রীষ্টানীর অনেক মতবাদ আর অনুষ্ঠানকে দূর ক'রে দিয়ে মাত্র যীশুর শিক্ষার আধারের উপর প্রতিষ্ঠিত এক বিশুদ্ধ খ্রীষ্টান মতবাদের প্রচারের চেষ্টা হ'ল।

লুটরের পরে জরমান জাতি রোমান-কাথলিক আর প্রটেস্‌টাণ্ট এই দুই ভাগে বিভক্ত হ'য়ে পড়ে, কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্মের তাতে কোনও ক্ষতি হয় নি। এখন কিন্তু জরমান জাতির লোকেরা, জাতীয়তা-বোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে



অধ্যাপক ভিল্‌হেল্‌ম্ হাউঅর—জরমান-ধর্ম-মার্গ আন্দোলনের নেতা

খ্রীষ্টান ধর্ম সম্বন্ধেই তাদের সহস্র বৎসর ধ'রে লব্ধ সংস্কার থেকে মুক্ত হবার জন্য চেষ্টা ক'র্‌ছে; জরমান জাতের সব লোক এটা না করুক, খুব প্রভাবশালী আর আমার মনে হয় বিশেষ প্রবর্ধমান একটী দলের লোকেরা ক'রছে। অধ্যাপক ভাগ্‌নর আমায় ব'ল্‌লেন, এই খ্রীষ্টান মত-বিরোধী দলের প্রকট হবার ফলে জরমানিতে খ্রীষ্টান ধর্মের পক্ষে এক নোতুন আর বিশেষ গুরুতর সমস্যা এসে উপস্থিত হ'য়েছে—রোমান-কাথলিক আর প্রটেস্‌টাণ্টের ঝগড়া এর কাছে

কিছুই নয়। খ্রীষ্টান ধর্মটাকেই এরা এখন জরমান জাতির পক্ষে জাতীয়তা-বিরোধী আর অনাবশ্যক, এমন কি হানিকর ব'লে জরমান জাতিকে এর প্রভাব থেকে মুক্ত ক'রে আবার তাদের প্রাচীন "আর্য-ধর্ম"তে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ক'রতে চাচ্ছে।

জরমানিতে এখন ধর্ম সম্বন্ধে তিনটী মতের লোক দেখা যায়: [১] Bekenntnis-Christen অর্থাৎ বিশ্বাসী খ্রীষ্টান—এরা হ'চ্ছে সাবেক চালের খ্রীষ্টান—এদের গোঁড়া খ্রীষ্টান বলা যায়, অবশ্য গোঁড়া মানে মারমুখো বা অসহিষ্ণু নয়; যীশুতে বিশ্বাস না আন্‌লে মানুষের মুক্তি হয় না, খালি খ্রীষ্টানেরাই স্বর্গে যায়, অখ্রীষ্টান সকলের জন্যই নরক, ইত্যাদি প্রচলিত খ্রীষ্টান মতে এরা বিশ্বাস করে। এরা "আগে-খ্রীষ্টান-পরে-জরমান"। এদের মনে কোনও ধর্ম-জিজ্ঞাসা নেই; বেশীর ভাগ জরমান এখনও এই দলের, তবে এখন নানা ঘাত-প্রতিঘাতে এদের বিশ্বাসের গোড়ায় কুড়ুল মারা হ'চ্ছে। [২] দ্বিতীয় মতের লোক হ'চ্ছে Deutsche-Christen অর্থাৎ জরমান-খ্রীষ্টানরা; এরা খ্রীষ্টান ধর্মকে ছেঁটে-কেটে বাদ সাদ দিয়ে, যুগোপযোগী আর বিশেষ ক'রে জরমান জাতির উপযোগী ক'রে নিতে চায়; এদের দল বাড়্‌ছে, তবে এরা মধ্যপন্থী ব'লে এই চরম পন্থীর যুগে তেমন প্রভাবশালী নয়। এরা হ'চ্ছে "আগে-জরমান-পরে-খ্রীষ্টান"মতের। তারপর আসে [৩] তৃতীয় শ্রেণীর ধর্মমতের লোকেরা—এরা হ'চ্ছে Die Deutsche Glaubens-Bewegung অর্থাৎ জরমান-ধর্মমার্গ-আন্দোলনের দল। Tuebingen ট্যুবিঙ্গেন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত Wilhelm Hauer ভিল্‌হেল্‌ম্ হাউঅর্ হ'চ্ছেন এই আন্দোলনের নেতা। এই দল মনে-প্রাণে হ'তে চায় "কেবল-শুদ্ধ-আর্য-জরমান"। অধ্যাপক হাউঅর্ আর তাঁর সহযোগীরা নিজেদের মত প্রকাশ ক'রে বই আর প্রবন্ধ লিখ্‌ছেন, পত্রিকা প্রকাশ ক'রছেন, বক্তৃতা দিচ্ছেন। "শুদ্ধ জরমান" মনোভাব, ধর্ম-জগৎ-ধর্ম-প্রেরণা, ধর্ম দেশনা কি, আর কেমন ভাবে এগুলিকে আধুনিক জরমান জগতে পুনরুজ্জীবিত ক'রে জরমান জাতিকে শক্তিশালী ক'রে তোলা যায় এ বিষয়ে এঁরা আলোচনা ক'রছেন। উপস্থিত এই আন্দোলন জরমানদের মধ্যে বিশেষ প্রবল। এদের বড় বড় সব সম্মেলন হ'চ্ছে, এর পরিচালকেরা—বিশেষ ক'রে অধ্যাপক হাউঅর্—মতটী প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আর মতের প্রচার-কল্পে বই লিখ্‌ছেন খুব।



অধ্যাপক হাউঅর্ বক্তৃতা দিতেছেন

এঁদের বিশ্বাস—পশ্চিম-এশিয়ায় আর শেমীয় জাতির মধ্যে উদ্ভূত ধর্মের সঙ্গে, আর্য-জাতির মনোধর্মের একটা বিশেষ বিরোধ আছে,—শেমীয় ধর্ম আর্য মনের উপযোগী নয়; এরা বিশ্বাস করে, আর্য মন শেমীয় মনের চেয়ে অনেক উঁচু স্তরে অবস্থান করে; খ্রীষ্টানী প্রভৃতি শেমীয় ধর্ম গ্রহণ করা আর্য মনের পক্ষে হানিকর। প্রাচীন জরমানীয় ধর্ম আর দেবজগৎ থেকে, আর মধ্য যুগের বিশিষ্ট জরমান চেতনা থেকে, এঁরা আর্য জরমান মনের, জরমান আর্য ধর্মের আর নীতির স্বরূপটাকে বা'র ক'রে, আবার জরমান-জীবনে সেগুলিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ক'রতে চাচ্ছেন।

অখ্রীষ্টান জরমানীয় সাহিত্যের যে সব ভগ্নাংশ খ্রীষ্টান প্রচারকদের হাত এড়িয়ে কোনও রকমে এযুগ পর্যন্ত বেঁচে এসেছে—সেই প্রাচীন স্কাণ্ডিনেভীয় ভাষার এড্ডা Edda গ্রন্থদ্বয়ে, আর কতকগুলি Saga সাগা বা বীর-কাহিনীতে, প্রাচীন ইংরেজি ভাষায় রচিত Beowulf বেওবুল্‌ফ্‌ প্রভৃতি কাব্যে বা কাব্যখণ্ডে মানুষের কর্ত্তব্য আর মানুষের নৈতিক চরিত্রের আদর্শ স্বরূপ Sigurd সিগুর্ড, Hoegni হোগ্নি, Weland বেলাণ্ড, Beowulf বেওবুল্‌ফ্‌, Finn ফিন্‌ প্রভৃতি বীরগণের চরিত্রকে, আর রোমান-বিজয়ী Arminius আর্মিনিউস্‌ বা Hermann হের্‌মান প্রভৃতি ঐতিহাসিক জরমান বীরগণের আদর্শকে, হিন্দুর জীবনে রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ভরত ভীষ্ম ভীম অর্জ্জুন অভিমন্যু কর্ণ পৃথ্বীরাজ প্রতাপ শিবাজী প্রভৃতির যে স্থান, সেই স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা হ'চ্ছে। মানুষের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সত্যাচার, নির্ভীকতা, আত্মবলিদান প্রভৃতি গুণের সাধনার জন্য এই সমস্ত জরমানীয় বীর-চরিত্র যে খুবই উপযোগী, যাঁদের প্রাচীন খ্রীষ্টান-পূর্ব যুগের জরমানীয় সাহিত্যের সঙ্গে স্বল্প পরিচয়ও হ'য়েছে তাঁরা সবাই সে কথা স্বীকার ক'রবেন। মানুষকে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে ল'ড়ে, সেই অবস্থার উপরে জয়ী হবার আদর্শ—"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" গীতার এই নীতি জীবনে পালন করবার আদর্শ জরমানীয় জাতির মধ্যে উজ্জ্বল ভাবে প্রকটিত হ'য়ে আছে। কিন্তু জীবন-সংগ্রামে বা অসত্যের বিরুদ্ধে অবিচলিত ভাবে পৌরুষের সঙ্গে লড়ার আদর্শ ছাড়া, গভীর অনুভূতির বা তত্ত্বানুসন্ধানের দিকে, কর্মপ্রাণ প্রাচীন জরমান জাতির মধ্যে বিশেষ কোনও চেষ্টার নিদর্শন দেখা যায় না; সেদিক্‌টা অপূর্ণ ছিল ব'লেই খ্রীষ্টান ধর্মের রহস্যবাদ আর তার তথা-কথিত দর্শন জয়ী হ'তে পেরেছিল। জরমানীয় ধর্ম চেতনায় আর সাধনায় কর্মযোগ আছে—কিন্তু জ্ঞানযোগ আর ভক্তিযোগ নাই ব'ললেও চলে। ভক্তিযোগ কতকটা খ্রীষ্টান ধর্ম এনে দিয়েছিল; কিন্তু খ্রীষ্টানী-মার্কা ভক্তি-সাধনকে জরমান মন তার প্রকৃতির বিরোধী ব'লে এখন অস্বীকার ক'রতে, বর্জ্জন ক'রতে চাচ্ছে। অপরা-বিদ্যা আধুনিক Science বা বিজ্ঞান এনে দিয়েছে—কিন্তু এ জিনিস বাহ্যজগৎকে অবলম্বন ক'রে গূঢ় বা আধ্যাত্মিক পরা-বিদ্যা এ নয়। আমি অস্‌ট্রিয়া আর জরমানিতে এ কথা শুনে বিশেষ আগ্রহান্বিত হ'য়েছিলুম যে, জরমান-ধর্মমার্গ-আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক হাউঅর্, অধ্যয়ন আর অধ্যাপনা এই দুইয়েই ভারত-বিদ্যা-বিৎ ব'লে, প্রাচীন ভারতবর্ষ থেকে এই আধ্যাত্মিক আর অনুভূতিমূলক দর্শন আর সাধনা নিয়ে তাকে জরমান জাতির অনুকূল ক'রে জরমান কর্মযোগের সঙ্গে সম্মিলিত ক'রে দিতে চান। উপনিষৎ আর গীতা—এই দুইয়ের মধ্যে নিহিত দর্শনই জরমান জাতির পক্ষে পারমার্থিক সাধনার পথে সহায়ক হবে এটা তাঁর বিশ্বাস। বের্লিনে অধ্যাপক হাউঅর-এর এক ভারতীয় ছাত্রের কাছেও অনুরূপ কথা শুনি। তবে হাউঅর এখন স্পষ্ট ভাবে প্রাচীন ভারতের আর্য জাতির মধ্যে (আর্য জরমান ভাষার জ্ঞাতি সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত) এই দর্শন ও সাধনের কথা জরমান জাতির সমক্ষে অনুমোদন ক'রে ধ'রে দিচ্ছেন না; কারণ জরমান জাতির মনে এখন ইহুদীর ছোঁয়াচের ভয় এত বেশী যে বাইরেকার, বিশেষতঃ এশিয়ার কোনও কিছু তারা অত্যন্ত অবিশ্বাসের সঙ্গে দেখ্‌বে। যথাকালে সু-অবসর এলে, তিনি ভারতের দর্শন ও সাধনার আধারের উপরে গঠিত তাঁর প্রকল্পিত আধ্যাত্মিক দর্শন ও সাধনা পুনরুজ্জীবিত জরমান-ধর্ম-মার্গের সঙ্গে সমন্বিত ক'রে দেবেন। এটা অবশ্য ভারতের হিন্দুর পক্ষে একটা সুসংবাদ; কারণ প্রচণ্ড কর্মশক্তিযুক্ত নব জাগরিত জরমান জা'তের মধ্যে গীতার ধর্ম, উপনিষদের আধ্যাত্মিক বাণী, সমগ্র মানব-জাতির পক্ষে নিশ্চয়ই কোনও সময়োপযোগী কল্যাণাবহ মূর্ত্তিতে দেখা দিয়ে, নোতুন ভাবে তাদের মধ্যে নিহিত অমর আর বিরাট্‌ ভাবধারাকে সার্থক ক'রে তুল্‌বে।

Deutsche Glaubens Bewegung আন্দোলন তার লাঞ্ছন বা প্রতীক স্বরূপ Nazi নাৎসী-রাষ্ট্রের মতনই স্বস্তিক-চিহ্নকে গ্রহণ ক'রেছে; তবে Nazi স্বস্তিকের বাহুগুলি হ'চ্ছে চতুষ্কোণের মধ্যে অধিষ্ঠিত, আর জরমান ধর্ম-মার্গ-আন্দোলনের স্বস্তিক চিহ্নের বাহু হ'চ্ছে চক্রের মধ্যে অধিষ্ঠিত—নীচের ছবি থেকে এই দুই স্বস্তিকের পার্থক্য বোঝা যাবে।

আমি যখন গত বৎসর জরমানিতে ছিলুম, তখন এই আন্দোলন মাত্র দেড় বছর ধ'রে চ'লছে, এর পুরো

দু বছরও হয় নি। এখন এই আন্দোলন কি অবস্থায় আছে জানি না; তবে ওদিকে মাঝে মাঝে কাগজে দেখা যেত, খ্রীষ্টান ধর্মের অনুষ্ঠানের প্রতি জরমান জনগণ আর



নাৎসী সরকারের প্রতীক স্বস্তিক



জরমান-ধর্ম-মার্গের প্রতীক স্বস্তিক

নাৎসী সরকার দুইই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিরূপ হ'য়ে উঠ্‌ছে। এই বৎসরটা জরমানরা বোধ হয় ওলিম্পিক ব্যায়াম-ক্রীড়া নিয়ে একটু ব্যস্ত ছিল। জরমানিতে কেউ কেউ আবার Woden, Friyo, Thunor প্রভৃতি দেবতাদের নামে দোহাই পাড়্‌তে আরম্ভ ক'রেছে, এমন কি দু-এক জায়গায় বিবাহও হ'য়েছে এই সব দেবদেবীর নাম নিয়ে। জরমান জা'ত যে এখন আবার মন্দিরে মন্দিরে এই সব দেবতাদের মূর্ত্তি খাড়া ক'রে পূজো আরম্ভ ক'রবে—সেটা সম্ভবপর ব'লে মনে হয় না; তবে সজ্ঞানে, আর খুব "জোশ"-এর সঙ্গে যে এই সব দেবতাদের আর জরমান বীর আর বীরাঙ্গনাদের আদর্শ নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত ক'রবে, আর আস্তে আস্তে বাইবেলের পুরাণকে ছেড়ে দেবে, সেটা বিশেষ সম্ভবপর ব'লে মনে হয়। এই ব্যাপারের পরিণতি কি দাঁড়ায় তা দেখবার জন্য আমরা আর অন্য জাতির লোকরাও ঔৎসুক্যের সঙ্গে প্রতীক্ষা ক'র্‌বো।



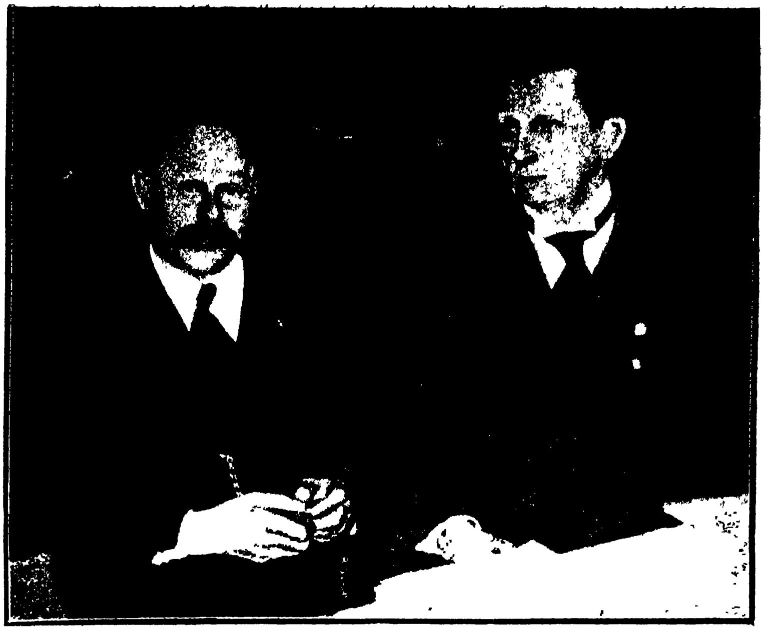
অধ্যাপক হাউঅর-এর শ্রোতৃবর্গ—উপরে জরমান বচন Durch deutschen Glauben zur religiœsen Einheit অর্থাৎ "জরমান ধর্মের মধ্য দিয়া ধর্ম-বিষয়ক একতায়"

এ রকম ব্যাপার পৃথিবীতে এই প্রথম নয়। ১৮৫০ সালের পরে যখন জাপানের নব জাগরণ আরম্ভ হ'ল Mikado Mutsu-Hito Meiji মিকাদো মুৎস্থ-হিতো মেইজি-র আমলে, তখন স্বয়ং সম্রাট্ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রায় সমস্ত অভিজাতবর্গ জাপানকে মনে-প্রাণে-আত্মায় "স্বদেশী" করবার চেষ্টায় তার ধর্ম-জীবনে আর রাষ্ট্র-জীবনে Kami-no-michi খামি-নো-মিচি বা Shin-to শিন্-তো অর্থাৎ "দেব-পথ" নামে শুদ্ধ জাপানী ধর্ম-মার্গকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা ক'রলে—চীন আর ভারতের প্রভাবে জাপানের সঙ্গে নাড়ীর যোগ ঘ'টে গিয়েছিল যে চীনা কন্‌ফুশীয় ও লাওৎসীয় দর্শনের আর ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মের, সেগুলিকে রাজ-দরবারে আমল না দিয়ে; তবে শিন্-তো ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে বৌদ্ধধর্মের বা চীনাধর্মের বিশেষ কোনও হানি জাপানে হয় নি—বরঞ্চ আধ্যাত্মিকতার দিক্ বিচার ক'রলে ব'ল্‌তে হয় উপস্থিত ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবই জাপানের ধর্ম-জীবনে গভীরতম ভাবে কার্য ক'রছে। চীনা ধর্ম বা বৌদ্ধ ধর্ম জাপানে গিয়ে দেশের দেবতাবাদ শিন্-তোকে অস্বীকার করে নি, তার উচ্ছেদ ক'রতে চেষ্টা করে নি, বরঞ্চ তার পরিপুষ্টি বা সম্পূর্ণতা ক'রতেই সাহায্য ক'রেছে—সে রকমটা খ্রীষ্টানধর্ম প্রকাশ্য ভাবে করে নি; কাজেই বিদেশী হ'লেও খুঙ্-ফু-ৎসে, লাউ-ৎসে আর বুদ্ধের ধর্মের বিরুদ্ধে জাপানের মনে কোনও বিপরীত ভাব বা শত্রুতা নেই। হালে তুর্কী জাতি আট ন' শ' বছর ধ'রে মনে প্রাণে মুসলমান থাকবার পরে, এখন আরবের ধর্ম ব'লে মোহম্মদীয় ধর্ম-মতের বিপক্ষে নিজের মত প্রকট ক'রেছে—Yeni-Turan য়েঞি-তুরাণ বা নব্য-তুরাণীয় মতের প্রচারকরা তো স্পষ্ট ভাষায় তুর্কীদের আদিম ধর্মে ফিরে যেতে তুর্কী জাতিকে আহ্বান ক'রেছিল। মুসলমান তুর্কীরা, ধর্মের অনুষ্ঠান নমাজ প্রভৃতিতেও এখন আরবীর বদলে মাতৃভাষা তুর্কী ব্যবহার ক'রছে। মিসরের মধ্য-যুগের ইস্লামীয় বিদ্যার কেন্দ্র আল্-আজহার্ থেকে বেকার মোল্লার দল যেমন এক দিকে স্যর মোহম্মদ একবালের আমন্ত্রণে ভারতের হরিজন-বিজয়ের জন্য ধাওয়া ক'রে আস্‌ছেন, তেমনি আবার অন্য দিকে মিসরের শিক্ষিত জনগণ ফিরৌন বা Pharaoh-দের সু-প্রাচীন মিসরীয় জগতের জন্য সগৌরব আকাঙ্ক্ষার ভাব পোষণ ক'রছেন—এঁরা প্রাচীন মিসরের শিল্পের স্পর্শের দ্বারা নবীন মিসরে এক নূতন ভাস্কর্য-শিল্পের পত্তন ক'রেছেন। ইরাণেও এই ভাব দেখা যাচ্ছে—"শুদ্ধ ইরাণী হও,—ভাষায়, মনোভাবে, সর্ববিধ সংস্কৃতিতে"; আর কেউ কেউ এ ধুয়াও ধ'রছে—"ধর্ম-মতেও শুদ্ধ ইরাণী হও, জরথুশ্ত্রীয় হও।" ওদিকে সুদূর মেক্সিকোর নব-মুক্তি-প্রাপ্ত আদিম আমেরিকান জনগণ, যারা Aztec আস্তেক, Maya মায়া প্রভৃতি প্রাচীন সুসভ্য জাতির বংশধর, তারা আবার তাদের পিতৃ-পুরুষদের সংস্কৃতির আব-হাওয়ার মধ্যে পূর্ণভাবে নিজেদের উপলব্ধি ক'রতে প্রকাশ ক'রতে চেষ্টা ক'র্‌ছে;—দেশ থেকে রোমান কাথলিক খ্রীষ্টান পাদরিদের বিতাড়িত ক'রে, এই চার শ' বৎসর ধ'রে যে খ্রীষ্টানী শাসন দেশের আদিম জনগণের বুকের উপর চেপে ব'সেছিল তা থেকে নিজেদের মুক্ত ক'রতে চাচ্ছে। আমার মনে হয়, এখন চারিদিকেই একটা সাম্রাজ্য-তন্ত্রের বিরোধী হাওয়া বইছে—তা সে সাম্রাজ্য-তন্ত্র রাজনৈতিক আর অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রেই হোক, আর আনুষ্ঠানিক ধর্মের ক্ষেত্রেই হোক; প্রায় সব সভ্য দেশেই, নিজের জাতীয় আধ্যাত্মিক সত্তাকে বিলুপ্ত ক'রে দিয়ে কোনও বিদেশী ধর্মকে তার জায়গায় বসিয়ে দেওয়া, এখন যেন একটা লজ্জার বা জাতীয় অমর্য্যাদার ব্যাপার—এমন কি কলঙ্কের কথা ব'লে পরি-গণিত হ'চ্ছে।

হিট্‌লরের লোকপ্রিয়তা জরমানিতে এত বেশি যে দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতে হয়। একটা জিনিস খুব বেশি ক'রে চোখে লাগে। জাতীয়তাবাদী জরমানরা—অর্থাৎ প্রায় সব শ্রেণীর জরমান—পরস্পরের সঙ্গে দেখা হ'লেই Heil Hitler "হাইল্ হিট্‌লর্" ব'লে অভিবাদন করেন। Heil শব্দটার ইংরেজী প্রতিরূপ হ'চ্ছে hail—এর মৌলিক অর্থ "স্বাস্থ্য বা স্বস্তি"; কতকটা আধুনিক ভারতবর্ষের "জয়" শব্দের মত ব্যবহৃত হয়—"হাইল্ হিট্‌লর্"কে "জয় হিট্‌লর্" ব'লে অনুবাদ করা যায়। পথে ঘাটে, দোকানে আপিসে, যেখানে সেখানে দুই জরমানে দেখা হ'লে, যিনি প্রথম কথা ব'লবেন তিনি ডান হাত উঁচুতে তুলে ব'লবেন—"হাইল্ হিট্‌লর্!" তার পরে তাঁর বক্তব্য ব'ল্‌বেন। যিনি উত্তর দেবেন, তিনিও হাত তুলে "হাইল্ হিট্‌লর্!" ব'লে জিজ্ঞাস্যের জবাব দেবেন। আবার বিদায়ের সময়ে উভয়ের মুখে একবার

ক'রে "হাইল্ হিট্‌লর্।" রাস্তা দিয়ে ভদ্রলোক যাচ্ছেন; ডাক-পিয়নের সঙ্গে দেখা—হাত তুলে, "হাইল্ হিট্‌লর্! কিহে, আমার চিঠি-পত্র কিছু আছে?"—"হাইল্ হিট্‌লর্! আজ্ঞে ছিল, বাড়ীতে দিয়ে এসেছি!"—"বেশ! হাইল্ হিট্‌লর্!"—"হাইল্ হিট্‌লর্।" এই ভাব সারা দিন ধ'রে যেখানে সেখানে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বা রাষ্ট্রীয় কেতাবখানায়, থিয়েটারে, সরকারী আপিসে—সর্ব্বত্র এই "হাইল্ হিট্‌লর্"-এর ছড়াছড়ি। আমাদের দেশের কংগ্রেসের সভ্য বা কর্মীরা যদি দেখা হ'লেই ক্রমাগত "জয় গান্ধীজী! জয় গান্ধীজী।" ক'র্‌ত, তা হ'লে অবস্থাটা এই রকম হ'ত। উত্তর ভারতের হিন্দুদের মধ্যে সাক্ষাৎ হ'লে বা বিদায়ের কালে যেমন "রাম, রাম!" বা "জয় রামজী!" বলার রীতি আছে—শ্রীরামচন্দ্র-প্রীতির ফলেই এটা হ'য়েছে—নবীন জরমানির এই "হাইল্ হিট্‌লর্!" তেমনি। হিট্‌লরের নাম এখন জরমান জা'তের নমস্কার-বাচক শব্দ হ'যে দাঁড়িয়েছে। বলা যায় যে, "জয় জরমান-জাতের জয়!" এই ভাবটা "জয় হিট্‌লর!" এই বচনের দ্বারায় সংক্ষেপে প্রকাশিত হ'চ্ছে।

আমি থাক্‌তে থাক্‌তে ইউরোপ-প্রবাসী ভারতীয় আর সিংহলী ছাত্রদের সমিতির বার্ষিক সম্মিলন বের্লিনে হ'ল—৩।৪।৫।৬ জুলাই এই চার দিন ধ'রে। অক্সফোর্ড থেকে এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবার জন্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তী এলেন। কদিন ধ'রে হিন্দুস্থান-হাউস-এর বৈঠকখানায় এই সম্মিলন নিয়ে খুব জল্পনা-কল্পনা চ'লছিল। সব ব্যাপারেই যেমন হ'য়ে থাকে—দু তিন জন পাণ্ডা, তাদের উৎসাহের আর অন্ত নেই; বাকী সব নিষ্ক্রিয়। ব্যক্তিগত আর প্রদেশ-গত মতান্তর আর মনান্তর প্রকাশের প্রশস্ত ক্ষেত্র হ'চ্ছে এই সব সম্মিলন প্রভৃতির আয়োজন। এখানেও দলাদলি ভাবের অবস্থিতি কিছু কিছু টের পাই—তবে মোটের উপরে বাঙালী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী সকলে মিলে সম্মেলনটীকে সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তোলেন। ছাত্র প্রতিনিধি বেশী আসে নি—আমার মনে হয় সব শুদ্ধ দশ-বারো জন মাত্র হবে। বের্লিনের ছেলেরা এঁদের আতিথ্য দেখান, Under den Linden-এর কাছে Dom Hotel ব'লে একটী হোটেলে এঁদের থাকবার ব্যবস্থা করেন। এই সম্মিলন-ব্যাপারে জরমান নাৎসী সরকারের সহানুভূতিও ছিল যথেষ্ট। প্রথম দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের aula বা প্রধান হলঘরে অধিবেশনের উদ্বোধন হ'ল। বের্লিন প্রবাসী ছাত্র আর কতকগুলি অন্য লোক—বয়ঃস্থ লোক—আর ভারতপ্রেমী কতকগুলি জরমান ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত সুধীর সেন—ছন্দোবিৎ ঐতিহাসিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধ-চন্দ্র সেনের ভ্রাতা—জরমানিতে অর্থ-তত্ত্ব বিষয়ে পাঠ সাঙ্গ ক'রেছেন, উচ্চ গবেষণায় এখন ব্যাপৃত, জরমান ভাষায়



অধ্যাপক ভিল্‌হেল্‌ম্ হাউঅর ও তাঁহার সহযোগী কাউণ্ট Ernst Von Reventlow এর্‌ন্‌স্‌ট্ ফন্ রেফেন্‌ট্‌লভ্

প্রবন্ধ ইত্যাদি খুব লেখেন—তিনি জরমান শ্রোতৃবর্গের বোঝবার জন্য জরমান ভাষায় বের্লিন প্রবাসী ছাত্রদের হ'য়ে তাঁর বক্তব্য ব'ললেন। আর একটী ভারতীয় ছাত্রও বক্তৃতা দিলেন। অমিয়বাবু আন্তর্জাতিকতা আর বিভিন্ন জাতির মধ্যে মিলনের আবশ্যকতা নিয়ে ইংরেজিতে ব'ল্লেন। জরমান সরকারের তথা জরমান ছাত্রদের পক্ষ হ'তে ফৌজী উর্দী পরা একটী জরমান ছাত্র বক্তৃতা দিলেন—ভারতীয় ছাত্রদের স্বাগত ক'রে নাৎসী আদর্শবাদের দু-চারটে কথা ব'ললেন। উদ্বোধন-পর্ব এই ভাবে সমাপ্ত হ'ল। আমি এঁদের অন্যান্য বক্তৃতার অধিবেশনে বা কার্যকরী সভায় উপস্থিত থাকতে পারি নি। এঁদের অনুরোধে আমি ৩রা জুলাই তারিখে ভারতীয় চিত্র-কলা বিষয়ে আমার চিত্রময় বক্তৃতাটী আবার দিই। Humboldt-Haus-এ বের্লিনের কতকগুলি অধ্যাপক আর অন্য শিক্ষিত লোকেদের সাম্‌নে এই বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়—বহু জরমান অধ্যাপক আর পণ্ডিত বন্ধু এই বক্তৃতায় উপস্থিত থেকে আমায় সম্মানিত ক'রেছিলেন। জরমান সরকার থেকে নাৎসীদের স্থাপিত এক শ্রমিকদের বাসাগ্রাম দেখতে মোটরে ক'রে প্রতিনিধি আর অন্য ভারতীয় লোক যাঁরা বের্লিনে তখন উপস্থিত ছিলেন আর ছাত্রসম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের নিয়ে গিয়েছিল—দুপুরে সেখানে তাঁদের খাইয়েছিল; আমার এঁদের সঙ্গে যাওয়া হয় নি—তবে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের মুখে নাৎসী সরকারের শ্রমিকদের জন্য ব্যবস্থার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছিলুম। এছাড়া একদিন রাষ্ট্রীয়-অপেরা-হাউসে ভাগ্‌নের-রচিত Lohengrin গীতিনাট্যের প্রযোজনা বিনামূল্যে সরকারের তরফ থেকে ভারতীয় ছাত্র-প্রতিনিধিদের দেখানো হয়—এতে আমিও নিমন্ত্রণ পাই, আর সানন্দে এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করি; আর শেষ দিন "জরমান-প্রাচ্যদেশীয় সমিতি" আর "জরমান-বিদ্যাবিষয়ক-আদান প্রদান-বিধায়ক-বিভাগ" (Deutsche-Orient-Vereinund Deutsche Akademische Austauschdienst) এই দুই আধা-সরকারী আর সরকারী বিভাগ থেকে ভারতীয় প্রতিনিধিদের সান্ধ্য চা-পান সম্মেলনে আপ্যায়িত করা হয়। এই চায়ের মজলিশে কতকগুলি জরমান পণ্ডিত আর নাৎসী সরকারের প্রচার-বিভাগের কর্ম্মচারীর সঙ্গে বেশ সদালাপ হয়।

মোটের উপরে ভারতের ছাত্র যারা জরমানিতে আর ইউরোপে গুরুকুল-বাস ক'রছে তাদের এই সম্মিলনের প্রতি জরমান সরকার খুবই সৌজন্য আর সহানুভূতির সহিত ব্যবহার করেন। ইংলাণ্ডে ইংরেজ সরকারও এতটা করে কি সন্দেহ। হিট্‌লর্‌ ইংরেজকে খুশী রাখবার জন্য (আর এখন বোধ হয় ইটালিকেও খুশী রাখবার জন্য) ভারতবাসী প্রভৃতি অশ্বেত জাতিদের সম্বন্ধে দুটো চড়া কথা ব'লে-ছিলেন—অবস্থা-গতিকে সে সব কথা আমাদের নীরবে স'য়ে যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই। তবে মোটের উপর আমি জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে যা জেনেছি—ভারতীয় ছাত্ররা ব্যাপকভাবে কোনও দুর্ব্যবহার জরমান জনসাধারণের কাছে পায় নি।

আমি জরমানিতে পৌঁছুবার পূর্বে হিট্‌লর্‌ নাকি এক প্রকাশ্য সভায় ব'লেছিলেন যে আর্য জরমান জাতীয় স্ত্রী বা পুরুষের উচিত নয়, ইহুদী, চীনা, জাপানী, ভারতীয় প্রভৃতি জাতির পুরুষ বা মেয়ের সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধে বদ্ধ হয়। এই মন্তব্যে ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে নাকি খুব বিক্ষোভ আর চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। কারণ এরকম উক্তিতে একটী সম্পূর্ণ জাতির প্রতি অবজ্ঞা স্পষ্ট। জাপানীরা সরকারী-ভাবে এই উক্তির প্রতিবাদ করে, তাতে নাকি হিট্‌লর্‌ জাপান সম্বন্ধে তাঁর এই উক্তির প্রত্যাহার করেন। জাপানের যুদ্ধ-জাহাজ আছে, ফৌজ আছে, হাওয়াই-জাহাজ আছে, কামান আছে—জাপানের কোমরে বল আছে—জাপানের আপত্তি সাজে। চীনারা এ কথার কোনও প্রতিবাদ করা আবশ্যক মনে করে নি—চীনাদের কাণ্ডজ্ঞান বা রসবোধ আছে। ভারতের কবি তুলসীদাস লিখেছেন—

যহ জগ দারুণ, দুখ নানা। সব তেঁ কঠিন জাতি অপমানা॥

(এই পৃথিবী কঠোর স্থান, এতে নানা প্রকারের দুঃখ; কিন্তু সবচেয়ে দুঃসহ হ'চ্ছে জাতির অপমান।)

আমাদের ছেলেদের প্রাণে যে হিট্‌লরের এই কথা লাগ্‌বে, তা স্বাভাবিক। তবে আমার মনে হয়, তাদের চুপ ক'রে যাওয়াই উচিত ছিল। তা না ক'রে তাদের মাতব্বরেরা এই উক্তির প্রতিবাদ ক'রে পাঠালেন। জরমান পররাষ্ট্র-বিভাগ অতি মোলায়েম ভাষায় জিনিসটার অন্য ব্যাখ্যা ক'রে এদের মনঃকষ্ট দূর করবার প্রয়াস দেখিয়ে একটু ভদ্রতা দেখালে। কিন্তু

আমার মনে হয় এসব প্রতিবাদে নিজেকেই খেলো করা হয়। মূল মহাভারতে আছে—দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে লক্ষ্য-বেধের সময়ে,

দৃষ্ট্বা তু সূতপুত্রং দ্রৌপদী বাক্যম্ উচ্চৈর্ জগাদ—"নাহং বরয়ামি সূতম্।"

(সূতপুত্র কর্ণকে লক্ষ্যবেধ ক'রতে উদ্যত দেখে দ্রৌপদী চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন, "আমি সূতকে পতি ব'লে স্বীকার ক'রবো না !")

আর তাতে কর্ণ কি ক'রলেন ?—

সামর্ষহাসং প্রসমীক্ষ্য সূর্য্যং তত্যাজ কর্ণঃ স্ফুরিতং ধনুস্তৎ ॥

(কর্ণ একটু ক্রোধের সঙ্গে হেসে, সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে, কম্পিত-হস্তে ধনুক ত্যাগ ক'রলেন।)

মহাভারত-কার কি চমৎকারভাবে বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণের উপযোগী ব্যবহার দেখিয়েছেন—যে কর্ণ এই কথা ব'লে জগতের নিপীড়িত অথচ পৌরুষযুক্ত সমগ্র অনভিজাতবর্গের মনের কথা প্রকাশ ক'রেছেন—

দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তং হি পৌরুষম্ ॥

(উচ্চ কুলে জন্ম দেবতার হাতে, কিন্তু পৌরুষ-প্রকাশ আমারই হাতে।)

কিন্তু বাঙালী নাট্যকার এই সংক্ষেপকে ফাঁপাও ক'রে তুলে এখানে কর্ণের মুখে দুটো লম্বা বক্তৃতা দিয়েছেন—জাতি-ভেদের বিরুদ্ধে হরিজন-নেতার ঢঙে প্রতিবাদ, আর নিজের বাহুবলের বড়াই। ভাবখানা এই রকম—"দেখেছেন মশাইরা, এই ভদ্রমহিলা কি অন্যায় কথা ব'লেছেন! এদিকে ব'ল্‌ছেন যে, যে লক্ষ্যবেধ ক'রবে তাকেই বিয়ে ক'রবেন—আবার ওদিকে জা'তের কথা তুলে যোগ্য লোককে দূর ক'রে দিচ্ছেন।" তারপর নাটকে কর্ণ দ্রৌপদীকে ব'ল্‌লেন, "সুন্দরি! যদি তোমাকে বাহুবলে জয় ক'রে নিয়ে যাই, তা হ'লে কি ক'রতে পারো?" তার জবাবে যখন দ্রৌপদী ব'ল্‌লেন, "আমি সূতপুত্রকে বিয়ে করার চেয়ে বরং অগ্নিপ্রবেশ ক'রবো," তখন কর্ণ হেসে ব'ল্‌লেন, "সুন্দরি! তোমায় অগ্নি প্রবেশ ক'রতে হ'বে না—এই আমি ধনুক ফেলে দিলুম।"

যাক্। জরমান নেতা হিট্‌লর্ ব'ল্‌লেন, আমরা চাই না যে আমাদের মেয়েরা বে-জাতে বিয়ে করে। ভারতীয় ছেলেরা আর্তনাদ ক'রে উঠ্‌ল—"সত্যি ব'ল্‌ছি, আমরা ছোটো জা'ত নই—আমরাই খাঁটি আর্য্য"—অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের কথায়—"আমরা কি কম্—আমরা হ'চ্ছি ডমুম্!"

ব্যাপারটা এতটা ফাঁপাও ক'রে ব'ল্‌ছি এই জন্য যে, এই প্রতিবাদের মধ্যে ভারতীয় ছাত্রদের যে মনোভাব দেখ্‌ছি সেটা আমার কাছে ভালো লাগে না। সব মানুষের মধ্যে এক সাধারণ মানবিকতা থাকলেও সব মানুষ কিছু সমান নয়; তেমনি সব জা'তও কিছু সমান নয়—নৈতিক গুণে, বুদ্ধিবৃত্তিতে, কর্ম্মশক্তিতে। কিন্তু তা ব'লে এক জা'ত অন্য জাতের উপর অভদ্রভাবে চাল দেবে কেন? যদি দেয়—তাহ'লে তার সঙ্গে Sinn Fein ভাবে ব্যবহার করা উচিত: "আমরা নিজেরা—আমরা যা তাই; They say? Let them say"—এইভাব অবলম্বন করা উচিত। "অপনে ঘরমেঁ হর আদমী বাদ্‌শাহ্ হৈ"—নিজের ঘরে সকলেই রাজা। আমাদের ছেলেদের মধ্যে সে আত্মবিশ্বাস যাচ্ছে—জাতীয়তা-ভাবের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, যেন ইউরোপের সামনে একটা inferiority complex এসে যাচ্ছে। নইলে এরকম দম্ভের উত্তর সেকালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাছে, এমন কি গোঁড়ামতের সেকালের সব হিন্দুর কাছেই মিল্‌ত। সাহেব রাজার জা'ত, বিজেতার জা'ত ব'লে নিজের আভিজাত্যের ঢাক পিটিয়ে ব্রাহ্মণের উপর আস্ফালন ক'রলে—ব্রাহ্মণ আর কিছু না ব'লে, সাহেবের সঙ্গে করস্পর্শ হ'য়েছিল ব'লে স্নান ক'রে শুচি হ'লেন—সাহেব তা দেখে থ' বনে গেলেন। খুশী আর থাকৃতে পারলেন না। এই ইঙ্গিতের অন্তর্নিহিত ভাব আমি পছন্দ করি না; কিন্তু বুনো ওলের মার হ'চ্ছে বাঘা তেঁতুলে। বাঙ্‌লার শিক্ষা-বিভাগের এক উচ্চ কর্ম্মচারী আমায় একবার ব'লেছিলেন যে, ঐ শিক্ষা-বিভাগেরই কোনও ইংরেজ এই রকম জা'তের বড়াই ক'রে ভারতবাসীরা ইংরেজের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর জীব এই ভাবের অশিষ্ট উক্তি করায় তিনি তাঁকে বলেন—"মিস্টার অমুক, আপনি যা ভাবেন তা ভাবেন; কিন্তু এটাও আপনার জেনে রাখা উচিত যে এই গরীব শক্তিহীন ভারতবাসীদের মধ্যে এমন হাজার হাজার লোক আছে, যারা মনে করে যে তোমাদের ছুঁলে শরীর কলুষিত হয়।" তাতে সাহেব লাল হ'য়ে একেবারে চুপ হ'য়ে যান। ইউরোপের ঘরের কর্ত্তারা আমাদের সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধ ক'রতে চায় না—জবাব হ'চ্ছে—আমরাও চাই না; তোমাদের মেয়ে আমাদের ছেলেরা মাঝে মাঝে আনে বটে, কিন্তু আমাদের মেয়ে তোমাদের ঘরে যদি কখনও যায় এখনও আমরা সেটাকে

আমাদের পক্ষে অপমানেরই কথা ব'লে মনে করি। "যেচে মান, আর কেঁদে সোহাগ" হয় না ; এ রকম স্থলে তূষ্ণীভাব অবলম্বন ক'রে থাকলেই মান বাঁচে—যখন অন্য কোনও ক্ষমতা আমাদের নেই। আত্ম-সম্মান-জ্ঞান-যুক্ত ভারত-সন্তান, নিজের দেশের গৌরব-সম্বন্ধে যার বোধ আছে, তা সে হিঁদুঘরের ছেলেই হোক্ আর মুসলমান ঘরের ছেলেই হোক্, সে জানে যে সে বড় ঘরের ছেলে, হীন অবস্থায় প'ড়লেও তার জাতীয় আভিজাত্যবোধ যায় নি—নিজেকে কোনও ইউরোপীয় জা'তের মানুষের চেয়ে ছোটো মনে ক'রতে পারে না।

এই সম্বন্ধে আর একটী সামাজিক প্রসঙ্গ—প্রসঙ্গ কেন, সামাজিক সমস্যার কথা এসে যাচ্ছে—ইউরোপ-প্রবাসী ভারতীয় ছেলেদের সঙ্গে ইউরোপীয় মেয়েদের বিয়ে। এই ব্যাপারটী আজকাল একটু বহুল পরিমাণেই হ'চ্ছে ব'লে মনে হয়। এ সম্বন্ধে দুই একটী কথা যা আমার মনে হয় তা' ব'ল্‌বো—বাইরে গিয়ে যা দেখেছি তাই অবলম্বন ক'রে।

জন্মদিনে

শ্রীরামেন্দু দত্ত

মস্ত বড় নেই সাধনা, নই সাধু কি সন্ন্যাসী
নইকো বড় বক্তা, নারি বল্‌তে বচন বিন্যাসি'!
ধরার মাটি লাগ্‌ছে গায়ে, নইকো অমল পুষ্প গো
নয়কো জনম ফুল-বাগিচায়, তাই ব'লে কায় দুষ্‌বো গো ?
গুণ যা' আছে গুণ্‌তি করা, দোষও আছে অগণ্য
নই ধনী কি মস্ত গুণী, মানুষ আমি নগণ্য।

কম্বলী লোটা চিম্‌টে হাতে ঘুর্‌বো বনে জঙ্গলে,
জলন্ধরে কিংবা গিয়ে মিশ্‌বো সাধুর দঙ্গলে,
কিংবা হব সত্যিকারের মৌন মুনি তপস্বী
নেই সে তেমন ইচ্ছে কিছুই 'পষ্ট করেই জানিয়ে দি'
"বদ্ধ জীবের" সগোত্র এ, জীবন আমার সামান্য
নেই সে সাহস মনের আদেশ কর্‌বো যাহে অমান্য!
সংসারেতেই জন্মেছিলাম, জন্মাবধি বর্ত্তমান,
তারই গরল পান ক'রে এই মন ও তনু বর্দ্ধমান—
অমৃত তার পাইনি কিছুই, তবু এমন ভাগ্য যে
তার সেবাতেই প্রাণান্ত হায়!
—অনেক কথা, থাক্‌গো সে!
স্বপ্ন দেখার পাইনি সময়, কারণ ছিলাম বিনিদ্র
সুখের তরী পাইনি, ছিল দুখের উড়ুপ্ সছিদ্র!
তাই বলে আজ দোষ দোবো না আমার ভাঙা কপালটার
মানুষ হয়ে জন্মেছিলাম যাই শুধে তার ঋণের ভার!
নেইকো জগৎ-চমকে-দেওয়ার মতন কোনো আদর্শ
তাই ব'লে নই আদর্শহীন, আনন্দহীন, বিমর্ষ—

দিনে দিনে সইছি যে সব দুঃখ ক্লেশের যন্ত্রণা
তাই দিতেছে কাণে আমার 'গুরুদেবের মন্ত্রণা'।
এই যে ব্যথার এই হতাশার নিত্য নূতন পরীক্ষা,
এই আমারে দেয় তাপসের কঠোর তপের তিতিক্ষা
সুখ দিল না যে-সংসারে, বাঁধলো তবু শৃঙ্খলে,
গহনচারীর অভিজ্ঞতা হচ্ছে আমার তা'র তলে!
শিকেয় তুলে রাখ্‌তে হ'ল উচ্চ যত আদর্শ,
সেই সে আমার দীক্ষা ত্যাগের এতেই আমি সহর্ষ!
ভগবানে একান্তে হায় পেলাম নাকো বন্দিতে
শাস্ত্রপাঠে অসমর্থ হলাম আমি মন দিতে,
এই কথাটা কাণের কাছে অন্তে করে ঝঙ্কৃত
'চতুর্থে কিং' ভেবে কিন্তু আমি নইকো শঙ্কিত!

আমি ভালোবাসি আমার শ্যামল মাতা মৃত্তিকা!
ভালোবাসি চন্দ্র তপন অযুত তারার বর্ত্তিকা!
বিশাল আকাশ, মুক্ত বাতাস সাগর, ভূধর, অরণ্য
ভুলিয়ে দিতে দুঃখ-ব্যথা আশৈশবের শরণ্য—
নদীর জল আর গাছের ফল আর ফুলের সরল মাধুর্য্য
প্রাণের মাঝে সদাই আনে ভক্তি-প্রেমের প্রাচুর্য্য
স্রষ্টারে ঠিক না দেখিলেও দেখেছি তাঁর সৃষ্টিকে,
মিথ্যে ব'লে কে উড়োবে এই আনন্দ-বৃষ্টিকে ?
স্রষ্টারে ঠিক না সেবিলেও সেবেছি তাঁর সৃষ্টিরে
স্নান ক'রেছে বিস্ময়ে মোর নয়ন-মনের দৃষ্টি রে!

বাংলা বানানের নিয়ম

শ্রীরাজশেখর বসু

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের যে নিয়ম সংকলন করেছেন তার সম্বন্ধে নানারকম আলোচনা প্রকাশিত হচ্ছে। আলোচনার দরকার আছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত বানান-সমিতি নিয়ম লিখেই খালাস, কিন্তু তার ফলভোগ করবে জনসাধারণ, বিশেষত ছাত্ররা। বিশ্ববিদ্যালয় যদি চাপ দেন তবে নূতন বানানেই পাঠ্যপুস্তক রচিত হবে এবং ছাত্ররা বাধ্য হয়ে নূতন বানান শিখবে। কিন্তু যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন নন তাঁরা অপ্রিয় নিয়ম মানবেন না, অভ্যস্ত বানানই চালাবেন। এই বিরোধ যদি স্থায়ী হয় তবে বানানের বিশৃঙ্খলা এখনকার চেয়ে বেড়ে যাবে। অতএব বানানের নিয়ম যথাসম্ভব জনপ্রিয় হওয়া আবশ্যক।

এমন নিয়ম রচনা অসম্ভব যার সমস্তটা সকলেই খুশি হয়ে মেনে নিতে পারেন, অথচ বাংলা বানানের নিয়ম-বন্ধনের প্রয়োজন আছে। এক্ষেত্রে যাঁরা বানান নির্ধারিত করবেন তাঁদের কর্তব্য—যথাসম্ভব সুসংগত ও সুসাধ্য নিয়ম রচনা। যাঁরা সমালোচনা করবেন তাঁদের কর্তব্য—বিষয়টি নানা দিক্ দিয়ে দেখে সমগ্রভাবে বিচার ক'রে মত প্রকাশ করা। নিয়মাবলির ভূমিকায় ভাইস্‌চান্‌সেলর মহাশয় লিখেছেন, 'আবশ্যক হইলে ইহা সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হইতে পারিবে।' অতএব সংস্কারের পথ খোলা আছে। গত মাসের ভারতবর্ষ পত্রিকায় ডক্‌টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মহাশয় বানান সম্বন্ধে যে সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তাতে আশা হয় এইরকম আলোচনা আর মতবিনিময়ের ফলে বিরোধের সম্ভাবনা বহু পরিমাণে নিবারিত হবে।

বানানের বিতর্কে তিন পক্ষের যোগ দেবার অধিকার আছে। প্রথম, যাঁদের কোনও অবধারিত মত আছে এবং যাঁরা সেই মত অনুসারে বানান চালাতে চান। এই পক্ষকে 'মতবাদী' বলব। দ্বিতীয়, নির্দিষ্ট বানান আর পাঠ্যপুস্তকের বশে যাঁদের চলতে হয়, অর্থাৎ ছাত্র ও শিক্ষক। এই পক্ষকে সংক্ষেপে 'ছাত্র' বলব। তৃতীয়, যাঁরা স্বাধীন লেখক, বানানের একটা অভ্যস্ত রীতি যাঁদের আছে, ভুল করলে যাঁদের নম্বর কাটা যায় না, অর্থাৎ সাহিত্যরথী থেকে আরম্ভ ক'রে গোমস্তা মুদি পর্যন্ত। এই পক্ষকে 'লেখক' বলব। বানানের নিয়ম রচনায় উক্ত তিন পক্ষের যুক্তি, রুচি ও লাভালাভ উপেক্ষা করলে চলবে না।

বলা বাহুল্য, প্রথম পক্ষ বা মতবাদীদের নানা মত আছে। সকল মত আলোচনার স্থান নেই, কেবল দুটি প্রধান ও বহু-কথিত মতের কথা বলব। এই দুই মত যাঁরা প্রতিষ্ঠিত করতে চান তাঁদের 'ব্যুৎপত্তিবাদী' আর 'উচ্চারণবাদী' বলা যেতে পারে। এঁরা পরস্পরবিরোধী। নিজের নিজের যুক্তিতে এঁদের যতই আস্থা থাকুক, ব্যবহারক্ষেত্রে দুই দলই কিছু কিছু লঙ্ঘন করা দরকার মনে করেন। কিন্তু লঙ্ঘন করলেই যুক্তির অপলাপ হয়, সেজন্য দুই মতেরই অক্ষুণ্ণ ব্যাখ্যান দেবার চেষ্টা করব। লঙ্ঘন করা উচিত কিনা এবং রফা করা যেতে পারে কি না তা পরে বিবেচ্য।

ব্যুৎপত্তিবাদী বলেন—বাংলা ভাষায় নানা জাতের শব্দ আছে, তাদের বানানে একই নিয়ম পালনীয়। উচ্চারণ যেমনই হোক, সকল শব্দের বানান এমন হওয়া দরকার যাতে মূল শব্দের সঙ্গে যোগ বজায় থাকে। সংস্কৃত শব্দের বানান ব্যাকরণ অভিধানের শাসনে একবারে পাকা হয়ে গেছে। বানান সরল করবার লোভে তাতে হস্তক্ষেপ করলে বিষম বিভ্রাট ঘটবে। যে সকল শব্দ অল্পাধিক বিকৃত হয়ে সংস্কৃত আর্বি ফার্সি ইংরেজি প্রভৃতি ভাষা থেকে এসেছে, তাদের বানানে মূল অনুসারে ই ঈ উ ঊ ণ ন শ ষ স বজায় রাখা কর্তব্য, যথা—কুমীর, উকীল, পূব, সোণা, শাঁস, শীষ, শামলা, সন। এই বহুপ্রচলিত রীতি যদি পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় তবে নিয়ম রচনা সহজ ও যুক্তিসংগত হবে।

এইখানে ছাত্র প্রশ্ন তুলবে (বোধ হয় সুনীতিবাবুর প্ররোচনায়)—সার, আপনার বিধান খুব সরল, কিন্তু মূল অনুসারে এই সকল বানান হবে কি?—খীল (সং কীল), তিসী (সং অতসী), মনীব, রেহাঈ, উনিশ, চুল, মাশুল,

বামুণ, কখণ, শাধ (সং শ্রদ্ধা), শরম, সক্ত (শক্ত নয়), শথ (সথ নয়)।

ব্যুৎপত্তিবাদী দমবার পাত্র নন। তিনি বলবেন—তা ছাড়া আর উপায় কি। এসব বানান আমারও অভ্যাস নেই স্বীকার করছি, কিন্তু সামঞ্জস্যের জন্য সবই করতে পারি।

উচ্চারণবাদী বলবেন—ও রকম নিয়ম চলবে না। বানান হওয়া উচিত উচ্চারণ অনুসারে, সকল দেশে এই চেষ্টা চলছে। বাংলা সাহিত্যের কেন্দ্র কলকাতা, অতএব কলকাতার উচ্চারণ অনুসারে সংস্কৃত অ-সংস্কৃত সমস্ত শব্দের বানান হবে।

বাঙাল ছাত্র বললে—সার, আপনাদের কলকাতার বড় বড় বিদ্বানের মুখে শুনেছি, 'মাতা-ব্যাতা কিচুতেই সারচে না।' বানান ঠিক এই রকম হবে কি ?

উচ্চারণবাদী।—ভোট নিয়ে দেখতে হবে। অধিকাংশ বিদ্বান্ যা উচ্চারণ করবেন বানানও সেই রকম হবে।

ব্যুৎপত্তিবাদী।—কখনই নয়, থ স্থানে ত, ছ স্থানে চ হ'তেই পারে না।

ছাত্র।—কিন্তু আপনি যে এইমাত্র কেবল ই ঈ ণ ন শ ষ স-এর বিধান দিলেন ?

ব্যুৎপত্তিবাদী।—ভুল হয়ে গেছে। ছ থ এবং আরও কয়েকটি বর্ণ মূল অনুসারে লিখতে হবে।

ছাত্র।—কিন্তু মস্তক শব্দে ত আছে, কিঞ্চিৎ-এ চ আছে, তবে 'মাতা' আর 'কিচু' লিখব না কেন ?

ব্যুৎপত্তিবাদী।—হুঁ। এর পর ভেবে চিন্তে বিধান দেব। বোধ হয় সংস্কৃত আর বাংলা রূপের মাঝে প্রাকৃত রূপও স্মরণ করতে হবে।

উচ্চারণবাদী।—বৃথা চেষ্টা, কিছুতেই সামলাতে পারবে না। আমি যা বলি শোন। উচ্চারণ অনুসরণ ছাড়া গতি নেই। সংস্কৃত আর অ-সংস্কৃত শব্দের ভেদ একবারেই মিথ্যা; যে শব্দ আমাদের ভাষায় এসেছে তার আর জাত নেই, বাংলা হয়ে গেছে। বাংলায় যে বর্ণের মৌলিক উচ্চারণ নেই সে বর্ণ ত্যাগ করতে হবে। ঈ উ ঋ ণ ষ স এবং বহু যুক্তাক্ষর অনাবশ্যক। আমি লিখতে চাই—নিল শিন্ধু, শোনার হরিন, ওত্তন্ত অশুশ্থ, শেপাই শান্ত্রি, শরকার শেলাম।

ছাত্র।—আচ্ছা, শ্রী না লিখে স্থ লিখলে চলে না? ভারি সুবিধা হয়। দোহাই সার, দন্ত্য-সটা বজায় রাখুন, শিল্ক শিগারেট শিনেমা আইশক্রিম লিখলে সর্বনাশ হবে।

ব্যুৎপত্তিবাদী।—ঠিক বলেছ ছোকরা, আমার নিয়মে মূলশব্দ অনুসারে বানান করলে কোথাও আটকাবে না।

উচ্চারণবাদী।—তুমি কি ভেবেছ বাংলাদেশের সবাই ভাষাতত্ত্বে চৌকস ? যদি পদে পদে সংস্কৃত আর্বি ফার্সি তুর্কি পোর্তুগিজ মূলশব্দ খুঁজতে হয় তবে কলম অচল হবে।

ছাত্র।—সেজন্য ভাববেন না সার। মূলশব্দ জানবার দরকার কি, মাষ্টার যা শেখাবেন চক্ষু বুঁজে মুখস্থ করব, সন্দেহ হ'লে অভিধান দেখব। যদি ব্যুৎপত্তি না জেনেও h-a-l-f হাফ, l-a-u-g-h লাফ শিখতে পারি, যদি দ্বন্দ্ব উচ্ছ্বাস কৃচ্ছ্র গণ পণ বন মন বানান করতে পারি, তবে যখণ-তখণ, মাস্থল রেহাঈ, নিল শিন্ধু, শরকার শেলাম বানানেও আপত্তি নেই। আপনারা চট্‌পট্ একটা মিটমাট ক'রে ফেলুন।

তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ লেখক এতক্ষণ চুপ ক'রে শুনছিলেন। এখন বললেন—মহাশয়রা আমাদের অবস্থাটা ভেবেছেন কি ? ছাত্ররা ছেলেমানুষ, যা শেখাবেন তাই শিখবে; কিন্তু আমাদের যা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে তা ছাড়ব কি ক'রে ? অল্পস্বল্প বদলাবার চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু বেয়াড়া ব্যবস্থায় রাজি নই।

ব্যুৎপত্তি ও উচ্চারণবাদী সমস্বরে বললেন—রাজি না হন বয়েই গেল। ছাত্ররা আমাদের ভরসা। আপনারা দশ বিশ বৎসরে লুপ্ত হয়ে যাবেন, তখন ছাত্রদের অভ্যস্ত বানান সর্বত্র চলবে।

লেখক।—মনেও ভাববেন না তা। আপনাদের প্রভাব স্কুলে আর কলেজে, কিন্তু বাড়িতে আমরা আছি। আমাদের লেখা গল্প কবিতা সংবাদপত্র ইত্যাদির ক্ষমতা কম নয়। ছেলেরা আমাদের বানানও শিখবে এবং শেষ অবধি সেই বানানই জয়ী হবে। অতএব সব রকম গোঁড়ামি বর্জন ক'রে একটা রফা করবার চেষ্টা দেখুন।

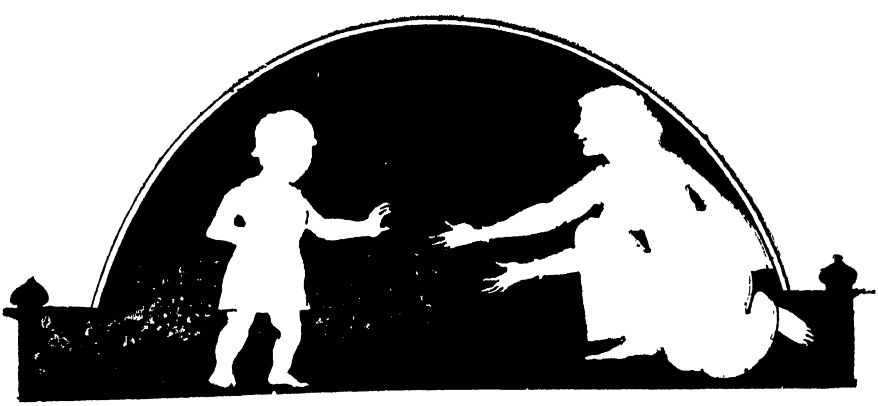
উপরে যে বিতর্কের নমুনা দেওয়া হ'ল তা অতিরঞ্জিত বটে, কিন্তু পণ্ডিতগণের মতভেদ এই রকমই প্রবল। আশ্চর্য এই, তর্কক্ষেত্রে যাঁদের অত্যন্ত বিরোধ, বানানে তাঁদের খুব

বেশি পার্থক্য দেখা যায় না। যুক্তি-তর্কের সময় যাঁরা বৈজ্ঞানিক ভেদ অবলম্বন করেন, ব্যবহারক্ষেত্রে তাঁরাই স্বচ্ছন্দে নানা রকম অসংগতি মেনে নিয়ে চলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সমিতি নিয়ম সংকলনের পূর্বে প্রায় দু-শ বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত সংগ্রহ করেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে অ-সংস্কৃত শব্দে ঈ ঊ রাখতে (এমন কি বিকল্পে রাখতে) প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা এখন পর্যন্ত 'রেশমী শাড়ী' লিখছেন, যদিও সংকলিত নিয়মে 'শাড়ি, শাড়ী' এবং কেবল 'রেশমি' বিহিত হয়েছে। উক্ত দু-শ ব্যক্তির মধ্যে দু-জন ছাড়া সকলেই রেফের পর দ্বিত্ব বর্জন করতে চেয়েছিলেন, অনেকে বর্জনের পক্ষে খুবই আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। অথচ এখন পর্যন্ত তাঁরা দ্বিত্ব চালাচ্ছেন। মতের চেয়ে অভ্যাসই প্রবল।

বানানের সমস্যা কেবল বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাহায্যে মিটবে না। সাধারণের অভ্যাস আর রুচি দেখতে হবে, বহু অসংগতি মেনে নিতে হবে। যাঁরা অভিমত দিয়েছেন তাঁদের অনেক বিষয়ে ঐক্য আছে, অনেক বিষয়ে নেই; আবার একই ব্যক্তির অভিমতে সামঞ্জস্যের অভাব আছে। যিনি মাসী পিসী লিখতে চান তিনি দিদী ঝী লিখতে রাজি নন, যিনি চূণ লিখবেন তিনি চুণ লিখবেন না। এই রকম হওয়াই স্বাভাবিক। বানান-সমিতির যাঁরা সদস্য তাঁরা উক্ত দু-শ অভিমতদাতার প্রতিনিধিস্বরূপ। এই সদস্যদের ভিতরেও মতভেদ আছে। এঁরা বাগ্‌যুদ্ধে পরস্পরকে পরাস্ত করবার চেষ্টা করেন নি, কারণ তা অসম্ভব। এঁরা প্রথমেই সম্পাদ্য স্থির করলেন—(১) বানানের সংস্কার যত হোক না হোক, নির্ধারণ আবশ্যক; (২) বানান যতটুকু সরল করা সম্ভবপর, তা করা উচিত; (৩) প্রথম উদ্যমে সমস্ত শব্দের বানান নির্ধারণ করা অনুচিত, এ চেষ্টা ক্রমে ক্রমে করাই ভাল। সমিতিতে ব্যুৎপত্তিবাদী ও উচ্চারণবাদী দুই দলই ছিলেন, কিন্তু চরমবাদী অবুঝ কেউ ছিলেন না। এঁদের রফার ফলে সংস্কৃতজাত শব্দে ণ বর্জিত হয়েছে কিন্তু শ ষ স বজায় আছে। এই ব্যবস্থা অসংগত বটে, কিন্তু অস্বাভাবিক নয়; কারণ, বহু নামজাদা লেখক কান চুন বামুন লেখেন অথচ শোনা (সোনা), শাপ (সাপ) লিখতে রাজি নন। অনেকে ঈ ঊ বর্জন করতে চান, আবার অনেকে তা রাখতে চান। বিকল্প বাঞ্ছনীয় নয়, কিন্তু যেখানে দুই বিরোধী দলের মত সমান প্রবল সেখানে আপাতত বিকল্প ভিন্ন উপায় নেই।

সকল ভাষার বানানেই অল্পাধিক অসংগতি-দোষ আছে, বাংলা বানানেও আছে এবং থাকবে। যে নিয়মাবলি সংকলিত হয়েছে তা একটু ভাল ক'রে দেখলে বোঝা যাবে যে প্রলয়ংকর পরিবর্তন কিছুই হয় নি। যদি নিয়মে ত্রুটি থাকে তবে তার শোধন আবশ্যক। সমালোচকের কর্তব্য ত্রুটি প্রদর্শন এবং সঙ্গে সঙ্গে শোধনের উপায় বলা—এমন উপায় বলা, যা মেনে নিতে সাধারণের বেশি আপত্তি হবে না।



শিলাবৃষ্টির দিনে *

শ্রীসুরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

শনিবার বারুণীর ছুটী—তার পর রবিবার। এক সঙ্গে এক-টানা দুদিন ছুটী যে কেরাণী-জীবনের কতখানি আরামের, তা ভুক্তভোগীমাত্রেই বুঝবেন। শুক্রবার দিনটা যেন আর কাটে না। ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি, কোন কাযে আর মন বসছে না। অবশ্য আমার সহকর্ম্মী গণপতি প্রভৃতি প্রবাসীদের মত আমার দেশে যাওয়ারও আকর্ষণ নেই বা গিন্নির জন্য এক্সপ্রেস গজা এবং মেয়ের জন্য ক্ষীরেলা নিয়ে যাওয়ারও তাগিদ নেই; কিন্তু তবুও বিশ্রামের দিন দুটোর জন্য মনটা রীতিমত ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ছিল।

তিনটে বাজতেই গণপতি সওদা সেরে ফিরল। তার পর বড়কর্ত্তাকে সভক্তি প্রণাম জানিয়ে সকাল সকাল বাড়ী যাওয়ার বরলাভ ক'রে এক্সপ্রেস গজা ও ক্ষীরেলার পুঁটলি নিয়ে Her Majesty'র ফোর্টে যাত্রা করল। কিছুক্ষণ বাদে সেজোবাবু গোবর্দ্ধন মিত্তিরও তিনটী মুটের মাথায় ঘাড়-ভাঙ্গা মোট চাপিয়ে তেত্রিশকোটী দেবতাকে প্রণাম ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে যাত্রা করলেন। আমরা "দুর্গা দুর্গা," "সিদ্ধিদাতা গণেশ গণেশ" ক'রতে ক'রতে এবং মৌলুবী ফজলুল করিম "বদর বদর" ক'রতে ক'রতে ওঁকে গেট পর্য্যন্ত এগিয়ে দিলাম। এমন সময় সিধুবাবু চীৎকার করতে করতে নীচে নেমে এলেন—"পেছুও ডাকিনি দাদা কিন্তু। আপনার ছোট নাতীর দরুণ শুঁড়ওয়ালা দেবতা দুটী ফেলে যাচ্ছেন যে?" মানে ওঁর ছোট নাতী ষ্টেশনের ধারে ষ্টেশনারী দোকান খুলবে বলে এক যোড়া গণেশের বরাদ্দ ছিল সে দুটী সিধুবাবু লুকিয়ে রেখেছিলেন এতক্ষণ।

তার পর একে একে ডেলিপ্যাসেঞ্জাররাও গত হলেন—মানে বাড়ী গেলেন আর কি। ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলোর মত আমরা কজন কলকাতার বাসিন্দা প'ড়ে রইলাম। সাড়ে চারটে নাগাদ খুব ঘনঘটা ক'রে ঝড় উঠ্‌ল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবলধারে শিলাবৃষ্টি সুরু হল। নীচে করোগেটের মোটরের শেডগুলো ঝন ঝন করে বেজে উঠ্‌ল। পাকা পনের মিনিট ধরে চল্‌ল প্রবল শিলাবর্ষণ। কার্ণিশে কার্ণিশে শিলের স্তূপ জমে উঠ্‌ল; উঠান হ'য়ে গেল একেবারে সাদা। এমন ধারা শিলাবৃষ্টি নাকি কখনও হয় নি। সবাই পারতপক্ষে এক-একটা কাহিনী বল্‌তে লাগ্‌লেন। বড়বাবু বল্‌লেন—এমনই ধারা কাণ্ড হয়েছিল একদিন দার্জ্জিলিঙ্গে। Boga সাহেব আর তিনি বেরিয়েছেন বেড়াতে এমন সময় দারুণ শিল। সাহেবের ওভারকোট ভেদ করে ওয়েষ্টকোটের পকেটের ঘড়ি ভেঙ্গে চুরমার, ওঁর নিজের ছড়ির হ্যাণ্ডেলটাও টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে গেল। কিন্তু এহেন শিলায় যে ওঁদের মাথাগুলো কি ক'রে বাঁচ্‌ল জান্‌তে ইচ্ছে থাক্‌লেও সাহস ক'রে জিজ্ঞাসা করতে পারিনি—কারণ উনি হলেন কাঁচা-খেকো দেবতা—বড়বাবু—মারিলে মারিতে পারি—মানে পেটে মারতে পারেন। কাযেই ওঁর ভাঙ্গা ছড়ির জন্য কজনা মিলে মর্ম্মান্তিক শোক প্রকাশ ক'রলাম। তার পর আরম্ভ ক'রলেন—মেজবাবু হরিহর ভড় মহাশয়। উনি গম্ভীর লোক—আমাদের সঙ্গে বড় একটা কথা কইতেন না; তাই বড়বাবুকে সম্বোধন করে বল্‌লেন "ওঃ শিল পড়েছিল বটে তের সনে। আমরা তখন দিনাজপুরে সেটলমেণ্ট আফিসে ব'সে। ও—সে শিল একেবারে খড়ের চাল ফুটো ক'রে আমাদের পায়ের কাছে এত জড় হ'ল।" স্বর্গের দেবতাদের তারিফ না ক'রে থাক্‌তে পারিনি। নরলোকের মানীগণের মান যে তাঁরাও রাখেন—বুঝলাম—নইলে অমন চক্‌চকে টাক ছেড়ে পায়ের তলা? এ যে ভক্তির পরম পরাকাষ্ঠা বাবা। এ সব ত তবু ভাল, কিন্তু অনুকূলবাবুর ঘোড়ার জন্য দরদ দেখে হাসি চাপ্‌তে প্রাণ বেরিয়ে যাবার যোগাড়। প্রাচীনের দলে হাস্‌তে নেই কিনা। সবাই যখন স্কুল-ফেরতা ছেলে মেয়েদের কথা ভেবে আকুল হ'চ্ছে উনি তখন ঘোড়ার কথা ভেবে অস্থির। "বল্‌লেন ঘোড়াগুলো সব মরে গেল বোধ হয় বড়বাবু।"

বড়বাবু গম্ভীরভাবে "আশ্চর্য্য নয়" ব'লে পেছন ফিরলেন। সিধুবাবু এবং আমরা কজন দাঁড়িয়ে রইলাম। সিধুবাবু ওঁদের সমান যান কাজেই ঠাট্টা ক'রবার অধিকার ছিল।

আমরা ইঙ্গিত করতে বল্লেন—"ঘোড়া ত প্রায় যাবার গেলই দাদা, অধিকন্তু আপনার পিঁজরাপোলেরও কোল খালি হল বোধ হয়।" অনুকূলবাবুর সোদপুরে বাড়ী।

আমি বল্লাম—ঐ ত সুসংবাদ সিধুদা? কিড্‌স্কিন্ আর উইলোকাফ্ এবার আমাদের মত কেরাণীরও পায়েও উঠ্‌বে তাহলে বলুন? সিধু—সে গুড়ে বালি ভায়া। পিঁজরে-পোলে আবার কি থাকে কোথায়? খালি তেজপক্ষ আর দোজপক্ষ। বড়জোর অনুকূলদার ঘোড়ার দরুণ "হাফসোল" সস্তায় পেতে পার। ও-রকম মর্ম্মান্তিক রসিকতায় অনুকূলদাও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলেন।

পাঁচটা বাজল। আমি, সিধুবাবু, সত্যবাবু, অনুকূলবাবু ইত্যাদি এসে ট্রামে চড়লাম। শিল থেমে গেছে, বৃষ্টি থেমে গেছে। অস্তচূড়াবলম্বী সূর্য্যদেব আবার হেসে উঠ্‌লেন। কিন্তু শিলার কাহিনী চলেছে পূরাদমে। ট্রাম সব সারবন্দি ব'সে আছে। কণ্ডাক্টার বল্লে—কালীতলায় তার ছিঁড়েছে।

অনুকূল—কালীতলায় তার ছিঁড়েছে বলে ডালহাউসিতে ট্রাম বন্ধ?

সিধু—ওকেই বলে ডাক্তারী দাদা। রামের পেটের ব্যামোতে পথ্য করে শ্যাম, ওষুধ খেয়ে মরে যদু।

গাড়ীতে দেখি ছেলেবুড়ো নির্ব্বিশেষে প্রবল উৎসাহে চোখে-দেখা শিলার কাহিনীর বর্ণনায় মুখর হ'য়ে উঠেছিল। কণ্ডাক্টার বল্‌ছে লাহোরের কথা; পুলিস সার্জ্জেণ্ট বল্‌ছে Scotch Borderএর hailstormএর কথা; চীনে মিস্ত্রি বল্‌ছে মাঞ্চুর কথা। সেকেণ্ড ক্লাসে হাতপা সঞ্চালনের প্রাচুর্য্যে হাতাহাতি ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেছে। চেনা অচেনা নেই, প্রাচীন নবীন নেই, প্রবল উৎসাহে "আরে শুনুন মশায়" "ও ত কি" প্রভৃতির টানা আঁচড় চলেছে। কিন্তু কেবা শোনে কার কথা—সবাই বক্তা। এক ভদ্রলোক তারস্বরে চীৎকার ক'রে উঠলেন "দোহাই আপনাদের, আমার কুকুরখেদা গাঁয়ের কথাটা একবার শুনুন। সেবারে যা পড়েছিল মশায়—তা এক একখানা থান ইঁট বললেই হয়।"

সিধু—থান ইঁট—বলেন কি মশায়! তা ব্যাপারটা শুধু কুকুরের ওপর দিয়ে গেছে ত? মানুষের গায়ে—

সিধুবাবু দেশে পাকা বাড়ী ক'রছিলেন। থান ইঁটের প্রসঙ্গে তাই আমি বল্লাম—সিধুদা আপনার গাঁয়ে সত্যিকারের থান ইঁট বর্ষণ হলে বোধ হয় আপনার বাড়ী করবার খরচটার একটু সুরাহা হয়?

সিধু—নিশ্চয়, যদি আমাদের মাথা বাঁচিয়ে এবং একটু আলগোছে আলগোছে বর্ষণ হয়; মানে আস্ত ইঁট যদি সারি বন্দী হ'য়ে নামে।

এক ভদ্রলোক বল্লেন "কথাটা একেবারে হেসে উড়িয়ে দেবার মত নয়। শিল বড় হলে থান ইঁটের মতই দাঁড়ায়; crystallographyতে তা স্পষ্ট লেখা আছে।"

সিধু—কিন্তু সে কপাল কি পোড়া বাঙ্গালা দেশের হবে মশায়? নইলে মাথা ফাটান শিলের কথা বাদ দিয়ে ধানের বা পাটের কথাই ধরুন না। ধান বা পাটগাছ crystallographyতে বেড়ে যদি মেহগনি বা প্লাই-উডে দাঁড়ায় তাহলে বাঙ্গালার দুর্গতি ত একদিনেই যায়। ও কচু কয়লা, পেট্রল বা লোহালক্কড়ের কোন দরকার হবে না।"

সিধুদার কথা চাপা দিয়ে অনুকূলবাবু সখেদে ব'লে উঠ্‌লেন "এতক্ষণ ধরে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, কই একটা ঘোড়ার গাড়ীও ত চোখে প'ড়ল না। ঘোড়ারা আর বেঁচে নেই সিধু।"

সিধু—ভয় কি অনুকূলদা? শিল বেড়ে যদি থান ইঁট হয়, আপনার ঘরের ছুঁচো ইঁদুর বড় হয়েও ঘোড়ায় দাঁড়াতে কতক্ষণ?"

একখানা গাড়ী দেখে আমি বল্লাম "ঐ দেখুন—ঐ দেখুন অনুকূলদা, ঘোড়ার গাড়ী আস্‌ছে।"

অনুকূলবাবু ক্ষীণ সুরে বল্লেন "এতক্ষণে একখানা দেখে আর কি হবে। ওটা হয়ত শেডে দাঁড়িয়েছিল।"

আমি বল্লাম "আচ্ছা অনুকূলদা, ঘোড়ার জন্য আপনার এত মাথাব্যথা কেন বলুন ত?"

সিধু—আহা জান না? আমাদের তৃতীয় পক্ষের বৌদির জন্য দাদা এক দ্বিতীয় পক্ষের ঘোড়ার গাড়ী কিনেছিল যে? সেবারে হারম্যানের বাড়ী থেকে ঘোড়ার জন্য ফ্ল্যানেলের গাউন ফুল মোজা কিনে নিয়ে গেছেন আমার দেখ্‌তা?"

কুকুরখেদার ভদ্রলোকটী প্রথমে বোধ হয় একটু চটেছিলেন—কিন্তু জামা জুতো পরা ঘোড়ার কথায় না হেসে থাক্‌তে পারলেন না।

সিধুই বল্লে "মশায় বোধ হয় মিথ্যে মনে করলেন? তা নয় ঘোড়ার বয়স হয়েছে। বৌদির তৃতীয় পক্ষের সোয়ামীর ওপর যা দরদ—বুড়ো ঘোড়াটার ওপর তার থেকে একচুল কম নয়।"

আর একটা হাসির হল্লা উঠ্‌ল।

বৈজ্ঞানিক ভদ্রলোকটী বল্লেন "কোন একটা প্রাচীন পুঁথিতে পেয়েছিলাম যে কৌরবদের এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নাকি কোথায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক শিলাবৃষ্টিতে পনের মিনিটে সাবাড়।"

সিধু—ওটা ত মহাভারতের শিলাকাণ্ডতেই র'য়েছে।

অনুকূলদা বল্লেন - তুমি যে অবাক ক'রলে সিধু? মহাভারতে ত "পর্ব্বই" আছে জানি, "কাণ্ড" আবার কবে থেকে হ'ল?

সিধু—গেল বছর থেকে, জানেন না? বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত আমার মামাত ভায়ের পিশ্‌তুত শালা অষ্টাদশপর্ব্বের পর আর একটা অধ্যায় জুড়ে দিয়েছেন অবাক-কাণ্ড—নাম দিয়ে। যত কিছু অদ্ভুত ব্যাপার অতঃপর ঐটাতেই পাওয়া যাবে।

অনুকূলবাবু অতঃপর আরও ক'টা ঘোড়ার গাড়ী দেখে আশ্বস্ত হ'য়ে বল্লেন—"তা হলে ঘোড়াগুলোর কিছু হয় নি? কি বল সিধু?"

সিধু—রামঃ, আর হলেই বা কি? আপনার ঘরে বৌদি রয়েছেন—গিয়ে দেখ্‌বেন আপনার আদরের ঘোড়া শাল গায়ে দিয়ে আপনার খাটে ব'সে বৌদির সঙ্গে গল্প করছে, চা খাচ্ছে, হাজার হ'ক—

অনুকূল—দেখ্ সিধু! ভাল হ'চ্ছে না বল্‌ছি।

আবার হাসির রোল উঠ্‌ল। সিধুদা ঘণ্টাখানেক জমালেন বটে—কিন্তু ব'সে ব'সে সবাই বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ছিল। বক্তারাও সত্য কাহিনী শুনিয়ে শুনিয়ে ক্লান্ত হ'য়ে পড়্‌লেন। কথার স্রোত ক্রমে স্তিমিত হ'য়ে এল। ক্রমশঃ খেদ উক্তি আরম্ভ হ'ল, আহা আমার আশা আর রইল না। দেশের চাষারা ধনে প্রাণে মারা গেল। ইত্যাদি গোছের।

এমন সময় কালো কোটপরা বেঁটে-খাট কুচ্‌কুচে কাল রকমের এক ভদ্রলোক মুষড়ে পড়া মনগুলোকে নাড়া দিয়ে একপ্রস্থ সুরু করলেন। ভদ্রলোক খুব সৌখীন; চোখে রিমলেশ চশমা, হাতে সোনার ঘড়ি, কোঁচান দেশী ধুতি, পায়ে চক্‌চকে পাম্পসু। বলবার ভঙ্গিটীও বেশ। বল্লেন—শিলাবৃষ্টির কথার নূতনত্ব কিছুই এর ভেতর নেই, তবে এমনই কালো মেঘ দেখে আমার আঠার সনের একদিনের কথা মনে পড়্‌ছে। আমার তখন ২৫ বছর বয়েস, কায-কর্ম্মের সুবিধা তখনও হয়নি। লক্ষ্ণৌয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ্চ করি। আমাদের দেশ হ'চ্ছে ভাওয়ালের পাশেই একটী ছোট্ট গাঁয়ে। ঠিক এমনই চৈত্র মাস, এমনই সারাদিন ধরে মেঘের আনাগোনা চল্‌ছিল। বিকেল নাগাৎ ঠিক আজকের মতই একখানা মিশমিশে কাল মেঘ পূবের আকাশ ছেয়ে উঠ্‌ল। বেলাও যেমন প'ড়ে আস্‌তে লাগ্‌ল—ওপরে কালীবনটীও ধীরে ধীরে নীচে নেমে এসে গাছ-পালা মাঠ ঘাট একেবারে মুছে ফেলে দিল। সূচিভেদ্য তমসা যে কি তা অনুভব ক'রলাম সেদিন। একবার মনে হ'ল—পৃথিবীটা বুঝি এতদিনের আলোর পথ ছেড়ে ছিট্‌কে বেরিয়ে আজ অতল অন্ধকারের ভেতর ডুবে চলেছে। মেঘের গম্ভীর শব্দটা এরই কালীসমুদ্রে ডুবে যাওয়ার ভক্-ভক্ আওয়াজের মত গুলিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। ডুবন্ত পাত্রের পাশ দিয়ে যেমন সাদা বুড়বুড়ি ফেনিয়ে ওঠে তেমনই ধারা এই কালীসমুদ্রে ঝলকে ঝলকে বিদ্যুৎ ফেনিয়ে উঠ্‌তে লাগল।

ঘড়িতে যখন টং টং ক'রে সাতটা বাজল বাইরেটা তখন যেন থমথম করছে; বাতাস নীরব নিথর; পাতাটী পড়ে না, ঝিল্লিরব স্তব্ধ হ'য়ে গেছে; উঃ প্রকৃতির এমনধারা ভ্রূকুটী দেখে আমার জোয়ান শরীরের শিরা-উপশিরাগুলো যেন অসাড় হ'য়ে আস্‌ছিল। বাবা বল্‌ছিলেন—আশ্বিনের ঝড়ের আগে অনেকটা এই রকম হয়েছিল কিন্তু এতক্ষণ ধরে নয়। আসন্ন প্রলয়ের ভয়ে ভীতা বড়দিদি ছেলে বুকে করে মাকে জড়িয়ে বসেছিল একপাশে—আমার স্ত্রী ব'সেছিল অন্যপাশে। বল্‌তে লজ্জা করে—২৫ বছরের জোয়ান যে আমি, আমারও ওদের সঙ্গে ঐ ম্যালেরিয়াজীর্ণ বুকখানার আড়ালে ওদেরই মত আশ্রয় নিতে প্রবল ইচ্ছে হচ্ছিল। আসন্ন মরণের অন্ধকারে হাত ধরাধরি ক'রে একসঙ্গে যাবার তীব্র বাসনা জাগছিল। কিন্তু লজ্জা বাধা হ'য়ে উঠ্‌ল। ক্রমে ক্রমে আমার যেন চেতনা লুপ্ত হ'য়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। হঠাৎ দেখি সুদূর বনের পাশ দিয়ে একঝলক বিদ্যুতের দীপ্তি ছুটে এল, সঙ্গে সঙ্গে গোঁ গোঁ শব্দ ক'রতে

ক'রতে ঝড়ো হাওয়াও এল ছুটে। উঠে প্রাণপণ বলে দরজা বন্ধ ক'রে দিলাম। মত্ত ঝড় রুদ্ররোষে বাইরে গর্জ্জন ক'রতে লাগ্‌ল। রুদ্ধ দ্বারে যেন লক্ষকোটী পদাঘাত ক'রতে লাগ্‌ল। বাতাস ঢোক্‌বার জাফ্‌রীর ভেতর দিয়ে রুদ্ধ গর্জ্জন তীব্র শব্দে আমাদের চকিত ক'রে তুল্‌তে লাগ্‌ল। ওপরে ঘরের চালখানা ধ'রে কে যেন প্রবল প্রয়াসে ঝাঁকুনি দিতে লাগ্‌ল।

স্বাস্থ্য ভাল থাক্‌বে বলে আমরা পাড়ার মধ্যে বাস না ক'রে আমাদের দুশো বিঘে চষা জমীর মধ্যে বাংলো ক'রেছিলাম। আশে আশে মাঠ আর বন। আজকে একলা থাকার ভয়টা প্রাণভরে বুঝলাম। চারিদিকে শন্‌শন্‌, সোঁ-সোঁ, গোঁ-গোঁ আওয়াজ—মনে হচ্ছিল যেন দৈত্যপুরের দৈত্যেরা আজ এই মাঠের মধ্যে তাণ্ডব সুরু ক'রেছে। মড়মড় ক'রে বড় বড় ডাল ভেঙ্গে পড়ছে—আর এক একবার ক'রে আর্ত্ত পশুপক্ষীর চীৎকার উঠ্‌ছে। এমন সময় জানালার একটা কপাট কব্জাসমেত ভেঙ্গে পড়ে গেল। বাইরের তাণ্ডবের ব্যাপারটা এবার পরিষ্কার বোধ হ'তে লাগ্‌ল। হঠাৎ একটা গাছ ভাঙ্গার প্রবল মড়মড় শব্দ ভেসে এল এবং সঙ্গে মেয়ে পুরুষের একটা মিলিত কলরব কানে এল। তারপর যেটা এল সেটা একটা নারী-কণ্ঠের তরল আর্ত্তনাদ। "ওগো মাগো।"

বাবা বল্‌লেন "ওঠ্‌ রে, কারা বুঝি গাছ চাপা পড়ে গেল।" মা প্রথম বারণ করলেন কিন্তু বাবা যখন বল্‌লেন, এক ক্রোশের মধ্যে জনপ্রাণী নেই। আমরা না গেলে ওরা বেঘোরে ম'রে যাবে যে। মাকে একলা রেখে আমরা বেরুলাম। মার রুগ্ন শরীরে কি ভয়ানক সাহস ছিল তা সেদিন বুঝলাম। টর্চ্চ নিয়ে বহুকষ্টে চলেছি বাবার পেছু পেছু। গাছ পড়ে সব পথ বন্ধ ক'রে দিয়েছে। বহুকষ্টে এগিয়ে চলেছি। এমন সময় একটা কালো মত জানোয়ার গোঁ গোঁ ক'রতে ক'রতে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ছুটে চলে গেল। আমি ধরাশায়ী হ'লাম। বাবা না থাকলে হয়ত ভয়েতেই মরে যেতাম ঐখানে। বাবা টেনে তুল্‌লেন—বল্‌লেন ওটা একটা গরুর গাড়ীর গরু। নিশ্চয় কাছেই কেউ গাড়ীশুদ্ধ গাছ চাপা প'ড়েছে। অনেকক্ষণ ওদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে সাপের মত নরম একটা কি যেন মাড়িয়ে ফেল্‌লাম। সাপ মনে করে লাফিয়ে উঠতেই কানে গেল একটা ক্ষীণ চীৎকার—"ওঃ মাগো।" টর্চ্চ ফেলে দেখি, রাঙ্গা চেলীপরা একটী টুকটুকে মেয়ে! কালো কালো চোখ দুটীতে ভয়ার্ত্ত দৃষ্টি—ও হেদো নাকি? আসি, তা হলে নমস্কার।

শেষের কথাগুলো কানে যায় নি। ঐ চেলীপরা মেয়েটী বড় বড় চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে তখন। নীচু হয়ে তার সুগোল হাতখানি ধ'রে বল্‌লাম "উঠে দাঁড়াতে পারবে?" মেয়েটী ঘাড় হেলিয়ে বল্‌লে "হ্যাঁ"। তারপর আমার কাঁধে ভর দিয়ে কঙ্কণের শিঞ্জিনী তুলে যেন দাঁড়াল। আমি অতি স্নিগ্ধস্বরে বললাম "বড্ড লেগেছে? না?"

মেয়েটীর বদনে হিন্দি-ভাষায় রূঢ় উত্তর হ'ল "এ বাবু মাতোয়ালা হ্যায়।" শ্যামবাজারের ডিপোর ভেতর কণ্ট্রাক্টারের জবাবটা বেখাপ্পা হ'য়ে গিছল আর কি। তারপর দুনো খরচ ক'রে বউবাজারের বাসায় ফিরি।

কিন্তু মেয়েটা আমায় পেয়ে ব'সল। সে রাতের সুখনিদ্রাটুকু যে কতবার ঐ আঠার সনের চেলীপরা মেয়েটীর ব্যাকুল আহ্বানে ভেঙ্গে গিয়েছিল তা বলবার নয়। শিলাবৃষ্টির সত্য, অতি সত্য, অর্দ্ধ সত্য কাহিনীগুলোকে উপেক্ষা ক'রেছি, বিদ্রূপ ক'রেছি, মিথ্যা ব'লে হেসে উড়িয়ে দিয়েছি—কিন্তু আঠার সনের আষাঢ়ে গল্পের ঐ চেলীপরা অতি মিথ্যা মেয়েটাকে সত্য বলে কেমন ক'রে মেনে নিলাম তা আজও জান্‌তে পারি নি। আমার এই চৈত্রস্ত শিলাবৃষ্টিদিবসের চেলীপরা অতিমিথ্যা মেয়েটী যে নিত্য নব নব রূপে মেঘদূত রচনা ক'রে আমায় ফ্যাসাদে ফেল্‌লে মশায়? উপায় কি?

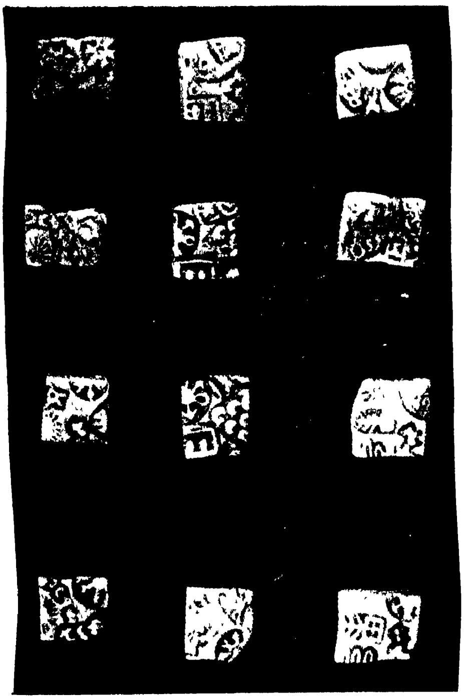


উত্তরবঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সরকার এম-এ, বি-এল

বিগত ১৩৪০ ও ১৩৪১ সালের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'উত্তরবঙ্গের প্রাচীন সভ্যতার আভাস' এবং 'উত্তরবঙ্গে শিল্পাদর্শের ও কৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের আভাস' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর নানা কারণে এতদিন ধারাবাহিকতা রক্ষা করিতে পারা যায় নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে উত্তর বঙ্গের সুপ্রাচীনত্বের নিদর্শনের আভাস মাত্র আলোচনা করিব।

উত্তরবঙ্গের প্রাচীনত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব



কতকগুলি কার্ষাপণ মুদ্রা

নাই। প্রাগৈতিহাসিক রামায়ণ মহাভারতের যুগে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ও পুরাণাদিতে এই জনপদ 'পৌণ্ড্র' বা পুণ্ড্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রদেশের অন্তর্গত একটি ভূভাগ যাহা 'বরেন্দ্রী', বরেন্দ্র বা 'বরিন্দা' নামে অভিহিত তাহা বর্ত্তমানে রাজসাহী বিভাগের অনেকাংশ অধিকার করিয়া আছে।

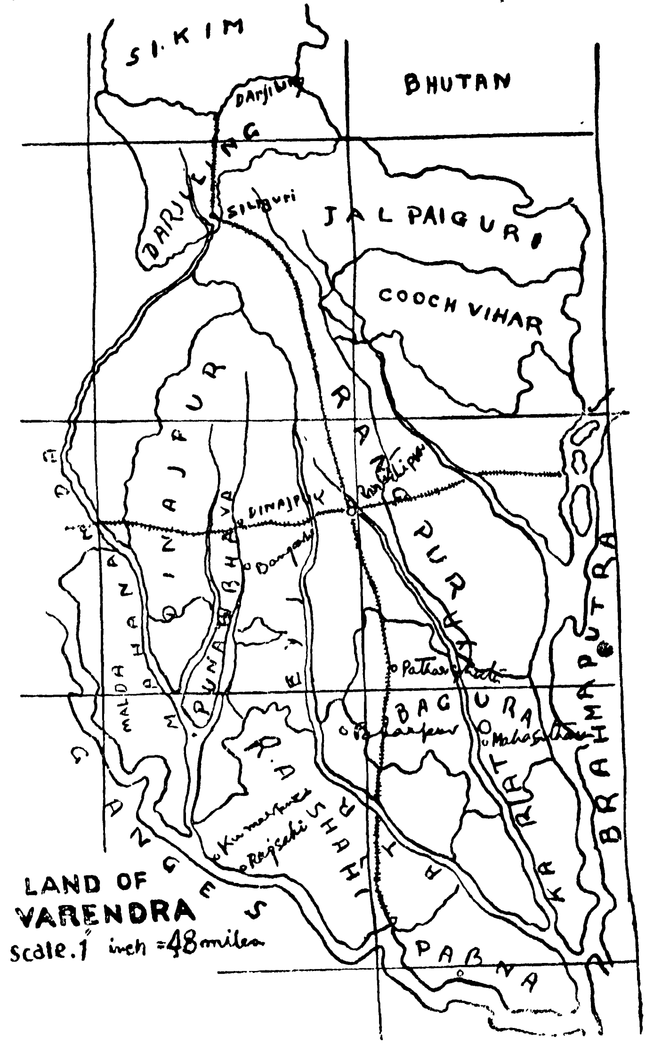
বগুড়া জেলার অন্তর্গত মহাস্থানগড় নামক স্থানে একখানি শিলালিপির উৎকীর্ণ অক্ষরগুলির আকৃতি প্রকৃতি মৌর্য্যযুগের ব্রাহ্মী অক্ষর বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। উক্ত শিলালিপিতে তৎকালীন মৌর্য্য-সম্রাট কর্ত্তৃক 'পুণ্ডনগলে' আধুনিক ভাষান্তরে 'পুণ্ড্রনগরে' মহামাত্রের (প্রধান মন্ত্রীর) প্রতি এই প্রদেশের দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত 'সংবঙ্গীয়'দের (United Bengal) 'সম্বগ্গীয়' নামক অধিবাসীগণের (?) দুঃখ নিবারণকল্পে ধান্য ও অর্থ (বিনাসুদে) বিতরণ করিবার আদেশ প্রচারিত করিবার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই লিপির ভাষা সম্রাট অশোকের অন্যান্য অনুশাসনের 'প্রাকৃত' ভাষার অনুরূপ। তৎকালীন মাগধী রাজভাষা উক্ত শিলালিপিতে ব্যবহৃত হওয়ায় পুণ্ড্রনগর মৌর্য্যসাম্রাজ্য-ভুক্ত ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

দেশের প্রাচীন ইতিহাস সঙ্কলন করিতে হইলে বস্তুগত ও লিপিগত প্রমাণ আবশ্যক। এই প্রদেশের প্রাচীনত্বের বস্তুগত ও লিপিগত প্রমাণের অসদ্ভাব নাই। মৌর্য্যযুগের আবিষ্কৃত 'মহাস্থান-লিপি' ব্যতীত বস্তুগত প্রমাণের নিদর্শন-স্বরূপ কতকগুলি রৌপ্য-মিশ্রিত 'কার্ষাপণ' মুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। আধুনিক যুগে কার্ষাপণ মুদ্রার প্রচলন নাই, কিন্তু মন্ত্রোচ্চারণে অদ্যাপিও হিন্দুগণ 'কার্ষাপণী'র উল্লেখ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। "সার্দ্ধদ্বাবিংশতি কার্ষাপণী লভ্য রজতাদি দানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদুষাং পরামর্শঃ।" এই দানের মন্ত্র এখনও উচ্চারিত হইতেছে। মনুসংহিতায় এই ধরণের মুদ্রা 'পুরাণ' নামে অভিহিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ অনুমান করেন বাবিলোনীয়দিগের অনুকরণে ভারতবর্ষের সহিত সমুদ্রপথে বাণিজ্য আরম্ভ হইবার সময় হইতে খৃঃ পূঃ ৭০০ অব্দ পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রথম এই প্রকার মুদ্রা প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা। তবে এই ধরণের তাম্রখণ্ডের মুদ্রাগুলি রৌপ্য-মিশ্রিত মুদ্রা অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিয়া সুধীবর্গ অনুমান করেন। রৌপ্যমিশ্রিত এই মুদ্রাগুলি উত্তরভারতে খৃঃ পূঃ

চতুর্থ শতাব্দী হইতে দ্বিতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল বলিয়া ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছে।

মুদ্রাগুলি আকারে সাধারণতঃ চতুষ্কোণবিশিষ্ট এবং তাহাতে কতকগুলি বিভিন্ন ধরণের চিহ্ন (১) বা Symbol মুদ্রিত আছে। চিহ্নগুলির বিভিন্নতা অনুযায়ী এই মুদ্রাগুলিকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। মুদ্রাগুলিতে তিনটি চূড়াযুক্ত পাহাড় বা বৌদ্ধচৈত্যের উপর প্রতিপদ চন্দ্রের (crescent moon) আকৃতি অঙ্কিত দৃষ্ট হয়। কতকগুলি কার্ষাপণ (২) মুদ্রায় আবার হরিণ, খরগোস, সর্পাকৃতি (tenrec) চিহ্ন, ময়ূর, লতাপাতা, ধনুর্ব্বাণ মুদ্রিত আছে। কতকগুলিতে গোলাকার বৃত্তের (Sphere) অভ্যন্তরে কয়েকটি ছত্রের সমাবেশ। কাহাতেও বা বেষ্টনীর মধ্যভাগে বৃক্ষ। উক্ত মুদ্রাগুলির প্রায় প্রত্যেক শ্রেণীতেই (type) সূর্য্যের প্রতীক (Symbol) দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মে প্রতীকোপাসনা চলিয়া আসিতেছে। এই সকল মুদ্রার অঙ্কিত চিহ্নগুলি সম্ভবত প্রতীকোপাসনারই দ্যোতক। চিহ্নগুলি তৎকালীন জাতীয় জীবনের ও ধর্ম্মের আলোকসম্পাত করিতে পারে এবং পশুপক্ষী বা প্রাণী চিত্রগুলি দেবতার বাহন নির্দ্দেশ করিত বলিয়া অনুমান করা যায়।

দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বকালের স্মৃতি নিদর্শন এই অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইলেও গুপ্তযুগের বা প্রায় দেড় হাজার বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের রীতিনীতি, শাসন-প্রণালী ও ভাস্কর্য শিল্পের কাহিনী এখনও সম্যক্‌রূপে ইতিহাসে স্থান লাভ করিতে পারে নাই। এ পর্য্যন্ত যৎসামান্য প্রত্নসম্পৎ সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতেই গুপ্ত যুগের আটখানি (৩) তাম্রশাসন এই অঞ্চল হইতে ইতিপূর্ব্বেই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং বিধিমত খনন কার্য্যের ব্যবস্থা আরম্ভ করিতে পারিলে মহাস্থানগড়, বাণগড়, বিহারৈল স্তূপ প্রভৃতি নানা



বরেন্দ্র দেশ

প্রাচীন স্থান হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মৌর্য্য শাসন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া কুশান, গুপ্ত, পাল ও সেন রাজগণের একটি ধারাবাহিক উত্তরবঙ্গের ইতিহাস প্রণয়নের উপাদান সংগ্রহে সহায়তা করিবে বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়।

(১) হরিণ = বাসুদেবের বাহন
ময়ূর = কার্ত্তিকের বাহন
চৈত্য = বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণের প্রতীক
'চন্দ্র' এবং ছত্র রাজশক্তির পরিচায়ক
বেষ্টনী অভ্যন্তরে বৃক্ষ = বোধিদ্রুম সূচিত করে।
সূর্য্য = দেবতা, অথবা 'চন্দ্র' হইলে রাজলক্ষণ সূচিত করে।

(২) কার্ষাপণ = ষোলপণ কড়ি = ১২৮০ কড়ি = ১ কাহন
কার্ষিকঃ = রৌপ্য, পণ = তাম্র

(৩) পরম্পর জানা গিয়াছে আরও দুইখানি গুপ্ত তাম্রশাসন সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়া পাঠোদ্ধারকারিগণের কুক্ষিগত আছে। আশা করি শীঘ্রই বিদ্বজ্জনসমাজে ইহার মূল তথ্যের অনুসন্ধান পাইবে।

বাংলা পদ্য-সাহিত্যে হাস্যরস

শ্রীসুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়

বাংলা-সাহিত্যের পরিসর জগতের অন্যান্য দেশের সাহিত্যের তুলনায় সঙ্কীর্ণ। জাতীয় দৈন্যই বোধহয় ইহার প্রধান কারণ। বাংলা-সাহিত্যের প্রাচীন রূপের নিদর্শন পাওয়া যায় কতকগুলি মৌখিক প্রবচনে। কিন্তু সেগুলিকে সাহিত্যের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। প্রবচনগুলির পর কতকগুলি ধর্ম্ম-গ্রন্থে বাংলার প্রাচীন সাহিত্যের অস্তিত্ব পাওয়া যায়; কিন্তু সেগুলির মধ্যে লেখকের লোকশিক্ষা ও উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যই মুখ্য বলিয়া লক্ষিত হয়।

প্রকৃত 'হিউমার' বলিতে আমরা যাহা বুঝি প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে তাহা পাওয়া যায় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ সে যুগে বাঙ্গালী জাতির উপর আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বেশী ছিল, সুতরাং ভাষার দৈন্যের জন্য বাংলার সাহিত্যও সম্যক্ পরিপুষ্টি লাভ করে নাই।

এই অপুষ্ট সাহিত্যে আমরা যে হাস্যরসের পরিচয় পাই তাহাকে প্রকৃত 'হিউমার' বলা যায় না। কারণ হাস্য-রসের অস্তিত্বই সব সময় হিউমারের অস্তিত্ব প্রমাণ করে না। সে যুগের লেখকগণ তাঁহাদের পাঠকগণকে হাসাইতে যে উপায় অবলম্বন করিতেন বিংশ শতাব্দীর পাঠকের চক্ষে তাহা সব সময় প্রীতিকর হইবে না, তবুও সে যুগের রুচির পরিচয় জানিতে হইলে তখনকার সাহিত্যের সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন এবং সে যুগের রুচি কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমানে নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এই প্রবন্ধে 'হিউমার', ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ প্রভৃতি হাস্যরসের বিভিন্ন রূপ পৃথকভাবে আলোচিত না হইয়া 'হাস্য-রস' এই সাধারণ নামে আলোচিত হইল।

বাংলা দেশের কবিদের রচনার সন, তারিখের ধারাবাহিক ক্রমিক আলোচনা সর্ব্বত্র সম্ভব নহে, তবে যতদূর সম্ভব ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

বিজয় গুপ্ত

বিজয় গুপ্ত নামে একজন কবি ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে 'পদ্মাপুরাণ' নামে একখানি মনসামঙ্গল রচনা করেন। তাঁহার রচনার মধ্যে রসিকতা দেখা যাইলেও তাঁহার রুচিকে মার্জ্জিত বলা যায় না। 'পদ্মাপুরাণে' একস্থানে পদ্মার বিবাহ সম্বন্ধে শিবদুর্গার আলাপে শিব এয়োদিগকে তাড়াইবার উপায় বলিতেছেন—

হাসি কহে শূলপাণি এয়ো ভাণ্ডাইতে জানি
মধ্যে দাঁড়াব নেংটা হ'য়ে,
দেখিয়া আমার বাণ এয়োর উড়িবে প্রাণ
লাজে সবে যাবে পলাইয়ে।

মাধবাচার্য্য

বিজয়গুপ্তের পর বাংলা-সাহিত্যে যে দুইখানি পুস্তকে হাস্যরসের অস্তিত্ব দেখা যায় তাহাদের নাম মাধবাচার্য্যের চণ্ডী ও কবিকঙ্কণের চণ্ডী। দুইখানি পুস্তকের মধ্যেই ভাঁড়ুদত্ত চরিত্রই সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য। মাধবাচার্য্য কবিকঙ্কণ অপেক্ষা এই চরিত্রটি অধিক দক্ষতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন বলেন— মাধুর ভাঁড়ুদত্ত কবিকঙ্কণের ভাঁড়ুদত্ত হইতে শঠতায় প্রবীণ।

মাধবাচার্য্যের ভাঁড়ু একদিন ক্ষুধিত হইয়া স্ত্রীর নিকট বলিতেছে—

ভাঁড়ুদত্ত বলে শুন তপন দত্তের মা
ক্ষুধার কারণে মোর পোড়ে সর্ব্ব গা।

(তপনদত্ত ভাঁড়ুর পুত্রের নাম)

ঘরে চাউল নাই একথা ভাঁড়ুর স্ত্রী তাহাকে জানাইয়া দিলে সে কতকগুলি ভাঙ্গা কড়ি লইয়া পোঁটলা বাঁধিয়া ছেলের মাথায় চাপাইয়া দিয়া বাজারে চলিল। তারপর ব্যবসায়ীদিগকে নানা কথায় ভুলাইয়া ও পোঁটলা দেখাইয়া জিনিষ লইল। যে দোকানী জিনিষ দিল না তাহাকে বলিল—

প্রাতঃকালে প্যাদা পাঠাইব ঘরে ঘরে। সে তখন ভয় পাইয়া জিনিষ দিল। শেষে এক মৎস্য বিক্রেতার সহিত টানাটানি ও ধ্বস্তাধ্বস্তি হওয়ায়—

'কচ্ছ হ'তে ভাঁড়ুদত্তের পড়ে কাণা কড়ি॥
কাণা কড়ি পড়ে ভাঁড়ু অতি লজ্জা পায়।
মৎস্য ছাড়িয়া তবে উঠিয়া পালায়॥

কালকেতুর লোকের দ্বারা প্রহৃত হইয়া—বাড়ী যাইবার সময় ভাঁড়ু—

পথে পড়া ফুল পাইয়া মাথে তুলি দিল।
হাসিতে হাসিতে ভাঁড়ু বাড়ীতে চলিল॥
বাড়ীর নিকট গিয়া ডাকয়ে রমণী।
সত্বরে আনিয়া দেও একঘটি পানি॥
ভাঁড়ুরে দেখিয়া তার রমণী চিন্তয়।
দেওযানের গেলা প্রভু ধূলি কেন গায়॥
ভাঁড়ু এ বোলয় প্রিয়া শুনহ কর্কশা।
মহাবীর সনে আজি খেলিয়াছি পাশা॥
ক্রমে ক্রমে মহাবীর ছয় পাটি হারি।
রসে অবশ হইয়া করে হুড়াহুড়ি॥
ধূলা ঝাড়ি বহুমতে পাইযাছি রস।
বীরেব গাযেতে দিছি তার দুই দশ॥

ভাঁড়ুর মস্তক-মুণ্ডন করাইয়া তাহাকে গঙ্গাপার করাইয়া দিলে—

লোকের সাক্ষাতে ভাঁড়ু বলে মিথ্যা কথা।
গঙ্গা সাগরেতে গিয়া মুড়াযেছি মাথা॥

কবিকঙ্কণ

কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে—'কালকেতুর নিকট ভাঁড়ুদত্তের আগমন' এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

ভেট লয়ে কাঁচকলা   পশ্চাতে ভাঁড়ুব শালা
আগে ভাঁড়ুদত্তের পয়াণ।
ফোঁটা কাটা মহাদম্ভ   ছেঁড়া ধুতি কোঁচা লম্ব
শ্রবণে কলম খরশান॥
প্রণাম করিয়া বীরে   ভাঁড়ু নিবেদন করে
সম্বন্ধ পাতিয়া চলে খুড়া।
ছেঁড়া কম্বলে বসি   মুখে মন্দ মন্দ হাসি
ঘন ঘন দেয় বাহু নাড়া॥
আইনু বড় প্রীতি আশে   বসিতে তোমার দেশে
আগেতে ডাকিবে ভাঁড়ুদত্তে।
যতেক কায়স্থ দেখ   ভাঁড়ুর পশ্চাতে লেখ
কুলে শীলে বিচার মহত্বে॥

হাটুয়াদের অভিযোগ শুনিয়া কালকেতু ভাঁড়ুকে ডাকিয়া পাঠাইলে—

তর্জ্জন গর্জ্জন করি ভাঁড়ু যায় পথে।
নিমিষেক উত্তরিল কেহ নাই সাথে॥
যদি হরির বেটা হই জযদত্তের নাতি।
বেচাইব হাটেতে বীরের ঘোড়া হাতী॥
* * *
অনুক্ষণ চিন্তে ভাঁড়ু বীরের বিপাক।
রাজভেট কাঁচকলা নিল পুঁই শাক॥
চুপড়ি ভরিয়া নিল কদলীর মোচা।
মাগেব বসন পরি ভূমে নামে কোঁচা॥

ভাঁড়ুর মস্তক মুণ্ডন করিবার জন্য—

হবিষ নাপিতে বীব দিল আঁখিঠার।
মনের হবিষে ক্ষুর আনে মুড়া ধার॥
বীরেব হুকুম পায় নাপিতের সুত।
ভাঁড়ুব ভেজাস মাথা দিয়ে অশ্ব মূত॥
চামাটি থাকিতে পদতলে ঘসে ক্ষুর।
দেখিয়া ভাঁড়ুর প্রাণ কাঁপে দুর দুর॥
দূরে থাকি শুনে সে ক্ষুবের চড়চড়ি।
নাক মুণ্ড ধরি তার উপাড়য়ে দাড়ি॥
বসন ভিজিযা পড়ে শোণিতের ধার।
ভাঁড়ু বলে খুড়া দোষ ক্ষম এইবার॥

শ্রীমন্তের নৌকার বাঙ্গাল মাঝিদের রোদনও হাস্য-রসাত্মক—

কাঁদেরে বাঙ্গাল ভাই বাকোই বাকোই।
কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই॥
* * *
আর বাঙ্গাল বলে বাই কইতে বড় লাজ।
অল্দি গুড়া বাস্যা গেল জীবনে কি কাজ॥
* * *
যুবতী যৌবনবতী তেজিলাম রোষে।
আর বাঙ্গাল বলে দুঃখ পাই গ্রহদোষে॥

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য

কবিকঙ্কণের পর রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের শিবায়নে হাস্য-রস দেখিতে পাওয়া যায়। পার্ব্বতী মহাদেবের উপর রাগ করিয়া বাপের বাড়ী যাইবার সময়—

ধাইয়া ধূর্জ্জটি গিয়া ধরে ঢুটি হাতে।
আড় হইয়া পশুপতি পড়িলেন পথে॥

ভারতচন্দ্র

এই সময়ের কবিদের মধ্যে ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকর বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার রচিত অন্নদা-মঙ্গলে হাস্যরসের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায় বটে কিন্তু তাহা সর্ব্বত্রই অশ্লীলতা-দোষদুষ্ট। বিদ্যাসুন্দরকাব্যে তাঁহার হীরা মালিনীর চরিত্রটি জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।—হীরার রূপ-বর্ণনায় কবি বলিয়াছেন—

কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য-অবিরাম॥
গালভরা গুয়াপান পাকি মালা গলে।
কানে কড়ে ক'ড়ে রাঁড়ী কথা কত ছলে॥

* * *

আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে।
ছিটা ফোঁটা তন্ত্র মন্ত্র জানে কতগুলি
চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় জানে কত বুলি।

কবি বিদ্যাসুন্দরের বিবাহ বর্ণনা করিতেছেন—

কন্যাকর্ত্তা হইল কন্যা বরকর্ত্তা বর
পুরোহিত ভট্টাচার্য্য হইল পঞ্চশর
কন্যাযাত্র বরযাত্র ঋতু ছয় জন—
বাদ্য করে বাদ্যকর কিঙ্কিণী কঙ্কণ॥ ইত্যাদি।

হীরা সুন্দরকে কড়ির মূল্য সম্বন্ধে বলিতেছে—

কড়ি ফটকা চিঁড়ে দই বন্ধু নাই কড়ি বই
কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে।
কড়িতে বুড়ার বিয়া কড়ি লোভে মরে গিয়া
কুলবধূ ভুলে কড়ি দিলে॥
এ তোর মাসীর বাপা কোন কর্ম্ম নাহি ছাপা
আকাশ পাতাল ভূমণ্ডলে।
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ ধরে দিতে পারি চাঁদ
কামের কামিনী আনি ছলে॥

'মানসিংহে' দুই সতীনের কথোপকথনে জ্যেষ্ঠা বলিতেছে—

সুয়া যদি নিম দেয় সেই হয় চিনি।
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হয় তিনি॥

অন্নদামঙ্গলে—হরগৌরীর কথোপকথনে মহাদেব পার্ব্বতীর আলিঙ্গন মাগিলে পার্ব্বতী বলিতেছেন—

নিজ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা।
কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা॥

দেব-দেবীগণকে কবি তাঁহার কাব্যে হাস্যাস্পদ করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। বিবাহের সময় মহাদেবের সজ্জা ও নারদ মুনির এয়োদের মধ্যে কোন্দল বাধাইবার চেষ্টায় তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতচন্দ্রের পর বাংলা দেশে 'কবিওয়ালা' নামে এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল। ইঁহারা নিজে নিজে গান রচনা করিতেন ও কোন উৎসবাদি হইলে সেইখানে দুইজন কবিওয়ালা নিজের দল সহ উপস্থিত থাকিতেন। একদল 'ছড়া' কাটিয়া অপর দলকে আক্রমণ করিতেন, অপর পক্ষও স্ব-রচিত কবিতা (ছড়া)-র দ্বারা তাহার উত্তর দিতেন। ইঁহাদের রচনায় অমার্জ্জিত হাস্যরসের উল্লেখ পাওয়া যায়।

এণ্ট্নি ফিরিঙ্গি

এণ্টুনি ফিরিঙ্গি নামে একজন পর্ত্তুগীজ ভদ্রলোক বাংলাদেশে কবির দল খুলিয়াছিলেন। তিনি এক ব্রাহ্মণ রমণীর প্রেমে পড়িয়া বাঙ্গালীভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। একবার তাঁহার প্রতিপক্ষ ঠাকুর সিংহ তাঁহাকে বলিতেছে—

বলহে এণ্টুনি আমি একটি কথা জানতে চাই।
এসে এদেশে এ বেশে তোমার গায়ে কেন কুর্ত্তি নাই?

এণ্টুনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন—

এই বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি।
হ'য়ে ঠাকুরে সিংযের বাপের জামাই
কুর্ত্তি টুপি ছেড়েছি॥

গোপাল উড়ে

গোপাল উড়ে নামে আর একজন কবিওয়ালার সম্বন্ধে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলিয়াছেন—'ইনি ভারতচন্দ্রের একবিন্দু ঘনরস তরল করিয়া এক শিশি প্রস্তুত করিয়াছেন।'

গোপাল উড়ের 'সুন্দর' হীরাকে মাসী বলিয়া সম্বোধন করাতে হীরা বলিতেছে—

যাদু এমন কথা কেন বলিলি,
ভোরের বেলায় সুখের স্বপন এমন সময় জাগালি।

বিদ্যা হীরাকে বলিতেছে—

ছেঁড়া চুলে বকুল ফুলে খোঁপা বেঁধেছ
প্রেম কি ঝালিয়ে তুলেছ ?

কৈলাস বারুই

কৈলাস বারুই নামে আর একজন কবি গোপাল উড়ের শিষ্য ছিলেন। তাঁহার রচনার একস্থানে প্রভাতের বর্ণনা আছে—

গা তোল রে নিশি অবসান প্রাণ।
বাঁশবনে ডাকে কাক, মালি কাটে কপিশাক
গাধার পিঠে কাপড় দিয়ে রজক যায় বাগান॥

দাশরথি রায়

উপরোক্ত কবিওয়ালা সম্প্রদায়ের মধ্যে একজনের রচনা অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত ছিল। তাঁহার নাম দাশরথি রায়। ইঁহার রচিত কবিতাবলী আজও দাশুরায়ের পাঁচালী নামে সুপরিচিত। ব্যঙ্গ করিতে ইনি দক্ষ ছিলেন। বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

গৌরাং ঠাকুরের ভণ্ড চেড়া যত অকাল কুষ্মাণ্ড নেড়া
কি আপদ করেছেন সৃষ্টি হরি।

* * *

গৌর বলে আনন্দে মেতে একত্রে ভোজন ছত্রিশ জেতে
বাগ্দী কোটাল ধোপা কলুতে একত্র সমস্ত।
বিল্বপত্র জবার ফুল দেখতে নারেন চক্ষুশূল
কালী নাম শুনলে কানে হস্ত॥
কিবা ভক্তি, কি তপস্বী জপের মালা সেবাদাসী
ভজন কুঠরী আইরি কাঠের বেড়া।
গোঁসাঞিকে পাঁচসিকে দিয়ে ছেলে সুদ্ধ করেন বিয়ে
জাত্যাংশে কুলীন বড় নেড়া॥

ভোলা ময়রা

ভোলা ময়রা নামে আর একজন কবিওয়ালার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি হরু ঠাকুরের চেলা ছিলেন। ভোলানাথ শিবের অপর নাম বলিয়া ইঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দল ইঁহাকে মহাদেব বলিয়া ব্যঙ্গ করাতে ইনি বলিতেছেন—

আমি সে ভোলানাথ নই।
আমি ভোলা ময়রা হরুর চেলা
শ্যামবাজারে রই।
আমি যদি সে ভোলানাথ হই
তবে তোরা বিল্বদলে আমায় পূজলি কই।

ঈশ্বর গুপ্ত

কবিওয়ালাদের মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যঙ্গরচনায় ইনি সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার ব্যঙ্গ কোন ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের প্রতি সীমাবদ্ধ ছিল না। Beam's Comparative grammarএ ইঁহাকে 'a sort of Indian Rabelais' বলিয়া উল্লেখ করা আছে। বিধবা বিবাহের আইন সম্বন্ধে ইনি বলিতেছেন—

সকলেই এইরূপ বলাবলি করে।
ছুঁড়ির কল্যাণে যেন বুড়ী নাহি তরে॥
শরীর পড়েছে ঝুলি চুলগুলি পাকা।
কে ধরাবে মাছ তারে কে পরাবে শাঁখা॥

ইংরাজ রমণীর সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছোটে।

সাহিত্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-সৃষ্টির স্রষ্টা হিসাবে ঈশ্বর গুপ্তকে ধরা যাইতে পারে। ইঁহার পূর্ব্বে হাস্য রস মাত্র আমোদের জন্যই সৃষ্টি হইত। তাহার পশ্চাতে বিশেষ উদ্দেশ্য থাকিত না। কিন্তু ঈশ্বরগুপ্তের সময় হইতে 'ব্যঙ্গ' বাংলা-সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করে। একজন সমালোচক তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—ঈশ্বর গুপ্ত realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত satirist ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য এবং ইহাতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

দীনবন্ধু মিত্র

ঈশ্বর গুপ্তের পর যে সব কবি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে হাস্য-রস ধারা সিঞ্চন করেন তাঁহাদের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্রের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহার রচিত কয়েকখানি নাটকে হাস্য-রসের উপাদান প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। ইঁহার রচনায় ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব আছে কিন্তু নিছক হাস্য-রস সৃষ্টিতে তাঁহার স্থান ঈশ্বর গুপ্তের উচ্চে, অবশ্য

ব্যঙ্গ রচনায় ঈশ্বর গুপ্ত শ্রেষ্ঠ ছিলেন। দীনবন্ধুর রচনাও অশ্লীলতা দোষদুষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রচনায় অশ্লীলতা দোষের কারণ বলিয়াছেন যে তিনি যে চরিত্র আঁকিতেন তাহা সম্পূর্ণভাবে আঁকিতেন—একটুকুও বাদ দিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। অন্তরের সহানুভূতিই ইহার কারণ। হাস্য রসাত্মক কবিতার মধ্যে তাঁহার 'জামাইষষ্ঠী' শীর্ষক কবিতাটি উল্লেখযোগ্য! এখানে তাহার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করা গেল—

কাল-নাগিনী পেড়ে ধুতি প'রে সমাদরে।
কোঁচার শেষের ফুল ভাল শোভা ধরে॥
শোভিছে নেটের জামা পেটের উপর।
অপরূপ রূপ্ আঁটা চোনাট সুন্দর॥

* * *

কারপেটি জুতা পায় শোভা পায় যত।
জুতা নয় সে জুতায় জুতা মারে কত॥

* * *

একদিকে বাপ সাজে আর দিকে ব্যাটা।
ভাইপোকে লজ্জা দিয়ে সাজিলেক জ্যাঠা॥

দ্বিজেন্দ্রলাল

দীনবন্ধুর পর বাংলা-সাহিত্যে একটি বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে। অশ্লীলতা-বর্জ্জিত হাস্য-রস এই সময়ে বাংলা-সাহিত্যে প্রথম প্রবেশ করে। পূর্ব্বের গতানুগতিকতা হইতে মুক্ত হইয়া বাংলা-সাহিত্য যে নূতন পথ ধরিয়াছিল—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে সে পথের প্রদর্শক হিসাবে ধরা যাইতে পারে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এই যুগে প্রাধান্য লাভ করিলেও নির্ম্মল হাস্যরস সৃষ্টি করিতে কবিরা এই সময় হইতেই আরম্ভ করিয়াছিলেন। সাহিত্যের এই নব-যুগের প্রবর্ত্তক হিসাবে ইংরাজ সাহিত্যিক 'Pope'এর সহিত দ্বিজেন্দ্রলালকে তুলনা করা যাইতে পারে।

কবির রচিত 'হাসির গান' নামে কবিতাগুচ্ছকে হাস্য-রসের প্রস্রবণ বলা যাইতে পারে। 'তোমরা ও আমরা' 'আমরা ও তোমরা', 'Reformed Hindus' প্রভৃতি কবিতাগুলি সকলেরই সুপরিচিত। তাঁহার রচিত 'নন্দলাল' কবিতা আজও আবৃত্তি হইয়া থাকে।

কবিতা রচনাতেও কবি সিদ্ধহস্ত ছিলেন—তাঁহার রচিত একটি কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন—

আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি leisure মাফিক্ বাসিও।

* * *

আমি সারানিশি তব লাগিয়া
রব চটিয়া মটিয়া রাগিয়া
তুমি নিমেষের তরে
প্রভাতেতে এসে
দাঁত বের ক'রে হাসিও॥

আর একস্থলে—

আর ত চাটগাঁয়ে যাবনা ভাই
যেতে প্রাণ নাহি চায়।
চাটগাঁর খেলা ফুরিয়ে গেছে
তাই এসেছি কলকাতায়॥

* * *

এই ছড়ি নে এই ছাতা নে
আজকের মত বিদায় দে ভাই,
তোমরা সবাই দাঁড়িও গিয়ে
আমাদের সেই শেওড়া তলায়।
ঠানদিদিকে বলো নেপাল
বেঁচে আছে টায় টায়॥

তাঁহার 'হ'লো কি' শীর্ষক কবিতায় লিখিয়াছেন—

হ'লো কি—এ হ'লো কি—এতো বড় আশ্চর্য্যি।
বিলেত ফের্ত্তা টান্‌ছে হুঁকা সিগারেট খাচ্চে ভশ্চার্য্যি॥

'এসো হে বঁধুয়া' কবিতায় কবি লিখিয়াছেন—

—ওহে দন্তমাণিক এসো হে!
এসো সরিষা-তৈল-স্নিগ্ধ-কান্তি
পমেটম চুলে এসো হে!
ওহে লম্পটবর এসো হে, ওহে বক্কেশ্বর এসো হে!

* * *

ওহে কম্ফর্ট গলে এসো হে
ওহে পেড়ে চড়নায় এসো হে,
ওহে অঞ্চলদড়িবন্ধনগরু
গোয়ালেতে ফিরে এসো হে। ইত্যাদি

'প্রেমতত্ত্ব' কবিতায় কবি প্রেমের সংজ্ঞা দিয়াছেন—

তারেই বলি প্রেম
যখন থাকে না futureএর চিন্তা
থাকে নাক shame ইত্যাদি।

'কবি' শীর্ষক কবিতায়—

আমি নিশ্চয় কোনরূপে স্বর্গ থেকে টস্‌কে
পড়েছি এ রঙ্গভূমে বিধাতার হাত ফস্‌কে!

* * *

তাইতে আমি লিখে যাচ্ছি কাব্য বস্তা বস্তা।
পাবে গুরুদাসের * নিকট ডজন দরে সস্তা॥

* * *

এখন কর গৃহে গমন নিয়ে আমার কাব্য।
আমি আমার তপোবনে এখন একটু ভাব্‌ব॥

হেমচন্দ্র

দ্বিজেন্দ্রলালের সম-সাময়িক কবিদের মধ্যে হেমচন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রচিত কবিতাবলীর মধ্যে নির্ম্মল হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়।

'সাবাস হুজুক আজব সহরে' কবিতায় লিখিয়াছেন।—

বিল্বপত্র বিনিময়ে 'বটন হোলে' আঁটা।
প্রেয়সীর কুন্তলের বাসি ফুলের বোঁটা॥

* * *

বাঁকা তেড়ি হাতে ছড়ি—এক মেটে গড়ন।
কামিজ আঁটা নধর বাবু নাগর কোন জন।
কেহ বা দোমেটে গাদা কেহ ঘেঁটু রাজ।
মাথা ছাঁটা মেইদি কেহ, কেহ শিমূল ভাঁজ॥

'বাজীমাৎ' কবিতায়—

সাবাস্ মুখুয্যের পো খেল্লে ভাল চোটে
তোমার খেলায় রাং রূপো হয় গোবরে
শালুক ফোটে।

বাঙ্গালীর মেয়ে সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—

নমস্কার তাঁর পায় পাড়ায় বেড়ানী।
পেট্‌টি ভরা কুঁজড়ো কথা, পরনিন্দা গ্লানি॥

* * *

পাত্তাড়ে পড়োর মত অক্ষরের ছাঁদ।
কলাপাতা না এগুতে গ্রন্থ লেখা সাধ॥

বাজীমাৎ কবিতায় আর একস্থানে কবি হাস্য-রস সৃষ্টি করিয়াছেন—

জজের গৃহিণী কন "ভ্যালা জজিয়তি।
নামে শুধু অনারেবল্ পদ বিলায়তি॥

* * *

ভাবতেম বুঝি কেষ্ট বেষ্ট তুমি একজন।
জরাসন্ধ রাজা কিম্বা লঙ্কার রাবণ॥
ওমা ওমা পোড়া ভাগ্যি উকিলের ওঁচা।
হাড় জ্বালাতে পারেন খালি এনে নথির গোছা॥
বলে', ঠোন্‌কা মেরে জজ-মহিলা বারাণ্ডায় যান।
মিত্র ভায়ার রাত্র শেষ ভাঙাতে তার মান॥

* * *

কেরাণীর নারী যত পাঁদাড়ে ফোঁপায়।
মাষ্টারের 'মিসট্রেস্'রা গোষা ঘরে যায়॥
কবির ফিরিতে ঘরে হৈল বড় দায়।
অনেক ভাবিয়া শেষে প্রবেশে সেথায়॥
কান্তা আসি হাস্যমুখে বলে—কৈ দেখি।
কি পাইলে কাব্য লিখে, সোনা কিম্বা মেকি॥

* * *

কবি কবে পায় কিবা কি দেখিবে ধনি?
না বলিতে রাঙ্গা ঠোঁট ফুলায়ে তখনি—
ধাক্কা দিয়ে গরবিণী গর্‌গরিয়ে যায়।
ফাঁপরে পড়িয়া কবি ফ্যাল্ ফ্যাল্ চায়॥

ব্যঙ্গের কষাঘাত করিতে কবি সুনিপুণ হইলেও তাঁহার কাব্যে অশ্লীলতা নাই।

অমৃতলাল

দ্বিজেন্দ্রলালের পর বাংলা-সাহিত্যে হাস্য-রসের পরিবেষক হিসাবে অমৃতলাল বসুর নাম সুপরিচিত। এই কবির রচনার অধিকাংশই রঙ্গমঞ্চের জন্য বিশেষভাবে লিখিত। তাঁহাকে সাধারণ শ্রোতা বা দর্শকদের উপভোগের উপযোগী করিয়া নাটক ইত্যাদি রচনা করিতে হইত এবং সেইজন্যই তাঁহার রুচি স্থানে স্থানে শ্লীলতার সীমারেখা অতিক্রম করিয়াছে। এজন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ

* কবি এখানে প্রসিদ্ধ পুস্তকপ্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের কথা লিখিয়াছেন।

দর্শকদের রুচির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নাটক রচনা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার Shakespeareকেও করিতে হইয়াছিল।

অমৃতলালের 'সংয়ের ছড়া' নামে কবিতাগুচ্ছের নাম হাস্য-রসাত্মক হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

কবির 'গানের ঝঙ্কার' শীর্ষক কবিতাবলীর মধ্যে 'নবীনার গীত' নামে একটি কবিতায় নবীনা বলিতেছেন—

সই লো নাকি পালিয়ে গেল গোরা।
ঢাক বাজায়ে রাজা হবে মোদের মনচোরা॥
উঠছে আজব ঢেউ শুন্‌লি মেজবৌ
পোক্ত হয়ে তক্তে বসবে আমাদের ওরা॥
আমি সবে ঘুমিয়েছি—মাইরি বলছি
ঠাকুর-ঝি গা ঠেলে আমায় বলে—
কাল সকালে রাজা হবে পান্তা বাড়িস্ এক খোরা॥

কবির 'তিল-তর্পণ' নাটকে নারদের গান,—

জয় গোধন চালক সূদন মধুকো
নবনী লুটিয়ে খায়ক জী।
জয় গোধন নায়ক অর্জ্জুন-শ্যালক
তেএটে বয়াটে বালক জী॥
জয় যমুনারি নীরে প্রাণপণ জোরে
হরদম্ বন্‌শী বাজাও জী।
জয় আসিলে নাগরী ভাঙ্গিয়ে গাগরী
কুলের কুলটা মজাও জী॥
জয় চূড়াধড়াধারী মেড়া পোড়া কারী
মামীর প্রেমের কাণ্ডারী জী॥
জয় ব্রজকী লম্পট শাড়ী লয়ে চম্পট
একদম কদমের ডালে জী।
জয় কি আর বর্ণিব চর্ব্বিত চর্ব্বিব
নিন্দা লভিব কাগজে জী॥

রসের টুকরায়—পাড়াগেঁয়ে স্বামী গদাধর শিক্ষিতা সহুরে স্ত্রী রামমণিকে সোহাগ করিতেছে।—

প্রাণ মন তুমি আত্মা তুমি মোর আঁখি।
হৃদয় পিঞ্জরে মোর তুমি শুকপাখী॥
* * * *
ভালোবাসা-ভোলা মন—বেশী নয় নোলা।
কুটুর কুটুর খাও সোহাগের ছোলা॥
তৃষ্ণার সলিল তুমি শীতেতে গুড়ুক।
দিবানিশি টানি তোমা ফুড়ুক ফুড়ুক॥
বিকারের বিষবড়ী ভেদের ধারক।
ঝাঁটা হস্তে ছিন্নমস্তে সারক আরক॥
* * * *
জনায়ে বিরাজ তুমি মনোহরা রূপে।
বর্দ্ধমানে সীতাভোগ আছ স্তূপে স্তূপে॥
সরভাজা রূপে তুমি সে কৃষ্ণনগরে।
মুড়কী অবতার তুমি খাগড়া সহরে॥
তুমি মোর অন্নপূর্ণা আমি বিশ্বেশ্বর।
মোর রামমণি আমি—তোর গদাধর॥

রবীন্দ্রনাথ

কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বাংলা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট সুপরিচিত। বাংলার সাহিত্যাকাশে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা মধ্যাহ্নসূর্য্যের কিরণলেখার মতই তেজোময়। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার উজ্জ্বল আলোকমালায় আজ সমগ্র বিশ্বের সাহিত্য-ক্ষেত্র উদ্ভাসিত। ইহা আরও সুখের বিষয় যে প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ, ভাবুক রবীন্দ্রনাথ—হাস্য-রসিক রবীন্দ্রনাথ রূপেও আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। বাংলা-সাহিত্যে উচ্চাঙ্গের 'হিউমার' একমাত্র তাঁহার রচনাতেই পাওয়া যায়। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে—'সোনার তরী'তে হিং টিং ছট, 'পলাতকা'য় নিষ্কৃতি, 'কল্পনা'য় জুতা আবিষ্কার এবং শিশু ও শিশু ভোলানাথে কয়েকটি কবিতায় উচ্চ শ্রেণীর 'হিউমার' পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার রচিত 'রবীন্দ্র-জীবনী'তে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন; কবিতাটি কৌতুকের দিক দিয়া খুবই উপভোগ্য। কবিতাটির কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল—

কলকাত্তাসে চলা গায়োরে সুরেন বাবু মেরা।
সুরেন বাবু আসল বাবু সকল বাবুর সেরা॥
খুড়া সাবকো কায়কো নাহি পতিয়া ভেজো বাচ্ছা—
মাহিনা ভর কুছ্ খবর মিলেনা ইয়েত নাহি আচ্ছা!

প্রবাসকো এক সীমা পর হাম বৈঠকে আছি একলা—
সুরি বাবাকো বাস্তে আঁখসে বহুৎ পাণি নিক্‌লা।
সর্ব্বদা মন কেমন করতা কেঁদে উঠতা হির্দয়—
ভাত খাতা, ইস্কুল যাতা, সুরেন বাবু নির্দয়।
মনকা দুঃখে হুহু করকে নিক্‌লে হিন্দুস্থানী—
অসম্পূর্ণ ঠেকতা কানে বাংলাকে জবানী।
মেরা উপর জুলুম কর্‌তা তেরি বহিন বাই,
কি করেঙ্গা কোথা যাঙ্গা ভেবে নাহি পাই।
বহুৎ জোরসে গাল টিপ্‌তা দোনো আঙ্গ্‌লি দেকে,
বিলাতী এক পৈনি বাজনা বাজাতা থেকে থেকে।

* * * *

গাড়ি চড়কে সাটিন পড়কে তুম্‌ ত যাতা ইস্কিল
ঠোঁটে নাকে চিম্‌টি খাকে হামারা বহুৎ মুস্কিল

* * * *

চিঠি লিখিও মাকে দিও বহুৎ বহুৎ সেলাম
আজকের মত তবে বাবা বিদায় হয়ে গেলাম।

কবিতাটি নাসিক হইতে সুরেন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন, ইহা ১২৯৩ সালের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

কবির অন্যান্য কবিতা বহু পরিচিত বলিয়া আর উদ্ধৃত করা হইল না।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

আর একজন প্রতিভাবান হাস্য-রসিক কবির নাম না উল্লেখ করিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এই কবির নাম সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ সত্যেন্দ্রনাথ অল্প বয়সেই পরলোক গমন করেন। কবির মৃত্যুতে বাংলা-সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল তাহা পূরণের সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতে নাই; তবে তাঁহার লিখিত কবিতা-কুসুমগুলি বাংলার সাহিত্য-কাননকে চিরকাল সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত করিয়া রাখিবে এ আশা আমরা করিতে পারি।

'সাক্রাজেঠকৃত শ্যামা বিষয়' শীর্ষক কবিতায় কবি লিখিয়াছেন—

শ্যামা গো তোর ভাগ্যি ভালো
ভোলার ঘরে পর্দ্দা নেই।
(বুড়ো) অবরোধের ধার ধারে না Radicalএর হদ্দ সেই।
(ওসে) গণ্ডী দিয়ে রাখলে তোরে
অসুরের ম্যাও ধর্ত্ত কে?
(ও তোর) ঘোমটাতে নথ জড়িয়ে যেত
শুম্ভ নিধন করত কে?

কবির 'আদর্শ বিয়ের কবিতা' হইতে এইবার কয়েক ছত্র তুলিয়া দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

কোরাস

(আহা) বিয়ে করা ভারি মজা ঢোলক বাজিয়ে,
(হাঁ, হাঁ) ভাড়া করা পোষাকেতে ভালুক সাজিয়ে।
(দেখ) যে হুজুর যত বিয়ে সে ততই বীর,
(আর) হারেম যাহার আছে সেই তো আমীর।
(তবে) লেগে যাও ক'রে নাও ক'রে নাও বিয়ে,
(টী টী) ট্যাটরা পেটার রবে সহর ঝাঁপিয়ে। *

* প্রবন্ধটি লিখিবার সময় আমি আমার শিক্ষাগুরু শ্রীসুকুমার সেন মহাশয়ের কাছে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। সেজন্য আমি তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ। স্থানাভাবে আরও কয়েকজন হাস্যরসিক কবির নাম দেওয়া গেল না। তাঁহাদের মধ্যে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রজনীকান্ত সেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।



'দুর্দ্দিন'

শ্রীঅর্চ্চনাপ্রসাদ দাসগুপ্ত

(মৃচ্ছকটিক হইতে)

বনবীথি শীর্ষে,
সঙ্গীত বীণা
সাঙ্গিনী সঙ্গে
অনঙ্গ অস্ত্র
'বিবেচনা-বিহীনা
'ঘনপয়োধরা-
পড়ুক না দীপ্ত
রসনাভিস্মুখা
বসন্ত-সেনা
উন্মাদ ঝঞ্ঝা,
কোথা চারুদত্ত,
গর্জ্জাক্ জীমূত
লাজহীন পয়োদ,
বৃষ্টির হস্তে
ওগো দেব শক্র !
নিশি অভিসারিকা
ওগো চারুদত্ত,
শিহরিতা তন্বী
নির্ম্মম বৃষ্টির
ক্ষিপ্রচরণে মধু
পীন-পয়োধর ওই
ধনমদমত্তা,
চিত্তের দৈন্য
নিষ্কাম নির্ম্মল
ঝরে শুধু দুঃখের
বসন্ত সেনা

স্রোতধারাবর্ত্তে,
সম গীতমানা
বসন্ত-সেনা
কামতরু পুষ্প
বসন্ত-সেনা,'
মম চারুদত্ত,
বজ্রের অগ্নি,
রমণীর চিত্তে
যৌবনমত্তা,
উন্মাদ দামিনী,
কোথা তার হর্ম্ম্য,
পুরুষ সে নির্দ্দয়,
প্রিয় অনুগামিনী
বল্লরী তনু ক্ষীণ
কেন এই আক্রোশ;
বসন্ত-সেনা,
নীপময়ী আজিকে
সচকিতা শঙ্কিতা,
তীক্ষ্ম শায়কে তার
ঝঙ্কৃত শিঞ্জিনী
কর্ণের আভরণ
পথিক ললনা এই
কর তুমি পূর্ণ
প্রেম তব প্রেষ্ঠি,
অশ্রুর বর্ষা
সমাপ্ত অভিসার

শৈলের-শৃঙ্গে,
ঝরে আজি হর্ষে
দয়িতাভিমুখা,
বিহ্বল চক্ষে
বর্ষার রাত্রি
মোর সৌভাগ্যে
গর্জ্জাক্ জীমূত,
বহে পরিপূর্ণ
উপেক্ষা দৃষ্টি,
বর্ষার বর্ষণ
কজ্জল তিমিরে
নারী তুমি বিদ্যুৎ,
বসন্ত-সেনা,
কেন করস্পর্শ
কর রোষে চূর্ণ
কর তার রক্ষা
মেঘান্ধকার এই
কামার্ত্তা সুন্দরী
পুষ্প স্তবকময়
নির্জ্জন বনপথে
বৃষ্টির বিন্দুতে
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রাতে
তব, চারুদত্ত,
নিক্ মেনে স্বর্গ
তারাহীন গগনের
প্রিয় চারুদত্তের

মৃদঙ্গ মন্দ্রে
বর্ষা সুছন্দে ।
অভিসার সজ্জা ;
পুঞ্জিত লজ্জা !
গর্জ্জায় ক্রুদ্ধ,
কেন তুই লুব্ধ ?'
ঝরুক্ না বর্ষা,
অক্ষয় ভরসা !
চলে অভিসারে,
নিরন্ধ্র ধাবে ।
দিগন্ত লিপ্ত,
কর পথ দীপ্ত !
পথ করি রুদ্ধ
পরশ বিমুগ্ধ ?
স্পর্দ্ধিত মেঘকে,
মর্ম্ম আবেগকে ।
বর্ষার রাত্রি,
দর্শন-প্রার্থী ।
কবরী যে ভগ্ন,
কর্দ্দম লগ্ন ।
করিয়াছে সিক্ত,
অন্তর রিক্ত ।
চিত্তের বিত্তে,
ওই তনু তীর্থে !
ভারাতুর চক্ষে,
উদ্বেল বক্ষে ।

প্রাচীন ভারতের ব্যাধি

ডক্টর বিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে অনেক প্রকার ব্যাধি প্রচলিত ছিল এবং তাহাদের প্রতিকারের জন্য অনেক রকম ঔষধও ছিল। ঐ সময়ে চিকিৎসক, অস্ত্রচিকিৎসক এবং শিশু-পীড়া-চিকিৎসকও ছিল। সর্ব্বপ্রথমে তিনটী রোগ ছিল যথা—ইচ্ছা, অনশন এবং জরা। তাহার পর ৯৮টী রোগের উল্লেখ আমরা পাই। কিন্তু ধর্ম্মপাল নামে একজন বৌদ্ধ-ভাষ্যকারের মতে সেকালে ৯৬টী রোগ ছিল। গৌতম বুদ্ধের সময়ে মগধরাজ্য পাঁচপ্রকার ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল যথা—কুষ্ঠরোগ, স্ফোটক, যক্ষ্মা, মূর্চ্ছারোগ এবং শুষ্ক কুষ্ঠরোগ। মগধসম্রাট্ বিম্বিসারের জীবক নামে সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক এই সকল ব্যাধির উপশম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জীবক তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এই শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। পুরাকালে স্ফোটকের উপর মাংস থাকিলে ঐ মাংস কাটিয়া দিত এবং স্ফোটকটীর উপর সরিষার গুঁড়া প্রয়োগ করা হইত। ইহাকে ভাল কাপড় দিয়া বাঁধা হইত এবং গরম জলে তুলা ভিজাইয়া সেক্ দেওয়া হইত। "তিলের মলম" কিংবা অন্য কোন গাছ গাছড়ার মলম ঐ ফোড়ায় দেওয়া হইত। চুলকানি কিংবা স্ফোটক দ্বারা আক্রান্ত হইলে চূণের জল সেবনের ব্যবস্থা করা হইত। শরীরের কোন অংশ ক্ষত হইলে কিংবা পুড়িয়া গেলে মলম দিবার ব্যবস্থা ছিল। মাথা ধরিলে মাথার উপর কিঞ্চিৎ তৈল দেওয়া হইত এবং নাসারন্ধ্রের মধ্য দিয়া ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাও দেখিতে পাওয়া যায়। মাথা ধরিলে চিকিৎসকরা হাঁচিবার ঔষধের ব্যবস্থা করিত। অগ্নিতে কোন একপ্রকার ঔষধ পুড়াইয়া নাসারন্ধ্রের দ্বারা তাহার ধূম টানিয়া লইবার প্রথাও ছিল। চোখের অসুখে ঠাণ্ডা ঔষধ প্রয়োগ করা হইত। পাণ্ডুরোগে (Jaundice) গরুর চোনা দেওয়া হইত। চর্ম্মরোগে শরীরে মলম দেওয়া হইত এবং বিরেচকও ব্যবস্থা ছিল। মোঘরাজ নামে কোন একটী ব্রাহ্মণের গৃহে চর্ম্মরোগ উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ সেই গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে চলিয়া গেল। চর্ম্মরোগ সংক্রামক বলিয়া সে-কালে বিদিত ছিল। বাতরোগে বাষ্পস্নানের ব্যবস্থা ছিল। ছয় ফুট গভীর একটী গর্ত্ত খনন করিয়া ঐ গর্ত্তটী কয়লার দ্বারা পরিপূর্ণ করা হইত এবং কয়লার উপরে মাটী কিংবা বালি দেওয়া হইত। যে সকল বৃক্ষের পাতা বাত-রোগের জন্য উপকারী ছিল তাহা ঐ বালির উপর রাখা হইত। রোগী শরীরের যে স্থান বাতগ্রস্ত সেই স্থান পাতার উপর রাখিয়া শয়ন করিত এবং যে পর্য্যন্ত ভাল করিয়া ঘাম বহির্গত না হইত সে পর্য্যন্ত ঐভাবে শয়ন করিয়া থাকিত। গঞ্জিকাও ঔষধ বলিয়া ব্যবহৃত হইত। স্নান করিবার জন্য গরম জল ব্যবহৃত হইত এবং গরম জলে ঔষধের পাতা



মগধসম্রাট বিম্বিসার

অনেকক্ষণ ধরিয়া ডুবাইয়া রাখিয়া ঐ জলে স্নানেরও ব্যবস্থা ছিল। যাহারা মধ্যে মধ্যে জ্বরাক্রান্ত হইত তাহাদিগের শরীর হইতে দূষিত রক্ত বাহির করিয়া দেওয়া হইত ; কারণ সে কালের চিকিৎসকদিগের ধারণা শরীরের কোন স্থানে খারাপ রক্ত সঞ্চিত থাকিলে দেহের অপকার হইবে। সর্পদংশন করিলে গোবর, প্রস্রাব, ছাই ও মাটী এই চারি প্রকার দ্রব্য প্রয়োগ করা হইত। সর্পদংশনরোগে বৃক্ষের ছাল, পাতা এবং পুষ্পের দ্বারা ঔষধ প্রস্তত করিয়া তাহা সেবনের জন্য চিকিৎসকরা ব্যবস্থা করিত। যাহারা বিষ খাইত তাহাদিগকে গোবরের জল খাইতে দিত। কোষ্ঠকাঠিন্য হইলে চাল পুড়াইয়া তাহার গুঁড়া খাইতে দিত। মানবদেহে রক্তের অভাব হইলে মাংসের সুরা এবং অনেক প্রকার স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক খাদ্যের ব্যবস্থা করা হইত। পেটে বায়ুর প্রকোপ হইলে একপ্রকার লবণাক্ত এবং তিক্ত পানের ব্যবস্থা করা হইত। ভগন্দর (fistula) রোগে অস্ত্রচিকিৎসকের প্রয়োজন হইত। আকাশগোও নামে একজন চিকিৎসক ভগন্দর রোগের চিকিৎসা বড়ই কঠিন বলিয়া মনে করিতেন। তৃণপুষ্পরোগ নামে আর এক প্রকার রোগ ছিল। এই রোগে আক্রান্ত হইলে শরীরের রক্ত তৃণবর্ণের ন্যায় হইয়া যাইত। বায়ু কিংবা পিত্তের প্রাধান্য হইতে সংক্রামক রোগের উৎপত্তি হইত। সেকালে চক্ষুরোগে কতকগুলি মলম ব্যবহৃত হইত, যথা—(১) কৃষ্ণমলম, (২) রসমলম, (৩) স্রোতমলম, (৪) গৈরিকমলম, এবং (৫) কপল্য—ইহাই কাজল। সর্ব্বপ্রকার পেটের পীড়ায় গরম জলের সহিত ফলের রস ব্যবহৃত হইত। সেকালের চিকিৎসকরা সকল পীড়ায় সর্ব্বপ্রথমে বিরেচকের ব্যবস্থা করিত এবং পরে অন্য ঔষধ দিত। রাজগৃহে একটী প্রধান শ্রেষ্ঠীর গৃহে মহামারীরোগের (plague) প্রাদুর্ভাব হয় এবং ইহার ফলে অনেক লোক মারা যায়। শ্রাবস্তী নগরে কোন একটী পরিবারের গৃহে অহিবাত রোগ (১) নামে এক প্রকার রোগের উৎপত্তি হয়। আমরা যে সকল রোগের উল্লেখ করিলাম ইহা ব্যতীত সেকালে আরও অনেক প্রকার রোগ ছিল যথা—কর্ণরোগ, জিহ্বারোগ, কাসরোগ, দন্তরোগ, মুখরোগ, শ্বাসরোগ, মূর্চ্ছারোগ, বিসূচিকা (Cholera), মধুমেহ (Diabetes), লোহিত-পিণ্ড, সান্নিপাতিক ইত্যাদি। সম্রাট অশোক মানব এবং পশুর পীড়া উপশমের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। যে সমস্ত গাছগাছড়া মানুষ এবং পশুর পক্ষে উপকারী রাজ্য মধ্যে তাহা বপন করিয়াছিলেন। যখন সম্রাট শুনিলেন ঔষধ অভাবে একজন ভিক্ষুক তাঁহার রাজ্যে মারা পড়িয়াছে তখন তিনি তাঁহার রাজ্যের চারিটী দ্বারের নিকট অবস্থিত চারিটী পুষ্করিণীতে বহু ঔষধ সর্ব্বদা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দিতেন।

এই প্রবন্ধ প্রণয়নে যে সকল পুস্তক হইতে আমি সাহায্য লাভ করিয়াছি, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) Jataka, (২) Susruta, (৩) Vinaya Texts, (৪) Milindapanha, (৫) Niddesa, (৬) Sutta Nipata Commentary, (৭) Dhammapada commentary, (৮) Theragatha Commentary, (৯) Digha Nikaya, (১০) Culavamsa, (১১) Vinaya-pitaka, (১২) Mahaniddesa commentary, (১৩) Pali-English Dictionary (P. T. S.), (১৪) Samantapasadika; (১৫) Asoka Inscriptions ইত্যাদি।

---

(১) সর্প-বায়ু ব্যাধি—কাহারও কাহারও মতে ইহা ম্যালেরিয়া—কিন্তু এই মত ঠিক নহে।



প্রসঙ্গিকী

কলিকাতার নূতন সেরিফ—

খ্যাতনামা পণ্ডিত ডাক্তার সত্যচরণ লাহা মহাশয় এবার কলিকাতার সেরিফ নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের পরিবারে এই সম্মানলাভ নূতন নহে। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার পিতামহ জয়গোবিন্দ লাহা, জয়গোবিন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা এবং মহারাজার পুত্রদ্বয় রাজা কৃষ্ণদাস লাহা ও রাজা হৃষীকেশ লাহা এই সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।



শ্রীসত্যচরণ লাহা

ডাক্তার সত্যচরণ শুধু ধনী ব্যবসায়ী ও জমীদার নহেন—তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র—এম-এ, বি-এল ও পি-এচ-ডি উপাধিধারী। বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়া—বিশেষত পক্ষিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য প্রচার করিয়া তিনি জগতের জ্ঞানীসমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তিনি কলিকাতার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিতও সংশ্লিষ্ট। তাঁহার বয়স বর্ত্তমানে মাত্র ৪৮ বৎসর। আমরা তাঁহার এই সম্মান লাভে তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

নূতন বিচারপতি নিয়োগ—

কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা এডভোকেট ডাক্তার বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। ডাক্তার বিজনকুমার মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বি-এল পরীক্ষায় এবং ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে এম-এল পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থানলাভ করিয়াছিলেন। পরে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ডি-এল উপাধিও প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি আইন ব্যবসায়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া সিনিয়ার সরকারী উকীল হইয়াছিলেন। আইন বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের জন্য তিনি সুধীসমাজে সর্ব্বদা আদৃত হইয়া থাকেন।



শ্রীবিজনকুমার মুখোপাধ্যায়

তিন জন রাজবন্দীর আত্মহত্যা—

অল্পদিনের মধ্যে পর পর তিনজন রাজবন্দী আত্মহত্যা করায় একদিকে যেমন রাজবন্দীদের আত্মীয়-স্বজনগণের মধ্যে বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনই রাজবন্দীদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে জনসাধারণের মনে সন্দেহের উদ্ভব

হইয়াছে। গত ২২শে সেপ্টেম্বর রাজবন্দী নবজীবন ঘোষ ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ থানায়, গত ১৭ই অক্টোবর রাজবন্দী সন্তোষচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় দেউলী বন্দি-নিবাসে এবং গত ২২শে নভেম্বর রাজবন্দী কৃষ্ণপঙ্কজ গোস্বামী মালদহে পিতৃগৃহে আত্মহত্যা করিয়া জীবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। নবজীবন ঘোষ মেদিনীপুর জেলা হইতে তাড়িত হইয়া ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস হইতেই রাজবন্দী ছিলেন। গোপালগঞ্জে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। সন্তোষচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এস সি পড়িবার সময় ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে হইতে রাজবন্দী হন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেউলীতে প্রেরণ করা হইয়াছিল; মাতার পীড়ার জন্য শেষে তিনি উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। কৃষ্ণপঙ্কজ গোস্বামী স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন; তাঁহার পিতা কৃষ্ণশশীবাবু মালদহের খ্যাতনামা উকীল। কেন যে এই তিনজন যুবক আত্মহত্যা করিয়াছেন, তাহার কারণ জানা যায় নাই। অথচ এই সকল আত্মহত্যার কারণ সম্বন্ধে কোন প্রকার সরকারী তদন্তেরও ব্যবস্থা হয় নাই। ইঁহাদের কাহারও মস্তিষ্ক-বিকৃতিরও কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। তবে এই সকল আত্মহত্যার কারণ কি?

তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা—

এদেশে ধনী ও জমীদার পরিবারের লোকরা দেবমন্দির প্রতিষ্ঠার কথা প্রায় বিস্মৃত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কদাচিৎ কোথাও মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা শুনা যায়—তাহাও আশানুরূপ ব্যয়বহুল বা আড়ম্বরপূর্ণ হয় না। সম্প্রতি কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার জমীদার অক্ষয়চন্দ্র ঘোষের পত্নী চারুশীলা ঘোষ তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে দেওঘর-বৈদ্যনাথধামে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইতেছেন। মন্দিরটি তাঁহার গুরু বালানন্দস্বামীর আশ্রমের নিকটেই নির্ম্মিত হইতেছে। মন্দিরে দেবপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থানে একটি সংস্কৃত কলেজও প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ব্রহ্মদেশে কৃতী বাঙ্গালী—

ঢাকা জেলার সুভড্যা নিবাসী শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দাস ব্রহ্মদেশের বেসিন সহরে থাকিয়া ওকালতী করেন। তিনি উপর্য্যুপরি তিনবার ব্রহ্মদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। গত ৩০ বৎসর কাল বেসিন সহরে তিনি স্থানীয় নানাপ্রকার উন্নতির জন্য যত্নের ত্রুটি করেন নাই। এবার নির্ব্বাচনে তাঁহার জয়লাভ বাঙ্গালীর পক্ষে আনন্দের বিষয়। ব্রহ্মদেশ যাহাতে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন না



শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস

হয় সেজন্য আন্দোলন করার পরও নির্ব্বাচনে তিনি সাফল্যমণ্ডিত হইলেন। আমরা তাঁহার এই সম্মান প্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।

মজঃফরপুরে সঙ্গীত-সম্মেলন—

গত ৪ঠা হইতে ৮ই নভেম্বর ৫ দিন মজঃফরপুর সহরে নিখিল ভারত সঙ্গীত-মহাসম্মেলনের অষ্টম-বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম তিন দিন ছাত্রছাত্রীগণের মধ্যে নিখিল ভারত সঙ্গীত প্রতিযোগিতা হইয়াছিল; বাঙ্গালার ছাত্রছাত্রীগণ অনেকেই অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও অনেক বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সম্মিলনে সমাগত গুণীগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, আবদুল আজিজ খাঁ, সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনায়ৎ খাঁ, ব্রহ্মানন্দ গোস্বামী, নারায়ণ রাও ব্যাস, ডি-এন-পটবর্দ্ধন, দিলীপ চাঁদ বেদী, গণপৎ রাও,

শম্ভুপ্রসাদ মিশ্র, কুমার গন্ধর্ব্ব, বি-কে-দেওধর, মুস্তাক আলি, নসির খাঁ, ওয়ালি মহম্মদ, ছোটে খাঁ, শান্তা



শ্রীযুত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

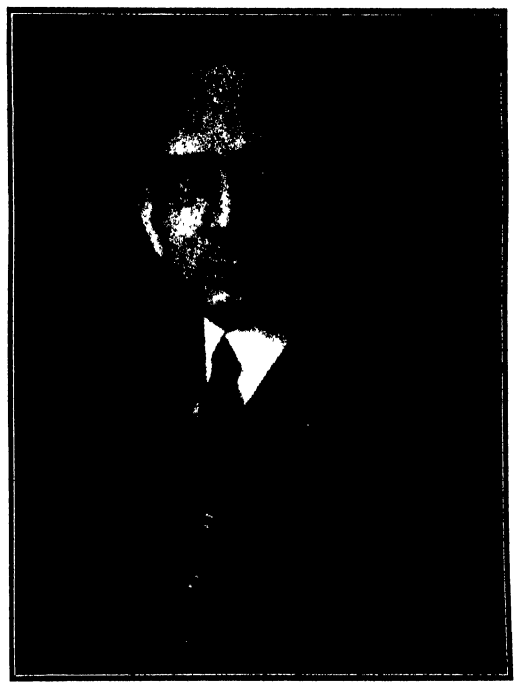


কুমারী সাবিত্রী খাণ্ডেলওয়ালা

অমলাঙ্গী, এন-কৃষ্ণমূর্ত্তি, কৃষ্ণচন্দ্র দে, অনাথ বন্ধু, বীণাপাণি মুখোপাধ্যায়, সুষমা দে, বালা সরস্বতী (নৃত্য), আশা ওঝা, অমলা নন্দী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুবিখ্যাত গীত শিল্পী শ্রীযুত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবার সম্মিলনে উচ্চাঙ্গের খেয়াল গান গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন এবং মিস সাবিত্রী খাণ্ডেলওয়ালা সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। মিস খাণ্ডেলওয়ালা সাঁতার, সাইকেল-চালনা প্রভৃতিতেও বিশেষ পারদর্শিনী।

বাঙ্গালীর সম্মান—

সার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র পূর্ব্বে কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট জেনারেল ছিলেন; পরে বড়লাটের শাসন পরিষদের আইন-সদস্য হন। এখন তিনি বাঙ্গালার গভর্ণরের শাসন পরিষদের সদস্যপদে নিযুক্ত আছেন। নূতন ভারত



সার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র

শাসন আইনে যে ফেডারেল কোর্ট বা রাষ্ট্রসংঘ-আদালত গঠিত হইবে সার ব্রজেন্দ্রলালকে তাহার এডভোকেট-জেনারেল পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বাঙ্গালার পক্ষে গৌরবের কথা এই যে—এখনও এই প্রকার উচ্চ

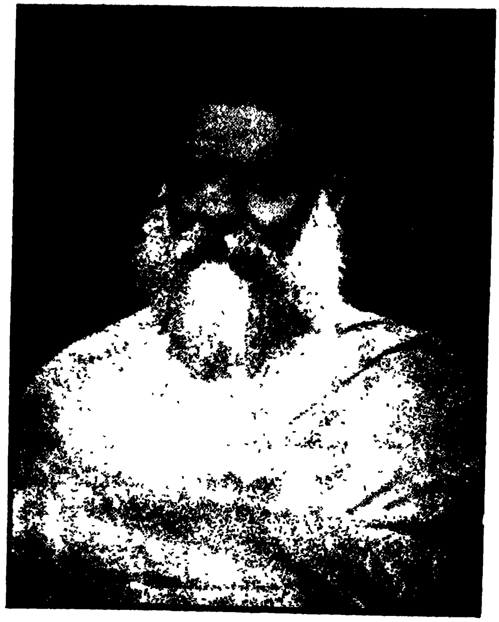
সম্মান লাভের যোগ্য কৃতী বাঙ্গালীর অভাব নাই। সার ব্রজেন্দ্রলাল এই পদ গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন। আমরা ভগবানের নিকট তাঁহার সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবন কামনা করি।

সম্রাটের সিংহাসন ত্যাগ—

সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ড মিসেস সিম্‌সন নাম্নী এক মার্কিণ মহিলাকে বিবাহ করিবার জন্য সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন, এই সংবাদে সমগ্র সভ্য-জগত চমৎকৃত হইয়াছেন। মিসেস সিম্‌সন ইতিপূর্ব্বে দুই বার বিবাহ করিয়া উভয় স্বামীকেই ত্যাগ করিয়াছেন; ঐরূপ মহিলার সহিত বৃটীশ সাম্রাজ্যের সম্রাটের বিবাহে বৃটীশ পার্লামেণ্ট সম্মতি প্রদান করেন নাই—রাজার ইচ্ছার সহিত প্রজাপুঞ্জের ইচ্ছার শুধু বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। বৃটীশ রাষ্ট্রতন্ত্রের নিয়মানুগতা বজায় রাখিবার জন্যই সম্রাটকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে হইল। এরূপ ঘটনা সচরাচর দুর্লভ—সম্রাট তাঁহার ঘোষণায় জানাইয়াছেন—তাঁহার প্রজাপুঞ্জের মঙ্গলের জন্য তিনি বহু চিন্তার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার স্থানে তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা "ডিউক অফ ইয়র্ক"কে সিংহাসন প্রদান করা হইবে। তিনি "ষষ্ঠ জর্জ্জ" নাম লইয়া সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হইবেন। ভূতপূর্ব্ব সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ড কোনরূপ উপাধিতে ভূষিত না থাকিয়া শুধু "মিঃ উইণ্ডসর" বলিয়াই পরিচিত থাকিবেন। একটি নারীর জন্য বিশাল সাম্রাজ্যের সিংহাসন ত্যাগ মানুষের আদিম প্রবৃত্তির আকর্ষণের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়—ইহা মানব চরিত্রেরই বিশেষত্ব। সমাজ-নীতির দিক দিয়া ইহা সর্ব্বথা নিন্দনীয় হইলেও সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ডের এরূপ ত্যাগে লোক তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিবে না।

কৃষ্ণকুমার মিত্র—

প্রবীণ সাংবাদিক 'সঞ্জীবনী'-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় গত ৫ই ডিসেম্বর শনিবার মধ্যাহ্নে ৮৫ বৎসর বয়সে সহসা পরলোকগমন করায় বাঙ্গালার সাংবাদিক সমাজের যে ক্ষতি হইল তাহা আর পূর্ণ হইবার নহে। আগামী ১৮ই ডিসেম্বর তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসর পূর্ণ হইবে বলিয়া ঐ দিন তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করার আয়োজন চলিতেছিল—কিন্তু সে আয়োজন অসমাপ্তই থাকিয়া গেল। মৃত্যুর মাত্র কয়দিন পূর্ব্বে ভারতীয় সাংবাদিক সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইয়াছিল। তিনি গত ৫৪ বৎসরকাল সঞ্জীবনীপত্রের সম্পাদন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এরূপ সুদীর্ঘকাল নিষ্ঠার সহিত কর্ম্ম-সম্পাদন সচরাচর দেখা যায় না। কৃষ্ণকুমারবাবু মৈমনসিংহ জেলার টাঙ্গাইলের অন্তর্গত বাঘিল গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। যৌবনে বি-এ পাশ করিয়া তিনি কিছুকাল সিটি কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপকের কার্য্য করিয়াছিলেন; কিন্তু অধিক দিন তাঁহাকে সে কার্য্য করিতে হয় নাই। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৭৪



কৃষ্ণকুমার মিত্র

খৃষ্টাব্দে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং স্বীয় অপূর্ব্ব বুদ্ধি ও কর্ম্ম-শক্তি দ্বারা অল্পদিনের মধ্যেই খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি 'বঙ্গবাসী' পত্রের সম্পাদন-বিভাগে যোগদান করেন বটে, কিন্তু বঙ্গবাসীতে অনুসৃত নীতির সহিত তাঁহার মতের মিল না হওয়ায় তিনি কয়েকজন বন্ধুর সহযোগে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সঞ্জীবনী প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময়ে বাঙ্গালা দেশে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন প্রবলভাবেই চলিতেছিল। বঙ্গবাসী রক্ষণশীল দলের মুখপত্র ছিল বলিয়া সংস্কারকদল সঞ্জীবনীকে তাঁহাদের

মুখপত্র বলিয়া প্রচার করেন। সঞ্জীবনী প্রথম তিন বৎসর চা বাগানের কুলীদের উপর অনুষ্ঠিত অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করায় সে বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং তাহাতে সুফল ফলিয়াছিল। শ্রমিকদের মধ্যে অহিফেন ব্যবহার ও মদ্যপান বন্ধ করিবার জন্যও সঞ্জীবনী বহুদিন আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। ফলে গভর্ণমেণ্ট অহিফেন তদন্ত কমিটী নিযুক্ত করেন ও বাঙ্গালায় মদ্যপান-নিবারণী সমিতি গঠিত হয়।

কৃষ্ণকুমারবাবু গত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম নেতারূপেই প্রথম রাজনীতি-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে দেশের লোক যাহাতে বিদেশী বর্জ্জন প্রস্তাব গ্রহণ করে, সে জন্য তিনিই প্রথম লেখনী ধারণ করেন এবং তাহার ফলে কংগ্রেসেও সে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। তখনকার যুগে এই প্রস্তাব দেশে কিরূপ জাগরণের সাড়া আনিয়াছিল তাহা আজ আর কাহারও অবিদিত নহে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনে গভর্ণমেণ্ট "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি উচ্চারণ করা নিষেধ করিয়া দেন। তথায় সমবেত নেতৃবৃন্দ সে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেন। গভর্ণমেণ্ট ১৪৪ ধারা জারি কবিয়া সম্মিলন বন্ধ করিয়া দিলেও কৃষ্ণকুমারবাবু সম্মিলন ত্যাগ করেন নাই এবং এরূপ দৃঢ়তার সহিত সরকারের ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন যে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে গ্রেপ্তার কবিতেও সাহস করে নাই। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট বিনা বিচারে যে ৮ জনকে আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন কৃষ্ণকুমারবাবু তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। অশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, শ্রীযুত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিও ঐ দলে ছিলেন। যাঁহারা সে সময়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়া সরকারকে তাঁহাদের ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন, কৃষ্ণকুমারবাবু তাঁহাদের অন্যতম অগ্রণী ছিলেন। কংগ্রেস পরবর্ত্তী কালে উগ্রপন্থীদের হস্তগত হইলে তিনি মডারেট বা নরমপন্থীদলে যোগদান করেন এবং নানাভাবে দেশের সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি আদর্শচরিত্র, সদয়-হৃদয় ও পরোপকারী ছিলেন বলিয়া কি স্বদলভুক্ত, কি পরদলভুক্ত—সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং তিনি সকলের সহিতই সমান ব্যবহার করিতেন। আদর্শ অক্ষুণ্ন রাখিয়া তিনি প্রায় ৫৪ বৎসরকাল সঞ্জীবনীর সম্পাদনা করিয়া গিয়াছেন এবং নিজ সংবাদপত্রের মারফতে দেশের বহু অভাব অভিযোগ দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি সিটি কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং সারা জীবন উক্ত কলেজের সেবা করিয়া গিয়াছেন। বহুদিন তিনি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভাপতি ছিলেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সেই পদে কাজ করিয়াছেন। তিনি স্বর্গত সুধী রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পত্নী-বিয়োগ হইয়াছিল। তাঁহার একমাত্র পুত্র সুকুমার এবং দুই বিবাহিতা কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনী বসু ও শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্ত্তী বর্ত্তমান।

তাঁহার কৃত একটি কার্য্য পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহাকে দেশের সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রিয় করিয়াছিল। বাঙ্গালায় নারী-নিগ্রহ নিবারণকল্পে তিনি নানাপ্রকার আন্দোলন পরিচালন করিয়া দেশ হইতে উক্ত পাপ দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। নারীরক্ষা-সমিতির কর্ম্মীরূপে তিনি দেশের সর্ব্বত্র লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত নারীগণের পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা করিতেন এবং তাঁহার কার্য্য-ফলে এখন দেশের বহু কর্ম্মী উক্ত সুমহান ব্রত গ্রহণ করিয়া নারী-রক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভ্রাট—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার মিঃ এ-এফ-রহমন সাহেব অবসর গ্রহণের পূর্ব্বে কয় মাসের জন্য অবকাশ গ্রহণ করায় বাঙ্গালার গভর্ণর তাঁহার স্থানে খাওজে সাহাবুদ্দীন সাহেবকে ভাইস চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। সাহাবুদ্দীন সাহেবের ভ্রাতা নবাব খাওজে নাজিমুদ্দীন বাঙ্গালার গভর্ণরের শাসনপরিষদের অন্যতম সদস্য। তিনি কয় মাসের ছুটী লইয়া হজে তীর্থ যাত্রা করিলে গভর্ণর নাজিমুদ্দীন সাহেবের স্থানে তাঁহার ভ্রাতাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে ঐ পদে সাহাবুদ্দীন সাহেবের মত বহু ব্যক্তি দ্বারা অলঙ্কৃত হওয়ায়

ঐ ব্যবস্থায় জনসাধারণের মধ্যে কোনরূপ বিক্ষোভ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি অল্পদিন পূর্ব্বে এক সভায় স্থির করিয়াছেন—মিঃ রহমন অবসর গ্রহণ করিলে ঐ পদে যেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদারকেই নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু অস্থায়ী ভাইস-চ্যান্সেলার নিয়োগ কালে গভর্ণর সে প্রস্তাবে কর্ণপাত না করিয়া যে ব্যক্তিকে ঐ পদে বৃত করিলেন তিনি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষাই কোন দিন পাশ করেন নাই। মিঃ রহমনকে তাঁহার অবসর গ্রহণ কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ডি-এল উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা করায় সকলেই গুণীর সম্মানলাভে আনন্দলাভ করিয়াছেন।

রাজবন্দীদের মুক্তি দান ও কার্য্য প্রদান—

কয়েক মাস পূর্ব্বে বাঙ্গালা-গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা দেশের কয়েকটি স্থানে কৃষি ও শিল্প শিক্ষা দানের কেন্দ্র খুলিয়া শতাধিক রাজবন্দীকে বিভিন্ন বন্দিনিবাস হইতে আনয়ন পূর্ব্বক কৃষি ও শিল্প শিক্ষাকেন্দ্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কয়েক দল রাজবন্দী শিল্পশিক্ষার পর মুক্তি লাভ করিয়াছে এবং কৃষি শিক্ষাকেন্দ্র হইতেও একদল শিক্ষিত রাজবন্দী শীঘ্রই মুক্তিলাভ করিবে। শিক্ষাপ্রাপ্ত রাজবন্দীরা প্রায় সকলেই দরিদ্র—তাহারা যে কার্য্য শিক্ষা করিয়াছে তাহা দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতে হইলে তাহাদিগকে ছোট ছোট কারখানা স্থাপন করিতে হইবে—কারখানা খুলিলে তাহাদিগকে প্রয়োজন মত অর্থ সরবরাহের বন্দোবস্ত গভর্ণমেণ্ট করিয়াছেন। কৃষিশিক্ষাপ্রাপ্ত রাজবন্দীরাও যাহাতে কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহে সমর্থ হয়, সেজন্য তাহাদের সাহায্য করা হইবে। গভর্ণমেণ্টের এই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইলে কিরূপ সুফলপ্রদ হইবে তাহা এখন বলা যায় না। তবে ইহা যে দেশের একদল বিপথগামী যুবককে সুপথে পরিচালিত করিবার প্রয়াস—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় এখনও সকল রাজবন্দীকে ঐ ভাবে জীবিকার্জ্জনের পথ নির্ব্বাচনের সুযোগ দেওয়া হয় নাই। অনেকে হয় ত কৃষি বা শিল্প কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিতে উৎসুকও নহে। যদি ইহাদের মত সকলকে বিশ্বাস করিয়া গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেককে নিজ নিজ পেশা স্থির করিয়া লইবার সুযোগ দেন, তবে রাজবন্দীরাও মুক্তিলাভ করে এবং তাহাদিগকে বিনা বিচারে আটক রাখার জন্য দেশে যে অসন্তোষ ব্যাপ্ত রহিয়াছে তাহাও দূর হইতে পারে।

শরৎচন্দ্র বসু—

বর্দ্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ জননেতা ও খ্যাতনামা উকীল রায় বাহাদুর নলিনাক্ষ বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় গত ১৪ই নভেম্বর শনিবার ৭১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। শরৎচন্দ্র ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বি-এ এবং মেট্রপলিটান ইনিষ্টিটিউসন হইতে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বি এল পাশ করিয়া ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট হন; কিন্তু বর্দ্ধমানেই তাঁহাকে অধিক সময় ওকালতী করিতে হইত। বাঙ্গালা ও বিহারের কয়েকটি সহরে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ও পসার হইয়াছিল। তিনি ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে একবার এবং ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে একবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি কলিকাতায় বাস করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যবহারাজীবী ছিলেন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বার এসোসিয়েশনের সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার বিধবা পত্নী, ৫ পুত্র ও দুই কন্যা বর্ত্তমান। পুত্রদের মধ্যে একজন এডভোকেট ও একজন ব্যারিষ্টার হইয়াছেন।

মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন—

খ্যাতনামা দেশসেবক, পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন গত ২৮শে নভেম্বর শনিবার ৬৬ বৎসর বয়সে তাঁহার মাণিকতলার বাটীতে পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি প্রথমে পুলিস আদালতে ও পরে হাইকোর্টে ওকালতী করিয়া প্রচুর অর্থার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনি জাতীয়তাবাদী ছিলেন এবং কংগ্রেসের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহিত একযোগে কাজ

করিয়াছিলেন এবং ঐ কার্য্যে তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল। তিনি কিছুকাল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান ছিলেন। সুলেখক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল ও নানা সাময়িক পত্রে তাঁহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। বাঙ্গালা, ইংরাজি ও উর্দ্দু তিন ভাষাতেই তাঁহার বেশ দখল ছিল। আমরা তাঁহার বিধবা পত্নী, তিন পুত্র ও তিন কন্যাকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

গীতশ্রী ইভা গুহ—

কলিকাতার খ্যাতনামা সাংবাদিক শ্রীযুত প্রিয়নাথ গুহ মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা গীতশ্রী কুমারী ইভা গুহ গত অক্টোবর মাসে আজমীরে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনে যাইয়া ঠুংরী গানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত সম্মিলনে ধ্রুপদ গানে বিয়াজুদ্দীন



কুমারী ইভা গুহ

খাঁ, খেয়াল গানে ফিয়াজ খাঁ ও ওস্তাদ রজাব আলি খাঁ, সারেঙ্গীতে বুন্দু খাঁ এবং সেতারে ফিজা হুসেন খাঁ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইয়াছেন। ভারতের নানাস্থান হইতে সমাগত গায়কবর্গের মধ্যে ঠুংরী গানে বাঙ্গালী বালিকার পক্ষে প্রথম স্থান অধিকার বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়। কুমারী ইভা কলিকাতা সঙ্গীত সম্মিলনীর এবং সঙ্গীত-বিশারদ শ্রীযুত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তীর শিষ্যা। আমরা এই বাঙ্গালী বালিকার অপূর্ব্ব সাফল্যে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

হোমিওপাথি ও সরকারী অনুমোদন—

কলিকাতার খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার এ, এন, মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত জুলাই মাসে গ্লাসগো সহরে হোমিওপাথিক সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করিতে গিয়াছেন। বাঙ্গালা-সরকার যাহাতে



ডাক্তার এ, এন, মুখোপাধ্যায়

হোমিওপাথী চিকিৎসার অনুমোদন করেন সে জন্য তিনি বিলাতে থাকিয়া নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াও বিষয়টি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় বার্লিন, ড্রেসডেন, ভিয়েনা, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে যাইয়া আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার উদ্যোগ ও চেষ্টার ফলে লণ্ডনস্থ বৃটীশ হোমিওপাথিক সোসাইটী কলিকাতায় "ইণ্ডোবৃটীশ হোমিওপ্যাথিক সোসাইটী" নামক একটি সমিতি স্থাপন করিয়া ভারত

ও বিলাতের হোমিওপাথিক চিকিৎসকগণের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছেন। আমরা ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টাসমূহ সাফল্যমণ্ডিত হইতে দেখিলে সুখী হইব।

বাঙ্গালার গভর্ণরের আশার বাণী—

প্রতি বৎসরই কলিকাতায় শীতকালে যে 'সেণ্ট এণ্ড্রুজ ডে' ডিনার হয় তাহাতে প্রাদেশিক গভর্ণর বক্তৃতা দানের সময় দেশের রাজনীতিক পরিস্থিতির কথা আলোচনা করিয়া থাকেন। এবার গত ৩০শে নভেম্বর গভর্ণর ঐ উপলক্ষে যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে একটি বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য দেখিয়া দেশবাসীমাত্রই প্রীত হইবেন। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ফলে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি প্রভৃতির জন্য বর্ত্তমানে দেশে শিক্ষিত বেকার যুবকের সংখ্যা যেরূপ বাড়িয়াছে সে জন্য শুধু অভিভাবকগণ চিন্তিত হন নাই, দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সকলেই বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। বাঙ্গালার গভর্ণর ও সেই দুশ্চিন্তার অংশীদার হইয়াছেন। কি ভাবে এই শিক্ষিত বেকার যুবকগণকে কাজে লাগান যাওয়া যায় গভর্ণর বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের মারফতে তাহার ব্যবস্থায়ও মনোযোগী হইয়াছেন। কয় বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুত নরেন্দ্রকুমার বসুর প্রস্তাবে বাঙ্গালার সরকারী শিল্প বিভাগ দেশের যুবকগণকে কুটীর শিল্প শিক্ষা প্রদানে উদ্যোগী হন। সরকারী শিল্পবিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টার শ্রীযুত সতীশ চন্দ্র মিত্রের আগ্রহে সে চেষ্টা অনেকটা সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। সকলেই জানেন গত কয় বৎসর হইতে গ্রামোন্নতিকর কার্য্যের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলিকে অর্থসাহায্য দান করিতেছেন। ঐ অর্থে গ্রামে জঙ্গল পরিষ্কার, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, পথ-নির্ম্মাণ, খাল কাটা প্রভৃতি কার্য্য হইতেছে। গভর্ণর দেশের যুবকগণের দৃষ্টি ঐ সকল কার্য্যের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে যুবকগণকে ব্যায়াম ও অন্যান্য শিক্ষা প্রদান করা হইবে। গভর্ণমেণ্ট যদি প্রকৃতই দুঃখের দরদী হইয়া যুবকগণকে কাজে লাগাইবার জন্য অর্থ ব্যয় করেন, তবে দেশ যে তদ্দ্বারা উপকৃত হইবে তাহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ম্যাজিসিয়ান পি-সি-সরকার—

কলিকাতার খ্যাতনামা তরুণ ম্যাজিসিয়ান মিঃ পি, সি, সরকার অতি অল্প বয়সেই নানাপ্রকার ম্যাজিক দেখাইয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া থাকেন। চক্ষু আবদ্ধ অবস্থায় লেখা ও পড়া এবং অপূর্ব্ব তাসের খেলা তাঁহার বিশেষত্ব।



পি, সি, সরকার

তিনি তালাবদ্ধ হাতকড়ি খুলিয়া ফেলিতে এবং জিহ্বা কাটিয়া পুনরায় তাহা জোড়া দিতেও পারেন। পাশ্চাত্য দেশে যাইয়া তাঁহার ক্রীড়া প্রদর্শনের জন্য তিনি সচেষ্ট হইয়াছেন।

শিক্ষা-মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িকতা—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা শেষ হইবার কয়দিন পূর্ব্বে প্রতিভাবান দরিদ্র ছাত্রগণকে গভর্ণমেণ্টের বৃত্তি দান সম্পর্কে বাঙ্গালার শিক্ষা-মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর আজিজল হক্ সাহেব সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। তিন সহস্রাধিক টাকার ২৪টি বৃত্তি ২ বৎসরের জন্য শুধু মুসলমান ছাত্রগণকেই প্রদান করা হইল। সম্মুখে নির্ব্বাচন—নির্ব্বাচনে ভোট সংগ্রহ করিতে হইলে ভোটদাতাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে। সেই জন্য কি এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে? ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণ কিরূপে শিক্ষামন্ত্রীর এই কার্য্য অনুমোদন করিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বাঙ্গালা দেশে কি হিন্দু

বা অনুন্নত ছাত্রগণের মধ্যে কেহই উক্ত বৃত্তি পাইবার যোগ্য ছিলেন না। তাঁহাদের যোগ্যতার বিচারকই বা কে ছিল? সরকারী দপ্তরখানায় মুসলমানদিগের শিক্ষার জন্য একজন মুসলমান সহকারী ডিরেক্টার থাকা সত্বেও এই জন্যই কি একজন হিন্দুকে সরাইয়া আর একজন নূতন মুসলমান সহকারী ডিরেক্টার আমদানী করা হইয়াছে? শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার মিঃ বটমলী ত মুসলমান নহেন—তিনি কি করিয়া মন্ত্রীর জন্য এরূপ তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিলেন?

বাঙ্গালার পুলিশের কার্য্য-বিবরণ—

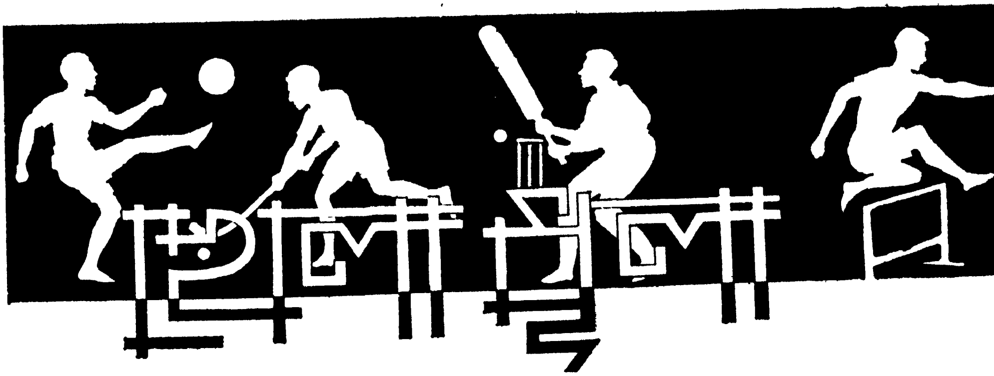
বাঙ্গালার সরকারী পুলিস বিভাগের ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের কার্য্য বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় আলোচ্যবর্ষে খুন, চুরি, ডাকাতি, বিপ্লববাদমূলক অপরাধ প্রভৃতির সংখ্যা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বেশ কমিয়া গিয়াছে। ইহার জন্য অবশ্য পুলিস বিভাগ সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু একটি বিষয় দেখিয়া সকলকে চমৎকৃত হইতে হয়। পুলিসের শাসন ফলে জনসাধারণের মধ্যে অপরাধ কমিয়া গেলেও পুলিসকর্ম্মচারীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অপরাধের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। পুলিস কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উপস্থিত করা হইলে অধিকাংশ সময়েই অপরাধী কর্ম্মচারীকে বিচারের জন্য প্রকাশ্য আদালতে প্রেরণ না করিয়া তাহাদের বিভাগীয় বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। হিসাবে দেখা যায় ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ৭৯৫৭ জন, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ৮২২২ জন এবং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ৮৯১৬ জন পুলিস কর্ম্মচারী বিভাগীয় বিচারে দণ্ডলাভ করিয়াছে। তাহারা যে প্রকৃত অপরাধী, তাহা তাহাদের দণ্ডের ব্যবস্থা হইতেই বেশ বুঝা যায়। পুলিস কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে এই নৈতিক অধঃপতনের জন্য দায়ী কাহারা?

রাজবন্দীর নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তি—

স্বাধীন দেশে সকল ঘটনাই সম্ভব হইতে পারে। মসিয়ে ওসিটস্কি জার্ম্মাণীর নাজি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া তিন বৎসর রাজবন্দী ছিলেন; গত ১৭ই নভেম্বর তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শান্তিকামীরূপে নরওয়ে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। এই সংবাদে জার্ম্মাণ সংবাদপত্রগুলি নরওয়ে গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের নিন্দা করিতেছে—নরওয়ে গভর্ণমেণ্ট নাকি নাজি জার্ম্মাণীকে অপমান করিবার জন্যই মসিয়ে ওসিটস্কিকে পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। নোবেল পুরস্কার জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে দেওয়া হইয়া থাকে—শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের বিচারকও আছেন। তাহার সহিত যে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নাই, তাহা এই কার্য্যের দ্বারা সপ্রকাশ।

নূতন শাসন ব্যবস্থা ও আগামী নির্ব্বাচন—

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর সুদীর্ঘ ১৬ বৎসর অতীত হইয়াছে। কথা ছিল ১০ বৎসর পরেই নূতন শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তন হইবে—কিন্তু তাহা পিছাইয়া গিয়া ১৬ বৎসরে দাঁড়াইয়াছে। সাইমন কমিশনের তদন্তের ফলে যে নূতন শাসন ব্যবস্থা রচিত হইয়াছে আগামী ১লা এপ্রিল (১৯৩৭) হইতে তদনুসারে ভারতবর্ষ শাসিত হইবে। বাঙ্গালা দেশে চতুর্থবারে যে ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইয়াছিল, তাহার কার্য্যকাল বর্দ্ধিত করিয়া ৩ বৎসর স্থানে ৭ বৎসর করা হইয়াছিল এবং তাহার ফলে উক্ত সভার সদস্যগণ ও উক্ত সভা হইতে মনোনীত মন্ত্রীরা সুদীর্ঘ ৭ বৎসর কাল কাজ করিবার সুবিধা পাইয়াছেন। শীঘ্রই নূতন ব্যবস্থাপরিষদ (নিম্ন-সভা) ও ব্যবস্থাপক সভার (উচ্চ সভা) সদস্য নির্ব্বাচন আরম্ভ হইবে এবং এই নির্ব্বাচনের ফলে নূতন শাসকদল সংগৃহীত হইবেন। দেশের সর্ব্বত্র এখন সাজ সাজ রব পড়িয়াছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের নির্ব্বাচনের সময় দেশবাসী নূতন শাসন-পদ্ধতিকে "অপর্য্যাপ্ত, সন্তোষজনক নহে এবং নিরাশাব্যঞ্জক" বলিয়া তাহা বয়কট করিয়াছিল। এবার সকলেই সমান উৎসাহে নির্ব্বাচনে মাতিয়াছেন। দেশের প্রকৃত হিতকামী বন্ধুরা যাহাতে নির্ব্বাচনে সাফল্যমণ্ডিত হন এবং দেশসেবার সুযোগ লাভ করেন, তাহা বিচার করিয়া সকলকে ভোট দিতে হইবে। কংগ্রেসকর্ম্মীরা দলাদলির ফলে বহুধা বিচ্ছিন্ন। সর্ব্বজনমান্য দেশনেতারও আজ অভাব। চারি-দিকে নৈরাশ্যব্যঞ্জক ভাব—এ অবস্থায় আশার বাণী শুনাইবে কে? সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের জন্য বাঙ্গালার হিন্দুগণ দুর্ব্বল—মুসলমানগণের মধ্যেও ঐক্য নাই। নূতন শাসনব্যবস্থা যাহাই কেন হউক না তাহাকে সুপরি-চালিত করিবার লোকেরও অভাব লক্ষিত হইতেছে। এ অবস্থায় নির্ব্বাচনে যাহাতে স্বার্থত্যাগী দেশসেবকগণ জয়ী হন, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতে আমরা দেশ-বাসীদিগকে নিবেদন জ্ঞাপন করিতেছি। সাম্প্রদায়িকতা ও দলাদলির মোহে পড়িয়া আমরা যাহাতে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট না হই—সে জন্য সকলকে সাবধানতার সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে।



প্রথম টেষ্ট ঃ

ইংলণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়া ঃ

দ্বিতীয় ইনিংসে ব্র্যাড্‌মান ও ব্র্যাড্‌কক্‌ অষ্ট্রেলিয়ার দুই ধুরন্ধর ব্যাটস্‌ম্যান 'ডাক্‌' করায় সকলেই আশ্চর্য্য হয়েছে। প্রথম ইনিংসেও ব্যাড্‌কক্‌ (৮), ব্র্যাডম্যান (৩৮), দু'জনেই ভালো খেলতে পারেন নি। ইংলণ্ডের পক্ষে হ্যামণ্ড এই টেষ্টে ভালো ফল দেখাতে পারেন নি, প্রথম ইনিংসে 'ডাক্‌' ও দ্বিতীয় ইনিংসে ২৫। এই টেষ্টে সেঞ্চুরি করেছেন দু' পক্ষের দু'জন—লেল্যাণ্ড (১২৬) ও ফিঙ্গলটন (১০)। ভোস সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উইকেট নিয়েছেন, দু' ইনিংসে ১০টি, এলেন ও ওয়ার্ড উভয়েই ৮টি, ও'রিলী ৫টি।

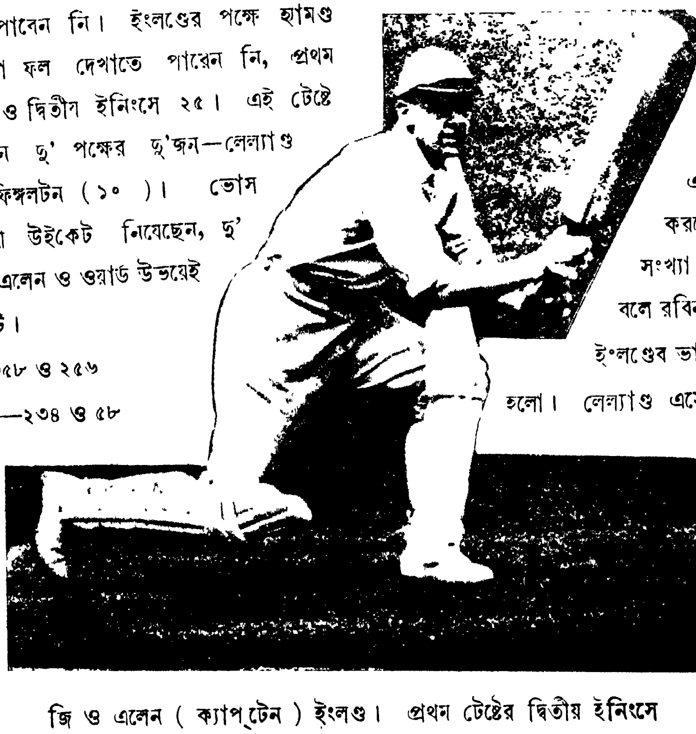
ইংলণ্ড—৩৫৮ ও ২৫৬

অষ্ট্রেলিয়া—২৩৪ ও ৫৮

ব্রিস্‌বেনে প্রথম টেষ্ট খেলা ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৩৬ থেকে আরম্ভ হয়ে ৯ই শেষ হয়েছে।

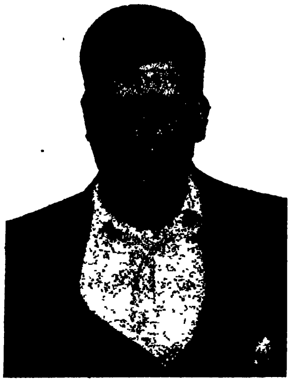
ইংলণ্ড ৩২২ রানে জয়ী হয়েছে।

ইংলণ্ড টস্‌ জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নামলো; আকাশ মেঘে ভরা, বারিপাতের সম্ভাবনাই অধিক। দশ হাজার দর্শক জড়ো হয়েছে। আরম্ভ সুবিধার হয় নি। ম্যাককর্‌মিসের প্রথম বলটি 'হুক্‌' করতে গিয়ে তোলায় ওল্ডফিল্ড ওয়ার্দ্দিংটনকে লুফে নিলে। ফ্যাগও মাত্র ৪ রান করে ২০ রানের মাথায় ম্যাক্‌কর্‌মিসের বলে ওল্ডফিল্ডের হাতে আটকালেন। ম্যাক্‌কর্‌মিস্‌ মারাত্মক বোলিং করেছেন, তিনি ইংলণ্ডের প্রথম তিন উইকেট মাত্র ১৬ রানে নিলেন। দুর্দ্ধর্ষ খেলোয়াড় হ্যামণ্ড এসে যখন এক রানও করতে পারলেন না সেই মোট সংখ্যা ২০তেই ম্যাক্‌কর্‌মিসের বলে রবিনসনের হাতে গেলেন তখন ইংলণ্ডের ভাগ্য বিশেষ মন্দ বলে মনে হলো। লেল্যাণ্ড এসে যোগ দিলেন। তিনি সতর্কতার সঙ্গে খেলে ইংলণ্ডকে বিপর্য্যয় থেকে বাঁচালেন। বার্ণেট ও তাঁতে মিলে চতুর্থ উইকেট সহযোগিতায় ৯৯ রান তুললে। বার্ণেট ৬৯ রান করে ওল্ডফিল্ডের হাতে ও'রিলীর বলে আউট হলো, ১৪৫ মিনিট খেলে, একটা ছয় ও ১১টা ৪ করে। ইংলণ্ডের ৪ উইকেট গেলো, মোট রান যখন ১১৯।



জি ও এলেন (ক্যাপ্‌টেন) ইংলণ্ড। প্রথম টেষ্টের দ্বিতীয় ইনিংসে অধিনায়কোচিত সুন্দর খেলেছেন এবং ৩৬ রানে ৫ উইকেট নিয়েছেন

লেল্যাণ্ড খুব সতর্কতা ও বিশ্বাসের সঙ্গে স্লো বোলিং-এর বিপক্ষে খেলেছেন, ১৯এর মাথায় মাত্র একবার সুযোগ দিয়েছিলেন। তাঁর নিজস্ব ৫০ উঠ্‌লো ১৩৯ মিনিটে।

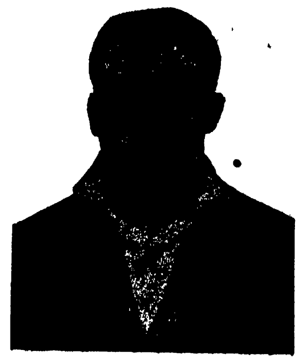


ভোস (নটিংহাম)। প্রথম ইনিংসে ৪১ রানে ৬ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন এবং দু' ইনিংসেই নট আউট ছিলেন

চা পানের পর দ্বিতীয় বলে এইমস্ গেলেন। হার্ডষ্টাফ্ যোগ দিলেন। মোট ২০০ উঠ্‌লো ২৪৫ মিনিটে। উভয়ে মিলে যখন ৯০ রান যোগ করেছেন, তখন লেল্যাণ্ড ওয়ার্ডের বলে আউট হলেন ১২৬ রান করে, ২৫১ মিনিটে ১১টা ৪ করেছেন। প্রথম দিনের খেলা শেষ হলো, ইংলণ্ড ৬ উইকেটে ২৬৩ রান করেছেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলা আরম্ভ হলো, বিশ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে। ৩০০ রান উঠ্‌লো ৩২১ মিনিটে। হার্ডষ্টাফ্ সকালের দিকে দৃঢ় প্রত্যয়শীল হয়ে খেলছিলেন। তিনি ও'রিলীর বলের গতি নির্ণয় করতে না পেরে ভুল মার মারতে ম্যাক্‌ক্যাবের হাতে গেলেন ৪৩ করে ১২৫ মিনিটে, ৮ বার চারের বাড়ী দিয়েছেন। এলেন এসে রবিনের সঙ্গে যোগ দিলেন কিন্তু ৪০ মিনিটে ৩৮ করে গেলেন, ৭টা ৪ করেছেন। এলেন ও ভেরিটি উভয়েই খুব ধৈর্য্যের সঙ্গে খেলেছেন—কেবল 'লুজ' বল পিটেছেন। ভেরিটি ৬৩ মিনিটে মাত্র ৭ করে ও'রিলীর বলে সীভারের হাতে গেলেন। ভোস এলেন। ক্যাপ্‌টেন ও'রিলীর বল সুন্দর পিটিয়ে গ্রাণ্ড ষ্ট্যাণ্ডে পাঠিয়ে ছয় করলেন। কিন্তু দু'বল পরেই 'মিড্ অনে' একটা জোর পিটুতে গিয়ে ম্যাক্‌ক্যাবের হাতে গেলেন ৩৫ রান করে, ৭৫ মিনিট খেলে ১টা ছয় ও ৪টা চার করবার পরে। ভোস নট আউট রয়ে গেলেন। ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হলো মোট ৩৫৮ রানে ৪০১ মিনিটে।

অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস আরম্ভ হলো ফিঙ্গলটন ও ব্যাড্‌কক্‌কে দিয়ে, এলেন ও ভোস বল দিতে নামলো। ৮ রান করেই ব্যাডকক্ এলেনের বলে গেলেন। ব্র্যাড্‌ম্যান এসে যোগ দিলেন। যখন ৫ রান করেছেন ভোসের ১টা বল অতি অল্পের জন্য তাঁর ষ্ট্যাম্পড নিতে পারলে না। চা পানের সময় ফিঙ্গলটন ৩০, ব্র্যাডম্যান ৩১ করেছেন। ৭১ মিনিট খেলে ব্র্যাডম্যান ৩৮

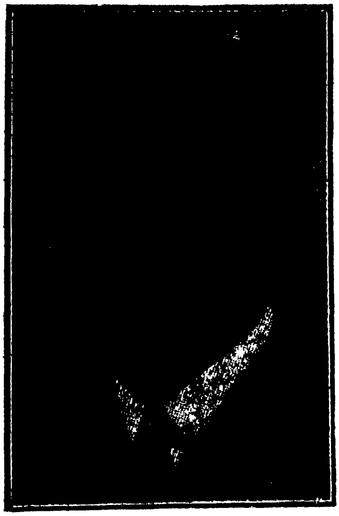


ওয়ার্দ্দিংটন (ডার্ব্বিসায়ার) প্রথম টেষ্টে মোটেই খেলতে পারেন নি, কিন্তু ব্র্যাডম্যানকে লুফেছেন



হ্যামণ্ড (গ্লসেষ্টার)। প্রথম টেষ্টে মোটেই ভালো খেলতে পারেন নি। ০ ও ২৫ রান মাত্র করেছেন

রানে ভোসের বলে ওয়ার্দিংটনের হাতে আটকালেন। তিনি ৫ বার চার করেছেন, আরম্ভে অত্যন্ত shaky ছিলেন, পরে তাঁর খেলায় মনে হয়েছিল যে তিনি বড় স্কোর করতে পারবেন। কিন্তু দু'মনা হয়ে backward pointএ অত্যন্ত খারাপ 'মার' দেওয়ায় আউট হলেন। অষ্ট্রেলিয়ার দু'জন ধুরন্ধর খেলোয়াড়ের অতি সহজে পতন হওয়ায় তাদের জয়াশা ক্ষীণ হলো। ম্যাক্‌ক্যাব এলেন এবং বাকী সময়টুকু কাটিয়ে দিলেন। ফিঙ্গলটন নিজস্ব ৫০ করলে ১৩৮ মিনিটে। মোট ১০০ রান উঠলো ১০২ মিনিটে। ৫।০টার সময় আলোর অভাব হওয়ায় স্কোরের গতি আরো কমে গেলো, ১৫০ উঠ্‌লো ১৭৩ মিনিট খেলার পরে। দর্শক সংখ্যা ৩০,৭৩৭ এবং প্রবেশ মূল্য ৩,৫৩৭ পাউণ্ড—টেষ্টের রেকর্ড।



ডন্ ব্র্যাডম্যান্
(ক্যাপ্‌টেন—অষ্ট্রেলিয়া)

তৃতীয় দিনের খেলা আরম্ভ হলো উত্তপ্ত রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায়, পাঁচ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে। ফিঙ্গলটন দু'বার বেঁচে গেলেন, একবার এল বি ডবলিউর আহ্বানের হাত থেকে ৮৫র মাথায়। ম্যাক্‌ক্যাব ভোসের বল তুলে দেওয়ায় বার্ণেটের হাতে সোজা ক্যাচ হলেন ৫১ রানে ১১০ মিনিটে, ৬টা চার করে। রবিন্‌সন এলেন এবং মাত্র ২ করে গেলেন ভোসের বলে, হ্যামণ্ড নীচু জোর ক্যাচ্ নিলেন সি্লপে। চিপারফিল্ড যোগ দিলে। ২০০



এস জে ম্যাকক্যাব
(অষ্ট্রেলিয়া)

রান উঠলো ২৬১ মিনিটে। চিপারফিল্ড ৭ করে গেলেন। ফিঙ্গলটন তাঁর শত রান করলেন ৩০০ মিনিটে, তার পরেই ভেরিটির বল এগিয়ে পিটুতে গিয়ে বোল্ড হলেন, ৬ বার ৪ করেছেন। straight driving ও লেগে placingএ তিনি চমৎকার খেলেছেন। ওল্ডফিল্ড ৬ করে গেলেন।

সীভারস্ ৭৫ মিনিট অতি কষ্টে টেঁকে থেকে মাত্র ৮ করে আউট হলেন এলেনের বলে। ওয়ার্ড এক রানও না করে হার্ডষ্টাফের হাতে এবং ও'রিলী ৩ করে লেল্যাণ্ডের হাতে আট্‌কালে অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস সমাপ্ত হলো ৩৪৮ মিনিটে মোট ২৩৪ রানে।

চা পানের পরে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ হলো ওয়ার্দিংটন ও



এইম্‌স্ (কেণ্ট)। প্রথম টেষ্টে ২৪ ও ৯ রান করেছেন। চিপারফিল্ড ও ওল্ডফিল্ডকে লুফেছেন

বার্নেটকে দিয়ে। ওয়ার্দিংটন ষ্ট্যাম্পড হলেন ৮ করে। ১০ মিনিট খেলে বার্নেট ও ফ্যাগে মিলে ৫০ তুললে। ওয়ার্ডের বলে বার্নেটকে ব্যাড্‌কক্ deep square-legএ সুন্দর লুফ্‌লে। বার্নেট ৭১ মিনিট খেলে ২৬ করেছে, তার মধ্যে ৫বার চার ছিল। হ্যামণ্ড যোগ



রবিন্‌স্ (মিডলসেক্স)। প্রথম টেষ্টে ৩৮ ও ৩০ রান করেছেন

দিয়ে চমকপ্রদভাবে square cutting ও cover driving আরম্ভ করলেন, দুর্জ্জয় দৃঢ়তার সঙ্গে। ৫০ মিনিট খেলে তিনি ১২ করেছেন, মাত্র একটি বাউণ্ডারী, মোটেই ঝুঁকি নিতে রাজী নন। বেলা শেষে ফ্যাগ (নট-আউট) ২৪, হ্যামণ্ড (নট-আউট) ১২ রইলেন।

চতুর্থ দিনের খেলা আরম্ভ হ'লো উত্তপ্ত সূর্য্যালোকে অতিশয় গরম আবহাওয়ায়। মাত্র একসহস্র দর্শক এসেছে। উইকেট জীর্ণ বলে মনে হ'চ্ছে। গতকল্য ম্যাচের পরে প্যাভিলনের সিঁড়িতে পা মচ্‌কে যাওয়ায় ব্র্যাডম্যান আজ বাঁধা পা নিয়েই ফিল্ড করতে নেমেছেন।

ফ্যাগ মাত্র ৩ রান করে ওল্ডফিল্ডের হাতে ষ্ট্যাম্পড হয়ে গেলেন ১০৮ মিনিট খেলে। লেল্যাণ্ড ও হ্যামণ্ডে মিলে মোট শতরান তুললেন ১৫১ মিনিটে। হ্যামণ্ড ওয়ার্ডের বল পিছিয়ে মারতে গিয়ে উইকেটে মারায় আউট হলেন, ৯৫ মিনিটে ২৫ রান, ২বার ৪ করেছেন। এই পর্য্যন্ত ওয়ার্ড ১২ রানে ২ উইকেট নিলেন। এইম্‌স্ ৯ রান করে আউট হলেন ১২২ রানের মাথায়। এলেন এলেন। দর্শক সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে হলো পাঁচ হাজার। লেল্যাণ্ডকে ব্র্যাডম্যান বিস্ময়কর ও উল্লেখযোগ্য ক্যাচে লুফ্‌লেন, মিড্-অনের দিকে বিশ গজ ছুটে এসে। লেল্যাণ্ড ১০৭ মিনিটে ৩৩ রান করেছেন। এলেন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সুন্দর অধিনায়কোচিত খেলেছেন। ও'রিলীর এক ওভারের দু'টো বলে চার করে মোট ২০০ রান ৩০০ মিনিটে তুললেন। ২০৫ রানের মাথায় হার্ডষ্টাফ্ ৬৪ মিনিটে মাত্র ২০ করে ওয়ার্ডের বল এগিয়ে পিটুতে গিয়ে ষ্ট্যাম্পড্ হলো। ওয়ার্ডের বলে রবিন্‌স্ এক রানও না করে চিপারফিল্ডের হাতে আটকালো। ভেরিটি এল্ বি হলো ১৯ করে। এলেন ৬৮ করে সীভার্সের বলে ফিঙ্গলটনের হাতে আটকালে, ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলো মোট ২৫৬ রানে।



ও'রিলী
(নিউ সাউথওয়েল্‌স্)

অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ হলো। ৩৭৮ রান করলে অষ্ট্রেলিয়া জয়ী হবে। ফিঙ্গলটন ভোসের প্রথম

বলেই বোল্ড হলে, সীভার্স্ এসে ব্যাড্ককের সঙ্গে যোগ দিলে। ক্ষীণালোকের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই খেলা



জে হার্ডষ্টাফ্ (নটিংহাম)। প্রথম টেষ্টে ৪৩ ও ২০ রান করেছেন। ওয়ার্ডকে লুফেছেন

সে দিন বন্ধ করতে হয়, অষ্ট্রেলিয়া ২ উইকেট খুইয়ে মাত্র ৩ করেছে।

পঞ্চম দিনের খেলা আরম্ভ হলো। মাত্র তিন হাজার দর্শক এসেছে। গত রাত্রের ও প্রভাতের বারিপাতে উইকেট নরম ছিল। অষ্ট্রেলিয়ার সমস্যা প্রথম বল থেকেই আরম্ভ হলো। ভিজা আধ-শুকনো উইকেটে বোলারদেরই সুবিধা। এলেনের উঁচু বল ব্যাড্ককের ব্যাটে ঠেকে ফ্যাগের হাতে গিয়ে উঠ্লো, যখন সে শূন্য করেছে। ওল্ডফিল্ড এলো, সীভারসের পতন ঘট্লো এলেনের বলে, ৫ করে। ব্র্যাডম্যান এলেন ও প্রথম বলটা আটকালেন কিন্তু দ্বিতীয় বলটা ওঠাতেই 'গালিতে' ফ্যাগের হাতে আটকালেন শূন্য করে। অষ্ট্রেলিয়ার বড় বড় ৪ উইকেট গেলো মাত্র ৭ রানে, এলেন এ পর্য্যন্ত ৩ উইকেট ১ রানে নিয়েছেন। ম্যাক্ক্যাব্ ৭ করে সহজে লেল্যাণ্ডের হাতে পড়লেন। ভোস পর পর ৩ উইকেট ফেললেন। রবিনসন তিনের মাথায় 'মিস্ হিট্' করে ক্যাচ তুললে হ্যামণ্ড ধরলেন। ওল্ডফিল্ড ৩৫ মিনিট খেলে ১০ করে বোল্ড হলে ও'রিলী এসে চিপারফিল্ডের সঙ্গে যোগ দেন। চিপারফিল্ড হতাশ হয়ে পিট্তে থাকেন এবং ৩১ মিনিটে ২৬ রান, ৪টা চার করেন। ও'রিলী ৩ করে গেলে শেষ খেলোয়াড় ওয়ার্ড আসেন ও ১ রান করেই বোল্ড হলে অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় ৫৮ রানে, মাত্র ৭১ মিনিটের মধ্যে। ম্যাক্কর্মিক অনুপস্থিত ছিলেন, লাম্বাগোর জন্যে।

এলেন ৩৬ রানে ৫ উইকেট ও ভোস ১৬ রানে ৪ উইকেট মাত্র ১২·৩ ওভারে নিয়েছেন, কিন্তু একটাও মেডেন পান নি।

ইংলণ্ড

প্রথম টেষ্ট—প্রথম ইনিংস

ওয়ার্দ্দিংটন—কট্ ওল্ডফিল্ড, বোল্ড ম্যাক্কর্মিক···	০
বার্ণেট—কট্ ওল্ডফিল্ড, বোল্ড ও'রিলী···	৬৯
ফ্যাগ—কট্ ওল্ডফিল্ড, বোল্ড ম্যাক্কর্মিক্···	৪
হ্যামণ্ড—কট্ রবিন্সন্, বোল্ড ম্যাক্কর্মিক্···	০
লেল্যাণ্ড—বোল্ড ওয়ার্ড···	১২৬
এইম্স্—কট্ চিপারফিল্ড, বোল্ড ওয়ার্ড···	২৪
হার্ডষ্টাফ্—কট্ ম্যাক্ক্যাব, বোল্ড ও'রিলী···	৪৩
রবিন্স্—কট্ সাব্ষ্টিটিউট্, বোল্ড ও'রিলী···	৩৮
এলেন—কট্ ম্যাক্ক্যাব্, বোল্ড ও'রিলী···	৩৫
ভেরিটি—কট্ সীভারস্, বোল্ড ও'রিলী···	৭
ভোস— নট্-আউট্···	৪
অতিরিক্ত···	৮
মোট···	৩৫৮

উইকেট পতন :

০ রানে ১, ২০ রানে ২, ২০ রানে ৩, ১১৯ রানে ৪, ১৬২ রানে ৫, ২৫২ রানে ৬, ৩১১ রানে ৭, ৩১১ রানে ৮, ৩৪৩ রানে ৯, ও ৩৫৮ রানে ১০

বোলিং : অষ্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
ম্যাক্‌করমিক্	৮	১	১৬	৩
সীভারস্	১৬	৫	৪২	০
ও'রিলী	৪০·৬	১৩	১০২	৫
ওয়ার্ড	৩৯	৩	১৩৮	২
চিপারফিল্ড	১১	৩	৪২	০
ম্যাক্‌ক্যাব্	২	০	১০	০

অষ্ট্রেলিয়া

প্রথম টেষ্ট—প্রথম ইনিংস

ফিঙ্গলটন্—বোল্ড ভেরিটি	···	১০০
ব্যাড্‌কক্—বোল্ড এলেন	··	৮
ব্র্যাডম্যান—কট্ ওয়ার্দ্দিংটন্, বোল্ড ভোস	···	৩৮
ম্যাক্‌ক্যাব্—কট্ বার্ণেট, বোল্ড ভোস	···	৫১
রবিন্‌সন্—কট্ হ্যামণ্ড, বোল্ড ভোস	···	২
চিপারফিল্ড—কট্ এইমস্, বোল্ড ভোস	···	৭
সীভারস্—বোল্ড এলেন	···	৮
ওল্ডফিল্ড—কট্ এইমস্, বোল্ড ভোস	···	৬
ও'রিলী—কট্ লেল্যাণ্ড, বোল্ড ভোস	···	৩
ওয়ার্ড—কট্ হার্ডষ্টাফ্, বোল্ড এলেন	···	০
ম্যাক্‌করমিক্— নট্ আউট	···	১
অতিরিক্ত	···	১০
মোট	···	২৩৪

উইকেট পতন :

১৩ রানে ১, ৮৯ রানে ২, ১৬৬ রানে ৩, ১৭৬ রানে ৪, ২০২ রানে ৫, ২২০ রানে ৬, ২২৯ রানে ৭, ২৩১ রানে ৮, ২৩১ রানে ৯ ও ২৩৪ রানে ১০

বোলিং : ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
ভোস	২০·৬	৫	৪১	৬
এলেন	১৯	২	৭১	৩
ভেরিটি	২৮	১১	৫২	১
রবিন্‌স্	১৭	০	৪৮	০
হ্যামণ্ড	৪	০	১২	০

ইংলণ্ড

প্রথম টেষ্ট—দ্বিতীয় ইনিংস



ওল্ডফিল্ড

ওয়ার্দ্দিংটন—ষ্টাম্পড্ ওল্ডফিল্ড, বোল্ড ম্যাক্‌ক্যাব	···	৮
বার্ণেট—কট্ ব্যাড্‌কক্, বোল্ড ওয়ার্ড	···	২৬
ফ্যাগ—ষ্টাম্পড্ ওল্ডফিল্ড, বোল্ড ওয়ার্ড	···	২৭
হ্যামণ্ড—হিট্ উইকেট, বোল্ড ওয়ার্ড	···	২৫
লেল্যাণ্ড—কট্ ব্রাডম্যান, বোল্ড ওয়ার্ড	··	৩৩
এইমস্—বোল্ড সীভারস্	···	৯
এলেন—কট্ ফিঙ্গলটন্, বোল্ড সীভারস্	···	৬৮
হার্ডষ্টাফ্—ষ্টাম্পড্ ওল্ডফিল্ড, বোল্ড ওয়ার্ড	···	২০
রবিন্‌স্—কট্ চিপারফিল্ড, বোল্ড ওয়ার্ড	···	০
ভেরিটি—এল-বি ডবলিউ, বোল্ড সীভারস্	···	১৯
ভোস— নট আউট	···	২
অতিরিক্ত	··	১৯
মোট	···	২৫৬

উইকেট পতন : ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস

১৭ রানে ১, ৫০ রানে ২, ৮২ রানে ৩, ১০৫ রানে ৪, ১২২ রানে ৫, ১৪৪ রানে ৬, ২০৫ রানে ৭, ২০৫ রানে ৮, ২৪৭ রানে ৯, ও ২৫৬ রানে ১০

বোলিং : অষ্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
ওয়ার্ড	৪৬	১৬	১০২	৬
সীভারস্	১৯·৬	৯	২৩	৩
ম্যাক্‌ক্যাব্	৬	১	১৪	১
ও'রিলী	৩৫	১৫	৫৯	০
চিপারফিল্ড	১০	০	৩৫	০

অষ্ট্রেলিয়া

প্রথম টেষ্ট—দ্বিতীয় ইনিংস

ফিঙ্গলটন—বোল্‌ড ভোস	...	০
ব্যাড্‌কক্‌—কট্‌ ফ্যাগ, বোল্‌ড এলেন	...	০
সীভার্‌স্‌—কট্‌ ভোস, বোল্‌ড এলেন	...	৫
ওল্ডফিল্ড—বোল্‌ড ভোস	...	১০
ব্র্যাড্‌ম্যান—কট্‌ ফ্যাগ, বোল্‌ড এলেন	...	০
ম্যাক্‌ক্যাব্‌—কট্‌ লেল্যাণ্ড, বোল্‌ড এলেন	...	৭
রবিন্‌সন্‌—কট্‌ হ্যামণ্ড, বোল্‌ড ভোস	...	৩
চিপারফিল্ড— নট্‌ আউট	...	২৬
ও'রিলী—বোল্‌ড এলেন	...	০
ওয়ার্ড—বোল্‌ড ভোস	...	১
ম্যাক্‌করমিস্‌— (খেলেন নি)		
অতিরিক্ত	...	৬
মোট	...	৫৮

উইকেট পতন :

০ রানে ১, ৩ রানে ২, ৭ রানে ৩, ৭ রানে ৪, ১৬ রানে ৫, ২০ রানে ৬, ৩৫ রানে ৭, ৪১ রানে ৮, ৫৮ রানে ৯

বোলিং : ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
এলেন	৬	০	৩৬	৫
ভোস	৬·৩	০	১৬	৪

ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার খেলায় কত অধিক সংখ্যক রান পূর্ব্বে উঠেছিল, তার হিসাব :—

১৯৩০	সালে	লর্ডসে	অষ্ট্রেলিয়া (৬ উইকেট)	৭২৯
১৯৩৪	„	ওভালে	„	৭০১
১৯৩০	„	„	„	৬৯৫
১৯২৮-২৯	„	সিড্‌নীতে	ইংল্যাণ্ড	৬৩৬
১৯৩৪	„	ম্যাঞ্চেষ্টারে	„ (৯ উইকেট)	৬২৭
১৯২৪-২৫	„	মেলবোর্ণে	অষ্ট্রেলিয়া	৬০০

ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার খেলায় পূর্ব্বে কত অল্প সংখ্যক রান উঠেছিল, তার হিসাব :—

১৯০২ সালে	—এড্‌বাস্‌টনে	অষ্ট্রেলিয়ার	৩৬
১৮৮৭-৮৮ „	—সিড্‌নীতে	অষ্ট্রেলিয়ার	৪২
১৮৯৬ „	—ওভালে	অষ্ট্রেলিয়ার	৪৪
১৮৮৬-৮৭ „	—সিড্‌নীতে	ইংলণ্ডের	৮৭

দেখা যায় যে, অষ্ট্রেলিয়া বেশী ও কম রানে দু'দিক দিয়েই প্রথম যাচ্ছে।

রঞ্জি প্রতিযোগিতা :

পশ্চিমভারত—১৮৩ ও ২৬২

গুজরাট—৭৭ ও ১০৫

পশ্চিম ভারত বনাম গুজরাটদলের খেলায় পশ্চিম ভারত ২৬২ রানে জয়ী হয়েছে। পশ্চিম ভারতদলের খাজা ২৩ রানে ৬ উইকেট পান। হরিমালি ৯২, শাহাবুর ৪২। ফৈজআমেদ এক ওভারে ৪টি বাউণ্ডারী করেন।

ফুটবলদলের বিদেশে আমন্ত্রণ :

আই এফ্‌ এ শ্যাম ও যবদ্বীপ থেকে সেদেশে ফুটবল দল পাঠাবার আমন্ত্রণ পেয়েছেন। সকল সর্ত্তের মীমাংসা হলে তাঁরা সেখানে ভারতীয় দল পাঠাবেন। কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য। এখানের ফুটবল খেলার সময় জুলাই ও আগষ্ট মাসে আই এফ এ দল পাঠাতে পারবেন না সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে পাঠাতে পারবেন, জাভাকে বলেছেন। পূর্ব্ব বছরও ঐ সময়ে দল গিয়েছিল। আই এফ এর চোখ ফুটেছে—দক্ষিণ আফ্রিকার মতন ভুল আর করবেন না। তবু ভালো।

১৯২৪ ও ১৯২৬ সালে ভারতীয় সম্মিলিত দল যবদ্বীপে গিয়েছিল। ১৯২৪ সালে এ বি রসার ভারতীয় দল নিয়ে যান। তারা ১০টি ম্যাচ খেলেন জাভায়, ২টি সিঙ্গাপুরে (১টি সম্মিলিত চীনাদলের সঙ্গে ও ১টি রেঙ্গুনে) এবং একটি খেলাতেও না হেরে বিজয় গর্ব্বে দেশে ফেরেন। এই দলের অধিনায়কতা করেছিলেন মোহনবাগানের মনি দাস।

১৯২৬ সালে পি গুপ্ত দল নিয়ে যান। এই দলটি প্রথম দলের মতন তেমন কৃত- কার্য্য হতে পারে নি। দলের দলের ক্যাপ্টেন সামাদ প্রথম খেলাতেই আহত হন, আর

খেলতে পারেন নি। সেণ্টার হাফ ব্যাক এন গোস্বামীও দ্বিতীয় খেলায় আহত হয়ে আর খেলায় যোগ দেন নি।

রসার ১৯২৫ ও ১৯২৯ সালে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দল নিয়ে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় দলের সঙ্গে এরিয়ানের এস মজুমদার ও বোগরা গিয়েছিলেন।

বিলাতের ফুটবলদলের আগমন ঃ

ইস্‌লিংটন কোরিন্থিয়ান্স নামে বিলাতের অবৈতনিক ফুটবলদল আগামী ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে চীনে যাবার পথে কলিকাতায় ফুটবল খেলে যাবেন বলে আই এফ একে জানিয়েছেন। তাঁদের দাবী তিন হাজার পাউণ্ড আই এফ এ অনুমোদন করেছেন। তবে ডিসেম্বর মাসে ক্যালকাটা ক্লাব তাদের মাঠ, হেডওয়ার্ড কোম্পানী তাদের গ্যালারী দেবেন কিনা এবং পুলিসের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ঐ সময় ফুটবল খেলার অনুমতি পাওয়া যাবে কিনা জেনে তবে আই এফ এ কোরিন্থিয়ান্সদের তাঁদের সম্মতিপত্র পাঠাবেন। আমরা আশা করি, এই সকল বাধা সহজেই অতিক্রান্ত হবে। এই সঙ্গে স্বতঃই মনে হয় এত বড় প্রতিষ্ঠান আই এফ এও না কতো শক্তিহীন। তাঁদেরও অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। আমরা বহুবার লিখেছি যে আই এফ এর নিজস্ব মাঠ ও গ্যালারী থাকা বিশেষ আবশ্যক, যতদিন না একটা পাকা ষ্টেডিয়ম গড়ে উঠ্‌ছে। একটা মাঠ ও গ্যালারী করতে বিশেষ কিছু অসম্ভব অর্থের প্রয়োজন হবে না। অথচ চীনাদল, কোরিন্থিয়ান্স প্রভৃতি কয়েকটি নামজাদা দল এলে যেরূপ অর্থাগম হবে তাতেই সকল অর্থব্যয় উঠে যাবে, আর পর-মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। তা'ছাড়া স্থানীয় বিশেষ বিশেষ খেলায়ও অর্থাগম মন্দ হবে না।



ক্যালকাটা রোভার্স দলের সভ্যত্রয়—এস দে, পি বসু ও ইউ ব্যানার্জ্জি (মালা গলায়) পায়ে হেঁটে মধুপুর ও পরেশনাথ পাহাড় গিয়েছেন। বাম পার্শ্বে, বি শর্ম্মা ও দক্ষিণ পার্শ্বে, রমানাথ বিশ্বাস, ইনি ১৯৩০ সালে সাইকেলযোগে ৪৫০০০ মাইল ভ্রমণ করেছেন। শীঘ্র দক্ষিণ আফ্রিকাভিমুখে ভ্রমণে বাহির হবেন ছবি—জে কে সান্যাল

৺বিজয় ভাদুড়ি ঃ

২১শে নভেম্বর শনিবার, ১৯১১ সালের শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগানের ও বাঙ্গালীর বিজে ভাদুড়ির টাইফয়েড রোগে মৃত্যু হয়েছে। তাঁর ছোট ভাই বিখ্যাত শিবে ভাদুড়ি পূর্ব্বে মারা যান। ১৯১১ সালে যাঁরা এই দুই ভায়ের খেলা দেখেছেন তাঁরাই জানেন যে ফুটবল খেলায় এঁদের কিরূপ নিপুনতা ছিল। বিজে ও শিবেয় মিলে যখন বল নিয়ে দৌড়োতো তখন তাদের আটকানো দুরূহ হতো। শিবে 'সেজদা ঠেলে দে' বলে এগিয়ে বল ধরে নক্ষত্রবেগে বিপক্ষকে কাটিয়ে গোলে বল মারলে প্রায়ই গোল হতো। ১৯১১ সালের ফাইনাল আজও চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌ছে। দুর্দ্ধর্ষ ইষ্টইয়র্ক দল যখন প্রথম গোল দিলে, ভারতীয়দের মন দমে গেলো। ইউরোপীয়দের আনন্দোচ্ছ্বাসের ভেতরে তারা ম্লান মুখে বসে রইল, তাদের বুক তখন ব্যথায় ভারাক্রান্ত। তারপর শিবে-বিজেতে বল নিয়ে গিয়ে যখন গোল করলে উপর্য্যুপরি দু'টো, তখন

ভারতীয়দের উল্লাসের ধ্বনি কলিকাতার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শোনা গিয়েছিল।

শিবে আগেই গেছেন, এখন বিজে গেলেন। এঁদের অন্তর্দ্ধানে বাঙ্গলার ফুটবল জগতের সত্যই ক্ষতি হয়।

বিজয় ভাদুড়ি বাল্যকাল থেকে ক্রীড়ানুরাগী ছিলেন এবং প্রথম থেকেই মোহনবাগান ক্লাবে খেলেন। তিনি কুচবিহারের স্বর্গীয় জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের এ-ডি-সি ছিলেন মহারাজার মৃত্যু পর্য্যন্ত।



বার্ণেট (গ্লসেষ্টার)। প্রথম টেষ্টে ৬৯ ও ২৬ করেছেন, এবং ম্যাক্‌ক্যাবকে লুফেছেন

অষ্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট ঃ

(৫) **এম সি সি**—৩৪৪ ও ৩৬ (৩ উইকেট)

ভিক্টোরিয়া—৩৮৪

চার দিনের খেলা অমীমাংসিত হয়ে শেষ হয়েছে। এম সি সি : প্রথম ইনিংস—বার্ণেট ১৩১, হার্ডষ্টাফ্ ৮৫, ফিস্‌লক্ ৪২। ফ্রেডারিক ৬৫ রানে ৬ উইকেট, এব্‌লিং ৪৯ রানে ২ ও ম্যাক্‌কর্‌মিক্ ৭৭ রানে ১ উইকেট পেয়েছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে—এম সি সি মাত্র ৩৬ রানে ৩ উইকেট খুইয়েছে। ফ্রেডারিক ১০ রানে ২ উইকেট ও এব্‌লিং ৪ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন।

ভিক্টোরিয়া : লী ১৬০, গ্রেগরী ১২৮। এলেন ৯৭ রানে ৩, ফার্নেস্ ৫৬ রানে ৩, ভোস ৫১ রানে ২, সিমস্ ৮৬ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন।

চতুর্থ উইকেট সহযোগিতায় রেকর্ড রান উঠেছে, লী ও গ্রেগরীতে মিলে রান তোলেন ২৬২।

১৯৩২-৩৩ সালের খেলায় এম সি সি এক ইনিংসে জয়ী হয়েছিল। সে জয়ের প্রধান কারণ ছিল হ্যামণ্ডের ডবল সেঞ্চুরী এবং এলেন, ভোস ও ভেরিটির যাদুকরী বোলিং।

(৬) **এম সি সি**—১৫৩ ও ৩১১

নিউসাউথ ওয়েলস ২১৭ ও ৩২৬

১৫৩ রানে নিউ সাউথ ওয়েলস্ জয়ী হয়েছেন। এম সি সির অষ্ট্রেলিয়ায় এই প্রথম হার হ'লো।

নিউ সাউথ ওয়েলস্ : প্রথম ইনিংস—রবিন্‌সন্ ৯১, ম্যাক্‌ক্যাব্ ৮৩, ফিঙ্গলটন্ ৩৯। হ্যামণ্ড ৩৯ রানে ৫, এলেন ৪৫ রানে ২, সিম্‌স্ ৭৩ রানে ২ ও কপ্‌সন ৭১ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন। দ্বিতীয় ইনিংস—চিপার ফিল্ড

(নট্-আউট) ৯৭, ম্যাক্ক্যাব ৪৬, ফিঙ্গলটন্ ৮২, মাজ ৩৪, মার্কস্ ৩৩। সিম্‌স্ ১০৩ রানে ৩, এলেন ৬৯ রানে ২, কপ্‌সন ৯১ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন।

এম সি সি: প্রথম ইনিংস—বার্নেট ৭০, হ্যামণ্ড ৩৯। মাজ ৪২ রানে ৬, ও'রিলী ৫৩ রানে ৩ এবং হোয়াইট ১৮ রানে ১ উইকেট পেয়েছেন। দ্বিতীয় ইনিংস—হ্যামণ্ড ৯১, লেল্যাণ্ড ৭৯, বার্নেট ৩৫, ওয়ার্দ্দিংটন ২৮। ও'রিলী ৬৭ রানে ৫, মাজ ৮৬ রানে ২ এবং হোয়াইট ২৩ রানে ২ উইকেট ফেলেছেন।

জার্ডিনের অধিনায়কতায় গত বারের টুরের খেলায় নিউ সাউথ ওয়েলসকে এক ইনিংস ও ৪৪ রানে এম সি সি হারিয়েছিল। স্কোর:—নিউ সাউথ ওয়েলস: ২৭৩ (ফিঙ্গলটন (নট্-আউট) ১১৯, ম্যাক্ক্যাব ৬৭; এলেন ৬৯ রানে ৫ ও টেট্ ৫৩ রানে ৪ উইকেট) এবং ২১৩ (কামিন্স ৭১; ভোস ৮৫ রানে ৫ উইকেট)।

এম সি সি: ৫৩০ (সাটক্লিফ্ ১৮২, এইম্‌স্ ৯০, ওয়্যাট ৭২, পতৌদী ৬১ ও ভোস ৪৬; ও'রিলী ৮৬ রানে ৪ ও হার্ড ১৩৫ রানে ৬ উইকেট)।

(৭) **এম সি সি**—২৮৮ ও ২৫৫ (৮ উইকেট)
অষ্ট্রেলিয়া ইলেভন—৫৪৪ (৮ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।

এম সি সি বরাত জোরে পরাজয় থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে। লেল্যাণ্ড ইংলণ্ডকে রক্ষা করেছে।

প্রথম ইনিংস—লেল্যাণ্ড ৮০, এইমস্ ৭৬, ফ্যাগ ৪৯, রবিন্‌স্ ৫৩। চিপারফিল্ড ৬৬ রানে ৮, ওয়েট ৪৮ রানে ১ ও এব্‌লিং ৭১ রানে ১ উইকেট পেয়েছেন।

দ্বিতীয় ইনিংস—লেল্যাণ্ড (নট আউট) ১১৮, এইম্‌স্ ৩৭, রবিন্‌স্ ৩৩; ওয়ার্দ্দিংটন ২৮। এব্‌লিং ৩৮ রানে ২, চিপারফিল্ড ৮৮ রানে ২, গ্রেগরী ৫৬ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন।

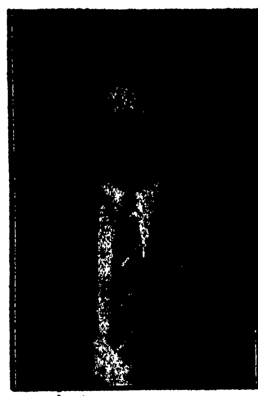
অষ্ট্রেলিয়া একাদশ: প্রথম ইনিংস—ব্যাড্‌কক্ ১৮২, ব্রাউন ৭১, ব্র্যাড্‌ম্যান ৬৩, ফিঙ্গলটন্ ৫৬, চিপারফিল্ড ৩৯। ভেরিটি ১৩০ রানে ৩, ফার্নেস ১১২ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন।

(৮) **এম সি সি**—২১৫ ও ৫২৮ (৮ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)
কুইন্সল্যাণ্ড—২৪৩ ও ২২৭ (৯ উইকেট)

খেলাটি অমীমাংসিত হয়ে শেষ হয়েছে। এম সি সি ৪৫৩ (৩ উইকেটে) হবার পর যদি ডিক্লেয়ার্ড করতো তবে তারা জয়ী হ'তে পারতো। কিন্তু শেষদিন লাঞ্চ পর্য্যন্ত খেলে ৫২৮ হলে ডিক্লেয়ার্ড করায় খেলাটি সমরাভাবে ড্র হয়ে যায়।

এম সি সি: প্রথম ইনিংস—লেল্যাণ্ড ৯৮, এইম্‌স্ ৪১, হ্যামণ্ড ৩৬, বার্নেট ২০। টি এলেন ২৭ রানে ৪, ডিক্সন ৫০ রানে ৩, অক্সেনহাম ৩৪ রানে ১ উইকেট নিয়েছে। দ্বিতীয় ইনিংস—বার্নেট ২৫৯, ফ্যাগ ১১২, এইম্‌স্ ৬০, ফিসলক্ ৪৯। ওয়েথ ৯৫ রানে ৩, এমোস ৯০ রানে ২, এলেন ১০৩ রানে ২ উইকেট পেয়েছে।

কুইনস্‌ল্যাণ্ড: প্রথম ইনিংস—ব্রাউন ৭৪, রোজার্স ৬২, ওয়েথ ২৯, এণ্ডরুজ ২৪। ভেরিটি ৫৫ রানে ৫, ফার্নেস ৭২ রানে ২, ভোস ৫৩ রানে ১ ও লেল্যাণ্ড ১৯ রানে ১ উইকেট নিয়েছে। ২য় ইনিংস—বেকার ৬৩, এণ্ডরুজ ৪৪, এমোস ৩৯। ফার্নেস ৪৫ রানে ৩, রবিন্‌স্ ৬৩ রানে ৪, ভেরিটি ৩১ রানে ২ উইকেট পেয়েছে।



মিষ্টার হেরল্ড লারউড—ইংলণ্ডের বিখ্যাত 'ফাষ্ট' বোলার। ইঁহার 'বডি-লাইন' বোলিং গতবারে অষ্ট্রেলিয়াকে বিশেষ আতঙ্কগ্রস্থ করেছিল। নূতন নিয়মে বডি লাইন উঠে গেছে, নূতন এল-বি-ডব্‌লিউ নিয়ম হয়েছে। ইনি সম্প্রতি ভারতে পাতিয়ালা মহারাজার দলের শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে এসেছেন। সম্ভাবতঃ বোম্বাই কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেট খেলায় ইউরোপীয়দলের হয়ে খেলবেন

১৯৩২-৩৩ সালের খেলায় এম সি সি এক ইনিংস ও ৬১ রানে জয়ী হয়েছিল। সেবার লারউডের মারাত্মক বোলিংএর কাছে কুইনস্‌ল্যাণ্ড দাঁড়াতেই পারে নি।

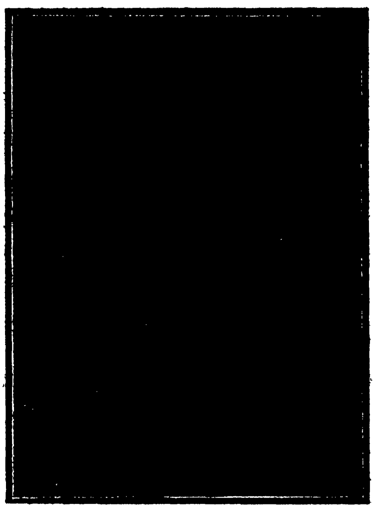
কুইনস্‌ল্যাণ্ড: ২০১ (কুক ৫৩, এণ্ডরুজ ৪৫, লিট্‌স্টার ৬৭; লারউড্ ২৪ রানে ২ উইকেট) এবং ৮১ (লারউড্ ৩৮ রানে ৬ উইকেট ও ভেরিটি ২০ রানে ৪ উইকেট)।

এম সি সি : ৩৪৩ (এলেন ৬৬, এইম্‌স্ ৮০ ও ওয়াট ৪০ ; অক্সেনহাম ৭০ রানে ৪ উইকেট)।

মুষ্টি যুদ্ধ ঃ

বিখ্যাত আমেরিকার নিগ্রো মুষ্টি যোদ্ধা গানবোট জ্যাক পয়েণ্টে ইয়ং ক্রিস্কোকে পরাজিত করেন। রেফারির বিচারে দর্শকরা সন্তুষ্ট হন নি।

গানবোট জ্যাক জাপানের চ্যাম্পিয়ন ফ্যাঙ্ক ম্যালিনোওকে পয়েণ্টে হারিয়েছেন। এদিনের বিচারেও দর্শকরা



গানবোট জ্যাক

সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। এই প্রতিযোগিতায় গানবোটই প্রকৃতপক্ষে পরাজিত হয়েছেন বলে জনসাধারণের ধারণা। গানবোট বহু যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন, কদাচিত তিনি পরাজিত হয়েছেন। কিন্তু ফ্রাঙ্ক ম্যালিনোও যেরূপ নির্ভীক হয়ে যুঝেছেন, জ্যাকের মুষ্ট্যাঘাত সয়েছেন ও প্রত্যুত্তর দিয়েছেন তাতে তাঁর শক্তির বিশেষ পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। তিনি কোন রাউণ্ডেই খারাপ লড়েন নি। তবুও ভাগ্যদোষে বিচারের ফল অন্যরূপ ঘোষিত হলে, ম্যালিনোওয়ের মুখে অসন্তোষের চিহ্ন ফুটে উঠলো।

অল্পদিন পূর্ব্বে এই দু'জন মুষ্টিযোদ্ধার কলম্বোতে শক্তি পরীক্ষা হয়। সেখানেও গানবোট পয়েণ্টে ম্যালিনোওকে হারিয়েছিলেন।

নিখিল ভারত কুস্তি প্রতিযোগিতায় জার্ম্মাণীর ভন্ ক্রেমার ও জলন্ধরের সর্দ্দার খানের কুস্তি হয়। ইহা মাত্র ৩ মিনিট স্থায়ী হয়েছিল। রেফারি ভন্ ক্রেমারকে জয়ী বলে ঘোষণা করলে দর্শকরা প্রতিবাদ করে, কারণ সর্দ্দার খান সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হবার পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়।



বিখ্যাত হাস্য-রসিক সিড্‌নী হাওয়ার্ড 'ফ্লাইং ডেমন' রূপে এবং কিং কং, ৭ ফুট ৪॥০ ইঞ্চি, 'ওয়াইল্ড বুল' রূপে কুস্তি ক্রীড়ারত

কলিকাতায় ক্রেমারের সঙ্গে রাজবংশী সিংয়ের মল্লক্রীড়া হয়। ইহা খুব উপভোগ্য হয়েছিল কিন্তু অমীমাংসিত হয়ে শেষ হয়েছে। ক্রীড়া ক্ষেত্রে বংশী সিংকে ক্রেমারের অপেক্ষা শক্তিশালী বলে দেখা গিয়েছিল। সে ক্রেমারকে চিৎ করতে বিশেষ চেষ্টা করেও পেরে ওঠে নি। তবে ক্রেমার এই যুদ্ধে বিশেষরূপ বিপর্য্যস্ত ও আহত হয়েছেন। ক্রেমার

অপেক্ষা বংশী অন্ততঃ ৫ ষ্টোন ওজনে বেশী ও ৩ ইঞ্চি লম্বায় বড়। রেফারী ছিলেন বলাই চট্টোপাধ্যায়।

কুস্তিতে ভারতের মল্লবীর গামা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁর ভ্রাতা ইমাম্ বক্স দ্বিতীয়। পূর্ব্বে গোঙ্গা পালোয়ানকে পরাজিত করে ক্রেমার ভারতের মল্লবীরদের মনে ত্রাসের উদ্রেক করেন। গোঙ্গা একজন বিশিষ্ট কুস্তিগীর।

রামপ্রিকা পণ্ডিতের সঙ্গে রুমেনিয়ার কুস্তিগীর আর্ণেষ্ট ককসিসের মল্লযুদ্ধ হয়। ইনি ১৯৩২ সালে অলিম্পিকে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। ক্রেমার দ্বিতীয় হয়েছিলেন, কিন্তু তিন মাস পরে চ্যাম্পিয়নকে জার্ম্মাণীতে পরাজিত করে পৃথিবীর চ্যাম্পিয়ন হন। রেফারি নবাব বাহাদুর মুর্শিদাবাদ রামপিকাকে বিজয়ী বলে ঘোষিত করেন, ককসিস্ ও তার ম্যানেজারের প্রতিবাদ সত্ত্বেও।

নিখিল ভারত কুস্তি প্রতিযোগিতায় এলাহাবাদে কুস্তিগীর ককসিসের লাহোরের মহম্মদ সফির নিকট ৭ মিনিটে পরাজয়ে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মহম্মদ সফি একজন মিস্ত্রি, সে যে ককসিস্‌কে পরাজিত করতে পারবে তা কেহই ভাবে নি। মহম্মদ সফি বিজয়ী হয়ে বেশ লাভবান হয়েছে। আনন্দে উন্মত্ত জনতা সফিকে টাকা ছুঁড়ে মেরেছে, তার প্রচুর অর্থ প্রাপ্তি হয়েছে।

লক্ষ্ণৌতে সোহন সিংয়ের সঙ্গে সরদার খাঁর কুস্তি হয়েছিল। সোহন সিং অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর জয়ী হয়েছে।

অমৃতসরের নিজাম পালোয়ান ক্রেমার-বংশীর বিজয়ীর সঙ্গে লড়তে সম্মত আছেন। নিজাম যে কোন সর্ত্তে ক্রেমারের সঙ্গে লড়তে চেয়েছেন। তিনি বলেন, দৈবক্রমে ক্রেমার গোঙ্গাকে পরাজিত করেছেন। গোঙ্গা বে-কায়দায় না পড়লে ক্রেমারের জেতা শক্ত হতো। নিজাম অমৃতসরে দু' মিনিটে পুরাণ সিংকে পরাজিত করেছিলেন। পুরাণ সিং দ্বারভাঙ্গায় ক্রেমারকে হারিয়ে দেন। দেখা যাক, ক্রেমার ও বংশীর মল্লযুদ্ধ পুনরায় হয় কিনা এবং ক্রেমার নিজামের সঙ্গে লড়তে যান কি না।

কলিকাতায় ক্রিকেট ঃ

বেঙ্গল জিমখানা—২৩২
ইউরোপীয় স্কুল—১৬৮ (২ ইনিংসে)

টালা পার্কে খেলে বেঙ্গল জিমখানা ইউরোপীয়ান স্কুল দলকে এক ইনিংস ও ৬৪ রানে পরাজিত করেছে। বেঙ্গল জিমখানা এক ইনিংসে ২৩২ ও ইউরোপীয়ান স্কুল দু' ইনিংসে মোট ১৬৮ রান করেন।

ক্যালকাটা—২২২ (৪ উইকেট)
বালিগঞ্জ—৫২

ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব ৭ উইকেটে বালিগঞ্জকে হারিয়েছে। গুরলের বোলিং ও স্কিনার, লংফিল্ডের চমৎকার ব্যাটিং এ খেলার বিশেষত্ব ছিল। গুরলে ২৮ রানে ৭ উইকেট পেয়েছেন। স্কিনারের এ-দিনের সেঞ্চুরি নিয়ে মোট তিনটি সেঞ্চুরি হলো।

কোল্ট—১২০
পিকের দল—১৬৩ ([illegible] উইকেট)

কোল্টের একাদশের সঙ্গে পিকের একাদশের খেলায় কোল্ট দল ৪ উইকেটে পরাজিত হয়েছে। কোল্ট দলের



বেঙ্গল জিমখানা—ইউরোপীয় স্কুলকে পরাজিত করেছে

ছবি—তারক দাস

পি ডি দত্ত ব্যাটিং ও বোলিংএ বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রান ২৪ করেন এবং ৪৪ রানে ৫ উইকেট পান।

স্পোর্টিং ইউনিয়ন—১৬৩ (৮ উইকেট)

রেঞ্জার্স—৮৫

স্পোর্টিং ৭৮ রানে জয়ী হয়েছে। কে বোস ৪৯, জি বোস ৪৪, বাবু বোস ৩৩। এন হ্যামণ্ড ৫১ রানে ৫, ডবলিউ মুণ্ডেন ২৭ রানে ১, ব্রাডলে ৪৩ রানে ১ উইকেট। রেঞ্জাসের এন হ্যামণ্ড (নট আউট) ৪২, এ বেডেল ১৮। জে এন ব্যানার্জ্জি ১৭ রানে ৪, চুনিলাল ২১ রানে ২, এন রায় ২৪ রানে ২, বি সর্ব্বাধিকারী ৯ রানে ১ উইকেট।

বেঙ্গল জিমখানা—১৫৫

কুচবিহার দল—১২৫

বেঙ্গল জিমখানা দেড় দিনের খেলায় ৩০ রানে কুচবিহারের মহারাজার দলকে হারিয়েছে। বেঙ্গল জিমখানার কে খাম্বাটা ৫১, এস দেব ২৩, কে ভট্টাচার্য্য ১৮। বিল হিচ্ ৬৪ রানে ৩, বেরেণ্ড ৩২ রানে ২, সুশীল বোস ২৪ রানে ২ ও মহারাজা ২৬ রানে ১ উইকেট পেয়েছেন।

কুচবিহার দলের বেরেণ্ড ৪০, এস রায় ৩০, বিল্ হিচ্ ১৫। কে ভট্টাচার্য্য ২১ রানে ৪, জে আরহাম্ ৩১ রানে ৩ ও এলেকজাণ্ডার ২৮ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন।

স্পোর্টিং ইউনিয়ন—১৯১

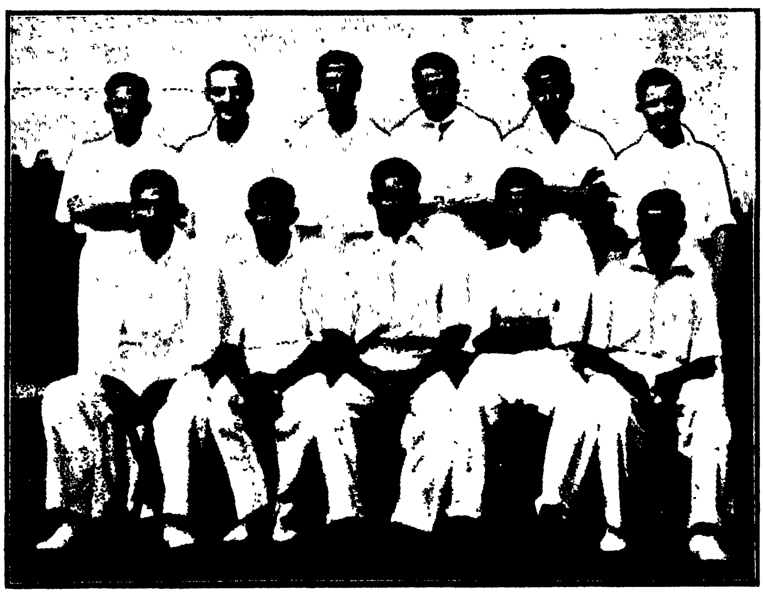
ক্যালকাটা—১৭৯ (৮ উইকেট)

খেলা ড্র হয়েছে।

স্পোর্টিং : কে বোস ৬৪, জি বোস ৩৩, এন চ্যাটার্জ্জি



ইউরোপীয়ান স্কুল। ইহারা বেঙ্গল জিমখানার বিপক্ষে খেলে হেরে গেছে
ছবি—তারক দাস



কুচবিহার মহারাজার একাদশ—কে বোস, জি বোস প্রভৃতি
ছবি—জে কে সান্যাল

২৩, এস গাঙ্গুলি ২২, বি গুপ্ত ২১; মিচেল-ইন্‌স্ ৭২ রানে ৬, স্কিনার ৫০ রানে ৪ উইকেট।

ক্যালকাটা: হোসী ৪৮, ভ্যানডারগাচ্ ৪৮, স্কিনার ৩৮; জে এন ব্যানার্জ্জি ৫৬ রানে ৪, প্রফেসর এস রায় ৩৭ রানে ২, চুণিলাল ৫৩ রানে ১ উইকেট।

ইষ্ট বেঙ্গল—২৩৫
(৬ উইকেট)

মহমেডান স্পোর্টিং—
১৪৬

মহমেডান স্পোর্টিং ৯২ রানে পরাজিত হয়েছে। ইষ্ট বেঙ্গলের ডি দাস (৯৩) ও কে রায়ের (৮৫) ব্যাটিং বিশেষ প্রশংসনীয় হয়েছিল। বোলিংএ ডি বসু ৩৬ রানে ৪ ও টি রায় ৯ রানে ৪ উইকেট পেয়েছেন। মহমেডানের সর্ব্বোচ্চ রান ৪০ করেন আজিজুর রহমন।

টেনিস খেলোয়াড়ের ক্রমপর্য্যায় ঃ

বিলাতের লন্ টেনিস এসোসিয়েশনের ক্রমপর্য্যায়ে ফ্রেড পেরী প্রথম স্থান লাভ করেছেন।

পুরুষ:—(১) ফ্রেড পেরী, (২) হিউজেস্, (৩) হেয়ার, (৪) লী, (৫) টাকে, (৬) পিটারস্, (৭) বাট্‌লার, (৮) সার্প, (৯) ওয়াইল্ড।

মহিলা:—(১) রাউণ্ড, (২) ষ্ট্যামার্স, (৩) কিং, (৪) জেমস্, (৫) হার্ডউইক্, (৬) নোয়েল, (৭) সণ্ডার্স, (৮) নাথাল, (৯) হেলে, (১০) স্ক্রিভেন।

ফ্রেড পেরী বেতনভুক্ খেলোয়াড় ঃ

আমেরিকার সংবাদে জানা গেছে যে ইংলণ্ডের বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় ফ্রেড পেরী বেতনভুক্ খেলোয়াড় হ'তে স্বীকৃত হয়ে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। ১৯৩৩ সাল থেকে এ পর্য্যন্ত পেরী টেনিস জগতে অদ্বিতীয় আছেন। বেতনভুক্ খেলোয়াড় হ'লে তিনি আর বিখ্যাত ডেভিস কাপে খেলতে পারবেন না। তাঁর অভাবে ইংলণ্ডের পক্ষে ডেভিস্ কাপ রক্ষা করা দুরূহ হবে।



ইউরোপীয় একাদশ—কুচবিহার মহারাজার দলের সঙ্গে খেলায় ড্র করেছে

ছবি—জে কে সান্যাল

আগামী জানুয়ারী মাসে ম্যাডিসন স্কোয়ারে বেতনভুক্ খেলোয়াড় হিসাবে পেরী প্রথম খেলবেন। দর্শকদের প্রবেশ মূল্য থেকে বৎসরে অনুমান লক্ষ ডলার পাওয়া যাবে, তার একটা অংশ পেরী পাবেন। বিখ্যাত বেতনভুক্ খেলোয়াড়দের—টিল্‌ডেন, ভাইন্‌স প্রভৃতির সঙ্গে তার খেলা হবে।

চ্যারিটির অর্থ ঃ

৬ই নভেম্বর তারিখে আই এফ এর অর্থ-বণ্টন কমিটির সভায় স্থির হয়েছে যে, এ বৎসরের সমস্ত চ্যারিটি খেলায় লব্ধ ৩৮,৫০০ টাকার মধ্যে ১১,০০০ টাকা হাসপাতালে এবং বাকী টাকা ২৭,৫০০ ইউরোপীয় ও ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে বিতরিত হবে। সম্ভবতঃ এখনও প্রাপ্য টাকা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির হস্তে পৌছায় নি। জুলাইয়ের শেষে সাধারণতঃ ফুটবলের ফাইনাল খেলা শেষ হয়ে যায়। তারপর সুদীর্ঘ তিনমাসকাল অতিবাহিত হয়ে গেলো মিটিং করে স্থির করতে প্রার্থীদের নাম ও তাদের দেয়

টাকার পরিমাণ! এখন পুলিস কমিশনারের অনুমোদন পেলে টাকা বিতরিত হবে। আমরা পূর্ব্বেও বলেছি, এখনও বলছি, আই এফ এর এ বিষয়ে তৎপরতা দেখান কর্ত্তব্য।

নিখিল ভারত টেনিস স্কুল ঃ

দিল্লী লন্ টেনিস এসোসিয়েশনের সভার আলোচনা থেকে জানা যায় যে, নিখিল ভারত লন্ টেনিস এসোসিয়েশনের অনেক টাকা মজুত আছে। কিন্তু তাঁরা টাকার সদ্ব্যবহার করছেন না বা করবার ইচ্ছাও তাঁদের নাই, দিল্লীর এসোসিয়েশন মনে করেন। নইলে ডেভিস কাপে বা অষ্ট্রেলিয়ান টেনিস প্রতিযোগিতায় ভারতীয় খেলোয়াড় পাঠাতে তাঁরা অনিচ্ছা প্রকাশ করতেন না। অজুহাত —ভারতীয় খেলোয়াড়রা ঐ সকল প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবার অনুপযুক্ত। যখন বৈদেশিক টেনিস শিক্ষক আনাবার এবং তার খরচ ৮০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত স্থির হলো, তখন নিখিল ভারত এসোসিয়েশন আপত্তি করে মত প্রকাশ করলেন যে শিক্ষক আনিয়ে বিশেষ কোন লাভ হবে না। এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করে দিল্লী এসোসিয়েশন ভারতীয় খেলোয়াড়দের শিক্ষা দেবার জন্য টেনিস শিক্ষার স্কুলের পরিকল্পনার খসড়া নিখিল ভারতের কাছে প্রেরণ করেছেন।

প্রত্যেক প্রদেশ একজন করে খেলোয়াড় শিক্ষার্থ ঐ শিক্ষা-কেন্দ্রে পাঠাতে পারবেন। নিখিল ভারত যদি মনে করেন, কোন প্রদেশ থেকে একাধিক খেলোয়াড় আনা উচিত, তাও তাঁরা করতে পারবেন। উক্ত স্কুল পরিচালনার ভার নিখিল ভারত এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক মনোনীত একটি সাব্-কমিটির উপর থাকবে। শিক্ষার সময় হবে সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগ থেকে নভেম্বরের প্রথম পর্য্যন্ত। ১৫জন খেলোয়াড় নিয়ে যদি স্কুল আরম্ভ হয়, তবে ঐ দেড় মাসে সর্ব্বসমেত দশ হাজার টাকা ব্যয় হবে।

দিল্লীর এসোসিয়েশনের এই স্কুল পরিকল্পনা সর্ব্বান্তকরণে অনুমোদন করি। মজুত টাকা আবদ্ধ করে রাখলে কোন লাভ হয় না। টাকার সদ্ব্যবহার হওয়া আবশ্যক। অন্য দেশের বড় বড় প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড় পাঠাতে তাঁদের আপত্তির কারণ যদি উচিত বলে মেনে নেওয়া যায়, তবে বৈদেশিক খেলোয়াড় এনে ভারতীয় খেলোয়াড়দের ঐ সকল প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার মতন যোগ্যতা অর্জ্জনে বাধা দেওয়া যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না। স্কুল পরিকল্পনা বিষয়ে আশা করা যায়, নিখিল ভারত এসোসিয়েশনের আপত্তির কারণ হবে না। দিল্লীর এসোসিয়েশনের সঙ্গে অন্য প্রদেশের লন্ টেনিস এসোসিয়েশনগুলির যোগ দিয়ে যাতে ভারতীয় টেনিসের উন্নতির জন্য আবদ্ধ টাকা ব্যয়িত হয় তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করান প্রত্যেক এসোসিয়েশনেরই কর্ত্তব্য।

ভারতে ক্রি

পাতিয়ালা মহারাজার দল—৪৪২

আস্গার সাহেবের দল—২৭২ ও ৫০ (৫ উইকেট)

খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। পাতিয়ালা দলে অমরনাথ, ব্রোমলী ও স্কেফ যোগদান করেছিলেন। অমরনাথ ১২৩, স্কেফ্ ৮৬, ব্রোমলী ৪৩, ওয়ার্ণে ৭১; মাসুদ ৯৪ রানে ৪, ইনামুল হক ৬১ রানে ২, আনওয়ার ৭০ রানে ২ উইকেট।

জলন্ধরের আস্গর সাহেবের দলের মহারাজ কিষেণ (নট-আউট) ৭৬, ক্যাপ্টেন নারায়ণ সিং ৪৭; অমরনাথ ৪৮ রানে ৪, ফিরোজ খাঁ ৬৮ রানে ৩, ব্রোমলী ৬০ রানে ১ উইকেট। ব্রোমলী মাত্র ২টি ওভার খেলে ৪৩ রান করেন; তিনি প্রত্যেক বলই মেরে খেলেছেন। স্কেফ কি করে উইকেট রক্ষা করতে হয় সে কৌশল দেখিয়ে কেবল গ্লেসিং ও হুক্ করে রান তুলেছেন।

ফ্রি ল্যান্সার্স—১৬৫ ও ১০৬ (৪ উইকেট)

সিন্ধুদল—৩১০ ও ১৬০

ফ্রি ল্যান্সার্স ৬ উইকেটে জয়ী হয়েছে। দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ হলো, তখন মাত্র ১ ঘণ্টা সময় বাকী। ঐ সময়ে ফ্রি ল্যান্সার্স ১০৬ রান তুললে তবে জয়ী হবেন। বেপরোয়াভাবে পিটিয়ে খেলতে আরম্ভ করে ঠিক ৬০ মিনিটে ১৬০ রান তুলে ফ্রি ল্যান্সার্স জয়ী হলো। অমরনাথের হুকিং, পুলিং ও হিটিংগুলি দেখবার মত হয়েছিল। ওয়াজির আলিও ত্রুটিহীন খেলেছেন, তাঁর অন্-ড্রাইভ ও পুলিং বিশেষ প্রশংসিত হয়েছিল।

ফ্রি ল্যান্সার্স: প্রথম ইনিংস—ওয়াজির আলি ১৫০, অমরনাথ ৮৯, কামারুদ্দিন ৫৯; মোবেদ ৪২ রানে ৫, গোলাম মহম্মদ ৪৬ রানে ২। দ্বিতীয় ইনিংস—আমীর ইলাহী ৫৬, আসগর লতিফ ২৪।

সিন্ধু : প্রথম ইনিংস—গোপালদাস ১০১, নাওমল ৪২, আবেদ ৩১ ; অমরনাথ ৩৮ রানে ২, সাহাবুদ্দিন ১২৩ রানে ৫, আমীর ইলাহী ৭৬ রানে ৩। দ্বিতীয় ইনিংস—দীপচাঁদ ৪৫, গোপালদাস ৪৪ ; সাহাবুদ্দিন ৭৫ রানে ৭, অমরনাথ ২৫ রানে ১, আমীর ইলাহী ৫০ রানে ১।

মধ্যপ্রদেশ কোয়াড্রাঙ্গুলার :

পার্শী : ১২৮ ও ৩৩ ; হিন্দু : ৪৭ ও ৬৩।

এগার বৎসর পরে পার্শীরা সারানগড় দরবার কাপ্ জয়ী হলো হিন্দুদের ৫১ রানে ফাইনালে হারিয়ে। ক্যাপ্‌টেন জে ইরাণীর ফিল্ডিং অতি সুন্দর হয়েছিল, এমন ভাবে তিনি তাঁর দলের খেলোয়াড়দের সাজিয়েছিলেন যে বিপক্ষ একটিও রান ফাঁকি দিয়ে করতে পারে নি।

বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন সিপ :

১১ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কয়েকটি খেলার ফলাফল : এই প্রতিযোগিতার খেলা ইডেন গার্ডেনে চল্‌ছে। মেয়েদের ডবল সেমিফাইনালে মিসেস ম্যাক্‌ইন্‌স্ ও মিস হোম্যান এবং মিসেস বোল্যাণ্ড ও মিসেট ফুটিট পৌছেছেন।

সিঙ্গলসের কোয়াটার ফাইনালে ফরাসী খেলোয়াড় এম্ ডুপ্রে গত দু' বৎসরের চ্যাম্পিয়ন হজেসকে ৬ ২, ৬ ৩ গেমে হারিয়েছেন।

ফরাসী দেশের ক্রমপর্য্যায়ে ডুপ্রে ১৯২৮ সালে নবম স্থান, ১৯২৯ সালে সপ্তম স্থান, ১৯৩০ সালে ষষ্ঠ স্থান, ১৯৩১ সালে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছিলেন।

১৯৩১ সালের ক্রমপর্য্যায় :—(১) ল্যাকোষ্ট, (২) ব্রুনো, (৩) কোসে, (৪) বোরোট্রা, (৫) ডুপ্রে।

এম ডুপ্রে ৬-২, ৬-১ গেমে এইচ ডোভারকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছেন। এস সি বেটি ৫-৭, ৬-১, ৯-৭ গেমে মিচেল মোয়রকে হারিয়ে ফাইনালে পৌছেছেন। এম ডুপ্রে ও এস সি বেটির সঙ্গে সিঙ্গেলসের ফাইনাল খেলা হবে।

এল ব্রুক্ এড্‌ওয়ার্ডস্ ও মিসেস বোল্যাণ্ড মিক্সড ডবল ফাইনালে মিষ্টার ও মিসেস ম্যাক্‌ইন্‌সের সঙ্গে খেলবেন।

মিসেস বোল্যাণ্ড ৬-০, ৬-০ গেমে মিস ফিলিপকে হারিয়েছেন।

মেয়েদের ডবল ফাইনালে মিসেস্ ম্যাক্‌ইন্‌স ও মিস হোম্যান ৮-১০, ৬ ৪ ৬-৩ গেমে মিসেস বোল্যাণ্ড ও মিসেস ফুটিটকে পরাজিত করেছেন।

লক্ষ্ণৌ প্রতিযোগিতায় সোহনলাল ৬-২, ৬-৪ গেমে প্রাগনাথকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছেন।

সি এল মেটা ও সাবুর ৬-৪, ৬ ২ গেমে সোহনলাল ও আহাদ হুসেনকে হারিয়ে পুরুষদের ফাইনালে উঠেছেন।

বেট্টি ও যুধিষ্ঠির সিং ৬-৩, ৬-১ গেমে গাউস মহম্মদ ও ই হাস্‌ম্যানকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছেন।

মেয়েদের ডবল ফাইনালে মিস্ ডুবাস ও মিস্ উড্‌কক্ ৬-৪, ৬-২ গেমে মিসেস উইস্‌হার্ট ও মিসেস বিসপকে হারিয়ে বিজয়িনী হয়েছেন।

গাছ

শ্রীঅচ্যুত রায়

গাছটাকে মেসের জানালা থেকে স্পষ্ট দেখা যেত। মেস-জীবনের প্রথম পাঁচ বছর সকালবেলা ঘুম ভেঙেই ওকে দেখে এসেছি। মেসের সবচেয়ে পুরাণো মেম্বারকে জিজ্ঞেস করেছি গাছটার বাল্যাবস্থা কেউ দেখেনি। কবে থেকে ও আছে পার্কের মধ্যে—সে খবরও কেউ জানে না।

বৃষ্টির জলে পুষ্ট হয়ে শরৎকালে সবুজ পাতার বাহার ছুটিয়েছে। শীতকাল ভরে পাতা ঝরিয়ে সরু সরু ডালগুলিকে চারিদিকে বিস্তার করেছে। কত কুয়াশামলিন বিনিদ্র রাত আমি ওর দিকে চেয়ে কাটিয়েছি। মনে হয়েছে ওর এই পত্রহীন জীবন যেন আমারি জীবনের প্রতিচ্ছবি, আমরাই এই পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় দুটি হতভাগা। কিন্তু দখিন হাওয়া বহার সাথে সাথে কচি কচি পাত আর হলদে হলদে ফুলে সমস্ত গাছটা ছেয়ে গেছে। সে ফুলের নাম কেউ জানে না। খুব ছোট ছোট পাপড়ি তার। তা দিয়ে মালা গাঁথাও যায় না। সে ফুল সকালে ফোটে সন্ধ্যার ঝরে ; সমস্ত বসন্তকাল ধরে এই উৎসবে ৎ

ব্যস্ত থাকে। পার্কটা মেসের দক্ষিণে। দক্ষিণদিকের জানালা বন্ধ করার যো নেই। আমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে যেতাম ওর এই উৎসব, ওর এই ফুল ফোটানোর খেলা। মনে ভাবতাম—আসুক শীতকাল, আমার মত হতভাগা ওকেও হতে হবে। এটা ওর অভিনয়, শীতের রিক্ততার কাছে একটা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ পাবার জন্য। আমার জীবনে যা আছে তার কাছে আমি কোনোদিন অবিশ্বাসী হই নি। হোক সে দারিদ্র্য, হোক সে অভাব, তবু আমি তাকে প্রাচুর্য্যের ক্ষণিক পরশে কোনোদিন মলিন করি নি।

পাঁচটি বছর কেটে গেছে, পাঁচটি বছর ধরে আমি ওর এই অভিনয় দেখেছি। শীতকালের রাত্রে এক একদিন ওর দিকে চেয়ে থাকতে ভয় করেছে। মনে হয়েছে মাঘ ফুরোলেই হাওয়া বইবে দক্ষিণ থেকে। ওরই ঝরা পাপড়িগুলি হাওয়ায় ভেসে এসে আমার বিছানা ছেয়ে ফেলবে আর ওর গন্ধেই রাত্রে আমার ঘুম আসবে না। ঠিক করলাম এ মেস ছেড়ে অন্য কোন মেসে যাবো—যে মেস্ থেকে কোন গাছ দেখা যায় না। দেখা গেলেও তা শীতকালের সাথী হয়ে বসন্তে বিদ্রূপ ক'রে মনে মনে আমোদ পায় না।

কিন্তু মেস্ আমাকে ছাড়তে হয় নি। কর্পোরেশনের কতকগুলি মজুর এসে একদিন গাছটাকে কেটে ফেল্‌ল।

যৌবনের আরম্ভে একটা বিষাদভাব আমায় পেয়ে বসেছিল। মৃত্যুর আধিপত্যের কথা ভেবে, মানুষের কপটতা দেখে বেঁচে থাকাটা অনেক সময় একটা বোঝা বলে মনে হত। ভাবতাম, জীবন একটা জটিল বস্তু। বাইরের সকল ক্ষমতা এর দিকে তাদের খড়্গ উঁচু করে আছে; যেমন করে হোক তারা এতে একটা সমাপ্তি আনতে চায়। ভিতরের এতটুকু ক্ষমতা নিয়ে তাদের সাথে যুঝ্‌তে যুঝ্‌তে একদিন হঠাৎ সব শেষ হয়ে যায়; ঠিক এই জন্যই বিয়ে করিনি। মা চোখের জল ফেলেছেন, বৌদি অনুরোধ করেছেন, শেষে আমাকে পাষাণ আখ্যা দিয়ে নিরস্ত হয়েছেন; তখনও আমি এ মেসে আসিনি।

এ মেসে আসার পর ঐ গাছটাই আমার দৃষ্টি প্রথমে আকর্ষণ করে, ওর সাজসজ্জা দেখে ঈর্ষায় জলে যেতাম। চেয়ে থাকি অথবা চোখ বুঝি, মনের অন্ধকার একটুও ঘুচতে চায় না। ও তেমনি কালো, তেমনি নিবিড়। মানুষ হয়ে পাঁচজনের দোষগুণ ভুলে তাদের দুঃখ সুখের সাথী হতে প্রবৃত্তি হয় না—তাদের কাছ থেকে পালিয়ে আসি দূরে থাকার জন্য; আর আমার সামনে ও তার হলদে হলদে ফুলের মধ্য দিয়ে যৌবনের বিজ্ঞাপন জাহির করে মৃদু বাতাসে কেঁপে ঝরা-দলে সবুজ ঘাসের উপর একখানা হলদে চাদর বিছিয়ে চারিদিকে সুন্দর একটি আবহাওয়া সৃষ্টি করে নেয়; পথচলা পথিকের দৃষ্টি আপনা থেকেই ওর উপরে পড়ে।

তবু ওর কাছ থেকে একটা নতুন জিনিস শিখেছিলাম। ঘরের সকল দরজা বন্ধ করে শুধু দক্ষিণেরটা খোলা রেখে গোপনে হাসতে চেষ্টা করতাম। কখনো আয়না সামনে রেখে কখনো বা এমনি ভাবতাম, এমনি করে সত্যিকারের হাসি হাসতে শিখে যাবো, চিরজীবন মুখ গম্ভীর করে কাটাতে হবে না, বৌদিও আমাকে আর পাষাণ আখ্যা দেবেন না। অন্ধকারও বোধ হয় একটু কমে এসেছিল।

ওর অভাব আজ পূর্ণমাত্রায় অনুভব করছি। পার্কটায় আর কোন গাছ নেই। দূরের যাও দু একটা চোখে পড়ে তাতে কোন ফুল ফোটে না। মেস্ ছেড়ে যেতে চেয়েছিলাম বলে নিজের উপর দয়া হয়। মাঝে মাঝে ভয় করে, আবার বুঝি অন্ধকার এলো; মৃত্যুকেই বুঝি জীবনের লক্ষ্য বলে গ্রহণ করলাম; মানুষকে বুঝি ভাল চোখে দেখতে শিখলাম না!

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রণীত (কবিতা) "ব্রাউনীং পঞ্চাশিকা"—২৲
শ্রীঅমিয়কুমার রায়চৌধুরী প্রণীত "খোস গল্প"—⃒৵৹
শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল প্রণীত উপন্যাস "ঝিকিমিকি"—১৷৹
শ্রীযতীন্দ্রকুমার পাল প্রণীত "বিবাহ মন্ত্র"—৷৹
শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য বিরচিত "বর্ষার জ্যোৎস্না"—১৷৹
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত "আগুনের পাহাড়"—৷৵৹
শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত "মনের গহনে"—১৷৹
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রণীত "প্রেম ও পাদুকা"—১৷৹
শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বাঁকা পথ"—১৷৹
শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত (কবিতা) "মনোমুকুর"—১৲
বাসব ঠাকুর প্রণীত "দ্বিতীয় বিপ্লব"—১৲
শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "বেড্ নম্বর ৩৯"—২৲
শ্রীযুক্তা তমাললতা বসু প্রণীত "কথার দাম"—১৷৹
শ্রীমতী আশালতা দেবী প্রণীত "পাওয়ার বেদনা"—১৷৹
কাজী কাদের নওয়াজ প্রণীত (কাব্য) "মরাল"—১৷৹
শ্রীমিহিরকুমার সিংহ সম্পাদিত "কালোভূত"—৸৹
শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত "মরণ গোলাপ"—৷৵৹

Editor :—
RAI JALADHAR SEN BAHADUR

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons, at the Bharatvarsha Ptg. Works 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta



দ্বিতীয় খণ্ড	চতুর্বিংশ বর্ষ	দ্বিতীয় সংখ্যা

প্রাচীন ভারতে ব্যবহার শাস্ত্র

শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন (এডভোকেট)

(১)

রাষ্ট্র সমাজ এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যে বন্ধন অপরিহার্য্য তাহার নাম আইন। স্বেচ্ছায় মানুষকে এই বন্ধন স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে—না লইয়া তাহার উপায় ছিলনা। যে স্বাধীনতাকে মানুষ তাহার জন্মগত অধিকার বলিয়া দাবী করে, তাহা নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা নয়, তাহার অর্থ নিজের জাতিকে বাঁধিবার জন্য নিজ হস্তে শৃঙ্খল রচনা করিবার নির্ব্ব্যূঢ় অধিকার।

সৃষ্টির প্রথম যুগ হইতে মানুষ কোন না কোনও প্রকার আইনের নাগপাশে বদ্ধ। বর্ব্বর যুগের অন্ধ সংস্কারের যে বন্ধন তাহারই মধ্যে সভ্যযুগের বিধিবদ্ধ উন্নত আইন শাস্ত্রের অঙ্কুর নিহিত। অসভ্য নর-খাদক জাতির মধ্যেও তাহাদের সংস্কারজাত চিরাচরিত প্রথা সমূহের অনুশাসন বর্ত্তমান। চুরি ডাকাইতি যাহাদের উপজীবিকা, রাজার আইন ভঙ্গ করাই যাহাদিগের নিত্য কার্য্য, তাহাদিগেরও ব্যবসায়ের নিজস্ব আইনের অনুশাসন আছে, যাহা তাহারা কদাচিৎ লঙ্ঘন করে। কোন প্রকার বন্ধন নাই অথচ সমাজ আছে, এ অবস্থা আমরা কল্পনা করিতে পারি না।

সামাজিক কল্যাণের নিমিত্ত মানুষের প্রয়োজন ও অভিজ্ঞতা প্রসূত যে সমস্ত বিধান প্রথম অবস্থায় সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিত তাহারই ক্রম পরিণতি ব্যবহার শাস্ত্রে।

(২)

ভারতবর্ষে পুরাতন আর্য্য-সভ্যতার যুগে ঋষিগণ কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়ের চর্চ্চাতেই নিমগ্ন ছিলেন না। পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডারে তাঁহাদিগের যে দান তাহা অতুলনীয়। দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, কাব্য, ললিতকলা প্রভৃতি বিদ্যার সাধনায় তাঁহারা যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাহার গৌরব কখনও ম্লান হইবার নহে। সেই সঙ্গে ব্যবহার শাস্ত্র অর্থাৎ আইন অনুশীলনে তাঁহারা যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন তাহাও যে কোনও জাতির পক্ষে গৌরবের বিষয়।

ব্যবহার শাস্ত্র ধর্ম্ম-শাস্ত্রেরই অঙ্গ। এই ধর্ম্মশাস্ত্র

ঐশ্বরিক অথবা মানুষী সৃষ্টি, সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট প্রাপ্ত হইয়া প্রথম মনু ইহা মরীচি প্রভৃতি ঋষির নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন কিনা, সে বিতর্ক নিষ্প্রয়োজন। তবে একথা সত্য যে হিন্দুর রাজা আইনের স্রষ্টা ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রজা সাধারণের মতই আইনের শাসনে আবদ্ধ। ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রণেতা অথবা দ্রষ্টা যিনিই হউন, প্রতীচ্যে সভ্যতার আলোক ফুটিবার বহুপূর্ব্বে এদেশে তাহা পরিণাত লাভ করিয়াছিল। একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

এখন ইংরাজ রাজার ধর্ম্মাধিকরণে কেবল বিবাহ ও দায়াধিকার বিষয়ে হিন্দু আইনের প্রয়োগ আছে, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রের অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। বিচারালয়ের কার্য্য পরিচালিত হয় যে "কার্য্য-বিধি" আইনের দ্বারা, তাহার ভিত্তি হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের উপরে নয়, বিলাতী আদর্শে তাহা গঠিত। আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবহারঅধ্যায় এখন পুঁথির পাতার মধ্যে নিবদ্ধ, প্রয়োজন অভাবে প্রায় বিস্মৃত। ভারতের নানাশাস্ত্র জগতের পণ্ডিত সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে. কিন্তু তাহার ব্যবহার শাস্ত্র এখন অবজ্ঞাত।

দুইটি Adjective Law,—ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবহার অধ্যায় এবং বিলাতী আদর্শে গঠিত কার্য্য-বিধি আইন—বহুশত যুগ অগ্র পশ্চাতে বিভিন্ন আবেষ্টনের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু উভয়ের প্রয়োগ বিধানে যে সাদৃশ্য বর্ত্তমান তাহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে আইন সংক্রান্ত মূলতথ্যগুলি (Principles) সম্বন্ধে সেকালের শাস্ত্রকর্ত্তাগণের গবেষণা, ভূয়োদর্শন এবং বিশ্লেষণশক্তি একালের আইন কর্ত্তাগণের তুলনায় কোনও অংশে কম ছিল না। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে বনচারী সর্ব্বত্যাগী ঋষিগণের হস্তে ভূর্জ্জপত্রে গ্রথিত ব্যবহার শাস্ত্র এই বিংশ শতাব্দীর বহু অর্থপুষ্ট আইন সভায় পালিত বর্দ্ধিত কার্য্যবিধি আইন অপেক্ষা কম উন্নত ছিল না। মনু পরাশরের উদ্দেশে গালিবর্ষণ করা হয়ত আমাদিগের জাতীয় প্রগতিরই একটি লক্ষণ। কিন্তু আইন শাস্ত্রের উৎকর্ষ উৎকৃষ্ট সভ্যতারই অন্যতম দান একথা সত্য হইলে সভ্যতার প্রসার হিসাবে এই গালি দিবার মত অহঙ্কার খুব বিচারসহ বলিয়া মনে হইবে না।

(৩)

ইংরাজি Civil Procedure Code এবং সেকালের ব্যবহার শাস্ত্রের বিধানগুলির একটি অনুভাব মূলক আলোচনার জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। এ প্রসঙ্গে সেকালের ধর্ম্মাধিকরণ অর্থাৎ বিচারালয়ের কথা প্রথমে উল্লেখযোগ্য।

কাত্যায়নের সূত্রানুসারে—

ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারেণ সারাসার বিবেচনম্।

যত্রাধিক্রিয়তে স্থানে ধর্ম্মাধিকরণং হি তৎ ॥

এই ধর্ম্মাধিকরণের গৃহ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে কতকগুলি বিধান আছে, যথা, গৃহ পশ্চিমদ্বারী হইবে, তাহার সমীপে জলাশয় এবং বৃক্ষ থাকিবে, ইত্যাদি। সাধারণ ভাবে গৃহ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অনেক অনুশাসনই আমাদিগের দেশে প্রচলিত আছে, তাহার সার্থকতা অথবা নিরর্থকতা আমাদিগের বিচার্য্য নহে। তবে ধর্ম্মাধিকরণ সমীপে বৃক্ষ থাকিবার যে ব্যবস্থা দেখা যায় (সভয়ে বলি) তাহাতে মনে হয় যে সাক্ষী এবং উকিল সম্পর্কে বটতলা সংসৃষ্ট যে অপবাদটি আছে তাহার ভিত্তি বহু পুরাতন।

প্রাড়্‌বিবাক, লেখক (Bench clerk), গণক (accountant) এবং নিযুক্ত ও অনিযুক্ত সভ্য (Jurrors and lawyers) ইহাদিগকে লইয়া ন্যায় সভা (court) গঠিত হইত।

রাজা স্বয়ং বিচারাসনে বসিবার বিধান ছিল—তিনি "ব্যবহারান্ দিদৃক্ষু" হইয়া "বিদ্বদ্ভিঃ ব্রাহ্মণৈঃ সহ" ন্যায় সভায় উপস্থিত থাকিবেন। কিন্তু রাজ্য মধ্যে ন্যায় সভা একটি মাত্র নয়, বিশেষতঃ—

যে চারণ্যে চরাস্তেষামরণ্যে করণং ভবেৎ।

সেনায়াং সৈনিকানাং তু সার্থেষু বণিজাং তথা ॥

সুতরাং বিভিন্ন ন্যায় সভায় রাজা স্বয়ং বিচারাসনে বসা সম্ভব নহে; এজন্য উপযুক্ত ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের মধ্য হইতে বিচারক নিযুক্ত করা হইত—"সভ্যৈঃসহ নিযোক্তব্যো ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বধর্ম্মবিৎ।"

সভ্যৈঃসহ কথাটি প্রণিধান যোগ্য। Civil Procedure Codeএ বিচারকের সহিত কোন Jury অথবা Assessor বসিবার বিধান নাই—দায়রার আদালতে বৃত্তান্ত-ঘটিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিবার জন্যই Jury অথবা Assessor প্রয়োজন। দেওয়ানী এবং ফৌজদারী মোকদ্দমা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, সেকালে উভয় প্রকার মোকদ্দমারই এক আদালতে বিচার হইত এবং "সভ্য"গণ ছিলেন বিচারাসনে

Jury অথবা Assessor স্থানীয়। সভ্য এবং Jury, একই উদ্দেশ্যে উভয়ের নিয়োগ এবং কার্য্য-প্রণালীও উভয়ের এক। অযুক্ত সংখ্যক অর্থাৎ ৩, ৫ অথবা ৭ জন সভ্যকে বিচারকের সহিত বসিতে হইত—ইহাদের মধ্যে একজন হইতেন "বক্তাধ্যক্ষ" (Speaker অথবা Foreman)। বৃত্তান্ত-বিষয়ক প্রশ্ন ইহাদের নিকট বিচারের জন্য অর্পিত হইত। মোকদ্দমায় কোন ব্যবহারিক (technical) বিষয়-ঘটিত প্রশ্ন বিচার্য্য থাকিলে তাহার বিচার জন্য ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সভ্য নিযুক্ত করা হইত।

বণিক শিল্প প্রভৃতিষু কৃষি রঙ্গোপজীবিষু।
অশক্যো নির্ণয়োহ্যন্যৈঃ স্তজ্জৈরেব কারয়েৎ॥

শিক্ষিত, ধর্ম্মজ্ঞ এবং সত্যবাদী ব্যক্তি ভিন্ন সভ্য নিযুক্ত হইতে অধিকারী ছিল না।

এই প্রকার "নিযুক্ত সভ্য" ব্যতীত বিচার সভায় শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ "অনিযুক্ত সভ্য" স্বরূপে উপস্থিত থাকিতেন। বিবদমান পক্ষগণের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বক্তৃতা করা ছিল তাঁহাদিগের কার্য্য। ইহারা বর্ত্তমানের উকিল স্থানীয়।

প্রাড়্ বিবাকের কার্য্য ছিল—

বিবাদে পৃচ্ছতি প্রশ্নং প্রতিপ্রশ্নং তথৈব চ।
প্রিয় পূর্ব্বং প্রাক্‌বদতি প্রাড়্ বিবাকস্ততঃ স্মৃতঃ॥

তিনি পক্ষ এবং সাক্ষীগণকে প্রশ্ন ও প্রতিপ্রশ্ন করিতেন—সভ্যগণও এই প্রকার প্রশ্ন ও প্রতিপ্রশ্ন করিতে পারিতেন। প্রমাণ গ্রহণ শেষ হইলে প্রাড়্ বিবাক সভ্যগণকে "Charge" দিতেন—তদনন্তর সভ্যগণ তাহাদের মতামত "Verdict" প্রকাশ করিলে বিচারক তাঁহার মীমাংসা প্রকাশ করিতেন।

বিচারকের দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিত সভ্যগণের আসন, বাম পার্শ্বে লেখকের এবং সম্মুখে গণকের আসন থাকিত।

বিচারালয়ে উচ্চ নীচ ভেদ ছিল না—বরং অপরাধী ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চপদস্থ হইলে তাহার দ্বিগুণ দণ্ডের বিধান ছিল।

(৪)

এখন আমরা মোকদ্দমা বলিতে যাহা বুঝি, তাহার নাম ছিল "ব্যবহার"—

স্মৃত্যাচার ব্যপতেন মার্গেণাধর্ষিত পরৈঃ।
আবেদয়তি চেদ্রাজ্ঞে ব্যবহার পদং হি তৎ॥

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় প্রকার মোকদ্দমা একই আদালতে বিচার্য্য ছিল। মনু ব্যবহারকে অষ্টাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—ঋণ দান, নিক্ষেপ (Deposit), অস্বামী বিক্রয়, সম্ভূয়-সমুত্থান (Partnership), দত্তাপ্রদানিক (Resumption), ভৃত্য বেতন দান, সংবিদ্ব্যতিক্রম (Breach of Contract), ক্রয় বিক্রয়ানুশয়, স্বামী-পালক বিবাদ (প্রভু ও পশুপালক ঘটিত) সীমা বিবাদ (Boundary dispute), বাক্-পারুষ্য (abuse), দণ্ডপারুষ্য (assault), চৌর্য্য; সাহস (henious offences) স্ত্রীসংগ্রহ (ব্যভিচার) দাম্পত্য বিষয়ক অপরাধ, বিভাগ (partition) দ্যূত এবং আহ্বয় (gaming with animals)—এই অষ্টাদশ প্রকার ব্যবহার।

ব্যবহারের চারিটি অংশ—ভাষা (Plaint), উত্তর (written statement), প্রমাণ এবং নির্ণয়। Civil Procedure Code অনুসারেও মোকদ্দমার সূচনা হইতে শেষ পর্য্যন্ত ঐ চারিটি বিভাগ।

ইহার পর appeal—ব্যবহার শাস্ত্রের ভাষায়—"পুনর্ব্বিচার"। "অসদ্বিচারে তু বিচারান্তরম্।" বিচারকের নির্ণয় ভ্রান্ত হইলে তাহার বিরুদ্ধে পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা করা হইত। এই পুনর্ব্বিচারের কর্ত্তা রাজা স্বয়ং এবং প্রথম বিচার ভ্রান্ত সাব্যস্ত হইলে বিচারক তজ্জন্য দণ্ডনীয় ছিলেন। নারদ বলিয়াছেন—

অসাক্ষিকন্তু যদ্দৃষ্টং বিমার্গেণ চ তীরিতম্।
অসম্মত মতৈর্দৃষ্টং পুনর্দর্শনমর্হতি॥

নির্ণয়কালে সাক্ষ্য প্রমাণ উপযুক্তভাবে গৃহীত অথবা বিবেচিত না হইলে তাহার বিরুদ্ধে আপীল চলিত। আবার আপীল করিবার সঙ্গত কারণ পুনর্ব্বিচারকালে না থাকা দৃষ্ট হইলে আপীলাণ্ট তজ্জন্য দণ্ডনীয় ছিল।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

দুর্দৃষ্টাংস্তু পুনর্দৃষ্ট্বা ব্যবহারান্নৃপেন তু।
সভ্যাঃ সজয়িনো দণ্ড্যা বিবাদাদ্দ্বিগুণং দমম্॥

সুবিচার জন্য ধর্ম্মের নিকট এবং রাজার নিকট বিচারকের দায়ীত্ব অতি গুরুতর। বিচার বিভ্রাটে পাপের ভাগ—প্রথম পাদ রাজার, দ্বিতীয় পাদ বিচারকের, তৃতীয় পাদ সাক্ষীর এবং চতুর্থ পাদ অন্যায়কারী পক্ষের।

দেওয়ানী কার্য্য-বিধি আইনে কোন Prima facie Case প্রমাণ করিবার আবশ্যকতা নাই, বাদী কর্ত্তৃক আরজি দাখিল হইলেই বিবাদীর প্রতি শমন জারি হইয়া থাকে। কিন্তু ফৌজদারী আইন অনুসারে, অভিযোগ উপস্থিত হইলে বিচারক প্রথমত বাদীর জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিয়া Prima facie case প্রমাণ হইলে আসামীকে তলব করেন। সেকালের ব্যবহার শাস্ত্রের বিধান এ বিষয়ে বর্ত্তমান ফৌজদারী মোকদ্দমার অনুরূপ ছিল।

কোন ব্যক্তি অপর কর্ত্তৃক স্মৃতি অথবা লোকাচার বিগর্হিত কার্য্য দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইলে রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন—

"কিং কার্য্যং কা চ তে পীড়া মাভৈষী ব্রূ হী মানবঃ।
কেন কস্মিন্ কদা কস্মাৎ পৃচ্ছেদেবং সভাগতং॥

বাদীর মৌখিক জবানবন্দী গ্রহণ করত অভিযোগের কারণ (Cause of action) থাকা সাব্যস্ত হইলে রাজমুদ্রাঙ্কিত আদেশ পত্র দ্বারা প্রতিবাদীকে "আহ্বান" অর্থাৎ সমন জারি-পূর্ব্বক তলব করা হইবে। আহ্বান অনুযায়ী প্রতিবাদী উপস্থিত হইলে তাহার সম্মুখে বাদীর অভিযোগের বিবরণ প্রথমত ফলকে তৎপর "পত্রে" লিপিবদ্ধ হইবে—এই লিপিই ব্যবহারের "ভাষা" (Plaint)। তৎপর প্রতিবাদীর "উত্তর" ঐ প্রকারে গৃহীত হইবে।

(৫)

ভাষা ও উত্তরের অনেকগুলি লক্ষণ ব্যবহার শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে—ঐ লক্ষণযুক্ত না হইলে উহা গ্রহণ করা হইত না অর্থাৎ Inadmissible plaint অথবা written statement বলিয়া গণ্য হইত। এ সম্বন্ধে যতপ্রকার অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে সমস্তই বিশদরূপে ব্যবহারশাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে। দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনে আরজি ও জবাব সম্বন্ধে যত বিধান লিখিত হইয়াছে, ব্যবহারশাস্ত্রের লিখিত বিধানের সহিত তাহা মিলাইয়া দেখিব।

অর্থবদ্ধর্ম্ম সংযুক্তং পরিপূর্ণমনাকুলং।
সাধ্যবদ্বাচক পদং প্রকৃতার্থানুবন্ধি চ॥
প্রসিদ্ধমবিরুদ্ধং চ, নিশ্চিতং সাধন ক্ষমং।
সংক্ষিপ্তং লিখিতার্থশ্চ দেশকালাবিরোধি চ॥
বর্ষর্ত্ত মাসপক্ষাহ বেলা দেশ প্রদেশবৎ। ইত্যাদি—

অর্থাৎ ভাষা হইবে—অর্থবৎ (disclosing a cause of action o. 7. r. 11 (a) C. P. Code), সংক্ষেপে ও সুস্পষ্টরূপে লিখিত (Concisely and specifically stated, o. 6. r. 4) সহজবোধ্য (unamb iguous) আইনশুদ্ধ আদর্শানুরূপ (Form o. 6. r. 3), বর্ণনা অলঙ্কার যুক্ত হইবে না, মূল অভিযোগের পোষক হইবে (Corroboration), সুনির্দ্দিষ্ট (Precise o. 7. r. 4), অবিরোধি এবং সঙ্গত হইবে। দাবীর বিবরণ (statement of value etc. o. 7. r. 11) পক্ষগণের নাম, পিতার নাম, বাসস্থান ইত্যাদি পরিচয় সংযুক্ত হইবে (O. 7. r, 1).

স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক অভিযোগে—

দেশশ্চৈব তথাস্থানং সন্নিবেশাস্তথৈব চ।
জাতি সংজ্ঞাধিবাসশ্চ প্রমাণং ক্ষেত্রনাম চ॥

অর্থাৎ description of the property, sufficient to identify, দিতে হইবে (o. 7. r. 3 C. P. Code), দেখা যায়। ব্যবহার শাস্ত্রে ভাষার দোষ গুণ লক্ষণ ইত্যাদি যাহা বর্ণিত হইয়াছে, দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের বিধান অপেক্ষা তাহা অধিকতর সূক্ষ্ম।

দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনে Joinder of causes of action একটি বিশেষ আবশ্যকীয় কথা। Nonjoinder অথবা misjoinder of causes of action আরজিতে একটি ত্রুটি। Multifareousness of suit ও একটি ত্রুটি। এই প্রকার ত্রুটির বিষয় ব্যবহার শাস্ত্রেও লক্ষিত হইয়াছে। Civil Procedure Codeএর বিধান আছে The suit must include the whole claim. কোন একটি বিশেষ দাবী আরজিভুক্ত না হইয়া থাকিলে পরে তৎসম্বন্ধে পৃথক নালিশ চলে না। ব্যবহার শাস্ত্রে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"ন গ্রাহ্যস্ত্বনিবেদিত"

আরজিতে ভুল ভ্রান্তি ঘটিলে তাহা সংশোধন করিবার বিধান (o. 6. r. 17 C. P. Code) ব্যবহারশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে "শোধয়েৎ পূর্ব্ব পদং তু যাবন্নোত্তর দর্শনং।"

দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের বিধানানুসারে মোকদ্দমায় পক্ষগণের মধ্যে কেহ নাবালক অথবা বিকৃত মস্তিষ্ক হইলে তাহার পক্ষে আসন্ন বন্ধু অভিভাবকের যোগ ভিন্ন মোকদ্দমা চলিতে পারে না (o. 32. C. P. Code)

ব্যবহারশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে—অপ্রগলভ, জড়, উন্মত্ত, বৃদ্ধ, স্ত্রী, বালক এবং রোগী, ইহাদের পক্ষে নিযুক্ত "বন্ধু" দ্বারা ভাষা অথবা উত্তর দাখিল করিতে হইবে। কোন কোন ব্যক্তি এই প্রকার বন্ধু হইবার উপযুক্ত, এবং বন্ধুর দায়ীত্ব, তাহার কৃতকার্য্যের ফলাফল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনাও ব্যবহার শাস্ত্রে করা হইয়াছে ?

(৬)

অভিযোগ গৃহীত হইলে তাহার পরবর্ত্তী কার্য্য বিবাদীকে "আহ্বান" করা—অর্থাৎ তাহার প্রতি "শমনজারি।"

বাদীর অভিযোগ উপযুক্ত হেতু সঙ্গত বিবেচিত হইলে রাজমুদ্রাঙ্কিত পত্র দ্বারা প্রতিবাদীকে আহ্বান করা হইবে। এই কার্য্য জন্য পৃথক লোক নিযুক্ত থাকিত—যাহারা বর্ত্তমান সময়ে Process server নামে অভিহিত হয়।

এই আহ্বান ব্যাপারে, আহুত ব্যক্তির প্রতি অকারণ অত্যাচার না হয় তদ্বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিবার বিধান আছে।

নারদের বচন অনুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে আহ্বান নিষিদ্ধ—ব্যাধিগ্রস্ত, ব্যসনস্থ, যজমান, শিশু, স্থবির, বিষমস্থ (সুরা প্রমত্ত) ক্রিয়াকুল (ধর্ম্মক্রিয়া নিযুক্ত) রাজকার্য্যে নিযুক্ত, ধর্ম্মোৎসবে রত, মত্ত, উন্মত্ত, প্রমত্ত, আর্ত্ত, ভৃত্য (ছাত্র সেবক প্রভৃতি পোষ্য), সহায়সম্পন্না স্ত্রী, কুলেজাতা (সম্ভ্রান্ত মহিলা) প্রসূতিকা এবং সর্ব্ববর্ণোত্তমা কন্যা।

স্ত্রীলোক স্বাবলম্বিনী, গণিকা, স্বৈরিণী অথবা পতিতা হইলে তাহাদিগের সম্বন্ধে নিষেধ নাই।

সংসারত্যাগী, বনবাসী, সন্ন্যাসীকে বিশেষ প্রয়োজন না হইলে আহ্বান করা হইত না।

রাজ-আহ্বান অমান্য করিলে অথবা এড়াইবার চেষ্টা করিলে (disobeying summons or evading service) অপরাধের তারতম্য অনুসারে ৫০ পণ হইতে ৫০০ পণ পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবার বিধান ছিল—আর ছিল "আসেধ"—(warrant of arrest).

আহ্বান এবং আসেধ সংক্রান্ত বিধি নিষেধগুলির মধ্যে সাধারণের সুখ দুঃখ এবং সুবিধা অসুবিধার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি লক্ষিত হয়।

আসেধ চতুর্ব্বিধ—স্থানাসেধ, কালবৃতঃ, প্রবাসাৎ কর্ম্মণস্তথা। আসেধ্য ব্যক্তি আসেধ লঙ্ঘন করিলে দণ্ডার্হ হইত (Contempt of Court)। আবার রাজকর্ম্মচারী আসেধ প্রয়োগে অত্যাচার করিলেও দণ্ডনীয় ছিলেন এবং অপ প্রযুক্ত আসেধ লঙ্ঘন করিলে তাহাতে অপরাধ ছিল না—যস্ত ইন্দ্রিয় নিরোধেন ব্যাহারোচ্ছ্বসনাদিভিঃ। আসেদয়েদনাসেধ্যৈঃ স দণ্ড্যো নত্বতিক্রমাদিতি॥

নদী সন্তরণকালে, কান্তারে অথবা দুর্দ্দেশে অবস্থিত অথবা বিপদাপন্ন ব্যক্তি আসেধ লঙ্ঘন করিলে অপরাধ ছিল না। বৃক্ষ পর্ব্বতাদি আরূঢ় অথবা হস্তী অশ্বাদি আরূঢ় ব্যক্তিও আসেধের অযোগ্য।

পীড়িত, অশক্ত, বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করা হইলে "শনৈঃ শনৈঃ" উপস্থিত করিবার বিধান ছিল।

আহ্বান এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত বিধান প্রতিবাদীর মত সাক্ষী সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। (আগামী মাসে সমাপ্য)



উপন্যাস

হংস-বলাকা

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

বড়দিনের আগেই স্কুলের পরীক্ষার ফল বার হ'ল।

সুকুমার ভাল শিক্ষক ব'লে যে খ্যাতি রটেছিল এই একটা পরীক্ষাতেই তার সমাধি হয়ে গেল। সে যে যে ক্লাসে ইতিহাস পড়াত তার একটাও ভাল ফল করতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে একটা লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, যারা ভাল ছেলে তারা ফল খুবই ভাল ক'রেছে। বস্তুত এক একটি ছেলে প্রশ্নের উত্তরে এমন মৌলিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে যে চমৎকৃত হ'তে হয়। কিন্তু বাকি সবাই, যাকে বাংলায় বলে গোবর গুলেছে। তাদের উত্তর দেখলে মনে হয় তারা প্রশ্নও বোঝেনি, কি যে উত্তর দিচ্ছে তাও জানে না। কয়েকখানি খাতা সুকুমারকে দেখান হ'ল। সে দেখে হাসি রাখা দায়।

সুকুমার তো চ'টে আগুন। তার একনিষ্ঠ পরিশ্রমের কি এই ফল হ'ল?

প্রশ্ন পত্র এমন কিছু কঠিন হয়নি। কঠিন হয়েছিল তার বোঝান। যাদের বই দেখে দেখে বই অনুযায়ী পড়ালেও ঠিক বুঝতে পারে না, তাদের মুখে মুখে পড়ালে যা হয় তাই হয়েছে। সুকুমার বহু বই দেখে বহু কথা ক্লাসে বলেছে। যারা ভাল ছেলে তারা সে সব মনে রেখেছে। অন্য ছেলেরা সে সব তো মনে রাখতে পারেই নি, বরং বইতে যা প'ড়েছে তাও গোল পাকিয়ে ফেলেছে।

হেড-মাষ্টার মশাই তাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি একটা তালিকা তৈরি ক'রেছেন। তাতে প্রত্যেক শিক্ষকের কাজের ফল তোলা হয়েছে। সুকুমার যে যে ক্লাসে যত ছাত্রকে যে যে বিষয় পড়িয়েছে এবং তার মধ্যে যত ছাত্র উত্তীর্ণ হয়েছে তা তাকে দেখান হ'ল। মোট পাঁচশো ছত্রিশ জন ছাত্রকে সে ইতিহাস পড়িয়েছে। তার মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। পাশে শতকরা কষা আছে। আর তার পাশে লেখা আছে—অসন্তোষজনক।

কিন্তু তার ইংরিজি ক্লাসের ফল খুব ভাল হয়েছে। তিনশো বার জনের মধ্যে দু'শো নিরানব্বুই জন উত্তীর্ণ হয়েছে এবং তারই ক্লাসের একটি ছাত্র ইংরিজিতে প্রথম চার ক্লাসের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে।

অন্যান্য শিক্ষকদের ফল যেমন সুকুমারের ইংরিজি ক্লাসের মত অত ভাল হয়নি, তেমনি তার ইতিহাসের মত অত শোচনীয়ও হয়নি। তাঁদের ক্লাসের কোন ছাত্র যেমন অত্যধিক নম্বর পেয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিতে পারেনি, তেমনি অত বেশী ফেলও করেনি। মোটামুটি গড়ে শতকরা আশীজন উত্তীর্ণ হয়েছে। তবু তাঁদের মাঝে মাঝে অল্প-স্বল্প বিরুদ্ধ মন্তব্য সইতে হ'ল। কিন্তু সুকুমারের কাছ থেকে একেবারে কৈফিয়ৎ তলব করলেন।

সুকুমারের মাথায় তখন চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ ও শিখজাতি—মাকড়সার জাল বুনছিল। এক কৈফিয়তের আঘাতেই মুহূর্ত্তে তা ছিন্ন হয়ে গেল।

সে বললে, আপনি তো জানেন আমি পড়াতে কোন দিন ফাঁকি দিইনি, আর কি ভাবে দিনের পর দিন খেটেছি।

এর বেশী আর তার কিছু বলবার ছিল না।

হেড-মাষ্টার দুঃখিতভাবে বলিলেন, আমি তো জানি, কিন্তু সেক্রেটারীকে কি বলা যায়?

সুকুমারের উপর হেড-মাষ্টারের সত্যিই একটা স্নেহ পড়েছে। সে যে অন্য শিক্ষকদের চেয়ে ক্লাসে ঢের বেশী খাটে এ বিষয়েও তাঁর সংশয় নেই। কিন্তু সেক্রেটারীকেও তিনি জানেন। তাঁর মাথায় সঙ্কল্প এসেছে, বড়দিনের পূর্ব্বে সুকুমারকে এই উপলক্ষে কর্ম্মচ্যুত ক'রে পুনরায় বড়দিনের পরে আবার লাগান। যা পনেরোটা দিনের মাইনে বেঁচে যায়। অথচ একটা উপলক্ষ না হ'লেও এ নিয়ে কেলেঙ্কারী হতে পারে। সেটা স্কুলের পক্ষে খারাপ।

আরও একটা লাভ হবে এই যে, সুকুমারের উপর এই শাস্তি দেখে অন্য শিক্ষকরাও বন্ধের আগে মাইনের জন্য বিশেষ চাপ দিতে সাহস করবেন না। বন্ধের আগে পূরো মাইনে মিটিয়ে দেওয়া সম্ভবও হবে না। কারণ মাতৃশ্রাদ্ধের সময় স্কুলের তহবিলের কিছু টাকা তিনি ভেঙেছেন।

হেড-মাষ্টার এ সবই জানেন; কিন্তু তিনিও অসহায়। সেক্রেটারী মস্ত বড় লোক; তাঁহার সঙ্গে বিরোধ করার সাহস তাঁর নেই। তার উপর অনেকগুলি কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে তাঁকে ঘর করতে হয়। সুকুমারকে কোন কথা বলার আগেই তিনি সেক্রেটারীকে তার জন্য অনেক অনুরোধ করেছেনও। কিন্তু সেক্রেটারী কিছুতে টলেননি। এরও পরে তাঁকে আর কিছু বলার অর্থ—নিজের বৃদ্ধ বয়সের শেষ সম্বলটি খোয়ান। পরের জন্য অতখানি উদারতাই বলুন, আর মাথাব্যথাই বলুন, আর হঠকারিতাই বলুন, দেখাবার বয়স তাঁর পার হয়ে গেছে। তিনি মনে মনে বেশ বুঝেছেন—সুকুমারকে সরতে হয়েছে।

সুকুমারও উত্তর দিলেন, তাঁকেও ওই কথাই বলবেন।

হেড-মাষ্টার তার ছেলেমি দেখে হাসলেন। বললেন, পরীক্ষার এই রকমের ফলের পর সে কথা কি কেউ বিশ্বাস করবে?

—আপনার কথাতেও করবেন না

হেড-মাষ্টার শুধু হাসলেন।

সুকুমার বললেন, আপনার কথাও যিনি বিশ্বাস করবেন না, তাঁকে আমি কি কথা বলতে পারি?

হেড-মাষ্টার একটুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। সুকুমারের নিষ্কৃতি কোন দিকেই নেই। তবে ক্ষমা-টমা চাইলে যদি বড়দিনের পর আবার কাজটা পায়।

বললেন, ও সব কৈফিয়ৎ দিও না। বরং মার্জ্জনা চেয়ে লিখে দাও, যা হবার হয়ে গেছে—আর কখনও এ রকম হবে না। আমিও আর একবার ব'লে দেখব।

সুকুমার বললে, না।

—না কেন?

সুকুমার ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, সত্যি কথায় যাঁর বিশ্বাস উৎপন্ন করা যায় না, তাঁর কাছে কিছুই আমার বলবার নেই। মিথ্যে কথা তো নয়ই।

—মিথ্যে কিসের?

সুকুমার জোরের সঙ্গে বললে, মিথ্যে নয় তো কি! আপনি জানেন দোষ আমি কিছুই করিনি। যা আমি পড়িয়েছি তার চেয়ে বেশী পড়াবার সাধ্য আমার নেই। কেন মিথ্যে ভবিষ্যতের আশ্বাস দোব?

ওর উষ্মা দেখে হেড-মাষ্টার হেসে ফেললেন। বললেন, তাহ'লে কি করবে?

—কিছুই করব না।

—কিন্তু একটা সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ তো দিতে হবে।

সুকুমার চুপ ক'রে রইল।

হেড-মাষ্টার গম্ভীরভাবে বললেন, শোন সুকুমার, ছেলেমি কোরো না। সেক্রেটারী যখন চেয়েছেন তখন হয় কৈফিয়ৎ না দিয়ে চাকরী ছেড়ে দিতে হবে, নয় কৈফিয়ৎ দিতে হবে। সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ। কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক মনে না করলে সেক্রেটারী তোমাকে ছাড়িয়ে দিতে পারেন।

চাকরী ছাড়ার কথায় সুকুমার প্রথমটা যেন একটু দমে গেল। কিন্তু তখনই নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত দৃঢ়স্বরে বললে, আমি চাকরীই ছেড়ে দোব—কৈফিয়ৎ দোব না।

হেড-মাষ্টার অবাক হয়ে গেলেন। কি যে বলবেন ভেবে পেলেন না।

সুকুমার মুখে একটু হাসি আনবার চেষ্টা করলে। বললে, আমার জন্যে আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না। চাকরী ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আমার আর সন্তোষজনক পথ নেই। আমি মার্চেন্ট আফিসের কেরাণী নই, স্কুলের শিক্ষক। আমার হাতে ভবিষ্যৎ জাতিগঠনের ভার। আমাকে পিছুলে চলবে না।

বিস্ময় কাটিয়ে হেড-মাষ্টার বললেন, তুমি কি সত্যি সত্যিই চাকরী ছেড়ে দিতে চাও সুকুমার?

মাথা নামিয়ে সুকুমার বললে, সত্যি সত্যিই। আমি এক মিনিটের মধ্যে পদত্যাগ পত্র লিখে এনে দিচ্ছি।

সুকুমার হেড-মাষ্টারের ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

(৭)

এক মিনিটের মধ্যে না হোক, পদত্যাগ-পত্র দিতে সুকুমার দেরী করলে না। পাশের ঘর থেকে একখানা কাগজে খস্ খস্ ক'রে দু' লাইনে চিঠিখানা শেষ ক'রে

নিয়ে এসে হেড-মাষ্টারের হাতে দিলে। দু' লাইনের চিঠি,—তাতে ভণিতা নেই, কাঁদুনি নেই, কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, আত্মদোষস্খালনের চেষ্টা নেই, কিছু নেই। স্রেফ মামুলি ক'টি কথায় একখানা চিঠি। হেড-মাষ্টার অবাক হয়ে তার দিকে চাইলেন। বোধ হয় কিছু বলতেও যাচ্ছিলেন, কিন্তু সুকুমার আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করলে না। বেরিয়ে চলে গেল।

চলে গেল, ক্লাসে নয়, মাষ্টারদের বিশ্রামকক্ষেও নয়—সোজা ফটকের বাইরে। বয়স তার যদিচ বেশী নয়, কিন্তু ঘা খেয়েচে প্রচুর। নইলে সে নিশ্চয় একবার ক্লাসগুলোয় যেত, ছেলেদের সামনে উন্নত শিরে ভাস্বর ললাটে গিয়ে দাঁড়াত, যেন এইমাত্র ওয়াটার্লু জয় ক'রে ফিরে এল। দুই পকেটে হাত দিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করত। ভাবে-ভঙ্গিতে এই কথাটা প্রকাশ করত যে চাকরীকে সে গ্রাহ্য করে না; আত্মসম্মানে আঘাত লাগলে সে লক্ষ টাকার চাকরীও বাঁ পায়ের ক'ড়ে আঙুল দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে। তার ভাব-ভঙ্গি দেখে সহকর্ম্মীদের চোখে শ্রদ্ধা এবং বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠত। সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের অন্তরের দৈন্যে তাঁরা লজ্জা বোধ করতেন। ছেলেরা চারিদিকে তাকে ঘের ক'রে দাঁড়িয়ে বিদায়াশ্রু ফেলত, আর সে সকলের মাথায় হাত দিয়ে মানুষ হবার জন্য তাদের আশীর্ব্বাদ করত। আশীর্ব্বাদ করত—কর্ম্মজীবনে নেমে তারা যেন চরম দুঃখের ভয়েও আপন আত্মাকে অবনমিত না করে। বিপদের ঝঞ্ঝা একদিন থেমে যাবেই, যাবেই কেটে দুঃখের মেঘ, সেদিন ভয়ে যারা আপন আত্মাকে দিয়েছে গ্লানি, তাদের আর লজ্জা রাখবার স্থান থাকবে না। এমনি অনেক বড় বড় কথাই বলত। কিন্তু এ সব কথা তার মনেই এল না। বরং সে মাথা নীচু ক'রেই বেরিয়ে গেল। কাকেও মুখ দেখাতে লজ্জা করছিল। সে জেনেছে, ন্যায়ে হোক, অন্যায়ে হোক, যে কোন কারণেই হোক, চাকরী যার যায়, তার আর লোকসমাজে মাথা উঁচু ক'রে চলবার কোন পথই থাকে না।

সে চলল পথে পথে, অকারণে, উদ্দেশ্যবিহীন। কলেজ ষ্ট্রীট থেকে সোজা ধর্ম্মতলা, সেখান থেকে এস্‌প্ল্যানেড, তার পরে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ হয়ে মেসের দিকে। মনের মধ্যে যে চাঞ্চল্য তার এসেছে তার কিছুটা দৈহিক প্রকাশ না হ'লে সে যেন স্বস্তি পাচ্ছিল না। তাই বক্ষস্পন্দনের তালে তালে জোরে জোরে চলতে লাগল।

চিন্তা অনেক:

আবার যে ভবঘুরে সেই ভবঘুরে। সম্বলের মধ্যে সকাল-বিকাল দুটি ট্যুইশান। তাতে মেস খরচ চ'লে গিয়েও কিছু অবশ্য বাঁচবে। কিন্তু সে আর কত্টুকু! এই ক'মাস চাকরীর ফলে সংসারের আংশিক ব্যয়ভার তার ঘাড়ে এসে পড়েছে। সে বোঝা আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মত। এখন আর কাঁধ থেকে নামান শক্ত, বোধ করি অসম্ভবই। সংসারে তার সাহায্যের পরিমাণ অবশ্য মোটা অঙ্কের নয়। কিন্তু বাঙালী সংসারের এমনি দস্তুর যে, তারই অভাবে পরিবারের দূরবিস্তৃত শিকড়ে ডালপালায় টান পড়বে। চারিদিক থেকে উঠবে—গেল গেল, রব। তার উপর সংবাদটা গ্রামে পৌছানমাত্র মুদী উঠ্‌নো জিনিস দেবার সময় একটু সন্দিগ্ধ-ভাবে চিন্তা করবে। কয়লাওলা তার কয়লার সামান্য ক'টা পয়সাই একদিন বাকি রাখতে দ্বিধা করবে। ধোপার হিসাব মিটতে একদিনের উপর দু'দিন দেরী হ'লে সে বিরক্তিভরে বিড় বিড় করবে। এমনি নানান ঝঞ্ঝাট।

এর উপর আরও একটা চিন্তার বিষয় আছে। স্কুলে তার প্রায় তিন মাসের মাইনে বাকি। প্রায় তিন মাসের এইজন্য যে, একটা মাসের দরুণ সাত টাকা আদায় হয়েছে। বিশেষ দরকারে একবার সে দশটা টাকা চেয়েছিল। সেক্রেটারী পাঁচ টাকা মঞ্জুর করেন। অনেক কচ্‌লাকচ্‌লির পর সে সাতটা টাকা আদায় করে। এই নিয়ে কিছু বচসাও হয়েছিল। কে জানে তার কর্ম্মচ্যুতির তাও একটা কারণ কি না। কর্ম্মচারী তার পরিশ্রমলব্ধ বেতনও ভিক্ষুকের মত চাইবে এইটেই রেওয়াজ। তার ব্যতিক্রমে মনিবের পক্ষে ক্রুদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক।

এখন এই যে প্রায় তিন মাসের বেতন, এটা কি ভাবে আদায় করা যেতে পারে ভেবে পেলে না। কোর্টে যাওয়া তার সাধ্যের অতীত। আর্থিক এবং মানসিক উভয় দিক দিয়েই। মামলা-মোকদ্দমার হাঙ্গামা পোহানর চেয়ে টাকা ছেড়ে দেওয়া তার পক্ষে সহজ। সেক্রেটারী স্বেচ্ছায় যদি না দেন তার আর করবার কিছুই নেই। সে সহায়-সম্বলহীন বিদেশী। যে সময়টা সে মিছিমিছি সেক্রেটারীর পিছনে পিছনে ঘুরে অপব্যয় করবে সে সময়টা অন্যভাবে

কাজে লাগাতেও পারে। ক'টা প্রবন্ধ তার লেখবার ছিল। কয়েকখানি কাগজ থেকেই তার লেখা চেয়েছে। সময়াভাবে লিখতে পারেনি। এখন সময় অঢেল। দ্বিতীয় চাকরী না পাওয়া পর্য্যন্ত তাকে অনেকগুলো লেখা শেষ ক'রে রাখতে হবে। এ রকম অফুরন্ত অবকাশ আর পরে নাও মিলতে পারে। সুকুমার মনে মনে প্রথম প্রবন্ধের খসড়া করতে লাগল।

যখন সে মেসে পৌছুল—চাকরটা সংবাদ দিলে তার ঘরে ক'টি ছোকরাবাবু ব'সে আছে।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। তার ঘরটি ছোট। পায়খানার সন্নিকটে ব'লে দরজাটা সব সময়েই ভেজিয়ে রাখতে হয়। উত্তর দিকে একটি মাত্র জানালা আছে। তাতে হাওয়া তেমন না খেললেও ঘরের দূষিত বাষ্প বেরিয়ে যেতে পারে। ঘরে দু'খানি মাত্র ছোট ছোট আম-কাঠের তক্তাপোষ হাত খানেক ব্যবধানে অবস্থিত। সমস্ত ঘরের মধ্যে ওইটুকু স্থানই ফাঁকা।

একখানি তক্তাপোষে রায় মশাই আলোর দিকে পিছন ফিরে শুয়ে। অপরখানিতে ক'টি ছেলে সম্ভবত অনেকক্ষণ থেকে ব'সে ব'সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সুকুমারকে দেখে তারা সসম্ভ্রমে তক্তাপোষ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

—বোসো, বোসো।

সুকুমার আর কি বলবে ভেবে না পেয়ে ওদের দিকে পিছন ফিরে গায়ের শার্টটা খুলতে লাগল।

দেখা করতে এসেছে তারই ক'টি ছাত্র। কারও বয়স চৌদ্দ পনেরোর বেশী নয়। এরাই তাদের নিজের নিজের ক্লাসের সব চেয়ে ভাল ছেলে, সুকুমারের অত্যন্ত প্রীতি-ভাজন। তার পড়ান শুনতে শুনতে আর সবাই যখন হাই তুলত তখন এরাই শুধু গভীর মনোযোগ এবং অসীম শ্রদ্ধার সঙ্গে তার পড়ান শুনত। তাকে নানা রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত। এরা সত্যিকার জিজ্ঞাসু। এসেছে তাকে শেষ সম্ভাষণ জানাতে।

সুকুমারের জলভরা চোখ বিজলী আলোয় চিক্‌চিক্ ক'রে উঠল। ছেলে ক'টি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। সুকুমারের অন্তরের সীমাহীন বেদনা-পারাবার যেন চাঁদের আলোয় হেসে উঠল। যেন ব'লে উঠল, পেয়ে গেছি, পেয়ে গেছি। একটি মুহূর্ত্তে তার শিক্ষকতার পারিশ্রমিক প্রাপ্যেরও অধিক আদায় হয়ে গেল।

গলা ঝেড়ে অবরুদ্ধস্বরে সুকুমার আবার বললে, বোসো।

ওরা একে একে সুকুমারের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে, পায়ের ধুলো নিলে। সুকুমার তাদের মাথায় হাত দিয়ে নীরবে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে কত যে আশীর্ব্বাদ করলে তার আর সীমা সংখ্যা নেই।

তার পর ধীরে ধীরে ওদের পাশে বসল।

একটু পরে ওরা জিজ্ঞাসা করলে, আমাদের সঙ্গে দেখা না ক'রেই যে চ'লে এলেন স্যার ?

সুকুমার একটু হাসলে। বললে, দেখা ? এই তো হ'ল।

—সকলের সঙ্গে তো হ'ল না।

—তাহ'লে তাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার বোধ হয় আবশ্যকও ছিল না।

ছেলেরা কথাটা ঠিক বুঝলে না। বললে, কেন স্যার ?

সুকুমার হেসে বললে, আবশ্যক থাকলে নিশ্চয়ই দেখা হ'ত। যেমন তোমাদের সঙ্গে হ'ল।

—তারা যে ঠিকানা জানে না স্যার।

—আবশ্যক থাকলে তোমাদের মতন জেনে নিত।

ছেলেরা চুপ ক'রে রইল। সুকুমারের কর্ম্মত্যাগের কারণ তারাও জানতে পেরেছে। কেবল জানতে পারেনি যে চাকরী ছেড়ে দেওয়া ছাড়া তার আর উপায় ছিল না। সুকুমার ভাল পড়াতে পারে না, সেক্রেটারীর এই মন্তব্যই নাকি তার কর্ম্মত্যাগের কারণ এইটুকুই তারা শুনেছে এবং শুনে অবাক হয়েছে। সকলেই অবাক হয়েছে। কারণ যারা ভাল ছেলে নয়, পড়ার নামেই যাদের তন্দ্রা-কর্ষণ হয়, তারাও এ কথা স্বীকার করবে যে সুকুমার তাদের পিছনে যে পরিশ্রমটা করে, অন্য কেউ তার সিকির সিকিও করেন না।

অনেকক্ষণ পরে ছেলেরা বললে, আপনি স্যার এই-খানেই থাকবেন তো ?

—আর যাব কোথায় ?

—আমরা মাঝে মাঝে আসব স্যার। আপনি এই সময়ে প্রায়ই থাকেন তো ?

—আসবে বই কি। মাঝে মাঝে এস। তোমাদের সঙ্গে দেখা হ'লে আমার খুবই আনন্দ হবে। এই সময়ে আমি প্রায়ই থাকি। বিশেষ কাজে কোন দিন একটু দেরী হলে…

—তাতে কিছু ক্ষতি হবে না স্যার। আমরা একটু বসব।

—হ্যাঁ। একটু বসলেই আমার দেখা পাবে।

আর কি কথা বলা যায়? উভয়েই আসল প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলছে। সুকুমার আশা করছে ছেলেরাই প্রথম কথাটা তুলুক্। ছেলেরা সাহস পাচ্ছে না। সুকুমার তাদের ছেড়ে চলল এতে তারা যে খুশী হয়নি তা তাদের মুখ দেখেই বোঝা যায়। এই স্বল্পভাষী, প্রিয়বাদী শিক্ষককে এরা অত্যন্ত ভালবেসেছে। সুকুমার শুধু যে ভাল পড়াত তাই নয়, সে কখনও কোন ছেলেকে রূঢ় কথা বলেনি। কেউ কোন অন্যায় আচরণ করলে, সে হয় একটুখানি হাসত, নয়তো নিঃশব্দে গম্ভীর হয়ে ব'সে থাকত। এতেই ছেলেদের লজ্জার অবধি থাকত না। এমনি ক'রে ধীরে ধীরে সুকুমারের উপর সকলেরই শ্রদ্ধা জেগেছে। তাদের প্রতি সুকুমারের স্নেহের প্রতিদানে তারাও তাকে পরমাত্মীয়ের মত ভালবেসেছে। তাই সে শিক্ষকতা ত্যাগ করায় তারা অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছে। সেই সঙ্গে তারা এই ভেবে গৌরব এবং গর্ব্ব অনুভব ক'রেছে যে তাদের অন্তত একজন শিক্ষক আছেন যিনি এতটুকুও লাঞ্ছনা সইতে প্রস্তুত নন, মনুষ্যত্বে আঘাত লাগলে ক্ষতিকে যিনি ভয় করেন না। ছেলেদের মন ভাবের রাজ্যে বিচরণ করে। সেখানে তারা যথেষ্ট সমারোহ ক'রে খুব উঁচুতে সুকুমারের আসন তৈরী করলে। এই ব্যাপারে দুঃখের মধ্যেও এইটুকু আনন্দ আছে।

রাত্রি হয়ে যাচ্ছে দেখে ছেলেরা আর দাঁড়ালে না। সুকুমারের পায়ের ধূলা নিয়ে চ'লে গেল। ব'লে গেল—সময় পেলেই তারা মাঝে মাঝে বিরক্ত করতে আসবে।

সুকুমার শুধু হাসলে, জবাব দিলে না।

ওরা চ'লে গেলে সে আলোর দিকে পিছন ফিরে নিঃশব্দে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। মনে তার এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে। নির্দ্দিষ্ট ক'রে কোন কিছুই সে ভাবতে পারলে না। মনের বল্‌গা যেন তার হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। যেন মনের সঙ্গে যোগই গিয়েছে ছিঁড়ে। নিশ্চিন্ত নিঃশব্দে সুকুমার দাঁড়িয়ে রইল।

গলা ঝেড়ে রায়মশাই জিজ্ঞাসা করলে, চাকরীটা গেল না কি সুকুমারবাবু?

সুকুমার চমকে উঠল। সে যেন এ সময় মানুষের কণ্ঠস্বর শোনবারই আশা করে নি। চেয়ে দেখলে, রায় মশাই ঘুমোয় নি। পিট পিট ক'রে চেয়ে আছে।

সুকুমার বললে, আপনি ঘুমোন নি?

রায়মশাই মুখের ঢাকা আরও একটু খুলে হেসে বললে, ঘুম আমার খুব কমই হয়, বুঝলেন?

সুকুমার হেসে জিজ্ঞাসা করলে, তবে সন্ধ্যে ছ'টা থেকে সারা রাত করেন কি?

—একটু বিশ্রাম। সারাদিনের খাটুনির পরে···

—ঘুম আসে না?

রায়-মশাই ঝেড়ে উঠে বসল। বললে, আসবে কোথা থেকে মশাই। এই সেদিন ছেলেটার পরীক্ষার ফি দিলাম পঁচিশ টাকা। দেখলেন তো? আজ চিঠি এল মেয়ে-জামাইএর শীতের তত্ত্ব পাঠাতে আর একটা দিনও দেরী করা চলবে না।

—শীতের তত্ত্ব এখনও করেন নি?

রায়-মশাই চ'টে গেল। ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, আপনি তো মোলায়েম ক'রে বললেন করেন নি? কিন্তু করি কোত্থেকে? ওই তো মাইনে। তার ধুতে-বাছতে কি থাকে বলুন তো? আমি তো আর এখানে টাকা জাল করি না! বাঁধা মাইনে।

—তা বটে।

সুকুমারের সমর্থন এবং সহানুভূতি পেয়ে রায়-মশাই একটু শান্ত হ'ল। বললে, সেখানে একটা সংসার আছে। এখানে মেসের খরচও মন্দ নয়। এ সব চালিয়ে কি ই বা বাঁচবে।

সুকুমার অন্যমনস্কভাবে বললে, তা আর নয়!

রায়-মশাই হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসল, তবে?

সুকুমার মাথা চুলকে বললে, কিন্তু দিতে তো হবে। মেয়ের বিয়ে যখন দিয়েছেন তখন···

রায়-মশাই বিমর্ষভাবে বললে, সেই কথাই তো ভাবছি মশাই। দিতে হবেই। যেখান থেকেই পাই। কিন্তু পাই কোথা থেকে? অ্যাঁ?

রায়-মশাই আবার শুয়ে পড়ল।

সুকুমার বললে—আবার শুলেন যে! খেতে হবে না?

—খেতে আবার হবে না? বিলক্ষণ! যত চিন্তাই থাক একটি বেলা খাওয়া বন্ধ রাখবার উপায় নেই।

রায়-মশাই উঠে বসল। টিনের কৌটো থেকে একটা বিড়ি বের ক'রে ধরিয়ে বললে, আমার আবার এমনি ধাত, জানলেন, যে একটি মিনিট ক্ষিধে সইতে পারি না। বাবা আমার টাকা দিয়ে যান নি বটে, কিন্তু এই সব ভাল ভাল গুণ কতকগুলো দিয়ে গেছেন। পৈতৃক ঋণের মত সে আর কিছুতে সঙ্গ ছাড়ে না।

রায়-মশাই হো হো ক'রে হেসে উঠল।

সুকুমারও হেসে ফেললে, বললে, চলুন তবে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ও আর দেরী করা কাজের কথা নয়। যে বাহারের রান্না, ঠাণ্ডা হ'লে ও আর মুখে দেওয়া যাবে না।

—যা বলেছেন!

সকাল বেলায় রমেশ এল পান চিবুতে চিবুতে। বাঁ হাতে এখনও একটি পান রয়েছে। ডান হাতে একটি পানের বোঁটায় চূণ।

রমেশ বয়সে সুকুমারের সমান হ'লেও একটু হিসেবী। মেসে বেশী খরচ হয় ব'লে সে মেসে থাকে না। তাদের গ্রামের একটি লোকের ওষুধের দোকান আছে, তারই একখানা অব্যবহার্য্য ঘরে সে এবং দোকানের কয়েকজন কম্পাউণ্ডার থাকে। খায় একটা হোটেলে। এই দিকে একটা চায়ের দোকানে দুবেলা চা খায়। পথে একটা উড়ের দোকানে পান কিনে সুকুমারের মেসে এল।

রমেশকে দেখে সুকুমারের মন খুশীতে ভ'রে উঠল। ওকে নিয়ে সে যেন কি করবে, কোথায় বসাবে ভেবে পেলে না। তার ঘরে আসনের মধ্যে ছোট একখানি আমকাঠের তক্তাপোষ। তার উপর অত্যন্ত পাতলা একখানি তোষক। বিছানার চাদরটিও এই সময়ে ময়লা হয়ে গিয়েছে।

এক গাল হেসে সুকুমার রমেশকে স্বাগত জানালে। বললে, কি ভাগ্যি! আসুন, আসুন।

উত্তরে রমেশ একটুখানি ফিকা হাসলে। অবহেলার সঙ্গে সঙ্কীর্ণ ঘরের চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে। পরে গম্ভীরভাবে বললে, কাল কাউকে কোন কথা না জিগ্যেস ক'রে সাত তাড়াতাড়ি কি ক'রে এলেন বলুন তো?

সুকুমার হো হো ক'রে হেসে বললে, কি ক'রে এলাম?

রমেশ বুঝলে তার গাম্ভীর্য্য যথোচিত হয় নি। ভাল ক'রে ব'সে আরও বেশী গম্ভীর হ'ল। ছোট ক'রে বললে, ভাল করেন নি।

সুকুমারও গম্ভীর হ'ল। বললে, তা ছাড়া আর কি পথ ছিল বলুন?

—পথ থাকে না। আমাদের জন্য কোথাও পথ তৈরি করা নেই। তৈরি ক'রে নিতে হয়।

—কেমন ক'রে?

রমেশ বিজ্ঞের মত হেসে বললে, তাই কি কেউ বলতে পারে! অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

—বেশ। আমার অবস্থায় কি ব্যবস্থা করতেন বলুন।

—একটা কিছু সম্ভব হ'ত নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনি যে বিনা বিবেচনায় হাতের ঢিল ছুঁড়ে দিলেন।

রমেশের কথাগুলো যেন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে চ'লে গেল।

সুকুমার মাথা নেড়ে বললে, কিচ্ছু হ'ত না রমেশবাবু, যেতে আমাকে হ'তই। এ ববং মানে মানে বিদায় নিলাম।

—অন্য কোথাও কিছু জুটেছে নাকি?

—কোথাও না।

—সে তো বুঝতেই পারছি। তাহ'লে?

রমেশ চিন্তিতভাবে পা দোলাতে লাগল।

সুকুমারের হঠাৎ মনে হ'ল, রমেশ তার চেয়ে এক ধাপ উপরে। গত কালের আগে পর্য্যন্ত সে-ই রমেশকে, অনুকম্পার সঙ্গে না হোক, সহানুভূতির সঙ্গে দেখে এসেছে। স্কুলের বেতন দু'জনেরই সমান হ'লেও ট্যুইশানে এবং ছেলেদের নোট লিখে সুকুমারের আরও কিছু আসত। রমেশকে দেখে অনেক বার তার মনে হয়েছে, আহা বেচারা! এই সামান্য বেতনে কি ক'রে যে চলে তার! এখন রমেশের পা দোলানো দেখে তার মনে হ'ল, হায়! সে যদি সুকুমার না হয়ে অন্তত রমেশও হ'ত—তাহ'লে কি সুখেরই না হ'ত!

সুকুমার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

রমেশ একটু হেসে বললে, আপনার চাকরী যে থাকবে না সে আমি আগেই জানতাম।

বিস্মিতভাবে সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, কি ক'রে?

—আপনার পড়ানোর ভঙ্গি দেখে।

—কি দোষ হ'ত ?

—দোষ কিছুই নয়। ছেলেদের জন্য আপনি যে কত পরিশ্রম করতেন সে বুঝি।

—তবে ?

রমেশ একটু বাঁকা হেসে বললে, ওতে ছেলেদের পাস করার কোন সুবিধা হয় না।

সুকুমার বিরক্তভাবে চুপ ক'রে রইল। এ অভিযোগ সে ইতিপূর্ব্বেও বহুবার শুনেছে। কিন্তু তার সত্যতায় তার তখনও আস্থা হয়নি, এখনও না। এদের মন জ'মে বরফ হয়ে গেছে। বুদ্ধি পাথর হয়ে গেছে। এরা নিজেরাও ফাঁকি দেয়, তরলমতি ছেলেদেরও ফাঁকি দিতে শেখায়। যারা গতানুগতিকতা ছেড়ে কোন মৌলিক পন্থায় চলে তাদের সম্বন্ধে এদের একটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন আতঙ্ক আছে। সুকুমার বুঝেছে এদের সঙ্গে তর্ক ক'রে লাভ নেই। তর্ক সে করেও না। এখনও চুপ ক'রে রইল।

রমেশ বলতে লাগল, অশ্বিনীবাবু যে বলেন···

সুকুমার অশ্বিনীবাবুর নাম শুনে তেলে-বেগুণে জ্বলে উঠল। এই লোকটিকে সে কোনদিনই প্রীতির এবং শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে পারেনি। ওর বকের মত মাথা নেড়ে নেড়ে চলা, শেলায়ের কলের সূচের মত বিজ্ঞভাবে মাথা দোলানো, অপরের ভাবালুতায় হাস্যপূর্ণ অবজ্ঞা এবং অযথা প্রহারে প্রীতি—তার মনে নিদারুণ বিতৃষ্ণা উদ্রেক করে। অশ্বিনীবাবুর নাম করতেই সে আর সহ্য করতে পারলে না।

ব'লে উঠল, অশ্বিনীবাবুর কথা থাক। তিনি কি বলেন সে আমিও জানি। কিন্তু আপনিই বলুন তো, ছেলেদের পরীক্ষা পাস করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব কি শিক্ষকদের ?

—নিশ্চয়ই। নইলে মাইনে দিয়ে আমাদের রেখেছে কেন ?

—মাইনে দিয়ে। তা বটে।—সুকুমার যেন একটা ধাক্কা সামলে নিলে। বললে, আমাদের রেখেছে সেজন্য নয়। পাঁচ সিকের বইতে যা পাওয়া যায় না, রেখেছে সেই কথা শোনবার জন্য। ভাষার আড়ালে যে কথা গোপন থাকে, রেখেছে সেই কথা জানবার জন্য। যে জ্ঞানভাণ্ডারের সন্ধান ছেলেরা এখনও পায় নি, আমাদের কাজ সেই সম্বন্ধে লোভ জাগাবার জন্য।

সুকুমারের ভাবালুতায় হেসে রমেশ যেন তার কথাকে ব্যঙ্গ করবার জন্য বললে, তারপরে ?

—তারপরে ছেলেরা নিজে খাটবে। যা নিজেদের বইতে নেই তা অন্য বইতে পাওয়ার জন্য খুঁজবে। নয় তো আমাদের জিজ্ঞাসা করবে। নিজেরাই বুঝবে কোনটা মনে রাখা বেশী দরকারী। কালের স্রোতঃপথের ধারাবাহিকতার সন্ধান পেলে উৎসের দিকে উজান চলা তাদের কিছুমাত্র কষ্টকর হবে না।

—কিন্তু তাতে যদি পরীক্ষায় ফেল করে ?

—পরের বৎসর পাস করবে। তখন আর সে পাসের মধ্যে ফাঁকি কোথাও থাকবে না।

রমেশ ঠোঁট টিপে হাসলে। বললে, একটা বৎসর এইভাবে লোকসান করার মানে জানেন ?

—না।

—মানে প্রায় পাঁচশো টাকা।

—কি ক'রে ?

—অতিরিক্ত এক বৎসরের পড়ার খরচ আছে। আর যে বৎসরটা নষ্ট হ'ল সেই বৎসর একটা ত্রিশ টাকারও চাকরী পেলে কত হয় হিসেব করুন।

সুকুমার ব্যথিতভাবে বললে, এটা কি হিসেব হ'ল।

—বেনের হিসেব।

—বেনের হিসেব কি এখানেও চলবে ?

—চলবে না ? এ শিক্ষার পরিণতিই যে বেনের দোকানে মোটা মোটা খাতায়!

রমেশ পরিহাস করছে, কিম্বা সত্য সত্যই বলছে বুঝতে না পেরে সুকুমার তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল।

রমেশ হেসে বললে, অবাক হবেন না সুকুমারবাবু! বেনের দোকানে চাকরী করা ছাড়া লেখাপড়া শেখার আর কি উদ্দেশ্য আছে বলুন ? আর সেই বেনের দোকানে ইতিহাস-ভূগোল-ফিলজফি-কেমিষ্ট্রির কতখানি দরকার লাগে তাও বলুন।

—লেখাপড়ার শেখার প্রয়োজন কি ওইতেই শেষ হয়ে গেল।

—গেল বই কি! যাওয়া উচিত হয়নি মানি, কিন্তু গেল। আপনার-আমার গেছে, যাদের পড়াবার ভার নিয়েছি তাদেরও ওইতেই শেষ হয়ে যাবে। এ ধ্রুব

জোরের সঙ্গে মাথা নেড়ে সুকুমার উত্তেজিতভাবে বললে, আমি মানি না।

রমেশ হো হো ক'রে হেসে বললে, নাই বা মানলেন। আপনার মানা না-মানার অপেক্ষাও রাখে না।

ওর হাসি সুকুমার কানেই তুলল না। উত্তেজনার বশে ব'লে চলল, আমি কি স্থির করেছি জানেন? সওদাগরী আফিসে চাকরী যদি পাই ত নোব না। যে পথে সবাই চলেছে গড্ডালিকার মত, সে পথে যাব না। তার জন্য যে মূল্যই দিতে হোক না কেন।

উত্তেজনায় ওর নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে উঠল। ঘন ঘন উচ্চ নিশ্বাস বইতে লাগল। ওর মুখ-চোখের উত্তেজিত ভাব দেখে রমেশ হাসতে গিয়েও থমকে গেল।

ধীরে ধীরে বললে, ভালই। পারলে খুবই ভাল। কিন্তু সে পথ কিছু স্থির করেছেন?

—না।

হাসি চেপে রমেশ বললে, তবে?

চিন্তিতভাবে সুকুমার বললে, কোন খবরের কাগজে যদি একটা কিছু পাই তো করি। অন্তত সেজন্য খানিকটা চেষ্টা করব। কিছুদিন থেকে কতকগুলি খবরের কাগজের আফিসের সঙ্গে জানা শোনাও হয়েছে। মনে হয়··

—লেগে যেতে পারে?

—অসম্ভব নয়।

—দেখুন চেষ্টা ক'রে।

সুকুমার নিঃশব্দে কি ভাবে চেষ্টা করা যায় ভাবতে বসল।

একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে রমেশ হঠাৎ বললে, আর ওদিকের কি ব্যবস্থা করবেন?

—কোন দিকের?

—স্কুলের বাকি টাকার?

সে সমস্যা সুকুমারের মনেও আছে। সে বিব্রতভাবে বললে, কি করা যায় বলুন তো? অন্তত কিছু টাকা বোধহয় মারা যাবেই।

হাত নেড়ে রমেশ বললে, গেলেই হ'ল! ন্যায্য খেটেছেন, মাইনে মারা যাবে কেন?

অসহায়ভাবে সুকুমার বললে, কি করব তবে? না দিলে আমি কি করতে পারি? এই সামান্য ক'টা টাকার জন্য আমি কোর্টে ছুটোছুটি নিশ্চয়ই করতে পারব না।

রমেশ এইবার ভাল ক'রে গম্ভীরভাবে চেপে বসল। বললে, ওই তো আপনাদের মত স্বভাবের লোকের দোষ। নিজেও মারা যান, পরকেও মেরে যান।

—কি ক'রে?

—না তো কি! আপনাকে আজ ফাঁকি দিতে পারলে, কাল আমাকেও ফাঁকি দেবার সাহস বাড়্‌বে। জানবে এ বেচারা হয় তো আর কিছু করতে পারবে না। এদের নির্ব্বিবাদে exploit করা চলবে না। আর আজ যদি আপনার কাছে ঠেলা পায়···

কি ক'রে পাবে?

রমেশ নড়বড়ে তক্তাপোষটায় সজোরে একটা চাপড় দিলে। সে প্রচণ্ড চাপড়ে তক্তাপোষখানা থর-থর ক'রে কেঁপে উঠল।

বললে, সেই কথা বলতেই এলাম। আপনাকে তো জানি কি না! একদিনের ওপর দু'দিন হয়তো তাগাদা করতে যাবেন। তারপর বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেবেন।

—আর কি করব?

—ওই তো! ওতে হবে না।

—কিসে হবে তাই বলুন না!

—দরকার হ'লে ইন্‌স্পেক্টার অফিসে দরখাস্ত করতে হবে। আপনি বোধ হয় জানেন না, এর আগে আরও দু'জনকে তাই ক'রে টাকা আদায় করতে হয়েছে। তাতেই তো ইন্‌স্পেক্টার অফিস চ'টে আছে, এর ওপর আপনার দরখাস্ত গেলে recognitionই বন্ধ হয়ে যাবে।

জিভ কেটে সুকুমার বললে, না না। অতখানি করা ঠিক হবে না। তবু তো যাহোক কতকগুলি শিক্ষকের অন্নসংস্থান হচ্ছে। অনেকগুলি ছেলে পড়ছেও।

হা হা ক'রে হেসে রমেশ বললে, পাগল হয়েছেন! অতখানি করবার হয়ত আবশ্যই হবে না। কিন্তু ওই ভয় দেখাতে হবে। আপনি আমাদের অন্ন-সংস্থানের কথা ভাবছেন মশাই, কিন্তু স্কুল রাখার প্রয়োজন আমাদের চেয়েও সেক্রেটারীর বেশী।

—কেন?

রমেশ আরও জোরে হেসে বললে, আপনি মশাই

একেবারে ছেলেমানুষ। যা হোক কিছুকাল ধ'রে মাষ্টারী তো করলেন, কিন্তু চোখ মেলে কিছুই তলিয়ে দেখেন নি। খালি গাধার মত খেটেছেন, আর ছেলেগুলোকে ফেল করার রাজপথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

ওর কথা শুনে সুকুমারও বোকার মত হাসতে লাগল। আর চকমক ক'রে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগল—কোন দিকটা সে ভাল ক'রে তলিয়ে দেখেনি।

প্রায় ওর মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ে রমেশ বললে, স্কুল থেকে বছরে যে টাকাটা সেক্রেটারী পায় তাও না হয় ছেড়েই দিন। তা ছাড়াও কি কম সুবিধাটা পায়!

সুকুমার তথাপি বুঝতে পারলে না। বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চাইতে লাগল।

রমেশ তার এই নির্ব্বুদ্ধিতায় বিরক্ত হয়ে বললে, আরে মশাই, এই স্কুলটা না থাকলে ও কি কর্পোরেশনে যেতে পারত ভেবেছেন? পাঁচজনের পাঁচটা ছেলে পড়ে, তারা কিছু খাতির না ক'রে পারে না। তার ওপর আমরা আছি। গেল ইলেকশনের সময় ছিলেন না তো। পড়াশুনো সব বন্ধ। ছেলেরা সাজগোজ ক'রে স্কুলে আসে, আর পাঁচটা পর্য্যন্ত হো হো ক'বে, মার্ব্বেল খেলে, লাট্টু ঘুরিয়ে বাড়ী যায়। আর আমরা কোমরে চাদর জড়িয়ে ভোটারের বাড়ী-বাড়ী দিনরাত ঘুরে বেড়াই। বড় বড় ছেলেরাও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। এমনি চ'লেছিল পূরো একটি মাস। বিনা পয়সায় এতগুলি ক্যানভাসার কোথায় পেত বলুন তো?

সুকুমার মাথা নেড়ে বললে, তা বটে।

—এবার আবার কাউন্সিলে দাঁড়াচ্ছে, শুনেছেন?

—হ্যাঁ।

—কি সাহসে দাঁড়াচ্ছে বলুন তো? স্কুলটি না থাকলে পারত? জনসাধারণের কাছে ভোট চাইবার কি অধিকার ওর আছে?

সুকুমার চুপ ক'রে রইল।

—তবেই বুঝুন স্কুল ও ওঠাতে পারবে না। যতদিন না তাড়াচ্ছে ততদিন আমরাও আছি। যদি দেখেন টাকাটা দেবার মতলব নেই, অমনি ইন্স্পেক্টার অফিসে দরখাস্ত করার ভয় দেখাবেন। দেখবেন, ভড়্কে গেছে।

যুক্তিটা সুকুমারেরও ভাল মনে হ'ল। বললে, এটা আপনি মন্দ বলেন নি। আসছে রবিবারে সকালের দিকে আসবেন একবার—আপনি তো চা খেতে এদিকে রোজই আসেন।

রমেশ হেসে বললে, প্রত্যহ আসি। এত দুঃখ-দুর্দ্দশার মধ্যেও ওইটুকু বিলাসিতা রেখেছি। ড্রিঙ্ক ওয়েল কেবিনের চা আর উড়ের দোকানের গুণ্ডি-দেওয়া পান, এ না হ'লে একটি বেলা আমার চলে না।

—কিন্তু আপনার বাসা তো অনেক দূরে।

—দেড় মাইলের কম নয়, মানে উজিয়ে উড়ের দোকান পর্য্যন্ত যাওয়ার জন্য। এই দেড় মাইল সকালে একবার, বিকেলে একবার।

দুজনেই হাসলে।

রমেশ তক্তাপোষ ছেড়ে উঠে একটা হাই তুলে বললে, তাহ'লে তাই হবে। রবিবার সকালে এসে জেনে যাব কি স্থির হ'ল। আপনি থাকবেন যেন।

—নিশ্চয়।

—আমি এই আজ যেমন সময়ে এলাম এই রকম সময়েই আসব।

—তাই আসবেন।

—আচ্ছা, নমস্কার। ন'টা বাজেনি নিশ্চয়ই। আজও পর্য্যন্ত আবার স্কুল আছে তো।

সুকুমার বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, আজও পর্য্যন্ত মানে? আপনার আবার কি হ'ল?

—হয়নি কিছুই। কিন্তু হ'তে কতক্ষণ! হয়তো গিয়েই শুনব আপনাকে আর দরকার নেই। আমাদের তো এই রকমেরই চাকরী কিনা! যাও বললেই উঠতে হবে।

সুকুমার হেসে বললে, সে ঠিক। স্থায়িত্ব ব'লে তো আর কিছু নেই।

রমেশ উঠেছিল, ফের বসল। বললে, ওই জন্যই তো আমাদের এত দুর্দ্দশা। সর্ব্বদা মাথা নীচু ক'রে চলতে হয়। প্রভুর মর্জ্জি বুঝে দাঁত বের ক'রে হাসতে হয়। মাঝে মাঝে প্রভুগৃহে গিয়ে তাঁর পুত্রকন্যাকে কোলে নিয়ে আদর করতে হয়। ওই স্থায়িত্ব নেই ব'লে না এত গ্লানি। নিজেদেরও মনুষ্যত্ব খর্ব্ব হচ্ছে, অন্যের মনুষ্যত্ব বিকাশেও বাধা দিচ্ছি। এমনি ক'রে আমরা কেরাণীরও অধম হয়ে পড়েছি।

রমেশ যেন বিষণ্ণভাবে কি ভাবলে।

একটু পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, আজকে তাহ'লে উঠলাম সুকুমারবাবু। রবিবারে থাকবেন, আমি আসব।

রমেশ নমস্কার ক'রে বিদায় নিয়ে চ'লে গেল। (ক্রমশঃ)

কবি ও সংস্কারক—হেনরী ডিরোজিও

শ্রীপরিমল দত্ত

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাসে, বাঙ্গালীর শিক্ষা ও শিক্ষকতার ইতিহাসে, বিশেষ করে ইংরেজি-শিক্ষিত নব্য-সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিগত নূতন আন্দোলনের ইতিহাসে—এই স্মিতহাস্য প্রিয়দর্শন কবি ও তরুণ অধ্যাপকের নাম অস্থিমজ্জায় মিশে আছে। আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার ধারা-বাহিক ইতিহাস রচিত হয় নি। যেদিন লেখা হ'বে সেদিনের উদীয়মান ঐতিহাসিক তাঁর উজ্জ্বলতম অধ্যায় ডিরোজিওর অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও তাঁর সুদূরবিসর্পী-প্রভাবের বিশ্লেষণে নিয়োজিত করবেন। তেইশ বছরের য়ুরেশিয়ান যুবক শিক্ষায় ও সংস্কারে, কাব্যে ও সত্যনিষ্ঠায় কলকাতার সেকালের ইঙ্গ ও বঙ্গ সমাজে তাঁর বলদৃপ্ত ব্যক্তিত্বের যে ছাপ রেখে গেছেন, তা শতাব্দীর যাত্রাপথের ধূলিতে আজও মলিন হ'য়ে উঠে নি।

একশ' বছর আগেকার কথা। তখন আমাদের জীবনের সমস্যা ছিল অন্য জাতীয়, তার সমাধানের ধারাও ছিল স্বতন্ত্র। আজকের দিনের মত বাঙ্গালা তখন বিংশ শতাব্দীর আলোকদীপ্ত আকাশের নীচে, ব্রিটীশ রাজনীতির তাঁতে স্বায়ত্তশাসনের জাল বুনতে শেখেনি। হরিজনের তখনও জন্ম হয়নি। প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িকতার ত্রৈবার্ষিক-দ্বন্দ্বে হিন্দু ও মুসলমান তখনও অগ্রসর হন নি। সেদিনে আরও অনেক কিছুই ভবিষ্যতের গর্ভে বিলীন ছিল। বিলাতী শিক্ষার রঙ্গীন আপেলে মুষ্টিমেয় ইংরেজিভাবাপন্ন জনসাধারণ সবে কামড় দিয়েছেন মাত্র। দেশ তখন দ্বিধাজড়িত, সন্দেহ-সঙ্কুল। পাশ্চাত্যশিক্ষা আসি-আসি করছে, চিরাগত প্রাচীনকালের পণ্ডিতী শিক্ষার উঠবার বড় একটা লক্ষণ নেই। সতীদাহ প্রথা রহিত হয়নি। সমুদ্রযাত্রা সেদিনে ছিল স্বপ্ন। হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও সেই সন্ধিযুগের লোক। তাঁকে জানতে হ'লে, তাঁর পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আবেষ্টনী ভাল করে বুঝা দরকার।

আঠারই এপ্রেল, আঠার শ'-নয়—মৌলালির কাছে পিতার আবাসস্থল লোয়ার সার্কুলার রোডে হেনরী ডিরোজিও ভূমিষ্ঠ হন। সে বাড়ী আর এখন নেই; সে জমির উপর এক বিরাট অট্টালিকা গড়ে উঠেছে। উপস্থিত সে বাড়ীর নম্বর হ'ল ১৫৫ লোয়ার সার্কুলার রোড। মাইকেল ডিরোজিও ব্যতীত ডিরোজিও পরিবারের অপর কোনও উর্দ্ধতন পুরুষের পরিচয় আমরা পাই না। ইনি কবি হেনরীর পিতামহ। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের St. John's Baptismal Register-এ তাঁর পরিচয়ে এই কথা লেখা আছে যে তিনি একজন "দেশীয় প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান"। আরও কয়েক বৎসর পরে ১৭৯৫ সালের "বেঙ্গল ডাইরেক্টরী"তে তাঁর নামের উল্লেখ দেখা যায়। এবারে তিনি সম্ভ্রান্ততর আখ্যায় অভিহিত হয়েছেন। দেশজ খৃশ্চানের পরিবর্ত্তে তাঁকে বলা হ'য়েছে, "জনৈক পর্ত্তুগীজ বণিক ও প্রতিনিধি"। এই সূত্রে বলা আবশ্যক মনে করি, মাইকেল ডিরোজিও একদা কোম্পানীর সমগ্র আফিং-এর চালান কিনে নিতে চেয়েছিলেন। সুতরাং তিনি যে টাকার মানুষ ছিলেন এ-কথা নিঃসন্দেহে মেনে নেওয়া চলে। অপরাপর কাগজ-পত্রের মধ্যে মাইকেল ডিরোজিওর সহিত ব্রিজেটের আইনতঃ বিবাহের কথা লেখা আছে। মাইকেলের বড় ছেলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে চাকরী করতেন। তাঁর মেজ ছেলে কবির পিতা ফ্রান্সিস ডিরোজিও মেসার্স জেমস্ স্কট য়্যাণ্ড কোম্পানীতে (Messrs James Scott & Co) চিফ য়্যাকাউনটেণ্টের কাজ করতেন। তিনি ১৮০৬ সালে সোফিয়া জনসন্ নামে এক এক ইংরেজ মহিলার পাণিগ্রহণ করেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় ডিরোজিও-দম্পতির সন্তানসন্ততির মধ্যে কেহই দীর্ঘ-জীবন লাভ করা দূরে থাক, নির্ম্মম অকাল-মৃত্যুর হাত এড়িয়ে যান নি। পাঁচ পুত্র ও কন্যার ভিতর তিনজন বাইশ বছরে, একজন বিশ বছরের কিছু আগেই এবং অন্যজন সতরো বছরে লোকান্তরিত হন। ডিরোজিওর শ্রেষ্ঠ সঙ্কলিত কবিতাবলীর প্রকাশক ব্রাড্‌লে-বার্ট (F. B. Bardley-Birt) বলেন—"পরিবারের অল্পায়ু হওয়ার একমাত্র কারণ বর্ণশঙ্করতা। দুটি পরস্পর বিভিন্ন

জাতির রক্তের সংমিশ্রণ এইরূপ শোচনীয় পরিণাম সৃষ্টি করে।" *

কবির সংক্ষিপ্ত জীবনে বাসস্থান পরিবর্ত্তনের বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়নি। শৈশব হ'তে কৈশোর, কৈশোর হ'তে তরুণায়িত যৌবন ও মৃত্যু পর্য্যন্ত লোয়ার সার্কুলার রোডের সেই দ্বিতল বাসভবনকে কেন্দ্র করে তাঁর জীবন প্রতিদিন ফলে ও ফুলে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। এটানের খেলার মাঠে যদি ওয়াটারলু জেতা সম্ভব হয়, তবে ডিরোজিও নিকেতনে যে শিক্ষা বিকীরণ হয়েছিল—নয়া বাংলার জয়যাত্রার সুরু সেই থেকে।

কতদিন অনেক রাত অবধি তর্কবিতর্কের পর ডিরোজিওর প্রিয় শিষ্যবৃন্দ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন। উন্নতদেহ শালপ্রাংশু রামগোপাল ঘোষ অনুচ্চারিতকণ্ঠে বার্ক আবৃত্তি করতে করতে সিঁড়ি ভেঙ্গে নেমেছেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় গম্ভীর ও বিষণ্ণ—প্যালেস্টাইনের উষর মরুর সেই স্বর্গীয় মেষপালকের অকলঙ্ক শুভ্র জীবন তাঁকে মুগ্ধ করেছে। চটুল দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কোনও রহস্যপঙ্কিল সদ্যপঠিত ইংরেজি প্রেমোপাখ্যান থেকে উঠে আসচেন—

—আর সবার শেষে নীরবস্রোতা রক্ষণশীল কুলীন রামতনু লাহিড়ী। 'আলাদিনের মায়ার প্রদীপ' এই প্রিয় হিন্দুকলেজের ছাত্রদলের উদ্দেশ্যে ডিরোজিও পরে লিখেছেন—

"Expanding like the petals of youg flowers
I watch the gentle opening of your minds
... ...
What joyance rains upon me, when I see
Fame in the mirror of futurity,
Weaving the Chaplets you have yet to gain !
Ah ! feel I have not lived in Vain." †

"নূতন ফুলের পাপড়ি মেলার মত,
তোমাদের তরুণ মনের মৃদু বিকাশ আমি লক্ষ্য করছি
... ...
কি আনন্দই না আমার উপর বর্ষিত হয়, যখন দেখি
ভবিষ্যের মুকুরে তোমাদের যশ সৌরভ
ফুলের মুকুট বুনছে—যা তোমরা এখনও পাওনি !
আহা ! তাহলে আমার জীবন ব্যর্থ হয়নি।"

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ডিরোজিওকে স্কুলে ভর্ত্তি করা হ'য়। ঐ বৎসর কবি-জননী সোফিয়া মারা যান। সে সময় কলকাতায় কোনও পাব্লিক স্কুল না থাকলেও ব্যক্তিগত পরিচালিত প্রসিদ্ধ কয়েকটী স্কুলের নাম করা যেতে পারে। তার মধ্যে সেরবোর্ণ, ফ্যারেল লীওষ্টেড, হার্টম্যান ড্রামণ্ড প্রভৃতি অন্যতম। হিন্দু-স্কুলের আগে শেষোক্ত স্কুলটী যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ডিরোজিও এই স্কুলেই নাম লেখালেন। ডেভিড ড্রামণ্ড (১৭৮৭-১৮৪৩) শিক্ষকতার উদ্দেশ্য নিয়ে সুদূর স্কটল্যাণ্ড হ'তে কলকাতায় আসেন। ছোটখাট গোছের একটী পরীক্ষা দেওয়ার পর মেসার্স ওয়ালেস য়্যাণ্ড মেন্সারর্স-এ তাঁর মাষ্টারী জুটে। ধর্ম্মতলার এই স্কুলই পরে ড্রামণ্ডস্ য়্যাকাডেমী নামে অভিহিত হয়। এই স্কচ্ পণ্ডিতের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

প্রতিভার মাঝে এমন কোনও জিনিস আছে—যা অপরাপর মানুষ হ'তে একটা মানুষকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে। ড্রামণ্ডের তাই হয়েছিল। তাঁর মৌলিক চিন্তার গভীরতা, লাটীন ও গ্রীক সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য, অধ্যাত্মদর্শন ও গণিতশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি—সেকালের স্কচ-পণ্ডিতেরই শোভন ছিল। ডিরোজিও একাদিক্রমে আট বছর ড্রামণ্ডের নিকট অধ্যয়ন করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে এ শিক্ষা তাঁর ব্যর্থ হয় নি। তাঁর জীবনে যদি কারুর প্রভাব সব চেয়ে বেশী কাজ করে থাকে তা তবে ড্রামণ্ডের।

বালককাল হতেই ডিরোজিও মিশুক প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর ব্যবহার ছিল বড়ই মধুর। এ কারণে সহজেই তিনি শিক্ষক ও সঙ্গীদের হৃদয় জয় করতে সমর্থ হন। অন্যায়ের প্রতি তাঁর ছিল মর্ম্মান্তিক আক্রোশ। নীরবে অন্যায়কে বরদাস্ত করা অভ্যাস ছিল না। অসত্য ও অবিচার, মিথ্যাচরণ ও কুসংস্কারকে জীবনে কোনও দিন তিনি স্বীকার করেন নি। অন্তর ও বাহিরে পৃথক দেওয়াল তুলে আপনাকে তিনি দ্বিখণ্ডিত করেন নি। ঐ একই কারণে—তাঁর কাব্য, সাংবাদিক প্রবন্ধ ও ব্যক্তিগত জীবন আন্তরিকতায় মাখা ছিল। হিন্দু কলেজের আদি পর্ব্বে যে স্বাধীন চিন্তাধারা একটা ঘুমন্ত বাঙালী সমাজে বিপ্লব সূচনা করেছিল—তারও মূলে ছিল ডিরোজিওর একনিষ্ঠ সত্যপ্রিয়তা ও সত্যের প্রকাশ। কবির বয়স যখন চৌদ্দ

* The Forgotten Anglo-Indian Bard Henry Louis Vivian Derozio,-Preface.
F. B. Bradley-Birt.

† Sonnet to the Pupils of the Hindu College.
H. Derozio.

(১৮২৩) তিনি ড্রামণ্ডস্ য়্যাকাডেমির সম্পর্ক ত্যাগ করেন এবং পিতার আপিসেই চাকরী করতে লাগলেন। স্কুল থেকে এত অল্প বয়সে কেন তাঁর নাম কাটানো হয় এ বিষয়ে ইতিহাস একান্ত নীরব। তাঁর অর্জ্জিত শিক্ষা, প্রবল পাঠানুরাগ, মার্জ্জিত রুচি ও অত্যুগ্র প্রতিভা নিশ্চিত নীরস বৈচিত্র্যহীন রুটীন-বাঁধা কেরাণী-জীবনের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সওদাগরী আপিসের দীর্ঘসূত্রিক লালফিতার ফাঁকে ফাঁকে স্বপ্ন-উদাস স্কুলজীবনের দিনগুলি ভিড় করে দাঁড়াত কি-না কে জানে। যাহোক আমাদের কবিকে বেশীদিন এ দুর্ভোগ সহ্য করতে হয় নি। গুরুতররূপে অসুস্থ হয়ে পড়ায় বাধ্য হয়ে তাঁকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য ভাগলপুরে পাঠান হয়। কবিতাময় ভাষায় যদি বলা যায়—তবে ডিরোজিও প্রতিভার মণিমঞ্জুষার দ্বারোদ্ঘাটন ভাগলপুরেই হ'য়েছিল। কলকাতায় যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর কাব্য অশ্বমেধ সাফল্যের বিঘ্নসঙ্কুল বন্ধুর পথে জয়যাত্রায় অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। সাহিত্যিক, শিক্ষিত ও রুচিবাগীশ মহলে তাঁর খ্যাতি হ'য়েছিল যথেষ্ট। সে কথা পরে বলা যাবে।

আর্থার জন্সন্ ভাগলপুরে তারাপুর নীলকুঠির মালিক ছিলেন। কিছুকাল নৌ-বিভাগে চাকরী করার পর ভাগলপুরে তিনি স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগলেন। ইতি জাতে ছিলেন খাঁটী ইংরেজ। ডিরোজিওর সঙ্গে এর সম্বন্ধ ত্রিবিধ। মামা ও দু'ইবার পিসেম'শায়। ডিরোজিও তাঁর মামার নীলকুঠিতে চাকরী করতে লাগলেন। কল্‌কাতার কলকোলাহলের পাল্লার বাইরে একান্ত নিরালায় প্রকৃতির এই অকুণ্ঠিত পরিচয় কবির ভাল লাগলো। অনাড়ম্বর পল্লীর জীবনযাত্রা, পশ্চিমের গঙ্গার গিরিমালাবিসর্পিত মঞ্জুশ্রী, আকাশ বাতাস ও আলোকময় পরিবেশ—সবাই মিলে তাঁকে দিয়ে কবিতা লেখাতে বাধ্য করালে। যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁদের অবশ্যই জানা আছে কবির সঙ্গে চারিদিককার আশপাশের যোগ কতখানি গভীর ও ঘনিষ্ঠ। এবারে তাঁর ভাববার সময় এল। সাধারণ মানুষের গণ্ডী ছাড়িয়ে যাঁরা বড় হয়েছেন, সমাজে যারা বিপ্লব এনেছেন, গতানুগতিক সংস্কার ছাড়িয়ে যারা উঠেছেন—তাঁরা শুধু বই-ই পড়েন নি—সেই সঙ্গে ভেবেছেনও প্রচুর। ডিরোজিও এতদিনে যা শিখেছিলেন, সে সম্বন্ধে ভাল করে তলিয়ে ভেবে দেখতে চাইলেন। পরবর্ত্তী জীবনে যে স্বাধীন মতবাদ ও যুক্তিস্পৃহতা পোষণ করতেন—তার সূচনা হ'য়েছিল এখান থেকেই। শুধু এই কারণবশতই পরে ডিরোজিওকে সনাতনী হিন্দু সমাজ "নাস্তিক" "অবিশ্বাসী" বলে উপহাস করেছে। স্কুলজীবনে ডিরোজিও সম্ভবত কবিতা চর্চ্চা করতেন। তাঁদের স্কুলে প্রায়ই ছোটখাট নাটক অভিনয় হ'ত। কবি গৌরচন্দ্রিকা লিখে দিতেন। ভাগলপুরে এসে তিনি নূতন উদ্যমে কাব্য-চর্চ্চা সুরু করে দিলেন। ফকির অব জঙ্গিরা (The Fakir of Jungheera)



হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও

একখানি সুন্দর খণ্ডকাব্য। ভাগলপুর থেকেই কবি তাঁর লেখা ডক্টর গ্রাণ্ট সম্পাদিত "দি ইণ্ডিয়ান গেজেটে" নিয়মিতভাবে প্রকাশ করতেন। তিনি নিজের নাম গোপন রেখে "Juvenis" এই ছদ্মনাম গ্রহণ করলেন। তাঁর কবিতার এই সহজ, সরল ও সাবলীল গতি এবং সুন্দর লিপিচাতুর্য্যে গ্রাণ্ট মুগ্ধ হয়েই শুধু ক্ষান্ত রইলেন না—ডিরোজিও ভবিষ্যতে যাতে আরো সাফল্য লাভ করতে পারেন—এ জন্য তিনি তাঁকে এ যুগের বিদিশা কলকাতায় আহ্বান করলেন। উদীয়মান কবি কলকাতায় ফিরে এলেন "ইণ্ডিয়ান গেজেটে"র সহকারী-সম্পাদকরূপে।

একথা অবশ্য স্বীকার্য্য ডিরোজিও ডক্টর গ্রাণ্টের সব চাইতে বড় আবিষ্কার। ঈশ্বর যার জীবনের শেষ দাঁড়ি তেইশ ধরে রেখেছিলেন—তাঁর কপালে সুযোগও জুটিয়ে রেখেছিলেন প্রচুর। কাব্যবিতান ডিরোজিওর মুকুলিত প্রতিভার মালী হিসাবে গ্রাণ্টকে আশা করি আমরা ভুলে যাব না। কলকাতায় ফিরে এসে তিনি নবীন উদ্যমে পত্রিকা পরিচালনায় আপনাকে ব্যস্ত রাখলেন। তাঁর লেখাপড়া ছিল প্রচুর, লিখনভঙ্গী ছিল ঝরঝরে, পরিষ্কার ও জোরালো। ইণ্ডিয়ান গেজেট ছাড়া কলকাতার অপরাপর অনেক কাগজেই তাঁর লেখা প্রকাশিত হত। "দি বেঙ্গল য়্যানুয়েল," "দি কালকাটা ম্যাগাজিন," "দি কেলিড্ স্কোপ," "দি ইণ্ডিয়ান ম্যাগাজিন" এবং আরও প্রায় পাঁচ ছয়খানি পত্রিকায় তিনি নিয়মিতভাবে লিখতেন। আরও কয়েক মাস পরে ডিরোজিও "দি কালকাটা গেজেট" নামে একখানি পত্রিকার সম্পাদনার ভার নিলেন। তখন তাঁর বয়স কুড়ি বছরও হয় নি।

তাঁর প্রতিভা ও বিদ্যার খ্যাতি সারা কলকাতা সহরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। শুধু তাই নয়, "ফকির অব্ জঙ্গিরা" প্রকাশিত হবার পরে লণ্ডনেও তাঁর কবিত্ব-খ্যাতির কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। কেউ কেউ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। কয়েক বছর পরে—হিন্দুকলেজ তখন স্থাপিত হয়েছে—ইংরেজি ও ইতিহাসের সহকারী শিক্ষকরূপে তাঁকে আহ্বান করা হল। কবি আনন্দের সহিত এ সম্মান গ্রহণ করলেন। তাঁর কলম যে প্রভাব বৃহত্তর জনসাধারণের উপর সৃষ্টি করেছিল—তার চাইতে আরও বেশী ছিল তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রভাব। চুম্বকের মত দলে দলে ছাত্র তাঁর অধ্যাপনায় আকৃষ্ট হ'তে লাগলো।

শিক্ষক হিসাবে ডিরোজিওর স্থান সবার উঁচুতে। হিন্দুকলেজের সংস্রবে তাঁকে বেশী দিন থাকতে হয় নি। তিন বছরের বেশী নয়। ডিরোজিও তিন বছরে যা করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তিরিশ বছরের ঐকান্তিক সাধনায় অপর কারুর পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। ডিরোজিওর একমাত্র প্রামাণিক জীবনী-কার এডোয়ার্ডস্ (Thomas Edwards) বলেন, ইংরেজিশিক্ষার বহুল প্রচার ও বাঙ্গালায় মিশনারী ডাফ্-এর সাফল্যে ডিরোজিরও দান অপরিসীম।

ডিরোজিওর শিক্ষার রীতি ছিল নিজস্ব ও আপন-করা। ডক্টর হোরেস উইলসন্, ডেভিড হেয়ার প্রমুখ বিখ্যাত শিক্ষাবিদরা তাঁর শিক্ষকতার শতমুখে প্রশংসা করে গেছেন। শিক্ষক ও ছাত্রের মাঝে যদি পরস্পরের আন্তরিক সমবায় সহানুভূতি ও শুভযোগ না থাকে—তবে শিক্ষাই বৃথা। ডিরোজিওর ব্যক্তিত্বের চুম্বকশক্তি ছাত্রকে দূরে ঠেলে রাখেনি, কাছেই টেনে এনেছিল। তাঁর অমায়িক চরিত্র ও সুমিষ্ট আলাপ সকলকেই মুগ্ধ করত।

চিন্তানায়ক ডেভিড ড্রামণ্ডের শিক্ষা এবং ভাগলপুরের নির্জ্জনে শোনা 'আপন মর্ম্মবাণী' তাঁকে চিন্তাশীল করে তুলেছিল। সকল জিনিষকে তিনি যুক্তি ও তর্কদ্বারা যাচাই করে গ্রহণ করতেন। সংস্কারের বশবর্ত্তী হ'য়ে কোন কাজ-করা তাঁর ধাতে সহ্য হ'ত না। ছাত্রদের মধ্যে তিনি আপনার স্বাধীন চিন্তাধারা শেখাতে লাগলেন। ছাত্রদের কাছে তাঁর বাণী ছিল—জ্ঞানানুশীলন ও সত্যানুসন্ধান। ডিরোজিও বিশেষ কোনও গোঁড়ামীর ধার ঘেঁসে চলতেন না। তিনি ছিলেন সংস্কারমুক্ত পুরুষ। তাঁর আদর্শকে খাটো করে মিথ্যার সঙ্গে সহজলভ্য সত্যের মিলন ঘটান নি। চিরাচরিত ক্রমচর্য্যায়ে (Tradition-এ) ঘা খেয়েও সত্যকে জানবার আগ্রহ তাঁর কমত না। তিনি হিন্দুর কুসংস্কারকে ঘৃণা করেছেন, হিন্দুকে ঘৃণা করেন নি; বাঙ্গালীর সামাজিক মিথ্যা আচারের উপর কশাঘাত করেছিলেন—বাঙ্গালীর উপর নয়। ডিরোজিওর শিক্ষার কুফল নিয়ে হিন্দুসমাজ লম্বা কাঁদুনী গেয়েছেন। কুফল ফলেছিল অনেক, কিন্তু যে কেবলি অবিমিশ্র কুফল ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পেয়েছিল এই কথাটাই সত্য নয়। দেশে যখন কোনও স্মরণীয় পরিবর্ত্তন উদ্যত হয়ে উঠে, তখন আবহমান কালের সংস্কার ও শিক্ষা আপনা থেকেই বদলায়। তখন রামমোহনের যুগ। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও স্বাধীন চিন্তা সনাতনী হিন্দুসমাজের বুকে নিশীথের দুঃস্বপ্নের মত চেপে বসেছে। অতি-আধুনিকরা তখন গোমাংস ভক্ষণ ও মদ্যপানের প্রতিযোগিতা দিচ্ছেন। পূজার ঘরে ইলিয়াদ গায়ত্রী-উপাসনার স্থান দখল করেছে। হিন্দুধর্ম্মবিগর্হিত এই জাতীয় অনেক অপরাধের জন্যই ডিরোজিওকে অভিযোগ করা হ'য়। তিনি সম্পূর্ণ না-হ'ক আংশিক দায়ী। তারুণ্যের ধর্ম্মই হ'ল বাড়াবাড়ি—যৌবনের উদ্বৃত্ত সঞ্চয় চিরদিনই উচ্ছৃঙ্খল। তাঁর শিক্ষার

একটা ভাল দিকও ছিল—সেটা ভাববার দিক, সেটা বুঝবার দিক। নিরেট যুক্তি ও তর্কের আওতায় শিক্ষানুরাগী ছাত্রদের মধ্যে যে চিন্তার বীজ বপন করেছিলেন, তার মূল ছিল অন্তরে—বাইরে নয়। সেই কারণে ডিরোজিও হিন্দুকলেজ হ'তে ইস্তফা নেওয়ার পরও আন্দোলন মিইয়ে যাইনি। ডিরোজিও পদত্যাগ সম্পর্কে ডক্টর উইলসন্ ও বোর্ড অব্ হিন্দু কলেজের উদ্দেশে যে কয়খানি চিঠি লিখেছিলেন তা সত্যই অদ্ভুত। চিঠিগুলির মধ্যে একখানি উচ্চশিক্ষিত আত্মমর্য্যাদা-সম্পন্ন ভদ্র মন উঁকি দেয়। ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ যে কারণে অভিযুক্ত করেন তার কোনও প্রমাণ ছিল না। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত প্রধান অভিযোগ কটী এই যে, তিনি প্রথমত ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। দ্বিতীয়ত পিতামাতাকে মান্য করা নৈতিক কর্ত্তব্য হিসাবে গ্রহণ করেন না। তৃতীয়ত ভ্রাতা ও ভগিনীর বিবাহ দোষের নয় ইহা সমর্থন করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় ডিরোজিও ইহার কোনটীও ছাত্রদের নিকট প্রচার করিতে যান নাই। যুক্তি ও বিচার মারফৎ তিনি বিষয়গুলিকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন মাত্র। হিন্দু কলেজের অপরিসর প্রেক্ষাপ্রাঙ্গণ হতে তাঁর ঘনিষ্ঠ প্রভাব সংবাদপত্রের দৈনন্দিন জগতে ছড়িয়ে দিলেন। আবার সেই আগেকার দিনের মত সাংবাদিকের কাজে ডুবে গেলেন। আবার সুরু হল তাঁর অসিযুদ্ধ। তাঁর শাণিত অসির যে ধার এত প্রখর নিজেই তখন প্রথম অনুভব করলেন। দৈনিক পত্র "দি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান" প্রকাশ হ'তে লাগলো। ডিরোজিও ফিরিঙ্গি সমাজের সমস্যা ও স্বার্থ নিয়ে চিন্তামূলক সম্পাদকীয় লিখতে লাগলেন। এবার আর ডিরোজিওর সখের সাংবাদিকতা নয়। বাবা তাঁর মারা গেছেন, আগেকার স্বচ্ছল অবস্থা আর নেই। টাকা-কড়ির দিক দিয়ে এবার তাঁদের ভাঁটা চলছে। কবি অমানুষিক পরিশ্রম করতে লাগলেন। তাঁর জীবনের নক্ষত্র ভোরবেলাকার শুকতারার মত ঔজ্জ্বল্যে দ্যোতনায় আরও গভীর আরও প্রকাশমান ও চঞ্চল হ'য়ে উঠল—এবার যে তাঁর বিদায় নেবার সময় হ'য়ে এল।

বিদ্যাসাগর ম'শায় যেমন "আমাদের এই কাকের বাসায় কোকিলের ডিম" বিশেষ—য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান হয়েও ফিরিঙ্গি সমাজে ডিরোজিওর উদ্ভব অনেকটা ঐ জাতীয়। তিনি ফিরিঙ্গি হয়েও তথাকথিত ফিরিঙ্গিয়ানাকে ঘৃণা করে এসেছেন।

"হোমের" মিথ্যা মোহ তাঁকে আকৃষ্ট করেনি। তিনি ভারতবর্ষকে নিজের দেশ বলেই জানতেন। ভারতবর্ষের অতীতের সমৃদ্ধি ও সভ্যতা ও বর্ত্তমানের পরাধীনতা, তাঁর মনে যুগপৎ আনন্দ ও ব্যথা দিয়েছে। 'The Harp of India' ও 'To India thy Native Land" নামে দু'টি সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর সনেটে যে সত্য কথা বলেছেন, তার তুলনা হয় না।

১৮৩৯ সাল। সেবার বর্ষায় কলেরার ভীষণ প্রকোপ দেখা দিল। তখন চিকিৎসাশাস্ত্রের এত উন্নতি হয় নি। কলকাতা ও উপকণ্ঠে গঙ্গার ধারে-ধারে চিতার ধূমকুণ্ডলী বর্ষার মেঘময় আকাশকে আরও কালো করে তুললো। শীত এল। তখন ঐ সংক্রামক ব্যাধি কমে এলেও নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যায় নি।

ডিসেম্বর ১৭, শনিবার ১৮৩১। কবি কলেরায় আক্রান্ত হ'লেন। সেই দিনকার সকাল বেলার ইণ্ডিয়ানে তাঁর এক প্রবন্ধ বেরুল। হিন্দু ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান যুবকের সহশিক্ষা সম্বন্ধে সমীচীন লম্বা ফিরিস্তি দেওয়ার পর অন্যান্য কথার শেষে কবি বললেন—

"In a few years the Hindus will take their stand by the best and the proudest Christians and it cannot be desirable to excite the feelings of the former against the latter. The East Indians complain of suffering from proscriptions, is it for them to proscribe? Suffering should teach us not to make others suffer. Is it to produce different effects on East Indians? We hope not. They will find after all, that is the best interest to unite and co-operate with the other native inhabitants of India.

The East Indian, Dec 17, 1831.

অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে চল্‌ল। তাঁর ছাত্রেরা রাত্রি জেগে সেবা করতে লাগলেন। লোকজনের সমাগম মঙ্গল-প্রশ্ন সেবা-শুশ্রূষা চিকিৎসা-যত্ন সব ব্যর্থ করে ডিরোজিও চলে গেলেন। সেদিনের তারিখ ছিল সোমবার,

ডিসেম্বর ২৬, ১৮৩১। * বড়দিনের পরের দিন। ছুটীর একটা আলস্যরঞ্জিত ছোঁয়াচ সারা সহরের উপর লেগে ছিল। বাইরে শীতের নরম সোণালী রোদ স্বপ্নের জাল বুনছে। ডিরোজিও উদয়াচল হ'তে যখন অস্তশিখরে নেমে এলেন তেইশ বছর পূর্ণ হ'তে তখনও কয়েক মাস বাকী। যৌবনের ধর্ম্ম হল বিদ্রোহ করা—ভাঙ্গা ও গড়া। গতানুগতিক চিরাচরিত পঞ্জিকার পাতায়—যৌবনের কপালে রাজটীকা না জুটিলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাঁর জয় অবশ্যম্ভাবী। বৃহত্তর জনসাধারণ নিয়ে যাঁদের কারবার—তিনি কবি হন বা রাষ্ট্রনীতিক হন, উজ্জ্বলতম মুহূর্ত্তেই এ মরজগত হ'তে বিদায় নেওয়া উচিত। ঐ কথা যদি গৃহীত হয় কবির অকালমৃত্যুতে আক্ষেপ করবার কিছুই নেই। আমাদের তরুণ কবি—মরণকে শ্যামসমান বলে স্বীকার না করলেও "শ্রেষ্ঠ সখা" (Best Friend) নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর মৃত্যুর সংজ্ঞা হ'ল, "The gloomy entrance to a funnier world" এবং "It boots not when my being's scene is furled."

সবার শেষে—

"Good out of evil, like the yellow bee,
That sucks from flowers malignant
a sweet treasure,
O tyrant fate, thus shall I vanquish thee.
For out of suffering shall I gather
pleasure."

যে কারণে ডিস্রেলি সাহিত্যিক হ'য়েও টোরী রাজনীতিক, যে কারণে রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের পরীক্ষা ছেড়ে প্রবন্ধ সাহিত্যের খবরদারী সুরু করেন, যে কারণে লাফক্যাডিও হেরন্ (Lafcadeo Hearn) ইংরেজ হয়েও জাপানী—মনে করি সেই একমাত্র সৃষ্টিছাড়া কারণেই ডিরোজিও কবি হয়েও বাঙ্গালায় ইংরেজি শিক্ষার গোড়ার দিকে ছাত্র-সমাজের মনোবিকাশের নামতা পড়িয়েছেন। তাঁর মতবাদও দার্শনিকতা, শিক্ষা ও সংস্কারের নীচে হ'ল তাঁর কাব্য-প্রতিভা। জনসমাজে সুকবি বলে আদৃত হলেও আসলে তিনি ছিলেন শিক্ষক ও সংস্কারক। ডিরোজিওর কবিতা ছিল মধুর—বিশেষ করে শব্দচয়নে তিনি পটু ছিলেন। গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে বায়রণের প্রভাব ছিল অখণ্ড। তরুণ কবি হেন্‌রী তা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। ডিরোজিওর কাব্যপ্রতিভাবিশ্লেষণ নিয়ে দু'টি পৃথক দলের সৃষ্টি হয়েছিল। একপন্থী বলিল, তিনি বেশীদিন বাঁচলে পরে আরো বড় হতেন; অপর পন্থীর মতে তিনি যা লিখেছিলেন তার চেয়ে বেশী আশা করা বৃথা। কারণ তরুণ বয়সেই যাঁর লেখার এমন সুন্দর পরিণতি, বছরের ক্রমিক বিবর্ত্তনে প্রবীণ কবির কলমের মুখে কাঁচা লেখার ঢল নামত। পরিণত বয়সে তাঁর লেখা কেমন দাঁড়াত সে সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সুকঠিন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে এটাও মনে রাখা সমীচীন বোধকরি সাহিত্যিকের খোলস নেই। সার্কাসের বহুরূপী জোকারের মতন কবি অথবা সাহিত্যিক "বেশ" গ্রহণে অসমর্থ। ষ্টাইল লেখকের নিজস্ব আপন—সে আপনার গৌরবেই আপনি স্বতন্ত্র। লেখার পরিণতি কেমন হত এ নিয়ে তর্ক করা নিষ্ফল। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কোনও লেখক * ডিরোজিওর কবিতাবলী সমালোচনা করতে গিয়ে যথার্থই বলেছেন,—"The brilliant hues of the Byronic sun-set flung their glow over Derozio's sky. ডিরোজিও শুধু বায়রণ নয়, মুর ও ল্যাণ্ডেনের (L. E. Landen) কবিতায় বিশেষ করে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এমন কি স্থানে স্থানে তাঁদেরই লেখার হুবহু প্রতিধ্বনি হয়েছে। ডিরোজিওর কাব্যে অলঙ্কারের প্রয়োগ আছে বেশী—ভাষার ঘনঘটা সমারোহ ও ভাবের আতিশয্য। এক কথায় তাঁর কবিতায় ফলের অনুপাতে ফুলের ফসলের প্রাচুর্য্য আছে বেশী।

"ফকির অব্ জঙ্গিরা" কবির বিরচিত একখানি খণ্ডকাব্য। ডক্টর গ্রাণ্ট পরিচালিত "ইণ্ডিয়ান গেজেটে" উক্ত দীর্ঘ কবিতাটী খণ্ডশ আকারে প্রকাশিত হয়। কবির জীবনে জঙ্গিরার ফকির যুগান্তর এনে দেয়। অতঃপর কবির সাফল্যের অতিবৃষ্টি সুরু। বইখানি যদি মোটেই না লিখিত হ'ত, গ্রাণ্ট যদি ডিরোজিওকে কলকাতা

Henry Derozio, the Eurasian Poet and Reformer. E. W. Madge.

সেকালের সংবাদপত্র—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* The Eurasian Poet and Reformer—E. W. Madge.

আসত্তে না উৎসাহিত করতেন কবিকে চেনা আমাদের দুষ্কর হত। ডিরোজিওর কবিতায় অভিনব মৌলিকতা না থাকলেও—অনুপ্রাণনা উচ্ছ্বাস ও উৎসাহ ছিল ষোল আনা। ফকির অব জঙ্গিরায় কিশোর-কবি পূরবের জীবনযাত্রাকে পশ্চিমের ভাষায় গ্রথিত করেছেন। সূর্য্যের বন্দনা, ব্রাহ্মণের উপাসনা, সতীদাহের বর্ণনা প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড কবিতা অপরূপ বর্ণনাবৈচিত্র্যে ঝলমল করছে। ডিরোজিওর কবিতার মূলীভূত আর একটী বৈশিষ্ট্য তাঁর দেশাত্মবোধ। তাঁর কবিতার মধ্যে সে দেশাত্মবোধ সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ পায়।* ডিরোজিওর আগে কোনও য়ুরেশিয়ান কবি ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি বলে স্বীকার করেন নি। ডিরোজিও বুঝেছিলেন যে দেশের জল ও যে দেশের বাতাসে তিনি বেড়ে উঠেছেন এবং চিরজীবন যেখানে বাস করতে হ'বে—সে দেশ শুধু তাঁর জন্মভূমি নয়, মাতৃভূমিও বটে। তাই যখন তাঁকে বলতে শুনি,

"স্বদেশ আমার কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিত ললাট তব অস্তে গেছে চলি'
যেদিন তোমার হায় সেইদিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে"

তখন মনে হয় কথাগুলি নিছক মৌখিক নয়। অন্তরের অন্তস্তল থেকে উঠে আসছে। দেশপ্রাণ না হলে দেশকে ভালবাসা যায় না।

ডিরোজিওর সমগ্র কবিতাবলী আজও গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়নি। ব্রাড্‌লে-বার্ট ও অপর একজন তাঁর কাব্য আংশিক চয়ন করেছেন। কিন্তু কোনটাই সম্পূর্ণ সংগ্রহ নয়। তবে ব্রাড্‌লে-বার্টের কাব্য সঞ্চয়ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে গৃহীত হয়েছে। ডিরোজিওর অনেকগুলি সুন্দর লিরিক কবিতা আছে। তার মধ্যে বিবাহ (The Bridal) বাতিকগ্রস্তা বিধবা (The Maniac widow) বৌদিদি (The sister-in-law) প্রভৃতি কবিতাগুলি অতি সুন্দর। শেষের কবিতাটী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অনুবাদ করেছেন। লিরিক কবিতা ব্যতীত কতকগুলি সনেট আছে—সেগুলি প্রায়ই ব্যক্তিগত। শেষের কয়েকটী সনেটে একটি স্পষ্ট নিরাশার সুর ফুটে উঠেছে। ব্যর্থ প্রেম অথবা ব্যর্থ জীবনের বলা মুস্কিল। কবির তেইশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে প্রেমের অবসর এসেছিল কিনা জানি না, তবে এডোয়ার্ডস্ সন্দেহ করেন যে ডিরোজিও সম্ভবত ভাগলপুরেই কোনও তরুণীকে ভালবেসেছিলেন। নয় তো ছোট বোন য়্যামিলিয়ার দ্বারা বারবার অনুরুদ্ধ হয়েও তিনি বিয়ে করেন নি।

"বৌদিদি চাস্? বোনটী আমার
বৌদিদি তোর চাই?
তারার হাটে খুঁজব এবার
দেখব যদি পাই।"

এই কাল্পনিক বৌদি ছাড়া এডোয়ার্ডসের মত সমর্থন করা কিছু কষ্টকর হয়ে উঠে।* তার এই সনেটগুলিতে দুঃখবাদ লক্ষ্য করবার বিষয়। কিন্তু নিরাশার মধ্যেও অন্ধ আশার রঙ্গীন আলো কবির আঁধার জীবন ভরে তুলেছিল।

* After him (Rammohon Ray) Derozio's love for India expressed in vigorous verse had no doubt its share in forming this consciousness in Young Bengal.—pp 116 Western Influence in Bengali Literature. P. R. Sen.

* Henry Derozio, the Eurasian Poet, Teacher, and Journalist. T. Edwards.



দ্বৈরথ

"বনফুল"

(১২)

সেতারের কাণে মোচড় দিতে দিতে হাসিমুখে চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"তার পর? ছেলে দুটো গিয়ে পাল্‌কিতে উঠ্‌ল?"

কমলাক্ষবাবু—ম্যানেজার উত্তর দিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ!"

সেতারের জুড়ি তার দুইটিতে মেজ্‌রাপের মৃদু আঘাত দিতে দিতে চন্দ্রকান্ত আবার বলিলেন—"আমাদের বিশ্বাস-মশায়ের ছেলে বেশ ওস্তাদ হয়ে উঠেছে তাহলে বল?"

কমলাক্ষবাবু কোন উত্তর দিলেন না। কমলাক্ষবাবু লোকটির কমলাক্ষ নাম এই হিসাবে সার্থক যে তাঁহার চোখ দুইটি রক্তাভ এবং বেশ ভাসা-ভাসা। আঁট-সাঁট গড়নের নাতিদীর্ঘ লোকটি। অত্যন্ত স্বল্পভাষী। মামলা মকদ্দমা করার দিকে একটু ঝোঁক বেশী। "তুমি যাও ডালে ডালে আমি যাই পাতায় পাতায়"—এই ভাবটি কমলাক্ষবাবুর চোখে মুখে এবং সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। কমলাক্ষবাবু কিন্তু চন্দ্রকান্তকে অর্থাৎ চন্দ্রকান্তের বুদ্ধিকে অত্যন্ত ভয় করিতেন। সেজন্য চন্দ্রকান্তের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। অকুণ্ঠিত চিত্তে তিনি চন্দ্রকান্তের সকল আদেশ পালন করিতেন। তাঁহার সর্ব্বদা ভয় হইত যে চন্দ্রকান্ত যেরূপ বুদ্ধিমান তাহাতে তাঁহার কোন কার্য্যই হয়ত চন্দ্রকান্তের মনোমত হইতেছে না। ইহা লইয়া চন্দ্রকান্ত অবশ্য কখনও কিছু বলেন নাই। কিন্তু এই ধারণা বদ্ধমূল থাকাতে কমলাক্ষ যখনই কোন কার্য্য-উপলক্ষে চন্দ্রকান্তের সমীপবর্ত্তী হইতেন কিম্বা অন্য কারণেও যখন কাছে আসিতেন তখনই তাঁহার আচারব্যবহার—কথাবার্ত্তায় কেমন একটা ভিজা-বিড়াল গোছ প্রকাশ পাইত।

ম্যানেজারকে নীরব থাকিতে দেখিয়া চন্দ্রকান্ত চোখ তুলিয়া তাহার দিকে তাকাইলেন এবং বলিলেন—"অর্থাৎ সংক্ষেপে এই দাঁড়াচ্ছে যে আমাদের গোমস্তা বিশ্বাস মশায়ের ছেলে—ছেলে দুটোকে রুম্‌নি ঝুম্‌নিকে দেখাবার নাম করে গঙ্গাগোবিন্দের বাড়ীতে নিয়ে আসে এবং সেখানে তুমি তাদের বল যে 'রুম্‌নি ঝুম্‌নি এখানে নেই—যমজঙ্গলে আছে।' তুমি পাল্‌কির বন্দোবস্ত করে দেবার প্রস্তাব কর এবং তারা সে প্রস্তাবে রাজী হওয়াতে তুমি তাদের পাল্‌কিতে করে তুলে নিয়ে টাল-জঙ্গলের কাছারিতে চালান করে দিয়েছ। এই ত?"

কমলাক্ষ নীরবে মাথা নাড়িলেন। সেতারের ঘরগুলিতে একবার হাত চালাইয়া চন্দ্রকান্তের সন্দেহ হইল—উদারার নি পর্দ্দাটা ঠিক মনোমত আওয়াজ দিতেছে না। তিনি ঘাটটা একটু সরাইয়া দিতে দিতে বলিলেন—"আমাদের বিশ্বাস-গোমস্তার ছেলের সঙ্গে যে অজয় বিজয়ের আলাপ আছে—তুমি জানলে কি ক'রে?"

"ওরা শ্যামগঞ্জ স্কুলে সব একসঙ্গে পড়ে কি না!"

"ও"—

চন্দ্রকান্ত কাফির একটা গৎ আস্তে আস্তে বাজাইতে লাগিলেন—কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হইল যেন তিনি অন্য কিছু চিন্তা করিতেছেন। হঠাৎ তিনি আদেশ করিলেন —"বিশ্বাসকে ডাক!"

রাধামাধব বিশ্বাস এই ষ্টেটের প্রাচীন কর্ম্মচারী। মলিন ক্যাম্বিসের জুতা জোড়াটা বাহিরে ছাড়িয়া আসিয়া ভক্তিভরে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইতেই চন্দ্রকান্ত বলিয়া উঠিলেন—"আপনার ছেলে এক কাণ্ড করে বসে আছে। মৃন্ময় ঠাকুরের দুই ছেলে অজয়-বিজয়ের সঙ্গে আমাদের রুম্‌নি ঝুম্‌নির বিয়ের সম্বন্ধ বুঝি হচ্ছিল। রুম্‌নি ঝুম্‌নিকে লুকিয়ে দেখাবে বলে আপনার ছেলে আজ তাদের গঙ্গাগোবিন্দের বাড়ীতে এনেছিল। যত সব ছেলেমানুষি বুদ্ধি! তার ওপর কমলাক্ষ করেছে আর এক কাণ্ড! রুম্‌নি ঝুম্‌নি আছে উগ্রমোহনের বনকর কাছারিতে—কমলাক্ষ ব্যাপারটা ঠিক জানত না—এক পাল্‌কি করে দিয়েছে পাঠিয়ে তাদের টালে!—দেখুন দিকি কাণ্ড!"

কমলাক্ষ এবং বিশ্বাস উভয়েই বিস্মিত হইল।

চন্দ্রকান্ত আবার কাফির গতে মন দিলেন। একটু বাজাইয়া আবার বলিলেন—"আপনি এক কাজ করুন বিশ্বাস মশায়। আপনি এখনি কিছু খাবার-টাবার নিয়ে আর আপনার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে টালে রওনা হয়ে যান্। ছেলে দুটোর তা না হলে সেখানে কষ্টের অবধি থাক্‌বে না। আর কমলাক্ষ ততক্ষণ—তাদের বাড়ীতে একটা খবর পাঠিয়ে দিক্। গঙ্গাগোবিন্দও আবার বাড়ীতে নেই।"

বিশ্বাস মশায় মনে মনে ছেলের মুণ্ডপাত করিতে করিতে প্রভুর আদেশ পালন করিতে বাহির হইয়া গেলেন। এই সময় টালে যাওয়া কি সোজা কথা!

বিশ্বাস চলিয়া যাইতে কমলাক্ষের ভিজা-বিড়াল-ভাবটা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। প্রভুর কথাবার্ত্তা সে বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছিল না। কাফির গৎটা মৃদু মৃদু বাজাইতে বাজাইতে চন্দ্রকান্ত বলিলেন—"বিশ্বাসের ছেলেটাকেও টালে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। তা না হলে সব কথা প্রকাশ হয়ে যাবে যে! বুঝলে না কথাটা? তুমি এক কাজ কর! মোহানিয়া ঘাট পেরিয়ে তবে ত টালে যেতে হয়! বিশ্বাস মশাই নদী পার হয়ে গেলে তুমি কোন অজুহাতে ঘাটের মাঝি-মাল্লা সবাইকে সদরে তলব করে ডাকিয়ে আনাও—অর্থাৎ আজ্‌কে রাত্তিরের মধ্যে যেন কেউ মোহানিয়া ঘাট পেরিয়ে ওপারে যেতে না পারে —ওপার থেকে আসতেও না পারে! বুঝলে?"

এইবার কমলাক্ষ বুঝিয়াছিলেন। প্রভুর এবং প্রভুর বুদ্ধির পদে ভক্তিভরে নমস্কার করিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

যেন কিছুই হয় নাই। চন্দ্রকান্ত চক্ষু বুজিয়া কাফিগৎ বাজাইতে লাগিলেন। তন্ময় হইয়া বাজাইতেছেন—বাহ্যজ্ঞান লুপ্তপ্রায়। খানিকক্ষণ পরে মৃদু পদশব্দে চন্দ্রকান্ত চক্ষু খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে?"

ভজ্‌না খানসামা আগাইয়া আসিয়া কহিল—"ম্যানেজার বাবু বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন—এক মিনিটের জন্য দেখা করিবেন কি?"

কমলাক্ষ আসিলে চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"আবার কি?"

"মোহানিয়া ঘাটে লোক পাঠালাম। আমি ভাবছি রুম্‌নি ঝুম্‌নিকে 'কিড্‌ন্যাপ' করার জন্য এক নম্বর নালিশ ঠুকে দিলে কেমন হয়—গঙ্গাগোবিন্দকে ফরিয়াদী খাড়া করে?"

চন্দ্রকান্ত একটু মৃদু হাসিলেন। বলিলেন—"তখন তোমাকে একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছলাম। আমার নামে খরচ লিখে তহবিল থেকে শতখানেক টাকা তুমি নিয়ে নাও গিয়ে—বক্‌শিস্ দিলাম তোমাকে। তোমার আজকের কাজে আমি খুব খুসী হয়েছি। কিড্‌ন্যাপের মোকদ্দমা এখন থাক্। পরে ভেবে দেখা যাবে—"

কমলাক্ষবাবু ভিজা বিড়ালের মত চাহিতে চাহিতে বলিতে লাগিলেন—"বখশিস্ আবার কেন—আপনারই ত খাচ্ছি পরছি। তহবিলে এখন মজুত বেশী নেই—তা ছাড়া কাল শ্রীপঞ্চমী—"

সেদিকে কর্ণপাত না করিয়া চন্দ্রকান্ত আবার সেতারে মন দিলেন। কমলাক্ষবাবু নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া যাইতেই সেতার রাখিয়া চন্দ্রকান্ত একটু মুচ্‌কি হাসিলেন এবং গা ভাঙিয়া হাঁকিলেন—"ওরে ভজ্‌না—তামাক দিয়ে যা —আর মিশিরজীকে একটু খবর দে—"

কাফি রাগিণীর গৎ ও গীত সমস্ত আলাপ করিয়া মিশিরজি যখন বিদায় লইলেন—তখন সন্ধ্যা আসন্ন। রাধাকিষণ জিউর মন্দিরে পূজার ঘণ্টা বাজিতে সুরু করিয়াছে। নহবৎখানায় বাঁশীতে পূরবী বাজিতেছে। চন্দ্রকান্তের সমস্ত হৃদয় সহসা কেমন যেন বিষাদময় হইয়া উঠিল। আলবোলার নলটা মুখে দিয়া নিতান্ত অসহায়ের মত তিনি তাকিয়া ঠেস দিয়া একা বসিয়া রহিলেন। অকারণে কেন যেন তাঁহার মনে হইল পৃথিবীতে কিছুরই কোন অর্থ নাই!

অকস্মাৎ বাহিরে মাদলের শব্দ শুনিয়া তাঁহার আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া গেল—তিনি জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিলেন একদল বেদে-বেদেনী আসিয়া কাছারি বাড়ীতে নাচ-গান জুড়িয়া দিয়াছে। একটি উদগ্রা-যৌবনা নারী আধময়লা একটা লাল রঙের ঘাঘরা এবং নীল রঙের কাঁচুলি পরিয়া নানাবিধ অঙ্গভঙ্গীসহকারে নৃত্য করিয়া সকলকে লোলুপ করিয়া তুলিয়াছে।

চন্দ্রকান্ত হাঁকিলেন—"ভজ্‌না—।"

ভজ্‌না আসিলে তিনি ম্যানেজারবাবুকে একবার ডাকিয়া দিতে বলিলেন। ভজনা চলিয়া গেলে চন্দ্রকান্ত দাঁড়াইয়া উঠিয়া বেদেনীর নাচ দেখিতে লাগিলেন। মাথায় বাব্‌রি চুলওলা তাহার দুইজন সঙ্গী মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বিভোর হইয়া মাদল বাজাইতেছে। বেশ নাচে ত মেয়েটি। চমৎকার স্বাস্থ্য!

কমলাক্ষবাবু আসিতেই তিনি বলিলেন—"ওই বেদে-বেদেনীর দলকে এখনই গ্রাম থেকে দূর করে দাও।"

"যে আজ্ঞে"—বলিয়া কমলাক্ষ চলিয়া গেলে তিনি নিজের ব্যবহারে নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তিনি কমলাক্ষকে ডাকাইয়াছিলেন জানিবার জন্য যে সমস্ত রাত নাচিলে মেয়েটি কত লইবে—অথচ তিনি এ কি বলিয়া বসিলেন!

ম্যানেজারের আদেশক্রমে বেদে-বেদিনীর দল চলিয়া গেল—চন্দ্রকান্ত দাঁড়াইয়া দেখিলেন। তাহারা যতক্ষণ দৃষ্টিপথ বহির্ভূত না হইয়া গেল চন্দ্রকান্ত নিমেষ-বিহীন-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেক কথাই তাঁহার মনে হইল। কি বিচিত্র সৃষ্টি এই নারী। তাঁহার জীবনেও নারী বারকয়েক আসিয়াছিল। অতি বাল্যকালে তিনি ভাল-বাসিয়াছিলেন উগ্রমোহনের ভাগিনেয়ীকে। কিন্তু কোষ্ঠী অন্তরায় হইল। গঙ্গাগোবিন্দের সহিত তাহার বিবাহ হইয়া ক্রমশঃ তাঁহার যৌবন বিকশিত হইল বটে কিন্তু চন্দ্রকান্ত লেখাপড়া গান-বাজনা ছবি-আঁকা প্রভৃতি লইয়া এত ব্যস্ত রহিলেন যে অন্য কিছু ভাবিবারই অবসর পাইলেন না। মূর্খ উগ্রমোহনের ধারণা যে রেশমকে সে লুকাইয়া ভাল-বাসিয়াছিল! যে রমণীর প্রেম রজতমূল্যে ক্রয় করা যায়—তাহাকে চন্দ্রকান্ত ভালবাসিতে পারে না। যে পত্রখানা সে রেশমকে লিখিয়াছিল এবং যাহা উগ্রমোহন বাহাদুরি করিয়া সেদিন তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে তাহা যে একটা ছদ্ম-প্রেম-পত্র তাহা বুঝিবার শক্তি উগ্রমোহনের থাকিলে আর ভাবনা কি ছিল! উগ্রমোহনের প্রণয়লীলায় বিঘ্ন জন্মাইবার জন্যই সে ইচ্ছা করিয়া চিঠিখানা লিখিয়াছিল এবং কৃতকার্য্যও হইয়াছিল। রেশম বাঈজী দুই দিন পরেই দেশত্যাগ করিয়াছিল।

চন্দ্রকান্তের অধরে মৃদু হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। তাহার পর অবশ্য জমাটি রকম প্রেমে সে পড়িয়াছিল—তাহা কলিকাতায়। তাহার এক বন্ধুর ভগ্নীর সহিত। সুজাতা তাহার নাম। সুজাতার পিছনে অনেক টাকা খরচ করিয়াছে সে। কিন্তু বিলাতী জাহাজ যেই এক ব্যারিষ্টার আনিয়া ভারতের তীরে নামাইয়া দিল অমনি সুজাতার সমস্ত প্রেম উবিয়া গেল। পাড়াগেঁয়ে জমিদারের ছেলে আর বিলাতী-আমদানি ফ্যাসান-দুরস্ত ঝক্‌ঝকে ব্যারিষ্টার! আকাশ-পাতাল তফাৎ! সুজাতার নির্ব্বাচনকে দোষ দেওয়া যায় না। মোটের উপর চন্দ্রকান্ত ভাবিয়া দেখিয়াছে যে নারীজাতির সঙ্গে তাহার পোষাইবে না। নারীজাতির প্রতি চন্দ্রকান্তের আকর্ষণ যে নাই তাহা নহে—কিন্তু বিতৃষ্ণাও প্রবল। এত ক্ষুদ্র!—টাকা দিয়া কেনা যায়! সত্যই টাকা দিয়া কেনা যায়!—কই এমন স্ত্রীলোক একজনও ত তাহার চোখে পড়িল না যে ঐশ্বর্য্যের মোহে না মুগ্ধ হয়! দরিদ্র স্বামীর যাহারা সতী স্ত্রী তাহারাও অপরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া লোলুপদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে—আর স্বামীদের বাক্য-যন্ত্রণা দেয়। নাঃ অতি নীচ এই স্ত্রীজাতিটা। হায় ভগবান, প্রেমাস্পদা মানসীকে এত হীন অকিঞ্চিৎকর করিয়া সৃষ্টি করিলে কেন? নাঃ—সেতারের সঙ্গে প্রেম করাই ভাল!

ওই বেদেনী মেয়েরাও কি এত নীচ? ভৃত্য ঘরে আলো লইয়া প্রবেশ করাতে চন্দ্রকান্তের চমক ভাঙিল। তিনি বলিলেন—"ওরে জুতো আর ছড়িটা আন ত! একটু বেড়াতে বেরুই।"

নদীর তীরে তীরে চন্দ্রকান্ত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার নজরে পড়িল যে নৌকা করিয়া সেই বেদের দল নদী পার হইতেছে। ওপারে তাহাদের তাঁবু রহিয়াছে—তাহাও দেখা গেল।

বেড়াইয়া চন্দ্রকান্ত যখন ফিরিলেন তখন নহবৎখানায় শানাই ইমন ধরিয়াছে।

(১৩)

মৃণ্ময় ঠাকুরের পুত্রদ্বয়ের আকস্মিক অন্তর্দ্ধান-বার্ত্তা শুনিয়া উগ্রমোহন সহসা যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া

পড়িলেন। মনের মধ্যে তাঁহার রাগ যতই হউক সিপাহীদের সম্মুখে তাহা প্রকাশ করিতে তাঁহার সঙ্কোচ হইল। পরাজিত হইয়া ক্রোধ প্রকাশ করাটা আত্মসম্মান-হানিকর। উগ্রমোহন ভিতরে ভিতরে পুড়িতে লাগিলেন। তাঁহার নাসারন্ধ্রের স্ফীতি দেখিয়া অঘোরবাবু অবশ্য তাহা বেশ বুঝিতেছিলেন—যদিও অঘোরবাবুর পাষাণ-মুখচ্ছবির একটি পেশীও বিকম্পিত হয় নাই। তিনি মৃদুস্বরে উগ্রমোহনকে বলিলেন—"মৃন্ময়কে ডেকে একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত কি—সে কিছু জানে কি না ?"

উগ্রমোহন বলিলেন—"আমি আগে চলে যেতে চাই। তুমি মৃন্ময়কে ডেকে জিজ্ঞাসা কর এবং তাকে বলো যে যদি তার ছেলেদের সঙ্গে কোন কারণে রুম্‌নি ঝুম্‌নির বিবাহ না হয় তাহলে সামান্য কুকুরের মত ঠেঙিয়ে তাকে মেরে ফেলব আমি।"

তাহারা ঘরের মধ্যে বসিয়া কথা-বার্ত্তা কহিতেছিলেন। বাহিরে গলার মৃদু শব্দ করিয়া পচ্‌না সহিস ডাকিল—"হুজুর—"

"কে ?"—অঘোরবাবু গিয়া দ্বার খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি চাস্ তুই ?"

পচ্‌না উত্তর দিল—"ঘোড়াটা হুজুর ফিরে চলে এসেছে। জামাইবাবু আসেন নি। কোথাও পড়ে-টড়ে যায় নি ত ? বলেন ত খোঁজ করি।"

বস্তুতঃ উগ্রমোহনের ঘোড়া চড়িয়া গঙ্গাগোবিন্দ অধিক দূর যান নাই। ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া পদব্রজেই তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন। ঘোড়াটা ফিরিয়াছে শুনিয়া উগ্রমোহনের আনন্দ হইল। তিনি এখনি বাড়ী ফিরিতে চান। এতটা পথ অশ্বারোহণে গিয়া বাড়ী পৌছিতে তাঁহার অবশ্য রাত্রি হইয়া যাইবে। তা হউক—তাঁহার বাড়ী ফেরা একান্ত দরকার। এস্রাজ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়ার পর হইতে বহ্নির সহিত তাঁহার ভাল করিয়া কথাই হয় নাই। বাহিরে বাহিরে তিনি ফিরিতেন। সন্ধি-কামনায় তাঁহার সমস্ত অন্তর আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। দ্বিতীয়ত মাণিক মণ্ডলকে দিয়া ছেলে দুইটার খোঁজ-খবর করিতে হইবে—বিবাহের আর দিন নাই। তৃতীয়ত—গঙ্গাগোবিন্দ গিয়া পুলিশের শরণাপন্ন হইতে পারে। তাহারও একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বাড়ী তাঁহাকে ফিরিতেই হইবে। পুলিশের কথা মনে হইতেই তিনি অঘোরবাবুকে বলিলেন "আমি এখন চলে যাচ্ছি। যদি পুলিশ আসে আজ-রাত্রেই—মারপিট করে হাঁকিয়ে দেবে। পঞ্চাশজন সিপাহী ত আছে। আর রাত্রে যদি কোন গোলমাল না হয় রুম্‌নি ঝুম্‌নি আর মৃন্ময় ঠাকুরকে কাল ভোরেই এখান থেকে সরিয়ে বাথানে নিয়ে রেখে এসো। ওদের রেখে তুমি ফিরে এস কিন্তু। কাল তোমার এখানে থাকা চাই। সিপাহীদের সব বাথানে পাঠিয়ে দিও। এক ভিখন তেওয়ারি ছাড়া কারো থাকার দরকার নেই—।"

অন্ধকারে বন-পথটা সাবধানে পার হইয়া উগ্রমোহন যখন মাঠে পড়িলেন—তখন অশ্বের বেগ তিনি বাড়াইয়া দিয়াছেন। অন্ধকার ভেদ করিয়া উগ্রমোহনের ঘোড়া ছুটিতেছে।

শীতের নির্ম্মেঘ আকাশে অগণ্য নক্ষত্র। ক্ষুরধার তীক্ষ্ণ তীব্র বাতাস বহিতেছে। দৃঢ় বজ্রমুষ্টিতে উগ্রমোহন অশ্বের বল্‌গা ধরিয়া বসিয়া আছেন।

তাঁহার মনের মধ্যে দুইটি মুখচ্ছবি জাগিতেছে—বহ্নি ও চন্দ্রকান্ত। ভগ্নী ও ভ্রাতা।

উগ্রমোহনের অশ্ব যখন গ্রামে প্রবেশ করিল তখন গ্রাম নিঃসুপ্ত। গ্রামের ভিতর কতকগুলি কুকুর অকারণে চীৎকার করিতেছে। একদল শৃগাল ডাকিতে ডাকিতে হঠাৎ একযোগে চুপ করিয়া গেল। তারার আলোয় গ্রাম-প্রান্তের তালগাছগুলি রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। কর্কশরবে ডাকিতে ডাকিতে একটা পেচক উড়িয়া গেল—রাত্রির অন্ধকার ঘনতর হইয়া উঠিল। ঘোড়ার উপর হইতে উগ্রমোহন দেখিতে পাইলেন চন্দ্রকান্তের খাসকামরায় এখনও আলো জ্বলিতেছে। চন্দ্রকান্ত এখনও জাগিয়া আছে না কি ? এক দান দাবা খেলিয়া গেলে কেমন হয়! উগ্রমোহন অশ্বের মুখ ফিরাইলেন। চন্দ্রকান্তের বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া দেখিলেন দেউড়ি তখনও বন্ধ হয় নাই। উগ্রমোহনের অশ্ব আসিয়া দেউড়ির ভিতর প্রবেশ করিতে শুর্খা প্রহরী আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন—"চন্দ্রকান্ত কোথায় ?"

"বাবু সাব আভি বাহার নিক্‌লে হৈঁ !"

"সওয়ারি পর ?"

"জি নেহি। পয়দল্ !"

"হামারা সেলাম কহ দেনা—"

"জি হুজুর"—গুর্খা সেলাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। উগ্রমোহন আবার অশ্বের মুখ ফিরাইলেন। উগ্রমোহনের অশ্ব যখন চন্দ্রকান্তের বাড়ীর সীমানা ছাড়াইতেছে চন্দ্রকান্ত তখন নিজের বাগানের অর্কিড হাউসে গোপনে বসিয়া ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিতেছিলেন। ছদ্মবেশ গ্রহণে চন্দ্রকান্তের অসাধারণ পারদর্শিতা। সঙ্গীতবিদ্যার মত এই বিদ্যাটিও তিনি বহু কৌশলে ও বহু অর্থব্যয় করিয়া আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং যখনই সকলের অগোচরে কোন কার্য্য করার তাঁহার প্রয়োজন হইত তিনি ছদ্মবেশে তাহা করিতেন। অর্কিড-হাউস হইতে সহজভাবে বাহিরে আসিলেন। গেটে প্রবেশ করিতেই গুর্খা আসিয়া অভিবাদন করিয়া জানাইল যে উগ্রমোহনবাবু আসিয়াছিলেন এবং সেলাম জানাইয়া গিয়াছেন। "আচ্ছা" বলিয়া চন্দ্রকান্ত ভিতরে চলিয়া গেলেন। তখনও তাঁহার রগের শির দুইটা দপ্ দপ্ করিতেছে। তিনি ওপারে গিয়াছিলেন।

বেদেনীর নাম ফুল্‌কি। সত্যই আগুনের ফুল্‌কি। ওপারেও সে একদল দর্শকের সম্মুখে নৃত্য করিতেছিল—যেন এক সর্পিণী ফণা বিস্তার করিয়া আবেগে কাঁপিতেছে। তাহার খিল্ খিল্ হাসি চন্দ্রকান্ত এখনও যেন শুনিতে পাইতেছেন।

টেবিলের উপর নীল রঙের ডোম্ দেওয়া একটি সুদৃশ্য বাতি কমান আছে। ধূপাধারের ধূপ তখনও পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। ক্ষীণ ধূম্রেখায় অগুরুর গন্ধ তখনও পুড়িয়া পুড়িয়া আপনাকে বিলাইতেছে। চন্দ্রকান্ত এস্রারটি নামাইয়া কানাড়ায় গান ধরিলেন—"আনন্দন আনন্দ ভয়ো—"

উগ্রমোহন যখন বাড়ী পৌছিলেন তখন তাঁহার খাস চাকর ব্রজ ছাড়া আর কেহ জাগিয়া ছিল না। ঘোড়া হইতে নামিতেই ব্রজ আসিয়া ঘোড়া ধরিল। ঘোড়া হইতে নামিয়া সোজা তিনি অন্দর-মহলে চলিয়া গেলেন। নৈশ-প্রহরী তাঁহাকে অভিবাদন করিল—তাহা তিনি দেখিতেও পাইলেন না।

ভিতরে গিয়া তিনি দেখিলেন বহ্নির ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। দালানের ঘড়িটা হইতে শুধু টক্ টক্ টক্ টক্ শব্দ হইতেছে।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে উগ্রমোহন বহ্নিদেবীর ঘরের সম্মুখে উৎকর্ণ হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। দ্বার ভেজান আছে। ভিতর হইতে কোন শব্দ নাই। মৃদু করাঘাত করিয়া তিনি দ্বার খুলিয়া ভিতরে গেলেন। দেখিলেন বহ্নিদেবী কার্পেটের কি যেন বুনিতেছেন।

উগ্রমোহন কহিলেন—"এখনও জেগে আছ দেখ্‌ছি। বুন্‌ছ কি ?"

"জুতো !—"

"লেখা-পড়া সঙ্গীত-চর্চ্চা সব ছেড়ে—হঠাৎ এ কি ?"

বহ্নিদেবীর নয়নে একটা ক্ষণিক দীপ্তি ফুটিয়া নিবিয়া গেল। তিনি উত্তর দিলেন—"যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ"

উগ্রমোহন পাগ্‌ড়িটা খুলিয়া রাখিতে রাখিতে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"একটা গান শুন্‌তে ইচ্ছে করছে এখন !"

বহ্নিকুমারীর গম্ভীর মুখে একটা হাসির আভা ফুটি ফুটি করিতে লাগিল। তিনি কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। আপন মনে বুনিয়া যাইতে লাগিলেন। উগ্রমোহন আবার কথা কহিলেন—"কতক্ষণ বুন্‌বে ?"

বহ্নিকুমারী হাসিয়া কি যেন একটা বলিতে যাইতেছিলেন এমন সময় শব্দ হইল "হুম্ ব্রো - হুম্ ব্রো—হুম্ ব্রো—"

"একি চন্দ্রকান্ত এল না কি !"

উগ্রমোহন নামিয়া গেলেন। চন্দ্রকান্ত হাসিয়া বলিলেন—"তুমি গিয়ে ফিরে এসেছ শুনলাম। এস, একদান দাবায় বসা যাক্।"

দুইজনে দাবার ছক্ লইয়া মুখোমুখি বসিলেন।

বহ্নিদেবী অন্দরমহলে একা বসিয়া বুনিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখের উদীয়মান হাসিটি নিবিয়া গেল।

১৪

অতি প্রত্যূষেই উগ্রমোহন অশ্বারোহণে বাহির হইয়া গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন—কেহ জানে না। রাণী

বহ্নিকুমারী প্রভাতে উঠিয়া স্নানাদি সমাপন করিয়া একখানি পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া এবং তাহার পর দুই ডালা পদ্মফুল লইয়া চন্দ্রকান্তের বাড়ীর উদ্দেশে পাল্‌কি যোগে যাত্রা করিলেন। প্রায় এক বৎসর পরে তিনি পিতৃগৃহে গমন করিতেছেন। তাঁহার পাল্‌কি আবৃত করিয়া লাল মখমলের একটি আস্তরণ। তাহার সোণালি ঝালর প্রভাতের স্বর্ণকিরণে ঝলমল করিতে লাগিল। তাঁহার পশ্চাতে একটি সাধারণ পাল্‌কিতে তাঁহার দুইজন দাসীও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া গেল।

চন্দ্রকান্তের বাড়ীতে সরস্বতী-পূজার একটু বৈচিত্র্য আছে। চন্দ্রকান্ত রায়ের অন্দর মহলে এক প্রকাণ্ড ফুলের বাগান। যাতি, যূথী, জবা, টগর হইতে আরম্ভ করিয়া গোলাপ, রজনীগন্ধা, ক্রিসান্‌থিমাম্ —এমন কি পিটুনিয়া, ডালিয়া, ভায়োলেট্, সুইট্ পি প্রভৃতি বিলাতী মরশুমী ফুলেরও প্রাচুর্য্য সেখানে। এই বৃহৎ উদ্যানের মধ্যস্থলে—বিশাল এক দীর্ঘিকা। ঘন কালো তাহার জল— পদ্মফুলে ভরা। সেই দীঘির মধ্যে শ্বেতপ্রস্তরের প্রকাণ্ড একটি মঞ্চ এবং সেই মঞ্চকে আচ্ছাদন করিয়া সুন্দর শ্বেত মর্ম্মরের প্রকাণ্ড এক পদ্মফুল—তাহার প্রস্তর নির্ম্মিত মনোরম মৃণালটি জলের ভিতর হইতে উঠিয়াছে।

চন্দ্রকান্তের সরস্বতীর প্রতিমা দীর্ঘিকা-মধ্যবর্ত্তী এই মঞ্চে স্থাপিত হয়। কৃষ্ণনগরের অনিন্দ্যকান্তি প্রতিমা। কিন্তু পূজার দিন মঞ্চে শুধু প্রতিমাই থাকে না। পৃথিবীর যেখানে যত জ্ঞানী, গুণী, বিদ্যানুরাগী আছেন বা ছিলেন সকলেরই ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতিকৃতির সমাবেশ সেখানে হয়। তাহা ছাড়া পূজার দিন সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সেই মঞ্চের চতুর্দ্দিকে প্রসিদ্ধ সেতারী, বীণ্‌কার, এস্রাজি—রাগ-রাগিণীর আলাপে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া তোলেন। সরস্বতীর পূজারী চন্দ্রকান্ত স্বয়ং। চন্দ্রকান্তের হুকুম পারতপক্ষে কোন বৈষয়িক ব্যাপারে সেদিন যেন তাঁহাকে বিরক্ত করা না হয়। আরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই বাণী-অর্চ্চনায় তিনি যাহাকে তাহাকে নিমন্ত্রণ করেন না। এই উপলক্ষে বাণীর একনিষ্ঠ সাধকগণকেই তিনি প্রতিবৎসর আহ্বান করিয়া থাকেন। আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেবল গঙ্গা-গোবিন্দ এবং রাণী বহ্নিকুমারী নিমন্ত্রিত হন—কিন্তু উগ্রমোহন সিংহ নয়। বাণীর সাধনায় সত্যকার আগ্রহের পরিচয় না থাকিলে চন্দ্রকান্তের আয়োজিত বাণী পূজার নৈবেদ্য সাজাইবার আহ্বান মেলে না।

বাতাসপুর গ্রামের দরিদ্র সারেঙ্গী-বাদককে চন্দ্রকান্ত সসম্ভ্রমে আমন্ত্রণ করেন কিন্তু হাই স্কুলের হেড্‌মাষ্টারকে নয়। ইহা লইয়া বহু নিন্দা সমালোচনা হইয়া গিয়াছে—কিন্তু চন্দ্রকান্তের মত পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

আজ সকাল হইতে তিন চারিটি ছোট ছোট হাল্‌কা পান্‌সি দীঘিতে ভাসিতেছে—অতিথিগণ আসিলে সেই পান্‌সি করিয়া তাঁহাদিগকে পূজা-মঞ্চে লইয়া যাওয়া হইতেছে—তাঁহারা অঞ্জলি দিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন—কেহ বা পান্‌সি লইয়া দীঘিতে বেড়াইতেছেন। রাণী বহ্নিকুমারী আসিয়া ঘাটে দাঁড়াইতেই গঙ্গাগোবিন্দ একখানি পান্‌সি বাহিয়া হাসিমুখে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন। রাণী বহ্নিকুমারীও স্মিতমুখে গঙ্গাগোবিন্দের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আকাশে বাতাসে শ্রীপঞ্চমীর শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধুপ ধুনা ফুলের গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত। গঙ্গাগোবিন্দ পান্‌সি বাহিয়া আসিতে আসিতে দেখিতে লাগিলেন—মহিমময়ী মূর্ত্তিতে বাণী দাঁড়াইয়া আছে। পট্ট-বস্ত্রের টক্‌টকে লাল পাড়—সীমন্তে রক্তবর্ণ সিন্দূর—হস্তে কমলকলি। বহ্নিকুমারী ভাবিতেছিলেন আহা, গঙ্গা-গোবিন্দ রোগা হইয়া গিয়াছে। পান্‌সি ঘাটে লাগাইয়া গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন—"বাণী—এস—"। বহ্নিকুমারী হাসিয়া উত্তর দিলেন—"বাণী মারা গেছে। আমি এখন বহ্নি।"

"তোমার নূতন নামটা মনেই থাকে না—"

"পরস্ত্রীর নাম মনে না থাকাই ভাল।"

বহ্নিকুমারী পান্‌সিতে উঠিলেন। পান্‌সি মঞ্চের দিকে ভাসিয়া চলিল। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। গঙ্গাগোবিন্দ ধীরে ধীরে বলিলেন "আমাকে এখনও কি ক্ষমা কর নি বাণী?"

বহ্নিকুমারীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন—"আজও সেকথা ভোল নি দেখ্‌ছি! আশ্চর্য্য তোমার স্মরণশক্তি!"

"না ভুলি নি" বলিয়া গঙ্গাগোবিন্দ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর একটু হাসিয়া বলিলেন—"তোমাদের কাণ্ডকেই ভুলতে পারছি না। ভুলতে দিচ্ছ কই তোমরা।"

বহ্নিকুমারীর ভ্রূলতা আকুঞ্চিত হইল। কানের হীরার দুল দুইটি সূর্য্য কিরণে জ্বলিয়া উঠিল। ঘাড় ফিরাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"অর্থাৎ ?"

"তুমি জান না ?"

"কি জানি না ?"

গঙ্গাগোবিন্দ কিছু না বলিয়া নীরবে দাঁড় বাহিতে লাগিলেন। তাহার পর বহ্নির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—

"একথা তোমার ত না জানবার নয় যে তোমার স্বামী আমার মেয়ে ছুটীকে জোর করে নিয়ে গিয়ে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মৃন্ময় ঠাকুরের ছেলেদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন !"

এ কথা বহ্নিকুমারী সত্যই এতদিন শোনেন নাই। স্বামীর এই কার্য্য তাঁহার নিকট অত্যন্ত হীন বলিয়া ঠেকিল। তাঁহার আত্মসম্মানে যেন আঘাত লাগিল—গঙ্গাগোবিন্দের কাছে নিজেকে অত্যন্ত হীন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মুখে তিনি কিন্তু বলিলেন—"সকলের কাছে বলই একমাত্র যুক্তি। দুর্ব্বলের যুক্তি ক্রন্দন !"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন—"আমি দুর্ব্বল নই—ক্রন্দন আমি করছি না—গল্পটা তোমায় শোনালাম।"

বহ্নিকুমারী অকস্মাৎ বলিয়া বসিলেন—"এই কি তোমার গল্প শোনান ? আড়ালে স্বামীর নিন্দা করে স্ত্রীর কাছে বাহাদুরী নেওয়ার বাসনা ? মেয়ের বিয়ে একদিন তোমায় দিতেই হবে। আমার স্বামী সৎপাত্র দেখে সেই বিবাহ ঘটিয়ে দিচ্ছেন—এত বড় তোমার গর্ব্ব যে তাতে কৃতজ্ঞতা বোধ না করে তুমি রাগ করছ। স্পর্দ্ধারও সীমা থাকা উচিত।"

গঙ্গাগোবিন্দ এই তেজস্বিনীকে চিনিতেন। বাণী যে তাঁহার বাল্যসহচরী ! গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন—"রাগ কোরো না বাণী ! আমার কথাটা ভেবে দেখ।"

বহ্নিকুমারীও বলিলেন—"তুমিও ভেবে দেখ—তিনি আমার স্বামী—" পান্‌সি আসিয়া পূজামঞ্চে ভিড়িল।

বাণী ও গঙ্গাগোবিন্দ নামিয়া অঞ্জলি দিতে গেলেন।

অঞ্জলি দেওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রকান্ত বিভোর হইয়া সারেঙ্গীর আলাপ শুনিতেছেন। বহ্নিকুমারী পূজা সমাপন করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছেন। গঙ্গাগোবিন্দ একা বসিয়া ভাবিতেছেন—বাণীর সহিত কতকাল পরে দেখা ! সেই বাণী—যে একদিন তাহার গলায় জোর করিয়া একছড়া ফুলের মালা পরাইয়া দিয়া বলিয়াছিল—"তুমি আমার বর !" সেই বাণী ! আজ প্রবল পরাক্রান্ত উগ্রমোহনের স্ত্রী রাণী বহ্নিকুমারী ! বাণী গঙ্গাগোবিন্দের জীবনের প্রথম প্রেম ! নিষ্কলঙ্ক শুভ্র। আজ এতদিন পরে তাহার সহিত দেখা হইল বটে, কিন্তু সে ঝগড়া করিয়া বসিল ! ছি, ছি—কাজটা অন্যায় হইয়া গিয়াছে। আর জীবনে হয়ত তাহার সহিত দেখাই হইবে না ! গঙ্গাগোবিন্দও যে বাণীকে ভালবাসে তাহা কি বাণী জানে ? কোনদিনও ত সে তাহাকে জানায় নাই। বাণী তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল কিন্তু বড়লোকের মেয়ে বলিয়া গঙ্গাগোবিন্দ তাহাকে বিবাহ করে নাই। বড়লোকের মেয়ে হওয়াটা কি অপরাধ ?—হঠাৎ গঙ্গাগোবিন্দের চিন্তাধারা ব্যাহত হইল। ভজনা খানসামা ঘাটের উপর হইতে তাহাকে ডাকিতেছে দেখা গেল ! কেন ? কি হইল ?

পান্‌সি বাহিয়া ঘাটের কাছে গিয়া সে শুনিল যে বাহিরে কমলাক্ষবাবু বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বাঘারবিল জলকর উগ্রমোহনের সিপাহীরা নির্ম্মমভাবে লুণ্ঠন করিতেছে। দশজন লোক গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। গঙ্গাগোবিন্দ আসিয়া চন্দ্রকান্তকে খবর দিতেই চন্দ্রকান্ত বলিলেন—"আঃ আজকের দিনেও জ্বালাবে উগ্রমোহন ? থানায় খবর দিতে বল। আমি কি করব ?"

কমলাক্ষবাবু ইহাই চাহিতেছিলেন।

বাঘার বিল জঙ্গলে ভীষণ দাঙ্গা। উভয় পক্ষে প্রায় পঁচিশজন আহত হইয়াছে। দুধনাথ পাঁড়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পাইয়াছেন; অচেতন অবস্থায় তাঁহাকে সদর হাসপাতালে ডুলি করিয়া লইয়া গিয়াছে। চন্দ্রকান্তের প্রায় পঞ্চাশজন সিপাহী—থানার দারোগা, কনেষ্টবল এবং অন্যান্য চৌকিদার সকলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত। দাঙ্গা তথাপি চলিতেছে। নানারূপ সত্য মিথ্যা গুজব আশে পাশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কেহ বলিতেছে উগ্রমোহনবাবু স্বয়ং বর্শা হস্তে ঘোড়ায় চড়িয়া গিয়াছেন। অধিকাংশ লোকেরই মত যে সম্পত্তিটা আসলে উগ্রমোহন সিংহেরই পূর্ব্বপুরুষদের ছিল। চন্দ্রকান্তের পিতামহ কি কৌশলে

জলকরটাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন—উগ্রমোহন সিংহ হঠাৎ তাহা জানিতে পারিয়াছেন—তাই এই কাণ্ড। তিনি "মরদ্‌কা বাচ্ছা"—ছাড়িবেন কেন? কথাটা হইতেছিল পীরপুরে—গোলক সার বাসায়। গোলক সা লোকটি নিঃসন্তান। দুইবার বিবাহ করিয়াও সংসার স্থাপন করিতে পারেন নাই। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীটিও বৎসর দুই আগে মারা গিয়াছেন। গোলক সার থাকিবার মধ্যে আছে তেজারতি কারবার—তাহা প্রায় লাখ খানেক টাকার। আর তাহার এক যমজ ভাই আছে। কিন্তু সেও বহুদিন হইল গোলকের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় গিয়া বাস করিতেছে। অনেকেরই ধারণা সে মারা গিয়াছে। এখন গোলক সার চড়া সুদে জমিদারগণকে টাকা ধার দেওয়া জীবিকা। ইহাই তাঁহার জীবনের বন্ধন এবং কর্ম্মের প্রেরণা। চন্দ্রকান্ত রায়কে টাকা ধার দিবার সুবিধা হইয়াছে বলিয়া তিনি পীরপুরে আসিয়া স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছেন।

উগ্রমোহন সিংহকে 'মরদ্‌কা বাচ্ছা' বলিয়া যিনি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন তিনি বৃন্দাবন মোদক। গোলক সার বাসার সম্মুখে তাঁহার মুদিখানার দোকান।

গোলক সা বলিলেন—"মরদ্‌কা বাচ্ছা তুমি ত ফট্ করে বলে বস্‌লে। কথা বল্‌তে ত আর পয়সা খরচ হয় না! হোঁৎকা হলেই মরদ্‌কা বাচ্ছা হল? বেশ যাহোক্—" বৃন্দাবন মোদক গোলক সাকে ঈর্ষার চক্ষে দেখিতেন। তিনি উত্তর করিলেন "মরদ্‌কা বাচ্ছা যদি কেউ থাকে এ তল্লাটে সে হচ্ছে উগ্রমোহন সিং। এক কথায় বলে দিলাম তোমায় সা জি!"

গোলক সা মস্তকে হাত বুলাইয়া বলিলেন—"খালি গোঁভারের মত মারামারি করলেই মরদ্‌কা বাচ্ছা হয় না—বুঝলে? ওর চেয়ে ঢের বেশী মরদ্‌কা বাচ্ছা—আমাদের চন্দ্রকান্তবাবু!"

বৃন্দাবন অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন—"কিসে আর কিসে—সোণা আর সীসে—একটা কথা আছে—না? এ হল গিয়ে তাই! সেতারের টুং টাং করে বলে হয়ত তুমি ওকে পছন্দ কর—কিন্তু মরদ্‌কা বাচ্ছার জাত ও নয়! হেলে কি কখনও কেউটে হতে পারে—" বলিয়া বৃন্দাবন মোদক ফু ফু করিয়া ধোঁয়াটা ছাড়িলেন। তিনি তামাক খাইতেছিলেন।

গোলক সা বলিলেন—"দাও বল্‌কেটা দাও! ভেতরের কথা তুমি ত আর জান না—আমি জানি। আমি বল্‌ছি শোন—আসল মরদ্‌কা বাচ্ছা হচ্ছে চন্দ্রকান্তবাবু!" এমন সময় অকস্মাৎ দশ বারোজন সশস্ত্র অশ্বারোহী আসিয়া উপস্থিত হইল। হাতে খোলা তলোয়ার। বৃন্দাবন ও গোলক উভয়েরই চক্ষুস্থির হইয়া গেল। এ কি কাণ্ড!

বজ্রগর্জ্জনে একজন অশ্বারোহী বলিলেন—বাঁধো। অমনি তিন চারিজন লোক আসিয়া গোলক সাকে ধরিল। তাহার হাত বাঁধিল—পা বাঁধিল—মুখও বাঁধিল এবং পরিশেষে বাঁধা হাত পায়ের ভিতর দিয়া একটি বংশদণ্ড প্রবেশ করাইয়া দিল।

আবার আদেশ হইল—চল!—

আটজন লোক গোলক সাকে শূকরের মত টাঙাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন মোদক ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। থানা পুলিস সব বাঘার-বিলের জঙ্গলে—বাধা দিবার কেহ নাই।

সকল জিনিসেরই একটা শেষ আছে। সুতরাং কিছুক্ষণ কাঁপিয়া বৃন্দাবন মোদকও প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। আশে পাশে আরও দুই চারিজন লোক এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিল—তাহারাও আসিয়া জুটিল এবং নানাভাবে জিনিসটা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কেহ উত্তেজিত ভাবে, কেহ মৃদুস্বরে, কেহ সহানুভূতি করিয়া। এ ব্যাপারে যে উগ্রমোহন সিংহের হাত আছে তাহা কাহারও মাথায় আসিল না। একটি রোগা গোছের ছোকরা আসিয়া বৃন্দাবন মোদককেই সমস্ত ব্যাপারটার জন্য দোষী সাব্যস্ত করিয়া বসিল। তাহার যুক্তি এই—বৃন্দাবন মোদক চেঁচাইল না কেন। উত্তেজিত স্বরে যুবকটি বলিতে লাগিল—"চেঁচালে আমরা সবাই বেরিয়ে পড়তাম। তাহলে কি আর সা-জিকে অমন ধারা তুলে নিয়ে যেতে পারে। দিন দুপুরে একটা জলজ্যান্ত লোককে বেঁধে তুলে দিয়ে গেল—আর আপনার মুখ দিয়ে একটা বাক্যি বেরুলো না!"

একজন বৃন্দাবন মোদককে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা লোকগুলো দেখ্‌তে কি রকম বল ত"

"সবারই চেহারা ত একই রকম। মুখোস পরে ছিল—হাতে সব খোলা তলোয়ার।"

সেই রোগা গোছের ছোক্‌রাটি হাসিয়া বলিলেন—"ওই তলোয়ার টলোয়ার দেখেই আপনি ঘাবড়ে গেছেন, বুঝেছি। একবার যদি একটা হাঁক দিতেন তাহলে—"

বৃন্দাবন মোদক এইবার চটিয়াছিলেন—"তুমি থাম তো হে বাপু!—সেদিন ত জ্বর থেকে ভুগে উঠ্‌লে—পেটে এখনও দিগ্‌গজ পিলে মজুত হয়ে রয়েছে। তোমার অত ফড়ফড়ানি কিসের?"

যুবকটি প্রত্যুত্তর দিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়াছিল—কিন্তু হঠাৎ তাহার বাক্‌রোধ হইয়া গেল। হঠাৎ একজন লোক অশ্বপৃষ্ঠে চীৎকার করিতে করিতে বলিয়া গেল—"সাবধান!—হঠাৎ একদল ডাকাত এসে চারিদিকে লুটপাট করছে—উগ্রমোহন সিংহের রতনপুর কাছারি এইমাত্র লুট হয়ে গেল!—সাবধান!"

আকস্মিক এই বার্ত্তায় প্রথমে সকলে একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেল। বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল প্রথমে বৃন্দাবন মোদকের। তিনি সেই রোগাগোছের ছোক্‌রাকে বলিলেন—"কই হে বীরপুরুষ, তোমার যে আর বড় সাড়াশব্দ পাচ্ছি না! যাও, ডাকাতের দলকে ঠেকাও গিয়ে যাও!"

যুবকটি চোখমুখের এমন একটা ভাব করিল যেন সে এখনি রতনপুর অভিমুখেই রওনা হইয়া পড়িবে—কিন্তু নিকটেই যুবকটির মাতুল রামকান্ত থাকাতে বোধ করি তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না।

রামকান্ত যুবককে ডাকিয়া বলিলেন—"ওরে তুই বাজে কথা ছেড়ে—একবার বাড়ীর ভেতর যা দিকিন্—তোর মামীকে গয়না পত্তর সব সিন্দুকে পুরে ফেল্‌তে বল—আর দেখ্—শোন্—" বলিয়া তিনি যুবকটিকে একটু দূরে ডাকিয়া লইয়া নিম্নস্বরে কি বলিতে লাগিলেন।

বৃন্দাবন মোদক দেখিলেন রামকান্ত নিজের ঘর সামলাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন এবং তাহা অনুকরণীয়। তিনিও কোমর হইতে চাবিটা বাহির করিয়া দোকান অভিমুখে পা চালাইয়া দিলেন।

অন্যান্য সকলেও বুঝিল এখন আত্মরক্ষার চেষ্টা করাই উচিত এবং নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

যে-কোন মুহূর্ত্তে যে-কোন অঘটন ঘটিয়া যাইতে পারে এই আশঙ্কায় চতুর্দ্দিক থম্ থম্ করিতে লাগিল।

দুই পক্ষ গিয়াই থানায় এজেহার দিলেন। দুই পক্ষ মানে দুই পক্ষের সিপাহীবৃন্দ। দুধনাথ পাঁড়ে অর্থাৎ উগ্রমোহন সিংহের দল গিয়া বলিল যে তাহারা প্রভু কর্তৃক প্রেরিত হইয়া রতনপুর কাছারি যাইতেছিল। কিন্তু পথে বাঘার-বিল পড়ায় তাহারা স্নানাদি সারিয়া লওয়ার উদ্দেশ্যেই নিতান্ত ভাল মানুষের মতই বিলে নামিয়াছিল। কিন্তু চন্দ্রকান্ত বাবুর এক সিপাহী রামবৃছ্ সিং তদ্দর্শনে অনর্থক তাহাদের গালিগালাজ করিতে থাকে এবং অকারণে লোষ্ট্রখণ্ড নিক্ষেপ করে। ঠিক অকারণেও বলা যায় না। রামবৃছ্ সিং কিছুদিন পূর্ব্বে উগ্রমোহন সিংহের নিকট চাকুরির আশায় গিয়াছিল—কিন্তু দুধনাথ পাঁড়ের জন্য তাহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। দুধনাথ পাঁড়ের উপর তাই তাহার আক্রোশ ছিল। রামবৃছ্ লোষ্ট্রখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া একটি সিপাহীকে আঘাত করে—ইহাই দাঙ্গার সূত্রপাত। রামবৃছ্ সিংহ প্রতিবাদ করিয়া কহিল যে ব্যাপার একেবারে অন্যরূপ। জলকরে মাছ ধরান হইতেছিল—দুধনাথ পাঁড়ের আদেশক্রমে কয়েকজন সিপাহী গিয়া ধীবরদের জাল ছিঁড়িয়া দেয় এবং রামবৃছ্ সিং তাহার প্রতিবাদ করিতে গেলে স্বয়ং দুধনাথ পাঁড়ে তাহাকে শ্যালক সম্বোধন করিয়া গণ্ডদেশে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত করে। সুতরাং দাঙ্গা হয়।

দারোগা সাহেব উভয় পক্ষের বিবৃতি টুকিয়া লইলেন এবং উভয় পক্ষেরই ধৃত দাঙ্গাকারীগণকে চালান দিলেন।

গোলক সাহা হরণ ব্যাপারটা কতকগুলি দুর্দ্ধর্ষ ডাকাতের কার্য্য বলিয়াই অনুমিত হইল। উগ্রমোহনের রতনপুর কাছারিতে অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়া যাওয়াতে এই বিষয়ে দারোগা সাহেবের অন্য সন্দেহ হইল না। তিনি চৌকিদার, দফাদার, কনেষ্টবল সকলকেই এ বিষয়ে অবহিত থাকিতে বলিয়া ব্যাপারটা সদরে রিপোর্ট করিলেন এবং সেই বেদে বেদেনীর দলকে গ্রেপ্তার করিলেন।

ফুল্‌কি থানার হাজত ঘরে গিয়া হাজির হইল।

(ক্রমশঃ)

সঙ্গীত

শিবরঞ্জনী মিশ্র—দাদ্‌রা

বেদনাতে বিজড়িত গান
বিদায় বেলায় দিনু দান।

বিরহ-বিধুর দিনে
বারেক তোমার বীণে
তুলিও করুণ তারি তান।

মুকুলিত চামেলির মালা
গাঁথিয়া দিলাম ভরি' ডালা—

আমারে ভাবিয়া মনে
নিশীথে নীরব ক্ষণে
পরিয়া অলকে দিও মান॥

স্বরলিপি ঃ—শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী   সুর ঃ—শ্রী হিমাংশুকুমার দত্ত, সুরসাগর

কথা ঃ—শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায়

II সা রা জ্ঞপা | পা -া -া | পা পজ্ঞা জ্ঞপা | পণ -া -পা | পণর্সা -র্সা -ণর্সা |
বে দ না- তে - - বি জ ড়ি ত - - গা- - - - - -

॥
-ণা -ধা পা | ণা ণা -ধণধপা | পধা মা -া | পা -দপা -র্সণা | দণদা -পা -া |
- - ন্ বি দা - - - য়্ বে- লা য়্ দি - - - নু- - - -

জ্ঞরা -জ্ঞা মা | -সা -া -া II
দা - - - - ন্

II {পা ধা র্সা | র্সধা র্সা র্জ্ঞা | র্সর্জ্ঞা -র্সর্জ্ঞা -র্জ্ঞর্রা | র্সা -া -া | না র্সনা দা |
বি র হ বি ধু র- দি- - - - - - - - নে - - বা রে- ক

দপা পদা পমা | পধণর্সা -ণর্রা -র্সা | ণদণদা -পা -া } ণা ণা ণধা | পধা ধা মা |
তো মা- র বী- - - - - - ণে- - - - - তু লি ও- ক- রু ণ

পা -দপা -ণা | দণদা -পা -া | ণা ণা ণধা | পধা ধা মা | পা -দা -র্সা | র্সণা -া -া |
তা - - - রি- - - - তু লি ও- ক- রু ণ তা - - রি - -

জ্ঞরা -জ্ঞা -মা | -সা -া -া II
তা - - - - ন্

II পা পজ্ঞা জ্ঞপা | পণা -া ধণপা | জ্ঞরা মা পমা | মপা -া -া | জ্ঞরা -সরা -পমপমা |
মু কু লি ত - - - চা মে লি- র - - মা- - - - - - -

মজ্ঞা -া -া | জ্ঞরা মা পা | ধণা পধা -ণা | পধণা -পধা -র্সর্সর্সা | ণা -া -মা |
লা - - গাঁ থি য়া দি- লা- ম্ ভ- - - - - - - - রি - -

পা -া -মা | জ্ঞা -া -া | পা ধা র্সা | সধা র্সা র্জ্ঞা | র্সর্জ্ঞা -র্সর্রা -র্জ্ঞা |
ডা - - লা - - আ মা রে ভা বি য়া- ম- - - - - -

র্জ্ঞা -া -া | র্জ্ঞর্সা -র্জ্ঞা -র্রা | র্সা -া -া | না র্সনা দা | দপা পদা পমা |
নে - - ম - - - - - নে - - নি শী- থে নী র- ব

পধণর্সা -ণর্রা -র্সা | ণদণদা -পা -া | ণা ণা ণধা | পধা ধা মা | পা -দপা -ণা |
ক্ষ- - - - - - ণে- - - - - প রি য়া- অ- ল কে দি - - -

দণদা -পা -া | ণা ণা ণধা | পধা ধা মা | পা -দা -ণা | পা -া -া | দা -ণা -র্সা |
ও- - প রি য়া- অ- ল কে দি - - ও - - দি

পা -া -া | জ্ঞরা -জ্ঞা -মা | -সা -া -া II II
ও - - মা - - - - - ন্



ভোগবাদ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

কিছুদিন পূর্বে শ্রীঅনিলবরণ রায় ভারতবর্ষে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; তাহাতে তিনি ইহা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে ইহলোকে থাকিয়া পৃথিবীকে ভাল করিয়া ভোগকেই মানব জীবনের উদ্দেশ্য করা উচিত। শঙ্কর যে প্রচার করিয়াছিলেন জগৎ মিথ্যা এবং বৈরাগ্য কল্যাণ-জনক—তাঁহার উক্তি ভ্রান্ত, তাঁহার প্রচারের ফলে বহুলভাবে বিধিনিষেধের প্রচলন হইয়াছে এবং তাহাই ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ। অনিল-বাবু গীতা এবং উপনিষদের দ্বারা তাঁহার মত সমর্থন করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে আমি একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম যে গীতা ও উপনিষদের যে বাক্যগুলি অনিলবাবু উদ্ধৃত করিয়াছেন সেগুলির তিনি ঠিক মত ব্যাখ্যা করেন নাই; গীতা ও উপনিষদে বহুস্থলে বৈরাগ্যের সুস্পষ্ট উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। গীতা ও উপনিষদকে প্রামাণিক বলিয়া মানিলে ইহলোকের ভোগকে কখনই জীবনের লক্ষ্য বলা যায় না, শঙ্করের মতকে ভ্রান্ত বলিয়া সহজে উড়াইয়া দেওয়া যায় না; শাস্ত্রের বিধিনিষেধগুলি ভারতের অবনতির কারণ নহে। শাস্ত্রবাক্যে ঈশ্বরের আদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বৈশাখ ১৩৪৩এর চিত্রালী নামক মাসিকপত্রে ইহার উত্তর দেওয়া হয়। প্রবন্ধ-লেখকের নাম শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। আমি যে বলিয়া-ছিলাম যে শাস্ত্রবাক্য ঈশ্বরের উক্তি তিনি ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন; বলিয়াছেন ইহা আমার অভিনব মত, বেদ অপৌরুষেয় এ পর্য্যন্ত তিনি মানিতে রাজি আছেন। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে আমি কোনও নূতন মত প্রচার করি নাই, শঙ্কর রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ এবং শ্রীচৈতন্য রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ যাহা প্রচার করিয়াছেন আমি তাহারই পুনরুক্তি করিয়াছি। শাস্ত্র দ্বিবিধ, শ্রুতি ও স্মৃতি। বেদের নাম শ্রুতি; যে শব্দগুলি ঋষিদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল, শিষ্য গুরুর নিকট সেগুলি শ্রবণ করিয়া সেই শব্দগুলি শিষ্যকে শিক্ষা দেন; এইভাবে শিষ্যপরম্পরায় অবিকল সেই শব্দগুলি রক্ষা করা হইয়াছে, এজন্যই বেদকে শ্রুতি বলা হয়। ঈশ্বরের যে সকল উক্তি এইভাবে অবিকল রক্ষা করা হয় নাই, যেগুলি ঋষিগণ "স্মরণ" করিয়া শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন সেগুলির নাম স্মৃতি, যথা—পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও ধর্মশাস্ত্র (মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা প্রভৃতি)। ঋষিগণ স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন, অবিকল শব্দগুলি রক্ষা করা হয় নাই, এজন্য স্মৃতিতে ভ্রমের যৎসামান্য সম্ভাবনা আছে; কিন্তু শ্রুতিতে ভ্রমের কোনই সম্ভাবনা নাই, এ জন্য স্মৃতি অপেক্ষা শ্রুতি প্রামাণিক। কিন্তু উভয়ই ঈশ্বরের অনুপ্রেরণা হইতে উদ্ভূত। যেস্থলে স্মৃতিবাক্য কোনও শ্রুতি বাক্যের বিরোধী নহে সেস্থলে স্মৃতিও প্রামাণিক। সাধু ও মহাপুরুষগণ যে স্মৃতি-বাক্য প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন আমি নিম্নে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইয়াছে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার নহেন, তিনি স্বয়ং ভগবান্। পুরাণের এই বাক্যকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন,

> ব্রহ্ম শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
> স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ শাস্ত্র পরমাণ॥
>
> শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে শ্রীচৈতন্যদেবের এই মত যে শাস্ত্র-বাক্য কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। পুনরায় উক্ত গ্রন্থের মধ্যলীলা ১৫ পরিচ্ছেদে দেখা যায় যে শ্রীচৈতন্য বলিতেছেন,

> প্রভু কহে ভাল বলিলে শাস্ত্র আজ্ঞা হয়।
> কৃষ্ণের সকল শেষ ভক্ত আস্বাদয়॥

অতএব শাস্ত্রের আজ্ঞা যে অবশ্যপালনীয় ইহাই শ্রীচৈতন্যের মত। মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যদেব বলিতেছেন—

> শাস্ত্র যুক্তে শুনি পুনঃ দৃঢ় শ্রদ্ধা যাঁর।
> উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার॥

এই বাক্যের কিছু পূর্বে "শ্রদ্ধা" শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

"শ্রদ্ধা" শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। সুতরাং যাহার শাস্ত্রবিশ্বাস আছে চৈতন্যদেবের মতে সে-ই শ্রেষ্ঠ অধিকারী অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র।

মধ্যলীলা ২০ পরিচ্ছেদে চৈতন্যদেব বলিতেছেন,—

> মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান।
> জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ॥
> শাস্ত্র গুরু আত্মারূপে আপনা জানান।
> কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান॥

অতএব চৈতন্যদেবের মতে কেবল বেদ নহে—পুরাণও ঈশ্বরের রচনা (বেদব্যাস ঈশ্বরের অবতার) এবং শাস্ত্র সকল ঈশ্বরের উক্তি।

সুরেশবাবু বলিয়াছেন যে মনুসংহিতাতে অনেক "ভালোকথা, ছেলে-মানুষী কথা এবং পরস্পরবিরোধী কথা আছে।" তাঁহার এই অভিযোগের সমর্থনে তিনি নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলি দিয়াছেন—

চতুর্থ অধ্যায় ১৬৬ শ্লোকে মনু বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণকে তৃণ দ্বারা আঘাত করিলেও একবিংশতিবার পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

মনু ব্রাহ্মণের কিরূপ আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন তাহা স্মরণ রাখিলে এই বিধান অন্যায় বলিয়া মনে হইবে না। ব্রাহ্মণ ক্ষেত্র হইতে পতিত

ধান্য সংগ্রহ করিয়া জীবিকা যাপন করিবেন, দিবারাত্র ব্রহ্ম চিন্তায় মগ্ন থাকিবেন, সকল জীবের কল্যাণ কামনা করিবেন। এরূপ ব্রাহ্মণকে আঘাত করিলে যে গুরুতর পাপ হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? ব্রাহ্মণ আদর্শ হইতে যত নীচে হইবেন, আঘাতকারীর পাপের গুরুত্ব তত কমিয়া যাইবে?

মনুর নবম অধ্যায়ে ১৪ ও ১৫ শ্লোকে স্ত্রীলোকের নিন্দা আছে—ইহা সুরেশবাবুর অন্য অভিযোগ। সুরেশবাবুর এইরূপ ভ্রম হইয়াছে যে এই শ্লোকগুলিতে সকল স্ত্রীলোককে লক্ষ্য করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এখানে যে সকল স্ত্রীলোকের চরিত্র মন্দ কেবল তাহাদিগকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। মনুর যদি ইহা অভিপ্রায় হইত যে সকল স্ত্রীলোকই মন্দ তাহা হইলে তিনি পরবর্ত্তী ২৬ ও ২৯ শ্লোকে স্ত্রীলোকের এত প্রশংসা করিতে পারিতেন না। ২৬ শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন,

স্ত্রিয়ঃ শ্রীয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন "গৃহে স্ত্রী এবং শ্রীর মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই।" ২৯ শ্লোকে বলিয়াছেন যে পতিব্রতা স্ত্রীলোককে সাধ্বী বলা হয়। সুতরাং ১৪ ও ১৫ শ্লোকে যে কেবল দুশ্চরিত্র স্ত্রীলোকের নিন্দা করা হইয়াছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

সুরেশবাবু মনুর ৮ অধ্যায়ের ৩৯৬ শ্লোকের অনুবাদ দিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে যে রজক যত্নপূর্ব্বক বস্ত্র পরিষ্কার করিবে—এক ব্যক্তির বস্ত্র অন্য ব্যক্তিকে পরিতে দিবে না। ইহার উপর সুরেশবাবু মন্তব্য করিয়াছেন যে এই শ্লোকটি "হিটলারের ন্যায় জবরদস্তের" পরিচায়ক। আমাদের তাহা মনে হয় না। মনুর ব্যবস্থাটি স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়াই মনে হয়।

সুরেশবাবু মনুর যে সকল উক্তি পরস্পরবিরোধী মনে করেন টীকাকারগণ সে সকল শ্লোকের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। অনেক সময় একটি গ্রন্থ প্রথমে পাঠ করিলে মনে হয় ইহাতে পরস্পর-বিরোধী কথা আছে। গভীরভাবে চিন্তা করিলে তাহার মধ্যে সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। বেদের মধ্যেও এমন অনেক কথা আছে যেগুলি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে হয়। মহর্ষি জৈমিনি তাঁহার প্রণীত পূর্ব্ব মীমাংসা এবং বাদরায়ণ তাঁহার প্রণীত ব্রহ্মসূত্রে সেই সকল আপাত-বিরোধী বাক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছেন।

অনিলবাবুর প্রচারিত ভোগবাদ সম্বন্ধে সুরেশবাবু যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন অতঃপর তাহার আলোচনা করা যাউক। সুরেশবাবুর মতে প্রত্যেক মানবের জীবনের উদ্দেশ্যই ভোগ—ইহা না হইয়া যায় না। যে সন্ন্যাসী সে ত্যাগ করিয়া সুখ পায় বলিয়াই ত্যাগ করে—তাহাই তাহার ভোগ। গান্ধীজীরও জীবনের উদ্দেশ্য ভোগ, রামকৃষ্ণেরও জীবনের উদ্দেশ্য ভোগ। এই মতই যদি সত্য হয় তাহা হইলে শঙ্করাচার্য্য বেচারাই বা কেন বাদ পড়িবেন? সুরেশবাবুকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে শঙ্করাচার্য্যও ভোগকেই জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু অনিলবাবু তাহা বলেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে শঙ্করাচার্য্য ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করেন নাই এবং সেজন্যই ভারতের অধঃপতন হইয়াছে। ফলতঃ সুরেশবাবু যদিও মনে করিতেছেন যে তিনি অনিল-বাবুর মতটি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তথাপি প্রকৃতপক্ষে তিনি অনিল-বাবুর মতকে ভুল বলিয়াই প্রতিপাদন করিয়া ফেলিয়াছেন।

সুরেশবাবু "ভোগ" এবং 'আনন্দে' গোল করিয়া ফেলিয়াছেন। যিনি ত্যাগ করেন তিনি ত্যাগ করিয়াই আনন্দ পান, ইহা বলা যায়। আনন্দকে জীবনের লক্ষ্যও বলা যায়, কারণ ব্রহ্মেরই অপর নাম আনন্দ। কিন্তু ভোগকে জীবনের লক্ষ্য বলা যায় না। কারণ অনিলবাবুর উদ্দিষ্ট "ভোগ" যে ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ভোগ তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। তিনি বলিয়াছিলেন যে জগৎকে পূর্ণভাবে ভোগ করাকেই জীবনের লক্ষ্য করা উচিত, সুতরাং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় ভোগই তাঁহার লক্ষ্য। শঙ্করাচার্য্য রামকৃষ্ণ প্রভৃতি বিষয় ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করেন নাই। অনিলবাবুর মতে তাঁহারা ভ্রান্ত ছিলেন। অনিলবাবুর এই মত ভুল।

সুরেশবাবু গীতা ও উপনিষদ হইতে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার উদ্ধৃত কোনও বাক্য হইতেই ইহা প্রতিপাদন হয় না যে ভোগকেই জীবনের লক্ষ্য করা উচিত। প্রথমে তিনি বৃহদারণ্যক উপনিষদ হইতে এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি" অর্থাৎ পতির সুখের জন্য পতি প্রিয় হয় না, আত্মার সুখের জন্য পতি প্রিয় হন। কিন্তু জীবনের কি উদ্দেশ্য হইবে তাহা এখানে বলা হইল না। এই বাক্যের শেষে তাহা বলা হইয়াছে—"আত্মায়া অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" অর্থাৎ আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, বিচার করিতে হইবে, ধ্যান করিতে হইবে। ইহাই জীবনের উদ্দেশ্য হইবে, বিষয়-ভোগ নহে।

তাহার পর সুরেশবাবু নিম্নলিখিত বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—

অন্ধঃ তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যাম্ উপাসতে।
ততো ভুয় ইব তে তমো চ উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

অর্থাৎ যাঁহারা কেবল "অবিদ্যা"র উপাসনা করে তাহারা অন্ধকারে প্রবেশ করে; যাহারা কেবল "বিদ্যা"র উপাসনা করে তাহারা আরও বেশী অন্ধকারে প্রবেশ করে। এখানে অবিদ্যার অর্থ কর্ম্ম। বিদ্যার অর্থ শঙ্করের মতে দেবতার উপাসনা, রামানুজের মতে ব্রহ্মজ্ঞান। যেরূপ ব্যাখ্যাই করা যাউক এখানে একথা বলা হয় নাই যে ভোগকেই জীবনের লক্ষ্য করা উচিত।

সুরেশবাবুর উদ্ধৃত অন্য বাক্যগুলি এইরূপ।

সুরেশবাবু বলিয়াছেন "তুমি যদি দেহ রক্ষার ভার না নেও, খুব সম্ভব চেঙ্গিস খাঁ এসে তোমার দেহ রক্ষার ভার নেবে।" দেহ রক্ষার ভার অবশ্য নেওয়া উচিত। কিন্তু দেহরক্ষার ভার নিলেই যে ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করিতে হইবে এরূপ কোনও মানে নাই।

সুরেশবাবু বলিয়াছেন যে আমার ব্যবহার কোনও গঞ্জিকাসেবী সাধুর মত—যিনি যে প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারিতেন সেগুলির উত্তর দিতেন, উত্তর দিতে না পারিলে সমাধির ভাণ করিতেন। কিন্তু আমি অনিলবাবুর কোন্ প্রশ্নের উত্তর দিই নাই তাহা তিনি উল্লেখ করেন

নাই। প্রত্যুত আমি পূর্ব্বের প্রবন্ধ দুইটিতে যে প্রশ্নগুলি করিয়াছিলাম তাহার অনেক প্রশ্নেরই তিনি উত্তর দেন নাই। নিম্নে সেরূপ কয়েকটি প্রশ্নের উল্লেখ করিতেছি :—

(১) গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—

তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ ॥

অর্থাৎ "কোন্ কর্ম করা উচিত, কোন্ কর্ম করা উচিত নয় এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ।"

অনিলবাবু ও সুরেশবাবু গীতা মানেন, কিন্তু একথা মানেন না কেন?

(২) বেদ বলিয়াছেন,—

যদ্ বৈ কিঞ্চ মনুঃ অবদৎ তৎ ভেষজম্

অর্থাৎ "মনু যাহা বলিয়াছেন তাহা ঔষধের ন্যায় হিতকারী।"

অনিলবাবু ও সুরেশবাবু বেদ মানেন, তথাপি বেদের একথা মানেন না কেন?

(৩) গীতা বলিয়াছেন,—

যে হি সংস্পর্শজাঃ ভোগাঃ দুঃখযোনয় এব তে।

আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় স্পর্শ করিয়া যে ভোগ তাহা দুঃখের কারণ, তাহার আদি ও অন্ত আছে, পণ্ডিতগণ তাহাতে আনন্দ পান না।

তাহা হইলে ইহজীবনে ভোগকে কিরূপে জীবনের লক্ষ্য করা যায়?

(৪) গীতা বলিয়াছেন,—

বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগাৎ যৎ তৎ অগ্রেঽমৃতোপমং।

পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥

অর্থাৎ বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে যে সুখ তাহা অগ্রে অমৃতের ন্যায়, পরিণামে বিষের ন্যায়।

এরূপ সুখকে কিরূপে জীবনের লক্ষ্য করা যায়?

(৫) উপনিষদ বলিয়াছেন,—

হীয়তে ঽর্থাৎ য উ প্রেয়ো বৃণীতে

অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রেয়কে বরণ করে সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। অতএব আপাত-রমণীয় বিষয় ভোগকে বরণ করিলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হইবে।

সুরেশবাবু তাঁহার প্রবন্ধে কিরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন নিম্নে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

"দুঃখবাদী মেরুদণ্ডহীন ছিচ্‌কাঁদুনে ও ত্যাগের বুলি কপ্‌চানো হামবাগ্‌দের অভিশাপ থেকে জাতির আত্মা মুক্ত" করা প্রয়োজন।

'চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মত মেরুদণ্ডহীন অজীর্ণরোগ-লক্ষণাক্রান্ত দার্শনিকদের আবির্ভাব হয় কেমন কোরে।"

"চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একেবারে পরিপূর্ণভাবে নিরেট।"

"বসন্তবাবুর নামের পিছনে এম্-এ ছাপ দেখে বিশ্বাস করতেই হয় যে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা প্রচণ্ড গলদ কোথাও আছে।"

পণ্ডিচারী আশ্রমের একজন শিষ্য দার্শনিক আলোচনা প্রসঙ্গে এইরূপ ভাষা ব্যবহার করেন ইহা দুঃখের বিষয়।

শাস্তি

শ্রীবীরেন দাশ

অফিস থেকে ফিরে প্রৌঢ় ডেপুটী, বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে গড়গড়ার নল টানছিলেন। বিধবা বোন্ মানদা-সুন্দরী আস্তে আস্তে কাছে এসে দাঁড়ালেন।

—তারা কি কি বই চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। আমি বলেছি তুমি বাড়ী নেই। তিনি বলতে লাগলেন আস্তে আস্তে। আজকের ডাকে দুটো চিঠি এসেছে…টেবিলে রেখে দিয়েচি। পেয়েছো নাকি?…হ্যাঁ, যতীন কিন্তু গোল্লায় যাচ্চে দিন দিন। এখন থেকে শাসনে না রাখলে, শেষকালে আর পেরে উঠবে না। সেদিন সে কি করছিল জানো? চুপি চুপি তোমার ঘরে ঢুকে সিগ্রেট টানছিল। আমায় দেখেই পালিয়ে গেল। আজও আবার ধরা পড়েছে। আমি যেমনি বকতে আরম্ভ করেছি, অমনি দুহাতে কাণ চেপে ধরে এমন জোরে চীৎকার জুড়ে দিলে যে বাধ্য হয়ে আমাকে থামতে হলো।

প্রৌঢ় বিরজাবাবু দিদির দিকে চেয়ে হেসে উঠলেন জোরে। আশ্চর্য্য ব্যাপার! তিনি বললেন, বয়স কত তার?

—সাত। এই বয়সে সিগ্রেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব খারাপ। তাই বলছিলাম এ অভ্যাস যাতে নষ্ট হয় তার চেষ্টা এখনি করা উচিত।

—সত্যি কথা। কে তাকে সিগ্রেট দিলে?

—কেন, তোমার টেবিল থেকে নিয়েছে, আর কি।

—আমার টেবিল থেকে?…ডাক তাকে।

মানদাসুন্দরী চলে গেলে বিরজাবাবু ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে মানসনেত্রে দেখছিলেন, যতীন সিগারেট টান্‌চে আর

কাল ধোঁয়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন হ'য়ে গেছে। মনে মনে তিনি না হেসে থাকতে পারলেন না। কিন্তু পরক্ষণেই দিদির গম্ভীর মুখ তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো—আর তাঁর মনে পড়লো বহুদিন আগেকার একদিনের কথা, যখন স্কুলে কি হোষ্টেলে সিগারেট ফুঁকা একটা ভয়াবহ অন্যায় বলে মাষ্টাররা আর বাপমারা মনে করতেন। এই অপরাধের অপরাধী ছিল ক্ষমার অযোগ্য। অত্যন্ত নির্দ্দয়-ভাবে তাদের বেত দেওয়া হ'তো, স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হতো···এই শাস্তির ভয়েই ছেলেরা ধূমপান থেকে বিরত হ'তো। খুব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাও মাঝে মাঝে না বুঝে তর্ক করে থাকেন। বিরজাবাবুর মনে পড়লো—তাঁর শৈশবের এক ঘটনা। একটী ছেলেকে সিগারেট-শুদ্ধ ধরে তাঁদের স্কুলের এক শিক্ষিত বিজ্ঞ মাষ্টার পাংশুটে হয়ে গিছলেন ভয়ে এবং পরক্ষণেই মাষ্টারদের এক বিশেষ সভা ডেকে ছেলেটাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়ে-ছিলেন। প্রৌঢ় ডেপুটীবাবুর কয়েকটী ঘটনাই মনে পড়্লো। তিনি কিন্তু চিরকালই ভেবে এসেছেন এসব ক্ষেত্রে অপরাধ থেকে অপরাধের শাস্তিটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়। ···কিন্তু মানুষ নাকি অবস্থার দাস, যখন যে অবস্থায় পড়ে তাতেই আপনাকে মানিয়ে নিতে পারে। তা' না হলে মানুষ বুঝ্‌তে পারতো যে এই সব বুদ্ধিমত্তার কাজের গোড়ায় রয়েছে অজ্ঞতা, এই সব দায়িত্ব-বোধের পেছনে সত্য আছে খুব কমই—স্কুলমাষ্টার, উকিল, লেখক প্রভৃতির ভীষণ দায়িত্ববোধ।

এমনি ধারা এলোমেলো চিন্তা যা' কোন পরিশ্রান্ত মস্তিষ্কে একবার ঢুকলে আর বেরোতে চায় না, বিরজাবাবুর মাথায় ঘুরতে লাগলো। কোন্ চিন্তা থেকে যে কোন্ চিন্তা আসে—আবার কোথায়ই বা তলিয়ে যায় কেউ জানে না; অথচ মজা এই যে এ নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। সারাদিন ধরে অফিসে হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে এসে এমনি লঘু পারিবারিক চিন্তা করতে বেশ লাগে কিন্তু।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে আস্‌ছে। পাশের ঘরে কার পদশব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। সন্ধ্যার নিস্তব্ধ অন্ধকারের সাথে এই লঘু পদশব্দের যেন কোথায় মিল আছে···সবে মিলে একটা মোহের সৃষ্টি করছে, যত রাজ্যের বাজে চিন্তা মাথায় এসে ভিড় করে এ সময়টাতে।

পাশের ঘরে যতীন আর মানদাসুন্দরীর কথাবার্ত্তা শুন্‌তে পাওয়া যাচ্ছে।

বাবা এসেছেন? যতীন শুধালে।

মানদাসুন্দরী ভীতকণ্ঠে বললেন, যাও তোমাকে ডাকচেন। সিগারেট খাওয়া বেরুচ্ছে।

আমি তাকে কি উত্তর দোব? যতীন মনে মনে ভাব্‌তে লাগলে। কিন্তু একটা কিছু উত্তর ঠিক করবার জন্য দাঁড়ালে না, দৌড়ে এসে ঢুকল বাবার ঘরে। শুধু তার কাপড় দেখেই বুঝতে হয় সে মেয়ে না ছেলে, এমনি দুর্ব্বল আর নরম আর পাংশুটে তার চেহারা। তার কোঁকড়ানো চুল, তার দৃষ্টি, তার ভেলবেটের কোট, তার চলাফেরা··· সমস্তই অত নরম, আর মেয়েলী।

বাবা! সে মিষ্টিস্বরে ডাকলে। বলতে বলতে ইজি-চেয়ারের হাতলের উপর বসে পড়ে এক হাতে বাবার গলা জড়িয়ে ধরলে; আমাকে ডেকেছিলে?

বিরজাবাবু তাকে একটু ঠেলে দিয়ে বললেন, একটু দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও···তোমার সাথে কথা আছে আর বেশ জরুরী কথা।···আমি ভয়ানক রেগে গেছি তোমার 'পরে···আর একটুও ভালবাসবো না তোমাকে। বুঝতে পারছো? আর একটুও ভালবাসি না তোমায়, তুমি আমার ছেলে নও···না নিশ্চয়ই না।

কি করেচি আমি?—যতীন সন্দেহমিশ্রিত স্বরে চোখ বড় বড় করে শুধালে; সারাদিনের মধ্যে একবারও আমি তোমার ঘরে ঢুকিনি···কিছুতে হাত দিইনি আমি।···

—পিসিমা এইমাত্র বলছিলেন তুমি সিগ্রেট খেয়েছো ···সত্যি নাকি? সিগ্রেট খাও তুমি?

—সত্যি বাবা, আমি একদিন সিগ্রেট খেয়েছিলাম।

—দেখো, তুমি আবার মিথ্যে কথাও বলছো! বিরজা-বাবু বলতে লাগলেন; মুখের হাসি চাপতে গিয়ে তাঁর ভুরু কুঁচকে উঠলো। পিসিমা তোমাকে দু'দিন দেখেছেন সিগ্রেট খেতে। মানে সবসুদ্ধ তিনদোষে তুমি দোষী হলে। এক—সিগ্রেট খাওয়া, দুই—পরের সিগ্রেট না বলে নেওয়া এবং তিন—মিথ্যা বলা। তিন দোষ!

হ্যাঁ ঠিক, যতীনের মনে পড়লো, হাসিমুখে সে বল্লে, সত্যি আমি দু'দিন সিগ্রেট খেয়েচি, আজকে আর আগে একদিন।

অর্থাৎ তুমি দু'দিন সিগ্রেট খেয়েছো। আমি তোমার উপর খুব—বিরক্ত হয়েছি। তুমি ভাল ছেলে ছিলে, কিন্তু এখন দেখছি একেবারে গোল্লায় গেছো!

বিরজাবাবু যতীনের কোটের কলার নাড়তে নাড়তে ভাবতে লাগলেন, আর কি তাকে বলতে পারি?

বড়ই দুঃখের কথা। তিনি বলতে লাগলেন, আমি তোমার কাছ থেকে এরকম আশা করিনি। প্রথমত, পরের টেবিলের ধারে গিয়ে সিগ্রেট চুরি করে আনা তোমার খুবই অন্যায় হয়েছে। একজন লোক শুধু তার নিজের জিনিসই ব্যবহার করবে এবং যদি পরের জিনিস চুরি করে…সে অত্যন্ত খারাপ লোক। (বিরজাবাবুর মনে হলো অন্যভাবে বলা দরকার)। যেমন ধর তোমার পিসিমার অনেক-অনেক কাপড় আছে; কিন্তু আমার এবং তোমার ও-গুলোতে হাত দেবার কোন ক্ষমতা নেই; কারণ, ওগুলো আমাদের নয়,…বুঝতে পারচো না? তোমার খেলনা আছে ছবি আছে। আমি সে-গুলি নিই নি। যদিও মাঝে মাঝে সে-গুলো নেবার প্রবল ইচ্ছে হয় আমার… নিই না, কারণ সে-গুলো তোমার ..আমার নয়।

—তোমার ইচ্ছে হ'লে সে গুলো নিতে পারো বাবা! যতীন বললে; আমার যা কিছু তোমার নিতে ইচ্ছে হয় নিয়ো। আর তোমার টেবিলে যে হল্‌দে কুকুরটা আছে ওটাও ত আমার…কিন্তু আমি মনে করিনে কিছু।

—আহা তুমি বুঝতে পারছো না। বিরজাবাবু বল্‌তে লাগলেন, তুমি আমাকে যে কুকুরটা দিয়েছো ওটাতো এখন আমারই, এটা দিয়ে আমি আমার যা খুসী করবো। কিন্তু আমি ত তোমাকে সিগ্রেট দিই নি, সিগ্রেট আমার; (কি করে তাকে বুঝাই। বিরজাবাবু ভাবতে লাগলেন, না এভাবে নয়)। যদি অন্য কারো সিগ্রেট আমার খেতে ইচ্ছে হয়, আগে তার মত নোবো…এবং আস্তে আস্তে শব্দবিন্যাসের দ্বারা ছোটদের ভাষায় বিরজাবাবু যতীনকে সম্পত্তি বলতে কি বুঝায় বলতে লাগলেন। যতীন বাবার বুকের দিকে তাকিয়ে মনোযোগ দিয়ে শুন্‌তে লাগলো। আস্তে আস্তে কখন তার দৃষ্টি আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে বাগানের হাস্‌নাহেনা ঝোপের উপর গিয়ে পড়্‌লো।

বাবা! হাস্‌নাহেনা সব সময় ফোটে না কেন? সহসা সে প্রশ্ন কর্‌লে। বিরজাবাবু একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, দ্বিতীয়তঃ তুমি সিগ্রেট খাও। অত্যন্ত খারাপ কাজ। আমি সিগ্রেট খাই বলে সব্বাই সিগ্রেট খাবে তার কোন মানে হয় না। আমি সিগ্রেট খাই বলে নিজেকে মনে মনে কত বকি। (আমি একজন আদর্শ শিক্ষক—বিরজাবাবু ভাবলেন) ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর…বিশেষ হানিজনক। ধূমপায়ীরা শিগ্‌গীর মরে যায়। আর বিশেষভাবে তোমার মত ছোট ছেলেদের পক্ষে এ খুব মারাত্মক। তোমার হার্ট দুর্ব্বল..এর থেকে কাশি, যক্ষ্মা, ব্রঙ্কাইটীস্ নানা রোগ হ'তে পারে.. তোমার নরেনকাকা ত হার্টের দুর্ব্বলতার জন্যই মারা গেলেন। যদি তিনি ধূমপান না করতেন হয়ত এখনও বেঁচে থাকতেন।

ভৃত্য টেবিলের উপর আলো দিয়ে গেল। যতীন এক-দৃষ্টে আলোর দিকে চেয়ে শ্বাস মোচন করলে।

তোমার নরেনকাকা খুব ভাল বল খেলতেন—বিরজা-বাবু বললেন।

যতীন আস্তে আস্তে ইজিচেয়ারের হাতলে গা এলিয়ে দিলে। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, সে যেন কি ভাব্‌ছে …তার বড় বড় খোলা চোখে দুঃখ আর ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট। খুব সম্ভব সে মৃত্যুর কথা ভাবছিল। মৃত্যু বড় নিষ্ঠুর। মৃত্যুই নাকি তার মাকে কেড়ে নিয়েছে, তার নরেনকাকাকে।.. মানুষ মরে তারাগুলোর পাশে যায় আর সেখান থেকে পৃথিবীর দিকে তাকায়। আমি তাকে কি বলবো?

বিরজাবাবু ভাব্‌তে লাগলেন। সে শুনতে পাচ্ছে না। নিশ্চয়ই সে ভাবছে আমার যুক্তি আর তার দোষ কোনটাই জরুরী নয়। আমাদের বেলা সিগ্রেট খাওয়া একটা ভীষণ অপরাধ বলে গণ্য করা হতো। তাই যারা ভীতু আর শিশু তারা শাস্তির ভয়ে সিগ্রেট খেত না। কিন্তু যারা সাহসী তারা জুতোর ভিতরে সিগ্রেট লুকিয়ে রাখতো আর ঝোপে জঙ্গলে গিয়ে টান্‌তো। কিন্তু আমি যাতে সিগ্রেট না খাই এ-জন্যে মা আমাকে মিষ্টি আর পয়সা দিতেন। কিন্তু আজকাল ও-সব নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামায় না। আজকালকার শিক্ষকেরা শিশুদের সব কিছু যুক্তির ভিতর দিয়ে বুঝাতে চায়…

ইতিমধ্যে যতীন কখন টেবিলের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

—আজ কি হয়েছিলো, জানো বাবা ? সে বলতে লাগলো, ঠাকুর আঙ্গুল কেটে ফেলেছিল ··

সে আরও বললে যে, এক ভিখারী বৈরাগী ভিক্ষা নিতে এসে একতারা বাজিয়ে গান গেয়েছিল।

বিরজাবাবু ভাবতে লাগলেন, সে তার নিজের চিন্তায় মশগুল।···তাকে বুঝাতে হলে আমাকে রাগ করে চীৎকার করতে হবে। এ-জন্যই মায়েরা শিশুদের শাসন করে ভাল, কেন না মা শিশুর মত হাসতে, কাঁদতে এবং রাগ করে চীৎকার করতে পারে। যুক্তি আর নীতি দিয়ে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া যায় না। আমি তাকে কি বলবো ?···

প্রৌঢ় ডেপুটীবাবু যিনি সুদীর্ঘ বিশ বৎসর ধরে কত দোষীকে শাস্তি দিয়েছেন, কত যুক্তিপূর্ণ রায় লিখেচেন, তিনি আজ বিস্মিত হতভম্ব হয়ে গেলেন, সাত বছরের ছেলেকে কি বলতে হবে না জেনে।

শোন, প্রতিজ্ঞা কর আর সিগ্রেট খাবে না !—তিনি বললেন।

প্রতিজ্ঞা !—যতীন বল্‌লে বিস্মিত হয়ে—প্রতিজ্ঞা !

কিন্তু প্রতিজ্ঞা মানে কি সে জানে ত ? বিরজাবাবুর মনে পড়লো ! তাই ত ! না আমার দ্বারা হবে না। যদি কোন স্কুল-মাষ্টার কোনো উকিল আমার এই অবস্থার কথা জানতো, আমাকে নিশ্চয়ই বোকা পাগল ভাব্‌তো। কিন্তু কোর্ট হলে ওকে শাস্তি দিতে আমার এতটুকু বিলম্ব হতো না। যদি এ আমার ছেলে না হয়ে ছাত্র অথবা বন্দী হ'তো আমাকে এ-রকম বোকার মত কাপুরুষের মত হতভম্বের মত বসে থাকতে হতো না।

যতীন ততক্ষণে কাগজ পেন্সিল নিয়ে ছবি আঁক্‌তে বসে গেছে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার ভোঁতা পেন্সিলের আঁচড়ে ভেসে উঠছে এক ঘর আর তার চেয়েও উঁচু এক সৈনিক—ঘর থেকে মানুষ উঁচু হয় না। বিরজাবাবু বললেন, না বাবা।

যতীন বাধা দিয়ে বললে—সৈনিককে ছোট করে আঁকলে তার চোখ যে দেখা যাবে না !—আস্তে আস্তে সে আবার চেয়ারের হাতলে এসে বসল। তার শ্বাসের গরম বাতাস বিরজাবাবুর গায়ে লেগে এক বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি করলো তার মনে।

একে মেরে কি হবে ?—তিনি ভাবতে লাগলেন, আগে মানুষ চিন্তা করতো কম, কোন সমস্যা উপস্থিত হলে বীরের মত সমাধান করতো।···অধুনা আমরা বেশী ভাবতে শিখেছি, কথায় কথায় আমাদের যুক্তির দোহাই···যে যত বেশী শিক্ষিত সে তত বেশী চিন্তাশীল। যত সে দার্শনিক চিন্তায় মগ্ন, ততই তার ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা কমে আস্‌ছে, কোন কাজে নামতে সে অত্যন্ত ভয় পায়···। দেওয়ালের ঘড়িতে সাতটা বেজে উঠে।

তোমার খাবার সময় হলো···যাও। বিরজাবাবু বল্‌লেন।

না বাবা ; যতীন জেদ ধরলে—পরে খাবো, তুমি আগে একটা গল্প বলো।

বল্‌তে পারি, যদি গল্প শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীটির মত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।

যতীন তার বাবার কাছে গল্প শুনতে ভালবাসে। রোজ বিকালেই বিরজাবাবু যখন অফিস থেকে ফিরে আসেন, একটা না একটা গল্প না শুনে সে রেহাই দেবে না। আর তিনিও রোজই আরম্ভ করেন—অনেক অনেক ছিল আগে এক যে ছিল রাজা—খুব মস্ত বড় রাজা, আর—তারপর অবশ্য বলতে বলতে ঠিক করে নেন, গল্পের মাঝখানটা আর শেষটা কি হবে। শোনো—তিনি আরম্ভ করলেন—অনেক দিন আগে, এক যে ছিল রাজা, মস্ত বড় রাজা। তিনি খুব বুড়ো হয়ে গিছলেন ; তাঁর দাড়ি হয়ে গিছল শাদা, আর গোঁফ ঠিক আমার মত। তাঁর কাচের ঘরটীতে রোদ পড়ে একটা বড় ল্যাম্পের মত চক্‌ চক্‌ করতো। রাজবাড়ীর চারিদিকে ছিল প্রকাণ্ড বাগান। সেখানে কমলা, আতা, গোলাপ, হেনা, আঙ্গুর, পদ্ম,··· নানা রকমের পাখী · সব কিছু ছিল। হ্যাঁ, পাখীরা গান গাইতো। গাছে গাছে ঘণ্টা ঝুলানো ছিল, যখন বাতাস বইতো তখন ঘণ্টাগুলো একসাথে বেজে উঠতো।

তার পর একটু থেমে বলতে লাগলেন—বুড়ো রাজার ছিল একমাত্র ছেলে—সাতটী নয় একটী, মাত্র একটী। সে খুব লক্ষ্মী ছেলে ছিল, শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর খেয়ে শুয়ে পড়তো, বাবার টেবিলে হাত দিত না। মানে সব দিক দিয়েই সে আদর্শ ছেলে ছিল, কিন্তু তার একটী দোষ ছিল—সে সিগ্রেট খেতো।

যতীন অপলক নেত্রে বাবার মুখের দিকে চেয়ে শুনছিল। বিরজাবাবু বল্‌তে লাগলেন—সিগ্রেট খাওয়ার

দরুণ ওর বুকের অসুখ হলো, আর সে মারা গেল···মাত্র বিশ বৎসর বয়সে সে মারা গেল।

তার রুগ্‌ন দুর্ব্বল বুড়ো বাপকে দেখবার কেউ ছিল না। রাজ্য-শাসন করবারও কেউ ছিল না।···বুড়ো রাজার শত্রুরা এসে তাকে মেরে ফেল্‌লে—আর রাজ্য কেড়ে নিলে। তার সাধের বাগানটী নষ্ট হয়ে গেল।"

বিরজাবাবুর মনে হল, গল্পের শেষটা কেমন যেন হাস্যকর হয়ে গেলো। কিন্তু গল্পটী যতীনের মনে খুব নাড়া দিল। আবার তার চখে ভেসে উঠ্‌লো দুঃখ আর ভয়ের চিহ্ন। বিমর্ষমুখে অন্ধকার বাগানের দিকে তাকিয়ে সে বললে, আমি আর সিগ্রেট খাবো না।

বেদনার ইতিহাস

আজিজুর রহমান

বালুচর একা কাঁদে ;
সেই বেদনায় "গোরাই"এর স্রোত বয়ে যায় কলনাদে'
দখ্‌নে বাতাসে বেজে বেজে ওঠে কাশের বীণার তার
বিরহী বাউল-চর কাঁদে—নদী ফিরিবে কি হেথা আর।
আমি বালুচর সে যে মরীচিকা দূরে থেকে বয়ে যায়
কত ব্যথা আছে আমার বুকেতে কভু নাহি ফিরে চায়,
তখনিই বুঝিবে কার লাগি কাঁদে তিয়াসী বালুর চর
কার লাগি হ'ল এ দশা আমার দুনিয়া করিনু পর।

ওপারের ওই শ্যাম তট রেখা আজো ডাকে ইসারায়
তবু আমি আছি বালুচর হ'য়ে দহিতেছি বেদনায়
পিয়াসায় মোর বুক ফেটে যায় তুমি যাও দূরে বয়ে
বেদনার মালা আমাকে পরিয়ে তাই আছি ওগো সয়ে।

কহিব গো সেই কথা!
নদী ও চরের মিলন কাহিনী সেই সুগভীর ব্যথা।
সেই কথা আমি লিখিয়া রাখিব নীল আকাশের গায়
সেই গান আমি নিতুই বাজাব কাশের "একতারা"য়।
হয়ত সে গান শুনিয়া কখনও দরদী মরমী জন
ক্ষণিকের তরে করিতে নারিবে অশ্রু-সম্বরণ।
কোনদিন কারু এই চরে প'লে তপ্ত আঁখির জল
সেইদিন হবে আমার বুকেতে আষাঢ়ের ঘন-ঢল।

* * * * *

শোন আজ কহি কতখানি ব্যথা
বালুচরে চাপা রয়।
কাশের বনের অস্ফুট ধ্বনি চুপে চুপে যাহা কয় ;
ভরা ভাদরের জলভার নিয়ে বয়ে যেত এই নদী
সামনে আমার চল-চঞ্চলা কুলুকুলু নিরবধি।
ঊর্ম্মি নূপুর পরিয়া "গোরাই" করিত গো আনাগোনা,
ঢেউয়ের দোলা মোর বুকে লেগে হ'য়ে গেল জানাশোনা।

আসিল সেদিন "শাওন নিশিতে"
মেঘ ও বাদল নামি,
অভিসারে তার গোপন চরণ মোর বুকে গেল থামি।
সাধ হ'ল মোর বরষার জলে একঘেয়ে সুর ছাড়ি—
নৃত্য-চপলা "গোরাই"এর বুকে ভিড়াই সুরের পাড়ি।
ডাঙ্গা হ'তে আমি পড়িনু ঝাঁপিয়ে তাহার গহীন্‌ জলে।
"কূল ভাঙ্গা গাঙে" হারালাম কূল অথই জলের তলে।
"গোরাই"এর রূপে মজিয়া সেদিন ভাঙিয়া আমার কূল
বালুচর হ'য়ে এখন বুঝিছি করেছিনু কত ভুল।

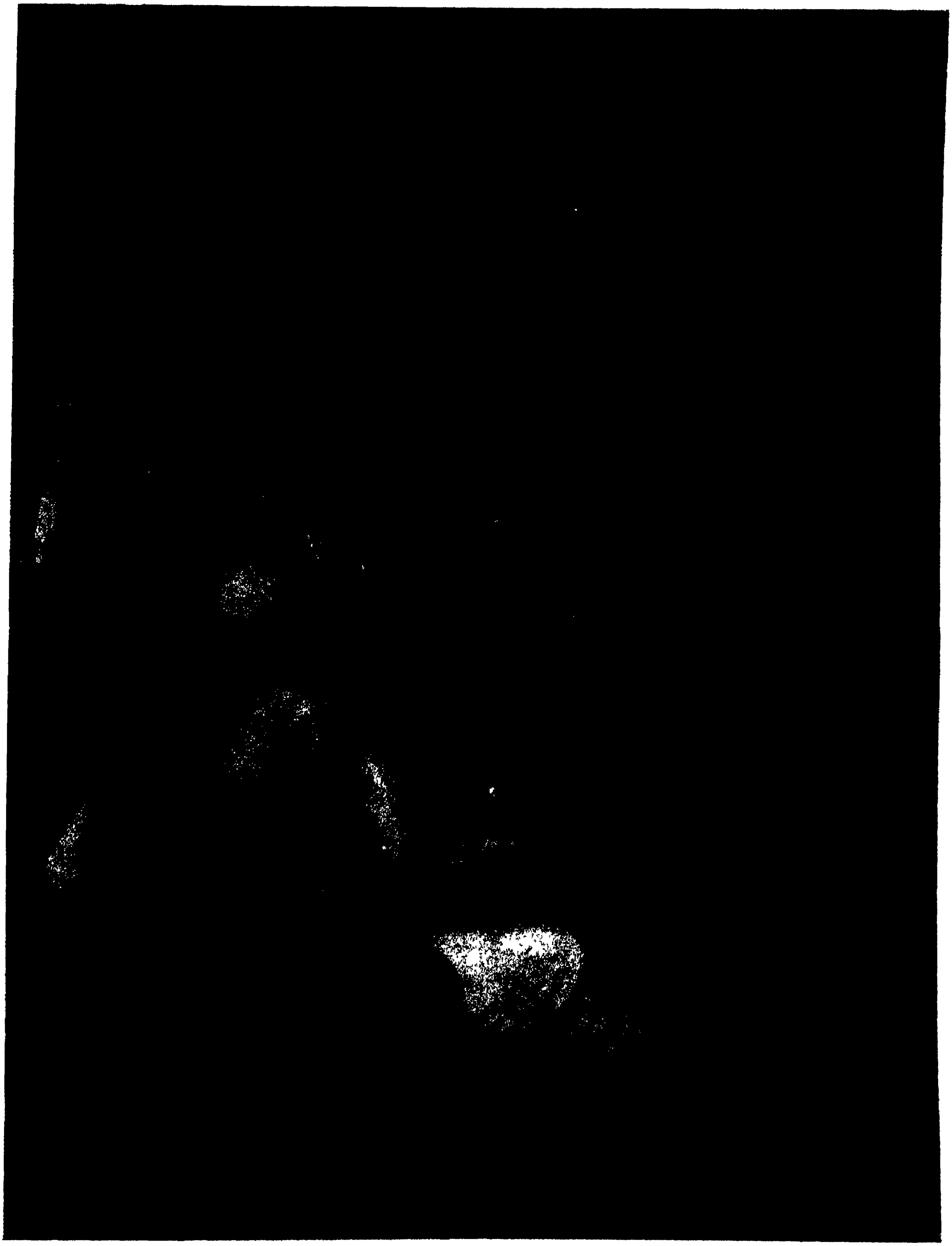
কতকাল তারপর
কেটে যেয়ে আজ হইয়াছে শুধু "গোরাই নদী"র চর।
আমি ছিনু ওগো শ্যামলতা মাখা কত ফলেফুলে ভরা
ধুধু বালুচর হইয়াছি আজ বেদনার বালু ঝরা।
গাড়ীর নিচেতে আজো বয়ে যায় কুটীলার মত বেঁকে,
যত নিঠুরতা অভাগী চরের বুকের উপরে এঁকে।
সাথী শুধু মোর বাব্‌লার গাছ আর দু'টী চখাচখী
উহাদেরি সাথে বেদনার ক্ষত হয়নি ত দেখাদেখি,
কাশ ঝাড়গুলি আমার বুকের পাঁজরার মত রাজে
হাওয়া লেগে তাতে ব্যথার সেতার পূবালী বাতাসে বাজে।

মর্ম্মরধ্বনি সেই রাগিণীই অসীমের পানে ধায়
কভু বা "বাউরী" জমাট বেদনা বাহির হইয়া যায়,
এই হ'ল মোর হৃদয়ের কথা "বেদনার ইতিহাস"
তারি সাথে মোর গত জীবনের মিলনের ক্ষীণাভাস।
শুধু এক ফোঁটা আঁখি জল লাগি
রহিয়াছি তারি আশে।
নদীজল নয়, আঁখিজল চাই, নদীতে রয়েছে পাশে
যতদূর চোখ যায়
বালুচর ধুধু পড়িয়া রয়েছি "গোরাই"এর মোহানায়।

মহাবনে—মহাবাণী

শ্রীনিরুপমা দেবী

বৃষভানুপুর পর্ব্বতের উপরিস্থ শ্রীজীর মন্দির বহুদূর হইতে দর্শন করিতে করিতে ক্রমে নিকটস্থ হইয়া সেই বহুস্তম্ভশোভী 'পুর' প্রাচীর বেষ্টনী, অলিন্দ, গৃহ ইত্যাদি দেখিতে দেখিতে প্রায় সন্ধ্যাকালে আমরা বর্ষাণা গ্রামে পৌঁছিয়া একেবারে পর্ব্বতের পাদদেশে 'অষ্টসখীর মন্দিরে' আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এ স্থানেরও গৃহ আমাদের পূর্ব্ব-কথিত আত্মীয় দ্বারা একদিন অধিকৃত ছিল। মন্দিরের পুরোহিত অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিতভাবে আমাদের দেখাইলেন "ঐ যে বড় বড় 'ঝরোখা' দেওয়া বড় ঘরটি ঐটি পণ্ডিত ভট্ট-বাবুজীরই তৈয়ারী, স্নান করিবার প্রাচীর ঘেরা জায়গাটিও 'পণ্ডিতাইন্' মাইজীর জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল; কিন্তু আপনাদের পূর্ব্বেই 'শেঠ্'জী আসিয়া ঐ ঘরে আশ্রয় লইয়াছেন; আপনাদের ঐ ঘর দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য ছিল" ইত্যাদি। আমাদের পরম উপকারী শেঠের দলই তাঁহারা, যাঁহারা কোশী হইতে নন্দ গ্রামের ট্রেণ সেদিন চালাইয়াছিলেন; অতএব আমরা পুরোহিতের কুণ্ঠা ভঞ্জন করিতে করিতে তাঁহার অগত্যানির্দ্দিষ্ট একটি সিন্দুকের ন্যায় কুঠুরীর মধ্যে নিজেদের তল্পী ফেলিয়া পাহাড়ে উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। দেবীদিদির কথামত স্কন্ধে খান দুই মোটা চাদর লইতে হইল—কেননা এ যাত্রা সমস্ত রাত্রের মতই। শ্রীজীর মন্দিরে ও তাঁহার জন্মের অভিষেক শ্রীকৃষ্ণের মত দ্বিপ্রহর রাত্রেই হইয়া থাকে; প্রভেদের মধ্যে সেটি ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমীর মধ্যরাত্রি—আর এটি শুক্লাষ্টমীর মধ্য-রাত্রি। (আমাদের দেশে দিবা দ্বিপ্রহরে প্রস্ফুটিত পদ্মের মধ্যে এই কুমারীকে বৃষভানু রাজা প্রাপ্ত হন্ এইরূপ সিদ্ধান্ত শোনা যায়, কিন্তু ব্রজবাসীরা জানে তাহাদের ভানুরাজমহিষী কীর্ত্তিদানন্দিনী এই লাড়্কী তাহাদের ঘরেরই মেয়ে। যেমন নন্দ মহারাজের নন্দন তাহাদের নন্দলালা যশোমতীরই গর্ভ-জাত আপনাদের বস্তু!) সন্ধ্যারতির পরে পর্ব্বতস্থ পুর-দ্বার বন্ধ হইয়া যায়, অন্য রাত্রে খুলিবে কি না জানা নাই, তাছাড়া সে সিঁড়ি নন্দপুরের মত নহে, মাতাকে লইয়া ততরাত্রে কিছুতেই উঠা নামা চলিবে না; অতএব যদি অভিষেক দেখিতে হয় এখনি যাত্রা করিতে হইবে এবং সমস্ত রাত্রি পুরীর মধ্যে কোথাও পড়িয়া থাকিতে হইবে। 'তথাস্তু' বলিয়া আমরা অষ্টসখীর মন্দিরের একেবারে গাত্রসংলগ্ন পর্ব্বতের সোপানে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। সোপানশ্রেণী পুরাতন, পাথরের ফাটলে ফাটলে লতাগুল্ম প্রভৃতি আগাছা আশে পাশে বেশ বর্দ্ধিতকলেবর হইয়াছে। সিঁড়ি খুব লম্বা অর্থাৎ একসঙ্গে দশ বারোজন লোক স্বচ্ছন্দে নামিতে উঠিতে পারে—চওড়া খুব বেশী নয় কিন্তু মাঝে মাঝেই চাতালের মত প্রশস্ত স্থানে যাত্রীরা দাঁড়াইয়া বসিয়া বিশ্রাম করিয়া লইতে পারে। খানিকটা উঠিয়াই একটা তোরণের মত গৃহ—এখন তাহা ভাঙিয়া আসিতেছে। গৃহের মধ্যে দুই দিকে যাত্রীদের বিশ্রামের মত প্রসর স্থান! কিন্তু ইহার পরে যে সিঁড়ি আরম্ভ হইল তাহা সাংঘাতিক! একেবারে সোজা এবং সে সোজাপথ বেশ টানা! এতক্ষণ পথটি পাহাড়ের গায়ে গড়াইয়া গড়াইয়া ঘুরিয়া এইবারে সোজা শৃঙ্গে আরোহণ করিতেছে, কাজেই চাতালের প্রশস্ততার বা সোপানের প্রশস্ততার আর অবকাশ নাই। কয়েক সিঁড়ি উঠিয়াই রীতিমত হাঁপ্ ধরে। মাতাকে লইয়া ধীরে ধীরে উঠিতে উঠিতে সন্ধ্যা ত উত্তীর্ণ হইয়াই গেল ও অষ্টমীর চন্দ্রকরে পার্ব্বত্যপথ—তাহার দুই পার্শ্বে পর্ব্বত-গাত্রস্থ জঙ্গলগুলিও বেশ আলোকিত হইয়া উঠিল। সেই সময়ে সঙ্গে আমাদের আমরা তিনজন ছাড়া অন্য কোন লোক ছিল না, চারিদিক নিস্তব্ধ। পর্ব্বতকোলে লুক্কায়িত ক্ষুদ্র পল্লী ও লোক—গ্রামের কোন চিহ্ন মাত্রও সেস্থল স্পর্শ করিতেছে না, পশ্চাতে নিম্নে অর্দ্ধচন্দ্র-কিরণোদ্ভাসিত উপত্যকা-ভূমির মত প্রান্তর ভাগ; স্থানে স্থানে শ্যাম বনানীর কুঞ্জ, উচ্চ পর্ব্বতের আশে পাশে উপ-পর্ব্বতের শ্রেণী, তাহাদের বৃক্ষগুল্ম মণ্ডিত শ্যাম গাত্র সব যেন সেই অনতিস্ফুট চন্দ্রকিরণে এক অতিন্দ্রিয় রাজ্যের মত বোধ হইতেছিল। সে সব যেন চোখে দেখিবার নয়, চোখ্ বুজিয়া কেবল



[illegible]

শিল্পী— শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

অনুভব করিতে হয় মাত্র। এমন সময়ে পর্ব্বতের উপর হইতে আবার একটি সুর, তাহার ভাষা ও ভাবটি যেন স্তোত্রের মতই স্পষ্ট কাণে আসিতে লাগিল—

ঔর কামনা মো হিঁ ন কোঈ।
মন বচ ক্রম করি রহৌঁ নিরন্তর
তুয় পদ পঙ্কজ মধুকর হোঈ।
অছ বলি জাউঁ বিহারিণী মেরী জীবনে
নিজ জিয় জানউঁ জোঈ।
শ্রীহরিপ্রিয়া সহজ সবহিকে অন্তর্গতিকি
সমুঝতি সোঈ॥

'দেবীদিদি' বলিয়া উঠিলেন "এও মহাবাণীর একটি পদ বোধ হয়। শুনেছি তার মধ্যে 'সহজ সুখ' 'সিদ্ধান্ত সুখ' এই রকম সব ভাগ করা আছে। এটি বোধহয় 'সহজ সুখের' পদ।"

মন তখন এ সব সিদ্ধান্ত শুনিতে প্রস্তুত হইতেছিল না, সে কেবল সহজে যাহা পাইতেছিল তাহাই শুনিতে চাহিতেছিল। শুনিতে চাহিতেছিল—যিনি "সহজ সবহিকে অন্তর্গতিকি সমুঝতি" তাঁরই পদপঙ্কজের মধুকরের সেই গুণগান।

প্রথম দেউড়ি পার হইয়া একটী বৃহৎ চত্তর—যাহার তিনদিক আলিশা দিয়া বাঁধাইয়া একটি প্রকাণ্ড ছাতের আকার দেওয়া হইয়াছে—সেই অঙ্গনোপম প্রশস্ত স্থানের প্রথমেই একটি ক্ষুদ্র মন্দির ও চারিদিক উন্মুক্ত ছতরি! এইখানে অষ্টমীর বৈকালে শ্রীজী বার দিয়া বসেন। সকলে তাঁহাকে এই উন্মুক্ত স্থানে দর্শন করে। আমরা সেই স্থানে প্রণত হইয়া আবার কয়েকটি সিঁড়ি অতিক্রম করিলাম এবং পুরী মধ্যে প্রবেশ করিতেই শ্রীজীর আরতির ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। এখন দর্শন হইয়া মন্দির বন্ধ হইয়া যাইবে এবং দ্বিপ্রহরে জন্মের পর অভিষেকের সময় দ্বার খুলিবে। ছুটাছুটি করিয়া আমরা মন্দিরের সম্মুখস্থ অলিন্দে গিয়া দাঁড়াইলাম। মূর্ত্তি অষ্টধাতুময়ী ক্ষুদ্রাকারা! কিন্তু সেই জনবিরল স্থানে—সেই আড়ম্বরবর্জ্জিত শান্ত স্নিগ্ধ আরতিটি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। আমরা যাহাকে মূর্ত্তি বলি সেই প্রস্তর বা ধাতুময়ী বিগ্রহকে এদিকে "স্বরূপ" বলিয়া অভিহিত করে, আর মানুষে তাঁহাদের যে বেশ ধরে তাহারই নাম 'মূর্ত্তি'!

আমরা আরতির মধ্যেই এক সময়ে আমাদের নন্দগ্রামের দৃষ্ট সেই কাশ্মীরি পরিবারকে একদিকে যোড়হস্তে দণ্ডায়মান দেখিলাম, আরও দুই চারি জন মাত্র লোক। শেঠেরা সন্ধ্যারতি দেখিতে আসিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল না!

একটা স্তব্ধ গাম্ভীর্য্যের মধ্যে আরতিটি শেষ হইয়া গেলে সেই সঙ্গে কয়েকটি লোকের প্রণাম ততোধিক নিস্তব্ধ মর্ম্মস্পর্শীভাবে যখন চলিতেছিল তখন সহসা কোথা হইতে একটা গম্ভীর কণ্ঠে গভীর স্বরে উচ্চারিত হইল—

—"মেরে অলবেলি সরকার"! চকিত হইয়া আমরা চারিদিকে চাহিতে চাহিতে দেখিলাম একটি স্তম্ভের পার্শ্বে মন্দিরের ক্ষীণালোকে একটি দীর্ঘ ক্ষীণ দেহ, যেন বহুদিনের তপঃক্লিষ্ট উদাসীন মূর্ত্তি! মস্তকের কেশ রুক্ষ যেন ধূলি-ধূসরিত, মলিন বসনে সর্ব্বাঙ্গ আবরিত। স্থির নয়নে বিগ্রহ দর্শন করিতেছেন, হস্ত দুইটি যুগ্মভাবে বুকের উপর ধরা। অন্তরের গভীর স্তর হইতে একটি শব্দ মাত্র মুখে একবার উচ্চারিত হইল "আমার সর্ব্বময়ী অধীশ্বরী।"

আমাদের মিলিত দৃষ্টির মধ্যে সে মূর্ত্তি কোন্ এক সময়ে বারান্দার অন্ধকারে সারি সারি স্তম্ভের মধ্যে মিলাইয়া গেল। আরতির পর দরজাও বন্ধ হইয়া গেল। আমরা তখন রাত্রের মত আশ্রয় স্থান অন্বেষণে 'দেবীদিদির' নির্দ্দেশমত পথে সেই দীর্ঘ বারান্দা অতিক্রম করিয়া মন্দিরের পশ্চাতের দিকে চলিলাম। দর্শক কয়টি কে কোন্ দিকে গিয়াছেন উদাসীনকে লক্ষ্য করিতে করিতে আমরা তাহা আর দেখি নাই। দিদি একবার মৃদুস্বরে বলিলেন "ইনিই হয়ত সেই গায়ক!" আমরা নিঃশব্দেই তাঁহার কথাকে অনুমোদন করিলাম। সমস্ত পুরী নিস্তব্ধ, যেন জনসম্পর্কহীন। মন্দিরের পশ্চাতেও বৃহৎ অঙ্গন—তাহার একদিকে উচ্চ প্রাচীরের গাত্রে প্রাসাদশিখরে উঠিবার আরোহিণী শ্রেণী; পথটি কিন্তু সঙ্কীর্ণ ও অনতি-প্রসর! অষ্টমীর চন্দ্রকিরণে সাবধানে আমরা সেই পথে উপরে উঠিয়া এক বিশাল দৃশ্যের মধ্যে উপস্থিত হইলাম। অনতিস্ফুট চন্দ্রকিরণে সে দৃশ্যের বিশালতা যেন বাড়াইয়াই দিতেছিল। নিম্নে নিস্তব্ধ অর্দ্ধস্ফুট বিশাল প্রান্তর, অর্দ্ধপ্রকাশিত ধূসর বনরাজি, অনতিউচ্চ পর্ব্বতমালা—সব যেন স্থির ধীর প্রতীক্ষমান! চন্দ্র ধীরে পশ্চিম গগনাভি-মুখে পিছাইতেছেন। পুরীর ছাতগুলিও রাত্রির রহস্যময়

আবরণে যেন বিশালত্বেই প্রকাশিত হইতেছিল। ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলাম একদিকের আকাশে নিম্নের আলোকচ্ছটা অস্পষ্ট—গুঞ্জন এবং উত্তপ্ত ঘৃতের গন্ধ উপরে ভাসিয়া আসিতেছে। বুঝা গেল এইদিকে শ্রীজীর ভোগাদি প্রস্তুত হইতেছে। আরও দেখিলাম ছাতের একদিকে সেই কাশ্মীরী পরিবারটিও আস্তানা লইয়াছেন। তাঁহারা কম্বল চাপা দিয়া বিশ্রাম করিতেছেন দেখিয়া আমরা নীরবেই অন্য দিকে সরিয়া গেলাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হইতে লাগিল। চন্দ্র যখন পশ্চিম গগনপ্রান্তে অস্তোন্মুখ তখন আবার দামামা বাজিয়া উঠিল। মাতাকে লইয়া ধীরে ধীরে নীচে আসিয়া মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখি মহাস্নান আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বাদ্যশব্দ এতক্ষণের জমাট নিস্তব্ধতাকে যেন খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়া দীপশিখার সঙ্গে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে। স্নানের পর দরজা বন্ধ হইয়া গেল, শোনা গেল শীঘ্রই খুলিয়া আরতি হইবে। অল্পসংখ্যক দর্শনার্থী সকলেই বারান্দায় বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। শীঘ্রটি আধ ঘণ্টা খানেক তো বটেই! শ্রীজীকে সুবেশে সজ্জিতা করিয়া তখন পূজা আরতি ভোগ ইত্যাদি আরম্ভ হইল। প্রথম দর্শনের সে গায়ক বা উদাসীন ভক্তের আর কোন পাত্তা মিলিল না। ভক্তবিহীন পূজা যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

বাকি রাত্রিটুকু সেই বারান্দাতেই কাটাইয়া উষার আলোকে আমরা প্রাতঃকৃত্যের জন্য নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিলাম। শেষ রাত্রি হইতেই পর্ব্বতনিম্নে লুক্কায়িত গ্রাম হইতে এক গম্ভীর শব্দ আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। যেন মনে হইতেছিল দূরে বড় রেল যাইতেছে। দেবীদিদি বলিলেন "দশ ক্রোশের মধ্যে তো রেল পথ নাই; কি জানি এ কিসের শব্দ।" পরে বুঝা গেল গ্রামবাসিনীদের গম ভাঙ্গার ঐক্য শব্দই রজনীর শেষ যাম হইতে ঐরূপে বিঘোষিত হইতেছিল। ক্ষুব্ধ মনে ভাবিতেছিলাম, উদ্ধব মহারাজের ব্রজদর্শনের কথা, তিনিও শব্দ শুনিয়াছিলেন তাহা—"গোদোহ শব্দাভিরবং বেণুনাং নিঃস্বনেন চ।

গায়ন্তীভিশ্চ কর্ম্মানি শুভানি বলকৃষ্ণয়োঃ

স্বলঙ্কৃতাভি র্গোপীভি র্গোপৈশ্চ সুবিরাজিতম্॥

শ্রীকৃষ্ণের অল্পদিন পরিত্যক্ত ব্রজের সেই পূর্ব্বসম্পদপূর্ণ মনোহারী বর্ণনা। আর আজ ব্রজের বনগ্রাম কি দারিদ্র্য-পূর্ণ, কি জনশূন্য, গোপীভি র্গোপৈ সম্পদ শ্রীশূন্য। *

আরক্ত পূর্ব্বাকাশে অরুণোদয় দেখিতে দেখিতে আমরা ক্রমে নিম্নে পৌছিয়া গ্রাম প্রাপ্ত হইলাম এবং বাসায় 'মালা-ঝোলা' ফেলিয়া স্নানের সাজে "ভানু ঘোর" অভিমুখে চলিলাম; কেন না শীঘ্রই আবার পর্ব্বতোপরে গিয়া শ্রীজীর জন্মোৎসব দেখিতে হইবে। মাঠে মাঠে চাষ করা ভূমির পার্শ্বে বেশ খানিক দূর গিয়া আমরা 'বৃষভানু কুণ্ড' বা 'ভানু খোরে' উপস্থিত হইলাম। দর্শনীয় বস্তু বটে। চারিদিক একেবারে কুণ্ডের আকারেই বাঁধানো—যেন একটি হ্রদ! গ্রামের দিকে যে ঘাটটি তাহার পার্শ্বে হাওয়াখানা, খিলানের স্তম্ভের ভিতরে হ্রদের জল প্রবেশ করিয়াছে। কুণ্ডের উপরে এই ক্ষুদ্র প্রাসাদটি এবং তাহার চারিদিকের সংস্থানে মনে হয়—এই কুণ্ডে বাস করিবার জন্যই তদানীন্তন কীর্ত্তিমান কোন ব্যক্তি ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। শীঘ্র শীঘ্র স্নান তর্পণাদি সারিয়া আমরা আড্ডায় ফিরিলাম এবং পুনর্ব্বার পর্ব্বতারোহণে প্রবৃত্ত হইলাম। এবারে কিন্তু গ্রামের শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে। দলে দলে নবনারী বিচিত্র বেশ-ভূষায় ভূষিত হইয়া গ্রামে প্রবেশ করিতেছে এবং পর্ব্বতে আরোহণ করিতেছে। পুরুষদের মস্তকে পীতবর্ণের পাগ্ড়ি, কর্ণে কড়ি, হাতে প্রকাণ্ড লাঠি, শুভ্র বস্ত্র উত্তরীয়, মুখে অপরিমিত হাসি—হাসিতে হাসিতে তাহারা চলিতেছে এবং আশে পাশে বিচিত্র ঘাগরি ওড়নাধারিণী যে ব্রজ-সুন্দরীবর্গ নবীন সূর্য্যকিরণে জরীদার ওড়না চম্‌কাইয়া সর্ব্বাঙ্গের এবং পদালঙ্কারের ঝঙ্কার তুলিয়া পাহাড়ে উঠিতেছিল, তাঁহাদের প্রতি পরিহাসের কটাক্ষ, ঈঙ্গিত এবং কেহ কেহ সুস্পষ্ট বিদ্রূপাত্মক বচন-বিন্যাস করিতে করিতেও চলিয়াছেন। শুনিলাম এই পুরুষরা বেশীর ভাগই নন্দগ্রামী! আজ তাঁহাদের একেবারে "পোয়া বারো"! একেবারে বরযাত্রীর বেশে সাজিয়া তাঁহারা অদ্য এ-গ্রামে পদার্পণ করিতেছেন, আজ এ-গ্রামে তাঁহাদের প্রতিপত্তির ও আদরের অন্ত নাই। আজ

* দীর্ঘ চতুর্দ্দশ পরে গিয়া এই সব গ্রামকে অনেকটা শ্রীমণ্ডিত দেখিলাম। সেই অষ্টসখীর মন্দির এখন চিনিবার উপায় নাই। গ্রামে দুইটি বড় বড় ধরমশালা হইয়াছে। দোকান-পসার, ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ, বাস প্রত্যহ যাওয়া আসা করিতেছে। তীর্থও শ্রীসম্পন্ন হইতেছেন।

তাঁহারা যাহাকে যাহা বলিবেন বর্ষাণার নরনারীবৃন্দ হাসি-মুখে তাহা সহ্য করিবে। উৎসবান্তে নন্দগ্রামীরা আজ বর্ষাণার ঘরে ঘরে লাড্ড মিঠাই পুরী ইত্যাদি ভোজন ও আব্দার করিয়া বেড়াইবেন। আজ বর্ষাণা যেন বিবাহ দিনে কন্যার গৃহ, আর নন্দগ্রামীরা বরপক্ষীয় সমাদৃত ব্যক্তি! তাহাদের 'লালা ও লালি' তাহাদের জীবনে এমনি চিরসত্য—চির নিত্য সম্বন্ধবিশিষ্ট যে যুগাতীত যুগের লীলাও তাহাদের কাছে বর্ত্তমানভুক্ত হইয়াই আছে। কালের প্রচণ্ড পেষণে আর সবই গিয়াছে, যায় নাই কেবল তাহাদের অন্তর—তাহাদের সম্বন্ধজ্ঞান। তাই আজ বর্ষাণার নরনারীও তাহার 'লালি'র জন্মদিনে সাজিয়া গুজিয়া বিবাহ-বাড়ীর এয়োদের মত নন্দগ্রামীদের অভ্যর্থনায় প্রস্তুত।

পর্ব্বতের উপরে তখন লোক যেন আর ধরিতেছে না। সর্ব্বত্র বিচিত্রবর্ণের সমাবেশে জনতা সূর্য্য-করে ঝল্‌মল্ এবং আনন্দচঞ্চল। মন্দিরের অঙ্গন লোকে লোকারণ্য, প্রশস্ত বারান্দার মধ্যে অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য। দ্বারের দুই পার্শ্বে সারি গাঁথিয়া শ্রেণী-বিভাগ করিয়া বর্ষাণাবাসী ও নন্দগ্রামীরা বসিয়াছে। দ্বারের দুই পার্শ্বের প্রথম সারিতে যত বর্ষীয়ান ব্যক্তি, ঠিক্ যেন পুরোহিতের মত—গাত্র ও মস্তক অনাবৃত; সম্মুখে তাহাদের বড় বড় পুঁথি কাষ্ঠাধারের উপর রক্ষিত, হস্তে এক এক গোছা সবুজ তৃণগুচ্ছ (ইহা আমাদের দূর্ব্বারই অনুকল্প বোধ হইল!)। তাঁহারা সেই পুঁথি হইতে এক এক লাইন্ স্তোত্র পাঠের ভাবে আবৃত্তি করিতেছেন আর তাঁহাদের পিছনে সারি দিয়া ক্রমপর্য্যায়ে যে পীতবর্ণ পাগ্‌ড়ি ও উত্তরীয় যুক্ত আনন্দোজ্জ্বলমুখ যুবক দল বসিয়াছে তাহারা সমবেত স্বরে জয় গাহিয়া উঠিতেছে "জয় জয় বৃষভানু রাজ কুঙার"। দুই ধারে দুই গ্রামের দল। একবার "বৃষভানুপুরের" অধিবাসীরা তাহাদের "বৃষভানু রাজ দুলারী"র জয় গাহিয়া আসিতেছে অমনি সেই পর্ব্বত যেন প্রতিধ্বনিত করিয়া নন্দগ্রামীরা বলিয়া উঠিতেছে "জয় জয় নন্দরাজ দুলার্"! মন্দিরের মধ্যের শ্রীমূর্ত্তিও যেন অন্তকার এই উৎসবে যোগ দিয়াছেন। মানুষের মনের ছাপ এমনি করিয়া চরাচরকেই যেন আনন্দময় করিয়া তুলে।

কতক্ষণ পরে বর্ষীয়ানদের মধ্যে যে হাঁড়িতে করিয়া হরিদ্রা মিশ্রিত দধি-জল রক্ষিত ছিল—তাঁহারা সেই দধি-জল তৃণগুচ্ছের দ্বারা প্রথমে মন্দিরের দিকে ছিটাইয়া দিলেন, পরে জনতার দুই ধারে বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন সকলের সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, দেখা গেল বারান্দার এক কোণে হাঁড়ি হাঁড়ি হলুদ দই মেশানো জল রাখা আছে, দুই গ্রামের লোক বিশেষতঃ বর্ষাণাগ্রামীরা নন্দগ্রামীদের ভালরূপ চুবাইতে চেষ্টা পাইতে লাগিল। বরযাত্রীদের "বরবেশ" কাহারো-কাহারো কয়েক মুহূর্ত্তেই শোচনীয় হাস্যজনকভাবে রূপান্তরিত হইল; কিন্তু তাহারা বেশীর ভাগই এ বিষয়ে সতর্ক ছিল। যাহারা নিতান্ত ধরা পড়িয়া গেল তাহারা ইহার প্রতিশোধ তুলিল বর্ষাণার নারীবৃন্দের উপর দিয়া—তাহাদের ঘাগ্‌রি ওড়নাও এই হরিদ্রাজলে সিক্ত হইল। কিন্তু আজ বর্ষাণাগ্রামীরা অনেকটা শান্ত সংযত, কেন না অদ্য যে মাত্র তাহাদেরই ঘরের উৎসব এবং নন্দগ্রামীরা সাদর নিমন্ত্রিত।

তারপর অঙ্গনে সেই বয়োবৃদ্ধদের উভয় হস্ত তুলিয়া জয়গানের সঙ্গে কি নৃত্য! মুহুর্মুহু মন্দির হইতে এবং চারিপার্শ্ব হইতে হরিদ্রা জল বর্ষিত হইতেছে, মন্দির হইতে দধি নবনীত মেওয়া ফল প্রভৃতি গায়ে আসিয়া পড়িতেছে আর তাঁহারা আনন্দে "ভানু দুলারের" জন্মদিনের জয়গান গাহিতেছেন। মনে পড়িল ভাগবতের নন্দোৎসবের বর্ণনার কথা।

হরিদ্রাচূর্ণ তৈলাদ্ভিঃ সিঞ্চন্তোঽজনমুজ্জগুঃ।
গোপাঃ পরস্পরং হৃষ্টা দধিক্ষীর ঘৃতাম্বুভিঃ।
আসিঞ্চন্তো বিলিম্পন্তো নবনীতৈশ্চ চিক্ষিপুঃ॥

সেই রকমই ব্যাপার। আমরা আর শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। পূর্ব্বদিনের উপবাস ও রাত্রি জাগরণ গিয়াছে, নিত্যকৃত্যের ও আহারাদির প্রয়োজন। নীচে নামিয়া যথাকৃত সমাপনান্তে রন্ধনাদির চেষ্টা হইতে লাগিল। মাতাঠাকুরাণী একবার বলিলেন "এ উৎসবে যে দান করতে হয় তোমাদের তাতো কৈ বাপু হলো না?" আমি বলিলাম "আর হলোনা প্রসাদ পাওয়া! দিদি আপনার বৃষভানু রাজনন্দিনীকে কিন্তু একটু দোষারোপ করতে হচ্ছে। তাঁর বাড়ীতে আজ নন্দগ্রামীর দল আহূত অনাহূত রবাহূত সবাই তো এসেছে, তিনি খোঁজ রাখবেন না কে কি পেলে না পেলে! এতে তাঁর যে বাপের বাড়ীর নিন্দা হবে তা তাঁর খেয়াল নেই?"

দিদিও যেন অপ্রস্তুতভাবে বলিলেন "তাই ত। কিন্তু আমরা যে তাড়াতাড়ি চলে এলাম। শেষ পর্য্যন্ত থাক্‌লে প্রসাদের ব্যবস্থা হ'তে পারতো হয় ত!" সে কথা মান্‌তে পারছি না—নিন্দা হবেই।"

একটি সাধারণ বাঙালী পরিচ্ছদের ব্যক্তি দেবী-দিদির নিকট আসিতেই দিদি "আপনি কোথা হ'তে বলিয়া" তাহাকে অভিনন্দিত করিলেন। তিনিও দিদিকে অভিনন্দন করিয়া 'এদিকে আসুন' বলিয়া ডাকিলেন। তাহার সঙ্গে একটু অন্তরালে কিছুক্ষণ কথা কহিয়া দিদি আসিয়া হাসিমুখে মাতাকে বলিলেন "মা এই নেন্—কি দান করবেন করুন! ইনি আমার জানিত ব্যক্তি, এখান হ'তে অনেকটা দূরে 'ছাতাই' বলে একটা স্থানে ইনি একটা আশ্রম করেছেন। সেখান হ'তে ইনি এখানে দর্শনে এসেছিলেন। এঁর আশ্রমে আজ ষোলজন সাধু অতিথি! তাঁদের সেবার জন্য কি দেবেন দেন্।" মাতার তো আনন্দের সীমা রহিল না।

এই বর্ষাণায় প্রথম যাত্রার যে কয়টি অসাধারণ লাভ অন্তরে চিরমুদ্রিত আছে তাহার দুই একটি ঘটনা কৃতজ্ঞতার আকারে প্রকাশিত না হইয়া থাকিতে পারিতেছে না। যে কয়টি ঘটনা মানুষকে অবলম্বন করিয়া সম্ভাব্যরূপে ঘটিয়াছিল তাহাই মাত্র বলিতে চাই।

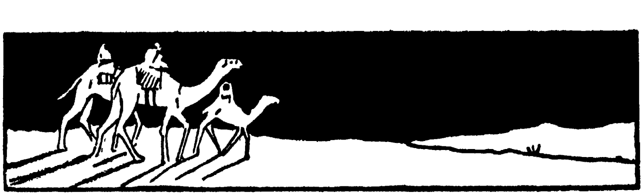
রন্ধনাদি প্রায় প্রস্তুত, এমন সময়ে কতকটা উদাসীন-বেশী একজন আসিয়া দেবীদিদিকে আহ্বান করিল "মহারাজ আপ্‌কো বোলাতেহে!"

"কৌন মহারাজ?" বলিয়া তিনি একটু বিমূঢ়ভাবে তাঁহার দিকে চাহিলেন; উদাসীন ব্যক্তি কি পরিচয় দিলেন আজ আর সে কথা আমার মনে নাই। দিদি আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন "হ্যাঁ এঁর সঙ্গে পাহাড়ের ওপর আমার দেখা হয়েছিল, ইনি একজন মহান্ত। বেশী কথা হ'তে পারেনি—চিনে আমি দূর হতে প্রণাম করায় তিনিও করেছিলেন। শুন্‌ছি নিকটেই তাঁর আস্তানা এবং এখনি তাঁরা চলে যাবেন! আপনারা বসুন একবার দেখা করে আস্‌ছি।"

তিনি চলিয়া গেলেন, আমরা তাঁহার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। মাতাঠাকুরাণী অষ্টসখীর মন্দিরের পূজারীজীকে দোকান হইতে লাড্ডু মিঠাই পুরী দধি আদি আনাইয়া ব্রাহ্মণ ও ব্রজবাসী একত্রে ভোজন করানোর ফললাভে ব্যাপৃত ছিলেন। ঘণ্টাখানেক পরে দিদি হাসিমুখে একটা খাবারের 'ছিদ্‌নির' মত পাত্র পত্রাবৃতভাবে হস্তে লইয়া প্রবেশ করিলেন। "এই নেন্—শ্রীজী কি বাপের বাড়ীর নিন্দা সহিতে পারেন? পাহাড় থেকে লোক দিয়ে আপনার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। খুলে দেখুন স্বয়ং শ্রীজীর প্রসাদ।" তখন মনের কি অবস্থা হইয়াছিল আজ আর চৌদ্দ বৎসর পরে সেকথা মনে করিয়া বলা অসম্ভব। বার বার মনে পড়িতেছিল পূর্ব্বদিনশ্রুত সাধককণ্ঠের সেই পদটি—

"শ্রীহরিপ্রিয়া সহজ সবহিকে অন্তর্গতিকি সমুঝতি সোঈ।"

দিদির পরিচিত সেই মহান্তপ্রবরই এ মহাপ্রসাদ লাভের হেতু। দিদি বলিলেন, মহান্তজী নিজ হ'তেই "প্রসাদ পাগ নাই" এই প্রশ্ন করে; তার পরে এমনিভাবে এক 'ছিদ্‌নি'-ভরা প্রসাদ তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন। ইহা খুবই সম্ভব, কেননা দিদিঠাকুরাণী ব্রজধামের নিতান্ত অপরিচিতা নন এবং তাঁহার সম্ভ্রমের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সেদিন কিন্তু মনে হইয়াছিল "তিনিই এ প্রসাদ পাঠাইয়াছেন—তিনিই নিজে পাঠাইয়াছেন—যাঁহার জন্মোৎসবে আমরা আসিয়াছি।" (ক্রমশঃ)



স্বদেশী ভাষার অনুশীলন

শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী

ধাত্রীস্তন্যে মোটাসোটা হইয়া উঠিলেও মমতা-মাখানো মাতৃস্তন্য ব্যতীত সন্তানের প্রকৃত পরিপুষ্টি-সাধন সম্ভব হয় না। সেইরূপ নানান্ দেশের নানান্ ভাষায় সুপণ্ডিত হইলেও মাতৃভাষা ব্যতীত শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। তাই কবি প্রকৃতই বলিয়াছেন—

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা
বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা ?

এই আশা বা স্পৃহা না থাকিলে মনুষ্যত্বের বিকাশ অসম্ভব। এই আশারই পরিতৃপ্তি-সাধনে মানুষ ক্রমাগত মহৎ হইতে মহত্তরের পথে ধাবিত হয়। মনন-শক্তি আছে বলিয়াই মানুষ মনুষ্যত্বের দাবী করিবার অধিকারী। চিন্তাজগতে বিচরণের ফলে সে যে রত্নখনির সন্ধান পায়, সে রত্ন-মণি শুধু জাতিগত বা ব্যক্তিগত সম্পদ নহে, উহা সমগ্র জাতির সমগ্র মানবের জন্য শাশ্বতকাল সঞ্চিত থাকে। ভাব-বিকাশের জন্যই ভাষা ; কিন্তু প্রত্যেক জাতিরই ভাব-প্রকাশের এক একটি বিভিন্ন ধারা আছে। নিজ নিজ ভাষার সাহায্যে সে সেই চিত্ত-ভাবটীকে অনুভবযোগ্য করিয়া তুলিতে পারে। এই জন্যই স্বদেশী ভাষা শিক্ষার এতখানি সার্থকতা। ভাব সর্ব্বদাই সঞ্চরণশীল, সুতরাং ভাষাও সেইরূপ সুগঠিত না হইলে ভাবের রাগ রাগিণী পরিস্ফুটভাবে সেই ভাষা ধরিয়া রাখিতে পারে না। স্বদেশী ভাষার উৎকর্ষ-সাধিত না হইলে সে ভাষায় সকল চিন্তার অভিব্যক্তি সম্ভব হয় না। স্বদেশী ভাষার চরমোৎকর্ষই সভ্যতা লাভের প্রধান সোপান। যে জাতির উন্নত ভাষা নাই সে সভ্যতার দাবী করিবে কিরূপে ? এই সভ্যতার এক একটি বিশেষ সুর আছে ; সে সুরের যে প্রকৃত স্পর্দ্ধা করিতে পারে, সেই সুর বা সভ্য অর্থাৎ দেবতা ; আর যাহার সে সুর নাই বা যে বেসুর সেই অসুর বা অসভ্য। আর্য্যেরা সুর বা সভ্য ছিলেন ; এই আর্য্যদের সুর-ভাষা বা দেব-ভাষা যুগ যুগান্তরের বহু সংস্কারের পর সংস্কৃত ভাষা হইয়াছেন। সেই সংস্কৃত ভাষায় সংযত বর্ণ-বিন্যাসে মধুর শব্দপ্রাচুর্য্যে যে উচ্চ মননশীল চিন্তারাজি প্রস্তরাঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে, অন্য ভাষা তাহার প্রান্ত স্পর্শ পর্য্যন্ত ক[illegible]ত পারে নাই। জাতি হিসাবে ভারতীয় আর্য্যজাতির মরণের সঙ্গে সঙ্গে সে ভাষাও আজ মৃত, বাংলা ভাষা তাহারই দুহিতা ; আমরা বাঙ্গালী, বাংলা ভাষাই আমাদের জননী ! আমরা মাতামহীর গৌরব করি, কিন্তু মাতার মুখে যে বুলি শুনি তাহাই আবৃত্তি করিয়া তৃপ্তি পাই, তাহারই সাহায্যে সভ্য পদবীতে উন্নীত হই। এই ভাষার সম্পদ লইয়া যদি বিশ্ব-মানবের জ্ঞানের ভাণ্ডারে প্রবেশ করিতে পারি তবেই আমাদের আশা পূরিবে—তৃষ্ণা মিটিবে।

—শুধু ভাষাতত্ত্বের কথা বলিতেছি না ; সাহিত্য ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান—সকল শাস্ত্রের সম্পুষ্টি দ্বারাই মাতৃভাষার প্রসার হয়, জ্ঞান রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি পায়। মানবিক জ্ঞান বিশ্লেষণ করিলে আমরা তাহার তিনটী প্রকৃতি দেখিতে পাই— স্মৃতি, বিচার ও কল্পনা। আমরা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বা চিন্তা দ্বারা যে ভাবরাজির অনুভব বা সৃষ্টি করি, স্মৃতি সুবিন্যস্তভাবে তাহা ধারণা করিয়া রাখে, বিচার বুদ্ধি তর্ক বলে তাহার তুলনা ও বিশেষত্ব বিজ্ঞাপিত করে। এই জন্য বিদ্যার তিনটী স্তর— ইতিহাস বিজ্ঞান ও সাহিত্য। ইতিহাস প্রাকৃতিক জগৎ বা মানবিক রাজ্যের তথ্য সংগ্রহ করিয়া শিক্ষা বিধান করে ; বিজ্ঞানশাস্ত্র বিচার-বুদ্ধির উপর যতটা নির্ভর করে সেইভাবে দর্শন গণিত ও নীতিশাস্ত্র প্রভৃতির পুষ্টিবিধান করে ; আর সাহিত্য রসময়, ভাষার সাহায্যে কল্পনা-রাজ্যের সৌন্দর্য্যবিকাশ বা বাস্তব রাজ্যের বিধিনির্দ্দেশ ও মীমাংসা সাধন করে। যে-কোনো দেশে যে-কোনো ভাবে জ্ঞানানুশীলনের উদ্যোগ করা যাউক না কেন, এই তিনটী পথে অগ্রসর হইতে হয়। সুতরাং মাতৃভাষা বা জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিতে হইলে আমাদিগকেও সকল সভ্য জাতির মত ত্রিপথগামী হইতে হইবে।

—বাংলাদেশে সেন রাজত্বের পর কেবলমাত্র বঙ্গের সুলতান হুসেন শাহের আমলে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব যুগে সংস্কৃত-সাহিত্য বা শাস্ত্রের চর্চ্চা ও বাঙ্গালী ভক্তের কবিত্বের অজস্রধারা বঙ্গভূমিকে পবিত্র ও প্রসিদ্ধ করিয়াছে। পাঠান-রাজত্বের শেষভাগে বা মোগল শাসনের সমগ্রকালে বঙ্গদেশের সে সৌভাগ্য আর হয় নাই। বঙ্গভাষায় সে যুগে যাহা কিছু সাহিত্যচর্চ্চা হইয়াছিল তাহা শুধু অনুবাদের কাব্য ; আর কবিকঙ্কণ চণ্ডী বা অন্নদামঙ্গলের মত কোন সুন্দর কাব্য দেশের কোলে দৈবাৎ আত্মপ্রকাশ করিলেও সংস্কৃত বা বাংলা কোনও সাহিত্যেরই আলোচনা দেশমধ্যে ছিল না। তাহার পর ইংরাজাধিকার আসিল। মোগলের মসনদে বিদেশী বণিক তুলাদণ্ড ছাড়িয়া রাজদণ্ড ধরিয়া বসিল। প্রারম্ভে পঁচিশ বৎসরের মধ্যে জাতীয় সাহিত্য কোনপ্রকার সাড়া দিল না বলিলেও চলে। এমন সময় এক নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ ভারতেতিহাসের একটী স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর স্যার উইলিয়ম জোন্স নামক একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি হাইকোর্টের জজ্ হইয়া এদেশে আসিবার অব্যবহিত পরে কলিকাতা নগরীতে Asiatic Society of Bengal নামক এক সাহিত্য পরিষৎ স্থাপন করেন। তাহার পূর্ব্বে কোনও পাশ্চত্য মনীষী এমন করিয়া আমাদের দেশের গুণব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহার নিজের কথায় বলিতেছি :—

It gave me inexpressible pleasure to find myself in the midst of so noble an amphitheatre, almost encircled by the vast regions of Asia which has ever been esteemed as the nurse of sciences, the inventers of delightful and useful arts, the scene of glorious actions, fertile in the production of human genius,

abounding in natural wonders and infinitely diversified in the forms of religion & government, in the laws, manners, customs and languages as well as in the features and complexions of men.

এই যে সকল বিশেষত্ব তাহারই সন্ধান লইবার জন্য বিভিন্ন ভাষায় নিবদ্ধ সর্ব্ববিধ শাস্ত্র দর্শন ও পুরাতত্ত্বের চর্চ্চাই হইল এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। ইহার অনুকরণে লণ্ডনে Rayal Asiatic Society ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ইহার একটি শাখা বম্বে নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল সোসাইটীর দ্বারা আমাদের কত যে গৌরববর্দ্ধক মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এক বিশাল মহাপ্রাণতা লইয়া এ দেশে আসিয়াছিলেন মহামতি জোন্স। তিনি কয়েক বৎসরের মধ্যে সাত আটটী এসিয়াটিক ভাষা আয়ত্ত করেন শকুন্তলা ও মনুসংহিতার ইংরাজী অনুবাদ করেন। যে পাশ্চাত্যের শিক্ষিত সম্প্রদায় পর্য্যন্ত ভারতবাসীদের আমেরিকার Red Indianদের মত Black Indian বলিয়া মনে করিতেন, তাহাদের উচ্চ সভ্যতা যে এত সুপ্রাচীন, তাহাদের শাস্ত্র ও সাহিত্য যে এত অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার সর্ব্বোপরি তাহাদের ভাষা যে ইউরোপীয় ল্যাটিন গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা হইতেও উৎকৃষ্ট ও উন্নত, এই নূতন সত্য প্রচার দ্বারা পাশ্চাত্য জগতের চক্ষু ফুটাইয়া মহামতি জোন্স আমাদের চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মহামতি জোন্সের পরিকল্পনায় তাহার পাশ্চাত্য স্বজাতীয়সমূহের যেমন উপকার ও প্রতিপত্তি সাধিত হইয়াছে, ভারতীয় গৌরবও সেইরূপ বর্দ্ধিত হইয়া বিদ্যাচর্চ্চার এক নবোৎসাহ ও নবতম প্রগতির উদ্ভব হইয়াছে।

—জোন্সের পর শাসনকার্য্যে বা নানা উপলক্ষে এদেশে যাঁহারা আসিতে লাগিলেন তাঁহাদের মধ্যে কোলব্রুক, হোরেস হেমান, উইলসন, ডা. মিল ও প্রিন্সেস একই ধারায় একই প্রতিভায় এসিয়াটিক পরিষদের কর্ণধাররূপে পাণ্ডিত্য ও অনুসন্ধিৎসার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। কোলব্রুকের গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধনিচয়, উইলসনের সংস্কৃত অভিধান ও মিলের বিরাট ভারতীয় ইতিহাস সুপ্রসিদ্ধ। সর্ব্বাপেক্ষা নূতন ও মহৎ কার্য্য করিয়া গেলেন প্রিন্সেপ। ভারতের নানা স্থানে মহারাজ অশোকের লিপিমালা চৈত্য-মন্দিরে স্তূপে স্তম্ভে ও পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ ছিল, কিন্তু কেহ তাহার পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই। প্রিন্সেপ সেই পাঠোদ্ধার করিয়া অনুশাসনমালার পালি ভাষা ব্যাখ্যা করিয়া সে যুগের ইতিহাসের উপর যে এক নূতন আলোকপাত করেন, তাহাতে ভারতীয় ইতিহাসকে নূতন করিয়া গড়িয়াছে।

এতক্ষণ ধরিয়া কেবল মহারথীদেরই নাম করা গেল। কিন্তু ইহাদের সঙ্গে যে আরও কত পণ্ডিতকর্ম্মী ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঙ্গে গভীর তত্ত্বানুসন্ধান ও গভীর তর্কালোচনা করিয়া ইতিহাসের সমুদ্ধার করিয়াছেন, তাহা বলিবার স্থান নাই। ইলেকিনস্, ডেভিস্, উইলফোর্ড, বুকানন হ্যামিলটন, আর্কসিন, টমাস্‌সন, কর্ণেল সাইকস্ ল্যাসেন, ফ্যক্‌নার, কীটো, টমাস, টেলর, কর্ণেল ম্যাকাঞ্জি, ভাওদাজী ও রাজা রাজেন্দ্রলালের নাম উল্লেখযোগ্য।

এসিয়াটিক সোসাইটির সর্ব্বতোমুখী পরিকল্পনা নিয়মিত অর্থসামর্থ্যে সুসম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৬২ খৃঃ ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আর্কিওলজিকাল বিভাগ স্থাপিত হয়। মহামতি কানিংহাম উহার প্রথম ডিরেক্টার। ১৮৯৯ খৃঃ লর্ড কার্জ্জন এদেশে বড়লাট হইয়া আসিবার পর হইতে ইহার কার্য্য নবোদ্যমে আরম্ভ হয়। ভারতে আসিয়া কার্জ্জন এদেশের কীর্ত্তি-মন্দিরগুলির সংস্কার ও সংরক্ষণ-মূলক আইন প্রবর্ত্তিত করিয়া দেশবাসীর অশেষ উপকার সাধন করেন। এসিয়াটিক সোসাইটির পৃষ্ঠ-পোষকতায় বহু সমিতির দ্বারা এই জাতীয় কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। হুল্জ ফুরের, ফুঁসে, হর্ণলে, ভাণ্ডারকর ব্লকম্যান, ওয়েষ্টমেকট, রাভেনস্, দয়ারাম সায়ানি, কাশীনাথ দীক্ষিত, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নূতন নূতন আবিষ্কার দ্বারা খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। এদেশে থাকিয়াই হউক বা পাশ্চাত্য দেশে বসিয়াই হউক, ভাষাতত্ত্ব লইয়াই হউক বা ইতিহাস-পুরাণের তত্ত্বালোচনা লইয়াই হউক, এনানডেল, ভেনিসন রস, বেবর, বুলার ডয়সেন, রীজ ডেভিডস, ম্যাকসমুলার, পার্জিটার, গ্রীয়ারসন, সতীশ বিদ্যাভূষণ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার, টেম্পল এডওয়াডস প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ ভারতের অতীত গৌরব উদ্ভাসিত করিবার জন্য বিপুল শ্রমস্বীকার করিয়াছেন।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে আভাস দেওয়া গেল—সে অতি বিরাট চিত্রের সামান্যতম আভাস। কর্ম্মীর সাধনা যাহাই হউক, তাহার সম্মুখে বিরাট আদর্শ রাখিবার ফল আছে। চোখের সম্মুখে এসিযাটিক সোসাইটির কার্য্যক্ষেত্রের এই বিপুল সমৃদ্ধি দেখিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীর মন কর্ম্ম প্রবৃত্তি জাগিয়াছিল। নেপোলিয়ানের সময় ফ্রান্সে তৎকর্ত্তৃক যে Academy of Literature নামক সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়, তাহারই অনুকরণে ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ তারিখে কলিকাতার কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা Bengal Academy of Literature নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের রাজবাটীতে সমিতির কতিপয় সদস্য সমবেত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্যালোচনা করিতেন। উহারাই অবশেষে ত্রিশ জনে মিলিয়া ১৩৪১ সালের ১৭ই বৈশাখ তারিখে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" নামক সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। বিজ্ঞবর রমেশচন্দ্র দত্ত উহার প্রথম সভাপতি হন। এসিয়াটিক সোসাইটির কার্য্যক্ষেত্র ছিল সমগ্র এশিয়াখণ্ড; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্র বঙ্গদেশেই সীমাবদ্ধ হইল ও ইহার কার্য্য-বিবরণী বঙ্গভাষায় লিখিবার বন্দোবস্ত হইল। স্থির হইল এই সভার উদ্দেশ্য সাধনার্থ নিম্নলিখিত ও আবশ্যক হইলে তদতিরিক্ত উপায় সমূহ অবলম্বিত হইবে।

(ক) বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন।

(খ) বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক শব্দের পরিভাষা সঙ্কলন।

(গ) প্রাচীন বাংলা কাব্যাদির সংগ্রহ ও প্রকাশ।

(ঘ) ভাষান্তর হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির অনুবাদ ও প্রকাশ।

(ঙ) দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, ইতিহাস প্রভৃতি সকল প্রকার সাহিত্যের আলোচনা ও সেই সেই বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি প্রকাশ।

(চ) সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা নামে এই সমিতির একখানি সাময়িক মুখপত্র প্রচার।

ক্রমে পরিষদের প্রসার ও প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। সর্ব্ব-সৎকার্য্যের উৎসাহদাতা কাশিমবাজারের মহারাজা, সাহিত্যামোদী লালগোলার মহারাজা, অক্লান্ত-কর্ম্মী দিঘাপতিয়ার রাজকুমার শরৎকুমার প্রভৃতি মহাজনরা মহৎ কার্য্যে যোগদান করিলেন; ঠাকুরবাড়ীর সত্যেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ, বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র, সাহিত্যরথী কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নবীনচন্দ্র সেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শিবনাথ শাস্ত্রী বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ ক্রমে যোগদান করিলেন। এখন বঙ্গের সকল সাহিত্যিক এবং উচ্চশিক্ষিত রাজা মহারাজা ও রাজকর্ম্মচারিগণ ইহার সদস্য তালিকাভুক্ত। বর্ত্তমানে উহার সভ্যসংখ্যা সার্দ্ধ ত্রিশসহস্রাধিক। এক্ষণে ঐ সমিতির সুন্দর বাড়ী, লাইব্রেরী ও মিউজিয়ম হইয়াছে। পূর্ণোদ্যমে ইহার কার্য্য চলিতেছে। বঙ্গদেশে জ্ঞান-চর্চ্চার এক নব যুগ আসিয়াছে। এসিয়াটিক সোসাইটি, গবর্ণমেন্ট স্থাপত্য বিভাগ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি একই উদ্দেশ্যে স্থাপিত এবং শুভ লক্ষণ এই যে উহারা অনেক ক্ষেত্রে মিলিয়া মিশিয়া নূতন নূতন ক্ষেত্রে কার্য্য করেন। গবর্ণমেন্ট বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদকে বাৎসরিক বৃত্তি দান করেন, অনেক বিষয়ে এই সমিতির সমালোচনা বিচার করেন ও সঙ্গত প্রস্তাব গ্রহণ করেন। পরিষদের প্রার্থনায় অন্ধ কবি হেমচন্দ্রকে ৩০০৲ টাকা বাৎসরিক বৃত্তি প্রদান করিয়া গবর্ণমেন্ট সৎবুদ্ধি ও সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা প্রবর্ত্তনের যে প্রচেষ্টায় ১৮৯১ খৃঃ হইতে বিচারপতি স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অগ্রণী হইয়া অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া লইয়াছিলেন তাহার মূলে পরিষদেরও অনেক চেষ্টা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের প্রার্থনা আংশিক প্রতিপালন করিলেও University Commisionএর রিপোর্টে বাংলায় এম-এ পরীক্ষা হওয়ার প্রস্তাব ছিল। উহা এখন কার্য্যে পরিণত হইয়াছে এবং উন্নত ধরণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষা দিবার মত উপযুক্ত প্রাচীন গ্রন্থাদি প্রকাশ করিয়া পরিষদ পূর্ব্ব হইতেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরিষদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সঙ্গে এই সমিতির উদ্দেশ্যের সফলতা ও বিপুল কার্য্যকারিতার উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যায়।

আমাদের উদ্দেশ্য বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন ও উন্নতি সাধন। আমাদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী বুকনিতে এত অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে ইংরাজী বাংলার খিচুড়ী ব্যতীত আমরা বাংলা বলিতে বা লিখিতে পারি না। মাতৃভাষা এখনও যেন শিক্ষার উপযুক্ত বাহন হইতে পারে নাই। কিন্তু আমাদের মনে হয় আমাদের স্বল্প চেষ্টাতেই বেশী ফল পাওয়া যাইবে। ভারতীয় সকল প্রাদেশিক ভাষা অপেক্ষা বাংলা ভাষার অত্যধিক উন্নতি হইয়াছে। আর কিছুর জন্য না হউক বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ও মহাকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও কবিতার জন্য বৈদেশিকদিগের বাংলা ভাষার সেবক হইতে হইবে।

মাতৃভাষায় প্রকাশ করিবার নিপুণতা হইলে ইংরাজী বা অন্য ভাষায় তাহা প্রকাশ করা সহজ হইবে। স্বরাজী হইলেই যে ইংরাজী ভাষার কসরৎ অনেকটা বাদ পড়িয়া যাইবে। তখন কি আমরা মূক হইয়া থাকিব? মৌলিক চিন্তার ফল মাতৃভাষায় প্রকাশ করিলে মাতৃভূমিরও স্থায়ী গৌরব অর্জ্জন করা হয়। রুসদের যে ভাষা এক সময়ে রুস ভদ্রলোকের উপযুক্ত বলিয়া উপহসিত হইত, টলষ্টয়ের মত সাহিত্যিক তাহাকে বিবিধ আভরণে সাজাইয়া মেণ্ডেলীফের মত বৈজ্ঞানিক সেই ভাষায় তাঁহার বিচিত্র গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ করিয়া ইয়োরোপের সর্ব্বস্থানের পণ্ডিতবর্গকে সে ভদ্রলোকের ভাষাও অধিগত করিতে বাধ্য করিয়া গিয়াছেন। ফ্রেডেরিক দি গ্রেটের সময় জার্ম্মাণীর বিদ্যালয়ে ল্যাটিন ও প্রাকই অধীত হইত, ফ্রেডেরিক নিজেই মাতৃভাষায় কথা কহিতে লজ্জাবোধ করিতেন। কিন্তু সে নৃপতির মৃত্যুর পর শীলার ও গেটের মত সাহিত্যিক কম্‌ট্ ও হিগেলের মত দার্শনিক এবং লাইবেন ও উলার (Wohler) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক জার্ম্মাণ মাতৃভাষাকে সমুন্নত করিয়া তুলিলেন। এখন পণ্ডিত হইতে হইলে জার্ম্মাণ ভাষা শিখিতে হয় নহিলে অনেক নূতন তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত রহিয়া যায়। জাপান এক সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়া বিলাতী-মানুষ হইয়াছিল, কিন্তু পরে যখন আপন মাতৃভাষার সমাদর বুঝিল, সেই ভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষা প্রচার করিল, তখন হইতেই জাপান মানুষ হইয়াছে। কোনো ইংরাজ কবি এক স্থানে বলিয়াছেন—যেস্থলে একটা ইংরাজী শব্দ প্রয়োগ করা যায়, সেখানে যিনি ফরাসী শব্দ যোজনা করিবেন, তিনি দেশদ্রোহিতার অপরাধে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি পাইবার যোগ্য। মাতৃভাষার এতই শক্তি—এই শক্তির উপযুক্ত না হইলে কোনো জাতিই স্বরাজ্য লাভের অধিকারী হইতে পারে না। মাতৃভাষার এই মাহাত্ম্য—এ বোধ যাহার নাই, তাহাকে সভ্য পদবীতে স্থান দেওয়া যায় না। সুতরাং দেশের মধ্যে এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত যত শিশু-প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলির নিয়মানুবর্ত্তিতার সহিত যতই উন্নতি সাধিত হইয়াছে—দেশের পক্ষে জাতির পক্ষে, ততই মঙ্গল।



গল্প

কো-এডুকেশন

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

অসীম সান্যাল বইয়ের পোকা—ছেলেবেলা হইতে বইয়ের পাতায় মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছে! বইয়ের বাহিরে যে সজীব পৃথিবী, তার কোন সংবাদ সে জানে কি না, সে বিষয়ে আত্মীয়-সহচরদের মনে সন্দেহ জাগিত।

চৌদ্দ বৎসর বয়সে মফঃস্বলের কোন্ স্কুল হইতে ভয়ঙ্কর বেশী নম্বর পাইয়া বিশ্ব-বিদ্যার ভাণ্ডারীদের চমক লাগাইয়া ম্যাট্রিকে ফার্ষ্ট হইয়া সে আসে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ইণ্টার-মিডিয়েট পড়িতে এবং তারপর ক'বৎসরে এখানকার সব ক'টা পরীক্ষায় নিজের সর্ব্বোচ্চ আসন-খানিকে কায়েমি রাখিয়া পাশ করিয়া কলিকাতার এক কলেজে সে এখন প্রফেশরি করিতে ঢুকিয়াছে।

বয়সে তরুণ হইলেও লোকে বলে, বিদ্যার ভারে বুড়া বেদব্যাসকেও অসীম টেক্কা দিয়াছে!

বইয়ের বাহিরে গ্রীষ্মের সন্ধ্যা, বর্ষার মেঘ, শরতের শ্রী, বসন্তের পুষ্পরাগ, জীবন্ত নর-নারীর মন, সে মনে আশা-নিরাশা, প্রেম-প্রীতি—এ সবের পানে অসীমের সত্যই কোন হুঁশ ছিল না। ক্লাশে ঢুকিয়া রুটীন-মাফিক্ সে 'রোল্' ডাকিত, তারপর লেকচারের গহনে প্রবেশ করিত। অধ্যাপক ভাল। নাম কিনিয়াছে। দিন বেশ কাটিতে-ছিল—সহসা সেদিন বিভ্রাট ঘটিল।

কলেজে ছাত্র-ছাত্রীরা এক ক্লাশে বসিয়া লেকচার এ্যাটেণ্ড করে—এ যুগে তাহাতে বাধা নাই। কাজেই কলেজ লগ্ন সভাটিতেও ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ গতি। সেদিন শনিবার বৈকালে ক্লাশে সভার অধিবেশনে অসীম আসিল নেতৃত্ব করিতে।

ডিবেট চলিয়াছিল—গদ্য বনাম পদ্য লইয়া। বক্তৃতার নানা খেই ধরিয়া অসীম উঠিল সকল তর্কের মীমাংসা করিতে।

দু'চারিটা কথা বলিবামাত্র চোখে পড়িল সামনের বেঞ্চে দীপ্ত দুটি আঁখি-তারা...সঙ্গে সঙ্গে আঁখির মালিক! কল্পলোক হইতে নামিয়া আসিয়াছে যেন মানসী প্রতিমা! অসীমের বক্তব্য গুলাইয়া গেল...বিদ্যুতের ঝলক লাগিয়া অনেক কথা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল!

মালিকের অধরে হাসির মৃদু রেখা সে রেখার নীচে সভা-সমিতি কোথায় গেল মিলাইয়া!

বিপর্য্যয় বিশৃঙ্খল ব্যাপার! অসীম যেন চেতনাহারা...

কে বলিল—অসুস্থ বোধ করচেন বুঝি!

আর একজন বলিল—পরিশ্রমের তো অন্ত নেই!

এক-ক্লাশ ছাত্র-ছাত্রী...তারপর গান। গান গাহিল সেই আঁখি-তারার মালিক...

কাগজে নামটা লেখা আছে—কুমারী নির্ঝরিণী দাশ-গুপ্তা, ফোর্থ ইয়ার।

গান শুনিয়া অসীমের চেতনা ফিরিল। মনে হইল, দুনিয়ার যা কিছু কাব্য, তা ব্রাউনিং, সেলি, কীট্‌স্ নিঃশেষ করিয়া যান্ নাই—তাঁদের কেতাবের আড়ালেও বাহিরে কাব্যের ধারা বহিয়া চলিয়াছে হাওয়ায় হাওয়ায় সুরে সুরে...

বিশেষ এই শ্রীমতী নির্ঝরিণী দাশগুপ্তার কণ্ঠে যে সুর, যে-মাধুরী..

অসীমের দৃষ্টি বার-বার নির্ঝরিণীর পানে...কুণ্ঠায় দ্বিধায় আবার বার-বার সরিয়া আসে...আবার যায়, আবার আসে! কোথাও অবলম্বন পায় না, আশ্রয়ের লোভে আবার যায়—বসন্ত-প্রাতে টাটকা তাজা ফোটা ফুলের বনে মুগ্ধ ভ্রমরের মত!

চোখে-চোখে মিলিল কত বার ..অসীমের বুক কাঁপিল। মনে হইল, বুঝি অপরাধ করিলাম!...

মনের মধ্যে কি যে হইতে লাগিল...ট্রোজান্ ওয়ার... না, প্রমিথিয়াসের...

সভা ভাঙ্গিল রাত্রি তখন আটটা।...

নির্ঝরিণী আসিয়া কহিল—স্যর…

নিশ্বাস ফেলিয়া অসীম কহিল—চমৎকার গান!

নির্ঝরিণী হাসিল…অতি মৃদু হাসির রেখা। অসীমের মনে হইল বিদ্যুৎ-বিকাশ!

তার পিছনে একরাশ কালো মেঘ! যত ছাত্র ভিড় করিয়া নির্ঝরিণীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কলরব …চীৎকার…সকলে ফিরিয়া চলিয়াছে।

নির্ঝরিণী বলিল—আমাদের দেশে মাসিকপত্রে এই যে মাসে মাসে লক্ষ লক্ষ কবিতা ছাপা হচ্ছে সেগুলোকে আপনি কবিতা বলতে রাজী নন?

অসীম বলিল—আমি সে সব কবিতা পড়ি না তো।

—পড়েন না?

প্রশ্নটা অসীমের বুকে বিঁধিল তীরের ফলার মত!

পিছন হইতে কে বলিল—কলেজ ম্যাগাজিনে মিস্ দাশগুপ্তার কবিতা পড়েন নি স্যর? ব্রাউনিংয়ের অনুবাদ?

বটে! ইঁহারি লেখা! অসীম বলিল—সময় পাইনি। পড়বো! আজই বাড়ী ফিরে পড়বো।

—পড়ে দেখবেন স্যর।

নির্ঝরিণী বলিল—আমার মনে হয়, এই সব অনুবাদ প্রকাশ করে বাঙলা দেশের পাঠক-পাঠিকাদের বোঝানো দরকার, কবিতা কাকে বলে! নাহলে যে সব লেখা কবিতা বলে বেরোয়…

সঙ্গে সঙ্গে নানা কণ্ঠে মন্তব্যের জের চলিল—যেন চীনা-পটকার বাণ্ডিলে কে দিয়াশলাই জ্বালিয়া দিয়াছে…

নির্ঝরিণী বলিল—এ সম্বন্ধে আপনাকে একদিন ভাল রকম বুঝিয়ে দিতে হবে। আজ আপনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন……

অসুস্থ!…অসীমের মনে পড়িল, বলিতে গিয়া দুটি চোখের দৃষ্টি-ঝলকে কোথায় সব মিলাইয়া গেল…

নির্ঝরিণী কহিল—আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে স্যর…

অসীম যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। মৃদু হাসিয়া বলিল—বেশ!……

কলেজের ফটক। অসীম আসিয়া দেখে, ফটকের বাহিরে পথে মস্ত মোটর। মোটরের সামনে দাঁড়াইয়া নির্ঝরিণী…তাকে ঘিরিয়া পাঁচ ছয়টি তরুণ ছাত্র। কে বলিতেছিল—কাল থেকে টেনিশ সুরু করে দিন। আপনার দাদা তো আসছেন। কাল রবিবার আছে…

—এই যে স্যর…

অসীমকে দেখিয়া নির্ঝরিণী কহিল—আপনার অসুস্থ শরীর…আসবেন আমার গাড়ীতে? আপনাকে পৌঁছে দেবো'খন!…

অসীম যেন থ! তার মুখে কথা ফুটিল না।

নির্ঝরিণী কহিল—আপনি কোথায় থাকেন?

—পটুয়াটোলা ষ্ট্রীট।

—ও! তাহলে আমার পথেই! আমি যাব ঐদিকে। আমার বাড়ী মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে।

এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব। বিশ্ব-বিদ্যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যৌবনের তরল প্রবাহ!

অসীমকে মোটরে বসিতে হইল—নির্ঝরিণী বসিল পাশে…গাড়ী চলিল।

একটা কথা কাণে আসিয়া লাগিল—The lamb to fleece.

যেন আগুনের গোলা! অসীমের কাণ জ্বলিয়া ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল।…

তার পর ক্লাশে রুটিনে-বাঁধা লেক্‌চার। সেদিনকার সভার কথা যেন স্বপ্ন! বি-এ ক্লাশে অসীম পড়ায় সেক্স-পীয়রের টেম্পেষ্ট। সামনের বেঞ্চে বসে নির্ঝরিণী—তার চোখে দীপ্তি…সে দীপ্তিতে টেম্পেষ্টের ছত্রে-ছত্রে কি আলোই ফোটে।

অসীম পড়াইতেছিল,—

……This my mean task
Would be as heavy to me, as odious; but
The mistress which I serve quickens
what's dead,
And makes my labours pleasures;…

পিছনের বেঞ্চ হইতে কে একটা মস্ত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল—সঙ্গে সঙ্গে কোরাশে জাগিল তীব্র হাস্যোচ্ছ্বাস!

অসীমের বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। চকিতে চোখ

পড়িল সম্মুখবর্ত্তিনী নির্ঝরিণীর পানে। তার দুটি কপোলে লাল পদ্মের আভা!

অসীম কহিল—Silence please.

ক্লাশ্ চকিতে নিস্তব্ধ···ছোট একটি আলপিন পড়িলে সে শব্দও বুঝি শুনা যাইত!

নিস্পন্দ দৃষ্টি! অসীম সেই দিকে চাহিয়া রহিল···যে দিকে নিশ্বাস জাগিয়াছিল···

দীর্ঘ গোঁফওয়ালা একটি ছাত্র—দশ বৎসর ধরিয়া আছে বি-এ ক্লাশের বেঞ্চ জুড়িয়া বসিয়া। সে কহিল—ওর নতুন বিয়ে হয়েছে—স্যর। বলছিল টেম্পেষ্ট পড়তে পড়তে ওর বুকে যেন সাইক্লোন বয়ে যাচ্ছে! নিজেকে সব সময় সামলাতে পারে না।

এ কথায় অসীম প্রথমে রহিল হতবাক; তার পর কহিল—মনে রাখা উচিত ক্লাশে আপনাদের পাশে বসে আছেন আপনাদের sisters.। তাঁদের সম্মান···

পরক্ষণে আবার মিশ্র কলরব। সে কলরব ভেদ করিয়া দু'চারিটা টুক্‌রা কথা স্পষ্ট শুনা গেল,

Love, precious love···

কাহাকে নিষেধ করিবে? কিসের নিষেধ? নিজেদের মান যারা রাখিতে জানে না, তারা রাখিবে সিষ্টারের মান!

নাঃ, এ সিষ্টেমটাই···

সে অধ্যাপক। তার নিজের মনেও ক'দিন ধরিয়া যে বিপ্লব চলিয়াছে···

পুরাণের কথাগুলা কেবলই ক'দিন মনে জাগিয়াছে···সাধনা···দুশ্চর তপস্যা! সে তপস্যায় বিঘ্ন-রূপে আসিয়া উদয় হইত উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা···তাদের মোহ কাটিয়া দেওয়া সহজ! কিন্তু··

তপোবনে শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে সেই কচ আর দেবযানী···

নির্ঝরিণী বলিল—যারা পড়বে না, তাদের স্যর আপনি পড়াতে পারবেন না! যারা পড়তে চায়, তাদের আপনি পড়ান।

তাই। নিরুপায়!

ক্লাশ নয়, যেন ম্যান্-অফ্-ওয়ার! কত রকমের মন লইয়া, সে মনে কত উদ্দেশ্য ভরিয়া বিরাট ফৌজ আসিয়া সে ম্যান্-অফ্-ওয়ারে চড়িয়া বসিয়াছে! কলেজের ফটক খোলা–কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপনের দামামা বাজিতেছে—চলে এস, চলে এস ··বিদ্যার হাট বসাইয়াছি।

কিন্তু সে আদার ব্যাপারী–জাহাজের কথা চিন্তা করিয়া ফল নাই!

অসীম অস্থির হইল। এ ক্লাশটিতে লেকচার দিবার সময় তার মন যেন উৎসাহে মাতিয়া ওঠে। উচিত নয়···কিন্তু উপায় কি?

রাজ্যের মহাত্মা মনে বসিয়া আছেন, তাঁদের জ্ঞানের ভাণ্ডার উজাড় করিয়া। তবু তো···

ঐ সামনের বেঞ্চ। ও বেঞ্চে ঐ দুটি চোখ! ও-চোখে কি যে আছে···

অসীমের লজ্জা হইল, ভয় হইল। মনের এ রহস্য ক্লাশে কি কাহারো জানিতে বাকী আছে?

পড়াইতে পড়াইতে অসীমের অধীর চোখের দৃষ্টি বার বার নির্ঝরিণীর পানে লুটাইয়া পড়ে। নির্ঝরিণী মুখ নামাইয়া বইয়ের পানে চাহিয়া থাকে···তার দুটি কর্ণ-মূল রাঙা-পলাশের মত ঝক্‌ঝক্ করে!

ভাল নয়। না, নির্ঝরিণীর চিন্তা সে করিবে না! ক'মাস পরে কলেজের পড়া সাঙ্গ করিয়া কোথাকার নির্ঝরিণী সরিয়া বহিয়া কোথায় চলিয়া যাইবে—তার জায়গায় আসিয়া বসিবে নূতন জন! হয়তো কোন মৈনাক পর্ব্বত!

কেন সে এমন উতলা হয়? শুধু মূঢ়তা নয়···এ যে বর্ব্বরতা!

নির্ঝরিণী তার কেহ নয়! এত বড় ক্লাশে সবার সমান···

মনের সঙ্গে যুদ্ধ চলিল। শুধু চোখের দেখা—ক্ষতি কি? কোন সাধ, কোন আশা নয়···

না···দেখাই বা কেন?

সে প্রফেশর—চাকরি করিয়া টাকা রোজগার করিতে আসিয়াছে।

সেদিন কলেজের ছুটী ছিল।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে সারা দিন কাটাইয়া বেলা চারিটা নাগাদ্ অসীম আসিয়া ঢুকিল ইডেন্ গার্ডনে।

ভিড় নাই, কোলাহল নাই। সবুজ ঘাসের উপরে অর্দ্ধশায়িত ভাবে বসিয়া পকেট হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল। ডিকেন্সের সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছে। সেগুলার পানে দৃষ্টি বুলাইতে লাগিল · একান্ত মনোযোগে।

সহসা কে ডাকিল—স্যর ··

সে স্বরে বিদ্যুতের প্রবাহ! শিরায় শিরায় স্রোত বহিল। চমকিয়া চোখ তুলিয়া অসীম দেখে · এ কি!

নির্ঝরিণী দাশগুপ্তা! এখানে! একা!

অসীম উঠিয়া বসিল, কহিল—আপনি!

—হ্যাঁ।

নির্ঝরিণী হাসিল, হাসিয়া কহিল—বাড়ী থেকে আমরা এসেছিলুম পিক্‌নিকে। ঘুরতে ঘুরতে দেখি, কে একজন একা বসে লেখাপড়া করছেন। তখনি মনে হয়েছে আপনি। তাই নিঃশব্দে এলুম!·· তা ওগুলো কিসের নোট্‌ স্যর? নিশ্চয় নোট্‌?

অসীম কহিল—ডিকেন্সের সম্বন্ধে কতকগুলো···

নির্ঝরিণী কহিল—আচ্ছা স্যর, সব সময়ে আপনি কল্পনার জগতে থাকবেন! সত্যকার পৃথিবীর মানুষ-জনের সঙ্গে কখনও মিশবেন না? তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবেন না?

যেন মস্ত অপরাধ করিয়াছে! অসীম মাথা তুলিতে পারিল না।

নির্ঝরিণী বলিল—এখানকার কোন এগজামিন তো আপনি পাশ করতে বাকী রাখেন নি! তাও so triumphantly!···এখনো ঐ তত্ত্ব নিয়ে মশগুল্‌ থাকবেন!

অসীম বলিল—আপনি এসেছেন পিক্‌নিকে!

—হ্যাঁ।···আপনার আপত্তি আছে? উঠুন···কাগজ-পত্তর রেখে দিন! আসুন, আমার দাদা আছে এখানে, মামা আছে, মা আছেন···তাঁদের সঙ্গে আলাপ করবেন! তাতে যদি আপত্তি থাকে তো বেশ, বেড়াতে বেড়াতে টেম্পেষ্টের সম্বন্ধে এমন কতকগুলো কথা বলুন, এগজামিনের খাতায় যে কথা লিখে আমি অনেক নম্বর পেয়ে যাব।

কথাটা বলিয়া নির্ঝরিণী আবার হাসিল।

অসীম কি করিবে, স্থির করিতে পারিল না।

নির্ঝরিণী বলিল—চেয়ে দেখুন তো চারিদিকে···ঐ ফুল, ঝিল, আকাশ, এই বাতাস···

সত্য, পৃথিবী কখন এমন রঙীণ হইয়া উঠিল! চমৎকার! এতক্ষণ অসীম লক্ষ্য করে নাই। এখন নির্ঝরিণীর কথায় চাহিয়া দেখে···

অসীমের দৃষ্টি বিমুগ্ধ।

অসীম কহিল—সত্যি, আপনাকে ধন্যবাদ!···আচ্ছা, আমার এ কাগজপত্র ঘাঁটা দেখে আপনাদের খুব আমোদ বোধ হয়···না?

নির্ঝরিণী কহিল—আমোদ বোধ হয় না। মনে করুণা জাগে। প্রফেশরি আরো অনেকে করেন—পৃথিবীর সঙ্গে তাঁরা সম্পর্ক ত্যাগ করেন নি!···কিছু মনে করবেন না স্যর, রাজ্যের জ্ঞান তো আপনি আয়ত্ত করেছেন?···কিছু বাকী রাখেন নি···

অসীম যেন থ! নির্ঝরিণীর এ কথার অর্থ?

নির্ঝরিণী বলিল—আপনি ফুটবল খেলতে জানেন? ক্রিকেট? টেনিশ? এরোপ্লেন চালাতে শিখেছেন? মোটর?···দেশ-বিদেশে ঘুরেছেন? পৃথিবীর লোক-জনের কোন খবর রাখেন? মানে তাদের সুখ-দুঃখের? তাদের সংসারের?

তাইতো···এ-সব কথা নির্ঝরিণী কেন বলে···

হাসিতে হাসিতে নির্ঝরিণী বলিল—সেক্সপীয়র, ব্রাউনিং, কার্লাইল, রাস্কিন ভাল, খুব ভাল, মানি। কিন্তু দুনিয়া শুধু এঁদের নিয়ে তৈরী হয়নি! দুনিয়ায় আলো আছে, বাতাস আছে, গ্রীষ্ম আছে, বর্ষা আছে, হাসিখেলা গান-গল্প আছে, রেলওয়ে আছে, ধানের ক্ষেত আছে। খেলার মাঠ, বায়োস্কোপ, কাবলীওয়ালা, পাহারা-ওয়ালা আছে, আমরা আছি—এ-সবের সন্ধান না রেখে, এ সবের পাশ কাটিয়ে শুধু লেকচার আর থিশিস্‌ নিয়েই থাকবেন! তাহলে যে দুর্ভাগ্যের সীমা থাকবে না স্যর।

অসীমের মন এ-কথায় হায়-হায় করিয়া উঠিল। জীবনটা তবে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে! মনে হইল, দিকে দিকে বালুকার রাশি . যেন সাহারা মরুভূমি ধূ-ধূ করিতেছে!

অসীমকে লইয়া নির্ঝরিণী আসিল প্যাগোডার পাশে। সেখানে তার মা···দাদা প্রশান্ত···মামা অবিনাশ ··

নির্ঝরিণী কহিল—ইনি আমাদের প্রফেশর সান্ন্যাল।

মা বলিলেন—তোমার অনেক সুখ্যাতি শুনেছি বাবা, আমার এই মেয়ের মুখে···

মামা বলিলেন—উনি হলেন ক্যালক্যাটা ইউনিভার্সিটির কোহিনুর মণি!

প্রশান্ত কহিল—আপনি টেনিশ খেলেন?

অসীম কহিল—না।

প্রশান্ত কহিল—আমাদের বাড়ী আসুন না কলেজের ছুটীর পর। এখন ক'দিন আমি বাড়ী আছি। কি জানেন, আপনাদের all-round culture দরকার। বিলেতের ভাল ভাল ছেলেদের দেখেন তো, তারা সর্বদিকে চৌখশ! আমাদের দেশের পণ্ডিত মানে book-worm. বইয়ের বাইরে যা-কিছু, তা তাঁদের কাছে অখাদ্য মাংস! সে সবের নামে নাক বাঁকিয়ে আছেন চব্বিশ ঘণ্টা!

লরেল-হার্ডির হাসি-তামাসার ছবি গোড়ায়! চমৎকার! তিনজনে পাশাপাশি বসিয়াছে। আগে প্রশান্ত, তারপর অসীম, তারপর নির্ঝরিণী।

ড্রামা সুরু হইল—ক্লিওপেট্রা। মিশর-রাণী সাজিয়াছে ক্লদেৎ কোলবার্ট! চার্মিং!

ক্ষণে ক্ষণে আশা···নিরাশা···দ্বিধা··ভয়···উল্লাস ··বেদনা···রোমাঞ্চ!

ছবি শেষ হইল। অসীমের মনে···

কি সে বলিয়া বুঝাইতে পারিবে না। মনে হইতেছিল পৃথিবীর এ ঘূর্ণন-গতি যদি চিরদিনের জন্য থামিয়া যাইত, ক্ষতি ছিল না।

ক্লিওপেট্রা! আণ্টনি তাকে কত ভালবাসিয়াছিল —সেক্সপীয়রের লেখা পড়িয়া এ ভালবাসার যে পরিচয় পাইয়াছিল তার চেয়ে কত নিবিড় এ ছবির পরিচয়!

প্রশান্ত শিবপুরে পড়িতেছে। লেখাপড়ায় ভাল—খেলায় পটু। ফুটবলে এবার ইয়র্কশায়ারকে দুখানি গোল সে-ই দিয়াছে ট্রেড্‌স্‌ কাপে! এখানে পাশ করিয়া সে বিলাত যাইবে। তার বাবাও এঞ্জিনীয়ার; বিলাতী ডিগ্রীওয়ালা।

নানা কথা চলিল।

কথায় কথায় নির্ঝরিণী বলিল—আপনি 'টকি' দেখেন নি স্যর! আশ্চর্য্য!

অসীম বলিল—সময় পাইনি।

প্রশান্ত কহিল—কটা বেজেছে?

নির্ঝরিণী বলিল—ছটা বেজে পাঁচ মিনিট।

প্রশান্ত কহিল—উঠে পড়ুন। আজই আপনার baptism হোক্!···সময় আছে। স'ছটায় আরম্ভ। আমাদের পৌঁছে গাড়ী এসে মাকে মামাকে বাড়ী নিয়ে যাবে'খন।···

তাহাই হইল।

নূতন দুনিয়া! বিজ্ঞান জানা আছে—তবে তার এ মূর্ত্তি অসীম কখনো চোখে দেখে নাই!

সে রাত্রে কখন কি কথা বলিয়া নির্ঝরিণীকে অসীম বিদায় দিল মনে নাই! এতক্ষণ সে যেন কোন্ স্বপ্নলোকে ছিল! বাস্তব জগতের চেতনা মিলিতে সে দেখে চৌরঙ্গীর ফুটপাথে দাঁড়াইয়া আছে।···

তারপর আর একদিন · আর একদিন। · ক'দিন হইল অসীমের নিমন্ত্রণ। চা, টেনিশ, গান, গল্প, সিনেমা···

চোখে সে দেখিয়া আসিল, প্রাণ দিয়া উপলব্ধি করিয়া আসিল।

আর এক দিন ডাকে আসিল কলেজের ঠিকানায় অসীমের নামে প্রশান্তর কার্ড।

ব্যাডমিণ্টন-টুর্ণামেণ্ট—শিবপুর বটানিকাল উদ্যান—রবিবারে বেলা ২টায়। চা জল-খাবার ইত্যাদি।

সেকেণ্ড-ইয়ারের পরীক্ষা হইয়াছে। ইংলিশের একগাদা খাতা। রবিবার ভিন্ন সে খাতা কবে দেখে?

উপায় নাই।

শনিবার। প্রফেশার্স রুমে বসিয়া একটুকরা কাগজ লইয়া কম্পিত হাতে অসীম লিখিল,—

Nirjharini Das Gupta.

লিখিয়া অক্ষরগুলার পানে চাহিয়া রহিল মুগ্ধ তন্ময়

দৃষ্টিতে। হরফগুলা নক্ষত্রের মত চোখের সামনে দপ-দপ্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল!

স্মৃতির সমুদ্র বহিয়া কৈশোরের কথা ভাসিয়া আসিল। ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কলিকাতায় আসিবে, বিধবা মা বলিলেন—এবারে একটি বৌ এনে দে বাবা! না হলে একা কার মুখ চেয়ে পড়ে থাকি বল্!

সে মা চলিয়া গিয়াছেন। বৌ আনা হয় নাই!

কোথা হইতে আনিবে? বৌ কোথায় পাইবে? লোকে বিবাহ করে, বিবাহ করিয়া বৌ আনিয়া সংসার পাতে। তার তা হয় নাই! সে সময় কোথায়? মা থাকিলে দেখিয়া-শুনিয়া···

পয়সা অনেক রোজগার করিতেছে। কলেজের মাহিনা আছে···দু'-তিনটা টুইশন্ আছে। তাছাড়া ইউনিভার্সিটির পেপার দেখা···

বই কিনিতে সব টাকা ফুরাইয়া যায়। মেসের দোতলায় দুটা ঘর। দুটা ঘরই তার। ঘর দুটা বইয়ে ঠাশিয়া গিয়াছে!

ইহার মধ্যে বৌ! তাহাকে রাখিবে কোথায়?···তবু···

একটা নিশ্বাস!···

ঘণ্টা পড়িল। ক্লাশ। চিঠিখানা লেখা হইল না। নাম-লেখা কাগজটুকু পকেটে ফেলিয়া অসীম ছুটিল থার্ড ইয়ারে রোজ-বেরির পীট্ পড়াইতে।···

রবিবারে এগ্‌জামিনের খাতাগুলার মধ্যে মন দাঁড়াইতে পারিল না। একটার সময় অসীম শিবপুরে ছুটিল।

খেলা চলিয়াছে। উঁচু ঢিপির উপরে সতরঞ্চ বিছানো—সেখানে বসিয়া পাঁচ-ছটি তরুণী—ক'জন তরুণ।

নির্ঝরিণীর হাতে কেকের প্লেট্—হাস্যোল্লাসে সে যেন প্রমত্ত!

অসীমকে দেখিয়া নির্ঝরিণী বলিল—এসেছেন!··· একবার আমার মনে হয়েছিল, আসবার সময় আপনার ওখানটায় ঘুরে আসি!···কিন্তু গাড়ীতে জিনিষপত্র ছিল অনেক। তা বসুন···চা খান্···

প্রশান্ত আসিয়া বলিল—খেলবেন তো প্রফেশর সান্যাল?

সলজ্জ মৃদু হাস্যে অসীম বলিল—কখন খেলিনি।···

প্রশান্ত কহিল—কখনো খেলেন নি বলেই আপনার খেলা প্রয়োজন।

খেলিতে হইল। খেলা নয়, যেন স্বপ্ন। দুঃস্বপ্ন!

হাস্য-কৌতুকের বন্যায় শ্রান্ত দেহ-মন লইয়া অসীম আসিয়া বসিল সেই সতরঞ্চের উপর। দুটা গাছের ডালে দড়ির দোলনা খাটাইয়া তাহাতে বসিয়াছে নির্ঝরিণী। বসিয়া গান গাহিতেছে—

খুলে দে তরণী, খুলে দে তোরা
　　স্রোত বহে যায় যে!

এবং দু'জন শর্ট-পরা তরুণ যুবা দোলনায় দোল দিতেছে পুরা-দমে। আশে-পাশে আরো ক'জন তরুণী উল্লাসে একেবারে আত্মহারা! বড় বড় গাছগুলার পিছনে অস্ত-রবির ঝিকিমিকি আলো—নিবিড় পত্রপল্লবের গায়ে যেন অন্ধকার নিঃশব্দে বসিয়া আছে! মাঠে খেলা চলিয়াছে। উহারা চমৎকার খেলিতেছে তো! আর সে···? ওখানে দোলনার পরেও হাসি-গান-গল্পের সমারোহ!

অসীম একটা নিশ্বাস ফেলিল।···

তারপর কখন যে পায়ে পায়ে এ-দলটি হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া অসীম আসিয়া দাঁড়াইল ফটকের বাহিরে··· খেয়াল ছিল না।

বাসে চড়িল না—ট্রামেও নয়। যেন ভুলিয়া গিয়াছে! শিবপুর হইতে সারা পথ পায়ে হাঁটিয়া সে নিজের গৃহ-কোটরে আসিয়া ঢুকিল। ঘামে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে! মন যেন মনে নাই!

রাত্রি গভীর।

অসীমের মনে অস্বস্তির সীমা নাই! ও রঙীন কল্পলোকে তার প্রবেশের অধিকার নাই! কেন সে উহার দ্বারে আসিয়া মাথা ঠুকিয়া মরে!···

যদি কোনদিন এ যোগ্যতা···

কলেজের লেক্‌চারের মধ্যে নিজেকে সে ডুবাইয়া দিল। না, স্বপ্ন নয়! ক্লাশে কাহারো পানে সে আর মুখ তুলিয়া চাহে না!···

ক্লাশের বাহিরে···

কিন্তু সেকথা কেহ না জানিতে পারে! খুব সতর্ক রহিল।…

পূজার ছুটীতে অসীম বাহিরে চলিয়া গেল। কলেজ খুলিতে ফোর্থ ইয়ার ক্লাশে আসিয়া রোল্ ডাকিল…16…

জবাব নাই! বেঞ্চের পানে চাহিল। নির্দ্দিষ্ট আসন-খানি শূন্য! রোল-সিক্সটীন কে—বুকে লেখা আছে সোণার রেখায়! সে লেখা মুছিবার নয়!

লেক্‌চার চলিল। মন আকুল হইয়া রহিল।

পরের দিন…তার পরের দিন…তার পরের দিন…

রোল সিক্সটীন্…না আসে নাই! এ্যাব্‌সেণ্ট।

অসুখ করিল না কি? নির্ঝরিণী দাশগুপ্তা কখনো ক্লাশ কামাই করে না! এমন রেগুলার…

তবে?

বিশ্ববিদ্যালয়ের রণাঙ্গনে সেকন্দর শাহের মত চিরদিন সে জয়ী হইয়াছে। এ রণাঙ্গনটাই দুনিয়ার একমাত্র রণক্ষেত্র নয়—আরো ক্ষেত্র আছে…কুরুক্ষেত্র, থার্ম্মোপলির মত…সব কটাতেই আজ সে বিজয়-পতাকা উড়াইতে চায়!

শিবপুর-বাগানের সেই পরাজয়ের গ্লানি তার বুকে যেন কাল কালি মাখাইয়া দিয়াছিল! তাই সে পণ করিয়াছিল…

কিন্তু এক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাইবার পূর্ব্বেই…?

টু-শীটার কার্। সে-কার্ হাঁকাইয়া অসীম সন্ধ্যার পূর্ব্বে চলিল মির্জাপুর ষ্ট্রীটে।

এই বাড়ী। গাড়ী থামাইয়া বেয়ারাদের কাছে খবর লইল—প্রশান্ত আছে শিবপুরে; দিদিমণি গিয়াছেন লেকের দিকে বেড়াইতে; সঙ্গে রায় সাহেব ব্যারিষ্টার।

অসীমের যেন রোখ চাপিল! একটা আক্রোশ! গাড়ী ঘুরাইয়া সে চলিল লেকের দিকে।…

এ-পথ ও-পথ…লোক-জন…গাড়ী…

ঐ চলিয়াছে…হিল্‌ম্যান-কার। নম্বরটা?

ঠিক! ও গাড়ীর নম্বর অসীমের মনে গাঁথা আছে।

হিল্‌ম্যানকে অতিক্রম করিয়া অসীম পিছন-পানে ফিরিয়া চাহিল—তার গাড়ী গেল বাঁকিয়া…

হিলম্যান্ আসিয়া পড়িল একেবারে গায়ের উপর…সে গাড়ী ড্রাইভ করিতেছিল মিষ্টার রায় ব্যারিষ্টার।

তীক্ষ্ণ স্বরে রায় হুঙ্কার ছাড়িল—Fool!

নির্ঝরিণীর চোখের দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিল অসীমের…

নির্ঝরিণী কহিল—স্যর!…

অসীমের গাড়ী নিথর! কোন মতে পাশ কাটাইয়া হিলম্যান্ আগাইয়া গেল…

রায় বলিল—লোকটা বদ্ধ আনাড়ি। ওকে প্রসিকিউট্ করানো উচিত।…Danger to human life…

নির্ঝরিণী কহিল—আমাদের প্রফেশর…মিষ্টার সান্যাল …ইউনিভার্সিটির রত্ন। যাকে বলে…

রায় বলিল—Cad!

বলিয়া রায় উচ্চ হাস্য করিল। হিলম্যান্ মোড় লইল ইয়ট্ ক্লাবের দিকে

অসীমের মাথার মধ্যে যেন দামামা বাজিয়া উঠিল। যেন নেপোলিয়ঁ চলিয়াছে বিজয়-অভিযানে

সে গাড়ী চালাইয়া দিল…সবেগে…

হিলম্যানের পিছনে আসিয়া জোরে হর্ণ বাজাইল। রায়ের মন আক্রোশে ভরিয়া উঠিল। পিছন-পানে বারেকের জন্য চাহিয়া ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া ষ্টীয়ারিং-হুইল ধরিয়া সে সুরু করিল খেলা…

সে খেলায় গাড়ী চলিল সাপের মতো…আঁকিয়া বাঁকিয়া…

নির্ঝরিণী কহিল—কি করছো?

রায় বলিল—ঐ cadটাকে শিক্ষা দিতে চাই। আমার সঙ্গে এসেছে ড্রাইভিংয়ে টক্কর দিতে…

কথার সঙ্গে সঙ্গে ঠোক্কর! সবেগে ধাক্কা! নূতন ড্রাইভার, অসীম টাল রাখিতে পারিল না! তার টু-শীটার স্কিড্ করিয়া চলিয়া গেল একেবারে জলের ধারে। এবং…

নির্ঝরিণী চীৎকার করিয়া উঠিল—তুমি মানুষ খুন করবে! সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর দ্বার ঠেলিয়া লাফাইয়া সে নামিয়া পড়িল।…

চীৎকার…হাঁকাহাঁকি…ডাকাডাকি…লোকজন!…

অসীমের গাড়ী জল-গর্ভে যায় নাই—খুব বাঁচিয়া গিয়াছে! তবে গাড়ীর মধ্যে অসীম অচেতন—তার মাথা কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে।

ধরাধরি করিয়া অসীমকে নামাইয়া তৃণশয্যায় শোয়ান হইল। শাড়ীর আঁচল ভিজাইয়া নির্ঝরিণী মাথার রক্ত মুছিয়া দিল···মিনতি জানাইয়া ভিড় সরাইল···

রয় বলিল—হাসপাতালে নিয়ে যাই। সরো।

ভ্রূ-ভঙ্গী সহকারে নির্ঝরিণী কহিল—না।···

সে স্বরে রয় ভয় পাইল—গাড়ী ছুটাইয়া সে গেল ডাক্তার ডাকিতে।···

নির্ঝরিণীর দুশ্চিন্তার অন্ত নাই! সেবায় নিজেকে সে একেবারে সঁপিয়া দিল।

স্মেলিং শল্ট···বরফ···বোরিক তুলা···আয়োডিন··· সব মিলিল। তরুণী যেখানে কল্যাণীর বেশে আর্ত্ত-সেবার ভার গ্রহণ করে, সেখানে কোন কিছুর অভাব ঘটে না! না চাহিতে জিনিস মেলে! দুনিয়ায় এ বড় আশ্চর্য্য সত্য!···

সন্ধ্যার আব্‌ছায়া···মাথার উপর নক্ষত্রের দীপ-মালা!

অসীম চোখ মেলিয়া চাহিল—চোখের সামনে কলেজ ক্লাশের সেই দুটি আঁখির দীপ্তি!

এ আলোর দীপ্তিটুকুতেই বাঁচিয়া আছে।

নির্ঝরিণীর বুকে কি আরাম···কি স্বস্তি!

সে ডাকিল—স্যর···

মাথার উপর নক্ষত্র-ভরা আকাশ···পাশে নির্ঝরিণী··· দুনিয়ায় যেন আর কেহ নাই, কিছু নাই···

দ্বিধা, সঙ্কোচ, ভয়, সংশয় সব মুছিয়া গিয়াছে! অসীম ধরিল নির্ঝরিণীর হাত—এ হাত নির্ঝরিণী প্রসারিত রাখিয়াছে···

অসীম বলিল—মার কথা মনে পড়ছিল···যেন ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় আসছি···মা বলছেন···

মা! অসীম এ কি কথা বলিতে বসিয়াছে!

একটা নিশ্বাস! নিশ্বাস ফেলিয়া অসীম বলিল— আপনি তামাসা করতেন, শুধু বই পড়েচি—পৃথিবীর সঙ্গে আর কোন দিক দিয়ে পরিচয় হলো না!···তাই, খেলতে শিখেছি—গাড়ী ড্রাইভ করতে শিখেছি। দেখাতে এসেছিলুম আপনাকে। গিয়েছিলুম আপনার বাড়ীতে··· সেখান থেকে খবর পেয়ে এখানে আসি।···ভাল কথা, কদিন কলেজে যান নি···বড্ড ভাবনা হয়েছিল···অসুখ করেনি তো··?

প্রশ্নের শেষ নাই! নির্ঝরিণী অবিচল দৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া আছে! অসীমের চোখে কি মিনতি, কি আরাম!···কি যে নাই···

নির্ঝরিণীর বুক যেন উথলিয়া উঠিয়াছে—নির্ঝরের মত!···

নির্ঝরিণী কহিল—শুনবো, সব কথা শুনবো। জবাবও দেব প্রত্যেকটি কথার।···এখন নয়, পরে। এখন এত কথা কবেন না। অনেক কষ্টে মাথার রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে।·· একটু চুপ করে থাকুন। আমি দেখি, আপনার গাড়ী ঠিক আছে কি না। আমিও ড্রাইভ করতে জানি। গাড়ী যদি চলে, তাহলে আপনাকে নিয়ে যাব আমাদের ওখানে। ভাল না হওয়া অবধি আমাদের বাড়ী ছেড়ে কোথাও আপনার যাওয়া হবে না। আমি যেতে দেব না···বুঝলেন···

অসীম বুঝিল। কোথাও সে যাইতে চায় না···যাইবে, সে শক্তিও তার নাই! দেহ-মন বড় শ্রান্ত···নির্ঝরিণীর কথাই সে শুনিবে।···

গাড়ী চলিল। নির্ঝরিণী ষ্টীয়ারিংয়ে—অসীমের মাথা ঘুরিতেছিল···শাড়ীর আঁচল ছিঁড়িয়া নির্ঝরিণী তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়াছে। মাথাটা···

নির্ঝরিণীর গায়ে হেলিয়া পড়িল।

হিলম্যানের হর্ণ···রয় আসিয়াছে। বলিল,—ডক্টর ডট্···

ভ্রূ-ভঙ্গী সহকারে নির্ঝরিণী কহিল—No need, Thanks···

গাড়ী চলিল। অসীম ভাবিতেছিল, কোন কল্পলোকে চলিয়াছে···সেখানে তার সব কামনা সফল হইবে···ভুল নাই···ভুল নাই! সে যেন থীশিয়াস···এ্যামাজনদেবর রাণী হিপোলিটাকে জয় করিয়া রাজ্যে চলিয়াছে! মাথার উপর নীল আকাশ···রাশি রাশি নক্ষত্রের দীপ জ্বলিতেছে বিজয়-উৎসবের আয়োজন চারিদিকে!

ভারতীয় চিত্রকলার দ্বৈতরূপ

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

চিত্রকলার আলোচনায় নানা দেশের ও মতের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়েছিল। অধিকাংশ সভ্যতার হৃদয়-তত্ত্ব কোন সমন্বয়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়—এ জন্য সে-সব দেশের রূপ-বিশ্লেষণে সঙ্কীর্ণতা প্রস্ফুট হয়ে উঠে। গ্রীক চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্য একটা বিশিষ্ট ছন্দে গাঁথা—তা একান্ত-ভাবে হুবহু প্রাকৃতিক ও স্বভাব-পন্থী। অপর পক্ষে জাপানী চিত্রকলায় কোন বিশিষ্ট স্বাভাবিক ব্যাপারকে অনুকরণ করা উদ্দেশ্যই নয়—জাপানী-চিত্ত রঙের ও রেখার কালোয়াতী ভালবাসে। একটা চেহারা বা বস্তুকে উপলক্ষ মাত্র ক'রে রঙের কোন হৃদয়গ্রাহী ব্যঞ্জনা বা রেখার কোন উদ্ভট লীলা প্রকট ক'রে জাপানী-চিত্ত আনন্দলাভ করে। এরূপ অবস্থায় স্বাভাবিক প্রতিকৃতি রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে—কারণ তাতে বর্ণের বা রেখার কোন লীলা বা ক্রীড়া সম্ভব হয় না।

যদিও নানা দেশ সম্বন্ধে অতি সহজে ভাল মন্দের একটা ফরমায়েস বা একটা আভাস দেওয়া চলে—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তা সম্ভব হয় না। কারণ ভারতীয় তত্ত্ব ও-রকমের কোন সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার উপর নিহিত নয়। এখানে নানা রকমের স্বাধীন চিন্তা অবলীলাক্রমে প্রভাব পেয়েছে। আস্তিক ও নাস্তিক সকলেই ভারতের বিশাল বক্ষে নীড় রচনা করে বাস করেছে। এরূপ অবস্থায় গ্রীসের ক্ষুদ্র ভাব-পরিধি বা জাপানের সঙ্কীর্ণ খেয়াল নিয়ে ভারতীয় তত্ত্ব বা রূপশিল্পের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা চলে না।

আধুনিক ভারতে ইউরোপীয় চিন্তাধারা অতর্কিতে এসে পড়েছে। পাশ্চাত্য প্রণালী এদেশের শিল্প-বিদ্যালয়ে অনুসৃত হয়েছে—এরূপ অবস্থায় চিত্র-শিল্প যে একটা নকল নবিসী ব্যাপার তা এক সময় বদ্ধমূল হয়েছিল। কোন বিখ্যাত জাপানী চিত্রকর এসে দেখ্‌লে—এখানকার পাশ্চাত্য-শিক্ষামত্ত চিত্রকরেরা একেবারে ইউরোপীয় ভঙ্গীর চিত্র আঁকা আরম্ভ করেছে—যাতে ভারতবর্ষের আবহাওয়া, অলঙ্করণ ও কোন বিধির সংস্পর্শ মাত্র নেই। তিনি জাপানী, তাই তিনি জাপানী চিত্রের বিরুদ্ধবাদিতা প্রাচ্যরীতির পোষক বলে ব্যাখ্যা করেন। ওকাকুরা প্রতীচ্যের নকল চেহারা আঁকার বিষয় এমন বিদ্রূপ করেছিলেন যে ইউরোপীয়দেরও তাতে তাক্ লেগে যায়। ভারতের কোন কোন ভাবুকও এই জাপানী মোহে পড়ে যায়। জাপানের কুয়াসাচ্ছন্ন অস্পষ্টতা ও-দেশের একটা প্রাকৃতিক অবগুণ্ঠনস্থানীয়—ভারতের সূর্য্যকরোজ্জ্বল আকাশে সে রকম ধোঁয়াটে ব্যাপার নেই। অথচ এখানকার চিত্রকররা বিলাতী মোহ ছেড়ে জাপানী ঢঙে চিত্র আঁকতে সুরু করলেন। নিজের চোখে চারিদিকের আকাশ বাতাস না দেখে জাপানী চস্‌মার ভিতর দিয়ে ভারতের দুনিয়া চোখে পড়ল। একদিকে নকল করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—অপরদিকে জাপানী কুজ্ঝটিকা বা আবহাওয়া সৃষ্টির প্রেরণা একটা আশ্চর্য্য সৃষ্টি সম্ভব করে তুল্‌ল। সে সৃষ্টি এদেশের একেবারে অপরিচিত। একথা নিঃসন্দেহ যে এ চেষ্টায় ইউরোপের মোহ কাট্‌বার একটা বলিষ্ঠ চেষ্টা আছে। কিন্তু তাতে করে দেখা গেল—রূপ-রচনার সহিত পেণ্ডুলম্ বা দুল একেবারে বিপরীত দিকে ছুটে গেছে। এক বিপদ কাট্‌তে গিয়ে দ্বিতীয়ের ভিতর ঢোকা হয়েছে! এ কোনটাই ভারতের মনোমান যন্ত্রের প্রতিফলক নয়।

বস্তুতঃ স্বভাববাদিতা ভারতীয় চিত্রকলার একটা বিশিষ্ট দিক। ভারতীয় কবিরা নারীর রূপবর্ণনায় যে সমস্ত উপমা ব্যবহার করে তা'তে বোঝা যায়—সেকালের সৌন্দর্য্যের আদর্শ একালের মত ছিল না। যখন যে রকম রুচির প্রবর্ত্তন হয় তখন কাব্যে ও চিত্রে তা'রই একটা প্রকাশ প্রস্ফুট হয়। সে-যুগের নরনারীরাও যুগোচিত ভঙ্গীতে দেহকে মার্জ্জিত করতে অভ্যস্ত হয়। এ-যুগেও রাজপুতরমণীদের বেশ-ভূষা অনেকটা কবিদের কাব্যে বর্ণিত চিত্রের মত। বংশানুক্রমে দেহলতাকে আদর্শানুযায়ী ভঙ্গীতে পরিচালিত করে রাজপুত-রমণী ঐতিহাসিক শ্রী লাভ করেছে। অথচ এ-যুগের আদর্শ একেবারে বিপরীত। এ-যুগের নব্য-ভারতীয় রমণীদের বেশ-ভূষা ও দেহভঙ্গী যদি বাস্তব ব্যাপার হয় তবে রাজপুত রমণীদের প্রাচীন বলয়াদিশোভিত অপূর্ব্ব

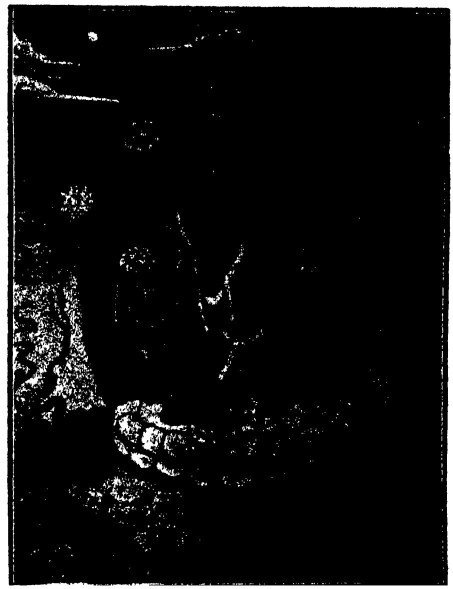
দেহশ্রী একটা স্বপ্নই মনে হবে। কাজেই বাস্তব বল্‌তে বুঝ্‌তে হবে খাঁটি ব্যাপার কি। চীনে বা জাপানে যা বাস্তব, এ-দেশে তা অবাস্তব—আবার ইউরোপে যা বস্তুপন্থী, এ-দেশে তা নয়। এ জন্য নানা দেশের realism বা বাস্তবের চেহারা বিভিন্ন। এক একটা দেশে এক একটি চেহারা একটা জাতিগত নমুনাকে (type) ফুটিয়ে তোলে। জাতি অন্তরে যা নিজের পক্ষে সুষমাযুক্ত মনে করে সে ভাবেই সকলকে গড়ে তোলে। এজন্য কোন চেহারা



রাধাকৃষ্ণ—মোলারাম

কিছু অদ্ভুত হলেই তা অবাস্তব হয় না। ইংরাজীতে একটা কথা আছে—সত্য জিনিস উপন্যাস অপেক্ষাও অধিক রহস্যময়।

এদেশের রূপবিদ্যা বাস্তবকে কখনও তাচ্ছিল্য বা প্রত্যাখ্যান করে নি; বরং বাস্তবের এত নিখুঁত চিত্র জগতে অন্য কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। শুধু চিত্রকলায় নয় ভাস্কর্যেও বাস্তব রচনায় ভারতীয় শিল্পী জগতের কোন শিল্পীর নিকট পরাজয় মানে নি। কোন রাজপুত চিত্র সম্বন্ধে পার্সি ব্রাউন সাহেব বলেন: "when the art represented realistic scenes of rural life, its animal drawing indicated a knowledge and nature surpassed only by the Japanese" ভাবার্থ—যখন চিত্রকলা গ্রাম্য-জীবনের জীবন্ত ও বাস্তব দৃশ্য নির্দেশ করতে অগ্রসর হয়েছে তখন তাতে প্রাকৃতিক ব্যাপার সম্বন্ধে এমন জ্ঞান দেখ্‌তে পাওয়া যায় যা শুধু জাপানীদের কাছে হার মানে। অন্যত্র উপরোক্ত লেখক বলেছেন যে, জঙ্গল দৃশ্যে ভারতীয় শিল্পীরা স্বভাবের সঙ্গে যেরূপ পরিচয় ও যোগ রেখেছে তা চিত্রকলায় অপরাজেয়।* এসব উক্তি হ'তে বোঝা যায় ভারতবাসীরা শুধু আকাশের দিকে চেয়ে চিরকাল ধ্যান

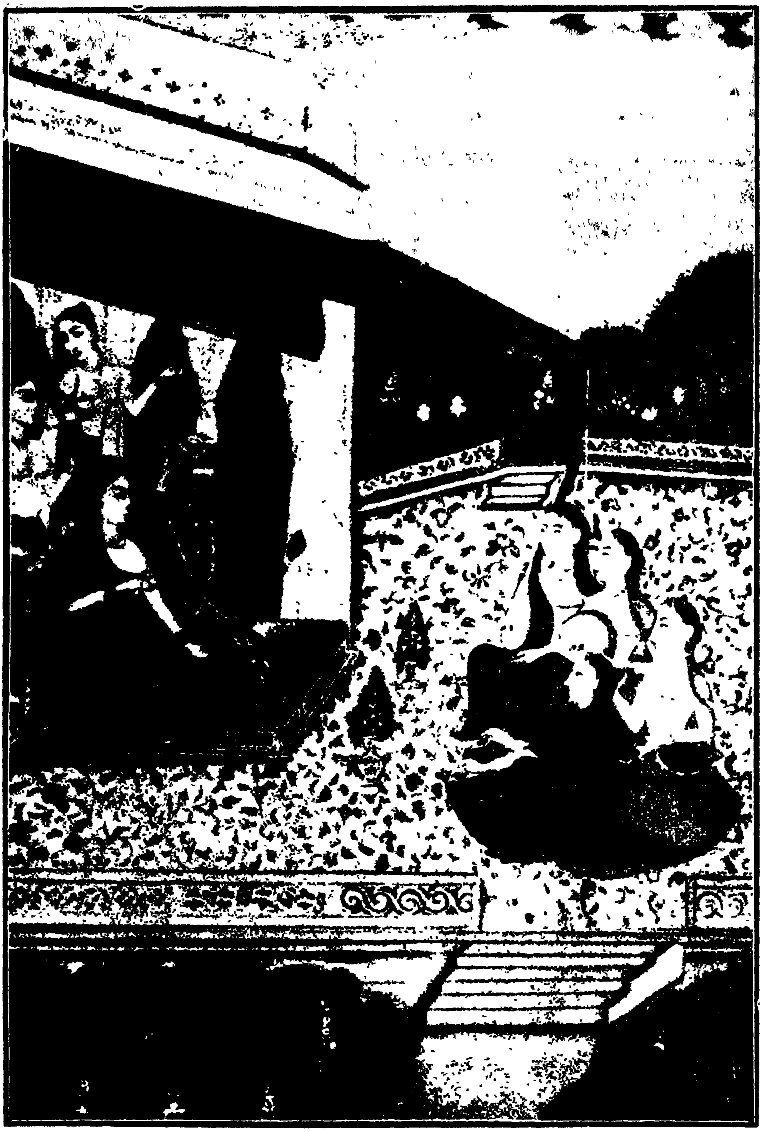


সবুজ তারা—নেপাল

করেছে একথা একটা অলীক অত্যুক্তি মাত্র। জগতের বিচিত্র রসসৃষ্টির সহিত চিরকাল এদেশের শিল্পীর প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল।

* In all those scenes the landscape is rendered with great feeliug, the distant hills and the nearer cover in which the animal has been located being depicted well, knowledge of nature which is unrivalled.

অনেকেরই একটা অলীক ধারণা—এদেশের শিল্পীদের কঙ্কালশাস্ত্র (anatomy) সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই ; এজন্য সে হাত পা দীর্ঘ করে এবং অবয়বগুলি পরিমাণ রক্ষা করে না ইত্যাদি। বস্তুত ইদানীং কোন কোন চিত্রকরের এই



সখি পরিবেষ্টিত রাধাকৃষ্ণ—নেপাল

রকম রচনার পক্ষপাতিত্ব দেখে অনেকের এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে। ভারতীয় বা "ওরিয়েণ্টাল্‌" চিত্র বললেই বুঝতে হবে এমন কিছু যা anatomyর সঙ্গে রহস্য বা বিদ্রূপ করেছে। বস্তুতঃ আধুনিক শিল্পীদের ছেড়ে দিয়ে প্রাচীন শিল্পীদের আলোচনা করতে গেলে এ রকম লঘু অসামর্থ্য কোথাও দেখা যায় না। সাঁচির ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে ফার্গুসন বলেন : "The treatment is frankly naturalistic. There is no attempt to idealise, no indication of the abnormally narrow waist or of the complete suppression of the muscular details ···There we have "the shoulders loaded with broad chains, the arms and legs covered with metal ring sand, the body encircled with richly lined girdles." Yet the principal anatomical facts are remarkably well given especially the modelling of the toes and the difficult movement of the hips. In fact it is very astonishing that on this, one of the earliest movements of Indian art we find such a high degree of technical achievements and such careful *study of anatomy*." এই উক্তি হ'তে দেখা যায় বহু বচনার সমগ্র কৃতিত্ব হ'তে ভারতের শিল্পীরা কোন কালে বঞ্চিত ছিল না। এদেশে শাস্ত্রকারেরা স্বভাববাদকে প্রত্যাখ্যান করে কোন নির্দ্দেশ দেওয়া দূরে থাক্‌—প্রাকৃতবাদ সমর্থন করেই অগ্রসর হয়েছে। অবশ্য দেবদেবী

মূর্ত্তি প্রাকৃতিক ব্যাপারই নয়—কাজেই সে সব সম্বন্ধে প্রাকৃত ব্যবস্থা অবলম্বন করা দেবত্ব-হীন করারই তুল্য হয়ে পড়ে।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকার অতি নিপুণভাবে চিত্রকলা সম্বন্ধে নির্দ্দেশ করেছে। চিত্রকলার তুল্য সফলতা কোথা? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন :—

সশ্বাস ইব যচ্চিত্রং তচ্চিত্রং শুভলক্ষণম।



মোগল চিত্র

যে চিত্র দেখে মনে হয় যে তা এমনি স্বাভাবিক যে শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলছে সে চিত্রই শুভলক্ষণযুক্ত। এরূপ স্বাভাবিক চিত্র আঁকার রীতিই সেকালে অভিনন্দিত হত। শকুন্তলা নাটকে দেখা যায় দুষ্মন্ত শকুন্তলা-চিত্র অঙ্কনে এইরূপ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছিল—কারণ বিদূষক সে চিত্র দেখে বল্‌ছে "এদের সঙ্গে কথা বল্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে।" শিল্পরত্নে আছে যে চিত্রকে দর্পণে বিম্বিত ছায়ার ন্যায় সাদৃশ্যযুক্ত হ'তে হবে। এর চেয়ে অধিকতর বাস্তববাদ কল্পনা করা যায় না।

কাজেই দেখা যাচ্ছে ভারতীয় চিত্রকলায় স্বভাববাদের স্বীকৃতি আছে। শুধু তাই নয়, অতি চমৎকার স্বাভাবিক চিত্রের নিদর্শন দেখেও মুগ্ধ হ'তে হয়। চিত্রকলায় Portrait বা চেহারা আঁকাতে স্বাভাবিকতার নমুনা পাওয়া যায়। রাজপুত চিত্রকলায় রাজাদের চিত্র দেখে মুগ্ধ হ'তে হয়। কোন ইউরোপীয় লেখক বলেন—"Portrait was the special feature of the Hill Rajputs." ভারতীয়

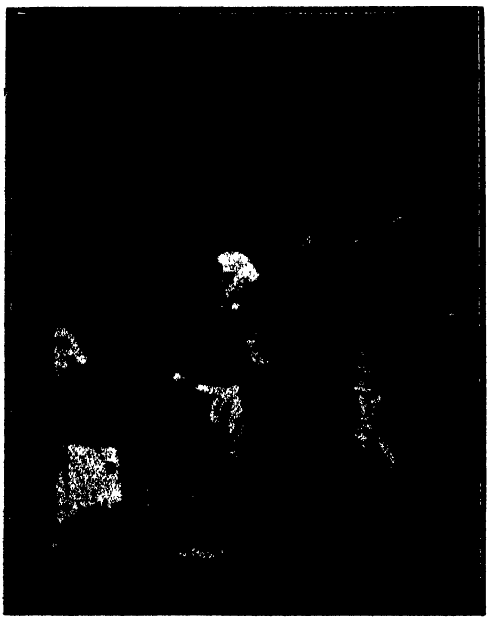


বাঘ গুহা

চিত্রকলার সমসাময়িক মোগল অধ্যায়েও এই স্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়। পার্সি ব্রাউন বলেন—"A keen appreciation of nature was also a characteristic of the mogul artist। জেহাঙ্গীর দুষ্প্রাপ্য পাখী বা জন্তুর হুবহু নকল করাতে ভালবাসতেন। এই প্রতিকৃতি রচনার প্রধান শিল্পী ছিল হিন্দু। তাদের ভিতর ভগবতী

ও হুনারের নাম প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আইনি-আকবরিতে আছে মোগল সম্রাট নিজের এবং সমস্ত আমির-ওমরাহদের প্রতিকৃতি রচনা করতে আদেশ দেন।

হিন্দু চিত্রকলা সম্বন্ধে অলীকভাবে বলা হয়েছে যে সে সব চিত্রে স্বভাববাদ দুর্লভ। বস্তুতঃ রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক চিত্রাদির সমগ্র আবেষ্টন অতি নিপুণ প্রাকৃতিক দৃশ্যে মণ্ডিত। অজন্তা চিত্রকলায় যে ছবিখানি মধ্যমণি—সেই চিন্তান্বিত বুদ্ধমূর্ত্তিতে কোন রকম অত্যুক্তি নেই। অতি সহজ ও স্বাভাবিকভাবে ছবিখানি আঁকা হয়েছে। আলো ও ছায়ার সাহায্যে গভীরতা



রাধাকৃষ্ণ—রাজপুত কাঙড়া

প্রতিপাদন করে চিত্রের যে স্বাভাবিকতা সম্পাদন করা তা অজন্তা চিত্রকরদের জানা ছিল। এমন কি ইউরোপের যে ছায়াপন্থী (Impressionist) রচনা প্রাকৃতিক দৃশ্যের হুবহুত্ব প্রতিপাদনে অদ্বিতীয় তা'রও আদিম ছায়া পাওয়া যায় বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী অজন্তার রচনায়। অজন্তার কোন কোন চিত্র দূর হ'তে বেশ সুগঠিত ও সুসম্পূর্ণ মনে হয় কিন্তু অতি নিকটে মনে হয়—সে সব যেন এলোমেলো ও শৃঙ্খলাহীন রচনা। দূরত্ব হিসেব করে কিরূপ রচনা করলে স্বাভাবিক হয় এই ধারণা এত পূর্ব্বে জন্মান এক আশ্চর্য্যের বিষয়। গ্রিফিথের Indian Antiquary তে আছে :—"One of the students when hoisted up on the scaffolding tracing his first panel on the ceiling naturally remarked that some of the work looked like child's work, little thinking that what seemed to him, up there rough and meaningless had been laid in with *a cunning hand*, so that when seen at its right distance every



প্রসাধন—রাজপুত

touch fell into its proper place." এ রকমের রচনায় প্রাকৃতবাদ সামান্য ব্যাপার নয়। কাজেই অজন্তার শুধু স্থলে স্থলে লীলায়িত বাহুলতা দেখে মনে করলে চলবে না এখানকার শিল্পীর প্রাকৃতিক ধর্ম্ম জানা ছিল না। বস্তুত অলঙ্করণের প্রসঙ্গেও ছোটখাট ফুল পল্লব প্রভৃতি অতি নিপুণভাবে আঁকা হয়েছে।

বৌদ্ধশিল্পের এই প্রাচীনতম নিদর্শন ও হিন্দুশিল্পের আদিতম দৃষ্টান্ত আলোচনা করা যাক। কিছুকাল পূর্ব্বে বাদামীর

তৃতীয় গুহায় কয়েকখানি চিত্রকলার নমুনা উদ্ঘাটিত হয়েছে। এত প্রাচীন রচনা অন্যত্র দুর্লভ। এই গুহায় মঙ্গলীশ নৃপতির একটা 'লেখ'ও পাওয়া গেছে এবং তাতে তারিখ দেওয়া আছে ৫০০শক অর্থাৎ খ্রীঃ ৫৭৮। এই গুহায় চিত্রকলার যে অস্পষ্ট ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে তাতে অজন্তার সহিত সমান ধর্ম্ম লক্ষ্য করা যায়। এই গুহার শিব-পার্ব্বতী রচনাতে একটা মৌলিক সহজ সংস্কারের ক্রিয়া দেখ্‌তে পাওয়া যায়। অজন্তার চিন্তান্বিত বোধি



রাধা—কাঙড়া

সত্ত্বের মত শিবপার্ব্বতীর আনন অতি স্বচ্ছ মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ; তাতেও স্বাভাবিকতার ছায়া অতি লোভনীয়ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। শুধু তা নয়, অতি মধুর ভাবকৌলীন্যে এ চিত্রগুলি ব্যাপ্ত হয়েছে; শুধু এলোমেলো রেখার কালোয়াতী মোটেই মুখ্য হয় নি। কাজেই স্বাভাবিকতাকে প্রত্যাখ্যান করেই ভারতীয় চিত্রকলার অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে একথা একটা অবান্তর উক্তি মাত্র।

তিব্বতীয় চিত্রকলার অত্যুক্তি একটা জানা ব্যাপার এবং তিব্বতীয় কলাও যে ভারতীয় প্রভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল তা'ও সকলের বিদিত। তিব্বতের রচনার ড্রাগন প্রভৃতি অতি-মানবীয় দৃষ্টিসৌন্দর্য্য হিসেবে মুগ্ধকর হ'লেও বাস্তবতা হিসেবে তেমন আলোচ্য নয়। অথচ Tsaparangএ যে সমস্ত চিত্র ও মূর্ত্তি ইদানীং আবিষ্কৃত হয়েছে (I. L. N. Feb. 17. 34.) তাদের স্বাভাবিকতা দেখে মুগ্ধ হতে হয়। একটি বোধিসত্ত্বের চারিদিকে কতকগুলি জন্তু এমন চমৎকারভাবে তৈরী হয়েছে যে মনে হয় সে সব বুঝি জীবন্ত।



বিষ্ণু—নেপাল

এ প্রসঙ্গে বাঘ-গুহার চিত্রের কথাও উল্লেখ কর্‌তে হয়। সেখানেও উদ্ভট কিছু নেই। একটি যৌথ দৃশ্যের নমুনা হতে দেখা যাবে শরীরের অতি নিপুণ ছন্দ কিরূপ স্বাভাবিকভাবে দেওয়া হয়েছে। নানা শারীরিক অবস্থার সামনের ও পার্শ্বের এবং নানা রকম মুখের অবস্থার শ্রী কি আশ্চর্য্যভাবে প্রকটিত করা হয়েছে! মোগল ও রাজপুত চিত্রকলা এ সৃষ্টির নিকট হার মানে। বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরকার থাড়াগত, অনৃজু, সাচীকৃতশরীর, অর্দ্ধ-

বিলোচন, পার্শ্বাগত, পরাবৃত্ত প্রভৃতি দেহ ও মুখভঙ্গীর যে সমস্ত নমুনা দিয়েছেন তার উৎকৃষ্ট কোন কোন দৃষ্টান্ত এই চিত্রে পাওয়া যাবে। অতি নিপুণভাবে প্রাকৃতিক ব্যাপারকে দেখবার ক্ষমতা না জন্মালে এ রকমের চিত্ররচনা সম্ভব নয়।

বস্তুতঃ বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরকার শুধু স্বাভাবিকতার ভিতরও যে সূক্ষ্ম পার্থক্য নিপুণ পর্য্যবেক্ষণ ও অঙ্কনের ধারা নির্দ্দেশ করেছেন তা কোন সাময়িক বা উদ্ভট ব্যাপার ছিল না—তা ভারতীয় চিত্রবিদ্যার প্রাণস্বরূপ ছিল। সুপ্ত ব্যক্তির চেতনা থাকে অথচ সে গতিহীন, মৃত



অজন্তা

ব্যক্তিও গতিহীন কিন্তু তার চেতনা থাকে না—এ দুটির স্থিতিগত সাম্যের ভিতরও পার্থক্য আছে। স্থিতির ভিতর এই পার্থক্যকে অনুধাবন করে চিত্রকলায় বিম্বিত করা অসাধারণ ক্ষমতার কাজ। অপরদিকে তরঙ্গ শিখা ধূম প্রভৃতির চঞ্চল ও হিল্লোলিত বিচিত্র বহুমুখী অবস্থা দ্যোতিত করা হয় গতিমূলক প্রাকৃতিক ব্যাপারের প্রতিপাদনে। অতি নিপুণ দ্রষ্টা না হলে এ সমস্তের গতি-ভঙ্গের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য্য কেউ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। ভারতীয় চিত্রকরকে এ সমস্ত চোখে দেখ্‌তে হয়েছে :—

তরঙ্গাগ্নি শিখা ধূমং বৈজয়ন্ত্যম্বরাদিকং
বায়ুগত্যা লিখেৎ যস্তু বিজ্ঞেয়ঃ স তু চিত্রবিৎ ॥
সুপ্তঞ্চ চেতনাযুক্তং মৃতং চৈতন্যবর্জ্জিতং
নিম্নোন্নত-বিভাগঞ্চ যঃ করোতি স চিত্রবিৎ।

আলো ও ছায়া সঞ্চারের দ্বারা এই বিভাগেরও প্রতিপাদন অজন্তার চিত্রকলায় আছে। ভারতবর্ষ হতেই তা চৈনিক চিত্রকলায় সঞ্চারিত হয়। জাপানের হরয়ুজি



সংগ্রাম—রাজপুত চিত্র

মন্দিরেও এই প্রথা ভারতবর্ষ হতে গৃহীত হয়। Waley বলেন :—

"The use of shading to obtain the appearance of relief was quite foreign to Chinese art ; but it is found in the Ajanta Frescow and in the wall-paintings of the Golden Hall at Horyuji."

ভারতীয় চিত্রকলার রাজপুত অধ্যায় অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যে

মণ্ডিত। নিপুণ প্রাকৃতিক রচনার ভিতরও এমন একটা আবহাওয়া ও রসশ্রী আছে যা একান্তভাবে ভারতীয়, ইউরোপীয় নয়। লতাপাতা তৃণগুল্মাদির এমন বিচিত্র হুবহু অনুসরণ জগতের কোন শিল্পকলায় দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। দোলায় দোদুল্যমান সুন্দরীর চিত্রে বৃক্ষপত্র ও ফুল কি অনির্ব্বচনীয়ভাবে হুবহু ও স্বাভাবিক হয়েছে। সমগ্র দৃশ্যটিই অতি চতুর পর্য্যবেক্ষণের ফল। হাওয়ায় সুন্দরীর বসন উড়ে যাচ্ছে—দোলার লীলায়িত ভঙ্গী সুন্দরীর দেহ-চাঞ্চল্যকে বরণ করে যে অপরূপ শ্রী দান করেছে—চিত্রকর তা অতি চমৎকারভাবে রচনা করছে। আর একটি চিত্রে একটি সুন্দরী দর্পণহস্তে বসে আছেন কাষ্ঠাসনে। সুনিপুণ রমণী পায়ে আল্‌তা পরিয়ে দিচ্ছে। সুন্দরী প্রসাধন-সম্ভার নিয়ে আস্‌ছে—এ-সমস্ত স্বাভাবিক অবস্থা অতি মনোহরভাবে আঁকা হয়েছে। এ চিত্রে গাছের ফুলগুলিকে যেরূপ ঠিকভাবে আঁকা হয়েছে তা



যশোদা-গোপাল—বাঙ্গালা পট

দেখে মুগ্ধ হ'তে হয়। এরূপ অবস্থান যারা মনে করে ভারতীয় চিত্রকলায় অস্বাভাবিকতার প্রাচুর্য্য বেশী তাদের সাহসের প্রশংসা কর্‌তে হয়। আর একখানি বাঙ্‌লা চিত্রে রাধা ও কৃষ্ণ উভয়ে চলে যাচ্ছেন—রাধা পেছনে একবার ফিরে দেখ্‌ছেন—এরূপ অবস্থা আঁকা হয়েছে। এ চিত্রের গাভীগুলিকে দেখে মনে হয় সেগুলি একেবারে জীবন্ত—শুধু তা নয়, জন্তুর মুখেও একটা বিশিষ্ট বৈচিত্র্যও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আলো ও ছায়ার সম্পাতে দূরত্ব ও গভীরতা প্রতিপাদিত হয়েছে। বর্ণের ঐশ্বর্য্যও এই চিত্রের একটি সম্পদ। তিহরী-গরওয়াল দরবারে রক্ষিত এই একখানি চিত্রেই ভারতীয় চিত্রের বিশিষ্টতা নির্ণয় করা যায়। মোলারামের রচিত রাধাকৃষ্ণের কথোপকথন দৃশ্যে আলো ও ছায়ার একটা সুনিপুণ ব্যঞ্জনা আছে। রাধাকৃষ্ণের



রাজপুত প্রতিকৃতি

মধুর মানবিকতা (humanism) সহজেই সকলের অনুরক্তি আকর্ষণ করে। এ-সব রচনা উদ্ভট খেয়াল নয়। হস্ত পদের অনাবশ্যক দীর্ঘতা সঞ্চার করা চিত্রগত সামঞ্জস্য বা শ্রীর উদ্ঘাটনে অপরিহার্য্য হয় নি। সামনের পিঞ্জরের ভিতর 'শারিকার চিত্র' ছবিটিকে আরও নিবিড় রসে ভরপুর করে তোলে। বলা হয়েছে প্রতিকৃতি রচনায় ও রাজপুতকলা প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল।

মোগল অধ্যায়ের প্রতিকৃতির যে সুযশ আছে তা ভারতীয় চিত্রকলার স্বোপার্জ্জিত সম্পদ্‌। সে সব প্রকৃতির বিশেষত্ব ভারতীয় রচনারই দান। শুধু প্রতিকৃতিতেই

এই শ্রেণীর রচনার স্বাভাবিকতা পর্য্যবসিত হয় নি। সম্রাট আকবরের আদেশে বাবরের যে আত্মজীবনী নকল করা হয়েছিল তার একখানি চিত্র বিলাতের Victoria ও Albert Museumএ আছে। ছবিখানি আশ্চর্য্যভাবে স্বাভাবিকতার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে। এ ছবিতে হাতীর, উটের ও মানুষের লড়াই আছে। এ সমস্ত অবস্থাগুলি অতি নিপুণভাবে আঁকা হয়েছে। হাতীগুলির চমৎকার স্বাভাবিক অবয়ব দেখে বিস্ময় জন্মে। দুটি উটের লড়াই এরূপ নিপুণভাবে ইউরোপীয় চিত্রকরও রচনা



নারীর প্রতিকৃতি—রাজপুত

করতে পারবে কিনা সন্দেহ। যে দেশে বহুপূর্ব্বে প্রস্তরেও পুঁথিতে চমৎকার হাতী রচিত হয়েছে, আমলপুব কোনারক প্রভৃতি স্থলে এখনও যে সব হাতীর মূর্ত্তি বিস্ময় উৎপন্ন করে, সে দেশের চিত্রকরের পক্ষে এরূপ প্রাকৃত রচনা মোটেই অসম্ভব নয়। বলা বাহুল্য এ ছবির শিল্পী ছিল একজন হিন্দু—তা'র নাম ছিল বড়-মধু। পাহাড়ের উপর লড়াইয়ের যে চিত্রখানি দেওয়া গেল তাতে উপত্যকা, পাহাড়ের শীর্ষদেশ, বৃক্ষাদিও বহুলোকের উচ্চ নীচ সমাবেশ প্রভৃতি যে রকম চমৎকারভাবে দেওয়া হয়েছে তাতে পার্সী ব্রাউন সাহেবের কথা বার বার মনে হয়। প্রকৃতির সহিত ও বড় বাস্তব ঘটনার সহিত চাক্ষুষ পরিচয় না থাক্‌লে এ-রকম চিত্র আঁকা যায় না। এ চিত্রে অতি চমৎকারভাবে দূরত্ব সূচিত হয়েছে। উচ্চে মেঘের স্তর ও নিম্নে গভীর পর্ব্বত-গহ্বরের সৌন্দর্য্য রচনায় পরপ্রেক্ষিত প্রথার সহিত গভীর পরিচয় সূচিত হয়।

নেপাল ভারতেরই অন্তর্গত। নেপালে হিন্দুরাজ-গণের আমলে চিত্রবিদ্যার খুবই চর্চ্চা হয়। দেবতা অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত শিল্পী দেবতাতেও মানবিকতা সঞ্চার করেছে। নেপালে রাজাদের ধাতুনির্ম্মিত যে প্রতিকৃতি রচনা প্রচলিত তা তুলনাহীন। মহারাজ ভূপতিমল্লের স্বর্ণপত্রমণ্ডিত যে প্রতিমা ভাটগাঁওতে আছে তা সৌন্দর্য্যে ও স্বাভাবিকতায় জগতের যে কোন মূর্ত্তির সমকক্ষ; ইউরোপীয়েরাও অবাক্ হয়ে এই মূর্ত্তি দেখে। বস্তুত স্বাভাবিকভাবে আঁকা বা মূর্ত্তিরচনায় নেপালের কলা প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। নেপালের চিত্রশিল্পের নমুনারূপে যে রাধাকৃষ্ণের সখীবেষ্টিত ছবি দেওয়া হ'ল তা একটি আশ্চর্য্য সৃষ্টি। রঙীন ছবি না দেখ্‌লে এর ভিতরকার ঐশ্বর্য্য বোঝা যায় না। এ চিত্রের ভিতরকার গাছগুলির প্রত্যেকটি পাতা স্বতন্ত্রভাবে আঁকা হয়েছে। মেয়েদের কাপড়চোপড়, অঙ্গভূষণ প্রভৃতি অতি সামান্য বিষয় অতি সূক্ষ্মভাবে রচিত হয়েছে। প্রত্যেক গাছের পাতা এক এক রকম। এরূপ স্বভাবপন্থী সৃষ্টি যে দেশে আছে সে দেশ চৈনিক বা জাপানী অত্যুক্তির কবলে পড়ার হেতু বোঝা যায় না। জাপানী চিত্রকলায় তারা মূর্ত্তিতেও তিব্বত-সুলভ আতিশয্যও বাড়াবাড়ি মোটেই নেই। স্বাভাবিকতা ও মানবিকতার যোগ হয়েছে গরুড়বাহন শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তিতে।

পরিশেষে বাঙ্গালার চিত্রকলার অসামান্য স্বাভাবিকতার দিকও উল্লেখ করা প্রয়োজন। যে দেশে কৃষ্ণনগরের পুতুল স্বাভাবিকতায় সকলকে তাক্ লাগিয়ে দেয় সে দেশের পটে যে স্বাভাবিকতা থাক্‌বে তা একান্তই অনিবার্য্য। কালীঘাটে পটের জন্ত রচনা অতি অনির্ব্বচনীয় প্রাকৃতিক মাধুর্য্যে মণ্ডিত। অতি সূক্ষ্মদৃষ্টি না হলে জন্তুর দেহসীমাকে এমনিভাবে রেখার ইন্দ্রজালে আবদ্ধ করা যায় না। বস্তুত স্বাভাবিকতা ভারতীয় চিত্রশিল্পে একটী স্থায়ী সম্পদ। চিত্রকলায় কালোয়াতী নানারকমের অত্যুক্তি ও আন্দো-লনে চিত্ররচনাকে উদ্বেলিত ক'রে তোলে সন্দেহ নেই—কিন্তু সকলের তাতে প্রীতিসঞ্চার হয় না। কাজেই জনসাধারণের তৃপ্তিবিধান যখন একটি অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য—তখন স্বাভাবিক-তার বর্জ্জন সব সময় পরমার্থ হয়ে উঠে না। স্বাভাবিক প্রতিকৃতি ও প্রতিমূর্ত্তির প্রয়োজন আছে—তাই সে সব রচিত হতে বাধ্য। ভারতীয় চিত্রকলাও ভূয়িষ্ঠভাবে প্রাচীন অনুশাসন কর্ত্তৃক পুষ্ট হয়ে এ ক্ষেত্রে রত্নপ্রসূ হয়েছে।

ব্রতী

শ্রীদুলালচন্দ্র মিত্র

১

বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল স্বরাজ আর আসিল না দেখিয়া নিশিকান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল; গোলামখানা পরিত্যাগ করা, আত্মীয়-স্বজনের স্নেহবন্ধন ছিন্ন করা, হেলায় কারাক্লেশ বরণ করা—এ সমস্তই কি প্রকাণ্ড ভুল বলিয়া শেষকালে ধার্য্য হইল! নিশিকান্ত চিন্তা করিল "এখন কি করা যায়!"—এমন সময় পুনরায় নেতৃবাণী তাহার মরমে পশিল; সে বেশ বুঝিতে পারিল যে পল্লীমাতার কথা বিস্মৃত হইয়া সহর-মায়াবিনীর কুহকে পড়িয়াই সব কিছু ভুল হইয়া গিয়াছে এবং সেইজন্যই এত বিফলতা —অতএব গ্রামে গিয়া স্বরাজ-সাধনা করিতে হইবে এই কথাটা খুবই ঠিক্। এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গেই নিশিকান্ত তাহার দলপতির নির্দ্দেশানুযায়ী কলিকাতার নিকটবর্ত্তী একগ্রামে যাইয়া স্বরাজদেবীর বোধন আরম্ভ করিল; যাত্রার পূর্ব্বে নেতৃবরের পাদপদ্ম স্মরণ করিতে সে বিস্মৃত হয় নাই।

গ্রামের উপকণ্ঠে হাড়ি, মুচি, ডোম, ক্যাওরাদের পল্লীর মাঝে নিশিকান্ত তাহার স্বরাজ-আশ্রম স্থাপিত করিয়াছে খড়ের একটা ছাউনীর ভিতর। বাক্‌পটুতায় নিশিকান্ত প্রসিদ্ধি লাভ না করিলেও অল্পবিস্তর সিদ্ধিলাভ করিয়াছে এবং সেই গুণে সে হাড়িমুচিদের মধ্যে বেশ আধিপত্য জমাইয়া আশ্রমটীকে জাঁকাইয়া তুলিয়াছে। তাহার দলপতি মধ্যে মধ্যে 'মোটর্‌'যান যোগে আশ্রম পরিদর্শন করিতে আসেন এবং ঘণ্টা দুই-তিন পরেই মোটারের ভেঁপু বাজাইতে বাজাইতে কলিকাতায় ফিরিয়া যান।

এই ভাবেই নিশিকান্তের স্বরাজ-সাধনার আর একটা বৎসর বুঝি অতিবাহিত হয়! সে আবার ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই পরিস্থিতিতে দলপতি আসিয়াছেন আশ্রম পরিদর্শনে।—

"আজকে আশ্রমটা এত ফাঁকা ফাঁকা ঠেক্‌ছে কেন নিশি?"

"আর 'স্যার্‌' (মহাশয়)—আশ্রম তো আর টঁ্যাকে না! আর, টেঁক্‌বেই বা কি ক'রে……"

"চেষ্টা কর নিশি; বিনা চেষ্টায় কি কিছু হয়! সত্যকে আঁক্‌ড়ে থাক, সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।"

"আপনারা 'স্যার্‌' চেষ্টা কাকে বলেন, আর 'সত্য' কাকে বলেন—তা তো এ পর্য্যন্ত বুঝলাম না! চেষ্টা ক'রে যা সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, দেখুন-না চোখের সাম্‌নে··· ।"

"আশ্রমবাসীর সংখ্যা বড়ই কমে গেছে—সে কথা তো প্রথমে এসেই বলেছি।"

"কম্‌বে না! খাবার লোভে তো তারা এসেছিল! দেখুন দেখি ছোঁড়াগুলোর চেহারা; আরও হাড্ডিসার হয়ে গেছে।"

"কি কারণ! এখানকার জলহাওয়া তো ভাল। স্বাস্থ্যবিধান শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে তুমি বোধ হয় মনোযোগ দিচ্ছ না?"—

এই অযথা দোষারোপে নিশিকান্তের মেজাজ আরও বিগ্‌ড়াইয়া গেল; সে বিরক্তিসূচক স্বরে বলিল—"পেটের খোরাক তো চাই—শুধু 'ন্যান্‌টার্ণ লেক্‌চারে' (দীপালী-বক্তৃতায়) কি স্যার্‌ শরীর বনে ওঠে?"

দলপতি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন? আশ্রমে প্রস্তুত খাদ্য-দ্রব্যে কি যথেষ্ট 'ভাইটামিন্‌' (খাদ্য-প্রাণ) থাকে না!" পরক্ষণেই চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া বলিলেন—"কৈ ভাইটামিন্ তালিকা তো দেখতে পাচ্ছি না, সেটা সর্ব্বদা চোখের সাম্‌নে থাকা উচিত।"

"পয়সা দিয়ে তো আর খাদ্য-দ্রব্য কেনা হয় না যে ভাইটামিন্-তালিকা দেখে জিনিস কিনব! হাটের দিনে ভিক্ষে ক'রে যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে তো আমাদের দিন গুজরান্ হয়।"

"ও কথা ব'লে গ্রামবাসীদের অবমাননা ক'র না নিশি! তাঁরা কর্ত্তব্য পালন করেন মাত্র ভিক্ষা দেন না। হাটের দিনে কি কি ভোজ্য পাওয়া যায়?"

নিশিকান্ত পুনরায় বিরক্তিসূচক স্বরে বলিল "কি আর পাওয়া যাবে! উচ্ছে, করলা, কচু, ঝিঙে—হ'ল বা একটা লাউ বা এক টুকরো কুমড়ো পাওয়া যায়; যদি বা ক্বচিৎ আলু, বেগুণ বা দু'-চার টুকরো মাছ পাওয়া গেল, তাও তো ওই উচ্ছে-করলা-কচুর সঙ্গেই আগুনে চাপাতে হয়—আলাদা রাঁধবার তো আর বিধান নেই···"

নিশিকান্তের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দলপতি সচকিত-ভাবে বলিলেন "দেখ, একাধিক ব্যঞ্জনের বন্দোবস্ত যেন কখনও ক'র না! গুরুদেব বলেন—একাধিক ব্যঞ্জনে ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয়।"

২

নিশিকান্তের আশ্রম বুঝি আর চলে না! গ্রামবাসী ভদ্র গৃহস্থেরা সপ্তাহশেষে দুই-চারি মুঠি করিয়া চাউল ভিক্ষা দিতেন আশ্রমবাসীদিগের জন্য; কিন্তু তাঁহারা তাহা বন্ধ করিয়াছেন; কারণ—দুই একঘর মেথর যাহারা ছিল তাহারা না-কি নিশিকান্ত প্রদত্ত শিক্ষার ফলে স্বজাতি-উপযুক্ত কার্য্য করিতে নারাজ—কলিকাতায় যাইয়া তাহারা সাহেব-সুবোদের 'খিৎমৎগার' হইয়াছে। দলপতি পরি-দর্শন কার্য্যে আসিয়া এই বার্ত্তা শ্রবণে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন; ক্ষণেক পরে তিনি বলিলেন "দেখ নিশি, পরের রবিবারে তুমি এক বিরাট সভার বন্দোবস্ত করে রেখ; আমি গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে বক্তৃতা দেব যে বিষ্ঠা কত প্রয়োজনীয় দ্রব্য—কি ভাবে কেমন করে তাঁরা নিজেরাই সেটা কাযে লাগাতে পারেন—সে কথাটা যদি তাঁরা জানতে পারেন, তা হ'লে মেথর ভায়েদের এই উচ্চ-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে তাঁদের আর কোনই অভিযোগ থাকবে না।"

"সভার বন্দোবস্ত করে দেব'খন, কিন্তু আপনার এই বক্তৃতা শুনে গাঁয়ের লোক আরও ক্ষেপে যাবে না তো স্যার!"—এই কথা অতর্কিতভাবে বলিয়াই নিশিকান্ত দলপতির মুখের দিকে তাকাইল; তাঁহার মুখবিকৃতি দেখিয়া সে বুঝিতে পারিল যে কথাটা বলা ঠিক্ হয় নাই। দলপতির মনস্তুষ্টির জন্য তৎক্ষণাৎ সে পুনরায় বলিল—"স্যার, আজ ভাগাড়ে একটা মস্ত মোষ পড়েছে খবর পেয়েছি—ছাল ছাড়ান শিখবেন বলেছিলেন—আজ তাহ'লে চলুন—নীলু সর্দ্দারকে বলে রেখেছি।"

দলপতি গম্ভীরভাবে বলিলেন "তবে তাই চল।"

নীলু সর্দ্দারের সহিত নিশিকান্ত ও তাহার দলপতি ভাগাড়ের অভিমুখে যাইতেছে। পথে দূর হইতে শকুনির ঝাঁক দৃষ্টিগোচর হইল; কি জানি কেন, শকুনির ঝাঁক দেখিয়া নিশিকান্ত বলিল—"ভাগাড়ের লাসগুলো যদি আমাদের কাযে লাগিয়ে দেওয়া হয়, তা হ'লে শকুনিরা কি খাবে স্যার্?"

নিশিকান্তের জিজ্ঞাসা শুনিয়া দলপতির গতি মন্থর হইয়া গেল; তিনি আনন্দবিহ্বলভাবে নিশিকান্তের মুখের দিকে তাকাইলেন এবং পরক্ষণেই গদগদ-স্বরে বলিলেন, "তোর মনটা কি সত্যি সত্যি শকুনিদের জন্য কাঁদছে নিশি!"

৩

অ্যাল্বার্ট্-হলে মহতী জনসভা। "জুলু কর্ত্তৃক হনুলুলু আক্রমণ ও অধিকারে হনুলুলুবাসিগণের প্রতি ভারতবাসি-গণের সহানুভূতি প্রকাশ"—ইহাই হইল সভার আলোচ্য বিষয়। ক্ষণিক মুক্ত ক্ষণিক রুদ্ধ স্বরে বক্তারা বক্তৃতা দিয়া যাইতেছেন একজনের পর আর একজন; নরম-গরম বক্তৃতা শুনিতেছি দ্বারের একপাশে দাঁড়াইয়া—স্থানাভাবে হল্-ঘরের ভিতরে যাইয়া আসন গ্রহণ করিতে পারি নাই; এমন সময় নিশিকান্ত আসিয়া বলিল "কি দাদা, খবর কি?"

"বড্ড ভীড়, চল বাইরে যাই"—এই কথা বলিয়া আমি হল-ঘরের বাহিরে আসিলাম, নিশিকান্তও আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিল; আমরা দুইজনেই সিঁড়ির উপরের চাতালে আসিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলাম।—

"তার পর নিশিকান্ত, হঠাৎ এ সময় আশ্রম ছেড়ে কল্‌কাতায়?"

"আর বলবেন না—আশ্রম চুলোয় গেছে"—এই কথা বলিয়াই নিশিকান্ত আমার দিকে আরও অগ্রসর হইয়া আসিল এবং বলিল "দাদা, ও সব বাজে কথা আর তুলবেন না—এবার আর দেশ-উদ্ধার নয়, এবার নিজেকে উদ্ধার—বুঝলেন দাদা?"

"তাতো বুঝলাম, কিন্তু উদ্ধারের উপায়?"

"উপায় ঠিক্ হয়ে গেছে—গুড় আর ঢেঁকী-ছাটা চা'ল

এত আমদানী করবার বন্দোবস্ত করেছি যে সারা কল্‌কাতায় সাপ্লাই (সরবরাহ) করব—বুঝলেন দাদা।"

"দোকান কোথা খুলেছ?

"দোকান আর কোথা খোলা হ'ল ছাই—আমাদের যা সব উন্‌পাজুরে দলপতি জুটেছে, কি হবে বলুন।"

"এ ব্যাপারে দলপতি আর কি করবেন বল।"

"ওই তো মজা! এখানেই তো আমাদের সবায়ের মরণ! আমার 'পার্টনার্' (অংশীদার) বললে, কর্ত্তার একটা 'সার্টিফিকেট' (প্রশংসা-পত্র) না হ'লে কি ক'রে হয়? কাযেই গেলাম কর্ত্তার কাছে ·····"

"আশ্রম উঠে যাওয়ার দরুণ কর্ত্তা বোধ হয় খুব চোটে আছেন?"

"আশ্রমের নিকুচি করেছে, কথাটা আগে শুনুন-না দাদা!"—আমি হাসিতে লাগিলাম; নিশিকান্ত বলিল—"কর্ত্তা সব কথা শুনে বললেন 'ঢেঁকী ছাটা চা'ল যে কতখানি উপকারী, তা' তো এখনও ঠিক্ হয় নি নিশি—সার্টিফিকেট (প্রশংসা-পত্র) দেবো কি ক'রে!"

"সে আবার কি কথা হে!"

"ব্যস্ত হচ্ছেন কেন শুনুন-না। কর্ত্তার গুরু না-কি বলেন, উদুখলে ভাঙা চালই হ'ল উম্‌দা (সরেশ)—আমাদের 'বাঙ্গালী'র ঢেঁকীর বদলে উদুখল প্রবর্ত্তিত করতে হ'বে। দেখুন তো, এ কি গেরো! হ্যাঁ দাদা, উদুখলে ধান ভানা যায়!"

"কেন যাবে না? দেখছ উদুখলে ফেলে বাঙ্গালা দেশটাকেই ভাঙ্‌তে আরম্ভ করেছে যখন······"

আমার কথায় বাধা দিয়া নিশিকান্ত বলিল "যা বলেছেন দাদা—গরম গরম বক্তৃতা শুনে যখন লেখাপড়া ছেড়ে দেশ-উদ্ধারে ব্রতী হয়েছিলাম, তখন তো জানতাম পুলিশের ডাণ্ডা জয় করলেই 'মার্ দিয়া কেল্লা'—কিন্তু এখন দেখছি ওরে বাস্! উদুখলের ডাঁটিও নেহাৎ কম যান্ না······

নিশিকান্তের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই—হল্-ঘরের ভিতর হইতে শ্রোতাগণ বাহিরে আসিতে আরম্ভ করিলেন; আমরাও সেই জনস্রোতের সহিত নিম্নতলে নামিয়া আসিয়া নিজ নিজ গন্তব্যপথে প্রস্থান করিলাম।

বাসিব তোমারে ভাল

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত এম-এ

যুগ যুগ ধরি' জনম লভিয়া
বাসিব তোমারে ভালো;
তুমি যে পরম প্রেমটুকু প্রিয়,
সুধা মাখাইয়ে ঢালো।
আকাশে তোমার স্বরূপ ছড়ানো,
বাতাসে তোমার সুবাস জড়ানো,
স্বরগে মরতে হিয়ার পরতে,
জ্বলে যে তোমারি আলো!
তোমারি স্মরণে কারণাকারণে,
চোখে বারি মোর ঝরে গো কেন?
তাই বলি আজ, কাজ বা অ-কাজ
তোমারে সঁপিতে পারি গো যেন!
করুণার বারিকণাটুকু দিয়ে
ধুয়ে দিও যত কালো।

সনেট

শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম-এ

হাসিগানে—যৌবনের উচ্ছল লীলায়
চপল জীবন সখি, যায়—চ'লে যায়
নদীর হিল্লোলসম! জ্যোৎস্না-রজনীর
চম্পক-সৌরভ করে আজিও অধীর
মোদের অন্তর; তীব্র কেতকী-সুঘ্রাণ
প্রাবৃটের মোহে দেয় ভরিয়া পরাণ;
নিরমল শরতের শুভ্র শেফালিকা
পর্ণের সম্পুট ভরি' আনন্দ-লিপিকা
বহি' আনে প্রাতে। মুগ্ধ স্বপন-অঞ্জন
আজিও র'য়েছে চোখে—তাই পুরাতন
জরাজীর্ণ ধরণীরে লাগে এত ভালো!
তবু অয়ি গরবিণী, তুমি জান না লো—
ব্যাধসম ফিরে জরা মোদের পশ্চাতে,
এ যৌবন-মৃগ লাগি' শরচাপ হাতে!

বাঙ্গালা বর্ণমালার সংস্কার

শ্রীব্রহ্মানন্দ সেন

বাঙ্গালার বানান সমস্যার সমাধান তথা ভাষা সংস্কার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া 'দেব দেবী' মিলিত শক্তি লইয়া 'ভারতবর্ষে' অবতীর্ণ হইয়াছেন। ১৩৫২ সালের চৈত্র মাসের ভারতবর্ষে প্রথম প্রবন্ধ শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব লিখিত "চলিত ভাষার সংস্কার" দ্রষ্টব্য। তাঁহাদের প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। যে কাজের পরিণাম জনসাধারণকে ভোগ করিতে হইবে প্রয়োজন বোধ করিলে দেবদেবীর বিনীত ভক্তও তাহার প্রতিবাদ করিতে পারে।

আলোচ্য প্রবন্ধের মধ্যে বানান সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রস্তাব অনেক অংশেই অনুমোদন করা যাইতে পারে কিন্তু বর্ণ সংক্ষেপ বিষয়ে তাঁহাদের কালাপাহাড়ী মতামত বাণীভক্তদের প্রাণে ভীতির সঞ্চার করে। তাই এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন আছে মনে হয়।

প্রথমে স্বরবর্ণ সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাউক। লেখক লেখিকা বলিতে চাহেন 'চলিত বাঙ্গালায় হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের বালাই নেই' এবং এই অজুহাতে তাঁহারা দীর্ঘ ঈকার ও দীর্ঘ উকার উঠাইয়া দিতে চাহেন। কিন্তু এটা তাঁহাদের জবরদস্তি মতামত বলিয়াই মনে হয়। চলিত বাঙ্গালা বলিতে শুধু গদ্যই বুঝায় না। পদ্যও ইহার অন্তর্গত। লেখক-লেখিকা দুইজনেই তো কবি। তাঁহারা কি জোর করিয়া বলিতে পারেন তাঁহাদের লিখিত কবিতা পড়িতে হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণের কোন দরকার করে না অথবা শুধু হ্রস্ব উচ্চারণ করিতে গেলে ছন্দ তাল ঠিক রাখিয়া পড়া যায়? হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণ ছাড়া যে কবিতা পাঠের কোন তাৎপর্য্যই থাকে না তাহা তাঁহারা ভুলিয়া যান কেমন করিয়া?

শুধু পদ্যে কেন গদ্যেও যে রীতিমত দীর্ঘ উচ্চারণ আছে তাহা তাঁহারা কতকগুলি দীর্ঘস্বরযুক্ত শব্দ মনে মনে উচ্চারণ করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। বাঙ্গালার যে অংশের অধিবাসীদের 'নদীয়া' 'বাঁকুড়া' ইত্যাদি উচ্চারণের অবসর হয় না, 'ন'দে' 'বাঁকড়ো' ইত্যাদি উচ্চারণ করেন তাঁহাদের জিহ্বায় হয়তো দীর্ঘ উচ্চারণ না থাকিতে পারে। কিন্তু তাঁহারাই তো বাঙ্গালার সব নহেন। এমন অংশও আছে যেখানের অধিবাসীরা 'নদীয়া' 'বাঁকুড়া'কে বানান অনুযায়ী উচ্চারণই করেন এবং দীর্ঘস্বর যুক্ত বর্ণকে দীর্ঘ করিয়াই উচ্চারণ করেন।

তাঁহারা কোন কোন স্থানে ইংরাজি নজীর দেখাইয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু সেই ইংরাজিতেও স্বরবর্ণের দ্বিত্ব ব্যবহারে দীর্ঘ উচ্চারিত শব্দের বানানের ব্যবস্থা আছে। i এবং u দিয়া যেমন হ্রস্ব ই এবং হ্রস্ব উকার যুক্ত শব্দের বানান করা হয় তেমনি আবার 'ee' এবং 'oo' দিয়া দীর্ঘ ঈ এবং দীর্ঘ উকার যুক্ত শব্দের বানান করা হয়। দেব দম্পতি যদি 'ী'কারের বোঝা কমাইতে চাহেন তবে 'দেবী' রূপান্তর গ্রহণ করিয়া দেবি'রূপে শোভা পাইতে পারেন। 'ি'কার অবশ্য ব্যঞ্জন বর্ণের পরেই বসান উচিত। দীর্ঘ উকার সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা চলিতে পারে। এখানে আর একটি কথা বলা দরকার। যে যুক্তি দেখাইয়া লেখক-লেখিকা 'ি'কার আগে না বসাইয়া পরে বসাইবার পক্ষপাতী, সেই যুক্তি বলেই 'ে'কারও বর্ণের আগে না বসাইয়া পরে বসান উচিত।

তাঁহারা 'ৌ'র (ঔকারের) 'ে' অংশ বাদ দিয়া বাকী 'ৗ' অংশ দিয়া ওকারের কাজ চালাইতে বলিয়াছেন। কিন্তু 'ৗ' চিহ্নটি শ্রীযুক্ত যোগেশ বিদ্যানিধি মহাশয় 'আউ' উচ্চারণের বানানকালে ব্যবহারের পক্ষপাতী। এখানে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। বিদ্যানিধি মহাশয় প্রেসের কাজ কমাইবার জন্য দুইটি স্বরের (া এবং উ) বদলে একটি স্বরের (ৗ) পক্ষপাতী। অথচ তাঁহারা সেই একই কারণে একটি স্বর কমাইয়া সেই স্থানে দুইটি স্বরের পক্ষপাতী ('ঐ'র বদলে 'অই' এবং 'ঔ'র বদলে 'অউ')। কাজেই এই ডিমক্রেসীর দিনে ভুক্তভোগী প্রেসের কম্পোজিটারদিগের ভোট লইয়াই ইহার মীমাংসা হওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে 'ঐ' এবং 'ঔ'র উচ্চারণ অই বা অউ নহে। তাহাদের উচ্চারণ 'অ্ই' এবং 'অ্উ'।

স্বরবর্ণ সমস্যা সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত—এবারে ব্যঞ্জনবর্ণ সমস্যার আলোচনা করা যাউক। তাঁহারা 'ঙ' বাতিল করিবার পক্ষপাতী। ইহাতে আপত্তি করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু 'বাঙ্গালী'র প্রস্তাবিত বানান 'বাংআলী' না লিখিয়া বাংলী লেখাই আমার মতে অধিক যুক্তিসঙ্গত। 'ও'র যদি আকার (া) দেওয়া চলে তবে অনুস্বারেই (ং) বা তাহা চলিবে না কেন? চোখে বাধিবার কথা বলিলে বলিব দুইটিই চোখে বাধে। অভ্যস্ত হইলে ক্রমে সহিয়া যাইবে।

এবারে 'ণত্ব' 'ষত্বের' আলোচনা করা যাউক। আলোচ্য প্রবন্ধে তাহারা 'মৌখিক ভাষা ণত্ব-ষত্বের ধার ধারেনা' এই অজুহাতে 'ণ' একেবারেই বাতিল করিয়া দিতে চাহেন। ভাষা না ধার ধারিলেও উচ্চারণ ধার ধারে বই কি। তাঁহারা শুধু 'ন' দিয়াই কাজ চালাইতে চাহেন চালান কিন্তু উচ্চারণের যে বিভিন্নতা এখনও আমাদের মুখে আছে তাহা তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। টণক; ষণ্ড, ভেরেণ্ডা এবং দীনেশ দত্ত, সন্দেশ প্রভৃতি শব্দের 'ণ' ও 'ন' উচ্চারণ করিয়া দেখিলে তাঁহারা নিজেরাই তাঁহাদের ভুল বুঝিতে পারিবেন। শেষোক্ত শব্দগুলির 'ন' উচ্চারণ করিতে জিহ্বা দাঁতের আগায় আসিয়া ধাক্কা দেয়। কিন্তু পূর্ব্বের গুলির বেলায় তাহা হয় না। অবশ্য 'ণ'র ঠিক শুদ্ধ উচ্চারণ এখন অনেক সময়েই আমরা করি না। কিন্তু দুই 'ন'এ উচ্চারণে পার্থক্য এখনও আমাদের মুখে উচ্চারিত হয়।

লেখক লেখিকা উচ্চারণ না থাকার দোহাই দিয়া 'শ ষ, স' এই ত্রিমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে ব্রহ্মরূপ 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'এর প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন।

স্বরান্ত 'স'এর উচ্চারণ বেশীর ভাগ জায়গাতেই নাই বটে কিন্তু একেবারেই যে নাই তাহা বলা যায় না। তাহা ছাড়া যুক্ত বর্ণে হসন্ত 'স্'এর উচ্চারণ তো মোটেই বিকৃত হয় নাই। কাজেই 'স' এর মায়া ত্যাগ করিলে লেখক দম্পতি গৃহেই বা 'বাস্তব্য' করিবেন কি করিয়া—আর রাস্তায় চলিবেনই বা কাহার ভরসায়? 'স'এর খাঁটি উচ্চারণ এবং 'ছ'এর পূর্ব্ববঙ্গীয় অশুদ্ধ উচ্চারণ হুবহু এক। কিন্তু যদি 'স'এর অভাবে 'বাছ্‌ত' না হইয়া 'আছতে' চলিতে বলা যায় তবে তাঁহারা বা বঙ্গদেশবাসী আর কেহ সে আদেশ মানিয়া চলিবেন কি? আবার অনভ্যাসে 'রাছ্‌তায়' চলিতে গিয়া বারবার হোচট্‌ খাওয়ার সম্ভাবনা নাই কি? স্বরান্ত 'স' ও বাতিল করা চলিবে না। কারণ সংস্কৃত ইংরাজি পারসী প্রভৃতি ভাষার শব্দাবলী প্রয়োজন মত বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিতে গেলে 'স'র শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নাই। আর 'শ' ও 'ষ'এর একটিকে যদি বাতিল করিতে হয় তবে 'ষ'কেই বাতিল করা উচিত। বাঙ্গালা ভাষায় 'স' যুক্ত শব্দ সকলের চেয়ে বেশী, তাহার পরেই 'শ' যুক্ত শব্দ। 'ষ' যুক্ত শব্দ তুলনায় অনেক কম।

তাঁহারা রেফ ছাড়িতে রাজী নহেন। কারণ দ্বিত্বরূপী হরফি দৈত্যের হাত হইতে ত্রাণ পাইতে হইবে। নচেৎ 'ধর্ম্ম' 'কর্ম্ম' বাঘাত ঘটে। কিন্তু 'ধরম্‌' 'করম্‌' করিলে যে সে দৈত্য আপনিই দূরে পালায়, রেফ-রূপী বজ্রের দরকার হয় না—এ সত্য তাঁহারা নিজেরা এ সকল আচরণ করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। আর 'রেফ'এর আবির্ভাবেই তো দ্বিত্ব দৈত্যের আবির্ভাবের সম্ভাবনা থাকে; নচেৎ তাঁহাদের 'ধর্ম্ম' 'কর্ম্মে' হস্তক্ষেপ করিবার জন্য মোটেই তাহার মাথা ব্যথা ছিল না, এ সত্যটি তাঁহারা ভুলিয়া যান কেন? তাহা ছাড়া 'রেফ' ঠিক অক্ষরের মাথায় রাখিতে চাহিলে প্রত্যেকটি হরফের দুই রকম সেট্‌ (চওড়া ছাঁচ এবং সরু ছাঁচ) রাখিতে হয় তাহা প্রেসে খোঁজ লইলেই তাঁহারা জানিতে পারিবেন। তবে 'রেফ'কে যদি একটু ডাইনে সরাইয়া 'ধর্ম' তাঁহাদের মতি হয় তাহা হইলে এক সেই হরফেই চলিবে। কিন্তু তাহাতে দুই অক্ষরের মাঝে একটু বেশী ব্যবধান হইয়া যায় এবং অনভ্যস্ত চোখে বাধে। ঠিক এই কারণেই যজ্ঞ বিজ্ঞ প্রভৃতির 'ঞ'র বদলে 'ঁ' দিয়া বানান করিতে গেলে তাহাতে প্রেসের কাজের লাঘব হইবে না।

লেখক লেখিকা 'ব'ফলা তুলিয়া দিয়া শুধু 'য' ফলার জোরে বঙ্গবিজয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন। কিন্তু অস্ত্রটি ছুঁচাল হইলেও সকল বাঙ্গালীই ইহাতে বশ মানিবে না। কোন ক্ষেত্রে আবার তাঁহারা এ অস্ত্রটিও ব্যবহার করিতে রাজী নহেন। ফলা একেবারেই তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী। 'ঐশ্বর্য্য'কে নাকি তাঁহারা 'ঐশর্য্য' উচ্চারণ করেন। আমি এরকম উচ্চারণ এই প্রথম শুনিলাম এবং বিভিন্ন অংশের কয়েকজন বাঙ্গালীকে দিয়া শব্দটির উচ্চারণ করাইয়া শুনিলাম। দেখিলাম শব্দটির 'ব'ফলা যুক্ত উচ্চারণ করেন এমন লোকের সংখ্যাই অত্যন্ত বেশী। বাঙ্গালার কোন বিশেষ অংশের লোকেরা সে স্থানের জলবায়ুর প্রভাবে জিহ্বার জড়তাবশতঃ যদি অশুদ্ধ উচ্চারণ করেন তবে সমস্ত বাঙ্গালাভাষাভাষীকেই সেই উচ্চারণ মানিয়া লইয়া সেইভাবেই লিখিতে হইবে এমন অদ্ভুত কথা কে কবে শুনিয়াছে? বর্ণ-সংস্কার করিতে হইলে বাঙ্গালার প্রত্যেক অংশের অধিবাসীদের উচ্চারণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া এ কাজে হাত দিতে হইবে।

তাঁহারা 'ব'ফলা বাতিল করিয়া শুধু 'য'ফলা রাখিতে চাহেন। কিন্তু 'ব'ফলা ও 'য'ফলার উচ্চারণ কি এক? বাঙ্গালার কোন অংশের লোকেরা হয়তো 'ব'ফলা ও য'ফলার একইরূপ উচ্চারণ করেন। কিন্তু অনেক অংশের অধিবাসীদের উচ্চারণে 'ব'ফলা ও 'য'ফলায় পার্থক্য খুব স্পষ্টভাবেই বুঝা যায়। লেখক লেখিকার মুখেই কি সত্য এবং দ্বিত, শস্য এবং নিজস্ব প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণে সত্যই কোন পার্থক্য নাই? অশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য শব্দ বা অক্ষর দায়ী নহে। দায়ী উচ্চারণকারী নিজে। অশুদ্ধ উচ্চারণ হিসাবে বানান করিতে গেলেই ভাষায় অনাবশ্যক প্রাদেশিকতা আসিয়া পড়িবে।

পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের লোকরা কথা বলিবার সময়ে বর্গের চতুর্থ বর্ণ শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করেন না। অবিকল তৃতীয় বর্ণের মত উচ্চারণ করেন। শুধু উচ্চারণের ঢংএর তফাৎ করেন। যথা—ঘাট=গাট, ঝাউ=জাউ, ঢাক=ডাক, ধন্দ=দন্দ ভাত=বাত। লিখিয়া ইহার উচ্চারণ বুঝান যাইবে না। কোন পূর্ব্ববঙ্গবাসীকে দিয়া উচ্চারণ করাইয়া শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন। (শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি পাঞ্জাবের কোন অংশে ঘোড়ার উচ্চারণ কোড়া)। কিন্তু ভাষা লিখিতে গিয়া যদি পূর্ব্ববঙ্গবাসী বর্গের চতুর্থ বর্ণের পরিবর্ত্তে তৃতীয় বর্ণ ব্যবহার করেন তাহা হইলে বাঙ্গালার কোন অংশের লোকই তাহা সহ্য করিবেন না এবং সহ্য করা উচিতও নহে। কিন্তু তর্কের খাতিরে বলা যায় যদি একটি বর্ণ ('ব'ফলা) সংক্ষেপের জন্য 'য'ফলার অশুদ্ধ উচ্চারণ মানিয়া লইতে হয় তবে যেখানে ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ, এই পাঁচটি বর্ণ সংক্ষেপ করা যায় সেখানে পূর্ব্ববঙ্গের অশুদ্ধ উচ্চারণও মানিয়া লওয়া উচিত। কিন্তু তাঁহারা তাহাতে রাজী আছেন কি?

পূর্ব্ববঙ্গবাসী সাধারণত আনুনাসিক উচ্চারণ করেন না। কাজেই সে দেশে 'যজ্ঞের' জন্য 'পদ্ম'ফুল পাওয়া যায় না। তাঁহাদিগকে 'পদ্ম'ফুল দিয়াই 'যগ্‌গ' করিতে হয়। আবার 'বাঁশের বাঁশীর' অভাবে 'কিষ্ট ঠাকুর'কে পূর্ব্ববঙ্গের গোপিনীদিগের মন ভুলাইতে 'বাশের বাশী' বাজাইতে হয়। তাই বলিয়া যদি বর্ণ সংক্ষেপের জন্য 'ম'ফলা বা 'ঁ' উঠাইয়া দিতে বলি তবে পশ্চিমবঙ্গবাসী নিশ্চয়ই 'পদ্ম'ফুল দিয়া 'যগ্‌গ' করিয়া তৃপ্তি পাইবেন না এবং বাশের বাশীর' সুরও সে অঞ্চলের গোপিনীদিগের কাণে মোটেই মিঠা লাগিবে না।

পশ্চিমবঙ্গে অনেক জায়গায় লোকে 'নেপ' গায়ে দিয়া শীত কাটান। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে শীত কাটাইবার জন্য লেপ' (উচ্চারণ লাপ) গায়ে দিতে হয়। সেখানের শীত 'নেপে' মানে না। আবার পশ্চিমবঙ্গের সধবারা হাতে 'নোয়া' পরেন, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের সধবারা হাতে 'লোহা' না পরিলে তাঁহাদের মন খুঁতখুঁত করে। আরও অনেক ব্যাপারেই এরূপ তারতম্য

আছে। তাই বলিয়া কি বর্ণ সংক্ষেপের জন্ম 'ল' বিসর্জ্জন দিয়া শুধু 'ন' দিয়া কাজ চালান উচিত? পূর্ব্ববঙ্গবাসীর 'ড়' উচ্চারণ নাই। সবই 'র' উচ্চারিত হয়। তাঁহারা যদি বলেন শুধু 'র'কে বাঙ্গালা দেশে রাখিয়া 'ড়'কে চিরতরে উড়িষ্যায় নির্ব্বাসন দিতে হইবে, তাঁহাদের সে মত টিকিবে কি?

কথা প্রসঙ্গে বলি পশ্চিমবঙ্গবাসীর সকল ক্ষেত্রে 'য়'এর শুদ্ধ উচ্চারণ হয় না। আমি তাঁহাদের অনেককে 'ময়ূর'র উচ্চারণ 'মউর' বলিতে শুনিয়াছি। কিন্তু 'য়'এর উচ্চারণ 'অ' নহে হয়্। 'আয়্'কে কিন্তু 'আউ' বলেন না।

তাঁহাদের মতে—'ন'ফলারও কোন প্রয়োজন নাই। কারণ 'বিষণ্য' 'অণ্য' ইত্যাদি 'য'ফলাতেই বানান করা চলিবে। কিন্তু বিবাদ বাধিলে 'অণ্য' হইতে 'অন্ন' পৃথক করিয়া লইবার কি ব্যবস্থা তাঁহারা করিবেন?

তাঁহারা 'ক্ষ' বাতিল করিবার পক্ষপাতী। তাহা ছাড়া যেখানে 'লক্ষ' টাকার দরকার সেখানে তাঁহারা 'লাখ' টাকাতেই কাজ সমাধা করিতে পারেন। তাঁহাদের যোগ্যতাকে ধন্যবাদ। কিন্তু টাকাই জগতে একমাত্র কাম্য নহে। এমন ব্যাপারও আছে যেখানে 'লাখ' দিয়া 'লক্ষের' ক্ষতিপূরণ হয় না। 'লাখ লাখ যুগ হিয়া হিয়ে' রাখার ব্যাপারে রসমাধুর্য্য আছে বটে কিন্তু যখন 'লক্ষ্য বিহীন লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে' তখন তাহার করুণ রসের মাধুর্য্যও এক চুল কম নহে। কাজেই এ অবস্থায় লক্ষ বাসনা বিসর্জ্জন দিলে এক লাখ কেন শত লাখেও সে শূন্য স্থান পূর্ণ হইবে না। 'ক্ষ' বাতিল করিলে প্রয়োজন মত সংস্কৃত শ্লোক এবং পূর্ব্বকবি বা সাহিত্যিকদিগের সংস্কৃত ঘেঁসা রচনা উদ্ধৃত করিবারও কোন ব্যবস্থা থাকিবে না।

শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী কি করিয়া চলতি ভাষার দোহাই দিয়া কালাপাহাড়ী বর্ণ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন তাহা ভাবিয়া পাই না। প্রেসের মালিকরা যদি তাঁহার বাতিল করা ব্যঞ্জনবর্ণগুলির উপরে 'প্রবেশ নিষেধ' আইন জারী করেন তবে তাঁহার নিজেরও তো অসুবিধা কম হইবে না। এইগুলিকে বাতিল করিয়া তিনি তাঁহার পাঠক-পাঠিকাদিগকে পরিবেশনের জন্য তাঁহার সংস্কৃত ঘেঁসা কাব্য-ব্যঞ্জন রন্ধন করিবেন কোন্ মশলার সাহায্যে?

যাবতীয় যুক্তবর্ণের উচ্ছেদ সাধন করিয়া তাঁহাদের সাহিত্য-সাধনার সহজ পন্থার আবিষ্কারের দিকে বিশেষ লক্ষ্য; কিন্তু বিশ্ববাসীর চরম লক্ষ্য ব্রহ্ম' কিন্তু তাঁহাদের লক্ষ্য এড়াইয়া গিয়াছে অথবা ইচ্ছা করিয়াই এ সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা তাঁহারা ব্যক্ত করেন নাই। 'হ্ম'কে রূপান্তরিত করিয়া 'ব্রহ্ম'কে লাভ করিবার অন্য কোন সহজ পন্থার নির্দ্দেশ দেওয়া তাঁহাদের উচিত ছিল।

পশ্চিমের যাত্রী

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বের্লিন

গতবার বাঙালী আর অন্য ভারতীয় ছেলেদের সঙ্গে ইউরোপীয় মেয়েদের বিয়ে সম্পর্কে কিছু ব'লেছিলুম। আজকাল বোধ হয় এরকম বিয়ে একটু বেশী ক'রে হ'চ্ছে। আমাদের সমাজের যাঁদের চোখের সামনে বা যাঁদের আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে এই রকম আন্তর্জাতিক বিবাহ হ'চ্ছে, তাঁদের মধ্যে অনেকে এতে বিশেষ একটু আশঙ্কিত হ'য়ে প'ড়েছেন। আবার দুচারজন এই রকম বিয়েতে বেশ উৎসাহ প্রকাশ ক'রছেনও দেখা যায়। এই রকম বিয়ে আমাদের সমাজের পক্ষে ভাল কি মন্দ, তার বিচার আমরা কিছুতেই নিরপেক্ষ-ভাবে ক'রতে পারবো না। আমাদের শিক্ষা, রুচি, দেশাত্মবোধ, মনোভাব, দেশের অবস্থা সম্বন্ধে মানসিক স্পর্শ-কাতরতা—এই সমস্ত ধ'রে, আমরা ইস্পার কি উস্পার একটা মত ঠিক ক'রে ফেলি। তবে আমার মনে হয়, বিষয়টীর গুরুত্ব বুঝে সমাজের হিতকামী প্রত্যেক দায়িত্ব-বোধযুক্ত ব্যক্তির মত ঠিক করা উচিত।

পৃথিবীতে এমন জিনিস অতি বিরল, যা নিছক্ ভাল, বা নিছক্ খারাপ। ভালমন্দ দু'টো দিকই সব বিষয়ের আছে। অবস্থা অনুসারে ভাল জিনিস মন্দ হয়, মন্দ জিনিস ভাল হয়। এইরূপ আন্তর্জাতিক একাধিক বিবাহের অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত থেকেছি এবং এরূপ দু-চারটী বিবাহের কথা আমি জানি যে বিবাহ খুবই সুখের হ'য়েছে। কিন্তু পরাধীন জা'তের মানুষ ব'লে, আমার মনে বরাবরই একটা খট্কা লেগে আছে; এরূপ বিবাহ, সাধারণ ভাবে ব'লতে গেলে, উপস্থিত অবস্থায় আমাদের মধ্যে না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ প্রথমতঃ, ওদিকে স্বাধীন জা'তের মেয়ে, যারা গায়ের সাদা রঙের দরুণ এক হিসেবে পৃথিবীর আর

সব জা'তের মানুষদের চেয়ে নিজেদের যথেষ্ট পরিমাণে উঁচু পর্যায়ের ব'লে মনে ক'রতে অভ্যস্ত, কালো রঙের ভারতবাসীকে তাদের বিয়ে করা আর এই গরমদেশ ভারতবর্ষে ঘর-বসত ক'রতে আসা ; আর এদিকে প্রাচীন জা'ত সুসভ্য জা'ত ব'লে যার মনে একটু-আধটু আভিজাত্য বোধ থাকবেই এমন হিন্দুঘরের ছেলে (অবশ্য যে ক্ষেত্রে বাপ-মায়ের চেষ্টায় বা নিজের চেষ্টায় ছেলেটী এই আভিজাত্য বোধ খুইয়ে ব'সেছে, সে ক্ষেত্রের কথা আলাদা), তার দ্বারা, কখনও-কখনও চোখের নেশায়, কখনও-কখনও কারে প'ড়ে, আর ক্বচিৎ বা সত্যকার ভালবাসার ফলে—নিজের সমাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে বহির্ভূত, ভাব আচার-ব্যবহার চাল-চলন ধরণ-ধারণ সব বিষয়ে আলাদা (আর বহু স্থলে দেশে তার নিজের যে সমাজ তার তুলনায় নীচু ঘরের) মেয়ে বিয়ে ক'রে ফেলা, আর সেই মেয়েকে তার এই দুঃখময় দেশে নিয়ে আসা ;—দুদিকেই গোড়া থেকে একটা লাঘব স্বীকার ক'রতে হয়। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ চরণে আত্ম-নিবেদিতা ভগিনী নিবেদিতার মত, ভারতবর্ষের প্রতি টান নিয়ে খুব কম মেয়েই এদেশে আসে ; মাঝে-মাঝে নিবেদিতার মতন মনোভাবের ইউরোপীয় মেয়ে দু-একটী এখনও, এই মিস্-মেয়োর যুগেও যে দেখতে পাওয়া যায় না তা নয়—আমার নিজের মনে হয়, এরকম মেয়ে দু-একটী দেখেওছি। কিন্তু বেশীর ভাগ—আমার নিজের ধারণার কথা ব'লছি—দেশে নিজের জা'তের মধ্যে বর আর ঘর হ'ল না ব'লেই, কালো মানুষ কালো মানুষই সই, তবুও তো সুখে রাখবে—এই রকম ভাব নিয়ে আসে। আবার অনেক মেয়ের মনে একটু adventure অর্থাৎ সাহসিকতার ভাব থাকে। লড়াইয়ের পর ইউরোপে নাকি পুরুষের অনুপাতে মেয়েদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। যে-সব মেয়ের মধ্যে নারী-প্রকৃতি বিলুপ্ত বা পরিবর্ত্তিত হয়নি, তারা বর চায়, ঘর চায়, সন্তান চায়। এখনও বেশীর ভাগ মেয়েই এই প্রকৃতির। বিবাহকে মেয়েদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল career বা জীবিকা আর প্রতিষ্ঠার উপায় ব'লে বলে। যদি ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ বা সংস্কারকে একটু দমন ক'রলে এই career উন্মুক্ত হয়, তাকে মন্দের ভাল ব'লতে হবে। তাছাড়া, ও দেশের কিন্তু মেয়ের ধারণা এই যে, ভারতবর্ষ থেকে যারা এত পয়সা খরচ ক'রে ইউরোপে প'ড়তে যায়, তারা নিশ্চয়ই রাজা-রাজড়া ঘরের ছেলে ; আর ওদেশের পোকা মাকড়টা পর্য্যন্ত জানে যে, ভারতের রাজারা হীরে-মুক্তো প'রে থাকে, হাতী চ'ড়ে বেড়ায়, আর দু-হাতে পয়সা ছড়ায়।

আজকাল ইউরোপের সামাজিক অবস্থার উলট-পালটের ফলে, আমাদের ভারতীয় ছেলেরা অনেক সময়ে ওদেশে গিয়ে তাল ঠিক রাখতে পারে না। বাপ-মা, আত্মীয়-বন্ধু, সমাজ—এদের নজরের বাইরে, স্বাধীন দেশে গিয়ে প'ড়ে, নিরঙ্কুশ ভাবে চলাফেরা করে ; অবস্থাটা দড়ি-ছেঁড়া গোরুর মত হয়। বয়সের ধর্মে যে কৌতূহল নিয়ে তারা যায়, অনেক সময়ে সেই কৌতূহলই তাদের নানা গোলমালের মধ্যে ফেলে ; আর বিবাহই সেই সব গোলমালের একটা সহজ সমাধান-রূপে দেখা দিয়ে অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে পড়ে। আমার মনে হয়, বহুক্ষেত্রে আমাদের ছেলেরা, বিশেষতঃ সদ্বংশীয় আর একটু দায়িত্বজ্ঞান-যুক্ত হ'লে, সহজাত ভদ্রতার বশে, সারা জীবনের মত নিজেদের বাঁধনের মধ্যে ফেলে দেয়। আমি নিজে যা দেখেছি, তাতে কোনও পক্ষকে, বিশেষতঃ আমাদের গোবেচারী বাছাদের, দোষ দিতে পারিনা। এইরূপ বিয়ে যদি আমাদের সমাজের পক্ষে কল্যাণকর না হয়—ছেলে যদি বোঝে যে তার নিজের অবস্থা, আর সঙ্গে-সঙ্গে নিজের পরিবারের, নিজের সমাজের আর নিজের পারিপার্শ্বিক ধ'রে বিচার ক'রলে এরূপ বিবাহ করা তার পক্ষে উচিত হবে না, তা হ'লে গোড়া থেকেই তার সাবধান হওয়া উচিত। বিবাহ জিনিসটা অনেকটা সমাজকে নিয়ে—যাদের মধ্যে বাস ক'রবো, তাদের নিয়ে ; মাত্র দু'জনের সুখ-সুবিধা ধ'রে বিবাহ সুখের হয় না ; আরও পাঁচ জনের, আর যারা পরে আসবে তাদেরও সুখ-সুবিধা এতে জড়িত—এই কথাগুলি অনুধাবন ক'রে বুঝ্‌লে পরে, ছেলেদের মধ্যে অনেকটা নিজেদের প্রবৃত্তিকে লাগাম দিয়ে টেনে রাখবার জন্য একটা চেষ্টা আস্‌তে পারে।

কিন্তু বিলেতে গিয়ে—বিশেষতঃ ইউরোপের কন্টিনেন্টে, ফ্রান্সে আর অন্যত্র, যেখানে ভারতীয়দের প্রজার জা'ত আর নিজেদের রাজার জা'ত ভেবে সাধারণ মেয়েদের মনে একটা 'ঠেকারে' ভাব নেই—বেচারী ভদ্রসন্তান করে কি ? ঐ যে চমৎকার দেখ্‌তে ছিপ্‌ছিপে গড়নের মেয়েটী, ভারত থেকে প্রত্যাগত মাদাম অমুক বা ফ্রাউ অমুকের বাড়ীতে চায়ের মজলিসে যার সঙ্গে আলাপ হ'ল—ও মেয়েটী উদ্‌র্ ক্ব

সংস্কৃত প'ড়ছে ; এই পাঠ্য বিষয় অবলম্বন ক'রে কতকগুলি ভারতীয় ছেলে দেখ ছি দিব্যি ওর সঙ্গে জমিয়ে' নিয়েছে ; বেশ একটু-আধটু আড্ডা দিচ্ছে, রসিকতা ক'রছে, flirt ক'রছে, করুক্। কিন্তু মেয়েটীর সঙ্গে কথা ক'য়ে, ওর মনে ভারতের প্রতি কোনও গভীর টান বা জিজ্ঞাসার ভাব আছে তা তো বোঝা গেল না ; কিংবা ইউরোপে ব'সে উর্দু বা সংস্কৃত পড়া যতটা বুদ্ধির বা গভীরতার পরিচায়ক ব'লে মনে করা যেতে পারে, মেয়েটীর সঙ্গে আলাপে তার তো কিছু আভাস পাওয়া গেল না। "মঁসিয়্যো অঁ্যান্তেল্, আপনি তো উর্দু পড়ান ; হের্ জে-উস্ত্রেক্স্, আপনি তো সংস্কৃত পড়ান ; বলুন তো, মেয়েটী বুদ্ধিমতীও নয়, ভারত সম্বন্ধে ওর কোনও সত্যকার আগ্রহও নেই, তবে কেন ও উর্দু বা সংস্কৃত প'ড়তে এসেছে ?"—"আ, উই, মঁ্যসিয়্যো শাতেযারঝী ; আখ্— আবর্ য়া, হের্ খাটর্য়ি—ওঃ, হাঁ, তা বটে, চাটুজ্যে মশাই, আপনি যা অনুমান ক'রছেন, এটাও খুব সম্ভব ; বিয়ের যোগ্য ভারতীয় ছেলে যদি কেউ ওর সঙ্গে প্রেমে পড়ে, সেই আশায়, ভারতীয় ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করবার সুবিধা হবে ব'লে, হয় তো মেয়েটী ভারতীয় ভাষা প'ড়তে এসেছে।" অবাধ মেলামেশার ফলে, তরুণ বয়সের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটা সত্যকার আকর্ষণ দাঁড়িয়েও যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে ছেলের তরফে প্রবৃত্তির স্রোতে গা ঢেলে দেওয়া হয়, মানসিক সংস্কৃতি বা অন্য কিছুর কথা তখন থাকে না ; ফলে, আন্তর্জাতিক বিবাহ ক'রে তাদের প্রগতিশীলতা প্রকট ক'রতে হয়।

বিলেতের মেয়ে আমাদের ছেলের সঙ্গে বিবাহিত হ'লে, আমাদের সমাজের বা জা'তের লাভ কতটা ? শিক্ষিত মেয়ে হয় তো কোনও কোনও স্থলে আমাদের মধ্যে এল ; কিন্তু আমাদের হিন্দু-সমাজ তার সংস্কার তার বিধি-নিষেধ তার আভ্যন্তরীণ মর্যাদাবোধ এসব নিয়ে, এই শিক্ষিত মেয়ের সাহচর্য পেয়েও তা থেকে উপকৃত হ'তে পারলে না। আর যে শিক্ষিত মেয়ে এলেন, তাঁর গৃহিণী-জীবন আদর্শ-স্বরূপ হ'লেও, তাঁর ইউরোপীয় জাতিত্ব, আর আমাদের অবস্থাটা ঠিক-মত তাঁর বুঝতে না পারার দরুণ, সাধারণতঃ সমাজের সঙ্গে তাঁর মনে-প্রাণে মিল ঘ'টল না। তার পরে, বিভিন্ন জা'তের সঙ্গে মিশ্রণ ঘ'টলে তবে একটা জা'ত বড় হয়, এই মতবাদ ধ'রে, কেউ-কেউ ব'লে থাকেন, এ-ভাবে ইউরোপের আমেজ বাঙালী হিন্দু সমাজে এলে পরে, তাতে সমাজের কল্যাণ হবে। কিন্তু এরূপ মিলন সমানে-সমানে হ'লেই তবে ঠিক মিলন হয়। আমাদের দেশে এরূপ মিলন হ'য়েছে—অতি অপকৃষ্টভাবে ; ফলে, মেটে-ফিরিঙ্গীদের উৎপত্তি ; জা'ত হিসাবে আদর্শ জা'ত এদের কেউ ব'ল্বে না। আড়াই কোটি বাঙালী হিন্দুর মধ্যে এই leaven বা খামীর কতটা কাজ ক'রবে ? বিশেষতঃ যখন সব সময়ে দুই জাতেরই শ্রেষ্ঠ উপাদানের মধ্যে মিল হ'চ্ছে না। যে-সব মেয়ে এদেশে আসে, তাদের মধ্যে, মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, মাঝামাঝি শিক্ষিত ঘরের মেয়ে, আমাদের দেশের মেয়েদের চেয়েও শিক্ষিত—আমাদের মেয়েদের কেন, আমাদের ছেলেদের চেয়েও অনেক সময়ে বেশী শিক্ষিত—মেয়ে যে না আসে, তা নয়। কিন্তু তাদের দেশে তারা যে স্তরের, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের ছেলেরা আমাদের দেশে তার চেয়ে উঁচু স্তরেরই হ'য়ে থাকে। আজকালকার যুগে সামাজিক স্তর-বিচার চলে না, তা জানি ; কিন্তু ব্যবহারিক জগতে আমরা একটা ভেদ অনেক স্থলেই পেয়ে থাকি। এটা হয় তো ব্যক্তিগত মতামতের কথা। তবুও, এখনও noblesse oblige নীতি দেখা যায়—যেখানে আভিজাত্যবোধ দায়িত্ববোধকে এড়িয়ে চলে না। জাতিকে জাত সম্বন্ধেও এ রকম কথা চলে ; একজন ইংরেজ সহজে যা ক'রবে না, ইউরোপে একটা ছোট বা হঠাৎ-বড় জা'তের লোক তাতে সঙ্কোচ ক'রবে না। মোটামুটিভাবে বলা যায়, আমাদের ছেলেরা যারা বিলেতে যায়, বিদ্যা-বুদ্ধিতে আর অর্থে, এই দুইয়ের একে বা দুটোতেই, তাদের প্রথম শ্রেণীর ছেলে ব'লে ধরা যায়। আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর মেয়েদের এই সব ছেলের হাতে পড়া উচিত। কিন্তু তারা বিলেত থেকে প্রথম শ্রেণীর মেয়ে আন্‌তে পারে না। এ-দিকে ছেলেগুলি বিদেশী মেয়ে নিয়ে এলে, আমাদের ভাল মেয়েদের আর একটু নিরেস পাত্রে প'ড়তে হয়। উপরি-উপার কতকগুলি ভাল উপার্জনক্ষম ছেলের ইউরোপ থেকে মেম-বউ আনার কথা শুনে, একটী বিবাহিতা মহিলা আমায় ব'লেছিলেন— তোমরা তো দেশ উদ্ধার ক'রবে, নিজেদের চাকুরী-বাকরী ব্যবসা-বাণিজ্য এ-সবে বিদেশী প্রতিযোগিতা তোমাদের চক্ষুশূল,—"কিন্তু বিদেশিনীদের সঙ্গে অন্যায় প্রতিযোগিতায়

ঘরের মেয়েদের ফেল্‌ছ ; ফরসা রঙ, লেখাপড়া, বিলেতের মোহ, এ-সবের সঙ্গে আমাদের মেয়েরা পারবে কেন? বাঙালী ভদ্রঘরের মেয়েদের এই এক নোতুন বিপদ উপস্থিত হ'ল—এইবার থেকে তাদের আঁতুড়-ঘরেই নুন খাইয়ে মেরে ফেলবার ব্যবস্থা কর।" টীকা নিষ্প্রয়োজন—কিন্তু এই কথা কয়টার মধ্যে নিহিত আমাদের কুমারী মেয়েদের অনেকেরই জীবনের ট্রাজেডীর ইঙ্গিত আমাদের ছেলেদের ভেবে দেখা উচিত। রবীন্দ্রনাথের "সে যে আমার জননী রে" গানে যে দরদ অনাদৃতা দেশমাতৃকা সম্বন্ধে ফুটে উঠেছে আমাদের ঘরের মেয়েরা যারা মালা গেঁথে বরের প্রতীক্ষায় র'য়েছে—তাদের সম্বন্ধে সে ভাবের দরদ আমাদের প্রবাস-গত বিদেশিনী-কৌতূহলী ভাবী বরেদের মনকে বিচলিত ক'রবে না?

আমাদের ছেলে ইউরোপের মেয়ে—এদের নিয়ে যে সমস্ত সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়, কোনও ইউরোপীয় তা ভাল চোখে দেখে না ; জরমান সরকার তো খোলসা ক'রে মানা ক'রেই দিয়েছে—জরমান মেয়ে, ওদিকে তুমি ঝুঁকো না। Coloured manএর বিরুদ্ধে মনোভাব সর্ব্বত্রই আছে। উপদেশ দিয়ে নিষিদ্ধ ফলের দিকে আকর্ষণ কমানো কঠিন কাজ। ছেলের সহজ বুদ্ধির উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই—যদি কম বয়সে বিয়ে না দিয়ে, বা বিয়ের পরে স্ত্রীর প্রতি টান হবার আগেই ছেলেকে বিলেতে পাঠানো হয়। এখানেও—বাড়ীর শিক্ষা আর আব-হাওয়া, আর ছেলের মনে কি ভাবে তার সমাজ আর দেশের প্রতি টান কাজ করে, তা বিশেষ কার্যকর হয়। আজকাল স্পৃশ্যাস্পৃশ্যবোধ আর নেই, সংস্কার যতটুকু টেনে রাখ্‌ত ততটুকু টেনে রাখতে আর পারছে না, কারণ আমরা বড্ড তাড়াতাড়ি সংস্কারমুক্ত হয়ে প'ড়ছি। অভিভাবকদের এ-সব কথা বোঝা উচিত।

বিলেতে ছেলে পাঠালে তার ঝকৃকি নিতেই হবে। কি রকমের ঝকৃকি আর কত রকমের, তা আমার খুঁটিয়ে বলবার প্রবৃত্তি নেই, সময় নেই, শক্তিও নেই ; আর আমার অভিজ্ঞতাও খুব বেশী নয়। ইউরোপে এ-বিষয়ে ভূয়োদর্শন যাঁদের ঘ'টেছে, এমন একাধিক সাহিত্যিক, কোনও-কোনও বিষয়ে রঙটা একটু চড়িয়ে আঁকলেও, অবস্থাটার যথাযথ চিত্র অনেকটা দিয়েছেন। এই অবস্থায় ছেলেদের সদ্‌বুদ্ধির উপর নির্ভর ক'রে "বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু" এই মন্ত্র জপ করা ছাড়া অভিভাবকদের আর ছেলেদের বাগদত্তা বা নবোঢ়া বধূদের অন্য উপায় নেই। আবার মেয়েদের সম্বন্ধেও অবস্থাটা গোলমেলে হ'য়ে আস্‌ছে। এবার দেখলুম, একটী দক্ষিণী ব্রাহ্মণ-কন্যা, ইংলাণ্ডে উচ্চ শিক্ষা পাবার পরে খুব স্নেহশীল পিতার কাছে আবদার করায় তিনি তাকে কন্টিনেন্টের কোনও দেশে কেরাণীর কাজ ক'রে স্বাধীন ভাবে অর্থোপার্জন করার ব্যবস্থা ক'রে দেন ; তার পরে মেয়েটী কিছুদিন পরে একটী রুষ যুবককে বিয়ে করে। এদিকে ভারতবর্ষে মেয়ের বাপকে তাঁর এক বন্ধু ইউরোপ-প্রবাসিনী কন্যার খবর জিজ্ঞাসা করায় তিনি ব'ললেন—"জানো না, মেয়ে আমার একজন রুষকে বিয়ে ক'রেছে।" ব'লেই হা হা ক'রে অট্টহাস্য ক'রে উঠ্‌লেন।

প্রসঙ্গান্তরে আসা যাক্। আজকাল সমগ্র ইউরোপীয় সভ্যতা অর্থাৎ আধুনিক সভ্যতাকে ব্যবসায়-বাণিজ্য আর হিন্দীতে যাকে ব'লে 'উদ্যোগ', সেদিকে আমেরিকার ছাঁচেই ঢালা হ'চ্ছে। Departmental stores—বড় বড় দোকানে বিভিন্ন বিভাগে ঘর-গৃহস্থালীর সব জিনিস-পত্র, ছুঁচ থেকে আরম্ভ ক'রে লোহা-লক্কড়ের সব জিনিস, যন্ত্রপাতি, কাপড়-চোপড়, খাবার জিনিস, এটা-ওটা-সেটা, মায় হীরে-জহরত পর্য্যন্ত সব এক দামে বিক্রী করার ব্যবস্থা আমেরিকায় খুব উৎকর্ষ লাভ ক'রেছে। বিক্রীর টেবিলের উপরে পসার-সাজানো জিনিস-পত্র যেন উজোড় ক'রে ঢেলে রেখে দেওয়া হ'য়েছে, যা খুশী বেছে নাও, জিনিসের স্তূপের মধ্যে একটা কাঠিতে দামের টিকিট লাগানো, কোনও ঝঞ্ঝাট নেই। আবার এই সব দোকানে খুব শস্তায় ভাল রেস্তোরাঁও আছে। Woolworth নামে এক আমেরিকান কোম্পানি এইরূপ এক বিরাট দোকান বের্লিনে ক'রেছে। বুদাপেশ্‌ৎ-তে হঙ্গেরীয়ানদের এইরূপ এক বিরাট দোকান দেখেছিলুম, আমাদের হোটেলের কাছেই—Corvinus-এর দোকান। আমার কতকগুলি জিনিস-পত্র কেনবার ছিল, তার মধ্যে rucksack বা পিঠে-বাঁধবার-ঝুলি ছিল একটা। জরমানিতে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা আর স্কুলের বড়-বড় ছেলেমেয়েরা গরমের ছুটীর সময়ে দল বেঁধে নিজেদের দেশ দেখ্‌তে বা'র হয়—যতটা সম্ভব তারা পায়ে হেঁটেই যায়। ছেলেদের সকলের জাঙিয়া-পাজামা বা হাফ-প্যাণ্ট পরা, মেয়েদের মধ্যেও অনেকে এই পোষাক প'রে বেরোয় ; সকলেরই

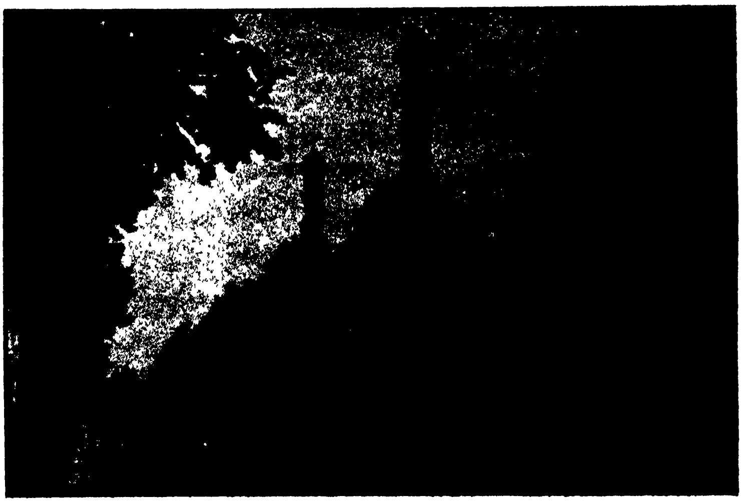
কাঁধের পাশ দিয়ে চামড়ার ফিতা দিয়ে বাঁধা একটা ক'রে এই ruecksack—সাধারণতঃ খাকী রঙের পিঠের উপরে থাকে—(ভারতবর্ষের কাছ থেকে আধুনিক জগৎ বাস্তব সভ্যতার এই কয়টী জিনিস খুব বেশী ক'রে নিয়েছে—কারী, চাট্নী, জাঙিয়া-পাজামা—শিখদের "কচ্ছ্"-এর আদর্শে, ফৌজে আর পরিশ্রমসাধ্য বা ধুলোমাটি-মাখার কাজে পরবার জন্য কাপড়ের খাকী রঙ, ঘোড়ায় চড়বার জন্য যোধপুরী পাজামা, আর পোলো খেলা; যেমন চীনের কাছ থেকে নিয়েছে কাগজ চা আর চীনামাটির বাসন, আরব-তুর্কী-ইরাণীর কাছ থেকে নিয়েছে কাফি আর গালিচা); তাতে তাদের দুই-একটা পরিধেয় জামা-টামা, আর দৈনন্দিন জীবনে দরকারী জিনিস রাখে; আর অনেকেরই হাতে একটা ক'রে লাঠি। আটজন দশজনে মিলে একটা দল ক'রে বেরোয়, সঙ্গে গিটার যন্ত্র নিয়ে দলে দুই একজন বাজিয়ে থাকে—বাজনার আর গানের সঙ্গে-সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে এরা কুচ ক'রে যায়; "ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে" গোছ অবস্থা ক'রে, শস্তার হোটেল যত আছে সে সবে রাত্রে আস্তানা গেড়ে, এইভাবে এরা স্বদেশের সঙ্গে পরিচিত হয়। জরমানিতে এইসব "ভ্রাম্যমান" তরুণ-তরুণীদের Wandervogel "ভাণ্ডর্-ফোগ্ল্" বা "ঘুরে-বেড়ানো পাখী" বলে। এরা উৎসাহশীল তরুণ জরমানির প্রতিনিধি-স্বরূপ, এরা শ্রমকাতর নয়, কষ্টসহিষ্ণু, দেশের মধ্যে ঘুরে ফিরে দেখে এরা এইভাবে দেশকে সত্য-সত্য ভালবাসতে শেখে। জরমানির Wandervogelদের দেখাদেখি ইউরোপের অন্য দেশে অনুরূপ ভ্রমণের রীতি তরুণ-তরুণীদের মধ্যে প্রবর্তিত হ'চ্ছে। ইংলাণ্ডে এই জিনিসটী খুব দেখা যায়—আর ইংলাণ্ডের লোকেরা একটু খোলা হাওয়ায় খেলাধুলা করার পক্ষপাতী ব'লে, খালি ছাত্র-ছাত্রী নয়, সব শ্রেণীর লোকের মধ্যে এই রীতি প্রিয় হ'য়ে উঠেছে—ইংলাণ্ডে এইরকম হাল্কা-বোঝা হ'য়ে বেড়ানোকে hiking বলে। জাপানেও Wandervogel-এর দল দেখা যায়। এর হাওয়া ভারতবর্ষেও এসেছে—আমাদের পুরাতন তীর্থযাত্রার রীতি থেকেও আমাদের দেশে এ জিনিস বেশ একটু সমর্থন পাচ্ছে; তবে আমাদের এই গরম দেশে বছরের মধ্যে ৮।১০ মাস ঘুরে বেড়াবার উপযোগী নয়, এক পাহাড়ে অঞ্চল ছাড়া; তা না হ'লে আশা করা যেত এই hiking বা Wandervogel-এর মত ব্যাপার আমাদের দেশে ও ছাত্রদের মধ্যে অন্ততঃ খুব সাধারণ হ'য়ে উঠ্ত। যাক্, এই Wandervogel দের পিঠের ঝোলা, গতবার জরমানি থেকে একটা এনেছিলুম; সেটাকে পিঠে বেঁধে বেড়াবার কোনও সুযোগ হয় নি বটে, তবে রেলে বা ষ্টীমারে ভ্রমণের সময়ে তার দ্বারা গৃহস্থের অনেক উপকার হ'য়েছিল। আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সতীর্থ, স্বনামধন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার আর শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সরকার মহাশয়দ্বয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সরকার বহুকাল ধ'রে আমেরিকা আর জরমানিতে প্রবাস ক'রছেন, তাঁর সঙ্গে বের্লিনে আলাপ হ'ল। খুব মিশুক হৃদ্যতাপূর্ণ ভদ্রলোক; তিনি আমাকে এই Woolworth-এর দোকানের খবর দিলেন, সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। আমাদের দেশের হোয়াইটাওয়ে-লেড্ল'র ফ্রান্সিস-হারিসন-হাথাওয়ে'র দোকান এই ধরণের, তবে এগুলি আরও বিরাট ব্যাপার। আমাদের দেশে কেবল ভারতবর্ষ-জাত জিনিস নিয়ে এই ধরণের departmental stores করবার চেষ্টা হ'য়েছে 'বিড়্লা কোম্পানীর' বেঙ্গল ষ্টোর্স্-এ; ক'লকাতার বাঙালী অছেল মোল্লার দোকানও এইরূপ একটী বড় departmental stores, কিন্তু এখান-কার জিনিস-পত্র বেশীর ভাগ বিদেশীয়—তাই এত বড় দোকান দেখেও মনটা খুশী হয় না। দেশী জিনিস খুব বেশী ক'রে রেখে, এই ধরণের বড় একটা দোকান চালানো আজকালকার বাঙালী খ'দ্দেরের চটক-প্রিয়তার যুগে কঠিন হবে ব'লে মনে হয়। কিন্তু তিরিশ বছর পূর্বেকার প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের যুগে খাঁটী স্বদেশ-জাত জিনিস কেনবার দিকে যে-ভাবে আমরা অনুপ্রাণিত হ'য়েছিলুম, সে ভাবটী এখনও যদি বজায় থাকৃত, যদি আরও সে ভাবটী উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'ত, তাহ'লে খাদি-প্রতিষ্ঠানের মত দোকান রাস্তায়-রাস্তায় হ'ত, আর শস্তা আর ভাল খাঁটী দেশী জিনিসের একটী বিরাট departmental stores ক'লকাতায় গ'ড়ে উঠে আমাদের আত্মসম্মান-বোধ আত্মবিশ্বাস আর আত্মপ্রতিষ্ঠার একটা কেন্দ্র হ'য়ে উঠ্ত—হৃদয়বান্ বিদেশী তা দেখে তারিফ না ক'রে পার্‌ত না, আমাদের জাতীয় কর্ম্মশক্তি আর গৌরব এতে বাড়্ত। বিলেতের সব বড়-বড় দোকান,

আর আমাদের দেশেও এই রকম সব বিলিতি জিনিসের বড়-বড় আড়ত দেখে মনে এ রকমের চিন্তা না এসে যায় না।

ধীরেনবাবু অনেক বছর আমেরিকায় কাটিয়েছেন, জরমানিতেও তাঁর বছর কতক কেটেছে। এখন তিনি জরমানিতে ব'সে ব্যবসায় ক'রছেন—জরমান জিনিস ভারতবর্ষে রপ্তানি, আর ভারতের জিনিস জরমানিতে আমদানীর কাজ। তাঁর বাসায় একদিন আমায় নিয়ে যান, আমার বাসায়ও তিনি আসেন। দুদিন একরাশ ষ্ট্রবেরী ফল নিয়ে চিনি দিয়ে মিশিয়ে একসঙ্গে খাওয়ার স্মৃতি মনে থাকবে। ইনি বেশ নির্ভীক্ স্পষ্টবাদী লোক। তিনি যে শার্লোটেনবর্গ পল্লীতে থাকেন সেই পল্লীতে, জরমানরা কি ভাবে ইহুদীদের প্রহার ক'রেছিল, তার বর্ণনা দিলেন। একদল গুণ্ডা-প্রকৃতির জরমান ছোকরার সামনে তিনি প্রতিবাদ করেন, তখন তাঁকে ধ'রেই মারে। ধীরেনবাবু মনে করেন, তাঁকে বিদেশী ইহুদী ভেবেইমেরেছিল। গুণ্ডারা তাঁকে প্রহার ক'রে স'রে প'ড়্‌ল,—আর পুলিস অবশ্য কোনও প্রতিকার ক'রতে পার্‌লে না।

অধ্যাপক ভাগনর-এর বাড়ীতে একদিন মাধ্যাহ্নিক আহার হ'ল। সেদিন আমি ছাড়া আর একজন অতিথি ছিলেন। ইনি খ্রীষ্টান মিশনারি হ'য়ে দক্ষিণ-ভারতে তামিল-দেশে অনেক কাল কাটিয়ে গিয়েছিলেন, তামিল ভাষাটা বেশ ভালো ক'রে শিখেছেন। এঁর নাম ডাক্তার Beythan বাইটান্। এখন বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য-বিভাগে তামিল ভাষা আর সাহিত্য পড়ান। বোধ হয় profession বা পেশা হিসাবে ধর্ম-প্রচারের কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। মানুষটী বেশ সজ্জন, মিশুক প্রকৃতির। অধ্যাপক ভাগনর-এর মত ইনিও হিট্‌লর্-এর অনুরাগী ভক্ত। আমায় এঁর লেখা তামিল গল্পের জরমান অনুবাদ একখানি দিলেন। আর ব'ল্‌লেন যে, তামিল ভাষায় হিট্‌লরের সম্বন্ধে তিনি এক-খানি বই লিখেছেন, সে বই ছাপা হ'চ্ছে, প্রকাশিত হ'লে আমায় পাঠিয়ে দেবেন। (আজ কয় সপ্তাহ হ'ল সেই বই আমার কাছে এসে গিয়েছে)। ডাক্তার বাইটান্ মোটের উপরে ভারতবাসীর সম্বন্ধে বেশ দরদ দেখিয়েই কথাবার্তা ক'র্‌লেন।

শ্রীযুক্ত তারাচন্দ রায় ব'লে একটি পাঞ্জাবী ভদ্রলোক বহুদিন ধ'রে জরমানিতে বাস ক'রছেন। তিনি বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দী আর উর্দূ পড়ান। তাঁর বাসায় একদিন তিনি নিমন্ত্রণ ক'র্‌লেন। Hohenzollern Damm নামে একটী নোতুন পল্লীতে এক ফ্ল্যাট নিয়ে তিনি থাকেন। ভদ্রলোক বের্লিনের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য-বিদ্যা-



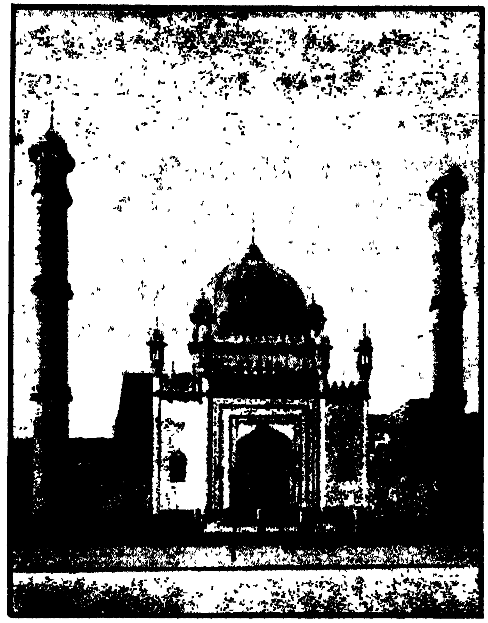
বের্লিন—মসজিদ

বিভাগে প্রদত্ত আমার বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন। চা খাওয়ালেন, গল্প-গুজব ক'র্‌লেন। তিনি ভারতীয় ধর্ম ও [illegible]তি সম্বন্ধে জরমানির বিভিন্ন শহরে বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। ভারতবর্ষের আহ্‌মদিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা তাঁর বাসার কাছেই একটী মসজিদ বানিয়েছে। এটী বোধ হয় জরমানি দেশের মধ্যে একমাত্র মসজিদ। এর গুম্বজ আর মিনার তারাচন্দজীর ফ্ল্যাট থেকে দেখা যায়। সাড়ে ছটা বাজে, বেশ পরিষ্কার আলো আছে—তারাচন্দজী আমায় নিয়ে গেলেন এই Moschee 'মোশে' বা মসজিদ্ দেখাতে। Wilmersdorf পল্লীতে মসজিদটী প্রতিষ্ঠিত। পরিষ্কার

নির্জন রাস্তা, দুধারে গাছের সারি; ইমারতটী ছোট, ভিতরে গিয়ে দেখলে মনে লাগে যে মসজিদ নয়, যেন একটী ছোট সভা-সমিতির ঘর। তবে সব পরিষ্কার সাফ-সুথরা অবস্থায় রাখা। বাড়ীটী ভারতীয় মোগল-রীতি অনুসারে তৈরী—দিল্লী-আগরার ইমারতগুলির ঢঙে। গুম্বজওয়ালা একটী ঘর, সামনেটা একটু হল মতন, আর মুখ্য ইমারতের দুধারে দুটী মিনার। মসজিদের সঙ্গে একটী ছোট বাড়ী আছে, সেখানে একজন জরমান দরোয়ান সস্ত্রীক থাকে। বের্লিন-প্রবাসী একটী মুসলমান ছেলে মসজিদের ইমামের কাজ করেন। তিনিও ঐ মসজিদের সংলগ্ন বাড়ীতেই থাকেন। আমি যখন অধ্যাপক তারাচন্দের সঙ্গে গেলুম তখন ইমাম সাহেব ছিলেন না; জরমান দরোয়ান মসজিদ ঘর দেখালে। ভিতরটায় গাল্‌চে পাতা, আর তার উপরে চেয়ার সাজানো। মিহরাব মিম্বার আছে। একটা টেবিলে মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে জরমান ভাষায় লেখা কতকগুলি বিভিন্ন পুস্তিকা আর পত্র-পত্রিকা রাখা দেখলুম, কতকগুলি বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, কতকগুলি নামমাত্র মূল্যে। আমরা একটু থেকে দেখেশুনে চ'লে এলুম। বিদেশে ভারতীয় ধর্মাগ্রহ আর কর্মশক্তির একত্র প্রকাশ এই ধর্মমন্দির দেখে বাস্তবিকই মনে আনন্দ হ'ল; এই সুদূর জরমানিতে দিল্লী-আগরার ঢঙে বাড়ী দেখে সব ভারতীয়ই পুলকিত হবেন; আর এই মসজিদের পিছনে যে একটী ক্ষুদ্র ভারতীয় মুসলমানসঙ্ঘের সাধনা বিদ্যমান, তারও প্রশংসাবাদ ক'রবেন।

এইরূপে বের্লিনে দিন চোদ্দ হ'য়ে গেল। আরও সপ্তাহ দুই থাকবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু পারিস থেকে পত্র পেলুম, আমার শিক্ষক অধ্যাপক ঝুল ব্লক প্রমুখ, যাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রতে চাই, তাঁদের সকলেই গরমের ছুটীতে শহরের বাইরে যাবেন, ১০ই জুলাইয়ের পরে আর কাউকে পারিসে পাওয়া যাবে না। সুতরাং ৭ই জুলাইয়ের বেশী বের্লিনে অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত ব'লে মনে হ'ল না। কারণ মাঝে দু দিন ব্রাসেলে থাক্‌বার মত্‌লব ক'রেছি। সুতরাং বের্লিনে অবস্থান সংক্ষেপ ক'রতে হ'ল ব'লে ক্ষুণ্ণমনে বের্লিন থেকে বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হ'লুম।

৭ই জুলাই সকালে Zoogarten ষ্টেশনে পূর্বাভিমুখী মেলট্রেণ ধরলুম। এই ট্রেণ পোলাণ্ড থেকে ফ্রান্সে যাচ্ছে, এতে ব্রাসেল যাবারও গাড়ী থাকে। অধ্যাপক ভাগনর-এর বাড়ী দূরে, তবুও এতদূর ষ্টেশনে এসে আমায় গাড়ীতে



বের্লিন—মসজিদ

তুলে দিয়ে তিনি বিদায় নিয়ে গেলেন। অধ্যাপক ভাগনরের হৃদ্যতা ভোলবার নয়।

ব্রাসেল

সকাল এগারোটার সময়ে বের্লিন ত্যাগ ক'রে সারাদিন ধ'রে চ'লে রাত্রি প্রায় সাড়ে-বারোটায় ব্রাসেল পৌঁছলুম। প্রায় সমস্ত জরমানিটার ভিতর দিয়ে যাওয়া গেল; বের্লিন, হানোভর, কলোন, আথেন—এই পথ ধ'রে। আমাদের ভারতবর্ষের তুলনায় ইউরোপের দেশগুলির ক্ষুদ্রত্ব এ থেকে অনুমান করা যায়। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী; আমি যে কামরায় ছিলুম তাতে পারিস-যাত্রী কতকগুলি পোলাণ্ডের লোক ছিল। এরা বেশ মিশুক; ফরাসীতে এদের সঙ্গে কথাবার্তা হ'ল। এদের কাছে স্বাধীন পোলাণ্ডের মুদ্রা দেখলুম—বেশ সুন্দর লাগ্‌ল, একটী রৌপ্য মুদ্রায় 'পোলোনিয়া' বা পোলাণ্ড-দেশমাতার আবক্ষ মূর্ত্তি, অন্যদিকে পোলীয় স্বাধীনতা-যুদ্ধের বীর মার্শাল পিলসুদ্‌স্কির মুখ। আথেনের পরে পারিস-যাত্রী গাড়ী

থেকে ব্রাসেল অভিমুখী আমাদের গাড়ী আলাদা ক'রে দিলে। পোলীয় সহযাত্রীরা তার পূর্বেই অন্য গাড়ীতে গিয়েছিল।

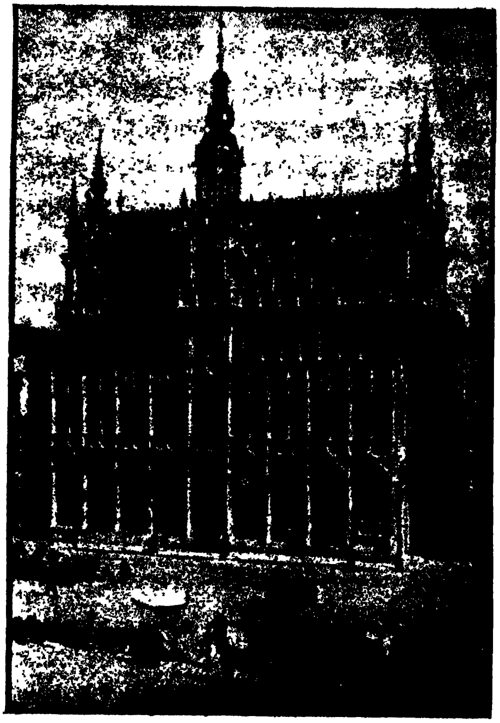
ইউরোপের অন্য সাধারণ যাত্রীদের মত সঙ্গে খাবার নিয়ে এসেছিলুম—রুটী, পনীর, কেক, ফল; তাই দিয়ে দুপুরের আর রাত্রের খাওয়া গাড়ীতেই সেরে নেওয়া গেল। ষ্টেশনে কাগজের গ্লাসে ক'রে গরম কফি কেনা গেল। পানীয় জল সব জায়গায় মেলা দুর্ঘট, এরা তেষ্টা পেলে জল খায় না। তেষ্টা পেলে জল খাওয়া ফ্রান্স আর জরমানির রেওয়াজ নয়। রেস্তোরাঁয় জল চাইলে 'মিনেরাল-ওয়াটার' এনে দেয়; তাই সাদা জল দরকার হ'লে ফ্রান্সের হোটেলে অনেক সময়ে ব'লে দিতে হয়, eau naturel 'ও নাত্যুরেল' অর্থাৎ 'স্বাভাবিক জল' চাই, আর জরমানিতে ব'লতে হয় kaltes wasser 'খাল্‌টেস্ ভাসর্' বা 'ঠাণ্ডা জল'। অগত্যা এক বোতল মিনারেল-ওয়াটার—উষ্ণ-প্রস্রবণের জল—কিনে তৃষ্ণা নিবারণ ক'রলুম। দেখেছি যারা রেলে ভ্রমণ করে তারা বিয়ার কিনেই খায়। ক্বচিৎ বা কেউ সঙ্গে একটা বোতলে ক'রে জল নিয়ে যায়।

আখেনের পরে বেলজিয়মে প'ড়তে গাড়ীতে ভীড় বাড়তে লাগ্‌ল। বেলজিয়মের সীমা পার হ'তেই বেলজিয়ান পুলিস কর্ম্মচারী এসে পাস-পোর্ট দেখে গেল। ঘন-বসতি এই বেলজিয়ম দেশ; পদে-পদে ছোট বড় শহর, বড় বড় গ্রাম। আমাদের গাড়ী যেন সব ষ্টেশনেই থামতে থামতে যাচ্ছিল। এদিকে যাত্রিও বাড়ছে; বড় বিরক্তিকর লাগ্‌ছিল। শেষে যখন রাত সাড়ে বারোটা আন্দাজ ব্রাসেল্‌-এ পৌছুলুম তখন আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

জরমানিতে কিছু বই কিনেছিলুম। বই বেশ ভারীই হয়; তাতে আমার সুটকেশটী বেশ ভারী হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু এদেশে লগেজের জন্য বেশী কড়াকড় করে না। কুলীরা মালটাকে রেলের কামরায় তুলে দিলেই হ'ল। ব্রুসেল্‌-এ যে কুলী গাড়ী থেকে আমার মাল নামালে কোথায় গিয়ে উঠ্‌বো তার ঠিক না থাকায় তাকে জিজ্ঞাসা ক'রলুম, ষ্টেশনের কাছে-পিঠে আমায় একটা শস্তা হোটেলে নিয়ে যেতে পারে কি না। ফরাসী ভাষায় কথা হ'ল। বেলজিয়ম দেশটায় দুটো ভাষা চলে, ফরাসী আর ফ্লেমিশ—এই ফ্লেমিশ হ'চ্ছে ডচ্ ভাষারই এক প্রাদেশিক রূপ। কুলী আমায় ব'ল্‌লে, তার জানা এক হোটেল কাছেই আছে, খুব বড়-মানষী চালের নয়, তবে ভদ্রলোকের উপযুক্ত ঘর সেখানে পাওয়া যাবে। তার সঙ্গেই চ'ললুম। ষ্টেশনের পাশেই একটা বাড়ীতে নিয়ে গেল। তলায় একটা public house বা মদ খাবার আর আড্ডা দেবার রেস্তোরাঁ—বিস্তর নিম্ন-শ্রেণীর লোক সেখানে জড়ো হ'য়েছে, মদ খাচ্ছে, তাস আর অন্য খেলা নিয়ে জনকতক কতকগুলি টেবিলের চারি ধারে জটলা ক'রছে। এটা ফ্লেমিশ-বলিয়ে নিম্ন শ্রেণীর লোকের আড্ডা ব'লে বোঝা গেল। সকলে ফ্লেমিশ ভাষায় কলরব ক'রে আড্ডা জমিয়েছে, তাদের কথা কিছুই বুঝ্‌তে পারলুম না। লম্বা টেবিলের উপরে খাবার-দাবার আর মদের বোতল আর পান-পাত্রের পসরা নিয়ে হোটেলের মালিকানী, একটী আধা-বয়সী মোটা-সোটা স্ত্রীলোক, আহ্লাদী পুঁতুলের মত ভাব (যেমন ফরাসী দেশের হোটেল বা রেস্তোরাঁ-উলীদের চেহারা হ'য়ে থাকে), জেঁকে ব'সে আছে। ঘরটায় খুব-উজ্জ্বল কতকগুলি বিজলীর বাতি জ্ব'লছে, কিন্তু সেগুলির আলোক পাইপের ধোঁয়ায় যেন মেঘের মত ঢেকে দিয়েছে। আমার কুলী মাল-পত্র রেখে হোটেলউলীর সঙ্গে ফ্লেমিশ্ ভাষায় কি ব'ল্‌লে। হোটেলউলী আমার দিকে আড়চোখে চেয়ে ফরাসীতে ব'ল্‌লে, "ঘর আছে, কিন্তু এই শহরের একজিবিশনের জন্য ভাড়া একটু বেশী লাগ্‌বে মশাই।" উপরের তিন তলায় একটা ঘর দেখালে—ছোট কামরা তবে সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ব'লে মনে হওয়ায়, সেই রাত্রি একটায় আর কোথায় যাবো ভেবে তখনই ঘরটী নিয়ে নিলুম;—কুলী মালপত্র তুলে দিয়ে গেল, তাকে বিদেয় ক'রলুম।

ব্রাসল্‌-তে ছিলুম দু রাত্রি আর দু দিন। এই শহরে আগে কখনও আসিনি। ব্রুসেল্ ইউরোপের সাহিত্য শিল্প আর কাথলিক খ্রীষ্টান ধর্ম-কলার অন্যতম পীঠস্থান, মধ্যযুগের ও আধুনিক ইউরোপের সভ্যতায় এর স্থান খুব উচ্চে। ব্রাসেল শহর ছাড়া এই শহরে একটা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হ'চ্ছে, সেটীও দেখবার উদ্দেশ্য ছিল। ৮ই জুলাই সকালে ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেরুনো গেল। একটা রেস্তোরাঁয় প্রাতরাশ সেরে নিয়ে একটা ভাল হোটেলের সন্ধানে

প্রদর্শনীর আপিসে গেলুম—জানতুম, এখান থেকে শস্তায় ভদ্র হোটেলের ঠিকানা পাবো। একটু ঘুরে ফিরে একটা



ব্রাসেল—'রাজার-বাড়ী' নামক গথিক প্রাসাদ

হোটেল ঠিক ক'রে নিলুম, গত রাত্রি যেখানে ছিলুম সেখান থেকে জিনিস-পত্র উঠিয়ে নিয়ে এলুম। তার পরে সারা দিন ধ'রে শহর দেখলুম।

শহরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে সব চেয়ে লক্ষ্যণীয় হ'চ্ছে কতকগুলি প্রাচীন মধ্যযুগের বাড়ী। ব্রাসেল্-এর প্রধান গির্জ্জা, Saint Michael দেবদূত মিকাইল ও Saint Gudule সিদ্ধা গ্যুড্যুল-এর নামে উৎসর্গীকৃত —এটা পশ্চিম ইউরোপের গথিক-রীতির দেবায়তন-সমূহের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর মন্দির। তার পরে Grand' Place 'গ্রাঁৎ-প্লাস' নামক চত্বরের চারিদিকে কতকগুলি অতি সুন্দর গথিক প্রাসাদের সমাবেশ ব্রাসেল-কে ইউরোপের প্রাচীন শহরগুলির মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। এই গ্রাঁৎ-প্লাসে Hotel de Ville বা Town Hall অর্থাৎ পৌরজন সভাগৃহ আর Maison du Roi অর্থাৎ রাজার বাড়ী ব'লে দুটী ইমারত শুদ্ধ গথিক রীতির প্রাসাদের অতি মনোহর নিদর্শন। একটা বড় বাড়ী একখানা বড় ছবি বা একটা শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের মতন উপভোগ্য। এই গ্রাঁৎ-প্লাসে অনেকক্ষণ কাটুল।



ব্রাসেল—পৌরজনসভাগৃহ

তার পরে অন্য অন্য লক্ষ্যণীয় স্থানগুলোও দেখে এলুম। নূতন রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি কতকগুলি ইমারত অতি সুন্দর। ব্রাসেল শহরটী লণ্ডন পারিস বের্লিন ভিয়েনা রোম প্রভৃতির তুলনায় ছোট কিন্তু সৌধ-সৌন্দর্যে ইহাদের সমকক্ষ। শহরের মধ্যে Palais-des Beauxarts অর্থাৎ সুকুমার-শিল্প-সৌধ দুইটাতে শিল্প-প্রদর্শনী হ'চ্ছিল—একটা বেলজিয়ান বাস্তুশিল্পের; আর একটা ফরাসী Impressioniste ঢঙের চিত্র-শিল্পের; Ganguin দ্বিতীয় প্রদর্শনীতে Gauguin গোগ্যাঁ, Monet মোনে, Renoir রেনোয়ার, Cezanne সেজান, Manet মানে, Degas দেগাস্, Van Gogh ফান্-খোখ্ প্রমুখ শিল্পীদের আঁকা ছবি দেখা গেল। এদের

ছবির প্রতিলিপি আগে অনেক দেখেছি, কিন্তু শিল্পে impressionism মতবাদটা আমি বুঝি না, আর এক Gauguin গোগ্যাঁ ছাড়া আর কারো ছবি আমার ভাল লাগে না—তাও বোধ হয় গোগ্যাঁর ছবির বিষয়-বস্তুর জন্য আর রঙের জন্য। গোগ্যাঁ প্রশান্ত মহাসাগরের পলিনেসিয়ার দ্বীপপুঞ্জে Tahiti তাহিতিতে গিয়ে সেখানকার আদিম অধিবাসীদের জীবন অবলম্বন ক'রে ছবি এঁকে গিয়েছেন—রঙের সমাবেশে আর আঁকবার ভঙ্গীতে তাঁর এই সব ছবিতে আমার কাছে শিল্পের প্রকাশের একটা নূতন দিক্ খুলে দিয়েছে।

ব্র্যাসেল শহরে পূরো একটা দিন ছিলুম—আর একটা দিনের বেশীর ভাগই কাটে প্রদর্শনীতে। ব্র্যাসেল্ সম্বন্ধে বেশী কিছু জানি না—একদিনের দেখায় কিছু ব'লতে যাওয়াও ধৃষ্টতা। ব্র্যাসেল্ রোমান কাথলিক ধর্মের আর রোমান কাথলিক শিল্পের একটা বড় কেন্দ্র। বেলজিয়মে লোকসংখ্যা দেশের আয়তনের অনুপাতে বোধ হয় পৃথিবীর সব চেয়ে বেশী। এখানকার অনেক লোক—পুরুষ আর মেয়ে—ধর্মকেই জীবিকা বা জীবনের আশ্রয়রূপে গ্রহণ করে। আমাদের দেশে জেসুইট আর অন্য কাথলিক পাদরি বেলজিয়ম থেকে যত বেশী আসেন, তত বোধ হয় ইউরোপের অন্য দেশ থেকে নয়। ভারতবর্ষের পূর্ব-হিন্দুস্থান যেমন ভবঘুরে সন্ন্যাসী আর সাধুদের আড়ত; পূর্ব হিন্দুস্থান খুব ঘন-বসতি স্থান। বেলজিয়মেরই মত।

বেলজিয়মে দুটো ভাষা চলে; সরকারের সব কাজে দুটোরই প্রায় তুল্য আসন—ফরাসী আর ফ্লেমিশ। জরমান জানা থাকলে ইংরেজি-জানা লোকে ডচ আর ফ্লেমিশ অনেকটা, শুনে না বুঝুক, প'ড়ে বুঝতে পারে। তবে বেলজিয়মের এই দুই ভাষার মধ্যে ফরাসীরই প্রতিষ্ঠা বা মর্যাদা একটু বেশী। ফ্লেমিশ জাতির লোকেরা ইংরেজ জরমান আর ডচের আত্মীয়, ডচেদের সাক্ষাৎ ভাই; কিন্তু ধর্মে এরা রোমান কাথলিক ব'লে প্রটেস্টান্ট ডচেদের সঙ্গে মেলেনি, এরা কাথলিক ফরাসীদের সঙ্গে মিলে আলাদা রাজ্য ক'রেছে। সরকারী ইস্তাহারে, বিজ্ঞাপনে, পথে-ঘাটে সর্বত্র দুই ভাষার ব্যবহার। রাস্তার নামগুলি সর্বত্র দুই ভাষায় লোহার নাম-পত্রে লেখা। রেলের নোটিস, আদালতের নোটিস, ট্রামের টিকিটের লেখা—সব দুই ভাষায়। অনেক সময়ে রাস্তার নামগুলি একেবারে আলাদা শোনায়; কিন্তু তাতে এরা ভয় না পেয়ে দুই ভাষারই তুল্য স্থান দিয়েছে। ফরাসীতে হ'ল Place Royale যে চত্বরের নাম, ফ্লেমিশে তার নাম হ'ল Koningsplaatje; 'দক্ষিণ ষ্টেশন' হ'ল ফরাসীতে Gare du Midi, ফ্লেমিশে Zuid Station; ফরাসী Petite île অঞ্চলকে ফ্লেমিশে লিখতে হবে Klein Eiland; Bois কে Bosch; ফরাসী Avenue Astrid লেখা যেখানে, তার পাশে সে রাস্তার নাম ফ্লেমিশে লেখা Astridlaan. ফরাসীতে Place des Bienfaiteurs, ফ্লেমিশে Weldoeners Plaatje; এইরূপ শত শত নাম পাশাপাশি দুই ভাষায় বিরাজ ক'রছে। একই রোমান লিপিতে লেখা; কিন্তু তবুও শব্দগুলো আলাদা।

বহু পূর্বে ক'লকাতা কর্পোরেশন যখন বাঙ্‌লায় আমাদের শহরের রাস্তার নাম-পত্র দেওয়া ঠিক করেন, তখন আমি প্রস্তাব করেছিলুম যে বাঙলায় অনাবশ্যক "ষ্ট্রীট, লেন, প্লেস, রোড, আভেনিউ, স্কোয়ার" এসব কথা না লিখে, এসব পথ এবং চত্বর-বাচক ইংরেজী শব্দের বাঙলা ক'রে দেওয়া হোক; যেমন—Cornwallis Street—'কর্ণওয়ালিস সড়ক'; Harrison Road—'হারিসন রাস্তা'; Chittaranjan Avenue—'চিত্তরঞ্জন বীথি'; Narendranath Sen Square—'নরেন্দ্রনাথ সেন চত্বর'; ইত্যাদি। আর তা ছাড়া আমি ব'লেছিলুম যে আমাদের শহরের সব পুরোনো বাঙলা নাম যথাসম্ভব বজায় রাখা উচিত; যেমন—'লাল দীঘি', 'হেদুয়া', 'হাতীবাগান' ইত্যাদি; নাম-পত্র দিয়ে এই সব নাম বজায় রাখতে সাহায্য করা উচিত। যেখানে দরকার সেখানে বিদেশী শব্দ অবশ্যই নেবো; কিন্তু 'সড়ক, রাস্তা, পথ, বীথি, সরণি, চত্বর', প্রভৃতি বহু পৌর-জীবনের উপযোগী শব্দ আমাদের থাকতে খামখা কতকগুলি বিদেশী শব্দ নিয়ে ভার বাড়ানো কেন? আমি নজীর-স্বরূপে বেলজিয়ম, আয়র্ল্যাণ্ড, লিথুআনিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের কথা তুলেছিলুম। যে-সব দেশে দুটো ভাষার প্রচলন আছে সে সব দেশের শহরে একই রাস্তার দুটো নাম অনায়াসেই লোকের মধ্যে চলে, কোনও ভাষাকে খাটো করা হয় না। এ রকম ব্যাপারটী ভারতের কতকগুলি শহরেও আছে। মির্জাপুরে দেখেছিলুম একটা রাস্তার নাম ইংরেজীতে লেখা New

City Road, আর তার দুপাশে নাগরী আর উর্দুতে লেখা 'নয়া শহর সড়ক'; বোম্বাইয়ে Hornby Road এই ইংরেজি নামের পাশেই নাগরীতে লেখা দেখেছি, 'হোর্‌ন্‌বি রস্তা'। মালাই দেশে দেখেছি মালাই ভাষার নামই চলে; Jalan Astana অর্থাৎ 'রাজবাড়ীর পথ'। ক'লকাতার Upper Chitpur Road, Lower Circular Road, Duel Road, Old Post Office Street—এ সবের তরজমা, যেমন 'উত্তর-চিতপুর-রাস্তা, দক্ষিণ-চক্রবেড়-রাস্তা, সাহেব-লড়াই-রাস্তা, পুরাতন ডাকঘর-সড়ক,' চ'লবে না কেন—যদি বাইরের আর পাঁচটা সভ্য দেশে সহজ ভাবেই এই ব্যাপার হ'য়ে থাকে? এতে আমাদের জাতীয় আত্ম-সম্মানবোধ বাড়্‌ত বই ক'ম্‌ত না; আর কালেকে হয় তো বাঙলা নামগুলিই থেকে যেত, কারণ এইগুলো আমাদের ঘরের কথা। আমি এই সব কথা বেশ বিশদ ক'রে লিখে চল্‌তি ইংরেজির রাস্তা-পথ-ঘাট-বাচক শব্দগুলির একটী বাঙলা অনুবাদ সমেত বহুপূর্বে Calcutta Municipal Gazette-এ এক পত্র লিখেছিলুম। এতে দুই একজন বাঙ্গালী city Father আমার এই আজগুবী প্রস্তাবকে philological prank—'ভাষাতত্ত্ব-ঘটিত পাগলামি'—ব'লে নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি আর দেশাত্মবোধকে সম্মানিত ক'রেছিলেন। আসল কথা দাস-মনোভাব-জাত আত্ম-বিশ্বাসের অভাবে এই সহজ জিনিসটী নিতে সাহস হ'ল না। তাই ক'লকাতার রাস্তায় রাস্তায় বাঙলা নাম-পত্রে 'চৌরিংঙ্গী' ('চৌরঙ্গী' স্থলে), 'মুখার্জ্জি লেন' ('মুখুজ্যে গলি' স্থলে) প্রভৃতি নাম তাদের বাঙলা হরফে লেখা ইংরেজি শব্দ-সম্ভার নিয়ে বাঙলা দেশের মাথা আর হৃদয় স্বরূপ ক'লকাতা শহরের অধিবাসী বাঙালীর আত্মমর্য্যাদা-বোধের আর মাতৃভাষাপ্রীতির জয়জয়কার ক'রছে।

অন্ত্যেষ্টি

শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

সাত

মঞ্জুলী দুর্ব্বল শরীর লইয়াই রাঁধাবাড়া করে। তপেশ দু'বেলা হোটেল হইতে ভাত আনিবার প্রস্তাব করিয়া মঞ্জুলীর সম্মতির জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিল, মঞ্জুলী কথা শোনে না।

গয়লার দুধের দাম মিটাইয়া দিয়া হাতে যাহা আছে তাহাতে দু'বেলা ডাল-ভাত খাইলে মাঝে মাঝে এক আধটুকু তরকারীর খরচটা চলিতে পারে মাত্র। সে-জন্য চিন্তা নাই। এমন দিন তাহাদের অনেক আসিয়াছে অনেক গিয়াছে। তপেশ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে মঞ্জুলীর জন্য।

হাসপাতাল হইতে আসিয়াছে আজ সাতদিন। শরীর সে রকমই দুর্ব্বল, কোনরূপ উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় না। হইবে কেমন করিয়া! তপেশ ভাবিল, এখনো সে একটা ভাইব্রোনা-ই কিনিয়া দিতে পারিল না! ঔষধের দোকানে সে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছে এক বোতল ভাইব্রোনার দাম চার টাকা ছ' আনা। এখন চার আনার পয়সাই বা কোথা হইতে আসিবে!

মঞ্জুলীর রাত্রে একটু একটু জ্বর হয়। ঘুষঘুষে জ্বর। স্বামীকে সে বলে না কিছু। পাছে তপেশের লেখাপড়ায় ব্যাঘাত জন্মে। সম্বলের মধ্যে এখন তো ঐ গল্প লেখার টাকা। টিউসন এই বাজারে চাহিলেই আর চট্ করিয়া মিলে না।

আজ সকালে মঞ্জুলীর সঙ্গে তপেশের একটী ছোট-খাটো কলহ হইয়া গেছে। তপেশের এক বন্ধু একটী টিউসনের খবর দিয়াছে। সেখানে কাল বিকালে খোঁজ লইবার কথা ছিল। তপেশ মঞ্জুলীকে আজ ভোরে যাইবে বলিয়াছিল, আজও মঞ্জুলী বারকয়েক স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। কিন্তু তপেশ সারা সকালটা ঘরে বসিয়া লেখা লইয়া কাটাইল। মঞ্জুলী তাহাকে নিশ্চেষ্টতার অপবাদ দেওয়ায় স্বামী-স্ত্রীতে নরম গরম কথা কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে।

দুপুরে মঞ্জুলী ঘুমাইয়াছে। তপেশ তক্তপোষের নীচ

হইতে বইএর বাক্সটা টানিয়া বাহিরে আনিল। কতকাল যে ঐ টিনের বাক্সটায় হাত পড়ে নাই। ভিতরে বাক্স-বন্দী অন্ধকারে এতকাল সেক্সপীয়র থেকে শরৎচন্দ্র যেন গুমরিয়া কাঁদিয়াছে।

বহুকাল পরে তপেশ আজ বাক্সের ঢাক্না খুলিয়া ধুলা ঝাড়িয়া বইগুলি বাহির করিতে লাগিল।

পাতা চিহ্নিত করিবার জন্য 'বলাকার' মধ্যে একটা পাখীর পালক ছিল, তপেশ দেখিল সেটা শুকাইয়া বিশ্রী বিবর্ণ হইয়া গেছে। সোণার তরীর 'মানস সুন্দরী' কবিতাটার আরম্ভের পাতায় মঞ্জুলী গুটিকয়েক গোলাপের পাপড়ী ছড়াইয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহারা বিশুষ্ক কুৎসিত। বৈষ্ণবগ্রন্থাবলীর মধ্যে পেজ-মার্ক করিবার উদ্দেশ্যে দু'তিন রকমের রেশমী সূতায় পাকানো মলাট-সংলগ্ন একটী রাখি ছিল, এখন তাহার বিভিন্ন রঙগুলিকে পৃথক করিয়া চিনিবার উপায় নাই। তপেশ বইগুলির ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে এক একটা পাতায় আসিয়া থমকিয়া থামিয়া কত কি ভাবে। পৃষ্ঠাগুলির অক্ষরে অক্ষরে শুধু কবিদের কল্পরঙীন মনের কথা—তাঁদের ধ্যান-বিস্তৃত অনুভূতির গাথাই লিপিবদ্ধ নয়, তপেশ-মঞ্জুলীরও কত দিনের কত হাস্যোজ্জ্বল মুখর ক্ষণিকতার সুরসে সৌরভ যেন পাতায় পাতায় বন্দী হইয়া আছে।

তপেশ বাঙ্গালা বইগুলি আবার তুলিয়া রাখিল। এগুলি কাজে লাগিবে না। পুরাতন বইএর দোকানে এদের কোন আদর নাই। বাকী ইংরেজী বইগুলির মধ্যে সেক্সপীয়রের ওয়ার্কস্ ও স্মিথের ভারতবর্ষের ইতিহাস ব্যতীত আর কোন কাজের বই খুঁজিয়া পাইল না। অন্যান্য বিক্রয়-যোগ্য ইংরেজী বইগুলি তো বহু পূর্ব্বেই বেচিয়া পেটে দিয়াছে। যাক্ এ বই কখানায় গোটা তিনেক টাকা মিলিতে পারে। আর এক টাকা ছ' আনা যোগাড় করিতে পারিলেই মঞ্জুলীর একটা ভাইব্রোনা হইবে।

তপেশ অন্যান্য বইগুলি তুলিয়া রাখিল। বাক্সের ডালা-বন্ধ করিবার শব্দে মঞ্জুলীর ঘুম ভাঙ্গিল।

"বইগুলি বুঝি আবার বিক্রি করতে নিচ্ছ?"

তপেশ জবাব দিল না। মঞ্জুলী একটু খোঁচা দিয়া কহিল, "আগে বুঝে চললে পরে এই দুর্দ্দশা হয় না।"

এবার তপেশ উত্তেজিত হইয়া উত্তর করিল, "বুঝবার ক্ষমতা ভগবান যথেষ্টই দিয়েছিলেন আজও আছে তা। নতুন করে শিখ্‌তে হবে না; দুর্দ্দশা! কথা বলতে তো আর পয়সা খরচ হয় না! ভাবছ বড় কষ্টে আছ—অক্ষম স্বামীর হাতে প'ড়ে। অনেক ভদ্র-পরিবার আধপেটা খায়, খবর রাখ? তাদের কাছে তুমি ভাগ্যবতী, আজও দু'বেলা পেট ভরেই খাও।"

"তারা সব তোমার মত নয়, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে।"

"আমিই বা কোন নবাব নবকেষ্ট সেজে আছি?" তপেশ একটু উগ্রস্বরে কথা বলিল।

মঞ্জুলীও পাল্টা জবাব দিল, "তা আবার খুলে ব'লতে হবে! আগে তোমার এমনি কাগজেই লেখা চলত। এখন পাঁচ আনা দামের প্যাড না হ'লে চলে না। সোয়ান্ ইন্‌ক্ না হ'লে এখন লেখা বেরোয় না, বাজারে কি আর কালীর বড়ি মেলে!"

"একশ' বার বেরোয় না। তা' বুঝবার ক্ষমতা ভগবান তোমায় দেয় নি।"

"আমার বুঝবার দরকারও নেই। আমি শুধু বুঝি সকাল দশটা বাজলেই ক্ষিধে পায় আবার রাত আটটা না বাজতেই পেটে খিদে লাগে।"

"শুধু কথা-ই শিখেছিলে—"

মঞ্জুলী আঁচল হইতে চাবীছড়া খুলিয়া ঝনাৎ করিয়া মেঝেতে ফেলিয়া দিয়া কহিল, "আর কথা শিখবার দরকার হবে না। এই চাবী, ঐ ক্যাসবাক্স, নিজেই ঝঞ্ঝাট হাতে নিয়ে দ্যাখ না। টের পাবে, কত ধানে কত চাল। নাও, ঐ চাবী আছে, বাক্সে কত আছে খুললেই পাবে'খন।"

তপেশ কোন কথা বলিল না, শুধু দুয়ারের ঈষৎ ফাঁকটা ভাল করিয়া বন্ধ করিল—যেন ও-ঘর হইতে কিছু শুনিতে না পায়। মঞ্জুলী ঝাম্‌টা দিয়া কহিল, "পরশু বিকেলে ছ' আনা নিয়ে বেরুলে, রাত্রে আনলে পাঁচ পয়সার আলু দু' পয়সার উচ্ছে। আর বাকী পয়সা যে কি হ'ল তুমিই জানো।—তোমার পয়সা তুমি যা খুসী তাই কর, আমি শুধু উনুন ধরিয়ে হাঁড়িতে খালি জল না ফোটালেই হ'ল। বেঁচে যাই তাহ'লে আমি।"

তপেশ কোন বাক্যব্যয় না করিয়া পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়া বাহির হইয়া গেল।

রাস্তায় চলিতে চলিতে তপেশ জামার বোতামগুলি

আঁটিল। মঞ্জুলীর অভিযোগ অহেতুক নয়।···সস্তা টিটাগড় ফুলস্ক্যাপেই তো এতদিন লিখিয়াছে। 'বিশ্ব-বাণী'র সহ-সম্পাদক হইয়া তাহাদের আর্থিক অবস্থা এমন কি বাড়িয়াছিল যে পাঁচ আনা দামের চিঠি লেখার প্যাডে গল্প না লিখিলে চলে না!

পরশুদিন চার আনার পয়সা-ও সে অযথাই খরচ করিয়াছে। দীনবন্ধু পাবলিশিং হাউসে যাইয়া তপেশ সে দিন শুনিল তাহার গল্পগুলি ও উপন্যাসখানি প্রকাশকের ভালই লাগিয়াছে। প্রকাশক সপ্তাহখানেক বাদে যাইতে বলিয়াছেন। পাকাপাকি কথাবার্তা হইবে। আনন্দে আত্মহারা হইয়া পথ চলিতে চলিতে তপেশ একটা খাবারের দোকানে ঢুকিয়া চার আনারই খাইয়া ফেলিল। ক্ষুধাও পাইয়াছিল। খাইতে বসিয়া অবশ্য মঞ্জুলীর কথা মনে পড়ে নাই এমন নহে! তাহার জন্যও তপেশ কিছু খাবার লইয়া যাইবে ভাবিয়াছিল। কিন্তু বাকী দু' আনার পয়সা হইতে তরকারী কিনিয়া না নিলে মঞ্জুলী রক্ষা রাখিবে না। রাত্রে তপেশ মঞ্জুলীকে পয়সার হিসাব দেয় নাই। জিজ্ঞাসা করায় উত্তর এড়াইয়া গেছে। চাকুরী-খোঁজা, ট্রাম-বাস ভাড়া, কি অমনধারা যা'তা একটা হঠাৎ বানানো বলে নাই।······

মঞ্জুলীর রাগিবারই কথা। বর্ত্তমান অবস্থায় চার আনার পয়সাও বড় কম কথা নয়। কিন্তু মঞ্জুলী যে ঘরে বসিয়াই থাকে। বাহিরে রাস্তায় রাস্তায় চলিতে হয় না। ক্ষুধা পাইলে দোকানে দোকানে কাচের বাক্সে সাজানো খাবার-গুলিও তাহাকে দেখিতে হয় না। তপেশকে বাহির হইতে হয়, মাইলের পর মাইল হাঁটে, অপর দশজনকে খাবারের দোকানে ঢুকিতে দেখে, ক্ষুধাও পায়, চোখে পড়ে মিষ্টি ও নোন্‌তার ভরপুর ভাণ্ড, চোখ ফিরিয়া চলার পথে আগাইয়া যায়। এই তো তপেশের আজকালকার বাইরের প্রাত্যহিক জীবন। একদিন না হয় ঢুকিয়াই ছিল খাবারের দোকানে! অনেককাল পরে খাইতে বসিয়া রসনার রাশ বাঁধিয়া রাখিতে না হয় পারেই নাই। এমন কি মহা অপরাধ!···

মঞ্জুলীর কাছে তাহার সত্য গোপন করা উচিত হয় নাই। খাওয়ার কথা শুনিলে মঞ্জুলী কিছুতেই আজ খোঁটা দিতে পারিত না। পেটে দিয়াছে শুনিলে সে শত অভাবেও আঘাত দিয়া কথা বলিত না নিশ্চয়ই।

তপেশ রাস্তায় চলিয়াছে আর ভাবিতেছে। ভাবনার তাহার অন্ত নাই। এক চিন্তা হইতে আর এক চিন্তা, তারপর কত কথার গলিঘুঁজি ঘুরিয়া আবার সেই পূর্ব্ব কথায়।···

মঞ্জুলীর ভাইব্রোনা। আজই কিনিতে হইবে। শরীর তাহার সারিতেছে না কেন?···

তপেশ কলেজ ষ্ট্রীটের এক পুরাতন বইএর দোকানে ঢুকিল। দাম শুনিয়া তপেশের চক্ষুস্থির। দু'খানি বইতে মাত্র পাঁচ-সিকে দিতে চায়। তপেশ অন্য দোকানে গেল। ঐ এক কথা—মশাই পুরনো এডিসন, এ এখন চলে না, এক টাকার বেশী দাম হয় না।

তপেশ ফিরিয়া আসিয়া সেই আগের দোকানেই অনেক দরাদরি করিয়া দু'টাকায় সেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলী ও স্মিথ-সাহেবের ভারত-ইতিহাসখানি বিক্রি করিল।···

মাত্র দুই টাকা! আরো দুই টাকা ছ' আনা হইলে এক বোতল ভাইব্রোনার দাম হয়।

বন্ধুদের কাহারো কাছে হাত পাতিবার উপায় নাই। আশু পাঁচ টাকা পায়। একদিন সিনেমায় তাহার সঙ্গে দেখা। তপেশ সেদিন মঞ্জুলীকে লইয়া একখানি বাঙ্গালা বই দেখিতে গিয়াছিল। তপেশ নিজেই তাহাকে বলিয়া আসিয়াছিল, তাহার টাকাটা পরের সপ্তাহে শোধ করিয়া দিবে। তারপর দুই মাস চলিয়া গেছে। এখন আর সেখানে কেমন করিয়া যায়।···

দু'টাকা, একটাকা, আট আনা—এ-রকম প্রায় সব কয়টী বন্ধুই পায়। তবু সে ইতিমধ্যে কাহারো কাহারো কাছে গিয়াছিল। ঘণ্টাখানেক বসিয়া একথা সেকথা নানা কথায় কাটাইয়া আসিয়াছে। তবু আসল কথা বলি-বলি করিয়াও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে নাই। আগের দেনা শোধ না দিয়া আবার হাত পাতিবে কেমন করিয়া!···

প্রকাশকের কাছে গেলে কেমন হয়? সপ্তাহখানেক পরে তো কথাবার্ত্তা ঠিক হইলে কিছু টাকা পাইবেই। আজ ভয়ানক দরকার বলিয়া গোটা পাঁচেক টাকা লজ্জা সরম ত্যাগ করিয়াই চাহিয়া বসিবে। পাইবে নিশ্চয়ই।···

এখন দু'টা বাজে। গোটা পাঁচেকের সময় প্রকাশকের কাজের তাড়া থাকে না। তখনই তপেশ দেখা করিবে আজ। এখন সময়টা কলেজ স্কোয়ারে বসিয়া কাটান যাক্।

তপেশ ছায়া দেখিয়া উত্তর পারে একটা বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িল।

আজকাল সময় কাটাইতে তপেশকে মাথা ঘামাইতে হয় না। দুশ্চিন্তা হালকা করিবার মন্ত্র জানে সে। মনে মনে না-হওয়াকে হইতে দেয়, না-পাওয়াকে পাইয়া যায়। মাঝে মাঝে এই দিবা-স্বপ্নের ধ্যান ভাঙ্গিয়া কর্ম্মচঞ্চল নগরীর বাস্তব সত্যের উপর একবার কাতর চোখ দুটী বুলাইয়া লইয়া মনে মনে হাসে। কখনো বা জোরেও হাসে। অমনি চারিদিকে তাকায়। কেউ হাসিতে দেখে নাই তো! পাগল মনে করাটা তেমন বিচিত্র কি! পাগলও বুঝি রাতদিন এমনি ভাবে। শুধু তফাৎ এই—আকাশ-কুসুমের রাজ্যে একজন যায় স্বেচ্ছায় বেড়াইতে, আবার ফিরিয়া আসে সময়মত প্রয়োজনের ডাকে; আর একজন ঐ ভোলানাথের রাজ্যে সর্ব্বক্ষণের নিরুদ্দেশ যাত্রী।

তপেশের কাছে কিন্তু এই বায়বীয় ধর্ম্মটা একেবারে মিথ্যা নয়। যে-নেশা কঠিন বাস্তব হইতে ক্ষণকালের জন্যও এক হাল্‌কা হাওয়ার স্বাধীন সাম্রাজ্যে লইয়া যাইতে পারে—দুনিয়ায় আর যে যাহাই বলুক—তপেশ তাহাকে নিতান্ত নিরর্থক বলিবে কোন সাহসে, কোন যুক্তির জোরে। এ-যে প্রত্যক্ষ! দুঃখ-ভোলানো, সত্য-ভোলানো, অতি গোচরীভূত অবাস্তব!

কোন দিন তপেশ গেছে ভবানীপুরে—টাকার ফিকিরে, কি টিউসনের খোঁজে, বন্ধুর বাসায়, অথবা চাকুরীর সন্ধানে, কিংবা ও-রকম কোন এক কাজে বা অকাজে। ফিরিতে রাত বাজিল দশটা, পকেট খালি, ক্লান্ত মন, শ্রান্ত দেহ। অবসন্ন পা-দু'খানি। এখন উপায়।

উপায় আছে। কল্পনায় রঙ্‌ ফলায় তপেশ। এলগিন্ রোড পার হইয়া কখন সে সাহেব-পাড়ার মধ্য দিয়া পথ চলিয়াছে। জীবনে যাহা হইয়া ওঠে নাই বা যাহা কোন মতেই হওয়া সম্ভব ছিল না, সেই ফেলিয়া-আসা অতীতকে তপেশ নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজে। তাহারই মধ্যে সেদিনের আপনাকে নব নব ভূমিকায় অভিনয় করাইতে করাইতে কখন চাহিয়া দেখে সম্মুখে ধর্ম্মতলা—ওয়েলিংটনের মোড়।

আর একটু পথ বাকী। পথের কথা মন ভুলিলেও পদ-যুগল ভুলিতে চায় না। আবার তপেশ দ্বিগুণ মাত্রায় দিবাস্বপ্নের মালা গাঁথে। মনে মনে ভাবে—এমন ত হইতে পারে, হয় না যে এমনও ত নয়—সে যেন কর্পোরেশনে কি রেলওয়েতে ১০০৲ মাহিনার চাকুরী পাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গেই বাসা-বদল, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড্, জীবনবীমা, মঞ্জুর গলার সরু চেন—কোন কিছুর হিসাবেই ভুলচুক হয় না।—

বাসায় পৌছিতে আরো পাঁচ মিনিট। পা ও পাদুকার মধুর সম্বন্ধ বিচ্ছেদ সুরু হইয়াছে। তপেশ হঠাৎ দপ্ করিয়া অনেক উঁচুতে উঠিয়া পড়ে। একেবারে লটারীতে এক লক্ষ টাকা! অবশ্য টিকেট সে কখনো কিনে না। বিনা-মূলধনে ব্যবসায় উন্নতিই ত বুদ্ধিমানের কাজ! কিন্তু এক লক্ষ টাকা লইয়া তপেশ বিপদে পড়ে। শাড়ী, গাড়ী, দোতলা-বাড়ী—ক্রমে ক্রমে উঠিতে উঠিতে ৫০ কি ৬০ হাজারে পৌছিতেই সুমতি, মনোরমা, লবঙ্গ প্রভৃতি চেনা জানা স্পষ্ট-অস্পষ্ট কয়েকটী মুখ আসিয়া তাহার চোখের সামনে ভীড় জমায়। ৫০।৬০ নামিয়া আসে ত্রিশ হাজারে। তপেশ দৃঢ় সঙ্কল্প করে, বাকী ৭০ হাজার Public Charity করিবে। চিত্তরঞ্জন সেবাসদন হইতে নারীরক্ষা-সমিতি পর্য্যন্ত কোন প্রতিষ্ঠান বাদ পড়িবে না। কখন বা দু'হাতে দান করিতে করিতে তপেশ নামিয়া পড়ে মাত্র পাঁচ হাজারে। বাকী ৯৫ হাজার সে ছাড়িয়া দিতে রাজী আছে বিনা দ্বিধায় কোন রকম দ্বিরুক্তি না করিয়াই, অবশ্য যদি তাহার নিজের অংশ ঐ সামান্য পাঁচ হাজার এখনই তাহাকে কেহ আসিয়া নগদ হাতে হাতে বুঝাইয়া দেয়। হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া তপেশ চারিদিকে চায়। হাসিতে দেখিল কি কেহ?

দেখিলই বা! ভবানীপুর হইতে বৌবাজার পর্য্যন্ত, যে-মিথ্যা পয়সা বাঁচাইল—ভুলাইল পথের কথা, পায়ের ব্যথা, মনের ভাবনা—তাহার মূল্য জগতের আর সকলের কাছে যাহাই হউক, তপেশের কাছে সে যে অতি-বড় বাস্তবের মর্য্যাদা পাইয়া বসিয়াছে। এই আকাশ-কুসুম রচনা করিতে জানে বলিয়াই আজও সে সুদীর্ঘকাল বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা রাখে। হক্ মিথ্যা, হক্ ফাঁকি, হক্ একান্ত শূন্য। তবু এই আশা, এই কল্পনা, এই অনুভূতি—ইহাই ত তপেশের জীবন, তাহার বর্ত্তমান। তপেশ ভাবে, এই ফাঁকি বুঝিয়াও বুঝিতে চায় না বলিয়াই বুঝি দুনিয়ায় কোন কালেও আত্মহত্যার মড়ক লাগে না।

এমনি করিয়া আজকাল তপেশের নিরালা সময় কাটে। আজও কলেজ স্কোয়ারের বেঞ্চে বসিয়া কত কি ভাবিল। কত কি বলিতে লাগিল মনে মনে অজানিতেই মুখ বিড় বিড় করিল।

হঠাৎ কে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল, "কি রে তপেশ, মুখ নেড়ে খাচ্ছিস কি?"

তপেশ চাহিয়া দেখিল কমলাক্ষ। তাহার কলেজ জীবনের এক সমবয়সী সতীর্থ।

হাসিয়া জবাব দিল তপেশ "মুড়ি-মুড়কি।"

কমলাক্ষ গম্ভীর হইয়া কহিল, "ইডিয়ট! কল্পনায়ই যদি খাওয়া তবে মুড়ি-মুড়কি কেন রে। বল সন্দেশ, পলোয়া, কোর্ম্মা, কোপ্তা—"

"তোর সঙ্গে আজ অনেকদিন পর দেখা, কেমন আছিস ভাই?" -তপেশ তাহার কথায় বাধা দিয়া একখানি হাত ধরিয়া পাশে বসাইল।

"বেকারের আবার থাকা না-থাকা কি।"

"তবে তুমিও সগোত্র, তাই বলো!"

"তুই তো তবু সাহিত্যিক—মাঝে মাঝে তোর লেখা দেখি কাগজে।" তপেশ হাসিয়া কহিল, "অর্থাৎ আমার ক্ষুধা পায় না, ঘুম আসে না, অসুখ করে না, মুদীর দোকান নেই, ধার শোধ দেবার ক্ষমতা নেই জেনেও ধার করি না—কেমন?"

কমলাক্ষ হাসিয়া কহিল, "খুব বলে নিলি একচোট, সাহিত্যিকের মতই, না, তুই প্রমিসিং।"

তপেশ কহিল, "কি কচ্ছিস্ এখন কমলাক্ষ?"

"এই তো বল্লুম কিছু না। বেকার! এই মধুর নামটা কতবার করে শুনতে চাও?"

"তবু একটা কিছু—"

"হ্যাঁ, বেকার নামটা ভাঁড়াবার জন্য অবশ্য গোটা দুই বলতে পারি।"

"যথা?"

"—প্রাইভেট্ টিউটর, লাইফ্ ইন্সিওরেন্সের এজেন্ট, রিলিফ্ ওয়ার্কসের স্বেচ্ছাসেবক।"

তপেশ হাসিয়া কহিল, "সবগুলি এক সঙ্গে, না পর পর?"

"আপাততঃ কোনটাই নয়।" বলিয়া কমলাক্ষ একটু মুচকিয়া হাসিল।

"সে কি রে। ক'লকাতার খরচ চলে কি করে?"

"শিকার করি—আছে? তোর কাছে আনা দুই পয়সা হবে?—'বসন্ত কেবিন' থেকে এক কাপ চা খেয়ে আসি।"

তপেশ চুপ করিয়া হাসিতে লাগিল।

কমলাক্ষ বলিয়া চলিল, "নেই? তা আগেই বুঝেছি। আমার জাতও গেল, পেটও ভরল না। তুই একেবারে বেয়ারিং পোষ্ট।"

উভয়েই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কমলাক্ষ তাহার মণিব্যাগ খুলিয়া দু'খানি চার পয়সার ষ্ট্যাম্প দেখাইয়া কহিল, "আমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার তোর মত শূন্য নয়। এখনো আমি দু' আনার মালিক। এ আমার চেক্ বুক। প্রয়োজন মত ভাঙ্গিয়ে নেই।"

তপেশ হাসিয়া কহিল, "তোর ব্যাঙ্ক কোথায়?"

"পোষ্ট আপিস। ডাক-টিকেট কিনতে লোক ভিড় করে দাঁড়ায়। তাদের কারু কাছে বিক্রি ক'রে দেই। আমি যে ভুলবশত বেশী কিনে ফেলেছি এ-কথাটা অবশ্য জানিয়ে দিতে ভুল করি না।—Money always burns holes in my pocket. তাই অর্থকে কাগজে আটকে রাখি বুঝলি? একদিন হয়ত পাইস্ সিস্টেম্ হোটেলের ছ'টি পয়সাও নেই, তখন দক্ষিণ হস্তের কাজে লেগে যায়। হাসছিস্ কি—এই তো সেদিন সকালে চায়ের নেশা চাপল। আগের দিন রাত্রে গেছে হরিবাসর। হঠাৎ মনে পড়ল, দু'খানা ষ্ট্যাম্প আছে বাক্সে। জামাটা গায় দিতে দিতে হুঁস হ'ল—আজ যে রবিবার, পোষ্ট আপিস বন্ধ। এখন উপায়! চুলগুলি নেড়ে উস্কো খুস্কো করে সতরঞ্চ দিয়ে বালিশটা জড়িয়ে নিয়ে বগলদাবা করলাম, রুম্‌মেটরা জিগ্‌গেস করলে, 'কোথায় প্রভু?'—'এলাহাবাদ' বলেই ঝাঁ করে বেরিয়ে পড়লাম। শেয়ালদার মোড়ে একটা বড় ওষুধের দোকানে চশমাপরা ডাক্তারবাবু বসে আছেন রোগীর আশায়। ঢুকে পড়ে বললাম, "মশাই বড় বিপদে পড়েছি—আমার একটু উপকার করবেন। দয়া করে আমায় দু' আনার পয়সা দিন। ভদ্রলোক বিস্ময়ের ভাব কাটিয়ে উঠবার আগেই ষ্ট্যাম্প দু'খানি সামনে ধরে বললাম, আপনার তো দরকার হবেই—আমি trouble বাঁচিয়ে দিচ্ছি।—কি বিপদেই পড়েছি। ঢাকা মেলে কাল রাত্রে

ঘুমের মধ্যে মনিব্যাগ শুদ্ধ যথাসর্ব্বস্ব—বুঝেছেন ? ভাগ্যিস ষ্ট্যাম্প দুখানা সঙ্গে ছিল। ভবানীপুর যাবার বাসের ভাড়াটা মিলে গেল। ভদ্রলোক কি ভাবল কে জানে। ড্রয়ার থেকে দু'গণ্ডা পয়সা বের করে দিয়ে টিকেট দু'খানা তুলে নিলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকলাম পাশের এক চায়ের দোকানে। তার পর চা-কেক্-যোগেন ব্রেকফাষ্ট্ শেষ করে নিলাম।"

তপেশ চাহিয়া আছে। এই সেই কমলাক্ষ! তাহার কলেজ-জীবনের সতীর্থ। কি চমৎকার স্বাস্থ্য, কি সুন্দর মুখশ্রী ছিল এই কমলাক্ষের। ব্যাকব্রাস্ চুল; সুগোল, সুডৌল, হাফ-সার্ট-পরা সুপুষ্ট দুখানি বাহু; দুপ্‌দাপ্ করিয়া পথ চলিত; চাল-চলনে ছম্‌ছম্ করিত স্বচ্ছন্দ পৌরুষ। তার পর আসিল আইন-অমান্য আন্দোলন। গরীবের ছেলে কমলাক্ষের মনটা ছিল না গরীব। গান্ধী টুপি মাথায় পরিয়া সে স্বেচ্ছাসেবকদের পুরোভাগে চলিত—অজেয় সিজার বা বিজয়ী নেপোলীয়নের মত। তখনকার কমলাক্ষকে দেখিলে একটানা বিশ বছরের ডেলি-প্যাসেঞ্জার কেরাণীরও একটু বুক টান করিবার ইচ্ছা যাইত। সে ছিল সেদিনের উদ্বেল-সুন্দর ছাত্রসমাজের এক মাধ্যাকর্ষণ!

তার পর কারাবরণ। জোয়ারের মুখে গা ভাসাইয়া দিল। ছ'মাস বাদে বাহিরে আসিয়া দেখে নিস্পন্দ ভাঁটা। পড়াশুনার পাট খতম করিতে হইল। কলিকাতায় টিকিয়া থাকিবার উপায় খুঁজিতে লাগিল। কমলাক্ষের সর্ব্বপ্রধান অযোগ্যতা, ভিতরের নগ্নতা সজলকণ্ঠে নিবেদন করিতে জানে না; কংগ্রেসী প্রভুদের দুয়ারে দুয়ারে ধন্না দিতে অপমান বোধ করে; রোজ রোজ তাহাদের বিরক্ত করিয়া খুশী রাখিতে লজ্জা পায়। সুতরাং কিছু জুটিল না। কমলাক্ষর চোখের উপরই কংগ্রেসী উপ-বৈঠকের লেবেল লইয়া অনেকেই অনেক কিছু করিয়া লইল। কমলাক্ষ হাসিল শুধু। ইচ্ছা হইল, শ্রীচৈতন্য পাবলিশিং হাউসের ত্রিতলের ছাদে একটা ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দেয়!

কমলাক্ষ আজ আর সে কমলাক্ষ নাই। কোথায় সেই ভাব-ব্যঞ্জক মুখসৌষ্ঠব; কমনীয়তার এতটুকু আভাসও যদি থাকে! অবশ্য আকার ও পরিমাণের তেমন কিছু হ্রাস ঘটে নাই; কিন্তু গাল দুটি ভাঙ্গিয়া গেছে; চোখ দুটি কোটরে একটু দাগও পড়িয়াছে: ইমারতখানির যেন এখনও কোন জখম হয় নাই—গায়ে শুধু নোনা ধরিয়াছে।

তপেশ চাহিয়া আছে, এই সেই কমলাক্ষ!

তাহার স্থিরদৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া কমলাক্ষ বলিয়া চলিল, "যাঃ, এতক্ষণ খাম্‌কা বক্‌বক্ করলাম। পকেট তোর এম্‌নি গড়ের মাঠ যে দু' পয়সার এক কাপ চা দিয়ে গলা ভেজাবার মুরদও তোর নেই। তুই একটা ননেন্টিটি! আজ বউনির মুখেই তোর মত অপয়ার সঙ্গে দেখা!"

তপেশ তাহার পকেটে হাত গলাইল। বই বিক্রির দুটি টাকা সঙ্গে আছে। কিন্তু ভাইব্রোনা—মঞ্জুলীর ভাইব্রোনা না লইয়া আজ বাসায় ফিরিবে না। হাসিয়া কহিল, "কাজ-টাজ খুঁজছিস্ তো?"

"প্রয়োজন বোধ করি নে।"

"অর্থাৎ?—"

"—একটা টিউসন আছে, কলকাতার খরচা কোন-গতিকে চলে যায়। ওরা গেছে পুরীতে হাওয়া বদলাতে। আমার অবশ্য হাওয়াতে পেট ভরে না। দিন পনেরো বাদেই ছাত্র আমার ফিরে আস্‌ছে, তার পর আর চিন্তা কি!"

"খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হ'য়ে এ বুঝি তোর অভিমান কমলাক্ষ?" তপেশ হাসিয়া সুধাইল।

"ফুঁ"

"মানে?"

"মানে, ঐ যে বললাম চাই না।"

"অর্থাৎ, high thinking and plain living…"

"তোর plain livingএর নিকুচি করি। আমার ধর্ম্ম ভোগের—লয়েন ক্লথ-পরা ত্যাগের নয়। আমি সব চাই—যত কিছু যা কিছু—সব।"

"তবে যে বল্‌লি চাই নে"—

"পেয়ে গেলেই আর চাইব না, তাই—ভগবান করুন, বেশী করে চাইব বলেই যেন পাই না কিছু।"

"হঠাৎ যে philosopher হয়ে গেলি কমলাক্ষ?"

কমলাক্ষ রুখিয়া উঠিল, "throw your philosophy to the dogs. অতি খাঁটি বাস্তব সত্য। বেকার তপেশ তুই যদি আজই একটা decent job পেয়ে যাস, কাল থেকে চাওয়ার কথা ভুলে যাবি—সবার সঙ্গে সবার হ'য়ে

ব্যাকুল হয়ে চাওয়ার ব্যথা। বুঝেছিস্?—ভিতরে আছে আমার আজন্ম উপবাসী ভোগলিপ্সা—তাই নিজেকেই বিশ্বাস করতে পারছি না। ভয় হয়, যদি ওপারের দলে ভিড়ে এপারের কথা একেবারেই ভুলে যাই।"

"তোর কথা ভাল করে বুঝলাম না কমলাক্ষ।"

"বুঝবি কচু আর কলা।—অতি বেশী স্পষ্ট বলেই বুঝতে পারছিস্ না।"

তপেশ হাসিয়া কহিল, "কমলাক্ষ, এ তোর defeatist mentality"—

কমলাক্ষ খেঁকাইয়া উঠিল,—"তোদের possessive mentalityর বিচারে। তাই তো হেসে বাঁচি নে যখন দেখি, মেসের স্যাতস্যেতে একতলায় মাদুর পেতে তোদের তরুণ কথাসাহিত্যিক বালীগঞ্জের বাড়ী, গাড়ী, শাড়ি, নারী বাদে প্লটই খুঁজে পায় না। খালি পেটেই এক কাপ চা খেয়ে নিয়ে গল্পের নায়িকার সাথে ফার্ষ্ট ক্লাসের রিজার্ভ বার্থে মনসা শিলং গচ্ছতি। এ ক্ষুধার যদি এতটুকু পরিতৃপ্তির সৌভাগ্যও ঘটে সে কি তখন আর মেসের এতকালের তক্তপোষের নড়বড়ে পায়া চারটার কথা একবার ভুলেও মনে আনে?"

তপেশ কহিল, "কমলাক্ষ! ভেবেছিস্ তোর কথা আমি কিছুই বুঝি নি।—এ তোর যুক্তি নয়, গায়ের ঝাল। সাহিত্যিকরা দল বেঁধে দুঃখ-দৈন্য সমস্যা-টমস্যা দিয়ে দীর্ঘশ্বাসের ঝঞ্ঝা আর অশ্রু-জলের বন্যা কেন ছুটিয়ে দেয় না?—তোর অভিযোগটা তো এই? জগৎ-জোড়া এই দুঃখ-কষ্টে, ব্যর্থতা অপমানের মধ্যে সাহিত্যে এসেও যদি মানুষ একটু হাসতে না পারে, সেখানেও যদি তাকে সেই কঠিন বাস্তবের কচমচিই শুনতে হয় তবে দুদিন বাদে মানুষ সে-সাহিত্যও আর পড়বে না!—সাহিত্যিকের ধর্ম্ম তোদের প্রয়োজনের চাহিদা মেটাতে নয়;—সে চলবে তার অন্তরের স্বধর্ম্ম মেনে। তুই চাস্ সাহিত্যকে ফরমাসী—"

"থাম্ আমার সাহিত্য-সম্রাট! অন্তরের স্বধর্ম্ম!" কমলাক্ষ বাধা দিয়া বলিয়া চলিল, "অন্তরই পারলি না জানতে, ধর্ম্মই পারলি না মানতে—তবু বড়াই করিস স্বধর্ম্মের। ফুলের ধর্ম্ম ফুটে ওঠায়—আলো-বাতাসের অভাবে হতভাগা তোর পাপড়ি পড়ছে অকালেই ঝরে, তোর এ বিশুষ্ক অঞ্জলি কার পূজোয় লাগবে! অন্ধ হয়ে আছিস, নইলে বুঝ্তিস তপেশ, তোর শক্তি ছিল, সাধও ছিল—কিন্তু তোর নিষ্ঠার সুযোগ কৈ, সাধনার অবসর কখন? তোরা সাহিত্যিকরা নিজেদেরই পারলি না ভাল করে জানতে, তাই তোদের সৃষ্টি হচ্ছে অনাসৃষ্টি—একটা করুণ আত্মপ্রতারণা। তোরা যে আনন্দের গান গাস্ তা নিতান্তই ফাঁকা, তোরা যে দাবীর জোরে ভোগের চিত্র আঁকিস তা মস্ত বড় ফাঁকি। আসলে তোদের মনটাই কুলটা। আবার বড়াই করিস স্বধর্ম্মের—চীৎকার করিস্—art for artist's sake."

"তোর মতে তবে artistরা হাতগুটিয়ে বসে থাকবে?"

"তা কেন। ভাববে আর ভাববে—লিখবে আর লিখবে: কেন তাদের ফুল ফুটি ফুটি করেও ফুটতে পেল না—কিসের অপরাধে তাদের বুকের গান জাগতে না জাগতে সুরের হ'ল সমাধি। লেখ তপেশ লেখ—আজ তপেশ তোরা লিখে যা না—জানিয়ে দিয়ে যা, কি হ'লে ফুল আপনি ফোটে, কি হ'লে গান আপনি জাগে। অনাগত যুগের তোরই মত শত শত তরুণ তপেশের বিকাশের বাধাবিঘ্ন দূর করে দেওয়ার মন্ত্র গেয়ে যা। আজ তুই বিকৃত বলেই তাই তোর সেই বিকৃত রূপেরই আত্মদান। এই ব'লেই আজ গর্ব্ব করবে—ভবিষ্যতের সেই প্রোজ্জ্বল দেহখানির ক্রমবিকাশের মূলে তোর মত সাধনাবঞ্চিত কত তপেশ লাহিড়ীর অস্থি, মজ্জা, কঙ্কালের দান রয়ে গেছে। ইমারতের অদেখা ভিত্তি হয়েও তোর সান্ত্বনা থাকবে, তবু আজকের এই নিরুপায় ঠুন্‌কো দানে তোর অপমান।"

"আজ এ-সান্ত্বনায় কি বুক ভরে কমলাক্ষ?"

"ভরে—যদি বুঝতে শিখিস্, কেন সত্তর বছরের বৃদ্ধও ঘরের কোণে আমের চারা পোঁতে। ভালবাস্তে শেখ্ তপেশ—প্রাণমন দিয়ে ভালবাস আজ শত সহস্র তপেশকে,—সম্মুখের ঐ অব্যাহত ধারার জন্মকথা আজ উঠুক তোর-আমার স্বপ্নের মায়ায় জেগে। হাসছিস্ তপেশ?—আমার এই বইএর ভাষার লেকচার শুনে?—সস্তা sentimentalism দেখে কাল্‌চার-অভিমানী সাহিত্যিকের গা ঘিন্ ঘিন্ করছে?—

তপেশ তেমনি হাসিয়া কহিল, "কমলাক্ষ! তোর বিচারের এক চোক কাণা। তোর এ অব্যাহত ধারা

কোন কালেই দেখা দেবে না যদি আজকের এই ক্ষীণ-স্রোত যোগসূত্রটুকুও একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাস্। এটা প্রয়োজন নয়—তোর অভিমানের কথা।"

"তখন মরা গাঙেও বাণ ডাকবে। পুকুরের মরা জল একেবারে সেচে ফেলে শুকিয়ে নিয়ে মাটি কেটেই তুলে আনতে হয় অঢেল জল। ভয় নেই তপেশ, জল না হলে মানুষ বাঁচে না, সেদিনও জল থাকবে—আজকের চেয়ে ঢের বেশী খাঁটি স্বতঃ-উৎসারিত জল।"

তপেশ কণ্ঠে বেশ একটু তর্কের ঝোঁক আনিয়া কহিল, "এটা উপমা—যুক্তি নয়। কথার মারপ্যাঁচে দৃষ্টি বিভ্রম ঘটতে পারে—সত্যকে ঢাকা চলে না।"

"তোর সত্যটা কি শুনি?"

"তুই যে অসম্ভবের স্বপ্ন দেখছিস কমল, সেদিনের বারোয়ারি তলায় রূপের পূজো ন্যাকামোরই নামান্তর হবে—আর্ট তখন তার জাত খুইয়ে আভিজাত্য হারাবে।"

কমলাক্ষ অট্টহাস্য করিয়া উঠিল, "বাকী অভিযোগ-গুলো রেখে দিলি কেন?—একটা তাজমহল সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, ব্যক্তিগত প্রতিভার স্ফুরণ হবে না, নারীর সতীত্ব থাকবে না, ভগবানের অস্তিত্বের কোন প্রশ্ন উঠবে না—বলে যা, থামলি কেন?"

তপেশ এতক্ষণে তাহার মনে মনে শাণাইয়া রাখা যুক্তিগুলি একে একে ছাড়িতে উদ্যত হইল। কিন্তু তাহাকে আরম্ভ করিবার কোন সুযোগ না দিয়াই কমলাক্ষ বলিয়া চলিল "তপেশ, তোদের এই একপেশে সাহিত্য-সৃষ্টি কি স্বার্থদুষ্ট! ঠিক সংসার ছেড়ে হিমালয়ে গিয়ে ব্যক্তিগত মুক্তিলাভের মত। তোদের এই জগৎজোড়া literary productions কি মানুষের জন্য? শুধু তোকে আর আমাকে নিয়েই কি গোটা মানুষ?—মাথাটাই কি সমস্ত শরীর? তোদের বাল্মীকি থেকে রবীন্দ্রনাথ, হোমার থেকে বার্ণার্ড শ'এর অনেক কিছুই মানুষ নিয়ে লেখা, কিন্তু মানুষের জন্য নয়। তোদের এই সাহিত্যের আবহমান স্বর্গ থেকে নিচের তলা চিরকাল বিচ্ছিন্ন হয়ে চলছে জ্যামিতির প্যারালাল লাইনের মত। তাদের কাছে—"

হঠাৎ কমলাক্ষ কথার মাঝখানে থামিয়া গিয়া বেঞ্চের পেছন দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল।

"ও কি রে?"

"চুপ্"—কমলাক্ষ ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, "ছাতাটাও আজ সঙ্গে আনি নি যে আড়াল দিয়ে বাঁচব।—গ্যাখ তো—আমাদের সুমুখ দিয়ে যে হোঁৎকা লোকটা গেল সে পিছন ফিরে তাকাচ্ছে নাকি?"

তপেশ হাসিয়া কহিল, "না।"

"বাঁচা গেল"—কমলাক্ষর অনুচ্চ কণ্ঠ আবার উদার উদাত্ত হইয়া উঠিল।

"কত টাকা পায়?"

"বেশী নয়, দুটাকা। দুবছর হয়ে গেছে—এখন প্রায় barred by limitation."

ভদ্রলোক এতক্ষণে স্কোয়ারের বাহিরে কলেজ ষ্ট্রীটের ফুটপাতে পড়িয়াছে। দুই বন্ধু হো হো করিয়া খানিকক্ষণ হাসিয়া লইল।

তপেশ আবার তাহাকে খোঁচাইয়া বলিতে চায়, "লোককে ঠকাবি, তবু চাকুরি খুঁজ্‌বি নে। আসলে এ তোর নিশ্চেষ্টতা।"

"Damn lie!"—কমলাক্ষ আবার রুখিয়া উঠিল। তপেশ ইহাই চায়। কমলাক্ষের ক্রুদ্ধ মূর্ত্তিই তাহার ভাল লাগে। কমলাক্ষও ইহাই চায়। প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে ফোঁস ফোঁস করিতে পারিলেই সে যেন কৃতার্থ হয়। তাই সব কিছুতেই প্রতিবাদ জানান কমলাক্ষর আজকাল একটা স্বভাবে দাঁড়াইয়া গেছে। ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল প্রতিপন্ন করিতে পারিলে সে যেন কেমন এক আনন্দ অনুভব করে। দেশের বড় বড় নেতাদের মুণ্ডপাত করিয়া সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। আজ সকালেই মেসের বারান্দায় অর্দ্ধ ডজন বেকার বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া কমলাক্ষ প্রমাণ করিয়া দিয়াছে—রবীন্দ্রনাথ বড় রকমের হাম্বাগ্, গান্ধী ছদ্মবেশী বুর্জ্জুয়া, পি, সি, রায় বাজে বকে, জওহরলাল 'flirt with socialism.' এদেশে সবাই ভ্রান্ত, প্রত্যেকেই অন্ধকারে—অবশ্য কমলাক্ষ বাদে। তর্ক করিতে করিতে রাগিয়া উঠে। অপর পক্ষের কথা শুনিতে চায় না। তাহাদেরও যে কিছু বক্তব্য থাকিতে পারে তাহা সে মানে না। সে ছাড়া আর সকলে তখন নীরব শ্রোতা মাত্র, বড় জোর মাঝে মধ্যে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ছাত্রের মত দু'একটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করিবে শুধু।

কমলাক্ষকে একবার ক্ষেপাইলে সহজে থামানো মুস্কিল।

তখন সে আর যুক্তির ধার ধারে না। অনর্গল বকিতে থাকে। তপেশ সে-কথা বেশ জানে। আজ কমলাক্ষকে একটু উস্কাইয়া দিবার বড় প্রয়োজন। তাহার কথা কতক শুনিয়া কতক না শুনিয়া সময়টা বেশ কাটিয়া যাইবে। তপেশ সুতরাং হাসিয়া হাসিয়া কহিল, "মিথ্যে কথা নয় কমলাক্ষ! আমাদের enterprise শুধু ডালহাউসি স্কোয়ারে দরখাস্ত হাতে করে—"

কমলাক্ষ গর্জ্জিয়া উঠিল, "সেই পুরাণো একঘেয়ে প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম লেক্‌চার। Gigantic মিথ্যে কথা, শুনে শুনে কাণ ঝালাপালা!"

তপেশ হাসিয়া কহিল, "সত্যম্ অপ্রিয়ম্"

কমলাক্ষ তিড়বিড় করিয়া উঠিল, "থাম্ সত্যবাদী। আজ সকালেই আমাদের মেসে তোরই মত এক স্পষ্টবাদী, অবশ্য তিনি চাকুরী করেন, একটু চুলকানো আলাপ জানিয়ে নিয়ে কথাচ্ছলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অধ্যবসায়ের উল্লেখ করে এক সুদীর্ঘ লেক্‌চার ঝেড়েছেন। subject matter আজকালকার ছেলেদের নিশ্চেষ্টতা। ভদ্রলোকের ভরসা এই sermonising costs nothing."

"একথা যেমন সত্য, আবার এ-ও সত্যি কমলাক্ষ, sermon falls on flat ears.—"

""shut up! আগে আমি বলে নিই।—বিদ্যাসাগরের কথা আপাততঃ মুলতুবী রইল। ঈশ্বরচন্দ্রের কথা ধরা যাক্। মাণিকতলার কর্পোরেশন ব্যারাকে, টেংরা-টালা-নারকেলডাঙ্গা-বেলেঘাটার টিনের ও টালির খুপ্‌রিগুলির মধ্যে মডার্ণ ঈশ্বরচন্দ্ররা পাঠ্য-পুস্তকের আদ্দেক-ও জোগাড় করতে পারে না। চেয়ে-চিন্তে ধার করে পড়তে হয়। ঈশ্বরচন্দ্র তবু রাত্তিরে পড়ত, কিন্তু মডার্ণ ঈশ্বরচন্দ্রদের গ্যাসের আলোয় পড়া মুখস্থ করার সময়টুকু হয় না; কারণ পরের ছেলে পড়িয়ে বাসায় ফিরতে তাদের রাত দশটা বাজে, তারপর খেয়ে-দেয়ে শুতে শুতে রাত এগারটা। বিদ্যাসাগর সামান্য ধুতি-চাদরে চটি হাঁকিয়ে লাট দরবারে যেতেও বাধা পেতেন না। আর তুমি-আমি? চটি পায়ে তো দূরের কথা, ময়লা জামা-কাপড় প'রে টিউসন করতে গেলে বাসার উড়ে চাকরটা তার খোকাবাবুকে উপর থেকে পড়ার ঘরে ডেকে দিতে অন্ততঃ দশ মিনিট দেরী করবে। অথচ এই পরিষ্কার জামা-কাপড় জুতোর কষ্টসাধ্য ঠাট বজায় রাখতে হ'বে সকাল বিকেলের দু'তিন পয়সার মুড়ির বরাদ্দ তু'লে দিয়ে।—হাসিস্ নে তপেশ—ঈশ্বরচন্দ্র এবেলা খেতেন মাছ, ওবেলা তারই ঝোল। মডার্ণ ঈশ্বরচন্দ্ররা সপ্তাহে কদিন মাছ খায় সে-কথা তুলব না। চালে ভেজাল, ডালে ভেজাল, তেলে ভেজাল, এমন কি নুনটুকুতেও ভেজাল তোমাদের ঈশ্বরচন্দ্রকে গিল্‌তে হয়নি। স্বাস্থ্য সুতরাং ভালই ছিল তাঁর। বিদ্যাসাগরও হলেন। মডার্ণ ঈশ্বরচন্দ্র-রা-ও পাশ করে অনার্স না পেতে পারে, ফাষ্ট ক্লাস ফাষ্ট নাই বা হ'ল। তবু তারা ফেল করে না। এর নাম নিশ্চেষ্টতা না?"

কমলাক্ষ কথার ঝোঁকে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। চিন্তাসূত্র এলোমেলো। এ কথায় সে-কথা খাপ খায় না। ওখানে এখন যুক্তিতর্ক আশা করিতে যাওয়াই ভুল। ইহা তাহার অভিযোগী মনের বহিরুচ্ছ্বাস। তাহার এই একটানা বক্তৃতার দাঁড়ি-কমা নাই। এক নিশ্বাসে সব কথা গড় গড় করিয়া বলিয়া যায়; যেন এতটুকু দেরী হইলে উত্তপ্ত বাক্যগুলি জুড়াইয়া যাইবে। বক্তৃতার উচ্ছ্বাসে গলার শিরা উপশিরা জাগিয়া উঠে। তপেশ তাহার মুখের ভাবান্তর ও কণ্ঠস্বরের ওঠা-নামা লক্ষ্য করিতেছে। কমলাক্ষ বিরক্তি-মিশ্রিত উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া চলিল, "তোমাদের সমালোচনা বক্তৃতা দেবার সময় শুধু কলেজ হষ্টেলগুলোর দিকে তাকায়—বাবার পয়সায়, শ্বশুরের টাকায় cinema-goersযারা তাদের কথাই ভাবে, যেন যুবক বাঙ্গালা বলতে ঐ ফ্যাসান দুরস্ত কলেজী ছেলেদেরই বোঝায়। শত শত ঈশ্বরচন্দ্রের মাস না যেতেই পাইস্ সিস্‌টেম হোটেলে খাওয়ার পয়সা ফুরিয়ে যায় সে ইতিহাস কেউ জান?"

কমলাক্ষের বক্তৃতা শুনিয়া পাশের বেঞ্চে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন।

তপেশ বুঝিয়াছে, উভয়েরই এক সুরে তার বাঁধা। নিজে কিছু বলিবে না, কমলাক্ষকে দিয়া বলাইয়া নিতে চায়। হাসিয়া কহিল, "তোর লেক্‌চারে এক লেবার-লীডারের উচ্ছ্বসিত উত্তাপ আছে। প্রশংসনীয় কিন্তু এত ক'রে লেখাপড়া শিখে মডার্ণ ঈশ্বরচন্দ্রদের লাভ কি হ'চ্ছে শুনি?"

"পথে আয়। এদেশের গরীবের ছেলের উচ্চশিক্ষা শুধু



[illegible]

শিল্পী—শ্রীযুক্ত [illegible]

Bharatvarsha Halftone & Pr[illegible]

অশোভন নয়, দস্তুর মত অপরাধ। কিন্তু নিশ্চেষ্টতার অপবাদ দিলে সইব না। বার বার ব্যর্থতায়ও তারা ভেঙ্গে পড়ে না এমনি জাতের ছেলে তারা।"

"ঐ চাকুরী খোঁজার বেলায়—"

"বুঝেছি, সেই থেঁত্লানো, তেতো, পুরাণো, বাঁধা গৎ। সেই এককথা—বিজনেস্! ব্যবসা! চাষ-আবাদ! স্বাধীন-ভাবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সসম্মানে খাওয়া! কিন্তু মডার্ণ ঈশ্বরচন্দ্রদের পান-বিড়ির দোকান খুলবার ক্যাপিটাল যোগাড় হয় না, সে কথা কেউ ভাব? পকেট কাট্তে হ'লেও ক্যাপিটাল চাই—একখানা কাঁচি কি ধারালো ব্লেড্ কিন্তে হয়। আর এই পান বিড়ির দোকান খুলে ক'জন খাবে? আর শিক্ষিত ছেলেরা দোকান খুলে বাজার থেকে যাদের হটিয়ে দেবে তারা সব যাবে কোথায়? ওদিকে ব্যবসা করতে পারে যারা, যাদের বাবার টাকা আছে, হেভি ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স আছে, কোম্পানীর কাগজ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, কত রকমের কত কি—তারা ব্যবসা করে না, বিজনেস্ নিয়ে মাথা ঘামায় না তারা—পাঁচ, দশ, পনেরো, বিশ হাজার টাকা সিকিউরিটি দেবার ক্ষমতা আছে তাদের, সুতরাং চাকুরী করে তারাই, সব বেটে নেয় তারাই। কটা বড় লোকের ছেলেকে বেকার দেখেছিস্? কটা পয়সাওয়ালার ছেলেকে পাশ করে বেরিয়ে বড়বাজারে দোকান খুলতে দেখেছিস্? বাঙ্গালা দেশের ধনকুবের বলে যারা বিখ্যাত তারা বড়বাজার যায় না, কলেজ ষ্ট্রীট কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে কাপড়ের দোকান খোলে। large scale business! আর ব্যবসা করবে ঈশ্বরচন্দ্ররা, জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়ন করবে তারা—খবরের কাগজ হক করে, তেল-সাবান ফেরী করে, এন-মুখার্জ্জির চানাচুর বা চিন্তামণি দাঁতের-মাজন বিক্রি করে! শুন্‌ছিস্ তো তপেশ?—চাষ আবাদ করবে, কৃষিকার্য্যে আত্মনিয়োগ করবে, সে ক্ষমতা আছে? জমি কোথায়?—জমি আছে তো সাজ-সরঞ্জাম? তা-ও জোটে তো ফসল হ'য়ে বিক্রি হ'য়ে ঘরে পয়সা আস্তে কম্‌সে কম দশটী মাস। খাওয়াবে কে এ দশ মাস?"

তপেশ কহিল—"কুতর্ক করিস্‌নি কমলাক্ষ। জোর গলায় বল্‌লেই দুর্ব্বলতা চাপা পড়ে না। দশ মাস! কত দশ মাস কেটে যায়, চাকুরী জোটে না, সে সময় কি খায়? কে খাওয়ায়?"

"চাকুরে আত্মীয়স্বজনের ঘাড়ে বসে খেয়ে চাকুরী খোঁজে, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে হাত পাতে, অপমানে অসম্মানে দু'বেলা দুটো মুখে গোঁজে। যার খায় তার ফুট্-ফরমাস্ও খেটে দেয়। জবাব পেয়েও নড়তে চায় না। দিনের পর দিন চলে, দরখাস্তের পর দরখাস্ত করে, কারু বা কিছু জোটে, কারু জোটে না। গ্রামে যাও, এক সন্ধ্যে খেতে দেবে না কেউ, খেতে দেবার ক্ষমতাই নেই। সেখানে আতিথ্য দু' একদিন চলে, তার বেশী নয়। শহরে আত্মীয়-স্বজনের কষ্টার্জ্জিত টাকায় তাদের অধিকার আছে; সুতরাং ভাগ বসায় শত কথা শুনেও। রোজগেরে স্বজনের কাঁধে চেপে সুদিনের আশায় পথ চেয়ে থাকে।"

"এই গলগ্রহ হয়ে থাকাটা support করিস্?"

"কি করবে তারা বলে দাও। পথ থাকে তো বাংলে দাও। লেক্‌চারের পথ নয়, সত্যিকারের ভদ্রঘরের ছেলে যা আঁকড়ে ধরে অকৃতকার্য্য না হয় এমন পথ।"

"পথ অনেকে অনেক বলে দিয়েছেন, শুধু আমাদের initiative-এর অভাব। একথা স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করতে পারি, কিন্তু এ সত্যি।"

কমলাক্ষ আবার উগ্র হইয়া উঠিল, "শুধু এক পথ। চাকুরী। ট্যাঁক-খালি ঈশ্বরচন্দ্রের শুধু ঐ এক পথ খালি, পান-বিড়ির দোকান। তারও ক্যাপিটাল যার নাই সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। স্বয়ং বিদ্যাসাগরও আজ সশরীরে এসে অন্তত এক বছর ঘুরবে টালা থেকে টালিগঞ্জ, জুতোয় বার পাঁচেক হাফ্-সোল লাগাবে—"

"বিদ্যাসাগর চটি পরতেন মশাই" পাশের বেঞ্চির একটী ছেলে বাধা দিয়া কহিল।

"—হ্যাঁ ঠিক বলেছেন মশাই, ঐ চট্‌চট্। চটি পায়ে রোজ চার পাঁচ মাইল হণ্টন মেরে নিরাশ হয়ে ফিরলে ঈশ্বরচন্দ্রের মন বিদ্রোহ না করলেও পদতল বিদ্রোহ করবে নিশ্চয়ই। তারপর বীরসিংহ থেকে আসে চিঠির পর চিঠি—মুদী আর বাকী দিতে চায় না। যাক্, চটি ছেড়ে বিদ্যাসাগর জুতো ধরে একটা কিছু জোটাল বছরখানেক বাদে। ক্লাইভ ষ্ট্রীট কি চীনাবাজারে ২০ টাকার অস্থায়ী কেরাণী—অথবা ধর্ম্মতলা বা মুর্গীহাটায় ১৫ টাকার ছ'মাসের প্রোবেশনার।"

কমলাক্ষ হাঁপাইয়া পড়িয়াছে। একটু দম নিয়া আবার চলিল—

"এত করে যাহ'ক্ ঈশ্বরচন্দ্র তো ভিড়ে গেলেন fortunate few দলে।—fortunate few! তারপর কাপড়-জামা, শীতের কম্বল, পায়ের জুতো, চুল-দাড়ি, কাপড়-কাচা—ঈশ্বরচন্দ্র বড় মন-মরা হয়ে গেছে রে। বহুদিন হ'ল বাড়ীর চিঠি পায় না। বীরসিংহ গ্রামটা ভূমিকম্পে মাটির তলায় চাপা পড়ল নাকি!—না না, চিঠি লেখার ষ্ট্যাম্প না থাকাই ভাল—কেবলি মুদীর তাগিদ, গয়লার হিসাব, খোকার অসুখ, চৌকিদারী ট্যাক্স, খুকী দিয়েছে ষোলয় পা……"

তপেশ হাসিয়া কহিল, "বুঝেছি, এখন তুই ঘণ্টার পর ঘণ্টা বকে যেতে পারবি। তোর যুক্তির বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলবার আছে। কিন্তু মুখের যা দাপট, লোক জমে যাবে চারপাশে।"

"বলবি তুই ঘোড়ার ডিম! সেই প্লাটফর্ম্ম লেক্চার, নয়ত মাসিকপত্রের প্রবন্ধ। আমিও বলতে পারি। ১০।১২ পৃষ্ঠার এক আর্টিকেল আধঘণ্টায় লিখে উঠ্‌তে পারি।"

কমলাক্ষ রীতিমত ঘামিয়া উঠিয়াছে। খানিকক্ষণ চুপ থাকিয়া একটু দম লইতে চায়।

থামিতে সে জানে না। রাতদিন তাহার কথার জ্বালায় মেসের লোকগুলি অতিষ্ঠ। দোতলায় কোণের ঘরের বুড়ো তো অগত্যা তল্পি-তল্পা লইয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। চব্বিশঘণ্টাই বেকারগরিষ্ঠ মেস্‌টা তর্কযুদ্ধে সরগরম। এই হারে কি এই হারে, তবু কেহ হারে না। কমলাক্ষ তো সর্ব্বসম্মতিক্রমে অজেয় বীর।

কমলাক্ষ বেশ বোঝে, প্রকৃতিস্থ লোক মাত্রই তাহাকে বুঝি উনপঞ্চাশী ভাবে। সে নিজেই যে জানে, এমনতর বাচাল সে কোন কালেও ছিল না। কিন্তু লোকে কেন বোঝে না ছাই—কথার স্রোতে মনের বাষ্প বাহির হইয়া যায় বলিয়াই তাহারা ভিতরে ভিতরে জমাট বাঁধিতে পারে না। এই কথার ধারা যেদিন বন্ধ হইয়া মনের কোণে গুমট বাঁধিবে, সেদিন ভাবিতে ভাবিতে কমলাক্ষ উন্মাদ হইয়া গেলেও এমন বিচিত্র কি! এই অস্থিরতাই তাহার আত্মরক্ষারই এক গত্যন্তর। সুতরাং কমলাক্ষ অপরের সন্তোষ-অসন্তোষে ভ্রূক্ষেপ করে না। বরং যে লোক মনে মনে চটে তাহাকে সে কথার দাপটে চটাইয়া টানিয়া আনে। সেই বেচারার আজীবনের বদ্ধমূল বিশ্বাসকে তাহারই চোখের উপর কালাপাহাড়ী হিংস্রতায় টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া ভাঙ্গিতে চায়। তারপর কেমন এক নিষ্ঠুর আনন্দে কমলাক্ষ ঘরে দুয়ার ভেজাইয়া খিল খিল করিয়া হাসে। এমন কমলাক্ষের কাছ হইতে উঠিয়া চলিয়া না গেলে সে কিছুতেই থামিবে না। সুতরাং কপালের ঘাম কোঁচার খুঁটে মুছিয়া আবার সে সুরু করিল। সৌভাগ্যবশতঃ প্রসঙ্গের মোড় ফিরিল ভিন্ন পথে। প্রশ্ন করিল, "তুই বিড়ি খাস্ তপেশ?"

"না।—হঠাৎ যে মাসিক পত্রিকার সুচিন্তিত প্রবন্ধ থেকে বিড়িতে নেমে এলি?"

"এখন থেকে সুরু কর। আমি এবার বিড়ির বিজনেস্ করব। পাঁচ সিকেয় হাজার বিড়ি পাওয়া যায়, ৪০ প্যাকেট। এক একটা প্যাকেট তিন পয়সায় বিক্রি করলে আমি পাব এক টাকা চৌদ্দ আনা। দশ আনা লাভ থাকে। এক বিড়িওয়ালার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ঠিক করেছি, ভাল বিড়ি সাপ্লাই করবে। কলকাতার এত মেস-হষ্টেল বোর্ডিং, আমি শিক্ষিত ভদ্রঘরের ছেলে গিয়ে লেক্চার দিলে ১০।১২টা মেস বোর্ডিংএ দৈনিক হাজার দুই চালাতে পারব। তা হ'লে রোজ এক টাকা পাঁচ সিকে পকেটে আসবে। Decent income!"

তপেশ হাসিয়া কহিল "বাঙ্গালী ছেলেদের কাছে dignity of labourএর এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হবে।"

"ফুঃ! ওসব বড় কথার ধার ধারি নে। একটা ছোট চামড়ার সুট্‌কেসে বিড়ি নিয়ে ঘুরব। রাস্তার সবাই ভাববে একটা কাজের লোক—অন্ততঃ বীমা-কোম্পানীর দালাল বটেই!

"মুখেই বলছিস্ কাজে পারবি না বিড়ি নিয়ে ঘুরতে।"

"তুই আমায় এখনো চিনিস্ নি। কালই আরম্ভ করব। মাত্র পাঁচ সিকে ক্যাপিটাল। তোর বাসায়ও যাব। এক প্যাকেট খেয়ে দেখিস্। খুব ভাল বিড়ি। কড়া, মিঠে-কড়া যা তোর ইচ্ছে। রমজান মিঞা, বিড়িওয়ালা-মহলে নাম আছে তার, বেশ পাকা হাত।"

তপেশ হাসিয়া হতাশের ভাব দেখাইয়া কহিল, "তুই তো যা হ'ক বিড়ি-টিড়ি দিয়ে সংস্থান করে নিলি, আমি কি করি বল্ তো?"

"তোর তো কলম আছে।"

"তাতে যে পেট ভরে না।"

"ভরবে কেমন করে! জন্মেছিস এ যুগে, লেখা লিখবি বিশ পঞ্চাশ বছর আগের মত। সেদিন তোর এক কবিতা পড়লাম 'অন্তর্লক্ষী'। ও-সব romantic lyricism আর mystic ফাজ্‌লামো কেউ পড়বে না আজকাল। আমার কথা শোন। সাহিত্যিক না হ'তে পারি, সাহিত্য বুঝি অর্থাৎ বর্ত্তমানের তরুণ তরুণীরা কি চায় তা জানি। ওসব পুরানো পাটপাতা ছেড়ে দে। কবিতার বিষয়-বস্তুর অভাব কি!—ল্যাম্প্‌পোষ্টের কমেডি, ডাষ্টবিনের ট্র্যাজেডি, হিপোপোটেমাসের বিরহ ব্যথা, মেনকা ও ম্যাডোনা, উর্ব্বশী ও এডোনিস, ক্লিওপেট্রার নাকের ডগা, হেলেনের স্তনের বোঁটা, কালীঘাট-টু-শ্যামবাজার-ইন্‌-এ-ডাবোল-ডেকার। বিষয়বস্তুর নতুনত্ব চাই, বুঝলি রে! আজকালকার উদীয়-মান কবি ও লেখকরা তাই কিছু কিছু পয়সাও পাচ্ছে। তোর মত বাজে লেখকের গল্প-কবিতা কিনে পড়বার মত মূর্খ পাঠক এদেশে আজকাল আর পাবি নে।"

তপেশ হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা, তোমার মূল্যবান নীতিগর্ভ পরামর্শ শুনে রাখলুম।"

কমলাক্ষ বিদ্রূপের সুরে কহিল "শুনে রাখলুম! ওসব দেমাক ছাড় তপেশ। আমার কথা শোন। কাজে লাগবে। গল্প লিখবি? ঘটনা টেনে নিয়ে যা বালীগঞ্জ বা আলীপুরের গেট-ওয়ালা দোতলা বাড়ীর সুসজ্জিত ড্রয়িং রুমে, অথবা মেল্‌ ট্রেণের ফার্ষ্ট ক্লাসের রিজার্ভড্‌ বার্থে। নায়কের ব্যাকব্রাস্‌ চুল, নায়িকার গোথ্‌রো বেণী। কয়েক মিনিটের পরিচয়েই প্রেমে পড়া চাই, আধ ঘণ্টা যেতে না যেতে হাতে-হাত, এক ঘণ্টায় মুখে-মুখ; অভিভাবক অবশ্য পাশের ঘরেই থাকবে কিন্তু বেরসিকের মত হঠাৎ এসে রসভঙ্গ করবে না। ট্রেণের কামরায় নব-পরিচিত নায়ক-নায়িকার চুম্বনের শব্দে ঘুমন্ত সহযাত্রীর তন্দ্রা ভেঙ্গে দেওয়া চাই। এ না হ'লে নভেল! কথাবার্ত্তার ফাঁকে ফাঁকে গড়গড় করে ইংরেজী বুলি আওড়াবে। কন্টিনেণ্টাল লেখকদের দু'চারখানা বইএর নাম জানা চাইই—যত latest ততই বাহাদুরী। বাবার মোটরে মেয়ে যাবে প্রেমাস্পদের সঙ্গে সান্ধ্য-ভ্রমণে, চা খাবে ফারপোতে, ছবি দেখবে এম্পায়ারে—অন্ধকার অডিটোরিয়ামে ছবির পর্দ্দার চুম্বনের সঙ্গে compeition চলবে রিজার্ভড্‌ বক্সের। এ রকম নভেল লিখ্‌তে সুরু কর। সুখ্যাতি তোর ছড়িয়ে পড়বে দেখতে দেখতে। মেয়েদের হষ্টেলে আর ছেলেদের মেসে তোর নাম হবে জপমালা। টাকায় উঠবে পকেট ভরে। Your book will sell like hot cakes. বিশ্বনিন্দুকদের গালিগালাজ পুষিয়ে যাবে তরুণ-তরুণী মহলের চিঠিপত্রের শ্রদ্ধা-নিবেদনে। সাহিত্যে তোর আবির্ভাব বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে। পারবি লিখতে? টাকা চাস?—"

"বাবু একটা পয়সা।"—একটা ভিখারী তপেশ ও কমলাক্ষের কাছে আসিয়া হাত পাতিল।

কমলাক্ষ তাড়া করিল "ভাগ্‌! ভাগ্‌।"

তপেশ কহিল, "অমন করতে নেই। মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে বল, নেই—কিছু মিলবে না।"

"ওদের আবার তেতো-মিষ্টির জ্ঞান আছে নাকি! এজন্যই আমাদের চেয়ে ওরা সুখে আছে। দুঃখের বোধ নেই, কষ্টের সঙ্গে বোঝাপড়া নেই, আপোষ-রফাও না, আছে আজন্ম স্বীকৃতি। আমাদের চেয়ে ঢের সুখে আছে।"

বাধা দিয়া তপেশ কহিল, "তা বটে! মাঘের শীতে ফুটপাতে শুয়ে—"

"ইঁদুরের হাত থেকে তো রক্ষা পায়। এই দ্যাখ্‌ তপেশ, কাণের পাশটায়—দেখ্‌তে পাচ্ছিস?—পরশু রাত্তিরে খানিকটা চুলশুদ্ধ কামড়ে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে।"

তপেশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল "সব বাড়ীতেই ও-রকম ইঁদুরের উৎপাত।"

"আমাদের বৈঠকখানা রোডের মান্ধাতার আমলের মেসটার একতলায় ওদের ক'লকাতা রেজিমেণ্টের হেড্‌ কোয়াটারস্‌। রাত্তিরে চারজন বাঙ্গালী বীর মেঝেতে সটান পড়ে থাকি, ওরা দস্তুরমত 'গরিলা ওয়ার-ফেয়ার' চালায়। ক'লকাতার লোকসংখ্যা যদি লাখ চৌদ্দ হয় তো ওদের হবে কোটী দেড়েক। ড্রেণের মধ্যে, পায়খানায়, ডাষ্টবিনে, ফুটো ফাটা গর্ত্তে আনাচে কানাচে দিনের বেলা থাকে লুকিয়ে। রাত্রে গোপনে এসে চড়াও করে ফ্রন্টিয়ারের দুর্দ্ধর্ষ আফ্রিদিদের মত। হঠাৎ সুইচ্‌ টিপে দিয়ে আলো জ্বাললেই—ব্যাটালিয়ন সব মুহূর্ত্তমধ্যে ডিস্‌পার্সড্‌। ওরা যে দিন 'পয়েজন গ্যাস্‌' তৈরী করতে শিখবে তপেশ, সেদিন থেকে মানুষ-সভ্যতার ধ্বংসের উপর ইঁদুর-সভ্যতার গোড়া-পত্তন।"

"তোর কল্পনার দৌড় আছে কমলাক্ষ।"

"কল্পনা কি রে! সত্যিকার আশঙ্কার ফোরকাষ্ট্। এই ছাখ আঙ্গুলটায় একদিন দাঁত বসিয়ে আচমকা আলাপ করে গেছে।"

"তোরা মশারির চার পাশ ভাল করে গুঁজে শুলেই তো পারিস্।"

"তা হ'লেই হয়েছে! একতলার ঘরের পূব দক্ষিণ বন্ধ। এই গরমে এমনি ঘুম আসে না। মশারি টানালে দম আটকে মরতে হবে।—আমার মেসে তোর একদিন নেমন্তন্ন রইল; খাবার নয়—শোবার। হাস্‌ছিস্! তোর গল্পের প্লট পাবি। মানুষ versus ইঁদুর নিয়ে গল্প হয় না রে?—ব্রাউনিঙের Pied Piperএর মত অন্ততঃ একটা কবিতা?"

ভিখারী নাছোড়বান্দা। আবার একটা পয়সা চাহিল। কমলাক্ষ এবার তাড়া করিতে মুখ বিড় বিড় করিতে করিতে চলিয়া গেল।

তার পর ঐ ভিখারিটিকে উপলক্ষ করিয়া সুরু হইল কমলাক্ষর সমাজতন্ত্রের ভাষ্য। মিনিট পনেরোর মধ্যেই সে কার্ল মার্কস ও এঞ্জেলসকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করিয়া, ফেবিয়ান সোসাইটিকে চাবকাইয়া, হিটলার-মুসোলিনীকে ধমকাইয়া অবশেষে ভিক্ষুক জগতের মুখপাত্র সাজিয়া বসিল: "ছাখ তপেশ, একটা পয়সা ভিক্ষে চাইলেই আমরা বলি ব্যাটা একনম্বর ঠক—সঙ্গে সঙ্গে যাও, ঠিক দেখবে ব্যাটা গাঁজার দোকানে গ্যাছে: যেন মোটরে করে ফারপোতে যেতে জানে না বলে ওর গাঁজা খাওয়ার অধিকারও নেই। ঘোমটা দিয়ে ভিক্ষে চাইলে তো অমনি যুক্তি দেখাই, রূপ-যৌবন আর নেই কি না তাই রাস্তায় এসে নেমেছে অর্থাৎ ভ্রষ্টা নারীরও পেটের ক্ষুধা থাকতে নেই। কাণাখোঁড়ারা তো এক একটা private business-এর money-facing commodities. আরো শুন্‌বি—এদের অনেকেই চাল জমিয়ে বিক্রি করে পয়সা করে—ফলে নাকি কোন ভিখিরির মৃত্যুর পরে তার ঘর থেকে নগদ ১০০৲ বেরিয়েছিল, যেন ভবিষ্যতের জন্য provision করার অপরাধ শুধু ওদেরই।"

ভিক্ষুক ছাড়িয়া এবার কমলাক্ষ ধরিল, শ্রমিক ধর্ম্মঘটের নীতি-ব্যাখ্যা; মুখে যেন তার খৈ ফুটে—মিনিটে দেড়শ' কথার স্পীড!

তপেশ হাসিয়া কহিল "তুই যে ভয়ঙ্কর রকমের সোস্যালিষ্ট রে।"

"কি যে তা জানি নে। তাই বলে ভেবো না গোয়াবাগান রাজাবাজার মাণিকতলার বস্তিগুলিতে জীবনেও কোন দিন গেছি! টেংরার মেথর ও কসাইপাড়ার নাম শুনেছি, চোখে দেখবার ইচ্ছে নেই। আমি বেড়াই চৌরঙ্গির চওড়া ফুটপাত ধরে। গ্রাণ্ড্ হোটেলের এণ্ট্-ট্রান্স্ দেখি; ফারপোর কার্পেটপাতা ষ্টেয়ারকেসের দিকে লোলুপ নেকড়ের মত তাকাই; ব্রোঞ্জের আউট্রাম তলোয়ার বাঁকিয়ে ঘোড়ার পিঠে গেলপ্ করছে, সেখান থেকে চোখ মেলে চাই ভিক্টোরিয়া হাউসের ঘূর্ণ্যমান গ্লোবটার দিকে—মাঝে চৌরঙ্গীর কাল বুকে এক পশলা বৃষ্টির জলে বিদ্যুতের আলো পড়ে চিকমিক করছে একটা অতিকায় সরীসৃপের পৃষ্ঠদেশ—গিশ্ গিশ্ করছে মানুষ, কাতারে কাতারে খাড়া আছে মোটরের পর মোটর। চমৎকার! পকেটে সাফিসেণ্ট্ টাকা থাকলে চাঙ্গোয়াতেও যেতে জানি দু'একটী কম্রেডী বন্ধু নিয়ে। রাশিয়ান Vodkaর অভাবে জার্ম্মান বীয়ারেই না হয় কাজ চালাব, Rubleএর অভাবে রুপেয়া দিয়েই না হয় দাম মেটাব।"

তপেশ হাসিয়া কহিল, "তুই একটা মূর্ত্তিমান্ অসামঞ্জস্য, মিনিটে মিনিটে সুর বদলাচ্ছিস্। কোনটা তোর আসল কথা, কি যে তুই মানিস্, কি তুই মানিস্ না, এতক্ষণের আলাপে তার এতটুকুও বুঝতে পারলুম না। তুই ভেগ্‌নেস্ পারসোনিফায়েড্।"

"ঠিক ধরেছিস্ তপেশ। তোর দৃষ্টিশক্তি আছে, কথা-সাহিত্যিক কিনা! আমি ইয়ং বেঙ্গল পারসোনিফায়েড্। নিত্য নূতন ওপার হতে আমদানী, মাঝে মাঝে এপার হতে নতুন করে পুরাতনের রপ্তানী—এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ—মাঝে পড়ে ইয়ং বেঙ্গল কি করবে ঠিক করতে পারছিল না। সব-ই তার ভাল লাগে বা কিছুই ভাল ঠেকে না। তাকে মনে হয়েছিল আমারি মতো ভেগ্, রেষ্ট্‌লেস্, ইন্‌কন্‌সিস্‌টেণ্ট্। I am young Bengal personified."

"কমলাক্ষ Young Bengalকে অত ছোট অত narrow ভাবিস্‌নে।"

"এই রেঃ! যা ভেবেছি তাই! তোর মত বুদ্ধিমান

ছেলেও আমায় ভুল বুঝ্‌লি। আমি যুবক বাঙ্গালাকে উঁচু করেছি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করেছি। সে যন্ত্র নয়, সে কোন ism এরই behaving organism নয়। সে সকলের মূল্য বাজিয়ে দেখতে চায়। গ্রহণযোগ্য হ'লে বিদেশী বলেই বর্জ্জন করবে না। নতুন বলেই অকেজো বলে বাতিল করে না। তাই সে সাময়িক দোটানায় পড়েছিল। এটা বিচার-বিহ্বলতার বন্যা—অনেক কিছু খড়কুটোও ভেসে আস্‌ছে, কিন্তু পলিমাটি পড়তে সুরু করেছে রে তপেশ—প্রকৃতিস্থতার পলিমাটী—সভ্যদশনের, গ্রহণের, বর্জ্জনের পলিমাটী। সেদিন এসেছে বলে মনে হয়।"

তপেশ কহিল, "কমলাক্ষ! তোর কথা না মানতে পারি কিন্তু তোর কথার মালা ভালই লাগে।"

ওপারে আশুতোষ বিল্ডিংএ ঢং ঢং করিয়া সাড়ে চারটা বাজিল। তপেশ উঠিয়া পড়িয়া কহিল "এবার যাই ভাই। —কাজ আছে।"

"কাজ যেন শুধু তোরই আছে! আর আমরা সব অ-কেজো।"

"আচ্ছা বিপদ! আমার কথার মানে তাই নাকি?"

"যাঃ—তোর কাছে বসে বসে আমার সময়টা নষ্ট হ'ল। এতক্ষণে একটা পরিচিত শিকার পাকড়াতে পারলে আজকের বিকেলটা আমার মাঠে মারা যেত না।"

তপেশ তাহার একখানি হাত নিজের হাতের মুঠিতে লইয়া কহিল, "একদিন আমার বাসায় যাস কমলাক্ষ। আজ তোকে এক কাপ চা খাওয়াতে না পারার দুঃখু দুর করবার সুযোগ আমায় দিস্ ভাই।"

"যাব এক দিন। নম্বর মনে থাকবে। এখনো স্মরণ-শক্তিটুকুই আছে। দু'বছর আগে হ'লে আজই তোর বাসায় গিয়ে বন্ধু-পত্নীর হাতের তৈরী চা খেয়ে দু'ট কথা বলে তৃপ্ত হয়ে আসতাম। কিন্তু আজ তোর বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করে তেমন আনন্দ পাব নারে। হাসছিস্? সত্যি কথা, জ্যোৎস্নারাতে আজকাল মাদুর পেতে রাত বারোটা অবধি ছাদে কাটাই না। মেঘ ডাকে, ঘরে বসে ছেঁড়া ছাতাটায় তালি দেই, কেবা পড়ে মেঘদূতের বিরহের শ্লোক, কেবা মনে করে রবীন্দ্রনাথের বর্ষার পিক্‌চার-গ্যালারী।"

হাসিয়া তপেশ কহিল, "যাস্ একদিন। আমার অনেক কাজ আছে আজ। নইলে মঞ্জুলীর সঙ্গে আজই তোর পরিচয় করিয়ে দিতাম—এখন যাই। যাস্ কিন্তু—"

তপেশ চলিয়া গেল। কমলাক্ষও উঠিয়া ধীরে স্কোয়ারের বাহিরে আসিল।

এ্যালবার্ট হলের কাছে আসিয়া তপেশ দেখিল আশুতোষ আসিতেছে। ষ্টার সিনেমায় সপ্তাহের মধ্যেই টাকা দিয়া আসিবে বলিবার পর আজ এই প্রথম দেখা।—কমলাক্ষর বুদ্ধি আছে! একটা ছাতাও সঙ্গে নাই যে আড়াল দিয়া পাশ কাটাইয়া যাইবে।

আশু যেন তাহাকে দেখিয়াও দেখে নাই এমনি ভাব দেখাইয়াই চলিয়া যাইতেছিল। তপেশই ডাকিয়া কহিল, "তোর সঙ্গে কথা আছে আশু।"

"বল্"

"তোর টাকাটা দিতে দেরী হয়ে গেল। সামনের সপ্তাহে শোধ করে দিতে পারব আশা করি।"

"সামনের সপ্তাহে সেবারও শোধ করে দিয়েছিলি। ও টাকার আশা আমি ছেড়েই দিয়েছি।"

"দ্যাখ আশু, আমি তোদের টাকা মারব এমন ঠক আমায় মনে করিস না। টাকার টানাটানি বলেই দিতে পারি নি এদ্দিন।"

"ইচ্ছে করলে অনেক আগেই দিতে পারতে। সিনেমা দেখার খরচা হয়, আর ইচ্ছে করলে ধার শোধ হয় না? যাক্ আমি তো তোমার কাছে টাকা চাই নি।" আশু আর বাক্যব্যয় না করিয়া চলিয়া গেল।

তপেশ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাগে দুঃখে অপমানে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। সে এত তুচ্ছ এত নগণ্য যে আশু তাহার পাঁচটা টাকার মায়া ত্যাগ করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত। তাহার ইচ্ছা হইল একবার চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠে। একবার ভাবে হাঁফ ছাড়িয়া কাঁদিতে পারিলে যেন সে বাঁচিয়া যায়। পকেট হইতে টাকা দুইটী হাতে লইয়া খানিক দূর আগাইয়া গেল। আজই তাহার দেনার দু'টাকা শোধ করিয়া দিবে। একটা ভাইব্রোনা না খাইলেই যদি মঞ্জুলী মরে তো মরুক্!

ফুটপাতের কিনারে আসিয়া তপেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া উত্তেজিত হইয়া কহিল, অবশ্য মনে মনে—কালই

তোমার টাকা ফেলে দেব আশু, আজ পাব্লিশারের কাছে টাকা পেলে কালই তোমার দেনা কড়ায় গণ্ডায় শোধ দেব; সুদ নিতে যদি লজ্জা না পাও তা-ও দেব হিসাব করে। সিনেমায়—হ্যাঁ মঞ্জুলীকে নিয়ে আমি সিনেমায় গিয়েছিলাম। 'দেশমুকুরের' লেখার টাকা পেয়ে একদিন একখানি বাঙ্গালা বই দেখতে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। দেখেছি, বেশ করেছি। একশবার সিনেমায় যাব। আজ টাকা পেলে কালই আবার দেখব। তুমি তাতে কথা শোনাবার কে? কালই যাব মঞ্জুলীকে নিয়ে ফিটনে করে আবার বায়স্কোপে, পথে তোমার মেসের দোরে গাড়ী দাঁড় করিয়ে তোমার টাকাটা ফেলে দিয়ে যাব। সুদ চাও তো সুদ-ও দেব। কাল-ই—কাল-ই দেব।

খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া অনেকটা সুস্থ হইয়া তপেশ আবার পথ চলিতে লাগিল। বিকালের কলিকাতার লোকারণ্যে পথ কাটিয়া তপেশ আগাইয়া চলিল কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ধরিয়া। (ক্রমশঃ)

মলয়-যাত্রী

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্-এ, বি-এল

রেঙ্গুনের জনস্রোত স্মরণ করিয়ে দেয় ভারতবর্ষের বহু-জাতির সম্মেলন কংগ্রেসের জনতা আর জেনিভার বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘ। একথা বলছি আমি ভিড় দেখে আর বহু ভাষা শুনে পথে-ঘাটে—মানব-প্রকৃতির অন্তঃদৃষ্টির অনুভূতির ফলে নয়। কারণ সেদিক থেকে ভাবলে বিপরীত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়। রাজনীতি-বিলাসী দেশ-হিতৈষী একটা চরম উদ্দেশ্য নিয়ে



একদল বালীদেশীয় নর্ত্তকী

মহাসভায় যায়—যার সাধনায় কিন্তু তাকে দেখা যায় উদাস এবং উদার। রেঙ্গুন সহরের বহু জাতির লোকেরা কর্ম্মকে আদর্শ ক'রে সাধনাকে সিদ্ধির অনুকূল করেছে। সিদ্ধি অবশ্য অর্থ-সংগ্রহ। এই জনস্রোতের কর্ম্ম-ক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করলে বিভিন্ন জাতির রুচি ও উপযোগিতার সন্ধান পাওয়া যায়।

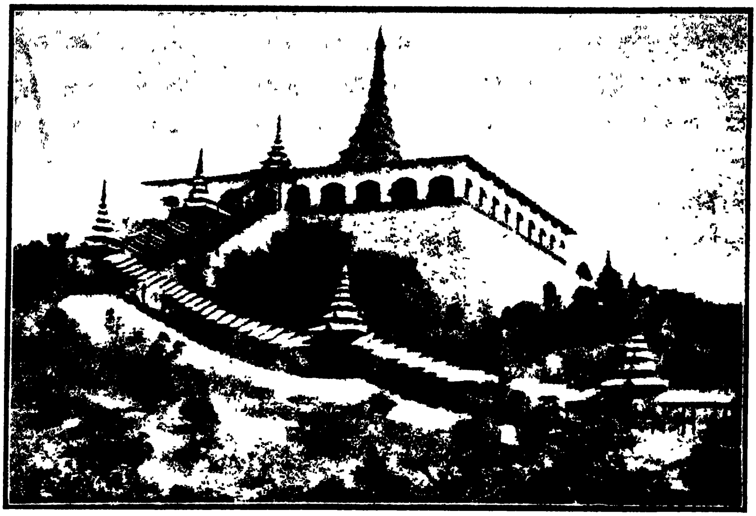
চাকুরীর বাজারে অবশ্য বাঙ্গালীর আধিপত্য ছিল একদিন। কিন্তু প্রতিযোগিতায় এ যুগ শিথিল। হয়তো তরুণ গোলামী ব'লে চাকুরী চায় না বা ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মের প্রাদেশিক ঈর্ষার ফলে পায় না। তবু এখনও ব্রহ্মের হাইকোর্টে একজন বিচারপতি আছেন বাঙ্গালী যাঁর সুযশ শুনলাম সর্ব্বত্র—এমন কি জাহাজের বিলাতী চীফ্ অফিসার ম্যাক্ল্যাগানেরও মুখে। আরও বিভিন্ন উচ্চ পদে আমাদের স্বজাতি প্রতিষ্ঠিত আছেন। শুনলাম এঁদের স্থলাভিষিক্ত আর বাঙ্গালী হবে না।

শিখ তার সু-গঠিত দেহ নিয়ে ব্রহ্ম থেকে হংকং অবধি সর্ব্বত্র সিপাহী আর পুলিস। অনেকে বুঝলাম হিন্দী বলতে পারে না। আমি যখনই তাদের সঙ্গে ভাঙ্গা পাঞ্জাবী বলেছি—অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে তারা আমাদের সাহায্য করেছে। পেনাঙের এক হিন্দু-মন্দিরের শিখ্ রক্ষক মহা-সমাদর ক'রে আমাদের ভোজনে নিমন্ত্রণ করেছিল এবং যতক্ষণ আমাদের মোটর দেখা গেল—সে আর মাদ্রাজী পুরোহিতরা তাকিয়ে রইল আর হাত নেড়ে বিদায় দিলে। তখন মনে গর্ব্ব হল—ভাবলাম ভারত একশত বিভিন্নতার মাঝেও।

কাঠের কাজে বর্ম্মার শিল্প-কুশলতা অসাধারণ—তবে চীনের আছে নিপুণতার সঙ্গে সৃষ্টিশক্তি। প্রাচ্যের শিল্প কমনীয় আর সুষ্ঠু করেছে জাপান—কেবল শিল্পের মর্ম্মটুকু নিয়ে আর চিত্তকে উপভোগের সুযোগ দিয়ে—চিত্র থেকে আখ্যান-বস্তু ব্যতীত বহু উপ-চিত্র বাদ দিয়ে।

আসল ব্রহ্মদেশ রেঙ্গুনের বাহিরে। রেঙ্গুনের প্যাগোডা-গুলি—আর ছাতা যা স্ত্রী-পুরুষে তৈরী করে ছোট ছোট কারখানায়—বর্ম্মী। বা কী সব পাঁচ-মিশালী। কিন্তু মান্দালয়ের সঙ্গে যে কেবল বর্ম্মার দুঃখের স্মৃতি জড়ানো আছে তা' নয়। ভারতবর্ষের ব্রহ্ম-মিত্রতার সুখের স্মৃতি এই প্রাচীন নগরের চারি-ভিতে। রেঙ্গুনের অনতিদূরে পেগুতে তথাগতের মহা-পরি-নির্ব্বাণ-মুদ্রায় শায়িত মূর্ত্তি দেখলে মনে পড়ে তাঁর ব্রহ্ম-বিজয়ের পরিমাণ। এ মূর্ত্তি অজ্ঞাত অবজ্ঞাত হয়ে সমাধিস্থ ছিল এক বনের মধ্যে। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হয়েছে। ইহা লম্বে ৬০ গজ এবং উচ্চে প্রায় ৪৯ গজ। বর্ম্মীরা ইহাকে বলে শ্বোয়েথালিয়ঙ্। একটা প্রকাণ্ড নির্ম্মম কঠিন পাষাণকে কত সাধ্য-সাধনা করলে—তার গায়ে সযত্নে আঁচড় দিলে তবে সে বিরাট করুণার আকার ধারণ করে। এ মনোরম পরিকল্পনা শিলার অঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে পারে মাত্র অতি দক্ষ শিল্পী।

পৌত্তলিকতা ভক্তের মনে জাগিয়ে তোলে প্রকৃতির মধুর রূপ। দেবালয় গড়ে সে দেবতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কামনায়। সহরের কোলাহল, সাংসারিক দুঃখ-দৈন্যের মাঝে তো আরাধ্য বাস করতে পারেন না, তিনি স্বর্গের বাসিন্দা। কাজেই ভক্তকে অন্বেষণ করতে হয় নিরালা—



মান্দালয় পর্ব্বতের মন্দির সমষ্টি



মান্দালয় দুর্গ

প্রকৃতির লীলা-ভূমি—ভূ-স্বর্গ। হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈনদের মন্দিরগুলি তাই ভূ-ভারতের সকল রম্য-স্থল অধিকার ক'রে রেখেছে। ব্রহ্মের মৌল-মেইনের পাহাড়ের গায়ে

কতকগুলি বুদ্ধ-মূর্ত্তি আছে। নির্জ্জনে ব'সে আত্ম-তত্ত্বে নিজেকে ভুলে যাবার ঐ সমীচীন স্থানটি যারা অনুসন্ধান ক'রে বার করেছিল নিশ্চয় তারা স্বভাব-কবি।

বলছিলাম মান্দালয়ের কথা। আমাদের ইদন উদ্যানের প্যাগোডা মনে হর্ষ উৎপাদন করে—কিন্তু মান্দালয়ে মন শিহরে ওঠে। স্বচ্ছন্দ-বন-জাত কাষ্ঠে অস্ত্র চালিয়ে মানুষ তাকে কত কমনীয় করতে পারে, তার শুক্‌নো নীরস গায়ে নিজের সরস প্রাণের সহজ সৌন্দর্য্যকে কতখানি মূর্ত্ত করতে পারে—সে কৃতিত্ব দেখলে—মানব প্রকৃতির ওপর শ্রদ্ধা বাড়ে। কারণ একজনের প্রাণ-দেওয়া সৌন্দর্য্য অন্যের চিত্তে সুন্দরের সুপ্ত গরিমাকে জাগিয়ে দেয়।

পৌত্তলিকতা যাকে বলে নবীন জগৎ—আধ্যাত্মিকতার



ছাতার কারখানা

দিক থেকে তার সার্থকতার কথা এ প্রসঙ্গের বাহিরে। কিন্তু মিলান, ফ্লরেন্স, রোম বা ভেনিস দেখে যাঁরা পুলক অনুভব করেন—তাঁরা ভাবেন না বিধাতা পৌত্তলিকতার পোষক-রূপে অনুরাগ ও ভক্তি মানুষের প্রাণে না দিলে জগতের শিল্প-সম্পদ আজ তার সৌন্দর্য্য-বিলাসকে পরিপুষ্ট করত না। মিশর-রোম-গ্রীসের বিক্রমের ইতিহাস কাকেও করে রুষ্ট—কাকেও করে নিষ্ঠুর। কিন্তু তাদের পৌত্তলিক-প্রাণের কোমলতার চাক্ষুস প্রমাণগুলা সকলকে করে তুষ্ট।

বহু যুগ ভারতবর্ষ টেনে এনেছে বিশ্বের দেশ দেশান্তর হ'তে সুন্দরের উপাসকদের। এখনও সকল পর্য্যটক উৎফুল্ল হয় অতীত-ভারতের শিল্পমাধুরী উপভোগ ক'রে—তারা বিমর্ষ হয় ভারতবাসীর দুঃখ দৈন্য আর নিরাশার বেদনায়। ল্যাণ্ড অফ্ ডিপ্রেসান বলে সব পরিব্রাজক এদেশকে। তবে যে শত্রু-পক্ষের পয়সা খায় মাত্র সেই বলে একে অপবিত্র-ভূমি।

প্রাচ্যের দৈনন্দিন জীবন ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপর প্রতিষ্ঠিত—অন্তত ধর্ম্মানুষ্ঠানের ভুলে-যাওয়া না-বোঝা ভুল-বোঝা বিধি-নিয়ম সমস্ত এশিয়ার উদ্দীপনা। বর্ম্মার গ্রামে গ্রামে মন্দির আছে—তার সহরের পাড়ায় পাড়ায় ফায়া বুদ্ধমূর্ত্তি ফুঙ্গিদের সঙ্ঘ আর সন্ন্যাসিনীর আশ্রম আছে। ছেলেদের প্রথম শিক্ষা হয় ফুঙ্গি পাঠশালায়। আশ্বিনের পূর্ণিমায় তাদের একটা প্রকাণ্ড পার্ব্বণ হয় যার নামটা আমি কায়দা করতে পারিনি।

প্রত্যেক বৌদ্ধ তার যোগ্যতা অনুসারে দান করে সঙ্ঘে—দারিদ্র্য ও সন্ন্যাসের দৃঢ় ভিত্তির উপর যে সব সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত। খাট-বিছানা ছাতা-লাঠি ঘড়ি লুঙ্গি মায় দৌড়-প্রতিযোগিতার পেয়ালা। শুনলাম মান্দালয়ে একদল ভক্ত প্রকাণ্ড একটা লরির ওপর নর্ত্তকীদের চড়িয়ে পোয়ে নৃত্য সহকারে প্রভু বুদ্ধ লাগি পুরোবাসীদের নিকট ভিক্ষা মাগে এই উৎসবের সময়।

পোয়ে নৃত্য মনোরম—কিন্তু আমার মনে হয় বালী ও জাভার নৃত্য আরও সংযত ও বিচিত্র। জাহাজে বেচ্‌তে এলো কাঠের পোয়ে নর্ত্তকী এক ফুট উঁচু। দর বললে পাঁচ টাকা করে এক একটা পুতুল। ঐ দরের আর দুটা ছিল সিংহ অর্থাৎ কল্পনার সিংহ—যারা মন্দিরের প্রহরী রূপে পরিকল্পিত। চারটে পুতুলের দাম—একুনে কুড়ি টাকা। আমি চারিদিকে দেখলাম মিত্র-পক্ষ—লাঞ্ছনার ভয় নাই। বল্লাম—কি বলছ? নগদ চার টাকা দেব বুঝলে—চার টাকা—এক্ দো তিন চার।

লোকটা মাদ্রাজী মুসলমান। বল্লে—কেয়া সাব্?

মিসেস—মুখ ঘুরিয়ে বল্লে—শেম্ মিঃ গুপ্ত।

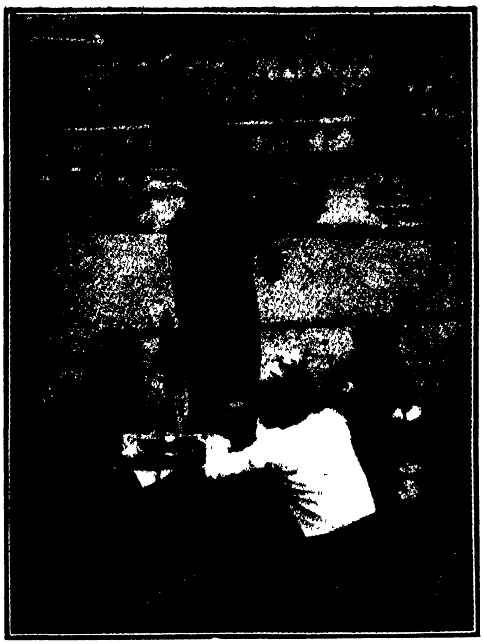
মিঃ—মুচকে হেসে বল্লে—ঠিক্ দাম।

দর বাড়ালে অভদ্রতা হয়—কেহ আর অধিক দাম বল্‌তে পারলে না। কিন্তু বুঝলাম জাহাজের সহযাত্রীরা অসন্তুষ্ট।

মিসেস—বল্লেন—মিঃ গুপ্ত ন্যায়বান (ফেয়ার) হও। জিনিস চারটে আমাকে কিনে দাও।

বল্লাম—ছেলেপুলেগুলাকে কি পথে বসাবে? দেখ না মেম-সাহেব, শেষকালে একটা সুবিধার সওদা হ'বে।

শেষকালে বুঝলাম—মরদকী বাত। চার টাকায় দিলে



খাবারওয়ালা

চারটি পুতুল—তবে খোদা কসম করে বল্লে—প্রত্যেক পুতুলটায় তার লোকসান হল।

কিন্তু বিচিত্র নারী-চরিত্র। মিসেস—বল্লেন—মিঃ গুপ্ত তিন টাকা বল্লে হত। বোধ হয় আমরা ঠক্‌লাম।

হবে! কিন্তু এই দর-কষা-কষি আর খোদা কসম্ থেকে বুঝলাম—কেন বাঙ্গালীর ছেলে—আইনন্দ বাজার বিক্রী করে!

আর একটা উদাহরণ দিই। ব্রহ্মের চুণী বিখ্যাত। জাহাজে চুণী বেচতে আসে মাদ্রাজী—খোদা কসমের সার্টিফিকেট দিয়ে তার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে। অনিলচন্দ্র দুটা পছন্দ ক'রে দাম জিজ্ঞাসা করলে। দাম পনেরো টাকা ক'রে এক এক দানা। তবে যেহেতু আমরা ভারতবাসী আমাদের পক্ষে দশ টাকা এক এক দানা। জাতীয়তার মোহে যে পাঁচ টাকা কমাতে পারে সত্যের অনুরোধে তার উচিত সেগুলা চার আনা করে দেওয়া—সিদ্ধান্ত কর্ল্লে এটর্ণী অনিলচন্দ্র।



ব্রহ্মদেশীয় নর্ত্তকী

এটর্ণীরা ভারী সাংসারিক আর চক্ষু-লজ্জাহীন—আমার বহুদিনের ধারণা। কিন্তু ভায়া আমার যে এতখানি অধঃপাতে গেছে তা' আগে জানতাম না। আমি বিরক্ত হ'য়ে মাতাল রেঙ্গুন নদীর ওপর সাম্পানের নৃত্য দেখতে লাগলাম। সেগুলা দারুণ মজার নৌকা—আকারে জেলে ডিঙ্গির মত—প্রকারে বিদ্যাসাগর মশায়ের চটিজুতার মত। দাঁড়িয়ে দু হাতে দুটা দাঁড় নিয়ে চাটগেঁয়ে মাঝি তাকে বহে, আর সুবিধা পেলে ভয় দেখিয়ে যাত্রীর কাছ

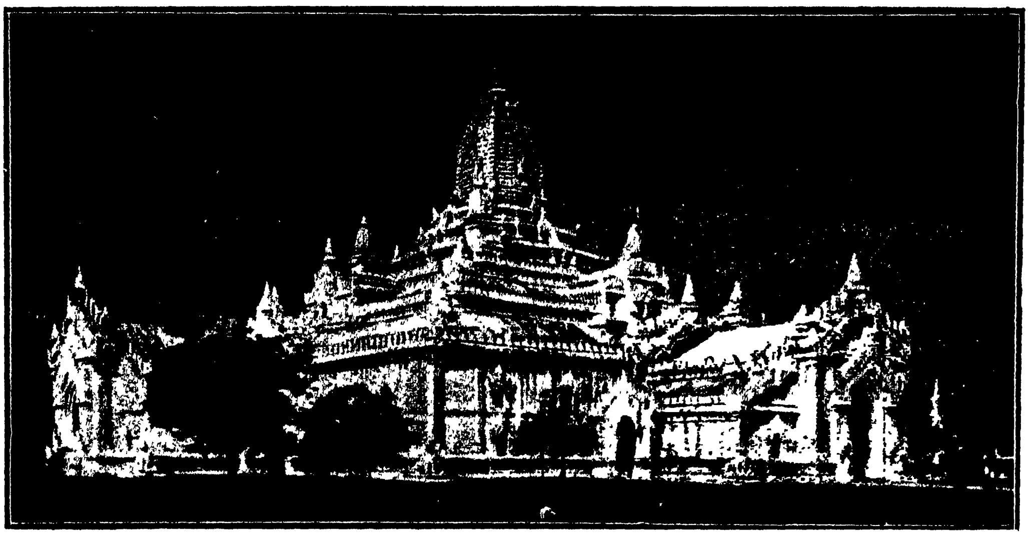
থেকে যথা-সর্ব্বস্ব কেড়ে বিগড়ে নেয় রাত-বিরেতে। জাহাজে নোটিস দেওয়া আছে—সাম্পান চড়ার বিরুদ্ধে।

ঘণ্টা তিন পরে অনিল খাঁটি রুবী দুটা সগর্ব্বে আমাকে দেখালে। কত দাম? দশ আনা! ফেরিওয়ালা এক কথার মানুষ দশ সংখ্যাকে আঁকড়ে ধরে ছিল—দশই পেলে। তবে দু দশ টাকা নয়। এক দশ আনা!

কাঠের কাজ মান্দালয়ের আশে পাশে অতি চিত্তাকর্ষক। অমরপুরায় পিতলের বুদ্ধ-মূর্ত্তি বড় চমৎকার হয়। রেঙ্গুনের বাহিরে কামানডাইনে পাথরের মূর্ত্তি শস্তা। মেয়েরা পালিস করে পুরুষরা কাটে। কিন্তু নাক চোখ সব মঙ্গোলিয়ার।

কাছে আরাম কেদারা, ছবি রাখবার লম্বা আধার প্রভৃতি কাঠের পদার্থ আছে—যাদের শিল্প-সজ্জা ঐ প্রকার প্রতিকৃতি আর চীনের ড্রাগন। বর্ম্মার শিল্প ও জাতীয় জীবনে চীন ও বঙ্গদেশের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত।

তুঙ্গু নামক প্রাচীন এক রাজধানীর একটি ভগ্ন মন্দির এই রকম চিন্তা-ধারার পরিপোষক। তুঙ্গু যেমন সংস্কৃত শব্দ তুঙ্গের অপভ্রংশ—তার মন্দির দেখ্‌লেই হঠাৎ ভ্রম হয় ভারতের কোন শৈল-শিরে অবস্থিত দেবালয় বলে। আভার ফায়া একেবারে চৈনিক শিল্পকলার নিদর্শন। কিন্তু আভা শব্দ সংস্কৃত। আভার ফায়া ইদন উদ্যানের প্যাগোডার অনুরূপ।



পাগানের আনন্দ প্যাগোডা

ইরাবতীর কুলে পাগান পুরাতন সহর। সেখানকার আনন্দ-মন্দির প্যাগোডা ধরণের নয় একেবারে ভারতের মন্দিরের মত। কিন্তু নাট-মন্দিরের দু'দিকের প্রবেশ কক্ষ খৃষ্টান গির্জ্জার অনুরূপ। অবশ্য এ-সব প্রত্নতত্ত্ববিদের গবেষণা-ভূমি—যার ফলে সাহিত্য-প্রাঙ্গণ হ'য়ে উঠ্‌তে পারে কুরু-ক্ষেত্র।

আর একটা গবেষণার বিষয় হ'চ্চে বর্ম্মী-পুতুলের লম্বা কোঁচা। বর্ম্মী তো পরে লুঙ্গি, তবে তার পুতুলগুলার কেন বেশ-ভূষা হয় বাঙ্গালীর মত? যেখানেই দ্বারপাল প্রভৃতির প্রতিকৃতি সেখানেই ঐ লম্বা কোঁচার পরিকল্পনা। আমার

পুরাতন কেল্লা ফায়া আর শিল্পকুশলতা দেখে প্রাচীন গরিমার ছায়া পড়ে চিত্তে। কিন্তু রেঙ্গুনের নবীন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিশাল ভবন, চীনে ছাত্রদের বিস্তৃত প্রাঙ্গণের মাঝে সুনির্ম্মিত বিদ্যালয়, খৃষ্টানদের কনভেণ্ট ব্রহ্মের তরুণদের কি ভাবে গড়ছে তার কোন প্রমাণ সংগ্রহ করবার সুবিধা পেলাম না। লক্ষ্ণৌ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার প্রসিদ্ধ গণিত-বিশারদ ডাঃ পারাঞ্জপে আমাদের সঙ্গে ব্রহ্মে গিয়াছিলেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কমিশনে এবং ফিরলেন আমাদের সঙ্গে। তিনি বললেন—বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যথেষ্ট ছাত্র নাই। আর যা সংবাদ পেলাম তা বিশেষ আশাপ্রদ নয়।

বর্ম্মী নবীনদের মধ্যে দেহ-চর্য্যার চেষ্টা দেখলাম সর্ব্বত্র। বর্ম্মা থেকে চীন অবধি একটা খেলা আছে। তার নাম চিঁলু। একে শ্যামে বলে রাগ-রাগ। গোল হয়ে খেলোয়াড়রা দাঁড়িয়ে একটা বেতের গোলা নিয়ে পায়ে করে মারে। প্রত্যেকে অপরের কাছে লাথি মেরে সেটাকে তাড়ায়—এই রকমে সে পদাঘাতের লাঞ্ছনা সহ্য ক'রে বহুক্ষণ শূন্যে ওড়ে। পায়ের চেটো থেকে হাঁটু অবধি সাম্‌নে পিছনে সবাই তাকে ঠুকছে—সে অভিমান ক'রে যার কাছে যায় তার কাছেই পায় ঐ আচরণ। বেচারা! কিন্তু দর্শকের চোখে খেলাটাকে বেশ দেখায়। আমাদের মানুষের সমাজে এমন চিঁলুর অভাব নাই। কিন্তু যে ঐ রকম পদাহত নিজে সে-ই আবার অপর চিঁলু দেখে আহ্লাদে আটখানা হয়।

ব্রহ্ম কর্ম্ম-ক্ষেত্র। আগে যেমন বাঙ্‌লা-দেশ ছিল—আসল বর্ম্মীর ব্রহ্ম-দেশ রঙ্গ-ভরা। কিন্তু সে যবে বাঙ্‌লার মত চোখ চেয়ে দেখ্‌বে তার ভিতর-বাহিরের চরম অবস্থা—তখন বাঙ্গালীর মত আধ্যাত্মিক সংগ্রামে তার অন্তরাত্মা হবে বিক্ষুব্ধ। অপরে কে কি ভাবে জানি না—রেঙ্গুন নদীর জোয়ারের স্রোত উজিয়ে যখন মাটাবান উপসিন্ধুর দিকে যাচ্ছিলাম তখন শস্য-শ্যামল ব্রহ্মকে দেখে একটা বেদনা অনুভব করলাম। রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে যদি বিজেতা ন্যায়-শাসন করে। কিন্তু অর্থনীতিক্ষেত্রে নিজ বাসভূমে মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য যদি ভিন্ন জাতির লোকের সমৃদ্ধির আওতায় থাকতে হয় মানুষের ভবিষ্যতের সামনে একটা মসীঘন-যবনিকা পড়ে—প্রাণ শিহরে ওঠে—তরুণরাও সহজ আশাকে বর্জ্জন ক'রে দুর্দ্দশার চরম উৎপীড়নের নিষ্ঠুর স্পর্শে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়। যে দেশে তরুণের প্রাণ আশার বাঁশী শুনে উদ্‌ভ্রান্ত হয় না সে দেশের অকল্যাণ দারুণ। বেচারা বর্ম্মী অ-বর্ম্মীর অর্থ-শোষণ কতদিন সহ্য করতে পার্ব্বে—সে কূটতর্ক জাহাজের তর্কের প্রসঙ্গ হ'ল—যখন অন্ধকার কালো আঁচলে স্বোয়ে ডাগনের সোণার চূড়া ঢেকে দিলে।

(ক্রমশঃ)

প্রশ্ন

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কর্ম্মস্থলে অবসরগ্রহণ ক'রে যেদিন নিজের পৈতৃক ভিটায় উপস্থিত হ'লাম সেদিন জীর্ণ বাড়ীটার পানে চেয়ে সত্যই চোখ দুটি জলে ভরে উঠ্‌ল। পাকুড়গাছের শিকড়গুলির প্রবল আকর্ষণে নোনাধরা ইঁটগুলি তখনও কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে। পূজার মণ্ডপের সামনে একহাঁটু ভাঁটি ও আশশেওড়ার গাছ জন্মেছে—একদা এই জীর্ণ বাড়ীখানির ধুলা-মাটি অঙ্গে মেখে বড় হ'য়েছিলাম; শৈশবের সহচর আজ আমারই মত বৃদ্ধ স্থবির।

ইচ্ছা ছিল শেষের এই কটা দিন পেন্‌সনের টাকা ক'টা নিয়ে পরম নিশ্চিন্তে পরিতৃপ্তির মধ্যে কাটিয়ে দেব—তাই জন্মপল্লীর কোলে ফিরে এসেছিলাম। জীর্ণ দালানটিকে সংস্কার ক'রে বাসোপযোগী ক'রতে প্রায় পনর দিন লেগে গেল—তারপরে সমগ্র পরিবারকে ক'লকাতা থেকে স্থানান্তরিত ক'রলুম। বড় ছেলে ইকনমিক্সে এম-এ পড়ছিল; সে একদিন এসে বললে—বাবা, চাকরী যখন আমাদের ক'রতেই হবে তখন এখানে এ গ্রামে অযথা কতকগুলো টাকা খরচ না ক'রে বরং বালীগঞ্জের দিকে একটা বাড়ী ক'রে রাখলে ভাল হয়। ভাড়া দেওয়াও যায় আবার সময়মত বাস করাও চলে, তাই ব'লছিলুম—

কোন উত্তর দিলাম না।

সেদিন বৈঠকখানায় বসে ওই কথাটাই ভাবছিলুম—

সমানবয়সীর মধ্যে বেঁচে আছে মাত্র এক মুকুন্দখুড়ো, সকালে তার আসার কথা ছিল এখনও পৌঁছয় নি।

সামনেই একটা এঁদো পুকুর—ওপারে জীর্ণঘাটের ফাটলে

আগাছা জন্মেছে। মাঝে মাঝে কলসীকাঁখে দু-একটা পাড়ার মেয়ে এসে চলে যাচ্ছে। তার ও-পারে একটা আমবাগান—পাতার ফাঁকে একখানা অসমাপ্ত বাড়ীর দেওয়াল দেখা যায়। ও জায়গা ছিল হারাণদার—আমাদের চেয়ে প্রায় ত্রিশ বছরের বড়। দিবারাত্রি আফিসের একটানা কাজের পরে এই সবুজ প্রকৃতি আর গ্রামের সরল সাবলীল জীবনটা বড়ই মধুর বলে মনে হতে লাগলো। ওই হারাণদার কথাই ভাবছিলাম—

তখন আমরা খুব ছোট, গ্রামের মাইনর স্কুলে পড়ি। এক শীতের রাত্রে রস চুরি ক'রে সন্তর্পণে বাড়ী ফিরে দেখি মায়ের সঙ্গে হারাণদা বসে গল্প ক'রছেন। প্রসঙ্গটা কৌতূহলপ্রদ, আমিও মায়ের পাশে ব'সে পড়লুম—

হারাণদা ব'লছেন—এখন ত খুড়ীমা গ্রামটীকে অনেক পরিষ্কার দেখছেন, ওই যে মাঠে যাওয়ার ভাগাড়টা দেখছেন ওর পাশে ছিল এক বড় জঙ্গল, জ্যৈষ্ঠের শেষে তার মধ্যে জাম খাওয়ার জন্য কচিৎ লোক ঢুকতো। একদিন—তখন শ্রাবণ মাস, মাঠের জমিতে বড় বড় পাটগাছ হ'য়েছে—সন্ধ্যার একটু আগে আমাদের মঙ্গলা গাইটাকে আলে ঘাস খাইয়ে ফিরছি, দেখি রাস্তার ঠিক উপরে থাবা পেতে একটা বাঘ বসে। আমি চেঁচিয়ে উঠ্‌তে পাটের জমি থেকে বলাই বেরিয়ে এল। ওই যে এখন নবীনের বাড়ী, ওইটে ছিল তারই বাড়ী। সে এসে ত ঢিল ছুঁড়তে লাগলো, কিছুতেই যায় না, বহুক্ষণ পরে ধীর মন্থর গতিতে ওই বাঁশের ঝাড়ের মধ্যে ঢুকে গেল—

আর একদিন—

হারাণদাকে বিশেষ ক'রে ভাল লেগেছিল আমার। তার কাছে এই গ্রামের অতীত ইতিহাস বাঘের গল্প শুন্‌তে তার কাছে যাওয়া আমার একটা বাতিকরূপে পরিণত হ'ল। তার কাছে নিত্যই গল্প শুনতে যেতুম। তখন হারাণদার বাড়ীর পশ্চিমে একটা নালা কেটে তার ধার দিয়ে কলমের গাছ লাগানো হচ্ছে, কয়েকজন মজুর কাজ কচ্ছে। নতুন-কাটা মাটির উপর বসে হারাণদা সামনের স্থানটা নির্দ্দেশ ক'রে ব'ললেন—এই জায়গাটায় ক্ষুদিরামখুড়ো একদিন বাঘের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধ ক'রে বাঘকে মেরে-ছিলেন—এই লোমহর্ষণ ঘটনা শুন্‌তে শুন্‌তে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। হারাণদা ব'ললেন—এই, এই গাছটা অমন বাঁকা ক'রে পুঁতলি কেন?

আমি বললুম—হারাণদা আপনি কোথায় থাকেন?

—আমি কোথায় থাকি দাদা! জলপাইগুড়িতে এক চা'এর আফিসে কাজ করি; তোমার বৌদি তার ছেলে সকলেই সেখানে থাকে।

—তাদের আনেন না কেন?

—আনবো। তার জীর্ণ মেটে দেওয়ালের খড়ের ঘরখানা একবার ভাল করে দেখে নিয়ে ব'ললেন—আনবো বই কি ভাই, বাড়ীটা ঠিক ক'রতে পারলেই হয়।

—আপনি ত আমগাছ পুঁতছেন, কই বাড়ী ত ঠিক ক'রছেন না।

—গাছগুলো বাড়তে থাক্, ওরা ফল দিতে দিতে আমার চাক্‌রী করার সামর্থ্যও চলে যাবে, বাড়ীটাও সমাপ্ত হবে, তখন সকলকে নিয়ে এসে ব'সবো।

আমি তার কাছে বসে বসে শুনতুম গ্রামের অতীত ইতিহাস। হারাণদার চোখের সামনে পুরান দিনের এই গ্রামখানি যেন জীবন্ত হ'য়ে উঠত; তিনি আনন্দে সেই স্মৃতির সমুদ্রে কেলী ক'রতেন, আমার চোখে তার গল্প যেন একটা মদির স্বপ্নের প্রলেপ দিত। এই গ্রামখানা আমার কাছে যেন বড় আপনার ব'লে মনে হত।

তার পরে প্রায় পাঁচ বছর চলে গেল—

আমরা তখন হাইস্কুলের উপর ক্লাসে পড়তুম। হারাণদার কলমের আমগাছ কতক বেড়ে উঠেছে—কতক বর্ষার জলে মারা গেছে।

জ্যৈষ্ঠের বন্ধে হারাণদা এসেছেন। তাঁর দেয়ালের ঘরখানা ঝেড়ে-পুঁছে তিনি আবার বাস ক'রতে আরম্ভ ক'রলেন। সেদিন তাঁর বাড়ীতে বসে চা-বাগানের গল্প শুনছিলাম। হঠাৎ তিনি ব'ললেন—দাদা, কটা গাছ মারা গেল, এখন বলত' কি করি?

—আবার লাগিয়ে দিন।

—কিন্তু বড় হ'তে ত পাঁচ বছর লাগবে, কতকাল আর বসে থাকি!

এই কথা কটির মধ্যে যে একটা নৈরাশ্য ছিল তা আমাকে আঘাত ক'রলে।

কয়েকদিন পরে—

হারাণদার বাড়ীর সামনে অদূরে কতকগুলো লোক টই কাটে, তিনি দেখতে দেখতে চা-বাগানের গল্প করেন। পাহাড়ীদের সাহস, জীবনযাত্রা, তাদের ভালুক বাঘের সঙ্গে সামনাসামনি যুদ্ধ করার গল্প শুনি। তার পরে হারাণদা পরজীবনের দু' একটা অভিজ্ঞতার কথা বলেন। হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন—ওরে তামাক খেতেই যে সারা সকালটা কেটে গেল!

মজুররা ব্যস্ততার সঙ্গে কাজ ক'রতে যায়—

হারাণদার এক মুহূর্ত্তও বসে থাকবার সময় নেই। উঠোন পরিষ্কার করা, গাছের গোড়া খুঁচিয়ে দেওয়া, এমনি ক'রে সর্ব্বদাই তিনি কাজে ব্যস্ত।

আমি প্রশ্ন ক'রলুম—দালানটা হবে কোথায় হারাণদা?

হারাণদা ব'ললেন—শুনবি ভাই, মনের কথাটা! বাড়ীখানা এমনভাবে তৈরী ক'রতে হবে যে তার থেকেই বাকী জীবনটা বেশ আরামে কেটে যেতে পারে। যেখানে ইঁট কাটায় গর্ত্ত হচ্ছে ওখান দিয়ে একটা পুকুর হ'বে, পশ্চিমে থাক্‌লো আম লিচুর বাগান, উত্তরের সীমানা ঘেঁসে তুলবো বাড়ীখানা। পুকুরে মাছ দেব, তার চার পাড় থেকে পাব তরকারী, পশ্চিমের বাগান দেবে ফল, উত্তরের কলাবাগান ফল তরকারী দুই-ই দেবে, বাড়ী থেকেই সংসার খরচ চলবে—কি বল?

আমি বল্‌লুম—হ্যাঁ চলবে বই কি!

হারাণদা ব'ললেন—আমারও ইচ্ছে তাই দাদা। বিদেশে চাকুরী করি বটে কিন্তু মনটা সেস্থানকে আপনার বলে মনে করে নেয় না। এই গ্রামের ধুলোমাটি গায়ে মেখে বড় হ'য়েছিলাম—এর প্রত্যেক গাছের পাতায় তার স্মৃতি জড়িয়ে আছে। কর্ম্মজীবনের শেষে যদি এখানেই বাস ক'রতে না পারি তবে শান্তি কোথায়? এই দেখ গ্রামে ত আমার আপনার কেউ নেই তবু কেন ছুটে আসি!—মাটির টানই বল—আর স্মৃতির টানই বল—একটা কিছু এর পিছনে আছেই।

আরও পাঁচ বছর পরের কথা মনে পড়ে—

তখন আমরা কলেজে পড়ি। মাঠের ধারে রোজ বেড়াতে যাওয়ার সময় চোখে পড়ে হারাণদার বাড়ীখানার পোতার উপর দিয়ে পাড়ার ছেলেরা ছুটোছুটি করে। হারাণদার কলমের গাছের আম পাড়ার দশজনে কুড়িয়ে খায়।

হঠাৎ একদিন হারাণদা অনেক সুরকী চূণ নিয়ে বাড়ী এলেন। আমি দেখা ক'রতে গেলাম, হারাণদার চুল দাড়ি মাঝে মাঝে সাদা হ'য়ে বার্দ্ধক্যের চিহ্ন সুপরিস্ফুট ক'রে দিয়েছে। তিনি আমাকে দেখে উৎসাহিত হ'য়ে ব'ললেন,—এই যে এস এস, আর পাঁচ বছরে শেষ হবে কি বল? বুড়ো অবশ্যই হ'য়েছি কিন্তু পাঁচ বছর আর ত নিশ্চয়ই বাঁচ্‌বো। এবার ত দেয়ালটা শেষ ক'রে যাবো, রইল কেবল ছাদটা।

আমি ব'ললুম—অবশ্যই হবে, হবে না কেন?

বড় হ'য়েছিলুম। কৌতূহল হ'ল, জিজ্ঞাসা ক'রলুম—দাদা আপনি কত মাইনে পান?

—সত্তর টাকা, তা না হলে ত পাঁচ বছরে মোট বাড়ীটাই ক'রতে পারতুম। সেখানে খরচ-পত্র ক'রে আর কি বাঁচে? তার পরে ছেলের বিয়েতেও কিছু খরচ হ'য়ে গেছে।

এক মাসের মধ্যে দালানের দেয়াল গাঁথা হয়ে গেল।

হারাণদা একদিন শুধলেন—বল ত ভাই, গাছের আম কেমন হ'য়েছে?

—দু' একটা যা খেয়েছি, তা ভালই হয়েছে। বিশেষতঃ ওই যে ছোট চারা গাছ—ওর আম খুব মিষ্টি, ল্যাংড়া বলে মনে হয়।

—হবেই যে, কাশীর ল্যাংড়ার কলম।

আমের সুস্বাদ ও দেয়ালের উচ্চতার মধ্যে তার মনটা একটা পরিতৃপ্তি খুঁজে পেয়েছিল হয় ত!

আমি যখন কৃষ্ণনগরে চাকুরী করি তখন শুনলুম, হারাণদা নিউমোনিয়া হ'য়ে কর্ম্মস্থলেই মারা গেছেন।

ওই যে আমবাগানের ফাঁকে অসমাপ্ত বাড়ীটা দেখা যায় ওই ত তাঁর বাড়ী! তাঁর অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ওই বাড়ীটার মাঝে ধীরে ধীরে রূপ নিয়েছিল, বাড়ীটার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিরজীবনের সাধনা সার্থকতা লাভ ক'রছিল; কিন্তু আজ পর-জীবনের চরম ব্যর্থতার নিদর্শন ওই অসমাপ্ত দেয়ালগুলি,

—হারাণদার সারাজীবনব্যাপী সেই তীব্র আশাকে যেন আজ ওরা ব্যঙ্গ করে!

হারাণদার অসমাপ্ত জীবনের সাক্ষী ওই অসমাপ্ত দালান!

কিছুকাল পরে হারাণদার ছেলে একবার আমার কাছে এসে ব'ললে—বাবা ত সারা জীবনের অর্থ দিয়ে দেশে বাড়ী ক'রতে গিয়েছিলেন, আমরা কত বলেছি কিন্তু তিনি শোনেন নি। আমরা যদি ব'লতুম, বাবা ওখানে একটা বাড়ীর কি মূল্য আছে! তিনি হেসে ব'লতেন, সে তোমরা বুঝবে না। এখন ওবাড়ীর সত্যই ত কোন মূল্য আমাদের কাছে আজ নেই, বাড়ী ত এখন আমাদের জলপাইগুড়ি; তাই বলছি ওটা আপনি কিনে নেন না, আমাদের ত এখন বড়ই অনটন চ'লছে—

জানি না কেন কিনি নাই—হয়ত হারাণদার মনের কথাটা জানতুম ব'লে—

ওই অসমাপ্ত হারাণদার বাড়ীটা চোখের সামনে ভাসছে। আমি ভাবছিলুম, যে বাড়ীটার মূল্য আমার কাছে এত, যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমার কাছে এত মধুর, তাকি আমার ছেলের কাছে মধুর থাকবে না! এ কি তবে মূল্যহীন!

ছেলে যে বালীগঞ্জে বাড়ী করার প্রস্তাব করেছিল তার কি জবাব দেই, তাই আবার ভাবতে লাগ্‌লুম—

তামাকু-মাহাত্ম্য

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম্-এ

একদা কৈলাস-শিখরে গৌরী-পতি মহাদেব ধ্যানে বসিয়া তাঁহার জটাগাছটি ঝাড়িলেন। ফলে জটার ভিতর হইতে একটি বীচি ভূমিতে পড়িল এবং দেখিতে দেখিতে সেটি একটি বৃক্ষরূপ ধারণ করিল। এই অসম্ভব ব্যাপার দেখিয়া শিব আর সকল দেব-গণকে আহ্বান করিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ, দেবিগণ, মুনি-ঋষিগণ ও যক্ষ, কিন্নর প্রভৃতি অপরাপর স্বর্গবাসিগণ সকলে কৈলাসশিখরে আসিয়া জুটিলেন। মহাদেব সকলকে সমাদর করিয়া বসাইয়া কহিলেন, "দেখ, কলিকালে ধর্ম্ম ত কিছুই নয়; কিন্তু এই যে বৃক্ষ জন্মিল ইহাই কলিকালে পরম ভাজন হইবে।"

ইহাই তামাকু-বৃক্ষ। অতঃপর ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই তিনজনে যথাক্রমে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ দিয়া তামাকুকে ত্রিগুণান্বিত করিলেন! বিশ্বকর্ম্মা হুঁকা প্রস্তুত করিয়া আনিলেন। প্রথমে টানিলেন শিব। পরম সন্তোষলাভ করিয়া তিনি বিষ্ণুর বদনে নলটি দিলেন। বিষ্ণুর পরে ব্রহ্মা টানিলেন। তারপরে অন্যান্য দেব ঋষি প্রভৃতিও টানিলেন। সভার মধ্যে বসিয়া দেব-নারীগণ হুঁকাটা আর টানিলেন না, কিন্তু পানের সহিত সাদা-পাতা খাইলেন। তামাকুর গন্ধে যাঁহার যত রোগ ছিল সব পলাইয়া গেল। শিব তখন নেশার আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "দিবানিশি যেবা নরে, তামাকু ভক্ষণ করে, অপমৃত্যু নাহিক তাহার।" এই কথায় যম গেলেন চটিয়া। কহিলেন, "হুঁকা দিয়া তুমি পাতকিদিগকে নিস্তার করিলা, কিন্তু আমার অধিকার রহিল কিসে?" শিব উত্তর দিলেন, "কেন, যাহারা তামাকু-বর্জ্জিত, তাহাদের তুমি লও অনায়াসে।" যম আশ্বস্ত হইলেন। শিব পুনরায় কহিতে লাগিলেন, "ধেনুদান, মঠ-স্থাপন, তীর্থযাত্রা প্রভৃতির অপেক্ষাও ঘরে বসিয়া তামাকু সেবন করিলে অধিক পুণ্যলাভ হয়। এক হুঁকা যথা রয়, তাহাই শালগ্রাম হয়। দুই হুঁকা লক্ষ্মী-নারায়ণ। যে তিন হুঁকা দেখে, সে স্বর্গলোকে যায়, তাহার পুণ্যফল কহিবার নয়। আর, চারি হুঁকা যেখানে থাকে সে স্থান ত গঙ্গা-বারাণসী, বৃন্দাবন-নীলাচল। আরও বলি শোন—জনক-কন্যা সীতা যে পাতালে গেলেন, এই দশা তিনি প্রাপ্ত হইলেন, কেবল তিনি তামাকু-বর্জ্জিতা ছিলেন বলিয়া। হরিচন্দ্র (হরিশ্চন্দ্র) মহারাজা তামাকুর পূজা করেন নাই, ফলে তিনি স্বর্গে যাইতে যাইতে শূন্যেই রহিয়া গেলেন। এই

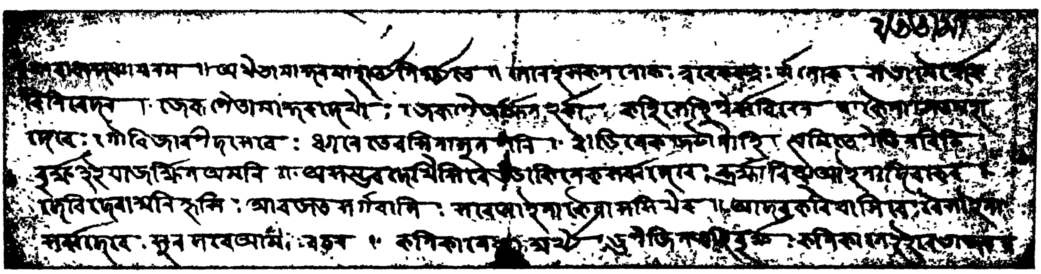
সকল দেখিয়া ভগীরথ ভয়ে ভয়ে সর্ব্বদাই তামাকু খাইতেন এবং সেই হুঁকার পুণ্যে তিনি গঙ্গাকে নিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন। ওদিকে বলি-রাজা এত পুণ্যবান, অথচ হুঁকাকে নিন্দিয়া তিনি গেলেন পাতালে। লঙ্কেশ্বর রাবণ হুঁকা ছাড়িয়া সবংশে ধ্বংস হইলেন, আর বিভীষণ হুঁকার কৃপায় হইয়া গেলেন রাজা। মহারাজ দুর্য্যোধন তামাকুর পূজা না করায় তাঁহারা শত-ভ্রাতা সমরে নিহত হইলেন, কিন্তু পাণ্ডবেরা পঞ্চভ্রাতা সর্ব্বদা তামাকু খাইয়া হস্তিনাপুরের সিংহাসন লাভ করিলেন। নন্দরাণী তামাকুর ছত্র খুলিয়া তবে কৃষ্ণ-হেন পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। বৃষভানু-সুতা রাধা সর্ব্বদা সাদা-পাতা খাইয়া দান-ছলে কৃষ্ণের প্রিয়া হইয়াছিলেন। কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতি কন্যাগণও তামাকু খাইয়াই এত সহজে স্বর্গে যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।"

এই সকল তথ্য যিনি দিব্যদৃষ্টিতে আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাঁহার নাম 'কবি রামপ্রসাদ'। তাঁহার আবিষ্কার-বার্ত্তা তিনি বুদ্ধি করিয়া লিপিবদ্ধও করিয়া গিয়াছেন। তাহার একখানি পুঁথি সৌভাগ্য-ক্রমে পাওয়া গিয়াছে; তাহার নকলের তারিখ, সন ১২০৮, ২৯শে অগ্রহায়ণ। অর্থাৎ ১৩৫ বৎসর পূর্ব্বে পুঁথিখানি লেখা। এই কবি রামপ্রসাদ কে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, কিন্তু ইনি উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ছিলেন সেটা স্থির। 'রামপ্রসাদ' বলিলেই যাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে, তিনি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। অতএব তিনিই যদি 'তামাকু-মাহাত্ম্যে'র কবি হইয়া থাকেন, তবে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নয়। না হইলেও ক্ষতি নাই। কবি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিয়াছেন, "দিবানিশি যেবা নরে, তামাকু ভক্ষণ করে, অন্তকালে চলি যায় কাশী।" ইহা পড়িয়া বাঙ্গালা দেশে তাম্রকূটের গোপন ও প্রকাশ্য ভক্তগণ যাহাতে পরলোক সম্বন্ধে যথেষ্ট আশ্বস্ত হইতে পারেন, সেই ভরসায় পুঁথিখানি ছাপা গেল। ভক্তগণ 'রেফ'গুলি বাদ দিয়া এবং ণত্ব-বিধান ও ষত্ব-বিধান সম্বন্ধে খেয়াল রাখিয়া পড়িবেন।

শ্রীরাধাকৃষ্ণায় নম ॥

অথ তামাকুর মাহার্ত্ত্য (ত্ম) লিক্ষ্য্যতে ॥

সোনহ সকল লোক দুরে কর দুঃর্খ সোক
সভা মৈর্দ্ধে (মধ্যে) করি নিবেদন।
জেরূপে তামাকুর দেখা জেরূপে জর্ম্মিল হুর্কা (হুকা)
কহি সেহি পুর্ব্ব বিবরণ ॥
কৈলাসেত মহাদেবে গৌরি জার পদ সেবে
ধ্যানেতে বসিলা সুলপানি।
ঝাড়িলেক জটা গাছি ভূমিতে পড়িল বিটি
বৃক্ষ্য হইয়া জর্ম্মিল অমনি ॥



সংগৃহীত পুঁথির একটি পৃষ্ঠা

অসম্ভব দেখি সিবে ডাকিলেক সর্ব্বদেবে
ব্রর্হ্মা বিষ্ণু আইলা দিবাকর।
দেবি দেবা মুনি হৃশি আর জত সর্গবাসি
সবে আইলা কৈলাস সিখর ॥
আদর করিয়া সিবে বৈসাইলা সর্ব্ব দেবে
সুন সবে আমার বচন।
কলিকালে ধর্ম্ম মুর্খ্য উপজিল এহি বৃক্ষ্য
কলিকালে হইবে ভাজন ॥
তবে সোন তার কথা ভাঙ্গিবেক বিস পাতা
মস্তক ভাঙ্গিবে জুবাকালে।
সিব অঙ্গে চিতা ধুলি তাহা দিয়া পাতা তুলি
বৃর্দ্ধকালে কাটিবেক মুলে ॥

ব্রহ্মা বলে বিষ্ণু হর আমার বচন ধর
তিন গুনে কর মহা মুর্খ্য।

রজ সত (সত্ব) তম গুণে মিশাইয়া তিন জনে
তামাকু করিলা মহাস্থর্ক্ষ্য॥

রজ গুনে আতুলা (?) থায়ে ব্রহ্মলোক সেহি পায়ে
সত গুণে নর্স্যদান করে।

তম গুন দিলা সিবে লুর্কা টানিবেক জিবে
মৈলে জাবে সিবের মন্দিরে॥

জেমুন (যেমন) মন্দাকিনি ভাগিরথি পাতালেতে ভগবতি
গঙ্গা নিস্তারিলা ত্রিভুবন।

তেমতি তামাকু জান তিন গুনে মুর্ত্তিমান
নিস্তারিলা জত অকিঞ্চন॥

স্থনিয়া সকলে কয়ে সোন সিব মহাশয়ে
কিমতে হুর্কাতে দিবে টান।

হুর্কার গঠন কিবা কিরূপে তামাকু খাবা—
সেহি তর্ত্ত কহ ত্রিনয়ান॥

নল দিলা পসুপতি বিনা (বীণা) দিলা স্বরেস্বতি
প্রথমে টানিলা ত্রিনয়ানে।

পরম সন্তোষ পাইয়া বিষ্ণুর বদনে দিয়া
পর দিলা ব্রহ্মার বদনে॥

তবে জত দেব হসি সভা মৈদ্ধে ছিল বসি
নল ধরি সবে তামাকু খান।

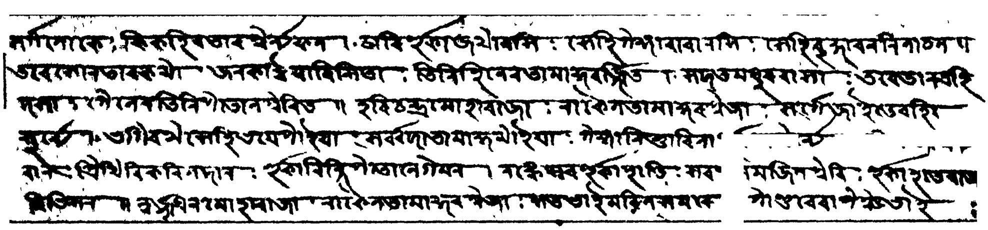
তবে জত দেবনারি সাদা পাতা হাতে করি
ভর্ক্ষন করিলা দিয়া পান॥

সালগ্রাম রূপ ধরি ছিলা সত্যযুগ ভরি
হুর্কা হইল কলির প্রথম।

পাইয়া তামাকুর গন্ধ দেব নাচে মহানন্দ
রোগ পলায়ে ছাড়িয়া তখন॥

নকরোল (?) দন্তসুল বাউ (বায়ু) বেথা পির্ত্যসুল
বিসচিকা জনের বিগার।

জর জারি উর্দ্ধকাস সিরপীড়া সান্নির্বাত
মহাব্যাধি রসা অতিসার॥



পুঁথির অপর একটি পৃষ্ঠা

সিবে দিলা কর্ম্মফুল ব্রর্দ্ধা দিলা কমণ্ডুল
ইস্বরে মুরুরি (মুরলী ?) দিলা আনি।

বিস্বর্কর্ম্মা তথা জাইয়া বহু বিধি রত্ন দিয়া
নির্ম্মান করিলা মুর্ত্তিখানি॥

থার্ণ্যকলি বেলয়ারি আলবালা বিহুরি
কত মুর্ত্তি হইলা প্রচার।

বিষ্ণো বোলে পসুপতি জেমতে আমার গতি
তাহা কহি সমাজে তোমারে॥

পুর্ব্বকালে এহি ছিল ভাবিতে সাক্ষ্যাত হৈল
ত্রেতাযুগে রাম অবতার।

দ্বাপরেতে নন্দসুত কলিযুগে অবধোত
হুর্কা হইল কলিতে প্রচার॥

এত বেগে জড়িত গায়ে প্রিতিকার নহে পায়ে
তামাকুতে করে পরিত্রান।

দিবানিশি জেবা নরে তামাকু ভর্ক্ষন করে
অপমিত্যু নাহিক তাহান॥

জমে (যমে) বোলে লুর্কা দিলা পাতকি নিস্তার কৈলা
মোর অধিকার রৈল কিসে।

সিবে বোলে এহি সার তামাকু বর্জ্জিত জার
তাকে তুমি নেও অনাআসে॥

তবে কহিলেক জমে থাইবেক কোন সমে (সময়ে)
সিবে বোলে অকাল হইতে।

রৌদ্রেত কিঞ্চিত খাট শিশিরেত মিষ্ট বাট
বড় আদর বাড়য়ে প্রভাতে॥

ধেনুদান গঙ্গাঘাটে মোট (মঠ) স্থাপন করে মাটে
কুরুক্ষেত্রে মুনি করে দান।
এত তির্থ করে জদি ঘরে বসি দেয়ে বিধি
তাহার অধিক ফল পাত্র ॥
প্রাতকালে হুর্কা ভরি বিপ্রেকে আদর করি—
জদি হুর্কা সমুখে জোগায়ে।
তিনবার ভরে জল প্রিথিবি লঙ্গনের ফল
পুর্ন্যসাগর হুর্কা দানে।
এক হুর্কা জথা রয়ে সেহি সালগ্রাম হয়ে
দুই হুর্কা লক্ষিনারায়ন ॥
তিন হুর্কা জেবা দেখে সেহি জায়ে সর্গলোকে
কি কহিব তার পুণ্যফল।
চারি হুর্কা জথা বসি সেহি গঙ্গা বারানসি
সেহি বৃন্দাবন নিলাচল ॥
তবে সোন তার কথা জনক ঝিয়ারি সিতা
তিনি ছিলেন তামাকু বর্জ্জিত।
সদত মধুর বাসা তবে তান এহি দসা
গেলেন তিনি পাতাল পুরিত ॥
হরিশ্চন্দ্র মোহারাজা না কৈল তামাকুর পূজা
সর্গে জাইতে রহিলেক শুন্যে।
ভগিরথ সেহি ভয়ে পাইযা সর্ব্বদা তামাকু খাইয়া
গঙ্গা নিস্তারিলা হুর্কার পুন্যে ॥

বলিরাজা পুর্ব্বে বান প্রিথিবি করিল দান
• হুর্কা নিন্দি পাতালে গমন।
লঙ্কেশ্বর হুর্কা ছাড়ি সবংসে মজিল পুরি
হুর্কা হতে রাজা বিভিসন ॥
দুর্জ্জধন মোহারাজা না কৈল তামাকুর পুজা
সত ভাই মরিল সমরে।
পাণ্ডবেরা পঞ্চভাই সর্ব্বদা তামাকু খাই
রাজা হইলা হস্তিনা সহরে ॥
পূর্ব্বজর্ম্মে নন্দরানি ধনে মহা ছিল ধনি
তামাকুতে দিল জলছত্র।
সেহি পুন্যে হইল রাজা বধিলা গোকুলের প্রজা
পাইলেন কৃষ্ণ হেন পুত্র ॥
ব্রকোভানু (বৃকভানু) সুতা রাধা সর্ব্বদা খাইয়া সাদা
কৃষ্ণপতি পাইলা দানছলে।
কুন্তি দ্রৌপদি মায়া সর্ব্বদা তামাকু খাইয়া
সর্গে চলি গেলা অবহেলে ॥
কবি রামপ্রসাদ কয়ে তামাকু ইয়ারি হয়ে
ইন্দ্রপদ তুর্ছ হেন বাসি।
দিবানিশি জেবা নরে তামাকু ভর্ক্ষন করে
অন্তকালে চলি জায়ে কাসি ॥

ইতি তামাকুর মাহার্ত্য সমাপ্ত। ইতি সন ১২০৮। তারিথ ২৯ অগ্রহায়ণ।.......... ·(লিপিকরের নাম)

স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ্-আর-ই-এস্

ভারতবর্ষের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণে যে সকল প্রখ্যাতনামা দেশবাসী বিচারপতির সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন,—ব্যবস্থাশাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞান, সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, অপূর্ব্ব ন্যায়-পরায়ণতা, অনন্যসাধারণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও নির্ভীক স্বাধীনতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদিগের মধ্যে স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ অন্যতম।

ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার ষোলঘর গ্রামে ১২৪৫ বঙ্গাব্দের ১৫ই ফাল্গুন (ইং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি) বঙ্গজ কায়স্থকুলে চন্দ্রমাধব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা পারস্য ও বাঙ্গালা ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন এবং ইংরাজী ভাষাও শিখিয়াছিলেন। দুর্গাপ্রসাদ প্রথমে বরিশাল চট্টগ্রামে কালেক্টরীতে কর্ম্ম করিতেন এবং পরে ডেপুটী কলেক্টরের পদে উন্নীত হন। শৈশবে চন্দ্রমাধব (১৮৪২-৪৪ খৃষ্টাব্দ) পিতার সহিত চট্টগ্রামে ছিলেন এবং ৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতা প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনারের পার্সন্যাল এসিষ্টাণ্ট পদে নিযুক্ত হইলে চন্দ্রমাধব তাঁহার সহিত কলিকাতায় আসেন। স্যর রমেশচন্দ্র মিত্রের পিতা সদর দেওয়ানী আদালতের তদানীন্তন সেরেস্তাদার রামচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাটীর নিকটে ভবানীপুরের চক্রবেড়িয়ায় দুর্গাপ্রসাদ বাসা করেন। এই স্থানেই একটি পাঠশালায় চন্দ্রমাধবের বিদ্যারম্ভ হয়। অতঃপর চাউলপটীতে কেশব মাষ্টার ও গৌরমোহন বসু

কর্ত্তৃক পরিচালিত ইংরাজী বিদ্যালয়ে চন্দ্রমাধব ইংরাজী শিক্ষার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে দুর্গা-প্রসাদ যশোহরে বদলী হন। বিদ্যাশিক্ষার সুবিধার জন্য তিনি বালক চন্দ্রমাধবকে তাঁহার আত্মীয় প্রেসিডেন্সী কমিশনারের সেরেস্তাদার রামকানাই ঘোষের বাটীতে রাখিয়া যান। চন্দ্রমাধব এই বৎসর ৮ই মার্চ তারিখে হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন।

তৎকালীন প্রথানুসারে মাত্র ১১ বৎসর বয়সে চন্দ্রমাধবের বিবাহ হয়। তাহার পত্নী টাকীর কালীশঙ্কর রায়চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা হেমন্তকুমারীর বয়ঃক্রম তখন ছয় বৎসর মাত্র।

হিন্দুকলেজে চন্দ্রমাধবের সতীর্থগণের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন, সাতকড়ি মিত্র, বলাইচাঁদ দত্ত, কাশীচন্দ্র মিত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে চন্দ্রমাধব জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে পরিণত হয়। চন্দ্রমাধব প্রেসিডেন্সী কলেজে সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন, কিন্তু গণিত শাস্ত্রে তাঁহার তাদৃশ অধিকার না থাকায় ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বার্ষিক পরীক্ষায় তাঁহার বৃত্তি বন্ধ হইয়া যায়। এই জন্য তিনি সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষাতে বৃত্তিলাভ করিতে সমর্থ হন নাই। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের আইনের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন এবং শীঘ্রই আইনের অধ্যাপক মণ্টি য়ো ও বুলনোইস এর অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক গৃহীত প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষায় চন্দ্রমাধব প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পর বৎসর তিনি বি-এ পরীক্ষা দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চন্দ্রমাধব আইনের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে তাঁহার পিতা বর্দ্ধমানে ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন। চন্দ্রমাধব ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১০শে নভেম্বর বর্দ্ধমানের উকীল শ্রেণীভুক্ত হন। ছয়মাস অতীত হইবার পূর্ব্বেই চন্দ্রমাধব কার্য্যদক্ষতা গুণে সরকারী উকীলের পদ লাভ করেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন তিনি সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন।

এত অল্প অভিজ্ঞতা লইয়া একজন তরুণ আইন-ব্যবসায়ী উকীল-সরকারের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া অনেকেই ঈর্ষাপরায়ণ হন এবং তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারিগণ তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মানজনক ব্যবহার না করায় তিনি উচ্চপদ ত্যাগ করিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদলাভের চেষ্টা করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ১৮ই সেপ্টেম্বর চন্দ্রমাধব বাখরগঞ্জের অস্থায়ী ডেপুটী কলেক্টর নিযুক্ত হন কিন্তু একমাস পরে তাঁহার কার্য্যের অবসান হয়। তিনি তখন কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া সদর আদালতে ওকালতী করিতে কৃতসংকল্প হন।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে চন্দ্রমাধব হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাইকোর্টের বিচারপতির পদে নিযুক্ত হওয়ায় দ্বারকানাথ মিত্র, কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীনাথ দাস, রমেশচন্দ্র মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তখন প্রথম শ্রেণীর উকীল বলিয়া পরিগণিত হইতেন। ইঁহারা সকলেই চন্দ্রমাধবের বন্ধু ছিলেন এবং শীঘ্রই চন্দ্রমাধব ইঁহাদের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। চন্দ্রমাধবকে প্রথমাবধি অর্থকষ্ট অনুভব করিতে হয় নাই, কারণ তাঁহার শুভাকাঙ্ক্ষী গুরু মণ্টি য়ো ১৮৬২ খৃষ্টাব্দেই চন্দ্রমাধবকে প্রেসিডেন্সী কলেজে আইনের অন্যতম অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করাইয়াছিলেন। ঐ পদের পারিশ্রমিক ছিল মাসিক তিনশত টাকা।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রমাধব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য মনোনীত হন এবং পর বৎসর তিনি হাইকোর্টের বিচারপতির পদে অভিষিক্ত হন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১২ জানুয়ারি হইতে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ২রা জানুয়ারি তারিখে অবসরগ্রহণ কাল পর্য্যন্ত চন্দ্রমাধব বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যেরূপ বিদ্যা, বুদ্ধি, সূক্ষ্মদর্শিতা, আইনজ্ঞান ও সমদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার সম্যক্ পরিচয় দেওয়া এস্থলে সম্ভব নহে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রধান বিচারপতি স্যর ফ্রান্সিস ম্যাক্লীন অবসর গ্রহণ করিলে তিনি ১১ই মে হইতে ৪ঠা আগষ্ট পর্য্যন্ত প্রধান বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার

পূর্ব্বে স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র ব্যতীত আর কাহারও ভাগ্যে এই দুর্লভ ও দায়িত্বপূর্ণ পদপ্রাপ্তি ঘটে নাই। এই বৎসরই চন্দ্রমাধব 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন।

চন্দ্রমাধবের কর্ম্মক্ষেত্র কেবল হাইকোর্টের প্রাচীরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। দেশহিতকর নানা প্রতিষ্ঠানে তিনি নেতৃত্ব করিয়াছেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হন এবং পর বৎসর 'ডীন অব দি ফ্যাকাল্টি অব ল' নির্ব্বাচিত হন। তিনি বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং সমাজের উন্নতি ও সংস্কারের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত ছিলেন।

তাঁহার অবসরগ্রহণের পর হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীতে তাঁহার একটি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা সেপ্টেম্বর তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যর লরেন্স জেন্‌কিন্স উহা উন্মোচিত করেন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে আনি বেশান্তের অন্তরীণের প্রতিবাদকল্পে কলিকাতা টাউনহলে যে বিরাট সভা হয় স্যর চন্দ্রমাধব তাহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই বৎসর আগষ্ট মাসে ইষ্টবেঙ্গল সোসাইটীতে আহূত আবদুল রসুলের স্মৃতি-সভাতেও তিনি সভাপতিত্ব করেন। পরবর্ত্তী সেপ্টেম্বর মাসে আনি বেশান্তকে মুক্তি দেওয়ায় গভর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য টাউনহলে যে সভা হয় তাহাতেও তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

কিন্তু এই সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি স্বাস্থ্যলাভার্থ দেওঘরে গমন করেন। এই সময়ে আমি কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী লিখিতেছিলাম, তাঁহার স্মৃতিকথা চাহিয়া পাঠাইয়াছিলাম। তিনি কম্পিত হস্তে অতি সংক্ষেপে তাঁহার কবিবন্ধুর সম্বন্ধে শ্রদ্ধাব্যঞ্জক দুই একটি কথা লিখিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। ১৯১৮ সালের ১৯শে জানুয়ারি তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হয়। ২০শে জানুয়ারি রাত্রি ২॥টার সময় তাঁহার মৃত্যু হয়।

স্যর চন্দ্রমাধবের মৃত্যুতে দেশবাসী অত্যন্ত ব্যথিত হয় এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য চেষ্টিত হয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ৭ই জানুয়ারি হাইকোর্টের প্রধান সোপানাবলীর উপরে ৩৫০ গিনি ব্যয়ে বিখ্যাত শিল্পী স্যর ডব্লিউ, গসকুম্ব জন দ্বারা নির্ম্মিত একটি সুন্দর প্রস্তরময়ী আবক্ষ মূর্ত্তি প্রধান বিচারপতি স্যর লন্সেলট স্যাণ্ডার্স্‌ন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

নির্ভরতা

শ্রীভুজঙ্গভূষণ রায়

ফল বিলাইতে বিমুখ কি তরু;
পথে ছিন্ন-বাস রয় না পড়ি?
নদ-নদী সব গেছে কি শুকায়ে,
রুদ্ধ ত নয় অচল-দরী?
শরণ নিলে কি দয়াময় হরি
রাখে না আপন ভক্ত-গণে;
কেন তবে কবি ভজিবারে চাহে
বিভব-মত্ত অজ্ঞ-জনে।

অচির স্থায়ী

শ্রীগোপাল ভৌমিক

চিরস্থায়ী নয় কিছু, এ রোদন, এই মধু হাসি:
প্রেম, ঘৃণা, বহ্নি কামনার
নিঃশেষে বিলোপ পায় মানবের অন্তর মাঝারে
ছেড়ে গেলে জগতের দ্বার!

দীর্ঘ তারা নয় কভু, গোলাপী মধুর দিনগুলি:
কুয়াসায় ঘেরা স্বপ্ন-দেশে
ক্ষণিক আলোকপাতে দেখা দিয়ে মানবের পথ—
মেশে পুনঃ স্বপন-আবেশে!

খুকু—খুকুর মা ও আমি

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

ছাতের ওপর পাতা বিছানা। ভোর হয়েছে—তখনও সকাল হয়নি। বোশেখ মাসের ভোর—ফিল্‌টার করা হাওয়ার মধ্য দিয়ে আকাশ দেখাচ্ছে গাঢ় নীল। সূর্য্যের দেখা নেই, কিন্তু সারা দিগন্ত ভরে একটা চাপা আলোর আভাস। খুব নজর করে দেখ্‌লে আকাশের গায়ে একটা আধটা পলাতক তারা দেখা যাচ্ছে।

জেগে শুয়ে আছি আমি আর খুকু। পাখীর কাকলী সবে সুরু হলেও আমার খুকুর কাকলী তখনও আরম্ভ হয়নি। খালি গায়ে সে পাশ ফিরে শুয়ে আমার গায়ে একটা হাত রেখে আছে। কথা কইছে না; তার ছোট্ট মনের কবিটা বোধ হয় এমন সুন্দর ভোরের বেলার নিথরতা কথার ঝঙ্কার দিয়ে আঘাত কর্‌তে চাইছে না। আমি শুয়ে আছি—অত বড় রাতটা ঘুমিয়ে শরীর যেন ক্লান্ত হয়েছে। অথবা অবসাদ, আলসেমো—কে জানে।

খুকুর মা উঠে গেছে কখন। এমন সোণার সকালটা যে শুয়ে ভোগ কর্‌বে—তাও কপালে লেখা নেই। তার শুধু সংসার আর কাজ—শুধু কাজ। খুকু আমি দুজনেই একমত, ও শুধু বাজে কাজের তাড়না। আসল কাজ হল, এই নিরিবিলিতে চুপটী করে সবাই মিলে শুয়ে পুবের আকাশটা রঙ করে কেমন রোদ ওঠে—তাই দেখা।

খুকুর বড় অন্যমনস্ক ভাব। আশ্চর্য্য হলাম; এতক্ষণ ত কথার রেকর্ড কখন সুরু হয়ে যায়। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি সে আকাশে চিল ওড়া দেখ্‌ছে। দূরে আকাশে একটা চিল বোধ হয় প্রাতঃভ্রমণ সার্‌তে বেরিয়েছে। দুবার পাখা নেড়েই হাওয়ায় গা এলিয়ে দিযে ভেসে চলেছে—বৃত্তাকারে। মনের আনন্দে হাওয়ার স্তরে সে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে ভাস্‌ছে—সাবলীল, বাধাহীন, বন্ধহীন সে গতি। তার বহু নীচে দিয়ে—দুটো চারটে ছোট পাখী সোঁ সোঁ করে উড়ে গেল, বোধ হয় খাবারের সন্ধানে। কিন্তু আকাশের গায়ে চিল এখন ভাস্‌ছে—খাওয়া তুচ্ছ তার কাছে। সে বুঝি তরুণ সূর্য্যকে আবাহন কর্‌বার জন্য আকাশের নির্ম্মল নীলে রোদ ওঠার অপেক্ষা কর্‌ছে। খুকু ঘাড় ঘুরিয়ে তার টানা-টানা চোখের তারা দুটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চিলের ওড়া দেখ্‌ছে আকাশে। চিলটী যত বড় বৃত্তেই ঘুরুক না কেন—খুকুর ছোট্ট চোখের ছোট্ট তারা তার অনুসরণ কর্‌ছে। অবাক হয়ে দেখ্‌ছে খুকু! হয়ত ভাব্‌ছে তার ছোট ছোট হাত পার অক্ষমতার কথা। কতটুকু সে, কিন্তু তার চেয়েও কত ছোট ওই চিল। তবু তার চেয়ে ছোট হয়েও কত মুক্ত, কত স্বাধীন সে। দুটী ডানার তলে তার বিশ্ব চরাচর পড়ে রয়েছে—হোক না সে ছোট, তাতে কি যায় আসে? সকাল বেলার সূর্য্যের আলোর বলে দৃপ্ত সে—ভোরের স্বচ্ছ হাওয়ায় অনুপ্রাণিত সে। পৃথিবীটা সে পায়ের তলায় দেখে ঘৃণাভরে—তুচ্ছ, হীন জগৎ। তাতে ভরা তুচ্ছতর, হীনতর কলরব—বেঁচে থাকার নির্লজ্জ প্রয়াস, অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর আশঙ্কা নিয়ে। কতদূরে চিল—তার কত নীচে খুকু। কিন্তু তার মনও চিলের মত পাখার ভরে উড়ছে। বড় করে বর্ত্তমান দেখ্‌ছে সে। এতটুকু খুকু—এতটুকু তার কল্পনা। তার জগৎ ওই চিলের পাখার আঁকা বৃত্ত। তার কল্পনার প্রসার ওই চিল যেখানে উড়্‌ছে সেই হাওয়ার স্তরটুকু। চিত হয়ে শুয়ে খুকুর চিল ওড়া দেখাটুকু উপভোগ করি। আমার বড় ভাবনা নিয়ে, আমার বড় কল্পনার বড় প্রসার নিয়ে, ওর ছোট্ট মুখের ওই নিবিষ্ট ভাব দেখ্‌লে হাসি পায়। এইক্ষণ—এই সময়টুকু ঘিরে রেখেছে খুকু ও তার মনকে · দেখি আর ভাবি!

ভাবি এই খুকু হবে কত বড়! বেণী দুলিয়ে যাবে স্কুলে। · নাঃ এখানকার মফঃস্বলের স্কুলগুলো তত ভাল নয়। কলকাতায় দেব ভাল দেখে—কোন স্কুলে। আবার কলকাতার জল-হাওয়া বড় খারাপ—কোন হষ্টেলে ঘিঞ্জিতে থেকে শেষে কি অসুখ বিসুক কর্‌বে—ওর আবার ফাঁকায় থাকা অভ্যেস। তা ছাড়া অভিভাবক-হীন হয়ে কলকাতায় থাকার দরকার নেই বাপু! শেষে শিখে আস্‌বে শুধু তিনপাক দিয়ে জড়িয়ে শাড়ী-পরা, আর তিন থাক দেওয়া মুক্তোর কাণবালা পর্‌তে—একটু

কথাবার্ত্তার ভব্যতাও শিখ্‌বে না ; চাল চলনে সভ্যতার লেশমাত্র থাকবে না।

দিতে হয় ত ভাল একটা স্কুলে। মশুরী পাহাড়ে দেখেছিলুম একটা সাহেবী স্কুল। পাহাড়ের গায়ে সন্ধ্যার আবছায়া নাম্‌ছে, ম্যলের ভেতর দিয়ে একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে কজন সিষ্টার চলেছে। কোথায় কোন চ্যারিটী শো দেখ্‌তে এসেছিল—দেখা বুঝি শেষ হলো! কি সুন্দর সুস্থ সবল চেহারা। আর সেই মুণ্ডিত-কেশ সিষ্টারদের কি আগ্রহ ও অনুরাগ! পথের মাঝ দিয়ে সোজা এক লাইনে যাচ্ছে—ছেলেরা একটা রিক্‌সা পাশ দিয়ে গেছে—তাড়াতাড়ি সাবধান করে দিচ্ছে—একটা ঘোড়সওয়ার দেখ্‌লে ছুটে গিয়ে আড়াল করে দাঁড়াচ্ছে। উঁচু নীচু পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে ওরা চলেছে—হাস্‌ছে, গল্প কর্‌ছে—জীবন্ত খুশীর প্রতিমূর্ত্তি। দূরে ওদের দল মিলিয়ে গেল—ওদের মাথার চুলের ওপর ডুবন্ত সূর্য্যের আলো চিক্ চিক্ কর্‌তে লাগ্‌লো। ঠিক যেন বায়স্কোপের ছবি। দিতে হয়তো খুকুকে ওইখানেই দেব—পড়্‌বে—মানুষ হয়ে আস্‌বে।

খুকুর বিয়ে দোব—শান্ত, সুশীল একটা সিভিলিয়ানের সঙ্গে। খুকুর বাবার অবস্থা এ-রকম তখন নিশ্চয়ই থাক্‌বে না। সিভিলিয়ান জামাইও বল্‌তে পার্‌বে—হ্যাঁ অমুক লোকের জামাই! কি আশ্চর্য্য—খুকুর আবার খোকা-খুকু হবে। তখন আমার আর খুকুর মার নিশ্চয়ই চুল পেকেছে—দাঁত হয়ত আস্তে আস্তে জবাব দিচ্ছে। আচ্ছা খুকুর মার দাঁত পড়ে গেলে মুখ দেখ্‌তে কি রকম হবে? এই এখনকার হাসিখুসী-ভরা মুখটা এই যে সারা দেহের উচ্ছল ভঙ্গী—তখন কি রকম হবে? ভাব্‌তে হাসি পায়—হয়ত আপন মনে হাসছি·····

হঠাৎ ছাতে উঠে এল খুকুর মা—পরণে একখানা লাল গরদের কাপড়। এই এত সকালেই সিঁথিতে সরু করে সিঁদুর পরেছে। চোখ দুটিতে ঘুমের ভাব যেন এখনও লেগে আছে—তাতে এখনি ধোওয়া সুন্দর মুখটা আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। মাথার কাপড়ের পাশ দিয়ে একগোছা উড়ন্ত চুল সামলাতে সামলাতে বল্লে—"বাঃ বাঃ,—যেমন বাবা তেমনি মেয়ে, কুড়ের সর্দ্দার। কখন আমি উঠেছি—বড়মার পূজোর সরঞ্জাম করেছি—আর তোমাদের ওঠার অবধি সময় হল না! ততক্ষণে বিছানার কাছে এসে পড়েছে। লুটানো আঁচলটা ধরে দিলাম টান। "আঃ ছাড়, ছাড়, কি যে করো! ছাড়া কাপড়ে বিছানায়···" বল্‌তে বল্‌তে সে বিছানার ওপর প্রায় আমার গায়েই ধপ্‌ করে বসে পড়্‌লো।

বল্‌লাম, "রাণী! এমন সোনার সকাল ওঠ্‌বার জন্য নয়। থাকুক তোমার কাজ পড়ে, রাণু! আজ তুমি উঠ্‌তে পাবে না আর। বোস এখানে।"

রাণী নড়ে বস্‌বার চেষ্টাও করেনি। আমার দিকে মুখ করে সে বসে পড়েছিল—আসন-পিঁড়ি হয়ে একটা হাঁটু আমার পাঁজরের ওপর। তার হাত দুটো আমার হাতে ধর্‌লাম।

খুকুর চিল দেখা বন্ধ হয়েছে। তার মাকে বন্দী করায় সে ভারী খুসী। সেও আমার গায়ে একটা পা তুলে গলার পৈতা নিয়ে খেলা কর্‌ছে।

বল্‌লাম, তোমার মেয়ে দেখ্‌ছিল চিল ওড়া—আর আমি দেখ্‌ছিলাম তোমার দেড় বছরের মেয়েকে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে—মেয়ে, জামাই, নাতি, নাত্‌নী, বেয়াই, বেয়ান সব চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌লো। আচ্ছা দেখ—

দেখি, খুকুর মার চোখের সে চপলতা নেই। নিমেষহীন দৃষ্টি তার দিগন্তের কোথায় যেন নিবদ্ধ। এই বোশেখের সকালটা ওকেও যাদু কর্‌লে। বেশ বুঝলাম ওই দিক-চক্রবালের রেখার কাছে ধীরে ধীরে অনেকগুলি পটই সরে গেল খুকুর মার চোখের সাম্‌নে থেকে। একটা নিশ্বাস ফেলে রাণী বল্‌লে "ভারী সুন্দর সকালটা, না?" জবাব দেবার আগেই সে সুরু কর্‌লে—জানো—ঠিক এই রকম ভোরে আমরা সব বেড়াতে বেরোতাম। প্রত্যেক বাড়ী গিয়ে মেয়েদের ডেকে নেওয়া হত। কত সব মেয়ে একসঙ্গে জড় হতাম! কি মজা—রাস্তার ওপর দিয়ে কেউ চল্‌তান না। ভিজে ঘাস—শিশির মাখানো—তারই ওপর দিয়ে চল্‌তে হবে—ফুটপাথের ধারগুলো বাঁধানো যে পাথর দিয়ে তার ওপর শুধু পা দিয়ে দিয়ে কে কতটা যেতে পারে। পড়ে গেলেই হার। মা, অন্য বাড়ীর কাকীমা, মাসীমারা কত বকতেন একসঙ্গে সব যাবার জন্য—কে শোনে কার কথা। কত মেয়েই ছিল, মিনা বিলা মাধুরী রত্না···কোথায় আমি কোথায় তারা—সত্যি। কত কথাই মনে হচ্ছে—শুভ্রা, সেই যে মঞ্জুকে দেখেছিলে

আমাদের পাশের বাড়ীর—তারই দিদি, সেই শুভ্রাদি যখন মারা গেল—ঠিক্ এমনিই ভোর—হাস্‌তে হাস্‌তে চোখ বুজ্‌লে, আমরা ভাবলুম বুঝিবা সারারাত কষ্ট পেয়ে এবার ঘুমুচ্ছে—একদম শেষ ঘুম···। ওই শুভ্রাদি কি রকম সাঁতার কাট্‌তো লেকে। তখনও লেক পুরো হয়নিক।··· আচ্ছা মনে পড়ে একদিন শীতের ভোর রাত্রে দুজনে পালিয়েছিলাম লেকের ধারে বিয়ের ঠিক পরেই, মনে নেই? কেয়াতলা রোড দিয়ে যাচ্ছি—তখনও অন্ধকার কাটে নি—বড় বড় মানকচুর পাতে শিশির জমে চক্ চক্ করছে। তুমি বল্‌লে কচুপাতাসীনা হয়ে বোস—একদিন দুপুর সময়ে, ঠিক্ সেই পোজে তোমার একটা ফটো নেব। সেদিন কি ঘোরাই হয়েছিল লেকে—তোমার গায়ে সোয়েটার আর ঢিলে রাত পায়জামা, আর—আমার গায়ে তোমার শাল জড়ানো। বার বার গা থেকে খুলে যাচ্ছিল আর তুমি গায়ে জড়িয়ে দেবার অছিলায় শুধু শুধু······কি দুষ্টুই ছিলে তুমি।

রাণী আরও কাছ ঘেঁসে বস্‌লো। ওর হাত দুটোর আঙুল নিয়ে এতক্ষণ নাড়াচাড়া করছিলাম। বুকের ওপর টেনে আন্‌লাম।

খুকু উঠে বস্‌লো। বল্লে—"বাবা, চলো" খুকুর মার চোখের সাম্‌নের অতীতের পট সরে গিয়ে বর্ত্তমানের পর্দ্দা নেমে এল।

চেয়ে দেখি সারা ছাত ভরে রোদ এসেছে। ভবিষ্যতের অতলে নিজের যে ভাবনাগুলো তলিয়ে ছিল তাড়াতাড়ি তাদের গুটিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে উঠ্‌লাম। খুকু উঠ্‌লো—খুকুর মাও উঠ্‌লো।

সময়ের অন্তহীন অসীমত্ব। তার বর্ত্তমানে রয়েছে খুকু—তার ভবিষ্যৎটুকুতে ছড়িয়ে তার ভাবের বোঝা খুকুর বাবা। অন্ধকার অতীত সোনালি সকালের ছোঁয়াচ লেগে মধুর হয়ে ওঠে খুকুর মার কাছে। বর্ত্তমান—ভবিষ্যৎ—অতীত।

তিনজনেই নীচে নেমে আসি।

ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাগৈতিহাসিক যুগ

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

বৈদিক যুগ হইতে পৌরাণিক যুগ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ কালটিকে আমরা প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। এ যুগে সঙ্গীত-কলা যে চরম উৎকর্ষে উপনীত হইয়া শিক্ষা ও সভ্যতার একটি বিশিষ্ট উপাদান ও নানা কল্যাণসাধনের প্রকৃষ্ট নিদানরূপে পরিণত হইয়াছিল তাহাও বলিয়াছি। এক্ষণে আলোচনা করিব—প্রাগৈতিহাসিক যুগে কিরূপে সঙ্গীতের সৃষ্টি ও ক্রমিক পুষ্টি সাধিত হইয়াছিল, কিরূপে এই চারুকলা লৌকিক অলৌকিক সর্ব্ববিধ কল্যাণের একটি প্রকৃষ্ট উপাদানরূপে পরিণত হইয়া সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল।

গীতবাদ্যনৃত্যাত্মক সঙ্গীত গান্ধর্ব-বেদের প্রতিপাদ্য। গান্ধর্ব বেদ সামবেদের উপবেদ। ইহা অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত ভারতীয় বিদ্যাস্থানের* অন্যতম বিদ্যাস্থান।

বেদ যেমন প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অনধিগম্য উপায়ে ব্যক্তিগত ও জাতিগত কল্যাণ সাধন করেন, বেদ-সহজাত সঙ্গীতের স্বরলহরীও সেইরূপ অলৌকিক উপায়ে জাতি ও ব্যক্তির ইষ্ট সাধন করিয়া থাকে। এই জন্যই সঙ্গীত-প্রতিপাদক গান্ধর্ব শাস্ত্র সামবেদের উপবেদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। অধিকন্তু এই সঙ্গীত দেশীরূপে পরিণত হইয়া লোকচিত্ত-বিনোদনেরও একটি অপূর্ব্ব উপকরণ। যাহা হউক, এই চারিটি উপবেদ যথাক্রমে চারিবেদ হইতেই উৎপন্ন।

পূর্ব্বং চতুর্ণাং বেদানাং সারমাকৃষ্য পদ্মভূঃ।
ইদন্তু পঞ্চমং বেদং সঙ্গীতাখ্যমকল্পয়ৎ॥

—সঙ্গীত-সংহিতা।

---

* অষ্টাদশ বিদ্যাস্থান—

অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থন্তু বিদ্যাহ্যষ্টাদশৈব তাঃ॥

ছয়টি বেদাঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ; চারি বেদ—ঋক্ যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব; মীমাংসা; ন্যায়; ধর্ম্মশাস্ত্র; পুরাণ। এতদ্‌ভিন্ন চারি বেদের চারিখানি উপবেদ—আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র। ইহাই ভারতবর্ষের অষ্টাদশ বিদ্যাস্থান।

ব্রহ্মা বেদচতুষ্টয়ের সম্পূর্ণ সার সঙ্কলন করিয়া এই সঙ্গীত নামধেয় পঞ্চম বেদ রচনা করিয়াছেন।

এই সঙ্গীত মার্গও দেশীয় ভেদে দুই প্রকার। ব্রহ্মা স্বয়ং ভরতকে মার্গ-সঙ্গীতের উপদেশ করিয়াছিলেন।

মার্গ দেশীয় ভেদেন দ্বেধা সঙ্গীতমুচ্যতে।
বেধা মার্গস্থ সঙ্গীতং ভবতায়া ব্রবীৎ স্বয়ম্‌॥
—সঙ্গীত পারিজাত।

ব্রহ্মা বেদ হইতে সঙ্গীত শাস্ত্র সঙ্কলনপূর্ব্বক ভরতের ন্যায় আরও চারিটি শিষ্যকে ইহা উপদেশ করিয়াছিলেন।

ভরতং নারদং রম্ভাং হূহূং তুম্বুরুমেবচ।
পঞ্চশিষ্যাংস্ততোঽধ্যাপ্য সঙ্গীতং ব্যাদিশদ্‌ বিধিঃ॥
—নারদ-সংহিতা।

ভরত, নারদ, রম্ভা, হূহূ ও তুম্বুরু এই পাঁচ শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইয়া বিধাতা সঙ্গীত প্রচার করিয়াছিলেন।

ভরত ব্রহ্মার নিকট মার্গ সঙ্গীত অধ্যয়ন করিয়া অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ দ্বারা উহা মহাদেবের সম্মুখে প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মণোঽধীত্য ভরতঃ সঙ্গীতং মার্গসংজ্ঞিতম্‌।
অপ্সরোভিশ্চ গন্ধর্বৈ শম্ভোরগ্রে প্রযুক্তবান্‌॥
—সঙ্গীত পারিজাত।

আমরা উল্লিখিত শাস্ত্রবাক্যসমূহ হইতে পাইলাম—পঞ্চম বেদ বা গান্ধর্ববেদ সামবেদের উপবেদ, ভগবান ব্রহ্মা সামবেদ হইতে উহা সঙ্কলন করেন এবং ভরতাদি পাঁচ শিষ্যকে উপদেশ করেন। ভরত ব্রহ্মার নিকট মার্গ-সঙ্গীত অধ্যয়ন করিয়া অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণের সাহায্যে মহাদেবের সম্মুখে প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

ভগবান ভরত এইরূপে কেবল মৌখিক উপদেশ দ্বারাই সঙ্গীতের প্রচার করেন নাই, তিনি সঙ্গীত প্রচার-কল্পে গান্ধর্ববেদ নামক একখানি বিশিষ্ট গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পণ্ডিতকুলশিরোমণি মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার "প্রস্থান-ভেদ" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—"গান্ধর্ব বেদশাস্ত্রং ভবতা ভরতেন প্রণীতম্‌, তত্র গীতবাদ্যনৃত্যভেদেন বহুবিধোঽর্থঃ।" এতদ্ব্যতীত ভরত "নাট্যবেদ" বা "নাট্যশাস্ত্র" নামক নাট্যকলার আরও একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই দুইখানি গ্রন্থই ভারতবর্ষের সঙ্গীত ও নাট্যবিদ্যার সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান গ্রন্থ। কালক্রমে "গান্ধর্ব্ববেদ" লুপ্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সঙ্গীত সম্বন্ধে ভরতের সম্প্রদায় অর্থাৎ মতপরম্পরা এখনও অন্তর্হিত হয় নাই। কারণ "গান্ধর্ব্ববেদ" লুপ্ত হইলেও "নাট্যশাস্ত্র" এখনও বর্ত্তমান। নাট্যশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রধানতঃ অভিনয়; গীত বাদ্য ও নৃত্য অভিনয়ের অঙ্গীয় বা পোষক বলিয়া প্রাসঙ্গিকরূপে নাট্যশাস্ত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং প্রাসঙ্গিক বলিয়াই নাট্যশাস্ত্রে গীত ও বাদ্যের আলোচনা সংক্ষিপ্ত। সুগঠিত সঙ্গীত-পদ্ধতির কোন ধারাবাহিক বিশদ বর্ণনা যদিও ইহাতে নাই তথাপি শ্রুতি, স্বর, মূর্চ্ছনা ও জাতি প্রভৃতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত যতটুকু আলোচনা ইহাতে রহিয়াছে, আমরা দেখিতে পাই মধ্যযুগের প্রবীণ গ্রন্থকার শার্ঙ্গদেবও তাঁহার "সঙ্গীত রত্নাকরে" তাহারই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। যদিও শার্ঙ্গদেব প্রাচীন সঙ্গীতাচার্য্যগণের বহু মতবাদের সার সঙ্কলন করিয়া "সঙ্গীত-রত্নাকর" রচনা করেন, তথাপি তিনি যে প্রধানতঃ ভরত মতেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহা বিশেষভাবে নিম্নলিখিত দুইটি কারণে স্পষ্টই অনুমান করা যায়। প্রথমতঃ শার্ঙ্গদেব গুরুপরম্পরার উল্লেখ করিতে যাইয়া সদাশিব, শিব ও ব্রহ্মার নাম উল্লেখ করিবার পরেই কশ্যপ নারদাদি মুনিগণের নামের পূর্ব্বেই ভরতের নাম উল্লেখ করিযাছেন এবং তৎপরেও নারদ মতঙ্গ প্রভৃতি কৃত গ্রন্থাদির ব্যাখ্যাকারগণের কোন উল্লেখ না করিয়া ভারতীয় গ্রন্থের বহু ব্যাখ্যাতার নাম স্পষ্টভাবেই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিকরূপে স্বর, বাদিসংবাদিবিভাগ, মূর্চ্ছনা, তান, সাধারণ, জাতি প্রভৃতি বিষয়গুলি যেরূপ পৌর্বাপর্ব ক্রমে নির্দ্দিষ্ট, শার্ঙ্গদেবকৃত রত্নাকরেও সেই ক্রমানুসারেই পূর্ব্বোক্ত বিষয়সমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। যে যে স্থানে নারদাদি মতে পার্থক্য আছে তথায় শার্ঙ্গদেব ভরত মতটিই গ্রহণ করিয়া প্রাসঙ্গিকরূপে নারদের মত পৃথক্‌ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার উদাহরণরূপে দুইটি স্থান আমরা উল্লেখ করিতেছি; যথা—

(১) মূর্চ্ছনার নামকরণ প্রসঙ্গে ভরত বলিয়াছেন—

আদাবুত্তর মন্দ্রাস্যাদ্‌ রজনী চোত্তরায়তা।
চতুর্থী শুদ্ধ ষড়্জাচ পঞ্চমী মৎসরীকৃতা॥

অশ্বক্রান্তা তথা ষষ্ঠী সপ্তমী চাভিরুদ্গতা।
ষড়্জ গ্রামাশ্রিতাহেতো বিজ্ঞেয়াঃ সপ্ত মূর্ছনাঃ॥

মধ্যম গ্রামের মূর্চ্ছনাপ্রসঙ্গে ভরত বলিয়াছেন—

সৌবীরী হরিণাশ্বাহথ স্যাৎ কলোপনতা তথা।
শুদ্ধমধ্যা তথাচৈব মার্গী স্যাৎ পৌরবী তথা॥
হৃষ্যকাচেতি বিজ্ঞেয়া সপ্তমী দ্বিজসত্তমাঃ।
মধ্যম গ্রামজাহেতো বিজ্ঞেয়াঃ সপ্তমূর্চ্ছনাঃ॥

রত্নাকরে শার্ঙ্গদেব ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন; যথা—

ষড়্জেত্তূত্তরেমন্দ্রাদৌ রজনী চোত্তরায়তা।
শুদ্ধ ষড়্জা মৎসরীকৃদশ্বক্রান্তাভিরুদ্গতা॥
মধ্যমে সাত্তু সৌবীরী হরিণাশ্বা ততঃ পরম্।
স্যাৎ কলোপনতা শুদ্ধমধ্যা মার্গী চ পৌরবী।
হৃষ্যকেত্যথ তাসান্ত লক্ষণং প্রতিপদ্যতে॥

মূর্চ্ছনার নাম নির্দ্দেশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রথমতঃ ভরতের মতটি শার্ঙ্গদেব গ্রহণ করিয়াছেন; পরে মতান্তর প্রদর্শন প্রসঙ্গে মূর্চ্ছনার নারদোক্ত নামগুলি উল্লেখ করিয়াছেন;— "তাসামন্যানি নামানি নারদো মুনিরব্রবীৎ"—ইত্যাদি।

(২) অন্যত্র শার্ঙ্গদেব ভরতের অনুসরণে নিজেও দুইটি গ্রাম স্বীকার করিয়া তাহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার পরে মতান্তররূপে নারদোক্ত গ্রামত্রয় ও তাহার লক্ষণ উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রাম সম্বন্ধে ভরতের মত—"অথ গ্রামৌ ষড়্জ গ্রামো মধ্যম গ্রামশ্চেতি।" শার্ঙ্গদেব বলিয়াছেন—

গ্রামঃ স্বরসমূহঃ স্যান্ মূর্ছনাদেঃ সমাশ্রয়ঃ।
তৌ দ্বৌ ধরাতলে তত্রস্যাৎ ষড়্জ গ্রাম আদিমঃ।
দ্বিতীয়ো মধ্যম গ্রামঃ—ইত্যাদি।

পরে নারদের মত প্রদর্শন উপলক্ষে বলিয়াছেন—

গান্ধার গ্রামমাচষ্টে তদাতং নারদো মুনিঃ।
প্রবর্ত্ততে স্বর্গলোকে গ্রামোহসৌ এ মহীতলে॥

অনুসন্ধিৎসু পাঠক বিশেষ অভিনিবেশপূর্ব্বক নাট্য-শাস্ত্র ও রত্নাকর মিলাইয়া পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন যে বীণাযন্ত্রের সাহায্যে শ্রুতি স্থান নির্দ্ধারণ, রাগের জাতিবর্ণন ও তাহার ভেদপ্রদর্শন প্রভৃতি সকল বিষয়েই শার্ঙ্গদেব ভরতেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন।

তথাপি যাঁহারা বলেন—'গ্রন্থকারগণ বোধ হয় আদি শাস্ত্রকারগণের স্থাপিত উপপত্তি সকল সম্যক্ না বুঝিয়া এবং তাহা কর্ত্তব্যের সহিত ঐক্য না করিয়া নিজ নিজ গ্রন্থে উহা বর্ণনা করিয়াছেন, তজ্জন্য ঐ সকল উপপত্তি অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।'—তাঁহাদের এইরূপ উক্তির সারবত্তা কৃতী পাঠকগণই বিচার করিবেন। আমাদের মনে হয় কোন বস্তুকে চিনিবার জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অনুশীলন না করা পর্য্যন্ত তাহা অস্পষ্টই থাকে; ধারাবাহিক অনুশীলনে উহা ক্রমে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠে। বর্ণমালা পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া যে কোন জটিল শাস্ত্ররহস্য পর্য্যন্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝিবার ইহাই চিরন্তন পদ্ধতি। সুতরাং মধ্যযুগের গ্রন্থকার শার্ঙ্গদেব প্রভৃতি বরেণ্য পণ্ডিতমণ্ডলী প্রাচীন শাস্ত্রের উপপত্তিসমূহ না জানিয়া বা না বুঝিয়াই বর্ণনা করিয়াছিলেন বলিতে হইলে প্রথমতঃ তাঁহাদের গ্রন্থসমূহ বুঝিতে যথেষ্ট প্রয়াস করা আবশ্যক। আমরা জানি না সে প্রয়াসের সুযোগ প্রতিবাদিগণ পাইয়াছিলেন কি না। আমাদের মনে হয় সে সুযোগ পাইলে প্রতিবাদিগণ ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেন না এবং শার্ঙ্গদেব যে অসীম সাধনায় প্রাচীন শাস্ত্র-সাগর মন্থন করিয়া তাহার সার রত্ননিচয় দ্বারা স্বীয় গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ করিয়া গিয়াছেন তাহা অস্বীকার করিতে পারিতেন না। ইহা হইল স্বরাধ্যায়ের কথা। আমরা দেখিতে পাই রত্নাকরের সকল অধ্যায়ই ভরতের মত অনুসরণ করিয়া লিখিত হইয়াছে। আমরা মধ্যযুগের আলোচনাকালে ইহা প্রদর্শন করিব। সুতরাং ভরত-মতবহুল প্রাগৈতিহাসিক যুগে সঙ্গীতপদ্ধতি সাধারণতঃ কিরূপ ছিল তাহা আমরা মধ্যযুগীয় রত্নাকরের সঙ্গীতপদ্ধতি পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারিব। সংক্ষিপ্তভাবে একটি কথা এখানে বলিতে হইতেছে যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে সঙ্গীতের একমাত্র মার্গী পদ্ধতিই ছিল —দেশী পদ্ধতি ছিল না। কারণ ভরতের গ্রন্থে কেবল মার্গী সঙ্গীতই আলোচিত হইয়াছে, দেশীর নাম পর্য্যন্ত কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। প্রাগৈতিহাসিক যুগ তো দূরের কথা; এমন কি খৃঃ পূঃ ৩৭৬ অব্দে কাশ্মীর-রাজ জয়াপীড় যখন বঙ্গদেশে পৌণ্ড্রবর্ধনে আসিয়াছিলেন তখনও তিনি ভরত মতানুগত নৃত্যগীতাদির প্রচলনই তথায় লক্ষ্য করিয়াছিলেন। রাজতরঙ্গিণীতে দেখিতে পাই—

লাস্যং স দ্রষ্টুমবিশৎ কার্তিকেয়-নিকেতনম্।
ভরতানুগমালক্ষ্য নৃত্যগীতাদি শাস্ত্রবিৎ॥
—রাজতরঙ্গিণী, ৪র্থ তরঙ্গ, ৪২২ শ্লোক।

শাস্ত্রজ্ঞ জয়াপীড় পৌণ্ড্রবর্ধনের নৃত্যগীতাদি ভরত-মতানুযায়ী লক্ষ্য করিয়া লাস্য (স্ত্রীনৃত্য) দর্শন করিবার নিমিত্ত কার্ত্তিকেয়-নিকেতনে প্রবেশ করিলেন।

পোলো—(চোগান)

শ্রীজিতেন্দ্র নাগ

পোলোর জন্মভূমি পারস্য (ইরাণ)। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হতে প্রাচীন ইরাণে সাধারণ খেলাধূলার মধ্যে পোলো বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। ইরাণীরা চিরদিনই অশ্বারোহণে বিশেষ পটু। বিশেষতঃ সে সময়ে কি রাজন্যবর্গ, কি প্রজাবর্গ, উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র সকলেই অশ্বচালনা অভ্যাস করতেন। ঘোড়দৌড় এবং ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে যুদ্ধ করার রীতি প্রাচীন ইরাণে বহুদিন হতেই প্রচলিত ছিল —যার ফলে অভিজাতবংশের মধ্যে এবং সেনাদলের মধ্যে অশ্বারোহণ ক'রে পোলো খেলার প্রথম অভ্যুদয় ঘটে।

আরবদেশীয় 'পনী'—যেগুলি অল্প ছোট সাইজের হলেও গতিতে অতি দ্রুত সেইগুলি বিশেষ করে এই ক্রীড়ায় ব্যবহৃত হয়ে থাকৃত। ইরাণীয় কবিদের বা লেখকদের রচনায় পোলোর উল্লেখ প্রচুর-ভাবে পাওয়া যায়। কবি নাজিম, জামী, ওমরখৈয়াম, ফারদৌসী প্রভৃতি লেখক-বর্গের গ্রন্থসমূহে প্রাচীন পোলোক্রীড়ার ভারী সুন্দর সুন্দর বর্ণনা আছে—তাঁরা গ্রন্থের নায়ককে প্রায়ই কুশলী পোলো খেলোয়াড় করে অঙ্কিত করেছেন। ওমর খৈয়ামের রোবাইয়াৎএ শাশানীয় নরপতি বারোমের চৌগানে (পোলো) বিশেষ পারদর্শিতার উল্লেখ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তাছাড়া ফারদৌসীর শাহনামাতে খৃষ্টাব্দ দশম একাদশ শতাব্দীতে ইরাণীয় রাজপরিবারে পোলো খেলার কিরূপ উৎসাহ ছিল তার যথেষ্ট বিবরণ আছে। শাহজাদা সিয়াওয়াশ, আক্রাসাহেব, তুরাণের তুর্কী সুলতানগণ সকলেই চৌগান খেলায় বিশেষ কুশলী ছিলেন। আমাদের বৃটীশ ভারতে ফুটবল যেমন একটা জাতীয় খেলায় দাঁড়িয়েছে তেমনি শুধু পারস্যে কেন—সারা মধ্য এশিয়ায় চৌগান একটী জাতীয় ক্রীড়ায় পরিণত হয়েছিল। ইরাণ ও তুরাণের মধ্যে প্রায়ই আন্তর্জ্জাতিক পোলো প্রতিযোগিতা চল্‌ত। রাজন্য-বর্গের আনুকূল্যে এবং যোগদানে সমারোহের অন্ত থাকৃত না।



পারস্যে আন্তর্জাতিক পোলো খেলার একটি চিত্র

পারস্যে প্রাচীন গ্রন্থ ভিন্ন পারস্য-শিল্পীদের পুরাতন আলেখ্যতে এবং কারুকার্য্যেও চৌগান খেলার নমুনা পাওয়া যায়। এইখানে বলে রাখি, পোলো নামটি আমাদের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত হলেও এই ক্রীড়ার মূল নাম চৌগান—মোগল আমলে ভারতবর্ষে ইহা চৌগান নামেই বিশেষ পরিচিত ছিল। পোলো নামের উৎপত্তি—

তিব্বতীয় শব্দ পুলু হ'তে যার অর্থ willow গাছের শিকড় —এই থেকে চৌগানের বল প্রস্তুত হত। এই পুলু কথা থেকেই পোলো—চৌগান বল্লে প্রকৃতপক্ষে খেলবার stick টাকেই বোঝায়; সাধারণভাবে তাতারীয়গণের মধ্যে পোলো চৌগান বলেই অভিহিত।

ইরাণে পোলোর প্রথম আবির্ভাব—যদিও এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। কারও মতে তিব্বতে বা মণিপুরেই পোলোর জন্ম—কিন্তু পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে পারস্যকেই



সম্রাট আকবর পোলো খেল্‌ছেন

মেনে নিতে হয় পোলোর আদি বাসভূমি বলে। পারস্যের মত পোলোর উন্নতি সে সময়ে অন্য কোথাও হয় নি। কাছাড় ও মণিপুরে পোলোর বিস্তার বর্ত্তমানে এবং উনবিংশ শতাব্দীতেও খুব বেশী ছিল বটে কিন্তু প্রাচীন যুগে এই দিকে পোলোর বিকাশের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়নি। ইতিহাস মানতে হলে ৭৭৩ খৃষ্টপূর্ব্ব অব্দে প্রথম যে অলিম্পিক খেলা হয় তারও পূর্ব্বে থেকে ইরাণ ও তুরাণে এই ক্রীড়া চল্‌ত।

পারস্য হতে অতি শীঘ্রই মধ্যএশিয়ায় তুর্কোমানদের মধ্যে পোলোর রেওয়াজ চল্‌তে সুরু হয়। ক্রমশঃ মধ্য এশিয়ার রুক্ষ ভূমিতে যাযাবর অশ্বারোহী তাতারগণ চৌগান খেলায় বিশেষ ভাবে মেতে ওঠেন। রাজদরবারে ভাল চৌগান খেলোয়াড়গণ যথেষ্ট সম্মানিত ও পুরস্কৃত হতেন। আজও পর্য্যন্ত সে কদর কমে নি। বড় বড় ঘরের ছেলেরা, সৈন্যাধ্যক্ষ ও রাজপুরুষরা সকলেই চৌগানের বিশেষভাবে ভক্ত।

এই খেলার জন্য বিশেষ ক্ষেত্র প্রস্তুত হত—খেলার সময় একদিকে বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে রাজপুরুষ এবং রাজকর্ম্মচারীদের বিশিষ্ট আসন নির্ম্মিত হত, অন্যদিকে থাকৃত সাধারণের জন্য আসন—দলে দলে লোক আস্‌ত দেখ্‌তে। খেলার সঙ্গে বেজে উঠ্‌ত যুদ্ধের বাজনা—দর্শক ও ক্রীড়কগণের উৎসাহে এবং চাঞ্চল্যে ঘোড়দৌড়ের চেয়েও এ খেলা জমে উঠ্‌ত—এর প্রমাণ আজও বড়দিনে কল্‌কাতায় বা জয়পুর, মণিপুর, যোধপুর, কাশ্মীর—সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়।

মধ্য এশিয়ায় খেলার পর পরাজিত দল জেতাদের নৃত্যসহকারে মর্য্যাদা দিয়ে থাকে এবং খেলা শেষ হয়ে গেলে বিরাট আনন্দ কোলাহল উত্থিত হয়ে অশ্বক্ষুরের ও বিশাল জনতার পদবিক্ষেপণের ধূলি আকাশবাতাস ঘোরাল করে পোলোর অপূর্ব্ব উত্তেজনাকে বহু দূরেও জানিয়ে দেয়।

মধ্য-এসিয়া থেকে ক্রমশঃ চীনে জাপানে রেওয়াজ সুরু হল পোলো খেলার। এদিকে ভারতবর্ষেও তাতারীয় আক্রমণে দেশীয় অশ্বারোহী সৈনিকগণের মধ্যে এই military game প্রবেশ করতে দেরী হল না। চীনের সৈনিকরাও তাতারীয়গণের নিকট হতে প্রথম চৌগান খেলিতে অভ্যাস করে। চীনদেশের পুরাতন পুঁথিপত্র এবং চিত্রপটে এইটুকু জানতে পারা যায় যে সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন চীন মধ্য এশিয়ায় রাজ্য বিস্তারের জন্য ক্ষেপে উঠেছিল সেই সময় চৈনিক অশ্বারোহী সৈন্যদল তুর্কোমানদের অনুকরণে পোলোকে যোদ্ধাদের ক্রীড়ারূপে গ্রহণ ক'রে তিব্বতে, মাঞ্চুকুওতে এবং জাপানে এর বিস্তার করে। ক্রমশঃ মঙ্গোলিয়াও বাদ পড়লো না—কুচকাওয়াজের সঙ্গে রুখা ভূমির উপর অবসর বিনোদনে মঙ্গোল সেনাদল অশ্বারোহণে পোলো খেলা অভ্যাস করতে থাক্‌ল।

জাপানে feudal timesএ অভিজাতবংশেই বেশীর ভাগ পোলো খেলার খুব প্রচলন ছিল। কিন্তু এদেশে খেলার রীতি একটু অন্য প্রকারের। জাপানীরা বড় বড় stick ব্যবহার করত না—এরা ব্যাডমিণ্টনের মত হাল্কা বল এবং netএর ব্যাট্ নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে পোলো খেলে। গোলপোষ্ট্ ভূমি থেকে পাঁচ ফিট উচ্চে একটা বোর্ডের সহযোগে নির্ম্মিত। বোর্ডের মাঝখানে একটা গোলাকার ছিদ্র থাকৃত তার ভিতর দিয়ে বল হিট্ করলে তবে গোল হত।

বিস্তার করতে এসে আজ হতে হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই চৌগানের ঢেউ তুলে যান। সে সময়ে হিন্দুরাজগণ অশ্বারোহণে বিশেষ পটু ছিলেন, অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধ করার রীতি প্রচলন ছিল। পাঠান ও মোগল রাজত্বের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভারত ও রাজপুতানায় যোদ্ধৃবর্গ ও রাজন্যবর্গের মধ্যে চৌগান খেলার ধুম পড়ে যায়। ছোট ছোট রাজ্য-গুলিতেও চৌগান সাদরে গৃহীত হল। কাশ্মীর, কনৌজ, জয়পুর কেহ বাদ পড়ল না। কথিত আছে সেই সময় মণিপুরের রাজা পাকুংবা উত্তরভারতে ভ্রমণ করতে এসে



চীন দেশের পোলো খেলা

কারো কারো মতে ভারতবর্ষে উত্তরপূর্ব্ব ভারতের কাছাড় ও মণিপুরের মধ্য দিয়ে তিব্বত দেশ থেকে পোলোর আগমন। কিন্তু কেবলমাত্র মণিপুরের পোলোর ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় প্রকৃতপক্ষে পোলো মণিপুরে প্রবেশ করে অনেক পরে—মুসলমান আমলে উত্তর ভারত হতে। পূর্ব্বে বলেছি ভারতবর্ষে এই খেলা চৌগান নামেই পরিচিত ছিল। তাতার বীরগণ আমির সুলতান সকলেই গান্ধার, গিল্‌গিট্, চিত্রালের পথ ভেঙ্গে হিন্দুস্থানে রাজ্য

গিল্‌গিট্ ও চিত্রালে এই বীরোচিত ক্রীড়া দেখে এত মুগ্ধ হন যে রাজ্যে এই খেলার প্রচলন করেন এবং ক্রমশঃ মণিপুরীদের মধ্যে এটা জাতীয় ক্রীড়ারূপে গণ্য হয়। লেখকের সৌভাগ্য মণিপুরের পোলো তিনি স্বচক্ষে দেখে এসেছেন। মণিপুরের রাজা এবং রাজপরিবারের সকলেই পোলোর খুব ভক্ত বলে মনে হল। রাজপ্রাসাদের পেছনে প্রকাণ্ড একটা মাঠে প্রায়ই পোলো খেলা হয়। তাছাড়া ইম্‌ফাল সহরে ক্যাণ্টনমেণ্টের নিকটে পোলো গ্রাউণ্ডে

নিয়মিতভাবে পোলো প্রতিযোগিতা চলে। ম্যাচ খেলাতে চারজন করেই এক এক সাইডে খেলে বটে কিন্তু প্র্যাক্‌টিস্ খেলায় সাত আটজন বা আরো বেশী সমানসংখ্যক খেলোয়াড় উভয়দলে নিয়ে খেলা হয়। এই সময় বার বার ঘোড়া বদল করা সম্ভব হয় না। ১০।১৫ মিনিট অন্তর বিশ্রাম নিয়ে বিকালে বা দুপুরে ঘণ্টা দুই তিন ধরে পোলো খেলা হয়। মণিপুরীদের এতে যথেষ্ট উৎসাহ দেখেছি।

শোনা যায় কল্‌কাতায় পোলো খেলার প্রথম সূত্রপাত এই মণিপুরেরই একদল এসে করে। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মণিপুরের রাজা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে কোন কাজের জন্য কলকাতায় আসেন। সেই সময় তাঁর অনুচরবর্গ

উল্লেখ পাওয়া যায় না। পাঠান সাম্রাজ্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা চৌগান খেলাটি যোদ্ধাদের ক্রীড়ারূপে গ্রহণ করেন। পাঠানরা চৌগানের খুব ভক্ত ছিলেন। কথিত আছে সুলতান মামুদ, বক্তিয়ার খিল্‌জী, সুলতানা রিজিয়া সকলেই চৌগান খেলতেন। কুতবুদ্দিন শাহ ত চৌগান খেলতে খেল্‌তেই ঘোড়া থেকে পড়ে মারা যান।

মোগল সাম্রাজ্যের অধিষ্ঠাতা সম্রাট বাবর ভয়ানক পোলো খেলতে ভালবাসতেন। তাঁর সময়ে কি সমারোহে দিল্লী ও আগ্রায় চৌগান চল্‌ত তার বিবরণ পাওয়া যায়। এই খেলায় তাঁর দক্ষতা ছিল যেমন, উৎসাহও ছিল তেমনি। আকবর বাদশাহও ছিলেন পাকা পোলো খেলোয়াড়—



জাপানী চিত্রে পোলো

ও সৈন্যসামন্তগণ গড়ের মাঠে পোলো খেলা দেখায়—তাই দেখে 10th Royal Hussar বৃটিশ রেজিমেণ্টদল মণিপুরীদের নিকট পোলো শিক্ষা করে ও তাদের সঙ্গে ম্যাচ্ খেল্‌তে সুরু করে।

বিলাতে প্রকৃতপক্ষে পোলো প্রবেশ করে এই 10th Royal Hussar দল কর্ত্তৃক। এরাই দেশে ফিরে গিয়ে সেখানে পোলো খেলার সর্ব্বপ্রথম সূচনা করে। মুসলমানদের ভারতবর্ষে আগমনের বহুপূর্ব্ব হতেই হিন্দুরাজপুরুষগণের মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধ করার রীতি চলিত থাকলেও সে সময়ে পোলো খেলা যে তাঁরা খেল্‌তে অভ্যস্ত ছিলেন তার কোন

মোগলেরা যে কম বেশী সকলেই বিশেষতঃ অভিজাত এবং সৈনিকবংশের লোকরা চৌগান খেলতেন—তার উল্লেখ পাই আইন ই-আক্‌বরীতে। দুর্গের বাহিরে বা ভিতরে চৌগানের জন্য মাঠ থাক্‌তই, কুচ-কাওয়াজের সঙ্গে সৈন্যরা প্রায়ই চৌগান খেল্‌ত। এখনও ফতেপুর সিক্রীর বুলাণ্ড দরজায় অশ্বক্ষুরের যে নমুনা আছে তাতে বিশ্বাস করতে হয় মোগলের মধ্যে অশ্বক্রীড়া কিরূপ প্রচলিত ছিল। শোনা যায় হারেমে মেয়েদের মধ্যেও চৌগান কিছু কিছু খেলা হত। নুরজাহান বেগম ছিলেন অন্যতম উৎসাহী এবং উদ্যোক্তা—বেগমরা মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়ে চৌগান

খেলতেন। এর বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় মধ্যভারতে বুণ্ডেলখণ্ড ষ্টেটে। অধুনা-পরিত্যক্ত অর্চ্চা বলে একটা স্থানে বীরসিংহ প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড কারু-খচিত মোটা পশমী কাপড়ে (Frieze) মেয়েদের পোলো খেলার চিত্র পাওয়া গেছে—কথিত আছে এই কাপড়টা পোলো খেলার প্যাভিলনে ব্যবহৃত হত। ইহাতে প্রমাণিত হয় সম্ভবত রাজপুত বীরাঙ্গনাগণও মাঝে মাজে অশ্বপৃষ্ঠে এই খেলা অভ্যাস করতেন।

মেয়েদের পোলো ক্রীড়া যে পারস্যেও প্রচলিত ছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায়। সুলতান খসরু পারভোজের বাইজান্তাইন স্ত্রী শীরিন ইরাণ-শাহাজাদীদের মধ্যে পোলো খেলার ঢেউ তোলেন—সে আজ প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা। কথিত আছে তাঁর সঙ্গে প্রায় ৭০ জন ইরাণী বীরাঙ্গনা যোগদান করতেন।

ইউরোপে বহুদিন পূর্ব্বে ইরাণ হতে গ্রীস ও তুরস্কে প্রথম পোলো খেলার রেওয়াজ ঘটে। দ্বাদশ শতাব্দীতে গ্রীক্ সম্রাট ইমানুয়েল ও বাইজান্তাইন রাজপরিবারের এবং অভিজাতবংশের স্ত্রী ও পুরুষগণ পোলো খেলতেন—তার পরিচয় পাওয়া যায় ইতিহাসে। তুরস্কেও কিছুদিনের জন্য মাত্র যোদ্ধা এবং রাজপুরুষেরা পোলো খেলতেন; কিন্তু উভয় স্থানে পোলো সে রকম ছড়িয়ে পড়েনি। সে সময় ইউরোপের অন্য দেশেও পোলো খেলার বিস্তার হয়নি। অধিকন্তু গ্রীস ও তুরস্কে ক্রমশঃ ইহা লোপ পেতে থাকে।

রয়েল হাসারের পূর্ব্বে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদের মধ্যে প্রথম জেনারেল সোরাব চৌগান খেলা শিক্ষা করেন এবং তিনিই কল্‌কাতায় প্রথম পোলো ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন; সেখানে মণিপুরীদের সঙ্গে কলকাতায় প্রথম পোলো ম্যাচ খেলা হয়। বাস্তবিক পক্ষে মণিপুরীরাই রয়েল হাসারকে ঠিকমত খেলার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে যায়।

আয়র্লণ্ডের জাতীয় খেলা হকি। পোলো যখন ইংলণ্ডে প্রবেশ করল তখন এরা এই খেলাকে ঘোড়ায় চড়ে হকি খেলার মতই অভ্যাস করতে থাকে। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে পোলো সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন খেলা—মূলতঃ এই খেলা থেকেই হকি, ক্রিকেট, গল্‌ফ্ প্রভৃতি খেলার উৎপত্তি।

রয়েল হাসারের দ্বারা পোলোর সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে পোলো খেলা নেশা দাঁড়িয়ে গেল। ইংলণ্ড বরাবরই অশ্বারোহণে অভ্যস্ত এবং খেলাধূলায় ব্যয় করতে তারা কুণ্ঠিত নয়। বছর দু'য়ের মধ্যেই লণ্ডনের নিকটে টেম্‌স্ নদীর ধারে হার্লিংহাম্ এষ্টেটে মস্ত এক পোলার আড্ডা জমে উঠ্‌ল। যুবরাজ সপ্তম এডওয়ার্ড হলেন হার্লিংটন ক্লাবের পাণ্ডা। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে অ্যাল্ডারশটে দশম হাসারের সঙ্গে নবম ল্যান্সারের ম্যাচ্ হয়। তারপর থেকেই ইংলণ্ডে এবং ক্রমশঃ সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকায় পোলো ক্লাব গঠিত হয়ে পোলো খেলা পুরাদমে চলতে আরম্ভ হল।



ষোড়শ শতাব্দীর পারস্যে অঙ্কিত পোলো খেলা

জার্ম্মানী অবশ্য একটু দেরীতে পোলো খেলা গ্রহণ করে—এখানে প্রথম পোলো ক্লাব—হাম্বুর্গ-পোলো ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় মাত্র ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে; এর পূর্ব্বে ইউরোপ আমেরিকায় সর্ব্বত্রই পোলো খেলার যথেষ্ট রেওয়াজ সুরু হয়ে গেছে। লণ্ডনে ১৯১২ খৃষ্টাব্দের অলিম্পিকে পোলো খেলা প্রথম হয়। পোলোর উৎসাহ আমেরিকাতে যেন একটু বেশী রকমের। আমেরিকায় আন্তর্জ্জাতিক পোলো

ম্যাচে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে Indian Polo Association একটি দল পাঠান—তাতে জয়পুরের মহারাজা অধিনায়ক ছিলেন। এঁরা প্রতীচ্যের বহু দলকে পরাজিত করে বিশেষ সম্মান-লাভ করে ফিরে আসেন।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে বিদেশী দল ভিন্ন জয়পুর, যোধপুর, কাশ্মীর, রুটলাম, রেওয়া, মণিপুর প্রভৃতি করদরাজ্যে পোলোর চর্চ্চা বিশেষ হয়ে থাকে। জয়পুর মহারাজার দল সর্ব্বাপেক্ষা ভাল দল। এজরা কাপ্ ও কারমাইকেল কাপ প্রতিযোগিতায় এই সমস্ত রাজন্যবর্গের দলের পোলো ক্রীড়ার কৃতিত্ব কলিকাতায় দৃষ্ট হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই প্রাচীন বীরোচিত খেলা দেখতে বাঙ্গালী দর্শক অতি অল্পই যান।

ভীরু বাঙ্গালী কোনদিনই অশ্বারোহণে পটু নয়। পোলো খেলায় যে-রকম সাহস, বীরত্ব ও অশ্বারোহণে পারদর্শিতার প্রয়োজন তা আমাদের নেই। ইহা পুরাদস্তুর military game—ইহাতে অর্থব্যয় যথেষ্ট হয়।

বড়বাড়ীর বারোমাস ও চন্ননের একদিন

শ্রীকমল সরকার বি-এ

আকাশ ভাল করে পরিষ্কার হবার আগেই চন্নন ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। তাদের ঘরের দাবায় আর পুকুর-পাড়ের নুয়ে-পড়া গাছের কোলে তখনও অন্ধকার জমাট্ বেঁধে রয়েছে। আরও খানিকক্ষণ বিছানার কোল আঁকড়ে শুয়ে থাকলেও কারও কিছু বলবার ছিল না—কেন না বাড়ীর কেউই তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। কিন্তু রান্নাঘরের দাবায় চন্ননদের হাঁসগুলো এমন প্যাঁক্ প্যাঁক্ আরম্ভ করেছে যে শুয়ে থাকা আর চলে না।

ঘাটে নেমে চন্নন মুখে চোখে জলের ঝাপ্‌টা দিলে। ঘুমন্ত পুকুরের জল সামান্য একটু ন'ড়েই আবার স্থির হয়ে এল—যেন সারারাত গভীর ঘুমের পর গা-হাত পা মোড়া দিয়ে পুনর্ব্বার ঘুমের আয়োজন। এত কথা অবশ্য চন্ননের মনে হয়নি—শুধু পুকুরটাকে স্থির হয়ে যেতে দেখে তার ভারী খারাপ লাগল। পুকুরের জলে ছোট ছোট ঢেউ না উঠলে তার বিশ্রী লাগে। ঐ জন্য সে হাঁসগুলোকে কখনও পুকুরপাড়ে উঠে বসতে দেয় না। চন্নন জানে ওরা না থাকলে সারাদিন পুকুরকে জাগিয়ে রাখা দুরূহ ব্যাপার। মনে মনে দুষ্টবুদ্ধি এঁটে আপন-মনে ও বললে—দাঁড়াও, আমার হাঁসমণিদের একবার ছেড়ে দি—তখন বুঝবে মজা!

রান্নাঘরের দাবায় চন্নন উঠে এল। ঝুড়ির ভেতর তখন বিচিত্র কলরব—প্যাঁক্, প্যাঁক্, প্যাঁক্। মাগো, মাদী হাঁসগুলোর লজ্জা-সরম কিছু যদি থাকে! অতগুলো মদ্দা হাঁসের সামনে গলা বার করছে দেখ না! নিজস্ব খুসীতে ভরপুর হয়ে, হাঁসের ঝুড়ির ওপর ঝুঁকে পড়ে চন্নন বললে, কিন্তু যদি দেখি আজও ডিম পাড়নি, তাহলে সারাদিন আজ ঐ ঝুড়ির মধ্যেই থাকতে হবে।

চন্ননদের হাঁস ও তাদের পিতৃপুরুষদের অসীম সৌভাগ্য—ঝুড়ি তুলতে দু-দুটো ডিম পাওয়া গেল। মুক্তি পেয়ে মহানন্দে ওরা অদ্ভুত নড়বড়ে ভঙ্গীতে ছুটলো পুকুরের দিকে, আর চন্নন সেই দাবার খুঁটি ধরে হেসে উঠলো খিল্‌খিল্ করে—যেন কত বড় মজাই না হয়েছে—আর অস্ফুটস্বরে বললে, বাবাঃ—কি ওদের চলার ভঙ্গী! যেন একদল মোটা আর খোঁড়া লোককে একটা ষাঁড় তাড়া করেছে!

চন্ননের ঠাকুমা প্রায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের লোক। অখ্যাত, অবজ্ঞাত, সামান্য লোক না হলে এতদিনে তার শতবার্ষিক জন্মোৎসবের আয়োজন চলতো। ঠাকুমার মাথার চুল বেটাছেলেদের মতন ছোট করে' কাটা এবং মাথার ওপর ঘোম্‌টা দেবার প্রথা ঠাকুমা যে কবে থেকে বর্জ্জন করেছে চন্ননের অন্ততঃ তা মনে পড়ে না। গল্পের মধ্যে হঠাৎ এ-হেন বৃদ্ধার আবির্ভাব আমার কাছেই হোক্, আর পাঠক-পাঠিকার কাছেই হোক্—প্রীতিপ্রদ নয়। কিন্তু

কি করবো, চন্ননের ঠাক্‌মা ইতিমধ্যে দুর্গানাম করতে করতে দাবায় এসে দাঁড়িয়েছে।

—হ্যাঁরে চন্ন্‌নী, এই ভোর সকালবেলা হঠাৎ এত হাসির ধুম কেন শুনি? হাঁসগুলো ছেড়েছিস্?

—হ্যাঁ ঠাক্‌মা, ঐ দেখ না একবার ওদের কাণ্ডটা—

বৃদ্ধার স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো—আমার আর কাণ্ড দেখে কাজ নেই—তুমিই দেখ বাছা। বলি, গোল-ঘরটা খোলা হয়েছে, না আমার অপেক্ষায় পড়ে আছে? গাই-দোয়া আর কোন্ বেলায় হবে?

মুখখানা দুষ্টু দুষ্টু করে চন্নন বললে, বা রে—আমি আগে গোলঘর খুললে তুমি যে বকো!

দন্তমার্জ্জনার জন্য পোড়া তামাকের গুল খানিকটা মুখে পোরায় ঠাক্‌মার ধমকটা তেমন জোর হ'ল না—নাত্‌নীর দিকে ফিরে শুধু বললে—যা, যা, ঘটি আর তেলের বাটি নিয়ে গোল খুলগে যা, আমি মুখ ধুয়ে যাচ্ছি।······

গাঁয়ের লম্বা লম্বা তাল নারকেলের গাছের মাথায় ততক্ষণে সকাল ফুটে উঠেছে। শোনা যাচ্ছে বাছুরের ডাক, নবীন চাষীর বাড়ী ঢেঁকির শব্দ, আর পথে ঘাটে দু' একটা ছেলে-মেয়ের খুসীর আওয়াজ। চন্ননদের বাড়ীরও সবাই প্রায় জেগে উঠলো একে একে। মাঝের ঘরে শিবুর কাসির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, অতুলকেও এইমাত্র ঘর থেকে বেরিয়ে ঘাটের দিকে যেতে দেখা গেল। নাঃ, আর দাঁড়িয়ে থাকবার উপায় নেই। সংসারের অসংখ্য খুঁটিনাটি কাজ পড়ে রয়েছে। গাই-দুইবার যোগাড়-যন্ত্র করে দিয়ে ত্রস্তপদে চন্নন রান্নাঘরে ঢুকলো। উন্নুনটা এখনি ধরাতে হবে—বাবা উঠেই তামাক চাইবে; আর চন্নন জানে যে সকাল-বেলায় একছিলিম তামাক না হলে সারাদিনটা শিবুর বিশ্রী কাটে।

কিন্তু এই উন্নুন ধরানোটা চন্ননের কাছে এক মহা-বিরক্তিকর ব্যাপার। আধা-শুক্‌নো ডালপালা কতকগুলো যোগাড় হ'ল, তার ওপর খানিকটা কেরোসিন তেল সিঞ্চন ও অগ্নিপ্রয়োগও হ'ল, কিন্তু পোড়া উন্নুন কিছুতেই ধরতে চায় না। ফুঁ দিতে দিতে চন্ননের মুখ চোখ লাল হ'ল, কপালে ঘাম উঠল ফুটে এবং শেষকালে ও রেগেমেগে—করলে কি জানেন—কোথা থেকে এক ঘটি জল এনে ঢেলে দিলে উন্নুনের ওপর হুড়হুড় করে'; আর তারপর জলের ঘটিটা এক পাশে লুকিয়ে রেখে একান্ত সহজ গলায় ডাক দিলে—

—ও ঠাক্‌মা, কাল বুঝি ডালপালাগুলো বাইরে পড়েছিল—শিশিরে ভিজে একেবারে জাব হয়ে' গিয়েছে। তুমি একবার এসো না ঠাক্‌মা—উন্নুনটা কিছুতে ধরাতে পাচ্ছি না।

উঠোনে গরু-সেবায় রত ঠাক্‌মা নাত্‌নীর আহ্বানে গজ্‌গজ্ করে' উঠলো—'যে কাজ আমি না দেখবো, তাতেই গণ্ডগোল'; 'গেরস্থ ঘরের মেয়ে উন্নুন ধরাতে শিখলি না' প্রভৃতি পাঁচ মিনিটব্যাপী অর্দ্ধ-স্বগত উক্তি।

কিন্তু গজ্‌গজ্‌ই করুক, আর যাই করুক, সামান্য উন্নুন-ধরানোর অপেক্ষায় ঠাক্‌মা যে সংসারের কাজ আট্‌কে রাখবে না, একথা চন্নন ভাল ক'রেই জানে। আর তা ছাড়া চন্ননকে ঠাক্‌মা সত্যি সত্যি স্নেহ করে। তার মুখের কর্কশতা অনেকটা অভ্যাসের ফল—আর অনেকটা সময় কাটাবার উপায়। অনেক কাজেই চন্ননকে ঠাক্‌মা হাত দিতে দেয় না, কেন না বয়স হ'লেও বৃদ্ধার স্বাস্থ্য অটুট, আর তার বিশ্বাস যে সংসারের যে কোনও ভারী কাজ গুছিয়ে করবার ক্ষমতা একমাত্র তারই আছে।······

কল্‌কেটায় আগুন দিয়ে শিবুর ঘরের দিকে আসতে আসতেই চন্নন শুনতে পেলে, দাদা ডাকছে—আজ কি আমায় কাজে বেরুতে হবে না চন্নন? মুড়ি-টুড়ি যাহোক্ দে দুটি গামছায় বেঁধে।

ঐ দেখ, অতুল যে আজ রায়েদের বাড়ী যাবে তা ও বেমালুম ভুলে বসে' রয়েছে! বাপের হাতে হুঁকো-কল্‌কে তুলে দিয়ে ও বললে—তুমি ততক্ষণ দেখ জলটল ঠিক আছে কিনা, আমি চট্ করে' দাদার জলখাবারটা দিয়ে আসি।

কিন্তু শিবুর ঘরের বাইরে আস্‌তেই ওর কাণে গেল ঠাক্‌মার গলা—'উন্নুনটা কামাই যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি কাপড় কেচে এসে দুধটা বসিয়ে দে। আর ঘাটে যাবার সময়ে এই বাসনগুলো অম্‌নি হাতে করে নিয়ে যাস্।

কুলঙ্গী থেকে চন্নন মুড়ির টিন পাড়ছে, এমন সময় তৃতীয় ডাক—'কল্‌কেটা পাল্‌টে দে মা চন্নন, একেবারে ধরেনি,' এবং তার পরমুহূর্ত্তেই চতুর্থ ডাক—'হারাণের মা কুলোখানা চাইতে এসেছে—দিয়ে যা চন্নন।'

রেগেমেগে মুড়ির টিনটা ধপাস্ করে মাটিতে ফেলে ও

ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো—পারিনে বাপু একসঙ্গে অত ফরমাস খাটতে। এই রইলো তোমাদের সংসারের কাজ পড়ে; একটা লোক দু'হাতে ক'দিক সামলাবে!—বলে' গুম্ হয়ে বসে রইল দাবার ওপর।……

কিন্তু মিনিট পাঁচ সাত পরে কেউ যদি চন্নদের বাড়ীর মধ্যে উঁকি মারতো, তাহ'লে দেখতে পেত যে অতুল মুড়ি চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে যাচ্ছে, ঘরের দাবা শিবুর তামাকের ধোঁয়ায় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, হারাণের মা কুলো নিয়ে এতক্ষণে ধান ঝাড়তে বসে গেছে, আর চন্নন নিজে এক হাতে গামছা আর এক হাতে বাসনের পাঁজা নিয়ে চলেছে পুকুরঘাটে।····

সকালের কাজকর্ম্ম সারা হয়ে যাবার পর চন্ননের একটা কাজ শুধু বাকী রইল—রায়েদের পুকুর থেকে জল আনা। চন্নন এবার সেইদিকেই যাবে এবং এই অবসরে আমরা রায়-বাড়ীর কথা কিছু বলে নিই।

চন্ননরা যে গ্রামে থাকে সে গ্রামে রায়েদের মত বড় আর সুন্দর পুকুর আর কোথাও নেই। পুকুরটা যেম্নি গভীর, তেম্নি পরিষ্কার তার জল। আশপাশের সমস্ত গ্রামের কত মেয়ে কত কলসী জল যে এই পুকুর থেকে রোজ নিয়ে যায় তার আর ইয়ত্তা নেই।

রায়েরা এ অঞ্চলের জমিদার। গ্রাম থেকে বেরুলেই ওদের গাছে-ঘেরা প্রকাণ্ড সাদা বাড়ীটা চোখে পড়ে। বছর দুয়েক হ'ল বাড়ীর কর্ত্তা মারা গেছেন—তাঁর বিধবা পত্নী ও সাবালক তিনটি ছেলের ওপরেই এখন জমিদারীর সমস্ত ভার। মেজ ছেলেটির সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে—বৌটি এইখানেই থাকে।

রায়েদের বাড়ীর সবাই বেশ ভাল লোক। গিন্নীমা অত্যন্ত সদাশয়া এবং কোমলহৃদয়া। বিপদে-আপদে এ অঞ্চলের অনেক লোক তাঁর কাছ থেকে সাহায্য পায়। ছেলে তিনটির প্রত্যেকেই বিদ্বান এবং সামাজিক ব্যাপারেও এঁদের যথেষ্ট নাম ও প্রতিপত্তি আছে। কিন্তু তবু এবাড়ীতে সব সময় যেন একটা বেসুরো আওয়াজ জেগে থাকে। এর কারণ কি তা অনেক চেষ্টা ক'রেও বয়োবৃদ্ধা গিন্নীমা ও তাঁর শিক্ষিত ছেলেরা আবিষ্কার করতে পারেন না। দোষ কারুরই নেই, কিম্বা যৎসামান্য—অথচ মনো-মালিন্য, কথা কাটাকাটি ও কথাবন্ধ হচ্ছে—এ ব্যাপার এ সংসারে লেগেই আছে।

এখন এই রায়েদের বাড়ীতে চন্নন দু' একদিন যাওয়া-আসা করেছে। গিন্নীমা ওকে ভারী স্নেহ করেন। যখন ইচ্ছে চন্নন ঢুকে পড়তে পারে ওবাড়ীর অন্দর-মহলে, এ অনুমতি তাকে দেওয়া আছে। কিন্তু তাহলেও এবাড়ী সম্বন্ধে চন্ননের কৌতূহল অনেকটা ভয়মিশ্রিত। এ বাড়ীর সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক জীবনযাত্রার ধারা চন্ননের কাছে অনেকটা ভোর-রাতের স্বপ্নের মত—অনেকটা ভয়-জাগানো আনন্দের মত। বড়বাড়ীর থামের কাছ পর্য্যন্ত সে বিস্ময়ের উত্তেজনায় এগিয়ে আসে, কিন্তু অন্দর মহলের কাছাকাছি এলেই তার বিস্ময়ের কুঁড়ি কুঁকড়ে আসতে থাকে। বড়বাড়ীর জীবন যেন তাদের জীবন নয়, এম্নি একটা অস্পষ্ট ভাবের ছায়া তার মনে দোলে।

প্রথম যেদিন চন্নন বড়বাড়ীতে ঢোকে, সেদিন এ বাড়ীর ইট কাঠ আর মানুষগুলো তার মনে এক অদ্ভুত স্বপ্নের জাল বুনেছিল। কেমন চমৎকার ওদের হাওয়া খেলানো ঘরগুলো! আর গিন্নীমা সস্নেহে কত কথাই না তাকে জিজ্ঞাসা করলেন! আর ওদের বাড়ীর বৌটি—তারই সমবয়সী—ঘুরে বেড়াচ্ছিল একটা গাঢ় নীল শাড়ী পরে। সেদিন ঐরকম একটা শাড়ী পরবার ইচ্ছে চন্ননের মনের গোপনতম কোণ থেকে উঁকি মেরেছিল। অবশ্য সে ইচ্ছে এতই অস্পষ্ট, যে চন্নন নিজেই তার কথা ভাল করে' ভাবতে পারে না।

কিন্তু এর পর সে যেকবার ও-বাড়ীতে গিয়েছে, ততবারই একটা জিনিস লক্ষ্য করে আশ্চর্য্য হয়েছে। এ বাড়ীতে কখনও সে খুসীর আভাস দেখতে পায়নি। অধিকাংশ সময়েই বাড়ীটা গভীর নৈঃশব্দের মধ্যে ডুবে থাকে। নেহাৎ বাইরে থেকে কোনও লোকজন না এলে ওখানে জীবনের সাড়া মেলে না। অথচ এদের কত-কিই যে আছে! আর কিছু নয়—শুধু এদের মত একটা পুকুর যদি চন্ননদের থাকতো—উঃ, চন্নন সে কথা শুধু ভাবতে গিয়েই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।



Bharatvarsha Halftone & Printing Works

এতক্ষণে চন্নন রায়েদের পুকুরধারে এসে পৌচেছে। পুকুর না বলে একে দীঘিও বলা চলে। জলে ছোট ছোট ঢেউ—যা চন্ননের এত প্রিয়। আর সেই চারকোণা দীঘির চার পাড়ে সারবন্দী সুপুরি গাছ—জলের বুকে তাদের ছায়ার জাল ধরা পড়েছে। খুব অল্প সময়ের জন্য চন্নন একেবারে চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল।

কলসী ভরে জল নিয়ে বাড়ীর দিকে পা বাড়াতে গিয়ে চন্নন হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। বড়বাড়ীতে কাদের উঁচু গলা পাওয়া যাচ্ছে না?—

ঘাট থেকে বড়বাড়ীর মধ্যে কেউ কথা কইলে প্রায় স্পষ্টই শোনা যায়। চন্নন যেন গিন্নীমার গলা শুনতে পেলে—

—আজকের দিনটা থেকে যা না বাপু। তুই থাকলে আমাদের মনটাও ভাল হয়, আর তোরও একদিন বাড়ীতে থাকা হয়। সারামাস তো পড়ে থাকিস্ কোথায় কোন্ হোষ্টেল, মেসে!

—কিন্তু ক'লকাতায় আমার কাজ রয়েছে সে কথা শুনছ না কেন? ল' ক্লাশ রয়েছে, টিউশানি একটা নতুন পেয়েছি - এখন শুধু শুধু কামাই করে লাভ কি হবে?

গিন্নীমার ছোট ছেলের উত্তর এ'ল।

—তাহোক্, আজকে আর তুই যাসনি—একদিন কামাই করলে কি আর এমন এসে যাবে?

—আজ আমায় যেতেই হবে, একেই তো অসুখে-বিসুখে অনেক কামাই হয়ে' গেছে।......

আরও দু' একটা কি কথাবার্ত্তা হ'ল চন্নন ভাল শুনতে পেলে না। খানিকক্ষণ সে দাঁড়ালো, কিন্তু বড় বাড়ীর মধ্যে হঠাৎ একেবারে চুপ্‌চাপ হয়ে গেল।

* * * *

সেই পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে চন্ননের হঠাৎ মনে হ'ল, তাদের খড়ের ছাউনী ঘর বড়বাড়ীর চেয়ে ভাল—একদিন যে সে বড়বাড়ীর বৌয়ের মত শাড়ী পরতে চেয়েছিল, তা ভেবে ওর হাসি এল। বড়বাড়ীর বৌয়ের নীলাম্বরীর চাইতে তার বিয়ের সময়কার সেই চওড়া লালপাড় শাড়ীটায় তাকে আরও ভাল মানায়। আর বিয়ের কথা মনে হ'তেই যৌবনের অজানা খুসীতে মুখর হয়ে উঠে চন্নন আঁচলটা ভাল করে' কোমরে জড়িয়ে নিলে; তারপর কলসীটা কাঁখে তুলে দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে এগিয়ে চললো।

বাংলার সত্য পরিচয়

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

বাংলার একটি বিশিষ্ট রূপ আছে। এই বৈশিষ্ট্য তাহার নদনদীর যৌবনতায়, পাহাড়পর্ব্বতের বিরাটত্বে, গান-গীতির সহজ ও সরলতায়, বনজঙ্গলের গভীরতার মধ্যেই পরিস্ফুট। বঙ্গশ্রীর এই আবহাওয়ার মধ্যে গড়ে-ওঠা বাঙ্গালী, বহিরাগত পরদেশী সভ্যতার চাপে পড়িয়া আজ সেই স্বাধীন অনুপ্রেরণার মূল উৎস ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছে। যাহাতে বাংলার এই বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে পুনরায় আমাদের যোগসূত্র স্থাপিত হয় তাহা আত্মবিস্মৃত ও অবসাদগ্রস্ত বাঙ্গালীমাত্রেরই করা একান্ত কর্ত্তব্য। আজ রবীন্দ্রনাথের নিকট গিয়া তাহার 'গীতাঞ্জলী' যেমন আমরা স্তব্ধ হইয়া শুনিব ঠিক সেই উৎসাহে বাংলার জল-হাওয়ায় বর্দ্ধিত অশীতিপর রবীন্দ্রনাথের নিকট আমাদের শুনিতে হইবে—তাঁহার মা বোনেরা আমাদের মঙ্গল কামনায় কি বলিয়া সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাইতেন, সুখদুঃখ জড়িত গ্রামের দিনগুলি তাঁহার কিরূপভাবে কাটিয়াছে। বাংলার এই মণীষীদের নিকট হইতে ঠাকুমাদের নিকট হইতে—যাহাদের এই সহজ সুরে সুর মিলাইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল—তাহাদের প্রত্যেকটি কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার দিন আসিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধে প্রথমে বাংলার সুসন্তান শ্রীগুরুসদয় দত্তের বিভিন্ন লেখা হইতে এইরূপ একটি তালিকা প্রস্তুত করিলাম। আশা করি এই সব প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় বাংলার জাতীয় সম্পদ রূপেই প্রত্যেকের নিকট আদৃত হইবে।

"জীবনে আমি অনেক সৌভাগ্যই পেয়েছি কিন্তু

বাংলার সুদূর কোণের এক নিভৃত পল্লীর কোলে যে আমার জন্ম হয়েছিল এবং আমার শৈশবকাল সেই পল্লীর কোলে অতিবাহিত হয়েছিল ইহা তার মধ্যে একটি প্রধান সৌভাগ্য বলে মনে করি। আর সেই পল্লীবাংলার চল্লিশোর্দ্ধ বছরের এক সুদূর নিভৃত কোণের পল্লী ছিল বলেই বাংলার আদত খাঁটি পল্লীজীবন যে কি মধুময় ছিল, নিজের



বাংলার ব্রতনৃত্য

সৌন্দর্য্যের দিক দিয়েও সেই পল্লী ছিল আদর্শ স্থানীয়। সেও আমার জীবনের আর একটি সৌভাগ্য। গ্রামের এক পাশ দিয়ে কুশিয়ারা নদী সুগভীর ও সুপ্রশস্ত ধারায় বারোমাস বয়ে চলেছে। শৈশবের অদম্য দুরন্তপনায় বিপদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নদীর সেই তরঙ্গায়িত স্রোতের উপর জেলেদের নৌকা চালাতাম। এখন বুঝতে পারছি জীবনে যা কিছু সাহস সঞ্চয় করতে পেরেছি তা বিশেষভাবে সেই নদীর তরঙ্গায়িত বক্ষে শৈশবে নৌকা চালনার খেলায় অর্জ্জন করে রেখেছিলাম। তা খালি নদীতে নয়, আমাদের বাড়ীর সামনেই দিগন্তব্যাপী বিস্তৃত তেপান্তরের মাঠ ছিল। বর্ষাকালে সেই প্রকাণ্ড মাঠটি জলে ভরে গিয়ে এক সমুদ্রের দৃশ্য ধারণ করত। কলা গাছের ভেলা বানিয়ে ছেলের দলের সর্দ্দার হয়ে ভেলায় চড়ে সেই তরঙ্গায়িত সমুদ্রের মত



বাংলার বীর সন্তান রায়বেঁশে

শৈশব জীবনে ব্যক্তিগতভাবে সে অভিজ্ঞতা লাভ করার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। প্রাকৃতিক প্রশস্ত বিলের উপর এবং সেই খরপ্রবাহিনী খালের উপর কতই না জলখেলা করেছি। আর তার থেকে

মনে যে সাহসের বীজ বপন হয়েছিল তা এতদিন পরে বুঝতে পারছি।

"বর্ষার শেষে মাঠ থেকে জল যেত সরে; আর খেলার ধূম পড়ত ধান চাষের ভূঁয়ে। আমরা হাডুডুডু খেলতাম্; গুলিডাণ্ডা খেলতাম; আবার ন্যাকড়া দিয়ে বল তৈরী করে সুবিস্তৃত মাঠের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত "থাব্ড়ি" খেলতাম। জীবনে স্বাস্থ্যের এবং শারীরিক শক্তির সম্পদ যা পেয়েছি তার কতটুকু সেই মাঠের খোলা হাওয়ায় মুক্ত খেলায় অর্জ্জিত তা বলা দুঃসাধ্য; আমার ত মনে হয় তার মূল ভিত্তি ঐখানেই গঠিত হয়েছিল। সেখানে যদি সে ভিত্তি সুগঠিত না হত তা হলে মনে হয় জীবনে যে অল্পটুকু এগিয়েছি সে-টুকুও এগুতে পারতাম না।



ব্রতচারীর ইষ্ট-আভাষণ



ফরিদপুরের চড়ক গন্তী

"ছেলেবেলায় আমি যথেচ্ছভাবে যেখানে সেখানে যেতে অথবা যা কিছু করতে কখনো যে কোন বাধা পাই নাই, এটুকু আমার বেশ মনে আছে। কি করতে যে আমার ঝোঁক ছিল সেটা আমার বেশ পরিষ্কার মনে আছে—তার সঙ্গে জড়িত ছিল আমাদের বাড়ীতে পালিত দুধের গাই ও ৪।৫টি চাষের বলদ, গ্রামের নমঃশূদ্র ও যুগী জাতীয় রাখাল বালকের দল, মাঠের গরুর পাল ও দুই তিন মাইল দূরে ঘাসে-ভরা ধূ-ধূ করা একটা প্রকাণ্ড 'হাওর'। তার নাম ছিল 'হিস্যার হাওর'। গ্রামের নমঃশূদ্র ও মুসলমান জাতীয় রাখালেরা আমাদের বাড়ীর গাই বলদ ও অন্যান্য গরুর পাল নিয়ে রোজ ভোরে যেত সেই "হিস্যার হাওরে", আর সেই গরুর পাল নিয়ে ফিরে আসত সন্ধ্যেবেলায় গোধূলির সময়ে। আমি প্রায়ই তাদের সঙ্গে সেই হাওরে চলে যেতাম এবং তাদের সঙ্গে সমস্ত সকালটা বা বিকালটা সেইখানেই খেলা করে বেড়াতাম। দিনের বেলা চরাতাম গরু, আর সন্ধ্যাবেলায় বাবার সামনে বসে মার কাছ থেকে রামায়ণ মহাভারত পড়া শুনতাম ও পড়তাম।

"আমার শৈশবের সেই পল্লীর কোলে কত কি অফুরন্ত সম্পদ ছিল, যার অজস্র দান আমার জীবনে আমি পেয়েছি তা বলে শেষ করা অসম্ভব। দুঃখ যে ছিল না

তা নয়; মৃত্যুশোক শৈশবে নিজের পরিবারে পেয়েছি এবং অন্য পরিবারকেও পেতে দেখেছি। এমন কি কখনো কখনো দুপুর রাতে প্রতিবাসীদের চীৎকারে জেগে উঠেছি এবং দেখেছি কারও কুঁড়ে ঘরে আগুন লাগার ভীষণ মর্ম্মভেদী দৃশ্য। কিন্তু এগুলা ছিল ক্ষণিকের কষ্ট।



যশোহরের ঢালি নৃত্য



ব্রতচারীর রায়-বেঁশে নৃত্য শিক্ষা

দুঃখ কষ্ট ব্যাধি ছিল ক্ষণিকের, স্বাস্থ্য সমৃদ্ধি ও আনন্দ ছিল পল্লীজীবনের স্বাভাবিক ভাব ও অবস্থা। ক্ষণিকের রোগের উপদ্রব অথবা ক্ষণিকের বিপদের ভার পল্লীর জীবনের সেই স্বাভাবিক আনন্দের ভাবকে কখনও দমাতে পারে নাই। অবশ্য তার মূলে ছিল সকলের বাড়ীতে অন্ন-সংস্থানের প্রাচুর্য্য—গোলাভরা ধান, একে অন্যের সঙ্গে সহযোগ—আর ছিল সহরের জিনিষের সঙ্গে সংস্রবের অভাব। গ্রামের উৎপন্ন জিনিষেই গ্রামের লোকের অভাব ও প্রয়োজন মিলে যেত। নদীতে বিলে মাছের ছড়াছড়ি ছিল; বাড়ীতে বাড়ীতে দুগ্ধবতী গাইয়ের যত্ন করতেন গৃহিণীরা নিজে; গ্রামের জমিদার-পরিবারেও এই নিয়ম ছিল। কাপড়ের অভাব ছিল না। গ্রামের এক পাড়ায় অজস্র তাঁতিদের বাস; তারাই কাপড় যোগাড় করত।

"আর এই প্রাচুর্য্য-জাত আনন্দের স্ফুরণ হত বার মাসের তের পার্ব্বণে, তাতে যোগ দিতেন হিন্দুমুসলমান-নির্ব্বিশেষে সকলেই। মুসলমান এবং হিন্দুদের এমনি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল যে পরস্পরের সঙ্গে আমাদের চাচা, মামু ইত্যাদি সম্বন্ধ পাতানো ছিল; পূজোতে বিয়েতে মুসলমানরা এসে পাতে বসে খেতেন।

"আনন্দের একটা বিশেষ স্ফুরণের ধারা ছিল গানের ভিতর দিয়ে। আমার শৈশবের সেই পল্লী-জীবনের আনন্দের ধারা যে কি সর্ব্বব্যাপী, কি গভীর, কি সহজ, কি নির্ম্মল ছিল—তা ভেবে এখনও আশ্চর্য্য হই। পৃথিবীতে কত দেশ ঘুরলাম, তাদের মধ্যে সঙ্গীতের ধারায় আনন্দের স্ফুরণ অনেক জায়গায়ই দেখেছি; কিন্তু আমার সেই শৈশবের পল্লী-জীবন ছিল যেরূপ নির্ম্মল নৃত্য-গীতে ভরা, সেরূপ কোথাও দেখিনি। সকালে ঘুম ভাঙ্গত কৃষ্ণলীলার ঘুম-ভাঙ্গাবার গানের সুর শুনে; দুপুর বেলা মাঠে রাখালদের সঙ্গে খেলা করতাম—তারা নেচে নেচে রাখালী গান

করত—আমি ছিলাম তাদের জমিদারের ছেলে, কিন্তু অসঙ্কোচে সহজভাবে তাদেরই মতন একজন হ'য়ে তাদের সঙ্গে মিলে-মিশে গেয়েছি নেচেছি। সন্ধ্যে বেলায় যখন মাঠ থেকে বাড়ী ফিরেছি—তখনো যে চারদিক থেকে



মৈমনসিংহের জারি নৃত্য

গানের সুর উঠেছে তার সঙ্গে সঙ্গে। তাছাড়া প্রায়ই গ্রামে বাউলের গান হ'ত; গেরুয়া পরে বাউলের সাজ সেজে "গৌর সিংহ নাচ রে নদীয়ায়—কি শোনা যায়" ইত্যাদি গান গেয়ে বাউলের দলে মিশে গিয়ে নির্ম্মল ভাবে কত নেচেছি। তাঁরা (আমার বাবা ও জ্যেঠামশায়) কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নমঃশূদ্র, যুগী প্রভৃতি জাতীয় প্রজাদের সঙ্গে মিশে গেয়েছেন নেচেছেন। আর কীর্ত্তন যখন বিশেষ করে জমেছে, তখন কীর্ত্তনের মণ্ডলীর বৃত্তের মাঝখানের মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে সাধারণের পায়ের ধূলি গায়ে মেখে তাঁরা ভেবেছেন—ভগবানের পদধূলি গায়ে মাখলেন। আমিও তাঁদের অনুকরণে কীর্ত্তনে নেচেছি এবং মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে জাতি-নির্ব্বিশেষে সাধারণের পায়ের ধূলি গায়ে মেখে তাকে ভগবানের স্পর্শ বলে' বরণ করে নিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছি।

আমি ছেলেবেলায় দেখেছি আমার মা-বোনেরা ও ভদ্র সমাজের অন্যান্য মেয়েরা বিবাহ উৎসব উপলক্ষে গ্রামের সকল শ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে মিশিয়া নির্ম্মল প্রণালীর নৃত্য-গীত করিতেন। পূর্ব্ববঙ্গের বিবাহ ব্যাপার বাংলার পল্লীজীবনের প্রচলিত একটি উৎকৃষ্ট রসকলার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পূর্ব্বে এই বিবাহ উৎসবে কোন জাতিভেদাভেদ ছিল না। নিম্নশ্রেণীর ও উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা সকলেই এক সঙ্গে এই বিবাহ উৎসবে নৃত্যগীত করিতেন।—("পূর্ব্ববঙ্গের বিবাহ-উৎসবের নৃত্যগীত" বঙ্গলক্ষ্মী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০)। আমার ছেলেবেলায় যে-বাংলাদেশকে আমি দেখেছিলাম সে-বাংলায় ধনী-দরিদ্র জমিদার-প্রজা সকল পুরুষই ছেলে বয়স থেকে ষাট্‌ সত্তর বয়স পর্য্যন্ত বাউল, কীর্ত্তন, জারী গেয়ে



গুরুসদয়ের রায়-বেঁশে নৃত্য

সহজভাবে নাচতো; ও সকল জাতির মেয়েরাই ষাট সত্তর বয়স পর্য্যন্ত, পর্ব্ব উপলক্ষে সহজ ও নির্ম্মলভাবে একসঙ্গে মিলিত হয়ে গ্রামে গ্রামে সমষ্টি-নৃত্য করতো।" গুরুসদয়ের

বাল্য-জীবনের কথার কিয়দংশ উপরে দেওয়া হইল। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি যাহা দেখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"ময়মনসিংহে এসে শুনলাম বাউলদের মধ্যে সুন্দর গান। বিশেষ ক'রে মুগ্ধ হ'লাম সেখানকার পল্লীবাসী মুসলমান কৃষকদের সুন্দর জারীর গান ও নাচে। ত্রিশ চল্লিশ জন মিলে একসঙ্গে তারা নাচছে—একসুরে গান, এক তালে



শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত

নাচ—নাচের কি বিচিত্র পদবিক্ষেপ, অঙ্গ-বিন্যাস তাতে সকলের সমতান গতির ফলে কি একটা একতার ভাব জেগে উঠেছে, অথচ সেই নাচে লেশমাত্রও কুৎসিত ভাব নাই।"

বীরভূমে আসিবার পর রায়-বেঁশের পুনরাবিষ্কার করিয়া এবং বাংলায় পল্লীমেয়েদের শিল্প-প্রতিভার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া গুরুসদয় লিখিয়াছেন—

"দেখিলাম বহুযুগের অবজ্ঞা ও দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে ইহাদের আর্থিক অবস্থা অবনতির গভীরতম স্তরে আসিয়া পড়িয়াছে এবং যুগের পর যুগ বৎসরের পর বৎসর অনশনে থাকিতে হয় বলিয়া ইহাদের শারীরিক তেজস্বিতা ও শক্তির মাত্রা এত অভাবনীয়ভাবে হ্রাস পাইয়াছে যে ইহাদের প্রাচীন যুগের তেজস্বিতা ও শক্তির শতাংশের একাংশও বজায় আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অবনতির গভীরতম গহ্বরে নিপতিত বাংলার নির্য্যাতিত এই বীরের দলের বীরোচিত মূর্ত্তির, তেজস্বিতার, অসম-সাহসিকতার, অনির্ব্বচনীয় নির্ভীকতার ও বিপদে ভ্রূক্ষেপহীনতার যে শতাংশের একাংশ আজিও অবশিষ্ট আছে তাহা আজকালকার বাংলার পুরুষকারবিহীন শিক্ষিত ভদ্রসমাজের প্রাণে এখনও যে ভীতি সঞ্চার করিয়া দেয় ইহা বীরভূমের পূর্ব্বাঞ্চলের লোকের কাছে অবিদিত নাই। ইহাদের (বীর-সন্তান রায়-বেঁশে) অনিন্দ্যসুন্দর বীরোচিত নৃত্যকলা ও অসাধারণ সামরিক ব্যায়াম-ক্রীড়া দেখিলে ইহারা যে কেবল নামে নয়, প্রকৃতি-পরম্পরায়ও সহস্র বর্ষাধিক পূর্ব্বের বাঙ্গালী "রায়-বেঁশে" যোদ্ধা বীরদিগের বংশধর, তাহাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।



গুরুসদয় ও দুইজন পটুয়া

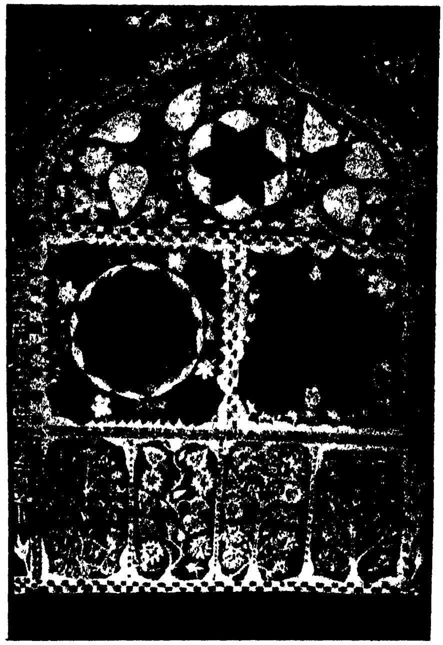
"বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের সীমান্ত প্রদেশে রামনগর ও সাহোড়া গ্রামে বেড়াতে গিয়ে দূর থেকেই একটি আধভাঙ্গা খড়ের চালওয়ালা কুটীর নজরে পড়ল। আশে পাশে আরও অনেক বাড়ীই ছিল, তার মধ্যে এই জীর্ণ-চাল কুটীরটি যে আমার নজরে পড়ল তার কারণ কুটীরের মাটির

দেওয়ালে উজ্জ্বল নীল, হলদে, সাদা ও সবুজ রঙে আঁকা দুটী পদ্ম ফুল; এই দুইটী পদ্মের রেখা ও রঙের অসাধারণ সৌন্দর্য্যসমাবেশের সম্পদে কুটীরটি এমনই একটি গৌরবময় রূপ পেয়েছিল, যে কুটীরটিকে লক্ষ্য না করে' থাকা অসম্ভব ছিল। কুটীরের দরজার পাশে খড়ের চালের অল্প নীচে এই দুইটী পদ্ম আঁকা ছিল। নজরে পড়েছিল আমার অনেক দূর থেকেই এবং সেই দূর থেকেই আমাকে এই পদ্ম দুটির সৌন্দর্য্য যেন চুম্বক পাথরের মত আকর্ষণ করে সেই কুটীরের দোরে নিয়ে গেল। যা দেখলাম তাতে অবাক হ'য়ে গেলাম। ম্যালেরিয়া ও দারিদ্র্য-পীড়িত বাংলা দেশের এক অজ্ঞাত কোণে যে পল্লী-রাণীর স্বভাবজাত সৌন্দর্য্য-রস সৃষ্টির এত ছড়াছড়ি থাকতে পারে, তা পূর্ব্বে কখনও কল্পনাও করিনি। গ্রামের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ডাইনে বাঁয়ে যেদিকে চাওয়া যায় সে-দিকেই প্রত্যেক বাড়ীর দেওয়ালে অনুপম সৌন্দর্য্যময় রঙ্গীন রূপাবলী নজরে পড়ে। কি সুরঞ্জিত বর্ণ-সমাবেশ, কি অপূর্ব্ব কৌশলময় রেখাবিন্যাস। সবই গ্রামের মেয়েদের



পটুয়া—চিত্রাঙ্কনে রত

হাতের কাজ। সহুরে শিল্পীদের মত রঙের বাহুল্যের ব্যবহার নাই, অতি অল্প কয়েকটী প্রাথমিক রঙের সহজ অথচ উজ্জ্বল সমাবেশ। কি অনুপম ছন্দোবদ্ধ রেখা-বিন্যাস, কোথাও এতটুকু ভুল-ত্রুটি নাই। অথচ প্রত্যেক চিত্রেই কেমন একটা অনির্ব্বচনীয় সরলতা ও মাধুর্য্য-রস মাখা রয়েছে। দেয়ালে রঙীন প্রাচীর-চিত্র আঁকার এই যে প্রথা, এটা মাটিতে পিড়িতে আলপনা আঁকার প্রথা হ'তে অনেকটা পৃথক্; কারণ আলপনা সাধারণতঃ আঁকা হয় চালের পিঠুলি দিয়া এবং মেয়েরা হাতের আঙ্গুল দিয়া

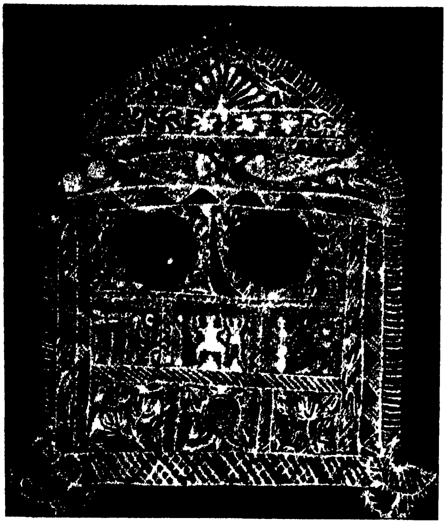


আল্পনা

সেই পিঠুলি নানাপ্রকার নমুনায় এঁকে থাকেন, তাতে কোন তুলির দরকার হয় না। কিন্তু এই প্রাচীর-চিত্র আঁকার প্রথা অন্যরূপ। এতে তুলি ব্যবহার করতে হয় এবং এতে কয়েকটি প্রাথমিক রঙের অর্থাৎ কাল, সাদা, সবুজ, লাল, নীল, হলুদ ইত্যাদির ব্যবহার হয়। মাটির দেওয়ালে নানা রঙের পরিকল্পনা বড়ই সুন্দর দেখায় এবং গ্রামটিকে যেন একটা নন্দনলোক অথবা একটা জীবন্ত অজন্তার মত করে তোলে। এই সাহোড়া গ্রামটীর ঘরে ঘরে প্রাচীর-চিত্রের সৌন্দর্য্য আমার বাস্তবিকই এক একটী জীবন্ত অজন্তা বলে মনে হয়েছিল।"

পশ্চিম বাংলার পটুয়াদের অনুপম শিল্প-প্রতিভার আবিষ্কার করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—"বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহারা এই সকল পট বাড়ীতে বাড়ীতে দেখাইয়া এবং তৎসঙ্গে রামলীলাপটের, কৃষ্ণলীলাপটের, শক্তিপটের ও

যমপটের কাহিনী স্বরচিত গীতি-কবিতায় সহজ ও সরলভাবে বিবৃত করিয়া এবং সুললিত সুরে তাহা আবৃত্তি করিয়া গাহিয়া গাহিয়া বিস্তর রোজগার করিয়া বেড়াইত। সম্প্রতি আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার ও শহুরে শিক্ষার প্রভাব-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার চাহিদা এবং ইহার গুণগ্রাহিতা



আল্পনা

বাংলার গ্রাম হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনুপম শিল্পকলা-নিপুণ এই গ্রাম্য পটুয়াদেব অন্নসংস্থান হওয়াও দায় হইয়া পড়িয়াছে। চাহিদার অভাবে বাধ্য হইয়া ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোককেই পট আঁকা ও পট দেখান ব্যবসা ছাড়িয়া জনমজুরের ব্যবসা গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইহা ছাড়া ভারত-ইতিহাসের ও বাংলার ইতিহাসের প্রহেলিকাময় আবর্ত্তনে হিন্দুর শিল্পশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন এই সুনিপুণ চিত্রকরগণ এখনও হিন্দুদের পূজার জন্য দেব-দেবীর ছবি আঁকার ও মাটির প্রতিমা গড়িবার কাজ করায় ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও হিন্দু সমাজের গণ্ডী হইতে বিতাড়িত হইয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে এবং এই দুই ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সীমান্ত প্রদেশে অনশনে ও অর্দ্ধাশনে অতি দুর্ভাগ্যময় ও দীনতাময় জীবন যাপন করিতেছে।

"সামাজিক নিদারুণ নিপীড়ন সত্ত্বেও ইহারা ইহাদের যে পুরুষানুক্রমিক রসকলা-সম্পদ সযত্নে চর্চ্চা ও বহন করিয়া আনিয়া বর্ত্তমান বাংলাকে দান করিয়াছে তাহা অমূল্য ও অতুলনীয় এবং জগতের রসকলার আসরে ইহা যে একটি শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিবে তাহা নিঃসন্দেহ। ইহাও নিঃসন্দেহ যে ইহাদের রসকলা পদ্ধতি অতি-প্রাচীন ভারতের প্রাগবৌদ্ধযুগের আদিম রসকলা-পদ্ধতির অবিকল প্রবাহিত বিশুদ্ধ পরম্পরার অভ্রষ্ট ও অপরিবর্ত্তিত রূপ-ধারা। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সেই অতি-প্রাচীন প্রাগ্‌বৌদ্ধ-যুগের চিত্রকলা-পরম্পরা তাহার আদিম ধারার বিশুদ্ধতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু বাংলার প্রতিভা যে সেই অসাধ্য-সাধনে সমর্থ হইয়াছে, বাংলার দীন-দুঃখী পটুয়াগণের চিত্রকলা তাহার জীবন্ত প্রমাণ।"

এই ভাবে গুরুসদয় বাংলার কত পটুয়ার পট, পুঁথির পাটা, দেয়ালের গায়ে ছবি আঁকা, রঙিন মাটির পুতুল, কাঠের পুতুল, সোণার কাজ, মূর্ত্তি, কাঁথা, শিকে, বাউল, ভাটিয়াল, জারি, ঝুমুর গান, রায়-বেঁশে, কাঠি, ঢালী, ব্রতনৃত্য ও মেয়েলী ছড়া সংগ্রহে অগণিত বাঙ্গালী নরনারীর মধ্যে তাঁহার জীবনের এই দুই তৃতীয়াংশ সময় কাটাইয়া দিয়া আসিয়াছেন। বাংলার প্রকৃত রূপকে চিনিতে হইলে তাহা



পটুয়া অঙ্কিত একখানি জড়ানো পট

দেশবাসী আমাদের এখন বিশেষ করিয়া জানিবার সময় আসিয়াছে। সম্প্রতি তিনি ব্রতচারীর আদর্শের মধ্য দিয়া দেশবাসীকে বলিয়াছেন,—

"প্রত্যেক বাঙ্গালীর সামনে এই ব্রতের আদর্শ ব্রতচারী

চায় ধরে দিতে। এই ব্রত পালন করতে হ'লে আমাদের প্রত্যেককে সোণার বাংলার বৈশিষ্ট্য-ধারাকে খুঁজে তাকে আপন আপন জীবনে আবার প্রবাহিত করতে হবে, বুক ফুলিয়ে আবার পূর্ণ বাঙ্গালী হতে হবে এবং প্রত্যেক বাঙ্গালীকে সেই পূর্ণ আদর্শের পথে চালিত করবার জন্য সাহায্য করতে হবে, বাঙ্গালী বলে আমাদের নিজকে অনুভব করতে হবে। বাঙ্গালীর সঙ্গে বাঙ্গালীর পরস্পর অভিভাষণে সোণার বাংলার জয়-যাত্রার এই অনুপ্রেরণাময় অনুভূতি আমাদের প্রতিনিয়ত অন্তরে জাগ্রত করে রাখতে হবে। বাঙ্গালী নরনারীর সঙ্গে বাঙ্গালীর দেখা হলে বুক ফুলিয়ে সগর্ব্বে উচ্চকণ্ঠে বলতে হবে—অভিভাষণ করতে হবে—জয় সোণার বাংলার—'জ-সো-বা'।" (বাংলার শক্তি—কার্ত্তিক)

এইরূপভাবে বাঙ্গালী জীবনের যে খাঁটি ও সত্যরূপ গুরুসদয় নিজের জীবনে উপলব্ধি করিয়া ব্রতচারীর বাণী দেশবাসীকে দিতে উদ্যত হইয়াছেন তাহা জাতি এখনও না গ্রহণ করিলে দুঃখের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই।

গুরুসদয় উপরোক্ত বাংলা সভ্যতার সমগ্র রূপকেই এক কথায় বলিয়াছেন "জয় সোণার বাংলার"—(সংক্ষেপে) 'জ—সো—বা'। বঙ্গলক্ষ্মী, আশ্বিন, জ্যৈষ্ঠ, অগ্রহায়ণ ১৩৪০, শ্রাবণ ১৩৩৮-৩৯ এবং প্রবাসী বৈশাখ ১৩৩৯ সংখ্যায় প্রকাশিত গুরুসদয়ের নিজস্ব লেখা স্মৃতিকথা হইতে উদ্ধৃত অংশ গ্রহণ করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধের চিত্রগুলি শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত এবং তাঁহার সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

ভীষণ

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

যে আগ্নেয় গিরি
গেছে মরি বহুদিন, তুমি ঘুরি ফিরি'
আঁধার গহ্বরপ্রান্তে ঝুঁকি,
কৌতূহল ভরে মার উঁকি,
বসিয়া অকুতোভয়ে নতমুখে শুধাও তাহারে
বারে বারে,
—কে আছ অতলস্পর্শে? প্রতিধ্বনি জাগে হাহাকারে
অথবা আকুল হর্ষে, ভাষা তার কে বুঝিতে পারে?

প্রেত আত্মা তার
আছে কি অমর হয়ে গুহার মাঝার?
ধ্যান মৌন তুরীয় অনল
ভস্মাসনে বসি অবিরল
মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র জপিছে কি তিমির গহনে
অবচনে?
ছিল যে নীরবে তারে প্লুত রবে সম্বোধন করি'
পুনরুজ্জীবিতে চাও লীলাভরে শঙ্কা পরিহরি'?

যদি কাকোদর
জলদর্চ্চি তনু ধরি দেয় প্রত্যুত্তর
লেলিহান্ বহ্নি ফণা তুলি?
নির্ব্বাণের নিস্পন্দতা ভুলি'
সহসা উল্লম্ফি, ওঠে উর্দ্ধশিরে ত্যজিয়া কন্দর?
তার পর
কুণ্ডলিত শতপাকে তোমারে জড়ায় ধূম্রজালে,
তখন কি রক্ষা পাবে উর্দ্ধশ্বাসে সন্ত্রাসে পলালে?

প্রাসঙ্গিকী

কংগ্রেস—

গত বড়দিনের ছুটীতে ভারতের নানাস্থানে বহু সভা, সমিতি ও সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই যুগে সংঘ গঠনের দ্বারাই শক্তি সঞ্চয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে; কাজেই সে দিক দিয়া এই সকল সভা সমিতির প্রয়োজনও আছে। সকল সভা সমিতির মধ্যে কংগ্রেসের অধিবেশনের কথাই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেস ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠান। গত ৫০ বৎসর ধরিয়া ইহার অধিবেশন চলিতেছে। ইহাতে জাতির শুধু অভাব-অভিযোগের কথাই আলোচিত হয় না—জাতির মুক্তি-সাধনার ইহা প্রতীকরূপেই বিবেচিত হইয়া থাকে।

কয়েকটি দিক দিয়া এবারকার কংগ্রেসের বিশেষত্ব দেখা গিয়াছে। গত ৫০ বৎসর কাল শুধু সহরেই কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছে। পল্লীগ্রাম—যেখানে ভারতের অধিকাংশ লোক বাস করে—সকল প্রকার সুবিধা লাভের অভাব হইবে বলিয়াই কোন গ্রামে কংগ্রেসের অধিবেশনের কথা এতদিন পর্য্যন্ত কেহ চিন্তা করেন নাই। এখন লোকের মন ক্রমে গ্রাম-মুখী হইতেছে। গ্রামগুলি যাহাতে পুনরায় শ্রীসম্পন্ন হয়, সে জন্য সকলের মধ্যেই চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে। সেই জন্যই এবার মহারাষ্ট্রের একটি গ্রামে কংগ্রেসের অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কংগ্রেসের নেতারা প্রায় সকলেই সহর-বাসী, গ্রামের সহিত তাঁহাদের পরিচয় থাকিলেও গ্রামে বাস করা তাঁহাদের পক্ষে প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। কংগ্রেসের কয়দিন—প্রায় এক সপ্তাহ কাল—সকলকেই 'ফৈজপুর' গ্রামে বাস করিতে হইয়াছিল। ইহা দ্বারা আর কিছু লাভ হউক আর না হউক—সহরবাসীরা গ্রামে বাস করিয়া গ্রামের প্রকৃত অবস্থার সহিত পরিচিত হইয়াছেন এবং গ্রামের সম্যক পরিচয় লাভ করিয়াছেন।

বাঙ্গালীর পক্ষে এই ফৈজপুর কংগ্রেসে একটি আশার রেখা দৃষ্ট হইয়াছিল। শ্রীযুত মানবেন্দ্রনাথ রায় বিপ্লববাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ভারত ত্যাগ করিতে হইয়াছিল এবং তিনি বহু বৎসর যাবৎ পৃথিবীর নানাদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। কয় বৎসর পূর্ব্বে তিনি



সভাপতি—পণ্ডিত জহরলাল নেহরু

ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাঁহাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কংগ্রেসের অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি মুক্তি-

লাভ করেন এবং ফৈজপুর কংগ্রেসে যোগদান করেন। তিনি পণ্ডিত জহরলালের সহিত একই ভাবের ভাবুক। তাঁহার উপস্থিতিতে এবার কংগ্রেসে এক নবজাগরণের সূচনা দেখা গিয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেসকে জনগণের প্রতিনিধিস্থানীয় বলা হইলেও প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ শ্রেণীর লোক দ্বারাই কংগ্রেস পরিচালিত হইয়াছে। এবার যে নূতন কার্য্যপদ্ধতি গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে দেশের কৃষক ও শ্রমিকগণের সহিত কংগ্রেসের সংযোগ ঘটিবে এবং এই কার্য্যের জন্য শ্রীযুত মানবেন্দ্রনাথের চেষ্টা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর হইতে কংগ্রেসে বাঙ্গালীর প্রভাব প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল—মানবেন্দ্রনাথ সেই প্রভাব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাঙ্গালীমাত্রেরই ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। আগামী কংগ্রেসের অধিবেশনের এখনও বহু বিলম্ব থাকিলেও এ কথা বলা যায় যে যদি মানবেন্দ্রনাথের কার্য্যব্যবস্থা কোন প্রকার বাধাপ্রাপ্ত না হয় এবং তিনি সোৎসাহে এই ব্যবস্থানুসারে কার্য্যপরিচালনে সমর্থ হন, তাহা হইলে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে দেশবাসী তাঁহাকেই কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিবেন।

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ—

সুদীর্ঘ ২২ বৎসর কাল আমেরিকায় নির্ব্বাসিত থাকার পর গত ২৪শে ডিসেম্বর শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ভারতে



শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ঘটনাচক্রে যে সকল ভারতবাসীকে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইয়াছিল শৈলেন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম। তৎপূর্ব্বে তিনি এদেশে অধ্যাপকের কার্য্য করিতেন। বিদেশে যাইয়া তিনি স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা দ্বারা সর্ব্বত্র সম্মানের পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন এবং ভারতের বাহিরে থাকিয়াও ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি বহু বর্ষ আমেরিকায় বাস করিয়াছেন—তথায় এক মহিলাকে বিবাহ করিয়াছেন ও তাঁহার দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কন্যাদ্বয় ও পত্নীকে তিনি সঙ্গে লইয়া দেশে ফিরিয়াছেন। স্বদেশে বাস করিয়া দেশ ও দেশবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করাই তিনি তাঁহার জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

সার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন—

সার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ভারতের খ্যাতনামা দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন-শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন এবং বর্ত্তমানে অক্সফোর্ডে যাইয়া অধ্যাপনা করিতেছেন। লণ্ডনে প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রগণের বার্ষিক সভায় সম্প্রতি সার সর্ব্বপল্লীকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। তিনি ছাত্রদের বিশেষ প্রিয় এবং এখনও নিজেকে ছাত্র বলিয়াই মনে করেন; কাজেই তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া ছাত্রগণ ভারতের মনীষার প্রতি উপযুক্ত সম্মানই প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু সভায় সার সর্ব্বপল্লী যাহা বলিয়াছেন তাহা সকলের প্রণিধানযোগ্য। সম্রাট এডওয়ার্ড রাজ্য ত্যাগ করায় বিলাতে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল সে সম্বন্ধে বিলাতের গভর্ণমেণ্ট সকল উপনিবেশের অভিমত গ্রহণ করিলেও ভারতের অভিমত গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। ভারত যে পরাধীন—তাহা সার সর্ব্বপল্লী প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রগণকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবার জন্যই এই কথা বলিয়াছিলেন; বিলাতের ছাত্র-সমাজ যদি তাঁহার কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করেন—তবেই দার্শনিক পণ্ডিতের এই রাজনীতিক উপদেশ সার্থক হইবে।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন—

গত ১২ই পৌষ রবিবার হইতে কয়েক দিন ছোট-নাগপুরের রাঁচী সহরে জেলা স্কুলের বিরাট সভা-গৃহে প্রবাসী

বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভারম্ভে অভ্যর্থনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত কালীচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মূল-সভাপতি ও উপস্থিত বিভাগীয় সভাপতিদিগকে মাল্যদান করিয়া সকলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করেন এবং মহিলা বিভাগের সম্পাদিকা কুমারী শান্তশীলা রায় শ্রীযুক্ত অনুরূপা দেবীকে



প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের রাঁচী অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির কর্ম্মপরিচালকগণ

বামদিক হইতে (দণ্ডায়মান) শ্রীলালমোহন ধর চৌধুরী, শ্রীনলিনীকুমার চৌধুরী, শ্রীতারকনাথ ঘোষ, শ্রীনারায়ণ গুপ্ত,
(যুগ্ম সম্পাদক) (সহকারী সম্পাদক) (কোষাধ্যক্ষ) (সম্পাদক, প্রচার বিভাগ)
শ্রীশশিভূষণ ঘোষ, শ্রীফণীন্দ্রনাথ আয়কত, শ্রীকালীশরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণকালী বন্দ্যোপাধ্যায়
(সম্পাদক, সাহিত্য বিভাগ) (সম্পাদক, সভামণ্ডপ বিভাগ) (সাধারণ সম্পাদক) (সম্পাদক, স্বেচ্ছাসেবক বিভাগ).
(উপবিষ্ট) শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীমধুসূদন সরকার, শ্রীঅবনীমোহন বন্দ্যো, রায়বাহাদুর শ্রীশরৎচন্দ্র রায়
(সম্পাদক, প্রদর্শনী বিভাগ) (সহঃ সম্পাদক, প্রদর্শনী বিভাগ) (সহকারী সম্পাদক) (সভাপতি, অভ্যর্থনা সমিতি)
শ্রীশান্তশীলা রায় রায়বাহাদুর শ্রীপ্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনন্দকুমার ঘোষ
(সম্পাদিকা, মহিলা বিভাগ) (সহকারী সভাপতি) (সহকারী সভাপতি)

মাল্যদান করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি প্রবীণ সাহিত্যিক রায়বাহাদুর শ্রীযুত শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিলে পর মূল-সভাপতি রায়বাহাদুর ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র শুধু মূল-সভাপতি ছিলেন না—তিনি সাহিত্য শাখারও সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন—কাজেই তাঁহাকে দুইটি স্বতন্ত্র অভিভাষণ পাঠ করিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয় অভিভাষণে তিনি শুধু সাহিত্যের কথাই আলোচনা করিয়াছিলেন। পারিবারিক দুর্ঘটনার জন্য দীনেশচন্দ্রকে প্রথম দিনের কার্য্য শেষ করিয়াই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল—সে জন্য তিনি অভিভাষণদ্বয় পাঠের পর শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর মূল-সভাপতির কার্য্যভার অর্পণ করিয়া প্রথম দিনেই রাঁচী ত্যাগ করেন।

স্থানীয় ইউনিয়ন ক্লাব রঙ্গমঞ্চে তিন দিনই নানারূপ

আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং ভারতের নানাস্থান হইতে আগত সাহিত্যিকগণকে আদর অভ্যর্থনার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল।



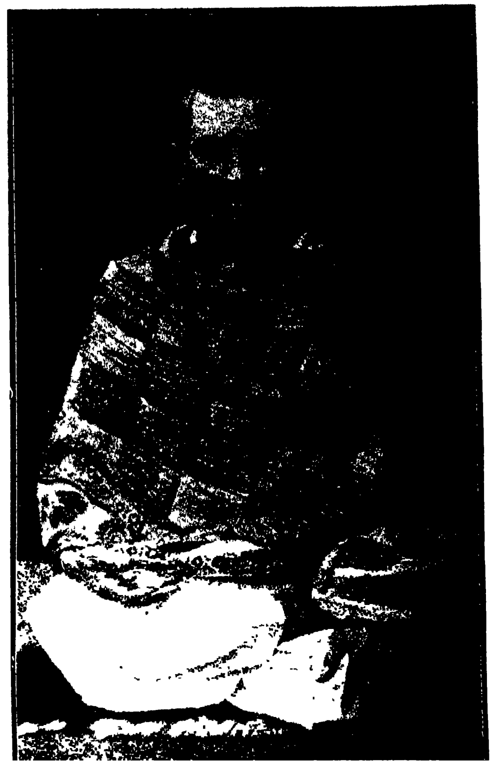
রায় বাহাদুর ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন—

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বিংশ অধিবেশন আগামী ৯ই, ১০ই ও ১১ই ফাল্গুন চন্দননগরে হইবে। ১৩৩৬ অব্দে এই সম্মেলনের উনবিংশ অধিবেশন কলিকাতা ভবানীপুরে হইয়াছিল। তাহার পর নানা কারণে এই সাত বৎসর সম্মেলনের অধিবেশন হয় নাই; সাহিত্য-সুহৃদ শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় এবার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সিতিকণ্ঠ বাচস্পতি—

নদীয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতচূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সিতিকণ্ঠ বাচস্পতি মহাশয় গত ২৩শে অগ্রহায়ণ স্বধামে প্রয়াণ করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছি। সন ১২৭৫ সালে নবদ্বীপে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—পণ্ডিত ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণি; চূড়ামণি মহাশয় ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ২২ বৎসর বয়সে সিতিকণ্ঠ নবদ্বীপের বিদ্বৎমণ্ডলী কর্ত্তৃক বাচস্পতি উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। ২৫ বৎসর বয়সে তিনি বর্দ্ধমান রাজচতুষ্পাঠীর স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ৪৩ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হইলেন। কলিকাতায় তিনি প্রায় সকল হরিসভাতেই বক্তৃতা করিতেন এবং অতি অল্পকালের মধ্যে সুবক্তা বলিয়া তাঁহার নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ৫৩ বৎসর বয়সে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রদানের দ্বারা সম্মানিত করিলেন এবং ৫৫ বৎসর বয়সে বাচস্পতি মহাশয় সরকারী কার্য্য



মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সিতিকণ্ঠ বাচস্পতি

হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তাহার পর গত ১৪ বৎসর কাল তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কার্য্য করিতেছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত তিনি "শ্যাম ও শ্যামার একত্ব" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মপ্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন—

এবার বড়দিনের ছুটীতে রেঙ্গুনে নিখিল ব্রহ্মপ্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন সম্পাদিত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রেঙ্গুনে সভাপতিত্ব করিতে গমন করিয়াছিলেন। আগামী ১লা এপ্রিল হইতে বিলাতী গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশানুসারে ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে পৃথক করা হইবে এবং ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙ্গালীদের সহিত ভারতবাসী বাঙ্গালীদের এতদিন যে রাজনীতিক ঐক্য ছিল তাহা অন্তর্হিত হইবে। ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙ্গালীদের সহিত বাঙ্গালা দেশের সম্পর্ক স্থায়ী করিয়া রাখিবার জন্যই ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙ্গালীরা এই বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন আরম্ভ করিলেন। সুনীতিবাবু শুধু সম্মিলনের সভাপতিত্ব করিয়াই ফিরিয়া



শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

আসেন নাই—তিনি ব্রহ্মের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া ব্রহ্মের কৃষ্টির সহিত পরিচিত হইয়া আসিয়াছেন। সুনীতিবাবু তাঁহার অভিভাষণে যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য; তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া দেশ যদি আজ তদনুসারে কার্য্য করিতে পারে, তবেই এই সঙ্কট সময়ে দেশ রক্ষা পাইবে। সুনীতিবাবু বলিয়াছেন—"এই বিংশ শতকে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ ও তদনন্তর পশ্চিমের কতকগুলি ভ্রান্তিকর ঘটনা ইউরোপে যে একটা ওলট পালট করিয়াছিল তাহার প্রভাব ভারতে ও বিশেষ করিয়া বাঙ্গালায় আসিল। বিজ্ঞানের এবং বিজ্ঞানের প্রসাদে নব নব যন্ত্রপাতির আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এখন শতগুণ শক্তিতে ইউরোপের বহুমুখী, শক্তিশালী ও বিশ্বগ্রাসী সভ্যতার প্রচণ্ড আঘাত আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র গ্রামীন সমাজের উপরে আসিয়া পড়িতেছে। স্বাধীন জাতি এবং দৈহিক ও মানসিক বলে উগ্র ও প্রচণ্ড জাতি হইলে এই আঘাত বা আক্রমণে আমাদের ক্ষতি করিতে পারিত না। আমাদের বাঁচিতে হইলে এই আক্রমণে পরাভব স্বীকার না করিয়া বিনা বিচারে সর্ব্ব বিষয়ে স্বাধীন ও শক্তিশালী ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ হইতে আমাদের আত্মরক্ষা করিতে হইবে; কিন্তু হায়, আমাদের বিচার, আমাদের দূরদৃষ্টি, আমাদের শক্তি কোথায়? আমাদের মধ্যে এমন সর্ব্বত্যাগী নেতা কোথায়, যিনি আমাদের ক্ষীয়মান আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তিকে তাঁহার নেতৃত্বের বজ্রনির্ঘোষ বাণী দ্বারা সঞ্জীবিত করিতে পারেন? কোথায় আমাদের স্থির আদর্শ, আমাদের ধ্রুব লক্ষ্য, যাহাকে আশ্রয় করিয়া সংহত হইয়া আমরা আত্মরক্ষার জন্য দাঁড়াইতে পারি? আমাদের এই বিক্ষিপ্ত অবস্থায়—যখন কঠোর নীতি-নিষ্ঠ আদর্শবাদকে ত্যাগ করিয়া নীতিহীন সুবিধাবাদকে জীবনে প্রধান নীতিরূপে আমরা প্রতিষ্ঠিত করিতেছি—যখন আমরা ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনা দ্বারা আমাদের দুঃখকে ভুলিতে চাহিতেছি, উত্তেজনা না পাইলে জোর করিয়া চক্ষু কর্ণ বুজিয়া আমাদের চারিদিকের বহু হৃদয়বিদারক দৃশ্য এবং রুদ্ধকণ্ঠে রোদনকে আমরা অস্বীকার করিতে চাহিতেছি—এরূপ অবস্থায় এখন আর কি প্রকারের সাহিত্য বাঙ্গালীর নিকট প্রত্যাশা করা যায়?"

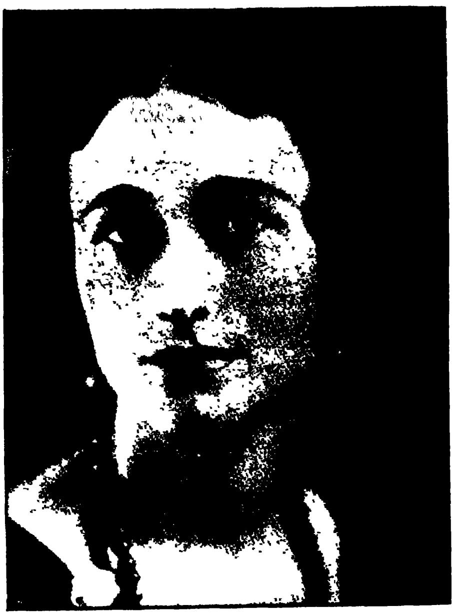
মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা—

ইউরোপে যে শীঘ্রই আবার মহাযুদ্ধের আরম্ভ হইবে, তাহার সম্ভাবনা চারিদিকে ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। গত কয়মাস যাবৎ স্পেনে যে অন্তর্বিপ্লব চলিতেছে, তাহা ক্রমে আন্তর্জাতিক যুদ্ধে পরিণত হইতেছে। সমগ্র ইউরোপে ফ্যাসিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট দুইটি দল বেশ শক্তিশালী হইয়াছে এবং এক দল অপর দলকে গ্রাস করিবার জন্য সর্ব্বদাই উৎসুক হইয়া আছে। স্পেনের অন্তর্বিপ্লবের মধ্যেও ঐ দুই দলেরই খেলা দেখা গিয়াছে। সেজন্য কিছুদিন পূর্ব্বে ইউরোপের জাতিসমূহ এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া স্থির

করিয়াছিলেন যে তাঁহারা স্পেনের যুদ্ধে কোন পক্ষকেই সমর্থন করিবেন না। কিন্তু কেহই শেষ পর্য্যন্ত সেই চুক্তি-পত্রের সর্ত্ত মানিয়া চলিতেছেন না। জার্ম্মাণী, ইটালী, রাশিয়া, ফ্রান্স ও আয়র্লণ্ড—প্রত্যেক দেশ হইতেই স্পেনে স্বেচ্ছাসৈনিক প্রেরিত হইয়াছে। স্পেনের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া মনে হইতেছে—স্পেনেই ফ্যাসিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট দলের শক্তি পরীক্ষা আরম্ভ হইবে এবং ইউরোপের সকল দেশ কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন।

সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জের সিংহাসনারোহণ—

আমরা গত মাসেই সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ড কর্ত্তৃক সিংহাসনত্যাগের সংবাদ প্রকাশ করিয়াছি। গত ১০ই



মিস্ সিম্‌সন

ডিসেম্বর অষ্টম এডোয়ার্ড সিংহাসন ত্যাগ করিলে পর ১২ই ডিসেম্বর তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা ডিউক অফ ইয়র্ক "ষষ্ঠ জর্জ্জ" নাম গ্রহণ পূর্ব্বক ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। তিনি বিবাহিত, তাঁহার পত্নী রাণী এলিজাবেথও বৃটীশ সাম্রাজ্যের সাম্রাজ্ঞী ঘোষিত হইলেন। নূতন সম্রাটের পুত্র নাই—দুইটি কন্যা বর্ত্তমান। জ্যেষ্ঠা কন্যা এলিজাবেথই এখন বৃটীশ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ পরলোকগমন করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অষ্টম এডোয়ার্ড নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন—কিন্তু এক বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে বিধির বিধানে সিংহাসন ত্যাগ করিতে হইল। এই সিংহাসনত্যাগ বৃটীশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এক অভিনব ব্যাপার। অষ্টম এডোয়ার্ড যখন সিংহাসন লাভ করিলেন তখন তিনি অবিবাহিত। তিনি কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলার পাণিগ্রহণ করিলে উক্ত



সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ড

মহিলাই সাম্রাজ্ঞী-পদ লাভ করিতেন। কিন্তু সম্রাট সে পথ ত্যাগ করিয়া মিস সিম্‌সন্ নাম্নী এক মার্কিণ মহিলার পাণিগ্রহণে উদ্যত হইলেন। উক্ত মহিলা ইতিপূর্ব্বে দুইবার

বিবাহ করিয়া স্বামী ত্যাগ করিয়াছেন। বৃটীশ মন্ত্রি-সভা সম্রাটের ঐ বিবাহে আপত্তি করিলেন। বৃটীশ সাম্রাজ্য আইনের দ্বারা শাসিত—তথায় সম্রাটেরও স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ নাই। সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ড যখন এ বিষয়ে বৃটীশ মন্ত্রিসভার সহিত একমত হইতে অসমর্থ হইলেন, তখন তিনি বিশাল বৃটীশ সাম্রাজ্যের অধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিলেন। নূতন সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ তাঁহাকে 'ডিউক অফ উইণ্ডসর' উপাধি প্রদান করিয়াছেন—তিনি এখন সেই নামেই পরিচিত হইবেন।



নূতন সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ, তাঁহার পত্নী ও কন্যা

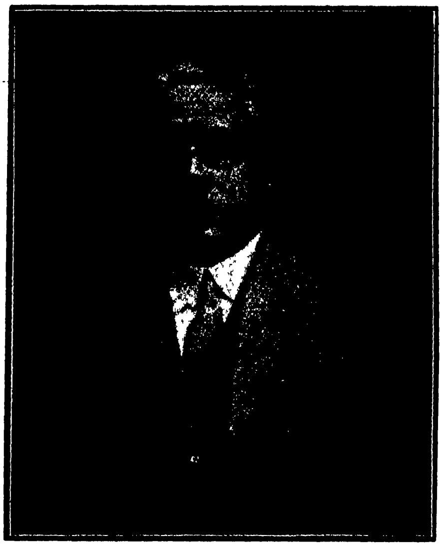
নূতন সম্রাট সিংহাসনারোহণের পরই ঘোষণা করিয়াছেন যে তিনি আগামী বৎসর (১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে) ভারত ভ্রমণে আগমন করিবেন ; সম্ভবতঃ আগামী ১লা জানুয়ারী তারিখেই দিল্লীতে তাঁহার মুকুটোৎসব সম্পাদিত হইবে এবং তাহার পর দুই মাসকাল তিনি ভারতের সকল প্রদেশে ঘুরিয়া ভারতবাসীদিগের সহিত পরিচিত হইবেন।

রেল ধর্ম্মঘট—

গত ১লা ডিসেম্বর হইতে বেঙ্গল নাগপুর রেলের সকল শ্রেণীর শ্রমিকদিগের মধ্যেই ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়াছে। ইহার ফলে ক্রমে ক্রমে উক্ত রেলে মাল প্রেরণ একরূপ বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইতিমধ্যেই লক্ষাধিক কর্ম্মী ধর্ম্মঘটে যোগদান করিয়াছে এবং ধর্ম্মঘট দিন দিন ছড়াইয়া পড়িতেছে। এযাবৎ যাত্রী চলাচল ঠিকই আছে। ধর্ম্মঘটের ফলে শুধু যে বি-এন-রেলের শ্রমিকদিগকে ও মালপ্রেরকদিগকে অসুবিধা বা কষ্টে পড়িতে হইয়াছে তাহা নহে, বহু জিনিসের আমদানী বা রপ্তানী বন্ধ হওয়ায় সেই সকল জিনিসের মূল্য অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যাইতেছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে বেকার লোকের সংখ্যা অল্প নহে—গত ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে বাণিজ্য-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের ফলে সাধারণ ভাবেই দেশে যে সঙ্কটময় অবস্থা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে চিন্তা করিলেই স্তম্ভিত হইতে হয়। তাহার উপর যদি এই ধর্ম্মঘটের ফলে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে অবস্থা যে আরও ভয়ঙ্কর হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। এজন্য আমরা ধর্ম্মঘটের শীঘ্র মিটমাট হওয়ার পক্ষপাতী।

ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক, খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হওয়ায় দেশবাসীমাত্রই গৌরবানুভব করিবেন সন্দেহ নাই। তিনি এত জনপ্রিয় যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকরী কমিটীতে মুসলমান সদস্যের সংখ্যাধিক্য থাকিলেও সেই কমিটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহাকেই ঐ পদের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। তিনিই



ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম হিন্দু ভাইস-চ্যান্সেলার। আমরা আশীর্ব্বাদ করি অধ্যাপক ও ঐতিহাসিক হিসাবে তিনি যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা তাঁহার ভাইস-চ্যান্সেলারের কার্য্যেও অটুট থাকিবে এবং তিনি সুদীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়া বাঙ্গালার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি বিধানে অবহিত থাকিবেন। ডাক্তার মজুমদারের এই সম্মান লাভে আমরা তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীযুত মহাদেব আঢ্যের সঙ্গীত-সাফল্য—

কলিকাতা চেৎলার খ্যাতনামা ব্যবসায়ী শ্রীযুত অমূল্যধন আঢ্যের পুত্র শ্রীমান মহাদেব আঢ্য এ বৎসর নিখিল ভারত-সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় ঠুংরীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি গত বৎসর নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতি-



শ্রীযুত মহাদেব আঢ্য

যোগিতাতেও বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মহাদেবের বয়স মাত্র ২২ বৎসর। আমরা তাঁহার সুদীর্ঘ গৌরবময় জীবন কামনা করি।

দীনেশচন্দ্রের পত্নীবিয়োগ—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক খ্যাতনামা সাহিত্যিক রায় বাহাদুর ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের



বিনোদিনী দেবী

পত্নী বিনোদিনী দেবী দীর্ঘকাল রোগভোগের পর গত ১১ই পৌষ প্রাতে ৬৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। মাত্র ৭ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল; তিনি ৬টি কৃতী পুত্র ও ৪টি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। দীনেশচন্দ্রের এই পরিণত বয়সে পত্নীবিয়োগে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই; আমরা দীনেশচন্দ্রে৲ ই গভীর শোকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পত্নীপ্রেমে আত্মহত্যা—

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক এক যুবক কলিকাতায় থাকিয়া সাংবাদিকের কার্য্য করিতেন। তাঁহার স্ত্রী দুইটি শিশুসন্তান লইয়া ফরিদপুরে এক গ্রামে বাস করিতেন। পতিপত্নীর মধ্যে বিবাদের ফলে তাঁহার পত্নী দুইটি শিশুকে বিষ দ্বারা হত্যা করিয়া নিজেও সঙ্গে সঙ্গে বিষপানে আত্মহত্যা করেন। কলিকাতায় ঐ সংবাদ পাইয়া বীরেন্দ্রনাথও গত ৭ই ডিসেম্বর বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছেন। বীরেন্দ্রনাথের পত্নী-প্রেম প্রশংসার যোগ্য হইতে পারে বটে, কিন্তু আত্মহত্যা যে মহাপাপ—তাহা যেন আজকাল লোক ভুলিয়া যাইতেছে। আত্মহত্যার সংখ্যা দিন দিন যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহা সমাজের পক্ষে শঙ্কাজনকই বলিতে হয়। আমাদের ধর্ম্মহীন শিক্ষাপদ্ধতিই কি ইহার একমাত্র কারণ নহে?

ব্যায়ামবিদ্ তারাচরণ মুখোপাধ্য —

আমাদের দেশে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শরীর-সাধনার কোন ব্যাপক চেষ্টা দেখা যায় না। বর্ত্তমানে অনেকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে। তাও হয়েছে জনকয়েক ব্যায়ামবিদের স্বাস্থ্য সাধনায় প্রাণ-ঢালা আদর্শের অনুপ্রেরণায়। তাঁদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে অসংখ্য তরুণ ও কিশোরের প্রাণহীন সুপ্তি নষ্ট হয়েছে। শরীর সাধনার আদর্শে তারা উদ্বুদ্ধ হয়েছে। যে ক'জন কুশলী ব্যায়ামবিদের আদর্শে দিকে দিকে প্রেরণা জেগেছে, তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত তারাচরণ মুখোপাধ্যায় (ওরফে 'চাঁদুবাবু')র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গবাসী কলেজ হোষ্টেলের প্রাঙ্গণে প্রত্যহ চাঁদুবাবুর অধিনায়কত্বে দেখা যায় কলেজের স্বাস্থ্যান্বেষী তরুণরা তাঁর প্রবর্ত্তিত বিশিষ্ট মতে বারবেল ব্যায়াম দ্বারা স্বাস্থ্য আর আনন্দলাভ করে দিনে দিনে নবজীবনের পুলক অনুভব করে। চাঁদুবাবু ছেলেবেলায় ছিলেন রুগ্ন। শক্ত অসুখে ছেলেবেলায় তাঁর শরীর একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল। ভগ্ন দেহ নিয়েই তাঁকে লেখাপড়া করতে হয়েছিল! এইভাবে যখন দিন কাটে, একদিনের এক রহস্যময় ঘটনায় তাঁর সারা চৈতন্যে একটা নতুন শিহরণ জাগিয়ে দিলে। তখন শীতকাল। তিনি এসেছিলেন কলকাতা গড়ের মাঠে সার্কাস দেখতে। হার্ম্মষ্টোন সার্কাস পার্টির খেলোয়াড়দের অপূর্ব্ব শরীর সঞ্চালন কৌশল তাদের সুঠাম স্বাস্থ্যপুষ্ট শরীরের অনবদ্য লাবণ্য বালক তারাচরণের মনে একটা নূতন জগতের ছবি এঁকে দেয়। সেদিন থেকে তিনি মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করলেন, নিয়মিত ব্যায়ামের দ্বারা শরীর গঠন করবেন। এই তাঁর শরীর-সাধনার সূচনা। ডিষ্ট্রিক্ট



ব্যায়ামবিদ তারাচরণ মুখোপাধ্যায়

জুনিয়ার কুস্তী প্রতিযোগিতায় পনেরো বছর বয়সে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। এখন শরীর সংক্রান্ত ক্রীড়াকৌশলে তাঁর সুনাম যথেষ্ট। ব্যায়াম বিষয়ে তাঁর একটী নিজের প্রবর্ত্তিত বিশিষ্ট ধারা আছে। এই তরুণ ব্যায়ামবিদের উদাহরণ সকলেরই অনুকরণীয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ের ব্যায়ামপদ্ধতির মধ্যে তিনি "বারবেল" ব্যায়ামই বেশী পছন্দ করেন। তাঁর মতে বারবেল ব্যায়ামে সত্বর শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পেশী এবং শিরা উপশিরার বিশেষ সঞ্চালন হয় এবং সমস্ত দিক দিয়েই শরীরের উন্নতি সম্ভব হয়।

আশার প্রদীপ

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্‌-এ

মহিম অফিসে গেলে সুমিত্রা ছেলেকে লইয়া শুইয়া পড়িল, আজ তাহার আহারনিদ্রা ঘরের কাজ কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। অতীত দিনের কত কথা কত ঘটনা তাহার মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিল। তাহার স্পষ্ট মনে পড়ে তিন বৎসরের পূর্ব্বের তাহাদের বিবাহের রাত্রি। মায়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেদিন তাহার পিতা মহিমের সহিত তাহার বিবাহ স্থির করেন সেদিন তাহার জননী কি কাণ্ডটাই না করিয়াছিলেন। তাহার পর যখন বেনারসীর জোড় পরিয়া চন্দন-চর্চ্চিত কপালে মহিম বরের আসনে দাঁড়াইয়া শুভদৃষ্টি করিল, কি করুণ বেদনা-মাখান প্রেম-বিহ্বল সে মুখখানি; সুমিত্রার উচ্চশিক্ষিত মন সর্ব্বান্তঃকরণে সেদিন মহিমকে প্রিয়তম বলিয়া গ্রহণ করিল। তাহার পর বাসর ঘরে মহিমের বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি অগ্রাহ্য করিয়া কুলাঙ্গনারা যখন তাহার দৈন্যের প্রতি কটাক্ষ করিল—কি ব্যথাই লাগিয়াছিল সুমিত্রার অন্তরে। তাহার পর অন্য জামাতাদের সহিত তুলনা করিয়া যেদিন জননী মহিমের দরিদ্রতাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছিলেন সে দিনের মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা সে সহ্য করিতে পারে নাই। কি ভাবে সে মহিমকে সব কথা খুলিয়া লিখিয়া সমস্ত নারীমনের সরম ত্যাগ করিয়া তাহাকে লইয়া যাইতে লিখিয়াছিল। নির্জ্জনে মহিম তাহাকে তাহার কক্ষে পাইয়া পাতিব্রত্যের কি পুরস্কার দিয়াছিল—কলিকাতার এই বাসায় স্বামী সেই হইতেই তাহাকে কাছে রাখিয়াছে—তাহাকে পাঠায় নাই—সেও তাহার এই স্নেহনীড় হইতে পিত্রালয়ে যাইতে চাহে নাই। তাহার পর যেদিন তাহাদের সব স্বপ্ন কল্পনাকে সার্থক করিয়া খোকা আসিয়া তাহাদের দাম্পত্য-প্রেমকে কুসুম-ডোরে সুদৃঢ় করিল, সেদিন কি আনন্দই তাহার হইয়াছিল। স্বামীকে সে বড় ভালবাসিত। এই একান্ত নির্ভরশীল আত্মীয়-বান্ধব শূন্য প্রাণীটিকে সে সব সময়ে কিরূপে ভরিয়া পূর্ণ করিয়া রাখিবে ইহাই ছিল তাহার কামনা। ছোট ছেলেটীকে যেদিন সে স্বামীর কোলে তুলিয়া দিল, সেদিন স্বামীর মুখের অপূর্ব্ব আনন্দদীপ্তি দেখিয়া তাহার নারীত্ব গর্ব্বে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার মনে পড়ে ছেলের নাম লইয়া তাহারা দুই-জনে কতদিন কতরাত্রি পরীক্ষার গেজেট লইয়া গবেষণা করিয়াছে। কত রাগারাগি—তার পরে আপোষ—স্বামীর সোহাগ চুম্বনে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে তাহার গোলমাল। সে ভাসিয়াই চলিয়াছে—এমন সময় 'মুকুল' কাসিয়া উঠিল। ছেলের কাসির শব্দে কোথায় ভাসিয়া গেল তাহার স্মৃতি-স্বপ্ন; তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া ছেলেকে কোলে লইল, কপালে জলের হাত দিয়া সে তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল।

আজ প্রায় তিন মাস মুকুল কাসিতে ভুগিতেছে; কত ডাক্তার, কত ঔষধ, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না; তখন স্বামী-স্ত্রী উভয়েই নিরাশ হইয়া পড়িল। ডাক্তার অবশেষে চেঞ্জের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু মহিমের ছুটি হয় না। আজই সকালে স্বামী-স্ত্রীতে ইহা লইয়া কত কথা হইয়াছে—সুমিত্রা অবশেষে আজ স্বামীর স্নেহে পর্য্যন্ত ইঙ্গিত করিয়াছে। ছেলের জন্য সুমিত্রার মনে এতটুকু শান্তি নাই। সময় সময় তাহার মনে হয় যেন সবই তাহার শূন্য—ফাঁকা! সেদিন ইংরাজীতে মহিমের নিকট ডাক্তার যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তাহার মন আরও খারাপ হইয়াছে। মনে মনে আজ সে আরও কঠিন হইল। স্বামী আসিলে একটা যা হয় ব্যবস্থা আজ সে করিবেই প্রতিজ্ঞা করিল; এমন সময়ে এক বৃদ্ধ অভিজ্ঞ ডাক্তার লইয়া মহিম ঘরে ঢুকিল। সুমিত্রা আস্তে আস্তে ছেলেকে শোয়াইয়া দিয়া সংযত বস্ত্র আরও একটু সামাল করিয়া ঘরের কোণে যাইয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "এর জন্য কোন ভাবনা নেই; কিছুদিনের টাইম দিন আমি সারাইয়া দিব, তারপর চেঞ্জে যেতে হয় যাবেন"—বলিয়া তিনি কাগজ লইয়া প্রেস্‌ক্রপ্‌শান করিয়া পুনরায় আর এক দফা ভরসা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। * * * বিশেষ আশ্বস্ত হইয়া সুমিত্রা অল্পদিন 'রচির সিরোলিন' ছেলেকে খাওয়াইয়া বেশ ফল পাইল। * * * কিছুদিন পরে সম্পূর্ণ সুস্থ মুকুল যেদিন সন্ধ্যার সময় ঘুমাইতেছিল তখন সুমিত্রা একান্ত বিহ্বলভাবে মহিমের কাছে কৃতকর্ম্মের জন্য মাপ চাহিলে সে কি ভাবে কতক্ষণে তাহাকে মাপ করিয়াছিল কে জানে! কিন্তু 'সিরোলিন' যে তাহাদের আদরের মুকুলকে এত শীঘ্র আরোগ্যের পথে আনিবে এ কথা সুমিত্রা তাহার বাল্যবন্ধু—একমাত্র কন্যার জননী—অণিমাকে বলিতে ভুলিল না। (বিজ্ঞাপন)

মদন বসন্তসখা—

শ্রীরাইমোহন সামন্ত এম-এ

শনিবারের সন্ধ্যাবেলা। বড় সুন্দর দিন। বসন্তের অপ্রখর সূর্য্যের আভায় কলিকাতাটা যেন একটা কল্পনার রাজ্য বলে মনে হচ্ছিল। কার্জ্জন পার্কের চার দিকের বড় বড় ঘরগুলায় আলোর মালা—নীল, বেগুনে, লাল কাচের মধ্য দিয়ে একটা অপূর্ব্ব রঙের সমাবেশ আনছিল। এই কলকাতাতেও বসন্ত আসতে ছাড়ে নাই; চার দিকের ধোঁয়া ধূলায় ভরা গাছগুলায় নূতন কচি পাতা বের হচ্ছিল। পায়ের নীচে সবুজ ঘাসে ঢাকা ভূঁইখানা দেখে মনে হচ্ছিল যেন রামধনুর মধ্যের সবুজটাকে ছিঁড়ে এনে নিচে বিছান হয়েছে। সমস্ত প্রকৃতি যেন শীতের মৃত্যু থেকে নবজীবনে জেগে উঠেছে! এই নবজীবনের সাড়া মানুষের মনেও প্রভাব বিস্তার করেছে, তাই দলে দলে স্ত্রীপুরুষ হাত ধরাধরি করে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যাদের হাতে সঙ্গিনী নাই তাদের মনে সঙ্গিনী—যথা পাশের বাড়ীর রমাদেবী, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে দেখা মেয়েটি, ক্লাশের সেই শ্যামলা চোখে-চশমা-পরা মেয়েটি বা বাড়ীতে আপনার সুন্দর স্ত্রী। মোট কথা অবিবাহিতের মনে মানসীর চিন্তা, বিবাহিতের মনে স্ত্রীর চিন্তা। মদনঠাকুর যেন এই সময় একটু অবাধেই ঘুরে বেড়াচ্ছে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত তার অস্তিত্বের ক্ষীণ আভাস বুঝতে পারছে। বিবাহিতরা স্ত্রীর সঙ্গে সকালের কলহ ভুলে গিয়ে ভাবিতেছে আজ তার জন্য একটা কিছু নিয়ে বাড়ী ফিরবে, একখানা বেনারসী সাড়ী কিম্বা একজোড়া ভেল্‌ভেটের জুতা—অথবা হাল ফেশানের একজোড়া কানজোড়া কানবালা; কিন্তু পরক্ষণেই মনে করিতেছে আজ শনিবার, বড় বড় দোকানপাট এতক্ষণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আরও চিন্তা করিতেছে মুহূর্ত্তের আবেগে কতকগুলা টাকা খরচ করলে শ্রীমতী হয়ত বকবেন; তার হৃদয় নিশ্চয় এমনভাবে খুলে যায় নাই—কারণ বসন্তের ফুটন্ত শোভা সে ত আর চোখে দেখতে পাচ্ছে না। তার পর একটু দার্শনিকতা করে চিন্তা করে, এই রকমই জীবন—যখন প্রাণের আগল খুলে যায়—তখন দোকানের আগল বন্ধ হয়ে যায়।

আর আর সকলের মত পৃথ্বীশ বরাটের মনেও এই বসন্তের ছোঁয়াচ লাগল। চারদিকের আনন্দিত যুবক-যুবতীদের দেখে তার মনে কি যেন একটা না পাওয়ার ব্যথা জাগল; চারদিকের আনন্দ-কোলাহলের তুলনায় তার প্রাণটা যেন আরও অন্ধকার মনে হল। সামনের ঐ গাছটায় কচি পাতা দেখা যাচ্ছে কিন্তু তাব প্রাণ ত সেই মরেই আছে। হাত ধরাধরি করে প্রণয়ী প্রণয়িণীরা ঘুরছে কিন্তু সে একা। এমন সুন্দর বাসন্তী হাওয়া, এমন সুন্দর সূর্য্যকিরণ, সম্মুখে রবিবারের ছুটি, চারিদিকে এমন সুন্দর আনন্দহিল্লোল—কিন্তু তারই প্রাণ নিরানন্দ।

এই রকম অবস্থায় যা হয় তাই হ'ল—পৃথ্বীশ কল্পনার আশ্রয় নিল। যথা—সে মনে করে—একটি সুন্দরী তারই সামনে দিয়ে আনমনে যেতে যেতে একটা কিছুতে হোচট্ খেয়ে পায়ে ব্যথা পেয়ে বসে পড়ল। পৃথ্বীশ বাস্তবিক যা—তার থেকে আর একটু মোটা লম্বা এবং আরও অনেক সুন্দর হয়ে ছুটে গেল তার পাশে; নিজের পরণের কাপড় ছিঁড়ে পাশের একটা জলের কল থেকে ন্যাকড়া ভিজিয়ে সেই কোমল পায়ে জড়িয়ে দিল। তার পর একটা ট্যাক্সি ডেকে—এইখানে পৃথ্বীশ একবার তার পকেটটা হাতড়িয়ে দেখে নিল, ট্যাক্সি ভাড়া তার সঙ্গে আছে কিনা—হাঁা একটা ট্যাক্সি ডেকে মেয়েটিকে তার ভবানীপুরের বাড়ীতে দিয়ে আসবে। সেখানে গিয়ে দেখবে, যুবতী এক মস্ত বড় ব্যারিষ্টারের মেয়ে। মেয়েটির সঙ্গে বিদায় নেবার সময় মেয়েটি বলে—'আবার আসবেন কিন্তু'। পৃথ্বীশ তার পর থেকে প্রায়ই তাদের বাড়ী আসবে। ক্রমে দুজনের মধ্যে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াবে প্রেমে।

কিম্বা যথা—পৃথ্বীশ লালদীঘির পাশ দিয়ে একদিন যেতে যেতে দেখে দীঘির জলে একটী শিশু হাবুডুবু খাচ্ছে। ত্বরিত পদে সে জলে ঝাঁপিয়ে ছেলেটিকে জল হ'তে তুলে আনল। ছেলেটির যুবতী বিধবা ধনী মাতা পৃথ্বীশকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পায় না, কুণ্ঠিত হয়ে তার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে। তার পরে জানাশুনা, তার পর

ভালবাসা। বিধবাবিবাহ বাংলাদেশে নিশ্চয় চল হবে পৃথ্বীশের বিশ্বাস।

কিম্বা গল্পের আরম্ভে কোন আকস্মিক বিপদ না থাকতেও পারে। হয়ত সে ইডেন গার্ডেনের নিরালা একটা বেঞ্চে একটি যুবতীকে একা বসে থাকতে দেখল। মেয়েটির চোখে মুখে বিষাদের ছায়া। সাহসী হয়ে খুব ভদ্রোচিত-ভাবে পৃথ্বীশ আগিয়ে গিয়ে একটা নমস্কার জানিয়ে সহাস্য-মুখে বলল, "আপনাকে বড় একা একা বোধ হচ্ছে"। কথা কটা সে বেশ স্বচ্ছন্দে বলে গেল, তার মধ্যে একটুও বাঙ্গালে টান রইল না, আর কিছুতেই বোঝা গেল না – সে তোৎলা। "আমি বেশ বুঝছি জগতে আপনার কেউ নাই। আমারও আপনার বলতে কেউ নাই। আমি কি বেঞ্চের একপাশে বসতে পারি? যুবতী একটু হাসল, পৃথ্বীশ মৌনং সম্মতি লক্ষণং জেনে বসে পড়ল।

তার পর আপনার পারিবারিক কাহিনী বলে চলল; ছোট-বেলায় সে বাপ-মা হারা—জগতে আপনার বলতে এক বৈমাত্রেয় বোন, তার বে হয়ে গিয়েছে বর্দ্ধমানে। যুবতীও আপনার পরিচয় দিয়ে বলল, সেও মাতাপিতাহীন। এই স্বজনহীনতাই যেন তাদের দুজনের যোগসূত্র। তার পর দুজনে দুজনের দুঃখের কথা বলে—বলতে বলতে যুবতীর চোখে জল আসে—বলে—জগতে তার কেউ নাই। পৃথ্বীশ বলে 'আপনি কাঁদবেন না—আপনি ত আজ আমাকে পেলেন।' এই উদার আশ্বাস শুনে যুবতীর প্রাণে একটা আনন্দ আসে। দুজনে metroতে গিয়ে একটা ছবি দেখে আসে, পরে ছবিরই যুবক যুবতীর মত তাদেরও দুজনার বে হয়ে যায়। বিয়ের পরের কোন ছবিই পৃথ্বীশের কল্পনায় আসে না, বিবাহিত জীবনের কোন জ্ঞানই নাই যে তার।

কিন্তু সত্যই আর এমনটা হয় না, পৃথ্বীশের কল্পনা বাস্তবে পরিণত হয় না। কোন যুবতীর আকস্মিক বিপদও হয় না, আর পৃথ্বীশ যে মনে মনে কত একলা বোধ কচ্ছে তাও সে কোন রূপসীকেই বলতে ভরসা পায় না। তা ছাড়া তার তোৎলামিটা একটা বিদ্‌ঘুটে জিনিস, কল্পনায় যেমন সে অবাধে কথা বলে—বাস্তবে তা কিছুতেই সম্ভব হয় না। তাছাড়া আরও বাধা কত! মাথায় সে সাড়ে চার ফুটের বেশি হবে না—চোখে একটু কম দেখে তাই একটা চশমাও চোখে দিতে হয়েছে—অথচ সোনার সুন্দর চশমা কিনতেও কৈ পারে নাই; মুখ সর্ব্বদাই ছোট ছোট ব্রণে ভর্ত্তি, কাপড় জামা কলকাতার ধূলায় ফরসা রাখা তার সাধ্যাতীত। পাঞ্জাবীর হাতা যেন কনুয়ের কাছে চলে আসতে চায়, সস্তার লংক্লথ ধোপে ধোপে কমে আসছে, জুতাটায় এত কালি দিয়েও সামনের দুটা তালি ঢাকা পড়ে নাই।

তার পায়ের ছেঁড়া জুতা জোড়াটাই যেন নির্দ্দয়ভাবে তাকে কল্পনার রঙীন জগৎ থেকে টেনে নিয়ে এল। যখন সে কল্পনায় ব্যারিষ্টারের মেয়েটিকে নিয়ে চৌরঙ্গীর রাস্তার উপর দিয়ে মটরে করে ছুটে চলে ভবানীপুরে তাদের বাড়ীর দিকে তখন তার জুতাজোড়া তার চোখের সামনে এসে স্বপ্ন ভেঙ্গে দেয়। কল্পনার রাজ্যে এই ছেঁড়া জুতার স্থান কোথায়। পৃথ্বীশের মনে হল জুতা জোড়াটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়—কিন্তু পরক্ষণেই তার সাংসারিক বুদ্ধি তাকে বাধা দিল। আরও অন্তত ছয় মাস এই জুতা জোড়াটাতেই তাকে চালাতে হবে।

সে নানা রকম জটিল হিসেব করতে থাকে। যদি জলখাবার বরাদ্দ চার পয়সা থেকে প্রত্যেক দিন এক পয়সা করে সে বাঁচায়, কাপড়গুলা যদি ধোবাকে না দিয়ে নিজেই কেচে নেয়···। কিন্তু যেমন করেই হিসেব সে করুক না, তার মাসের ৩৫৲ টাকা বেতন ৩৬৲ টাকা হয় না। ভাল জুতার দাম আজকাল নেহাৎ কম না; তা ছাড়া কায়ক্লেশে টাকা বাঁচিয়ে একজোড়া জুতা না হয় তাড়াতাড়ি কেনা গেল – কিন্তু পরণের কাপড়খানা, গায়ের পাঞ্জাবীটা—এদের নিয়ে কি করবে সে! সবই সত্য, কিন্তু তবুও বাইরের পৃথিবী যে বসন্তের মায়া স্পর্শে জেগে উঠেছে, তার চোখের সামনে জোড়া জোড়া নরনারী যে চোখে মুখে ভালবাসা নিয়ে আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আনন্দের হাটে সেই যে কেবল একা। কঠিন সত্যই শেষে বলবৎ হল; যখনই কল্পনা তাকে উড়িয়ে নিতে চায়, তার পায়ের জুতা আর গায়ের পিরাণ তাকে তার সত্যকার দুঃখের মধ্যে ফিরিয়ে আনে।

দুটি যুবতী রাস্তার ভিড় থেকে ছিটকে এসে কার্জ্জন পার্কের মধ্যে ঢুকে সোজা অক্টারলোনি মনুমেণ্টের দিকে চলল। পৃথ্বীশও তাদের পিছনে পিছনে চলল। আর তার বুকটা যেন অসম্ভব রকম দ্রুত চলতে লাগল।

তার মনে হ'ল মেয়ে দুটি যেন স্বর্গ হতে এইমাত্র নেমে এল। পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু রমণীয় আছে তা দিয়ে তরুণী দুটি যেন গড়া হয়েছে। তাদের পথ ছেড়ে এদিকে আসতে দেখেই—তাদের মুখের অতি উজ্জ্বল বেশবিন্যাস দেখেই—পৃথ্বীশ তাদের পিছু পিছু চলতে লাগল কেন? তা কি সেই জানে ছাই! হয়ত তাদের নিকটে থাকতেই তার সুখবোধ হচ্ছিল, কিম্বা তার মনে মনে আশা হচ্ছিল যে এমন একটা কিছুও ত ঘটতে পারে যেটা অবলম্বন করে পৃথ্বীশ ওদের জীবনের পথে আসতে পারে।

কাঙালের মত সে তাদের পিছন পিছন চল্‌তে লাগল—আর উচিতানুচিত ভুলে গিয়ে তাদের নিরীক্ষণ কর্ত্তে লাগল। দুজনেই দীর্ঘাঙ্গী, একজন পরেছে একটা আসমানী রঙের জর্জ্জেট, আর একজন একটা টক্‌টকে লাল বেনারসী। একজনের পায়ে জরির কাজ ভেলভেটের নাগরা, আর একজনের পায়ে সাপের চামড়ার চিত্রিত উঁচুহীলের জুতা। তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে একটা পাহাড়ে লোমওয়ালা সাদা ধবধবে ছোট কুকুর; কখনও সেটা খানিক আগিয়ে যায়, আবার কখনও পিছিয়ে পড়ে।

তরুণী দুটির কথা পৃথ্বীশ শুনতে পাচ্ছে এত কাছে সে চলে এসেছে। "এমন সুন্দর লোক, সত্যি ভারি সুন্দর" —লাল বেনারসী পরিহিতা বলে। পৃথ্বীশ বুঝল ইহার গলা একটু মোটা ও কর্কশ।

"ইলাও তাই আমাকে বলছিল", সরু গলায় অপরা বলে। পৃথ্বীশ মনে মনে তাদের নামকরণ করে অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা।

অনসূয়া বলিল, "পার্টিটা বড় সুন্দর হয়েছিল—তিনি একাই জমিয়ে রেখেছিলেন। সমস্ত সন্ধ্যেটা হাসিতে কেটে গেল।"

এমন সময় একদল বালক হল্লা কর্ত্তে কর্ত্তে এসে হাজির হল। তাদের চীৎকারে পৃথ্বীশ বাকী কথাগুলো শুনতে পেল না। মনে মনে সে এই অভদ্র ছেলেগুলাকে ধিৎকার দিল। একটা অজানিত জগতের রহস্য ভেদ করছিল সে, আর ছেলেগুলা···। বড়লোকের জীবন সম্বন্ধে চিরকালই পৃথ্বীশের একটা অস্বাস্থ্যকর ঔৎসুক্য! কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই পৃথ্বীশের কল্পনা ছিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-পিপাসু। ব্যারিষ্টারের মেয়েকে নিয়ে সে কল্পনার সেই পাড়াগাঁয়েই নীড় রচনা করত। এটা অবশ্য স্বেচ্ছায় নয়, প্রয়োজনের খাতিরেই; কারণ বড় লোকের সান্ধ্য-ভোজ, আমোদ-প্রমোদ, গান-বাজনা, এ-সব সে কল্পনাতেও সৃষ্টি করতে পারত না। সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব জগতের যদি বা একটু দেখা মিলছিল তার··। পৃথ্বীশের মনে হল যেমন করেই হ'ক এই আলোকময়, জাঁকজমকপূর্ণ রঙীন জগতে সে প্রবেশ লাভ করবে—তার নিজের নগণ্য জীবনকে এই দুই দেবকন্যার জীবনের সঙ্গে কোন রকম করে জড়িয়ে দেবে। আচ্ছা যদি এই তাদের নীচু বেড়াটা অন্যমনস্কভাবে পার হতে গিয়ে পা বেধে গিয়ে দুজনেই পড়ে যায়, যদি···কিন্তু পৃথ্বীশের আর কোন সম্ভাবনার কথা ভাববার পূর্ব্বেই তরুণীদ্বয় নিরাপদে বেড়াটা পার হয়ে গেল। কিন্তু তার পরেই কুকুরটার দিকে চেয়ে পৃথ্বীশ একটা আশার সন্ধান পেল।

কুকুরটা রাস্তা ছেড়ে পাশের একটা পামগাছের গোড়া শুঁকছিল। শোঁকা হলে একটু ঘেউ ঘেউ করে সেখানে তার আগমনের নিদর্শন-স্বরূপ অকথ্য কিছু ত্যাগ করে পিছনের পা দুটা দিয়ে যখন মাটি ছুঁড়ছিল তখন একটি মেমের একটা টেরিয়ার কুকুর হঠাৎ সেদিকে ছুটে এল। পামগাছটাকে শুঁকে তরুণীদের কুকুরটাকে সেটা শুঁকতে লাগল। তরুণীদের পাহাড়ে কুকুরও ধূলা ছোঁড়া ছেড়ে নূতন কুকুরটাকে শুঁকতে লাগল। এই রকম করে দুটা কুকুর উভয়ে উভয়কে শুঁকতে শুঁকতে ঘুরতে ঘুরতে চলতে লাগল। পৃথ্বীশ একটা অলস কৌতুহলের সঙ্গে কুকুর দুটার দিকে একবার তাকাল। তার মন ছিল অন্যত্র, কত সম্ভাবনার কথাই তার মনে আসছিল। হঠাৎ তার মনে হল দুটা কুকুর বোধ হয় মারামারি আরম্ভ করবে। তা যদি হয় তবে তার ভাগ্য দেখে কে? সে সাহসী বীরের মত ছুটে গিয়ে তাদের ছাড়িয়ে দেবে। হয়ত তাকে একটা কুকুর কামড়ে দেবে; কিন্তু তাতে কি আসে যায়! কামড়ালেই ত তরুণীদের সহানুভূতি পাওয়া তার পক্ষে সোজা হবে! কুকুর দুটায় যুদ্ধ করুক, পৃথ্বীশ মনেপ্রাণে তাই আশা করতে লাগল। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্ব্বেই যদি তরুণীরা বা ঐ টেরিয়ারটার ফেরঙ্গ প্রভু দেখতে পায় তাহ'লে পৃথ্বীশের ভাগ্য বিপর্য্যয়। সে মনে মনে ভগবানকে নিবেদন করল, হে ঠাকুর, ওরা যেন কুকুটাকে সরিয়ে নেয় না, যুদ্ধটা আরম্ভ হয়ে যাক! পৃথ্বীশের ভগবদ্ভক্তি একটু

বেশি রকমই ছিল, তাই বিপদে আপদে ভগবানের স্মরণ নিতে তার ভুল হত না।

ছেলেগুলো এতক্ষণ দূরে চলে গেছে, পৃথ্বীশ নবীনাদের কথোপকথন আবার শুনতে পেল। কোমলকণ্ঠা প্রিয়ম্বদার গলা শুনা গেল—লোকটা কি জ্বালাতুনে; এক পা বাড়াবার জো নাই, পিছু নিয়েছেন। একেবারে গণ্ডারের চামড়া, কিছুই বিঁধে না। আমি বললাম—বাঙ্গাল আমি বরদাস্ত করতে পারি না, তা ছাড়া তার মত কুৎসিৎ বোকা লোককে···কিন্তু তাতেও কিছু হয় না।

অনসূয়া কড়িস্বরে বলল—বিয়ে না কর, তাকে কাজে ত লাগাতে পার।

"সে আর তোমাকে বলতে হবে কি?"

"তা হলেও কিছুটা হ'ল বলতে হবে।"

"হাঁ ঐ কিছুটাই, তার বেশি না।"

তার পর কথাবার্ত্তা একটু থামল। পৃথ্বীশ আশঙ্কিত হয়ে প্রাণপণে প্রার্থনা করে—'হে ভগবান ওরা যেন দেখে না।'

পরম তাত্ত্বিকের মত প্রিয়ম্বদা বলল, পুরুষগুলো যদি বুঝতে পারে যে·····। কুকুর দুটার বিকট ঘেউ ঘেউ চীৎকারে তার তত্ত্বকথা বাধাপ্রাপ্ত হল, দুজনেই কুকুরের দিকে চাইল। "পল্টু-উ-উ-উ", দুজনেই একযোগে কুকুরটাকে ডাকল, 'পল্টু ইধার আও'। কিন্তু তাদের ডাক ব্যর্থ হ'ল, পল্টু তখন মেমের কুকুরটার সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ করে দিয়েছে। পল্টু পল্টু বলে এরা কেবলই চীৎকার করে, মেমটিও আপনার কুকুরটাকে ডাক দেয় 'বেলি'।

পৃথ্বীশ মুহূর্ত্তের জন্য ভগবানকে প্রার্থনা জানাচ্ছিল তা তার সামনে। সে আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে কুকুরদের মাঝে পড়ল। মেমসাহেবের টেরিয়ার কুকুরটাকে পা দিয়ে লাথি মেরে সে তাড়িয়ে দিল—তরুণীদের, তার দেবীদের কুকুরের সঙ্গে ঝগড়া করেছে—এত বড় বেয়াদপ সে। পৃথ্বীশ ছাড়িয়ে দিতে দিতে বলে 'ভাগো'। আশ্চর্য্য, সে ভুলেই গেল যে সে তোৎলা, বেশ সহজেই সে বলল "ভাগো"। দুহাতে দুটা কুকুরের বগ্‌লস ধরে তাদের পৃথক করে দিতে সে প্রাণপণ চেষ্টা করল। তার শত্রু মেমের কুকুরটাকে মাঝে মাঝে সে লাথি মারতে লাগল—কিন্তু তার দেবীদের অকৃতজ্ঞ কুকুরটাই তাকে কামড়াল। পৃথ্বীশ রাগ করল না, সেই কামড়ই তার অঙ্গের ভূষণ হল। কয়েকটা দাঁতের দাগ তার হাতে—আর তা থেকে দিব্যি রক্ত বের হ'তে লাগল।

প্রিয়ম্বদা পৃথ্বীশের হাত দেখে বলল, "উঃ!" যেন তারই হাতটা কুকুরটা কামড়েছে এমনই ভাব।

উৎকণ্ঠার সঙ্গে অনসূয়া চীৎকার করে—"দেখবেন, সাবধান"। তাদের গলায় সহানুভূতির আভাস পেয়ে পৃথ্বীশ যেন মেতে উঠল। সে আরও পরাক্রমে কুকুরটাকে ছাড়াবার চেষ্টা করে, মেমের কুকুরটাকে লাথি মারে। অবশেষে সে জয়ী হ'ল, তরুণীদের কুকুরটাকে তুলে নিল তার শত্রুর কবলের বহু উর্দ্ধে।

বিজয়ী বীরের মত পৃথ্বীশ কুকুরটাকে নিয়ে চলল তার সুন্দরী মালিকদের কাছে। অনসূয়ার চোখ দুটি ছোট, মুখটি বিষাদপূর্ণ; প্রিয়ম্বদা ওর থেকে পূর্ণাবয়ব, ওর থেকে ফরসা, চোখ দুটি ভাসা ভাসা, দুজনেই যুবতী। পৃথ্বীশ একবার এর দিকে তাকায়, আর বার ওর দিকে, বুঝে উঠতে পারে না "কে বেশি সুন্দর"।

তার হাতের মধ্যে কুকুরটা ছটফট করছিল; তরুণীদের সামনে তাকে নামিয়ে সে বলল, "এই নিন আপনাদের কুকুর।" বলল বললে ভুল হবে, সে তাই বলতে চাইছিল; কিন্তু তাদের প্রোজ্জ্বল রূপ দেখে তার আত্মজ্ঞান ফিরে এলো, ফিরে এলো তার তোৎলামি। "এই নিন আপনাদের" সে বেশ বলল, কিন্তু কুকুর সে আর বলতে পারল না। "কু-কু-কু-কু" করে লাল হয়ে উঠল। প্রিয়ম্বদা তাকে উদ্ধার করে বলল, "বহু ধন্যবাদ আপনাকে"। অনসূয়া তার হাতের জখম লক্ষ্য করেছিল। সে বলল "আপনি আশ্চর্য্য, আপনাকে তারিফ না করে পারা যায় না; কিন্তু আমার মনে হয়, কুকুরটা আপনাকে জখম করেছে।"

"ও কিছু না" বলে পৃথ্বীশ রুমাল দিয়ে হাতটাকে ঢাকা দিয়ে পকেটে পুরল। প্রিয়ম্বদা ততক্ষণ কুকুরের গলায় চেনটা লাগিয়ে দিয়েছে; সে বলে "নেন—এখন কুকুরটা নামিয়ে দেন"। পৃথ্বীশ আদেশ পালন করে, কুকুরটা ছাড়া পেয়ে পৃথ্বীশের দিকে ছুটতে চায়—কিন্তু চেনের টানে ব্যাহত হয়।

অনসূয়া বলে 'সত্যিই আপনার লাগে নি ত? দেখি আপনার হাতটা।'

অতি শিষ্টভাবে পৃথ্বীশ তার পকেট হতে হাতটা বের করে রুমালটা সরিয়ে হাতটা তাদের সামনে ধরল। তার মনে হল যেন কল্পনায় সে যেমন যেমন ভেবে রেখেছে ঘটনার গতি ঠিক সেই পথেই চলেছে। তার পর তার নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে তার মনে হ'ল—হায় হায়, হাতের নখগুলোতে বিস্তর ময়লা জমে রয়েছে। কেন আজ বের হবার সময় হাতটা বেশ পরিষ্কার করে আসে নাই। তারা এই হাতের মূর্ত্তি দেখলে কি ভাববে। পৃথ্বীশের মুখ চোখ রাঙা হ'য়ে উঠল, সে হাতটা টেনে সরিয়ে নিতে চাইল—কিন্তু অনসূয়া হাতটা ধরে ফেলল। "থামুন, থামুন—ইস্ দারুণ কামড়েছে"। প্রিয়ম্বদাও সায় দিয়ে বলল, "উঃ দেখা যায় না। দেখুন ত, এমনই সয়তান কুকুরটা।"

অনসূয়া বলল, আপনার আর দেরী করা উচিত নয়, এখনই সোজা কোন ডাক্তারখানায় চলে যান। ডাক্তার দিয়ে ওটাকে ধুইয়ে ওষুদ দিয়ে বেঁধে নেন, না হলে বিষ হতে পারে।" এই বলে তার চোখ দুটা পৃথ্বীশের মুখে ফেলল।

"হাঁ হাঁ সত্যিই ডাক্তারের কাছে আপনার যাওযা উচিত বলে প্রিয়ম্বদাও চোখ তুলল।

পৃথ্বীশ একবার এদিকে আর বার ওদিকে তাকায় আর দুজনের উজ্জ্বল বিস্মিত চোখে চেয়ে তার চোখ ঠিক্‌রে আসে। তাদের মুখের দিকে চেয়ে সে একটা ম্লান হাসি হাসে—আর ঘাড় নাড়ে। তার পর নীরবে হাতটাকে রুমাল দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে পকেটের মধ্যে রাখে। বলে, "ও কিছু না"।

"না না, তুচ্ছ কর্ব্বেন না"

"এখনই ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত আপনার"

পৃথ্বীশ বলে, ন্-ন্ ন্ ন্ না, ও ক্-ক্-ক্-কি···

প্রকৃত প্রস্তাবে সে ডাক্তারের কাছে না গিয়ে এই দেবী দুটির কাছেই থাকতে চায়।

প্রিয়ম্বদা অনসূয়ার দিকে তাকায়—তার কাণে কাণে বলে Does he want something. প্রিয়ম্বদার ধারণা পৃথ্বীশ ইংরাজি জানে না।

অনসূয়া একটু চিন্তা করে বলে, who knows; he may take offence. বলে একবার পৃথ্বীশের দিকে তাকিয়ে তাকে বুঝে নেবার চেষ্টা করে। তার ময়লা সস্তা কাপড়, জামা, জুতা, ব্রণলাঞ্ছিত মুখ, ময়লা হাত পা ইত্যাদি নজরে পড়ে পৃথ্বীশ ওদের কথা ভাল শুনতেও পায় না, বুঝতেও পারে না। সে কেবল দেখে অনসূয়া তার দিকে চাইছে। তার মনে একটা অনিশ্চিত উল্লাস বয়ে যায়—ভাবে কি সুন্দর এই মেয়েটি। বোধ হয় ওরা এখনই পৃথ্বীশকে চায়ে নিমন্ত্রণ করবে—নিশ্চয় ওরা সেই কথাই পরামর্শ করছে। তা ছাড়া আর কি হতে পারে। পৃথ্বীশের কল্পনা সত্যেরই আভাস মাত্র।

অনসূয়া প্রিয়ম্বদার দিকে ফিরে নিচু গলায় ইংরেজি করে বলে—"লোকটা গরীব—কিছু দেওয়া যেতে পারে"

প্রিয়ম্বদা জিজ্ঞাসা করে "কত, পাঁচ টাকা?"

অনসূয়া বলে "না—দশ টাকাই দাও"। প্রিয়ম্বদা ব্যাগ থেকে নোট বের কর্ত্তে লাগল। অনসূয়া পৃথ্বীশের দিকে চেয়ে বলল—"ও আপনার দুর্জ্জয় সাহস"। পৃথ্বীশ কিছুই বলতে পারল না, একটু ঘাড় নেড়ে লজ্জায় রাঙা হ'য়ে চোখ নিচু করল। তার প্রাণের ইচ্ছা একবার নয়ন ভরে মেয়েটিকে দেখে নেয়—কিন্তু তার স্থির চোখের দৃষ্টি সে সহ্য করতে পারল না।

"কুকুর নাড়াচাড়া আপনার বোধ হয় অভ্যাস আছে, আপনার কি নিজের কুকুর আছে?"—অনসূয়া জিজ্ঞাসা করে।

পৃথ্বীশ কোন রকম করে বলে—"ন্-ন্ ন্ না"

"ও, তাহলে ত আপনার সাহসকে সত্যিই প্রশংসা করতে হয়।"

ততক্ষণ প্রিয়ম্বদা ব্যাগ থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করেছে দেখে অনসূয়া পৃথ্বীশকে একটা নমস্কার করে বলল, "আপনার কাছে আমরা সত্যই কৃতজ্ঞ"।

প্রিয়ম্বদা একটু আগিয়ে এসে পৃথ্বীশের হাতে একটা দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে একটু হেসে বলল "নমস্কার, আপনি কিন্তু একটা ডাক্তারের কাছে যেতে ভুল্‌বেন না।"

পৃথ্বীশের কাণ দুটো লাল হ'য়ে উঠল, কপালের সব শিরগুলো ফুলে উঠল; "ন্ ন্ ন্ না" বলে সে নোটটা ফেরত দিতে চাইল। কিন্তু প্রিয়ম্বদা কেবল হাসল, বলল, "হাঁ, হাঁ রাখুন।" অনসূয়া ততক্ষণ একটু আগিয়ে গিয়েছে, প্রিয়ম্বদা একটু ছুটেই সঙ্গিন কাছে গেল।

"নিয়েছে, না ?"—অনসূয়া জিজ্ঞাসা করল।

"হাঁ, হাঁ", প্রিয়ম্বদা ঘাড় নেড়ে বলল ; তারপর স্বর পরিবর্ত্তন করে—"হাঁ কি বলছিলাম যেন।"

পৃথ্বীশ দু এ কপা তাদের পিছনে গিয়ে থেমে দাঁড়াল। না দরকার নাই ; তার মনের কথা তরুণীদের বুঝান অসম্ভব, সে চেষ্টা করলে তাকে আরও হয়ত হীন হতে হবে। তারা হয়ত ভাববে সে আরও বেশি চায়, দশ টাকায় তার মন উঠ্‌ছে না ; তাই ভেবে হয়ত তার মুখে আর একটা দশ টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়ে চলে যাবে। পৃথ্বীশ দাঁড়িয়ে তাদের দিকে চেয়ে রইল, যতক্ষণ না ওরা ওদিকের রাস্তার ভিড়ে মিশিয়ে গেল।

পৃথ্বীশ মনে মনে আর একবার ঘটনাটার মানসিক অভিনয় করে নিল ; যেমনটা ঘটেছে তেমন ভাবে নয়, তার ধারণায় যেমনভাবে হওয়া উচিত ছিল তেমনভাবে। যখন প্রিয়ম্বদা তার হাতে দশ টাকার নোটটা গুঁজে দিল তখন সে বলল, "দেখুন আপনার ভুল হয়েছে ; অবশ্য আপনার দোষ নাই ; আমার কাপড় জামা চেহারা বলে দিচ্ছে আমি গরীব। সত্যিই আমি গরীব কিন্তু আমি নীচ নই। আমার বাবা ছিলেন গোয়ালন্দের ডাক্তার, আমার মাও ছিলেন একজন ডাক্তারের মেয়ে। আমাকে বাপ মা ভাল স্কুলেই দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা মরে যাওয়ায় আমার পড়াশুনা বেশি এগুলো না, আমাকে যেমন তেমন একটা কাজ নিতে হল। আমি টাকা নিতে পারব না।" তারপর একটু বীরত্ব ও উদারতা দেখিয়ে "এই কুকুরটাকে ছাড়ালাম আপনাদের বন্ধু ভেবে—বন্ধুদের উপকার করবার জন্য। আমি যদি ভদ্রবংশের সন্তান নাও হতাম তবুও দুটি তরুণীর বিপদে উপকার করার জন্য টাকা বকশিস নিতে পারতাম না।" প্রিয়ম্বদা এই কথা শুনে খুব মুগ্ধ হয়ে গেল, না বুঝে তাকে টাকা দিতে গিয়ে বিশেষ অন্যায় করেছে বলে দুঃখ প্রকাশ করল ; পৃথ্বীশ মনে কোন গ্লানি রাখবে না বলে আশ্বাস দেওয়ায় তারা তাকে চায়ে নিমন্ত্রণ করল। তারপর পৃথ্বীশের কল্পনা পরিচিত খাদে এসে পৌছাল ; আস্তে আস্তে সেই ব্যারিষ্টার কন্যা, কৃতজ্ঞ বিধবা এবং সঙ্গীহীন অনাথারা এসে তার মগজে ভিড় জমাল।

কিন্তু সত্যিই যা ঘটেছে সেটা পৃথ্বীশ কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। তার দেবীরা তাকে যে কোন কথা বলবারই অবকাশ দেয় নাই। আর দিলেও পৃথ্বীশ ত নিজের কথা বলতে পারত না। তার বাবা ডাক্তার—কিন্তু ডাক্তার কথাটাতেই ত সে ভয়ানকভাবে আটকে যেত, ও কথাটা যে তার কিছুতেই উচ্চারণ হয় না। সত্যকে সে কেমন করে এড়িয়ে যাবে—তাদের দেওয়া দশ টাকা এখনও যে তার হাতের মুঠায়। তারা ত তাকে রাস্তার একটা বাজে ছোঁড়া ছাড়া কিছুই ভাবে না। ওদের স্তরের থেকে সে যে অনেক নীচে, তাকে চায়ে ডাকা যে তারা কল্পনাও করতে পারে না।

কিন্তু কল্পনাও শীঘ্র পরাস্ত হতে চায় না। সে ভাবে কোন রকম ভণিতা না করে নোটটা জোর করেই প্রিয়ম্বদার হাতে ফিরিয়ে দেওয়া যেত ত, তাই কেন সে করে নাই। নিজের এই বোকামির জবাবদিহি নিজেকেই করতে হয়—ওরা যে বড় তাড়াতাড়ি চলে গেল, টাকা ফেরত দেবার সময় সে পেল কই! আচ্ছা—যদি সে ওদের থেকেও জোরে গিয়েও তাদের সামনে কোন একটা ভিক্ষুককে ঐ নোটটা দিয়ে দিত, তাহ'লেই ত কতকটা বুঝান হ'ত যে সে টাকার কাঙাল নয়। এই সামান্য বুদ্ধিটা তার কেন মনে আসে নাই তখন

নানারকমভাবে ব্যাপারটাকে পৃথ্বীশ নিজের মনোমত করে সাজায় আর ভাঙে। কিন্তু সাজান জিনিস বেশিক্ষণ থাকে না, সত্য এসে তাকে অত্যন্ত পীড়া দেয়।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত হল। অন্ধকার একটু গাঢ়তর হ'ল—অবশ্য কলিকাতায় যতটা সম্ভব সেই অনুপাতেই। ক্রমে ক্রমে চারিদিকের সব আলো জ্বলে উঠল ; উপরে আকাশেও একখানি সরু চাঁদ পাতলা মেঘের সঙ্গে কেবলই পাল্লা দিয়ে ছুটতে লাগল। পৃথ্বীশের মনটা যেন আরও বিষণ্ন হয়ে পড়ল।

তার হাতের জখমটা বড় কষ্ট দিতে লাগল, একটা ডাক্তারের কাছে গিয়ে ক্ষতস্থানটা ভাল করে ধুয়ে ঔষধ দিয়ে বাঁধিয়ে নিল। তারপর একটা চায়ের দোকানে গিয়ে একটা ডিমের পোচ, আধ ডিস কারি, কয়েক টুকরা রুটি—আর এক কাপ চা ফরমাস করল। দোকানের বয়কে অবশ্য বোঝাতে তার অনেক কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু সে কথা আর নাই বললাম।

বয় আপনার কাজে চলে গেলে পৃথ্বীশ আবার ভাবতে

থাকে। "আমাকে কি একটা ভিক্ষুক ঠাউরেছেন" একটা ক্রুদ্ধ গর্ব্বে পৃথ্বীশের এই কটা কথাই বলা উচিত ছিল। তার বলা উচিত ছিল "আপনি আমাকে অপমান করেছেন, আমার মনুষ্যত্বের অপমান করেছেন। আপনি যদি পুরুষ হতেন তা হলে আপনি সহজে নিষ্কৃতি পেতেন না। নেন আপনার ঘৃণিত অর্থ।" পরক্ষণেই পৃথ্বীশের মনে হয় ক্রুদ্ধ জবাবের পর ত আর সুন্দরীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন অসম্ভব হত। না ক্রোধ প্রকাশ করে কোন ফল হত না, তাতে পৃথ্বীশের নিজেরই ক্ষতি।

"বাবু আপনার কি হাতে চোট লেগেছে" বলে দোকানের বয় তার সামনে পোচ আর রুটি রাখল। পৃথ্বীশ ঘাড় নেড়ে জানাল, "হাঁ, একটা কু-কু-কু-কু" বয়টা হাসি লুকিয়ে অন্য কাজে চলে গেল।

অপমানের স্মৃতি তার মুখ চোখ আরক্ত করে তুলল।—হাঁ, তারা তাকে একটা ভিক্ষুকই ভেবেছে, সেও যে একটা মানুষ সে কথা তারা ভাবে নাই। একটা মজুর তার পাওনা মজুরি ছাড়া আর কি দাবী করতে পারে। ঘৃণা ও অপমান তার মনকেই কেবল স্পর্শ করে নাই, তাতে দেহের উপরও প্রতিক্রিয়া করতে লাগল। তার বুক অসম্ভব রকম দ্রুত চলতে লাগল, সে রীতিমত অসুখ বোধ করতে লাগল। পোচ কারি সে অনেক কষ্টের সঙ্গেই খেল।

যন্ত্রণাদায়ক বাস্তবকে নানারকম কাল্পনিক ঘটনা দিয়ে ঢাকা দিতে দিতে সে চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে তার নিরুদ্দেশ যাত্রা সুরু করল। ধর্ম্মতলা ছেড়ে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, তার পর কলেজ ষ্ট্রীটে এসে সে পৌছিল। মেডিকেল কলেজের কাছাকাছি একটা গলির মুখে এলে একটি মেয়ে তার গায়ের উপর একরকম ধাক্কা দিয়েই একটু চাপা স্বরে বলে গেল, "মুখটি কেন ভার গো মশাই"। পৃথ্বীশ একটু আশ্চর্য্য হয়ে মেয়েটির দিকে চাইল। এটা কি সম্ভব যে তারই সঙ্গে মেয়েটি কথা কইছে! একজন নারী—এও কি সম্ভব!! মুহূর্ত্তেই পৃথ্বীশ বুঝল লোকে যাদের বারাঙ্গনা বলে মেয়েটি তাদেরই একজন। কিন্তু সে যে তার সঙ্গে উপযাচক হয়ে কথা বলছে এইটাই তার কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর বোধ হল। এই আশ্চর্য্য ব্যাপারটার সঙ্গে মেয়েটির নোংরা চরিত্র সে যোগ করতে পারল না।

"আসবেন, আসুন না আমার সঙ্গে"—মেয়েটি বলল। পৃথ্বীশ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল—কিন্তু সে বিশ্বাস করতে পারল না যে ব্যাপারটা সত্য। মেয়েটি তার হাত ধরল, জিজ্ঞাসা করল, "পকেটে টাকা আছে ত?" পৃথ্বীশ আবার ঘাড় নাড়ল। "কি মশাই—আপনি কি মড়া পুড়িয়ে বাড়ী ফিরছেন না কি, একটু কি হাসতেও নাই", মেয়েটি বলে। "দেখুন, পৃথিবীতে আমি বড়ই একা" পৃথ্বীশ বলে; ভাবে সে একবার কাঁদে, কেঁদে মনের গুরুভার একটু লাঘব করে। তার গলার স্বর কেঁপে গেল।

"একা, আশ্চর্য্য করলেন আপনি! এমন সোনার চাঁদ ছেলে, আপনি একা হতে যাবেন কেন"—বলে মেয়েটি একটু দুষ্টামির হাসি হাসল।

মেয়েটির শোবার ঘরে একটি মিটমিটে হ্যারিকেন জ্বলছিল, ময়লা বিছানার গন্ধের সঙ্গে একটা কম দামী এসেন্সের গন্ধ ঘরের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছিল।

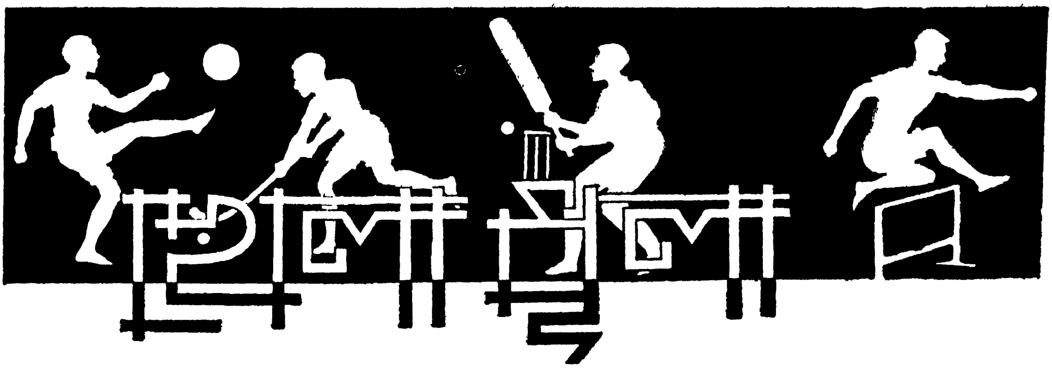
বেশ্যাবাড়ী বুঝতে পেরে পৃথ্বীশ সেখান থেকে তখনই চলে যেতে উদ্যত হ'ল।

মেয়েটি রেগে তার হাত ধরে চীৎকার করে বলল, "তবে রে সয়তান"—তার পর ইতর ভাষায় গালাগালি করতে লাগল। "বেশ্যা বাড়ী এসে ফাঁকি দিয়ে পালাবার মতলব; সেটি হচ্ছে না বাছাধন।" তার পর একপ্রস্থ অশ্রাব্য গালাগাল চলল।

পৃথ্বীশ পকেটে হাত ঢুকিয়ে প্রিয়ম্বদার ভাঁজকরা নোটটি বের করল। সেটি মেয়েটির হাতে দিয়ে বলল "নিন, এখন আমায় যেতে দিন।"

মেয়েটি সন্দিগ্ধভাবে নোটটা পরখ করবার জন্য আলোর কাছে গেল। ততক্ষণ পৃথ্বীশ তার ঘর থেকে বের হয়ে অন্ধকার গলি পার হয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়েছে।





ইষ্ট ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়ন সিপ্ ঃ

সাউথ ক্লাবের চ্যাম্পিয়নসিপ্ টেনিস খেলা শেষ হয়েছে। সিঙ্গলস্ ফাইনাল খেলা নিউজিল্যাণ্ডবাসী এ সি ষ্টেডম্যান ও লক্ষ্ণৌবাসী গাউস মহম্মদের মধ্যে হয়। ষ্টেডম্যান বহু আয়াসে ৩-২ সেটে জয়ী হতে পেরেছেন। ৫টি সেটে ৫৪টি গেম খেলতে হয়; ষ্টেডম্যান ২৮টি গেম ও গাউস মহম্মদ ২৬টি গেম জেতেন। পঞ্চম সেটে উভয়কেই আঙ্গুলের ব্যথার জন্য মালিস প্রযোগ করতে হয়। ষ্টেডম্যানই বিশেষ আক্রান্ত হন। ষ্টেডম্যান ৭-৫, ৬-৩, ৩-৬, ৬-৮, ৬ ৪ গেমে বিজয়ী হয়েছেন।

ডবলস্ ফাইনালে—ষ্টেডম্যান ও ম্যালক্রয় ৬-৩, ৬-৪ গেমে ব্রুক এডওয়ার্ডস্ ও মিচেলমোরকে পরাজিত করেছেন।

মহিলাদের সিঙ্গল্‌স ফাইনালে—মিসেস আর জি ম্যাক্‌-ইন্‌স্ ৬-২, ৬-৩ গেমে মিস্ হার্ভে জনষ্টনকে অতি সহজে পরাজিত করে বিজয়িনী হয়েছেন।

ডবল্‌স্ ফাইনালে—মিসেস ম্যাকইন্‌স্ ও মিস হোম্যান ১০-৮, ৬-৪ গেমে মিসেস এডনি ও মিসেস ফুটিটকে হারিয়ে বিজয়িনী হয়েছেন।

মিক্সড ডবল ফাইনালে—আর জি ম্যাক্‌ইনস্ ও মিসেস ম্যাক্‌ইন্‌স্ ৬-৩, ৬-২ গেমে এ সি ষ্টেডম্যান ও মিস হোম্যানকে হারিয়েছেন।



বেঙ্গল টেনিস চ্যাম্পিয়ন
এ সি বিটি (দিল্লী)



ইষ্ট ইণ্ডিয়া টেনিস চ্যাম্পিয়ন
এ সি ষ্টেডম্যান (নিউজিল্যাণ্ড)



ডুপ্লে
(ফ্রান্স)

ফাইনালের পথে :

স্টেডম্যান হারিয়েছেন	গউস মহম্মদ হারিয়েছেন—
জি বিরলাকে ৬-৩, ৭-৫	বি বড়ুয়াকে ৬-৪, ৬-০
হারদোয়ারীলালকে ৬-১, ৬-০	এ কে মিত্রকে ৬-১, ৬-৩
কচ্ছের যুবরাজকে ৬-৪, ৭-৫	সোহনলালকে ৬-২, ৩-৬, ৮-৬
ওয়াই সবুরকে ৬-২, ৬-৪	ডি এন কাপুরকে ৮-৬, ৮-৬
স্লিমকে ৬-১, ৪ ৬, ৬-১	
এস্ সি বিটিকে ৭-৫, ১০-১২, ৬-৪	

আন্তর্জ্জাতিক খেলার ফলাফল ঃ

সাল	বিজয়ী	বিজিত
১৯৩০	গ্রেট বৃটেন	ভারত



সি ই ম্যাল্‌ফ্রয় (নিউজিল্যাণ্ড)

১৯৩১	জাপান	ভারত
১৯৩২	ভারতবর্ষ	ইটালী
১৯৩৩	ভারতবর্ষ	পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া
১৯৩৪	জুকোশ্লোভিয়া	ভারতবর্ষ
১৯৩৫	(ড্র হয়েছে)	সেণ্ট্রাল ইউরোপ ও ভারতবর্ষ

ইণ্টার-ন্যাসনাল :—ভারতবর্ষ ৩-২ ম্যাচে ফ্রান্স-নিউজিল্যাণ্ডকে হারিয়ে ইণ্টার-ন্যাসনাল রবার লাভ হয়েছে।

সিঙ্গলস ফাইনালে—ভারতবর্ষ (গউস মহম্মদ) ৬-৪, ৭-৫ গেমে ফ্রান্সকে (জেঁ্যসিও) পরাজিত করেছে।

ভারতবর্ষ (সোহনলাল) ১-৬, ৬-৩, ৬-১ গেমে ফ্রান্সকে (ডুপ্রে) হারিয়েছে।

নিউজিল্যাণ্ড (এ সি ষ্টেডম্যান) ৬ ১, ৬-৩ গেমে ভারতবর্ষকে (সোহানি) হারিয়েছে।

ডবলস্ ফাইনালে—ভারতবর্ষ (এস এল আর সোহানি ও এইচ এল সোনি) ৬-৪, ৬-৪ গেমে ফ্রান্স ও নিউজিল্যাণ্ডকে (এ জেঁ্যসিও ও সি ই ম্যালফ্রয়) হারিয়েছে।

ফ্রান্স ও নিউজিল্যাণ্ড (ম্যালফ্রয় ও জেঁ্যসিও) ৬-২, ৩-৬, ৯-৭ গেমে ভারতবর্ষকে (ওয়াই সিং ও মিচেলমোর) পরাস্ত করেছে।

পলো ঃ

ইণ্ডিয়ান পলো এসোসিয়েশন চ্যাম্পিয়নসিপের সেমি ফাইনালের খেলায় বিং বয়েজ ৬-৫ গোলে ভূপালকে এবং জয়পুর ৮-৫ গোলে দারভাঙ্গাকে হারিয়ে উভয়ে ফাইনালে উঠে। ফাইনালে জয়পুর ৭-৬ গোলে বিং বয়েজকে হারিয়ে উপর্য্যুপরী পঞ্চমবার চ্যাম্পিয়ন হলো। রাও রাজা হন্ত সিং সর্ব্বোৎকৃষ্ট খেলেছেন, রক্ষণভাগে ও আক্রমণে।

কুস্তি ঃ

লক্ষ্ণৌতে রুমেনিয়ার কুস্তিগীর আর্নেল্ড কক্‌সিস্ লক্ষ্ণৌর জনপ্রিয় পালোয়ান সাদিকের কাছে পরাভূত হয়েছে। যুক্তপ্রদেশের একজিবিসনে কুস্তিটি হয়, মাননীয় গবর্ণর ও বেনারসের মহারাজার উপস্থিতিতে। মহারাজা প্রদত্ত কাপ্ গবর্ণর মহোদয় সাদিককে প্রদান করেন্।

ব্যাডমিণ্টন ঃ

নিখিল ভারত ব্যাড্‌মিণ্টন প্রতিযোগিতার ফলাফল :—

পুরুষদের সিঙ্গলস্ : বিজয়ী—জি লিউইস (লাহোর); বিজিত—টি ব্যানার্জ্জি (আওয়ার ক্লাব)। জি লিউইস ১৫-৩, ১৫-২ গেমে গত বৎসরের বিজয়ী ব্যানার্জ্জিকে পরাজিত করেছেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস্ : বিজয়িনী—মিস্ পি ঘোষ (য়ো য়ো ক্লাব), বিজিতা—মিস ডি স্যাণ্ডলে (য়ো য়ো ক্লাব)

পুরুষদের ডবলস : বিজয়ী—হাদওয়াৎ ও হরনরায়ন (অমৃতসর) ; বিজিত—লিউইস্ ও করতার সিং (লাহোর)

মহিলাদের ডবলস : বিজয়িনী—মিস পি ঘোষ ও মিস ডি স্যাণ্ডলে (য়ো য়ো ক্লাব) ; বিজিতা—মিসেস জেফ্‌রজ্ ও মিসেস রিথ্ (য়ো য়ো ক্লাব)

মিক্সড ডবলস : বিজয়ী—এন নাইট ও মিসেস ব্রিড্‌জেস (য়ো য়ো ক্লাব) ; বিজিত—ভি ওয়াল্টার্স ও মিসেস কে মিনোস (মেরী মেকার্স)

দ্বিতীয় টেষ্ট ঃ

ইংলণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়া ঃ

সিড্‌নেতে দ্বিতীয় টেষ্ট খেলা ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৩৬ আরম্ভ হয়ে ২২শে শেষ হয়েছে। ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ২২ রানে জয়লাভ করেছে।

ইংলণ্ড—৪২৬ (৬ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

অষ্ট্রেলিয়া—৮০ ও ৩২৪

সিডনেতে প্রথম টেষ্ট খেলা হয় ১৮৮১-৮২ সালে। সে টেষ্টে অষ্ট্রেলিয়া ৫ উইকেটে ইংলণ্ডকে হারায়।

সিড্‌নেতে উভয় পক্ষের ইনিংসে সর্ব্বোচ্চ রানের সংখ্যাঃ

ইংলণ্ডেরঃ	অষ্ট্রেলিয়ারঃ
১৯২৮-২৯ সালে…৬৩৬	১৮৯৪-৯৫ সালে…৫৮৬
১৯০৩-৪ ” …৫৭৭	১৯২০-২১ ” …৫৮১
১৮৯৭-৯৮ ” …৫৫৫	১৯০৩-০৪ ” …৪৮৫
১৯৩২-৩৩ ” …৫২৪	১৯২৪-২৫ ” …৪৫২
১৯০১-০২ ” …৪৬৪	১৯২৫-২৬ ” …৪৫০

সিড্‌নেতেই পতৌদীর নবাব খেলায় প্রথম অবতীর্ণ হয়ে শত রান করেছিলেন। এখানে হ্যামণ্ড ১৯২৮-২৯ সালে ২৫১, ১৯৩২-৩৩ সালে ১১২ ও ১০১ রান করেন এবং ১৯৩৬-৩৭ সালে ২৩১ (নট আউট) হয়েছেন।

ম্যাককাব্ ১৯৩২-৩৩ সালে ১৮৭ (নট-আউট) করেন। সাটক্লিফ্ ও হ্যামণ্ডে মিলে দ্বিতীয় উইকেটে রেকর্ড ১৮৮ রান তোলেন ১৯৩২-৩৩ সালে এই সিড্‌নেতে। কিন্তু ব্র্যাডম্যান এ পর্য্যন্ত সিড্‌নেতে একটিও সেঞ্চুরি করতে পারেন নি।

ইংলণ্ডের ৩০০ রান ৩৩২ মিনিটে ওঠে। হ্যামণ্ড ১৬৮ রান করলে এই টুরে তাঁর হাজার রান সংখ্যা পূর্ণ হয়। ১৬২ রান যখন তাঁর হলো তখন অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেষ্ট ম্যাচ খেলায় তাঁর মোট দু' হাজার রান করা হলো। ইতিপূর্ব্বে কেবল হব্‌স্ ও সাটক্লিফ্ এরূপ কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন। ২১৫ রানের মাথায় হ্যামণ্ড দু'বার সুযোগ দিয়েছিলেন, তিনি ৪৬৮ মিনিট খেলে মোট ২৩১ করেছেন। দ্বিতীয় দিনের শেষ বেলায় খেলা বৃষ্টির জন্য বন্ধ হয়।


হ্যামণ্ড (গ্লসেষ্টার)

তৃতীয় দিনে মাঝে মাঝে বারিপাত হওয়ায় উইকেট বিশ্বাস-ঘাতকতা করবে মনে করে এলেন ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করে দেন। অষ্ট্রেলিয়া ঐ রকম ভিজা মাঠে খেলে মাত্র ৮০ রানে সকলে আউট হয়ে যান। ব্র্যাডম্যান, ম্যাক্‌ক্যাব্, ও'ব্রায়ন ও ওয়ার্ড প্রত্যেকে 'ডাক্' করেন। ব্রাড্‌কক্ ব্যাট করেন নি। ফলো-অন্ করতে বাধ্য হয়ে অষ্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে মোট ৩২৪ রান করতে সক্ষম হয়।

প্রথম দিনের খেলায় ৩৫,১০৭ জন দর্শক উপস্থিত ছিল এবং দর্শন মূল্য পাওয়া গেছে ৩,৩৮৮·৬ পাউণ্ড।

ইংলণ্ড

দ্বিতীয় টেষ্ট—প্রথম ইনিংস্

ফ্যাগ্… কট সীভারস্, বোল্ড ম্যাককর্‌মিক্	১১
বার্ণেট…ব ওয়ার্ড	৫৭
হ্যামণ্ড……নট আউট	২৩১
লেল্যাণ্ড্ …এল্ বি ডবলিউ, ব ম্যাক্‌ক্যাব	৪২
এইম্‌স্… কট পরিবর্ত্ত, ব ওয়ার্ড	২৯
হার্ডষ্টাফ…ব ম্যাক্‌কর্‌মিক্	২৬
এলেন…এল্ বি ডবলিউ, ব ও'রিলী	৯
ভেরিটি………… নট আউট	০
অতিরিক্ত	২১
(৬ উইকেট)	৪২৬

বোলিং :—ম্যাক্‌করমিক্ ৭৯ রানে ৩, ওয়ার্ড ১৩২ রানে ২, ও'রিলি ৮৬ রানে ১, ম্যাক্‌ক্যাব ৩১ রানে ১ উইকেট।

অষ্ট্রেলিয়া

দ্বিতীয় টেষ্ট—প্রথম ইনিংস্

ফিঙ্গল্‌টন্···কট ভেরিটি, ব ভোস্	১২
ওব্রায়েন···কট সিম্‌স্, ব ভোস্	০
ব্র্যাডম্যান্···কট এলেন্, ব ভোস্	০
ম্যাক্‌ক্যাব···কট সিম্‌স্, ব ভোস্	০
চিপারফিল্ড···কট সিম্‌স্, ব এলেন্	১৩
সীভারস্···কট ভোস্, ব ভেরিটি	৪
ওল্ডফিল্ড···ব ভেরিটি	১
ও'রিলী············নট আউট	৩৭
ম্যাক্‌করমিক্·· ব এলেন	১০
ওয়ার্ড ··ব এলেন্	০
অতিরিক্ত	৩
মোট	৮০

ব্যাডকক্ ব্যাট করেন নি।

বোলিং :—ভোস ১০ রানে ৪, এলেন ১৯ রানে ৩, ভেরিটি ১৭ রানে ২ উইকেট।

অষ্ট্রেলিয়া

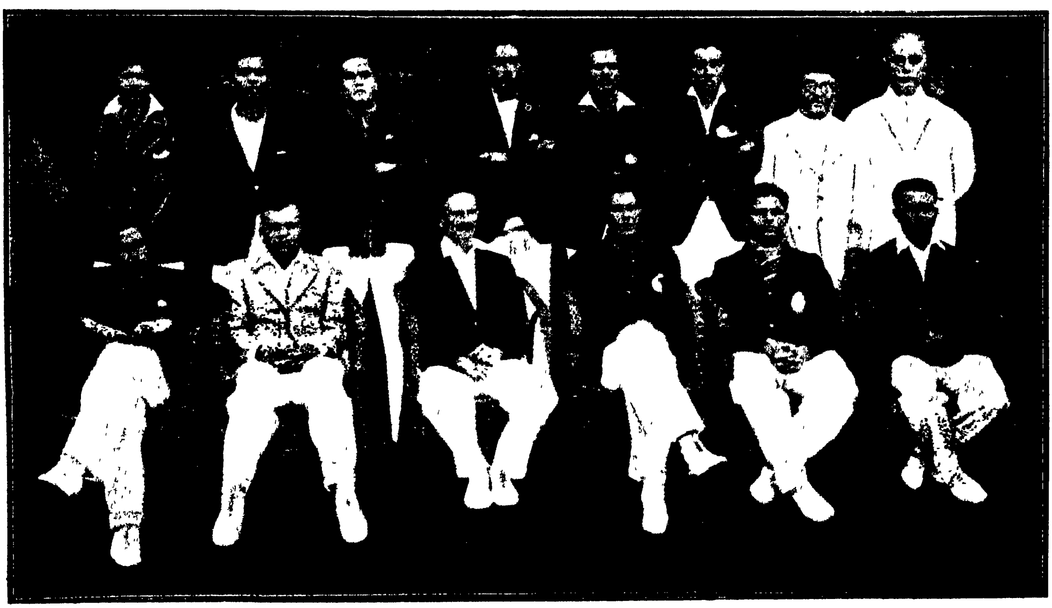
দ্বিতীয় টেষ্ট—দ্বিতীয় ইনিংস্

ফিঙ্গল্‌টন্···ব সিম্‌স্	৭৩
ওব্রায়েন···কট এলেন, ব হ্যামণ্ড	১৭
ব্র্যাডম্যান···ব ভেরিটি	৮২
ম্যাক্‌ক্যাব···এল বি ডবলিউ, ব ভোস্	৯৩
চিপারফিল্ড·· ব ভোস্	২১
ব্যাডকক···এল বি ডবলিউ, ব এলেন	২
সীভারস্···রান আউট	২৭
ওল্ডফিল্ড···কট, এইম্‌স্, ব ভোস্	১
ও'রিলী···ব হ্যামণ্ড	৩
ম্যাক্‌করমিক্···এল্ বি ডবলিউ, ব হ্যামণ্ড	০
ওয়ার্ড নট আউট	১
অতিরিক্ত	৭
মোট	৩২৪

বোলিং :—ভোস্ ৬৬ রানে ৩, এলেন ৬১ রানে ১, হ্যামণ্ড ২৯ রানে ৩, ভেরিটি ৫৫ রানে ১, সিম্‌স্ ৮০ রানে ১ উইকেট।

বোম্বাই কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেট ঃ

হিন্দু ও মস্‌লিমদলের খেলা ড্র হয়ে শেষ হয়। হিন্দুরা প্রথম ইনিংসের বেশী রান সংখ্যার জন্য ফাইনালে ওঠে।



বোম্বাই কোয়াড্রাঙ্গুলার বিজয়ী হিন্দু ক্রিকেট দল

হিন্দুদলের ক্যাপটেন দেওধর কেন যে মস্‌লিমদলকে ফলো-অন্ করতে বাধ্য করলেন না তা' বোঝা গেল না। ফলো-অন্ করালে তাঁরা ইনিংসে জয়ী হতে পারতেন। দেওধরের বাঁ হাতের ক'ড়ে আঙ্গুল ভেঙ্গে গেছে।

হিন্দু—৪০১ ও ২০২ (৫ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

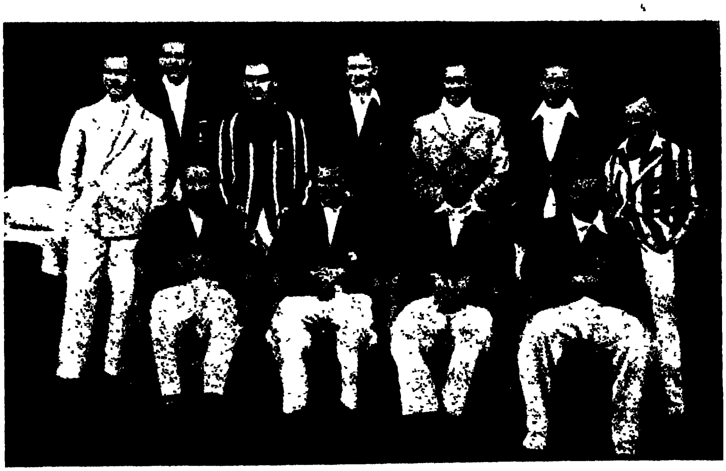
মস্‌লিম—১৫০ ও ১৭৫ (৯ উইকেট)

হিন্দু পক্ষে—প্রথম ইনিংস—মার্চ্চেণ্ট ৬৯, হিন্দেলকার ১৩৫, দেওধর ৫২, জয় ৪৯, দিবাকর ৩০। আমীর ইলাহী ৬৩ রানে ২, সাহাবুদ্দিন ৩০ রানে ১, এস আমেদ ৪১ রানে ১ ও মোবারক আলি ৬০ ১ উইকেট নিয়েছেন।

দ্বিতীয় ইনিংস—মার্চ্চেণ্ট (নট আউট) ১১০, অমরনাথ ২৫, মানকাদ ২৩, নওমল ১৮, ব্যানার্জ্জি ১০।

মস্‌লিম—প্রথম ইনিংস—মাস্তাক আলি ৫০, বাপোরিয়া ২০, মোবারক আলি ১৫। ব্যানার্জ্জি ৫৮ রানে ২, গোদাম্বে ২৭ রানে ৩, অমরনাথ ২১ রানে ৩, ভগবান দাস ৮ রানে ১ ও মানকাদ ২১ রানে ১ উইকেট পেয়েছেন।

দ্বিতীয় ইনিংস—কাদ্রি ৪০, সৈয়দ আহমেদ ২৫, বাপোরিয়া (নট আউট) ২৪, মোবারক আলি ২১। ব্যানার্জ্জি ২৯ রানে ৫, দিবাকর ৪৪ রানে ২, গোদাম্বে ৪৭ রানে ১ ও মানকাদ ৮ রানে ১ উইকেট পেয়েছেন।



বোম্বাই কোয়াড্রাঙ্গুলারে বিজিত ইউরোপীয় দল

সুটে ব্যানার্জ্জির মারাত্মক বোলিংএর কাছে মস্‌লিমরা দাঁড়াতে পারেনি। তিনি ১৭ ওভারে ৯টা মেডেন পেয়েছেন ও ২৯ রানে ৫টা—ওয়াজির আলি, আমির ইলাহী, মহম্মদ হুসেন, সাহাবুদ্দিন ও কামারুদ্দিনের উইকেট নিয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

ইউরোপীয়ান—৩১৩ ও ৭৭ (২ উইকেট)

পার্শি—২৮০ ও ২০১

খেলা ড্র হয়। ইউরোপীয়ানরা প্রথম ইনিংসের বেশী রানের জন্য ফাইনালে ওঠেন।

ইউরোপীয়ানদের—(প্রথম ইনিংস) সামার-হেজ ১০৯, ব্রোমলে ৯৬, লংফিল্ড ৩৩, ভ্যাণ্ডারগাচ্ ২৭। পল্‌সেটিয়া ৭৬ রানে ৩, এম প্যাটেল ১১৭ রানে ২, হাবেওয়ালা ৮৭ রানে ২ ও ভাবিজদার ৪১ রানে ১ উইকেট।

দ্বিতীয় ইনিংস—গ্রীয়ার (নট আউট) ৩২, সামার-হেজ ২২, স্কোফ্ ১৭।

পার্শিদের—(প্রথম ইনিংস) নরীম্যান ৫৬, কোলা ৫০, মিস্থ প্যাটেল (নট আউট) ২৮, জে বি প্যাটেল ৩১। ব্রোমলী ৪২ রানে ৩, মারে ৩৯ রানে ৩, লংফিল্ড ৬১ রানে ২, লারউড্ ২৬ রানে ১, ব্রাড্‌স' ৪৫ রানে ১ উইকেট।

দ্বিতীয় ইনিংস—ভাবিজদার ৫০, এম প্যাটেল ৩৬, কোলা ৩১। লংফিল্ড ৩৯ রানে ৩, ব্রাড্‌স' ২২ রানে ২, মারে ৫৪ রানে ২, ব্রোমলী ৩৮ রানে ২, লারউড্ ৪৩ রানে ০ উইকেট।

হিন্দু—২৯২ ও ৩১৬ (৭ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

ইউরোপীয়ান—১৪৮ ও ১৬৩

কোয়াড্রাঙ্গুলার ফাইনাল

হিন্দুদের সঙ্গে ইউরোপীয়ানদের খেলা হয়। হিন্দুরা ২৫৭ রানে বিজয়ী হয়েছেন। হিন্দুদের এই জয়ের বিশেষ কৃতিত্ব আছে, কারণ ইউরোপীয়ানদের পক্ষে অষ্ট্রেলিয়ার ও ইংলণ্ডের বিখ্যাত খেলোয়াড়—ব্রোমলী, স্কেফ্ ও লারউড খেলেছিলেন। বডি-লাইন-খ্যাত বোলার লারউড মাত্র

একটি উইকেট ৪৩ রানে নিতে পেরেছেন। প্রথম ইনিংসে ব্যানার্জ্জি ৭৩ রানে ৪ উইকেট ও দ্বিতীয় ইনিংসে অমর সিং ৫৪ রানে ৮ উইকেট নিয়েছেন।

অমরনাথ ৭৪, এস ব্যানার্জ্জি ৫১, ভিন্নু মানকাদ ৪১, মার্চ্চেণ্ট ৩২, নওমল ২৬, জয় ২২।

লংফিল্ড ৪২ রানে ৪, টেরাণ্ট ৬৪ রানে ৩ উইকেট।

দ্বিতীয় ইনিংসে—মার্চ্চেণ্ট ১৩০, ভগবান দাস ৭৬, অমরনাথ ৪৩, অমর সিং ৩৬, জয় ২০।

লংফিল্ড ৭৩ রানে ২, ব্রোমলী ৯৮ রানে ২।

টেরাণ্ট ৭৮, ব্রোমলী ৫৬, হপ্‌কিন্স ৪৭, গ্রীয়ার ২৩। ব্যানার্জ্জি ৭৩ রানে ৪, অমরনাথ ৩৯ রানে ৩, গোদাম্বে ১৮ রানে ২।

দ্বিতীয় ইনিংস—সামার-হেজ ৩৬, লংফিল্ড ৩২, স্কেফ ২১, টেরাণ্ট ১৮। অমর সিং ৫৪ রানে ৮ উইকেট।

রঞ্জি ট্রফী ঃ

আন্তঃপ্রাদেশিক খেলায় বাঙ্গলা ৮ উইকেটে বিহারকে হারিয়েছে। বাঙ্গলা এবার মধ্যভারতের সঙ্গে পূর্ব্ব 'জোনের' সেমিফাইনালে খেলবে।



মহারাজা পাতিয়ালা প্রদত্ত
রঞ্জী ট্রফী

বাঙ্গলা—৮৯ ও ১৫২ (২ উইকেট)

বিহার—১১৩ ও ১২৭

তিনদিনের খেলা দু'দিনেই শেষ হয়েছে। প্রথম দিনেই প্রত্যেকের এক ইনিংস শেষ হয়। ১৫২ রান হলে জিত হবে, বাঙ্গলা দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলে ২-৫০ মিনিটে। কে বোস প্রথম ৫টা মারই বাউণ্ডারী করলেন, তাঁর ড্রাইভিং, কাটিং, পুলিং অত্যন্ত দর্শনীয় হয়েছিল। ক্যাপটেন হোসী এসে কে ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে যোগ দিয়ে অতি সুন্দর খেলে ৬০ রান করে তাড়াহুড়ো করায় আউট হলেন। তখন মাত্র ২ রান বাকী, জি বোস এসে দু'য়ের বাড়ি দিয়ে বাঙ্গলাকে জয়ী করে দিলে।

বাঙ্গলার পক্ষে—প্রথম ইনিংসে—পি ডি দত্ত ৩৩ রানে ৫, বেরেণ্ড ৪১ রানে ৩ উইকেট; দ্বিতীয় ইনিংসে—বেরেণ্ড ২৯ রানে ৫, পি ডি দত্ত ৩৯ রানে ৪ উইকেট।

বিহারের পক্ষে—প্রথম ইনিংসে—জে দাসগুপ্ত ১৮ রানে ৬, আর ব্রুক ৩১ রানে ৩; দ্বিতীয় ইনিংসে—জে দাস গুপ্ত ৪৯ রানে ১ ও এস চক্রবর্ত্তী ৪৬ রানে ১ উইকেট।

অষ্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট ঃ

(৯) **এম সি সি**—৪০৬
কুইন্সল্যাণ্ড কাণ্ট্রি—৩০০ ও ১২৪

খেলাটি সময়াভাবে ড্র হয়েছে। ইহা প্রথম শ্রেণীর খেলা নহে। ভোস এক ওভারে ৩০ রান, ৫টিই ছয়, করেছেন। হ্যামণ্ড শতরান ৪৮ মিনিটে করেন, তার মধ্যে ৯টা ছয় ও ১০টা চার ছিল। তাঁর ছয়ের মারে মাঠের বাইরে মোটর ও বাড়ীর টিনের ছাত জখম হয়েছে। এ খেলায় কয়েকটি অপ্রচলিত ব্যাপারও ঘটেছে। ভোস ক্লান্ত হলে ওয়েড উইকেট রক্ষা করতে আসে এবং জেরার্ডের আঙ্গুলে লাগায় ব্লাক্‌বার্ণ তার হয়ে ব্যাট করে। হ্যামণ্ড ১০৯, ওয়ার্দিংটন ৭২, ফ্যাগ ৪৬, ভোস ৩৯।



এ ফ্যাগ (কেণ্ট)

কুইন্সল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসে—টি এলেন ১১৮, ম্যাদার্ণ ৬২, ডি এলেন (নট-আউট) ২৮; দ্বিতীয় ইনিংসে—কক্‌বার্ণ ৩৩, ম্যাদার্ণ ৩৩, টি এলেন ২৩।

(১০) এম সি সি—১৭৮ (৪ উইকেট)
নিউ সাউথ ওয়েলস্ কান্ট্রি একাদশ—১৮৮
(৪ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

দু'দিনের খেলা, প্রথম দিন বৃষ্টির জন্য হয় নি। দ্বিতীয় দিনে খেলা হয়ে সময়াভাবে ড্র হয়েছে। ফ্যাগ ৬৭ রান করেন।

তৃতীয় টেষ্ট ঃ

ইংলণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়া ঃ

১লা জানুয়ারী থেকে ৭ই পর্য্যন্ত ৬দিন ব্যাপী তৃতীয় টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ৩৬৫ রানে ইংলণ্ডকে হারিয়েছে। ইংলণ্ড এখনও এক ম্যাচে জিতে রইলো। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্র্যাডম্যানের ২৭০ ও ফিঙ্গলটনের ১৩৬ এবং প্রথম ইনিংসে ম্যাক্ক্যাবের ৬৩ রান অষ্ট্রেলিয়াকে জয়ের পথে এগিয়ে দিলে। বোলিংএ প্রথম ইনিংসে সীভারস্ ও ও'রিলী এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ফ্লিটউড-স্মিথ ও ও'রিলী পর্য্যায়ক্রমে ৫টি ও ৩টি উইকেট নেওয়ায় ইংলণ্ডের পরাজয় সম্ভব হয়েছে।

বরুণদেব এবারও টেষ্ট খেলায় জয়-পরাজয়ের বিশেষ কারণ হয়েছেন। পূর্ব্ব দু' টেষ্টে বরুণদেব ইংলণ্ডের পক্ষে ছিলেন, এবার তিনি, যস্মিন পক্ষে জনার্দ্দন হয়ে—অষ্ট্রেলিয়াকে সহায়তা করেছেন। ২৯শে জানুয়ারী, এডেলেডে চতুর্থ টেষ্টের উপর অষ্ট্রেলিয়ার ভাগ্য সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। নিশ্চিত পরাজয় সম্মুখে করেও দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলণ্ড বেশ সাহস ও কৃতিত্বের সঙ্গে যুঝেছে। এ যুদ্ধের বীর—লেল্যাণ্ড, তিনি অতি নৈপুণ্য সহকারে অষ্ট্রেলিয়ার বোলিংয়ের বিপক্ষে ১১১ রান তুলে শেষ পর্য্যন্ত নট-আউট ছিলেন, যখন হ্যামণ্ডও ৫১র বেশী রান তুলতে পারেন নি।



ডোলাল্ড জর্জ্জ ব্র্যাডম্যান—২৭শে আগষ্ট ১৯০৩ সালে নিউ সাউথ ওয়েলসের কুটামুণ্ড্রাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯২৭ সাল থেকে ক্রিকেট খেলতে আরম্ভ করেন। দু' বৎসর বয়সে সিড্নে থেকে ৮০ মাইল দূরবর্ত্তী বাউরালে যেখানে তাঁর পিতা সূত্রধরের ব্যবসা করতেন তথায় তাঁর বাল্যকাল কাটে

অষ্ট্রেলিয়া—২০০ (৯ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) ও ৫৬৪
ইংলণ্ড—৭৬ (৯ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) ও ৩২৩

নব বর্ষের প্রথম দিনে তৃতীয় টেষ্ট খেলা আরম্ভ হলো মেলবোর্ণের রৌদ্রোজ্জ্বল মাঠে ষাট হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে, মাঠ যদিও নরম ছিল। অষ্ট্রেলিয়ার আরম্ভ ভালো হয় নি, ব্রাউন এক রান করে গেলেন উইকেট-রক্ষকের হাতে। ব্র্যাডম্যান এবারও কৃতিত্ব দেখাতে পারলেন না ১৩ করে ভেরিটির বলে স্কোয়ার-লেগে রবিনসের হাতে আটকালেন। একমাত্র ম্যাক্ক্যাব দর্শনীয় ও আনন্দকর খেলা দেখিয়েছেন। স্কোর খুব ধীরে ধীরে উঠছিল, ১৫০ রান ২২৩ মিনিটে। ইংলণ্ডের বিপক্ষে অষ্ট্রেলিয়ার উইকেট-রক্ষক হিসাবে ওল্ডফিল্ড এবার ৩৬ সংখ্যক টেষ্ট খেলে ব্লাকহামের রেকর্ড ভঙ্গ করলেন। আলো অভাবে খেলা কিছু পূর্ব্বেই বন্ধ হ'লো, অষ্ট্রেলিয়া ৬ উইকেট খুইয়ে ১৮১ রান করেছে। দর্শক সংখ্যা উঠেছে ৭৮,৬৩০, টিকিটের মূল্য ৭,১২৬ পাউণ্ড পাওয়া গেছে।

পরদিন সকাল ১০টাতেও বারিপাত হওয়ায় খেলা আড়াইটায় আরম্ভ হলো। বৃষ্টির জন্য ব্যাটস্‌ম্যানদের সমূহ বিপদ ও বোলারদের অপূর্ব্ব সুযোগ হয়েছে। ব্র্যাডম্যান অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করলেন—ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করে দিলেন ৯ উইকেটে ২০০ রানে, ২৮৩ মিনিট খেলার পর। ইংলণ্ডের ইনিংস আরম্ভ হলো, ওয়ার্দ্দিংটন কিছু না করেই গেলেন, বার্ণেটও গেলেন ১৪ রানের মাথায়। হ্যামণ্ড ও

লেল্যাণ্ড মিলে উইকেট কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখলেন। লেল্যাণ্ড ১৭ ও হ্যামণ্ড ৩২ রানে গেলে বাকী ব্যাটস্‌ম্যানগুলি ৩টা 'ডাক্' ও ৩টা ৩ করে আউট হ'লো। ইংলণ্ডও ৯ উইকেটে তাদের ইনিংস মোট ৭৬ রানে ডিক্লেয়ার্ড করে দিলে ১১৬ মিনিট খেলবার পর, এই আশায় যে ঐ রকম বিপজ্জনক উইকেটে অষ্ট্রেলিয়াকেও তাদের মত অবস্থায় ফেলবে। অষ্ট্রেলিয়ার গ্রাউণ্ড ফিল্ডিং অত্যন্ত সুন্দর এবং সীভারস্ ও ও'রিলীর বল অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়েছে।

ব্র্যাডম্যান দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলে ও'রিলী ও ফ্লিটউড্-স্মিথকে দিয়ে। ও'রিলী শূন্য করে গেলো। আলো অভাবে ও আবার বারিপাতের জন্য খেলা সেদিন ৫-৪০ মিনিটে বন্ধ হলো।

তৃতীয় টেষ্টের তৃতীয় দিন আরম্ভ হলো মেঘেভরা আকাশতলে। উইকেটের অবস্থা অনেকাংশে উন্নত হয়েছে। ফ্লিটউড কিছু না করেই গেলেন। চায়ের আগে আবার খেলা উপভোগ্য হয়েছিল। ব্রাউন ও রিগে সতর্কতার সঙ্গে খেলে ৫০ রান তুললে ৮৮ মিনিটে। রিগ ৪৭ রান করে গেলে ব্র্যাডম্যান এসে ফিঙ্গলটনের সঙ্গে জুটি হলেন। চা পানের সময় রান উঠলো ১৪৯। ৪-২০তে খেলা আরম্ভ হয়ে ৫ মিনিট পরে বৃষ্টির জন্যে বন্ধ হলো। ১৫০ রান উঠ্‌লো ১৮৪ মিনিটে।

৫-১৫ মিনিটের সময় যখন খেলা আরম্ভ হলো, এলেন বল দিতে গেলে, ব্র্যাডম্যান জানালেন যে ভোসের ওভারের তিনটি বল তখনও বাকী। ব্র্যাডম্যানও ভুল করে নিজে খেলা আরম্ভ করেন, খেলবার কথা কিন্তু ফিঙ্গলটনের। এতদিন পরে ব্র্যাডম্যানের ক্রিকেট-প্রতিভা যেন ফিরে এসেছে। তিনি নিজস্ব ৫০, ৮৫ মিনিটে তুলেছেন। বেলা শেষে অষ্ট্রেলিয়ার ৫ উইকেটে ১৯৫ রান উঠেছে—ব্র্যাডম্যান ১০০ মিনিটে ৫৬ ও ফিঙ্গলটন ১২২ মিনিটে ৩৯ করে নট আউট রইলেন।



টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ফিল্ড করতে মাঠে নামছেন

বৃষ্টি পড়্‌লো। রিগ্ ও ওয়ার্ড মিলে ৩৫ রান যোগ করলে, ওয়ার্ড ১৮ রান করে হার্ডষ্টাফের হাতে আটকালেন। রিগের

চতুর্থ দিন খেলতে নামলেন ব্র্যাডম্যান ও ফিঙ্গলটন, আকাশ মেঘে ভরা, বাতাস ঠাণ্ডা। এই জুটির ১০০ রান

১২৭ ও ১৫০ রান ১৮৪ মিনিটে এবং ইনিংসের মোট ২০০ রান ২৫২ ও ২৫০ রান ৩২৩ মিনিটে উঠ্‌লো। ব্র্যাডম্যানের 'টাইমিং'এ নিখুঁত, ফুটওয়ার্ক উৎকৃষ্ট, উইকেটের চতুর্দ্দিকে অবাধে পিটেছেন। তাঁর 'লেগ্-গ্লান্‌সিং' সত্যই আনন্দদায়ক। অতি সুন্দর ফিল্ডিং তাঁর স্কোরের গতিকে অনেকটা কমিয়েছে। দুই খেলোয়াড়ের ষ্টাইল সম্পূর্ণ বিভিন্ন—ফিঙ্গলটন ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি, বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে প্রত্যেক মারটি দিয়েছেন, ব্র্যাডম্যান দ্বিধাহীন সাহসী, দুঃসাহসী হয়ে চমকপ্রদ খেলেছেন। তাঁর নিজস্ব দ্বিশত রান—ত্রুটিহীন ও দীপ্তিময়, ৩৫৪ মিনিটে হয়েছে। ফিঙ্গলটন ৪৪৩ রানের মাথায় নিজের ১৩৬ রান করে এইম্‌সের হাতে আটকালেন ৩৮৬ মিনিট খেলে, ৬টা চার ছিল। ম্যাকক্যাব এলেন, এবং বাকী ৩৩ মিনিটে উভয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ৫৭ রান তুললেন। অষ্ট্রেলিয়া ৫৬৬ মিনিট ব্যাট করে রান তুলছে ৫০০—৬ উইকেটে। অদ্যকার দর্শক সংখ্যা ৬৪, ৮২৬ এবং দর্শনী ৫,২৯৭ পাউণ্ড। চার দিনের মোট দর্শক সংখ্যা ২৯৬,৪৮৯ এবং দর্শনী ২৫,৩৯৩ পাউণ্ড—উভয়ই নূতন রেকর্ড।

দু'টি রেকর্ড ভঙ্গ হয়েছে। আর্ম্মষ্ট্রং ও কেলিতে মিলে ৬ষ্ঠ উইকেটে ১৮৭ রান করেছিলেন ১৯২০-২১ সালে, এবার তা' ভাঙ্গলো। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে ১৯১১-১২ সালে মেলবোর্ণে হবস্‌ ও রোডসে মিলে ৩২৩ করেছিলেন, এবার ব্র্যাডম্যান ও ফিঙ্গলটনে মিলে ৩৪৬ রান করলেন ৩৬৪ মিনিটে।

পঞ্চম দিনে ম্যাকক্যাব ২২ করে গেলেন, সীভারস্‌ ও ব্র্যাডম্যানে ৩৮ রান তুললেন। এর পরে ব্র্যাডম্যান ভেরিটির বল পিটতে গিয়ে বল খুব উঁচুতে ওঠাতে 'মিড্-অনে' এলেনের হাতে 'ক্যাচ' হলেন ৪৫৮ মিনিট খেলে ২৭০ রান করে। ব্র্যাডম্যানের দু'দিন থেকে সামান্য ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল বলে আজ সকালে জানা গেছে। তাঁর খেলা অসুস্থ অবস্থাতেও অত্যন্ত চমকপ্রদ ও প্রশংসার্হ হয়েছিল সে বিষয় কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। ওল্ডফিল্ড আউট হলে অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ৫৬৪ রানে শেষ হলো।



ভেরিটি (ইয়র্কসায়ার)

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করে শেষ বেলা পর্য্যন্ত ২১৬ মিনিট খেলে ৬ উইকেটে ২৩৬ রান তুললে। ব্র্যাডম্যান ফিল্ড করেন নি, তার বদলে ব্যাডকক্ নেমেছেন। হ্যামণ্ড ও লেল্যাণ্ডে মিলে ১০০ রান তুললে ১০৯ মিনিটে। ১১৭ রানের মাথায় সীভারস্‌ হ্যামণ্ডের ষ্ট্যাম্প উড়িয়ে দিলে যখন তিনি ৫১ করেছেন। এইম্‌স্ আউট হবার পরে হার্ডষ্টাফ্ পিটিয়ে ১৬ মিনিটে ১৭ রান তুললেন। এলেন ১১ করে সীভারসের হাতে আটকালেন। রবিনস্‌ ও লেল্যাণ্ডে ২৫০ রান তুললে ২২৩ মিনিটে, ৩০০ উঠলো ২৫২ মিনিটে। খুব দ্রুত রান উঠ্‌ছে, উভয়ে মিলে দারুণ পিটিয়ে ৫০ তোলেন ২৫ মিনিটে এবং ১০০ রান ৫৯ মিনিটে। শেষ পর্য্যন্ত লেল্যাণ্ড ১১১ করে নট-আউট রইলেন। ইংলণ্ডের ইনিংস শেষ হলো ৩২৩এ।



লেল্যাণ্ড (ইয়র্কসায়ার)



আর রবিনস্‌ (মিডলসেক্স)

মেলবোর্ণের মাঠে অধিক সংখ্যক রানের তালিকা :

অষ্ট্রেলিয়ার		ইংলণ্ডের	
১৯২৪-২৫ সালে	৬০০	১৯১১-১২ সালে	৫৮৯
১৮৯৭-৯৮ সালে	৫২০	১৯২৪-২৫ সালে	৫৪৮
১৯২০-২১ সালে	৪৯৯	১৯২৮-২৯ সালে	৫১৯
১৮২৮-২৯ সালে	৪৯১	১৯২৪-২৫ সালে	৪৭৯
		১৮৯৪-৯৫ সালে	৪৭৫

তৃতীয় টেষ্ট—প্রথম ইনিংস

জে এইচ ফিঙ্গলটন…কট, সিমস, ব রবিনস্	৩৮
ডবলিউ এ ব্রাউন…কট এইমস্, ব ভোস	১
ডি জি ব্র্যাডম্যান…কট রবিন্‌স, ব ভেরিটি	১৩
কে ই রিগ…কট ভেরিটি, ব এলেন	১৬
এস জে ম্যাক্‌ক্যাব…কট ওয়ার্দ্দিংটন, ব ভোস	৬৩
এল এস ডারলিং…কট এলেন, ব ভেরিটি	২০
এম সীভারস্…ষ্টাম্পড এইমস্, ব রবিনস্	১
ডবলিউ এ ওল্ডফিল্ড… নট আউট	২৭
ডবলিউ ও'রিলী…কট সিমস্, ব হ্যামণ্ড	৪
এফ ওয়ার্ড…ষ্টাম্পড এইমস্, ব হ্যামণ্ড	৭
অতিরিক্ত	১০
(৯ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)	২০০

বোলিং : ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস

হ্যামণ্ড ১৬ রানে ২, ভেরিটি ২৪ রানে ২, রবিনস্ ৩১ রানে ২, ভোস ৪৯ রানে ২ ও এলেন ৩৫ রানে ১ উইকেট।

অষ্ট্রেলিয়া

তৃতীয় টেষ্ট—দ্বিতীয় ইনিংস

ডবলিউ ও'রিলী…কট ও ব ভোস	০
ফ্লিট্‌উড-স্মিথ…কট ভেরিটি, ব ভোস	০
এফ ওয়ার্ড…কট হার্ডষ্টাফ, ব ভেরিটি	১৮
কে ই রিগ…এল-বি (নূতন), ব সিমস্	৪৭
ডবলিউ ব্রাউন…কট বার্ণেট, ব ভোস	২০
জে এইচ ফিঙ্গলটন…কট এমস্, ব সিমস্	১৩৬
ডি জি ব্র্যাডম্যান…কট এলেন, ব ভেরিটি	২৭০
এল এস ডার্লিং…ব এলেন	০
এস ম্যাক্‌ক্যাব…এল-বি (নূতন), ব এলেন	২২
এম ডবলিউ সীভারস্… নট-আউট	২৫
ডবলিউ ওল্ডফিল্ড…এল বি ডবলিউ, ব ভেরিটি	৭
অতিরিক্ত	১৯
মোট	৫৬৪

বোলিং : ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস

ভেরিটি ৭৯ রানে ৩, ভোস ১২০ রানে ৩, এলেন ৮৪ রানে ২ ও সিমস্ ১০৯ রানে ২ উইকেট।

ইংলণ্ড

তৃতীয় টেষ্ট—প্রথম ইনিংস

ওয়ার্দ্দিংটন… কট ব্র্যাডম্যান, ব ম্যাক্‌ক্যাব	০
বার্ণেট…কট ডারলিং, ব সীভারস্	১১
হ্যামণ্ড…কট ডারলিং, ব সীভারস্	৩২
লেল্যাণ্ড…কট ডারলিং, ব ও'রিলী	১৭
সিম্‌স্…কট ব্রাউন, ব সীভারস্	৩
এইম্‌স্…ব সীভারস্	৩
রবিনস্…কট ও'রিলী, ব সীভারস্	০
হার্ডষ্টাফ…ব ও'রিলী	৩
এলেন… নট আউট	০
ভেরিটি…কট ব্রাউন, ব ও'রিলী	০
অতিরিক্ত	৭
(৯ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)	৭৬

বোলিং : অষ্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস

সীভারস্ ২১ রানে ৫, ও'রিলী ২৮ রানে ৩ ও ম্যাক্‌ক্যাব ৭ রানে ১ উইকেট।

ইংলণ্ড দল

তৃতীয় টেষ্ট—দ্বিতীয় ইনিংস

ওয়ার্দ্দিংটন…কট সীভারস্, ব ওয়ার্ড	১৬
বার্ণেট…এল বি ডব্লিউ, ব ও'রিলী	২৩
হ্যামণ্ড…ব সীভারস্	৫১
লেল্যাণ্ড… নট আউট	১১১
এইম্‌স্…ব ফ্লিটউড-স্মিথ	১৯
হার্ডষ্টাফ…কট ওয়ার্ড, ব ফ্লিটউড-স্মিথ	১৭
এলেন…কট সীভারস্, ব ফ্লিটউড-স্মিথ	১১
আর রবিন্‌স্…ব ও'রিলী	৬১
ভেরিটি…কট ম্যাক্‌ক্যাব, ব ও'রিলী	১১
সিমস্…এল-বি (নূতন), ব ফ্লিটউড-স্মিথ	০
ভোস…কট ব্র্যাডম্যান, ব ফ্লিটউড-স্মিথ	০
অতিরিক্ত	৩
মোট	৩২৩

বোলিং : অষ্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস

ফ্লিটউড-স্মিথ ১২৪ রানে ৫, ও'রিলী ৫৫ রানে ৩ ও সীভারস্ ৩৯ রানে ১ উইকেট।

ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড :

১০টি সেঞ্চুরী ইংলণ্ডের বিপক্ষে—
৪টি সেঞ্চুরী দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে—
৪টি ডবল সেঞ্চুরী ইংলণ্ডের বিপক্ষে—
২টি ডবল সেঞ্চুরী দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে—
২টি ত্রিপল সেঞ্চুরী ইংলণ্ডের বিপক্ষে—
১টি ত্রিপল সেঞ্চুরী করতে বিরত হন—২৯৯ (নট আউট) থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে—
২৫টি ডবল সেঞ্চুরী ও ততোধিক রান করেছেন এপর্য্যন্ত—
৪টি টেষ্টে সেঞ্চুরী ইংলণ্ডের বিপক্ষে মেলবোর্ণে— অর্থাৎ প্রত্যেক বারই যখন টেষ্টে নেমেছেন।
(হব্স্ অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৫টি করেছিলেন মেলবোর্ণে)
পৃথিবীর রেকর্ড—৪৫২ নট আউট করেছেন
ইংলণ্ডে পঞ্চম টেষ্টে একদিনে ২৪৪ রান তুলেছেন—
ইংলণ্ডের বিপক্ষে টেষ্টে সর্ব্বোচ্চ স্কোর ৩৩৪ করেছেন—

মেলবোর্ণের মাঠে টেষ্টে সেঞ্চুরীর তালিকা :

ব্র্যাডম্যানের		হ্যামণ্ডের	
১৯২৮-২৯ সালে	১১২ ও ১২৩	১৯২৮-২৯ সালে	২০০
১৯৩৩-৩৪ সালে	১০৩	লেল্যাণ্ডের	
	(নট আউট)	১৯২৮-২৯ সালে	১৩৭

জে বি হব্সের ৫টি সেঞ্চুরী :—

১২৬ (নট আউট), ১৭৮, ১২২, ১৫৪ ও ১৪২

সাট্‌ক্লিফের ৪টি সেঞ্চুরী :—

১৭৬, ১২৭, ১৪৩ ও ১৩৫

ইউনিভারসিটি ট্রেনিং কোর্ ঃ

এ বৎসর পূজার ছুটিতে মেজর এন্, সি, জ্যাক্‌সনের অধিনায়কত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিং কোরের তাঁবু জসিদি আর বৈদ্যনাথ ধামের মধ্যে বাঘমারায় পড়েছিল। জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং একদিন পরিদর্শনে গিয়েছিলেন।

সাধারণ কুচ্‌কাওয়াজ ছাড়া কয়েকটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান এ বছর হয়েছিল;—(১) শপথ গ্রহণ (২) কৃত্রিম যুদ্ধ (৩) যুদ্ধ-বিরতি দিবস পালন (৪) নগর পরিভ্রমণ (৫) পরিদর্শন কুচকাওয়াজ (৬) গুলি বর্ষণ। এ-ছাড়া ছাত্রদিগের মধ্যে একদিন স্পোর্টসেরও ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল।

মাননীয় ভাইস্ চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও একদিন ছাত্রদিগের কুচ্‌কাওয়াজ পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন।



জি ও সি ইউনিভারসিটি কোর পরিদর্শন করছেন

বিলিয়ার্ড ঃ

১৯৩৭ সালের এমেচার বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়নসিপ বিজয়ী হলেন এম এম বেগ গতবারের বিজয়ী প্রতুষদেবকে ৩০৮ পয়েণ্টে পরাজিত করে। প্রথম দিনের দু' সেসনের খেলার শেষ ফলাফল—বেগ : ১১৮৩ ; দেব : ৮৬৯। দ্বিতীয় দিনে ৩১৪ পয়েণ্টে অগ্রগামী বেগ তৃতীয় সেসনের শেষে ৫৭১ পয়েণ্টে এগিয়ে গেলেন। শেষ সেসনে, মাত্র দু' ঘণ্টা সময়ে প্রায় ৬০০ পয়েণ্টের ন্যূনতা সমান করা দুরূহ ব্যাপার। দেব অতি সুন্দর খেলে ঐ বিপুল ঘাটতি কতকটা কমাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ভাইন্‌স্ পেরীকে গিলবে ঃ

প্রবীন টেনিস খেলোয়াড় টিলডেন, তিনবার উইম্বলডন-বিজয়ী ভূতপূর্ব্ব-অবৈতনিক অধুনা-প্রফেসনাল টেনিস খেলোয়াড় বিখ্যাত ফ্রেডপেরী ও প্রফেসনাল খেলোয়াড় ভাইন্‌সের মধ্যে আগামী ম্যাচ খেলার সম্বন্ধে মতামতে বলেছেন,—"ভাইন্‌স্ যে কেবল বিজয়ী হবে তা নয়, অতি সহজেই সে জয়ী হবে, তিনটি সেটেই। ভাইন্‌স্ প্রফেসনাল খেলোয়াড় হবার পরে তার যা কিছু দোষ ছিল সব সংশোধন করেছে। বর্ত্তমানে জগতে একটিও খেলোয়াড় নেই যে তাব সমযোগ্য হতে পারে। ভাইন্‌স্ এক কথায় —'পেরীকে গিলে ফেলবে'। তবে আমি বলছি না যে পেরী কখনই ভাইন্‌স্‌কে হারাতে পারবে না। নামকরা প্রফেসনাল খেলোয়াড়দের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় খেলতে খেলতে সময়ে সে ভাইন্‌সের সম-যোগ্যতার্জ্জন করতে পারবে, তখন তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটবে। আমার মতে উপস্থিত ভাইন্‌স্‌ই সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ।"

মনে পড়ে, সাংহাইয়ে দু'টি একজিবিশন খেলাতেই টিলডেন ভাইন্‌সের কাছে দাঁড়াতেই পারেন নি, প্রত্যেক খেলাতেই চার সেটে হেরেছিলেন।

কলিকাতায় ক্রিকেট ঃ

স্পোর্টিং ইউনিয়ন—২৫২ (৪ উইকেট)

এরিয়ান—৭৫

৬ উইকেটে স্পোর্টিং জয়ী হয়েছে। জি বসু ১০০, এন চ্যাটার্জ্জি ৯১, কে বসু (নট আউট) ১৮।

কুচবিহার—১৬১ (৬ উইকেট)

কলিকাতা ক্লাব—১৯১ (৪ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

খেলা ড্র হ'য়েছে। কলিকাতার গোয়ার্ড ৫৭, গিলবার্ট (নট আউট) ৮১, লং ফিল্ড ২৪।

কুচবিহারের এ কামাল ৯৬, মহারাজা ২৩।

দ্বিতীয় খেলায় কলিকাতা ক্রিকেট ক্লাব ৮ উইকেটে জিতেছে। কুচবিহার—১৫৮, কলিকাতা ক্রিকেট ক্লাব—১৬৪ (৩ উইকেট)

এরিয়ান—২৪৯ (৩ উইকেট)

ক্যালকাটা—১০০

এরিয়ান ১৪৯ রানে জয়ী হয়েছে। ইহাদের প্রথম খেলাটিতে এরিয়ান পরাজিত হয়েছিল। সুনীল বোসের ব্যাটিং বিশেষ প্রশংসনীয় হয়েছিল। সুনীল বসু (নট আউট) ১০০, কে ভট্টাচার্য্য ৫৩, বি মিত্র (নট আউট) ৩৯, এস মজুমদার ৩০।

বোলিংএ বিমল মিত্র ১৬ রানে ৩, এস চ্যাটার্জ্জি ২২ রানে ৪, কে ভট্টাচার্য্য ১৩ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন।

ব্রিটিস্ স্কুল—২৪৬ (৩ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

ইউরোপীয়ান স্কুল—৭০ ও ৭৭

ব্রিটিস স্কুল এক ইনিংস ও ৯৯ রানে জয়ী হয়েছে। মিলার (নট আউট) ১৩৬, বেরেণ্ড ৫৭, কার্টার (নট আউট) ১৫, স্কিনার ১২, জ্যাকসন ৫।



লংফিল্ড (ক্যাপটেন)
ব্রিটিস্ স্কুল

ইউরোপীয়ান স্কুলের কেহই ভাল ব্যাট করতে পারেন নি, গুর্‌লে, লংফিল্ড ও বেরেণ্ডের বোলিংএর বিরুদ্ধে। গুর্‌লে ২৬ রানে ৭ ও ২৯ রানে ৩, লংফিল্ড ৩৬ রানে ৪, বেরেণ্ড ১২ রানে ২ ও ৫ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন।

আলিগড় ইউনিভারসিটি—১৩৯

রসিদের একাদশ—১৬১

খাঁ সাহেব রসিদের একাদশ ২২ রানে জয়ী হয়েছে। দলের প্রথম অর্দ্ধেক সেরা খেলোয়াড়—পালিয়া, জি বোস, কে ভট্টাচার্য্য, কামাল মাত্র ২৯ রানে আউট হয়ে যায়। কে খাম্বাটা এসে দলকে বাঁচায় ৫৩ রান করে, পি ডি দত্ত ৩৪, ইন্দার (নট আউট) ২৪। জহিরুদ্দীন ৬১ রানে ৫, সালাউদ্দীন ১২ রানে ২, ইসমাইল ২১ রানে ২ উইকেট।

আলিগড়ের আকটার হোসেন ৩৩, নবাব জহিরুদ্দীন ৪২। পালিয়া ৩৬ রানে ৫, কামাল ৩৮ রানে ৩, পি ডি দত্ত ৩৪ রানে ২ উইকেট।



আলিগড় ইউনিভারসিটি। বেঙ্গল জিমখানাকে এক রানে হারিয়েছেন

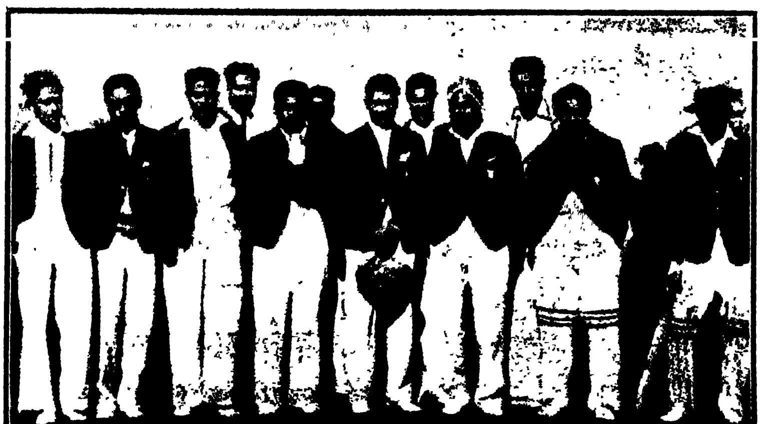
ছবি—তারকদাস

মিনার্ভা সি সি—৮০

ভবানীপুর—৬৩

মিনার্ভা সি সি ১৭ রানে জয়ী হয়েছেন। হায়দার আলি ৩৮, এম সি গোপাল ২২। জি আব্রাহাম্ ৩৮ রানে ৮ উইকেট, অরোরা ৮ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন।

ভবানীপুরের ইউ পাল ১৭, এম অরোরা ১৪, এ বোস ১০। রামসিং ২৯ রানে ৬, হায়দার আলি ২০ রানে ৪ উইকেট পেয়েছেন। বোলারদের দিন ছিল।



মাদ্রাজের মিনার্ভা ক্রিকেট ক্লাব—ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবকে পরাজিত করেছেন

মিনার্ভা সি সি—১২৭

ক্যালকাটা—১১১

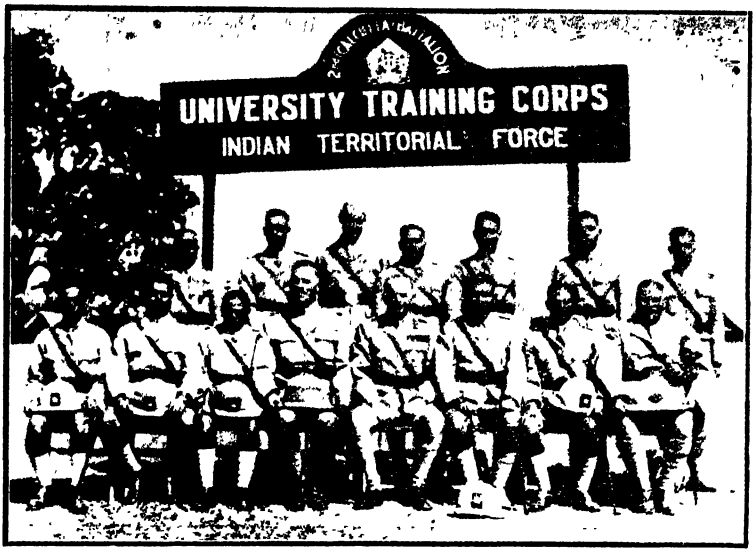
মিনার্ভা ক্লাব কলিকাতায় তাদের প্রথম খেলা ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের সঙ্গে খেলে ১৬ রানে জয়ী হয়েছে। ক্যালকাটার এ বৎসরে এই প্রথম হার হ'লো। শেষ উইকেট সহযোগিতায় মিনার্ভা ক্লাবের দীনান (২১) ও আর নাইডু (নট আউট) মোট রান ৮২ থেকে ১২৭ তোলেন। গুহ্মলে ৪৬ রানে ৫, নেলসন ৩৩ রানে ৪ উইকেট নিয়েছে।

ক্যালকাটার মিলার ৪৬, স' ২৩, হোসী ২২। রামসিং ৪৪ রানে ৩, হায়দার আলি ২৮ রানে ৩, দীনান ২৯ রানে ৩ উইকেট পেয়েছে।

মিনার্ভা—২১৪

মোহনবাগান—২০৬ (৯ উইকেট)

সময়াভাবে খেলা ড্র হয়েছে। মিনার্ভাদের প্রথম তিনটি উইকেট একটি রান না করেই পড়ে যায়। চতুর্থ উইকেট সহযোগিতায় হায়দার আলি (৮৬) ও রামসিং (৮৮) মিলে রান তোলেন শূন্য থেকে ১৯২এ। বি দে ৬৫ রানে ৮ ও টি ভট্টাচার্য্য ২৮ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। মোহন-বাগানের এস ভট্টাচার্য্য ৭০, এন ব্যানার্জ্জি ৬৩, এ গাঙ্গুলি ২৩, গোষ্ঠ পাল (নট আউট) ১৬।



সেকেণ্ড ব্যাটালিয়ন ইউনিভারসিটি কোরের অফিসারগণ—
মধ্যে—জি ও সি ও মেজর জ্যাকসন

আলিগড় ইউনিভারসিটি—২১৯ (৫ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

কুচবিহার একাদশ—১৬৮ (৬ উইকেট)

সময়াভাবে খেলা ড্র হয়েছে। আকতার হোসেন ৬২, মকবুল আলাম ৫৯, হাবিবুল্লা ৩০, নবাব জহিরুদ্দীন (নট আউট) ২২। পালিয়া ৬৭ রানে ৩, হিচ্ ৭১ রানে ২।

কুচবিহার—ওয়াই আলি বেগ ৭৮, পালিয়া ৪৬।

পেরী ভাইন্‌স্‌কে পিটেছে ঃ

টিলডেনের ভবিষ্যদ্বাণী ফলে নি। ৭ই জানুয়ারী নিউনিয়র্কে ফ্রেড পেরী তাঁর প্রথম পেশাদার ম্যাচ এল্‌সওয়ার্থ ভাইন্‌সের সঙ্গে খেলে ৭-৫, ৩-৬, ৬-৩, ৬-৪ গেমে ভাইন্‌সে পরাজিত করেছেন। কোথায় ভাইন্‌স তাঁকে ষ্ট্রেট সেটে হারাবে না ভাইন্‌সই প্রায় ষ্ট্রেট সেটে হেরে গেলো। তিনি খেলার পরে স্বীকার করেছেন যে "পেরী অতুলনীয় খেলেছেন, বিশেষতঃ তৃতীয় ও চতুর্থ সেটে। ইতিপূর্ব্বে আমি তাঁকে এমন সুন্দর খেলতে দেখি নি।" এই খেলাতে দর্শক হয়েছিল ১৭,৬৩৩ এবং দর্শক মূল্য পাওয়া গেছে ৫৮,১১৭। প্রকাশ যে ভাইন্‌সের একটু ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল তাই তিনি সাধ্যমত ভালো খেলতে পারেন নি। ক্লেভল্যাণ্ডে পেরী ১৩-১১,৬-৩ গেমে পুনরায় ভাইনস্‌কে হারিয়ে টেনিসে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করেছেন। খেলাটি খুব প্রতিযোগিতামূলক হয়েছিল, অনেকবার 'ডিউস' হয়েছে। এবার টিলডেন কি বলবেন ?

সাহিত্য-সংবাদ

নব-

শ্রীহীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "বিরহ মিলন কথা"—১৷৹

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "অভিজ্ঞতার মূল্য"—১৲

শ্রীকালিদাস রায় প্রণীত ছাত্রগণের জন্য লিখিত "কুরুরাজ"—১৲

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ও শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত গল্প পুস্তক "প্রজাপতির পক্ষপাত"—১৲

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "স্বয়ং সিদ্ধা"—২৲

আশু চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "ধরা ছোঁয়ার বাইরে"—১৲

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল প্রণীত উপন্যাস "সব মেয়েই সমান"—১৷৹

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় প্রণীত বৈজ্ঞানিকগ্রন্থ "সুগন্ধ রসায়ন"—৷৵৹

Editor :—
RAI JALADHAR SEN BAHADUR

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons, at the Bharatvarsha Ptg. Works 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta





ফাল্গুন—১৩৪৩

দ্বিতীয় খণ্ড | চতুর্বিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

আমাদের নীতি

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস

নৈতিক সমস্যা মানুষের যে একটা আছে এ কথা ধরে নিতে গেলেই আমাদের কয়েকটা জিনিষ মেনে নিতে হবে। গোড়ার কথা মেনে নিতে হবে এই যে মানুষের কতকগুলি ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করা সম্ভব। নীতিশাস্ত্রের এটি প্রতিপাদ্য জিনিষ নয়, এটিকে অবলম্বন করে নিয়ে নীতি-শাস্ত্রের অবতারণা। যদি এটা ধরে নেওয়া যায় যে মানুষ দুই তিনভাবে একটা কাজ কর্‌তে পারে, তখন প্রশ্ন এসে পড়ে কোন পথটা সে অবলম্বন করবে। সেটা নির্ভর করে তার ইচ্ছাশক্তির ওপর। এই ইচ্ছাই হ'ল তার সারথি। ইচ্ছাটা কি রকম হওয়া উচিত সেটা আবার নির্ভর করে তার অভীষ্ট কি, তার কামনা কি—তার ওপর। কাজেই মূলে এসে পড়ে অভীষ্ট কি এই কথাটাই।

মানুষ পেয়েছে তার জীবনটা দানস্বরূপ। সে সেই জীবনে অনেক বিভিন্ন জিনিস লাভ কর্‌তে পারে—সুখ, শান্তি, সন্তোষ, তৃপ্তি—যার যা খুসী। সে যা চায়, তার যা কাম্য বা অভীষ্ট সেই ভাবেই তার জীবনের প্রতিদিনকার কাজ তাকে করে যেতে হবে, যাতে তার অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। কাজেই মানুষের জীবনের কাম্য বা অভীষ্ট কি—তার পরমার্থ কি—সেই হল নীতি শাস্ত্রের মূল কথা এবং সেইটাই হল নৈতিক সমস্যা।

মানুষের পরমার্থ কি এই প্রশ্নের উত্তর নানা দেশের নানা মনীষী, নানাকালে নানাভাবেই দিয়ে গেছেন। সেটা এমনি হবার কথা, কারণ নানা মুনির নানা মত—এ প্রবাদ বাক্যটা যে সম্পূর্ণ সত্য সেকথা সকলেই মানেন। কোন মতটা ঠিক সেটি জান্‌তে হলে আমাদের সব মতগুলির সঙ্গেই প্রথমে বিশেষ রকম পরিচয় হওয়া আবশ্যক। কাজেই নৈতিক সমস্যার উৎপত্তি এবং তার সমাধানের চেষ্টা মানুষের ইতিহাসে যে ক্রমে ঘটেছিল, সেই ক্রম অনুসারেই এই মতগুলির আলোচনা করে তোলাই আমাদের সব থেকে সুবিধা হবে। সুতরাং সেই ভাবেই আমরা এই আলোচনা আরম্ভ কর্‌ব।

মানুষের পরমার্থ কি—সেই প্রশ্নের উত্তরে যে সমস্ত বিরুদ্ধ-মতবাদগুলি সম্ভব সেগুলি প্রধানতঃ দুই জোড়া বিরুদ্ধ-মতে ভাগ করা যায়। তাদের ভিত্তি হ'ল মানুষের প্রকৃতির

গঠনের ওপর। সেই প্রকৃতির চতুর্মুখী গতি এবং সেই চারিটী গতির মধ্যে দুটি পরস্পর-বিরোধী। প্রথমত মানুষ গঠিত দুইটি জিনিস দিয়ে—এক মন ও দুই দেহ। এই দুইটী পরস্পরবিরোধী। দেহ মনকে দেখ্‌তে পারে না এবং মন দেহকে করে ঘৃণা। দেহ যা চায় মন তা চায় না, এবং মন যা চায় দেহ তাকে আমল দেয় না। দেহ চায় ইন্দ্রিয়সুখ, কিন্তু মন বলে তা ঘৃণ্য, তা সর্ব্বজনপরিত্যজ্য। মন চায় জ্ঞানআলোচনা, ইন্দ্রিয়সংযম—দেহ বলে সে বড় কঠোর, তা করেই বা লাভ কি ?

এদিকে মানুষ আবার সামাজিক জীবও বটে এবং সেই অনুসারে তার মনে দুটি বিরোধী গতি লুকিয়ে আছে। প্রতি বিভিন্ন মানুষ তার ব্যক্তিগত স্বার্থ খুঁজবে—না সে খুঁজবে সমগ্র সমাজের স্বার্থকে ? কোনটী হল বড়, দুইএর মধ্যে বিরোধ বাধলে কোনটির নির্দ্দেশ মান্‌তে হবে, সেইটিই হল সমস্যা। একটা গতি বলে ব্যক্তিগত স্বার্থই বড়, সমাজ ত বাহিরের জিনিস। আর অন্যটী বলে—ব্যক্তিগত স্বার্থ খোঁজা নীচতার পরিচয়, সঙ্কীর্ণতাজ্ঞাপক, চাই নিঃস্বার্থ ত্যাগ, চাই সমাজের জন্য আত্মবলিদান। যে মত বলে ব্যক্তিগত স্বার্থই বড় জিনিস তাকে ব্যক্তিত্ববাদ বা Egoism বলা হয়ে থাকে। যে মত বলে পরার্থে আত্মত্যাগই বড় জিনিস তাকে পরার্থবাদ বা altruism বলা হয়ে থাকে। এই চার রকম মত অনুসারে নীতির ভিন্ন ভিন্ন মাপকাঠি খাড়া করা হয়। এক মত অনুসারে যে কাজ ভাল অন্য মত অনুসারে তা মন্দ, আবার অন্য মত অনুসারে যা মন্দ আর এক মত অনুসারে তা ভাল। এমনি পরস্পরবিরোধী সব বিধান। কোন বিধানটি সত্য এবং সঠিক নৈতিক সমস্যার সমাধান করে সেইটাই আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়।

আমরা যদি এ জিনিসটাকে আর একটু তলিয়ে দেখ্‌তে চেষ্টা করি তা হলে দেখ্‌ব যে এই দু জোড়া বা চারিটি বিরুদ্ধ মতকে আমরা এক জোড়া বা দুইটি বিরুদ্ধ মতে এনে দাঁড় করাতে পারি।

দেহ যা চায় সে হল প্রতি মুহূর্ত্তের ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ, সুতরাং ইন্দ্রিয়সুখ হতে হলেই সেটী হওয়া চাই ব্যক্তিবিশেষের ইন্দ্রিয়সুখ, কাজেই ব্যক্তিগত স্বার্থ খোঁজা এবং ইন্দ্রিয়সুখ খোঁজা দুটাই এক জিনিস হয়ে দাঁড়ায়। এই দুইটী মতের সংযোগে যে নূতন মতটী সম্ভব তাকে আমরা প্রেয়ানুসন্ধানী-বাদ বলে নামকরণ করতে পারি। কারণ যা আপাতমধুর এবং ইন্দ্রিয়সুখকর, তাই হল প্রেয়। অপরদিকে মন দেহকে করে ঘৃণা, দৈহিক যা কিছু তাই তার অবজ্ঞার বিষয়—সে চায় ইন্দ্রিয়-নিরোধ, সংযম। পরার্থবাদও চায় পরার্থে আত্মত্যাগ, ব্যক্তিগত সুখের বলিদান। কাজেই এই দুইটি মতকেও আমরা একত্র সন্নিবিধ কর্‌তে পারি। মানুষের পরমার্থ মানসিক আনন্দ সন্ধান, যা ইন্দ্রিয়সুখে নাই ব্যক্তিগতসুখে নাই। তার কাম্য হল প্রেয় নয়—শ্রেয়। কাজেই এই মতটিকে আমরা শ্রেয়ানুসন্ধী-বাদ এই নামকরণ কর্‌তে পারি। এই শ্রেয় ও প্রেয়ের ইংরাজী প্রতিশব্দ হল happiness ও pleasure।

বিরোধ হল তা হলে এই দুইটী মতকে নিয়ে, শ্রেয় বড়, না প্রেয় বড়। আমাদের কামনার বস্তু হওয়া উচিত শ্রেয়ের না প্রেয়ের ? প্রেয় হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, প্রেয় হল স্থূল, প্রেয় হল আপাতমধুর। অন্যদিকে শ্রেয় হল মানসিক তৃপ্তিকর, শ্রেয় হল সূক্ষ্ম, সহজগ্রাহ্য নয়। মন যা বলে সেই হল শ্রেয় সেই হল কর্ত্তব্য। তা বড় কঠোর, তা বড় নির্ম্মম, তা হল "Stern daughter of the voice of God।"

ইন্দ্রিয়সুখকে তা আমলই দেয় না। সেই জন্য কর্ত্তব্য সাধারণতঃ প্রেয় হয় না।

এখন আমরা যে কথাগুলি বল্‌লাম সেগুলি বিরোধ অবস্থার কথা। মানুষের ইতিহাসে এমন একদিন ছিল যখন নৈতিকক্ষেত্রে এ বিরোধ দেখা দেয় নাই। সেই নির্ব্বিরোধের অবস্থাই আমাদের প্রথম আলোচনার বিষয়।

এই নির্ব্বিরোধের অবস্থা আমরা পাই শিশুসুলভ বে-নীতির অবস্থায়। শিশু যখন বড় হয় নি, কোনটা করা উচিত নয় এই বিরোধ যখন তার মনে জাগেনি, তখন সে কাজ করে—যা খুসী তাই। তখন তার খেয়াল জাগে না কোনটা ভাল কোনটা মন্দ, কোনটা তার করা উচিত কোনটা করা উচিত নয়। তখন তাঁর স্বাধীনভাবে কাজ করবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু দুই বিরোধী পথের কোন পথে তার যাওয়া উচিত—সে প্রশ্ন জাগ্‌বার মত বুদ্ধি তার পরিপক্ক হয় নি।

মানব-সভ্যতার ইতিহাসেও এমনি একটা দিন খুঁজে

পাওয়া যায়, আমরা এমন একটা অবস্থা তার কল্পনা করে নিতে পারি—যখন সুদূর অতীতে তার সমাজ ছিল না, তার দল ছিল না। সেই অতীত যুগের আদিম মানুষ তখন বাস করত গুহায় গুহায়, দুই দুই নারী ও পুরুষে। কিন্তু তখনকার সে দম্পতির মধ্যে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ কিছু ছিল না—যা পরস্পরের মধ্যে স্বতন্ত্র ব্যক্তির আবিষ্কার করত বা পরস্পরকে "ভালবাসতে" শেখাত। তাদের সম্বন্ধ ছিল যেমন উচ্চশ্রেণীর চতুষ্পদ জীবের মধ্যে দেখা যায়, স্বাভাবিক বৃত্তি নিয়ন্ত্রিত; হয় ত তা হতে একটু ওপরে। পরে তার জীবনে এমন একদিন এল—যখন সে তার জীবন-সঙ্গিনীকে সত্যই "ভালবাস্‌তে" আরম্ভ কর্‌লে। সে আবিষ্কার কর্‌ল যে তার এমন অনেক কাজ আছে যা তার সঙ্গিনীকে ব্যথা দেয় বা যন্ত্রণা দেয়। তখন হতেই সে এই রকম কষ্টদায়ক কাজ হতে নিজেকে সংযত কর্‌তে সুরু কর্‌ল। তখনই তার সঙ্গিনীকে সে "প্রিয়া" বল্‌বার অধিকার পেল, তার দায়িত্ববোধ জাগ্‌ল, তার কর্ত্তব্যবুদ্ধির উদ্রেক হল। এর পর হতে সে ভাল-মন্দ বিচার করে কাজ কর্‌তে সুরু কর্‌ল, সে নীতিপরায়ণ জীব হল।

শিশুর জীবনেও আমরা ঠিক এর অনুরূপ অবস্থা লক্ষ্য কর্‌তে পারি। মানুষের ক্রমোন্নতির ইতিহাসে সে যে যে স্তরের মধ্য দিয়ে গিয়ে বিকাশ লাভ করে, প্রতি মানুষ তার ব্যক্তিগত জীবনেও ঠিক সেই সেই স্তরের মধ্য দিয়ে যায়। এটা হল একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। বিবর্ত্তবাদের মতে মানুষ প্রথমে মৎস্যরূপী ছিল, তারপর চতুষ্পদ জীব ছিল, তারপর বানরজাতীয় জীব ছিল—সর্ব্বশেষে মানবরূপ পায়। এর প্রমাণ তাঁরা এই দেখান যে প্রতি মানব ভ্রূণ ও ঠিক জঠরের মধ্যে পরিবর্দ্ধনের সময় যথাক্রমে মৎস্য, কুকুর, বানর এবং সর্ব্বশেষে মানবশিশুর রূপ পায়। দেহের দিক হতে যেমন, মানসিক গঠনের দিক হতেও এ তথ্য তেমনই সত্য। কাজেই শিশুর নৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয় ঠিক ওপরে বর্ণিত অবস্থার অনুরূপ অবস্থার মধ্য দিয়ে।

আগেই বলা হয়েছে শিশুর কাজ বুদ্ধিবিবেচনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। সে প্রথম অবস্থায় কেবলমাত্র একটা জিনিষের ধার ধারে, সে হল আপনার যথেচ্ছাচারী খেয়াল। সে মার গালে চড় মারে, বাবাকে খাম্‌চায়, পিঁপ্‌ড়ে টিপে মারে। পরে একদিন আসে যখন তার মধ্যে দায়িত্ববোধ অঙ্কুরিত হয়। হয়ত একদিন সে নজর করল মাকে চড় মারাতে মা তার কাঁদ্‌ছেন। সে ভাবল, তাই ত এ কাজ করতে নেই—মার তাতে কষ্ট হয়। তখন হতে আর সে মাকে মারে না। তার বুদ্ধি তখন বেড়েছে। তাকে যদি তখন বুঝিয়ে দেওয়া যায় পিঁপ্‌ড়েদের মার্‌তে নেই—তাতে ওদের লাগে, তাহলে সে পিঁপ্‌ড়ে মারা ছেড়ে দেবে। তার তখন দায়িত্ববোধ জেগেছে।

এই দায়িত্ববোধ জাগার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা নৈতিক সমস্যার বিকাশের ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসে পড়ি। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হ'ল বিরোধের অবস্থা। এখানে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশলাভ করেছে, সে ভাব্‌তে শিখেছে কোন্‌টা ভাল কোনটা মন্দ। এ প্রশ্নের উত্তর ভেবে ভেবে নানা ব্যক্তি মত জাহির করলেন, বিভিন্ন মতের উৎপত্তি হ'ল, নৈতিক সমস্যার সমাধানে তুমুল বিরোধ দেখা দিল। সেই বিরোধের ইতিহাসই আমরা এবার বর্ণনা কর্‌ব।

প্রথমেই আমরা দেখতে পাই দুই দলে বিরোধ লেগেছে। একদল বলেন মানুষের পুরুষার্থ বা পরমার্থ হল দৈহিক সুখ-সন্ধান এবং অপর দল বলেন পুরুষার্থ তা নয়, পুরুষার্থ হল মানসিক সুখ অনুসন্ধান।

যে মত বলে দৈহিক সুখই মানুষের পরমার্থ তার আদিমতম রূপটী পাই আমরা এরিষ্টিপাস্ স্থাপিত "সীরিনেইক"দের মতে। তাঁদের মতে মানুষের পরমার্থ হ'ল সব চেয়ে বেশী পরিমাণ দৈহিক সুখসম্ভোগ। যা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ করা যায় তাই ভাল এবং তাতে লজ্জার কিছু নেই। সময় দ্রুত চলে যায়, একটী মুহূর্ত্তও অপব্যয় কর্‌লে চল্‌বে না। প্রতি মুহূর্ত্তটিকে ইন্দ্রিয়সুখানুভূতিতে নিয়োগ কর্‌তে হবে। ইন্দ্রিয়সুখের মধ্যে জাতিভেদ নাই, সকল ইন্দ্রিয়সুখই সমান। মানসিক সুখ আছে—কিন্তু তা দৈহিক সুখের তুলনায় অতি নিকৃষ্ট। তাঁদের মতে মানুষের জ্ঞানের বিস্তার বর্ত্তমানের গণ্ডী ডিঙ্গিয়ে ভবিষ্যতের রাজ্যে পৌছয় না। ভবিষ্যতে আমাদের কপালে কি আছে তা যখন জান্‌বার উপায় নেই, তাতেও ত সময় নষ্ট হয়। প্রতি মুহূর্ত্তের সুখটিকে আমরা আদায় করে নেব, ইন্দ্রিয়-সুখানুভূতিতে আমরা গা ঢেলে দেব, তাই হল আমাদের কাম্য, তাতেই জীবনের সার্থকতা।

ভারতীয় নীতির ইতিহাসে এরই সমশ্রেণীর মত হল চার্ব্বাকদের মত, তাঁদের গুরু হলেন দেব-গুরু বৃহস্পতি। তাঁরা পরজন্মও মানেন না, কর্ম্মফলও মানেন না। তাঁরা বলেন প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্ত্তটী চরম ইন্দ্রিয়সুখে নিয়োগ কর্‌লেই আমাদের সময়ের প্রকৃত সদ্ব্যয় করা হবে। বর্ত্তমান জীবন আছে এই জানি—ভবিষ্যতে কি হবে জানার সাধ্য নেই। দেহ একবার পুড়ে ছাই হয়ে গেলে আর ফির্‌বে না—সে ত হ'ল ধ্রুব সত্য, কাজেই জ্ঞানীর কাজ হল "যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ" এমন কি "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ"—তাতেও দোষ নাই। ভবিষ্যতের ভাবনার দরকার নাই, মরণে সকলি হয় শেষ।

প্রসিদ্ধ পারসিক কবি ওমর খৈয়ামের মতটিও হল এইরূপ। ঠিক এই কথাগুলিকে তিনি এমন সুন্দর ভাষায় রূপ দিয়েছেন যে তা চিরকালই সকল দেশের সকল লোকের মনকে আকর্ষণ করে এসেছে। তাঁর মতের কিন্তু একটু পার্থক্য আছে, তা হল এই যে তিনি অবশ্য উপসংহার করেছেন একই—তবে সে উপসংহারের কারণ তাঁর স্বতন্ত্র। তিনি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন যে মানুষের জ্ঞান তাকে বেশী দুর নিয়ে যেতে পারে না, চারিদিক বড় আঁধার, সবই যেন অনিশ্চিত, সবই যেন অজানা। জগতে শৃঙ্খলা যেন নেই, ন্যায় অন্যায় বিচার যেন নেই, জগতের স্রষ্টা যদি কেউ থাকেন তবে তিনি মানুষের সুখ দুঃখের প্রতি বেশী নজর দেন না, তিনি অন্ধ নিয়তির মত চলেন। মানুষের সুখদুঃখ তাঁর খেয়ালবশে নিয়ন্ত্রিত হয়, ঠিক যেমন করে কুম্ভকার করে কোন হাঁড়িটা ভাল, কোন হাঁড়িটা মন্দ। পরকাল আছে কি নেই কে বলবে? এ জগতে ন্যায় অন্যায় আছে কি না কেউ জানে না—তবে একটি কথা সকলেই জানে যে—দিন চলে যায়, থাকে না :—

Oh threats of Hell and hopes of paradise !
One thing at least is certain—this life flies ;
One thing is certain and the rest all lies ;
The flower that once has blown, for ever dies.

কাজেই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা কর্‌তে হয়। ভবিষ্যৎ যখন অনিশ্চিত তখন সামনে যা পাই তাই দু-হাতে মুঠো পূরে নেই। ইন্দ্রিয়সুখকেই জীবনের কাম্য করি, কবির নিজের ভাষায় :—

Some for the Glories of this world and some
Strive for prophets' paradise to come ;
Ah ! take the cash and let the credit go,
Nor heed the rumble of a distant drum.

ইন্দ্রিয়সুখ এবং বর্ত্তমান সুখ তাঁদের মত এঁরও কাম্য, কিন্তু তাঁর এ মত হতাশাজাত। তিনি আমাদের মদ্য সেবনের উপদেশ দেন, কারণ তা হলে জীবনের নিগূঢ় সমস্যা যা জ্ঞানের আলো আমাদের সমাধান করে দিতে পারে না, তা নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হয় না, জীবনের নিরাশা এবং অন্ধকারের কথা আমরা সহজেই ভুলতে পারি। এ জগতকে আমরা যেমনটি চাই তেমনটি নয়। কাজেই সকল ভ্যবনা ভুলে যাওয়াই ভাল।

এপিকিউরাস এসে এই ইন্দ্রিয়সুখবাদ বা "হেডনিজম্"কে আরও পরিবর্দ্ধিত করেন। তিনি বলেন মানুষের পুরুষার্থ হ'ল তার প্রকৃতিগত অভিলাষের চরিতার্থতায়। তার প্রকৃতিগত কামনা হ'ল অনুকূল অনুভূতির সম্ভোগ। চার্ব্বক-বাদীদের মত ইনিও মেনে নেন যে মৃত্যুর পর আর পরজন্ম নেই, কাজেই পরজন্মের ভাবনার প্রয়োজন নেই। অনুভূতি হয় সুখপ্রদ—না হয় দুঃখপ্রদ। দুঃখপ্রদ অনুভূতিকে আমাদের এড়িয়ে যেতে হবে এবং সুখপ্রদ অনুভূতির সংঘটন অনবরত যাতে সম্ভব হয় তার চেষ্টা দেখ্‌তে হবে। সাধারণ মানুষ [illegible] যা সুখকর অনুভূতি পায়, তার প্রতিই আকৃষ্ট হয়; কিন্তু আমাদের বিবেচনা-শক্তির প্রয়োগ কর্‌তে হবে, যে অনুভূতি আপাতমধুর কিন্তু পরে দুঃখপ্রদ তাকে ত্যাগ কর্‌তে হবে, যে অনুভূতি ভবিষ্যতে আমাদের দুঃখ আন্‌বে না সেই অনুভূতিই আমাদের কাম্য হবে, মনকেও দেহের কাজে লাগাতে হবে। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অবিমিশ্র ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগ আর এঁদের আদর্শ নয়। প্রথম অবস্থার একান্ত একপেশে আদর্শ পরিবর্ত্তিত হতে আরম্ভ করেছে। এপিকিউরাসের শিষ্যসম্প্রদায় পরে আরও বদলে গিয়েছিলেন। তাঁদের মতে অবিমিশ্র সুখ-সম্ভোগ মানুষের ভাগ্যে বড় একটা ঘটে না। কাজেই আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত দুঃখপ্রদ অনুভূতিকে এড়ান মাত্র। কাজেই আমাদের সকল কামনাকে জয় করতে হবে। কামনা থাক্‌লেই সেটা অপূর্ণ থেকে যাবারও সম্ভাবনা আছে—

সেই সঙ্গে অপূর্ণ কামনার কষ্টভোগও আছে; কাজেই কামনা না থাকাই ভাল। আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত সুখ এবং দুঃখবোধ দুইকে নষ্ট করে ফেলা। সুখ চাইলেই দুঃখ আসে, তাকে ত এড়ান যায় না। অতএব দুই যাক্; সুখ হতে বঞ্চিত হই হলাম—শান্তি ত আমার রইলো।

এই ইন্দ্রিয়সুখবাদ পরবর্ত্তীকালে বেন্‌থাম ও মিলের হাতে আরও অনেক পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়। এই বাদের মূল লক্ষ্য হল সুখকর অনুভূতি লাভ। সব থেকে সুন্দরতম অনুভূতি মানুষের পক্ষে যা সম্ভব সে হল প্রেম বা ভালবাসা। ইন্দ্রিয়সুখবাদীদের পরে এইদিকে লক্ষ্য পড়্‌ল। তাঁরা দেখ্‌লেন মানুষের চরিতার্থতা ইন্দ্রিয়সুখ-সম্ভোগে নয়, প্রণয়-বৃত্তির বিকাশ লাভে। এই বৃত্তি এক বা দুইটী মানুষকে অবলম্বন করে বিকশিত হবে না, এ বিকাশলাভ করবে সমস্ত মানব-সমাজের প্রতি মমতার বিকাশে। ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়সুখই তার লক্ষ্য হবে না, সমগ্র মানব-সমাজের ইন্দ্রিয়-সুখানুভূতিই হবে তার কামনার বস্তু। এই হল বেন্‌থাম্ ও মিলের মোটামুটি মত। একে "সমাজ কল্যাণবাদ" অথবা utilitarianism এই নাম দেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু বেন্‌থাম ও মিলের হাতেখড়ি হয় ফরাসি দার্শনিক অগষ্ট কোম্‌তের নিকট; তিনিই হলেন তাঁদের গুরু।

কোম্‌তের মত এই যে মানুষের প্রথম জীবনে তার স্বার্থ-সিদ্ধির ইচ্ছাটা প্রবল থাকে; তার কারণ তখন তার মন উন্নত নয়। আদর্শ নৈতিক-জীবনে স্বার্থসিদ্ধি একান্ত হেয় জিনিস, সমাজের মঙ্গল সাধনা এবং পরার্থে আত্মোৎসর্গ সেখানে বেশী লোভনীয় জিনিস। মানুষের কর্ত্তব্য হল তার নীচ স্বার্থপরতাকে দমন করা এবং সমাজের মঙ্গলকেই নিজের মঙ্গল বলে গ্রহণ করা। সমাজের হিতে আত্ম-নিয়োগই হল আমাদের নৈতিক ধর্ম্ম, সমাজের কল্যাণ সাধনেই মানুষের জীবনের সার্থকতা।

বেন্‌থাম্ এবং মিল্ এই মতকেই অবিসম্বাদী সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং এই মতের ওপর ভিত্তি করেই তাঁদের বিখ্যাত নীতি প্রচার করেন যে মানুষের পরমার্থ বা Summum bonum হল গরিষ্ঠ সংখ্যার প্রকৃষ্ট সুখ-সাধন। কাজেই তাঁদের মতে স্বার্থান্বেষী বৃত্তিগুলিকে দমন করতে হবে, মেরে ফেল্‌তে হবে, বিশ্বজনীন বৃত্তিগুলিকেই পরিবর্দ্ধিত করতে হবে। জগদ্ধিত হল মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত। এ সাধনা মুনিঋষিদের যোগসাধনার মতই কঠোর সাধনা, এখানেও সকল ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সমস্তই পরিত্যাগ করতে হবে। এদের মত অনুসারেও কাজেই হল—ত্যাগ-ধর্ম্মই সকল ধর্ম্মের সার।

সমাজকল্যাণবাদ বা utilitarianismএর একটা মত হল এই যে বিভিন্ন জাতীয় সুখের মধ্যেও জাতি হিসাবে উচ্চ নীচতা আছে। বেন্‌থাম্ বলেছিলেন যে বিভিন্ন প্রকারের সুখানুভূতির মধ্যে পার্থক্য হতে পারে কেবল তাদের পরস্পরের গভীরতা বা intensity সম্পর্কেই—এ ছাড়া আর কোন সম্পর্কেই তাদের মধ্যে জাতিভেদের সৃষ্টি করা যায় না। কিন্তু মিল্ বলেন তাদের মধ্যে গুণবিশেষেও জাতিভেদ করা যায়, যেমন মানসিক সুখ ইন্দ্রিয়-সুখানুভূতি হতে উৎকৃষ্ট। যে মানুষ দৈহিক সুখ ও মানসিক সুখ দুই অনুভব করেছে—তার মানসিক সুখের প্রতিই পক্ষপাত হবে বেশী। যে মানুষ কবিতাও পড়েছে তাসও খেলেছে তার ঝোঁক হবে বেশী কবিতা পড়ার ওপর। তাঁরা বলেন—সুখপূর্ণ শূকরের জীবনের থেকে দুঃখপূর্ণ সক্রেটিসের জীবন কাম্যতর। মোট কথায় দৈহিক সুখের প্রতি একটা ঘৃণা বা অবজ্ঞার ভাব এসেছিল এবং মানসিক আনন্দ উপভোগের প্রতি আকর্ষণ এসেছিল বেশী।

এইভাবে আমরা দেখ্‌তে পাই যে বেন্‌থাম এবং মিলের হাতে ইন্দ্রিয়-সুখবাদ বা Hedonismএর দুর্দ্দশার চূড়ান্ত হয়। ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়সুখের বদলে তাঁরা বিধান করেন যে সামাজিক মঙ্গলসাধনই মানুষের ধর্ম্ম এবং দ্বিতীয়তঃ দৈহিক সুখের সন্ধানেই ঘুরতে হবে। মোট কথায় এখানে ইন্দ্রিয়সুখবাদ মানে যা হওয়া উচিত, মতটা হয়ে দাঁড়িয়েছে ঠিক তার উল্টো রকমের, মানসিক সুখবাদ বা Rationalism এর প্রতিই তার টান ষোল আনা বেশী। এঁরা হলেন ঘরের শত্রু বিভীষণ, ইন্দ্রিয়সুখবাদের পরাজয় ঘটানই যেন এঁদের অন্তরের উদ্দেশ্য।

এই হল একপক্ষ। এখন অপর পক্ষ বা যে দল বলেন মানসিক সুখ সন্ধানই মানুষের পরমার্থ সেই দলের লোকের কি বলেন সেটা আমাদের ভাল করে একবার বুঝে দেখ্‌তে হবে।

প্রথমেই আমরা আরম্ভ করব—মানসিক সুখবাদে

আদিমতম রূপটিকে নিয়ে। তার অভিব্যক্তি সিনিক্‌দের হাতে, তাদের নীতিশাস্ত্রের মধ্যে। এঁদের মত হল সিরিনিইক্‌দের উল্টো। তাঁরা বলেন মানুষের পক্ষে সেই জিনিসটাই ভাল যা হল তার সম্পূর্ণ নিজস্ব জিনিস। যে জিনিসটা হ'ল তার সম্পূর্ণ নিজস্ব—সেটা হল তার মন বা জ্ঞান। নিজের মনের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখার একটা মস্ত বড় গুণ আছে। মন আমাদের নিজস্ব, কাজেই তাকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত কর্‌তে পারি। কিন্তু বাহিরের জগতের জিনিসকে আমরা পারি না। কাজেই আমরা যদি নিজের সুখের জন্য বাহিরের জিনিসের ওপর নির্ভর করি, আমরা সব সময় আমাদের সুখ-সাধনের অনুকূল অবস্থা নাও পেতে পারি, কারণ তা আমাদের শাসনের বাহিরে। ফলে হয় ভাগ্যে জুটবে দুঃখবোধ। কাজেই বুদ্ধিমানের কাজ হল বাহিরের জগতের থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা ও মনের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা। তার মানেই আমাদের দৈহিক সুখ-সম্ভোগ ত্যাগ কর্‌তে হবে এবং আত্মত্যাগ এবং সংযম অভ্যাস করতে হবে। তাঁদের আরও উপদেশ এই যে সুখদুঃখের প্রতি আমাদের সমভাবেই উদাসীন হতে শিখ্‌তে হবে, কারণ আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সুখভোগ নয় ততখানি, যতখানি হল দুঃখকে এড়ান। সুখ না পাই আমরা শান্তি পাব এবং সেইটাই বড় জিনিস। যে মানুষ তার সমস্ত কামনাকে নির্ম্মূল করেছে সেই ধন্য, শাশ্বত শান্তি তার করতলগত।

তাঁদের পরবর্ত্তী যুগে "ষ্টোইক"রা—"সিনিক্‌"দের মতটি আরও পরিবর্দ্ধিত করেছিলেন। তাঁদেরও মত হল যে মনের রাজ্যের গণ্ডির মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা হল বিচক্ষণতার পরিচয়। তাঁদের মতে জগতে যা কিছু আছে সবই ক্ষণস্থায়ী এবং অন্তঃসারশূন্য। এই বাহিরের মায়ার জগতের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের মূলে অনুভূতি শক্তি—এই অনুভূতি শক্তিকে বিলোপ কর্‌তে হবে এবং বাহিরের জগত হতে মনকে বিচ্ছিন্ন কর্‌তে হবে। তাঁদের মত সাধারণ ভারতীয় দার্শনিকদেরই মতের অনুরূপ। মায়ার জগত এবং ইন্দ্রিয়ভোগবহুল জীবন তাঁদের মত ষ্টোইকদের কাছে ঘৃণার এবং অবজ্ঞার বিষয়।

এই যে ইন্দ্রিয়সুখ-বিতৃষ্ণা এবং ত্যাগধর্ম্ম প্রচার—এর প্রতি মানুষের মনের যেন একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। নানা দেশের নানা কালের নানা মনীষী একই কথা বার বার প্রচার করেছেন যে ইন্দ্রিয়সুখসম্ভোগের পরিণতি হল দুঃখ এবং অতৃপ্তি। দুঃখকে যদি এড়াতে চাও তা হলে ইন্দ্রিয়সম্ভোগ পরিত্যাগ কর্‌তে হবে, দেহকে বশে আনতে হবে, ইন্দ্রিয় জয় করতে হবে—দুষ্ট অশ্বের মত তারা যেন বিপথগামী না হয়—বহির্জগতের আকর্ষণ যেন তাদের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার কর্‌তে না পারে।

ক্রিশ্চানদিগের ত্যাগধর্ম্মবাদ ঠিক এই মতেরই অনুবর্ত্তী। এই মতগুলি মনে হয় তাঁরা বেশ হৃদয়ঙ্গম করেছেন। তাঁরা বলেন "বাঁচ্‌তে হলে মর্‌তে হয়" (Die to live)। তাঁরা আরও বলেন যে "যে নিজের জীবনকে বাঁচায় সেই তাকে হারায় এবং যে তাকে হারায় সেই তাকে ফিরে পায়" (He that saveth life shall lose it and he that loseth his life shall find)। ক্রিশ্চানদের আদর্শ হল ক্রুশবিদ্ধ যীশুর জীবন, যিনি পরার্থে সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিয়েছেন, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বলিদান দিয়েছেন। তাঁরা বলেন যে ইন্দ্রিয়ভোগের জীবন মানুষের পারমার্থিক সাধনায় বাধা দেয়। কাজেই তা হতে আমাদের নিজেকে দূরে রাখ্‌তে হবে। ক্রিশ্চান সাধক টমাস্ এ্যাকুইনাস্ বলেন যে, ভগবৎ চিন্তাই মানুষের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম এবং তার জন্য দুঃখ বরণ কর্‌তে হবে। পার্থিব সুখ ত্যাগ কর্‌তে হবে এবং কৌমার জীবন যাপন কর্‌তে হবে। মুসলমানদের মধ্যে সুফী সম্প্রদায়ও এই ধরণের মত প্রচার করেছিলেন এবং ত্যাগ ও সংযমকে ভগবদ্দর্শনের সহায় বলে মনে করেছিলেন।

ভারতীয় ত্যাগধর্ম্মবাদীদের মধ্যে জৈনরা হচ্ছেন সবার সেরা। তাঁরাও বাহির-জগত ও ইন্দ্রিয়সুখ চানই না, মানসিক সুখানুভূতিও চান না। তাঁরা চান পরিপূর্ণতম নির্ব্বাণ, কারণ তাঁদের বিশ্বাস হল এই যে যতক্ষণ জীবন থাকে ততক্ষণই মানুষের ভাগ্যে থাকে দুঃখ। কাজেই দুঃখ এড়াবার একমাত্র উপায় হচ্ছে জীবনের বিনাশ। "পঞ্চাস্তিকায় সময়সার" নির্দ্দেশ করেন যে নির্ব্বাণলাভ হয় "ত্রিরত্নের" চিন্তায়। তা হল সত্য জ্ঞান, সত্য বিশ্বাস এবং সত্য আচরণ। "সত্যধর্ম্ম হল স্পৃহা এবং ঘৃণা নির্ব্বিশেষে বাহ্যজগতের প্রতি নিরপেক্ষ আচরণ।" জগতের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন কর্‌তে, পুনর্জন্মের হাত এড়াতে, চাই পুণ্য সঞ্চয়। তা হয় (১) অহিংসা (২) সত্যকথন

এবং দান (৩) অনবদ্য আচরণ (৪) মনে পবিত্রতা এবং (৫) ইন্দ্রিয়সুখ ত্যাগে। এই সব কাজেই মনে শান্তি আসে এবং মন কামনার তাড়নায় বিচলিত হয় না। অহিংসা অভ্যাস করতে গিয়ে জৈনরা বড় বাড়াবাড়ি করেন। তাঁরা মুখে কাপড় ঢাকা দিয়ে চলেন, পাছে কোন জীবাণু নিশ্বাসের সঙ্গে নাসিকায় প্রবিষ্ট হয়ে মৃত্যুলাভ করে। জৈনরা যখন চলেন তখন সামনেটা ঝাঁট দিতে দিতে যান—পাছে কোন জীবকে তাঁরা মাড়িয়ে ফেলেন। জৈনরা এতেও সন্তুষ্ট নন, তাঁরা বলেন ত্যাগকে সম্পূর্ণতম প্রতিষ্ঠা দিতে হলে দিগম্বর হতে হবে। এমন কি তাঁরা বলেন—ত্যাগ ও সংযমের দ্বারা যখন আমরা পরজন্মকে জয় করে ফেলি তখন আত্মহত্যাই প্রকৃষ্ট পথ। তাতে কোন দোষ নাই। হিন্দুদের ষড়দর্শনের মধ্যেও এই ত্যাগধর্ম্মের প্রভাব খুবই বেশী। তাঁরা বলেন—মুক্তি অর্থাৎ পরজন্ম জয়ই হল মানুষের পরমার্থ, কারণ সকলের কাছেই এই ধারণা বলবতী যে পার্থিব জীবন মানুষের ভাগ্যে আনে কেবল কষ্ট ও দুঃখ। যাঁরা এমন মত প্রচার করেন তাঁদের মতে এই কষ্টের জীবন এড়ানর এক অতি সহজ উপায় হল আত্মহত্যা করা; কিন্তু সেখানে বাধা আছে, কারণ তাঁরা ত চার্ব্বাকদের মত বিশ্বাস করতে পারেন না যে মৃত্যুর পর আর পরজন্ম নাই; তাঁরা জানেন যে "জন্মিলে মরিতে হবে" শুধু তা নয় "মরিলেও জন্মিতে হবে।" কাজেই আত্মহত্যা আর প্রকৃষ্ট পথ নয়। পরজন্মকে জয় করা যায় তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা—এই তাঁদের বিশ্বাস। তাই তাঁরা সকলেই বলেন মানুষের কর্ত্তব্য হল ইন্দ্রিয়-বিলাসপূর্ণ পার্থিব ভোগের জীবনকে পায়ে ঠেলে তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধানে মনোনিয়োগ করা। এই তত্ত্বজ্ঞান সহজে হয় না, এ সাধনার জিনিস। এর জন্য চাই কঠোর ইন্দ্রিয়-সংযম, তবেই মানুষ তত্ত্বজ্ঞানে মনোনিবেশ করতে পারবে, ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হবে। সেই জন্য তাঁরা সকলেই জ্ঞানার্জ্জনের আগে ইন্দ্রিয় সংযম অভ্যাস করতে বলেন, কারণ ইন্দ্রিয়গুলিই সকল আপদের মূল। তাদের যদি না বশ করা যায় তা হলে কেবলই চিত্তবিক্ষেপ ঘটবে, তত্ত্বজ্ঞানে মনঃসংযোগ সম্ভব হবে না। শঙ্কর তাঁর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের গোড়াতেই ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। যোগদর্শনের বিশেষ চেষ্টাই হল চিত্ত-বিক্ষেপের সম্ভাবনা নির্ম্মূল করবার উপায় উদ্ভাবন করা। যোগ-সাধনায় দেহের উপর শক্তি সঞ্চয় হয় এবং তার ফলে তত্ত্বচিন্তায় মনোনিবেশে সুবিধা হয়। একথা সকলেই জানেন—যোগের উদ্দেশ্য চিত্ত-নিবেশের শক্তি সঞ্চয় করা।

উপনিষদের মতটাও উপেক্ষার জিনিস নয়, তারও মতটা এই সম্পর্কে আলোচনা না করে গেলে আমাদের অন্যায় হবে, তার প্রতি অবিচার করা হবে। মোটামুটি উপনিষদ্ হলেন মানসিক সুখবাদী, ইন্দ্রিয়সুখের প্রতি তাঁদের গভীর বিতৃষ্ণা। শুধু তাই নয়—এঁরা বলেন ইন্দ্রিয়সুখ সর্ব্বদা পরিহার্য্য। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলেন যে এই জগতের পার্থিবসুখ আমাদের দেয় অল্প—যে সুখ অল্প ও ক্ষণস্থায়ী তাতে সুখ নেই। অনন্ত যে আনন্দ সেই হল আসল সুখ; সেই অশেষ আনন্দের আধার হল ভূমা, এই ভূমার মাঝেই সকল সুখের সন্ধান মেলে। এই ভূমার আস্বাদ পাওয়া যায় ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে—সেখানে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ থাকে না। ইন্দ্রিয়সুখস্পৃহা এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অন্তরায়, সেই জন্য তাকে দমন করতে হবে। তাই কঠোপনিষদ্ বলেন "আত্মাকে জানতে হবে রথী বলে এবং বুদ্ধিকে সারথী বলে, মনকে প্রগ্রহ বলে ইন্দ্রিয়গ্রামকে অশ্ব বলে এবং ভোগ্যবস্তুকে রাস্তা বলে; যে মানুষের মনের বল কম তার ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি দুষ্ট অশ্বের মত এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়।" ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাস প্রয়োজনীয় জিনিস। উপনিষদের পার্থিব সুখভোগের প্রতি একটা গভীর ঔদাসীন্য এবং বিতৃষ্ণা আছে সেটা বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয়। উপনিষদেই দুইটি সুন্দর গল্প আছে—যা এই বিতৃষ্ণার ভাবটিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলে। কাজেই সেই গল্পদুটিকে সংক্ষেপে এখানে বলবার লোভ সংবরণ করা আমার পক্ষে শক্ত হবে। কঠোপনিষদের নচিকেতার গল্প বোধ হয় সকলেই জানেন। বাপ তার বিরক্ত হয়ে দিলেন তাকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে। সেখানে সে তিন দিন অনাহারে উপবাসী। ব্রাহ্মণের ছেলে বাড়ীতে অভুক্ত—যমের কি করে সহ্য হবে, তাই তিনি বার বার তাকে খেতে অনুরোধ করলেন। শেষে সর্ত্ত হল এই যে যম তাহাকে জ্ঞান শিক্ষা দেবেন তাহলে তিনি অন্ন স্পর্শ করবেন নচিকেতার আব্দার হল যে মানুষের মৃত্যুর পর কি হয় সেটা জানতে হবে। কিন্তু যম তাতে রাজী নন; তিনি বললেন

"তোমায় অশ্ব, হস্তী, হিরণ্য, বড় জমিদারী দেব—আর দেব-দুর্লভ সুন্দরী মেয়ে। জগতে যা কিছু দুর্লভ এবং কামনার বিষয় আছে সব দেব। তুমি এই প্রশ্ন হতে আমাকে অব্যাহতি দাও।" কিন্তু নচিকেতা তার যা উত্তর দিলেন সেইটাই লক্ষ্য করবার বিষয়। তিনি বললেন "সুদীর্ঘ জীবন তাও ত সীমাবদ্ধ—অশ্ব নৃত্য-গীত সবই তোমার থাকুক—কারণ বিত্তের দ্বারা মানুষকে কখনও তৃপ্ত করা যায় না।" এই হল উপনিষদের মত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ীর গল্পটিও ঠিক এই নীতিই প্রচার করে। যাজ্ঞবল্ক্য যখন স্থির করলেন যে তিনি প্রব্রজিত হবেন, তিনি তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে ডেকে তাঁর সম্পত্তি দিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু মৈত্রেয়ী সে সব জিনিস সগর্ব্বে প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বললেন 'যাতে অমৃতা হব না, সেই অর্থ নিয়ে আমি কি করব? বরং আমার স্বামী—তাঁর জ্ঞান যা আছে তারই ভাগ দিয়ে যান আমাকে।' ইন্দ্রিয়সুখের ত্যাগ ও জ্ঞানলাভের প্রতি মনোনিবেশ—এই হল উপনিষদের শিক্ষা।

ইউরোপীয় নীতিশাস্ত্রের মধ্যে কাণ্টের মতের মধ্যেই এই মানসিক সুখবাদ এবং ত্যাগধর্ম্মবাদ সব থেকে পরিবর্দ্ধিত আকারে দেখা গিয়েছিল। সকল মানসিক সুখবাদীর মত তাঁরও দৈহিক সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত বিতৃষ্ণা ছিল। তিনি বলেন "সাধারণ জন্তরা হল সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়-বৃত্তি পরিচালিত জীব, কিন্তু মানুষ ত জন্ত নয়; তার বিশেষত্ব হল এই যে তার মধ্যে জ্ঞানশক্তির বিকাশ হয়েছে। এর নির্দ্দেশই হল এই যে মানুষ জন্তর জীবনকে একেবারে নির্ব্বাসিত করে জ্ঞানের জীবনকেই নিঃসপত্ন-ভাবে গ্রহণ করুক।" তাঁর "ক্রীটিক্ অফ্ প্র্যাক্টিকাল রিজ্‌নে" তিনি বলেন যে "বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যদি মানুষ সেই বুদ্ধিবৃত্তিকে ইন্দ্রিয়সুখ সন্ধানেই ইতর প্রাণীর মত নিযুক্ত করে তা হলে জন্তুত্বের থেকে তার উচ্চতার প্রমাণ রইল কোথায়?"

অন্য মানসিক সুখবাদীরা অনুভূতিকে আমল দিতে চাইতেন না, তার কারণ তার সঙ্গে ভাগ্যে দুঃখও আসতে পারে এবং মানসিক শান্তির ব্যাঘাত হতে পারে। উপনিষদরাও অনুভূতি চাইতেন, কিন্তু সসীম জগতের অল্পক্ষণস্থায়ী সুখানুভূতি নয়, চিরস্থায়ী ভূমানন্দের অনুভূতি। কিন্তু কাণ্ট বললেন—কোন রকম সুখের আশাই মানুষের রাখা উচিত নয়, কোন সুখানুভূতিকেই আমল দিতে নেই। অনুভূতিশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাসিত করতে হবে, তবেই আমরা আদর্শ নীতি-পরায়ণ জীব হতে পারব। কাণ্টের মতে সহানুভূতি-প্রণোদিত বা স্নেহ-প্রণোদিত হয়ে কোন একটা ভাল কাজ করলে সেটা নীতিশুদ্ধ কাজ হবে না। ঘৃণার মত ভালবাসাকেও পরিহার করতে হবে, কারণ নীতির দাবী হল এই যে যন্ত্রচালিতের মত আদেশ পালন করতে হবে, যেমন সৈন্য বিনা বাক্যব্যয়ে তার সেনাপতির আদেশ পালন করে। মানুষের নীতি-বুদ্ধি মানুষকে এমন কথা বলে না যে প্রকৃত সুখ ও আনন্দ চাও ত এইটে কর; তা বলে—এইটা কর, কারণ এইটা তোমার কর্ত্তব্য—তার ফল কি হবে ভাব্‌বার প্রয়োজন নাই, কেন করতে হবে তা প্রশ্ন করবার প্রয়োজন নাই। মানুষের অন্তরস্থিত নীতিবুদ্ধি তাকে আদেশ করবে "যে কাজ বিশ্বের সকলের অনুমোদিত হবে সেই কাজ তুমি করে যাবে—বিনা দ্বিধায় বিনা বাক্যব্যয়ে।" কাণ্টের মতের মধ্যে এইটাই বিশেষ করে লক্ষ্য করবার জিনিস যে তিনি অনুভূতিশক্তিকেও নির্ব্বাসন দিতে প্রস্তাব করেছিলেন। বেনথাম্ ও মিল অনুভূতি-শক্তির যা উচ্চতম বিকাশ—ভালাবাসা বা প্রেম—তাকে আদরের জিনিস বলে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কাণ্ট তা করতে নারাজ। সেও যে দেহের সঙ্গে লিপ্ত—সহানুভূতি বা ভালবেসে কোন কাজ করলে সে ত আত্ম-তৃপ্তির জন্যই করা হল, সেওত ভোগ করা হয়ে দাঁড়াল। আমরা ভোগ করতে আসিনি—কাজ করতে এসেছি। কাজেই কাণ্টের মতে মানসিক মতবাদ সব থেকে একপেশে হয়ে দাঁড়াল।

এই দুইদলে রেশারেশি এবং যুদ্ধের গল্পটা এখন আমরা শেষ করে ফেলেছি। এখন দেখা যাক্ এই দুইয়ের মধ্যে শান্তিস্থাপনের কোন সম্ভাবনা আছে কিনা।

একটা জিনিস আমাদের সহজেই চোখে পড়ে এই যে—মানসিক সুখবাদ ও দৈহিক সুখবাদ এই দুয়েরই যেন মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণাটী সত্যের ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয় নাই। যেহেতু মানুষের বিশেষত্ব হল যে তার বুদ্ধি শক্তি আছে, সেই হেতু একদল লোক ঠিক করেছিলেন যে মানুষের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে কেবল বুদ্ধির সঙ্গেই, আর

কিছুর সঙ্গে নয়। কিন্তু আমরা কি দেহকে এবং তাকে অবলম্বন করে যে অনুভূতি শক্তি আছে তাকে—বাদ দিতে পারি? মানুষের যে কেবলমাত্র ইচ্ছাবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি দিয়েই মনখানি গড়া তা ত নয়, অনুভূতিবৃত্তিও তার আছে। এই তিনটি নিয়েই তার মন; এই তিনটি পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষ চিন্তা ক'রে ঠিক কর্‌বে তার ইচ্ছাশক্তি কোনদিকে যাবে; কিন্তু তার ইচ্ছাশক্তিকে বল দেবার যে কর্ত্তা সে হল তার অনুভূতিশক্তি। মানুষের অনুভূতিশক্তিই তার কাজে তাকে উৎসাহ দেয়, প্রেরণা এনে দেয়। মানুষের প্রেরণার গভীরতা যত পরিমাণ বেশী, তার কাজ কর্‌বার ক্ষমতাও সেই পরিমাণ বেশী হবে। আমরা যদি অনুভব করি যে একটা ভয়ানক অন্যায় অত্যাচার আমাদের ওপর চলেছে—তাহলে সে অত্যাচারকে দমন কর্‌বার চেষ্টা এবং ইচ্ছাও সেই পরিমাণ বেড়ে যাবে। শুধু তাই নয়, অনুভূতিশক্তি যদি না থাকৃত তাহলে জীবনে রস থাকৃত কোথায়? জীবন ত হ'ত পরম শূন্য মরুভূমির মত। নীতি-শাস্ত্রের নির্দ্দেশ যদি হয় নীতির রূপ, তাহলে প্রেরণা বা অনুভূতি সেই রূপকে পূর্ণতা দেয়, সজীবতা দেয়, তাকে নির্জীব কঙ্কাল রাখে না—রক্তমাংসের দেহে পরিণত করে। মাংসবিহীন কঙ্কাল যেমন বীভৎস, প্রেরণা বা অনুভূতি-বিহীন নীতি-পরায়ণতাও সেইরূপ অশোভন। মানুষের অনুভূতিশক্তিকে বজায় রাখতে আপত্তিই বা কেন? তার ত সত্যিই কোন বিরোধ নেই নীতির সঙ্গে। "সীনিক"রা যদি ব যে "সুখ চাইতে গেলে দুঃখও আসতে পারে, অতএব দু: কে এড়াতে অনুভূতিশক্তিকে মেরে ফেল্‌তে হবে, সুখ দুঃখ দুইকেই ত্যাগ কর্‌তে হবে"—আমি বল্‌ব সেটা অতি ভুল যুক্তি। এর মানে কি এমন কথা হয়ে দাঁড়ায় না যে "যেহেতু আমার ডান হাতটি ভাল কাজও কর্‌তে পারে—মন্দ কাজও কর্‌তে পারে, কাজেই তাহাকে কেটে ফেলে দেওয়াই ভাল। কি জানি যদি খারাপ কাজ সে করে বসে?" কেবলমাত্র খারাপ কাজ করাকে এড়িয়ে চলার থেকে ভাল কাজ করা অনেক বড় জিনিস। কেবলমাত্র দুঃখকে এড়িয়ে চলার চেয়ে সুন্দর সুখানুভূতি বাঞ্ছনীয় বেশী। শুধু তাই কেন, আমরাও এমনভাবেও চল্‌তে পারি যাতে দুঃখের পথ না মাড়াতে হয়, আমাদের যেটা দরকার সেটা অনুভূতিশক্তিকে মেরে ফেলা নয় বা স্বার্থকে নির্ব্বাসিত করা নয়, স্বার্থকে বিস্তারিত করা, তাকে সঙ্কীর্ণতাদোষ মুক্ত করা। আমাদের নিজের স্বার্থকে সকলের স্বার্থের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে, সেই ত হল উপায়—দুঃখকে জয় করবার। আমরা যদি অনুভূতিশক্তিকে কাণ্টের নির্দ্দেশমত একেবারে মেরে ফেলি এবং কেবলমাত্র নীতিবুদ্ধির নির্দ্দেশমত কাজ করে যাই—যেমন ক'রে ভৃত্য তার প্রভুর আদেশ যন্ত্রচালিতের মত পালন করে—তাহলে কি জীবনের সব সৌন্দর্য্য হারিয়ে যায় না? মানুষ তা হলে হয়ে পড়ে যন্ত্রচালিত জীব মাত্র, জীবনের প্রতি তার আকর্ষণ থাকে না, কাজ আর তার কাছে খেলার সামিল থাকে না, সেটা হয়ে পড়ে একান্তই বোঝার জিনিস। নৈতিক জীবনে অনুভূতির প্রয়োজনীয়তা আছে, যেমন জীবনের বিকাশের জন্য দেহের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই যুক্তিকে অবলম্বন করে জেম্‌স সেথ্ বলেছেন "দেহ ও মনের যুগল নৃত্যে - হয় ত তারা মাঝে মাঝে ঝগ্‌ড়া কর্‌বে—তবু দুজনের হওয়া চাই দুজনের নৃত্যসঙ্গী; না, শুধু তাই নয় তাদের কপালে লেখা আছে এই যে—তারা অনবিচ্ছিন্ন বিবাহিত জীবনই যাপন কর্‌বে" (In their dance, reason and sensibility must be partners, even though they often quarrel; now their true destiny is a wedded life where no permanent divorce is possible.)

মানসিক সুখবাদীদের যে ঠিকে ভুল দিতে এই গোড়ায় গলদটুকু রয়ে গিয়েছে তা এই মতাবলম্বী কয়েকটি দার্শনিকের নিজেদের চোখেই ধরা পড়ে গেছে। স্কচ্ দার্শনিক শ্যাফ্‌টস্‌বেরী বলেন যে স্বার্থান্বেষণ ও পরার্থ অন্বেষণ দুই হল মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কাজেই নীতি-পরায়ণ লোকের কর্ত্তব্য হল একটির উচ্ছেদ সাধন করে অন্যটিকে গ্রহণ করা নয়, দুইকেই বজায় রেখে দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা।

সাধারণ মানুষের মধ্যে আমরা দুই মতেরই লোক পাই। একমত বলেন যে ইন্দ্রিয়সুখ ঘৃণ্য জিনিস, উচ্চতর জীবনযাপনের বাধাস্বরূপ—সুতরাং তাকে সমূলে বিনাশ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। তাঁদের মত হল এই যে দেহ হল মনের শত্রু, অতএব মনকে বিকশিত কর্‌তে হলে চাই দেহের দাবীকে খর্ব্ব করা। দেহকে বশে আন্‌বার জন্য তাই

তাঁরা নানা রকম কঠোর সাধনা করেন, উপবাস করে দেহকে শীর্ণ করে ফেলেন। সত্য কথা বল্‌তে কি—তাঁদের একমাত্র কাজ হয়ে পড়ে দেহকে মাত্র বশে আনা। হাজার হক, দেহকে বশে আনাটা প্রয়োজনীয় হতে পারে, কিন্তু সেইটাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়; সেটা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, মুখ্য উদ্দেশ্য হল সুনীতির কাজ করা। কিন্তু দেহকে জয় করার ওপর নজর বেশী দেওয়ায় মানুষের মনোভাব বিকৃত হয়ে পড়ে, তার তখন উদ্দেশ্য হয় দেহকে জয় করাই—আর কিছু নয়। সেই কাজেই হয় তার সমস্ত সামর্থ্য ব্যয়িত। ধরে নেওয়া যাক্ একটা বাড়ীর তিনতলার ছাদে আমাদের উঠ্‌তে হবে, সেইটাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য—কিন্তু সে ছাদে সিঁড়ি নাই। সেই জন্য মই চড়া অভ্যাস করা দরকার। সেই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হয়ে কেউ যদি মই চড়া অভ্যাস করেই সমস্ত জীবন কাটিয়ে দেন—আর ছাদে ওঠ্‌বার কথা একেবারে ভুলে যান, তা হলে সেটা যেমন বুদ্ধিহীনতার পরিচয় হবে এও ঠিক তেমনি। এই ভাবে দেহকে নির্য্যাতিত করার ফল হয় এই যে—দেহ নিস্তেজ হয়ে পড়ে—সেই সঙ্গে মনও তার কাজ কর্‌বার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এই জন্যই ত মহাদেবের মুখ দিয়ে কালিদাস এই তথ্যপূর্ণ উক্তিটি করিয়েছিলেন—"সুস্থ শরীর ধর্ম্মের মূল" (শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্)। অপরদিকে আর একদল আছেন যাঁরা মনের অস্তিত্বের কথা ভুলে যান। তাঁরা ভাবেন মানুষের একমাত্র সুখের মূল হল দেহ। এই দেহকে অবলম্বন করে যত সুখ সম্ভব, সমস্তই ভোগ করে নাও—কারণ, মরে গেলে আর কিছুই থাক্‌বে না। এঁরা বল্‌বেন যে মানুষ হল কেবলমাত্র দেহধারী—আর মানসিক সুখবাদীরা বল্‌বেন যে মানুষের কর্ত্তব্য কেবল মানসিক সুখ অনুসন্ধান এবং দেহকে নিপীড়ন করা। দুইটাই হল একপেশে এবং দুইটাই হল অপূর্ণ সত্যের ওপর স্থাপিত। পূর্ণ সত্যকে যদি তাঁরা উপলব্ধি কর্‌তেন তাহলে তাঁরা বল্‌তেন—মানুষ দেহ এবং মন দুই নিয়ে গঠিত, তবে সৃষ্টির নির্দ্দেশ হচ্ছে এই যে দেহকে অবলম্বন করে মন বিকাশ লাভ কর্‌বে। দেহকে খর্ব্ব করে নয়, দেহকে অবলম্বনরূপে ব্যবহার করেই মনের বর্দ্ধিত হতে হবে; কিন্তু মনের বশেও তার থাকৃতে হবে—তার বিদ্রোহী হলে চল্‌বে না। বাট্‌লারের নৈতিক মতে এই রকমের একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টার আভাস আমরা পাই। তাঁর মতে নীতি-বুদ্ধি বা conscience হল নীতির রাজ্যে সব থেকে বড় জিনিস। নীতি-বুদ্ধির কার্‌বার দুটি বৃত্তিকে নিয়ে, এক হল স্বার্থান্বেষণ এবং দুই হল পরার্থান্বেষণ। প্রথমটির উদ্দেশ্য হল সাধারণের কল্যাণ সাধন করা। যেখানে আত্ম হিত অপরের স্বার্থে ঘা দেয় না সেখানে তাকে নিবৃত্ত করা হয় না; আবার যেখানে পর হিত নিজের স্বার্থকে বিশেষ রকম আঘাত করে তাকেও অনুমোদিত করা হয় না। তার কাজ হল এই দুটি বৃত্তির মধ্যে বিরোধ এড়িয়ে সামঞ্জস্য স্থাপন করা।

কিন্তু বাট্‌লারের হিসাবে একটা ভুল রয়ে গেছে যে তিনি কেবল স্বার্থ এবং পরার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মানুষের নৈতিক সমস্যা এই দুটি বিরোধীবৃত্তির সামঞ্জস্যে শেষ হয় না। তার মধ্যে যে আরও দুটি বিরোধী বস্তু রয়ে গেছে তা আমরা এই আলোচনার গোড়াতেই নির্দ্দেশ করেছি। কাজেই সে বিষয়ের মীমাংসা তিনি করেন নি। তাছাড়া নৈতিক সমস্যার আলোচনায় আমরা দেখেছি অনুভূতিকে নীতি-শাস্ত্র অনুমোদন করে কি না সেটাও একটা বড় প্রশ্ন—সে প্রশ্নেরও তিনি কোন উত্তর দেন নি।

এই সম্পর্কে আমাদের গীতার নীতি সম্বন্ধে মতের কথা আপনি এসে পড়ে। গীতার মতে হিন্দুর ষড়দর্শনেরই মত মানুষের পরমার্থ বা Summum Bonum হল মোক্ষ লাভ, অর্থাৎ পুনর্জন্ম হতে মুক্তিলাভ। মানুষের যখন মতি, চিন্তা এবং অনুভূতি এই তিনটি উপকরণ নিয়ে মনখানি গঠিত, গীতার মতে এই তিনটির যে কোন একটিকে অবলম্বন করেই আমরা মুক্তির সাধনা কর্‌তে পারি। মানসিক সুখবাদীর মত গীতা এ কথা বলেন না যে কেবলমাত্র মানসিক চিন্তা নিয়েই আমাদের নৈতিক কাজগুলি সীমাবদ্ধ থাকবে। সমাজকল্যাণবাদীদের সঙ্গে একমত হয়ে গীতা একথাও বলেন যে পর হিত দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়। আবার দৈহিকসুখবাদীদের কাছ হতে দৈহিক অনুভূতির যা চরম বিকাশ প্রেম, তাকেও গ্রহণ কর্‌তে গীতা কুণ্ঠিত নয়। ভগবদ্‌ভক্তির দ্বারা মুক্তি অর্জ্জন করা যায় গীতা বলেছেন। এইভাবে গীতার মতের মধ্যে একটা উদারতা এবং ব্যাপকতা আমরা লক্ষ্য কর্‌তে পারি। গীতার মতে সংক্ষেপে পরমার্থ-

লাভ চিন্তা দ্বারা, কর্ম্ম দ্বারা এবং ভক্তি দ্বারা তিন প্রকারেই হয়। এই তিন উপায়কে যথাক্রমে জ্ঞানমার্গ, কর্ম্মমার্গ এবং ভক্তিমার্গ বলা হয়ে থাকে। গীতার মতে ভগবানের প্রকাশ সৎ, চিৎ এবং আনন্দ এই তিনরূপে; সেই কারণে যিনি মনীষী, যিনি চিন্তাশীল—তাঁর কাছে তিনি প্রকাশ হন অজ্ঞান-আঁধারবিনাশকারী সত্যরূপে; যিনি পরার্থপর তাঁর কাছে তিনি প্রকাশ পান নরনারায়ণরূপে তাঁর সেবা গ্রহণের জন্য এবং যিনি হৃদয়বান্ তাঁর কাছে তিনি প্রকাশ হন সকল প্রেমের আধার পরমভক্তিভাজন শ্রীভগবানরূপে।

জ্ঞানমার্গ জিনিসটা দর্শনের রাজ্যে গিয়ে পড়ে বেশী। ঠিক সেই রকম ভক্তিমার্গটা ধর্ম্মরাজ্যেরই জিনিস। নিছক খাঁটি নীতি-রাজ্যের জিনিস হল কর্ম্মমার্গ, কারণ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত কর্ম্ম নিয়েই ত নীতির কারবার। গীতা কর্ম্মহীন অলস জীবন পছন্দ করেন না, কৃচ্ছ্রসাধন গীতার অনুমোদিত নয়। সন্ন্যাস মানে গীতার মতে সংসারত্যাগ এবং যোগাভ্যাস নয়। কর্ম্মসন্ন্যাসই গীতার মতে আসল সন্ন্যাস। এই সন্ন্যাসের শিক্ষা এই যে মানুষের কল্যাণ-সাধনের জন্য মানুষের উচিত কর্ম্ম করে যাওয়া। নিঃস্বার্থ পরোপকার-সাধনই গীতার নৈতিক আদর্শ, এই বিষয়ে ফরাসী দার্শনিক কোম্‌তের মতের সঙ্গে গীতার বেশ মিল আছে।

কাজ করে যাবে পরার্থে, কিন্তু সেটা কি ভাবে সম্পাদিত হবে? সে সম্বন্ধে গীতার আদেশ হল এই যে, এমনভাবে কাজ কর্‌বে যাতে পরজন্মের কারণ তা না হয়ে দাঁড়ায়। কোন উদ্দেশ্য বা কামনা নিয়ে যা কাজ করা যায় সেই কাজের ফলভোগী আমাদের হতে হবে এবং সেই কর্ম্মফলভোগের জন্য পরজন্ম আসে; কাজেই কর্ম্মফলের আশা না করে নিষ্কাম হয়ে যদি আমরা কাজ করি সে কাজ আমাদের পরজন্ম আন্‌বে না। গীতার মতে যোগ হল দেহের ওপর নানা উপায়ে প্রভাব বিস্তার নয়, যোগের অর্থ হল কর্ম্মেতে কৌশল বা নিপুণতা (যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্) অর্থাৎ কামনাহীন কর্ম্মে আত্মনিয়োগ। আমরা যদি নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাই এবং কর্ম্মফলের প্রতি মনোযোগ না দিই তা হলে আমাদের মুক্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী, আমাদের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিতে হবে এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কর্‌তে হবে।

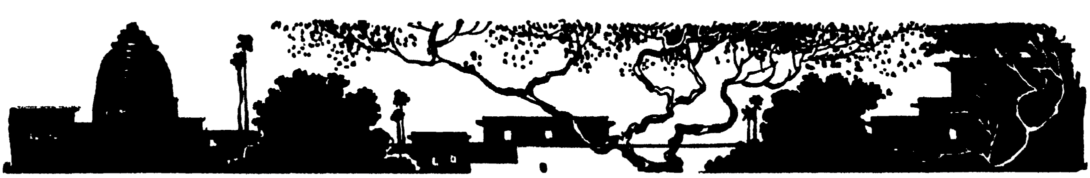
কিন্তু গীতা এখানে একটা ভুল কর্‌লেন—কর্ম্মফল ত্যাগ কর্‌তে আদেশ দিয়ে বিধান কর্‌লেন এই যে আমাদের অনুভূতি-শক্তিকে নির্ব্বাসন দিতে হবে—কারণ উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা কোন কাজ কর্‌তে পার্‌ব না। পরের ভাল করে আমরা যে তৃপ্তি পাব তা হলে চল্‌বে না, তা হলে ত কর্ম্ম-ফলের আশা নিয়ে কাজ করা হয়। কাণ্টের মত এখানে গীতার আদেশ হল—আমরা কেবলমাত্র যন্ত্রচালিতের মত কাজ করে যাব, কাজ করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, তৃপ্তি পাওয়া বা সুখ পাওয়া নয়। এ মতটির আমরা সমালোচনা করেছি পূর্ব্বেই এবং নৈতিক জীবনে অনুভূতির যে স্থান আছে সেটা স্থাপন কর্‌তে চেষ্টা করেছি। কাজেই সে কথাগুলির পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই।

ভগবান বুদ্ধ নীতি সম্বন্ধে যে মতটি দিয়েছিলেন সে মতটি আরও পূর্ণতর এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ। নৈতিক মতগুলির দোষই হল এই যে—তারা সাধারণতঃ হয়ে পড়ে একপেশে। তার প্রমাণ আমরা পূর্ব্বে অসংখ্য পেয়েছি। বুদ্ধের মত সে-রকম একপেশে দোষদুষ্ট নয়। বুদ্ধ বলেন না যে সন্ন্যাস গ্রহণ কর্‌তে হবে—শরীরকে শুকিয়ে শুকিয়ে নিস্তেজ করে ফেল্‌তে হবে। তিনি আবার এমন কথাও বলেন না যে ইন্দ্রিয়সুখভোগে গা ঢেলে দিতে হবে। পূর্ণ ইন্দ্রিয়সুখকে তিনি পরিহার করেন, আবার কঠোর সন্ন্যাসকেও তিনি অনুমোদন করেন না। সুদীর্ঘ ছয় বছর ধরে সন্ন্যাসীর জীবন-যাপন করে তিনি এক পরম সত্য আবিষ্কার করেছিলেন এই যে—দুর্ব্বল মানুষ নৈতিক জীবন-যাপন কর্‌তে অক্ষম। বৌদ্ধদের নিজের ভাষায় বলি—দুইটি বিপরীত জিনিস আছে যা কারও করা উচিত নয়। এক হল অত্যধিক ইন্দ্রিয়সুখ-পরায়ণতা এবং ভোগ-লালসা; অন্যটি হল কষ্টকর-হীন এবং অর্থ-হীন আত্মনিগ্রহ। তথাগত একটি মধ্যপথ আবিষ্কার করেছেন—"যে পথ চক্ষু খুলে দেয়, মনকে বোধশক্তি দেয়, শান্তি আনে এবং পরিতৃপ্তি দেয়, নির্ব্বাণের পথ দেখায়।" বুদ্ধের নৈতিক অভিমতটির নামকরণ "মধ্যপথ" অর্থের অনুরূপই হয়েছে। একদিকে বুদ্ধ যেমন আত্মনিগ্রহ পছন্দ করেন না, অন্যদিকে তেমনি তিনি অনুভূতিশক্তির বিনাশসাধনের পক্ষপাতী নন। কাণ্ট এবং গীতার ভুল তিনি করেন নি। নৈতিক-জীবনে তিনি প্রেরণার, রসোপলব্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখেছিলেন।

কেবল যন্ত্রচালিতের মত কর্ম্ম করে যাওয়াই তাঁর মতে নীতির আদর্শ নয়। তিনি বৌদ্ধের "পরমার্থ নির্ব্বাণ"কে সুখ বলে কল্পনা করেছেন, নির্ব্বাণ অন্তঃসারহীন শূন্যতা মাত্র নয়। পরজন্মের বন্ধন কাটতে পারলেই নির্ব্বাণ আমাদের হাতে। তার জন্য প্রয়োজন—যে কাজের জন্য কর্ম্মফল ভোগ করতে হয় না এমন কাজ করা। যে কাজ পবিত্র, সে কাজে কর্ম্মফলভোগ নেই। বুদ্ধদর্শনের চারিটি মহা সত্যের অনুশীলন হল পবিত্র কাজ। সেইরূপ অন্যের কল্যাণ-সাধনও ভাল কাজ, কারণ সেখানে স্বার্থান্বেষণ নাই। শুধু তাই নয়, বুদ্ধ বলেন যে মানুষের ভালবাসা বৃত্তিটিকে বিকাশ করে তুলতে হবে। জীবে দয়া এবং সর্ব্বজীবে প্রেম বুদ্ধের যে কত আকাঙ্ক্ষার জিনিস তা "জাতকের" গল্পগুলি অতি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেয়। "মাঝিমনিকায়" বলেন—"আমাদের মন বিচলিত হবে না, হিংসাপূর্ণ কথা আমরা ব্যবহার করব না, আমরা হব কোমল, আমরা হব সহানুভূতি-পরায়ণ, আমরা হৃদয়ে বহন করব দ্বেষহীন অকৃত্রিম ভালবাসা, তথাগতের জন্য আমরা প্রীতিস্নিগ্ধ চিন্তা পোষণ করব এবং তাঁর কাছ হতে গিয়ে আমরা সমগ্র জগতকে প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষিত করব—যে প্রেম বহুদূর বিস্তারী, অফুরন্ত এবং অনন্ত—যে প্রেমে হিংসা দ্বেষ জ্বালা নাই।" সমগ্র বিশ্ববাসীকে ভালবেসে আপন ভেবে তাদের কাজে আত্ম-নিয়োগ করব এই হল ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা। মিসেস্ রীজ্ ডেভিস্কে এ শিক্ষা অতি গভীরভাবেই মুগ্ধ করেছিল—তাই তিনি ক্রীশ্চান হয়েও এমন কথা বলেছেন যে "জগতে ক্রীশ্চান ধর্ম্মকে জড়িয়ে নিয়েও এমন কোন ধর্ম্ম পাওয়া যায় না যা মানুষের প্রেমের বিকাশের মধ্যে পরম মহত্ত্ব আবিষ্কার করেছে।"

আমরা নৈতিক সমস্যার সমালোচনার প্রায় শেষ ভাগে এসে পড়েছি। নৈতিক সমস্যার সমাধান সেই মতই করবে—যে মত মন ও দেহ দুইটির প্রতি সুবিচার করবে, যে মত স্বার্থ এবং পরার্থ দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখবে। একদিকে সন্ন্যাসীর মত দেহ নিপীড়ন করতে তা শিক্ষা দেবে না, অন্যদিকে কেবল মানসিক সুখ-সন্ধানকেই নৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য বলে নির্দ্দেশ করবে না। অনুভূতিশক্তিকে সে নির্ব্বাসনে পাঠাবে না; সে বলবে নীতির রাজ্যে অনুভূতি শক্তি থাকুক, রসোপলব্ধি আমাদের বজায় থাকুক, প্রেরণা আমাদের থাকুক। কামনা আমাদের থাকবে—কিন্তু সে কামনায় আমাদের স্বার্থসিদ্ধিই বড় জিনিস হবে না। স্বার্থকে আমাদের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে রাখব না, তাকে বিস্তারিত করে পরার্থের সঙ্গে এক করে দিতে হবে।

নিজের স্বার্থ এবং পরের স্বার্থ যেখানে একই জিনিস হয়ে যাবে—সেখানে স্বার্থ এবং পরার্থে দ্বন্দ্ব রইল কোথায়? সকল মানুষের স্বার্থকে যদি নিজের স্বার্থের সামিল করে নেই, তা হলে পরার্থে কাজ করতে আর কষ্টবোধ হবে না, সেটা আমাদের প্রিয় কাজই হয়ে দাঁড়াবে। সেটা তখন কেবলমাত্র কর্ত্তব্যের তাড়নায় সম্পাদিত হবে না, নিজের প্রাণের টানেই সম্পাদিত হবে। কর্ত্তব্য যখন বলে যে অন্যের ভাল কর, তখন মন ভাবে "এত হুকুম"—কিন্তু যখন অন্যকে ভালবাসি, অন্যের স্বার্থ এবং আমার স্বার্থ এক হয়ে গেছে, তখন একথা আর মনে হবে না। তখন মনে হবে "এ ত আমার নিজের মঙ্গল সাধনের মতই"; এতে তৃপ্তি আছে, এ ত কর্ত্তব্যবুদ্ধির নির্দ্দেশ নয়, এ ত ভালবাসার দাবী।" তখন তার আত্মত্যাগে কষ্টবোধ হবে না—আসবে পরিতৃপ্তি, তখন শ্রেয় এবং প্রেয়ে বিরোধ থাকবে না; যা শ্রেয় এবং যা নিজের ও সকলের মঙ্গলজনক—তাই হবে বাঞ্ছনীয়—তাই হবে প্রেয়। চাই আমাদের প্রাণভরা ভালবাসা—সর্ব্বজীবের জন্য এবং চাই আমাদের স্বার্থের বিস্তার লাভ। তা হলেই সকল সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। যে অনুভূতি নিজের এবং সকলের কল্যাণকর সেই অনুভূতিই ভাল, তাই কর্ত্তব্য—তা সে দৈহিক হক্ বা মানসিক হক্।



উপন্যাস

দ্বৈরথ

"বনফুল"

১৬

উগ্রমোহন সিংহ বাহিনী নদীর উপর বজরার ছাদে বসিয়া পশ্চিম দিগন্তের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন। সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। অস্ত রবির কিরণে বন্য স্রোতস্বিনী বাহিনী অপূর্ব্ব শোভায় সাজিয়াছে। নদীর জলে একদল চক্রবাক ভাসিতেছিল। তাহাদের গৈরিক অঙ্গে, বাহিনী-তীরবর্ত্তী শীত-রিক্ত বনশ্রীর পর্ণ-পল্লবে অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণারুণরাগ স্বপ্নলোক সৃজন করিয়াছিল। চিত্রার্পিতবৎ বসিয়া উগ্রমোহন এই চিত্র দেখিতেছিলেন। সুদূর আকাশে শুভ্র বকের সারি উড়িয়া চলিয়াছে—যেন সন্ধ্যার কুন্তলে শ্বেত পুষ্পের একগাছি মালা।

পদশব্দ শুনিয়া উগ্রমোহন পিছন ফিরিয়া দেখিলেন—অঘোরবাবু আসিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি খবর ?"

"মাণিক মণ্ডল এসেছে—"

"ডেকে আন এখানে—"

মাণিক মণ্ডল মুষিকবৎ আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল।

উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন খবর পেলে ?"

"আজ্ঞে, সঠিক কোন খবর এখন পর্য্যন্ত পাই নি। তবে আমার আন্দাজ ছেলে দুটি টাল জঙ্গলেই আছে।"

"কি করে বুঝলে ?"

মাণিক মণ্ডল চঞ্চল চক্ষু দুইটিতে একটু বুদ্ধির জ্যোতিঃ ফুটাইয়া কহিল—"মোহানিয়া ঘাটটা হঠাৎ বন্ধ করে দিয়েছেন কি না! মাঝি মাল্লা কেউ নেই সেখানে।"

"ঘাট বন্ধ আছে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

উগ্রমোহনের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল!

তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"পাগ্‌লী নদী পেরোবার উপায় কি তা হলে? লোকে যাচ্ছে কোন দিক দিয়ে।"

অঘোরবাবু বলিলেন—"মোহানিয়া ঘাট দিয়ে এক টাল ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়া যায় না। ওটা ও তরফের খাস ঘাট—সরকারী নয়। টাল বনকর ত চন্দ্রকান্তবাবু কাউকে বন্দোবস্ত করেন নি—ওটা খাসেই আছে। সেই জন্য মোহানিয়া ঘাট বন্ধ করলে সাধারণের কোন অসুবিধা নেই। সাধারণতঃ লোকে পাগ্‌লী নদী পার হয় ছন্নরামাঝি ঘাটে—এখান থেকে প্রায় আট ক্রোশ দূরে।

উগ্রমোহন সিংহ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়াই রহিলেন।

হঠাৎ তিনি বলিলেন—"মাণিক মণ্ডল—তুমি আজ এখানেই থাক। আমি সিপাহী পাঠিয়ে খবর নিচ্ছি। সিপাহীর মারফৎ তোমার বাড়ীতেও খবর পাঠাও যে তুমি আজ ফিরবে না। এখন তুমি নিচে গিয়ে বস।"

মাণিক মণ্ডল এইরূপ আদেশের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিল—"হুজুর আমার মেজ ছেলেটার জ্বর দেখে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম—তা না হলে—"

উগ্রমোহন বলিলেন—"তুমি যে খবর এনে দিচ্ছ—তা ঠিক কি না তা না জানা পর্য্যন্ত তোমাকে ছাড়ব না। সিপাহীরা যদি ফিরে এসে বলে যে মোহানিয়া ঘাট বন্ধ আছে—তাহলে তুমি ছাড়া পাবে—তার আগে নয়। যাও—বিরক্ত করো না।"

মাণিক মণ্ডল সভয়ে নিচে নামিয়া গেল।

উগ্রমোহন অঘোরবাবুকে বলিলেন—"তুমি বিশ জন সিপাহী পাঠাও। তারা প্রথমে মোহানিয়া ঘাটে যাবে। ঘাট যদি বন্ধ থাকে—একজন ফিরে এসে খবর দেবে।

বন্ধ যদি না থাকে তাহলেও এসে খবর দেবে। ঘাট বন্ধ থাকলে ছন্নরামারি ঘাট দিয়ে পাগ্‌লী পেরিয়ে আজ রাত্রেই তারা চন্দ্রকান্তের টাল কাছারিতে যেন পৌছায়। সেখানে যদি মৃন্ময়ের ছেলেরা থাকে তাদের ছিনিয়ে কেড়ে আনতে হবে। যদি আনতে পারে প্রত্যেককে ভাল করে বখশিস্ দেব। বুঝলে ?"

—"আজ্ঞে হাঁ।—"

অঘোরবাবু নিচে নামিয়া গেলেন।

উগ্রমোহন পশ্চিম দিগন্তের দিকে আবার চাহিয়া দেখিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে কিন্তু অস্ত রবির আলোক নিবিয়াও যেন নেবে না।

১৭

মিশরজী মল্লারে গান ধরিয়াছিলেন—

"বাদর ঝুমি ঝুমি আয়ে—"

একজন তবলায় ঠেকা দিতেছিল। চন্দ্রকান্ত ডাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। তাঁহার চক্ষু দুইটি মুদ্রিত। অঙ্গে একখানি সুকোমল বালাপোষ—হাতে আলবোলার নল। চতুর্দ্দিকে অম্বুরি তামাকের গন্ধ। চন্দ্রকান্ত মাঝে মাঝে আলবোলায় মৃদু টান দিতেছেন। গান বেশ জমিয়া উঠিয়াছে।

এমন সময় রস-ভঙ্গ করা ঠিক হইবে না ভাবিয়া কমলাক্ষবাবু ম্যানেজার বাহিরে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন। গান যত জমিয়া উঠিতেছে কমলাক্ষবাবুর অধীরতা ততই বাড়িতেছে। মালিকের সঙ্গে দেখা করা নিতান্ত প্রয়োজন। বাঘার বিল্ দাঙ্গা সম্পর্কে উগ্রমোহন-বাবুকে আসামী করা সমীচীন কি না তাহা চন্দ্রকান্তকে একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার। গানটা থামিলেই তিনি কাজটা সারিয়া লইবেন। এদিকে মিশরজির গান আর থামে না। তিনি উচ্ছ্বাসভরে গাহিয়া চলিয়াছেন—

বাদর ঝুমি ঝুমি আয়ে
বরণ বরণ বরষণ প্রাণ প্যারে—

চন্দ্রকান্তবাবু চক্ষু বুজিয়া গান শুনিতেছেন—চিন্তাও করিতেছেন। থানার দারোগা বুঝিতে না পারুক চন্দ্রকান্ত রায় ইহা নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিলেন যে গোলক সাকে উগ্রমোহনই ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন এবং পুলিশের দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটাইবার জন্য তিনিই নিজের রতনপুর কাছারি নিজেই লুণ্ঠন করাইয়াছেন। সাধারণ লোক হইলে চন্দ্রকান্ত রায় ভিতরকার ব্যাপারটা নানা বর্ণসমাবেশসহকারে এতদিন পুলিসকে জানাইয়া দিতেন। কিন্তু তিনি ভিন্ন জাতের মানুষ। প্রসিদ্ধ দাবা খেলোয়াড়। 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' নীতির অনুসরণ করিয়া এ ব্যাপারের কোন সুরাহা হইতে পারে কি না তাহাই তিনি ভাবিতেছিলেন। টাল জঙ্গলে মৃন্ময় ঠাকুরের দুই পুত্রকে আট্‌কাইয়া রাখিয়াছেন, তাহাদেরও অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা করা দরকার। সমস্যা জটিল। সুতরাং যদিও মিশরজি প্রাণ ঢালিয়া গাহিতে-ছিলেন এবং তব্‌লাবাদকও নিখুঁতভাবে ঝাঁপতাল বাজাইতেছিল তথাপি চন্দ্রকান্ত রায় সম্পূর্ণ মন দিতে পারিতেছিলেন না। বরং সঙ্গীতের অন্তরালে ব্যাপারটাকে আগাগোড়া ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতে-ছিলেন। কি করা যায়। গান বন্ধ হইল। চন্দ্রকান্ত বলিলেন—"বহুৎ আচ্ছা—"

কমলাক্ষবাবু ওৎ পাতিয়া ছিলেন। দ্বারদেশে গলা বাড়াইলেন। গলা বাড়াইতেই চন্দ্রকান্ত বলিলেন—"তুমি খাওয়া দাওয়া সেরে একেবারে এস। তোমাকে একবার বেরুতে হবে। বিরিঞ্চিকে হাতীটা কস্‌তে বল। আর দেখ, রাধিকামোহনকে একবার খবর দাও ত।" কোথা হইতে কি হইল ভাবিয়া কমলাক্ষবাবু নির্ব্বাক হইয়া গেলেন।

কমলাক্ষবাবু চলিয়া গেলে চন্দ্রকান্ত মিশরজির দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"আর একটা হোক্ মিশিরজি!"

মিশিরজী হাসিয়া বলিলেন—"জি হুজুর—"

তৎপরে একটু ভাবিয়া বলিলেন—"তব্ এক সুরদাসী মল্লার শুনিয়ে। গান্ধার বর্জ্জিত সুরাট্।" তবলাবাদককে বলিলেন—বাজাও চৌতাল। সুরদাসী মল্লারে মিশিরজী গান ধরিলেন—

আধো মুখ নীলাম্বর সোঁ ঢাকি
বিথুরী অলক কৈসি হৈ।
এক দিশা মানো মকর চাঁদনী
এক দিশা ঘন বিজুরী ঐসে হরি মন মো হৈ।

মিশরজির সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে তাঁহারা বিদায় লইলেন। চন্দ্রকান্ত তথাপি একভাবেই বসিয়া রহিলেন। রাধিকামোহন আসিয়া দেখিলেন যে চন্দ্রকান্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধূমপান

করিতেছেন। তাহার পায়ের শব্দ পাইয়াও তিনি চোখ খুলিলেন না দেখিয়া রাধিকামোহন কথা কহিলেন—"হুজুর কি আমায় ডেকেছেন ?"

চন্দ্রকান্ত চক্ষু খুলিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ—বোস।"

রাধিকামোহন উপবেশন করিলে তিনি বলিলেন—"আচ্ছা সেদিন যখন তুমি গোলক সার কাছে টাকা আনতে যাও তখন আর কেউ কি ছিল সেখানে ?"

"কোন খানে ?"

"গোলক সার বাড়ীতে ?"

"আজ্ঞে না।"

চন্দ্রকান্ত একটু ভাবিয়া বলিলেন—"তাহলে কথাটা প্রকাশ পেল কি করে ? গোলক সা কাউকে বলবে বলে ত মনে হয় না।"

তখন রাধিকামোহন একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন—"কেন, কথাটা কি প্রকাশ পেয়েছে ? আমি যখন টাকাটা জমা করি তখন আমাদের মধ্যে গোমস্তা জিগ্যেস করেছিল আমাকে—কোথা থেকে টাকা এল। তাকে অবশ্য আমি বলেছিলাম। হুজুরের ত কোন নিষেধ ছিল না।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন—"তুমি সেই গোমস্তাকে ডেকে দিয়ে যাও।"

একটু পরে মাধব ঘোষাল গোমস্তা আসিলেন। তাহাকে প্রশ্ন করিয়া চন্দ্রকান্ত জানিতে পারিলেন যে মাণিক মণ্ডলের কাছে সে গল্পটা করিয়াছিল বটে। তাহাকে বিদায় দিয়া চন্দ্রকান্ত আপন মনে একটু হাসিলেন। সে হাসির অর্থ "ব্যাপারটা এইবার বোঝা গিয়াছে।"

একটু পরেই কমলাক্ষবাবু আসিলেন। তিনি আসিতেই চন্দ্রকান্ত বলিলেন—"দেখ, তুমি এখনি সোজা টালে চলে গিয়ে ছেলে দুটোকে নিয়ে আমাদের নবিপুর কাছারিতে এনে রাখ আজ রাত্তিরেই। মোহানিয়া ঘাট কি বন্ধ আছে এখনও ?"

"হাঁ"

"বেশ তুমি হাতী সুদ্ধ সাঁৎরে ওপারে যাবে। বুঝলে ? সেখানে গিয়ে ছেলেদের কাছে বলবে যে ভুল করে তাদের তুমি টালে পাঠিয়ে দিয়েছিলে বলে লজ্জিত। মাঝির অসুখ করার জন্য ঘাট দু'দিন বন্ধ ছিল বলে' তাদের ফেরবারও বন্দোবস্ত করতে পার নি। এখন তাদের বাড়ী পৌছে দেওয়ার জন্য হাতী এনেছ। তার পর তারা হাতীতে চড়লে কিছুদূর গিয়ে বলবে যে মহা মুস্কিল—হাতী নবিপুর কাছারির রাস্তা ধরেছে—নিমাইনগরের দিকে কিছুতেই ত যাবে না। বিরিঞ্চিকে দিয়ে এটা বলাবে। আগে থাকতে শিখিয়ে রেখ তাকে। বিশ্বাস আর তার ছেলেকেও সঙ্গে নিয়ে যেও। বুঝলে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ !"

"ঠিক পারবে ত ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ" বলিয়া কমলাক্ষবাবু ভিজা-বিড়ালের মত প্রভুর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। চন্দ্রকান্ত বলিলেন—"দেখ হাতী তৈরি হল কি না! হ্যাঁ, আর এক কাজ কর। যাবার সময় তুমি থানা হয়ে যাও। দারোগার সঙ্গে আলাপ আছে ?"

"আছে।"

"তা হলে শোন।" বলিয়া চন্দ্রকান্ত তাহার কানে কানে চুপি চুপি কি একটা বলিয়া দিয়া আবার বলিলেন—"বেশী কিছু নয়, মাণিক মণ্ডলকে যেন একটু কড়কে দেয়।"

"আচ্ছা"—বলিয়া কমলাক্ষবাবু বিদায় লইলেন। একটু পরেই ঢং ঢং ঘণ্টার শব্দ করিতে করিতে চন্দ্রকান্ত রায়ের হস্তী মোহানিয়া ঘাট অভিমুখে চলিয়া গেল।

ম্যানেজার চলিয়া গেলে চন্দ্রকান্ত সেতারটা পাড়িয়া একটা বেহাগের গৎ আলাপ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ আলাপ করিবার পর হঠাৎ তিনি বাজনা থামাইয়া হাঁক দিলেন—"ওরে ভজনা—"। ভজনা আসিলে তাহাকে বলিলেন—"একটা কাগজ, কলম আর দোয়াত নিয়ে আয়ত।" ভজনা দপ্তরখানায় কাগজ কলম এবং দোয়াতের সন্ধানে চলিয়া গেল। চন্দ্রকান্ত আবার বেহাগে মন দিলেন। ভজনা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল প্রভু তন্ময় হইয়া বাজাইতেছেন। সে সন্তর্পণে কাগজ কলম দোয়াত প্রভুর নিকটে রাখিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। চন্দ্রকান্ত জানিতে পর্য্যন্ত পারিলেন না।

বেহাগ রাগিণীকে নিঙড়াইয়া ছাড়িয়া দিয়া চন্দ্রকান্ত যখন চক্ষু খুলিলেন তখন তিনি সম্মুখে কাগজ কলম এবং দোয়াত দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মুখে মৃদু একটি হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। দুষ্ট বালকের মত তিনি বাম হস্তে লেখনী ধারণ করিয়া লিখিলেন "গোলক সাকে

ছাড়িয়া না দিলে অজয় বিজয়কে পাইবে না।" চিঠিটা লিখিয়া তিনি আবার ভজনাকে ডাকিলেন। বলিলেন, "জমাদার সীতারাম পাঁড়েকে ডেকে আন্ ত!"

বৃদ্ধ জমাদার সীতারাম পাঁড়ে আসিলে তিনি বলিলেন—"এই চিঠিখানা উগ্রমোহনবাবুর চাকর ব্রজকে দিয়ে আস্‌তে হবে। অথচ ব্রজ যেন জানতে না পারে যে চিঠিটা আমি লিখেছি। তুমি যেও না—অন্য কোন লোক মারফৎ পাঠাও। সে যেন বলে আসে যে উগ্রমোহন বাবু এলেই যেন চিঠিটা দেওয়া হয়। বুঝলে?" সীতারাম পাঁড়ে চন্দ্রকান্তের দিকে মিটিমিটি একবার চাহিয়া হাসিয়া পত্রটি লইয়া প্রস্থান করিল।

সকলে যখন চলিয়া গেল তখন চন্দ্রকান্ত নিতান্ত একাকী বসিয়া রহিলেন। গান বাজনা আর ভাল লাগিতেছে না। উগ্রমোহন এখনও ফেরেন নাই—দাবা খেলা বন্ধ। সহসা চন্দ্রকান্তের মনে হইল উগ্রমোহন না থাকিলে তাহাকে এতদিন বোধ হয় বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে হইত। উগ্রমোহনই তাহার জীবনের একমাত্র আশ্রয়—তাহার প্রতিভার প্রেরণা। উগ্রমোহনরূপ কঠিন প্রস্তর খণ্ডে বারম্বার ঘর্ষিত না হইলে চন্দ্রকান্তের বুদ্ধির ছুরিকায় মরিচা ধরিয়া যাইত।

সত্যই চন্দ্রকান্ত পৃথিবীতে একা। পিতা মাতা মারা গিয়াছেন—ভগ্নীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। নিজে বিবাহ করেন নাই। সুতরাং আপনার বলিতে আর কে আছে? কেহ নাই। থাকিবার মধ্যে আছে প্রকাণ্ড জমিদারী এবং তাহার প্রকাণ্ড আয়োজন। কিন্তু তাহাতে কি অন্তর ভরে? অন্তরের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য যে সুধা প্রয়োজন তাহা চন্দ্রকান্তের নাই। তাহার জীবনে যে কয়জন নারী দেখা দিয়াছিলেন সকলেরই মধ্যে সে পণ্য-রমণীর মূর্ত্তি দেখিয়াছে। সকলেই নিজেকে যেন নিলামে বিক্রয় করিতে চায়—যে ক্রেতা বেশী দাম দিবে ইঁহারা তাহারই। অন্ততঃ মনে মনে। সভ্য সমাজে সে যতটা দেখিয়াছে—টাকা দিয়া যেমন জামা কেনা যায়, জুতা কেনা যায়, হাতী কেনা যায়, প্রেমও কেনা যায়।

জামা, জুতা, হাতী, প্রেম—কোনটার সম্বন্ধেই তাহার আর মোহ নাই। অন্তরলোকের নির্জ্জন মহাশূন্যে তাহার নিঃসঙ্গ আত্মা নিঃসঙ্গ নক্ষত্রের মতই একা জ্বলিতেছে।

কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া চন্দ্রকান্ত ভজনাকে ডাকিলেন। ভজনা আসিল। চন্দ্রকান্ত বলিলেন—

"ওরে জুতো আর ছড়িটা আন ত।"

চন্দ্রকান্ত অন্ধকারে একাকী বাহির হইয়া গেলেন। দেউড়ির সিপাহী ঢং ঢং করিয়া বারটার ঘণ্টা বাজাইল।

দিনের পৃথিবী ঘুমে মগ্ন—রাত্রির পৃথিবী জাগিয়াছে। দিনের পৃথিবীর সমস্ত আলোক লইয়া সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। রাত্রির আকাশে কোটি কোটি সূর্য্য উঠিয়াছে—অন্ধকার তবু যায় না। রাত্রির পৃথিবীর প্রাণের স্পন্দন শোনা যাইতেছে—অতি মৃদু অব্যক্ত সে ধ্বনি। শব্দহীন অথচ সুস্পষ্ট। দিবসের পৃথিবীতে মানুষের কোলাহল – পৃথিবীর প্রাণের স্পন্দন শোনা যায় না।

নদীর তীরে তীরে চন্দ্রকান্ত একাকী ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কত কথাই মনে হইতেছে। কত ভাব মনে আসিতেছে যাহার ভাষা নাই। যাহার ভাষা আছে তাহা বলিতে ইচ্ছা করে না। গভীর নিশীথে আকাশের দিকে চাহিয়া সমস্ত ভাষা স্তব্ধ হইয়া যায়। বিস্মিত অন্তরে শুধু দুইটি কথা জাগে—আমি কত ক্ষুদ্র, আমি কত বৃহৎ।

সহসা অকারণে চন্দ্রকান্তের সুজাতার কথা মনে হইল। সুজাতার চক্ষু দুইটি যেন তাহার দিকে চাহিয়া আছে। নীরব বেদনা তাহা হইতে ক্ষরিয়া ক্ষরিয়া পড়িতেছে। তাহার অশ্রুজলে চন্দ্রকান্তের সমস্ত অন্তর যেন পরিপূর্ণ হইয়া গেল!

সুজাতা গেল, আসিল কমলা। সেই দুরন্ত হাস্যমুখী কমলা! চন্দ্রকান্তের ক্ষুধিত আত্মা অতীতের অন্ধকারে কাহাকে যেন খুঁজিয়া ফিরিতেছে! বেহাগের পদটা মনের মধ্যে আসা-যাওয়া করিতেছে—

শ্যাম মোরি আঁখন বীচ সমায় রহো
লোগ জানে কজরারে!

মিথ্যা—মিথ্যা—মিথ্যা—সব মিথ্যা!—কবির কল্পনা। রাধিকা কল্পনা, কৃষ্ণ কল্পনা, প্রেম কল্পনা। সত্য শুধু কবিত্বটুকু। সত্য শুধু সঙ্গীত—সুরের উন্মাদনা। সেই

উন্মাদনায় মাতিয়া পৃথিবী শুদ্ধ লোক রাধার বিরহে কাঁদিয়া মরিতেছে।

মেঘের স্তর ভেদ করিয়া কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠিল। অন্ধকারের যবনিকা সরিয়া গেল। রঙ্গমঞ্চে নূতন নট-নটীর সমাগম হইল। স্বচ্ছসলিলা চন্দনা নদী ও ওপারের শুভ্র বালুচর। ক্ষিপ্রস্রোতা তন্বী চন্দনা যেন কাহার অভিসারে ছুটিয়া চলিয়াছে—ব্যর্থ-প্রেমিক শুভ্র বালুচর স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া আছে। বালুচর অনন্ত স্বপ্নে নিমগ্ন। স্বপ্নই তাহার সম্বল। সে প্রতীক্ষা করিয়া আছে —কবে বর্ষার বান আসিবে। কূলের বাঁধন ভাঙিয়া আকুল চন্দনা কবে তাহাকে আবিল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে প্লাবিত করিয়া দিবে। বর্ষা আসে কিন্তু থাকে না। চন্দনার স্রোতে কত বর্ষা আসিল, কত বর্ষা গেল। বালুচর কতবার ডুবিল—কতবার উঠিল। চন্দনা আজও বহিতেছে—বালুচর আজও জাগিয়া আছে। চিরন্তন কাহিনী।

চন্দ্রকান্ত নদীর ধারে গেলেন। কাছেই একটা জেলে-ডিঙি হইতে কে গাহিয়া উঠিল,

আধি রাতি রে পাপিহারা
পিয়া পিয়া বোলে—!
পিয়া পিয়া বোলেরে পিয়া
পিয়া গিয়া বিদেশ
কৈ সে ভেজুঁ রে সন্দেশ !

সেই চিরন্তন বিরহের গান। আকাশ, বাতাস, নদী, বালুচর, মানবমানবী সকলের মনে সেই এক সুর—পাইলাম না। যাহাকে চাই ঠিক লগ্নটিতে তাহাকে পাইলাম না। সে দূরেই রহিয়া গেল! সহসা চন্দ্রকান্তের ফুল্‌কির কথা মনে পড়িল। মেয়েটির সহিত পরিচয় করিয়া দেখিলে হয়! কিন্তু তখনই আবার তাহার সমস্ত অন্তর বলিয়া উঠিল—"কাছে যাইও না। কাছে গেলেই মোহ টুটিয়া যাইবে। মোহ টুটিয়া গেলেই ফুল্‌কি নিবিয়া যাইবে! সুজাতার কাছে গিয়াছিলে—লাভ কি হইয়াছে? তাহার বণিকবৃত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছ মাত্র। পৃথিবীশুদ্ধ নারীর আসল মনোবৃত্তি হয়ত ওই। কি হইবে এই সার সংগ্রহ করিয়া? তাহার চেয়ে দূর হইতে দাঁড়াইয়া স্বপ্ন দেখাই কি ভাল নয়?

ওই ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকী জ্বলিতেছে। জ্বলিতেছে এবং নিবিতেছে। দাঁড়াইয়া দেখ। পার ত উহাদের লইয়া কবিতা রচনা কর—সুখ পাইবে। কিন্তু জোনাকীকে ধরিয়া যদি বিশ্লেষণ করিতে যাও দেখিবে উহা কীটমাত্র। কবিত্ব তখন আর থাকিবে না।

খানিকটা আব্‌ছা, খানিকটা অন্ধকার প্রয়োজন। অস্পষ্ট অজানাকে লইয়া মন স্বপ্ন-রচনা করিতে চায়। সমস্ত জানিতে চাহিও না। সমস্ত জানিতে পারিবে না। সবজান্তা হইবার ব্যর্থ চেষ্টায় জীবনটা শুধু বিফল হইয়া যাইবে। কত কথাই চন্দ্রকান্তের মনে হইতে লাগিল। একাকী তিনি অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

যখন তিনি বাড়ী ফিরিলেন তখন রাত্রি আর বেশী বাকী নাই। পূর্ব্বাকাশে অরুণাভাস দেখা যাইতেছে। দ্বিধাভরে দুই একটা পক্ষী ডাকিয়া আবার থামিয়া যাইতেছে। শুইবেন কি না চিন্তা করিতেছিলেন এমন সময় দেখিলেন গেটের ভিতর দিয়া গঙ্গাগোবিন্দ প্রবেশ করিতেছেন।

চন্দ্রকান্ত হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এত ভোরে বেরিয়েছ আজ!"

গঙ্গাগোবিন্দ কিছু না বলিয়া একটু হাসিলেন।

তাহার পর বলিলেন—"কিছুদিন আগে উপনিষদে পড়েছিলাম—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।"

চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ—একই অগ্নি দাহ্যবস্তুর রূপভেদে যেমন ভিন্নরূপ ধারণ করে, একই অন্তরাত্মা তেমনি বস্তুভেদে নানা মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন। এর সত্যতা আজ উপলব্ধি করছি—"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন—"হেঁয়ালি বুঝতে পারছি না।"

গঙ্গাগোবিন্দ হাসিলেন। বলিলেন—"জাগরণের জগতে যে ব্যক্তি অতি রূঢ়—স্বপ্নের জগতে সে অতি কোমল। আজ তার প্রমাণ পেয়েছি।"

"কি প্রমাণ?"

"এইমাত্র একটা স্বপ্ন দেখে উঠে আসছি।"

"কি স্বপ্ন?"

"বাণীকে স্বপ্ন দেখলাম—অর্থাৎ রাণী বহ্নিকুমারীকে।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন—"তাই না কি?"

১৮

উগ্রমোহন সিংহ এত বিস্মিত জীবনে আর কখনও হন নাই।

মৃন্ময় ঠাকুরের পুত্রদ্বয় হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে—কিছুতেই তাহাদের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। তাহাদের ধরিবার নানাবিধ চেষ্টার ত্রুটি নাই—কিন্তু সাফল্যের চিহ্নমাত্র দেখা যাইতেছে না। গতকল্য তাঁহার সিপাহীগণ আসিয়া খবর দিয়াছে যে টাল জঙ্গলে কেহ ছিল না। চন্দ্রকান্তবাবুর একজন সিপাহীর মুখে তাহারা শোনে যে মৃন্ময় ঠাকুরের পুত্রদের লইয়া কমলাক্ষবাবু হস্তী-পৃষ্ঠে নিমাই-নগরে যাত্রা করিয়াছেন। এই শুনিয়া সিপাহীরা নিমাই-নগরে গিয়াছিল কিন্তু সেখানেও কেহ নাই।

মৃন্ময় ঠাকুর কিছুক্ষণ পূর্ব্বে দুইজন সিপাহী সমভি-ব্যাহারে পুত্র-অপহরণের জন্য কমলাক্ষবাবুর নামে নালিশ করিতে থানায় গিয়াছেন। থানার শরণাপন্ন হওয়া উগ্রমোহনসিংহের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মৃন্ময় ঠাকুরের আগ্রহাতিশয্যে এবং গত্যন্তর না থাকায় অগত্যা তিনি রাজী হইয়াছিলেন।

যমজঙ্গল কাছারির পার্শ্ববর্ত্তী বনপথে উগ্রমোহন সিংহ তাঁহার প্রাত্যহিক প্রাতঃকালিক ব্যায়ামান্তে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার মনে সুখ নাই—মুখে চিন্তার রেখা। তিন দিন তিনি বাড়ী ফেরেন নাই।—বজরায়, অশ্বপৃষ্ঠে, বাথানে, যমজঙ্গলে—ঝটিকার মত তিনি ছুটিয়া ফিরিয়াছেন। কিন্তু মৃন্ময় ঠাকুরের পুত্রদ্বয়ের নাগাল পান নাই।

অঘোরবাবুরও পরামর্শ তিনি পাইতেছেন না। দিনের বেলা বাথানে অঘোরবাবু রুম্নি ঝুম্নিকে লইয়া ব্যস্ত থাকেন। রাত্রে তাঁহাকে গোলক সার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়। গোলক সা চামা প্রান্তরের কালীবাড়ীতে বন্দী অবস্থায় বাস করিতেছে। চামা একটি চারক্রোশব্যাপী বিরাট মাঠ। যতদূর দৃষ্টি যায় উষর প্রান্তর ছাড়া সেখানে আর কিছু চোখে পড়ে না—দৃষ্টি চক্রবাল রেখায় থামিয়া যায়। চামা প্রান্তরে লোকচলাচল নাই। এই মাঠ সম্বন্ধে এমন সব অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে যাহা শুনিলে যে কোন সাধারণ লোকেরই হৃৎকম্প হইবার কথা। ভূত, প্রেত, পিশাচ অহরহ না কি এই প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। কত লোক পথহারা হইয়া এই প্রান্তরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে। এই প্রান্তরে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—মহাকালী। মাঠের ঠিক মধ্যস্থলে মহাকালীর একটি মন্দির। মন্দিরটি বহু প্রাচীন—মহাকালীর মূর্ত্তিটিও ভীষণদর্শনা। কে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া এই নির্জ্জন প্রান্তরে কালীমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিল তাহা জানা নাই। চামাপ্রান্তর বর্ত্তমানে উগ্রমোহন সিংহের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। একজন বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ সিপাহী এই মন্দিরের রক্ষক এবং কালীর পূজারী। এই মন্দিরের সংলগ্ন একটি কক্ষে উপস্থিত গোলক সা বন্দী অবস্থায় আছেন।

উগ্রমোহন সিংহ একাকী বনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে নানা উদ্ভট ও অসম্ভব কল্পনা জাগিতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন যে যদি রুম্নি ঝুম্নির সহিত অজয় বিজয়ের বিবাহ না হয় তাহা হইলে তিনি ওই বিস্ফারিতচক্ষু মৃন্ময়কে হত্যা করিয়া তাহার ছিন্ন মুণ্ডটা চন্দ্রকান্তকে উপহার পাঠাইয়া দিবেন। আবার তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনে হইতেছিল মৃন্ময়ের দোষ কি? সে ত কোন আপত্তি আর করিতেছে না। বরং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সে থানায় গিয়াছে—পুত্রদের সন্ধান কামনায়।

কমলাক্ষ লোকটাকে 'গুম্' করিয়া দিলে কেমন হয়! কিন্তু—এমন সময় ভিখন তেওয়ারি আসিয়া তাঁহার চিন্তাধারা বিঘ্নিত করিল। কহিল—চন্দ্রকান্তবাবুর নিকট হইতে এই 'খৎ' অর্থাৎ চিঠি আসিয়াছে। পত্র পড়িয়া উগ্রমোহন অবাক হইয়া গেলেন। পত্রে আছে—

বন্ধু,

তোমার ভাবী নাতজামাইগণ তোমার নাতিনীদ্বয়কে দেখিবার সদিচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বাড়ী হইতে যাত্রা করিয়াছিল। কিন্তু ভ্রম-ক্রমে তাহারা নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। ভ্রমণ-কাহিনীটা উহাদের মুখেই শুনিতে পাইবে। বিবাহ শুনিয়াছি ২৩শে মাঘ। এই বিবাহ

উপলক্ষেই লক্ষ্ণৌ হইতে বাঈজী আনাইবার বন্দোবস্ত করিলাম। মীর সাহেবও আসিবেন। এই সুযোগে একটু আমোদ-আহ্লাদ করা মন্দ কি?

তুমি কবে ফিরিতেছ? বহুদিন দাবা খেলা বন্ধ আছে।

চন্দ্রকান্ত।

উগ্রমোহন আসিতেই অজয় বিজয় আসিয়া তাঁহার পদধূলি লইল। তিনি দেখিলেন চন্দ্রকান্তের পালকি করিয়া তাহারা আসিয়াছে। বিস্মিত উগ্রমোহন বুঝিতেই পারিলেন না কেমন করিয়া কি ঘটিয়া গেল। চন্দ্রকান্ত রায় ত কম বিস্মিত হন নাই। গঙ্গাগোবিন্দ আসিয়া তাঁহাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছে মৃন্ময় ঠাকুরের ছেলেদের যেন ফিরাইয়া দেওয়া হয়। উহাদের হস্তেই সে রুম্‌নি ঝুম্‌নিকে সম্প্রদান করিবে মনস্থ করিয়াছে। সেদিন ভোরে স্বপ্ন দেখিবার পর অকস্মাৎ তাহার মত বদলাইয়া গিয়াছে।

মানুষের মতামত কখন কোন কারণে যে কি করিয়া বদলায় তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব।

উগ্রমোহন অজয় বিজয়কে মহা সমাদরে বসাইলেন। তাহাদের বসাইয়া তিনি চন্দ্রকান্তকে একখানি পত্র লিখিলেন—

ভাই চন্দ্রকান্ত,

অজয় বিজয় নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়াছে। তাহাদের ভ্রমণ-কাহিনী আমি জানি। নাচগানের বন্দোবস্ত করিয়া ভালই করিয়াছ। আজই রাত্রে ফিরিব।

উগ্রমোহন।

পুনশ্চ। তুমি বাঈজী আনাইবার বন্দোবস্ত কর—আমি আসর সাজাইবার ভার লইলাম।

চিঠি লইয়া চন্দ্রকান্তের সিপাহী ফিরিয়া গেলে পাল্‌কি করিয়া অজয় বিজয়কে তিনি সদরে—অর্থাৎ নিজ বাটীতে পাঠাইলেন। সকলে চলিয়া গেলে উগ্রমোহন দেহে ও মনে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন।

অজয় বিজয়কে শেষকালে চন্দ্রকান্ত ফিরাইয়া দিল! ভয় খাইয়া, না অনুগ্রহ করিয়া? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কিছুতেই ঠিক করিতে না পারিয়া অশ্বারোহণে তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

সেইদিন রাত্রে উগ্রমোহন ও চন্দ্রকান্ত দাবা লইয়া বসিলেন। বহুকাল এরূপ খেলা তাঁহারা খেলেন নাই। রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—দাবার ছকের উপর দৃষ্টি রাখিয়া নিস্পন্দভাবে দুইজনে বসিয়া আছেন।

১৯

রুম্‌নি ঝুম্‌নির বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া দুই পরাক্রান্ত জমিদার উগ্রমোহন ও চন্দ্রকান্ত মাতিয়া উঠিয়াছেন। কলিকাতা হইতে গোরার বাদ্য, লক্ষ্ণৌ হইতে হাসীনা বাঈজি, আগ্রা হইতে সেতারী মীরসাহেব এবং কাশী হইতে কয়েকজন বিখ্যাত কুস্তিগীর পালোয়ান আসিয়াছেন। দুই জমিদারের এলেকায় যত ঢাক, ঢোল, কাঁসি, বাঁশী এবং খঞ্জনি ছিল সব আসিয়া জুটিয়াছে এবং বিচিত্র শব্দ-সমন্বয়ে চতুর্দ্দিক সরগরম করিয়া তুলিতেছে। গ্রামের মধ্যে এবং গ্রামের ঠিক বাহিরে যত ফাঁকা জায়গা ছিল তাঁবুতে ভরিয়া গিয়াছে। উগ্রমোহন ও চন্দ্রকান্তের সম্মানিত অতিথি-বর্গ তাঁবুগুলিতে অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যেক তাঁবুতে পৃথকভাবে পাচক, ভৃত্য এবং রন্ধনের বন্দোবস্ত আছে। অতিথিদের অভিরুচিমত স্নানাহারের যেন ত্রুটি না হয়। ভাণ্ডারিগণ প্রয়োজন ও ফরমায়েস মত প্রতি তাঁবুতে সিধা দিয়া ফিরিতেছেন। উগ্রমোহন ও চন্দ্রকান্ত নিজেরা প্রতি তাঁবুতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আলাপ আপ্যায়ন করিতেছেন। উভয়েরই কাছারি বাড়ীতে প্রকাণ্ড আটচালার নিচে সারি সারি ভিয়ান বসিয়া গিয়াছে। দিবারাত্রি আহারের আয়োজন। চতুর্দ্দিকেই দীয়তাং ভুজ্যতাং। উভয় পক্ষেরই নায়েব গোমস্তা হইতে আরম্ভ করিয়া চাকর ঠাকুর সকলেরই গলা ভাঙিয়াছে। একদল সাঁওতাল যুবক-যুবতী মহানন্দে নাচ জুড়িয়া দিয়াছে। সারি বাঁধিয়া মাদলের তালে তালে গান গাহিয়া তাহারা একদল অতিথিকে সন্তুষ্ট করিতেছে। কোনখানে আবার মহাসমারোহে ঝুমুর জমিয়া উঠিয়াছে। সেখানেও একদল মুগ্ধ দর্শক। সুখপুর গ্রামের রামলীলার দলও এই সুযোগে নিজেদের কৃতিত্ব দেখাইতে ছাড়ে নাই। হনুমানের অভিনয় সত্যই উপভোগ্য। বহু লোক সেখানে ভীড় করিয়াছে। উগ্রমোহন সিংহ এবং চন্দ্রকান্ত রায়ের সর্ব্ব-শুল্ক ছয়টি হস্তী হস্তিনী আছে। রুম্‌নি ঝুম্‌নির বিবাহ

উপলক্ষে তাহারা বিচিত্র সাজে সাজিয়াছে। কাহারও পিঠে হাওদা, কাহারও পিঠে সোণার কাজ করা মখমলের বিস্তৃত আস্তরণ দুলিতেছে। কেহ বাজনার তালে তালে গা দোলাইতেছে—কেহ বিশাল দন্ত-গৌরবে সকলকে ভীত চমৎকৃত করিতেছে। তাহাদের মাথায় কপালে তৈল ও বর্ণ সহযোগে নানাপ্রকার চিত্রাঙ্কন করা হইয়াছে।

মাহুতগণেরও পোষাকের আজ পারিপাট্য! "হেই" "ধেৎ" "বিরি" প্রভৃতি বিচিত্র শব্দ উচ্চারণ করিয়া তাহারা কাজে অকাজে হস্তীদলকে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

নানা বর্ণের বিশালকায় অশ্বগুলি সুসজ্জিত। রামপ্রসাদ নামক সিপাহী একটি কৃষ্ণবর্ণ অশ্বিনীপৃষ্ঠে চড়িয়া ব্যাণ্ড বাদকদের নিকট গিয়া নিজের পারদর্শিতা দেখাইতেছেন। ব্যাণ্ডের তালে তালে অশ্বিনী গ্রীবাভঙ্গী-সহকারে এমন নৃত্য করিতেছে যে সকলের তাক্ লাগিয়া গিয়াছে।

উগ্রমোহন সিংহের বাড়ীর সম্মুখস্থ ময়দানে কাশী হইতে সমাগত পালোয়ানবৃন্দ মহা-উৎসাহে কুস্তী সুরু করিয়াছেন। দুইজন ভীমকায় পালোয়ান মহাপরাক্রমে মল্লযুদ্ধে ব্যাপৃত। যুযুধান বীরগণকে ঘিরিয়া একদল বিস্মিত দর্শক।

কিছুদূরে উগ্রমোহন সিংহের নির্দ্দেশমত প্রকাণ্ড একটি সামিয়ানা টাঙাইবার বন্দোবস্ত করা হইতেছে। অক্ষয় গোমস্তা ১৫।২০ জন মজুর লইয়া চেঁচামেচি জুড়িয়া দিয়াছে। যদিও রাত্রি বারটার পর এই সামিয়ানাতলে হাসীনা বাঈজী অবতীর্ণা হইবেন কিন্তু মালিকের হুকুম যে সন্ধ্যার মধ্যেই যেন সামিয়ানা টাঙান শেষ হইয়া যায়। সুতরাং অক্ষয় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

চন্দ্রকান্ত টিয়া-ডাঙার জমিদারের তাঁবুতে বসিয়া আছেন। টিয়া-ডাঙার জমিদার গীতবাদ্যের একজন গুণী সমজদার। সুবিখ্যাত সেতারী মীরসাহেবের সেতারের বৈঠক তাঁহারই তাঁবুতে বসিয়াছে। গ্রামের তবলাবাদক বিষ্ণুপদ বাহাদুরি করিয়া মীরসাহেবের সহিত বাজাইতে গিয়া নাস্তানাবুদ হইয়া পড়িয়াছে। মীরসাহেব কৃপা-মিশ্রিত হাস্যের সহিত তাঁহাকে সংশোধন করিয়া লইতেছেন। মীরসাহেবের খাস্ তবল্‌চি করিম খাঁ বিষ্ণুপদর এতাদৃশ অবস্থা-সঙ্কট দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতেছেন।

পার্শ্ববর্ত্তী একটি তাঁবুতে তাস খেলা চলিতেছে। খেলাতগঞ্জের চৌধুরীবাবুদের বাড়ীর ছেলেরা আসিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে সমাগত তাঁহাদের জামাইবাবুকে তাস খেলায় কোণ ঠেসা করিয়া তাঁহারা মহা উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছেন। একজন খেলোয়াড় একখানা হরতনের আটা চাপড়াইয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন—"নহলখানা কেমন আটকাচ্ছেন এবার দেখি—হ্যাঁ—হ্যাঁ—।"

হাস্যের কলরব উঠিতেছে।

নিকটবর্ত্তী আর একটি তাঁবুতে স্বয়ং উগ্রমোহন সিংহ চিকনহাটির চিকিৎসক বিশ্বম্ভরবাবুর সহিত পাঞ্জা ধরিয়াছেন। বিশ্বম্ভরবাবু নাকি পাঞ্জাতে অজেয়। কেহ কাহাকেও এখনও হারাইতে পারেন নাই। দমবন্ধ করিয়া দুই চারিজন অতিথি তাহাই দেখিতেছেন।

মিশিরজী আসর জমাইয়াছেন আর একটি তাঁবুতে। সেখানে কাঁটাগাছির জমিদার স্বয়ং তবলা ধরিয়াছেন এবং তাঁহার মোসাহেব মুরারিমোহন অতিরিক্ত মাত্রায় কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ করিতেছে।

বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গেল। দুইজন প্রবল জমিদারের কুটুম্বিতা লাভ করিয়া মৃন্ময় ঠাকুর মনে মনে মহা খুসী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু একটু রসভঙ্গ হইয়া গেল। উগ্রমোহন সিংহ তাঁহাকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা পণের সহিত এক পাটি ছেঁড়া চটিজুতাও দান করিয়া বসিলেন। মৃন্ময় ঠাকুর ব্যাপারটা নাতজামাইদের প্রতি রসিকতা হিসাবে ধরিয়া লইয়া যদিও দুই পাটি দাঁত বাহির করিয়া খুব খানিকটা হাসিয়া ফেলিলেন এবং অন্তর্নিহিত তীব্র খোঁচাটাকে লঘু করিয়া দিবার প্রয়াস পাইলেন কিন্তু তাঁহার সে প্রয়াসটা যে সফল হইল না তাহা তাঁহার দন্ত-সর্ব্বস্ব হাসিই প্রকাশ করিয়া দিল।

দ্বিতীয়বার রসভঙ্গ হইল বাঈজীর আসরে। আসর সাজাইবার ভার ছিল উগ্রমোহনের উপর। তিনি প্রকাণ্ড সামিয়ানা টাঙাইয়াছেন। ঝালর দেওয়া চমৎকার সামিয়ানা। বংশদণ্ডগুলি রূপালি জরির কাজকরা লাল কাপড় দিয়া মোড়া। আসরে আতরদান, গোলাপ পাশ, ফুলের তোড়া, পানের দোনা, শাখা-প্রশাখাময় বড় বড় ঝাড়-লণ্ঠন, সুদৃশ্য মখমলের তাকিয়া, সুকোমল গালিচা কোন কিছুরই অভাব ছিল না।

কিন্তু বাঈজী গান জমাইতে পারিলেন না। তাহার কারণ আসরের চতুর্দ্দিকে উগ্রমোহন পাখী টাঙাইয়া দিয়াছিলেন। উগ্রমোহনের পাখী পোষার প্রচণ্ড সখ। বহু খরচ করিয়া বহুপ্রকার পক্ষী তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার এত পাখী আছে যে তাহাদের তত্ত্বাবধানের জন্য তাঁহাকে একজন পাখীর দারোগাই রাখিতে হইয়াছে। সেই সব পাখীদের আজ তিনি আসরের চারিদিকে টাঙাইয়া দিয়াছেন। সুদৃশ্য বহু পিঞ্জর চতুর্দ্দিকে দুলিতেছে। সেই পিঞ্জরের কোনটাতে শ্যামা, কোনটাতে ভিংরাজ, কোনটাতে তোতা। মুরি, হীরামন, কিরকিচ্, খাকৃষুর, কাকাতুয়া, কেনেরি, বুলবুল-হাজার-দস্তা—নানাবিধ পাখী। বাজ্‌ড়ি, ময়না, তিলোরা, লাল, ময়তাবি, মুনিয়া, দহিয়াল, কোকিল, জরদপিলক্—পাখীর হাট। সারেঙ্গী যেই বাজনা সুরু করে—পাখীর দল তখন আর এক পর্দ্দা উচ্চে শিস্ দিতে থাকে। পাখীর সঙ্গে পাল্লা দিয়া মানুষ পর্দ্দা চড়াইতে পারে না। হাসীনা বাঈজি একটু হাসিয়া নিবেদন করিল যে পাখীদের না সরাইলে সে গান গাহিতে পারিবে না। উগ্রমোহন সিংহ জবাব দিলেন—"পাখী ত এখন সরান সম্ভব নয়। হাসীনাবিবি যদি গান গাহিতে অসমর্থা হন তাহা হইলে তাহার জন্য দায়ী পাখীও নহে—বিবি সাহেবাও নহেন। দায়ী আমাদের দুরদৃষ্ট !"

হাসীনা বিবি আরও দু'এক বার চেষ্টা করিলেন—কিন্তু গান জমিল না। কোকিল, দহিয়াল, কাকাতুয়া, ময়না আসর জমাইয়া রাখিল।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন—"আজ থাক তা হলে। কাল পাখীগুলো সরিয়ে রেখো উগ্রমোহন। পাখী সরিয়ে মহিষগুলো এনে হাজির ক'রো না যেন আবার !"

উগ্রমোহন বলিলেন—"আমরা ক্ষেপেছি এই যথেষ্ট চিন্তার কারণ। মহিষগুলোকে শুদ্ধ ক্ষেপিয়ে লাভ হবে না তা ত বুঝছি !"

গান হইল না। চন্দ্রকান্তকে জব্দ করিয়াছেন ভাবিয়া উগ্রমোহন কিন্তু ভারি সন্তুষ্ট হইলেন।

কন্যা-সম্প্রদান করিয়া গঙ্গাগোবিন্দ নিজ শয়ন গৃহে গিয়া প্রবেশ করিলেন। সমস্ত দিনের উপবাসে দেহ-মন ক্লান্ত। কমলার মুখখানা তাঁহার বারম্বার মনে পড়িতেছে। সে বাঁচিয়া থাকিলে এই বিবাহ হইত কি ? রুম্‌নি ঝুম্‌নির বয়স এই ত সবে নয় বৎসর। গঙ্গাগোবিন্দ ভাবিতে-ছিলেন—"ইহারই মধ্যে রুম্‌নি ঝুম্‌নিকে পর করিয়া দিলাম ! এত তাড়াতাড়ি বিবাহ দিবার কোন প্রয়োজন ছিল না ত ! সামান্য একটা স্বপ্ন দেখিয়া এই দুর্ব্বলতা-প্রকাশ না করিলেই পারিতাম ! রাণী বহ্নিকুমারী আমার কে ?"

রাত্রি পোহাইতেছে। পূর্ব্বাকাশে উষাভাস দেখা যাইতেছে। ক্লান্ত গঙ্গাগোবিন্দ চক্ষু মুদিয়া শয়ন করিলেন।

ঠিক সেই সময় রাণী বহ্নিকুমারীও একাকিনী অলিন্দে দাঁড়াইয়াছিলেন। এই বিরাট উৎসবে তিনিও যোগ দিয়াছিলেন—কিন্তু অন্তরের সহিত নয়—লৌকিকতার খাতিরে। তাঁহার অন্তরে যাহা হইতেছিল তাহা এতই বিচিত্র ও জটিল—এতই মধুর ও তিক্ত যে তাহা বর্ণনাসাপেক্ষ নহে। বহ্নিকুমারী দেখিতেছিলেন যে তাঁহাদের উদ্যান-মধ্যবর্ত্তী দীর্ঘিকার কালজলে এক জোড়া রাজহংস ভাসিতেছে। এই হংস দম্পতিকে দেখিয়া তাঁহার হিংসা হইতেছিল। নির্নিমেষনেত্রে তাহাদের দিকে চাহিয়া তিনি ভাবিতেছিলেন—"সৃষ্টির নিকৃষ্ট জীব মানুষ এবং মানুষের মধ্যে নিকৃষ্টতম এই ধনীরা !"

নহবৎখানায় শানাই তখন ভৈরবী ধরিয়াছে।

(২০)

বিরাট উৎসবের পর বিরাট অবসাদ আসে। উগ্রমোহন ও চন্দ্রকান্ত উভয়েরই মন অবসন্ন। ইহার আরও একটা কারণ ছিল। যদিও উগ্রমোহনের জিদই বজায় থাকিয়া

গিয়াছে কিন্তু এই জয়লাভের মধ্যে যে চন্দ্রকান্তের অনুগ্রহ-বর্ষণ আছে একথা উগ্রমোহন কিছুতে ভুলিতে পারিতেছেন না। থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার অন্তরাত্মা নিঃশব্দে বলিয়া উঠিতেছে—'চন্দ্রকান্ত ছেলে দুটিকে ফিরাইয়া না দিলে এ বিবাহ হইত কি না সন্দেহ'। অন্তরাত্মার এই উক্তি উগ্রমোহনের পক্ষে সুখকর নহে।

চন্দ্রকান্তেরও মনে সুখ ছিল না। তাহার কারণ গোলক সা। সা-জির কোন সন্ধানই তিনি পাইতেছেন না। কমলাক্ষবাবু জমিদারের সমস্ত কাজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এই কর্ম্মেই নিযুক্ত আছেন। কিন্তু অদ্যাবধি কোন খবরই তিনি সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অথচ গোলক সাকে মুক্ত করিতে চন্দ্রকান্ত ধর্ম্মত বাধ্য। তাঁহারই কথার উপর বিশ্বাস করিয়া গোলক সাহা তাঁহাকে টাকা দিয়া বিপন্ন হইয়াছে। যেমন করিয়া হউক লোকটাকে উদ্ধার করিতে হইবে।

সেদিন সন্ধ্যার সময় উগ্রমোহন ও চন্দ্রকান্ত যথারীতি দাবার ছক্ লইয়া বসিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া খেলা চলিতেছে। এমন সময় চন্দ্রকান্তের বাড়ীর সম্মুখস্থ পথ দিয়া বাজনা বাজাইয়া একদল লোক যাইতেছে শোনা গেল।

উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন—বাজনা কিসের?

চন্দ্রকান্ত হাঁকিলেন—ভজনা!

ভজনা আসিল।

"দেখে আয় ত, কিসের বাজনা বাজিয়ে যাচ্ছে!"

ভজনা চলিয়া গেল। উভয়ে আবার দাবার ছকে মন দিলেন।

একটি বড়ে আগাইয়া দিয়া চন্দ্রকান্ত বলিলেন—"এইবার তোমার হয় গজ—না হয় নৌকো—একটা যাবেই!"

"আচ্ছা, এই নাও। তোমার মন্ত্রীকে সামলাও।"

আবার দুইজনে নীরব। ভজনা আসিয়া খবর দিল যে আনন্দপুরের দোল-পূর্ণিমার মেলায় একদল বাজীকর যাইতেছে। তাহাদেরই বাদ্যভাণ্ড।

উগ্রমোহন বলিলেন—"আনন্দপুরে মেলা বসেছে না কি? গেলে মন্দ হত না!"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন—"এইবার তোমার মন্ত্রীটি বাঁচাও দেখি!"

মুমূর্ষু মন্ত্রীকে উগ্রমোহন একটি ঘোড়া দিয়া বাঁচাইলেন। ঘোড়াটি অবশ্য তৎক্ষণাৎ মারা গেল।

চন্দ্রকান্ত আবার হাঁকিলেন—ভজনা—

ভজনা আসিলে তিনি আদেশ দিলেন—"আসব নিয়ে আয় ত। আজ শীতটা একটু বেশী অন্য দিনের চেয়ে।"

দুইটি সুদৃশ্য স্ফটিকাধারে করিয়া ভজনা আসব আনিয়া দিল। দুইজনে নিঃশব্দে তাহা পান করিয়া আবার খেলায় মন দিলেন।

খেলা শেষ করিয়া উগ্রমোহন যখন গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন তখন শুক্লা একাদশীর চন্দ্র মধ্য গগনে উঠিয়াছে।

উগ্রমোহন চলিয়া গেলে কমলাক্ষবাবু আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—খবর পেলে কিছু?

কমলাক্ষবাবু কহিলেন—"এইটুকু শুধু নিট্ খবর পেয়েছি যে গোলক সা যমজঙ্গলে কোথাও নেই।"

চন্দ্রকান্ত কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রহিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ সব খবর তুমি সংগ্রহ করছ কি উপায়ে?"

প্রশ্ন শুনিয়া কমলাক্ষবাবু ভিজা বিড়ালের মত চাহিতে লাগিলেন।

চন্দ্রকান্ত আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"উপায়টা কি তোমার?"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কমলাক্ষবাবু বলিলেন—"আমাদের সিপাহী পাঠিয়ে খবর নিচ্ছি!"

"এ সব খবর ঠিক মত নেওয়া ওসব ভোজপুরি সিপাহীর কর্ম্ম নয়। দাঙ্গা করতেই ওরা মজবুত—এ সব সূক্ষ্ম ব্যাপার ওদের দ্বারা হবে না। তুমি এক কাজ কর—মাণিক মণ্ডলকে লাগাও।"

কমলাক্ষবাবু ভিজা-বিড়াল-চাহনি চাহিতে লাগিলেন। চন্দ্রকান্ত বলিয়া চলিলেন—"লোকটা খুব কাজের! আমার বিশ্বাস কিছু টাকা ঢাল্‌লেই রাজী হয়ে যাবে। বুঝলে?"

কমলাক্ষবাবু চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে চন্দ্রকান্ত আবার

বলিলেন—"কার্পণ্য ক'রো না এসব ব্যাপারে। টাকা ঢালো ঠিক হয়ে যাবে সব। মাণিক মণ্ডলের কাছে লোক পাঠাও আজ! আমি হয়ত দু'এক দিনের জন্য বেরুতে পারি। আনন্দপুরের মেলায় যাবার ইচ্ছে আছে। ইতিমধ্যে গোলক সার খবরটা জোগাড় ক'রো।"

কমলাক্ষবাবু চলিয়া গেলে তিনি সেতারটা পাড়িয়া বসিলেন এবং মীরসাহেবের কাছে হিন্দোলের যে গৎটা শিখিয়াছিলেন তাহা বাজাইতে লাগিলেন।

পরদিন লোক-লস্কর বরকন্দাজ সমভিব্যাহারে জমিদার উগ্রমোহন সিংহ আনন্দপুর মেলা অভিমুখে রওনা হইলেন দেখা গেল। রুম্‌নি ঝুম্‌নির বিবাহের পর জীবনটা তাঁহার নিতান্তই একঘেয়ে ঠেকিতেছিল। আনন্দপুর মেলায় কিছু বৈচিত্র্যের সন্ধানে তিনি যাত্রা করিলেন।

দশক্রোশ দূরবর্ত্তী আনন্দপুর গ্রামে প্রতি বৎসর দোল-পূর্ণিমার সময় একটি প্রকাণ্ড মেলা হয়। আনন্দপুর উগ্রমোহনের বা চন্দ্রকান্তের জমিদারীর অন্তর্গত নহে। ক্ষুদ্র জমিদার রামপ্রতাপ চৌবের ইহা জমিদারী। মেলাটি বেশ বড় মেলা। বহুস্থান হইতে লোকজন দোকানী ব্যবসায়ী এই মেলায় আসিয়া থাকে। অনেক গণ্য-মান্য ধনী জমিদারগণও এই মেলায় পদার্পণ করেন। গরু, ঘোড়া, পাখী পর্য্যন্ত এই আনন্দপুর মেলায় বিক্রয় হয়—এত বড় এই মেলা। উগ্রমোহনের পশু-পক্ষী কেনার সখ খুব বেশী—তাই প্রতি বৎসর তাঁহার এই মেলায় যাওয়াটা একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য। সুতরাং উগ্রমোহনের পাল্‌কি পরদিন আনন্দপুর অভিমুখে যাত্রা করিল।

চন্দ্রকান্ত বাতায়নপথে দেখিলেন উগ্রমোহনের পালকি চলিয়া গেল। তিনিও পাল্‌কি-যোগে একটু পরে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে অবশ্য লোকজন বিশেষ কিছু গেল না। আটজন পাল্‌কির বেহারা এবং একটি ক্ষুদ্র পেটরা তাঁহার সঙ্গী হইল। (ক্রমশঃ)

পাথুরিয়া কয়লা

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়চৌধুরী

কয়লা সম্বন্ধে কোন কথা বলতে গেলে প্রথমতঃ ভূগর্ভের যে প্রাথমিক স্তরের উপর সঞ্চিত থেকে যোজনব্যাপী খনিসমূহের সৃষ্টি সম্ভবপর হ'য়েছে—সেই আদিম স্তরের কথা দিয়েই আরম্ভ কর্‌তে হয়। ভূতত্ত্বের ভাষায় ইহার নাম Carboniferous Strata ; Carbon শব্দের ধাতুগত মানে কয়লা—fero মানে উৎপাদক (to bear) ; কয়লা ভিন্ন এই শ্রেণীর আদিম স্তরে অপরাপর খনিজ প্রস্তরেরও উপস্থাপনা (deposit) আছে—যথা চূণপ্রস্তর, কর্দ্দম-সঞ্জাত লৌহপ্রস্তর, কোন কোন উচ্চশ্রেণীর লৌহপ্রস্তর (Hæmatite), বিশেষ ক'রে চুম্বক লৌহপ্রস্তর (Magnetite)। Matrix কথাটির মানে "সহজাত খনিজ" ; কয়লা উৎপাদক স্তরে যে সকল সহজাত খনিজ দেখা যায় তাদের মধ্যে বালুকা প্রস্তর (ধূসর, লাল, সাদা) আগ্নেয় কর্দ্দম (fireclay লাল ও সাদা), শম্বুকাদির বহিরাবরণ (Shale) ও প্রবাল প্রস্তর (Coral)ই প্রধান। ভূ-পৃষ্ঠের ঠিক নীচুতেই ধূসর বা লাল বালুপ্রস্তরের স্তরের সহিত কয়লার পাতলা এক স্তর দেখা যায়। মূল উপস্থাপিত স্তরের সন্ধান আরও খানিকটা নিচুতে মিলে। সহজাত খনিজগুলির কথা বলা হ'য়েছে—উহারা কখন বিচ্ছিন্নভাবে, কখন বা দুইটী গভীর কয়লা স্তূপের মধ্যে পাত্‌লা একটি ব্যবধান স্তর সৃষ্টি করিয়া অবস্থান করে। এই সকল সহজাত খনিজের পরিস্থাপনা দেখেই কয়লা সৃষ্টির মূল তথ্য অনুসন্ধান কর্‌তে হ'বে।

সুদূর অতীত যুগের বিশাল অরণ্যানীর পরিণতিই যদি বর্ত্তমান যুগের খনিজ কয়লা—তবে এই অনুমানও সহজসাধ্য যে ধরিত্রী সে যুগে উদ্ভিজ্জ সম্পদে সমৃদ্ধিশালিনী ছিলেন ;

সাগরসন্নিহিত এইরূপ উদ্ভিজ্জশোভিত ভূখণ্ড, সমুদ্রের অগভীর অংশ ও উপকূল অথবা হ্রদ ও তার সন্নিহিত নিম্ন ভূভাগের উপরই কয়লার খনিগুলি সৃষ্ট হ'য়েছে। সহজাত খনিজগুলির কথা থেকেই সাগরের কথা মনে আসে। ধরা যাক প্রবাল প্রস্তরের কথা—উহা সমুদ্রের অগভীর অংশেই বর্ত্তমান থাকে—অতিরিক্ত চাপ আদৌ সহ্য করিতে পারে না বলিয়াই। তার পর মনে উঠে প্রাকৃতিক বিপ্লবের তাণ্ডব—ঝঞ্ঝা, প্লাবন হয়ত বা ভূকম্পনেরও কথা—যা'তে ক'রে বিরাট মহীরুহগুলি উৎপাটিত এবং বন্যাচালিত হ'য়ে নিম্ন ভূমিতে জড় হয়। তাদের উপর পড়ে বালি স্তূপের বিস্তৃত আচ্ছাদন। দ্বিতীয় পর্ব্বে দেখা গেল আর একদফা প্রাকৃতিক তাণ্ডবের অবসানে নূতন করে বৃক্ষ ও বালুস্তূপের আর এক স্তর প্রথমোক্ত স্তূপের উপর সংস্থাপিত হ'যেছে। এইভাবে চলতে থাকে স্তূপের উপর স্তূপের উপস্থাপনা—যতদিন না একটি পূর্ণাবয়ব খনি বা খনি-নিচয়ের গড়ন হয়। আভ্যন্তরীণ উত্তাপ এবং নিম্নতর স্তূপের উপর উর্দ্ধতন স্তূপ বা স্তূপাবলীর চাপ অভ্যন্তরস্থ বৃক্ষাবলিকে রূপান্তরিত ও প্রস্তরীকৃত—mineralised করিতে থাকে। ইহাই হইল কয়লা খনি সৃষ্টির তথ্য—ধ্বংস ও সৃষ্টির খেলা পাশাপাশি।

সহজাত খনিজগুলির নাম করতে গিয়ে আগ্নেয় কর্দ্দমের উল্লেখ করা হ'য়েছে; সংক্ষেপে ইহার সম্বন্ধে দু'চারিটী কথা বোধ হয় অবান্তর ব'লে মনে হ'বে না। সামুদ্রিক মৃত্তিকা দুইটি প্রধান খনিজস্তূপে বহু যুগ ধ'রে আবদ্ধ ও পিষ্ট থেকে কালবশে আপনার ক্ষারত্ব alkali ও লৌহাংশ ভ্রষ্ট হ'য়ে বর্ত্তমান আকারে রূপান্তরিত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সাগর-দেবতার প্রভাব এইভাবেই আমাদের প্রতি পদে উপলব্ধি হয়। এই খনিজটী বর্ত্তমান যুগে আগুনের বিরাট ভাঁটি নির্ম্মাণের প্রসঙ্গে জোড়াই ও লেপের কাজে সন্তোষজনক-ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

কয়লার জাতি ও শ্রেণী ভেদ চলে Fixed carbonএর পরিমাপে। জ্বালানী কাঠে শতকরা ৫০ ভাগের অতিরিক্ত Fixed carbon থাকে না কিন্তু ধূম্রহীন এনারসাইট কয়লায় শতকরা ৯০ হইতে ৯৫ অংশ Fixed carbon দেখা যায়। খনিগর্ভে পরিণতির আভাস ইহা হইতেও কতকটা উপলব্ধি হয়। কয়লার চারি প্রকার শ্রেণীভেদ আছে (১) ক্যানেল কোল (২) এনথে্রসাইট (৩) বিটু-মিনাস—(৩ক) ষ্টিমকোল বা সেমিবিটুমিনাস (৪) লিগনাইট বা ব্রাউন কোল।

কোল গ্যাস উৎপাদন প্রচেষ্টায় সাধারণতঃ ক্যানেল কোলের ব্যবহার হয়; ১ টন কয়লা থেকে অবস্থা-ভেদে দশ হাজার হইতে সাড়ে তের হাজার কিউবিক ফিট গ্যাস ইহা হইতে উৎপাদিত হইতে পারে। বিটুমিনাস কয়লা হইতে কিন্তু কোন ক্রমেই নয় হাজার বা সাড়ে নয় হাজার কিউবিক ফিটের অতিরিক্ত গ্যাস পাওয়া যায় না। জ্বালানর কাজ ভিন্ন; ধাতু নিষ্কাষণের কার্য্যে এই গ্যাস প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ খনিজ ধাতুই oxideরূপে উদ্ভূত হয়; কোল গ্যাসের সাহায্যে তাহাদিগকে Reduce করিবার পর ব্যবহারিক ধাতু লাভ করা যায়। বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করবার পূর্ব্বেই গ্যাস হইতে Bye-product বাহির করিয়া লওয়া বাঞ্ছনীয়। উৎকৃষ্ট জাতীয় ক্যানেল কোল হইতে প্রতি টনে ১১৫০ পাউণ্ড কোক, ২৬ গ্যালন আলকাতরা, ৩৫ টোয়াইডেল শক্তিবিশিষ্ট ৯ গ্যালন এমোনিয়া লিকার পাওয়া গিযাছে; ইহার চাহিদা এইভাবে দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে; কেহ কেহ ইহাকে বিটু-মিনাস শ্রেণীভুক্ত বলিয়া মনে করেন; কিন্তু উভয় শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্যও বিস্তর বিদ্যমান বলিয়া মনে হয়। অনুবীক্ষণ সহায়তায় ইহার উদ্ভিজ্জ অবয়বের কোন নিদর্শনই মিলে না; পরন্তু খানিকটা প্রস্তরীভূত কাদার অবস্থানও এর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ভাঙ্‌তে গিয়েও বিটুমিনাসের বিভিন্ন স্তর ইহার টুকরায় পরিলক্ষিত হয় না। ছুরি দিয়া কাটিয়া নানাবিধ খেলনার অলঙ্কার কিন্তু canel কোলের টুকরা থেকে হ'তে পারে। porcelainএর উপর ঘষিলে এক রকম পীতাভ বাদামী দাগ দেখা দেয়—ইহাও এ জাতীয় কয়লা চিনিবার অন্যতম উপায়।

ধূম্রহীন অথচ প্রভূত উত্তাপদায়ক কয়লা বল্‌তে সাধারণতঃ এনথে্রসাইট কয়লাই বুঝায়। দেখতে বেশ মিশ-মিশে কালো অথচ হাতে ধরিলে কোন দাগ পড়ে না; এইজন্য ইহার অপর নাম "অন্ধ প্রস্তর"—Blind Stone। আগুন ধরানো একটু শক্ত হইলেও ধরানো কয়লা বহুক্ষণ ধ'রে তাপ বিকীরণ ক'রে থাকে। ইহার প্রকৃতি থেকে মনে হয় ভূগর্ভস্থ তাপের প্রভাবে ইহা স্বাভাবিকরূপেই কতকটা

কোক কয়লার পরিণতি লাভ ক'রেছে। বিভিন্ন Sample বিশ্লেষণে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করা গিয়াছে।

	%	%
	Fixed carbon.	V. matter.
উৎকৃষ্ট	৮৮·৫০	৫·০০
নিম্নতর	৭৫·০০	৫·০০

%	%	%
ash	Sulpher	Combined water
৫·০০	০·৫০	১·০০=১০০·০০
১৬·০০	২·০০	২·০০=১০০·০০

বিটুমিনাস কয়লার নাম সর্ব্বজনবিদিত বল্লেও চলে; নামকরণ বোধ হয় ইহার ঠিক হয় নাই কারণ বিটুমেন (দাহ্ তৈলাক্ত পদার্থ, নেপ্থা, পেট্রোলিয়ম) ইহাতে কিছুই নাই। ইহার অপর নাম Coking Coal—কোক্ কয়লা উৎপাদনে ইহার অত্যধিক প্রয়োগ আছে। অবশ্য এ শ্রেণীর NonCaking জাতীয় কয়লাও বিরল নহে। জলবার সময়ে ইহা হইতে হলদে শিখা ও মাত্রাতিরিক্ত ধুম নির্গত হইয়া থাকে। কয়লার গুড়োগুলি অগ্নিস্পর্শেই ফুলিয়া উঠে এবং ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাল একটা Mass রেখে যায়। এই কয়লা অতি সহজেই জ্বালান যায় এবং জলবার ধরণ দেখে শ্রেণীভেদ করা যায়—অবশ্য গ্যাস ও কাব্বনের তারতম্য অনুসারেই এই বিভেদ ঘটিয়া থাকে। বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত পর্য্যবেক্ষণ সম্ভব হইয়াছে।

	Fixed carbon	V. matter.
উৎকৃষ্ট	৫৩৫০%	৪০.০০%
অপকৃষ্ট	৪৬.৫০%	৩৪.০০%

ash	Sulphur	Combined water
৫.০০%	০.৫০%	১.০০%=১০০.০০
১২.০০%	৩.৫০%	৩.০০%=১০০.০০

ষ্টীম কয়লার অন্য নাম Semi butiminous হইলেও এনথ্রেসাইট কয়লার সহিত ইহার কতকটা সাদৃশ্য আছে। উভয় শ্রেণীর খানিকটা প্রকৃতি লাভ করিয়া ইহা মধ্যপথে দাঁড়ানো অবস্থায় আছে। Fixed carbon শতকরা ৬৭ হইতে ৭৬ অংশ, V. m শতকরা ১৫ হইতে ১৮ অংশ, ash ১২ হইতে ৫ অংশ, Sulphur ৩ হইতে ·৫ অংশ এবং Combined water ৩ হইতে ১ অংশ পর্য্যন্ত বিদ্যমান।

লিগনাইটকে কয়লা শ্রেণীভুক্ত করা হইলেও প্রস্তরীয়তায় রূপান্তরপথে ইহা অসমাপ্ত অবস্থা মাত্র। রং ইহার ব্রাউন এবং কয়লা উৎপাদক আদিম স্তর ভিন্ন ও অন্যান্য আদিম স্তরে ইহার সন্ধান মিলে। সাউথ ওয়েলসে Devonian, জার্ম্মাণিতে miocene, নিউজিলাণ্ডে ও অষ্ট্রেলিয়ার Tetiary যুগন্তর সমূহেও ইহার সন্ধান পাওয়া যায়।

ছাই ও সহজাত জলের হ্রাসবৃদ্ধি অনুপাতেই কয়লার আদর ও অনাদর হইয়া থাকে; অতিরিক্ত মাত্রায় যে কয়লায় ছাই বর্ত্তমান সেই কয়লা দিয়ে কাজ চালাতে গিয়ে ঘন ঘন আগুন ঝাড়তে হয়। চুল্লীর মুখ খোলা পেয়ে বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া প্রবেশ ক'রে-দেয় তাপ কমিয়ে—শ্রম তথা ব্যয়ের দিক দিয়ে দেখতে গেলে বিরক্তির মাত্রাই বৃদ্ধি পায়। অধিকাংশ ভারতীয় কয়লায় ছাইয়ের পরিমাণ অত্যধিক থাকায় তার ব্যবহারে পূর্ব্বোক্ত অসুবিধা অনুভূত হয়। কয়লার ফস্‌ফরাস ছাইএর মধ্যেই নিহিত থাকে। জীবদেহেই ফস্‌ফরাসের মাত্রা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। যদি অরণ্যচারী জীব-জন্তু বৃক্ষাবলীর সঙ্গে একই যোগে প্রস্তরীকৃত হ'য়ে থাকে তবে আমাদের দেশের কয়লা উৎপাদক স্তর অপেক্ষাকৃত আধুনিক মনে কর্‌তে হ'বে। বোধ হয় উদ্ভিজ্জাদির সৃষ্টির বহু পরেই ধরায় জীবজন্তুর আবির্ভাব হ'য়েছিল।

যে কোন কয়লা ব্যবহারের পূর্ব্বেই তাহার কেলোরিফিক শক্তি (Btu) জানা আবশ্যক। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কয়লা জ্বালিয়ে লভ্যমান সমস্ত তাপটুকু কার্য্যকরীরূপে প্রয়োগের ইহা ভিন্ন অন্য পন্থা নাই। ইহার অর্থ তাপ তথা জ্বালনের মিতব্যয়িতা; কয়লার মধ্যে সহজাত জল বেশী মাত্রায় থাকিলে কেলোরিফিক শক্তির খানিকটা অপব্যয় হয় ইহাকে শুষ্ক ও কার্য্যোপযোগী অবস্থায় নিয়ে তুল্‌তে। এইখানেও মিতব্যয়িতার প্রশ্নই এ'সে পড়ে।

সঙ্গীত

দীপঙ্কর

(নৃত্য সঙ্গীত)

(প্রবহমান মাত্রাবৃত্ত ছন্দ)

শ্রীদিলীপকুমার

এসো লাবণ্য-লীলা-লাস্যে,
আলো- অলৌকিক স্মহাস্যে,
এসো নীলিমা বয়ান-বয়নে,
তারা- চয়নে,
মধু মন্ত্রে—
হৃদি- তন্ত্রে
উঠি' শিহরি' স্মরবসন্তে :
টুটি' গোধূলি-তন্দ্রা চকিত-চন্দ্রা
উলুধ্বনি-আনন্দে।

এসো নব-আগমনী-শঙ্খে—
তুলি' রক্তে ডমরু-ডঙ্কে,
করি' মন্থর মনে উতরোল
ঋতু হিন্দোল ;
এই বসুধায়
রাস- ঝুলনায়
ঢালি' ছন্দ-নিঝর-ঝঙ্কার—
এসো ভরিয়া অরুণা- কিরণে করুণা-
কলোচ্ছলিত ভৃঙ্গার।

এসো বাজায়ে তপ -তূ
স্বনি' মিলনময় মাধুর্য্য
যত সঙ্গীতহারা পরাজয়ে
রাগ- বরাভয়ে
প্রেম- মরীচির
রণি' মঞ্জীর—
করো নৃত্য-বিবাগী অন্তর—
তব গহন অরাল রঙ্গে মরাল-
বিভঙ্গে—নটসুন্দর !

আর রহিতে দিব না তোমারে
গূঢ় গোপনে—আড়াল-বিহারে ;
এসো উষা-মঞ্জুষা সজ্জিয়া
নিশা লজ্জিয়া
ছবি- স্বপ্নে—
রবি- রত্নে—
খচি' যামিনী-মায়া-মুহূর্ত্ত :
ছায়া- কুণ্ডলী-ফণী তব জাগরণী
গানে করি' মণি-মূর্ত্ত।

ওগো বৈভবী, চির-নিঃস্ব !
যার বুকে অচিন্ত্য বিশ্ব—
যার অনিন্দ্য অরবিন্দ
(বিনা বৃন্ত)
সুধা- সৌরভে
জাদু- গৌরবে
করে অকিঞ্চনেও ধন্য—
তব বৈরাগ-রুচি হোমানলে শুচি
করো এ-কামনারণ্য।

তোলো দীপি' বরণের লগ্ন
ছানি' মর্ম-মাধুরী : মগ্ন
প্রাণ শরণাঞ্জলি-সুরে চায়
দিতে তব পায়
নতি- আরতি :
শিব সারথি !—
জপি' তব অবাসনা শান্তি।
এসো হে দীপঙ্কর, মরণে-অমর
বিরহে-বাসর-কান্তি !

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীদিলীপকুমার

দাদ্‌রা

{ সা রসন্‌া | সা মা -া | মা মা মা | গপা মগা মমা | সা } সা পা | পা পা -া | পা পক্ষা পা |
এ সো লা ব ণ্‌ ণ্য লী লা লা - -স্‌ স্তে আ লো অ লৌ - কি ক সু
আ - র র হি তে দি ব না তো মা - রে গূ ঢ় গো প নে আ ড়া ল

মধা পপা ধধা | মা মা পমগা | গা মা ধা | পা ণা ধা | পা র্সা ণা | -া র্রা র্সার্র | ধা ণা ধা |
হা - -স্‌ স্তে এ সো নী লি মা ব য়া ন ব য় নে - তা রা চ য় নে
বি হা - রে এ সো উ ষা ম ন্‌ জু ষা স জ্‌ জি য়া নি শা ল জ্‌জি

-া মা ধা | র্সা -া র্সা | -া না না | ণা -া ধা | -া ধা ধণা | পা পা ধা | পমা মা পা |
- ম ধু ম ন্‌ দ্রে - হৃ দি ত ন্‌ ত্রে - উ ঠি' শি হ রি' সু র ব
য়া ছ বি স্ব প্‌ নে - র বি র ত্‌ নে - খ চি' যা মি নী মা য়া মু

গা পা ধনা | র্সর্রা র্গর্পা র্মর্গা | র্রর্সা নর্রা র্সনা | ধপা মগা পমা | মা র্মা র্মা | র্জ্ঞা র্রা র্সা |
স ন্‌ তে - - - - - - - - - টুটি' গো ধূ লি ত ন্‌ দ্রা
হৃ ন্‌ ত - - - - - - - - - ছায়া কু ন্‌ ড লী ফ ণী

র্সা র্সর্রা ধর্সা | ণা ধা ধণা | পধা পা -া | ধা ধণর্রা র্সা | ণধা পধা পমা | -া ধা মা | মা ধা র্রা |
চ কি ত চ ন্‌ দ্রা উ লু - ধ্ব নি আ ন ন্‌ দে - উ লু উ লু উ
ত ব জা গ র ণী গা নে ক রি ম ণি মূ র্‌ র্ত্ত - গা নের তা নে তা

র্সর্রা ধা র্সা | ণা ধা -া | ণা পা -া | সসা গগা ররা | মমা গগা পপা | মমা ধধা পপা |
লু উ লু উ লু - ধ্ব নি - ম - - - - - হা - -
নে তা নে মু ক্‌ তি গা নে - ম - - - - - ণি - -

ননা ধধা র্সর্সা | ননা র্রর্রা র্সর্সা | র্গর্গা র্রর্রা র্মর্মা | র্গর্গা র্রর্রা র্সর্সা | ননা ধধা পপা |
- - - নন্‌ - - - - - দে - - - - -
- - - মূ - - - - র্‌ ত - - - - -

মমা গগা পপা | মা মা মা | মা সা সা | মা মা সা | গমা পধা ণধা | পমা মা পা | সা সা পা |
- - - - এ সো লা ব ণ্‌ ণ্য লী লা লা - - স্তে আ লো অ লৌ -
- - - - আ র র হি তে দি ব না তো মা - রে গূ ঢ় গো প নে

পা পা ধা | মপা ধর্সা ণধা | পধা ধা ণা | পা ধা না | র্সা র্রা র্গা | পা র্সা র্সা |
কি ক স্থ হা - - স্তে এ সো ন ব আ গ ম নী শ ঙ্ খে
আ ড়া ল বি হা - রে ও গো বৈ - ভ বী চি র নিঃ - স্ব

-া র্সা র্সা | র্সা সা সা | সসা ন্া ধন্া | ধ্া মা মা | -া মা গা | মা ধা মধনর্সা | র্সা র্সা র্সা |
- ছু লি' র ক্ তে ড ম রু ড ঙ্ কে - ক রি' ম ন্ থ র ম নে
- যা র বু কে অ চিন্ - ত বি - শ্ব - যা র অ নি - ন্ দ্য অ র

র্ঋা র্ঋা র্সা | -া না র্সা | নর্সনা ধণা ধা | -া ধা ধা | ণা ণা ধর্সা ¦ ণণা ধা ণা | ধণধা ঋ্মা মা |
উ ত রো ল ঋ তু হি ন্ দো ল্ এ ই ব সু ধা -য় রা স ঝু ল না
বি ন্ দ - বি না বৃন্ - ত - সু ধা সৌ - র ভে জা ছু গৌ - র

-া মা মাপ | গা -া গাম | ঋা সা ন্া | ধ্া সা মা | -া মা ঋ্মগা | গা ধঋ্মা ধা | ঋ্মা নধা র্সা |
য় ঢা লি' ছ ন্ দ নি ঝ র ঝ ঙ্ কা র এ সো ভ রি য়া অ রু ণা
বে ক রে অ কি ন্ চ নে ও ধ - ন্য - ত ব বৈ - রা গ রু চি

না র্রা র্সা | র্গা র্রা র্মা | র্গা র্রা র্সা | র্সা র্সা র্সর্রা | সনা ধণা ধা | -া ধা ণা |
কি র ণে ক রু ণা ক লো চ্ ছ লি ত ভ ঙ গা র এ সো
হো ম ন লে ও চি ক রো এ কা ম না রণ্ ড় ড় - এ সো

পধা ণর্সা র্রর্গা | র্মর্পা র্মর্গা র্রর্সা | নর্সা র্গর্রা র্সনা | ধপা মগা পমা | সা মা সা | মা পা ধা |
হে - - - - - - - - - - - - - এ সো আ গ ম নী
হে - - - - - - - - - - - - - বৈ - ভ লী ও গো

সর্সা ধধা পমা | -া সা র্মা | র্গর্গা র্রর্রা র্সা | ধা র্গা র্রা | র্সর্রা র্সধা পমা | -া গা মা |
শ ঙ্ খে - ছু লি' র ক্ তে ড ম রু ড ঙ্ কে - এ সো
নিঃ - স্ব - যা র বু কে অ চি ন্ ত্য বি - ব - তো লো

পা ধা না | র্সা র্রা র্গা | র্মর্গা র্রর্গা র্রর্সা | -া র্সা র্মা | র্গা র্জ্ঞা র্রা | র্স নর্স র্রা |
বা জা য়ে ত প ন তূ -র্ য্য - রি' মি ল ন ম য়ু মা
দী পি' ব র ণে ব ল -গ্ ন - ছা নি' ম ধু ম মা ধু রী

র্সর্সা নর্সনা ণা | ধা ধা ণধপা পা -া ধা | পগা পা মা | রা গা পা |
ধু - র্ য্য য ত স ঙ্ গী ত হা রা প রা জ
য - গ্ ন প্রা ণ্ শ য় ণা ন্ জ লি সু রে চা

মা ঋা গা | মমা পপা ধধা | র্সর্সা র্রর্রা র্গর্গা | র্সা -া -া | -া র্সা র্সপা | গা র্সা র্সা |
যে রা গ ব রা ভ য়ে - - - - - - প্রে ম ম রী চি
য় দি তে ত ব পা - - - - - - য ন তি আ র ত

র্সা র্সা র্রা | র্সর্রা র্মর্জ্ঞা র্রর্সা | -া র্সনা র্সা | র্রা র্সা ণা | ধা ণা পধা | পধা ণর্রা র্সা |
ব র ণি' মন্ - - র হে ম তা লে তা লে র ণি' মন্ - জী
- শি ব সা র থি - প্রা ণ যা চি যে তো মা রি আ র তি

-া র্সনা র্সা | নর্সা র্রর্জ্ঞা র্সর্রা | নর্সা ণা পধা | পধা র্রা র্সা | -া ণা ণা | ধা ণধা পা |
র হে ম তা লে র ণি' প্রে ম মন্ - জী র ক ধো নৃ - ত্য
- ০ র ব র ণে শ ব ণ আ র তি - জ পি' ত ব অ

মা গা ঋগা | সা গা পা | মা সা মা | মা মা মা | মা ঋমা গা | গা ধজ্ঞা ধা | না র্সা -া |
বি বা গী অ নৃ ত র ত ব গ হ ন অ রা ল র ঙ্ গে ম রা ল
বা স না শা - ন্ তি এ সো হে নী প ঙ্ ক র ম র ণে অ ম র

র্সা র্গা -া | র্মর্গর্রা র্সা র্সর্রা | না র্রা র্সা | -া -া র্রা | নর্সা না র্সা | র্সনা না র্সা |
বি ভ ঙ্ গে ন ট সু ন্ দ - - - - - - - - -
বি র হে বা স র কা ন্ তি - - - - - - - - -

ধনা ধনর্সা না | ধা পা ধা | গমা পধা নর্সা | র্পর্মা র্গর্রা র্সনা | ধপা মগা ঋসা | -া -া সা |
- - - - - র এ - - সো - - - - - - ০ ০ ন
- - - - - - এ - - সো - - - - - - ০ ০ ন

মা মা -া | -া -া সা | ধা ধা মা | -া -া র্সা | র্সা র্সা ধা | র্সা -া -া | -া -া -া | -া -া -া |
ট রা জ ০ ০ ন ট রা জ ০ ০ ন ট রা - - - - - - - - - - -
ট রা জ ০ ০ ন ট রা জ ০ ০ ন ট রা

-া -া র্সা | র্রা -া -া | -া -া -া | -া -া -া | -া র্সা না | র্সা -া -া | -া -া -া | -া
- - জ এ - - - - - - - - - - - সো - - - - - -
- - জ এ - - - - - - - - - - - সো - - - - - -

অন্ত্যেষ্টি

শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

দীনবন্ধু পাবলিসিং হাউসের কাছে আসিয়া আজ সে বহুকাল পরে মনে মনে একবার ভগবানের নাম লইল।

কর্ম্মকর্ত্তা বিজয়বাবু সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া কহিলেন, "আ-সুন তপেশবাবু"। তপেশ চেয়ার টানিয়া তাহার সম্মুখে বসিয়া পড়িল।

বিজয়বাবু চসমার কাচ মুছিতে মুছিতে কহিলেন, "আপনার গল্পের বইটার টাকা দেওয়া হবে না—ওটা এমনি দিতে হবে।"

"কেন?"

"আপনি নতুন লেখক, অবশ্য দুদিন বাদে আপনার বই হয় ত হুড় হুড় করে কাট্‌তি হবে। তখন আমিই আপনাকে উপযুক্ত টাকা দিয়ে এ'র দ্বিতীয় সংস্করণ বার করব। এখন তো আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করা যায় না। আফটার অল্‌, আমরা ব্যবসা করতে বসেছি।"

তপেশ ভিতরে ভিতরে একটু দমিয়া গেল। কহিল, "গল্পগুলির জন্য আমি মাসিক থেকে টাকা পেয়েছি। সম্পাদকরা উচ্চ প্রশংসাও করেছেন। আপনি কেন টাকা দেবেন না?"

"তপেশবাবু, বাঙ্গালা দেশে এই এক মজার ব্যাপার। মাসিক-সাপ্তাহিকের প্রধান অবলম্বনই হচ্ছে গল্প, গল্প না হ'লে সে কাগজ অচল। অথচ বুক ফর্ম্মে গল্প বের করলে তা আর চলে না তেমন। বাজে একখানা নভেলও তার চেয়ে ভাল কাটে। এ একটা paradox."

"বইয়ের জন্য টাকা না পেলে আমার লাভ?" তপেশ উষ্ণ হইয়া উঠিল।

"লাভ—নাম"

"আমি নামের কাঙাল নই—আমি টাকার কাঙাল।"

বিজয়বাবু অট্টহাস্য করিয়া কহিলেন, "ঐ টাকা পেতে হ'লেই তো আগে নামের প্রয়োজন। ওটা essential pre-requisite."

তপেশ চুপ করিয়া রহিল। বিজয়বাবু এবার একটু সুর বদলাইয়া বলিলেন, "আপনার নভেলখানা বেশ লেখা হয়েছে। ওটায় অবশ্যই টাকা পাবেন।"

"কত?"

"দেখুন তপেশবাবু, কিছু মনে করবেন না, আপনি বাজারে সবেমাত্র ঢুকেছেন—নাম-টাম এখনো তেমন বেরোয় নি।"

"তবু কত দেবেন তাই জিজ্ঞেস করছি।"

"গোটা পঞ্চাশেকের বেশী দিতে পারব না।"

তপেশ ভিতরে ভিতরে একটু উত্তেজিত হইয়া কহিল, "একটা বই অমনি দিলাম—তাতেও মাত্র পঞ্চাশ।"

"আপনি অন্যত্র দেখতে পারেন। নতুন লোককে এর চেয়ে—"

তপেশ বাধা দিয়া কহিল, "না, না—অন্য কোথাও আমি যাবার কথা বলছি নে।"

বিজয়বাবু এবার হাসিয়া কহিলেন, "এই বই দু'খানা ভাল য়্যাপ্রিসিয়েসন পেলে, ফেবারেবেল বুক রিভিউ হ'লে, চাই কি পরের বইগুলোর বেলায় আপনার সঙ্গে তখন শ'এর কোঠায় লেন-দেন হবে। কে বলতে পারে, কার ভিতর কি শক্তি আছে।"

তপেশ রাজী হইল। অন্যত্র দু'এক জায়গায় সে পূর্ব্বেই চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছে। পুরানো বইএর দোকানের মত সকলেরই এক সুর।

তপেশ এবার ইতস্তত করিয়া একটু কাসিয়া আস্তে আস্তে কহিল, "বিজয়বাবু, আজ আমায় গোটা পাঁচেক টাকা দিতে পারেন? একটু ট্রবলে পড়ে গেছি। গোটা পাঁচেক—বেশী নয়।"

"Sorry, তপেশবাবু। আজ ক্যাসে কিছু নেই। খানিক আগে দুটো বিল শোধ করতে হয়েছে।"

"কাল হবে?"

"কাল বইএর দোকান সব ছুটি থাকবে। পরশু

রোববার। বিলের টাকা আদায় না হ'লে দেবার উপায় নেই। ঘর থেকে টাকা বের করে ব্যবসা করবার ক্ষমতা তো নেই আমাদের। আপনার এই উপকারটা করতে পারলাম না। কিছু মনে করবেন না।"

তপেশ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বসিয়া থাকিয়াও লাভ নাই, উঠিয়া যাইতেও কেমন লজ্জা বোধ হয়।

বিজয়বাবু কহিলেন, "আপনি আসছে সোমবারের পরের সোমবার আসবেন। সেদিন আপনাকে গোটা পঁচিশ দিতে পারব। বাকী টাকা কিস্তিতে কিস্তিতে পেমেণ্ট হবে। ১৩ই তারিখ—পজেটিভ্।"

তপেশ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে গেল। ভাইব্রোনা যে আজ কিনিতেই হইবে। কালরাত্রে সে গায়ে হাত দিয়া দেখিয়াছে মঞ্জুলীর সামান্য জ্বর হইয়াছিল। আজ সারাটা সকাল খুক্ খুক্ করিয়া কাসিয়াছে। স্বামী হইয়া স্ত্রীকে এক বোতল ওষুধ কিনিয়া দিতে পারিবে না তো বিবাহ করিয়াছিল কেন! ছেলেটার না-মরিয়া যদি বাঁচিয়াই জন্মিবার দুর্ভাগ্য হইত তবে আজ খাইয়া না-খাইয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার বন্দোবস্ত তো করিতে হইত। আর এখন মঞ্জুলীর এক বোতল ওষুধও জুটিবে না। কি কাহিল না হইয়া পড়িয়াছে!

তপেশ ফিরিয়া দাঁড়াইল। ভাবিল, প্রকাশকের কাছে যাইয়া বলে—আজ আমায় শুধু তিনটে টাকা দাও, —আর দু'টাকা ছ' আনা হইলেই একটা ভাইব্রোনা হয়। চাই না ১৩ই তারিখের পঁচিশ টাকা। তিন টাকায়ই আমি বই দু'খানি বিক্রি করিব আজ। তোমার যথেষ্ট লাভ, আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না।

তপেশ আবার পথ চলিতে লাগিল। দুনিয়ায় যাহা কিছু ভাবা যায়, তাহাই সব সময় করা যায় না। তপেশ হাঁটিতে হাঁটিতে হেদুয়ায় আসিয়া পৌছিল।

সন্ধ্যার কলিকাতার উত্তাল কলকোলাহলে তাহার কান নাই। ভ্রূক্ষেপ নাই রাজপথের দুই পাশে কি ঘটিতেছে না-ঘটিতেছে। কথঞ্চিৎ নির্জ্জন একটা স্থান বাছিয়া তপেশ ঘাসের উপর শরীরটা বিছাইয়া দিল।

হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল, সাম্‌নে বলরাম দে ষ্ট্রীটে নলিনী থাকে। মাস তিনেক আগে এই হেদুয়ায়ই একদিন দেখা হইয়াছিল। বাসার নম্বর বলিয়াছিল, মনে আছে—১৩।১এ। এখন সে ৬০্ মাহিয়ানায় এক সাহেব কোম্পানীতে চাকুরী করে। বিবাহ করিয়াছে, একটী ছেলেও হইয়াছে। দেশ হইতে বিধবা মা ও বোনকে লইয়া আসিয়াছে। তাহার কাছে একবার যাইবে। সে বড় হিসাবী ছেলে. কলেজ জীবনেই তপেশ দেখিয়াছে সে এক পয়সাও বাজে খরচ করে না। সংসারের দুঃখ-কষ্ট কতদিনে দূর করিতে পারিবে ইহাই ছিল ঐ গরীব বিধবার একমাত্র ছেলের সর্ব্বক্ষণ চিন্তা। বড় ভাল ছেলে সে। তপেশকে বিশ্বাসও করে সে যথেষ্ট। কলেজ ম্যাগাজিনের এডিটর বলিয়া শ্রদ্ধাও করিত। তাহার কাছে গোটা তিনেক টাকা নিশ্চয়ই মিলিবে, কারণ এখন মাসের শেষ নয়, সবে প্রথম সপ্তাহ; আর নলিনীও চিরদিনের হিসাবী ছেলে—তাহাদের মত হতচ্ছাড়া নয়।

তপেশ উঠিয়া পড়িল। এই সাম্‌নেই, কয়েক মিনিটের রাস্তা, বলরাম দে ষ্ট্রীট।......

তপেশ কড়া নাড়িল। ভিতর হইতে কেহ সাড়া দিল না। মিনিট দুই দেরী করিয়া আবার কড়া নাড়িল। তবু কাহারও সাড়া শব্দ নাই। এবার তপেশ জোর গলায় ডাকিল, "নলিনী, নলিনী, নলিনী বাসায় আছ?"

মিনিট পাঁচেক বাদে এক পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছরের ভদ্রলোক দুয়ার খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাকে চান?"

"নলিনী। নলিনী বাসায় আছে?"

ভদ্রলোক তপেশের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

"নলিনী ব'লে কেউ থাকে না এখানে?—এটা ১৩।১এ তো?"

"হাঁ মশাই, ১৩।১এ-ই বটে। নম্বর আপনার ভুল হয় নি। তারা এখানেই থাক্‌তো।"

তপেশ ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিল, "উঠে গেছে? কোথায়, ঠিকানা জানেন? আমি তার এক ইণ্টিমেট ফ্রেণ্ড্।"

ভদ্রলোক এবার একটু রুক্ষস্বরে কহিল, "ইণ্টিমেট ফ্রেণ্ড! দু'মাস হ'ল সে মারা গেছে। ইণ্টিমেট বন্ধু বলেই সে খবরটাও রাখেন না।"

"এঁ্যা, নলিনী নেই?"

"শ্রাদ্ধের আগে টাকা ধার দেবার ভয়ে কোন ফ্রেণ্ডেরই দর্শন মিলল না—তার ফ্যামেলী দেশে পাঠাবার দিন কারু টিকি দেখা যায় নি। আজ এসেছেন আপনি ইণ্টিমেট—"

তপেশ দ্বিরুক্তি না করিয়া সরিয়া পড়িল।

নলিনী নাই!...মরিয়াছে তো বাঁচিয়াই গেছে। কিন্তু ওর বিধবা মা-বোন, স্ত্রী, কচি ছেলেটা?—তাদের এ দুর্দ্দিনে দেশের বাড়ীতে কেমন করিয়া চলিবে?

যেমন করিয়াই চলুক, সে-চিন্তা তপেশের কেন? পরের ভাবনা লইয়া মাথা ঘামাইবার সময় তাহার নাই।..

মঞ্জুলীর সঙ্গে আজ ঝগড়া করিয়া বাহির হইয়াছে। সুতরাং ঘরে ফিরিবে সে এক বোতল ভাইব্রোনা লইয়া। ভাইব্রোনা আজ চাই ই। শেষ চেষ্টা করিবে বন্ধু শচীনের কাছে। হঠাৎ কোন বিপদ বা এক আকস্মিক দুর্ব্বিপাকের একটা চমৎকার ঘটনা বানাইয়া যেমন করিয়াই হউক, শচীনের নিকট হইতে আজ কিছু খসাইতেই হইবে। আশু! তাকে বেশী দোষ দেওয়া যায় না। বন্ধুত্বের সুযোগ তপেশই বড় বেশী মাত্রায় নিয়াছে।...

ভাইব্রোনা! ভাইব্রোনা খাইলেই মঞ্জুলী সারিয়া উঠিবে, আর তাহা না হইলেই ভাল হইবে না, এ-কথা মানিবার মত আহাম্মক তপেশ লাহিড়ী নয়। এ-জগতে যাহাদের ভাইব্রোনা জুটে না তাহারা বুঝি আর প্রসূতি হয় না! তবু চাই। খাওয়ার ব্যবস্থা যখন মিলিয়াছে তখন মঞ্জুলী ভাইব্রোনা খাইয়া মরিলেও তাহার ঐ ভাইব্রোনাই চাই। শুধু ভবিষ্যতের আফশোষ এড়াইবার জন্ত বর্ত্তমানের সান্ত্বনার ফাঁকিতেও মানুষ মাত্রেরই অধিকার আছে—অন্ততঃ থাকা উচিত।...

নলিনীর মা, বোন, বউ, ছেলেটা—না-না, ও-চিন্তা আজ এখন থাক্; পরে একদিন সময় মত ভাবিয়া দেখিবে। তবু একটা কথা শুধু: নলিনীর স্ত্রী লেখাপড়া জানে তো? একটু-আধটু ইংরেজী?...মঞ্জুলী! সাহিত্য-চর্চ্চায় না মাতিয়া তপেশ যদি তাহাকে লেখাপড়া শিখাইত!—অন্ততঃ জুনিয়র ট্রেনিং পাশ। আজ মঞ্জুলী নিশ্চয়ই একটা স্কুল মিষ্ট্রেস্ তো হইতই! ভুল, ভুল হইয়া গেছে! জীবনের হিসাবে আগাগোড়াই একটা বড় রকমের গরমিল! ..

মঞ্জুলী আজ বড় রূঢ় কথা শোনাইয়াছে। অবশ্য সে-ও পাল্টা জবাবে বড় ছাড়িয়া কথা কহে নাই। · এই তো সবে সুরু। তারপর বুঝি প্রত্যহ, শেষে দু'বেলা, অবশেষে চব্বিশ ঘণ্টা!...

তপেশের এতকাল গর্ব্ব ছিল—আজও আছে—অন্তরের আভিজাত্য তাহার অনাহত। দারিদ্র্য তো বাহিরের শত্রু। বিজিত হইয়াও বিজেতার কাছে মাথা নোয়ায় নাই। আজ সে-রুদ্র কোন সুযোগে অন্তরে আনাগোনা সুরু করিয়াছে। ম্লানায়মান পাপড়িগুলির উপর আরম্ভ হইয়াছে তাহার কলুষ পাদক্ষেপ। বাহিরের শত্রু আজ সিঁধ কাটিয়া ঘরে ঢুকিয়াছেন! দম্ভ আর কতকাল চলে!...

শিমলা ষ্ট্রীট হইতে একটা সরু গলি বরাবর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে গিয়া পড়িয়াছে। তপেশ চাহিয়া দেখিল, রাস্তার দুদিকে সারবাঁধা খোলার ঘর। দুধারেই কালীঘাটের ভিখারীগুলির মত রঙচঙ্ মাখিয়া ব্যগ্র আশায় বসিয়া আছে নানান বয়সের মেয়েছেলে। তপেশ দেখিল—ভাল করিয়াই দেখিল: তাহাদের চোখেমুখে যেন লালসার লেশমাত্র নাই; আছে ক্ষুধা, দুরন্ত ক্ষুধা—পেটের ক্ষুধা!......

খোলার ঘরগুলি শেষ হইতেই পর পর খানচারেক দোতলা বাড়ী। ঐ সম্প্রদায়েরই উচ্চবর্ণ! দুয়ারের ধারে তীর্থের কাকের মত এদের বসিয়া থাকিতে হয় না। দেউড়িতে দারোয়ান। ঘরে ঘরে লাল-নীল আলো। জানালায় রঙীন পরদা। ভিতরে ফ্যান ঘোরে ভন্‌ভন্। কর্কশ মিহি-গলাব কলগুঞ্জন। গেটে মোটর খাড়া।...

এখানেও সেই কথা! পাশাপাশি দুই দৃশ্য! সমাজের শুক্লপক্ষে আর কৃষ্ণপক্ষে একই নীতি। সর্ব্বস্তরে যে একই ইতিহাস!...

কমলাক্ষ! কি হইতে যাইয়া সে কি হইয়া গেল! কি না-পাইয়া সে কি হারাইল! না—না, ওর একদিন না একদিন সুদিন আসিবেই। অমন ছেলে! কিন্তু—

তপেশ ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিল—কিন্তু ততদিনে তাহার কত না অঙ্কুরিত সম্ভাবনার অকাল-মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ করিবে কে? ইতিমধ্যে তাহার যে-সম্পদ খোয়া যাইবে, যে-সত্য জাগিতে না-জাগিতে মিথ্যা হইয়া যাইবে, সে-দুঃখের—সে-ক্ষতির সান্ত্বনা কিসে? ফুটিবার পালা সাঙ্গ হইয়াছে যার রুদ্র-দাহনে, অবেলায় বারিবর্ষণে সেই বিশুষ্ক কুসুমের লাভ কি? আর সেই বারিবর্ষণেরও বা সম্ভাবনা কৈ! কমলাক্ষ যে শুধু কমলাক্ষই নয়। কমলাক্ষ আছে পথে ঘাটে, দেশে দেশে, স্তরে স্তরে, যুগে যুগে। শিক্ষিত

কমলাক্ষ। অনক্ষর কমলাক্ষ! সুখ-দুঃখের ভেদজ্ঞান-রহিত কমলাক্ষ!!

চলিতে চলিতে তপেশ একটা বিদেশী-মদের দোকানের সামনে আসিয়া থামিল। কাচের আড়ালে বোতলে বোতলে রঙীন তরল! ওরা যখন পেয়ালায় পেয়ালায় টলমল করিয়া গলিয়া পড়ে তখন বুঝি উচ্ছ্বসিয়া উঠিয়া জন্ম-কথা জানাইয়া দেয়—আমরা অমুক দ্রাক্ষাক্ষেত্রে অমুক অমুক ব্যক্তির জন্য স্তবকে স্তবকে টুস্‌টুস্ করিয়াছি। মঞ্জুলীর নাম বুঝি ভুলেও উচ্চারণ করিবে না। ভাইব্রোনা! প্রকৃতি বুঝি বিশেষ করিয়া এর-ওর-তার জন্য আপনার সর্ব্বদেহে উচ্ছল রস-সম্পদে নিরন্তর স্পন্দিত হইয়া ওঠে! ঐ একচেটে অধিকারে মঞ্জুলীর যদি স্থানই নাই তবে তপেশের কিসের প্রয়োজন আর তিনটি টাকার? ভাইব্রোনা! চার টাকা ছ' আনা! এক মাসের বাজার খরচ! ভাইব্রোনা না হইলে মঞ্জুর অসুখ ভাল হইবে না! যত সব বাজে ব্যবস্থা! একশ বছর আগেকার সন্তানের মায়েরা সব ওষধির মত প্রথম ফলান্তেই মরিয়া যাইত!······

না—না, মঞ্জুর ভাইব্রোনা আজ চাই-ই। যার অস্তিত্ব ছিল না, তার প্রয়োজনের প্রশ্ন ওঠে না। যাহা আছে তাহা লইয়াই ক্ষমতা-অক্ষমতা, অধিকার-অনধিকার!·· হ্যাঁ!···ঠিক!

নলিনীর মা-বোন-ছেলে-বৌ···শিমলা ষ্ট্রীটের খোলার বাড়ী···কমলাক্ষদের মেস···রাজাবাগান গোসাবাগানের বস্তিগুলি··ট্যাংরা-টালা···মডার্ণ ঈশ্বরচন্দ্র···

দূর, ওসব এখন থাক্। তপেশ কবি। সে সাহিত্য-সেবী—রূপপূজারী সে। কমলাক্ষের মত অমন পাউণ্ড-শিলিং-পেন্স-ঘটিত সমস্যা লইয়া মাথা ঘামানো তাহার ধর্ম্ম নয়। এসব কথা লইয়া বই লিখিলে বাহবা মিলিবে, সাহিত্য হয় না—প্রয়োজনের মূল্য থাকিতে পারে, পূজার আসনে স্থান নাই।···কিন্তু···তবু···কমলাক্ষ এমন হইল কেন? না—না, কমলাক্ষর মাথা খারাপ হইয়াছে,—নয় ত বা অতি শীঘ্রই হইবে। যাক্ কমলাক্ষ পাগল হইলে তপেশ না হয় একটা বেদনাগম্ভীর সনেট্ লিখিয়া বন্ধুর প্রতি সমবেদনা জানাইবে।······

ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট এখনো আধ মাইল। শচীনদের মেসের নম্বর ৫৩৩১। ঠিক মনে আছে। আজ সত্য-মিথ্যায় ছলে-কৌশলে যে প্রকারেই হউক তিনটি টাকা না হইলেই নয়। মঞ্জুলীর ও-বেলাকার তুহিন-অভিমানে এ-বেলা তপেশ কর্ত্তব্যের উত্তাপ ছড়াইবে! শুধু এক বোতল ভাইব্রোনা!······

চলিতে চলিতে তপেশের একটি কবিতা লিখিতে ইচ্ছা গেল। কাগজ পেন্সিল সঙ্গে থাকিলে এখনই একটা পার্কে বসিয়া লিখিয়া রাখিত। বাঃ! আরম্ভের লাইনটি তো মন্দ নয়: জাতির ক্ষতির ক্ষত, আমি অপচয়। · নাঃ, এটাকে প্রারম্ভে না দিয়া মাঝের একটা লাইন করিতে হইবে।···

তপেশ মনে মনেই কবিতার ছন্দ গাঁথিয়া চলিল। খানিক যাইযাই থামে। মনের কথা কানে শুনিয়া জানিতে চায়, ঠিক হইতেছে কি না:

বাঙ্গালী যুবক আমি অভিমানী বিংশ শতাব্দীর।
কামনার কল্প-তরু, যুবরাজ শূন্য নগরীর॥

একবার আশেপাশে চাহিয়া ফুটপাতের কিনারে বাড়ীগুলির কোল ঘেঁষিয়া মনে মনে আবৃত্তি করিয়া চলিল:

আমারে চিনিতে চাহ? কি দিয়ে বোঝাব বলো!
দিকে দিকে চির-চেনা আছি সর্ব্ব ঠাঁই;
আমি আর আমি নহি—প্রতিনিধি সহস্রের—
লক্ষ কোটী সগোত্রের মর্ম্মকথা গাই।······

নাঃ—কথার গতি মোটেই মোলায়েম হইতেছে না; ছন্দের মিলও সুষ্ঠু নয়; কবিতার মত ভাববাহী নয়—রূঢ় ভারবাহী।···যাক্ বাড়ী যাইয়া আজই কবিতাটি লিখিয়া বাঁচিবে। তখন সব ত্রুটি আপনি ঠিক হইয়া যাইবে। আরম্ভের কাঠিন্যের সঙ্গে শেষের দিকে খানিকটা শিথিল উচ্ছ্বাস জুড়িয়া দিবে—আগাগোড়া একটা ভাবগত ঐক্য রাখাও অসম্ভব হইবে না। যাক্—আপাততঃ কথার পর কথা সাজাইয়া পথের দৈর্ঘ্য কমিতে থাকুক্:

বেসুর শানাই আমি, বেতাল নূপুর-নৃত্য,
জাতির ক্ষতির ক্ষত, আমি অপচয়;
কি হতে কি হয়ে গেছি! কি শিখিতে কি ভুলেছি!
মোর কাছে অবশেষে আমিই বিস্ময়।···

মঞ্জুলী! নলিনীর স্ত্রী! কমলাক্ষ! আশু! প্রকাশক! শিমলা ষ্ট্রীটের খোলার বাড়ী! গোলদীঘির ঐ ভিখারী-গুলি!······

তপেশ সিনেট হলের ওপারে ফুটপাতের কাছে উন্মাদের

মতই থমকিয়া থামিল। কাহাকেও খানিকটা কামড়াইয়া দিতে পারিলে বুঝি সে এখন বাঁচিয়া যায়। কিন্তু যাহাকে সে কামড়াইতে চায় সে কে? সে বুঝি মানুষ নয়, কোন ব্যক্তি নয়—বস্তু নয়, যন্ত্র নয়, কি তবে?—কি? সে যে ধরা-ছোঁয়ার জিনিস নয়, তবু সে আছে—তার সূক্ষ্ম অস্তিত্বের স্থূল প্রকাশই না আজ তপেশ সারা বিকালটা দেখিয়া দেখিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া আসিল। কি ঐ অপ্রমেয় শক্তি?—কে সে বিকৃত মনুষ্যত্বের বিশ্বজোড়া স্বার্থরূপ?···

তপেশ সামনের ফুটপাতের প্রান্তে দাঁড়াইয়া গ্যাস্-পোষ্টটা দুই হাতে ধরিয়া প্রবল ঝাঁকুনি দিতে চাহিল। ভাঙ্গিয়া ফেলিবে? অসম্ভব! না—না, গ্যাসপোষ্ট নয়—গ্যাসপোষ্ট নয়—সে চায় এখন সমস্ত পৃথিবীটাকে কমলালেবুর মত হাতের মুঠায় পিষিয়া ঠাসিয়া থেঁতলাইয়া দেয়।··· ··

শচীন! ওয়েলিংটন স্কোয়ার!···

সুতরাং আবার তপেশ পথ চলে।

পথ চলে। তবু মনের মধ্যে কেবলি অসমাপ্ত কবিতাটি ঘুরপাক খাইয়া খাইয়া সমাপ্তি চায়।—কবিতার সমাপ্তি, দ্বন্দ্বের নিরসন, অসুন্দরের সমাধি···

ভাবিতে ভাবিতে চলিতে চলিতে হঠাৎ তপেশ গুণগুণ করিয়া তাহার সদ্যোজাত সঙ্গীতের প্রথম দুটি লাইন গাহিয়া উঠিল:

মোর সুন্দর কারাগারে বন্দী
তাই বাঁশী মোর হ'ল বিষরন্ধ্রী···

কমলাক্ষর এ কি উদ্ভট যুক্তি! মানুষ কেমন করিয়া স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন করে!—কোন প্রাণে আপনার আরাধ্য প্রিয়কে বিদায় দেয়!—তা'ও নাকি দিতে হয়।—অভাগিনী জননীর নিরুপায় ভ্রূণহত্যার মত তবু নাকি নির্ম্মম হইতে হয়!···কমলাক্ষ উন্মাদ!

রাত বাজে এগারটা। তপেশের দেখা নাই। মঞ্জুলী দুয়ারের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ঘরের মধ্যে আলোটা নিবু-নিবু জ্বালান। অপর দুই পরিবারের সকলেই শুইয়া পড়িয়াছে।

তপেশ এত রাত্রেও বাসায় ফিরে নাই। ভয়ে মঞ্জুলীর বুক দুরুদুরু করে। সেই যে তপেশ দুপুরবেলা রাগ করিয়া বাহির হইয়াছে, আর এখন রাত দুপুর হইতে চলিল, এখনো তাহার দেখা নাই। দশটার ওদিকে কোনদিনই তপেশ বাহিরে থাকে না।

আকাশে মেঘ জমিতেছে। মঞ্জুলীর ভাবনার অন্ত নাই। কত রকমের কত কি বিপদই না ঘটিতে পারে এই কলিকাতার রাস্তা ঘাটে। মঞ্জুলীর বড় শঙ্কা ঐ আপন-ভোলা স্বামীকে লইয়া। বিশ্বাস কি—হয়তো সে পথ চলিতে চলিতেই গল্পের প্লট ভাবিতেছে, বা গুণগুণ করিয়া গান গাহিয়াই চলিয়াছে। ঘরে যে সে অমন দৃশ্য অনেক বার দেখিয়াছে। স্বামী আপন মনে কবিতার লাইন আওড়ায়—কখনো হাসে, কখনো রাগে, কখনো বা শূন্য-দৃষ্টি মেলিয়া মুখভার করে—কাহার উপর কে জানে। রাস্তায় যদি অমনি করে! গাড়ী-ঘোড়া, ট্রাম বাস—কত উৎপাত মোড়ে মোড়ে।

সমবেদনায় মঞ্জুলীর মন ভরিয়া ওঠে। ভাবে, দুঃখ-দৈন্যের জন্য স্বামীর এই পাগলামো; সুদিনের মুখ দেখিলেই এসব কাটিয়া যাইবে। হায়! মঞ্জুলী বুঝিতে পারে না, স্বামীর কিসের ব্যথা—কোন খানে তাহাকে সমবেদনা জানাইতে হইবে। কথঞ্চিৎ অর্থের সচ্ছলতা আসিলেই স্বামী আবার সুখী হইবে, শান্তি ফিরিয়া আসিবে—এই সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে মঞ্জুলীর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

মঞ্জুলী বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে।···রাগ করিয়াছে বটে। কিন্তু এত রাত অবধি রাগের জের টানিয়া বাহিরে কাটাইবার মত হাল্কা মান-অভিমান তাহার স্বামীকে দিয়া সম্ভবে না।·

আজকাল তাহাদের দুজনকেই এ কি দশায় পাইল! দুঃখকষ্ট তো সংসার ভরিয়াই আছে। তবু আগেকার সেই দিনগুলি অমন অনায়াসে বিদায় লইল কেন!···

না—আজ স্বামী যত রাত্রেই বাসায় ফিরুক না কেন,—আজই সে একটা দিনকে অতীতের সেই মধুর রঙে রাঙাইয়া তুলিবে। আজ সে গান শুনিবে। কতদিন যে তপেশ আর গান করে না। আজ মঞ্জুলী দিনের তিক্ত কলহকে রাতের মিষ্টি মুখরতায় মোলায়েম করিয়া দিবে। বর্ষণক্ষান্ত নির্ম্মল আকাশেই না চাঁদের হাসি ফোটে ভাল! আর না হউক—অন্ততঃ আজ একটি রাত্রে। আস্তে

আস্তে গুণ গুণ করিয়া গান। বেশী না হউক—একটি মাত্র। না হয় ও-ঘরের ওরা শুনিল। কি এমন অপরাধ! ওদের দিকের জানালা দুটি না হয় বন্ধ করিয়াই লইবে। আজ সে গাহিতে ফরমাস করিবে—"আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কি এনেছিস্ বল"—অথবা সেই গানখানি—"সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি···"

আজ সে তপেশের কোন ওজর আপত্তিই মানিবে না। স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া শুনিতে শুনিতে ঘুমাইবে :—

"আজি কি সব-ই ফাঁকি ?
সে-কথা কি গেছ ভুলে ?"

মঞ্জুলীর চোখের কোণে জল! · ভুলিয়া কি সত্যই গেছে ? আজ তাহারা প্রমাণ করিবে, ভুলিয়া যায় নাই। অন্ততঃ আজ এ রাত্রে। সেই তাহারা আজও তাহারাই! সেই দুজন, সেই ঘর, সেই সম্বন্ধ! তাহাদের বয়সের জোয়ারে ভাঁটার ডাক আসিতে এখনো অনেক—অনেক দেরী। তবে?—শুধু কি সেই মনটাই নাই? তা-ও তো না। মনও চায়, একান্তভাবেই চায় ; তবু কেমন চাহিতে পারে না! কিসের যেন বাধা—কোথায় যেন নিষেধ। সেই রঙীন দিনগুলি আজ ও যে উভয়েরই চেতনার উপর স্মরণের এক পাতলা আস্তরণ গায়ে দিয়া ঘুমাইয়া আছে। তাহাদের একটি দিনেরও কি ঘুম ভাঙ্গানো যায় না ? না, আজ মঞ্জুলী সব-কিছু ভুলিবে—বাড়ী ভাড়া বাকী, মুদীর তাগিদ—স্বামীর চাকুরী নাই—সব-ই আজ মঞ্জুলী কাল সকালের জন্য ভুলিয়া রাখিবে। একটি দিন শুধু—তেমনি একটি প্রলাপী রাত্রি!···

সত্যই তো, তাহাকে কি দশায় পাইয়াছে। আজ-কাল ভাল করিয়া চুলটাও যে বাঁধে না। পরণের ময়লা কাপড়খানার এখানে-সেখানে হেঁসেলের চিহ্ন এই আবছা অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখা যায়।· ·না, আজ সে একটু বিশেষ করিয়াই সাজিবে ; অর্থাৎ ধোপাবাড়ীর আটপৌরে শাড়িখানা ও মিলের শাদা ব্লাউসটায় যতটা সাধ্য—চটকের অভাব চটুলতায় যতখানি পোষান সম্ভব।···

মঞ্জুলী তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া বাক্স খুলিয়া ফরসা শাড়িখানা বাহির করিল। ব্লাউসের বোতাম ভাল করিয়া আঁটিয়া আঁচলটা ঘুরাইয়া পরিয়া লইল। তারপর চিরুণী হাতে লইয়া আবার চৌকাঠের কাছে আসিয়া বসিল। সংস্কার আছে, রাত্রিবেলা যুবতীর আরসিতে মুখ দেখিতে নাই। মঞ্জুলী তাই আন্দাজেই সিঁথি চিরিয়া বিননী বাঁধিতে বসিল। তপেশ আসিবার আগেই তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। ছি-ছি! এতদিন এই অবহেলাকে সে স্বাভাবিকতা বলিয়া ভাবিয়া আসিয়াছে! আজ সে পূজার আয়োজনে সাধ্যানুযায়ী এতটুক ত্রুটি ঘটিতে দিবে না···

আন্দাজেই ভ্রূযুগলের মাঝখানে সিঁদুরের ফোঁটা পরিল। ঠিক মাঝে পড়িল কি না, আর একটু উপরে কি নীচে দিবে, যথাযথ সুগোল হইল না বুঝি—এ সব ভাল করিয়া জানিবার উপায় নাই। সাজগোজ শেষ করিয়া মঞ্জুলী আঁচলে মুখখানা ভাল করিয়া মুছিল। গালে হাত পড়িতেই সচেতন হইল—ভাঙ্গনটা একটু মাত্রাহারা হইয়া পড়িয়াছে। যাক্‌গে, চোখ-জোড়া তবু এখনো বুঝি তেমনি ভাসা-ভাসাই আছে। রোজই তো আয়নার কাছে দাঁড়ায়, আজ সকালেও একবার আল্‌গা খোঁপা ঠিক করিয়া লইয়াছে, তবু মঞ্জুলী এখন একবার যদি আরসিতে মুখখানি দেখিয়া লইতে পারিত! ভুল হইয়া গেছে—আজ দিন থাকিতেই তাহার চুল বাঁধা সারিয়া রাখা উচিত ছিল। স্বামী কাজল পরিলে ভারী খুশী হয়। সে আর আজ হইবার নয়।···

মঞ্জুলী তো প্রস্তুত। স্বামীরই যে দেখা নাই। এতক্ষণ ত্বরিত সাজগোজে যে ভাবনা ভুলিয়াছিল তাহা আবার দ্বিগুণ হইয়া দেখা দিল।···ভাবিয়াছে, রাত করিয়া আসিয়া তাহাকে জব্দ করিবে। দেখা যাক্—জব্দ হয় কে! ··

আকাশে গড় গড় করিয়া মেঘ ডাকিল। বৃষ্টি আসিল বলিয়া। মঞ্জুলী চুপ করিয়া চৌকাঠের কাছে বসিয়া আছে। ক্রমে গলির লোকচলাচলও শোনা যায় না আর। চারিদিক নিঝুম। নির্জ্জন বাড়ীটা থমথম করে। মুহূর্ত্তগুলি যেন ঢিমা তেতালায় গড়াইয়া চলিয়াছে। ভয়ে মঞ্জুলীর বুক যেন শুকাইয়া গেল। এখন-ও আসে না!

খানিক বাদে বাহিরে কড়া নাড়ার শব্দ হইল। আলোটা না নিয়াই মঞ্জুলী ছুটিয়া গেল। ডাকিল "কে?" বাহির হইতে কোন সাড়াশব্দ নাই।

আবার কড়া নাড়ার শব্দ। বার-দুয়ারের কপাট খুলিয়া মঞ্জুলী ভয়ে ভয়ে একটু ফাঁক করিয়া দেখিল—তপেশই।

তপেশ ভিতরে ঢুকিল। মুখে ভুরভুর করিতেছে মদের গন্ধ। এই উগ্র গন্ধের সহিত মঞ্জুলীর সবিশেষ পরিচয় আছে। কত দিন শ্বশুরের মাথায় জল দিয়াছে। কোন কোন দিন রাত দুপুরে পায়ের তলায় বরফ ঘষিতে হইয়াছে। এতকাল পরে আজ পুত্রের মুখে পিতার মুখের সেই সুরার গন্ধ!

মঞ্জুলী অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল, "এঁ্যা তুমি—"

"কি লা মঞ্জু?"—ওঘর হইতে মনোরমা ডাকিল।

"কিছু না দিদি।" মঞ্জুলী নিমেষে আত্মসংবরণ করিয়া কণ্ঠস্বর প্রকৃতিস্থ করিয়া লইয়াছে।

তপেশ ঘরে ঢুকিয়াই বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে।

মঞ্জুলী ঘরে দুয়ার দিল। নরেনবাবুদের দিকের জানালাটা ভাল করিয়া বন্ধ করিল।

তারপর আলোটা চড়াইয়া চৌকির কাছে আসিল। তপেশ চঞ্চলতা ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছে। মঞ্জুলী তাহার হাত ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল, "ওগো তুমি অমন করে—"

"কাঁদছ কেন? মদ খেয়েছি। তাই বলে মাতাল হই নি। ভুলো না, আমি ভূপেশ লাহিড়ীর ছেলে—ভূপেশ লাহিড়ী নই।"

মঞ্জুলী এবার তাহার বুকের উপর উপুড় হইয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল। মনোরমা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। দুয়ার-জানালা ভাল করিয়াই বন্ধ। লজ্জা তাহার বাঁচিয়াছে; কিন্তু দুঃখ তাহার ঘুচিবে কিসে। স্বামীকে সে এমন কতকগুলি মনোমত ধারণা দিয়া গড়িয়া রাখিয়াছে যে, এই একদিনের সামান্য একটু মদ খাওয়ার মত তুচ্ছ ঘটনাটিও সেখানে একান্তই মর্ম্মান্তিক।

"আঃ! কাঁদছ কেন?—ওঠ, আমার মাথায় একটু জল দাও।"

মঞ্জুলী চোখ মুছিতে মুছিতে দুয়ার খুলিয়া রক হইতে বালতি আনিল।

তপেশ গামছা দিয়া মাথা পুঁছিতে পুঁছিতেই খাইতে বসিল।

মঞ্জুলী চুপ করিয়া সামনে বসিয়া গুম হইয়া আছে। কপালে সিঁদুরের গোলাকার ফোঁটাটি লেপিয়া একাকার; খোঁপার সটান ভাঁজ বিশ্রীভাবে ভাঙ্গিয়া গেছে; এত সাধের ঘুরিয়ে-পরা আঁচলখানি বালতির জলে ভিজিয়া চিপচিপ!···

ওদের দিকের জানালা তো বন্ধই আছে। স্বামীও যে বাসায় ফিরিয়াছে!··

তপেশ মুখ ধুইয়া আসিয়া বিছানায় উঠিয়াছে। স্বামীর পাতে মঞ্জুলীর খাবার আজ পড়িয়াই রহিল।

দুয়ার বন্ধ করিয়া বাতি নিবাইয়া মঞ্জুলী বিছানার কাছে আসিল। মাথার বালিশ দুটি ঠিক করিয়া দিয়া কহিল, "শুয়ে পড়—ঘুমাও।"

তপেশ অন্ধকারেই বিহ্বলের মত মঞ্জুলীর দিকে তাকাইয়া কহিল, "শোবার আগে যেন তোমার ভাইব্রোনা খেতে ভুলো না মঞ্জু!"

ভাইব্রোনা!!

মঞ্জুলী স্বামীর মাথাটা বুকের মধ্যে লইয়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল। (ক্রমশঃ)



প্রাচীন ভারতে ব্যবহারশাস্ত্র

শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন (এডভোকেট)

(৭)

আহ্বান অনুসারে প্রতিবাদী উপস্থিত হইলে "শ্রুতার্থস্যোত্তরলেখ্যং পূর্ব্বাবেদকসন্নিধৌ"—বাদীর সম্মুখে তাহার "উত্তর" লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

নারদ ভাষা লক্ষণ-বর্ণনা করিয়াছেন—

পক্ষস্য ব্যাপকং সারমসন্দিগ্ধমনাকুলং।
অব্যাখ্যাগম্যমিত্যেতদুত্তরং॥

ভাষা হইবে—concise, reasonable, unambiguous, consistent and easy to understand without an explanation.

উত্তর চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—মিথ্যোত্তর (Denial) সত্যোত্তর (Admission) কারণোত্তর (Special plea) এবং প্রাঙ্‌ন্যায়োত্তর (Previous judgment অথবা Resjudicata)

দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১১ ধারায় বিধান আছে যে, কোন মোকদ্দমার বিষয়ীভূত অভিযোগের কারণ (cause of action) লইয়া যদি পক্ষগণের মধ্যে অথবা যাহাদিগের নিকট হইতে ঐ পক্ষগণের স্বার্থোদ্ভব হইয়াছে তাহাদিগের মধ্যে পূর্ব্বে মোকদ্দমা হইয়া বিচার সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে, তবে পুনরায় ঐ বিষয় লইয়া মোকদ্দমা চলিবে না। ইহাই ব্যবহারশাস্ত্র লিখিত প্রাঙ্‌ন্যায়োত্তর।

প্রতিবাদী তাহার উত্তরে "প্রাঙ্‌ন্যায়" (Previous Suit) প্রকাশ করিলে তাহা প্রমাণের ভারও তাহারই প্রতি ছিল এবং ইহা প্রমাণ করিবার জন্য পূর্ব্ব মোকদ্দমার "জয়পত্র" অর্থাৎ ডিক্রি উপস্থিত করিতে হইত। "প্রাঙ্‌ন্যায়ে জয়পত্রেণ প্রাঙ্‌ন্যায়দর্শিভির্বা ভাবয়িতব্যম্।" এইপ্রকার জয়পত্র দ্বারা প্রমাণের বিধান দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের বিধানের সহিত অভিন্ন।

ইহা দ্বারা সিদ্ধান্ত করা যায় সেকালেও মোকদ্দমার Record রক্ষা করিবার প্রথা ছিল এবং নথী হইতে নকল লইবার ব্যবস্থাও ছিল। আরও একটি কথা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—মোকদ্দমা বিচারকালে আইন এবং ন্যায় (Equity) ব্যতীত পূর্ব্ব-মীমাংসিত বিচারের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিববার বিধানও ছিল দেখা যায়। ইহাতে অনুমান করা যায় Law Reportsএর ব্যাপারও সেকালে অজ্ঞাত ছিল না।

"উত্তর" প্রসঙ্গে যত প্রকার কূট প্রশ্ন এবং বিরুদ্ধ সম্ভাবনার উদ্ভব হইতে পারে, ব্যবহার শাস্ত্রে তাহা সমস্তই লক্ষ্য ও আলোচনা করা হইয়াছে।

(৮)

ভাষা ও উত্তর গৃহীত হইলে তৎপর প্রমাণের কথা।

প্রমাণ বিষয়ে প্রথম প্রশ্ন—Onus অথবা Burden of proof. এই প্রশ্ন লইয়া অনেক সময় বিতর্ক উপস্থিত হইয়া থাকে। ইংরাজি আইনে বিভিন্ন অবস্থানুসারে এবং ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ইহার বিধান আছে। নারদ, ব্যাস, হারিত প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে।

কথিত হইয়াছে, প্রতিবাদীর উত্তর চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। Onus সম্বন্ধে সাধারণ বিধি হইতেছে—

সাক্ষীষূভয়তঃ সৎসু প্রথমং পূর্ব্ববাদিনঃ।
পূর্ব্বপক্ষে বৈরিভূতে ভবন্ত্যুত্তর-বাদিনঃ॥

ইহার সহিত দেওয়ানী-কার্য্যবিধি আইনের Order 18 তুলনীয়। এতদ্ভিন্ন প্রতিবাদীর উত্তরের বৈশিষ্ট্য অনুসারে Onus সংক্রান্ত যত প্রকার বিতর্ক উপস্থিত হইতে পারে, সম্ভাবিত সকল প্রকার অবস্থা ব্যবহারশাস্ত্রে বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে।

প্রমাণের শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে—"প্রমাণং লিখিতং ভুক্তি সাক্ষিণশ্চেতি কীর্ত্তিতম্। এষামন্যতরাভাবে দিব্যাগতং সমুচ্যতে॥"

"বাচিক" এবং "লেখ্য" (oral and documentary) হিসাবে প্রমাণ দ্বিবিধ। ভুক্তি (Possession) অন্যতম প্রমাণ এবং এই সকল প্রমাণের অভাবে দিব্য প্রমাণ (trial by ordeal) লওয়া বিধেয়।

(৯)

প্রথমতঃ বাচিক প্রমাণের কথা উল্লেখ করিব। ধর্ম্মাধিকরণে প্রকাশ্যভাবে সাক্ষ্য প্রমাণ লইবার বিধান ছিল। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনেও (O. 18. r. 4) অনুরূপ বিধান আছে। আবশ্যক হইলে "অর্থস্যোপরি" অর্থাৎ local inspection এবং পক্ষগণের অনুপস্থিতিতেও সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইত।

গুরুতর অপরাধ স্থলে ভিন্ন লোক নির্ব্বিশেষে যে কেহ বিচারালয়ে সাক্ষী স্বরূপ উপস্থিত হইতে পারিত না। বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্রে সাক্ষী এবং অসাক্ষী (competent and incompetent witnesses) লক্ষণ নির্ণয় করিয়া বিভাগ করা হইয়াছে।

Evidence Actএ oral evidence সংক্রান্ত বিধান-গুলির মূলসূত্র (Principles) সমস্তই ব্যবহারশাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে দেখা যায়।

সাধারণ বিধি অনুসারে oral evidence সকল ক্ষেত্রেই "Direct" evidence হইবার বিধান অর্থাৎ—"if it refers to a fact which could be seen, it must be evidence of a witness who says he saw it ;

if it······could be heard··· a witness who heard it. (Evidence Act. S 60).

Hearsay evidence বিচারালয়ে অগ্রাহ্য। কিন্তু যে ক্ষেত্রে বিশেষ অবস্থানুসারে Direct evidence পাওয়া যায় না—সেরূপ স্থলে Indirect evidence লইবার ব্যবস্থা আছে (Evidence Act S. 32, Statement ·· by person who is dead or cannot be found etc).

ব্যবহারশাস্ত্রে বাচিক সাক্ষী সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে "সমক্ষ দর্শনাৎ সাক্ষী-শ্রবণাদ্বা" এবং "উদ্দিষ্ট সাক্ষিনি মৃতে দেশান্তরগতে বা তদভিজ্ঞাতারঃ প্রমাণম্।"

সাক্ষী বিচারালয়ে উপস্থিত হইলে প্রথমতঃ তাহাকে শপথ গ্রহণ করিতে হইত—"সাক্ষিণশ্চাহুয়াদিত্যোদয়ে কৃতশপথান্ পৃচ্ছেৎ।" শপথ গ্রহণ করা হইলে—সাক্ষিণশ্চ শ্রাবয়েৎ—"যে মহাপাতকিনো লোকাঃ যে চোপপাত-কিতস্তে কূট-সাক্ষীনামপি। জননমরণান্তরে কৃত সুকৃত হানিশ্চ।" এবং "সত্যেনাদিত্যস্তপতি সত্যেন ভাতি চন্দ্রমা" ইত্যাদি। অতঃপর প্রশ্ন এবং প্রতি প্রশ্ন (Examination and cross examination) দ্বারা তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইত।

কূট-সাক্ষীর (Perjury) দণ্ড ছিল গুরুতর। যে ব্যক্তি বিবাদের বৃত্তান্ত জানিয়াও সাক্ষ্য না দেয় (shirking evidence) সেও কূটসাক্ষীর ন্যায় দণ্ডনীয়। কোন সাক্ষী মিথ্যা কথা বলিতেছে কিনা লক্ষণ (demeanour) দৃষ্টি করিয়া নির্দ্ধারণ করিবার জন্য লক্ষণসমূহ বর্ণিত আছে। Impeaching the credit of witness (Evidence Act S. 155) প্রতি প্রশ্নে সাক্ষীকে বিশ্বাসের অযোগ্য ব্যক্তি প্রতীয়মান করিবার বিধান ছিল ; আবার এই উদ্দেশ্যে কোন সাক্ষীর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিলে তাহার দণ্ডের বিধানও ছিল।

(১০)

লেখ্য প্রমাণ অর্থাৎ documentary evidence. পূর্ব্বে বাচিক প্রমাণ সম্বন্ধে যে direct evidenceএর উল্লেখ করা হইয়াছে, লেখ্য প্রমাণ সম্বন্ধেও সেই বিধান। সাধারণতঃ দলীল Primary evidence দ্বারা প্রমাণ করা বিধেয় (Evidence Act S. 64) এবং বিশেষ বিশেষ অবস্থায় Secondary evidence দ্বারা প্রমাণ করিবারও ব্যবস্থা আছে (Evidence Act S. 65).

ব্যবহারশাস্ত্রে লেখ্য প্রমাণ সম্বন্ধে Secondary evidence বিধান এইরূপ—

দেশান্তরস্থে দুর্লেখ্যে নষ্টোন্মৃষ্টে হৃতে তথা।
ভিন্নে দগ্ধে অথবা ছিন্নে লেখ্যমন্যত্তু কারয়েৎ।

অর্থাৎ উপরোক্ত কোনও অবস্থা ঘটিলে মূল দলীলের পরিবর্ত্তে নকল প্রমাণে ব্যবহার্য্য।

লেখ্যে দেশান্তর ন্যস্তে জীর্ণে দুর্লিখিতে হৃতে।
সতস্তৎ কালকরণমসতো দ্রষ্টু দর্শনং॥

দলীলের অস্তিত্ব থাকিলে উপরোক্ত অবস্থায় তাহা উপস্থিত করিবার জন্য সময় দিতে হইবে অথবা অস্তিত্ব না থাকিলে বাচিক প্রমাণ দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইবে। Evidence Actএর কথিত ধারা দুইটির সহিত এই বিধান তুলনীয়।

সাধারণ ভাবে লেখ্য সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করিবার আছে—কিন্তু প্রমাণ প্রসঙ্গে ভুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পরে পৃথকভাবে তাহা উল্লিখিত হইবে।

(১১)

স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধে "ভুক্তি" ((Possession) অন্যতম প্রমাণ। ইংরাজি আইনে একটি সূত্র আছে "Possession follows title—এতদনুসারে স্থাবর সম্পত্তি যাহার দখলে থাকে, স্বত্ব সম্বন্ধেও তাহার অনুকূলে অনুমান (Presumption) করিয়া লওয়া হয়। এই প্রকার স্বত্ব ও দখল সম্বন্ধে ব্যবহার শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

আগমোঽপি বলং নৈব ভুক্তি স্তোকাদপি বিনা।
আগমোঽপ্যধিকোভোগাৎ বিনা পূর্ব্বক্রমাগতাৎ॥

কিন্তু বিষয়টির মধ্যে অনেক প্রকার জটিলতার উদ্ভব হইতে পারে। বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিবার স্থান ইহা নয়, তবে মোটামুটি এই প্রসঙ্গে Adverse possession, Prescription, Easement, Limitation, Wrongful possession, এই বাক্যগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাতে দেখা যাইবে যে এই সমস্ত বিষয় সংক্রান্ত Principles গুলি ব্যবহার শাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে।

দখল ও স্বত্ব বিষয়ক যত প্রকার প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে, নারদ, ব্যাস, হারিত ও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় সবই বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে। Prescriptive right এবং Easement সম্বন্ধে একটি শ্লোকে দেখা যায়—

দ্বারমার্গ ক্রিয়া ভোগে জলবাহাদিকে তথা।
ভুক্তিরেব হি গুর্ব্বী স্যান্নলেখ ন চ সাক্ষিণঃ॥

বর্ত্মস্বত্ব, জল নিকাশের পথ, আলোক ও বাতাস চলাচলের সুবিধা কোন বিষয়ই বাদ যায় নাই।

Continuous and uninterrupted possession for the statutary period to the knowledge of the adverse party—ইংরাজি আইন অনুসারে এই প্রকার দখল দ্বারা নিঃস্বত্ব ব্যক্তিরও স্থাবর সম্পত্তিতে বিরুদ্ধ দখল জনিত স্বত্ব (Title by adverse possession) জন্মিয়া থাকে—Statutary period অর্থে দ্বাদশ বৎসর। ব্যবহার শাস্ত্রে এই প্রকার স্বত্বের উল্লেখ আছে—দীর্ঘকালঃ, অব্যবিচ্ছেদঃ, অপরোজ্‌ঝিত এবং প্রত্যর্থসন্নিধানং—ভুক্তি দ্বারা জমিতে স্বত্ব উদ্ভব হইয়া থাকে। এ স্থলে statutary period "বিংশতি বার্ষিকী"। সাধারণতঃ—"আগমেন বিশুদ্ধেন (with good title) ভোগো যাতি প্রমাণতাং'—কিন্তু পশ্যতোঽব্রুবতোহানি ভূমের্বিংশতি বার্ষিকী।" ইহার পরে স্বত্ববিশিষ্ট ব্যক্তিরও দখল উদ্ধারের দাবী তামাদী হইয়া যাইবে।

বিস্তারিত আলোচনার স্থান নাই—কিন্তু মোটের উপর বলা যায়, স্বত্ব ও দখল সংক্রান্ত ইংরাজি আইনের মূলে যে Principles বর্ত্তমান—ব্যবহারশাস্ত্রের বিধানগুলিও তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত।

(১২)

উভয় পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করিবার পর বিচারকের মীমাংসা। বিচারক এবং সভ্যগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে—সভ্যগণ Jury স্থানীয়, বিচারক তাহাদিগকে "charge" দিয়া তাহাদিগের "verdict" গ্রহণ করিবেন এবং বিরোধের মীমাংসা করিবেন। স্মৃতিশাস্ত্রানুসারে বিচার হইবে বটে, কিন্তু ন্যায় (Equity) এবং ব্যবহার (custom and customary Law) এবং পূর্ব্ব ব্যবহারে কৃত অনুরূপ বিষয়ের নির্ণয়ের প্রতিও বিচারক লক্ষ্য রাখিবেন। "কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো হি নির্ণয়ঃ।"

ইংরাজিতে Judgment এবং Decree দুইটি পৃথক জিনিস, ধর্ম্মশাস্ত্রে এই Judgment ও decreeর নাম "জয় পত্র"।

Civil Procedure Code (order 20 rule 6 Contents of decree) অনুসারে ডিক্রিতে থাকিবে—মোকদ্দমার নম্বর, উভয় পক্ষের নাম ও বিবরণ, দাবীর বিবরণ, আদালতের নির্দ্দেশ, খরচার পরিমাণ—কাহার দেয় অথবা কি সম্পত্তি হইতে আদায় হইবে, নিষ্পত্তির তারিখ। এই Contents of decreeর সহিত জয়পত্রের লক্ষণ তুলনীয়।

বৃহস্পতি জয়পত্রের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

যদ্‌বৃত্তং ব্যবহারেষু পূর্ব্বপক্ষোত্তরাদিকং।
ক্রিয়াবধারণোপেতং জয়পত্রেঽখিলং লিখেৎ॥
পূর্ব্বেণোক্তক্রিয়াযুক্তং নির্ণয়ান্তে যদা নৃপঃ।
প্রদদ্যাজ্জয়িনে পত্রং জয়পত্রং তদুচ্যতে॥

কাত্যায়ন বলিয়াছেন—

অর্থি প্রত্যর্থি বাক্যানি প্রতিসাক্ষীবচস্তথা।
নির্ণয়স্ত তথা তস্য যথা চারধৃতং স্বয়ং॥
এতদ্যথাক্ষরং লেখ্যং যথাপূর্ব্বং নিবেশয়েৎ।
সভাসদশ্চ যে তত্র ধর্ম্মশাস্ত্রবিদস্তথা॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে ইংরাজি Judgement ও Decree অপেক্ষা এই জয়পত্র অধিকতর বিশদ এবং বিস্তারিত।

(১৩)

ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে ব্যবহার কাণ্ড মোটামুটি বর্ণিত হইল। এখন আনুসঙ্গিক দুই একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা প্রয়োজন।

একালে মোকদ্দমার প্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান সমস্যা কোর্ট ফি। কোর্ট ফি সংগ্রহ করিয়া মোকদ্দমা করিবার সামর্থ্য যাহার নাই মাথা পাতিয়া প্রবলের অত্যাচার সহ্য করা ভিন্ন তাহার গত্যন্তর নাই। সেকালে কিন্তু এই কোর্টফির বালাই ছিল না। আবার মোকদ্দমায় জিত হইলে ডিক্রিজারির বিভ্রাটও ছিল না। অবশ্য বিনা খরচায় মোকদ্দমা করা চলিত অথবা বিচার বিভাগে রাজার "রেভিনিউ" ছিল না এমন নয়। মোকদ্দমার সূচনায় রাজার রেভিনিউ এবং জয়ীপক্ষের প্রাপ্য অর্থের জন্য উভয় পক্ষের নিকট উপযুক্ত জামিন গ্রহণ করা হইত। ধর্ম্মশাস্ত্রে এই জামীন সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থা যাহা আছে সেগুলি অতি সুচিন্তিত, সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচায়ক এবং গবেষণাপূর্ণ। তাহার বিস্তারিত উল্লেখ স্থান ও সময় সাপেক্ষ।

False and vexatious suits সম্বন্ধে ব্যবহারশাস্ত্রের বিধান—

নিহ্নবে ভাবিতো দদ্যাদ্দনং রাজ্ঞে চ তৎসমম্।
মিথ্যাভিযোগী দ্বিগুণমভিযোগাদ্ধনং বহেৎ॥

বিবাদী যদি বাদীর দাবী মিথ্যা বলিয়া উত্তরদায়ক হয়, সে ক্ষেত্রে বাদীর দাবী সত্য প্রমাণিত হইলে তাহাকে দাবীকৃত অর্থ দিয়া সমপরিমাণ অর্থ রাজকোষে দণ্ডস্বরূপ দিতে হইবে। পক্ষান্তরে বাদীর অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইলে তাহাকেও দণ্ডস্বরূপ রাজকোষে দাবীর দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ দিতে হইত।

ফৌজদারী আইনে Suit for malicious prosecution ভিন্ন বর্ত্তমানে মিথ্যা মোকদ্দমার জন্য কোন দণ্ডের ব্যবস্থা নাই। ব্যবহারশাস্ত্রে এ সম্বন্ধে যে বিধান ছিল তাহাতে মিথ্যা মোকদ্দমার সংখ্যা সেকালে অন্ততঃ এ কাল অপেক্ষা কম হইত এরূপ অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে না।

(১৪)

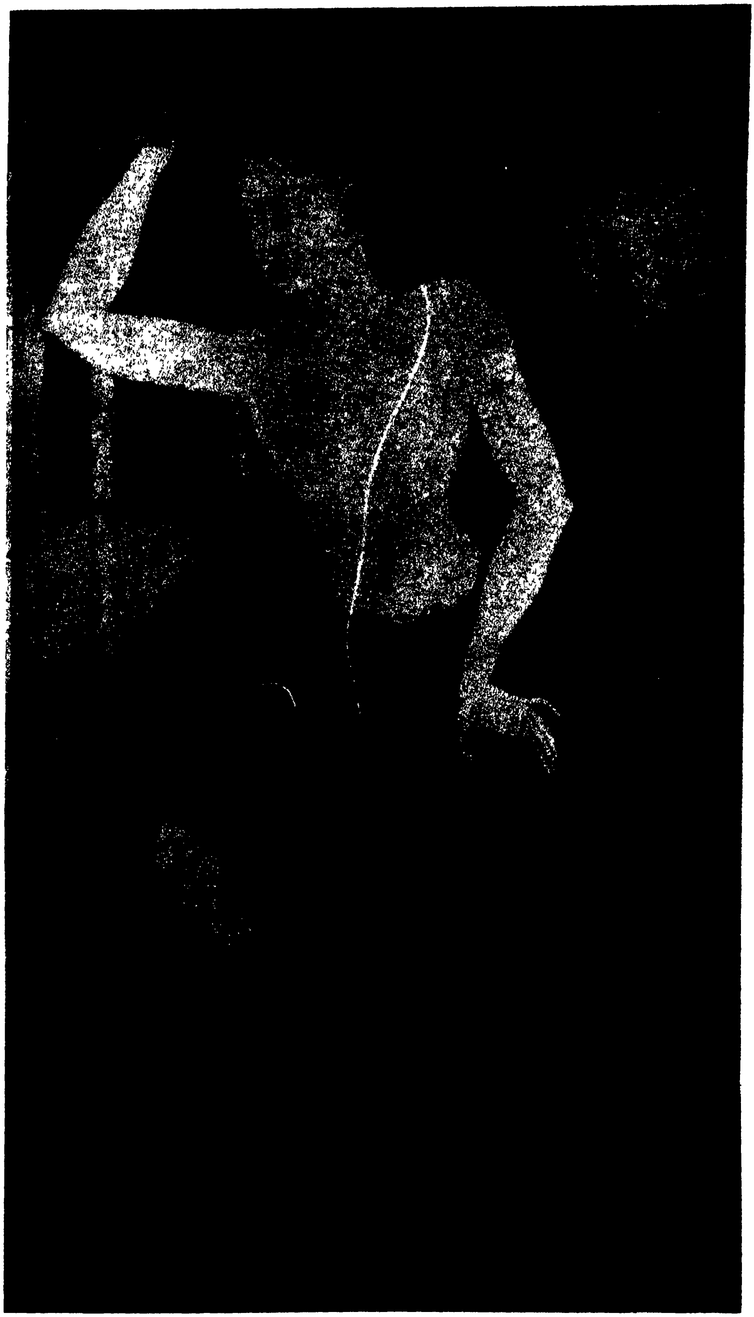
পূর্ব্বে প্রমাণসংশ্রবে "লেখ্য" কথাটির উল্লেখ করা হইয়াছে। যে উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধের অবতারণা তাহাতে লেখ্য সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা না বলিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

বশিষ্ঠ লেখ্যকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—"লৌকিকং রাজকীয়ং চ লেখ্যং (Private and Public documents). লৌকিক লেখ্য সাত প্রকার, যথা—ভাগ (Partition), দান, ক্রয়, আধি (Pledge and mortgage), সংবিৎ (agreement), দাসপত্র (slavery bond) এবং ঋণ-লেখ্য। রাজলেখ্য চারি প্রকার—শাসন (mandate), জয়পত্র (decree in a suit), আজ্ঞাপত্র (Edict) এবং প্রজ্ঞাপন পত্র (conveying a request). ইহা ধাতু অথবা প্রস্তর-ফলক এবং বস্ত্রখণ্ডের উপর লিখিত হইত।

লৌকিক লেখ্য তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে—"রাজসাক্ষিকং সসাক্ষিকমসাক্ষিকঞ্চ।" রাজসাক্ষিক অর্থে—"রাজাধিকরণে তন্নিযুক্ত কায়স্থ কৃত্যং তদধ্যক্ষকর চিহ্নিতং (written by a public deed-writer and bearing the seal affixed by the officer appointed for that purpose). দেখা যাইতেছে দলীল রেজিষ্টি করিবার প্রথাটি সেকালেও ছিল—এই কর্ম্মচারীটি ছিলেন—Registrar.

সসাক্ষিক এবং অসাক্ষিক লেখ্য যথাক্রমে attested and unattested documents (unregistered)। দাতার স্বহস্ত লিখিত হইলে লেখ্য attested না হইলেও চলিত।

লেখ্য সম্পাদন, নিরক্ষর ব্যক্তি পক্ষে অপরের দ্বারা "বকলম" দস্তখত, তৃতীয় ব্যক্তি লেখক, সাক্ষীর কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পক্ষগণের স্বার্থ-



[illegible]

[illegible] Bharatvarsha Halftone & Ptg. Wo

সংরক্ষণ এবং ব্যবহারের জটিলতায় যত প্রকার প্রশ্ন লেখ্য সম্বন্ধে উঠিতে পারে, সকল বিষয়েই উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে—সূক্ষ্মদৃষ্টির অভাব কোথাও নাই।

এই প্রসঙ্গে Indian Contract Actএর উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই আইন অনুসারে যে কোন ব্যক্তি "who is of the age of majority…and who is of sound mind and not disqualified" তাহার Contract করিবার অধিকার আছে (১১ ধারা)। কি কি কারণে Contract void অথবা voidable হইতে পারে তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। এই বিধানগুলির মর্ম্ম সেকালের ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিত বিধানের অনুরূপ; মূল সূত্রগুলি সমস্তই ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থায় আলোচিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে, লেখ্য (স্বহস্ত লিখিত হইলেও) তদ্বলাৎকারিতমপ্রমাণম্ (coercion) উপাধিকৃতশ্চ (fraud) দূষিত কর্ম্মদুষ্ট সাক্ষ্যাঙ্কিতম্—তৎ সসাক্ষিকমপি। তাদৃগ্বিধিনা লিখিতঞ্চ। স্ত্রীবালাস্বতন্ত্র মত্তোন্মত্তভীততাড়িতকৃতঞ্চ। দেশাচারবিরুদ্ধ (opposed to public policy) ইত্যাদি।

ঋণের টাকা আদায় করিয়া দলীলের পৃষ্ঠে ওয়াশীল লিখিয়া দেওয়া এবং পরিশোধিত দলীলের শিরোভাগ ছিন্ন করিয়া নষ্ট করা—এই দুইটি প্রথা সেকালেও ছিল। "লেখ্যস্য পৃষ্ঠে অভিলিখেদ্দত্বা দত্তর্ণকোধনম্।" এবং "দত্তর্ণপাটয়েল্লেখ্যং শুদ্ধৈবন্যত্তু কারয়েৎ।" সসাক্ষিক দলীল সাক্ষীর সম্মুখে অধমর্ণকে ফেরত দিবার বিধান ছিল।

সন্দেহযুক্ত দলীলের হস্তাক্ষর পরীক্ষা (Comparison of disputed handwriting) করিবারও বিধান ছিল।

লেখ্য বিষয়ক না হইলেও Contract প্রসঙ্গে প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধে একটু উল্লেখ করিব। বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখা যায়, নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে ভৃত্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গেলে তাহার বেতন বাজেয়াপ্ত হইত এবং রাজদ্বারে ১০০ পণ পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিত। পক্ষান্তরে ভৃত্যকে ঐ প্রকার কার্য্যকাল পূর্ণ হইবার অগ্রে কর্ম্মচ্যুত করিলে প্রভু তাহার সম্পূর্ণ বেতন এবং ঐ প্রকার অর্থদণ্ড দিতে বাধ্য ছিলেন।

আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য। কেবল অর্থদণ্ড এবং রাজভাগ গ্রহণ করিয়াই রাজার কর্ত্তব্যপূর্ণ হইত না। প্রজার গৃহে চুরি হইলে তাহার ক্ষতিপূরণ জন্য রাজা দায়ী ছিলেন—নতুবা চোরের পাপের ভাগও তাহাকে গ্রহণ করিতে হইত। যথা—

দেয়ং চৌরহৃতং দ্রব্যং রাজ্ঞা জনপদায় তু।
অদদদ্ধি সমাপ্নোতি কিল্বিষং যস্য তস্য তৎ॥

Sick leave on full pay, invalid or superannuation pension পূর্ণমাত্রায় যাবজ্জীবন বৃত্তিরও বিধান ছিল—

আর্ত্তস্তু কুর্য্যাৎ স্বস্তঃসন্ যথা ভাষিত মাদিতঃ।
স দীর্ঘস্যাপিকালস্য তল্লভেতৈব বেতনম্॥—(মনুঃ)

(১৫)

আইনশাস্ত্র পরিবর্ত্তনশীল—দেশ কাল ও অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য ইহার সংস্কার (amendment) অপরিহার্য্য। লোকের কর্ম্মক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তৃতিলাভ করিতেছে, চক্ষু ফুটিতেছে, তাহার উপর কূটপন্থা গ্রহণ করিয়া সূক্ষ্ম তর্কজাল সৃষ্টি করিয়া আইনের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিবার লোকেরও অভাব নাই; সুতরাং ক্রমশঃ অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সহিত আইনশাস্ত্রের ক্রম পরিবর্দ্ধন হইতেছে। কিন্তু আইনের মূলসূত্র যে সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত তাহা সর্ব্বকালে সর্ব্বসমাজে এক। এই সত্যের সন্ধান যে জাতি যত পরিস্ফুটরূপে পাইয়াছে তাহার আইনশাস্ত্র তত উন্নত, তত শৃঙ্খলাবদ্ধ।

আমাদের দেশে সাধারণ বিশ্বাস আছে যে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র কেবল প্রায়শ্চিত্ত, তুষানল, অঙ্গচ্ছেদ, দান, ব্রত, উপবাসের বিধানে পূর্ণ। Civil Law বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহা প্রায় অজ্ঞাত ছিল। আদালত হইতে আরম্ভ করিয়া আরজি, জবাব, সওয়াল, হাকিম, উকিল, মুহুরি, আমলা, দলীল-দস্তাবেজ, ফয়সালা পর্য্যন্ত সকলই মুসলমান আমলের আমদানি—এই শব্দগুলিই এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের জন্য দায়ী। হিন্দুর Civil Law আজিকার দিনে আমরা যে পরিণত অবস্থায় দেখিতেছি এই অবস্থা লাভ করিতে কত সময় লাগিয়াছিল, অথবা কত শত যুগ পূর্ব্বে এই পরিণতি লাভ হইয়াছিল, নিশ্চিতরূপে তাহার কাল নির্ণয় হয় নাই, হইবে কি না তাহাও জানি না। Civil Law হিসাবে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রের আদর নাই। কিন্তু আজিকার দিনে অবজ্ঞাত হইলেও হিন্দুর ব্যবহারশাস্ত্র পৃথিবীর কোন জাতির Civil Law অপেক্ষা হীন ছিল না এবং সেই জন্যই ইহার প্রাচীনত্ব অধিকতর গৌরবের কারণ। আমরা আইন শিখিবার জন্য Roman Law পড়িয়া থাকি—ঘরের পানে তাকাইয়া দেখিবার অবসর আমাদিগের নাই।

এ সম্বন্ধে চর্চ্চা করিবার বহু বিষয় আছে—তাহা স্থান ও সময় সাপেক্ষ—এ প্রবন্ধে সংক্ষেপে আভাস দিবার চেষ্টা করিলাম মাত্র। (সমাপ্ত)

হংস-বলাকা

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

৮

হংসবলাকার একটি যাত্রী আজ পর্য্যন্ত চলতে চলতে কত দূরে এসে পৌঁছল? মাঝে মাঝে সুমুখ পানে কতক দূর এগিয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে যাত্রা হয়েছে থামাতে—আবার কখনও পিছিয়েই আসতে হয়েছে। গতি ও সর্ব্বত্র এক নয়। কখনও দ্রুত, কখনও মন্থর, কখনও বা শৃঙ্খলিত। জীবনের যাত্রা-পথ কোথাও মসৃণ, কোথাও বন্ধুর, কোথাও ঋজু, কোথাও বক্র। সুকুমার তার এই ছাব্বিশ বৎসরের জীবনকালে কত দূর এল?

অলস মধ্যাহ্নে সুকুমারের মুদ্রিত চোখের দৃষ্টি দূর অতীতে পিছিয়ে চলে।

যে বিশেষ গ্রহনক্ষত্রের সমাবেশে সে জন্ম নিয়েছিল সেই বিশেষ মুহূর্ত্তে আরও কত কোটি কোটি শিশুর জন্ম হয়েছে কে জানে। জ্যোতিষ যদি সত্য হয় তা'হ'লে তারা সবাই কি এই মুহূর্ত্তে তারই মত অসহায় অবস্থায় পাখা ঝাপ্‌টাচ্ছে? সে তা হ'লে একা নয়? আরও যে কোটি কোটি ছেলে ভগবানের দেওয়া অন্ধকারে পথ হারিয়েছে সে তাদেরই একজন—কোটিতম। অকারণে সুকুমার উল্লসিত হয়ে উঠল। মনে মনে বললে—ভগবান, জ্যোতিষ যদি সত্য হয়! জ্যোতিষ যেন সত্য হয়! সংসারে দুঃখ পাওয়ার দুঃখ অনেক, কিন্তু একা দুঃখ পাওয়ার দুঃখ আরও বেশী। সে একেবারে মানুষের পৌরুষে গিয়ে আঘাত দেয়।

শৈশবে তার সঙ্গে যারা যাত্রা করেছিল, আজকে তারা কত দূরে! যাদের সঙ্গ একদা সে অচ্ছেদ্য ভেবেছিল আজ আর তাদের কথা মনেও পড়ে না। এখন তারা কেউ মাঠে কাটছে সোণার বরণ ধান, কেউ আগুনের মত টকটকে লাল লোহাকে পিটিয়ে বানাচ্ছে লাঙলের ফাল। কেউ সোণার পাতে তুলছে নানা রকমের ফুল লতা-পাতা, মাকুর একটানা শব্দের মধ্যে আপন মনে কেউ বুনে চলেছে বিচিত্র বর্ণের গামছা। কেউ কর্ম্মহীন শীতের দ্বিপ্রহরে মুক্ত প্রাঙ্গণে রোদে ব'সে খেলছে তাস-পাশা-দাবা, আবার কেউ বা চারতলা বাড়ীর একটা প্রায়ান্ধকার কক্ষে ব'সে ডেবিট ক্রেডিট মিল ক'রছে, নয় তো ল্যাট্রিনের পাশে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে বিড়ি ফুঁকছে। তার ছেলেবেলার সঙ্গীরা কেউ কামার, কেউ কুমোর, কেউ তাঁতী, কেউ বা কেরাণী। এককালে এদের সঙ্গ তার অচ্ছেদ্য মনে হ'ত। ঘুরতে ঘুরতে আজ সে তাদের কাছ থেকে কত দূরেই না স'রে এসেছে। তার পরেও কত বিচিত্র আবহাওয়ায় কত বন্ধুর দল এসেছে গেছে, আবার নতুন বন্ধু এসে তাদের স্থান পূর্ণ ক'রেছে। শুধু কি তারাই? তার জন্মভূমিও যেন আর তাকে তেমন ক'রে টানতে পারে না। জলভরা পুকুরের উঁচু উঁচু পাড়, বাঁশের বন, কোমল গ্রামপথ, সমস্ত থেকে কেমন ক'রে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে। সেখানে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করা মিছে। সুমুখে তাকে চলতেই হবে।

কিন্তু কোথায়? একটা মাস তার মাষ্টারী নেই। এই একটা মাস সে কি ক'রেছে, আর কি যে করে নি—তার ঠিক নেই। এর মধ্যে সে যায় নি এমন স্থান নেই, ধরে নি এমন লোক নেই। ভেবেছিল এই সময়টা সে ক্রমাগত লিখবে, অনেক কিছু লিখবে। কিন্তু একটা লাইনও লিখতে পারে নি। এই অস্থির মন নিয়ে লেখা অসম্ভব। পড়েও নি। আগে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে যাওয়ার সময় পেত না ব'লে কত দুঃখই না ক'রেছে। এখন সময় অঢেল। কিন্তু যাওয়া আর ঘটে ওঠে না। যাওয়ার ইচ্ছাই হয় না। লাইব্রেরীর টিকিটখানাই খুঁজে পাচ্ছে না। বোধ হয় হারিয়েই গেছে।

এখন সে শুধু ভাবে। খাওয়া-দাওয়ার পরে জনহীন মেসের একটি নির্জ্জন কক্ষে ব'সে কেবল ভাবে। কি যে ভাবে তার মাথা-মুণ্ড নেই। হয় তো ভাবে—সে যেন একজন মস্ত বড় গ্রন্থকার হয়েছে। মাসে মাসে তার বইয়ের সংস্করণ হচ্ছে। মোটা মোটা অঙ্কের আসছে চেক। তার থেকে

বালীগঞ্জে উঠছে বাড়ী, আর হচ্ছে প্রকাণ্ড বড় গাড়ী। সেই গাড়ীখানা নিয়ে একদিন সে চন্দ্রভূষণের নাকের নীচে দিয়ে হাঁকিয়ে যেতে পারে তো মনের ঝাল মেটে। এই লোকটির উপর সে বেজায় চ'টে গেছে। মেসের তাগাদায় অস্থির হয়ে ক'দিন আগে ছুটি টাকা ধার করবার জন্য চন্দ্রভূষণের কাছে গিয়েছিল। চন্দ্রভূষণ টাকা না দিয়ে দিল বিস্তর উপদেশ। প্রথমে মাষ্টারী ছেড়ে দেওয়ার জন্য খুব এক চোট তিরস্কার করল এবং ভবিষ্যতে এমন দুষ্কার্য্য আর কখনও না করবার জন্য সতর্ক ক'রে দিল। উপসংহারে তার নিজের আসন্ন তিন শত টাকা ব্যয়ের ফর্দ্দ দিয়ে এমন কাঁদুনি আরম্ভ করল যে সুকুমার একেবারে অথই জলে হাবুডুবু খেতে লাগল। অবশেষে বহু কষ্টে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। ওঠবার সময় চন্দ্রভূষণ তাকে সান্ত্বনার সুরে বলেছিল—ভাই রে, মোটা টাকা মাইনে পাই ব'লে যদি ভেবে থাক আমার কাছে সব সময় টাকা থাকে সে ভুল। সবাই সমান। তুমি দু'টাকার ভাবনায় ব্যস্ত, আমার ভাবনা তিনশো টাকার।

এই ক্রোধ সুকুমার কিছুতে ভুলতে পারে না। যখনই মনে পড়ে বিছার যন্ত্রণার মত তার বুক জ্ব'লে জ্ব'লে ওঠে। অথচ একটা কথা ভাবে না, চন্দ্রভূষণ যখন তাকে এই সব উপদেশামৃত বর্ষণ করছিল তখন তার এই তেজ ছিল কোথায়? তখন তো সে মুখ বুজেই সমস্ত সহ্য ক'রেছিল—একটা কথাও বলে নি। আসলে নিজের কাছেই সে সব চেয়ে আগে ছোট হয়ে গেছে। সেইটেই তার নিজের চোখে পড়ে না। অথচ শুধু এই জন্যই লোকে যখন তার মাথায় চোখা চোখা উপদেশ ঘা দিয়ে দিয়ে বসিয়ে দেয়, সে একটা কথাও বলতে পারে না। ফলে প্রকারান্তরে তাদের উপদেশ দেবার অধিকারকেই স্বীকার ক'রে আসে। এসে বাড়ীতে ব'সে নিষ্ফল আক্রোশে ফুলতে থাকে। অবশ্য আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী যাওয়া সে ছেড়েছে। কিন্তু পথে অকস্মাৎ দেখা হয়ে গেলে আর উপায় কি?

শুধু আত্মীয়-স্বজন নয়, বাড়ীতেও এই একটা মাসের মধ্যে সে একখানাও চিঠি দেয় নি। তার বাবার অবশ্য চিঠিপত্র দেওয়ার অভ্যাস কম। বিশেষ এই খামখেয়ালী ছেলের কাছে উত্তরের আশা কম ব'লেই আরও চিঠি দেন না। কিন্তু মণিমালার কাছ থেকে পর পর তিনখানা চিঠি এসেছে। তার চিঠি না পেয়ে বাড়ীর সকলে যে কি দুশ্চিন্তায় কাল কাটাচ্ছে সে সংবাদ তো আছেই, তার উপরে পরবর্ত্তী শনিবারে অন্তত একটি দিনের জন্যও বাড়ী যাওয়ার বার বার মাথার দিব্য দেওয়া আছে। কিন্তু সুকুমার যায় কি ক'রে? রেল কোম্পানী বিনা ভাড়াতেও যাতায়াত করতে দেবে না, ধারেও দেবে না। আর যদি বা রেলভাড়া কোন রকমে যোগাড় হয়, এই মন নিয়ে প্রিয়জনের কাছে যাওয়া যায়? তিনখানা চিঠিই সে একবার ক'রে চোখ বুলিয়ে বিছানার নীচে রেখে দিয়েছে। বিছানায় শুলেই সেগুলি তার বুকে কাঁটার মত বেঁধে এবং সে মণিমালার উপর চ'টে ওঠে।

মাঝে মাঝে তার মনে একটা আশ্চর্য্য অনুভূতি জাগে। কিছুই যেন তার বিশ্বাস হয় না। বড় রাস্তা থেকে দূরে একটা সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর তার মেস। নগরের কর্ম্ম-কোলাহল এতদূর পৌঁছায় না। এই নিস্তব্ধ পরিবেশের মধ্যে হয় তো ছুটি তিনটি কাক কলতলায় এঁটো বাসনের চারদিকে কলরব তুলেছে। জানালার বাইরে এক ফালি ধোঁয়াটে আকাশ যেন চিররোগীর অর্থহীন চাহনি। অত্যন্ত দুর্ব্বল পাণ্ডুর রোদের একটি শীর্ণ রেখা জানালা দিয়ে ঘরের মেঝেয় এসে পড়েছে। শীতের দ্বিপ্রহরের এই চিরপরিচিত রূপ। কিন্তু সুকুমারের কেমন আশ্চর্য্য মনে হয়। যেন বিশ্বাস হয় না। এই দুপুর—তার মধ্যে সে শুয়ে আছে একা—হাতে কোন কাজ নেই—এ যেন তার বিশ্বাস হয় না। এমন কর্ম্মহীন, নিঃসঙ্গ, অলস দিনযাপনে সে এখনও অভ্যস্ত হয় নি। এই সেদিনও তার স্কুল ছিল, সমস্ত দুপুর খাটুনির আর অন্ত ছিল না। অকস্মাৎ এল ছেদ—যেমন অকস্মাৎ মধ্য আফ্রিকায় আসে রাত্রি। এই অবিশ্বাস্য আকস্মিকতার অস্থিরতায় সে ছটফট করতে থাকে। বহুদিনের আগে পড়া সেই ইংরাজি কবিতার ক'টি লাইন মনে পড়ে:

'Man's happiest lot is not to be;
 And when we tread life's thorny steep,
Most blest are they who earliest free
 Descend to death's eternal sleep.'

সুকুমার শুয়ে শুয়ে এই পরম লোভনীয় মৃত্যুর কথা ভাবতে লাগল। তার মনে হ'ল এই পাণ্ডুর রবিকর,

নিঃশব্দ প্রাণ-স্পন্দহীন দ্বিপ্রহর, শীতল নিঃসঙ্গতা, এ কখনই জীবলোকের নয়। মেসের ছোট ঘর তার চোখে পরম রহস্যময় হয়ে উঠল। একটি অপূর্ব্ব আনন্দময় দুঃখে অন্তর প্লাবিত হয়ে গেল। মনের খোপে খোপে জমল রস।

ওর মনে এখনও প্রচুর ভাববিলাসিতা রয়েছে। যে কবি জীবনের সাফল্যে হতাশ হয়ে মৃত্যুকেই মানুষের পরমতম সৌভাগ্য ব'লে স্থির ক'রেছিলেন তার সঙ্গে সুকুমারের যথেষ্ট অনৈক্য। জীবন সংগ্রামে এখনও তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয় নি, স্বপ্ন রচনাতেও ক্লান্তি আসে নি। তার দুঃখ যতখানি সত্য, আরও ঠিক ততখানি কাল্পনিক। যতখানি সত্য, তা যেন তার বুকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। যন্ত্রণায় সে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যায়। সেই সঙ্গে কাল্পনিক দুঃখ তাকে রঙিন ফানুসের মত অনন্ত আকাশে উড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

সুকুমার শুয়ে শুয়ে ভাবছিল, death's eternal sleepএর কথা। এমন সময় মেসের চাকর তাকে একটা চিরকুট দিয়ে গেল। পড়া মাত্র তার মৃত্যুর চিরনিদ্রার স্বপ্নজাল ছিঁড়ে খান খান হয়ে গেল।

একটি চিরকুটে ভুল ইংরিজিতে কয়েক ছত্র লেখা। মেসের ম্যানেজার আফিস যাওয়ার সময় রেখে গেছে। এ মাসে জগদীশ ম্যানেজার। ওই দুটি ছত্রে সে সুকুমারকে আজ, নিদেন পক্ষে কাল রাত্রির মধ্যে অগ্রিম টাকার জন্ম অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে অবহিত ক'রে গেছে। সেই সঙ্গে অদ্যকার তারিখটা যে আঠারোই সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

সুকুমারের মাথার ভিতরে যেন খানিকটা তরল আগুন শন শন ক'রে বয়ে গেল। জগদীশ একটা কেও কেটা ব্যক্তি নয়। সে তাকে স্বচ্ছন্দে মুখে-মুখেই চাইতে পারত। কোন দিন যে চায় নি তাও নয়। তাকে বলাও হয়েছে যে স্কুলের বাকি মাইনেটা সে কাল নয় পরশু পাবে। তৎসত্ত্বেও তাকে কাল দেবার জন্ম তাগাদা করা এবং তাও মুখে নয় লিখে—এ যেন তাকে অনাবশ্যক অপমান করার উদ্দেশ্যেই ব'লে ধ'রে নিল।

অবশ্য দশ তারিখের মধ্যেই মেসে অন্তত পাঁচ টাকা অগ্রিম দেওয়াই নিয়ম। ক্বচিৎ কখনও ব্যতিক্রম হ'লেও সাধ্যমত সে এই নিয়ম এতকাল পালন ক'রেই এসেছে। ক্বচিৎ কখনও ব্যতিক্রম হ'লেও তখন কেউ কোন কথা বলেনি। কথা উঠল এই প্রথম। তার অসাক্ষাতে এ নিয়ে মাঝে মাঝে ঘোঁট চলে এ সন্দেহ করারও সম্প্রতি যথেষ্ট কারণ ঘটেছে। কেন? তারা কি মনে ক'রেছে সুকুমার টাকা না দিয়েই পালিয়ে যাবে? সুকুমার কি এতই অপদার্থ যে তার মেস খরচের টাকাটাও রোজগার করতে পারবে না? তার ট্যুইশান দুটো তো এখনও যায় নি!

এই পাঁচটা টাকা সে এতদিন ফেলেও দিত। কিন্তু বাড়ীতে সে এখনও তার চাকরী ছাড়ার কথা জানাতে চায় না। এ খবর শোনা মাত্র সংসারে নানা অবশ্যম্ভাবী বিশৃঙ্খলা এসে যাবে। এই ভেবে সে যে তারিখে যে পরিমাণ টাকা এতদিন ধ'রে বাড়ীতে মণি-অর্ডার ক'রে এসেছে, এবারও তাই পাঠাল। তাই মেসের অগ্রিম টাকা আর দিতে পারে নি। ভেবেছিল স্কুলের টাকাটা, অন্তত কিছুও, অবিলম্বে পেয়ে যাবে। সেক্রেটারীও সেই রকমই কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু বড়লোকের কথা ঠিক না রাখলেও চলে, চলে না গরীবের। সুকুমারও তাঁদের কথার উপর ভরসা ক'রে মেসে দু'বার কথার খেলাপ ক'রেছে। খুব সম্ভবত সেই জন্মই এই পত্রাঘাত। মেসের বাবুরা তথা স্বয়ং ম্যানেজারও বিশ্বাস করে নি যে সে সত্যই পরশু টাকা দিতে পারবে। সুকুমার নিজেও সে বিষয়ে সুনিশ্চিত নয়। তার নিজেরও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবু অপরের সন্দেহ কিছুতে সহ্য করতে পারলে না। মনে হ'ল ওদের পক্ষে এটা নিতান্তই অনধিকার-চর্চ্চা। সে ভীষণ চ'টে গেল। স্থির করলে, কাল কারও কাছে ধার ক'রেও এই টাকাটা ম্যানেজারের নাকের উপর ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কিন্তু ধার? কার কাছে? কে দেবে? চন্দ্রভূষণের কাছে নয় নিশ্চয়ই। সুকুমার তার অন্য বন্ধুদের নাম স্মরণ করতে লাগল।

চাকরটা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। সুকুমার তাকে হাত-ইসারায় চ'লে যেতে বললে।

চাকরটা বললে, জবাব?

—জবাব আবার কি?

—ম্যানেজারবাবু জবাব চেয়েছেন।

সুকুমার উষ্মার সঙ্গে বললে, সে যা দেবার আমি দ'ব। তুই যা।

চাকরটা আর কিছু বলতে সাহস করলে না। কিন্তু সুকুমারের মনে হ'ল ওর মুখে যেন একটা বিদ্রূপের হাসি দেখা গেল। সে উত্তেজিতভাবে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু ভেবে দেখলে এ নিয়ে চাকরের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করা শোভন নয়, ক'রে লাভও নেই। হয়তো ভুল দেখেছে। কিন্তু ভুল নয়। ক'দিন থেকেই দেখে আসছে তার সম্বন্ধে ঠাকুর-চাকরেরও আর যেন তেমন সমীহ ভাব নেই। না থাকাও বিচিত্র নয়। মেস-পলিটিক্স আলোচনার প্রকৃষ্ট স্থান হচ্ছে খাবার ঘর। ঠাকুর-চাকরের সামনে। তার সম্বন্ধেও সেখানে আলোচনা হয় এ সে টের পেয়েছে। তাই কি দিনে কি রাত্রে সে সকলের শেষে খেতে বসে। প্রায়ই একা, কখনও বা রায় মশাই থাকে। যে দিন রায় মশাই থাকে সে দিন গরম ভাতটা পায়। যে দিন থাকে না সে দিন দেখে, তার ভাত ঢাকা আছে। ফলে কড়কড়ে হয়ে গেছে। ঠাকুর-চাকরের খাওয়া শেষ। কিন্তু এই ব্যাপার এতই তুচ্ছ যে এ নিয়ে কোন কথা বলাই সে লজ্জাকর এবং অমর্য্যাদাজনক মনে করে। আজও সেই ভেবেই ফের শান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল। নিজের শোচনীয় অসহায়তায় হাসিও এল। আপন মনে হেসে ভাবলে, Man's happiest lot is not to be ? অ্যাঁ ?

সকালে উঠেই সুকুমার বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে যাওয়ার সময় পর্য্যন্ত স্থির করতে পারলে না কার কাছে প্রথমে যাবে। বন্ধুবান্ধব অনেকেই আছে। ইচ্ছা করলে পাঁচটা টাকাও অনেকেই ধার দিতে পারে। কিন্তু দেবে কি ? মাষ্টারীতে নিয়মিত মাইনে না পাওয়া গেলেও তার কল্যাণে ধারটা অনায়াসেই মিলত। যার হাতে টাকা থাকে, সে ধার শোধ না দিলেও যায় আসে না। যার নেই সে যথাসময়ে ধার শোধ না করলেই পাওনাদারের দুশ্চিন্তার অবধি থাকে না। তাকে ঘনিষ্ঠতম বন্ধুতেও ধার দিতে দ্বিধা করে। তার নিজেরও ধার চাইতে লজ্জায় মাথা কাটা যায়।

কিছুক্ষণ পথ চলার পরেও যখন সে মন স্থির করতে পারলে না, তখন সম্ভবত মন স্থির করবার জন্যই পাশের চায়ের দোকানে উঠে পড়ল। এক বাটি চায়ে মাথাও খানিকটা স্থির হবে, একটু চিন্তা করবার অবসরও পাবে। সুকুমার এক পেয়ালা চায়ের ফরমাস দিয়ে সুমুখের খবরের কাগজে চোখ বুলোতে লাগল।

'মুসোলিনীর সমরাভিযান, আবিসিনীয়া আক্রমণের উদ্যোগ' 'রেঙ্গুনে প্রবাসী বাঙালীদের সভা' 'পদ্মা নদীতে নৌকা ডুবি' 'রাষ্ট্রীয় পরিষদে নূতন বিল' 'সুনলিনী হরণের মামলা, সাত জন আসামী দায়রা সোপর্দ্দ' 'পরলোকে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র দত্ত', 'চলন্ত ট্রেণে ডাক লুঠ' 'মিঃ চার্চ্চিলের অনলোদ্গার' 'প্যালেষ্টাইনে আরববিদ্রোহ' 'পাটের দর' 'সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য, শীঘ্রই অস্ত্রোপচার হইবে' 'জওহরলালের ওজস্বিনী বক্তৃতা, সর্ব্বসাধারণের জন্য স্বরাজ চাই' 'চীনে আবার সমরানল, জাপানের চরম পত্র' 'মার্কিণ মহিলার একত্রে তিনটি সন্তান প্রসব, প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়াল' 'নাট্য নিকেতনে প্রতিজ্ঞা পালন, মহাসমারোহে ত্রিংশ রজনী' 'চিত্রায় প্রহ্লাদ-চরিত্র, অগ্রিম সিট রিজার্ভ হয়' 'জাপানে আবার ভূমিকম্প, তিন মিনিট ব্যাপী কম্পন' 'আইসল্যাণ্ডে প্রবল তুষারপাত, শিশুসন্তান সহ একটি রমণীর শোচনীয় মৃত্যু' 'পকেট কাটায় ছয় মাস' 'স্বামী কর্ত্তৃক পত্নী হত্যা, ব্যভিচারের সন্দেহ' 'সোনা রূপার দর চড়িল' 'খুলনায় ঝিনঝিনিয়া রোগের প্রকোপ' 'বাঁকুড়ায় অন্নকষ্ট' 'ক্যাশিয়ারের কীর্ত্তি, বত্রিশ হাজার টাকা উধাও'···

সুকুমার মনে মনে ভাবলে, এই আজকের পৃথিবীর রূপ। এর সঙ্গে যোগ ক'রে দেওয়া যেতে পারে 'পাঁচটি টাকার সন্ধানে সুকুমার রায়, হতাশভাবে চা-পান'। রবীন্দ্রনাথ যে পৃথিবী দেখে ভেবেছিলেন, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' সে সুন্দর ভুবন কোথায় ? এক চুমুক চা খেয়ে সুকুমার কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেখতে লাগল। বীমা কোম্পানীর এজেন্ট চাই, সেলাইএর কলের ক্যানভাসার চাই, খবরের কাগজ বিক্রির হকার চাই, শিক্ষয়িত্রী চাই, পরিশ্রমক্ষম যুবক চাই, টেলিগ্রাম শেখবার ছাত্র চাই, অমুক চাই, তমুক চাই···অবশেষে সুকুমারের চোখ এক জায়গায় আটকে গেল : এম-এ কিম্বা বি-এ পাশ একজন গৃহশিক্ষক চাই ! দু'টি শিশুশ্রেণীর ছাত্রকে সকালে দু'ঘণ্টা, সন্ধ্যায় দু'ঘণ্টা পড়াতে হবে—বেতন দশ টাকা। চমৎকার ! শিশু শ্রেণীর ছেলেকে পড়াবার

জন্যও এম-এ কিম্বা বি-এ পাশ লোক চাই! কারণ একটা ভদ্রলোককে দিয়ে দু'বেলা দুটো ছেলে পড়িয়ে নিয়ে দশ টাকার কম দেওয়া ভাল দেখায় না এবং দশ টাকাতেই একটা গ্রাজুয়েট যখন পাওয়া যাবে তখন অন্য লোক কেনই বা নেবে। সুকুমার মনে মনে হিসাব করলে সওয়া পাঁচ আনা রোজ অর্থাৎ একটা কুলী হাওড়া ষ্টেশন থেকে বড়বাজার পর্য্যন্ত একটা মোট আনতে যা নেয় তারও কম!

সুকুমার কাগজটা ঠেলে রেখে চা পান করতে বসল। হঠাৎ তার একটা জায়গায় নজর পড়ল। স্থানটা বোধ হয় তার গায়ের কাপড়ে আড়াল হয়ে ছিল। উদগ্রীব হয়ে দেখলে, কোন একটি কাগজের জন্য একজন সহকারী সম্পাদক চাই। বেতন যোগ্যতানুসারে। বক্স নং ৭৪৫এ আবেদন করতে হবে। উৎসাহ এবং উত্তেজনায় সুকুমার আর বসে থাকতে পারছিল না। এক চুমুকে চা শেষ ক'রে পয়সা দিয়ে বেরিয়ে এল। কিসের টাকা ধার! এইটে যদি লেগে যায়··

বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছে 'সুদর্শন' কাগজে। বাংলা দেশে সুদর্শন একটা বিখ্যাত জাতীয় দৈনিক পত্র। দেশহিত-ব্রতী কয়েকজন আত্মত্যাগী নেতা এর পরিচালক। স্বয়ং হরিসাধনবাবু সম্পাদক। বাংলা দেশে তাঁর লেখার কদর আছে। সৌভাগ্যক্রমে এঁর সঙ্গে সুকুমারের অল্পদিন হ'ল পরিচয় হয়েছে। ভদ্রলোককে তার খুব ভাল ব'লেই মনে হয়েছে। লেখা সম্বন্ধে ইনি কথাপ্রসঙ্গে তাকে যথেষ্ট উৎসাহ এবং উপদেশ দিয়েছেন। সুকুমার স্থির করলে, স্নানাহারের পরে একখানা দরখাস্ত লিখে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবে। সহকারী সম্পাদক যে কাগজের জন্যই দরকার হোক, তাঁর কাগজে যখন বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছে তখন একটা কোন সন্ধান পাওয়া যাবেই। তারপরে তাঁর সুপারিশেও অনেক কাজ হতে পারবে। সুকুমার জানে না, বিজ্ঞাপন বিভাগের সঙ্গে সম্পাদকীয় বিভাগের কোনই সম্বন্ধ নেই এবং বক্স নম্বরের গোপনীয়তা ফাঁস ক'রে দেওয়া নিয়ম বিরুদ্ধ।

আশায়, আনন্দে, উৎসাহে এবং উদ্দীপনায় সুকুমারের বুকের ভিতরটা আথাল-পাথাল করছিল। এও কি তার জীবনে সত্য হতে পারে? খবরের কাগজে সম্পাদক-গিরি? এত ভাগ্য কি সে ক'রেছে? কথায় বলে, বিশ্বগুরু। সেই বিশ্বগুরুর বন্দ্যনীয় আসনে বসবে সে? সুকুমার? এত বড় সম্ভাবনা যেন সে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

খবরের কাগজের আফিস সে মাত্র চোখেই দেখেছে। নীচে ছাপাখানায় রোটারি মেশিনের সমুদ্র গর্জ্জনবৎ গুরু গুরু আওয়াজ, উপরে কলিং বেলের ঠুং ঠুং, টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং, চাকর-বেয়ারা-বাবুদের কর্ম্মব্যস্ততা—এই সবই তাকে অভিভূত ক'রেছে। সকালে চায়ের পেয়ালা সুমুখে নিয়ে যে কাগজখানি পড়া যায় তার পিছনে কত প্রতিভাবান লোকের মস্তিষ্ক পরিচালনা, কত লোকের দেহের শ্রম আছে এই ভেবে সে বিস্মিত হয়েছে। অতঃপর সেই আফিসের প্রত্যেকটি ঘরের এবং প্রত্যেকটি খুঁটি-নাটি কাজের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবে ভেবে সে আনন্দে অধীর হয়ে উঠল।

তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে সে উপরে এসে দরখাস্ত-খানা বেশ বিনিয়ে বিনিয়ে লিখতে বসল। নির্জ্জন ঘর। রায় মশাই আফিস গেছেন। চোস্ত ক'রে একখানা দরখাস্ত লেখার সময় এবং সুযোগ দুইই হাতের কাছে এসেছে। কিন্তু কি লিখবে সে? এ কথা সত্য যে ভাল লেখাই যেখানে সবচেয়ে আবশ্যকীয় গুণ সেখানে এই দরখাস্তখানার উপরেই তার ভাগ্য নির্ভর করছে। কিন্তু নানা ভাবের আবেগে তার এমন হয়েছে যে কিছুতেই একটা বিশেষ ভাবকে বাগিয়ে লেখনীগত করতে পারছিল না। অবশেষে দু'খানা খসড়া ছেঁড়ার পর তৃতীয়খানা তার মন্দ লাগল না। তাতে সে নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিত্বের কথা লিখেছে, বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রচনাবলীর উল্লেখ ক'রেছে, অবশেষে সাংবাদিক জীবন যে তার কতখানি আশা-আকাঙ্ক্ষার বস্তু তাও নিবেদন ক'রে বিজ্ঞাপিত পদে তাকে নিয়োগ করার সবিনয় প্রার্থনা জানিয়েছে। সামান্য কাটাকুটি ও অদল বদলের পর এইখানাই সে একখানা পুরু ফুলস্ক্যাপ কাগজে টুকে একখানা লম্বা খামে বন্ধ করলে।

ঘড়িতে তখন একটা সতের। হরিসাধনবাবু দুটোর আগে আসেন না তা সে জানে। সুতরাং পৌনে দুটো, এমন কি দুটোর সময় বেরুলেই যথেষ্ট। কিন্তু ওর মনে

তখন এমন ঝড় বইছে যে এই তেতাল্লিশ মিনিট যেন আর কাটে না। সুকুমার দাড়িটা কামালে, জুতোয় কালি দিলে, ধোয়া কাপড়-জামা হাতের কাছে এনে রাখলে, তথাপি একটা আটাশ! এখনও বত্রিশ মিনিট। রায় মশায়ের এই ঘড়িটার অশেষ গুণ! প্রত্যহ পনেরো মিনিট ফাষ্ট ক'রে দেয়। সে কথা স্মরণ হতেই সুকুমার হিসাব করতে বসল, চব্বিশ ঘণ্টায় যদি পনেরো মিনিট শ্লো যায় তা হ'লে সকাল থেকে একটা পর্য্যন্ত এই ক'ঘণ্টায় কতখানি শ্লো যাবে। অঙ্ক কষার মত মানসিক অবস্থা তার নয়। ভাবলে জামা-কাপড় প'রে রাস্তায় বেরিয়ে তো যাওয়া যাক, তারপরে যা হয় তা হবে। না হয় একটু সকালেই গেল। নয় তো সামনের পার্কে একটু ঘোরাঘুরি ক'রেই যাবে। এ ভাবে ব'সে থাকা অসহ্য।

রায়-মশাযের খাটের শিয়রের দিকে দক্ষিণেশ্বরের মা-কালীর একখানি ছবি টাঙান আছে। রায়-মশাই সকালে উঠেই কোন পার্থিব প্রাণীর মুখ দর্শনের পূর্ব্বেই তাঁর চরণ দর্শন এবং তাঁকে প্রণাম করে। প্রথম প্রথম যখন ছবিখানি সে কিনে আনে তখন কেবলমাত্র আফিস কিম্বা এই প্রকার কোন গুরুতর স্থানে যাওয়ার সময়ই মাকে প্রণাম ক'রে যেত। সেই অভ্যাস বাড়াতে বাড়াতে এখন এমন হয়েছে যে এক পয়সার তামাক কেনবার জন্য নীচে নামতে হ'লেও মাকে একবার প্রণাম করা চাই। এমন কি প্রণাম যে ক'রে গেল তাও খেয়াল থাকে না। ঘন ঘন প্রণামের ফলে ছবির নীচেটায় মাথার তেলের একটা কালো চক্রাকার দাগ পড়েছে। এ নিয়ে সুকুমার কতবার রায়-মশাইকে তার ভক্তি বাহুল্যের জন্য প্রকাশ্যে পরিহাস করেছে। রায়-মশাই তাতে অপ্রস্তুত হ'ত না। বলত —দাঁড়ান, আমার মত বয়স হোক, রক্তের তেজ কমুক, আমার মত পাঁচ ঝঞ্ঝাটে ঠেকুন, তখন আপনারও এমনি ভক্তি-শ্রদ্ধা আসবে।

এখন সুকুমার ভেবে দেখলে কথাটা মিথ্যে নয়। রায়-মশাই ঠিকই বলেছেন। তারও যেন একটু ভক্তির উদ্রেক হচ্ছে। যে যাই বলুক, আর যে যাই করুক, আখেরে ভগবানের কৃপা ছাড়া মানুষের একটি মুহূর্ত্ত চলবে না।

সুকুমার এদিক-ওদিক চেয়ে খুব ভক্তিভরে মা-কালীকে প্রণাম করলে। মনে মনে বললে—মা গো, তোমার দয়ায় আমার জীবনের এই আশাটি যদি সফল হয় তোমাকে পাঁচটি টাকার ভোগ দোব।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলে একটা বিয়াল্লিশ। যাক, আর পার্কে পাদচারণা করার প্রয়োজন হবে না। হেঁটে গেলে যথাসময়েই 'সুদর্শন' আফিসে পৌঁছুবে। দরখাস্তখানা আর একবার খুলে দেখলে ঠিকই আছে।

সুকুমার 'দুর্গা' 'দুর্গা' ব'লে যাত্রা করলে।

হরিসাধনবাবু একটু আগেই এসেছিলেন। বিকেলে একটা ছাত্র-সভায় তাঁকে সভাপতিত্ব করতে হবে। সে জন্য একটা সম্পাদকীয় লিখে চ'লে যাবেন এই ইচ্ছা। তাঁর সম্মুখে লেখবার প্যাড, হাতে কলম, আর অদূরে ধূমায়মান চায়ের বাটি। সুকুমার এসে নমস্কার করতেই হাতের কলম রেখে তিনি তাকে সহাস্যে অভ্যর্থনা করলেন।

—কি ব্যাপার? লেখা নাকি? কিন্তু আপনার ওপর আমি অত্যন্ত রেগে গেছি।

একটা প্রশস্ত টেবিলের ওদিকে সম্পাদক। এদিকে একখানা চেয়ার টেনে সুকুমার ব'সে মুখে হাসি টেনে বললে—চটে গেছেন? আমার অপরাধ?

—বলছি।

হরিসাধনবাবু টিং টিং ক'রে ঘণ্টা বাজালেন। দ্বারের পরদা ঠেলে একজন বেয়ারা এল। তাকে সুকুমারের জন্য আর এক পেয়ালা চা আনবার হুকুম হ'ল।

বললেন, আমাদের কাগজ কি 'মোগল যুগের মুদ্রা-নীতি' ছাপবার একান্তই অযোগ্য?

অল্পদিন হ'ল সুকুমারের ঐ নামের প্রবন্ধটি পত্রিকান্তরে বেরিয়েছে। সে কাগজটি 'সুদর্শনের' প্রতিযোগী। সম্ভবত সেই কারণেই হরিসাধনবাবুর হিংসার উদ্রেক হয়েছে।

সুকুমার লজ্জিত হয়ে বললে—না, না। ওঁরা আগেই লেখাটা চেয়েছিলেন। নইলে…

—আর নইলে! যাকগে, আপনার পকেট থেকে উঁকি মারছে কি ওটা বের করুন দেখি।

সুকুমার অপাঙ্গে চেয়ে দেখলে—তার দরখাস্তের খাম-খানার একটা কোণ দেখা যাচ্ছে। হেসে বললে, ওটা লেখা নয়।

—তবে ?

একটু দ্বিধাভরে সুকুমার বললে—একটা দরকারে আপনার কাছে এসেছি।

—কি বলুন তো ?

সুকুমার খামখানা পকেট থেকে বার করলে। হরিসাধনবাবু সেদিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন। সুকুমার খামখানা একবার নেড়ে চেড়ে থেমে থেমে বলতে লাগল :

—আপনার আজকের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখলাম ··একজন সাব্-এডিটার চাই···সেটা কোথায় যদি জানা যেত···

হরিসাধনবাবু বললেন, আপনি করবেন ?

—করতাম। আমার খুব ইচ্ছা···

হরিসাধনবাবু কি যেন একটু চিন্তা করলেন। টেলিফোনটা বাজল। রিসিভারটা কাণে নিয়ে ভদ্রলোক কার সঙ্গে কথা কইলেন। তার পর রিসিভারটা যথাস্থানে রেখে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, একটু বসুন—আমি আসছি।

সুকুমার চুপ ক'রে রইল। বাঁ দিকের বেতের বাস্কেটে স্তূপীকৃত লেখা। কতজনের কতকালের লেখা ওর মধ্যে পচছে কে জানে! তার মধ্যে কোন কোন ভাগ্যবানের লেখা ছাপার অক্ষরে লোকসমাজে বার হবে। বাকি সব ওখান থেকে ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে, সেখান থেকে কোথায় যাবে কে জানে! হয়তো মুদীর দোকানে, নয়তো ঘুরতে ঘুরতে আবার কাগজের কলে গিয়ে উপস্থিত হবে; আর নয়তো টুকরো টুকরো হয়ে রাস্তায় ধুলোর সঙ্গে উড়বে। সেই সমস্ত অপরিচিত ভাগ্যহীন উৎসাহী লেখকদের জন্য ওর মনে দয়ার সঞ্চার হ'ল।

টেবিলের ডান দিকে অনেকগুলি বিলিতি সাময়িক পত্রিকা স্তরে স্তরে সাজান রয়েছে। তার কতকগুলি বোধ হয় সবে এসেছে, এখনও মোড়ক খোলা হয়নি। ওর মধ্যে কত নতুন নতুন খবর আছে, কত মূল্যবান প্রবন্ধ আছে কে জানে ? সুকুমার একখানি খুলে নিঃশব্দে পড়তে বসল। বেয়ারা চা দিয়ে গেল।

একটু পরে হরিসাধনবাবু এলেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর রূপ যেন বদলে গেছে। যে হরিসাধনবাবু দেখা হ'লেই সহাস্যে সুকুমারের সঙ্গে আলোচনা করতেন—এ যেন সে হরিসাধনবাবুই নন। যথেষ্ট গম্ভীর। মুখে বেশ একটা ঔদ্ধত্যের ছায়া নেমেছে।

ঠাণ্ডা চায়ে একটা চুমুক দিয়েই ভদ্রলোক পেয়ালাটাকে একটু ঠেলে দিলেন। সুকুমারের দিকে চেয়ে বললেন, আপনার মত একজন লোকই চাইছিলাম। কিন্তু কি জানেন···

হরিসাধনবাবু চুপ করলেন। সুকুমার বিস্মিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

গলাটা ঝেড়ে হরিসাধনবাবু বলতে লাগলেন—কথা হচ্ছে আমাদের এটা ঠিক ব্যবসা নয়। ডিরেক্টাররা এই কাগজের লোকসানের অংশভাগী বটেন, কিন্তু লাভের নয়। তাঁরা এক পয়সা লাভের অংশ নেন না। আর দিনরাত্রি অবিশ্রান্ত খেটে যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানটিকে বড় করেছেন, তাঁরাও ঠিক চাকরী হিসেবে এখানে নেই। তাঁদের যোগ্য বেতন দেবার সামর্থ্যও এ কাগজের নেই। "সুদর্শন" সম্ভবত একমাত্র দৈনিক পত্র—দেশহিতৈষণা থেকে যার জন্ম এবং পুষ্টি। আমার বোধ হয় সেই কারণেই এর প্রসারও সব চেয়ে বেশী। কি বলেন ?

হরিসাধনবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুকুমারের দিকে চাইলে। সুকুমার কিছুই না বুঝে নিঃশব্দে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লে।

খুব মোলায়েমভাবে হেসে হরিসাধনবাবু বললেন, তবেই বুঝুন এ প্রতিষ্ঠানের মূল সুর কোথায়।

সুকুমার আর একবার বোকার মত মাথা নাড়লে। স্রোত কোন্ দিকে বইছে সে কিছুই ঠিক করতে পারলে না। সে এসেছে যে কাগজের জন্য সহ-সম্পাদক চাই তার নামটা জানতে এবং সম্ভব হ'লে হরিসাধনবাবুর কাছ থেকে একখানা সুপারিশ পত্রও নিতে। কিন্তু তার মধ্যে এ সব কথা আসে কোথা থেকে ?

সশব্দে টেবিলের উপর হাত দু'খানা নামিয়ে হরিসাধনবাবু সম্মুখের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি খবরের কাগজে চাকরী করতে চান, না সংবাদপত্রসেবা করতে চান ?

সুকুমার পার্থক্যটা বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চাইতে লাগল।

হরিসাধনবাবু কথাটা ভেঙে বুঝিয়ে বললেন—আপনি

কি শুধুই জীবিকা অর্জ্জনের জন্য এ পথে আসতে চান, না মহত্তর কোন উদ্দেশ্য আছে ?

আবার সেই পুরাতন প্রশ্ন! একদিন হেডমাষ্টারও এই প্রশ্ন ক'রেছিলেন। কিন্তু নিয়তি কি হাস্যকর উত্তরই পরিশেষে দিলে! সুকুমারের মনে সন্দেহ জেগেছে, লোকালয়ে মহত্তর উদ্দেশ্যের সত্যই কোন স্থান আছে কি না। মুখে মহত্তর উদ্দেশ্যের কথা বললেও আসলে সকলেই চায় পেশাদারকে, যে গাছেরও খেতে পারে তলারও কুড়োতে পারে, সে দুই দিকেরই তাল সামলাতে জানে।

সেই কথা স্মরণ হওয়ায় সুকুমারের হাসি এল।

বললে, প্রথম যখন মাষ্টারীতে ঢুকি তখন হেডমাষ্টারও ঠিক এই প্রশ্ন ক'রেছিলেন। জানেন হরিসাধনবাবু, আমার স্কুলের কাজটি গেছে। কিছু একটা পাওয়া নিতান্তই দরকার হয়ে পড়েছে।

কথাটা ব'লেই সুকুমার বেশ খুশী হয়ে গেল। বেশ বাগিয়ে বলা হয়েছে। ওই ক'টা কথায় হরিসাধনবাবুর সমস্ত কথার উত্তর নিহিত আছে। তবে সব উত্তর তিনি ধরতে পারলেন কি না সন্দেহ।

একটু চিন্তিতভাবে বললেন, আচ্ছা কি রকম হ'লে আপনার চলে বলুন তো ?

—টাকা ?

—হ্যাঁ।

সুকুমার হেসে বললে, তার কি শেষ আছে ? যত বেশী দেবেন ততই ভাল চলবে। এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন বলুন তো ? আপনাদের এখানে কিছু খালি আছে না কি ?

হরিসাধনবাবু একটু মুচকি হেসে উত্তর দিলেন, আমাদের এখানকার জন্যই তো বিজ্ঞাপন দেওয়া। বেশ ভাল লিখতে পারেন এবং নির্ভরযোগ্য এমন একজন সহকারী আমার চাই।

এতক্ষণে সুকুমার যেন তল পেলে। "সুদর্শনের" সহকারী সম্পাদক ? সে তো পরম ভাগ্যের কথা! খুশীতে তার মন আলো হয়ে উঠল। বললে, বেশ তো! এখানে যদি হয়···

—কিন্তু ওই যে বললাম। এ আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এখানে বেশী মাইনে তো পাবেন না। কিছু স্বার্থত্যাগ করতে না পারলে এখানে কাজ করার কোন মানেও হয় না সুকুমারবাবু।

শেষ কথাটা হরিসাধনবাবু বেশ জোরের সঙ্গে টেবিলে একটা ঘুঁসি মেরে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে সুকুমারের নৌকার নোঙর গেল ছিঁড়ে। তার ব্যবসাদারী বুদ্ধির কাছিগুলো পটাপট গেল খুলে। ভাবের হাওয়া পালে লাগবা মাত্র নৌকা ছুটল তীরবেগে নিরুদ্দেশের পথে। নিজের উপর নিজেরই আর কোন শাসন রইল না।

আবেগের সঙ্গে বললে, উত্তম। আপনার কাগজে যদি চাকরী পাই, আপনি যা দেবেন তাতেই রাজি।

একটু দ্বিধাভরে হরিসাধনবাবু বললেন, কিন্তু সে যে অত্যন্ত সামান্য।

—কি রকম সামান্য ? আমিও অবশ্য অসামান্য কিছুর আশা করি না।—সুকুমার হা হা ক'রে হেসে ফেললে।

হরিসাধনবাবু হেসে বললেন—মনে করুন পঞ্চাশ।

পঞ্চাশ ? সুকুমারের ধারণা ছিল সম্পাদকীয় বিভাগের লোকদের মাইনে আরও বেশী। অন্তত একশো। যারা দেশের জনমত গঠন করছে, যাদের পড়তে হয় প্রচুর, জানতে হয় প্রচুর এবং লিখতে হয় প্রচুর, তাদের মাইনে একশোর কম হওয়া কিছুতে উচিত নয়। কেরাণীগিরি যে কোন লোক করতে পারে, এমন কি মাষ্টারীও। কিন্তু লেখা একটা বিশেষ ক্ষমতা। ভাল জানাশোনা থাকলেও সকলে ভাল লিখতে পারে না। অন্তত সেই কারণেও এঁদের মাইনে বেশী হওয়া উচিত। সেই কারণে হঠাৎ একটু দমে গেল। তবু তার পক্ষে পঞ্চাশই যথেষ্ট। মাষ্টারীতে যে আরও কম দেয়।

বললে—বেশ। আমি রাজি।

—তা'হ'লে আজ থেকে কাজ করবেন ? না কাল থেকে ?

—যখন থেকে বলবেন।

—তবে কাল থেকেই কাজ করবেন বরং। আজকে চলুন, সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই গে। কি ভাবে কাজ করে সে সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞান হবে। আপনার বোধ হয় বিকেলের দিকে ডিউটি হ'লেই সুবিধে। কি বলেন ?

—তাই আসব। ক'টায় আসব ?

—এই তিনটেয় ? তিনটে থেকে দশটা।

সুকুমার মনে-মনে হিসাব করলে, তা হ'লে রাত্রের ট্যুইশানটা ছাড়তে হবে। সকালে একটা আছে। আর পারবে না। তা ছাড়া "সুদর্শনের" সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করতে গেলে তাকে পড়াশুনোর জন্তও খানিকটা সময় রাখতেই হবে। সহজ কাজ তো নয়! এর জন্ত রাত্রের ট্যুইশানটার মমতা করা কাজের কথা নয়। সুকুমার এই ডিউটিতে রাজি হ'ল।

হরিসাধনবাবু বললেন, তাহ'লে চলুন ও ঘরে। ওঁদের সঙ্গে পরিচয়টা হয়ে থাক।

দু'জনে সহ-সম্পাদকদের ঘরে গেলেন। (ক্রমশঃ)

এলিয়ে দিও না কেশদাম

শ্রীঅনিলময় বন্দ্যোপাধ্যায়

হে বর্ষা সুন্দরী···তুমি রাখিবে কি আমার মিনতি?
মোর চাওয়া—এবারের মত—ঔদ্ধত্যের শেষ পরিণতি!
সময়ের ফাঁকা বৃন্তে তুমি
আত্মহারা চঞ্চলার বেশে
প্রীতি বর্ষে—এ উষ্ণ আবেশে
সিক্তাধরে কেন যাও চুমি?
তোমার সজল দান দিও না ধরায়—উল্লসিত নতি!

* * *

মৃদু পায়ে ধীরে ধীরে উচ্ছ্বসিয়া স্বপ্ন সহচরি—
মর্ম্মরিয়া সুরস্রোতে কেন আসে সুখ-সুপ্ত তরী?
দিশেহারা আকাশের কোলে
আসিতে ভুলিয়া যেও
ভুলে যেও তপ্ত দিবসেও;
অনন্ত সে অভ্যাসের দোলে!
মহাশান্তি মগ্ন যারা তাহাদের শান্তি নিও হরি'!

* * *

কাঁপিয়া স্মরণে শুধু রেখ মোর শেষ অনুরোধ।
আষাঢ়ের গর্ব্ব কেড়ে তারে দাও অহিংস বিরোধ!
প্রেমিকের প্রেমমাখা বুকে
উথলিয়া পড়িবে না
স্বপ্ন-লিপি চেনা
অতৃপ্ত—বিরহ-মধু সুখে!
আজ তুমি রাখ মোর মান—সহ-সহ তীব্র প্রতিশোধ!

* * *

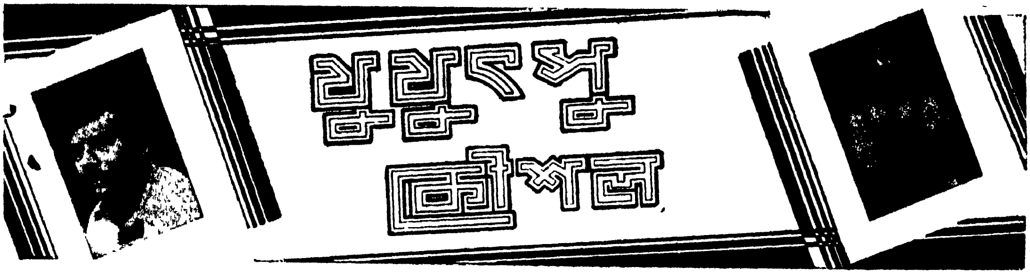
তোমার এ আগমনে কবিরা যে ছেলেখেলা করে
স্বপ্ন আর কল্পনায় লক্ষ লক্ষ বুক দেয় ভরে!
ছন্দময়ি ওগো ও চঞ্চলা
থেমে যাও নিয়মের মাঝে
ভুলে যাও চিরাশ্রিত কাজে;
শুধু বলি—এই মোর বলা!
তুমি না আসিলে আলো নিবে যাবে অন্তরের স্তরে!

* * * *

আনন্দের সজল পরশ দিতে কেহ পারিবে না;
প্রাণে প্রাণে ক্লান্ত অবিশ্বাস, ভুলে যাবে যারা চিরচেনা!
বিরহের সেই মহাস্তূপে
চাপা পড়ে যাবে স্বপ্নালোকে
জল! সেও জমিবে না চোখে,
হাসি যে, মরিবে চুপে চুপে;
ঝরণার হারাইবে গতি, কেউ কারো ডাকে আসিবে না!

* * *

এই মোর শেষ কথা এর পরে লইব বিদায়,
জানিতে দিও না ওগো কে কাহারে চায় কি না চায়!
এলিয়ে দিও না কেশদাম
ধরা আর মানুষের পরে;
কৃষ্ণ মেঘ যেন না সত্বরে
পুরাইতে পারে মনস্কাম!
রহস্যে ভ'রো না তুমি উদার এ মুক্ত নীলিমায়!
এই মোর শেষ কথা এর পরে—বিদায়—বিদায়—।



শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১০২ নং প্যাঁচ

যদি অপরের ডান পায়তারা থাকে, তবে বাঁ হাত দিয়া তাহার ডান মুঠোটি ধরিয়া লইয়া যদি তাহার ডান হাতটি কনুই হইতে মোড়া অবস্থায় থাকে তবে ডান পুর বাহুটি



১০২ নং প্যাঁচের—১ম চিত্র

তাহার ডান হাতের গুলির উপর রাখিয়া তাহার ধরা হাতটি ধরা কনুইটি নিজের ডান বগলে আট্‌কাইয়া বাঁ হাতে ধরা মুঠোটি মোচড় দিয়া কব্জীটি চাড় দিতে দিতে নিজের ডান পা-টি তাহার ডান পায়ের ডান দিক দিয়া লইয়া গিয়া তাহার হাঁটুর পিছনে লাগাইয়া (১০২ নং



১০২ নং প্যাঁচের—২য় চিত্র

প্যাঁচের ১ম চিত্র) জোরে পিছনে তুলিয়া ও সামনে শরীরের ঝোঁক দিয়া তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়। (১০২ নং প্যাঁচের—২য় চিত্র)

১০৩ নং প্যাঁচ

যদি কেহ সম্মুখ হইতে দুই হাত বগলের নীচু দিয়া লইয়া গিয়া বুকটি জড়াইয়া ধরে এবং যদি তাহার ডান পা-টি আগান থাকে তবে দুই হাত দিয়া তাহার চিবুকে ধাক্কা মারিয়া কিম্বা পুরবাহু দুইটি একত্র করিয়া তাহার



১০৩ নং প্যাঁচের চিত্র

গলার নলিতে ধাক্কা মারিবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ পা-টি তাহার ডান পায়ের ডান দিক দিয়া পিছনে লইয়া গিয়া আটকাইয়া কিম্বা ডান পা-টি তাহার দুই পায়ের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া তাহার ডান পা-টি টানিয়া লইয়া সাম্‌নে শরীরের ঝোঁক দিয়া তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়। (১০৩ নং প্যাঁচের চিত্র)

১০৪ নং প্যাঁচ

অপরের পাঁয়তারা দেখিয়া যদি তাহার বাঁ পাঁয়তারা থাকে, তবে একটু নীচু হইয়া দুই হাত দিয়া তাহার বাঁ হাঁটুর একটু উপরে জড়াইয়া ধরিয়া নিজের ডান দিকে টানিয়া তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে (১০৪ নং প্যাঁচের—১ম চিত্র) নিজে ডান দিকে ঘুরিয়া বাঁ পা টি তাহার দুই পায়ের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া তাহার ডান উরতের পিছনে নিজের বাঁ উরতের পিছনটি লাগাইয়া নিজের বাঁ পা-টি তুলিয়া তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়। (১০৪ নং প্যাঁচের—২য় চিত্র)



১০৪ নং প্যাঁচের—১ম চিত্র



১০৪ নং প্যাঁচের—২য় চিত্র

১০৫ নং প্যাঁচ

অপরে যখন দুই হাত দিয়া পা দুইটি ধরিতে আসে,



১০৫ নং প্যাঁচের - ১ম চিত্র



১০৫ নং প্যাঁচের—২য় চিত্র

তখন যদি তাহার মাথা নিজের বাঁ দিকে থাকে তবে বাঁ হাত দিয়া তাহার মাথাটি চাপিয়া ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে (১০৫ নং প্যাঁচের—১ম চিত্র) নিজের ডান পা-টি তাহার বাঁ বগলের নীচু দিয়া লইয়া গিয়া ঘুরাইয়া পিঠের উপর চাপাইয়া দিয়া তাহার শরীরটিকে বাঁ দিকে ঘুরাইয়া ফেলিয়া দেওয়া যায়। (১০৫ নং প্যাঁচের—২য় চিত্র)

১০৬ নং প্যাঁচ

যদি অপরের বাঁ পায়তারা থাকে, তবে দুই হাত তাহার দুই বগলের নীচু দিয়া লইয়া গিয়া, তাহার কাঁধ



১০৬ নং প্যাঁচের চিত্র

জোরে ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজে ডান দিকে ঘুরিয়া আসিয়া কোমরের পিছনটি তাহার কোমরে লাগাইয়া জোরে সামনে ঝোঁক দিয়া নিজের কোমরটি নীচু করিয়া তাহাকে উল্টাইয়া ফেলিয়া দেওয়া যায়। (১০৬ নং প্যাঁচের চিত্র)

১০৭ নং প্যাঁচ

যে কোন অবস্থা হইতে অপরের মাথাটি নিজের বগলের নীচে পাইলে বাহুদ্বারা তাহার গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া যে হাত দিয়া গলাটি ধরা আছে সেই দিকের হাঁটুটি তাহার পেটে রাখিবার (১০৭ নং প্যাঁচের—১ম চিত্র) সঙ্গে সঙ্গে

নিজে বসিয়া (১০৭ নং প্যাঁচের—২য় চিত্র) ও শুইয়া পড়িয়া তাহাকে উল্টাইয়া ফেলিয়া দেওয়া যায়। (১০৭ নং প্যাঁচের—৩য় চিত্র)



১০৭ নং প্যাঁচের—১ম চিত্র



১০৭ নং প্যাঁচের—২য় চিত্র



১০৭ নং প্যাঁচের—৩য় চিত্র

১০৮ নং প্যাঁচ

যদি অপরের ডান পাঁয়তারা থাকে, তবে বাঁ হাতটি তাহার ডান বাহুর বাহির দিয়া লইয়া গিয়া বাহুটি জড়াইয়া



১০৮ নং প্যাঁচের—১ম চিত্র



১০৮ নং প্যাঁচের—২য় চিত্র

ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে একটু নীচু হইয়া নিজে বাঁ দিকে ঘুরিয়া ডান হাতটি তাহার দুই পায়ের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া পাছার নীচে রাখিয়া ডান হাঁটু তুলিয়া ও বাঁ হাঁটু মাটিতে রাখিয়া জোরের সহিত পাঁয়তারা করিয়া বসিবার সঙ্গে সঙ্গে (১০৮ নং প্যাঁচের ১ম চিত্র) নিজে বাঁ দিকে কাৎ হইয়া তাহার শরীরটি নিজের বাঁ দিকে টানিয়া উল্টাইয়া দিয়া নিজের বাঁ দিকে ফেলিয়া দেওয়া যায়। (১০৮ নং প্যাঁচের —২য় চিত্র)

মহানাদের গুহ রাজবংশ

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যে দেশের স্নেহোর্ব্বর শ্যামল বক্ষে সুখে বিচরণ করিতেছি, যে দেশের পরিপূর্ণ ভাণ্ডার আমাদিগের ক্ষুন্নিবৃত্তির ও সুখসমৃদ্ধির জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে, যে দেশের হ্রদযোথিত পীযূষপূরিত সুশীতল বারি আমাদিগের শুষ্ক কণ্ঠ সতত সরস করিয়া দিতেছে, যে দেশের সস্নেহ আহ্বান নানাবিধ বিহগকূজনরূপে শ্রবণবিবরে নিয়ত অমিয় ক্ষরণ করিতেছে, সেই দেশের—সেই আমাদিগের সর্ব্বফলপ্রদা শস্যশ্যামলা মাতৃভূমির অতীত কাহিনীর উপরিভাগ হইতে বিস্মৃতির সমষ্টিভূত ধূলিকণা অপসারিত করিলে মনে যেরূপ গৌরবানুভূতি হইবে, সেরূপ আর কিছুতেই হইতে পারে না, এই গৌরবানুভূতি হইতে নির্জীব দেহ অনুপ্রাণিত হইয়া নবশক্তি ধারণ করে এবং দীনহৃত্রতা ও অনুৎসাহ চিরবিদায় লইতে বাধ্য হয়। মাতৃভূমির অতীত কাহিনী আলোচনায় প্রত্যেক উন্নতিশীল জাতিই যত্নবান। যে জাতির অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি যত উজ্জ্বল—যত অলঙ্কৃত, সে জাতিই তত গৌরবান্বিত। আমাদিগের সাহিত্য-ভাণ্ডার মাতৃভূমির অগণ্য অতীত কাহিনীর রত্ন-রাজির পরিবর্ত্তে কাল্পনিক পাত্রপাত্রীর অসারগর্ভ আপাত-মনোহারিণী প্রণয় কাহিনীতে পরিপূর্ণ হইয়াছে; মধ্যবর্ত্তী কালে আহরণ নিপুণতার অভাবে অনেকানেক সুরভি সম্পদে সমৃদ্ধ লোভনীয় কুসুম ঝরিয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, এই বিষম ভ্রম সংশোধনার্থ বাঙ্গালায় একটা উত্তেজনা জাগিয়া উঠিয়াছে; সুধীগণ উপন্যাস ছাড়িয়া ইতিহাসে মন দিয়াছেন। এই প্রবন্ধে একটা ঐতিহাসিক তত্ত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করিব।

"মহানাদ বা বাঙ্গালার গুপ্ত ইতিহাস" প্রকাশিত হওয়ার পর রাঢ়ের প্রাচীন রাজধানী জেলা হুগলীর অন্তর্গত মহানাদের পুরাতত্ত্ব আবিষ্কারে কতিপয় মহানুভব ব্যক্তির এবং ভারত গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে গভর্ণমেণ্টের খনন বিভাগ মহানাদের রাজবাটীর ধ্বংসস্তূপের কিয়দংশ খনন করিয়া অতীতের অন্ধকার কক্ষের যে রুদ্ধদ্বার উন্মোচন করিয়াছেন, তাহাতে ১০ ফিট মৃত্তিকার নিম্নে যে সকল প্রাচীন চিহ্ন ও রাজভবনের ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীরাদি বাহির হইয়াছে, তাহা ১৬০০ বৎসরেরও পুরাতন বলিয়া নির্ণীত হইলেও উহার একস্থানে তিনটী যুগের (Periodএর) চিহ্ন দেখা যাইতেছে; ইহাতে সিংহ ও গুহ রাজবংশ ব্যতীত আরও একটি রাজার অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া আছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। অতীতের কোন্ স্মরণাতীত যুগে হয়ত অন্য কোন বংশীয় নরপতি মহানাদে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। সেটি কোন্ রাজবংশ তাহার আলোচনা আমি এখন করিব না, সমগ্র স্তূপ খননের পর সকল তথ্যই আবিষ্কৃত হওয়া সহজ হইবে বলিয়া আমার মনে হয়।

এই যে সিংহ ও গুহবংশ ইঁহারা কে কাহার পর মহানাদে রাজত্ব করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ইহা বুঝা যায় যে, মেদিনীপুর অঞ্চল হইতে মহারাজ বিরাট গুহ মহানাদে আগমন করেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। সিংহবংশীয় রাজারা অতি প্রাচীনকাল হইতে মহানাদে রাজত্ব করিয়াছেন, ইহা সিংহবংশের রক্ষিত কাগজপত্রপাঠে অবগত হওয়া যায়। তাহা হইলে গুহ বংশকেই সিংহ বংশের পরবর্ত্তী রাজা মনে করিতে হয়; কিন্তু মুর্শীদ্ কুলী খাঁর সময়েও পুরণ খাঁ সিংহ মহানাদের রাজা ছিলেন, সুতরাং গুহ বংশের পরেও সিংহবংশীয় রাজা দেখিতে পাওয়া যায়। মহানাদের উত্তরাংশে মহারাজ বিরাট গুহ প্রথমে একটি উদ্যান বাটিকা নির্ম্মাণ করিয়া তথায় কিছুকাল অবস্থান করেন এবং ঐ স্থান 'বরাট" নামে কথিত হয়, এক্ষণে সেই বরাট নাম লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহাও দেখা যায় যে পরাক্রান্ত সিংহরাজগণ সময় সময় অন্যান্য স্থানে রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন; সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, মহারাজ বিরাটের মহানাদে আগমনের পর সিংহবংশ অন্য কোন স্থানে চলিয়া যান এবং তদবধি গুহবংশ মহানাদে রাজত্ব করিতে থাকেন। সিংহবংশে বিবাহ করিয়াই গুহবংশ মহানাদে অবস্থিতি করেন, সিংহবংশের সঞ্চিত কাগজপত্রে ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। এই দুই বংশের পরস্পর আত্মীয়তা থাকায় এবং মহানাদের রাজবাটীর সুবিস্তীর্ণ ভগ্নস্তূপ দেখিয়া ইহাও মনে হয় যে, হয়ত উভয় রাজবংশের রাজভবন পাশাপাশিভাবেই অবস্থিত ছিল। গুহবংশের কতিপয় পুরুষ গত হওয়ার পর সিংহবংশের সহিত গুহবংশের সংঘর্ষ হওয়ার কথাও জানিতে পারা যায় এবং কালক্রমে গুহবংশের বিস্তৃতি হয় ও

ভ্রাতৃবিরোধ ঘটে, এই সময় গুহবংশ বাঙ্গালার নানা স্থানে যাইয়া বসতি স্থাপন করেন এবং মহানাদ ক্রমে গুহবংশশূন্য হয়; সেই সময়ে সিংহবংশ আবার মহানাদে আগমন করিয়া থাকিবেন। কালের গতিতে সিংহবংশও মহানাদ হইতে অন্যান্য স্থানে চলিয়া গিয়াছেন।

মৌদ্গল্য গোত্র সিংহবংশীয়গণের মধ্যে অনেকের নিকটে তাঁহাদের ধারাবাহিক বংশাবলী ও রাজকীর্ত্তির বহু প্রাচীন কাহিনী লিখিত ছিল, তাহা অনেক পরিমাণে আমার হস্তগত হইয়াছে। মহারাজ বিরাটের বংশধর বাঙ্গালার বহু স্থানে অবস্থান করিতেছেন; অনুসন্ধান করিতে পারিলে হয়ত সিংহবংশের অপেক্ষাও তাঁহাদের উজ্জ্বল কীর্ত্তিকাহিনী অধিক পরিমাণেই পাওয়া যাইতে পারে। সিংহ ও গুহ রাজবংশের অনেক প্রাচীন কথা ইতিপুর্ব্বে দুই খণ্ড "মহানাদ বা বাঙ্গালার গুপ্ত ইতিহাস" গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

টাকী, শ্রীপুর ও সৈয়দপুরের গুহবংশের আদি পুরুষ রাজা ভবানীদাস গুহ রায় চৌধুরী তিন শত বৎসর পুর্ব্বে মহানাদে ছিলেন। মহেশ্বর-পাশার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ গুহ মজুমদার মহাশয়ের উর্দ্ধতন ৬ষ্ঠ পুরুষ রাজা আনন্দিরাম বা নন্দরাম গুহ মহানাদ হইতে মহেশ্বরপাশায় যাইয়া বাস করেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্যও এই মহানাদ বরাটের গুহ-বংশীয় ছিলেন। ঢাকা—বাঘুটিয়ার গুহ নিয়োগীবংশ মহারাজ বিরাটের অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ রাজা তপন গুহের পৌত্র রাজা পুণ্ড গুহের বংশধর। মহানাদ-বরাটের ৯ম পর্য্যায় রাজা নন্দন গুহের পৌত্র ত্রিলোচন গুহের বৃদ্ধ প্রপৌত্র যাদবেন্দ্র গুহের ভ্রাতৃ-পৌত্র বিশ্বনাথ গুহ রায় চৌধুরী জেলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত সন্তোষ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন, সন্তোষের সুকবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী ও মহারাজা স্যর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরী এই গুহরাজবংশের সন্তান। এইরূপ অনুসন্ধান করিলে বহু স্থানের গুহ-বংশের সহিত মহানাদের সম্বন্ধ বিজড়িত দেখিতে পাওয়া যাইবে। এক কথায় যাঁহারা মহারাজ বিরাট গুহের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা সকলেই মহানাদের গুহরাজবংশসম্ভূত।

মহানাদে গুহরাজবংশের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী কেহ নাই, লিখিত বিবরণেরও অভাব; এক্ষণে আমরা এখানে যে সকল মূক সাক্ষী দেখিতে পাই, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

পুষ্করিণী, রাজপথ, পল্লী, মন্দির প্রভৃতি অতীতের মূক সাক্ষী। মহানাদে আমরা ঐ প্রকার কতিপয় মূক সাক্ষীর নিকট হইতে গুহরাজ-বংশের বিবরণ প্রাপ্ত হইতে পারি।

মহারাজ বিরাট গুহের অপর নাম বীর গুহ এবং তাঁহার একটী উপাধি ছিল—গুণাকর। মহানাদের উত্তরাংশে মহারাজ বিরাট গুহ উদ্যান-বাটিকা নির্ম্মাণ করিয়া তথায় একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণীও খনন করিয়া-ছিলেন, সেই পুষ্করিণীটি "বীরপুকুর" নামে খ্যাত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই সুরম্য রাজোদ্যানের অস্তিত্ব না থাকিলেও পুষ্করিণীটি একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। ঐ পুষ্করিণীর অবস্থা দেখিলে উহা যে বহুকাল পুর্ব্বে খনন করা হইয়াছে এবং ঐরূপ সুবৃহৎ জলাশয় যে সাধারণ লোক খনন করিতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ঐ স্থানটাই "বরাট" নামে খ্যাত। কালক্রমে সেই বরাট নাম লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রায় একশত বৎসর পুর্ব্বে মহানাদের বেজপাড়ার জমিদার বৈকুণ্ঠনাথ বসু ঐ স্থানের নাম বৈকুণ্ঠপুর রাখিয়াছিলেন এখনও সেই নামে উহা কথিত হইতেছে। এক সময় ঐ স্থানটী মুসলমান পল্লীতে পরিণত হয় ও সেই সময় হইতে মুসলমানেরা ঐ বীরপুকুরকে পীরপুকুর করিয়া লইয়াছেন এবং কতিপয় বৎসর পুর্ব্বে ঐ পুষ্করিণীর দক্ষিণপুর্ব্ব কোণে একটী বটবৃক্ষের নিম্নে তাঁহাদের "ইদগড়" নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এক্ষণে বীরপুকুর স্থলে পীরপুকুর হইয়া থাকিলেও কোন কোন স্থানের পীরপুকুরে যেমন বৎসরের কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে নানা স্থানের মুসলমানেরা স্নানার্থ সমাগত হইয়া থাকেন ও মেলা বসে এখানে কখনও সেরূপ কিছু হয় না। যে স্থান যখন যাহার অধিকারে আসে, সে তখন তাহা সকল রকমে নিজস্ব করিয়া লইতে চেষ্টা করে, ইহাই জগতের স্বাভাবিক নিয়ম; সুতরাং মুসলমানদের সময়ে বীরপুকুর পীরপুকুর হইয়া যাওয়া বিচিত্র নহে।

এই বীরপুকুরের দক্ষিণ দিকে অনতিদূরে আর একটী বৃহৎ প্রাচীন পুষ্করিণী আছে, সেটীর নাম "গুণাপুকুর"। এই নামটীও মহারাজ বিরাটের উপাধি প্রকাশক, সুতরাং এই পুষ্করিণীটিও তাঁহার উপাধির স্মৃতি বহন করিতেছে।

আর একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণীর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে, সেটি—বশিষ্ঠ গঙ্গা। মহানাদে বশিষ্ঠ কাশী নির্ম্মাণের জন্য মহর্ষি বশিষ্ঠদেব কর্তৃক যোগবলে গঙ্গাকে আনয়ন করার ব্যাপার যদি বিশ্বাস করা না যায়, তাহা হইলে ঐ বশিষ্ঠ গঙ্গা মহারাজ বিরাটের অধস্তন ৭ম পুরুষ মহারাজ বশিষ্ঠ গুহ খনন করিয়া থাকিবেন। ঐ পুষ্করিণী ৺ জটেশ্বর শিবের মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত এবং উহা এক্ষণে ঐ শিবের সেবাইত মোহান্ত মহারাজের অধিকারভুক্ত থাকিলেও উহা চিরকালই বশিষ্ঠ গঙ্গা নামে খ্যাত আছে, উহাকে কেহ কখনও শিবগঙ্গা বলে না। মহানাদের অনতিদূরে সুদর্শন গ্রামে বশিষ্ঠ" নামে আর একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়।

মহানাদ-দেপাড়া নামক ১২০ ফিট প্রশস্ত রাস্তা—যাহা "মহানাদ বা বাঙ্গালার গুপ্ত ইতিহাস ১ম খণ্ডে" বর্ণিত হইয়াছে—গুহবংশীয় রাজারা প্রস্তুত করিয়া থাকিবেন, কারণ ঐ রাস্তা মহানাদের বরাট হইতেই বহির্গত হইয়াছে।

নিজ নামে পল্লীস্থাপন করা শুধু ভারতে নহে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ঐ রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। মহানাদের যে স্থানে রাজবাটীর বিস্তৃত ভগ্নস্তূপ রহিয়াছে, যেখানে গভর্ণমেণ্টের খনন বিভাগ খনন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, ঐ স্থানটীর নাম নগরপাড়া। এই নগরপাড়ার সংলগ্ন পুর্ব্বদিকে সুবৃহৎ 'হাড়মালা" পল্লী মহারাজ বিরাটের অধস্তন ৪র্থ পুরুষ মহারাজ হাড়মল্ল গুহের নাম ঘোষণা করিতেছে। এই হাড়মালা পল্লীটি অতি সুরম্য ও বাসের উপযুক্ত স্থান ছিল বলিয়াই পরবর্ত্তীকালে (২৫০ বৎসর পুর্ব্বে) তাম্বুলী জাতীয় করবংশ সপ্তগ্রাম হইতে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। মহানাদে আগমনের পর করদের অবস্থা খুব ভাল হয় এবং তাঁহারা রাজভবন সদৃশ গৃহাদি নির্ম্মাণ করেন। করদিগের বংশধরগণ

বলেন—হাড়মালায় বাস করিবার সময় ঐ স্থানের একাংশে কতকগুলি মুসলমানের বাস ছিল ; হাড়মালার পূর্ব্ব সীমায় বাসগৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করার পর নিজেদের বাসভবন নির্ম্মিত হইয়াছিল। কালের গতি ও অদৃষ্টের পরিহাসে আজ করবংশের অবস্থা হীন, বাসভবনাদি ভগ্ন ও ইষ্টকাদি স্থানান্তরিত হইয়াছে ও হইতেছে! এখনও অবশিষ্ট প্রাচীর গাত্রে গ্রথিত ইষ্টকের মধ্যে প্রাচীনকালের বৃহদাকারের পুরাতন ইষ্টক দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে মনে হয়—সেই ইষ্টকগুলি গুহরাজবংশের নিদর্শন। হাড়মল্লের নাম হইতেই যে হাড়মালা নাম উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই হাড়মালা চিরদিন মহারাজ হাড়মল্ল গুহের স্মৃতি উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে ও রাখিবে। মহানাদের দক্ষিণে "লক্ষ্মণহাটীর মাঠ" (লক্ষ্মণহাটী গ্রাম এক্ষণে রামনাথপুর নামে অভিহিত) এবং উত্তরে "রুদ্রখণ্ডা" গ্রাম মহারাজ হাড়মল্ল গুহের পিতা মহারাজ লক্ষ্মণ গুহ ও পুত্র মহারাজ রুদ্র গুহের নাম স্মরণ করাইয়া দেয়।

প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর ন্যায় "হাড়মালা" পল্লী ব্যতীত গুহরাজবংশের আর একটী সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, সেটি—"৺আনন্দময়ীর মন্দির"। হাড়মালায় দেবী আনন্দময়ীর মন্দির ছিল, ঐ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আজিও বর্ত্তমান আছে এবং ঐ স্থানটী '৺আনন্দময়ীর ভিটা' নামে কথিত হইতেছে। এই দেবী মৃন্ময়ী ছিলেন। কালক্রমে মন্দির ভগ্ন হইবার সময় দেবীমূর্ত্তিও ভগ্ন হইয়া যায়, তৎপরে আর মন্দির অথবা মূর্ত্তি পুনর্নির্ম্মিত হয় নাই, কিন্তু তদবধি দেবীর ঘট অন্যত্র (৺অখিলেশ্বর শিবের মন্দিরাভ্যন্তরে) রক্ষিত হইয়া আজ পর্য্যন্ত পূজিত হইতেছেন। শুনা যায় ৺আনন্দময়ীর সেবা পূজার জন্য যথোপযুক্ত ভূসম্পত্তি ছিল ; তাহার কতকাংশ পূজক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে হ্রাস প্রাপ্ত হয়, কোন কোন পূজক অভাববশতঃ নিজের সম্পত্তি বলিয়া কতক বিক্রয় করেন এবং অসাধু জমিদার কর্তৃকও কতক আত্মসাৎ হইয়াছে। এই সকল কারণে এক্ষণে কয়েক বিঘা শালি জমি ও ৺আনন্দময়ীর মন্দিরের ভিটা নিষ্কর দেবোত্তর বলিয়া সেটেল্‌মেন্টের সময় স্বীকৃত হইয়াছে এবং উহা বর্ত্তমান পূজকের অধিকারে আছে। হাড়মালায় এই ৺আনন্দময়ী দেবীকে কে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা কেহই বলিতে পারেন না ; মহানাদের অন্য কোন রাজা, জমিদার বা কোন ধনবান বংশ এ পর্য্যন্ত কোন দিন কেহ দেবীর প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া দাবী করেন নাই ; কিন্তু গুহবংশেরই কোন রাজা (সম্ভবত হাড়মালা পল্লী-স্থাপয়িতা রাজা হাড়মল্ল গুহ) এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় অথবা গুহবংশ যে সময়ে মহানাদ হইতে অন্যত্র যাইয়া বসতি স্থাপন করেন সেই সময় ৺আনন্দময়ীর সেবা পূজার জন্য যথোপযুক্ত ভূসম্পত্তি দেবোত্তর রূপে এই গুহবংশই দান করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে ; কারণ এখনও দেখা যায়—গুহবংশের যে সকল ধনবান ব্যক্তি বাঙ্গালার নানাস্থানে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের বাড়ীতে ৺আনন্দময়ী দেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। ইহা অপেক্ষা মহানাদে গুহ-রাজবংশের প্রকৃষ্ট প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

সিংহ ও গুহবংশের আদিম রাজাদের সম্বন্ধে এই দুই বংশের বংশাবলী ছাড়া বৈদিক সাহিত্য খুঁজিয়া দেখিবার দরকার নাই ; কারণ এই দুই বংশ অদ্যাপি বিশাল শাখাপ্রশাখা হইয়া ভারতের নানাস্থানে বর্ত্তমান আছেন। গুহবংশের প্রাচীন রাজধানী মহানাদ বরাটের স্মৃতি কবে বিস্মৃতির অতল তলে সমাধি-শায়িত, কিন্তু মহানাদ নগরে তাঁহাদের গৌরব আজ পর্য্যন্ত ম্লান হয় নাই। বিজয়কৃষ্ণ ঘটক, জগচ্চন্দ্র ঘটক, নন্দরাম ঘটক প্রভৃতির কারিকায় গুহবংশের বংশাবলী আছে, মহানাদ-সমাজের নামোল্লেখ আছে। মহারাজ বিরাটের অধস্তন বিংশ জন নরপতি মহানাদে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। মালদহ জেলা পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল ; এখনও তাহার চিহ্ন ঐ জেলায় গুহবংশের স্থাপিত বরাট ও ছাতনা-বরাট গ্রাম বিদ্যমান রহিয়াছে। মুসলমান রাজত্বের সময় হইতে গুহবংশে অনেকগুলি প্রাচীন উপাধি বংশানুক্রমে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, যেমন—গুহ ঠাকুরতা, গুহ কীর্ত্তনীয়া, গুহ মীরবহর, গুহ দস্তীদার, গুহ খাসনবীশ, গুহ দেওয়ান, গুহ বক্সী, গুহ মজুমদার, গুহ সরকার, গুহ নিয়োগী, গুহ খাঁ, গুহ রায়, গুহ রায় চৌধুরী ইত্যাদি। মহানাদের এই গুরুদ্বারেই গুহবংশের অভ্যুত্থান।

মৃগতৃষ্ণা

সুকমল দাশগুপ্ত

বুভুক্ষু অন্তর মোর ক্ষুধার তাড়নে
ছুটিয়াছে অবিরাম যেন কার পিছে,
পিপাসিত কণ্ঠ মোর বৃথা বার বার—
মরুর মরীচি মাঝে, ঘুরে মরে মিছে।

যাহারে পাইতে চাহি ছায়া হেরি তার
পলকে পুলকে যায় হৃদয় উচ্ছ্বসি,
দ্যুলোকে ভূলোকে তারে খুঁজে নাহি পাই-
আঁধারে আলোকে কভু ওঠে না বিকশি।

ছন্দ-পতন

মনোজ গুপ্ত

ডাক্তার শরৎ দত্তর বয়েসটা ঠিক কত তা কেউ বলতে পারে না। তাঁর আগাগোড়া সব ডিগ্রিগুলোই বিলিতি—তাই তা থেকে বয়েস ধরে নেওয়া যায় না; তাঁকে জিজ্ঞেস করলে ইংরিজি কায়দায় বলেন, "আন্দাজ করুন।" তা তাঁর বয়েস যতই হোক না কেন, তিরিশ থেকে খুব বেশী দূর এগিয়েছে বলে মনে হয় না। তবু তাঁর বয়সের সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে—কারণ তাঁর বন্ধুদের মধ্যে সব বয়েসের লোকই ছিল। ছেলেদের সঙ্গে মিশে তিনি যে রকম দৌড় ঝাঁপ করতে পারতেন, বুড়োদের আড্ডায় গিয়ে দাবা নিয়ে বসতে তার চেয়ে কম পারতেন না। নতুন বিলেত-ফের্‌তা কেউ দাবা খেলার দোষারোপ করলে তিনি বলতেন, ওহে পড়তে এতখানি বুদ্ধি খরচ করতে হয় না—এটা রীতিমত এক রকম মানসিক শক্তি পরীক্ষা।

ডাক্তার শরৎ দত্তর শরৎটা কবে লোপ পেয়েছিল তা বলা যায় না—সম্ভবত বিলেত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। ডক্টর ডট্‌কে ডাক্তারি ছাড়া এত কাজ করতে হ'ত যে অন্য কেউ হলে খেলা তো দূরের কথা, দম ফেলবার সময় পেত না; কিন্তু তিনি বেশ সময় পেতেন। রুগী দেখতে যাওয়ার তাঁর প্রায় ধরা-বাঁধা নিয়ম ছিল—নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পার হয়ে গেলে আর যেতেন না—অন্তত নেহাৎ বাধ্য না হলে তো নয়।

সন্ধ্যের পর ডাক্তার দত্তর বাড়ীটা একটা রীতিমত ক্লাব হয়ে যেত। তাঁদের গোলমালের চোটে পাড়ার লোক এক এক সময় বিরক্ত হয়ে উঠত কিন্তু কিছু বলতে পারত না; কারণ যারা হৈ হৈ করে তারা সকলেই পদস্থ লোক—আর সেটা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। রাত বারটার পর কোনদিন কেউ সেখানে আওয়াজ শোনে নি—এমন কি সে বাড়ীতে লোক আছে বলে মনেই হ'ত না। যে দিন থেকে তিনি কলকাতায় এসেছেন প্রায় সেদিন থেকেই তাঁর জীবন এইভাবে সুরু হয়েছে—আর কোনদিন তার মধ্যে কোন বৈচিত্র্য দেখা যায় নি। তাঁর আত্মীয় স্বজন কেউ আছে কি না তা তাঁর বন্ধুদের মধ্যে কেউ জানত না—জানবার চেষ্টাও করে নি। ডাক্তার দত্তর সঙ্গেই তাদের সম্পর্ক, তাঁর আত্মীয়দের সঙ্গে নয়। তা ছাড়া কারও ঘরের খবরের জন্য বেশী ঔৎসুক্য প্রকাশ করাটাও তাঁর সমাজের লোকরা ভদ্রতা বলে মনে করে না!

হঠাৎ একদিন যদি ডাক্তার শরৎ দত্তর বাড়ীতে চাবী পড়ে যায় তা হলে পাড়ার সকলের সেটা আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠা আশ্চর্য্য নয়। পাড়ার সবাই এক সময় বিরক্ত হয়েছে তাঁর বাড়ীর আড্ডার জন্য—কিন্তু সেই আড্ডা যখন বন্ধ হয়ে গেল তখন তাদের অস্বস্তির সীমা রইল না। অনেকে অনেক রকম কল্পনা করলে; কিন্তু তার কোনটা ঠিক তা বলা যায় না—কোনটা ঠিক কি না তাই বা কে বলতে পারে? ডাক্তার দত্তর এখানে আসা এবং এখান থেকে চলে যাওয়া দুটোই এত আকস্মিক যে তার সত্যতার সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়া আশ্চর্য্য নয়। লোকটা কোথায় গেছে, কবে ফিরবে, ফিরবে কি না—এই নিয়ে অনেকেরই ঔৎসুক্য হয়েছিল।

*   *   *   *

মধুপুর জায়গাটা খুব বড় নয়; আর যাদের সত্য সৌন্দর্য্য-জ্ঞান আছে, অন্তত আজকাল তারা ওখানে সৌন্দর্য্যও খুঁজে পায় না। পূজার বাজারে কলেজ ষ্ট্রীটে যত ভিড় হয় সাঁওতাল পরগণায় তার চেয়ে কম ভিড় হয় না—যে কেউ এ সময় ওখানে গিয়েছেন তিনিই জানেন। সারা ভারতবর্ষে এত জায়গা থাকতে ডাক্তার শরৎ দত্ত ওখানে এসে কেন হাজির হলেন তা বলা শক্ত। "নিরালা বনালয়" তিনি পছন্দ করেন না—তা না বললেও বোঝা যায়। শহরের ঠিক মাঝে—যেখানে ভিড় সবচেয়ে বেশী—সেইখানে এসে উঠলেন। তাঁর সঙ্গে বেশী কেউ ছিল না, আর জায়গাটাও অচেনা—কাজেই তাঁর পক্ষে টিকে থাকা অসহ্য হয়ে উঠেছিল। অন্য কোথাও যাওয়া যায় কি না ভেবে দেখছিলেন; কিন্তু কোথাও ঠিক সে সময়ে তাঁর যাওয়া হল না।

দু'বেলা ষ্টেশনে এসে বেড়ান ছাড়া ভাল কাজ কিছু তখন ছিল না। রোজই আসেন কিন্তু অন্য কাউকে পর পর দুদিন আসতে দেখেন না। তিনি ভাবতেন অন্য

সকলেও তাঁর মত আলাপ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কিন্তু কেউই যেচে কথা কইত না; তাই যখন একজন ভদ্রলোক পাশে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "মশায়ের কতদিন আসা হয়েছে?" তখন তিনি ঠিক করে উঠতে পারেন নি কথাটা তাঁকেই জিগেস করা হচ্ছে কি না। লোকটা পাশে দাঁড়িয়ে আছে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "আমায় জিজ্ঞেস করছেন?"

"আপনি ছাড়া তো কাছাকাছি আর কেউ নেই।"

"ঠিক বুঝতে পারি নি। এই কদিন হ'ল এসেছি।"

তারপর যথারীতি প্রশ্নোত্তর চলল—বেড়াতে আসা, না হওয়া পরিবর্ত্তন করতে আসা, কোথায় থাকা হয়, একা আসা হয়েছে না সঙ্গে বাড়ীর লোকজন আছে ইত্যাদি।

ডাক্তার দত্ত কথা কইবার একজন লোক পেয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। সে ভদ্রলোকও তাঁরই মত একাই এসেছেন—তবে বাড়ীর সব সেইদিনই আসছেন, আর সেই জন্যই তিনি ষ্টেশনে এসেছেন।

একটা স্পেশ্যাল ট্রেণ এসে দাঁড়াল। ভদ্রলোকটী সঙ্গে সঙ্গে ছুটোছুটি সুরু করলেন। ভদ্রতা হিসেবে ডাক্তার দত্তকে তাঁর সঙ্গে যেতে হ'ল। তিনি বললেন, "আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? জিনিসপত্র কি খুব বেশী আছে?"

"না, তা আর এমন বেশী কি? মেয়েদের সঙ্গে আছে আমার ছোট ছেলে। সে তো নেহাৎ ছেলেমানুষ। অবশ্য আমার মেয়ে····· "

কথা শেষ করা হল না—তিনি তাঁর 'বাড়ীর সবকে' দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি এগিয়ে গেলেন, ডাক্তার দত্ত একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। গাড়ী থেকে নামল ভদ্রলোকটির স্ত্রী, ছেলে আর মেয়ে। মেয়েটীর নাবাই বিশেষ করে নাবা—অবতরণ বললেই ভাল হয়। তাকে দেখলেই মনে হয় সে শুধু এ-কেলে নয়—বিশেষ করে অগ্রবর্ত্তী। ডাক্তার দত্ত ভেবেছিলেন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়ে তাঁর অনেক সুবিধে হল; কিন্তু তাঁর মেয়েকে দেখে সে ভরসা তাঁর বিশেষ আর ছিল বলে মনে হয় না। ভদ্রলোক ষ্টেশন থেকে বেরুবার সময় ডাক্তার দত্তর সঙ্গে সকলের পরিচয় করে দিলেন—আর তাঁকে তাঁদের বাড়ী যাবার জন্যও বিশেষ করে অনুরোধ করলেন। মেয়েটীর নাম ছন্দা শুনে ডাক্তার দত্তর মনে হচ্ছিল বলেন, "বাপ-মার নাম দেওয়ার ভুলের আর একটা দৃষ্টান্ত।" তাঁর বুঝতে সময় লাগে নি—ছন্দা তাঁকে কথা কইবার উপযুক্ত মানুষ বলে মনে করে নি।

*　　*　　*　　*

লোকের সঙ্গের লোভ খুব বেশী থাকলেও ডাক্তার দত্ত ছন্দাদের বাড়ী গিয়ে উঠতে পারেন নি। কোথায় তাঁর একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। ছন্দার বাবা অমরেশবাবু কিন্তু তাঁকে মুক্তি দিলেন না; বলে পাঠালেন, বিকেলে তাঁদের সঙ্গে শরৎবাবুকে বেড়াতে যেতে হবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন কাজ করার মত লোক শরৎ দত্ত নয়; কিন্তু সময় বিশেষে অনেক কাজই যেমন আর সকলকে করতে হয়েছে ডাক্তার দত্তকেও তেমনি সেদিন বিকেলে অমরেশবাবুদের সঙ্গে বেড়াতে যেতে হল। শরৎবাবু যে ডাক্তার এই কথাটাই ছন্দাদের বাড়ীর সকলে জেনেছিল; কিন্তু তাঁর সবগুলো ডিগ্রিই যে বিলিতি তা কেউ জানত না। জানলে বোধ হয় ছন্দা তাঁকে একজন অপ্রিয়-সঙ্গী বলে মনে করত না।

সারা রাস্তায় অমরেশবাবু তাঁর ছেলেমেয়েদের গুণ-বর্ণনা করতে করতে চলেছিলেন—বিশেষ করে মেয়ের। ছন্দা তাঁর ছেলেদের চেয়েও বুদ্ধিমতী ইত্যাদি। ছন্দা একবার তার বাবাকে বাধা দেবার চেষ্টা করলে কিন্তু তারপর চুপ করে গেল। শরৎ ডাক্তারের ছুরী, কাঁচি, ওষুধের মধ্যে তার ইংরিজি সুরে বাঙ্লা গান গাইতে গেলে কতখানি শক্তির দরকার তা যে স্থান পাবে না তা সে জানত। সে চুপ করল অনেকটা ডাক্তার দত্তর অসম্পূর্ণ শিক্ষার ওপর দয়া করে।

ছন্দা বললে, "বাবা মিষ্টার বোসও এসেছেন যে।"

"আরে তাই তো! মিষ্টার বোস, মিষ্টার বোস···"

যাঁকে ডাকা হচ্ছিল তিনি অমরেশবাবুর দিকেই আসছিলেন। দু'জনের হৃদ্যতাটা প্রথম সাক্ষাতেই বোঝা গেল। অমরেশবাবু ডাক্তার দত্তর সঙ্গে তার পরিচয় করে দিলেন। নামটা শুনে মিষ্টার বোস বললেন, "কলকাতায় আপনি কোথায় থাকেন বলুন তো?"

"ভবানীপুর ডক্টর রাজেন্দ্র রোড।"

"তাই বলুন! আপনি সাইকো-এনালিষ্ট ডক্টর ডট্! আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে ছাপার অক্ষরের মধ্য দিয়ে। আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ার সৌভাগ্য···"

বাধা দিয়ে ডাক্তার দত্ত বললেন, "কি বলছেন! আমি আর···"

মিষ্টার বোস আর ডাক্তার দত্তর মধ্যে যখন এসব কথা চলছিল তখন ছন্দার অবস্থাটা লক্ষ্য করলে ডাক্তার দত্ত নিশ্চয়ই একটা ভাল প্রবন্ধ লেখবার বিষয় পেতেন। ছন্দার প্রথমেই মনে হল, ডাক্তার দত্তর বিলিতি ডিগ্রীগুলোর কথা। কতদিন ভদ্রলোক বিলেতে ছিলেন কে জানে? ভদ্রলোকের সঙ্গে ও-রকম ব্যবহার করে কি ভুলই করেছে!

বাড়ী ফেরার পথে ছন্দা ডাক্তার দত্তকে জিজ্ঞেস করলে, "আপনি কতদিন বিলেতে ছিলেন?"

"বহুদিন—আমার লেখাপড়া ঐখানেই আরম্ভ হয়। তারপর কিছুদিন বাবার সঙ্গে এদেশে এসেছিলাম। বাবা এখানেই থেকে গেলেন, কিন্তু আমায় ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। দেশে এসেই যে বাস করব তা ভাবতেও পারতাম না।"

"আচ্ছা, আপনার এখানে থাকতে অসুবিধে হয় না?"

"অসুবিধে হবে কেন?"

"আপনি তো বাঙ্গালীর মত করে শিক্ষা পান নি।"

"কিন্তু আমার বাবা-মা দুজনেই বাঙ্গালী ছিলেন। রক্তের সঙ্গে যেটা মিশে আছে, সেটাকে অস্বীকার করা যায় না।"

"আপনি এখানে কতদিন থাকবেন?"

"ঠিক নেই। তবে কিছুদিন বোধ হয় থাকতে হবে।"

"আমার সায়েন্সের জ্ঞান খুব কম, কিন্তু সাইকো-এনালিসিস শেখবার খুব ইচ্ছে আছে। চেষ্টাও যে করিনি তা নয়, কিন্তু কিছু হয় নি। আপনার যদি অসুবিধে না হয়······"

ছন্দা ভেবেছিল ডাক্তার দত্ত যখন বিলিতি পণ্ডিত তখন কোন মেয়ে শিখতে চাইছে শুনলে সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, "এর আর কথা কি? আপনার যখন ইচ্ছে যাবেন।" কিন্তু ডাক্তার দত্ত বললেন, "দেখুন যে ক'দিন এখানে থাকি, ও-সব নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। কলকাতায় গিয়ে বরং চেষ্টা করে দেখব।" ছন্দার আত্ম-সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, কিন্তু নিজের কাছেও সে তা মানতে চাইলে না।

* * * *

ডাক্তার দত্ত ঘরের ভেতর বসে কাগজ পড়ছিলেন। দরজার কাছে এসে ছন্দা জিজ্ঞেস করলে, "ভেতরে আসতে পারি?"

ডাক্তার দত্ত এর জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। ভদ্রতা রাখবার জন্য তাঁকে বলতে হল, "নিশ্চয়।"

ছন্দা ঘরে এসে বললে, "অনুমতি না নিয়েই এসেছি, কিছু মনে করেন নি তো? আসতে বাধ্য হলাম। এখানে থাকতে আপনি সাইকো-এনালিসিসের কথা তুলতে বারণ করেছেন, কিন্তু না তুলে পারছি না। কাল থেকে আমার এক বন্ধুর কথা মনে হচ্ছে। তার সঙ্গে যে আমার খুব বেশী অন্তরঙ্গতা আছে তা নয়—কিন্তু যত সময় যাচ্ছে তত মনে হচ্ছে তাকে না দেখলে আমি আর কিছুতেই এখানে থাকতে পারব না। ঠিক এই মুহূর্ত্তে আমি তার অভাব যত বোধ করছি জীবনে কারও অভাব কখন তত বেশী বোধ করি নি। এর কারণ বিশ্লেষণ করতে পারলাম না, তাই আসতে হল।"

ডাক্তার দত্ত শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন; বললেন, "এর জন্য সাইকো-এনালিষ্টের দরকার হয় না, হয় সোডা ওয়াটার আর সোডি বাই-কার্বে।"

"তার মানে?"

"মানে আর কি? হিষ্টিরিয়া"

"আপনি আমায় ঠাট্টা করছেন।"

"ঠাট্টা করতে যাব কেন? মেয়েদের কি কেউ ঠাট্টা করে?"

"করে না নাকি? জানতাম না।"

"অন্তত আমি করি না, কারণ ঠাট্টা বুঝতে গেলে মাথার যে অবস্থা থাকা দরকার মেয়েদের তা থাকে না।"

"এ আপনার আমাদের প্রতি অবিচার করা।"

"অবিচার?"—ডাক্তার দত্ত আর কিছু বললেন না। ছন্দার সব কথারই জবাব হাঁ না করে সেরে দিলেন। তিনি যে অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন তা বুঝতেই ছন্দা থেমে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ছন্দা জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা, বাড়ীতে আপনার কে কে আছে? জিজ্ঞেস করছি বলে কিছু মনে করছেন না তো? কি রকম ঔৎসুক্য হচ্ছে।"

"এতে আর মনে করবার কি আছে? বাড়ীতে আমার কেউ নেই বললেও অন্যায় হয় না—কারণ আমি আত্মীয়হীন।"

"একেবারে আত্মীয়হীন কেউ হয় নাকি ?"

"অন্য কারও কথা বলতে পারি না, তবে আমার আত্মীয় বলতে যে আমি ছাড়া কেউ নেই তা ঠিক।"

"আরও ব্যক্তিগত কোন কথা জিজ্ঞেস করতে পারি ?"

"জিজ্ঞেস করতে কেন পারবেন না! অসঙ্গত হলে জবাব না দেবার অধিকার তো কেউ কেড়ে নিচ্ছে না।"

"আপনি বিয়ে করেন নি কেন ?"

ডাক্তার দত্ত হাসতে হাসতে বললেন, "আপনার প্রশ্ন আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। আচ্ছা, আজকালকার দিনে যখন মেয়েরাও বিয়ে করছে না—তখন আমার পক্ষে বিয়ে না করাটা কি খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় ?"

"না তা নয়, তবে··"

"তবে কি ? কোন কারণ আছে কি না ? কারণ অবশ্যই আছে কিন্তু এইখানে এসে আমার জবাব না-দেবার অধিকার দাবী করতে হল।"

"আপনার কথা বলবার যা ক্ষমতা তাতে ডাক্তারি না করে ওকালতি করলে বোধ হয় ভাল হ'ত।"

"কে কি হয় সেটা খুব কম ক্ষেত্রেই তার নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করে। বেশীর ভাগ সময়েই আমাদের অবস্থার ফেরে পড়ে কাজ করতে হয়; তাই নয় কি ?"

"কতকটা—তবে সবটা নয়; অন্তত চেষ্টা করলে যে নিজের ইচ্ছাটাকে বাঁচান যায় না তা স্বীকার করি না।"

"আপনার এখনও অনেক শিখতে বাকি। আমিই যে খুব বেশী কিছু শিখেছি তা নয়; তবে বয়সে আপনার চেয়ে অনেক বড় সেই হিসেবে কিছু বেশী অভিজ্ঞতা দাবী করতে পারি।"

"অনেক বড় ? কেন আপনার বয়স কত ?"

"আন্দাজ করুন।"

"খুব বেশী হলেও ত্রিশ-বত্রিশের বেশী হবে না।"

ডাক্তার দত্ত হাসতে লাগলেন।

ছন্দা বললে, "কেন, ঠিক হল না ?"

"না। যাক্, তাহলেও আপনার চেয়ে অনেক বড়।"

ছন্দা তার ছোট্ট রিষ্ট-ওয়াচটার দিকে চেয়ে বললে, "ও! এত বেলা হয়ে গিয়েছে খেয়াল ছিল না তো! নমস্কার, এখন চললাম।"

* * * *

ছন্দার ছোট ভাই এসে তাদের বাড়ী খবর দিলে সে মধুপুরে মেমসাহেব দেখেছে—আর তাও ডাক্তার শরৎ দত্তর সঙ্গে। সকাল বেলা সে ষ্টেশনে গিয়েছিল; মেমসাহেব ভোরের গাড়ীতেই এসেছে। অমরেশবাবু বললেন, "ভদ্রলোকের প্র্যাক্‌টিস্ এত বেশী তা তো ধারণাও করতে পারি নি। কোথায় মধুপুরে বেড়াতে এসেছে সেখানেও লোক ছুটে আসে।"

অমরেশবাবুর স্ত্রী বললেন, "কত টাকা রোজগার করে বলতে পার ? সাহেব মেম নিয়ে যখন কারবার, তখন পয়সার তো সীমা নেই। ছন্দা তো প্রথম ওকে আমলই দেয় নি। আচ্ছা, ভদ্রলোক তো এখানে একা রয়েছে; খাওয়া-দাওয়ার কত অসুবিধে হচ্ছে, মাঝে মাঝে এখানে খেতে বললে হয় না ?"

অমরেশবাবু হেসে উঠলেন; বললেন, "কারণটা কি ঠিক তাই ? লোকটা বিয়ে করে নি কেন, খবর নিতে হবে।"

"সে তো বটেই, তবে হাতছাড়া করা ঠিক নয়।"

যাকে নিয়ে এসব আলোচনা চলছিল, তার ঘরে তখন সত্যই একজন মেমসাহেব বসেছিলেন। ডাক্তার দত্ত অসম্ভব গম্ভীর হয়ে অন্যদিকে চেয়ে বসেছিলেন। তাঁকে দেখে মনে হয় তিনি খুব বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। মেমসাহেব টেব্লের ওপরকার সিগারেট-কেস থেকে একটা সিগারেট নিয়ে বললেন, "তুমি অনর্থক আমার ওপর বিরক্ত হচ্ছ। আমার আর উপায় ছিল না।"

ডাক্তার দত্ত তার দিকে না চেয়েই বললেন, "এই জন্যই এখানে এসেছিলাম, কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই। অসহ্য।"

তার শেষ কথাটা শুনে ছন্দা ঘরে ঢুকল। তাকে দেখে মেমসাহেব উঠে পড়লেন। ঘর ছেড়ে যাবার সময় বললেন, "তুমিও তা হলে আসছ তো ?"

"বলতে পারি না; তুমি যেতে পার।"

মেমসাহেবের এরকম ভাবে উঠে যাওয়াতে ছন্দা একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললে, "অসহ্য হওয়ারই কথা! এখানে এসেছেন বেড়াতে, এখানেও যদি লোক এসে জ্বালাতন করে তা হলে আর থাকা যায় কি করে ?"

"থাকা আর গেল না। কালই চলে যেতে হবে।"

"কালই ? খুব দরকারী কোন কাজ···"

"হাঁ, এক রকম দরকারী বৈ কি !"

"এক রকম দরকারী মানে ? আপনার কথার মধ্যে এত বেশী হেঁয়ালী থাকে যে বুঝে উঠতে পারি না। ভেবেছিলাম এখানে ক'টা দিন বেশ কাটবে, তা আর হ'ল না। ক'লকাতায় গিয়ে কিন্তু আমাদের একেবারে ভুলে যাবেন না।"

"মনে করে রেখেই বা লাভ কি ?"

"দেখুন ডক্টর ডট্, সেদিন যে কথাটা আপনি চাপা দিলেন সেটা কিন্তু আমার মনে রয়েছে।"

"কি বলুন তো ?"

"বিয়ে না করার কারণ।"

"ও ! ও সব ভেবে মিথ্যে নিজের সময় নষ্ট করবেন না।"

"আমার মনে হয় আপনার সঙ্গে থেকে থেকে আমিও কতকটা সাইকো-এনালিষ্ট হয়ে গেলাম। আপনার জীবনে বোধ হয় এমন কোন দুঃখ…"

ছন্দা তার কথা শেষ করলে না। ডাক্তার দত্তও চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার দত্ত বললেন, "নিজের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা কোন দিনই পছন্দ করি না, কাউকে করতে দি-ও না; আপনাকেও তাই সেদিন থামিয়ে দিয়েছিলাম। আজ মনে হচ্ছে তাতে আপনার ক্ষতি করা হয়েছে।"

"তার মানে ?"

"আপনি আমায় ভুল বোঝবার চেষ্টা করেছেন। জীবনে দুঃখ যখন সকলের আছে তখন আমারও আছে নিশ্চয়, তাতে আপনার ভুল নয়। ভুল করেছেন আমি বিয়ে করি নি ভেবে।"

"আপনি বিয়ে করেছিলেন ? আপনার স্ত্রী বুঝি খুব অল্প দিনে মারা যান ?"

"না।"

"তবে ?"

"তিনি বেঁচে আছেন। আমার বয়েস ত্রিশ বা বত্রিশ নয়; আমার ছেলে অক্সফোর্ডে পড়ে…"

"আপনি এসব কথা আমায় বলেন নি কেন ?"

"বলবার দরকার হয় নি তো !"

"নিশ্চয় হয়েছিল। আপনি কি আমার মনের কথা কিছুই বোঝেন নি ?"

"আগে ভয় করি নি; যখন করেছি, তখনই আপনাকে জানালাম।"

"ঐ মেমসাহেব…"

"হাঁ, আইনত উনি আমার স্ত্রী। যদি কোন অপরাধ…"

"থাক, আর দরকার হবে না। এটা বিলেত হলে এর জবাব এটর্ণীকে দিয়ে দিতাম।"

"এটা বিলেত না হওয়ার জন্য আমি দুঃখিত।" ছন্দা কি একটা অস্পষ্ট কথা বলে চলে গেল।

* * * *

অমরেশবাবুর বাড়ী ডাক্তার দত্তর আর নিমন্ত্রণ হয় নি।

ইউরোপের চিঠি

অধ্যাপক শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার

[১৯৩৪ সালে অধ্যাপক ডাঃ সরকার হিন্দু ধর্ম্ম ও দর্শনের উপর বক্তৃতা দেবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া ইউরোপে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁহার বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে যে পত্র লিখিছিলেন আমরা এখন তাহা প্রকাশ করিব।]

আমি রোমে এসে পৌচেছি। ব্রিণ্ডিসীতে নেমেই এ দেশের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল। কী সুন্দর শহর। রাস্তাঘাটগুলি কেমন পরিষ্কার। স্ত্রী-পুরুষের গঠন কী চমৎকার। ইটালির শহরের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। ব্রিণ্ডিসীতে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্য আমি অনুভব করেছিলাম। আড্রিয়াতিক সমুদ্রের দৃশ্য আমাকে বড় আনন্দ দিল। তার তীরে এই শহরটি; তাহার মিলিটারী Base দেখে স্বাধীন দেশের জীবনের ভিতরে কত আশা, কত ভরসা এবং তার অশেষ নৃত্যভঙ্গী আমাকে এক নতুনভাবে পূর্ণ করল। জাহাজ হ'তে নেমেই ইটালির ভাস্কর-চাতুর্য্য চোখে পড়ে, কিন্তু ব্রিণ্ডিসীতে এই প্রস্তর মূর্ত্তি আমাকে তেমন আকৃষ্ট করে নি—যতটা করেছিল প্রকৃতির উদার দৃশ্য ও মহান স্পর্শ।

সমুদ্রের হাওয়া জাহাজে ততটা ভালো লাগেনি, ব্রিণ্ডিসীতে যতটা লেগেছিল। তার কারণ বোধ হয় সমুদ্রের সঙ্গে শীঘ্র আর দেখা হবে না বলে, বিদায়ক্ষণে তার অপরূপ গাম্ভীর্য্য ও প্রশান্তি আমার হৃদয় পূর্ণ করেছিল। ত্যাগ পদার্থের যে সৌন্দর্য্যের প্রকাশ করে, ভোগ তা করে না। ত্যাগ আসক্তি-শূন্য ব'লেই পদার্থের স্বরূপকে বিকাশ করে। কিন্তু ভোগ লালসাপূর্ণ ব'লেই পদার্থের স্বরূপকে গ্রহণ করতে পারে না। হৃদয় যখন ভোগ করে তখন সৌন্দর্য্যের প্রাণ কোথায় তার সন্ধান সে পাব না। কিন্তু ত্যাগের সময় বস্তুর শক্তি ও বিভূতি আমাদের হৃদযকে আনন্দেব ও অনুভূতির নিবিড়তায় ভরে দিয়ে যায়। এই প্রকারে বিরহ নিত্যই মানুষকে সৌন্দর্য্য দেখিয়ে দেয়, মানুষ কিন্তু তবুও বিরহ চায় না। তার কারণ তার অন্তরিন্দ্রিয় অভ্যাসবশতঃ পুরাতন জগতে বিচরণ ক'রতে চায়। নবীনকে নবীনরূপে মানুষ চায় না, নবীনকে পুরাতনের ভিতর দিযে চাওয়াতেই সে অভ্যস্ত।

ব্রিণ্ডিসীর রাস্তায় একটুখানি বেড়িযে এলুম। ইটালীর স্ত্রী-পুরুষের সৌন্দর্য্য দেখলুম। প্রকৃতি যেন এদের ছাঁচে ঢেলে প্রস্তুত করেছেন। নাক চোখ কাণ এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গগুলি এমন সমাবিষ্ট যে মনে হয় সৌন্দর্য্যের ধারায অভিষিক্ত হযে এরা সৃষ্ট হ'য়েছে। এই সৌন্দর্য্য শুধু রূপের নয়, আকৃতিরও বটে। সমস্ত আকৃতি যেন ভাস্করের শাণিত যন্ত্রের দ্বারা খোদিত হ'যেছে। রূপ ও আকৃতি বলিষ্ঠ দেহে সমাবিষ্ট হওয়াতে তারা যেন আরো সুন্দর হ'য়ে উঠেছে। ইটালীর ভাস্কর্য্যের যে এতো চাতুর্য্য তার কারণ প্রকৃতি এখানে তার সৃষ্ট বস্তুকে আকারেব সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করেছে। এরূপ সৌন্দর্য্যের মধ্যে ভাস্করের অন্তর মন পূর্ণ হ'য়ে ওঠে আকৃতিগত সৌন্দর্য্যের শুদ্ধানুভূতিতে।

বাইরের রূপ সুন্দর হ'লেও অন্তর-সৌন্দর্য্যের বোধ অনেক সময় পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে না। কারণ ইন্দ্রিয়গুলি এখানে এতো সতীক্ষ্ণ হ'য়ে বাইরের সৌন্দর্য্যে মগ্ন থাকে যে অন্তর-সৌন্দর্য্যের সঙ্গে তার পরিচয় হয় না। অন্তরের অনুভূতি হয় ইন্দ্রিয়ের উপভোগের উপরমতা থেকে। অন্তরের সৌন্দর্য্য ধ্যানের প্রাপ্য, বাইরের সৌন্দর্য্যে মগ্ন অন্তঃকরণে তার স্ফুরণ হওয়া কঠিন। মনটা চলে ইন্দ্রিয়ের অনুগমন ক'রে, সেইখানে তৃপ্ত হওয়ার জন্যে তার একাকী অন্তর্জগতে বিচরণ করা শক্ত হ'যে ওঠে। ইটালীর ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার সঙ্গে পরিচয় হ'য়ে আমার এই কথা অন্তরে জেগেছে। বাইরের সৌন্দর্য্যস্বপ্নে এরা এতো মগ্ন ব'লেই বোধ হয় এদের সৃষ্ট-মূর্ত্তির বাইরের রূপ এতো সুন্দর ভাবেই ফুটে ওঠে। বর্ণসমাবেশ, অবয়ব, আকার ও ভঙ্গী সব যেন জীবন্ত বলে মনে হবে।

বহির্জীবনের ছন্দ এখানে এতোভাবে প্রকাশিত যে প্রাণের স্তরের প্রতি গ্রন্থীতে যে সব ভোগের বিভূতি ও বৈপুল্য সাজান আছে তার প্রত্যেকটি প্রকাশিত হয় দৃষ্টির ভাবে, আকৃতিতে ও বর্ণ সমাবেশে। বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের মধ্যে যেটা প্রাণস্তরের সৌন্দর্য্য ইটালীর চিত্রকরেরা তার ঋষি; এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এদের লাঘবতা অন্তর-সৌন্দর্য্য প্রকাশেই ধরা পড়ে। খৃষ্টের যতগুলি ছবি দেখলুম তাতে যিশুর কোনোটাতেই দিব্যভাবের বা শক্তির প্রকাশ পায় নি, বরং দৈন্যই প্রকাশ পেয়েছে। খৃষ্টীয় সেন্টদের ছবিতেও সেই দৈন্য। আকৃতিগত সৌন্দর্য্যের মধ্যে অন্তর-সৌন্দর্য্য লুপ্ত হ'য়েছে। এই অন্তর-সৌন্দর্য্যের দৈন্য প্রকাশ হয় যতটা সেন্টদের ছবির ভেতর, ততটা প্রকাশ হয় না সাধারণ মানুষের ছবির ভিতর। কারণ সেখানে আমাদের অন্তর চায় না ভাবের ও চিন্তার বিশালতা এবং প্রাণের দিব্য স্পন্দন। এই জন্যেই এ সব ছবিতে প্রাণ ব্যথা ও ক্লেশ অনুভব করে। চিত্ত চায় এখানে তার অন্তর-দৈন্য ক্ষণিক দূর ক'রতে, কিন্তু হৃদয় শূন্য হয় কোনো গভীর ভাব-ব্যঞ্জনার অভাবে। প্রত্যেক চার্চ্চে সেন্টদের যে সব মূর্ত্তি আছে, সে সব মূর্ত্তি এ সব ভাবেরই সাক্ষ্য দেবে। খৃষ্টের প্রত্যেক ছবিখানির সঙ্গে আমাদের দেশের বুদ্ধের ছবির তুলনা করলে এই কথাটা যে কত সত্য তা বুঝতে পারা যায়। ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি অন্তরের গভীর প্রদেশে আঘাত ক'রে, বহির্বিশ্বকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেয় এবং কোনো দিব্যভাবে অন্তরকে পূর্ণ করে। কিন্তু যীশুর ছবিতে এমন দিব্যভাব হৃদয়ে পরিস্ফুট হয় না, বরং ধর্ম্মজীবনের ক্লেশ ও ক্লান্তির কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। যিশুর জীবনের শেষ অধ্যায় একটা দিব্য করুণায় ভরা, কিন্তু এখানকার ছবির মধ্যে করুণাই ফুটেছে—দিব্য ভাবটা ফোটে নি। Christএর ছবির কোনোটার মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আনন্দ-লোকের যে কোনো সম্বন্ধ ছিল, তাঁর অন্তর যে মর্ত্ত্যের পাপের বিশুদ্ধির জন্যে অনন্ত তেজঃপূর্ণ ও কারুণ্যপূর্ণ ছিল

তার সম্যক বিকাশ হয়নি। প্রকৃতির ছবির মধ্যেও প্রাণস্তরের ভাষার সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতির ভিতর আছে যে আনন্দের সন্ধান, তার প্রকাশ কোথাও হয়নি। প্রাণের বেগে অন্তর-আনন্দকে প্রচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। প্রাণের বেগ উপশম না হ'লে বিশ্বের অন্তরের আনন্দের পরিচয় পাওয়া যায় না। ব্যক্তি ও জাতির চরিত্রেও আমি অনুভব করলুম প্রাণের সাড়া ও গতি। কারোর মুখমণ্ডলে একটা শান্ত সৌন্দর্য্যের পরিচয় পেলুম না, কিন্তু প্রাণের ছন্দে এদের জীবন মুখরিত।

ব্রিণ্ডিসীতে সান্ধ্য-সমীরণের কথা কখনো ভুলব না। সন্ধ্যার স্নিগ্ধ ছায়া ধীরে ধীরে আকাশের উপর থেকে পৃথিবীর উপর অবতরণ করল আমি সেই সময় ষ্টেশনের দিকে যাত্রা করলুম। রাস্তা ও ষ্টেশন তখন জনবিরল, রাত্রি ন'টায় ট্রেণ ছাড়বে। কারোর বড় সাড়া নেই, একটি কক্ষে একটি দীপ জ্বলছে না জ্বলার মতো ; কিন্তু এই প্রশান্তির ভিতর হাওয়ার একটা নতি এমনভাবে আমার হৃদয়কে আকৃষ্ট করল যে আমি যেন শান্তির মধ্যে অনন্ত জীবনের স্পন্দনে আবিষ্ট হলুম। মানব-হৃদয়ের উচ্ছ্বাস সর্ব্বত্র শান্ত হওয়াতে অনন্তের ভাষা আমার হৃদয়কে পূর্ণ ক'রে দিয়ে গেলো। ঘড়িতে নটা বাজল, গাড়ী ছাড়ল—আমি রোমের উদ্দেশে যাত্রা করলুম। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলি ইটালীর নানা স্থানের ছবিতে সুসজ্জিত। এই ছবিগুলি দেখে আমাদের দেশের গাড়ীগুলির কথা মনে হ'লো।

পরদিন ভোরে গাড়ী পৌছল রোমে। আমি সকালে গাড়ীর ভিতর হ'তে তুষারাবৃত পর্ব্বতগুলি দেখতে পেলুম। ইটালির সমতল ভূমি কতকটা বাঙ্গালা দেশের মতো নীলবর্ণ দুর্ব্বাদলে আচ্ছাদিত। আমি গাড়ী থেকে নামলুম ; পরক্ষণেই দেখি অধ্যাপক পি, এন্, রায় আমাকে নিতে এসেছেন Instituto Italianoর পক্ষ থেকে। তিনি আমাকে মোটরে নিয়ে হোষ্টল বোষ্টনে পৌছে দিলেন। যেখানে আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছিল।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবার পর বন্ধুবর পি, এন, রায়ের সঙ্গে শ্রদ্ধেয় বন্ধু Scarpa সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রতে গেলুম। তিনি হোটেল Ambassaderdতে থাকেন। Scarpa সাহেব আমাকে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল কলিকাতায়। প্রথম দর্শন হয় বেলুড় মঠে, যেখানে তিনি প্রায় মিস মেকলিওডের কাছে আসতেন। Scarpa হিন্দু সভ্যতার বৈশিষ্ট্য বুঝতে প্রায়ই চেষ্টা করতেন। তিনি বেদান্তের অনুরাগী ছিলেন এবং হিন্দুর যোগ-মার্গকে শক্তি অর্জ্জনের বিশিষ্ট পথ ব'লে মনে করতেন। তিনি হিন্দু সভ্যতার উপর শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং তিনি যখন এই দেশ থেকে চ'লে যান তখন আমাকে লিখেছিলেন যে রোমের থেকে আহ্বান এলে আমি authes pass যেন তা গ্রহণ করি। আমি এই বৎসরেই পূজার ছুটির পরে অধ্যাপক জেন্টিলের আহ্বান পাই রোম থেকে। Scarpa আমার সঙ্গে প্রায়ই কথাবার্ত্তা বলতেন এবং মধ্যে মধ্যে আমার বাড়ীতে এসে বেদান্তদর্শনের প্রজ্ঞার গভীরতার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে তিনি অত্যন্ত সুখ অনুভব করতেন। এখানে দেখতে পাচ্ছি ভারতবর্ষের তন্ত্রশাস্ত্রের উপর বেদান্ত অপেক্ষাও গভীর শ্রদ্ধা। পাশ্চাত্য দেশ শক্তির উপাসক বিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে, এই জন্যে তারা চায় ভারতবর্ষের শক্তিবাদের সঙ্গে সম্যক পরিচিত হ'তে। অধ্যাপকদের ভিতরেও তন্ত্রের উপর এই গভীর শ্রদ্ধা দেখতে পেয়েছি, এবং তাঁরা চান তন্ত্রশাস্ত্রের বিজ্ঞান ও প্রয়োগ কৌশলের সঙ্গে পরিচিত হতে। তন্ত্রের মধ্যে আছে যে দিব্য জ্ঞান ও দিব্য শক্তির সন্ধান—তার পুনঃ প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষে সম্পূর্ণরূপে আবশ্যক হ'য়েছে। এ যুগ শক্তি সাধনার যুগ, শক্তিহীন হওয়াতে আমাদের সব সাধনা ব্যর্থ হ'চ্ছে। শক্তি ত্যাগ ও ভোগ দুই দেয়। শক্তিহীন হ'লে ত্যাগ বা ভোগ কিছুই হয় না। ভারতবর্ষের জীবন বেগ আজ মন্থর, তার কারণ শক্তির উদ্দীপনার অভাব। শক্তি আমাদের স্তরে স্তরে জড়তা নষ্ট করে, মন প্রাণ ও বুদ্ধিকে পুষ্ট ক'রে তোলে এবং তাতে কার্য্যকরী শক্তি অনন্ত গুণে বর্দ্ধিত হয়। ভারতবর্ষে আজ যে শিক্ষা প্রচারিত তাতে বুদ্ধি বৃত্তিকে কিছু পরিমাণে বিকশিত করলেও শক্তিতে দৈন্য এনেছে। ভারতবর্ষে এ যুগের সাধনা শক্তির সাধনা হওয়া চাই, অন্তরের শক্তি যখন কমে আসে তখনই মানুষ বিধি-নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে প'ড়ে যায়। শক্তি যখন দুর্ব্বার গতিতে তার সৃষ্টি সম্ভার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, তখন সে প্রতিমুহূর্ত্তে জীবনের নতুন রস অনুভব করায় এবং উদ্দীপনায় জীবনের বিপুল সম্ভাবনাকে জানিয়ে দেয়।

ভারতবর্ষের সঙ্গে আবশ্যক হ'য়েছে জীবনের এই লীলায়িত ছন্দের বিকাশ, যার ভিতর দিয়ে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে সমষ্টি মানববোধ এবং সমষ্টি মানবের উদ্ধার। মানব-ধর্ম্ম ভারতের এ যুগের মহান ধর্ম্ম। এই মানব-ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে অন্তর শক্তিকে পূর্ণরূপে জাগ্রত করা আবশ্যক। জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সহিত শক্তির বিভূতির সমন্বয় আজ এ জাতির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। শক্তি জীবনকে পল্লবিত করে অনন্ত ধারায়—জ্ঞানের স্থিতির সঙ্গে যোগ-ঐশ্বর্য্যের ঐক্যের অত্যন্ত আবশ্যক হয়েছে এ যুগে। একমাত্র শক্তি এ সমন্বয় করতে পারে; বিজ্ঞানের শক্তিও শক্তি, অধ্যাত্ম শক্তিও শক্তি। সময় এসেছে যখন অধ্যাত্ম শক্তির সহিত বিজ্ঞান শক্তির সমন্বয় হওয়ার একান্ত প্রয়োজন। বিজ্ঞানের শক্তি পার্থিব জীবনে নানা সুখ সম্পদের ব্যবস্থা করে; অধ্যাত্ম শক্তি অন্তর্জীবনের ভিতর স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠা করে এবং নানাবিধ অলৌকিক রহস্যকে উদ্ঘাটন করে। অধ্যাত্ম শক্তির অলৌকিক সামর্থ্যের সঙ্গে আমি কখনো পরিচিত হই নি, কিন্তু এই শক্তি যে মানবচিত্তে পরম শ্রেয়ের সন্ধান ও লাভের পথ খুলে দেয় তাতে কি আর সন্দেহ থাকতে পারে? বিজ্ঞানের দ্বারা প্রকৃতির অন্তরে প্রবেশ ক'রে তার দিব্যভাবের সঙ্গে পরিচিত হবার কোন অধিকার নেই। এই জন্য বিজ্ঞান প্রভূত শক্তি দিলেও আমরা প্রকৃতির গভীর সত্তায় প্রবেশ ক'রে আমাদের স্বভাবের পরিবর্ত্তন করতে পারি না। মানুষ এত সম্পদ-সম্ভারে পূর্ণ হ'য়েও তার আদিম প্রকৃতির সংস্কারগুলি এখনও পরিত্যাগ করতে পারে নি। তার কারণ এই নয় কি—যে মানুষের অনন্ত ক্ষুধা ও জিগীষা তার অন্তরের যে রূপের পরিচয় দেয় সভ্যতার ক্রমবিকাশ হ'য়েও মানুষের সে স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। ভারতে এই জন্য অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হ'য়েছিল, যে বিজ্ঞানের লক্ষ্য ছিল মানুষের স্বভাব ও সংস্কারের পরিবর্ত্তন। যোগ বলতেই লোকে সাধারণতঃ মনে করে যে মানুষের এমন শক্তি হ'তে পারে যে, যার দ্বারা তার স্বাস্থ্য ও সম্পদ অক্ষুণ্ণ থাকে এবং অলৌকিক উপায়ে তার প্রভাব বিস্তার ক'রতে পারে। কিন্তু যোগের লক্ষ্য তো এ নয়, তার লক্ষ্য স্বভাবের ও সংস্কারের পরিবর্ত্তন ক'রে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করা। অন্তর্জীবনকে সুসংস্কৃত করে—মানবত্বকে দিব্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করে—বিকাশ করে এক অনুপম সৌন্দর্য্য ও মাধুরী সঞ্চার করে এক নবীন শক্তি—যার সাহায্যে মানুষ লাভ ক'রতে পারে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান। মানব-চিত্তের পাশবিক ভাবনিচয় দূরীভূত না ক'রতে পারলে জীবনে বহু সমস্যার ও সংশয়ের সমাধান হইতে পারে না। এই জন্যই হিন্দুর মনীষা, জীবনের ভিতর আছে যে উর্দ্ধ আধ্যাত্মিক স্রোত—তাকে গ্রহণ ক'রে মানুষের দিব্য পরিণতি ও মুক্তিকে আকাঙ্ক্ষা করেছিল। এইরূপ আদর্শের সন্ধান মানুষের সামনে না থাকাতে আজ অনেক সমস্যার সৃষ্টি হ'য়েছে। শক্তি মাত্রই মানুষের কাম্য নয়। যে শক্তি মানুষকে দিব্য বিভূতির দিকে নিয়ে যায় তাই তার কাম্য। এই যোগ-দৃষ্টির দ্বারা যেদিন বিজ্ঞান নিয়ন্ত্রিত হবে সেদিন হবে শক্তির ও শান্তির সমন্বয়। সমস্ত জগত চাইছে এই সমন্বয়। ভারতবর্ষে আমরা গৌরব ক'রে থাকি যে আমরা অধ্যাত্ম-সম্পন্ন জাতি; ব্যক্তি বিশেষের কথা ছেড়ে দিলুম, কিন্তু এ কথা বোধ হয় সম্পূর্ণরূপে জাতির পক্ষে সত্য নয়। যে জাতি অধ্যাত্ম শক্তিতে সঞ্জীবিত সে জাতির কোথাও লাঘবতা থাকে না। ভারতবর্ষের অন্তর্জীবনে নানা দৈন্য আছে; ভারতের আজ যে এই অবস্থা তার কারণ অপার্থিব তত্ত্ব আলোচনার জন্য নয়, তার কারণ অধ্যাত্ম শক্তির অভাব। অধ্যাত্ম শক্তি উদ্বোধিত হ'লে মানুষের অনন্ত বিকাশের পথ খুলে যায়; রাষ্ট্র ও সমাজপরিবার জীবনের পূর্ণ বেগে উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে। আজ ভারতবর্ষের আবশ্যক আছে এই অধ্যাত্ম শক্তির; অধ্যাত্ম শক্তি কোন ব্যক্তি বা জাতির জীবনে জড়তা আনে না। প্রথমে জাতির জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে শান্তি এবং শান্তির মধ্যে বিকাশ করে শক্তির। শান্তি হ'লো শক্তির প্রতিষ্ঠা, জ্ঞান হ'লো অভয়ের প্রতিষ্ঠা।

এইবার Scarpa সাহেবের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা ব'লে হোটেলে ফিরলুম। Scarpa অধ্যাপক জেন্টিলেকে আমার আগমনবার্ত্তা জানিয়ে দিলেন এবং আমাকে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা জেন্টিলের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন একথা আমাকে বললেন। অধ্যাপক রায় ও আমি বিদায় নিয়ে রাস্তায় বেরলুম এবং রোমের নানা স্থানে দেখা-শুনো করলুম। সে সব কথা আগামীবারে বলব।

রোম, ৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৩৪।

এপ্‌ষ্টাইন্‌ ও নবযুগের ভাস্কর্য্য

শ্রীনরেন্দ্র দেব

অধুনা শিল্প-জগতে যে একটা নূতনত্বের সাড়া জেগেছে, যেটাকে প্রাচীনপন্থীরা 'অতি-আধুনিক' ব'লে অবজ্ঞা করেন এবং বর্ত্তমান যুগের কলাবিদ্‌ ও শিল্প-রসজ্ঞেরা যেটাকে নব-শক্তির নবীন আবির্ভাব জ্ঞানে শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিনন্দিত করেন, তার সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অভিব্যক্তি ও বিচিত্র বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় বর্ত্তমান ভাস্কর্য্যের মধ্যে। সুতরাং এই 'অতি-আধুনিকতার' যে অতি-নিন্দিত ও অতি-স্তুত শিল্প-সৌন্দর্য্য, তার প্রকৃতিগত ভাব ও রূপের বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে হ'লে ভাস্কর্য্য শিল্প নিয়ে অনুশীলন করাই প্রকৃষ্ট পন্থা!—কেন না, ভাস্কর্য্য এমন একটা শিল্প যার সাহায্যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বা প্রকৃতিগত রূপটিকে শুধু যে স্পর্শ



"পেগী জীন" (এপ্‌ষ্টাইনের রচিত একটি বালিকার মুখ—কাদা-মাটির তৈরি)

করা যায় তাই নয়, নির্ভুল ভাবেই ধরা যায়। রং ও তুলির কোমল স্পর্শে রূপ ও রেখার বৈচিত্র্য নিয়ে যে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করা যায় তা দিয়ে লোক ভোলানো খুবই সহজ, কিন্তু কঠিন শিলার বুকে কঠিনতম লৌহকুলিকের বলিষ্ঠ আঘাতে যে অপরূপ স্বপ্নকাব্য রচনা করেন ভাস্কর্য্য-শিল্পের আচার্য্যগণ—তার মধ্যে ফাঁকি চলে না। দৃষ্টি-বিভ্রম সৃষ্টি করবার সুযোগ বা অবকাশ কোনোটারই সুবিধা পান না তাঁরা। কাজেই তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে ফুটে ওঠে সাধনার সেই ধ্যানমূর্ত্তি—যার প্রতি অণু পরমাণু শিল্পীর প্রাণের স্পন্দনাবেগে অনুপ্রাণিত।

ভারতের প্রাচীন ভাস্কর্য্য এবং চীন ও মিশরের অতীত শিলা-শিল্প যাঁরা অনুশীলন ক'রে দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে সেকালে প্রাচ্যের পৌরাণিক শিল্পীরা বাহিরের দিকে সতর্ক দৃষ্টি না রেখে অন্তরের ঐশ্বর্য্যকে ফুটিয়ে তোলবার কঠিন প্রয়াসেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই কৃচ্ছ্র সাধনায় সিদ্ধি লাভ ক'রেই তাঁরা অমরত্ব অর্জ্জন ক'রতে পেরেছেন। কোনো মূর্ত্তিগঠনরত ভাস্করের যদি একমাত্র লক্ষ্য হয় যে বিষয়বস্তুর স্থূল প্রতিরূপটি এমন অবিকল সৃষ্টি করবো যে আসলে ও নকলে তিলমাত্র প্রভেদ থাকবে না কোথাও, সে প্রচেষ্টা তাঁর সকল দিক দিয়েই হয়ত সার্থক ও সুন্দর হ'য়ে উঠতে পারে—যেমন গ্রীসের প্রাচীন শিলা-শিল্প ও রোমের ভাস্কর্য্য একদিন য়ুরোপের গর্ব্ব ও গৌরবের সামগ্রী হ'য়ে উঠেছিল; কিন্তু একথাও ঠিক যে তা' শিল্পশাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিচারে ভাব ও পরিকল্পনার উচ্চ স্তরে কোনো দিনই তার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। দেহের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অন্তরের সৌন্দর্য্যকে উদ্ভাসিত ক'রে তোলাই যে উচ্চাঙ্গের শিল্পকলার চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত য়ুরোপ আজ সে সত্য আবিষ্কার ক'রতে পেরেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত য়ুরোপের শিল্প জগতে realism বা বাস্তবতার যুগই প্রাধান্য লাভ করে এসেছে; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সূক্ষ্ম রসবেত্তা ও শিল্প সমালোচকেরা তাতে পরিতৃপ্ত হ'তে পারেন নি। তাঁরা বারম্বার এর প্রতিবাদ করেছেন। Mr. Max Beerbhoom এই বাস্তবপন্থী ভাস্কর্য্য-শিল্পকে উপহাস করে বলেছেন "The details that go to compose this or that gentleman's appearance, such as the little wrinkles round

his eyes, and the way his hair grows, and the special convulsion of his ears, all these···are not right matters for the chisel···sculpture is too august to deal with what a man has received from his maker, and much less ought it to be bothered about what he has received from his hosier and tailor !"

অর্থাৎ মোটের উপর তিনি বলছেন আকৃতিটাই মানুষের সব নয়। বাইরেটাকে হুবহু ফুটিয়ে তোলাই ভাস্কর্য্য-শিল্পের আদর্শ হ'তে পারে না। বিধাতার কাছ থেকে পাওয়া বা সৃষ্টিকর্ত্তার দেওয়া যে রূপ তা নিয়ে শিল্পীর কারবার চলে না! বেশভূষা অলঙ্কার প্রভৃতি যেমন মানুষের একটা বাহুল্য আবরণ মাত্র, তার বাইরের আকৃতিটাও তেমনি শিল্পীর কাছে একান্ত অনাবশ্যক !

তবে ভাস্কর্য্য-শিল্পের অবলম্বন কি ? এ প্রশ্নের উত্তরে কলাবিদগণ বলেন আত্মার অন্তর্নিহিত ভাব-মূর্ত্তিকে রূপায়িত ক'রে তোলাটাই হ'চ্ছে ভাস্করের প্রকৃত সাধনা! তার কল্পনা বিচরণ করুক দেহাতীত রূপের ঐশ্বর্য্য সন্ধানে। তার কঠিন করধৃত তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে কঠোর পাষাণ বিদীর্ণ হয়ে উৎসারিত হোক অন্তর তলের অনন্ত সম্পদ—যা এক-মাত্র তাপসের ধ্যান দৃষ্টির গোচর। শিল্পরাজ্যে স্থূলতার স্থান নেই। অতীন্দ্রিয় জগতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলাক্ষেত্র যেখানে পরম রূপ রসের বিচিত্র বিকাশ আত্মগোপন ক'রে আছে। বিরাট পাষাণ স্তূপ—যা একান্ত গুরুভার বস্তুপিণ্ড মাত্র! সেই কঠিন হিমশীতল জড়পদার্থ যার পূজার একমাত্র উপকরণ, যা নিয়ে ভাস্কর্য্য-শিল্পীকে সৃষ্টি করতে হয় প্রাণ-চঞ্চল সজীব জীবের লঘু লীলায়িত ললিত সৌন্দর্য্য—মর্ত্ত্য-লোকে যা নিয়ে আসে এক সার্ব্বজনীন শাশ্বত আবেদন !—সে যে রূপদক্ষ শিল্পীর কত বড় শক্তি ও প্রতিভার পরিচায়ক সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই !

শক্তিমান শিলাশিল্পী যিনি তিনি কেবলমাত্র ঈষৎ আভাসে—একটু ইঙ্গিতে,সামান্য কোনো প্রতীকের সাহায্যে তাঁর ধ্যানের মূর্ত্তিকে এমন এক অতুলনীয় রূপ দিতে পারেন যে রূপের অনুপম বৈশিষ্ট্য সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীরও একটা বিশিষ্ট প্রতিভা বিজ্ঞাপিত করে এবং যা উত্তরকালেও তাঁর অক্ষয় খ্যাতির স্মৃতিস্তম্ভরূপে শিল্পজগতে বিরাজিত থাকে। সেই শিল্পীই প্রকৃত ভাস্কর যিনি কোনো মহাপুরুষের প্রতিমূর্ত্তি গঠন করবার সময় তাঁর বাহ্যিক খোলসটার



"ক্যালের নাগরিকগণ" (রোঁদার রচিত এই অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্যে যেন অনন্তকালের জন্য ধরা দিয়েছে গতিবেগের একটি চলন্ত মুহূর্ত্ত ! এই চকিত দৃষ্টিতে গৃহীত চপল চাহনীকে চিরন্তন করে ধরে রাখাই ছিল রোঁদার বিশেষত্ব। কিন্তু নবযুগের ভঙ্গীতে এও প্রাচীন রীতির মধ্যে পড়ে গিয়েছে।

প্রতি তত বেশী লক্ষ্য না রেখে তাঁর আত্মগত প্রাণ-প্রকৃতির প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হন।

উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভাস্কর্য্য-শিল্পের রাজ্যে এই বিশ্বজনীন চিরন্তন ভাবাভিব্যক্তির একান্ত অভাব দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু অত্যন্ত সুখের বিষয় এই যে বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতে একাধিক শিল্প-সাধক ভাস্কর্য্যের এই অনুদ্‌ঘাটিত দিকটার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। তাঁদের বিভিন্ন প্রচেষ্টার মধ্যে যতই কেন অদ্ভুত ও অদৃষ্টপূর্ব্ব ভঙ্গী প্রকট হয়ে উঠুক না, তাঁদের এ উদ্যম সকল দিক দিয়েই আশাপ্রদ!



ব্যারোক ভাস্কর্য্য (দেখে মনে হয় যেন একখানি পটে আঁকা ছবি! কঠিন পাষাণশিলা এদের হাতে জাত হারিয়েছে। সব কিছুই হয়ে উঠেছে একান্ত কমনীয় ও পেলব!)

রেণেশাঁসের যুগে অর্থাৎ য়ুরোপে গ্রীক ও রোমান সাহিত্য এবং ললিতকলার প্রভাবে যে একটা নব যুগের অভ্যুদয় হয়েছিল সেই সময় কি সাহিত্যে, কি চিত্রশিল্পে, কি ভাস্কর্য্যে, ললিত কলার সকল বিভাগেই বাস্তবতার একান্ত প্রভাব একেবারে ওতপ্রোত হ'য়ে উঠেছিল দেখা যায়। এই বাস্তবতার মোহে আকৃষ্ট হ'য়ে বস্তুকে নিখুঁত ও সুন্দর করে গড়ে তোলবার জন্য কত না শিল্পী প্রাণপাত করে গেছেন! চিত্র-শিল্পের ভিতর দিয়ে রূপদক্ষদের এই মহতী প্রচেষ্টার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়। বস্তুতন্ত্রের সাধনা যেন সে যুগের শিল্পীদের জীবনের একমাত্র ধর্ম্ম হ'য়ে উঠেছিল।

বিংশ শতাব্দীতে দেখা দিলো তার অবশ্যম্ভাবী প্রতি-ক্রিয়া! বস্তু মানুষের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ ক'রতে পারে, কিন্তু মন ভরিয়ে তুলতে পারে না। তাই মনের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত



কাফ্রিদের মূর্ত্তি-শিল্প

করবার জন্য শিল্পীর চিত্তে জেগে উঠেছিল এক অদম্য আকুতি! আপন সৃষ্টিতে সে সম্পূর্ণ সন্তোষলাভ ক'রতে পারে নি। তার কলা-নৈপুণ্য সেদিন তাকে অশেষ যশ-গৌরবে মণ্ডিত ক'রে তুলেছিল বটে, কিন্তু প্রাণের মধ্যে কোথায় যেন কি একটা দৈন্য তাকে অহরহ পীড়া দিয়েছে! পরম পরিতুষ্টির অনির্ব্বচনীয় আনন্দ সে লাভ করতে পারে নি!

করলেন।

তাই বস্তুর অতীত রূপের সন্ধানে বিংশ শতাব্দীর বহু শিল্পীকে আমরা অভিযান করতে দেখি। অপরিজ্ঞাত যাত্রাপথের প্রতি বাঁকে বাঁকে অনেকেই তাঁরা তাঁদের সেই ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের প্রাথমিক রচনাগুলি রেখে গেছেন অগ্রগামিনী শিল্প-লক্ষ্মীর চারু চরণ-চিহ্ন স্বরূপ! কিন্তু আমাদের অজ্ঞতা ও মূঢ়তা বশতঃ সেগুলিকে আমরা "অতি-আধুনিক" আখ্যা দিয়ে উপহাস ও অশ্রদ্ধা করি! অবশ্য এ কথা ঠিক যে শিল্পে এই 'অতি-আধুনিকতার' অসংখ্য উদ্ভট নিদর্শন দেখে আমাদের মধ্যে অনেকেরই মনটা অকস্মাৎ তার প্রতি বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে! এর কারণ কিন্তু আর অন্য কিছুই নয়, একমাত্র শিল্পরাজ্যে এতকাল ধরে যা দেখতে আমরা অভ্যস্ত হ'য়ে পড়েছি সেই চির পরিচিত এবং মন, বুদ্ধি ও দৃষ্টির একান্ত অধিগত রূপটিকে আমরা এর মধ্যে খুঁজে পাই নে বলে! যা পাই তা আমাদের অচেনা এক আগন্তুক! আমরা তার অন্তরঙ্গ পরিচয়ও জানি না, আমরা তার বক্তব্যের ভাষাও বুঝি না! অতএব তাকে আপনজন বলে চিনে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করতে আমাদের সনাতন এবং রক্ষণশীল শিক্ষা, সভ্যতা ও শিষ্টাচারে বাধে!

কিন্তু এ বাধা দূর হওয়া খুব কঠিন নয়। যদি এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের আগ্রহ কারুর মনে জাগে—তাহ'লে এই "অতি-আধুনিক" শিল্প পদ্ধতির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপনে বিলম্ব হয় না এবং এদের ভাষাও অচিরে আমাদের বোধগম্য হ'তে পারে। এর জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন নবাগতের প্রতি একটু আন্তরিক শ্রদ্ধা, নূতনকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করবার অকপট সদিচ্ছা এবং প্রাচীন সংস্কারের মোহ-মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে একে সম্যকরূপে পর্য্যবেক্ষণ করা।

য়ুরোপের এই নবযুগের ভাস্কর্য্যশিল্পকে বুঝতে হ'লে আগে ভুলে যেতে হবে যে এথিনিয়ান রীতির তক্ষণশিল্প যা পরে পার্থেনন ভাস্কর্য্যশিল্পে পরিণত হয়েছিল এবং ফ্লোরেন্টাইন রীতির শিলা-কলা যার চরম পরিণতি



মিশরীয় শিলা-শিল্প (খৃঃ পূঃ ২০০০ শতাব্দীর রচনা)

দেখতে পাওয়া যায় ডনাতেলো এবং মাইকেলেঞ্জেলোর মধ্যে—একদিন তা' অপ্রতিহত প্রভাবে য়ুরোপের সমগ্র শিল্পলোক আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিল! মনে রাখতে হবে



চীনের ভাস্কর্য্য (মূল্যবান জেড্ প্রস্তরে গঠিত)

যে আরও দূরতর অতীতে জগতে আরও এমন সব সভ্যতা-দীপ্ত মহাদেশ ছিল যেখানে চিত্র ও ভাস্কর্য্যশিল্পের আরও একাধিক এমন রীতি ও পদ্ধতি প্রচলিত ছিল যার

অনুসরণে বহুশিল্পী এমন অপূর্ব্ব আদর্শ সৃষ্টি ক'রতে পেরেছিলেন যা আজও ত্রিভুবনের বিস্ময় জাগিয়ে রেখেছে! 'এপোলো'র মত পুরুষ এবং 'ভেনাস'এর মত নারীই ভাস্কর্য্যশিল্পের মধ্যে নর-নারীর দৈহিক সৌন্দর্য্য প্রকাশের চরম বা একমাত্র অবলম্বন নয়।

নবযুগের ভাস্কর্য্য সমস্ত অনতি-প্রাচীন সংস্কারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম ক'রে অখিল পৃথিবীর বিশাল শিল্পক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে খুঁজে দেখবার চেষ্টা করছে—আর কোনো রীতি—আর কোনো ভঙ্গী—আর কোনো প্রণালীতে



পল রব্‌সন (এপ্‌ষ্টাইন রচিত কাদামাটির মূর্ত্তি)

ভাস্কর্য্যশিল্পের চরম সৌন্দর্য্যকে রূপায়িত ক'রে তোলা যায় কি না? অজানার সন্ধানে এই যে তাদের নূতনপথে যাত্রা—এর জন্য যদি তাদের কখনো বিপথেই ঘুরতে দেখা যায় তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই! একাধিক নব নব ধারাবিধি গড়ে উঠছে দেখে বিরক্ত হবারও কোনো কারণ নেই! যে হেতু প্রথম পথ কেটে চলে যারা, তাদের এমনি করেই আন্দাজে নানা অজানা পথ ধ'রে অগ্রসর হ'তে হয়।

শিলাশিল্পের নব-পতাকাবাহী ভাস্কর শ্রীযুক্ত এরিক্ হিল্ যিনি মধ্যযুগের অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর ভাস্কর্য্য-রীতির একান্ত পক্ষপাতী, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যদি আমরা কোথাও কঠিন সংযম ও বলিষ্ঠ বৈরাগ্যের পরিচয় পাই, তাহ'লে ত্রয়োদশ শতাব্দীর ভাস্কর্য্য-রীতির অন্ধ অনুকারী বলে তার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা আমাদের চলবে না! লিঁয়ো আণ্ডারউড্ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নবযুগের ভাস্কর-সূর্য্য শ্রীযুক্ত এপ্‌ষ্টাইন্ পর্য্যন্ত কাফ্রীদের আদিম বর্ব্বরতার রূঢ় প্রকাশভঙ্গী অথচ সহজসুন্দর অভিব্যক্তিটি অনুসরণ করেছেন। কিন্তু তা ব'লে একে অনুকরণ বলা যেতে পারে না



"নিশিথিনী" (এপ্‌ষ্টাইন রচিত প্রসিদ্ধ মর্ম্মর-শিল্প)

কোনো কারণেই। এ যেন প্রতিধ্বনির ধ্বনিটুকু তিনি শুনিয়েছেন আমাদের; ধ্বনির প্রতিধ্বনি করেন নি কোথাও! কাফ্রীদের রূঢ় বর্ব্বর আদিম প্রকাশভঙ্গী এপ্‌ষ্টাইনের প্রতিভার সংস্পর্শে এসে যেন এক অভিনব শিল্পলোক সৃষ্টি করেছে। যদিও এই প্রাক্-প্রাচীন নব ভাস্কর্য্য ভঙ্গীকে ঠিক প্রত্যক্ষধর্ম্মী বলা চলে না, বরং ঋণাত্মক বলা চলে; কারণ অতিপ্রাচীনের অনুকরণ না হ'লেও কতকটা অনুসরণতো বটে! তা সে আদিযুগের মিশরীয় ভাস্কর্য্য রীতিই হোক্, আর মধ্যযুগের কাফ্রি শিল্পকলাই হোক।

এঁদের সৃষ্টি যেন দর্শকদের ডেকে বলতে চায়—'চেয়ে দেখো আমরা গতানুগতিকের প্রভাব এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেছি!'

নবযুগের এই ভাস্কর্য্যভঙ্গী আপাতদৃষ্টিতে ঋণাত্মক বলে মনে হলেও এর পশ্চাতে আধুনিক শিল্পীর প্রত্যক্ষানুভূতি যে কতখানি আছে তা অনায়াসেই বোঝা যায়। কোনো শিল্পী কোনো একটা বিশেষ ভঙ্গী পছন্দ ক'রেন বলেই তিনি যে আগে সেই রীতিটিতে অভ্যস্থ হ'য়ে তবে রচনা সুরু করেন এ ধারণা কিন্তু অত্যন্ত ভুল। ভঙ্গী বা রীতি কখনো অনুকরণ ক'রে আয়ত্ত হয় না, ওটা শিল্পীর একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য—যা তার রচনার মধ্যে তার নিজের অজ্ঞাতেই স্বতোৎসারিত হ'য়ে ওঠে! শিল্পী শুধু জানে তার ধ্যানের ধনটি কি?—কিন্তু কেমন করে যে সেই



মধ্যযুগের শিলা শিল্প। (নবযুগের ভাস্কর এবিক্‌গিলের রচনায় এই মধ্যযুগের ভাস্কর্য্য রীতির প্রভাব খুব বেশী রকম চখে পড়ে)

ধ্যানমূর্ত্তি গড়ে উঠবে তার কোনো হদিসই সে জানে না। সুতরাং শিল্পরাজ্যের প্রধান ছাড়পত্র হচ্ছে 'কি রচনা করবো' সেইটে জানা—'কেমন ক'রে করবো' সেটা আগে ভেবে রাখা নয়।

একসময় 'ব্যারোক' ভাস্করদের (Baroque Sculptors) মধ্যে এইটেই ছিল পরম আনন্দ ও গৌরবের ব্যাপার যে প্রচণ্ড ভারি ও কঠিন এবং প্রকাণ্ড সব পাথর কুঁদে কে কত বেশী তাকে লুতাতন্তু সদৃশ্য সুক্ষ্ম ও চিকণরূপে পরিদৃশ্যমান ক'রে তুলতে পারে এবং এমন একটা দৃষ্টিবিভ্রম সৃষ্টি করতে পারে যাতে সেই ভারি ও কঠিন প্রস্তর শোলার ন্যায় লঘু ও মাখনের ন্যায় কোমল মনে হবে! সপ্তদশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর 'বার্নিনি' ছিলেন এ বিষয়ে একেবারে সিদ্ধহস্ত! কঠিন প্রস্তর খণ্ড তাঁর যাদুকরস্পর্শে হ'য়ে উঠতো বায়ু-চঞ্চল উত্তরীয় বাস বা রেশমী বসনাঞ্চলের মত; অথবা



ম্যাডোনার মূর্ত্তি (লিয়োঁ আণ্ডারউডের রচিত) (কাফ্রি ভাস্কর্য্যের অনুসরণে)

শরতের নির্ম্মল আকাশে ভাসমান লঘুশুভ্র মেঘমালার মত কিম্বা লাবণ্যময়ী তরুণীর কুসুম-কমনীয় অঙ্গসুষমার মত! কাজেই তাদের ছোঁয়া লেগে পাথরের জাত গিয়েছিল বলা যেতে পারে! অবশ্য এই মেহনতের একটা দাম আছে। এ কৃতিত্বেরও তুলনা হয় না—একথা উচ্চকণ্ঠেই স্বীকার করতে হবে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! দর্শকের সপ্রশংস দৃষ্টি এবং তাদের কণ্ঠের মুখর প্রশংসার বাণী ছাড়া তারা আর কি পায়? ব্যারোক ভাস্কর্য্যভঙ্গী গভীরভাবে আমাদের মনকে স্পর্শ

করতে পারে না, অন্তরের মধ্যে একটা নিবিড় অনুভূতির সাড়া জাগিয়ে তোলে না। ক্ষণিকের জন্য একটা বিস্ময় বিমুগ্ধ আনন্দ সে দিয়ে যায় বটে, কিন্তু চিরন্তন রসাবেশের কোনো অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি তার মধ্যে নেই! ভারতের ভাস্কর্য্য, চীনের শিলাশিল্প, মিশরের প্রস্তরকলার মধ্যে আমরা সেই দুর্লভ আদর্শের সন্ধান পাই যা কেবলমাত্র শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে—একেবারে অন্তরের অন্তঃপুরে; বাহিরের অবগুণ্ঠনে আবদ্ধ হ'য়ে নিঃশেষিত হয় না।

গ্রীক ভাস্কর্য্যের আদর্শ ছিল শুধু বহিরাবরণের সৌন্দর্য্যটাকে নিয়েই মত্ত হ'য়ে। তাই রূপের ঐশ্বর্য্য রয়ে



ম্যাডোনার মূর্ত্তি (আইভান মেষ্ট্রোভিক্ রচিত নবযুগের অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্য!)

গেল তার কাছে কেবল রক্তমাংসের এই দেহটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অরূপের যে অপরূপ সম্পদ—সে আর তার সন্ধান পেলে না কোনো দিন। বস্তুর সাধারণ জ্ঞানের মধ্যেই তার কল্পনা বন্দিনী হ'য়ে রইলো; রূপাতীতের রূপ ধ্যান করে তার শিল্পসৃষ্টি আর অসামান্য হ'য়ে উঠতে পারলে না!

পাশ্চাত্যজগত এতকাল ছিল এই গ্রীক ভাস্কর্য্য শিল্পেরই একান্ত ভক্ত শিষ্য! কলা-লক্ষ্মীর অন্তরের প্রসাদ সে লাভ করতে পারে নি, পেয়েছিল শুধু তাঁর বহিরাবরণের সৌন্দর্য্যটুকু! তাই এতদিন সে ছিল শুধু রূপের মোহেই মুগ্ধ হ'য়ে। অন্তর লোকের অনন্ত ঐশ্বর্য্য থেকে বঞ্চিত তাঁর মন তাই হাহাকার করে ঘুরেছে একটা অতৃপ্তির অস্থিরতা নিয়ে! আজ তার ধ্যানদৃষ্টি উন্মীলিত হ'য়েছে! তার অভাব ও দৈন্য যে কোথায়, সেটা যেন কতকটা সে বুঝতে পেরেছে! তাই নবযুগের ভাস্কর্য্য আজ অধীর হ'য়ে রূপের অন্তঃপুর দ্বারে করাঘাত সুরু করেছে! এতকাল যে ঐশ্বর্য্য ছিল তার কাছে অবগুণ্ঠনের অন্তরালে সংগুপ্ত, আজ সে যেন তার একটু কিছু সন্ধান পেয়েছে! অরূপের অপরূপ সৌন্দর্য্যের ঈষৎ আভাসেই সে যেন আজ আত্মহারা!



প্রস্পেরো ও এরিয়েল (এরিকগিলের রচিত এই ভাস্কর্য্য ভঙ্গীর সঙ্গে স্থাপত্য-কলারীতির বেশ একটা যোগ দেখতে পাওয়া যায়।)

শিলাশিল্পের সৌভাগ্যবান সাধক এপ্‌ষ্টাইন আজ প্রাচ্যজগৎকে চমকিত ক'রে তুলেছেন তাঁর এই নবলব্ধ ঐশ্বর্য্যের অসীম সৌন্দর্য্যে! ভাস্কর্য্যশিল্পের ক্ষেত্রে তিনি আজ যে নব আদর্শের সন্ধান এনে দিয়েছেন, পূর্ব্ব আদর্শের সঙ্গে তুলনায়

তা যে কত বৃহৎ ও কত মহৎ সেটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় তাঁর "নিশিথিনী" (Night) মূর্ত্তিটির দৃষ্টান্ত থেকে! রোমের সেণ্ট্‌পিটার্স ধর্ম্মমন্দিরে ভাস্করাচার্য্য মাইকেলেঞ্জেলোর রচিত যে মর্ম্মর মূর্ত্তিগুলি আছে তার মধ্যে 'Pieta' অর্থাৎ ধর্ম্মানুরাগ বা ঈশ্বরে পরানুরক্তি সম্বন্ধীয় মূর্ত্তিটি অবলম্বনেই যে এপষ্টাইন্ তাঁর এই "নিশিথিনী"র সৃষ্টি ক'রেছেন এটা অস্বীকার করা চলে না; কিন্তু পরিকল্পনার ঐশ্বর্য্যে ও অভিব্যক্তির সৌন্দর্য্যে এপ্‌ষ্টাইনের সৃষ্টি যে মাইকেলেঞ্জেলোর অপেক্ষা বৃহত্তর ও মহত্তর হয়ে উঠেছে একথাও অকপটে স্বীকার করতে হবে। মাইকেলেঞ্জেলো তাঁর নিপুণ করে পাষাণের বক্ষ হ'তে সৃষ্টি করেছেন একটি মহিয়সী রূপসী নারী—যাঁর অঙ্কে শায়িত রয়েছে প্রভু যীশুখ্রীষ্টের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মৃতদেহ! দুটি মূর্ত্তির সংযোগে সৃষ্ট এই আদর্শ যুগলরূপ! দুজনেই বাস্তব জগতের নরনারী! কিন্তু "নিশিথিনীর" মধ্যে এপষ্টাইন্ ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন কল্পলোকের দুটি ভাবরূপকে। বাস্তবতার লেশমাত্র এর মধ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। জননীর কোলে সন্তান নিদ্রাতুর—এ আদর্শকে তিনি এর মধ্যে বড় হ'য়ে উঠবার সুযোগ দেন নি! সুতরাং এ মূর্ত্তিটি 'বাস্তববাদ' ও 'আদর্শবাদ' উভয় তন্ত্রকেই বাদ দিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। মানব দেহের শারীরিক গঠনপারিপাট্যের দিক থেকে বিচার করলেও এ মূর্ত্তি নিয়ে হতাশ হ'তে হবে, কারণ দেহের মাপকাঠি দিয়ে এপ্‌ষ্টাইন্ এটি গড়েনি। কিন্তু এ-মূর্ত্তির মধ্যে নিবিড় 'নিশিথিনীর' শান্ত গভীর স্তব্ধতা যেন ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত! নিখিল জগৎ যেন এই অন্ধকার রাত্রির ক্রোড়ে অগাধ ঘুমঘোরে অচেতন! এর পট ভূমিকায় যেন বিশ্বের ঘুমপাড়ানিয়া গানের মৃদু মন্থর সুরটি জমাট বেঁধে রয়েছে! যেমন বিরাট দিগন্তপ্রসারী এর পরিকল্পনা, তেমনি দৃঢ় বলিষ্ঠ শক্তিমান এর ব্যঞ্জনা। এ যেন প্রতিভার প্রদীপ্ত সূর্য্যোদয়। এর তুলনায় মাইকেলেঞ্জেলোর সৃষ্টি যেন ক্ষুদ্র এক সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ সামান্য একটু আলো!

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এ হেন শক্তিশালী ভাস্কর এপ্‌ষ্টাইনও কোনো প্রসিদ্ধ লোকের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করবার সময় তাঁর এই বিরাট আদর্শের অনুসরণ করেন না। বাহিরকে অস্বীকার ক'রে মানুষের অন্তরপ্রকৃতির রূপটি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা না ক'রে তাঁকে আমরা অপরাপর মূর্ত্তি-শিল্পীর মতই মানুষটির বহিরাবরণের নানা ছোট-খাটো খুঁটি-নাটির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে দেখি—যাতে আকৃতি-গত সাদৃশ্যটাই বড় হয়ে ওঠে, প্রকৃতির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। এ-বিষয়ে তাঁকে একেবারে রোঁদার সাক্ষাত-শিষ্য বা উত্তরাধিকারী বলা যেতে পারে!

নবযুগের ভাস্কর্য্যরীতি একটা মহৎ নীতি আবিষ্কার করেছে, সেটা হ'চ্ছে উপাদানের সম্মান রাখা বা উপকরণের মর্য্যাদা রক্ষা করা! অর্থাৎ পাথর কেটে যদি তারা মূর্ত্তি গড়ে তবে পাথরের ঋণ তারা অস্বীকার করবে না! মাটির মণ্ড নিয়ে যদি তারা মূর্ত্তি গড়ে, মাটির বৈশিষ্ট্য তারা নষ্ট করবে না! কারণ, তারা বলে—উপাদানভেদে রূপের ব্যঞ্জনা ও ভাবের অভিব্যক্তি বিভিন্নতর হ'তে বাধ্য! কেন না পাথর কেটে যখন মূর্ত্তি গঠন করা হয় তখন মূর্ত্তি রূপায়িত হ'তে থাকে বাহিরের দিক থেকে উপাদানের বহিরঙ্গ অবলম্বনে। কিন্তু কাদামাটির তাল নিয়ে যখন মূর্ত্তি গড়া সুরু হয় তখন মূর্ত্তি আকার ধারণ করতে আরম্ভ করে ভিতরের দিক থেকে, অর্থাৎ উপাদানের অভ্যন্তরভাগ আশ্রয় ক'রে। সুতরাং এর মধ্যে যে স্বাভাবিক পার্থক্য বর্ত্তমান থাকে তাকে "ফিনিশিং টাচ্" দিয়ে নষ্ট করা উচিত নয়। কঠিন প্রস্তরখণ্ডের কাঠিন্য তখনই প্রতিভাত হবে যখনই বাটালীর রূঢ় আঘাতগুলি মূর্ত্তি-সন্দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের চোখে পড়বে। মাটির তালের এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো দাগ ও টাল-টোলগুলি বজায় রাখলে তবেই মাটির মর্য্যাদা রক্ষা হবে। চেঁচে-ছুলে পালিশ করে ছেড়ে দিলে পাথর ও মাটি দুইয়েরই জাত নষ্ট হবে। নবযুগের ভাস্কর, অতি আধুনিক শিল্পী বলে নিন্দিত Gill, Moore এবং Ivan Mestrovic এর রচনার মধ্যে এই বিশেষত্বটুকু সম্পূর্ণ বজায় থাকে বলে সমালোচকেরা তাঁদের রচিত মূর্ত্তিগুলিকে কুৎসিত ও বীভৎস বলে উপহাস করেন। কিন্তু, শিল্পীর যুক্তি দিয়ে দেখলে উপাদানের প্রতি তাদের এই কৃতজ্ঞতাকে শ্রদ্ধা না ক'রে পারা যায় না এবং কল্পনাকুশল ভাবুকের দৃষ্টি নিয়ে দেখলে এই নবযুগের ভাস্কর্য্যকে অভিনন্দন করতেই হয়।

জীবনের ক্রমবিকাশে মনোবৃত্তির স্থান

ডাক্তার শ্রীনরেন্দ্রনাথ পাল এম-বি

জীবনের স্বাভাবিক অথবা অস্বাভাবিক যে কোন অবস্থাতেই মনোবিজ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক। কলিকাতার মত অসংখ্যরোগবহুল ক্ষেত্রে, হাসপাতালে ও শ্রদ্ধেয় গুরু ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের চিকিৎসাগারে মোট আট বৎসরে আমার যে ধারণা জন্মিয়াছে তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করিতে প্রয়াস পাইতেছি মাত্র। যে সমস্ত ব্যক্তি বহুদিন যাবৎ রোগভোগ করেন তাঁহাদের সংখ্যানুপাতে ক্ষয়রোগাক্রান্ত ও স্নায়ুদুর্ব্বল লোকের সংখ্যা একুনে শতকরা প্রায় আশী। ক্ষয়রোগ শরীরের রোগপ্রতিরোধক শক্তি আক্রমণ করিয়া বিনষ্ট করে, আর স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য মনের সঞ্চিত শক্তির হ্রাস করিয়া উহাকে বিকল করে। একের সংখ্যা অপরকে যেন টেক্কা মারিয়া বাড়িতে চায়।

আমরা সাধারণতঃ দুই প্রকার ভ্রম করিয়া থাকি ; এই উভয় প্রকার ভ্রমই অবাঞ্ছনীয়। যাহাতে আমরা শরীরগত রাসায়নিক, (Physico-chemical), জৈব-শারীরিক (bio-phyisical) এবং জৈব-রাসায়নিক (bio-chemical) প্রক্রিয়ার কথা ভুলিয়া যাই এমন ভাবে আমাদের মনের বশবর্ত্তী হওয়া উচিত নয় ; অথবা কেবলমাত্র রোগ-সংক্রমণ হেতু রোগোৎপত্তি এই মতবাদের উপর নির্ভর করিয়া—জীবাণু সংক্রমণ রক্ত, দন্ত, টন্‌শিল্, উদর প্রভৃতি স্থানে খুঁজিয়া না পাইলে এমন কি নালীহীন গ্রন্থিবিশেষের (endocrine gland) সংক্রমণ (infection) নির্ণয় করিতে যাওয়াও বিধেয় নয়। রোগোৎপাদক জীবাণুই (microbes) রোগোৎপত্তির একমাত্র কারণ—একথা আমাদিগকে অবশ্য ভুলিতে হইবে। জীবাণু যে প্রকাশমান ব্যাধির উপস্থিত কারণ একথা সত্য, কিন্তু মূল কারণ কে বলিল ? মানসিক অসামঞ্জস্য ও অশান্তি যে অনেক স্থানে রোগ সৃষ্টির কারণ এবং আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রনির্দ্ধারিত শরীরের বাত, পিত্ত, কফ্ আদির অসামঞ্জস্যে ব্যাধি এবং সামঞ্জস্যে যে স্বাস্থ্য—ইহা ব্যাপকতর সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। মনেও সেইরূপ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণ বিরাজিত ; পরে তাহা আলোচনা করা যাইবে।

শারীরিক অবয়ব-কণিকা ও মানসিক চৈতন্য-কণিকা—পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। শারীরিক অবয়ব-পরমাণু বাদ দিয়া মানসিক অবস্থা এবং মানসিক চিৎকণাগুলিকে ভিন্ন করিয়া শারীরিক অবস্থাকে আমরা পূর্ণভাবে বিচার করিতে পারি না। শারীরিক অবয়বাণু ও মানসিক চিৎপরমাণুর তথা শরীর ও মনের সামঞ্জস্যের উপর আমাদের স্বাস্থ্য নির্ভর করে।

রোগনিবারক উপায় নির্দ্ধারণ করাই স্বাস্থ্যবিজ্ঞার লক্ষ্য। ধ্বংসের সহিত সমীকরণই জীবন বা জীবনবর্দ্ধনের লক্ষণ। অন্তর্জগৎ অর্থাৎ মানসিক অবস্থা এবং বহির্জগৎ অর্থাৎ শারীরিক অবস্থার ক্রম-বিবর্ত্তনের মধ্যে সাম্য সংস্থাপনই জীবনের উদ্দেশ্য। সেই জন্য আমাদের বিভিন্নমুখী কামনা, উত্তেজনা, প্রেরণার মধ্যে জীবন গঠন করিতে হইলে মানসিক রোগতত্ত্ব শিক্ষা করা আবশ্যক। ইচ্ছা, অভিপ্রায়, উন্মাদনা প্রভৃতি মানসিক জগতের পরিবর্ত্তনশীল বৃত্তিগুলিকে নীচতামূলক, ক্ষণস্থায়ী, জঘন্য, সচপল ও অসমঞ্জস বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। সে গুলির প্রকৃত সত্তা উপলব্ধি করিয়া সেগুলিকে জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে কাজে নিয়োজিত করাই আমাদের দরকার। স্বাস্থ্যবান মনেই সুস্থ শরীর যে পুষ্টিলাভ করে—একথা অস্বীকার করা যায় না।

মানসিক রোগতত্ত্ব বিশেষভাবে আলোচনা না করায় চিকিৎসকগণ অধিকাংশ সময় ভ্রমে পতিত হন। রোগের প্রকৃত কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না। রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে লইয়াই চিকিৎসা বিধানের মূল কারবার। রোগ লইয়া এবং রোগ সারাইবার ব্যবস্থাপত্র প্রণিধানের জন্য ওই জাতীয় পুস্তকের পাতায় মনঃসন্নিবিষ্ট করিয়া রোগের চিকিৎসা হয়, রোগীর হয় না। আমরা দেখিয়াছি, বহুদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে এমন রোগীর কুইনাইন ইন্‌জেক্‌সনে কোন ফল হয় নাই ; কিন্তু রোগীকে রক্তহীন দেখিয়া—তাহার ম্যালেরিয়ার মূল কারণ যে রক্তহীনতা, তাহা নির্ণীত হয় নাই বলিয়া—কুইনাইন চিকিৎসায় উক্ত রোগীর কোন ফল হয় নাই ; অথচ অপরের শরীরস্থ ধমনী হইতে রক্ত লইয়া গোটাকতক ইন্‌জেক্‌সন্ দিবার পর কুইনাইনেই বিশেষ ফল-লাভ হয়। আমাদের বলিবার কথা—রোগীর চিকিৎসা করিতে হইলে তাহাকে রোগ হইতে পৃথক করা অর্থাৎ ওই জাতীয় অন্যান্য রোগী হইতে উক্ত রোগী কিসে স্বতন্ত্র, তাহা নির্ণয় করা অত্যাবশ্যক। এই প্রকার সত্য নির্ণয় করিতে হইলে গোটা মানুষের মনকে তাহার শরীর হইতে পৃথক করিয়া রাখিলে প্রায়ই ঠকিতে হইবে।

যেমন রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিবার পর রোগ একেবারে বাহিরে প্রকাশ পায় না, শরীরের মধ্যে অবস্থান করে—তাহার যতদিন থাকা দরকার তাহার পর ফুটিয়া বাহির হয়—তেমনি মানসিক রোগের মূল পুনঃ পুনঃ ব্যর্থতার মধ্যে স্নায়বিক রোগে পরিণত হইবার পূর্ব্বে কিছুকাল মনের কোণে গোপন-বাস করে। সাধারণতঃ আমরা যে সকল মানসিক ব্যাধি দেখিতে পাই তাহা নিম্নলিখিত প্রকারের হইয়া থাকে :-(১) উৎকণ্ঠা-প্রধান স্নায়ুদৌর্ব্বল্য (anxiety nervosis) —যৌন-ধর্ম্মের ইচ্ছানিরোধ বা বলপূর্ব্বক স্বেচ্ছারোধহেতু স্নায়ুবিকার। (২) হিষ্টিরিয়া বা মূর্চ্ছা (৩) ধাতু-দৌর্ব্বল্য, (৪) প্রক্ষিপ্ত স্নায়ুবিকার (compulsion nervosis),—রক্ষা-কবচস্বরূপ ক্লেশদায়ক ধর্ম্মসূচক নিয়ম-কানুনগুলির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখা বা এমনি কিছু। (৫) উৎক্ষিপ্ত স্নায়ুবিকার (obsession nervosis)—ইষ্ট-দেবতার বা অপ-দেবতার মুখস লইয়া আত্মগোপন করিবার একটা-না

একটা-কিছুর অবস্থা বিভ্রাট—কথায় যাহাকে ভর-পাওয়া বলে, ইত্যাদি।

আমবাত্, হাঁপানি প্রভৃতির আকারে মানসিক রোগ প্রকাশ পাইতে পারে। সময় সময় হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়া, স্নায়ুমণ্ডলীর পীড়া, মূত্র-সম্বন্ধীয় এবং ধাতু-ঘটিত পীড়া, পাক যন্ত্রের—শ্বাস যন্ত্রের—এমন কি চক্ষু-কর্ণ প্রভৃতি বিশিষ্ট যন্ত্রের পীড়ার অনুরূপ মানসিক ব্যাধি দেখা যায়। আমরা দেখিয়াছি পিত্ত-থলির শূল বেদনায় অহিফেন ইন্‌জেক্‌সন্ ছাড়া রোগিণীর উপায়ান্তর ছিল না, কিন্তু আসলে তিনি স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে ভুগিতেছিলেন ; বস্তুতঃ অহিফেন ইনজেক্‌সনের কোন দরকার ছিল না।

তীব্র আবেগ হেতু নালীহীন গ্রন্থির (endocrial g'and) প্রতি-ক্রিয়ায় যে কিরূপ আক্ষেপ উপস্থিত হয় এবং শারীরিক লক্ষণের আকারে কিরূপে মানসিক দুর্য্যোগ প্রকাশ পায় তাহা আমরা বুঝিতে পারি। মানব-চরিত্র যে সমস্ত কারণে বিচলিত হয় আমরা তাহার সম্বন্ধে প্রায়ই অজ্ঞ থাকি। সেই জন্য শারীরিক স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপর কেমন করিয়া বিভিন্নমুখী চিন্তা প্রণালীর দ্বৈত টানা-পড়েন, মানসিক অশান্তির অনির্দ্দেশ্য প্রভাব আসিয়া পড়ে, তাহা নির্ণয় করিতে যাইয়া মানব-চরিত্রের বিশিষ্টতা অর্জ্জনের তথা ব্যক্তিত্বের মূলীভূত কারণ-সূত্রে পৌঁছাইতে পারা যায়।

হৃদ্‌ যন্ত্রের উপরই বিশেষভাবে মানসিক ক্রিয়া প্রতিফলিত হয়। অনুরাগ, আবেগ প্রভৃতি অনুভূতির সহিত দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় হৃদ্‌ যন্ত্রের নিজের একটা বিশিষ্ট মনস্তত্ত্ব আছে। উৎকণ্ঠার সময় হৃদ্‌-যন্ত্রের ক্রিয়া যেভাবে চলে তাহা একবার লক্ষ্য করিলে হৃদ্‌ যন্ত্রের পীড়ার সহিত মনের যে কি জটিল-সংযোগ তাহা বুঝিতে পারা যায়।

মানসিক রোগোদ্ভূত যে সমস্ত রোগ নাসা, কণ্ঠ, বিশেষ করিয়া স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ে উৎপত্তি বা স্থিতি লাভ করে তাহাদের বংশ-তালিকা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। পুরুষের শুক্র-মেহ—নৈশকালীন শুক্র-স্খলন প্রভৃতিকে তাহার আপন কৃত মনের উন্মাদনাজনিত স্নায়ুদৌর্ব্বল্য বলিয়া ধরা হয়। এই সমস্ত ব্যাধিকে (জীবনের যে কোন পর্য্যায়ে এই জাতীয় ব্যাধি যাহা আবির্ভূত হয় তাহাকে) অনেক স্থানে আমাদের হিতকারী বলিয়াই ধরা হয়, নহিলে চিত্তের আন্দোলন ও আলোড়ন বিভ্রাটে নানাপ্রকার ব্যাধির জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়।

যৌন স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইতেছে না, সে জন্য যথেষ্ট ক্ষতিও হইতেছে। সুসংযত জীবন যাপন করাই প্রত্যেক সবল সুস্থকায় ব্যক্তির শিক্ষার আদর্শ হওয়া উচিত। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে প্রায় সকল জীবনই যৌন জীবন হইতে উর্দ্ধে নহে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ যুবকগণকে মৈথুন জীবন সম্বন্ধে অজ্ঞ রাখা হয়—তাহার ফলে তাহারা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে আক্রান্ত হয়। এই ব্যাপারের সংস্কার আবশ্যক। যৌন-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং ইচ্ছাকৃত বা বাধ্যকৃত যৌন ধর্ম্মের সহিত বিরোধ বাতিরোধ বর্ত্তমানে আমাদের শারীরিক ও নৈতিক অবনতির অন্যতম কারণরূপে নির্ণীত হয়। আমাদের গৃহস্থের নিত্য-ব্যবহার্য্য পঞ্জিকার রঙ্গীন পাতার উপর বিজ্ঞাপন তালিকা দিয়া হাতুড়িয়ারা ভগ্ন-স্বাস্থ্য যুবকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ; মিথ্যা প্রচার করিয়া ব্যক্তিদিগকে প্রতারিত করে ; আত্মগোপন ও অজ্ঞতাপ্রসূত বিচারবুদ্ধিহীন ভ্রমময়তার পথে চালিত করে এবং তাহাদের হীন ব্যবসায়ে দু-পয়সা দস্কা রোজগারও করে। যৌন-স্বাস্থ্য বিষয়ে অজ্ঞতা ও যৌন-সত্যের বলপূর্ব্বক ব্যবহারিক নিরোধ হেতু যখন এত অনিষ্ট ঘটে—এত অসংযমেও যখন চাপা থাকে, জোর করিয়া সংযত করিলেও চাপা থাকে—একমাত্র সুসংযমে যখন ইহার দণ্ড নাই তখন স্বাস্থ্য ও মানসিক রোগের প্রতিকারের উপায়সমূহের কথা যাহাতে বহুল প্রচারিত হয় সে বিষয়ে সকলের মন আকর্ষণ করা দরকার।

চিকিৎসকের পক্ষে মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞানতা অবাঞ্ছনীয় এবং তাহাতে ফল অনিষ্টজনক হইয়া থাকে। কারণ চিকিৎসকগণ রোগীর চিকিৎসা করিতে গিয়া যদি রোগের কারণ নির্দ্দেশ করিতে এবং চিকিৎসা করিতে যত্নশীল না হন, বরং কেবলমাত্র রোগ সম্বন্ধে হিষ্টিরিয়া, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, মানসিক চাঞ্চল্য বা এইরকম কিছু বলিয়া ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে তাহাতে রোগ সারে না, বরং রোগী চিকিৎসকের উপর বিশ্বাস হারায়। মানসিক রোগতত্ত্ব আলোচনায় তথা মনোবিজ্ঞানে আমাদের কি লাভ হয়? মনস্তত্ত্ব আলোচনা করিলে অনেক অজ্ঞাত তথ্য আমাদের জ্ঞান-গোচরীভূত হয়, তাহা আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করে। রোগতত্ত্বের আলোচনা করিতে গিয়া রোগ প্রতিবিধানের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ; তাহার মূলীভূত সত্যগুলি আবিষ্কৃত হয় ; শুধু তাই নয়—জীবের ক্রমোন্নতির জ্ঞান অধিকৃত হয় এবং চিন্তাস্তর সন্ধান মিলে।

মনস্তত্ত্ব আলোচনা দ্বারা ইহাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে যাহাকে আমরা ব্যক্তিত্ব বা বিশিষ্ট চরিত্র পর্য্যায়ভুক্ত করি, তাহা আমাদের সাধারণ জ্ঞানের বহির্ভূত। আত্মপ্রসাদ ও আত্মত্যাগ—আত্মসংরক্ষণ ও বংশবর্দ্ধন—নিজেকে স্বতন্ত্রীকরণ ও পারিপার্শ্বিক জগতের সহিত সমীকরণ—একত্ব ও বহুত্ব—এই সংঘর্ষশীল দ্বৈত-জিনিসের মিলিত ও সাম্য অবস্থার সমষ্টির নামই ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র বৈশিষ্ট্য। এই চরিত্রই আবার সক্রিয় শক্তি এবং সম্ভাব্য জীবনের গোড়া পত্তন। গত বৎসর জাপান পরিভ্রমণ সময়ে লক্ষ্য করিয়াছিলাম, দৃঢ় জাপানী চরিত্র চীনাদিগের চরিত্র হইতে সম্পূর্ণ বিসদৃশ। চীনাদিগের চরিত্র অনেকটা আমাদের মত। জাপানী চরিত্রের দৃঢ়তার কারণ এই যে তাহারা জীবনকে সম্পূর্ণ নূতন ভাবে দেখিয়াছে এবং যৌন সত্যকে তাহারা আমাদের মত অথবা চীনাদিগের মত বিকৃতচক্ষে দেখে না। তাহারা বুঝিয়াছে যে জীবন পুরাপুরি না হইলেও অনেক ক্ষেত্রে যৌনক্ষুধা হইতে ভিন্ন বা উচ্চ নহে। সেই জন্য চীনদেশে ও আমাদের দেশে যৌনক্ষুধার অতি নিরোধের ফলে যখন বহু মানসিক দুঃখ ও তদ্ভূত অপকাররাশি দেখা যাইতেছে, তখন এই সব বিষয়ের প্রতিক্রিয়াকল্পে আমাদের জনন-শাস্ত্রের আলোচনা ও প্রচার আবশ্যক। এ প্রকার আলোচনা আমাদের ধর্ম্মের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমাদের শাস্ত্রেও শিবলিঙ্গ বা শিবের প্রতীক—"অকার, উকার, মকার সংযোগে" ওঙ্কার স্বরূপে, বিন্দু বিরাজিত হইয়া আছে। "মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ" একথা অনেকেই

জানেন। জীবত্ব ওঙ্কারময়। জাগ্রত, স্বপন ও সুষুপ্তি এই ত্রিকালে উক্ত মাত্রাত্রয় বিরাজিত। তুরীয়-সংজ্ঞক সে বিন্দু সৃষ্টির কারণস্বরূপ। সাধন প্রভাবে জাগ্রত স্বপ্নাদি উক্ত তিন অবস্থা লুপ্ত হইলে—তথা তুরীয়ে জীব সংস্থিত হইতে পারিলে তাহার শিবত্বপ্রাপ্তি ঘটে। বীর্য্যস্খলনে যে সুখ (orgasm) এবং বীর্য্যপাতের পর যে অবসাদ (Post coitumomne triste) তাহার কারণস্বরূপ যে সুন্দর ব্যাখ্যা আমাদের শাস্ত্রে পাওয়া যায় তাহা এইরূপ :—বিন্দুই ব্রহ্ম। ব্রহ্মার স্বরূপ আনন্দ। ঊর্দ্ধরেতা হইতে পারিলে আনন্দ স্থায়ী ও আয়ত্বাধীন হয় ; কিন্তু জীব যদি তাহাকে পরিত্যাগ করে, ব্রহ্ম চলিয়া যাইবার সময় তাহার স্বরূপ অর্থাৎ আনন্দ জানাইয়া যায়। আমরা এই বিন্দুর শিবত্বে বিশ্বাস হারাইয়াছি। এই প্রতীকের পূজাই আমাদিগকে আমাদের শাস্ত্রমতেই বা বৈজ্ঞানিকের কথায় জানাইতে হইবে—

We have lost our belief in the sacredness of the germ plasm or germ-Gods We know how to approach its altar and how to alter some of the traits"—Dominance of traits. Sex Psychology.

যৌন-ধর্ম্মের পরিস্ফূরণ যুবচিত্তকে সান্ত্বনা দেয়। সাহিত্য রসকলা ও অন্যান্য কলাচচ্চায় শান্তিকামী মানুষ, আত্মপ্রসাদ ও অনুরাগ, আত্ম-পুষ্টি ও আত্মত্যাগ—এই দুই পরস্পর সংঘর্ষশীল প্রেরণার মধ্যে আপনার সাম্যাবস্থা খুঁজিয়া পায়। কামজ চিত্ত সর্ব্বত্রই যে পায় একথা বলা যায় না ; কলাচার্য্য রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্যগুরু শরৎচন্দ্রের স্থান সার্ব্বভৌমিক পূজার বেদীতে যে অকুণ্ঠিতভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেখানেও অনেকে যে এই সত্যেরই মোটা রকম ইঙ্গিত পায় তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় ; কিন্তু জীবের প্রকৃত শান্তি কিসে ?

যদি আমরা সত্যই কেবলমাত্র আত্মনিষ্ঠ জৈবশক্তির অধীন প্রজনন-বিধুর মেরুদণ্ড বিশিষ্ট জীব হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে না চাই এবং যদি আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষের মত জনসাধারণের চেতনাকে জড়ীভূত করিয়া রাখিতে না ইচ্ছুক হই—তবে আমাদিগকে মানসিক ব্যাধিও তাহার প্রতিকারের বিষয়ে তথা মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিতেই হইবে এবং সত্যের সম্মুখীন হইয়া সমাজ সংস্কৃত করিতে হইবে—আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ও প্রথা প্রক্রিয়ার চিরানুগত প্রতারণাপূর্ণ (অর্থাৎ স্বল্প এবং স্বার্থ-কায়েম লোকের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য) অনুষ্ঠান দ্বারা নহে. —প্রেম ও ত্যাগের শক্তিতে আমাদিগকে প্রাধান্য স্থাপন করিতে হইবে। সার্ব্বজনীন উৎকর্ষ ও এতৎকালীন চরিত্র বৈশিষ্ট্যের উপর, তৎকালীন ব্যক্তিত্বের উপর যথা—"মনু উবাচ" বলিয়াই নয়। আমাকে বুঝিতে হইবে—ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা যতই তীক্ষ্ণদর্শী হউন না কেন আমার জগৎ আমি বুঝিয়া না লইলে আমার ব্রহ্মের সাধনা ও তৃপ্তি কোথায় ?

যৌন-সত্য জীবনের মৌলিক সত্য ; ইহাকে অস্বীকার করা চলে না কারণ ইহা জীবনের সক্রিয় শক্তির অত্যাবশ্যক উপাদান। এই উপাদান এবং এখানকার আবরণ. অবগুণ্ঠন, সংগোপন এবং সংযম সুষ্ঠু জীবনের পক্ষে ফলোপদায়ক ; এই নিভৃতের দিকই সবচেয়ে বড় দিক। সত্যই সকল বড় কার্য্যেই আমাদিগকে বৃহতের মধ্যে আহ্বান করিয়া আনে ও নিভৃতের দিকে নির্দ্দেশ করে। প্রথমে প্রিয় বা প্রিয়ার সহিত বাঁধে, নিজের স্বার্থের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া আবার সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া বাহির করে ; পরে একটা ভূমার সহিত বাঁধিয়া দেয়। তাহা হইলে মা-সিক যোগতত্ত্ব শিক্ষা ও আলোচনার মধ্যে প্রধান কথা এই হইবে যে যৌন বৃত্তির আইন-কানুন বাঁধন কষণগুলি যেন উঠিয়া না যায় ; অথচ সেগুলি যেন কোন ক্ষেত্রে আমাদের নিরোধ যন্ত্রের চাপে নিষ্পিষ্ট না হয়। জীবনের পূর্ণ পরিণতির পক্ষে এইরূপ জোর করিয়া নিষ্পেষণ শুধুই যে ব্যাধির কারণ তাহা নহে। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ শৈশবাবস্থার দাস হইলে তাহাকে বিকৃত বুদ্ধিগত, যুক্তিবিভ্রাটময়, অভাব পারম্পর্য্যের অপরিহার্য্য অসহায় অবস্থায় আনীত করিবে।

পারিপার্শ্বিক জগতের সহিত নিজেকে স্বতন্ত্রীকরণ ও সমীকরণ—এই উভয়ের মধ্যে জীবনের সংঘর্ষ বাধে। জীবনের স্তর যতই উচ্চ হইতে থাকে এই সংঘর্ষ ততই বাড়িতে থাকে। এই কারণেই যৌন বিধি-ব্যবস্থা সর্ব্বাংশে রক্ষা করা একান্ত দরকার। তাহার ফলে মানুষ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে নীত হয়। শিশু যখন জন্ম লাভ করে তখন সে এক মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জীবমাত্র। পরে সে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন ও সংযোজনা পরম্পরায় মধ্য দিয়া পরিণত অবস্থায় আসে। মেরুদণ্ডবিশিষ্ট সকল শিশুই পিতামাতার তথা বংশের মনোবৃত্তি লইয়াই জন্মায় এবং পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় পরিস্ফুট হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মেরুদণ্ডের উপর প্রাধান্য ও নিষেধাত্মক শাসন শক্তিও চলিতে থাকে। আমরা জানি যে মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জীব, বংশানুক্রমিক বৃত্তির বা ধর্ম্মের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে ; কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম বুদ্ধির উৎকর্ষ লাভ (development of intellectual centres) শিক্ষার দ্বারা বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। এইজন্যই শিক্ষার গুরু-দায়িত্ব আছে। মস্তিষ্কে মেরুদণ্ডের নিম্ন পর্য্যায়ভুক্ত বৃত্তিগুলির উপর সংযমাত্মক বা শাসনাত্মক কেন্দ্রও আছে। পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি তমঃপ্রধান, আর মস্তিষ্কের সংযম ও শাসন রজঃপ্রধান। স্বপ্নে কামজযুবচিত্তে নৈশস্খলন এই রজঃপ্রধান গুণের সুপ্তিতে ঘটে। যাহাদের এই শেষোক্তগুণ সহজজাত অর্থাৎ অন্তর্জ্জাত তথা জ্ঞানরূপ অস্ত্র দিয়া কিম্বা পুনঃপৌনিক আলোচনার দ্বারা কাম বা কামনা খণ্ডিত, তাহাদের নৈশ-স্খলন না হইবারই কথা। মোটের উপর যেমন ভাবেই বর্দ্ধিত হও না কেন "আত্মানং বিদ্ধি।" (ক্রমশঃ)



নিষ্ফলা

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

(১)

শ্যামাচরণ ও রাধাচরণ দুই ভাই। কিন্তু ভাই হইলে কি হইবে, পারতপক্ষে কেহ কাহারও মুখ পর্য্যন্ত দেখিতে চাহিত না—এমনি ভাব। এজমালী পৈত্রিক বাড়ীটার মাঝখানে বেড়া দিয়া দুই ভাগ করিয়া লওয়া হইয়াছে—তাহারই দুই পাশে দুইজন বাস করে। নিকটে গঞ্জের পৈত্রিক দোকানটারও এই দশা—ভাগাভাগি করিয়া সেখানেও দুই পাশে দুইজন ব্যবসা করিতেছে। বড় ভাই শ্যামাচরণের গুটি চার-পাঁচেক সন্তান। ছোট ভাই রাধাচরণের সংসার ছোট—নিজে আর স্ত্রী কুমুদিনী—মাত্র দুটী প্রাণী! কুমুদিনীর বয়স হইয়াছে কিন্তু ছেলে পিলে হয় নাই। আজ পনর বৎসর ধরিয়া এত যে জলপড়া, তেলপড়া, তাবিজ কবচ—সকলি বিফল গিয়াছে। কুমুদিনীর এ লইয়া দুঃখের অন্ত নাই, কিন্তু রাধাচরণ ব্যাপারটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, বলে—"বেশ তো আছি আমরা। ঐ দেখ না ঐ পাশের ওদের গণ্ডা কয়েক কাচ্চা বাচ্চা—যেন একটা শূয়ারের পাল।"

কুমুদিনী জবাব করে না—চুপ করিয়া থাকে। সে জানে, তাহার মনের কথা স্বামীকে বুঝাইতে পারিবে না, কারণ সে পুরুষ মানুষ।

পুরুষকে আর সব বুঝান যায় কিন্তু এই কথাটী বুঝান যায় না। কত দিন, কত সাধু সন্ন্যাসীর নিকট হইতে গোপনে কত না তাবিজ কবচ কমুদিনী আনাইয়াছে—কত টাকা পয়সা এমনি করিয়া বাজে খরচ করিয়াছে—রাধাচরণ এ জন্য কতদিন রাগারাগি করিয়াছে—কত বিশ্রী গালাগালি দিয়াছে—কিন্তু তবু যে কুমুদিনী নীরবে সব সহ্য করিয়াছে কেন, তাহা শুধু সেই জানে।

সেদিন দুপুর বেলা দোকান হইতে আসিয়া রাধাচরণ বাড়ীতে কুমুদিনীকে খুঁজিয়া পাইল না। কিন্তু বাড়ীর পিছনের পুকুরটার দিকে যাইতেই দেখিতে পাইল—এ পাশের বেড়ার ধারে দাঁড়াইয়া কুমুদিনী যেন ওপাশের কাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে আর কি বলিতেছে। ব্যাপারটী রাধাচরণের নিকটে বড় আশ্চর্য্য ঠেকিল; কারণ এ-বাড়ী ও-বাড়ীর মধ্যে কথাবার্ত্তা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল—আর এই সব ব্যাপারে দুই ভাইয়ের চেয়ে দুই বউই ছিলেন বেশী অগ্রণী। একটু পরে দেখা গেল শ্যামাচরণের বছর চারেকের ছেলে নিরু আসিয়া দাঁড়াইল বেড়ার ধারে। কুমুদিনী যেই তাহাকে বেড়ার উপর দিয়া কোলে তুলিয়া লইতে যাইবে ঠিক এমন সময়ে নজর পড়িল স্বামীর উপর। কি যেন একটা অন্যায় কাজ করিতেছিল—এমনি করিয়া হাতখানি সরাইয়া লইয়া স্বামীর নিকটে আসিয়া কৈফিয়তের মত বলিতে লাগিল—"ছেলেটা ডাক্‌তে ডাক্‌তে এদিকে এলো কি না তাই—।"

বাধা দিয়া রাধাচরণ বলিল—"সাবধান, ও-বাড়ীর কারু সাথে একটা কথাও কইতে যেয়ো না যেন।"

কুমুদিনী বলিল—"কিন্তু নিরুটা দেখ্‌তে বড় সুন্দর হয়েছে।"

—"তা হোক্ গে। ভারী তো সুন্দর। —আমার ও-গুষ্টির সবাইকে দেখ্‌লে গায়ে জ্বর আসে। নাও, এখন খেতে দেবে এস।" বলিয়া রাধাচরণ বাড়ীর ভিতরে ঢুকিল। কুমুদিনী তাকাইয়া দেখিল—নিরু তখনও এই দিকেই তাকাইয়া আছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেও স্বামীর অনুগমন করিল।

(২)

খিড়কির পুকুর পাড়ের সেইখানটায় দুপুর বেলা রোজ আসিয়া নিরু হাজির হয়। কুমুদিনীও ঠিক সেই সময়টারই যেন প্রতীক্ষা করিতে থাকে। দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর সকলেই সাধারণতঃ শুইয়া পড়ে—ছেলেটী ঠিক সেই অবসরে সকলের অজ্ঞাতে এখানে চলিয়া আসে। এটা যে একটা অন্যায় কার্য্য তাহা এই চার বৎসরের ছেলেটী পর্য্যন্ত জানিয়া ফেলিয়াছে।

কুমুদিনী সেদিনপূর্ব্বেই বেড়ার ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—নিরু তখনও আসিয়া পৌছে নাই। একটু পরেই নিরু একেবারে ধূলা কাদা মাখিয়া ভূত সাজিয়া হাজির হইল।

কুমুদিনী ডাকিল—নিরু, বাবা!

নিরু কহিল—কি? কেন?

নিকটে আসিতেই কুমুদিনী তাহাকে নিজের বুকের ভিতরে টানিয়া লইয়া আঁচল দিয়া ধূলা কাদা মুছাইয়া দিতে দিতে বলিতে লাগিল—"হাঁরে নিরু, আমাকে কি বলে ডাক্‌তে হয় জানিস তো?"

নিরু বলিল—"না"।

—"দূর বোকা ছেলে, তাও জানিস্ নে?" তার পর কুমুদিনী দুই একবার ইতস্তত করিয়া বলিল—"আমাকে মা বল্‌বি, বুঝলি নিরু?"

—"আমার মা তো ঘরে শুয়ে আছে?"

—"তা থাক্। তবে আমাকে ছোট মা বলে ডাকিস্ নিরু। কেমন ডাকবি তো?"

—"ডাক্‌বো।—ছোটমা—ছোটমা!" বলিযা লজ্জায় নিরু কুমুদিনীর বুকে মুখ লুকাইল। কুমুদিনী জোর করিয়া তাহার মুখ নিজের মুখের কাছে টানিয়া আনিয়া চুমুতে চুমুতে ভরিয়া দিল।

তারপর আঁচলের খুঁট খুলিয়া একটা বাঁশী বাহির করিয়া নিরুর হাতে দিয়া বলিল—"এটা কি বল্‌তো নিরু?"

—"কি ছোটমা?"

—"বাঁশী। দেখ্ কেমন বাজে।" বলিয়া কুমুদিনী একবার বাজাইয়া দেখাইল। নিরু লাফাইয়া কুমুদিনীর কোল ছাড়িয়া নামিয়া বলিল—"আমি বাজাব ছোটমা দাও। নিপুকে আর মিনিকে দেখাব আমার কেমন বাঁশী হয়েছে।"

বলিয়া কুমুদিনীর হাত হইতে এক মুহূর্ত্তে বাঁশীটী কাড়িয়া লইয়া বেড়া গলাইয়া নিরু নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া চলিল।

কুমুদিনী পরিপূর্ণ আনন্দে দুই চোখ মেলিয়া এই আনন্দ-ধারা পান করিতে লাগিল। নিরুর বাঁশীর স্বর তাহার কাণে যেন অমৃত ঢালিয়া দিল।

কিন্তু কুমুদিনী কাজটা ভাল করে নাই; কারণ পরদিন সকালেই ও-বাড়ী হইতে গালাগালি সুরু হইল—"আঁটকুড়ে মাগী—পরের ছেলের উপরে নজর দিতে আসে! তলে তলে আমার ছেলেটাকে বশ করে নেবার ফন্দি।"

ইহার পূর্ব্বেও কয় দিন নিরুর মা নিরুর কুমুদিনীর সহিত মিলামিশার খবর পাইয়া এই বাড়ীর উদ্দেশে এমনি বাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়াছে; কিন্তু অন্যকার ব্যাপারটা শুধু এইখানেই শেষ হইল না। শ্যামাচরণ আর রাধাচরণেরও এ লইয়া দোকান ঘরে বসিয়া রীতিমত বাক্‌যুদ্ধ হইয়া গেল। দুপুর বেলা রাধাচরণ বাড়ী আসিয়াই কুমুদিনীকে কিছু উত্তম মধ্যম দিয়া রাগের মাথায় বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। কুমুদিনীর ভাগ্যে এমনি পাওনা মাঝে মাঝে ঘটিয়া থাকে।

(৩)

মার খাইয়া হজম করিতে বাঙ্গালা দেশের মেয়েদের জুড়ি পৃথিবীতে নাই। কুমুদিনী দুই একদিন স্বামীর উপরে মুখ ভার করিয়া রহিল; কিন্তু দুই চার দিন পরেই আবার যে কে সেই।

সেদিন নিরুও মায়ের নিকট কম মার খায় নাই। সেই হইতে সেও আর কয়দিন কুমুদিনীর নিকটে আসিত না বটে, কিন্তু দুই চারিদিন পরে আবার সেও সব ভুলিয়া গেল।

সেদিন নিরু কুমুদিনীর নিকটে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"তুমি ডাইনী ছোট মা।"

কুমুদিনী বলিল—"ছিঃ বাবা, ও বল্‌তে নাই।

—"কেন, মা যে আমাকে শিখিয়ে দিল—তোর ছোট মাকে দেখ্‌লে ডাইনী বল্‌বি। বল্‌তে নেই ছোট মা?"

—"না, কখনও বলিসনে যেন বাবা!"

বলিয়া কুমুদিনী তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। এ যে কি আনন্দ—ইহা কুমুদিনী আর কাহাকেও বুঝাইতে পারিবে না—নিরুর মাকেও নয়—তাহার স্বামীকেও নয়।

নিরুকে কোলে করিলে সে স্বামীর প্রহারের কথা—নিরুর মায়ের গালাগালির কথা সমস্তই ভুলিয়া যায়। নিরুর উপরে আর কাহারও যে কোন দাবী আছে—তাহার মন তাহা স্বীকার করিতেই চায় না। মাঝে মাঝে ভাবে—নিরুকে লইয়া যদি সে কোন দূরদেশে পলাইয়া যাইতে পারিত—যেখান হইতে তাহাদের আর কোন খোঁজই কেহ

পাইত না! বাড়ীর সম্মুখে রেল লাইন—একটু দূরেই ষ্টেসন। ভাবে যদি ঐ ষ্টেসন হইতে টিকিট কাটিয়া একবার গাড়ীতে নিরুকে লইয়া উঠিতে পারিত! কিন্তু কল্পনা আর বেশী দূর অগ্রসর হয় না—বড় জোর ২।৩ ষ্টেসন পরে যেটাতে নামিয়া তাহার বাপের বাড়ী যাওয়া যায় সেই পর্য্যন্ত।

কিন্তু এসব কল্পনা করিতেই ভাল লাগে—সত্য সত্যই তো তাহার এসব করিবার উপায় নাই—ভাবিয়া কুমুদিনীর মনটা আবার দমিয়া যায়।

পৌষ মাসের মাঝামাঝি হইবে—সে দিনটায় সারাক্ষণ ধরিয়া টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। দুপুরবেলা রাধাচরণ আহার করিয়া দোকানে চলিয়া গিযাছে। কুমুদিনীর হাতে কোন কাজ ছিল না—তাই লেপটা গায়ে জড়াইয়া শুইয়া পড়িল। পড়ন্ত-বেলায় তাহার ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিতে পাইল—তাহারই বুকের কাছে এক হাত দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া নিরু নিদ্রা যাইতেছে। কখন যে সে আসিয়া লেপের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে—কুমুদিনী তাহা মোটেই টের পায় নাই। কুমুদিনীর বুকখানা আনন্দে নাচিয়া উঠিল—পরম স্নেহভরে নিরুর সারা গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। সে ভাবিয়া পায় না—কেমন করিয়া এমনি সুন্দর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট একটী শিশু মানুষেরই দেহের ভিতরে তিলে তিলে জন্মলাভ করে? মানুষেরই দেহ চুয়াইয়া হয় মানুষের সৃষ্টি! ইহা তাহার নিকটে একটা পরম বিস্ময়!

বাহির হইতে ক্ষ্যান্ত মাসি ডাকিল—"বউ ঘরে আছিস্?"

নিরুর গায়ের উপর ভাল করিয়া লেপটী চাপা দিয়া কুমুদিনী বাহিরে আসিয়া বলিল—"এই যে মাসি—এমন অবেলায় যে?"

—"একটা কথা তোকে বল্‌তে এলাম বউ। মিত্তিরদের বাড়ীতে একজন সাধু এসেছে—বড় ভাল লোক। আর বছরে ও-পাড়ার তারিণীর বউকে একটা কবচ দিয়েছিল—তাই তো একমাস যেতে না যেতেই অমন ফুটফুটে ছেলেটা পেটে এল। বেশী কিছু দিতে হয় না—মোটে এক টাকা সওয়া পাঁচ আনা। তুই যদি বলিস বউ, তবে তোর নাম করে কবচটা আমি আনিয়ে দি।"

কুমুদিনী হাসিয়া বলিল—"না মাসি, আর দরকার নাই। ভগবান যখন বঞ্চিত করেছেন, তখন আর তাবিজ কবচে কি হবে?

—"খুব ভাল কবচ কি না, তাই বলছিলাম।"

—"তা হোক্ মাসি—আর দরকার নাই।"

—"তবে আমি আসি বউ—দেখ্ ভেবে দেখ্—যদি মত করিস্ আমি এনে দেব।" বলিযা মাসি বিদায় লইল। কুমুদিনী ঘরে আসিয়া নিরুর গা হইতে লেপটী সরাইয়া লইয়া তাহার মুখের পানে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল—তারপর ধীরে ধীরে তাহার গণ্ডে একটী চুম্বন আঁকিয়া দিল। মনে মনে বলিল—"ভগবান, আমাকে তো তুমি বঞ্চিত কর নি—নিরুকে তো আমাকে দিয়েছ।"

স্পর্শ পাইয়া নিরু জাগিয়া উঠিল। কুমুদিনী বলিল—"হাঁরে নিরু কখন এলি?"

—"সেই কখন।"

—"আমাকে তো ডাক্‌লি নে?"

—"তুমি যে ঘুমুচ্ছিলে?"

—"বোকা ছেলে! তাই বুঝি ডাক্‌তে নেই?"

তারপর কুমুদিনী দুধ ভাত মাখিয়া নিরুকে খাওয়াইতে বসিল। খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া যখন তাহাকে বিদায় দিল—তখন সন্ধ্যা হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই।

৪

কিন্তু এত বাড়াবাড়ি বেশীদিন চলিল না। নিরুর মা একেবারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন—না, আর আস্কারা দেওয়া নয়—ছেলে যে তাহার পর হইয়া চলিল। পরের দিন কুমুদিনীকে দেখাইয়া দেখাইয়া নিরুর মা নিরুকে রীতিমত প্রহার করিল। কুমুদিনীর উদ্দেশ্যেও কম গালাগালি করিল না এবং শুধু তাই নয়, এখন হইতে কড়া নজর রাখিতে লাগিল—যাহাতে আর নিরু কুমুদিনীর নিকটে যাইতে না পারে।

আজ ১২।১৪ দিন আর নিরু আসে না। কুমুদিনীর এ দিনগুলা যে কেমন করিয়া কাটিতেছিল—তাহা সেই জানে। সংসারে তেমন কোন কাজ নাই—একমাত্র স্বামীর জন্য চাট্টি ভাত সেদ্ধ—তাই বা কতক্ষণের কাজ। তাহার পর স্বামী বাড়ীর বাহির হইলে—এই নির্জ্জন বাড়ীতে

তাহার মন কাঁদিয়া উঠে। সেই কোন্ দুপুরবেলা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খিড়কির আম গাছটার ছায়ায় একদৃষ্টে এইদিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকে। কখন কখন এইখান হইতে বেড়ার ফাঁক দিয়া ও-পাশের ২।১জনকে দেখা যায়। সারাটা বেলার ভিতরে হয় তো নিরু ২।১বার এই দিকটায় আসে, কিন্তু সর্ব্বদা একজন করিয়া সতর্ক প্রহরী তাহার সঙ্গে লাগিয়াই থাকে। যদি কখনও ভুলিয়া নিরু এইদিকে দৃষ্টিমাত্র ফিরায়, অমনি হয়তো তাহার বড় বোন মিনি চেঁচাইয়া উঠে—"এই নিরু আবার! বলে দেব মাকে?" নিরু হয়তো ভয়ে এতটুকু হইয়া যায়—এক ছুটে একেবারে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। এমনি করিয়া কুমুদিনীর দিন আর কাটিতে চায় না।

তবু সারাদিনের ভিতর নিরুকে তো দুই একবার দেখিতে পায়! কুমুদিনী ভাবিল - আজ নিরুকে সে কাছে না পাক, কিন্তু একদিন না একদিন তো পাইবেই—আর ভাইয়ে ভাইয়েও তো এমনি বিবাদ চিরটা কাল থাকিবে না। কিন্তু এ কাল্পনিক সান্ত্বনা তাহার মনকে শান্ত করিতে পারিল না। আজ ৪।৫ দিন সারা বেলা ও-বাড়ীর পানে চাহিয়া থাকিয়াও নিরুকে সে একবারটীও দেখিতে পায় নাই। সেদিন আর থাকিতে না পারিয়া কুমুদিনী নিরুর বোন মিনিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"হাঁরে মিনি, নিরু কোথায়?" কিন্তু মিনি কোন জবাব না দিয়া মুখ ঘুরাইয়া চলিয়া গিয়াছিল। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কুমুদিনী এক উপায় ঠিক করিল; ক্ষ্যান্তমাসিকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল—"মাসি, জান তো ও-বাড়ীর ছেলে নিরুটা আমার বড় বাধ্য হয়েছে—আর ছেলেটার উপরে আমারও কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গিয়েছে মাসি। কিন্তু ওরা তো ওকে এ-বাড়ীর সীমানায় পা দিতে দেয় না—সেদিন এসেছিল—তাই ঐ দুধের ছেলেকে কি মারই না মারলে। আজ পাঁচ ছ'দিন ছেলেটার একদম দেখা নাই। কোন অসুখ-বিসুখ না করে থাকে সেই ভয় মাসি। তাই তোমাকে একবার ছল করে ও-বাড়ী যেয়ে আমাকে খবরটা এনে দিতে হবে—বাছা আমার কেমন আছে।"

—"তা যাচ্ছি বউ, তুই ভাবিস্ নে।"

—"কিন্তু দেখো, কেউ যেন জানে না মাসি যে আমি তোমায় পাঠিয়েছি।"

—"কেউ জানবে না বউ—কেউ জানবে না।" বলিয়া মাসি বিদায় লইল। সন্ধ্যা হয়-হয়—কুমুদিনী রান্না চড়াইয়া দিয়াছে, আর বারে বারে বাহিরের দিকে তাকাইতেছে—কখন মাসি ফিরিয়া আসিবে।

মাসি ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"তোর কথাই ঠিক হল্যো বউ—আহা ছেলেটা আজ ছ'দিন ধরে জ্বরে ধুঁক্‌ছে। ভুবন ডাক্তার বলে গেছে জ্বরটা নাকি ভাল নয়—কি হবে না হবে কিছুই বলা যায় না।"

—"তাই নাকি মাসি?"—"হাঁ বউ। তবে তুই ভাবিস্ নি, ভুবন ডাক্তার এ গাঁয়ের ধন্বন্তরি—ভাল আবার হবে না! আমি এখন আসি বউ, সন্ধ্যে হলো।"

—"কাল একবার এস মাসি।" "আচ্ছা"—বলিয়া মাসি বিদায় লইল। উনানের ভাত ধরিয়া গিয়া গন্ধ বাহির হইতে লাগিল—কিন্তু কুমুদিনীর এ সবে খেয়াল নাই।—জ্বরটা নাকি ভাল নয়—কি হবে কিছুই বলা যায় না শুধু এই কথা কয়টী বার বার মনে হইয়া তাহার হৃদ্‌কম্প হইতে লাগিল।

পরদিন হইতে ক্ষ্যান্তমাসি রোজ সকালে বিকালে আসিয়া কুমুদিনীকে নিরুর খবর দিয়া যাইতে লাগিল। কুমুদিনী আজকাল সকল কাজকর্ম্ম ভুলিয়াছে—কেবল কখন মাসি কি খবর লইয়া আসিবে এই প্রতীক্ষায় থাকে। চার পাঁচ দিন পরে বিকাল বেলা মাসি আসিয়া বলিল—"কি ই বা বল্‌বো বউ—ভুবন ডাক্তার আজ দু-দু বার এসে বলে গেছে—আর কোন আশা নাই—শিবের অসাধ্যি। আজ রাত টিক্‌বে না।"

—"আজ রাত টিক্‌বে না?"

—"না বউ।" বলিয়া মাসি আরও যেন কত কি বলিয়া বিদায় লইল; কিন্তু কুমুদিনীর কর্ণে তাহার একবর্ণও প্রবেশ করিল না।

সন্ধ্যা হইয়া আসিলে সে ধীরে ধীরে উঠিল—উঠিয়া খিড়কির বেড়া ডিঙ্গাইয়া একেবারে শ্যামাচরণের বাড়ীর ভিতরে গিয়া ঢুকিল। আজ একটু দ্বিধা বা সঙ্কোচ কিছুই যেন তাহার মনে স্থান পাইল না।

সন্ধ্যাবেলা রাধাচরণ বাড়ী আসিয়া রান্নাঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—"ছেলেটা বোধ করি বাঁচবে না কুমুদ—যাই একবার দেখে আসি—না গেলে আর দশ জনে নিন্দে



আদি গঙ্গা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত হেরম্বকুমার গাঙ্গুলী

Bharatvarsha Halftone & Ptg Works

করবে। আমি এই এলাম বলে" বলিয়া রাধাচরণ বাহির হইয়া গেল; কিন্তু জানিল না যে যাহাকে উদ্দেশ করিয়া সে কথাগুলি বলিল—সে তাহার এক বর্ণও শুনিতে পাইল না।

রাধাচরণ যখন এ বাড়ী আসিয়া পৌছিল—তখন আর সময় নাই—একটু পরেই সকলে ধরাধরি করিয়া নিরুকে বাহিরে লইয়া আসিল। নিরুর মায়ের কান্না সমস্ত পাড়া ছাপাইয়া উঠিল।

হঠাৎ ঘরের পাশে কি যেন একটা গুরু দ্রব্য পতনের শব্দ হইল। মিনি চেঁচাইয়া বলিল—"ও কে ওখানে পড়ে? শীগ্‌গির দেখ বাবা!"

ব্যাপার কি দেখিবার জন্য শ্যামাচরণ আর রাধাচরণ দুইজনেই ছুটিয়া আসিল। শ্যামাচরণ বলিয়া উঠিল—"এ কি এ যে ছোট বৌমা! ফিট্ হয়েছে।"

রাধাচরণ ব্যাপার দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। শ্যামাচরণের ডাকে তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল;—"দাঁড়িয়ে কি দেখছিস্ রাধা—মাথায় জল দে—বাতাস কর। আহা মা আমার নিরুকে কি ভালই না বাস্ত?"

গ্রাফোলজী-মানুষের অন্তর বিশ্লেষক

শ্রীরণজিতচন্দ্র সান্যাল

গ্রীক 'গ্রাফো' কথাটির অর্থ লেখা এবং সম্ভবত এই শব্দকে ভিত্তি করে 'গ্রাফোলজী' কথাটার সৃষ্টি হয়েছে। এক কথায় অর্থ করতে পারি—'হস্তাক্ষর-অনুশীলন'। ঐতিহাসিক মধ্যযুগ হতে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন সময়ের মনীষীদের গবেষণা এবং অনুশীলনের উপর বিষয়টির ভিত্তি এমনভাবে গঠিত হয়ে গেছে যার বলে আজ অসঙ্কোচে প্রমাণসাপেক্ষভাবে স্বীকার করা যায় যে—মানুষের হাতের লেখা এমন এক অভিনব বিজ্ঞান—যার সাহায্যে যে কোনও মানুষের দুর্বোধ্য চরিত্রের সমস্ত জটিল রহস্যই প্রকাশ হয়ে পড়ে। অবশ্য স্বীকার করতে হয় যে এই বিষয়টি এ সময়ে আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। Recreative হিসাবে গ্রাফোলজীর দাবী সাধারণ নয়। এই বিষয়টির যবনিকার অন্তরালে কয়েক শতাব্দীর ধারাবাহিক ইতিহাসের অস্তিত্ব রয়েছে কিন্তু তার ক্ষেত্র আলাদা। এই প্রবন্ধের স্থূল উদ্দেশ্য হাতের লেখা অনুশীলনের কার্য্যকরী নির্দ্দেশ এবং থিয়োরীগুলি আলোচনা করা।

হাতের লেখাকে সাধারণ দৃষ্টিতে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—(১) সাধারণ হাতের লেখা (২) সই বা দস্তখত; উভয়েরই অনুশীলন-রীতি আলাদা। এই বিষয় শিক্ষা-ব্রতীদের প্রথমেই জেনে রাখা ভাল যে ব্যাকরণের দৃষ্টিতে একটা সাধারণ বাক্য-প্রণালীর যেমন বিভিন্ন শব্দাংশ (parts of speech) আছে এই বিষয়টিরও তেম্‌নি বিভিন্ন খণ্ড আছে এবং মানুষের মনস্তত্ত্ব হতেই সেগুলির সূত্রপাত হয়েছে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তাবৃত্তি এবং মানসিক কার্য্যক্ষমতাকে তিন অংশে বিভক্ত করা যায়—উত্তম, মধ্যম, অধম (superior, mediocre, inferior)। এই অনুসারে মানুষের হাতের লেখাকেও তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে; এই ভাগগুলির আবার কতক-গুলি অধীন (sub-ordinate) ভাগ আছে। সেই অধীন ভাগগুলি হ'লো—সাধারণ চিহ্ন (general signs), বিশেষ চিহ্ন (special signs) এবং সমবায়োৎপন্ন বিশিষ্টতা (resultant characteristics)। বলা বাহুল্য এইগুলির অস্তিত্ব মানুষের হাতের লেখায় খুব বেশী পরিমাণে রয়েছে।

হাতের লেখার মধ্যে সাধারণ চিহ্ন বল্‌তে বোঝায় লেখার সাধারণ বিশিষ্টতা। দ্রুত, আন্দোলিত, পরিষ্কার, সামঞ্জস্যযুক্ত, চৌকোণো, গোলাকার, কোণ বিশিষ্ট, ছোট, বড়, অপাঠ্য, ফাঁক্ ফাঁক্—সমস্তই এই সাধারণ বিশিষ্টতার পর্য্যায়ে পড়ে। এই বৈশিষ্ট্য দিয়ে হাতের লেখার general signs স্থির করা হয় এবং মানুষের চারিত্রিক বিশিষ্টতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। কতকগুলি প্রধান বিশিষ্টতার উদাহরণ এখানে আলোচনা কর্‌ছি।

পরিষ্কার সামঞ্জস্যযুক্ত লেখা—এই ধরণের লেখা থেকে লেখকের কল্পনাবৃত্তির স্বচ্ছতা, উদার মনোবৃত্তি এবং বুদ্ধিমত্তার কথা প্রকাশ হয়।

তাড়াতাড়ি লেখা—এই ধরণের লেখা এমন ব্যক্তিরাই লিখে থাকে—সিদ্ধান্তে যারা খুব তৎপর এবং এই শ্রেণীর লেখাকে খুব উন্নত স্তরে স্থান দেওয়া হয়।

চৌকোণা লেখা—লেখকের নেতৃত্বকুশলতার কথা প্রকাশ করে; উপরন্তু এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা পরিণামদশা হয়ে থাকে।

গোলাকার লেখা—সাধারণতঃ স্নেহশীল, সূক্ষ্মবুদ্ধি এবং লোকপ্রিয় মানুষেরা লিখে থাকে; এদের চরিত্রে diplomacyর অস্তিত্ব আছে বুঝ্‌তে হবে।

কোণবিশিষ্ট লেখা—এই ধরণের লেখার দ্বারা লেখকের ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্য এবং সংগ্রাম করবার ক্ষমতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

খুব ছোট লেখা—এমন ব্যক্তিরাই লেখে—মনোবৃত্তি যাদের সঙ্কীর্ণ; এদের স্বভাবে ধর্ম্মপরায়ণতার অস্তিত্ব হয়ত অনেক ক্ষেত্রেই আছে কিন্তু পার্থিব বিষয়ের উপর তাদের ভাল ধারণা থাকৃতে পারে না।

সুপাঠ্য বড় লেখা—তারাই লেখে যারা উদার এবং আত্মনির্ভরশীল।

লম্বা ধরণের লেখা—যে সকল লোক লেখে তারা অহঙ্কারী এবং যুক্তির সাহায্যে চালিত হয়ে থাকে।

যারা ডান্ দিকে বেঁকিয়ে লেখার পক্ষপাতী তাদের স্বভাবে স্নেহশীলতা, কল্পনাশক্তি এবং আবেগ বা অভিমান প্রভাব বিস্তার করে।

ফাঁক ফাঁক লেখা যাদের—তারা অমিতব্যয়ী, সামাজিক এবং নিম্নশ্রেণীর জীবজন্তুর প্রতি মনোযোগী হ'য়ে থাকে।

ইংরাজি হাতের লেখার মধ্যে আমরা প্রায় এক শত সাধারণ বিশিষ্টতা পাই, যে গুলির বর্ণনা করা হ'লো সে গুলি মুখ্য।

এর পর বিশেষ চিহ্ন (special signs) বিচার ক'রবার সময় আসে। ইংরাজি বর্ণমালায় ছাব্বিশটি অক্ষর আছে একথা নূতন করে উল্লেখের প্রয়োজন নেই। এই অক্ষরগুলির প্রত্যেকটিই এক এক জন এক এক ধরণে লিখে থাকে এবং লেখার ঐ বিভিন্নতা থেকে special signs বিচার করতে হয়। ইংরাজি অক্ষরমালার যে কয়েকটি অক্ষর বিশেষ নিদর্শন হিসাবে আমরা সর্ব্বদা পাই তার একটা বর্ণনা দিলাম।

ইংরাজি বর্ণমালার প্রথম অক্ষর A—এই অক্ষরটি নানা রকমে লেখার মধ্যে প্রকাশ হয়। এই অক্ষরটি যারা গ্রীক্ alpha আকারে লিখে থাকে তারা বিদ্যাভিমানী এবং মার্জ্জিত হয়। যাদের লেখায় অক্ষরটির মাথা কাটা যায় তাদের চরিত্রে সরল বাচালতার একটা প্রভাব আছে জান্‌তে হবে।

তারপর ধরা যাক্—I (আই)! যাদের লেখায় ছাপার অক্ষরের মত (typographical) I (আই) পাওয়া যায়—অনুভব ক'রবার ক্ষমতা তাদের মধ্যে পর্য্যাপ্তভাবে আছে জান্‌তে হবে। অক্ষরটির মাথার ফুট্‌কী যারা অপেক্ষাকৃত উঁচুতে দেয় তারা সাধারণতঃ দুর্ব্বোধ্য চাপা স্বভাবের হয়।

তারপর নেওয়া যাক্—T (টি)। এই অক্ষরটি গ্রাফোলজীর অনুশীলন ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান বলে স্বীকার করা হয়েছে। অক্ষরটির উপর লম্বা টান (dash) যদি কোন লেখায় অক্ষরটির আগেই পড়ে তাহলে বুঝতে হবে সে ব্যক্তি সন্দেহচিত্ত। টান্‌টি যদি অপেক্ষাকৃত ছোট হয় তা হলে তার দ্বারা লেখকের সংযত উদ্যমের বিষয় প্রমাণিত হয়। টান্‌টি যদি সামান্য নীচের দিকে হয় তাহলে বুঝ্‌তে হবে মানসিক নগণ্যতা এবং জঘন্যতা।

এই রকম ভাবে লেখার মধ্যে প্রত্যেকটি অক্ষরের বিশেষ চিহ্ন ধরে তার দ্বারা একটা ধারণা করা সহজসাধ্য। পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি লেখার দুইটি ভাগ আছে—সাধারণ হাতের লেখা এবং সই। পূর্ব্বে যে সকল বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলি সাধারণ হাতের লেখার পক্ষেই বিশেষভাবে খাটে। মানুষের হাতের সই (signature) অনুশীলনের রীতি ভিন্ন থিয়োরীর অধীন। সাধারণ হাতের লেখার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে কোনও দুই ব্যক্তির একটা সামঞ্জস্য আবিষ্কার করা যায়—কিন্তু সইয়ের ক্ষেত্রে তা পাওয়া খুবই কঠিন।

অনুশীলন করে দেখা গিয়েছে যে কোনও মানুষের সই যদি তার সাধারণ হাতের লেখা অপেক্ষা তুলনায় ছোট হয় তাহলে সে বৈশিষ্ট্য তার পার্থিব সম্পদের প্রতি বৈরাগ্যের

চিহ্ন বলে প্রমাণিত করে; অনেক ক্ষেত্রে এই স্বভাবের ব্যক্তিরা কার্য্যক্ষেত্রে দায়িত্ব-জ্ঞানের অভাবের কথা প্রমাণ করে। হাতের সই যদি সাধারণ লেখা অপেক্ষা বড় হয়, তা'হলে তার দ্বারা প্রমাণ হবে যে লেখক নিজের সম্বন্ধে একটা উচ্চাশা করে। যে সকল ব্যক্তির স্বাক্ষরের নীচে একটা রেখা টেনে দিতে দেখা যায় তারা প্রায়ই নিজেদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করতে প্রয়াস পায়। যদি সইএর শেষ অক্ষরটির পর একটা লম্বা টান্ থাকে তাহলে প্রমাণ হয় সে মানুষের মধ্যে অপরের সাথে শত্রুতা করবার মনোবৃত্তি প্রবল। বলা বাহুল্য সইয়ের চিহ্ন বিচার করবার সময়ে নিজেকে তীক্ষ্ণদর্শী করে নিতে হবে। এ ছাড়া সাধারণ হাতের লেখার অনুশীলনের কোনও কোনও নিয়ম এক্ষেত্রে খাটান যেতে পারে।

অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে যে ব্রিটিশ অপেক্ষা ইউরোপের অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের হাতের লেখা এবং সইয়ের মধ্যে তফাৎ অনেক বেশী, কারণ ইউরোপের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাতের লেখাকে একটা সূক্ষ্ম কলা (fine art) হিসাবে পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

হাতের লেখার সাধারণ এবং বিশেষ চিহ্ন নিদর্শন বিচার করবার পর আমাদের Resultant characteristicsএর সম্মুখীন হতে হয়। এই বিষয়টির সাহায্যে মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে একটা যুক্তি ও সিদ্ধান্তমূলক ধারণা করা যায়। প্রথম অনুশীলকদের পক্ষে সিদ্ধান্তমূলক বিশিষ্টতা কঠিন মনে হয়। এ সম্বন্ধে কঠিন থিয়োরীর কোনও অনুগমন না করে resultant characteristics সম্বন্ধে সাধারণ বিধিগুলি আলোচনা করা যাক্।

লেখার সাধারণ এবং বিশেষ চিহ্ন নিদর্শন আলোচনা করবার পর লেখাকে তিন্‌টি ভাগে বিভক্ত করা আবশ্যক—উত্তম, মধ্যম, অধম। প্রত্যেকটি পুনরায় তিন অংশে বিভক্ত। উত্তম শ্রেণীর লেখার তিনটি অংশ যথাক্রমে—প্রতিভা (genius), বিশেষ পারদর্শিতা (talent) এবং স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা (intelligence)। প্রতিভার ইংরাজি সংজ্ঞা—a power inclined to inspiration and creative faculty জেনে রাখা ভাল; প্রতিভার মধ্যে নিহিত আছে এমন অনুপ্রাণিত শক্তি Psychic force যার কোনও রকম বিচার বা অনুশীলন অসম্ভব। বিশেষ পারদর্শী ব্যক্তির মধ্যে কোনও একটা জটিল বিষয়কে নিজের ধারণার আয়ত্বে এনে ফেল্‌বার ক্ষমতা আছে কিন্তু তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সাধারণ বুদ্ধিমত্তা এমন একটা শক্তি—যার সাহায্যে মানুষ অপরের মৌলিক সৃষ্টিকে তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বলে মার্জ্জিত ও উন্নত করতে পারে—কিন্তু তার কোনও মৌলিক সৃষ্টি করবার ক্ষমতা নেই।

অধম শ্রেণীর লেখাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—মধ্যবিধ, নিকৃষ্ট এবং জঘন্য। হাতের লেখার উৎকৃষ্টতা এবং অপকৃষ্টতা স্থির হবার পর সেগুলির একটা বিচার আছে এবং এরই সাহায্যে মানুষের চরিত্রের সরলতা, উদ্যম, ভাবপ্রবণতা, উৎসাহ, বাচালতা, স্বার্থপরতা, উদ্ধতভাব ইত্যাদি গুণগুলি সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। এই গুণগুলির নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি সম্মিলন অর্থাৎ combination আছে। সেই combinationই মানুষের মূল চরিত্র প্রকাশ করে। কোনও এক ক্ষেত্রে হয়ত একটি সাধারণ হাতের লেখা অনুশীলন করে তার মধ্যে অহঙ্কার, ভাবপ্রবণতা এবং স্বার্থপরতা এই তিনটি গুণের অস্তিত্ব আছে দেখা গেল। সম্মিলন রীতি অনুসারে ভাবপ্রবণতা এবং স্বার্থপরতাকে একটি নির্দ্দিষ্ট সম্মিলনের মধ্যে ফেলা চলে এবং এই গ্রুপের সাহায্যে মানুষের আগ্রহশূন্য উদাসীন চরিত্রের কথা প্রমাণ হয়; পুনরায় অহঙ্কার এবং স্বার্থপরতা একটি পৃথক নির্দ্দিষ্ট গ্রুপের অধীন এবং তার দ্বারা কেবলমাত্র মানুষের অবজ্ঞাকারী স্বভাবের কথাই প্রকাশ পাচ্ছে। অবশেষে ঐ লেখার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়—লেখকের প্রকৃতি উদাসীন, অহঙ্কারী এবং অবজ্ঞাকারী। বলা বাহুল্য combinationগুলির মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। যেমন ভাবপ্রবণতা এবং স্বার্থপরতা এই দুইটি গুণ কেবলমাত্র একটি নির্দ্দিষ্ট সম্মিলনের অধীন এবং তার দ্বারা লেখকের অনুরাগহীন প্রকৃতির কথাই স্বীকার করা হবে।

উপসংহারে আমি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের হাতের সই অনুশীলন করবার প্রয়াস পেয়েছি। এ বিষয়ে আমার কৃতিত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে—কারণ রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের সংস্পর্শে যাবার শুভযোগ আমার ছাত্রজীবনে এখনো হয় নি। তাঁর সম্বন্ধে আমার

অনুশীলনমূলক সিদ্ধান্ত কতদূর মেলে তা বিচারের ভার আমার নয়; রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গের উপর। তাঁর স্বাক্ষরের প্রথম অক্ষর—R বেশ সুন্দর আকারের হওয়াতে প্রমাণ হয় তিনি তাঁর সম্বন্ধে একটা ভাল ধারণা করেন। ডান দিকে বেঁকিয়ে লেখার পক্ষপাতী হয়ে তিনি প্রমাণ করেন—আবেগপ্রবণ। সইয়ের অক্ষরগুলি পরস্পর যুক্ত থাকায় প্রকাশ হয়—তিনি কার্য্যকালে যুক্তিবিচারের সাহায্য করেন। তাঁর লেখার মধ্যে কলমের খোঁচা (rapid pen movement)র অস্তিত্ব আছে বলে প্রমাণ হয় তাঁর বিচারক্ষিপ্রতা। বিশ্বকবির হাতের লেখা বা সইকে উঁচু পর্য্যায়ে ফেলে তার মধ্যে প্রবল কল্পনাশক্তি এবং কার্য্যক্ষমতা আবিষ্কার করা হয়েছে এবং লেখাকে বা স্বাক্ষরকে প্রতিভার অন্তর্গত করা হয়েছে। বিশ্বকবির সই বা হাতের লেখা অনুশীলন করবার সময় কোনও সম্মিলন (combination) রীতি খাটে না—এ জন্য স্বীকার করতে হয় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা একটা নির্দ্দিষ্ট ধারায় প্রকাশমান হচ্ছে, সেটি—কাব্য এবং সাহিত্য। একজন ইংরাজ গ্রন্থকার তাঁর সই অনুশীলন করে বলেছেন—Had he been a painter instead of a poet, his subjects would have been bizarre and unusual—অর্থাৎ কবি যদি কবি না হয়ে চিত্রকর হতে বাধ্য হন তাহলে তাঁর প্রতিভার বিকাশ হতে পারে না।

বন্ধুর বউ দেখা

শ্রীবিরজাকান্ত চক্রবর্ত্তী

সেদিন দুপুর বেলা
গিয়াছিনু আমি গোপেনের 'মেসে' করিবারে তাস খেলা।
খেলা তখনও ওঠেনিক জমে
আমি তাস হাতে ছিনু এক কোণে
গোপেন হাসিয়া দেখাইল ক্রমে
দেবেন দাদার চিঠি
দেখি লেখা আছে ঠিক্ই।

গোপেনের পানে চেয়ে দেখি মুখ হাসিতে গিয়েছে ভ'রে
হাসিয়া রাগিয়া বলিলাম তারে, "শয়তান তুই ওরে
বিয়ের খাওয়ানো দিয়েছিস্ ফাঁকি
বৌদিদিকেও দেখাবি না নাকি ?
একথা কখন কেউ শুনেছে কি
বউ ছাড়া সব পর ?
থাম্ তুই চুপ্ কর্।"

"যাইতেছি আমি বৌমারে ল'য়ে কাল্ চারটের ট্রেণে,
ভুলে তুমি বসে থেকোনাক' যেন আসিও ইষ্টিশনে ;
হাওড়া হইতে তুমি যাবে ল'য়ে
তাঁহারে তাঁহার পিতার আলয়ে
আমারে আবার কাল্ই ঘুরিয়া
যাইতে হইবে বাড়ী,
আছে খুব তাড়াতাড়ি।"

চাপিল গোপেন হাওড়ার 'বাসে' আমিও নাছোড়বান্দা
উঠিনু 'বাসেতে' মনে জাগে শুধু বৌদি দেখার ধান্দা।
চারটের গাড়ী পহুঁছিল যবে
ভরিল হাওড়া কল-কলরবে
আমি এক পাশে দাঁড়ায়ে নীরবে
দেখি লোক আসা-যাওয়া
হঠাৎ থামিল চাওয়া—

গোপেনের পিছে আসিছে কে ওই ধীরে স্যাণ্ডেল্ পায়
শাড়ী-ঢাকা এক চলমান দেহ, মুখ ঢাকা তার হায় !
দেবেনদা মোরে দেখে কন হেসে
"বেশ হইয়াছে তুমি গেছ এসে
ভাইটিরে আর বৌমারে মোর
তুলে দিয়ে পুরী 'মেলে'
তারপর যেও চলে' ।"

পরের গাড়ীতে দেবেনদা মোর ফিরিয়া গেলেন বাড়ী ;
গোপেন সহজে আসিতে চাহে না 'ওয়েটিং-রুম্' ছাড়ি,
অবশেষে যবে সে এল বাহিরে
আমাতে তখন আমি যে নাহিরে
ছারপোকাদের কামড়ে কামড়ে
শরীর গিয়াছে ফুলি
বেঞ্চিতে বসা ভুল-ই ।

কহিল গোপেন, "দেখ্‌লি কেমন" ? কহিলাম হাসি আমি,
"আর পাঁচজনে দেখেছে যেমন চটী-পরা পা দু'খানি ;
ধীরে ধীরে চলে মুখ নাহি তুলে
সাথে কেবা আছে গিয়েছে তা ভুলে
শুধু মনে আছে হইবে চলিতে,
হাঁটি-হাঁটি পায়-পায়
বৌদি আমার যায় !

শাড়ী-ভেদকারী দৃষ্টিশক্তি দেন্ নি তো মোরে ধাতা,
থাকিত তা যদি দেখিতাম তবে চোখ মুখ নাক মাথা ।"
গোপেন তখন বলিল, "আচ্ছা,
দেখাইব তোরে বলিনু সাচ্চা
বৌদিদি তোর দেখিতে কেমন
উঠিব যখন ট্রেণে
করিস্ না কিছু মনে ।"

গোপেনের সাথে আরও কিছু কাল গল্প করিয়া আমি
ওধার হইতে কুলী একটাকে ধরিয়া আনিনু টানি,
বলিনু, "বৌদি চট্‌পট্ নিন্
পুরী 'এক্‌স্‌প্রেস্' হয়ে গেছে 'ইন্'
মাল যাহা আছে শীগ্‌গীর দিন্
আসিয়া গিয়াছে কুলী
আসেন নি কিছু ভুলি ?"

গাছের সাথেতে কথা বলিতেছি আমি হোথা হ'তে যেন !
নতুবা কথার উত্তর নাই, কি হেতু জানি না কেন !
যাহোক্ করিয়া দিলাম তুলিয়া
গোপেন এবং মালেরে ঠেলিয়া
বৌদি কখন্ উঠিয়া ঘুরিয়া
বসেছে ঘোম্‌টা টানি
ছোট সে কামরাখানি ।

গাড়ী ছাড়িবার দেরী তখনও আছে দেখি আধঘণ্টা ;
মোর "আধুনিকা" (?) বৌদিরে দেখি ভারী হ'য়ে গেল মন্‌টা ।
গোপেন করিল কত সাধাসাধি
কোন অনুরোধ রাখিনিক বাদই—
বৌদি বোধ হয় করিয়াছে রাগই
রহিল পিছন ফিরি
আর ক মিনিট দেরী ?

গাড়ীটা যখন নড়িয়া উঠিয়া চলিতে লাগিল ক্রমে
বলিলাম—"মোর বরাত খারাপ" যাইতে যাইতে নেমে,
বৌদির লাজ কি সর্ব্বনেশে
রইলেন্ ঠায় ঘুরে বেঁকে বসে !
বৌদি তখন চাহিলেন হেসে ;
বৌদির মুখ দেখা
বরাতে ছিলই লেখা !



টেক্‌নিকের অনুরূপ বাঙ্গালা

শ্রীআশুতোষ ঘোষ বি-এল্

টেক্‌নিক কথাটা একেবারে খাঁটি ইংরাজী শব্দ। অথচ ইহার বহুল প্রচলন বাঙ্গালা সাহিত্য-সমালোচনার দেখা যায় - প্রায় অনেক পত্রিকায়। টেক্‌নিকের খাঁটি বাংলা যে কি হওয়া উচিত তাহা সুধীগণের বিচার্য্য। টেক্‌নিক জিনিসটা সাহিত্যে কি বুঝায় তাহার আলোচনা হইলে আশা করি উহার অনুরূপ বাঙ্গালা শব্দটা পাওয়া দুরূহ হইবে না।

পাশ্চাত্য সাহিত্য-সমালোচনার ইতিহাস ও ক্রমোন্নতি পাঠে জানা যায় যে টেক্‌নিক শব্দটাও আধুনিক সমালোচকদিগের দ্বারা আবিষ্কৃত।

দার্শনিক প্লেটো সাহিত্য-সমালোচনার বিধিতে বলিয়াছেন—সাহিত্য হইতেছে নর-নারীর ব্যবহারের নকল ("behaviour of men and women"), যেমন চিত্র জাগতিক বস্তুর নকল (painter copies objects)। কিন্তু অ্যারিষ্টটল বলেন—নকল বটে, কিন্তু সঙ্গীত বা নৃত্যের ন্যায়। অর্থাৎ নৃত্য বা সঙ্গীত নর-নারীর রিপুচয় ও কার্য্যাবলী (represent) নকল করিলেও তাহাদের মধ্যে যে ছন্দ এবং মাধুর্য্য আছে, তাহা অবশ্যই নকল নহে। প্রকারান্তরে অ্যারিষ্টটল বলিতে চান—সাহিত্য নরনারীর ব্যবহারের নকল হইলেও তাহারা আরও কিছু।

যাহা হউক সাহিত্যকে যখন প্রধানত নকল বলিয়া ধরিলেন, তখন সমালোচনার জন্য তিনি সাহিত্যকে তিনটী প্রশ্নে বিশ্লেষিত করিলেন:—(১ম) ঐ নকল কিরূপ ভাষার দ্বারা সমাধান করা হইয়াছে? (২য়) উহা কি বিষয় নকল করিয়াছে? এবং (৩য়) উহা কিভাবে নকল করিয়াছে? অর্থাৎ তাঁহার প্রশ্ন তিনটী মূলত দাঁড়ায় এই:—(১) ঐ নকলের উপকরণ কি? (২) তাহার উদ্দেশ্য বা বস্তু কি? এবং (৩) নকল করিবার ধারাটা কি? ("he classifies imitation according to its med'um, its object and its manner" · ··· "Instead of saying, as Plato does, that, it is like painting, Aristotle s ys that it is like music or dancing.")

সাহিত্য নকলের উপকরণ যে ভাষা তাহা না বলিলেই চলে। নকলের উদ্দেশ্য যে কি তাহা রচনাটুকু পাঠেই বুঝা যায়। কিন্তু নকল করিবার ধারা সম্বন্ধে তিনি সাহিত্যিক প্রেরণা ও সাহিত্যের ভাষা লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার তথাকথিত নকলের ধারাটা গিয়া দাঁড়ায়—সাহিত্যিক প্রেরণা ভাষায় স্ফুটীকরণের প্রচেষ্টায়। ঐরূপ প্রচেষ্টাকেই তাঁহার পরবর্ত্তী সমালোচকরা টেক্‌নিক নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।

নকলের ধারা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া কবিতাকেই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া ধরিয়া গিয়াছেন। অবশ্য কবিতা বলিতে তিনি ছন্দোবদ্ধ রচনাকেই একমাত্র কবিতা বলিয়া ধরেন নাই। কারণ সম্বন্ধে তিনি বলেন—কবিতায় অনেক উপাদানাবলী বা সংবাদ রচনা হইতে পারে—তাই বলিয়া সেটা কবিতা নহে। কারণ তাঁহার মতে সেরূপ কবিতা কোন কিছুর নকল করে না—নর-নারীর ব্যবহার ("the behaviour of men and women) নকল করে না।

ওই কারণেই সমালোচকগণের মধ্যে তিনিই প্রথমে ঘোষণা করেন যে-গদ্য-রচনাও ঐ হিসাবে অনেক সময়ে কবিত্ব আখ্যা পাইতে পারে।

যাহাই হউক, খাঁটি সাহিত্যকে তিনি দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন—(১) নাটকীয় ধারায় (২) বর্ণনীয় ধারায় (dramatic and narrative)। মহাকাব্য (Epic) ও নাটক (drama) এই উভয়ের প্রভেদ সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—মহাকাব্য নাটক অপেক্ষা সুদীর্ঘই হইয়া থাকে। নাটকের কার্য্যধারা তাঁহার মতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আবদ্ধ থাকা উচিত। অবশ্য নাটক সম্বন্ধীয় তাঁহার উক্তি তাঁহার পরবর্ত্তী নাট্যকারগণ মান্য না করিয়াও বেশ ভাল ভাল নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে—"drama endeavours, as far as possible, to confine itself to the events of 24 hours"

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহার ঐ ভ্রমাত্মক উক্তিই এক সময়ে উন্নত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল নাটকীয় তিনটী বিধিতে; যথা—(১) Unity of action, (২) Unity of time and (৩) Unity of placeএ, অর্থাৎ (১) নাটকীয় কার্য্যধারাসমূহের উদ্দেশ্য একত্বব্যঞ্জক হইবে (২) উহা একটী স্থান (৩) এবং একটী বিশিষ্ট সময় মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে। গ্রীকদেশীয় বিয়োগান্ত-নাট্যকারগণ ঐ ভাবেই নাটকসমূহ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু আসলে সময় ও স্থান সম্বন্ধে অন্যান্য নাট্যকারগণ কোনও বিধি পালন না করিয়াও খুব ভাল ভাল নাটক রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—যেমন সেক্ষপীয়র ইত্যাদি।

কিন্তু Unity of action অর্থাৎ নাটকীয় কার্য্যধারাসমূহের একোদ্দেশ্যজ্ঞাপকতা সম্বন্ধে তিনি যে সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা নাটক কেন, আজ পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার সাহিত্যেই প্রযুজ্য হইতেছে—উহার অভাবে কোন রচনা সাহিত্য-রচনা বলিয়া গ্রাহ্য হয় না!

ট্র্যাজেডী বা বিয়োগান্ত রচনাদি সম্পর্কে তিনি যে সব বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটাই সর্ব্বপ্রকার সাহিত্য-রচনা—যথা, নাটক, নভেল, গল্প ইত্যাদিতে আজকাল প্রযুজ্য হয় এবং এবম্বিধ আলোচনা হইতেই তাঁহার পরবর্ত্তী সমালোচকগণ টেকনিক কথাটার উদ্ভব করেন।

ট্র্যাজেডী বা বিয়োগান্ত নাটকাদি তাঁহার মতে—কোনও কার্য্য-ধারার (actionএর) নকল হইতেছে। কার্য্যধারা বা action মানে কি? উত্তরে বলিতেছেন—কার্য্যধারা বা action মানে কোন ঘটনা বা কোনও ঘটনার ক্রমোন্নতি এইরূপই বুঝিতে হইবে। ইহাকে কার্য্যধারা বলিলেন কেন? উত্তর হইতেছে—যেহেতু কতকগুলি চরিত্র-সংযোগে কার্য্যধারা দেখান হয়, সেই হেতু কার্য্যধারা বা action নাম দেওয়া গেল।

ট্র্যাজেডী বা বিয়োগান্তক রচনাদি—শুধু কার্য্যধারার নকল হইলেই চলিবে না। ইহার উপর আরও কিছু চাই। সেটী হইতেছে—ঐরূপ কার্য্যধারা নিজেকেই নিজে সম্পূর্ণ ("complete in itself") হইয়া নকল হইবে; তবেই ট্র্যাজেডী আদি নামে ভূষিত হইবে।

ট্র্যাজেডী সম্বন্ধে তিনি যে অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান সমালোচকগণ সাহিত্য রচনা মাত্রেই প্রয়োগ করেন। উপরে ট্র্যাজেডী সম্বন্ধে তাঁহার মতটুকুই দেওয়া গেল।

রচনা সম্বন্ধে "নিজেতেই নিজে সম্পূর্ণ" এই কথাটা ব্যবহার করায় বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়—সাহিত্যের সহিত মানবের সত্যিকার জীবনের প্রভেদটুকু কোথায়।

মানবের জীবন আগাগোড়া একটানেই চলিয়া থাকে; কোন যে এক বিশেষ জায়গায় তাহার প্রারম্ভ এবং কোনো এক বিশেষ জায়গায় যে তাহার শেষ, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না—অর্থাৎ সত্যকার জীবনের ধারায় না আছে প্রারম্ভ, না আছে শেষ। কিন্তু সাহিত্য রচনায় গোড়া আরম্ভ করিতে হইবে একটা বিশেষ জায়গা হইতে এবং তাহার উপসংহারও টানিতে হইবে আর একটা বিশেষ জায়গায়। কাজেই সাহিত্যে থাকিয়া যায়—প্রারম্ভ, মধ্য ও শেষ এবং ঐভাবে সাহিত্য হইয়া বসে "নিজেতেই নিজে সম্পূর্ণ" (thus complete in itself")।

কিন্তু বাস্তবিক জীবনধারায় কত বিষয়ের যে সমস্যা উঠে তাহার স্থিরতাই নাই; আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলি জীবনে প্রায়শঃই অমীমাংসিতই রহিয়া যায়—যেহেতু জীবনধারায় না আছে প্রারম্ভ, না আছে শেষ। হয়ত কোনও সমস্যা আমার জীবনে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেছি, অথচ বাস্তবিক পক্ষে সেটার আরম্ভ ঘটিয়াছে সমাজ-জীবনে কতকাল পূর্ব্বে! এইরূপ কোন সম্বন্ধেও তাহাই। জীবনটা যেন, তর্ তর্ ধারায় প্রবাহিত সুদীর্ঘ নদনদীর মতন—আর সাহিত্য হইতেছে,—জীবন-পথের দুই একটা তরঙ্গ-লীলা দুই একটা ঘটনা মাত্র। জীবন নদীর এপারে যে ঘটনা সঙ্ঘটিত হইতেছে, ওপারে হয়ত অনুরূপ আর একটী অতি বিপরীত ঘটনা ঘটিতেছে—দুইটী ঘটনাই হয়ত একটী রচনায় মিলিত করান্ দুরূহ।

সাহিত্য যাহা নকল করে তাহা ঠিক খাঁটি জীবন নহে—জীবনের একটা স্ফুলিঙ্গ বা একটা ধারণা। কোনও একটা স্ফুলিঙ্গ বা ধারণা হইতে হয়ত সাহিত্যিকের একটা প্রেরণা জাগে। সেই প্রেরণা বলেই তিনি কতকগুলি বা একটা ঘটনার সহিত কতকগুলি চরিত্র সৃষ্টি করিয়া 'নিজেতেই নিজে সম্পূর্ণ' এমন একটী নাটক, উপন্যাস, কাব্য বা অন্য কোন সাহিত্য সৃষ্টি করিতে বসেন।

উপরোক্ত যেভাবে অ্যারিষ্টটল সাহিত্য রচনা বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন, সে সমুদয় পাঠ করিলেই বুঝা যায়, তাহার তথাকথিত নকল করিবার ধারাই হইতেছে আলোচ্য টেক্‌নিক—সে নকল বা টেক্‌নিক দ্বারা সাহিত্যিক আপন প্রেরণা ভাবারূপ উপকরণের সাহায্যে নাটক, উপন্যাস, কাব্য আদি সৃষ্টি করেন।

সাহিত্যিক প্রেরণা বা তাঁহার তথাকথিত নকল করিবার প্রেরণায় উদ্দীপিত হইয়া রচনাকার ভাষার সাহায্যে যে প্লট্ বা ঘটনাবলী সৃষ্টি করেন—যে ঘটনাবলী সৃষ্টির জন্য চরিত্রের সমাবেশ করেন এবং চরিত্রদিগের দ্বারা রস ও চিন্তার উদ্রেক করান, তাহার সমস্তটাই অ্যারিষ্টটল মতে manner of imitation (নকল করিবার ধারা) আখ্যায় পড়ে এবং ঐ নকল করিবার ধারাই আধুনিক সমালোচনা-সাহিত্যে টেক্‌নিক আখ্যা গ্রহণ করিয়াছে।

ঐ দার্শনিকের মতে প্লট্ই হইতেছে টেক্‌নিকের প্রধান বস্তু—চরিত্র হইতেছে পরবর্ত্তী বিচার্য্য বস্তু। অবশ্য কোন কোন সমালোচক বলেন—চরিত্রই হইতেছে মুখ্যবস্তু, প্লট হইতেছে গৌণ বিষয়। মোটের উপর দেখা যায়—যেটাই প্রধান হউক না কেন—চরিত্র, চিন্তা এবং ভাষা সমস্তই প্লটের অন্তর্গত এবং সমস্তই টেক্‌নিক নামে অভিহিত হয়। ইহাই হইতেছে আধুনিক সমালোচকদিগের অভিমত (Mr. Abercomtre Prof.' of Literature, London University)

টেক্‌নিকের প্রতিটী অংশ দ্বারাই দেখিতে হইবে- উপন্যাস বা নাটক বা কাব্যটী একত্বব্যঞ্জক হইয়াছে কিনা এবং ঐভাবেই টেক্‌নিকের প্রতি অঙ্গ বিচার করিতে হইবে—অর্থাৎ রচনার একত্বজ্ঞাপক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোনও চরিত্র বিসদৃশ হইয়াছে কি না—অথবা ব্যাখ্যান্তরে কোথাও বড় খুঁয়াটে হইয়া গিয়াছে কি না এবং চিন্তা ও ভাষা তদুপযোগী সামঞ্জস্যরক্ষা করিয়া চলিয়াছে কি না ইত্যাদি।

কাজেই দেখা গেল—পাশ্চাত্য সমালোচকগণ টেক্‌নিকের ব্যাপক অর্থ ধরিয়া তাহার মধ্যে প্লট্ বা ঘটনাসমাবেশ, চরিত্র, চিন্তা ও ভাষা সমস্তই অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। অবশ্যই ভাষার ভঙ্গী যাহাকে ষ্টাইল (style) বলে তাহাও ঐ টেক্‌নিকের অন্তর্গত এইরূপই বুঝায়।

উপরের টেক্‌নিক অর্থে দাঁড়ায়—সাহিত্য-প্রেরণা ভাষায় রূপান্তরিত করিবার ব্যাখ্যাবিশিষ্ট নৈপুণ্য বা ধারা। রূপান্তর করিবার নৈপুণ্য মানেই সম্পাদনা কৌশল অথবা সম্পাদনা-শিল্পই বুঝায়।

অতএব টেক্‌নিকের প্রতিশব্দ সম্পাদনা-শিল্প বলিলে দোষ হয় না।

যখন প্রেরণাকে রূপ দিতে হয়, তখন প্লট্, চরিত্র, চিন্তা, ভাষা আদি নানাপ্রকার সরঞ্জাম লাগে বলিয়া টেক্‌নিককে অল্প কথায় রূপ নৈপুণ্য বা রূপ-কলাও বলা যায় কি না তাহাও সুধীগণের বিচার্য্য।

সোণার দেশের তামা ও পিতলের কথা

শ্রীপিনাকীলাল রায়

রাজস্থানের প্রমারবংশীয় ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের রাজধানী ছিল ধারানগর। কথিত আছে উক্তবংশীয় কোন এক রাজার কনিষ্ঠ পুত্র জগদ্দেউ প্রমার সিংহভূম জেলার ধলভূম-রাজবংশের আদিপুরুষ। উদ্ধত ও স্বাধীনচেতা জগদ্দেউ প্রমার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী অগ্রজের সহিত গৃহ-বিপ্লব ঘটাইয়া জন্মভূমি পরিত্যাগ করিবার কালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন "যদ্যপি কখনও তাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন হয় তাহা হইলে তিনি মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, নচেৎ সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তীর্থপর্য্যটনে জীবন অতিবাহিত করিবেন।"

একদা ঘটনাক্রমে রাজপুত্র পুরুষোত্তমতীর্থে উপনীত হইয়া যখন তত্রত্য নরপতি রুদ্রাদিত্যদেবের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময় একদিন রাত্রির তৃতীয় যামে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন এক ষোড়শী নীলবসনাসুন্দরী তাঁহার শিয়রে দণ্ডায়মানা থাকিয়া বলিতেছেন "রাজপুত্র, আমার সঙ্গে এস। আমি তোমাকে সোণার নদী প্রবাহিত, আকরিক দ্রব্যে পরিপূর্ণ, পর্ব্বতপরিবেষ্টিত এক সোণার রাজ্যে লইয়া যাইব এবং তোমাকে সেই রাজ্যের সিংহাসনে বসাইব। কালবিলম্ব না করিয়া আমার পশ্চাদনুসরণ কর" এই বলিয়া সুন্দরী কিয়দ্দূর উত্তরদিকে গিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র তিনি মনে মনে বিচার করিলেন "এই স্বপ্নদৃষ্টা সুন্দরী রমণী নিশ্চয়ই রাজলক্ষ্মী; ইনি তাঁহার উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য স্বপ্নে ভাগ্য-বিধাত্রীরূপে দেখা দিলেন।"

তিনি অতি প্রত্যূষে পুরীধাম পরিত্যাগ করিয়া যে পথে রাজলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন সেই উত্তরদিকের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। স্বপ্নাদেশের মোহ যেন এক নব-শক্তিতে সঞ্জীবিত করিয়া তাঁহাকে অলৌকিক স্বপ্ন-রাজ্যের সিংহাসনের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। এই দুর্ব্বার আকর্ষণ তাঁহার গতিমুখে পতিত দুর্গম খাল, বিল, নদী, জঙ্গল, পাহাড়, পর্ব্বত প্রভৃতি যত কিছু বাধা ও বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাকে স্বপ্নের নদী সুবর্ণ-রেখার তীরে—ইতিহাসপ্রসিদ্ধ আমাইনগরের ঘাটে পৌছাইয়া দিল।

ধলভূম রাজ্যের রাজধানী ছিল তখন "বরাগেড়া"। তিনি শ্যামচাঁদ নামক জনৈক প্রতিপত্তিশালী কৃষক-জমীদারের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া তাহার সাহায্যে তত্রত্য রজক নরপতি অভিরাম ধবলকে পরাজিত করেন এবং বাং সন ৬৩৮ সালে জগন্নাথ ধবলদেউ নাম গ্রহণ করিয়া ধলভূমের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। পরে রাজনৈতিক সুবিধা ও অসুবিধার বিষয় চিন্তা করিয়া তিনি তাঁহার রাজধানী "বরাগেড়া" হইতে ঘাটশীলায় স্থানান্তরিত করেন। ইহা প্রায় সাতশত বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। *

·· এই সেই স্বপ্ন-দৃষ্ট সোণার দেশ। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা কল্পলতিকা বঙ্গমাতার মুকুটমণি এই সোণার দেশ সিংহভূম। মায়ের মুকুট হইতে এই মণিটি আজ দৈব দুর্যোগের মধ্যে স্খলিত হইয়া পড়িলেও যতদিন বাঙ্গালা দেশ ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিঃশেষে মুছিয়া না যাইবে ততদিন কোন বাঙ্গালীই জন্মভূমির এই দারুণ ক্ষতির কথা ভুলিতে পারিবে না।

···এই সেই পাহাড়-ঘেরা সোণার দেশ, যাহার পাহাড়ে সোণার সন্ধান পাইয়া—গিল্যান্ডারস্ আরবুথনট্ কোম্পানী কালিকাপুরের নিকটবর্ত্তী রাজদোহা নামক স্থানে "দি রাজদোহা মাইনিং কোম্পানী" নামে একটি স্বর্ণ খনির কারখানা ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে স্থাপন করে। কিন্তু কোম্পানী উক্ত খনির স্বর্ণপ্রস্তরে (Gold ore) সোণার অংশ অর্থ-নৈতিক হিসাবের দিক দিয়া অনুপাতে কম হওয়ায় এবং ফণ্ডের অস্বচ্ছলতা হেতু খনির কার্য্য বন্ধ করিতে বাধ্য হয়।

যেমন কেঁচো তুলিতে গিয়া সাপও বাহির হইয়া পড়ে তেমনি এই কোম্পানী সোণা তুলিতে গিয়া এই সোণার দেশের পাহাড়ে সোণার চেয়ে কম মূল্যের আর একটি ধাতুর

* শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রাউল প্রণীত "ধলভূম বিবরণ" দ্রষ্টব্য।

সন্ধান পাইল। ইহা তামা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই—সোণা ও তামা যেন একই মায়ের পেটের দুটি যমজ ভগ্নী, পরস্পর পরস্পরের সাহচর্য্য ভিন্ন থাকিতে পারে না। একই পাহাড়ে কিম্বা তন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে সোণা ও তামার অবস্থিতি যেন একটা স্বতঃসিদ্ধ নিয়মের অধীন। মানভূম জেলায় সুবর্ণরেখা নদীতীরবর্ত্তী পাতকুম্ ও চাণ্ডিল্ থানার পার্ব্বত্য অঞ্চলের দুইটি পাহাড় কোন্ প্রাচীনকাল হইতে এখনও পর্য্যন্ত সোণার পাহাড় ও তামার পাহাড় নামে ঘোষিত হইয়া আসিতেছে এবং উক্ত অঞ্চলের পার্কিডি নামক স্থানের একটি পাহাড়ে স্বর্ণপ্রজননের জন্য প্রায় ৬।৭ লক্ষ টাকা মূলধনে সম্প্রতি একটি ভারতীয় কোম্পানীও গঠিত হইয়াছে।

যাহা হউক এই রাজদোহা মাইনিং কোম্পানী সোণার কাজে ইস্তফা দিয়া কিয়ৎকাল তামার কাজে আত্মনিয়োগ করে এবং রাজদোহার কয়েক মাইল পূর্ব্বে ও সিংহভূম পর্ব্বতমালার মধ্যে যে সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ "সিদ্ধেশ্বর" নামে অভিহিত তাহারই ঠিক পশ্চিমস্থ "রাখা" পাহাড়ে বহু টাকার যন্ত্রপাতি স্থাপন করিয়া তথায় এই কোম্পানী একটি তাম্র-খনির কার্য্য আরম্ভ করে। এদিকে ঠিক এই সময়ে ভারতসরকারের ভূতত্ত্ব-বিভাগ হইতে (The Geological survey of India) সিংহভূমের তাম্র সম্বন্ধীয় একটি সুন্দর গবেষণামূলক রিপোর্ট সবে মাত্র বাহির হইয়াছিল; তাহা স্যর টমাস হল্যাণ্ডের রিপোর্ট নামে খ্যাত। এই রিপোর্টে প্রলুব্ধ হইয়া অনেকগুলি কোম্পানী এই খনির স্বত্ব ও যাবতীয় সরঞ্জাম রাজদোহা মাইনিং কোম্পানীর নিকট হইতে কিনিয়া লইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে; কিন্তু আফ্রিকায় তাম্রখনির কারবারে সুপ্রতিষ্ঠিত "কেপ্ কপার কোম্পানী" সর্ব্বোচ্চ মূল্য চৌদ্দ হাজার পাউণ্ড বা প্রায় দুই লক্ষ টাকায় ইহা কিনিয়া লইয়া মেসার্স "জন টেলার এণ্ড সন্সের" তত্ত্বাবধানে খনির কার্য্য পরিচালনা করিতে সুরু করে। এই ব্যাপার ১৯০৭ হইতে ১৯০৮ সালের মধ্যে সংঘটিত হয় এবং ১৯১৪ সালে

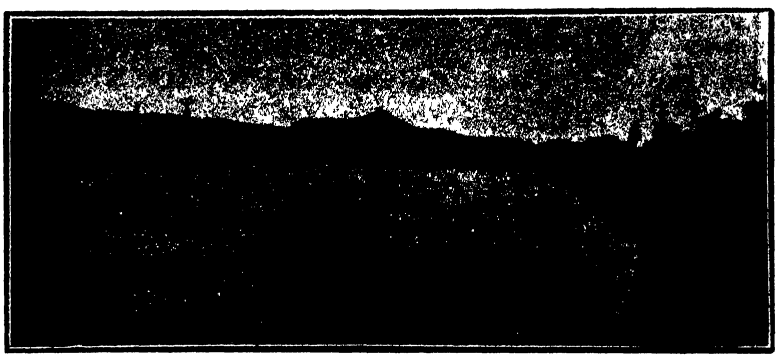


লেখক।

এই কোম্পানী ভারতে সর্ব্বপ্রথম (অবশ্য এই আধুনিক যুগে) তাম্র উৎপাদন করিয়া রাখা-পাহাড়ের শীর্ষদেশে ইংরেজ জাতির বিজয় নিশান প্রোথিত করে।

পরে নানা কারণে এই কোম্পানী ১৯২১ সালে লিকুইডেসনে যায় এবং ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত খনিটি কার্য্যকরী করিয়াই রাখা হইয়াছিল—যদি কোন ক্রেতা ইহা উচিত মূল্যে কিনিয়া লয় এই আশায়।

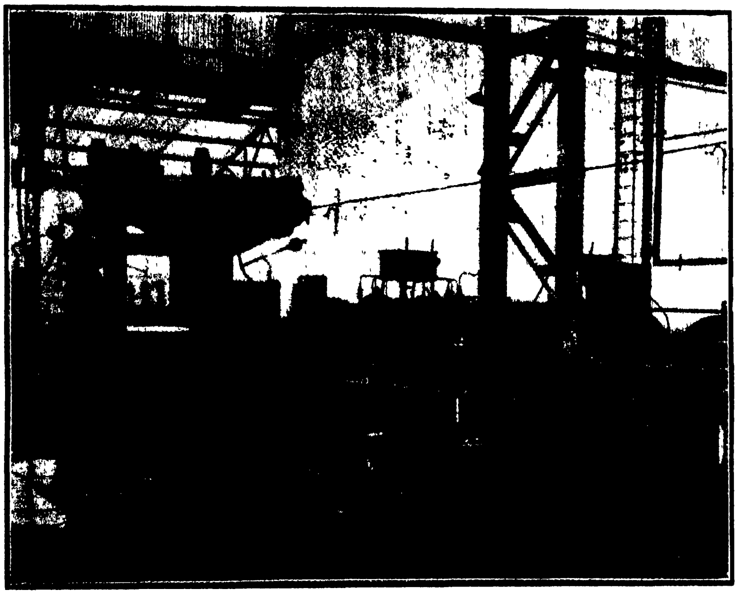
এদিকে ১৯২৪ সালে আর একটি ব্রিটিশ কোম্পানী এই রাখা পাহাড়েরই কয়েক মাইল পূর্ব্বে "মোষাবনি" নামক স্থানে "দি ইণ্ডিয়ান্ কপার করপোরেশন লিমিটেড" নামে গঠিত হয়; সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের খনির কার্য্যও বেশ দ্রুত-গতিতেই অগ্রসর হইতে থাকে। পরে ১৯২৭ সালে খনিটি কার্য্যোপযোগী বিবেচিত হইলে সুবর্ণরেখা নদীর উত্তর তীরে ঘাটশীলার অনতিদূরস্থ মৌভাণ্ডার নামক স্থানে তাম্র-প্রজননের জন্য এক বিরাট কারখানা স্থাপিত হইয়া ১৯২৮



সুবর্ণরেখা নদীতীরস্থ তামা ও পিতলের কারখানার সাধারণ দৃশ্য। এরিয়্যাল্ রোপওয়ের পোষ্টগুলি দেখা যাইতেছে। দূরে সিদ্ধেশ্বর পাহাড়।

সালের ডিসেম্বর মাসে তাহা হইতে তাম্র-প্রজননক্রিয়া বেশ সুষ্ঠুভাবে আরম্ভ হয়।

ইহার দুই বৎসর পরে এই কোম্পানী ১৯৩০ সালের জুলাই মাসে উক্ত কারখানার পার্শ্বে আর একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলে এবং ইহা হইতে ভারতে সর্ব্বপ্রথম পিতল উৎপাদন করিয়া এই নূতন কোম্পানী তামা ও পিতলের কার্য্যে আজ এই দেশে যে নব-যুগের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এক্ষণে প্রতি মাসে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে প্রায় ৬০০ টন্ বিশুদ্ধ তামার ইন্‌গট্ উৎপন্ন হইতেছে এবং এই তামা দস্তার সংমিশ্রণে পিতলে পরিণত হইয়া উহা হইতে প্রতি মাসে প্রায় হাজার টন্ করিয়া পিতলের শিট্, প্লেট ও সার্কল্ ক্রেতার অর্ডার অনুযায়ী প্রস্তুত হইয়া ভারতের বাণিজ্য-কেন্দ্র কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, রেঙ্গুন, দিল্লী, লাহোর, জয়পুর প্রভৃতি বড় বড় সহরের ব্যবসায়ীমহলকে এই অল্প-দিনের মধ্যেই একচেটে করিয়া ফেলিয়াছে।



যেখানে পিতলের শিট ও প্লেট তৈয়ার হইতেছে সেই রোলিং মিলের ভিতরের দৃশ্য।

ভারতের এই নষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধার করিয়া ইংরেজ আজ যে আমাদের ধন্যবাদার্হ তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন ভারতও তাহার নিজের বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে এই খনিজ শিল্প লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছে। ইহার প্রামাণ্য তথ্য অধ্যাপকপ্রবর পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় লিখিত "দি কপার ইন্ এন্‌সিয়েন্ট্ ইণ্ডিয়া" নামক ইংরেজী গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। তামা ও পিতলের ব্যবহার এবং প্রজননক্রিয়া বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তীকাল পর্য্যন্ত ভারতের পার্ব্বত্য-অঞ্চলে বিশেষতঃ সিংহভূম ও তন্নিকটবর্ত্তী দুর্গম স্থানগুলিতে কিরূপ বিপুল ও ব্যাপকভাবে উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল তাহার সঠিক সংবাদ আজ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর না হইলেও তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া আজ প্রয়োজন বলিয়া মনে করিতেছি এবং এক্ষেত্রে তাহা সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

বৈদিক যুগের প্রথম হইতেই ভারতের আর্য্য হিন্দুগণ লৌহের বিষয় অবগত ছিল এবং পরবর্ত্তী-কালেও ইহার গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়া লৌহ-শিল্প চাতুর্য্যে তাহার যে একদিন যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন-স্বরূপ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতা-ব্দীতে নির্ম্মিত ইন্দ্রপ্রস্থের সুপ্রসিদ্ধ লৌহ-পিলার, রাজস্থানের প্রমারবংশীয় নৃপতি-গণের রাজধানী ধারানগরীর লৌহস্তম্ভ এবং আবু পাহাড়ের শীর্ষদেশে স্থাপিত লৌহগুম্বজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার পরবর্ত্তী মোগল যুগ পর্য্যন্তও এই লৌহ এবং তজ্জাত ইস্পাত-(steel) শিল্পের যশোভাতি বিশেষ ম্লান হইয়া না গেলেও বিদেশীয়দের স্পর্শে ভারতের বৈশিষ্ট্যে যে ভাঙ্গন ধরিতে সুরু করিয়াছিল সেই অপ্রিয় সত্যের কথা আজ বাধ্য হইয়াই বলিতে হইতেছে। পরে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই ভারতের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ইউরোপীয় লৌহ ও ইস্পাত ভারতের বাজারকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করে

এবং সে চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হইলেও সম্প্রতি টাটা কোম্পানীর লৌহ ও ইস্পাত ভারতকে যে বহুল পরিমাণে স্বাবলম্বী করিয়াছে তাহা আজ আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

নখ, দন্ত ও শৃঙ্গ সম্পন্ন হইয়া কিম্বা কর্ণের মত সহজাত কবচকুণ্ডলধারী হইয়া কোন মানুষই জন্মগ্রহণ করে নাই। তাহাদিগকে অতি আদিম যুগ হইতে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথম তাহাদের প্রধান অস্ত্র ছিল—প্রস্তর ও যষ্টি। কিন্তু সৃষ্টির পর হইতেই অভিব্যক্তিবাদ সুরু হইয়াছে সুতরাং প্রস্তর ও যষ্টির পর তাহা হইতে উৎকৃষ্টতর দ্রব্য আবিষ্কৃত হইল—লৌহ। এই লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রই সবচেয়ে বেশী কার্য্যকরী বলিয়া বিবেচিত হইল। আবার এই লৌহের সন্ধানে ফিরিতে ফিরিতে তাহারা তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর আরও দুইটি মূল্যবান ধাতুব সন্ধান পাইয়া গেল—তামা ও সোণা। সুতরাং জাতিরও ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সব উন্নততর ও উন্নততম দ্রব্যাদিও জাতির জীবন-সংগ্রামে অপরিহার্য্যরূপে দেখা দিল।



রোলিং-মিলের একটি ফার্ণেস্। এই ফার্ণেসে পিতলের বাটগুলি প্লেটের আকারে পরিণত করিবার জন্য উত্তপ্ত করিয়া লওয়া হইতেছে।

যাহা হউক, ভারত শুধু লৌহশিল্পের উপর তাহার মস্তিষ্ক চালনা করিয়াই যে ক্ষান্ত ছিল তাহা নহে; পরন্তু ইহা অপেক্ষাও মূল্যবান ধাতু তামার ব্যবহার ও প্রজনন সম্বন্ধে যে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিল তাহা দ্বারা নিজের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে প্রাণবন্ত করিয়া রাখিতে সে কম সহায়তা করে নাই। ইতিহাসপূর্ব্ব কোন্ আদিম যুগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই ভারতোৎপন্ন মূল্যবান খনিজ পণ্য ভারতের অভাব মিটাইয়া তাহা এই ভারতের বণিকদেরই অর্ণবপোতে বোঝাই হইয়াছে এবং উজানির ধনপতি সদাগরের মত কত হাজার হাজার ধনপতি তাহাদের কত সাত-ডিঙ্গা মহার্ণবে ভাসাইয়া সেই অকূল সমুদ্রে পাড়ী জমাইয়াছে—সাগরপারের বিদেশী স্যাঙাৎদের অভাব পূর্ণ করিয়াছে।

মোটের উপর, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একমাত্র ভারতই যে তখন সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী ছিল তাহার বিবরণ পাশ্চাত্য গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস খৃঃ পূঃ ৩০২ অব্দে তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

অতি প্রাচীনকালে ছোটনাগপুর, সিংহভূম ও হাজারীবাগ জেলার পার্ব্বত্য-অঞ্চলে তাম্র-প্রজনন ক্রিয়া যে বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ ভূতত্ত্ব ও খনিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়। তাম্র নিষ্কাশনের পর পরিত্যক্ত ময়লাগুলি (slags) যাহা—সিংহভূম জেলার আসনবনি রেলওয়ে ষ্টেশনের পশ্চিমদিকস্থ পাহাড়ে, বাদিয়া ও মোষাবনীতে, সুরদার পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমদিকের পাহাড়ে, রোঁয়ামের দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ সিদ্ধেশ্বর পাহাড়ে এবং কেন্দাডি, চাপড়ি, ধবনী, পুটুর প্রভৃতি

আরও বহু স্থানে স্তূপীকৃত ভাবে পড়িয়া আছে তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে প্রাচীনকালে এই সব অঞ্চলে তাম্র-প্রজননক্রিয়া কিরূপ নিরবচ্ছিন্ন অবাধগতিতে চলিয়াছিল। যদিও ভারতের অন্যান্য স্থানেও তাম্র-প্রজননক্রিয়ার নিদর্শন অল্প বিস্তর পাওয়া গিয়াছে তবুও তাম্র উৎপাদনের প্রাচুর্য্য ও পরিশুদ্ধতায় সিংহভূমই ছিল তখন যে প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ এবং ভারতের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলিও যে এই সিংহভূমের তামাতেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

অধুনা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভাগলপুর জেলাস্থ সুলতানগঞ্জ নামক স্থানের বৌদ্ধ-প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে একটি তাম্রনির্ম্মিত বুদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়া তাহা এক্ষণে ইংলণ্ডস্থ বার্মিংহাম মিউজিয়মে সুরক্ষিত আছে। ই, আই, রেলওয়ের রেসিডেণ্ট ইন্‌জিনীয়ার মিঃ হ্যারিস্ ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নিকট উক্ত মূর্ত্তিটির সঠিক সংবাদ অবগত হইয়া তিনি উক্ত ধ্বংস-স্তূপ হইতে উহার উদ্ধার সাধন করেন এবং সম্ভবত তিনিই উহা বার্ম্মিংহাম মিউজিয়মে পাঠাইয়া দেন।

মিঃ হ্যারিসের বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে উহার উচ্চতা ৭½ ফিট্ এবং ওজনে প্রায় ১ টন্। এই মূর্ত্তিটি সম্বন্ধে তিনি তাঁহার বর্ণনায় একটি সুন্দর উল্লেখযোগ্য তথ্য প্রদান করেন। মূর্ত্তিটির অবয়বের উপর সাধু-সন্ন্যাসীদের পরিচ্ছদের মত একটি পরিচ্ছন্ন আবরণ আছে। ইহার ভিতর দিয়া মূর্ত্তিটির প্রকৃত গঠনপারিপাট্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই আবরণটি সম্বন্ধে ডক্টর মিত্রের যুক্তি এই যে তামার বিশুদ্ধতা ও প্রস্তুত প্রণালীর উপরই এই স্বচ্ছতা নির্ভর করে এবং ইহা আজ ভারতীয় ভাস্কর্য্য-শিল্পের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদানস্বরূপ জগতের চক্ষে যে পরম বিস্ময়ের বস্তু তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বার্ম্মিংহাম মিউজিয়মের সচিত্র হ্যাণ্ডবুকে এই মূর্ত্তিটি ভুলক্রমে ব্রোঞ্জনির্ম্মিত বলিয়া লিপিবদ্ধ আছে।

অনুরূপ আর একটি তাম্রনির্ম্মিত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির কথা সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েনসাংএর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিত আছে। এই মূর্ত্তিটি উচ্চতায় ৮০ ফিটের কম নয়। ইহা দণ্ডায়মান অবস্থায় নালন্দা বিহারের ঠিক পূর্ব্বদিকে অবস্থিত আছে। ইহা আকারে রোডস্ ও সাইপ্রস্ দ্বীপের অতিকায় ব্রোঞ্জমূর্ত্তিটির সমতুল বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। এই মূর্ত্তিটি সূর্য্য-দেবতা হেলিয়সের বিগ্রহ বলিয়া কথিত আছে। লিন্‌ডাস্ নামে গ্রীস দেশীয় জনৈক পল্লী-ভাস্করের দ্বারা ও গ্রীসের রাজকোষ হইতে প্রদত্ত অর্থে ইহার প্রাথমিক গঠনকার্য্য আরম্ভ হয়। মহারাজা চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ভারত ও গ্রীস যখন আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ সেই সময় মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত উৎকৃষ্ট ভারতীয় ভাস্কর ও ধাতব উপাদান দ্বারা মূর্ত্তিটির পূর্ণতা সম্পাদনে সহায়তা করিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তিটির উচ্চতা ৭০ কিউবিটস্ (cubits) এবং ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইতে দীর্ঘ ১২টি বৎসর অতিবাহিত হয়। ইহা নির্ম্মিত হইবার পর ৫৬ বৎসর কাল অক্ষতদেহে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রবল ভূমিকম্পে ইহার কতক অংশ পড়িয়া যায়। সে সময় ইহা স্যারাসিন্‌দের (saracene) অধিকারে



তামা ও দস্তার সংমিশ্রণে গলিত পিতল ছাঁচে ঢালাই হইতেছে।

ছিল। খৃষ্টীয় ৬৫৩ অব্দে স্যারাসিন্‌রাজ এই ভূপতিত অংশগুলি জনৈক ইহুদি বণিককে বিক্রয় করেন। কথিত আছে যে উহা বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য ৯০০ উষ্ট্রের প্রয়োজন হইয়াছিল।



মুচি (Crucible) উত্তপ্ত করিবার জন্য ফার্নেসের মধ্যে বসানো হইতেছে।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মহারাজ অশোকের শেষ বংশধর রাজা পূর্ণবর্ম্মার আমলে নালন্দার বুদ্ধমূর্ত্তিটি যেন ধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্যের জয়স্তম্ভস্বরূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। রোডস্‌ দ্বীপের মূর্ত্তিটি উপর্য্যুপরি ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রকৃতির নির্ম্মম কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া প্রায় ধ্বংসের করতলগত হইতে চলিয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় জগতের সপ্তাশ্চর্য্যের মধ্যে যাহার স্থান—ভারতীয় শিল্পী ও ভারতীয় উপাদানে রূপায়িত হইয়া যাহার পূর্ণতা পরিস্ফুট হইয়াছিল—সেই পরমাশ্চর্য্যকর বস্তুটির বিষয় ভারত আজ নিঃশেষে ভুলিতে বসিয়াছে। দৃষ্টি-সীমানার বাহিরে বলিয়াই কি তাহার এই আত্মবিস্মৃতি! ভারতের ভাস্কর্য্য-শিল্পের যাহা চরম অবদান তাহার বিষয়ে ইতিহাসেরও কি কোন কৈফিয়ৎ নাই?

·· খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে পিতলের ব্যবহার ও প্রজনন ভারতে যে যথেষ্টই ছিল তাহার প্রমাণ চরক-সংহিতা, মনুসংহিতা রসরত্নসমুচ্চয় প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই পিতলের অপর নাম ছিল 'রীতি'। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে অমরকোষে এবং বরাহমিহিরের বৃহৎ-সংহিতায় এই "রীতি" ের উল্লেখ আছে। পরে ত্রয়োদশ শতাব্দীর রসরত্নসমুচ্চয়-গ্রন্থে 'রীতিকা' ও 'কাকতুণ্ডি' নামক দুই প্রকার পিতলের কথা আমরা দেখিতে পাই।

"রীতিকা কাকতুণ্ডশ্চ
দ্বিবিধং পিত্তলং ভবেৎ।"

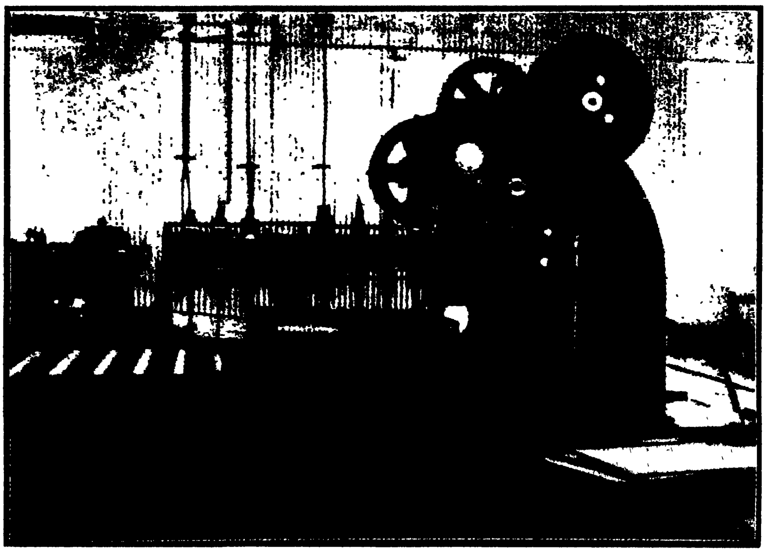
......খৃষ্ট পূর্ব্ব কিম্বা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে নির্ম্মিত পিতলের তৈজস-পত্র ও পূজার বাসন অনেক স্তূপ ও ভগ্নাবশেষের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। পিতল ও ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত বহু দেব দেবীর



গলিত ও জলন্ত পিতলপূর্ণ মুচি (Crucible) ফারনেস্‌ হইতে বাহির করা হইতেছে।

মূর্ত্তি যাহা আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকগণের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহার সঠিক বিবরণ পাওয়া না গেলেও তাহা যে অন্তত কোন্ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা কতকটা অনুমান করা যায় ও কতকটা গবেষণার ফলে জানিতে পারা যায়। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর একটি পিত্তল-খোদিত বুদ্ধমূর্ত্তি (৩০ সেন্টিমিটার উচ্চ, ১৩·৫ সেন্টিমিটার চওড়া) কংরাকোটের ২০ মাইল পশ্চিমে ফতেপুর নামক স্থানের একটি ধর্ম্মশালায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর আর একটি বৃহদাকার পিতলের মূর্ত্তি জঙ্গিলা দেশের কোন এক ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সম্প্রতি ঢাকার মিউজিয়মে সুরক্ষিত আছে। কিন্তু হুয়েনসাং বর্ণিত সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার পিত্তল প্রতিষ্ঠান—যাহা তিনি নালন্দা বিহারের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে দেখিয়াছিলেন সেইটিই যে সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বিশাল বিহারটি মহারাজ শিলাদিত্যের কীর্ত্তিস্তম্ভ। হুয়েনসাং এই বিহারের বর্ণনায় কেবলমাত্র ১০০ ফিটের কথা উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু এই ১০০ ফিট দীর্ঘ কি উচ্চ কি চওড়া তাহা স্পষ্ট করিয়া লেখা নাই। এই বিপুলায়তন পিত্তল বিহারটি ৬:৬—৬৪৭ অব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিন্তু যদিও রাজা শিলাদিত্য (যিনি হর্ষবর্দ্ধন নামে খ্যাত) তাঁহার সঙ্কল্প অনুযায়ী বিহারটির সম্পূর্ণ রূপ দিতে পারেন নাই—ইহা এখনও অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মহাকালের সাক্ষী-স্বরূপ দণ্ডায়মান আছে—তবুও ইহা অকপটে স্বীকার করিতে হইবে যে সপ্তম শতাব্দীর ভারত পিতলের কাজের যে অতুলনীয় স্মৃতি-চিহ্নগুলি রাখিয়া দিয়াছে তাহা এই বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের নিকটও পরম বিস্ময়ের বস্তু।

ইহা ছাড়া কত অসংখ্য পিতলনির্ম্মিত দেবদেবীর মূর্ত্তি ভারত ও তিব্বতের লক্ষ লক্ষ মন্দিরে বিগ্রহরূপে বিরাজমান আছে এবং গৃহকার্য্য ও দেব-পূজার নিত্য ব্যবহার্য্যরূপে কত হাজার হাজার মণ তৈজসপত্র মধ্যযুগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার হিসাব কে দিতে পারে?



এই যন্ত্রে পিতলের শিট্ ও প্লেট্ কাটিয়া সাধারণ আকারে পরিণত করা হইতেছে।

বহু পূর্ব্ব হইতে ব্রিটীশ বর্ম্মাও পিতলের দেশ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া আসিয়াছে। মধ্যযুগ হইতে এবং বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দীতে পিতলনির্ম্মিত বিপুলায়তন বুদ্ধ প্রতিকৃতি-গুলি বর্ম্মার মন্দিরে মন্দিরে পূজিত হইয়া আসিতেছে এবং সুবৃহৎ পিতলের ঘণ্টা প্রত্যেক মন্দিরের শোভাবর্দ্ধন করিয়া আসিতেছে। 'সিউই-ডেগন্‌পায়া' নামক স্থানের বিশাল পিতলের ঘণ্টা তত্রত্য সম্রাট 'সিম্‌বিশিন্' কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় ১৭৭৫ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার ওজন ৮১ টন। উত্তর বর্ম্মার পিতল নির্ম্মিত সুপ্রসিদ্ধ 'মিংগুইন' ঘণ্টা যাহা ওজনে ও আয়তনে জগতের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট 'বেদোপায়া' কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার ব্যাস্ ১৬ ফিট ও ইহার ওজন ৮৮ টন। ইহা এত বড় যে ভূমি হইতে তিনজন মানুষ পরস্পর পরস্পরের

কাঁধে চড়িয়া দাঁড়াইলেও ইহার মস্তকদেশ স্পর্শ করা সম্ভব হয় না।

রুশিয়ায় পিতলনির্ম্মিত মস্কোর ঘণ্টাও নাকি জগতের সপ্তম আশ্চর্য্যের অন্যতম। ইহার ওজন ১২৮ মণ। এই ঘণ্টাটির চেয়েও বড় আর একটি ঘণ্টা মস্কোতে আছে। ইহার নামকরণ হইয়াছিল "জার কোলোকোগ্" (Tsar kolokog) এবং ইহার ওজন প্রায় ১৮০ টন্। কিন্তু এই ঘণ্টাটি প্রস্তুত হইয়া চুল্লী (Furnace) হইতে নামাইবার কালে হঠাৎ ফাটিয়া যায় (cracked)। সুতরাং উহা এখন অব্যবহার্য্যরূপে মস্কোর মিউজিয়মের কোন এক কোণে পড়িয়া থাকিলেও কৌতূহলী দর্শনার্থীরা ইহাকে যথেষ্ট প্রশংসমান দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকেন।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের সংস্কৃতি ও সাধনা ভারতের নিকটতম দেশের উপরেও যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার অকাট্য প্রমাণ বোডস্ দ্বীপের সূর্য্যমূর্ত্তি ও মস্কোর এই দুইটি ঘণ্টা।

মোগলদের আমলে বন্দুক কামান প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র প্রস্তুতের জন্য তামা, পিতল, ব্রোঞ্জ ও লোহের যথেষ্ট ব্যবহার ছিল। প্রথম মোগল বাদশাহ বাবর—যিনি তদানিন্তন যুগে সর্ব্বপ্রথম ভারতে কামান প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তিনি—তাঁহার 'হদিশে' অর্থাৎ স্মারকলিপিতে আগ্নেয়াস্ত্র নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। যে কোন ধাতু গলাইয়া আগ্নেয়াস্ত্র নির্ম্মাণ করিবার সর্ব্বপ্রধান শিল্পী ছিল তখন ওস্তাদ্ কুলী খাঁ।

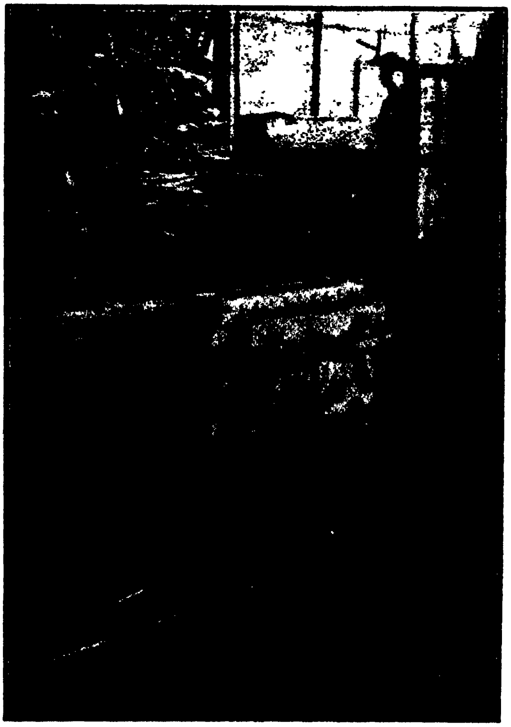
এই সকল আগ্নেয়াস্ত্র নির্ম্মাণের ক্রমিক অভিজ্ঞতা দ্বারা ইহাদের আকারও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং তামা পিতল ব্রোঞ্জ ও ইস্পাত এই কার্য্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইয়া উহাদের উপর 'ঝালের' কাজ (Welding works) এমন নিখুঁতভাবে সুসম্পন্ন হইতে লাগিল যে সাধারণদৃষ্টিতে তাহা মোটেই ধরা পড়িবার উপায় ছিল না। সম্রাট জাহাঙ্গিরের আমলে ঢাকায় এই সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র নির্ম্মাণের কৌশল এরূপ উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল যে মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারের অত্যাবশ্যকীয় আগ্নেয়াস্ত্রগুলি এই ঢাকাতেই নির্ম্মিত হইত এবং বড় বড় কামানগুলি নির্ম্মিত হইয়া যখন মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইত তখন এক একটি কামান বহিয়া আনিবার জন্য ১০ জোড়া করিয়া বলবান বলীবর্দ্দের প্রয়োজন হইত।



পিতলের অপরিষ্কার বাটগুলি (Blooms) স্ক্রেপিং মেসিনে চড়াইয়া সেগুলিকে কার্য্যোপযোগী করা হইতেছে।

মোগল বাদশাহদের আমলে নির্ম্মিত কামানগুলির মধ্যে আগরার সুবৃহৎ কামানটি (Great Gun of Agra) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণীর হাওইট্জারের প্রায় অনুরূপ - ইহা ১৪ ফিট লম্বা ও ২২½ ইঞ্চ ছিদ্র বিশিষ্ট (Bore) ; তাহার মধ্যে একটি মানুষ সহজেই প্রবেশ করিতে পারে। আগ্রা দুর্গের বহির্দ্দেশে যমুনার তীরে এই কামানটি স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার ওজন সর্ব্ব-সাকুল্যে ১০৪৯ হন্দর বা ১৪৬৯ মণ এবং পুরাতন পিতলের হিসাবে ধরিলেও ইহার দাম আজ ৫৩,৪০০৲ তিপ্পান্ন হাজার চারি শত টাকা। কিন্তু

যখন ইহা কার্য্যোপযোগী করিয়া তৈয়ার হইয়াছিল তখন ইহার দাম পড়িয়াছিল ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। ময়দানের



পিতল ঢালাইয়ের প্রাথমিক যন্ত্র
(Blooming machine)

মালিক (Malik-i-Maidan) নামে খ্যাত মোগল আমলের আর একটি কামান সম্বন্ধে মেসার্স মিডোজ্ টেলার্ ও ফার্গুসন্ জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কামান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উহা যে যে উপাদান সমষ্টি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার শতকরা অনুপাতের পরিমাণ হইতেছে ৮০·৪২৭ ভাগ তামা ও ১৯·৫৭৩ ভাগ টিন এবং বর্ত্তমানে সার্ভে করিয়া ইহার আকারের যে পরিমাপ পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দীর্ঘ	১৪′—৩″
মুখের ব্যাস্	৪′—১০″
নেজেল্	৪′—৫″
ছিদ্রের ব্যাস্	২′—৪½″

এই বিপুলায়তন হাওইট্জার কামানটি এক্ষণে বিজাপুর রাজ্যের প্রাচীরোপরি অবস্থিত হইয়া স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ, সাধারণের কৌতূহল নিবৃত্তি করিতেছে। ইহার খোলের মধ্যে একটি মানুষ সোজা দাঁড়াইয়া অনায়াসে 'চলা-ফেরা' করিতে পারে। ইহা ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে আহমেদনগরের সুলতান বারহাম নিজাম সাহেবের আমলে উক্ত আহমেদ-নগরেই ঢালাই (casting) হইয়াছিল এবং যে স্থানে উহার ঢালাই কার্য্য সম্পন্ন হয় সেই স্থানটি তারের বেড়া দিয়া ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া বহু ছোট ছোট পিতলের কামান ভারতের নানাস্থানে অদ্যাবধি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত কামানের অধিকাংশই 'ঈশা খাঁর কামান' নামে খ্যাত এবং এই ধরণের অনেক কামান অধুনা বাঙ্গালা দেশের নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল কামান হইতে এক খণ্ড ধাতু লইয়া রাসায়নিক বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি পাওয়া গিয়াছে।

তামা	৮৪·৩৫
দস্তা ও লৌহ	১৩·৮২
টিন্	১·৮৩
	১০০·০০



কারখানার এক অংশের দৃশ্য।

এক্ষণে উপসংহারে বক্তব্য, উপরোক্ত প্রমাণ-পরম্পরা দ্বারা স্বতঃই মনে উদয় হয় যে ভারত একদিন জড়-জগতেও কর্তৃত্ব করিতে ত্রুটী করে নাই। সেদিনের জড়-বৈজ্ঞানিক এদিনের জড়-বৈজ্ঞানিকের চেয়েও বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন, কি ছিলেন না—তাহা লইয়া মস্তিষ্ক চালনা করিতে হইলে ভারতের আর্য্য সংস্কৃতির প্রতিভূ-স্বরূপ যে প্রামাণ্য গ্রন্থগুলি আছে সর্ব্বাগ্রে সেইগুলিই ভাল করিয়া পাঠ করা উচিত। যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদ, তৈত্তিরীয় সংহিতা, মৈত্রায়নিসংহিতা, ছান্দোগ্য উপনিষদ, জৈমিনী উপনিষদ, শতপথব্রাহ্মণ, রসেন্দ্রচিন্তামণি, রস-কল্প, রসরত্নাকর, সারঙ্গধরের রসায়ন, রসরত্নসমুচ্চয়, কৌটিল্য-অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে লৌহ, তাম্র, পিত্তল, ব্রোঞ্জ, স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার ও প্রজনন সম্বন্ধে তৎ-কালিক গবেষণামূলক যে তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ আছে তাহা কত বড় বিজ্ঞ রসায়নবেত্তার মস্তিষ্কপ্রসূত তাহা আমাদের ধারণাতেই আসে না। অথচ আজ সেই দেশেই পাশ্চাত্য জাতি তাম্র প্রজনন ও পিত্তল প্রস্তুতের বিরাট কারখানা খুলিয়া এবং এই ভারতে উৎপন্ন লক্ষ লক্ষ টাকার তামা ও পিতল ভারতেরই বাজারে বিক্রয় করিয়া আমাদের তাক লাগাইয়া দিতেছে সত্য, কিন্তু তাহারা এই সমস্ত বিষয়ের মূল সূত্রগুলি খুঁজিয়া পাইল কোথা হইতে? একদিন এই ভারতেরই আর্য্য-মস্তিষ্ক মন্থনে যে অমিয়ধারা উদ্গীরিত হইয়াছিল তাহাই ছানিয়া আজ বিংশ শতাব্দীর রসায়ন ও যান্ত্রিক শাস্ত্র রচিত হইতেছে। অথচ সেই আর্য্যদেরই হতভাগ্য সন্তান আমরা ইহার গূঢ় রহস্যের মর্ম্মভেদ করিতে অক্ষম হইয়া আপাতমধুর পরানুকরণপ্রিয়তা নামক একটা উদ্ভট উপসর্গের মোহ কোন রকমে কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছি না। আর্য্য মণীষিগণ উল্লিখিত যে গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহা আজ আমাদের দুর্ব্বোধ্য বলিয়া অবহেলার চক্ষে দেখিতেছি; আর তাহারই মূল তথ্যগুলির উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া প্রতিভার বরপুত্র হুইট্‌নি, গ্রিফিথস্, ম্যাকডোন্যাল্ড, কীথ্ প্রভৃতি ইউরোপীয়-গণ যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাই পড়িয়া ধাতুতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা জ্ঞান অর্জ্জন করিবার প্রয়াস পাইতেছি। তবুও আজ যে ইহা মন্দেরও ভাল তাহাই বা অস্বীকার করি কেমন করিয়া? যে কর্ম্মফলে আজ আমরা দাসমনোভাবাপন্ন হইয়াছি সেই কর্ম্মফল ভোগ করিবার মেয়াদ যতদিন উত্তীর্ণ না হয়, ততদিন যেটুকু পাইতেছি তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মানিয়া লওয়া উচিত। কারণ সাত শত বৎসরের জড়তায় জাতির যে অঙ্গগুলি পঙ্গু হইয়া আছে তাহার এখনও যথেষ্ট শেঁক তাপের প্রয়োজন।*

* ছবিগুলি কোম্পানীর জেনারেল্ ম্যানেজার (Mr. Russel B. Woakes A. R. S. M; M. I. M. M.) মিঃ রাসেল বি ওকস্ এ, আর, এস, এম্; এম, আই, এম্, এম্ মহোদয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত এবং প্রবন্ধটি লিখিতে অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী মহাশয়ের ("The copper in Ancient India") দি কপার ইন্ এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া নামক গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছি।

কোকিল-বেশে

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী

এক প্রাণে কি পাওনি তা'রে পূরো?
তাইতে কিগো হাজার হয়ে বঁধু,
কোকিল-বেশে আস্‌লে জগত জুড়ে
হাজার প্রাণে ফুরিয়ে নিতে মধু?

ক্ষুদ্র ব্রজে সাধ মেটেনি বলে
বৃন্দাবন কি কর্‌লে নিখিল আজ—
পুষ্পে পাতায় কুঞ্জ করে তাই
আনলে ধরায় নূতনতর সাজ?

বিশ্বজোড়া খেল্‌ছো খেলা ভালো
গোপন হয়ে বিজন বন ফাঁকে,
প্রেমের বাঁশী হাজার কুহু তব
হাজার দিকে কেবল রাধা ডাকে।

হওনা পাখী, যতই করো ছলা,
সেই কালো রূপ অঙ্গে মাখা ভাই,
মোহন-বাঁশী পড়লো তা'ও ধরা—
এমন মধু? পাখীর ডাকে নাই!

অপরিচিতা

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বিহারের ভীষণ ভূমিকম্পে সে বছর ধরিত্রী নানাস্থানে শতধা, অগণ্য গৃহ ধ্বংস, কত সহস্র লোক ধনে-প্রাণে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই আকস্মিক বিরাট সর্ব্বনাশ কতিপয় ব্যক্তির ভগ্নাদৃষ্ট জোড়া দিয়া অল্পদিনেই ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিল!

সে দিন দ্বিপ্রহরে রাইচরণ ঘর্ম্মাক্ত দেহে বাসায় প্রবেশ করিয়াই বলিলেন—শীগ্‌গীর ভাত দাও লখিয়া, আধ ঘণ্টার ভেতরেই আমায় আবার বেরিয়ে যেতে হবে!

পাশের ঘর হইতে লখিয়া উত্তর করিল—আপনি একটু জিরিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিন, আমার আর কতক্ষণ লাগবে?

দালানের এক পাশে খোলা ছাতাটা ফেলিয়া রাইচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন—খুড়িমা কেমন আছেন, জ্বর এখন কত?

ধুতি গামছা লইয়া লখিয়া বাহির হইয়া বলিল—প্রায় সেই একশো এক, তবে আজ বেশ ঘুমুচ্ছেন, মাঝে মাঝে ঘামও হচ্ছে।

রাইচরণ জামা-কাপড় ছাড়িয়া আলনায় তুলিবার উপক্রম করিতেই লখিয়া বাধা দিল—ওসব আর তুলতে হবে না। ঘামে ত ভিজে পচে গেছে, এখনই আবার প'রবেন কি করে? আমি অন্য জামা বা'র করে দিচ্ছি, ওগুলো থাক্ কেচে দেবো।

রাইচরণ আপত্য করিলেন—না, না, এরই মধ্যে ফরসা জামা বার কর্ব্বে? এটা তো এখনও ময়লা হয় নি।

লখিয়া তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া ছাড়া কাপড়-চোপড় সব স্নানের ঘরে ফেলিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে রাইচরণ আহারে বসিয়াছিলেন, লখিয়া পাখা লইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতেছিল।

রাইচরণ কহিলেন—আজও চিঠিপত্র এল না?

লখিয়া উত্তর করিল—না; এরই মধ্যে সুক্তো ছেড়ে ডাল্‌না ধরলেন যে বড়? এত তাড়া আপনার কিসের? এ রকম করলে শরীর টেঁকবে কেন? শেষে একটা বড় ব্যায়রামে পড়ে যাবেন?

রাইচরণ শুধু বলিলেন—তোমার ধোঁকার ডালনা আমার বড় ভাল লাগে কি না!

লখিয়া তৎক্ষণাৎ কহিল—তার মানে সুক্তনি আজ ভাল হয় নি। কি করে হবে বলুন, সব রকম জোগাড় না পেলে কি হয়? আমি একা মানুষ! চাকরটা সেই যে নয়টার সময় কোথায় গাঁয়ের লোকের সঙ্গে দেখা করতে গেছে এখনও ফেরে নি। ওদিকে আবার মাসীর তাল সামলাতে হচ্ছে।

রাইচরণ হাসিয়া বলিলেন—বেশী খাইয়ে এই কয়মাসে আমায় কি রকম মোটা করে দিয়েছ, অনেকে সহসা চিন্‌তে পারে না।

লখিয়া বলিল—তাদের চোখে আগুন!

রাইচরণ প্রসঙ্গ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন—আচ্ছা মুঙ্গের থেকে কোন চিঠি না আসবার মানে কি? অথচ শুনেছি—

লখিয়া বলিয়া উঠিল—আমাকে তাড়াবার জন্য আপনি এত ব্যস্ত কেন? কি ক্ষতিটা আপনার আমি করেছি?

রাইচরণ যেন অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—না, না, লখি তা নয়। তবে কি জান, যদি আপনার লোক তোমার কেউ থাকে তাকে খবর দেওয়াটা কি আমার কর্ত্তব্য নয়?

লখিয়া উত্তর করিল—চেষ্টা ত কম কিছু করেন নি, কতগুলা চিঠি দিয়েছেন।

এমন সময় একটি যুবক উঠানে আসিয়া ডাক দিল—দাদা! তাহার পিছনে কুলি মোট লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

লখিয়া তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে পলাইয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল—উঠে পড়বেন না যেন, খাওয়া এখনও কিছুই হয় নি আপনার!

রাইচরণ আসনে বসিয়াই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—এই যে ননী, এস, এস! এতদিনে বুঝি এলে? কত কাজ হাত থেকে বেরিয়ে গেল। যাক্, তবু এসে পড়েছ। ও লখিয়া দই-টই কি দেবে দাও, আমি উঠে পড়ি। ও যে আমার

ছোট ভাই ননী! ঐ ঘরে যাও ননী, জিনিসপত্তর সব রাখাও আমি আস্‌ছি।

লখিয়া একটা পাথর বাটি করিয়া দই আনিয়া দিল। রাইচরণ অস্ফুটে বলিলেন—হাঁড়িতে ভাত আছে ত?

লখিয়া উত্তর করিল—ঢের আছে। আরও তিন জন খেতে পারে, আপনাকে দেব, চাই?

কোনও ক্রমে নাকে মুখে গুঁজিয়া রাইচরণ উঠিয়া পড়িলেন। তারপর হাঁক-ডাক লাগাইয়া দিলেন—দেখ-দিকিনি, ঠিক এই সময় চাকরটা কোথায় গেল। নাইবার জলটল কই? সোজা রাস্তা ত আর নয়, পথে কষ্ট কত হয়েছে!

রান্নাঘর হইতে লখিয়া বলিল—সে সব ঠিক আছে। স্নান ঘরে জল ভরিয়ে নিয়ে তবে আমি চাকরকে যেতে দিয়েছি। আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি যাচ্ছি।

পাশের একটা ছোট ঘরে ননীকে লইয়া গিয়া রাইচরণ বলিলেন—এই ঘরে তোমার সব জিনিস পত্তর রাখিয়ে ঠিক করে নিও। আমার আর সময় নেই ভাই, এখন বে'রোতে হবে।

গোলমালে খুড়িমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিতেছিলেন—রাইচরণ, ও রাই।

লখিয়া তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিল—কি বলছো মাসিমা?

তিনি হাঁফাইয়া বলিতে লাগিলেন—কিসের এত গোল রে লখিয়া?

লখিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল—ঐ ওঁর ভাই এসেছেন এই গাড়ীতে, দেশ থেকে—ননী, গো ননী! তুমি এখন ঘুমিয়ে পড়। আমি ওঁকে খাইয়ে তবে আস্‌বো।

দুই

সন্ধ্যার পর দুই ভা'য়ে বসিয়া গল্প হইতেছিল।

রাইচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁরে নিতাইএর ডাক্তারি চলছে কেমন?

ননী বলিল—মন্দ নয়। তবে কি জানেন, আজকাল গাঁয়ে দু-দুটো এম-বি ডাক্তার হয়েছে। তা ছাড়া এমনিই চার পাঁচটা আছেই। মে'জদার তা'র মধ্যে চলে মন্দ নয়, তবে সব মাসে কি আর সমান হয়?

রাইচরণ বলিলেন—তুই আজকাল করিস কি? কবে আস্‌তে লিখেছি, এতদিনে এলি?

ননী কহিল—যা আপনাদের দেশে রোজ ভূমিকম্প কাগজে দেখি। আমি মেজদার দোকানে কম্পাউণ্ডারী শিখ্‌ছিলাম, কিন্তু কি জানেন—আসল কথা যা পাই সবই তো মেজ'দাকে দিতে হয়, তা না হলে মেজবৌদি যদি টের পায় তাহলে কি আর রক্ষে আছে? আর কি সব তার বাক্যি—যদি শোনেন—

রাইচরণ বাধা দিয়া বলিলেন—যাক ওসব কথা। অনেক দুঃখেই পনের বছর দেশ ছেড়েছি। তাছাড়া নিতাইএর সংসারটিও ত ছোট নয়, পাঁচটি ছেলেমেয়ে। তা তুই এইখানেই থাক্‌, আমার কাছে কাযকর্ম্ম শিখে নে। এখন অনেক বাড়ী ঘর তৈরি হবে এখানে। উপস্থিত মেয়র কলনি সব হচ্ছে, তার সব ভার আমারই ওপর। ভাল করে দেখাশোনা করতে পারলে লাভ যথেষ্ট আছে। খুড়িমার সঙ্গে দেখা করেছিস?

ননী কহিল—না দাদা, উনি আমাদের কি রকম খুড়িমা জানিনে ত?

রাইচরণ বলিলেন—তুই জানবি কি করে। উনি হ'ল দূর সম্পর্কের আমার এক খুড়-শ্বাশুড়ী। এক বছরের উপর হোল খুড়োমশাই আমার কাছে ওঁকে রেখে চাকরীর চেষ্টায় চলে যান। মাঝে মাঝে চিঠি দেন, ভাল কাযের যোগাড় বোধ হয় হয় নি তাই খুড়িকে নিয়ে যেতে পারেন নি। এখন কাশীতে আছেন, এইবার হয়ত খুড়িকে নিতে আসবেন।

খুড়িমার ঘরে দুইজনে যখন উপস্থিত হইলেন তখন লখিয়া তাঁহাকে দুধ খাওয়াইতেছিল।

রাইচরণ আরম্ভ করিলেন—ননী আবার একটু লাজুক কি না, তাছাড়া তোমায় কখনও দেখেনি। এখন কেমন আছ খুড়িমা?

খুড়িমা কহিলেন—জানি না বাবা। কতদিন যে আর ভুগবো, কি যে কপালে আছে!

লখিয়া বলিল—আগে দুধটা খেয়ে নাও দেখি, গলায় বেধে যাবে।

দুধ খাওয়ান হইলে রাইচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন—এখন জ্বর দেখেছ?

লখিয়া বলিল—হাঁ একশোর নীচে, কাল এসময় অনেক বেশী ছিল।

ননী বলিয়া উঠিল—কি ওষুধ খাওয়ান হচ্ছে, প্রেস্‌-ক্রিপ্‌সন দেখি?

টেবিলের উপর হইতে একটুকরা কাগজ ননীর হাতে দিয়া লখিয়া দুধের বাটি লইয়া চলিয়া গেল।

কাগজখানা নিরীক্ষণ করিয়া ননী জিজ্ঞাসা করিল—এ কি হোমিওপ্যাথি?

রাইচরণ ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন।

ননী ঘোর আপত্তির সহিত বলিল—না, না, ওতে কি রোগ সারে! আমি এমন এক প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন করে দেব যাতে কালকেই জ্বর ছেড়ে যাবে।

খুড়ি বলিলেন—তাই কর না বাবা, আর এ রোগের কষ্ট সহ্য করতে পারি না।

ননী বলিল—তা আর কি। দাদা কাগজ কলম আনিয়ে দিন, এখনই লিখে দিচ্ছি।

রাইচরণ বলিলেন—আচ্ছা সে কাল দেখা যাবে তখন। রোজই ত জ্বর কমে আস্‌ছে, কাল দেখে যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

ননীগোপালের যখন সভ্যলব্ধ ডাক্তারি বিদ্যা প্রকাশের সুযোগ ব্যর্থ হওয়ায় ক্ষুণ্ণ হইল তখন সমস্তদিন যে কৌতূহল দমন করিয়া আসিতেছিল তাহা রোধ করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল—আচ্ছা দাদা, এ মেয়েটিকে চিনতে পারলাম না।

রাইচরণ মাথা নাড়িয়া বলিলেন—আমরাও ঠিক চিনি নে। ভূমিকম্পের দিন সন্ধ্যার সময় একটা বাটির ভগ্ন-স্তূপের মধ্যে ওকে পাওয়া যায়। বাড়ীশুদ্ধ ওদের সকলেই মারা যায়—কিন্তু ওর দেহে প্রাণ ছিল যে কেমন করে তা বড়ই আশ্চর্য্য। আমিই ওকে বার করি এবং কোন রকমে হাঁসপাতালে দিই। দশ দিনেই লখিয়া সম্পূর্ণ সেরে ওঠে, তারপর আমার কাছে নিয়ে আসি। ওর আত্মীয়-স্বজনের সন্ধান এখনও পাইনি, মুঙ্গেরে নাকি এক পিসতুতো ভাই থাকে। তাকে কিন্তু চিঠি লিখে জবাব পাই নি।

ননী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—তা হলে ও কি জাত, কি করে জানলেন দাদা?

রাইচরণ বলিলেন—ওর মুখেই শুনেছি, ও মৈথিল ব্রাহ্মণের মেয়ে।

ননী কহিল—তা'হলে বাঙ্গালা জানলে কি করে?

রাইচরণ হাসিয়া বলিলেন—তা আর শক্ত কি? আগে ও বাঙ্গালীর সঙ্গে মিশে বাঙ্গালা একরকম বল্‌তে পারতো। তবে আমার কাছে এই মাসছয়েকের মধ্যে বেশ বাঙ্গালা শিখে গেছে, লেখা পড়ায় খুব আগ্রহ। এখন কে ওকে বলবে বিহারী!

খুড়ি বলিতে লাগিলেন—মেয়েটি সব রকম কাযের, বুঝেছ ননী। ও এসে অবধি আমার সংসারের আর কিছু দেখ্‌তে হয় না। এই অসুখে আমার কি সেবাটাই না করেছে। তাছাড়া আয়-পয়ও বেশ আছে। আমি ত রাইএর কাছে বছরখানেক আছি, কিন্তু লখিয়াকে আনার পর থেকেই ওর লক্ষ্মী যেন উছলে পড়েছেন। আর কি দয়া মায়া! কিন্তু ও ত পরের মেয়ে, কোন্ দিন চলে যাবে। আমাকেও তোমার খুড়ো নিতে এলেই হোল। আমি বলি রাই, যা হয়েছে হয়েছে, এই দশ বছর ত ভেসে বেড়াচ্ছ, এইবার অবস্থা ফিরেছে, একটা ঘর-সংসার পেতে থিতু হও।

এমন সময় লখিয়া আসিয়া বলিল—আচ্ছা তোমাকে আর বক্ বক্ করে জ্বর বাড়াতে হবে না মাসি! তারপর আমাকেই ত সারারাত বাতাস আর জল জোগাতে হবে? আসুন, আপনাদের খাবার দেওয়া হয়েছে।

তিন

মাসখানেক পরে একদিন বিকালে লখিয়া নিজ-খাটে বসিয়া নিবিষ্টমনে একটা টেবিলের ঢাকায় ফুল তুলিতেছিল। মাসী পাশের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিলেন।

ননী ধীরে ধীরে সেই ঘরে ঢুকিল।

মুখ না তুলিয়াই লখিয়া বলিল—আজ এরই মধ্যে চলে এলে যে? এখনও চারটে বাজে নি।

ননী সেই খাটের একপাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল—শরীরটা ভাল নেই, যা রোদ্দুর!

লখিয়া সেই ভাবেই বলিল—কেন, আবার পিলে টন্‌টন্ কচ্ছে না কি?

ননী উত্তর দিল—হাঁ, মাথাও খুব ধরেছে।

লখিয়া বলিতে লাগিল—আমার কথা ত শুনবে না, সকালে খালি পেটে চোনা খাও, আর দুবেলা চোনার সেঁক

দাও, দেখ সাত দিনে সেরে যায় কি না। মদনের বাড়ী থেকে চোনা আমি রোজ এনে দে'ব।

ননী কহিল—সেঁক দিয়ে দিতে পার, কিন্তু চোনা আমি খাব না।

লখিয়া তিক্তস্বরে বলিল—তুমি খাবে না ত কি আমি খাব। কি আব্‌দার! না ে আমার দায় পড়েছে সেঁক দিতে।

তার পর লখিয়ার আর কোন সাড়া নাই।

ননী এদিক ওদিক চাহিয়া আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া চুপ করিয়া লখিয়ার কাযের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে লখিয়া সহসা তাহার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—শরীর ভাল নয় ত যাও না, নিজের বিছানায় শুয়ে পড়গে না। জ্বর হয় নি ত?

ননী ভরসা করিয়া বলিল—হয়েছে বোধ হয়।

লখিয়া কহিল—মাসীর ঘর থেকে দেখগে না থার্মো-মিটার নিয়ে। জ্বর না থাকে ত তোমার সেই 'জ্বরবজ্র' এক দাগ খেয়ে নাও গে।

যাই—বলিয়া ননী সেইভাবেই বসিয়া রহিল। লখিয়াও এক মনে ফুল তুলিতে লাগিল।

অবশেষে নিস্তব্ধতা অসহ্য হইলে ননী কহিল—একটা কথা বলবো?

লখিয়া সেইভাবেই উত্তর দিল—বল।

ননী বলিতে লাগিল—এই দেশেই যখন থাক্‌তে হবে, তখন হিন্দীটা একটু শেখা বড় দরকার—নয় ত এমন অপ্রস্তুতে পড়তে হয়। আমায় মুখে মুখে একটু হিন্দী শিখিয়ে দেবে?

লখিয়ার সে ফুলটা শেষ হইয়া গেল, তাহা খুলিয়া ফেলিয়া অপর একটি ফ্রেমে চড়াইয়া বলিল—ও আর শক্ত কি, মূলে সব ভাষাই এক।

উৎসাহ পাইয়া ননী কহিল—আচ্ছা বল ত এর হিন্দী কি হবে—তুমি এ কায খারাপ করেছ।

লখিয়া ফুল তুলিতে তুলিতে বলিল—তুম ই কাম খারাব কিয়া হ্যায়।

ননী জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কেন ছুটি চাইছ!

লখিয়া বলিল—তুম কাহে ফুরসৎ মাঙ্গতা হ্যায়।

ননী কহিল—তুমি বিয়ে করবে?

লখিয়া উত্তর দিল—তুম্ সাদি করেগা।

ননী জিজ্ঞাসা করিল—তুমি আমায় ভালবাস?

যেন চমক ভাঙ্গিয়া লখিয়া দৃপ্তনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—নানা! আমার সঙ্গে তামাসা হচ্ছে—ইয়ারকি!

মৃদু হাসিয়া যথাসম্ভব মধুরস্বরে ননী কহিল—এ আবার ইয়ার্কি কোথায় লখি!

নিমেষে লখিয়ার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল—ফের যদি অমন করে তাকাও আমার দিকে, তাহ'লে তোমার চোখ এই ছুঁচ দিয়ে গেলে দেব!

ননী একটু ভীত হইল—কেন আমি আবার কি করে তাকিয়েছি?

লখিয়া সরোষে বলিল—আহা কিছু জানেন না, ন্যাকা! তোমার মতলব আমি অনেক দিনই টের পেয়েছি। কিন্তু এখন থেকে সাবধান হয়ে চোলো বলে দিচ্ছি, নানা।

ননীও তখন রাগ দেখাইয়া বলিল—আমায় নানা বলবার তুমি কে? তোমার চেয়ে আমি বড় না?

লখিয়ার স্বর ক্রমেই চড়িতেছিল—ওঃ উনি আবার বড়! কিসে বড় শুনি?

এমন সময় রাইচরণ সেখানে আসিয়া পড়িয়া কহিলেন—তোদের কিসের ঝগড়া রে ননী?

ননী বলিয়া উঠিল—দেখুন না দাদা, ও আমার চেয়ে কত ছোট, কিন্তু বলবে আমায় কেবল 'নানা' আর 'নানা'।

রাইচরণ তখন ফিরিয়া কহিলেন—সত্যিই এ তোমার অন্যায় লখিয়া। ননী যে তোমার চেয়ে বয়সে বড়।

লখিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল—কত ওর বয়স?

রাইচরণ উত্তর দিলেন—তা বাইশ তেইশ হবে।

লখিয়া তাচ্ছল্যভরে বলিল—এই? আমার কত বয়স জানেন? পঁয়ত্রিশ!

মাসী ততক্ষণে সেখানে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন—সে কি কথা রে লখিয়া, তুই কি ক্ষেপে গেলি?

আসল কথা প্রকাশ করিতে না পারিয়া দাঁত দিয়া নীচের ঠোঁট চাপিয়া লখিয়া তখন অসহ্য রাগে ফুলিতেছিল।

রাইচরণ আদরের স্বরে বলিলেন—না, না, তোমার বয়স সতের আঠার হবে।

মাসী বলিলেন—না হয় জোর কুড়ি।

লখিয়া তখন মাসীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—তোমরা কেউ আমাকে জন্মাতে দেখেছ? তবে যে সব ফস্ ফস্ করে বলে যাচ্ছ? যাও, তোমাদের ননীকে ঘরে নিয়ে যাও। ওর শরীর খারাপ, পিলে ব্যথা কর্ছে। আর ওকে বুঝিয়ে দিও যেন কখনও আমার সঙ্গে লাগতে না আসে, তাহলে কোনদিন ওর পিলে আমি ফাটিয়ে দেব। এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

খুড়ি আসিয়া তখন ননীর হাত ধরিয়া বলিলেন—চল বাছা চল—এ ঘরে কি করতে এসেছিলে?

ননী প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—আমি জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম যে থার্ম্মোমেটার কোথায়, তাইতে বল্লে কিনা—আমি অত রোগের সেবা রোজ কর্ত্তে পার্ব্ব না, খুঁজে নাও গে মাসীর ঘরে। আর সব কথায় কেবল বলে—'নানা' আর 'নানা'। আমি সহ্য কর্ব কেন?

খুড়ি বলিলেন—ও ঐ রকম। রাগ হলে আর কারো নয়। কিন্তু এম্‌নিতে ওর মনটা খুব শাদা।

রাইচরণ বলিতে লাগিলেন—সেই আঘাত লাগার পর থেকে ওর মাথা বোধ হয় একটু কেমন হয়ে গেছে। তিন দিন জ্ঞানই ছিল না, ভুল ব'কৃতো। বরাবরই দেখছি সকলকে নাম ধরে একটা ডাকা ওর বাতিক। আমাকে কি বলে ডাকে জানিস্?

খুড়ি বলিলেন—তা আর শুনিনি? রাণা! আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই!

রাইচরণ বলিলেন—এখন রাণার ভাই হয়েছে, কেবল তোমার নামটা জানে না খুড়ি, তাই আর ডাকৃতে পারে না।

ইতিমধ্যে লখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল; এখন ঘরের ভিতর গিয়া সেলাইটা তুলিয়া লইয়া বলিল—জান্‌বো না কেন? ইচ্ছা করেই বলি না, ভারী চমৎকার ত নাম!

রাইচরণ কহিলেন—আচ্ছা বল দেখি?

লখিয়া বলিয়া গেল—দিগম্বরী! আহা মরে যাই, কি সুন্দর নাম!

রাইচরণ হাসিয়া উঠিলেন, ননীরও মলিন মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। খুড়ি কিন্তু সে হাসিতে যোগ দিতে পারিলেন না।

চার

শ্রাবণের প্রারম্ভে সেবার বর্ষা খুব নামিয়াছিল। সমস্ত দিন ধরিয়া বিরাম নাই, সন্ধ্যার দিকে একটু থামিয়াছিল। রাত্রের অন্ধকারের সঙ্গে আবার মুষলধারে বর্ষণ চলিতেছিল।

লখিয়া থাকিত মাসীর পাশের ঘরেই, মাঝে দরজা ছিল। রাইচরণ ননীকে লইয়া একটা নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন।

এদিকে খাওয়া-দাওয়া সারা হইয়া গিয়াছিল। লখিয়া নিজের বিছানা আশ্রয় করিল দেখিয়া মাসী বলিলেন—এরই মধ্যে শুলি নাকি বাছা? ওদের ফিরতে হয়ত রাত হবে, আবার তোকেই তো দরজা খুলতে উঠ্‌তে হবে। ততক্ষণ দু একটা গান কর্ না।

লখিয়া সন্ধ্যা হইতেই গুণ গুণ করিতেছিল; এখন এক কথাতেই সে উঠিয়া পড়িয়া হার্ম্মোনিয়াম বাহির করিল।

মাসী কি গাই?

যা তোর ভাল লাগে।

লখিয়া একবার বাজাইয়া লইয়াই ধরিল

তব চরণতলে হৃদয় আমার
চায় মেশাতে, বাদল রাতে।
.... শ্রাবণ রাতে
............আঁধার রাতে

গান শেষ হইলে মাসী বলিলেন—তুই বাপু এ গানটার কথা বোধহয় বদলে ফেলেছিস্।

লখিয়া উত্তর করিল—তা হবে, অনেকদিন শুনেছি, হয়ত ভুলে গেছি।

কয়েকটা অন্য গান গাওয়ার পর লখিয়া গাহিল:—

যদি না দেখা মেলে দূরে গেলে এ জীবনে
তবু গো মনে রেখো, রেখো রেখো রেখো মনে
চাঁদিনীর নীলাকাশে যদি ভাসে নদীতীরে
এ মরুপথে যদি নাহি বহে নদী ধীরে
যদি না উঠে ডাকি, বনপাখী এ বিজনে
তবু গো মনে রেখো, রেখো রেখো রেখো মনে।

মাসী শেষে বলিলেন—না বাছা তুই বাঙ্গালীর মেয়ে। আমাদের ছলনা করে মিথ্যে বলেছিস্। নয়ত এমন নিখুঁত বাঙ্গালা গান গাইলি কি করে।

লখিয়া শুধু মুখ টিপিয়া হাসিল। পরে কহিল—এসব

যে রেকর্ডের গান মাসী, সামনের বাড়ীতে বাজতো—তাই শুনে শিখে নিতাম।

এমন সময় সদর দরজায় ঘা পড়িতেই লখিয়া ছুটিয়া গিয়া খুলিয়া দিল।

রাইচরণ ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—এই যে গান-বাজনা চল্‌ছিল দেখ্‌ছি, আমরাও দু একটা শুনি?

লখিয়া হার্ম্মোনিয়াম তুলিয়া ফেলিল—এখন আর গান শুনে কায নেই। সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়ে এসেছেন? ছেড়ে ফেলুন এখনই!

রাইচরণ বলিলেন একটা ছাতা, ননীকে জল থেকে বাঁচাতে গিয়ে ভিজে গেছি।

ননী কহিল—আমার শার্টের এই হাতাটা সব ভিজে গেছে।

লখিয়া বলিল—ও জামা খুলে ফেল, তোমার ত কাপড় ভেজে নি।

রাইচরণের গায়ে মাথায় হাত দিয়া সে বলিল—কি সর্ব্বনাশ করেছেন বলুন তো, এ যে সব ভিজে গেছে। আজ তিন দিন আপনার সর্দ্দিকাসি রয়েছে সে খেয়ালও নেই। এমন নেমতন্ন না খেলেই নয়? যান, ঘরে গিয়ে সব ছেড়ে ফেলুন।

কাপড় বদলাইয়া রাইচরণ দরজা বন্ধ করিতে যাইতেছেন, লখিয়া এক বাটি গরম তেল লইয়া ঢুকিল।

রাইচরণ কহিলেন—এত রাতে আবার তেল মালিশ কর্ব্বে?

লখিয়া উত্তর করিল—তা না হলে কাল ঠিক জ্বর হবে আপনার। আপনি গায়ে এই চাদরটা চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ুন, আমি পায়ের তলায় গরম তেল মালিশ করে দিই, ঘাম হলেই সব সর্দ্দি কেটে যাবে। কিন্তু খালি পায়ে রাত্রে আর বিছানা থেকে যেন নামবেন না।

এতও জান তুমি—বলিয়া রাইচরণ অগত্যা শয়ন করিলেন।

লখিয়া খুব জোরে তেল ঘষিতেছিল—

রাইচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন—এ-বেলা কোনও চিঠিপত্র আসে নি?

লখিয়া একটু পরে বলিল—এসেছে, দেবো না।

রাইচরণ উঠিয়া বসিলেন—মুঙ্গেরের চিঠি বুঝি?

মাথা নাড়িয়া লখিয়া কহিল—তাও ব'লব না!

তখন রাইচরণ কহিলেন—আহা, দাও না দেখি।

লখিয়া ভৎর্সনার স্বরে বলিল—গা খুলে বসলেন ত? কেমন ঘাম হয়েছে। এইবেলা চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ুন, নয়ত ঠাণ্ডা লাগবে। না, কোন চিঠিই আজ আসে নি।

রাইচরণ সর্ব্বাঙ্গে চাদর টানিয়া শুইলেন।

লখিয়া একটু পরে আরম্ভ করিল—আচ্ছা সত্যিই যদি মুঙ্গের থেকে চিঠি আসে, আমাকে আপনি যেতে দেবেন?

রাইচরণ একটু ভাবিয়া বলিলেন—তা কি কর্‌বো বল, তোমার নিজের লোক যদি তোমায় চায়?

এইবার লখিযার চোখে জল আসিল, উদ্গত অশ্রুকে রোধ করিয়া কোনমতে সে বলিল—আর আপনি কি আমার পর?

রাইচরণ উত্তর দিলেন—আমি তোমার প্রাণরক্ষা করেছি বটে, সে হিসাবে আমার একটু অধিকার তোমার উপর হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তাই বলে আমার কাছে চিরদিন তোমায় রেখে তোমার জীবন আমি ব্যর্থ হতে দিতে পারি না।

লখিয়া কহিল—যদি এখানে থাক্‌লেই আমার জীবন সফল হয়?

রাইচরণ বলিলেন—না না তাকি হয়? আপনার জনের সন্ধান না মেলে, অন্ততঃ তোমার স্বজাতি খুঁজে আমায় তোমার বিবাহ দিতেই হবে। আমি আশ্চর্য্য হই, তোমাদের ঘরে এ বয়সেও তোমার বিয়ে হয় নি কেন?

লখিয়া আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, রাইচরণের দুই পায়ের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল—আপনি আমায় নির্ব্বাসন দেবেন না, আপনাকে ছেড়ে কোথাও আমি থাকতে পারব না!

বিস্ময়ে রাইচরণের সর্ব্বদেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এই তাঁহার বয়স, সংসারসুখে বহুদিন জলাঞ্জলি দিয়াছেন, আজ তাঁহারই পায়ের তলায় পূর্ণ যুবতী আকুল হইয়া প্রেম নিবেদন করিতেছে! এ কি আরব্য উপন্যাস, না স্বপ্ন? তাহা ছাড়া আর কি হইতে পারে?

অভিভূতের ন্যায় রাইচরণ কহিলেন—লখি, এ তুমি কি বলছো?

লখিয়া পায়ের উপর মাথা রাখিয়াই বলিতে লাগিল—

কিছুদিন থেকে জানতে পেরেছি···আগে বুঝতে পারি নি··· আপনাকে না পেলে আমি বাঁচব না। প্রাণদাতা—কেন বাঁচিয়েছিলেন আমায় নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে, কেন আমার ভার নিয়েছিলেন?

রাইচরণ বলিলেন—কি জানি আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না, আমার যে অনেক বয়স লখি!

লখিয়া উত্তর দিল—আমি আপনার বয়স তো জানি না, আপনাকেই শুধু জানি।

রাইচরণ কহিলেন—আমার বয়স চল্লিশ।

লখিয়া বলিল—তাই তো আমার পঁয়ত্রিশ।

রাইচরণ বলিলেন—জলে আমার পা ভিজ্‌লো।

লখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল—কি আক্কেল আমার! তারপর আঁচল দিয়া দুই পা মুছাইয়া দিয়া আবার তেল মালিশ করিতে লাগিল।

এমন সময় খুড়ীমা আসিয়া বলিলেন—ও রাইচরণ, ননীর বোধ হয় জ্বর এল, তার কাঁপুনি দিয়েছে।

তেলের বাটিটা মাসীর হাতে তুলিয়া দিয়া লখিয়া বলিল—এই নাও, মালিশ করে দাগ গে, আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে।

দুম্ দুম্ করিয়া গিয়া সে নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িল।

তুমি তা হ'লে দোর দাও বাবা—বলিয়া খুড়ীমাও প্রস্থান করিলেন।

পাঁচ

পরদিন সকালে লখিয়া আসিয়া দরজায় ধাক্কা দিল—রাণা, ও রাণা, এত ঘুম কিসের? জ্বর হয় নি ত?

রাইচরণের রাত্রে প্রায় ঘুম হয় নাই, ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। দরজা খুলিয়া দিয়া বলিলেন—অনেক বেলা হয়ে গেছে নাকি? জ্বর হয় নি, তবে গায়ে বেশ ব্যথা হয়েছে।

লখিয়া ধাঁ করিয়া তাঁহার কপালে উল্টা হাত দিয়া বলিল—না জ্বর আবার হয় নি। বেশ গরম রয়েছে কপাল। যান শুয়ে পড়ুন গে, আমি আদা তুলসীপাতা দিয়ে চা করে আনছি।

রাইচরণ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই লখিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

তারপর আসিলেন খুড়ীমা। কেন বাবা, দেহটা ভাল নেই বুঝি? কাল যা ভিজেছ দুই ভায়ে মিলে।

ননী আসিয়া বলিল—আমারও খুব শীত দিয়েছিল। কিন্তু খুড়িমা যা মালিশটা কর্লেন, আজ শরীর একবারে ঝরঝরে!

রাইচরণ বলিলেন—তা হলে তুই না হয় বেরিয়ে পড়্। ততক্ষণ কাযকর্ম্ম দেখ্ গে যা, আমি ঘণ্টাখানেক পরে যাব।

লখিয়া আসিয়া পড়িল—আগে এই নুন তেল দিয়ে মুখটা ধুয়ে ফেলুন তো, তার পর যেতে পারেন কি না পরে বোঝা যাবে।

তার পর ননীর দিকে ফিরিয়া সে বলিল—তোমার ত খাওয়া দাওয়া হয়েছে বাপু, আর গড়িমাসি কেন?

রাইচরণ কহিলেন—যাব আমি ঠিকই, তবে তুমি আর দেরী কোরো না।

অগত্যা ছাতা মাথায় ননীগোপাল বাহির হইয়া গেল। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, একটু পরেই জোরে আসিল।

রাইচরণের মুখ ধোয়া চা খাওয়া হইল; তার পর লখিয়া ছাড়িল না, থার্ম্মোমিটার আসিল এবং জ্বরও উঠিল প্রায় নিরানব্বই।

খুড়ীমা বলিলেন—তা হলে ত জ্বর হোল?

লখিয়া কহিল—এবেলা যা দেখছেন, ওবেলা তার চেয়ে এক ডিগ্রি বাড়বে ত? যাই সাবু চড়িয়ে এসেছি, যা আঁচ, পুড়ে না যায়। এক মুঠো চিঁড়ে ভাজাও খাবেন ত?

রাইচরণ হাসিয়া বলিলেন—তোমরা আমায় দস্তুরমত রুগী করে তুলতে চাও দেখছি। একটু জ্বর হয়েছে কি না—

খুড়ী বলিলেন—তা বাবা, উঠেছে ত কাঁচে!

রাইচরণ বলিলেন—যা লখি চেপে রাখলে দশ মিনিট ধরে, ওটুকু আর উঠবে না?

লখিয়া রাগ করিয়া বলিয়া গেল—একদিন কাযে না গেলে সবাই আপনার টাকা লুটে নেবে। আজ যদি বাড়ী থেকে বার হয়েছেন ত রইল আমার দিব্যি।

রাইচরণ শুষ্ক হাসিয়া মাথা চুলকাইলেন।

খুড়ীমা বলিলেন—তা বাছা মিথ্যে বলেনি। তুমি গায়ে ঢাকা দিয়ে শুয়েই পড়। যা চেপে বিষ্টি এল।

পথ্যাদির কোন ত্রুটি হয় নাই। তাহার পর রাইচরণের

নিদ্রাও আসিয়াছিল বেশ, কিন্তু মধুর স্বপ্নাবেশে কতক্ষণ থাকার পর সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিলেন যে লখিয়া চুপি চুপি চলিয়া যাইতেছে।

রাইচরণ ডাকিলেন—লখি!

লখিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

কি কচ্ছিলে এখানে?

বলবো কেন?

লখিয়া কিন্তু যাইতে পারিল না, এক-পা এক-পা করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বিছানার পাশে বসিল। তার পর রাইচরণের একটা হাত তুলিয়া লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া বলিল—দেখ্‌ছিলাম আপনার ঘুমন্ত মুখ। বড় ভাল লাগছিল—কি সুন্দর!

একটু পরে যেন নিজ মনেই বলিতে লাগিল—এতদিন লুকিয়ে রেখেছিলাম সে এক রকম ছিলাম, কিন্তু বলে ফেলার পর থেকে আমাকে যেন কিসে পেয়ে বসেছে। লজ্জা ভয় সব পালিয়ে গেছে। কেন এমন হয় বলুন ত?

রাইচরণের বুকে ধীরে ধীরে মাথা রাখিয়া লখিয়া কিসের আবেগ দমন করিয়া অস্ফুটে কহিতে লাগিল—কত রকম ইচ্ছা যে হচ্ছে তা মুখে বলা যায় না।

রাইচরণের সমস্ত শরীর ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছিল। তাঁহার দেহে মনে নবীন উন্মাদনার গভীর অনুভূতি সেই প্রথম যৌবনের নূতন প্রেমের কথা জাগাইয়া তুলিতে লাগিল।

লখিয়ার কপালের চুলগুলি এক হাতে সরাইয়া দিয়া রাইচরণ বলিলেন - লখি ওঠো।

তাড়িতস্পৃষ্টের ন্যায় লখিয়া উঠিয়া বসিল—কেন, কষ্ট হচ্ছে বুঝি?…আমায় ভাল লাগে না?

রাইচরণ কেমন অপ্রতিভ হইয়া গেলেন।

লখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—ওঃ বুঝেছি, আমারই খেয়াল ছিল না, আমি যে সুন্দরী নই, কুরূপা!

তাহার পর বেগে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

ছয়

বন্যার প্রকোপ পূর্ব্ব হইতে অনুমিত হইয়া তাহার সমুচিত আয়োজন ও ব্যবস্থা হইলেও আশাতিরিক্তভাবে প্লাবন দেখা দিয়া গ্রামের পর গ্রাম ভাসাইয়া দিতে লাগিল। সরকার পক্ষ হইতে নিঃস্ব অধিবাসীদের প্রাণরক্ষার জন্য বহু লোক প্রেরিত হইতে লাগিল এবং হৃতসর্ব্বস্বদের শহরে আশ্রয়দানের জন্য শত শত পর্ণকুটীর নির্ম্মিত হইতে লাগিল। বাসোপকরণাদির মূল্য চতুর্গুণ হইয়াও দুর্লভ হইয়া গিয়াছিল।

রাইচরণের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হইয়া রোজগারও খুব বাড়িয়া গেল। দ্বিপ্রহরে বাসায় আসিবার অবকাশ তাহার ছিল না, লখিয়া খাবার করিয়া পাঠাইয়া দিত। ওভার-টাইম কুলি খাটাইয়া রাইচরণ দুই মাসের কায দুই সপ্তাহে শেষ করিতেছিলেন।

সেই ঘটনার পর হইতে লখিয়া তাঁহাকে যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিত, রাইচরণও সেই ব্যবধানের বাহিরেই নিজেকে রাখিতেন।

সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাসায় ফিরিয়া রাইচরণ বলিলেন—খুড়ি, ননীকে আজ দেখতে পেলাম না। সে চলে এসেছে কেন, কত কাযের ক্ষতি হয়ে গেল।

খুড়িমা বলিলেন—কই বাবা, ননী ত আসে নি।

রাইচরণ ঘরে গিয়া একটু পরেই ডাক দিলেন—লখিয়া।

লখিয়া আসিয়া দেখিল—বাক্স খোলা, রাইচরণ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

লখিয়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন—টাকার থলি?

লখিয়ার মুখ শুকাইয়া গেল—আমি ত জানি না। চাবি কোথায় রেখে গিয়েছিলেন?

রাইচরণ কহিলেন—চাবি কোথায় থাকে, তুমিই কেবল জান। বালিসের তলায়।

লখিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখে কথা সরিতেছিল না।

খুড়ি আসিয়া পড়িলেন—কি হয়েছে বাবা?

রাইচরণ বলিলেন—টাকার থলি নেই।

খুড়ি চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন—এ কি অনাছিষ্টি কথা গো! কত টাকা ছিল?

রাইচরণ কহিলেন—টাকা তেমন বেশী নয়, পঞ্চাশ ছিল; কিন্তু নিলে কে?

খুড়ি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—এ চাকর-বাকরের কর্ম্ম। আজ রঘুয়াকে বিকেল থেকে দেখছিনে। তুমি পুলিশে খবর দাও বাবা।

তাই দিতে হবে—বলিয়া রাইচরণ বাক্স বন্ধ করিলেন।

মুখ হাত ধুইয়া জলখাবার খাইয়া রাইচরণ একটা চাদর কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, লখিয়া পাশে আসিয়া বলিল—কোথায় যাচ্ছেন, চাবি নিয়ে যান।

রাইচরণ দাঁড়াইলেন—কি করা যায় বল ত ?

লখিয়া উত্তর করিল—আমার কিন্তু মনে হয়—। তাহার পর আর বলিতে পারিল না।

রাইচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বল্‌ছিলে বল না ?

লখিয়া তথাপি চুপ করিয়া নতমুখে রহিল।

রাইচরণ বলিলেন—আমারও তাই মনে হয়। ষ্টেশনে গেলেই ঠিক জানতে পারবো। তুমি ক্ষেপেছ, আমি থানায় খবর দেব ? ছোট ভাই একমাস প্রায় খেটেছে, নিয়েই গেল বা পঞ্চাশটা টাকা ! তবে চেয়ে নিলেই পারতো।

লখিয়া শুধু কহিল—আমার যা ভয় হয়েছিল !

রাইচরণ হাসিয়া বলিলেন—কি ভয় লখি ? ছি ! ছি ! ও-কথা মুখে এনো না। আজ আমার বাক্সে আড়াইশ টাকা রাখলাম, কিন্তু চাবি তোমার কাছেই দিয়ে গেলাম কেন ?

রাইচরণ বাহির হইয়া গেলেন। লখিয়া একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া রহিল।

সাত

শ্রাবণ প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে। অতিরিক্ত বর্ষায় কাযকর্ম্ম বন্ধ হইয়া গিয়াছে। রাইচরণ এখন প্রায় বাসায় থাকেন, মাঝে মধ্যে বিলের টাকার তাগাদায় বাহির হইতে হয়।

বাটী হইতে নিতাইচরণের পত্র আসিয়াছে। ননী নির্ব্বিঘ্নে বাটী পহুঁছিয়াছে। কয়েকটা কারণে তাহাকে বাধ্য হইয়া চলিয়া যাইতে হইয়াছে, সে সকল কথা পত্রে লেখা যায় না। তবে এ অঞ্চলে এখনও যেরূপ মধ্যে মধ্যে ভূমিকম্প হইতেছে, তাহাতে প্রাণ হাতে করিয়া কোন বুদ্ধিমানের এদেশে থাকা উচিত নয়।

রাইচরণ ডাকিলেন—লখিয়া। সে আসিলে বলিলেন—এই দেখ নিতাইএর চিঠি।

লখিয়া পত্র পড়িয়া ফিরাইয়া দিল, কিছু বলিল না। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে চলিয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিল একটি খামের পত্র হাতে।

রাইচরণ বলিলেন—এ আবার কার চিঠি ?

লখিয়া বলিল—অনেকদিন এসেছে সেই যে বলেছিলাম, আপনাকে দেওয়া হয়নি।

রাইচরণ পত্র খুলিয়া দেখিলেন কাঁচা ইংরাজিতে লেখা। তাহার মর্ম্ম এইরূপ।

মুঙ্গের·········৩৪

প্রিয় মহাশয়,

আপনার পত্র কয়খানিই পাইয়াছি। নানা দুর্ঘটনায় উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়া গেল। আপনি যে ভগিনীর কথা লিখিয়াছেন তাহাকে আমরা জানি না। ওখানে বাস করেন তাহাও কখন শুনি নাই। তবে অনাথার যদি অন্য গতি না থাকে ত আমার নিকটে পাঠাইতে পারেন। আশ্রয় দিতে আপত্তি নাই। ইতি—

শ্রীযদুনারায়ণ মিশ্র

লখিয়া এতক্ষণ রাইচরণের মুখের ভাব নিরীক্ষণ করিতেছিল। এইবার জিজ্ঞাসা করিল—মুঙ্গের থেকে তো ? কি লিখেছেন ?

রাইচরণ বলিলেন—তোমাকে চেনেন না। তবে অনাথাকে আশ্রয় দিতে আপত্তি নাই।

লখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তাহলে কি স্থির কর্‌লেন—পাঠিয়ে দেবেন ?

রাইচরণ বলিলেন—তাই দেওয়া ত উচিত। কিন্তু কে নিয়ে যায়, ননী চলে গেল।

লখিয়া বলিল—তার সঙ্গে আমি যেতাম না। আপনাকেই নিয়ে যেতে হবে।—কবে যাবেন ?

রাইচরণ কহিলেন—তাইত, মুস্কিল—দেখি খুড়িমার সঙ্গে পরামর্শ করে।

দালানে গিয়া খুড়িকে ডাকাইয়া রাইচরণ বলিলেন—খুড়ো পরশু আসবেন না তোমায় নিয়ে যেতে ?

খুড়ি কহিলেন—হাঁ বাবা।

রাইচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা তাঁর কতদিন ছুটি, আরও তিন চারদিন থাকবেন ?

খুড়ি বলিলেন—তা হয়ত' পারতে পারেন, কেন না দশদিন ছুটি পেয়েছেন লিখেছেন।

রাইচরণ বলিলেন—তা হ'লেই হবে।

খুড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন বাবা?

রাইচরণ বলিলেন—একটা দরকার ছিল। এই—তা হ'লে এই লখিয়ার বিয়েতে থেকে যেতে পারত। তোমাকেই ত মেয়ে সম্প্রদান করতে হবে।

খুড়ি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—এরই মধ্যে বিয়ের ঠিক হয়ে গেল বাবা?

রাইচরণ বলিলেন—হ'ল বই কি, এই মাসেই।

ঘরে ফিরিয়া আসিয়া রাইচরণ দেখিলেন—লখিয়া সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে। তাহার দুই চো'খ দিয়া কেবল অশ্রুর ধারা নামিয়াছে।

গলায় আঁচল দিয়া রাইচরণের পায়ের ধুলা লইয়া লখিয়া বলিল—তাহলে আমায় চরণে স্থান দেবেন রাণা?

রাইচরণ তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন—এখনও কি সন্দেহ আছে রাণী?

বর্ষণক্লান্ত রৌদ্রদীপ্ত আকাশের মত তাহার শ্যামল মুখখানি অপূর্ব্ব শ্রীতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

রাতে ও প্রাতে

শ্রীরামেন্দু দত্ত

আকাশেব চাঁদ কাঁদিছে আকাশে, নীচে কুমুদিনী হাসিছে সুখে
সরসীর জল করে টলমল দু'জনার ছবি ধরিয়া বুকে!
মৃদুল মলয়া জলে দোলা দিয়া ঢেউ তোলে আর নাচায় ছবি
তালি নারিকেল চামর ঢুলায়—শীষ দিয়ে গায় কোয়েলা কবি!

*   *   *   *

মেঠো পথ খানি বাঁকা রেখা টানি চলিয়া গিয়াছে চোখের আড়ে
রাখালিয়া বাঁশী প্রেমিক উদাসী বাজায়—আবার বনের ধারে!
সে বাঁশের বাঁশী হইতে উঠিয়া করুণ লহরী ছড়াযে যায়
কুটীরের কোণে নিশীথে গোপনে রূপসী সে সুর শুনিতে পায়!
বাঁধা দেহ তার, বাঁধা গেহ দ্বার, বাধা স্নেহ আর সমাজরীতি
প্রেমে পরিপূর বাঁশরীর সুর সে কারা মাঝারে জানায় প্রীতি!
বন্দীশালার প্রাচীর পারায়ে মুক্ত মনের পাখীটি তার
উড়িয়া পলায় আকাশ বাহিয়া না ডরি' রাতের অন্ধকার!

*   *   *   *

আকাশের চাঁদ মিলায় আকাশে, কুমুদিনী ঘুমে ঢলিয়া পড়ে,
সরসীর জল করে ঝলমল—কোনো ছবি আর বুকে না ধরে!
বনের কিনারে বাজায় না বাঁশী বসিয়া উদাসী প্রেমিক আর—
প্রাতের সৌর কিরণে দূরিত হয়েছে রাতের অন্ধকার!
রূপসীও আর বন্দিনী নহে, ঘর-বার করে গৃহের কাজে
মনের মুক্ত পাখীটি তাহার ফিরিয়া এসেছে খাঁচার মাঝে!

মহাবনে মহাবাণী

শ্রীনিরুপমা দেবী

(৩)

আবার বৈকালে পাহাড়ে উঠিয়া ততোধিক উৎসব দর্শন করা গেল। শ্রীজী তখন মন্দির হইতে নিম্নস্তরের বিস্তৃত অঙ্গনমধ্যস্থ 'ছত্রি' বা মন্দিরে বার্ দিয়া বসিয়াছেন। * দর্শনের জন্য বহু দূরদূরান্তর হইতেও জনসমাগম হইয়াছে। এ দর্শন আজ অবাধ অকুণ্ঠ। রাজনন্দিনীকে এখানে আজ যাহার যাহা শক্তি ভেট্ প্রদান করিতেছে। চারিদিকে আনন্দ কোলাহল, ব্রজবধূরা চারিদিকে মঙ্গল গান করিতেছে। সন্ধ্যারতির পর দোলায় চড়িয়া তিনি মন্দিরে চলিয়া গেলেন—আমরাও নবমীর চন্দ্রকিরণে পথ দেখিতে দেখিতে নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিলাম। তাঁহার কৃপার কথা আরও একটু স্মরণে আসিতেছে। সেই সোপান অতিবাহিত করিতে করিতে দেখি সেই বাঙ্গালী মহাজনটি —যিনি আমাদিগকে তাহার ষোলজন সাধু সেবার কিছু অংশ প্রদান করিয়াছিলেন—আমাদের দেখিয়া স্মিত হাস্যে নিকটে আসিলেন। হস্তে একটি ক্ষুদ্র লোহিত বর্ণের পদ্ম, যেন একটি বড় গোছের গোলাপ! কিছুক্ষণ শিষ্টাচারাদির পর সহসা সেই পদ্মযুক্ত হস্তটি আমার দিকে প্রসারিত করিয়া ধরিয়া বলিলেন "শ্রীজীর চরণপদ্মের স্পর্শযুক্ত এই পদ্ম প্রসাদটি আপনি নিন্"!

তাঁহারা বোধহয় তাহার পরে এরূপ স্থানে এরূপ পদ্ম-প্রাপ্তির অলৌকিকতার কথা বলিতে বলিতে নামিয়াছিলেন; কিন্তু যে সেদিনের সে প্রসাদ পাইয়াছিল তাহার পক্ষে আলোচনার মত কোন কথাই ছিল না। সেই শুষ্ক পদ্ম আজও কৌটায় লুকানো আছে।

কয়েক দিন আমরা ইহার পরে বর্ষাণায় ছিলাম। প্রত্যহ এক এক স্থানে "লীলা" হইত। 'প্রেম সরোবরে' একদিন 'লীলার' মেলা হইল। সেদিন আর মূর্ত্তিদিগের 'লীলা' নহে। স্বয়ং 'স্বরূপ' অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ হস্তিপৃষ্ঠে বাহিত হইয়া প্রেম সরোবরের তীরে আসিয়া সুসজ্জিত জলযানে আরোহণ করিলেন এবং ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অতি বৃহৎ কুণ্ডের চারিপাশে মনোরম বৃক্ষশ্রেণী সেদিন আলোক মালায় সজ্জিত, চারিদিকে আলোয় আলোময়। কুণ্ডটির সমস্ত দেহটি তো বাঁধানো বটেই, মাঝে মাঝে একটি একটি অনতিপ্রশস্ত পথ জলের উপরে অনেকখানি গিয়া এক একটি প্রশস্ত স্তম্ভশীর্ষে শেষ হইয়াছে। তাহার উপরে কম্বল বিছাইয়া কতকগুলি সাধু মহান্ত বা সাধারণ দর্শক যাহারা অগ্রে আসিয়া স্থান দখল করিতে পারিয়াছে তাহারাই বসিয়া গিয়াছে। কুণ্ডের চারিপাশে তো তেমনি জনতা এবং রীতিমত মেলা।

এইরূপে সেদিন কিছু রাত্রি পর্য্যন্ত ব্রজ-গোপীর সঞ্চিত নয়নজলের কুণ্ড "প্রেম সরোবরে" স্বরূপযুগল জলক্রীড়া সমাপনান্তে আবার হস্তী আরোহণে আলোক, দণ্ড ও জয় জয় রবকারী জনতার মধ্যে গ্রামে ফিরিলেন। সেই রাত্রেও পথে দেখা গেল—স্থানে স্থানে নানা প্রকার 'লীলা' চলিতেছে। শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও সখীগণরূপে সজ্জিত ও শিক্ষিত কতকগুলি বালকের দ্বারা এই লীলার অভিনয় চলিতে থাকে। নানা স্থানের নানা দল এই সময়ে বর্ষাণার শ্রীজীর জন্মোৎসবে 'লীলা'র অভিনয় করিতে আইসে। ইহার মধ্যে যে সব সঙ্গীত চলে তাহা সাধারণ গ্রাম্য গীতি নহে। শ্রীবৃন্দাবনে ঝুলনে বড় বড় রাজবাড়ীতে তো এই সব সঙ্গীতের পরম উৎকর্ষতাই প্রকাশ পায়। সে সব দলও তেমনি জাঁকজমকের—বালকগুলিও তেমনি মধুরকণ্ঠ, সুশ্রী এবং তাহারা সঙ্গীতে, নৃত্যে ও অভিনয়ে প্রচুর দক্ষতা প্রকাশ করে। অবশ্য সে সব দল এই সব গ্রামে আসে না; তথাপি এই সব গ্রাম্য দলের মধ্যেও সঙ্গীতের ও নৃত্যের পারিপাট্য অতি মধুরই হয়। এখানের এই লীলার আরও একটি বিচিত্রতা; এক এক স্থানে এক এক লীলার স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে এবং সেইখানে একটি গোলাকার চত্তর এবং যুগলের উপবেশন উপযোগী মধ্যস্থলে একটি পৃষ্ঠদেশে অবলম্বনযুক্ত

* এখন এই মন্দিরটি শ্বেতপ্রস্তর মণ্ডিত হইয়াছে।

বেদী নির্ম্মাণ করা আছে। স্থানে স্থানে সখীদের উপবেশনের উপযুক্ত টানা লম্বা বেদীরও অভাব নাই। পরদিন আমরা "ময়ূর-কুটীর" লীলা দেখিতে এক বন্য পথে যাত্রা করিলাম। সে পথের বর্ণনা আজ আর প্রকাশ করিবার বস্তু নহে! যদি সেই সঞ্চয়ের অনুভব কিছু লেখা থাকিত তবেই কথঞ্চিৎ প্রকাশ পাইত। দুইদিকে পর্ব্বতমালা স্থানে স্থানে সবুজে ঢাকা, স্থানে স্থানে গ্রেণাইট প্রস্তরের এবং নানা ধরণের পর্ব্বতশ্রেণী। একস্থানে দুইদিকেব খাঁটি পাথবেব পাহাড়ে একেবারে পথকে রুদ্ধ করিয়াছে। দুইদিকের পর্ব্বতের দুই রকম রং এবং উভয়েব প্রায় মিলিত স্থানের উপরিভাগে সেইরূপ 'লীলা-চত্তর' এবং বেদী রহিয়াছে। এই চত্তরগুলি অতি পুবাতন, স্থানে স্থানে কিছু ভগ্ন-দশাও প্রাপ্ত হইযাছে, তবু সেকালের নির্ম্মাণের গুণে এখনো তেমন ভাবে রহিযাছে। এই দুই পর্ব্বতেব মধ্যে মাত্র একটি মনুস্য বাহির হইতে পারে এমনি একটু অবকাশ! শোনা গেল ইহার নাম "সঁক্‌রি-খোর্"! এই সঙ্কীর্ণ পথেই নন্দলালা নাকি তাহার দলবল লইয়া বৃষভানুপুরের লাড়্‌লি এবং লালিদের পথ আটক করিসা নবনী লুণ্ঠন করিতেন। দুই পর্ব্বতের দুইদিকের দুই চত্তরে দুইদল দাঁড়াইয়া এখনো এই লীলার অভিনয কবে; উৎসবের সর্ব্বশেষ দিনে সে লীলা এইখানে হইবে। লালার দল লালিদের দধিভাণ্ড ভঞ্জন করিয়া লীলাগানের সমাপ্তি করিবে। সে লীলার নাম "মট্‌কি তোড়্"। ইহার প্রতিশোধ-স্বরূপ গোপবালারা সেদিন বালকদের 'চুট্‌কি' বৃক্ষডালে বাঁধিয়া দিয়া প্রতিফল দিবে, স্বয়ং 'নন্দলালা'ও ইহাতে বাদ পড়িবে না। 'সাঁকৃবি খোর্' অতিক্রম করিয়া আমরা বনে বনে চলিতে লাগিলাম। দুই পার্শ্বের পর্ব্বত উচ্চ হইয়া উঠিয়া দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করিতেছে। নানা জাতীয় বৃক্ষে লতাগুল্মে তাহাদের শরীর ঢাকা, সেই বনে ময়ূরেব দল নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে তাহাদের দলের নৃত্য দেখিতে দেখিতে আমরা 'ময়ূর-কুটীব' নিকটস্থ একটি কুণ্ডে উপস্থিত হইলাম; সে কুণ্ডটির নাম কৃষ্ণ-গঙ্গা। সেখানে আজ বেশ জনতা, অনেক সাধু মহান্তও সেই কুণ্ড-তীরস্থ কুঞ্জের মধ্যে সপার্ষদ অবস্থান করিতেছেন। গিয়া শুনিলাম লীলা হইয়া গিয়াছে; শ্রীকৃষ্ণ রাধা সখিগণ প্রভৃতি মূর্ত্তিগণ তখন বিশ্রাম করিতেছেন; অনেকগুলি লোক কেহ তাহাদের খাওয়াইতেছে, কেহ ব্যজন করিতেছে এবং তাহাদের ভুক্তাবশিষ্ট নির্ব্বিচারে সকলে প্রসাদরূপে গ্রহণ করিতেছেন। এদেশের ধারণা ঐ লীলার সময়ে ঐ সব মূর্ত্তিধারীদের উপরে স্বরূপের আবির্ভাব হয়। 'ময়ূর-কুঠী' উচ্চ পর্ব্বতের উপরে অবস্থিত, সেখানে সাধারণে যাইতে পারে না; সে জন্য এই কুণ্ডের তীরে শ্রীকৃষ্ণের 'ময়ূর-নৃত্য' লীলা হইয়া থাকে। গোপীমণ্ডলমণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ ময়ূর সাজিয়া নাচিয়াছিলেন; তাঁহাদের বেশের চিহ্ন বহু ময়ূরের পাখা সেখানে ছড়ানো পড়িয়া আছে এবং তাঁহাদের শিরোভূষণ এবং বেশে তখনো বহু ময়ূর পাখা শোভা পাইতেছে; সকলেরই বস্ত্রাদি আজ উজ্জ্বল নীল ও সবুজ বর্ণের। শুনিলাম কিছুক্ষণ পরে সেই উচ্চ ময়ূর-কুঠী হইতে আজ এক হাজার লাড্ডু নিম্নে পতিত হইবে। জনতা সেই লাড্ডু কুড়াইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে! লাড্ডু-গুলি নাকি ওজনে এক সেরের কম নহে। আমরা বিস্মিত-নেত্রে সেই পর্ব্বত উপরিস্থ 'কুঠী' ঘরটির পানে চাহিতে চাহিতে পথ চলিতে লাগিলাম। এত উচ্চ হইতে পতিত হইয়াও যে 'লাড্ডু' অথণ্ডমণ্ডলাকারেই থাকিবে—না জানি সে লাড্ডু কি বস্তু! কুঠী ঘরটির উপরে ও চাতালে ঝাঁকে ঝাঁকে ময়ূবের আধিপত্য দেখিয়া উহাকে সার্থক-নামা মনে হইল।

এইখান হইতে যে পথ আরম্ভ হইল তাহা যত্নে প্রস্তুত করা পাথরবিছানো ক্রমোর্দ্ধগতি বনপথ! কি সুন্দর তাহার চারিপার্শ্বের বনশোভা। বন স্থানে স্থানে নিবিড়, পথ-কুঞ্জ মধ্যস্থ ডালপালা শাখা প্রশাখা সরাইয়া স্থানে স্থানে চলিতে হইতেছে। দূরে কখনো কচিৎ এক একটা পর্ণকুটীর বা ক্ষুদ্র আশ্রমের মত স্থান দেখা যাইতেছে * আর মাঝে মাঝে সেই বাঁধানো 'লীলা স্থান'। ময়ূরের কেকা আর বন্য শুকের কলরব শুনিতে শুনিতে ক্রমে আমরা উচ্চে উঠিতে লাগিলাম। অদূরে জয়পুর মহারাজের প্রাসাদের শিখর দেখা যাইতে লাগিল, দক্ষিণে একটা উচ্চ স্থানে হিন্দোলোৎসবের প্রকাণ্ড চত্তর। চারিদিকে বন আগাছায় ভরিয়া গিয়াছে—অনেকটা অংশই ভাঙ্গিয়া আসিতেছে, কেবল দুইটি হিন্দোল-স্তম্ভ সুদৃঢ়ভাবে উচ্চ শিরে দাঁড়াইয়া

* এখন এ পথে অনেকগুলি ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত আশ্রমাদি নির্ম্মিত হইয়াছে।

আছে। স্তম্ভের উপরে দুইটা ময়ূর বসিয়াছিল, আমাদের দেখিয়া উড়িয়া বনে অদৃশ্য হইল। মাঝখানে দাঁড়াইয়া চারিদিকের পর্ব্বত-গাত্রের বনরাজি দেখিতে দেখিতে কত কিই যে মনে আসে। আবার চলিতে চলিতে ক্রমে আমরা জয়পুর মহারাজের প্রাসাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সেখান হইতে অদূরে শিখরান্তরে শ্রীজীর মন্দিরচূড়া এবং বর্ষাণা পাহাড়ের পুরী দেখা যাইতেছিল। ব্রজবাসী পাণ্ডাজী এইরূপে আমাদের বর্ষাণা পর্ব্বতরূপী ব্রহ্মাজীকে প্রদক্ষিণ করাইলেন। রাজবাড়ীর পার্শ্ব হইতে সুন্দর ক্রমনিম্ন কঙ্করময় ঢালু পথে কিছুদূর গিয়া আবার আমরা বর্ষাণা পাহাড়ের শ্রীজীর পুরীশোভিত শৃঙ্গে উঠিতে লাগিলাম এবং অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই পুরীর একদিকে উপস্থিত হইলাম।

আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া বর্ষাণা-প্রসঙ্গ শেষ করি। অপরাহ্ণে আমরা বিলাসগড়ের হিন্দোললীলা দেখিতে যাইব বলিয়া দ্বিপ্রহর হইতেই ব্যস্ততা চালাইতে-ছিলাম। অপরাহ্ণ না আসিতেই আকাশে মেঘের দল সাজিতে লাগিল। পরামর্শ স্থির হইল আমরা এখনি বাহির হইয়া পড়িব; দুর্য্যোগ সম্মুখে বলিয়া বসিয়া থাকিলে দেখা তো হইবে না! মা বাসায় থাকুন, ব্রজবাসী পাণ্ডাও এখন বাহির হইতে চাহিবেন না এবং আমাদেরও নানা কথায় দমাইয়া দিবেন। অতএব তাঁহার অপেক্ষায় কাজ নাই; দেবীদিদি যখন পথ দেখাইতে পারিবেন তখন ভাবনা কি। দিদি হাসিয়া বলিলেন "পথের কথা না ভাবিয়াই যে চলিতে হইবে—এ সর্ত্ত এখানে আমার কিন্তু একভাবেই থাকিল! ভরসা ছিল এ উৎসবের দর্শনপথে যাত্রী মিলিবে, তাও দেখি ঘটে না।" মাতাঠাকুরাণী মেঘের ঘটা দেখিয়া সহজেই বাসায় থাকিতে রাজী হইলেন; উভয়ে আমরা গাত্রবস্ত্র এবং এক এক গামছা মাত্র সম্বলে বাহির হইয়া পড়িলাম। পূর্ব্বদৃষ্ট বনপথেই কিছুদূর চলিতে লাগিলাম। পর্ব্বতশিরে মেঘ ঘনঘোররূপে ক্রমে সঞ্চিত হইতে লাগিল—নিম্নে বনতলে ময়ূর দলের ঘন ঘন 'কেঁও কেঁও' শব্দ, কোনখানে তারা নিঃশব্দে সমস্ত পুচ্ছ বিকাশ করিয়া সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া আছে, এক একবার এদিক হইতে ওদিকে ফিরিতেছে। ইহাই তাহাদের নৃত্য। দেখিতে দেখিতে আমরা সেই "সঁকুরি-খোরের" সঙ্কীর্ণ পথে আসিয়া পড়িলাম। সেই গিরি-সঙ্কটের ক্ষুদ্র সংস্করণ পার হইয়া দূরে একটি গ্রামের আভাস বামপার্শ্বে যাহা দৃষ্ট হইতেছিল সেইদিকে চাহিয়া 'দিদি' বলিলেন—"ঐ গ্রামটি পুরো বেষ্টন করে তবে পথ পাওয়া যাবে বোধ হচ্চে। তাহলে আমাদের এখনো ঘণ্টাখানেক চলার মামলা। একটিও যে সঙ্গী জুটলো না—নৈলে এ দেশের লোকে বনের মধ্যে মধ্যে অল্প দূরের পথ বাত্‌লে দিতেও হয় ত পারত!" মেঘ তখন পর্ব্বতের মাথায় একেবারে নামিয়া পড়িয়াছে—বৃষ্টি আরম্ভের আর দেরী নাই। সহসা আমরা দাঁড়াইয়া গেলাম—হ্যাঁ, স্পষ্টই বাদ্যধ্বনি! কোন্ দিকে তবে বিলাসগড়? দিদি বিমূঢ়ভাবে বলিলেন "কিছুই তো আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না—ঐ গ্রাম পার হয়েই তো যেতে হয়, এ বাজানার শব্দই বটে।" অস্পষ্ট কিন্তু বাদ্যধ্বনি—দুই দিকেরই পর্ব্বতগাত্রে ধ্বনিত হইতেছে। কোথা হইতে আসিতেছে, স্তব্ধ কর্ণে আমরা দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধনেত্রে বামপার্শ্বস্থ পর্ব্বতের দিকে চাহিতে লাগিলাম—সেস্থান যেমন উচ্চ তেমনি কণ্টকময় জঙ্গলে এবং সঙ্কটময় বন্ধুরভাবে অবস্থিত।

দুইটি নারী, কোমরে ঝুড়ি, কাঠ কুড়াইতে কুড়াইতে সেইদিকে আসিতেছে। ঘাগ্‌রি, চোলি, ওড়্‌নিপরা দুইটি অসমবয়স্কা স্ত্রীলোক। একটি বয়সে অল্প, অন্য জন তদপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা; আমাদের দিকে দৃষ্টিমাত্র না করিয়া হাসিতে হাসিতে গল্প করিতে করিতে "সঁাকরি-খোরে"র দিকে চলিল দেখিয়া আমি প্রায় তাদের পথরোধ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম—"বিলাসগড়ে লীলা দেখিতে যাইব—বৃষ্টি আসিতেছে—পথ কোন্‌দিকে?"

"রাস্তা?" হাস্‌িয়া একজন আমাদের দিকে চাহিল—"যিধর্ সে যাও তাঁহাই রাস্তা মিলেগা"! অদ্ভুত উত্তর! কিন্তু কিছুমাত্র না ভাবিয়া আমি পার্শ্বস্থ দুরধিগম্য পর্ব্বত-গাত্রের দিকে হাত তুলিয়া বলিলাম "এই দিক্ দিয়া যদি যাই—তাহা হইলেও কি রাস্তা মিলিবে?"

"হ্যাঁ—হুঁয়াভি আল্‌বৎ রাস্তা মিলেগা!"

কি উত্তেজনায় কি ভাবে যে এই কথা শুনিবামাত্র সেই পথহীন পথের দিকে ঊর্দ্ধগামী হইতে হইতে দিদিকে ডাকিয়া বলিলাম "আসুন—এইদিকেও পথ মিলবে" তাহা আজ বুঝিতে পারি না! পরে মনে হইয়াছিল, ও-রকমভাবে

না ছুটিয়া যদি আর একটু সেখানে দাঁড়াইতাম বা অন্য কিছু করিতাম—কিন্তু তখন সেই বিলাসগড়ের লীলা দেখা ছাড়া অন্য কোন কথাই মনে পড়িল না। দেবীদিদি অতি কষ্টে আমার অনুসরণ করিতে করিতে হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিয়া চলিয়াছেন "এ কি অসম সাহস? এদিকে পথ? সম্মুখের জায়গাটা কি করে পার হওয়া যাবে?—ও-দিকেও যে কাঁটাবন!" একবার পশ্চাতে ফিরিয়া তাঁহাকে উঠিবার সাহায্য করিতে গিয়া সেই পথ নির্দ্দেশ-কারিণীদের কথা মনে হওয়ায় নিম্নদিকে চাহিয়া দেখিলাম তাহারা বোধহয় "সাঁকরি-খোরের" পথে কোনদিকে চলিয়া গিয়াছে, মোট কথা তাহাদের চিহ্নমাত্র নাই! পশ্চাৎ দৃষ্টিতে একটা স্থান কেবল চোখে পড়িল, পার্শ্বের ক্রমনিম্ন-পথে দূরে সেই চত্তরটি দেখা যাইতেছে; যেখানের সঙ্কীর্ণ পথে উভয় দলের "দান-লীলার" অভিনয় হয়। দানী হইয়া যেখানে ব্রজলালেরা লালিদের ঘাটি আগ্‌লায়। উভয়ে কি করিয়া উপরে উঠিতেছি যেন তাহাও সম্পূর্ণ বোধের মধ্যে আসিতেছে না। চারি হাত পায়ে একস্থানে উঠিতে গিয়া দেখি একেবারে কাঁটার বনে আসিয়া পড়িয়াছি। দিদিকে বলিতে যাইতেছি "ঘুরিয়া উঠুন—কাঁটার বন, কাঁটা!" কিন্তু শব্দ মুখে ফুটিবার পূর্ব্বেই অনুভব হইল "কই কাঁটা?" কাঁটার গাছের মত সাজানো তীক্ষ্ণাগ্র পত্রশাখাসম্বলিত ঝাড়গুলির শুষ্ক পত্র ও কণ্টকগুচ্ছগুলি দলিত হইবা মাত্র মুচ মুচ্ করিয়া গুঁড়া হইয়া যাইতেছে। উল্লাসে দিদি-ঠাকুরাণীকে একথা জ্ঞাপন করিতে যাইতেছি এমন সময়ে দেখি তিনি বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতেছেন "আর আমার সাধ্য নাই।"

তাঁহার দিকে চাহিয়া কিংকর্ত্তব্য ভাবিবার পূর্ব্বেই সহসা সেই গুম্ভিত মেঘের দল মাথার উপরেই যেন ডাকিয়া উঠিল "গুম্ গুম্ গুম্"—সঙ্গে সঙ্গে জোরে এক ঝলক বাতাসের সঙ্গে উত্তাল বাদ্যশব্দ, যেন খুব কাছেই কোথাও বাজিতেছে। নিমেষে দিদিঠাকুরাণী উঠিয়া সেই কাঁটাবন ভাঙ্গিয়াই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পীঠে দুচার ফোঁটা বৃষ্টি পুষ্পবৃষ্টির মতই পড়িল, বুঝা গেল তার আগমনের আর দেরী নাই। দ্বিগুণ বেগে আমরা ঊর্দ্ধমুখে ধাবিত হইলাম। খাড়াই শেষ হইয়া সহসা সবুজ তৃণমণ্ডিত প্রায় সমতল খানিকটা প্রশস্ত ভূমি সম্মুখে—তাহার উপরে আবার তেমনি—এমনি ভাবে কয়েকটি স্তরভূমি—তাহাতে বনের নাম নাই—মাঝে মাঝে কতকগুলি বৃক্ষ মাত্র আছে। দিদি সানন্দে বলিলেন "পাহাড়ের ওপরে পৌছেচি। ঐ দ্যাখ, দূরে একটা ঘরের মত!" বলিতে বলিতে ঝর্ ঝর্ করিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসিল। কোন দিকে মনুষ্যের চিহ্ন মাত্র নাই, অথচ কোথা হইতে এমন সুস্পষ্ট বাদ্যশব্দ আসে! আমরা এখন একেবারে দৌড়িলাম।

ঝমাঝম্ বৃষ্টি! আমরা দৌড়িতে দৌড়িতে একটি কুটীর সাম্‌নে আসিতেই দেখি—এক ব্যক্তি দ্বারপথে দাঁড়াইয়া আছেন। "লীলা কিধর্ হোতা?" প্রশ্ন করিতেই সে হস্তেঙ্গিতে যেদিক প্রদর্শন করিল আমরা সেই দিকে ছুটিয়া চলিলাম। "বৃষ্টি আসিয়া গিয়াছে, লীলা এখনি বন্ধ হইবে—দেখা আর হইল না" এই হতাশাই মনে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান—বৃষ্টির বা আশ্রয়ের কথা ভাবিবারই অবসর নাই। বাদ্য ও সঙ্গীত শব্দ ক্রমশঃ নিকট হইয়া আসিতেছে! নানা যন্ত্র সম্মিলিত শব্দ, ক্রমে তাহা দ্রুত তালে বাজিতে লাগিল।

একটি সম্মিলিত দল বৃক্ষতলে যেন জড় হইয়া তাল পাকাইয়া দাঁড়াইয়াছে! উপরে ঘনঘোর মেঘ, ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, আর কি উদ্দাম তালে তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাদ্য গীতধ্বনি জয়ধ্বনি এবং ঝন্ ঝন্ ঝনাঝন্ হিন্দোলের ঝুলন শব্দ! অপরূপ দৃশ্য! সেই বৃষ্টির মধ্যে দুইটি বৃক্ষের মধ্যে সবেগে হিন্দোল দুলিতেছে, তাহাতে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি! দুই দিকে দুইটি সখি। মুখে তাহাদের অপরূপ হাসি, বৃষ্টিতে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত, সিক্ত বেণী দোলার আন্দোলনে "বেণী ব্যালাঙ্গনা"র বিভ্রমই দেখাইতেছে। আশে পাশে নীচে আরও সখী ও দর্শক এবং বাদকের দল! বাদ্যযন্ত্রগুলিরও বাদকের কতকাংশ কেবল বড় বড় পত্র নির্ম্মিত ছত্রে আবরিত, আর সব একেবারে খোলা বৃষ্টির নীচে দাঁড়াইয়া। মুখে তাহাদের কি অদ্ভুত আনন্দোচ্ছলতা! বৃষ্টিতে যেন তাহাদের উৎসাহ আরও বাড়িয়াই গিয়াছে। যেমন মেঘ বিদ্যুৎ বৃষ্টি সমান চলিতে লাগিল, আর সঙ্গীতের জোরও তেমনি বৃদ্ধি পাইতেছিল। কোন বাধায় ভ্রূক্ষেপ নাই, তারা যেন রক্তমাংসের মানুষ নয়। সেই সাশ্বত ঝুলনোৎসব যেন আজ প্রত্যহ দেখিতেছি! আমরাও গুম্ভিতভাবে একটি বৃক্ষ-

নিম্নে দাঁড়াইয়া রহিলাম। সেই তুমুল শব্দে সঙ্গীতের একবর্ণও কর্ণগোচর হইল না—কিন্তু মন তাহাতে একটুও অসন্তোষ পাইল না, সেই দৃশ্য আর সেই সম্মিলিত শব্দই মনকে এমন একটা পূর্ণতার আভাস সেদিন দিয়াছিল।

বৃষ্টি কমিয়া আসিল, সঙ্গীতবাদ্য এবং দোলার বেগও সঙ্গে সঙ্গে থামিয়া আসিল। তার পরে বৃষ্টি নিবৃত্তির সঙ্গে উৎসব সমাপনান্তে সেই রাধাকৃষ্ণ সখিবৃন্দ প্রভৃতি মূর্ত্তিগুলি (অর্থাৎ সেই বেশী বালকগুলিকে) স্কন্ধে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া জনতা জয় জয় ধ্বনি করিতে করিতে পর্ব্বত অবরোহণে প্রবৃত্ত হইল। আমরাও তাহাদের অনুসরণ করিলাম। একেবারে ভিন্ন দিকে ভিন্ন পথ সুখে অবরোহণ করা চলে। দেখিলাম সেই দলে গৈরিকধারী জটাধারী উদাসীন এবং মহান্ত প্রভৃতিও আছেন। বাদক দল এবং বাদ্যযন্ত্রগুলিও সম্ভ্রমোৎপাদক! দিদি সেই 'লীলা-গায়ক' দলের পরিচয় লইতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু তাহাতে বাধাই দিতে হইল। ইহাঁদের যেন বাস্তবে টানিয়া আনিতে ইচ্ছা হইতেছিল না।

বিলাসগড় হইতে নামিয়া সেই পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট গ্রাম ঘুরিয়া ক্রমে "সাঁকরি-খোরের" পথে যখন আসিলাম তখন সন্ধ্যার অন্ধকার অগ্রসর হইয়া আসিলেও পথ জনশূন্য নয়।

বৃথা আশায় চারিদিকে চাহিলাম, কোথায় আমাদের সেই পথনির্দ্দেশকারিণীরা—যাঁহাদের কৃপায় আমরা আজ এই অপরূপ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি!

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম্-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ্-আর্-ই-এস্

যে সকল বরেণ্য বাণীসেবক তাঁহাদের জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্থান অতি উচ্চে। তাঁহার 'নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্যরসে' পরিপূর্ণ প্রহসনগুলি বাঙ্গালীকে আনন্দ দান করিয়াছে, তাঁহার স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক নাটকাবলী বাঙ্গালীকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তাঁহার সুমধুর ব্রাহ্মসঙ্গীতগুলি কত অশান্ত হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করিয়াছে, তাঁহার সুচিন্তিত সন্দর্ভাবলী কত নূতন নূতন ভাব ও চিন্তার ধারা উন্মুক্ত করিয়াছে, তাঁহার সংস্কৃত, ফরাসী, মারাঠা প্রভৃতি কত ভাষায় লিখিত গ্রন্থের সুললিত বঙ্গানুবাদ বাঙ্গালা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। শিল্প ও ললিতকলার ইতিহাসেও তাঁহার অমূল্য অবদান চিরস্মরণীয়। 'ভারতবর্ষ' আজ তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছে।

কলিকাতার যোড়াসাঁকো পল্লীতে প্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশে সন ১২৫৫ সালে ২২শে বৈশাখ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ 'প্রিন্স' দ্বারকানাথ ও পিতা 'মহর্ষি' দেবেন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর প্রাতঃস্মরণীয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহোদর সহোদরাগণের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানের সাধক ও স্বপ্নপ্রয়াণের কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ, প্রথম বাঙ্গালী সিবিলিয়ান ও 'বোম্বাই প্রবাসে'র গ্রন্থকার সত্যেন্দ্রনাথ, বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের লেখক হেমেন্দ্রনাথ, প্রথম বাঙ্গালী ঔপন্যাসিকা স্বর্ণকুমারী, কবিসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকেই এই সর্ব্বজনসম্মানিত বংশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজ প্রতিভা ও সাধনা বলে যে কীর্ত্তিস্তম্ভ রচনা করিয়া গিয়াছেন, কালের প্রভাবে তাহা বিলুপ্ত হইবার নহে।

শৈশবে তিনি গৃহস্থিত পাঠশালায় জনৈক গুরুমহাশয়ের নিকট বর্ণপরিচয়াদি শিক্ষা করেন। পরে অগ্রজ হেমেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে জনৈক গৃহশিক্ষকের নিকট ইংরাজী শিক্ষা লাভ করেন। তিনি শৈশবে ও বাল্যে রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইলেও নানাবিধ পুরুষোচিত ব্যায়াম, সন্তরণ-বিদ্যা, অশ্বারোহণ, শীকার প্রভৃতিতে অনুরাগী হইয়াছিলেন। হেমেন্দ্রনাথ তাঁহার ক্রীড়ার সময় সঙ্কোচ করিয়া পাঠের সময় বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ায় বাল্যকাল হইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পাঠ্যপুস্তকপাঠে বিতৃষ্ণা জন্মে। অতঃপর

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ক্রমান্বয়ে সেণ্ট পল্‌স্ স্কুল, মণ্টেগু একাডেমী ও হিন্দুস্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেন।

অতঃপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন-প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা কলেজে প্রবিষ্ট হন। এই বিদ্যালয়ে (পরে আলবার্ট কলেজ নামে খ্যাত) কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, (ডব্লিউ সি ব্যানার্জ্জীর পিতৃব্য) উকীল ভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্যর তারকনাথ পালিত প্রভৃতি শিক্ষাদান করিতেন।

ঘন ঘন বিদ্যালয় পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহার পাঠে যে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। তিনি স্কুলে পাঠ্য বিষয়ে মনোযোগ না দিয়া শিক্ষকগণের ছবি আঁকিতেন। যাহা হউক ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি অপ্রত্যাশিত ভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অতঃপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশলাভ করেন। ভারতগৌরব রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্ত তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। এইস্থানে আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট শিক্ষালাভের তিনি সুযোগ পাইয়াছিলেন।

এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অধিকাংশ সময় তাঁহার খুল্লতাতপুত্র গুণেন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় গান-বাজনা ও গল্প-গুজবে কাল কাটাইতেন। সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁহার অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদ মনোমোহন ঘোষ বিলাত হইতে যথাক্রমে সিভিলিয়ান ও ব্যারিষ্টার হইয়া এদেশে প্রত্যাগমন করিলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এফ-এ পরীক্ষা দিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের নিকট ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সত্যেন্দ্রনাথের কর্ম্মস্থল বোম্বাই নগরে তাঁহার নিকট অবস্থান করত সংস্কৃত, ইংরাজী ও ফরাসী গ্রন্থাদি পাঠ এবং সেতার হারমোনিয়াম প্রভৃতি বাদ্যাদি শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া তিনি তাঁহার পরিবারস্থ অন্যান্য সমবয়স্কগণের সহযোগিতায় একটি নাট্যসমিতি গঠন করিয়া মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' ও 'একেই বলে সভ্যতা'র অভিনয় করেন। গুণেন্দ্রনাথের অগ্রজ গণেন্দ্রনাথ রীতিমত অভিনয় করিবার পরামর্শ দিলেন এবং পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দিয়া বিখ্যাত নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন দ্বারা 'নবনাটক' নামক গ্রন্থ রচনা করাইলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ৫ই জানুয়ারী যোড়াসাঁকোর 'নবনাটক' অভিনীত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উহাতে নটীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন ও হার্মোনিয়ম বাজাইয়াছিলেন।

এই বৎসর স্বদেশপ্রেমিক রাজনারায়ণ বসুর কল্পনানুসারে নবগোপাল মিত্র 'হিন্দুমেলা' বা চৈত্রমেলার প্রবর্ত্তন করেন। উহাতে স্বদেশীয় শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইত এবং জাতীয় সঙ্গীত ও বক্তৃতাদি দ্বারা দেশপ্রেম উদ্দীপ্ত করিবার চেষ্টা করা হইত। গণেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী, কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি অনেকে এই মেলায় জাতীয় সঙ্গীত পাঠ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বাৎসরিক মেলায় (১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে) ১৯ বৎসর বয়স্ক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একটি সুন্দর দেশপ্রেমোদ্দীপক কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটী বাঙ্গালা সাহিত্য-চর্চ্চার একটি কেন্দ্র হইয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ঠাকুরপরিবারস্থ ব্যক্তিগণ ব্যতীত কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি অনেকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রেম উদ্দীপ্ত করিয়াছিলেন। ফলে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নামক এক প্রহসন বঙ্গবাণীর চরণে উপহার দিলেন। উহাতে কেশবচন্দ্রের দলের নব্যপন্থী ব্রাহ্মগণের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাত করা হইয়াছিল এবং নব্য ব্রাহ্মদলের মুখপত্র 'ইণ্ডিয়ান মিরর' অশ্লীলতাদোষদুষ্ট বলিয়া উহার নিন্দা করিয়াছিলেন; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র উহাকে "একখানি উৎকৃষ্ট প্রহসন" বলিয়া দীর্ঘ প্রবন্ধে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'পুরুবিক্রমনাটক' নামে একটি স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক নাটক প্রকাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র এ গ্রন্থখানিরও প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"এই উপন্যাসে বৈচিত্র্য আছে। * * লেখক যে কৃতবিদ্য ও নাটকের রীতি-নীতি বিলক্ষণ জানেন তাহা গ্রন্থ পড়িলেই বোধ হয়। গ্রন্থখানি বীররসপ্রধান এবং গ্রন্থে বীরোচিত বাক্যবিন্যাস বিস্তর আছে বটে, কিন্তু সকল স্থানেই যেন বীররসের খতিয়ান বলিয়া বোধ হয়। * * যাহা হউক, এইরূপ কৃতবিদ্য এবং মার্জ্জিতরুচি মহাশয়গণ নাটক প্রণয়নের

ভার গ্রহণ করেন ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে নিতান্তপক্ষে বাঙ্গালা নাটকের বর্ত্তমান অশ্লীলতা ও কদর্য্যতা থাকিবে না।"

এই গ্রন্থখানি গুজরাটী ভাষাতে অনুবাদিত হইয়াছিল এবং ন্যাশান্যাল থিয়েটারে মহাসমারোহে বহুদিন ধরিয়া অভিনীত হইয়াছিল।

অতঃপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটক প্রকাশিত হয়। এখানিও পুরুবিক্রমের ন্যায় বীররসাত্মক ও স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক নাটক এবং মহাসমারোহে ন্যাশান্যাল থিয়েটারে উপর্য্যুপরি অভিনীত হয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সঙ্গীতের সাধনা তাঁহার অনুজ রবীন্দ্রনাথ ও অনুজা স্বর্ণকুমারীকে সাহিত্য-চর্চ্চায় ও সঙ্গীত-সাধনায় বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। এই সময়ে (১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে) সহোদর-সহোদরাগণের সহযোগিতায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ "ভারতী" নামক সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রের প্রবর্ত্তন করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ উহার সম্পাদক বলিয়া বিঘোষিত হইলেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথই উহার সঙ্কল্পয়িতা ও প্রতিষ্ঠাতা। উহাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কত সুচিন্তিত সন্দর্ভ, রস-রচনা ও বিদেশীয় গল্প প্রভৃতির অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আর একটি অপূর্ব্ব প্রহসন "এমন কর্ম্ম আর করবো না" প্রকাশিত হয়। উহা পরে "অলীকবাবু" নামে পুনর্মুদ্রিত হয়। এই সর্ব্বজন-প্রশংসিত প্রহসনখানি বাঙ্গালা সাহিত্যে যথার্থই অদ্বিতীয়। সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক প্রিয়নাথ সেন বলিয়াছেন, "এই অপূর্ব্ব কল্পনা হাস্য-রসিকের সৃষ্টি। সাহিত্যে ইহা বিরল। বঙ্গসাহিত্যে নাই বলিলেই হয়। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক মোলিয়ের তাঁহার রচিত কোন কোন নাটকে এইরূপ হাস্যময়ী কল্পনার অবতারণা করিয়াছেন। এ কল্পনার ভিতর কোন বিশাল বা সূক্ষ্ম তত্ত্বের গূঢ় ছায়া বা নিগূঢ় অভিসন্ধি নাই। হাসিতেও কোন জ্বালা নাই। না থাকিলেও বা নাই বলিয়াই ইহা অমূল্য। ইহার প্রয়োজনীয়তাও কম নয়। এই স্বচ্ছ উজ্জ্বল হাসি জাতীয়-জীবনের স্বাস্থ্যের পরিচায়ক—কল্যাণকর—শোভাবিধায়ক।"

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'অশ্রুমতী' নামক আর একখানি ঐতিহাসিক নাটক প্রকাশ করেন। এই নাটকখানি বহুবার বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইয়া দর্শকগণের প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। উহাতে সন্নিবিষ্ট কতকগুলি প্রেমগীতি এখনও বাঙ্গালায় সমাদৃত।

ইহার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আর একখানি ঐতিহাসিক নাটক—'স্বপ্নময়ী' প্রকাশিত হইয়া উহার পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের ন্যায় সমাদৃত হইয়াছিল। এই সময়ে নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্রঘোষের আবির্ভাব হওয়ায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অন্য দিকে তাঁহার প্রতিভা নিযুক্ত করেন।

তখন সাহিত্য পরিষদ জন্মগ্রহণ করে নাই। সাহিত্য-পরিষদ যে উদ্দেশ্য লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থ একটি সভা স্থাপনের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বাঙ্গালার সাহিত্যিকগণের সমবায়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তদীয় আবাস ভবনে "সারস্বত সমাজ"-এর প্রতিষ্ঠা করেন। ডাঃ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই সভার সভাপতি-পদ গ্রহণ করিয়া উৎসাহসহকারে "ভৌগোলিক পরিভাষা" নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক উহার সভ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় উহা অধিককাল স্থায়ী হয় নাই।

এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তদীয় ভবনে একটি বার্ষিক সাহিত্য-সম্মেলনেরও প্রবর্ত্তন করেন। হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় উহার নামকরণ করিয়াছিলেন "বিদ্বজ্জন সমাগম।" "কাল-মৃগয়া" ও "বাল্মীকি-প্রতিভা" এই উপলক্ষেই প্রথম রচিত ও অভিনীত হয়। বাল্মীকি-প্রতিভার অধিকাংশ গীতই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রদত্ত সুরে রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মলিয়েরে বিরচিত একটি ফরাসী প্রহসন অবলম্বনে "হঠাৎ-নবাব" নামক একটি প্রহসন প্রকাশিত করেন।

ইহার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিছুদিন পাটের ব্যবসায়, নীলের চাষ, স্বদেশী ষ্টীমার পরিচালনা প্রভৃতি দ্বারা দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টা করেন; কিন্তু নানা প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হইয়া তাঁহাকে প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত ও ঋণগ্রস্ত হইতে হয়।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী—কাদম্বরী দেবী—যাঁহাকে 'সারদামঙ্গলে'র কবি বিহারীলাল "সাধের আসনে" চিরস্মরণীয়া করিয়া গিয়াছেন—অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার জীবন সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার সাধনায় উৎসর্গ করিয়া এই শোক হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা পান।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে "সাধনা" পত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য প্রতিভাশালী লেখকগণের সহিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথও এই অতুলনীয় মাসিকপত্রের গৌরব সম্পাদন করিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কনে বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি সুযোগ পাইলেই পরিচিত অপরিচিত সকলেরই মুখের প্রতিকৃতি আঁকিতেন। রবীন্দ্রনাথের ইংলণ্ডে প্রবাসকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কতকগুলি রেখা-চিত্র দেখিয়া বিখ্যাত চিত্রকর উইলিয়ম রোটেনষ্টাইন তাঁহাকে বলেন যে সেগুলি "প্রথম শ্রেণীর গুণীর উপযুক্ত" এবং প্রকাশ করিতে পরামর্শ দেন। ইঁহার পরামর্শানুসারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কতকগুলি চিত্র ইংলণ্ডে মুদ্রিত করিবার অনুমতি দেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এই চিত্র পুস্তক রোটেন-ষ্টাইনের ভূমিকা সহ প্রকাশিত হয়। এই ভূমিকার এক-স্থানে তিনি লিখিয়াছেন—"আমার বিশ্বাস যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস-গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া আমরা বাঙ্গালী জীবনের যেরূপ ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাই, এই সকল চিত্র হইতেও আমরা অনেকেই সেইরূপ পরিচয় পাইতে পারি। আমি আধুনিক প্রতিকৃতি অতি অল্পই দেখিয়াছি যাহাতে এইরূপ সৌন্দর্য্য ও মনোভাব প্রকাশের ক্ষমতা অভিব্যক্ত হইয়াছে।"

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'হিতে-বিপরীত' নামক একখানি অভিনব প্রহসন প্রকাশিত হয়। উহার রচনার একটু ইতিহাস আছে। তাঁহার ভ্রাতৃজায়া মাননীয়া শ্রীযুক্তা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী একদিন তাঁহাকে বলেন "তুমি অনেক দিন কোন নাটিকা লেখ নাই—একখানি লেখ।" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অসম্মত হওয়ায় তিনি তাঁহাকে একটি গৃহে আবদ্ধ করিয়া বলেন—যতক্ষণ নাটক লেখা না হয় ততক্ষণ তাঁহার মুক্তি নাই। দায়ে পড়িয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে এই নাটিকা লিখিতে হয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চেষ্টায় 'ভারতী' ও 'সাধনা' পত্রে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে 'ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্'-এর সাহায্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৬৮টী বাঙ্গালা গানের স্বরলিপি 'স্বরলিপি গীতিমালা' নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়া প্রকাশিত করেন। এই বৎসরেই তিনি 'বীণাবাদিনী' নামক একটি সঙ্গীত ও স্বরলিপিবিষয়ক মাসিকপত্রিকা 'ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্'-এর সাহায্যে সম্পাদিত ও প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন। এই পত্র দুই বৎসর চলিয়াছিল। পরে ভারত-সঙ্গীত-সমাজের মুখপত্র 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা'র ভার তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয়।

এই ভারত-সঙ্গীত-সমাজও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্কল্পিত। এই সমাজে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী', 'অলীক-বাবু', 'হিতে-বিপরীত' প্রভৃতি নাটক ও প্রহসন বহুবার অভিনীত হয়। উহাতে অভিনয়ের জন্য তিনি 'পুনর্বসন্ত', 'বসন্তলীলা', 'ধ্যানভঙ্গ' প্রভৃতি কয়েকখানি গীতিনাট্যও রচনা করিয়াছিলেন।

মহাকবি কালিদাসের 'শকুন্তলা' পাঠ করিয়া জ্যোতি-রিন্দ্রনাথ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি একে একে প্রায় সমস্ত উৎকৃষ্ট সংস্কৃত নাটক পড়িয়া ফেলেন এবং সাধারণকে তাঁহার আনন্দের অংশী করিবার নিমিত্ত অক্লান্ত পরিশ্রমে ও প্রশংসনীয় অধ্যবসায়ের সহিত সেগুলির বঙ্গানুবাদ করিয়া প্রকাশিত করেন। তাঁহার অনূদিত গ্রন্থগুলির নাম ও প্রকাশের তারিখ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

অভিজ্ঞান শকুন্তলা	১৩০৬
উত্তর রামচরিত	১৩০৭
রত্নাবলী	”
মালতী-মাধব	”
মুদ্রারাক্ষস	”
মৃচ্ছকটিক	১৩০৮
মালবিকাগ্নিমিত্র	”
বিক্রমোর্ব্বশী	”
মহাবীর চরিত	”
চণ্ডকৌশিক	”
বেণীসংহার	”

প্রবোধ-চন্দ্রোদয়	১৩০৮
নাগানন্দ	১৩০৯
বিদ্ধশালভঞ্জিকা	১৩১০
ধনঞ্জয়-বিজয়	"
প্রিয়-দর্শিকা	১৩১১
কর্পূর-মঞ্জরী	"

কেবল সংস্কৃত নহে, য়ুরোপীয় নানা গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। মোলিয়ের বিরচিত একখানি প্রহসন অবলম্বনে তিনি 'হঠাৎ-নবাব' রচনা করিয়াছিলেন একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইংরাজী ও ফরাসী হইতে অনূদিত অন্যান্য পুস্তকের তালিকা ও প্রকাশকাল নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ইংরাজী হইতে

জুলিয়াস সীজার	১৩১৪
এপিক্‌টেটসের উপদেশ	"
মার্কস অরিলিয়সের আত্মচিন্তা	"

ফরাসী হইতে

হঠাৎ নবাব (মলিয়ের কৃত 'ল-বুর্জোয়া জাঁতিয়ম' হইতে)	১২৯১
দায়ে পড়ে দারগ্রহ (মোলিয়ের কৃত 'মারিয়াজ ফোর্সে' হইতে)	১৩০৯
ভারতবর্ষে (ভ্রমণ-বৃত্তান্ত)	১৩১০
ফরাসী-প্রসূন (গল্প ও কবিতা-সংগ্রহ)	১৩১১
শোণিত-সোপান (উপন্যাস)	১৩২৭
ইংরাজবর্জ্জিত ভারতবর্ষ	"
সত্য, সুন্দর, মঙ্গল (ভিক্টর কুঁজ্যা প্রণীত ফরাসী গ্রন্থ হইতে)	"
অবতার (থিয়োফিল গ্যতিয়ে হইতে)	১৩২৯
মিলিতোনা (ঐ)	১৩৩০

এতদ্ব্যতীত বহু ফরাসী গল্প ও কবিতার অনুবাদ বহু মাসিক-পত্রে এখনও বিক্ষিপ্ত আছে।

১৩১৩ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'রজতগিরি' নামক একটি ব্রহ্মদেশীয় নাটকের অনুবাদ প্রকাশ করেন।

বহুদিন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বোম্বাইপ্রদেশে বাস করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মারাঠী ভাষা শিক্ষা করিয়া উহার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তিনি দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসনীস বিরচিত 'ঝাঁশী সংস্থান মহারাণী লক্ষ্মীবাই সাহেব হ্যাচে চরিত্র' অবলম্বনে ঝান্সীর মহারাণী লক্ষ্মীবাইএর একটি প্রামাণিক জীবন-চরিত প্রকাশিত করেন। কিন্তু লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক রচিত "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারহস্য" বঙ্গভাষায় অনুবাদিত করিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যের যে গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন তাহার তুলনা হয় না।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইলে ১৩০৯ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উহার অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। পরিষদের এক অধিবেশনে তিনি ১৩১০ বঙ্গাব্দে 'ভারতে নাট্যের উৎপত্তি' শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। উহা তাঁহার "প্রবন্ধ-মঞ্জরী"তে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার শেষ জীবন রাঁচীতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই স্থানে বাসের জন্য তিনি মোরাবাদী পাহাড়ের উপর "শান্তিধাম" নামক একটি সুদৃশ্য ভবন নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন। পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে ঈশ্বরোপাসনার জন্য তিনি একটি সুন্দর উপাসনা-মন্দিরও প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই শান্তিধামে তিনি প্রায় জীবনের শেষ দিবস পর্য্যন্ত সাহিত্য ও শিল্পের সাধনা করিয়া গিয়াছেন।

১৩৩১ বঙ্গাব্দে ২০শে ফাল্গুন তিনি পরলোকে গমন করেন। কিন্তু তিনি ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেও তাঁহার মধুর চরিত্র, গভীর স্বদেশবাৎসল্য ও স্বজাতিপ্রীতি, একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনা, দেশের কল্যাণকর সর্ব্ববিধ বিষয়ে তাঁহার অক্লান্ত উৎসাহ, শিল্প ও সঙ্গীতের উন্নতির জন্য তাঁহার অদম্য অধ্যবসায়, তাঁহার কৃতজ্ঞ দেশবাসীর নিকট চিরদিন দেদীপ্যমান থাকিবে। আজিও যেন তাঁহার উৎসাহপূর্ণ বাণী আমাদের কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে :—

"চল্‌রে চল্ সবে ভারত-সন্তান, মাতৃভূমি করে আহ্বান!
বীরদর্পে পৌরুষ গর্ব্বে, সাধ্‌রে সাধ্ সবে দেশেরি কল্যাণ,
পুত্র ভিন্ন মাতৃ দৈন্য কে করে মোচন?
উঠ জাগো সবে বল মা গো, তব পদে সঁপিনু পরাণ।
এক তন্ত্রে কর তপ, এক মন্ত্রে কর জপ;
শিক্ষা, দীক্ষা, লক্ষ্য, মোক্ষ, এক সুরে গাও সবে গান!
দেশ-দেশান্তে যাওরে আনতে নব নব জ্ঞান;
নব ভাবে নবোৎসাহে মাতো, উঠাও রে নবতর তান॥
লোক-রঞ্জন লোক-গঞ্জন, না করি দৃকপাত,
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, ন্যায়, তাহাতে জীবন কর দান।
দলাদলি সব ভুলি হিন্দু-মুসলমান;
এক পথে এক সাথে চল উড়াইয়ে একতা-নিশান।"

সৃষ্টিছাড়া

শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গাঁয়ের সবাই তাকে বিলক্ষণ চিনতো, আর সব চেয়ে বেশী চিন্‌তাম আমি।

সবাই জ্বালাতন—কি ডাকাতে ছেলে রে বাবা! এখনি এই, না জানি বড় হ'লে কি হবে।—এই ছিল গাঁয়ের সবারি বুলি। বুড়ীরা বলত দস্যি, অন্য মেয়েরা বলত মুখপোড়া। আর মুরুব্বীরা বলতেন—পাজি বদমায়েস্ বোম্বেটে। গাঁয়ের যিনি তথাকথিত মোড়ল—যদিও তাঁকে কেউ মানতো না—তিনি বলতেন ছিষ্টিছাড়া।

মোট কথা—ভাল তাকে কেউই বলত না। ছেলেরা তাকে দেখে প্রায়ই দূরে সরে যেত—কি জানি কখন এক থাবড়াই না বসিয়ে দেয়। বুড়োরা জানতো—যত মিছে কথা আর ধাপ্পাবাজী পাওয়া যাবে তার কাছে। কিন্তু তাই বলে উপকারটুকু তার কাছ থেকে কেউই নিতে ছাড়তো না—সেও আবশ্যকমত তা দিতে কার্পণ্য করত না।

আমার বাবা সরকারী বড় চাকরী করতেন। পেন্সন নিয়ে গাঁয়ের বাড়ীতে এলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে বহু দেশ ঘুরেছি, কাযেই সাধারণ পাড়াগাঁয়ের ছেলেদের চেয়ে আমাদের নানা বিষয়ে জানাশুনা ছিল অনেক বেশী। ভাল মন্দ সংসর্গও বাছাই করতে পারতাম—কেন না সেই ভাবেই আমরা শিক্ষা পাচ্ছিলাম। আমার বয়স তখন পনর-যোল, তারও তাই।

স্কুলে সে যায়, কিন্তু পড়াশুনা কিছু করে বলে বোধ হয় না। শুনলাম থার্ড ক্লাসে পড়ে। তা এমন ছেলে থার্ড কেলাস ছাড়া আর কি হবে!

সঙ্গী তার দুটী। তারাও পড়ে—একটী ওপরে, আর একটী নীচে। সে ছেলে দুটী কথায় বার্তায় বেশ, পড়াশুনাতেও লক্ষ্য আছে বলে মনে হ'ল। আমি তখন কলেজে পড়ি।

সে ছেলে দুটীকে দেখে আমি আকৃষ্ট হলাম। তারা আমার সঙ্গী হ'ল। গাঁয়ের কত কাযে তারা আমাকে উদ্যোগী করে অগ্রণী করে তুললো। আমিও সহজভাবে তাদের সঙ্গে মিশে গেলাম। সে কিন্তু পিছুলো না। সেও আমার গায়ে এসে পড়তে চেষ্টা করল, আমি তাকে এড়িয়ে চললাম। তার ঐ দুষমণের মত ভাবটা আমি মোটেই পছন্দ করতে পারলাম না। সে বুঝ্‌লে—একটু তফাতে তফাতে ঘুরতে লাগ্‌লো, সঙ্গ কিন্তু ঠিক ছাড়লে না।

*　　*　　*　　*

আজ যাত্রা হবে। তারা এসে বলল—দাদা, এই ব্যবস্থা চাই। আমি তথাস্তু বলে যোগ দিলাম। সন্ধ্যা-বেলা যাত্রায় বেশ ভীড় হয়েছে। হঠাৎ দেখি, কতকগুলো গুণ্ডা গোছের ইতর লোকের সঙ্গে তাদের দুজনের বচসা হচ্ছে—আর সে সেখানে দাঁড়িয়ে হাত পা ছুঁড়ে খুব আস্ফালন করছে। গোলমাল শুনে আমি তার মধ্যে ঢুকবার চেষ্টা করলাম কিন্তু অনেকেই আমাকে নিষেধ করল। বল্‌ল, বম্বেটে যেখানে যাবে সেইখানেই এই কীর্ত্তি করবে। মোড়ল বললেন—ছিষ্টিছাড়ার সবই বিট্‌কেল।

আমি তাদের ডাকালাম। তখন যুদ্ধ বাধে বাধে। অনেক ডাকাডাকিতে তারা এল, সে কিন্তু এল না। আমি তার ওপর অত্যন্ত বিরক্তির ভাব দেখালাম। তারা বল্লে—দাদা যা বলেছেন—কি হবে সামান্য স্থান নিয়ে ঝগড়া করে। ঐ ছোটলোকগুলো দেখ্‌তে পাচ্ছে না, তাই সরতে বলেছে, আর গালমন্দও করেছে। এই নিয়ে ওর সঙ্গে লেগে গেছিল। তা যাক্, সে তো দেখছি এল না।

আমি অপর পক্ষকেও বেশ করে সমঝে দিলাম যেন এমন আর না হয়। তাকে কিন্তু দেখলাম না। একটু সন্দেহ হ'ল—কি জানি দুষমণ তো, গোলমাল না বাধিয়ে বসে।

ভদ্র লোকজন অনেক জমায়েত হয়েছে। মুরুব্বীদের হুকুম হলেই গাওনা আরম্ভ হয়। তাঁদের হুকুম হ'ল। পাড়াগাঁয়ের নিয়ম অনুসারে দুম্ দুম্ করে দুটো বোম ফাট্‌লো। যাত্রা সুরু হ'ল।—এক দল লোক একটা গাঁয়ে চড়াও করে এক গৃহস্থবাড়ী আক্রমণ করবে। বাড়ীর

নিমকের চাকর তার প্রকাণ্ড লাঠি নিয়ে তাদের বাধা দিতে এসে ঘায়েল হয়ে চেঁচিয়ে বলছে—মাজী পালাও, এরা আমাকে মেরে ফেল্লে। মাজী চিৎকার করে উঠলেন। রক্তবস্ত্রপরিহিত শুভ্র দাড়ী শক্তি-মন্দিরের বৃদ্ধ পূজক-ঠাকুর দীর্ঘ যষ্টি নিয়ে কোথা হ'তে লাফিয়ে এসে সেখানে পড়লেন ও দ্বিগুণ চিৎকার করে বল্লেন "ভয় নেই"; তার পরই বজ্র-নির্ঘোষে বললেন "খবরদার।"

সেই এক শব্দে কোথায় বা সেই ডাকাত দল আর কোথায় বা কে, যে যেদিকে পারল ছুটলো। বৃদ্ধের বজ্রস্বর ক্ষণপরেই একটী চরণে গুম্‌রে গুম্‌রে ঘুরতে লাগল—

ভয়েরে জয় কর রে
ভয় কি এতই ভয়াবহ,
জান্ চেয়ে কি মান বড় নয়
কেন রে ভয় অহরহ।

"বাঃ বেশ" ও হাততালির শব্দে চারিদিক মুখর হয়ে উঠ্‌ল। ওদিকের আলোটা দপ করে জ্বলে উঠে ফস্ করে নিবে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার উঠল—মলাম, মলাম। ধর ধর।

চারিদিকে একটা মহা হৈ-চৈ। ক্ষণকালের মধ্যে একটা আতঙ্কের স্থষ্টি হয়ে যাত্রা ভেঙ্গে গেল। সেই যে কয়েকজন একটা তুমুল ঝগড়া বাধিয়েছিল তাদেরই তিন জনের বিশেষ চোট লেগেছে। পাড়াগাঁয়ের লোক, ভদ্রতাকে অনুরোধ-উপরোধকে একেবারেই মানে না। মানে শুধু লাল-পাগড়ীকে আর তাদের গুঁতোকে। এমন রক্তারক্তি ব্যাপারে পুলিশ যে এখনি আসবে নিঃসন্দেহ। আর এলে যে গ্রাম চষে ফেলবে তাও নিশ্চয়। তারপর অনেককেই থানায় নিয়ে যাবে—সে বড় সোজা কথা নয়। তাও না হয় গেল। কিন্তু সেখানে আবার জেরা করবে!—তা হলেই সর্ব্বনাশ! জেরা তো যেমন তেমন নয়—চেরার বাড়া—বাঁশ যেমন দু-ফাঁক চেরা হয় জেরাও তেমনি হয়। এমনি কত কি মন্তব্য করতে করতে যে যার প্রস্থান করল।

মনটা তেতো হয়ে উঠল। সকালে মুরুব্বীদের কাছ থেকে কত কথাই শুনলাম। এ সেই বোম্বেটেরই কায। যাত্রাটা ভেঙ্গে দেবার উদ্দেশ্যেই সে নিশ্চয়ই ২।৪ জনের সঙ্গে এইটে করেছে। মোড়ল মশায় আমাকে বল্লেন—দেখ বাবা, ঐ ছিষ্টিছাড়া হতভাগাটাই এমন যাত্রাটা মাটী করলে; বাবাজী, ঐ ছোঁড়াটাকে যেমন করে হয় জব্দ কর। ও কিছুদিন জেলে থাকে সে ভি আচ্ছা। মেয়েরা পুকুরঘাটে বল্লে—দস্যিটার জ্বালায় কি কিছু হবার যো আছে। এতকাল পরে যদি বা যাত্রাটা বস্‌ল, ছিষ্টিছাড়া ছোঁড়াটার জন্য তা ভেঙ্গে গেল। কি গানই ধরেছিল সেই দেড়ে ঠাকুরটা, আহাঃ। এমন সময় দুটী ছোট ছোট দুলেদের ছেলে, ও-পাশের ঘাট থেকে গলাটা অস্বাভাবিক ভারী করে জিভ খানিকটে বের করে স্বরের চেয়ে বেস্বুরের ভর দিয়ে পদটী প্রায় ভুলে গিয়ে অতি-ভৈরবে আওয়াজ দিল—

ওড়ে ভয়েড়ে ভয় কড় রে,
ভয় কি এত ভয়াবহ
জান চেয়ে কি মান বড় নয়
কেনেরে ভয় ওহো ওহো।

* * * *

তারা এল। যাদের লেগেছে তাদেরও এক জন এল। আর দুজন তাকে বলে দিয়েছে—বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করবে। গাঁয়ের সবারি সঙ্গে দেখা হ'ল। সবাই বল্লে পুলিশে দাও। গাঁ ঠাণ্ডা হোক। আমি সবাইকে বল্লাম—হ্যাঁ, আমি ঠিক ব্যবস্থা করছি। পুলিশ তো আর এ গাঁয়ে থাকে না। আসতে দেরী হতে পারে। একটা খট্‌কা লাগলো। তাকে কিন্তু কোথাও দেখলাম না। সবাই বল্লে পুলিশের ভয়ে সে লুকিয়ে আছে। ভাবলাম হবেও বা।

তারা দুজন তার বন্ধু। তারাও কতকটা এই রকমই বল্লে। আমার কিন্তু একটু ভাবনা হোল।

দুপুরে সাইকেলখানা নিয়ে পাঁচ মাইল দূরে শহরের দিকে গেলাম। উদ্দেশ্য সেখানকার থানায় জানিয়ে দেওয়া যে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না; অথচ এমনি ধরণ একটা গোলযোগ হয়েছিল যাতে করে তিন তিনটে গুণ্ডা প্রকৃতির লোক ঘায়েল হয়েছে। কি জানি তার জন্য মনটা আমার কেমন যেন একটু হয়ে গেল। আমি যে শহরে আসব সে কথা কাউকে বলিনি। বেরিয়ে এসে তাদের কিন্তু রাস্তায় এক জায়গায় পেয়েছিলাম। তারা না খেয়ে না দেয়ে এখানে কেন—তার উত্তরে বল্লে, শহরে জিনিস-পত্তর কেনবার দরকার ছিল। তার কথা তাদের জিজ্ঞেস করায় বল্লে—সে অমন মাঝে মাঝে কোথায় যায়। আবার দু'দিন বাদে

আসে। রাত্রের গোলমালের পর সে গেল কোথায় তা তারা জানে না বা ভাবতেও রাজী নয়; কারণ ওসব ছেলের সন্ধান রাখা কি যার তার কায।

শহরে এ-দোকান ও-দোকান ঘুরে, একটু আইডিন কুইনিন ইত্যাদি দু-চারটে ওষুধ নিয়ে থানার দিকে যাব ঠিক করে ডাক্তারের বাড়ীর ফটকে ঢুকতেই—দুটী ছেলে—একটীর মাথায় ব্যাণ্ডেজ আর একটী সহজ—বাড়ীর ভেতরে চলে গেল। খট্‌কা লাগল—ঐ কি সে! মাথায় ব্যাণ্ডেজ কেন? তবে কি তার লেগেছে? তারা কিন্তু আমায় দেখেনি।

কিছু বুঝলাম না। ওষুধগুলি খাকির ঝুলিটায় পুরছি বাড়ীর ভেতর থেকে সহজ ছেলেটী বেরিয়ে এল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছেলেটীও এসে অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি কিছু বলবার আগেই সে বলল "দাদা, আপনি কাউকে কিছু বলবেন না, আমি এখানে আছি উপস্থিত যেন কেউ জানতে না পারে।" পরক্ষণেই সঙ্গীকে কি একটা ইঙ্গিত করল, আর আমাকে তার পরিচয় দেবার জন্য বল্ল—এদেরই বাড়ী।

কি করে তার লাগলো সে কিছুতেই তা বলল না। সুধু বলল—বিশেষ কিছু লাগেনি। ঘটনাটা কি হয়েছিল তাও বলতে রাজী নয়। কেবল বললে—ও-সব আপনার শুনে কায নেই।

ডাক্তারবাবুর ছেলেকে বল্লাম—আমার গোটা কতক জিনিস দরকার। একবার বাজারের দিকে চল তো ভাল হয়, জিনিসগুলি কেনবার সুবিধা হয়। সে বল্লে চলুন। আমিও তাই চাই, যদি তার কাছ থেকে কিছু জানা যায়।

ডাক্তারবাবুর ছেলে ও আমি দুজনে পথে বেরুতেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম—ও এখানে এল কি করে। সে একটু চুপ করে থেকে বল্লে—আপনিই তো গাঁয়ের দাদা, অথচ আপনিই জানেন না। ও বুঝি কিছু বলেনি? অথচ আপনাকে এত মানে, এত খাতির করে, বলে যে আপনি গাঁয়ের সব জানেন। আর বলে যে খাঁটীমানুষ যদি কেউ থাকে তবে আপনি। আর আপনার জন্য সে জানও দিতে পারে।

আমি হেসে বল্লাম—আরে, ও কি কথা। আর কেনই বা সে এ রকম বলবে।

ছেলেটী বল্লে—কেন বলবে! আপনি কি জানেন না—কি ভক্তি সে আপনাকে করে। এমন সে একদিন বলে নি, যখনই দেখা হয় তখনই বলে। ওর কাছ থেকেই আমরা সবাই, মা বাবা দাদা সক্কলে আপনার কথা জানি।

ওই তো আমাকে যাত্রা শুনতে যেতে বলেছিল। সেইখানে ভীড়ের মধ্যে আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে বলেছিল—এই দাদা।

আমি ক্রমশঃই আশ্চর্য্যবোধ করতে লাগলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কখন গেলে—কখনই বা এলে। কই আমি তো তোমায় দেখিনি।

কি করে দেখবেন! আমি গেলাম তখন বোম্ হল, সাইকেলখানা কোন ক্রমে রেখে যাত্রার ভেতর ঢুকতেই দেখি—কেলো আর ভূতো তিন চারটে লোকের সঙ্গে জায়গা নিয়ে ঝগড়া বাধিয়েছে। লোকগুলো তাদের দুজনকে গালমন্দ করতেই ও জ্বলে উঠলো। গায়ে ক্ষমতা রাখে। একখান লাঠি পেলে ও তিনজনের মোহড়া নেয়।

আমি বললাম—তারপর!

সে বলতে লাগলো—কি! আমাদের গাঁয়ে এসে আমাদেরই গালাগালি! দাঁড়া তো। লোকগুলোও রুখে উঠল। কেলো আর ভূতো দাঁত বের করে হেঁ হেঁ করে বল্লে—যাক্ যাক্, থাকগে যাক্ বলেই তাকে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে। সে "বেরো কুকুর" বলেই তাদের দুটোকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে আবার লোকগুলোর সামনে দাঁড়ালো। আমি তাকে নিষেধ করতেই আপনি এসে পড়লেন, গোলমাল থেমে গেল।

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম আর ভাবছিলাম—তাই তো! জিজ্ঞাসা করলাম—আবার গোলমাল হ'ল কেন?

সে একটু আশ্চর্য্য হয়ে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল—কেন? কেলোরা কিছু বলেনি বা আর কেউ কিছু বলেনি। যদিও আমি ঠিক কিছুই শুনিনি তবুও বল্লাম—তোমার কাছে শুনতে চাই।

সে বলে গেল—গাঁয়ের গোয়ালাদের একটি মেয়ে এসে সেইখানে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখছে, কোথাও জায়গা আছে কি না। সেখানে আলোর একটা ছায়া পড়ে একটু আলো-আঁধারে হচ্ছিল। সেই লোক

তিনটের একজন তাকে একটু ইসারা করে তার কাছে বসতে বললে। মেয়েটী অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চলে যাচ্ছিল। আর দুটো হেসে একটা কি ঠাট্টা করল।

আর যাবে কোথা! সে একেবারে লাফিয়ে এসে বাঘের মত তার টুটি ধরে ধাক্কায় ধাক্কায় একেবারে খুটির গায়ে। আলোটা দুলে উঠে দপ্ করে নিবে গেল। আর দুটো লোক তাকে দুদিক থেকে আক্রমণ করল, লাঠি চলল। সে ঝাঁ করে বসে প'ড়ল, আমি ভাবলাম বোধহয় লেগেছে। কিন্তু মুহূর্ত্তেই দেখি বসে পড়ায় তাদের লাঠি তাদেরই ওপর পড়েছে। আর সেই অবসরে সে তাদেরই একখানি লাঠি হাত করেছে। তখনি বুঝলাম—গুরুতর। কিছু বলবার আগেই দেখি তিনটেই পড়েছে।

আমি তাকে টেনে বাইরে এনেই দেখি তার মাথায় রক্ত। সে বল্লে বেশী লাগেনি। রুমাল দিয়ে তখনি চাপা দিয়ে—সাইকেলের পেছনে তাকে বসিয়ে একেবারে এখানে এসে ব্যাণ্ডেজ করে ঘুমুই। সকালে উঠে মা বাবা সবাই আমার কাছে শুনে তো একেবারে অবাক হয়ে গেছেন।

আমি বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় ও ঘৃণায় বিরক্তিতে কি করি বুঝে উঠতে পারলাম না। তাকে বললাম, তাই তো ছেলে বটে। আচ্ছা কি রকম লেগেছে বল তো। বেশী কি?

সে বল্লে, না। বিশেষ কিছু নয়। ও-রকম লাগাকে ও গ্রাহ্যই করে না। জিজ্ঞাসা করলাম—ও-রকম কি ওর প্রায়ই লাগে, আর এ রকম মারামারি কি ও প্রায়ই করে? সে বল্লে, মারামারি যে সব সময়ে করে তা ঠিক নয়! দরকার হলে করে, কিন্তু গাছে ওঠা, ছাদে ওঠা, লাফিয়ে পড়া, গর্ত্ত খুঁড়ে সাপ বের করা, তার লেজ ধরে ঘোরানো, এমনি অসমসাহসিকতার ব্যাপার তার লেগেই আছে। কাযেই একটু আধটু ফেটে যাওয়া, আছাড় খাওয়া, কখন বা কারুর দু-এক ঘা ঠ্যাঙানি খাওয়াও আছে। আর মিছে কথা বা ধাপ্পা দিয়ে লোকদের জব্দ করতে গিয়ে গালাগালি মন্দটা পাওয়াও তার আছে।

আমি বল্লাম সব দিকেই চৌকস। সে বল্লে—তা হোক, প্রাণ দিয়ে পরের জন্য করা ও-রকম আর কই!

* * * *

বাজার থেকে ফিরে ভাবলাম তাকে নিয়েই বাড়ী যাব। কিন্তু আমার সাইকেলখানি খুঁজে পেলাম না। কম্পাউণ্ডার-বাবুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্লেন যে সে সেখানি নিয়ে গাঁয়ে গেছে। ওষুধ-বিষুধও নিয়ে গেছে।

এই মাত্র যে শ্রদ্ধাটা গজিয়ে উঠছিল সেটা একেবারে ভূমিসাৎ হতে বসল, কিন্তু একেবারে নয়। ভাবলাম—অদ্ভুত বটে। মোড়ল মশায় যে বলেন সৃষ্টি ছাড়া, এ বাস্তবিকই তাই। একটু ফাঁক পেলেই কিছু না কিছু নষ্টামী করবেই। ডাক্তারবাবুর ছেলে বল্লে—না দাদা, বিশেষ কিছু কারণ না হলে সে কখনই আপনার গাড়ী নিয়ে যাবে না। তাকে আমি জানি। যাই হোক আপনি আমার সাইকেল নিয়ে যান।

অগত্যা তাই। সারা পথ ভাবলাম—অদ্ভুত বটে। এই শুনলাম এত ভক্তি, তার পরই আমারই গাড়ী নিয়ে লম্বা। একি ভক্তির জুলুম নাকি? তারপর আগাগোড়া ইতিহাসটাও একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার।

কিন্তু কোন্‌টা ঠিক। ভুতো কেলো তো অন্য রকম বলে। ডাক্তারের ছেলে বলে তার উল্টো। গাঁয়ের আবাল-বৃদ্ধবনিতা বলে—আরোও উল্টো—সুধু বেসুরো নয়—বেতালা।

ডাক্তারের ছেলে বল্লে—সেবার হরিসভার মচ্ছোবে খিচুড়ী রাঁধছে অনেকেই। সেও মহা উৎসাহে সবারই সঙ্গে বড় বড় বানে হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি নামাচ্ছে। হঠাৎ একজনকে ধরেই সে একেবারে রন্ধনশালা থেকে বের করে দিলে। সে বল্লে, কি!—আমাকে অপমান! যাও আমি রাঁধব না। সে বল্লে—দূর হ, তোর বান্‌টা আমিই সাম্‌লাবো এখন। অনুসন্ধানে জানা গেল—পাড়াগাঁয়ে যা হয় তাই। তিনি কিছু সরাচ্ছিলেন। হাতে হাতে সে ধরে ফেলেছে। বল্লে—ভিক্ষের চাল সংগ্রহ করে কাঙ্গালীদের খাওয়াবার জন্য এই মচ্ছোব—তাই থেকে চুরী। এসব অবশ্য বাইরে সে কাউকে বলেনি। সে বরং এজন্য বকুনিই খেয়েছিল। কিন্তু অনুসন্ধানে পরে এসব জানা যায়। এর পর শ্রদ্ধা না করেও তো উপায় নেই।

বাড়ী এলাম। দেখি আমার সাইকেল আমার জিনিস-পত্র সুদ্ধ আমার বৈঠকখানায় রয়েছে। চাকর বল্লে, আপনি বুঝি ট্রেনে চড়েছেন বলে এটাকে ওর সঙ্গে



গ্রামের ঘাট

পাঠিয়ে দিয়েছেন! বুঝলাম কেহই কিছু জানে না। সেও কাউকে কিছু বলে নি।

ছুদিন তার দেখা নেই। কোন কৈফিয়ৎ দিতে সে এল না। আবো আশ্চর্য্যবোধ করতে লাগলাম। এমনি সময়ে গাঁয়ের সরকারি দাদা এসে বল্লেন—শুনেছ ভায়া, হতভাগা বেইমান বাঁদর ছিষ্টিছাড়া ছোঁড়াটার কীর্ত্তি। ওদিকের গাছে যে কটা ডাব ছিল সব কটা রাতারাতি চুরি করে নিয়ে গেছে। আমি প্রমাণ পেয়েছি, সেই গাছে উঠে সব কটা নামিয়ে নিয়ে গেছে। তা তুমি কি পুলিশে খবর দিয়েছ? ও ছিষ্টিছাড়া ছোঁড়াটাকে কবে নিয়ে যাবে? রাত্তিরে ঐ ঢেঙা নারকেল গাছে উঠে—বাবারে বাবা!—সব ডাব কটা নামিয়ে নিয়ে গেল! এসব ছিষ্টি-ছাড়া নয় তো কি?

পরদিন শুনলাম বৃদ্ধ চক্কোত্তী দাদার ভারী অসুখ। গিয়ে দেখি সে একমনে বসে রোগীব সেবা করছে। চক্কোত্তী মশায় বললেন—পরশু ওকে খবর পাঠিয়েছিলাম। ও দেশে ছিল না। একজন ভুলে সহরে ওকে দেখতে পেয়ে বলে। ও তখনি ওষুধ নিয়ে এসে সেই যে বসেছে, একটু চোখ না বুজলে আমাব কাছ থেকে একটীবারও ওঠে না। ও যে আর জন্মে কে ছিল ভগবান জানেন। ও বড় ভাল ছেলে।

যাক বাঁচা গেল। চোখেব ঝাপসানি কেটে গেল।

*　*　*　*

কিন্তু 'দাদার' বক্‌বকানী আর যায় না। কেলো আর ভূতোকে তার পরদিন সঙ্গে নিয়ে এসে সাক্ষ্য দেওয়ালেন যে সেই ডাব চুরি করেছে। এমন সময় দা হাতে করে হন্ হন্ করে সে ছুটে চলে গেল। আমি ভাবলাম এ আবার কি?

ভেকু এসে বল্লে—দাদা, আপনাকে একবার আমাদের সঙ্গে এখনি আসতে হবে।

সরকারী দাদা চুপ করেছিলেন, হঠাৎ রুক্ষভাবে বললেন —তা বলে কি সবগুলোই নিতে হয়! ভেকু বল্লে—বাঃ সে যখন আপনার কাছে চাইলো—বল্ল—চক্কোত্তীদা মর-মর গোটা কতক ডাব চায়—আপনি বল্লেন ডাব নেই। সে যখন বল্লে—ঐ গাছে, আপনি বল্লেন—একটাও নেই। তাই রাত্তিরে প্রাণের ভয় না করে গাছে উঠে সব কটাই নামিয়ে আনলো—এখন দেখুন বাস্তবিকই একটাও তো নেই। চক্কোত্তী মশায় ডাব খেয়ে তৃপ্ত হয়েছেন।

এমন সময় মনে ও কুমো এসে বল্ল—চলুন দাদা, আর দেরী করে কায কি? সরকারী দাদার দিকে চেয়ে বল্লে—কিছু মনে কোরো না দাদা, চক্কোত্তি আর কখন ডাব খেতে চাইবে না। নিজের জানের পরোয়া না করে তাঁরই জন্য এই ভীষণ আঁধার রাতে ডাব পাড়তে হয়েছিল।

আমার চোখ জলে ভরে এল—বললাম—দাদা ঠিক বলেছেন—ও বাস্তবিকই সৃষ্টিছাড়া।

ফাগুন সাঁঝে

হোস্‌নে আরা বেগম

কার চরণের ছন্দ বাজে
　　আজ ফাগুনের সাঁঝে
উতল বায়ের পাগল তালে
　　আমার হিয়ার মাঝে।
　　　আমার হিয়ার ব্যাকুলতায়
　　　চঞ্চলতা বিশ্বে জাগায়
　　　মনের বনের লতায় পাতায়
　　　　কার মুরলী বাজে।

ঝাউয়ের শাখায় লাগে আজি
　　আমার হিয়ার দোল
মলয় বায়ে বনের পাখীর
　　চিত্ত যে বিভোল।
　　　ফুল-ভোমরা গানের সুরে
　　　ডাক দিয়ে যায় কোন সুদূরে
　　　সেই ডাকে সই যাই যে ভুলে
　　　　আমার সকল কাজে॥

কৃত্রিম কণ্ঠযন্ত্র

-শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষাল

বাণী মানবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে—তৃপ্তি জানিয়ে যে সব আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা—তাদের প্রত্যেকেরই মূলে রয়েছে এই বাণী।

বাণীর কাঙাল চিরসুন্দরের সভায় এক ক্ষুদ্র পক্ষীর সম্মানও দাবী কর্‌তে পারেন না।

তাই মানবের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য বাণী হারিয়ে মূক হ'য়ে থাকা। খেয়ালী প্রকৃতির নির্ম্মম হস্ত মধ্যে মধ্যে মনুষ্যের 'কণ্ঠযন্ত্রে কুলুপ লাগিয়ে', তার 'অমৃতের বাণী' হরণ ক'রে তাকে চিরমূক ক'রে রাখে। ইহাদের দুর্ব্বহ জীবনের ভার কথঞ্চিৎ লাঘব করবার জন্যই সকল দেশে মূক ও বধির বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীর শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ ক'রে মূক-ব্যক্তিগণ আকার ইঙ্গিত বা লেখনীযোগে আপন আপন অভাব অভিযোগ বা ভাব প্রকাশ ক'রে থাকেন।

সহানুভূতিসম্পন্ন মানবমন ইহাতেই পরিতৃপ্ত নহে—মূকের মূকত্ব-নাশেই তার তৃপ্তি। এ বিষয়ে অস্ত্রবিদ্ চিকিৎসকগণ বহুবর্ষ যাবৎ গবেষণারত ছিলেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডে এক অভিনব যন্ত্র সৃষ্ট হইযাছে, তদ্দ্বারা মূক ব্যক্তিগণ তাঁহাদের হৃতস্বর ফিরিয়া পাইতেছেন।

যন্ত্রটী দৈবক্রমে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিশ্ববিখ্যাত ওয়েষ্টার্ণ ইলেক্‌ট্রিক্ কোংর গবেষণাগারে কয়েকজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক শব্দতত্ত্ববিষয়ক এক জটিল গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা শব্দোৎপাদনকারী এক নূতন যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া মনুষ্যকণ্ঠের সহিত ইহার সাদৃশ্য উপলব্ধি করেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহারা কণ্ঠসম্বন্ধীয় গবেষণারত অস্ত্রচিকিৎসকগণকে এ বিষয়ে সংবাদ দেন। উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় এই যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।

অনেকেই অবগত আছেন যে কথোপকথনকালে বায়ু ফুসফুস্ হইতে নির্গত হইয়া শ্বাসনলী (trachea) দ্বারা স্বরযন্ত্রে (larynxএ) নীত হয়। এই স্বরযন্ত্র মধ্যে বহু স্বরতন্ত্রীর (Vocal chord) অবস্থিতি। এই সকল স্বরতন্ত্রী পূর্ব্বোক্ত বায়ুর সাহায্যে ঘন ঘন কাঁপিতে থাকে। এই কম্পনেই শব্দতরঙ্গের (Sound Waves) সৃষ্টি হয়; পরে উহা কণ্ঠ, মুখগহ্বর ও নাসিকা দ্বারা শব্দে পরিণত হয়।

আবিষ্কৃত যন্ত্রটীও অনুরূপ নিয়মে গঠিত। একটী কোমল নমনীয় রবার নির্ম্মিত নলের সহিত একটী অতিক্ষুদ্র ধাতুনির্ম্মিত 'রীড্' ও একটী 'সাউণ্ডবক্স' সংযুক্ত আছে। উক্ত কিঞ্চলুকবৎ নলটী সুদক্ষ অস্ত্র-চিকিৎসক দ্বারা মূক ব্যক্তির কণ্ঠসংযুক্ত করা হয়। পরে মূকব্যক্তি কথা কহিবার অনুরূপ মুখভঙ্গী করিলেই তাঁহার ফুসফুসস্থ বায়ু উক্ত 'রীড্' সাহায্যে শব্দতরঙ্গে পরিণত হইয়া বাক্যরূপে বহির্গত হয়।—যে সমস্ত ব্যক্তির স্বরযন্ত্র (larynx) পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগে বা অস্ত্রোপচার জন্য একেবারেই বিকৃত হইয়াছে তাঁহারাও এই যন্ত্র ব্যবহার করিয়া আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারেন। এই যন্ত্র ব্যবহারকালে তাঁহাদিগকে বহিস্থ বায়ু সঞ্চালনের জন্য হস্তচালিত এক ক্ষুদ্র যাঁতার (bellows) ব্যবহার করিতে হয়।

ওয়েষ্টার্ণ ইলেক্‌ট্রিক্ কোং এই যন্ত্র সমুদয় সরঞ্জমাদিসহ মাত্র ৬০৭ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রয় করিতেছেন। যন্ত্রটী অতি ক্ষুদ্র—এ কারণ ব্যবহার-কালে হঠাৎ অন্যের লক্ষ্য পড়িবার সম্ভাবনা নাই। এই যন্ত্র ব্যবহারে বহু মূকব্যক্তি বাক্‌শক্তি লাভ করিয়াছেন; এস্থলে দুই একজনের কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব।

ম্যাঞ্চেষ্টার সহরের মিঃ স্যাম্ হিগ্‌ন্‌স ক্রমেই তাঁহার বাক্‌শক্তি হারাইতে থাকেন। কয়েক সপ্তাহ পরে তাঁহার কণ্ঠস্বর অতিরিক্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িল। বহু চেষ্টার পর লণ্ডনের জনৈক বিশিষ্ট চিকিৎসক বলেন যে কণ্ঠদেশে অস্ত্রোপচার ভিন্ন তাঁহার জীবন রক্ষা অসম্ভব। হিগ্‌ন্‌স তাঁহার কথানুযায়ী অস্ত্রোপচার করান এবং কয়েক মাস কাল তিনি মূক অবস্থায় থাকেন। এই আবিষ্কারের কথা শুনিয়া তিনি অবিলম্বে লণ্ডনে যান এবং সৌভাগ্যক্রমে ইহা লাভে সমর্থ হন। তিন দিন পরে তিনি টেলিফোন যোগে তাঁহার মাতার সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করেন। প্রথমতঃ তাঁহার মাতা আপন কর্ণেন্দ্রিয়কে অবিশ্বাস করিতে থাকেন; কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি যখন আপন ভ্রম বুঝিতে পারিলেন তখন তাঁহার গণ্ডদেশ বহিয়া আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল। মূক হিগ্‌ন্‌স পুনরায় বাক্‌শক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

ইংলণ্ডের অষ্টত্রিংশবৎসরবয়স্ক এক গায়কের কণ্ঠস্বর কোন কঠিন রোগে লুপ্ত হয়। চিকিৎসকগণ তাঁহার কণ্ঠদেশে অস্ত্রোপচার করেন এবং তাঁহাকে এই কৃত্রিম কণ্ঠযন্ত্র ব্যবহার করিতে দেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই তাঁহার কণ্ঠ হইতে শিশুকণ্ঠের ধ্বনির ন্যায় শব্দ বাহির হইতে থাকে।

এই ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া পুনরায় আপন কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন।

উইণ্ডসরের নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসী রেভারেণ্ড ডি. এল্. আস্‌বী অত্যাশ্চর্য্যরূপে তাঁহার বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছেন।

বক্ষের পীড়া হওয়ায় চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করিয়া বলেন যে অস্ত্র করিয়া তাঁহার স্বরযন্ত্রটী (larynx) বাদ না দিলে তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন। অস্ত্রোপচারে তাঁহার স্বরযন্ত্রটীকে একেবারেই বাদ দেওয়া হয় এবং এই কৃত্রিম কণ্ঠযন্ত্র ব্যবহার জন্য আনীত হয়। তিনি এই যন্ত্রসাহায্যে কথা কহিতে প্রথমতঃ অতিশয় কষ্টবোধ করিতেন এবং ইংরাজী বর্ণমালার কয়েকটী স্বরবর্ণ ছাড়া আর কিছুই উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। কথা কহিবার ইচ্ছা তাঁহার অতিশয় প্রবল ছিল এবং এই দৃঢ় শক্তিবলে তিনি অপূর্ব্ব শক্তি লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি এই যন্ত্র ব্যতিরেকেও সুস্পষ্টরূপে কথা উচ্চারণ করিতে পারেন। তিনি বলেন ইচ্ছাশক্তি দ্বারা কথাবার্ত্তা কালে তিনি পাকস্থলী হইতে বায়ু নির্গত করেন।

বর্ত্তমানে কৃত্রিম কণ্ঠযন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এ বিষয়ে এখনও গবেষণা চলিতেছে। ভবিষ্যতে এতদপেক্ষা উন্নতপ্রণালীর যন্ত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে আশা করা যায়।

মলয়-যাত্রী

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল

যা দেখিনি তাকে দেখবার পূর্ব্বে চিত্তে ফুটে ওঠে অ দেখার কল্পিত রূপ। মলয়-যাত্রার পূর্ব্বে কল্পনা যে বিশ্ব সৃষ্টি করেছিল তার মান-চিত্রে বঙ্গোপসাগর ছিল উন্মত্ত তরঙ্গে ভরা। ভেবেছিলাম কাশ্মীরের পথ যেমন অদ্রির উপর অদ্রি—অদ্রি তদুপর—দৃশ্যটা হ'বে সেই প্রকার—কেবল তাতে থাকবে না হিমালয়ের স্থিরতা আর দৃঢ়তা—আর সিন্ধু-নীরে-গড়া ঢেউগুলা হবে লীলা-চপল। ব্রহ্মদেশ অবধি সে চিত্রের তো কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তবে চৈত্র-বৈশাখে জাহ্নবী যেমন ছম্‌ছমে আর চঞ্চল হয় অন্তত সমুদ্রের সে ভাব ছিল। কিন্তু মাটাবান উপসাগর পার হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব্ব পথে যখন জাহাজ চল্‌লো তখন মনে হ'ল—চলেছি এক অতি-বিস্তৃত গোল-দীঘির উপর দিয়ে—এমন শান্ত স্থির ছিল সাগর। তার ফিকে নীল অঙ্গে প্রভাত অরুণের সোণার বর্ণ মেখে সমুদ্র হাসি মুখে যখন আমাদের অভিবাদন কর্ল্লে তখন আনন্দের পরিসীমা রহিল না। দিগন্ত অবধি ঢলঢলে স্নিগ্ধ দেহ—কেবল যেখানে জাহাজের ছায়া পড়েছে সে জায়গাটা ঘন নীল।

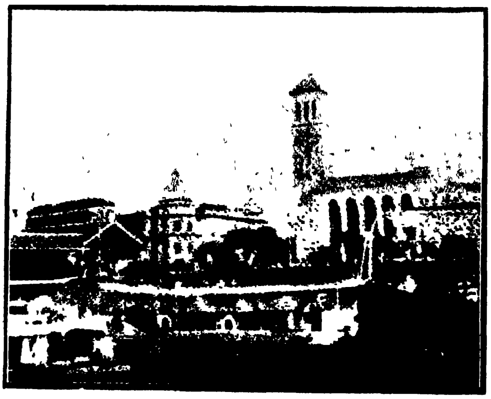
স্থিতিশীলতা চাইছিল বিচিত্র ব্রহ্মদেশের সঙ্গে নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতাতে। আরো জানবার আরো-দেখবার-কৌতূহল তেমনি বেগবান কর্চ্ছিল মনকে মলয়ের পরিচয় পাবার জন্য। জাহাজের ঘড়ি প্রত্যহ সকালে বারো মিনিট থেকে কুড়ি মিনিট এগিয়ে দিচ্ছিল জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষ। কারণ আমরা ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে যাচ্ছিলাম যেদিকে সূর্য্য ওঠে প্রথমে। রেঙ্গুনে যারা নেমে গেল তাদের প্রসঙ্গ আলোচনার বিষয় হল খেলার মাঠে।

খেলার মাঠ বলতে আরম্ভ করলাম—কারাপারার অগ্রভাগের ডেককে রেঙ্গুন পার হয়ে। ব্রহ্মদেশে বহু যাত্রী নেমে গেল। ডেকের চন্দ্রাতপ খুলে স্থানটি ধুয়ে মুছে কাপ্তেন সাহেব সেই অংশকে পরিণত করলে ক্রীড়া-ভূমিতে। একদিকে হ'ল ডেক্-টেনিসের খেলা-ঘর জাল-ঘেরা। অন্যদিকে ক্যাম্বিসের "সরোবর" তৈরি হল—যাতে একদিক দিয়ে নিরন্তর সাগরের লবণাম্বু প্রবেশ কর্ত্তে লাগলো আর অন্যদিকে অবশ্য অপেক্ষাকৃত সরু



জাহাজের স্নান

প্রণালী দিয়ে জল বার হতে লাগলো। এতে চৌবাচ্ছার জল যথাসম্ভব বিশুদ্ধ রাখবার ব্যবস্থা হল। এইটা হ'ল যাত্রীদের সাঁতারের জলাশয়। এর রচনা কৌশলে মানতে হয়—নিরাপত্তা সর্ব্বাগ্রে—এই নীতি। অতএব এটা দীর্ঘে ফুট পনেরো—প্রস্থে ছয় ফুট—খাড়াই পাঁচ ফুট। মোটামুটি নেহাত জলে ডুবে মরব বলে সিদ্ধান্ত ক'রে ঘাড় গুঁজে না থাকলে কারও পক্ষে জলমগ্ন হবার আশঙ্কা ছিল না। এতে কর্ম্মকর্ত্তাদের রসবোধ আছে। মাত্র একটি লম্ফ দিলে যেখানে অগাধ সমুদ্রে ডুবে মরা যায় সে ক্ষেত্রে মানুষ যদি ক্যাম্বিসের হৌসে ডুবে মরে তো আপশোষের পরিসীমা থাক্‌বে না। তাই বোধ হয় এসব জাহাজের সাঁতার কাটবার দীঘি পুরা এক মানুষ হয় না উচ্চে। মাঝের ফল্‌কার ওপর পরিষ্কার ক্যাম্বিস পাতা হ'ল। যাত্রীরা



পেনাং বন্দর

স্নানান্তে বা স্নানের পূর্ব্বে বারো আনা নগ্ন অবস্থায় তার ওপর আড় হ'য়ে শুয়ে টেনিস প্রতিযোগিতা দেখতো। আর সেখানে বস্‌ত শ্রান্ত খেলোয়াড়রা আর দর্শকেরা। নীল সিন্ধুর ভ্রাম্যমান উপকূলে বসে জলের ও মানুষের খেলা পরিদর্শন করা সুখের অনুভূতি। যারা সাঁতারু বা খেলোয়াড় নয় তারা উপরের ডেকের রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে খেলার মাঠের অনুষ্ঠিত কার্য্য কলাপ পর্য্যবেক্ষণ কর্ত্ত।

এ কার্য্য-কলাপের বিশেষ দ্রষ্টব্য ছিল—এক ঘাটে স্ত্রী-পুরুষের অবগাহন—ইংরাজ যাকে বলে মিশ্র স্নান। পাশ্চাত্য সমাজ তাকে করে নিয়েছে পাংক্তেয়। বিলাতী জাহাজে বিশেষ এট্‌লান্টিক পোতে থাকে কায়েমী স্থায়ী জলাশয়—চীনা মাটির টালি দিয়ে রচা। নোনা-জলে-স্নান সমুদ্র যাত্রার উপাদেয় বিলাস—রম্য, মনোহর, স্বাস্থ্যপ্রদ। এ যুগের পাশ্চাত্য মহিলা সাদা পায়ের চক্‌চকে নখে কিউটেক্স আলতা মেখে—অধরোষ্ঠ লিপ্‌-ষ্টিকের রঙীন স্পর্শে রক্ত-রাগ-রঞ্জিত ক'রে প্রাচ্যের পুরাঙ্গনাদের প্রাচীন প্রসাধনকে সমাদৃত করেছে। সুন্দরী যাত্রীরা আঁট-সাঁট পোষাকে স্নানের ঘাটে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দাখিল কর্ত্ত বিশ্বকর্ম্মা ও প্রসাধন-শিল্পীর সৃষ্টি নিপুণতার। প্রকৃতি-গড়া দেহকে দর্জ্জি-গড়া পরিচ্ছদে ঢেকে সভ্য মানুষ অলীক আদর্শের দোহাই দিয়ে এতদিন বিশ্বের রুচিকে বাঁকা-পথে নিয়ে যাচ্ছিল। তাই ভ্রান্ত ভূ-পর্য্যটক সন্দেহ কর্ত্ত সাঁওতালনী, জুলুনী ও ফিজি-বধূর শীলতা-বোধ। ভগবদ্‌-কৃপায় এখন বিশ্বকর্ম্মার শিল্প-কলার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা জেগে উঠেছে। এটা প্রকৃতি-পূজার প্রসারের পরিচায়ক। বিশ বৎসর পূর্ব্বে মহিলাদের স্নানের পোষাক কারারুদ্ধ করে রাখ্‌তো ললিত সৌন্দর্য্য। অগ্রগতি নারী প্রগতি ইত্যাদি ইত্যাদির কৃপায় এখন সে রুদ্ধ সুষমা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।

যারা নেমে গেল তাদের মধ্যে দুজন ছিল সুইস—জুরিভের সাহিত্য-সেবী – মিস্ অস্‌ওয়াল্ড আর মিঃ লুভেন বার্জার। এরা তরুণ—এদের ভূ পর্য্যটন অচেনা বিশ্বে তরুণের অভিযান—বিপত্তির অন্তর জয়ের আকাঙ্ক্ষায়। আমাদের গরীব দেশের বীর ছেলেরা বাইসিকেল নিয়ে গিরি নদী মরুভূমি পার হ'য়ে ভূ-প্রদক্ষিণ কর্ত্তে বেরিয়েছে অনেকে। এরা দুই বন্ধুতে একখানা ফোর্ড গাড়ীতে ঐরূপ সু-অভিসন্ধি চিত্তে নিয়ে হ'য়েছে গৃহত্যাগী। জার্ম্মাণ এদের মাতৃ-ভাষা। সেই ভাষায় ভ্রমণ-কাহিনী লিখে এরা যশস্বী হবে - আর ফাঁকী দিয়ে সমস্ত দুনিয়াটাকে তন্ন তন্ন ক'রে দেখে নেবে। তবে বিপদ-আপদ ?

যুবতীটি বল্লে—ওঃ! মিষ্টার গাপ্টা—বিছানায় শুয়ে তো কোটী কোটী লোক মরচে, তা বলে কি মানুষ বিছানায় শোয়া ছেড়ে দেবে ?

এ অকাট্য যুক্তি আমি এ যুগে নিত্য শুনি-- তাই তার শত দোষ থাকলেও এ যুগকে ভালবাসি। আমি নিত্য বাঙ্গালার তরুণ দেখি যারা সকল বিপদ মাথায় নিতে সম্মত। কিন্তু যাদের অর্থ আছে প্রতাপ আছে প্রভাব আছে তারা এই ডান-পিটেদের সাহায্য করে না—বিজ্ঞতার

ভাগ ক'রে। এই প্রসার পিপাসু শক্তিকে কারারুদ্ধ করতে গিয়ে বাঙ্গালা গড়েছে বিপ্লববাদী বোমা-মারার দল। এই শক্তির প্রেরণায় ড্রেক্ হকিন্স, ফ্রবিসার ইংলণ্ডকে শক্তিশালী করেছিল—কলম্বাস একটা মহাদেশ আবিষ্কার করেছিল। প্রাচীন ভারত ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে নিজের গৌরবের নিশান তুলে বিশ্ব-বিজয়ের আয়োজন করেছিল। আর আজ? যে শক্তি ঘরে থাকবে না তাকে কক্ষে বন্ধ ক'রে দলাদলির মারামারির অসুরেরা বলশালী হ'চ্চে। মানুষ ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে আরব ও ভারতীয়ের সমান। তারা বাস্‌রা অবধি মোটরে এসেছিল। তারপর করাচী থেকে কলিকাতা আসবার সময় অসংখ্য গ্রামে সর্ব্বত্র তারা আদর পেয়েছে।

—কিন্তু আরবদের সঙ্গে তোমাদের একটা তফাৎ দেখলাম—বল্লেন পর্য্যটক।

—যথা?

—মোটর গাড়ীর সামনে আরব পড়লে সে লাফিয়ে চলে যায় গন্তব্যের পথে। আর তোমাদের দেশের লোক ধীরে ধীরে পেছিয়ে যায় মোটরের পথ ছেড়ে।



মলয়ের সঙ্গীতজ্ঞ

শক্তির ভাণ্ডার। সেই শক্তিকে যে সমাজ নিয়ন্ত্রিত করে সেই সমাজ শক্তিশালী। বাঙ্গালী শক্তিহীন, অকর্ম্মণ্য—এসব মিথ্যা কথা। একজন মুসোলিনী বা কামাল আতা-তুর্কের মত অধিনায়ক জুটলে এরাই বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে বীরের ভূমিকায় স্বর্ণ-পদক পেতে পারে।

সুইস ভূ-পর্য্যটকদের জিজ্ঞাসা করলাম ভারতবর্ষের কথা। প্রধান ধারণা হ'য়েছে তাদের মনে—ভারতবাসীর শান্ত কোমল স্বভাব। দৈন্য এশিয়ার সর্ব্বত্র। কিন্তু দৈন্য প্রাচ্যে ঔদ্ধত্যের সৃষ্টি করেনি। পাশ্চাত্যের গরীবরা ভীষণ উদ্ধত আর দারুণ ঘৃণা করে সমৃদ্ধকে। আতিথেয়তা

—অর্থাৎ আরব বিপদের সঙ্গে যুঝতে ভয় পায় না। ভারতবাসী তাকে এড়াতে চায়—হেসে বল্লেন কুমারী।

একজন সহযাত্রী বল্লেন—বিশ্লেষণে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আছে।

এরা না হয় যা বলেছে তা যুক্তি-মূলক! ভারতবর্ষের ওপর এদের দেখলাম প্রেম খুব বেশী। প্রফেসার বিনয় সরকার এবং তাঁর স্ত্রীর এরা শত-মুখে প্রশংসা করলে, আর মিস্ সরকারের মধুর প্রকৃতির!

আমি বল্লাম—ইন্দিরা বাপ্-মার কাছে এক সঙ্গে তিনটে ভাষা শিখ্ছে—জার্মান ইংরাজি বাঙ্লা। ওর

একটু দুষ্টুমী শেখাটা হ'চ্চে কম—আট বছরের মেয়ের পক্ষে।

ঋষি-বাক্য সত্য। যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ। ভবঘুরেদের একটা ফ্রি-মেশন-সঙ্ঘ আছে। তা না হ'লে কলিকাতার চৌদ্দ লক্ষ লোকের মধ্যে এরা উপরোক্ত অধ্যাপকটির সঙ্গে ভাব করলে কেন?

অপরে আমাদের সম্বন্ধে কে কি বলে এটা জানবার প্রয়াস আমাদের মধ্যে খুব বেশী। কারণ আমরা দুর্ব্বল—নিজেদের ওপর ভরসা কম। মিস্ মেয়োকে আমরা যত নিন্দা করেছি, তার পুস্তক তত কিনেছি। আর গালাগালির ওপর যদি একটু সুখ্যাতির রাংতা মোড়া থাকে



পেনাংএর একটি পথ

তা হ'লে আর রক্ষা নাই—যেমন রবার্ট বার্ণের—নেকেড্ ফকীর। বার্ণে এসেছিল এক স্থিতি-শীল ভারত-বিদ্বেষী সংবাদ-পত্রের দূত-রূপে। সে থাকতো লাট্-ভবনে, রাজপুরুষদের সঙ্গে। তার রাজনৈতিক মতবাদ এ প্রবন্ধের প্রসঙ্গ নয়। মহাত্মা গান্ধীকে স্থানে স্থানে সুখ্যাতি ক'রে—মোটের ওপর কি রঙে তাঁকে লেখক এঁকেচেন ঐ পুস্তকের পাঠকমাত্রেরই সে কথা বিদিত। ঐ দুটা সুখ্যাতির চিনির পাতের নীচে কি সব তিক্ত বিষ লুকানো আছে তা ভুলে আমরা ঘরের পয়সা দিয়ে তার বই কিনেছি।

আমি মাত্র দু' একটা পংক্তি উদ্ধার করে আমার সিদ্ধান্তের প্রমাণ দেব। বারাণসীর ঘাটের সুখ্যাতি ক'রে ধর্ম্মের ষাঁড় ও সন্ন্যাসীদের পরিহাস ক'রে লেখক বলেছে —তাদের ধর্ম্মের উচ্ছ্বাসের আড়ালে আমি দেখলাম পাপের আভাস—অজ্ঞতা, ঔদ্ধত্য, ব্যাধি, অকিঞ্চনতা, যৌন-উদ্দীপনা বাড়াবার জন্ত অপর পক্ষের ও নিজের শরীরকে পীড়া-দেওয়ার প্রচেষ্টা।*

সুতরাং ভারতীয় জাতীয়তাবাদীর কর্ত্তব্য খৃষ্টীয় মিশন বিদ্যালয়—নিদেন নিরীশ্বরবাদিতার বিদ্যালয়ে দেশ ছেয়ে ফেলা। এই সব সুবুদ্ধি দিয়ে ভদ্রলোক তার স্থাপত্য-রস-অনুভূতির এইরূপ সারমর্ম্ম দিয়েছেন।



শ্যামদেশের নৌকা

—হিন্দু-ধর্ম্মের কতকগুলা দিক দারুণ নোঙ্রা। হিন্দু স্থাপত্যই ঘৃণ্য। কল্পনা কর এক শ্রেণীর অট্টালিকা যার মধ্যে সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টিগোচর হয় লিঙ্গের আকৃতি। এর এত মনোহারিতা সত্বেও বারাণসী খোলাখুলি অশ্লীল।†

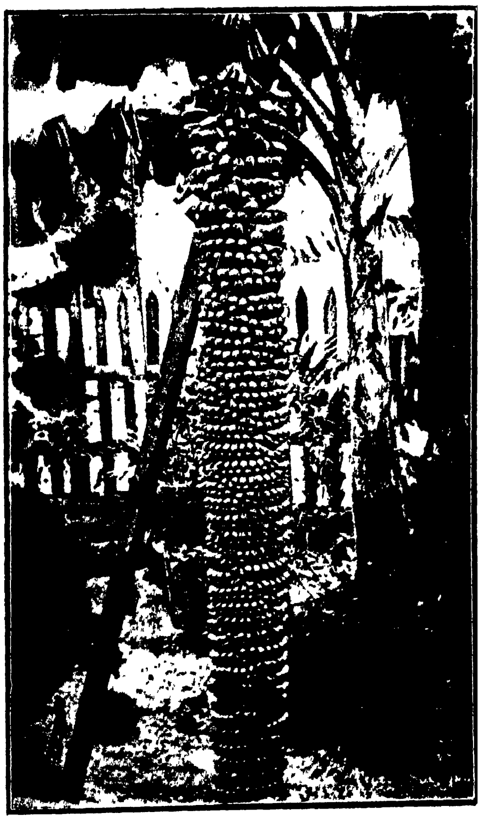
অলমতি বিস্তরেণ। বেচারা মিস্ মেয়ো! অনেক জন্তু মোট বয়, ধরা পড়েছে গাধা!

* I saw the sinister background of their religious ecstasies—ignorance, arrogance, disease, destitution, masochism, sadism. Naked Fakir P. 116.

† "The very Hindu architecture is disgusting. Imagine a style of building of which the most prominent feature is the Phallus. Benares, for all its fascination is positively unclean." P. 117.

ফরেষ্টার তার 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' পুস্তকে গল্পের ছলে শাসক সম্প্রদায় ও শিক্ষিত মোস্লেম ভারতের অন্তরাত্মার আবরণ উন্মোচন কর্ব্বার চেষ্টা করেছে। তার জন্য তাকে পরিশ্রম করতে হয়েছে, দেখ্তে হয়েছে, বুঝতে হয়েছে। তাই সে পুস্তক সমাদৃত। কিন্তু ইতিহাস ব'লে তাকে গ্রহণ করলেও ভুল করা হবে।

এক দিন এক রাত্রি অজানার ওপর দিয়ে ক্রমাগত অগ্রসর হ'লাম—চারিদিকে স্বচ্ছ নীল জল—উপরে নীল



মলয়ের কলাগাছ

আকাশ—জলে এক একটা জেলী মাছ। ঝাঁক ঝাঁক উড়ো মাছ বিগত যুগের উড়োজাহাজের পাইলটদের মত আকাশকে আয়ত্ত কর্ত্তে চেষ্টা করছে—আর ফিরে আছড়ে পড়ছে জলের মাঝে ভয় পেয়ে। তার পর পূর্ব্বদিকে পাহাড় দৃষ্টি-গোচর হল। চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা আর তার সঙ্গে গবেষণা। অবশেষে সংবাদ পাওয়া গেল আমরা শ্যামের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল দিয়ে যাচ্চি—সমুদ্র সেখানে শ্যাম-রাজ্যের অধীন আর ছোট ছোট দ্বীপগুলা সব শ্যাম রাজ্যের অন্তর্ভূ'ত। পাল-তোলা নৌকা সমুদ্রের উপর যাতায়াত করছে। সবাই ক্যামেরা বার করে তাদের ছবি নিলাম।

এখানে একটা বড় মজার দ্বীপ আছে—তার নাম পারফোরেশন দ্বীপ। মস্ত পাহাড় যেন ইঁদুরের মত বসে আছে জলের মধ্যে। যখন তার সন্নিকটে গেলাম—দেখলাম বৃহৎ এক সুড়ঙ্গ সমস্ত পাহাড়টাকে সোজাসুজি ফুঁড়েছে—সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্চে দ্বীপের অপর প্রান্তে সমুদ্র।



পেনাং দ্বীপের একটি অংশ

শ্যাম আর মলয়ের সংযোগস্থল ত্রিশ মাইলের অধিক প্রশস্ত নয়। এইটুকু জমি কেটে খাল করতে পারলে শ্যাম-উপসাগর আর বঙ্গোপসাগর মিলিত হয়। চীন, জাপান, শ্যাম, কোচিন এমন কি আমেরিকা - ব্রহ্মের ও ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী হয়। তবে সে খাল কেটে দেশে জাপানী কুমীর ঢুকলে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের পরকাল নষ্ট হবে। জাহাজে একটি জাপানী যুবক ছিল। শুনলাম তার দেশে জনরব যে জাপান শ্যাম-রাজ্যের সঙ্গে সন্ধি ক'রে ঐ রকম একটা পরি-কল্পনা করেছে।

ব্রিটিস্ ডিপ্লোমেসি এত মলিন হয়নি যে জাপানকে এতখানি সুবিধা দিয়ে তাদের বহু-কোটী টাকায় অনুষ্ঠিত সিঙ্গাপুর অস্ত্রাগার, অর্ণবপোত ও বিমানপোতের ঘাঁটি ব্যর্থ প্রতিষ্ঠান করবে। জার্ম্মানী ও ইতালীর মিতালীতে

জাপান যোগদান করেছে—তার ওপর শ্যাম-যোজক ফুঁড়ে খাল! দক্ষিণ-পশ্চিম চীনদেশে ভাড়াটে চৈনিক সৈনিক পাওয়া যায়—জাপানের নায়কতায় তাদের নিয়ে পূর্ব্ব ব্রহ্মে হানা দেওয়া সম্ভব। ইংরাজ-বাহিনী ঐ সীমান্ত সংরক্ষণ করবে, আর ব্রিটিস পররাষ্ট্রনীতি শ্যামকে নিশ্চয় আয়ত্তাধীন রাখবে—সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে কারাপারার আরোহীবৃন্দ



সেকালের স্নানের পোষাক

উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করলে। জাপানী আরোহী আমাদের আলোচনার চরম সিদ্ধান্তটা মোটেই জানতে পারলে না। অষ্ট্রেলিযান মিঃ ডবলিউ বল্লে—ড্যাম্ জাপান! সভ্য-পেন্সন-পাওয়া জেলা-জজ মৌলভী সাহেব বল্লেন—হুঁ—উঁ!

ভোরের আলোয় আবার আমরা ইংরাজের সমুদ্রে পড়লাম। বাম দিকে মলয়-যুক্তরাষ্ট্রের উপকূল উষার আলোকে মরকতের মত ঝিক্‌মিক্ করছিল। মনোরম বাতাস বহিতেছিল। সমুদ্রের নীলের উপর সোনালী কাপড় বিছানো। অনেক ছোট ছোট পাহাড়ে-দ্বীপের ভিতর দিয়ে পেনাঙের প্রকৃতি-রচা বন্দরে আমরা প্রবেশ করলাম। সব নূতন—বাড়ী-ঘর লোক-জন নৌকা ও তার মাঝি-মাল্লা। তুঙ্গ পাহাড় গড়িয়ে পড়েছে সাগরের দিকে। তার পাদমূলে সৌধমালা। সেই অট্টালিকার সমষ্টি—প্রিন্সজর্জ্জ দ্বীপ—পেনাঙ।

প্রকৃতি ও শিল্পের স্বচ্ছন্দ ঘনিষ্ঠতা সকলকে চঞ্চল করলে। জাহাজও এঁকে বেঁকে এমন একটা স্থানে প্রবেশ করলে যেখানে পৌছবার জন্য একটানা দুরাত্রি দুদিন জল-যাত্রার কষ্ট স্বীকার করা যায়। বাকি সৌন্দর্য্যটুকু উপরি।

একদিকে পেনাঙ্, অপর দিকে একটা পাহাড়ে দ্বীপ সমুদ্রকে বেঁধে বন্দর করেছে। বাঙ্‌লা দেশের মত সবুজ গাছে ভরা—নারিকেল, কলা, পান্থ-পাদপ, রবার, ম্যাঙ্গো-ষ্টিন। বড় বড় ধুচুনীর মত টুপী-মাথায় চীনে মাঝি সাম্পান বাইছে, জাঙ্ক বাইছে। মালাই সারেঙ ও খালাসী বাষ্প আর মোটর-লাঞ্চ চালাচ্ছে।

বন্দরের আগন্তুকরা এলো—চিকিৎসক, শুল্ক বিভাগের লোক, পুলিস। দেহ-পরীক্ষা, মাল-পরীক্ষা, পাস-পোর্ট পরীক্ষা শেষ হ'ল। ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজার পাস-পোর্ট লাগে না। তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সমাপ্ত ক'রে সবাই কোম্পানীর লাঞ্চে উঠে তীরে নামলাম। প্রথম দর্শনেই আগন্তুক পেনাঙের প্রেমে পড়ে। আমাদেরও সেই গতি হ'ল। (ক্রমশঃ)

লিপি

শ্রীপ্রবোধকুমার সেনগুপ্ত

যুগে যুগে মানবের ব্যথা, হাসি, গান,
শাদা ও কালোর পাতে লভিয়াছে প্রাণ

প্রাসঙ্গিকী

নির্ব্বাচন পর্ব্ব—

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে বিলাতের পার্লামেণ্টে ভারতের শাসন-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য যে নূতন ভারত-শাসন-আইন রচিত হইয়াছে, তদনুসারে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সমগ্র ভারতে নির্ব্বাচন পর্ব্ব চলিয়াছে। গত জানুয়ারী মাসের শেষ ১৫ দিনে বাঙ্গালা দেশের নির্ব্বাচনসম্পর্কে ভোট গ্রহণ ও ভোটপত্র গণনা হইয়া গিয়াছে। নূতন ব্যবস্থায় বিলাতের 'হাউস অফ লর্ডস্' ও 'হাউস অফ কমন্সে'র ন্যায় বাঙ্গালা দেশেও দুইটি ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইবে।



শ্রীশরৎচন্দ্র বসু (দক্ষিণ কলিকাতা সাধারণ) কংগ্রেস দলের নেতা।

উচ্চতর পরিষদের নাম হইবে 'বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিল' ও নিম্নতর পরিষদের নাম হইবে 'বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ এসেম্বলী'। নিম্নতর পরিষদের সদস্য সংখ্যা ২৫০ জন—তাঁহারা সকলেই দেশবাসীদিগের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি। এই ২৫০ জনের নির্ব্বাচনই শেষ হইয়া গিয়াছে। ২৫০ জনের মধ্যে ৮০ জন সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—উক্ত ৮০ জনের মধ্যে আবার ৩০জন নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের প্রতিনিধি এবং বাকী ৫০জনের মধ্যে ৪৮ জন উচ্চ শ্রেণীর পুরুষ হিন্দু ও ২ জন উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু মহিলা। ভারতীয় খৃষ্টানগণ ২ জন, মুসলমানগণ ১১৯ জন (তন্মধ্যে ২ জন নারী), এংলোইণ্ডিয়ানগণ ৪ জন (তন্মধ্যে ১ জন নারী), শ্বেতাঙ্গগণ ১১ জন, ব্যবসায়ী-বৃন্দ ১৯ জন, জমীদার সম্প্রদায় ৫ জন, ২টি বিশ্ব-বিদ্যালয় (কলিকাতা ও ঢাকা) ২ জন ও শ্রমিক সম্প্রদায়



মৌলবী এ, কে, ফজলল হক (পটুয়াখালি উত্তর মুসলমান ও পিরোজপুর উত্তর মুসলমান)—প্রজা দলের নেতা।

৮ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। ৮০টি সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্রের তিনটিতে, ১১৯টি মুসলমান কেন্দ্রের ১০টিতে এবং ১১টি শ্বেতাঙ্গ কেন্দ্রের ১০টিতে ভোটযুদ্ধ হয় নাই—ঐ সকল স্থানের প্রতিনিধিরা বিনা বাধায় নির্ব্বাচনে জয়ী হইয়াছেন। ব্যবসায়ী কেন্দ্রের ১৯ জনের মধ্যে ১৪ জন শ্বেতাঙ্গ, ১ জন মাড়োয়ারী ও ১ জন ভারতীয়-ব্যবসায়ী বিনা-বাধায় জয়ী হইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে,

জমীদারদিগের ২টি কেন্দ্রে এবং শ্রমিকদিগের ৩টি কেন্দ্রেও ভোট যুদ্ধ হয় নাই।



শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু (উত্তর কলিকাতা সাধারণ)
মডারেট দলের নেতা।

যুদ্ধ সমাপ্ত হইয়াছে, কাজেই আমরা এখন আর পরাজিত প্রার্থীদের নাম সম্বন্ধে আলোচনা করিব না।



শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

তবে যে সকল স্থানে প্রবল প্রতিযোগিতা হইয়াছে বা যে সকল স্থানের নির্ব্বাচনে বিশেষত্ব দেখা গিয়াছে, শুধু সেই-রূপ কয়টি স্থানের কথা উল্লেখ করিব। অধিকাংশ সাধারণ কেন্দ্রেই কংগ্রেসপক্ষীয় প্রার্থীরা নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রায় সকল স্থানেই তাঁহারা জয়ী হইয়াছেন। তিনটি কেন্দ্রে ৩ জন কংগ্রেসকর্ম্মী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া কংগ্রেসপ্রার্থীর বিরুদ্ধে ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে দুই জন পরাজিত হইয়াছেন এবং ১ জন মাত্র জয়লাভ করিয়াছেন। ঢাকা বিভাগে জমীদার কেন্দ্রে দুই মহারাজাতে ভোট-যুদ্ধ হইয়াছিল—বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি



সার হরিশঙ্কর পাল (বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অফ কমার্স)

মহারাজা সার মন্মথনাথ রায়চৌধুরী তথায় পরাজিত হইয়াছেন। প্রেসিডেন্সি বিভাগের একটি মিউনিসিপাল কেন্দ্রে প্রবীণ দেশকর্ম্মী ও খ্যাতনামা এডভোকেট শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু পরাজিত হওয়ায় সকলেই বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, বীরভূম প্রভৃতি কয়েকটি জিলাবোর্ডের চেয়ারম্যানগণ ভোট-যুদ্ধে কংগ্রেস-কর্ম্মীদের নিকট পরাজিত হইয়াছেন। ২৪ পরগণা জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন জনৈক কংগ্রেস-প্রার্থীকে পরাজিত করিয়া নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিয়াছেন এবং বর্দ্ধমানে মহারাজকুমার উদয়চাঁদ মহাতাব ও জনৈক কংগ্রেস-প্রার্থীকে পরাজিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান

মন্ত্রীরা সকলেই (৩ জন) নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিয়াছেন। মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল কেন্দ্রে নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খান বাঙ্গালাদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ভোট পাইয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—বলা বাহুল্য তিনি কংগ্রেস পক্ষের প্রার্থী ছিলেন। বারাকপুর শ্রমিক কেন্দ্রে শ্রীযুত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যাধিক্যে দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়াছেন। ২৪ পরগণা দক্ষিণ কেন্দ্রে মন্ত্রী নবাব সার কে, জি, এম, ফারোক্বীকে মৌলবী জসিমুদ্দীন আহমদ নামক



খাঁ বাহাদুর এম, আজিজল হক সি, আই, ই
(নদীয়া পশ্চিম, মুসলমান)

জনৈক দরিদ্র প্রাথমিক-শিক্ষকের নিকট পরাজিত হইতে হইয়াছে ; তবে সুখের বিষয় মন্ত্রী নবাব সাহেব ত্রিপুরার অপর একটি কেন্দ্রে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মুসলমানদিগের মধ্যেও প্রার্থীরা দুইটি প্রধান দলে বিভক্ত ছিলেন (১) প্রজাদল ও (২) মুসলেম লীগ দল। পটুয়াখালি (বরিশাল) উত্তর কেন্দ্রে প্রজা দলের নেতা মৌলবী এ, কে, ফজলল হকের সহিত বাঙ্গালার গভর্ণরের শাসন পরিষদের বর্ত্তমান সদস্য খাওজা সার নাজিমুদ্দীন সাহেবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছিল এবং তথায় খাওজা সাহেব পরাজিত হওয়ায় তাঁহার আর নূতন পরিষদে প্রবেশ করা হয় নাই। প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ঢাকা পূর্ব্ব কেন্দ্রে জনৈক কংগ্রেস-প্রার্থীর নিকট পরাজিত হইয়াছেন। স্বদেশী যুগের কর্ম্মী, মৈমনসিংহের বদান্য জমীদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের



নবাব সার কে, জি, এম, ফারোকী
(ত্রিপুরা উত্তর, মুসলমান)

পুত্র শ্রীযুত বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর নিকটও পূর্ব্ব-মৈমনসিংহ কেন্দ্রে জনৈক কংগ্রেস কর্ম্মীকে পরাজিত হইতে



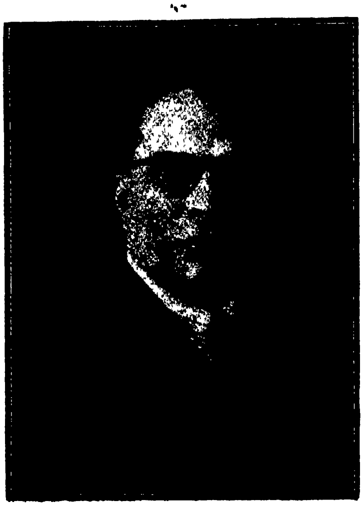
শ্রীসন্তোষকুমার বসু (কলিকাতা পূর্ব্ব, সাধারণ)

হইয়াছে। কলিকাতা ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের ভারতীয় খৃষ্টান কেন্দ্রে দানবীর অধ্যাপক হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের

নির্ব্বাচনে সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। বাখরগঞ্জ উত্তর-পূর্ব্ব কেন্দ্রে কংগ্রেস-সেবক শ্রীযুত সরলকুমার দত্ত পরাজিত হইয়াছেন। নূতন ব্যবস্থা পরিষদে ২৫০ জনের মধ্যে ৫ জন মহিলা থাকিবেন—২ জন হিন্দু, ২ জন মুসলমান ও এক জন এংলো ইণ্ডিয়ান।

বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এসেম্ব্লির নির্ব্বাচিত সদস্যগণকে মোটামুটি নিম্নলিখিতরূপ দলভুক্ত করা যাইতে পারে—

কংগ্রেস	৪২
অনুন্নত জাতি	৩১
স্বতন্ত্র হিন্দু	২২
মুসলেম লীগ	৪৪
প্রজা দল	৪৭
কৃষক দল	৫
স্বতন্ত্র মুসলমান	৩০
শ্বেতাঙ্গ	২৫
এংলো-ইণ্ডিয়ান	৪
ভারতীয় খৃষ্টান	২



শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার
(বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অফ কমার্স)

মিঃ এ, কে, ফজলল হক ও মিঃ এচ, এস, সুরাওয়ার্দ্দী দুইটি করিয়া কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে একটি করিয়া স্থানে পদত্যাগ করিতে হইবে—কাজেই শীঘ্রই দুইটি স্থানে উপ-নির্ব্বাচন হইবে। নানা কারণে কংগ্রেসের পক্ষে সকল কেন্দ্রে কংগ্রেস পক্ষীয় প্রার্থী স্থির করা সম্ভব হয় নাই। সেজন্য অনেক কেন্দ্রে প্রকৃত দেশ-কর্ম্মীদের সহিতই কংগ্রেস-প্রার্থীকে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল; ইহা বাস্তবিকই অনুশোচনার বিষয়। এইরূপ কারণেই ৪।৫টি স্থানে কংগ্রেস-প্রার্থীর পরাজয় হইয়াছে; নচেৎ এবার কংগ্রেসের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে যেরূপ প্রচার কার্য্য পরিচালনা করা হইয়াছে, তাহাতে সকল স্থানেই কংগ্রেস-প্রার্থীরা জয়লাভ করিতে পারিতেন।



মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী
(প্রেসিডেন্সি বিভাগ, জমীদার)

নামের তালিকা

নিম্নে নূতন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে নির্ব্বাচিত সদস্যগণের নাম প্রদত্ত হইল—

সাধারণ কেন্দ্র—সহর—

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু—উত্তর কলিকাতা। শ্রীসন্তোষকুমার বসু—পূর্ব্ব কলিকাতা। শ্রীপ্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা—পশ্চিম কলিকাতা। ডাক্তার যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত—মধ্য কলিকাতা। শ্রীযোগেশচন্দ্র গুপ্ত—দক্ষিণ মধ্য কলিকাতা। শ্রীশরৎচন্দ্র বসু—দক্ষিণ কলিকাতা। শ্রীবরদাপ্রসন্ন পাইন—হাওড়া হুগলী মিউনিসিপাল। শ্রীতুলসীচন্দ্র গোস্বামী—বর্দ্ধমান বিভাগ উত্তর মিউনিসিপাল। রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী—২৪পরগণা মিউনিসিপাল। ডাক্তার নলিনাক্ষ সান্যাল—

প্রেসিডেন্সী বিভাগ মিউনিসিপাল। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন মৈত্র—উত্তর বঙ্গ মিউনিসিপাল। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মজুমদার —পূর্ব্ব বঙ্গ মিউনিসিপাল।

সাধারণ কেন্দ্র—গ্রাম—

কুমার উদয়চাঁদ মহাতাব ও শ্রীঅদ্বৈতকুমার মাঝি নিম্ন জাতি)—বর্দ্ধমান মধ্য। শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবঙ্কুবিহারী মণ্ডল (নিম্ন)—বর্দ্ধমান উত্তর পশ্চিম। ডাক্তার শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাস (নিম্ন)—বীরভূম। শ্রীমণীন্দ্রভূষণ সিংহ ও শ্রীআশুতোষ মল্লিক (নিম্ন)—বাঁকুড়া পশ্চিম। শ্রীকমলকৃষ্ণ রায়—বাঁকুড়া পূর্ব্ব। কুমার দেবেন্দ্রলাল খান ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মণ্ডল (নিম্ন)—মেদিনীপুর মধ্য। শ্রীকিশোরীপতি রায় ও দাস (নিম্ন)—২৪পরগণা উত্তর পশ্চিম। হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ও লক্ষ্মীনারায়ণ বিশ্বাস (নিম্ন)—নদীয়া। শশাঙ্কশেখর সান্যাল ও কীর্ত্তিভূষণ দাস (নিম্ন)—মুর্শিদাবাদ। অতুলকৃষ্ণ ঘোষ ও রসিকলাল বিশ্বাস (নিম্ন)—যশোহর। নগেন্দ্রনাথ সেন, পতিরাম রায় (নিম্ন) ও মুকুন্দবিহারী মল্লিক (নিম্ন)—খুলনা। সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়—রাজসাহী। অতুলচন্দ্র কুমার ও তারিণীচরণ প্রামাণিক (নিম্ন)—মালদহ। নিশীথনাথ কুণ্ডু, প্রেমহরি বর্ম্মণ (নিম্ন) ও শ্যামাপ্রসাদ বর্ম্মণ (নিম্ন)—দিনাজপুর। খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ (নিম্ন) ও প্রসন্নদেব রায়কত (নিম্ন)—জলপাইগুড়ী ও শিলিগুড়ী। যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, পুষ্পজিত বর্ম্মণ (নিম্ন) ও ক্ষেত্রনাথ সিংহ (নিম্ন)—রঙ্গপুর। নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও মধুসূদন



শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
(বর্দ্ধমান উত্তর পশ্চিম, সাধারণ)



শ্রীদেবীপ্রসাদ খৈতান
(ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স)

শ্রীহরেন্দ্র দলুই (নিম্ন)—ঝাড়গ্রাম ও ঘাটাল। ডাক্তার গোবিন্দচন্দ্র ভৌমিক—মেদিনীপুর পূর্ব্ব। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র মাল—মেদিনীপুর দক্ষিণ পশ্চিম। নিকুঞ্জবিহারী মাইতি—মেদিনীপুর দক্ষিণ পূর্ব্ব। গৌরহরি সোম—হুগলী উত্তর পূর্ব্ব। সুকুমার দত্ত—হুগলী দক্ষিণ পশ্চিম। শ্রীমন্মথনাথ রায় ও পুলিনবিহারী মল্লিক (নিম্ন)—হাওড়া। রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র সেন ও হেমচন্দ্র নস্কর (নিম্ন)—২৪পরগণা দক্ষিণ পূর্ব্ব। পি, বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনুকূলচন্দ্র সরকার (নিম্ন)—বগুড়া ও পাবনা। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধনঞ্জয় রায় (নিম্ন)—ঢাকা পূর্ব্ব। কিরণশঙ্কর রায়—ঢাকা পশ্চিম। চারুচন্দ্র রায় ও অমৃতলাল মণ্ডল (নিম্ন) মৈমনসিংহ পশ্চিম। বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও মনোমোহন দাস (নিম্ন)—মৈমনসিংহ পূর্ব্ব। সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, বিরাটচন্দ্র মণ্ডল (নিম্ন) ও প্রমথকুমার ঠাকুর (নিম্ন)—ফরিদপুর। নরেন্দ্রনাথ দাস ও উপেন্দ্রনাথ এতবার (নিম্ন)—বাখরগঞ্জ দক্ষিণ পশ্চিম। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল—

—বাখরগঞ্জ উত্তর পূর্ব্ব। ধীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ও জগৎচন্দ্র মণ্ডল (নিম্ন)—ত্রিপুরা। হরেন্দ্রকুমার সুর—নোয়াখালি। ডম্বর সিং—দার্জ্জিলিং। মহিমচন্দ্র দাস—চট্টগ্রাম।

মুসলমান কেন্দ্র—সহর—

এচ-এস-সুরাওয়ার্দ্দী—কলিকাতা উত্তর। এম-এ ইস্পাহানি—কলিকাতা দক্ষিণ। কে-নুরুদ্দীন—হুগলী হাওড়া মিউনিসিপাল। মহম্মদ সোলেমান—বারাকপুর মিউনিসিপাল। এচ-এস-সুরাবর্দ্দী—২৪পরগণা মিউনিসিপাল। নবাব-কে-হবিবুল্লা বাহাদুর—ঢাকা মিউনিসিপাল।

মুসলমান কেন্দ্র—গ্রাম—

মৌলবী মহম্মদ আবুল হাসেন—বর্দ্ধমান। আবদার রসিদ—বীরভূম। মহম্মদ সিদ্দিক—বাঁকুড়া। খাঁ বাহাদুর



পি, বন্দ্যোপাধ্যায়
(২৪ পরগণা উত্তর পশ্চিম, সাধারণ)

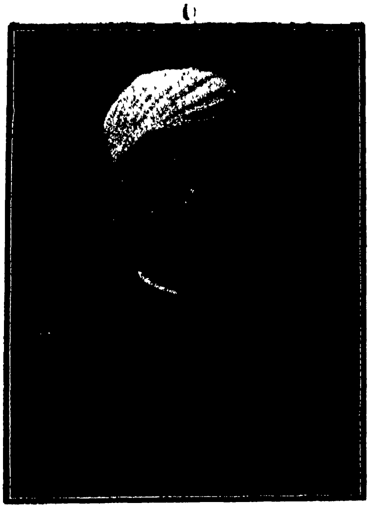
আলফাজুদ্দীন আমেদ—মেদিনীপুর। আবুল কাসেম—হুগলী। এস-আবদার রৌফ—হাওড়া। মৌলবী জসিমুদ্দীন আমেদ—২৪ পরগণা দক্ষিণ। ইউসুফ মির্জ্জা—২৪ পরগণা মধ্য। খাঁ বাহাদুর এ-এফ-এম আবদার রহমান—২৪ পরগণা উত্তর পূর্ব্ব। মৌলবী সামসুদ্দীন আমেদ—কুষ্টিয়া। মহম্মদ মোহসিন আলি—মেহেরপুর। আফতাব হোসেন জোয়ারদার—নদীয়া পূর্ব্ব। খাঁ বাহাদুর আজিজল হক—নদীয়া পশ্চিম। আবদুর বারি—বহরমপুর। কাজি-মালি মির্জ্জা—মুর্শিদাবাদ দক্ষিণ পশ্চিম। ফোরহাত রাজা চৌধুরী—জঙ্গীপুর। সৈয়দ নউসের আলি—যশোহর সহর। ওয়ালিয়ার রহমন—যশোহর পূর্ব্ব। সিরাজুল ইসলাম—বনগাঁ। মৌলানা আমেদ আলি—ঝিনাইদহ। আবদুল হাকিম—খুলনা। সৈয়দ জালালুদ্দীন হাসেমী—সাতক্ষীরা। সৈয়দ মোস্তাগাসান হক—বাগেরহাট। আসরাফ আলি খাঁ চৌধুরী—নাটোর। নাম জানা যায় নাই—রাজসাহী উত্তর। আমীর আলি—রাজসাহী দক্ষিণ। মোসলেম আলি—রাজসাহী মধ্য। মফিজুদ্দীন চৌধুরী—বালুরঘাট। হাফিজুদ্দীন চৌধুরী—ঠাকুরগাঁ। আবদুল জব্বর—দিনাজপুর মধ্য পূর্ব্ব। খাঁ বাহাদুর মাতাবুদ্দীন আমেদ—দিনাজপুর মধ্য পশ্চিম। নবাব মসারফ হোসেন—জলপাইগুড়ী ও দার্জ্জিলিং। খাঁ



রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র সেন
(২৪ পরগণা দক্ষিণ পূর্ব্ব, সাধারণ)

বাহাদুর এ-এম-লুতফর রহমন—নীলফামারী। হাজি সফিরুদ্দীন আমেদ—রঙ্গপুর উত্তর। হাজি সাহ আবদার রউফ—রঙ্গপুর দক্ষিণ। কাজি এমদাদুল হক—কুড়িগ্রাম উত্তর। আবদুল হাফেজ মিয়া—কুড়িগ্রাম দক্ষিণ। আবু হোসেন সরকার—গাইবান্ধা উত্তর। আহমদ হোসেন—গাইবান্ধা দক্ষিণ। রাজিবুদ্দীন তরফদার—বগুড়া পূর্ব্ব। মহম্মদ ইসাক—বগুড়া দক্ষিণ। মফিজুদ্দীন আমেদ—বগুড়া উত্তর। মহম্মদ আলি—বগুড়া পশ্চিম। আজাহার আলি—পাবনা পূর্ব্ব। এ-এম-আবদুল হামিদ—পাবনা

পশ্চিম। আবদুল রসিদ মামুদ—সিরাজগঞ্জ দক্ষিণ। আবদুল্লা আল মামুদ—সিরাজগঞ্জ উত্তর। মহম্মদ বরাত আলি—সিরাজগঞ্জ মধ্য। জুহুর আমেদ চৌধুরী—মালদহ উত্তর। ইদরিস মহম্মদ মিয়া—মালদহ দক্ষিণ। খাওজা সাহাবুদ্দীন—নারায়ণগঞ্জ দক্ষিণ। আবদুল আজিজ—নারায়ণগঞ্জ পূর্ব্ব। এস-এ-সালিম—নারায়ণগঞ্জ উত্তর। আবদুল হাকিম বিক্রমপুর—মুন্সীগঞ্জ। রাজাউর রহমন খাঁ—ঢাকা দক্ষিণ। আউলাৎ হোসেন খাঁ—মাণিকগঞ্জ পূর্ব্ব। আবদুল লতিফ বিশ্বাস—মাণিকগঞ্জ পশ্চিম। মহম্মদ আবদাস সহিদ—ঢাকা উত্তর মধ্য। খাঁ বাহাদুর সৈয়দ আবদুল হাফিজ—ঢাকা মধ্য। ফজলর রহমন মুক্তার—



রায় মুংটুলাল টাপুরিয়া (মাড়োয়ারী এসোসিয়েসন)

জামালপুর পূর্ব্ব। (নাম জানা নাই)—জামালপুর উত্তর। গিয়াসুদ্দীন আমেদ—জামালপুর পশ্চিম। আবদুল করিম—জামালপুর ও মুক্তাগাছা। আবদুল মজিদ—মৈমনসিংহ উত্তর। আবদুল ওয়াহেদ বোকাইনগরী—মৈমনসিংহ পূর্ব্ব। মৌলানা সামসুল হুদা—মৈমনসিংহ দক্ষিণ। মৌলবী আবদুল হাকিম—মৈমনসিংহ পশ্চিম। মাসুদ আলি খাঁ পানি—টাঙ্গাইল দক্ষিণ। মির্জা আবদুল হক—টাঙ্গাইল পশ্চিম। সৈয়দ হাসান আলি চৌধুরী—টাঙ্গাইল উত্তর। আবদুল হোসেন আমেদ—নেত্রকোণা উত্তর। খাঁ সাহেব কবিরুদ্দীন খাঁ—নেত্রকোনা দক্ষিণ। মহম্মদ ইসরাইল—কিশোরগঞ্জ দক্ষিণ। আবদুল হামিদ সাহ—কিশোরগঞ্জ উত্তর। খাঁ সাহেব হামিজুদ্দীন আমেদ—কিশোরগঞ্জ পূর্ব্ব। সামসুদ্দীন আমেদ—গোপালগঞ্জ। আহমদ মৃধা—গোয়ালন্দ। তমিজুদ্দীন খাঁ—ফরিদপুর পশ্চিম। চৌধুরী



মৌলবী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
(ভোলা উত্তর, মুসলমান)

ইউসুফ আলি—ফরিদপুর পূর্ব্ব। গিয়াসুদ্দীন আমেদ চৌধুরী—মাদারীপুর পূর্ব্ব। আবুল ফজল—মাদারীপুর



ডাক্তার শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বীরভূম সাধারণ)

পশ্চিম। এ-কে-ফজলল হক—পটুয়াখালি উত্তর। আবদুল কাদের—পটুয়াখালি দক্ষিণ। হাতেমালি জমাদার—

পিরোজপুর দক্ষিণ। এ-কে-ফজলল হক—পিরোজপুর উত্তর। হাসেমালি খাঁ—বাখরগঞ্জ উত্তর। সদরুদ্দীন আমেদ—বাখরগঞ্জ দক্ষিণ। আবদুল-ডবলিউ-কে-উকীল—বাখরগঞ্জ পশ্চিম। মোজাম্মেল হক—ভোলা উত্তর। তাফেল আমেদ চৌধুরী—ভোলা দক্ষিণ। মোস্তাফ আলি দেওয়ান সাহেব—ব্রাহ্মণবাড়িয়া উত্তর। নবাবজাদা কে-নসিরুল্লা—ব্রাহ্মণবাড়িয়া দক্ষিণ। মুকবুল হোসেন—ত্রিপুরা উত্তর পূর্ব্ব। নবাব সার কে-জি এম-ফারোকী—ত্রিপুরা উত্তর। রামিজদ্দী আমেদ—ত্রিপুরা পশ্চিম। অসিমুদ্দী আমেদ—ত্রিপুরা মধ্য। হোসেনাজ্জমান—ত্রিপুরা দক্ষিণ। জনাব আলি মজুমদার—চাঁদপুর পূর্ব্ব। আবিদুর রেজা



শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
(জলপাইগুড়ী ও শিলিগুড়ী সাধারণ)

চৌধুরী—চাঁদপুর পশ্চিম। সৈয়দ আলি—মাতলা বাজার। মহম্মদ ইব্রাহিম—নোয়াখালি উত্তর। আমিনুল্লা—নোয়াখালি মধ্য। সৈয়দ গোলাম সারোদর—রামগঞ্জ ও রায়পুর। আমেদ খাঁ—নোয়াখালি পশ্চিম। সৈয়দ আবদুল মজিদ—নোয়াখালি দক্ষিণ। আবদুল রেজাক—ফেনী। খাঁ জালালুদ্দীন আমেদ—কক্স বাজার। আমেদ কবির চৌধুরী—চট্টগ্রাম দক্ষিণ। মৌলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী—চট্টগ্রাম দক্ষিণ মধ্য। ডাক্তার সোনাউল্লা—চট্টগ্রাম উত্তর পূর্ব্ব। খাঁ বাহাদুর ফজলল কাদের—চট্টগ্রাম উত্তর পশ্চিম।

সাধারণ মহিলা—

কুমারী মীরা দত্ত গুপ্ত—কলিকাতা। শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার—ঢাকা।

মুসলমান মহিলা—

মিসেস হাসিনা মোরসেন—কলিকাতা। বেগম ফরহাত বানু কাহান—ঢাকা।

এংলোইণ্ডিয়ান—

(একজন মহিলা সমেত মোট ৪ জন) মিসেস এলেন ওয়েষ্ট। সি-গ্রিফিফ্‌স। জে-ডবলিউ-চিপেণ্ডেল। লুইস টি-ম্যাগোয়ার।



শ্রীমণীন্দ্রভূষণ সিংহ (বাঁকুড়া পশ্চিম, সাধারণ)

শ্বেতাঙ্গ—

ডবলিউ এল-আর্মষ্ট্রং—বর্দ্ধমান বিভাগ। জি-এ-ওয়াকার—হুগলী ও হাওড়া। সি-মিলার, ফ্রান্সিস কেড্রিক ব্রাসার, কলিন সিনক্লেয়ার ম্যাকলানসিয়ান ও ডবলিউ-ডবলিউ-কে-পেজ—৪ জন—কলিকাতা ও সহরতলী। জি-মর্গান—প্রেসিডেন্সি বিভাগ। রবার্ট হাণ্টার ফার্গুসন—রাজসাহী বিভাগ। উইলিয়ম চার্লস পেটন—দার্জ্জিলিং। জে-ই-অরডিসফ্—ঢাকা বিভাগ। এল-এন-ক্রসফিল্ড—চট্টগ্রাম বিভাগ।

ভারতীয় খৃষ্টান—

ডাক্তার হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা ও প্রেসিডেন্সি বিভাগ। এস-এ-গোমেস—ঢাকা বিভাগ।

বাণিজ্য কেন্দ্র—

এরিক ষ্টাড, জে-এ-এন-এ-ক্লার্ক, ডি-হেনরী, ডোনাল্ড ম্যাক্‌ক্রিমন, এ-পি-ব্লেয়ার, ডবলিউ-সি-ওয়ার্ডসওয়ার্থ, আর-এন-সাম্নন—৭ জন—বেঙ্গল চেম্বার অফ্ কমার্স বা শ্বেতাঙ্গ বণিক সমিতি। আর-এন-নর্টন ও কে-এ-হ্যামিল্টন—কলিকাতা ট্রেড্স এসোসিয়েসন। সি-জি-কুপার ও টি-বি-নিমু—ইণ্ডিয়ান জুট মিল এসোসিয়েসন। এচ-সি-



শ্রীকমলকৃষ্ণ রায় (বাঁকুড়া পূর্ব্ব, সাধারণ)

ব্যানারম্যান ও সি-ডবলিউ-মাইল্‌স—ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েসন। জে-বি-রস—ইণ্ডিয়ান মাইনিং এসোসিয়েসন। নলিনীরঞ্জন সরকার ও সার হরিশঙ্কর পাল—বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অফ কমার্স বা বাঙ্গালী বণিক সমিতি। দেবীপ্রসাদ খৈতান—ইণ্ডিয়ান চেম্বার কমার্স বা ভারতীয় বণিক সমিতি। রায় মুংটুলাল টাপুরিয়া—মাড়োয়ারী এসোসিয়েসন। আবদার রহমান সিদ্দিক—মুসলেম চেম্বার অফ্ কমার্স বা মুসলমান বণিক সমিতি।

জমীদার—

সার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়—বর্দ্ধমান বিভাগ। মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী—প্রেসিডেন্সি বিভাগ। কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়—রাজসাহী বিভাগ। মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী—ঢাকা বিভাগ। রায় বাহাদুর ক্ষীরোদচন্দ্র রায়—চট্টগ্রাম বিভাগ।



শ্রীহরেন্দ্রকুমার শূর (নোয়াখালি, সাধারণ)

শ্রমিক—

ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—কলিকাতা ও সহরতলা। নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার—বারাকপুর। জে,



শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী (পাবনা ও বগুড়া, সাধারণ)

এন, গুপ্ত—রেল শ্রমিক সমিতি। শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—হাওড়া। এ-এম-এ জামান—হুগলী ও শ্রীরামপুর।

এম-আলতাফ আলি—নৌ-শ্রমিক সমিতি। বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—খনি-শ্রমিক সমিতি। সর্দ্দার লিতাউরাও —চা-বাগান শ্রমিক সমিতি।

বিশ্ববিদ্যালয়—

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা। ফজলর রহমন —ঢাকা।

উচ্চতর পরিষদ

বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিল বা উচ্চতর পরিষদে মোট সভ্যের সংখ্যা হইবে ৬৩ হইতে ৬৫ জন। তাঁহারা নিম্নলিখিতভাবে নির্ব্বাচিত বা মনোনীত হইবেন—



শ্রীঅতুলকৃষ্ণ ঘোষ (যশোহর, সাধারণ)

গভর্ণর কর্ত্তৃক মনোনীত ৬ হইতে ৮ জন। (ইঁহারা সরকারী কর্ম্মচারী হইবেন না)।

সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত (মুসলমান ও ইউরোপীয় ভিন্ন)—১০ জন।

মুসলমান নির্ব্বাচিত—১৭ জন

ইউরোপীয় নির্ব্বাচিত—৩ জন

এসেমব্লি বা নিম্নতর পরিষদ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—২৭ জন

৩০টি কেন্দ্রেই নির্ব্বাচন শেষ হইয়া গিয়াছে। উচ্চতর পরিষদে বিভিন্ন রাজনীতিক দলের সদস্য সংখ্যা হইয়াছে এইরূপ—

কংগ্রেস	৮
স্বতন্ত্র হিন্দু	৫
হিন্দু-সভা	১
জাতীয়দলের হিন্দু	১
মুসলেম লীগ	৪
স্বতন্ত্র মুসলেম	১৩
শ্বেতাঙ্গ	৩

শ্বেতাঙ্গের হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ—

ডাক্তার জে-এচ্-কাজিন্স ২১ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে আগমন করিয়াছেন। তিনি জাতিতে ইংরাজ; তিনি এতকাল থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর সংস্রবে থাকিয়া অধ্যাপকের কাজ করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে তিনি মাদ্রাজ মদনপল্লীস্থ থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর কলেজের প্রিন্সিপাল। ভারতের সভ্যতা ও কৃষ্টির বিষয়ে এতদিন আলোচনার ফলে তিনি উহার এত অধিক অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে সম্প্রতি তিনি হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণের পর তাঁহার নূতন নাম হইয়াছে—জয়রাম। সম্প্রতি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে সকল জাতিকে মন্দির প্রবেশের অধিকার প্রদত্ত হইলে 'জয়রাম' তথায় যাইয়া মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক বিগ্রহ পূজা করিয়াছিলেন। ডাক্তার কাজিন্সের মত বিশ্ব-বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করায় তদ্দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের উদারতাই প্রকাশ পাইয়াছে।

পণ্ডিত মালব্যের জন্মোৎসব—

গত ৫ই জানুয়ারী তারিখে ভারতের অন্যতম প্রধান নেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের বয়স ৭৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহাকে এক সভায় অভিনন্দিত করা হইয়াছে। সভায় পণ্ডিতজী বলিয়াছেন—তাঁহার হাতে এখনও এত অধিক কাজ আছে যে তাঁহার এখনও ১০ বৎসর জীবিত থাকা প্রয়োজন। তাঁহার এখন মরিবার সময় নাই। যাঁহারা পণ্ডিত মালব্যের কর্ম্মজীবনের কথা অবগত আছেন, তাঁহারা পণ্ডিতজীর এই

উক্তির সারবত্তা সম্যক উপলব্ধি করিবেন। তাঁহার একার চেষ্টায় কাশীতে যে বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্ম পণ্ডিতজীর আগ্রহের সীমা নাই। আমরা পণ্ডিতজীর কর্ম্মময় সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি।

বাঙ্গালা দেশে কৃষিশিক্ষার কলেজ—

বাঙ্গালা দেশে কৃষিকার্য্য শিক্ষাদানের কোন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নাই। কয় বৎসর পূর্ব্বে দিঘাপাতিয়ার কুমার হেমেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় রাজসাহীতে একটি কৃষি কলেজ স্থাপনের জন্ম অর্থদান করিয়াছেন বটে কিন্তু এখনও তথায় কলেজের কার্য্যারম্ভ হয় নাই। খুলনায় দৌলতপুর কলেজের বর্ত্তমান পরিচালকগণের চেষ্টায় তথায় একটি কৃষি কলেজ খোলার ব্যবস্থা হইয়াছে। সেজন্য এবার গভর্ণমেণ্ট এককালীন ৩০ হাজার টাকা দিবেন এবং বার্ষিক ৭ হাজার টাকা ব্যয়ের মধ্যে কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ বার্ষিক ৩ হাজার টাকা ও গভর্ণমেণ্ট বাকী টাকা দান করিবেন। বাঙ্গালা কৃষি-প্রধান দেশ—এখানে কৃষি-কলেজের প্রয়োজন কেহ অস্বীকার করিবেন না। তবে উহা দ্বারা দেশ যদি প্রকৃতই উপকৃত হয়, তবেই মঙ্গল।

বেকার যুবক সমস্যা—

বাঙ্গালা দেশে যে বহু শিক্ষিত ও ভদ্র যুবককে বেকার অবস্থায় বসিয়া থাকিতে হইয়াছে, সে কথা বাঙ্গালার গভর্ণর সার জন এণ্ডারসনও গত সেণ্ট এণ্ড্রুজ ভোজ-সভার বক্তৃতায় স্বীকার করিয়াছিলেন। কি করিয়া ঐ সকল যুবককে সুপথে পরিচালিত করা যায় এবং কি করিলে যুবকগণ অর্থার্জ্জন করিতে পারেন সে সম্বন্ধে তদন্ত ও ব্যবস্থা করিবার জন্ম সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। কমিটীতে বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোককে গ্রহণ করা হইয়াছে; কিন্তু তাঁহারা কি সত্যই যুবকগণকে কোন পথ বাৎলাইয়া দিতে পারিবেন। যতদিন না এই কেরাণী-প্রসবিনী শিক্ষার ধারা পরিবর্ত্তিত হয়, ততদিন কোন কমিটী বা কমিশন শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে বেকার সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে না। কমিটী যদি কোনরূপ উন্নততর শিক্ষাপদ্ধতির পরিকল্পনা স্থির করিয়া দেন, তবেই তদ্দ্বারা দেশ প্রকৃতপক্ষে উপকার লাভ করিবে।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র—

একদল লোক সর্ব্বদাই প্রচার করিয়া থাকেন যে বাঙ্গালীর প্রতিভা ক্রমে হ্রাস পাইতেছে এবং সেজন্য বাঙ্গালী জীবন-সংগ্রামে সকল ক্ষেত্রে পশ্চাদ্পদ হইয়া পড়িতেছে। আমরা এই প্রকারের দুঃখবাদীদের সহিত কখনই একমত হইতে পারি না। বাঙ্গালী যে এখনও উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলে তাহার অপূর্ব্ব প্রতিভার প্রকাশ দ্বারা সমগ্র সভ্য-জগতকে চমৎকৃত করিতে পারে, তাহা এখন পর্য্যন্তও অনেক স্থলেই দেখা যাইতেছে। শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহার অসামান্য কর্ম্মশক্তির দ্বারা সম্প্রতি বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের শিল্প-বিভাগের ডিরেক্টারের পদ লাভ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। তিনি গত কয় বৎসর শিল্প-বিভাগে কাজ করিয়া উহার উন্নতি-বিধানের যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা দেখিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। তিনি বাঙ্গালার শিল্পোন্নতির উপায় নির্দ্দেশ করিয়া যে সুবৃহৎ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও পাঠকদিগকে মুগ্ধ করিয়া থাকে। সতীশবাবুর এই পদোন্নতির ফলে সমগ্র বাঙ্গালা দেশ যে উপকৃত হইবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। বাঙ্গালার সরকারী শিল্প-বিভাগের এই নূতন কর্ম্ম-প্রচেষ্টার ফলে যদি দেশের লোক তাহাদের লুপ্ত ঐশ্বর্য্য পুনপ্রাপ্ত হয়, তবেই ইহার সার্থকতা।

শ্রীযুত মানবেন্দ্রনাথ রায়—

শ্রীযুত মানবেন্দ্রনাথ রায় যে ফৈজপুরে কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া ও তাহাতে যোগদান করিয়া তাঁহার অসামান্য ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, সে কথা আমরা গত মাসের 'ভারতবর্ষে' উল্লেখ করিয়াছি। সম্প্রতি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর পক্ষ হইতে সংগঠন কার্য্য পরিচালনের জন্য যে নূতন সম্পাদকের পদ সৃষ্ট হইয়াছে, সেই সংগঠন-সম্পাদক পদে শ্রীযুত রায় মহাশয়কে নিযুক্ত করা হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। তিনি যে ঐ কার্য্যের উপযুক্ত ব্যক্তি, তাহা সকলেই এখন বুঝিয়াছেন। মানবেন্দ্রনাথ গুণবান ব্যক্তি—কাজেই কোথাওই তাঁহার সমাদরের অভাব হইবে না।

বোম্বায়ে বাঙ্গালীর সভাপতিত্ব—

গত ২রা ও ৩রা জানুয়ারী বোম্বাই সহরে বোম্বাই প্রাদেশিক ছাত্র সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত সৌম্যেন্দ্র-

নাথ ঠাকুর বাঙ্গালা হইতে ঐ সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিতে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সম্মানপ্রাপ্তিতে বাঙ্গালী মাত্রেরই গৌরব অনুভব করা উচিত। ছাত্র সম্মিলনের সভাপতিরূপে তিনি শুধু বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির নিন্দা করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই, তিনি পৃথিবীর বর্ত্তমান রাজনীতিক পরিস্থিতির কথা বিবৃত করিয়া ভারতের ছাত্র-বৃন্দকে ফ্যাসিজমের ভয়ও দেখাইয়াছেন। ফ্যাসিজম যে গণতন্ত্রের বিরোধী তাহা ইটালী ও জার্ম্মাণীর ব্যবস্থায় দেখা গিয়াছে। সৌম্যেন্দ্রবাবু বহুদিন ইউরোপে থাকিয়া সে দেশের রাজনীতি আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। কাজেই তাঁহার উপদেশ যে গৃহীত হইবে তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ব্যক্তি স্বাধীনতা সংঘ—

বাঙ্গালা দেশে বর্ত্তমানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজন যেরূপ অধিক, অন্য কোন সময়ে সেরূপ অধিক ছিল বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গালার বহু লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হওয়ায় কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর নির্দ্দেশ মত বাঙ্গালায় শ্রীযুত নরেন্দ্রকুমার বসুকে সভাপতি করিয়া একটি সংঘ গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুত সুরেশরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় কলিকাতায় উহার কার্য্যালয় খুলিয়া সংঘের পক্ষ হইতে কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। সংঘ নানা দিক দিয়া লোকের স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থায় মনোযোগী হইয়াছেন। যাঁহারা কোন প্রকারে স্বাধীনতা হারাইয়াছেন, তাঁহাদের সেই সংবাদ সংঘ জানিতে পারিলেই তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থা করিবেন। প্রতীকারের ব্যবস্থা যে সহজ নহে, সংঘের কর্ম্মীরা তাহা বিশেষ ভাবেই অবগত আছেন। তথাপি ব্যবস্থা পরিষদ প্রভৃতির মধ্যে আন্দোলন চালাইয়া সংঘ তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। আমরা বাঙ্গালার নির্য্যাতীত ব্যক্তি-মাত্রকেই তাঁহাদের প্রকৃত অবস্থা সংঘ কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়া দিতে অনুরোধ করিতেছি।

কুমারী জ্যোতিপ্রভা দাশগুপ্তা—

কলিকাতাস্থ ডেভিড হেয়ার ট্রেণিং কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের কন্যা সম্প্রতি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিষয়ক ডিপ্লোমা লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ও বি-টি পাশ করিয়া বিলাত গিয়েছিলেন। তাঁহার লব্ধ



কুমারী জ্যোতিপ্রভা দাশগুপ্তা

জ্ঞান তিনি এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োগ করিলে তাহা দেশের পক্ষে লাভের বিষয় হইবে।

উপাধি বর্ষণ—

বিলাতে সম্রাট পরিবর্ত্তনের ফলে এবার নববর্ষে উপাধি বর্ষণ বন্ধ ছিল—গত ১লা ফেব্রুয়ারী উপাধির তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এবার বাঙ্গালার ভাগ্যে অধিক উপাধিলাভ ঘটে নাই; মাত্র কয়েক জনকেই নূতন উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। কলিকাতার এডভোকেট জেনারেল শ্রীযুত অশোককুমার রায় 'সার' উপাধি পাইয়াছেন; তিনি স্বদেশপ্রেমিক এবং নিজ জন্মভূমির উন্নতির জন্য যথেষ্ট যত্ন ও অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। বাঙ্গালার বর্ত্তমান শিক্ষা-মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর এম, আজিজুল হক সি-আই-ই

হইয়াছেন; তিনি নির্ব্বাচনেও জয়ী হইয়াছেন—গভর্ণমেণ্টেরও কৃপা প্রাপ্ত হইলেন—কাজেই তাঁহার পুনরায় মন্ত্রীপদ লাভের আশা বর্দ্ধিতই হইল। জমীদারদিগের মধ্যে রাজা দিগম্বর মিত্রের বংশধর শ্রীযুত হিরণ্যকুমার মিত্র ও-বি-ই এবং উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহনের পৌত্র শ্রীযুত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় এম-বি-ই উপাধি পাইয়াছেন; তাঁহারা উভয়েই নির্ব্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন, কাজেই এই উপাধি লাভ তাঁহাদের কতকাংশে সান্ত্বনার বিষয় হইবে।

রেঙ্গুনে সুনীতিকুমার সম্বর্দ্ধনা—

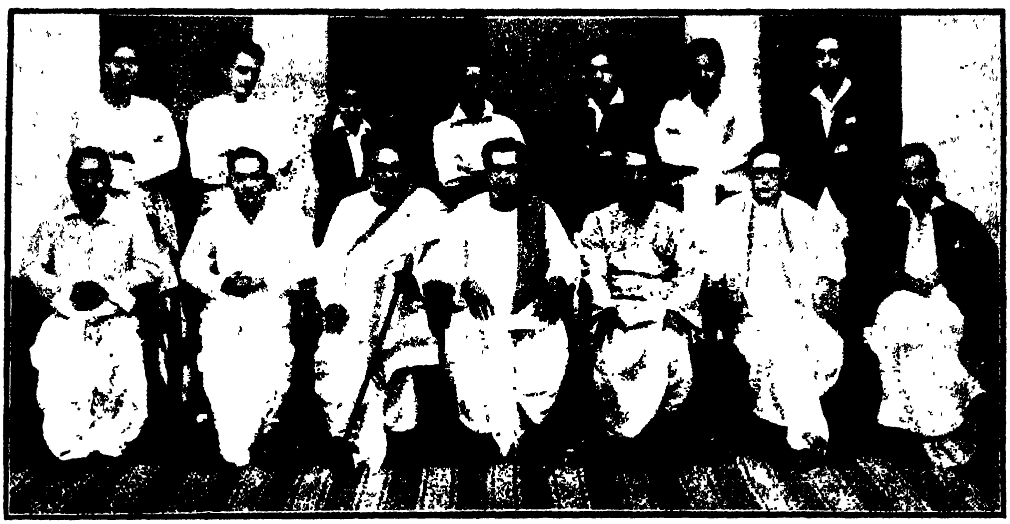
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রেঙ্গুনে গমন করিলে স্থানীয় বেঙ্গল একাডেমীর প্রাক্তন ছাত্র সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে এক সভায় সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহাকে এক মান-পত্র প্রদান করা হইয়াছিল। সভা শেষে সম্বর্দ্ধনার উদ্যোক্তাদিগের সহিত গৃহীত সুনীতিবাবুর একখানি চিত্র আমরা এখানে প্রকাশ করিলাম।

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা—

১৩৪৪ সালের বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা প্রকাশিত হইয়াছে। ভ্রান্তিমূলক গণনা পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীন সিদ্ধান্ত শাস্ত্রের সহিত নবীনতম গবেষণা-মূলক সংস্কারাদির সাহায্যে নির্ভুল পঞ্জিকা প্রকাশ করাই বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা-প্রকাশকগণের একমাত্র উদ্দেশ্য। সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্মকার্য্যে ইহার অনুসরণ আরম্ভ করিলে প্রকাশকগণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

রায়বাহাদুর তারকনাথ সাধু—

কলিকাতা চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতের ভূতপূর্ব্ব সরকারী-উকীল রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধু গত ৮ই জানুয়ারী ৭০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। রায় বাহাদুর ১২৭৪ সালে ২০শে কার্ত্তিক কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার পিতা রমানাথ সাধুর বড়বাজারে মসলার দোকান ছিল। ১০ বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। তৎপরে কিছুদিন সামান্য চাকরী করিয়া তিনি মতি শীলের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে



দণ্ডায়মান:—(বাম দিক হইতে)

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, ভূপেশ দেওয়ানজী, চন্দন ঘোষ, অভয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ সেনগুপ্ত, ধীরেন বোস।

উপবিষ্ট:—(বাম দিক হইতে)

প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী, সুধীর বসু, ক্ষেত্রনাথ ডাঙ্গালী, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চৌধুরী, মণীন্দ্রনাথ লাহিড়ী, শৈলেন মুখোপাধ্যায়

প্রবেশ করেন। এক বৎসরের মধ্যে স্কুলে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা প্রকাশ পায় ও কিছুদিন জেনারেল এসেম্বলি ইনিষ্টিটিউসনে পড়িয়া ১৮৮৮ খৃঃ তিনি এন্ট্রান্স পাশ করেন। সে সময়ে তিনি শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপকদিগকে বাঙ্গালা শিখাইয়া সংসার চালাইতেন ও নিজে পড়াশুনা করিতেন। বি-এল পাশ করিয়া কিছুদিন ওকালতীর পর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সরকারী উকীল নিযুক্ত হন ও মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেই কাজ করিয়াছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হইলে তিনি গ্রন্থ-রচনায় মনোযোগ দেন ও নিম্নলিখিত কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন—(১) ভোলানাথের ভুল (২) মেনকারাণী (৩) ঋণমোক্ষ (৪) মহামায়ার মহাদান (৬) হুন্দাদার (৬) স্মৃতি কথা (৭) উপেক্ষিতার উপকারিতা। তিনি বহু সাময়িক পত্রে প্রবন্ধও লিখিতেন। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বেকার সমস্যা—

বাঙ্গালা দেশে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারে বেকার সমস্যা যেরূপ উৎকটভাবে দেখা দিয়াছে, তাহাতে তাহা সমাধানের ব্যবস্থা সত্বর করা না হইলে সমগ্র জাতি পরে বিপন্ন ও বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট কৃষি ও শিল্প শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য দুই বৎসরে ৩৬ হাজার টাকা ব্যয় করিবেন স্থির করিয়াছেন এবং সে জন্য সুযোগ্য ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটি পরিকল্পনাও মঞ্জুর করিয়াছেন। ভাইস-চ্যান্সেলার বলিয়াছেন—"বিশিষ্ট কয়েকজন যুবকের জন্য আরও কয়েকটি চাকরী সংগ্রহ করিয়া দেওয়াই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য নহে। যুবকগণ যাহাতে উপযুক্তভাবে শিক্ষালাভ করিয়া অল্প মূলধনে ব্যবসা আরম্ভ করিতে পারে অথবা ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানাদির মধ্যে যাহাতে তাহারা তাহাদের লব্ধ শিক্ষা প্রয়োগ করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদিগকে হাতে-কলমে শিক্ষালাভের সুযোগ ও বন্দোবস্ত করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না। পরিকল্পনাটি দুই বৎসর পরীক্ষামূলক হিসাবে গ্রহণ করা হইবে।" নানা দিক দিয়া নানা ভাবে যদি এই সমস্যার সম্মুখীন হওয়া যায়, তবে ইহার কথঞ্চিৎ সমাধান সম্ভব হইতে পারে; এ বিষয়ে যত অধিক চেষ্টা আরম্ভ হয়, ততই মঙ্গলের বিষয়।

কাগজের মূল্য বৃদ্ধি—

গত মহাযুদ্ধের পর যখন বিদেশী কাগজের মূল্য ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতে লাগিল, তখন ভারতের কয়টি কাগজের কলের মালিক মিলিত হইয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে এদেশে কাগজ-শিল্প রক্ষার ব্যবস্থার জন্য গভর্ণমেণ্ট সংরক্ষণ শুল্ক বসাইয়াছিলেন; তাহার ফলে এদেশের কাগজের দামও কমিয়া গিয়াছিল এবং কাগজের কলের মালিকদিগকে কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। উপরন্তু তাঁহারা পূর্ব্বের মতই লাভ করিতেছিলেন। সম্প্রতি ইউরোপে মহাযুদ্ধের আশঙ্কার ফলে বিদেশী কাগজের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এদেশী কাগজের কলের মালিকগণও বিনা কারণে দেশী কাগজের দামও বাড়াইয়া দিয়াছেন। অথচ এখন পর্য্যন্ত এদেশী কাগজের কলের মালিকগণ সংরক্ষণ-শুল্ক ভোগ করিয়া আসিতেছেন। ফলে পুস্তক-প্রকাশক ও পত্রিকা-প্রকাশকগণকে দারুণ অসুবিধায় পতিত হইতে হইয়াছে; কোন কোন কাগজের দাম বাড়িয়া প্রায় দ্বিগুণ পর্য্যন্ত হইয়াছে। এ অবস্থায় দেশীয় কাগজওয়ালাগণ যাহাতে অযথা কাগজের মূল্য বাড়াইতে না পারেন, সে জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্টকে অবহিত হইতে হইবে। আমরা দেশীয় শিল্প-রক্ষার জন্য সংরক্ষণ-শুল্ক ব্যবস্থার বিরোধী নহি—কিন্তু তাহার অপব্যবহার এই দরিদ্র দেশে কখনই সমর্থিত হইতে পারে না। কাগজের বাজারে যাহাতে অযথা এইরূপ মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি না হয়, সে জন্য সর্ব্বত্র আন্দোলন হওয়া উচিত।



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

রাত্রির চাঁদ ও তারকার জোছনা ছানিয়া সূর্য্যের অরুণ রশ্মি যখন উষার কুয়াসা ভেদ করিয়া ইডেন উদ্যানের দেবদারু বৃক্ষের উপর পতিত হইয়াছিল তখন ভারতের তথা প্রাচ্যের অন্যতম প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যামন্দিরসমূহের ছাত্রবৃন্দ সমবেত হইয়া জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে সমান তালে পা ফেলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকার নিম্নে মস্তক অবনত করিল। কুচ-কাওয়াজের সহিত কোন জাতীয় সঙ্গীত পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠা-দিবসে গীত হইত না; ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের এইবার ইহা হইতেও বঞ্চিত করেন নাই। তাই বলি

বাহিরের এই ভিক্ষা ভরা থালি
এইবারে যেন নিঃশেষে হয় থালি
অন্তর যেন গোপনে যায় ভরে প্রভু,
তোমার দানে, তোমার দানে,
তোমার দানে।

এ বৎসর আর একটী জাতীয় সঙ্গীতের সমবেত-কণ্ঠের সুর পাইলাম; তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত—যাহা সমগ্র ভারতের বাণী।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আজিকার নহে। কিন্তু শত বর্ষেরও অনেক পরে মাত্র ১৯৩৫ সালে ইহার প্রতিষ্ঠা-দিবসের প্রথম উৎসব সম্পন্ন হয়।

এই উৎসব যাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সম্পন্ন হয় তিনি আমাদের জনপ্রিয় ভাইস-চান্সেলার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ঋত্বিক্ স্যার আশুতোষের পুত্র শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।



ভাইস-চান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অভিভাষণ পাঠ।
ছবি— কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-সমাবর্ত্তন-উৎসবে জাতীয় পরিচ্ছদে গমন, মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কোর্ট অফ্ আর্মস'এর পরিবর্ত্তন প্রভৃতি সংস্কারের ন্যায় ইহাও তাঁহার নবতম সৃষ্টি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস সকল ছাত্র-ছাত্রীর নিকট স্মরণীয় ও পবিত্র। শিক্ষাদান ব্যতীত ছাত্র সমাজকে নানা দিক হইতে মানুষ হিসাবে গড়িয়া তোলা ও বিভিন্ন বিদ্যায়তনের ছাত্রমণ্ডলীকে একত্র মিলিত হইবার সুযোগ দেওয়াও যে প্রয়োজন তাহা আমাদের



বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের ছাত্রগণ। ছবি—তারক দাস

বর্ত্তমান ভাইস-চান্সেলার মহাশয়ের চিন্তাস্রোত হইতে প্রথম উত্থিত হয়।

৩০শে জানুয়ারী প্রত্যুষে প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাঙ্গণে চারি সহস্রাধিক ছাত্র নিজ নিজ বিদ্যামন্দিরের বিশিষ্ট পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া তাহাদের নিজ নিজ কলেজের পতাকা তলে সমবেত হয়। অতঃপর কলিকাতা নগরীর রাজপথের উপর দিয়া এই বিরাট ছাত্রবাহিনী ধীরগতিতে ময়দান অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। রাজপথের দুই পার্শ্বের শত শত নরনারী নীরবে এই বিরাট ছাত্রবাহিনীকে তাহাদের শুভদিনের জয়-যাত্রাপথে শুভ কামনা জানায়। শোভাযাত্রার পুরোভাগে কলিকাতা আইন কলেজের ছাত্রবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা বহন করিয়া অগ্রসর হয়। ছাত্রবাহিনী ময়দানে পৌছিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাণ্ডের ঐক্যতানের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করা হইলে বেথুন ও আশুতোষ কলেজের কয়েকটী ছাত্রী রবীন্দ্রনাথের রচিত সঙ্গীতটী গাহিয়া সাত সহস্রাধিক নরনারীর প্রাণ পুলকিত করিয়া তুলে। রবীন্দ্রনাথ রচিত নূতন সঙ্গীতটি এইখানে প্রদত্ত হইল—



ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রীবৃন্দ ছবি—তারক দাস



বেথুন কলেজের ছাত্রীবৃন্দ ছবি—তারক দাস

চলো যাই চলো যাই চলো
যাই চলো যাই
চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে,
চলো দুর্জ্জয় প্রাণের আনন্দে,
চলো মুক্তিপথে
চলো বিঘ্নবিপদজয়ী মনোরথে,
করো ছিন্ন করো ছিন্ন
করো ছিন্ন
স্বপ্নকুহক করো ছিন্ন ;
থেকো না জড়িত অবরুদ্ধ
জড়তার জর্জ্জর বন্ধে।
বলো জয় বলো জয় বলো জয়
মুক্তির জয় বল ভাই,
চলো যাই চলো যাই চলো
যাই চলো যাই॥
দূর করো সংশয় শঙ্কার ভার
যাও চলি তিমির দিগন্তের পার
চলো চলো জ্যোতির্ম্ময়লোকে,
জাগ্রত চোখে,
বলো জয় বলো জয় বলো জয়
বলো নির্ম্মল জ্যোতির জয় বল ভাই
চলো যাই চলো যাই চলো যাই চলো যাই॥

ইহার পর কুচ-কাওয়াজ আরম্ভ হয়। সর্ব্বপ্রথম বেথুন কলেজের ছাত্রীরা সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকার সম্মুখ দিয়া কুচকাওয়াজ করিয়া যায়। সেণ্টপলস্, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রেসিডেন্সি কলেজের পরিচ্ছদ ও কুচ-কাওয়াজ জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের ছাত্ররা সাদা পা-জামা পরিধান করিয়া কুচকাওয়াজে যোগদান করে। মেডিকেল কলেজ গত বৎসরের ন্যায় এবারও কৃতিত্বের সহিত কুচকাওয়াজ করিয়াছে। এবৎসর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছাত্র আসিয়াছিল আশুতোষ কলেজ হইতে। ঐ কলেজের ছাত্রদের পরিধানে ধুতি ছিল। ইউনিভারসিটির ব্যাণ্ড ও ব্যাগ-পাইপ ছাড়া রিপন ও সিটি কলেজের ছাত্ররা ব্যাণ্ড বাজাইয়া উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলে। এবৎসর মফঃস্বল হইতে বিভিন্ন কলেজের বহু ছাত্র উৎসবে যোগদান করে কুচকাওয়াজ করিবার সময় সকল কলেজের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকার সম্মুখ দিয়া অগ্রসর হয় ও পতাকা অভিবাদন করে। অতঃপর কুচকাওয়াজ শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

তিনি অনুষ্ঠান-পদ্ধতি সম্বন্ধে বলেন—

"সম্প্রতি এই অনুষ্ঠান-পদ্ধতি বিষয়ে আমাকে কয়েকটী প্রশ্ন করা হইয়াছে। আমরা বিশেষ কোন কার্য্য-পদ্ধতি অনুসরণ করিতে প্রতিশ্রুত নহি। আমরা ক্রমশঃ কার্য্য-তালিকার পরিবর্ত্তন করিতেছি এবং ভবিষ্যতে কার্য্য-তালিকার ক্রম-বিস্তারের প্রস্তাব আসিলে বিশ্ববিদ্যালয় সে বিষয়ে বিবেচনা করিবেন। কিন্তু ইহাও আমি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া রাখি যে, অদ্যকার এই অনুষ্ঠানকে কেবল-মাত্র উৎসবের আকার দান করা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য যাহাতে কলেজ ও স্কুলের ছাত্রসমাজের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ কর্ম্মের প্রেরণা জাগ্রত হয়। বাঙ্গালার কলেজসমূহের ৪০ হাজার ছাত্রের মধ্যে অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণের প্রচেষ্টায় যদি শতকরা ৫০ জন ছাত্রের



আশুতোষ ও ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রীবৃন্দ ছবি—তারক দাস



ভারতী বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পাইক নৃত্য করিতে নামিতেছে। ছবি—দেবব্রত

বুদ্ধি, স্বাস্থ্য ও চরিত্রগঠন সম্ভব হয় তাহা হইলে বাঙ্গালা নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিবে। বাঙ্গালাকে আর অপরের নেতৃত্বাধীনে থাকিতে হইবে না—বাঙ্গালাই তখন নেতৃত্ব করিবে। জাতির মুহূর্তের আহ্বানে বাঙ্গালার হাজার হাজার সুস্থ, সবল ও শিক্ষিত হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান যুবক সত্য, প্রগতি ও একতা এবং স্বাধীনতার পতাকা হস্তে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত থাকিবে। আজ যে অনুষ্ঠান উপলক্ষে তোমরা দলে দলে যোগদান করিয়াছ ইহাই তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য।"

ভাইস চান্সেলার মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠ শেষ হইলে, "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতের প্রথম কয়টি লাইন গীত হইবার সময় সকলেই অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান হইয়া জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেন। প্রাতঃকালীন উৎসব এইখানে সমাপ্ত হয়।

পুনরায় তিনটার সময় স্থানীয় কয়েকটী স্কুলের বহু ছাত্র ড্রিল প্রভৃতি ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন করে। তাহাদের মধ্যে দর্শকদিগকে আনন্দ দান করে সরস্বতী স্কুলের ছাত্রবৃন্দ। বঙ্গবাসী, ল' কলেজ ও সিটির 'প্যারালাল বার' ও আশুতোষ কলেজের ব্রতচারী নৃত্য দেখান হইয়াছিল, ব্রতচারী নৃত্যের প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত স্বয়ং ছাত্রদের সহিত নৃত্য করেন। সর্ব্বশেষে ভাইস চান্সেলার মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমূহের ছাত্র-



ভারতী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাইক নৃত্য। ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়



বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাগপাইপ ও ব্যাণ্ডদল। ছবি—দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

দিগকে 'ইউনিভারসিটি ব্লু' ও 'প্রশংসাপত্র' বিতরণ করেন। বাঙ্গালার খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় এস্, ব্যানার্জ্জিও 'ব্লু' পাইয়াছেন।

সর্ব্বশেষে ভাইস চান্সেলার মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবের উদ্দেশ্য কি সে বিষয়ে কিছু বলেন। সমবেত ছাত্রবৃন্দ তুমুল আনন্দধ্বনির সহিত তাঁহাকে অভিনন্দিত করে। ভবিষ্যতে এই উৎসব যেন আরো উন্নত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় এই প্রার্থনা করিয়া কবির ভাষায় এইখানে শেষ করি—

"ফের যদি মিলি সবে
আরো আলো চক্ষে যেন আসি নিয়ে
সে মিলন আরো যেন ভাল লাগে।
এবারের যত ভুল ভ্রান্তি,
স্খলন, পতন,
ক্ষমায়, ভুলিয়া আসি
আরো আনি পথের পাথেয় আনন্দ অক্ষয়
আজি বিদায় বিদায়।"

ক'রোনা কিন্তু শব্দ

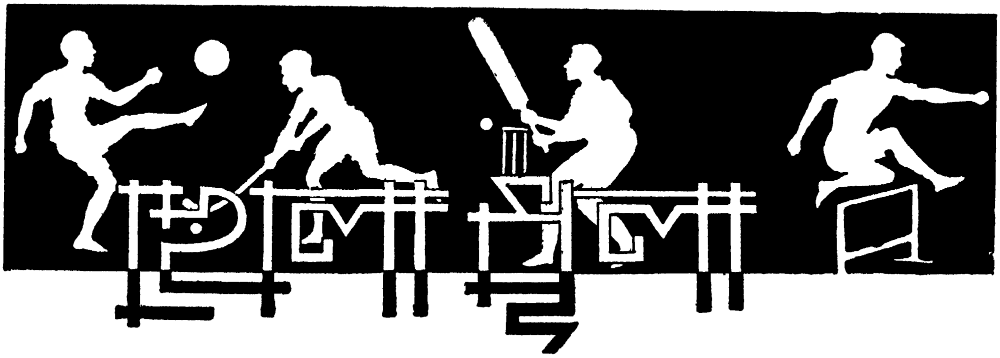
শ্রীঅনুরাধা দেবী

শীতের সকালে বাদল নেমেছে দেখে,
রয়েছ যে শুয়ে এখনো মুখটি ঢেকে!
অফিস্ বের'তে হবেনাক বুঝি আজ?
ব'লেছিলে কাল—জমেছে অনেক কাজ,
মেল ডে'র আগে সেরে নিতে হবে সব;
নইলে চাকুরি রাখাই অসম্ভব!
ঘড়ির কাঁটায় বেজেছে আটটা দশ,
নেইক খেয়াল? যা হোক্ ঘুমের বশ
হ'য়েছ ত আজকাল! আমি ভোরে উঠে
তাড়াতাড়ি নেয়ে, যদিবা এলুম ছুটে;
তোমার নেইক গরজ একটুখানি!

হাত ধ'রে কেন কর মিছে টানাটানি?
যাবেনা অফিস্, নেবে ক্যাজুয়াল লীভ্?
যা হোক্ ধন্যি হ'য়েছ কলির জীব!
বয়েস হ'য়েছে এত, তবুও লজ্জা নাই!
আঃ ছাড়ো; রান্না দেখি গে যাই।
এখুনি আস্‌বে মঞ্জু না হয় খোকা;
পুঁটি এসে গেছে; ভাব্‌ছ সে খুব বোকা!
নয় তা মোটেই। দুটি পায়ে ধ'রি ছাড়ো;
অবাক্ কাণ্ড! এতও কি তুমি পারো?

আমি কোনদিন শুনিনা তোমার কথা?
ব'ল্‌তে মিথ্যে বাজেনা ত মুখে ব্যথা!
আর কোনদিন শুন্‌ব না কিছু; বেশ।
কথায় কথায় আছে ত মানের রেশ!
অমনি হ'য়েছে মুখখানি ভার রাগে!
এমন ত তুমি ছিলেনা কখনো আগে?!
এই নাও চুমু ক'রোনা কিন্তু শব্দ;
খোকা এসে গেলে দুজনেই হব জব্দ।





চতুর্থ টেষ্ট ঃ

অষ্ট্রেলিয়া—২৮৮ ও ৪৩৩

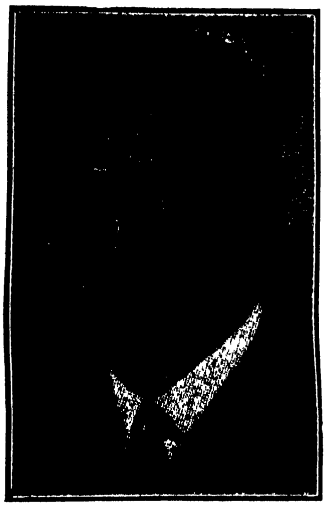
ইংলণ্ড—৩৩০ ও ২৪৩

২৯শে জানুয়ারী থেকে অষ্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ডের চতুর্থ টেষ্ট খেলা এডেলেডে আরম্ভ হয়ে ফেব্রুয়ারী ৪ঠা, বেলা ৩টায় সমাপ্ত হয়।

অষ্ট্রেলিয়া ১৪৮ রানে বিজয়ী হয়েছে।

পঁচিশ হাজার দর্শক উপস্থিত হয়েছিল সূর্য্যোকরোজ্জ্বল ও গরম আবহাওয়ার মধ্যে। অষ্ট্রেলিয়া টসে জিতে ব্যাট করাতে নামালে ফিঙ্গলটন ও ব্রাউনকে। ব্র্যাডম্যান ১ রান করে আনন্দদায়ক মার দেখিয়েছেন। তিনি ১৩৫ মিনিট খেলে ৮৮ রান তোলেন। লাঞ্চের পরই অষ্ট্রেলিয়ার দুর্ভাগ্য সুরে হলো—ব্রাউন ও রিগ্ ফারনেসের প্রথম ওভারেই আউট হলেন। প্রথম দিন খেলে অষ্ট্রেলিয়া ২৬৭ রান ৭ উইকেটে করলে। মোট দর্শক সংখ্যা হয় চৌত্রিশ হাজার—মূল্য পাওয়া গেছে ৩৬০০ পাউণ্ড।

দ্বিতীয় দিনে, অষ্ট্রেলিয়া মাত্র ২১ রান করে মোট ২৮৮ রানে সকলে আউট হয়ে গেলো। চিপার ফিল্ড ৫৭ রান ১০৫ মিনিটে করে নট আউট রইলেন।



ডি জি ব্র্যাডম্যান (সাউথ অষ্ট্রেলিয়া)



কে ফারনেস

(এসেক্স)



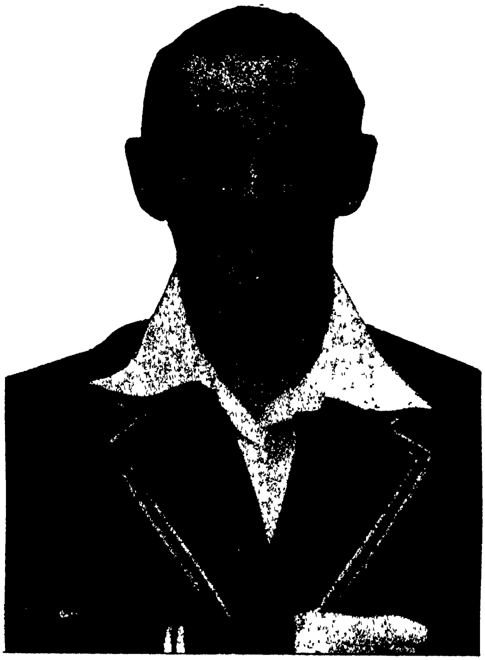
ও'রিলী

(নিউ সাউথ ওয়েলস)

অষ্ট্রেলিয়া-ইংলণ্ডের টেষ্ট খেলায় তাঁর নিজস্ব তিন হাজার রান সংখ্যা পূর্ণ করলেন। **কিন্তু** মাত্র ২৬ রানে এলেনের বলে সোজা বোল্ড হয়ে সকলকে হতাশ করলেন। ম্যাক্‌ক্যাব সুযোগবিহীন খেলেছেন, হুকিং ও কাটিংএ

ইংলণ্ড প্রথম ইনিংস আরম্ভ করে বেলা শেষে ২ উইকেট খুইয়ে ১৭৪ রান তুললে। বার্ণেট ৯২ ও লেল্যাণ্ড ৩৫ ব্যাট করছেন, হ্যামণ্ড ২০ ও ভেরিটি ১৯ করে গেছেন। শত রান ১৫২ মিনিট এবং ১৫০ রান ২১৫ মিনিট খেলে উঠেছে। দর্শক সংখ্যা হয়েছে তেত্রিশ হাজার এবং মূল্য পাওয়া গেছে ৩৭০৬ পাউণ্ড।

তৃতীয় দিনে পূর্ব্বদিনের নট আউট বার্ণেট ও লেল্যাণ্ড ইংলণ্ডের পক্ষে আরম্ভ করলে। প্রবল বায়ু বইছিল, তাতে স্পিন বোলারদের সুবিধা হয়েছে। ব্যাটস্‌ম্যানরা অত্যাধিক সতর্কতাবলম্বন করায় দু'শো রান উঠ্‌লো ২৮৬ মিনিটে, অষ্ট্রেলিয়ার দু'শো উঠেছিল ২২২ মিনিটে। পঞ্চম উইকেটে, বার্ণেট ও এইমসে মিলে ৫০ রান তুললে ৫৯ মিনিটে। বার্ণেট ৩৪১ মিনিট খেলে ১২৯ রান করেন, তার মধ্যে একটা ছয় ও তেরোটা চার ছিল। এইমসের ইনিংস খুব চমৎকার হয়েছিল, তিনি ৮টা ৪ করেছেন। অষ্ট্রেলিয়া অতি উত্তেজনায় চার ব'লের মধ্যে ২টা ক্যাচ ফেলে দিলে। বোলাররাই এদিন প্রবল ছিল—ও'রিলী এক সময়ে ৮ ওভারের ৫টা মেডেন ও ১৩ রানে ১ উইকেট পেয়েছেন। ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস ৪৩৫ মিনিট কাল ব্যাপী হয়েছে। আম্পায়ারের ভুল দেখা গিয়েছিল—ও'রিলীর বল রবিন্‌সের 'বেল' ফেলে ওল্ডফিল্ডের হাতে গিয়ে উঠলে, আম্পায়ার রবিন্‌সকে 'কট্' দেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি ও'রিলীর বলে বোল্ড হন। হ্যামণ্ড, ওয়্যাট ও এলেন বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। ও'রিলী ও ফ্লিটউড্-স্মিথ বল করে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।



এলেন
(ক্যাপ্‌টেন—ইংলণ্ড)

অষ্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করে ৭৫ মিনিট খেললে। ১ উইকেট খুইয়ে ৬৩ রান করলে বেলা শেষ হয়।

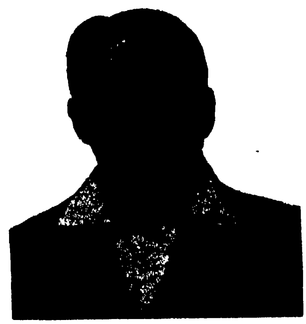
চতুর্থ দিনে বত্রিশ হাজার দর্শক জড়ো হয়েছিল। ব্র্যাডম্যান সমস্ত দিন ব্যাট করে ১৭৪ নট আউট থাকলেন। বোলার পরিবর্ত্তন করে ও লোভনীয় বলের লোভ দেখিয়েও তাঁকে আউট করতে পারলে না। ব্র্যাডম্যান তাঁর শত রান ১৪১ মিনিটে এবং ১৫০ রান ২৭৪ মিনিটে তোলেন। ব্র্যাডম্যান-ম্যাকক্যাব সহযোগিতায় ১০০ রান ৮৫ মিনিটে ওঠে। তাঁর নিজস্ব ১২৩ রানের মাথায় তিনি একবার অতি ক্ষীণ সুযোগ দিয়েছিলেন। অষ্ট্রেলিয়ার ২০০ রান ২২৫



এইমস
(কেণ্ট)



এস জে ম্যাকক্যাব



সি এস বার্ণেট
(গ্লস্টারস্)

মিনিটে এবং ৩০০ রান ৩৪২ মিনিটে উঠেছে। ব্র্যাডম্যান ও গ্রেগরী জুটি ১০৪ রান তুলেছে। বেলা শেষে ৪ উইকেটে অষ্ট্রেলিয়ার মোট ৩৪১ রান উঠলো।

পঞ্চম দিনে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, উইকেটের অবস্থা খারাপ দেখা যাচ্ছে। ব্র্যাডম্যান ভয়েসের নো বল পিটিয়ে ৩ করে নিজস্ব দু'শত রান ৪২৪ মিনিটে করলেন—মোট ৪০০ রান সংখ্যা উঠ্‌লো ৪৬৬ মিনিটে। ব্র্যাডম্যান হ্যামণ্ডের বলের পরিবর্ত্তিত গতির দ্বারা প্রতারিত হয়ে হ্যামণ্ডেরই হাতে আটকালেন ২১২ রানে ৪৩৭ মিনিট খেলবার পর। তিনি ১৪টা ৪ করেছেন। লাঞ্চের পর ২৫ মিনিটের মধ্যে বাকী ৪ জন খেলোয়াড় মাত্র ১১ রান করে আউট হলে অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস মোট ৪৩৩ রানে ৫০৯ মিনিট খেলবার পরে শেষ হ'লো। হ্যামণ্ড আজ ৪ উইকেট মাত্র ২০ রানে নিয়েছেন।

ইংলণ্ড ৩৯২ রান করলে জয়ী হ'তে পারবে, দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলে ২-৪৫ মিনিটে। ৪৫ রানের মাথায় ভেরিটি বোল্‌ড হলো, ৫০ রানের মাথায় বার্ণেট গেলো চিপারফিল্ডের হাতে। অষ্ট্রেলিয়ার ফিল্ডিং তুলনায় খারাপ—ফিঙ্গলটন বার্ণেটকে ও ম্যাককর্‌মিক হার্ডষ্টাফকে ফসকালে। হ্যামণ্ড যোগ দিয়ে খুব সতর্কতার সঙ্গে খেলতে আরম্ভ করলেন। হার্ডষ্টাফ পুনরায় বাঁচলেন ও'রিলীর হাতে। শত রান উঠলো ১১৮ মিনিটে। হার্ডষ্টাফ ৪৩ রান করে বোল্‌ড হলে লেল্যাণ্ড এসে জুটি হলেন এবং ইংলণ্ড ১৪৮ রান ৩ উইকেটে করলে বেলা শেষ হলো।



আর ই এস ওয়্যাট

৬ষ্ঠ দিনে, খেলারম্ভে মাত্র দশ হাজার দর্শক উপস্থিত হয়েছে। আবহাওয়া উত্তপ্ত ও রৌদ্র উঠেছে। ইংলণ্ডের আশা ভরসা হ্যামণ্ড ফ্লিটউডের ষষ্ঠ বলে সম্পূর্ণ পরাভূত হয়ে উইকেট হারালেন। ফ্লিটউড ও ও'রিলী মারাত্মক ও নিখুঁত বল করেছেন। ওয়্যাটের উইকেট একটুর জন্যে বেঁচে গেলো। ওয়্যাট তাঁর নিজস্ব ৫০ রান ১০১ মিনিটে করেছেন, তিনি খুব সাহসের সঙ্গে লড়েছেন, ৫ বার ৪ করেছেন। এলেন ৪৩ মিনিট খেলে মাত্র ৯ করে গ্রেগরীর হাতে আটকালেন। রবিনস্ ৪ করে আউট হলে মোট ২৪৩ রানে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ



তৃতীয় টেষ্টের দ্বিতীয় দিনে মেলবোর্ণের মাঠে ডার্লিং (ভিক্টোরিয়া) এক হাতে ও এক পায়ে ভর দিয়ে প্রায় শুয়ে পড়ে অত্যাশ্চর্য্য স্ব-স্পষ্ট ক্যাচ নিয়েছে লেল্যাণ্ডকে আউট করতে। হাত তুলে দাঁড়িয়ে বোলার ও'রিলী

হলো বেলা ৩টায়। ফ্লিট্‌উড্-স্মিথ ১১০ রানে ৬টি উইকেট নিয়েছেন।

২৬শে ফেব্রুয়ারী মেলবোর্ণের মাঠে পঞ্চম ও শেষ টেষ্ট খেলা সুরু হবে। সেই খেলার জয়-পরাজয়ের উপর 'এ্যাসেস্' লাভ নির্ভর করছে। যে পক্ষ জয়ী হবে সেই 'এ্যাসেস্' পাবে এবার।

অষ্ট্রেলিয়া
চতুর্থ টেষ্ট—প্রথম ইনিংস

ফিঙ্গলটন···	রান আউট	১০
ব্রাউন···কট এলেন, ব ফার্নেস্		৪২
রিগ···কট এইমস্, ব ফার্নেস্		২০
ব্র্যাডম্যান···ব এলেন		২৬
ম্যাক্ক্যাব্···কট এলেন, ব রবিনস্		৮৮
গ্রেগরী···এল-বি, ব হ্যামণ্ড		২৩
চিপারফিল্ড···	নট আউট	৫৭
ওল্ডফিল্ড···	রান আউট	৫
ও'রিলী···কট লেল্যাণ্ড, ব এলেন		৭
ম্যাক্করমিক···কট এইমস্, ব হ্যামণ্ড		৪
ফ্লিট্উড্-স্মিথ···ব ফার্নেস্		১
	অতিরিক্ত	৫
	মোট	২৮৮

বোলিং : ফার্নেস্ ৭১ রানে ৩, হ্যামণ্ড ৩০ রানে ২, এলেন ৬০ রানে ২ ও রবিন্স্ ২৬ রানে ১ উইকেট।

ইংলণ্ড
চতুর্থ টেষ্ট—প্রথম ইনিংস

ভেরিটি···কট ব্র্যাডম্যান, ব ও'রিলী		১৯
হ্যামণ্ড···কট ম্যাক্করমিক্, ব ও'রিলী		২০
বার্ণেট···এল-বি, ব ফ্লিট্উড্-স্মিথ		১২৯
লেল্যাণ্ড···কট চিপারফিল্ড, ব ফ্লিট্উড-স্মিথ		৪৫
ওয়্যাট · কট ফিঙ্গলটন, ব ও'রিলী		৩
এইমস্···ব ম্যাক্করমিক্		৫২
হার্ডষ্টাফ্·· কট ও ব ম্যাক্করমিক্		২০
এলেন···এল্-বি, ব ফ্লিটউড্-স্মিথ		১১
রবিন্স্···কট ওল্ডফ্লিড, ব ও'রিলী		১০
ভয়েস···কট রিগ, ব ফ্লিটউড্-স্মিথ		৮
ফার্নেস···	নট আউট	০
	অতিরিক্ত	১৩
	মোট	৩৩০

বোলিং :—ও'রিলী ৫১ রানে ৪, ফ্লিট্উড্-স্মিথ ১২৯ রানে ৩, ম্যাক্করমিক্ ৬০ রানে ২ উইকেট

অষ্ট্রেলিয়া
চতুর্থ টেষ্ট—দ্বিতীয় ইনিংস

ফিঙ্গলটন·· এল্-বি, ব হ্যামণ্ড		১২
ব্রাউন · কট এইমস্, ব ভয়েস		৩২
ম্যাক্কাব···কট ওয়্যাট, ব রবিনস্		৫৫
রিগ···কট হ্যামণ্ড, ব ফারনেস্		৭
ব্র্যাডম্যান···কট ও ব হ্যামণ্ড		২১২
গ্রেগরী···	রান আউট	৫০
চিপারফিল্ড···কট এইমস্, ব হ্যামণ্ড		৩১
ওল্ডফিল্ড · কট এইমস্, ব হ্যামণ্ড		১
ও'রিলী···কট হ্যামণ্ড, ব ফারনেস্		১
ম্যাক্করমিক···ব হ্যামণ্ড		১
ফ্লিটউড্-স্মিথ···ব ফারনেস		১
	অতিরিক্ত	২৭
	মোট	৪৩৩

বোলিং :—হ্যামণ্ড ৫৭ রানে ৫, ফারনেস ৮৯ রানে ২, রবিনস্ ৩৮ রানে ১, ভয়েস ৮৬ রানে ১ উইকেট।

ইংলণ্ড
চতুর্থ টেষ্ট—দ্বিতীয় ইনিংস

ভেরিটি···ব ফ্লিটউড্-স্মিথ		১৭
বার্ণেট···ব ফ্লিটউড্-স্মিথ		২১
হার্ডষ্টাফ···ব ও'রিলী		৪৩
হ্যামণ্ড···ব ফ্লিটউড্-স্মিথ		৩৯
লেল্যাণ্ড···কট চিপারফিল্ড, ব ফ্লিটউড্		৩২
এইমস্···এল্-বি, ব ফ্লিটউড্		০
ওয়্যাট···কট ওল্ডফিল্ড, ব ম্যাকক্যাব		৫০
এলেন···কট গ্রেগারী, ব ম্যাক্করমিক্		৯
রবিনস্···ব ম্যাক্করমিক্		৪
ভয়েস···ব ফ্লিটউড্-স্মিথ		১
ফারনেস ··	নট আউট	৭
	অতিরিক্ত	২০
	মোট	২৪৩

বোলিং :—ফ্লিটউড-স্মিথ ১১০ রানে ৬, ম্যাক্করমিক্ ৪১ রানে ২, ম্যাকক্যাব ১৫ রানে ১, ও'রিলী ৫৫ রানে ১উইকেট।

ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট খেলার ফলাফল ঃ

	প্রথম খেলার সাল	ইংলণ্ড জয়ী	অষ্ট্রেলিয়া জয়ী	সমান-সমান	মোট
অষ্ট্রেলিয়ায়	১৮৭৬-৭	৩৪	৪০	২	৭৬
ইংলণ্ডে	১৮৮০	২০	১৫	২৭	৬২
	মোট	৫৪	৫৫	২৯	১৩৮

অষ্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট ঃ

এম সি সি—৩১৭

টাস্‌মেনিয়া—১০৪ ও ২০৯

এম সি সি এক ইনিংস ও ৪ রানে জয়ী হয়েছে। এইমস্ ১০৯, ফ্যাগ ৬০, হার্ডষ্টাফ ৫৫, ওয়ার্দিংটন ৫০। টাস্‌মেনিয়ার পাট্‌নাম দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৭ করে।

এম সি সি—২৫০

টাস্‌মেনিয়া—১৪৫ (৫ উইকেট)

এক দিনের খেলা অসমাপ্ত হয়ে শেষ হওয়ায় ড্র হয়েছে।

এম সি সি—৪১৮ ও ১১১ (১উইকেট)

সম্মিলিত অষ্ট্রেলিয়া—১৩৪

বরুণদেবের কৃপায় সম্মিলিত অষ্ট্রেলিয়া একাদশ বেঁচে গেলো, খেলা বন্ধ হওয়ায়। বার্ণেট ১২৯, হার্ডষ্টাফ ১১০, এলেন ৫৫। ফলো-অন্ না করিয়ে অষ্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করে। ওয়াট (নট আউট) ৬৮, ফ্যাগ (নট আউট) ১০, ফিস্‌লক ৩১।

এম সি সি—৩০১

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া—১৯১ (৪ উইকেট)

বৃষ্টির জন্যে খেলা পরিত্যক্ত হওয়ায় অমীমাংসিত বলে ঘোষিত হলো।

অল্ ইণ্ডিয়া টেনিস চ্যাম্পিয়ন সিপ্ ঃ

এলাহাবাদে নিখিল ভারত টেনিস প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে।

পুরুষদের সিঙ্গলস্ ফাইনালে—ইউ ভি বব্ ৬-৪, ৭-৫, ৬-৩ গেমে ডি এন কাপুরকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। বব্ এ বৎসর টেনিস পর্য্যায়ে পঞ্চম স্থান পেয়েছিলেন। খেলাটি খুব উৎকৃষ্ট হয় নি—উভয় প্রতিযোগীই ভীরুতা দেখিয়েছেন।

পুরুষদের ডবলস্ ফাইনালে—ডি এন কাপুর ও যুধিষ্ঠির সিং 'ওয়াক-ওভার' পেয়ে জিতেছেন। মেটা ও কয়ড্রে যোগ দেন নি।

মহিলাদের সিঙ্গলস্ ফাইনালে—মিস লীলা ২-৬, রাও ৯-৭, ৬-২ গেমে মিসেস লেকম্যানকে পরাজিত করে বিজয়িনী হয়েছেন।

মহিলাদের ডবলস্ ফাইনালে—মিস লীলা রাও ও মিস ডুবাস ৬-২, ৮-৬ গেমে মিসেস এড্‌নে ও মিস স্কুটিটকে পরাজিত করেছেন।

মিক্সড ডবলস্ ফাইনালে—মিসেস লেকম্যান ও মার্সাল ৪-৬, ৮-৬, ৬-৩ গেমে মিস হার্ভে জনষ্টন ও গাউস মহম্মদকে হারিয়েছেন।



যুধিষ্ঠির সিং (পাঞ্জাব) ষ্টেডম্যানকে পরাজিত করেছেন

এক্‌জিবিসন্ ম্যাচে ঃ

যুধিষ্ঠির সিং (উত্তর ভারত) ৬-৩, ৬-১ গেমে এ সি ষ্টেডম্যান্‌কে (নিউজিল্যাণ্ড) হারিয়েছেন। ষ্টেডম্যানের

ভারতে ইহা প্রথম হার। এবং ৬ ৩, ৬-২ গেমে জ্যেঁসিওকে (ফ্রান্স) হারিয়েছেন।

বি টি ব্লেক (উত্তর ভারত) ৬-২, ৬-০ গেমে সি ই ম্যালক্রয়কে (নিউজিল্যাণ্ড) হারিয়েছেন।

ষ্টেডম্যান (নিউজিল্যাণ্ড) ৬ ২, ৭-৯, ৯-৭ গেমে গাউস মহম্মদকে (উত্তর ভারত) হারিয়েছেন।

মালক্রয় (নিউজিল্যাণ্ড) ৬-১, ৯-১১, ৬-২ গেমে বিটিকে হারিয়েছেন।

এ জ্যেঁসিও ও এ সি ষ্টেডম্যান (ফ্রান্স ও নিউজিল্যাণ্ড) ৬ ০, ৬-৩ গেমে আহাদ হুসেন ও ওয়াই সিংকে (উত্তর ভারত) হারিয়েছেন।

ষ্টেডম্যান ও মালক্রয় (নিউজিল্যাণ্ড) ৬-২, ৪-৬, ৬-৪ গেমে ওয়াই সিং ও বিটিকে (উত্তর ভারত) হারিয়েছেন।

কলিকাতায় ক্রিকেট ঃ

স্পোর্টিং ইউনিয়ন—১৮৮

মোহনবাগান—১৮৩ (৭ উইকেট)

স্পোর্টিং ভাগ্যবলে হার থেকে বেঁচেছে। সময়াভাবে দু'দিনের খেলা ড্র হয়েছে। তাদের কে বোস ছাড়া আর কোন ব্যাটস্‌ম্যানই কিছু করতে পারে নি। কে বোস (নট আউট) ১২০, কে চট্টোপাধ্যায় ২৬। বোলিংএ—জে এন বন্দ্যোপাধ্যায় ৭১ রানে ৫, এস রায় ৪৯ রানে ১, জি বোস ৫৯ রানে ১ উইকেট।

মোহনবাগানের—টি ভট্টাচার্য্য ৪৫, এস ব্যানার্জ্জি (নট আউট) ৩৮, এ বোস (নট আউট) ২৩, জে ঘোষ ২৬। বোলিংএ—টি ভট্টাচার্য্য ৩৮ রানে ৪, ডি দে ৫৫ রানে ৩, এ বোস ৫২ রানে ২, আর মুখার্জ্জি ৩২ রানে ১ উইকেট।

কাশীপুর—৩২৩ (৪ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

মেজারার্স—৭২

কাশীপুর ২৫১ রানে জয়ী হয়েছে। এ খেলায় কাশীপুরের আর স্কট্ পিটিয়ে লাঞ্চের মধ্যে ২০১ রান করে নট আউট থেকে রেকর্ড স্থাপন করেছেন। ইনি ১৮টা ছয় ও ১৪টা চার করেন। ডেভের এক ওভারে ৫টা ছয় করেন এবং ঐ ওভারে মোট রান করেন ৩১। স্কট্ ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের বিখ্যাত ব্যাক।

এরিয়ান—৩০১ (৬ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

স্পোর্টিং ইউনিয়ন—২২৭ (৯ উইকেট)

সামান্য সময়াভাবে খেলাটি ড্র হয়ে গেলো। এরিয়ানরা কিছু সময় আগে ডিক্লেয়ার্ড করে স্পোর্টিংকে ব্যাট করতে দিলে তারা খেলাটি জিততে পারতো। এরিয়ানের সুশীল বোস ১০৫ (নট আউট), এস চ্যাটার্জ্জি ৫৮, এস ব্যানার্জ্জি ৪৩, কে ভট্টাচার্য্য ৩৮। বোলিংএ—সুশীল বোস ৯ রানে ২ উইকেট, বিমল মিত্র ৪০ রানে ২, এস ব্যানার্জ্জি ৫৪ রানে ২, কে ভট্টাচার্য্য ৫৩ রানে ২ উইকেট।

স্পোর্টিংএর—বি গুপ্ত ৭৯, বাবু বোস ৪৭, পি ডি দত্ত ২৭, চুণিলাল ২৬। বোলিংএ—জে এন ব্যানার্জ্জি ৮৫ রানে ৩, পি ডি দত্ত ৮২ রানে ২, এস রায় ৩৮ রানে ১ উইকেট।



রেঞ্জার্স ক্লাবের পাগ্‌লা জিমখানা রিক্স রেস বিজয়িনী মিস্ এম স্মিথ

কুচবিহার কাপ ঃ

এরিয়ান—১৯৫ (৯ উইকেট)

কালীঘাট—১৯৪

এরিয়ান ১ উইকেটে জয়ী হয়ে এই কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠলো। তারা স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও মহমেডান স্পোর্টিংএর বিজয়ীর সঙ্গে ফাইনাল খেলবে।

এরিয়ান পক্ষে—সুশীল বোস ৬০, কে ভট্টাচার্য্য ৫১, এস চ্যাটার্জ্জি ১৭। বোলিংএ—এস ব্যানার্জ্জি ৬১ রানে ৪, এস চ্যাটার্জ্জি ১০ রানে ২, এস দত্ত ২০ রানে ২ ও কে ভট্টাচার্য্য ৪০ রানে ১ উইকেট পেয়েছেন।

কালীঘাট পক্ষে—এ হামিদ ৬৯, রামচন্দ্র (নট আউট) ৪৬। বোলিংএ—এম অরোরা ৩৫ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন।

মহিলা ক্রিকেট ঃ

মহিলা—১৫৪ (১১ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

পুরুষ—১৭২ (১০ উইকেট)

৫ উইকেট ও কমল ভট্টাচার্য্য ১৬ ওভারে ১৯ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়ে বোলিংএ বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ইউরোপীয়ান বোলাররা—



বালীগঞ্জ ক্রিকেট ক্লাবের মহিলা ও পুরুষ খেলোয়াড়গণ। ×চিহ্নিত খেলোয়াড়—ডবলিউ এস্ স্কট (ক্যাপ্টেন) পুরুষদল এবং ×চিহ্নিত মহিলা—মিসেস এড্নে (ক্যাপ্টেন) মহিলাদল ছবি—তারক দাস

বালীগঞ্জ ক্রিকেট ক্লাবের বার্ষিক মহিলাদের সঙ্গে ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় এবার মহিলারা ১ উইকেটে পরাজিতা হয়েছেন।

রঞ্জি প্রতিযোগিতা ঃ

বাঙ্গলা ও আসাম—২৫৫ ও ১০৮ (২ উইকেট)

মধ্যভারত—১২৮ ও ২৩৪

ইষ্টার্ণ জোনের ফাইনালে বাঙ্গলা ও আসাম ৮ উইকেটে মধ্যভারত দলকে পরাজিত করেছে। বাঙ্গলা এই খেলায় সকল বিভাগেই প্রতিপক্ষ অপেক্ষা নিপুণতা ও উৎকর্ষতা দেখাতে সক্ষম হয়েছে। গত বৎসরেও মধ্যভারত এই বাঙ্গলার কাছেই পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। প্রথম ইনিংসে স্থঁটে ব্যানার্জ্জি ১০ ওভারে ৩৩ রান দিয়ে



এ এল হোসী (ক্যাপ্টেন—বাঙ্গলা ও আসাম)

লংফিল্ড ২৩ ওভারে ৫৭ রানে ৬ উইকেট, গুরলে ১৩.৫ ওভারে ৪৮ রানে ২ উইকেট নিয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ব্যাটিংএ—প্রথম ইনিংসে—হোসী ৬১, বেরেণ্ড ৪৭, স্কিনার (নট আউট) ৩৫, কে ভট্টাচার্য্য ২৫।

দ্বিতীয় ইনিংসে—কে বোস (নট আউট) ৬০, বেরেণ্ড ২৬, হোসী (নট আউট) ১৯।

মধ্যভারত—প্রথম ইনিংসে—ভায়া ৩৩, সৈদুদ্দিন ৩০, মাস্তাক আলি ২৮। দ্বিতীয় ইনিংসে—মাস্তাক আলি ৬৭, হাজারী ৫৭, ইস্তাক আলি ৫২, ওয়াজির আলি ৩৩।



ওয়াজির আলি (ক্যাপ্টেন—মধ্যভারত)

মাস্তাক আলির ব্যাটিং অত্যন্ত দর্শনীয় হয়েছিল। দর্শকরা যখন খেলায় বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, সেই সময় মাস্তাক এসে তার সাবলীল স্থচারু মারগুলি দিয়ে দর্শকদের মন আনন্দে ভরিয়ে খেলায় আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে।

মাস্তাক উইকেটের সকল দিকেই পিটতে লাগলো, কোন বোলারকেই গ্রাহ্য করলে না। দর্শক আনন্দে উত্তেজিত হয়ে তাঁর নিপুণ হাতের প্রত্যেক সুন্দর মারই প্রশংসিত করতে লাগলো। মাস্তাকের এই প্রশংসনীয় সুন্দর ইনিংস বহুদিন কলিকাতাবাসীদের মনে জাগরূক থাকবে।



মাস্তাক আলি

প্রথম ইনিংসে—সাহাবুদ্দিন ৩৬ রানে ৩, জিয়ল হুসেন ৮৮ রানে ২৩, হাজারী ২৩ রানে ২, মাস্তাক আলি ৬১ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন। দ্বিতীয় ইনিংসের দু'টি উইকেটই সাহাবুদ্দিন পেয়েছেন ২২ রানে।

বাঙ্গলা ও আসাম—২৯৯ ও ১৫৮

হায়দ্রাবাদ—১৭০ ও ১৬০

ইষ্টার্ণ জোন বিজয়ী বাঙ্গলা ও আসাম ১২৭ রানে সাদার্ণ জোন বিজয়ী হায়দ্রাবাদকে পরাজিত করে রঞ্জি প্রতিযোগিতার মূল ফাইনালে উঠেছে। অন্যদিকে ইউ পি না খেলায় জামনগরদল ফাইনালে পৌচেছে।

চার দিনের খেলা তিন দিনেই শেষ হয়েছে। বাঙ্গলার যখন রান অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল, তখন কে বোস এসে ৪৪ রান করে বাঙ্গলার জয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন। বাঙ্গলার ৪ উইকেট মাত্র ৭০ রানে পড়ে, ১১৭ রানে ৭ উইকেট গেলো, তখন এ কামাল এসে হায়দ্রাবাদের বোলারদের তাচ্ছিল্য করে সব বল পিটতে সুরু করে দিলে। খেলায় যেন জীবনীশক্তি ফিরে এলো দর্শকদের প্রাণে আশার উদ্রেক হলো। এস ব্যানার্জ্জি ও কামালে মিলে খুব দ্রুত রান তুলতে লাগলো। কামাল নিজস্ব শতরান একশো মিনিটে করলে। কামাল ১০৫ রানে আউট হলে, সুঁটে ব্যানার্জ্জি পিট্তে সুরু করলে, একটা ছয়ের বাড়ীও দিলে। সুশীল বোস ১৪ করে হায়দার আলির হাতে আটকালে সুঁটে ৪৭ (নট আউট) থেকে গেলো।



কার্ত্তিক বোস
(বাঙ্গলা)

হায়দ্রাবাদ প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৭০ রানে আউট হয়ে যায়। বাঙ্গলার দ্বিতীয় ইনিংসও মাত্র ১৫৮ রানে শেষ হলো। এবার কামাল, কে বোস বা ব্যানার্জ্জি কেহই বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। হায়দ্রাবাদের দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ হলো ১২-২০ মিনিটে এবং দিন শেষের আগেই শেষ হয়ে গেলো। একমাত্র আইবারা ৬৯ করেছেন। ভেঙ্কটস্বামীর দোষে দাসবাগার রান আউট হলেন।



সুঁটে ব্যানার্জ্জি
(বাঙ্গলা)

বাঙ্গলা প্রথম ইনিংস—এ কামাল ১০৫, এস ব্যানার্জ্জি (নট আউট) ৪৭, কে বোস ৪৪। দ্বিতীয় ইনিংস—লংফিল্ড ৩৬, মিলার ৩০, ভ্যানডারগাচ্ ২১, এ কামাল ১৭।

বোলিংএ—প্রথম ইনিংসে—লংফিল্ড ৫১ রানে ৪, বেরেণ্ড ২৭ রানে ৩, কে ভট্টাচার্য্য ৪৯ রানে ২ ও এস ব্যানার্জ্জি ৩০ রানে ১ উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে—ভট্টাচার্য্য ২৯ রানে ৩, বেরেণ্ড ৩২ রানে ২, এস ব্যানার্জ্জি ৩৯ রানে ২ ও লংফিল্ড ৩২ রানে ১ উইকেট।

হায়দ্রাবাদ—প্রথম ইনিংসে—আসাদুল্লা ৩৩, এস এম হাদি ৩২, ভাজুবা ৩২, মাচি ২২। দ্বিতীয় ইনিংসে—আইবারা ৬৯, মাচি ১২, দাসবেগার ১০।

বোলিংএ—প্রথম ইনিংসে—মেটা ৫৬ রানে ৩, হায়দার আলি ৬২ রানে ২, ইব্রাহিম খাঁ ৮২ রানে ২, আসাদুল্লা ৭৫ রানে ২ ও ভাজুবা ১৯ রানে ১ উইকেট।

দ্বিতীয় ইনিংসে—হায়দার আলি ৪৬ রানে ৪, ভ ২৬ রানে ২, মেটা ৩৩ রানে ২, ইব্রাহিম খাঁ ৩০ রানে ১ ও আসাদুল্লা ১৬ রানে ১ উইকেট।

রঞ্জি ফাইনাল ঃ

রঞ্জি প্রতিযোগিতার ফাইনাল ৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে বোম্বাইতে আরম্ভ হয়েছে। বাঙ্গলার পক্ষে হোসী, লংফিল্ড খেলতে যেতে পারেন নি। এস ব্যানার্জ্জি সেখানে গিয়েও

জাম সাহেবের আদেশে খেলতে পারেন নি, তিনি তাঁর চাকরী করেন। বাঙ্গলা ফাইনালে উঠ্‌তেই জামসাহেবের এ বিষয়ে বাঙ্গলার কমিটি ও ব্যানার্জ্জিকে জানান উচিত ছিল। তাহ'লে বাঙ্গলা ব্যানার্জ্জিকে নির্ব্বাচিত না করে অন্য খেলোয়াড় নির্ব্বাচন করতে পারতো, ব্যানার্জ্জিকে বোম্বাইয়ে নিয়ে যেতো না। ব্যানার্জ্জিরও উচিত ছিল নির্ব্বাচন কমিটিকে পূর্ব্বেই এ বিষয়ে সমস্ত কথা জানান,—যদি তাঁর সঙ্গে জামসাহেবের সর্ত্তই ছিল যে তিনি জামনগর দলের বিপক্ষে খেলতে পারবেন না। লং ফিল্ড ও স্লঁটে ব্যানার্জ্জি না-খেলায় বাঙ্গলার বোলিং-শক্তি কমছে।



কোলা

বাঙ্গলা দুর্ব্বল দল নিয়ে খেলতে গেছে। নওয়ানগর প্রথম ইনিংসে ৪২৪; মানকাদ ১৮৫, কোলা ৬৬। দ্বিতীয় ইংনিংসে ৩৮৩; ইন্দ্রবিজয় সিংজী ৯১, মুবারক আলি ৯০। গুরলে, স্কিনার ও বেরেণ্ড তিনটি ক্যাচ, মুবারক আলিকে দু'বার ও মানবেন্দ্র সিংজীকে একবার ফস্‌কাতে বাঙ্গলার জয় সুদূর পরাহত হয়েছে। ৪ উইকেটে ২৮৯ রান তুলতে হবে, যা' একেবারেই অসম্ভব। বাঙ্গলা—৩১৫; ভ্যাণ্ডারগাচ্ (ক্যাপ্‌টেন) ৭৯, কে বোস ৬৩, বেরেণ্ড ৪০। দ্বিতীয় ইনিংসে—২০৪ (৬ উইকেট); স্কিনার (নট আউট) ১৬৯, মিলার ৪১।—(৯ই, ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত)



অমর সিং

বোলিং:—গুরলে ১২৬ রানে ৪, বেরেণ্ড ৭০ রানে ২, কে ভট্টাচার্য্য ৮১ রানে ২ উইকেট।

দ্বিতীয় ইনিংস—গুরলে ১১২ রানে ৩, বেরেণ্ড ১১৯ রানে ৪, ভট্টাচার্য্য ৪৫ রানে ৩ উইকেট।

অমরসিং ১০৪ রানে ৪, ওয়েন্সলে ৯৩ রানে ৪ উইকেট।

বোমণ্ট কমিটির রিপোর্ট ঃ

ভারতের ক্রিকেটদলের বিলাত পর্য্যটন, বিশেষ করে অমরনাথ বিষয়ক ব্যাপার ও অন্যান্য খেলোয়াড়দের মধ্যে সহযোগিতার অভাবের কারণ সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্য ১৯৩৬ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড যে কমিটি গঠন করেন সেই বোমণ্ট কমিটির রিপোর্ট গত ১১ই জানুয়ারী প্রকাশিত হয়েছে।



দমদম স্পেশাল জেলের চতুর্থ বার্ষিক স্পোর্টসে ৭৫ গজ 'চ্যারিয়ট' রেস বিজয়ী

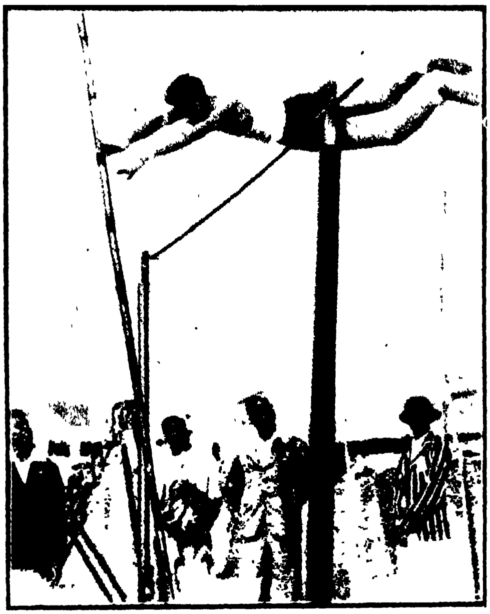
ছবি—তারক দাস

গোলযোগের কারণ নির্দ্দেশ সম্পর্কে কমিটির অভিমতের সারাংশ:—

(১) দলের মধ্যে মতানৈক্যের জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলি দায়ী:—(ক) মেজর নাইডুর দল থেকে পৃথক

থাকা ও ক্যাপ্‌টেনকে সাহায্য না করা। (খ) ক্যাপটেনের নিজ দল গঠন করা ও সকল খেলোয়াড়কে সমানভাবে না বিবেচনা করা। তাঁর এইরূপ আচরণের জন্যই দলের শৃঙ্খলা বা একতা রক্ষার উপায় সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়েছিল। (গ) দলের সকল খেলোয়াড়ের ধারণা যে, অধিনায়কের অধিনায়কতা উপযুক্ত হয় নাই। এই ধারণা সত্য হউক বা অসত্য হউক, উক্ত ধারণাই দলের একতা নষ্ট করেছে। (ঘ) অতিরিক্ত খেলোয়াড় দলে থাকাও একটি কারণ।

(২) দলের অসাফল্যের জন্য ম্যানেজারকে খুব দোষী করা যায় না, তবে খেলোয়াড়গণ মাঠ হতে আসবার



ভারতীয় এথলেটিক ক্যাম্পের এইচ কে মুখার্জ্জি পোল ভল্টে ১০ ফুট ৩½ ইঞ্চি উচ্চতা লঙ্ঘন করে বিজয়ী হচ্ছেন ছবি—তারক দাস

পর কিরূপ ভাবে থাকবেন, বা কখন হোটেলে ফিরবেন সেই সম্বন্ধে কোনও লিখিত নিয়মাবলী তিনি দলের জন্য দেন নাই, যদিও তাঁর দেওয়া উচিত ছিল। (৩) মাঠে কোনও দিনই কোনও খেলোয়াড় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেন নাই। (৪) অমরনাথ ক্যাপ্‌টেনের সম্মুখে অভদ্র আচরণ ও ব্যবহারের জন্য দায়ী। তবে তাহা অপ্রকাশ্য স্থানেই তিনি করেছেন। পূর্ব্বে তাঁকে সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও যখন তিনি পুনর্ব্বার অন্যায় ব্যবহার করেছেন, তখন ম্যানেজার ও ক্যাপ্‌টেনের পক্ষে তাঁর প্রতি শাস্তির ব্যবস্থা করা খুবই যুক্তিযুক্ত হয়েছে—তবে শাস্তি অতিরিক্ত হয়েছে।

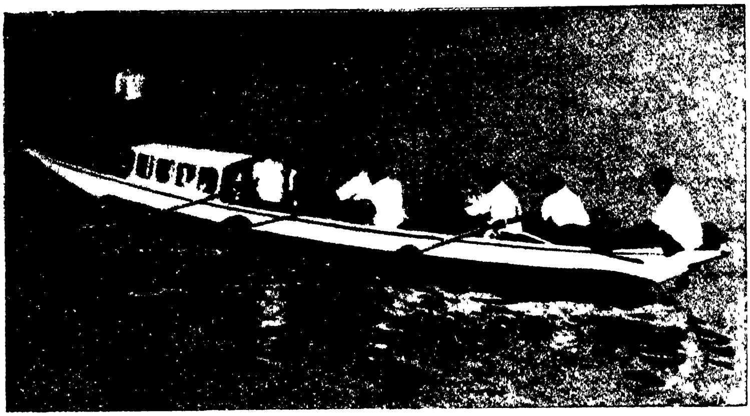


সেবা সমিতি বয়েজ স্কাউটস্ স্পোর্টস—বালিকাদের প্রতিযোগিতায় খেলাঘর 'অনার' পেয়েছে। (বাম থেকে)—কুমারী রেণুকা ঘোষ (১০০ গজ ফ্ল্যাট রেস) ; কুমারী প্রতিমা বোস (স্কিপিং রেস) ; কুমারী লক্ষ্মী ঘোষ (নিডিল রেস) ; কুমারী মনোরমা দত্ত (এ্যাগ্ এণ্ড স্পুন রেস)

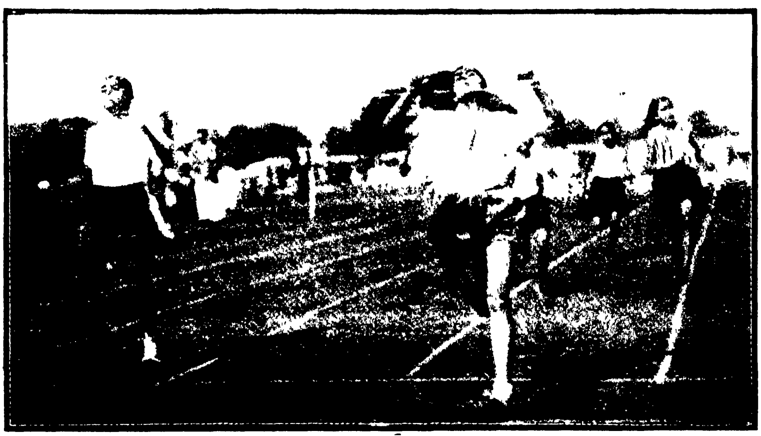
ছবি—তারক দাস

অধিনায়ক সম্বন্ধে বলেছেন যে, মহারাজ কুমারের ইংলণ্ডের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট সম্বন্ধে কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না, প্রথম শ্রেণী ক্রিকেট দলের অধিনায়কতা করার অভিজ্ঞতাও ছিল তাঁর খুবই কম। দলের অধিকাংশের দৃঢ় ধারণা ছিল যে তিনি ফিল্ড সাজান বা বোলিং বদলান সম্বন্ধে কিছু বুঝতেন না এবং ব্যাটিংএ কোন শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন না।

মেজর নাইডু সম্বন্ধে বলেছেন,—যদিও মেজর নাইডুর কৈফিয়ত তাঁরা শুনতে পান নাই। তবু তাঁরা নিঃসন্দেহ যে তিনি দল থেকে পৃথক থাকতেন, ক্যাপ্‌টেনকে কোন সাহায্য করেন নাই। তিনি নিজে ক্যাপটেন থাকলে হন এবং আমীর ইলাহীর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ করেও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন নি। দলের একজন বিশিষ্ট খেলোয়াড়ের যেরূপ মনোবৃত্তি হওয়া উচিত, তাঁর মনোবৃত্তি তর সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল।



বেনেটোলা রোয়িং ক্লাব বরাহনগর বাচ্ প্রতিযোগিতায় বরাহনগর রোয়িং ক্লাবকে ৩ লেংথে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে



মোহনবাগান ক্লাবের বার্ষিক স্পোর্টসের ভারতীয় বালিকাদের ৭৫ মিটার (সাধারণ) দৌড়। প্রথম—কুমারী সরস্বতী চট্টোপাধ্যায় (৮৭), দ্বিতীয়—রমা চক্রবর্ত্তী (৭৬), তৃতীয়—হিরণ্ময়ী বসু (৪৩)

ছবি—তারক দাস

অভিযোগ অসত্য হ'লে, মেজর নাইডুর অবিলম্বে ইহার প্রতিবাদ করা উচিত। সত্য হলে তাঁর ব্যবহার খেলোয়াড়ের উপযুক্ত হয় নি। দলাদলির ভিতরে পড়ে তিনি দেশের ও দলের সম্মান ক্ষুণ্ণ করেছেন।

ওয়াজির আলির সম্বন্ধেও অসহযোগিতা দোষ আরোপিত হয়েছে। তবে তিনি ক্যাপ্‌টেনের বিরুদ্ধে কোনও মনোভাব দেখান নাই বলা হয়েছে।

দলের ম্যানেজার ব্রিটেন জোন্সের সম্বন্ধে বলেছেন যে লিখিত নিয়মাবলী দিয়ে খেলোয়াড়দের রাত্রে হোটেলে ফিরবার সময় নির্ণয় করে দেওয়া এবং সে বিষয়ে বিশেষ কড়া হওয়া তাঁর উচিত ছিল। এই অনবধানতার জন্য কোন কোন খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে উচ্ছৃঙ্খলতার অভিযোগ হয়েছে।

খেলায় তাঁর যেরূপ উৎসাহ দেখা যেতো, মহারাজ কুমারের অধীনে সেরূপ দৃষ্ট হতো না। তাঁর এরূপ আচরণে অন্যান্য খেলোয়াড়রাও বিশেষ প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় টেষ্টে খেলোয়াড় নির্ব্বাচনে সাহায্য করতে তিনি অসম্মত খেলোয়াড়রা স্ফূর্ত্তির দিকে অত্যধিক দৃষ্টি দিয়েছেন, অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত বাইরে অতিবাহিত করেছেন, অবসাদকর আমোদ-প্রমোদে মত্ত হয়ে শারীরিক সামর্থ্য অক্ষুণ্ণ না রাখায় খেলার মাঠে তাঁদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেন নি।

কমিটি ভবিষ্যতের জন্য এ বিষয়ে নির্দ্দেশ দিয়েছেন যে, চুক্তিপত্রে ঐ বিষযে বিশেষ সর্ত্ত থাকা উচিত। খেলোয়াড়রা উচ্ছৃঙ্খলতা, বাইরে অধিক রাত্রিযাপন, আমোদ-প্রমোদে মত্ত হয়ে শারীরিক সামর্থের হানি করলে তখনি তাঁদের ভারতে ফেরত পাঠান হবে।

আমরা এই নির্দ্দেশ সম্পূর্ণ অনুমোদন করছি।

অধিক সংখ্যক খেলোয়াড় নির্ব্বাচন করা উচিত হয় নি। ইহাতে খেলোয়াড়বৃন্দের উপর অবিচার হযেছে।



তিন মাইল দৌড় প্রতিযোগিতার প্রথম তিনজন, ও সভাপতি। প্রথম কে কে নন্দী (বিবেকানন্দ স্পোর্টিং)—সময় ১৮ মিঃ ৯ সেঃ। দ্বিতীয় —এস বসু (ঢাকুরিয়া স্পোর্টিং)—সময় ১৮ মিঃ ২২ সেঃ। তৃতীয়—পি এল ঘোষ (সরস্বতী ইউনিয়ন) —সময় ১৮ মিঃ ৩৮ সেঃ

খেলোয়াড়দের নিয়ে গিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ বসিয়ে রাখা, পালিয়ার মতন খেলোয়াড়কেও ভাল খেলা এবং সুস্থ থাকা সত্ত্বেও দু' মাসের মধ্যে কোন ম্যাচ খেলতে সুযোগ না দেওয়া বিশেষ অনুচিত হয়েছে। প্রত্যেক খেলায় নির্ব্বাচিত খেলোয়াড় ব্যতীত আট দশ জন খেলোয়াড় অলসভাবে বসে থাকতে বাধ্য হতেন। তাঁরা অবসর বিনোদনের জন্য ক্রিকেট অপেক্ষা কম স্বাস্থ্যকর বিষয়ে মন দিবে ইহা অপরিহার্য্য। ঘোঁট পাকাইতে তাঁরাই বেশী কৃতকার্য্য হয়। ইহা সম্পূর্ণ ঠিক।

ভবিষ্যৎ দল যাতে সকল দোষ থেকে মুক্ত থাকতে পারে এখন থেকে সর্ব্ববিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করে উপযুক্ত নিয়মাবলি প্রণয়ন করতে ক্রিকেট কণ্ট্রোলবোর্ডকে আমরা অনুরোধ করি।

কুস্তি ঃ

ব্যায়াম সমিতি পরিচালিত বঙ্গীয় কুস্তি প্রতিযোগিতা রবিবার শেষ হয়েছে। এবার বসিবার বেশ সুবন্দবস্ত হয়েছিল। এরূপ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করায় ব্যায়াম সমিতি ধন্যবাদার্হ। নির্দ্দিষ্ট সময়ে কুস্তি আরম্ভ হয় নি। এবং প্রতিযোগিগণ প্রস্তুত না থাকায়, প্রত্যেক কুস্তির পরে অহেতুক সময় নষ্ট হয়েছে। পরিচালন সমিতির এ বিষয়ে কঠোর নিয়ম প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক। নাম ডাকার সঙ্গে সঙ্গে কুস্তিগীররা যদি কুস্তিস্থানে অবতীর্ণ না হন তবে অনুপস্থিত বাতিল হবে ও উপস্থিত জয়ী বলে ঘোষিত হবেন—এইরূপ নিয়ম করা উচিত। নাম ডাকবার পরে শোনা গেছে যে অমুক ল্যাঙ্গট পরছেন এবং তজ্জন্য সকলকে বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে। এরূপ ব্যাপার কেবল ভারতীয়দের মধ্যেই সম্ভব। পরের কুস্তির মল্লবীরদের নাম আগেই ঘোষিত হয়েছিল, তথাপি যাঁরা সময়ে প্রস্তুত হন নি তাঁদের বাতিল করাই শ্রেয। তৎপরতা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা বিষয়ে আমরা ইউরোপীয়দের চেয়ে কত নিম্নে তা প্রত্যেক ক্রীড়ায়—স্পোর্টসে, কুস্তিতে, সকল বিষয়েই প্রতিপন্ন হয়। এক্‌জিবিসন কুস্তিতে সার্জ্জেণ্ট জার্ডিনের সঙ্গে শ্রীপতি দাসের লড়বার কথা, ইহা পূর্ব্বে সংবাদ পত্রেও ঘোষিত হয়েছিল। এই কুস্তির বহু পূর্ব্বে জানান হলো যে হেভি গ্রুপ ফাইনালের পর এই কুস্তি হবে। আরো দু'টি কুস্তি ক্রীড়া সম্পন্ন হয়ে গেলো। সার্জ্জেণ্ট জার্ডিন পূর্ব্ব থেকেই প্রস্তুত হয়েছিলেন। ঠিক সময়ে তিনি মল্লভূমিতে অবতীর্ণ হলেন, কিন্তু প্রতিপক্ষ শ্রীপতি দাসের দর্শন প্রায় পাঁচ মিনিটেরও অধিক সময় পরে পাওয়া গেলো। প্রস্তুত হওয়াও তো বিশেষ ব্যাপার নয়—ল্যাঙ্গট পরে তার উপর একটা আবরণ দিয়ে তো বসে থাকলেই পারতেন, যেমন সার্জ্জেণ্ট বার্জ ও সার্জ্জেণ্ট জার্ডিন ছিলেন।

৯ ষ্টোন বিজয়ী ব্যায়াম সমিতির ঘনশ্যাম দাস (ব্যায়াম সমিতি) সর্ব্বোৎকৃষ্ট শারীরিক সৌন্দর্য্যের জন্য বিশেষ পুরস্কার



ঘনশ্যাম দাস (ব্যায়াম সমিতি)

পেয়েছেন—সত্যই ইহার শারীরিক গঠন সুন্দর। গত বৎসর বিজয়ী ভোলা হালদারের সঙ্গে ইহার মল্লক্রীড়া অত্যন্ত দর্শনোপযোগী ও বিশেষ প্রতিযোগিতামূলক হয়েছিল। বলাই দের সঙ্গে প্রভাস চট্টোপাধ্যায়ের কুস্তিটিও বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল।

প্রতিবাদ :

এলাহাবাদ থেকে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র মজুমদার ভারতবর্ষের পৌষ সংখ্যায় ক্রেমার ও সর্দ্দার খাঁর কুস্তির বিচার ফলে দর্শকদের প্রতিবাদের প্রতিবাদ করে লিখেছেন,—

এই কুস্তির আমি বিচারক ছিলাম, রেফারি ছিলেন মিঃ ক্রাইটন। ক্রেমারের জয়ের বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। মজার কথা এই যে সর্দ্দার খাঁ নিজে স্বীকার করে যে তার হার হয়েছিল। দর্শকদের অসন্তোষের কারণ এই—পূর্ব্বদিনে কক্‌সিস্ ও মহম্মদ শফীর যে কুস্তি হয়েছিল তাতে কক্‌সিস Wrestler's Bridge position অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। যতক্ষণ না তার কাঁধ ভূমি-সংলগ্ন হয় ততক্ষণ বিচারক কোন মত দেন নি। ক্রেমারের কুস্তিতেও Wrestler's Bridge সম্বন্ধে pinfallএর ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু ক্রেমার সর্দ্দারকে দাঁড়ানো অবস্থাতেই আছাড় দিয়েছিল। কলকাতার দর্শকদের চেঁচামেচিতে মুর্শিদাবাদের নবাব সাহেব যা ভুল করেছেন, এখানকার বিচারক বা রেফারী তা করেন নি, এইমাত্র।

পূরণ সিং দারভাঙ্গাতে ক্রেমারকে হারায় নি। তবে তাকে technically জেতা বলা যেতে পারে। ক্রেমারের হাতে আঘাত লেগেছিল, সে ব্যাণ্ডেজ করবার জন্য সময় চায় কিন্তু তা দেওয়া হয়নি। ক্রেমার বাধ্য হয়ে কুস্তি থেকে অবসর নিয়েছিল।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত "ময়ূরাক্ষী" — ২৲

বনফুল প্রণীত "বৈতরণী তীরে" উপন্যাস—১।•

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু সম্পাদিত গোয়েন্দাগ্রন্থ "মরণ গোলাপ"—৸৶•

শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ডিটেকটিভ উপন্যাস "মন্দোদরীর কণ্ঠহার"—১৲

অপরাজিতা দেবী প্রণীত "বিচিত্র-রূপিণী"—১॥•

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ছেলেদের পুস্তক "হেস্ত-নেস্ত"—।•

আর বিশ্বাস প্রণীত "যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি"—২।•

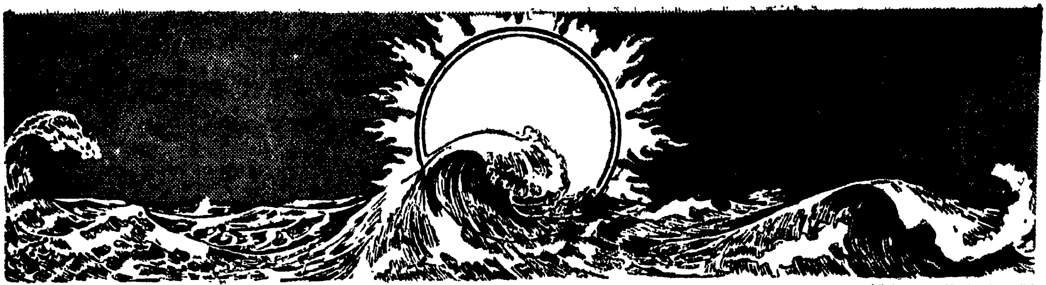
ডাক্তার শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত "সর্পদংশন ও বিষ-চিকিৎসা"—২।•

Editor :—
RAI JALADHAR SEN BAHADUR

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons, at the Bharatvarsha Ptg. Works 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta



জন্ম—১৮০৮ খৃষ্টাব্দ   কালীকৃষ্ণ দেব   মৃত্যু—১৫ এপ্রেল ১৮৭৪ খৃঃ



প্রবাসী

চৈত্র—১৩৪৩

দ্বিতীয় খণ্ড | চতুর্বিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

ভক্তিধর্ম্মের বিবর্ত্তন

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত এম-এ

একদিন এমন ছিল যেদিন এ ধারণাটি আমাদের কাছে একেবারে অসম্ভব মনে হইত না যে নিখিল শূন্যের মাঝখান হইতে এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড যন্ত্রটি বাহির হইয়াই অনন্ত প্রবাহে পাক খাইতে আরম্ভ করিযাছিল; কিন্তু আজ মনে হয়, চেতন-অচেতনে এমন বহু-বিচিত্র—এমন রহস্যময় জটিল সৃষ্টির ছবিটি বোধ হয় কোনও এক মুহূর্ত্তে খেয়ালী বিধাতা-পুরুষের মানসলোকে ভাসিয়া ওঠে নাই—অজ্ঞাত দৈব-শক্তির যে ধ্যান ও তপস্যার ভিতরে লুকায়িত ছিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-রহস্য—তাহার ভিতরেও ছিল একটা প্রকাণ্ড তপস্যা—একটা ক্রম-বিবর্ত্তনের সুনিয়ন্ত্রণ। তাই উপনিষদ্ বলিয়াছে, —স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ব্রহ্মানন্দবল্লী—৬)। নিখিল সৃষ্টির ভিতরে এই একটা ক্রম-বিবর্ত্তনের বোধ জাগিয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আজ কোন বস্তুর আদি-অন্ত-রহস্য সুস্পষ্টরূপে জানিতে না পারিলেও তাহার অস্তিত্বকে কার্য্য-কারণের দুইটি পাখায় একটি ক্রম-প্রবাহের পথে উড়াইয়া দিতে না পারিলে আমরা কিছুতেই যেন সোয়াস্তি বোধ করি না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত মানবাত্মার প্রেমোন্মাদনার উপরে প্রতিষ্ঠিত বাঙলার বৈষ্ণবধর্ম্ম জগতের সকল ধর্ম্মমতের ভিতরে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার 'বিদগ্ধ-মাধবে' মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়াছেন—

> অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
> সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
> হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
> সদা স্ফুরতু বঃ হৃদয়কন্দরে শচীনন্দনঃ॥ (১ম অধ্যায় ২ শ্লোক)

ইহা ভক্তের আন্তরিক শ্রদ্ধা-নিবেদন—ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে এই 'উজ্জ্বলরসা স্বভক্তিশ্রী'কে একেবারে 'অনর্পিত-চরীং চিরাৎ' বলা যায় না। তবে একথা ঠিক যে বহুযুগ পূর্ব্ব হইতে ভারতীয় ধর্ম্ম ও দার্শনিক মতবাদের ভিতরে যে ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে ক্রমে শাখাবাহু বিস্তার

করিতেছিল চৈতন্যদেব-প্রচারিত 'রম্যা কাচিদুপাসনা' এই বৃক্ষেই সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যময় পূর্ণ-প্রস্ফুটিত একটি অনবদ্য ফুল।

ভারতীয় প্রায় সমস্ত দার্শনিক মতবাদের ন্যায় বৈষ্ণব মতবাদটিও মূলত শ্রুতি-স্মৃতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্' (কঠোপনিষৎ ১।২।২৩) এই শ্রুতিবাক্য এবং 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' (গীতা ১৮।৬৬) এই স্মৃতি-বাক্যকে কোন বৈষ্ণব মতবাদই এড়াইয়া চলিতে পারে নাই। কিন্তু কোন দার্শনিক মতবাদের বালুকাকণাকে মূলত অবলম্বন করিয়াই যে ভক্তিধর্ম্মের মুক্তারাজি দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে একথা বলা যায় না; বরং এই কথাই সঙ্গত যে ভক্তিসাগরের ভিতরেই জ্ঞানী শুক্তিগণের মধ্যে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে বিভিন্ন বৈষ্ণবদর্শনের মুক্তারাজি।

এই ভক্তি-গঙ্গা তাহা হইলে কোন্ অজ্ঞাত গিরিকন্দর হইতে প্রথম প্রবাহিত হইয়াছিল? পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে সমগ্র ভারতবর্ষে যে প্রেম-ধর্ম্মের ঢেউ উঠিয়াছিল তাহার মূল ছিল শ্রীমদ্ভাগবতে। ভাগবত একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ—ইহা একাধারে জ্ঞান ও প্রেমের খনি। ভাগবত অনেক স্থলেই ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের শ্রবণ, মনন, কীর্ত্তন ও অর্চ্চনরূপ ভক্তিধর্ম্মের প্রচার করিয়াছে। ভগবৎ প্রেমে এবং তাঁহার নামকীর্ত্তনে ভক্তের কিরূপ অবস্থা হয় সে সম্বন্ধে ভাগবতে আছে—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মত্তবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ (১১।২।৪)

অর্থাৎ—'এইরূপ আচরণকারী ব্যক্তি স্বীয় প্রিয়ের নাম-কীর্ত্তনে জাতানুরাগ ও বিগলিত-হৃদয় হইয়া বিবশ উন্মাদের ন্যায় কখনও উচ্চৈঃস্বরে হাসে, কখনও ক্রন্দন করে, কখনও বিলাপ করে, কখনও গান করে, কখনও নৃত্য করে।' অন্যত্রও দেখিতে পাই,—

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥

ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিৎ
হসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥ (১১।৩।৩১, ৩২)

অর্থাৎ—'(ভক্তগণ) পাপাপনোদক হরিকে পরস্পর স্মরণ করে ও অন্যকে স্মরণ করাইয়া দেয় এবং সাধনভক্তি ও সঞ্জাতভক্তি দ্বারা পুলকিত শরীর ধারণ করে। কখনও কৃষ্ণচিন্তায় রোদন করে, কখনও হাস্য করে, কখনও আহ্লাদিত হয়, কখনও অলৌকিক বাক্য বলে, কখনও নৃত্য করে, কখনও গীত কখনও কৃষ্ণানুশীলন করে এবং কখনও নির্বৃত হইয়া তূষ্ণীভাব অবলম্বন করে।'

ইহা ব্যতীতও ভাগবতে উল্লিখিত উপখ্যানগুলি দেখিলে মনে হয়, যে-কৃষ্ণপ্রেম মানুষকে উন্মত্তবৎ হাসায় কাঁদায়, যে-প্রেমে দেহে অশ্রু-পুলকাদি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের সঞ্চার করে, সেই প্রেমধর্ম্ম বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে প্রচারিত ছিল। পদ্মপলাশলোচন বিষ্ণুর দর্শনে ভক্ত-প্রবর পৃথু—

স আদিরাজো রচিতাঞ্জলির্হরিং
বিলোকিতুং নাশকদশ্রুলোচনঃ।
ন কিঞ্চ নোবাচ স বাষ্পবিক্লবো
হৃদোপগুহ্যামুমধাদবস্থিতঃ॥ (৪।২০।২১)

অর্থাৎ—'আদিরাজ (পৃথু) বদ্ধাঞ্জলি হইলেন, কিন্তু অশ্রু-লোচনে আর হরিকে বিলোকন করিতে পারিলেন না; আর বাষ্পবৈক্লব্যহেতু (কণ্ঠরোধ হওয়ায়) কিছু বলিতেও সমর্থ হইলেন না—অতএব তূষ্ণীভাবে অবস্থিত হইয়া হৃদয় দ্বারা ভগবানকে কেবল আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন।' ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদের ভক্তির বর্ণনায়ও দেখিতে পাই—

ক্বচিদ্রুদতি বৈকুণ্ঠচিন্তাশবলচেতনঃ
ক্বচিদ্ধসতি তচ্চিন্তাহ্লাদ উদগায়তি ক্বচিৎ॥
নদতি ক্বচিদুৎকণ্ঠো বিলজ্জো নৃত্যতি ক্বচিৎ।
ক্বচিত্তদ্ভাবনাযুক্তস্তন্ময়োঽনুচকার হ॥
ক্বচিদুৎপুলকস্তূষ্ণীমাস্তে সংস্পর্শ নির্বৃতঃ।
অস্পন্দ প্রণয়ানন্দ সলিলামীলিতেক্ষণঃ॥ (৭।৪।৩৯-৪১)

অর্থাৎ—'প্রহ্লাদ বৈকুণ্ঠ-চিন্তায় ক্ষুভিতমানস হইয়া কখনও রোদন করিত, ভগবচ্চিন্তাজনিত আনন্দে কখনও হাসিত, কখনও গান করিত, কখনও উৎকণ্ঠিত হইয়া শব্দ করিত, কখনও নির্লজ্জ হইয়া নাচিত, কখনও তদ্ভাবনাযুক্ত হইয়া তন্ময় হইয়া তাঁহার চেষ্টাদির অনুকরণ করিত, কখনও তাঁহার স্পর্শে নির্বৃতি লাভ করিয়া পুলকিত হইয়া তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিত, কখনও নিস্পন্দ-প্রণয়জনিত আনন্দাশ্রুতে তাহার নেত্রদ্বয় ঈষৎ নিমীলিত হইয়া থাকিত।'

প্রহ্লাদ দৈত্যবালকদিগের বিশ্বাসার্থ যেখানে আপনার মাতৃগর্ভে বাসকালীন নারদোপদেশ শ্রবণ-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছে সেখানেও ভক্তির লক্ষণ বলিতেছে—

যদাতিহর্ষোৎপুলকাশ্রুগদ্গদঃ
প্রোৎকণ্ঠ উদ্গায়তি রৌতি নৃত্যতি॥
যদা গ্রহগ্রস্ত ইব কচিদ্ধস-
ত্যাক্রন্দতে ধ্যায়তি বন্দতে জনম্।
মুহুঃ শ্বসন্ বক্তি হরে জগৎপতে
নারায়ণেত্যাত্মমতির্গতত্রপঃ॥ (৭।৭।৩৪, ৩৫)

অর্থাৎ—'যখন অতিশয় হর্ষহেতু পুলকোদ্গম হয়, অশ্রুপাত হয় এবং গদ্গদস্বরে উৎকণ্ঠিত হইয়া গান করে, ক্রন্দন করে, নৃত্য করে—যখন গ্রহগ্রস্তের ন্যায় কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, কখনও ধ্যান করে—কখনও বা জনগণের বন্দনা করে—যখন মুহুর্মুহুঃ শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে নিরপত্রপ হইয়া 'হে হরে, জগৎপতে, হে নারায়ণ'—এই বাক্য উচ্চারণ করিতে থাকে·· ।'

ভাগবতে বর্ণিত এই যে বৈষ্ণবধর্ম্ম ইহার সহিত শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের বা তৎকালীন ভারতবর্ষের অন্যান্য বৈষ্ণব মতবাদের সহিত কোন বিজাতীয় বা স্বজাতীয় ভেদ আছে বলিয়া মনে হয় না। মহাভাবে বিভোর চৈতন্যদেবের যে ছবিটি আঁকিয়াছেন গোরাপ্রেমমুগ্ধ বাঙলার কবিগণ, সে ছবি যে ভাগবতে একেবারেই বিরল একথা বলা যায় না। গোবিন্দদাস মহাভাবে বিভোর চৈতন্যদেবের রূপটি আঁকিলেন—

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল-অবলম্ব।
স্বেদমকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব॥
হাম কি পেখলুঁ নটবর গৌরকিশোর।
অভিনব হেম- কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী-তীরে উজোর॥

নরহরিদাসও গাহিয়াছেন—

ক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে গায় কারে পহুঁ কি সুধায়
কোথায় আমার প্রাণনাথ।
ক্ষণে শীতে অঙ্গকম্প ক্ষণে ক্ষণে দেই লম্ফ
কাঁহা পাঙ যাঙ কার সাথ॥
ক্ষণে উর্দ্ধবাহু করি নাচি বোলে ফিরি ফিরি
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে বিলাপ।
ক্ষণে আঁখি যুগ মুদে হা নাথ করিয়া কান্দে
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে সন্তাপ॥

ইহা ভাগবত-বৃক্ষেরই অনবদ্য ফুল। বর্ত্তমান বৈষ্ণবসমাজ কর্ত্তৃক স্বীকৃত ভক্তির নবধা লক্ষণও আমরা ভাগবতেই দেখিতে পাই। প্রহ্লাদ গুরুগৃহে যাইয়া কি শিখিয়াছে হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক এই কথা জিজ্ঞাসিত হইলে প্রহ্লাদ উত্তর করিয়াছিল—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥ ৭।৫।২৩, ২৪)

অর্থাৎ—'বিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন এবং দাস্য, সৌখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নবধা লক্ষণ ভক্তি যদি পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুতে সমর্পণপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করে তবে আমার মতে তাহাই অতি উত্তম অধ্যয়ন।'

সুতরাং ভক্তিধর্ম্ম যে ভারতীয় ধর্ম্মমতের ভিতরে কোন বিশেষ যুগের আমদানি একথা বলা যায় না। এইরূপে গভীর ব্যাকুলতা এবং হৃদয়ের ভাবপ্রাচুর্য্য দ্বারা ভগবানের সান্নিধ্যলাভের ধর্ম্মমত বহু যুগ হইতেই ভারতবর্ষের জল-বাতাসে মাখা ছিল। কিন্তু এখন প্রশ্ন জাগে, ভাগবত এই ভক্তিধর্ম্ম কোথায় পাইয়াছিল? ভাগবতের প্রথমে ভাগবতকে 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং' (১।১।৩) বলা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে দেবর্ষি নারদ অবতারে শ্রীভগবান্ সাত্বত-তন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন (১।৩।৮)। অন্যত্রও দেখিতে পাই নারদমুনিই ব্যাসদেবকে এই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন (১২।৪।৪১-৪২)। অবশ্য পঞ্চরাত্রের মতবাদের ভিতর দিয়াই যে বৈষ্ণবমতটি ক্রমে প্রচারিত হইয়াছিল এবং একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই এবং নারদই সাধারণত পঞ্চরাত্রের প্রচারক। কিন্তু এই ভাগবতের ভিতরেই অনেক স্থলে আমরা দেখিতে পাই যে দ্রবিড়দেশে বহু পুরাকাল হইতেই ভক্তিধর্ম্ম প্রচারিত ছিল। পদ্মপুরাণান্তর্গত ভাগবত-মাহাত্ম্যের ভিতরে আমরা একটি উপাখ্যানের মধ্যে দেখিতে পাই, দ্রবিড় দেশই ভক্তির জন্মস্থান। উপাখ্যানটি

এইরূপ—একদা নারদমুনি ভারতবর্ষের অনেক ভূভাগ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি যমুনার তটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি দেখিতে পাইলেন একটি খিন্ন-মানসা শোকাকুলা তরুণী বসিয়া আছে, আর তাহারই পার্শ্বে দুইটি বৃদ্ধ মৃতপ্রায় অচেতন পড়িয়া রহিয়াছে। নারদ অগ্রসর হইয়া সেই পদ্ম-লোচনা তরুণীর কাছে তাহার ও পতিত বৃদ্ধদ্বয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাহার গভীর দুঃখের কারণও জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রত্যুত্তরে তরুণী বলিল—

> অহং ভক্তিরিতিখ্যাতা ইমৌ মে তনয়ৌ মতৌ।
> জ্ঞানবৈরাগ্যনামানৌ কালযোগেন জর্জ্জরৌ।
> ...
> উৎপন্না দ্রবিড়ে সাঽহং বৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা।
> কচিৎ কচিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জ্জরে জীর্ণতাং গতা॥
> তত্র ঘোরে কলের্যোগাৎ পাষণ্ডৈঃ খণ্ডিতাঙ্গকা।
> দুর্ব্বলাহং চিরং জাতা পুত্রাভ্যাং সহ মন্দতাম্॥
> বৃন্দাবনং পুনঃ প্রাপ্য নবীনেব সুরূপিণী।
> জাতাহং যুবতী সম্যক্ প্রেষ্ঠরূপা তু সাম্প্রতম্॥
> (শ্রীপদ্মপুরাণান্তর্গত শ্রীভাগবৎ মাহাত্ম্যম্ শ্লোঃ ৪৪, ৪৭ ৪৯)

অর্থাৎ—'আমি ভক্তি নামে খ্যাত; এই দুইটি আমার তনয়, ইহাদের নাম জ্ঞান এবং বৈরাগ্য; কালযোগে ইহারা জর্জ্জরিত হইয়াছে।…দ্রবিড় দেশে আমার জন্ম, কর্ণাটকে আমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছি; কখনো কখনো মহারাষ্ট্রে পরিবর্দ্ধিত—গুর্জ্জরে আসিয়া আমি জীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছি। ঘোর কলির যোগহেতু পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক খণ্ডিত হইয়া আমি ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি—পুত্রদ্বয়সহ ক্রমেই মন্দতা প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু সম্প্রতি বৃন্দাবনে আসিয়া আমি আবার সুরূপিণী প্রেষ্ঠরূপা নবীনা যুবতী হইয়াছি।'

ইহা শুনিয়া নারদ বলিলেন—হে তরুণি, তুমি শোক করিও না; কারণ সত্যাদি ত্রিযুগে মোক্ষলাভের জন্য ভক্তির সহিত জ্ঞান-বৈরাগ্যের প্রয়োজন হইত—কিন্তু কলিযুগে—বিশেষত কৃষ্ণপাদস্পর্শে দীপ্ত বৃন্দাবনধামে জ্ঞান-বৈরাগ্যের আর কোন প্রয়োজন নাই, শুধু নাম-সঙ্কীর্ত্তনেই জীবগণের মুক্তিলাভ হইবে।

এই উপাখ্যানটিতে আমরা দেখিতে পাইলাম, ভক্তির জন্ম দ্রবিড় দেশে এবং সেখান হইতেই সে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধামে আসিয়া ভক্তি জ্ঞান-বৈরাগ্যের সহিতও সম্পর্কশূন্য হইয়া শুদ্ধ প্রেমরূপ ধারণ করিয়াছে। ভাণ্ডারকর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অবশ্য মনে করেন যে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই বৈষ্ণবধর্ম্ম ক্রমে দক্ষিণ দেশেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু তাঁহারাও স্বীকার করিয়াছেন যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর বহুপূর্ব্বেও যে দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত ছিল না একথা বলা যায় না। (১)

ভাগবতপুরাণ রচিত হইবার বহুপূর্ব্ব হইতেই দাক্ষিণাত্যে যে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত ছিল তাহার একাধিক উল্লেখ আমরা ভাগবতেই দেখিতে পাই। একাদশ স্কন্ধে যেখানে কলিযুগের ধর্ম্মসম্বন্ধে ঋষভপুত্র করভাজন ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন, সেখানে বলা হইয়াছে—

> কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ॥
> কচিৎ কচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ।
> তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী॥
> কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী।
> যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বরঃ।
> প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবে ঽমলাশয়াঃ॥ (১১।৫।৩৮-৪০)

অর্থাৎ 'কলিযুগে নারায়ণপরায়ণ ভক্তগণ জন্মলাভ করিবেন; কোথাও কোথাও অল্প অল্প হইবেন, কিন্তু দ্রবিড় দেশেই খুব বেশী হইবেন—যে দ্রবিড় দেশে তাম্রপর্ণী নদী, কৃতমালা, পয়স্বিনী, মহাপুণ্যা কাবেরী এবং পশ্চিমে মহানদী প্রভৃতি প্রবাহিত। হে রাজন্, এই সকল নদীর জল যাঁহারা পান করেন তাঁহারা প্রায়ই নির্ম্মলচিত্ত হইয়া ভগবান বাসুদেবের ভক্ত হন। ভাগবতের উক্ত এই নারায়ণ-পরায়ণ ভক্তগণ দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আলওয়ারগণ বলিয়াই মনে হয়। এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে বিশেষ যুক্তি এই যে আলওয়ারগণ যে শুধু দ্রবিড় দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাই নহে, কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার দেখাইয়াছেন (২) যে, ভাগবতে যে সকল নদীর উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদের তীরেই অনেক আলওয়ারের জন্ম হইয়াছে। তাম্রপর্ণী নদীর তীরস্থ প্রদেশে নাম্-আলওয়ার এবং মধুর কবি জন্মগ্রহণ করেন। কৃতমালা বা

(১) Vaisnavism Saivism etc.—ভাণ্ডারকর, পৃঃ ৫০

(২) Early History of Vaisnavism in South India, পৃঃ ৮, ৯

বৈগে নদীর তীরে পেরিয়ালওয়ার এবং তাঁহার কন্যা আণ্ডাল জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; পয়স্বিনী বা পলার নদীর তীরে পইগই আলওয়ার, ভূতত্তালওয়ার, পেয়-আলওয়ার এবং তিরুমলসাই আলওয়ার জন্মগ্রহণ করেন; কাবেরী নদীর তীরে টোণ্ডর ডিপ্পোডি আলওয়ার, তিরুপ্পান্-আলওয়ার এবং তিরুমঙ্গাই আলওয়ার জন্মগ্রহণ করেন; মহানদী বা পেরিয়ার নদীর তীরে কুলশেখরের জন্ম। সুতরাং ভাগবতের এই উল্লেখ যে দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবপ্রধান আলওয়ার সম্বন্ধেই সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এই শ্লোকগুলি যদি পরবর্ত্তী যুগের প্রক্ষিপ্ত না হয় তবে ইহা হইতে অতি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় যে ভাগবত রচিত হইবার পূর্ব্বেই দাক্ষিণাত্যের আলওয়ার বৈষ্ণবগণের প্রসিদ্ধি সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

এই আলওয়ারগণের উল্লেখ ব্যতীত ভাগবতে দাক্ষিণাত্যে অতি পৌরাণিক যুগ হইতেই বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। চতুর্থ স্কন্ধের অষ্টবিংশতি অধ্যায়ে দেখিতে পাই, পুরঞ্জন বিদর্ভরাজের কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে পর মলয়ধ্বজ রাজা তাহাকে বিবাহ করেন (৪।২৮।২৯)। এই মলয়ধ্বজ রাজা সম্বন্ধে শ্রীধর স্বামী তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন—'মলয়োপলক্ষিতে দক্ষিণদেশে ধ্বজ ইব দর্শনীয়ঃ। স হি শ্রীবিষ্ণুভক্তিপ্রধানো দেশঃ, তত্র মুখ্যঃ, মহাভাগবত ইত্যর্থঃ।' মলয়ধ্বজ যে দক্ষিণ দেশের রাজা তাহা এই অধ্যায়ের পঁয়ত্রিশ শ্লোক দৃষ্টেও বোঝা যায়; সেখানে বলা হইয়াছে, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মলয়ধ্বজ চন্দ্রসরা, তাম্রপর্ণী এবং বটোদকা প্রভৃতি পবিত্র নদীর তীরবর্ত্তী স্থানে জন্মগ্রহণ করিলেন। যাহা হোক—

> তস্যাং স জনয়াঞ্চক্রে আত্মজামসিতেক্ষণাম্।
> যবীয়সঃ সপ্তসুতান্ সপ্তদ্রবিড়ভূভৃতঃ॥
> একৈকস্যাভবৎ তেষাং রাজন্নর্ব্বুদমর্ব্বুদম্।
> ভোক্ষ্যতে যদ্বংশধরৈর্ম্মহী মন্বন্তরং পরম্॥ (৪।২৮।৩০, ৩১)

অর্থাৎ সেই বৈদর্ভীর গর্ভে মলয়ধ্বজ অসিতেক্ষণা নামক এক আত্মজা এবং সপ্তদ্রবিড় ভূমির পালক সপ্ত পুত্রের উৎপাদন করেন। তাহাদের এক একজনেরই আবার অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বংশধর হইয়াছিল এবং যুগে যুগে তাঁহাদের দ্বারাই সমগ্র মহী ভুক্ত হইয়াছিল। এই অসিতেক্ষণা আত্মজা সম্বন্ধে শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন,—'আত্মজাং শ্রীকৃষ্ণসেবারুচিম্। সৎসঙ্গেন ভগবদ্ধর্ম্মেকচিরতুদিত্যর্থঃ। অসিতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ঈক্ষণং যয়া তাম্।' তাহা হইলে এই কন্যা জন্মের অর্থ, ভাগবত-সঙ্গলাভে শ্রীকৃষ্ণদর্শনের কারণভূত শ্রীকৃষ্ণসেবারুচির উদয় হইল। সপ্ত পুত্র সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—'যবীয়সঃ সপ্তসুতান্—শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যমিতি ভক্তিপ্রকারান্। সখ্যাত্মনিবেদনয়োস্তৎপদার্থজ্ঞানোত্তরকালত্বাৎ তস্য চ ভগবতৈবোত্তরত্র উপদেক্ষ্যমাণত্বাৎ ইদানীমনুপপত্তেঃ সপ্তেত্যুক্তম্। ভগবদ্ধর্ম্মরুচ্যা তৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদিকং জাতমিত্যর্থঃ। দ্রবিড় ভূমিপালকান্, দ্রবিড় ভূমির্হি শ্রবণাদি ভক্তিভিরেব সুরক্ষিতাস্তীতি প্রসিদ্ধম্।

এখানেও দেখিতে পাইতেছি মলয়ধ্বজের সপ্তপুত্র শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সপ্ত প্রকারের ভক্তি। এই সপ্তপুত্রই দ্রবিড় ভূমির পালক অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সপ্ত প্রকারের ভক্তি দ্বারাই দ্রবিড় ভূমি সুরক্ষিত এবং একথা শ্রীধর স্বামীর সময়ে সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সখ্য এবং আত্মনিবেদন ভক্তির এই দুইটি অঙ্গ পরে উৎপন্ন হইয়াছিল। এই সপ্তধা ভক্তিই ক্রমে বহুরূপ ধারণ করিয়া সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

দশম স্কন্ধের একোনাশীতিতম অধ্যায়ে দেখিতে পাই—বলরাম একবার তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি যে-সকল তীর্থ-ভ্রমণ করিলেন তাহা প্রায় সকলই দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কেন্দ্রগুলি।

> স্কন্দং দৃষ্ট্বা যযৌ রামঃ শ্রীশৈলং গিরিশালয়ম্
> দ্রবিড়েষু মহাপুণ্যাং দৃষ্ট্বাদ্রিং বেঙ্কটং প্রভুঃ॥
> কামকোষ্ণীং পুরীং কাঞ্চীং কাবেরী চ সরিদ্বরাম্।
> শ্রীরঙ্গাখ্যং মহাপুণ্যং যত্র সন্নিহিতো হরিঃ॥ (১০।৭৯।১৩, ১৪)

এখানেও বেঙ্কট, শ্রীরঙ্গনাথ প্রভৃতির প্রাচীনত্ব প্রসিদ্ধত্ব এবং মহাপুণ্যা দ্রবিড়ের বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রাধান্যেরও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আমরা আরও দেখিতে পাই—বিষ্ণুর অষ্টম অবতার ঋষভ পরম ভাগবত ছিলেন; তাঁহার সমস্ত বর্ণনা দেখিয়া মনে হয় যে তিনি দাক্ষিণাত্যের রাজা ছিলেন। এই ঋষভের নয়জন পরম ভাগবত পুত্রের ভিতরে একজনের নাম ছিল 'দ্রবিড়'। একাদশ স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে এই 'দ্রবিড়

সত্তম' বিষ্ণুর অবতার ঘটিত কার্য্যাবলী সম্বন্ধে উপদেশ করিতেছেন। দ্রবিড়াধিপতি সত্যব্রতই মীনরূপী বিষ্ণুকে আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং তিনিও পরম ভাগবত ছিলেন। অবশ্য এই সব পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য দিতে হয়ত অনেকেই রাজি হইবেন না; তবে পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি সকলই কবির স্বকপোল-কল্পিত নিছক গল্প নহে—সত্যের কঙ্কালের উপরে কবি-কল্পনার রক্তমাংসেই পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি জীবন্ত হইয়া ওঠে। সুতরাং ঐতিহাসিক সত্য নির্দ্ধারণ করিতে এই জাতীয় প্রবাদগুলির মূল্য যথেষ্ট।

এই ত গেল পৌরাণিক কাহিনী। ঐতিহাসিক যুগেও আসিয়া দেখিতে পাই, শঙ্করাচার্য্যের প্রবল অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে দ্বৈতবাদের বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন দাক্ষিণাত্যের রামানুজ, মধ্ব প্রভৃতি আচার্য্যগণ। দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন বৈষ্ণবগণের ভিতরে দুইটি সম্প্রদায় ছিল—আলওয়ার সম্প্রদায় এবং আচার্য্য সম্প্রদায়। এই আলওয়ার সম্প্রদায় ছিল গভীর প্রেমের নির্ঝর। ইঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করেন নাই—কিন্তু এই আলওয়ারদের গভীর প্রেমভক্তির প্রেরণা লইয়াই বোধ হয় পরবর্ত্তী বৈষ্ণব আচার্য্যগণ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের দার্শনিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রামানুজ সম্বন্ধেও আমরা জানিতে পাই যে তিনি বাল্যে কাঞ্চিপুরে প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদী যাদবপ্রকাশের ছাত্র ছিলেন; কিন্তু শুষ্ক বেদান্তে তাঁহার মন শান্তি পাইল না—তিনি তখন গভীর অনুরাগের সহিত ভক্তচূড়ামণি আলওয়ারদের প্রেম-সঙ্গীতগুলি অধ্যয়ন করিলেন এবং তাহার ভিতরেই তাঁহার বৈষ্ণব চিত্তটি অপূর্ব্ব আস্বাদন লাভ করিল। সুতরাং রামানুজের ভক্তিবাদের ভিতরে আলওয়ারগণের প্রেম-ভক্তির প্রেরণা অনেকখানি ছিল বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য রামানুজ সম্প্রদায়ের বড়গলাই সম্প্রদায় আলওয়ারগণের ন্যায় প্রপত্তিকেই ভগবৎসান্নিধ্যলাভের একমাত্র উপায় বলিয়া গ্রহণ করে নাই, কিন্তু তেঙ্গলাই সম্প্রদায় আলওয়ার-গণেরই যেন সাক্ষাৎ বংশধর।

গোস্বামিগণ প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয়বৈষ্ণববাদের সিদ্ধান্তের ভিতরে যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাহাও কতখানি গোস্বামি-গণের নিজস্ব একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে দার্শনিক গ্রন্থ জীবগোস্বামীর ষট্সন্দর্ভ। অবশ্য চৈতন্য-চরিতামৃতে আমরা দেখিতে পাই মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের সহিত বেদান্ত-সূত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে শঙ্কর-মতের উপরে এই বলিয়া দোষারোপ করিতেছেন যে, শঙ্কর শ্রুতির মুখ্যার্থ ছাড়িয়া স্বকল্পিত গৌণার্থের উপরে তাঁহার মায়াবাদকে স্থাপিত করিয়াছেন এবং এই জন্যই পরিণাম-বাদকে অস্বীকার করিয়া তিনি বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু মহাপ্রভুর নিজস্ব দার্শনিক মত এখানে বা অন্য কোথাও সুস্পষ্ট নহে। যাহা হোক—জীব-গোস্বামীর ষট্সন্দর্ভে আমরা কিছু দার্শনিক আলোচনা পাইতেছি। কিন্তু এই ষট্সন্দর্ভে আলোচিত মতবাদ যে জীবগোস্বামীর নিজস্ব নহে একথা তিনি ষট্সন্দর্ভের প্রারম্ভেই স্বীকার করিয়াছেন। সেখানে বলা হইয়াছে—

> জয়তাং মথুরা ভূমৌ শ্রীলরূপসনাতনৌ।
> যৌ বিলেখয়তস্তত্ত্বং জ্ঞাপকৌ পুস্তিকামিমাম্॥
> কোঽপি তদ্বান্ধবো ভট্টো দক্ষিণদ্বিজবংশজঃ।
> বিবিচ্য ব্যলিখদ্গ্রন্থং লিখিতাদ্বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ॥
> তস্যাদ্যং গ্রন্থনালেখং ক্রান্তব্যুৎক্রান্তখণ্ডিতম্।
> পর্য্যালোচ্যাথ পর্য্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ॥
>
> (শ্রীভাগবতসন্দর্ভে তত্ত্বসন্দর্ভঃ শ্লোঃ ৩—৫)

এ কথা জীবগোস্বামী অন্য পাঁচটি সন্দর্ভের প্রারম্ভেও স্বীকার করিয়াছেন। এখানে তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে রূপসনাতনের কোনও দক্ষিণদেশীয় ভট্টবন্ধু এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলেন। এই ভট্টবান্ধব খুব সম্ভবত গোপাল ভট্ট। তাহা হইলে গোপাল ভট্টের ক্রান্তব্যুৎক্রান্তখণ্ডিত গ্রন্থের পর্য্যায় আলোচনা করিয়াই জীবগোস্বামী রূপসনাতনের আদেশে এই গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু এই গ্রন্থালোচিত মতবাদ গোপাল ভট্টেরও নিজের নহে—তিনিও বৃদ্ধ বৈষ্ণবগণের লিখন বিবেচনা করিয়াই এই গ্রন্থ লিখিয়া-ছিলেন। এখন প্রশ্ন হয়, এই বৃদ্ধ বৈষ্ণবগণ কাঁহারা? বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন—'বৃদ্ধ বৈষ্ণবৈঃ শ্রীমধ্বাদিভির্লিখিতাৎ গ্রন্থাৎ।' কিন্তু জীবগোস্বামী এ সম্বন্ধে নিজেই বলিয়াছেন যে তাঁহার ষট্সন্দর্ভ একরূপ ভাগবতেরই ব্যাখ্যা এবং এই ব্যাখ্যায়—'কচিত্তেষামেবাস্তত্র দৃষ্ট ব্যাখ্যানুসারেণ দ্রবিড়াদি দেশবিখ্যাত পরমভাগবতানাং তেষামেব বাহুল্যেন তত্র বৈষ্ণবত্বেন প্রসিদ্ধাৎ। শ্রীভাগবত

এব কচিৎ কচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ। ইত্যনেন প্রথিতমহিম্নাং সাক্ষাৎ শ্রীপ্রভৃতিতঃ প্রবৃত্তসম্প্রদায়ানাং শ্রীবৈষ্ণবাভিধানাং শ্রীরামানুজভগবৎপাদবিরচিতশ্রীভাষ্যাদি-দৃষ্টমতপ্রামাণ্যেন মূলগ্রন্থস্বারস্যেন চান্যথা চ।' অর্থাৎ কোথাও কোথাও দ্রবিড়াদি দেশবিখ্যাত পরম ভাগবতগণের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হইয়াছে। ভাগবতগণের বহুলতাহেতু দ্রবিড়ভূমি বৈষ্ণবপ্রধান স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ—ভাগবতেই তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। এইরূপ প্রথিত-মহিমা শ্রী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের শ্রীরামানুজাদি বিরচিত শ্রীভাষ্যাদির অনুসরণে তথা মূলের অভিপ্রায়বোধেও এই ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে।

কবিকর্ণপুরের 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় আমরা দেখিতে পাই মহাপ্রভু স্বয়ং দাক্ষিণাত্যের মাধ্বিসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছেন। * কিন্তু মধ্বাদি আচার্য্যগণ প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং পুরাণাদিবর্ণিত বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে মহাপ্রভুর আচরিত বৈষ্ণবধর্ম্মের একটা বিশেষত্ব রহিয়াছে—ইহা মহাপ্রভুর গোপীভাব বা রাধাভাব—রূপগোস্বামী, যাহাকে 'উন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্' বলিয়াছেন। ভাগবতে গোপীপ্রেমের ভিতরে উজ্জ্বলরসা ভক্তির চরম দৃষ্টান্ত আছে—কিন্তু গোপীভাব অঙ্গীকার করিয়া সাধন-প্রণালী ভাগবতে পাই না। এই গোপীভাবের উদাহরণ আমরা অতি চমৎকাররূপেই পাই—দাক্ষিণাত্যের আলওয়ার সম্প্রদায়ের ভিতরে। এই আলওয়ারদের বৈষ্ণব কবিতাগুলি আলোচনা করিলে দেখিতে পাই—বাঙলা বৈষ্ণব-সাহিত্যের শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি রসগুলি কি অপূর্ব্ব প্রকাশ লাভ করিয়াছে চৈতন্যদেবের প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই আলওয়ারগণের গানগুলির ভিতরে। আলওয়ার-গণের সমসাময়িক শৈবভক্তগণের গানগুলিও প্রপত্তির অতি চমৎকার উদাহরণ। আলওয়ার ভক্তগণের গান-গুলিকে 'প্রবন্ধম্' বলা হয় †। দাক্ষিণাত্যের সকল বিষ্ণু-মন্দিরে এখনও এই সঙ্গীতগুলি গীত হয়—ইহাই দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবগণের বেদ।

প্রসঙ্গক্রমে এই আলওয়ার বৈষ্ণবগণের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া দরকার। এই বিষ্ণুভক্ত সম্প্রদায়ের ভিতরে বারজন ভক্তচূড়ামণি ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের প্রবাদ যে এই বারজনের ভিতরে প্রথম তিনজনের আবির্ভাব কাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব বহু সহস্র বৎসর আগে এবং গোবিন্দাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সর্ব্বপ্রথম বৈষ্ণব পয়গই আলওয়ারের আবির্ভাব কাল খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ ৪২০৩ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান পণ্ডিতগণ আলওয়ারদিগকে এত প্রাচীন মনে না করিলেও তাঁহারা যে রামানুজাচার্য্যের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রবাদ, এই বৈষ্ণব-গণ কেহ বিষ্ণুর শঙ্খের অবতার, কেহ চক্র, কেহ বা গদা, কেহ বা বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের অবতার ছিলেন। এই বৈষ্ণবগণ জ্ঞানমার্গ পরিত্যাগ করিয়া অনন্যশরণ হইয়া প্রপত্তিমার্গ অবলম্বন করিতেন এবং ভক্তির প্রাবল্যে বৈধীমার্গ ত্যাগ করিয়া রাগানুগমার্গেই বিষ্ণুর ভজনা করিতেন। এই ভক্তগণ দিনরাত্র নামপ্রেমে মত্ত হইয়া থাকিতেন; তাঁহারা বাদ্য ও করতাল সংযোগে দিনরাত্র কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর গুণগান করিতেন—নাম লইতে লইতে তাঁহারা ভাবস্থ হইয়া পড়িতেন; তাঁহাদের দেহে অশ্রু, পুলক, স্বেদ, বৈবর্ণ্য প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইত—ভাবে বিহ্বল হইয়া তাঁহারা কখনও হাসিতেন, কখনও কাঁদিতেন, কখনও উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করিতেন। কথিত আছে, তিরুপ্পান আলওয়ার ভাবাবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ করিলে বিষ্ণু তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করেন এবং আলওয়ার বিষ্ণুর বিগ্রহের ভিতরেই ভাবাবেশে লীন হইয়া যান। ইহা আমাদিগকে ভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর গোপীনাথের দেহে লীন হইয়া যাইবার প্রবাদকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। পেরিয়ালওয়ারের কন্যা আণ্ডাল আমাদের মীরাবাঈএরই পূর্ব্বমূর্ত্তি। পেরিয়ালওয়ার তাহাকে (আণ্ডালকে) পুষ্পোদ্যানে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন এবং শ্রীরঙ্গনাথকে ফুলসাজে সাজাই-

* অবশ্য ডাঃ সুশীলকুমার দে প্রভৃতি এ মতটি সমর্থন করেন না। আমারও এসম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে।

† এক নাম্-আলওয়ারই এক সহস্র গান রচনা করিয়াছিলেন, উহা 'সহস্রগীতা' নামে প্রসিদ্ধ। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের নিকট 'দ্রবিড়োপনিষৎ' নামে একখানি সংস্কৃত পুথির পাণ্ডুলিপি আছে। ইহাতে একশত শ্লোকে 'সহস্রগীতা'র সারসঙ্কলন রহিয়াছে। লণ্ডনে তিনি 'সহস্রগীতা'র একখানি সংস্কৃত অনুবাদও পাইয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ দাশগুপ্তই প্রথমে এই প্রবন্ধের বিষয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং এ সম্বন্ধে তাঁহার নিকটে অনেক মূল্যবান্ উপদেশ লাভ করিয়াছি।

বার জন্যই তাহাকে নিযুক্ত করেন। যৌবনাগমে বিবাহের প্রস্তাব আসিলে আণ্ডাল তাহা প্রত্যাখ্যান করিল এবং রঙ্গনাথকেই আপনার স্বামিরূপে বরণ করিয়া লইয়া সমস্ত জীবন-যৌবন তাঁহারই পায়ে সমর্পণ করিয়া দিয়াছিল। প্রভাত হইলেই আণ্ডাল সমস্ত সখিগণকে জাগাইয়া শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া কৃষ্ণের ঘুম ভাঙ্গাইতে যাইত; তাহার 'তিরুপ্পাবাই'র ভিতরে এই কৃষ্ণের ঘুম ভাঙ্গান অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। আলওয়ারগণের প্রবন্ধগুলির ভিতরে দেখিতে পাই, তাঁহারা অনেক সময় নিজেকে ভগবানের প্রিয়তমা নায়িকাভাবে ভাবিত করিয়া প্রেম-সাধনা করিতেন। এই কবিতাগুলির ভিতরেও দেখি সেই নায়ক-নায়িকার রূপানুরাগ, অনুরাগ, মান, অভিমান, বিরহ, দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি; ভাব বা কবিত্বে এই পদগুলি পরবর্ত্তী হিন্দী এবং বাঙলা বৈষ্ণব কবিতা হইতে কোন অংশে হীন বলিয়া মনে হয় না।

দাক্ষিণাত্যের এই বৈষ্ণব কবিতাগুলি আলোচনা করিলে এবং তাহার রচনাকাল বিচার করিলে, এ বিশ্বাসটি মনে স্বতঃই উদিত হয় যে পরবর্ত্তী যুগের বৈষ্ণব কবিতার উপরে দাক্ষিণাত্যের এই বৈষ্ণব কবিতার কিছু কিছু প্রভাব থাকা অসম্ভব নহে। অবশ্য দাক্ষিণাত্যের এই বৈষ্ণব কবিতা পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-সাহিত্যকে যে কি ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল তাহার কোন সুস্পষ্ট যোগসূত্র এখন পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমরা দেখিতে পাই জয়দেবের গীতগোবিন্দ, ভাগবত ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপুরাণ প্রভৃতিকেই অনেক-খানি অনুসরণ করিয়াছে এবং চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ভাগবত ও গীতগোবিন্দকেই অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ৫ম অধ্যায়ের উক্তি যদি প্রক্ষিপ্ত না হয় তবে ভাগবত যে এই আলওয়ারগণের পরবর্ত্তী তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। অধিকন্তু আমরা দেখিতে পাই, ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণের অনেক বাল্য, কৈশোর এবং পরবর্ত্তী লীলা এবং বিষ্ণুর নানা অবতারে ঘটিত অনেক লীলা আলওয়ারগণের কবিতার ভিতরেই পাইতেছি। অতএব মূল ভাগবতের উপরেও দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাব থাকা কিছুই অসম্ভব নহে।

শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যক্তিগত জীবন এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মমতের উপরে এই দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবধর্ম্মের মুখ্য প্রভাব থাকা খুব সম্ভব। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর গত ১৩৪১ সনের অগ্রহায়ণ মাসের 'উদয়ন' পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা অতি প্রণিধানযোগ্য। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াই দাক্ষিণাত্যভ্রমণে বাহির হইলেন—ইহার গুরুত্ব কম নহে। আমরা চৈতন্য-চরিতামৃতে দেখিতে পাই—নীলাচলে বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করিয়াই মহাপ্রভু দক্ষিণ গমনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

এই মতে সার্ব্বভৌমের নিস্তার করিল।
দক্ষিণ গমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল॥ (মধ্যলীলা ৭।২)

এই দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের উদ্দেশ্য কি? মহাপ্রভু বলিয়াছেন, তিনি বিশ্বরূপের উদ্দেশ করিতেই যাইতেছেন—কিন্তু চরিতামৃতকার বলিতেছেন

দক্ষিণ দেশ উদ্ধারিতে করেন এই ছলা॥

আমাদের কিন্তু মনে হয়, দাক্ষিণাত্যের প্রেমধর্ম্ম সম্বন্ধে মহাপ্রভু পূর্ব্বেই জ্ঞাত ছিলেন এবং এই ভ্রমণের বাসনাও তাঁহার মনে পূর্ব্ব হইতেই ছিল; তাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াই তিনি প্রথমে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বাহির হইলেন। অবশ্য এক রামানন্দ রায়ের সহিত রাধাপ্রেম আলোচনার ভিতর দিয়াই আমরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না; কিন্তু মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য হইতে কৃষ্ণ-প্রেমাত্মক ব্রহ্মসংহিতা এবং কর্ণামৃত প্রভৃতি গ্রন্থসংগ্রহ, বৈষ্ণব ভাগবতগণের সঙ্গে নিভৃতে কৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধে ইষ্টগোষ্ঠী এবং দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর হইতে নিরন্তর রাধাভাবে দিব্যোন্মাদ মহাপ্রভুর জীবন ও ধর্ম্মমতের উপরে দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রভাব সূচিত করে। অবশ্য জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মালাধর বসু প্রভৃতির কবিতা এবং কাব্যও যে পূর্ব্ব হইতেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না।

বাঙলার বৈষ্ণবধর্ম্মকে এইরূপ একটি ঐতিহাসিক ক্রম-বিবর্ত্তনের ধারার ভিতরে খুঁজিয়া পাইতে পারিলে বাঙলার বৈষ্ণবধর্ম্মের গৌরব বা মহিমা কিছুই ক্ষুণ্ণ হয় না। হিমালয়ের কোন অজ্ঞাত গিরিকন্দরে পার্ব্বত্য উপখণ্ডের ভিতরে গঙ্গার উৎস আবিষ্কৃত হইলেও পুণ্যসলিলা গঙ্গার মাহাত্ম্য কিছুই ক্ষুণ্ণ হয় না। সমস্ত বৈষ্ণবমতবাদের ভিতর দিয়া মহাপ্রভুর যে অতল গভীর প্রেমমূর্ত্তিখানি জাগিয়া উঠিয়াছিল, সে ছবিখানি জগতের ইতিহাসে সত্যই বিরল!

উপন্যাস

হংস-বলাকা

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

(৯)

সাব-এডিটারদের ঘরটা একটা বড় হল ঘর। প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় গুটি দুই -বড় টেবিল গায়ে-গায়ে লাগান। তার চারদিকে আট-দশখানা চেয়ার। সকাল থেকে সকাল পর্য্যন্ত এখানে কাজ চলে। তবে বিকেলের দিকেই কাজ বেশী। এই দলে লোকও বেশী।

সুকুমার যতখানি মস্তিষ্কচালনার আশঙ্কা করেছিল তার কিছুই নয়। কেবল টেলিগ্রাম তর্জ্জমা। সাব-এডিটারের তাই কাজ। অত্যন্ত একঘেয়ে। সে প্রথমে যতখানি উৎসাহ নিয়ে কাজে নেমেছিল, অল্পদিনের মধ্যেই তার অনেকখানি মিইয়ে গেল। তবু মাষ্টারীর চেয়ে অনেক ভাল। অন্তত তার কাছে স্কুলের বদ্ধ হাওয়া অসহ্য হয়ে উঠেছিল। প্রবীণ ঝুনো শিক্ষকদের দেখলেই তার হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে যেত। এখানে তা নয়। তার সহকর্ম্মীরা প্রায় সকলেই তারই সমবয়সী। হাসিতে গল্পে কাজে মিশে একাকার হয়ে যায়। বিশেষ ক'রে সরিৎবাবুর মত রসিক লোক সুকুমার তার জীবনে দেখেনি। ওরা তার নাম রেখেছে কথাসরিৎসাগর। লোকটির ভিতর-বাহির নেই। আর হাসি ছাড়া কথা নেই। অন্য কথাকে সে বলে বাজে কথা। সরিৎবাবুর কল্যাণে দশটার আগে আর কারও খেয়ালই হয় না যে দশটা বেজেছে।

আর আছে জ্যোতির্ম্ময়বাবু। লিকলিকে লম্বা, হাড় বের করা। জ্যোতির্ম্ময়ের কতকগুলো বাঁধা রসিকতা আছে। সেগুলো নিতান্ত পুরোনো হয়ে গেছে। কিন্তু এমন একটা সময়ে এমনি জুৎসই ক'রে বলে যে, এখনও তার ধার নষ্ট হয়নি। নির্ম্মলকে ওরা বলে জামাইবাবু। সুন্দর চেহারা, সব সময় বেশ চালের উপর জামাইবাবুটি সেজে থাকে। কালীমোহন থস্‌থসে বেঁটে। মাথার চুল সমস্ত সময় উদ্ধত বিদ্রোহে খাড়া হয়ে আছে। আর পরণের কাপড়, যেমন ক'রেই পরুক, কিছুতে হাঁটুর নীচে নামে না। কোঁচা দিতে তার কাছা খুলে যায়, কাছা দিতে কোঁচা। তবু উৎসাহের শেষ নেই। কোথায় খেলার মাঠ, কোথায় সাহিত্য-বাসর—আর কোথায় রাজনীতির আসর—সর্ব্বত্র সে আছে। আর যে কথা কেউ জানে না তাই নিয়ে এমন মাতামাতি করে যে অপেক্ষাকৃত কম উৎসাহী লোকে বিব্রত হয়ে ওঠে। এরই ঠিক পালটা দিক হচ্ছে নগেন। কালীমোহন যেমন অসাধারণ বেঁটে, নগেন তেমনি অসাধারণ লম্বা। চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে বেরিয়ে আছে। রংটি অত্যন্ত ময়লা ব'লে বেশের পারিপাট্য বেশী। মাথার সযত্ন-বিন্যস্ত চুলের একটি গাছি স্থানভ্রষ্ট হয় না। কাপড়ে জামায় কোথাও একটি ফোঁটা ময়লা নেই। এমন কি পাঞ্জাবীর হাতায় ইস্ত্রির ভাঁজটি পর্য্যন্ত অটুট। জুতো জোড়া ঝক্‌ঝক্ করছে। অতি শান্ত মিহি স্বরে দু'টি একটি কথা বলে। আর কোনো বড় রকম রসিকতা হ'লে বড় জোর ঠোঁটটি ফাঁক ক'রে আল্‌তো একটুখানি হাসে। সরিৎ ওর নাম রেখেছে বেতসবাবু।

এ ছাড়া আরও অনেক সাব-এডিটার আছে। তাদের কয়েকজন সকালে কাজ করে, কয়েকজন রাত্রে। এদের সঙ্গে সুকুমারের কচিৎ কখনও দেখা হয়। তাহ'লেও বেশ আলাপ হয়ে গিয়েছে। সকলেই এক বয়সী। সকলেই সমান উৎসাহী, ভাবনা চিন্তার ধার ধারে না এবং কথায় কথায় রসিকতা করার চেয়ে মহত্তর কাজ মানুষের আছে তা স্বীকার করে না। সেই কারণে নিজেদের মধ্যে সামাজিক ভদ্রতার নিয়ম-কানুন আদৌ মেনে চলে না। জিহ্বারও বল্গা নেই। এরা নিজেদের তরুণের অগ্রণী ব'লে

মনে করে এবং সেই হিসাবে একটা previleged class অর্থাৎ যা খুশী করবার এবং যা খুশী বলবার অধিকার আছে। সুতরাং নিজেদের মধ্যে ভাব জমায় যত শীঘ্র, ঝগড়াও করে তত শীঘ্র—আবার ফের ভাবও করে তেমনি শীঘ্র। এরা বড় বড় কথার আলোচনা করে, বড় বড় কাজের বিশ্লেষণ করে এবং বড় বড় চিন্তার গবেষণা করে; আর যে যাকে সুবিধা পায় সে তাকে আক্রমণ ক'রে হাসির হর্‌রা তোলে। তারপর তিন কলম সংবাদ তর্জ্জমা ক'রে আর কয়েক বাটি চা-পান ক'রে বাড়ী যায়। এদের সঙ্গ, এদের সান্নিধ্য এবং এদের সুনিপুণ বাক্‌যুদ্ধ সুকুমারের ভাল লেগেছে। এমন ভাল যে দুপুরে একলা ঘরে শুয়ে থাকতে ভাল লাগে না, কখন তিনটে বাজবে তারই প্রতীক্ষা করে। অসুস্থ অবস্থাতেও একবার ঠুক ঠুক ক'রে আফিস না গেলে মন ফাঁকা ঠেকে। শুধু তার নয়, সকলেরই। ছুটির দিনে এমন বিরক্ত লাগে যে সে আর বলবার নয়। মূল কথা, এমন জমাটি আড্ডার সন্ধান ইতিপূর্ব্বে সুকুমার কোথাও পায়নি।

কিন্তু কাঁটা ছাড়া গোলাপ হয় না। এ আসরেও শুধু মধু নেই, সঙ্গে হুলও আছে। সে হুল যে কোথায়, কেউ শপথ ক'রে বলতে পারে না। মাত্র অনুমানে সন্দেহ করে। সন্দেহ করে ব্রজরাজবাবুকে। ব্রজরাজবাবু বয়সে এদের চেয়ে অনেক বড়। মাথার বিরল কেশে এবং মুখের গোঁফে পাক ধরেছে। বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছে। সংবাদপত্র মহলে পাকা সাব-এডিটার ব'লে তাঁর খ্যাতি আছে। কারণ ভদ্রলোক বিশ বৎসরেরও উর্দ্ধকাল ধ'রে এই কাজই ক'রে যাচ্ছেন। এর বেশী আর কখনও ওঠেন নি। 'সুদর্শনের' তিনি নৈশ-সম্পাদক। তাঁর মত ধীরবুদ্ধি লোক ছাড়া অন্য কারও উপর রাত্রের ভার দিতে হরিসাধনবাবু ভরসা পান না। আর তো সব ছোকরা। কাগজ সম্পাদনার কিই বা বোঝে তারা? কেবল হাসতে আর ইয়ার্কি দিতে, আর ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা খেতে ওস্তাদ।

ব্রজরাজবাবু রাত্রি ঠিক দশটায় আসেন। পাঁচ মিনিট আগে আসেন তো পরে নয়। এসেই একবার নিজের হাতঘড়িটার দিকে, একবার দেওয়ালের বড় ঘড়িটার দিকে চেয়ে খাতায় নামটা সই করেন। তার পরেই কাজে বসেন। কোন দিকে চাওয়া নয়, কাকেও একটা কথা বলা নয়—একেবারে সংবাদ তর্জ্জমায়। ওঁকে দেখলেই সুকুমারের মুখের হাসি যায় মিলিয়ে। ঘরের হাওয়া ভারি হয়ে ওঠে। সকলের মন পালাই পালাই করে। হাতের বাকি কাজটা সেরেই একে একে স'রে পড়ে।

ভদ্রলোক যে কারও সঙ্গে কলহ করেন, তা নয়। কলহও করেন না, ভাবও করেন না। বিনা প্রয়োজনে কথাই বড় একটা বলেন না। হয়তো সেটা বয়োধর্ম্মে এবং সেই কারণ দোষেরও কিছু নয়। কিন্তু তাঁর ঝুলে-পড়া ঠোঁটে, ছোট ছোট চোখে এবং বক্র নাসিকায় এমন একটা কিছু আছে, যাতে ছোকরার দল তাঁর সঙ্গে ভাব জমাতে সাহস পায় না। তাঁকে এড়িয়ে চলে। বিশেষ সম্প্রতি সাব-এডিটারদের সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের কাছে নানা রকম অভিযোগ গেছে। সেই সমস্ত গুরুতর অভিযোগের সত্যতা সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য সম্পাদকের কাছে কর্ত্তৃপক্ষের জরুরী চিঠি এসেছে। এইতেই গোল পাকিয়েছে আরও বেশী।

হরিসাধনবাবু অত্যন্ত প্রাণখোলা রসিক লোক। কারও কোনো দোষ ত্রুটি দেখলে যা বলবার তখনই তখনই তার সামনেই ব'লে দেন। তারপরে সে কথা আর তাঁর নিজেরও মনে থাকে না, যাকে বলেন তারও মনে থাকে না। নিউজ এডিটার কমলবাবু নিরীহ লোক। কারও সাতেও থাকেন না, পাঁচেও থাকেন না। আপনার মনে কাজ ক'রে যান এবং সকলের দুনো কাজ ক'রে যান। বস্তুত পক্ষে তিনি যে নিজে কি পরিমাণ খাটেন তা একদিন তিনি অনুপস্থিত থাকলেই সকলে হাড়ে হাড়ে টের পায়। সেদিন আর কারও হাসি-তামাসা, ইয়ার্কি-গজল্লার অবসর মেলে না। সম্পাদক হরিসাধনবাবু কর্ত্তৃপক্ষের চিঠি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতেই তিনি বিব্রত হয়ে উঠলেন। তাঁর অনেক কাজ। নিশ্বাস নেওয়ার অবসর পান না। কি বিপদ দেখ! এখন তিনি কাজ করবেন, না সব ফেলে রেখে এই সব ব্যাপারের তদন্ত করবেন? তিনি লিখে দিলেন, ভবিষ্যতে এ রকম আর যাতে না হয় সে বিষয়ে তিনি অবহিত থাকবেন। দিয়ে আবার নিঃশব্দে নিজের কাজে মনোনিবেশ করলেন।

কিন্তু তিনি যত চুপি চুপি সারলেন মনে করলেন, ব্যাপারটা তত চুপি চুপি মরল না। খবরটা সাব-

এডিটারদের কানে পৌছে যথেষ্ট উষ্মার সৃষ্টি করলে। নানা প্রকার অনুমানের বলে তারা স্থির করলে এ কাজ ব্রজরাজবাবু ছাড়া আর কারও নয়। এত মাথাব্যথা কারও নেই, এ প্রবৃত্তিও আর কারও নেই। সকলেই যে কাঁটায় কাঁটায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসে, কিম্বা নির্দ্দিষ্ট সময়ে যায়—তা নয়। হয়তো কেউ দেরীতে এল, আবার হয়তো কেউ একটু সকালেই গেল। কিন্তু সে খবর হরিসাধনবাবুও রাখেন না, কমলবাবুও রাখেন না। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি তাঁর সম্পাদকীয় রচনা আর সভা-সমিতি, দেশোদ্ধার নিয়েই আছেন। আর শেষোক্ত ব্যক্তি যখন কাজে বসেন তখন পাশ দিয়ে হাতী গেলেও টের পান না। ব্রজরাজবাবুও অবশ্য রাত্রে আসেন। দিনের বেলায় কে কখন আসেন না আসেন তা জানা তাঁর পক্ষেও সম্ভব নয়। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে তিনি ছাড়া আর এ রকম করবার লোক কই? সুতরাং তাঁর উপরেই পড়ল সকলের রোষ।

তা সে যাই হোক, ব্যাপারটা চুকে গেছে ভেবে রোষটা আর ততদূর বাড়ল না। হাসি গল্প অবশ্য বন্ধ হ'ল না, কিন্তু সকলেই এখন থেকে যথাসময়ে আসতে যেতে লাগল।

তথাপি দেবলোক থেকে বজ্রপাত হ'ল।

সাব-এডিটাররা এক পেয়ালা ক'রে চা সামনে নিয়ে হিটলার এবং মুসোলিনীর রাষ্ট্রনীতি নিয়ে তুমুল গবেষণায় মেতে গিয়েছিল। সরিৎ এই কথা প্রমাণ করবার চেষ্টা করছিল যে—রাষ্ট্রে অল্প সময়ের মধ্যে অধিক কাজ করার প্রয়োজন থাকলে ডিক্টেটারশিপ চাই। দেশের কল্যাণের জন্ম একটা বিল তৈরি করতে হবে। ডাক কাউন্সিল, দাও বিলের নোটিশ, জনমতের জন্ম কর সে বিল প্রচার, পনেরো দিন ধ'রে চলুক বক্তৃতা, দাও ভোট—তারপরে হয়তো বিল পাশ হ'ল, হয়তো হ'ল না, আর নয়তো রইল কিছু কালের জন্ম ধামাচাপা। এমন ক'রে কাজ চলে?

চায়ের প্রসাদে সরিতের কণ্ঠ খুলে গেছে। তাকে এরা কেউ এঁটে উঠতে পারছিল না।

সুকুমার মিন মিন ক'রে বললে, তা সত্যি। তবু কোটি লোকের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ভার একজনের ওপর ছেড়ে দেওয়া শুধু যে বিপজ্জনক তাই নয়, ওতে নিজের আত্মার অপমান হয়।

সুকুমার একটা বড় কথা বললে বটে, কিন্তু মিন মিন ক'রে। মোট কথা জার্ম্মানী কিম্বা ইটালীর রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ে তার আগ্রহ নেই। সে শুধু নিছক নীতির খাতিরে তর্ক করছিল। তাই তার কথার তেমন জোর হ'ল না। সরিতের একটা ধমকেই তলিয়ে গেল।

বললে, ওঃ! আত্মার অপমান! ভারি আমার আত্মা রে! বাপ মাকে মেনে চলি, তাতে আত্মার অপমান হয় না? মাষ্টারকে মানি, তাতে আত্মার অপমান হয় না? আত্মার অপমান!

সুকুমার হেসে বললে—তাঁদের আমরা জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে বড় ব'লে মেনে নিয়েছি। কিন্তু এই হিটলার, মুসোলিনী কে? ওদের জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় কতদূর?

—বটে! ওরা বুঝি সহজ লোক! অত বড় বড় স্বাধীন জাতকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে তা বুঝি গেরাহ্যি হচ্ছে না? শুনছ হে বেতস বাবু!

নগেন গোলমালে থাকে না। সে আল্‌তো একটু হেসে একবার মাথা নাড়লে নিতান্তই অর্থশূন্যভাবে।

সে মাথানাড়া মনঃপূত না হওয়ায় সরিৎ জ্যোতির্ম্ময়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। বললে—জ্যোতি বাবু, শোন হে সুকুমারের কথা।

জ্যোতির্ম্ময় সোজা হয়ে ব'সে মোটা গলায় হাঁকলে—শূলটা? শূলটা কই হে?

সুকুমার চোখ বিস্ফারিত ক'রে বললে—আমি কি করলাম?

জ্যোতির্ম্ময় গম্ভীরভাবে বললে—তোমার জন্ম নয় হে, এই টেলিগ্রামগুলোর জন্ম।

জ্যোতির্ম্ময় টেলিগ্রাম গাঁথার তারের ফাইলকে বলে শূল, আকৃতির সৌসাদৃশ্যের জন্ম। এটা তার মামুলি রসিকতা। কিন্তু বলে লাগসই। লোকে হেসে ফেলে।

এমন সময় বেয়ারা একখানা কাগজ ওদের সামনে ফেলে দিয়ে বললে—এইটে দেখে সই ক'রে দিন।

—কি হে ওটা?

সুকুমার নিঃশব্দে পড়তে লাগল, জবাব দিলে না। পড়া শেষ হ'লে সরিতের হাতে দিলে। সরিৎ জোরে জোরে

পড়তে লাগল। ব্যাপারটা এই প্রকার: কর্ত্তৃপক্ষের হুকুম মত নিউজ-এডিটার নোটিশ দিচ্ছেন যে অতঃপর প্রত্যেককে নির্দ্দিষ্ট সময়ে এসে নিউজ-এডিটারের ঘরে গিয়ে হাজিরা খাতায় নাম সই ক'রে আসতে হবে। যাবার সময়ও সেই ব্যবস্থা। তিন দিন দেরী হ'লে এখন থেকে একদিনের মাইনে কাটা যাবে। আরও জানান হয়েছে যে, প্রত্যেককে অন্তত তিন কলম সংবাদ তর্জ্জমা করতে হবে। কম হ'লে তার মাইনে কাটা যাবে।

এই অপ্রত্যাশিত আদেশে সকলে কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হয়ে ব'সে রইল।

চায়ের পেয়ালাটা অবজ্ঞাভরে দূরে ঠেলে দিয়ে সরিৎ বিরক্তিভরে বলে উঠল, ধ্যেৎ তেরি চাকরী!

মুখখানি ছুঁচ ক'রে সুকুমার বললে—কেন? হিটলার তো···

সরিৎ এক ধমক দিয়ে বললে—থাম হে ছোকরা! হিটলার! হিটলার যেন পথে-পথে ছড়ানো রয়েছে কি না! মাথা চাড়া দিলেই হ'ল। তাহ'লে আর ভাবনা ছিল কি!

সুকুমার হেসে বললে—ভাবনা নেই তো! তারা বড় হিটলার, এরা ক্ষুদে হিটলার। পকেট গীতা কি গীতা নয়?

সরিৎ ঝাঁঝের সঙ্গে বললে—রসিকতা রাখ। আমি ভাবছি, ক্রমে ক্রমে ব্যাপার কি দাঁড়াচ্ছে?

—সঙ্গীন!—সুকুমার হেসে বললে—তোমার শূল কোথা, শূলপাণি? ধর শূল।

জ্যোতির্ম্ময় গম্ভীরভাবে বললে—আস্তে। দেওয়ালের কাণ আছে। দেখি হে, সইটা ক'রে দিই।

সকলে চটপট সই ক'রে নোটিশটা বেয়ারার হাতে ফিরিয়ে দিলে। বেয়ারা চ'লে গেল।

অনেকক্ষণ পরে সরিৎ বললে, সে সব দিন মনে আছে হে বেতসবাবু, যখন নিয়মিত মাইনে পেতাম না? আজ পাঁচটাকা, কাল দু'টাকা ক'রে এক এক জনের তিন চার মাসের মাইনে বাকি?

নগেন চাপা গলায় বললে, আ···স্তে।

ক্রোধে সরিতের মুখ তখনও লাল হয়ে আছে। একটু শুকনো হেসে বললে—তোমার মেসের দু'মাসের টাকা বাকি। আফিসে মাইনে পাওয়া যায় না, বাজারে ধার পাওয়া যায় না, ম্যানেজার তোমার বাক্স-বিছানা আটকে রেখে তাড়িয়ে দিতে চায়—মনে পড়ে?

সুকুমার বিস্মিতভাবে বললে—ও সব আবার কি কথা!

সরিৎ হেসে বললে—ও তুমি বুঝবে না। একটা পুরোনো কথা রোমন্থন করা গেল।

জ্যোতির্ম্ময় নিবিষ্ট মনে তর্জ্জমা করতে করতে বললে—আঃ সরিৎ! চেপে যাও না।

—আমি তো চেপে যেতেই চাই। ওরাই কেবল মনে পড়িয়ে দিচ্ছে।

কিছুক্ষণ কলমের খস খস শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না। সুকুমারও নিঃশব্দে লিখে যেতে লাগল। ওদের মুখ দেখে তার মনের মধ্যে কেবল একটা কথা কাঁটার মত খচ খচ করতে লাগল। আজকে 'সুদর্শনের' যে জমজমাট সে দেখছে, এদিন চিরকাল ছিল না। এমন একটা দিন ছিল, যেদিন কর্ম্মচারীরা নিয়মিত মাহিনাও পেত না। বহু দুঃখ সহ্য ক'রেও তারা যে সেই অদিনে কাগজখানি ছাড়েনি, আজ তাই এই সুদিনের উদয় হয়েছে। কিন্তু সেই পুরাতন কথা স্মরণ ক'রে এদের মনে আজ প্রশ্ন জেগেছে, অত যে কষ্ট সহ্য ক'রেছে সে কার জন্য? সুকুমার কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করলে না। নিজেও সে যথেষ্ট দুঃখ পেয়েছে। ফলে এ জ্ঞান তার হয়েছে যে, কঠোরতম মানুষেরও একটা দুর্ব্বল স্থান আছে। সেখানে আঘাত না দেওয়াই সমীচীন! সেও নিঃশব্দে কাজ ক'রে যেতে লাগল।

আধ ঘণ্টা ধ'রে অনেকগুলো কলম অনর্গল চলতে লাগল। কেউ কাউকে কোনো কথা বললে না। জ্যোতির্ম্ময় একটিবারও শূল চাইলে না। সরিতের হিটলার-মুসোলিনী কোথায় গেল তলিয়ে। তার মুখের চিরাভ্যস্ত হাসি গেল মিলিয়ে। নগেনের মাথা টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়েছে। সুকুমার মাঝে মাঝে ওদের মুখের দিকে আড়ে আড়ে চায়, কিন্তু কিছু বলে না। যারা সব সময় হাসে তারা যখন হঠাৎ গম্ভীর হয়, তখন বড় ভয়ঙ্কর রকমের গম্ভীর হয়।

আধ ঘণ্টা এমনি ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতার মধ্যে কেটে চলল। প্রিণ্টার সদানন্দ এসে কপি নিয়ে গেল। সদানন্দকে দেখলেই সরিতের হাসি পায়। সদানন্দর মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কপি চাই। এত কপির তাগিদ আর কোনো প্রিণ্টারের

দেখা যায় না। সরিতের দৃঢ় বিশ্বাস, কপি ও খায়। নইলে এত কপি নিয়ে মানুষ আর কি করতে পারে? কিন্তু সে কথা সদানন্দও কিছুতে স্বীকার করবে না, সরিৎও নাছোড়বান্দা। সদানন্দকে দেখলেই এই স্বীকার করাবার জন্য সরিৎ সকাতরে অনুরোধ করবেই। কিন্তু এখন আর সে সদানন্দর দিকে মুখ তুলে চাইলেই না। সদানন্দ প্রতিদিনের অভ্যস্ত প্রশ্নের প্রতীক্ষায় একটুক্ষণ দাঁড়াল বটে, কিন্তু উৎসাহের অভাবে ক্ষুণ্ণভাবেই ফিরে গেল।

এমন সময় ঝড়ের মত বেগে ঘরে ঢুকল কালীমোহন। তার কাছার একটি প্রান্ত কটিতে সংলগ্ন, অপর প্রান্ত ধূলোয় লোটাচ্ছে। স্যাণ্ডেল-পরিহিত চরণযুগল ধূলোয় সমাচ্ছন্ন। আর মাথার চুলের একটি গাছিও শায়িত নেই, সব খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্রিকেট ম্যাচের রিপোর্ট নিতে গিয়েছিল সে।

এসেই চীৎকার ক'রে বললে—আজকে অষ্ট্রেলিয়া···

সরিৎ গম্ভীরভাবে বললে—চুপ ক'রে ব'সে রিপোর্ট লেখ।

ওদের গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে আর সরিতের কথা শুনে কালীমোহন একেবারে ভড়্কে গেল। তার গলার স্বর তৎক্ষণাৎ নেমে গেল। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কেন? কি হয়েছে কি?

—ভীষণ ব্যাপার।

—কি রকম?

—বিরক্ত কোর না। চুপ ক'রে লেখ।

কালীমোহন বিব্রতভাবে সকলের মুখের দিকে পর্য্যায়ক্রমে চেয়ে বললে—কি ব্যাপার সুকুমার? কেউ মারা গেল না কি?

সুকুমার উত্তর দেবার পূর্ব্বেই জ্যোতির্ম্ময় বললে—হুঁ।

—এই সেরেছে! এখনি আবার বাণী নিতে ছুটতে হবে। কে আবার মারা গেল?

কালীমোহন বাণী নেবার জন্য তৈরি হয়ে খাতা-পেন্সিল পকেটে পুরল।

সুকুমার তার ব্যস্ততা দেখে হেসে ফেলে বললে—আর কে মারা যাবে! আমরাই গেলাম।

কালীমোহন উঠে দাঁড়িয়েছিল, আবার বসল। আশ্বস্ত হয়ে বললে, তাই বল। আমি ভাবলাম···কিন্তু তোমরা সবাই চুপচাপ। ব্যাপার কি?

সুকুমার বললে, ওই যে বললাম।

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু মারা যাব কেন?

সরিৎ আর থাকতে পারলে না। হাতের কলমটা উঁচিয়ে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললে—মারা যাব নয়, মারা গেছি। হুকুম এসেছে এখন থেকে রীতিমত মাপ হবে।

—কিসের?

—কিসের তা কমলবাবুকে জিগেস ক'রে এস।

কালীমোহন বুঝলে এ রহস্যের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করা তার সাধ্য নয়। হতাশভাবে সে ঘণ্টাটা বাজালে। বেচারা সেই দুপুরে বেরিয়েছিল, এই ফিরলে। ক্লান্তিতে গা ভেঙে পড়ছিল। বেয়ারা পাশে এসে দাঁড়াল। কিন্তু কালীমোহনের ওই এক দোষ। ঘণ্টা বাজাচ্ছে তো বাজাচ্ছেই, বেয়ারা যে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। বেয়ারা অবশেষে সামনে এসে দাঁড়াতে যেন চমক ভেঙে বললে—এই! ইয়ে—চা নিয়ে এস।

বেয়ারা চ'লে যেতেই সরিৎ আবার মুখ ভেঙচে বললে, চা পরে খাবে। আগে কমলবাবুর সঙ্গে একবার দেখা ক'রে এস।

—কেন?

—যাওই না। ঠেলাটা নিয়ে এস।

কালীমোহন হাসতে হাসতে উঠে গেল, কিন্তু ফিরে এল মুখ কালী বর্ণ ক'রে। এতক্ষণে সে ব্যাপারটা টের পেলে।

সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, কেমন?

—খুব ভাল।

কালীমোহন আর বাক্যব্যয় না ক'রে লিখতে ব'সে গেল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে লেখার পর হঠাৎ উত্তেজিতভাবে ব'লে উঠল, এ নিশ্চয় ওই ঘুঘুটার কাজ!

জ্যোতির্ম্ময় ধমক দিলে, চুপ!

কালীমোহন আবার লিখে যেতে লাগল। কিন্তু বেশীক্ষণ সে চুপ ক'রে থাকতে পারে না। তাতে এ ঘরের আবহাওয়াই অন্যরকমের হয়ে গেছে। কালীমোহন ভুলে ভুলে হঠাৎ বললে—ওঃ! সুরৎ পাল···

—আবার!

—আচ্ছা, আচ্ছা।

কালীমোহন আবার নিঃশব্দে লিখতে লাগল। দুর্ব্বার সিংহের বোলিং আর রহিম খাঁর ব্যাটিং, আর কার ক'টা রান হ'ল। কিন্তু আজকের রিপোর্ট অন্যদিনের মত জমল না।

ক'দিন এমনি চলল।

সকলে নিয়মিত আসে, নিয়মিত যায়। হাসি-তামাসা গল্প-গুজব বন্ধ। ঘরের চিরদিনের লঘু হাওয়া হঠাৎ ভারি হয়ে উঠল। কমলবাবু অবশ্য হাজিরা খাতাখানা আর ওদের ঘর থেকে নিয়ে গেলেন না। ওরা তেমনি তার বদলে আসামাত্র কমলবাবুর সঙ্গে গল্প করার অছিলায় একবার দেখা দিয়ে জানিয়ে আসত—তারা ঠিক সময়ে কাজে এসেছে। বেচারা কমলবাবু লজ্জিত হতেন, কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারতেন না। এ প্রসঙ্গ তোলাই লজ্জাকর মনে করতেন। এমনি ক'রে দিন কেটে যেতে লাগল। খবরের কাগজের আফিস একটা মস্ত বড় আড্ডা। খ্যাতিপ্রয়াসী বহু লোকই এখানে নিয়মিত আড্ডা দিতে আসেন। যাঁরা খুব বড়, তাঁরা সটান এডিটারের ঘরে গিয়ে বসেন। যাঁরা মাঝারি—তাঁরা নিউজ-এডিটারের ঘরে। আর যাঁরা উদীয়মান—তাঁরা সাব-এডিটারদের ঘরে। এই সব উদীয়মানের দল সাব-এডিটারদের মুখাকৃতি দেখে প্রমাদ গণলেন। আর তেমন আড্ডা জমে না, মুহুর্মুহু চা-ও আসে না। ব্যাপার দেখে তাঁরা আসা-যাওয়া কম করলেন।

মুস্কিল সাব-এডিটারদেরও কম হয়নি। তারা চিরকাল চুটিয়ে আড্ডা দিয়ে এসেছে। এই স্তব্ধতা তাদের কাছে কারাযন্ত্রণারও অধিক হয়েছে। কিন্তু করবে কি? বেঁধে মারে সয় ভাল। এতদিন নিয়মিত মাইনে পেত না, সে একরকম ছিল। তখন এটা চাকরী ব'লেই মনে হ'ত না। এখন নিয়মিত মাইনে পাওয়ায় কেরাণীজীবনের সূত্রপাত হয়েছে। কার সাধ্য এ চাকরী ছাড়ে! নিয়মিত মাইনের মমতা তো সোজা নয়। তার বন্ধনও বড় কঠিন ও দুশ্ছেদ্য।

কিন্তু সকলের চেয়ে বেশী মুস্কিল হয়েছে কালীমোহনের। সবাই যেমন অনর্গল গল্প করতে পারে, তেমনি চুপ ক'রেও থাকতে পারে। পারে না কালীমোহন। এত কাণ্ডের পরেও সে ভুলে ভুলে পরমোৎসাহে চীৎকার ক'রে ওঠে। তখনি অপ্রস্তুত হয়ে চুপ ক'রে যায়। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভুলে যায়। তার স্বভাবই এমনি ভোলা।

আরও একটা জিনিস ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। আড়ষ্ট আবহাওয়ায় থেকে ওদের ষ্টাইলও কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় তর্জ্জমাগুলো ইংরিজির এমন কোল ঘেঁসে যায় যে, তার অর্থই হয় না। কিন্তু তার জন্য ওরা চিন্তিত হয় না। একটি আঘাতে কাগজের থেকে ওদের মর্ম্মগত যোগ গেছে। এখন কোন রকমে তিন কলম ক'রে কপি তুলতে পারলেই ওরা দায় থেকে খালাস। লক্ষ্য রাখে শুধু সেই দিকে। আরও একটা সুবিধা বাঙ্গালা দেশের পাঠকদের নিয়ে। চাঁদপারা পাঠক। ছাই পাঁশ যাই দেবে, চাঁদের মত মুখখানি ক'রে তাই গলাধঃকরণ করবে। বলবে না এটায় নুন কম হয়েছে, ওটায় ঝাল বেশী, সেটা পান্‌সে। এ সব বাজে জিনিস নিয়ে খুঁৎ খুঁৎ করার বালাই তাদের নেই। তাদের দৃষ্টি আসল বস্তুর দিকে। সেটা হ'ল ওজন। অর্থাৎ হিসাব ক'রে দেখবে, দু'পয়সা দিয়ে যে কিনলাম তাতে কাগজ পেলাম কয় তা। সে কাগজ 'শিশি-বোতল-বিক্রি'দের কাছে বিক্রি করলে কত উশুল হতে পারে। যারা আরও বিজ্ঞ তারা হিসাব করবে, একদিনের কাগজে কত ঠোঙা হ'তে পারে। বাঙ্গালা দেশে এই হিসাবে কাগজের বড়-ছোট ভালো-মন্দ। আর লেখা? লেখার অর্থ হোক বা না হোক, তার মধ্যে যুক্তি থাক বা না থাক কিছু যায় আসে না। কেবল ভাষাটা গুরুগম্ভীর হওয়া প্রয়োজন। আর গবর্ণমেন্টকে স্থানে অস্থানে, সময়ে অসময়ে খানিকটা চুটিয়ে গালাগালি দিতে হবে সেই গুরুগম্ভীর ভাষায়—পড়লেই মনে হবে যেন পাখোয়াজ বাজছে, বুক নেচে উঠছে, চোখে জল আসছে। ব্যস। আর কিছু চাই না। এইতেই পাঠকদের মৌতাত জমে উঠবে। আর সেই জন্যই তো খবরের কাগজ কেনা।

হরিসাধনবাবু হলেন এ সম্বন্ধে জ্ঞানপাপী। বাঙ্গালা দেশে তাঁর লেখার বহু অনুরাগী পাঠক আছে। তথাপি নিজের লেখা সম্বন্ধে তিনি অন্ধ নন। সব জেনেও তাঁর এই trade-secretটি সযত্নে পালন ক'রে আসছেন, ছাড়েন নি।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি সাব-এডিটারদের ঘরে এসে

দেখলেন—সব নিঃশব্দে মাথা নীচু ক'রে লিখে যাচ্ছে। হেসে বললেন, ওঃ! এ যে বড্ড ভাল ছেলে হয়ে গেছেন দেখছি!

সবাই হেসে মুখ তুললে।

সব্বিৎ বললে—না তো কি করি বলুন। চাকরী তো আর খোয়াতে পারি না।

—তা বটে। জ্যোতির্ম্ময়বাবু, কি লিখছেন অত নিবিষ্টমনে?

—এডিটোরিয়াল।

হরিসাধনবাবু বিস্মিতভাবে হেসে বললেন, সে আবার কি?

তাঁর বিস্মিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখার দায়িত্ব তাঁর এবং তাঁর আর দু'জন সহকারীর;—সাব-এডিটারের নয়। জ্যোতির্ম্ময়কে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতে কে বললে!

হরিসাধনবাবু ঝুঁকে প'ড়ে বললেন, কি নিয়ে লিখছেন? এ কি! এতো দু'কলম হেডিং!

জ্যোতির্ম্ময় গম্ভীরভাবে বললে, হুঁ।

—তবে যে বললেন···

সব্বিৎ হেসে বললে—ওকেই ও এডিটোরিয়াল বলে। বলে, আমাদের ওই এডিটোরিয়াল।

হরিসাধনবাবু হেসে বললেন—তা মন্দ নয়। কিন্তু অত ক্ষোভ কেন? বাস্তবিক এক একদিন ক'রে আপনারাও তো এডিটোরিয়াল লিখলেই পারেন।

জ্যোতির্ম্ময় হেসে বললে—আর খবর তর্জ্জমা?

চিন্তিতভাবে হরিসাধন বললেন—সে একটা কথা। তা দিনে একজন ক'রে তো? খুব spare করা যায়।

সব্বিৎ বললে—কিচ্ছু করতে হবে না। আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। টেলিগ্রাম তর্জ্জমার চেয়ে ষ্টাইল নষ্ট করার মহৌষধ আর নেই।

সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, মিটিং থেকে ফিরছেন?

হরিসাধন বললেন, মিটিং থেকে? ব'সে ব'সে ইংরেজ তাড়াচ্ছিলাম। ওঃ! অমানিশার অন্ধকার থেকে আরম্ভ ক'রে কি কথাটাই না লিখলাম!

—'নব প্রভাতের নবীন সূর্য্য' লেখেননি?

—নিশ্চয়। কাল সকালে আর একটি ইংরেজের বাচ্চাও দেখতে পাবেন না।

—কি হবে তাদের?

—বিলেত চ'লে যাবে, আবার কি হবে? ওই লেখার পরেও যদি তারা থাকে, বুঝতে হবে ওদের লজ্জার লেশমাত্র নেই। ওদের আশা ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

—দেখা যাক।

হরিসাধনবাবু হাসতে হাসতে উঠে চ'ললেন। তাঁর আবার সন্ধ্যায় পার্টি মিটিং আছে। ফিরে এসে নিজের লেখার প্রুফ দেখবেন। তাঁর সহকারীদের লেখাও একবার চোখ বুলোতে হবে।

এইটুকু গল্পেই ওরা যেন অনেকটা আরাম পেলে। মাত্র ক'দিন ওরা নিঃশব্দে কাজ করছে, তাই যেন যুগ ব'লে মনে হচ্ছে। আর একটু আরাম করার জন্য ওরা চায়ের ফরমাস দিলে। আর আনতে দিলে মিউনিসিপাল মার্কেট থেকে কিছু চানাচুর।

এমন সময় এল দেবপ্রিয়। দেবপ্রিয়র বয়স বেশী নয়—কুড়ি একুশ বড় জোর। থার্ড ইয়ারে পড়ে। কিন্তু তাতে কি? দেবপ্রিয় বাঙ্গালা দেশে একজন নেতৃস্থানীয় সুপরিচিত ব্যক্তি। সে বাঙ্গালা দেশের ছাত্রসমিতির পাণ্ডা। এ আফিসে তার ঘন ঘন যাতায়াত আছে। কিন্তু সাব-এডিটারদের ঘরে বড় একটা আসে না। তার আড্ডার স্থান খাশ সম্পাদকের ঘরে, প্রথম শ্রেণীর নেতাদের সঙ্গে।

দেবপ্রিয় একটু গরম মেজাজেই ঘরে ঢুকল। সকলের কর্ম্মব্যস্ত আনত মুখের দিকে একবার চেয়ে বিশেষ কাকেও লক্ষ্য না ক'রে উমার সঙ্গেই প্রশ্ন করলে—আমার সেটা ছাপা হয়নি কেন?

সকলেই বিস্মিতভাবে মুখ তুলে চাইলে।

সুকুমার ওকে চিনত না। সে অল্পদিন হ'ল এসেছে। মাত্র এ ঘরে যারা আসে তাদের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছে, আর কারও সঙ্গে নয়। ওর ঔদ্ধত্যে বিরক্তও হ'ল, বিস্মিতও হ'ল।

কেউ কোন উত্তর দেবার পূর্ব্বেই সেও উমার সঙ্গে উত্তর দিলে, আপনার কোন্‌টা ছাপা হয়নি।

ওর উম্মা দেখে দেবপ্রিয় যেন একটু দমে গেল। একটা সাব-এডিটারের এতটা স্পর্দ্ধা সে প্রত্যাশা করেনি। ঈষৎ নরম হ'য়ে বললে, আমার সেই বিবৃতিটা?

সুকুমার তেমনি স্বরেই বললে—আপনার কোন বিবৃতিটা ?

জ্যোতির্ম্ময় তাড়াতাড়ি সুকুমারকে বললে—উনি দেবপ্রিয়বাবু—ছাত্রসমিতির সম্পাদক। একজন বিশিষ্ট তরুণ নেতা।

দেবপ্রিয়কে সসম্ভ্রমে বললে—বসুন, বসুন। আপনার ওটা আজকের কাগজেই যেত। কিন্তু এত বড় হয়েছে···

জ্যোতির্ম্ময় সম্ভ্রম দেখাবামাত্র দেবপ্রিয়ের পুরাতন উষ্মা ফিরে এল। মাথা নেড়ে বললে, বড় statement কি আপনারা ছাপেন না ?

জ্যোতির্ম্ময় বললে—না না, ছাপব না কেন, ছাপি। কিন্তু একেবারে তিন কলম···

—তিন কলমই যেতে হবে এবং ভাল জায়গায়। জানেন, ওটা না বেরুনোর জন্ম আমাদের কত ক্ষতি হয়েছে ? আমাদের সমিতিতে কি রকম সাড়া প'ড়ে গেছে ? তারা তো এই নিয়ে আপনাদের কর্ত্তৃপক্ষের কাছেই যেতে উদ্যত। আমিই ব'লে ক'য়ে নিরস্ত করলাম। আমরা আপনাদের কর্ত্তৃপক্ষের জন্ম এত করি, আর প্রতিদানে আপনারা···

সরিৎবাবু একটু কুটিল হেসে বললে—জানি,সবই জানি। আপনারা আছেন ব'লেই আমাদের কর্ত্তৃপক্ষের পার্টি আছে, আমাদের কাগজের এত বহুল প্রচার। কিন্তু কাগজের পৃষ্ঠা তো আমরা বাড়াতে পারি না।

জ্যোতির্ম্ময় বললে—নিয়ে এলেন রাত দশটায়···

সরিৎ বললে—তায় ইংরিজি লেখা। ওর তর্জ্জমা করতে হবে।

জ্যোতির্ম্ময় বললে—একটু ছোট করা চলে না ?

দেবপ্রিয় গম্ভীরভাবে বললে—একটি অক্ষরও না। ওইটিই আমাদের মিটিঙে পাশ হয়েছে। ঠিক হুবহু ওইটিই ছাপতে হবে।

সুকুমার ততক্ষণে খুঁজে খুঁজে সেই বিবৃতিটি বার ক'রেছে। ভুল ইংরিজিতে লেখা টাইপ-করা ফুলস্ক্যাপ কাগজের পুরা পাঁচ পৃষ্ঠা। মনে মনে তার হাসি এল, এমন ইংরিজিতে না লিখলেই নয় ? বাঙ্গালায় লিখলে এমনই কি মহাভারত অশুদ্ধ হ'ত ? বিশেষ ভুল ইংরিজিতে লেখা যত সহজ, তার ঠিক অনুরূপ ভুল বাঙ্গালায় তর্জ্জমা করা তত সহজ নয়। তার কি হবে ?

সুকুমার বললে, এটা বাঙ্গালায় তর্জ্জমা ক'রে দিতে পারেন না ?

দেবপ্রিয় রাগে ওর কথার উত্তরই দিলে না, একবার ওর দিকে ফিরে চাইলে না পর্য্যন্ত। শুধু বললে—কাল যেন নিশ্চয়ই যায়, বুঝলেন ? নইলে কিন্তু ভীষণ কাণ্ড হবে।

দেবপ্রিয় চ'লে যাওয়ার জন্ম পিছন ফিরতেই সরিৎ ডাকলে—ও মশাই, শুনছেন ?

দেবপ্রিয় ফিরে দাঁড়াতেই সরিৎ হাতজোড় ক'রে বললে—কাল ওটা যাবে না। মাফ করতে হবে।

—কেন শুনি ?

—স্থানাভাব।

দেবপ্রিয়ের অনেক দিনের রোষ জমা হ'য়ে ছিল। সে একেবারে বারুদের মত ফেটে পড়ল :—স্থানাভাব ? ষোল পৃষ্ঠার কাগজে একটা statement ছাপার স্থান হয় না ? মিটিংয়ের রিপোর্ট যখন ছাপেন তখন উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আমার নামটা যে বাদ যায় সেও কি স্থানাভাবে ? যাকৃগে, আপনাদের যা খুশী করবেন। কিন্তু আমিও শেষ কথা ব'লে যাচ্ছি, আমাকে চটালে আপনাদের পার্টির সমূহ ক্ষতি হবে।

দেবপ্রিয় এক মিনিট না দাঁড়িয়ে গট্ গট্ ক'রে চলে গেল।

একটু পরে জ্যোতির্ম্ময় বললে, কথাসরিৎসাগরের জন্যই চাকরীটা অবশেষে যাবে দেখছি।

সরিৎ এতক্ষণ পরে হাসলে। সে হাসি তার সহজ হাসি নয়, অত্যন্ত কঠিন একপ্রকার হাসি। তার মুখে এমন কঠিন হাসি ইতিপূর্ব্বে কেউ দেখেনি।

সরিৎ মাথা দুলিয়ে বললে—জ্যোতির্ম্ময়, জননী নেই, জন্মভূমিও গেছে, এবারে তারও চেয়ে গরীয়সী চাকরীও যেতে বসেছে, যাবেও। তবে পেঁয়াজ পয়জার দুই কেন খাই ?

জ্যোতির্ম্ময়ও তার অনুকরণে মাথা দুলিয়ে বললে—তবে কি খাবে ? খাবি ?

সরিৎ চিন্তিতভাবে বললে, সম্ভবত। কিন্তু আমার জন্ম ভাবছি না ভাই। দেশে গিয়ে একটা মাষ্টারী করলে, কিম্বা না করলেও দু-সন্ধ্যে দুটো ডাল-ভাত জুটে যে। আমার চিন্তা তোমার জন্ম।

জ্যোতির্ম্ময় সহাস্তে বললে, আমার জন্ম ভাবতে হবে না বন্ধু। আমার অন্ন ভগবান মাপিয়ে রেখেছেন।

সরিৎ রসিকতা ক'রে ব'ললে—খবর এসেছে? কোথায়?

—অন্তরীণ শিবিরে।—জ্যোতির্ম্ময় হো হো ক'রে হেসে বললে—দু'দিন চৌমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে দুটো ফিস্‌-ফাস্‌ করলেই ব্যস। কিন্তু জননী-জন্মভূমির চেয়ে গরীয়সী চাকরী কি সত্যিই যাবে?

গলা নামিয়ে অভিনয়ের সুরে সরিৎ বললে—যাবে, সব যাবে। দেখছ না বাতাস কেমন ভারি হ'য়ে উঠেছে? আকাশ কেমন…? জান না, গৃহস্থ ধনী হ'লে সে আর পুরোনো স্মৃতির চিহ্ন মাত্র সহ্য করতে পারে না? এ বাড়ীর অতীত দুর্দ্দিনের স্মৃতি জাগিয়ে আছি আমরা ক'জন। আমাদের তাই যেতে হবে।

জ্যোতির্ম্ময় যেন চমকে উঠল। সরিতের সুতীক্ষ্ণ সত্যবাণী একেবারে ওর মর্ম্মে গিয়ে পৌঁচেছে। তাদের সম্বন্ধে কেবলই এত গণ্ডগোল হয় কেন, সে সম্বন্ধে সে অনেক ভেবেছে। কিন্তু কিছুই স্থির করতে পারেনি। এখন মনে হ'ল, সরিৎ যা বলেছে সে তার অনুমান নয়, অমূলক সন্দেহও নয়। এ তার দিব্যদৃষ্টি, এ ধ্রুব সত্য। তাদের যেতে হয়েছে।

জ্যোতির্ম্ময় মুহূর্ত্তের মধ্যে অনেক কথা ভেবে ফেললে। এই তালপত্রের ছায়াটুকু গেল। তারপরে? সে চারিদিকে খুঁজে কোথাও এতটুকু ছায়া দেখতে পেলে না। আর যারা আছে তারাও এই রকম, কিম্বা এর চেয়েও খারাপ। সর্ব্বত্রই এমনি—তালপাতার ছায়া, সঙ্কীর্ণ আশ্রয়। নিরাপদ নিশ্চিন্ততা কোথাও নেই, এ তো আর বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের তৈরি গোলামখানা নয় যে, একটা বেয়ারাকে ছাড়াতেও তিন বচ্ছর লাগবে। এ আমাদের নিজের হাতেগড়া জাতীয় প্রতিষ্ঠান। যোগ্য বেতন এরা দিতে পারে না। এখানে ত্যাগ স্বীকার ক'রে আসতে হবে, ত্যাগ স্বীকার ক'রেই যেতে হবে। হয় তো কিছু মাইনে থাকবে বাকি, নয় তো রাত দুপুরে অকস্মাৎ আসবে বরখাস্তের কুলিশ। এখানে যাও বললেই যেতে হবে, আর এক মিনিট অপেক্ষা করা চলবে না।

জ্যোতির্ম্ময় ফিক্‌ ক'রে হেসে ফেললে। বললে, সেই গানটা গাইব কথাসাগর?

—সেই 'যাবার বেলায়' গানটা?

—হ্যাঁ?

মাথা নেড়ে সরিৎ বললে—আসবার কোন গান জান না?

কুণ্ঠিতভাবে জ্যোতির্ম্ময় বললে—না ভাই।

ওই তো হে, এতকাল সংসারে রইলে, কিন্তু একটার বেশী গান শিখতে পারলে না—তাও যাবার গান।

খুব মিষ্টি ক'রে হেসে জ্যোতির্ম্ময় বললে, আরও একটা শিখেছে।

—কি গান?

—'সরল মনে সরল প্রাণে প্রাণ যদি নিতে পার…' গাইব?

সরিৎ হেসে বললে, না থাক।

সুকুমার নিঃশব্দে ওদের কথা শুনছিল। এক প্রকার রুদ্ধ নিশ্বাসে। কে এরা? সন্ন্যাসী? জীবন অকস্মাৎ ওদের কাছে এত হাল্‌কা হয়ে গেল কি ক'রে? যাদের সে নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ব'লে ভেবেছিল অকস্মাৎ তারা যেন বহু দূরে স'রে গেল—সুদূর আকাশে। তার চোখে সেখানে তারা শুকতারার মত জ্বলতে লাগল। সুকুমার স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ ব'সে রইল। তারপরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে আবার সংবাদ তর্জ্জমায় মন দিল।

ক্রমশঃ



যুধিষ্ঠিরের সময়

শ্রীঅমৃতলাল শীল

পৌষের ভারতবর্ষে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সময় নিরূপণ করা হইয়াছে, কিন্তু ঐ সময় পুরাণের সাহায্যে অন্য উপায়ে নিরূপিত হওয়া সম্ভব।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞারম্ভের অল্প পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমার্জ্জুন মগধের রাজা জরাসন্ধকে মারিয়া তাঁহার পুত্র সহদেবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। এই সহদেব কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের পক্ষাবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়া দেহ রক্ষা করেন। তাহার পর [অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর] বাইশ জন বার্হদ্রথ অর্থাৎ বৃহদ্রথবংশীয় রাজা পূর্ণ এক সহস্র বৎসর মগধে রাজ্য করেন [বিষ্ণু—৪ অংশ ২৩ অধ্যায়]। তাহার পর প্রদ্যোৎবংশীয় পাঁচ জন রাজা ১৩৮ বৎসর রাজ্য করেন। তাহার পর দশ জন শিশুনাগ-বংশীয় রাজা ৩৬০ বৎসর রাজ্য করেন। শিশুনাগবংশীয় শেষ রাজা মহানন্দিনকে মারিয়া মহাপদ্মনন্দ রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই তিনটি রাজবংশ ১০০০+১৩৮+৩৬০=১৪৯৮ বৎসর রাজ্যপালন করিয়াছিলেন। সকল পুরাণেই এই সংখ্যাগুলি এইরূপ আছে; কেবল বিষ্ণুপুরাণে শিশুনাগ বংশের রাজ্যকাল ৩৬২ বৎসর লেখা হইয়াছে; বোধ হয় এই তিন বংশের রাজত্বকালের যোগফল পূর্ণ ১৫০০ করিবার জন্য দুই বৎসর বাড়াইয়া লেখা হইয়াছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে এই তিনটি সংখ্যার যোগফল ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দেখা যায়। বিষ্ণুপুরাণে আছে:—

যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥৩২॥ [বিষ্ণু ৪।২৪]

অর্থাৎ পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দমহাপদ্মের অভিষেকের সময় পর্য্যন্ত ১০১৫ বৎসর। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে আছে—

এতদবর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চাশদুত্তরম্ (৩।৭৪।২২৭)

অর্থাৎ সময়ের পরিমাণ ১০৫০ বৎসর। বায়ুপুরাণ ও মৎস্যপুরাণেও ঠিক এই প্রকার আছে। আবার ভাগবত-পুরাণে আছে—

এতদবর্ষ সহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম (১২।২।২৬)

অর্থাৎ ১১১৫ বৎসর।

কুরুক্ষেত্রের অষ্টাদশ দিবসব্যাপী যুদ্ধ কার্ত্তিক শুক্ল চতুর্দ্দশীতে আরম্ভ হইয়া অগ্রহায়ণ শুক্ল প্রতিপদে শেষ হয় ও শেষ দিনে দুর্য্যোধন ভগ্নোরু হইয়া দেহত্যাগ করেন। তাহার পর দিবস অগ্রহায়ণ শুক্ল দ্বিতীয়া হইতে যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকাল আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ একাদশী দিন যখন শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনা অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যু সপ্তরথী দ্বারা বেষ্টিত হইয়া অধর্ম্ম-যুদ্ধে নিহত হয়েন, তখন তাঁহার পত্নী বিরাটরাজতনয়া উত্তরা গর্ভবতী ছিলেন। সার্দ্ধ চার মাস পরে চৈত্র পূর্ণিমায় অশ্বমেধযজ্ঞারম্ভের দিন তাঁহার পুত্র পরীক্ষিতের জন্ম হইল। অতএব পরীক্ষিতের জন্ম, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যারম্ভ ও মহাভারতবর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ মোটামুটি একই সময়ে ধরা যাইতে পারে।

এই পুরাণগুলির কবিরা যে সামান্য তিনটি সংখ্যা যোগ করিতে ভুল করিয়াছেন, একথা বলিলে নিজের নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ হয় ও তাঁহাদের অপমান করা হয়। বেশ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে এ ভ্রম আখরিয়া [লেখক]দের, তাহারা

এতদবর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চশতোত্তরম্

না লিখিয়া ঐরূপ ভুল পাঠ লিখিয়াছেন; কেন না ১৪৯৮ বৎসরকে মোটামুটি ১৫০০ বৎসর বলা সম্ভব। কিন্তু ১০১৫, ১০৫০ বা ১১১৫ বলা অসম্ভব।

এ ত নন্দমহাপদ্মের অভিষেক পর্য্যন্ত সময় হইল; তাহার পর নন্দবংশ পূর্ণ একশত বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন।

মহাপদ্মঃ তৎপুত্রাশ্চ একং বর্ষশতমবনীপতয়ো ভবিষ্যন্তি।
নবৈবতান নন্দান কৌটিল্যো ব্রাহ্মণঃ সমুদ্ধরিষ্যতি ॥ ৬।
তেষামভাবে মৌর্য্যাশ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি।
কৌটিল্য এব চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি ॥ ৭
[বিষ্ণু—৪।২৪]

মহাপদ্ম ও তৎপুত্রগণের রাজ্যভোগকাল একশত বৎসর। কৌটিল্য নামক একজন ব্রাহ্মণ এই নয়জন নন্দবংশীয়কেই

উচ্ছেদ করিবেন। নন্দবংশীয়গণের উচ্ছেদের পর মৌর্য্য শূদ্ররাজগণ পৃথিবী ভোগ করিবে। কৌটিল্যই মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন।

শেষ নন্দবংশীয় রাজাকে চাণক্যের সাহায্যে মাকিডোনিয়া-পতি আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্য্য ৩২২ পূর্ব্ব ঈশাব্দে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। অতএব পরীক্ষিতের জন্ম

১৪৯৮ + ১০০ + ৩২২ = ১৯২০ পূর্ব্ব ঈশাব্দ

কলিযুগের আরম্ভ ৩১০১ পূর্ব্ব ঈশাব্দে ধরা হয়, অর্থাৎ গত মাঘী পূর্ণিমাতে [২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭ ঈশাব্দ] কলির ৫০৩৭ অব্দ শেষ হইয়া ৫০৩৮ তম বৎসর আরম্ভ হইবে। অতএব পরীক্ষিতের জন্ম ৩১০১—১৯২০ = ১১৮১ কল্যাব্দের শেষে বা ১১৮২ কল্যাব্দের ঠিক দুই মাস গত হইলে চৈত্র পূর্ণিমাতে হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ জয়ের পর দিবস হইতে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যারম্ভ ধরিলে কল্যাব্দের ১১৮১ অব্দের অগ্রহায়ণের শুক্ল দ্বিতীয়া যুধিষ্ঠিরের রাজ্যারম্ভ ধরিতে হইবে ও ৩৬ বৎসর পরে ১২১৭ কল্যাব্দাতে পরীক্ষিতের রাজত্বকাল আরম্ভ হইয়াছিল।

বিষ্ণুপুরাণের স্থানান্তরে আছে যে পরীক্ষিতের সময়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘাতে ছিলেন; তখন কলির বারশত বৎসর গত হইয়াছিল।

> তে তু পরীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন দ্বিজোত্তম।
> তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দ শতাত্মকঃ॥ ৩৪
>
> [বিষ্ণু—৪।২৪]

উপরেও আমরা পাইয়াছি যে কলির ১২১৭ বৎসর গত হইলে পরীক্ষিতের রাজত্বকাল আরম্ভ হইয়াছিল, অতএব হিসাবে ভুল হয় নাই।

অন্ত্যে

শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

আট

এতদিনে তপেশ লাহিড়ী সুদিনের নাগাল পাইল। সুদিন! অর্থাৎ কিঞ্চিৎ টাকার মুখ দেখিল।

তাহার গল্পসঞ্চয়ন এবং উপন্যাসখানি প্রকাশিত হইতে না হইতে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া গেছে। ঐ দুখানিরই দ্বিতীয় সংস্করণ ও আর একখানি উপন্যাস যন্ত্রস্থ।

মেয়েদের হষ্টেলে, ছেলেদের মেস-বোর্ডিংএ, প্রবাসী বাঙ্গালীদের নিশ্চিন্ত সান্ধ্যবৈঠকে তপেশের উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর মনস্তত্ত্ব প্রসঙ্গে তুমুল বিতর্ক বসে। ক্লাবে-লাইব্রেরীতে তাহার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-ক্ষমতার কথা লইয়া নরম-গরম বাদানুবাদ হয়। সমঝদারদের অভিমত, তপেশের বই দুইখানি নাকি বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান গড্ডালিকায় বেশ একটু অভিনবত্ব লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইংরেজি-বাঙ্গালা দৈনিক মাসিক সাপ্তাহিকে তপেশের "সংসার-সমুদ্রে" ও "আঁধারে আলোর" উচ্ছ্বসিত অনুকূল সমালোচনা। গ্রন্থ প্রকাশকের মামুলী বিজ্ঞাপনে "অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথা-শিল্পী", সম্পাদকের আগামী সংখ্যার বিষয়বস্তুর পূর্ব্বাভাষে "অপরাজেয় সাহিত্যিক", সমালোচকদের নির্জ্জলা প্রশংসার চিরাচরিত ভাষায় 'খ্যাতনামা' 'প্রথিতযশা', 'লব্ধপ্রতিষ্ঠ', 'বিশিষ্ট', 'বলিষ্ঠ', প্রভৃতি বিশেষ্য-বিশেষণে আজকাল মসীমুদ্রিত তপেশ লাহিড়ীর অগ্র-পশ্চাতে হরপের ছড়াছড়ি। এক কথায় বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তপেশ অপ্রত্যাশিত প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া ফেলিয়াছে।

শান্তি-নিকেতন হইতে পাচ লাইন স্বতঃপ্রণোদিত প্রশংসা, শিবপুর হইতে পনের লাইন অভিভূত আশীর্ব্বাদ, পণ্ডিচারী হইতে সুদীর্ঘ পত্র-পরিকীর্ত্তন, লক্ষ্ণৌ হইতে অবিসংবাদী ছাড়পত্র ও অন্যান্য বড়-ছোট জহুরীদের সুচিন্তিত অভিমতগুলির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া বুদ্ধিমান গ্রন্থ-প্রকাশক রীতিমত একখানি ছোট পুস্তিকাও প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। সংবাদপত্রে পূর্ব্বদিন

বিজ্ঞপ্তি ছাপাইয়া রুই-কাতলা চুনোপুঁটি—সকল মহলেই আমন্ত্রণলিপি বিলি করিয়া, সভা ডাকিয়া, প্রবন্ধ পড়াইয়া, নিজের ঢাক দলের লোক দিয়া নিজেই বাজাইয়া লইয়া পরদিন সংবাদপত্রে সুবিধামত স্থানে প্রকাশিত করিয়া আত্ম-বিজ্ঞাপনের সকল প্রকার কলাকৌশল তপেশও পুরাপুরিই আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

নবীন লেখকদের চক্ষুশূল বিশ্বনিন্দুক 'রবিবারের পত্রাঘাত' নবাগতমাত্রকেই না চাব্‌কাইয়া জলস্পর্শ করে না, কিন্তু এই মাসিকেরই স্বনামধন্য সমালোচক রজনী রায়ও তাঁহার 'অতি-আধুনিক সাহিত্যের মর্ম্ম-উৎঘাটন' শীর্ষক এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধে সন্ধি-সমাসের বাহুল্য-ভারে তপেশকে আকাশে উঠাইয়া দিয়া লিখিয়াছেন—বিকৃত যৌন-আবেদন-ফেনিল, সমস্যাসর্ব্বস্ব, অতি-আধুনিকতম কথা-সাহিত্যের গতানুগতিক আবিল আবর্ত্তে তপেশবাবুর ভাবসুস্থ ও ভাষাসুস্থির শুভ আবির্ভাবকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দন জানাইতেছি।

সাহিত্যের পাকা জহুরী 'বীরবল'—লেখা তাঁহার ভাল লাগিয়াছে এই মর্ম্মে "দেশ-মুকুরের" সম্পাদকের মারফৎ তপেশকে এক চিঠি দিয়াছেন। পশ্চিমের কোন এক কলেজের বিশিষ্ট অধ্যাপক ও বাঙ্গালা সাহিত্যের নামজাদা সমালোচক সেদিন রেডিওতে তাঁহার সাহিত্য-বিষয়ক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে 'স্বাগত হে নবাগত' বলিয়া তপেশের প্রশস্তি গাহিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেশ-বিখ্যাত জনৈক অধ্যাপক তপেশের "আঁধারে আলো"র মৃদুলা চরিত্রের সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্যের দু'একটি সমজাতীয়া নায়িকার তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে বিস্তর ইংরেজী ও সংস্কৃত কোটেসন ঝাড়িয়াছেন। মহিলা সমাজের মুখপত্র "বিশ্বশ্রী" মাসিকপত্রের স্বনামখ্যাতা লেখিকা কুমারী উষারাণী সরকার "আঁধারে আলোর" সমালোচনার সুযোগে পশ্চিমী সাহিত্যে তাঁহার পড়াশুনার দৌড় দেখাইয়া তরুণ মহলের চমক লাগাইয়া দিয়াছেন। এত সব অনুকূল সমালোচনার মধ্যে কেবলমাত্র বাঙ্গালা সাহিত্যের enfant terrible অদ্বৈত অধিকারী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মুরুব্বিয়ানার মারফৎ পাঠকসমাজকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন—নূতন কিছু হঠাৎ এসেই চোক ধাঁধায়, তাই সন্দেহ জাগে তার সত্যিকার মূল্য সম্বন্ধে; অতএব এতখানি ভাল নয়।

'তরুণের অভিযান' মাসিক পত্রিকা অবশ্য না-গ্রহণ না-বর্জ্জন মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে: "বইখানি আমাদের ভালই লেগেছে বলতে হবে। কিন্তু তা নিয়ে এত হৈ-চৈ আমাদের বাড়াবাড়ি বলেই মনে হচ্ছে। লেখকের চিন্তার দৈন্য অবশ্য নেই, কিন্তু মাঝে মাঝে কেমন এক অবোধ্য philosophical pose নেবার দুরন্ত ঝোঁক পাঠকদের রসগ্রহণে বেশ একটু বাধা জন্মায়। কল্পনা ও কাল্পনিকতার পার্থক্য সম্বন্ধে তপেশবাবুকে সচেতন করে দিতে চাই। ঘটনার সুনিপুণ সন্নিবেশে, ডায়লগের ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্রগুলি হয়েছে একেবারে জীবন্ত, যেন তারা কথা কয়, হাত বাড়ালেই তাদের যায় ছোঁয়া। কিন্তু দুঃখের বিষয়, লেখক ভাষাকে জোর করেই সংস্কৃতের 'অক্টোপাসে' আট্‌কে রেখেছেন। ভাষার ক্রমবিকাশের পথে এই পিছু হঠা নীতি আমাদের ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার, বারে বারে একই আইডিয়ার repetition এবং যত্র-তত্র বাছা বাছা জোরালো শাঁসালো বিশেষণ প্রয়োগের দুর্নিবার লোভে পাঠক ওঠে হাঁপিয়ে। তপেশবাবুর কলমে অবশ্য অনাবশ্যক জোর আছে, আছে তাঁর প্রয়োজনাতিরিক্ত বাক্‌পটুতা—আছে শব্দের ফুলঝুরি ছড়াবার অবাঞ্ছনীয় সাফল্য। এই popular গুণটাই তাঁর দোষ হয়ে দাঁড়িয়েছে সত্যিকার সাহিত্যের দৃষ্টি-বিচারে; তপেশবাবুর কাছ থেকে আমরা অনেক ভাল জিনিস আশা করছি, তাই তাঁকে বন্ধুভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি, কলম হাতে নিয়ে তিনি যেন ভুলে না যান—The best friend of a writer is not the pen but the eraser.

ইতিমধ্যেই এক সিনেমা কোম্পানী তপেশের 'সংসার সমুদ্রে' গল্পটি অবলম্বন করিয়া একখানি ছবি তুলিবার কাজ সুরু করিয়াছে। বিখ্যাত প্রযোজক নবীন বোস ও আলোকশিল্পী ক্ষৌণীশ মিত্রের সমন্বয়ে 'সংসার সমুদ্রে'র ছায়ারূপ বাঙ্গালা-চিত্র-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিবে বলিয়া কলিকাতার সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি একমাস ধরিয়া সমস্বরে ভবিষ্যৎবাণী করিতেছে। ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড মিউজিকের ভার নিয়াছেন শান্তি-নিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র সুপ্রসিদ্ধ সুরশিল্পী ভবানী দস্তিদার। ওদিকে, রাস্তায় রাস্তায় নব নাট্যায়তনে "আঁধারে আলোর" আগমনের ওয়ালপোষ্টার পড়িয়াছে। নাট্যরূপ দিয়াছেন বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চেরই এক

উদীয়মান অভিনেতা। প্রযোজনা করিতেছেন নটশ্রেষ্ঠ নীতিশ রায়। দৃশ্যপট পরিকল্পনার ভার নিয়াছেন চিত্র-শিল্পী নিখিল দাশগুপ্ত। সুরসংযোজনা করিবেন সুপ্রসিদ্ধ রেকর্ড ও রেডিও গায়ক প্রণবেশ দত্ত। গান রচনা করিয়াছে তপেশ নিজেই।

তপেশ নাকি আর সে তপেশ নাই, তাহার লেখা-পড়ায় বিঘ্ন কত! আজ আসে এক প্রকাশক, কাল মাসিকের সম্পাদক, পরশু এক সাপ্তাহিকের চর—কোন দিন বা আসে অমুক কলেজের 'সেমিনারে' তপেশকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার অনুরোধ জানাইতে তাঁহারই প্রতিভামুগ্ধ গুটিকয়েক তরুণ ছাত্র।

বাধ্য হইয়া তপেস বাড়ীওয়ালাকে বলিয়া বাইরের দিকে রাস্তার উপরের ছোট ঘরখানি ৮৲ টাকায় ভাড়া নিয়াছে। বন্ধুবান্ধব ও অভ্যাগতরা সেখানে সময়ে-অসময়ে আসিয়া হাজির হয়। তপেশও অধিকাংশ সময়ই সেখানে বসিয়া লেখাপড়া করে। আজকাল তাহার আট আনা দামের লেখার প্যাড—পার্কার ফাউন্‌টেন পেন, ছোট্ট একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিল ও খানকয়েক চোরা-বাজারি সুন্দর চেয়ার।

সন্ধ্যার পর তপেশ সাজগোজ করিয়া বাহির হইয়া যায়। আজ সাহিত্য-পরিষদ, কাল এলবার্ট হল, পরশু ইন্‌স্‌টিটিউট, রবি বৈঠক, মিলনী কেন্দ্র, অগ্রগতি সঙ্ঘ বা ঐ জাতীয় কোন না কোন সাহিত্যবৈঠক হইতে বাসায় ফিরিতে আজকাল তপেশের রাত বাজে এগারটা। নিত্য নূতন বন্ধু লাভ। ক্রমশঃ গুণমুগ্ধ ভক্তের সংখ্যা-বৃদ্ধি। সর্ব্বত্র সাদর-সম্ভাষণ। যাহারা এই সেদিনও তপেশকে আমলই দেয় নাই, তাহারাই আজ সমীহ করিয়া কথা বলে। তপেশের জীবনে এক নূতন অধ্যায়। এতদিন ছিল ঘরে বসিয়া আত্ম-সাধনা, এখন বাহিরে আসিয়া আত্মপ্রসারণ।

এদিকে মঞ্জুলীর প্রায়ই ঘুষঘুষে জর। সঙ্গে খুস্ খুস্ কাসি। মাঝে মাঝে একটু আধটু রক্তও পড়ে—বোধহয় কাসিবার দরুণ গলা চিরিয়াই।

আট টাকা ভিজিটের এক ডাক্তার আসিয়া পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। একটি চাকর রাখা হইয়াছে, নাম তাহার নারায়ণ। বাজার করা, দোকান যাওয়া, বাসনমাজা, কাপড় ধোওয়া—এমন কি মঞ্জুলীর শরীর যেদিন খারাপ থাকে সেদিন রাঁধাবাড়ার কাজ—সব কিছুই আজকাল নারায়ণই করে। ডিস্‌পেনসারী হইতে মঞ্জুলীর ঔষধও নারায়ণই আনে। তপেশের সময় হয় না, কিন্তু খেয়াল আছে। সুতরাং কোন দিকে কোন ত্রুটি নাই। ওষুধ-পথ্য, বিধি-ব্যবস্থা, সমস্তই যথাযথ পালিত হইতেছে। তবু মঞ্জুলীর অসুখ সারে না। ওষুধের শিশিতে উপরের তাকটা ভরিয়া উঠিয়াছে।

আবার ডাক্তার দেখাইবার প্রয়োজন আছে কিনা, ঔষধ পাল্টাইয়া দেওয়া অত্যাবশ্যক কিনা, সে সব বিষয়ে তপেশের আজকাল দৃষ্টি দিবার সময় হইয়া ওঠে না। মঞ্জুলীর আজকাল প্রায় প্রত্যহই জর হইতেছে। একঘরে বাস করিয়া সে-খবরও তপেশ রাখে না। কাহার ঊর্দ্ধমুখীন হাতছানি তাহাকে আজ সব কিছু ভুলাইয়া দিয়াছে। বিজয়-উল্লাসে সে ঊর্দ্ধশ্বাসে সম্মুখপানে ছুটিয়া চলিয়াছে। জীবনের এতগুলি চড়াই-উৎরাই পার হইয়া আজ সে সার্থকতার সমতলক্ষেত্রে নামিয়া আসিয়াছে।

আরো লেখা, আরো নাম, আরো টাকা! আরো চাই প্রতিষ্ঠা—যে প্রতিষ্ঠার গোড়াপত্তন মুদ্রায়—যে উন্মত্ত উন্নয়নের প্রতি ধাপে প্রেরণা যোগায় ধাতুর ধুতুরা!

মঞ্জুলী বুকের পাশে ব্যথা বোধ করে। কিন্তু স্বামীকে সে ইহার বিন্দুবিসর্গও বলে না। অভিমান—নিদারুণ অভিমান মঞ্জুলীর। স্বামীর ঔদাসীন্যে তাহার বুক-চাপা অভিমান!

স্বামী-স্ত্রীর আলাপ-আলোচনার বেশীর ভাগই আজকাল টাকা পয়সা লইয়া। আজ তপেশ ১০০৲ টাকার একখানি চেক্ পাইয়াছে অমুখ কোম্পানী হইতে। আগামী সপ্তাহে আর্য্যস্থান পাবলিশিং হাউস হইতে ৩০০৲ টাকা পাওয়া যাইবে। 'আঁধারে-আলো' তৃতীয় সংস্করণ বাহির করিবার জন্য প্রকাশকের তাগিদ আসিয়াছে। · মঞ্জুলীর হাতে এখন কত টাকা আছে, ফুরাইয়া আসিয়া থাকিলে কালই ব্যাঙ্ক হইতে পঞ্চাশ টাকা তুলিয়া আনিতে হইবে।···সকালের জল খাবার পরোটা না হইয়া লুচি হওয়া ভাল।···হাতে আরো কিছু টাকা জমিলে দেখিয়া শুনিয়া আলো-বাতাসযুক্ত দোতলা বাসায় উঠিয়া যাইবে। এখন নয়, আগে বনীয়াদটা শক্ত হউক, নহিলে আবার যদি পুনর্মূষিকো হইতে হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য সংসার চালাইয়াও তপেশের ব্যাঙ্কের অঙ্ক কয়েক হাজারের উপরে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইচ্ছা তাহার, আরো হাজার কয়েক টাকা জমিলে অন্যত্র উঠিয়া যাইবে। আর এই স্যাঁৎসেতে বাসায় থাকিবে না। তারপর সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য ব্যবসা করিবে, অর্থাৎ একখানি মাসিকপত্র বাহির করিবে। তপেশের মতে—বাঙ্গালা দেশে খাঁটি সাহিত্যসম্বন্ধীয় পত্রিকা নাই। মাসিক-পত্রিকাগুলি সর্ব্ববিষয়ের সংমিশ্রণ। গল্প, কবিতা, উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে থাকে পুরাতত্ত্ব, রাজনীতি, সমাজ-নীতি, বিজ্ঞানবিষয়ক ও বিবিধ মুখরোচক প্রবন্ধ অর্থাৎ যাহা চাও সব-ই মিলিবে। খেলাধুলা ও রঙ্গজগতও আজকাল মাসিকের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। তপেশের মতে, ইহা এক জগা খিচুড়ী। তাহার ইচ্ছা, একখানি খাঁটি সাহিত্য-বিষয়ক মাসিক পত্র প্রকাশিত করিবে। তাহাতে থাকিবে গল্প, কবিতা, উপন্যাস, সাহিত্য সম্বন্ধে সুচিন্তিত প্রবন্ধ, দেশী-বিদেশী সাহিত্যের তুলনা মূলক সমালোচনা, বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্যরথীদের জীবনকাহিনী ও বিবিধ সাহিত্য-বিষয়ক আলাপ-আলোচনা, পত্র-যুদ্ধ, অভিযোগ প্রত্যুত্তর। সেই কাগজে নবাগতদের লেখাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচিত হইবে, তাহাদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেওয়াই হইবে তপেশের সম্পাদকীয় ধর্ম্ম।

মঞ্জুলী স্বামীর ভাবান্তর বুঝিয়া উঠিতে পারে না। মনে মনে খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া বিচার করিয়াও এতটুকু সমর্থন পায় না কোনরূপে কোন দিক দিয়া। কখনো ভাবিতে চেষ্টা করে, এ তাহার অহেতুক অভিমান। স্বামী তাহার এখন আর দশ জনের একজন নয়—আজ সে এক সবিশেষ বিশেষ। কিন্তু শত করিয়াও তপেশের ঔদাসীন্যে মন তাহার সায় দিতে চায় না।···

কেন এই ব্যবধান! নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যেও স্বামীর নিবিড় সান্নিধ্যই ছিল তাহার সকল দুঃখহরা অমৃততৃপ্তি। কারণে অকারণে স্বামী গিয়া রান্নাঘরের দুয়ারের কাছে দাঁড়াইত। কি রান্না হইতেছে সে-কথা জিজ্ঞাসা একটা ছল মাত্র—তাহার মঞ্জুলীকে অনেকক্ষণ না দেখিয়া সে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। মঞ্জুলী বুঝিত সব। তাহাকে বাদ দিয়া তপেশের কোন কিছুই সুসম্পূর্ণ ছিল না; দারিদ্র্যের মাঝখানেও সে ছিল সেদিন মহিমান্বিতা। আজ স্বামী লেখা লইয়াই ব্যস্ত থাকে। লেখা থামে, বই লইয়া বসে। দেশ-বিদেশের কত রকমের কত কি বই! লেখা-পড়ার বাহিরে যে সময়টুকু তাহাও প্রায় বাহিরেই কাটায়; সোহাগও সে মাঝে মধ্যে পায়, আদরও শোনে; কিন্তু সে যে আরো কিছু চায়। আরও কিছু যাহা এতদিন সে ঐশ্বর্য্যশালিনীর মতই পাইয়া আসিতেছিল। যখন-তখন স্ত্রীর সঙ্গে চলিত তপেশের নিজের লেখার সমালোচনা, মঞ্জুলী বুঝিতে পারে না এমন প্রসঙ্গেও তাহার ডাক পড়িত। প্রয়োজন হইত স্ত্রীর হাস্যমধুর যেন-তেন একটা মতামত। ভবিষ্যতের স্বপ্ন-চিত্রণে আবশ্যক হইত মঞ্জুলীর সহাস্য সহযোগিতা। জীবনের নবতর অভিজ্ঞতার স্বাদ-গ্রহণে স্ত্রীরও ছিল আমন্ত্রণ। স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া সেই না কত রকমের কল্পনা-গবেষণা! কত কি আবোল-তাবোল জল্পনা! স্ত্রীর চোখে স্বামী ছিল সেদিন সবজান্তা, স্বামীর চোখে স্ত্রী যেন সব-বোদ্ধা। আজ কেন এই অবহেলা? মঞ্জুলীর কান্না পায়—আজ বুঝি তাহার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। আর সে বোঝে না কিছু-ই। মূর্খ সে, অশিক্ষিতা। অযোগ্যা স্ত্রী। অভিমানও সাজে না বুঝি!······

মঞ্জুলী মাঝে মাঝে সকল অভিমান ভুলিয়া স্বামীর লেখার মাঝেই বাধা দেয়—কত কি প্রশ্ন করে। উত্তরে আর সেই সমতা নাই,—সেই উচ্ছল সমালোচনা! সংক্ষিপ্ত জবাব—বেশ উৎরাইয়া যাইতেছে; এটায় টাকা কিছু বেশী দাবী করিবে, 'মডার্ণ বুক কোম্পানী' একখানা নভেলের জন্য জোর অনুরোধ জানাইয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। মঞ্জুলী শোনে, খুসী হয়। কিন্তু আরো যেন কি সে চায়। পায় না। ফিরিয়া যায় রান্নাঘরে।

একদিন মঞ্জুলী স্বামীর সঙ্গে তাহার জনৈক সাহিত্যিক বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল।

মিসেস্ সেন, মিসেস হালদার, কুমারী মিনতি রায় সকলেরই কি সুন্দর চটুল চালচলন। ফুরফুর করিয়া ইংরেজী বুলি আওড়ায়, কথার ফুলঝুরি ছড়ায় যখন-তখন। বিতর্ক উঠিল, বর্ত্তমান যুগের সমস্যা-সর্ব্বস্ব সাহিত্য সুদূর ভবিষ্যতেও বাঁচিয়া থাকিবে কিনা। সুবিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক অবনী সোম একেবারে সন-তারিখ তিথি-নক্ষত্র সঠিক বলিয়া জানাইয়া দিলেন, কাহার কাহার লেখা গতায়ু হইতে আর বেশী দিন বাকী নাই, কোন কোন বই আরো

কিছুকাল আদর পাইতেও পারে এবং গুটিকয়েক কে-কে চিরকালই নাকি বাঁচিয়া থাকিবে। তারপরই সুরু হইল সাহিত্যে অশ্লীলতার অর্থাৎ যৌনসমস্যার মুখরোচক বিতর্ক। কতটুকু অশ্লীলতা থাকিলেও সাহিত্য শ্লীল ও সুন্দরই থাকে, কতখানি বেশী থাকিলে সাহিত্য অসুন্দর বলিয়াই অশ্লীল হইয়া পড়ে, আর নিতান্ত কত পার্সেণ্ট না থাকিলে সাহিত্য সাহিত্য-পদবাচ্যই হয় না—থার্ম্মোমিটরের সুনির্দ্দিষ্ট স্বাভাবিক ডিগ্রীর মত সাহিত্য-বিচারের এক নির্ভুল মানদণ্ড নির্ণয় করিতে অপরেশ বসুর সে কি ভীষণ বাগাড়ম্বর! এক পক্ষে তপেশ, অপর পক্ষে অপরেশ বসু। বাগযুদ্ধে তপেশের সঙ্গে আসিয়া যোগদান করিল স্বয়ং মিসেস্ বসু। কুমারী অনিমা সরকার ও পক্ষে। কত মতবাদের কাটাকাটি, কত থিয়রীর লাঠালাঠি, বাক্যবর্ষণের টেনিস খেলা যেন; বল একবার এদিকে, আবার ওদিকে।

মঞ্জুলী একপাশে চুপ করিয়া চেয়ারে বসিয়া রহিল। ভাবিল, তাহার আজ ঐখানে আসা অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা হইয়া পড়িয়াছে। এখানে আজ আর সকলেরই মূল্য আছে। ঐ আসরে সেদিন সেই যেন শুধু একটী মাত্র খুঁৎ। নিজেকে সারাক্ষণ কাহার কাছে যেন দায়ী করিতে লাগিল। বিতর্ক থামিল। মঞ্জুলী বুঝিয়া লইল, তাহার স্বামী পরাজিত হয় নাই; যে-হেতু গলাবাজি করিয়াছে তাহারাই বেশী। কিন্তু একা বুঝি সে পারিয়া উঠিত না—জিতিয়াছে মিত্রশক্তির সহযোগিতায়।

বাড়ী আসিয়া মঞ্জুলী সটান বিছানায় শুইয়া পড়িল। চোখে ঘুম নাই।···তপেশের বাহিরের জীবন এমন সুন্দর হওয়াই তো চাই। সেখানে তাহার হিংসা নাই, অভিমান নাই—অপমানও না। মঞ্জুলী শুধু চায়—তাহাদের গৃহকোণে, আপনার অধিকারের মধ্যে স্বামীর চোখে আগেকার মতই সে তেমন সববোদ্ধা সমঝদার থাকিবে। একটুখানি অনধিকার-চর্চ্চার নিরালা অধিকার শুধু! এই বড়-বেশী এতটুকু! থাকুক না বাহিরে শত মিসেস্ বসু। গৃহকোণের এই বায়ুমান যন্ত্রে সে বাহিরের আসন্ন ঝড়োহাওয়ার পূর্ব্বাভাস পাইবেই পাইবে। ঐ অতটুকু লইয়াই সে অসংখ্য কুমারী মিনতি রায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামিয়া আসিতে পারে। সুনিশ্চিত জয় তাহার ঐটুকু পাইলেই। মিসেস্ বসুদের তো কত আছে—কত চিন্তা কত ভাবনা, কত কথা, কত কি। তাহার যে আর কিছু নাই, স্বামীর সমালোচনার অক্ষম অংশ গ্রহণ হইতে বঞ্চিত হইলে সে যে নিতান্ত তুচ্ছ হইয়া পড়িবে—অনাদৃত, একান্ত রিক্ত। রহিবে শুধু রাঁধাবাড়া, খাওয়া-দাওয়া, ঘর ঝাড়া, চুল বাঁধা। আর কিছু থাকে না যে। তাহাদের দেওয়া নেওয়ার ধারাটি অব্যাহত অফুরন্ত রাখিতে যে এতটুকুরই এত বেশী প্রয়োজন। মঞ্জুলী আশা করে, এই বুঝি তাহার ডাক পড়িল।—এই বুঝি স্বামী কবিতা আবৃত্তি করিবে, গল্প পড়িবে, মতামত চাহিবে, তর্ক করিবে, হাসিবে, রাগিবে, রাগাইবে। কিন্তু তপেশ ডাকে না। এখন আর পূর্ব্বেকার সে সময়টুকু হয় না। কেবল লেখা আর পড়া, সভা ও সমিতি, চিঠি লেখালেখি।··

মঞ্জুলী বোঝে না। ভাবে—ইহা সজ্ঞান ঔদাসীন্য, ইচ্ছাকৃত অবহেলা। সে জানে, স্বামীর উপর তাহার সকল জোর, সকল আব্দার, তেমনি অধিকার আজও তাহার আছে। তবু সে মুখ ফুটিয়া সকল কথা বলিবে না। সাধিয়া জানাইতে চাহে না, গত সপ্তাহে তাহার ঔষধ ফুরাইয়া গেছে, বুকের পাশটা কেমন-কেমন করে, খুস-খুসে কাসির সঙ্গে একটু আধটু রক্ত-ও ওঠে; রাত্রে গা গরম হয় রোজই। কেন?—বলিবে কেন সে? স্বামীর কি চোখ নাই? সে কি অন্ধ না-কি?

মঞ্জুলী বুঝিল, সে এখন অনাবশ্যক, অবান্তর, একটা সরস কর্ত্তব্য মাত্র!

তপেশ আজকাল রাতদিন বই লইয়া থাকিতে চায়। দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি পড়ে। তাহার চোখে এক নূতনতর আলো-গীতি-গন্ধ-স্বাদের জগৎ। পাতায় পাতায় মণীষার মৃত্যুহীন বাণী—কালজয়ী অম্লান সাধনা, নব নব জ্ঞানের অন্বেষণ। চোখে দেখাকে সে আজকাল নূতন করিয়া দেখে, অ-দেখাকে আভাসে আস্বাদ করে। অক্ষরে অক্ষরে মানসলোকের অশ্রান্ত পরিভ্রমণের অক্ষয় পদচিহ্ন। পড়িতে পড়িতে তপেশ থামিয়া যায়, চোখ বোজে, চোখ মেলে, হাসে, ভাবে—ঐ অনির্ব্বাণ জ্যোতিষ্কমণ্ডলের চারি-পাশে অনুজ্জ্বল তারকা গোষ্ঠীর মধ্যে সে-ও একটী স্বতন্ত্র সত্ত্বা! গর্ব্বে তাহার বুক ফুলিয়া ওঠে—বিশ্বের বিরাট

বারোয়ারি-তলায় সংখ্যালঘিষ্ঠ স্বপ্নদর্শীদের মধ্যে সে-ও যে একজন! আজ সে সবারই সঙ্গে এক হইয়া-ও একটু পৃথক্। আজ সে স্বয়ং স্বতন্ত্র একটা নির্দ্দিষ্টতা। তপেশ তন্ময় হইয়া পড়িতে থাকে পূর্ব্বসূরীদের কলকথা। ঝম্ ঝম্ করিয়া মর্ম্মরিয়া ওঠে নির্জ্জীব পাতাগুলি। নাড়ীতে নাড়ীতে অনুভব করে তাঁহাদের হৃদয়-স্পন্দন! রক্তে রক্তে দোলা দেয় যেন চির-চেনা সুরের রেশ!

আজ সে ঘরের কোণে বসিয়া থাকিতে চাহিলেই থাকিতে পারিবে কেন? আজ বাহিরের ডাক আসিয়াছে, বৃহত্তর জগতের ইঙ্গিত-ইসারা—আপনাকে শত-সহস্ররূপে বহুর সঙ্গে মিলাইয়া মিশাইয়া বাজাইয়া দেখিবার আহ্বান! ইহাকে অস্বীকার করা তাহার পক্ষে যে আত্মহত্যারই নামান্তর। কিন্তু মঞ্জুলী এই রূপান্তর বুঝিয়া উঠিতে পারে না। জানিয়াও জানিতে চায় না, নবীন-প্রবীণ সহধর্ম্মীদের আলোকদীপ্ত সঙ্গলাভ আজ স্বামীকে তাহার ঘরের পরিমিতি হইতে বাহিরের ব্যাপক পরিধির মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে।

এমনি করিয়া তপেশের প্রতিষ্ঠা স্বামী-স্ত্রীর সহজ সম্বন্ধের মধ্যে যেন এক আড়াল রচিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আজ তপেশ রেডিয়োতে একটা ছোট গল্প পড়িবে। কাগজে কাগজে সেদিনের প্রোগ্রাম ছাপা হইয়াছে।

তপেশ প্রসাধন শেষ করিয়া আরশির কাছে দাঁড়াইয়া মাথা আঁচড়াইতেছিল।

তপেশের ডাইং-এণ্ড্-ক্লিনিংএর পাঞ্জাবীটার একটা সাইড্ পকেটের কোন সামান্য একটু ছিঁড়িয়া গেছে। মঞ্জুলী কহিল, "পকেটের কাছটা ছেঁড়া, ওটা বদ্‌লে যাও।"

"আর এখন গায়ে দিয়ে ফেলেছি—থাক্।"

"না-না, একটু দাঁড়াও, আমি শেলাই করে দিচ্ছি"—

"সামান্য ছেঁড়া—চোখে পড়বে না।"

মঞ্জুলী ছুঁচসুতা আনিয়া জামাটা সেলাই করিতে করিতে বলিল, "ওদের উপরের রেডিয়োতে রোজ শুনি যেন হাঁড়ির ভিতর থেকে কথা বলে। তোমার গলাও অম্‌নি শোনাবে না-কি?"

তপেশ হাসিয়া কহিল, "কেমন করে বলব।"

"আমরা সব ছ'টার সময় ওপরের ওদের ঘরে যাব। বলে রেখেছি। লবঙ্গদি, বড়দি, সুমতি—আমরা সবাই।"

"ওপরের ওরাও জানে নাকি; আমি আজ গল্প পড়ব?"

"বা রে বা, ওরা তো আমাদের আগেই জানে গো।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মঞ্জুলী কহিল, "সেদিন,—তেতলার বিপিন বাবু আছে না? তার শ্বশুরবাড়ীর মেয়েরা এসেছিল বেড়াতে; নীচে আমাদের এখানেও এসেছিল—তোমায় দেখ্‌বে বলে। আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ বসে গল্প করল। তারা নাকি প্রথমে শুনে বিশ্বাসই করতে চায় নি তপে—তুমি এ-বাড়ীতে থাক।"

তপেশ হাসিয়া কহিল, "বই পড়ে লেখক সম্বন্ধে লোকের কত কি ধারণাই থাকে। পরিচয় হ'লে দেখে সে-ও তাদেরই মত সাধারণ লোক, রক্তমাংসে গড়া।"

মঞ্জুলী প্রতিবাদের সুরে কহিল, "হ্যাঁ, তুমি সাধারণ বুঝি!"

"অবশ্য তোমার কাছে আমি অসাধারণ বৈ কি। আমারই তো আগে কত রকমের ধারণা ছিল লেখকদের সম্বন্ধে। এখন দেখি তারা আমারি মত কাপড় জামা পরে। কথা বলার ভঙ্গীও অনন্যসাধারণ নয়। তর্ক করতে বসে সাধারণের মতই রেগে উঠে—ব্যক্তিগত আক্রমণ-ও কেউ কেউ করে, প্রতিদ্বন্দ্বী লেখকের প্রশংসা শুনে উঠে যায়, সইতে পারে না। মানুষ তারা সবাই, সাধারণের চেয়ে বিশেষ কিছু অসাধারণ নয়। তফাৎ এই, তারা কলম নিয়ে কাগজের পাতায় মনের গলি-ঘুঁজির গোপনতম কথাগুলি কথার মালায় ব্যক্ত করে দিতে জানে।"

মঞ্জুলী তপেশের পায়ের দিকে চাহিয়া কহিল, "তোমার জুতোটা যে ব্রাস্ হয় নি। নারায়ণটা কোন কাজের নয়। রোজ ওকে মনে করিয়ে দিতে হবে!"

মঞ্জুলী ডাকিল, "নারায়ণ!"

"মা"

"বাবুর জুতো ব্রুস্ করিস নি কেন?"

"এই যে—যাই মা"

"আয় মা!—তোর বড্ড ভুল মন", বলিয়া মঞ্জুলী কালি ও ব্রাসটা লইয়া আসিল।

"থাক্ না—নারায়ণ আসুক্"

মঞ্জুলী জুতায় কালি মাখাইতে মাখাইতে কহিল, "তোমার এই বইটা শেষ হ'তে আর কত দেরী ?"

তপেশ উল্লসিত হইয়া কহিল, "এটা শেষ হতে অনেক সময় নেবে মঞ্জু। এটা হ'বে আমার মাষ্টারপিস্। আগের লেখাগুলোর সঙ্গে এর আকাশ-পাতাল তফাৎ। আমি যেন এ নভেলের মধ্যে আমার সমস্ত শক্তি উজাড় করে দিচ্ছি। ধীরে ধীরে এটাকে শেষ করতে হবে। বড় শক্ত আইডিয়া নিয়ে নাড়াচাড়া। এ বই দিয়ে আমি আরো বড়, আরো বড় হ'ব মঞ্জু!"

মঞ্জুলী গম্ভীর হইয়া কহিল, "আর বড় হয়ে কাজ নেই। এই তো বেশ।"

"সে কি গো ?" তপেশ হাসিয়া উঠিল।

"না, বেশী বড় হওয়া ভাল নয়।"

তপেশ হাসিতে লাগিল। মঞ্জুলীর একথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝিবার মত শক্তি তপেশ লাহিড়ীর ঘটিয়া উঠিল না।

তপেশ জুতা পায়ে দিয়া আয়নার কাছে দাঁড়াইয়া আর একবার চুলে চিরুণী বুলাইয়া লইল। মঞ্জুলী টেবিলের উপর হইতে ফাউন্টেন্ পেনটা আনিয়া আঁটিয়া দিল বুক-পকেটের কোণে। তপেশ তাহার ওষ্ঠপুটে একটী চুম্বন আঁকিয়া দিয়া কহিল, "এ কি! তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে!"

"ও তো রোজই হয় এ সময়টায়। আবার দশটার আগেই ঘাম দিয়ে ছেড়ে যায়।"

"আমায় তো বলো নি সে কথা"

মঞ্জুলী চুপ করিয়া রহিল। তপেশ প্রশ্ন করিল, "তোমার ওষুধ খাচ্ছ তো রীতিমত ?"

"ওষুধ গেল হপ্তাতেই ফুরিয়ে গেছে।"

"আর সে-খবর আমার জানতে নেই ?—তোমার এ সব ভাল নয়—তুমি যেন আজকাল কেমন হয়ে গেছ মঞ্জু!" তপেশ স্ত্রীর একখানি হাত তুলিয়া লইল।

মঞ্জুলীর মুখখানি খুসীতে ভরিয়া উঠিল। তাহার আনন্দের ছন্দোময় আবেগ বুক ঠেলিয়া উঠিতে চায়। স্বামী আজ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছে! একটুখানি।—তবু সে কতখানি!

"কাল একবার ডাক্তার মুখার্জ্জিকে কল দিতে হবে" বলিয়া তপেশ একবার ঘড়ির দিকে চাহিয়া বাহির হইয়া গেল।

ফিরিবার পথে কার্জ্জন পার্কে কমলাক্ষর সঙ্গে দেখা। একটা বেঞ্চে বসিয়া একমনে বিড়ি টানিতেছে। খালি পা। ডান গোড়ালিতে পটি বাঁধা।

"তোর পায়ে কি হ'ল কমলাক্ষ ?"—তপেশ তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া প্রশ্ন করিল।

"জখম।"

"কেমন করে ?"

"এই—এমনি করে" বলিয়া কমলাক্ষ পাটি খুলিতে বসিল। তপেশ দেখিল, পা তাহার রীতিমত অক্ষত—কোথাও একটু ফোলার লক্ষণও নাই।

"জখম আমার পায়ের হয় নি—হয়েছে আমার স্যাণ্ডেলের—স্যাণ্ডেলেরও নয়—জখম আমার মনের অর্থাৎ মানের। কাল রাত্রে কোন গতিকে হেদুয়া থেকে কাগজে মুড়ে বাসায় এনেছিলাম—আজ সকালে একটা মুচী ডেকে জোড়াতালি দেবার কাণাকড়িও ছিল না। কাজের লোক, ঘরে বসেও বা থাকি কি করে!"

দুদিন আগে হইলে তপেশ হাসিয়া উঠিত, আজ সে চুপ করিয়া বন্ধুর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

কমলাক্ষ হাসিয়া বলিয়া চলিল, "রাস্তায় যেতে-যেতে দূর থেকে কোন চেনা লোক চোখে পড়লেই একটুখানি খুঁড়িয়ে চলি—পাদুকার অভাব একথা নিতান্ত বেয়াদবও মনে করবে না।"

"তোর সেই টিউসনটা আছে তো ?"

"আছে। কিন্তু ভাই, ছেলে চরান আর ভাল লাগে না। মাইনে তো regularly irregular—যার দেবার ক্ষমতা আছে, সেও দিই-দিচ্ছি ক'রে তারিখের পর তারিখ পেছিয়ে দেয়। একটু জোর তাগিদ দিলেই মুখ কালি, যেন ওটা আমাদের পাওনা নয়—ওদের দয়া দান।"

"চাকুরি খুঁজছিস ?"

"পেয়েও আর লাভ নেই—দুদিন বাদে বিদায় করে দেবে। আমি এখন more unemployable than unemployed."

উভয়ে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

তপেশ কহিল, "চল কমলাক্ষ—আমার বাসায় চল। সেদিন মঞ্জুলীর অসুখ ছিল। নিজের হাতে চা তৈরী করে খাওয়াতে পারে নি।—তোকে একদিন নিয়ে যেতে বলেছে।"

"নাঃ, তোর বাসায় আর যাব না। মন খারাপ হয়।—বাসায় ফিরে মনে হয় তুই আমার চেয়ে সুখী—তোর দুঃখকষ্টে ভাগাভাগি আছে।"

"তা বটে! 'নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস, ওপারেতে যত সুখ আমার বিশ্বাস'।"

"আজ সুখ বৈ কি! অবশ্য দুদিন আগে তুই ছিলি আমার চেয়েও হতভাগা। আমি যেদিন প্রথম তোদের ওখানে যাই—মনে আছে তোর?—সেদিন আমাকে চা-মিষ্টি দিয়ে যে ভদ্রতা করেছিলি সে ক'টি পয়সাও পাশের ঘর থেকে হাওলাত চেয়ে আনতে হয়েছিল। ঠিক কি না?"

"তুই টের পেয়েছিলি?"

"পাই নি? তোর বৌ তোকে ইসারায় বাইরে ডেকে নিয়ে গেল, দুজনে মিনিট দুই গুজগুজ পরামর্শ করলি—তারপর তোর স্ত্রীর অন্তর্ধান, খানিক বাদে দুয়ারের ওপারে সলজ্জ পুনরাবির্ভাব—অতঃপর তোর বহির্গমন। তবু সেদিন বলি নি সে-কথা—তোরা অত করে আতিথ্যধর্ম্ম পালন করছিলি সে আনন্দ মনেপ্রাণে উপভোগ করেছি। ক্যাশবাক্সের লক্ষ্মী সেদিন না হয় একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছিল—কিন্তু তোর অচঞ্চল গৃহলক্ষ্মীকে দেখে এসেছি রে!"

তপেশ এবার একটু হাসিয়া কহিল, "দূর থেকে কবিত্ব করতে ভালই লাগে। এখনো বিয়ে করিস্ নি কি না।"

কমলাক্ষ যেন আনমনা হইয়াই বলিয়া চলিল, "তোর দুঃখকষ্টের চূড়ান্ত পরিচয় তো পেয়েই ছিলাম—অতি কুৎসিত—জঘন্য। তবু তপেশ, বাসায় ফিরে রাতটা সেদিন বড় মধুর ঠেকছিল। তোর ঐ ছন্দোহীনতার মাঝখানেও কোথায় যেন বিশ্বধ্বনির একটুখানি বাঁশী বাজছিল তাকে লাভ-লোকসানের নিক্তির ওজনে পাওয়া যায় না রে!"

তপেশ মুচকিয়া হাসিতে লাগিল।

কমলাক্ষ সুধাইল, "যাক্ সে দুর্দ্দিন আজ তুই পেরিয়ে এসেছিস। Lucky dog! কত টাকা জমালি?—ধীরেনদার কাছে শুনলাম, তুই আজকাল বেশ দু'পয়সা পাচ্ছিস্।—চেহারাও দিনের দিন দিব্বি খোল্‌তাই হচ্ছে।"

"যতটা ভাবছিস্ ততটা নয়।"

"যাক্—এবার এন্‌তার কাঁচের পেয়ালায় রিনিঝিনি গান গাইবি তো?"

তপেশ নিরুত্তর। কমলাক্ষ খানিকক্ষণ চুপ থাকিয়া গা-ভাঙ্গিয়া হাই তুলিল, "আজ তিন দিন রাত্রে ঘুমুই নি—শরীরটা ভাল লাগছে না।"

"ঘুমুস্ নি কেন?"

"আমাদের রুমের রমেনকে দেখেছিস তো?—তাদের গ্রামেরই একটি ছেলের টাইফয়েড হয়েছে।—রমেনের guest অর্থাৎ আমাদের চারজনেরই।"

"টাইফয়েড?"

"—চাকুরি খুঁজতে এসেছে কলকাতায়। আমরা না হয় ঐ ব্ল্যাক্ হোল ট্র্যাজিডিতে থেকে থেকে ডিজিজ্-প্রুফ্ হয়ে গেছি। ঐ রোগা ছেলেটার তা সইবে কেন!—অমন কচি ছেলেকে তার হতচ্ছাড়া বাপ-মা কোন প্রাণে যে শুধু গাড়ীভাড়াটা দিয়ে এই কলকাতা সহরে পাঠিয়ে দিয়েছে তাই ভাবি।"

"কেন যে পাঠিয়েছে কমলাক্ষ তা তো জানিস্।"

"জানি। কিন্তু এখন যে ডাক্তার ডাকবারও একটা পয়সা নেই। পথ্যের খরচা না হয় আমরা চারজনে কষ্টেসৃষ্টে ভাগাভাগি করে চালাচ্ছি।"

তপেশ তাহার মনিব্যাগ হইতে দশ টাকার একখানা নোট বাহির করিয়া কহিল, "একটা ডাক্তার ডেকে নিয়ে যা কমলাক্ষ।—আমি আজ রাত্রে একবার তোদের ওখানে যাব—আরো কিছু সঙ্গে নিয়ে যাব, যদি দরকার—"

কমলাক্ষ হাত বাড়াইয়া নোটখানি লইয়া কহিল, "আজ তোর দশটা টাকা দেবার মত টাকা হয়েছে—এতে আর এমন বাহাদুরি কি।"

তপেশ একটু ম্লান হাসি হাসিল, "এতে আর বাহাদুরি—"

কমলাক্ষ স্বভাবসিদ্ধ উগ্রতায় বাধা দিয়া কহিল, "রাখ্। আমরা তিন-তিনটা রাত জেগে কাটালাম। খেয়ে না খেয়ে গ্লুকোসের খরচা চালাচ্ছি। মুদীর চোক এড়াবার জন্য সার্কুলার রোড ঘুরে পাঁচ মিনিটের বেশী পথ হেঁটে

চারিদিক চেয়ে মেসে ঢুকি।—আর তুই ধক্ করে দশ টাকার একখানি নোট ফেলে দিয়ে—"

"কমলাক্ষ, তোরা যা করছিস্ আমার চেয়ে তা ঢের বেশী।"

"মিথ্যে কথা তপেশ। আমরা দিতে পারি শুধু বার্লির জল, আর হাত-পাখার বাতাস—রাতের পর রাত জেগে যম-দুয়ারে পৌঁছে দেবার সময় হা করে তাকিয়ে থাকতে পারি। আর তপেশ—তোর এই কাগজখানায় আছে একজন এম-বি, দু' শিশি ওষুধ, তিনটে ইন্‌জেকসন্, কমলা-বেদানা—হিংসে হচ্ছে সাধে! তুই একটা হঠাৎ-জাগা sentiment দিয়েই একটা মর-মর লোককেও বাঁচাতে পারিস—অন্ততঃ মৃত্যুর সঙ্গে যথাসাধ্য লড়াই করতে তো পারিস্।"

"দেরি করিস্ নে আর। আমি বাসা হয়ে তোদের ওখানে যাব।—"

কমলাক্ষ উঠিয়া দাঁড়াইল। তপেশ কহিল, "তুই আমাদের ওখানে আর একদিন যাস্। মঞ্জুলী অনুরোধ জানিয়েছে।"

"ভাল কথা?—এতক্ষণ কেবল বক্‌বক্ করলাম, আর তোর বৌ আজকাল কেমন আছে সে-কথাটা জিগ্‌গেস করাই হ'ল না। তার শরীর সেরেছে?"

"মোটেই না। আরো দিনের দিন দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে।"

"সে কি রে তপেশ! আমিই যে সেদিন ভয়ানক কাহিল দেখে এসেছি। তার চেয়েও খারাপ মানে যে রীতিমত ভয়ের কথা।"

তপেশ একটু ঢোক গিলিয়া কহিল, "ভাবছি, এ বাসাটা ছেড়ে একটা ভাল বাসায় উঠে যাব।"

"এদ্দিন যাস্ নি কেন কসাই?"

তপেশ চুপ করিয়া রহিল।

কমলাক্ষ বলিয়া চলিল, "বুঝেছি, তোকে ভবিষ্যৎ-ভাববার রোগে ধরেছে।"

"ভবিষ্যতের কথা মানুষ মাত্রেই ভাবে—পশুপক্ষী নয়।"

কমলাক্ষ টগবগ করিয়া উঠিল, "জানি রে জানি।—ছেলে-পিলে, বিপদ-আপদ, অসুখ-বিসুখ, old age—"

"ভাখ কমলাক্ষ, আমি একটা মস্ত কিছু হয়ে পড়ি নি,—আজও আমি দরিদ্র—এমনি দরিদ্রের মতই আমি থাকতে চাই।"

"আগে তুই দরিদ্র ছিলি না তপেশ—হালে হয়েছিস। —জমানো টাকা রয়ে-বসে ভোগ করা সে-ও যে দারিদ্র্য। বর্ত্তমানকে কাঁচা রেখে মোটা টাকা জমিয়ে ভবিষ্যতে পাকা ইমারত তুললেও গৃহপ্রবেশ করতে হয় ভিখারী মন নিয়েই। হতভাগা, from what a height to what a pit you have fallen."

তপেশ হাসিয়া কহিল, "একটা ভাল দেখে বাসার সন্ধান দিতে পারিস?—গোটা পঁচিশ টাকার বেশী না হয়। একখানা ঘর হ'লেও চলবে, তবে সব আলাদা চাই।"

"খোঁজ কাউকে দিতে হয় না—ইচ্ছে থাকলে আপনি মিলে।—পঁচিশের কাছে পঁয়ত্রিশেও আপত্তি ওঠে না, একখানি ঘর না পেলে দু'খানি নিতেও ইতস্তত করে না। আসলে, তুই যে-যন্ত্রে পা দিয়েছিস তারই তো বুলি গাইবি! কাঁটাল গাছে কাঁটালই জন্মায়—আম হয় না।"

তপেশ কোন প্রত্যুত্তর করিল না। সামান্য কিছু পাইয়াই সে নাকি এমন কিছু পাইয়াছে যাহাতে কমলাক্ষর সঙ্গে তাহার একটা স্তরভেদের প্রশ্ন উঠিয়াছে। কমলাক্ষর এই আক্রমণকে হিংসা, মাৎসর্য্য, অভিমান বলিয়া উড়াইয়া দিবার মত জোরাল যুক্তির ভাণ্ডার তাহার শূন্য নয়। কিন্তু মানুষের উদগ্র বুদ্ধিবৃত্তির মুখোমুখী চিরকাল যে আর একটি স্বচ্ছ সহজ দিক রহিয়াছে তপেশের সেই মর্ম্ম-মুকুরখানি একেবারে কালিমাখা নয়। তাই সে চুপ করিয়া আছে।

"সামান্য একটু হাঁফ ছাড়ার সুযোগ যখন পেয়েছিস, প্রচুর আলো-বাতাস আছে এমন একটা বাসায় উঠে যা; দেখবি দুদিনেই তোর বৌএর অসুখ সেরে যাবে—আমি আর দেরী করব না। তোর আজ আমাদের ওখানে না গেলেও চলবে। কাল সন্ধ্যেবেলা একবার যাস্। দরকার মনে করলে, আমি তোর কাছে যাব।" কথা শেষ করিয়া কমলাক্ষ হন হন করিয়া পটি-বাঁধা পায়ে সটান কার্জ্জন পার্কের কাঁকরের পথ পার হইয়া গেল।

তপেশ ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিয়াছে। তাহাকে কিছু শিখাইতে পারে, ভাবাইতে পারে, এতখানি ক্ষমতা কমলাক্ষর আছে বলিয়া অভিমানী তপেশ মানে না। কমলাক্ষর বক্তব্যকে আরো বেশী জোরাল করিয়া, বেশ গুছাইয়া—ঢের বেশী যুক্তিসহ করিয়া বলিবার ক্ষমতা তপেশেরই আছে। কিন্তু যতবারই কমলাক্ষর সঙ্গে তাহার

দেখা হয় ততবারই—কমলাক্ষর কথা নয়—মারমুখো কমলাক্ষ নিজেই যেন মূর্ত্তিমান অপমৃত্যুর মত তপেশের চোখের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। কমলাক্ষর তর্ক-বিতর্ক উপেক্ষা করা কঠিন নয়—কিন্তু কমলাক্ষকে অস্বীকার করে সে কেমন করিয়া!

বাসায় ফিরিয়া তপেশ পা ধুইতে গেছে কলতলায়। সুমতি রকের উপর দাঁড়াইয়া অনুচ্চকণ্ঠে কহিল, "দিদিকে কাল একবার ডাক্তার দেখান উচিত।"

"হ্যাঁ, আমি-ও তাই ভাব্‌ছি।" তপেশ জবাব দিল।

সুমতি কহিল, "উপরে রেডিয়ো শুনতে গিয়ে ওদের ঘরে আজ আবার রক্ত বমি ক'রে বড় দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে।"

"রক্ত বমি!"

"কেন, আপনি কিছু জানেন না? দিদির কাসির সঙ্গে প্রায়ই একটু একটু রক্ত ওঠে।"

"না—হ্যাঁ—আচ্ছা কালই আমি ডাঃ মুখার্জ্জিকে 'কল্' দিচ্ছি।"

তপেশ ঘরে ঢুকিয়াই ডাকিল, "মঞ্জু!"

মঞ্জুলী পাশ ফিরিয়া স্বামীর দিকে চাহিল।

"মঞ্জু! ঘরের কথা ঘরের লোকের আগে পরকে জানানো, এটা বুঝি মেয়েদের স্বভাব?"

"কি কথা কাকে বল্লাম?"

তপেশ উগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "তোমার মাঝেমধ্যে গলা দিয়ে রক্ত পড়ে সে-খবরটা, আমি স্বামী কি না, তাই আমার জানবার প্রয়োজন নেই! অপরকে সে-কথা জানানোয় স্বামীর মুখোজ্জ্বল হয়!"

মঞ্জুলী চুপ করিয়া রহিল। তাহার এই নীরবতা তপেশের আরো অসহ্য বোধ হইল। তীক্ষ্মস্বরে কহিল, "চুপ করে রইলে যে? জবাব দাও।"

"আমি কাউকে কিছু বলি নি।"

"তুমি বলো নি!—তারা শুনতে জানে!"

স্বামীর বিদ্রূপ বাক্যে এবার মঞ্জুলী পাল্টা খোঁচা দিল, "তাদের চোক আছে, দ্যাখে—অন্ধ নয়।"

"আর, আমি অন্ধ!—এই না? স্বীকার করি।—কিন্তু আমি ত কালা নই।"

মঞ্জুলী পাশ ফিরিয়া শুইল।

"আমি অন্ধ যদিও—কাণে তো শুনি! তুমি-ও বোবা নও।"

মঞ্জুলী নিরুত্তর।

"জবাব দাও মঞ্জু! আমিই না হয় চোখে ঠুলি প'রে ছিলাম—তোমার মুখ-ও তো ছুঁচসুতায় শেলাই করা ছিল না।"

জবাব আসিল না। মঞ্জুলীর নিঃশব্দ ক্রন্দন দেহলতায় তরঙ্গায়িত হইতেছে। কিন্তু তপেশের বিদ্রূপের ঝাঁজ একটুও কমিল না।

"অ্যাহ্! কেঁদেই জিত্‌তে চাও!" বলিয়া তপেশ বেতের আরাম কেদারায় গা-ভাঙ্গিয়া বসিয়া পড়িল। বুঝিল, জবাবের কোন প্রয়োজন নাই। সব-ই পরিষ্কার হইয়া গেছে।...তাহার ঔদাসীন্য সহস্র বার সে স্বীকার করিবে। কিন্তু মঞ্জুলীর এই যে অভিমান, এ'র কোন অর্থ আছে? তাহার কি দাবী নাই, অধিকার নাই—নাই এতদিনের সম্বন্ধের জোর?

নারী, এ অভিমান তোমার অপমান! এ যে তোমার আত্মঘাতী আত্মমর্য্যাদা? সদম্ভ আত্ম-নিপীড়ন? মস্ত বড় ভুল করিয়াছ......

ভুল যে সে-ও করিয়াছে। পথের সাথী পিছু পিছু হাঁটিয়া চলিয়াছে, এইটুকু জানিয়াই সে ছিল নিশ্চিন্ত। উদ্দাম উত্তেজনায় পিছনে তাহার দৃষ্টি ছিল না—কাণে শুধু নিঃশব্দ এক অনুসরণের অনুভূত পদধ্বনি। ক্ষত-বিক্ষত চরণে সাথী তাহার কখন যে খোঁড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে সে-খবর এতক্ষণ সে জানে নাই। জানিল—এইমাত্র। গন্তব্য স্থল ঐ যে সম্মুখে। কিন্তু সাথী বুঝি শেষ অবধি পৌঁছিতে পারিবে না...

রক্ত? বুকে ব্যথা! জ্বর। তবে কি?...

তপেশ এতক্ষণ জামাটা খুলিবার সময় পায় নাই। উঠিয়া গেল আলনার কাছে। মঞ্জুলী উঠিয়া কুঁজা হইতে জল ভরিয়া গ্লাসটা মেঝেতে রাখিল। তারপর আসন পাতিয়া দুয়ারের কাছে যাইতেই তপেশ দোর আগলাইয়া কহিল, "বাড়াবাড়িরও একটা সীমা আছে। হোঁসেল থেকে খাবারের থালা একদিন না হয় না-ই নিয়ে এলে; তাতে তোমার স্বামীসেবার বড়াইএর মুখে আগুন লাগ্‌বে না। আমি অন্ধ—খোঁড়া নই।"

মঞ্জুলী চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

"চুপ করে রইলে যে! একটা লাগ্‌সই উত্তর দাও।... মরলে বেঁচে যাব—মরতেই তো চাই—এমন ধারা একটা কিছু জবাব!"

মঞ্জুলী নিরুত্তর।

তপেশ তেমনি বলিয়া চলিল, "মরলে মানুষ বেঁচেই যায়—তুমিও বাঁচবে; কিন্তু লোকে মরে কৈ—ভোগে—অপরকেও ভোগায়, জ্বালায়—টাকার শ্রাদ্ধ হয়।"

মঞ্জুলী নীরবে বিছানায় ফিরিয়া গেল। ক্রমশঃ

প্রজ্ঞানের প্রগতি (৩)

অধ্যাপক শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু ডি-এস্‌সি

(৩)

সক্রেটীস্ চরিত্র অনবদ্য।

এ সম্বন্ধে কিছু না জানিলে তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণের দর্শনতত্ত্ব আস্বাদ করা যায় না; অপূর্ণতার ছবি রসের প্রবাহ সৃষ্টি করে না। গ্রীসীয় দর্শনের সূচনা সক্রেটীস্ হইতে। সে তত্ত্বের স্তরগুলি পাঁচটী বিশেষ বিদ্যাকে লইয়া গঠিত—ন্যায়শাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, রস-সংবেদ-বিদ্যা (æsthetics) রাষ্ট্রতত্ত্ব ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান। সক্রেটীস্ সম্প্রদায় ঐ সব বিদ্যার আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

সোফীষ্টদের তর্কাত্মক ইন্দ্রজাল ভেদ করিয়া সক্রেটীসের ভাস্বর মূর্ত্তি। প্রাচীন ভাস্কর্য্যের ধ্বংসাবশেষ স্বরূপ সক্রেটীসের যে প্রস্তরময় পূর্ব্বার্দ্ধমূর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে তাহাতে একটী অসৌষ্ঠব রূপই ফুটিয়া উঠে। খর্ব্ব আকৃতি, স্থূল অবয়ব, বৃষ স্কন্ধ, প্রশস্ত মুখবিবর, পুরু অধরোষ্ঠ, উজ্জ্বল চক্ষু, কেশবিহীন শিরোভাগ, প্রকাণ্ড বর্ত্তুল মুখমণ্ডল, উল্টান বিপুল নাসিকা, প্রসারিত নাসারন্ধ্র—যাহা কতবার পানগোষ্ঠীতে (symposium) দার্শনিকতত্ত্বের আলোচনায় স্ফীত, সুস্পষ্ট ও রঞ্জিত হইয়া উঠিত; মস্তকের গঠনটি কে বলিবে কোন দৌবারিকের ভিন্ন একজন প্রতিভাশালী দার্শনিকের! সক্রেটীসের বাহ্যমূর্ত্তি সশ্রদ্ধভাব জাগায় না, তাহা মূর্খতারই অভিব্যক্তি। কিন্তু সে প্রস্তরখোদিত প্রতিমায় স্ফুরিত হইতেছে এমন একটি করুণার প্রস্রবণ ও নিরভিমান সারল্যের ভাব—যে এই সাদাসিধা ভাবুকটি এথেন্সের সুকুমার আভিজাত যুবকগণের মনোহরণ করিবে ইহাতে বিচিত্রতা আছে বই কি! আভিজাত্যগর্ব্বী প্লেটো অথবা সংযতবাক্ সুপণ্ডিত য়্যারিষ্টটল্ অপেক্ষা কত নিবিড়-ভাবেই না তাঁহাকে আমরা জানি।

দ্বিসহস্রাধিক তিন শতাব্দীকালের আঁধার ভেদ করিয়া সে অসুন্দর রূপটি, সে মহান্ চরিত্রটী মানসপটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। আজানুলম্বিত, কুঞ্চিত, সংশ্রিত বহির্বাস ["rumpled tunic"] পরিধান করিয়া তিনি বাণিজ্য-স্থলীর মধ্য দিয়া মৃদুমন্দ গমন করিতেছেন, উদ্দাম রাষ্ট্র-তান্ত্রিকদল তাঁহাকে মুগ্ধ বা বিচলিত করিতে পারিতেছে না, কাহাকেও বা পথরোধ করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কোথাও বা পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার চতুষ্পার্শে জড় হইয়া গিয়াছে, কখনও বা দেবালয়ের দ্বারমণ্ডপের ছায়া-শীতল বীথিকায় এক সুপুষ্ট তরুণদলকে প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া গিয়া কোন পদের সংজ্ঞা বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছেন। এই দলে কত রং-বেরঙের যুবকই না তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বিশ্রম্ভালাপে মগ্ন থাকিত; ইহাঁরাই পাশ্চাত্য দর্শনের প্রতিষ্ঠায় তাঁহাকে সাহায্য করে। এই জনতায় ছিলেন ধনাঢ্য সন্তান প্লেটো ও আল্‌সিবিয়াডীস্—যাঁহারা সক্রেটীসের গণতন্ত্রের ব্যঙ্গ বিশ্লেষণে কতই না আমোদ উপভোগ করিতেন; এই জনতায় ছিলেন সমাজতান্ত্রিক (Socialist) এণ্টিস্থেনীস্—যিনি গুরুর বীতচিন্ত দারিদ্র্যের পোষকতা করিয়া একটা বিশিষ্ট ধর্ম্মই গড়িয়া তুলিয়াছিলেন; এই জনতায় ছিলেন এরিষ্টিপ্পাস্ প্রমুখাৎ বিপ্লবপন্থী—যাঁহারা এমন একটি রাজ্য স্পৃহনীয় বলিলেন যেখানে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ থাকিবে না এবং সক্রেটীসের মত সকলেই নিরুদ্বেগ ও স্বরাট হইতে পারিবে।

আধুনিক যুগে যে-সব সমস্যা মানবজাতির চিন্তাকে অহরহঃ আলোড়িত করিতেছে ও যুবকবৃন্দের অবিরাম যুক্তি-তর্কের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে, সেই সমুদয় সমস্যা সক্রেটীসের এই ক্ষুদ্র দলটিকে আলোড়িত যে করে নাই তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় না। সক্রেটীসের ন্যায় তাঁহাদের মত ছিল এই যে, সংলাপবিহীন জীবন মানুষের জীবন হইতে পারে না।

—Life without discourse would be unworthy of a man.—

সমাজবিষয়ক যাবতীয় চিন্তাই এই দলটীর কাহারও না কাহারও মনে উৎসারিত ও ঝঙ্কৃত হইত।

প্রশ্ন এই, সক্রেটীসের শিষ্যগণ তাঁহাকে এত শ্রদ্ধা করে কেন ?

গুণের আদর সর্ব্বত্র। সক্রেটীসের বাহ্যরূপ কিছুই নয়, আসলরূপ তাঁহার চরিত্র। মনুষ্যত্বই তাঁহার স্বরূপ। সক্রেটীস্ শুধু দার্শনিক নন, তিনি মানুষ। তিনি ন্যায়নিষ্ঠ। কোনও লোকের কোনওরূপ ক্ষতি তিনি জীবনে করেন নাই। এরূপ মিতাচারী যে সুখসুবিধাকে কখনও ন্যায়পরতা অপেক্ষা বরণীয় করেন নাই। এরূপ জ্ঞানী যে হিত-অহিত বিচারে তাঁহার ভুলভ্রান্তি কদাপি হয় নাই। আত্ম-সংযম বলে তিনি বলীয়ান্। তিতিক্ষায় তিনি অচলপ্রতিষ্ঠ। আচার-ব্যবহার এরূপ পরিমিত যে তাঁহার স্বল্প সংস্থানেই সকল অভাব পূরণ হইত। দুর্ম্মুখা স্ত্রীর উগ্র মেজাজ তিনি প্রশান্ত নির্ব্বিকারচিত্তে সহ্য করিতেন। নৈতিক ও মানসিক প্রকর্ষে তিনি তুল্যভাবে অদ্বিতীয়। স্বভাবতঃ তিনি সজাগ, তীক্ষ্ণ ও চিন্তাশীল। ঐ সব সদ্‌গুণের তিনি উৎকর্ষ-সাধনায় চরমে উন্নীত হইয়াছিলেন। সে যুগে জ্ঞানে সর্ব্বাপেক্ষা মেধাবী হইয়াও তিনি কথাবার্ত্তায়, আচার-ব্যবহারে, সর্ব্বস্থানে আপনাকে অতি অজ্ঞরূপে উপস্থিত করিতেন। সক্রেটীস্ জ্ঞানী অথচ বিনয়ের অবতার। এই ত সক্রেটীস্। ডেল্‌ফীর ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়াছিলেন যে গ্রীক্‌দিগের মধ্যে জ্ঞানী বলিতে সক্রেটীস্। সক্রেটীস সে উক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন :—

—One thing only I know and that is I know nothing.—

ইহা অজ্ঞতাবাদীর কথা। জ্ঞানার্জ্জন করা তিনি ভালবাসিতেন, ইহাই তাঁহার মূল প্রকৃতি। কে একজন বলিয়াছেন—He was wisdom's *amateur*, not its professional.

তিনি বলিতেন মানুষ যখনই সন্দেহ করিতে আরম্ভ করে, তখনই জ্ঞানের গোড়াপত্তন হয়। মানুষ মাত্রেই কতকগুলা বিশ্বাস, নির্দ্দিষ্ট মত (dogmas) ও সহজ-সিদ্ধান্ত (axioms) পোষণ করিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ প্রায়শঃ করে না। এই সব বিশ্বাস, মত বা সিদ্ধান্ত কিরূপে "সত্য" বলিয়া সংস্কারাবদ্ধ হইল তাহার তল্লাস প্রায় কাহাকেও করিতে দেখা যায় না। এজন্য জ্ঞানলাভ মোটেই সুকর হয় না। যে পর্য্যন্ত না মনের গতি নিজেকে পরীক্ষা করিতে "মোড় ফেরে" তাবৎ দর্শন গড়িতে পারে না। সক্রেটিস্ বলিতেন আত্মজ্ঞান লাভ কর, know thyself.

GNOTHI SEAUTON

মনের নিভৃত স্তরগুলি অন্বেষণ করিতে হইবে। মানবাত্মার স্বরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। তাহাতে অজ্ঞাতপূর্ব্ব অনেক তত্ত্বই চিদাকাশে প্রস্ফুটিত হইবে। সত্য বাহিরে নাই—অন্তরে। রবার্ট ব্রাউনিং বিষয়টি বেশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

"Truth is within ourselves ; it takes no rise
From outward things, whate'er you may believe.
There is an inmost Centre in us all,
Where Truth abides in fullness ; and around
Wall upon wall, the gross flesh hems it in,
This perfect, clear conception—which is Truth.—"

বুদ্ধিভ্রংশকারী মায়িক দেহ সত্যকে আবৃত রাখিয়া ভ্রম উৎপাদন করে। সত্যের জ্যোতিঃ অন্তরের মধ্যে অপ্রকট রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই অব্যক্তকে ব্যক্ত করিতে হইবে কোন উপায়ে। জ্ঞানের কার্য্য হইবে পন্থা নিরূপণ। সক্রেটীস্ বলিলেন,—ন্যায্যতা (justice), নীতিধর্ম্ম (morality), প্রকর্ষ (excellence ; virtue) প্রভৃতির সংজ্ঞা তত্ত্বতঃ বুঝ। এইগুলির সংজ্ঞা শুধু বিশুদ্ধরূপে জানিলেই হইবে না, ইহাদের সম্বন্ধে সূক্ষ্ম চিন্তন, প্রগাঢ় অনুচিন্তন, যথাযথ বিশ্লেষণ অপরিহার্য্য। ইহাই জ্ঞানের পন্থা—চিত্তশুদ্ধি—চিদনুশীলন। আর্য্যঋষি গাহিয়াছেন—

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো
যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।
প্রাণৈশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানাম্
যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা॥ মুণ্ডক, ৩।১।৯

বিশুদ্ধ চিত্তে এই একমাত্র সত্য আত্মাকে উপলব্ধি করিতে হয়। কিন্তু অভিজাত সন্তান ব্যতীত তাঁহাকে কেহই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিল না। ঐশ্বর্য্য-ভোগ-লোলুপ গণতান্ত্রিক দল অন্তর্দৃষ্টির কথা কি বুঝিবে ? নিত্য ধর্ম্মের কথা কি বুঝিবে ? নৈমিত্তিক ও কাম্য ধর্ম্মকে তাহারা প্রধান আসন দিয়াছে। তাহারা "সক্রেটীস্ দেবদেবী মানেন না, তরুণদের নৈতিকধর্ম্ম জলাঞ্জলি গেল, সক্রেটীস্ সমাজ-

দ্রোহী” ইত্যাদি বহুবিধ অপবাদ দিয়া তাঁহাকে বিষপানে হত্যা করাইল। তখন এথেন্সে গণতন্ত্রই রাষ্ট্রশাসক; সক্রেটীস্ সে তন্ত্রে সম্মতি দেন নাই।

সক্রেটীসের শিষ্যগণ

তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে প্লেটো, ক্রীডো, ফীডো, আল্সিবিয়াডীস্, য়্যাপোলোডোরাস্, ইউক্লাইডস্, এন্টিস্থেনীস্, এরিষ্টিপ্পাস্ প্রভৃতি ইতিহাস প্রসিদ্ধ। প্রকর্ষ ও প্রজ্ঞান এই দুইটী সক্রেটীসীয় নীতি পরবর্ত্তী দর্শনাত্মক শিক্ষা প্রসারে অনেক সাহায্য করে। সেই শিক্ষার যুগ হইল dialectic ও ethics লইয়াই। সক্রেটীস্ মন্ত্রদ্রষ্টা। তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে অনেকেই ঐ যুগল তত্ত্বের একটী-না-একটীর অনুসন্ধানে ও প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। ঐতিহাসিকগণ কতকগুলিকে “partial disciples of Socrates” বলেন। উক্ত অর্দ্ধ শিষ্যমণ্ডলীর চারিটী সম্প্রদায়ের কথা বিশ্ববিশ্রুত। প্রথম মেগারীয় বা eristic সম্প্রদায়; দ্বিতীয়, ইলিসীয় বা dialectic সম্প্রদায়; তৃতীয়, সিনিক্ সম্প্রদায়; চতুর্থ, সুখবাদী বা Cyrenaics সম্প্রদায়। শেষোক্ত সম্প্রদায় দুইটীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ethics বা নৈতিক সমস্যা লইয়া তত্ত্বনির্ণয় করা। সর্ব্বশেষে বক্তব্য প্লেটো সম্বন্ধে। তাঁহার দর্শনকে একটা বিশিষ্ট পর্য্যায়ে নিবদ্ধ করা সমীচীন; প্লেটোর দর্শন হইল systematic সুব্যবস্থিত। তিনি বোধহয় সক্রেটীসের “পূর্ণশিষ্য” হইবেন! প্লেটো শুধু যে সর্ব্বদর্শন বা সর্ব্বমতবাদের সংগ্রাহক ও সমন্বয়কর্ত্তা, তাহা নয়; পরন্তু তাঁহার প্রতিভায় জ্ঞান-বিদ্যা (epistemology) ও তত্ত্ব-বিদ্যার (ontology) দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল ‘idealism’ নামক একটী অভিনব প্রত্যয়াত্মকবাদের কঞ্চুককাঠির সাহায্যে।

মেগারীয় ও ইলিসীয় দর্শন

গ্রীসদেশস্থ য়্যাটিকা ও কোরিন্থ প্রদেশদ্বয়ের মধ্যভাগে যে উপসাগর (Saronic Gulf) বর্ত্তমান আছে তাহার উত্তর ভূখণ্ড মেগারীসের অন্তর্গত শহর ছিল মেগারা। মেগারীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হইলেন সক্রেটীস্-শিষ্য ইউক্লাইডস্ (Euclides); ইহাঁকে অনেকে Euclid বলেন। কিন্তু ইনি জ্যামিতিশাস্ত্র প্রণেতা Euclid হইতে স্বতন্ত্রব্যক্তি—যিনি প্রায় শতাব্দীকাল পরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

দুইটী মূলসূত্রের সমবায়ে মেগারীয় দর্শন [Megarian Dialectic] গঠিত হইল—সক্রেটিসের নীতিতত্ত্ব (ethical principle) ও ইলীয় দর্শনের অদ্বয়বাদ (doctrine of unity.)

ইউক্লাইড্‌স্ বলিলেন:

The Good is one, although called by many names, as Intelligence, God, Reason. The opposite of Good is without Being. The Good remains ever immutable and like Itself.

অর্থাৎ সততা—‘শিবং, অদ্বৈতং’; যদিও উহার বিভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া হয়, যেমন প্রজ্ঞা, ঈশ্বর, পরমকারণ। অশিব বস্তুর অস্তিত্ব নাই—অবাস্তব, অসৎ। শিব—নির্বিকল্প, নিত্য ও স্বস্থ।

মেগারীয় eristic এর মূলতথ্য এই।

ইউক্লাইড্‌স্ জেনোর অপ্রত্যক্ষ-প্রমাণ-পদ্ধতি [indirect proof of demonstration] অবলম্বন করেন। ‘প্রকর্ষই প্রজ্ঞান’—এই সক্রেটীসীয় মূলসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার সহিত ইলীয় অদ্বয়তত্ত্বটী সংযুক্ত করিয়া দিলেন। ইন্দ্রিয় ও অভিজ্ঞতার জগৎ হইতে স্বতন্ত্ররূপে রূপায়িত করিলেন এই “প্রজ্ঞান” বস্তুটীকে, তাঁহার অতীন্দ্রিয় বা তুরীয় তর্কবিদ্যার মধ্যদিয়া। উক্ত তর্কশাস্ত্রকে “transendental dialectic” অভিধান দেওয়া হইয়াছে। ইলীয় অদ্বয়তত্ত্ব যে “শিবং”, তাহা ঐন্দ্রিক কল্পনার বহির্ভূত সামগ্রী।

শিবই সৎ। বস্তু, বস্তুর গতি, জন্ম-বৃদ্ধি-জরা-মৃত্যু সবই ঐন্দ্রিক রচনা—“figments of the senses”; উহাদের মধ্যে বাস্তবতা নাই। প্রজ্ঞান—“আইডিয়া” বা নিত্য-প্রত্যয়স্বরূপ। এই “idea” যদিও বাস্তব ও শাশ্বত, তত্রাচ ইহার জীবন নাই, জৈবশক্তি নাই, গতি নাই কর্ম্মপ্রেরণা নাই, action বা ক্রিয়াদি নাই।

তাঁহার প্রবর্ত্তিত dialectic অনেকস্থলে অভিজ্ঞতার সহিত ঐক্য রাখিয়া চলিতে পারে নাই। ইউবুলাইড্‌স্ (Eubulides) ও আলেক্সিনাস্ (Alexinus) নামক তাঁহার শিষ্যদ্বয়ের “চুলচেরা” বিচারে সে dialectic

অসঙ্গতিতেই (*reductio ad absurdum*) পরিণত হইয়া যায়। এই যুগল দার্শনিক destructive dialectrician, তাঁহারা গঠনমূলক হেতুবাদের মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। হেতুবাদী (dialectrician) রূপে তাঁহাদের প্রখ্যাতি থাকিলেও তাঁহারা নৈতিক উৎকর্ষ বিষয়ক কোন চিন্তায় প্রণোদিত হন নাই। এমন কি তাঁহারা প্লেটো ও য়্যারিষ্টটল্‌কে পর্য্যন্ত পদে পদে আক্রমণ করিতেন। এজন্য তাঁহাদের "eristic" বা কিং তার্কিক এই অপবাদ দেওয়া হয়। সে যাহা হউক, ধীশক্তির শ্রেষ্ঠতায় সে যুগে তাঁহারা যথেষ্ট গৌরবান্বিত হন। রোমক রাজ্যের অদ্বিতীয় বাগ্মী সিসিরো তাঁহাদের নীতিকে 'মহৎ উপদেশ' [*Nobilis disciplina*] এই অভিধানে বিভূষিত করিয়া তাঁহাদিগকে ইলীয় দার্শনিক পারমিনাইড্‌স্ ও জেনোর সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন। আলেক্সিমাসের তার্কিক বিচার সম্পর্কে বহুবিধ প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে, যথা অনৃতভাষী ["The Liar], সংবৃত ["The concealed"], গোধুমমান ["The measure of grain"], সশৃঙ্গব্যক্তি ["The horned man"], কেশহীন মানুষ ["The bald head"] ইত্যাদি। সে-সব বিস্তারিত লিখিতে গেলে একখানা পুরাণ হইয়া পড়ে।

ইউক্লাইডেসের অপর শিষ্য ছিলেন Diodorus Cronus এবং তৎশিষ্য Philo হইলেন তিতিক্ষাবাদী দার্শনিক [Stoic philosopher]—জেনোর * সমসাময়িক ও বন্ধু। ইহাঁরা ব্যতীত মেগারায় Stilpo নামে একব্যক্তি ছিলেন। তিনি মেগারীয় ও সিনিক্ দর্শনের একটা সমন্বয় সাধন করেন। ষ্টিল্‌পো ছিলেন polemic, বাদানুবাদ-রসিক! আইডিয়াবাদের বিরুদ্ধে তিনি বহুবিধ যুক্তিবিচার প্রদর্শন করেন। ঐতিহাসিকগণ উক্ত তিতিক্ষাবাদী জেনোকে ষ্টিল্‌পোর শিষ্য মধ্যে গণ্য করেন। ষ্টিল্‌পো এথেন্সে শিক্ষাদান করিতেন আনুমানিক ৩২০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে। বাদানুবাদপ্রিয় ষ্টিল্‌পো ঘোষণা করেন যে যাবতীয় নৈতিক প্রচেষ্টার প্রকৃত লক্ষ্য হইবে ইন্দ্রিয়সুপ্তি।

—Insensibility is the proper end of all moral endeavour.

* ইঁহার কাল খৃঃ পূঃ ৩৫০—২৮৮ ; এজন্য ইনি ইলীয়দার্শনিক জেনো হইতে পারেন না, যাঁহার কাল ছিল খৃঃ পূঃ ৪৯০—৪২০

মধ্যগ্রীসের ইলিস্ [Elis] প্রদেশে সক্রেটীস্ শিষ্য ফীডো [Phædo] একটী বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেন; তাহাতে অনেকটা মেগারীয় দর্শনই আলোচিত হইত। তিনি কয়েকখানি দ্বন্দালাপগ্রন্থ [Dialogues] প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে ; তাঁহার দার্শনিক-তত্ত্ব বিষয়ে সবিশেষ কিছুই জ্ঞাত হওয়া যায় না। তাঁহার শিষ্য ছিলেন মেনেডীমাস্ (খৃঃ পূঃ ৩৫২-২৭৬) ; তিনি প্লেটো, ফীডো, ষ্টিল্‌পো প্রভৃতির উপদেশাবলীতে বিমুগ্ধ হইয়া ইলিসের বিদ্যামন্দিরটী তাঁহার মাতৃভূমি ইরিট্রিয়া প্রদেশে স্থানান্তরিত করেন। এজন্য মেনেডীমাসের শিষ্যগণ "Eretrians" নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। মোটের উপর মেনেডীমাস মেগারীয়বাদই পোষণ করিতেন। প্রকর্ষের একটি সংজ্ঞা তিনি দিলেন—জ্ঞানগর্ভ অন্তর্দৃষ্টি এবং তৎসঙ্গে একটা ন্যায়নিষ্ঠার প্রযত্নজড়িত থাকিবেই থাকিবে *।

সিনিক্ সম্প্রদায়

এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এণ্টিসথেনীস্ (খৃঃ পূঃ ৪৪৪-৩৬৯) এথেন্স নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে জর্জিয়াসের এবং সম্ভবত প্রোডিকাস্ ও হিপিয়াসের শিষ্য ছিলেন ; এজন্য অলঙ্কার বিদ্যায় তাঁহার বেশ ব্যুৎপত্তি ছিল। শেষ জীবনে তিনি সক্রেটীসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। প্লেটো ও য়্যারিষ্টটল্ তাঁহাকে "lacking in culture" বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। সে যাহাই হউক, এণ্টিসথেনীস্ সম্প্রদায়ের আলোচনা করিলে প্রতীতি হয় যে সক্রেটীসীয় ও তিতিক্ষাবাদীয় দর্শনের সংযোগ সাধক তত্ত্ব হইল এই "সিনিক্" দর্শন।

এণ্টিসথেনীসের মতে সংজ্ঞাই [definition : gk. *logos*] হইল বস্তুর সার। মৌলিকবস্তু ["The simple"] অবর্ণনীয়, মাত্র অভিধেয় ও উপমেয় ; বিমিশ্রপদার্থেরই ["The composite"] ব্যাখ্যাদি সম্ভবপর। ন্যায়শাস্ত্রে তিনি "এক ও বহু"র সমস্যা লইয়া যথেষ্ট চিন্তা করিয়া গিয়াছেন। অন্তরে তিনি নামবাদীই [Nominalist]

* "He defined virtue as rational insight, with which he seems like Socrates, to have considered right endeavour inseparably connected."—*Cicero.*

ছিলেন, idealism একটা বাজে কথা। তাঁহার মতে সংজ্ঞা, গুণবিধান (predication) সর্ব্বৈব মিথ্যা ও বৃথা আম্রেড়ন, tautology মাত্র। আইডিয়ার বাস্তবতা থাকিতে পারে না; কেন না উহা ব্যক্তিবিশেষের আত্মবোধ-সঞ্জাত চিন্তারই প্রতিচ্ছবি।

—Ideas donot exist save for the consciousness which thinks them.—

তিনি বলিলেন—অশ্বজন্তুটী আমার নেত্রগ্রাহ্য, কিন্তু অশ্বত্ব আমার দৃষ্টির বহির্ভূত।

—A horse I can see, but horsehood I cannot see.—

তাঁহার মতে—

"Virtue is the only good. Enjoyment, sought as an end, is an evil. The essence of virtue lies in self-control. Virtue is one. Virtue is the supreme end of human life. The good is beautiful, evil is hateful. The good is proper to us, the bad is something foreign. He who has once become virtuous and wise, cannot afterwards cease to be such…"

অর্থাৎ প্রকর্ষই শিবদ। ইন্দ্রিয়ভোগ জীবনের লক্ষ্য হইলে অনর্থ হইবে। আত্মসংযমই প্রকর্ষের সার। প্রকর্ষ অদ্বয়; ইহাই জীবনের চরম লক্ষ্য ও 'প্রয়োজন'। "শিবং সুন্দরম্"। অশিব, অপ্রীতিকর। শিব আমাদের নিজস্ব, অশিব পরকীয়। যিনি প্রকর্ষ ও প্রজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন তাঁহার সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ইত্যাদি।

সক্রেটীসের উপদেশ—Virtue is knowledge: in the ultimate harmony of morality with reason is to be found the only true existence of man—তিনি মূলতঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু "প্রজ্ঞান" কথাটীর ব্যাখ্যা অন্যরূপ দিয়াছিলেন। আমাদের ব্যবহারিক জগতে যাহা করণীয় ও বিচার্য্য তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া প্রজ্ঞান আয়ত্ব করিতে হইবে। সাধারণ মনুষ্য জীবনে যে ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তি কর্ম্মপ্রেরণায় ক্রিয়া করিতেছে, সেই ইচ্ছাশক্তির সার্থকতা যে জ্ঞানের দ্বারা লাভ হইবে তাহাকে 'প্রজ্ঞান' বলিলেন। সক্রেটীসের প্রজ্ঞানের সংজ্ঞায় যেখানে কোন ব্যক্তিগত জাতিগত ভাব নাই, এন্টিস্থেনীস্ সেখানে একটা ব্যক্তিগত ভাব আনিলেন। ন্যায়ের যুক্তি অনুসারে তিনি যেমন 'nominalist', নীতিবিজ্ঞানের (morality) যুক্তিতে তেমনি 'individual will'কে প্রাধান্য দিলেন।

ঐ ব্যক্তিবাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি তিনি করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মতে—সাধারণতঃ ঐন্দ্রিক সুখসম্ভোগ ["Pleasures"] মহা অনিষ্টকর, কেন না ইচ্ছাশক্তির উহা পরিপন্থী। কিরূপে? তিনি বলিলেন:—ধন, শক্তি বা প্রভুত্ব, লোকপ্রীতি—এ সব ন্যায়ের অধিকারকে অধিকারচ্যুত করিয়া আত্মাকে স্বাভাবিক হইতে কৃত্রিমের দিকে বিপথগামী করে। মানুষের অস্তিত্ব তাহার মনুষ্যত্বেই। তাহার সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য হইল আত্মবোধ ও আত্মোপলব্ধি—self-knowledge and self-realisation. স্বকীয় বিচারবুদ্ধি নির্দ্দেশ করে—কি উপায়ে ঐ আত্মবোধ ও আত্মোপলব্ধিকে জাগরিত করিতে হইবে, রাষ্ট্র ও সমাজের সহিত নিঃসম্পর্ক হইয়া। লক্ষ্য স্থির রাখিতে হইলে অখ্যাতি ও দারিদ্র্যকে ইষ্টপ্রদ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে; কারণ ইহারা মানুষকে বহির্মুখী না করিয়া অন্তর্মুখী করে, আত্মস্থ করে, আত্মসংযমশক্তি উপচীয়মান হইয়া বাহ্যের অপবিত্র অসার হইতে বুদ্ধিবৃত্তিকে নিশ্চয়াত্মিকা করে, নির্ম্মল করে। জ্ঞানীব্যক্তি এজন্য অভাববোধ করেন না, দেবগণের ন্যায় তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, আপ্তকাম, self-sufficing. তাঁহার চূড়ান্ত ধারণা এই—মানুষ নয় জ্ঞান লাভ করুক, না হয় আত্মঘাতী হউক।

—Let men get wisdom, or buy a rope.—

জ্ঞানী ব্যক্তি যিনি, তিনি বিশ্বনাগরিক—a citizen of the world—কোন বিশেষ দেশ বা প্রদেশের অধিবাসী নন।

এন্টিস্থেনীস্ সম্প্রদায় এইরূপ অদ্ভুত নীতি ও ধারণার অগ্রনায়ক হওয়ায় সমসাময়িকগণ দ্বারা সমালোচিত ও উপহসিত হইতেন। ডাইওজেনীস্ ও ক্রেটীস্ নামে সিনিকদ্বয় ঐ সম্প্রদায়ের মতামতগুলি সমসাময়িকগণের গ্রাহ্য করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট প্রয়াস পান। এ বিষয়ে তাঁহাদের প্রগল্‌ভতা ও অবিচক্ষণতাই সমধিক প্রকাশ পায়। তাঁহাদের সার কথা ছিল:

—Negation of the graces of the social courtesy.—

কিন্তু সামাজিক শ্লীলতার সকল মাধুর্য্য পদদলিত করিয়া স্বাভাবিক নগ্ন অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করা কি সহজ কথা ? বিবর্ত্তিত লোকব্যবহারের কৃত্রিমতায় আবৃত সমাজের অন্তর্গত মানুষ সমাজ-গত নরনারীর মজ্জাগত অনুভূতিকে আঘাত দিতে পারে কই ? কিন্তু nudismএর ধূয়া উঠিয়াছে আবার এই কৃত্রিমতায় ভরা ও যন্ত্র-সর্ব্বস্ব বিংশ শতাব্দীতেই ! যাহা হউক, এই উলঙ্গতা ও সারল্যে প্রত্যাবর্ত্তন - যাহাকে শালিনতার রূপ দিয়া ভাষান্তরিত করা হয় "return to nature" বলিয়া—উহাই সিনিক দর্শনের 'মর‍্যালিটি'। ইহাতে নাসিকা কুঞ্চনের কি আছে ? অধ্যাত্ম-বিশ্লেষণের (psycho—analysis) ফলে দেখা গিয়াছে যে মানুষের প্রকটী-বৃত্তি (exhibitionistic instinct) সহজাত, এজন্য দেহ উলঙ্গকরাও স্বভাবের আকর্ষণ। আবার সভ্যতার অরুণোদয়ে উলঙ্গতা হইতে বস্ত্র-ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে ; কিন্তু instinctকে সভ্যতা খর্ব্ব করিতে পারে নাই, মাত্র অবসৃত (displaced) করিয়াছে ; প্রকটী-বৃত্তি ব্রীড়াসমন্বিত হইয়া উন্নতস্তরেই আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য সততই উন্মুখ হইয়া আছে *। কিন্তু সিনিক্‌দের nudism ত প্রকটীবৃত্তির তাণ্ডবনৃত্য দেখান নয় ; ঐন্দ্রিক সংযম দ্বারা আত্মকেই উদ্‌বুদ্ধ করা। পার্থক্য এইখানেই। কিন্তু তাঁহাদের নৈতিকবোধ একটা সুবিধা করিল এই যে, চিত্রশিল্পী ও ভাস্করকে প্রণোদিত করিল ঐ সারল্য ও নগ্নতাকে মূর্ত্তির আকারে ফুটাইয়া তুলিতে। গ্রীসীয় শিল্প ও ভাস্কর্য্যের এইটাই হইল আর্টের বৈশিষ্ট্য।

এন্টিস্‌থেনীস্‌ তাঁহার সাদাসিধা জীবন, সরল প্রকৃতি ও সহজ শিক্ষাদানের জন্য দরিদ্র শ্রেণীকে রীতিমত আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। ডাইওজেনীস্‌ তাঁহার তপশ্চরণমূলক শিক্ষায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্য হন এবং সত্বর গুরুকে যশোগৌরবে ও জীবনের কৃচ্ছ্রসাধনায় অতিক্রম করিয়া যান। তিনি পূর্ব্বতন মত অনুসরণ করেন :—ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতা পরিত্যাজ্য, ইহাই প্রকর্ষ লাভের উপায় ; সত্তার সন্ধানে ক্ষুৎকাতরতা ও দৈহিক ক্লেশ কল্যাণপ্রদ ; মর‍্যালিটির সংজ্ঞা হইল সারল্যে প্রত্যাবর্ত্তন।

এই আরণ্যকপন্থা (?) (asceticism) অবলম্বন করিয়াছিলেন Thebes প্রদেশের ক্রেটীস্‌, তাঁহার স্ত্রী হিপ্পারকিয়া ও শ্যালক মেট্রোক্লীস্‌ এবং Syracuse নগরের মণিমাস্‌।

সিনিক্‌দের দোষযুক্ত মনোবিজ্ঞান, অনুর্ব্বর ন্যায়বিচার ও অসংস্কৃত কলাজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও দুইটী মহৎ ও আবশ্যকীয় সত্যের বিষয়ে তাঁহারা একটা সজীবতা ও গুরুত্ব আনয়ন করেন। প্রথম, "the absolute responsibility of the individual as the moral unit", অর্থাৎ নৈতিক চরিত্রের অখণ্ড মান হিসাবে ব্যক্তিবিশেষের নিরপেক্ষ দায়িত্ব ; এবং দ্বিতীয় "autocracy of the will," অর্থাৎ, এষণার স্বৈররাজ্য। এই দুইটী দান পরবর্ত্তী তিতিক্ষাবাদের পূর্ব্বাভাস মধ্যে গণ্য।

সাইরিণীয় সম্প্রদায় (Cyrenaics)

মেগারীয় ও সিনিক্‌ সম্প্রদায়ের ন্যায় সাইরিণীয় সম্প্রদায়ও সক্রেটীসীয় দর্শনের একটা বিশেষ দিক পরিপুষ্ট করিয়াছে। সক্রেটীস্‌ প্রকর্ষকেই শুভদ বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্রকর্ষের উপযোগিতা বুঝাইতে গিয়া "সুখ" কে নৈতিক ধর্ম্মের একটা গৌণ-লক্ষ্য বলিয়াছিলেন। এরিষ্টিপ্পাস সম্প্রদায় সুখকে জীবনের অভিপ্সিত সামগ্রী মনে করিলেন ; সুখই জীবনের মূল অবয়ব (factor) স্বরূপ ; প্রকর্ষের আসল মূল্য ইহা ব্যতিরেকে অপর কিছু হইতে পারে একেবারে অস্বীকার করিলেন। অতএব সুখই মুখ্য ও চরম প্রয়োজন। সাইরিণীয়গণ হইল hedonists, সুখবাদী দার্শনিক।

এরিষ্টিপ্পাস্‌ (আনুঃ খ্রীঃ পূঃ ৪৩৫-৩৫৪) এই সুখ-বাদীদের অগ্রগণ্য। সক্রেটীসের সহিত পরিচিত হইবার পূর্ব্বে তিনি প্রোটাগোরাসের দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন। মাতৃভূমি সাইরেণ (Cyrene) শহরে এবং অন্যত্র তিনি কিছুকাল শিক্ষকতাকার্য্যে ব্রতী ছিলেন। পরিশেষে সক্রেটীসের "গণ" মধ্যে পরিগণিত হইয়াও তিনি সোফীষ্ট-দিগের অনুসরণে অধ্যাপনার দরুণ পারিশ্রমিক লইতেন ;

* Clothes are, however, exquisitely ambivalent, in as much as they both cover the body and thus subserve the inhibiting tendencies that we call 'modesty', and at the same time afford a new and highly efficient means of gratifying exhibitionism on a new level."—*Flugel, The Psychology of clothes.*

সক্রেটীস্ কিন্তু এ বিষয়ের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। সুখবাদী সম্প্রদায়ের মধ্যে এরিষ্টিপ্পাসের কন্যা এরিটী (Arete) ও তাঁহার দৌহিত্র "কনিষ্ঠ এরিষ্টিপ্পাস" সুবিদিত। কনিষ্ঠ এরিষ্টিপ্পাস্ মাতৃশিক্ষিত—"mother-taught"—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। ইনি সাইরিণীয় দর্শনকে ব্যবস্থাপিত করেন। এই দর্শনের মূল তথ্যনিচয় প্লেটো তাঁহার Philebus নামক দ্বন্দালাপগ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন এবং ঐতিহ্যরত্নাকর Diogenes Lærtius তাহা সমর্থন করেন।

প্রজ্ঞান হইল প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতি—Knowledge is immediate sensation ; এজন্য ন্যায়শাস্ত্র, প্রাকৃত বিজ্ঞান প্রভৃতির জ্ঞান নিরর্থক। উক্ত অনুভূতি বেগ-সঞ্জাত—these sensations are motions. বেগ দ্বিবিধ। শুদ্ধ বিষয়গত এবং বেদনাত্মক, নির্লিপ্ত ও সুখাবহ। বেগের তীব্র, শান্ত ও সুমন্দ মাত্রার উপর যথাক্রমে বেদনা, নির্লিপ্ততা ও আনন্দ (pleasure) নির্ভর করে। আবার

—All pleasure belongs to the category of things *becoming* and not to that of things *being*.—

এজন্য সুখ হইল অবাস্তব, অসৎ। ঐন্দ্রিক অনুভূতি ব্যক্তিগত ; ইহাতে নিরপেক্ষ বিষয়াত্মক জ্ঞানের ["Absolute objective knowledge"] কোন উপাদান বর্ত্তমান নাই। অতএব বোধ ["Feeling"] হইল প্রজ্ঞান ও চরিত্রের ("conduct") একমাত্র সম্ভাব্যনিকশ। এজন্য জ্ঞাতব্য, কি প্রকারে বিষয়ের সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের অন্তরে রসহিল্লোল সঞ্চারিত হয়। বোধ [সুখবোধ ?] মাত্রেই ক্ষণিক এবং অমিশ্র (homogenous) ; অতীত ও ভবিষ্য আনন্দের কোন বাস্তবতা নাই আমাদের কাছে ; বর্ত্তমানের সুখই সুখ। সুখের রূপ, ভেদ, জাতি নাই, কিন্তু তীব্রতার (intensity) তারতম্য আছে।

সক্রেটীস্ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনায় উন্নত বিশুদ্ধ সুখানুভবের কথা বলিয়াছিলেন। সাইরিণীয় সম্প্রদায় শুদ্ধাশুদ্ধ-নির্ব্বিশেষে "রায়" দিলেন—আধিভৌতিক সুখ জটিলতা-বিবর্জ্জিত ও অতি মাত্রায় প্রবল হওয়ায় একমাত্র কাম্য ; অতঃপর ক্ষণিকসুখ, সাধারণতঃ কামজ সুখই মানুষের পক্ষে প্রেয় ও শুভকর। এক্ষণে বোদ্ধব্য, যদি কামজ সুখই চূড়ান্ত হইল, তবে ইতর জীব বা নিকৃষ্টস্তরের মানব ও ধীমান্ দার্শনিকের চিন্তায় কি প্রভেদ হইল ? তবে কি সাইরিণীয় hedonism অনাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত ? তাহা নয়। ইহাতে এমন একটী ত্রুটি সংশোধক ধর্ম্ম, এমন একটী বিশেষ 'redeeming feature' অন্তর্নিহিত আছে, যেটী ইন্দ্রিয়লালসার নিশ্চয় পোষক নয় এবং তাহা অনুচিন্তনেই উপলব্ধি হইবে। এরিষ্টিপ্পাস্ সিদ্ধান্তে এবং অনুষ্ঠানে এই জিনিসটাই বলিতে ও করিতে চাহিয়াছিলেন যে প্রকৃত সুখী সেই ব্যক্তি—যিনি ইন্দ্রিয়জয়ী ও আত্মসংযমী। প্রকৃত সুখীব্যক্তির বিমৃশ্যকারিতা ও প্রাজ্ঞতা থাকিবেই থাকিবে, যদ্দরুণ তিনি ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইতেই পারেন না। * সুখবাদের প্রতিষ্ঠাতা এরিষ্টিপ্পাস্ সিনিকদর্শনের কাছাকাছি গিয়াছিলেন। পরেও আমরা দেখিব যে এপিকুরাস (Epicurus) ও আধুনিক চিন্তার সংস্কৃত সুখবাদও তাঁহার চিন্তায় অল্পবিস্তর অনুপ্রাণিত হইয়াছে।

"The Cynics sought for independence through abstinence from enjoyment, Aristippus through the control of enjoyment in the midst of enjoyment."—

কথাটী বেশ মনোজ্ঞ, অন্ততঃ হিন্দুদের কাছে। সিনিকরা চাইতেন ইন্দ্রিয়নিরোধদ্বারা স্বারাজ্যের প্রতিষ্ঠা, এরিষ্টিপ্পাস্ বলিতেন উপভোগের মধ্যে থাকিয়া ভোগেচ্ছাকে বশীভূত করাই স্বরাট্ হওয়া। উভয় দর্শনের মধ্যে মারাত্মক প্রভেদ। এই সুখবাদী দর্শনের কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে।

> রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
> আত্মবশ্যৈ বিধেয়াত্মা প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি ॥ ২।৬৪

অর্থাৎ যাঁহার আত্মা [চিত্ত বা মন] বিধেয় [বশীভূত] হইয়াছে তিনি হইলেন 'বিধেয়াত্মা' ; এরূপ ব্যক্তি অনুরাগ ও বিদ্বেষশূন্য ; তিনি আপনার বশীভূত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা

---

* The Socratic element in the doctrine of Aristippus appears in the principle of self determination directed by knowledge and in the control of pleasure as a thing to be acquired through knowledge and culture.—*En. Bri.*

বিষয়সমূহ উপভোগ করিয়াও প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন। তাই এরিষ্টিপ্পাস্ বলিলেন,—

Not he who abstains, but he who enjoys without being carried away, is master of his pleasures.

সিনিকদের ইন্দ্রিয় নিরোধ হইল অকর্ম্ম, asceticism, প্রকৃত সন্ন্যাস নয়; কেননা ভোগের বস্তু হইতে দূরে থাকা, নির্জনতায় বাস, প্রসন্নতালাভের পক্ষে অনুকূল নয়। এ সবে আকাশের রূপ বদলায় কিন্তু মনের "ছোপ" মুছিয়া যায় না। গীতা বলিতেছেন, যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াদি উপভোগ না করিয়া ঐন্দ্রিয়-বিষয় মনে মনে স্মরণ করিয়া অবস্থিতি করেন সে কপটাচারী ও দাম্ভিক।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য যে আস্তে মনসা স্মরণ্।

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৩।৬

এজন্য ইন্দ্রিয়গণকে মনে-মনে সংযত করিয়া অনাসক্তচিত্তে ভোগের আবেষ্টনীর মধ্যেই কর্ম্ম করিতে হয়। ইহাই প্রকৃত সন্ন্যাস বা নৈষ্কর্ম্ম্য। সাইরিণীয় দর্শনের মূল বক্তব্যটী ইহাই।

প্লেটোর পূর্ব্বকথা

প্লেটোর পূর্ব্বনাম য়্যারিষ্টোক্লস্। তিনি খৃঃ পূঃ ৪২৭ অব্দের ২৭শে মে তারিখে এথেন্সে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অভিজাতবংশোদ্ভব। ডাইওনিসিয়াস্ নামক জনৈক ব্যক্তির নিকট তিনি প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষা করেন। আরগস্ প্রদেশের এরিষ্টো তাঁহাকে ব্যায়াম (gymnastics) শিক্ষা দিতেন এবং সুবিখ্যাত ড্যামন্ ও মেগীলাস্ নামক সঙ্গীতাচার্য্যদ্বয়ের শিষ্য অধ্যাপক ড্রাকো তাঁহাকে সঙ্গীত বিদ্যায় শিক্ষিত করেন। উক্ত ব্যায়াম শিক্ষকই তাঁহার "প্লেটো" এই নামকরণ করেন। যৌবনের প্রারম্ভে প্লেটো ছন্দ-বিষয়ক বহু নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন কিন্তু বিংশ বৎসর বয়সে সক্রেটীসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার পর কবিতাসুন্দরী তাঁহার মানসপটের অন্তরালে চিরতরেই আত্মগোপন করে। এই পরিচয়ের পূর্ব্বেই তিনি হিরাক্লিটাসীয় দর্শন সম্বন্ধে ক্র্যাটীলাসের নিকট শিক্ষালাভ করেন একথা য়্যারিষ্টটলের Metaphysics গ্রন্থ হইতে জানা যায়। ঐতিহাসিক Diogenes Lærtes এর মতে তিনি বিংশতিবর্ষ বয়সেই সক্রেটীসের সহিত দার্শনিক দ্বন্দ্বালাপে যোগ দেন। অতঃপর ৩৯৯ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে 'হেমলক্' নাম গুল্মমূলের নির্য্যাসে সক্রেটীসের প্রাণদণ্ড হয়। গুরুর মৃত্যুর সময় প্লেটো অষ্টাবিংশতিবর্ষ বয়স্ক। শান্তিময় জীবনের শোচনীয় পরিণামে ছাত্রের চিন্তারাজ্যে কত মর্ম্মবেদনাই জাগাইয়া দিয়াছিল! গণতন্ত্রের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষবহ্নি স্ফুলিঙ্গ উদ্গার করিতেছিল; ইতরশ্রেণী (mob) সম্বন্ধে তিনি এতাদৃশ নিদারুণ ঘৃণ্যভাব পোষণ করিলেন যাহা তাঁহার আভিজাত্যকুল ও শিক্ষা আদৌ পোষণ করে নাই। তিনি রোমক্ সেন্সর ক্রীটোর মতই ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে গণতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করিয়া জ্ঞানী শাসনতন্ত্র নামক একটী মুখ্যতন্ত্রের (oligarchy) প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। কিন্তু কি উপায়ে এই কৌটিল্য-প্রতিম জ্ঞানীজনের সন্ধান মিলিবে, দার্শনিক-রাজ জনক কোথায়—যাঁহার হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করা যাইবে, ইহাই তাঁহার জীবনের প্রধান সমস্যা হইয়া উঠিল। ইতোমধ্যে তিনি যে সক্রেটীস্‌কে বাঁচাইবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন সে সংবাদ অবগত হইয়া গণতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে সন্দিগ্ধ চক্ষে দেখিতেছিলেন। সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভব সুহৃদ্‌বর্গের প্ররোচনায় তিনি সুবর্ণ সুযোগ বুঝিয়া দীর্ঘকালের জন্য দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া পড়িলেন। প্রথমে তিনি মেগারায় ইউক্লাইড্‌স্ নিবাসে গমন করেন। তৎপরে ঈজিপ্টে পদার্পণ করেন। নীলনদবাসী ফীনিক্স-জাতীয় রাষ্ট্র-পরিচালক পুরোহিত-শ্রেণীর মুখে অবগত হইলেন যে ঈজিপ্টের সহিত তুলনায় গ্রীস্-রাজ্য একটী শিশুমাত্র—গ্রীসের না আছে একটা অচল-প্রতিষ্ঠ জাতিধর্ম্ম (tradition), না আছে গম্ভীরা সংস্কৃতি। বিদেশীর মুখে স্বদেশের অগৌরব কথা শ্রবণে মর্ম্মে আঘাত অনুভব করিলেন। এ কথা আমরণ তাঁহাকে আন্দোলিত করিয়াছিল এবং এই মর্ম্ম-প্রেরণাই তাঁহাকে কল্পিত য়ুটোপীয় (Utopian) রাজনীতি লিপিবদ্ধ করিতে প্রণোদিত করে। আঘাত (impulse) না পাইলে প্রেরণা (energy) আসে না, এই 'গতিবিদ্যা'র সত্যটী মনজগতেও খাটে! তৎপরে প্লেটো সিসিলি দ্বীপে গমন করেন। তথায় সাইরাকিউজ্ শহরে Dionysius নামক যথেচ্ছাচারী অধিনায়ক ["Tyrant"] বসতি করিতেছিলেন। তাঁহার ভগ্নিপতি Dion সহিত প্লেটোর

সম্ভাব হয়। এইস্থানে অবস্থিতি কালে প্লেটোর রাজনৈতিক স্পষ্টবাদিতায় উক্ত অধিনায়ক রুষ্ট হন এবং স্পার্টার রাজদূত (ambassador) 'পোলিগ্' এর নিকট যুদ্ধ-বন্দীরূপে প্লেটোকে "ধরাইয়া" দিয়া কিছু অর্থলাভ করেন; কিন্তু এন্নিসেরীস্ নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। মুক্তিলাভ করিয়া প্লেটো ইটালীতে পীথাগোরাস্ সম্প্রদায়ের নিকট কিছুকাল দর্শন পাঠ করেন। তাঁহাদের সারল্যময় জীবনযাপনের সঙ্গে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সমাবেশ দেখিয়া প্লেটো সাতিশয় চমৎকৃত হইয়াছিলেন। অতঃপর সাইরেন্ ও এশিয়া-মাইনর ভূ-খণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া তিনি স্বকীয় জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতে লাগিলেন; পণ্ডিতমাত্রেরই নিকট আলাপন করিয়া তিনি জ্ঞানরস পান করেন, প্রতি পীঠস্থানের ধূলি অঙ্গে লেপন করেন, প্রতি ধর্ম্মবিশ্বাস আস্বাদ করেন। প্রবাদ আছে, তিনি জুডিয়া রাজ্যে গমন করেন; তথায় সমাজতান্ত্রিক 'পয়গম্বর' সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যকাহিনীতে জীবন গঠনোপযোগী অনেক আহার্য্য পান এবং পরিশেষে প্লেটো ভারতে আসিয়া পূতসলিলা গঙ্গাতটের অধিবাসী অনেক হিন্দু-সন্ন্যাসীর নিকট নানাবিধ ধ্যান রহস্য শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। এই সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর অন্তে তিনি খৃঃ পূঃ ৩৮৭ অব্দে এথেন্সে তাঁহার দার্শনিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠান "একাডেমী" স্থাপন করেন। অতঃপর প্রায় বিশ বৎসর পরে তিনি পুনরায় সাইরাকিউজ্-শহরে গমন করেন। তখন Dionysius গত হইয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয় অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল যে যথেচ্ছাচারী কনিষ্ঠ ডাইও-নিসিয়াস্কে অন্ততঃ তাঁহার নৈতিক শিক্ষার ও রাষ্ট্রীয় তত্ত্বের প্রভাব দেখাইয়া দেওয়া; অবশ্য Dio এ বিষয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট সহায়তা করেন। কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হন নাই; বরঞ্চ Dio ও Dionysiusএর মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে এবং তিনিও প্রত্যাগমন করেন। কথিত আছে, ইহার পাঁচ বৎসর পরে তিনি তৃতীয়বার তথায় যাত্রা করেন। কিন্তু পূর্ব্বঘটিত মনোমালিন্য দূর না হওয়ায় তিনি এবারেও সফলকাম হইলেন না। ইহার পর হইতেই তিনি দার্শনিক চিন্তায় ও বিদ্যাদান-কার্য্যে ব্রতী হইয়া নিরালায় এথেন্সে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। খৃঃ পূঃ ৩৪৭ অব্দে অশীতি বর্ষ বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

সাহিত্যে প্লেটো

প্লেটোর "একাডেমী" নামক বিদ্যামন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের উপর ধাতু-ফলকে উৎকীর্ণ ছিল এই কয় ছত্র "জ্যামিতি শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির এখানে প্রবেশ নিষেধ"। ইহার অর্থ এই যে, ঐ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন না হইলে কোন ভাবাত্মক ছবি (ideal figures) ধারণায় আসে না এবং 'আইডিয়ালিজম্'এর উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে ঐন্দ্রিক-জগতের বহির্ভূত কোন ভাবই (idea) গ্রাহ্য হয় না। অধ্যাপক Wolf বলেন, "Plato's 'idealism' was largely the outcome of his pre-occupation with pure geometry." কিন্তু ভারতে বহু পূর্ব্বযুগ হইতে জ্যামিতি-জ্ঞান "দানা বাঁধিয়া" ছিল। বৈদিক কল্পসূত্র-গুলির মধ্যে "শুল্বসূত্র" সমুদয় তাহার প্রমাণ। বৌধায়ন, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন, গ্রীসের থেলীস্, পীথাগোরাস্, প্লেটো। ভারতের সে যুগ বহুদিন গত হইয়াছে; ভারত এখন সর্ব্বহারার মত প্রাচ্য-পুরাতনের কাঠামে পাশ্চাত্য-নূতনের রঙ্ ধরাইয়া প্রতিরূপ গড়িতেছে; সুরাহা এই যে বঙ্গ-সাহিত্যে একটা 'অঘটনঘটনপটীয়সী বাক্‌প্রতিভা' শব্দচয়নে সজীব, প্রাণবন্ত, বেগময় হইয়া সুর-সভাতলে 'হিলোল-বিলোল' উর্ব্বশীর মতই নৃত্য করিয়া চলিয়াছে। এই প্লেটোর ভাবাত্মক ছবিই যুগে যুগে নব নব রূপ লইয়া দেখা দিয়াছে প্রতীচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বেদীমূলে। দেকার্ট, কেপলার্, স্পিনোজা, কান্ত, গাউস্, লোবাৎচিউস্কী, রীমান্, হেলমৎ-হোল্জ্, বেলট্রামী, ল্যাণ্ড, ক্লাইন্, বার্কলী, হিউম্, ক্যান্সিনন্, ব্রগ্‌লী, লেচালাস্, কোহেন্, নাটর্প, ষ্টালো, পঁয়কার্, রাস্সেল্, কুতুরা, মিঙ্কোস্কী, এডিংটন্, আইন-স্টাইন্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক ভাবসমুদ্র মথিত করিয়া ফেলিল, কিন্তু ভারত গঠনাত্মক রূপাদর্শ পরিত্যাগ করিয়া ভাষ্যটীকা সম্বল করিয়া নিরূপের সমাধিলাভে দুরাকাঙ্ক্ষা এখনও পোষণ করে।

কথিত আছে প্লেটো সর্ব্বসমেত ৩৬খানি দ্বন্দ্বালাপগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।* নানাশাস্ত্রসম্ভারে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থনিচয়;

* কয়েকখানির উল্লেখ করিলাম:—(১) Phædrus, (২) Repub'ic, (৩) Laws, (৪) Timacus, (৫) Hippias Minor, (৬) Lysis, (৭) Protagoras, (৮) Meno, (৯) Menexemus, (১০) Phaedo, (১১) Banquet,

প্রত্যেকটাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের রত্নমঞ্জুষা, স্বতন্ত্র জীবন-বেদ। জ্যামিতি, গণিত, প্রাকৃতবিজ্ঞান, রাষ্ট্রতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, সৌন্দর্য্যবিজ্ঞান, ধর্ম্মবিজ্ঞান, সুপ্রজননবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, অধ্যাত্ম-বিশ্লেষণ, মানব-বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য, ন্যায় প্রভৃতির ভাণ্ডার ঐ গ্রন্থগুলি। প্লেটো, জ্ঞানী ও আর্টিষ্ট, কবি ও দার্শনিক, বাহ্যতঃ সুদর্শন, অন্তরে শিব-সুন্দরের উপাসক। দর্শন এরূপ সুষ্ঠু পরিচ্ছদ আশ্রয় করিয়া কখনও অবতীর্ণ হয় নাই, আর হইবে বলিয়া আশা নাই। অনুবাদেও প্লেটোর বাণীর গতি-ভঙ্গীর পরিচয় সুস্পষ্ট। ভাষার চারু-কলায় একটা প্রভা বিচ্ছুরিত, রচনা যেন বুদ্‌বুদায়িত হইয়া নৃত্য-চপল ছন্দে বেগোচ্ছলে উপ্‌চিয়া পড়ে। কবি-শেখর শেলী প্লেটোর সাহিত্যে শাব্দিক কারুকার্য্য ও জ্ঞানরস আস্বাদ করিয়া এই প্রশস্তি করিয়াছিলেন :—

Plato exhibits the rare union of close and subtle logic with the Pythian enthusiasm of poetry, melted by the splendour and harmony of his periods into one irresistible stream of musical impressions, which hurry the pursuations onward as in a breathless career. *

প্লেটোকে বুঝিতে যাওয়া মানে আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সবই মনের দিক্‌চক্রবালে টানিয়া আনা। প্লেটোর মগজ, যীশুর হৃদয়, শেক্ষপীয়রের কাব্যপ্রাণ—সবই শ্রীভগবানের বিভূতি সন্দেহ নাই। প্লেটোনীয় সাহিত্যে, দর্শন ও কাব্য, কলা ও বিজ্ঞান, নীতি ও সৌন্দর্য্য, সমাজ ও শাসন যেন রাগ-তাল-লয়ের উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার dialogues পড়িয়া বুঝা যায় না, কোন্ ভূমিকায় প্লেটো স্বয়ং বাক্যজাল সৃষ্টি করিতেছেন ; অরূপকে কথা বলিতেছেন —কি রূপকে কথা বলিতেছেন ; সরল literal ব্যাখ্যা করিতেছেন—কি অলঙ্কার metaphor দিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন ; অকপটে বলিতেছেন—কি পরিহাসছলে বলিতেছেন।

তাঁহার দ্বন্দালাপগ্রন্থের মধ্যে "Republic" গ্রন্থটী একখানি আস্ত ঋক্, বিশ্বসাহিত্যে মহামূল্য অবদান। ইহাতে আছে তাঁহার সর্ব্ববিদ্যাসংগ্রহ, epitome. মেটাফিজিক্স, থিওলজী, এথিক্স, সাইকোলজী, পলিটিক্স, পেডাগগী, আর্ট -কি নাই ? নব্যযুগের কমিউনিজম্, সোসিয়ালিজ্‌ম্, ফেমিনিজ্‌ম্, জন্মনিয়ন্ত্রণ রহস্য, য়্যুজিনিক্স, নীৎশের মর‍্যালিটিও য়্যারিষ্টোক্র্যাশী, রুশোর "return to nature' ও স্বাধীনেচ্ছামূলক (libertarian) শিক্ষা, বার্গসোঁর *elan vital*, ফ্রয়ডের সাইকো-য়্যানালিসিস্, সবই আছে। এমার্স'ন বলেন—

—Plato is philosophy and philosophy Plato.—

ওঙ্কার যেমন ব্রহ্মের বাচক, দর্শন প্লেটোর বাচক ; নাম-নামী অভেদ। 'গ্রন্থাগারের সবই নষ্ট করিতে পার, কিন্তু এই গ্রন্থটী নয়'—মধ্যযুগের ওমরখৈয়ম্ একথা বলিয়াছিলেন কোরাণ সম্বন্ধে। বেদ সম্বন্ধে হিন্দুরা তাহাই বলেন। কৃষ্টিই যদি লক্ষ্য হয় তবে প্লেটোর সাহিত্য সম্বন্ধে ঐ কথাই প্রযোজ্য।

(১২) Gorgias, (১৩) Theætetus, (১৪) Philebus, (১৫) Sophistes, (১৬) Politicus, (১৭) Apologia, (১৮) Cratylus, (১৯) Euthydemus, (২০) Critias, (২১) Symposium, (২২) parmenides, (২৩) Statesman, (২৪) Timœus.

* Barakr, Greek political History, London, 1918, p. 5.



পুরস্কার-বিতরণী সভা

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী বি-এ

মেয়েদের পুরস্কার বিতরণী সভা। যারা প্রবেশিকা পরীক্ষায় পারদর্শিতার সঙ্গে পাশ করেছে সেই মেয়েদের মধ্যে যে সব-চাইতে দুঃখ-কষ্টের ভিতর লেখাপড়া শিখছে তার জন্য একটা সোণার মেডেল পুরস্কার ছিল। এটি পেলেন কুমারী আশা সান্যাল। সভাপতি মহাশয় তাঁর বক্তৃতা প্রসঙ্গে বললেন, 'এই মেয়েটি নানারূপ অভাব অভিযোগের মধ্যে সংসারের কাজকর্ম্ম করে যে সময় পেয়েছে তার অপব্যবহার করেনি, মাত্র স্কুলের সাহায্যের উপর নির্ভর ক'রে এ লেখা-পড়া করে আসছে' ইত্যাদি।

পুরস্কার বিতরণের পর সমবেত হর্ষধ্বনির সঙ্গে সভা ভঙ্গ হ'ল।

বেরিয়ে এসে ভাবলাম—আশা সান্যাল সোণার মেডেল পাক্ তাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই, কিন্তু দুঃখ, কষ্ট, অসুবিধার মধ্যে লেখাপড়া শিখে ভালভাবে পাশ ক'রবার জন্যই যদি একটা পুরস্কার থাকে, তা' হ'লে সে পুরস্কার আর একজনেরও প্রাপ্য ছিল—যে ছিল সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে একপাশে চুপটি করে ব'সে।

কিন্তু ন্যায্য বিচার জগতে কতটুকু হয়?

জেলার জজ ফষ্টার সাহেব প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে কোন্ বেগুনওয়ালার ঝাঁকা-মোট তুলে দিয়েছিলেন, আর অমনি তাঁর জয়-জয় রব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে এটাও প্রকাশ হ'ল যে বাঙ্গালী জাতি স্বার্থপর, হিংসুক—এরা পরের উপকার ত' করেই না—এমন কি পরের যাতে ভাল হয় সেটাও এরা সহ্য করতে পারে না—এই সব।

কিন্তু এইখানেই কি বিচারের শেষ? কে ব'লবে যে 'সাহেব, যেহেতু তুমি দুই হাজার টাকা মাইনে পাও তোমার হাওয়া খাওয়া সাজে এবং বেগুনওয়ালার ঝাঁকা তুলে দেওয়া তোমার পক্ষে বিলাসিতা।'

আশা সান্যাল অবৈতনিক ছাত্রী। সংসারের কাজ-কর্ম্ম ক'রে লেখাপড়া শিখছে, কিন্তু তার চেয়েও দুঃখ কষ্টের মধ্যে যে ঐ সুজাতা রায় লেখাপড়া করে, কে তা বিশ্বাস কর্ব্বে?

অবশ্য একথা স্বীকার ক'ত্তেই হবে বিচারে যতই ত্রুটি থাকুক মানুষের বেশী দোষ নেই। বাঙ্গালী বেড়াতে গিয়ে বেগুনওয়ালার মোটটি মাথায় তুলে দেয় নি অতএব তার শাস্তি—দুর্নাম। সুজাতা রায় বড়লোকের মেয়ে, কাজেই সব চাহিতে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে সে যে লেখাপড়া শিখছে একথা কে বিশ্বাস কর্ব্বে? সুজাতার এই সত্যিকারের পরিচয়টুকু আমি কি করে পেলাম সেই কথাই আজ বলব।

সেবার পূজোর ছুটিতে দেশের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। বাইরের ঘরে একা বসে কি একটা কাগজ দেখছি, এমন সময় হাঁটুর উপর কাপড় পরা এক চাষা প্রজা এসে সেখানে ব'সল। তার নাম নবির। ছেলেবেলা থেকেই তাকে আমি চিনি। সে জিজ্ঞাসা ক'রল, 'ছোটবাবু আপনার এলে-বিয়ে পাশ দেওয়ার আর কত দেরী?' ব'ললাম, 'এলে পাশ দিয়েছি নবির, এইবার বি-এ দেব।' নবির আবার জিজ্ঞাসা ক'রল, 'এর পর আরও লেখাপড়া আছে নাকি?'

ব'ললাম, 'আছে—ঢের আছে। বিদ্যের কি শেষ হয় নবির?' নবির উদ্বিগ্ন হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার হাকিম হওয়ার আর কত দেরী?'

ব'ললাম, 'লেখাপড়া শিখলে যে হাকিমই হ'তে হবে তা ত নয়—আরও কত কি হওয়া যায়।'

'এজ্ঞে এবার যে পাশ দেবেন তাতে কি হওয়া যায়?'

দেখলাম, একটা কিছু না হ'লে নবির ঠিক আমার ওজনটা বুঝতে পারছে না, বললাম, 'দারোগা হওয়া যায় অথবা রেজেষ্ট্রী অফিসের হাকিমও হওয়া যায়'—কিন্তু আমার ভবিষ্যতের দারোগাগিরির চেয়ে নবিরের হেজে-যাওয়া হাত এবং পায়ের পাতার দিকেই আমার লক্ষ্য প'ড়েছিল বেশী। তার হাত পা থেকে কেমন একটা পচা দুর্গন্ধ আসছিল। আঙ্গুলগুলির ফাঁকের মধ্যে কেমন শাদা ঘা'র মত হয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম—জলে দাঁড়িয়ে পাট কেচে এবং পচা পাট ছড়িয়ে তার এমনি ধারা অবস্থা হ'য়েছে। অথচ পাটের দর তিন টাকা!

নবির ব'লল, সে এসেছে কত্তাবাবু—অর্থাৎ আমার কাকার সঙ্গে দেখা ক'রতে। বছর তিন-চার আগে সে তাঁর কাছ থেকে কুড়িটি টাকা কর্জ্জ নিয়েছিল। প্রথমবার সে তিন মণ গুড় দিয়েছে, তার পরের বছর তার ভাই ছবির এক মাস আমাদের বাড়ীতে কাজ ক'রেছে।—ছবিরের নাম ক'রে সে কেঁদে ফেল্‌ল—তার বুকের বল ছিল সেই ছোট ভাই—রায়বাবুদের হুকুম মত ওপারের চরে ধান কাটতে গিয়ে সে জান দিয়ে এসেছে—বর্ষার ভরা নদীর মধ্যে শত্রুপক্ষ তার ভাইকে মেরে ভাসিয়ে দিয়েছে। নবির উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কাঁদতে লাগল। তার প্রার্থনা—আসল টাকাটা নিয়ে তাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হোক।

কাকা ব'ললেন, 'সে হয় না। চা'র বছরে তোমার কাছে পাওনা হয়েছে পঞ্চাশ—গুড় আর ছবিরের মাইনে বাদ দাও দশ—থাকে চল্লিশ।'

আমি তার হ'য়ে কাকার কাছে অনুরোধ জানালাম। কাকা ব'ললেন, 'তুমি কেন এর মধ্যে মাথা দাও? মাস মাস বাড়ী থেকে টাকা যায় বুঝতে পার না সে টাকা কোত্থেকে আসে—টাকার ত আর গাছ হয় না যে একটা থেকে দশটা হবে।'

চুপ ক'রে থাকলাম। নবির টাকা দিল কিন্তু খত তার মিটল না।

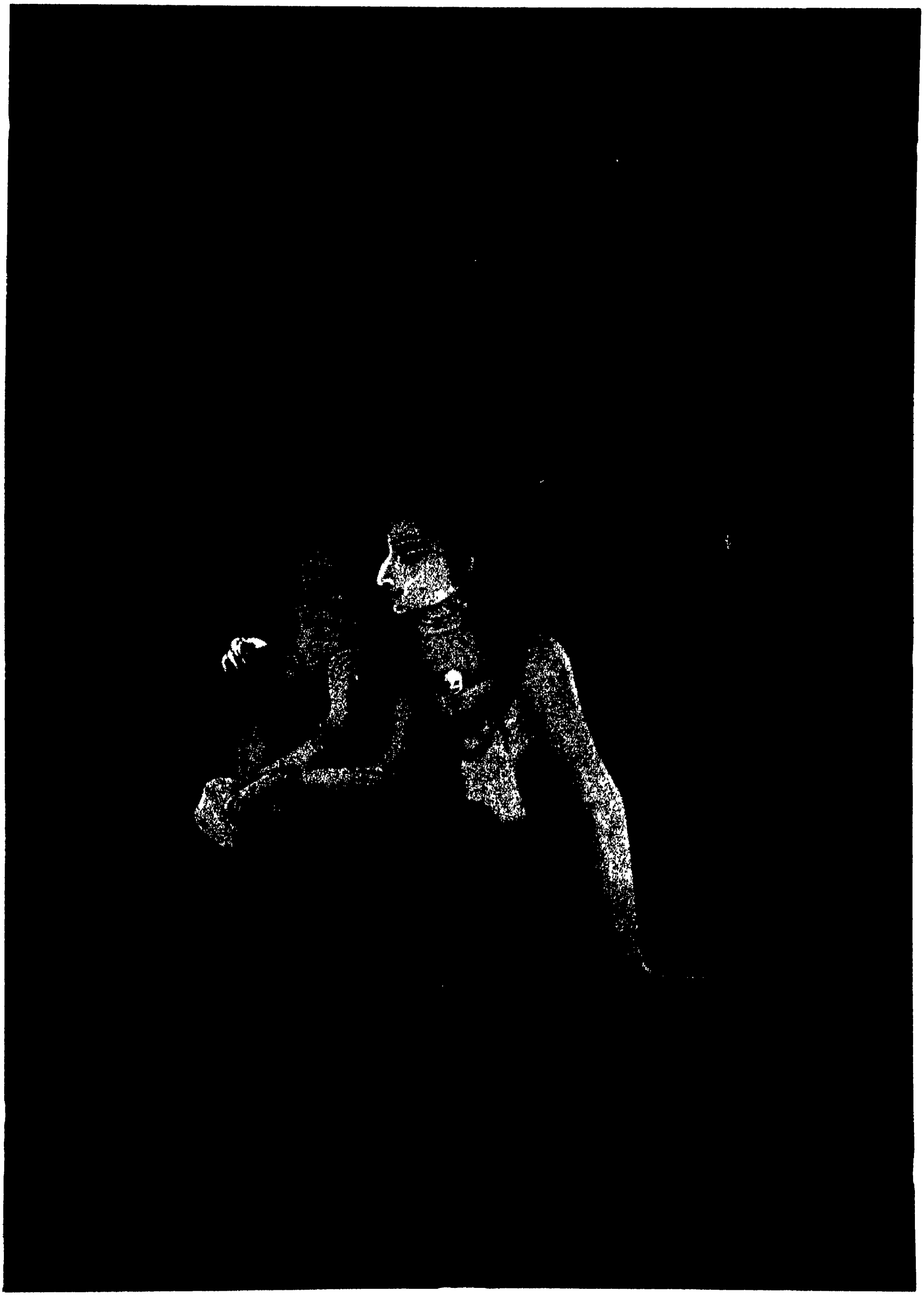
চিরদিন বিদেশে মেসে বোর্ডিংএ থেকে লেখাপড়া ক'রে আসছি—মাস মাস নিয়মিত বাড়ী থেকে টাকা যায়; কিন্তু সে টাকা কোথা থেকে আসে একথা সত্যিই একবারও ভেবে দেখিনি। আজ যেন কে আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে সেই কথা দেখিয়ে দিয়ে গেল—নবিরের দেহপাত ক'রে উপার্জ্জন করা ঐ কুড়িটি টাকা হয়ত বাড়ী থেকে যাওয়ার দিন আমিই নিয়ে যাব—ঐ টাকায় আমার মোজা হবে, সেণ্ট হবে, থিয়েটার বায়স্কোপ দেখা হবে!

হঠাৎ আমার কেমন রুচি-বিকার হ'য়ে গেল। সেণ্ট্ মাখা ছিল আমার একটা নেশা—বোর্ডিংএ অনেকের চাইতে হয়ত' বাবু ছেলে ছিলাম আমি; বন্ধুরা কাউকে কিছু উপহার দিতে হ'লে তার ভাল-মন্দের বিচার ক'রত আমার কাছে এসে। সেই আমি এখন সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে মুখ ধোওয়া পেষ্টটা পর্য্যন্ত সুগন্ধী ব'লে নিমের দাঁতন ধরেছি!—ধারা একেবারেই উল্টে গেছে! সেণ্টের শিশি খুললে আমার নাকে নবিরের সেই পচা হাতের গন্ধ যেন এসে লাগে!

তা এমন হয়। আমার বন্ধু জ্যোৎস্না সান্যাল খালি পায়ে ঘুরে বেড়ান—পথ দিয়ে চ'লবার সময় আপন মনে কি সব বিড়বিড় ক'রে বলেন; তিনি এম-এতে ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট, গোল্ড মেডালিষ্ট। কিন্তু ওরা সব জিনিয়াস:—ষ্টিফেন সাহেবও বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে ভিজতে ছাতি বগলে ক'রে পথ চ'লতেন। জিনিয়াস কোন আইন মানে না। আমাদের অধ্যাপক রাখালবাবুও জিনিয়াস—নিজের বাড়ী মনে ক'রে পরের বাড়ী ঢুকে বলেন—'সরি'। কেউ কেউ যে পরম পণ্ডিত হ'য়েও রাজ্যের পাথরের নুড়ী দিয়ে বৈঠকখানা বোঝাই করেন—ছেলেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে সেটাকে গোপনে বলে 'স্ক্রু' ঢিল। এদিকে আমাদের শ্রীমধুসূদন তরফদার যিনি কাপড়ের পাড় পছন্দ হয় না ব'লে প্যাণ্ট প'রে ঘুরে বেড়ান, আর দরজীর দোকানের ছেঁড়া ন্যাকড়ার মালা গলায় দিয়ে রাস্তার মাঝে নৃত্য করেন—তাকে আমরা জিনিয়াস্‌ও বলি না, স্ক্রু ঢিলও বলি না; এটা হ'চ্ছে দস্তুর মত ই'নস্যানিটি অর্থাৎ পাগলামীর লক্ষণ!

যে কথা হ'চ্ছিল। আমার যেন কেমন রুচি-বিকার হ'য়ে গেল। জিনিয়াস্‌এর লক্ষণ এটা নয়। আবার স্ক্রু ঢিল—অর্থাৎ কোনও একটা বিষয়ে দুর্ব্বলতাও এটাকে ঠিক বলা যায় না। বন্ধু শিশির সেন ব'ললেন—এটা তবে প্রেম। কিন্তু প্রেমে প'ড়লে যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায় আমার মধ্যে তার কিছুই দেখা যায় নি—কালিদাসের মতেও নয়, সাহিত্যদর্পণের মতেও নয়। এমন কি শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক ললিতবাবুও তাঁর 'প্রেমের কথায়' তেমন কিছু লক্ষণ প্রকাশ ক'রে যান নি।

কাজেই আমি হয়ত ক্ষেপে যাব ব'লে ছেলেরা যে একটু আধটু সন্দেহ ক'রেছিল একথা আমি নিশ্চয় বলতে পারি। কিন্তু তারা আমায় ভালবাসত, নইলে আমার এই ক্ষ্যাপামীর সুবিধা নিয়ে তারা আমায় উদ্ব্যস্ত ক'রত, এমন কি তারা আমায় দস্তুর মত পাগল ক'রে তুলতেও পারত। কিন্তু তা তারা করে নি। সতীন্দ্রের কাছে আমার সেদিনের সেই অত্যন্ত বাড়াবাড়ির কথা হয় ত তারা শুনেছিল। আমি যে সত্যিই পাগল হয়ে যাচ্ছি এইটাই হয়েছিল তাদের দুঃখের বিষয়।



হরপার্বতী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার সেনগুপ্ত

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

*   *   *   *

সেদিন সেণ্টের শিশিটা অমন ক'রে ছুড়ে ফেলে না দিলেই পারতাম। জামাটায় একটু সেণ্ট মাখিয়ে দিয়েছিল —বন্ধু সে, এ অধিকারটুকু তার আছে; কিন্তু আমার পক্ষে তখনই জামাটাকে ধুয়ে নিয়ে আসা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হ'য়েছিল।

বিলাসের ন্যায় বৈরাগ্যেরও বোধ হয় একটা ব্যাপক-শক্তি আছে। ঐ থেকে আমার যে বিকারের সূত্রপাত হ'য়েছিল কেবলমাত্র আপন বসনেই তার পরিসমাপ্তি হ'ল না—বাড়ীর অর্থ সাহায্যের উপরও আমার কেমন একটা বিতৃষ্ণা জন্মে গেল।

মনে আছে প্রথম যে দিন সুজাতাকে পড়াতে আসি। সেদিন সতীন্দ্রের মামা মোক্তার কালীশঙ্কর চাটুয্যে বাড়ীতে ছিলেন না। সতীন্দ্র আমাদের নিয়ে বাইরের ঘরের পাশে একটা ঘরে বসাল। ছাত্রী কোন দিন পড়াই নি। শুনেছি স্থানবিশেষে কাজটা নাকি খুবই কঠিন; অনেক ভাল ভাল ছাত্রেরও মাথাটা কেমন ঘুলিয়ে যায়। এক সমকোণ নব্বই ডিগ্রীতে হয়, না ষাট ডিগ্রীতে হয় এটা পর্য্যন্ত তখন কেমন গোলযোগ হ'য়ে পড়ে।

একটা অজ্ঞাত আতঙ্ক মনের মধ্যে সাড়া দিচ্ছিল; 'সুজাতা' নামটি বেশ। কল্পনা ক'রে নিচ্ছিলাম স্যাণ্ডেল পায়ে চওড়া পাড় রঙিন শাড়ী পরা একটি তন্বী তরুণী—কাণ দুটি চুলে ঢাকা। চকিতা হরিণীর মত তার দৃষ্টি—কিন্তু ইতিমধ্যে বাস্তব সুজাতা যখন পর্দ্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল তখন দেখলাম আমার কল্পনার সঙ্গে তার কিছুমাত্র মিল নেই! সুজাতা বিধবা—মলিন থানের কাপড় পরা। এ যেন শকুন্তলার সেই—'বসনে পরিধূসর ধৃতৈকবেণী' এবং 'নিয়মক্ষামমুখী' ব্রতচারিণী বেশ!

সেদিন আর পড়ান হ'ল না। কি ভাবে কি পড়িতে হবে মোটামুটি তার একটা ব্যবস্থা দিয়ে সতীন্দ্রের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম।

সতীন্দ্র বলল, 'বিয়ে হওয়ার বছর দুই পরেই সুজাতা বিধবা হ'লে মামা তাঁর এই মেয়েটিকে এনে হেঁসেলে পূরলেন, —ব্রত পার্ব্বণ আর উপবাস—এই দিয়ে চাইলেন তাকে ভুলিয়ে রাখতে; কিন্তু বাইরের আবেষ্টন সব সময় মনের উপর আধিপত্য করে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে সতীন্দ্র আবার বলল, 'আমি জানতাম ছেলেবেলা থেকেই ওর পড়াশুনার দিকে খুব ঝোঁক ছিল, তাই ভাল ভাল বই ওকে এখনও এনে দিই; কিন্তু সেগুলো পড়তে হয় ওর খুব সন্তর্পণে—কাউকে না জানিয়ে সংসারের সমস্ত কাজকর্ম্ম সেরে সকলে যখন ঘুমিয়ে পড়ে ও-তখন বসে আঁক কষিতে। এমনি ক'রেও অনেকখানি এগিয়েছে; কিন্তু বাধা উঠেছে অনেক। মামার ধারণা মেয়েরা লেখাপড়া শিখলেই খারাপ হ'য়ে যায় এবং তাদের হরিভক্তি ও পতিভক্তি দুইই আসে কমে: আমার মামাটিও দেখছি তাঁর ব্যক্তিত্ব হারিয়ে লেখাপড়া যে কোনকালে কিছু জানতেন এখন তা' মনেও কর্ত্তে পারেন না। এদিকে অতি শাসনের ফলে মামার তিনটি ছেলে হ'য়েছে তিনটি রত্ন বিশেষ! একটি বাক্স ভেঙ্গে টাকা নিয়ে কোথায় উধাও হয়েছেন—আর একটি নাকি এর মধ্যেই মাঝে মাঝে রাত্রিতে বাড়ী আসা বন্ধ ক'রেছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তা হ'লে আমাকে যে গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত ক'রলে সেটা কি তোমার মামার অমতে?'

সতীন্দ্র ব'লল, 'সেই কথাই তোকে বলছি। মামীমাকে অনেক বুঝিয়েছি—শ্বশুরকুলে ওর দাঁড়াবার স্থান নেই। এখানে মামা দু' চক্ষু বুজতে যতক্ষণ! সুজাতা যদি লেখা-পড়া শিখতে পারে তা'হলে অন্তত কারও গলগ্রহ ওর হতে হবে না—তার নিজেরও লেখাপড়া শিখবার প্রবল ইচ্ছা—মামীমা কতক রাজী; কিন্তু সবচেয়ে বড় বাধা ওকে পড়াবে কে? মিসট্রেসদের মামা কখনও বাড়ীতে ঢুকতে দেবেন না—কলেজের ছেলেদের উনি বিশ্বাস করেন না—বলেন, 'আগুন আর ঘি এক যায়গায় রাখতে নেই।'

ব'ললাম, 'তোমার মামা আইনের মানুষ হয়েও যুক্তিটা দিয়েছেন অসিদ্ধ। কুয়োর দড়ি জল আর রৌদ্র পেয়ে অতি শীঘ্র নষ্ট হয়—তাই ব'লে মানুষ যে রোজ দুই একবেলা স্নান ক'রলে এবং রোদ লাগালে তাড়াতাড়ি প'চে ছিঁড়ে যাবে তা নয়। ঘি এবং আগুন এদের আত্মসম্মান এবং আত্মচেতনা বলে কোন জিনিস নেই। মানুষের সঙ্গে ওর তুলনা চলে না।'

সতীন্দ্র ব'লল, 'তা বুঝি। আমি নিজে এখানে থাকতে

পারিনে; কাজেই ওকে দেখিয়ে দেবার জন্ত একজন ভাল লোক চাই। তুই যেমন দিন দিন সন্ন্যাসী হ'চ্ছিস তাতে তোকেই মানাবে ভাল। মামারও অমত হ'বে ব'লে মনে হয় না। তা' ছাড়া তোর সম্বন্ধে আমি বিশেষ ক'রে ওদের ব'লেছি—তুই আমার বিশিষ্ট বন্ধু তাও ওঁরা জানেন।

এর পর থেকে সুজাতাকে আমি একঘণ্টা ক'রে আঁক আর ইংরিজি পড়াতে লাগলাম।

আগে কোনদিন ছাত্র পড়াই নি সত্য কিন্তু ছাত্রের সঙ্গে প'ড়ে আস্‌চি অনেকদিন থেকে। সুজাতার মত এমন অনুসন্ধিৎসু ছাত্রী আমি কমই দেখেছি। অথচ তাকে কত কষ্টই না ক'রতে হ'ত। কোন কোন দিন বেলা দুটোর সময় আমি এসে দেখতাম তখনও তার খাওয়া হয় নি! একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাস ক'রেও ভোর থেকে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তাকে খাটতে হ'ত। এজন্ত তাকে কারও সহানুভূতি দেখাবার উপায় ছিল না—কারণ মোক্তার কালীশঙ্করবাবুর কড়া হুকুম—মেয়েমানুষ সব সময় খাটুনির উপর থাকবে –আর মন রাখবে গৃহস্থালীর দিকে। নিরম্বু উপবাস বিধবার অবশ্যপ্রতিপাল্য ব্রত। সুজাতার উপর আদেশ ছিল—সে পেড়ে কাপড় পরতে পাবে না—কোন প্রকার উপন্যাস কি গল্পের বই তার অপাঠ্য। সে কোন উৎসব-আনন্দে যোগ দেবে না—কখনও হাসবে না, এমন কি বাড়ীর বাহিরে পর্য্যন্ত তার যাওয়া নিষেধ।

মাস দুই পরে খবর আসিল সতীন্দ্র রাজবন্দী হ'য়ে জেলে গেছে। এই সংবাদ সবচেয়ে হতাশ ক'রেছিল সুজাতাকে।

'আমার আর পড়াশুনা হবে না অমলদা'—তার সেই হতাশার দীর্ঘশ্বাস—সেই ব্যর্থতার উচ্ছ্বাস, লেখাপড়া হবে না ব'লে যে হৃদয়ের সত্যিকারের ব্যথার অভিব্যক্তি তা' আমার আজও মনে আছে। ব'ললাম, 'এটা হ'চ্ছে তোমার বুঝবার ভুল সুজাতা, সে গেছে ক্ষুদ্র জেলে; কিন্তু তার ব্যক্তিত্বটাকে রেখে গেছে আরও ছড়িয়ে—আরও প্রসারিত করে। আমরা যদি তার জেলে যাওয়ার জন্ত কর্ত্তব্যকে শিথিল করে দিই তা হ'লে তার ব্যক্তিত্ব হ'য়ে যাবে ছোট—তার জেলে যাওয়া হবে অনর্থক।

এই উপলক্ষে সুজাতার সঙ্গে আমার কথা হ'ল। সে ব'ল্ল তার লেখাপড়ার একমাত্র সহায় ছিল এই সতীন্দ্র। জানতে পারলাম কালীশঙ্করবাবু কেবল গোঁড়া নয় কৃপণও বটে। বিধবা মেয়ের লেখাপড়ার জন্ত তিনি এক কপর্দ্দকও ব্যয় ক'রতে রাজী নয়।

এর পর লোকমুখে আরও শুনলাম, কেবল আইন-শাস্ত্রে নহে—অর্থ-নীতিতেও তাঁর পাণ্ডিত্য বিদ্যমান! তিনি দেশের কেউ যা বোঝে না এমন একটি গূঢ় তত্ব আবিষ্কার করে বলেছেন—বি-এ, এম্‌-এ পাশ ক'রে সব ছেলেগুলো আজকাল রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায়। অথচ এই বি-এ, এম-এ পাশ করাতে তাদের পেছনে সবসুদ্ধ যা খরচ হয়েছে সেটা যদি গোড়াগুড়ি থেকে বেঁধে কোন ব্যাঙ্কে জমা রাখা হ'ত তা হ'লে পাশ ক'রে বেরিয়ে যে বয়সে তারা বেকার হয়ে ঘুরে বেড়ায় সেই বয়সে তারা দেখবে কেউ দশ হাজার কেউ পনর হাজার টাকার মালিক।—স্যাড্‌লার কমিশনে কালীবাবুর এই মত গৃহীত হয়েছিল কি না জানিনে।

শুনলাম সতীন্দ্রের চেষ্টাতেই কালীশঙ্করবাবু তার মেয়ের শিক্ষা বাবদ মাত্র আটটি টাকা দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। কালীশঙ্করবাবু জানেন আমি নিতান্ত অভাবগ্রস্ত ব'লেই এই সামান্ত টাকাতেই পড়াই। সুজাতাকে একবার সত্যাসত্য জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম। সত্যকে সে অস্বীকার করতে পারে নি।

জিজ্ঞাসা ক'রলাম—'কিন্তু তোমরা ত আমাকে কুড়ি টাকা দাও—আর টাকা কে দেয়?'

সুজাতা বল্লে, 'মা কিছু, আর সতীদা—'

'আচ্ছা, তোমরা আট টাকা দিলেই ত পারতে?'

সুজাতা লজ্জিত হ'য়ে ব'ল্ল, 'সতীদা বলেছে আপনি গরীবের রক্ত বলে বাড়ী থেকে কোন সাহায্য নেন না—কিন্তু হোষ্টেলে আপনার কুড়ি টাকার কম খরচ পড়ে না।'

দুঃখ দিয়ে ভগবান মানুষকে পরীক্ষা ক'রে নেন। সুজাতারও বোধ হয় কঠিন পরীক্ষা চ'লছিল। দু মাস যেতে না যেতেই হঠাৎ একদিন সুজাতার মায়ের শ্বাসরোধ হ'য়ে এল—ডাক্তারেরা বললেন ডিপ্‌থিরিয়া। প্রতি মুহূর্ত্তে রোগীর চোখে মৃত্যুর ছায়া ফুটে উঠছিল—তিনি আমার হাত ধরে কি যেন বলতে যেয়ে বলতে পারলেন না।

বার বার চেষ্টা ক'রে শেষে অতি ক্ষীণ স্বরে ব'ললেন—সতু জেনে। ওর যাতে লেখাপড়া হয় তা তুমি ক'রো।

তার পর সব শেষ হয়ে গেল।

বৈশাখ মাসের প্রথমে আমার পরীক্ষা শেষ হ'লে সুজাতার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সুজাতা কেঁদে ব'ল্ল, 'আর কারও কাছে আমার পড়া ঘটবে না—আপনার পরীক্ষার ফল না প্রকাশ হওয়া পর্য্যন্ত যদি আপনি থেকে যান—'

ব'ললাম, 'তা না হয় হল, কিন্তু প'ড়বে কখন ?'

'আপনার ত আর কলেজ নেই—দয়া ক'রে যদি দুপুরে আস্‌লেন তা হ'লে আমার খুব সুবিধা হয়।'

আমারও কিছু অসুবিধা ছিল না। স্বীকার ক'রলাম। ভাবলাম, কেঁদে-কেটে বোধ হয় সুজাতা ঐ সময়টুকু তার বাবার কাছ থেকে আদায় করতে পেরেছে।

কিন্তু তা পারি নি। কালীশঙ্করবাবু আমায় ডাকিয়ে ব'ললেন—'এখন সংসারের সমস্ত চাপ ওরই ঘাড়ে। ওর আর পড়াশুনা ঘটে উঠবে না, তাছাড়া ওর লেখাপড়া শেখার আবশ্যকও আমি কিছু দেখিনে।' কিছুক্ষণ চুপ থেকে তিনি আবার ব'ললেন, 'যাদের বিয়ে হয় নি তারা লেখাপড়া শেখে স্বামীর কাছে চিঠিপত্র লিখতে পারবে ব'লে। যাদের বিয়ে হয়েছে তারাও যদি লেখাপড়া শেখে ত' তারও একটা কৈফিয়ৎ হয় ত থাকতে পারে; কিন্তু যে বিধবা তার লেখাপড়া শেখার কি প্রয়োজন ?'

বড় দুঃখ হ'ল। ব'ললাম, 'আমার ত মনে হয় যে, যেহেতু ও বিধবা সেই জন্যই ওর লেখাপড়া শেখা দরকার এবং সেটা শিখতে হবে শেখার প্রয়োজনেই—চিঠি লেখার জন্য নয়।'

'কিন্তু সে শেখার কি প্রয়োজন ?'

'দেখুন, কেবলমাত্র প্রয়োজনটা নিয়েই মানুষের চলে না। মানুষ সাড়ে তিন হাত লম্বা কিন্তু সে ঘর বাঁধবে দশ হাত উঁচু ক'রে—কারণ তার চলা-ফেরার স্বচ্ছন্দতা চাই। মানুষের আহার নিদ্রাই তার সবখানি নয়—সে মনের খোরাকও চায়, তাই দরকার হয় তার শিক্ষার।' বিনীত হয়ে ব'ললাম, 'আপনি প্রবীণ শিক্ষিত লোক—আপনার কাছে এসব বলা আমার ধৃষ্টতা। সে জন্য আমায় ক্ষমা করবেন। শিক্ষা যে মানুষের দরকার—কেবল মানুষ হিসাবেই দরকার—একথা আপনিও অস্বীকার করবেন না বোধ হয়।'

বোধ হয় তার কথাটা নরম হয়েছিল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে মোক্তারবাবু ব'ললেন,—'আমার ছেলেগুলো সব পালিয়ে বেড়াল' লেখাপড়ায় হাওয়া লাগবে ব'লে—আর মেয়েটি ধন্না দিয়েছে সরস্বতীর দুয়ারে।'

তাঁর মনের সাম্য ব্যবস্থাগুলি সবই বুঝি কেমন ওলট-পালট হ'য়ে যাচ্ছিল। ব'ল্লেন, 'আচ্ছা পড়ুক কিন্তু দেখুন ইংরিজি-টিংরিজি ওসব শেখার মেয়েদের কিছু দরকার নেই।' বাদানুবাদ বৃথা জেনে আমি তাই-ই স্বীকার ক'রে নিলাম।

ম্লেচ্ছ ইংরেজি ভাষার উপর কালীশঙ্কর বাবুর বিশেষ অশ্রদ্ধা। তিনি সেকেলে মোক্তার। কোর্টে বাঙ্গালাতেই ছলজব করেন। শোনা যায় তাঁর আইনের তর্কের চেয়ে জোরের তর্কই ছিল বেশী। এ সম্বন্ধে গল্প আছে।

আশু মিত্র ছিলেন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর এক ছেলে আই-সি-এস। আশুবাবুর কোর্টে মোকদ্দমা উঠেছে। আসামী পক্ষে কালীশঙ্কর চাটুয্যে মোক্তার। ফরিয়াদী পক্ষের মোক্তার যখন আশুবাবুকে আইনের বিষয় বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন তখন কালীবাবু দেখলেন গতিক খারাপ—অমনি তিনি তাড়াতাড়ি কাগজপত্র ছিঁড়ে ফেলে ফরিয়াদী পক্ষের মোক্তারকে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ব'ল্লেন –'হুজুরকে এসেছ আইন শেখাতে—জান, হুজুর আই সি এস-এর জন্মদাতা ?'

তার পর আসামীকে ব'ল্লেন—'ধর বেটা হুজুরের পা জড়িয়ে ধর—এ যাত্রা হুজুরের দয়ায় বেঁচে গেলি !'—আশুবাবু ভক্তিমান ব্যক্তি।—তার উপর বয়স হ'য়েছে। পুরাতন মোক্তার কালীশঙ্করের কথা হয় ত ঠেলতে পারলেন না—মোকদ্দমায় কালীশঙ্কর বাবুরই জয় হল।

কিন্তু এই রকম কালীশঙ্কর চাটুয্যে দেশে এবং সমাজে অনেক আছেন। আমাদের এক গোঁপওয়ালা পণ্ডিত মশাই ব'লতেন—'শরৎ চাটুয্যে যাচ্ছে তাই লেখে। তার লেখা অপাঠ্য এবং অশ্লীল।' আমরা তাই মেনে নিতাম। কারণ জানতাম, পণ্ডিতমশাই শরৎ চাটুয্যের একখানা বইও পড়েন নি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সঙ্গে যাদের কিছুমাত্র পরিচয় নেই তাদের অনেকেই বলেন—রবীন্দ্রনাথের আধুনিক কবিতাগুলি দুর্ব্বোধ্য অসঙ্গত এবং অর্থহীন !…কিন্তু যে কথা হচ্ছিল। ইংরিজি সাহিত্যের সঙ্গে কালীশঙ্করবাবুর

কোন কালেই পরিচয় নেই—কাজেই ইংরিজি সাহিত্যের বিপক্ষে তিনি বক্তৃতা দিবেন সেটা আর বিচিত্র কি ?

সুজাতার ঘণ্টাখানেক পড়ার কথা ; কিন্তু সতীন্দ্রের জেলে যাওয়ার পর থেকে আমার কেমন মনে হ'ত—সে দিয়ে গেছে আমার উপর একটা দায়িত্ব—সেটা থেকে মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আমার কোন ডাকেই আর সাড়া দিবার উপায় নেই। এক ঘণ্টার যায়গায় দু'ঘণ্টা—এমন কি কোন কোন দিন তিন ঘণ্টাও পড়াতে লাগলাম। কিন্তু আমি লক্ষ্য ক'রেছি যে দিনই আমি একটু বেশীক্ষণ থাকি পাঠ্য বিষয়ে বিশেষ আকর্ষণ থাকা সত্বেও সুজাতা কেমন চঞ্চল হ'য়ে উঠে! বুঝলাম, তার সংসারে অসংখ্য কাজ—দাঙ্গাবাজ মোক্তার কালীশঙ্কর চাটুয্যের রুটিন করা কাজ—নড়চড় হবার যো নেই। তার এক ঘণ্টা ছুটিতে এত দিন তার স্বর্গগতা জননীই তার কাজ ক'রে দিয়েছেন, কিন্তু আজ তার মুখের দিকে চাইবে কে ?

অবশ্য এখানেই কথার শেষ নয়। মোক্তারবাবু স্ত্রীর মৃত্যুর পর সংসারটাকে 'বহাল' রাখবার জন্য এতদিনের অজ্ঞাত তার এক নিঃসম্পর্কীয় ভগিনীকে এনে উপস্থিত ক'রলেন। মোক্তারবাবু মামলা মোকদ্দমায় মাথার চুল পাকিয়েছেন—তিনি কাঁচা লোক নন। এই ভগিনীটির উপরই হয় ত তিনি দিয়েছিলেন মাষ্টার মশাইয়ের উপর নজর রাখবার ভার।

জানিনে সে মাসেও সুজাতা আমার বেতন কুড়ি টাকা কি ক'রে সংগ্রহ করেছিল। টাকা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে ব'ল্লাম—'মাইনে আমি তোমার কাছ থেকে আর না নিলে আমার অসুবিধা নেই এখন'। সুজাতা অতি শান্ত স্বরে উত্তর দিল—'আপনাকে আমি জানি অমলদা, কিন্তু এটাকা আপনাকে নিতেই হবে, নইলে জানবেন আমার আর পড়া হবে না।'

টাকা নিতেই হ'ল। দিন চারেক পরে আমার বন্ধু প্রভাস গাঙ্গুলীর বাড়ীতে জানতে পারলাম—সুজাতা তার কাণের দুল রেখে দিন কয়েক আগে কোনও যায়গা থেকে কাউকে দিয়ে পনরটি টাকা নিয়ে গেছে! কি জন্য নিয়েছিল তা আমি বুঝতে পারলাম। ভাবলাম ভগবান আমার জন্য কি কেবল এমনি ধারা সব অর্থই ওজন ক'রে রেখেছিলেন ? যে জন্য নবির সেখের টাকা নিই নি সেই জন্যই সুজাতার টাকাও আমার সহ্য হ'ল না।

বোর্ডিংএ তখন আমার খরচপত্র ছিল না। কারণ ছেলেরা আমায় ভালবাসত—তারা আমাকে তাদের বন্ধুরূপেই রেখে দিয়েছিল। আমিও বাজার করা থেকে হিসাবপত্র রাখা পর্য্যন্ত সব কাজেই তাদের সাহায্য ক'রতাম।

যথাসময়ে টাকা দিয়ে সুজাতার কাণের দুল দুটি ফিরিয়ে আনা হ'ল।

সেদিন পড়া'তে গিয়ে সুজাতাকে ব'ললাম—'আমি সতীন্দ্রের বন্ধু—তোমার ভ্রাতৃস্থানীয়, তার উপর তোমাকে এতদিন পড়াচ্ছি—আজ যদি তোমাকে একটা কিছু উপহার দিই আশা করি তুমি তা প্রত্যাখ্যান ক'রবে না। সুজাতা হাত পেতে আমার উপহার নিল—কিন্তু কাগজের মোড়কটি খুলতেই তার মুখ কেমন বিমর্ষ হ'য়ে গেল !

"এ দুল আপনি কোথায় পেলেন ?"

'টাকা দিয়ে কারও কাছ থেকে নিয়ে এসেছি।' সুজাতা চুপ ক'রে রইল। বুঝি কোন অতীতের স্মৃতি তাকে উন্মনা ক'রে তুলছিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে জিজ্ঞাসা ক'রল—'কিন্তু এ দুল দিয়ে আর কি ক'রব ?' ইচ্ছা হচ্ছিল ব'লতে যে দুল তুমি পরতে পার সুজাতা! দুল প'রলে তোমায় বেশ মানায়। পরক্ষণেই মনে হ'ল—সমাজের কোন কোন ব্যবস্থা কালীশঙ্করবাবুর ব্যবস্থার চেয়ে কড়া—তার বিরুদ্ধে কথা ব'লবার শক্তি আমাদের নেই! ব'ললাম—কি ক'রবে এ সম্বন্ধে আমার নিজের মত তুমি জিজ্ঞাসা ক'রো না। তবে আর কিছু না পার, আপাতত বাক্সে তুলে রাখতে পার।'

সুজাতা হয় ত ভেবেছিল একটি কথায় সে আমার মুখ বন্ধ ক'রে দেবে। সে ব'ল্লে—'আচ্ছা অমলদা, গয়না পরা ত ভোগ। ভোগে কি কোনদিন কারও আশা মেটে ?' একটু হেসে উত্তর দিলাম,—'ত্যাগেও কোনদিন আশা মেটে ব'লে আমার মনে হয় না। মানুষ ভূমি চেয়ে যেমন আশা মিটাতে পারে নি, ভূমা চেয়েও তেমনি অতৃপ্ত র'য়ে গেছে। অর্থের লিপ্সা দিন দিন বাড়ে; কিন্তু পরমার্থের তৃষ্ণাও দিন দিন কমে বলে শোনা যায় নি।'

সুজাতা আমার কথার মর্ম্মার্থ বুঝতে না পেরে চেয়ে

রইল। ব'ললাম, ভগবান সত্য, শিব এবং সুন্দর। অসুন্দর যে সে তাকে পায় না। অবশ্য আমি ব'লছি না যে এক গা গয়না প'রে থাকলেই সে সুন্দর হয়। মন যার থাকল কলুষ, চিন্তায় যার থাকল পাপ, তার বাইরের সজ্জায় কি হবে? কিন্তু একথাও সত্যি যে মন বাইরের কড়া জুলুমে নিজেকে ক'রল বঞ্চিত—নিজেকে যে জানল হীন দুঃখী ব'লে, সে তার পথের দাবী হারাল যাত্রা পথে; যার মন গেল পুড়ে, হৃদয় গেল শুষ্ক মরুভূমি হ'য়ে—পরম সুন্দরকে পাওয়ার পথ তার রইল কোথায়?'

বুঝলাম সুজাতা এমন কিছু একটা ব'লতে চায় যা তার নিজের অবস্থাটাকে সমর্থন করে। ব'ললাম, কোন কিছুর ব্রত উদ্‌যাপন, সমাজের—সম্প্রদায় বা ব্যক্তি বিশেষের কোন কৃচ্ছ্র-সাধনা—এর কোন মূল্য নেই তা আমার ব'লবার উদ্দেশ্য নয়। বরং তার প্রয়োজন আছে যদি সে প্রেরণা আসে নিজের অনুভূতি এবং আনন্দের ভিতর দিয়ে। কিন্তু পুরস্কার বা তিরস্কার দিয়ে যে ব্রত উদ্‌যাপিত হয়—যে সাধনা বাইরের অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত—পরলোকে সেই সাধনার বলে গোলোক কি ইন্দ্রলোক যাই পাওয়া যাক ইহলোকে সমাজ তার উপযুক্ত মূল্য দেয় নি। যে সারা জীবন শুচিতার ক'রল সাধনা, পুণ্যের ক'রল ধ্যান—সমাজপতি তার সম্বন্ধেই পাতি দিলেন অশুচি ব'লে। শুভকার্য্যে তার সঙ্গেই হ'ল অসহযোগ!

সুজাতা উপহার গ্রহণ ক'রে আমাকে তার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাল। আমি তাকে আশীর্ব্বাদ করবার বাণী খুঁজে পেলাম না!

সেদিন মনোযোগের সঙ্গে সুজাতাকে কি একটা জিনিস বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম এমন সময় থিয়েটারী ঢংএ একটি লোক হঠাৎ ঘরে ঢুকে আমাকে ব'ল্লে "গুড্‌ মর্ণিং, মাষ্টার মশাই।"

আমি হাত তুলে প্রতি নমস্কার জানালাম। সে প্রশ্ন ক'রল সিদ্ধি খেলে নেশা হয় আপনি মানেন?'

লোকটির প্রশ্ন শুনে অবাক হলাম। ব'ললাম, 'না মানবার কোন কারণ আছে ব'লেত মনে হয় না'।

'তবেই দেখুন, দিদি যে ব'লছে আমি সিদ্ধি খেয়েছি সেটা মিথ্যা একেবারে ফল্‌স্‌!' লোকটি খিল্‌খিল ক'রে হেসে উঠে আবার ব'ল্লে—আপনি পরীক্ষা নিন সার—এই আপনার সামনে এক পায়ের উপর ঠিক একটি ঘণ্টা আমি দাঁড়িয়ে থাকব।' বুঝলাম লোকটির নেশা হ'য়েছে। ব'ললাম, 'আচ্ছা, আর দাঁড়াতে হবে না আপনি যান—আপনি সিদ্ধি খান নি।'

'কুয়াইট সো'—মাইরি বলছি সার।—আপনি একটু লিখে দিন যে আমার নেশা হয় নি। অগত্যা তাই লিখে দিতে হ'ল। আমার বড্ড হাসি পাচ্ছিল এই মনে ক'রে যে, লোকটি আপ্রাণ শক্তিতে যতই চেষ্টা ক'চ্ছে প্রমাণ ক'ত্তে যে তার নেশা হয় নি—ততই তার নেশা হওয়ার অবস্থাটাই বেশী করে প্রকাশ পাচ্ছে!

ব্যক্তিটি নবাগত হ'লেও তার একটা বিশেষ পরিচয় আছে। শুনলাম, ইনি কালীশঙ্কর বাবুর সম্প্রতি আবির্ভূতা ভগিনীর গ্রাম সম্পর্কীয় ভ্রাতা। নাম কালীচরণ। এখানে মুহুরীরূপে কাজ-কর্ম্ম শেখাই তার উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু মোক্তারবাবু সে বিষয়ে মনোযোগী না হওয়ায় ইনি আজ যাই কা'ল যাই ক'রে ভগিনীর অনুরোধে ক্রমে আরও দুদশদিন এখানে থেকে তারপর ক'লকাতায় কোনও ফিল্‌ম্‌ কোম্পানিতে নিজের ছবি দেবেন এইরূপ সিদ্ধান্ত ক'রেছেন। সুজাতার কাছে শুনলাম, প্রত্যহ স্নানান্তে উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে তার চুলগুলি 'কেয়ারী' কর্ত্তে দু'তিন ঘণ্টা সময় লাগে!

তার পরদিন পড়াতে যেয়ে শুনলাম—'সুজাতা প'ড়বে না।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন? অসুখ বিসুখ ক'রেছে কি?'

'না—হাঁ—তাই। অসুখ বিসুখ ক'রেছে। পড়বে না'।

বেরিয়ে এলাম। পরক্ষণেই মনে হ'ল উত্তরদাতার কথা সত্য নয়—অথবা যদি সত্যই হয় তা হ'লে কি অসুখ সেটা জেনে যাওয়াই বা মন্দ কি? ফিরে এলাম। বাইরের ঘরে গিয়েই আমি ব'সলাম; মনে মনে ভাবছিলাম সুজাতার অসুখ বিসুখের কথায় উত্তর পেলাম—না এবং হাঁ! কোনটা ঠিক?—কিন্তু এই উত্তরদাতা লোকটিকে আমি চিনি; ইনিই সে দিন সিদ্ধির নেশাটা অসিদ্ধ ক'রবার জন্য পুরো একটি ঘণ্টা এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে উদ্যত হয়েছিলেন।

প'ড়বার ঘরে ব'সে ভাবছি—সুজাতার যদি অসুখ হ'য়েই থাকে তবে আমার সেটা সবিশেষ জানবার অধিকার আছে কি না—এমন সময় পাশের ঘরের কথাবার্ত্তা আমার কাণে গেল।

'মাষ্টারটা চলে গেছে ?'

দোতালার সিঁড়ি থেকে সেই ঝবাচুল কালীচরণ উত্তর দিল—'হ্যাঁ।'

'হুঁ, আমি সেই গোড়াতেই ওকে ব'লেছিলাম—ছাখো ওসব ঢং আমার ভাল লাগে না। বিধবা মেয়ের আবার লেখাপড়া কেন ? মেয়ে কেঁদেই আকুল !—তুমি ছাড়া আমার লেখাপড়া হবে না—কেন ? মাষ্টার কি দেশে আর নেই ? আমার ভাইয়ের কাছে কি ও বইখানা নিয়ে দু'দণ্ড ব'সতে পারে না ? মাষ্টার পড়ান—মুখে হাসির লহর খেলে যায় কেন বাপু ? সোমত্ত মেয়ে—তুমি পড়াবে ঘাড়গুঁজে পড়িয়ে যাও—রামায়ণ মহাভারতের কথা শেখাও—তা নয় কি সব ফট্ লট্ বলে—বোঝাও যায়না !'—তারপর নিজেদের এই বুঝতে না পারার জন্য একটা গৌরবময় চাপা হাসি। কথা হচ্ছিল সম্ভবত প্রতিবেশী কারও ঝির সঙ্গে। ভাবলাম —আর আমার এখানে থাকা ঠিক নয় ; কিন্তু তখনই মনে হচ্ছিল—উঠতে গেলে চেয়ারে শব্দ হবে—জুতোর শব্দ হবে ; ওরা হয় ত জানবে চুরি ক'রে আমি আমারই সম্বন্ধে এত বড় হীন কথা জেনে গিয়েছি ; আমার উঠা হ'ল না। শিথিল দেহভার নিয়ে আমি সেই চেয়ারের উপরেই প'ড়ে রইলাম।

যার সঙ্গে কথা হচ্ছিল সে জিজ্ঞাসা কল্লে—'ওর শ্বশুর বাড়ীর তারা কেউ বুঝি আর খোঁজ খবর নেয় না ?'

'দায় প'ড়েছে তাদের। উনিই চিঠি লিখেছিলেন ওর ভাসুরপো না কে আছে তার কাছে। তাতে লিখেছিলেন —ওর জীবিকার জন্য তাদের ভাবতে হবে না। ওর অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান উনি নিজেই ক'রে নিতে পারবেন ! ভাসুর-পো ত আর তোমার বাপ নয় যে বুকের উপর ব'সে যা ইচ্ছে তাই ক'রবে ?—আর তা ছাড়া এখানকার এই সব বিবিয়ানা, এই সব কীর্ত্তি কথা তাদের কাণে না যায় এমন ত নয়।'

কথা হ'চ্ছিল চাপা সুরে ; হঠাৎ চীৎকার ক'রে তার ভাইকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হ'ল—'দোকান থেকে ভাল ময়দা আনতে ভুল যেন না হয়।' প্রসঙ্গ আবার পূর্ব্ববৎ চ'লল। 'কি জানি ভাই, আমরা ত নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াব এমন কথা কোন দিন সাহস ক'রে ব'লতে পারলাম না ! সে যারা পারে গেরস্থর বাড়ী তারা যায়গা পায় ? পোড়া কপাল অমন মেয়ে মানুষের !

'উনি আমাকে বলেছিলেন, নজর রাখ।'

'কি আর নজর রাখব ? সেক্‌রা দোকান থেকে কানের ফুল তৈরী হ'য়ে আসছে—সুন্দর সুন্দর বলা হ'চ্ছে ! তা ভাই আমরাও এককালে কাল কুৎসিৎ ছিলাম না ; কিন্তু মুখের উপর অমন ক'রে 'মন পুড়ে গেল, হৃদয় মরুভূমি হ'য়ে গেল'—এসব কথা ত লজ্জার মাথা খেয়ে কেউ ব'লতে পারে নি ? ঝাঁটা মারি অমন লেখাপড়ার মাথায়। ওদিকে আবার সতী সাধ্বী সাজা হয়। আমার ভাই কালী সে ত ছেলে মানুষ ; উনি তার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলেন না।' পরে আরও চাপা গলার অস্পষ্ট কথা শোনা গেল— 'পায়ের ধুলো নেওয়ারই বা কি ঢলাঢলি ! আমি ভাই আর দেখতে পারলাম না—জানলা বন্ধ ক'রে দিয়ে সরে এলাম।' তারপর সেই দেখতে না পারার জন্য আবার নীতি-জ্ঞান— গৌরবের উচ্ছ্বসিত হাসির রোল !

আমার পায়ের নীচে থেকে যেন মাটি স'রে যাচ্ছিল, মাথা দিয়ে আগুন উঠছিল। আর থাকতে পারলাম না সেখানে। রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। সুজাতা হয়ত তার দোরে খিল এঁটে দিয়ে কাঁদছিল তখন।

বোর্ডিং-এ ফিরে এসে শুয়ে শুয়ে সতীন্দ্রের কথা, সুজাতার মায়ের কথা, আর যারা নীরব ক্রন্দনে তাদের নিষ্ফল আশাশূন্য জীবনটাকে কোন রকমে শেষ পর্য্যন্ত টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের কথা ভাবছিলাম, এমন সময় পাঁচু নন্দী এসে জিজ্ঞাসা ক'রল—'অমলবাবু এমন অসময়ে শুয়ে যে ? আপনার ছাত্রী পড়াতে যান নি আজ ?'

'না। তার অসুখ ক'রেছে।'

তাই বুঝি অমন মনমরা হ'য়ে প'ড়ে আছেন ? আচ্ছা এবার ত বুঝি ওদের মিট্‌ফোর্ড এর 'ইনসেনডায়ারী' পড়াতে হ'চ্ছে না ?

তার এই কথার মধ্যে ছিল একটা অসঙ্গত ইঙ্গিত। মনে হ'ল তখনই এক ঘুসি মেরে লোকটার মুখখানা খেঁতো ক'রে দিই। আমার কোন উত্তর না পেয়ে সে হাসতে হাসতে বেরিয়ে চ'লে গেল। এই পাঁচুনন্দী এককালে এই বোর্ডিংএর এক ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রেছিল। এখনও সেই সূত্রে মাঝে মাঝে এখানে এসে এক হাত তাস খেলে

বা বিলিতি মাসিক[illegible]র ছবি দেখে এবং আরও কারও সঙ্গে দুই একটা হাল্কা তরল রসিকতা ক'রে চ'লে যায়। এই পাঁচুনন্দীর সঙ্গে কালীচরণের খুব মাখামাখি ভাব—আমি কিছুদিন থেকে লক্ষ্য ক'রে এসেছি।

তারপর দু'চার দিন কেটে গেল—আমি আর সুজাতাকে পড়া'তে যাইনি; কিন্তু এরই মধ্যে কত কথাই কাণে এল! কিছুদিন পরেই শুনলাম পাঁচুনন্দী সুজাতার গহনা চুরীর দায়ে ধরা প'ড়েছে—আর আর্টিষ্ট কালীচরণ সুজাতার ঘরে অনধিকার প্রবেশ ক'রতে গিয়ে একটা আঙুলের অর্দ্ধেকখানি রেখে এসেছে!

সুজাতার ভবিষ্যৎ এরপর আমি একটা কিছু কল্পনা ক'রে নিলাম—যা' হ'য়েছে, হ'চ্ছে এবং হবে।

কিন্তু বাড়ী যাওয়ার আগে আমি সুজাতাকে এই কথাটি আর একবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া আবশ্যক মনে ক'রলাম যে হাজার বাধা বিঘ্ন সত্বেও যেন তার সঙ্কল্প স্থির থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই সাধারণ কথাটা সহজভাবে জানিয়ে যাওয়াই ক'রেছিল একটা অসাধারণ গোলযোগের সৃষ্টি। সেটা আমি জানতে পেরেছিলাম বাড়ী পৌঁছবার ঠিক দুদিন পরেই যখন থানার দারোগা সাহেব আমার নামে একটা গ্রেপ্তারী পরওয়ানা নিয়ে উপস্থিত হ'য়েছিলেন! ফুস্‌লিয়ে পরের মেয়েকে নিয়ে ইলোপ করার সন্দেহ চার্জ্জে! এই বায়স্কোপ এবং নভেল-সুলভ ব্যাপার যখন গ্রামের মধ্যে রাষ্ট্র হ'ল তখন কেউ অবাক হ'লেন, কেউ দুঃখ পেলেন! বৃদ্ধ রামলোচন ভট্‌চার্যি বাঁশের মাচার আসরে ব'সে এই কথাই বারংবার ব'লতে লাগলেন যে এসব ব্যাপার তিনি আগেই জানতেন—পরীক্ষা শেষ হ'ল, কলেজ ছুটি হ'ল, তবু ছেলেটা বাড়ীতে আসেনা কেন? রামলোচন তাঁর এই দূরদর্শিতার জন্য অনেকের কাছ থেকে ধন্যবাদ পেয়েছিলেন সন্দেহ নাই।

যা' হ'ক আমি যখন আবার স্নেহ[illegible] যাওয়া পরিবেষ্টনের মধ্যে ফিরে এলাম তখন সমস্ত গোলযোগ মিটে গেছে। সুজাতা স্ব-ইচ্ছায় একা তার শ্বশুর বাড়ীতে চ'লে গিয়েছিল। আমি অবশ্য কলঙ্ক থেকে মুক্তিলাভ ক'রলাম। কিন্তু বেচারা সে জানত না—তার যত দাবী স্বামীর সংসারের উপর, তার চেয়ে ঢের বেশী দাবী তার উপর সমাজের যথেচ্ছ ব্যবহারের। তাই সে যতখানি বুকের বল নিয়ে গিয়েছিল স্বামীর ঘর ক'রতে—তার দ্বিগুণ লজ্জা এবং দুর্ব্বলতা নিয়ে ফিরে এসেছিল বাপের বাড়ী। যে ভাবে যাওয়াটা সে মনে করেছিল পরম গৌরব—সেইটাই হ'য়েছিল তার সব চেয়ে অগৌরবের পরিচয়!

সুদীর্ঘ দুই বছর পরে আবার আমি ফিরে এসেছি। সতীন্দ্র এখনও জেলে। পুরস্কার বিতরণী সভায় দেখলাম—যারা পারদর্শিতার সঙ্গে পাশ ক'রেছে সুজাতা তারমধ্যে ব'সে আছে! আজ পথে বেরিয়ে সেই কথাই ভাবছিলাম যে কেবল দুঃখ কষ্ট নয়—লাঞ্ছনা, অপমান, লজ্জা, দৈন্য, নিন্দা—সবগুলির ভিতর দিয়েই তাকে আসতে হ'য়েছে। আজকের সভার সভাপতি সে খবর না জানলেও বিশ্বসভার অধিপতি সে খবর প্রতিদিন এবং প্রতিনিয়ত পেয়ে থাকবেন।

শীতের প্রকৃতি

শ্রীঅনিলা সেন

ধূসর আকাশ; নিস্তেজ মধ্যাহ্ন-রবি;
তৃণহীন শুষ্ক মাঠ; গৈরিক বসন
রুক্ষকেশ তপঃক্লিষ্ট তাপসের মতো।
হেমন্তের অফুরন্ত শস্যের সম্ভার
শূন্য আজি; শেফালির মৃদু গন্ধ,
শুভ্র কাশবনে মন্দ পবন-হিল্লোল
মনে ভেসে আসে যেন সুদূর স্বপন।

রিক্ত, হিমাকুল ধরণীর তন্দ্রাসম
ঘিরে আসে কুহেলীর জাল সন্ধ্যাগমে,
অস্তাচলে গোধূলির বর্ণ-সমারোহ
আজি অন্তর্হিত, রক্তরবিকরচ্ছটা
নীড়গামী বিহঙ্গের পক্ষপুট ভরি'
নাহি দেয় সুবর্ণ-প্রলেপ; ম্লান জ্যোতি
রজনীর তারাদল; স্তব্ধ ঝিল্লীরব।



খট্‌টোরী

সে দিন অভাব ঘচবে কি মোর
যে দিন তুমি আমার হবে।
আমার ধ্যানে আমার জ্ঞানে
প্রাণমন মোর ঘিরে রবে ॥
রইবে তুমি প্রিয়তম, আমার দেহে আত্মা সম,
জানিনা সাধ মিটিবে কিনা—
তেমন ক'রেও পাব যবে ॥
পাওয়ার আমার শেষ হবেনা
পেয়েও তোমায় বক্ষতলে,
সাগর-মাঝে মিশে গিয়েও
নদী যেমন ব'য়ে চলে।
চাঁদকে দেখে পরাণ জুড়ায়
তবু দেখার সাধ কি ফুরায় ;
মিটেছিল সাধ কি রাধার—
নিত্য পেয়েও নীলমাধবে ॥

কথা ও সুর ঃ—কাজী নজরুল ইস্‌লাম্‌ স্বরলিপি ঃ—জগৎ ঘটক

II সা রসা -ন্া সজ্ঞা ¦ জ্ঞপা -া -া -া | পদা মা পা পর্সা | ণা -ধণা -ধণাঃ -দপঃ I
সে দি৹ ন্ অ ভা ৹ ৹ ব্ ঘু৹ চ্ বে কি মো ৹ ৹ ৹ ৹ ৹র্

I পা পধা মা মা | পা -া -া -া | জ্ঞমা জ্ঞমাঃ -গমগা ঋঃ | সা -া -া -া I
যে দি৹ ন্ তু মি ৹ ৹ ৹ আ৹ মা৹ ৹ ৹ র্ হ বে ৹ ৹ ৹

I পা পদা পদণা ণদা | পা -া -া -া | পা পধা পমা মা | মপধণা -া -ধণর্সা -া I
আ মা৹ র৹৹ ধ্যা নে ৹ ৹ ৹ আ মা৹ র জ্ঞা নে৹৹ ৹ ৹ ৹ ৹ ৹ ৹

I ণা র্সা ণর্সা -র্র্সা | ণর্সা -ণার্স -দাণ -পা | জ্ঞমা জ্ঞমাঃ -গমগা ঋঃ | সা -া -া -া II
প্রা ণ ম৹ ৹ন্ মো৹ ৹ ৹ র্ ঘি৹ রে৹ ৹ ৹ ৹ র বে ৹ ৹ ৹

II মা পা পা পা | ণদা -ণদা -ণদা -ণা | ণর্সা -া সর্রা -র্সা:ন: | র্সা -া -া -া I
র ই বে তু মিং •• •• • প্রি • য়ং • ত ম • • •

I র্সা র্সর্রা র্রা· র্রা | র্জ্জা -া -র্সা -া | ণর্সা ণর্সা -া -নর্সা ন: দ: | পা -া -া -া I
আ মাং র দে হেং • •• • আং খ্যাং • ••• স ম • • •

I পদা পমা মা -া | মপধা -ণা -ধণা -া | ণা র্সা ণর্সা -ণর্সা: দ: | পা -া -া -া I
জাং নি না • সাং • •• ধ্ মি টি বেং •• কি না • • •

I পা পধা -া মা | পা -া -া -া | জ্ঞমা জ্ঞমা -া -গমগ: ঋ: | সা -া -া -া II
তে মং ন্ ক রে ও • • পাং বং • ••• য বে • • •

II জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞসা সা | সমা -া -া -া | মপা: -প: দা ণা | ণদা -পমা -পা -া I
পাও য়া ০য়্ আ মা • • র্ শে ষ্ হ বে নাং •• • •

I পা পধা মা মা | জ্ঞমা -পদা -া -া | পমা -জ্ঞরা জ্ঞা মা | মসা -া -া -া I
পে য়ে ও তো মাং •• • য়্ বং •• ক্ষ ত লে • • •

I পা ধা মা মা | মপা -দা -পদা র্সা | র্সধা -র্সা র্রা র্জ্জা | র্রর্সা -নর্সা -া -া I
সা গ র মা ঝেং • •• • মি • শে গি য়েং •• • ও

I ণর্সা ণর্সা -া নর্সা ন: দ: | দমা -া -া -া | সা সঋা গা: গঋ: | সা -া -া -া I
ন দী •••• যে ম • • ন্ ব' যেং • চ লে • • •

I মা -া পা পা | পদণা -দণা মা -া | মা মর্সা -র্রর্সনা নর্সা | নর্সা -া -া -া I
চাঁ দ্ কে দে খেং •• • • প রাং ••ণ্ জুং ড়াং • • য়্

I র্সা -র্সর্রা র্রা র্রা | র্জ্জা -া -র্রর্সা -া | ণা -র্সা ণর্সা -নর্সন: দ: | দপমা -া -া -া I
ত •• বু দে পাং • •• য়্ সা ধ্ কিং ••• ফু রাং • • য়্

I মা মপা -ধণা ধা | ণধা -ণা -া -া | ণা -র্সা ণর্সা -নর্সন: দ: | পা -া -া -া I
মি টেং •• ছি লং • • • সা ধ্ কিং ••• রা ধা • • য়্

I পা -ধা ধা: পম: | পা -া -া -া | জ্ঞা -মা: গমগা ঋ: | সা -া -া -া II II
নি • ত্য পে য়ে • • ও নী ল্ মাং•• ধ বে • • •

জীবনের ক্রমবিকাশে মনোবৃত্তির স্থান

ডাক্তার শ্রীনরেন্দ্রনাথ পাল এম-বি

আমরা জানি না, কোথায় গিয়া আমাদের অবরুদ্ধ চিন্তা প্রতিক্রিয়া করিবার বা রূপান্তরিত হইবার স্থান পায় এবং দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধিতে পরিণত হয়। তবে নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত হইতে মনে হয়—মস্তিষ্ক-কেন্দ্রগুলির মধ্যে পরস্পর যোগাযোগশীল স্নায়ুগুলির সন্ধিস্থলে গিয়া (Synapse) অবরুদ্ধ চিন্তাগুলি প্রতিক্রিয়া করিবার বা রূপান্তরিত হইবার স্থান পায়।

(১) আমরা জানি সম্মোহন-বিদ্যা বা যোগ-নিদ্রার দ্বারা বহুকাল-বিস্মৃত অথচ সক্রিয় অনেক জিনিস রোগীকে জানাইতে পারিলে তাহার হিষ্টিরিয়া বা এইরূপ ব্যাধি সারান যাইতে পারে। (২) বিখ্যাত কুয়ে (Coue) সাহেবের মতে হিষ্টিরিয়া রোগীকে বশীভূত না করিয়া যাহা ভাবিতে বলা যায়, তাহা যদি সে বিশ্বাস লইয়া ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনোরাজ্যের চিদ্ধর্ম্মের অবজ্ঞাত অবস্থায় সেই ভাবনা পৌঁছাইতে পারে—যেখানে অপরের দেওয়া ভাবনা (Suggestion) তাহার নিজস্ব ভাবনায় (Auto Suggestion) রূপান্তরিত হয়—তাহা হইলেও তাহার উক্ত রোগ সারান সম্ভব হয়। (৩) মাদুলী বা জল-পড়া কতকগুলি নিষেধাত্মক অনুজ্ঞার সহিত জড়িত হইয়া সজ্ঞান ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া-রাজ্যে অর্থাৎ অবজ্ঞাত মনে প্রক্ষিপ্ত হয় এবং স্নায়বিক রোগের প্রতিকারে সমর্থ হয়। (৪) মনস্তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনার দ্বারা মনের রুদ্ধ কোণের গোপন সন্ধান পাওয়া যায়। যখনই এইরূপ রূপ রসহীন সন্ধান মিলে তখনই বক্তাকে বা রোগীকে সেই বিষয়ের রস যোগাইতে হয়—সেই কথারই অনুরূপ সহানুভূতিপূর্ণ বিস্তৃত আলোচনার দ্বারা। এমনি করিয়া রোগীর বিস্মৃতির পট হইতে সজ্ঞান মনের নিষেধাত্মক হুকুম স্বীকার করাইয়া লইতে হয় এবং বিনা দ্বিধায় ক্ষুৎপিপাসাক্রান্ত পথভোলা পথিকের ন্যায়, পান্থশালার আহার-পানীয় দ্বারা তাহাকে পরিতৃপ্ত করাইয়া ঘরের ছেলেকে সোজা-রাস্তায় ঘরে ফিরিতে বলা হয়। মনের কোণের গোপন জিনিসের এই সমস্ত সন্ধান পাইতে হইলে রোগীর কথা বলিবার সময় মুখভঙ্গিমা, আড়ম্বর এবং অনাবশ্যক বিলম্ব—তাহার রীতিনীতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিতে হয়। বলা বাহুল্য, উক্ত পান্থশালার আহার-পানীয়, যৌন ক্ষুধার খোরাক ছাড়া আর কিছু নয়। সেগুলি ইহার গণ্ডী রেখা ছাড়িয়া অন্য ছদ্মবেশ ধরিয়া থাকিলেও পরীক্ষাকর্ত্তা বা বিচক্ষণ বিশ্লেষকের চক্ষে উক্ত প্রকার ঠুনকো-আচ্ছাদন কথায় কথায় ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং স্বরূপ লাভ করে। অন্তরের এই সব গোপন ক্ষুধার নগ্ন-মূর্ত্তির পরিচয় দেওয়াই এই প্রকার ব্যাধির যথার্থ চিকিৎসা; যেমন করিয়াই হউক তাহাকে তাহার নিজের কথার অনর্গলভাবে বলিতে দিতে হইবে—

> "যে বারতা, যেই ভাষা, নাহি পেয়ে আশা বুকে বুকে মূক ছিল,
> সেই গুপ্ত-কথা, আজিকে ফুটায়ে তুলি, আপনারে করি দান,
> আপনারই পানে।"

প্রতীচ্যে ইহাকে মনের বিরেচক-ক্রিয়া (Catharsis) বলিয়া থাকেন। আমরা ইহাকেই আত্মজ্ঞান বলিয়াছি।

আমাদের বক্তব্য, আমাদের বুভুক্ষু-আত্মা প্রকাশিত না হইয়া কোথায় স্নায়বিক ব্যাধিতে রূপ লয়? এই সমস্ত রোগ স্বভাবতঃ শান্তি-প্রদ ঔষধ (Valerian) ও মন্ত্র-অভ্যাস প্রভৃতি তান্ত্রিক বা হঠযোগের ক্রিয়া-কলাপের দ্বারাও দূর হয়। সম্মোহন-বিদ্যা, নিদ্রা, যোগনিদ্রা, তান্ত্রিক-বিদ্যা প্রভৃতির দ্বারা বাহ্য উত্তেজনা হইতে জীবকোষের অন্তর্জগত, তথা কোষ-কণিকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনের চৈতন্য জগৎ (Every cell has its mind) আক্ষিপ্ত হয় না। যে সত্য ইহার কারণ স্বরূপে সম্ভাব্য তাহা নিদ্রারাজ্যের স্নায়ুতথ্য নামে (Neuronic theory of sleep) পরিচিত। এই তথ্যে বলা হয়, উপরি উক্ত যোগাযোগশীল স্নায়ুগুলির সন্ধিস্থানই (Synapse) ইহার কর্ম্ম ক্ষেত্র। এইখানে রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গতিময় বৈদ্যুতিক বার্ত্তাবহ স্নায়ু অন্য আর একটি স্নায়ুর সহিত যুক্ত হয়। এই সন্ধিস্থানে শান্তিপ্রদ ঔষধগুলি কাজ করিতে পারে কি না জানা নাই তবে অন্য ঔষধ কাজ করিতে পারে। পরন্তু যে সব সহজ-জাত ক্রিয়া, (Reflex action) ব্যবহারিক জীবনে প্রায় পূর্ণতালাভ করে, তাহাদের প্রক্রিয়া অনুধাবন করিলে বুঝা যায় এই সন্ধিকেন্দ্রই—যতদিন উপরি উক্ত রূপ-রস আদিময়-বৈদ্যুতিক শক্তির কোনপ্রকার অপচয়ে (Diffusion) কারবার চালায়, ততদিন বার্ত্তা মস্তিষ্কে বা কার্য্যকরী কেন্দ্রে সুচারুরূপে পৌঁছে না এবং বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ারও উৎকর্ষ লাভ বা পূর্ণতা প্রাপ্তির বিলম্ব ঘটে। কিন্তু পুনঃ পৌনিক চেষ্টার দ্বারা যখন উক্ত ক্রিয়া অবগত হয় তখন এই সন্ধিকেন্দ্রগুলির আবেষ্টন কায়েম হইয়া উঠে। এই সন্ধিকেন্দ্রই (Synapse) আমাদের বুভুক্ষু আত্মার আড্ডা। কে জানে ইহারাই স্নায়ু-কোষের বিযোধক সেফ্‌টী-ভাল্‌ভ্‌ (safety valve) কি না? এইগুলিই স্নায়ু সঙ্কেত, আক্ষেপ, আন্দোলন, আলোড়ন ইত্যাদির সমীকরণ কার্য্যের একমাত্র সহায়ক। এইগুলিই বা অবরুদ্ধ চিন্তারাশির ভাণ্ডার ঘর এবং প্রতিক্রিয়া পথের গতি-সম্ভব স্থানিক কেন্দ্র; কেন না কোন বিশেষ ক্রিয়ার পূর্ণতার পথে, ইহাদেরই সঙ্গতি (co-ordination) এবং আবেষ্টনীর (Insulation) সম্পূর্ণতা অভাবে রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গতিময় বৈদ্যুতিক শক্তির অপচয় ঘটাইয়া বিঘ্ন জন্মায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে সাইকেল চালান বা সন্তরণ—এই প্রকার সহজজাত ক্রিয়া। কিন্তু

উক্ত উভয় প্রকার ক্রিয়ার প্রথম অবস্থায় যতই সংজ্ঞাত মনঃসংযোগ (conscious efforts of mind) করা যায়—সাইকেল নর্দ্দমায় যাইবে না বা কাহাকেও চাপা দিবে না—তথা সন্তরণকামী ব্যক্তি স্বয়ং ডুবিয়া যাইবে না, ততই সংজ্ঞাত বা বলজাত (eflortive) চেষ্টা তাহার বিরুদ্ধাচরণ উপস্থিত করিবে—(Effort is a conflic there) অর্থাৎ সাইকেল নর্দ্দমায় গড়াইবে,মানুষ চাপা দিবে এবং সন্তরণকামী লোক জলে হাবুডুবু খাইবে। অথচ বারম্বার চেষ্টার ফলে যতই উক্ত স্নায়ুকেন্দ্রের আবেষ্টনী শক্তি (Insulation or myclination) বৃদ্ধি পাইবে ততই সাইকেল চালান এবং সন্তরণ ক্রিয়ার পূর্ণতা লাভ ঘটিবে। উপরন্তু এই সন্ধি কেন্দ্র শূন্ততাময় (vaccuum) বলিয়া ইহাকে আকাশের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। মননশক্তি তাহা হইলে বেতারবার্ত্তার ক্রিয়া কলাপের সহিত নির্দ্দেশ্য। কেনই বা নয়?

বেতার জগতে, যেমন আকাশপথের ছোট বড় কম্পমান শব্দময় সঙ্কেতরাশি বেতার যন্ত্রের সম্মুখীন হইয়া রাশি রাশি শব্দের মূর্ত্তি গ্রহণ করে—সম আকিম্প্ত না হইলে যেমন করে না—তেমনি মস্তিষ্কের চৈতন্ত-শক্তি, রূপ-রসময় বৈদ্যুতিক শক্তিকণাকে ক্রিয়াশীল করে সজ্ঞানে—যদি এই সব সন্ধি কেন্দ্র তাহাদের গতিবিধানে সাহায্য করে; কিন্তু যখন বুভুক্ষু-আত্মা অবজ্ঞাত অবস্থা যাপন করে মনে হয় এই সমস্ত সন্ধিকেন্দ্রই তাহাদের গতিরোধ করে মস্তিষ্কের অন্তর্জ্ঞাত অবস্থায় এবং এই সমস্ত সন্ধির কেন্দ্রের চিৎকণিকার সমবায়ে। যখন সাহায্য করে, তখন সমস্বার্থে আন্দোলিত হয় বলিয়া। যখনই ব্যতিক্রম হয় তখন হয়ত—স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় নতুবা উপস্থিত ক্ষুণ্ণ করিয়া সম্ভাব্য শক্তির উৎকর্ষ যোগায়; অর্থাৎ জীবনের আশঙ্কামূলক চেৎ-পুরুষের হয়ত সেগুলা স্বার্থ মিটায়, মিটাইবার দাবী রাখে, নতুবা রাখে না। কে জানে, যে সকল সঙ্কেত অবজ্ঞাত বা অন্তর্জ্ঞাত থাকে তাহা এই সকল সন্ধিকেন্দ্রে শুধু যে বাধা পায় তাহা নহে, হয়ত এই সকল শূন্য গর্ভে অবরুদ্ধ থাকে। এই সকল অবরোধ অতিক্রম করিয়াই ত হিষ্টিরিয়ায়, রোগ-বিশেষের আকস্মিক আক্ষেপে, স্বপ্নে, কিম্বা নিদ্রালুতারূপ রোগবিশেষে (somnambulism) এই সব অপ্রকাশিত চৈতন্ত স্তূপের দ্বারোদ্ঘাটন হয় এবং চেৎপুরুষের সংজ্ঞাত রাজ্যে অথবা অন্তর্জ্ঞাত রাজ্যে—সজ্ঞানে বা অন্তর্জ্ঞানে, জাগরণে-স্বপ্নে বিকারে, বহু সঙ্কেতই নানা আকারে প্রকাশমান হয়, কথনো হুবহু, কথনো অনুকল্পে (imitative) কথনো বা বিকল্পে, (opposite) কথনো ঘন হইয়া (condensed) কথনো বা ফিকাকারে (Diffused)।

জীবন সংঘর্ষ-পরম্পরায় সমষ্টি এবং বাঁচিয়া থাকার অর্থ—বাধা বৈষম্য ও বিপর্য্যয় অতিক্রম করিয়া টি'কিয়া থাকা। জীবন সত্যই একটা সঙ্গতি (Harmony) বিশেষ। এই সঙ্গতি কষ্ট করিয়া অর্জ্জন করিতে হয়। এই সঙ্গতি একেবারে এক নিশ্চল দণ্ডের (pivot) উপর—চিদ্বস্তু বা সদ্বস্তু যাহাই বলুন, তাহার উপর নিয়তই পরীক্ষিত হয়। ত্যাগ ব্যতীত কোন উল্লেখযোগ্য সুসঙ্গত ও সুসমঞ্জস সুবিধা কখনও লাভ করা যায় না। ত্যাগ ব্যতীত জীবনের প্রকৃত সুখ বা শান্তি কোথায়? যে দণ্ডের উপর বা সদ্বস্তুর উপর জীবনের সঙ্গতি নির্ভর করে তাহা কি এবং ত্যাগই বা কিসে সম্ভবপর?

অবচেতনা বা মগ্ন-চৈতন্তের কারণ জানিতে হইলে মনস্তত্ত্ব আলোচনা আবশ্যক। চেতনার ক্ষেত্র—চিন্তা, জ্ঞান ও বুদ্ধির রাজ্য। এইখানেই আমাদের উপভোগ, চেষ্টা, আশা, ব্যর্থতা ও সহনশীলতার স্থান। অবচেতনার ক্ষেত্র—নিরুদ্ধ কামনার রাজ্য; যে কামনার উপর গোটা সৃষ্টিটা নির্ভর করিতেছে। সমগ্র বুদ্ধি, চিন্তা, জ্ঞান, কামনারই ভরণ-পোষণ ও পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত। আর কামনার অর্থ বর্ত্তমান অভাবের দূরীকরণের প্রবৃত্তি। স্বার্থান্বেষী জীব স্বার্থসিদ্ধিই কামনা করে—সেটা আংশিক সত্য; ব্যাপকতর সত্য আমাদের ত্যাগ। যৌন আকাঙ্ক্ষা এই ত্যাগেরই পরিচর্য্যা ও পরিপোষণ করে। এই আকাঙ্ক্ষা বা কামনার মধ্যে প্রেম নিবিড় হইয়া বাস করিতেছে। তাই ত প্রায় সকলের পক্ষেই যেমন বিবাহ দায়িত্বপূর্ণবন্ধন, সেইরূপ বিবাহ না করায়ও জীবনের ব্যাপকতর দায়িত্ব আছে। অসংজ্ঞাত তৃপ্তি লইয়া ইহার আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

অবচেতনার ক্ষেত্র নিয়ত নিদ্রারূপে স্বাভাবিকভাবে এবং মানসিক ব্যাধিরূপে অস্বাভাবিক ভাবে প্রতিক্রিয়া করে। বস্তুতঃ অবচেতনা—শান্তি, সম্ভাব্য শক্তি বিক্ষোভ বা মানসিক ব্যাধিরূপে এবং আকস্মিক দুর্যোগরূপ নানাপ্রকার অশান্তিরূপে প্রকাশমান হয়। এই অবচেতনার কারণসমূহ নির্দ্দেশ করাই মনস্তত্ত্ব আলোচনার বিশেষ কাজ। এমন কি স্বাস্থ্যপূর্ণ ও স্বাস্থ্যক্ষুণ্ণ অবস্থার উৎকট রীতিপ্রিয়তা, সামান্ত সামান্ত ভুলভ্রান্তি, এ সমস্তই অবচেতন মনের লক্ষণ ও বহির্বিকাশ। অবচেতন মনই এই সব সজ্ঞান বিকাশের মূলীভূত শক্তি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এই চেতনা সক্রিয়নিরোধের দ্বারা আপনাকে প্রথমতঃ অবচেতনারূপে সংগোপনে রাখে। তারপর হয়, শান্তিরূপে অজ্ঞেয় থাকিয়া যায়, নতুবা বহুপ্রকার বিক্ষোভ বা ব্যাধিরূপে প্রকাশমান হয়। স্বপ্ন সেই দিক দিয়া সেফ্‌টী ভাল্‌ভ; কারণ স্বপ্নে রুদ্ধ ইচ্ছার প্রকাশ পায়। তাহা ছাড়া এই সব রুদ্ধ ইচ্ছার আত্মপ্রকাশ আমাদের অজ্ঞাতে অনেক কাজেই দেখা যায়। ইহাকেই আমরা তৃপ্তি বলি। রুদ্ধ ইচ্ছার তৃপ্তি মোটা-মুটি দুইপ্রকার—সংজ্ঞাত ও অসংজ্ঞাত। বাকী যাহা তাহা অসংজ্ঞাত অতৃপ্ত তৃপ্তি অর্থাৎ দ্রাক্ষাফল টক্, না খাওয়াই ভাল; যেখানে ভক্ষণে অতৃপ্ত থাকিয়াও কল্পনায় তৃপ্তি লাভ ঘটে। যাহা সংজ্ঞাত তাহা কার্য্যে প্রকাশ পায়:—অনেকে পড়িতে বসিয়া দুলিতে থাকেন; খাইতে বসিয়া পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাড়িতে থাকেন। এ প্রকার দোলন কার্য্য বানরেরাও করিয়া থাকে এবং পায়ের বুড়া আঙুল নাড়াটা কুকুরের লেজ নাড়ার মত, কারণ লেজের স্থান যে কশেরুকার বা পৃষ্ঠদণ্ডের (spinal column) নিম্নতম স্থানটী অধিকার করিয়াছে পায়ের বুড়া আঙুল একই ভাগ (Segment) হইতে উদ্ভূত এবং সম বিভাগীয় স্নায়ু দ্বারা চালিত। তারপর অসংজ্ঞাত তৃপ্তি যখন কার্য্যে অপ্রকাশ থাকে তখন উহাকে কাল্পনিক ভাবে মিটাইতে হয়। এই খানেই জীবনবর্দ্ধনের প্রকাশ পায়; কথনো কথনো পায় না; যখন প্রকাশ পায় কল্পনা তখন পরকীয়,

যখন জীবন বর্দ্ধনের প্রকাশ পায় না কল্পনা তখন বকীয়। ইন্‌স্পেক্টর সাহেব পাঠশালা পরিদর্শনে আসিয়া দেখেন বালকগুলি পড়িবার ঘরেই লাফাইতেছে; শিক্ষক মহাশয়ের হুঁস নাই; তিনি তখনো দেখিতেছেন তাঁহার প্রয়োজন, প্রিয়বস্তু বা টাকাই লাফাইতেছে; কল্পনায় তাঁহার তৃপ্তি লাভ ঘটিতেছে সুতরাং ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের উপস্থিতিতেও বালকদিগের আচরণ অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হইতেছে না। অপর পক্ষের পরকীয় বা তদাত্মভাব—বিধবার মাছ খাইতে নাই কিন্তু রাঁধিয়া খাওয়াইতে কেমন যেন তাহার ভাল লাগে। বহুমূত্র রোগীর সন্দেশ খাইতে নাই তাই দেবতার কাছে উহা উৎসর্গ করিয়া এবং চিকিৎসকের নিকট উপহার পাঠাইয়া তাহার সে পরিতৃপ্তি হয় আমরা দেখিয়াছি।

আমাদের অনুভূতি—কামনা ও তাহার তৃপ্তি লইয়া গঠিত। আর যে মানুষের স্তর যত উঁচু তাহার অনুভূতি তত তীক্ষ্ণ। কাজেই জীবনের ভোগ দুঃখ-ভোগের নামান্তর। যিনি আপেক্ষিক ভাবে ভোগী নহেন তিনি অপেক্ষাকৃত দুঃখী নহেন অর্থাৎ তিনিই সুখী যিনি ভোগী নহেন। তবে কেন মানুষ জীবন ভোগের প্রয়াস পায় এবং জীবন লোপের প্রয়াস পায় না; সত্যই পায়। সে পক্ষের কথা কামনা নিরোধ কর, কর্ম্ম থাকিবে না, মুক্তিলাভ করিবে। ইঁহাদের বক্তব্য স্বতন্ত্রীকরণে—নিজেকে কামনা হইতে মুক্ত করিয়া। অপর পক্ষের কথা - চেতনা ও মগ্নচৈতন্য পরস্পরকে পরাজিত ও সাহায্য করিয়া থাকে এবং পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া পরস্পরের অবস্থা গড়িয়া তুলে। মগ্নচৈতন্য তো চেৎপুরুষের অনুপ্রেরণা। মানুষের অন্তর্মুখী আত্মা অপ্রকাশ থাকিলেও তাহার বহিঃ-প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বাস করিতেছে। আমরা দেখাইতেই প্রয়াস পাইব কি পদার্থবিদ্যা, কি রসায়নশাস্ত্র, কি ভৈষজ্য বিদ্যা, যে বিষয়েরই আলোচনা করিতে যাই না কেন উক্ত সত্যকে পৃথক করিয়া রাখা যায় না।

ডাঃ কেণ্ট বলেন "You cannot divorce medicine and theology. Man exists all the way down from innermost spiritual to his outermost natural."

যখন এই উভয়ের মধ্যে—চৈতন্য এবং মগ্নচৈতন্যের মধ্যে মিলনের পরিবর্ত্তে সংঘর্ষ বাধে (যেমন ব্যাধিতে বিশেষ স্নায়বিক ব্যাধিতে) তখন শরীরের সুষ্ঠু সংস্কারের জন্য উভয়ের মধ্যে বুঝাপড়ার আবশ্যক হয়। এই আত্মজ্ঞান বা বিরেচক ক্রিয়ার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সে পক্ষের কথা এই জীবনের অভিসন্ধি বুঝা পড়ার বা সমীকরণে—নিজেকে পারিপার্শ্বিক জগতের সহিত, অজ্ঞানকে জ্ঞানের সহিত, আয়ুর্ব্বেদীয় বাত, পিত্ত, কফ পরস্পরের মধ্যে বনিবনাও করায়। তাঁহাদের কথা এই জ্ঞানের দ্বারাই "নেতি নেতি" করিয়া পরে কামনা হইতে মুক্তি পাইবে। মোট কথা জীবনের প্রকৃত ঠাওর নিজেকে স্বতন্ত্রীকরণেই হউক আর সমীকরণেই হউক, এক অবস্থায় মিলে। কর্ম্মপাশাবদ্ধ জীব পরিশেষে কামনা হইতে মুক্তি লাভ করিবে। ইহাই সচ্চিদানন্দের রূপ।

মনের চেতন অবস্থায় বা সংজ্ঞাত রাজ্যে (conscions) স্বার্থের প্রগাঢ়তা দ্বারাই আমরা যথার্থ অবস্থা অবগত হইতে ও স্মরণ করিতে পারি। বিস্মৃত ভাবনার মধ্যে, অন্তর্জ্ঞাত বা অবজ্ঞাত ভাবনা (unconscious) অপেক্ষা সজ্ঞান লভ্য অসংজ্ঞাত ভাবনা (foreconscious) অধিকতর মনোহর বা অপেক্ষাকৃত স্বার্থপরিপোষক বলিয়াই আমাদের জীবনস্মৃতি বিস্মৃতির তল হইতে চেষ্টা করিয়া স্মরণ করিতে পারি। অন্তর্জ্ঞাত বা অবচেতন মনের ভাবনাগুলি স্বপ্নে স্থান পায়। নিদ্রিত অবস্থায় পিপাসা বোধ হইলে অনেকেই জলের স্বপ্ন দেখেন। এইরূপে জীবনের স্বার্থ, নিদ্রারাজ্যে স্বপ্ন, সমাজের স্নেহের বন্ধন, পদার্থ বিদ্যার বৈদ্যুতিক গতিসম্ভাব্য, রাসায়ণিকের পরমাণু মধ্যে অনুরাগ (affinity), জীবনের যৌন প্রেরণারই অনুরূপ বলা যায়। আর ইহাদের জ্ঞান-সমন্বয়ে, জীবনের এবং এই জগতের গোটা অভিপ্রায়ের সন্ধান পাওয়া যায়।

পদার্থবিদ্যায়, যেমন ঈথার কম্পনে (Ethereal vibration) আলোকের গতি শূন্যে প্রবাহমান হয় এবং এই ঈথার অনির্দ্দেশ্য হইলেও ইহার কল্পনা অবশ্যম্ভাবী—সেইরূপ জীবকোষের মননক্রিয়ার চৈতন্যরূপ সংজ্ঞাত ও অসংজ্ঞাত অবস্থায় থাকে। চৈতন্যরূপী জ্ঞাত ও অজ্ঞাত আত্মা বা ব্রহ্মই—যে সমস্ত অনুভূতির তথা কামনা, আন্দোলন, আলোড়ন, আক্ষেপ ও বিক্ষোভের—স্বতন্ত্রীকরণে ও সমীকরণে—প্রকাশ ও অপ্রকাশে মূলীভূত হইয়া সদা বিরাজমান—জলে স্থলে, ব্যোমে—জড়ে ও জীবনে—সর্ব্বত্রই এ কথা অস্বীকার করিবে কে? তাই বলিতে ইচ্ছা করে "কে তুমি চালাইছ মোরে অন্তর বাহিরে?" আমার জীবন গতিতে তুমি গণ্ডীরেখা টানিয়েছ কেন? কখন? তবে কি—"ব্রহ্মোঽস্মি, তত্ত্বমসি, ওঁ তৎসৎ" ইহা ছাড়া কোন জ্ঞান সম্পূর্ণ হইবার নহে? রবীন্দ্রনাথের কথায়—

'মনে হয় কি একটা শেষ কথা আছে
যে কথা হইলে বলা সব বলা হয়"

সে কি পূর্ব্বোক্ত ঋষিবাণী?

"যে কথা শুনিতে সবে রবে আশা করি
মানব এখনো তাই ফিরিছেনা ঘরে
সে কথায় আপনারে পাইব জানিতে
আপনি কৃতার্থ হব আপন বাণীতে।" ক্রমশঃ



দ্বৈরথ

"বনফুল"

(২১)

আনন্দপুর মেলায় উগ্রমোহন সিংহের তাঁবু পড়িয়াছে। উগ্রমোহন পৌঁছিবার কিছু পরেই চন্দ্রকান্তের পাল্‌কিও আনন্দপুরে পৌঁছিল। নিজের আগমন উগ্রমোহনকে জানাইবার ইচ্ছা চন্দ্রকান্তের ছিল না। সুতরাং প্রকাণ্ড একটি বটবৃক্ষতলে পাল্‌কিটা তিনি নামাইতে বলিলেন। পাল্‌কি হইতে বাহির হইয়া চন্দ্রকান্ত বেহারাদের বিদায় দিলেন। বলিলেন —"তোরাও মেলা দেখ গিয়ে যা" বলিয়া প্রত্যেক বেহারাকে কিছু অর্থ দিলেন। বেহারাগণ আভূমি প্রণত হইয়া সেলাম করিল এবং খুসী হইয়া মেলার জনতার মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। তাহারা চলিয়া গেলে চন্দ্রকান্ত আবার পাল্‌কির ভিতর প্রবেশ করিলেন। একটু পরে পুনরায় যখন তিনি পাল্‌কি হইতে বাহির হইয়া আসিলেন তখন তাঁহাকে চেনা শক্ত। সামান্য একজোড়া গোঁফ এবং একটি রঙীন চশমার সহায়তায় চন্দ্রকান্ত একেবারে ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন।

ছদ্মবেশ ধারণ করা চন্দ্রকান্ত রায়ের একটি গোপন সখ। এ বিষয়ে বহু পুস্তক তিনি পড়িয়াছেন এবং বহু অর্থ তিনি ব্যয় করিয়াছেন। চন্দ্রকান্ত জীবন-রসের রসিক। তিনি ইহা ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন এক বেশে জীবনের বৈচিত্র্য উপভোগ করা যায় না। জীবনের বিভিন্ন স্তরের বিচিত্র প্রাণবস্তুর সম্যক্ পরিচয় লাভ করিতে জমিদার চন্দ্রকান্ত রায় একা অপারগ। জমিদার চন্দ্রকান্ত রায় জমিদারমহলেই স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারেন এবং অভিজাতসম্প্রদায়সুলভ খানিকটা আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন। কিন্তু জমিদার চন্দ্রকান্ত রায়ের পক্ষে বেদের তাঁবুতে গিয়া ফুল্‌কির নৃত্যলীলা দর্শন করা সম্ভবপর নয়। এই মানব-জীবনের নানা বিভাগ। এক বিভাগের আচারব্যবহার পোষাকপরিচ্ছদ অন্য বিভাগে অচল। সুতরাং সর্ব্ব বিভাগের রসাস্বাদন করিতে হইলে ছদ্মবেশ প্রয়োজন। চন্দ্রকান্ত ভাল করিয়াই বুঝিয়াছেন যে বৈচিত্র্য পাইতে হইলে জমিদার চন্দ্রকান্ত রায়ের স্বরূপত্ব মাঝে মাঝে লোপ করিয়া দেওয়া দরকার। গভীর নিশীথে চন্দ্রকান্ত রায় কতবার কত বেশে কত স্থানে গিয়াছেন। এই সেদিনই ত নিজেরই একটা জলকরে ধীবরের বেশে জেলে ডিঙিতে মাছ ধরিয়া তিনি রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

আজও তাঁহার সখ হইয়াছে—ছদ্মবেশে মেলাটা দেখিবেন। সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে। নিকটেই দেখিলেন মেলার জমিদার রামপ্রতাপ চৌবের তাঁবু পড়িয়াছে। তাঁবুর মধ্যে নৃত্য-গীতের আয়োজন। চন্দ্রকান্ত সেইদিকেই অগ্রসর হইলেন।

উগ্রমোহনও মেলায় ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে-ছিলেন। মেলার যে অংশে ঘোড়া বিক্রয় হইতেছিল—উগ্রমোহন সেইদিকে গেলেন। একটি ঘোড়া দেখিয়া তাঁহার ভারি পছন্দ হইয়া গেল। কালো কুচ্‌কুচে ঘোড়াটি—পায়ের চারটি খুর শাদা—কপালে শাদা তিলক। রেশমের মত কোঁকড়ান ঘাড়ের চুলগুলি। অশ্ব ঘাড় বাঁকাইয়া আছে। সুন্দর সুলক্ষণ ঘোড়া। উগ্রমোহনের কিনিবার সখ হইল। তিনি তাঁবুতে ফিরিয়া অক্ষয় গোমস্তাকে দর-দস্তুর করিবার নিমিত্ত পাঠাইলেন। অশ্বটি অধিকার করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত হৃদয় প্রলুব্ধ হইয়া উঠিল। ক্রীড়ণকলুব্ধ বালকের ন্যায় উগ্রমোহন সিংহ নিজের তাঁবুতে অক্ষয়ের প্রত্যাগমন প্রত্যাশায় বসিয়া রহিলেন। একটু পরেই অক্ষয় ফিরিল এবং কহিল "ঘোড়া ত হুজুর আগেই বিক্রি হয়ে গেছে।"

"তাই না কি? কে কিনেছে?"

"রামপ্রতাপবাবু—"

"ও"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উগ্রমোহন সিংহ বলিলেন —"আচ্ছা তুমি রামপ্রতাপবাবুর কাছেই যাও। তাঁকে আমার নমস্কার জানিয়ে বলো যে ঘোড়াটি আমার ভারি পছন্দ হয়েছে—তিনি যদি ঘোড়াটি আমাকে বিক্রয় করেন আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব। তিনি যে দামে কিনেছেন

তার চেয়ে দাম আমি বেশী দিতেও রাজী আছি। সঙ্গে টাকা কত আছে ?"

অক্ষয় সংক্ষেপে কহিল—"টাকা আছে।—শুনলাম ৩২৫৲ টাকায়—"

"আচ্ছা, তুমি যাও—গিয়ে বলো যে আমি পাঁচশ পর্য্যন্ত দিতে রাজী আছি। ঘোড়াটা আমার চাই।"

অক্ষয় চলিয়া গেল। অবুঝ বালকের মনোবৃত্তি লইয়া উগ্রমোহন নিজ তাঁবুতে বসিয়া অধীরভাবে গুম্ফ প্রান্তে চাড়া দিতে লাগিলেন।

রামপ্রতাপ চৌবে তরুণবয়স্ক জমিদার। মেলায় একটু স্ফূর্ত্তি করিতে আসিয়াছেন। তিনি উগ্রমোহনের মত ঘোড়ার সমঝদার নহেন; কেবল বাজারের সেরা ঘোড়াটা দেখিয়া তিনি কিনিয়া ফেলিয়াছেন মাত্র। ঘোড়ার অপেক্ষা তাঁহার বাইজির সখই বেশী। দুইজন সুন্দরী বাইজি ইতিমধ্যে আসিয়া তাঁহার তাঁবুতে আসরও জমাইয়াছে। ছদ্মবেশী চন্দ্রকান্ত রামপ্রতাপ চৌবের মোসায়েব সাজিয়া বাঁয়া তবলা লইয়া জাঁকাইয়া বসিয়াছেন। রামপ্রতাপ চৌবে যদি ঘুণাক্ষরেও চন্দ্রকান্তের আসল পরিচয় জানিতে পারিতেন তাহা হইলে অবশ্য এ রস আর জমিত না। এ অঞ্চলের ছোট বড় সকল জমিদারই চন্দ্রকান্তকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। শ্রদ্ধাস্পদকে লইয়া আর যাই হোক, বাইজির আসর জমে না। চন্দ্রকান্ত মতিলাল নামে নিজের পরিচয় দিয়া বেমালুমভাবে মোসাহেবের দলে ভিড়িয়া গিয়াছেন এবং আসর জমাইয়া তুলিয়াছেন।

অক্ষয় যখন আসিয়া হাজির হইল তখন চৌবেজির বেশ একটু রসাপ্লিষ্ট ভাব। সিদ্ধির নেশাটি ধরিয়াছে—সম্মুখে সুন্দরী বাইজি গাহিতেছে—

উমড় ঘুমড় ঘন গরজে
মেরো পিয়া পরদেশ—

গান থামিতে অক্ষয় উগ্রমোহনের প্রস্তাব চৌবেজিকে নিবেদন করিল। চৌবেজি প্রথমটা বুঝিতেই পারেন না। ঘোড়া কেনার কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন।—স্মৃতি-শক্তি ফিরিয়া আসিলে তিনি বলিলেন—"ও, উগ্রমোহনবাবু ঘোড়া নেবেন ? বেশ ত !"

চকিতের মধ্যে চন্দ্রকান্ত দেখিলেন একটি সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে; তিনি চৌবেজিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"দিয়ে দিন ঘোড়া। কিন্তু উগ্রমোহনবাবু দাম দিতে চাইছেন এইটে আমার ভাল লাগছে না। সামান্য একটা ঘোড়ার দাম নেওয়াটা কি হুজুরের ইজ্জতের পক্ষে ক্ষতিকর নয় ? ঘোড়া আপনি দিয়ে দিন, দাম নেবেন না।"

সিদ্ধির ঝোঁকে চৌবেজি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—"না, দাম নেব না।"

ছদ্মবেশী চন্দ্রকান্ত তখন অক্ষয়ের দিকে ফিরিয়া বুঝাইয়া বলিয়া দিলেন—"বাবু সাহেব বলিতেছেন যে তিনি ঘোড়াটিকে বিক্রয় করিবেন না। তবে সিংহ মহাশয়ের যদি এই সামান্য অশ্বটিকে পছন্দ হইয়া থাকে তাহা হইলে তিনি সানন্দে ইহা তাঁহাকে দান করিতে প্রস্তুত আছেন !"

অক্ষয় এই বার্ত্তা লইয়া ফিরিয়া গেল !

উগ্রমোহন অধীরভাবে পায়চারি করিতেছিলেন।

অক্ষয় গিয়া চৌবেজির বার্ত্তা নিবেদন করিতেই বারুদের স্তূপে যেন আগুন পড়িল ! উগ্রমোহন চীৎকার করিয়া উঠিলেন —"কি বল্লে—দান ? অর্ব্বাচীনটার স্পর্দ্ধা কম নয় ত ! একটা চুনো-পুঁটি পত্তনীদার—তার এত বড় লম্বা কথা ! সাড়ে পাঁচ শ' টাকা আন। আর হরনন্দন সিপাহীকে ডেকে দাও—।"

অক্ষয় একটি থলি করিয়া সাড়ে পাঁচ শত টাকা আনিয়া প্রভুর হস্তে দিল। হরনন্দন সিপাহী আসিলে উগ্রমোহন বলিলেন—তুম্ লোগ কয় আদ্‌মি হো ?

—পঁচিশ।

—মার পিট করনেকা লিয়ে তৈয়ার রহো ! ঔর দো সিপাহী হামারা সাথ্ চলো !

দুইজন সিপাহী সমভিব্যাহারে উগ্রমোহন সিংহ শঙ্কর-মাছের হাণ্টার গাছটা হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

চৌবেজির তখন বেশ তন্ময় ভাব। সম্মুখে নৃত্যপরা বাইজি। মতিলাল ওরফে চন্দ্রকান্ত—সঙ্গত করিয়া

চলিয়াছেন। তবলা সারেং নূপুরের ঐক্যতানে অপূর্ব্ব রসলোক সৃষ্ট হইয়াছে। এমন সময় মূর্ত্তিমান রস-ভঙ্গের মত উগ্রমোহন আসিয়া উপস্থিত। তিনি সোজা চৌবেজীর কাছে গিয়া সপাসপ্ ঘা কয়েক চাবুক বসাইয়া দিয়া বলিলেন—"উগ্রমোহন সিং কারো দান নেয় না কথনো। মানীর মান রেখে কথা বলতে শিখুন।" তৎক্ষণাৎ টাকার তোড়াটা ঝনাৎ করিয়া আসরে ফেলিয়া বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন—"ঘোড়া নিয়ে চল্লাম। সাধ্য থাকে আটকান।"

হাল্লা হৈ হৈ মারামারির মধ্যে সেই রাত্রেই উগ্রমোহন অশ্বপৃষ্ঠে মেলা ত্যাগ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে জমিদার চন্দ্রকান্ত রায়ও আসিয়া পাল্‌কিতে আরোহণ করিলেন। তাঁহার মুখে একটি মৃদু হাস্য রেখা। এত সহজে কার্য্যসিদ্ধি হইবে তিনি ভাবেন নাই। গোলক সাকে উদ্ধার করিতে হইলে উগ্রমোহনকে অন্য কোন ব্যাপারে ব্যাপৃত করিয়া অন্যমনস্ক রাখা দরকার। গতকল্য হইতে চন্দ্রকান্ত চিন্তা করিয়াছিলেন কি করিয়া তাহা সম্ভবপর হইবে। উগ্রমোহন একটু অন্যমনস্ক না থাকিলে গোলক সার অনুসন্ধান করা অসম্ভব। অন্তত কমলাক্ষ তাহাই বলিতেছে।

মতিলাল-বেশে আন্দাজে যে দাবার চালটা তিনি চালিয়াছিলেন তাহা অব্যর্থ হইয়াছে দেখিয়া চন্দ্রকান্ত অত্যন্ত পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

(২২)

উক্ত ঘটনার প্রায় পনর দিন পরে একদিন সন্ধ্যায় অঘোর চক্রবর্ত্তী আসিয়া উগ্রমোহনকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলেন।

উগ্রমোহনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হল ?"

অঘোরবাবু শান্তভাবে উত্তর দিলেন—"মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হয়ে গেল।"

'তাই না কি ?'

"আজ্ঞে হ্যাঁ"

"যাক্। ঘোড়াটা চড়ার সখও মিটে গেছে আমার। এবার ওটা চৌবেজিকে ফেরত দিয়ে দাও।"

"যে আজ্ঞে"

"থাম, একটা চিঠিও আমি দিয়ে দেব ওর সঙ্গে" বলিয়া উগ্রমোহনবাবু নিজের খাসকামরায় প্রবেশ করিলেন। অঘোরবাবু বাহিরে দাঁড়াইয়া নীরবে তামাটে গোঁফ জোড়াটাকে দক্ষিণ করতল দিয়া অকারণে মুছিতে লাগিলেন। যথনই অঘোরবাবু এরূপ করেন তথনই বুঝিতে হইবে অঘোরবাবু মনে মনে কোন কিছু চিন্তা করিতেছেন। অঘোরবাবুর পরিচ্ছদও আজ একটু অসাধারণ ধরণের। অঙ্গে একটি কালো চাপকান গোছের লম্বা কোট—গলায় পাকান শাদা চাদর এবং মাথায় পাগড়ি জাতীয় শিরস্ত্রাণ্। তিনি সদর হইতে ফিরিয়াছেন ; আনন্দপুর মেলায় যে দাঙ্গা হইয়াছিল সেই সম্পর্কে মোকদ্দমার তদ্বির করিতে তিনি জিলা-কোর্টে গিয়াছিলেন। এত বড় একটা মোকদ্দমা কি উপায়ে যে সহসা ডিস্‌মিস্ হইয়া গেল তাহা অঘোরবাবুই জানেন।

উগ্রমোহন সিংহ ঘরে বসিয়া পত্র লিখিলেন—

প্রিয় চৌবেজি,

আমার সখ মিটিয়াছে।—এইবার আপনার সখ মিটাইতে পারেন। ঘোড়াটি ফেরত পাঠাইতেছি। মামলা করিয়া কোন সুবিধা হইবে না তাহা আশা করি বুঝিয়াছেন।

উগ্রমোহন সিংহ।

বাহিরে আসিয়া পত্রখানি অঘোরবাবুর হস্তে দিয়া তিনি বলিলেন—"এই চিঠির সঙ্গে ঘোড়াটা পাঠিয়ে দাও।"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া অঘোরবাবু পত্রখানি লইলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন—"সদরে গিয়ে শুনলাম—শ্যামাঙ্গিনী দাতব্য চিকিৎসালয় হচ্ছে। রাণীমার নাম করে সেখানে হাজার খানেক টাকা দান করে এসেছি।

শ্যামাঙ্গিনী কে ?

"শ্যামাঙ্গিনী দেবী হচ্ছেন বর্ত্তমান সদরালার স্ত্রী। অতি সদাশয়া মহিলা ছিলেন তিনি। তাঁরই স্মৃতিরক্ষার জন্য চিকিৎসালয় হচ্ছে শুনলাম।" অঘোরবাবুর প্রস্তরবৎ মুখমণ্ডলে ক্ষণিকের জন্য একটু হাসির আভাস যেন জাগিয়া মিলাইয়া গেল।

উগ্রমোহন বলিলেন—বেশ করেছো।

তাহার পর অঘোরবাবু বলিলেন—গোলক সা সম্বন্ধে একটা কোন ব্যবস্থা করা দরকার। তাকে এরকমভাবে লুকিয়ে আর কতদিন রাখা যাবে ?

"কোথায় আছে এখন ?"

"কালীর মন্দিরে—চাষা মাঠে।"

উগ্রমোহন খানিকক্ষণ ভাবিলেন—তাহার পর বলিলেন "আচ্ছা আগামী কালী পূজার দিন—আমি রাত্রে সেখানে যাব। মায়ের পূজার ভাল করে আয়োজন ক'রো।"

"যে আজ্ঞে।"

উগ্রমোহন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"গোলক সার ব্যাপারে একদল নিরীহ বেদে বেদেনী যে ধরা পড়েছিল শুনেছিলাম, তাদের কোন ব্যবস্থা করেছ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তারা ছাড়া পেয়ে গেছে। আমাদের সদর নায়েব কুঞ্জবাবু সে বন্দোবস্ত করে এসেছেন।"

"তাদের কিছু দিয়ে দেওয়া হয়েছে ত ?"

"আজ্ঞে হাঁা। প্রত্যেককে দশ টাকা করে নগদ—আর একখানা করে কাপড় দেওয়ার হুকুম দিয়েছি।"

"কি করে ব্যবস্থা হ'ল ?"

"তারা ছাড়া পাবার পর শিয়ালমারি কাছারিতে তাদের নাচগান করবার জন্ম ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।"

ম্যানেজারের এতাদৃশ দূরদর্শিতায় উগ্রমোহন সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "সবাই সব পেলে—তুমিই কিছু পেলে না।"

অঘোরবাবুর পাষাণ মুখচ্ছবি কোন ভাবপ্রকাশ করিল না। কেবল কহিল—"আপনার অনুগ্রহই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

উগ্রমোহন বলিলেন—"আচ্ছা এখন তাহলে যাও। আগামী কালী পূজার দিন গোলক সার ব্যবস্থা করে ফেলা যাবে।"

অঘোরবাবু নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

অঘোরবাবু চলিয়া যাইতেই উগ্রমোহনের মনে হইল ওদিকের জানালাটার দিক্ হইতে ঝপ্ করিয়া কি একটা শব্দ হইল। উগ্রমোহন বলিলেন—কে ? বলিয়া জানালার দিকে আগাইয়া গেলেন। মনে হইল অন্ধকারে কে যেন দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছে। আবার তিনি ডাকিলেন—"এই—কে !"

"আজ্ঞে আমি"—বলিয়া মূর্ত্তিটি ফিরিয়া আসিয়া নমস্কার করিল।

"মাণিক মণ্ডল যে ! ওখানে কি করছিলে তুমি ?"

"আজ্ঞে সিকি আমার একটা পড়ে গিয়েছিল হুজুর, তাই খুঁজছিলাম।"

"সিকি ? ওখানে হঠাৎ সিকি গেল কি করে ?"

"কেতলাটায় একটা বেল পড়ল কি না, তাই কুড়োতে গিয়ে সিকিটা গেল পড়ে !"

"তাই না কি ?"

"হুম্ ব্রো--হুম্ ব্রো—হুম্ ব্রো"—চন্দ্রকান্তের পাল্‌কি আসিল।

উগ্রমোহন সেইদিকে আগাইয়া গেলেন। মাণিক মণ্ডল পলাইয়া বাঁচিল !

তাহার পরদিন অঘোরবাবু আসিয়া আবার প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সংবাদ এই যে শ্রীযুক্ত রামপ্রতাপ চৌবের নিকট যে সিপাহী অশ্বটি লইয়া গিয়াছিল তাহাকে চৌবেজি অপমান করিয়া দূর করিয়া দিয়াছেন এবং ঘোড়াটাকেও গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছেন। এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য তাহাই তিনি জানিতে আসিয়াছেন। অঘোরবাবু ইহাও বলিলেন—"খবরটা শুনলাম বলে' হুজুরকে জানিয়ে গেলাম। কিন্তু আমার মনে হয় এ সব সামান্য ব্যাপার নিয়ে বেশী আর ঘাঁটাঘাঁটি করা আমাদের পক্ষে সম্মানজনক হবে না। সিপাহীটা কিন্তু বড় মর্ম্মাহত হয়েছে।"

উগ্রমোহনবাবু সংক্ষেপে আদেশ দিলেন—"সিপাহীটাকে এখনি দূর করে দাও। বুঝলে ?"

অঘোরবাবু নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখের একটি পেশীও বিচলিত হইল না। উগ্রমোহন সিংহ আবার বলিলেন—"যে সিপাহী অপমানিত হয়ে তৎক্ষণাৎ তার প্রতিকার করে না, বাড়ীতে ফিরে এসে মর্ম্মাহত হয়—তাকে এখনি বিদেয় কর। ও-রকম শিষ্ট সিপাহী রাখ্‌তে চাই না আমি! চৌবেজিকে আর একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি নিয়ে যাও। দুধনাথ পাঁড়ের মারফৎ এটা পাঠিও। সে হাজৎ থেকে খালাস হয়ে এসেছে ত ? সে যেন হাতিয়ারবন্দ্ হয়ে যায় !" বলিয়া উগ্রমোহন খাসকামরায় চিঠি লিখিতে চলিয়া গেলেন। অঘোরবাবু নীরবে দাঁড়াইয়া গোঁফের উপর অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

উগ্রমোহন লিখিলেন—

চৌবেজি,

আপনার রামপ্রতাপ নাম সার্থক। সত্যই রামের ন্যায় প্রতাপ আপনার। আপনার বীরত্বের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি। কথিত আছে আপনার প্রপিতামহ স্বর্গীয় প্রিয়প্রতাপ চৌবে মহাশয় সুন্দরবন অঞ্চলে বন্য ব্যাঘ্র শিকার করিয়া খ্যাতি-লাভ করিয়াছিলেন। আপনি বংশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হইতেছে। আমার সিপাহীর প্রতি আপনার বিনম্র ব্যবহারের কথা শুনিয়া দুধনাথ পাঁড়েকে এই পত্রের বাহক-স্বরূপ পাঠাইতেছি। আত্ম-সম্মান রক্ষার জন্য এই ব্যক্তি একদা একখানি হস্ত বিসর্জ্জন দিয়াছিল। মস্তক বিসর্জ্জন দিতেও তাহার আপত্তি নাই। কিন্তু আত্ম-সম্মান সে ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না। আশা করি আপনি সুস্থ হইয়াছেন।

শ্রীউগ্রমোহন সিংহ

কিছুক্ষণ পরে দুধনাথ পাঁড়ে পত্রের জবাব লইয়া আসিল। রামপ্রতাপ চৌবে লিখিয়াছেন—

সিংহ মহাশয়,

এই সামান্য ব্যাপার লইয়া নাড়াচাড়া করিতে আর প্রবৃত্তি নাই। ক্ষেত্রান্তরে আপনার দর্শন লাভের আশায় রহিলাম।

শ্রীরামপ্রতাপ চৌবে।

(২৩)

রাণী বহ্নিকুমারী একাকিনী বসিয়াছিলেন। তাঁহার কোলের উপর 'মালবিকাগ্নিমিত্র'খানি খোলা পড়িয়াছিল। তিনি মুক্ত বাতায়নপথে চাহিয়া বসিয়াছিলেন। রুম্নি-ঝুম্নির বিবাহ ব্যাপারে তাঁহার মনের মধ্যে একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়া গিয়াছে। প্রমাণ চাহিলে অবশ্য তিনি দিতে পারিবেন না কিন্তু অন্তরের মধ্যে তিনি নিঃসংশয়ে ইহা বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহারই প্রীত্যর্থ গঙ্গাগোবিন্দ রুম্নি-ঝুম্নির সহিত অজয়-বিজয়ের বিবাহ দিয়াছে। কথাটা বুঝিয়া অবধি তাঁহার মনে শান্তি নাই। কেন তিনি গঙ্গাগোবিন্দকে ও-কথা বলিতে গিয়াছিলেন? গঙ্গাগোবিন্দ হয় ত ভাবিয়াছিল স্বামীর হইয়া তিনি ওকালতি করিতেছেন এবং এই জন্যই সে হয় ত এই মহানুভবতাটা করিয়া বসিল। মনে করিল 'রাণী ইহাতে খুসী হইবে!' হায় রে, রমণীরা সত্যই কি সে খুসী হয় তাহা যদি পুরুষরা বুঝিত! গঙ্গাগোবিন্দ কি জানে না যে তাহার খুসীর পথে সে নিজেই একদিন অলঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করিয়াছে? দারিদ্র্যের দম্ভ! এই দম্ভের জগদ্দল প্রস্তরের তলায় রাণীর কিশোরী মন যে একদিন সে নিজেই গুঁড়া করিয়া দিয়াছিল তাহা কি সে নিজে জানে না। আজ সে মহানুভবতা দেখাইয়া রাণীকে খুসী করিতে চায়। স্পর্দ্ধা ত তাহার কম নয়! সে কি মনে করে তাহাকে বিবাহ করিতে পায় নাই বলিয়া রাণী আজও তাহার পথ চাহিয়া আছে? তাহা যদি মনে থাকে তাহা হইলে মূর্খ সে! প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার উগ্রমোহন সিংহের রাণী বহ্নিকুমারী কিশোরী-কালের একটা ভ্রমকে আঁকড়াইয়া আজও বসিয়া নাই। উগ্রমোহন সিংহের যে পত্নী—তাহার আবার ক্ষোভ কিসের? গঙ্গা-গোবিন্দের মত পুঁথির মুখস্থ বুলি আওড়াইতে হয়ত তাহার স্বামী পারে না কিন্তু তাহার স্বামীর মত পুরুষ-সিংহ কয়টা আছে এ অঞ্চলে? কয়টা লোকের এমন বিরাট হৃদয়, বিশাল শৌর্য্য, বিপুল বিক্রম? গঙ্গাগোবিন্দ এই বিবাহ ব্যাপারে মহত্ত্বটা দেখাইয়া ভালই করিয়াছে; তাহা না হইলে উগ্রমোহনের রোষবহ্নিতে পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইত সে। অন্তঃসারশূন্য দারিদ্র্যের গর্ব্ব লইয়াই লোকটা গেল! এত বড় অহঙ্কৃত লোক বহ্নিকুমারী জীবনে আর একটাও দেখেন নাই। ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যায় যে রুম্নি-ঝুম্নির বিবাহটাও সে দিল শুধু একটা বাহাদুরি দেখাইবার জন্য! কি আর এমন তিনি বলিয়াছিলেন তাহাকে? কিছুই নয়।—এ স্পর্দ্ধা! এ কেবল তাঁহাকে খাটো করিয়া দিবার একটা ফন্দী! গঙ্গাগোবিন্দকে আর কেহ না চিনুক, রাণী ভাল করিয়াই চেনে! রাণী ভাল করিয়াই জানে যে গঙ্গাগোবিন্দের জীবনের প্রধান সুর—'কাহারো নিকট খাটো হইব না—চিরকাল মাথা উঁচু করিয়া থাকিব! কাহারো নিকট অনুগ্রহ ভিক্ষা করিব না—যতটা পারি অপরকে অনুগ্রহ করিব!' রাণীকে অনুগ্রহ করিয়া সে রুম্নি-ঝুম্নির বিবাহে মত দিয়াছে। তাহার এই নীরব অহঙ্কারে বহ্নিকুমারীর সমস্ত হৃদয়টা যেন জ্বালা করিতে

লাগিল। কেহ যদি তাহার উঁচু মাথাটা জোর করিয়া হেঁট করিয়া দিতে পারে তবে যেন তিনি স্বস্তি পান।

'মালবিকাগ্নিমিত্র' আর পড়া হইল না—তাঁহার সমস্ত হৃদয় গঙ্গাগোবিন্দকে লইয়া অকারণে তিক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি জোর করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন যে গঙ্গাগোবিন্দের সমস্ত আচরণের মধ্যেই আত্মশ্লাঘা ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং তাহা আর কেহ বুঝিতে না পারুক তিনি বুঝিয়াছেন। তিনি জোর করিয়াই বারম্বার মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন যে তাঁহার স্বামীর তুলনায় গঙ্গাগোবিন্দ একটা নগণ্য জীব! অত্যন্ত আত্ম-পরায়ণ, অত্যন্ত স্বার্থপর এবং অত্যন্ত অহঙ্কারী। সমস্ত পুরুষ জাতিটাই এইরূপ। কেবল স্থান-কাল-পাত্র ভেদে একটু ইতর-বিশেষ। মহাকবি কালিদাস এই 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে রাজার মুখ দিয়া মালবিকার যে রূপ-বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পুরুষ কবির পক্ষেই সম্ভব—প্রেমের ছদ্মবেশে লালসার উচ্ছ্বাস! বহ্নিকুমারী মুক্ত বাতায়ন পথে চাহিয়া একাকিনী বসিয়া রহিলেন। এক ঝলক বাতাস চূতমুকুলের গন্ধ বহিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। কিন্তু বহ্নিকুমারীর তাহাতে আজ আনন্দ হইল না। গঙ্গাগোবিন্দকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার সমস্ত মন বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এত বিষের মধ্যেও কি অমৃত ছিল না? ছিল। বায়ুমণ্ডলে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত আছি বলিয়া আমরা যেমন বায়ুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকি না, অমৃত-পরিমণ্ডলে-নিমজ্জিত বহ্নিকুমারীর অন্তরাত্মা অমৃত সম্বন্ধে তেমনি সচেতন ছিল না। সচেতন হইল যখন উগ্রমোহন আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন—

"গঙ্গাগোবিন্দ দেশ ছেড়ে একেবারে চল্‌ল!"

"কোথা?"

"কাশী।"

"কেন?"

"সংস্কৃত পড়বে বলে। তোমাকে একখানা চিঠি লিখেছে। ছোক্‌রার চিরকালই মাথায় একটু ছিট্ আছে।" বলিয়া একখানি পত্র তিনি বহ্নিকুমারীকে দিলেন। তাহাতে লেখা আছে—

রাণী,

তোমাদের কৃপায় আমার জীবনের সামাজিক দায়িত্ব শেষ হইয়াছে। যে কয়দিন বাঁচিব লেখাপড়ার চর্চ্চা করিয়াই কাটাইব স্থির করিয়াছি। বহুদিন হইতে বাসনা ভাল করিয়া সংস্কৃত অধ্যয়ন করি। দারিদ্র্যনিবন্ধন এতদিন তাহা পারি নাই। সম্প্রতি কাশী হইতে জনৈক অধ্যাপক আশ্বাস দিয়াছেন যে আমি যদি তাঁহার নিকট গিয়া বাস করি তাহা হইলে তিনি আমাকে জ্ঞানার্জ্জনে সহায়তা করিবেন। এ সুযোগ আমি পরিত্যাগ করিব না। দুই একদিনের মধ্যেই কাশী যাত্রা করিব এবং জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়টা বিশ্বেশ্বরের চরণতলে কাটাইয়া দিব। যাইবার পূর্ব্বে তোমার সাক্ষাৎ পাইলে সুখী হইতাম।

ইতি—গঙ্গাগোবিন্দ

রাণী বহ্নিকুমারীর সমস্ত অন্তরটা কে যেন মুচড়াইয়া দিল। গঙ্গাগোবিন্দ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে? আর কখনো ফিরিবে না? আর কখনো তাহাকে দেখিতে পাইবে না সে; তাঁহার স্বামী চেষ্টা করিলে কি তাহার যাওয়াটা বন্ধ করিতে পারেন না?

বহ্নিকুমারী একটু হাসিয়া বলিলেন—"সত্যিই লোকটা পাগল! এর কাশী যাওয়াটা বন্ধ করতে পার?"

অসীম ঔদাসীন্য-ভরে উগ্রমোহন উত্তর করিলেন—"তাতে লাভ কি?"

বহ্নিকুমারী মুহূর্ত্তের জন্য উগ্রমোহনের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং তাহার পর আবার মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"তা বটে।"

উগ্রমোহন জানালা দিয়া দেখিতে পাইলেন হস্তী-পৃষ্ঠে তাঁহার ম্যানেজার অঘোরবাবু আসিতেছেন। আগামী পরশ্ব মহাকালীর মন্দিরে পূজা—তাহার সম্বন্ধেই উপদেশ লইতে আসিতেছেন বোধ হইল।

"অঘোর আসছে দেখ্‌ছি। নীচে যাই—" বলিয়া উগ্রমোহন নামিয়া গেলেন। বহ্নিকুমারী একা স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সহসা তাঁহার "রাজসিংহ" উপন্যাসের জেব-উন্নিসা চরিত্র মনে পড়িল। মবারককে জেব-উন্নিসা বিষধর সর্প দিয়া হত্যা করিয়াছিল। সেও কি গঙ্গাগোবিন্দকে দেশছাড়া করিল? রুমনি-ঝুমনির বিবাহ না হইলে সে ত

চলিয়া যাইত না! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বহ্নিকুমারীও জেব-উন্নিসার মত ভাবিলেন—"যদি চাষার মেয়ে হইতাম।"

আবার তখনই তাঁহার মনে হইল চাষার মেয়ে হইলেই বা করিতাম কি? গঙ্গাগোবিন্দের মত এত বড় একটা অবুঝ লোককে লইয়া কিছুই করা যায় না। নিজের গরিমায় সে এমন আত্মমগ্ন যে অপরের দিকটা ভাবিয়া দেখিবার অবসর তাহার নাই। আলোকের মত দীপ্ত প্রতিভায় সে চতুর্দ্দিকে শুধু ছড়াইয়া থাকিবে। কাহারও বিশেষ সম্পত্তি সে হইবে না—কাহারও সুবিধা-অসুবিধার দিকে তাহার লক্ষ্য নাই। নিজেকে বিকশিত করিয়া বিকীর্ণ করাই তাহার জীবনের উদ্দেশ্য। বহ্নিকুমারীরই বা তাহার জন্য এত মাথাব্যথা কেন? পৃথিবীতে কাহারও অভাবে কিছু আটকায় না। উগ্রমোহন সিংহের বিশাল জমিদারীর মধ্যে গঙ্গাগোবিন্দের মত একটা সামান্য প্রজা থাকিল কি গেল তাহা লইয়া উৎকণ্ঠিত হওয়া রাণী বহ্নিকুমারীর সাজে না! উগ্রমোহনের পত্নী তিনি! গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহার কে?

(২৪)

শ্যামলতালেশহীন রুক্ষ চামা-প্রান্তরে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। চতুর্দ্দিকে একটা নিষ্করুণ রক্তাভা। রক্তাম্বর-ধারী কাপালিকের মত চামা-প্রান্তর স্থির হইয়া রহিয়াছে। তাহার নীরব উদ্ধত গাম্ভীর্য্যে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ। অনুর্ব্বর তাহার বক্ষে সবুজের চিহ্নমাত্র নাই। বৃক্ষ নাই, গুল্ম নাই, তৃণদলও নাই। ছায়া-বিহীন দীর্ঘ দিবস তাহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। প্রখর সূর্য্যের তীব্রদাহে যুগযুগান্ত ধরিয়া চামা-প্রান্তর এইরূপ প্রতিদিন দগ্ধ হইতেছে। পুড়িয়া পুড়িয়া তাহার কোমলতা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। আছে শুধু এক বিশাল ব্যাপ্তি। যতদূর দৃষ্টি যায়—শেষ নাই। উষর প্রান্তর আকাশে গিয়া মিশিয়াছে। মনে হয় যেন একটা অতৃপ্ত বুভুক্ষা মূর্ত্তি ধরিয়াছে।

অঘোরবাবু মহাকালীর মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া নিমেষ-বিহীন নয়নে সূর্য্যাস্তের পানে চাহিয়াছিলেন। চামা-প্রান্তরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মহাকালীর মন্দির তান্ত্রিক-সাধক অঘোরনাথের অতিশয় প্রিয় স্থান। এই চামা-প্রান্তর যেন তাঁহারই জীবনের প্রতিচ্ছবি। তাঁহার ছয় পুত্র আর দুই কন্যার মধ্যে একটিও আজ বাঁচিয়া নাই। শোকে দুঃখে স্ত্রীও মারা গিয়াছেন। অনেকের ধারণা তান্ত্রিক সাধনাই অঘোরবাবুর কষ্টের কারণ। যেদিন হইতে তিনি ইহা সুরু করিয়াছেন সেইদিন হইতেই মৃত্যুর করাল ছায়া তাঁহার জীবনে পড়িয়াছে। তথাপি তিনি আজিও নিরস্ত হন নাই। তিনি শব-সাধনা করিয়াছেন, নরবলি দিয়াছেন—মহাকালীকে সন্তুষ্ট করিবার বহু চেষ্টা তিনি বহু প্রকারে করিয়াছেন; কিন্তু ছলনাময়ী উন্মাদিনী তাঁহাকে দিয়াছেন শুধু দুঃসহ শোক। অঘোরবাবুর ধারণা 'পাগ্‌লি তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেছে।'

তাঁহার দৃঢ় পণ এ পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইবেনই। তাই আজও তিনি একাগ্রমনা শ্যামা-সাধক। এখনও প্রতি অমাবস্যায় এই নির্জ্জন প্রাণহীন শূন্য-প্রান্তরে তিনি মহাকালীর পূজার আয়োজন করেন। সূর্য্য অস্ত গেল। অঘোরবাবু নিস্পন্দ-নয়নে দেখিতে লাগিলেন। ঘোরা অমাবস্যা রজনীর গাঢ় তমিস্রা চামা-প্রান্তরে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে।

•

অমাবস্যার গভীর রাত্রি। চতুর্দ্দিকে নীরন্ধ্র অন্ধকার। মহাকালীর মন্দিরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। অঘোরনাথ কালী-পূজা করিতেছেন। পরিধানে তাঁহার রক্তাম্বর, কপালে সিন্দূরের টিকা—গলায় জবাফুলের মালা। চক্ষু দুটিও ঈষৎ রক্তবর্ণ। কারণ পান করিয়াছেন। নিকটেই উগ্রমোহন বসিয়া আছেন। তাঁহারও সমস্ত মুখে একটা গম্ভীর প্রশান্ত ভাব। তিনি একাগ্রচিত্তে মহাকালীর পূজা দেখিতেছেন। পূজা-শেষ হইতে আর দেরী নাই।

গোলক সাও একটু দূরে বসিয়া আছে। পূজা হইয়া গেলে তাহার বিচার হইবে। অঘোরবাবু মন্ত্রপাঠ করিয়া চলিয়াছেন—একটা আর্ত্ত ছাগশিশু তারস্বরে চীৎকার করিতেছে। বাহিরে অমাবস্যার সূচীভেদ্য অন্ধকার।...

...পূজা শেষ হইল। বলিদান হইয়া গেল।

উগ্রমোহন তখন গোলক সার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বল্‌বার আছে তোমার? এখন যদি মায়ের সামনে তোমাকে বলিদান দিয়ে দেওয়া হয়, কি করতে পার তুমি?"

গোলক সা কহিল—"আমায় ক্ষমা করুন হুজুর—"

"একবার ত তোমায় ক্ষমা করা হয়েছিল। দ্বিতীয়বার তুমি আমার আদেশ অমান্য করেছ। তোমাকে আর ক্ষমা করা যায় না। তোমাকে কঠোর শাস্তি দেব আমি! যা তুমি জীবনে কখনও ভুলবে না। দুধনাথ পাঁড়ে—"

দুধনাথ পাঁড়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

"পঁচিশ চাবুক! পহ্‌লে নাঙ্গা কর লেও!"

কম্পিত-কলেবর উলঙ্গ গোলক সাকে লইয়া দুধনাথ বাহিরে চলিয়া গেল। একটু পরেই গোলক সার আর্ত্তস্বর অন্ধকার চামা-প্রান্তরে কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল।

উগ্রমোহন বলিলেন—"অঘোর, মায়ের প্রসাদ একটু দাও ত।" অঘোরবাবু একপাত্র কারণ আগাইয়া দিলেন। উগ্রমোহন তাহা নিঃশেষে পান করিয়া বলিলেন—"আর একটু দাও।" অঘোরবাবু আর একপাত্র দিলেন।

গোলক সাকে লইয়া দুধনাথ পাঁড়ে ফিরিয়া আসিল। উগ্রমোহন বলিলেন—"এখনও শেষ হয় নি। একটু বিশ্রাম করে নাও। আরও চাবুক লাগাব। কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর আজ চাবকাব তোমায়। তোমার টাকার অত্যন্ত গরম হয়েছে!"

উগ্রমোহন আর একপাত্র কারণ পান করিতে করিতে বলিলেন—"তোমার পিটের চামড়াখানি আজ ছাড়িয়ে নিয়ে যাব। বুঝলে? আর সেই চামড়ায় একজোড়া জুতো বানিয়ে তোমার খাতক চন্দ্রকান্ত রায়কে উপহার দেব। বুঝতে পারছো?"

সহসা গোলক সার চক্ষে একটা হিংস্র দীপ্তি জ্বলিয়া উঠিল। নিকটেই একটা থান ইট্‌ পড়িয়াছিল তাহা তুলিয়া সে সবেগে উগ্রমোহনের শির লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া দিল। উগ্রমোহন চকিতে মাথা সরাইয়া লইলেন—ইট্‌ সোজা গিয়া প্রতিমার অঙ্গে লাগিল। মহাকালীর হস্তধৃত মুণ্ডটা চুরমার হইয়া ভাঙিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

ব্যাঘ্রের মতন উগ্রমোহন গোলক সার উপর লাফাইয়া পড়িলেন। লাথি, চড়, কীল, জুতা অবিশ্রান্ত ভাবে বর্ষণ করিয়া শেষে তিনি বলিলেন—"এর শাস্তি মৃত্যু! বলিদান দাও একে। অঘোর—"

প্রতিমার অঙ্গে আঘাত লাগিয়াছে। ঘোরতর অমঙ্গল আশঙ্কায় অঘোরনাথের অন্তরাত্মা কাঁপিতেছিল। মুখে কিন্তু তাঁহার এতটুকু চাঞ্চল্য নাই। পুরোহিতের আসন হইতে তিনি ধীরভাবে বলিলেন—"বলিদানের পশু অক্ষত দেহ হওয়া প্রয়োজন। ওর নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে।" সত্যই গোলক সার নাক দিয়া রক্ত পড়িয়া তাহার খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি পর্য্যন্ত ভিজিয়া গিয়াছিল। উগ্রমোহন প্রচুর কারণ পান করিয়াছিলেন। বজ্রকণ্ঠে বলিলেন "মায়ের গায়ে আঘাত করেছে। প্রাণ দিয়ে ওকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। বলিদান না হয় অন্য ব্যবস্থা করো। ওর মৃত্যু আমি চাই!"

অঘোরবাবু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"যমঘরে পাঠিয়ে দিন তাহলে।" বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সুরার তীব্র উন্মাদনায় উগ্রমোহন আবার বলিলেন—"হাঁ্যা এখনি নিয়ে যাও। এই দুধনাথ পাঁড়ে। তুম্‌ ঔর শুকুল্‌ সিং ঔর—"

অঘোরবাবু বলিলেন—"আমি সব ব্যবস্থা কচ্ছি।"

কিছুক্ষণ পরে অচেতন গোলক সাকে লইয়া সিপাহীরা যমজঙ্গল অভিমুখে রওনা হইয়া গেল।

সঙ্গে অঘোরবাবুও গেলেন।

মন্দিরের পিছনে মাণিক মণ্ডল নিঃশব্দে বসিয়াছিল। সেও এবার ধীরে ধীরে উঠিয়া এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

উগ্রমোহন সিংহ যখন বাড়ী পৌছিলেন—তখন রাত্রি দুইটা হইবে। তিনি গিয়া দেখিলেন রাখালবাবু দেওয়ান চিন্তিত মুখে তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন।

"কি খবর হে এত রাত্রে?"

"আজ্ঞে বৃন্দাবন থেকে প্রাণমোহন এসেছে। কর্ত্তা-মায়ের ভারি অসুখ। আপনাকে যেতে বলেছেন।"

"মায়ের অসুখ? কোথা প্রাণমোহন?"

"সে তার নিজের বাড়ী গেছে। এখনি ফিরবে।"

উগ্রমোহন সিংহের বৃদ্ধা জননী স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিতেছিলেন। সহসা তাঁহার অসুখের খবর শুনিয়া উগ্রমোহন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কহিলেন—

"সওয়ারি ঠিক কর। আমি ভোরেই বেরিয়ে যাব। কিছু টাকা—আর জন পাঁচেক লোক সঙ্গে চাই।"

রাখালবাবু ব্যবস্থা করিবার জন্য বাহিরে গেলেন।

(২৫)

উগ্রমোহন বৃন্দাবন চলিয়া গিয়াছেন। বহ্নিকুমারী সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলেন—কিন্তু উগ্রমোহন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন না। বহ্নিকুমারী একা পড়িলেন। বহ্নিকুমারী অবশ্য চিরকালই একাকিনী। সাধারণতঃ জমিদার-গৃহিণীগণ সখী-দাসী পরিবৃতা হইয়া যে জীবন যাপন করেন বহ্নিকুমারী তাহা করিতে পারেন নাই। তাঁহার আত্মীয়াগণের মধ্যে এমন কেহ ছিল না যিনি বহ্নিকুমারীর মার্জ্জিত মনের সূক্ষ্ম সুখদুঃখের অংশ লইতে পারেন। সখী-বেশে যাঁহারা আসিতেন তাঁহারা সকলেই চাটুকার। বহ্নিকুমারী তাঁহাদের প্রশ্রয় দিতেন—কারণ অপরের মুখে আত্মপ্রশংসা শ্রবণ করাও মধ্যে মধ্যে সকলেরই প্রয়োজন। কিন্তু স্তাবককে তিনি অনুগ্রহই করিতে পারেন তাঁহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার হয় না—কারণ তাঁহারা অযোগ্য। বহ্নিকুমারীর মন যখন কাদম্বরীর সৌন্দর্য্যে অভিষিক্ত বা সাহানার সুরে মোহিত, তখন যাঁহারা আম-সত্ত বা ব্যঞ্জন-প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেন তাঁহাদের প্রতি মৃদুহাস্যে কিছু অনুগ্রহ বর্ষণ করা যাইতে পারে মাত্র। তাঁহাদের সহিত বন্ধুত্ব করা চলে না। মানসিক সমতা না থাকিলে বন্ধুত্ব বা শত্রুতা কিছুই জমে না। বহ্নিকুমারীর সখিপদপ্রার্থিনীরা সকলেই নিম্নস্তরের প্রাণী—তাঁহাদের সহিত সখিত্ব করিবার মত মানসিক স্থিতিস্থাপকতা বহ্নিকুমারীর ছিল না।

স্বামী উগ্রমোহন বহ্নিকুমারীর অবলম্বন—সঙ্গী নহেন। বিশাল মহীরুহ ব্রততীর সঙ্গী হইতে পারে না। আশ্রয় হইতে পারে। উগ্রমোহনের বিরাট ব্যক্তিত্বকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বহ্নিকুমারী বাঁচিয়াছিলেন। দুইজনের মধ্যে মিল কিছুমাত্র ছিল না। পরস্পর পরস্পরকে অধিকাংশ সময়ে বুঝিতেও হয়ত পারিতেন না—কিন্তু তবু তাঁহাদের মিলনে বাধা ছিল না। মনের নিভৃত জগতে বহ্নিকুমারী পূজা করিতেন উগ্রমোহনকে নয়—উগ্রমোহনের শক্তিকে। উগ্রমোহনের এই শক্তি, এই মহিমা, এই প্রাবল্য বহ্নিকুমারীর দাম্পত্য জীবনের মেরুদণ্ড। ইহাকে অবলম্বন করিয়াই বহ্নিকুমারীর সমস্ত সত্তা দাঁড়াইয়াছিল, গঙ্গাগোবিন্দের বিরহে ভূমিসাৎ হইয়া যায় নাই। কিন্তু বহ্নিকুমারীর সঙ্গী কেহ ছিল না। বহ্নিকুমারী চিরকালই একাকিনী। লেখাপড়া আর সঙ্গীত-চর্চ্চা, প্রসাধন ও কারুশিল্প—ইহা লইয়াই তাঁহার দিন কাটে। উগ্রমোহন সমস্ত দিন থাকেন অশ্ব-পৃষ্ঠে। সাধারণ জমিদারের মত বৈঠকখানা তাকিয়া, বাঈজি ও মোসায়েব লইয়া তাঁহার কারবার নয়। সুতরাং বহ্নিকুমারী তাঁহার মধ্যে সঙ্গী খুঁজিয়া পান নাই। চন্দ্রকান্তের মত তিনিও আপনার কল্পলোকেই বাস করেন। তাঁহার কিশোর মনে গঙ্গাগোবিন্দের যে ছবি আঁকা হইয়া গিয়াছিল—তাহা এখনও আছে। যুক্তির ঘর্ষণে তাহা খানিকটা বিকৃত হইয়া গিয়াছে বটে—কিন্তু বিলুপ্ত হয় নাই। তাঁহার চিত্তাকাশে গঙ্গাগোবিন্দ যেন ক্ষুদ্র একটি তারা—উগ্রমোহন যেন বিশাল একখানা মেঘ। তারা ক্ষুদ্র হউক, কিন্তু তাহা উজ্জ্বল। মেঘের দ্যুতি নাই—কিন্তু শোভা আছে—বিদ্যুৎ আছে—বজ্র আছে—সলিল সম্ভারও আছে। তারা আকাশের এক-প্রান্তেই স্থির হইয়া থাকে—মেঘ সমস্ত আকাশে নিমেষে আপনাকে বিস্তারিত করিয়া দেয়—ক্ষুদ্র নক্ষত্র ঢাকা পড়িয়া যায়। ঢাকা পড়িয়া যায় বটে কিন্তু নিবিয়া যায় না। মেঘ সরিয়া গেলে আবার তাহার উজ্জ্বল দীপ্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আজ প্রায় দশ দিন হইল উগ্রমোহন বৃন্দাবন গিয়াছেন।

বহ্নিকুমারীর একা-একা আর ভাল লাগিল না। সন্ধ্যা হইয়াছে—শিবমন্দিরে আরতির শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনি বাজিতেছে। নহবৎখানায় শানাই পূরবী ধরিয়াছে। আর একদিনের কথা মনে পড়িল।

বহ্নিকুমারী ডাকিলেন—"কুসুম—"

কুসুম নাম্নী দাসী আসিতেই তিনি আদেশ করিলেন—"আমার পাল্‌কি তৈরি করতে বল। একবার দাদার কাছে যাব।"

ক্রমশঃ

ইউরোপে এক বৎসর

শ্রীআলাউদ্দিন খাঁ

জানুয়ারী মাসে আমরা ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করি। আমাদের দলে ছিল উদয়শঙ্কর, রবীন্দ্রশঙ্কর, শ্রীমতী সিম্‌কি, জহুরা বেগম, সের আলী, দুলাল, আমাদের ইহুদী ম্যানেজার গ্রাটা এবং আরও ছয় সাত জন। দক্ষিণ ভারতে হায়দারাবাদ, পুণা, বম্বে, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে আমাদের নৃত্যগীতাদি দেখান হয়। বম্বেতে আমরা নয়দিন ছিলাম। তৎপর ইউরোপ যাত্রা করি।



বিখ্যাত বেহালা বাদক Joseph Szigeti

শৈশব হইতে দেশভ্রমণ একটা নেশার মত ছিল। তাহাতে যত আনন্দ পাইতাম তেমন আর কিছুতে পাই না। দেশভ্রমণ আর সঙ্গীতের আকর্ষণে আট বৎসর বয়সে বাড়ী ছাড়িয়া পিতা মাতা আত্মীয়স্বজনের স্নেহাশ্রয় ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিলাম। তার পর কত অবস্থায় কত দেশ বেড়াইয়াছি—কতবার পিতা বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন এবং কতবার আবার দূরদেশের মায়ায় ও সঙ্গীতশিক্ষার আকর্ষণে বাহির হইয়া গিয়াছি—তাহার সংখ্যা নাই। এখন আমার বয়স ৬৭। কিন্তু তবু ইউরোপগামী জাহাজে চড়িয়া মনে হইল আমার বিগত শৈশব বুঝি আবার ফিরিয়া পাইলাম। আরব, প্যালেস্তাইন, মিশর, ইটালী, জার্ম্মানী, ফ্রান্‌স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ দেখিতে পাইব মনে হওয়ায় ১৬ বৎসর বয়স্ক বালকের ন্যায় মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল।



আলাউদ্দীন খাঁ ও চেকভ (বিখ্যাত রাশিয়ার অভিনেতা—chekav)

ইউরোপীয় রীতি-নীতি, চাল-চালন, খাওয়া-পরা আমার মোটেই অভ্যস্ত নয় এবং অভ্যাস করিবার বয়সও ছিল না। কাজেই জাহাজে প্রথমে কাঁটা চামচ প্রভৃতির ব্যবহার অসুবিধাজনক হইল। আমাদের দলের অল্পবয়স্করা

অল্পদিনেই নূতন অবস্থা আয়ত্তাধীন করিয়া ফেলিল। উদয়রা বহুদিন ইউরোপে থাকিয়াছে। সুতরাং তাহাদের কোন অসুবিধাই হইল না। শুধু বিপদে পড়িলাম আমি। সকলের সঙ্গে খাইতে বসিতাম কিন্তু কাঁটা চামচের অসংলগ্ন চালনা ও শব্দে এবং আহারকালে মুখ বিস্তারে সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইত। অপরিচিত ভারতীয়রা আমার এই প্রকার ব্যবহারে নিজেরা বোধ হয় লজ্জিত হইত এবং তাহাদের চোখে মুখে তাহা প্রকাশ পাইত। কিন্তু আমি সেজন্য কোথাও সঙ্কোচ বোধ করি নাই। অতি নির্ব্বিকারচিত্তে আহার কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছি। ইউরোপে বহু বড় বড় হোটেলে ও অনেক বড় বড় লোকের বাড়ী পার্টিতে ও সেই একইভাবে চলিয়াছি। সেজন্য কোথাও অনাদর বা তাচ্ছিল্য পাই নাই। কি জাহাজ, কি প্যারিস প্রভৃতি নগরের হোটেল, কি ডিভনসায়ারে লর্ড এমহার্ষ্টের বাড়ী—সর্ব্বত্রই চার পয়সার নিমের মাজন দ্বারা দাঁত মাজিয়াছি, বাথরুমে সাবান দিয়া নিজের গেঞ্জি রুমাল প্রভৃতি কাচিয়াছি। নিদ্রার সময়ে—আহারের সময়ে বিভিন্ন রকমের পোষাক ব্যবহার করি নাই। লুঙ্গী পরিয়াই ঘুমাইয়াছি এবং সাধারণ সুট দ্বারা সকল কার্য্যই চালাইয়াছি। গানের সময়ে আমরা—দলের সকলেই ধুতি পাঞ্জাবী পরিয়া আসরে বসিয়াছি।

ইউরোপীয় আহারও আমার নিকট রুচিকর মনে হয় নাই। জল পাওয়া যায় না—মদ যত ইচ্ছা খাও। মাছ মাংস তরকারী সকলই শুধু সিদ্ধ করা—আমাদের দেশের ন্যায় হলুদ লঙ্কা মিশাইয়া রান্না করা হয় না। আমি দেশে থাকিতেই মাছ মাংস খাইতাম না। কাজেই ইউরোপে সিদ্ধ মাছ মাংস মুখেই দিতে পারি নাই—এত দুর্গন্ধ বোধ হইত। আর সকল দ্রব্যেই মাংসের গন্ধ পাইতাম এবং তাহাতে আমার বমনের উদ্রেক হইত। অন্য সকলেই কিন্তু বেশ তৃপ্তির সহিত ভোজন করিত। একদিন ইংলণ্ডে এক লর্ডের বাড়ীতে একটি মেয়ে কাঁচা মাংসই মুখে পুরিল। আমার ইহা এত বিসদৃশ মনে হইল যে বলিয়া ফেলিলাম, রাক্ষসী, কাঁচা মাংস খাচ্ছ! আমাকে ছুতে পারবে না? বলা বাহুল্য মেয়েটি আমার এই খাঁটি বাংলা ভাষার এক বর্ণও বুঝিল না এবং ইহা একপ্রকার আদর মনে করিয়া কাঁধে উঠিয়া বসিল ও আমার দাড়ি টানিতে লাগিল।



প্যালেস্তাইনের কবি ও নর্ত্তকী মহিলা এবং উদয়শঙ্কর

ইংলণ্ডে মুড়ি পাইতাম এবং তাহা খুব তৃপ্তির সহিত চর্ব্বণ করিয়াছি। আমাদের দলের অনেকেই পরে মুড়ির ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। দুধ ও দই খুব ভাল পাইয়াছি।

ভাষা জানি না বলিয়া অনেক সময় বড় দুঃখ হইয়াছে। কিন্তু সেজন্য বড় একটা অসুবিধায় পড়িতে হয় নাই। উদয়রা অনেকেই ফরাসী, জার্ম্মানী প্রভৃতি ভাষা খুব ভাল জানে এবং উদয় আমার দোভাষীর কাজ করিত। বুদাপেষ্ট, ভিয়েনা, প্যারিস প্রভৃতি স্থানে বহু সঙ্গীতজ্ঞ গুণী লোক আমার সঙ্গে সঙ্গীত বিষয়ে আলোচনা করিতে আসিত। তাহাদের সহিত আলাপ করিতাম। উদয় বুঝাইয়া দিত।

তখন দুঃখ হইত ঐ সব ভাষা জানি না বলিয়া। উদয়ের সঙ্গেই সর্ব্বত্র বেড়াইয়াছি এবং তাহারা সব দেখাইয়াছে ও বুঝাইয়াছে। হোটেলের চাকর চাকরাণীরা খুব ভদ্র ও



বিয়েত্রিস

চালাক। যখন যাহা দরকার আভাসে ইঙ্গিতে বুঝিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহা করিয়া দিয়াছে। হোটেলে একদিন



আমেরিকান চিত্রকর Mark Potrj

ভয়ানক ক্ষুধা পাইল। ম্যানেজারকে ফোনে ডাকিলাম কিন্তু বুঝাইতে পারি না। বুঝিতে না পারিয়া ম্যানেজার চীৎকার করিতে লাগিল। সে কি চীৎকার! ভয়ে আমি ফোন ছাড়িয়া দিলাম। তারপরই ম্যানেজার ঘরে আসিয়া হাজির। তখন সব বুঝাইয়া দিলাম।

বম্বে হইতে আমরা প্রথমে পোর্ট সৈয়দে যাই। তারপর প্যালেস্তাইন ও তুর্কীর বড় বড় সকল শহরে প্রায় একমাস



এলিস বোনার ও আলাউদ্দীন খাঁ

কাল ঘুরিয়া বেড়াই। জেরুজালম, জাফা, একার, স্মারণা, ইস্তাম্বুল প্রভৃতি সকল স্থানেই আমাদের শো হয়। উদয়শঙ্করের নৃত্য, আমাদের কনসার্ট ও পরে আমার ভারতীয় যন্ত্রসঙ্গীত হইত। লোকে বিস্মিত হইয়া শুনিত এবং হলে



সিম্‌কি, সিম্‌কি-জননী ও আলাউদ্দীন

আর তিলধারণের স্থান অবশিষ্ট থাকিত না। পরদিনই সেখানকার কাগজগুলিতে আমাদের সঙ্গীতাদির আলোচনা, ছবি প্রভৃতি বাহির হইত এবং শহরের সর্ব্বত্র শুধু উদয়শঙ্করের কথাই আলোচিত হইত। আমরা বাহির হইলে চতুর্দ্দিকে

লোক জমিয়া যাইত, বাসে বা গাড়ীতে উঠিতে হইলে সকলে পথ ছাড়িয়া দিত এবং হয়ত বৃদ্ধ বলিয়া আমাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া দিত। একবার এক মহিলা আমার দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। আমার ভারতীয় সংস্কারপুষ্ট মন। আমি হাত পিছাইতে লাগিলাম। মহিলাটি যত অগ্রসর হয় আমি তত পশ্চাতে যাই। কিন্তু মহিলাটি দস্তুরমত বলিষ্ঠা। আমাকে টানিয়া বাসে তুলিল এবং জায়গা করিয়া বসাইয়া দিল। পরে এই প্রকার অনেক হইয়াছে; তখন আর সঙ্কোচ বোধ করি নাই।

আমাদের দেশেও উদয়শঙ্করের নৃত্যের খুব আদর এবং উদয় যেখানেই যায় সেখানেই হৈ-চৈ পড়িয়া যায়; কিন্তু ইউরোপে ইহার দশগুণ অধিক দেখিলাম। সেখানে লোকে যে তাহাকে কত আদর ও সম্মান করে তাহা না দেখিলে বিশ্বাস হয় না।

জেরুজালেমের গভর্ণর আমাদিগকে এক পার্টিতে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাহাতে তিনি খুব সুন্দর এক বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন ভারতবর্ষে যে এমন উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত আছে এবং কলাবিদ্যার যে এত সূক্ষ্ম অনুশীলন হইয়া থাকে তাহা তিনি জানিতেন না এবং উদয়শঙ্করের নৃত্যাদি দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহার ধারণা বদলাইয়া গিয়াছে।

প্যালেস্তাইন হইতে আমরা মিশর যাই। সেখানে কাইরো, আলেকজান্দ্রিয়া এবং আরও কয়েক স্থানে প্রায় পনর দিন ছিলাম। সেখানেও আমাদের শো হয়। নবাব-বাড়ীর বেগমরা এবং গণ্যমান্য সকলেই আমাদের শো দেখিতে আসেন। শো হইয়া গেলে বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া উদয়শঙ্করের জন্য অপেক্ষা করেন। পরদিন নবাব-বাড়ীতে আমাদের নিমন্ত্রণ হয় কিন্তু আমরা পিরামিড দেখিতে চলিয়া গিয়াছিলাম বলিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করা হয় নাই।

আমরা মক্কা যাইতে পারি নাই। কারণ সেখানে অমুসলমান যাইতে পারে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি যাইতে পারিতাম কিন্তু তাহাতে দল হইতে পৃথক হইয়া যাইতে হয়; সেজন্য আমি মক্কা যাই নাই। কিন্তু প্যালেস্তাইন, তুর্কী, মিশর প্রভৃতি যে কয়টি মুসলমানরাজ্য দেখিয়াছি তাহাতে আমার ধারণা অনেক বদলাইয়া গিয়াছে। এই সকল দেশের মুসলমানরা আমাদের দেশের মুসলমান হইতে কত পৃথক। সেখানে মোল্লাদের লম্বা দাড়ী দেখি নাই। অথচ তাহাদের কোরাণ পাঠ ও আজান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। যেমন চমৎকার ও বিশুদ্ধ উচ্চারণ, তেমন প্রাণস্পর্শী অনুরাগ। ভক্তিতে মন গলিয়া যায়। দেশের মোল্লাদের শিক্ষায় মনে হইত ইস্‌লামে বুঝি সঙ্গীতের স্থান নাই। কিন্তু সেখানে সঙ্গীতের অনাদর দেখিলাম না। পল্লী অঞ্চলে যাইয়া ঐ দেশীয় গ্রাম্য নৃত্য ও গীত দেখিয়া আসিয়াছি এবং তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছি। তাহাদের প্রাণে সঙ্গীত আছে এবং অতি সহজ ও সরল ভাবে তাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া আসিতেছে। উদয়শঙ্করের সকল নৃত্যই হিন্দু দেবদেবী অবলম্বন করিয়া। কিন্তু সেজন্য উদয়শঙ্করের নৃত্য সেখানে অনাদৃত হয় নাই। সকল শ্রেণীর মুসলমানই উদয়শঙ্করের নৃত্য দেখিয়াছে ও প্রশংসা করিয়াছে। শারীরিক স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য, পোষাকপরিচ্ছদ, শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়েই সেখানকার মুসলমানগণ আমাদের দেশের মুসলমান হইতে অনেক সুন্দর ও বড়। মুসলমান নারীরা পর্দ্দা বর্জ্জন করিয়াছে এবং পুরুষের সঙ্গে বাহিরে কাজ করিতেছে; তাহাদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের অভাব নাই—পরিশ্রম করিতে পারে প্রচুর। আমাদের দেশের মোল্লাদের যদি একবার আরব তুর্কী প্রভৃতি দেশ দেখাইয়া আনিতে পারিতাম তাহা হইলে ভারতবর্ষের মুসলমানদের দুরবস্থা কমিয়া যাইত—দাঙ্গা-হাঙ্গামাও হইত না।

মিশর হইতে আমরা গ্রীসে যাই। গ্রীসে আমরা এক মাস থাকি এবং বলকান রাজ্যগুলিতে শো দেখাইয়া বেড়াই। এথানে প্রথম রজনীতেই রাজ্যের মন্ত্রী ও রাজ-কর্ম্মচারীরা আমাদের শো দেখিতে আসেন এবং উদয়শঙ্করের নৃত্যাদি দেখিয়া বিশেষ প্রীত হন। পরদিন আমাদিগকে এক পার্টিতে নিমন্ত্রণ করা হয় এবং উদয়শঙ্করের নৃত্যের খুব প্রশংসাদি করিয়া বক্তৃতা হয়। সেই দিন হইতে সংবাদ-পত্রাদিতে উদয়শঙ্করের নৃত্যাদির ছবি ও সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় এবং আমাদের শো দেখিতে হাজার হাজার লোক আসিতে থাকে। রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, জেকোশ্লাভাকিয়া, জোগশ্লাভিয়া, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গারী, সুইজারল্যাণ্ড, পোলাণ্ড, বেলজিয়ম, সুইডেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান সকল সহরেই প্রায় চারি

মাস ধরিয়া শো হয়। এই সকল দেশে এত আদর ও সম্মান পাইয়াছি যে তাহা ধারণা করিতে পারা যায় না। সর্ব্বত্রই রাজা, রাজপুরুষ, প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী এবং পদস্থ ও সম্মানিত ব্যক্তিদের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং পার্টিতে আমাদের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। স্থানীয় সকল সংবাদপত্রেই আমাদের নৃত্যগীতের প্রচুর আলোচনা ও প্রশংসা হইয়াছে। প্রেক্ষাগৃহে কখনও স্থান অবশিষ্ট থাকে নাই এবং শেষ পর্য্যন্ত দর্শকদের ভীড় লাগিয়াই থাকিত। উদয় আসরে নামিলেই হাততালি আরম্ভ হইত এবং নৃত্যের সময় অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সকলেই নৃত্য দেখিত। নৃত্য শেষ হইলে আবার হাততালিতে ঘর ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইত এবং ফুলের তোড়ায় আসর ভরিয়া যাইত। রাত্রে আমরা যখন প্রেক্ষাগৃহ হইতে হোটেলে ফিরিতাম তখন দেখিতাম বহু লোক প্রায় ঘণ্টাখানেক পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছে—উদয়শঙ্করকে দেখিবার জন্য। ইহা ছাড়া হোটেলে বহু লোক দেখা করিতে আসিত। লণ্ডন ছাড়া ইউরোপের যে স্থানেই আমরা গিয়াছি সেখানেই লোকের ভীড় জমিয়া যাইত। আমাদের দেখিয়া উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছে লণ্ডন ছাড়া আর কোথাও তাহা দেখি নাই।

বুদাপেষ্ট, ভিয়েনা, প্রাগ, প্যারিস প্রভৃতি সহরে সঙ্গীতাদি শিল্পের বিশেষ সমাদর দেখিলাম। সেই সকল সহরে সঙ্গীতালাপের জন্য বিশেষভাবে নির্ম্মিত প্রেক্ষাগৃহ আছে। তাহাতে থিয়েটার বায়োস্কোপাদি কিছুই হয় না। প্রেক্ষাগৃহ এমনভাবে নির্ম্মিত যে সকল স্থান হইতে অতি সুস্পষ্টরূপে সঙ্গীতের সূক্ষ্মতম ঝঙ্কার পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায়। গৃহের শেষ অংশে যাহারা থাকে তাহারাও পরিষ্কার শুনিতে পায়। এইরূপ এক একটি হলে দশ হাজার বার হাজার লোক এক সঙ্গে বসিতে পারে এবং যখন সঙ্গীত আরম্ভ হয় তখন সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া যায়। সমস্ত আলো নিবাইয়া দেওয়া হয়; শুধু একটি ক্ষীণ রশ্মি আমার উপর নিক্ষেপ করা হয়। হল এত নিস্তব্ধ হয় যে মনে হয় হিমালয়ের কোনও অরণ্যে একা বাজাইতেছি। তারপর শেষ হইয়া গেলে চীৎকার ও হাততালিতে ঘর ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হয় এবং পুনর্ব্বার বাজাইবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে অনুরোধ আসিতে থাকে। এক এক আসরে চারি পাঁচ বার বাজাইতে হইয়াছে তবু শ্রোতারা শান্ত হয় না। এমন শ্রোতার সম্মুখে সঙ্গীতালাপ করিতে আমারও উৎসাহ বাড়িয়া যায়। আমি তন্ময় হইয়া বাজাইতে থাকি। এত আত্মহারা হইয়া দেশে আমি কোথাও বাজাই নাই। আমার কাঠের যন্ত্র প্রাণবান হইয়া উঠে। যে আনন্দ ইউরোপীয় শ্রোতার সম্মুখে বাজাইয়া পাইয়াছি তেমন আর কোথাও পাই নাই।

প্যারিসে accalia হোটেলে আমরা প্রায় এক মাস থাকি। সেখানে আমাদের ভারতীয় গীত যন্ত্রের একজিবিসন হয়। আমাদের সঙ্গে সকল প্রকার যন্ত্রই ছিল। বহু সঙ্গীতজ্ঞ একজিবিসনে ভারতীয় যন্ত্র মনোযোগ করিয়া দেখিত—ছবি আঁকিয়া লইত এবং কি প্রকারে বাজাইতে হয় আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিত। প্যারিসে দেখিলাম ভারতীয় সঙ্গীতের উপর লোকের বেশ অনুরাগ আছে। ভারতীয় সঙ্গীত যে খুব সূক্ষ্ম এবং তাহা প্রাণস্পন্দন জাগাইয়া তুলে ইহা তাহারা বুঝিতে পারে। আমার এই সকল দেখিয়া খুব আনন্দ হইত এবং আশা হইত একদিন ভারতীয় সঙ্গীত জগতের গুণী লোকদের সমাদর পাইবে।

হোটেলে একদিন কয়েকটি যুবতী আসিল। কয়েকজন আমেরিকান ও কয়েকজন ইউরোপীয়। উদয় বলিল, এরা আমার স্বরদ শুনিতে আসিয়াছে। ইহাদের দেখিয়া প্রথমে আমার ভাল লাগিল না। ভাবিলাম হুজুকপ্রিয় আমেরিকান নারী, সকল সময়েই নূতনত্বের পিছনে ছুটিতেছে—বোধ হয় আমোদ করিতে আসিয়াছে বা oriental musicই এখন আভিজাত্যের মধ্যে একটা style দাঁড়াইয়াছে। তখন বিকাল ৩টা হইবে। নিতান্ত অনিচ্ছায় একটা ভীমপলশ্রী বাজাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম তাহারা খুব মনোযোগ সহকারে শুনিতেছে এবং বুঝিতে ও উপভোগ করিতে চেষ্টা করিতেছে। তারপর আমারও অনুরাগ বাড়িল। তিন ঘণ্টা বাজাইলাম। আমি নিজেও তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম; ছয়টা পর্য্যন্ত পূর্ণ তিন ঘণ্টা ইহারা একাসনে চক্ষু বুজিয়া বসিয়া শুনিল এবং ছয়টার পর চাহিয়া দেখি সকলেরই চক্ষু বহিয়া জল পড়িতেছে। তাহাদের কান্না আর থামে না। গলা দিয়া কাহারও কথা বাহির হইতেছে না। পর মুহূর্ত্তেই সকলে ছুটিয়া আসিয়া আমাকে জড়াইয়া

ধরিল এবং কপালে চুম্বন করিতে লাগিল। উদয় পরে বলিল—ওস্তাদজি, আপনার বাজনা আজ বড় চমৎকার জমিয়াছিল।

বুদাপেষ্টে একদিন কয়েকজন ইউরোপীয় সঙ্গীতজ্ঞ দেখা করিতে আসিল। ইহারা সকলেই ইউরোপীয় সঙ্গীতে বিশেষ দক্ষ। আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করিল—আমি কোনও রাগ-রাগিণী রচনা করিয়াছি কি না এবং করিয়া থাকিলে তাহাদের শুনাইতে অনুরোধ করিল। আমি তখন তাহাদের বুঝাইলাম যে ভারতীয় রাগ-রাগিণী ইউরোপীয়দের ন্যায় কেহ compose করে না। ঐ সকল রাগ অনাদিকাল হইতে ঋষি ও গুণীরা রচনা করিয়া গিয়াছেন; আমরা অভ্যাস করিয়া তাহা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করি মাত্র। তারপর আমি বিভিন্ন প্রকারে যে সকল বিভিন্ন রাগ আলাপ করা হয় তাহা বর্ণনা করিলাম। কেহ কিছু বুঝিল বলিয়া মনে হইল না।

আমি বলিলাম, দিবসের এক এক ভাগে এক এক রাগের আলাপ করিতে হয় এবং কবি যেমন কবিতায় এক এক প্রকার ভাব মনে জাগাইয়া তুলে, চিত্রকর যেমন চিত্রে এক এক ভাব জাগাইয়া তুলে—ভারতীয় ওস্তাদরাও রাগের আলাপে সেইরূপ ভাব শ্রোতার মনে জাগাইয়া তুলিতে পারে। চিত্রকরের তূলির টানে এক একটি ভাব প্রকাশ পায় সেইজন্য বিশেষ করিয়া লিখিয়া বুঝাইবার আবশ্যক হয় না। সেই হিসাবে চিত্র বিদ্যা international। ভাষা জানা না থাকিলেও শুধু অন্তরে ভাব থাকিলে ও চক্ষু থাকিলেই চিত্রে কি বলা হইয়াছে বুঝা যায়। আমাদের সঙ্গীতও সেই প্রকার। আমি কি ভাবপ্রকাশ করিতে চাই তাহা তারের ঝঙ্কারে প্রকাশ করিব। তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে।

তাহারা যন্ত্র দ্বারা বুঝাইতে অনুরোধ করিল। তখন বিকাল পাঁচটা। আটটায় সন্ধ্যা হইবে। আমি একটি ভৈরবী বাজাইলাম। শ্রোতারা চক্ষু বুজিয়া খুব মনোযোগ সহকারে শুনিতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি মনে হইল?

একজন বলিল, আমার মনে হইল গির্জ্জায় বসিয়া Prayer করিতেছি। দ্বিতীয় জন বলিল, যেন ভোর হইয়াছে কোন নির্জ্জন প্রান্তরে বসিয়া ভগবৎ চিন্তা করিতেছি। তখন আমি ভোরবেলা হইতে শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন রাগ রাগিণীর আলাপ করিলাম। সকলেই বলিল যে সেই প্রকার ভাব অনেকটা আসে। একটি ভীম-পলশ্রী বাজাইলে কয়েকজন বলিল, আমাদের কান্না আসিতেছে। তোমাদের সঙ্গীতে এত করুণ melody কি করিয়া সম্ভব হয়? এত কান্না আসে কেন?

আমি বলিলাম, ভারতীয় সঙ্গীত খুব সূক্ষ্ম। সা-রে-গা-মা প্রভৃতি যে সাতটি সুর আছে তাহাদের আবার বাইশটি শ্রুতি, একুশটি মূর্চ্ছনা আছে। সা-এর পরেই রে নয়। সা হইতে রে পর্য্যন্ত চারিটি ঘাট। এই চারিটি শ্রুতির ধ্বনি আমরা বিভিন্ন করিতে পারি।

তাহারা বিশ্বাস করিল না।

তখন বাজাইয়া দেখাইলাম। তোমাদের কাণ কি এত সূক্ষ্ম ধ্বনি উপলব্ধি করিতে পারে? আমি বলিলাম, পারে। সেই জন্যই আমাদের রাগরাগিণী এত melodious হয় এবং তাহাতে কাটা কাটা খাপছাড়া আওয়াজ হয় না।

আমি স্বরোদ দ্বারা আমার বক্তব্য বুঝাইতেছিলাম। শ্রোতাদের মধ্যে একজন ছিলেন যাহাকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বেহালাবাদক বলা যাইতে পারে। তাহার অঙ্গুলী চালনা এত দ্রুত ও পরিষ্কার যে বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু তাহাতে তেমন melody আসে না। তৎপর আমি কম্পন, গমক, মূর্চ্ছনা প্রভৃতি দেখাইলাম। সকলেই তাহা উপলব্ধি করিল।

সঙ্গীতের মাত্রা সম্বন্ধেও আলোচনা হইল। আমি বলিলাম—তোমাদের শাস্ত্রে তিন প্রকার তাল ও time অধিক নাই। কিন্তু আমাদের ৩৬০ তাল পর্য্যন্ত আছে। সঙ্গে চৌতালা, ঝাঁপতালা, সুরফাঁক, ধামার, আড়াচৌতাল প্রভৃতি শুনাইলাম।

সেইদিন রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত আমাদের আলোচনা চলিয়াছিল। আমাদের ও উদয়শঙ্করের অনেক engagement ছিল। তাহাদেরও ছিল—কিন্তু আলোচনা এত জমিয়াছিল যে সেদিকে কাহারও খেয়াল ছিল না। একটি জিনিস লক্ষ্য করিলাম। শ্রোতারা সকলেই জিজ্ঞাসু, খুব মনোযোগী ও বিশেষ শ্রদ্ধাবান। তাহাদের

সঙ্গে আলাপ করিয়া আমিও বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলাম।

পরে এইরূপ বহুবার আলোচনা করিয়াছি এবং হোটেলে আসিয়া অনেকে রাগিণীর আলাপ শুনিয়াছে ও কাঁদিয়াছে। শুধু বাঙ্গালীরাই যে হুজুকপ্রিয় তাহা নহে। ইউরোপও কম হুজুকপ্রিয় নয়। অনেকেই আমাদের গান বুঝিতে পারে না। কিন্তু ইউরোপের সঙ্গীতজ্ঞগণ এবং বিশেষ বিশেষ সূক্ষ্মকলাবিদ্যার অনুরাগীরা আমাদের সঙ্গীত মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছে এবং সেই জন্য সাহস করিয়া বলিতে পারি—ইউরোপের গুণীগণ এক সময়ে ভারতের সঙ্গীতের আদর করিবেই।

উহাদের গান আমার ভাল লাগে নাই। হঠাৎ এক এক সময়ে মনে হইত কেহ বুঝি মারামারি আরম্ভ করিল। কর্কশ কণ্ঠের সে কি চীৎকার। পরে জানিলাম যে উহা সঙ্গীতচর্চ্চা হইতেছে। কাবুলীদের গানও শুনিয়াছি। কিন্তু ইউরোপীয়দের গানের সঙ্গে কাহারও তুলনা হয় না।

আমরা রাশিয়ায় যাই নাই। পাশ পাই নাই। ইটালীতে আমাদের কোন শো হয় নাই। তখন ইটালী আবিসিনিয়ার যুদ্ধ হইতেছিল। ইটালী-সরকার বাহিরে অর্থ যাইতে দিবে না। আমরা রোম, ভেনিস, ফ্লোরেন্স প্রভৃতি বেড়াইয়া আসিয়াছি। জার্ম্মাণীর বার্লিন, মিউনিক প্রভৃতি সহরেও বেড়াইয়াছি এবং হোটেলে বসিয়া অনেক লোককে গান শুনাইয়াছি। কিন্তু কোথাও শো হয় নাই। আমাদের ইহুদী ম্যানেজার সকল সময়ই ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিত। পরে ম্যানেজর পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল এবং ভারতে আসিয়া রবীন্দ্রশঙ্করের চিঠিতে জানিলাম জার্ম্মাণীতে শো হইতেছে এবং উদয়শঙ্করের দল আমেরিকার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

ইংলণ্ডে আমরা তিনমাস ছিলাম। ডিভন-শায়ারের এক সহরে Darlington Hall নামক এক প্রতিষ্ঠানে। সেখানে বহু বালক বালিকাকে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের আদর্শে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এখানে ছোট ছোট বালকবালিকা পাইয়া আমি যেন প্রাণ পাইলাম। ইহাদের সঙ্গে খুবই ভাব হইয়া গেল এবং তাহারা আমার কাঁধে চড়িয়া, দাড়ি টানিয়া এবং কিল ঘুষি ও চুম্বন করিয়া ব্যতিব্যস্ত রাখিত। তিন মাস রিহার্সাল দিয়াছি এবং লণ্ডন প্রভৃতি সহরে মধ্যে মধ্যে বেড়াইয়াছি। কিন্তু লণ্ডনে আমাদের শো হয় নাই।

উদয়ের সঙ্গে পূর্ব্বেই কথা ছিল এক বৎসর থাকিব। এক বৎসর শেষ হইলে দেশে ফিরিলাম। ইতিপূর্ব্বে তিমির-বরণ গিয়াছিল এবং ইউরোপ মাতাইয়া আসিয়াছিল। অনেক স্থানে তাহার খুব প্রশংসা শুনিয়াছি এবং তাহাতে খুব আনন্দিত হইয়াছি। তিমিরবরণ আমারই ছাত্র। সেজন্য আমার যথেষ্ট গৌরব। আমার নিজের তেমন সাধনা নাই। সুরের সৃষ্টি করিয়া শ্রোতার মনে মোহ জন্মাইতে পারি না। রাজা বিক্রমাদিত্য মধ্যরাত্রিতে দীপক রাগিণী বাজাইলে প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিত—রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি করিয়া শীতে বসন্ত আনয়ন করিতে পারিত। ভারতীয় সঙ্গীতের এইরূপ ক্ষমতা আছে আমি তাহা বিশ্বাস করি। কিন্তু সাধনার অভাবে নিজে তাহা করিতে পারি না। এত অসম্পূর্ণ বিদ্যা হইলেও আমার সঙ্গীতে ইউরোপ যেরূপ প্রীতিলাভ করিয়াছে তাহা মনে করিয়া খুব গৌরব অনুভব করিতেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হিন্দুস্থানের কোনও গুণী একদিন পাশ্চাত্য সভ্য জগত মাত করিয়া আসিতে পারিবে। আজ উদয়শঙ্করের দল যাহা করিল, তাহাতেই আমি মহা গৌরব ও আনন্দ অনুভব করিতেছি।

ইউরোপে দ্রষ্টব্য স্থান বহু দেখিয়াছি এবং রাজনৈতিক আলোচনাও বহু শুনিয়াছি কিন্তু সেই সকল কথা আমার বক্তব্যের বাইরে। শুধু একটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না। আমাদের দেশ কত পশ্চাতে রহিয়াছে—কি অর্থে, কি শিক্ষায়, কি সভ্যতায়। আরব পালেস্তাইন হইতে আরম্ভ করিয়া সকল দেশই চালচলন, শিক্ষা-দীক্ষা সকলই নূতন প্রণালীতে আরম্ভ করিয়াছে ; আর আমাদের দেশ ধর্ম্মান্ধতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে জর্জ্জরিত হইয়া আছে। কে বলে ইউরোপ যন্ত্রসভ্যতার উপাসক—ইউরোপ জড়বাদী ? জড়বাদ ও যন্ত্র-ব্যবহারে ইউরোপ মানুষকে spiritualise করিয়াছে। সেখানে মানুষ মানুষের মত থাকিতে শিখিয়াছে—আর আমাদের দেশ নির্জ্জীব তামসিকতায় ডুবিয়া আছে।

ইউরোপের নৈতিক জীবন সম্বন্ধে আমার অনেক ভ্রান্ত ধারণা ছিল। আমি বয়সে বৃদ্ধ এবং মনোবৃত্তিও সেকেলে।

ইউরোপের নরনারীর নৈতিক জীবনের অনেক কিছুই আমার ভাল লাগিবে না বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু ইউরোপ নিজের চোখে দেখিবার পর আর কিছু খারাপ লাগে নাই। চরিত্রহীনতা সকল দেশেই আছে এবং ইউরোপেও আছে। কিন্তু আমি যাহাদের বিশেষ করিয়া দেখিয়াছি ও মিশিয়াছি তাহাদের মধ্যে অনেককে এত পবিত্র ও মহৎ দেখিয়াছি যে ইউরোপ সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ব্যতীত অন্য কোন ভাব আমার মনে আসে না। এলিস বোনার, বিয়েত্রিস প্রভৃতি মহিলাদের আমি দেবীর মত মনে করি। তাঁহাদের আন্তরিকতা, ভক্তি, পরার্থপরতা ও হিন্দুস্থানপ্রীতি এমন জ্বলন্ত যে তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিলে মোহিত হইতে হয়। অল্পবয়সের নরনারীর অবাধ মেলামেশা, স্নান, রৌদ্রসেবন ও ব্যায়াম আমার নিকট মোটেই বিসদৃশ মনে হয় নাই। সেখানে যেন ঐরূপ না হইলেই বিসদৃশ হইত। ইউরোপের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ও সুন্দর, আমরা হয়ত কেবল তাহাই দেখিয়াছি। ইউ-রোপের অসুন্দর ভাগ হয়ত আমাদের অভিজ্ঞতার বাহিরে। কিন্তু যেটুকু দেখিয়াছি তাহাতে বিসদৃশ কিছুই পাই নাই। ইউরোপের মেয়েরা যেমন শিক্ষিত, তেমনি বুদ্ধিসম্পন্ন ও কর্ম্মঠ। হোটেলের চাকরাণীরা বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে আমাদের দেশের অনেক গ্রেজুয়েটের সমকক্ষ। একটু অবসর পাইলেই খবরের কাগজ বা পুস্তক লইয়া পড়িতে আরম্ভ করে। তাহারা অত্যন্ত কর্ম্মঠ। পল্লীগ্রামের গৃহস্থবধূদের মত হয়ত এত মাংসপেশীর চালনা করে না কিন্তু দস্তুরমত হাড়ভাঙ্গা খাটুনীতে অভ্যস্ত। তাহাদের শরীরের গঠনও এত সুন্দর যে মার্জ্জিত ভাষায় বলিতে হয় তাহারা স্বাস্থ্য-বতী। নতুবা মহিষমর্দ্দিনী বলিলে অন্যায় হয় না। ইহারা সত্যই বীরপ্রসবিনী। ছেলেপিলেরা প্রকৃতই এক একটি angel. দেখিলে এত স্নেহ হয় ও আদর না করিয়া পারা যায় না। ইউরোপের নারীদের এত পঞ্চমুখে প্রশংসা করিলাম। সেইজন্য সঙ্গে সঙ্গে মনে করাইয়া দিতেছি যে আমি তিনকাল উত্তীর্ণ বৃদ্ধ। যাহাদের প্রশংসা করিলাম তাহারা আমার নাতনীর মত। অতএব আশা করি—মনে করিবার মত কিছুই নাই। লণ্ডন ছাড়া সর্ব্বত্রই দেখিয়াছি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কৌতূহল সকলেরই আছে এবং সকলেই প্রকৃত সত্য জানিতে ইচ্ছুক। গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের নাম সকলেই জানে। আমরা যাহাদের সংস্পর্শে আসিয়াছি তাহারা প্রায় সকলেই রবীন্দ্রনাথের ভক্ত ও অনুরাগী।

প্যারিস হইতে উদয়শঙ্করের নিকট বিদায় লইয়া ভারতের অভিমুখে এক বৎসর পরে যাত্রা করিলাম। উদয় বলিল—ওস্তাদজি, ভারতবর্ষকে আমার প্রণাম জানাইবেন। আমি 'ভারতবর্ষের' মধ্য দিয়া ভারতবাসীদের উদয়শঙ্করের প্রণাম জানাইতেছি। উদয়ের জন্য মনে বেশ কষ্ট হইতেছিল। তাহাকে আমি যেমন ছেলের মত স্নেহ করি; সেও আমাকে তেমনি পিতার মত ভক্তি করে। ভারত-বর্ষের মুখ সে বিদেশে উজ্জ্বল করিয়াছে। সে যে শুধু oriental dance দেখায় তাহা নহে। তাহার শারীরিক বল এবং সৎসাহসও প্রচুর। ইউরোপে বহুদিন থাকিয়া তাহার সাহসও সেই প্রকার হইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত কয়েকবারই দেখিয়াছি। লণ্ডনে একবার আমি, উদয় ও একজন ফরাসী-মহিলা যাইতেছিলাম। একজন ইংরাজ ফরাসী-মহিলার গায় ধাক্কা দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। উদয় তৎক্ষণাৎ সেই ইংরেজের কলার ধরিয়া আনিল এবং ক্ষমা ভিক্ষা করিতে বলিল। লোকটি তাহা করিতে অস্বীকার করিলে উদয় তাহাকে কয়েক ঘুষিতে পথে ফেলিয়া দিল। লোকটি ঘুষি খাইয়া গায়ের ধূলি ঝাড়িল এবং প্রসন্ন চিত্তে চলিয়া গেল। পথে জনতাও হইয়াছিল কিন্তু কেহই লোকটিকে সাহায্য করিতে আসিল না এবং লোকটিও কোন প্রকার সাহায্য চাহিল না।

আমার শীঘ্র শীঘ্র দেশে ফিরিবার অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। বিদেশ হইতে উদয়শঙ্কর অর্থ আনিতে পারে না। শো দেখাইয়া যাহা পায় তাহা খরচ হইয়া যায়। কিছুই থাকে না। শুধু প্রাচ্যনৃত্য ও সঙ্গীতের প্রচার হয় মাত্র। এই জন্য কয়েকজন ইউরোপীয় মহানুভব ব্যক্তি তাহাদের অর্থে কাশীতে উদয়শঙ্করের নামে এক প্রাচ্যনৃত্য ও গীতের শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এই সম্পর্কে দুই জন মহিলার নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। একজন এক ক্রোড়পতি মার্কিণ ব্যাঙ্কারের কন্যা বিয়েত্রিস। দ্বিতীয় জন এক সুইস মহিলা এলিস বোনার। বিয়েত্রিস এই উদ্দেশ্যে বহু লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন এবং বহু

গ্রামোফোন, নানা দেশের গীত ও বাদ্যের বহু রেকর্ড এবং আরও হাজার রকমের জিনিস আমার সঙ্গে দিয়াছেন। এলিস বোনার আমার সঙ্গেই ভারতে ফিরিয়াছে। ইহারা প্রাচ্য কলাবিদ্যার মহা অনুরাগী। ইহারাই উদয়শঙ্করকে ইউরোপে বড় করিয়াছে। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এবং বহু বৎসর পরিশ্রম করিয়া উদয়শঙ্করের দল organise ক'রিয়া ইউরোপে ঘুরাইয়াছে। ইহাদের নাম কেহ জানে না। বহু প্রতিষ্ঠানে ইহারা হাজার হাজার টাকা দান করে কিন্তু নিজের নামে কিছুই করে না। নাম যশ ইহারা চাহেও না। তাহাদের এই প্রচেষ্টা যাহাতে ফলবতী হয় আমি আশা করি আপনারা সকলেই সেই চেষ্টা করিবেন।

এক বৎসর দেশে ছিলাম না। আমার প্রভু গুণগ্রাহী রাজা সাহেব মাস মাস টাকা গুণিয়া দিয়াছেন এবং আমার পরিবারের জন্য যে পরিমাণ পরিশ্রম ও তত্ত্বাবধান করিয়াছেন বোধ হয় রাজ্যের দেওয়ান সাহেবের জন্যও তদ্রূপ হয় না।

ইউরোপের বহু জিনিস দেখিয়াছি কিন্তু সেই সকল বর্ণনা করিবার মত শক্তি আমার নাই। আমার বিদ্যা-বুদ্ধি নিতান্তই অল্প। অতএব সেই চেষ্টা ত্যাগ করিয়াছি। কেবল সঙ্গীত সংক্রান্ত কিছু বলিয়াছি তাহাও ভাল করিয়া পারি নাই। কথা ভাল করিয়া লিখিবার ও বুঝাইবার শক্তি আমার নাই। আশা করি সেজন্য কেহ আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।

এস

শ্রীবনমালী দাস

এস ওহে ঋতুরাজ
এস নব বর বেশে।
পুলক-চঞ্চল হিয়া
তোমার পরশ আশে॥

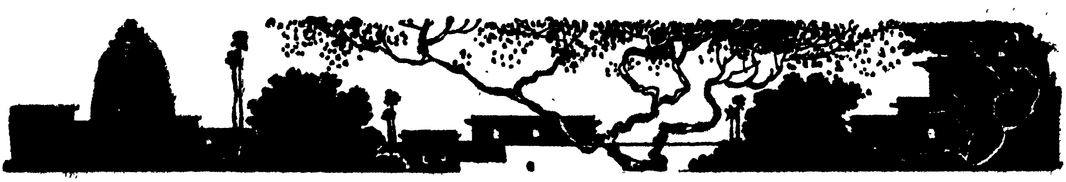
শ্রীহীন কুসুম কলি,
গুঞ্জরি না আসে অলি,
যেন তব প্রতীক্ষায়,
লাজে হেরি ম্রিয়মান॥

তোমা বিনা রসময়,
ভুলি গীত পিকচয়,
দেয় অর্ঘ্য অশ্রুময়
তোমার উদ্দেশে॥

অমিয় পরশি তব
কুহু ডাক কোকিলার।
বিরহ ব্যথিত প্রাণে
আনে প্রেম অভিসার॥

মধুময় উপবন
শুষ্ক পত্র শোভাহীন।
দক্ষিণা বায়ু সেও
বহে যেন উদাসীন॥

এস সখা সঙ্গে ক'রে,
তব প্রিয় সহচরে,
মলয় সুবাস সহ
এস শেষে বরষের॥



বাংলা বানানের একটি নিয়ম

শ্রীগোবর্ধনদাস শাস্ত্রী

(প্রতিবাদ)

গত পৌষমাসের (১৩৪৩) ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "বাংলা বানানের একটি নিয়ম" নামে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। তিনি লিখিয়াছেন : —"কেহ কেহ শব্দের ব্যুৎপত্তি সন্ধানের পরিশ্রম লাঘবের জন্য হিন্দি মারাঠির নজির দেখাইয়া বলিয়াছেন, (ভারতবর্ষ ভাদ্র, ১৩৪৩ সন, 'বাংলা বানানের নিয়ম'—শ্রীগোবর্ধন দাস শাস্ত্রী) বাংলা ভাষায় কোনখানেই রেফের পর দ্বিত্ব লেখা হবে না'।"

এখানে আমার বক্তব্য এই যে সে প্রবন্ধে একথাই বলা হইয়াছে—"দ্বিত্বসম্বন্ধে হিন্দি মারাঠি আদি ভাষার নিয়ম অত্যন্ত ব্যাপক। কেবল রেফের পরেই নয়, 'সন্ন্যাস, পুত্র, মহত্ত্ব' ইত্যাদিতে য-ফলা, র-ফলা ও ব-ফলার পূর্বেও সে সমস্ত ভাষায় সাধারণত দ্বিত্ব লেখা হয় না। কাজেই দ্বিত্ব বিষয়ে হিন্দি মারাঠি আদি ভাষার নজির বাংলাভাষায় সম্পূর্ণভাবে খাটবে না। সুতরাং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচারিত "বাংলাবানানের নিয়মে" (প্রথম সংস্করণে) কার্তিক, বার্তা, বার্তিক আদি কতিপয় শব্দ বাদ দিয়া কেবলমাত্র অর্চনা-মূর্ছা আদি শব্দের দ্বিত্ববিষয়ে হিন্দি মারাঠি আদি ভাষার যে নজির দেখাইয়াছেন তাহা উপযুক্ত হয় নাই।" একথা ছাড়া বাংলাভাষায় রেফের পরবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব উঠাইয়া দেওয়ার প্রমাণরূপে হিন্দি, মারাঠি আদি ভাষার নজির দেখানো হয় নাই। তাহার জন্য যে সমস্ত যুক্তি ও প্রমাণ দেখানো হইয়াছে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। সে প্রবন্ধ একটু মনোযোগ দিয়া পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

ইহার পরে লেখক মহাশয় পাণিনির নামে একটি সূত্র—"রহাদ্‌যপো দ্বিঃ" চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই সূত্র পাণিনির নয়। এমন কি বাংলাদেশে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত কলাপ ব্যাকরণেরও নয়। এ বিষয়ে পাণিনির সূত্র যাহা (অচোরহাভ্যাং দ্বে") তাহা "বাংলা বানানের নিয়ম" প্রবন্ধে লেখক এবং গত অগ্রহায়ণ মাসের (১৩৪৩) ভারতবর্ষে 'বাঙ্গালা বানান সমস্যা' নামক প্রবন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, এম-এ, বি এল, ডি-লিট্‌, ডিপ্লো-ফোন (প্যারি) মহোদয় ভালরূপেই দেখাইয়াছেন। লেখক মহাশয় সেদিকে একটু দৃষ্টি রাখিলেই পারিতেন।

লেখক মহাশয়ের "রহাদ্‌ যপো দ্বিঃ" সূত্রটি কোন্‌ ব্যাকরণের জানি না ; তবে ইহা হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন একটি সূত্র "সারস্বত" ব্যাকরণে আছে—"রাদ্‌ যপো দ্বিঃ"। তাহার অর্থ হইতেছে 'স্বরবর্ণের পরে রেফ তাহার পরবর্তী 'যপ্‌-এর অর্থাৎ শ, ষ, স, হ-ব্যতীত সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণের বিকল্পে দ্বিত্ব হয়।" লেখক মহাশয়ের সূত্র (রহাদ্‌ যপো দ্বিঃ) সেই সারস্বতের সূত্রেরই একটি সংশোধিত রূপমাত্র। কাজেই ইহার অর্থও "স্বরবর্ণের পরে যে রেফ এবং হ-কার তাহার পরবর্তী "যপ্‌"-এর বিকল্পে দ্বিত্ব হয়" এরূপ হওয়াই উচিত। পাণিনিরও ইহাই অভিমত। কিন্তু লেখক মহাশয় ইহার অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন 'র্‌ হ্‌ পরে থাকিলে যপ্‌ অর্থাৎ শ, ষ, স ব্যতীত সমস্ত ব্যঞ্জন বর্ণেরই বিকল্পে দ্বিত্ব হয়।" ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে সূত্রটির এরূপ অর্থ হইতে পারে না। তর্কের খাতিরে এরূপ অর্থ স্বীকার করিলেও তখন ইহাতে কেবল 'ঘ্রাণ, ক্ষিপ্র, বাগ্‌হরি, এতদ্দ্বি" ইত্যাদিতে র-ফলা এবং হ-কারের পূর্ববর্তী বর্ণেরই (ঘ্‌, প্‌, গ্‌, দ্‌ ইত্যাদিরই) দ্বিত্ব হইবে। অর্চনা, মূর্ছা আদি শব্দে রেফ ও হ-কার পরে না থাকায় কখনও দ্বিত্ব হইতে পারিবে না। ইহার উপর আর মন্তব্য দরকার নাই।

ইহার পরেই লেখক মহাশয় লিখিতেছেন :—সংস্কৃত শব্দগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে রেফযুক্ত হইয়া কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বর্ণেরই নিয়মিত দ্বিত্ব হইতেছে ও কতকগুলি বর্ণের নিয়মিতভাবে দ্বিত্ব বর্জন করা হইতেছে ইত্যাদি।"

"বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে" বাংলাদেশে মুদ্রিত সংস্কৃত গ্রন্থগুলিতেই এরূপ অব্যবস্থা দেখা যাইবে ; বাংলার বাহিরে দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত গ্রন্থগুলিতে এরূপ দেখা যাইবে না। তাহার কারণ আছে। সাধারণত দেখা যায়—প্রত্যেক দেশেরই পণ্ডিতগণ সংস্কৃত লিখিবার বা ছাপিবার সময়ে চিরদিনের অভ্যাসবশত দেশভাষার বানানের নিয়মগুলি কিছু কিছু পালন করিয়া থাকেন—যদি তাহাতে সংস্কৃত ব্যাকরণের কোন বাধা না থাকে। হিন্দি মারাঠি আদি ভাষায় সাধারণত রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব লেখা হয় না। এই অভ্যাসের কারণে সংস্কৃত ভাষাতেও সে দেশের পণ্ডিতগণ সাধারণত দ্বিত্ব লেখেন না। এই কারণে সে সকল দেশে মুদ্রিত সংস্কৃতগ্রন্থে এরূপ "বৈষম্য" বেশি একটা চোখে পড়ে না। এ দেশের পণ্ডিতগণও বাংলাভাষায় যে যে বর্ণে দ্বিত্ব লিখিয়া অভ্যস্ত, সংস্কৃতেও সে সকল বর্ণে দ্বিত্ব লিখিয়া থাকেন এবং যে সমস্ত বর্ণে দ্বিত্ব লিখিয়া অভ্যস্ত নন সে গুলিতে লেখেন না। (ইহাতে ব্যাকরণের কোন বাধা নাই।) এই কারণেই এদেশে মুদ্রিত সংস্কৃত পুস্তকগুলিতে রেফের পর কোন কোন বর্ণের নিয়মিত দ্বিত্ব এবং কতকগুলি বর্ণের নিয়মিত দ্বিত্ববর্জন দেখা যায়। তাহা ছাড়া ব্যাকরণের নিয়মগুলির প্রতি পণ্ডিতগণের অবহেলার কারণে কিংবা অন্য কোন কারণে এরূপ হয় নাই।

লেখক মহাশয় তাঁহার কথার সমর্থনের জন্য এখানে ধ্বনিতত্ত্বমূলক

(Phonological) কারণ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাও ভুল। লেখক মহাশয়ের ধ্বনিতত্ত্ব বা (Phonology) জীবিত ভাষার বানানের পক্ষেই খাটে। সংস্কৃত ভাষা জীবিত ভাষা নয়। কাজেই ইহাতে উচ্চারণ বা ধ্বনি দেখিয়া বানান ঠিক করা যায় না। ইহাতে প্রথমেই ত্রিকালদর্শী ঋষিগণের নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে প্রত্যেকটি পদের বানান ঠিক করিয়া লইতে হয়। তাহার পরে সে সকল পদের প্রত্যেকটি বর্ণের "স্থান, প্রযত্ন, মাত্রা" আদির সঙ্গে সমন্বয় রাখিয়া উচ্চারণ নির্ধারণ করিতে হয়। ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই। কারণ সংস্কৃত ভাষার বিষয়ে আমরা এখনও "লক্ষণৈকচক্ষুষ্ক" মাত্র—অর্থাৎ ঋষিনির্দিষ্ট লক্ষণই (নিয়মই) সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করিবার পক্ষে আমাদের একমাত্র সম্বল। এই লক্ষণ দিয়াই লক্ষ্য নির্ধারণ করিতে হয়। তাহা ছাড়া জীবিত দেশ্যভাষাগুলির মত লক্ষ্য দেখিয়া লক্ষণ গড়িতে—উচ্চারণ দেখিয়া বানান নির্দেশ করিতে পারা যায় না। কাজেই সংস্কৃত শব্দের বানানের পক্ষে বর্তমান ধ্বনিতত্ত্বের (Phonologyর) কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

বাংলা জীবিত ভাষা হইলেও তাহার বানান সম্পূর্ণ ধ্বনিমূলক নয়। কাজেই তাহার বানান নির্ধারণের পক্ষেও অন্তত এখন কোন ধ্বনিতত্ত্বের কথা উঠিতে পারে না। শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয়ের নির্দেশ ('ভারতবর্ষ' চৈত্রসংখ্যা ১৩৪২ সন, "চলিত ভাষার সংস্কার" নামক প্রবন্ধ) অনুসারে বাংলাবানানকে সম্পূর্ণ ধ্বনিমূলক করিতে এখনও কেহ প্রস্তুত হন নাই। যখন্ হইবেন তখন্কার কথা স্বতন্ত্র। তাহা ছাড়া লেখক মহাশয় নিজেও এই 'ধ্বনিতত্ত্বমূলক কারণের" প্রতি নিঃসন্দেহ নন। তিনি এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন "কণ্ঠ্যবর্ণের দ্বিত্ব না হওয়ারও 'হয়তো' উচ্চারণগতই কোন কারণ আছে"। এই "হয়তো" কথাটি এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহেরই সমর্থন করিতেছে।

অতঃপর লেখক মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহার সারাংশ এই যে—"দুল্লহ" আদি প্রাকৃত শব্দের প্রভাবে পড়িয়াই পরবর্তীকালে "দুর্ল্লভ" আদি শব্দে বৈকল্পিক দ্বিত্ব বিধান করা হইয়াছে। ইতিপূর্বে আরও অনেকে এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। বিষয়টি এখনও বিবাদাস্পদ। কাজেই ইহার বিস্তৃত আলোচনা দরকার। তাহা অন্য কোন সময়ে করিব। এখন কেবল প্রাকৃতের একটি আর্যার উদাহরণ দেখাইয়া সংক্ষেপেই আমার বক্তব্য শেষ করিব।

আর্যাটি এই :—

দুল্লহজণ অণুরাও লজ্জা গ্ৰুরুঈ পরব্বসো অপ্পা।
পিয়সহি বিসমং পেম্মং মরণং সরণং ণু বরমেক্কম্॥

শ্লোকটি শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' নাটিকার। কাজেই প্রাচীন। ইহার সংস্কৃত হইতেছে :—দুর্ল্লভ জনানুরাগো লজ্জা গ্ৰুর্বী পরবশ আত্মা।
প্রিয়সখি বিষমং প্রেম মরণং শরণং নু বরমেকম্॥

প্রাকৃতের "দুল্লহ" শব্দ হইতেই যদি সংস্কৃতের "দুর্ল্লভ" শব্দে বৈকল্পিক দ্বিত্ব আসিয়া থাকে, তবে সংস্কৃতের "গ্ৰুর্বী" শব্দে বৈকল্পিক দ্বিত্ব আসিল কোথা হইতে? প্রাকৃতের "গ্ৰুরুঈ" শব্দে তো কোনও দ্বিত্ব দেখা যায় না; এমন কি একটি ব-কার পর্যন্ত নাই। অন্যদিকে দেখি, প্রাকৃত-আর্যার "পরব্বসো" এবং "একম্" শব্দে দ্বিত্ব রহিয়াছে; কিন্তু সংস্কৃতের "পরবশ" ও "একম্" শব্দে দ্বিত্ব হইল না। এমনি "পেম্মং" শব্দে দুইটি বর্ণে দ্বিত্ব আছে; কিন্তু সংস্কৃতের "প্রেম" শব্দে একটারও দ্বিত্ব হইল না। মোটকথা, লেখক মহাশয়ের মন্তব্য ন্যায়শাস্ত্রের "অন্বয়-ব্যভিচার" এবং "ব্যতিরেক-ব্যভিচার" এই উভয় দোষেই দুষ্ট। সুতরাং প্রাকৃত শব্দের দ্বিত্ব কোনও মতেই সংস্কৃত শব্দের বৈকল্পিক দ্বিত্বের প্রতি কারণ হইতে পারে না। লেখক মহাশয়ের অন্যান্য মন্তব্যগুলিও এমনি মূল্যহীন। অস্তু। এখন এই বিষয় লইয়া আলোচনা করা অনেকটা মৃতপুত্রের কোষ্ঠীবিচারের মতই নিরর্থক। যেহেতু কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নির্ধারিত "বাংলা বানানের নিয়ম"এর সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহাতে রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্বকে বাংলা ভাষা হইতে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে। কবিকুলগুরু রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত ইহাতে তাঁহার সম্মতি জানাইয়াছেন। তিনি তাঁহার শত সহস্র গ্রন্থের স্বার্থের দিকে একটু দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করেন নাই। বাংলা বানানের উচ্ছৃংখলতা ও জটিলতা দূর করিবার পবিত্র উদ্দেশ্যেই তিনি এত বড় ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। কাজেই আমাদের সকলেরই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ মানিয়া চলাই কর্তব্য।



গল্প

শালীবাহন

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শালীবাহনের আসল নামটা কি ছিল ভুলিয়া গিয়াছি। বোধ করি, ধীরেন সুরেন গোছেরই একটা কিছু হইবে। গত বিশ বছর ধরিয়া ক্রমাগত নিজেকে ঐ নামে সম্বোধিত হইতে শুনিয়া তাহার নিজেরও সম্ভবত পিতৃদত্ত নামটা বিস্মরণ হইয়াছিল।

আশ্চর্য্য নয়। একেবারে হ্যালা-ক্যাব্‌লা না হইলেও শালীবাহনের মত গো-বেচারি সদা-বিকশিত-দন্ত নিরীহ মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। আমাদের বিরাট বন্ধু-গোষ্ঠীর মধ্যে সকলেই তাহাকে তাচ্ছিল্যভরে ভালবাসিতাম। আমাদের উপহাস পরিহাসের সে ছিল পরম সহিষ্ণু লক্ষ্যস্থল।

বছর কুড়ি আগে শালীবাহনের প্রথম বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহ করিয়াই সে শ্বশুর পরিবারের সঙ্গে বেবাক মিশিয়া গেল। প্রায়ই ছোট ছোট শালীদের সঙ্গে লইয়া পার্কে বেড়াইতে যাইত; একটি শালীর বয়স আট-নয় বছর, বাকি দুটি একেবারে কচি। আমাদের মধ্যে কেহ একজন একবার শালীবাহনকে কোঁচার খুঁট দিয়া কচি শালীর নাক মুছাইয়া দিতে দেখিয়া ফেলিয়াছিল; কথাটা তৎক্ষণাৎ বন্ধু-সমাজে রাষ্ট্র হইয়া গেল এবং তাহার অনিবার্য্য ফল দাঁড়াইল তাহার শালীবাহন খেতাব।

শালীবাহনের শ্বশুর গুণময়বাবু যে একজন অতি কূটবুদ্ধি লোক ছিলেন তাহার প্রথম প্রমাণ এই যে জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিবার পরই তিনি জামাতার হাতে সংসার তুলিয়া দিয়া পরম আরামে তামাক টানিতে লাগিলেন। শালীবাহন তখন চাকরি করিতে আরম্ভ করিয়াছে, দন্ত-বিকশিত করিয়া শ্বশুর ও তাঁহার চারিটি কন্যার ভার গ্রহণ করিল।

এইভাবে বছর পাঁচেক কাটিয়া গেল। শালীবাহন খুশী, গুণময়বাবু খুশী, শ্যালিকারাও খুশী—এক কথায় সকলেই খুশী, কাহারো মনে কোন দুঃখ নাই। এমন সময় শালীবাহনের জীবনের প্রথম ট্রাজেডি দেখা দিল।

তাহার স্ত্রী সহসা মারা গেল। শালীবাহন একে ভাল মানুষ, তায় পত্নীর বড়ই অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; এই ঘটনায় সে একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। তাহার দাঁতের হাসি কেমন যেন ফ্যাকাশে হইয়া গেল; রুক্ষ মাথায়, অপরিচ্ছন্ন বেশে এখানে-সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

একদিন আমাদের আড্ডায় বসিয়া স্ত্রীর শেষ রোগের কথা বলিতে বলিতে বেচারি একেবারে কাঁদিয়াই ফেলিল। সুধাংশু আমাদের মধ্যে কুমার-ব্রহ্মচারী, বিবাহ করে নাই; সে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিল—'কি আর করবে শালীবাহন, দুঃখ করে লাভ নেই। কথায় বলে ভাগ্যবানের বৌ মরে, আর অভাগার ঘোড়া। তুমি দেখে-শুনে আর একটি বিয়ে করে ফেল।'

চোখ মুছিয়া শালীবাহন বলিল—'আর ওসব ভাল লাগে না ভাই।—অফিসে যাই, তাও মনে হয় কার জন্য—'

শালীবাহনের উদাসীনতা এতদূর গড়াইল যে সে শালীদের পর্য্যন্ত অবহেলা করিতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া গুণময়বাবু অতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

এদিকে শালীবাহনের মেজ শালীটি উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। গুণময়বাবু তাহার বিবাহ দিতে পারিতে-ছিলেন না, কারণ কন্যার বিবাহ দিবার পক্ষে যে বস্তুটি অপরিহার্য্য তাহা গুণময়বাবুর ছিল না। তিনি কয়েক ছিলিম তামাক পুড়াইয়া শালীবাহনকে সংসারের অনিত্যতা ও সংসারী মানুষের সর্ব্ব-অবস্থায় গৃহধর্ম্মপালনরূপ মহা-কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান-গরিষ্ঠ উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

বৎসর ঘুরিবার পূর্ব্বেই মেজ শালীর সহিত শালীবাহনের বিবাহ হইয়া গেল।

আবার সকলেই খুশী। শালীবাহনের বিকশিত-দন্তে পূর্ব্বতন হাসি দেখা দিল। বিবাহের বছর খানেকের মধ্যে সে দিব্য মোটা হইয়া উঠিতে লাগিল। আমাদের বন্ধু-সভার সিদ্ধান্ত হইল, এতদিনে শালীবাহনের গায়ে 'বিয়ের জল' লাগিয়াছে।

তারপর একটি একটি করিয়া বছর কাটিয়া চলিল। পিছু ফিরিয়া তাকাইবার সময় নাই, আশে পাশে তাকাইবার সময় কম—স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি। যে-স্রোতে প্রথম যৌবনে খেলাছলে সাঁতার কাটিয়া স্রোত তোলপাড় করিতাম, এখন তাহাতে নাকানি-চোবানি খাইতেছি, কখন বা অতি কষ্টে নাক জাগাইয়া রাখিয়াছি। বন্ধু-গোষ্ঠীর অনেকেই কে কোথায় ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছে। দশ বছর আগে যাহারা হৃদয়ের কাছাকাছি ছিল, আজ তাহারা কোথায়?

শালীবাহন কিন্তু বিপুল বিক্রমে সাঁতার কাটিয়া চলিয়াছে। তাহার গণ্ড আরো স্ফীত হইয়াছে, হাসি আর প্রসারিত হওয়া অসম্ভব তাই পূর্ব্ববৎ আছে। দশ বছর তাহার মনকে যেন স্পর্শ করিতে পারে নাই।

কিন্তু যে নিয়মে গাছের কাঁচা ফল পাকে, সেই নিয়মে তাহার কচি শালী দুটিও পাকিয়া উঠিয়াছে। শালীবাহন চাকরি করিয়া যে টাকা উপার্জ্জন করে তাহাতে শ্বশুর পরিবারের ভরণ-পোষণ চলে, কিন্তু শালীদের সুপাত্রে ন্যস্ত করা চলে না। তাহারা লক্কোদয়া চান্দ্রমসী লেখার ন্যায় দিনে দিনে পরিবর্দ্ধমানা হইতে লাগিল।

অনূঢ়া কন্যা দুটির বয়স যখন যথাক্রমে উনিশ এবং কুড়ি, সেই সময় কূটবুদ্ধি গুণময়বাবু একটা মস্ত চাল চালিলেন। তিনি হঠাৎ শালীবাহনকে কোনরূপ নোটিস্ না দিয়া মরিয়া গেলেন।

শালীবাহনের জীবনের ইহা দ্বিতীয় ট্রাজেডি। শালী দুটি তাহার ঘাড়ে ত ছিলই, এখন আরো চাপিয়া বসিল।

শালীদের বিবাহ দিবার দায়িত্ব যতদিন শ্বশুরের সঙ্গে ভাগাভাগি ছিল ততদিন শালীবাহন বিশেষ গা করে নাই। কিন্তু এখন সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল; দন্ত-বিকাশ করিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিল। আমাদের বন্ধু রণিনাক্ষ সম্প্রতি বিপত্নীক হইয়াছিল, তাহার বাড়ীতে গিয়া ধর্ণা দিল; আমার বাড়ীতেও ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিল। আমার একটি অবিবাহিত ছোট ভাই আছে, লক্ষ্য তাহার উপর।

কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হইল না। শালীবাহনের শালীদের বিনা পারিশ্রমিকে তাহার স্কন্ধ হইতে নামাইয়া নিজ স্কন্ধে বহন করিতে কেহ রাজি নয়। শালীবাহনের হাসি ক্রমশ নিস্তেজ হইয়া আসিতে লাগিল; তাহার গোঁপের চুল দু'একটা পাকিয়া গেল। বুঝিলাম, সংসার-স্রোত এতদিনে তাহাকেও কাবু করিয়া আনিয়াছে।

একদিন আমার বৈঠকখানায় তাহাকে কিছু সদুপদেশ দিলাম—

'ছাখ শালীবাহন, ও সব ধান্ধা ছেড়ে দাও। টাকা থাকলে মেয়ে না থাকলেও তার বিয়ে দেওয়া যায়; কিন্তু মেয়ে থাকলে—আর টাকা না থাকলে বিয়ে দেওয়া যায় না। এই সহজ কথাটা বুঝে নাও। আজকাল কত মাইনে পাচ্ছ?'

'পঁচাত্তর।'

'হুঁ। কিছু বাঁচিয়েছ?'

'কোত্থেকে বাঁচাব ভাই। খেতে পরতেই কুলোয় না, তার ওপর বাড়ীভাড়া আছে। শ্বশুর যতদিন বেঁচে ছিলেন, তিনি তবু সতেরো টাকা করে পেন্সন পেতেন, কিন্তু এখন—; আমরা চারটি প্রাণী, আর সম্বলের মধ্যে ঐ পঁচাত্তরটি টাকা। ভাগ্যে ছেলেপুলে হয়নি তাই কোন রকমে চলে যাচ্ছে। বুঝতেই ত পারছ।'

'বুঝেছি। বিয়ে দেবার আশা ছেড়ে দাও; তোমার শালীরা এমন কিছু সুন্দরী নয় যে বিনা পণে কেউ নেবে। আজকাল অনেক মেয়ে-স্কুল হয়েছে, দেখেশুনে তাইতে মাষ্টারণী করে দাও।'

'কিন্তু ভাই, লেখাপড়াও ত এমন কিছু শেখেনি যে স্কুলে শেখাতে পারে। রামায়ণটা মহাভারতটা পড়তে পারে এই পর্য্যন্ত বিদ্যে। কি করি বল।' বলিয়া অসহায়-ভাবে আমার পানে তাকাইয়া রহিল।

বড় বিরক্তি বোধ হইল; অধীরভাবে বলিলাম—তবে আর কি করবে, শালী দুটিকে কাঁধে করে নিয়ে বসে থাক। বিয়ে ওদের হবে না, আমি লিখে পড়ে দিলুম। আর আমার ভায়ের কথা যে বলছ, জানো ত সে ভাল ছেলে, য়ুনিভার্সিটিতে ভাল রেজাল্ট্ করেছে। তার ইচ্ছে বিলেত

যার ; কিন্তু আমার এমন টাকা নেই যে তাকে বিলেত পাঠাই। শ্বশুরের পয়সায় সে যাতে বিলেত যেতে পারে সে চেষ্টা আমার করা উচিত নয় কি ? তুমিই বল।'

শালীবাহন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তারপর পাংশু হাসিয়া বলিল—'হ্যাঁ, ঠিক কথা। আচ্ছা ভাই, আজ তাহলে উঠি।' বলিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া চলিয়া গেল।

তারপর মাসছয়েক আর তাহার দেখা পাইলাম না। খবর পাইতাম, সে এখনো আশা ছাড়ে নাই, এখানে ওখানে শালীদের জন্য চেষ্টা করিতেছে।

এইবার শালীবাহনের জীবনের তৃতীয় ট্রাজেডি। একদিন শুনিলাম, তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীটিও মারা গিয়াছে। তাহার জন্য মনে একটা বেদনা অনুভব করিলাম। পৃথিবীতে যে যত ভালমানুষ, শাস্তি কি তাহাকেই সব চেয়ে বেশী সহিতে হয় ? সেদিন তাহার প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিয়াছিলাম স্মরণ করিয়া একটু অনুতাপও হইল।

তারপর আরো বছরখানেক কাটিয়া গেল। শালীবাহনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ নাই ; তাহার খবরও পাই না। পুরাতন পরিচিতদের সংসর্গে সে আর আসে না ; নলিনাক্ষের আশাও ছাড়িয়াছে।

অবশেষে পূজার সময় কলেজ ষ্ট্রীটের একটা বড় কাপড়ের দোকানে হঠাৎ শালীবাহনের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম, তাহার মুখে সেই পুরাতন বিকশিত-দন্ত হাসি ফিরিয়া আসিয়াছে।

সানন্দে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলাম—'আরে শালীবাহন ! কেমন আছ ?'

শালীবাহন এক জোড়া শস্তা সিল্কের জংলা শাড়ী দেখিতেছিল, সরাইয়া রাখিয়া হাসি মুখে বলিল—'ভাল আছি ভাই।'

'তারপর, তোমার শালীদের খবর কি ? বিয়ে হল ?'

সলজ্জভাবে শালীবাহন বলিল—'হ্যাঁ ভাই, হয়েছে। মানে—আমিই তাদের বিয়ে করেছি।'

স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

'বল কি ! দু'জনকেই ?'

'হ্যাঁ ভাই, দু'জনকেই। কি করি বল, কোথায় ফেলি ওদের ? পয়সা নেই, পাত্র ত আর পেলুম না। স্ত্রীও মারা গেলেন। তাই শেষ পর্য্যন্ত—'

আমি আবার তাহার পিঠ ঠুকিয়া দিয়া বলিলাম—'খাসা করেছ। বাহাদুর লোক বটে তুমি।'

শালীবাহন স্মিতমুখে নীরব হইয়া রহিল। আমি বলিলাম—'যাক, মোটের ওপর ভালই আছ তাহলে! অন্তত শালী-দায় থেকে ত উদ্ধার পেয়েছ। তা—তোমার শালীরা কোন আপত্তি করলে না ? আজকালকার মেয়ে—'

শালীবাহন বলিল—'না আপত্তি করেনি। আর, করলেই বা উপায় কি ছিল বল। স্ত্রী মারা গেলেন ; বাড়ীতে আর দ্বিতীয় লোক নেই—আমি আর ওরা। ভাল দেখায় না—ওরা সোমত্ত হয়েছে, বুঝলে না ? কাজেই—'

আমি সজোরে হাসিয়া উঠিলাম—'তা বটে। যাক, শ্বশুর-কন্যার কোনটিকেই বাদ দিলে না। সাবাস শালীবাহন !'

শালীবাহন চোখ টিপিয়া খাটো গলায় বলিল—'আস্তে ! ওরা রয়েছে।'

চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলাম। অদূরে দাঁড়াইয়া দুইটি যুবতী কাপড় পছন্দ করিতেছিল—লক্ষ্য করি নাই ; এখন একযোগে তীক্ষ্ণ তীব্রদৃষ্টিতে আমার পানে তাকাইয়া আছে। থতমত খাইয়া গেলাম। শালীবাহন স্ত্রীদের লইয়া পূজার বাজার করিতে আসিয়াছে। লজ্জায় অস্পষ্টস্বরে শালীবাহনকে আমার বাড়ীতে একদিন যাইতে বলিয়া তাড়াতাড়ি দোকান হইতে বাহির হইয়া গেলাম।

পথে যাইতে যাইতে যুবতী দুটির চোখের সেই দৃষ্টি আমাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। ভৎর্সনা, আর অভিমান ! সত্যই ত, এ লইয়া হাসি তামাসা করিবার আমার কি অধিকার আছে ? মনে হইতে লাগিল, ঐ ভৎর্সনা আর অভিমানের সমস্তটাই আমার প্রাপ্য।

কিন্তু সে যাই হোক, শালীবাহনের শালী দুটি দেখিতে নেহাৎ মন্দ নয়। শালীবাহনকে ভাগ্যবান পুরুষ বলিতে হইবে।

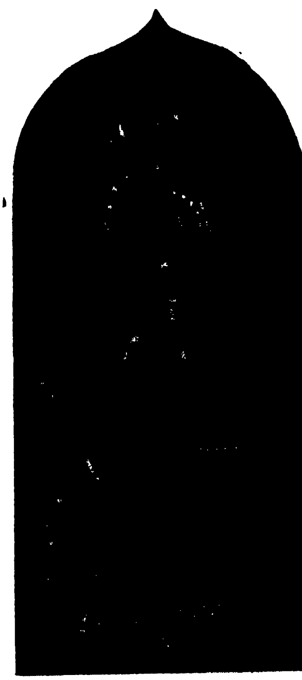


বিক্রমপুরের প্রত্ন-সম্পদ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বিক্রমপুর—প্রাচীন বাঙ্গালার এক সময়ে রাজধানী ছিল। বিক্রমপুরের ইতিহাস, বাঙ্গালার ইতিহাস। কিন্তু এদেশের ইতিহাসানুশীলনের দিকে বিক্রমপুরের অধিবাসিগণ যেমন উদাসীন এবং উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকেন তেমনি বাঙ্গালাদেশের সুধীবৃন্দও বিক্রমপুরের শিক্ষা ও সভ্যতার ইতিহাস, শিল্প ও বাণিজ্যের ইতিহাস, ললিতকলার নিপুণতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পরাঙ্মুখ। পদ্মা ইহার কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়া 'কীর্ত্তিনাশা' নাম ধারণ করিয়াছে, তবু কি সে নিবৃত্ত রহিয়াছে? একদিকে ধলেশ্বরী, আর একদিকে পদ্মা—ভীষণ আক্রমণের সহিত দিনের পর দিন আমাদের পুণ্য মাতৃ-ভূমির চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দিবার জন্য সতত উন্মুখ! কত কীর্ত্তি যে নিঃশেষ হইয়াছে তাহার অবধি নাই। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' প্রণয়নকালে যে সমুদয় কীর্ত্তি, যে সব দর্শনীয় স্থান দেখিয়াছিলাম, এখন আর তাহাদের কোন চিহ্নই পৃথিবীর বুকে নাই; সেখানে দেখিবে বেগবতী পদ্মার স্রোতোধারা তটভূমি আলোড়িত করিয়া আপনার অপ্রতিহত গতিবেগের মহিমা প্রচার করিতেছে। এখনও যাহা আছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া এবং তাহার চিত্র প্রকাশ করিয়া বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যই আমি এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমার আশা আছে সুধু বিক্রমপুরবাসী নহে—বাঙ্গালী মাত্রেই যাঁহারা বাঙ্গালা দেশকে ভালবাসেন তাঁহারা আমার সহায় হইবেন। বিক্রমপুরের প্রত্ন-সম্পদ অসংখ্য।—পৌষের 'ভারতবর্ষে' আমরা 'সদাশিব' মূর্ত্তির পরিচয় দিয়াছি, এইবার আরও কয়েকটি শ্রীমূর্ত্তির পরিচয় দিতেছি। বিক্রমপুরে হিন্দু বা Brahmanic Images, বৌদ্ধমূর্ত্তি ইত্যাদি বহু সংখ্যক পাওয়া গিয়াছে। —তাহার পরিচয় আমি কিছু কিছু বিক্রমপুরের ইতিহাসে, 'বিক্রমপুর' পত্রিকায় এবং বিবিধ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। সে সমুদয়ের একটা শ্রেণীবদ্ধ ইতিহাস বা আলোচনা আমি করিতে পারি নাই। আমার কাজ ছিল সুধু মজুরের কাজ। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বন্ধুবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca museum নামক গ্রন্থে এবং তাঁহার পূর্ব্বে The Indian Buddhist Iconography নামক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিক্রমপুরের কতিপয় বৌদ্ধ পুরুষ ও নারীর মূর্ত্তির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আমি সে সব মূর্ত্তি সম্বন্ধে কোন কথা এখানে বলিব না। আমার সন্ধানে যে সমুদয়-নূতন মূর্ত্তি আসিয়াছে এবং যাহাদের চিত্র আমি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি আমি ক্রমশঃ তাহাদের বিষয়ই বলিব।

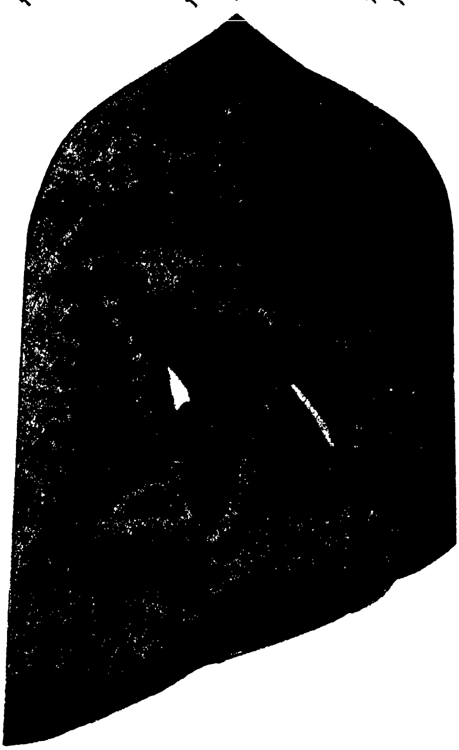
প্রায় দুই তিন বৎসর হইল আমাদের বাসগ্রাম মূলচরের নিকটবর্ত্তী দশলং অধুনা যশোলং নামে পরিচিত গ্রামে মাটি কাটিবার সময় একটি প্রজ্ঞা-পারমিতার মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটি অভগ্ন এবং কৃষ্ণবর্ণের কষ্টি প্রস্তরে নির্ম্মিত। মূর্ত্তিটি দ্বিভুজা, তথাগতমুখী, ব্যাখ্যান মুদ্রাবতী,



যশোলং গ্রামে প্রাপ্ত প্রজ্ঞাপারমিতা মূর্ত্তি

বিশ্বদলপদ্মে চন্দ্রাসনসীনা, সর্ব্বালঙ্কারবস্ত্রবতী, উৎপলহস্তা। মাথার উপরে অক্ষোভ্য বা পাঁচটি ধ্যানীবুদ্ধ। এক হিন্দুর বাড়ীতে—জানি না কোন দেবীমূর্ত্তিতে তিনি পূজিতা হইতেছেন। মূর্ত্তির চক্ষু দুইটি রৌপ্য দ্বারা নির্ম্মিত হওয়ায় মুখের সৌন্দর্য্য অনেকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মূর্ত্তির সৌম শান্ত মুখশ্রী দেখিলে প্রাণে শান্তির ভাব আসে; এই মূর্ত্তির সহিত যবদ্বীপের (Leiden) বিখ্যাত প্রজ্ঞাপারমিতামূর্ত্তির আসন ও মুদ্রার প্রভেদ থাকিলেও এই মূর্ত্তিটি যে প্রজ্ঞাপারমিতা সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। বাঙ্গালাদেশে প্রজ্ঞাপারমিতা মূর্ত্তি বড় বেশী আবিষ্কৃত হয় নাই, সে হিসাবে এই মূর্ত্তিটি বিশেষরূপে গৌরবের সামগ্রী বলিতে হইবে।

হেরুকা বৌদ্ধদের প্রিয় দেবতা। হেরুকা ও তাহার শক্তিমূর্ত্তির একসঙ্গেও পূজা হয় এবং ঐরূপ যুগ্মমূর্ত্তিও বিরল



হেরুকা মূর্ত্তি—বিক্রমপুর

নহে। দ্বিভুজ হেরুকামূর্ত্তিই সাধারণতঃ পূজিত হয়। চতুর্ভুজ হেরুকামূর্ত্তিও আছে। আমরা বিক্রমপুরে যে কয়টি হেরুকামূর্ত্তি পাইয়াছি, সে কয়টিই দ্বিভুজ। হেরুকাদেব মার-বিজয়ী ও উপাসককে বুদ্ধত্বদান করেন। আমরা এখানে যে মূর্ত্তিটির চিত্র প্রকাশ করিলাম, তাহার ধ্যান এইরূপ :—

স্বস্থ্যাম্ অর্দ্ধপর্য্যঙ্কং নরচর্ম্মসুবাসসম্।
ভস্মোদ্ধূলিত গাত্রঞ্চ স্ফুরদ্ বজ্রাঙ্ক দক্ষিণম্॥
চলৎ পতাকা খট্বাঙ্গং বামে রক্ত করোটকম্।
শতার্দ্ধমুণ্ডমালাভিঃ কৃতহারমনোরমাম্।
ঈষদ্ দ্রংষ্ট্রাকরালাস্তম্ রক্তনেত্রবিলাসিনম্।
পিঙ্গোর্দ্ধকেশম্ অক্ষভ্য মুকুটং কর্ণকুণ্ডলম্॥
অস্থ্যাভরণশোভং তু শ্রীঃ পঞ্চকপালকম্।
বুদ্ধত্বদায়িনং ধ্যায়েৎ জগন্মারনিবারণম্॥

এই ধ্যানের বর্ণনার সহিত মূর্ত্তিটির সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে। নিম্নাংশ ভগ্ন থাকায় নিম্নের বর্ণনাটুকুর সহিত পাঠক মূর্ত্তিটি মিলাইতে পারিবেন না। ঢাকা যাদুঘরেও একটি হেরুকার মূর্ত্তি আছে। ত্রিপুরা জেলা হইতে ঐ মূর্ত্তিটি সংগৃহীত হইয়াছে। এই মূর্ত্তি অত্যন্ত দুর্লভ। এমন কি নেপালের বৌদ্ধনাথের মন্দিরে একটি ও ঢাকা যাদুঘরে একটি মাত্র আছে।* কিন্তু সম্প্রতি আমরা বিক্রমপুর হইতে তিন চারিটি মূর্ত্তির সন্ধান পাইয়াছি; এই প্রবন্ধের সহিত একটি মূর্ত্তির চিত্র মুদ্রিত করিলাম, অপর মূর্ত্তি কয়টির চিত্র মৎপ্রণীত 'বিক্রমপুরের ইতিহাসে' যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইবে। বিক্রমপুর এক সময়ে বৌদ্ধ প্রভাবে যে কিরূপ প্রভাবান্বিত ছিল, এই সকল মূর্ত্তি তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ।

এইবার দুইটি বিষ্ণুমূর্ত্তি, একটি দ্বাদশাদিত্যশোভিত সূর্য্যমূর্ত্তি এবং বৃষসংযুক্ত একটি শিবলিঙ্গের বিষয় আলোচনা করিব।

বিক্রমপুরে বাস্‌রা একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই গ্রামের বাসুদেব মূর্ত্তি জাগ্রত দেবতা এবং শত শত ভক্তজনের দ্বারা নিত্য পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এই মূর্ত্তির আলোক-চিত্র গ্রহণের সময় আমাদের প্রেরিত ফোটোগ্রাফার

* His (Heruka) images are extremely rare even in Nepal. We know of only two images; one appears in the Baiddhanath Temple in Nepal and another has recently been discovered in Comilla and is deposited in the Dacca Museum, Dacca. Buddhist Iconography by B. C. Bhattacharjya M A. (1924) Page 62.

মহাশয়কে প্রতিপদে বাধাপ্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল। গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে এই মূর্ত্তির আলোক-চিত্র গ্রহণ করিলে তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য্য। মৃত্যু ভয় অগ্রাহ্য করিয়া তিনি এই ফোটোগ্রাফখানি তুলিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। বিষ্ণুমূর্ত্তির চতুর্বিংশতি প্রকারের বর্ণনা পদ্মপুরাণের ৭৮ অধ্যায়ে লিখিত আছে।



বাস্‌রা গ্রামের বাসুদেব

বাস্‌রার বিষ্ণুমূর্ত্তিটিকে পুরাণের বর্ণনানুযায়ী উপেন্দ্র বা বাসুদেব নামে অভিহিত করিতে পারি, কেননা এই মূর্ত্তির দক্ষিণাধঃে পদ্ম, দক্ষিণোর্দ্ধে গদা, বামোর্দ্ধে চক্র এবং বামাধঃ শঙ্খ রহিয়াছে। এই মূর্ত্তির ধ্যান শব্দকল্পদ্রুম কথিত কালিকাপুরাণ ৮২ অধ্যায়ের শ্লোকানুযায়ী এইরূপ :—

পূর্ণচন্দ্রোপমঃ শুক্লঃ পক্ষিরাজোপরিস্থিতঃ।
চতুর্ভুজঃ পীতবস্ত্রৈস্ত্রিভিঃ সংবীতদেহভৃৎ।
দক্ষিণোর্দ্ধে গদাং ধত্তে তদধো বিকচাম্বুজম্।
বামোর্দ্ধে চক্রমত্যুগ্রং ধত্তেঽধঃ শঙ্খমেব চ।
শ্রীবৎসবক্ষাঃ সততং কৌস্তুভং হৃদিচাদ্ভুতম্।
ধত্তে কক্ষে হ্যধো বামে তূণীরং বাণপূরিতম্।
দক্ষিণে কোষগং খড়্গং নন্দকং সশরাসনম্।
শীর্ষে কিরীটং খদ্যোতং কর্ণয়োঃ কুণ্ডলদ্বয়ম্।
আজানুলম্বিনীং চিত্রাং স্বর্ণমালাং গলস্থিতাম্।
দধানং দক্ষিণে দেবীং শ্রিয়ং পার্শ্বে তু বিভ্রতম্।
সরস্বতীং বামপার্শ্বে চিন্তয়েদ্ বরদং হরিম্।*

(শব্দকল্পদ্রুমে বাসুদেব দ্রষ্টব্য)

কলমা রামকৃষ্ণের আশ্রমস্থিত বিষ্ণুমূর্ত্তিটিও উপেন্দ্র বা বাসুদেব সংজ্ঞার অন্তর্ভূ'ত। দুইটি মূর্ত্তিই শিল্পের দিক্ দিয়া পরম সুন্দর। কলমার বিষ্ণুমূর্ত্তিটির হাত দু'খানি ভগ্ন।—বিক্রমপুরের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিতে



কলমা রামকৃষ্ণআশ্রমস্থিত বিষ্ণু মূর্ত্তি

পাওয়া যায়। তন্মধ্যে শিয়ালদির চন্দ্রমাধব, চন্দনধূলের বাসুদেব, বাসরার বাসুদেব প্রভৃতির প্রভাব বা মাহাত্ম্য খুবই বেশী।

বিক্রমপুরে সৌরপ্রভাব এক সময়ে বিশেষভাবে বিদ্যমান ছিল। অনেক গ্রামেই সূর্য্যমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুমূর্ত্তির পরেই—বিক্রমপুরে সূর্য্যমূর্ত্তির সংখ্যাধিক্য

* বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়—১২—১৩ পৃষ্ঠা—বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ।

দেখিতে পাই। পূর্ব্বে বিক্রমপুর অঞ্চলে সূর্য্যের পূজা বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। সূর্য্যের ব্রত, মাঘমণ্ডলের ব্রত ইত্যাদি এখনও বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। বিক্রমপুরের ৩।৪ ও ৫।৬ বৎসর বয়স্কা মেয়েরা যখন পুকুরের ঘাটে ফুল হাতে করিয়া সূর্য্য উঠিবার ছড়া সুমধুর সুরে আবৃত্তি করিতে থাকে, তখন শীতের কুহেলিকাচ্ছন্ন প্রভাতটি যেন সুমধুর গীতিগুঞ্জরণে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। তাহারা গাহিতে থাকে—

ওঠ ওঠ সূর্য্যদেব ঝিকিমিকি দিয়া
না উঠিতে পারি আমি ইয়লের লাগিয়া!
ইয়লের পঞ্চকোটি শিয়রে থুইয়া,
সূর্য্য উঠ্‌বেন কোন্‌খান দিয়া!

ইয়ল—কুয়াসা। থুইয়া—রাখিয়া।—সারা মাঘ মাস এই ব্রত করিতে হয় বলিয়া ইহা মাঘমণ্ডলের ব্রত নামে পরিচিত। পাঁচ বৎসর কাল এই ব্রত করিবার নিয়ম। ইহার আবার মণ্ডল অঙ্কিত করিতে হয়। সেই মণ্ডল দেখিতে অতি সুন্দর এবং তাহা নানা বর্ণে অনুরঞ্জিত করা হয়।

বিক্রমপুর হইতে আমরা যে সকল সুগঠিত সূর্য্যমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছি, তন্মধ্যে সুয়াসপুর বা সুখবাসপুরের সূর্য্য মূর্ত্তি, সোণারঙ্গের সূর্য্য মূর্ত্তি, ফিরিঙ্গিবাজারের সূর্য্য মূর্ত্তি, মূলচর গ্রামের সূর্য্য মূর্ত্তি এবং দ্বাদশাদিত্যশোভিত আরিয়ল গ্রামের এই সূর্য্য মূর্ত্তিটি উল্লেখযোগ্য। সূর্য্যদেব বিকশিত-শতদলের উপর দণ্ডায়মান। দুই হস্তে পদ্মের মৃণাল সহ দুইটি প্রস্ফুটিত শতদল ধারণ করিয়া আছেন। মস্তকে কারুকার্য্যখচিত মুকুট। অপূর্ব্ব সুন্দর কর্ণভূষা। মুখমণ্ডল হাস্যময়। মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে উজ্জ্বল জ্যোতির্মণ্ডল। কণ্ঠে ও বক্ষঃস্থলে বিবিধ অলঙ্কার। তাঁহার কটিদেশে বিবিধ কারুকার্য্যশোভিত কটিবন্ধ। বস্ত্র হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত পরিহিত। পায়ে উপানৎ।

সূর্য্যমূর্ত্তিটির সম্মুখে দুই পায়ের মধ্যভাগে একটি ক্ষুদ্র নারীমূর্ত্তি। তাহার নীচে চাবুকহস্তে অরুণ-সারথী। সর্ব্ব-নিম্নে সপ্তাশ্ব রথটিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। রথ—একচক্র। সূর্য্যদেবের দক্ষিণ দিকে একটি লম্বোদর পুরুষ মূর্ত্তি। তাহার লম্বমান দাড়ি। তাহার দক্ষিণ হস্তে লেখনী ও বাম হস্তে মস্যাধার। এই মূর্ত্তিটির সম্মুখে আবার একটি ক্ষুদ্রকায় নারীমূর্ত্তি। ইঁহার নাম মহাশ্বেতা, ইনি দুর্গা বা সরস্বতীর রূপান্তর। তাহার দক্ষিণহস্তে চামর এবং বাম-হস্তদ্বারা ধৃত পদ্ম-কোরক। সূর্য্যের বামদিকে যে পুরুষমূর্ত্তি তাহার দক্ষিণ হস্তে তরবারি। বাম হস্তেও অনুরূপ একটি অস্ত্র। পায়ে উপানৎ। মাথায় মুকুট। হাতে বালা। কিন্তু এই মূর্ত্তির মুখে দাড়ি নাই। ইহারা দণ্ডী ও পিঙ্গল নামে অভিহিত। যাঁহার হাতে লেখনী ও মস্যাধার,



দ্বাদশাদিত্যশোভিত সূর্য্য মূর্ত্তি

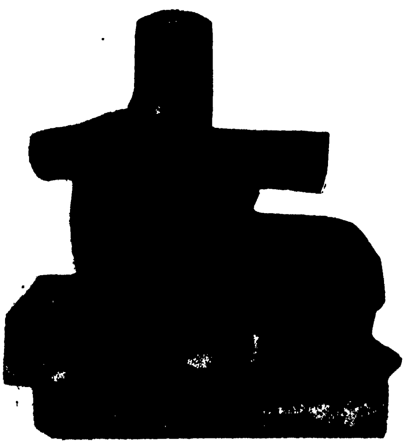
তাঁহার নাম পিঙ্গল; তাঁহার কর্ত্তব্য হইতেছে মানুষের পাপ ও পুণ্যের হিসাব লিখিয়া রাখা—আর দণ্ডী হইতেছেন স্বর্গরাজ্যের সৈন্যাধ্যক্ষ। পিঙ্গল অগ্নিদেবতার প্রতীক, আর দণ্ডী স্কন্দ বা দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের প্রতীক। মূর্ত্তির উপরিভাগে কীর্ত্তিমুখ, কীর্ত্তিমুখের দুই পাশেও দুইটি মূর্ত্তি। দক্ষিণ দিকের মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্তে তরবারি, বাম হস্তে

ধনুক। বামদিকের নারীমূর্ত্তির দক্ষিণ হস্তে চামর, বাম হস্তে কি রহিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। মূর্ত্তির দক্ষিণে ও বামে দ্বাদশাদিত্য মূর্ত্তি।

সূর্য্যদেবের পূজা সুদূর অতীতকাল হইতেই বিদ্যমান। বায়ুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, বরাহপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থে এক এক প্রকার আখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। মৎস্যপুরাণে সূর্য্যমূর্ত্তি কিরূপভাবে নির্ম্মাণ করিতে হইবে তাহার বিধান রহিয়াছে। বৃহৎসংহিতা, বিশ্বকর্ম্মশিল্প প্রভৃতি গ্রন্থেও সূর্য্যদেবের নির্ম্মাণ প্রণালী উল্লিখিত আছে।

এইবার যে মূর্ত্তিটির পরিচয় দিতেছি, এই মূর্ত্তিটি বৃষসম্বলিত শিবলিঙ্গ।

শিবের নানারূপ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়—নামও নানারূপ—যেমন মহাদেব, শম্ভু, বীরভদ্র, ভৈরব, নটরাজ, শিব, সদাশিব, অর্দ্ধনারীশ্বর, উমালিঙ্গন মূর্ত্তি, উমা-মহেশ্বর,



তেওটীয়ার বৃষ ও শিবলিঙ্গ

হরগৌরী ইত্যাদি। আমাদের দেশে সাধারণত লিঙ্গপূজা প্রচলিত। বিক্রমপুরে পঞ্চমুখ শিবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়। এই লিঙ্গমূর্ত্তি সম্মুখে বৃষ। ইহাকে বৃষবাহন লিঙ্গমূর্ত্তি বলিয়া থাকে। এই লিঙ্গমূর্ত্তিটি তেওটিয়া গ্রামের দত্ত-বংশীয়দের মুন্সীবাড়ী নামক বাড়ীর একটি মঠে আছে। বৃষের সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র পুরুষমূর্ত্তিটির দক্ষিণ হস্তে গদা এবং বাম হস্তে ত্রিশূল। সম্ভবত ইনি নন্দী। আমার মনে হয় এই শিবলিঙ্গ ও বৃষটি বেশীদিনের প্রাচীন নহে।

আমি এই প্রবন্ধে মূর্ত্তি কয়টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র প্রদান করিলাম। মূর্ত্তি কয়টির প্রাচীনত্ব, শিল্পনৈপুণ্য প্রভৃতির দিক্ দিয়া আলোচনা যথাকালে করিব।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত ও চিত্রশিল্পী শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন দাশের সৌজন্যে কলমার বিষ্ণুমূর্ত্তির ফোটোগ্রাফ-খানা পাইয়াছি। শ্রীমান্ জয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—দ্বাদশাদিত্যশোভিত সূর্য্যমূর্ত্তি ও হেরুকার আলোকচিত্রখানি পাঠাইয়াছেন; বাসরার বাসুদেব ও তেওটিয়ার বৃষবাহন শিবলিঙ্গটির ফোটোগ্রাফ সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রলাল চন্দ মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত হইয়াছি—এই সুযোগে তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রাম হইতে ঐতিহাসিক কীর্ত্তি প্রভৃতির ফোটোগ্রাফ গ্রহণ করিবার জন্য আমার প্রেরিত ফোটোগ্রাফারেরা বিশেষ ক্লেশস্বীকার করিয়া নামমাত্র পারিশ্রমিক গ্রহণে দেশের ইতিহাসটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছেন; কিন্তু একান্ত দুঃখের বিষয় যে তাঁহারা বিক্রমপুরের ভদ্রমহোদয়গণের নিকট যথোচিত সাহায্য পান না—আশা করি দেশবাসী এই গুরুতর কার্য্যে আমাকে সাহায্য করিবেন এবং আমার প্রেরিত ফোটো-গ্রাফারদিগকে ঐতিহাসিক দ্রব্যাদির চিত্রগ্রহণের সহায়তা করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। তাঁহাদের ভালবাসা ও যত্ন এবং দেশপ্রীতির উপরই আমার ইতিহাসের সাফল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।



উপন্যাসের আলো

শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত

পঞ্চাশ বছর বয়সে হারু খুড়োকে উপন্যাস পড়িয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে দেখিয়া বন্ধু রাখাল চট্টো মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কি হে ভায়া, রামায়ণ মহাভারত পড়বার বয়সে তোমার আবার উপন্যাস পড়া রোগ হল কবে থেকে ?"

বইখানি রাখিয়া বন্ধুর দিকে চাহিয়া ভগ্নস্বরে খুড়ো বলিলেন, "জীবনটা বৃথায় গেল দাদা, প্রেম করাটা আর ভাগ্যে ঘটে উঠল না। বয়সটা যদি এখন আবার পেছিয়ে নিয়ে যাওয়া যেত !"

রাখাল চট্টো আপনার পাকা লম্বা দাড়ির মধ্যে আঙুল চালাইতে চালাইতে হাসিতে লাগিলেন।

তামাকের কল্কে সাজাইতে সাজাইতে খুড়ো বলিলেন, "আচ্ছা, এই বৈজ্ঞানিক যুগে তা কি সম্ভব হয় না ; তুমিও ত সাধুদের সঙ্গে পাহাড়ে পাহাড়ে অনেক ঘুরেছ, তন্ত্র মন্ত্র অনেক জান—পার না কি পঁচিশটা বছর পেছিয়ে দিতে বা আমাকে ময়ূর ছাড়া কার্ত্তিকটির মত যুবা করতে ?"

"যা ভগবান পারেন নি দাদা—তা আর সাধু-সন্ন্যাসীরা পারবে কি করে বল ? তবে যদি বিজ্ঞান পারে ত আলাদা কথা।"

"তাতেও আশা নেই ভায়া ; সেদিন আমার বিজ্ঞান বন্ধু 'ডি, এসসি, সরকার'কে এ কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম—তিনি তখন টিন্‌চার আইডিনের সরবৎ খেয়ে আইডোফরম দিয়ে পান খাচ্ছিলেন, লক্ষ্ণৌয়ের জরদা কোথায় লাগে তার কাছে, কি ভুরভুরে গন্ধ—তা তিনি বললেন—ব্যস্ত হয়ো না হারু, আর দু'তিনশ বছর অপেক্ষা কর—বিজ্ঞান তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে বোধ হয়।"

রাখাল চট্টো হাসিয়া বলিলেন, "দাও—হুঁকাটা এদিকে দাও।"

হুঁকাটি নিজেই লইয়া খুড়ো বলিলেন, "কিসের ছাই মন্ত্র নিয়েছ, সন্ন্যাসী হয়েছ—বুজরুগী।"

"মন্ত্র নিয়েছি কি সাধে রে দাদা, আমারও যে তোমার দশা কি না ; তোমার প্রেম হল না চেহারার লালিত্যে—আর আমার বাদ সাধল এই দাড়ি। মেয়েরা সতীনকেও অত ভয় করে না যত ভয় করে তারা এই দাড়িকে—বিশেষত আমার।"

"তা বছরটি ত কম নয়, কিন্তু প্রেম হল না বলছ কেন ? দাড়ি কাটলেই ত আপদ ঘুচে যেত।"

"নাঃ—নেহাৎ শুনবে দেখছি" রাখাল চট্টো বলিলেন, "বেশ হুঁকাটা এবার দাও, আজ বাদলার দিনে একটু জমে বসা যাক ; কিন্তু ভায়া একথা যেন কাক পক্ষীতেও না শুনতে পায়।"

খুড়ো হাসিয়া হুঁকায় টান মারিয়া বলিলেন—"রামচন্দ্রঃ।"

(২)

রাখাল চট্টো বলিতে লাগিলেন—

"যখন আমার একুশ বছর বয়েস—আই, এ পরীক্ষার ফল দেখে ভাবলাম আর জীবনে কোনই দরকার নেই। বার বার তিনবার ফেল, কাজেই মনের দুঃখে সন্ন্যাসী হয়ে লছমন ঝোলায় গিয়ে বসলাম যোগ সাধনা করতে। হায়, তখন যদি জানতাম যে আমার অলক্ষ্যে সময়-চাষা আমার মুখে দাড়ির ক্ষেত বসিয়ে দিয়েছে তাহলে কি আর—

যাক, যখন জানলাম যে তিন ইঞ্চি দাড়ি ছ'মাসেই আমার মুখখানাকে সুন্দরবন করেছে তখন ভয় হল, ছ'মাসে যদি এত হয় ত সারা জীবনে কত হয় অঙ্ক কষে বলতে পার ভায়া ? মোটকথা যোগ ছাড়লাম।

আরম্ভ করলাম ভাগ—হাঁ ভাগ, ভাগ একেবারে কল্‌কাতায়। মায়া হল, দাড়ি কামালাম না ; কেটে-কুটে একটু ফ্যাশানের তুলি বুলিয়ে নিলাম। অন্ধের নড়ি, বিধবা মায়ের এক ছেলে তাই সবার আগ্রহে লেখাপড়ায় কষে দিলাম মন।

কিন্তু ঐ 'ক'য়ে একার আর 'ল'। এই জন্যই বলে—সত্য চিরকালই সত্য থাকে—সোণা সর্ব্বত্রই একরকম নয় কি ?

তবুও চারবার ফেল, আর কি বাঁচা চলে, না উচিত? গেলাম রাত এগারটার সময় হেদোর পুকুরে ডুবে মরতে। পথে ভাবলাম কোন্ পুকুরটাতে মরা ভাল, হেদোয় যাওয়া হল না—লালদিঘিতে গেলাম, জলটা একটু খারাপ মনে হল। অগত্যা ট্যাক্সি ভাড়া করে পদ্মপুকুরে হাজির হলাম কিন্তু একটাও পদ্মফুল দেখলাম না, বড় দুঃখ হল—হায়রে কর্পোরেশন। মরবার মত একটা পুকুরও কি শহরে রাখতে নেই, এত আয়োজন, এত ট্যাক্সি ভাড়া সবই বৃথায় যাবে?

কলেজ স্কোয়ারের কথা হঠাৎ মনে হল—ঠিক, ঠিক। ফেল করা ছেলে মেয়েদের চোখের জলে এটা তৈরী—কাজেই ফিরে এসে সেখানে একটা গাছের তলায় অন্ধকারে বসে রইলাম—একটা পাহারাওয়ালা আসছিল তাকে ফাঁকি দিতে হবে ত।

পাহারাওয়ালা চলে গেল, সব চুপ চাপ—এই সুযোগ। আকাশে শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ জলের উপরও ঝিক্‌মিক্ করছিল, সিঁড়ির ধারে দাঁড়িয়ে চাঁদের শোভায় বিভোর হয়ে গেলাম—

লাফিয়ে পড়বার জন্য তৈরী হয়েছি—'দিই লাফ, দিলাম লাফ' অবস্থা—হঠাৎ সেই সময় কে আমার জামায় একটু টান দিয়ে বীণার সুরে বললে "মরবেন না, মরবেন না।"

ফিরে দেখলাম, একি! স্বপ্নলোক হতে এ কোন অপ্সরী ছলনা করতে এল আমার—কি সুন্দর চোখ, কি অনুপম চেহারা—আঃ।

হঠাৎ খুড়ো গাহিলেন—"সখি হে, অপরূপ পেখলুঁ রামা।"

বড় বেরসিক, শুনে যাও—হাঁ, আমি ফিরলাম, জিজ্ঞাসা করলাম "তুমি কে, কিসে জানলে আমি মরতে যাচ্ছি?"

আমার হাত ধরে একটু টেনে নিয়ে গিয়ে সে বললে "আমি সব জানি, আপনি বোধ হয় ফেল হয়েছেন? আমিও ফেল হয়েছি—মরতে এসেছিলাম কিনা, তাই লোক চিনতে দেরী হয় নি।"

আমি অবাক। জিজ্ঞাসা করলাম "মরতে এসেছিলে কেন, কোন অভাব তোমার আছে, এই রূপ এই বয়স—এই"—আর কথাই জুটল না—

মৃদুহাস্যে অপ্সরী বলিল "চলুন গাছতলায়, বেশ অন্ধকার আছে—সব বলব।"

গাছের আলো-আঁধারের নীচে আমরা সজীব আলো আঁধারের রূপ নিয়ে বসলাম।

আলো প্রশ্ন করলে "আপনার নাম?"

আঁধার উত্তর দিলে "রাখাল চট্টোপাধ্যায়"।

"ক্যাড—আপনার মা বাপ কি ভাল নাম খুঁজে পান নি? ঐ নামের দোষেই ত বার বার ফেল করেছেন। রাখাল যে, সে শুধু গরুর পাল নিয়েই মাঠে যাবে—তার আবার লেখাপড়ার বাতিক কেন?"

সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার নামটা—"

"বিশ্রী, যাচ্ছেতাই—মা বাপের নাম রাখার দোষে আমরা আজ কতটা অন্যায় করতে যাচ্ছিলাম—নয় কি?"

"তা বটে—কিন্তু নামটা?"

"কুমারী সর্ব্বমঙ্গলা—দেখলেন ত কি নাম, একদম অচল, আন্‌বেয়ারেবল্"।

"কেন, নামটায় ত বেশ হিন্দুত্বের ছাপ রয়েছে, প্যাজের গন্ধ পাওয়া যায় না।"

"হিন্দুত্বের ছাপ আর চন্দনের গন্ধে লাভ? নামে আড়ষ্টভাব রয়েছে, রোমান্সের গলা টিপে মেরে ফেলা হয়েছে—নন্‌পোয়েটিক্, অবসোলিট। জীবনে আড়ষ্ট ভাব আমি দেখতে পারি না কখনও।"

"আমিও পারি না।"

"সত্যি।" বলে হঠাৎ সে আমার একটা হাত চেপে ধরল। চাঁদটা তখন ঘুরিয়া গিয়াছে, তরল জ্যোৎস্না-ধারা সুন্দরীর মুখে আসিয়া পড়িয়াছে—সে রূপ, সে শোভা—উচ্ছ্বসিত যৌবনের সে উন্মত্ত আবেগ দেখেছ কখন ভায়া—

খুড়ো হঠাৎ 'উপু' হইয়া বসিয়া হুঁকা রাখিয়াই বলিলেন, "বলে যাও—বলে যাও"।

হুঁকায় টান মারিয়া চাটুয্যে বলিলেন, "আর বলব কি ভায়া, তামাকের দফা যেমন রফা করেছ আমারও দশা সেই রকম হয়েছিল।"—

সেই সুন্দরী সেই জ্যোৎস্নাকুমারী হঠাৎ আমার কাঁধের উপর হাত রেখে মহা আবেগে বললে, "কেন মরব আমরা, এক পথের পথিক দু'জন একই পথে সারা জীবন কি চলা যায় না?"

'কেন যাবে না, নিশ্চয় যাবে' বলে বিস্ময়ে, আনন্দে

আমিও তার অপর হাতটি টেনে নিলাম—কি নরম, কি সে স্পর্শসুখ।

খুড়ো সুর ধরিলেন—"সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো—"

তারপর হঠাৎ কি যেন ভেবে তার মুখ মলিন হয়ে গেল—প্রাণে বড় আঘাত লাগল, বললাম 'কি ভাবছ।'

"না এমন কিছু নয়—ভাবছি দু'জনে পালিয়ে গেলে কেমন হয়, কিছু টাকাকড়ি যোগাড় করে যদি কোথাও যাই—রাজী আছ?"

"একশ' বার। কিন্তু বিয়েটা কোথায় হবে, তোমরা বন্দ্যো নাকি?"

"আমি মিস এস রায়, পছন্দ হবে ত?"

"অপছন্দের কোনটা আছে তোমার—বয়সটা বোধ হয়—?"

"চব্বিশ, পঁচিশ হবে—তোমার কত?"

"বাইশ আন্দাজ।"

"তাতে কিছু যায় আসে না, প্রেমের রাজ্যে সভ্য জগতে বয়সের কম বেশী দেখাটাই মূর্খতা—আমরা ত আর হিন্দু মতে বিয়ে করছি না।"

"সে কি! বিনা বিয়েতে তোমাকে নিয়ে—এই কি বলে গিরিডি মধুপুর—।"

হাসিয়া সে বলিল, "উপন্যাস পড়নি, রোমান্স কাকে বলে তা জান না—এ দেশেই ত কত লেখক কত লিখেছে এ রকম—বিলাতী বই না হয় নাই ধরলাম। এ সব থেকে কি শিক্ষা হয়?"

"তা'বলে—এই কি না—হ্যাঁ, মিস্ রায় তোমরা—?"

"আমরা বামুন নয়—কৈবর্ত্ত।"

"এঁ্যা—"

এতবড় মূর্খতা জীবনে আমি আর কখনও করি নি। আমার সেই পেচকনিন্দিত, উপন্যাসলাঞ্ছিত—রোমান্স-কলুষিত—'এঁ্যা' শুনিয়া নায়িকা হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল—সাপ দেখিলেও বোধ হয় অতটা চমকিত হয় না লোকে।

কর্কশ স্বরে সে বলিল "আপনার ঐ 'এঁ্যা'র মানে কি গরুর পাল বাবু? কৈবর্ত্তের মেয়ের কি প্রাণ নেই, প্রেম নেই—তারা কি ভালবাসতে জানে না, প্রেমের নায়াগ্রা, আকাঙ্ক্ষার আগ্নেয়গিরি, সুখের নন্দন-কানন তারা কি গড়তে চায় না—"

বাধা দিলাম, বলিলাম "না আমি তা বলছি না; তবে একে বয়সটা আমার দিদির মত, তারপর আবার এদিকেও বাধছে—তাই ভাবছি বিয়েটা—"

"বিবাহ বিবাহ করে চেঁচিয়ে মরেন কেন? আজ-কালকার যুগের বড় বড় লেখকেরা প্রেমের কাছে বয়স, ধর্ম্ম, জাতিকে অম্লান বদনে বলিদান দিচ্ছেন, মূর্খ আপনি—তাই এ রকম নীচ সামাজিকতায় প্রেমের অবমাননা করেন।"

"কিন্তু আপনার লেখকেরা নিজেদের জীবনে এ রকম বিবাহ করেছেন কি না—

ব্যথিতা এবার ঘুরিয়া দাঁড়াইল। ঘাসের উপরে সজোরে স্যাণ্ডেল ঠুকিয়া বলিল, "আমি যাদের আদর্শ লেখক বলে মানি, তাঁদেরই নামে এ রকম বলতে সাহস করেন আপনি? রোমান্সের কি জানবেন, এক মুখ দাড়ি নিয়ে অসভ্য জংলী জানোয়ার নারীর প্রেমের মর্য্যাদা কি বুঝবেন? মরতে এসেছিলেন মরতে যান—এখনই ডুবে মরুন, এ সব আহাম্মকের মরাই মঙ্গল।" তারপর এক পাক ঘুরিয়া নিমিষে সে অন্য দিকে চলে গেল। বিশ্বাস না হয়—ঘাসের উপর স্যাণ্ডেলের দাগ আজও দেখে আসতে পার।"

আর এক ছিলিম তামাক সাজিতে সাজিতে খুড়ো বলিলেন "মরাই তোমার উচিত ছিল সেই মুহূর্ত্তে। মরম না জানে, ধরম বাখানে, এমন আছয়ে যারা—"

"তা বলে জাত-ধর্ম্ম হারাব নাকি? প্রেম ত আমাকে নিয়ে, ধর্ম্ম ত চলবে পুরুষানুক্রমে, নিজের স্বার্থসুখের জন্য বংশের জীবনে দাগ লাগাবার লোক আমি নয় দাদা।"

"আরও কিছু আছে না-কি?"

(৩)

মা একদিন বললেন "ওরে রাখাল, আর কতদিন ভবঘুরের মত থাকবি, বে থা কর, সংসারী হ—দাড়ি টাড়ি-গুলো কামিয়ে ভদ্রলোকের মত থাক।"

বললাম, "কেন মা, ভদ্রলোকের কি দাড়ি থাকে না।"

"বুড়ো বয়সেই মানায় ভাল, যখনকার যা—বলিস ত বে'র চেষ্টা দেখি, সম্বন্ধ দু'একটা আসছে।"

"বেশ, চেষ্টা কর কিন্তু দাড়ি কামান হবে না তা বলে রাখছি।"

মা হাসিলেন মাত্র।

দু'দিন পরেই মেয়ের জোগাড় হল। ভবানীপুর থেকে আমায় দেখতে এলেন এক বুড়ো—চোখে সোণার চশমা, দাড়ি গোঁফের বালাই নেই—সিল্কের পাঞ্জাবী, কালাপেড়ে মিহি ধুতি আর পম্‌সু জুতা পায়ে—একটি লক্কা পায়রা। শুনলাম তিনি মেয়ের জ্যাঠা।

জ্যাঠা যে তা না বললেও চেহারায় বুঝতে পারা যেত।

আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "ক'বার আই, এ ফেল করেছ হা?"

বললাম, "মোটে চার বার।"

"মোটে? তাতেই দাড়ি রাখার মত বিদ্যে হয়েছে? আচ্ছা, খবর দেওয়া যাবে" বলে তিনি পালিয়ে বাঁচলেন।

আবার এক দল এলেন, তাঁরা টাকা কড়ি কিছুই দিতে পারবেন না; কাজেই আমাকে পছন্দ করলেন কিন্তু খবর এল তাঁদের মেয়েরা ফটো চেয়ে পাঠিয়েছেন। ঘটক দ্বারা মা আমার একখানি ফটো পাঠালেন—এক মাস আগের ফটো—কাজেই তৎক্ষণাৎ ফেরত এল। ঘটকের মুখে শুনলাম—মেয়েরা দয়া করে বলেছেন 'সর্ব্বনেশে দাড়ি।'

খুড়ো বলিলেন, "দাড়িতে বাধালে গোল—হরিবোল, হরিবোল।"

তামাক টানিয়া চাটুয্যে বলিলেন—'টাকা দিয়ে ত আর কেউ এগোতে চায় না।' ঘটক বললেন, "তোমার দাড়ির জন্ত বিস্তর ক্ষতি হচ্ছে।'

আমি বললাম "তা আপনি অন্ত পথ দেখুন—মেয়েদেরই বিয়ে দিন, তাদের দাড়ির বালাই নেই, পুরুষদের না হয় বিয়ে না দিলেন।"

একদিন হঠাৎ শুনলাম কোথায় কোন জলার ধারে এক যোগেন বন্দ্যোর মেয়ে শ্যাওড়া গাছ থেকে সদ্য নেমে এসেছে—তার বাপ নাকি আমার মা'র পুত্রদায় উদ্ধার করবার জন্ত বিয়ের খরচা বাবদ মাত্র আড়াইশ টাকা নিয়ে তাঁর মেয়েকে এমন অপাত্রে দিতে রাজী হয়েছেন। ঘর ভাল, বংশ ভাল—খুঁত কিছুই নেই শুধু একটুখানি কাণা, আর একটুখানি খোনা।

মা বল্লেন, "আর ত পারি না বাপু, কত মেয়ে দেখা হল কেউ ত রাজী হয় না—তোর দিদির বে দিতে ত আমায় এত বেগ পেতে হয় নি।"

"কেন, এই যোগেন বন্দ্যোর মেয়ে—?"

"কাজেই কথা দিয়েছি—একটু কালো বটে, মুখখানা পাকা পাকা তবে ঘর বংশ সব নিখুঁত। কি করি, তুইও ত জেদ ছাড়বি না—না হলে দেখতাম সুন্দরী বউ আসত কি না।"

আমি বললাম "মা, ভবিতব্য মান, যার যা বিধিলিপি তার তা হবেই—দাড়ি থাকলেও হবে না থাকলেও হবে।"

"বুঝি না বাপু তোদের আজকালকার ছেলেদের কথা—" মা গজ গজ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

বিয়ের সব ঠিক, আমিও নিশ্চিন্ত। বয়স কম, জাতে বামুনই বটে কৈবর্ত্ত নয়, আর আর সব মিলেছে—চেহারায় কি আসে যায়?

খুড়ো বলিলেন, "আহম্মক তুমি। আমি হলে দাড়ি কেন মাথার চুল পর্য্যন্ত মুড়িয়ে ফেলতাম।"

"শোন, শোন—বিয়ের ত ঠিকঠাক—হঠাৎ শুনলাম মেয়েটার নাকি খুব জ্বর হয়েছে, বসন্ত বেরিয়েছে—যদি বাঁচে ত তিন চার মাস পর বিয়ে হবে।"

"যাক্‌, ফাঁড়া কাটালে।" বলিয়া খুড়ো হুঁকায় টান দিলেন।

"একদম নয়, ও মেয়ে কি মরতে পারে রে ভাই—ওরা মা কালীর জাত। ও সব মেয়ের ফিট হয় না, মাথায় ব্যথা হয় না, বুক ধড়ফড় করে না, আছাড় মারলে পাথর ভাঙে ত ওরা ভাঙে না। মার অনুগ্রহে বরং মেয়ের রূপের বাহার আরও খুলে গেল—মুখে গর্ত্ত হয়ে গেল—চাঁদের মধ্যেও কত শত গর্ত্ত আছে, চাঁদমুখে থাকবে না।"

"তারপর?"

"আবার সময় এল, বিয়ের সব ঠিক। যে ছেলে চার বার আই এ ফেল করবার সাহস রাখে, তার যে বিয়ে পাশ করতে কত কাঠ-খড় পুড়বে তা কি আর মা জানত।"

"কেন, আবার কি হল?"

"বিয়ের দু'দিন আগে মেয়েকে সাপে কামড়াল—দু'ছুটো কেউটে সাপ!"

"সর্ব্বনাশ—তাতেই মারা গেল বুঝি?"

"হ্যাঁ, মরণ ঘনিয়ে এসেছিল তাই সাপ দু'টো তাকে

কাদাভাতে গিয়েছিল—দু'বেটা সাপই মরে গেল, আর মেয়েটা হাত পা ঝেড়ে উঠে বলল। বললে কিনা "গাঁয়ে জ'ল দিলে কেঁ? শী'ত কঁরছে।"

"মেয়েটার কিছু হল না?"

"বলেছি ত ওসব পেল্লাদ মার্কা মেয়েরা—ডেথ্ প্রুফ। ওদের 'নট্ মরণ, নট্ কিচ্ছু।"

"হুঁ" বলিয়া খুড়ো জানালাটা বন্ধ করিয়া দিলেন—বৃষ্টিটা একটু জোরে আসায় ঘরে জলের ছিটা আসছিল।

চাটুয্যে বলিলেন, "তার পর হঠাৎ কোন অজ্ঞাত কারণে শুনলাম মেয়ের বাপ বিয়ে ভেঙে দিয়েছেন। ঘটক বললেন—আমি অপয়া অলক্ষণে, কাজেই তারা অন্ত সম্বন্ধ ঠিক করেছে।"

টাকার কথাটা মা পাড়লেন—আড়াই শ' টাকা আগেই দেওয়া হয়েছিল, সে টাকা ফেরত চাওয়া হল।

টাকার কথা মেয়ের বাপ অস্বীকার করলেন—কোন লেখাপড়া ছিল না কাজেই চুপ করে যেতে হল।

পাড়ার লোকে বললেন, "অমন অলক্ষণে দাড়ি যার, তার আবার বে হয় নাকি। ঠিক হয়েছে টাকা গেছে।"

মা আর বের চেষ্টা করেন নি—আমিও বিয়ে ফেল রইলাম।

"এবার পাশ করবার চেষ্টা কর না একবার।"

"হ্যাঁ, নন-কলিজিয়েট হয়ে এই বাহান্ন বছরে একবার চেষ্টা করে দেখব ভাবছি। সধবা হ'ক, বিধবা হক—চাই কি বৈধব্য-সম্ভাবিতা হলেও মন্দ কি।

(৪)

তারপর হয়েছে কি—একদিন শীতকালে রাত দশটার সময় আমি ভবানীপুর থেকে হেঁটেই বাড়ী যাচ্ছি; একে শীত তার উপর কিছু সর্দ্দি হওয়ায় গলায় গলাবন্ধ বেঁধে আলোয়ান মুড়ি দিয়ে চলেছি—পিছনে মোটর আসছিল তা আর জানতে পারি নি।

হঠাৎ পাশে এসেই 'হর্ণ' দিয়ে মোটর থামায়; আমি ভয়ে সরতে গিয়েই হোঁচট খেয়ে রীতিমত চিৎপাত, অমনি একটি তেইশ চব্বিশ বছরের চশমা চোখে দেওয়া ফুটফুটে মেয়ে টক্ করে গাড়ী থেকে নেমে আমার হাত ধরে তুলে জিজ্ঞাসা করলে "বড্ড লেগেছে? আমার ক্ষমা করুন।"

আমি বললাম, "না এমন কিছু নয়, বাড়ী যাচ্ছিলাম তা না হয় রাস্তার একটু শুয়ে জিরিয়ে নিলাম।"

ফিক্ করে একটু হেসে সে বললে, "না না—নিশ্চয় লেগেছে আপনার, কোথায় বাড়ী? চলুন আমি পৌছে দিয়ে আসি।" আমার হাত ধরে টেনে গাড়ীতে তুলে, পাশে বসিয়ে মোটরে ষ্টার্ট দিয়ে দিল।

খুড়ো বলিলেন, "তোমার হার্টও ষ্টার্ট নিল নিশ্চয়।"

তা বটে—গাড়ীতে আমরা দু'জনে একা একা—গাড়ীও আস্তে চলতে লাগল। পরিচয়ে জানলাম—ব্রাহ্মণ কুমারী, আই এ পাশ করে বি এ পড়ছে এবার—এড্ভেঞ্চার 'বড্ডো' ভালবাসে।

আমায় জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি বদরিনাথ গেছলেন বললেন—পায়ে হেঁটে, আপনার সাহস ত খুব।"

আমি বললাম, "সাহস আর কি, জীবনের যার কোন দাম নেই, যে বার বার আই এ ফেল করে—তার আর সাহস কি, প্রাণের মূল্য কি?"

"কি বলেন আপনি, এই কেতাবী পরীক্ষাই কি আমাদের জীবনের মাপকাঠি; কলম্বাস ক'টা পাস করেছিলেন, আলেকজাণ্ডার ক'টা ডিগ্রি পেয়েছিলেন? জ্ঞান-সমুদ্রের জল কি ডিগ্রির ঘড়ায় মাপ করা যায়—জ্ঞান যেখানে অনন্ত বিরাট হয়ে পড়ে, ডিগ্রি সেখানে এগুতে পারে না। বাল্মীকি, ব্যাসদেব, বশিষ্ঠ মুনি ডিগ্রির ফাঁদে পড়লে ছোট হয়ে যেতেন।"

আমি বললাম, "তোমার কথা বড়ই সুন্দর লাগছে, আগে এটা বুঝতে পারি নি—তাই জলে ডুবে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম।"

"আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন আপনি! এ সুন্দর রূপ, এই মনোহর, পাগলকরা চেহারা, এই নবীন বয়সে আপনার তা শোভা পায় না। ভাল, আপনি বিয়ে করেন নি কেন?"

"এ হতভাগাকে কে বিয়ে করবে বল? টাকা পয়সা, ঘর বাড়ীর ত কষ্ট ছিল না।"

হঠাৎ 'ক্যাচ্ ক্যাচ্' শব্দে মোটর থামিয়া গেল, বাড়ীতে এলাম না কি? না তা ত নয়—এ যে সামনেই 'ইডেন গার্ডেন'।

কিশোরী আমার দিকে চেয়ে হঠাৎ বললে, "কেন মরতে গিয়েছিলেন, কেন নিজেকে হতভাগ্য বলছেন?

বলুন আপনার প্রাণে কি ব্যথা, বলুন, মিনতি করি বলুন" বলে সজল চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। গাড়ীর ভিতরের আলোয় তার চোখের জল মুক্তার মত জলছিল।

বড় গরম মনে হল—শিরায় শিরায় আগুনের হল্কা লাগায় শরীর ঘামতে লাগল—জীবনে আর একটা ভুল করলাম, গলাবন্ধ আলোয়ান সব খুলে ফেললাম। একটা বিপরীত রূপশ্রী প্রকাশ হল—প্রাকৃতিক ক্ষুরে কামান সুন্দরীর চক্‌চকে মুখের একহাত দূরেই আমার 'খোঁচামার্কা' ক্যাসানেবল কাঁচিকাট দাড়ি!

বিকট চিৎকারে হঠাৎ সুন্দরী সরে গেল—তার পরেই "পুলিস, পুলিস—চোর, গুণ্ডা, বদমায়েস, নেড়ে—বলে আমাকে আপ্যায়িত করতে লাগল—নেবে যা গাড়ী থেকে —ছদ্মবেশে গুণ্ডামি করতে এসেছিস শয়তান।"

বিভ্রাট করিল এই দাড়ি—আরও করিত। দূরে পুলিসকে আসিতে দেখিয়া গাড়ী হতে নেমে প্রাণপণে ছুটলাম—পুলিসও "পাকড়ো, পাকড়ো শালাকো" রবে পিছু নিল কিন্তু ধরতে পারল না—তাই রক্ষে। আলোয়ানটা সেই মেয়েটার কাছে আছে, নিয়ে আসতে পার দাদা?"

খুড়ো গাহিলেন, "আমার মনটি করিয়া চুরি, আলোয়ান-খানি কেড়ে নিলে বঁধু, আর ত দিলে না ফিরি—।"

(৫)

তারপর একদিন—

"এই সেরেছে" খুড়ো বলিলেন "নারী-নামের ঝুলি, এখন হয় নি খালি—?"

"না, আছে অনেক, তবে এইখানেই শেষ করব। বৃষ্টিটাও ধরে এল তোমার তামাকও ফুরিয়ে গেল।"

চাটুয্যে আরম্ভ করিলেন, "কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে হাজির হলাম এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে—প্রাইভেট টিউশনি খালি ছিল।"

ভদ্রলোকটি একেবারে দাড়ির সম্রাট, খুব ভরসা হল। কথাবার্ত্তায় জানলাম তাঁর মেয়েকে রোজ সন্ধ্যায় দু'ঘণ্টা পড়াতে হবে—মেয়ে এবার ম্যাট্রিক দেবে।

মাইনের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন "আপনার যা বিদ্যে বুদ্ধির নমুনা পেলাম, তাতে পাঁচ সাত টাকা দেওয়া চলে। ভাল কথা, আপনি কবি না গবি?"

কবি ত নয়ই, কিন্তু গবি অর্থ টা বুঝলাম না।

তিনি বললেন, "পদ্য লিখে কবি হয়, আর গদ্য লিখে গবি হচ্ছে আজকাল—আপনার বোধ হয় সে শক্তিও নেই?"

"আজ্ঞে না—কবিও নই গবিও নই।"

"উপন্যাস পড়েছেন ক'খানা? বিয়ে করেছেন কতবার?"

"ও দু'টোর কিছুই করি নি—ধর্ম্মশাস্ত্র কিছু পড়া আছে বটে।"

"বেশ কথা, কাল সন্ধ্যা থেকে কাজে আসবেন। রমলা আজ তার বন্ধু নরেন মিত্তিরের সঙ্গে বায়োস্কোপে যাবে কি না তাই অবসর হবে না—কালই পড়া সুরু করবেন।"

রাস্তায় এসে ভাবলাম "এসব কাণ্ড কারখানা কি রে বাবা!"

হরু খুড়ো গাহিলেন, "দুহুঁ জন নিতি নিতি নব অনুরাগে—"

যাক্, সময় মত ছাত্রীর সঙ্গে দেখা হল। পড়াবার ঘরে চুপ করে বসে ছাত্রীর রূপ চিন্তা করছিলাম হঠাৎ উনিশ বছরের এক টুকরা আগুনের ফুলকির মত রমলা আমার সামনে এসে ছোট একটি নমস্কার করে বললে, "মাষ্টার মশাই, কতক্ষণ এসেছেন—ডাকেন নি কেন?"

"বেশীক্ষণ নয়—এই ডাকব ভাবছিলাম।"

"আজ কিন্তু পড়ব না স্যার, মাথাটা একটু ধরেছে কি না।"

"বেশ, তাহলে আমি এখন যাই, কাল আসব।"

"না, না—পড়ব না বলে আপনাকে যেতে দেব ভাবছেন না কি? তা হবে না। কোন জ্ঞানের কথা আলোচনা করুন।"

"বেশ, কি কথা বল?"

খিল খিল করিয়া হাসিয়া রমলা বললে, "আমি আপনাকে বলে দেব না কি? যা ভাল লাগে তাই বলুন।"

"তবু কোন বিষয়টা তোমার পছন্দ হয় বল?

"আপনি উপন্যাস পড়েছেন ত, বলুন ত প্রেম বড় না ধর্ম্ম বড়?"

"উপন্যাস পড়ি নি বটে তবে তোমার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে হিন্দুর ধর্ম্মপুস্তকের অভাব নেই ত। আমার মতে প্রেম ও ধর্ম্ম আলাদা জিনিস নয়, ধর্ম্মের প্রাণই প্রেম—কেউ বড় নয়, ছোট নয়। যে প্রকৃত ধার্ম্মিক সে প্রেমিকও নিশ্চয়, আবার যে প্রেমিক সেও পরম ধার্ম্মিক। গৌরাঙ্গদেবই বল, রামকৃষ্ণদেবই বল—ঈষা, মুষা, জারথুস্ত্র, গৌতমবুদ্ধ সর্ব্বত্রই প্রেম ও ধর্ম্মের মিলন হয়েছে।

"ওসব পণ্ডিতি প্রেম-ধর্ম্মের কথা বলছি না স্যার। এই যে উপন্যাসে সব প্রেমের গল্প আছে—প্রেমের জন্য লোকে ধর্ম্ম, জাত, বয়স কিছু মানছে না, অল্প লেখাপড়া শিখে মেয়েরা সব বিদেশী নকল করে অবাধে পুরুষদের সঙ্গে হাসি তামাসা করছে, বায়োস্কোপ থিয়েটারে যাচ্ছে—যুবক যুবতীর এই যে অবাধ মেলামেশা—এ বিষয়ে আপনার কি মত ?"

বিস্মিত হয়ে আমি তার মুখের দিকে চাইলাম—আধুনিক শিক্ষার মধ্যেও এমন প্রশ্ন আমার জীবনে কোন স্ত্রীলোকের মুখেই শুনিনি আর। বললাম, "এ সব ঠিক প্রেম নয় রমলা, একে আকর্ষণ বা মোহ বলতে পারা যায়। এ সব আগুনে পুড়ে মরবার পথ ছাড়া আর কিছু নয়—প্রকৃত প্রেম হলে জাত ধর্ম্ম কিছুই থাকে না—কুকুরের সঙ্গে এক পাতে বসে খাওয়া চলে, যবন হরিদাসকে আজও বৈষ্ণবেরা মাথায় করে রেখেছেন। উপন্যাসের প্রেম আর এ প্রেম এক বলা যায় না।"

রমলা নীরবে কি ভাবিতে লাগিল। উপন্যাস সে অনেক পড়িয়াছে জানিলাম—কিন্তু তাহার ঐ একটা সমস্যাই সে মীমাংসা করিতে চায়। মনের বাঁধন-হীন গতিতে ছুটে যাওয়া ভাল কি মন্দ—তাহাই তাহার প্রশ্ন।

(৬)

রমলার মনোভাবের কারণ কয়েক দিনে আমি আন্দাজ করে নিয়েছিলাম—ব্রাহ্মণ কন্যা সে, নরেন মিত্তিরের সঙ্গে মেলামেশায় মনে তার বেশ দাগ লেগেছে—জাতের বাঁধন তার বুকে বড় ব্যথা দিচ্ছে।

একদিন হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করল, "জাত জাত করেই আপনি ব্যস্ত স্যার, বলতে পারেন কি—কেন বামুনের ছেলে কায়েতের মেয়েকে বিয়ে করবে না—জাতের গণ্ডি ? কে এই গণ্ডি দিয়েছে, কেন আমরা এ নিয়ম মানব ? পুরাকালে ব্রাহ্মণে কি শূদ্রাণী বিবাহ করে নি, বলুন—উত্তর দিন।"

মহা সমস্যা। কি উত্তর দেওয়া যায় ভাবছিলাম কিন্তু রমলা নিজেই আবার বলতে লাগল, "আজকালকার এই সব উপন্যাস পড়েছেন ? স্পষ্টই এ সব লেখকেরা আমার এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন—আপনি কি বলতে চান এঁরা সব মুর্খ—আর আপনি বার বার ফেল করে জ্ঞানের ভিত্তি পাকা করেছেন ? মানুষ বড়, না তার জাত বড়—প্রাণ আগে না কুসংস্কার আগে ?"

"তুমি তাহলে বলতে চাও বামুনের মেয়ের সঙ্গে কায়েতের ছেলের বিয়ে হলে দোষের হয় না—এই ধর নরেন মিত্তিরের সঙ্গে যদি তোমার বিয়ে হয় ত সেটা—"

আমায় আর কথা শেষ করতে হল না খুড়ো—বারুদে আগুন পড়ার মত রমলা হঠাৎ গর্জ্জিয়া উঠিল—পরে সে বলতে লাগল, "সাবধান মাষ্টার ম'শায়, এরকম ব্যক্তিগত কথা তুলে ছোটলোকের মত ব্যবহার করবেন না। ভেবেছিলাম জ্ঞান বুঝি কিছু আছে, কিন্তু দেখছি মগজে গোঁড়ামী ও ভণ্ডামী ছাড়া বেশী কিছুই নেই। একরাশ দাড়ি থাকলেই জ্ঞানী হয় না মানুষে।"

হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, "দাড়ি তোমার বাবারও আছে রমলা।"

"বটে, এতদূর! বাবার সঙ্গে তুলনা করবার ধৃষ্টতা রাখেন। গরীব বলে এতদিন আপনাকে অনুকম্পা দেখিয়ে এসেছি ; এখন দেখছি সেটা আমাদেরই অপরাধ—ভেবেছিলাম আপনি ভদ্রলোক—কিন্তু কোন শিক্ষিতা মহিলার কাছে একমুখ জঙ্গল নিয়ে যে কোন ভদ্রযুবক আসে না, আসতে পারে না, এটা আমাদের আগেই জানা উচিত ছিল। যাক—কাল থেকে আর কষ্ট করবেন না, বাবাকে আপনার হিসেব মিটিয়ে দিতে বলব।"

ঝড়ের মত বেগে রমলা বার হয়ে গেল—কি আর করি, দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে আমিও রাস্তায় দাঁড়ালাম। দাড়ির অমর্য্যাদায় প্রাণে বড় আঘাত লাগল—এ সংসারে দাড়ির মূল্য নারী কি বুঝিবে ?

বন্ধুর পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া খুড়ো বলিলেন—

দাড়ির লাগিয়া নারী হারাইয়া
কিনিলে আনাড়ী নাম—

রাখাল চট্টো হাসিয়া বলিলেন—"তা যা বল ভায়া। এ হচ্ছে আমার রক্ষাকবচ। নারীর ছল, চাতুরী মায়া, মোহ, নাকে কান্না, আর গয়নার বায়না থেকে বাঁচাবার এমন অস্ত্র আর নেই। দাড়ির জোরেই চিরকুমার রয়ে গেলাম—আর মা মারা যাবার পর লোটা কম্বল সম্বল করলাম।"

"হরি হে, তোমার কৃপায়—" বলিয়া খুড়ো হাই তুলিলেন।

বুদ্ধি-মাপ বিষয়ে আলোকপাত

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এম-এ, বি-টি, ডিপ্-এড্ (এডিন্ ও ডাব্)

সাধারণতঃ সহজ জ্ঞান, অর্জ্জিত জ্ঞান, যুক্তি, বিচার বা পর্য্যবেক্ষণ বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্নের সমাধান সাহায্যে শিশুর বুদ্ধি মাপা হয়। বুদ্ধি মাপিবার যত কিছু পরীক্ষা বাহির হইয়াছে প্রায় সকলগুলিতেই তাড়াতাড়ি উত্তর দেওয়া বা কাজে সাড়া দেওয়ার উপর ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং বুদ্ধি মাপিবার প্রণালীর উপর প্রণালীর কর্ত্তারাও সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। এই প্রণালীর অসুবিধা হইতেছে ইহাতে অল্প সময়ের মধ্যে কতকগুলি প্রশ্নাদেশের সাড়ার উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু আমাদের প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতির ক্ষেত্র আরও বেশী প্রশস্ত। তবে তাহাও পরীক্ষা হিসাবে অসম্পূর্ণ এবং অর্জ্জিত শিক্ষাকেই ঘেরিয়া বেশী আছে। ইহা ডাঃ জেন্‌কিন্‌স্‌ও স্বীকার করেন। সহজ বুদ্ধি ও সাধারণ জ্ঞান এ পরীক্ষাতে ধরা পড়িলেও বুদ্ধিমাপ প্রণালীতে তারা বেশী ধরা দেয়। চেহারা দেখিয়া ও কয়েক মিনিটের আলাপে মানুষের স্বরূপ-বিচার ততোধিক অসম্পূর্ণ পদ্ধতি। তাহা লণ্ডনের বার্ট সাহেব ভালভাবেই দেখাইয়াছেন। সুতরাং প্রচলিত কোন প্রণালীই বুদ্ধি মাপিবার বিষয়ে নির্ভরযোগ্য নয়। এখন বুদ্ধির মাপকাটি বা বুদ্ধিমাপের পরীক্ষাগুলির বিষয়ে একটী প্রস্তাব করিতে চাই। যখন এই মাপগুলি সম্পূর্ণ নয় এবং ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের ন্যায় চরিত্রের ভারী গুণগুলির সন্ধান যখন এগুলিতে মিলে না—তখন অন্য কোন প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়া প্রচলিত প্রণালীর সঙ্গে যোজনা করিতে হয়। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন এম্-এড্ (লিড্‌স) মহোদয় এ বিষয় ভারত-বিজ্ঞান সম্মিলনে উল্লেখ করেন।

আমার মনে হয় ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় প্রভৃতি কথঞ্চিৎ মাপিতে গেলে স্কুল প্রজেক্টের আশ্রয় লইতে হয়। প্রজেক্ট ছাপরায় রাইরী সাহেবের ট্রেণিং স্কুলে প্রচলিত আছে; কলিকাতা নর্ম্যাল স্কুলেও কতকটা ছিল। এই প্রজেক্ট প্রণালীতে ছেলে বা মেয়েদের মনোনীত পারিপার্শ্বিকের মধ্যে একটী বিশেষ উদ্দেশ্য সমবায়ে সাধন করিতে দেওয়া হয়। ইহাতে শিক্ষণীয় বিষয়ের সমন্বয় থাকে। অঙ্ক, ড্রইং, জমির মাপ, কৃষি, বিজ্ঞান, জলবায়ুর জ্ঞান সকলেরই কম বেশী সমাবেশ দেখা যায়। যেমন কোন বীজ-বিশেষ না ঘষিলে বা না ফাটাইয়া দিলে অঙ্কুর উদ্গমের পক্ষে উপযুক্ত হয় না সেইরূপ অন্তর্গত বা ব্যক্তিগত সংঘর্ষ বা সংস্পর্শ সমন্বিত শিক্ষার প্রজেক্টগুলিতে ব্যক্তি-বিশেষের বুদ্ধি ধরা দেয় বা বিকশিত হয় অর্থাৎ ছাত্র বা ছাত্রী বিশেষ এই অবস্থা সংঘাতে আত্মশক্তি ও ব্যক্তিত্ব বিষয়ে বিশ্বাস লাভ করে। যেহেতু মানুষ বেতন গণনার যন্ত্র বিশেষ, রেডি রেকনার নয়। সেজন্য তার কাছে বুদ্ধি-পরীক্ষার প্রচলিত প্রশ্ন দিয়া টকাটক উত্তর নাও মিলিতে পারে। ফলে সাড়া দেয় তখনি তখনি, কিন্তু জীব সাড়া দিতে সময়ের অপেক্ষাও করে। পাঠদানের পর আমরা যদি ছাত্রের কাছে তেমন সন্তোষজনক সাড়া না পাই তো আমরা প্রচলিত শিক্ষাবিধান অনুসারে ভাবিয়া বসি যে বুঝি পাঠদান ভাল হয় নাই; কিন্তু আমার মনে হয় তখনকার তখনি সাড়া না পেলেও হয় তো পরে একদিন ঐ পাঠদানেরই ফল দেখা যাইবে। শিক্ষা-বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এ কথাটা খেয়াল করিলে মন্দ হয় না। শুনা যায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন নূতন বিষয় বেশ তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিতেন ও সেজন্য বেশী সময় নিতেন। অন্যদিকে তিনি কোন প্রশ্নের উত্তর দিতেও সময় নিতেন। বিস্তার, গভীরতা ও সর্ব্বাঙ্গীনতাই যে ইহার মূলে, এ কথাটা বুদ্ধির মাপকাঠিনির্ম্মাতাদের মনে রাখা উচিত। এই বুদ্ধি-মাপের যুগে উদয় হইলে হয়তো বিদ্যাসাগরকে পরীক্ষায় বুদ্ধি হারাইতে হইত।

আমার দ্বিতীয় প্রস্তাবে বুদ্ধি-মাপ কার্য্যে বংশানুক্রমিক সহজাত বৃত্তির কতটা ঐ মাপকাঠিতে ধরা যায় সে সম্বন্ধে আমার মৌলিক অনুসন্ধানের কথা বলিতেছি। এডিন্‌বরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গড্‌ফ্রে টম্‌সন্ সাহেবের নির্দ্দেশমত আমি প্রায় চারিশত বালক-বালিকার বুদ্ধি মাপিয়া ছিলাম। সেজন্য ছিল কতকগুলি সরল গণিতের প্রশ্ন, কতকগুলি সাধারণ জ্ঞানের ও কতকগুলি অন্যের নিকট হইতে লব্ধ জ্ঞানের প্রশ্ন। বড়লোক, মধ্যবিত্ত লোক ও গরীব লোক এই তিন শ্রেণীর বসবাসস্থলের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী লইয়া পরীক্ষা করা হয়। তাদের বয়স ছিল ১১ ও ১৩ বৎসর। প্রত্যেক স্কুল হইতেই প্রায় তুল্যমূল্য ছাত্র-ছাত্রীদের এক দলের সঙ্গে আর এক দলের তুলনা করা হয়। তুলনাক্রমে দেখা যায় যারা উজ্জ্বল-বুদ্ধি তাদের মধ্যে বড়রাই অপরের নিকট লব্ধজ্ঞান বিষয়ে ছোটদের বেশী পরাজিত করিয়াছে। বংশজবৃত্তি বিষয়ে কিন্তু ছোটদের বেশী উজ্জ্বল বোধ হয়। উপরি উক্ত তুল্যমূল্যতা তাহাদের সাহিত্যবিষয়ক পাঠে অধিকৃত স্থানের দ্বারা নিরূপিত হইয়াছিল। যাহা হউক আমেরিকার অধ্যাপক চ্যাপম্যানের গবেষণার ফল হইতে আমার গবেষণার ফলে কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখা যায়। আমার পরীক্ষায় সাধারণ বুদ্ধিমূলক পরীক্ষাটাই বেশী সহজবুদ্ধি-জ্ঞাপক বলিয়া ধরা যায়। আমার এডিন্‌বরার অধ্যাপক এই হিসাবে আমার সিদ্ধান্তকে চ্যাপ্‌ম্যানের সিদ্ধান্তের পরিপূরক বলিয়া বিবেচনা করেন।



বাজার

শিল্পী—শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ চৌধরী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

পশ্চিমের যাত্রী

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ব্রাসেল্—আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী

ব্রাসেল্-এর আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী দেখবার লোভ ছিল, ইউরোপে পৌঁছুবার আগে থেকেই এই প্রদর্শনীর সম্বন্ধে খবরের কাগজে প'ড়ে এটা দেখে আস্‌বো স্থির ক'রেছিলুম। একটি বিকাল আর সন্ধ্যা ক'রে প্রদর্শনীতে ঘুরে বেড়ালুম। এত দেখবার আছে, যে পাঁচ দিনও যথেষ্ট নয়। আজকাল প্রদর্শনীতে দুইটী জিনিসের জয়-জয়কার; কাচের, আর বিজলীর আলোর। মাটি চুন সুরকি ইট কাঠ পলস্তারা দিয়ে প্রদর্শনীর সব বাড়ীর কাঠামো তৈরী হ'ল বটে, কিন্তু প্রচুর কাচের কাজে, রকমারি কাচের প্রয়োগে, তর-বেতর বিজলীর বাতির বাহারে এই সব বাড়ীর সৌষ্ঠব-সৌন্দর্য্য খুল্‌ল। আজকাল যে ভাবে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীগুলি হ'চ্ছে, তাতে ক'রে এইরূপ একটী প্রদর্শনী থেকেই নানা জাতির সভ্যতা শিল্প-কলার, পোষাক-পরিচ্ছদ গান-বাজনা এমন কি রান্না-বান্নারও পরিচয় পাওয়া যায়। বেলজিয়মের রাজধানী ব্রাসেল্‌তে প্রদর্শনী হ'চ্ছে; বেলজিয়ান জাতির শিক্ষা সভ্যতা ধর্ম শিল্প চিত্র-কলা ব্যবসায়-বাণিজ্য সাম্রাজ্য প্রভৃতি সব বিষয়ের উন্নতির পরিচায়ক দ্রব্য-সম্ভার পৃথক্ পৃথক্ বাড়ীতে সজ্জিত। বিজলীর কাজ দেখানোর জন্য একটী পৃথক্ বাড়ী; রোমান কাথলিক গির্জা আর তার মধ্যে রোমান কাথলিক পূজার তৈজস-পত্র—এ নিয়ে একটী চমৎকার ছোটো বাড়ী; বেলজিয়মের চিত্র-শিল্প ভাস্কর্য্য সঙ্গীত, লোহা-লক্কড়ের কাজ কাচের কাজ, অন্য নানা শিল্প—এই সব দেখাবার জন্য বহু বহু বাড়ী। তা ছাড়া বিরাট প্রদর্শনী ক্ষেত্রের এক অংশে, অষ্টাদশ শতকের ব্রাসেল আর তখনকার দিনের ব্রাসেলের জীবন-যাত্রা দেখাবার ব্যবস্থা ক'রেছে; একটা ছোট শহরকে-শহরই বানিয়ে ফেলেছে—সেকেলে সব বাড়ী, দোকান-পাট, চত্বর, ইত্যাদি নিয়ে; অষ্টাদশ শতকের পোষাক প'রে লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সব বাড়ীতে কোথাও বা অষ্টাদশ শতকের গান-বাজনা শোনানো হ'চ্ছে, কোথাও বা রেস্তোরাঁ হ'য়েছে সেখানে অষ্টাদশ শতকেরই খানা খাবার ব্যবস্থা হ'য়েছে। এই পুরাতন ব্রাসেল দেখ্‌তে গেলে, আলাদা দর্শনী দিয়ে ঢুক্‌তে হয়। আফ্রিকায় কঙ্গোতে বেলজিয়মের যে সাম্রাজ্য আছে, সেখানকার জিনিসপত্র, কাফরীদের জীবন-যাত্রা, তাদের শিল্প-কলা, ধর্ম, সব দেখাবার জন্য, আফ্রিকার ঐ অঞ্চলের সর্দারদের খ'ড়ো চালের বাড়ীর নকলে এক বিরাট্ বাড়ী ক'রেছে। এক বেলজিয়মের সংস্কৃতিগত ঐশ্বর্য্য দেখাবার জন্য কত বাড়ী।



ব্রাসেল প্রদর্শনী—অস্‌ট্রিয়া দেশের প্রাসাদ

তারপর ফ্রান্স, ইটালী, অস্‌ট্রিয়া, সুইট্‌জর্লাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ফিন্‌লাণ্ড, গ্রীস রুষ তুর্কীস্থান, ইংলাণ্ড প্রভৃতি—এদের নিজ নিজ প্রাসাদ হ'য়েছে; ইংলাণ্ডের তরফ থেকে ভারতবর্ষেরও এক প্রাসাদ তৈরী হ'য়েছে, যেমন ফ্রান্স তার সাম্রাজ্যের অধীন দেশ আল্‌জিয়ার্স্ আর ইন্দোচীন (আনাম, কোচিন-চীন, কম্বোজ) প্রভৃতির জিনিস, শিল্প, কারুকার্য্য সব দেখাবার জন্য কতকগুলি বাড়ী ক'রে

দিয়েছে। এই সব বিভিন্ন জাতির প্রাসাদে বা বাড়ীতে তাদের বিশিষ্ট জিনিস-পত্র তো আছেই, আবার বহুস্থলে তাদের বিশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য নিয়ে রেস্তোরাঁও আছে; সুতরাং, বেলজিয়মে ব'সে ব'সেই, হঙ্গেরীর রান্না মাংসের 'গ্লশাশ্' আর 'পাপ্রিকা', তুর্কীর পোলাও-কোর্মা, গ্রীসের বিশেষ মদ, নরওয়ের রকমারি মাছ—এসব খাওয়া যায়। ফ্রান্সের প্রজা আল্জিয়াসে'র আরবদের সভ্যতা দেখাবার জন্য একটী "সূক" বা বাজার বসানো হ'য়েছে; মগ্‌রী বা পশ্চিমা আরবী বাস্তরীতির বাড়ী, তাতে নানা আরব জিনিসের পসরা—গাল্‌চে, পিতলের কাজ, চামড়ার কাজ, জরীর বা সুতার কাজ; আর আছে আরবী কাফিখানা, সেখানে খরতালের সঙ্গে আরবী গান শুন্‌তে শুন্‌তে আরবী কাফি আর মিঠাই খাওয়া যায়; আরবী প্রমোদাগার আছে, সেখানে আরব নাচুনী মেয়ের নাচ, আরব সাপুড়ের সাপ-খেলা, এসব দেখা যায়। আনাম আর কম্বোজের জিনিসেরও পসরা দেওয়া হ'য়েছে। ভারতীয় রেশম আর ভারতীয় মণিহারী জিনিসের দোকান খুলেছে।

ইটালীর যে প্রাসাদটী খোলা হ'য়েছে, সেখানে খুব ঘটা ক'রে বড় বড় ছবি দিয়ে ফাশিস্ত সরকারের জয়জয়কার তার-স্বরে ঘোষণা করা হ'চ্ছে। কি কি উপায়ে ফাশিস্ত সরকার ইতালীয় প্রজার জীবনকে উন্নত ক'রে তুলে ইটালী-দেশে একটী ভূস্বর্গ গ'ড়ে তুলেছে, তা গলা-ফাটা আর কানে-তালা লাগানো চীৎকার ক'রে যেন জানানো হ'চ্ছে।


ব্রাসেল প্রদর্শনী—প্যারিস নগরীর প্রাসাদ-উদ্যান

বিরাট সব প্রাসাদে প্রাচীন আর আধুনিক বেলজিয়ান চিত্র-শিল্পের আর ভাস্কর্যের প্রদর্শনী করা হ'য়েছে। ঘুরে ঘুরে' দেখতে-দেখতে শ্রান্তি আসে—কিন্তু পান ভোজন ক'রে চাঙ্গা হবার আয়োজনও প্রচুর র'য়েছে। আবার সমস্ত প্রদর্শনী-ক্ষেত্র ঘুরে ছোট্ট একটী রেল-লাইন পাতা হ'য়েছে, নাম মাত্র মূল্যের টিকিট কিনে তাতে ক'রে চ'ড়ে, প্রদর্শনীর এক অংশ থেকে আর এক অংশে যাওয়া যায়।

প্রদর্শনীর বাড়ীগুলিতে আধুনিক ইউরোপের বাস্তরীতির উদ্দাম কল্পনা বেশ পরিস্ফুট। ইউরোপ আর সেই সাবেক গ্রীক আর রেনেসাঁস, গথিক আর বিজাতীয় পদ্ধতি আঁকড়ে নেই। এরা অদ্ভুত অদ্ভুত পরিকল্পনার বাড়ী সব বানিয়েছে—আর কাচের ছড়াছড়ি। মূর্তিরও বাহুল্য খুব। যেখানে-সেখানে পুরুষ আর নারীর আধুনিক রীতির বিবস্ত্র মূর্তি। কতকগুলির পরিকল্পনা অতি মনোহর। এই সব মূর্তি দেখে মনে হয়, ইউরোপের নবীন ভাস্কর্যে আর বাস্তবের অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা ততটা নেই, যতটা আছে মূর্তি-নিহিত ভাবের পরিস্ফুটনের। সুগঠিত তরুণ বা তরুণীর মূর্তি—কিন্তু হাত পা আঙুলগুলি অস্বাভাবিক লম্বা ক'রে দিয়েছে; এতে ক'রে, বস্তু-সাপেক্ষ বা যথাযথ বস্তুর অনুকারী না হ'লেও, মূর্তি-সৃষ্টিতে রসের অভাব হয় না। কিন্তু ঘুরে ফিরে সেই প্রাচীন গ্রীসেরই প্রভাব। এহেন অতি-আধুনিক অথবা আধুনিক-গন্ধী মূর্তি-শিল্পে নর-নারী-দেহের পরিকল্পনার মধ্যে, দেখে মনে হয় যেন প্রাচীন গ্রীসের, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ আর পঞ্চম শতকের গ্রীক black-figured vase বা কালো-রঙে আঁকা ছবিওয়ালা মাটীর ঘট আর অন্য ছবিতে নর-নারী-দেহ-চিত্রণের যে আদর্শ পাই, সে আদর্শকেই আধুনিক শিল্পীরা এখন জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে গ্রহণ ক'রেছে। গ্রীসের অনুপ্রাণনা চিরকালের মত কার্যকরী হ'য়ে র'য়েছে। ফিদিয়াসের পরের যুগের, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আরম্ভ

ক'রে (বিশেষ ক'রে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে) গ্রীস যে শিল্প সৃষ্টি করে, সেই শিল্প এই গত চার পাঁচ শ' বছর ধ'রে ইউরোপের শিল্পের মূল প্রেরণাস্থল ছিল; খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম, ষষ্ঠ আর পঞ্চম শতকের প্রথমার্ধের গ্রীক শিল্প—Archaic Greek Art—তার সরল সবল শক্তিশালী ভঙ্গীর দ্বারা ইউরোপকে এখন অভিভূত ক'রে ফেল্ছে। আধুনিক ভাস্কর্যে আংশিক ভাবে এই Archaic Greek Art, এই black-figured vase-এর চিত্র-পদ্ধতি যে বিদ্যমান, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

আধুনিক ইউরোপীয় ভাস্কর্যে কেবল-মাত্র যে সুপ্রাচীন গ্রীক শিল্পের প্রভাব বিদ্যমান, তা ব'ল্লে ঠিক হবে না। ইউরোপের পূর্বতন যুগের নানা শিল্পের ধারাও কার্য ক'রছে। আবার প্রাচ্য—ভারতীয়, যবদ্বীপীয়, কম্বোজীয়, চীনা, জাপানী—শিল্প, আর আফ্রিকার নিগ্রো শিল্প—এদের প্রভাবও ইউরোপীয় ভাস্কর্য গ্রহণ ক'রছে। মোট কথা, শিল্প-বিষয়ে ইউরোপ এখন বিশ্বগ্রাসী হ'য়ে প'ড়েছে। যেন সব কিছু নিয়ে, হজম ক'রে, ইউরোপ বিশ্বমানবের উপযোগী নোতুন একটা কিছু সৃষ্টি ক'রতে চায়। আভ্যন্তর অনুপ্রাণনা না হ'লে কিন্তু বড় শিল্প গ'ড়ে ওঠা সম্ভব হয় না—যদিও, বাইরের জগতের প্রভাবেই ভিতরে সাড়া প'ড়ে থাকে।



ব্রাসেল প্রদর্শনী—ফ্রান্সের হাওয়াই বিভাগের প্রাসাদ

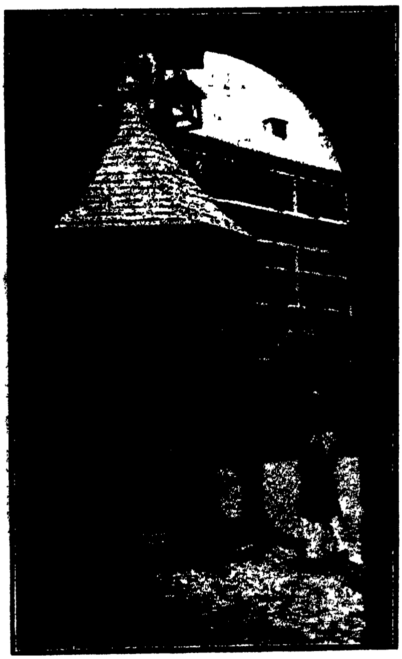
প্রদর্শনীর একটা বাড়ীতে টাটকা চকলেট-মিঠাই তৈরী ক'রে বিক্রী ক'রছে, তাই কিনে নিয়ে, দু-একটা মুখে ফেল্তে ফেল্তে, ঘুরে ফিরে চারিদিক দেখে বেড়ালুম। প্রদর্শনীর স্মারক—সচিত্র বই, পোষ্ট-কার্ড, সব কিনলুম। বিজ্ঞাপনের কাগজ আর পুস্তিকায় একটা ছোট-খাটো মোট হ'য়ে গেল।

পুরাতন ডচ্ ধরণের গোলাপ বাগান এক জায়গায় ক'রেছে; বড় বড় গাছে গোলাপ ফুটে বাগান একেবারে আলো ক'রে দিয়েছে; ব'সে ব'সে দেখবার জন্য বেঞ্চি পাতা; খানিকক্ষণ ধ'রে এই বাগানের শোভা দেখলুম। তারপরে আস্তে আস্তে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ইউরোপের উত্তরের দেশে Twilight বা আলো-আঁধারি অনেক ক্ষণ ধ'রে থাকে; গ্রীষ্মকালে সূর্য্যাস্ত হ'ল সাতটায়, নটা পর্য্যন্ত বেশ আলো আঁধারি; আমাদের দেশের মত And with one great stride came the Dark—একেবারে হঠাৎ পা ফেলে অন্ধকার এসে প'ড়ে না। বেশ অন্ধকার হ'তে, সব বিজলীর বাতীর সৌন্দর্য্য আত্মপ্রকাশ ক'রলে। কত অদ্ভুত বর্ণের সমাবেশ, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন রঙের কাচের মধ্য দিয়ে, চারিদিকে সমস্ত বাড়ী আর বাগিচাগুলিকে একটা কল্পরাজ্যে পরিণত ক'রলে। বড় বড় ফোয়ারা, নানা জটিল নক্শায় তাদের জল উচুতে উঠ্ছে, বেঁকুছে; তাদের ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত শিকরকণা এমনিই রামধনুর সৃষ্টি ক'রছে; এই সব ফোয়ারার ভিতর থেকে রঙীন বিজলীর বাতি অন্ধকারে আত্মপ্রকাশ ক'রলে—সে এক নয়নাভিরাম দৃশ্য হ'ল।

রাত্রে দোকান-পাট আর বিভিন্ন প্রদর্শনীর বাড়ীগুলি বন্ধ হ'ল, কিন্তু পানভোজনশালাগুলি আর প্রমোদাগারগুলি খোলা রইল—অনেক রাত পর্য্যন্ত সেখানে ভীড়। কোথাও বা আমেরিকান-ইণ্ডিয়ান একদল এসে, তাদের ঘোড়া-চড়ার কসরৎ দেখাচ্ছে; কোথাও বা বিখ্যাত গায়িকা গান

শোনাচ্ছে; কোথাও কন্‌সার্ট হ'চ্ছে। এইরূপে সারা বিকাল, সন্ধ্যা আর রাত্রির প্রথম অংশ ধ'রে, একটানা কয় ঘণ্টা ঘুরে, ক্লান্ত শরীর আর মন নিয়ে, লম্বা ট্রামের গাড়ী দিয়ে রাত্রি এগারোটায় হোটেলে ফিরলুম।

ব্রাসেল-এর কাছে Tervueren ট্যর্‌ভুয়েরেন্‌ ব'লে একটী গাঁয়ে একটী বিখ্যাত মিউজিয়ম আছে—আফ্রিকার নিগ্রোদের শিল্প আর সংস্কৃতির খুব বড় আর বিখ্যাত একটী সংগ্রহ এখানে আছে। বেশীর ভাগ বেলজিয়মের অধিকৃত কঙ্গোদেশের। একটী চমৎকার প্রাসাদের



ব্রাসেল প্রদর্শনী—প্রাচীন ব্রাসেল শহরের দৃশ্য

মধ্যে এই সংগ্রহশালা অবস্থিত। বেলজিয়মের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ড্‌ এই প্রাসাদটী তৈরী ক'রে, আফ্রিকার সংগ্রহ এতে রাখবার জন্য বেলজিয়ান জাতিকে দান করেন। ১৯১০ সালে এই মিউজিয়ম খোলা হয়। প্রাসাদটী এক-তালা, বেশ বড় বড় অনেকগুলি হল-ঘর আর অন্য কামরা আছে, তার প্রত্যেকটী, নিগ্রোদের হাতের কাজ, নানা দ্রব্যসম্ভারে ঠাসা সব আলমারী আর শো-কেসে ভরতী। ফ্লেমিশ আর ফরাসী ভাষায় কতকগুলি বিবরণী-পুস্তিকা আছে, ছবিওয়ালা পোষ্ট-কার্ড আছে। বাড়ীটী একটী প্রকাণ্ড আর খুব সুন্দর বাগিচার মধ্যে অবস্থিত। ব্রাসেল্‌ থেকে ট্রামে ক'রে যেতে অনেকক্ষণ লাগে। আমি বেশ আনন্দের সঙ্গে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ধ'রে সব জিনিস দেখলুম। কঙ্গোর নিগ্রোদের কাঠের মূর্তিগুলির বেশ একটু বৈশিষ্ট্য আছে। আমেরিকান শিল্পী Herbert Ward হর্বর্ট্‌ ওয়ার্ড আফ্রিকায় গিয়ে নিগ্রোদের অনেকগুলি মূর্তি গ'ড়েছিলেন, তার মধ্যে অনেকগুলি ব্রঞ্জ-ধাতু ঢালা হ'য়েছিল, এই মিউজিয়মে তার কতকগুলি আছে দেখ্‌লুম। মানুষের আকারের গ্রুপ বা মূর্তিসমূহ গ'ড়ে, আফ্রিকার নিগ্রোদের জীবন-যাত্রার পরিচয় দেবার চেষ্টা হ'য়েছে। যাঁরা মানব-সভ্যতার আলোচনায় উৎসুক, পেছিয়ে-পড়া জাতিদের সম্বন্ধে যাঁদের মনে দরদ আছে, আর যাঁরা শিল্প-রচনায় রস পান, তাঁদের পক্ষে Tervueren সংগ্রহশালা একটী দর্শনীয় স্থান।

পারিস

৯ই জুলাই ১৯৩৫—বিকালে ৫-৪০-এর গাড়ীতে ব্রাসেল থেকে রওনা হ'য়ে রাত এগারোটায় পারিসে পৌঁছুলুম। বেলজিয়ম যে কত ঘন-বসতি দেশ, তার যথেষ্ট পরিচয় রেলের থেকেই পাওয়া গেল; ক্রমাগত বাড়ী আর ক্ষেত, বাগিচা আর কারখানা; বন-জঙ্গল কোথাও নেই। পারিসে ছাত্রাবস্থায় এক বছর কাটিয়ে গিয়েছি, পারিসে কোনও ঝঞ্ঝাট হ'ল না। সরাসরি টাক্সি ক'রে Rue de Sommerard র‍্যু-দ্য-সোম্‌রার, যেখানে আগে বাস ক'রতুম, সেখানকার একটী বাসায় এসে উঠ্‌লুম। এই বাসায় কতকগুলি ভারতীয় ছাত্র ছিলেন; তাঁদের একজনকে—আমার পূর্ব-পরিচিত প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র বর্মাকে চিঠি লিখেছিলুম, তিনি তাঁরই বাসায় আমার জন্য ঘর ঠিক ক'রে রেখেছিলেন।

ইউরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্র পারিস; ইউরোপের মুকুটমণি পারিস; শিক্ষা সংস্কৃতি, নাগরিকতা, ভব্যতা এ-সবের পীঠস্থান Ville Lumiére আলোক-নগরী পারিস; ছাত্রাবস্থায় এই নগরীশ্রেষ্ঠ পারিসে বৎসরকাল বাস করবার সৌভাগ্য আমার হ'য়েছিল, মনে-প্রাণে এই শহরকে ভালবাস্‌তেও আরম্ভ ক'রেছিলুম। এই শহরের

পথ-ঘাট, বাড়ী-ঘর, লক্ষণীয় অনেক কিছু এক সময়ে কত না পরিচিত হ'য়ে উঠেছিল! সেই পারিসে আবার এলুম। মনটা আনন্দে পূর্ণ হ'ল।

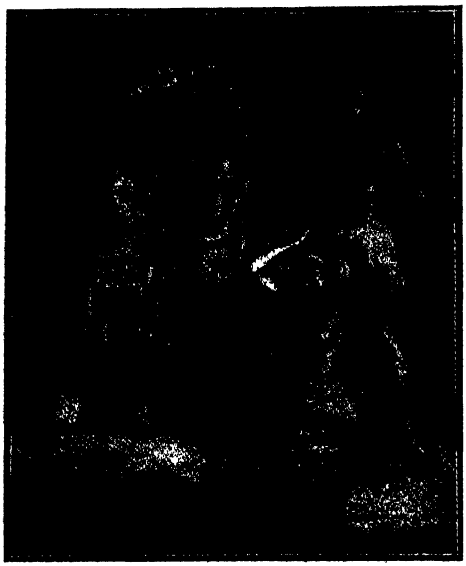
এবার পারিসে কিন্তু ছ দিন মাত্র ছিলুম। অধ্যাপক Jules Bloch ঝ্যুল্ ব্লক, যাঁর ছাত্র আমি ছিলুম, তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল, সুদীর্ঘ আলাপাদি হ'ল। অধ্যাপক Sylvain Lévi সিল্‌ভ্যাঁ লেভি, পারিসের উত্তরে Andilly আঁদিয়ি ব'লে একটী গ্রামে থাকেন, তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা ক'রে এলুম। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র বর্মা আর আমি দুজনে গিয়েছিলুম। তিনি আঁদিয়িতে তাঁর সেই বাড়ী অনেক বাড়িয়েছেন, আধুনিক বাস্তুরীতি অনুসারে বসবার ঘর, পড়ার ঘর সব ক'রেছেন, আমাদের দেখালেন সব। আচার্য লেভি আর লেভি-গৃহিণী শান্তিনিকেতনে ছিলেন, "গুরুদেব" অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ, "শাস্ত্রী মহাশয়" অর্থাৎ মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী, নন্দলালবাবু, ক্ষিতিমোহনবাবু, এঁদের সকলের কুশল জিজ্ঞাসা ক'রলেন। লেভির সঙ্গে আলাপ ক'রলুম; তখন কে জানত যে, প্রাচীন ভারত-বিদ্যার আধার, এশিয়ার সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান পণ্ডিত অধ্যাপক লেভি এত শীঘ্র দেহত্যাগ ক'রবেন! আমি ইউরোপ ত্যাগ ক'রে ফিরে আসবার মাস কতকের মধ্যেই অতি আকস্মিকভাবে আচার্য লেভির মৃত্যু হয়।



টেম্‌ফুয়েরেন্—কঙ্গো মিউজিয়মের বাটী

পারিস্ তের বছর আগে যেমনটী দেখেছিলুম, বাইরে থেকে দেখতে তেমনিই আছে—মোটামুটিভাবে কয়দিন ঘুরে ফিরে তাই মনে হ'ল। আমার একটী প্রিয় ভ্রমণের স্থান ছিল Seine সেন্ নদীর দক্ষিণ তীরে; সেখানে রাস্তায় নদীর ধারের দিক্‌টায়, ইটের বুক-সমান পাঁচীলের উপরে পুরাতন বইওয়ালারা কাঠের বাক্সে ক'রে বইয়ের, ছবির, ধাতু-নির্মিত চিত্রময় পদকের, আর নানা রকমের curio বা মণিহারী জিনিসের, অদ্ভুত আর দুষ্প্রাপ্য শিল্পদ্রব্যের পসরা দিয়ে থাকে। সেখান থেকে সেন্ নদীর উত্তরের তীরে, দ্বীপের মধ্যে নোত্র্-দাম গির্জা, আর লুভ্‌রের প্রাসাদ র'য়েছে; পাথরের দেওয়াল কয় শতাব্দী ধ'রে, বরফ, বৃষ্টি আর রোদে পাঁশুটে বা কালো হ'য়ে গিয়েছে; সেন্ নদীর অপ্রশস্ত বুকে ছোট ছোট লঞ্চ, গাধাবোট আর বাচ-খেলার নৌকো চ'লেছে; নদীর দুধারে প্লেন গাছের সারি—আগের মতনই আছে। পারিসের ছাত্র-পল্লী Quartier Latin কার্তিয়ে-লাত্যাঁ-র বড় রাস্তা দুটী—বুল্‌ভার্ স্যাঁ-মিশেল আর বুল্‌ভার্ স্যাঁ ঝের্মাঁ্যা—তেমনই আছে, সেই সব রেস্তোরাঁ, সেই সব দোকানপাট। ছাত্রদের ভীড় সেই রকমই—তবে এত নিগ্রো আর চীনে ছাত্র তো আগে আমাদের সময়ে ছিল না। বেঁটে চেহারার, চীনাদের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের মতো আনামীরা চ'লেছে—চেহারার অসৌষ্ঠব পোষাকের চটকে আর চুরুট ধরবার কায়দায় মানিয়ে দেবার চেষ্টা আছে। লম্বা, ঢাঙা চেহারার নিগ্রো—বিকট হাসির সঙ্গে ফরাসী "বান্ধবী"র হাত বগল-দাবায় ক'রে রাস্তা দিয়ে চ'লেছে, খুব লা-পরওয়া ভাব দেখিয়ে। আমাদের সময়ে, ১৪ বছর আগে, জন তিন-চার চীনা ছাত্রকে জানতুম, নিগ্রোও ছিল অতি কম, চোখেই প'ড়ত না। ফরাসীদের অধিকৃত আফ্রিকা-খণ্ডে তা হ'লে "উচ্চ শিক্ষা"র প্রচলন হ'চ্ছে। ছেলেদের হুল্লোড়ে আগে কতকগুলি রেস্তোরাঁ সারা বিকাল আর সন্ধ্যা মুখরিত থাকত,

তাদের হল্লায় রাস্তাও মাত হ'ত -এখন সে জিনিস ততটা নেই—তার কারণ, কার্তিয়ে-লাত্যাঁ বা ইউনিভার্সিটিপাড়া থেকে ছেলেদের বস-বাস দূরে সরিয়ে নেবার চেষ্টায়, সরকার থেকে পারিসের দক্ষিণে, ট্রামের পথে প্রায় মিনিট কুড়ির মত দূরে এক Cité Universitaire-সিতে য়ুনিভেয়ার্সিতেয়ার্ বা বিশ্ববিদ্যালয়-নগরী বানিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। এখানে ছাত্রদের থাকবার জন্য বড় বড় হস্টেল বা ছাত্রাবাস তৈরী হ'য়েছে; ফরাসী সরকার কতকগুলি বাড়ী ক'রে দিয়েছে, ফরাসী ছেলেদের থাকবার জন্য; আর তা ছাড়া, বিভিন্ন দেশের সরকার থেকে অথবা বিভিন্ন দেশের পয়সাওয়ালা



টেম্‌স্‌ফুয়েরেন্‌—মিউজিয়মের ভিতরে
নিগ্রো জীবনের দৃশ্য

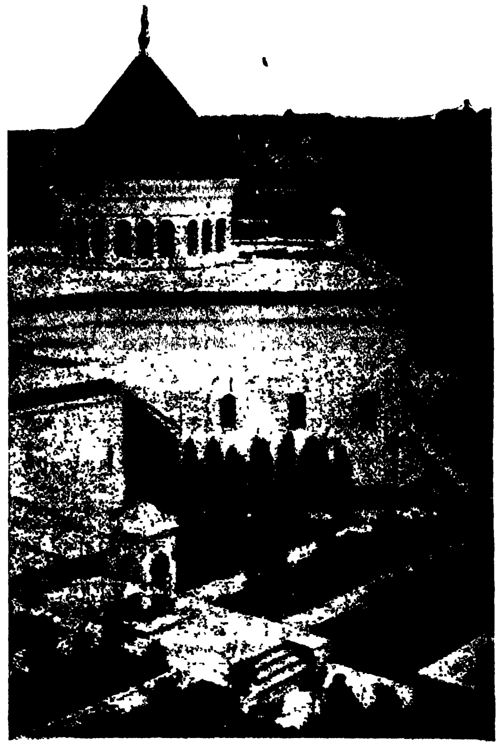
ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, নিজ-নিজ দেশের ছেলেদের থাকবার জন্য বাড়ী ক'রে দিয়েছে। এই সব বিভিন্ন জাতের এক একটী বাড়ীকে সেই জাতের Maison "মেজ্‌." বা প্রাসাদ বলা হয়; যেমন Maison Suisse, Maison Suedoise, Maison Grecque, Maison Chinoise, Maison Japonaise ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন দেশের বাস্তুরীতি অনুসারে এই সব বাড়ী তৈরী হ'য়েছে—Maison Chinoise "মেজ্‌. শিনোয়াজ্‌." বা চীনাদের বাড়ী, চীনা বাস্তুরীতি অনুসারে তৈরী হয়েছে; Maison Suisse "মেজ্‌. সুইস্‌" বা সুইট্জর্‌লাণ্ডের বাড়ী ঐ দেশের বাড়ী করার রীতি ধ'রে হ'য়েছে। ভারতবর্ষের ছাত্রদের জন্য আচার্য লেভি আর অনেকে চেষ্টিত ছিলেন, যাতে ক'রে একটী Maison Indienue "মেজ্‌. অ্যাঁদিএন্‌" গড়ে উঠে। শুনেছি, ফরাসী সরকার বিনা পয়সায় জমী দিতে রাজী আছেন—খালি বাড়ী ক'রে দেওয়া, আর তার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা হ'লেই হ'ল। ভারতবর্ষ থেকে কত রাজা-রাজড়া পারিসে যান, দু-দশ লাখ এমনি ফুর্তি ক'রে ওড়ান, লোক-দেখানো খয়রাত করবার জন্য, পারিসের গরীব লোকেদের সেবায় পাঁচ-দশ হাজার টাকা দানও করেন, কিন্তু এই আবশ্যক আর উপযোগী জিনিসটার জন্য তাঁদের কোনও গা নেই।

শ্রীযুক্ত শিবসুন্দর দেব পারিসে ভূতত্ত্ববিদ্যা অধ্যয়ন ক'রছেন; তাঁর সঙ্গে আগে আমার পরিচয় ছিল (ইনি বাঙলা দেশের প্রথম যুগের জাপান-প্রত্যাগত মৃৎশিল্পী শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দেবের ভাই), তিনি আমাকে "সিতে-য়ুনিভেয়ার্সিতেয়ার্" দেখিয়ে নিয়ে এলেন। জন পাঁচ ছয় ভারতীয় ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়-নগরীতে বাস করেন—ফরাসী সরকার সৌজন্য ক'রে, ফ্রান্সের মফঃস্বল থেকে আগত ফরাসী ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট একটী বাড়ীতে ঘর দিয়ে এঁদের থাকতে দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত শিবসুন্দর দেব ছাড়া আর যে কয়টী ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হ'ল, তাঁদের নাম হ'চ্ছে বজ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, অমিয় সরকার, কৃষ্ণমাচার্য, আর গোয়া থেকে আগত ডিসুজা। এঁরা সব বাড়ী আমায় দেখালেন; আর ছাত্র আর অধ্যাপকদের জন্য কর্তৃপক্ষ থেকে যে রেস্তোরাঁ ক'রে দেওয়া হ'য়েছে, সেখানে খেতে নিয়ে গেলেন। খুব চমৎকার ব্যবস্থা। খুব বড় এক খাবার হল। যে যে জিনিস তৈরী হ'য়েছে, সেগুলির নাম আর পাশে দাম লেখা এক নোটিস-বোর্ড থেকে ছাত্র ছাত্রীরা এসে দেখে নিলে, কি কি জিনিস নেবে; ধরুন, সুপ—তিরিশ সাঁতীম, রোষ্ট—পঞ্চাশ সাঁতীম, মিষ্টান্ন—পঁয়ত্রিশ সাঁতীম, পনীর—পঁচিশ সাঁতীম, ইত্যাদি। ছেলেরা এক একটী জিনিসের জন্য আগে থাকতেই দাম দিয়ে, পৃথক্ পৃথক্ টিকিট কিনে নিলে। তার পরে, যেখানে একটা লম্বা টেবিলের পিছনে খাদ্য-পরিবেষণকারিণীরা দাঁড়িয়ে, তার পাশে এক বাসনের গাদা থেকে ছেলেরা নিজেরাই ছোট

বড় প্লেট, গেলাস, আর ছুরি-কাঁটা আর সব জিনিস, খাবার রেকাবগুলির জন্য ট্রে, এই সব তুলে নিয়ে যায়। খাবার যারা দেয়, তাদের কাছে এসে, টিকিট দিয়ে, জিনিসের নাম ব'ললেই, সামনে রাখা প্লেটে জিনিস তারা দিলে। তার পরে সব জিনিস নিয়ে, একটা টেবিলে গিয়ে ব'সে গেলেই হ'ল। খাওয়ার জিনিসগুলি উৎকৃষ্ট, আর প্রচুর দেয়; দামের অনুপাতে, এত ভাল খাবার বাইরের কোনও রেস্তোর'ায় পাওয়া যায় না। আহারাদি সেরে, শিবসুন্দরবাবুর ঘরে ব'সে, অনেকক্ষণ বেশ গল্প-স্বল্প করা গেল।

পারিসে কার্তিয়ে-লাতাঁতেও কতকগুলি ভারতীয় ছাত্র থাকেন; তাঁদের মধ্যে এলাহাবাদ থেকে আগত ধীরেন্দ্র বর্মা, (হিন্দী), বিশ্বেশ্বর প্রসাদ (ইতিহাস), আর একটী ভদ্রলোক, এঁরা হিন্দুস্থানী, আর বিমলচন্দ্র বসু ব'লে একটী ভদ্রলোক ডাক্তারী পড়েন—এঁদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ধীরেন্দ্র বর্মার মত শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর প্রসাদের সঙ্গে আমার পূর্বে দেশেই পরিচয় ছিল।

পারিসে পৌছুই ৯ই জুলাই রাত্রে, আর ১৪ই জুলাই ছিল ফরাসী-জাতির জাতীয় উৎসব; Bastille বাস্তীয় দুর্গের পতনের তারিখ; ফরাসী বিপ্লবের সূচনাকে চিরস্মরণীয় করবার জন্য, ফরাসী জাতি এই তারিখে সভাসমিতি করে, আর সারা দিন ধ'রে নাচ-গান পান-ভোজন ক'রে ফুর্তি করে। ১৯২২ সালে পারিসে এই Quatorze Juillet ক্যাতর্জ্‌-ঝু্‌ইয়ে বা চৌদ্দই জুলাইয়ের উৎসব দেখেছিলাম; আর এইবার, ১৯৩৫ সালে দেখলুম। এই দুইবারের উৎসবের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ দেখলুম; আর এই প্রভেদ থেকে ফরাসী-জাতির তখনকার, আর উপস্থিত এখনকার রাজনৈতিক অবস্থা অনেকটা বোঝা গেল। ১৯২২ সালে উদ্দাম আনন্দের বান ছুটেছিল, চৌদ্দই জুলাইয়ের দিন। মিউনিসিপালিটী থেকে, প্রতি চৌমাথায়, বাজিয়েদের জন্য, জাতীয় পতাকা ফুলপাতা দিয়ে সাজানো মাচা বেঁধে দেওয়া হ'য়েছিল; এই সব চৌরাস্তার মাচায় বাজাবার জন্য, মিউনিসিপালিটি থেকে খরচ দিয়ে ৩।৪ জন ক'রে বাজিয়ে মোতায়েন করা হ'য়েছিল; ২।৩ খানা ক'রে বেহালা আর পিয়ানো নিয়ে, বাজিয়েরা সারা বিকাল আর সারা রাত ধ'রে বাজাচ্ছিল, আর রাস্তায় মেয়ে পুরুষেরা (কখনও কখনও দুজন ক'রে মেয়ে) জোড় বেঁধে সারা বিকাল আর রাত ধ'রে নাচ্‌ছিল। জরমানদের সঙ্গে লড়াইয়ের পরে, নোতুন বিজয়ের মাদকতা ফরাসী জা'তকে বিশেষ ভাবে উল্লসিত ক'রে তুলেছিল, সেই উল্লাস চোদ্দই জুলাইয়ের উৎসবে খুবই দেখা গিয়েছিল। এবার কিন্তু সে ঢালাও আনন্দের হাওয়া নেই। ফরাসী জাতির মধ্যে লড়াইয়ের সময়কার সে একতা নেই; মাস কতক পূর্বেই পারিসের মধ্যেই ছোটখাট আত্মবিগ্রহ ঘটে গিয়েছে। সাম্যবাদ আর সাম্রাজ্যবাদের ঝগড়া, ফরাসীদের জীবনে দেখা



প্যারিসের নবনির্ম্মিত মসজিদ

দিয়েছে। এবারও আগেকার মত নাচের আয়োজন রাস্তার মোড়ে-মোড়ে হ'য়েছে বটে, কিন্তু লোকের তেমন ফুর্তি নেই, উৎসাহ নেই; নিম্ন মধ্যবিত্ত আর গরীব লোকেরাই এই নাচে আনন্দ করে, তারা যেন একটু মন-মরা। সকলেই একটু সন্ত্রস্ত। ওদিকে, পাছে শ্রমিকরা গোলমাল লাগায়, সেই আশঙ্কায় পারিসের রাস্তায় রাস্তায় সাঁজোয়া-গাড়ী ঘুরছে, শুনলুম সৈন্যও তৈরী আছে।

ইউরোপের অনেকগুলি দেশে যেমন, ফ্রান্সেও তেমনি

আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ-বিগ্রহের হাওয়া বইছে। এবার চোদ্দই জুলাইয়ের উৎসব উপলক্ষে, সোসিয়ালিস্ট্ বা সাম্যবাদীর দল, আর ছিট্‌লারিয়ান্ বা ফরাসী জাতীয়তার আর সাম্রাজ্য-বাদের পরিপোষক দল, এদের পরস্পর-বিরোধী ইস্তাহার পারিসের বাড়ীর দেওয়ালে পাশাপাশি লট্‌কানো দেখেছি। সাম্যবাদীরা ব'ল্‌ছে—১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই জুলাই রাজ-শক্তির অত্যাচারের প্রতীক-স্বরূপ বাস্তীয়্-কারাগার ধ্বংস করা হ'য়েছিল; আর এখন ফরাসী জাতি আবার দল-বিশেষের প্রাধান্ত স্বীকার ক'রবে—জাতীয়তার নামে আবার গরীবের পক্ষে সর্বনাশকার যুদ্ধ-বিগ্রহের পথে চ'লবে? অন্য জাতের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটী ক'রবে? জাতীয়তা আর সাম্রাজ্য-বাদীরা ব'ল্‌ছে—জনকতক সাম্যবাদী আর ইহুদী এসে ফ্রান্স দেশটাকে নষ্ট ক'রলে, 'আন্তর্জাতিকতা' 'সাম্যবাদ' প্রভৃতি বড় বড় বুলি আউড়ে, এরা ফরাসী জাতির গৌরবকে ভূলুণ্ঠিত ক'রলে; ফরাসী জাতিকে সবচেয়ে বড় ক'রে তুলতে হবে; ফ্রান্সে শুদ্ধ ফরাসী মনোভাবের ফরাসীরাই রাজত্ব করুক, আন্তর্জাতিক মনোভাবের ইহুদীরা পালেস্তীনে স'রে পড়ুক।

উৎকট জাতীয়তার ভাব আজকাল ইউরোপের অনেক দেশেই এই উৎকট ইহুদী-বিদ্বেষের ভিতর দিয়ে প্রকট হ'চ্ছে। ইহুদীরা সবাইয়ের সামনে বড্ড বেশী এসে প'ড়েছে—তাদের বুদ্ধি নিয়ে, তাদের আন্তর্জাতিকতা নিয়ে, তাদের বিশিষ্ট ইহুদী মনোভাব নিয়ে। জরমানির মত অন্যত্রও তাদের দুর্গতি করবার আয়োজন চ'লছে। ফ্রান্সেও সেই মনোভাব দেখলুম। আমার অধ্যাপক ঝ্যুল্ ব্লক জাতিতে ফরাসী, ধর্মে ইহুদী। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা কইবার চেষ্টা ক'রলুম; কিন্তু ভাবে মনে হ'ল, এই বিষয়ে আলোচনা করা তাঁর পক্ষে কষ্টদায়ক। জরমানির মতন উৎকট জাতীয়তা-বাদী ফরাসীরা যে কোনও দিন ইহুদীদের উপর অত্যাচার আরম্ভ ক'রে দিতে পারে। অস্‌ট্রিয়া আর অন্যত্র ইহুদীদের উপর ভিতরে ভিতরে কি রকম অত্যাচার চ'লছে, তার কিছু খবর তাঁর কাছে শুনলুম।

অধ্যাপক ঝ্যুল ব্লকের সঙ্গে তিন দিন দেখা হ'ল। পারিসে পৌঁছুবার পরের দিনই সকালে টেলিফোনে আমার আগমনের সংবাদ তাঁকে জানালুম (তিনি পারিসের বাইরে Sevres স্যাভ্র্-পল্লীতে থাকেন)—তিনি আমার বাসায় এলেন। বহুদিন পরে আমার এই অমায়িক, হৃদয়বান্, যথার্থ পণ্ডিত গুরুকে পুনর্দর্শনের সৌভাগ্য ঘ'টল। নানা বিষয়ে আমি আমার এই অধ্যাপকের কাছে ঋণী। গবেষণার কাজে একেবারে বিষয়-নিস্পৃহ বৈজ্ঞানিক মনোভাবের আবশ্যকতা, আর এই মনোভাবে যে অপূর্ব একটা আনন্দ আছে, আমি প্রধানত ব্লকের মত গুরুর কাছেই তার আভাস পাই। অধ্যাপক আমাকে দুদিন তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়ালেন। অধ্যাপক-পত্নী আগেকারই মতন, স্নেহশীলা, অতিথি-পরায়ণা। ছাত্রাবস্থায় স্যাভ্র্-এ যখন এঁদের বাড়ী যেতুম, তখন এঁদের দুটী ছেলে আর একটী মেয়ে ছিল। বড় ছেলেটীর বয়স তখন সাত-আট বছর হবে, খুব বুদ্ধিমান্; ছোটটী তখন পাঁচ বছরের সুন্দর বালক, মেয়েটী কোলের খুকী। বড় ছেলেটীর সঙ্গে তখন খুব ভাব ক'রে নিয়েছিলুম। তার পরে, দেশে ফিরে এসে বছর কয়েক পরে, অধ্যাপক ব্লকের কাছে নিদারুণ সংবাদ পাই—এই ছেলেটী জলে ডুবে মারা গিয়েছে। অধ্যাপকের আর দুটী ছেলে মেয়েকে এবার দেখলুম—তের বছরে যতটা ডাগর হবার হ'য়েছে—বাপের মতন ছেলেটীরও ভাষা আর ভাষা-তত্ত্বের দিকে ঝোঁক হ'য়েছে। অধ্যাপকের সঙ্গে অনেক পুরাতন বিষয়ে আলাপ হ'ল, অনুশীলন হ'ল, ভবিষ্যতের কাজ সম্বন্ধেও কথা হ'ল। একখানি অপ্রকাশিত প্রাকৃত ব্যাকরণ যদি আমি সম্পাদন ক'রে প্রকাশ করি, সেইজন্য বইখানির একটী নাগরী অনুলিখন অধ্যাপক আমাকে দিলেন। অধ্যাপক ব্লকের বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছিলেন এক বিখ্যাত ফরাসী composer অর্থাৎ সঙ্গীত অথবা সঙ্গত-স্রষ্টা। তিনি অধ্যাপকের বৈঠকখানায়, যেখান থেকে তাঁর বাড়ীর বাগানের চমৎকার দৃশ্য পাওয়া যায়, সেখানে ব'সে ব'সে পিয়ানোতে বাজাবার জন্য একটী কম্‌পোজিশন বা সংবাদনা রচনা ক'রলেন, সেটী নিজে পিয়ানো বাজিয়ে আমাদের শোনালেন, আর ব্লক-দম্পতীকে ঐ দিনটীর স্মৃতি-স্বরূপ রচনাটী উপহার দিয়ে গেলেন।

অধ্যাপক ব্লকের সঙ্গে এত দিন পরে আবার দেখা হ'ল—ইউরোপে আসার একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল। এই তিন দিন অধ্যাপক ব্লকের সঙ্গে দেখা ছাড়া, প্রাণ ভ'রে পারিসে খুব ঘুরে বেড়ালুম। Louvre লুভ্র্ থেকে আরম্ভ ক'রে, Musee Guimet ম্যুজে গীমে, Musee

Cernuschi ম্যুজে. চের্নুস্কি, Musee Trocadero ম্যুজে. ত্রোকাদেরো প্রভৃতি মিউজিয়মগুলি খুব ক'রে আবার দেখে নিলুম। ম্যুজে. চের্নুস্কিতে, বিখ্যাত ফরাসী প্রাচ্য-শিল্পকলা-বিৎ আর প্রাচ্য সভ্যতার ঐতিহাসিক, চীন ও ভারতের একান্ত সুহৃৎ শ্রীযুক্ত René Grousset রেনে গ্রুসে-র সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রলুম। এঁর সঙ্গে ছাত্রাবস্থায় পরিচয় হ'য়েছিল। রেনে গ্রুসে-র ভারত, চীন প্রভৃতি দেশের শিল্প-বিষয়ক বই অপূর্ব—প্রাচ্য দেশের শিল্পের পরিচয়াত্মক তাঁর এই সুন্দর বইখানির চারিটি খণ্ড ফরাসী থেকে ইংরেজিতে হালে অনুদিত হ'য়েছে। শ্রীযুক্ত গ্রুসে মহাশয়ের কথামত ত্রোকাদেরো-মিউজিয়মের শ্রীযুক্ত Metraux মেত্রো-র সঙ্গে দেখা ক'রে আলাপ ক'রে এলুম —ইনি সম্প্রতি South Sea Island-দক্ষিণ-প্রশান্ত-মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ (পলিনেসিয়া) থেকে ফিরে এসেছেন; সেখানকার আদিম অধিবাসীদের সংস্কৃতির আলোচনা ক'রতে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে অনেক জিনিসও এনেছেন; Easter Island ঈস্টার-দ্বীপেও গিয়েছিলেন, ঈস্টার-দ্বীপের প্রাচীন সংস্কৃতি ঘটিত কতকগুলি রহস্যের উদ্ঘাটনের জন্য চেষ্টিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত মেত্রোর সঙ্গে আলাপে, ঈস্টার-দ্বীপের লিপির সঙ্গে সুপ্রাচীন ভারতবর্ষের মোহেন-জো-দড়োর লিপির যোগ কল্পনা ক'রে দুই একজন পণ্ডিত আর লেখক ইউরোপে যে একটা হৈ-চৈ আরম্ভ ক'রে দিয়েছিলেন, যার ঢেউ ভারতেও পৌচেছিল, সেই কল্পনার অসারত্ব তাঁর সঙ্গে এই সাক্ষাৎ আলোচনায় বুঝতে পারা গেল। ফিরে এসে এ সম্বন্ধে ইংরেজিতে আমি লিখেওছি। ভারতীয় চিত্রবিদ্যা আর অন্য শিল্পের একজন নামী জরমান আলোচক ডাক্তার শ্রীযুক্ত Hermann Goetz হের্মান্ গ্যোৎস্-এর সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ হ'ল। ইনি ভারতবর্ষের আধুনিক জীবনের ধারা, তার রাজনীতি অর্থনীতি সংস্কৃতি এসব সম্বন্ধে খোঁজ ক'রছেন শীঘ্রই সে বিষয়ে নিজের চোখে অবলোকন ক'রতে ভারতে আসবেন।

পারিসে আল্জিয়র্স্-এর আরব মুসলমানদের জন্য একটা মসজিদ ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। আফ্রিকা থেকে নিগ্রো ছাত্রদের সঙ্গে উত্তর আফ্রিকার অনেক মুসলমান ছাত্রও পারিসে আস্ছে,—ফরাসী রাজ্যের অন্য মুসলমান প্রজাও অনেক পারিসে আসে, থাকে। এবার পারিসের রাস্তায়, বড় বড় রেস্তোরাঁ আর কাফের ধারে, আরব ফেরিওয়ালারা উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার শিল্পদ্রব্য ফেরি ক'রে বেড়াচ্ছে দেখলুম। এদের জন্যও একটা মসজিদের মতন কেন্দ্রের দরকার ছিল। এই মস্জিদটী ভিতরে গিয়ে আমার দেখা হয় নি—সন্ধ্যের দিকে গিয়েছিলুম, তখন মসজিদে অ-মুসলমানদের 'প্রবেশ-নিষেধ', তাই অগত্যা ঘুরে ফিরে বাইরে থেকে দেখে নিলুম; মগরেবী আরব ধরণের বাড়ী, একটু বাগানও আছে। মসজিদের সংলগ্ন এক আরব রেস্তোরাঁ আছে—ভিতর থেকে আরবী গানের আর বাজনার আওয়াজ শুন্লুম, কিন্তু খাদ্য দ্রব্যের নাম দেখে—বাইরে রাস্তার ধারে নোটিস-বোর্ডে নাম আর দাম লেখা আছে—খুব লোভনীয় না লাগ্তে ভিতরে আর গেলুম না; মসজিদের ছবি সংগ্রহ ক'রে ফিরে এলুম।



বঙ্গীয় কুটীর শিল্প ও সরকারী সহযোগ

শ্রীবৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়

(প্রতিবাদ)

আজকাল বাঙ্গালাদেশে, শুধু বাঙ্গালাদেশে কেন, সারা ভারতে অন্ন-সমস্যা এত গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে যে সকলেরই দৃষ্টি সেইদিকে পড়িয়াছে। কেহ কেহ সত্য সত্যই সে সমস্যা সমাধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই দেশের হতভাগ্য যুবক-সম্প্রদায়কে Advice gratis বিতরণ করাই তাঁহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন।

আমরা যখন দেখি যে বাঙ্গালা দেশে যত বড় বড় কারবার আছে তার বেশীর ভাগের মালিক সাত সমুদ্র তের নদী পারের শ্বেতাঙ্গ-পুঙ্গবরা, যখন দেখি এক একটা বিলাতী কোম্পানী বাৎসরিক শতকরা ৪০৲ হইতে ৮০৲ টাকা পর্য্যন্ত লভ্যাংশ দিতেছে, অথচ তাহাদের কারবারে বাঙ্গালী অংশীদার থাকা ত' দূরের কথা, কেরাণীর উর্দ্ধে কোনও দায়িত্বপূর্ণ পদে বাঙ্গালীর স্থান নাই, তখন আমাদের মনে এই কথাই জাগে, যে আমাদের দেশের সমস্ত অর্থ যখন নানা দফায় সাগর পারে চালান যাইতেছে, তখন যদি দেখি সদাশয় গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর অন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য সাতকোটী দেশবাসীর মধ্যে দুই তিন শত মাত্র যুবককে ছুরি কাঁচি প্রস্তুত করিতে শিখাইয়াই তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল মনে করিতেছেন, আর তাহা দেখিয়া শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষাল প্রমুখ আমার দেশবাসিগণ কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া গাহিতেছেন, Glory, Hallelojh to the Department of Industries, তখন স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে—"তখন হাসি চেপে, নাহি ক্ষেপে থাক্‌তে পারে কোন শা—?"

দেশের অন্নসমস্যার প্রতি এই তীব্র ব্যঙ্গ—এর সঙ্গে তুলনা চলে একমাত্র আমাদের বর্ত্তমান বড়লাটের কৃষি-সমস্যা সমাধানের চেষ্টার।

যে দেশে ছত্রিশকোটী লোকের বাস, সেখানে যদি রাজপ্রতিনিধি in all seriousness সিমলার কোনও স্কুলের পঞ্চাশটী মাত্র ছাত্রকে দুগ্ধ পান করাইয়াই মনে করেন দেশে অন্নসমস্যা তথা স্বাস্থ্যসমস্যার সমাধান হইল, আর ষ্টেট্‌স্‌ম্যান প্রভৃতি পত্রে সেই সংবাদ বহু ঢক্কা নিনাদে মহাসমারোহে প্রচারিত হয়—তখন আবার দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতাটী মনে পড়ে।

ঘোষাল মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে সরকারী কর্ম্মচারিগণের সহৃদয়তার এক লম্বা ফিরিস্তি দিয়াছেন। প্রবন্ধ লিখিবার পূর্ব্বে অথবা পরে তিনি সরকারী শিল্প বিভাগের কোনও কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন কি না জানি না। তবে যদি ভবিষ্যতে তাঁহার কোনও রাজপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হয় ত' যেন তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে এই কথাটাই জানান যে শিল্পবিভাগ বর্ত্তমানে যে পথে চলিতেছে, সে পথে অনন্তকাল চলিলেও দেশের লোকের শতাংশের এক অংশের অন্নসংস্থানের উপায় তাঁহারা উদ্ভাবন করিতে পারিবেন না।

যদি কোনও রাজপুরুষ সত্যই বাঙ্গালার অন্ন-সমস্যার সমাধান করিতে চান নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতীকার করা তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হইবে।

(১) ব্যবসায় ক্ষেত্রে দেশীয় ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে বিদেশী ব্যবসায়ীদের (অনেক সময় সঙ্ঘবদ্ধ) unfair competition, যেমন কলিকাতার বাস কোম্পানীগুলির বিরুদ্ধে চলিতেছে। এমন অনেক জলপথ আছে যেখানে শ্বেতাঙ্গ ষ্টীমার কোম্পানী কোনও ষ্টীমার চালান না। কিন্তু যদি কোনও দেশীয় ভদ্রসন্তান একখানি ছোট লঞ্চ লইয়া সেখানে সার্ভিস খোলেন, অমনি ষ্টীমার কোম্পানী নামমাত্র ভাড়ায় যাত্রীবহনের জন্য দুইখানি ষ্টীমার সেখানে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু দেশীয় লঞ্চ কোম্পানীর বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা হয় ভাড়া চতুর্গুণ বৃদ্ধি করেন, নয় ত' সার্ভিস একেবারে তুলিয়া দেন।

(২) ক্লাইভ ষ্ট্রীট বিলাতি অফিসগুলিতে অনুদ্‌গত গুম্ফশ্মশ্রু শ্বেতাঙ্গ বালকগণ ৭০০৲ টাকা মাসিক বেতনে শিক্ষানবীশ নিযুক্ত হয়, অথচ যে দেশের অর্থে এই সমস্ত বেণিয়াতি দোকান চলে, সে দেশের লোকের বেলায় বরাদ্দ সেই সনাতন ৩০৲ টাকা।

(৩) আমরা জানি ভারতে এমন বিদেশী দিয়াশলাইএর কারখানা আছে, যেখানে কোনও শিক্ষিত ভারতবাসীই নিযুক্ত হন না, পাছে তাঁহারা দিয়াশলাই তৈয়ারী শিখিয়া ফেলেন। অথচ এই কোম্পানীই ভারতের বুকের উপর প্রকাণ্ড কারখানা করিয়া ভারতবর্ষে বৎসরে কোটী কোটী টাকার দিয়াশলাই বিক্রয় করে।

(৪) কলিকাতার উপকণ্ঠে, গঙ্গার উভয় তীরে যে অনুমানিক শতাধিক পাটের কল আছে, সেখানে দশজনও বাঙ্গালী ইঞ্জিনীয়ার অথবা অফিসার নাই কেন ? তার কারণ ইহা নয় যে বাঙ্গালীর ছেলেদের মধ্যে উপযুক্ত মেক্যানিকাল ইঞ্জিনীয়ার নাই ; আসল কারণ হইতেছে এই যে ঐ সমস্ত পাটকলে Scotchman ভিন্ন প্রবেশ নিষেধ। বঙ্গীয় শিল্পবিভাগ এ বিষয়ে কি করিয়াছেন জানিতে পারিলে কৃতার্থ হইব।

ইহার পর যদি কেহ দেখেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত বেকার বাঙ্গালী যুবক মাসিক ২৫৲ টাকা বেতনের চাকুরীর জন্য most respectfully I beg to offer myself তাহা হইলে আশ্চর্য্য হইবার ই-বা কি আছে, অথবা সরকারী শিল্প বিভাগের—অথবা অন্য কোনও বিভাগের প্রতি কৃতজ্ঞতায় উথলিয়া উঠিবার কি আছে তাহা আমরা জানি না। আমরা আবার বলি, সাতকোটী লোকের ভিতর দুই তিন শত জনকে ছুরি কাঁটা প্রস্তুত করিতে শিখাইয়া দেশের অন্ন-সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা—আর ঝিনুক দিয়া সমুদ্র সেচন করার চেষ্টা একই প্রকার রসের সৃষ্টি করে—যথা হাস্যরস।

প্রায়শ্চিত্ত

শ্রীবীণা গুহ বি-এ

"এ ব্যর্থ জীবনের বোঝা আর কতদিন বইতে হবে বল্‌তে পার তাপস?" প্রত্যুত্তরে তাপস ব্যথিত দৃষ্টিতে বন্ধুর পানে চাহিল। "আলোর দেশের মানুষ হোয়ে অতর্কিতে চির-আঁধারের রাজ্যে নির্ব্বাসিত হবার দুঃখ যে বড় বেশী নিদারুণ। এর চাইতে যদি জন্মান্ধ হ'তাম—সেও যে অনেক ভাল ছিল ভাই।" সান্ত্বনাভরা কণ্ঠে তাপস বলিল, "কেন তুমি এত উতলা হ'চ্ছ পল্লব? ওখানকার ডাক্তারেরাও বলেছেন যে কোন একটা 'শকে' তুমি আবার তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে পার।" নৈরাশ্যের হাসি হাসিয়া পল্লব বলিল, "সে ভরসা আমি আর করিনে ভাই। আমি ত জানি কি ঘোর পাপের ফলে আজ আমার এই দারুণ শাস্তি।" ধীরে ধীরে সে বলিতে লাগিল, "একটা হৃদয় আমি দলে, মুচড়ে, পিষে দিয়েছি। তার জীবনের হাসি আনন্দ নিঃশেষ করে নিয়েছি।" ক্ষণেক মৌন থাকিয়া আবার বলিল, "তার প্রাণ-ঢালা ভালবাসার অসীম শ্রদ্ধার উপযুক্ত প্রতিদানই আমি দিয়েছি। বল দেখি তাপস, এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি আর আছে?" ক্লেশ-কর অনুতাপরাশির মধ্যে নিমেষে পল্লব যেন মগ্ন হইয়া গেল। তার পিঠে হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে তাপস ডাকিল, "পল্লব!" চকিতকণ্ঠে পল্লব বলিতে লাগিল "খবর পেয়েছি, বাইরের কোন্ একটা স্কুলে টীচারি নিয়ে সে না কি তপস্বিনীর মত দিন কাটাচ্ছে। অকালে তার তরুণ জীবনের সব কিছু সুখসাধ এমন নির্ম্মমভাবে ঘুচিয়ে দেবার জন্য দায়ী কে?" তার অন্ধ দৃষ্টির কোণ বাহিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। বন্ধুর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া তাপস বলিল, "আচ্ছা পল্লব, তাঁকে একটা সংবাদ দিলে হয় না? আমার মনে হয় সমস্ত কথা জান্‌লে পরে তোমার অপরাধ তিনি নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন।" ধীরে ধীরে পল্লব বলিল, "তাকে অনেক ব্যথা দিয়েছি। এখন হয় ত সে শান্তিতেই আছে, আর তা ভাঙ্গতে আমি চাইনে।" সাগ্রহে তাপস বলিল, "কিন্তু এ অবস্থায় খবর না দিলে তিনি যে আরো দুঃখ পাবেন পল্লব।" ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া পল্লব বলিল, "তোমার কথাই হয় ত ঠিক্ তাপস। কিন্তু খবর দেওয়া যে আমার পক্ষে একান্তই অসাধ্য।" সবিস্ময়ে তাপস জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?" নিশ্বাস ফেলিয়া রুদ্ধকণ্ঠে পল্লব বলিল, "এ কলঙ্কিত মুখ নিয়ে তার সাম্‌নে দাঁড়াবার সাহস যে আমি হারিয়ে ফেলেছি ভাই।"

(২)

অতুল রূপ, বিপুল বিভব, নিখুঁত চরিত্র—মানুষের যা কিছু কাম্য, ভগবান্ মুক্তহস্তে পল্লবকে দান করিতে কার্পণ্য করেন নাই। জগতে তার একমাত্র অভাব ছিল আপন জনের। পৃথিবীতে তাকে আনিয়া দিয়াই মাতা বিদায় লন। পিতাও মারা যান তার ম্যাট্রিক্ দিবার আগের বৎসরে। আপন বলিতে আছেন এক বিধবা দিদি। তিনি তাঁর নিজের সংসার লইয়াই ব্যতিব্যস্ত—দুই একটা চিঠি-পত্র দ্বারা খোঁজ খবর লইয়াই তিনি ভাইয়ের প্রতি কর্ত্তব্য সমাধা করেন। দেশের বিরাট্ জমিদারী তত্ত্বাবধান করেন পিতার আমলের বিশ্বস্ত নায়েব হরিহর গাঙ্গুলী। তিনি পল্লবকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। পিতাকে হারাইয়া পঞ্চদশবর্ষীয় পল্লব যখন চারিদিক আঁধার দেখিল, তখন প্রৌঢ় নায়েব মহাশয় এই শোকার্ত্ত বালকটীর মাথায় হাত রাখিয়া সজলকণ্ঠে বলিলেন, "এত অধীর হ'য়ে পোড় না বাবা। বাবা মা ত কারুরই চিরকাল থাকে না। যতদিন না তুমি উপযুক্ত হও ততদিন তোমার পিতৃস্থানীয় হ'য়ে তোমার এবং তোমার জমিদারীর আমি তত্ত্বাবধান করব। বাবার যথেষ্ট নুন খেয়েছি, আমার দেহে প্রাণ থাক্‌তে তাঁর একমাত্র বংশধরের গায়ে আমি এতটুকু আঁচ লাগতে দেব না।" আশ্বস্ত হইয়া পল্লব পড়াশুনায় মন দিল। বিজ্ঞানের দিকে তার বরাবর ঝোঁক। বি-এস্‌সি পাশ করার পর বালিগঞ্জে পছন্দ মত একটী ছোট দোতলা বাড়ী কিনিয়া একতলায় এক ল্যাবরেটরী করিয়াছে। বাইরে তার বড়

বেশী বন্ধু-বান্ধব নাই ; কলেজ করিয়া অবসর সময়টুকু নিজের ল্যাবরেটরীতে বিজ্ঞানের আরাধনায় সে মহানন্দে কাটাইয়া দেয়।

সেদিন আহারের সময় পুরাতন ভৃত্য ভোলা সাগ্রহে সংবাদ দিল, "জান খোকাবাবু, পাশের খালি বাড়ীটাতে এ্যাদ্দিন বাদে এক ভাড়াটে এয়েছে। ওদের চাকর বল্‌ছিল বাবু নাকি কোন কলেজে মাষ্টারী করেন। আর তাঁর—।" পল্লব তখন একটা নূতন রিসার্চ্চের বিষয় ভাবিতেছিল। ভোলার কথায় তার সূত্র হারাইয়া যাওয়াতে বিরক্তির সহিত ধমক দিয়া উঠিল, "তুই চুপ্ কর্‌ত ভোলা। পাশের বাড়ীর খবরে আমাদের দরকার কি বাপু? খাবার সময় তোর যে আন্দাজ অনর্গল কথা কইবার অভ্যেস হ'য়েছে, তার চোটে আমি দেখছি একদিন বিষম খেয়ে মারা যাব।" মহা অপ্রতিভ হইয়া ভোলা থামিয়া গেল।

দিন কতক বাদে সারা দুপুর ল্যাবরেটরীতে কাজ করিয়া ক্লান্ত পল্লব দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া অলস দৃষ্টিতে পথের পানে চাহিয়াছিল। একটী তন্বী তরুণী, হাতে খানকতক বই, এই দিকেই আসিতেছিল। ভাল করিয়া মুখ না দেখিতে পাওয়া গেলেও তার স্বচ্ছন্দ গতি-ভঙ্গী পল্লবের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিল। সোৎসুকে সে তার গমন পথের পানে চাহিল। মেয়েটী আসিয়া পাশের বাড়ীতে ঢুকিল। রেশমী পর্দ্দা ঢাকা পাশের বাড়ীর জানালাগুলির পানে সাগ্রহে চাহিয়া পল্লব ঘরে ঢুকিয়া গেল। এই প্রথম তার মনে পাশের বাড়ীর বাসিন্দাদের সম্বন্ধে একটু কৌতূহল জাগিল। চায়ের টেবিলে বসিয়া ভোলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে, সেদিন পাশের বাড়ীর কথা কি জানি বল্‌ছিলি?" ধমক খাইয়া ভোলা আর ও প্রসঙ্গ কোনদিন তোলে নাই। আজ খোকাবাবুর প্রশ্নে কিছু বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিল। পল্লবও আগ্রহ করিয়া শুনিল। সন্ধ্যাবেলা ল্যাবরেটরীতে ঢুকিয়া কাজে মন দিতেই পাশের বাড়ী সংক্রান্ত সব কিছু কথা তার স্মৃতি হইতে লোপ পাইল।

ছুটীর দিন। বেলা হইয়াছে। এক প্রফেসারের নিকট হইতে পল্লব ফিরিতেছিল। বাড়ীতে ঢুকিবার মুখে দেখা হইয়া গেল এক ভদ্রলোকের সহিত। ভদ্রলোকটী প্রৌঢ়-বয়স্ক, গায়ে শাদাসিধা একটা খদ্দরের পাঞ্জাবী—মুখখানি সদানন্দ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনিই কি এ বাড়ীতে থাকেন?" "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এই যে 'ডোর-প্লেটে' নাম লেখা আছে 'পল্লব রায়', আপনিই কি তিনি?"

মাথা হেলাইয়া বিস্মিতকণ্ঠে পল্লব বলিল, "আপনাকে ত আমি চিন্‌তে পারছিনে।" প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, "না চিন্‌তে পারারই কথা মশায়। চাক্ষুষ দেখা ত এ পর্য্যন্ত আপনার সঙ্গে আমার হয় নি।" একটু থামিয়া তিনি বলিলেন, "আমার নাম শ্রীঅনাদিকুমার মিত্র। আপনার পাশের বাড়ীটা আমি মাসখানেক যাবৎ ভাড়া নিয়েছি।" স্মিতমুখে পল্লব বলিল, "ও।" সহাস্য-কণ্ঠে অনাদিবাবু বলিতে লাগিলেন, "এর মধ্যে দিন তিনেক আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসে চাকরদের কাছে শুনেছি আপনি নাকি পড়ার ঘরে আছেন, সেখানে ঢোকার হুকুম তাদের নেই। আপনি ত আচ্ছা ষ্টুডিয়াস্ লোক মশায়।" সলজ্জহাস্যে পল্লব উত্তর দিল, "ষ্টুডিয়াস্ আমি মোটেই নই। সাম্‌নের বছর আমার এম্-এস্-সি পরীক্ষা—কিন্তু কোর্স বল্‌তে গেলে এখন পর্য্যন্ত আমার ছোঁয়াই হয় নি। তবে একটু বিজ্ঞানচর্চ্চার বাতিক আছে। বাড়ীতে একটা ছোট মত ল্যাবরেটরী করেছি। অবসর সময়টা ওখানেই এটা ওটা নেড়ে-চেড়ে কাটাই।" সোৎসুকে অনাদিবাবু বলিলেন, "বাঃ! তাই নাকি! বেশ, বেশ, এরকম রিসার্চ্চিং স্পিরিটই ত চাই। শুধু কোর্স মুখস্থ করলেই কি আর যথার্থ জ্ঞান লাভ হয়? প্রফেসারি করে চুল পাকালাম, কিন্তু এ স্বভাবের ছেলে আমাদের হাতে খুব কমই এসেছে। এরকম ছেলেদের দিয়েই জগতের প্রকৃত উপকার হয়।" মৃদু হাসিয়া পল্লব বলিল, "আমি আপনার এ প্রশংসার যোগ্য পাত্র নই অনাদিবাবু। জ্ঞানস্পৃহা আমার খুব বেশী নেই। নিছক্ আনন্দ পাবার লোভেই এ কাজ আমি করি।" "ও একই কথা পল্লববাবু। অযথা নিজের গুণটুকু ঢাকবার চেষ্টা করবেন না।" পল্লব মাথা নত করিল, ক্ষণপরে মুখ তুলিয়া বলিল, "আপনি যে দু-তিন দিন আমার দেখা না পেয়ে ফিরে গেছেন—এতে সত্যিই আমি বড় লজ্জা পাচ্ছি। চাকরেরাও ত আমাকে কিছু বলে নি—যত সব ইডিয়টের দল।" "আরে রাম, রাম—এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই।

আর সত্যি যদি আপনি লজ্জা পেয়েই থাকেন তা হ'লে না হয় আমার তিনবার আসার জায়গায় আমার ওখানে ছয়বার যেয়ে সুদ সুদ্ধ শোধ দিয়ে আসবেন। কি বলেন ?" অনাদিবাবু হাসিতে লাগিলেন। পল্লবের মনের যা কিছু সঙ্কোচ ভাসিয়া গেল, তাঁর এই সরল হাসিতে সে যোগ না দিয়া থাকিতে পারিল না। খানিক বাদে অনাদিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কি আপনি একাই থাকেন ?"

"হ্যাঁ।"

"বাবা মা বুঝি সব দেশের বাড়ীতে—"

বাধা দিয়া পল্লব বলিল, "আমার বাবা মা নেই। বল্‌তে গেলে সংসারে আমি একা।" অনাদিবাবুর সদা-প্রফুল্ল মুখের উপর সমবেদনার গাঢ় ছায়া ভাসিয়া উঠিল। ক্ষণপরে পল্লব বলিল, "আপনার সঙ্গে আলাপ হ'ল—আমার মহা সৌভাগ্য। আবার আপনার সঙ্গে আমি দেখা করব। আজ বেলা হ'ল, তাহ'লে আসি।" ব্যগ্র হইয়া অনাদিবাবু পল্লবের একটা হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "না পল্লববাবু, ছুটীর দিন এটুকু বেলা বেলাই নয়। আমার বাড়ীতে একবার চলুন্।" স্মিতমুখে পল্লব বলিল, "নিশ্চয়ই আমি আপনার ওখানে যাব। আপনার সঙ্গে কথা কইবার আনন্দের লোভ আমি কিছুতেই সম্বরণ করতে পারব না। পারিত আজ বিকালেই যাব। কিন্তু এখন আর না।" মাথা নাড়িয়া অনাদিবাবু বলিলেন, "আপনার স্বভাব আমি চিনেছি পল্লববাবু; মুখে আপনি যতই বলুন্, দুপুরের খাওয়া সেরে একবার ল্যাবরেটরীতে ঢুকলে বিশ্বসংসার আপনার মন থেকে মুছে যাবে।" একটু থামিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "বাড়ীতে আমার বেশী লোক নেই, শুধু আমার স্ত্রী ও একটীমাত্র মেয়ে। তাদের সঙ্গে আমি আপনার আলাপ করিয়ে দিতে চাই।" পল্লবের দ্বিধাগ্রস্ত মুখের পানে ক্ষণেক চাহিয়া তিনি আবার বলিলেন, "আপনার বাড়ী থেকে আমার বাড়ী কিছু মাইল খানেক দূর নয়, অতএব আপনার কোন আপত্তিই আমি শুনব না।" প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই তিনি পল্লবকে টানিয়া লইয়া চলিলেন।

সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া অনাদিবাবু ডাকিলেন, "দীপা।" "যাই বাবা।" বলিতে বলিতে চঞ্চল চরণে এক তরুণী আসিয়া দাঁড়াইল। সবেমাত্র সে স্নান করিয়াছে। একরাশ ঘন কালো চুল স্তবকে স্তবকে তার পিঠটী ছাইয়া আছে। এই মেয়েটীর গতি-ভঙ্গীই একদিন পল্লবকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। সাগ্রহে পল্লব তার পানে চাহিল—মেয়েটীর গায়ের রং উজ্জ্বল গৌর না হইলেও বেশ স্নিগ্ধ আর চোখ দুটী অপরূপ। অনাদিবাবু বলিলেন, "এই যে মা দীপা, ইনিই আমাদের পাশের বাড়ীর প্রতিবেশী পল্লব রায়, সামনের বছর এম্, এস্, সি দেবেন। আর পল্লববাবু, এটী আমার মেয়ে দীপা—এবারে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেছে।" পল্লব নমস্কার করিল। প্রতি নমস্কার করিয়া দীপা স্মিতকণ্ঠে বলিল, "আসুন।" দীপার পিছনে পল্লব ও অনাদিবাবু বসিবার ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। এইভাবে প্রথম পরিচয়ের পালা কাটিল।

(৩)

বছর খানেক কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে মিত্র পরিবারের সহিত পল্লবের আলাপ বেশ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। মিত্র-জায়া এই প্রিয়ভাষী সুদর্শন ছেলেটীকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন। তাঁর অনুরোধে পল্লব দীপাকে 'তুমি' বলিয়া ডাকিত। পল্লব আজকাল আর রাত্রিদিন ল্যাবরেটরীতে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে আনন্দ পায় না। পড়াশুনার এবং ল্যাবরেটরীর কাজের ফাঁকে অবসরটুকু কাটাইতে যখন তখন মিত্রগৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়। তার বিকালবেলার চায়ের বন্দোবস্ত এইখানেই হইয়া গিয়াছে। সেদিন বিকালে চায়ের পাট শেষ হইবার পর প্রবীণ অধ্যাপক এবং নবীন বৈজ্ঞানিকের ভিতর তুমুল তর্ক উঠিয়াছিল। অনাদিবাবু সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষ লইয়া এরূপ তর্ক প্রায়ই হইত—আজও হইতেছিল। দীপা এই সব তর্কে কথনো যোগ দিত না। দূরে বসিয়া সে মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল। তার পানে চোখ পড়িতেই উত্তেজিতকণ্ঠে পল্লব বলিয়া উঠিল, "তুমি হাসছ দীপা, কিন্তু এ নিয়ে চর্চ্চা করলে বুঝতে পারতে। আপনাদের সঙ্গে যদি আর কিছুদিন আগে আলাপ হত কাকাবাবু, তাহ'লে দীপাকে আমি সায়েন্স্ নেওয়াতাম, নিজে পড়াতাম। তখন দীপাই আপনাকে বুঝিয়ে দিত কি অফুরন্ত রসের ভাণ্ডার আমাদের এই বিজ্ঞান।" এই বাদ-বিসম্বাদের মাঝে আসিয়া

উপস্থিত হইলেন মিত্র-জায়া। তিনি সহাস্য কণ্ঠে বলিলেন, "আচ্ছা লোক যা হোক্ তোমরা—এই চমৎকার সন্ধ্যাটা বাজে তর্ক করে কাটাচ্ছ! সাহিত্য বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা নিয়ে আমাদের ঝগড়া করে মরবার দরকার কি বাপু?" গল্পের স্রোত তখন অন্যদিকে গেল।

পল্লবের এম্ এস্ সি পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে বছর দুয়েকের জন্য সে বিলাত যাইবে। যাত্রার দিনও স্থির হইয়া গিয়াছে, আর দিন সাত আট বাকী। আবশ্যকীয় জিনিসপত্র কিনিতে, এর ওর সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে পল্লব আজকাল ভারী ব্যস্ত; যখন তখন আর মিত্রগৃহে আসিতে পারে না। সন্ধ্যাবেলা আধ ঘণ্টার জন্য আসিয়া হয় ত চা খাইয়া যায়। সেদিন বিকালে দীপা বসিবার ঘরে অর্গ্যান্ বাজাইতেছিল, পল্লব আসিয়া ঢুকিল। পায়ের সাড়া পাইয়া দীপা উঠিয়া দাঁড়াইল। পল্লবকে দেখিয়া একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি? এত সকাল সকাল যে?" স্মিতমুখে পল্লব বলিল, "আজ আর বিশেষ কোন কাজ নেই, তাই চলে এলাম।" "তাও ভাল। বিলাত যাবার আগেই আপনার যে ভাবগতিক হোয়ে দাঁড়িয়েছে। বাপ্ রে, দেখেশুনে মনে হয় ফিরে এসে আমাদের হয় ত আর চিন্‌তেই পারবেন না।"

"তার মানে?"

দীপা বলিল, "সন্ধ্যাবেলা মিনিট কতকের জন্য তাড়াতাড়ি এসে চা খেয়েই চলে যান্। আর কয়টা দিনই বা দেশে আছেন; এ কয়টা দিনও কি অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্য আমাদের এখানে আসতে আপনার ইচ্ছা করে না?" দীপার অভিমান-ভরা মুখের পানে চাহিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে পল্লব বলিল, "এ তোমার আমাকে অযথা দোষ দেওয়া হ'চ্ছে দীপা। কতদিনের জন্য চলে যাব, আবার কতদিন বাদে তোমাকে দেখব—তুমি কি বুঝতে পার না, এখানে আসার জন্য মন আমার কি রকম আকুল হ'য়ে ওঠে। কিন্তু কি করব? কাজ ত কম না, সবই যে সেরে নিতে হবে।" ক্ষণেক মৌন থাকিয়া আবার বলিল, "তবে কাজকর্ম্ম সবই প্রায় গুছিয়ে এনেছি। বাকী কয়টা দিন আমার হাতে আর বিশেষ কোন কাজ নেই।" দীপার মুখ রাঙিয়া উঠিল, মাথা নত করিয়া বলিল, "যান্, কথা কইতেই খুব শিখেছেন।" ক্ষণপরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আচ্ছা, আপনি একটু বসুন। আপনার চা নিয়ে আসি।"

"আমি একা চা খাব কেন, কাকাবাবু কাকীমা কোথায়?"

"আমার এক মামার খুব অসুখ, তাই বাবা মা দেখতে গেছেন, ফিরতে সন্ধ্যা হবে।"

"তা হোক্, তাঁরা এলে একসঙ্গেই চা খাওয়া যাবে। তুমি বোস।" নিজের চেয়ারটা দীপার নিকটে একটু সরাইয়া লইয়া পল্লব বলিল, "তোমাকে একটা কথা আমার জিজ্ঞাসা করার আছে দীপা। আজকের মত সুযোগ হয় ত আর পাব না।" দীপার মুখপানে চাহিয়া সে আবার বলিল, "আমাদের পরস্পরের মন আমাদের দুজনের কাছে অজানা নয়। একথা আগেই একদিন আমাদের হ'য়ে গেছে। আজ আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই দীপা—।" পল্লবের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিজের মুখের উপর অনুভব করিয়া মুখ তুলিয়া দীপা বলিল, "বলুন।" সাগ্রহে পল্লব বলিল, "দু বছরের জন্য আমি যাচ্ছি, ফিরতে হয় ত আরো কিছুদিন দেরী হ'তে পারে। এতদিন আমার আশায় বসে থাকতে পারবে ত দীপা? না এর মধ্যে—।" বাধা দিয়া রুদ্ধকণ্ঠে দীপা বলিল, "এতদিনেও কি আমাকে চিনতে পারেন নি পল্লববাবু?" স্নিগ্ধ হাসিয়া পল্লব বলিল, "চিনতে তোমাকে আমার বাকী নেই। তবু তোমার নিজের মুখ থেকে একথাটা না শুনেও যেন আমি সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হ'তে পারছিনে। এ অন্যায় আব্দারের জন্য আমায় মাপ্ কর দীপা।" দীপা মুখ তুলিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "মেয়েরা জীবনে একবারই ভালবাসে। যদি সারা জীবনও আপনার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হয়, তাতেও আমি অসম্মত হব না।" দীপার একখানা হাত সস্নেহে নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া সোচ্ছ্বাসে পল্লব বলিল, "তা আমি জানি। এই পাথেয় নিয়েই সেই দূর দেশে যাত্রা করব। এই ভরসাতেই আমার সব কিছু কাজ সেখানে সাফল্যমণ্ডিত হ'য়ে উঠবে।" দুইজনেই কিছুক্ষণ নীরব। ক্ষণপরে উৎফুল্লকণ্ঠে পল্লব বলিল, "আকাঙ্ক্ষিতের প্রাণভরা ভালবাসা পাবার মত অপার আনন্দ জগতে বোধহয় আর কিছুই নেই দীপা।" কৌতুক হাস্যে দীপার চোখ দুটী নাচিয়া উঠিল; মৃদু হাসিয়া বলিল, "আজ তাই হয় ত

আপনার মনে হ'চ্ছে। কিন্তু আর কিছুদিন বাদে সে দেশের মেয়েদের উজ্জ্বল রূপের আভায় চোখ যখন আপনার ঝলসে যাবে, সেদিনও কি আপনার মনের অবস্থা এই রকমই থাকবে? সেদিন হয় ত আমাকে আপনার সুখের পথের কাঁটা বলেই মনে করবেন।" বলিতে বলিতে কল্পিত আশঙ্কায় দীপার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। পাংশুমুখে সে বলিল, "ঈশ্বর না করুন, আমার সে দুর্গতির দিন যদি সত্যিই আসে তবে সেদিন শুধু কথা রাখার খাতিরেই গলগ্রহ হিসেবে আমাকে গ্রহণ করবেন না। সে ব্যথা আমার আরও অসহ্য হবে। এই ভিক্ষাই আপনার কাছে আজ আমি চাচ্ছি।" ব্যগ্র হইয়া পল্লব বলিল, "তুমি কি পাগল হ'য়েছ দীপা। এমন কৃতঘ্নতা করার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়।" ক্ষণপরে স্নিগ্ধকণ্ঠে আবার বলিল, "তোমার অতুলনীয় চোখের রূপ যে প্রাণভরে দেখেছে, আর কোন রূপের আভাতেই তার চোখ ঝলসাবার ভয় নেই।"

(৪)

এক পদস্থ সাহেবের সুপারিশ-পত্রে বিলাতে একটী ভদ্রপরিবারে পল্লব আশ্রয় পাইয়াছিল। ধীরে ধীরে এক বৎসর কাটিয়া গেল। অযথা আনন্দ করিয়া পল্লব এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট করিত না। যে কাজের জন্য সে গিয়াছে, তাই মন দিয়া করিত। কাজের চাপে ক্লান্ত হইয়া কখনো কখনো ম্যাণ্ট্‌ল্‌পিসের উপর রক্ষিত দীপার ফটোখানার সামনে গিয়া দাঁড়াইত। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে মনে হইত, ছবির ভিতরে দীপার সুশ্রী চোখদুটী যেন সজীব হইয়া তাকে উৎসাহ দিতেছে; যেন বলিতেছে, "তাড়াতাড়ি তোমার কাজ সেরে ফিরে এস। আমি যে তোমার পথ চেয়ে বসে আছি।" পল্লবের কতগুলি সহপাঠী বন্ধু-বান্ধবও বিলাত গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের শুধু অসার আমোদ করা ভিন্ন আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তাহারা পল্লবকে দলে টানিতে চেষ্টা করিত—ধনবান পল্লবকে সাথী পাইলে বিলক্ষণ লাভ আছে, কিন্তু সাধ্যে কুলাইত না। বহু চক্রান্ত করিয়া অবশেষে এক পার্টিতে পল্লবকে তাহারা বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রণ করিল। পল্লবকে বাধ্য হইয়া যাইতে হইল। সেখানে প্রচুর আমোদের ব্যবস্থা। বন্ধুরা মহাসমাদরে অনেক সুবেশা সুন্দরী মেয়ের সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দিল। এতগুলি মেয়ের ব্যূহজালে পড়িয়া অনভ্যস্ত পল্লব যেন দিশাহারা হইয়া গেল। একটী মেয়ে তাহার পানে বিলোল কটাক্ষ হানিয়া নাচে তাহাকে সহযোগী হইতে আহ্বান করিল। সবিনয়ে পল্লব তা প্রত্যাখ্যান করিল। সে নাচিতে জানিত না। মেয়েটীর নাম এঞ্জেলা। সে বিলাতের এক বিখ্যাত অভিনেত্রী। তার উজ্জ্বল রূপ, লীলায়িত ভাবভঙ্গী পল্লবের চিত্তকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল। ফিরিবার পথে এঞ্জেলার কণ্ঠস্বর তার কাণে বাজিতে লাগিল। সে নিজেকে মহা অপরাধী বোধ করিল। বাড়ী ফিরিয়া নীরবে বহুক্ষণ দীপার ছবির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া শুইল। শুইয়াও স্বস্তি পাইল না, আবার উঠিয়া টেবিলের কাছে গিয়া বসিল। সব কিছু জানাইয়া দীপাকে একখানা বড় চিঠি লিখিয়া তার মনের ভার কিছু লঘু করিল। তখন সে সুস্থিরচিত্তে ঘুমাইল। তার আশা ছিল ঘুমাইয়া উঠিলে মনের এই ক্ষণিক গ্লানি কাটিয়া যাইবে। কিন্তু সকালে জাগিয়া প্রথমেই তার চিত্তপটে ভাসিয়া উঠিল দীপার পরিবর্ত্তে এঞ্জেলার মুখখানি। অপরাধের ভারে সে ঝুঁকিয়া পড়িল। পূজার ফুলের ন্যায় পবিত্র দীপার স্নিগ্ধ মুখখানি মনে করিয়া সে তার অশান্ত মনকে সংযমের বাঁধনে বাঁধিতে চেষ্টা করিতে লাগিল—সবই বৃথা। ভিতরে ভিতরে মন তার এঞ্জেলাকে আর একবার দেখিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিল। দিনকয়েক বাদে বন্ধুরা আবার তাহাকে পার্টিতে নিমন্ত্রণ করিল। যাওয়া একান্ত অনুচিত বুঝিয়াও পল্লব এঞ্জেলাকে দেখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। বন্ধুদের চক্রান্ত সার্থক হইল। এঞ্জেলার রূপের ফাঁদে পল্লব ধরা পড়িল।

পল্লবের শিক্ষা, দীক্ষা, নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের অভিমান—সব কিছু পাপের স্রোতে ভাসিয়া গেল। দীপার ছবির পানে আর সে চাহিতে পারিত না। মনে হইত তার চোখে আর সে স্নিগ্ধ চাহনি নাই—পরিহাস-কঠিন দৃষ্টিতে সে যেন পল্লবের পানে চাহিয়া আছে; বিষণ্ণকণ্ঠে যেন বলিতেছে, "এই ত তোমার চরিত্রের দৃঢ়তা, এই ত তোমার কথার মূল্য! শেষে কি না একটা সামান্য অভিনেত্রীর মোহে আমাকে ভুললে, ছিঃ!" পাছে দীপার ছবির উপর চোখ পড়িয়া যায়—এই ভয়ে ছবিখানাকে ভাল করিয়া ঢাকিয়া সে ড্রয়ারের এক কোণায় রাখিয়া দিয়াছে। সুযোগ বুঝিয়া এঞ্জেলা পল্লবকে শুষিতে লাগিল। প্রতি সপ্তাহে

টাকা পাঠাইবার জন্ত চিঠি পাইয়া হরিহরবাবু চিন্তিত হইলেন। এক বৎসর হইল পল্লব বিলাত গিয়াছে—কই তখন ত এত অপর্য্যাপ্ত টাকা তার প্রয়োজন হয় নাই। তবে কি সে কোন কুসংসর্গে পড়িয়াছে? কিন্তু সে ত তেমন ছেলে নয়। নিশ্চয়ই তার কোন বিশেষ আবশ্যক উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপে মনকে প্রবোধ দিয়া তিনি টাকা পাঠাইতে লাগিলেন। কি জন্ত এত অর্থের প্রয়োজন হইতেছে জানিতে চাহিয়া ইতিমধ্যে তিনি খানকয়েক চিঠি লিখিয়াছিলেন। পল্লব তার কোন জবাব দেয় নাই। অবশেষে এক বৎসরের মধ্যে ব্যাঙ্কের সঞ্চিত অর্থরাশি যখন নিঃশেষ হইয়া আসিল তখন তাহা জানাইয়া তিনি আবার লিখিলেন যে পল্লব তাঁর পুত্রাধিক্, কোন কথাই তাঁহাকে জানাইতে তার বাধা নাই। অতএব ওখানে কি ঘটিয়াছে তা' জানাইয়া পল্লব অবশ্যই যেন তাঁহাকে নিশ্চিন্ত করে—এই তাঁহার বিশেষ অনুরোধ। উত্তরে ওকথার কোন উল্লেখ না করিয়া পল্লব লিখিল, 'যেখান হইতে হউক্ টাকা সংগ্রহ করিয়া যেন অবিলম্বে তাকে পাঠানো হয়—জমিদারি বিক্রয় করিতে হইলেও তার কোন আপত্তি নাই। টাকা না পাইলে তাকে বিপদে পড়িতে হইবে।

সে তখন অবনতির চরম সোপানে।

পল্লব যে কোন কুহকে আবদ্ধ হইয়াছে এ বিষয়ে হরিহরবাবুর আর কোন সন্দেহ রহিল না। অথচ অর্থাভাবে যে সে বিপদগ্রস্ত হইবে—এ চিন্তাও তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। জমিদারিতে তিনি কিছুতেই হাত দিতে পারিবেন না। এই বিরাট সম্পত্তি তিনি সারাজীবন ধরিয়া আপ্রাণ-শক্তিতে রক্ষা করিয়াছেন, বাড়াইয়াছেন। তাঁর কত-কালের সাধ, পল্লব উপযুক্ত হইলে স্বর্গীয় প্রভুর বিশাল ঐশ্বর্য্যরাশির মধ্যে তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া তিনি নিশ্চিন্তমনে কাশী যাত্রা করিবেন। দুই তিন দিনের মধ্যে কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করাও সম্ভব নয়। ভাবিয়া চিন্তিয়া নিজের সঞ্চিত অর্থ হইতে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই সে টাকা পল্লব শেষ করিয়া ফেলিল। আবার সে টাকা চাহিয়া লিখিল। হরিহরবাবু সে চিঠি পাইলেন না। খানকয়েক কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিতে এবং কাহাকেও দিয়া বিলাতে পল্লবের কোন সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় কি না এই আশায় তিনি তখন কলিকাতা গিয়াছেন। দেশের কর্ম্মচারীরা তাঁহার ঠিকানা জানিত না। এদিকে পল্লব দারুণ বিপাকে পড়িল। হাত-ঘড়ি, দামী পোষাক—যা কিছু জিনিস ছিল, সব বিক্রী করিয়াও কোন সুরাহা হইল না। যে ভদ্র পরিবারে সে বাস করিত, পদস্খলনের জন্ত পূর্ব্বেই সেখান হইতে বিতাড়িত হইয়া রুম্‌স্ লইয়া ছিল। চার্জ্জ না দিতে পারার দরুণ ল্যাণ্ড্‌লেডি বিদায় করিয়া দিল। দোহন করিয়া আর কিছু পাওয়া যাইবে না বুঝিয়া এঞ্জেলাও তাহাকে তাড়াইয়া দিল। ধীরে ধীরে পল্লবের মোহের ঘোর কাটিতে লাগিল। যত সব গভীর প্রেমের কথা এঞ্জেলা পল্লবকে শুনাইয়াছিল, তাহা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া ব্যাকুল-কণ্ঠে পল্লব জিজ্ঞাসা করিল—সে সবই কি তবে মন-ভুলানো মিথ্যা কথা? প্রত্যুত্তরে পাইল এঞ্জেলার ব্যঙ্গভরা অট্টহাসি। তার হাত ধরিয়া ব্যথিতকণ্ঠে পল্লব বলিল, "দিনকয়েকের মধ্যেই দেশ থেকে আমার টাকা এসে পৌঁছাবে। এর আগে কি কখনো তোমাকে টাকা দিতে আমার দেরী হ'য়েছে? এমন নির্দ্দয়ভাবে আমাকে ত্যাগ ক'র না এঞ্জেলা।" হাত ছাড়াইয়া লইয়া বিদ্রূপ করিয়া এঞ্জেলা চলিয়া গেল। মর্ম্মাহত হইয়া পল্লব রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। অতিরিক্ত অত্যাচার এবং অত্যধিক মদ্যপানের ফলে শরীর তখন তার নিস্তেজ। অটুট্ স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সুকুমারকান্তি ম্লান হইয়া গিয়াছে। হাতে এক কপর্দ্দক নাই, মাথা গুঁজিবার এক ফোঁটা স্থান নাই। আশা, ভরসা, উৎসাহ, উদ্যম মন হইতে চিরতরে বিদায় নিয়াছে। অনির্দ্দিষ্ট পথে পল্লব চলিতে লাগিল। কিছুদূর গিয়া ক্লান্ত দেহের বোঝা আর সে বহিতে পারিল না। একটা গাছতলায় অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িল। গায়ে তখন তার ১০৪° ডিগ্রী জ্বর। এ্যাম্বুলেন্স্ কার্ তুলিয়া লইয়া দীনদুঃখীর হাসপাতালে তাহাকে পৌঁছাইয়া দিল। কীর্ত্তিপুরের পরাক্রান্ত জমিদারবংশের একমাত্র বংশধর, লক্ষপতি পল্লব কুলিমজুরদের সহিত পাশাপাশি শয্যায় অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিল। হরিহরবাবু আর তার কোন সংবাদ পাইলেন না।

(৫)

তাপসকুমার মুখার্জ্জি নামে একটী ভারতীয় ছেলে একদিন হাসপাতালে বেড়াইতে আসিল। ঘুরিতে ঘুরিতে

এক রোগীর প্রতি দৃষ্টি পড়িতে সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। নিকটে গিয়া আবার ভাল করিয়া দেখিল। তাও কি সম্ভব—নিশ্চয় চোখেরই ভুল। তবু সন্দেহ ঘুচিল না। সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, খাতা দেখিয়া তিনি নাম বলিলেন, 'পল্লব রায়।' "পল্লব রায়!" ঘোর বিস্ময়ে তাপস জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে এল কেমন করে?" সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট উত্তর দিলেন, "আমাদের গাড়ী পথের ধার থেকে ওঁকে তুলে এনেছে।" "আশ্চর্য্য! অগাধ সম্পত্তির মালিক হ'য়েও এই হাসপাতালে পড়ে আছে! ওর দেশে একটা খবর দেন্ নি কেন?" "ওঁর আত্মীয়-স্বজনের ঠিকানা অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছি, উনি কিছু জবাব দেন্ না।"

আর বাক্যব্যয় না করিয়া তাপস পল্লবের শয্যার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। গভীর সমবেদনার সহিত তার সেই শীর্ণপ্রায় চেহারার পানে ক্ষণেক চাহিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল, "পল্লব।" সচকিতকণ্ঠে পল্লব বলিল, "কে? কে আমাকে ডাকে?"

"আমাকে চিনতে পারছ না ভাই?"

এমন স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর ত বহুদিন পল্লবের কর্ণে প্রবেশ করে নাই। তার পূর্ব্বের বন্ধুরা তাকে পাপের পথে টানিয়া আনিয়াই সরিয়া পড়িয়াছে। এ সংসারে তার ব্যথার ব্যথী হইতে আর যে কেহ আছে—তাই ত সে ক্রমে ভুলিতে বসিয়াছিল। জ্যোতিহীন চক্ষু দুটী তাপসের পানে মেলিয়া ক্ষীণকণ্ঠে পল্লব বলিল, "চিনতে পারছি নে। দৃষ্টিশক্তি যে চিরকালের জন্য আমার লোপ পেয়েছে।" "এ্যাঁ!" শয্যার উপর বসিয়া পড়িয়া রুদ্ধকণ্ঠে তাপস জিজ্ঞাসা করিল, "এমন সর্ব্বনাশ কি করে হ'ল?" মলিন হাসিয়া পল্লব উত্তর দিল, "কি করে হ'ল তা আমিও জানি না। ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞাসা করেও কোন সঠিক জবাব পাইনি। কিন্তু ও-কথা থাক্। এ অভাগার উপর এত করুণা—তুমি কে?"—দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া পল্লবের হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া তাপস বলিল, "আমি তাপস।" অতীতের স্মৃতিরাশির মধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও পল্লব কোন আলোর রেখা পাইল না। লজ্জাবিবর্ণ মুখে বলিল, "স্মৃতিশক্তি বড় বেশী ক্ষীণ হ'য়ে গেছে, আমায় মাপ্ ক'র ভাই।" "ছেলেবেলাকার খেলার সাথী, ইস্কুলের জীবনের একমাত্র বন্ধু—তাপস মুখার্জ্জিকে ভুলে গেছ পল্লব?" ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া, সহসা তাপসের হাত দুটী ধরিয়া, উৎফুল্লকণ্ঠে পল্লব বলিয়া উঠিল, "মনে হ'য়েছে তাপস, এতক্ষণে মনে হ'য়েছে। মাথা আমার এখন এত দুর্ব্বল হ'য়ে গেছে যে শেষে কি না তোমাকে পর্য্যন্ত ভুলতে বসেছি, ছিঃ। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর তোমার বাবা মারা গেলেন, তুমি কানপুরে তোমার মামার কাছে চলে গেলে, তারপর থেকে তোমার আর কোন খবর জানি না। তবু একদিনের জন্যও তোমাকে ভুলতে পারিনি। সব সময়েই তোমার কথা মনে জেগেছে।" নিশ্বাস লইয়া ধীরে ধীরে আবার বলিল, "ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত কোথা থেকে তুমি উপস্থিত হ'লে তাপস? এ দুঃসময়ে তোমাকে পেয়ে, আজ আমার মনে হ'চ্ছে, ঈশ্বরের কৃপা হ'তে তা হ'লে বোধ হয় আমি একেবারে বঞ্চিত হই নি।" তাপস বলিল, "আর্টের দিকে আমার বরাবর ঝোঁক—তারই চর্চ্চা করতে ইটালীতে এসেছিলাম। ফেরার আগে এখানকার দেশগুলি বেড়িয়ে নেবার মত্‌লব ছিল।" বিষণ্ণকণ্ঠে পল্লব বলিল, "যে উদ্দেশ্যে এসেছিলে সফল করে ফিরে যাচ্ছ। সার্থক তোমাদের জীবন তাপস। আর আমার জীবন উঃ—পূর্ণ ব্যর্থতার যেন একখানা নিদারুণ ইতিহাস।" পল্লবের রুক্ষ চুলগুলির উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে ভারী গলায় তাপস বলিল, "এ দশা তোমার কেমন করে হ'ল পল্লব—না শুনে যে আমি থাকতে পারছিনে ভাই। তোমাকে চিনতে পেরেও সঠিক্ ভাবে তোমার নাম না জানা পর্য্যন্ত আমি যে আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।" তাপসের হাতখানা বুকের উপর টানিয়া আনিয়া শ্রান্তকণ্ঠে পল্লব বলিল, "অসংযমের পরিণাম যে কতদূর শোচনীয় তা যদি তুমি জানতে চাও—তোমার কাছে আমি কিছুই গোপন করব না।" থামিয়া থামিয়া, বহুক্ষণ ধরিয়া, ধীরে ধীরে পল্লব বলিতে লাগিল—কিছুই বাকী রাখিল না। ক্ষণকাল উভয়েই নীরব। অবশেষে ব্যথিত কণ্ঠে তাপস বলিল, "এ কুহকের জালে তুমি কি করে ধরা পড়লে?" "এর সদুত্তর তোমাকে আমি দিতে পারব না। আমার মনে হয়, এ আমার অদৃষ্টের পরিহাস। না হ'লে দীপার অক্ষয় ভালবাসার অটুট বর্ম্মে আবৃত হ'য়ে আমার এ অবস্থা হবে কেন?" দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু পল্লবের চোখের

কোণ বাহিয়া বালিশের উপর ঝরিয়া পড়িল। চোখ মুছাইয়া দিয়া তাপস তার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল। ক্ষণপরে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা পল্লব, তুমি দেশে একটা খবর দিলে না কেন? তা হ'লে ত তোমাকে এ শোচনীয় অবস্থায় পড়ে থাকতে হোত না।"

"কাকে খবর দেব বল? এ প্রচণ্ড বিশ্বাসঘাতকতা করার পর অনাদিবাবুকে কোন সংবাদ দেওয়া আমার পক্ষে একান্ত অসাধ্য। আর আছেন নায়েব মশায়, তিনি আমার পিতৃতুল্য। তাঁর স্নেহে বাবার অভাব কোনদিন বুঝতে পারি নি। আমার এ অবনতির ব্যথা তাঁর বুকে যে বড় বাজবে। সেই ভয়ে—।" বাধা দিয়া তাপস বলিল, "এতদিন কোন সংবাদ না পেয়ে তাঁরা হয় ত কত ব্যাকুল হ'য়ে আছেন।" "না, সে চিন্তা নেই। খোঁজ খবর করে এতদিনেও কোন পাত্তা না পেয়ে নিশ্চয়ই তাঁরা মনে করেছেন আমার কোন বিপদ ঘটেছে। এ সংবাদ জানানোর চাইতে, তাঁদের নিকট মৃত হ'য়ে থাকা ভাল।"

ধীরে ধীরে পল্লব আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল। আর অল্প কিছুদিন বাদে এখান হইতে মুক্তি পাইবে—এ ভরসা ডাক্তার সম্প্রতি দিয়া গিয়াছেন। নিজব্যয়ে তাপস তাকে অন্য কোন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিতে চাহিয়াছিল—পল্লব রাজী হয় নাই। দিনের মধ্যে অধিকক্ষণ তাপস এখানে কাটাইয়া যায়। তন্দ্রার আবেশে পল্লব সেদিন চোখ বুজিয়া শুইয়াছিল। কোথা হইতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া তাপস পল্লবের শয্যার উপর বসিয়া পড়িয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "একটা সুখবর নিয়ে এসেছি পল্লব।" পল্লবের মুখের দিকে চাহিয়া আবার বলিল, "এইমাত্র ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে আসছি; তিনি বলিলেন অত্যধিক মানসিক উত্তেজনার ফলে চোখের একটা প্রধান নার্ভ নিস্তেজ হ'য়ে তোমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হ'য়েছে। এর পরে এমনি একটা মানসিক উত্তেজনার কারণ যদি ঘটে—সে আনন্দেই হোক্, অথবা আর কিছুর জন্যই হ'ক্, খুব সম্ভব তুমি আবার দেখতে পাবে।"

সবিষাদে পল্লব বলিল, "তুমি কি পাগল হ'য়েছ তাপস? চোখ একবার হারালে মানুষ আর কি তা' ফিরে পায়! বিশেষ করে আমার এ অন্ধত্ব ত ঘোর পাপের প্রতিফল।" ভারী মুখে তাপস বলিল, "তোমার ও-সব কথা ছেড়ে দাও ত পল্লব। যখন আশার একটা আলো-রেখা দেখতেই পেয়েছি তখন তা নিয়ে আনন্দ করব না কেন?" আর প্রত্যুত্তর না করিয়া ম্লান হাসিয়া পল্লব মৌন রহিল। নানা কথাবার্ত্তার পর এক সময়ে পল্লব জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, কবে ঠিক্ তোমাকে ছেড়ে দেবে জান?" "বোধ হয় আর দিন দশেক বাদেই দেবে—ডাক্তার ত এই রকমই বল্‌ছিলেন।" ক্ষণেক মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে পল্লব বলিল, "কবে তুমি দেশে ফিরে যেতে পারবে, আমার জন্য এতদিন অযথা তোমাকে আটকে থাকতে হ'ল। তোমার এ ঋণ যে আমি—।"

বাধা দিয়া তাপস বলিল, "ছি! পল্লব ও-কথা বলে আমায় লজ্জা দিও না। এ ত আমার কর্ত্তব্য। আমি এ অবস্থায় পড়লে তুমিই কি আমার জন্য করতে না?" তাপসের হাতখানা নিজের দুর্ব্বল হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া সজলকণ্ঠে পল্লব বলিল, "তোমাকে পেয়েই আমি এত তাড়াতাড়ি সেরে উঠেতে পারলাম তাপস। না হ'লে এই অনাথার হাসপাতালে একান্ত অসহায় ভাবেই হয় ত আমাকে মরতে হ'ত।"

(৬)

তাপসের সহায়তায় কলিকাতায় আসিয়া বালিগঞ্জের বড় সাধের বাড়ীটা বিক্রয় করিয়া একটা ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া পল্লব বাস করিতেছিল। সংবাদ পাইয়া দিদি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দিদির কোলে মাথা রাখিয়া পল্লব ধীরে ধীরে বলিল, "ভোলাই ত আমার সব কিছু এক রকম চালিয়ে নিচ্ছিল দিদি। তুমি আসাতে তোমাদের ওখানে আবার কষ্ট হবে না ত?" উদ্বেল অশ্রুরাশি সংযত করিয়া পল্লবের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে দিদি উত্তর দিলেন, "আপন বলতে তুই ছাড়া জগতে আমার আর কেউ নেই পল্লব। ভাগ্য বিড়ম্বনায় তোর এই অবস্থা যখন আজ আমায় দেখতে হোল, তখন আর কোন প্রাণে ভাসুর-দেবরের সংসার আমি আঁকড়ে পড়ে থাকতে পারি বল্?"

সেদিন সকালে পল্লবকে চা পান করাইয়া দিদি নিজের কাজে গিয়াছেন। খাটের উপর বসিয়া পল্লব বেহালাটাতে সুর বাঁধিতেছে। সব হারানোর দুঃখ ভুলিবার জন্য এই যন্ত্রটিকে সে প্রিয়সাথী করিয়া তুলিয়াছিল। গভীর নিশীথে

তার বুকের পুঞ্জীভূত ব্যথা এর তারের ভিতর দিয়া যখন গলিয়া ঝরিয়া পড়িত তখন পাশের ঘরে দিদি নীরবে অশ্রুপাত করিতেন। আজও সে তন্ময় হইয়া সুরের জাল বুনিয়া চলিয়াছিল। এমন সময়ে দিদি আসিয়া বলিলেন, "কে একটী মেয়ে তোর সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছে পল্লব।" চকিতকণ্ঠে পল্লব বলিল, "কে সে?" "তা ত জানিনে, এসেই তোর ঘরটা দেখিয়ে দিতে বল্‌ল।"

"আচ্ছা, নিয়ে এস।"

দ্বারের সন্নিকটে পল্লব শুনিতে পাইল অস্ফুটকণ্ঠে কে যেন তার দিদিকে বলিল, "আপনি আর কষ্ট করে আসবেন না—আমি এবার নিজেই যেতে পারব।" পরক্ষণেই সে তার পায়ের উপর একরাশ নরম চুল ও কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রুর স্পর্শ অনুভব করিল। ধীরে ধীরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?" রুদ্ধস্বরে উত্তর আসিল, "চিনতে আমায় পারছ না?" সংযতকণ্ঠে পল্লব বলিল, "চিনতে তোমায় পেরেছি। দিদি যখন এসে বললেন, একটী মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছে, তখনি বুঝেছি তুমি ছাড়া আর কেউ নও দীপা।" দীপার হাত দুটী ধরিয়া তাকে উঠাইয়া বসাইয়া আবার বলিল, "তুমি কেন এলে?" চোখ মুছিয়া দীপা বলিল, "আসব না! এ সময়ে আমি ছাড়া আর কে এসে তোমার পাশে দাঁড়াবে? কত কষ্ট করে তোমার ঠিকানা পেয়েছি জান? এতদিন হ'ল কল্‌কাতা এসেছ, আজ পর্য্যন্ত একটা খবর দাও নি। ব্যথা ত যথেষ্টই দিয়েছ তবু কি আশ্‌ মিটছে না?" অধর দংশন করিয়া পল্লব বলিল, "খবর দেবার মুখ আমি যে আর রাখিনি দীপা।"

"কেন তোমার কি হ'য়েছে? মতিভ্রম ত মানুষেরই হয়ে থাকে; কিন্তু তা ব'লে সেই ভুলের বোঝাই যে সারাজীবন ধরে বয়ে বেড়াতে হবে, এমন কথা কোন শাস্ত্রে লেখা আছে?" পল্লবের হৃদয় হইতে একটা গুরুভার নামিয়া গেল। দীপার হাতখানা সবলে চাপিয়া ধরিয়া উৎফুল্লকণ্ঠে সে বলিল, "আমায় তবে সত্য ক্ষমা করতে পেরেছ দীপা? কিন্তু আমি যে ক্ষমার একান্তই অযোগ্য। তোমার প্রাণঢালা ভালবাসার আমি দারুণ অপমান করেছি।" দীপ্তমুখে দীপা বলিল, "অসম্ভব, আমার ভালবাসাকে অপমান করার সাধ্য তোমার নেই। যে কুহকিনীর মায়ায় সেখানে জড়িয়েছিলে, তা' চোখের ক্ষণিক নেশা ছাড়া আর কিছুই না। তোমার আমার সম্পর্ক শুধু এই জন্মেই মিটে যাবার নয়—এ যে জন্ম জন্মান্তরের বাঁধন—এরই টানে তোমাকে আবার আমার কাছে ফিরে আসতে হ'য়েছে।" বিষাদাচ্ছন্নকণ্ঠে পল্লব বলিল, "নেশার ঘোর যখন আমার কেটে গেল তখন বুঝতে পারলাম যে ক্ষণিক ভুলের বিনিময়ে কি অমূল্য নিধি আমি হারিয়েছি। এ কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে আর কোন্ স্পর্দ্ধায় তোমাকে কামনা করতে পারি? তারপর ভগবান নির্ম্মম হস্তে আমার এ বিশ্বাসঘাতকতার সমুচিত দণ্ডবিধান করলেন। মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্—চোখ আমি হারালাম।" রুদ্ধকণ্ঠে দীপা বলিয়া উঠিল, "তোমার পায়ে পড়ি থাম। আর বোল না। আমি আর সইতে পারছিনে।" ভারী গলায় পল্লব বলিল, "বেশী কথা বলব না। এ কয়টা কথা বলে আমার মনের জমাট্ ব্যথা তোমার কাছে একটু হাল্কা করতে দাও দীপা।" নিশ্বাস লইয়া সে বলিতে লাগিল, "হাতে একটা পয়সা নেই, আশা উদ্যম মন থেকে নিঃশেষ হয়ে গেছে, সকলের দরজা থেকে তাড়িত। তবু সেদিন তোমাদের কারুকে খবর দিতে পারলাম না, সে মুখত আর রাখিনি। একটা অনাথ হাসপাতালে পড়ে যখন তিলে তিলে মরণের পথে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তখন ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত কোথা থেকে এসে উপস্থিত হ'ল আমার বাল্যবন্ধু তাপস। তারই দয়ায়, তার সাহায্যে সেরে উঠে আবার আমি এখানে ফিরে আসতে পেরেছি।" ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে আবার বলিল, "অপরাধ আমার ক্ষমাতীত হ'লেও তার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত ত আমায় করতে হ'য়েছে দীপা।" বাষ্পাচ্ছন্নকণ্ঠে দীপা বলিল, "সেখানকার পঙ্কিল ঘূর্ণাবর্ত্তে ক্ষণেকের জন্য তোমার গায়ে যদি কাদা লেগেই থাকে—সে খোঁজে আমার দরকার কি? আমি ছাড়া তোমার উপর আর যে কারুর দাবী নেই—এটুকু জানলেই আমার যথেষ্ট।" গভীর আবেগ-ভরে পল্লব বলিল, "তোমাকে পেয়ে এতদিন বাদে আমার নিঃস্বতা, রিক্ততা, অন্ধত্বের ব্যথা আমি ভুলতে বসেছি।" একটু থামিয়া সে আবার বলিল, "তবু তোমায় একটা কথা মনে না করিয়ে দিয়ে আমি যে থাকতে পারছিনে দীপা।"

"বল।"

দীপার হাতখানা নিজের হাতে লইয়া উৎসুক-কণ্ঠে

পল্লব বলিল, "এ অন্ধকে নিয়ে সত্যই কি তুমি সুখী হতে পারবে? সংসার পথে চলতে গিয়ে নিজেকে কি একদিন বড় বেশী ভারাক্রান্ত বলে মনে হবে না?" নিশ্বাস লইয়া আবার বলিল, "ব্যর্থতার দুঃখ ভোগ করে পরজন্মের অপেক্ষায়—এস, এ জন্মটা আমরা কাটিয়ে দি। সে জন্মে এমন কোন গ্রহের ফেরে আমাদের যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে না হয়।" স্মিতমুখে দীপা বলিল, "আমার পক্ষে তা সম্ভব হবে না। এ জন্মে দিন কতকের জন্য অপেক্ষা করেই তোমাকে আমি হারাতে বসেছিলাম। আর একদিনও অপেক্ষা করতে আমি রাজী নই।"

"কিন্তু—।" বাধা দিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে দীপা বলিল, "তোমার দ্বিধার কারণ আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ, আজ এই অবস্থাতেই আমার প্রয়োজন তোমার সব থেকে বেশী।" ক্ষণেক মৌন থাকিয়া সে আবার বলিল, "দৃষ্টিহীনতার ব্যথা আর তোমাকে বুঝতে দেব না। আমার চোখের ভিতর দিয়েই তুমি জগৎ সংসারের আলো দেখতে পাবে।" পল্লবের হাত দুখানা চাপিয়া ধরিয়া সাগ্রহে বলিল, "তোমায় মিনতি করছি, এ সাধ থেকে আমায় বঞ্চিত ক'র না।" গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া রুদ্ধকণ্ঠে পল্লব বলিল, "তবে তাই হোক্। দুরদৃষ্ট জীবনের বোঝা তোমার হাতে সম্পূর্ণরূপে তুলে দিয়ে আমি একেবারে নিশ্চিন্ত হই। জীবনব্যাপী দুঃখকে বরণ করে নিয়ে যদি তারই ভিতর দিয়ে তুমি সুখের আলো পেতে চাও দীপা, তবে আপত্তি করে তোমার ব্যথা আর আমি বাড়িয়ে তুলব না।"

সারাটা ভারত কাঁদিছে আজি

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য

কাঁদে অযোধ্যা ভাসিয়া আজিকে
চোখের জলে,
অভিমানে বঁধু গিয়াছে যে তার
পাতালে চলে;
সরযূর তীর মনে ভাবে আর
প্রাণে ওঠে তার জেগে হাহাকার,
পঞ্চবটীর কথাটি ভাবিতে
কেবলই কাঁদা,
অশোকের মূলে আছে যে তাহার
পরাণ বাঁধা!

নয়ন মেলিয়া চেয়ে দেখ ঐ
আগ্রা পানে,
অশ্রুর নীর যেতেছে বহিয়া
শোকের গানে;
সাহ্‌জাহানের বক্ষ দলিয়া
করুণ বিলাপ ফিরিছে ধ্বনিয়া,
মর্ম্মরে তার র'য়েছে গোপন
মর্ম্ম কথা,
গম্বুজে তার রয়েছে মাখান
প্রাণের ব্যথা।

কাঁদিছে মেবার জগতে নাহিক
তুলনা তার,
পদ্মিনীহীন চিতোর নগরী
অন্ধকার;
সঙ্গে লইয়া সহচরীদল,
হাসিমুখে সে যে পশেছে অনল,
সেইদিন হ'তে মেবারের বুকে
জ্বলিছে চিতা,
সাগরের জলে জনমেতে হায়
নিবিবে কি তা?

গীতা ও শাস্ত্রবিধি

শ্রীঅনিলবরণ রায়

গীতায় আছে,—"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং"। গীতা ৩।৮

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, নিয়তং নিত্যং শাস্ত্রোপদিষ্টং। প্রাচীন টীকাকারগণ প্রায় সকলেই নিয়ত কর্ম্মের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; শ্রুতিস্মৃতিপ্রতিপাদিত সন্ধ্যা উপাসনা ইত্যাদি নিত্যকর্ম্ম এবং শ্রাদ্ধাদি নৈমিত্তিক কর্ম্ম। কিন্তু গীতা কেবল এই সকল কর্ম্ম করিবারই উপদেশ দিয়াছে, এই ব্যাখ্যা শ্রীঅরবিন্দ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, এখানে "নিয়তং কর্ম্ম" অর্থে পূর্ব্ব শ্লোকের মর্ম্মানুসারে ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত করিয়া (নিয়ম্য) যে কর্ম্ম করা যায় তাহাই বুঝায় (controlled action)। পূর্ব্ব শ্লোকে কৃষ্ণ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করে সেই শ্রেষ্ঠ—মনসা নিয়ম্য আরভতে কর্ম্মযোগম্ এবং ঠিক ইহার পরেই এই সাধারণ সত্যটি হইতে তিনি একটি উপদেশ বাহির করিলেন—নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বম্, তুমি নিয়ত কর্ম্ম কর। পূর্ব্ব শ্লোকের "নিয়ম্য" শব্দকে লইয়া এখানে "নিয়তং" করা হইয়াছে এবং "আরভতে কর্ম্মযোগম্"কে লইয়া "কুরু কর্ম্ম ত্বম্" এই বিধান দেওয়া হইয়াছে। বাহ্যিক বিধি-নিষেধের অনুসরণে গতানুগতিক কর্ম্ম নহে, পরন্তু মুক্ত বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নিষ্কাম কর্ম্মই গীতার শিক্ষা।

কর্ম্মকে এইভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে প্রথম অবস্থায় শাস্ত্র আমাদের সহায় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং গীতাও তাহা অন্যত্র বলিয়াছে,

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্মকর্ত্তু মিহার্হসি ॥ ১৬।২৪

কিন্তু এখানেও গীতা শাস্ত্র বলিতে শ্রুতিস্মৃতি বা অন্য কোন বিশেষ শাস্ত্রগ্রন্থ নির্দ্দেশ করে নাই। অশুদ্ধ বাসনা-কামনাদির বশে (কামচারতঃ) না চলিয়া সুনির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসারে কর্ম্ম করাই প্রাথমিক সাধনা এবং শাস্ত্রানুসরণ বলিতে ইহাই বুঝায়। যাহা ইচ্ছা হইল তাহাই করিলে মানুষে আর পশুতে কোন প্রভেদ থাকে না। তাই মানুষ নিজেদের কার্য্যাকার্য্য নির্ণয়ের জন্য অভিজ্ঞতা, বিচার ও যুক্তির দ্বারা কতকগুলি বিধি স্থির করিয়াছে। এই সকল বিধিনিষেধ দেশকালভেদে কিছু কিছু ভিন্ন হইতে পারে; কিন্তু কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুর বশে না চলিয়া এই সকল বিধি-নিষেধ মানিয়া কার্য্য করিলে পাশবিক প্রবৃত্তিগুলি ক্রমেই সংযত হয় এবং সেই জন্যই এই সকল বিধি-নিষেধকে শাস্ত্র বলা হয়। তাই গীতা যেখানে বলিয়াছে শাস্ত্রই কার্য্যাকার্য্যের প্রমাণ, সেখানে প্রাচীন হিন্দু সমাজে যাহা শাস্ত্র বলিয়া প্রচলিত ছিল শুধু তাহাই বুঝিবার কোন প্রয়োজন নাই। গীতার শিক্ষা সার্ব্বজনীন। খৃষ্টান যথেচ্ছাচারী না হইয়া খৃষ্টান শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম করুক, মুসলমান কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ে মুসলমানশাস্ত্রের অনুসরণ করুক, হিন্দু হিন্দুর শাস্ত্রবিধিমত কর্ম্ম করুক—মোট কথা অবাধ ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার পরিবর্ত্তে কোন নির্দ্দিষ্ট বিধি-নিষেধকে কার্য্যাকার্য্যের মানদণ্ড করুক, তাহা হইলেই তাহাদের সদ্গতিলাভ হইবে।

পাশ্চাত্য দেশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জীবনের সকল বিভাগেই শাস্ত্র প্রণীত হইতেছে। কোন কার্য্য কি ভাবে সম্পাদন করিলে তাহা সুসম্পন্ন হইতে পারে, তাহার নিজ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিতে পারে সে-সম্বন্ধে গবেষণার দ্বারা নানা নীতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দ্ধারিত হইতেছে। এইভাবে রাজনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধ, কৃষি, শিল্প, সঙ্গীত, এমন কি দাবা-খেলা, তাস-খেলা প্রভৃতি সম্বন্ধেও বিস্তারিত শাস্ত্র রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। প্রাচীন ভারতেও এইরূপ নানা বিষয়ে নানা শাস্ত্র রচিত হইয়াছিল এবং সাধারণ প্রাকৃত জীবনকে সংযত ও সুশৃঙ্খল করিবার নিমিত্ত এই সকল শাস্ত্র বিশেষ সহায়রূপে পরিগণিত হইত, গীতাতে তাহাই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু বাহ্যিক শাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া কর্ম্মসাধন কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ স্বরূপ নহে। ক্রমশঃ বাহ্য শাস্ত্র ও বিধি-নিষেধের ঊর্দ্ধে উঠিয়া, আমাদের যে আভ্যন্তরীণ স্বভাব বা মূল প্রকৃতি তাহার অনুসরণ করিয়াই কর্ম্ম করিতে হইবে, স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম।

ইহার উত্তরে কেহ হয় ত বলিবেন যে শাস্ত্র স্বভাবানুযায়ী কর্ম্ম করিবারই উপদেশ দিয়াছে। কিন্তু কাহার মূল স্বভাব কি তাহা তাহার ভিতর হইতেই নির্দ্ধারিত হইতে পারে; কোন সামাজিক বিধিবিধান বা শাস্ত্রের দ্বারা তাহা নির্ণয় করা যায় না। শাস্ত্র কেবল প্রথম অবস্থাতেই সহায় হইতে পারে, আবার অনেক সময়েই তাহা প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়, শাস্ত্রবচনের মোহে মানুষ বিভ্রান্ত হইয়া যায়। বেদ উপনিষদের ন্যায় শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রও যে মানুষের বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতে পারে; গীতা "শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে বুদ্ধিঃ" এই কথাটির দ্বারাই তাহা স্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছে। তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অনুসরণ করিয়া শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করিবার অধিকার গীতায় স্বীকৃত হইয়াছে,

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।

কিন্তু পরিশেষে ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা সাক্ষাতভাবে যখন আমাদের সমুদয় কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হইবে তখনই তাহা হইবে শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। কেবল এইরূপ কর্ম্মই মুক্ত পুরুষের যথার্থ ও সত্য কর্ম্ম, মুক্তস্য কর্ম্ম।

ফুরায়ে যা যায়—

"আলেয়া"

যেদিন হাটবার…নিকটেই হাট…রাজবন্দীদের ঘরের পাশ দিয়ে যাবার রাস্তা।

ঘরের সাম্‌নে বিকালবেলা সুশান্ত তার ডেক চেয়ারটায় এসে বসে—পাশের সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে কত লোকই যায় আসে—সে অভিনিবেশ সহকারে তাদের দেখে আর ভাবে—কি সহজ সরল জীবন—কোথাও এতটুকু কৃত্রিমতা নেই; যতটুকু দরকার তার এতটুকু বেশী কোথাও এদের চাল-চালনে ধরা পড়ে না।

হঠাৎ তার নজর যায় সাম্‌নের ছোট মেয়েটার ওপরে—হাতে একফালি আক নিয়ে ওই রাস্তা দিয়েই সে একলা আসে;—বেশ গোলগাল চেহারা—একমাথা কোঁকড়ান ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল।

সুশান্ত ডাকে—"খুকি, শোন—" সে একটুও ভয় পায় না। আস্তে আস্তে তার সাম্‌নে এসে দাঁড়ায়।—"তোমার নাম কি" সুশান্ত জিজ্ঞাসা করে।

—"আকি"

—"তোমাদের বাড়ী কোথায়?"

—"ওই তো আমাদের বাড়ী" বলে মেয়েটী অনতিদূরে একখানা চালা বাড়ী দেখায়।

—"তুমি কার সঙ্গে হাটে গিছলে?"

—"বাজানের সঙ্গে—ওই তো আসছে।"

ইতিমধ্যে তার বাপ মংলা সেখানে এসে পড়ে—সুশান্ত বলে—"তোমার মেয়ে বুঝি?"

মংলা বলে—"হ্যাঁ বাবু, আকি বন্দীবাবুকে সেলাম দাও।"

আকি সুশান্তের পাশে দাঁড়িয়ে হাসে।

মংলা বলে—"আর ছেলে মেয়ে নেই বাবু—বড় দুর্বৎসর—জমী-জমা কিছুই নেই—জনমজুরি করে কোন রকমে দিন চলে—আররে আকি।"

আকি চলে যায় তার বাপের সঙ্গে।

এইটুকু মেয়ে বছর চার পাঁচ বয়স হবে—কেমন করে যে অমন প্রাণ-গলান হাসি হাসে ভেবে সুশান্ত আশ্চর্য্য হয়। চাষার ঘরের মেয়ে হলেও তার হালকা হাসির মধ্যে কেমন একটা বৈশিষ্ট্য, তার আধময়লা ছোট্ট চেহারার মধ্যে কেমন একটা আকর্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়।

আকি চলে যায়—সুশান্ত আপনহারা হ'য়ে অনেকক্ষণ তাকে উপলক্ষ করে নিজের অতীত জীবনটাকে চিন্তা করে। সেখানেও আকির মত একটী কচি মেয়ের মুখ তার চোখের ওপর ভেসে ওঠে—সে তার ভাইঝি বেলি।

পরদিন সকালবেলা সুশান্ত ঘরে একখানা বই পড়ে। হঠাৎ রাস্তার ছোট ছেলে মেয়েদের আনন্দ কোলাহল তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাইরে এসে দেখে—আকি আর তিন চারটে ছোট ছেলে মেয়ে। সুশান্তকে দেখে আকি ছাড়া আর সকলে পালিয়ে যায়। আকি বলে—"কিছু বলবে না—পালাস নি রে।"

সুশান্ত আকিকে নিয়ে তার ঘরে আসে; একটুও সে কুণ্ঠিত হয় না—যেন কতদিনের চেনা। সে কত কথাই জিজ্ঞাসা করে—"এটা কি, ওটায় কি হয়" ইত্যাদি।

সুশান্ত বলে—"কিছু খাবে?"

আকি ঘাড় নেড়ে বলে—"খাব"…সুশান্ত বলে—"কি খাবে"—"মিঠাই"

সুশান্ত চাকরকে ডাক দেয়। সে বলে—"বাবু, এ কি শহর—মিঠাই পাওয়া যায় না।"

আকি বলে—"না গো বন্দীবাবু, পাওয়া যায়—সাউদের দোকানে।"

চাকর বলে—"বাবু বাতাসা পাওয়া যায়, মিঠাই নয়।"

—"না মিঠাই, এক পয়সায় এতগুলো দেয়" বলে আকি তার ছোট হাতে একটী পরিমাণ দেখায়।

সুশান্তর চাকর দোকান থেকে বাতাসা কিনে এনে আকির হাতে দেয়; সে কতক খায় বাকি হাতে নিয়ে বাড়ী আসে।

আকিকে অবলম্বন পেয়ে সুশান্তর বন্দী-জীবনের দুর্ব্বহতা আসে অনেকখানি কমে। আকির সাহচর্য্যে সুশান্তর অন্তরের শুষ্কপ্রায় স্নেহের উৎস আবার উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে।

ওই এতটুকু ছোট মেয়েটাও যেন তার সবটুকু বাঁধন দিয়ে সুশান্তকে ধরে রাখতে চায়।

সুশান্ত বিকালে নদীর চরে বেড়াতে যায়—আকিও প্রত্যহ তার সঙ্গ নেয়। আকি না থাকলে সুশান্তর এই বেড়ানটাও যেন নেহাৎ প্রাণহীন হয়ে পড়ে।

ছোট্ট নদীর এ-পারে ধূ ধূ করছে নতুন-জাগা-চর, ও-পারে শুধু কাশের বন আর বুনো ঝাউএর ঝোপ। সুশান্ত চরের বালির ওপর বসে—আকি তার পাশে বালি নিয়ে খেলা করতে সুরু করে। মাঝে মাঝে সে শিশু মনের কৌতূহলভরা কত প্রশ্নই না জিজ্ঞাসা করে। সুশান্ত সাধ্যমত তার উত্তর দেয়—তাতেই তার আনন্দ।

আকি জিজ্ঞাসা করে—"বন্দীবাবু, বোঁচাইরে দেখেছ?" সুশান্ত 'বোঁচাইরে' কি বোঝে না, তবু উত্তর দেয়—"দেখেছি।"

আকি বোধ হয় বুঝতে পারে যে সুশান্ত না বুঝে উত্তর দেয়। তাই সে পুনরায় প্রশ্ন করে—"কোথায় থাকে বল তো?" সুশান্ত মুস্কিলে পড়ে; সে বলে—"কেন? গাছের ডালে।"

আকি হেঁসে ওঠে বলে—"ধেৎ, কিছু জানে না… বোঁচাইরে জলে থাকে…মানুষ খায়।"

সুশান্ত তখন বুঝতে পারে যে সে কুমীরের কথা বলতে চায়। তখন সে তার কাছে কুমীরের বর্ণনা দেয়। আকি হাঁ করে শোনে; তারপর বলে—"তোমরা কুমীর বল, আমরা বোঁচাইরে বলি।" হঠাৎ সে একটু থেমে যায়। তারপর সুশান্তর হাত ধ'রে তুলবার চেষ্টা করে "চল বাড়ী যাই, ভয় করছে, ওই দেখো ভূতের আলো" বলে সে বহুদূরে ওপারে ঝাউ বনের ফাঁক দিয়ে একটা আলো দেখায়।

সুশান্ত সেইদিক পানে চেয়ে বলে—"ওটা ভূতের আলো, কে বল্লে?"

—"কেন বাজান বলেছে…ওই ঝাউবনে ভূত থাকে… সন্ধ্যে হ'লে তারা আমাদের মত ধরে আলো জ্বালে…"

ও-পারে ঝাউবনের তলায় তখন ঘন জমাটবাঁধা অন্ধকার …তারই ফাঁক দিয়ে বহুদূরবর্ত্তী পল্লীর সন্ধ্যা প্রদীপের ম্লান শিখা সান্ধ্য তারার মত চোখের ওপর ভেসে ওঠে। এ-পারে শেষ আলো তখনও নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায় না…রক্তিম আকাশ হ'তে তারই আভা চরের বালির ওপর উদ্ভাসিত হয়, আর তার ভিতর হ'তে একটা রঙিন আলোর ছটা সুশান্ত ও আকির চোখে মুখে এসে পড়ে।

সুশান্ত তার হাত ধরে সেই মৌন সন্ধ্যায় আপনার ঘরে ফিরে আসে, সারাপথ উভয়ে নির্ব্বাক। আকি নিজের মনে তখন ভূতের আলোর কথা ভাবিতে থাকে—আর সুশান্ত নিজেকে গত জীবনের অতীত কাহিনীর মধ্যে ডুবিয়ে দেয়।

হঠাৎ আকিই প্রশ্ন করে—"বন্দীবাবু, ভূত দেখেছ?"

সুশান্ত বলে—"দেখেছি, প্রকাণ্ড চেহারা, বড় বড় দাঁত, চোখগুলো আগুনের ভাঁটার মত…"

আকি মধ্য পথে বাধা দিয়ে বলে—"আর বলতে হবে না, আমার ভয় করে" তারপর সে সুশান্তের হাত ছেড়ে কোঁচার খুঁট ধরে চলতে থাকে।

বর্ষাকাল, মংলার সবদিন জন-মজুরী জোটে না, চাল কেন্‌বার পয়সার অভাবে সস্তায় মেটে আলু কিনে আনে; তাই সিদ্ধ করে খেয়ে দিন কাটায়। আকি তা খেতে চায় না, ভাতের জন্য বায়না নেয়, তার মা তাকে ভুলাবার অনেক চেষ্টা করে, পারে না…ক্ষুধার্ত্ত সন্তানকে একমুঠো ভাত দিতে না পারার অক্ষমতা মা বাপের প্রাণে এতটুকু বাজে না—এ ঘটনা তাদের কাছে এত সাধারণ, এত স্বাভাবিক।

মংলা আকিকে নিয়ে সুশান্তর কাছে আসে। সব শুনে সুশান্তর দু'চোখ সজল হ'য়ে ওঠে, জিজ্ঞাসা করে—"আচ্ছা মংলা, এমন ক'রে কতদিন চলবে?"

মংলা একটুও অপ্রতিভ না হ'য়ে উত্তর দেয়—"গ্রামদেশে যাদের জমিজমা নেই—তাদের বাবু এম্নি করেই তো চলে আসছে।"

সুশান্তর চাকর আকির জন্য ভাত বেড়ে দেয়; আকির মুখে হাসি ফুটে ওঠে। সে ভাত নিয়ে বাপের সঙ্গে বাড়ী চলে যায়।

তারপর হ'তে যেদিন ঘরে চাল থাকে না, আকি নিজেই সুশান্তর কাছে আসে। খাওয়া-দাওয়া ক'রে বাড়ী যায়; বর্ষার দিন প্রায়ই বৃষ্টি পড়ে, সুশান্তর চাকরকে ছাতা নিয়ে তাকে এগিয়ে দিতে হয়।

এম্নি করে সুশান্তর দিনগুলো কেটে যায়। হঠাৎ দুদিন আকি আসে না; সুশান্ত চাকরকে পাঠায় খবর নিতে…

সে এসে বলে—"পরশু রাত থেকে বাবু আকির খুব জ্বর।" সুশান্ত মংলাকে ডেকে পাঠায়; তাকে বলে—"আকির চিকিৎসা করাচ্ছ?"

মংলা বলে—"হ্যাঁ বাবু, সকালে এক ফকিরকে এনেছিলুম—সে দাওয়াই দিয়ে গেছে।"

সুশান্ত জিজ্ঞাসা করে—"সে কি অসুখ বল্লে?"

মংলা বলে—"আমরা ভেবেছিলুম জ্বরের ঘোরে মেয়েটা ভুল বক্‌ছে; ফকির বলে—ও-সব কিছু নয়। পরীর হাওয়া লেগেছে, দুদিনেই সেরে যাবে।"

সুশান্ত ফকিরের ওপর তাদের বিশ্বাস দেখে আশ্চর্য্য হয়। সে বলে—"তুমি সরকারী ডাক্তারকে ডেকে এনে দেখাও, যা টাকা লাগে আমি দেব।"

মংলা কিন্তু হ'য়ে উত্তর দেয়—"তা তো বুঝলুম বাবু; আপনি নয় আজ আছেন—চিরদিন ত আর থাকবেন না—আজ ফকিরকে চটালে সে কোন দিন আর আমার বাড়ী চিকিৎসা করবে না। তখন ত আর আমি সরকারী ডাক্তার ডাকতে পারব না। তাই আমি বলি কি বাবু সে ত দুদিনে ভাল ক'রে দেবে বলেছে; এই দুদিন দেখা যাক, তারপর সরকারী ডাক্তার ডাকা যাবে।"

এরপর সুশান্তর কিছু বলবার থাকে না। কাজেই সে বলে—"আচ্ছা তাই ক'রো, আর যদি দরকার হয় তো খবর দিও।" মংলা চলে যায়।

রাত্রি প্রায় তিনটা, হঠাৎ কান্নার শব্দে সুশান্তর ঘুম ভেঙ্গে যায়। কান্নার শব্দটা যেন মংলার বাড়ীর দিক হ'তেই আসে—তবে কি আকি—সে আর ভাবতে পারে না; তার ইচ্ছা করে খবরটা আনতে একবার এখনই দৌড়ে যায়। তার পরেই মনে পড়ে মংলার বাড়ী তার রাত্রির সীমানার বাইরে—

তাড়াতাড়ি চাকরটাকে ডেকে তোলে; সে খবর এনে দেয় "আকি মারা গেছে।"

সুশান্ত শুধু একবার উদ্‌ভ্রান্তের মত জিজ্ঞাসা করে—"মারা গেছে?"

বর্ষা শেষ হয়। জলে-ডোবা-নদী-চর আবার মাথা তুলে জেগে ওঠে; সুশান্ত আগের মত সেখানে বেড়াতে যায়; ওপারে ঝাউবনের মাথা থেকে সন্ধ্যার অন্ধকার এগিয়ে আসে। তারই ফাঁকে পল্লীর সন্ধ্যা-প্রদীপের আলোগুলো জোনাকীর মত একটা একটা ক'রে জ্বলে ওঠে। হঠাৎ সেদিকে তাকাতে তার ভূতের আলোর কথা মনে পড়ে; আর সেই সঙ্গে তার মনে জাগে—আকির সেই ছোট্ট কচি মুখের হাসি। সে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে আসে, পিছন পানে ফিরে তাকাবারও তার আর সাহস থাকে না।

মলয়-যাত্রী

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ বি-এল

অবশেষে মলয়-উপদ্বীপ। জাহাজ পেনাঙে নজর করবার পূর্ব্বেই তার সৌন্দর্য্য আমাদের মুগ্ধ করছিল। কারণ উপকূল সবুজ—মনে হয় সাগরের অন্তর ভেদ করে উঠেছে বন। বালুবেলা নাই। আর পুরী, গোপালপুর, ওয়ালটেয়ার প্রভৃতির পায়ের তলায় বঙ্গোপসাগর যেমন আছড়া-আছড়ি করে তেমন তরঙ্গের মলাকা-প্রণালীতে অভাব।

পেনাঙ সহরে নেমে মনে হল যেন পৃথিবীটা বদলে গেছে। অবশ্য বড় বড় প্রাসাদ দেখ্‌তে পেলাম, যেমন অট্টালিকা ক্লাইভ ষ্ট্রীট বা লালদিঘির ধারে দেখা যায়। সেগুলা সভ্য-বিশ্বের সর্ব্বত্র দৃশ্যমান আধুনিক সভ্যতার ষ্ট্যাণ্ডার্ড ছাপ। কিন্তু ভাব, ভাষা, লোকজন, মায় টাকা পয়সা অবধি বদলে গেল—যখন সাগরকূলের এই নবীন সহরে কারাপারা-যাযাবরদের শুভাগমন হল। প্রথম চোট খেলে চির আকাঙ্ক্ষার বস্তু টাকা পয়সার বদ্ধ-ধারণা। সেখানে পয়সাগুলা সেণ্ট। চির-পরিচিত টাকা নাই, আছে ডলার—যার নগদ মূল্য একশত সেণ্ট। আশৈশব মুখস্থ করা নামতার চারের কোটা হয়ে গেল বাতিল—আর্থিক হিসাবের সময়। পাঁচের কোটার অকস্মাৎ গজিয়ে উঠ্‌লো গুরুত্ব।

চির-পরিচিত পাঁচসিকা হল এক ডলার পঁচিশ সেণ্ট—অবশ্য মূল্যে না। কারণ এক ডলার এক টাকা ন' আনা। দু'পণ্ডা পয়সার কথা কেহ ভাবে না—ভাবে দশ সেণ্টের কথা। ইত্যাদি ইত্যাদি।

জেটির বাহিরে একদিকে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—মোটর গাড়ি। একদিকে রিক্‌সা। মোটরের অনেক ড্রাইভার শিখ্—কিন্তু তার দাড়ির পাশে গোঁপ-দাড়ি-বিহীন চোপ্‌সানো হলদে মুখ ড্রাইভার এবং তার অনতিদূরে না-কালো, না-হলদে, না-নাক-থ্যাবড়া, না-টিকোলো-নাক—মলয়-বাসী ট্যাক্সি-চালক। এ যোগাযোগ মনের চিরাচরিত ভাব-ধারাকে ওলট-পালট খাইয়ে দেয়।

কোনো দেশেই শালিকপাখী বিয়োয় নাকো টিয়াপাখীর ছানা। কিন্তু পারম্পর্য্য ও সংযোগের বিভিন্নতা অভিনব করে দৃশ্যকে। দুনিয়ার কোথাও এমন দৃশ্য নাই বা এমন ইমারত নাই খণ্ডভাবে যে ভারতবর্ষে দুর্ল্লভ-দর্শন। কিন্তু সংশিষ্ট-ভাবে যখন একটা বিশেষ পরিকল্পনার প্রচুর বিকাশ দেখা যায় কোন ভূ-খণ্ডে, তখন সেই পরিকল্পনাকে সেই দেশের অন্তরাত্মার নিদর্শন বলে মেনে নেওয়া যায়। প্রকৃতিও পৃথিবীর এক একটা স্থানকে সাজায় এক এক প্রকার সাজে। সেই ভাবে দেখলাম যখন পিনাঙকে—তখন সত্য মনে হল নূতন দেশে এসেছি।

সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টিপথে পড়ে মানুষ। এ-শহর চীন দেশের একটা অংশ বলে মনে হয়। অবশ্য অনাগত কালের চীন মুলুক—যখন চীনা তার দেশে শিখ মলয় হিন্দু ও ইংরাজকে প্রবেশ করতে দেবে। চীনের ছেলে মেয়ে বই হাতে ক'রে পড়তে যাচ্চে—চীনের আমাহ ঝুড়ি-হাতে বাজার করতে যাচ্চে—পথের ধারে বসে চীনে-মুচি জুতা ক্রয় করচে—আর চীনা-নাপিত, চীনে-ধোবা মানুষকে করছে সভ্য।

রিক্‌সা টানে চীনে। কালো ছাতার কাপড়ের পায়জামা আর কোর্টে তাদের হলদে দেহকে করে আবৃত—মাথা আলো করে ধুচুনীর মত প্রকাণ্ড বেতের টোকা।

রিকস্-কুলী সম্বন্ধে আমার মন চিরদিন দরদী—যেমন ইন্‌কাম্‌ট্যাক্স আমার ধৈর্য্যচ্যুতি করে। এমন জিনিস সভ্য মানুষ খুব অল্প ব্যবহার করে—যার জন্য সে নিজের রাষ্ট্রকে কর দেয় না। কিন্তু যেহেতু তাকে সহজে কর দিতে হয় না—সে যখন অধিক মূল্যে কোনো পদার্থ কেনে, দোকানদারকে গালাগালি দিয়ে তাপিত প্রাণ শীতল করে। অবশ্য হিসাব-মত সে রোষের কতকটা প্রাপ্য সরকার বাহাদুরের। অত হিসাব ক'রে মানুষ দোষগুণ বিচার করে না। সে হয় কুরু-কুল চেপে পড়ে, নয় পাণ্ডব-কুল। অবশ্য আয়ারল্যাণ্ডে গালাগালি খায় সরকার—দোকানদার



পেনাংয়ে চীনাদের বাড়ী

নয়। ভাত খাবার সময় ভাবি না—আমার চাষা-ভাই কতখানি জলে-কাদায় দাঁড়িয়ে—মাথার ব্রহ্মতলে কি প্রকার নিদারুণ সূর্য্যের প্রচণ্ড অগ্নিবাণ সহ্য ক'রে আমার ভুরি-ভোজনের ব্যবস্থা করে। সে সব অপ্রত্যক্ষ অজ্ঞাত পরিশ্রম অবজ্ঞাত আহারের সময়। কিন্তু আমারই মত একজন মানুষ পাঁচ পয়সার জন্য দরদর ধারে ঘামচে—আর আমার অদূরে টাট্টু ঘোড়ার মত কদম-বাজি করছে, সে নিদারুণ কাণ্ড আমার দরদী প্রাণকে লজ্জায় ব্যথা দেয়। আর তার ওপর যখন দেখি আমার নিজের দেশের দুঃখী লোক একটা চীনে কিম্বা কাবুলীকে গাড়িতে চড়িয়ে আমারই

দেশের রাজপথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—আমার চিত্তের নীচের কোটায় স্বজাতি-প্রীতি স্বদেশ-প্রেম বলশেভিজম জোট বেঁধে আমাকে হীন করে, ক্ষুব্ধ করে।

রেঙ্গুনে রিক্‌সা টানে তেলেগু কুলী। রাজ্যের লোকের সে ভারবাহী। তাই মলয়ে নেমে চীনে শ্রমিক দেখে প্রতিহিংসা-বৃত্তি একটু মাথা তুললে। কিন্তু প্রতিহিংসা-গড়া সুবিমল আনন্দটুকু স্থায়ী হ'ল না। কারণ মানুষ গাড়ির চীনে বাহক দীন নয়। হিন্দুস্থানী কুলির দীনতা হীনতা নগ্নতা মলিন করে নি চীনে শ্রমিককে। দার্জ্জিলিঙের তিব্বতীয় কুলীর গায়ে আছে অনেক কাপড়—কারও কাণে ফিরোজার কর্ণাভরণ আছে। কিন্তু তার গায়ে ইয়াকের



মলয় দেশীয় ডাক-হরকরা

ও মারথরের মত বোট্‌কা গন্ধ, আর তার চামড়ার ওপর সাড়ে তিন পুরু ময়লা। চীনে-কুলী কিন্তু মোটে মলিন নয়। তার হল্‌দে চামড়া বেশ তেলচুকচুকে—আর তার জামা-পায়জামা বেশ পরিষ্কার। দাঁতের অবস্থা নিখুঁত ভাল নয়। তবে যেহেতু চীনে হাসে কম—তার দেহের আভ্যন্তরীণ অবস্থা প্রকাশ্য গবেষণার প্রসঙ্গ হ'তে পারে না। আসল কথা সে নিজেকে আমাদের কুলীর মত বেচারা ভাবে না। আর গরীব-আদমী গরীব-আদমী ব'লে নিরন্তর দৈন্যের প্রচার (প্রপাগাণ্ডা) করে না। কাঠের মিস্ত্রী যেমন মোটা চুরুট মুখে দিয়ে শিল্পকে উপার্জ্জনের উপায় করেছে—চীনে রিক্‌সাওয়ালাও তেমনি চুরুট মুখে দিয়ে মানুষগাড়ি-টানা শিল্পকে জীবিকার্জ্জনের সম্ভ্রান্ত অস্ত্র ব'লে গ্রহণ করেছে। তবে ইউরোপের শ্রমিকের মত সে শ্লেষ দিয়ে কথা বলে না—অন্তত বিদ্রোহী ভাবগতিক দেখায় না। " কি বলে অবশ্য তা স্বর্গীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্ হরিনাথ দে মহাশয়ও বুঝতে পারতেন না।

রিক্‌সা-গাড়ি চীনের জাতীয় অনুষ্ঠান—একা যেমন পশ্চিম ভারতের। দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছে চৈনিক-সভ্যতা শিল্পকে—হিন্দুস্থান যেমন ধর্ম্মের ক্রিয়াকাণ্ডকে জড়িয়েছে। তাই চীনা-শ্রমিকেরও কুটীরে এবং দেহের সাজে তার বিশিষ্ট জাতীয় শিল্পের নিদর্শন বিদ্যমান থাকে। চীনাদের রিক্‌সা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—আর তার গায়ে আঁকা থাকে ড্রেগন—আমরা যাকে বলি চীনের ভূত—অথবা স্বভাবের দৃশ্য, যার মধ্যে অন্তত একটা পোল আছে। উপবনের অন্তরকে সরস করে চিত্রিত বাঁকা খালের তরল সুষমা—তার উপর সেতু। বুদ্ধিজীবী মানুষ শ্রম ও শিল্পের সাহচর্য্যে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে যথেচ্ছা উপভোগ কর্ত্তে পারে—এই সত্যকে পরিচিত কর্ব্বার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় চীনা ও জাপানী শিল্পে এত সেতু-বন্ধনের পরিকল্পনা।

বলেছি মলয়ের সব ব্যাপারে নূতনত্ব আছে। পোষ্ট পিওন মলয়জাতির হ্যাট-কোট-পরা। পুলিস শিখ ও মলয়। ট্রাফিক্ পুলিস বিচিত্র। তার পিটে লম্বা একটা বেত দিয়ে বোনা সাইন-বোর্ড আছে। তাতে লেখা আছে স্টপ্। সে যেদিকে পিছন ফিরে দাঁড়ায় সেদিকে তার পিঠের লেখা দেখে গাড়ি থামে—সামনের গাড়ি থামে তার হাতের ইসারায়। পুরীতে পুলিস দাঁড়ায় একখানা জল-চৌকির উপর। এখানে অনেক চৌমাথার মাঝে বেশ কায়েমী বেদী আছে কালো-শাদা রঙের চৌখপ্পী আঁকা যাদের অঙ্গে। পুলিস দাঁড়ায় তার উপর। আমেরিকায় কলের পুতুল—রনট ঘুরিয়ে পথের যান নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা হ'চ্চে। কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষকে একটা পুত্তলিকায় পরিণত ক'রে তার পৃষ্ঠে সাইন বোর্ড বেঁধে দেওয়ায় মানব-প্রকৃতি অবজ্ঞাত ও অবমানিত হয়েছে ব'লে বোধ হয়। এ ব্যবস্থা করেছে যারা, তারা নিশ্চয়ই পাশ্চাত্যের লোক—যাদের বর্ণ-কৌলিন্য হাস্যাস্পদ শিখ ও

মালাই পাহারাওয়ালার মনস্তত্ত্ব বিচার ক'রে সময় নষ্ট করতে চায় নি।

বৃটিশ ঔপনিবেশিকের দৃঢ়-শাসনে এবং মলয় চীনা ও ভারতীয় অধিবাসীর পরিশ্রমে ও নাগরিক কর্ত্তব্য-বুদ্ধির শৃঙ্খলার আশীর্ব্বাদে মলয়ের পথ-ঘাট গৃহ-প্রাঙ্গণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পিনাঙে নেমে প্রথমেই এই কথা মনে হয়। ভারতবর্ষের কোন নগর এমন পরিচ্ছন্নতার গর্ব্ব করতে পারে না। পেনাঙের ম্যাকাডাম ঢাকা রাস্তা ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। একটি কুটো নাই ছেঁড়া কাগজ নাই—জঞ্জাল তো নাই। কোন কোন রাস্তা কংক্রিটের। চীনেদের ছেলেরা চীনের বাদাম খেয়ে পথে খোসা ফেলে না। আধুনিক প্রাচ্যের চিরাচরিত কু-প্রথাকে মলয় বর্জ্জন করেছে।

একেবারে খাঁটি নিম্ন-স্তরের শ্রমিকের বসতিও পরিষ্কার। কিন্তু চীনে-গন্ধ মারতে পারে না কোন শৃঙ্খলা। কারণ তাদের খাদ্যের মন্দ-গন্ধ তামাকের তীব্র-বাসের সঙ্গে মিলে একটা আঁস্‌টে কড়া গন্ধের সৃষ্টি করে—কলিকাতার ব্ল্যাক-বারণ লেনের যেমন সুবাস। এরা খায় সুঁটকী মাছ, শূকর, সিদ্ধ-হাঁস-ভাজা—আর ভাত। একটা চীনা-মাটির পাত্রে ভাত রেখে তাকে এক হাতে ধরে আর ডান হাতে দুটা কাটি নিয়ে খায়। ভাতের পর ভাত সার বেঁধে সুড়সুড় ক'রে মুখের মধ্যে প্রবেশ করে।

ভদ্র চীনেরা একেবারে সাহেব হ'য়ে গেছে—অবশ্য তাতে চৈনিক সংস্কৃতির বিশিষ্টতা হারায় নি। মেয়েরা কেহ কেহ ফুল-আঁকা ড্রাগন চিত্রিত রেশমী কাপড়ের ঢিলা পায়জামা ও কোট পরে। আবার অনেকে মেমেদের মত স্কার্ট পরে। পিজিন্‌ ইংরাজি বলে প্রায় সকলে।

পিনাঙ্‌ পাহাড়ের ওপর চমৎকার একটা রেস্তোরাঁ আছে। দুহাজার ফুট উঁচু শৈল-শিরে একটা গাছের তলায় টেবিল চেয়ার সাজানো। সেখানে চীনা খানসামা চা মিষ্টান্ন প্রভৃতি সরবরাহ করে। বিলাতী হোটেলের মত ধবধবে চাদর পাতা—অবশ্য টেবিল-ঢাকায় সনাতন ড্রাগন আঁকা। দুইটি চীনা তরুণীর সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিলে তাদের পুরুষ সঙ্গীরা। কথা-প্রসঙ্গে অতি মোলায়েম ভাবে তাদের জিজ্ঞাসা করলাম—তারা বিলাতী পোষাক পরে কেন?

যুবক হেসে বল্লে—আপনাদের পোষাক ত ভারতীয় নয়।

—আমি মহিলাদের কথা বলছি। আমাদের মহিলারা সর্ব্বত্র—এমন কি ইউরোপেও ভারতীয় পোষাক পরেন।

একটি যুবতী হেসে উত্তর দিল।

—আমাদের চীনা ভদ্র-পোষাক বড় ভারী ও ঝল্‌মলে। বিশাল আলখাল্লা—ভীষণ চিত্র বিচিত্র যেমন চিত্রে দেখেন। সাধারণ পাজামা-কোট পোষাক খুব বেশী লজ্জা-নিবারক নয়।

—সাড়ী পরেন না কেন? ড্রাগন আঁকা—চীনের সেতু চীনের মন্দির চিত্রিত।

তারা হাসলে। বল্লে—সাড়ী আমাদের কৃষ্টির বাহিরে। অবশ্য গাউন কেমন ক'রে তার ভিতরে প্রবেশ কল্লে



সিঙ্গাপুরের রিক্‌সা

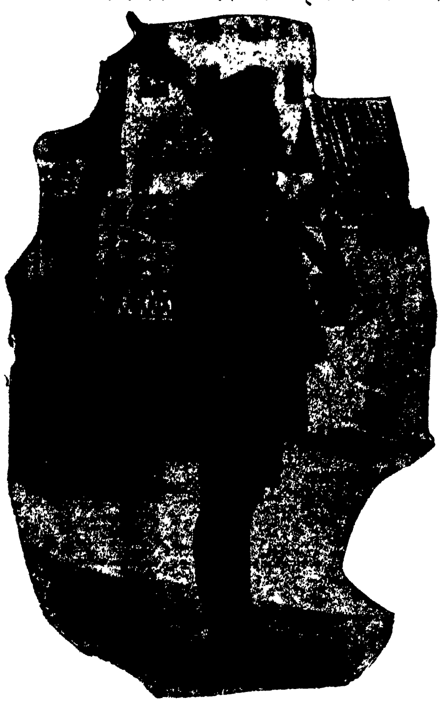
বুঝলাম না। মলয়-মহিলারা শিক্ষিত হ'লে অনেকে দেখলাম সাড়ী পরে। তবে সাধারণতঃ রঙীন লুঙ্গি বা সারঙ্‌ হল তাদের জাতীয় পরিচ্ছদ। দ্রাবিড়িয়েরা অবশ্য মাদ্রাজের প্রথায় রেশমী সাড়ী পরে। বিধবা হিন্দু মহিলা শুভ্র-বসন ব্যবহার করে।

বলছিলাম পথ-ঘাটের পরিচ্ছন্নতার কথা। বিশেষ—হেথায় আর্য্য হেথা অনার্য্য হেথায় দ্রাবিড় চীন—নিজ নিজ সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য যথা-সম্ভব বজায় রেখে বাস করে। এর কারণ আছে দুটা। প্রথমত শাসন দৃঢ়। যাদের হাতে শাসন-ভার তারা শাস্তি দিয়ে আইনের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখে। প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে আছে এক একটা আবর্জ্জনা ফেলবার আবৃত আধার। তার মধ্যে জঞ্জাল

লুকিয়ে রাখতে হয়—যথাসময়ে ধাঙড় এসে তাকে নিয়ে যায়।

দ্বিতীয় কারণ পাশ্চাত্যের লোকের সর্ব্বদা চেষ্টা থাকে ঘরের ময়লা ঢেকে রাখবার। সাধারণ স্থলে ময়লা কাপড় কাচা—নিকৃষ্ট নিন্দনীয় কদাচার। মলয় ইংরাজের উপনিবেশ। বৃটেন নিজের এই উৎকৃষ্ট জাতীয় আচারটি ওদেশে প্রবর্ত্তিত করেছে।

গৃহ পরিষ্কার ক'রে ঠিক প্রবেশ দ্বারের পার্শ্বে স্তূপাকারে ময়লা রাখা আমাদের কতদিনের বদ্‌-স্বভাব কে জানে।



সিঙ্গাপুরে সশস্ত্র পুলিস (শিখ)

ধর্ম্মালয়ে প্রবেশ করতে গেলে প্রথমেই দর্শনলাভ হয় ধূলা-কাদা মাখা অসংখ্য নূতন পুরাতন ছেঁড়া আধ-ছেঁড়া সুস্থ ও জীর্ণ-দেহ পাদুকা। ফরাস-বিছানো বৈঠকখানায় গৃহ-স্বামীর শিল্প-সম্পদ চোখে পড়বার পূর্ব্বে দৃষ্টিগোচর হয় আগন্তুকের পাদুকা প্রবেশ পথে। আবার শেষের অতিথি পূর্ব্বাগত অতিথির পাদুকাকে পদদলিত ক'রে নিজের জুতার নিরপত্তার ব্যবস্থা করে।

ভারতবর্ষ নিজের ঘরের জঞ্জালকে ধামা চাপা দিয়ে রাখতে শিখলে আজ সে সংসারে এত লাঞ্ছিত হ'ত না। গৃহ-বিবাদ সব দেশে আছে। কিন্তু অতীব ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখি ভারতবাসী মার্কা-মারা সাম্প্রদায়িক ঝগড়াটে। সার ফিলিপ গিব্‌স্ তার প্রসিদ্ধ সু-লিখিত 'সিক্স মেন' নামক পুস্তকে মহা-যুদ্ধের পর সকল দেশের দলাদলি লাঠালাঠির সমাচার দিয়েছে। সে সব রক্তের স্রোতবহা কলহ সে অভিব্যক্তির সোপান-রূপে গ্রহণ করেছে। কিন্তু অভাগা ভারতবাসিগণ ইংরাজের আওতায় না থাকলে তারা কামড়া-কামড়ি ক'রে মরবে। তাদের গৃহ-বিবাদ অসভ্য মনস্তত্ত্বের বিকাশ ইত্যাদি ইত্যাদি। লেখক এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন এদেশ সম্বন্ধে ঘরের জঞ্জাল বাহিরের লোকের সামনে ধরবার প্রবৃত্তি ভারতবাসীর প্রবল ব'লে। তার দেশে উকীল মোক্তার এটর্ণী ব্যারিষ্টার বিনা মূলধনে ব্যবসা চালিয়ে পুষ্ট হয় এই দুর্ব্বলতার কল্যাণে।

পিনাঙ্‌ দ্বীপ পরিক্রমণ করবার একটা চমৎকার পথ আছে। সমস্ত চক্করটা প্রায় ষাট মাইল। দ্বীপ-প্রদক্ষিণ করলে সহর, গ্রাম এবং ম্যাঙ্গোষ্টিন নারিকেল কদলী প্রভৃতির বাগান দেখা যায়। এক এক স্থলে পাহাড়ের উপর উঠ্‌তে হয় দার্জ্জিলিঙের পথের মত পথ দিয়ে। উপত্যকার বনের ভিতর দিয়ে যখন সমুদ্র দেখা যায় প্রাণ উল্লাসে ভরে ওঠে। ঠিক্ সহরের বাজারের বাহিরে বড় বড় বাগানের ভিতর ধনী চীনাদের বাড়ী। অট্টালিকা হিসাবে আমাদের দেশের ধনীদের বিলাস-ভবনের সঙ্গে তাদের তুলনা হ'তে পারে না। কিন্তু তারা ভারি সুদৃশ্য।

বাগানের সখ এশিয়া-বাসীর খুব প্রবল—কারণ তাদের ভূ-খণ্ডে গাছ-পালা জন্মে প্রচুর। এ বিষয়েও কৃষ্টি ও সৌন্দর্য্য-বোধ হিসাবে ভিন্ন জাতীর রুচি বিভিন্ন। অদ্ভুত জাত চীনে এ সম্বন্ধে। তার বাড়ীর সম্মুখে সবুজ মাঠ রেখে তাকে ফুল গাছ দিয়ে ঘেরে। সেই গাছের বিথীতে লোহার জালের হাঁস, ময়ূর, কুকুর, ভেড়া সিপাহী তৈরী করে। তার ভিতর ডুরান্‌ণ্ডা, মেদী, রমন, জবা প্রভৃতি গাছ পোতে। গাছ বড় হ'লে সেই তারের কাঠামোর আকারে তাকে ছেঁটে দেয়। তখন মনে হয় যেন বাগানের মধ্যে গাছের ময়ূর বা ময়ূর-গাছ বিদ্যমান আর তাদের গায়ে ফুল ধরেছে। প্রকাণ্ড গাছের বোঝা চীনে-বর্ম্মা পরা একটা বাগানে দেখে বিস্মিত হ'য়েছিলাম। বাগানের রেলিঙে আবার

যেমন গোড়া মাটির থাম বসাই—ইঁটের গাঁথুনীর সাথে—ওরা বসায় চীনে-মাটির বাঁশের প্রতিকৃতি—মাস্ গাঁট অবধি। বেশ দৃষ্টি-সুখকর সেগুলা। আর বাড়ীর গাড়ি-বারান্দায় থাকে প্রকাণ্ড একটা চীনের ফানুস—যার মধ্যে জলে বিদ্যুতের আলো।

বর্ম্মা হ'তে কোরিয়া মাঞ্চুরিয়া অবধি সর্ব্বত্র কুটীরগুলা মাচার ওপর নির্ম্মিত। সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে হয় বাড়ীতে। বাড়ীর নীচে রাত্রে গরু-বাছুর থাকে। ঐ রকম মাচানের ওপর বড় বড় মালাই বিদ্যালয় আছে—গৃহস্থের বাসস্থানের তো কথাই নাই। নাক-চেপ্‌টা লোকেরা কাঠের কাজে দক্ষ। এই সব গ্রাম্য কুটীরের চারিদিকে বারান্দা থাকে বাঁশের রেলিঙ ভারি মনোরম। বারান্দায় মাদুর পাতা। একই গ্রামে চীনে, মালাই ও মাদ্রাজী থাকে। চীনে বৌদ্ধ শূকর খায়—মলয় মুসলমান শূকরকে ঘৃণা করে হাঁস মোরগ খাসি খায়—দ্রাবিড় হিন্দু ঐ রকম সব খাদ্যকেই ঘৃণা করে। তিনজনেই ভাত খায়। বেশ শান্তিতে থাকে ওরা। সবাই মালাই ভাষা বলে। কিন্তু মলয় লেখে আরবী অক্ষরে, চীনে লেখে চৈনিক অক্ষরে—আর ভারতীয় লেখে তামিল বা তেলেগু অক্ষরে। পোষাক-পরিচ্ছদও তিনজনের বিভিন্ন। এদের মধ্যে চাকুরীর উমেদারী নাই তাই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা নাই। হ'লে ভারি সুবিধা—মাচানে গড়া বাঁশের বাড়ি—মাদুর কিম্বা দরমা ঘেরা—এক দিয়াশলাইয়ের ওয়াস্তা।

এই পরিক্রমণের সময় বোঝা যায় মলয় কত সুন্দর। পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী ইত্যাদি ইত্যাদি মূর্ত্ত হ'য়ে আনন্দিত করে পর্য্যটককে। ভায়ের মায়ের স্নেহ কতখানি কি তা জান্‌তে পারি নি—অল্প সময়ে জানতে চেষ্টাও করি নি।

এই পথে মাঝে মাঝে বরাবরের ম্যাঙ্গোষ্টিনের নারিকেলের আবাদ আছে। প্রত্যেক বাগানই বিস্তৃত। তাদের মালিক ইউরোপীয় কিম্বা চীনা। সুপারী বা নারিকেল বাগানের বোধহয় মলয় অধিস্বামী আছে।

রবারের ব্যবসা দুইভাগে বিভক্ত। রবার উৎপাদন এবং রবারের জিনিসপত্র নির্ম্মাণ। পিনাঙ্‌ দ্বীপে রবার-গাছের বাগান আছে। সে সব বাগানের শ্রমিক প্রায় অধিকাংশ ভারতবাসী—তেলেগু, তামিল এবং অল্প সংখ্যক হিন্দুস্থানী। এরা রবার গাছের গা কেটে ছোট ছোট পাত্র বেঁধে দেয়—সেগুলা যখন শাদা গঁদে ভর্ত্তি হয় গাড়িতে চেলে কারখানায় নিয়ে যায়। সেখানে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গঁদ বা ল্যাটেক্স পরিণত হয় রবারে। এখন সে ঢালাই হয়ে কাপড়ের মত রবারের থান হয়। তারপর কাটাই ছাঁটাই করে চীনেদের স্ত্রী-পুরুষ এবং মালাই।

মলয়কে সম্পদশালী করেছে—রবার আর টিন। পেনাঙ্‌ মানে সুপারী। পেনাঙ্‌ হ'তে শত শত বস্তা সুপারী চালান হয় প্রতি জাহাজে কলিকাতায়। নারিকেল হয়



সিঙ্গাপুরের ট্রাফিক পুলিস (গাড়ী থামাইবার সঙ্কেত সমেত)

এক একটা প্রায় পনেরো ইঞ্চি লম্বা—সেই পরিমাণে গোল। নারিকেল চালান হয় দেখলাম। কিন্তু কলিকাতায় তো ঐ শ্রেণীর নারিকেল দেখি না—কে জানে চালানী ফল কোথায় যায়। নারিকেল তৈল লোহার পীপায় খুব অধিক মাত্রায় চালান হয় পিনাঙ্‌ প্রভৃতি মলয়ের বন্দর হ'তে। নারিকেল ছোব্‌ড়ার কারখানায় মেয়েরা কাজ করে—নারিকেল দড়ি পাকায় পুরুষে। কাতা কাছি প্রভৃতিরও ব্যবসায়ে মলয় অর্থ উপার্জ্জন করে। অবশ্য লাভ

করে বিদেশী ধনিক—কিন্তু মলয় নিবাসী তার সুবিধা পায় পরোক্ষ ভাবে। মোট কথা ওদেশকে সবাই উপার্জ্জনের স্থান ভাবে, তাই সকলে পাল্লা দিয়ে পরিশ্রম করে। প্রত্যেক পদার্থের আদর আছে। আমাদের দেশে এক একটা আদালতের প্রাঙ্গণে যত ডাবের খোলা পড়ে থাকে—তাদের ছোবড়ায় দড়ি পাকালে অনেক অকেজো জুয়াচোরের ভবপারে যাবার ব্যবস্থা হ'তে পারে। কালীঘাটের বাজারেরও শ্রী-মন্দিরের আশেপাশের রাস্তার ডাবের খোলার তো কথা নাই।

মলয়ের বিপুল-দেহ আনারস প্রসিদ্ধ। আনারসের কারখানা সিঙ্গাপুরের দিকে হয়েছে অনেক। মেয়েরা কাজ



চীনা রমণী বাজারে যাইতেছে

করে ঐ সব কারখানায়। কলিকাতায় এক টিন ঐ আনারস তিন আনায় পাওয়া যায়। ওদেশের ডোরিয়ান এক বিচিত্র ফল। দেখতে কাঁটালের মত—গায়ের কাঁটাগুলা বড়। একটা ফল ভাঙ্গলে বাধা-বিঘ্ন না পেলে অক্লেশে এক ফার্লঙ্ অবধি তার দুর্গন্ধ বিস্তার লাভ করে। জাহাজের এক কর্ম্মচারী বলেছিল—খেতে ও-ফল ভারি সুস্বাদু। বোধ হয় ভদ্রলোকের ধারণা যে ঈশপের লাঙ্গুল-হীন শৃগালের গল্পটা বাঙ্গালা ভাষায় অনুদিত হয় নি।

পরিক্রমার পথ পাহাড়ের গিরিবর্ত্ম ছেড়ে আবার নামে খোলা জমিতে। পিছনে সবুজ-গাছে-ভরা শৈল, তার সানুদেশে ধান-জমি। স্থানটি স্মরণ করিয়ে দেয় ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণা। কৃষকের ভঙ্গীও খুব বিভিন্ন নয়, কারণ মলয় লুঙ্গি পরে। তবে তার মাথায় বিলাতী হ্যাটের ধরণের টুপি।

মহিষ এদেশের কৃষকের সহায়। এ দেশের লাঙ্গলা মহিষ আমাদের দেশের মহিষের মত অত মোটা হয় না। বনের ধারে নাবাল জমি—নিশ্চয়ই ম্যালেরিয়ার মশা জন্মায় সেখানে। শুনলাম মলয়ে ম্যালেরিয়া খুব কম। এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করবার সময় আমাদের ছিল না।

বহুদিন শুন্‌তাম পিনাঙের সর্প-মন্দিরের কথা। বন্দর হ'তে দশ বারো মাইল দূরে এই সর্প-মন্দির। একটা ছোট বাড়ি—অবশ্য চারিদিকে একটু বাগান আছে—চীনা-মাটির টবে ফুলগাছ আছে। মন্দিরের ঘরে দেওয়ালে কাঠের থাক—তার ওপর চীনে বুদ্ধ এবং মহাপুরুষদের মূর্ত্তি। চীনামাটির ফুলদানে ফুল আছে। ধূপ ধূনা আর চীনে তামাকের গন্ধ ঘরের মধ্যে। মাঝে একটা মস্ত টেবিল আছে—যেমন বেণ্টিক ষ্ট্রীটে জুতার দোকানে থাকে। তার ওপর সার সার আট দশটা চীনামাটির টবে তিন ফুট চার ফুট উঁচু বহু-শাখ শুক্‌নো গাছ। তাদের জড়িয়ে বেশ হৃষ্টপুষ্ট অনেকগুলা সবুজ সাপ—কেহ নিদ্রিত, কেহ গোল গোল পুঁথির মত চোখে তাকাচ্চে, কেহ জিভ্ ভাঙ্গাচ্চে চেরা-জিহ্বায়। কতকগুলা শাখা হতে যাচ্চে শাখান্তরে। কেহ বা সর্প-গতিতে টেবিলের ওপর পায়চারি করছে। আমাদের আলিপুরের ভুজঙ্গমদের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে অবশ্য জন কতক কুণ্ডলী পাকিয়ে দিবানিদ্রা-বিলাস উপভোগ করছিল।

পাইপ হাতে একজন চীনে দাঁত বার করে হাসলে। দাঁতগুলা তার তামাকের ধোঁয়ায় ধূসর-বর্ণ ধারণ করেছিল।

ইংরাজি বললে সে হাসে। চীনে জানি না, মালাই-বুলি আয়ত্ত নাই। মুখে হাত দিয়ে সাপেদের দেখিয়ে সঙ্কেতে জিজ্ঞাসা করলাম—নাগেরা কি খায়।

জবাব দিলে চীনে ভাষায়। ভাবলাম কোনো ধাতু প্রত্যয়ের মধ্যে যখন ব্যাঙ্ আসে না, তখন ব্যাঙ্ শব্দ

বাঙ্গালায় এসেছে চীনে হ'তে। বিশেষ তার অঙ্গে যখন অ্যাঙ আছে।

বল্লাম—ব্যাঙ্‌। ব্যা—রা—ঙ্‌।

অসম্ভব! লোকটা নিজের ভাষাও বোঝে না। কেবল হাসে—আর হাসির সঙ্গে বিকশিত হয় রঙ্‌-বদলানো দাঁতের পংক্তি।

শেষে এক মলয় এলো। সে ভাঙ্গা ইংরাজী বলে। অবশ্য সাপেরা ব্যাঙের বাচ্ছা পোকামাকড় খায়। রাত্রে এরা বনে চলে যায়—আবার রাত্রে এদের বন্ধু-বান্ধব আসে—নাগ-সভা হয়। মোটামুটি অনেক বাজে কথা। অবশেষে অকস্মাৎ দেখা গেল আমাদের অব্যবহিত পশ্চাতে এক বিশাল-দাড়ি চৈনিক মহাপুরুষের ছবির ফ্রেমে একটা সাপ জিম্‌ন্যাষ্টিক করছে।

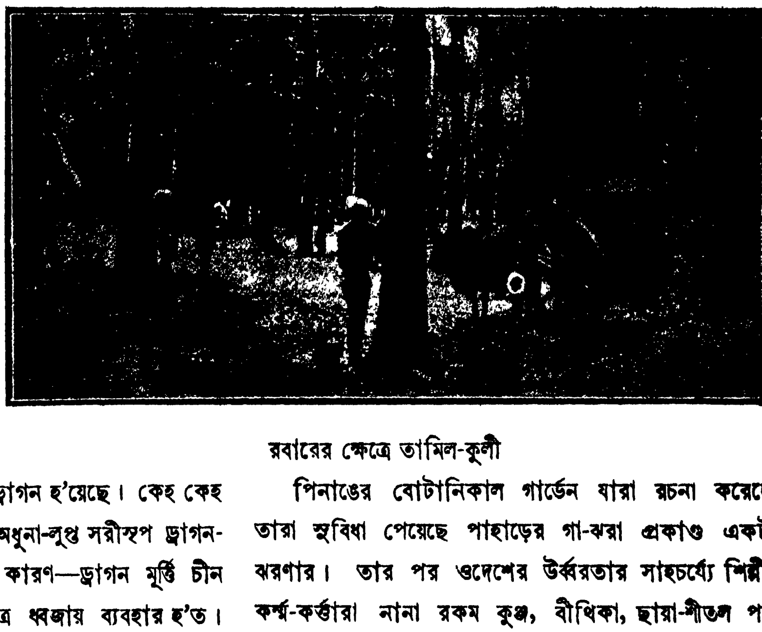
তার পর মাত্র দে-চম্পট ভিন্ন অন্য কিছু করবার রহিল না।

বাগানে বসে গবেষণার দ্বারা স্থির করলাম—সেগুলা লাউডগা সাপ—ভেক, কচি ইঁদুর আর গঙ্গাফড়িঙ্‌ আফিমের টাক্‌না দিয়ে খায়।

নাগপূজা কেবল ভারতবর্ষের অনার্য্যদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল না—উত্তর পূর্ব্ব এশিয়ার সর্ব্বত্র ছিল সাপের পূজা। সাপই আদর পেয়ে চীনে ড্রাগন হ'য়েছে। কেহ কেহ বলেন কোনো প্রাক্‌-ঐতিহাসিক অধুনা-লুপ্ত সরীসৃপ ড্রাগন-রূপে মনুষ্য সমাজে সমাদৃত। কারণ—ড্রাগন মূর্ত্তি চীন থেকে প্রাচীন বৃটেন অবধি সর্ব্বত্র ধ্বজায় ব্যবহার হ'ত। ভারতবর্ষে সর্প বাসুকীরূপে পৃথিবীকে ধারণ করে। সে মহাদেবের অঙ্গের ভূষণ। পুরাণে সর্প বৈনতেয় রূপে প্রসিদ্ধ। অনার্য্যেরা শিলা ও নাগ-নাগিনী সূর্য্যরূপী ভগবানের প্রতীক-রূপে পূজা করে।

প্রাচীন পার্থীয়দের যুদ্ধের নিশান ছিল কাপড়ের ফাঁপা ড্রাগন। বৃটেনের রাজা হ্যারল্ডের ড্রাগন-পতাকা ছিল। ক্রেসীর যুদ্ধে ইংরাজদের জলন্ত ড্রাগনের চিত্র ছিল নিশানে। টেনিশন আর্থার রাজার গাথায় ড্রাগনের উল্লেখ করেছেন। রোমানদের ড্রেকোন কেতু ছিল। সুতরাং নাগ এবং তার আত্মীয় ড্রাগন মাত্র চীনেদের পৈতৃক সম্পত্তি নয়। আমি ওদেশ থেকে যত জামা এনেছি——সকলের গায়ে ড্রাগন আঁকা। আর ঐ জীব অঙ্কিত অনেক আজব পদার্থ আমি সংগ্রহ করেছি।

পিনাঙের বোটানিক গার্ডেন বড় চমৎকার। কেহ যদি এক এক মুঠা অন্ন দেয়—সারাদিন এখানে বসে স্বর্গসুখ ভোগ করা যায়। বিশ্বের অনেক সৌন্দর্য্য পুঞ্জীভূত ক'রে কে যেন এই উপবন সৃজন করেছে। এক এক দিকে এক এক রকমের দৃশ্য। গাছ ও তাদের ছায়া, ফুল ও তাদের সুষমা, সরোবর আর প্রকাণ্ড জলপ্রপাতের তরলতা আর শত শত পক্ষীর কাকলী স্থানটিকে এত মনোরম করেছে।



রবারের ক্ষেত্রে তামিল-কুলী

পিনাঙের বোটানিকাল গার্ডেন যারা রচনা করেছে তারা সুবিধা পেয়েছে পাহাড়ের গা-ঝরা প্রকাণ্ড একটা ঝরণার। তার পর ওদেশের উর্ব্বরতার সাহচর্য্যে শিল্পী-কর্ম্ম-কর্ত্তারা নানা রকম কুঞ্জ, বীথিকা, ছায়া-শীতল পথ নির্ম্মাণ ক'রে নাগরিকের বিরামকে সরস করেছে। তাল-জাতীয় অশেষ প্রকার বৃক্ষ জন্মে সমুদ্রের উপকূলে দ্বীপে ও উপদ্বীপে। ফুলও ওখানে ফোটে খুব। আর ফার্ণ। ষ্ট্যাগ-হর্ণ-ফার্ণ নামক এক রকম ফার্ণ দেখলাম—আকার ঠিক বার-শিঙ্গা হরিণের শৃঙ্গের মত—অতি সুদৃশ্য। পদ্মগাছাও অনেক রকম হয় কিন্তু আমরা যখন ছিলাম তখন পদ্মগাছার বাৎসরিক ফুল ফোটেনি। খুব বড় বড় পদ্মে ভর্ত্তি ছিল

এক নিভৃত উপত্যকার ছায়া-শীতল সরোবর। অবশ্য তার ওপর পুল ছিল।

সকল মৃণালে কণ্টক আছে। একটা কোণে ঝিল্লীরব-মুখরিত এক গাছের ছায়ায় ক'টা চীনের ছেলে বসেছিল। আমাদের দেখে একটু গম্ভীর হয়ে শান্ত-ভাবে বসবার চেষ্টা করলে। বুঝলাম কোন অপকর্ম্ম করছিল। সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠটিকে জিজ্ঞাসা করলাম—হাসি চাপবার চেষ্টা করছ কেন? কি দুষ্টামী করছিলে।



কুয়াটানে মলয় দেশীয় ধীবরদিগের গ্রাম

তারা দল বেঁধে হেসে উঠ্‌লো। তখন গাছের ঝোঁপের ভিতর থেকে দারুণ কিচিমিচি শব্দ হ'ল। চেয়ে দেখলাম রাজ্যের লেমার বানর। কি ব্যাপার?

এদের শান্ত-ভাব তিরোহিত হ'ল। এরাও নীচে লাফায় আর চিৎকার করে—বৃক্ষশাখে তদনুরূপ আস্ফালন করে শাখামৃগের দল। কবিতা গেল—আলোক ও ছায়া—প্রকৃতি ও শিল্প সব রসাতলে গেল। সেই অতি-বাস্তব রঙ্গরস এত গাঢ় যে তার কাছে এগুতে পারলে না সূক্ষ্ম কবিতার রস।

অনিল বল্লে—বাঁচা গেল। না হ'লে তোমার আহা উহু শুনতে শুনতে দম্ বন্ধ হ'চ্ছিল।

এটর্ণীদের প্রায় ঐ রকম কথা।

লেমারগুলা না বাঁদর না শেয়াল। ওগুলো শেয়ালমুখো বাঁদর। বাঁদরগুলো যেমন বা-নর অথবা-নর—এগুলো তেমন নয়। এরা আরও নিম্নস্তরের জীব।—এরা খুব আমোদ-প্রিয়।

অনেকের ধারণা আছে বাঙ্গালা দেশের চেয়ে মলয়ে পাখী বেশী। ধরণা সত্য নয়। কাকাতুয়া উড়ে বেড়াচ্চে—নৈসর্গিক পাখী—বার্ড অফ্ প্যারাডাইসের লেজের উপর রঙ্ খেলে যাচ্চে—এ চিত্র একেবারে ভুল। সেই সব মামুলী পাখী—শালিখ দোয়েল কোয়েল পাপিয়া হাঁড়িচাচা বুলবুল। তবে মুনিয়া বহুবর্ণের আর টিয়া চন্দনা ফুলটুসি মদনা ছাড়া তোতা আছে আরও ভিন্ন রঙের। ক্রমশঃ



বার্কলীর দর্শন

শ্রীঅমূল্যকুমার নাগ এম-এ

বিশপ্ বার্কলীর নাম দার্শনিক জগতে সুপরিচিত। "সর্ব্বমনোময়" দর্শনের জনক হিসাবে তিনি সমস্ত সভ্যজগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বার্কলীর ত্যাগ, বার্কলীর প্রতিভা, তাঁহার নূতন ধরণের দর্শন ইউরোপকে এককালে মুগ্ধ করিয়াছিল। ভারতীয়েরা কেহ কেহ ভাবিল—"বার্কলী ইউরোপের শঙ্করাচার্য্য।"

বার্কলীর দর্শনের শেষ কথা হইল "অস্তিত্বই অনুভূতি অর্থাৎ যাহা কিছু আছে সবই আমাদের অনুভূতির মধ্যে, বাহিরে কিছুই নাই। আমাদের অনুভূতি হয় আমাদের মনে, অতএব দুনিয়ার যেখানে যাহা আছে, সবেরই আধার আমাদের মন। মনের মধ্যেই সমস্ত বিশ্ব বিরাজ করিতেছে। মনের বাহিরে একটী অণুরও অস্তিত্ব নাই। যেখানে মন আছে সেখানে দ্রব্য আছে, যেখানে মন নাই সেখানে দ্রব্য নাই। এই আব্রহ্মস্তম্ব একমাত্র মনেরই লীলা। মোট কথা হইতেছে এই যে আমি যে সমস্ত দ্রব্য দেখিতেছি, যে সব শব্দ শুনিতেছি, যাহা কিছু স্পর্শ বা আস্বাদ করিতেছি অর্থাৎ যাহা কিছু ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে লাভ করিতেছি সবই আমার মনের "চিন্তা" (idea)। সবই আমার মনেই উঠিতেছে, ভাসিতেছে ও লয় পাইতেছে। আমার মন আছে তাই দুনিয়া আছে।

বার্কলীকে যদি প্রশ্ন করা হয় "মহাশয়, যখন আমি এই ঘরে থাকি না, তখন কি এই ঘরের টেবিলটি এখান হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়?" তবে তিনি উত্তর করিবেন, "যদি কেহ ঘরে উপস্থিত না থাকে, যদি কোনও ব্যক্তিবিশেষের মনের অভাব হয়, তবু ঘরের জিনিসগুলি অন্তর্হিত হইবে না, কারণ সেগুলি ভগবানের মনে বিরাজ করিবে। বস্তুতঃ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভগবানেরই মনে বিরাজ করিতেছে।"

ভারতীয় দার্শনিকগণ বার্কলীর কথায় খুসীই হইলেন। ভারতীয় দর্শনে বলা হয় যে এই জগতটা ব্রহ্মের সঙ্কল্প হইতেই উদ্ভুত। এই জগতের আর একটা নাম ব্রহ্মাণ্ড বা ব্রহ্মের অণ্ড। জগতের যাহা কিছু দ্রব্য সবই ব্রহ্মের সঙ্কল্প। অতএব জগত সঙ্কল্পময়। এই কথাই বার্কলী পুনর্জীবিত করিলেন। তিনি বলিলেন, "অস্তিত্বই সঙ্কল্প।"

বার্কলী এই কথাদ্বারা লোকের বহুকালের সংস্কারের উপর আঘাত করিলেন। সাধারণতঃ মানুষ বিশ্বাস করে যে জড় ও মন আলাদা বস্তু। জড় মনের উপর আঘাত করিয়া চৈতন্য সম্পাদন করে। এই বদ্ধমূল ধারণার প্রতি আঘাত করিয়া বার্কলী জগতের দৃষ্টি আপনার দিকে আকৃষ্ট করিলেন।

বার্কলীর বন্ধুরা বার্কলীকে তাঁহার মতবাদ লইয়া নানারূপ ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। এই সম্বন্ধে একটি বেশ মজার গল্প আছে। একদিন বার্কলীর একবন্ধু বার্কলীকে মাংস খাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। যথাসময় তিনি বন্ধুর বাড়ী গেলেন। বন্ধু বার্কলীর সহিত নানাদেশীয় নানাবিধ মাংসের কথা বলিতে লাগিলেন। খাইবার সময় উত্তীর্ণ হইয়াও কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। বন্ধু খাবার কোন আয়োজনই করিলেন না। তখন বার্কলী একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া বলিলেন, "কি হে তোমার মতলব কি? তুমি কি খেতে টেতে দেবে?" বন্ধু উত্তর করিলেন "কেন? আমি তোমাকে মাংস খাওয়াব বলেছিলাম সেজন্যই তোমার সঙ্গে এতক্ষণ মাংসের প্রসঙ্গ করলাম। আচ্ছা, তুমি যে এতক্ষণ মাংসের চিন্তা করলে এতে কি তোমার মাংস খাবার তৃপ্তি হয় নি। মাংসের চিন্তাই কি মাংস নয়?" বার্কলী বুঝিলেন যে তাঁহার বন্ধু তাঁহার নূতন দর্শনকে বিদ্রূপ করিতেছেন। তিনি এবার খানিকটা নিরুপায় হইলেন, যাহা হউক তাহার পর তাঁহার বন্ধু তাঁহাকে প্রচুর ভোজন করাইয়া দিলেন।

বার্কলীর মূল কথা হইতেছে যে তিনি খাঁটি জড় (Things in themselves) বলিয়া কোন জিনিসই মানেন না। তাঁহার মতে মনের বাহিরে কোন সত্তাই নাই। প্রকৃতপক্ষে আমি যাহা কিছু জানিতে পারি তাহাই আমার চিন্তা বা ভাবনা। অথবা আমি আমার মনের চিন্তা বা ভাবনা ছাড়া আর কিছুই জানি না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যখন আমরা একটা আতাফল চিন্তা করি তখন তাহার একটা বিশিষ্ট বর্ণ, আস্বাদ, গন্ধ, আকৃতি ও প্রকার আমাদের মনে জাগে। একটা পাথর, কি একটা গাছ, কি একটা বইর কথা বলিলেও ঐ ঐ জিনিসের বিভিন্ন ভাব (idea) আমাদের মনে উদিত হয়। এখন বার্কলী বলেন যে এইসব দেখিয়া শুনিয়া যদি আমরা বলি যে এক একটা জিনিস কেবলমাত্র আমাদেরই মনের ভাবসমষ্টি, তাহাতে দোষ কি?

বার্কলী এই কথা বলিয়াই চুপ করিলেন না। এই কথার ভিতরে যে খুঁত আছে তাহা নিজেই উপলব্ধি করিলেন এবং নিজেই তাহা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ব্যষ্টি মন ও সমষ্টি মন যে আলাদা তাহা বার্কলী স্বীকার করিলেন। বার্কলী আপনার মতবাদকে ব্যষ্টিজ্ঞানবাদে (Solipism) পরিণত করিতে চাহিলেন না। সমষ্টি জ্ঞানবাদই (necessary and universal knowledge) তাঁহার লক্ষ্য। যাহা সত্য তাহা সার্ব্বজনীন (universal) ও অবশ্যম্ভাবী (necessary)।

ব্যষ্টিজ্ঞানে সার্ব্বজনীনত্ব ও অবশ্যম্ভাবীত্ব নাই। আমার মন যাহা বলে রামের মন তাহা নাও বলিতে পারে, শ্যামের মন একেবারেই আলাদা কথা বলিতে পারে। ব্যষ্টিজ্ঞানবাদের মূল কথা হইতেছে, "আমার মন যাহা বলে তাহাই ঠিক।" বার্কলী কিন্তু এই বিষয়ে একমত হইতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, যখন আমার মন একটি

বিষয়ে একটা কথা বলিতেছে, তখন যদি আমার মত আরও পাঁচজনের মন সেই বিষয়ে একই কথা বলে তখনই বুঝিতে হইবে যে আমার মন ঠিক কথাই বলিতেছে। বস্তুতঃপক্ষে ইহাই বার্কলীর ন্যায় (Logic)। এইদিক দিয়া দেখিলে বার্কলীর ন্যায়শাস্ত্রে কোন দোষ দেখা যায় না। কারণ প্রচলিত ন্যায়শাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই যে যখন ক্রমাগত কতকগুলি লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে ইহা দেখা যাইতেছে, তখনই "মানুষমাত্রই মরণশীল" এই সার্ব্বজনীন সিদ্ধান্ত করা হইয়া থাকে। সুতরাং "মানুষমাত্রই মরণশীল" কথাটার মধ্যে যেমন কোন দোষ নাই, তেমনি বার্কলীর "পদার্থমাত্রই মনোময়" কথাটারও কোন দোষ দেখা যায় না। এইরূপে বার্কলী আপনার দর্শনকে ব্যষ্টিমনোবাদের খুঁত হইতে রক্ষা করিলেন।

তিনি আরও বলেন যে "পদার্থমাত্রই মনোময়" বটে কিন্তু মনের বিকার বা খেয়াল নহে অর্থাৎ একটা জিনিসকে আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই আমি দেখিতে সমর্থ হই না। তাঁহার কথার অর্থ হইতেছে যে কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারে গিয়া যদি মনে করি আমি দেশবন্ধু পার্ক দেখিব তখনই কলেজ স্কোয়ারটা অন্তর্ধান হইয়া সেখানে দেশবন্ধু পার্কের আবির্ভাব হইবে না প্রত্যেকটি দ্রব্যই মনোময় বটে কিন্তু মনের একটা নিয়ম ও অবস্থা আছে; সেই নিয়ম ও অবস্থা ব্যতীত সেই দ্রব্যের উপলব্ধি হয় না। দেশবন্ধু পার্ক অনুভব করিতে হইলে মনকে সেই অবস্থায় নিতে হইবে অর্থাৎ দেশবন্ধু পার্কেই যাইতে হইবে। দ্রব্যসমূহ যে মনেরই সঙ্কল্প—মনের বিকার, কল্পনা বা খেয়াল নহে—তাহাই বার্কলী প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন।

বার্কলীর কথায় ইহাই প্রমাণ হয় যে আমরা যাহাকে জড় বলিয়া জানি বাস্তবিকই তাহা মন ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহা হইতে আরও প্রতীয়মান হয় যে মনই একমাত্র সত্তা, মনই অনাদি অনন্ত, মনের পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। মন স্বয়ম্ভূ। এই সৃষ্টি মনেরই সঙ্কল্প ছাড়া আর কিছুই নহে। এই কথা কিন্তু বিজ্ঞানের বিরোধী। বিজ্ঞান কিন্তু বলিয়া থাকে যে, সর্ব্বপ্রথমে একমাত্র জড়ই ছিল এবং জড়ের বিবর্ত্তন বা ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মনের উৎপত্তি। জড়-বিজ্ঞান আরও বলে যে, পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হইয়াছে সে খুব বেশী দিনের কথা নহে, বস্তুতঃ তাহার সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতেই পৃথিবীর অস্তিত্ব ছিল। বাস্তবিক এই প্রকার যে বিজ্ঞান তাহার সহিত বার্কলীর কোন সহানুভূতি নাই। তিনি মন বা মনোভাব (Idea) হইতে একচুল এদিক ওদিক করিবেন না। তিনি বলেন মনোভাবগুলি হয়ত দ্রব্যাদির ন্যায় হইবে না, অথবা দ্রব্যাদির ন্যায়ই হইবে। যদি প্রথমটাই হয়, তাহা হইলে আমরা মনোভাবের সাহায্যে কিরূপে দ্রব্যাদি জানিতে পারিব? আর যদি শেষেরটাই সত্য হয় তবে ত দ্রব্যাদিগুলি ও মনোভাবগুলি একই পদার্থ হইয়া যায়। তবে আর অনর্থক মনোভাবগুলি বাড়াইয়া লাভ কি? অতএব তিনি দ্রব্যগুলিকে মনোভাবগুলি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন।

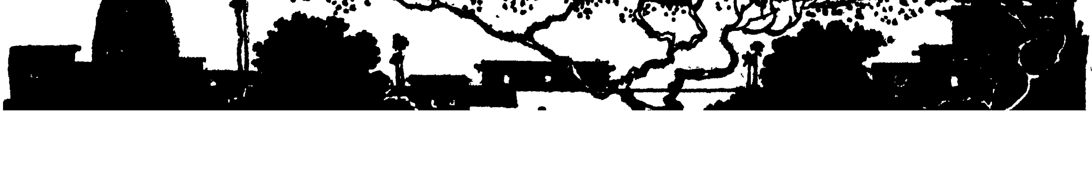
বার্কলী মনে করেন যে মনই কর্ত্তা (subject) এবং মনোভাবগুলিই কর্ম্ম (object)। তাহা ছাড়া আর কোন সত্য নাই। বার্কলী বলেন, "মানুষগুলির ধারণাটা অতি আশ্চর্য্য! তাহারা মনে করে যে গৃহ, পর্ব্বত, নদী ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থসমূহের প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব সত্তা আছে। মনের বাহিরেও তাহাদের একটা অস্তিত্ব নাকি আছে। এ ধারণাটা সত্যই বিস্ময়কর।"

প্রকৃতপক্ষে জড় (Matter) জিনিসটা বার্কলীর নিকট এতটা অসার, নিরর্থক ও অবাস্তব যে তিনি জড়ের অর্থ করিয়াছেন "অকিঞ্চন" (Nothing) অর্থাৎ আমরা "কিছু না" বলিতে যাহা বুঝি, জড় বলিতেও যেন আমাদের তাহাই বোঝা উচিত।

বার্কলী একবার জড়বাদীদের বলিয়াছিলেন, "আপনারা এবং আমি উভয়েই একথা মানি যে, বাহির হইতে একটা শক্তি আমাদের উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে। এখন এই শক্তিটা কিরূপ তাহা লইয়াই আমাদের মতভেদ। আমি বলি যে এই শক্তিটা আমাদের মন; আর আপনারা বলেন যে ইহা জড়; আমি ও আপনারা কিন্তু আর কোন তৃতীয় সত্তার কথা জানি না।"

বার্কলীর মতবাদ লইয়া ইউরোপে প্রকাণ্ড আন্দোলন চলিতে লাগিল। প্রচলিত দর্শন-বিজ্ঞানকে তিনি একেবারেই উড়াইয়া দিলেন। এক শতাব্দীরও উপর পর্য্যন্ত পৃথিবীর দর্শন ও বিজ্ঞান যেন স্তব্ধ হইয়া রহিল। ক্রমে ক্যাণ্ট ও হেগেল আসিয়া বার্কলীর "স্বকীয় ভাববাদ" (subjective idealism) উড়াইয়া দিয়া "পরকীয় ভাববাদের" (objective idealism) নিশান উড্ডীন করিলেন। হেগেলের পরে ডাক্তার হীরালাল হালদার বার্কলীকে ঘন ঘন আক্রমণ করিয়া বলিতে লাগিলেন "বার্কলী জানিবার অবস্থাটাকেই জ্ঞান মনে করিয়া ভুল করিয়া বসিলেন। ভাবনা কখনও ভাবনার বিষয়ে পরিণত হইতে পারে না।" হেগেলের "পরকীয় ভাববাদের" (objective idealism) ভিত্তি শক্ত করিতে গিয়াই হালদার মহাশয় ঘন ঘন বার্কলীর অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বস্তুতঃ বর্ত্তমান যুগে বার্কলীর "স্বকীয় ভাববাদের" প্রতিপক্ষগণের মধ্যে হালদার মহাশয়ই প্রধান। হেগেল বলেন, "ভাব ও পদার্থ একই বস্তু" (Thought and Being are identical)। এই জন্যই হেগেলের দর্শনে ন্যায় (Logic) ও পরাতত্ত্ব (Metaphysics) একই জিনিস। কিন্তু তথাপি তিনি বার্কলীর মত স্বকীয় ভাববাদী হইলেন না। তাহার কারণ তিনি "চিন্তার ক্রম" (dialectics) বলিয়া একটি নূতন বিষয় তাঁহার দর্শনে স্থান দিয়াছেন। হেগেল বলেন যে আমি যাহাই চিন্তা করি, অমনি বহির্জগত হইতে তাহার একটা বিরুদ্ধ চিন্তা আমার চিন্তাকে আঘাত করে। ফলে আমার পূর্ব্বচিন্তা ও পরচিন্তার সংমিশ্রণে বা ত্যাগে আমাকে একটা নূতন চিন্তার আশ্রয় লইতে হয়। তারপর বাহিরের জগত হইতে হয়ত আর একটা চিন্তা আসিয়া আমাকে আঘাত করিয়া নূতন আর এক চিন্তা গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের মন পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইবে বা অসীমে ডুবিয়া না যাইবে ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের এই "নেতি নেতি" ত্যাগ হইবে না। আবার যতই আমরা "নেতি নেতি" করিয়া পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইব ততই আমাদের মন বিশালতর হইবে। অবশেষে মন একেবারে অসীমে ডুবিয়া যাইবে, সব "ইতিতে" (absolute) পরিণত হইবে। তখনই ভাবনা বা ভাবনার বিষয় এক হইয়া যাইবে।

হেগেলের এই মতবাদে বার্কলীর ভুল সংশোধিত হইল। হেগেল "আত্মা" ও "অনাত্মা", মন ও জড়, পুরুষ ও প্রকৃতি—সবই রক্ষা করিলেন, কিন্তু অসীমে গিয়া সবই একাকার করিয়া দিলেন। এতদিন পরে বার্কলীর স্ববিরোধ দুনিয়ার চোখে ধরা পড়িল।



যে নিয়মে চল্‌ছে ধরা—

লীলা দত্ত

থার্ড ক্লাশের যাত্রী—মুখ বুজে সহ্য করতেও জানে, হুম্‌কি দিয়ে ভয় দেখাতেও জানে।

বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে সব সহ্য করছিলাম, এবার হুম্‌কি দিয়ে বল্‌লাম—মশাই, ঠ্যাং ছড়িয়ে তো দিব্বি নাক ডাকাচ্ছেন; পাহাড় প্রমাণ জায়গাও দখল করেছেন, বস্‌ব কোথা?

ভদ্রলোক জেগে ছিলেন, কিন্তু ভাবে তা জানতেও দিলেন না। তিনি যেন ঘুমঘোরে অচেতন। বল্‌লাম—অনেক ঘুম হয়েছে মশাই, এবার একটু মেহেরবাণী করে উঠে বসুন দেখি!

আমার প্রতি তোমার এত চোখ কেন বাপু, ওদের ওঠাতে পার না?—বলে ভদ্রলোক পাশ ফিরলেন।

চেয়ে দেখলাম, সারা কামরায় আমার মত হতভাগ্য আরও জনকয়েক আছে; কিন্তু তাদের কারও মুখ দিয়ে কোনই প্রতিবাদ বেরুচ্ছে না, তারা নীরবে দাঁড়িয়েই আছে।

আর এই ভদ্রলোকের মতও জনকয়েক যাত্রী বিস্তৃত জায়গা দখল করে পড়ে আছে—নিশ্চিন্ত আরামে।

দু'চারজন কোন প্রকারে বসবার জায়গা করে নিয়েছিল; সেখানেই তারা মধ্যবিত্ত পরিবারের মত বসে বসে ঝিমুচ্ছে; পূর্ণ সুখ তাদের ভাগ্যে নেই।

আর প্রতিবাদ করলাম না, নীরবে দাঁড়িয়েই রইলাম; কারণ জানলাম—এ কামরায় আমরা সংসার পথের কৃষকদের মতই নিকৃষ্ট। আমাদের প্রচুর আপত্তি এবং আবেদন কিছুতেই ঐ বিলাসসাগরে নিমগ্ন ধনী অর্থাৎ নিদ্রাতুর ভদ্রলোকদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে না। তাই নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের বিলাসব্যসনের খোরাকই যোগাতে হ'বে।

দাঁড়িয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ; এবার ফিরে চাইলাম, পার্শ্ববর্তী দণ্ডায়মান ভদ্রলোকের কথায়—দেখ্‌ছেন মশাই, ব্যাটারা কি নাকই ডাকাচ্ছে। সত্যি হিংসে হয় কিন্তু!

তার দিকে চেয়ে করুণ হাসি হাসলাম। কিই বা উত্তর দেব! ধনীদের সুখ দেখে, বিলাস ব্যসনের সরঞ্জাম দেখে দরিদ্রের হিংসে হয়—এটা নূতন নয়, সম্পূর্ণ সত্য!

ভদ্রলোক পুনঃ বলতে লাগলেন—ব্যাটাদের ভাবখানা দেখলে সত্যি রাগ হয়। আমরা যেন বিনে টিকেটেই উঠেছি!

এরও উত্তর দিলাম না, কারণ এটাও স্বাভাবিক। দরিদ্রে-দরিদ্রে এমনি কানাকানি হয়েই থাকে; কারণ তারা প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করতে জানে না, পারে না।

ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন অনেকক্ষণ, তারপর একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কোথা যাবেন?

উত্তর দিলাম। ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন।

আমায় এবার বাধ্য হয়ে কথা বলতে হ'ল, জিজ্ঞেস করলাম,—আপনি বুঝি বাড়ী যাচ্ছেন?

তিনি উত্তর দিলেন—আজ্ঞে না, বাড়ী থেকে চলেছি কর্ম্মস্থলে।

ও—বলে চুপ করলাম।

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন—পরের চাকুরি করি মশাই, কি করব! একদিনও কি তারা দেরী সইবে! মেয়েটার অসুখ—তাও চলে আসতে হ'ল। ছুটি চাইলাম, তা ব্যাটারা দিলে না। আবার চাকুরি ছাড়লেও কি চলে। তাই বড্ড চিন্তায় পড়ে গেছি মশাই। বাড়ীতে আবার পুরুষমানুষ কেউ নেই। কি করেই বা কি হবে একটা দুশ্চিন্তার শ্বাস তার বুক দিয়ে বার হয়ে এল।

ভদ্রলোক পুনরায় বলতে লাগলেন—মেয়েটার কি সুন্দরই চেহারা ছিল মশাই; আর আমার যা বাধ্য ছিল! সব সময়ই আমার কাছে থাকত, আমায় পেলে ওর মাকেও ওর লাগত না। আধ ফুটন্ত ভাষায় কত কথা বলত, সব

সময় মুখে হাসি লেগেই ছিল, আর আজকাল কি হয়ে গেছে! ফুট-ফুটে চেহারা শুকিয়ে কৃশ হয়ে গেছে, হাসি একেবারে মিলিয়ে গেছে, কিছুই বলে না, খায় না—শুধু চুপ করে শুয়েই থাকে! বল্‌তে বল্‌তে ভদ্রলোকের স্বরটা গাঢ় হয়ে এল, চোখ দু'টো ছল্ ছল্ করে উঠল, তাড়াতাড়ি সে বাইরের দিকে তাকাল, হয়ত আমার কাছে চোখের জল গোপন করবার জন্যই!

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দু'টী যুবক তখন আলাপ করছিল। প্রথম যুবকটী বললে—খুব নাম করেছিস্ যা হোক্। তুই যে আবার খেলতে জানতিস্ তা তো আমার জানাই ছিল না। আমি তো আশ্চর্য্যই হয়ে গিছ্‌লাম। সত্যি, সেদিন তুই-ই টীমের সম্মান রেখেছিলি ভাই!

দ্বিতীয় যুবকটী নিজের অসীম প্রশংসায় আনন্দিত হয়ে বললে—সেদিন খেলেই চাকুরি পেয়ে গেলাম। বাপ মা তো আমার আশাই ছেড়ে দিয়েছিলেন। লেখাপড়াও তো কিছুই করিনি; তবু শুধু খেলার জন্যে চাকুরিটা হয়ে···

বাইরের বিরাট অন্ধকারের দিকে তাকালাম, কিন্তু কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না। সমস্তই অন্ধকারে ঢাকা, অদৃশ্য, অস্পষ্ট।

এই ক্ষুদ্র কামরার প্রত্যেক যাত্রীর মনে হয়ত এই ভদ্রলোকটীর মতই কত দুঃখ, কত জ্বালা, কত অশান্তি, কত উদ্বেগ চাপা আছে তা বাইরের এই বিরাট অন্ধকারের মতই আমার কাছে অস্পষ্ট, অদৃশ্য!

ঐ যুবকদ্বয়ের মত হয়ত কারও মনে আনন্দের জোয়ার ছুটেছে, নিজ সৌভাগ্যসুখে ডুবে আছে, তাও কেমন করে জানব।

এই ক্ষুদ্র কামরায়ও কারো অপরের দিকে তাকাবার অবকাশ নেই, নিজের সব কিছু নিয়েই সবাই ব্যস্ত।

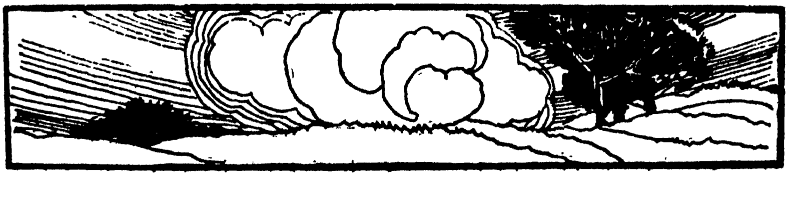
সম্পূর্ণতা

এম, আবদুর রহমান

(রুমীর পার্শী কবিতা হইতে স্বাধীন অনুবাদ)

স্বর্গে নহে, ধরাধামে ধাতু আর কঙ্করের দেশে—
ছিনু আমি অখ্যাত-নগণ্য হয়ে নামহীন বেশে।
তারপর উঠেছিনু ফুটে—বিচিত্র ফুলের রঙে আনন্দ-বিকাশে,
শ্বাপদের সনে করেছি ভ্রমণ, কাটায়েছি দিন আকাশে—
জনমি কত না রূপে,
কভু ডুব দিয়া চলেছি ভাসিয়া, হামা গুড়িদিয়া চুপে;
আপনার মনে দৌড়েছি কভু, ছুটিয়াছি তীর-বেগে—
ধরণীর বুকে ফুটেছি রূপে, যখন উঠেছি জেগে—
মানুষের রূপ ধরি'।

তারপর আমি সেই সেই দেশে যাত্রা আরম্ভ করি—
মেঘের ঊর্দ্ধে রহিয়াছে যাহা, আকাশ পাইনি' টের,
মৃত্যু যেথায় আছে অজ্ঞাত, নাই জীবনের হের ফের—
দুঃখহীন সেই চিরসুখময় ফেরেস্তা-হুরীর দেশে
এক অভিনব বেশে।
তারপর গেছি ঊর্দ্ধে আরও, সীমাহীন সেই দেশে
আলো ও আঁধার, জীবন-মরণ, দৃশ্য-অদৃশ্যের শেষে,
পূর্ণতা যেথা করিছে বিরাজ, সব হয়ে গেছে লীন
সম্পূর্ণতা আর একের মাঝেতে থেমে গেছে কবি বীণ।



জড় ও শক্তির রূপ

কমলেশ রায়

পুরাতন দর্শনে জড় ও শক্তি

খৃষ্টপূর্ব্ব চারি শতাব্দীতে ডিমোক্রিটাস্ ব'লেছিলেন—মহাশূন্য ও তন্মধ্যে অসংখ্য অদৃশ্য অবিভাজ্য জড়কণা নিয়ে এই বিশ্ব সংগঠিত।

জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ জানতে চেষ্টা ক'রেছে জড়জগতের স্বরূপ কি?—প্রথমেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় বিশ্বের দুইটি প্রধান উপাদানের প্রতি—জড় ও শক্তি। এই দুইটির স্বরূপ জানবার চেষ্টা হ'চ্ছে বহু শতাব্দী হ'তে—আজও তার সঠিক মীমাংসা মিলে নাই। কিন্তু সন্ধানের শেষ হয় নাই এখনও। সমগ্র পৃথিবীর বিজ্ঞান-গবেষণাগারে অক্লান্ত পরিশ্রম আজিও বিন্দু বিন্দু ক'রে সত্যের প্রকাশ ক'রছে।

ডিমোক্রিটাস অদৃশ্য ও অবিভাজ্য জড়-কণার মূল ভাব পেয়েছিলেন আনেক্সাগোরাসের নিকট থেকে। ইনি পূর্ব্বতন গ্রীক্ দার্শনিকদের মত জড়ের সৃষ্টি ও লয়ে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মতে বস্তুর পরিবর্ত্তন বা রূপান্তর হওয়ার কারণ ঐ বস্তুকণাগুলির (spermata) বিশেষ-ভাবে সংযোজন বা বিচ্ছেদ। কণাগুলি অপরিবর্ত্তনীয় ও অবিনশ্বর।

জড়ের অবিনশ্বরতা ও বর্ত্তমান আণবিক মতবাদের মূলভাব এইখানে দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের 'কণা'-বাদী কণাদের নামও এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এরিষ্টট্‌ল্ বলেছেন জড়ের নূতন সৃষ্টি অসম্ভব, যেহেতু—"যা আছে" সেটাই "যা হবে" তার কারণ হ'তে পারে এবং "যা নেই" সেটা "যা হবে" তার কারণ হ'তে পারে না। অতএব যেটা জড় নয়, তা থেকে জড়ের উৎপত্তি হ'তে পারে না এবং বিপরীত ভাবে দেখতে গেলে—যা আছে সেটা 'নেতি'তে লুপ্ত হ'তে পারে না। তিনি জড়ের অক্ষয়তা সমর্থন ক'রতে গিয়ে ব'লেছেন—যদি জড়ের বিলোপন সম্ভব হ'তো তবে এতদিনে সকল সৃষ্টি সমগ্র বিশ্বজগৎ নিঃশেষ হয়ে লুপ্ত হ'য়ে যায় নাই কেন?

তাঁরা শক্তি সম্বন্ধেও অনেক ভেবেছিলেন এবং অনেক দার্শনিক তথ্য বলেছেন। জড়ের ন্যায় শক্তি ও অবিনশ্বর এবং তার সৃষ্টিও অসম্ভব। সূর্য্য, অগ্নি, আলোক, তাপ প্রভৃতিকে মানুষ পূজার অর্ঘ্য দিয়ে আস্‌ছে শত সহস্র বৎসর হ'তে।

ডাল্টনের আণবিক মতবাদ

শক্তি ও জড়ের মোটামুটি এই প্রকার দর্শনবাদ পুরাতন হ'লেও বিজ্ঞান জগতে এর মূল্য খুব বেশী নয়; কারণ ডিমোক্রিটাস্, কণাদ বা এরিষ্টটলের উক্তির মূলে বিশেষ কোনও পরীক্ষালব্ধ সত্য ছিল না। এর প্রায় দু' হাজার বছর পরে জড়ের আণবিক মতবাদ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন ডাল্টন—১৮১০ খৃষ্টাব্দে।

ফ্যারাডে ও বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ

জলের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালনা ক'রলে জল আপনার মেটালিক উপাদানে (অক্সিজেন ও হাইড্রোজন) বিভক্ত হ'য়ে পড়ে। জল ভিন্ন অন্যান্য যৌগিক পদার্থও বিদ্যুৎ দ্বারা এই ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়।

জড় ও বিদ্যুৎ

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ফ্যারাডে এই বিষয়ে গবেষণা ক'রে বিদ্যুৎ-বিশ্লেষণ (Electrolysis) সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান সূত্র আবিষ্কার করেন। সূত্রগুলির আলোচনা এখানে প্রয়োজন নাই—কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে জড়-পরমাণুর সঙ্গে বিদ্যুতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

ইলেক্ট্রণ

আরও কয়েকটি ঘটনা থেকে এই কথার সত্যতা উপলব্ধি হয়। একটি ধাতুখণ্ডকে উত্তপ্ত ক'রলে সেটা রক্তাভ হ'য়ে কেবলমাত্র আলোই দেয় না, তা থেকে বিদ্যুৎ-কণাও বিচ্ছুরিত হ'তে থাকে। এগুলিকে ধনবিদ্যুৎযুক্ত

ধাতব পাতের দিকে আকৃষ্ট হ'তে দেখা যায়; অতএব এরা ইলেক্ট্রণের ব্যাস এক সেন্টিমিটারের প্রায় লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ $\frac{১}{১০০০\cdots\text{তেরোটি শূন্য}\cdots০০}$ সেন্টিমিটার, এবং ভার প্রায় $\frac{৯}{১০০০\cdots\text{আটাশটি শূন্য}\cdots০০}$ গ্র্যাম।

একটি পরিষ্কার ধাতুখণ্ডের উপর আল্ট্রা-ভায়োলেট আলো পড়লে ঐ স্থান হ'তে ইলেক্‌ট্রণ নির্গত হ'তে থাকে।

জে, জে, টম্‌সন ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বিরল বায়ুপূর্ণ কাচ নলের মধ্যে ইলেক্‌ট্রণ রশ্মি বা ঋণরশ্মি উৎপাদন ক'রতে সমর্থ হন। টমসনের ইলেক্‌ট্রণ আবিষ্কার পরমাণু বিজ্ঞানে যুগান্তর এনেছে।

প্রোটন

যদিও ইলেক্‌ট্রণ জড় পরমাণুর অন্যতম উপাদান তথাপি বস্তু মাত্রেই ঋণবিদ্যুৎযুক্ত নয়, কারণ প্রত্যেকটি পরমাণুতে সমান পরিমাণে ঋণ ও ধনবিদ্যুৎকণা আছে। ধনবিদ্যুৎ-কণার নাম "প্রোটন"। প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রণে সমপরিমাণ বিদ্যুৎ আছে—কিন্তু তা'রা বিপরীত জাতীয়—ধন ও ঋণ। বিদ্যুৎ পরিমাণ সমান হ'লেও প্রোটনের ভার ইলেক্‌ট্রণের প্রায় ১৮৫০ গুণ।

স্বত-বিচ্ছুরণশীল ধাতু

কতকগুলি ধাতু—যথা রেডিয়াম, ইউরেণীয়াম্ প্রভৃতি স্বতই ইলেক্‌ট্রণ ও প্রোটনবিচ্ছুরিত করে। ইলেক্‌ট্রণগুলি পৃথক ভাবে বিচ্ছুরিত হ'লেও প্রোটনের বেলা ঠিক সেরূপ হয় না। চারিটি প্রোটন ও দু'টি ইলেক্‌ট্রণ একত্র সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে নির্গত হয়—এই গুলির নাম আল্‌ফা-কণা (alpha particles)। বিচ্ছুরিত ইলেক্‌ট্রণের নাম বিটা-কণা (beta particles)। এ'ছাড়া অতি ক্ষুদ্রতরঙ্গ রঞ্জনরশ্মির মত এক প্রকার রশ্মি নির্গত হয়—তা'রনাম গামারশ্মি (gama rays)।

এই সকল থেকে দুইটি সিদ্ধান্ত করা যায়—(১) বিদ্যুতের আণবিকতা (atomicity of electricity) ও (২) ইলেক্‌ট্রণ ও প্রোটন জড় পরমাণুর উপাদান।

টমসনের পরমাণু

ইলেক্‌ট্রণ ও প্রোটন পরমাণুর উপাদান সাব্যস্ত হওয়ার পর প্রশ্ন ওঠে—তাদের অবস্থান বা সজ্জা প্রণালী কিরূপ? টমসনই এর উত্তর সর্ব্বপ্রথম দিয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর মত-বাদে একটু ভুল ছিল। তাঁর মতে এক একটি পরমাণু দুইটি মণ্ডলে ভাগ করা যেতে পারে—উপরে প্রোটনের মণ্ডল—ভিতরেরটি ইলেক্‌ট্রণের। এই হ'ল টমসনের পরমাণুর চিত্র।

কিন্তু প্রোটনগুলি যদি এইভাবে সমগ্র মণ্ডলের উপর ইতস্তত ছড়িয়ে থাকে তবে একটি প্রত্যক্ষ পরীক্ষার কারণ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

টমসন-পরমাণু দ্বারা আল্‌ফা-কণা বিক্ষেপণ

রেডিয়াম ইউরেণীয়াম প্রভৃতি হ'তে নির্গত আল্‌ফা-কণা কোনও ধাতুর পাৎলা পাতের মধ্য দিয়ে ভেদ করে যাবার সময় বিক্ষিপ্ত (scattered) হ'য়ে পড়ে, কারণ ধাতব পাতের পরমাণুর প্রোটন এবং আলফা-কণাগুলির মধ্যে বিকর্ষণ (repulsion) হয়—যেহেতু উভয়ই ধনবিদ্যুৎযুক্ত। কিন্তু টমসনের চিত্র অনুসারে পরমাণুর প্রোটনগুলি পৃথকভাবে ছড়িয়ে থাকার ফলে আল্‌ফারশ্মি অতি অল্পই দিক্‌ভ্রষ্ট (deflected) হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবিক আল্‌ফা রশ্মিগুলি অত্যন্ত বেশী দিক্ পরিবর্ত্তন করে—এমন কি বিপরীত মুখে ফিরেও আসে কোন কোনটি—প্রতিফলিত হওয়ার মত।

রাদারফোর্ড বোরের পরমাণু চিত্র

এই কারণে রাদারফোর্ড মনে করলেন—প্রোটনগুলি নিশ্চয়ই একত্রিত হ'য়ে পরমাণুর মধ্যে থাকে—যা'তে আল্‌ফা কণাগুলিকে প্রচুর বলে ইতস্তত বিক্ষেপ করতে পারে।

কেন্দ্রীণ

রাদারফোর্ড ও বোর তখন এই ভাবে পরমাণুর চিত্র আঁকলেন:—প্রোটন বা ধনকণাগুলি একত্রিত হ'য়ে পরমাণুর কেন্দ্রীণ (nucleus) গঠন করে ও ঋণ ইলেক্‌ট্রণ-গুলি ঐ কেন্দ্রীণের চারিপাশে প্রচণ্ড বেগে প্রদক্ষিণ করে, অনেকটা যেন সূর্য্যের চারিপাশে গ্রহগণের মত। লঘুতম

হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রে একটি মাত্র প্রোটন এবং তা'কে প্রদক্ষিণ করে একটি মাত্র ইলেকট্রণ। ইলেকট্রণের এই বৃত্তাকার কক্ষের ব্যাস প্রায় $\frac{১}{১০০,০০০,০০০}$ সেন্টিমিটার। পৃথিবীর ব্যাসের তুলনায় সূর্য্য যত দূরে, ইলেকট্রণের তুলনায় কেন্দ্রীণের দূরত্ব তা'রও প্রায় দশগুণ। পরমাণুগুলি নিটোল বর্ত্তুল নয়—যেমন পুরাতন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ মনে করতেন।

রাদারফোর্ড-বোরের চিত্র অনুসারে হিলিয়াম গ্যাসের পরমাণুর কেন্দ্রীণ ৪টি প্রোটন ও ২টি ইলেকট্রণের সংবদ্ধ সমষ্টি এবং আরও ২টি ইলেকট্রণ এদের প্রদক্ষিণ করছে। কেন্দ্রীণে ৪টি প্রোটন থাকায় হিলিয়াম পরমাণুর ভার হয়েছে। হাইড্রোজেন পরমাণুর চারগুণ—কারণ হাইড্রোজেন কেন্দ্রীণে আছে মাত্র একটি প্রোটন। ইলেকট্রণের সংখ্যার উপর পরমাণুর ভার নির্ভর করে না—নির্ভর করে প্রোটনের সংখ্যার উপর; কারণ ইলেকট্রণ অপেক্ষা প্রোটন ১৮১০ গুণ ভারী। যাক্—রাদারফোর্ড-বোরের চিত্র অনুসারে হিলিয়াম কেন্দ্রীণ ও আল্ফা কণার গঠন প্রণালী একই। বাস্তবিক পরীক্ষা ক'রে দেখা যায় রেডিয়াম ইত্যাদি হ'তে হিলিয়াম গ্যাস উৎপন্ন হয়।

পরমাণবিক গুরুত্ব

বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ভার বিভিন্ন এবং উনবিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা ছিল যে পরমাণবিক গুরুত্বের উপর মৌলিক পদার্থের গুণাগুণ নির্ভর করে। কিন্তু দেখা যায় একই পদার্থের পরমাণবিক গুরুত্ব বিভিন্ন হ'তে পারে। শতকরা ৯৯·৮ ভাগ অক্সিজেনের পরমাণবিক গুরুত্ব ১৬, শতকরা ·১ ভাগের পরমাণবিক গুরুত্ব ১৭ এবং আর ·১ ভাগের পরমাণবিক গুরুত্ব ১৮ (অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরমাণুর যথাক্রমে ১৬, ১৭, ১৮ গুণ)। কিন্তু সকলগুলিই অক্সিজেনের পরমাণু—অর্থাৎ সকলগুলিতেই অক্সিজেনের গুণ বর্ত্তমান। অতএব পরমাণুর গুরুত্বের উপর মৌলিক পদার্থের গুণাগুণ নির্ভর করে না।

মৌলিক পদার্থের গুণাগুণ ও পরমাণবিক সংখ্যা

পরীক্ষা করে দেখা গিয়াছে—সকল প্রকার পরমাণবিক ভারের অক্সিজেন কেন্দ্রীণে সমপরিমাণ ধনবিদ্যুৎ বর্ত্তমান এবং কেন্দ্রীণের ধনবিদ্যুতের (অর্থাৎ উদ্ধৃত প্রোটনের সংখ্যার) উপরই মৌলিক পদার্থের গুণাগুণ নির্ভর করে। ১৬, ১৭ বা ১৮ পরমাণবিক গুরুত্বের অক্সিজেনের সকল গুলির কেন্দ্রীণেই ৮টি প্রোটনের ধনবিদ্যুৎ আছে। ১৬ গুরুত্বের অক্সিজেন কেন্দ্রীণে ১৬টি প্রোটন (+) ও ৮টি ইলেকট্রণ (−), ১৭ গুরুত্বের কেন্দ্রীণে ১৭টি প্রোটনও ৯টি ইলেকট্রণ এবং ১৮ গুরুত্বের অক্সিজেন কেন্দ্রীণে ১৮টি প্রোটন ও ১০টি ইলেকট্রণ বর্ত্তমান; ফলে সকলগুলির কেন্দ্রীণের ধনবিদ্যুতের পরিমাণ ৮টি প্রোটনের সমান এবং এই কারণে সকলগুলিতেই অক্সিজেন পরমাণুর ধর্ম্ম বর্ত্তমান। অতএব অক্সিজেনের পরমাণবিক সংখ্যা (atomic number) ৮ অর্থাৎ অক্সিজেন কেন্দ্রীণে উদ্ধৃত প্রোটনের সংখ্যা ৮। এইরূপ বিভিন্ন পরমাণবিক ভারের একই মৌলিক পদার্থকে (অর্থাৎ একই পরমাণবিক সংখ্যার মৌলিক পরমাণু) আইসোটোপ (isotope) বলে। প্রায় সকল মৌলিক পদার্থেরই অল্পবিস্তর সংখ্যক আইসোটোপ পাওয়া গিয়াছে। অঙ্গারের (পরমাণবিক সংখ্যা ৬) দুইটি আইসোটোপ, ১২ ও ১৩ পরমাণবিক গুরুত্বের। দস্তার (পরমাণবিক সংখ্যা ৩০) ৫টি আইসোটোপ ৬৪, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৭০ ভারের। টিনের ১১টি—ইত্যাদি। আইসোটোপ সম্পর্কে এস্টনের (Aston) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আইসোটোপ

রাদারফোর্ড ও বোর পরমাণু ও তার কেন্দ্রীণের যে চিত্র দিয়েছিলেন তাতে কেবলমাত্র ইলেকট্রণ ও প্রোটনের উল্লেখ আছে অর্থাৎ ইলেকট্রণ ও প্রোটনই সূক্ষ্মতম জড় (ও বিদ্যুৎ) কণা এবং কেন্দ্রীণে সর্ব্বদাই প্রোটনের সংখ্যাধিক্য হয়। অনেক বৈজ্ঞানিকের মনেই একটি প্রশ্ন উঠেছিল—কোনও কেন্দ্রীণে সমানসংখ্যক ইলেকট্রণ ও প্রোটন থাকতে পারে না কি? অর্থাৎ সমানসংখ্যক প্রোটন ইলেকট্রণ যুক্ত হ'য়ে কোনও বিদ্যুৎহীন কণার সৃষ্টি হ'তে পারে না কি?

চ্যাডউইকের নিউট্রণ আবিষ্কার

বিদ্যুৎবিহীন সূক্ষ্ম কণার সন্ধান পাওয়া যায় ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে। রাদারফোর্ড দেখিয়াছিলেন আল্ফারশ্মির আঘাতে

অন্যান্য পরমাণুর কেন্দ্রীণ চূর্ণ করা যায় এবং এইভাবে তিনি কেন্দ্রীণ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেন। ইরেণে কুরি ও তাঁর স্বামী জোলিও রাদারফোর্ডের পরীক্ষার অনুরূপ আল্‌ফা রশ্মি দিয়ে বেরিলীয়াম ধাতুর কেন্দ্রীণ চূর্ণ করতে গিয়ে একপ্রকার অত্যন্ত ভেদক (penetrating) রশ্মির সন্ধান পেলেন। তাঁরা এটাকে মনে করলেন 'গামা রশ্মি'। কিন্তু চ্যাড্‌উইক প্রমাণ করলেন (১৯৩২) —এগুলি বিদ্যুৎবিহীন জড়কণা—গুরুত্বে প্রায় প্রোটনের সমান। এর নাম নিউট্রণ (neutron)। নিউট্রণের ভেদ করবার ক্ষমতা (penetrating power) খুব বেশী; কারণ নিজে বিদ্যুৎহীন হওয়ার ফলে কোনও কেন্দ্রীণের থেকে বিকর্ষণ-বাধা পায় না—যেটা আলফা-কণা পেয়ে থাকে। এই কারণে আলফা রশ্মি অপেক্ষা নিউট্রণ রশ্মি দ্বারা কোনও পরমাণুর কেন্দ্রীণ বিধ্বস্ত (bombardment of the nucleus) করা অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ। এই কারণে নিউট্রণ আবিষ্কার অত্যন্ত মূল্যবান। চ্যাড্‌উইক নিউট্রণ আবিষ্কার ক'রে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন (১৯৩৫)।

পজিট্রণ

ইলেকট্রণ যেরূপ লঘু ও ঋণ-বিদ্যুৎযুক্ত, ঐরূপ ধনবিদ্যুৎ-যুক্ত কণার অস্তিত্বও অসম্ভব মনে হয় না। বাস্তবিক ধন-ইলেকট্রণ বা পজিট্রণ (Positron) সম্প্রতি আবিষ্কার হ'য়েছে। নিউট্রণ দিয়ে বেরিলিয়াম, বিস্‌মাথ্‌ প্রভৃতিকে আঘাত ক'রলে তাদের পরমাণু চূর্ণ হ'য়ে পজিট্রণও নির্গত হয়। এইভাবে পজিট্রণকে পাওয়া গেলেও প্রকৃতপক্ষে এর আবিষ্কার হয় কস্‌মিক-রশ্মি (Cosmic rays) সম্পর্কে গবেষণাকালে। কস্‌মিক-রশ্মির পরিচয় এখানে একটু আবশ্যক।

কস্‌মিক-রশ্মি

সাধারণত বায়ু বিদ্যুতের অপরিচালক। বায়ুকে পরিচালক করা যায় যদি তার মধ্য দিয়ে রেডিয়াম-রশ্মি, রঞ্জন-রশ্মি ইত্যাদি চালনা করা হয়। অবশ্য এই সকল পরিচালককারী রশ্মি (ionizing radiations) সরিয়ে নেওয়া মাত্র তখনি বায়ু আবার অপরিচালক হ'য়ে যাবে। কিন্তু দেখা যায় বাতাস সর্ব্বদাই অল্প পরিচালক থাকে। প্রথমে মনে করা হ'য়েছিল মাটির নানা স্থানে হয়তো রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম বা ঐ জাতীয় কোনও খনিজ পদার্থ অল্প থাকার ফলে এই রকম হ'চ্ছে। এই মনে ক'রে পরীক্ষাধীন বায়ু-কক্ষটি খুব ভাল ক'রে ঢেকে দেওয়া হ'ল, কিন্তু তাতেও আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল না। মনে হয় সাধারণ পরিচালককারী রশ্মি অপেক্ষা এর ভেদ করবার ক্ষমতা আরও অনেক বেশী এবং বৈজ্ঞানিকরা প্রথমে মনে করলেন—হয়তো এই রশ্মি পৃথিবীর গভীর প্রদেশ থেকে আস্‌ছে। কিন্তু বেলুনে ক'রে বহু ঊর্দ্ধে উঠে দেখা গেল —ঐ অদ্ভুত রশ্মির তীব্রতা সেখানে আরও বেশী। অতএব এ'টা মাটি থেকে আস্‌ছে না; আস্‌ছে বাইরে থেকে। দিনে বা রাতে এই রশ্মির কোনও পরিবর্ত্তন হয় না— অতএব এর মূলে সূর্য্য নয়। এর উৎপত্তি বিশাল মহাকাশে —এইজন্য নাম হয়েছে Cosmic ray বা যা'কে অনুবাদ ক'রে বলা যেতে পারে "ব্যোম জ্যোতি"। এই রশ্মির উৎপত্তির কারণ এখনও ঠিক নির্দ্দেশ ক'রতে পারা যায় নাই।

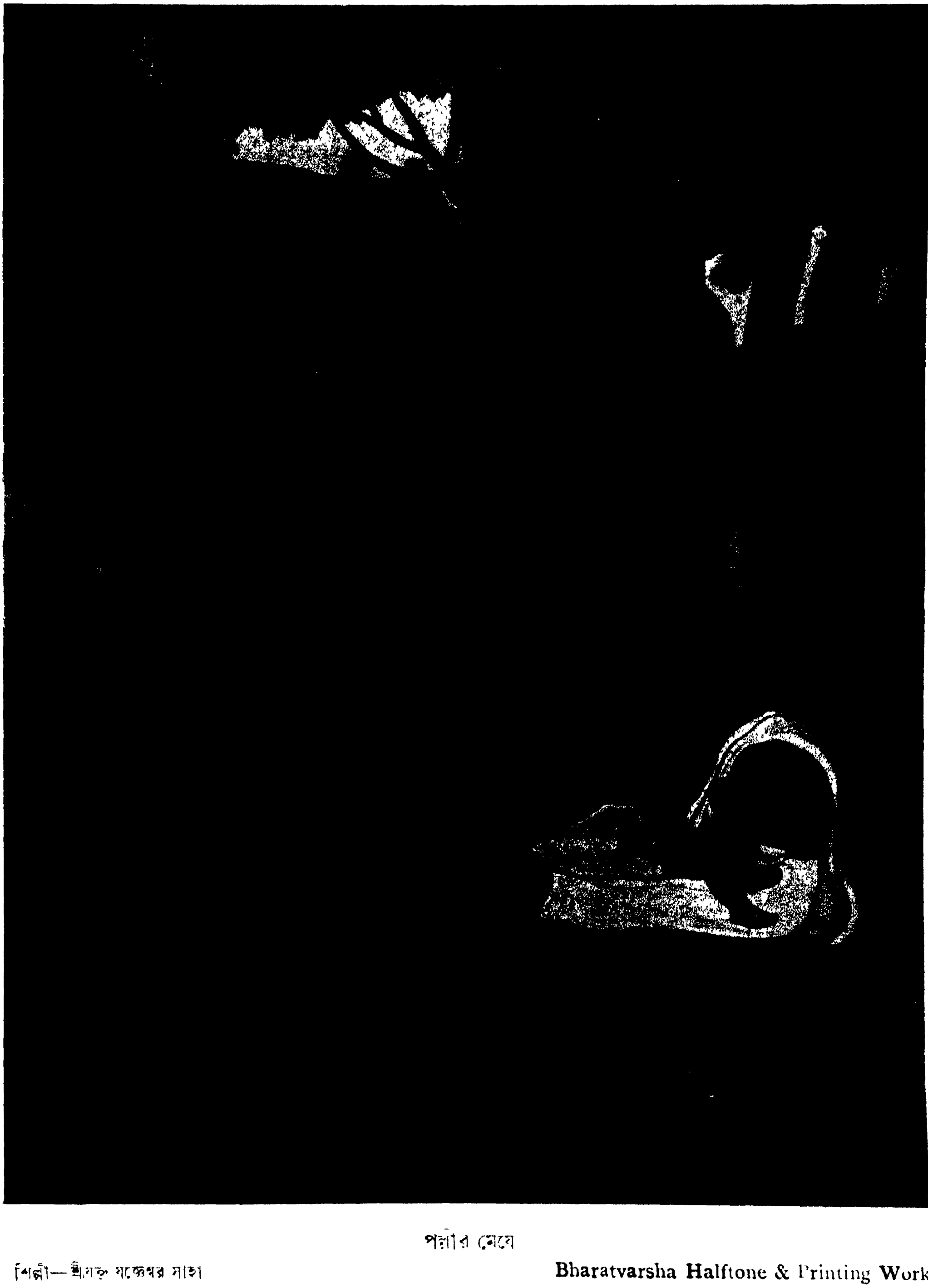
আল্‌ফা-কণা বা নিউট্রণের সাহায্যে যেমন পরমাণু চূর্ণ করা যায়, শক্তিশালী কস্‌মিক রশ্মির আঘাতেও তেমনি পরমাণু বিধ্বস্ত হয়। চুম্বকশক্তির প্রভাবে দেখা যায়, কস্‌মিক রশ্মির আঘাতপ্রাপ্ত স্থান হ'তে দুইটি কণা বিপরীত দিকে সমানভাবে ভ্রষ্ট হয়। তা'দের একটি সুপরিচিত ইলেকট্রণ। অন্যটির গমন পথের বক্রতা ইত্যাদি ইলেকট্রণের পথের অনুরূপ। অতএব সে'টি ইলেকট্রণের সমভার ধনবিদ্যুৎকণা—পজিট্রণ।

অনাবিষ্কৃত নয়ট্রিণো

পাউলি ও ফের্মি (১৯৩৪) বলেছেন ইলেকট্রণ বা পজিট্রণের অনুরূপ লঘু অথচ বিদ্যুৎহীন কণিকার অস্তিত্বও অসম্ভব নয়; এর নাম দেওয়া হ'য়েছে নয়ট্রিণো (neutrino)। অবশ্য এর অস্তিত্বের চাক্ষুষ প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

পরমাণু সংগঠনে জড়ত্ব হানি

আবার একটু পুরাতন প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে হয়। হিলিয়াম পরমাণুতে চারিটি প্রোটন আছে, কিন্তু হিলিয়াম



পল্লীর মেয়ে

শিল্পী—শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর সাহা

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

পরমাণুর ওজন প্রোটনের চারিগুণ নয়—কিছু কম। জড় কি করে বিলুপ্ত হয়? আইনষ্টাইনের মতে (১৯০৫) জড় এবং শক্তি মূলতঃ অভিন্ন; জড়ের বিলোপনে শক্তির উদ্ভব হ'তে পারে। মূল কণিকাগুলি (প্রোটন ইত্যাদি) সংবদ্ধ হ'য়ে পরমাণু কেন্দ্রীণ গঠনকালে যে শক্তি ব্যয়িত হয় তা'রই ফলে পরমাণুর ভার বিচ্ছিন্ন মূল-কণিকাগুলির চেয়ে অল্প কম হয়। মিলিকান প্রভৃতি পূর্ব্বে ব'লেছিলেন—এই হিলিয়াম পরমাণু স্থষ্টি হতে যে শক্তি নির্গত (ব্যয়) হয় সেটাই কস্‌মিকরশ্মি ভাবে বেরিয়ে আসে। অবশ্য এর মূলে কতখানি সত্য আছে সে-কথা এখন পর্য্যন্ত বলা কঠিন। বিভিন্ন পরমাণুর এইরূপ জড়ত্বহানির পরিমাণ এস্টন (Aston) অতি সূক্ষ্মভাবে মেপেছেন।

জড় ও শক্তির অভিন্নতা

আমাদের পূর্ব্বে ধারণা ছিল বিশ্বের মূল উপাদান জড় ও শক্তি—দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন সত্তা। কিন্তু এখন দেখা যায়—জড় শক্তিতে রূপান্তরিত হ'তে পারে—তারা মূলতঃ অভিন্ন। শক্তিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—জড়ের দ্বারা বাহিত শক্তি—যেমন চলন্ত ট্রেণের গতিশক্তি এবং দ্বিতীয়—আলোকজাতীয় তরঙ্গ-শক্তি। যে কোনও প্রকারের হোক্ না কেন—জড় এবং শক্তি মূলতঃ একই।

যদি বলা হয়—অচল ট্রেণ অপেক্ষা চলন্ত (গতি-শক্তিশালী) ট্রেণের জড়ত্ব বেশী—তবে অনেকেই হয়তো ভীষণ আপত্তি ক'রবেন। কিন্তু নানাপ্রকার পরীক্ষা দ্বারা আইনষ্টাইনের জড় ও শক্তির অভিন্নতা মতবাদ সুপ্রমাণিত হ'য়েছে। তবে একটি কথা মনে রাখতে হ'বে যে বস্তুর গতিবেগ অত্যন্ত বেশী না হ'লে তার গতিশক্তিজনিত জড়ত্ববৃদ্ধি আমাদের চোখে ধরা পড়বে না। বস্তুতঃ তা'র গতিবেগ আলোর গতিবেগের (প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল) সমকক্ষ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গতিবেগ অনুসারে ইলেক্‌ট্রণের গুরুত্বের হ্রাস বৃদ্ধি

রেডিয়ম জাতীয় স্বত-বিচ্ছুরণশীল ধাতুনির্গত ইলেক্‌ট্রণ (বিটা কণিকা)গুলি প্রচণ্ড বেগসম্পন্ন—আলোকের প্রায় দশমাংশ বা শতাংশ। কাউফ্‌মান (Kaufmann) পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন অধিকতর বেগসম্পন্ন বিটা কণিকার গুরুত্ব অল্প বেগবানগুলির অপেক্ষা বেশী।

আলোর জড়ত্ব

তরঙ্গজাতীয় আলোক শক্তিরও যে জড়ত্ব আছে এবং সেও যে আপন পথে জড় বস্তুর উপর চাপ (mechanical pressure) দেয় তা' স্পষ্ট দেখা গিয়াছে। এমন কি মাধ্যাকর্ষণের বলে আলোক-রশ্মি (নিক্ষিপ্ত ঢিলের মত) ধাবিত হয় তা'ও প্রমাণ হ'য়ে গিয়েছে।

আলোর চাপ

ধূমকেতুর শরীর অত্যন্ত লঘু বাষ্প দ্বারা গঠিত। এর দীর্ঘ লঘু পুচ্ছ সর্ব্বদাই সূর্য্যের বিপরীত দিকে ফিরানো থাকতে দেখা যায়। এর কারণ লঘু পুচ্ছের উপর সূর্য্যালোকের চাপ। এ ছাড়া লেবিডিউ, নিকল্‌স্‌, হাল্‌, পয়েন্টিং প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ আলোকের চাপ পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করেছেন।

কম্পটন (compton) দেখিয়েছেন—রঞ্জনরশ্মি পথে ইলেক্‌ট্রণ থাক্‌লে—রশ্মি ও ইলেক্‌ট্রণের মধ্যে দুইটি বিলিয়ার্ড বলের মত সংঘর্ষ হয়—ফলে ইলেক্‌ট্রণ ও রশ্মিটি দুইদিকে বিক্ষিপ্ত (scattered) হয়। এ থেকে আলোকের জড়রূপ খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ হয় না কি? এ'টি Compton Effect নামে খ্যাত। আলোক কেবলমাত্র তরঙ্গরূপী হ'লে ইলেক্‌ট্রণকে ধাক্কা দিয়ে পাশে নিক্ষেপ করতে পারতো না। জলের ঢেউ ভাসমান নৌকাকে উপর-নীচ নাচাতে পারে—বহন করে নিয়ে যেতে পারে না—এটাই তরঙ্গের বিশেষত্ব।

আলোর উপর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব

নিউটন বলেছেন, দুইটি জড়বস্তুর মধ্যে সর্ব্বদাই একটি আকর্ষণ বল বিদ্যমান থাকে—এরই নাম মাধ্যাকর্ষণ। আলোক শক্তির যদি জড়ত্ব না থাকে তবে তা'র উপর মাধ্যাকর্ষণের কোনই প্রভাব আশা করা যায় না। কিন্তু আইনষ্টাইনের মতে আলোরও জড়ত্ব আছে এবং এই কারণে আলোক-রশ্মি জড়বস্তু দ্বারা আকৃষ্ট হ'বে। অবশ্য আলোকের গতি এরূপ প্রচণ্ড এবং এর জড়ত্ব এত অল্প যে রশ্মির বক্রণ (deviation) খুব অল্পই হ'বে এবং মাধ্যাকর্ষণ প্রচণ্ড না হলে সেটা বুঝতেই পারা যাবে না। প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণ পাওয়ার জন্য প্রকাণ্ড জড়পিণ্ডের প্রয়োজন। পৃথিবী নিজেই এত ছোট (বৈজ্ঞানিকরা কখন কখনও 'ধরা'কে 'সরা'র চেয়েও ছোট জ্ঞান করেন)

যে তার উপর এমন কোনও গুরুবস্তু নেই যা দিয়ে আলোক-রশ্মিকে যথেষ্ট পরিমাণে দিকভ্রষ্ট করা যেতে পারে। এজন্য আইন্‌ষ্টাইন প্রস্তাব করলেন সূর্য্যকে মাধ্যাকর্ষক জড়পিণ্ড (gravitating body) ভাবে নেওয়া গেলে সুদূর তারকা-নিসৃত আলোক-রশ্মির দিক্‌ভ্রষ্টন দেখা যাবে—যখন সে সূর্য্যের পাশ দিয়ে আমাদের কাছে আস্‌বে। তিনি অঙ্ক ক'ষে ব'লেছিলেন ঐ রশ্মি কতটা সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা আকৃষ্ট হ'বে। কিন্তু সূর্য্যকে মাধ্যাকর্ষক ভাবে গ্রহণ করার একটি অসুবিধা আছে। সূর্য্যের প্রচণ্ড আলোক-তীব্রতার মধ্য দিয়ে ঐ তারাকে দেখা যাবে কি করে? অতএব আমরা সূর্য্যকে চাই কিন্তু সূর্য্যের আলোক চাই না। এই আব্দারটি কয়েক বছর অন্তর দু'তিন মিনিটের জন্য পূর্ণ হয়—সূর্য্য-গ্রহণের পূর্ণগ্রাসের সময়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে যে পূর্ণগ্রহণ হ'য়েছিল সেটা আইনষ্টাইনের ভবিষ্যৎ বাণীর সত্যতা পরীক্ষা ক'রতে কাজে লাগানো গেল না, কারণ তখন মহাযুদ্ধ চল্‌ছে। অতএব অপেক্ষা ক'রতে হ'ল পাঁচ বছর। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পূর্ণগ্রহণের সময় পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল আইন্‌ষ্টাইনের কথা হুবহু ঠিক্।

অতএব এখন দেখা যাচ্ছে—জড় ও শক্তির মধ্যে যে মূল ব্যবধানের কথা এতদিন আমরা ভেবেছি সেটা ঠিক নয়। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির ফলে দেখতে পাই—জড় ও শক্তির মধ্যে মূলতঃ বিশেষ পার্থক্য নেই। প্রকৃতির কার্য্যধারায় জড় ও শক্তির পৃথক ভাবে সংরক্ষণ-শীলতার (conservation) ধারণা আমূল পরিবর্ত্তন হ'য়েছে; প্রকৃত পক্ষে ঐ দু'য়ের যুগ্ম সত্তাই সংরক্ষিত হয়। যদি কোন স্থানে জড়ের বিলোপন দেখতে পাই তখনই দেখা যায় অনুরূপ পরিমাণ শক্তি সৃষ্টি হ'য়েছে এবং শক্তিও জড়ে রূপান্তর হ'তে পারে।

বর্ত্তমানে কোন কোনও বৈজ্ঞানিক মনে করেন—দুইটি আলোক-রশ্মির পরস্পর সংঘর্ষের ফলে বিদ্যুৎকণার (ইলেক্‌ট্রন, পজিট্রণ ইত্যাদি) সৃষ্টি হ'তে পারে। এই সুকঠিন পরীক্ষাটি কোন কোন স্থানে করবার চেষ্টা হ'য়েছে এবং হ'চ্ছে—কিন্তু এখন পর্য্যন্ত বিশেষ কোনও ফল পাওয়া যায় নাই।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলি চিন্তাধারাকে বিচার ও সংশোধন ক'রতে সাহায্য ক'রে। নতুবা চিন্তাধারা বেশী দূর অগ্রসর হ'তে পারে না এবং বেশী দূর অগ্রসর হ'বার চেষ্টা ক'রলে বিষয়টি অত্যন্ত কাল্পনিক ও অবাস্তব (unreal) হ'য়ে পড়ে।

কিন্তু বর্ত্তমান বিজ্ঞান-জগতে এরূপ যান্ত্রিক উন্নতি (mechanical perfection) হ'য়েছে যে তা'র ফলে দ্রুত ও সূক্ষ্ম পরীক্ষালব্ধ সত্যগুলি আমাদের বুদ্ধিকে অভিভূত ক'রে ফেল্‌ছে। পরীক্ষার (experiments) সঙ্গে যুক্তি ও মতবাদ সমান তালে চ'লতে পারছে না। এর জন্য কত নূতন মতবাদ, কত নূতন গণিতশাস্ত্র গড়ে উঠেছে বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে—তা'র ঠিক নাই। বৈজ্ঞানিকগণ এখন অতি অদ্ভুত জানা-অজানার সন্ধিস্থলে এসে উপস্থিত হয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞানকে যে চোখে দেখতেন এখন সে ভাব কারো নাই। তাঁরা মনে করতেন, হয়তো শীঘ্রই প্রকৃতির সকল রহস্য ভেদ ক'রে মানুষ শক্তির চরম উৎকর্ষতা লাভ ক'রতে পারবেন এবং মানুষের সত্তা জগতের মাঝে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা ক'রবেন। কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে মানুষ ধীরে ধীরে জান্‌তে পারছে তার অজ্ঞানতার অন্ধকার এখনও কতদূর বিস্তৃত! সকল বৈজ্ঞানিকের মনের মধ্যে এখন নিউটনের বাণী ধ্বনিত হ'চ্ছে—আমরা জ্ঞানসমুদ্রের তীরে পাথর কুড়াচ্ছি। বাস্তবিক জ্ঞান রাজ্য কি বিশাল—মানুষ তার কতটুকু অংশ পরিভ্রমণ করেছে!

কিন্তু এই মনোভাব নিরাশার নয়। প্রত্যেকটি সত্য আবিষ্কারের মধ্যে যে আনন্দ, যে পূর্ণতা, যে আকাজ্ক্ষা নিহিত আছে তারি বলে বৈজ্ঞানিকগণ এগিয়ে চলেছেন। এই ভাবে আগে চলার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। এই অগ্রসর হওয়াই মানুষের সার্থকতা।

বর্ত্তমান সময় বিজ্ঞান ও দর্শনের পক্ষে একটি বিশেষ পরিবর্ত্তনের যুগ। মনে হয় আগামী ক'য়েক বছরের মধ্যে বিজ্ঞান রাজ্যে বিশেষ পরিবর্ত্তন আস্‌বে—যা'র ফলে বর্ত্তমান মতামত সব ওলটপালট হ'য়ে যেতে পারে। অবশ্য সেটা কি ভাবে হ'বে সে কথা এখন বলা কঠিন। বিজ্ঞানের স্বাভাবিক ক্রমোন্নতির ফলাফলের উপরই সেটা নির্ভর করছে এবং সেজন্য আমাদের ধীরভাবে অপেক্ষা করতে হ'বে।

বিগত যৌবন

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

ম্যাক্‌ফারসন কোম্পানীর বড়বাবু যখন সুকুমারকে জবাব দিলেন, তখন আফিসশুদ্ধ লোকের সঙ্গে বড়বাবু নিজেও কম অবাক হন নাই। কারণ বৎসর দেড়েক পূর্ব্বে সুকুমারের চাকুরী প্রাপ্তি অল্প বিস্ময়কর ঘটনা নহে। কিন্তু তাহার ইতিহাসটা আগে আপনাদের শোনানো দরকার।

আফিসে যে পদটী খালি হইয়াছিল তাহা টাইপিষ্টের এবং সেজন্য বিনা বিজ্ঞাপনেই প্রার্থী হইয়াছিল অন্ততঃ তিনশ'জন। সুকুমারও সংবাদটী কোথা হইতে সংগ্রহ করে, সেই সঙ্গে বড়বাবুর নাম এবং তাঁহার প্রতাপের কাহিনীও শোনে এবং যেদিন ইণ্টারভিউর সময় ধার্য্য হইয়াছিল সেদিন সহসা আসিয়া বড়বাবুকে ধরে যে চাকুরীটী তাহাকে করিয়া দিতে হইবে।

বড়বাবু তখন নবীনবাবুর সহিত একটা কিসের ষ্টেটমেণ্ট লইয়া বচসা করিতেছিলেন; এই আকস্মিক উৎপাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মুখ তুলিয়াই বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেলেন। সে বিস্ময় শুধু সুকুমারের চেহারার দিকে চাহিয়া—উনিশ কুড়ি বছরের ছেলে, উন্নত বলিষ্ঠ দেহ, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, সুন্দর মুখশ্রী এবং সর্ব্বোপরি প্রথম যৌবনের কমনীয়তার পরিপূর্ণ ছাপ তাহার সর্ব্বদেহে। সেদিকে মুহূর্ত্ত কয়েক চাহিয়া থাকিয়াই সহসা বড়বাবুর দৃষ্টি কোমল হইয়া আসিল; অপেক্ষাকৃত নরম সুরে কহিলেন, তা আমার কাছে কেন? ইণ্টারভিউ ত সাহেব নিজে দেবেন!

সুকুমার বিনীতভাবে কহিল, আজ্ঞে আমি দরখাস্ত করি নি; ইণ্টারভিউ আমার নেই।

অধিকতর বিস্মিত হইয়া বড়বাবু কহিলেন, দরখাস্ত করনি? তবে—?

—আজ্ঞে দরখাস্ত ক'রে কোনও ফল নেই তা আমি জানি। আপনিই চাকরীর মালিক; সেই জন্য সোজাসুজি আপনার কাছেই এসেছি।

নবীনবাবু মুখ টিপিয়া হাসিলেন। বড়বাবু কহিলেন, আমার কথা কে ব'লে দিলে?

সুকুমার মাথা নাড়িয়া কহিল—আজ্ঞে তা বলতে পারব না। নিষেধ আছে।

বড়বাবুর দৃষ্টি প্রসন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু মুখ অপ্রসন্ন করিয়াই কহিলেন, নিশ্চয়ই আমার আফিসের কোনও গুণধর! লেলিয়ে দিয়ে ব'সে রইল, তারপর মর্ বেটা তুই!...হুঁ, তা টাইপ করতে জান ত?

প্রশান্তভাবেই সুকুমার জবাব দিল, না। জানি না—তার মানে?

নবীনবাবু লোকটা বাতুল ভাবিয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন; বড়বাবুরও কিছুকাল আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। অনেকক্ষণ পরে কহিলেন—তবে আর কি করব? চাই যে টাইপিষ্ট!

সুকুমার দুই হাত জোড় করিয়া কহিল, কিন্তু আপনাকে করতেই হবে, নইলে আমি কোথায় যাব বলুন?

বড়বাবু ভ্রূকুটী করিয়া কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর শুধু কহিলেন, ঐ বাইরে গিয়ে বোসগে—

নবীনবাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন; এমন কি ষ্টেটমেণ্টটার বড়-রকমের গোলটাই যে এখনও বাকী আছে সে কথাও আর তাঁহার মনে রহিল না। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গেলেন সুধীরবাবু ও জীবনবাবুকে এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনার কাহিনী শোনাইতে।

বড়বাবুও বিনয়কে ডাকাইয়া আনিলেন। কহিলেন, বিনয় তুমি টাইপ্‌রাইটিং শিখ্‌ছিলে না?

বিনয় ঘাড় নাড়িয়া কহিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, মাস দুই ধোল শিখ্‌ছি।

বড়বাবু বলিলেন, আমাদের এই পোষ্টটা যদি তোমার দেওয়া যায়, কাজ চালাতে পারবে ব'লে মনে হয়?

বিনয় বার দুই ঘাড় চুলকাইয়া কহিল—যদি বলেন, তাহ'লে রাত জেগে আর একটু প্র্যাকটিস্ করে নিই—

—তাই নাও। আর হয়ত চান্স্ পাবেই না। হঠাৎ তোমার ধাঁধাটা মনে পড়ল—

বিনয় কৃতার্থ হইয়া চলিয়া গেল। বড়বাবুও উঠিয়া সাহেবের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। ইহার পরের ইতিহাসটা অবশ্য ভাল রকম জানা নাই; তবে পরের দিন শোনা গেল যে বিনয়ই দশ টাকা বেশী মাহিনাতে টাইপিষ্টের কাজে বাহাল হইয়াছে এবং বিনয়ের জায়গায় কাজ পাইয়াছে মাকালফলের মত রূপসর্ব্বস্ব এক ছোকরা—সুকুমার!

নবীনবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, ছোকরা মোসাহেবীটে শিখেছিল বটে! দিনকে রাত ক'রে দিলে বাবা!

কিন্তু সে যাহাই হউক, সেই হইতে সুকুমার ঐ পদেই বাহাল ছিল এবং অপ্রতিহত প্রভাবে চাকরী করিয়া আসিতেছিল। মাহিনা তাহার যে কোথা দিয়া চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ এবং পঞ্চাশ হইতে ষাটে পৌছিল তাহা বোধ হয় বড়বাবু আর তাঁহার অন্তর্য্যামীই জানেন; তবে নবীনবাবুর দল সুকুমারের প্রতি বড়বাবুর পক্ষপাতটা অচিরেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাহা কাজে লাগাইতেও দেরী করেন নাই। ইদানীং তাঁহাদের আবেদন নিবেদন তাঁহারা সুকুমারকেই জানাইতেন।

কিন্তু সহসা সুকুমারের ভাগ্যলক্ষ্মী একদিন অপ্রসন্ন হইলেন। সেটা মাঘ মাসের মাঝামাঝি, আফিসে কাজকর্ম্মের ভীড় সে সময়টায় একটু কম; সুকুমার বড়বাবুর কাছে গিয়া বসিয়া কহিল, সামনের মাসে আমায় হপ্তাদুই-এর ছুটি দিতে হবে বোধ হয়!

বড়বাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, কেন বল দেখি?

মাথার পিছনটা বার-দুই চুলকাইয়া লইয়া সুকুমার জবাব দিল—আজ্ঞে বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে—আমার অবিশ্যি ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু মা পেড়াপীড়ি করছেন, আর এড়ানো যাচ্ছে না।

বড়বাবুর ভ্রূকুটী যেন সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল; তিনি কিছুকাল স্থিরভাবে সুকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, বয়স কত তোমার?

—আজ্ঞে একুশ পূরো হ'য়ে বাইশে পড়েছি।

—তবে অত বিয়ের তাড়া কেন? এই অল্প বয়স—এখনও যথেষ্ট উপার্জ্জন করতে পারনি, এরই মধ্যে বিয়ে ক'রে স্ত্যাঙারি হওয়া কেন?

সুকুমার এদিক-ওদিক চাহিয়া পুনশ্চ কহিল,—আজ্ঞে, মা কিছুতেই ছাড়ছেন না যে!

—মাকে গিয়ে বল যে সাহেব এখন ছুটি দেবে না।

সুকুমার সেদিন আর কথাটা বেশী বাড়াইল না, তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল। কিন্তু কেন যে বড়বাবু তাহার বিবাহে বিরূপ, সে কথাটা কিছুতেই বুঝিতে পারিল না।

বড়বাবু দিনকতকের মধ্যেই কথাটা ভুলিয়া গেলেন; তাই মাঘ মাসের মাঝামাঝি যখন সহসা পেটের অসুখ ও জ্বরের কথা জানাইয়া সুকুমার মাত্র পাঁচদিনের ছুটি চাহিল তখন তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে সাহেবকে দিয়া মঞ্জুর করাইয়া দিলেন।

কিন্তু কথাটা তিনি ভুলিয়া গেলেও নবীনবাবু ভোলেন নাই। পাঁচটার পর আফিস জন-বিরল হইয়া গেলে তিনি ধীরে ধীরে মুখে একটা পান দিয়া বড়বাবুর টেবিলের ধারে উপস্থিত হইলেন। বড়বাবু মাথা হেঁট করিয়া কাগজপত্র গুছাইতেছিলেন; মাথা না তুলিয়াই কহিলেন, কি, বাড়ী চললেন?

নবীনবাবু কহিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, এরিয়ার কায যা ছিল সবই সেরে ফেলেছি, আজ একটু সকাল ক'রে বাড়ী যাব।...আমাদের সুকুমারের কেলেঙ্কারীটা শুনেছেন?

বড়বাবু চমকিয়া ঘাড় তুলিয়া কহিলেন, না,—কেলেঙ্কারী?

নবীনবাবু কহিলেন, আজ যে তার বিয়ে!...পরশু বৌভাত।...আমাদের বললে না, জানালে না—নেমন্তন্ন ত চুলোয় যাক্! আপনাকে বলেছে?

বড়বাবুর চোখ দুইটা যেন সহসা জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি পরক্ষণেই ঘাড় নামাইয়া কহিলেন,—হ্যাঁ, কি একটা বলছিল বটে, অতটা আমি কাণ দিইনি!

নবীনবাবু কহিলেন, তবু ভাল, যে এটুকু কর্ত্তব্যবোধ আছে! আচ্ছা, নমস্কার!

নবীনবাবু চলিয়া গেলেন, কিন্তু বড়বাবুর সেই অতিবড় দরকারী হিসাবটাতেও মন বসিল না। মনের মধ্যে কতকগুলি বিক্ষিপ্ত বৃত্তি যেন এক সঙ্গে কোলাহল করিতেছিল। রাগ—প্রচণ্ড রাগ, কিন্তু ঠিক যে কি জন্ম

তাহা তিনি নিজেই হদিশ পাইতেছিলেন না। অনেকক্ষণ বিমূঢ় জড়ের মত বসিয়া থাকিয়া চাপরাশীকে কাগজগুলি গুছাইয়া রাখিতে বলিয়া ডেস্কে চাবী দিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন।

ট্রামের টিকিট পকেটেই ছিল, কিন্তু ট্রামে চড়িতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না; সোজা বৌবাজারের দিকে হাঁটিয়া চলিলেন।

বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাসে মনের এলোমেলো ভাব কাটিতে প্রথমেই তাঁহার ক্রোধটা সুকুমারের অকৃতজ্ঞতাকে অবলম্বন করিয়া বিশেষ আকার ধারণ করিল। মনে-মনে তিনি যেন গজরাইয়া উঠিলেন—ওরে অকৃতজ্ঞ, ওরে বেইমান—রাস্তার কুকুরকে আনিয়া সিংহাসনে বসাইলাম, এই কি তাহার পরিণাম? যে লোকটা এত উপকার করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে তাহার কথার এতটুকু মর্য্যাদা দেওয়া চলে না? নিজের প্রবৃত্তি এতই বড় হইয়া উঠিল যে আর কয়েকটা মাসও অপেক্ষা করিতে পারিলি না?…

ক্রোধের প্রথম বেগটা কমিয়া আসিতেই মনের অপেক্ষাকৃত শান্ত অবস্থায় মনটা নিজের একুশ বছর বয়সে ফিরিয়া গেল। মনে পড়িল—বাবা প্রথম যেদিন বিবাহের কথা পাড়িলেন তাহার পর দুই তিন রাত্রি ঘুমাইতে পারেন নাই।…সুকুমার? হাঁ, ও বয়সে তিনি অত সুন্দর না হউক অতটাই জোয়ান ছিলেন!…মনে পড়ে প্রতি শনিবার প্রকাশ্যে এবং সপ্তাহে প্রায় পাঁচদিন গোপনে শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার কথা। কলেজ পালাইয়া দুপুরে ও বন্ধুর বাড়ী পড়িতে যাওয়ার অছিলায় সন্ধ্যাবেলা!

যৌবনের ধর্ম্মই এই! অনর্থক রাগ করিয়া ফল নাই।

বড়বাবুর মনের রাগ সব যেন অকস্মাৎ কোথায় চলিয়া গেল। তিনি স্মিত প্রসন্ন মুখে কলেজ স্কোয়ারের মোড় হইতে এক গাছা বেলফুলের মালা কিনিয়া হাতে জড়াইলেন; তারপর বহুদিন পরে গুন্‌গুন্ করিয়া ছেলেবেলাকার গাওয়া একটা গান ভাঁজিতে ভাঁজিতে পা আরও জোরে হাঁকাইলেন।

যে পথটা আসিতে তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থায় পনের-কুড়ি মিনিট লাগা উচিত, সেই পথটা অনায়াসে দশ মিনিটের মধ্যে অতিক্রম করিয়া নিজের বাড়ীতে পৌছিলেন। কিন্তু দ্বারে পা দিতেই সমস্ত স্বপ্ন যেন রূঢ়ভাবে ভাঙিয়া গেল। গৃহিণী তাঁহার মোটা ভাঙা গলায় বিকট চীৎকার করিতেছেন, মুখে আগুন তোমার! একটা কাজ যদি তোমার দ্বারা হবার যো আছে! এক-একসের দুধ দিলে পা লাগিয়ে সবটা ফেলে? কি হাড়-হাবাতে লক্ষ্মীছাড়া ঘরের মেয়ে এনেছি গো! কর্ত্তা আসুক, তোমায় বাপের বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে তবে আমার নাম!

বুঝিলেন যে পুত্রবধূর সঙ্গে আবার বাধিয়াছে। প্রত্যহই বাধে, কিন্তু আজিকার এই কলহের মত নিষ্ঠুরতা বোধ হয় আর কিছু নাই! তাঁহার মনে পড়িল—ত্রিশ বৎসর আগে এই রমণীরই মিষ্ট কণ্ঠের মধু-গুঞ্জন অহরহ কাণে বাজিত বলিয়াই বি-এ পাশ করা তাঁহার ঘটিয়া ওঠে নাই। তবুও তিনি মুখে প্রসন্নতা আনিয়া ভিতরে পা দিয়া কহিলেন—আবার ভর সন্ধ্যেবেলা তোমাদের কি হোল গো!

গৃহিণী মুখের কাছে আসিয়া বিশ্রীভাবে হাত-পা নাড়িয়া কহিলেন, কি হবে আবার! গুণবতী বৌ তোমার দিলেন একসের দুধ পা লাগিয়ে ফেলে। লক্ষ্মীমন্ত ঘরের মেয়ে এনেছ, এইবার ধন-দৌলত উছলে পড়বে!

বধূ আড়ষ্ট হইয়া দূরে নতমুখে দাঁড়াইয়া ছিল, সেদিকে চাহিয়া বড়বাবু কহিলেন, যাক্‌গা ছেলেমানুষ অসাবধানে ক'রে ফেলেছে, তার জন্য সন্ধ্যেবেলা বকাবকি ক'রে আর কি হবে? এস—ওপরে এস—

অকস্মাৎ যেন খণ্ডপ্রলয় বাধিয়া গেল। বার কতক লাফাইয়া, নাচিয়া, চেঁচামেচি করিয়া গৃহিণী সত্যই কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া তুলিলেন। স্থূল দেহ, প্রকাণ্ড মুখ—বলীরেখায় ও দন্তহীনতায় কুৎসিত, বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে; গাত্র চর্ম্ম লোল ও কুঞ্চিত; তাহার উপর ঐ জঘন্য ভঙ্গী; সেদিকে চাহিয়া যেন তাঁহার গা ঘিন্-ঘিন্ করিতে লাগিল। তিনি তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। পিছনে গৃহিণীর আস্ফালন তখনও থামে নাই—বুড়ো হ'য়ে মরতে চললেন, অস্ত-দন্তসার, শকুনি উড়ছে মাথার ওপর; এখনও আক্কেল হোল না? আমার মুখের সামনে বৌকে আস্কারা দেওয়া? আবার বুড়ো বয়সে বেলফুলের মালা জড়ানো হয়েছে হাতে! ছোঁড়া সাজবার সখ হয়েছে?…

না, যৌবন আর নাই। তাহাকে বহুদূরে ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছেন। সে কবেকার কথা, এখন যেন

মনেও পড়ে না! দেহে নানারকমের রোগ জরার উপস্থিতি ঘোষণা করিতেছে। এখন আর সত্যই বেলফুলের মালা হাতে জড়ানো যায় না!

নিজের ঘরে না ঢুকিয়া বড়ছেলের ঘরে আসিয়া আয়না বসানো আলমারীটার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বাহিরের আলো তখন পাণ্ডুর হইয়া আসিয়াছে কিন্তু তাহাতেই যাহা নজরে পড়ে তাই যথেষ্ট! চুল পাকিয়াছে; দাঁতের অর্দ্ধেক বাঁধানো, তাহাতে গাল ও ঠোঁটের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া উঠিয়াছে; গায়ের চামড়া গোসাপের পিঠের মত; স্থূল বেডোল দেহ; এইটুকু উঠিয়া আসিয়াই হাঁপাইতেছেন!

চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল সুকুমারের যৌবনপুষ্ট বলিষ্ট দেহ; তাহার সর্ব্বাঙ্গে যৌবনের সেই আবেশময় উচ্ছৃঙ্গলতা। সেই কবি-কল্পনায় একটী সুন্দরী কিশোরীর আবেগময় প্রেম-নিবেদনও যেন তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন; যৌবন ও কৈশোরের সেই বিহ্বল মিলন। তাঁহার বুকের মধ্যে যেন একটা আগুন জ্বলিয়া, সারা বুক পুড়াইয়া প্রচণ্ড একটা হাহাকার তুলিয়া চলিয়া গেল। ঈর্ষার তীব্র বিষে শরীর তাঁহার মূর্চ্ছাতুর হইয়া উঠিল। তিনি টলিতে টলিতে নিজের ঘরে ঢুকিয়া মালাটা ছিঁড়িয়া ফুলগুলি দলিয়া ছুঁড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। তারপর অফিসের পোষাক না ছাড়িয়াই একখানা পোষ্টকার্ড বাহির করিয়া সুকুমারকে চিঠি লিখিতে বসিলেন।

যাহা লিখিলেন তাহার মর্ম্মার্থ এই; সুকুমারের অতঃপর আর অফিসে আসিবার দরকার নাই; তাহার এই কয়দিনের মাহিনা নোটীশের এক মাসের মাহিনা শুদ্ধ মনিঅর্ডারযোগে তাহাকে যথাসময়ে পাঠানো হইবে। তাহার চাকুরী আর নাই।

চাকরকে ডাকিয়া চিঠিখানি ডাকে পাঠাইয়া দিয়া ধীর হস্তে পায়ের জুতা গায়ের জামা খুলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। নীচে গৃহিণীর চীৎকার তখনও থামে নাই।

সনেট

শ্রীনিখিল সেন

বেকার বসিয়া ঘরে লিখিনু কাতারে:
কাগজে পাঠিয়ে দিয়া ভাবিনু পুলকে:
শেখজীর মসী-স্রোতে ভাসাব' ভাষারে—
অবাক গণিবে লোকে আমার ঝলকে।
প্যাড্ কিনে সেই হেতু শিখিলাম কত—
কবিতা সমুদ্রে দিনু সাঁতারিয়া পাড়ি,
মাসিকেতে পাঠালাম সাইক্লোন মত;
ব্যাক-ব্রাশ চুল করে রাখিলাম দাড়ি!

ফিরিল কবিতাগুলি মসী-রক্ত দেহে—
ছাপাল' না কেহ হায়, লাগিল যে ধাঁধা;
টানিয়া আবার প্যাড্ লিখিতে বসিনু,
এবার জাহ্নবী ধারা আটকাবে কে হে!
গুচ্ছ শুভ্র চুল টানি কহিলেন দাদা:
এতগুলি টাকা বৃথা জলেতে ফেলিনু!

আপন-পর

শ্রীনিরাপদ মুখোপাধ্যায়

স্বর্গ মর্ত্ত নরক নিয়ে
সৃষ্টি হ'ল জগৎখানা—
সেই জগতের মধ্যে এসে
মোদের যত পাওনা দেনা।

রামা বলে এটা আমার
শ্যামা বলে তোমার নয়—
এম্নি ক'রে ভবের মাঝে
মিলন যত ছিন্ন হয়।

যেদিন হব তোমার আমি
যেদিন হবে আমার তুমি
সেই দিনেতে বুঝ্বো রে ভাই—
সফল হ'ল জন্মভূমি॥

রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্‌-এ, এফ্‌-এস্‌-এস্‌, এফ্‌-আর্‌-ই-এস্‌

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, পলাশীর প্রথম ও শেষ ব্যারণ, মহামাননীয় লর্ড ক্লাইভের বিশ্বস্ত দেওয়ান মহারাজা নবকৃষ্ণদেব বাহাদুর কলিকাতার শোভাবাজার পল্লীতে যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, সেই বংশের অনেকেই কেবল নেতৃরূপে বঙ্গের সামাজিক জীবনের উপর কল্যাণময় প্রভাব বিস্তৃত করেন নাই, পরন্তু সাহিত্যের সেবকগণকে উৎসাহিত করিয়া এবং স্বয়ং বাণীর সেবার দ্বারা দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। মহারাজা নবকৃষ্ণের রাজসভা বঙ্গগৌরব জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ও বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের প্রতিভালোকে একদা উজ্জল হইয়া উঠিয়াছিল। হরু ঠাকুর (হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী), নিতাই দাস প্রমুখ কবিগণ, আখড়াই সঙ্গীতের প্রবর্ত্তক কুলুইচন্দ্র সেন প্রভৃতি গীতরচয়িতৃগণ মহারাজা নবকৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষকতায় ও উৎসাহে বঙ্গসরস্বতীর সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। রাজা গোপীমোহন দেব জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব অন্যান্য গ্রন্থের কথা ছাড়িয়া দিলেও কেবল 'শব্দকল্পদ্রুম' সম্পাদনের জন্য চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। রাজা রাজকৃষ্ণ স্বয়ং সঙ্গীতজ্ঞ কলাবিৎ ছিলেন। এই বংশোদ্ভূত 'রত্নগিরি' 'আমার গুপ্তকথা' প্রভৃতি প্রণেতা উপেন্দ্রকৃষ্ণ, 'বঙ্গের কবিতা' প্রণেতা অনাথকৃষ্ণ, সাহিত্য পরিষৎ ও সাহিত্য সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা এবং কলিকাতার ইতিহাস লেখক রাজা বাহাদুর বিনয়কৃষ্ণ প্রভৃতির নামও সাহিত্যসেবার জন্য স্মরণীয় থাকিবে। যাঁহার উদ্দেশে বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি সেই মহাত্মা রাজা কালীকৃষ্ণও তাঁহার অক্লান্ত সাহিত্য-সেবা, গভীর স্বজাতিপ্রেম ও অপূর্ব্ব স্বধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য চিরদিন দেশবাসীর আদর্শস্থানীয় হইয়া থাকিবেন।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে রাজা কালীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজা নবকৃষ্ণের প্রথমে কোন পুত্র সন্তান না হওয়ায় তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গোপীমোহনকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে মহারাজা নবকৃষ্ণের চতুর্থা পত্নীর গর্ভে তাঁহার ঔরসজাত পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ৪২ বৎসর বয়সে রাজা রাজকৃষ্ণ আটটি পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন; যথা—রাজা শিবকৃষ্ণ, রাজা বাহাদুর কালীকৃষ্ণ, রাজা দেবীকৃষ্ণ, রাজা অপূর্ব্বকৃষ্ণ, রাজা মাধবকৃষ্ণ, মহারাজা কমলকৃষ্ণ, মহারাজা স্যর নরেন্দ্রকৃষ্ণ ও রাজা যাদবেন্দ্রকৃষ্ণ। পিতার মৃত্যুকালে কালীকৃষ্ণের বয়ঃক্রম মাত্র ষোল বৎসর।

সমৃদ্ধির ক্রোড়ে লালিত, বয়ঃসন্ধিকালে পিতৃহীন, কালীকৃষ্ণের পক্ষে বিলাসিতার মধ্যে আলস্যে জীবন অতিবাহিত করা অস্বাভাবিক হইত না; কিন্তু তিনি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ভ্রাতা (গোপীমোহন দেবের পুত্র) রাজা স্যর রাধাকান্তকে আদর্শস্থানীয় বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহার ন্যায় বাণীসেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তখন উচ্চশিক্ষার সেরূপ সুযোগ না থাকিলেও তিনি ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারস্য, আরবীয় ও উর্দ্দ ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহার রসাস্বাদন করিতে পারিতেন, সংস্কৃত ভাষায় শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন, পারস্য, উর্দ্দু ও আরবীয় ভাষায় লিখিতে ও বলিতে পারিতেন এবং বাঙ্গালা গদ্য ও পদ্যে রচনা লিখিতে পারিতেন।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি যে সকল গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিলেই তাঁহার সাহিত্যানুরাগের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। গ্রন্থগুলি এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে :

১৮৩০ খৃষ্টাব্দ	পুরুষ পরীক্ষা (ইংরাজী অনুবাদ)
১৮৩১ „	নীতি সঙ্কলন (Moral Maxims)—২৫৮টি সংস্কৃত শ্লোক ইংরাজী অনুবাদ সহ।
১৮৩২ „	বিদ্বন্মোদ তরঙ্গিণী (অর্থাৎ ষড়্‌দর্শনাদি সংস্কৃত সংগৃহীতা সজ্জন স্বান্ত সন্তোষিণী তত্ত্বাবার্থ ইংলণ্ডীয় ভাষায় মহারাজ শ্রীকালীকৃষ্ণ বাহাদুরেণানুবাদিতঃ)।

(গুপ্তিপল্লীনিবাসী চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যের গ্রন্থের অনুবাদ)

„ মহানাটক

১৮৩৪ „ সংক্ষিপ্ত সদ্বিদ্যাবলী অর্থাৎ বিবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান প্রসঙ্গ—

„ র‍্যাসেলাস (বঙ্গানুবাদ)

„ বেতাল পঁচিশী (ইংরাজী অনুবাদ)—গ্রন্থখানি লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে উৎসৃষ্ট হয়।

১৮৩৫ „ মজমুয়ি লতায়েফ (ইংরাজী ও হিন্দী)

„ সৌরজগতের মানচিত্র

১৮৩৬ „ Gay's Fables বা গে সাহেবের ইতিহাস (পয়ার ছন্দে, বাঙ্গালা ভাষায়)

„ Fables by the late Mr. Gay with its translation into Urdu Poetry (স্যর চার্লস মেটকাফকে উৎসৃষ্ট)

১৮৪০ „ মহানাটক (ইংরাজী অনুবাদ)—মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে উৎসৃষ্ট।

তাঁহার পূর্ব্বে আর কোনও হিন্দু বাঙ্গালী উর্দ্দু ভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি। রাজা কালীকৃষ্ণ স্বয়ং একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং "রাজার শোভাবাজার প্রেস" হইতে তাঁহার অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার গ্রন্থগুলি মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক, লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড, স্যর চার্লস মেটকাফ প্রভৃতিকে তাঁহাদিগের অনুমতি গ্রহণানন্তর উৎসৃষ্ট হয়। সুপণ্ডিত বলিয়া সামসময়িক সমাজে তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। মহানাটকের ইংরাজী অনুবাদ পাইয়া মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে স্বাক্ষরযুক্ত পত্র ও একটি সুবর্ণপদক প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইংরাজী অনুবাদ কার্য্যে রাজা কালীকৃষ্ণের পিতৃস্বস্‌পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া ফরাসী সম্রাট, জর্ম্মাণ সম্রাট, বেলজিয়মের রাজা, অষ্ট্রিয়ার অধিপতি, দিল্লীর বাদশাহ, অযোধ্যার নবাব, নেপালের মহারাজা, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক প্রভৃতি তাঁহাকে সুবর্ণ পদক প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের অধিপতি চতুর্থ উইলিয়ম, মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার স্বামী প্রিন্স কন্সর্ট, ইংলণ্ডের যুবরাজ (পরে সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড), রাজপুত্র ডিউক অব এডিনবরা, ডিউক অব কেম্‌ব্রিজ, স্যর রবার্ট পীল, আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট, গ্ল্যাডষ্টোন, ডিসরেলী, লর্ড হ্যালিফ্যাক্স প্রভৃতি রাজমন্ত্রী, মহারাজা রণজিৎ সিং, ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা, জয়পুরের ও যোধপুরের মহারাজা প্রভৃতি দেশীয় রাজন্যবৃন্দ, কেম্‌ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রভৃতি অসংখ্য গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহাকে প্রশংসাসূচক পত্র লিখিয়াছিলেন। নেপালের অধিপতি তাঁহাকে 'নাইট অব দি গুর্খা ষ্টার' নামক গৌরব জনক উপাধি প্রদান করেন।

তাঁহার পুস্তকাগারে বহু মূল্যবান পুস্তকের সংগ্রহ ছিল। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় তাঁহার প্রসিদ্ধ মহাভারত অনুবাদকালে কালীকৃষ্ণের পুস্তকাগারে রক্ষিত পুঁথির সাহায্য লইয়াছিলেন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক কালীকৃষ্ণকে উপযুক্ত খিলাত সহ "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন।

সমাজ-সংস্কার বিষয়ে রাজা কালীকৃষ্ণ রাজা রাধাকান্তের ন্যায় রক্ষণশীল ছিলেন এবং সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশীয় বালকবালিকাগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে তাঁহার অসীম আগ্রহ ছিল। তিনি বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ সভাদিতে প্রায়ই উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রগণকে উৎসাহিত করিতেন। এই প্রসঙ্গে জাতীয় মেলার প্রবর্ত্তক নবগোপাল মিত্র তৎসম্পাদিত 'ন্যাশন্যাল পেপার'এ একটি কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছিলেন। একবার ন্যাশন্যাল স্কুলের একটি সভায় রাজা কালীকৃষ্ণকে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করা হয়। তখন বিমাতার মৃত্যুর জন্য তাঁহার অশৌচাবস্থা, তিনি নগ্নপদে আছেন, নিজের শরীরও নিতান্ত অসুস্থ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার উপস্থিত থাকা কি একান্ত প্রয়োজন ?" উত্তর হইল "উপস্থিত হইলে ভাল হইত, কিন্তু আপনার এই পারিবারিক বিপদের দিনে অসুস্থ শরীরে যাইতে আমরা পীড়াপীড়ি করিতে পারি না।" তিনি বলিলেন, "আমার শারীরিক বা মানসিক অবস্থার কথা ছাড়িয়া দাও, কাল বিজ্ঞাপন পত্র পাঠাইয়া দিও,

আমি যাইব।" যদিও তাঁহার অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহাকে কোন পত্র প্রেরিত হইল না, রাজা সশরীরে স্কুলের সভায় যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। রাজা কালীকৃষ্ণ ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীরও পরিচালনা-সভার সভাপতি ছিলেন।

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারেও তাঁহার আগ্রহের সীমা ছিল না। তিনি বেথুন বিদ্যালয়ের পরিচালনা সভার সদস্য ছিলেন এবং যদিও সেকালে হিন্দু রক্ষণশীল পরিবার হইতে সাধারণ বিদ্যালয়ে বালিকাগণকে সচরাচর প্রেরণ করা হইত না, রাজা কালীকৃষ্ণ তাঁহার নিজের নাতিনীগণকে বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া নৈতিক সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন।

সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন বলিয়া রাজা কালীকৃষ্ণকে দেশহিতকর সকল সভাসমিতিতে যোগদান করিতে হইত। রাজনীতিক সভাসমিতিতে সংশ্লিষ্ট থাকিলেও তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল সাহিত্যসভা প্রভৃতির প্রতি। তিনি দেশের তৎকালীন সর্ব্বপ্রধান রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার অন্যতম সহকারী সভাপতি ছিলেন; কিন্তু জীবনের শেষ কয়েক বৎসর কোন অপ্রকাশ্য কারণে উহার সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজনীতিক নেতারূপে তিনি বহুবার গবর্ণর জেনারেল বা লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণরের নিকট দেশবাসীর প্রতিনিধিবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি 'জাষ্টিস অফ দি পীসে'র (তৎকালে অতীব সম্মানজনক) পদ লাভ করেন। কলিকাতা য়ুনিভার্সিটী প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' মনোনীত হইয়াছিলেন।

তিনি লণ্ডনের এসিয়াটিক সোসাইটী এবং য়ুরোপের অন্যান্য দেশের প্রাচ্যবিদ্যানুশীলনী সভায় সম্মানিত সদস্য ছিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্যারী নগরীতে কৃষিশিল্প প্রদর্শনীতে তিনি কতকগুলি দ্রব্য ও কৃষিশিল্পদ্রব্যের একটি তালিকা প্রেরণ করিয়া সুখ্যাতি লাভ করেন। তিনি মেয়ো হাসপাতালের অন্যতম গবর্ণর এবং অন্যান্য বহু দেশহিতকর প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে সাহিত্য-সভাদিতে যোগ দিতে তিনি বিশেষ ভাল বাসিতেন। এদেশে 'ইংরাজী শিক্ষার পিতা' প্রাতঃস্মরণীয় ডেভিড হেয়ারের পরলোকগমনের পর তাঁহার পুণ্যস্মৃতি চিরজাগরূক রাখিবার জন্য কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁহার মৃত্যু দিবসে একটি সাম্বৎসরিক স্মৃতিসভার ব্যবস্থা করেন। প্যারীচাঁদ মিত্র বিরচিত ডেভিড হেয়ারের ইংরাজী জীবন-চরিত দৃষ্টে প্রতীত হয় যে কালীকৃষ্ণ বহুবার এই সভায় নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। যথা,—

(১) ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ১লা জুন জোড়াসাঁকোতে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের ভবনে ডেভিড হেয়ার স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাবু অম্বিকাচরণ ঘোষাল, কালীপ্রসন্ন সিংহ ও কৃষ্ণদাস পাল প্রবন্ধ পাঠ করেন।

(২) ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ১লা জুন কালীপ্রসন্ন সিংহের ভবনে হেয়ার স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। সভাপতি ডেভিড হেয়ারের পরহিতৈষণা ও উদার আত্মত্যাগের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তৎপরে বাবু শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় ইংরাজী ভাষায় 'শিক্ষা' সম্বন্ধে এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ বাঙ্গালা ভাষায় "দেশীয় ভাষার আলোচনা" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠের পর মিষ্টার ম্যাক লাকি, প্রফেসর বার্জেস (পেরেণ্ট্যাল একাডেমী), কৃষ্ণদাস পাল, যদুনাথ ঘোষ, রেভারেণ্ড সি-এইচ-এ-ডল প্রভৃতি তদ্বিষয়ে আলোচনা করেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় ডেভিড হেয়ারের একখানি জীবনচরিত প্রণয়ন ও প্রকাশের প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

(৩) ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ১লা জুন কালীপ্রসন্ন সিংহের ভবনে হেয়ার স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতির পদে বৃত হন। কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বাঙ্গালা নাটক' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

(৪) ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ১লা জুন কালীপ্রসন্ন সিংহের ভবনে ডেভিড হেয়ার স্মৃতিসভা আহূত হয়; রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাবু বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবন্ধ পাঠ করেন।

সেকালে 'বেথুন সোসাইটী' নামক এক প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সভা ছিল। শিক্ষাপরিষদের সভাপতি এবং বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা পুণ্যশ্লোক ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের নাম

চিরস্মরণীয় করিবার জন্য য়ুরোপীয় এবং দেশীয় সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দদ্বারা এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। উহাতে য়ুরোপীয় সর্ব্বোচ্চ পদমর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিগণও যোগদান করিতে বা বক্তৃতা দিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। রাজা কালীকৃষ্ণ এই সভার একজন 'সম্মানিত' সদস্য ছিলেন। উক্ত সভার কার্য্যবিবরণাদি পাঠে প্রতীত হয় যে তিনি ঐ সভায় বক্তৃতাদি প্রদত্ত হইবার পর তর্ক-বিতর্কে বহুবার যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মন্তব্য সকলে শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিতেন। কয়েকটি সভার বিবরণ হইতে কিছু কিছু সঙ্কলিত করিতেছি :—

(১) ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ১৫ই মার্চ মেডিক্যাল কলেজ হলে সভার মাসিক অধিবেশন হয়। সভাপতি ডাক্তার আলেক্জাণ্ডার ডফ্ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি স্যর বার্টল্ ফ্রেয়ার, কর্ণেল বেয়ার্ড স্মিথ ও রাজা কালীকৃষ্ণ প্রভৃতি সর্ব্বজনমান্য ব্যক্তিগণকে উপস্থিত দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন এবং অসুস্থতার জন্য স্যর জেমস্ আউটর্যাম এবং অন্যান্য কার্য্যনিবন্ধন স্যর রবার্ট নেপিয়ার ও মহা-মাননীয় মিষ্টার উইলসন অনুপস্থিত থাকায় দুঃখ প্রকাশ করেন। অতঃপর মিষ্টার ওয়াইলি "হানা মূর ও স্ত্রীশিক্ষা" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠের পর রাজা কালীকৃষ্ণ শাস্ত্রগ্রন্থাদি হইতে নানা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় দীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

(২) ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ১৪ই মার্চ সভার পঞ্চম মাসিক অধিবেশন হয়। রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডফ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কলিকাতার মহা-মাননীয় লর্ড বিশপ মহোদয় "কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়" সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন। রাজা কালীকৃষ্ণ প্রবন্ধ-পাঠককে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া এদেশের শিক্ষাপদ্ধতি—চতুষ্পাঠী প্রভৃতি সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় একটি সুললিত বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি গরুড়পুরাণ, পদ্মপুরাণ, দেবীপুরাণ প্রভৃতি পুরাণ হইতে বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় মত সমর্থিত করেন।

(৩) ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ১৮ই এপ্রিল সভার ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন হয়। রেভারেণ্ড ডাক্তার ডফ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আচার্য্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের সম্বন্ধ' বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। রাজা কালীকৃষ্ণ আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন তাহা সভাস্থ সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রবণ করেন এবং রাজা বাহাদুরের পাণ্ডিত্যের অশেষ প্রশংসা করেন।

(৪) ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ১৩ই নভেম্বর সভার প্রথম মাসিক অধিবেশন হয়। রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডফ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ডাক্তার নরম্যান চেভার্স 'কলিকাতার স্বাস্থ্য-বিষয়ক ব্যবস্থা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভায় স্যর রবার্ট নেপিয়ার, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার মাননীয় মিষ্টার আরস্কিন প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রবন্ধপাঠের পর রাজা কালীকৃষ্ণ আলোচনায় যোগদান করেন এবং নানা শাস্ত্র হইতে শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণিত করেন যে এদেশের শাস্ত্রকারগণ যে সকল নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে স্থানীয় স্বাস্থ্য রক্ষার প্রশ্ন উপেক্ষিত হয় নাই।

(৫) ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর সভার দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন হয়। রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডফ সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র "হিন্দু-নারী ও দেশের উন্নতির সহিত তাহাদের সম্বন্ধ" বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ ও সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই সভায় তৎকালীন লেফ্টেন্যাণ্ট গবর্ণর স্যর সিসিল বীডন এবং সুপ্রিম কৌন্সিলের বহু সদস্য শ্রোতারূপে উপস্থিত ছিলেন। প্রবন্ধপাঠের পর রাজা কালীকৃষ্ণ তাঁহার পুরাতন বন্ধু এবং দেশীয়গণের শিক্ষার উন্নতি সম্বন্ধে সর্ব্বদা অবহিত বক্তেশ্বরকে এবং সুপ্রিম কৌন্সিলের অন্যান্য সদস্যগণকে তাঁহাদের উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ দেন এবং নানা শাস্ত্র হইতে শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়া স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রবন্ধপাঠককে সমর্থন করেন।

উপরি ধৃত বিবরণ হইতে পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন যে ইংরাজীতে অভিজ্ঞ হইয়াও রাজা কালীকৃষ্ণ মাতৃভাষায় সর্ব্বোচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীবৃন্দের সমক্ষে বক্তৃতা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে রাজা স্যর রাধাকান্ত দেবের মৃত্যুর পর রাজা কালীকৃষ্ণই হিন্দুসমাজের সর্ব্বপ্রধান নেতা হন। লর্ড ড্যালহৌসী তাঁহার পরবর্ত্তী গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ক্যানিংএর নিকট রাজা রাধাকান্ত ও কালীকৃষ্ণকে হিন্দুসমাজের নেতা

বলিয়া পরিচিত করিয়া দেন। রাজপুত্র ডিউক অব্ এডিনবরা এদেশে আসিলে লর্ড মেয়ো রাজা কালীকৃষ্ণকে হিন্দুসম্প্রদায়ের নেতা বলিয়াই পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাজা বালকবালিকাগণের শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে উদার মত পোষণ করিলেও ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারাদি সম্বন্ধে অতি রক্ষণশীল ছিলেন। রাধাকান্ত দেবের ধর্ম্ম-সভার বিলোপের পর তিনি সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা নামক এক সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। উহাতে বহু সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ হিন্দু সাগ্রহে যোগদান করিয়াছিলেন। রাজা কালীকৃষ্ণই এই সভায় সভাপতি ছিলেন।

রাজা কালীকৃষ্ণ স্বয়ং ভূস্বামী হইয়াও প্রজাবন্ধু ছিলেন। যখন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মুখপত্র হইয়া কৃষ্ণদাস পালের সম্পাদনায় জমিদারগণের স্বার্থরক্ষায় নিয়োজিত হয়, তখন উহার প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক দেশপ্রাণ গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রজাপক্ষ সমর্থনের জন্য সুপ্রসিদ্ধ "বেঙ্গলী" পত্রের প্রবর্ত্তন করেন। রাজা কালীকৃষ্ণ এই সময়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের উদারনীতি ও স্বাধীনমতের প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা ছিল। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২০শে সেপ্টেম্বর গিরিশচন্দ্র পরলোক গমন করিলে উক্ত বৎসরে ১৬ই নভেম্বর তারিখে তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে টাউনহলে এক বিরাট সভা হয়। তাহাতে 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' পত্রের সম্পাদক মিষ্টার উইলসন, অধ্যাপক লব প্রভৃতি য়ুরোপীয় এবং বহু উচ্চপদস্থ দেশীয় ব্যক্তি তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। রাজা কালীকৃষ্ণ এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া একটি গভীর শ্রদ্ধাব্যঞ্জক বক্তৃতা করেন এবং স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে বিশেষ চেষ্টা পান।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে রাজা কালীকৃষ্ণ উদরাময় রোগে আক্রান্ত হন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ সপরিবারে বারাণসী ধামে গমন করেন। এই স্থানে তাঁহার স্বাস্থ্যের কিঞ্চিৎ উন্নতি পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু মার্চ্চ মাসে তাঁহার বৃদ্ধা জননী কার্ব্বাঙ্কল রোগে আক্রান্ত হন। উহাতে অস্ত্র প্রয়োগের প্রয়োজন অনুভূত হয়। কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র রাজা কালীকৃষ্ণের পঁচাশী বৎসর বয়স্কা জননীর জন্য উদ্বেগের সীমা ছিল না। এই উদ্বেগের ফলে তাঁহার নিজের পুরাতন রোগ পুনরাক্রমণ করে। সিভিল সার্জ্জন তাঁহাকে আরোগ্য করিবার আশা পরিত্যাগ করিলে কাশীর সুপরিচিত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক লোকনাথ মৈত্রের চিকিৎসাধীনে তাঁহাকে রাখা হয়। ইহাতে কয়েক দিন কিছু সুফল দেখা গিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে মৈত্র মহাশয়ও নিরাশ হইলেন। ১১ই এপ্রিল (৩০শে চৈত্র ১২৮০) রাজা কালীকৃষ্ণ পরলোক গমন করেন।

তাঁহার মৃত্যুতে দেশব্যাপী হাহাকার পড়িয়াছিল। সনাতন ধর্ম্মসভার উদ্যোগে তাঁহার একটি স্মৃতিসভা আহূত হয়। উহাতে বিজয়নগরের মহারাজা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং উহার সম্পাদক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত শ্যামাচরণ বিদ্যাভূষণ, রায় বাহাদুর জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, যদুলাল মল্লিক, মনোমোহন বসু, মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রভৃতি সময়োচিত বক্তৃতায় গভীর শোক প্রকাশ করেন। রাজা কালীকৃষ্ণের স্মৃতিরক্ষা সমিতির চেষ্টায় তাঁহার একটি সুন্দর মর্ম্মরময়ী মূর্ত্তি কলিকাতায় বিডন উদ্যানে স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতার টাউনহলে তাঁহার একখানি সুন্দর তৈলচিত্রও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর (এবং পরে বোম্বাই প্রদেশের গবর্ণর) সুপণ্ডিত স্যর রিচার্ড টেম্প্ল্ তদীয় "Men and Events of my time in India" নামক অতীব চিত্তাকর্ষক গ্রন্থের এক স্থানে রাজা কালীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদান করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। স্যর রিচার্ড যাহা লিখিয়াছেন তাহার একটি বর্ণও অতিরঞ্জিত নহে। তিনি লিখিয়াছেন :—

"পলাশীর যুদ্ধের পর লর্ড ক্লাইভ যে সকল রাজনীতিক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার প্রবর্ত্তনের সময় হইতে শোভাবাজার পরিবার ইতিহাসে খ্যাত। এই বংশের প্রধান ছিলেন রাজা কালীকৃষ্ণ। ইনি হিন্দু রক্ষণশীলতার আদর্শ এবং হিন্দু জাতির যে সকল সদ্গুণ আছে তাহার আধার ছিলেন। তিনি প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন এবং তিনি উক্ত ধর্ম্মের বিশুদ্ধি ও কল্যাণময় প্রভাব রক্ষার জন্য নিরন্তর প্রয়াস পাইতেন। কিন্তু আধুনিক প্রতীচ্য জ্ঞানালোকও তাঁহার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিত। তাঁহার পাণ্ডিত্য ইংলণ্ডীয় এবং য়ুরোপীয় বিদ্যায় সীমাবদ্ধ ছিল না, দেশের প্রাচ্য বিদ্যাতেও তাঁহার বিস্তৃত অধিকার ছিল। ইংরাজী কাব্যাদি স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত করিয়া এবং সংস্কৃত শ্লোকাদি রচনা করিয়া তিনি তাঁহার উন্নত সাহিত্যরুচির পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার উচ্চ পদমর্য্যাদা, ঐশ্বর্য্য, জনহিতচিকীর্ষা ও সামাজিক সদ্গুণাবলী তাঁহাকে তাঁহার দেশবাসীর প্রিয় এবং য়ুরোপীয় সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধাভাজন করিয়াছিল।"

গ্রহের ফের

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষাল

তাড়াতাড়ি সাবান ঘসিয়া ঝপাঝপ্ শব্দে টিনের মগ চৌবাচ্চায় ডুবাইয়া অফিসারবাবু মাথায় জল ঢালিতে থাকেন; পরে মাথা মুছিতে মুছিতে চিৎকার করেন—ঠাকুর, ও ঠাকুর—ভাত বাড়।

রান্নাঘর হইতে রামেশ্বর ঠাকুর উত্তর দেয়—আচ্ছা বাবু। কলিকাতা সহরের হ্যারিসন্ রোডের উপর সম্পূর্ণ আধুনিক রুচির এক যাত্রী-নিবাস—মাত্র যাত্রীগণের উপর নির্ভর করিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ কয়েকজন স্থায়ী লোক থাকারও ব্যবস্থা করিয়াছেন—তাঁহারা কেহ অফিসার, কেহ ব্যবসায়ী, আবার কেহ বা ইন্সিওরেন্সের এজেন্ট। রামেশ্বর একাই রান্না ও পরিবেশন করিয়া সকলকে খাওয়ায়—তাহার তৎপরতায় ও পটুতায় কাহারও কোন অসুবিধা হয় না—যাত্রী বা অস্থায়ী লোক যাহারা দু'একদিনের জন্য আসে তাহারাও রামেশ্বরের যত্নে পরিতুষ্ট হইয়া যাইবার সময় এই অর্থকষ্টের দিনেও কিছু দিয়া যাইতে কুণ্ঠিত হয় না।

অফিসারবাবু আহারের ঘরে আসেন। রামেশ্বর তৎক্ষণাৎ ভাত, ডাল, ভাজা, ঝোল ইত্যাদি সবই সাজাইয়া দেয়।

পাশে ম্যানেজারের ঘরে ঘন ঘন ফোন আসিতে থাকে।

ম্যানেজারবাবু উত্তর দেন—Single seated rooms, special arrangements for ladies, Comfortable seats, Moderate charges—

ট্যাক্সিতে বিছানাপত্তর ও সুটকেশ লইয়া সপরিবারে বাবু আসিয়া পড়ে।

ভৃত্যগণের ছুটাছুটি পড়িয়া যায়।

ম্যানেজারবাবু বলেন—৩নং রুম।

ভৃত্যবর্গ মালপত্তর সেই ঘরেই তুলিয়া দেয়। রামেশ্বর তাহাদের মুখে খবর পায়—৩ নম্বরে দুইজন বাড়িয়াছে।

ছোট হাঁড়িতে দুইজনের মত ভাত চট্‌পট্ চড়াইয়া দেয়। পাঁচ বৎসর এখানে কাজ করিয়া রামেশ্বর এখন একজন পাকা ঠাকুর হইয়া উঠিয়াছে।

সাড়ে বারটার পর রামেশ্বরের সব কাজ শেষ হয়। এই সময় সে ঘণ্টা দুই তিনের মত ছুটি পায়। আর একবার সে স্নানাদি সারিয়া লইয়া আহারে বসে।

আহারের পর আপনার ঘরে খানিক শুইয়া পড়ে।

রাজ্যের চিন্তা আসিয়া তাহার মস্তিষ্ক অধিকার করে। কাজ করিলে রামেশ্বর বেশ থাকে—বিশ্রামের সময় অতীতের যত চিন্তা আসিয়া তাহার মনকে পীড়ন করিতে থাকে।

রামেশ্বরের স্ত্রীবিয়োগের কথা মনে পড়ে—আহা ভাগ্যবতী সে—তাই ত দুঃখের দিনে তাহাকে কষ্ট সহিতে হইল না। সে ছিল তার সুখের দিনের সাথী—তখন তার গোলাভরা ধান, বাগানভরা শাকসব্জী, পুকুরভরা মাছ ছিল। তখন তাহার অভাব কি? গ্রামের মধ্যে তাহার অবস্থা তখন সকলকার চেয়ে স্বচ্ছল ছিল। তাহার মঙ্গলা গাই দৈনিক চার পাঁচ সের দুধ দিত। দই দুধ ঘি তখন তাহার প্রাত্যহিক আহারের অঙ্গীভূত ছিল। আর আজ—রামেশ্বর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবে—

তাহার সেই রাত্রির কথা মনে পড়ে—যে কাল রাত্রিতে তার সাত বৎসরের মেয়েকে তাহার হাতে দিয়ে তার স্ত্রী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিল।

রামেশ্বরের চক্ষু জলসিক্ত হইয়া উঠে। সে ভাবে তার পর কেমন ক'রে বুকে ক'রে সেই কন্যাটিকে পালন করেছিল। শেষে তার যোগ্যপাত্র খুঁজিয়া তারই পণ যোগাইতে সে না ভাবিয়া ভদ্রাসন পর্য্যন্ত বন্ধক দিয়াছিল। আজ তাহারই ফলভোগের জের চলিয়াছে।

রামেশ্বর ভিজা গামছায় মুখ মুছিয়া ফেলে। মধ্যাহ্নের আলস্য আসিয়া পড়ে। রাস্তা দিয়া ট্রাম ঘড় ঘড় শব্দে চলিয়া যায়।

হোটেলের সামনের উড়িয়া পানওয়ালা তাহাকে ডাকে—এ ঠাকুরঅ আজঅ পানঅ খাবে না—

রামেশ্বর তাহার নিকট উঠিয়া যায়।

পাঁচ নম্বর রুমে এক ভদ্রলোক সস্ত্রীক আসিয়া উঠিলেন। পূজার বন্ধ হইয়াছে—ভদ্রলোক সন্ধ্যার ট্রেণে পশ্চিমে বেড়াইতে যাইবেন। স্নানাহার সারিয়া লইতে ও কয়েকটী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিতে কলিকাতায় এক-বেলা থাকা—

বাজারে বাহির হইলেন। তাঁহার স্ত্রী ভৃত্যের মুখে হোটেলের ভোজনের বরাদ্দ শুনিয়া দুই একটী অতিরিক্ত ব্যঞ্জনাদির অর্ডার দিবার জন্য ঠাকুরকে ডাকাইলেন।

রামেশ্বর পাঁচ নম্বর ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। "দেখ ঠাকুর" বলিয়া মুখের দিকে চাহিয়াই সেই নারী সবেগে রামেশ্বরের বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

রামেশ্বর বজ্রাহতের মত স্তব্ধ ও মূক হইয়া রহিল। নারী-উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন বেগ কমাইয়া বলিলেন,

"বাবা, শেষে তোমার এই অবস্থা—"

রামেশ্বর সস্নেহে কন্যার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কি কর্‌ব মা, গ্রহের ফের।"

সঞ্চারিণী

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

যবে ওই সীমাহীন আকাশের গায়ে
কুন্তল ছড়ায়ে,
এ মোর যৌবন বনে সবুজ ছায়ায়
দুরন্ত মায়ায়
তোমার অঞ্চলখানি নীরবে দুলায়ে
ল'য়ে চল কোন দূর দিগন্তের পানে
খরস্রোতা কামনার আনন্দ বিতানে,
অনত চঞ্চল চিত্ত চুম্বনে ভুলায়ে;

ধাবমান জীবনের অন্ধকার তলে
না জানি কি ছলে
ফেনিল উত্তপ্ত সুরা জমে রাশি রাশি।
অগ্নিময় হাসি
ফুটে ওঠে নয়নের মৌন দুটি তটে;
শিরায় শিরায় বাজে ঘাত প্রতিঘাত,
তোমার দুয়ার প্রান্তে বাড়াইয়া হাত
মাগি শুধু লালসার স্পর্শ অকপটে।
পায়ে পায়ে ছুটে চলে রাত্রি আর দিন
শ্রান্তি-ক্লান্তিহীন;
অতীত এলায়ে পড়ে বিস্মৃতির কোলে
নিত্য কলরোলে।
সম্মুখে গণনাহীন আঁধার আলোক
স্বপ্নের কঙ্কাল সম ধায় অবিরাম;
শূন্য পাত্রে পূর্ণ করি আনন্দ উদ্দাম,
মৃত্যুর পালঙ্কে রচে মোর মর্ত্যালোক।



মালদহে দ্বিতীয় গোপালদেবের তাম্রশাসন আবিষ্কার

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বর্ম্মণ এম্-এ

মালদহ জেলার অন্তর্গত গাজোল থানার অধীন জাজিলপারা গ্রামে গত ২৫শে নবেম্বর তারিখে আমি পালবংশীয় সপ্তম নরপাল দ্বিতীয় গোপালদেবের নামাঙ্কিত একখানি মূল্যবান্ তাম্রশাসন আবিষ্কার করিয়াছি। জনৈক মুসলমান কৃষক ইহা দীর্ঘকাল যাবৎ পৈতৃক সম্পত্তি হিসাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। মালদহের বর্ত্তমান জেলা মাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, আর, সেন আই-সি-এস্ মহোদয়ের সাধু চেষ্টার ফলে অল্পদিন হয় মালদহে একটী মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই মিউজিয়মের জন্য প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি পাণ্ডুলিপি মুদ্রা প্রভৃতি সংগ্রহের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকা কালে আমি তাম্রশাসনখানির সন্ধান পাইয়া স্বত্বাধিকারীর নিকট হইতে ইহা মূল্য দ্বারা ক্রয় করিয়া লইয়াছি।

তাম্রপট্টখানি ক্রয় করার পর হইতে ইহার পাঠোদ্ধার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া আমি যে পাঠ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা পরে আদ্যোপান্ত বিদ্বৎসমাজের অবগতির জন্য প্রকাশ করিব। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সাধারণ ভাবে তাম্রশাসনখানির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইল। এস্থলে আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিশ্র বি-এল মহাশয় আমাকে পাঠোদ্ধার কার্য্যে অকুণ্ঠিতভাবে সাহায্য করিয়াছেন। মিঃ বি-আর-সেন মহোদয়ও আমাকে এ কার্য্যে যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহিত করিয়াছেন। তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহের ফলেই তাম্রপট্টখানি এত অল্প সময়ের মধ্যে সুধীসমাজে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে।

ইহার আয়তন দৈর্ঘ্যে ১′ ফুট ১½″ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ১ ফুট ১″ ইঞ্চি। ইহা অক্ষুণ্ণ অবস্থায়ই পাওয়া গিয়াছে। ইহার উভয় পৃষ্ঠারই লেখা আছে। প্রথম পৃষ্ঠায় ৩১ লাইন ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১৫ লাইন। শিরোদেশে বৃত্তাকৃতি ধর্ম্মচক্র রাজমুদ্রা। ইহার মধ্যস্থলে "শ্রীগোপালদেবঃ" এই নাম উৎকীর্ণ আছে। নামের উপরে বৌদ্ধমত-বিজ্ঞাপক ধর্ম্মচক্র চিহ্ন। ইহার উভয়পার্শ্বে মৃগমূর্ত্তি এবং উপরে রাজছত্র। রাজমুদ্রাটীর ব্যাস ৩″ ইঞ্চি। ইহার ঊর্দ্ধদেশে একটী শঙ্খ খোদিত আছে এবং চতুষ্পার্শ্বে বিচিত্র কারুকার্য্য।

শাসনলিপিখানি অতি সুন্দর পদ্যগদ্যাত্মক সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ। প্রথম ১৫ লাইন বংশ-বিবৃতি-মূলক। প্রথম লাইন "ওঁ স্বস্তি। মৈত্রীং কারুণ্যরত্নপ্রমুদিতহৃদয়ঃ প্রেয়সীং সন্দধানঃ"—এইরূপ আরম্ভ হইয়াছে। তারপর ক্রমে ৯টী শ্লোকে (১৫ লাইন) গোপাল (প্রথম), ধর্ম্মপাল, বাক্‌পাল, জয়পাল, দেবপাল, বিগ্রহপাল, নারায়ণ পাল, রাজ্যপাল এবং গোপালদেবের (দ্বিতীয়) নাম উল্লিখিত আছে। প্রথম পাঁচটী শ্লোক পঞ্চমপাল নরপাল নারায়ণপালের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় (গৌড়লেখমালা—৫৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এই নয়টী শ্লোকই এবং পরবর্ত্তী আরও কয়েকটী শ্লোক নবম পালরাজ প্রথম মহীপালের বাণগড় লিপিতে পাওয়া যায়। এ পর্য্যন্ত পালরাজবংশের কেবলমাত্র দ্বিতীয় (ধর্ম্মপাল), তৃতীয় (দেবপাল), পঞ্চম (নারায়ণ পাল), নবম (প্রথম মহীপাল), একাদশ (তৃতীয় বিগ্রহ পাল) ও সপ্তদশ (মদন পাল) নৃপতির তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। দ্বিতীয় গোপালদেব খুব প্রতাপশালী ও বিখ্যাত নৃপতি ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সময়ের কোন তাম্রলিপি ইতঃপূর্ব্বে আবিষ্কৃত না হওয়ার জন্যই ইতিহাসে তাঁহার শাসন সময়ের বিশেষ বিস্তৃত উল্লেখ দেখা যায় না। ঐতিহাসিকগণ ৯৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় গোপালদেবের রাজ্যকাল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

"তস্মাৎ (রাজ্যপাল) পূর্ব্ব ক্ষিতিধ্রান্নিধিরিব মহসাং রাষ্ট্রকূটান্বয়েন্দোস্তুঙ্গস্যোত্তুঙ্গমৌলের্দুহিতরি তনয়ো ভাগ্যদেব্যাং প্রসূতঃ। শ্রীমান্ গোপালদেবশ্চিরতরমবনেরেকপত্ন্যা ইবৈকো ভর্ত্তাভূন্নৈকরত্নদ্যুতিখচিত—চতুঃসিন্ধুচিত্রাংশুকায়াঃ॥ (৮) যং স্বামিনং রাজগুণৈরনূনমাসেবতে চারুতরানুরক্তা। উৎসাহ-মন্ত্র প্রভুশক্তিলক্ষ্মী পৃথ্বীং সপত্নীমিব শীলয়ন্তী॥ (৯) (১২-১৫ লাইন)—এই উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে রাজ্যপালের ঔরসে রাষ্ট্রকূটকুল-

চন্দ্র উত্তুঙ্গমৌলি তুঙ্গদেবের দুহিতা ভাগ্যদেবীর গর্ভে পূর্ব্বাচলোদিত তপনতুল্য গোপালদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অনেক রত্নদ্যুতিখচিতচতুঃসিন্ধুবস্ত্র-বিভূষিতা অনন্যানুরক্তা বসুন্ধরার একমাত্র ভর্ত্তা হইয়া সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কয়েক লাইনেও তদীয় কীর্ত্তিসমূহ বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বর্ণনা হইতে তদানীন্তন কালের অনেক ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণীত হইতে পারে।

তদীয় রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে, পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত (২১ লাইন) কুদ্দালখাত বিষয়ের অধীন, আনন্দপুর নামক অগ্রহারের (ব্রহ্মত্রভূমি গ্রামাদি) অন্তঃপাতি তাম্রশাসনোক্ত ভূমি (২২ ২৩ লাইন) বটপর্ব্বত-সমাবাসিত-শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার হইতে (২০ লাইন) পরম সৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীরাজ্যপালদেবের পদানুধ্যানপরায়ণ পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্গোপালদেব (২১ লাইন) সীহগ্রামবাসী কাশ্যপগোত্রীয় যাজ্ঞিক শ্রীধরশর্ম্মাকে দান করিয়াছিলেন। তাম্রশাসনের পাঠ এইরূপ :—

"বটপর্ব্বতকং সমাবাসিত-শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ পরম-সৌগতো মহারাজাধিরাজ-শ্রীরাজ্যপালদেবপদানুধ্যাতঃ পরমেশ্বর-পরম-ভট্টারকো মহারাজাধিরাজ-শ্রীমদ্গোপালদেবঃ। কুশলী। শ্রীপুণ্ডবর্দ্ধনভুক্তৌ। কুদ্দালখাত-বিষয়-সম্বদ্ধ। আনন্দপুরাগ্রহারান্তঃপাতি। স্বসম্বদ্ধাবিচ্ছিন্ন তলোপেত কাষ্ঠগৃহ। স্বসম্বদ্ধাবিচ্ছিন্ন তলোপেত মহারাজপলিকয়োঃ অত্রত্য আভাব্যং। দ্বারিকাদান সমেতয়োঃ সমুপগতাশেষ-রাজপুরুষান্……………(এই স্থলে অনেক রাজপুরুষ ও রাজপদের উল্লেখ আছে।)…যথার্হং মানয়তি বোধয়তি। সমাদিশতি চ। বিদিতমস্ত ভবতাং। যথোপরি লিখিতমেতৎ ……অকিঞ্চিৎ প্রগ্রাহ্যং………ভগবন্তং বুদ্ধভট্টারকমুদ্দিশ্য কাশ্যপসগোত্রায়। কাশ্যপাবৎসারনৈধ্রুব প্রবরায়। বাজসনেয় মাধ্যন্দিনশাখাধ্যায়িনে। সামবেদ ত্রিপাটি-পাঠকায়। মুক্তাবস্ত বিনির্গতায়। সীহগ্রামবাস্তব্যায়। ভট্টপুত্র নাগপৌত্রায়। ভট্টপুত্র শ্রীগর্ভপুত্রায় ভট্টপুত্র-যাজ্ঞিক-শ্রীধরশর্ম্মণে উত্তরায়ণ-সংক্রান্তৌ স্নাত্বা শাসনীকৃত্য প্রদত্তং।…………ইতি সম্বৎ ৬ আরম্ভ পৌষদিনে॥" (২০ হইতে ৩৭)। অসম্পূর্ণ স্থানগুলির পাঠ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধের পক্ষে অনাবশ্যক বিবেচনায় ইহা উদ্ধৃত হইল না। সম্পূর্ণ পাঠ পরে প্রকাশিত হইবে।

উপরে যে কয়েকটী শব্দ নিম্নরেখা দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে তাহাদের পাঠে অর্থসঙ্গতির অভাব আছে বলিয়াই আমার পাঠ ভ্রমাত্মক হইতে পারে সন্দেহ হইতেছে। তাম্রপট্টখানির ফটো পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। তখন বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক আমার এই ভ্রম সংশোধিত হইবে বলিয়া আশা করি। এখানে ঠিক কি দান করা হইয়াছে বুঝিতে অসুবিধা হইতেছে। গ্রাম প্রদত্ত হইলে "প্রদত্তং" না হইয়া "প্রদত্তঃ" লেখা হইত। "তলোপেত কাষ্ঠগৃহ" দেওয়া হইল কিনা বিচার্য্য।

দ্বিতীয় গোপালদেবের বিজয়সংবৎ ৬ ইংরেজী ৯৪৬ খৃষ্টাব্দ। অতএব এই তাম্রশাসনখানি প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্ব্বের। ইহা পৌষমাসের প্রথম দিবসে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ("আরম্ভ পৌষদিনে॥")। পৌষদিনের পর যে দুইটী দাড়ি চিহ্ন (॥) আছে তাহা দ্বারা ১১বা একাদশী তিথি সূচিত হয় কিনা ইহা অনুধাবনযোগ্য। দানের তারিখ পৌষ সংক্রান্তি দিবস। ("উত্তরায়ণ সংক্রান্তৌ স্নাত্বা শাসনীকৃত্য প্রদত্তং")।

৪১ হইতে ৪৫ লাইনে ধর্ম্মানুশাসনমূলক যে কয়েকটী শ্লোক আছে তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী পালরাজগণের তাম্রশাসনেও পাওয়া যায়। শ্লোকগুলি এই :—

"তথা ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ—

বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং॥
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে মোদতি ভূমিদঃ।
আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকে বসেৎ॥
স্বদত্তাং পরদত্তাম্বা যো হরেত বসুন্ধরাং।
স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥
ইতি কমলদলাম্বু-বিন্দু-লোলা
শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতং চ।
সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা
নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়োঃ বিলোপ্যাঃ॥"

প্রাচীনকালে কি মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া নৃপতিগণ ভূমিদান করিতেন উপরোক্ত শ্লোকগুলি তাহার প্রমাণ।

শাসন লিপির ৪৫ লাইনে দূতকের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে :—

"শ্রীমদ্গোপালদেবেন দ্বিজশ্রেষ্ঠোপপাদিতো
ভট্টঃ শ্রীমান্ প্রভাসোঽত্র শাসনে দূতকঃ কৃতঃ॥"

দ্বিজশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীমান প্রভাস এই শাসনের "দূতক," ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য।

৪৫ লাইনের পর (২য় পৃষ্ঠায়) ৪½" ইঞ্চি পরিমিত স্থান শূন্য আছে। ইহার মধ্যস্থলে "ওঁ × সব্রহ্মচারিণে ×" এই কথাগুলি লেখা আছে। ঢেরা চিহ্ন থাকায় মনে হয় শিল্পী অনবধানতাবশতঃ কোথাও "সব্রহ্মচারিণে" শব্দটী ফেলিয়া গিয়াছিলেন এবং পরে স্থানাভাবপ্রযুক্ত যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে না পারিয়া সর্ব্বশেষে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিশেষণটী ঠিক্ কোন স্থানে বসিবে তাহা এখনও নির্দ্ধারণ করিতে পারি নাই। তবে ইহা যে "শ্রীধরশর্ম্মণে" এই শব্দের গুণবাচক এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষ পংক্তিতে (৪৬ লাইন) নিম্নলিখিত শ্লোক আছে :—

"শ্রীমদ্বিমলদাসেন মন্দদাসস্য সূনুনা। ইদং শাসন-মুৎকীর্ণ সৎসমতটজন্মনা॥"

এই তাম্রশাসন সৎসমতটজন্মা মন্দদাসের পুত্র শ্রীমান্ বিমলদাস নামক শিল্পী কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল। আমার মনে হয় এই শিল্পী নারায়ণপালের তাম্রশাসনের শিল্পী মন্দদাসের পুত্র। গৌড়লেখমালায় মন্দদাসকে "মংখদাস" লেখা হইয়াছে (৬২ পৃঃ—গৌড়লেখমালা)। গৌড়ের ইতিহাসপ্রণেতা পণ্ডিত রজনী চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন "শুভদাসের পুত্র সমতটজন্মা মন্দদাস কর্ত্তৃক নারায়ণপালের তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হয়" (গৌড়ের ইতিহাস—১ম ভাগ—১১৯ পৃঃ)।

ক্ষোদকের অজ্ঞতাবশতঃ বর্ণাশুদ্ধি হওয়া মোটেই বিচিত্র নহে। আমার বিশ্বাস এই যে "বিমলদাস" নারায়ণপালের তাম্রশাসনের শিল্পীর পুত্র। নারায়ণপালের রাজত্বকাল ৯০০ খৃঃ হইতে ৯২৫ খৃঃ। তদীয় তাম্রশাসনখানি তাহার রাজত্বের সপ্তদশ বর্ষের অর্থাৎ ৯১৭ খৃষ্টাব্দের। আমার আবিষ্কৃত তাম্রশাসনখানি ৯০৬ খৃষ্টাব্দের। সুতরাং ইহা নারায়ণ পালের শাসনের শিল্পীর পুত্রদ্বারা উৎকীর্ণ এইরূপ অনুমান অযৌক্তিক নহে।

দ্বিতীয় গোপালদেবের ইহাই প্রথম আবিষ্কৃত তাম্রশাসন। কাজেই ঐতিহাসিকগণ ইহা হইতে গবেষণার কোন কোন মূল্যবান উপাদান পাইতে পারেন বলিয়া আশা করি। ঐতিহাসিকগণ এ যাবৎ এই মত পোষণ করিয়া আসিয়াছেন যে পরবর্ত্তী পালরাজগণের প্রভাব বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। এই তাম্রশাসনখানি দ্বারা সে মত খণ্ডিত হইতে পারে। গবেষকগণ কর্ত্তৃক ইহার যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারিত হউক এই আশায় তাম্রলিপিখানির পরিচয় সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিলাম।

কে তুমি?

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত এম-এ

কে তুমি? আমারে বল গো!
হৃদয়েরি বল, সাধনারি ফল,
জীবন সম্বলটুকু গো!

সৃজন পালন প্রলয় কারণ—
যোগী যোগবলে কহে গো!
তব গুণ শুনি কখনো দেখিনি,
শুধু মনে জানি আছ গো।

রবি-শশী-আদি যত গ্রহতারা,
তোমারি নিয়মে করে চলা-ফেরা,
তুমি পরাপরা, বেঁচে থাকা মরা,
দিবস রজনী ধারা গো!

পাপী বলে তুমি পতিতপাবন,
তাপী বলে তুমি ত্রিতাপনাশন,
জ্ঞানী বলে তুমি পরম-বাঁধন,
আমি বলি প্রেমটুকু গো!

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কিছুক্ষণ

শ্রীপরিমল গোস্বামী এম-এ

চন্দননগর সাহিত্য সম্মিলনীর সঙ্গে ঝড়বৃষ্টির অভাবিত সম্মিলন সাহিত্যের গুরুতর ক্ষতি না করিলেও সাহিত্যিকদের সামান্য কিছু ক্ষতি করিয়াছিল। কিন্তু সম্মিলনীর প্রথম দিন আকাশ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার ছিল এবং সেই সুযোগে আমরা কলিকাতা হইতে সমাগত কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া সম্মিলনীর বাহিরে আরও দুইটি ক্ষুদ্রতর কিন্তু (সম্ভবত) মহত্তর সম্মিলনীর বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা শেষ হইবার পর শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার অভিভাষণে এমন একটা সরলতা এবং আন্তরিকতার সুর ছিল যাহা শুনিয়া মনে হইল আর যাহাই হউক ইঁহার হাতে ঠকিবার ভয় নাই। আন্তরিকতার সঞ্চার অলক্ষিত-পথে হৃদয় হইতে হৃদয়ান্তরে। হৃদয়বান ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসিলে কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না যে এই ব্যক্তিটি হৃদয়বান, মন আপনা হইতেই তাহা বুঝিয়া লয়।

কালবিলম্ব না করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। ভাগলপুর হইতে 'বনফুল' আসিয়াছিলেন তিনিও উঠিলেন এবং শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, অমল হোম, অশোক চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক নীহাররঞ্জন এবং আরও অনেকে।

'বনফুলের' বিছানায় আসিয়া বসা গেল। সেবকগণের তৎপরতার সীমা ছিল না। তাঁহারা বলেন, কি চাই? কি চাওয়া উচিত তাহা জানিতাম না, সুতরাং সর্ব্বত্র যাহা অসঙ্কোচে চাওয়া যায় তাহাই চাহিলাম। বলিলাম—চা চাই।

এক ঘণ্টা পরে যখন সেখান হইতে উঠিবার চেষ্টা করিলাম তখন দেখি ওঠা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ আমাদের পরস্পরের প্রীতিবন্ধন যে খুব দৃঢ় হইয়া উঠিল তাহা নহে, বরঞ্চ ঠিক তাহার উল্টাটাই হইল।



বনফুলের 'বৈতরণীর তীরে' হাতে করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—
"বৈতরণীর তীরে—আমাকে!"

এমন কি আমাদের পরস্পরের সঙ্গে যে কোন সম্বন্ধ আছে বা ছিল তাহা আর মনেই পড়িল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিস্মৃতপ্রায় বঙ্গসাহিত্য লইয়া যে দুই ব্যক্তি গবেষণা করিতেছেন কেবল তাঁহারাই আমাদের মধ্যে

শুক্তোদয়ঘটিত হতাশায় আত্মচেতন ছিলেন, কারণ ডাক্তারের আদেশে ইঁহারা উভয়েই শর্করাসম্পর্কিত খাদ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে শর্করার যদি কোন সম্বন্ধ থাকে তবে তাহারও গবেষণা হয়ত তাঁহারাই করিবেন, আমরা এ বিষয়ে অনধিকারী।

যখন প্রথম আত্মচেতন হইলাম তখন দেখি শ্রীযুক্ত অমল হোম, নীহাররঞ্জন রায় এবং আমি রবীন্দ্রনাথের হাউস্‌-বোটের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে বসিয়া আছি। এই-খানে আমাদের দ্বিতীয় সম্মিলন। কবি গেরুয়া রঙের ধুতি, পাঞ্জাবি এবং চাদরে শোভিত হইয়া উদাসভাবে বসিয়া আছেন। মাঝে মাঝে নৌকা করিয়া ছেলেরা তাঁহার বোটের পাশ দিয়া তাঁহাকে উঁকি মারিয়া দেখিয়া যাইতেছে। কবির সম্মুখে টেবিলের উপর এক টিন চকোলেট। খুব সম্ভব টিনটি



রবীন্দ্রনাথের হাউস বোট। সাধনার যুগ হইতে কবির জীবনের সঙ্গে এই বোটের স্মৃতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

খুব কাছেই ছিল; আগন্তুকের পদশব্দে দূরে সরিয়া গিয়াছে। বোটখানির ভিতরটা অতি পরিষ্কার ভাবে সাজানো। একধারে রেডিও সেট্, অন্য দিকে একটা ছোট টেবিলে কয়েকটা শিশি এবং একটা অপেরা গ্লাস্। আর একদিকে কতকগুলি ইংরেজি বই ও শ্রীযুক্ত অনিল-কুমার চন্দ।

আমাদের প্রাথমিক আলাপ আরম্ভ হইতেই শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ভিতরে প্রবেশ করিলেন। কবি তাঁহার দিকে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "সিনেমা দেখা হ'ল?" সুধাকান্তবাবু অবাক হইয়া বলিলেন, "এখন সিনেমা!" কবি বলিলেন, "চন্দননগরে হয় ত হয়, ঠিক জানিনে।" শুনিয়া সুধাকান্তবাবুর টাক চক্‌চক্‌ করিয়া উঠিল।

কবির সংস্পর্শে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারা কবির এই কৌতুকপ্রিয়তার বিষয়ে অবশ্যই জানেন। তাঁহার কথা বলার ইহা একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী। কেহ যদি বরাবর তাঁহার কথাগুলি লিখিয়া যাইতে পারিত তাহা হইলে বাংলা সাহিত্য অন্তত হাস্যরসের দিক দিয়া সমৃদ্ধ হইত।

অমলবাবু খাবারের কথা পাড়িলেন। বলিলেন, "এঁরা যা খাইয়েছেন তা ভুলতে পারব না—চমৎকার সব খাবার—বিশেষ ক'রে সন্দেশ আর চম্‌চম্।"

শুনিবামাত্র কবি তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টিতে অনিলকুমারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অনিল, তুমি ত ওখানে ব'লে এলে আমি খাব না, শুনলে ত?" অনিলবাবু বলিলেন, "ওঁরা খাবার পাঠিয়ে দেবেন।" কবি আশ্বস্ত হইলেন।

ইহার পর সম্মিলনীর কথা কঠিল। নীহারবাবু বলিলেন, "আপনার বক্তৃতা খুব পরিষ্কার হয়েছে।" কবি বলিলেন "বড় বড় বক্তৃতা কেউ শোনে না; আর সাহিত্য বিষয়ে কিছু বললে সেখানে লোকও বেশি আসে না। এর সঙ্গে সিনেমা দেখালেই ত পারে—ধর, এর সঙ্গে যদি 'আলিবাবা' দেখানো হ'ত!"

আমি বলিলাম, আপনার "কন্‌ভোকেশনের বক্তৃতা না কি এত স্পষ্ট হয়েছিল, বিশেষ ক'রে ব্রডকাষ্টিংএর পক্ষে, যে ওঁরা ৬ খানা রেকর্ডে আপনার বক্তৃতা ধ'রে রেখেছেন।" কবি প্রশ্ন করিলেন, "সবটাই কি নিয়েছে?" আমি বলিলাম, "না, খানিকটা।" কবি তখন বিলাতের গল্প বলিলেন; সেখানেও তিনি শুনিয়াছেন তাঁহার কণ্ঠস্বর ব্রড-কাষ্টিংএর খুব উপযুক্ত।

ইহার পর গোরা নাটকের কথা তুলিলাম। কবি বলিলেন, "আমি উপন্যাসে যা লিখেছি সেই কনসেপ্‌শন নিয়ে ষ্টেজে কোন নাটক হওয়া শক্ত—তবে ওরা যেটুকু ক'রেছে তা ভালই হয়েছে।" আমি বলিলাম "হরিমোহিনীর ভূমিকা আমার সব চেয়ে ভাল লেগেছে।" কবি বলিলেন, "হ্যাঁ খুব চমৎকার; কিন্তু আমি দেখলাম পানুবাবুর

অভিনয়টা সাধারণের পক্ষে সহজ হয়েছে, দর্শক হরিমোহিনীকে ঠিক সেভাবে নিতে পারে নি। তা ছাড়া পরেশবাবুর ভূমিকাও খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে।" অমলবাবু বলিলেন, "হরিমোহিনীর চরিত্রের সঙ্গে বাঙ্গালী অতি পরিচিত ব'লেই ওর মধ্যে বোধ হয় কোন সৌন্দর্য্য পায়নি।" কবি বলিলেন "তা হবে।"

আমি বলিলাম, "একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছি, যার যা কিছু বিদ্যা আছে তা এখন হয় সিনেমায়—না হয় থিয়েটারে বিক্রি হচ্ছে। যেমন গোরা নাটকে একটা ব্যায়াম সমিতি এসে তাদের ব্যায়াম কৌশল দেখাচ্ছে।" কবি বলিলেন, "নাটকে হঠযোগের কথা থাকলে ষ্টেজেও হয়ত হঠযোগ দেখতে পেতে।"

এমন সময় 'বনফুল' তাঁহার সদ্যপ্রকাশিত 'বৈতরণীর তীরে' বইখানা হাতে করিয়া প্রবেশ করিলেন। কবি বইখানা পাইয়া হাসিয়া বলিলেন, "বৈতরণীর তীরে—আমাকে! নামটা ভয়ঙ্কর হে।"

তাহার পর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পরিমল আর বনফুলে খুব মতের মিল আছে—না?"



ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল হোম, হরিহর শেঠ, অশোক চট্টোপাধ্যায়, বনফুল, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনী দাস, নলিনী সরকার, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি

এই সময় বাহির হইতে কে একজন ছোট্ট একটি খাতা পাঠাইয়া দিলেন; কবি দূর হইতে খাতা দেখিয়াই বলিলেন, "অটোগ্রাফ চায় বোধ হয়।" অমলবাবু বলিলেন, "সে রকম ত মনে হয় না।" কবি খাতাখানা খুলিয়াই পড়িতে লাগিলেন "Will you please give your autograph—" পড়িয়াই একটি স্বাক্ষর করিয়া খাতাখানা ফিরাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "অটোগ্রাফের খাতা আসতে দেখলে আমি বহুদূর হ'তেই বুঝতে পারি।"

অতঃপর বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত সরকার ও হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় আসিলেন। নলিনীকান্ত প্রণাম করিতেই কবি তাঁহার দিকে চাহিয়া তাঁহার নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন—"নলিনাক্ষ—নলিন—" নলিনীকান্ত বলিলেন "আমি সেকালের বিজলীর নলিনীকান্ত সরকার।" কবি বলিলেন "নলিনীকে ভোলবার সময় ত এল।"

আমি কয়েকটা ফোটো তুলিলাম। 'বনফুল' বলিলেন "আমার মেয়ে আপনার মালা গলায় দেওয়া একটা ফোটো আপনার কাছে চেয়েছিল।" কবি হাসিয়া বলিলেন, "তিন চার বছরের মেয়েরা আমার গলায় মালা দিতে চায়—এই আমার এক দুঃখ।" আমাকে বলিলেন, "আমার বোটের একখানা ছবি নিও, এ আমার বহুদিনের বোট।"

বহুদিনের অর্থাৎ ছিন্ন পত্রে যে বোটের উল্লেখ আছে, যে বোট কুষ্টিয়া ব্রিজের নীচে ডুবিবার উপক্রম করিয়াছিল এবং যে বোটে বসিয়া কবি 'সাধনা' চালাইতেন ইহা সেই বোট এবং সেই সময় হইতে ইহা কবির জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হইয়া আছে।

'বনফুল' হঠাৎ স্মরণ করিলেন তিনি আসলে ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। স্মরণ করিতেই কবির কাছে প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "আপনার সঙ্গে আমার একটি আলোচনা আছে, আপনি হোমিওপ্যাথি বিশ্বাস করেন?" কবি বলিলেন, "আমার বিশ্বাস খুব গভীর।"—এই প্রসঙ্গে তিনি কি করিয়া কয়েকটি কঠিন ব্যাধি হোমিওপ্যাথির সাহায্যে সারাইয়াছিলেন সেই গল্প করিলেন। একটা St. Vitas'-Dance এবং আর একটা মেনিঞ্জাইটিস্ কেস্।

'বনফুল' কয়েকখানা হোমিওপ্যাথি বইএর নাম কবির নিকট হইতে জানিয়া লইলেন। কবি প্রথমত Pharmaco dynamics নামক বইখানা পড়িতে বলিলেন।

এই সময় সম্মিলনের তরফ হইতে সন্দেশ আসিয়া পৌছিল। কবি খুব খুশী হইয়া উঠিলেন। তিনি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সাহিত্য সম্মিলনে বলিয়া আসিয়াছেন, "বাঙ্গালী পরস্পর কুৎসা ক'রে বহু জিনিস নষ্ট ক'রেছে, কিন্তু একটি জিনিস সে প্রাণপণে বাঁচিয়ে রেখেছে—সে তার সাহিত্য।"—ইহার সঙ্গে আরও একটি শব্দ জুড়িয়া দিলে ঠিক হইত—সাহিত্য এবং সন্দেশ। কেন না সন্দেশের স্বাদ এখনও অবিকৃত।

ইহার পর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা আসিতেই রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইল। তার পরেই উঠিল বাংলা বানানের কথা। চলতি ভাষা সম্বন্ধে কবি কিছু ভূমিকা করিলেন। কলিকাতার উচ্চারণটাই মান্য এবং সে উচ্চারণ ঠিক রাখিতে গেলে শব্দের বানানও ঠিক করা আবশ্যক। কবি শব্দানুগ বানানের পক্ষপাতী। সংস্কৃত বানান যেমন phonetic, বাংলাও সেই রকম হওয়া প্রয়োজন। 'হল' না লিখিয়া 'হোলো' লিখিবার দিকেই তাঁহার ঝোঁক। তিনি বলিলেন, "হলেক দিয়ে 'হ'ল' আমি লিখতে পারব না।"

আমি বলিলাম, "যখন যে রীতিকে গাল দেওয়া যায় কিছুদিন পরে সেই রীতিটাই স্থায়ী হ'তে থাকে। শব্দের বেলাতেও তাই। আপনি 'কৃষ্টি' শব্দটার বিরোধী কিন্তু ঐ নিয়ে আলোচনা করতে করতে এখন 'কৃষ্টি' শব্দটা আরও বেশি ক'রে চল্‌ছে। আপনার সম্বন্ধেও—এমন কি আপনার সম্পর্কেই ওটা অনেক জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে।"

কবি হাসিয়া বলিলেন, "কি রকম—অর্থাৎ আমার কৃষ্টি আছে এটা স্বীকার করেছে ত?"

এই সময় সজনীকান্ত দাস আসিয়া পৌছিলেন। তিনি যখন পৌছিলেন তখন পুরাদমে তর্ক চলিতেছে। কিন্তু তাহাতে কোন অসুবিধা হইল না; তিনি মাঝখানেই যোগ দিলেন এবং বলিলেন, "তা হ'লে 'আমি কোরি', 'আমি বোলি' এইভাবে লিখতে হবে ত?"

কবি গভীর সুরে বলিলেন "সাহস নেই কেন? তাই লেখাই ত উচিত।"

কবির মতে phonetic বানান লিখিলে বাংলা শব্দ পাঁচ রকম উচ্চারণের বিভীষিকা হইতে অনেকখানি রক্ষা পাইবে। কবির ইচ্ছা, বাংলাতেও সংস্কৃতের মত phonetic বানান চলুক। রবীন্দ্রনাথ সুদীর্ঘকালের সাহিত্য সাধনায় এবং ভাষার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচার করিয়া দেখা উচিত। বাংলাভাষাকে বাঁচাইবার জন্য যিনি যেটুকু চিন্তা করিতেছেন সেইটুকুর জন্যই তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

'ভেতর' বা 'ওপর' না লিখিয়া কবি চলতি ভাষাতেই 'ভিতর' বা 'উপর' লেখেন। তিনি বলেন বাল্যকাল হইতে যে উচ্চারণে তিনি অভ্যস্ত, সেইটাই তাঁহার কাছে সহজ। 'ভেতর' 'ওপর' অনেকে বলেন এবং লেখেন তিনিও সেটা মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নিজের হাতে ওরূপ বানান আসিবে না। উদাহরণস্বরূপ বলিলেন, ম্লান শব্দটা তিনি তাঁহার বাড়ীর প্রচলিত উচ্চারণে পড়েন। phonetic রীতিতে লিখিলে দাঁড়াইবে 'ম্লানো'। কোন্ এক কবিতায় ম্লান-শব্দের সঙ্গে আন্-এর মিল দেখিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন রাইমিং-এ ভুল হইয়াছে।

ছোঁড়া ও ছোড়া লইয়া আলাপ হইল। চারুবাবু বলিলেন ছোঁড়া মানে বালক, ছোড়া মানে নিক্ষেপ করা। এ বিষয়ে আমাদের মতভেদ হইল। কবি বলিলেন, "দুটোতেই আমি চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করি।" তারপর সুনীতিবাবুকে বলিলেন, "তুমি ত এ বিষয়ে বাদশা; কিন্তু কমিটি করলে বানান বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত হবে না, একা করতে হবে। তুমি বাংলা শব্দের একখানা অভিধান তৈরী কর, তাতে শব্দার্থ লেখবার দরকার নেই, শুধু বানানের জন্য তার ব্যবহার হবে।"

কবির মতে তৎসম শব্দের বানানে প্রচলিত রীতিই রাখিতে হইবে, কেবল তদ্ভব শব্দের যথাসম্ভব phonetic বানান চালাইতে হইবে।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, একটু একটু বৃষ্টিও হইতেছিল, আলো প্রায় নিবিয়া আসিতেছিল; আমি বোটের ফোটো লইবার জন্য নামিয়া আসিলাম। ফোটো তোলা হইল। তাহার পর বাড়ী ফিরিয়া ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখের এই স্মৃতিটুকু সযত্নে রক্ষা করিবার কাজে মনোনিবেশ করিলাম।

সাময়িকী

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন-

সুদীর্ঘ ৭ বৎসর পরে এবার চন্দননগরে গত ৯ই, ১০ই ও ১১ই ফাল্গুন বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বিংশ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ১৩১২ সালে প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন আরম্ভ হয়। তাহার পর ১৩৩৬ সালে কলিকাতা ভবানীপুরে উহার উনবিংশ অধিবেশনের পর উদ্যোক্তার অভাবে এতদিন উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এবার চন্দননগর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ প্রমুখ কর্ম্মীদিগের উৎসাহে অধিবেশন সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। নদীয়া জেলার পক্ষ হইতে সম্মিলনের আগামী বর্ষের অধিবেশন আহ্বান করা হইয়াছে; কৃষ্ণনগর বাঙ্গালার মনীষার কেন্দ্রস্থল—উভয় পার্শ্বে শান্তিপুর এবং নবদ্বীপও কম গৌরবের স্থান নহে; কাজেই আমরা বিশ্বাস করি, আগামী বৎসর কৃষ্ণনগরে সম্মিলনের অধিবেশন অধিকতর উৎসাহ সঞ্চার করিবে।

চন্দননগরে প্রবীণ সুধী শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় মূল-সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাহিত্যের বিভাগ বর্দ্ধিত হওয়ায় বিভিন্ন ১২টি শাখা সম্মিলনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং নিম্নলিখিত ১২ জন সুপণ্ডিত ১২টি শাখায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। (১) সাহিত্যশাখা—সভাপতি শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরী (২) কথা-সাহিত্য শাখা—সভানেত্রী শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী (৩) কাব্য সাহিত্য শাখা—সভানেত্রী শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু (৪) ইতিহাস শাখা—সভাপতি সার যদুনাথ সরকার (৫) দর্শন শাখা—সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার (ইনি অসুস্থতা নিবন্ধন সম্মিলনে উপস্থিত হইতে না পারায় তাঁহার অভিভাষণ পঠিত হইয়াছিল) (৬) বিজ্ঞান শাখা—সভাপতি অধ্যাপক ডাক্তার প্রফুল্লকুমার মিত্র (৭) অর্থনীতি শাখা—সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (৮) চিকিৎসা শাখা—সভাপতি ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস (৯) সুকুমার কলা শাখা—সভাপতি শ্রীযুত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (১০) শিশু-সাহিত্য শাখা—সভাপতি শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১১) সাংবাদিক সাহিত্য শাখা—সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১২) বানান আলোচনা শাখা—সভাপতি অধ্যাপক ডাক্তার মহম্মদ শহীদুল্লাহ্।

তাহা ছাড়া সম্মিলনের উদ্যোক্তারা চন্দননগরের ইতিহাস, শিল্পবাণিজ্য ও পুরাবস্তু প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া একটি প্রদর্শনী করিয়াছিলেন এবং কলিকাতার মেয়র সার হরিশঙ্কর পাল মহাশয় ঐ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন।



শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

এবারের সম্মিলনের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা কবীন্দ্র শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্মিলনের উদ্বোধন। ৩১ বৎসর পূর্ব্বে সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে এই রবীন্দ্রনাথই সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালার সৌভাগ্য যে আজও তাঁহাকে আমরা সম্মিলনে লাভ করিতে পারিয়াছি। তিনি সম্মিলনের উদ্বোধনে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালী মাত্রেরই পাঠ করা উচিত। আমরা নিম্নে তাঁহার বক্তৃতার একাংশ উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তিনি বলিয়াছিলেন—"সমস্ত পৃথিবী কলুষিত হয়েছে; সমস্ত পৃথিবীর হাওয়াতে লেগেছে পাপ;

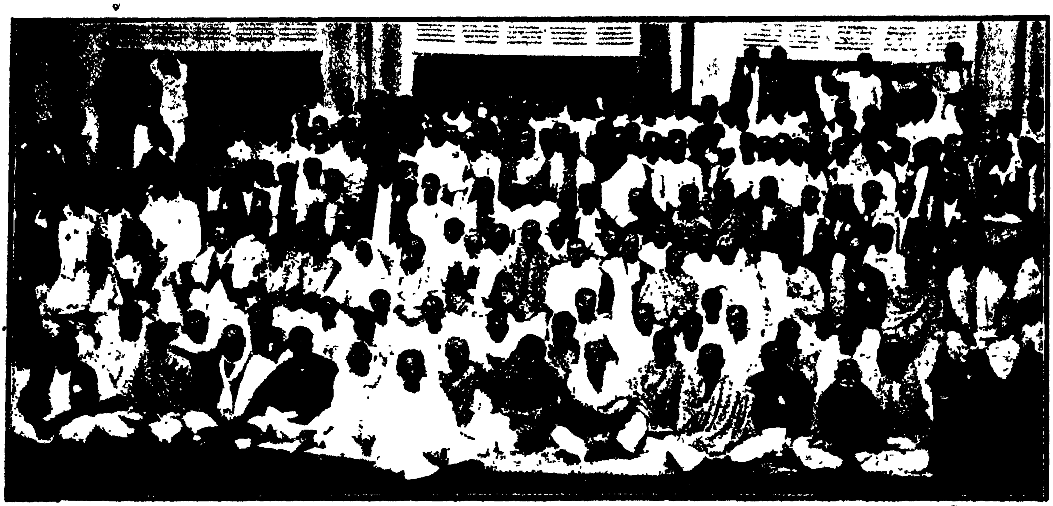
তা সে যুদ্ধের জন্য বা যে জন্যই হোক। সে কত বড় আঘাত তা জানি না। তারা আজ বিশ্বাস হারিয়েছে; পরম দুঃখ পেয়ে মানুষের যা কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা তাদের নষ্ট হয়েছে। কিন্তু যাদের সেই ঘটনা ঘটে নি, যারা তার থেকে দূরে ছিল, তাদের যদি সেই বিকৃতির ছোঁয়াচ লাগে সংক্রামকের মত, তবে তার থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করতে হবে। এই যুদ্ধের সঙ্গে যে চিত্তবিকৃতি হয়েছে তাতে সমস্ত বিশ্বের সাহিত্যকে



রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উদ্বোধন-অভিভাষণ পাঠ করিতেছেন

আকাঙ্ক্ষা যেন আমাদের থাকে। আমি নির্ম্মলতাকে সঙ্কীর্ণতা বলছি না, নীরসের কথাও বলছি না। কবি হ'য়ে আমি তা পারি না। বিধাতা আমাদের যে কত সৌন্দর্য্য ও রসের অধিকারী করেছেন, সেটা যদি আমরা স্বীকার না করি তবে তাঁকেই অস্বীকার করা হয়।"

মনীষী হীরেন্দ্রনাথ তাঁহার অভিভাষণে বঙ্গভাষাকে শিক্ষার বাহন করার ইতিহাস বিস্তৃতভাবেবিবৃত করিয়াছেন এবং তাঁহার ২০ বৎসর পূর্ব্বের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহা সফল হইতে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। তথাপি তিনি বলিয়াছেন—"এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে ভারতীয় ভাবে ভাবিত ও জাতীয় প্রেরণায় প্রবুদ্ধ করিবার জন্য কি উদ্যোগে আয়োজন হইয়াছে? এখনও



সম্মিলনে সমাগত সাহিত্যিক মণ্ডলী

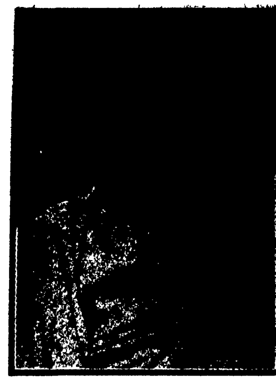
ভূমিতলে নামাবার চেষ্টা হয়েছে—যাকে তারা মনে করে বাস্তবতা। যা কীটের বাস্তবতা, পশুর বাস্তবতা, মানুষের বাস্তবতাও কি তাই? সেটাও দেশ থেকে আমাদের মধ্যে সংক্রামিত হতে চলেছে। সাহিত্যকে নির্ম্মল করার আশা

কি আমাদের এই সকল প্রতিষ্ঠান য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিশেষত্ব-বর্জ্জিত হীন-অনুকৃতি মাত্র নহে? কবে সেই শুভদিন আসিবে, যেদিন উহারা ভারতীয় বিদ্যা, ভারতীয় ভাব, ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভারতীয়

কৃষ্টিকলা, ভারতীয় সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন-চর্চ্চার সজীব কেন্দ্রে পরিণত হইবে? সম্ভবত এজন্য আমাদিগকে স্বরাজ আগমনের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। সে কত দিন?"

বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ এসেমব্লি—

আমরা গত মাসে বেঙ্গল লেজিলেটিভ এসেম্বলির (নিম্নতর পরিষদ) কয়েকজন সদস্যের চিত্র প্রকাশ করিয়াছি। এ মাসে আরও কয়েকজনের চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল:—



কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ (মেদিনীপুর গ্রাম্য মধ্য)



কুমারী মীরা দত্তগুপ্তা (কলিকাতা মহিলা কেন্দ্র)



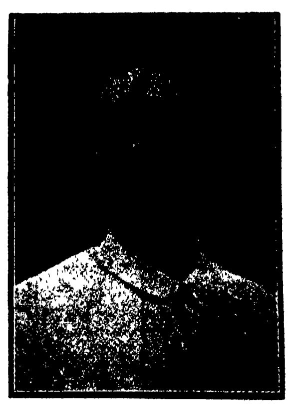
শ্রীযুত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (মৈমনসিংহ গ্রাম্য পূর্ব্ব)



শ্রীযুত নিশীথনাথ কুণ্ডু (দিনাজপুর)



মহারাজকুমার উদয়চাঁদ মহতাব বি এ (বর্দ্ধমান গ্রাম্য মধ্য)



শ্রীযুত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (ঢাকা পূর্ব্ব)



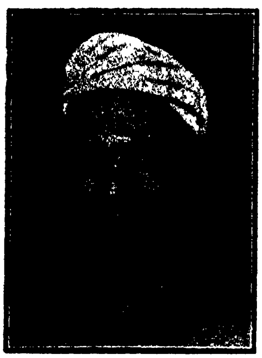
শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার
(বারাকপুর শ্রমিক কেন্দ্র)



ফজলুর রহমন এম-এ, বি-এল
(ঢাকা বিশ্ববিত্যালয় কেন্দ্র)



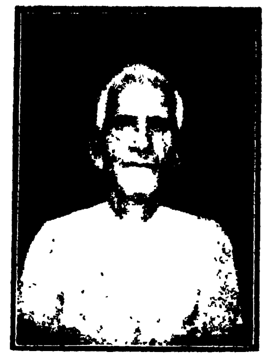
শ্রীযুত রসিকলাল বিশ্বাস
(যশোহর নিম্নজাতি কেন্দ্র)



শ্রীযুত প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা
(কলিকাতা পশ্চিম)



ডাক্তার গোবিন্দচন্দ্র ভৌমিক, এম-বি
(মেদিনীপুর পূর্ব্ব)



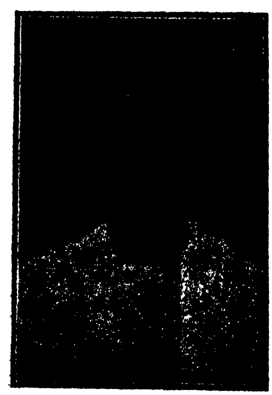
শ্রীযুত কিশোরীপতি রায়
(ঝাড়গ্রাম ও ঘাটাল)



শ্রীযুত সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
রাজসাহী)



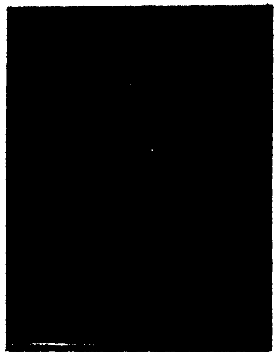
সৈয়দ জালালুদ্দীন হাসেমী
(সাতক্ষীরা)



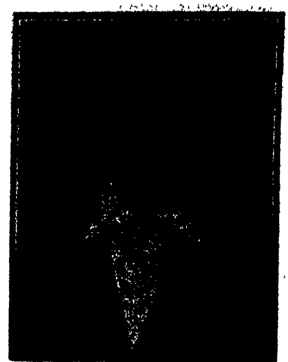
শ্রীযুত চারুচন্দ্র রায়
(মৈমনসিংহ পশ্চিম



শ্রীধনঞ্জয় রায়
(ঢাকা পূর্ব্ব নিম্নজাতি)



শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্ন্যাল এম-এ, বি-এল
(মুর্শিদাবাদ)



মুহম্মদ আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী
(মুন্সীগঞ্জ)



মরতুজা ফারহাদ রেজা চৌধুরী
(জঙ্গীপুর)



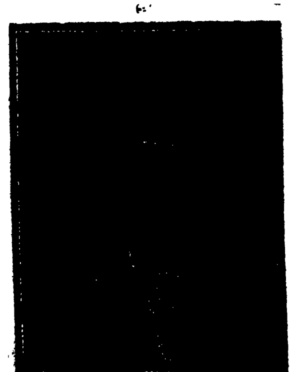
মৌলবী হাফিজুদ্দীন চৌধুরী
(ঠাকুরগাঁ)



রায় বাহাদুর ক্ষীরোদচন্দ্র রায়
(চট্টগ্রাম বিভাগ জমীদার)



আবদুল হাকিম
(খুলনা)



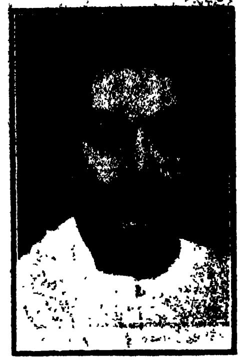
মহম্মদ আবুল কাজল বি-এল
(মাদারীপুর পশ্চিম)



শ্রীউপেন্দ্রনাথ এদবার (বাখরগঞ্জ দক্ষিণ পশ্চিম নিম্নজাতি)



শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (বাখরগঞ্জ উত্তর পূর্ব্ব)



হেমচন্দ্র নস্কর (২৪ পরগণা দক্ষিণপূর্ব্ব নিম্নজাতি)



এ, এম, এ, জামান (হুগলী শ্রীরামপুর শ্রমিক)



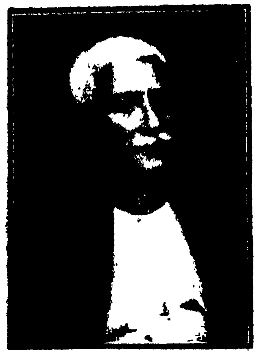
ডাক্তার নলিনাক্ষ সান্যাল (প্রেসিডেন্সি বিভাগ মিউনিসিপাল)



প্রিন্স ইউসুফ মির্জ্জা (২৪ পরগণা মধ্য মুসলমান)



শ্রীযুত পুলিনবিহারী মল্লিক (হাওড়া নিম্নজাতি)



শ্রীযুত বীরেন্দ্র নাথ মজুমদার (পূর্ব্ববঙ্গ মিউনিসিপাল)

সার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র—

বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান সার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র গত ২১শে ফেব্রুয়ারী বেলা সাড়ে ৩ ঘটিকার সময় তাঁহার কলিকাতা ১০৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে পরলোক গমন করিয়াছেন। সামান্য চাকরীতে প্রবেশ করিয়া কার্য্যদক্ষতার দ্বারা কি ভাবে উচ্চতম চাকরী লাভ করা যায়, তাহা ভূপেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন; মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৬২ বৎসর হইয়াছিল। এম-এ পাশ করিয়া ৬০ টাকা বেতনে তিনি



সার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র

চাকরীতে প্রবেশ করেন, কিন্তু নিজ অদ্ভুত কর্ম্মশক্তি দ্বারা ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ সংক্রান্ত হিসাবের কণ্ট্রোলার ও ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মিলিটারী একাউণ্টেণ্ট জেনারেল পদলাভ করিয়াছিলেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩০ পর্য্যন্ত তিনি বড়লাটের শাসন পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং ১৯৩১ হইতে ১৯৩৬এর অক্টোবর পর্য্যন্ত বিলাতে হাই-কমিশনারের কার্য্য করিয়াছিলেন। বিলাত হইতে দেশে ফিরিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন—"মৃত্যু সন্নিকট জানিয়াই আমি দেশে মরিতে যাইতেছি।" তাঁহার এই কথা যে সত্যে পরিণত হইবে তখন কেহ তাহা কল্পনাও করেন নাই। তাঁহার বাঙ্গালী প্রীতির কথা বাঙ্গালী কোন দিন বিস্মৃত হইবে না। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ডাক্তার এম, উইণ্টারনীজ—

যে সকল মনীষী ভারতের বাহিরে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রতি অনুরক্ত হইয়া সারা জীবন সেই কৃষ্টির প্রচার-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, সুপ্রসিদ্ধ অষ্ট্রিয়ান অধ্যাপক ডাক্তার এম, উইণ্টারনীজ তাঁহাদের অন্যতম। অধ্যাপক ম্যাকস্ মূলারের নাম তাঁহার ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি প্রীতির জন্য চিরকাল ভারতবাসী শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। ডাক্তার উইণ্টারনিজ ম্যাক্সমূলার সাহেবের সহকর্ম্মী ছিলেন এবং উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টাতেই ম্যাকসমূলারের ঋক্ বেদের দ্বিতীয় সংস্করণ সুসম্পাদিত হইয়াছিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ডাক্তার উইণ্টারনিজ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে সুপণ্ডিত অধ্যাপক বুলারের নিকট প্রথম সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন প্রভৃতি তাঁহাকে এত অধিক আকৃষ্ট করিয়াছিল যে তিনি তাহার পর শুধু সংস্কৃত গ্রন্থই পাঠ করিতেন। তাঁহার প্রণীত ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস নামক দুই খণ্ড পুস্তক তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করে। বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধেও তিনি প্রভূত গবেষণা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গ্রন্থগুলি সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া থাকে। 'রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার কাব্য' সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত পুস্তকখানি তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন মাত্র পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের একজন প্রকৃত বন্ধুর অভাব হইল।

নূতন হাইকোর্ট-জজ—

কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় অবসর গ্রহণ করায় সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় কলিকাতা হাইকোর্টের অতিরিক্ত জজ নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে চারুচন্দ্রের জন্ম হয়; তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স, ফার্ষ্ট্ স্

আর্টস্‌ ও বি-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। এম-এ ও বি-এল পাশ করিয়া তিনি ১৯১০ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের উকীল হন। ১৯১৮-২১ পর্য্যন্ত তিন বৎসর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এবং ১৯৩১-৩৪ পর্য্যন্ত তিন বৎসর তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ছিলেন। গত ২০ বৎসর কাল তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো রূপে ও গত ১৬ বৎসর কাল কলিকাতা কর্পোরেশনের মনোনীত সদস্যরূপে কার্য্য করিতেছেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি-আই-ই উপাধি দান করিয়াছেন এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল সমিতির ভাইস্‌-প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি জাতি সংঘের সভায় যোগদান করিবার জন্য জেনিভায় গমন করিয়াছিলেন। কলিকাতার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া চারুবাবু বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছেন।

স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ—

বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ গত ৭ই ফেব্রুয়ারী রবিবার অপরাহ্নে বেলুড় মঠে ৭২ বৎসর বয়সে মহাসমাধি লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বাশ্রমে ইঁহার নাম ছিল গঙ্গাধর ঘটক (গঙ্গোপাধ্যায়)। কলিকাতা বাগবাজারে ইঁহাদের বাসস্থান। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতা কর্পোরেশনের জনৈক পদস্থ কর্ম্মচারী। ১৪ বৎসর বয়সে অখণ্ডানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। তাহার ২ বৎসর পরে তিনি গৃহত্যাগ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত অখণ্ডানন্দ মহারাজ ভারতের বহু তীর্থে গমন করিয়াছিলেন এবং একাও বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ শিষ্যগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম তিব্বতে যাইয়া তথায় তিন বৎসর বাস করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা কার্য্যের তিনিই প্রবর্ত্তক। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তিনি তাহাতে সাহায্য দান করিতে গমন করেন; তদবধি তিনি জেলাতার নিকটস্থ সারগাছি গ্রামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানেই বাস করিতেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ জ্ঞানী, পণ্ডিত, ত্যাগী ও আড়ম্বরবিহীন উচ্চস্তরের সাধু ছিলেন। তিনি মান ও যশোলিপ্সায় কখনও অভিভূত হন নাই। রামকৃষ্ণদেবের ১৭ জন সন্ন্যাসী শিষ্যের তিনি অন্যতম। রামকৃষ্ণ মিশনের তিনি তৃতীয় সভাপতি হইয়াছিলেন—প্রথম—স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও দ্বিতীয়—স্বামী শিবানন্দ। রামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের মধ্যে আর মাত্র ৩ জন জীবিত আছেন—(১) স্বামী অভেদানন্দ (২) স্বামী নির্ম্মলানন্দ



স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ

ও (৩) স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। স্বামী অখণ্ডানন্দ মিশনে যে ত্যাগ ও সেবার আদর্শ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহাই আজ মিশনকে সমগ্র জগতের সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও সেই আদর্শ ই মিশনকে চিরস্থায়ী করিবে।

কৃষ্ণলাল দত্ত—

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বাঙ্গালার অন্যতম সুসন্তান কৃষ্ণলাল দত্ত মহাশয় ৭৮ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এম-এ পাশ করিয়া মাত্র ৫০ টাকা মাসিক বেতনে গভর্ণমেণ্টের চাকরী আরম্ভ

করিয়াছিলেন এবং নিজ অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধির দ্বারা মাদ্রাজের একাউন্টেন্ট জেনারেল পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেন্টের চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণলালবাবু ২ বৎসর কাল মহীশূরের রাজার অর্থসম্বন্ধীয় পরামর্শদাতার কাজ করেন ও ২ বৎসরকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের কাজ করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে রয়াল কারেন্সী কমিশনে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তথায় প্রেরণ করেন; ফিরিয়া আসিয়া তিনি কিছুকাল পাতিয়ালা রাজ্যে চাকরী



কৃষ্ণলাল দত্ত

করিয়াছিলেন; কিন্তু স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হওয়ায় তাঁহাকে সে চাকরী ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে হইয়াছিল। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম। জনহিতকর কার্য্য সম্পাদনে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। হিসাব ও অর্থ বিভাগে পাণ্ডিত্যের জন্য সকলেই সর্ব্বদা তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন এবং তিনি সকলকে উপযুক্ত পরামর্শ ও সাহায্য দানে কখনও কার্পণ্য করেন নাই। তিনি নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র ও চারি কন্যা বর্ত্তমান।

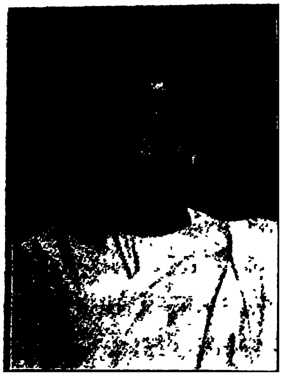
দামোদরের উপর পুল নির্ম্মাণ—

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী বাঙ্গালার গভর্ণর সার জন এণ্ডারসন বর্দ্ধমানে যাইয়া প্রস্তাবিত দামোদর পুলের ভিত্তি স্থাপন করিয়া আসিয়াছেন। দামোদরের মত দুর্জ্জয় নদ বাঙ্গালা দেশে নাই; তাই উহার উপর পুল নির্ম্মাণ এতদিন অসম্ভব বলিয়াই বিবেচিত হইত। বর্দ্ধমান সহরে সদর ঘাটের নিকট পুল নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই পুল নির্ম্মিত হইলে হুগলী, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের বহু দুর্গম স্থানে কলিকাতা হইতে [illegible] সুবিধা হইবে এবং ঐ অঞ্চলের লোকেরা [illegible] সহজেই রপ্তানি করিতে পারিবে। এই পুল নির্ম্মাণের [illegible] কলিকাতা হইতে বোম্বাই ট্রাঙ্ক রোড নির্ম্মাণ [illegible] এবং কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ গমনকারীদিগের [illegible] হইবে। এই পুল নির্ম্মাণ প্রসঙ্গে বাঙ্গালা [illegible] ৩টি বড় রাস্তা নির্ম্মাণের প্রস্তাবও হইয়াছে—(১) মৈমনসিংহ টাঙ্গাইল রাস্তা—৫৮ মাইল—ব্যয় ২১ লক্ষ টাকা (২) [illegible] বঙ্গ রাস্তা—৯৮ মাইল—ব্যয় ৫৯ লক্ষ টাকা (৩) চট্টগ্রাম আরাকান রাস্তা—৮৪ মাইল—ব্যয় ৩৪ লক্ষ টাকা।

বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিল—

নূতন শাসন ব্যবস্থায় উচ্চতর ব্যবস্থা পরিষদের নাম হইয়াছে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল। উক্ত কাউন্সিলের ৩০ জন সদস্য সরাসরিভাবে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং ২৭ জন সদস্য নিম্নতর ব্যবস্থা পরিষদের (বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ এসেম্বলি) সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আর ৮ জন বা ৬ জন সদস্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইলে ৬৩ বা ৬৫ জন সদস্য লইয়া উচ্চতর পরিষদ গঠিত হইবে। নিম্নতর পরিষদের সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ২৭ জন সদস্যের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—(১) ডাক্তার [illegible] কুমুদ মুখোপাধ্যায় (২) খাঁ সাহেব [illegible] মোল্লা (৩) কামিনীকুমার দত্ত (৪) মহম্মদ হোসেন (৫) মহারাজা সার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী (৬) রাধিকাভূষণ রায় (৭) সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল (৮) টি, ল্যাম্ব (৯) শেঠ হনুমানপ্রসাদ পোদ্দার (১০) বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত (১১) নরেশনাথ মুখোপাধ্যায় (১২) মৌলানা আক্রাম্ খাঁ (১৩) [illegible] সান্যাল (১৪) মৌলবী হামেদল হক (১৫) [illegible] আমেদ (১৬) মৌলবী কাদের বক্স (১৭) [illegible] সিংহ রায় (১৮) নগেন্দ্রনারায়ণ রায় (১৯) [illegible] (২০) খাঁ বাহাদুর মুয়াজ্জুদ্দীন হোসেন (২১) [illegible] দত্ত (২২) হুমায়ুন কবীর (২৩) রাজা [illegible] সিংহ (২৪) নবাবজাদা [illegible] (২৫) ই-সি-অরমণ্ড (২৬) [illegible] (২৭) রায় বাহাদুর সুরেন্দ্র সিংহ নেহালিয়া।

নিম্নে উচ্চতর পরিষদের কয়েকজন সদস্যের চিত্র প্রদত্ত হইল :—



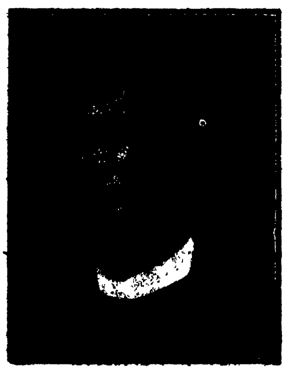
শ্রীযুত রণজিত পাল চৌধুরী



শ্রীযুত কানাইলাল গোস্বামী



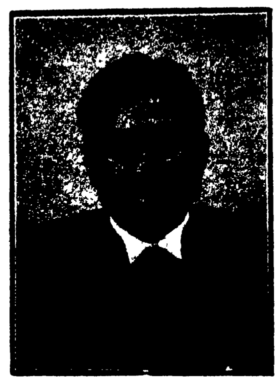
রায় বাহাদুর ব্রজেন্দ্রমোহন মৈত্র



রায় বাহাদুর মন্মথনাথ বসু



শ্রীযুত ললিতচন্দ্র দাস



রায় সাহেব যতীন্দ্রমোহন সেন



খাঁ বাহাদুর মহম্মদ আসফ খাঁ



খোরসেদ আলম চৌধুরী



শ্রীযুত ইন্দুভূষণ সরকার

অধ্যাপকের দান—

ডাক্তার হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমূহের ইন্সপেক্টার ছিলেন; বর্ত্তমানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত আছেন। সম্প্রতি তিনি নূতন বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এসেম্ব্লিরও সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি দেশীয়-খৃষ্টান সম্প্রদায়ের লোক। পূর্ব্বে তিনি উক্ত সম্প্রদায়ের ছাত্রগণের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থার জন্য তিন লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন; সম্প্রতি ঐ উদ্দেশ্যে তিনি আরও এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। সকল অর্থ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে দান করিতেছেন এবং সকল ব্যবস্থার ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অর্পিত হইয়াছে। দরিদ্র দেশের অধ্যাপকের পক্ষে শিক্ষার জন্য এই দান অতুলনীয়।

বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালী—

ডাক্তার চারুচন্দ্র ঘোষ পেশোয়ারে বাস করেন। তিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস আন্দোলনের প্রবর্ত্তক। তিনি সীমান্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ছিলেন; ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩ আইনে তাঁহাকে ব্রহ্মে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি কারাদণ্ড লাভ করিয়াছিলেন। এবার তিনি কংগ্রেসপ্রার্থীরূপে সীমান্ত প্রাদেশিক এসেম্বলীর সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর এই সম্মান লাভে বাঙ্গালীমাত্রই গৌরবানুভব করিবেন।



ডাক্তার চারুচন্দ্র ঘোষ

বাঙ্গালী বালিকার কৃতিত্ব—

গত বড়দিনের সময় লক্ষ্ণৌ সহরে যে শিল্প প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে সূচীশিল্প প্রদর্শন করিয়া কুমারী জাহান-আরা বেগম চৌধুরী প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। তিনি শুধু শিল্পী নহেন তিনি একজন ভাল লেখিকা; "বর্ষবাণী" নামক বার্ষিক পত্র সম্পাদন করিয়া তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা ও বিহারের বহু প্রদর্শনীতে নিজ শিল্পকার্য্য প্রদর্শন করিয়া কুমারী জাহান-আরা যশোলাভ করিয়াছেন।



কুমারী জাহান আরা বেগম চৌধুরী

ভারতীয় কবির সম্মান—

খ্যাতনামা ইংরাজ কবি ই, বি, ইয়েট্‌স সম্প্রতি আধুনিক ইংরাজী কবিতার এক সঙ্কলন-পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৪৪ বৎসরে ইংরাজি ভাষায় লিখিত যত কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট কবিতাগুলিই এই সঙ্কলন পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয় এই যে তিন জন ভারতীয়

কবির লিখিত কবিতা উক্ত পুস্তকে স্থান পাইয়াছে—(১) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২) পরলোকগত অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ ও (৩) শ্রীপুরোহিত স্বামী। তৃতীয় ব্যক্তি বাঙ্গালা দেশে সুপরিচিত না হইলেও প্রথম দুই মনীষীর পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নাই। মনোমোহনবাবু শ্রীঅরবিন্দের অগ্রজ; তাঁহার ইংরাজি সাহিত্য-অধ্যাপনার কথা লোক এখনও বিস্মৃত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ গত অর্দ্ধ শতাব্দীকাল বাঙ্গালার সাহিত্য-ক্ষেত্রে গৌরব-রবিরূপে উদিত থাকিয়া বাঙ্গালাকে জগতের সমক্ষে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিতেছেন।

শ্রীযুত দ্বারকানাথ মিত্র—

কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি শ্রীযুত দ্বারকানাথ মিত্র গত ১লা মার্চ্চ হইতে অবসর গ্রহণ



শ্রীযুত দ্বারকানাথ মিত্র

করিয়াছেন; তিনি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাই হাইকোর্টে আইন-ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ২২শে নভেম্বর বিচারপতি পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বহুকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোরূপে এবং কিছুদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ফ্যাকালটির ডীনরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবন কামনা করি।

রামকৃষ্ণ শত-বার্ষিকী—

গত এক বৎসরকাল পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশেই রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যে ধর্ম্মসমন্বয় ও মিলনের বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আজ জগতের সকল শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মানিয়া লইয়াছেন এবং সেই বাণী প্রচার দ্বারা জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। গত প্রায় দুই মাস যাবৎ কলিকাতা সহরেও উক্ত শতবার্ষিকী উৎসব মহাসমারোহে সম্পাদিত হইতেছে। এই উৎসব সম্পর্কিত দুইটি অনুষ্ঠান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম, ভারতীয় কৃষ্টির প্রদর্শনী—দক্ষিণ কলিকাতায় নর্দার্ন পার্কে এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রদর্শনীর ৪টি প্রধান বিভাগ ছিল (ক) কলা (খ) কৃষ্টি (গ) স্বাস্থ্য ও (ঘ) শিল্প। কৃষ্টি ও কলা বিভাগের উদ্বোধন করিয়াছিলেন—যথাক্রমে কলিকাতার সেরিফ ডাক্তার সত্যচরণ লাহা ও বিচারপতি শ্রীযুত দ্বারকানাথ মিত্র। কৃষ্টি বিভাগে ভারতীয় সভ্যতার ক্রমোন্নতির ইতিহাস দেখান হইয়াছিল—মহেঞ্জো-দারোর সময় হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত কি ভাবে ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ হইয়াছে, তাহা সত্যই চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে। কলা বিভাগেও প্রাচীন, মধ্য ও বর্ত্তমান যুগের সকল প্রকার কলার অনুশীলন দেখান হইয়াছিল। ঐ সঙ্গে একটি মহিলাদের গৃহজাত শিল্পদ্রব্যের প্রদর্শনী ছিল।

দ্বিতীয়—বিশ্ব ধর্ম্ম সম্মিলন। গত ১লা মার্চ্চ হইতে ৭ দিন কলিকাতায় বিশ্বধর্ম্ম সম্মিলন হইয়াছিল। প্রথম দিন আচার্য্য সার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল উক্ত সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা-বশতঃ অল্পক্ষণ পরেই তাঁহাকে সভা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তাহার পর স্বামী অভেদানন্দ সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। পোলাণ্ড, হল্যাণ্ড, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা,

ইরাক, কায়রো, বোষ্টন, ওহিও প্রভৃতি দূর দেশ হইতে প্রতিনিধিরা এই সম্মিলনে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন। ভারতের সকল প্রদেশের বিভিন্ন ধর্ম্মনেতারাও সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। এরূপ ধর্ম্মযাজক ও সুধী সম্মিলন ভারতে আধুনিককালে আর কখনও দেখা যায় নাই। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সকালে কলিকাতাস্থ চীন দেশীয় রাষ্ট্রদূত (কন্সাল জেনারেল)ও বিকালে স্বামী অভেদানন্দ সভাপতিত্ব করেন। তৃতীয় দিনের অধিবেশন বিশেষ উল্লেখযোগ্য—সকালে কাকা কালেলকার এবং বিকালে শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতিত্ব করেন এবং বিকালের অধিবেশনে শ্রীমতী সরোজিনী নাইড একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণের কয়েক পংক্তি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—"ক্ষমতাপ্রিয়তা যখন মানুষের ধর্ম্ম-জীবনের উপর আধিপত্য করে তখন ইতিহাস করুণ হইয়া উঠে। কারণ আত্মিক মুক্তির যে একটি মাত্র উপায় আছে তখন উহাই হইয়া পড়ে মুক্তির বিজাতীয় শত্রু। যে শৃঙ্খল ধর্ম্মের মিথ্যা মাহাত্ম্য মণ্ডিত, সর্ব্বপ্রকার শৃঙ্খলের মধ্যে সেই শৃঙ্খল ভঙ্গ করাই সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্কর এবং অহঙ্কার-প্রসূত আত্মপ্রেরণায় মানুষের আত্মা যে কারাগারে আবদ্ধ হইয়া পড়ে সর্ব্বপ্রকার কারাগারের মধ্যে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসহ। কারণ আত্মপোষণের উলঙ্গ কামনা অনাবৃততার মধ্যেই আশ্রয় খোঁজে। ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িকতায় পর্য্যবসিত হইয়া পড়িলে মানুষ যে নির্লজ্জ আত্ম গরিমায় অন্ধ হইয়া পড়ে এবং মানবের অন্তর্নিহিত গুণগুলি নিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহা জগতের এক বিকৃত রূপ—ধর্ম্মের ছদ্ম আবরণে আবৃত। নিছক জড়বাদে মনুষ্য হৃদয় যতদূর সঙ্কীর্ণ না হয়, এই বিকৃত ধর্ম্মে মনুষ্য হৃদয় ততোধিক সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবী-সম্মানবিতরণ—

পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেসনে চ্যান্সেলার ও ভাইস চ্যান্সেলারই বক্তৃতা করিতেন; এবার সে নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সন্তান শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এই উৎসবে বক্তৃতা করার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল। অন্য কেহ হইলে হয় ত ইংরাজিতেই বক্তৃতা করিতেন; কিন্তু কবি সাধারণ প্রকৃতির লোক নহেন; তাঁহার জাতীয়তাবাদ দেশের সকলের সুপরিচিত। তিনি কনভোকেসন সভায় আসিয়া বাঙ্গালার গভর্ণরের সম্মুখেই বাঙ্গালা ভাষায় অভিভাষণ পাঠ করিলেন। কাজেই এবার কনভোকেসনে (রবীন্দ্রনাথ ইহার বাঙ্গালা নামকরণ করিয়াছেন—পদবী-সম্মান-বিতরণ-উৎসব) তিন প্রকার নূতনত্ব হইয়াছে—প্রথম, স্থান পরিবর্ত্তন (এবার প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠে সামিয়ানা খাটাইয়া কনভোকেসন হইয়াছিল, দ্বিতীয়—বাহিরের লোক দ্বারা বক্তৃতা দান, তৃতীয়—বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এবারের উৎসব চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণও তাঁহারই উপযুক্ত হইয়াছে; এ যুগে তাঁহার মুখ হইতে এরূপ বক্তৃতা আর শুনা যায় নাই। আমরা নিম্নে তাঁহার বক্তৃতার কিয়দংশ মাত্র উদ্ধৃত করিলাম :—

"আজ প্রচণ্ড আলোড়ন উঠেছে পৃথিবীব্যাপী জন-সমুদ্রে। যেন সমস্ত সভ্য জগতকে এক কল্প থেকে আর এক কল্পের তটে উৎক্ষিপ্ত করবার জন্য দেব-দৈত্যে মিলে মন্থন সুরু হয়েছে। এবারকারও মন্থনরজ্জু বিষধর সর্প, বহু ফণাধারী লোভের সর্প। সে বিষ উদ্গার করছে। আপনার মধ্যে সমস্ত বিষটাকে জীর্ণ করে নেবেন এমন মৃত্যুঞ্জয় শিব পাশ্চাত্য সভ্যতার কর্ম্মস্থানে আসীন আছেন কি না এখনো তার প্রমাণ পাই নি। ভারতবর্ষে আমরা আছি কালের রুদ্রলীলা সমুদ্রের তটসীমায়। বর্ত্তমান মানব সমাজের এই দুঃখের আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেবার উপলক্ষ আমাদের ঘটে নি। কিন্তু ঘুর্ণির টান বাহির থেকে আসছে আমাদের উপরে এবং ভিতরের থেকেও দুর্গতির ঢেউ আছাড় খেয়ে পড়ছে আমাদের দক্ষিণে বামে। সমস্যার পর দুঃসাধ্য সমস্যা এসে অভিভূত করছে দেশকে। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পরস্পর বিচ্ছেদ ও বিরোধ নানা কদর্য্য মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হ'য়ে উঠল। বিকৃতি আন্‌লে আমাদের আত্মকল্যাণ-বোধে। এই সমস্যার সমাধান সহজে হবার নয়; সমাধান না হলেও নিরবচ্ছিন্ন দুর্গতি।

সমস্ত দেশের সংস্কৃতি, সৌভ্রাত্য, স্বচ্ছলতা একদা বিকীর্ণ ছিল আমাদের গ্রামে। আজ সেখানে প্রবেশ করলে দেখ্‌তে পাবে, মরণদশা তার বুকে খরনখর বিদ্ধ করেছে একটা রক্তশোষী শ্বাপদের মতো। অনশন ও

দুঃখ দারিদ্র্যের সহচর মজ্জাগত মারী সমস্ত জাতির জীবনী-শক্তিকে জীর্ণ-জর্জ্জর করে দিয়েছে। এর প্রতিকার কোথায়, সে কথা ভাবতে হবে আমাদের নিজেকে—অশিক্ষিত কল্পনার দ্বারা নয়, ভাব-বিহ্বল দৃষ্টির বাষ্পাকুলতা দিয়ে নয়। এই পণ করে চলতে হবে যে, পরাস্ত যদি হোতেও হয় তবে সে যেন প্রতিকূল অবস্থার কাছে ভীরুর মত হাল ছেড়ে দিয়ে নয়, যেন নির্বোধের মত নির্ব্বিচারে আত্মহত্যার মাঝ দরিয়ায় ঝাঁপ দিয়ে পড়াকেই গর্ব্বের বিষয় মনে না করি।

ভাবপ্রবণতা আছে আমাদের দেশে অতি পরিমাণে। কর্ম্মোদ্যোগে নিজেকে অপ্রমত্তভাবে প্রবৃত্ত করতে আমাদের মন যায় না; অবাস্তবের মোহাবেশ কাটিয়ে পুরুষের মতো উজ্জ্বল বুদ্ধির আলোকে দেশের সমস্ত অসম্পূর্ণতা, মূঢ়তা, কদর্য্যতা, সব কিছুকে অত্যুক্তি বর্জ্জিত করে জেনে, দৃঢ় সঙ্কল্পের সঙ্গে দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করো। যেখানে বাস্তবের ক্ষেত্রে ভাগ্য আমাদের প্রতিদিন বঞ্চিত করে, অবমানিত করে, সেখানে ঘরগড়া অহঙ্কারে নিজেকে ভোলাবার চেষ্টা দুর্ব্বল চিত্তের দুর্লক্ষণ।

সত্যকার কাজ আরম্ভ করার মুখে একথা মানা চাই যে, আমাদের সমাজে, আমাদের স্বভাবে, আমাদের অভ্যাসে, আমাদের বুদ্ধিবিকারে গভীর ভাবে নিহিত হয়ে আছে আমাদের সর্ব্বনাশ। যখনই আমাদের দুর্গতির সকল দায়িত্ব একমাত্র বাহিরের অবস্থার অথবা অপর কোন পক্ষের প্রতিকূলতার উপর আরোপ ক'রে বধির শূন্যের অভিমুখে তারস্বরে অভিযোগ ঘোষণা করি, তখনই হতাশ্বাস ধৃতরাষ্ট্রের মতো মন বলে ওঠে—"তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।"

আজ আমাদের অভিযান নিজের অন্তর্নিহিত আত্ম-শত্রুতার বিরুদ্ধে, প্রাণপণ আঘাত হানতে হবে বহু শতাব্দী নির্ম্মিত মূঢ়তার দুর্গ-ভিত্তিমূলে। আগে নিজের শক্তিকে তামসিকতার জড়িমা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে তার পরে পরের শক্তির সঙ্গে আমাদের সম্মানিত সন্ধি হোতে পারবে। নইলে আমাদের সন্ধি হবে ঋণের জালে ভিক্ষুকতার জালে আষ্টে-পৃষ্ঠে আড়ষ্টকর পাকে জড়িত। নিজের শ্রেষ্ঠতার দ্বারাই অন্যের শ্রেষ্ঠতাকে আমরা জাগাতে পারি, তাতেই মঙ্গল আমাদের ও অন্যের। দুর্ব্বলের প্রার্থনা যে কুণ্ঠাগ্রস্ত দান সঞ্চয় করে, সে দান শতছিদ্র ঘটের জল, সে আশ্রয় পায় চোরা বালিতে, সে আশ্রয়ের ভিত্তি নাই।

হে বিধাতা,
দাও দাও মোদের গৌরব দাও
দুঃসাধ্যের নিমন্ত্রণে
দুঃসহ দুঃখের গর্ব্বে।
টেনে তোলো রসাক্ত ভাবের মোহ হতে
সবলে ধিক্‌কৃত করো দীনতার ধূলায় লুণ্ঠন।
দূর করো চিত্তের দাসত্ব বন্ধ
ভাগ্যের নিয়ত অক্ষমতা
দূর করো মূঢ়তায় অযোগ্যের পদে
মান-মর্য্যাদা বিসর্জ্জন
চূর্ণ করো যুগে যুগে স্তূপীকৃত লজ্জারাশি
নিষ্ঠুর আঘাতে।
নিঃসঙ্কোচে
মস্তক তুলিতে দাও
অনন্ত আকাশে,
উদাত্ত আলোকে,
মুক্তির বাতাসে।

সমবায় শক্তির সাফল্য—

যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমার হানু নদীর দক্ষিণাংশ মজিয়া গিয়াছিল। স্থানীয় সার্কেল অফিসারের উদ্যোগে ও অধিবাসীদিগের চেষ্টায় উহার তিন মাইল পরিমিত স্থানের পঙ্কোদ্ধার হইয়া উহা বহতা করা হইয়াছে। স্থানীয় অধিবাসীরা সকলেই বিনা পারিশ্রমিকে মাটি কাটিয়াছেন; তাহার ফলে ৫ লক্ষ ৭০ হাজার ঘন ফিট মাটি কাটা হইয়াছে। এই কার্য্যের ফলে আমালসার ও চৌগাছি ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত তিন হাজার বিঘা জমীতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা হইবে। স্বেচ্ছাকৃত কার্য্যের দ্বারা এরূপ বিপুল ব্যাপার সম্পাদন সত্যই বিস্ময়ের বিষয়। বাঙ্গালার অধিবাসীরা নিজেরা চেষ্টা করিলে এরূপ অনেক বড় কাজ করিতে পারেন। শক্তির সমবায়ের প্রয়োজন; আমাদের বিশ্বাস মাগুরাবাসীদের এই দৃষ্টান্ত বাঙ্গালার সর্ব্বত্র অনুসৃত হইবে।

বাগ্‌দেবী নিরঞ্জন শোভাযাত্রা—

রামজয়শীল শিশু পাঠশালা উত্তর কলিকাতার ১১নং রামজয়শীল লেনে অবস্থিত। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কর্ত্তৃপক্ষ খেলার ছলে মাত্র দশটি বালকবালিকা নিয়ে ইহার স্থাপনা করেন। আজ এই পাঠশালার ছাত্রী-সংখ্যা ২০৫। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ সাতটি শ্রেণী আছে। পাঠশালাটি অবৈতনিক—সাধারণের দানের অর্থে ইহার খরচ নির্ব্বাহ হয়। কলিকাতা কর্পোরেশন ও ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন প্রতি বৎসর ইহাতে অর্থ সাহায্য করে থাকেন। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও পাঠশালার ছাত্রীরা সরস্বতী পূজার নিরঞ্জন শোভাযাত্রা বাহির করে। এবার 'ভারতবর্ষ' অফিসের সম্মুখ দিয়ে শোভাযাত্রা যাওয়ায় আমাদের দেখবার সুযোগ হয়। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহাদের মিছিল বাহির হচ্ছে। দু'টি সুসজ্জিত গাড়ীতে এগারজন করে ছাত্রী বেহালা ও এস্রাজ যন্ত্রে আলাপ করছিল। ছোট ছোট বালিকারা বাসন্তী রংয়ের বস্ত্রে একরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে গান গেয়ে যাচ্ছিল। কলিকাতার রাজপথে এক-সঙ্গে এতগুলি ছোট মেয়েদের এরূপ শোভাযাত্রা বিশেষ বৈচিত্র্য এনেছিল। যখন রাজপথ জুড়ে বৃহৎ চক্রাকারে বেষ্টিত বালিকারা তাদের মধুর সুললিত কণ্ঠে গান, মধ্যস্থলে একটি বালিকা হার্ম্মোনিয়ম এবং সঙ্গের সুসজ্জিত গাড়ীতে বালিকারা বেহালা ও এস্রাজে আলাপ করছিল সে দৃশ্য সত্যই অভিনব ও বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। দেশীয় ভাব ধারাকে উৎস করে কর্ত্তৃপক্ষ ইহাতে নিজস্ব কল্পনার পরিচয় দিয়েছেন। আমরা তাঁদের এই পরিকল্পনার প্রশংসা করি।



বাগ্‌দেবী নিরঞ্জন শোভাযাত্রা

রায় সতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—

খুলনা জেলার অন্তর্গত নকীপুরের জমিদার রায় সতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মূত্রাঘাত রোগে ভুগিয়া গত রবিবার ২রা ফাল্গুন তাঁহার কলিকাতাস্থিত ৫৯নং পদ্মপুকুর রোড ভবনে ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫১ বৎসর হইয়াছিল। তিনি অমায়িক, মিষ্টভাষী, সঙ্গীতজ্ঞ,

দাতা, পরোপকারী, তেজস্বী এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ জমিদার ছিলেন। বহু দাতব্য প্রতিষ্ঠান তাঁহার ও তাঁহার কনিষ্ঠ-ভ্রাতা যতীন্দ্রনাথের সাহায্য পায়। দেশে দুর্ভিক্ষের সময় তাঁহারা বহুলোককে বাটীতে অন্নদান করিয়াছেন। দেশের বহু অনাথ দরিদ্র ছাত্র তাঁহার কলিকাতার বাটীতে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছে। তাঁহার অনেক গুপ্তদান ছিল। তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্‌ এসোসিয়েশন, ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশন এবং সুন্দরবন ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন। তাঁহার বিয়োগে দেশের বিশেষ ক্ষতি হইল। তাঁহার চারিটী পুত্র, দুইটী কন্যা, পত্নী, এবং কনিষ্ঠ সহোদর প্রভৃতি বর্ত্তমান। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।



রায় সতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

হরিপদ স্মৃতিতীর্থ—

২৪ পরগণা মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের কাব্য-শাস্ত্রাধ্যাপক হরিপদ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় গত ৮ই মাঘ ৬১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি গত ৩৩ বৎসর কাল মূলাজোড় কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বহু ছাত্র বর্ত্তমানে বাঙ্গালা দেশে কৃতী পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার জন্মভূমি নবদ্বীপ; তাঁহার পিতা সূর্য্যকুমার তর্কভূষণ মহাশয় তৎকালে একজন খ্যাতনামা বৈয়াকরণিক ছিলেন। হরিপদ স্মৃতি-তীর্থের ন্যায় সরলস্বভাব ছাত্রবৎসল অধ্যাপক অতি অল্পই দেখা যায়।

মনোরমা ঘোষ—

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী মনোরমা ঘোষ গত ৬ই মার্চ্চ শনিবার সকালে পুরীধামে পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। তিনি স্বর্গীয় ডাক্তার আর, জি, করের ভ্রাতা রাধারমণ কর মহাশয়ের কন্যা; হেমেন্দ্রপ্রসাদের মত তিনিও সাহিত্য চর্চ্চা করিতেন এবং তাঁহার লিখিত গল্প নানা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার কন্যাদ্বয়ের বিবাহের পর তিনি ধর্ম্ম-সাধনা ও ধর্ম্মগ্রন্থপাঠে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ প্রায় ২০ বৎসরের অধিকাংশ সময়ই তিনি সাধনায় মগ্ন থাকিতেন। গত কয় বৎসর স্বাস্থ্যহানির জন্য তিনি পুরীধামেই বাস করিতে-ছিলেন। পীড়াবৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া হেমেন্দ্রপ্রসাদ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ডাক্তার অরুণেন্দ্রপ্রসাদ পুরীধামে গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সম্মুখেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আমরা হেমেন্দ্রপ্রসাদকে তাঁহার এই দারুণ শোকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

লালা হরকিষণ লাল—

পাঞ্জাবের খ্যাতনামা নেতা লালা হরকিষণ লাল গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী সহসা পরলোকগমন করিয়াছেন। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তাঁহাকে নানাপ্রকার ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার মত প্রতিভাবান লোক অতি অল্পই দেখা যায়। তিনি শুধু রাজনীতি-চর্চ্চা করেন নাই, অর্থনীতিক্ষেত্রেই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা অধিক পরিস্ফুট হইয়াছিল। তিনি দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি বিধানের জন্য বহু ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। এক দিকে যেমন উগ্র রাজনীতিক বলিয়া তাঁহাকে কারাদণ্ড ও নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল, অন্যদিকে তেমনই তাঁহার গুণের আদর করিয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মন্ত্রীপদেও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সমগ্র জীবন প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া তিনি দেশের ও জাতির মঙ্গল কামনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগত আত্মা শান্তিলাভ করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

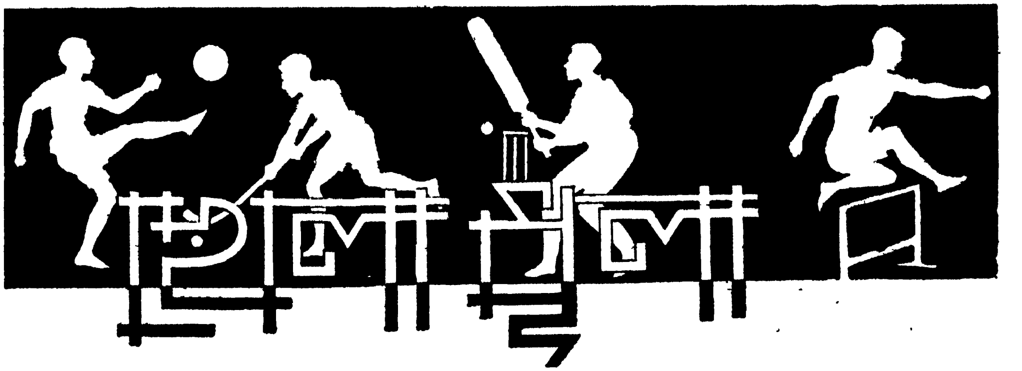
বাঙ্গালার উৎপন্ন দ্রব্য—

বাঙ্গালা দেশে যে সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে পাট, চাউল ও চা এর কথা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালার পাটের ব্যবসা প্রায় নষ্ট হইতে বসিয়াছে। এবার চা ও চাউলের ব্যবসাও নষ্ট হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালার চা'য়ের ব্যবসা বেশ ভাল ছিল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০ বৎসর কাল উহা আরও অধিক লাভজনক হইয়া উঠে; কিন্তু তাহার পর হইতে গত ৭ বৎসর চাযের বাজার মন্দা হইয়া গিয়াছে। এই মন্দার প্রধান কারণ দুইটি মাত্র—(১) চা'য়ের বাগানের সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রত্যেক বাগানে উৎপাদন বৃদ্ধি (২) জাভা ও সুমাত্রায় উৎপন্ন চা'য়ের সহিত প্রতিযোগিতা। জাভা ও সুমাত্রার জমী উর্ব্বরা ও জলবায়ু চা-বাগানের অনুকূল। জাভা ও সুমাত্রায় উৎপন্ন অধিকাংশ চা এত উৎকৃষ্ট যে ভারতীয় সাধারণ চা'য়ের সহিত প্রতিযোগিতায় তাহারাই জিতিয়া যায়। সে জন্য চা ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যবসায়ীদিগকে এখন হইতে সাবধান হইতে হইবে। চাউলের ব্যবসায়েরও ঐ একই অবস্থা হইয়াছে; শ্যাম ও ইণ্ডোচীন হইতে ভারতে সস্তা চাউল আমদানী হইতেছে; তাহা ছাড়া সব দেশেই এখন চাউল উৎপাদন করায় বাহিরে ভারতীয় চাউলের চাহিদা কমিয়া যাইতেছে। বহির্জগতে ভারতীয় চাউলের ব্যবহার প্রায় অর্দ্ধেক নামিয়া আসিয়াছে। এ অবস্থায় চাউল সম্বন্ধে কি করা উচিত তাহা ভাবা একান্ত প্রয়োজন। যদি দেশের উৎপন্ন চাউল দেশেই ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হয়, তবে আগামী এপ্রিল মাসে ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইলে ব্রহ্মদেশ হইতে আমদানী (বাৎসরিক ২০১১০০৩ টন চাউল) চাউলের উপর শুল্ক বসান উচিত। স্পেন ও অন্যান্য দেশের চাউলের পালিশ ও প্যাকিং ভাল বলিয়া ইউরোপের বাজারে ভারতীয় চাউলের বিক্রয় কমিয়া গিয়াছে; এ বিষয়েও ভারতীয় চাউল-ব্যবসায়ীদিগের চিন্তা করা উচিত। চা ও চাউলের উৎপাদন ও বাণিজ্য দ্বারা কত বাঙ্গালী জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহা কাহাকেও বলিয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই; সেই জন্যই এই দুইটি দ্রব্যের বাণিজ্যের উন্নতি বিধান বিশেষ প্রয়োজন।

হরিজনদিগের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ—

কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষ এবার তিলজলা অঞ্চলে দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে হরিজনদিগের জন্য গৃহনির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিতেছেন। কলিকাতার বস্তী অঞ্চলগুলির এখনও আবশ্যক উন্নতি হয় নাই; কাজেই যদি অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রণালীর গৃহ নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে বস্তীবাসীরা অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু চির-অবজ্ঞাত মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের জন্য কর্পোরেশন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন না কেন? তাঁহাদিগকে যে অধিকাংশ সময় বস্তীবাসীদিগের অপেক্ষা অধিকতর অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিয়া কলিকাতায় বাস করিতে হয়। আমরা আশা করি, হরিজন উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়েও অবহিত হইয়া কার্য্য করিবেন।





অষ্ট্রেলিয়া বনাম ইংলণ্ড ঃ

পঞ্চম টেষ্ট ঃ

২৬শে ফেব্রুয়ারী থেকে মেলবার্ণের মাঠে অষ্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ডের পঞ্চম বা শেষ টেষ্ট খেলা আরম্ভ হয়ে ৩রা মার্চ্চ সকালে মাত্র দু'টি বল দিতেই শেষ হয়ে গেছে।

অষ্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ২০০ রানে ইংলণ্ডকে পরাজিত করে 'এ্যাসেস্' বিজয়ী হয়েছে।

এইবারের টেষ্ট অভিযানে অষ্ট্রেলিয়া প্রথম দু'টি টেষ্টে পরপর পরাজিত হওয়ায় তাদের 'এ্যাসেস্'-বিজয়ী হবার আশা সুদূর পরাহত হয়েছিল। তারপর উপর্য্যপরী তিনটি টেষ্টে জয়ী হওয়া বিশেষ দক্ষতার ও ভাগ্যের পরিচয়। যাদুকর ব্র্যাডম্যান সুদক্ষ অধিনায়কতারও পরিচয় দিলেন। তিন ধুরন্ধর ব্যাটস্‌ম্যান —ব্র্যাডম্যান, ম্যাক্‌ক্যাব ও ব্যাডকক্—সেঞ্চুরী করে এবং তরুণ খেলোয়াড় গ্রেগরী ৮০ করে অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের স্কোর তুললে ৬০৪এ। ইতিপূর্ব্বে মেলবোর্ণের মাঠে অষ্ট্রেলিয়ার সর্ব্বোচ্চ স্কোর ছিল ছ'শো, ১৯২৪-২৫ সালে।



ডি জি ব্র্যাডম্যান
(ক্যাপটেন অষ্ট্রেলিয়া)

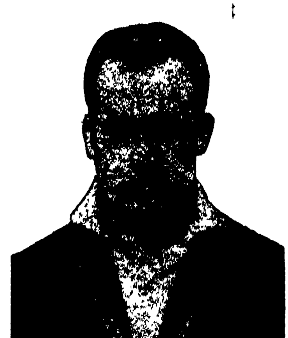
অষ্ট্রেলিয়া—৬০৪

ইংলণ্ড—২৩৯ ও ১৬৫

পঞ্চাশ হাজার দর্শক জড়ো হয়েছিল। ব্র্যাডম্যান টস জিতে ব্যাট করতে পাঠালে ফিঙ্গলটন ও রিগকে। ইংলণ্ডের নায়ক এলেন প্রথম বল দিলেন। ৪৮ রানের মাথায় রিগের উইকেট পড়লো, ব্র্যাডম্যান এসে যোগ দিলেন। ফিঙ্গলটন গেলে ম্যাক্‌ক্যাব নামলেন। এলেন বিদ্রূপের জ্বালায় যেন একটু ব্যতিব্যস্ত হয়েছেন মনে হয়। তিনি ম্যাক্‌ক্যাব ও ফিঙ্গলটনকের ক্যাচ্ ফেলেছেন। ম্যাকক্যাব-ব্র্যাডম্যান জুটিতে



জে হার্ডষ্টাফ্ (নটিং)

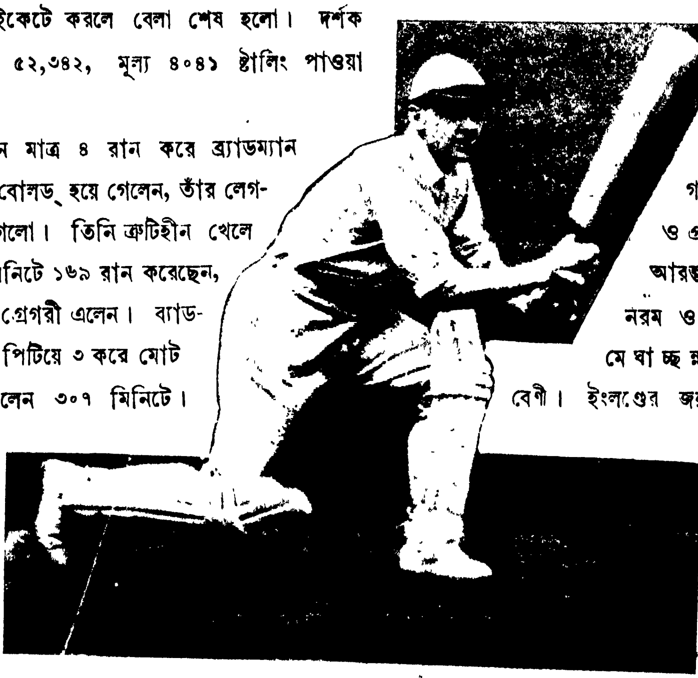


ওয়ার্দিংটন (ডার্বিসায়ার)

২৪৯ রান ওঠে ছ'ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে, তৃতীয় উইকেটের রেকর্ড। পূর্ব্বে লীডসে ব্র্যাডম্যান ও কিপ্যাক্সে মিলে ২২৯ রান তুলেছিলেন।

তিন শত রান উঠ্‌লো ৪-২৫ মিনিটে। শত রান পূর্ণ হবার পরে ম্যাককাব অধৈর্য্য হয়ে পড়লেন, ভেরিটির বল জোরে পিঠ্‌তে গিয়ে ফারনেসের হাতে আটকালেন ১১২ রান ১৬৩ মিনিটে করে। ব্যাড্‌কক্‌ যোগ দিলেন। ব্র্যাডম্যান নিজস্ব ১৫০ রান তুললেন ১৯৯ মিনিটে। ব্র্যাডম্যান ১৬৫ ও ব্যাডকক্‌ ১২, অষ্ট্রেলিয়া ৩৪২ রান ৩ উইকেটে করলে বেলা শেষ হলো। দর্শক সংখ্যা উঠেছে ৫২,৩৪২, মূল্য ৪০৪১ ষ্টার্লিং পাওয়া গেছে।

দ্বিতীয় দিনে মাত্র ৪ রান করে ব্র্যাডম্যান ফারনেসের বলে বোল্ড্‌ হয়ে গেলেন, তাঁর লেগ-ষ্ট্যাম্প উপ্‌ড়ে গেলো। তিনি ক্রটিহীন খেলে তিন ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে ১৬৯ রান করেছেন, ১৫টা ৪ ছিল। গ্রেগরী এলেন। ব্যাডকক্‌ ফারনেসকে পিটিয়ে ৩ করে মোট ৩৫০ রান তুললেন ৩০৭ মিনিটে। ব্যাডকক্‌ ও য়ার্দ্দিংটনের এক ওভারে ১৭ রান করে উচ্চ প্রশংসিত হলেন।



জি ও এলেন—ক্যাপ্‌টেন ইংলণ্ড

১৯২ মিনিট খেলে নিজস্ব শত রান করলেন। ৫০৭ রানের মাথায় ১১৮ রান করে ব্যাডকক্‌ ওয়ার্দ্দিংটনের হাতে আটকালেন। বৃষ্টির জন্য খেলা কয়েক মিনিটের জন্য বন্ধ হয়। ফ্লিটউড্‌-স্মিথ ভেরিটির বল তার মাথার উপর দিয়ে চালিয়ে প্রথম ছয়ের বাড়ি দিলেন। ৭৭,১৮১ জন দর্শক ৬৪৮৮ পাউণ্ড খরচ করেছে খেলা দেখতে। অষ্ট্রেলিয়া ৯ উইকেটে ৫৯৩ রান তুলেছে।

তৃতীয় দিনে ১১ রান হবার পর ফ্লিটউড্‌-স্মিথের লেগ ও মধ্য ষ্ট্যাম্প ফরনেসের বলে উপ্‌ড়ে গেলে অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস মোট ৬০৪ রানে শেষ হলো। ছ'শো রান উঠেছিল ঠিক ছ'শো মিনিটে—অর্থাৎ মিনিটে এক রান। ফারনেস ৯৬ রানে ৬ উইকেট নিয়েছেন।

ইংলণ্ড প্রথম ইনিংস আরম্ভ করে বেলা শেষে ৪ উইকেট খুইয়ে ১৮৪ রান মাত্র করলে। ধুরন্ধর ব্যাট হ্যামণ্ড, যাঁর উপর অষ্ট্রেলিয়ার বিপুল রান সংখ্যার যোগ্য প্রত্যুত্তর সম্পূর্ণ নির্ভর করছিল, তিনি মাত্র ১৪ রানে এবং লেল্যাণ্ড ৭ রানে যাওয়ায় ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ যে আশাপ্রদ নয় তা জানা যাচ্ছে। হার্ডষ্টাফ ৭৩ রান করে নট আউট রইলেন।

চতুর্থ দিনে মাত্র চার সহস্র ক্রীড়ামোদী এসেছে। গত রাত্রের প্রবল বারিপাত ও প্রভাতের সামান্য বৃষ্টির জন্য আরম্ভ বিলম্বে হলো। উইকেট নরম ও প্রতারণাত্মক। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বারিপাতের সম্ভাবনাই বেশী। ইংলণ্ডের জয়াশা নেই বললেই হয়।

হার্ডষ্টাফ ২৪০ মিনিট সাহসের সঙ্গে খেলে ৮৩ রানে ও'রিলীর বলে ম্যাক্‌কর্মিকের হাতে আটকালেন। ওয়্যাট ও এইমস্‌ মিলে স্কোর তুললে ২৩৬এ। তার পর ঐ স্কোরেই ৩টি উইকেট গেলো ও বাকী দু'টি গেলো ৩ রান পরে। ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হলো মাত্র ২৩৯ রানে ৩২৪ মিনিট খেলে। ও'রিলী ১৮ রানে ৩ ও ন্যাস ১০ রানে ৩ উইকেট নিলেন।

ইংলণ্ডকে ফলো-অন্‌ করতে হলো। দ্বিতীয় ইনিংসেও বিশেষ সুবিধা হলো না। প্রথম দু' উইকেট মাত্র দশ রানে পড়ে গেলো। বার্নেট একটু স্থায়ী হয়েছিল, একটি ছয়ের বাড়ী দিলে ও'রিলীকে, কিন্তু পরে ৪১ রানের মাথায় গেলো। হ্যামণ্ড ও লেল্যাণ্ড মিলে সাবধানতার সঙ্গে



পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির প্রতিযোগিগণ ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

অতি ধীরে খেলতে লাগলেন, এই আশায় উইকেট যদি একটু শুকিয়ে যায়। হ্যামণ্ড দেড় ঘণ্টা ধরে খেলে ৫৬ করে ব্র্যাডম্যানের হাতে গেলেন, ৯ বার ৪ করেছেন। লেল্যাণ্ড ১০৫ মিনিট খেলে মাত্র ২৮ করলেন। দিনের শেষে ইংলণ্ড ৮ উইকেট খুইয়ে মোট ১৬২ রান করলে।

পঞ্চম দিনে দশ হাজার দর্শক বিনামূল্যে প্রবেশাধিকার পেয়েছে। আবহাওয়া ঠাণ্ডা, রোদ উঠেছে। ইংলণ্ড ভয়েস ও ফারনেসকে খোয়ালে একটি রানও না পেয়ে। ফ্লিটউড্-স্মিথের প্রথম দু'টি বলেই দু'জন ব্যাডকক ও ম্যাসের হাতে আটকালে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস মোট ১৬৫ রানে শেষ হয়ে অষ্ট্রেলিয়াকে এক ইনিংস ও ২০০ রানে বিজয়ী করে দিলে।

অষ্ট্রেলিয়া

পঞ্চম টেষ্ট—প্রথম ইনিংস

ফিঙ্গলটন···কট ভয়েস, ব ফারনেস	১৭
রিগ···কট এইমস, ব ফারনেস	২৮
ব্র্যাডম্যান···ব ফারনেস	১৬৯
ম্যাক্‌ক্যাব · কট ফারনেস, ব ভেরিটি	১১২
ব্যাডকক্ কট ওয়ার্দিংটন, ব ভয়েস	১১৮
গ্রেগরী···কট ভেরিটি, ব ফারনেস	৮০
ওল্ডফিল্ড···কট এইমস, ব ভয়েস	২১
ম্যাস···কট এইমস, ব ফারনেস	১৭
ও'রিলী···ব ভয়েস	১
ফ্লিটউড্-স্মিথ···ব ফারনেস	১৩
ম্যাক্‌কর্মিক্ ·· নট আউট	১৭
অতিরিক্ত	১১
মোট	৬০৪

বোলিং :—ফারনেস ৯৬ রানে ৬, ভয়েস ১২৩ রানে ৩, ভেরিটি ১২৭ রানে ১ উইকেট।

ইংলণ্ড

পঞ্চম টেষ্ট—প্রথম ইনিংস

বার্ণেট···কট ওল্ডফিল্ড, ব ম্যাস	১৮
ওয়ার্দিংটন···ব ফ্লিটউড-স্মিথ	৪৪
হ্যামণ্ড···কট ম্যাস, ব ও'রিলী	১৪
লেল্যাণ্ড···ব ও'রিলী	৭
হার্ডষ্টাফ···কট ম্যাক্‌কর্মিক্, ব ও'রিলী	৮৩
ওয়্যাট···কট ব্র্যাডম্যান, ব ও'রিলী	৩৮
এইমস্···ব ম্যাস	১৯
এলেন···কট ওল্ডফিল্ড, ব ম্যাস	০
ভেরিটি কট রিগ, ব ম্যাস	০
ভয়েস···ষ্টাম্পড ওল্ডফিল্ড, ব ও'রিলী	৩
ফারনেস··· নট আউট	০
অতিরিক্ত	১৩
মোট	২৩৯

বোলিং :—ও'রিলী ৫১ রানে ৫, ম্যাস ৭০ রানে ৪, ফ্লিটউড্ স্মিথ ৫১ রানে ১ উইকেট।

ইংলণ্ড

পঞ্চম টেষ্ট—দ্বিতীয় ইনিংস

বার্ণেট···এল্-বি, ব ও'রিলী	৪১
ওয়ার্দিংটন·· কট ব্র্যাডম্যান, ব ম্যাক্‌করমিক্	৬
হার্ডষ্টাফ···ব ম্যাস	১
হ্যামণ্ড · কট ব্র্যাডম্যান, ব ও'রিলী	৫৬
ওয়্যাট··· রান আউট	৯
লেল্যাণ্ড···কট ম্যাক্‌কর্মিক্, ব ফ্লিটউড-স্মিথ	২৮
এইমস্···কট ম্যাক্‌ক্যাব, ব ম্যাক্‌কর্মিক্	১১
এলেন·· কট ম্যাস, ব ও'রিলী	৭
ভয়েস···কট ব্যাডকক্, ব ফ্লিটউড্-স্মিথ	১
ফারনেস···কট ম্যাস, ব ফ্লিটউড্-স্মিথ	০
ভেরিটি··· নট আউট	২
অতিরিক্ত	৩
মোট	১৬৫

বোলিং :—ও'রিলী ৫৮ রানে ৩, ফ্লিটউড্-স্মিথ ৩৬ রানে ৩, ম্যাক্‌কর্মিক্ ৩৩ রানে ২, ন্যাস ৩৪ রানে ১ উইকেট।

ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়া টেষ্ট

খেলার ফলাফল ঃ

এ পর্য্যন্ত মোট ১৩৯টা টেষ্ট খেলা হয়েছে। অষ্ট্রেলিয়া ৫৬ ও ইংলণ্ড ৫৪ বার জয়ী হয়েছে। ২৯টি খেলা সমান সমান হয়েছে।

১৯৩৬-৩৭ সালের টেষ্ট খেলার সেঞ্চুরী ঃ

অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে :

ডি জি ব্র্যাডম্যান—২৭০ (তৃতীয় টেষ্ট), ২১২ (চতুর্থ), ১৬৯ (পঞ্চম)

জে এইচ ফিঙ্গলটন—১৩৬ (তৃতীয়), ১০০ (প্রথম)

এস জে ম্যাক্‌ক্যাব—১১২ (পঞ্চম)

ইংলণ্ডের পক্ষে :

হ্যামণ্ড—২৩১ (নট আউট) (দ্বিতীয়)

বার্ণেট ১২৯ (চতুর্থ)

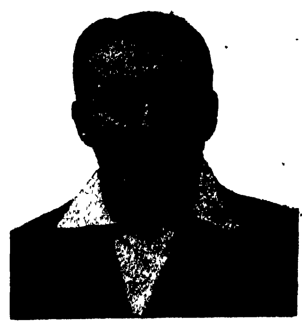
লেল্যাণ্ড—১২৬ (প্রথম), ১১১ (নট আউট) (পঞ্চম)



লেল্যাণ্ড
(ইয়র্ক)



হ্যামণ্ড
(গ্লষ্টারস্)



সি এস বার্ণেট
(গ্লষ্টারস্)



রঞ্জি প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বী নওয়ানগর ও বাঙ্গলা-আসাম ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়গণ

রঞ্জি প্রতিযোগিতা ঃ

নওয়া নগর—৪২৪ ও ৩৮৩

বাঙ্গলা—৩১৫ ও ৩৩৬

নওয়ানগরদল ২৫৬ রানে বিজয়ী হয়ে রঞ্জি ট্রফী পেয়েছেন। বাঙ্গলার দ্বিতীয় ইনিংসে স্কিনার ১২৫, গুরুলে অনুপস্থিত থাকায় ব্যাট করেন নি। অমরসিং ৭২ রানে ২, ওয়েন্সেলে ৪৬ রানে ৪, মার্সাল ২১ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন।

আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস্ ঃ

কলিকাতা ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তম বার্ষিক স্পোর্টস্ প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাব এবারও বিজয়ী হয়েছে। পাঞ্জাবের প্রতিনিধিরা ১২টি বিষয়ে জয়ী এবং কলিকাতা মাত্র ২টি প্রতিযোগিতায়—লং জাম্পে ও রীলে রেসে, জয়ী হয়েছে।

পাঞ্জাবের ছাত্ররা বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছে, নিজেদের শক্তির উপর তাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। বাঙ্গলার বৈদ্যনাথ বসু ও বেণীপ্রসাদ দোবে অসুস্থতার জন্য যোগ দিতে পারেন নি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে ছাত্রদের খেলা-ধূলার উন্নত করবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করতে পূর্ব্বেও অনুরোধ করেছিলুম। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে প্রমাণিত হচ্ছে যে বাঙ্গলার ছাত্রদের এ বিষয়ে অবনতিই ঘটছে। গত সাত বৎসরই পাঞ্জাব বাঙ্গলাকে পরাজিত করলে। অভিজ্ঞ শিক্ষক নিযুক্ত করে ছাত্রদের স্পোর্টসের প্রত্যেক বিষয়ে নিয়মিত শিক্ষা দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য। নতুবা বাঙ্গলার মুখের কালি বৎসরের পর বৎসরে আরো গাঢ় হবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবে 'মার্চপাষ্ট', খেলাধূলা, ব্রতচারী নৃত্য দেখিয়ে বাঙ্গলার মুখোজ্জ্বল করতে পারবে না। আমরা এ বিষয়ে পুনরায় জনপ্রিয় ভাইস-চ্যান্সলার মহাশয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করছি।



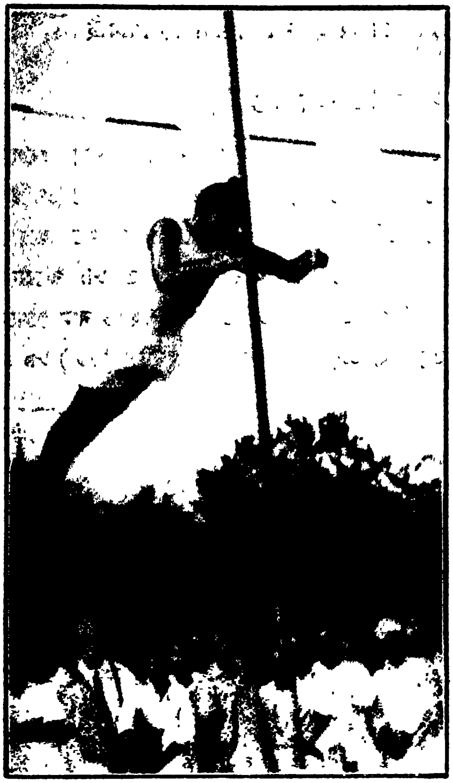
ইন্টার-ভার্সিটি স্পোর্টসের ১০০ মিটার দৌড়ে সলিমউল্লা (পাঞ্জাব) প্রথম হচ্ছেন, সময়—১০$\frac{৩}{৫}$ সেকেণ্ড (ভারতীয় রেকর্ডের সমান) ছবি—এন্ সেন

১১০ মিটার হার্ডলে বাঙ্গলার জে এস হে প্রথম থেকে অগ্রগামী থেকেও শেষ রক্ষা করতে পারেন নি, পাঞ্জাবের মহম্মদ এন্ভার শেষভাগে দুর্জ্জয় বিক্রমে এসে তাঁকে পরাস্ত করেছে।

১০০ মিটারে বাঙ্গলার জেড্ এইচ খাঁ পায়ের মাংসপেশী সঙ্কোচনের জন্য জয়ী হতে পারলেন না, পাঞ্জাবের সলিমউল্লা প্রথম হলেন।

ইণ্টার-ভার্সিটি হকি ঃ

পঞ্চম বার্ষিক এই হকি প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি ৫-০ গোলে কলিকাতাকে পরাজিত করেছে। পূর্ব্বে চার বার পাঞ্জাব জয়ী হয় এবং এক বারের খেলা ড্র হয়। পাঞ্জাব এ পর্য্যন্ত অপরাজেয় রইল। খেলা একদিকেই হয়েছে, কলিকাতা অত্যন্ত নিকৃষ্ট খেলেছে। পাঞ্জাব গোলরক্ষককে মাত্র দু'বার বল ধরতে হয়েছিল।



পোলভল্টে অমরসিং (পাঞ্জাব) ১০ ফিট ৯¾ ইঞ্চি অতিক্রম করে প্রথম হচ্ছেন —এম সেন

কলিকাতার দল নির্ব্বাচন দেখেই বোঝা গিয়েছিল যে তাদের হার অনিবার্য্য।

অষ্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট ঃ

এম সিসি—২৮২ ও ২৫১

দং—১৬১

খেলা ড্র হয়েছে। হার্ডষ্টাফ্ ৯৭, এইমস্ (রান আউট) ৫১, লেল্যাণ্ড ৫৩, ওয়ার্দ্দিংটন ৩৯।

এম সি সি—৩৮০

নিউ সাউথ ওয়েলস (কান্ট্রি)—১৬২ ও ৭৮

এম সি সি এক ইনিংস ও ১৪০ রানে বিজয়ী হয়েছেন। এম সি সির এইমস্ ৮২, হার্ডষ্টাফ ৬৭, লেল্যাণ্ড ৬৭, ওয়্যাট ৫১, ওয়ার্দ্দিংটন ৪৯। কপ্‌সন দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১৬ রানে ৭ উইকেট



জহুর আমেদ (পাঞ্জাব) ৪১ ফিট ৯½ ইঞ্চি দূরে সট্‌পুট নিক্ষেপ করে প্রথম হয়েছেন —জে কে সাম্যাল



কলিকাতা ইউনিভার্সিটি রীলে দল পাঞ্জাবকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছেন। ঝে এল হে (২০) রানিং ব্রড্ জাম্পে ২০ ফিট ৮ ইঞ্চি লাফিয়ে প্রথম হয়েছেন —তারক দাস

নিয়েছেন। নিউ সাউথ ওয়েলসের কেলি ৪৯, হাই ২৩; লীজ ২৫।

এম সি সি—৭৩ ও ২৯৯

নিউ সাউথ ওয়েলস—২৩১ ও ২৪৬

এম সি সি ১০৫ রানে পরাজিত হয়েছেন। নিউ সাউথ ওয়েলসের লাস্ ৪৯, জ্যাকসন ৪২, চিপারফিল্ড ৩৭; ম্যাক্ক্যাব ৯৩, ফিঙ্গলটন ৬০, ওল্ডফিল্ড (নট আউট) ৩০। এম সি সির বার্ণেট ১১৭, হার্ডষ্টাফ ৬৪, এইমস ৬০।



বেঙ্গল অলিম্পিকের হাই জাম্প বিজয়িনী
মিস্ বার্বারা এড্ওয়ার্ডস্
ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

এম সি সি—১৮৭ ও ১৩২ (৩ উইকেট)

ভিক্টোরিয়া—২৯২

খেলাটি সময়ভাবে ড্র হয়েছে। ভিক্টোরিয়ার গ্রেগরী ৮৬, হ্যাটসেট ৫৪, লি ৪০। এম সি সির এইমস ৬৪, রবিন্‌স্ ৩৩; হার্ডষ্টাফ (নট আউট) ৬০, হ্যামণ্ড ৫৬।

এম সি সি—৩৪৪ ও ১১৮ (৬ উইকেট)

ভিক্টোরিয়া (কাণ্ট্রি)—১৪৭ (৮ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

বৃষ্টির জন্য খেলা মধ্যে বন্ধ হয়। সময়াভাবে ড্র হয়েছে। প্রত্যেক দলে ১২ জন করে খেলোয়াড় খেলেছে।

কুচবিহার কাপ ঃ

এরিয়ান ক্লাব কুচবিহার কাপ বিজয়ী হয়েছেন। মহমেডান স্পোর্টিং তৃতীয় দিনে খেলার মাঠে উপস্থিত না হওয়ায় এরিয়ানদল বিজয়ী বলে ঘোষিত হয়েছেন। মহমেডান স্পোর্টিং প্রথম ইনিংসে মাত্র ৮৬ করেন এবং দ্বিতীয় দিনে এরিয়ান ৮ উইকেটে ২১১ রান তোলেন। কে ভট্টাচার্য্য ৬৮, সুঁটে ব্যানার্জ্জি (নট আউট) ৮৯।



কালীঘাট স্পোর্টসের ৮৩ গজ নীচু বেড়া দৌড়
বিজয়িনী মিস্ বেটি এড্ওয়ার্ডস্
ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

হকি ঃ

কলিকাতায় হকি লীগখেলা চলছে। প্রথম বিভাগে নবাগত গ্রীয়ার চ্যাম্পিয়ন কাষ্টমস দলকে এক গোলে হারিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। কাষ্টমস পুলিসের সঙ্গেও হেরেছে। রেঞ্জার্স'ও এরই মধ্যে দু'টি খেলাতে হেরেছে। মোহনবাগান তিনটির মধ্যে দু'টি খেলাতে

জয়ী হয়েছে। দলে এ দেব, এইচ কে মিত্র প্রত্যাবর্ত্তন করায় তারা এবার শক্তিশালী হয়েছে। কোন দল যে



সিটি এথ্‌লেটস্ স্পোর্টসে প্রথম বাঙ্গালী বালিকার জাভেলিন নিক্ষেপণ ছবি—জে কে সান্যাল



বেঙ্গল অলিম্পিকের ৪০০ মিটার বেড়া দৌড় বিজয়ী জে সার্জ্জেণ্ট ছবি—কাঞ্চন

এবার চ্যাম্পিয়ন হবে এখনি তা নির্ণয় করা দুরূহ। বি জি প্রেস ও মিলিটারী মেডিকেল উপস্থিত প্রথম যাচ্ছে, রেঞ্জার্স ও আর্ম্মেনিয়নস্ দ্বিতীয় যাচ্ছে।



ক্রাউন স্পোর্টসের বালিকা প্রতিযোগিনীগণ। ১০০ ও ১৫০ গজ দৌড় বিজয়িনী মিস এল্ ক্যারো (৫৯) ছবি—জে কে সান্যাল

গোয়ালিয়র কাপ ঃ

বোম্বাই কাষ্টমস ৫-১ গোলে বোম্বাই টেলিফোন কোম্পানীকে পরাজিত করে গোয়ালিয়র কাপ জয় করেছে। খেলাটি বেশ প্রতিযোগিতামূলক হয়েছিল, যদিও টেলিফোন পাঁচটি গোল খেয়েছে। প্রথমার্দ্ধে টেলি-

কোনের ইন্‌সাইড রাইট উড্‌কক্ একটি গোল নষ্ট করে এবং পরে আরো কয়েকটি সুযোগ তারা হারায়।



জ্যাভেলিন্-নিক্ষেপ-বিজয়ী মেহের চাঁদ (পাঞ্জাব), দূরত্ব—১৮১ ফিট ৯ ইঞ্চ। রেকর্ড)

ছবি—জে কে সান্যাল

শচীন্দ্র গোল্ড কাপ ঃ

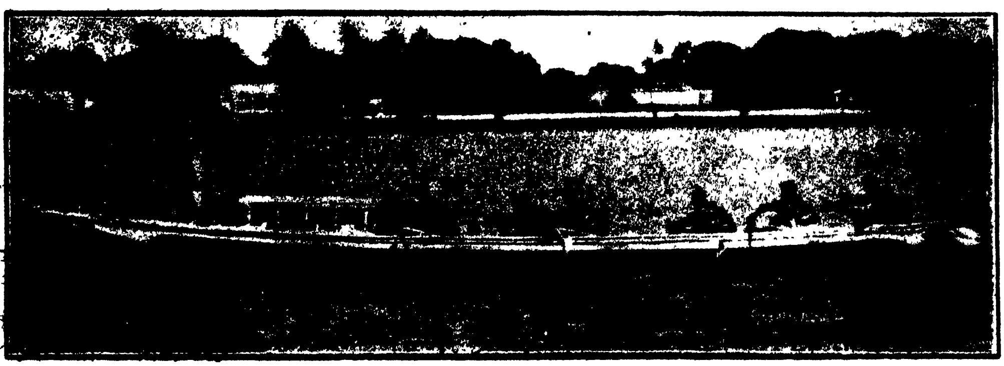
গোয়ালিয়র ষ্টেট ৩-০ গোলে দিল্লী ওরিয়েণ্টাল দলকে হারিয়ে কাপ জয়ী হয়েছে। গোয়ালিয়রের পক্ষে ঝান্সি হিরোর দলের প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় রূপসিং, এইচ্ ব্যানার্জ্জি, মথুরাপ্রসাদ, ছোটেবাবু, দায়াশঙ্কর খেলেছিলেন। দিল্লীর দলের পক্ষে ভূপাল দলের কাদের, বাম্মি খাঁ, সুলেমান খেলেন। গোয়ালিয়র দল সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শিতা দেখিয়ে অনায়াসে জয়ী হয়েছেন। মধ্য মাঠ থেকে সকলকে অতিক্রম করে রূপসিং দ্বিতীয় গোলটি দেন, ইহা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়েছিল।

বরফে হকি খেলা ঃ

ওয়েম্বেলেতে পৃথিবীর বরফ-হকি টুর্ণামেণ্ট খেলায় গ্রেট বৃটেন ২-০ গোলে সুইজার্ল্যাণ্ডকে পরাজিত করেছে দু'বার অতিরিক্ত সময় খেলবার পর। প্রথমে প্রতীয়মান হচ্ছিল যে সুইস্‌দের দ্রুত স্কেটিংএর কাছে গত বৎসরের চ্যাম্পিয়ন গ্রেট বৃটেন যেন দাঁড়াতে পারছে না। বৃটিস গোলরক্ষক জিমি ফষ্টার অতি কষ্টে তার গোল রক্ষা করেছে। কিন্তু হিরজ্ ছোট্ট সুইস গোলরক্ষক, যেরূপ দর্শনীয় ও অত্যাশ্চর্য্য রকমে তার ছ' ফুট গোল বহুবার রক্ষা করেছে তা' অতুলনীয়। গ্রেট বৃটেন পরের খেলায় কানাডার কাছে হেরে গেছে। কানাডা ৫-২ গোলে জার্ম্মাণীকে হারিয়েছিল। চ্যাম্পিয়নসিপ্ খেলা মাত্র ন'বার হয়েছে, কানাডা সাতবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এবারও কানাডাই খুব সম্ভব চ্যাম্পিয়ন হবে।

বাচ্-খেলা ঃ

চাতরা রোইং ক্লাব বেনিয়াটোলা রোইং ক্লাবকে এক



বাচ্-খেলায় বিজয়ী চাতরা রোইং ক্লাব

ছবি—এস বোস

লেংথে হারিয়ে হরিহর স্মৃতি নৌকা বাচ্ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছে। প্রতিযোগিতা ব্যারাকপুর গোলাঘাট থেকে আরম্ভ হয়ে চাতরা স্কুল ঘাটে শেষ হয়। বিজয়ীদল নির্দ্দিষ্ট পথ ২ মিনিট ১৭ সেকেণ্ড (রেকর্ড) মধ্যে অতিক্রম করে।

পশ্চিম ভারত লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়নসিপ্ ঃ

মেয়েদের সিঙ্গলস্ ফাইনালে—মিস লীলা রাও ৬-১, ৬-২ গেমে মিস্ এম ডুবাসকে হারিয়ে বিজয়িনী হয়েছেন।



মিস লীলা রাও

পুরুষদের সিঙ্গলসে—এ জে সিং ৭-৫, [illegible] গেমে এ সি ষ্টেডম্যানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

মিক্সড ডবলে—মিস এল উড্ব্রীজ ও এস সি বিট্টি ৬-০, ৬-৪ গেমে মিস্ এম ডুবাস ও বি টি লেকৰে হারিয়েছেন।

মেয়েদের ডবল্সে—মিস এম ডুবাস ও মিস লীলা রাও ৬-২, ৬-৩ গেমে মিস এল উড্ব্রীজ ও মিস এফ্ তায়িরাব্ খাঁকে হারিয়েছেন।

পুরুষদের ডবল্সে—এ সি ষ্টেডম্যান ও সি ই ম্যালক্রম ৬-১, ৩-৬, ৯-৭ গেমে জে চিরঞ্জীত্ ও এল্ ব্রুক এডওয়ার্ডসকে পরাজিত করেছেন।



সি ই ম্যালক্রম

বোম্বাই প্রেসিডেন্সি হার্ডকোর্ট চ্যাম্পিয়নসিপ্ ঃ

ওয়াই আর সাবুর ৭-৫, ৬-৩ গেমে জে এম মেটাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। সাবুর ৬-২, ৬-৩

গেমে জিতিল. ভারত চ্যাম্পিয়ন ই. ভি বব্‌কে হারিয়েছিলেন।

মিস লীলা রাও ৬-১, ৬-৪ গেমে মিস এল্‌ উডব্রীজকে হারিয়ে উপর্য্যুপরি ৬ষ্ঠবার বিজয়িনী হলেন।

ডি মণ্টমরেন্সী টুর্ণামেণ্ট ঃ

লাহোরে এইচ এল আই (পেশোয়ার) ৭-১ গোলে রয়েল সিগ্‌ন্যাল্‌স্‌কে (রাওলপিণ্ডি) হারিয়ে দ্বিতীয়বার বিজয়ী হয়েছে। রয়েল সিগ্‌ন্যালদের আর্গাইল ও সাদারল্যাণ্ডের সঙ্গে পূর্ব্বদিন সেমি-ফাইনালে ভীষণ যুঝতে হওয়ায় এদিন তাদের বিশেষ ক্লান্ত দেখা যায়, তারা এইচ এল আইএর সঙ্গে পাল্লা রাখতে পারে না। তারা প্রথমার্দ্ধে মাত্র একটি গোল খায়, কিন্তু দ্বিতীয়ার্দ্ধে একেবারে মুছড়ে পড়ে, আরো ছ'টি গোল হয়।

ফ্রেড পেরীর আদর্শ খেলোয়াড় ঃ

পেরীর আদর্শ টেনিস খেলোয়াড় কেমন হবে ?—তার থাকবে—service of Vines, forehand of Tilden, low volley of Cochet, high volley of Borotra, back-hand of Locoste, smash of Cochet or Vines, generalship of Crawford and concentration of Locoste,—পেরী বলেছেন, এই সকল গুণসম্পন্ন খেলোয়াড় অপরাজেয় হবে।

মুষ্টিযুদ্ধ ঃ

আর্ম্মি ও আর এফ এ ইণ্টার-রেজিমেণ্টাল বক্সিং চ্যাম্পিয়নসিপে এবারও রয়েল নরফোক রেজিমেণ্ট ১৮-১৫ পয়েণ্টে কিংস রেজিমেণ্টকে পরাজিত করেছে। রয়েল নরফোক ১৯৩৫-৩৬ সালেও চ্যাম্পিয়ন ছিল।

বোমণ্ট কমিটি রিপোর্ট ঃ

প্রকাশ, বোমণ্ট তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পুনরায় আলোচিত হবে। ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড মহারাজ কুমার, বুটেন জোন্স, মেজর নাইডু, মেজর রিকেটস্‌ ও মিষ্টার হাদিকে কমিটি প্রকাশিত মন্তব্য সম্বন্ধে মতামত জানাবার জন্য লিখেছেন। মহারাজকুমার নাকি অমরনাথ প্রেরিত বলে সেই তারগুলি বোর্ডের নিকট এখনও পাঠান নাই।



প্রেসিডেন্সী কলেজের বার্ষিক স্পোর্টসের ৪৪০ গজ দৌড়ে বেণীপ্রসাদ দোবে প্রথম হচ্ছেন। ইনি সর্ব্বাধিক ৭৪ পয়েণ্ট পেয়ে ইন্‌ডিভিজুয়াল চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন

ছবি—জে কে সান্যাল

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত স্বরলিপি গ্রন্থ 'গীতশ্রী'—৩৲
শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত গল্প পুস্তক 'চক্রপাক'—১৲
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্য-উপন্যাস 'অপরা হীরা'—৸৹ ও 'ডিটেকটিভ ডাক্তার—৸৹
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত কবিতা পুস্তক 'হবিত্রী'—৷৷৹
শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস 'খেয়ালের খেসারত,—২৲
শ্রীমুরলীধর রায় প্রণীত ভ্রমণ কাহিনী 'তীর্থ ভ্রমণ'—৲
শ্রীমতী কাত্যায়নী দেবী প্রণীত ভ্রমণ-কাহিনী 'কেদার বদরীর পথে'—১৲
শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত জীবনী পুস্তক 'ঋষি টলষ্টয়'—৸৹

Editor :—
RAI JALADHAR SEN BAHADUR

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons, at the Bharatvarsha Ptg. Works 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta



দ্বিতীয় খণ্ড | চতুর্বিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

প্রাচীন বঙ্গনারীর বেশভূষা ও প্রসাধন

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম-এ

কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' 'বাঙ্গক' ও 'পৌণ্ড্রক' (২।১১) নামক সূত্রবস্ত্রের প্রশংসা আছে।

'বাঙ্গক' কি? "বাঙ্গকং শ্বেতং স্নিগ্ধং দুকূলং।" বঙ্গে অর্থাৎ মধ্য (বা পূর্ব্ব) বাঙ্গালায় উৎপন্ন শ্বেতবর্ণ স্নিগ্ধস্পর্শ যে সূক্ষ্মবসন তাহাই 'বাঙ্গক'। আর 'পৌণ্ড্রক' কিরূপ? "পৌণ্ড্রকং শ্যামং মণিস্নিগ্ধং।" পৌণ্ড্রে বা উত্তর বঙ্গে জাত বস্ত্র শ্যামবর্ণ এবং মণির উপরিভাগের ন্যায় স্নিগ্ধ। পৌণ্ড্রদেশে 'ক্ষৌম'ও প্রস্তুত হইত। 'দুকূল' ও 'ক্ষৌমে'র পার্থক্য টীকাকার বলিয়া দিয়াছেন, 'দুকূল' যতটা সূক্ষ্ম, 'ক্ষৌম' তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্থূল বা কর্কশ।

তাহা হইলে খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে বঙ্গরমণীগণ এই 'বাঙ্গক' ও 'পৌণ্ড্রক' দ্বারা বেশ সম্পাদন করিত। সকলে নয় সদাসর্ব্বদাও নয়—কিন্তু করিত।

ইহার আনুমানিক দুই শতাব্দী পরে ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' বঙ্গনারীর উল্লেখ পাই, সেটা তাহাদের কেশপ্রসাধনের প্রশংসাসূচক—"গৌড়ীনামলকপ্রায়ং শেষাপ্রায়ৈকবেণীকম্" (২১।৪৮)। অবশ্যই ভরতের যুগে গৌড়-নারীগণের বেণীতে একটা কিছু বিশেষত্ব ছিল, নইলে তিনি এ কথার অবতারণা করিবেন কেন?

তারপর আসি গুপ্ত যুগে। নাট্যকার বিশাখদত্তকে পূর্ব্বে মনে করা হইত, ইনি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বা তাহারও পরে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু তাঁহার 'দেবী-চন্দ্রগুপ্ত' নামক একখানি নাটকের অংশ বিশেষ আবিষ্কৃত হওয়ার পরে এই ধারণার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তিনি গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের (বিক্রমাদিত্যের) সমসাময়িক ছিলেন এখন এইরূপ মনে করার সুসঙ্গত কারণ বিদ্যমান। বিশাখদত্ত তাঁহার 'মুদ্রারাক্ষসে'র পঞ্চমাঙ্কের শেষ দিকে ভাগুরায়ণের মুখে বলিয়াছেন—

"গৌড়ীনাং লোধ্রধূলীপরিমলধবলান্ ধূম্রয়ন্তঃ কপোলান্
ক্লিশ্নন্তঃ কৃষ্ণিমানং ভ্রমরকুলরুচঃ কুঞ্চিতস্যালকস্য
পাংশুব্যূহাবলানাং তুরগখুরপুটক্ষোদলব্ধাত্মলাভাঃ
শত্রূণামুত্তমাঙ্গে গজমদসলিলচ্ছিন্নমূলাঃ পতন্তু॥"

গৌড়রমণীগণের লোধ্রফুলের পরাগ দ্বারা ধবলিত গণ্ডস্থলের ধূম্রবর্ণতা বিধায়ক এবং তাহাদের ভ্রমরবৎ কুঞ্চিত কুন্তলের

কুরুব-বিঘাতক (হানিকর) অশ্বক্ষুরাঘাতজনিত সৈন্তগণের ধূলিসমূহ হস্তিগণের মদবারি দ্বারা ছিন্নমূল হইয়া শত্রুগণের মস্তকে নিপতিত হউক।

বিশাখদত্তের এই শ্লোকটি হইতে বুঝি ৪০০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার মেয়েরা লোধ্রফুলের রেণু দিয়া মুখে পাউডারের কাজ করিত এবং তাহাদের ভ্রমরবৎ কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত কুন্তলের শোভা লোকের মুগ্ধদৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

কালিদাসের 'শৃঙ্গার-তিলকে' ১৭ শ্লোকে বঙ্গ-বারাঙ্গনাগণের নয়নশোভার ("নয়নসুভগং বঙ্গবারাঙ্গনানাং") উল্লেখ আছে। কিন্তু এই শোভা নয়নের স্বাভাবিক শোভা এবং তাছাড়া এই কালিদাস মহাকবি-কালিদাস কিনা তাহাও বলা কঠিন।

গুপ্ত-পর-যুগে বাঙ্গালার নারীগণ কিভাবে কাপড় পরিত, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় রাজসাহী জেলায় পাহাড়পুর-স্তূপের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত দুই তিনটি মূর্ত্তিতে। ইহার একটি রাধার ও অন্য একটি দুর্গার মূর্ত্তি। এই দুইখানিতেই পরিধেয় বস্ত্র তাঁহাদের প্রায় গুল্ফ-সন্ধি (ankle) পর্য্যন্ত নামিয়াছে (*Arch. Surv. Ann. Rep.* 1926-27, Pl. XXXII, fig. c and Pl. XXIII, fig. b)। কিন্তু অপর একটি নারীমূর্ত্তিতে বসন হাঁটুর উপরে (Ibid, Pl. XXIII fig. d, বামদিকের নারীমূর্ত্তি)। কাপড় পরার ঢংটা অনেকটা মালকোছা দিয়া পরার মত।

ভরহুত-স্তূপের নারীমূর্ত্তিগুলির পরিধেয় বসনও হাঁটু পর্য্যন্ত বা হাঁটুর সামান্য নিম্নে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিজাপুরের বাদামি গিরিগুহায় কতকগুলি নারীমূর্ত্তিতেও বসন হাঁটু পর্য্যন্ত অথবা হাঁটুরও উপরে (১)। সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে ভারতের সর্ব্বত্রই নারীদিগের পরিধেয় বস্ত্র হাঁটু পর্য্যন্ত পরাটাই ছিল রীতি। কিন্তু গুপ্তযুগ হইতে এ রীতি পরিত্যক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল – অন্ততঃ ভদ্রসমাজে। সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে চীনা হুয়েন্ সাং ভারতে আসিয়া দেখিয়াছিলেন স্ত্রীজাতির পরিচ্ছদে পা পর্য্যন্ত আবৃত হয়। সপ্তম শতাব্দীতে (অথবা তাহার পরে) পূর্ব্ববঙ্গের সামন্ত-রাজ লোকনাথের তাম্রশাসনের রাজমুদ্রার (seal) যে লক্ষ্মীমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে তাহা অস্পষ্ট হইলেও তাহাতে দেবীর বসন হাঁটুর অনেক নিম্নে দেখা যায়। কিন্তু তবু ভারতের কোনও কোনও স্থানের, বিশেষতঃ উড়িষ্যার ও (ময়ূরভঞ্জের) খিচিঙ্গের মূর্ত্তি-শিল্পে একাদশ শতাব্দীতে বা তাহারও পরে কখনও কখনও প্রাচীন রীতিটা অনুসৃত হইতে দেখা যায়।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর কোনও সময়ে কাশ্মীর-রাজ জয়াপীড় ছদ্মবেশে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়া দেবনর্ত্তকী কমলার রূপ-লাবণ্য দেখিয়া ও মার্জ্জিত আলাপ ('অগ্রাম্য পেশলালাপ') শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। কবি কল্হন কমলার 'পদ্মপলাশাক্ষি'র কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার 'কাঞ্চন-পর্য্যঙ্কে'র কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার বেশ-ভূষা বা প্রসাধনের কোনও বিবরণ দেন নাই।

প্রায় ৯০০ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জের রাজকবি রাজশেখর একটি শ্লোকে বলেন—

"অত্রার্দ্রচন্দনকুচার্পিত সূত্রহার সীমন্তচুম্বিসিচয়স্ফুটবাহুমূলঃ
দূর্বাপ্রকাণ্ডরুচিরাসু গুরূপভোগো গৌড়াঙ্গনাসু চিরমেব
চকাস্তিবেষঃ।"

শ্লোকটি শ্রীধরদাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' (১২০৫ খৃঃ) উদ্ধৃত আছে (২।২০।৪)। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—আর্দ্রচন্দন-লিপ্ত স্তনতটের উপরিস্থ সূত্রহার ও সীমন্তকে তাহাদের বস্ত্র (সিচয়) স্পর্শ করে, কিন্তু বাহুমূল উন্মুক্ত থাকে; এইরূপ বেশ উত্তম দূর্বার মত মনোহর (শ্যামবর্ণা) গৌড়াঙ্গনাদিগের দেহে শোভা পায়।

রাজশেখরের এই উক্তি তেমন স্পষ্ট না হইলেও ইহা হইতে মনে হয় গৌড়াঙ্গনাগণের পরিহিত বস্ত্রেরই একাংশ (কোনও স্বতন্ত্র উত্তরীয় নয়) ডানদিক হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাদের বক্ষের অধিকাংশ স্থান আবৃত করিয়া বাম স্কন্ধের উপর দিয়া সীমন্তকে স্পর্শ করিত। বাঙ্গালী মেয়েদের দক্ষিণ বাহুমূল বা স্কন্ধদেশ—ব্লাউজ্ বা সেমিজ্ না থাকিলে এখনও উন্মুক্তই থাকে। কিন্তু তুলনা করুন, হুয়েন্ সাং বলেন ভারতীয় রমণীদিগের স্কন্ধদেশও বস্ত্রাঞ্চলে আবৃত থাকে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে কচিৎ কচিৎ অবগুণ্ঠনের উল্লেখ দেখা যায়। যথা বাল্মিকী-'রামায়ণে'—রাবণের

(১) Cf. Memoirs of the Arch. Surv Ind, No 25. *Bas-reliefs of Badami*, R. D Banerji, pl XIX (b) and (c) and Pl. XX(c), Cave No. III.

মৃতদেহের উপর পতিত হইয়া মন্দোদরী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "আমি অবগুণ্ঠিতা না হইয়া নগরদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত এবং পদব্রজে এখানে আসিয়াছি, ইহা দেখিয়া তোমার ক্রোধ হইতেছে না? চাহিয়া দেখ, তোমার (অপর) পত্নীদিগের লজ্জাবগুণ্ঠন স্খলিত, ইহারা অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া এইস্থানে উপস্থিত, ইহা দেখিয়াও তোমার ক্রোধ হইতেছে না কেন?" (লঙ্কা, ১১২)। ভাস-কবির 'প্রতিমা' নাটকে রামচন্দ্র বনগমন সময়ে সীতাকে অবগুণ্ঠন অপনীত করিতে বলিতেছেন—অপনীয়তামবগুণ্ঠনম্—ইত্যাদি। তবু জানি, রাজশেখরের কালেও অবগুণ্ঠন ব্যাপকভাবে সমাজে প্রচলিত ছিল না। এমন কি, জানি রাজশেখরের সময়েই ভারতীয় অধিকাংশ নরপতিদিগেরও অন্তঃপুরিকাগণ বিনা অবগুণ্ঠনে রাজসভায় আসিতেন (Elliot and Dowson, *History of India*, Vol. I, Abu Zaid, p. 11)। কিন্তু রাজশেখরের সময়ে বাঙ্গালী গৃহস্থ মেয়েদেরও শালীনতাবোধ পূরা মাত্রায় ছিল। বক্ষ আবৃত, মাথায়ও কাপড়। প্রাক্-রাজশেখর যুগের ভারতীয় নারীমূর্ত্তিগুলির অধিকাংশেরই বক্ষ অলঙ্কৃত, কিন্তু আবৃত নয়। ক্বচিৎ কোথাও কোথাও কুচবন্ধ। তবে ইহার একটা কারণ আছে। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে সীবন করা বস্ত্র অঙ্গে ধারণ করা নিষিদ্ধ, বিশেষতঃ ধর্ম্ম-কর্ম্ম অনুষ্ঠানের সময়। কাজেই সেকালের ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণের সহধর্ম্মিণীগণ একখানি বস্ত্রে নির্ম্মিত কুচবন্ধ ব্যতীত ব্লাউজ, বডিস্, সেমিজ প্রভৃতি ব্যবহার করিতে পারিত না (২)। কিন্তু চোল বা কূর্পাসকের অর্থাৎ কাঁচুলির প্রচলন অন্ততঃ চতুর্থ শতাব্দীতে কিছু কিছু ছিল ইহাতে সংশয় নাই; নতুবা 'অমর-কোষে' ইহার উল্লেখ থাকিত না ("চোলঃ কূর্পাসকঃ স্ত্রিয়াঃ")।

বাঙ্গালার পাল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল মোটামুটি হিসাবে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। পাল-রাজগণ প্রায় চারি শতাব্দী ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাঙ্গালার ভাস্কর-শিল্প চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এই শিল্পের অভিব্যক্তি প্রধানতঃ ঘটিয়াছিল দেব-দেবীর মূর্ত্তির মধ্য দিয়া। পাল-যুগের অসংখ্য হিন্দু ও বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্ত্তি বাঙ্গালার নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তবে একাদশ ও দ্বাদশ শতকের মূর্ত্তির তুলনায় নবম ও দশম শতাব্দীর মূর্ত্তি সংখ্যা অল্প। বিশেষতঃ দেবী-মূর্ত্তি ত খুবই কম। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রচুরসংখ্যক দেবী-মূর্ত্তিগুলি দেখিলে কিন্তু কাপড় পড়িবার রীতি সম্বন্ধে রাজশেখরের উক্তির সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কারণ পরিধের বস্ত্রেরই একাংশ দ্বারা তাহাদিগের বক্ষ আবৃত নয়। কিন্তু মূর্ত্তি দেখিয়া কাপড় পরিবার ধরণটা বুঝা কঠিন, বুঝান আরও কঠিন। কেহ কেহ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সফলকাম হইয়াছেন বলিয়া মনে করি না। মূর্ত্তির পশ্চাদ্দিকের প্রতি ভাস্কর সমভাবে মনোযোগী হইলে অবশ্য বুঝা সহজসাধ্য হইত। যাহাই হউক, ধরণটা এযুগের মত ফের দিয়া বা দো-ছুটি করিয়া পড়িবার মত নয়। আরও এক কথা, কাপড় নাভির তলে পরিহিত। এই বিশেষত্ব মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, রাজপুত প্রভৃতি মহিলাদিগের মধ্যে এখনও দেখা যায়। সেকালের বঙ্গরমণীগণ নাভির নীচে কাপড়খানি নীবিবন্ধ দ্বারা বাঁধিয়া রাখিত।

বক্ষে অনেক দেবী-মূর্ত্তিরই—বুদ্ধ, বিষ্ণু, সূর্য্য প্রভৃতি দেব-মূর্ত্তির ন্যায় উত্তরীয়। উত্তরীয়খানি দক্ষিণ কোমর হইতে উঠিয়া বাম স্কন্ধ আবৃত করে। নারীর উত্তরীয় পরিধানের একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত দ্বাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী ধোয়ীকবির 'পবন দূত' নামক দূত-কাব্যে আছে—"অসিতাম্বুত্তরীয়ঞ্চল ত্বং" (৩৫ শ্লোক)। কিন্তু নারীর উত্তরীয় বঙ্গদেশেই নয়, অন্যত্রও প্রচলিত ছিল। শিল্পে তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে। 'ভাগবত-পুরাণে'ও (১০।৫২) পাই, "গোপকামিনীগণ কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত স্ব স্ব উত্তরীয় বসন দ্বারা অন্তর্য্যামী ভগবানের (কৃষ্ণের) আসন রচনা করিয়া দিল।" 'অমর-কোষে' উত্তরীয়ের বিবিধ নাম—প্রাবার, উত্তরাসঙ্গ, বৃহতিকা, সংব্যান ও উত্তরীয়। উত্তরীয় ঊর্ণা নামেও চলে।

উত্তরীয় ব্যতীত আর দেখি কুচবন্ধ। ভাগবত পুরাণে ইহার একটি নাম পাই 'কুচ-পট্টিকা' (১০।৩৩)। যেন বুকে একটা চওড়া 'বেল্ট'।

পাল-যুগে বডিস্ (bodice) জাতীয় জামাও ক্বচিৎ ক্বচিৎ দেখি। জে, সি, ফ্রেঞ্চ সাহেব প্রণীত '*Art of the*

(২) Cf. *Element of Hindu Iconography*, T. A. Gopinath Rao, Vol. I, Part I, p. 23.

Pal Empire' নামক গ্রন্থের সপ্তম সংখ্যক চিত্রে বর্দ্ধমান জিলার বরাকরের এক মন্দিরের বহির্ভাগে রক্ষিত একটি বৌদ্ধ দেবীর যে ছবি আছে তাহাতে এই বডিস্ দৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় লিখিত '*Iconography of the Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum*' নামক গ্রন্থের ১৪ ও ২২ (ক) সংখ্যক চিত্রে যে পণ্ডিতসার-গ্রামের মারীচি-মূর্ত্তি ও খৈলকৈরের তারা মূর্ত্তির ছবি আছে তাহাতেও বডিস্ দেখা যায়।

পাল-যুগে অনাবৃত-বক্ষ দেবী মূর্ত্তিও নজরে পড়ে। অর্থাৎ না উত্তরীয়, না কুচবন্ধ, না বডিস্, না অন্য কিছু। কিন্তু অনাবৃত হইলেও বক্ষ অনলঙ্কৃত নয়।

'সদুক্তিকর্ণামৃত'—ধৃত রাজশেখরের আর একটি শ্লোকে (২।২০৫) বঙ্গ-বারাঙ্গনাদিগের বেশ-ভূষা ও প্রসাধনের কথা আছে—

"বাসঃ সূক্ষ্মং বপুষি ভুজয়োঃ কাঞ্চনী চাঙ্গদশ্রী
মালাগর্ভঃ সুরাভিমসৃণৈর্গন্ধতৈলৈঃ শিখণ্ডঃ
কর্ণোত্তংসে নবশশিকলানির্মলং তালপত্রং
বেশঃ কেষাং ন হরতি মনো বঙ্গ-বারাঙ্গনানাম্।"

বঙ্গদেশের (পূর্ব্ববঙ্গের) বারাঙ্গনাদিগের বেশ কাহাদের চিত্ত হরণ না করে?—(কিরূপ বেশ?) দেহে সূক্ষ্মবস্ত্র, দুই বাহু সুবর্ণ অঙ্গদ দ্বারা শ্রীশালী, মস্তক মাল্যবেষ্টিত ও সুগন্ধি মসৃণ তৈল দ্বারা সুরভিত, আর কর্ণে নবোদ্গত চন্দ্রকলার ন্যায় শুভ্র তালপত্র।

মস্লিনের দেশের বারাঙ্গনার দেহে সূক্ষ্মবস্ত্র কিছুই আশ্চর্য্য নয়। অঙ্গদ ভারতের পুরাতন অলঙ্কার। মস্তকে মাল্য কেবল বঙ্গ-বারাঙ্গনার নয়, বঙ্গ-বরাঙ্গনারও প্রসাধনের একটা মস্ত বিশেষত্ব—পরে দেখা যাইবে। 'তালপত্র' সম্পর্কে 'অমর-কোষে' পাই, "কর্ণিকা তালপত্রং স্যাৎ কুণ্ডলং কর্ণবেষ্টনং।" ১৩২১ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'সাহিত্যে' গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "অমরের মতে কর্ণের আভরণ সাধারণতঃ কুণ্ডল ও কর্ণিকা—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে "কর্ণিকা"র অপর নাম "তাল-পত্র"; ইহা কর্ণের উপরিভাগে ধার্য্য আভরণের নাম বলিয়া বোধ হয়। কারণ কুণ্ডলের ব্যবহার কর্ণের নিম্নভাগেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আচার্য্য হেমচন্দ্র যেন "তালপত্র" ও "আটঙ্ক"কে কুণ্ডল স্থানের আভরণ বলিয়াছেন এবং কর্ণের পৃষ্ঠভাগে ধারণীয় অলঙ্কারকে "উৎক্ষিপ্তিকা", "কর্ণান্দু" ও "বালীকা" এই তিন নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।"

রাজশেখর যখন কাণের কেবল একটি মাত্র অলঙ্কারের নাম করিয়াছেন তখন উহার ব্যবহার কাণের নিম্ন-ভাগে হওয়াই সম্ভব। কিন্তু দুই চারিটি এমন মূর্ত্তিও দেখিয়াছি যাহাদের কাণে একটি অলঙ্কার, অথচ সেটি উপরিভাগে।

নবম ও দশম শতাব্দীর দেব ও দেবীর মূর্ত্তিতে অলঙ্কার অপেক্ষাকৃত কম। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর মূর্ত্তিতে অলঙ্কারের তদপেক্ষা বাহুল্য দেখা যায়। পাল-যুগের দেবী-মূর্ত্তিগুলির কর্ণে অনেক ক্ষেত্রেই নিম্নভাগে বড় ও গোলাকার কুণ্ডল। শিল্পশাস্ত্রে পাঁচ প্রকার কুণ্ডলের নাম আছে, তন্মধ্যে রত্ন-খচিত গোলাকার কর্ণাভরণের নাম রত্নকুণ্ডল। কোনও কোনও মূর্ত্তিতে কর্ণের উপরিভাগে আর একটি অলঙ্কার। পরবর্ত্তী কালের বাঙ্গালা সাহিত্যে কর্ণে তিন প্রকার অলঙ্কারেরও উল্লেখ পাই, "উপর কর্ণে চাকি, নাম্বাকর্ণে বলি, তার মধ্যে শোভা করে হীরামঙ্গল কড়ি।"

পাল-যুগের মূর্ত্তিগুলির উপর হস্তের অলঙ্কার সাধারণতঃ কেয়ূর বা অঙ্গদ এবং নিম্নহস্তের অলঙ্কার বলয়শ্রেণী। গলায় ও বক্ষে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর মূর্ত্তিগুলির সাধারণতঃ তিন সেট্ হার। একটি প্রায় কণ্ঠলগ্ন, এই কণ্ঠাভরণের সংস্কৃত নাম 'গ্রৈবেয়ক'। কণ্ঠের কিঞ্চিৎ নিম্নে ধৃত হাঁসুলি জাতীয় অপর একটি অলঙ্কার—এটির ব্যবহার অতিশয় ব্যাপক। এই দুই ব্যতীত, বক্ষে প্রলম্বমান একটি হার। তবে এই হারের কোনও কোনও মূর্ত্তিতে অভাব।

নিতম্বে কাঞ্চী ও চরণে নূপুর প্রায় সকল মূর্ত্তিতেই দেখা যায়।

এই দুই শতাব্দীর নারীমূর্ত্তিতে একাধিক প্রকার চুলের খোঁপা দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে খোঁপাটি মাথার উপরে (আজকালকার মত পিছনে নয়) বদ্ধ। কোনও কোনও ক্ষেত্রে খোঁপাটি ডিম্বাকৃতি এবং স্কন্ধের

দিকে ঝুলান (৩)। এ ছাড়া আরও ভিন্ন প্রকারের আছে।

রামপালদেবের ২য় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত যে তারামূর্ত্তি বিহারের তেত্রাওন্ গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে (Indian Museum, No 3824) তাহাতে দশ পদাঙ্গুলিতে দশটি অঙ্গুরী দেখা যায়। অতএব পদাঙ্গুরী মুসলমান কর্ত্তৃক এদেশে আমদানী নয়।

আয়ুর্ব্বেদে মুখের লাবণ্যবর্দ্ধনকারী তৈল ঘৃত প্রভৃতির উল্লেখ আছে। বাঙ্গালী চক্রপাণি দত্তের (১০৬০ খৃঃ) 'চক্রদত্তে'ও আছে। যথা 'ক্ষুদ্ররোগ চিকিৎসা'য়—

"কুঙ্কুমাদ্যমিদং তৈলং চাভ্যঙ্গাৎ কাঞ্চনোপমম্
করোতি বদনম্ সদ্যঃ পুষ্টিলাবণ্যকান্তিদম্।"

এই কুঙ্কুমাদি তৈল অভ্যঙ্গ করিলে বদন কাঞ্চনোপম, সদ্যপুষ্টি, লাবণ্য ও কান্তিযুক্ত হইয়া থাকে।

"অনেনাভ্যাসলিপ্তং হি বলীপলিতনাশন-
নিষ্কলঙ্কেন্দুবিম্বাভং স্যাদ্বিলাসবতীমুখম্।"

এই (বর্ণক ঘৃত) দ্বারা নিয়ত মুখ লেপন করিলে বলী-পলিতবিহীন হইয়া নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র-বিম্বাভ বিলাসবতী মুখকান্তি পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

'স্থৌল্য-দৌর্গন্ধ চিকিৎসা'য় আছে—

"হরীতকী-লোধ্রমরিষ্টপত্রং চূতত্বচোদাড়িমবল্কলঞ্চ
এযোঽঙ্গরাগঃ কথিতোঽঙ্গনানাং জঙ্ঘাকষায়শ্চ নরাধিপানাম্।"

হরীতকী, লোধ, নিম্বপত্র, আম্রবল্কল ও দাড়িমবল্কল একত্র করিয়া পেষণ করিবে, ইহা অঙ্গনাদিগের শরীর ব্যঞ্জক এবং রাজন্যবর্গের ঘোটকাদি আরোহণ জনিত বিবর্ণ জঙ্ঘায় স্ববর্ণকারক।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে পাল-যুগে প্রসাধনে এই সকল ব্যবহৃত হইত, সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

বাঙ্গালায় পাল-বংশের অবসান ও সেন-বংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে এবং এই শতাব্দীর শেষে মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার সপ্তদশ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বাঙ্গালায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর বেশ-ভূষা ও প্রসাধনের ইতিহাস মিলে—শিল্প বাদে—তাম্রশাসন এবং জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে। এই শতাব্দীতেই বাঙ্গালায় সর্ব্বপ্রথম সধবাত্বের বা আয়তের চিহ্নস্বরূপ সিন্দূরের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাঙ্গালার শেষ পাল-নরপতি মদনপালের মনহলি গ্রামে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় গোপাল সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"প্রত্ত (ত্য) র্থি প্রমদাকদম্বকশিরঃ সিন্দূরলোপক্রম-
ক্রীড়াপাটলপাণিরেষ সুষুবে গোপালমূর্ব্বীভুজ।"

(কুমারপাল) হইতে নরপতি গোপাল জন্মগ্রহণ করেন। প্রত্যর্থিগণের রমণীসমূহের (শত্রুপ্রমদাগণের) শিরস্থিত সিন্দূর-লোপ ক্রমরূপ ক্রীড়া দ্বারা যাঁহার হস্ত পাটল হইয়াছিল।

দ্রষ্টব্য—শিরে সিন্দূর, ললাটে নয়। এই তাম্রশাসনেই মদনপালের অগ্রজ কুমারপালের সম্বন্ধে পাই—

"নেদিষ্ঠকীর্ত্তিশ্চনরেন্দ্রবধূকপোল-কর্পূরপত্রমকরীষু
কুমারপালঃ।"

কুমারপাল নরেন্দ্রবধগণের কপোলে কর্পূরপত্র ও মকরীর চিত্রণ বিষয়ে বিপুল কীর্ত্তিলাভ করিয়াছিলেন।

ভারতে নারীদিগের গণ্ডস্থলে নানারূপ চিত্রণ করার প্রথাটা বহু পুরাতন। 'রামায়ণে'র একস্থানে আছে, "শরৎকালে নদী চক্রবাক ও শৈবালে আকীর্ণ হইয়া পত্ররচনা ও গোরোচনায় অলঙ্কৃত বধূমুখের ন্যায় শোভিত হইতেছে" (কিষ্কিন্ধ্যা, ৩০)। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে'ও দেখি, নারীদিগের গণ্ডস্থলের ভূষণ—তিলক ও পত্রলেখা ("তিলকাঃ পত্রলেখাশ্চ ভবেদ্গণ্ডবিভূষণম্", ২১।২৪)। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে তিলক গাল ছাড়িয়া কপালে উঠিয়াছে,—'অমরকোষে' কপালে চিত্রবিচিত্রের নাম পাই তমালপত্র, তিলক, চিত্রক ও বিশেষক। অমর গালে চিত্রিত লেখার নাম দিয়াছেন পত্রলেখা ও পত্রাঙ্গুলি ("পত্রলেখা পত্রাঙ্গুলি-রিমে সমে"—মনুষ্যবর্গ)। গণ্ডস্থল-চিত্রণের এই পুরাতন প্রথাটাই দেখিতেছি মদনপালের তাম্রশাসনে। কিন্তু এই প্রথাটি বোধ হয় এই সময়ে বাঙ্গালায় ন্যূনাধিক লোক-প্রিয়

(৩) সরস্বতী মূর্ত্তি, *Iconography of the Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum*, Pl. LXIII; গঙ্গামূর্ত্তি, *Rupam*, April, 1921, Pl. facing p. 9; কৃষ্ণ-জননী মূর্ত্তি, 'বাঙ্গালার ইতিহাস', প্রথম ভাগ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্র ২৫; তারা মূর্ত্তি, ঐ, চিত্র ১৮, প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

হইয়া উঠিয়াছিল ; কারণ জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'ও পাই, "চিত্রং কুরুষ্ব কপলয়ো" (দ্বাদশ সর্গ) ; রাধা বলিতেছেন, "হে কৃষ্ণ, আমার গণ্ড চিত্রিত করিয়া দাও"।

বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তিতে একটি শ্লোকে কয়েকটি অলঙ্কারের নাম আছে—

"নেপথ্যং যস্ত জজ্ঞে সততমিয়দিদং রত্নপুষ্পাণি হারা-
স্তাড়কং নূপুরস্রক্কণকবলয়মপ্যস্ত ভৃত্যাঙ্গনানাম্।"

এই রাজার অধীন ভৃত্যগণের বনিতাগণ সর্ব্বদা সুবেশা সালঙ্কৃতা ছিল অর্থাৎ রত্নবিজড়িত পুষ্পহার (বা রত্নে নির্ম্মিত পুষ্পের হার) যাহাদিগের কণ্ঠে, সুবর্ণতাড় বাহুদ্বয়ে, নূপুরের মালা পদদ্বয়ে ও সুবর্ণ-বলয় প্রকোষ্ঠে শোভা পাইত।

বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেনের সীতাহাটি তাম্রশাসনে বিজয়সেনের শত্রুবনিতাগণের নয়নে কজ্জল দিবার কথা আছে, "নয়নজলমিলৎ কজ্জলৈ··"।

ধোয়ী-কবির 'পবনদূতে' একটি শ্লোকে (২৭ শ্লোকে) পাই—

"শ্রোত্রক্রীড়াভরণপদবীং ভূমিদেবাঙ্গনানাং
তালীপত্রং নবশশিকলা-কোমলং যত্র যাতি।"

যে স্থানে (সুহ্মদেশে বা দক্ষিণরাঢ়ে) নব চন্দ্রকলার ন্যায় কোমল তালীপত্র সকল ব্রাহ্মণ পত্নীগণের শ্রোত্রের ক্রীড়াভরণরূপে পরিণত হইয়াছে।

ধোয়ী যে 'উত্তরীয়ে'র উল্লেখ করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' নিম্নলিখিত অলঙ্কারগুলি পাই—শ্রবণ যুগলে কুণ্ডল ; একস্থানে তমালস্তবকশ্রেণী ("শ্রবণয়োতাপিঞ্জ গুচ্ছাবলীং")। বক্ষে মুক্তাহার। হস্তে মরকত-নিবেশিত বলয় অথবা বলয়াদি মণিভূষণ। জঘনে কাঞ্চী বা মেখলা। চরণে মণি-নূপুর।

ইহা ছাড়া পাই—নয়নে অঞ্জন। ললাটে মৃগমদে রচিত মনোহর তিলক ; একস্থানে শশাঙ্কবৎ তিলক। চিকুরে কুসুম ; একস্থানে চপলাসম শোভান্বিত রক্তঝিণ্টী-পুষ্প। তা ছাড়া কেশপাশে মাল্য ; একস্থানে নীলোৎপলমালা ('শ্যামসরোজদাম')। গণ্ড চন্দনে ও বক্ষ কস্তূরিকাপত্রে অঙ্কিত। পদপল্লবে যাবকাভরণ (আল্তা)।

পায়ে আল্তা দিবার রীতিও বহু পুরাতন। 'রামায়ণে'ও অলক্তকের উল্লেখ আছে। স্মরণ করুন, সীতার চরণদ্বয় বনে অলক্তকরাগশূন্য (অযোধ্যা, ৬০)।

'গীতগোবিন্দে'র চতুর্থ সর্গের শেষ শ্লোকে পাই, "তদর্পিতাধরতটীসিন্দূর মুদ্রাঙ্কিতো। বাহু।" কৃষ্ণের বাহু গোপনারী কর্ত্তৃক চুম্বিত হওয়ায় তাঁহাদের সিন্দূরে উহা অঙ্কিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সিন্দূর গোপনারীর সিঁথিতে কি ললাটে তাহা বুঝিতেছি না। 'বিষ্ণুপুরাণে' বা 'ভাগবতে' গোপীগণের সিন্দূর নাই।

'গীতগোবিন্দে' শাঁখার কোনও উল্লেখ নাই। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দী বা তাহার পূর্ব্বে শাঁখার ব্যবহার ছিল তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। শ্রীধরদাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' আচার্য্য গোপীকের একটি শ্লোক (১।৫৫।৫) উদ্ধৃত আছে—

"সঙ্কেতীকৃত কোকিলাদি নিনদং কংসদ্বিষঃ কুর্ব্বতো
দারোন্মোচনলোল-শঙ্খবলয়ক্কাণং মুহুঃ শৃণ্বতঃ।" ইত্যাদি।

কোকিলাদির নিনাদচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কেত করিলে (শ্রীরাধার) বারম্বার দ্বারোন্মোচনে চঞ্চল শঙ্খ ও বলয়ের শব্দ শ্রীকৃষ্ণের কর্ণগোচর হইতেছিল।

এই শ্লোকটি শ্রীরূপ গোস্বামীর 'পদ্যাবলী'তেও উদ্ধৃত আছে (২০৬ শ্লোক) ; কিন্তু রূপ ভুলক্রমে শ্লোকটি হরের (হর-কবির) রচনা মনে করিয়াছেন।

—জয়দেব রাধাকে কাঞ্চুলিও দেন নাই, উত্তরীয়ও দেন নাই। দিবার প্রয়োজনও বোধ করি ছিল না।

ইহার পরে প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য দেখি। সর্ব্বাগ্রে কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ' ও বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'। 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' হইতে রাধার বেশ ভূষা ও প্রসাধন পূর্ব্বে একবার দেখিয়াছি (বিচিত্রা, ১৩৪১, পৃঃ ১৫৬-১৫৭), পুনরায় দেখি ও তুলনা করি।

চণ্ডীদাসের রাধিকার গলায় অধিকাংশ স্থলেই 'সাতেসরী (সপ্তকণ্ঠী) হার' ('শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন', প্রথম সং, পৃঃ ২৮, ৩৮, ৭৩, ৮৮ ইত্যাদি), কোথাও কোথাও 'গজমুতী হার' (পৃঃ ৯০, ৩৮১) ; একস্থানে 'গুণিজা' (সুত-হার), (পৃঃ ১৩৪) ও অপর আর একস্থানে 'উল পুষ্পের হার' (পৃঃ ৩৪১)। কৃত্তিবাসের সীতার গলায় 'হার ঝিলিমিলি'

(আদি), 'মণিময় মালা' (অযোধ্যা), 'বিচিত্র হার মকরত সঙ্গে' (লঙ্কা)।

রাধিকার কর্ণে কুণ্ডল, একস্থানে 'হিরাধর (হীরক-খচিত) কড়ী' (পৃঃ ১১২)। সীতারও কর্ণে 'কুণ্ডল' (লঙ্কা), 'মকর কুণ্ডল' (মকরের স্থায় মুখওয়ালা কুণ্ডল) (অযোধ্যা) এবং 'সুবর্ণের কর্ণফুল' (আদি)।

রাধিকার হস্তের অলঙ্কার যথা :—'আঙ্গদ ভুজ যুগলে' (পৃঃ ৩৮১), 'কেয়ুর' (পৃঃ ১৩৭), 'বাহুর বলয়া' (পৃঃ ৬২, ৮৮, ১১২, ১১৫, ১৬৩, ৩৯২); রতনে জড়িত দুই বাহু শঙ্খ' (পৃঃ ২৮৭); 'হাতের বাহুঠী' (পৃঃ ১৩৪, ১৪৪); 'কনক কঙ্কণ' (পৃঃ ২৩৪) অথবা 'রতন কঙ্কণ' (পৃঃ ৩৮১)। একস্থলে "বাহুতে কনক চুড়ী, মুকুতা রতনে জড়ী, রতন কঙ্কণ করমূলে" (পৃঃ ৩৮১)। এই 'বাহু'কে করমূল বা মণিবন্ধের (wrist) উপরিভাগ না বুঝিলে 'বাহুর বলয়া' 'বাহুর চুড়ী', 'দুই বাহু শঙ্খ' প্রভৃতির অর্থ হয় না। কৃত্তিবাসের 'বাহু'ও তাহাই। তাঁহার সীতার "দুই বাহু শঙ্খেতে শোভিত বিলক্ষণ। শঙ্খের উপরে সাজে সোনার কঙ্কণ" (আদি)। শঙ্খ ও কঙ্কণ ব্যতীত সীতার "উপর হস্তের তাড় (অনন্ত, তাবিজ) স্বর্ণময়"। অন্যত্র সীতা 'কেয়ুর' (অঙ্গদ) পরিয়াছেন।

রাধিকার হস্তাঙ্গুলিতে 'অঙ্গুঠী' (পৃঃ ১৩৪) নামান্তর 'মুদড়ী' (পৃঃ ২৭৯)। সীতারও 'হীরার অঙ্গুরিতে শোভিত অঙ্গুলি' (অযোধ্যা)। রাধিকার 'কটিতে কিঙ্কিণী' (পৃঃ ১৩৪, ২৯২, ৩০১); কিন্তু কৃত্তিবাস সীতাকে 'কিঙ্কিণী' দিতে ভুলিয়াছেন। রাধিকার চরণে 'কনক মল্লতোর' (পৃঃ ৩৮১) ও নূপুর (পৃঃ ৬২, ৬৯, ১৩৪ ইত্যাদি) এবং পদাঙ্গুলিতে 'পাসলী' (পৃঃ ১৩৪, ৩৮১)। সীতারও 'তোড়ল', 'নূপুর' ও 'বিচিত্র পাসুলি' আছে।

কৃত্তিবাস উপরন্তু সীতার 'নাকেতে বেসর' (আদি) দিয়াছেন। বড়ু-চণ্ডীদাস অথবা জয়দেব নায়িকার নাকে অলঙ্কার দেন নাই। কৃত্তিবাসের পূর্ব্বে শিল্পে বা সাহিত্যে বাঙ্গালী রমণীর নাসিকার অলঙ্কার দেখি নাই। কিন্তু নাসিকার অলঙ্কার খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ইরাণ দেশ হইতে মুসলমানেরা এদেশে আমদানী করিয়াছিল এই মতবাদ ভুল। প্রাক্-মুসলমান যুগেও অর্থাৎ দ্বাদশ খৃষ্টাব্দীতে বা তাহারও পূর্ব্বে ভারতে নাসিকার অলঙ্কার ছিল তাহা অন্যত্র দেখাইয়াছি।

রাধিকার পরিধের বসন হয় নেতের (ময়ূরকণ্ঠী বা ঐ জাতীয় রঙ্গের একপ্রকার রেশমী কাপড়), না হয় পাটের। কৃত্তিবাস সীতার 'সকল শরীরে পাটের পাছুয়া' (আদি) দিয়াছেন ও 'নেতের বসন' দিয়া স্নানান্তে কেশের বারি মুছাইয়াছেন (লঙ্কা)।

জয়দেব রাধিকাকে কাঁচুলিও দেন নাই, উড়্নীও দেন নাই। বড়ু-চণ্ডীদাস উভয়ই দিয়াছেন। কৃত্তিবাস সীতাকে 'সোনার কাঁচলি' (আদি) দিয়াছেন, উত্তরীয় দেন নাই। কৃত্তিবাসের পরে দ্বিজ বংশীবদনের 'মনসা-মঙ্গল' ব্যতীত উড়্নীর সন্ধান প্রায় মিলে না। বড়ু-চণ্ডীদাসের রাধিকার 'কাঞ্চুলী' একস্থানে 'বিচিত্র' বটে, কিন্তু 'পূর্ণরাস' বা শৃঙ্গাররসাত্মক চিত্রাবলী দ্বারা অঙ্কিত কাঁচুলি বড়ু-চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস উভয়েরই অজ্ঞাত।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' রাধিকার প্রসাধনে সর্ব্বত্রই 'শিসতে (সিঁথিতে) সিন্দূর', কেবল একস্থানে ললাটে, "সিন্দূর সুর ললাটে।" নতুবা ললাটে (কুঙ্কুম-চন্দনাদি দ্বারা রচিত) তিলক। বড়ু-চণ্ডীদাসের যুগে ও তৎপূর্ব্বে ললাটে সিন্দূর অপেক্ষা সিঁথিতে সিন্দূরের প্রচলনটাই বেশী ছিল ইহাতে সংশয় নাই। কৃত্তিবাস কিন্তু সীতার কপালেই তিলক ও সিন্দূর দিয়াছেন, "কপালে তিলক তার নির্ম্মল সিন্দূর। বালসূর্য্য সম দেখিতে প্রচুর" (আদি)। অন্যত্র পাই, "অঙ্গরাগে সিন্দূর দিলেক ভালে রঙ্গে····· চন্দন তিলক শোভে কপালের আগে।" ইহা হইতে বুঝিতেছি কপালের আগে অর্থাৎ কূর্চ্চে বা দুই ভ্রূর মধ্যভাগে চন্দনের তিলক এবং তাহার উপরে ললাটে সিন্দূর।

বড়ু-চণ্ডীদাসের রাধিকার নয়নে কাজল, কৃত্তিবাসের সীতারও তাই। রাধিকার মুখে একপ্রকার মুখ রঞ্জন, "কর্পূর কস্তুরী যোগে আঅর তাম্বুল রাগে, গন্ধরাংগে রচিল বদনে" (পৃঃ ৩৮১); কিন্তু কৃত্তিবাস সীতার জন্য এত-শত যোগাইবার সুযোগ পান নাই। এমন কি সীতার খোঁপায় পর্য্যন্ত একটা ফুলের মালা দিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে রাধিকার খোঁপায় মালা নানা ফুলের, বউল (বকুল), দোলজ, খদির, লজ, মালতী, গুলাল, চাঁপা, কানড় ইত্যাদি। তবে সীতা তাঁহার অগ্নি-পরীক্ষার পূর্ব্বে যথারা

কবরী বাঁধিয়াছিলেন, তাহা 'রত্নেতে জড়িত' এবং "নানা চিত্র লেখা তাহে আছে সারি সারি" (লঙ্কা)। ইহা ছাড়া সীতার সখীগণ আমলকী ও পিঠালি-রূপ সাবান দ্বারা তাঁহার অঙ্গের ময়লা তুলিয়াছিল। কৃত্তিবাস বা বড়ু-চণ্ডীদাস কেহই সীতা বা রাধিকার পায়ে অলক্তক দেন নাই।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণে' মনসা-দেবীর ও বেহুলার বেশ-ভূষা ও প্রসাধন এইরূপ—কাণে কর্ণফুল, সুবর্ণের চাকি বা সোনার মদন-কড়ি; নাসায় বেশর; গলায় হার; দুই হাতে তাড়, শঙ্খ ও শঙ্খের সম্মুখে কঙ্কণ; পায়ে নূপুর, খাড়ু ও পাশলি; গায়ে চন্দন বা কস্তূরী-কুঙ্কুম; কপালে তিলক, চোখে কাজল (শরৎকুমার সেনগুপ্তের সংস্করণ, পঞ্চম সং, পৃঃ ২৭-২৮, ৯৮-৯৯ এবং ২০৫)। পায়ের খাড়ু বিজয়গুপ্তের 'মনসা-মঙ্গলে' নূতন পাওয়া গেল। পরে ইহার দৃষ্টান্ত বহু।

আর এক কথা, মনসা-দেবী গোয়ালিনী বেশে "কাছিয়া কাপড় পিন্ধে।" ষোড়শ শতাব্দীতে (ভারতবর্ষ, ১৩৪১, মাঘ পৃঃ ১৭৭-১৮৫) অদ্ভুতাচার্য্য নিত্যানন্দের 'রামায়ণে' কবি সীতাকে কোঁচা দিয়া কাপড় পরাইয়াছেন। ইহারও পরে যদুনন্দন দাসের বঙ্গানুবাদ 'গোবিন্দলীলামৃতে' দেখি, রাধিকার "আশ্চর্য্য কোঁচার শোভা নাহিক উপমা। সে শোভা দেখিয়া লাজ পায় কত রামা"। খুঁজিলে হয়ত বঙ্গনারীর কাছা-কোঁচা দিয়া কাপড় পরার দৃষ্টান্ত আরও মিলিতে পারে।

বিজয়গুপ্তের বর্ণিত কাঁচলিও দেখা প্রয়োজন—

কাঁচলি গড়ে বিশ্বকর্ম্মা হেট করিয়া মাথা
আদি অনাদি লিখে স্বর্গের দেবতা।
ব্রহ্মা বিষ্ণু লিখে আর উমা মহেশ্বর
কুবের বরুণ লিখে চন্দ্র দিবাকর।
বরাহী চামুণ্ডা লিখে দেবী ভগবতী
রামলক্ষ্মণ সীতা লিখে দেবী পদ্মাবতী।
ইন্দ্র যম অগ্নি লিখে আর মহীধর
লক্ষ্মী সরস্বতী লিখে পর্ব্বত সাগর।
নানা পুষ্প লিখে চম্পা নাগেশ্বর
যূথী মল্লিকা লিখে মালতী টগর।
বেহুলার কাঁচলির কি কহিব কথা
নানাবিধ প্রকারে লিখে গন্ধর্ব্ব দেবতা
কোনখানে নেতবস্ত্র কোনখানে সাদা
কাঁচলি গড়ি বিশ্বকর্ম্মা তাহে দিল সদা॥"

ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিরাট বঙ্গ-সাহিত্যে (৪) বঙ্গ-রমণীর সাধারণতঃ নিম্নলিখিত অলঙ্কার দেখা যায়। কবিকঙ্কণ 'চণ্ডীমঙ্গলে' খুল্লনার ললাটে 'সিঁথী' দিয়াছেন। দ্বিজ বংশীবদনের 'মনসা-মঙ্গলে' দেখি উষা-বিদ্যাধরীর কপালে 'উজ্জ্বল ঝুড়ি মুক্তাবলী'। কবিকঙ্কণ গলায় 'পদক', বংশীবদন 'গ্রীবাপত্র' ও মাধবাচার্য্য 'চণ্ডী-মঙ্গলে' 'সোনার কাটী' দিয়াছেন। কাণের অলঙ্কার 'কুণ্ডল' এই যুগেও লোপ পায় নি; 'কর্ণফুল', 'কর্ণপুর' প্রভৃতি ত আছেই। কবিকঙ্কণ-'চণ্ডী'তে দেবী ভগবতী ও লহনার কর্ণে 'হেম মুকুলিকা' আছে। শঙ্করদাসের 'ভাগবতে' 'কর্ণে কনকপাতা'। রূপরামের 'ধর্ম্মমঙ্গলে' সর্পাকৃতি কর্ণালঙ্কারের উল্লেখ আছে, "টল টল করে কাণ সাপের যুগল"। এতদ্ব্যতীত দ্বিজ বংশীবদনের 'মনসা-মঙ্গলে' কাণের উপরে ও নীচে দুই অলঙ্কার, "মণিময় কর্ণফুলী তদুপরে চক্রাবলী"। অন্যত্র "মাণিক্যের কর্ণফুল শোভে গণ্ডস্থলী, তার উপরে চন্দ্রাবলী ঝলকে উজ্জ্বল।" উপর কাণের 'চন্দ্রাবলী' ও 'চক্রাবলী' অবশ্যই এক পদার্থ। জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসামঙ্গলে' কাণে তিন অলঙ্কার—"উপর কর্ণে চাকি পরে নাম্বা কর্ণে বালি, তাহার মধ্যে শোভা করে হীরামঙ্গল কড়ি"। এই চাকি ও উপরোক্ত চক্রাবলী বা চন্দ্রাবলীও যে অভিন্ন তাহাতে সন্দেহ নাই এবং ইহা উপর-কাণের অলঙ্কার। শুধু কড়ির ব্যবহারের দৃষ্টান্তও বিরল নয়। কবিকঙ্কণ-'চণ্ডী'র 'কড়ি-মাছি' সম্ভবতঃ কাণের অলঙ্কার। নাকে সাধারণতঃ 'বেশর', 'মুকুতা সহিত বেশর', 'পুরট-পাথর দিয়া বেশর'। রূপরামের 'ধর্ম্মমঙ্গলে' নাকে 'নাকচনা'। শঙ্করদাসের 'ভাগবতে' নাসিকায় 'নাকস্বানা'। সম্ভবতঃ 'নাকচানা' 'নাকস্বানা'র অপভ্রংশ। বক্ষে হার, হারের নাম 'শতেশ্বরী', 'শতস্বর',

(৪) এই অংশ লিখিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত রায় ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন বাহাদুরের 'বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়' হইতে প্রচুর সাহায্য পাইয়াছি।

'সরস্বতী' ইত্যাদি। গজমুক্তা বা গজমতি হারও কয়েকস্থলে দেখি, বিশেষতঃ (দ্বিজ) চণ্ডীদাসের পদে। মাণিক গাঙ্গুলী 'ধর্ম্মমঙ্গলে' 'গলায় চন্দ্রহার' (পৃঃ ৯৬, ১৭৬) ও "তার কোলে পদক" দিয়াছেন। দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী'তে গলায় চন্দ্রহার দিয়াছেন। চন্দ্রহার তাহা হইলে কোমর ও গলা উভয়েরই অলঙ্কারের নাম। হাতে অঙ্গদ বা কেয়ূর, তাড়, বাজুবন্ধ বা বাজুমল, জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসা মঙ্গলে' ঝাম্পানি (ঝাঁপা), বাহুটী, চুড়ি, কঙ্কণ, বালা, শঙ্খ ইত্যাদি। রূপরামের 'ধর্ম্মমঙ্গলে' হাতে 'রাঙ্গা রুলী' ও দেখি। হস্তাঙ্গুলিতে অঙ্গুরী। 'কটিতে কিঙ্কিণী' অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বিরল নয়। মাণিক গাঙ্গুলী কাঁকালিতে 'কনকপাতি' দিয়াছেন। চরণে খাড়ু, মকর-খাড়ু। কোথাও কোথাও 'ঘুঙ্গুর সহিত মকর খাড়ু'। দুই এক স্থানে পাতা-মল। খাড়ুর নীচে নূপুর। খাড়ুর অভাবেও নূপুর বাদ যায় না। নূপুরহীন চরণ বিরল। পায়ের আঙ্গুলে পাশুলি ও অঙ্গুরী। দ্বিজ বংশীবদন 'উঙ্কট' (চুট্‌কি) দিয়াছেন।

কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গলে' খুল্লনার বামহাতে 'লোহা আয়াত'। কিন্তু বাঙ্গালার আয়ত বা এওতের এই লক্ষণটির এই যুগেই সম্ভবতঃ সূত্রপাত হইলেও সাহিত্যে ইহার ব্যবহার আর বড় বেশী নজরে পড়ে না। অপর দুই লক্ষণ, শাঁখা ও সিন্দুর এই যুগে কিরূপ, তাহা দেখা প্রয়োজন। এই দুইটি সধবার অবশ্য ব্যবহার্য্য। শঙ্খ ও সিন্দুর-হীনা সধবা এই যুগে দেখি না। শঙ্খ একাধিক প্রকারের ও নামের। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে 'কুলুপিয়া শঙ্খ' ও 'শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ'। মাধবাচার্য্যের 'চণ্ডীকাব্যে' 'সরস লাবণ্যশঙ্খ'। দ্বিজ বংশীবদনের 'মনসা মঙ্গলে' 'লক্ষ্মীবিলাস শঙ্খ'। জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসামঙ্গলে', রামবিনোদের 'মনসামঙ্গলে', মাণিক গাঙ্গুলীর 'ধর্ম্মমঙ্গলে' ও আরও কোথাও কোথাও 'শঙ্খ শ্রীরামলক্ষ্মণ'। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'শ্রীরামলক্ষ্মণ শঙ্খের' একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন—কুলুপা শঙ্খ অনেক দিন আগে বাঙ্গালায় চলিত। এটি নাচি-করা শাঁখা। সাধারণতঃ দু-সেট হইত। এক সেট হলুদে, এক সেট সবুজ। হলুদে সেটকে লক্ষ্মণ বলিত, সবুজ সেটের নাম রাম। রামেশ্বরী সত্যনারায়ণে আছে—"কুলুপা দু-বাই শঙ্খ শ্রীরামলক্ষ্মণ"। বাই মানে সেট। (প্রবাসী, ১৩৪১, কার্ত্তিক, পৃঃ ১০৩)। মাণিক গাঙ্গুলীর 'ধর্ম্মমঙ্গলে' যে আছে, "কুহু পাদৈ বহৈ শংখ শ্রীরামলক্ষ্মণ"—এই 'বহৈ' ও তাহা হইলে সম্ভবতঃ সেট (বাই)। কিন্তু 'কুহু পাদু' কি জানি না। কখনও কখনও শঙ্খ শুধু এক হাতেই ব্যবহৃত হইত। ভবানীশঙ্কর দাসের 'চণ্ডীকাব্যে' "এক করে শঙ্খ ধরে, কঙ্কণ শোভে আর করে"। 'শঙ্খ' আবার সর্ব্বত্র শাঁখের নয়, 'গজদন্ত শঙ্খ' ও দেখা যায়।

অধুনা সধবার ললাটে শুধু সিন্দুরে—তাহাও অতি সূক্ষ্ম ফোঁটা। কিন্তু আলোচ্য যুগে সিন্দুরের ফোঁটা আয়তনে প্রশস্ত এবং তাহার চারিদিকে চন্দনের মোটা টানা রেখা অথবা বিন্দু। অর্থাৎ পূর্ব্বতন যুগের নীচে তিলক ও উপরে সিন্দুরের একত্র সমাবেশ বা বিন্যাস। বলা বাহুল্য, এই সমাবেশ কপালের মধ্যস্থলে। চন্দনের রেখাকে চন্দ্রের ও সিন্দুরকে বালারুণের দ্যোতক মনে করা হইত। অর্থাৎ সধবার ললাটে চন্দ্র ও সূর্য্যের একত্র অবস্থান। কখনও কখনও সিন্দুরের চারিদিকে চন্দনের টানা রেখা ও সেই রেখার চারিধারে আবার চন্দনের ছোট ছোট বিন্দু অর্থাৎ সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকা তিনই। "কপালে সিন্দুর পরে তপন উদয়। চন্দন চন্দ্রিমা তার কাছে কাছে রয়। চন্দ্রলোকে শোভা যেন করে তারাগণ। ঈষৎ করিয়া দিল বিন্দু বিচক্ষণ" (রূপরামের 'ধর্ম্মমঙ্গল')। কবিচন্দ্রের 'ভাগবতে'—"কপালে সিন্দুর বিন্দু চন্দনের রেখা। জলধর কোলে যেন চাঁদ দিল দেখা।" এই চন্দন বোধ হয় অগুরু মিশ্রিত (কৃষ্ণবর্ণ) চন্দন, নচেৎ অর্থ সঙ্গতি হয় না। মাণিক গাঙ্গুলীর 'ধর্ম্মমঙ্গলে'—"সুভাসে সিন্দুর ফোঁটা সুরঙ্গ শোভন। ঈষৎ কালীর বিন্দু কিবা তার কোলে"।

কৃত্তিবাস সীতাকে বিবাহের পূর্ব্বেই সিন্দুর দিয়াছেন, "যেন শশী রবি ছটা, ললাটে সিন্দুর ফোঁটা"। কবিচন্দ্রের 'ভাগবতে' ও রুক্মিণীহরণের পূর্ব্বেই রুক্মিণীর "কপালে সিন্দুর বিন্দু চন্দনের রেখা।" চন্দনদাস মণ্ডলের 'মহাভারতে' প্রমীলার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধকালে (তাহাদের বিবাহের পূর্ব্বে) প্রমীলার "কপালে সিন্দুর পরি, চন্দনের বিন্দু সারি, মন্দ মন্দ পড়ে তার ঘাম"। দ্বিজ ভবানীর 'রামায়ণে' সীতার (বিবাহের পূর্ব্বে) স্বয়ম্বর সভায় যাত্রাকালে "কপালে সিন্দুর ফোঁটা দেখিতে সুন্দর"। বনমালীদাসের

'জয়দেব চরিতে' পদ্মাবতীর বিবাহের পূর্ব্বেই "সিঁথায় সিন্দূর দেখিতে সুন্দর চন্দনের বিন্দু পাশে।" এইরূপ উদাহরণ আরও পাই। কবিকঙ্কণ খুল্লনাকে বিবাহের পূর্ব্বে শুধু সিন্দূরই দেন নাই, 'করে শঙ্খ'ও দিয়াছেন। মাণিক গাঙ্গুলী 'ধর্ম্মমঙ্গলে' সুরিক্ষা নাম্নী বেশ্যাকে সিন্দূর ও শ্রীরাম-লক্ষ্মণ শঙ্খ উভয়ই দিয়াছেন এবং নয়নী নাম্নী দ্বিচারিণীকে ও হীরা নাম্নী নটীকে সিন্দূর দিয়াছেন। অতএব বলিতে পারি, আলোচ্য যুগে শঙ্খ ও সিন্দূর কেবলমাত্র সধবা কুলবধূদিগেরই একচেটে ছিল না। অবিবাহিতা কন্যার কপালে সিন্দূর (অথবা কুঙ্কুম) এখনও পশ্চিমবঙ্গে কোথাও কোথাও চলে।

কপালে সিন্দূর ছাড়া এ যুগের নারী প্রসাধনের একটা বিশেষ অঙ্গ ছিল নয়নে কাজল। আর এক অঙ্গ ছিল পায়ে আল্‌তা (আলক্তক, যাবক)। কাজল এখন উঠিয়া গিয়াছে বয়ঃপ্রাপ্তাদিগের মধ্যে, কিন্তু আল্‌তা আছে।

'কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে' পাওয়া গিয়াছে, "গন্ধরাংগে রচিল বদন"। ঘনরামের 'ধর্ম্মমঙ্গলে' পাই, "মুখে মাখে তৈল পড়া।" কতকটা আধুনিক 'ক্রীমের' মত—মুখকে স্নেহময় করিয়া রাখার প্রয়াস আর কি। কিন্তু ইহার ব্যবহার খুব কমই দেখা যায়।

প্রসাধনে দন্তও বাদ যাইত না। বনমালীদাসের 'জয়দেব-চরিতে' আছে, "দন্ত দুই পাটি জিনি যেন গজমতি। মধ্যে মধ্যে নীলরত্ন যেন দিল গাঁথি।" গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলেন, 'চতুঃষষ্ঠীকলার মধ্যে দন্তচিত্র কার্য্যও একটি। পূর্ব্বকালে অনেক রমণী এই চিত্রবিদ্যা জানিতেন এবং তাঁহারা আপন মনোমত বর্ণে দন্ত চিত্রিত করিতেন। এস্থলে দন্তের মধ্যভাগ শুক্লবর্ণ এবং উভয়পার্শ্ব নীলবর্ণে রঞ্জিত থাকায় মুক্তা ও নীলরত্নের সহিত সাদৃশ্যটি অনুরূপই হইয়াছে।"

আলোচ্য যুগে কপোলে পত্রাবলী রচনার উল্লেখ পাই না।

এইবার কেশের সংস্কার ও প্রসাধন দেখি। বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালার মেয়েদের স্বাস্থ্যের অবনতির সঙ্গে কেশের বাহারও অনেকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেশের প্রসাধন ও সংস্কারে তেমন অনুরাগও নাই, বৈচিত্র্যও নাই, পটুতাও নাই। কিন্তু আলোচ্য যুগে এমন নয়। যদুনন্দন দাসের বঙ্গানুবাদ গোবিন্দ-লীলামৃত (দ্বিতীয় সর্গ) হইতে রাধিকার কেশ-প্রসাধন বর্ণনা পড়ুন—

"সুগন্ধনলিনী নাম নাপিতের কন্যা।
মর্দ্দনোদ্বর্ত্তনে কেশ সংস্কারে ধন্যা॥
নারায়ণ তৈল অঙ্গে মর্দ্দন করিল।
শীতল উজ্জ্বল অঙ্গে উদ্বর্ত্তন দিল॥
সুগন্ধি ধাত্রির কল্কে (আমলকীর কাথ)
কেশের সংস্কার।
প্রক্ষালন করিতে পুন দিল জলধার॥
সূক্ষ্মবাস দিয়া জল ঘুচাইল তার।
এরূপে উজ্জ্বল কৈল কেশের সংস্কার॥"

—ইহার পরে রাধিকার স্নানান্তে—

"স্বস্তিদাক্ষ মহারত্ন কাঁকই লইয়া।
ললিতা করএ বেশ কেশ বনাইঞা॥
ধূপ ধূনা দিয়া সেই কেশ শুখাইল।
স্নিগ্ধ কুঞ্চিত কেশ সুগন্ধি করিল॥
সহজে সুগন্ধ কেশ অন্তরের গন্ধ।
তাহাতে লেপিল আর অনেক সুগন্ধ॥
শঙ্খচূড় মণি দিল বানাইয়া বেণী।
কালসর্প ফণী যেন সোহে দিব্যমণি॥
বকুল ফুলের মাল মুকুতার মালা।
তাতে দিল যেন ভেল ত্রিবেণীর মেলা॥
সমুষ্টি করিয়া বান্ধে স্বর্ণসূত্র দিয়া।
মূলে বন্ধ কৈল পট্ট জাদেত বেড়িয়া॥"

বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলেও পাই, "ধূপের ধোঁয়া দিয়া বাসিত (সুবাসিত) করে কেশ"। নারায়ণ তৈল গায়ে দেওয়ার কথা কবিকঙ্কণ-'চণ্ডী'তেও আছে। কিন্তু কেতকা দাসের 'মনসামঙ্গলে', "নারায়ণ তৈল দিল তাহার সিঁথায়"। নারায়ণ তৈল তাহা হইলে শরীরে ও মস্তকে উভয় স্থানেই দেওয়া চলিত। কৃত্তিবাসী-'রামায়ণে' আবার পাই, "নারায়ণ তৈলে জ্বলে তিন লক্ষ বাতি"। মনে হয় এই তৈল আমলকী হইতে প্রস্তুত বইত। লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মহাভারতে' আছে, "আমলকী তৈল অঙ্গে হরিদ্রা মাথায়। খসাএ অঙ্গের মলা ...."। আর এক তৈল—বিষ্ণু তৈল। নারায়ণ তৈল ও বিষ্ণু তৈল এক নয়। কারণ

জগজ্জীবন ঘোষাল দুই তৈল পাশাপাশি উল্লেখ করিয়াছেন, "নারাণ তৈল বিষ্ণু তৈল কেশের গোড়ে দিয়া। খোপাখানি বান্ধে রামা চারি দ্বার থুয়া।" শঙ্করদাসের 'ভাগবতে' "রাধিকা স্নান করে বিষ্ণু তৈল অঙ্গেত মাখিয়া"। বিষ্ণু তৈল পুরুষেও ব্যবহার করিত। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' "বিষ্ণু তৈল হরিদ্রামলকী উদ্বর্ত্তনে, গৌরাঙ্গ করিল স্নান নিজ গৃহাঙ্গনে।"

খোঁপা নানা ছান্দে বাঁধা হইত। ভবানীশঙ্কর দাসের 'চণ্ডীকাব্যে', "কুন্তল করিল বদ্ধ উর্দ্ধ করি খোপা"। দ্বিজ বংশীবদনের 'মনসামঙ্গলে' "মাথায় ঢালুয়া খোপা—ধরিছে পেখম।" চন্দনদাস মণ্ডলের 'মহাভারতে' "মার্জ্জনা করিয়া কেশে লোটন বান্ধিল পাশে"। লোটন, স্কন্ধের দিকে ঝুলান নিম্নমুখ খোঁপার নাম। কবিকঙ্কণ-'চণ্ডী'তে "কবরী বাঁধিল রামা নাম গুয়ামুটী। দর্পণে নিহালি দেখে যেন গুয়াগুটি।" অর্থাৎ সুপারির আকারের ন্যায় খোঁপা গুয়ামুটি। গোবিন্দদাসের একটি পদে "ধনী কানড়া ছাঁদে বাধে কবরী।" বড়ু-চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে'ও কানড়ী খোঁপা আছে (পৃঃ ৮৮) এবং উহার সম্পাদক মহাশয় ইহার ব্যাখ্যা দিয়াছেন, "কানড় পুষ্পাকৃতি খোঁপা অথবা কানড় সাপ যে প্রকার কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকে সেইরূপ ভাবে বদ্ধ কবরী।" শ্রীযুক্ত যোগেশবাবু অনুমান করেন, "কর্ণাট দেশীয় রীতিতে বিন্যস্ত কেশ…।"

খোঁপা হইলেই পুষ্পহার চাই। ফুলের মালা বেড়িয়া নাই এইরূপ খোঁপা বোধ করি এ যুগের কবিগণের কল্পনার অতীত ছিল। অনেক স্থলেই মালাটা মালতীর মালা। অন্যান্য ফুলও আছে।

জগজ্জীবন ঘোষাল খোঁপার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন—

"সুবর্ণ চিরণি লইল হস্তেত করিয়া।
একে একে কেশ সব লইল উভারিয়া॥
নারাণ তৈল বিষ্ণু তৈল কেশের গোড়ে দিয়া।
খোঁপাখানি বান্ধে রামা চারি দ্বার থুয়া॥
পূর্ব্বদ্বারে শোভা করে সুবর্ণ কেতকী।
দক্ষিণ দ্বারে শোভা করে যুথি মালতী।
খোঁপার উপরে পড়ে খোঁপার মধু খায়॥" ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত রায় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর মহাশয় "খোঁপাখানি বান্ধে রামা চারি দ্বার থুয়া" এই বর্ণনার অর্থ করিয়াছেন, "চারিটি সিঁথিতে কেশদাম বিভক্ত করিয়া।" ইহা পড়িলেই প্রাচীনকালের হুয়েন্ সাঙ্গের একটি কথা স্মরণ হয়, "তাহারা (ভারতীয় রমণীগণ) মস্তকোপরি কেশের কিয়দংশ দ্বারা কবরী বন্ধন করে, তদ্ভিন্ন অবশিষ্ট কেশরাশি বিস্তীর্ণ থাকে।" (রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয়ের অনুবাদ)। আরও স্মরণ হয় ঋগ্বেদের একটি ঋক্—যাহা হইতে বুঝা যায় যুবতীগণ প্রসাধন সময়ে মস্তকে চারিটি বেণী ধারণ করিত (১০।১১৪।৩)।

আলোচ্য যুগে পরিধেয় বসন সম্বন্ধে কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে পাই, "দোছুটী করিয়া পরে বার হাত শাড়ী"। বার হাত শাড়ী কিছুকাল পূর্ব্বে দশ হাতে নামিয়া গিয়াছিল, এখন পুনরায় অনেক স্থলে এগার হাতে উঠিয়াছে। কবিকঙ্কণের পুরা শ্লোকটি, "অবধানে খসয়ে দৃঢ়বন্ধন দড়ি। দোছুটী করিয়া পরে বার হাত শাড়ী"। অন্যত্র "অবধানে আলুয়ায় বন্ধনের দড়ি। দোছুটী করিয়া পরে তসরের শাড়ী"। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে দড়ি দিয়া কোমরে কাপড় বন্ধন করিয়া রাখা হইত। দ্বিজ বংশীবদন বলেন, "নাভির উপরে পরে নীবিবন্ধখানি"। নীবিবন্ধ এবং দড়ির উদ্দেশ্য একই। কিন্তু বুঝিতেছি নাভির নীচে কাপড় পরিবার প্রথা চলিয়া গিয়াছে অথবা যাই-যাই করিতেছে। সময়ে সময়ে দুইখানি বস্ত্র ব্যবহার করিতেও দেখি। যথা, যদুনন্দন দাসের 'গোবিন্দ-লীলামৃতে' "সূক্ষ্ম রক্ত বস্ত্র ধনি ভিতরে পরিলা। তাহার উপরে নীল বসন ধরিলা"।

বস্ত্রের নাম এ যুগে বিস্তর। এক জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসা-মঙ্গলে'ই পাওয়া গিয়াছে—যাত্রাসিদ, খুঞানেত, নাকর মঞ্জাফল—"যাহার সুতার তোলা পঞ্চাশ টাকা মূল' ও অগ্নিফুল (বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৮৮)। সুকবিবল্লভ নারায়ণদেব প্রভৃতির 'পদ্মাপুরাণে' পাওয়া যায়, খুঞা ভূটী, ভুনি গঙ্গাজল, ধোকড়া ও দাপুলী (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৩১৭, পৃঃ ৩০)। রাম-বিনোদের 'মনসা-মঙ্গলে' 'সফরিয়া সাড়ী'। যদুনন্দন দাসের 'গোবিন্দ লীলামৃতে' পাই, "ভ্রমরের তুল্য বস্ত্র অতি সূক্ষ্মতর। মেঘাম্বর নাম তার মেঘের শোধর"। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে "বাছিয়া পরয়ে মেঘডুম্বুর কাপড়"। সম্ভবতঃ 'মেঘাম্বর' ও 'মেঘডুম্বুর' একই। দ্বিজ বংশীবদনের 'মনসা-মঙ্গলে' 'গঙ্গাজলী সাড়ী'র উল্লেখ আছে; ইহা কি? 'কবি-

কঙ্কণ-চণ্ডী'তে পাই—"ময়ূর পাখার গঙ্গাজলী পাটী"। 'গঙ্গাজলী সাড়ী'ও কি ময়ূর-শাখা দিয়া নির্ম্মিত অথবা ময়ূর পাখার রঙ্গের কোনও সাড়ী ?

ষোড়শ শতাব্দী হইতে বক্ষের কাঁচুলির একটা গুরুতর বিশেষত্ব চোখে পড়ে। কাঁচুলিতে কৃষ্ণলীলা ও নানারূপ শৃঙ্গার-রসাত্মক চিত্র অঙ্কিত থাকিত। ইহা নীতির দিক দিয়া দারুণ অধঃপতনের একটা কলঙ্ক চিহ্ন।

আলোচ্য যুগে এ যুগের মত স্যাণ্ডেলের ছড়াছড়ি ছিল না ইহা সত্য, কিন্তু কবিকঙ্কণ 'চণ্ডীমঙ্গলে' লহনার পায়ে রজত পাশলি দিয়া পরে যে 'দিব্য তুলাপাটি' পরাইয়াছেন তাহা নিশ্চয় তুলার জুতা। মাণিক গাঙ্গুলী সুরিক্ষা বেশ্যার 'শ্রীচরণে জুতা' দিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গনারীর বেশভূষা ও প্রসাধনের একটি সুন্দর চিত্র আছে দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'গঙ্গা-ভক্তি-তরঙ্গিণী'তে :—

"প্রেমালসে অবশেষে রামাগণ যত।
রাণীপুরে বসি বেশ করে মনোমত॥
চাঁচর চিকুর-জাল চিরুণে আচরি।
বিনাইয়া বান্ধে খোপা দিয়া কেশ দড়ি॥
খোপায় সোনার ঝাপা বেণী কারো দোলে।
কেহ বা পরিলা সিতি মতি তার কোলে॥
কিবা শোভা সিন্দূর চন্দনে অতিশয়।
মণিময় টীকা যেন ভাস্কর উদয়॥

* * * *

ঢেঁড়ি চাপা মাকুড়ি কর্ণেতে কর্ণফুল।
কেহ পড়ে হীরার কমল নাহি তুল॥
নাসিকাতে নত কারো মুক্ত চুণি ভাল।
লবঙ্গ বেসরে কারো মুখ করে আলো॥
কিবা গজমুক্তা কারো নাসিকার কোলে।
দোলে সে অপূর্ব্ব ভাব হাসির হিল্লোলে॥

* * * *

পরিল গলায় কেহ তেনরী সোনার।
মুকুতার মালা কণ্ঠমালা চন্দ্রহার॥
কারো গলে মণিময় হার চমৎকার।
তেজে যার তরাসে পলায় অন্ধকার॥
ধুকধুকি জড়াও পদক পরে সুখে।
সোনার কঙ্কন কারো শাঁখার সমুখে॥

* * * *

পাতামল পাশুলি আনট বিছা পায়।
গুজরি পঞ্চম কারো শোভা কিবা তায়!"

দ্রষ্টব্য—দুর্গাপ্রসাদের এই বর্ণনায় কয়েকটি নূতন অলঙ্কারের নাম আছে, অথচ কয়েকটি পুরাতন অলঙ্কারের নাম নাই। পুরাতনের স্থান নূতন আসিয়া অধিকার করে। যুগ বিভাগ করিয়া সর্ব্বব্যাপারে নূতনের আবির্ভাব-কাহিনী সন্ধান করিতে পারিলে দেশের ইতিহাস পূর্ণতা লাভ করে।



উপন্যাস

অন্ত্যেষ্টি

শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

নয়

পরদিন সকালে আসিলেন বত্রিশ টাকা ভিজিটের ডাক্তার সুশীলরঞ্জন সেন। মঞ্জুলীকে দেখিয়া পূর্ব্ব ইতিহাস শুনিয়া কাগজে বিধি-ব্যবস্থা লিখিলেন।

মোটরে উঠিতে উঠিতে ডাক্তার সেন কহিলেন, "তপেশবাবু, একবার ডাঃ রায় কি ডাঃ সরকারকে দেখালে ভাল হয়।"

তপেশ উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিল, "আপনি কি রকম বুঝ্লেন ডাক্তারবাবু?"

"আমার মনে হচ্ছে"—ডাক্তার সেন একটু থামিয়া কাশিয়া লইলেন—"ভয়ের তেমন কিছু নেই—"

"অসুখটা কি ডাক্তারবাবু?"

"মনে হচ্ছে—যক্ষ্মা।"

"যক্ষ্মা!!!"

"হ্যাঁ, থাইসিসের প্রিলিমিনারী ষ্টেজ্। শীগ্‌গীর কোথাও চেঞ্জে নেবার বন্দোবস্ত করুন। তার আগে একবার ডাক্তার রায়কে দেখাবেন।"

মোটর ছাড়িয়া দিল।

তপেশ দুয়ারের বাহিরে রাস্তার উপর খানিকক্ষণ নিশ্চল দাঁড়াইয়া আছে। কাল রাত্রে বার বার ভগবানের নাম লইয়া এত করিয়া যে আশঙ্কাকে সে মন হইতে বিদায় দিয়াছিল, আজ সকালেই বারো ঘণ্টা যাইতে না-যাইতে সেই ছায়াতঙ্ক রূঢ় নিষ্ঠুর সত্যে পরিণত হইয়া গেল!

যক্ষ্মা?

মঞ্জুলী যক্ষ্মার করাল কবলে!

যক্ষ্মা! মঞ্জুলী তবে মরিবে?—আর রক্ষা নাই?

না—না, মঞ্জুলীকে মরিতে দিবে না তপেশ। সে যে তাহাকে চোখের জল মুছাইয়া বুকের কাছে টানিয়া সান্ত্বনার বাণী শুনাইয়াছে—"কেঁদো না মঞ্জু, আবার হবে।" আজ কি সে কথা মিথ্যা হইয়া যাইবে?··

যত টাকা লাগে, মঞ্জুলীকে বাঁচিতে হইবে। মরিতে তাহাকে দিবে না তপেশ।—···

যদি মঞ্জু না বাঁচে! যদি জীবনের মঞ্জু-মধুর মাঝখানেই সে অকালে ঝরিয়া পড়ে! কেন? মধুমাছি-মুখর মধু-ফাল্গুনের অন্তস্তল হইতে নবমঞ্জরী অসময়েই শুকাইয়া খসিয়া পড়িবে কিসের জন্য? কোন্ অপরাধে? কাহার দোষে?—'ভ্যানগার্ড'? 'বিশ্ববাণী'? মুদী? বাড়ীওয়ালা? স্যাঁৎসেতে ঘর? না—ভাইব্রোণা? না—পুস্তক-প্রকাশক? না, তপেশ নিজে?—কি বা কে দায়ী—মঞ্জুলীর এই অকাল-মৃত্যুর?··

যক্ষ্মা! যদি মঞ্জুলী না-ই বাঁচে—ভাগ্য ভাল, ভাগ্য ভাল তাহার! কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড্, নিউ-মোনিয়া, বেরিবেরি, মেনিঞ্জাইটিস্—অন্য কোন, অন্য কোন ব্যাধি হয় নাই। যক্ষ্মা! অভিজাত ব্যাধি! রাজকীয় পীড়া! কুলীন কালান্তক! তপেশ শুনিয়াছে, যক্ষ্মারোগীর শেষ সময় পর্য্যন্ত আশা থাকে সে বাঁচিয়া উঠিবে। বাঁচিয়া থাকিবার উৎকট উল্লাস! জীবনধারণের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা! এই পৃথিবীর ক্রোড়ে আর-ও কিছুদিন আঁকড়াইয়া থাকিবার দুরন্ত বাসনা! মঞ্জুলীর ভাগ্য ভাল! যদি সে না-ই বাঁচে, তাহার সোনার কপাল! যক্ষ্মা, আর কেহ নহে, অন্য কিছু না! যক্ষ্মা! শেষ পর্য্যন্ত-ও সে বাঁচিয়া উঠিবে—ভাবিতে ভাবিতেই যাইবে। মরিতে চাহিবে না! শত শত অঙ্কুরিত বাসনা কামনা অপরিতৃপ্ত রাখিয়া সে এত সকালে বিদায় চাহিবে না! মঞ্জুলী ভাগ্যবতী! তাহার যক্ষ্মা হইয়াছে! যক্ষ্মা!!

তপেশ ঘরে ফিরিতেই মঞ্জুলী প্রশ্ন করিল, "ডাক্তার আমার অসুখের কথা কি বলে গেল ?"

"ভয়ের কারণ নেই, সেরে যাবে।"

"কি অসুখ বল্‌লে ?"

"এই—ইয়ে—বুকেরই এক রকম ব্যাধি। আজকালকার ব্যাধির দাঁতভাঙ্গা ইংরেজী নাম মনেও থাকে না।"

মঞ্জুলীর অপলক দৃষ্টি তপেশের বিষণ্ণতা ঢাকিবার ব্যর্থ চেষ্টার উপর যেন আক্রমণের তীব্র আলোকপাত করিয়াছে। তপেশ তাড়াতাড়ি আলনা হইতে জামা গায় দিবার সুযোগে আত্মরক্ষার অন্তরাল পাইল।

"এখন কোথায় বেরুচ্ছ ?—ও'সুধ নারায়ণ এনে দেবে'খন।"

"নারায়ণ পারবে না। বাথ্‌গেটের ওখান থেকে আন্‌তে হবে। আর নারায়ণ আমার সঙ্গে যাবে এখন-ই। কাল রাত্রে আমি বাসা দেখে এসেছি। আজই সন্ধ্যার মধ্যে উঠে যেতে হবে।"

"আজ-ই কেন! জিনিষপত্র গোছাতে টোছাতেও সময় লাগে। কাল কি পরশু ভাল দিন দেখে উঠে যাওয়া যাবে।"

"দিন-ক্ষণ আমি মানি নে তা জানো। এ বাড়ীতে আর একদিনও থাকা চল্‌বে না, পশুর মত আর এক রাত্রিও নয়।"

মঞ্জুলী ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "কি কথার কি উত্তর! এ্যাদ্দিন এ-বাসায় যাদের সঙ্গে কাটালে তারা বুঝি মানুষ নয় ?"

তপেশ একটু উত্তেজিত হইয়া কহিল, "পরের চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই। নারায়ণ নতুন বাসায় বসে থাকবে। ক'লকাতা সহরে কুলির অভাব নেই। একদিন!—এক ঘণ্টার মধ্যে দশটা বাসা বদলানো যায়।"

মঞ্জুলী চুপ করিয়া রহিল। ডাক্তার চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে অগোণে বাসা-ত্যাগের মধ্যে মঞ্জুলী স্বামীর গোপন-করা কথার অনেকখানি বুঝিয়া লইল।

তপেশ ডাকিল, "নারায়ণ!"

বাহির হইতে জবাব আসিল, "যাই বাবু।"

"মঞ্জু, ঘরের জিনিসপত্তর সব কুলিরাই গুছোবে। তুমি শুধু রান্নাঘরের শিশি-বোতল বাসন-কোসনগুলি এক জায়গায় জড়ো করে রাখ। আজ এ-বেলা খাবার আনিয়ে নিলেই চল্‌বে। নারায়ণকেও আমি খাবার কিনে দিয়ে আসব'খন।"

নারায়ণ আসিয়া হাজির। তপেশ তাহাকে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই তপেশদের সারা অস্থাবর সংসারটায় দুইটী গরুর গাড়ী বোঝাই হইয়া গেল। ক্যাসবাক্স ও সুট্‌কেসটা সর্ব্বশেষে মঞ্জুলীর সঙ্গে ট্যাক্সিতে যাইবে। তপেশ একটা কুলির সঙ্গে বিছানাটা বাঁধিয়া লইতেছিল।

মঞ্জুলী ঘরে ঢুকিয়া একটা মাথার বালিশ সরাইয়া নিয়া কহিল, "এটা আমার সঙ্গে যাবে।"

"হঠাৎ এটার উপর পক্ষপাতিত্ব কেন ?"

মঞ্জুলী একটু মুচ্‌কিয়া হাসিল। তপেশ শুধাইল, "ব্যাপার কি ?"

"এটা আমার সঙ্গে পরেই যাবে।"

"কোন রত্ন লুকানো আছে নাকি ?"

মঞ্জুলী হাসিয়া কহিল, "এ বালিশটার মধ্যে দুখানা পাঁচ টাকার নোট্‌ আছে।"

"নোট্‌! বালিশের মধ্যে ?"

"হ্যাঁগো, আমি কত কষ্টে তোমার 'ভ্যানগার্ডের' চাকুরীর টাকা থেকে মাস মাস কিছু কিছু জমিয়েছি। একদিন শেলাই খুলে নোট দু'খানি রেখে দিয়েছিলাম।"

তপেশ মঞ্জুলীর মুখের দিকে নিষ্পলক চাহিয়া আছে।

"অসুখ-বিসুখ কত কি আপদ-বিপদ ঘটতে পারে। তখন মাথা খুঁড়লেও দু'টো টাকা ধার মেলে না! হাতের কাছে থাক্‌লেই খরচ হয়ে যাবে—ভয়ে বালিশের ভিতর রেখে দিয়েছিলাম।"

তপেশ চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল।

"আজ নতুন বাসায় গিয়ে শেলাই খুলে বের করব।"

"আজ-ই বা বে'র করবে কেন ?"

"আর তো আমাদের বিপদে-আপদে ভয় নেই। এখন দু' দশ টাকার দরকার হ'লেই মিলবে। এখন আর ভয় কি বল ?"

তপেশ নির্ব্বাক। অসুখ-বিসুখ বিপদ-আপদ! তাহাদের জীবনে কোনদিন এতটুকু বিপদও আসে নাই!

দুর্ভাবনার চরমান্তও ঘটে নাই! এক বোতল ভাইব্রোণা কেনাও অত্যাবশ্যক প্রয়োজন ছিল না!…

আত্মঘাতিনী নারী! আত্মম্ভরি! অহঙ্কারী!

ট্যাক্সি আসিল।

দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া দুইটী পাশাপাশি সংসার! সুমতির চোখে জল। মনোরমার মেঘলা মুখ। লবঙ্গও আজ বিষণ্ণ। রেণুকণা নীরবে এক কোণে দাঁড়াইয়া আছে।

বিদায়! যেমন করিয়া বিদায় জানায় মুক্তি-আজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদী-বন্ধুকে জেলখানার বহির্দ্বারে তাহার এতদিনকার অবরুদ্ধ সাথীরা!

মঞ্জুলী আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে মোটরে উঠিল।

তপেশের মনের কোণে কিসের এক ঘনগম্ভীর বেদনা-ভার। সুদিনের মুখ দেখিয়াছে তাহারা। সুদিন! ওই দু'ঘরের চোখে তপেশের আজ শুভদিন বৈকি!

সুখের নাগাল পাইয়াছে তাহারা দু'জন! তাই ছাড়িয়া চলিয়াছে দুঃখ-কষ্টের পুরাতন আবাস। তাহাদের জয়-যাত্রায় আজ অশ্রুজলের বিদায় অভিনন্দন দিতেছে এতদিনের দিবস-রজনীর সমধর্ম্মী দুইটী পাশাপাশি সংসার!…

দুনিয়ার এই তো নিয়ম। কেহ আগাইয়া যায়, কেহ থাকে পিছাইয়া। অদৃষ্টের জোর! প্রাক্তন ফল! অথবা ইহজন্মেরই কর্ম্মসূত্র!!

মোটর ছাড়িয়া দিয়াছে।

মঞ্জুলী কহিল, "নতুন বাসায় উঠে ওদের একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়ান উচিত, কি বল?"

"হুঁ।"

"তুমি গিয়ে বলে আস্‌বে। লবঙ্গদি, রতনবাবু—সবাইকে।"

"আচ্ছা।"

অনুকম্পা! সমবেদনা! এখন হইতে আর সমতল ক্ষেত্র নহে, উর্দ্ধ হইতে নিম্নে চাহিয়া মাঝে-মধ্যে বিস্মরণের পরদাখানি ফাঁক করিয়া একটু-আধটু কৃপা-প্রদর্শন! চিরদিন এমনি হইয়া আসিয়াছে—এমনি-ই হয়।

সন্ধ্যা হইয়া গেছে। তিনটী কুলি ও নারায়ণের সাহায্যে নূতন জায়গায় সংসার-পাতানো সুসম্পন্ন হইয়াছে।

মঞ্জুলী রান্নাঘরে নব-নিযুক্ত উড়েঠাকুরকে কাজ বুঝাইয়া দিতেছে।

তপেশ অপ্রশস্ত বারান্দায় রেলিঙে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরে চাহিয়া আছে। তেতলা বাড়ী। আশে পাশে দোতলার-ই সংখ্যাধিক্য। ছবির মত রাজধানী কলিকাতা। হুস্ হুস্ করিয়া বাতাস আসিতেছে। দক্ষিণ ও পুবদিক সম্পূর্ণ খোলা। দূরে-অদূরে তেতলা-চারতলার ঘরে ঘরে আলো জ্বলিতেছে। তপেশ চাহিয়া আছে নির্ণিমেষ।

উত্তাল তরঙ্গে সাঁতারশ্রান্ত শতসহস্রের দুইটী প্রাণী আজ ডাঙায় উঠিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। এখনও সিক্ত বসন ভাল করিয়া শুকায় নাই। তাই পিছন ফিরিয়া তাহারা গর্জ্জমান জলরাশির মধ্যে হতভাগ্যদের তীরের শুভেচ্ছা জানাইতেছে। আর বেশীদিন নয়। তীর ছাড়িয়া সম্মুখে আগাইয়া যাইতে হয়। যাইতে যাইতে পরিশেষে একদিন শুনিয়াও শোনা যায় না এই জলকল্লোল, পাশ্চাতের এই করুণ-কাতর কণ্ঠের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি!…

কি অপরাধ করিয়াছে সুমতি-মনোরমারা?—লবঙ্গলতার কি দোষ? তপেশ-মঞ্জুলীই বা এতকাল এমন কোন পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছে?……

তপেশ চাহিয়া আছে। ঐ তো সম্মুখে কোলাহলাকীর্ণ কর্ম্মচঞ্চল মহানগরী। আছে তাহার সুবিশাল ক্রোড়ে রমানাথ কবিরাজের লেন, কমলাক্ষদের বৈঠকখানার মেস্,—আছে শিমলা ষ্ট্রীটের সারি সারি খোলার ঘর, আছে জানা ও অ-জানা আরো কত কথা, কত ছবি, কত কি। ক্রমে নগর ছাড়িয়া নগরপ্রান্তের না-দেখা ঘরে-ঘরে, সুদূর পল্লীর অপরিচিত কুটীরে-কুটীরে তপেশের চিন্তার ধারা অচেনা পথ ধরিয়া চলিল। অবশেষে কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া দেশ-দেশান্তের সমুদ্র-পর্ব্বত হ্রদ-মরুভূমি নদী-নালা অতিক্রম করিয়া তপেশের চিন্তাস্রোত বৃত্তাকার আবর্ত্ত রচিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে বাড়িতে বাড়িতে সারা দুনিয়া ছাইয়া ফেলিল। সেই বিশ্ব-বিরাট বৃত্তের কলধ্বনিত পরিধির মধ্যে কিল্‌বিল্ করিতেছে লক্ষ কোটী রুক্ষ কমলাক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া শিমলা ষ্ট্রীটের কুশ্রী করুণ দেহ-পসারিণীরা পর্য্যন্ত। তপেশ শিহরিয়া উঠিল। ভয়ে ভয়ে চোখ বুজিল। ভীষণ বিভীষিকা! চাহিয়া থাকিলে চোখ বুঝি কোটর হইতে ঠিক্‌রাইয়া পড়িবে! আর না—আর না। তপেশ

ও-দৃশ্য দেখিতে চাহে না! ওই দলিত নারায়ণের বিশ্বরূপ !!

মঞ্জুলীর পায়ের মৃদু শব্দে তপেশ মুখ তুলিয়া চাহিল। চোখের কোণের জলবিন্দু দুটী মুছিবার আর সময় পাইল না। মঞ্জুলী তাহার বক্ষ-সংলগ্ন হইয়া শাড়ীর আঁচলে চোথ মুছাইয়া কহিল, "কাঁদছ কেন তুমি ?"

তপেশ মঞ্জুলীর মাথাটা বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

"তুমি অমন করে কেঁদো না। তোমার চোখে জল যে আমি সইতে পারবো না। অত ভাব্‌ছ কেন? ডাক্তারই তো বলেছে, আমার অসুখ সেরে যাবে।"

তপেশ কোন উত্তর দিল না। মঞ্জুলী জানুক, এই অশ্রুজল শুধু তাহার-ই। তাহারই অসুখের সময় অপর কাহারো জন্য উদ্বেল হইয়া স্বামীর চোখে অশ্রু দেখা দিতে পারে এতখানি গ্রহণ করিবার সামর্থ্য তাহার নাই। ঐ নয়নাশ্রু বিশ্লেষণ করিলে মঞ্জুলীর ভাগে নিশ্চয়ই আর আর সকলের চেয়ে বেশী পরিমাণই মিলিবে। তবু সে ইহার সবটুকুই একান্ত আপনার বলিয়া বুঝিয়া লউক্‌। ক্ষতি কি!

খানিকক্ষণ চুপচাপ। তপেশ এখন প্রকৃতিস্থ। মঞ্জুলী সুধাইল, "এখনো ভাবছ কি তুমি ?"

"কিচ্ছু না—আচ্ছা, ও-বাসার সবাইকে খেতে বলবে কবে ?"

"সামনের রোববার। ওদের আপিস্‌ ছুটী থাকবে।"

আবার কিছুক্ষণ নীরব। তপেশ বলিবার মত আর কিছু খুঁজিয়া পায় না।

"খেতে আজ দেরী হ'বে মঞ্জু, না ?"

"এক গোবরগণেশ উড়ে ভূত নিয়ে এসেছ। হাত চালিয়ে কাজ করতে জানে না, যাক্‌ দুদিনেই শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে পারব। লোক কিন্তু ভাল।"

"আমি তবে একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি মঞ্জু ?—একটা জরুরী কাজ আছে।"

"যাও। কিন্তু বেশী রাত করো না যেন।" মঞ্জুলীর কণ্ঠস্বরে আদেশের সুর।

"না, দেরী হবে না। সাড়ে নটার মধ্যেই ফিরে আসব।" তপেশ ঘরে যাইয়া পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়া বারান্দায় আসিয়া দেখিল, মঞ্জুলী চুপ করিয়া রেলিঙে দাঁড়াইয়া আছে বাহিরে চোখ মেলিয়া। তপেশের খানিকক্ষণ পূর্ব্বেকার বিষণ্ণ মনের ছবিটাই যেন মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে এই বিমনা সন্ধ্যালোকে!

মুখ ফিরাইয়া সে ডাকিল, "শোন।"

"বল।"

"আজ আমার কাছে তোমায় একটা শপথ করতে হ'বে।"

"কিসের মঞ্জু ?"

"আগে আমায় ছুঁয়ে বল।" মঞ্জুলী স্বামীর একখানি হাত মাথার উপর তুলিয়া নিল।

"কি কথা মঞ্জু ?"

"সে পরে বলব—আগে কথা দাও, আমি যা নিষেধ করব আজ থেকে তা তুমি মেনে চল্‌বে।—একটা কথা শুধু।"

তপেশ চুপ করিয়া রহিল।

"ভয় পেয়ো না। কঠিন কিছু বল্‌ব না।"

"আচ্ছা। এবার বল, কি তোমার অনুরোধ ?"

"সে পরে জানতে পারবে। প্রতিজ্ঞার কথা তখন মনে থাকে যেন।"

খানিকক্ষণ চুপ থাকিয়া মঞ্জুলী আবার কহিল, "আর একটা অনুরোধ আমার রাখতে হবে। কাল থেকে তোমার সেই নভেলখানা লিখতে থাক্‌বে। তোমার ওটা হবে মাষ্টার পিস্‌। তাড়াতাড়ি শেষ করবে। তোমাকে আরো বড়, আরো বড় হ'তে হবে।"

"বড় হওয়া কাকে বলে বুঝিনে মঞ্জু—শুধু বুঝি, যেমন আছি সেই তো বেশ।"

"আমার কালকের কথায় তোমার অভিমান হয়েছে না ?"

"না মঞ্জু! এ আমার মনেরই কথা।"

"কখনো নয়। এ তোমার রাগের কথা। ছি লক্ষীটা!"

মঞ্জুলী বুঝিতে চাহিল না, সত্যই ইহা আজ তপেশের মনেরই কথা। সম্প্রসারণ এত সুন্দর অথচ এত কঠিন! উচ্ছ্বাসের আবর্ত্ত যত পড়ে চারিদিকে ছড়াইয়া, কেন্দ্রের সুস্পষ্ট কলকথা থাকে ততই কমিতে। আজ তপেশ গভীর মায়ায় আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। সেই সীমান্তের

সুস্থির মায়া! কি কাজ তাহার বৃহত্তর পরিধিতে। নীড় যদি তাহার নিরানন্দ, কিবা প্রয়োজন অসীম আকাশের! সে সামান্তের ঐশ্বর্য্য হারাইয়া অসামান্ততার মহিমা চাহিবে না। এই তো ভাল!

মঞ্জুলী কহিল, "বল—কাল থেকে লিখ্‌বে ?"

"আচ্ছা" বলিয়া তপেশ মঞ্জুলীর চিবুক স্পর্শ করিবার আগেই সে মাঝপথে খপ্‌ করিয়া স্বামীর হাতখানি ধরিয়া ফেলিল। "আর দেরী করো না। সাড়ে নটার মধ্যেই ফিরে আসতে হবে কিন্তু।"

তপেশ কি ভাবিতে ভাবিতে সিঁড়ির পথে নামিয়া গেল। * * *

রাত্রে শুইবার সময় তপেশ দেখিল, আলাদা তক্তপোষে পৃথক দুটী বিছানা পাতা। কহিল, "এ কি মঞ্জু ?"

মঞ্জুলীর অধরপ্রান্তে একটু ম্লান হাসির রেখা। কহিল, "আজ থেকে তোমাকে আলাদা শুতে হ'বে।"

"কেন ?"

"কেনর উত্তর নেই। এরি মধ্যে শপথ ভুলে গেলে ? যা বল্‌ছি তাই শোন।" মঞ্জুলী একটু হাসিতে চেষ্টা করিল।

তপেশ দ্বিরুক্তি না করিয়া শুইয়া পড়িল। রাত্রে বাসায় ফিরিবার পর হইতে তপেশের মুখে বিষণ্ণতার ছায়া। মঞ্জুলীর দৃষ্টি তাহা এড়ায় নাই।

বাতি নিবাইয়া মঞ্জুলীও শুইয়া পড়িয়াছে। কেবলি সে এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিল। চোখে তাহার ঘুম নাই আজ। দেখিতে দেখিতে বালিশ ভিজিয়া উঠিল। নিঃশব্দ ক্রন্দন। দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া মঞ্জুলী ভিতরের অসহ্য উচ্ছ্বাস প্রাণপণে চাপিয়া রাখিতে চায়।···

স্বামীকে সে এক বিছানায় শুইতে দিবে না—কিছুতেই না। কিন্তু তপেশ কি তাহার স্বভাবসুলভ সোহাগের একটু জুলুমও দেখাইতে পারিল না! একটুখানি জেদ-ও আজ ধরিল না একত্র শুইবার! শুধু তুচ্ছ একটী কথা 'কেন ?' সে না হয় কিছুতেই স্বামীর কথা রাখিত না, উপেক্ষা করিত সকল আব্দার—সব অনুরোধ। কিন্তু স্বামী কেন মিথ্যা করিয়াও আজ এতকালের সত্যের এতটুকু পরিচয়ও দিল না! সংক্রমণ-ভীতির সশঙ্ক পাষাণে তাহাদের প্রেমের মণিমঞ্জুষা কি আজ ঠুন্‌কো কাচের বাসনের মত টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ভাঙিয়া গেল! বুকে তাহার বাসা বাঁধিয়াছে মরণের বীজাণু! সে কি পাগল, না ক্ষ্যাপা, না বুদ্ধিহীনা, না এতই স্বার্থকাতর যে প্রিয়তমের সুস্থ সবল অটুট দেহখানিকে ক্ষণিকের মোহের বশেও তাহার পার্শ্বে আজ স্থান দিত!—কিন্তু স্বামীর এই নীরবে আজ্ঞাপালন যে সে সহিতে পারিতেছে না।—প্রতিবাদে একটী কথাও কেন স্বামী শুনাইল না! তবে কি ইহা মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাহাদের বিচ্ছেদের পূর্ব্বাভাষ ?—এই ব্যাধি কি তাহাদের প্রাণে-প্রাণে-বাঁধা অচ্ছেদ্য হেম-হারের অগ্নি-পরীক্ষা ?······

তপেশ শুইয়া আছে। মঞ্জুলীও পাশ ফিরিয়া আব্‌ছা অন্ধকারে একদৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়া আছে। স্বামীর নিশ্চিন্ত নিদ্রার নীরবতা যেন তাহাকে বিদ্রূপের মত বিঁধিতে লাগিল।

ঘুম নাই, ঘুম নাই চোখে মঞ্জুলীর।

তাহার বিছানার কোণ হইতে একটা বালিশ লইয়া মঞ্জুলী স্বামীর চৌকির কাছে গেল। জোড়া বালিস না হইলে তপেশের ভাল ঘুম হয় না। আজ মঞ্জুলী কি ভাবিয়া ইচ্ছা করিয়াই একটী মাত্র বালিস রাখিয়াছিল। তপেশের আজ সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। হাতের কনুইয়ের উপর মাথার ভার রাখিয়া ঘুমাইয়া আছে।

আস্তে আস্তে মঞ্জুলী তাহার মাথাটী তুলিয়া বালিশটা ঠিক করিয়া পাতিয়া দিল। তপেশ একবার মাথাটা তুলিয়া মঞ্জুলীর দিকে চাহিয়া আবার বালিশে মাথা রাখিল।

বাহিরে ঘণ্টা খানেক ধরিয়া মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বোধ হইতেছে আজ। মঞ্জুলী আল্‌না হইতে র‍্যাপার আনিয়া তপেশের বুকের কাছ অবধি সন্তর্পণে ঢাকিয়া দিল।

মঞ্জুলী ফিরিয়া আসিল নিজের বিছানায়। কাঁথা গায়ে দিল। জ্বর জ্বর বোধ করিতেছে। ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। ঘুম আসে না।

সুষুপ্ত প্রহরের বুকে যেন কাঁটা-বিছানো—প্রতিটি মুহূর্ত্ত বিঁধিতেছে মঞ্জুলীর উদ্বেল চেতনায়। কয়েক মিনিট এপাশ-ওপাশ করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। অন্ধকারে তপেশের চৌকির দিকে চাহিয়া রহিল। ভাবিল, একবার ঘুমন্ত স্বামীর বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে; নিষ্ঠুর

সোহাগে তাহার কাঁচা ঘুম ভাঙ্গাইয়া এতদিনের একাধিপত্য কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লয়।

বিছানা হইতে নামিয়া আসিল। নিঃশব্দে দেয়ালের কাছে যাইয়া আলো জ্বালিল। তপেশ চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে তেমনি। ভাবিল, চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠে—আঃ! ঘুম ভাঙ্গাইবার কোন একটা অছিলা যদি পায় এখন! অভিমানে আলোটা নিবাইয়া দিয়া বিছানায় যাইবার পথে ইচ্ছা করিয়াই পা দিয়া খালি গেলাসটা ফেলিয়া দিল।—এত বড় একটা আওয়াজেও মানুষের ঘুম নষ্ট হয় না! এতই ঘুম!

মঞ্জুলী বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া বালিশে মুখ গুঁজিল।—নিশুতি নিরালায় ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এদিকে এ-বিছানায় তপেশের চোখেও ঘুম নাই। এতক্ষণ সে নিঃশব্দে চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

তপেশের চোখে ঘুম নাই। সন্ধ্যার পরে আজ আসন্ন মৃত্যুর কুশ্রীতা দেখিয়া বাসায় ফিরিয়াছে। কমলাক্ষদের ঘরের সেই ছেলেটাকে দেখিতে গিয়াছিল। টাইফয়েডের শেষ সময়ে আর ডাক্তার আসিয়া করিবে কি! সতের-আঠার বছরের পাড়াগাঁয়ের ছেলে। গেল বার গ্রামের হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে।······

চাকুরী খুঁজিতে আসিয়াছিল এই কলিকাতায়। বাপ-মা পাঠাইয়া দিয়াছে এই নির্ব্বান্ধব বিদেশে। উঃ, কমলাক্ষদের রুমটা এমন বীভৎসরূপে অস্বাস্থ্যকর!

ছেলেটার 'ডিলিরিয়ম' আরম্ভ হইয়াছে। ডাক্তার বলিয়া গেল, আজিকার রাত্র টিকিলে হয়। প্রলাপের মাঝে ছেলেটা কেবলি থাকিয়া থাকিয়া মা, বাবা ও ছোট বোনটার নাম লইতেছে: "মা তুমি কেঁদো না, আমি তো আস্‌ছে পূজোয়ই আবার বাড়ী যাব······না-না, খুকীর বালা জোড়া বিক্রি করো না···আমি যাব না ক'লকাতা······।" তপেশ নিঃশব্দে চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু মন তাহার ঘুরিতেছিল কমলাক্ষদের রুমে সেই ছেলেটার রোগশয্যার চারিধারে। ছোট বোনের বালা বিক্রির টাকায় কলিকাতা আসিয়াছে চাকুরী খুঁজিতে! চাকুরী!···

"আমি তো পূজোর সময় আবার বাড়ী আসব···খুকীর বালা জোড়া বিক্রি করো না মা······।" এই গুটিকয়েক প্রলাপ বাক্যের মধ্যে সুদূরস্থিত পল্লীর একটা গোটা সংসার তপেশের চোখে অনাবৃত হইয়া পড়িয়াছে।

মঞ্জুলী এই সময় মাথার নীচে বালিশ দিয়া গেল। বুকের কাছে অনুভব করিল মঞ্জুলীর কোমল স্পর্শ।

ছেলেটাকে ছাড়িয়া চিন্তার ধারা এবার মঞ্জুলীকে ঘিরিয়া ধরিল। আহা! মঞ্জুলীর এ কি হইল! চোখের কোণে ক্লান্ত কালিমা। কণ্ঠাস্থি জাগিয়া উঠিয়াছে। কব্‌জি বাহিয়া চুড়ি ক'গাছি নামিয়া পড়িতে চায়। আর সে শ্রী নাই! গা-ময় কাতর শীর্ণতা! এঁ্যা! এ কি হইল! কেন হইল?

মঞ্জুলী নিজেই দায়ী। দায়ী তাহার দুরন্ত অভিমান। দায়ী সে-ও—তাহার ঔদাসীন্য, তাহার বিস্মরণ।

অতীতের অধ্যায়গুলি দুশ্চিন্তার ঝড়ো-হাওয়ায় একটী একটী করিয়া উল্টাইয়া যাইতে লাগিল।···সেই ভবানীপুর, ঐ রমানাথ কবিরাজ লেন, এই আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট! সেদিনের সোনার বেড়া, কালকের লোহার খাঁচা, আজ এই একটুখানি রূপালী কিনারাদার! দিন কোথাও একস্থানে আবদ্ধ থাকে না। আগড় ভাঙ্গিয়া সুখে দুঃখে আগাইয়া চলিবেই। এবার সম্মুখে আর এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা! কি আছে কে জানে! এ কি অদৃশ্য শক্তি জীবন লইয়া পুতুল খেলা খেলিতেছে! এ কাহার বেতালা নূপুর-নৃত্য! এ কেমন যতিভঙ্গ কবিতা! এ কোন্ বেসুর শানাই!!···

মঞ্জুলী! মঞ্জুলীর যক্ষ্মা হইয়াছে!···

এ-বিছানায় তপেশ মনে মনে নিজেকে মঞ্জুলীর দুর্দ্দশার জন্য জবাবদিহি করিতেছিল। আর ও-বিছানায় মঞ্জুলী বুক-ফাটা ক্রন্দনের উর্দ্ধ উচ্ছ্বাস ঢোক গিলিয়া চাপিয়া যাইতেছে।

দুই চৌকীতে স্বামী-স্ত্রী কাহারো চোখে ঘুম নাই।

গভীর রাত্রে কে যে কখন প্রথম ঘুমাইল বলা কঠিন।

শেষ রাত্রে তপেশের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া নিদ্রিতা স্ত্রীর গা পরীক্ষা করিল। শরীর গরম নয়। কিন্তু আজিকার ঠাণ্ডা-পড়া রাত্রেও কপালের উপরে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বুকের দুই পাশের ব্লাউসের অংশ ভিজিয়া উঠিয়াছে।

তপেশ কোঁচার খুঁটে মঞ্জুলীর কপালের ঘাম মুছিয়া লইল। ডান হাতখানি একান্ত অসহায়ের মত মোড় ভাঙ্গিয়া পাশ বালিসের তলে চাপা পড়িয়াছে।—তপেশ অতি সন্তর্পণে হাতখানি বুকের উপর তুলিয়া দিল। তারপর মঞ্জুলীর বিছানায় তাহারই পাশে শুইয়া পড়িল বাঁ-হাতের কনুইয়ের উপর মাথা রাখিয়া!

ভোরবেলা স্বামী-স্ত্রী অঘোরে ঘুমাইয়া আছে।

সব কয়টী জানালা বন্ধ। খড়খড়ির ফাঁকে ঘরের মধ্যে আবছা আলো। তপেশের বুকের মাঝখানে কখন মঞ্জুলীর চিরাভ্যস্ত মাথাটী অজানিতে আপনার অধিকার জুড়িয়া লাগিয়া আছে। ক্রমশঃ

"লালপল্টনে"র কথা

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বঙ্গদেশস্থ দেশীয় সৈন্যদলে বাঙ্গালী সিপাহী ছিল কি না, ইহা লইয়া বহু বৎসর পূর্ব্বে একবার আলোচনা হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছিলেন যে কোম্পানীর সেনাবিভাগে বিশেষতঃ "লাল পল্টনে" বাঙ্গালী সিপাহী যথেষ্ট সংখ্যায় ছিল। বাঙ্গালীরা কোম্পানীর আমলেও যুদ্ধ করিতে জানিত। শুধু তাহাই নহে, প্রধানতঃ বাঙ্গালীর বাহু বলেই ক্লাইভ বঙ্গপ্রদেশে সমর-সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন একথাও অনেকে বলিতেন বলিয়া মনে পড়ে।

ইংরাজ কর্ত্তৃক দেশীয় সেনাদল সৃষ্টির ইতিহাস এক আশ্চর্য্য কাহিনী। রাজপুত, পাঠান, ছত্রি, রোহিলা—ইহারা এদেশেই ছিল। দেশীয় রাজাদের অধীনে দেশীয় সেনাপতির পরিচালনায় ইহারা ছিল বিশৃঙ্খল অথবা উচ্ছৃঙ্খল জনসমষ্টি। ইউরোপীয় শিক্ষার ফলে ইহারাই হইয়া দাঁড়াইল সুসংগঠিত, শ্রেণীবদ্ধ ও যে কোনরূপে চালনযোগ্য যুদ্ধযন্ত্র।

ফরাসীরাই সর্ব্বপ্রথম দেশীয় সৈনিক গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে পঁদিচারির শাসনকর্ত্তা ফাঁসয় মার্টিন তিনশত দেশীয় সৈনিক গ্রহণ করেন, কারণ তাঁহার অধীন ইউরোপীয় সৈনিকের সংখ্যা অত্যল্প ও পঁদিচারি রক্ষার পক্ষে অপ্রচুর ছিল। পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা ডুমা (Dumas) যে সেনাদল গঠন করেন তাহাতে ইউরোপীয় সৈনিকদের সঙ্গে চারি হইতে পাঁচ হাজার ভারতীয় মুসলমান ভর্ত্তি করেন এবং তাহাদিগকে ইউরোপীয় প্রণালীতে শিক্ষিত করেন। প্রসিদ্ধ সুইস্ সেনাধ্যক্ষ প্যারাডিস (Paradis) দেশীয় সৈন্য দ্বারা যে অভূতপূর্ব্ব কৃতকার্য্যতা প্রাপ্ত হন তাহা দেখিয়াই ক্লাইভও ঐ দৃষ্টান্ত অনুকরণে প্রবৃত্ত হন এইরূপ কথিত হয়।

কিন্তু সুপ্রতিষ্ঠিত দেশীয় সৈন্যদলের গঠনকর্ত্তা মেজর ষ্ট্রিঙ্গার লরেন্স (Major Stringer Laurence)। ইনি মাদ্রাজে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে নিয়মিতরূপে সিপাহীদিগকে কোম্পানির সেনাদলে ভর্ত্তি করিতে আরম্ভ করেন। ইংরাজ ও ফরাসীর যুদ্ধ উক্ত কার্য্যের আবশ্যকতা উৎপাদন করিয়াছিল। এই লরেন্স সাহেব "ভারতীয় সেনাদলের পিতা" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বেই ক্লাইভ দেশীয় সৈনিকদিগের সামরিক শিক্ষার উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করেন। প্রথম যুগে কোম্পানীর কুঠিতে যে সকল ভৃত্য (পিয়ন) ও প্রহরী থাকিত তাহারা দেশীয় প্রথামত ঢাল, তরবারি, তীর, ধনুক, বর্ষা ও চকমকিপাথরযুক্ত বন্দুক—এই সকল অস্ত্রে সজ্জিত থাকিত। ইহারা ক্লাইভের সময়ের পূর্ব্বেই তিরোহিত হইয়াছিল। ক্লাইভের সময় সামরিক কর্ম্মপ্রার্থী রোহিলা, রাজপুত প্রভৃতিরা দলে দলে ঘুরিয়া বেড়াইত। কথিত হয়, ক্লাইভ এই সকল উপাদান সংগ্রহ করিয়া ঐ সকল সিপাহীকে ইউরোপীয় নিয়মে ড্রিল শিক্ষা দিয়া সামরিক কৌশল ও নিয়ম অভ্যস্ত করাইয়া প্রথমতঃ একটী সুসংগঠিত ব্যাটেলিয়ন (Battalion) প্রস্তুত করেন। পলাশী যুদ্ধে সফলতা লাভের পর সৈন্যসংখ্যা ক্রমে বাড়াইয়া দেওয়া হইতে থাকে। প্রথম দেশীয় সেনাদলের সর্ব্বোপরি কর্ত্তা অর্থাৎ প্রধান সেনানীর পদে ইউরোপীয় কর্ম্মচারীকেই রাখা হইত। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির দেশীয় সেনাদলের পুনর্গঠন হয়। ঐ সালে সমগ্র ভারতে প্রায় ৫৭০০০ সাতান্ন হাজার সিপাহী কোম্পানির সেনাদলভুক্ত ছিল। তন্মধ্যে মাদ্রাজ ও বাঙ্গালায় ২৪০০০ চব্বিশ হাজার করিয়া এবং বোম্বাইয়ে ৯০০০ নয় হাজার ছিল। (১)

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোম্পানির দেশীয় সেনাদলের ইতিহাস সংক্ষেপতঃ এই। এই ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন এবং বাঙ্গালী সিপাহী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহারা বাঙ্গালী সেনাদলের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে কোম্পানির দেশীয় সেনাদলের ইতিহাসের তথ্য অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য ও সুপ্রচুর এবং বাঙ্গালী

(১) Imperial Gazetteer of India, vol IV (1909)

সিপাহীদলের অস্তিত্ব অনুমান করিবার অবকাশ আরও বিরল।

কোম্পানির দেশীয় সেনাদলের যথাসম্ভব বিস্তৃত ইতিহাস উইলিয়ম্‌স্ সাহেবের পুস্তকে পাওয়া যায়। বোধ হয়, এই পুস্তকই (২) ঐ বিষয়ের সর্ব্বপ্রাচীন মুদ্রিত ইতিহাস। ইহা লণ্ডনে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। ইহাতে প্রণিধানযোগ্য যে যে বিষয়গুলি আছে, তাহার আলোচনা করা যাউক।

সর্ব্বপ্রথমে "লাল পল্টনে"র কথা দেখা যাউক। উইলিয়ম্‌স্ সাহেবের পুস্তকে এ সম্বন্ধে যাহা আছে তাহার সারমর্ম্ম এই :—

১২ সংখ্যক রেজিমেণ্টের অন্তর্গত ২ সংখ্যক ব্যাটেলিয়ন (Battalion) এইটী। ইহা ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় গঠিত। নিয়মিতরূপে পরিচ্ছদ পরিধানে এই সৈন্যদল প্রথম; সেইজন্য (পরিচ্ছদের রং অনুসারে) বহুকাল পর্য্যন্ত ইহা 'লালপল্টন' নামে পরিচিত ছিল। পরিশেষে ইহা 'গ্যালিয়েজের পল্টন' (সেনাপতি গ্যালিয়েজের (Galliez) নাম অনুসারে) নামে অভিহিত হইয়াছিল।

সম্পূর্ণরূপে সুশিক্ষিত হইবার পূর্ব্বেই এই সেনাদল ক্লাইভের অধীনে চন্দননগর আক্রমণে অগ্রসর হইতে আদিষ্ট হইয়াছিল। পরে (ক্লাইভের সেনাপতিত্বে) ২৩শে জুন তারিখে পলাশীর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে একটী নবীন সেনাদলের পক্ষে যতখানি আশা করা যায়, ইহা তত সুচারুরূপেই কর্ত্তব্য সম্পাদন করে। পরে উত্তর ভারত প্রদেশে মারাঠাদের সহিত যুদ্ধে (১৭৫৮ খৃঃ) ইহা বিশেষ যশ লাভ করে। ১৭৫৯ কি ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজদিগের সঙ্গে যুদ্ধে এই সেনাদল জয়লাভ করে এবং প্রায় সমগ্র ওলন্দাজসেনাকে বন্দী করে। মীরজাফরকে সিংহাসন হইতে অপসারণের এবং মীরকাশিমকে সিংহাসনে বসাইবার সময় যে সকল সেনাদল উপস্থিত ছিল 'লালপল্টন' তাহাদের অন্যতম। সংক্ষেপত সেকালে যখনই কাজের দরকার হইত, 'লালপল্টন' ও 'ম্যাথিউর পল্টনে'র (৩) ডাক পড়িবার অন্যথা হইত না ইত্যাদি। পরে মীরকাশিমের বিরুদ্ধেও 'লালপল্টন' নিযুক্ত হইয়াছিল।

দেখা যাইতেছে যে "লালপল্টন" একটী প্রসিদ্ধ সমরকুশল সৈন্যদল; ইহা বহু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া জয়লাভ করিয়াছিল (পলাশীর যুদ্ধ তাহাদের অন্যতম) এবং কলিকাতায় এই দলের সিপাহীদিগকে প্রথম ভর্ত্তি করা হয়। শেষোক্ত কথাটী ব্যতীত "লালপল্টনে" বাঙ্গালী সিপাহী থাকিবার স্বপক্ষে অনুমান করারও অবকাশ নাই। কলিকাতায় যে সিপাহীদলের সৃষ্টি তাহাতে কলিকাতার অধিবাসী অর্থাৎ বাঙ্গালীরা সিপাহীরূপে ভর্ত্তি হইয়াছিল এই অনুমান করায় বাধা নাই।

এইরূপ অনুমান করিবার ক্ষেত্র—আরও কয়েকটী আছে। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে উনিশটী সিপাহী ব্যাটেলিয়ন (Battalion) ছিল। তন্মধ্যে কয়েকটীর জন্মস্থান বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থান। যথা :—

(১) ১নং রেজিমেণ্টের ১নং ব্যাটেলিয়ন ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানে গঠিত। বর্দ্ধমানের নামানুসারে ইহার নাম হইয়াছিল।

(২) উক্ত রেজিমেণ্টের ২য় ব্যাটেলিয়ন ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে গঠিত। লর্ড কর্ণওয়ালিস ইহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

(৩) ২নং রেজিমেণ্টের ১ম ব্যাটেলিয়ন—১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামে সিপাহী ভর্ত্তি করিয়া ইহার সৃষ্টি।

(৪) ৯নং রেজিমেণ্টের ১ম ব্যাটেলিয়ন – ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানে গঠিত। ইহাকে "ছোটা" অথবা "দ্বিতীয় বর্দ্ধমান" ব্যাটেলিয়নও বলা হইত।

(৫) ৫নং রেজিমেণ্টের ১ম ব্যাটেলিয়ন—১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় সৃষ্ট।

(৬) ৭নং রেজিমেণ্টের ১ম ব্যাটেলিয়ন—১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে গঠিত।

(৭) ১০নং রেজিমেণ্টের ১ম ব্যাটেলিয়ন—১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে।

(৮) ১১নং রেজিমেণ্টের ১ম ব্যাটেলিয়ন ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে।

(৯) ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আর একটী ব্যাটেলিয়ন তৈয়ারী হয় (১৯নং ব্যাটেলিয়ন)।

(২) An historical account of the Bengal Native Infantry (1757-1796) by Captain John Williams (London, 1817)

(৩) Mathew's

(১০) সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সিপাহী ব্যাটেলিয়ন "লাল পল্টনের" কথা সর্ব্বাগ্রে বলা হইয়াছে।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেশীয় সৈন্যদলের মধ্যে কয়েকটা ব্যাটেলিয়নের জন্মস্থান বাঙ্গালীর জন্মভূমি বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা ও চট্টগ্রাম। এই সকল স্থানে যে সিপাহী-দিগকে ভর্ত্তি করা হইয়াছে তাহারা ঐ ঐ স্থানের অধিবাসী অর্থাৎ বাঙ্গালী ইহা অনুমান করা স্বাভাবিক। দেশীয় সৈন্যদলের পূর্ব্বোক্ত ইতিহাসে অনেকগুলি ব্যাটেলিয়নের জন্মস্থান কানপুর, এলাহাবাদ, চুনার, বাঁকিপুর ইত্যাদি এইরূপ লিখিত হইয়াছে। সেখানেও অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত যে ঐ ঐ স্থান হইতে গৃহীত সিপাহীরা ঐ ঐ স্থানের অধিবাসী অর্থাৎ বিহার ও যুক্তপ্রদেশের লোক (হিন্দুস্থানী)। কিন্তু কোম্পানীর সেনাদলে বাঙ্গালী সিপাহীর অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার পথে বাধা আছে। প্রথম বাধা এই যে দেশীয় পল্টনের ইতিহাস যাঁহারা রচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই অনুমান করিয়া অথবা বলিয়া গিয়াছেন যে বাঙ্গালী সিপাহী ছিল না। অন্ততঃ ঐ সম্বন্ধে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ তাঁহারা পান নাই। ক্লাইভই ইংরাজদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম দেশীয় সিপাহী দ্বারা চাঞ্চল্য-কর ঘটনার সৃষ্টি করেন। ক্লাইভের সময়কার ইতিহাসের লেখকেরা এবং তাঁহার জীবনীকারেরা—তিনি যে বাঙ্গালী সিপাহী বাহিনী দ্বারা যুদ্ধ জয় করিয়াছিলেন—একথা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সিপাহী বিদ্রোহের সময় "বঙ্গীয় সেনাদল" (Bengal Army) বিখ্যাত হইয়া পড়ে। ইহার পূর্ব্বেও উক্ত সেনাদলের নাম ছিল। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহে নেতৃত্ব করিয়া "বঙ্গীয় সেনাদল" অধিকতর পরিমাণে চর্চ্চার বিষয়ীভূত হইয়া পড়ে। এই সেনাদলের ইতিহাসের আলোচনা করিতে গিয়া লেখকরা প্রায় সকলেই বাঙ্গালী সিপাহীর উল্লেখ করা অনাবশ্যক মনে করিয়াছেন; দু-একজন স্পষ্টই বলিয়াছেন যে উক্ত সেনাদলে বাঙ্গালী সিপাহী ছিল না। যথা—সার জন্ ষ্ট্রাচি (Sir John Strachey) বলিয়াছেন যে "বঙ্গীয় সেনাদলের" সিপাহীরা প্রধানতঃ অযোধ্যার ব্রাহ্মণ ও রাজপুত এবং উত্তর পশ্চিম (এখনকার আগ্রা-অযোধ্যা) প্রদেশের লোক হইতে গৃহীত। তিনি আরও মন্তব্য করিয়াছেন যে "বঙ্গীয় সেনাদল" এই নামটী ভ্রমাত্মক, কারণ এই সৈন্যদলে বাঙ্গালার অধিবাসী (বাঙ্গালী) একটাও ছিল না এবং ইহার একটী ক্ষুদ্র অংশ মাত্র বঙ্গদেশে স্থাপিত থাকিত। (৪)

মতামতের কথা ছাড়িয়া দিয়া দ্বিতীয় বাধার উল্লেখ করিতেছি।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর সেনাদল সম্বন্ধীয় যে নিয়মাবলী প্রবর্ত্তিত হয়, সেই সঙ্গে এই আদেশও প্রচারিত হয়—বিদ্রোহ ও বিনা আদেশে সেনাদল ত্যাগ (Mutiny & Desertion)—এই সম্বন্ধে যুদ্ধ বিভাগের নিয়মগুলি ফার্সি ও হিন্দুস্থানী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ঐ লিখিত নিয়ম পাঠ করিয়া মাসে একবার দেশীয় সৈন্যদিগকে যেন বুঝাইয়া দেওয়া হয়। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ঐ ইংরাজি নিয়মাবলীর পুনর্দর্শন (revision) ও পরিবর্দ্ধন হয় এবং উহার অনুবাদ ফার্সি ও নাগরী অক্ষরে ছাপাইয়া প্রত্যেক সিপাহী-পল্টনের নিকট প্রেরিত হয়। দেশীয় সেনাদলের দেশীয় সেনাধ্যক্ষদিগকে এবং সিপাহীদিগকে আদেশ দেওয়া হয় যে তাহারা যেন ঐগুলি পড়িয়া বা শুনিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, যদি উক্ত পল্টনে বাঙ্গালী সিপাহী থাকিত তবে সামরিক আদেশসকল ও নিয়মাবলী ফার্সি ও হিন্দুস্থানী ভাষার মত বাঙ্গালা ভাষায়ও কি অনুবাদ হইত না?

ফার্সি ও হিন্দুস্থানী (উর্দ্দু) ভাষায় এবং ফার্সি ও নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত নিয়মাবলী উত্তর ভারতের (বাঙ্গালার বাহিরের) হিন্দু ও মুসলমানগণের জন্যই প্রস্তুত হইতে পারে।

কোম্পানির পল্টনে বাঙ্গালী সিপাহীরা বিদ্যমান ছিল এবং সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল ইহা ঐতিহাসিক সত্য রূপে প্রমাণিত হইলে অনেক বাঙ্গালীই গৌরব বোধ করিবেন, সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে কোন সুযোগ্য ঐতিহাসিক যদি অধিকতর প্রমাণ ও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তবে তাহা বিশেষ আনন্দদায়ক হইবে। জড়-

(৪) India—its administration and progress-by Sir John Strachey (1903).

জ্ঞানের মত ইতিহাসও একটা প্রগতিশীল শাস্ত্র। একজন ধন যাহা প্রতিষ্ঠিত সত্য মনে করেন, পরে আর একজন আবিষ্কৃত প্রমাণ দ্বারা তাহা খণ্ডন করিতে পারেন।

কোম্পানির প্রাচীনতম সিপাহী-পল্টনগুলির মধ্যে "লাল পল্টন" সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। তাহার বিষয় অবলম্বন করিয়া অন্য কয়েকটা সিপাহী পল্টনের কথাও সংক্ষেপে লিয়াছি। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় একদল দেশীয় "সখের" সৈন্য (militia) গঠিত হয়। ইহাতে ৮টী "কোম্পানি" হয় (company); প্রত্যেক "কোম্পানিতে" ০ জন সিপাহী ছিল। পরে সংখ্যা-বৃদ্ধি করিয়া ১৬টী কোম্পানী" এবং প্রত্যেক "কোম্পানি"তে ১০০ একশত সিপাহী করা হয়। এই স্বেচ্ছাসৈনিকদল ... ও বাণিজ্যাদির সাহায্য করিত এবং বেতনভোগী সাধারণ সিপাহীদিগকে অনেক সময় বিশ্রামের অবকাশ দিত।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে আরও পাঁচটা "সখের" সিপাহী-পল্টন (Battalion) তৈয়ারী হয়। ইহারা সাধারণ সৈন্যদলের সঙ্গে যবদ্বীপে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল। Light Infantry Battalion of Bengal Volunteers নামক একটী দেশীয় সেনাদলের নামও পৃথকভাবে দেখা যায়।

এই সকল "সখের" সিপাহী-পল্টন কলিকাতায় সৃষ্ট। কিন্তু এই সিপাহীরা জাতিতে কি ছিল? বাঙ্গালী, না হিন্দুস্থানী?

বনফুল

২৬

চন্দ্রকান্ত তাঁহার খাসকামরায় একা বসিয়া তাঁহার নব-নির্ম্মিত একটি সেতারের আওয়াজ পরীক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় বহ্নিকুমারীর পাল্‌কি আসিয়া থামিল। উগ্রমোহনের উর্দ্দিপরা সিপাহী আসিয়া সেলাম করিয়া খবর দিল যে রাণীজি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়াছেন।

চন্দ্রকান্ত সেতার রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—"কে রাণী এসেছ নাকি? কোথা?" বলিয়া তিনি বাহিরের দিকে আগাইয়া আসিলেন। সিপাহীরা সরিয়া গেল এবং বহ্নিকুমারী পাল্‌কি হইতে নামিয়া অগ্রজের পদধূলি লইলেন। চন্দ্রকান্ত হাসিয়া বলিলেন—

"রাণী বহ্নিকুমারীর আজকাল দেখাই পাওয়া যায় না যে! আয় ভেতরে আয়!"

ভ্রাতা-ভগ্নী ভিতরে গেলেন।

বহ্নিকুমারী ভিতরে গিয়াই বলিলেন—"বাঃ, চমৎকার সেতারটা ত! কোথা থেকে আনলে দাদা?"

"তৈরী করালাম—এইখানেই। আওয়াজ মন্দ হয় নি।"

বহ্নিকুমারী সেতারটা তুলিয়া লইয়া টুং-টাং আওয়াজ করিতে করিতে কহিল—"বাঃ, বেশ সুন্দর হয়েছে ত!"

চন্দ্রকান্ত উপবেশন করিয়া বলিলেন—"একটা কিছু বাজা দেখি! অনেকদিন তোর বাজনা শুনি নি।"

বহ্নিকুমারী অগ্রজের দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিলেন।

চন্দ্রকান্ত আবার বলিলেন—"ভুলে গেছিস্ না কি সব? আগে ত তুই আমার চেয়ে ভাল বাজাতিস্। বাজা একখানা শোনা যাক্।"

"কি বাজাব?"

"যা তোর খুসী—"

বহ্নিকুমারী সেতারটা লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিয়া বলিলেন—"তুই যে সেই জৌনপুরির গৎটা আমায় দিয়েছিলি সেইটে বাজাই। বাজাব?"

"এই সন্ধেবেলা জৌনপুরি বাজাবি? আচ্ছা, বাজা!"

বহ্নিকুমারী জৌনপুরি বাজাইতে লাগিলেন। তাঁহার হাতের বাজুবন্ধের দোলক দুলিতে লাগিল। কঙ্কণের শিঞ্জিতের সহিত সেতারের ঝঙ্কার মিলিয়া জৌনপুরি নূতন মূর্ত্তি ধরিল—পুরুষ ওস্তাদের হাতে ইহা সম্ভব নয়। বহ্নিকুমারীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া চন্দ্রকান্তের মন অতীতে ফিরিয়া গেল। তখনও রাণী অনূঢ়া—নূতন সেতার

বাজাইতে শিখিয়াছে। গঙ্গাগোবিন্দকে বাজনা শুনাইবার জন্ত তাহার কি আগ্রহ! নানা ফন্দীতে, নানা ছুতায় গঙ্গাগোবিন্দকে সেতার শুনাইয়া দিবার জন্ত বাণী উন্মুখ হইয়া থাকিত! চন্দ্রকান্ত ইহা লইয়া বাণীকে কত বিদ্রূপই না করিয়াছেন।

বহ্নিকুমারী বাজনা শেষ করিয়া বলিলেন—"উঃ যা বড় তোমার সেতার। হাত ব্যথা হয়ে গেছে। তুমি একটা বাজাও দাদা—এবার।"

চন্দ্রকান্ত সেতার লইয়া বলিলেন—"শুনেছিস্, গঙ্গা-গোবিন্দ কাল কাশী চলে যাচ্ছে?"

"হ্যাঁ। আমাকে চিঠি লিখেছিল একটা! কালই যাবে? এত তাড়াতাড়ি?"

"ওর মাথায় একটা খেয়াল ঢুকলে ত আর রক্ষে নেই! প্রাকৃত শিখবে ঝোঁক চেপেছিল—শিখে তবে ছেড়েছে। এখন সংস্কৃতের ভূত কাঁধে চেপেছে! দেখা যাক্—কোথায় গিয়ে থামে!" বলিয়া চন্দ্রকান্ত সেতারের সুর মিলাইতে লাগিলেন। মিলাইতে মিলাইতে বলিলেন—"আমার আবার এমন অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে—কেউ ঠেকা না দিলে ভাল বাজাতে পারি না। তুই ঠেকা দিতে পারবি?"

"না, আমি পারব না" বলিয়া বহ্নিকুমারী একটু হাসিলেন। "আচ্ছা, তবে এম্‌নিই শোন। একখানা হাম্বীর বাজাই।" বলিয়া চন্দ্রকান্ত সুরু করিলেন। বহ্নিকুমারী বসিয়া শুনিতে লাগিলেন। বহুকাল দাদার বাজনা শোনা হয় নাই। চমৎকার হাত হইয়াছে ত! বহ্নিকুমারীর মনও অতীতে ফিরিয়া গেল। বৃদ্ধ ওস্তাদ আবিদ মিঞাকে মনে পড়িল। বুড়ার হাত কি মিঠা ছিল! আবিদ মিঞার কাছে বাণীর প্রথম হাতে খড়ি! প্রথম প্রথম মেজরাপে আঙুলে কত লাগিত—তারে হাত কাটিয়া যাইত। ছাতের ঘরটাতে একা বসিয়া সেই ডা রা ডা রা সাধা! তাহার পর ক্রমশঃ দুই একটা গৎ। গঙ্গা-গোবিন্দকে ডাকিয়া গৎ শোনান!...গঙ্গা-গোবিন্দ কাল চলিয়া যাইতেছে! বহ্নিকুমারী অন্তমনস্ক হইয়া গেলেন। চন্দ্রকান্তের সেতার থামিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন লাগল হাম্বীর?"

"বেশ—"

চন্দ্রকান্ত হাসিয়া উঠিলেন।

"এঃ—তুই সব ভুলে গেছিস্ দেখ্‌ছি। হাম্বীর নাম বলেই হাম্বীর? কেদার ধর্ত্তে পারলি না? এই দেখ—" বলিয়া তিনি আবার একবার একটু বাজাইলেন। বহ্নিকুমারী যে গঙ্গা-গোবিন্দের কথা ভাবিতেছিলেন তাহা না বলিয়া বলিলেন—"অনেক দিন চর্চ্চা নেই—"। ঠিক সেই সময় বাহিরে শব্দ হইল।

"চন্দ্রকান্ত আছো না কি? আসতে পারি?" বলিয়া গঙ্গা-গোবিন্দই ঘরে ঢুকিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন—"এ কি বাণীও যে এখানে। আমি কাল ভোরে তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাব ভাবছিলাম!" এমন অপ্রত্যাশিতভাবে গঙ্গা-গোবিন্দ আসিয়া পড়িবেন বহ্নিকুমারী তাহা কল্পনাও করেন নাই। হঠাৎ তাঁহার মুখটা ক্ষণিকের জন্ত বিবর্ণ হইয়া গেল। নিজেকে সামলাইয়া লইয়া তিনি বলিলেন—

—"কাল সত্যিই যাবে তাহলে!"

"হ্যাঁ। দেরী করে লাভ কি? স্বল্পং তথায়ুর্বহবশ্চ বিঘ্নাঃ!"

"বৃন্দাবন থেকে কোন খবর এল?"

"না"

কিছুক্ষণ তিনজনেই চুপ্ চাপ্।

গঙ্গা-গোবিন্দই প্রথমে কথা বলিলেন—"মনে রেখো তোমরা। নানাভাবে অনেক বিরক্ত করেছি তোমাদের।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন—"ভাখো বিনয় প্রকাশের স্থান-অস্থান আছে। সেটা ভুলে যাও কেন? সংস্কৃত পড়তে যাচ্ছ বলে মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি?"

বহ্নিকুমারী কিছু না বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

গঙ্গা-গোবিন্দ বলিলেন—"গ্রাম ছাড়বার সময় বুঝতে পারছি গ্রামের সঙ্গে সত্যিই একটা নাড়ীর যোগ আছে।"

চন্দ্রকান্ত কহিলেন—"তোমার মেয়ে জামাইদের সঙ্গে দেখা করে এসেছ? কি বল্লে তারা!"

"বিশেষ কিছু নয়। বিয়ে হলেই মেয়েরা পর হয়ে যায়। বাণী যেমন আমাদের পর হয়ে গেছে।"

বহ্নিকুমারীর মনে যে উত্তরটা আসিয়াছিল তাহা না বলিয়া তিনি বলিলেন—"তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে বটে সত্যিই পর হয়ে গেছি এবং পরস্পর!"

গঙ্গা-গোবিন্দ বলিলেন—"এইবার উঠি আমি। আমাকে আবার একটু গোছগাছ করতে হবে।" বলিয়া তিনি সত্য সত্যই উঠিয়া পড়িলেন। অতি সাধারণ কথা-

বার্ত্তার ভিতর দিয়া বিদায়ের পালা শেষ হইয়া গেল। যাইবার সময় তিনি বলিলেন—"ওহে তোমার ম্যানেজার অনেকক্ষণ থেকে বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছে।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন—"তাই না কি? আচ্ছা একটু বসুক।"

বহ্নিকুমারী বলিলেন—"তার দরকার কি? আমি ততক্ষণ পাশের ঘরে গিয়ে তোমার বইটইগুলো একটু দেখি!"

"—আচ্ছা—তাহলে ডেকে দিয়ে যাও।"

গঙ্গাগোবিন্দ চলিয়া গেলেন এবং বহ্নিকুমারী উঠিয়া চন্দ্রকান্তের পুস্তকাগারে প্রবেশ করিলেন!

২৭

কমলাক্ষ আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন খবর পেলে?"

"—আজ্ঞে না।"

"না, মানে? মাণিক মণ্ডলের খবর তাহলে ভুল?"

"খবর ভুল নয়। সে শুনে এসেছিল যে উগ্রমোহনবাবু গোলক সাকে যমঘরে নিয়ে যেতে বলেছিলেন। অথচ যমঘর বলে যে ঘর যমজঙ্গল আছে তার ভিতরকার খবর নেওয়া শক্ত। একপ্রকার অসম্ভব।"

"কেন?"

"সে ঘরে একটি লোহার দ্বার আছে এবং তা বাইরে থেকে তালাবন্ধ। ঘরে একটিও জানালা নেই। ঘরের দেওয়াল অত্যন্ত উঁচু। সুতরাং গোপনে সে ঘরের সম্বন্ধে কোন খবর সংগ্রহ করা শক্ত! অথচ মাণিক মণ্ডলের খবর সেই ঘরের মধ্যেই গোলক সা আছে। আজ প্রায় দশ দিন অতীত হয়ে গেল—কোন খবরই জোগাড় করতে পারলাম না।" চন্দ্রকান্ত চুপ করিয়া রহিলেন।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"অঘোর চক্রবর্ত্তী কোথা? তাঁর কাছে রামদীন্ সিপাহীর মারফৎ একটা চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলাম। লিখেছিলাম যে যম-ঘরের অনুরূপ একটি ঘর টাল-জঙ্গলে করাবেন বলে বাবুর ইচ্ছে হয়েছে—আপনি যদি যমঘরটা খুলিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন তাহলে আমরা ভিতরের মাপ-জোপ নিতে পারি।"

"কি উত্তর দিলেন তিনি?"

"তিনি বল্লেন যে যমঘরের চাবি মালিকের কাছে আছে। তিনি বৃন্দাবন থেকে ফিরে এলে সে ব্যবস্থা হবে।"

চন্দ্রকান্ত কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। তাহার পর কমলাক্ষকেই বলিলেন—"তাহলে এখন কি করা উচিত?"

কমলাক্ষ ভিজা-বিড়ালের মত চাহিতে চাহিতে বলিলেন—"পুলিশে খবর দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় দেখি না!"

"পুলিশে খবর দেবে?" বলিয়া চন্দ্রকান্ত আবার খানিকক্ষণ নীরব রহিলেন। তাহার পর আবার বলিলেন—"পুলিশে খবর দেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ভেবে পাচ্ছ না?"

"আজ্ঞে না। আমার মনে হচ্ছে গোলক সাকে আমরা যদি দু' একদিনের মধ্যে উদ্ধার না করতে পারি তাহলে সে বাঁচবে না!"

"বল কি?"

"আমার ত সেই রকমই মনে হয়। উগ্রমোহনবাবু তাকে মেরেছেন প্রচুর। তার ওপর আজ দশদিন ধরে সে ওই যম-ঘরে বন্দী অবস্থায় আছে। এক ফোঁটা জল বা একদানা খাবার তার পেটে পড়ে নি।"

"কি করে জানলে তুমি?"

"যমজঙ্গলে লুকিয়ে লোক মোতায়েন রেখেছিলাম যমঘরের উপর নজর রাখবার জন্য। দিবারাত্রি একজন লোক সেখানে ছিল। আজ থেকে অবশ্য আর নেই।" বলিয়া কমলাক্ষ আবার ভিজা-বিড়ালের মত চাহিতে লাগিলেন।

"যমঘরে গোলক সা আছে এ খবর ঠিক ত?"

"মাণিক মণ্ডলের তাই খবর। উগ্রমোহনবাবু এই হুকুম দিয়েছিলেন সে স্বকর্ণে শুনেছে।"

চন্দ্রকান্ত নীরবে আরও খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে একটি কথাই প্রবলভাবে জাগিতে লাগিল যে বিলম্ব করিলে গোলক সার মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে এবং মৃত্যু যদি হয় তাহার জন্য দায়ী তিনি। সুতরাং বিলম্ব করা অনুচিত। পুলিশে খবর দেওয়াটা যদিও তাঁহার মনঃপূত হইতেছিল না তথাপি তিনি বলিতে বাধ্য হইলেন—"আচ্ছা, যা ভাল বোঝ তাই কর তাহলে—"

কমলাক্ষ নমস্কার করিয়া বিদায় লইতেই গঙ্গাগোবিন্দ আবার ফিরিয়া আসিলেন—"ওহে মল্লিনাথের টীকা

তোমার আছে ? ওকি, তুমি অমন করে বসে আছ কেন ?”

চন্দ্রকান্ত হাসিয়া উত্তর দিলেন—“মহাবীর উগ্রমোহনের প্রতাপে অস্থির হয়ে গেলাম।”

“কি রকম ?”

“গোলক সাকে কোথা এক যম-ঘরে নিয়ে গিয়ে আট্‌কে রেখেছে আজ দশদিন। লোকটা অনাহারে সেখানে শুকিয়ে মরছে !”

গঙ্গাগোবিন্দ হাসিয়া উত্তর দিলেন—“সিংহ যে—বীরত্ব দেখাবেন বৈ কি ! মল্লিনাথের টীকা আছে তোমার ?”

“ছিল ত সবই। খুঁজে দেখে কাল পাঠিয়ে দেব। গোলক সার ব্যাপারে মনটা বড় দমে’ আছে এখন !”

গঙ্গাগোবিন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—“বাণী চলে গেল কখন ? বাণীর জন্য ভারি কষ্ট হয়। উগ্রমোহনের মত লোকের সহধর্ম্মিণী হওয়া নিশ্চয়ই সুখের নয় ওর পক্ষে—”

চন্দ্রকান্ত একটু চোখ টিপিয়া বলিলেন—“চুপ কর ! সে পাশের ঘরেই আছে।”

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন—“তাই না কি ? শুনতে পায় নি বোধ হয়। আচ্ছা আমি চল্লাম। মল্লিনাথটা খুঁজে দেখো।”

পাশের ঘরে দাঁড়াইয়া বহ্নিকুমারী সমস্ত শুনিয়াছিলেন। কমলাক্ষের কাহিনী, চন্দ্রকান্তের উক্তি এবং গঙ্গাগোবিন্দের মন্তব্য কিছু বাদ যায় নাই। তাঁহার বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল—“ধরণী দ্বিধা হও ! স্বামীর নিন্দা আর শুনিতে পারি না।” রাগে, ক্ষোভে, লজ্জায় তাঁহার মনের যে অবর্ণনীয় অবস্থা হইয়াছিল তাহার আভাস তাঁহার মুখেও ফোটে নাই যে তাহা নহে। তাঁহার পাতলা ঠোঁট দুটি কাঁপিতেছিল। গঙ্গাগোবিন্দ যখন তাঁহার স্বামীর সম্বন্ধে শ্লেষোক্তি করিলেন তখন তাঁহার ইচ্ছা করিতেছিল যে বাহির হইয়া আসিয়া মুখের মতন একটা জবাব দেন ! কিন্তু তাহাতে উগ্রমোহন সিংহের পত্নীর সম্মানলাঘব হইবে এই আশঙ্কায় তিনি তাহা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ পুড়িয়া যাইতেছিল। যম-ঘর ? যমজঙ্গল কাছারিতে বনভোজন উপলক্ষে গিয়া তিনি যম-ঘর দেখিয়াছিলেন বটে। তখনও তাহাতে তালা লাগান ছিল। সে তালার চাবিও বোধ হয় বহ্নিকুমারী খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবেন। উগ্রমোহন সিংহের একটা দেরাজের মধ্যে যে চাবির গোছা আছে তাহার মধ্যে একটা বড় চাবির গায়ে একটা কাগজ আঁটা আছে বটে ‘যম-ঘর’ !

চন্দ্রকান্ত ডাকিলেন—“বাণী—এখানে খেয়ে যাবি নাকি ?” যেন কিছুই হয় নাই এইভাবে হাসিয়া বহ্নিকুমারী বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিলেন—“না ! আমি এখনি চল্লাম। আমি তোমার এই বইটা নিয়ে চল্লাম। সাদীর অনুবাদ।”

“আচ্ছা।”

বহ্নিকুমারী চলিয়া গেলেন।

চন্দ্রকান্ত নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

বহ্নিকুমারীর পাল্‌কি চন্দ্রকান্তের বাড়ীর সীমানা ছাড়াতেই বহ্নিকুমারী আদেশ দিলেন—“গঙ্গাগোবিন্দের বাড়ী চল।” গঙ্গাগোবিন্দ আহারাদি শেষ করিয়া শুইবার জোগাড় করিতেছিলেন এমন সময় বহ্নিকুমারীর পাল্‌কি তাঁহার দ্বারে থামিল। উর্দ্দিপরা সিপাহী ভিতরে গিয়া নিবেদন করিল—“রাণীজি সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।”

গঙ্গাগোবিন্দ বিস্মিত হইলেন। বাহিরে আসিয়া বলিলেন—“এস বাণী, এস ! কি খবর ? এলে যে আবার।”

বহ্নিকুমারী নামিয়া ভিতরে গেলেন এবং সংক্ষেপে বলিলেন—“তোমায় প্রণাম করতে এলাম। তখন ভুলে গিয়েছিলাম।” মুখে বিচিত্র হাসি !

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন—“সে কি ?”

“আর দেখা ত না-ও হতে পারে”—বলিয়া বহ্নিকুমারী গঙ্গাগোবিন্দের পদধূলি লইলেন।

বিস্মিত গঙ্গাগোবিন্দ সঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বহ্নিকুমারী আবার হাসিয়া বলিলেন—“আর একটা ভুলও তোমার ভেঙে দিতে এলাম। আমার স্বামী আমার গর্ব্বের বস্তু। তাঁকে পেয়ে আমি যে শুধু সুখী হয়েছি তা নয়—ধন্য হয়েছি। দাদার কাছে তাঁর সম্বন্ধে যা শুনে এলে তা সমস্ত মিথ্যে কথা। পুলিশ গিয়ে কাল সকালেই বুঝতে পারবে যে গোলক সাকে সেখানে আট্‌কে রাখা

হয় নি—ওটা অল্পবুদ্ধি কমলাক্ষবাবুর বানানো গল্প। তুমি ত কাল থাকবে না—তোমাকে তাই জানিয়ে দিলাম। কাউকে বোলো না যেন!"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন—"না না, আমি কাউকে কিছু বল্‌ব না। দরকার কি আমার?"

বহ্নিকুমারীর চক্ষে একটা বিদ্যুৎ-দীপ্তি খেলিয়া গেল। তিনি আবার একটু হাসিয়া বলিলেন—"চললাম তাহলে।" বলিয়া দ্বারের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া গেলেন। তাহার পর ফিরিয়া বলিলেন—"আমার একটা কথা রাখবে?"

"কি কথা?"

"কিছুই নয়। শুধু মনে রেখো যে মানব জন্মটা শুধু মহত্ত্ব আস্ফালন করবার জন্যই আমরা পাই নি। দেবতাই পাথরের হয়—মানুষের মধ্যে রক্তমাংসের দুর্ব্বলতা থাকা সব সময় দোষের নয়। মনে রেখো কথাটা। চল্লাম—" বলিয়া বহ্নিকুমারী বাহিরে গিয়া একেবারে পাল্‌কিতে উঠিয়া বসিলেন। নির্ব্বাক গঙ্গাগোবিন্দ বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বহ্নিকুমারীর পাল্‌কি চলিয়াছে।

যদি কেহ তখন পাল্‌কির দরজা খুলিয়া দেখিত তাহা হইলে দেখিতে পাইত যে রাণী বহ্নিকুমারী উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছেন।

ক্রমশঃ

অচল টাকা ও নকল টাকা

উর্ম্মিলা সেন বি-এ

টাকাটি হাতে এলেই যার চক্ষু লজ্জা নেই সে বাজিয়ে দেখে, যার একটু চক্ষু লজ্জা আছে সে আড়ালে ছল করে একটু দেখে নেয়, যে একেবারে ভোলানাথ সে পকেটে ফেলে বাড়ী নিয়ে আসে; এসে খারাপ টাকা আনার দরুণ হয়ত গৃহকর্ত্রীর কাছে দুর্ব্বাক্য শোনে—আর সবাই তাকে বোকা সাব্যস্ত করে। বাড়ীর চাকর যদি নোট ভাঙাতে গিয়ে না দেখে অচল টাকা আনে তবে বাড়ীর কর্ত্তা ও গিন্নির বিরক্তি ও অসন্তোষের অবধি থাকে না।

আজকাল পথে ঘাটে প্রত্যেক কাজেই সকলকে অচল টাকা নিয়ে ভুগতে হচ্ছে। অচল টাকা নেবার কারুর ইচ্ছা নেই। তবু কেউ না চিনেই নেয়, কেউ জেনেও নিতে বাধ্য হয়। নানা রকমে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অচল টাকা হাতে চলে আসে। না চিনে অচল টাকা নিয়ে বেরবার কত রকম বিপদ। কোনও দোকানদার নেবে না, কোন জিনিষ কিন্‌তে পারবে না। হয়ত ট্রামে উঠেছ জরুরী কাজ, পকেটে একটা টাকাই ছিল। ট্রাম কন্‌ডাক্‌টার সেটা ফেরৎ দিল; তখন সুড় সুড় করে নেমে আসতে হ'ল; সমস্ত দিন সব কাজ মাটি। যে দুর্ভাগা কোনও রকমে বাজারে অচল টাকা চালিয়ে উঠ্‌তে পারে নি তার আর দুর্গতির শেষ নেই।

অচল টাকা চালাবার জন্য কত ছলই না লোকে করে। কাউকে টাকা দাও—চট্ করে ট্যাক থেকে খারাপ টাকা বের করে বদ্‌লে নেবে এবং সেই টাকা তোমায় ফেরৎ দিয়ে ভাল টাকা দাবী করবে। তোমারও যদি খেয়াল না থাকে তবে খারাপটি নিয়ে ভাল টাকাটিই দেবে। অনেক সময় যে ছল করে টাকা চালাবার চেষ্টা করে সে ধরা পড়ে যায়। তোমার ঠিক মনে আছে যে তুমি জর্জ্জের টাকা একজনকে দিয়েছ সে হয়ত অচল বলে ফেরৎ দিলে ভিক্টোরিয়ার টাকা। তখন তার ভাগ্যে জোটে চড়, চাপড়, কাণমলা, গালাগালি ইত্যাদি। এরকম ভুল শুধু সেই লোকেরই হতে পারে—যে না বুঝে লোক ঠকাতে চায়। লোক ঠকাতে হোলে বহুসংখ্যক লোকের চেয়ে অধিক বুদ্ধি থাকা প্রয়োজন। অধিকবুদ্ধিবিশিষ্ট ঠগের অভাব বোধ করি কমই আছে; সুতরাং টাকার সম্বন্ধেও আমাদের আশঙ্কা অনেক আছে। বহু বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাদের খারাপ টাকা আমাদের দিয়ে আমাদের ভাল টাকা

নিয়ে যাবে। তাদের ডবল লাভ, আমাদের ডবল ক্ষতি।

এই অচল টাকা চালাবার জন্য ভদ্রলোকরাও নানা উপায় উদ্ভাবন করে থাকেন। সচরাচর অচল টাকা চালাবার বিশেষ সুবিধাজনক স্থান হচ্চে সিনেমা। ভীড়ের মধ্যে টিকিট কেনবার সময় বোধ হয় অনায়াসে অচল টাকা দিয়ে দিলাম—সে অম্লানবদনে নিয়ে গেল। অচল টাকা চাঁদা দিলাম, বৌএর মুখ দেখে এলুম, কোনও ভাল মানুষ দুঃস্থকে কিছু দিতে হবে—তাকে কিছু দিলাম। ডাক্তারের ভিজিটে—উকিলের ফিতে—আরও কত রকমে অচল টাকা চালিয়ে দিই।

এর থেকে দেখা যাচ্ছে যে অচল টাকা থাকার দরুণ একদল দুষ্টু লোক তাদের ঠকানোর ব্যবসাটা বেশ জাঁকিয়ে তোলবার ব্যবস্থা করছে। আর ভদ্রলোকদের মধ্যেও অচল টাকা চালাবার জন্য একটু নিম্নতর ভাব মনের মধ্যে এসেছে। উভয়েই সমাজ ও দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। অচল টাকা সমাজে ক্ষতি করছে—গৃহে আনছে অশান্তি বিবাদ কলরব ইত্যাদি।

বড় বড় সহরে অচল টাকা চালাবার অসুবিধা কম। কোনও প্রকারে যদি বাজারে না চলে তবে বিস্তর ব্যাঙ্ক আছে ট্রেজারি আছে—চালালেই হয়। কিন্তু এরা শুধু "বিকৃত মুদ্রা"ই নেবে (Defaced Coin, যা এককালে ভাল টাকাই ছিল ; কিন্তু এখন বিকৃত হওয়ার দরুণ অচল হয়েছে)। খারাপ টাকা (Base Coin) না নিয়ে তারা যে জাল করার কাজকে উৎসাহিত করে না এটা খুবই ভাল কথা। কিন্তু সময় সময় মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক ও ট্রেজারিতে এই বিকৃত মুদ্রাও নিতে চায় না।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক ছেড়ে শুধু অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেখতে গেলেও অচল টাকার অনেক অসুবিধা আছে। একথা অকাট্য সত্য যে খারাপ মুদ্রা শীঘ্রই ভাল মুদ্রাকে বাজার থেকে বিতাড়িত করে। এই কথার সত্যতা আমরা আমাদের নিজেদের কার্য্যকলাপ থেকেই জানতে পারি। একটি অচল টাকা হাতে এলেই প্রাণ অস্থির। যতক্ষণ না তাকে সরাতে পারছি ততক্ষণ অশান্তির আর শেষ নেই। যেমন করেই হোক্ টাকাটি চালিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত। কিন্তু টাকাটি আমার ঘাড় ছেড়ে নামল বটে, বাজার থেকে ত অদৃশ্য হল না। যে তাকে পাবে সে ওকেই আগে চালাবার চেষ্টা করবে। এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে সে হয়ত আমারই ঘাড়ে আবার চাপবে। অচল টাকা থাকলেই ভাল টাকার খরচ কমে। ভাল জিনিষটিকে সকলেই আদর করে কাছে রাখতে চায়। যদি এভাবে বেশী দিন শুধু খারাপ টাকাই চলতে থাকে তবে অবস্থাটা যে কেমন হবে তা বিশেষ চিন্তার যোগ্য।

অচল টাকার দরুণ দেশের দরিদ্র সম্প্রদায়ই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দরিদ্র কৃষক হয়ত ধান বিক্রী করে পাঁচটি টাকা পেলে তার মধ্যে যদি একটিও অচল হয় তবে তার ক্ষতিটা যে কত বড় তা সহজেই অনুমান করা যায়। একটি টাকার মূল্য ওর কাছে অনেক বেশী। ধনী ব্যক্তির একটা ছেড়ে পাঁচটা অচল টাকা বেরলেও বিশেষ ক্ষতি নেই।

এ হেন অনিষ্টকর যে অচল টাকা তার প্রতিকারের জন্য তিনটি উপায় আছে। প্রথম, হচ্ছে যথেষ্ট পরিমাণে পূর্ণ ওজনের মুদ্রা তৈয়ারী করে বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া। দ্বিতীয়, সাধারণ আদানপ্রদানের জন্য অন্য সমস্ত রকম মুদ্রার ব্যবহার আইন দ্বারা বন্ধ করে দেওয়া। তৃতীয়, বিকৃত মুদ্রার বিনিময়ে পূর্ণ ওজনের নূতন মুদ্রা জনসাধারণকে দেওয়া। এই তিনটি কাজই গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য। ভারত সরকারের আইনে এই তিনটি পন্থাই অবলম্বন করিবার ব্যবস্থা আছে। তবে টাকার মূল্য ঠিক রাখার জন্য সরকারকে মুদ্রার সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। তাতে হয়ত অচল টাকা সরাবার জন্য যত পরিমাণে নূতন মুদ্রা দরকার ততটা হয়ে উঠতে নাও পারে। তবু গবর্ণমেণ্ট অচল টাকার প্রচলন বন্ধ করবার জন্য যে চেষ্টা করেন সেটা বোধহয় জনসাধারণ জানে না। টাকা জাল করার বিরুদ্ধে এবং এই জাল টাকা চালাবার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে আইনও আছে যথেষ্ট। তবু ত নকল টাকায় দেশ ছেয়ে গেল। আমাদের দোষেই এটা চলছে। ভবিষ্যতে যাতে আর জাল টাকা না হয় এবং আরও জাল টাকা বাজারে না আসে—তার বন্দোবস্তও সরকার খুব কড়া আইনের সাহায্যে করতে পারেন। কিন্তু যে টাকাগুলো বাজারে ছড়ান রয়েছে সেগুলিকে সরাবার কি উপায় হবে? এক হতে পারে যদি গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেন—যে খারাপ টাকা পাবে সে যদি পুলিশের কাছে ঐ টাকা জমা দেয় তবে ১৲ টাকাই

পুরস্কার পাবে। কিন্তু এতে গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি। এর উচ্ছেদ শুধু আমাদের সততার উপর নির্ভর করে। খারাপ টাকা পেলেই সেটিকে আমরা ট্রেজারিতে জমা দিয়ে আসতে পারি; সেখানে সেটাকে নষ্ট করে ফেলা হয়। কিন্তু যেখানে একটু চেষ্টা করলেই নকল টাকাটি চালানো যায় সেখানে এই টানাটানির বাজারে আমরা আমাদের নিজেদের সততার উপর নির্ভর করতে পারি না—কেননা অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হতে কেউই চায় না। অতএব আমরা জ্ঞানীজনের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি, তাঁরা যেন এর জন্য একটি সুব্যবস্থার চিন্তা করেন।

বিকৃত মুদ্রার কথা আরও কিছু বলার আছে। সরকারের নিয়ম আছে যে যদি কেউ ট্রেজারিতে অথবা মিণ্টে বিকৃত মুদ্রা এনে ভাল মুদ্রা দাবী করে তবে তৎক্ষণাৎ তাকে নূতন মুদ্রা দিতে হবে। কিন্তু ভারতবর্ষে এ ব্যবস্থা খুব সুন্দরভাবে এবং সুবিধাজনকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। ব্যাঙ্কে বা ডাকঘরে অনেক সময়েই বিকৃত মুদ্রা নেয় না। গবর্ণমেণ্টের উচিত ব্যাঙ্ক, ডাকঘর ও রেলওয়ের উপর খুব কড়া হুকুম দেওয়া যে তারা যেন ঐ টাকা নেয়। রেলের পার্শ্বেল-ক্লার্ক টিকিট-কলেক্টর ইত্যাদি সব কর্ম্মচারীদের আসল ও নকল টাকা চেনবার জ্ঞান থাকা চাই। পোষ্ট অফিসের কর্ম্মচারীদের বিশেষ করে পিয়নদের এই জ্ঞান থাকা আবশ্যক। নইলে অনেক সময় তারা নকল টাকা নেয়; নয়ত যখন ভিঃ পিঃ বা পার্শ্বেল আনে তখন টাকার পর টাকা ফিরিয়ে দিয়ে গৃহস্থকে উদ্‌ব্যস্ত করে তোলে। ভাল মুদ্রার পরিবর্ত্তে যে বিকৃত মুদ্রা সরকার গ্রহণ করেন সেটা গলিয়ে আবার কাজে লাগিয়ে নেন। তাঁরা যে টাকায় ৭ আনার রূপা দিয়ে ষোল আনা দাম ঠিক করে ন' আনা লাভ করেন সেই নয় আনার তহবিল থেকে এর ক্ষতিটা পূরণ করে নিতে পারেন।

দ্বিতীয় অসুবিধা হচ্চে যে ট্রেজারি কেবল বড় সহরেই থাকে। এতে গ্রামের লোকদের বড় অসুবিধা। তারা তাদের অচল টাকার বিনিময়ে ভাল টাকা পায় না। যদি গ্রামের থানায় থানায় ট্রেজারির মত টাকা বিনিময়ের ব্যবস্থা করা যায় এবং যদি টাকা চেনবার ভাল লোক সেখানে নিযুক্ত করা যায় তবে খানিকটা অসুবিধা দূর হয়। কিন্তু এরকম পন্থা সরকারের পক্ষে যে খুব সুবিধাজনক হবে তা বলা যায় না। আবার যদি প্রত্যেক মাসের কোনও বিশিষ্ট তারিখে টাকা বিনিময় হবে বলে ঘোষণা করা হয় তাহ'লে চারিদিক থেকে লোক এসে সহরের ট্রেজারিতে টাকা বিনিময় করতে পারে অথবা গ্রামেও এরকম বিনিময়ের ব্যবস্থা হতে পারে। এই ব্যবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক নয়। ট্রেজারিতেও সব সময়ে বিকৃত মুদ্রা গ্রহণ করা হয় না। আইনের তেমন জোর নেই। সব গোলমাল চুকে যেত যদি মুদ্রাটি সোনার হত। তবে তার ধাতুই তার মূল্যের পক্ষে যথেষ্ট হ'ত এবং সেটা বিকৃত হলেও তাকে নিতে সাধারণ এবং সরকার কেউই আপত্তি করত না।

আমাদের দুরকম অসুবিধা, একত টাকাটি রূপার—অপর এটি 'নিদর্শক' মুদ্রা—(Token coin)। প্রকৃতপক্ষে এর ধাতব মূল্য অতি সামান্যই। এর জন্য জনসাধারণ আকৃষ্ট হবে না। যখন স্বর্ণমান নেই তখন সরকারের কর্ত্তব্য কোনও উপায়ে এই বিনিময়ের ব্যাপারটা সহজ করা।

যে টাকা মানুষের এত বড় বন্ধু তার রাজ্যে এমন গোলযোগ উপস্থিত হলে ত মানুষের দিন চলে না। দেশের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা ও গবর্ণমেণ্ট এর উপায় করে অচলটাকার হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করুন এই প্রার্থনা।



'হাজারিবাঘ' আর নেই

শ্রীশচীন্দ্র মজুমদার

ভারতীয় গেজেটিয়রের পাতায় অনুসন্ধান করলে অবশ্যই দেখা যাবে যে হাজারিবাগ জেলা ও শহরটি অত্যন্ত প্রাচীন। ঐ শহরের এই বিশিষ্ট নামেরও একটা কারণ আছে। কিন্তু আমি গেজেটিয়র পড়িনি, কোন ভল্যুমে এ কথার সন্ধান পাওয়া যাবে তাও আমার জানা নেই; কারণ আমার বিশ্বাস যে ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করা ভদ্রমহিলার পক্ষে অশোভন। তবুও হাজারিবাগ নামটার ওপর আমার মনের টান আছে সেই জন্যই এই গল্প বলা।

গিরিডি-পচম্বার বিখ্যাত ডায়ার সাহেবকে চোখ দেখাতে গিয়ে আমি প্রথম হাজারিবাগের প্রতি আকৃষ্ট হই। নামটার উৎপত্তি বিষয়ে অনুসন্ধান করতে আমার মনের গবেষণাবৃত্তি জেগে ওঠে। প্রথমে মনে হয় হাজার টিকাইতের অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারের বাস বলে ওই নামটা হয়েছে; কথাটা মনে লাগল না। হাজার হাজার আম্র-কাননের কথা মনে হল, কিন্তু 'বাগ' কথাটার ব্যবহার এদেশে হবার কোন কারণ নেই; কারণ এদেশে পূর্ব্বকালে মুসলমানবিজয়ের কোন প্রভাব হয়নি, এখনো এটা মুসলিম-অধ্যুষিত দেশ নয়। মুসলমান যা আছে তারা এখানকারই আদিম নিবাসী, কোন কালে তাদের ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয়নি। এই জেলাতে সুবিখ্যাত ভেল্‌ওয়ারা জঙ্গল আছে মনে পড়ায় আমার তৃতীয় তর্কের সূত্র হল—ব্যাঘ্র, শার্দ্দূল, শের, টাইগার। কিন্তু এখানে ত বাঘকে চলতি ভাষায় 'হুঁড়ার' বলে! হাজারের সঙ্গে ওই চতুষ্পদের কোন সম্পর্ক থাকলে স্থানীয় ভাষার কল্যাণে শহর ও জেলার নাম 'হাজারহুঁড়ার' হওয়া উচিত ছিল। বলা বাহুল্য অচিরেই পঙ্গু গবেষণা নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হল।

কিন্তু বহুকাল পরে আমার এ সমস্যার হঠাৎ সমাধান হয়ে গেল—হাজারিবাগ শার্দ্দূল সম্পর্কীয়ই বটে। এদেশ সাঁওতালপ্রধান না হয়ে কবিপ্রধান হলে কেবল শার্দ্দূল বিক্রীড়িত ছন্দই শোনা যেত।

এ সম্বন্ধে প্রমাণের কথা জানতে হলে আপনাদের অনুগ্রহ করে আমার পারিবারিক কিছু কথা শুনতে হবে।

কোলকাতা থেকে তুফান মেলে ফিরছিলাম ও হাজারিবাগ দেখার মোহে জানলায় মুখ রেখে বসেছিলাম। সেই পুরাণো রোড ষ্টেশন, কিন্তু পুরাণো নাম কি হল? লেখা রয়েছে ন'শো নিরানব্বই বাঘ। হঠাৎ কারণটা মনে পড়ে গেল। স্বামীও লক্ষ্য করছিলেন; মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—হাঁগা, সেই থেকে? চোখ নীচু করে তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তিনি কি ভেবে আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি নূতন টাইম-টেবলের শহর বর্ণনার পাতা উল্টে দেখলাম, এই ত রয়েছে—৯৯৯ বাঘ। নাম পরিবর্ত্তনের কারণ এই প্রদেশের প্রাণহন্তারক, দুর্দ্ধর্ষ হাজারটি বাঘের একটিকে বহু শ্রমে হত্যা করেছেন মিষ্টার কল্যাণ ব্যানার্জি; মৃত শার্দ্দূলের আইডেন্টিটি ডিস্কের নম্বর ছিল সহস্রতম, তারিখ ৩রা জানুয়ারী ১৯৩৩ সাল, রাত্রি ১০টা ৫১ মিমিট।

আবহমান কাল থেকে বিবাহের পথ দিয়ে সাধারণ নারী প্রেমের পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে আসছে, আমি প্রবেশ করলাম জীবহত্যার পরিমণ্ডলে। যেদিকে কাণ ফেরাই কেবল শুনি হাঁস, কাদাখোঁচা, সারস, বয়েস, চীল, চিলের কথা; অকৃতজ্ঞ কত পাখী পাঁচ নম্বর গুলিতে বিদীর্ণ ডানা নিয়েও নিরাপদ দূরত্বে উড়ে চলে গেছে; কত হাঁস বিদারিত বক্ষে জলের তলে ডুবে ফাঁকি দিয়েছে। যেখানে দৃষ্টিপাত করি—দেখি পুস্তকের সমারোহ, কোনটায় migratory birdsএর স্বভাব বর্ণনা, কোনটায় বা বড় জন্তু শীকারের উন্মাদ-করা কাহিনী। চারিদিকে কাগজে আঁকা প্ল্যান; কোনটা মাচানের, কোনটা নদীর চরের, কোনটা বা জলা-ভূমির। কোথাও নিখুঁত হিসাবের তালিকা, কোন জেলায় beaters লাগাতে কত খরচ লাগে ইত্যাদি।

যখন এই ভালমানুষ, কোমলপ্রাণ, মৃদুভাষী স্বামীর মুখে উচ্ছ্বসিত ভাষায় তাঁর Winchester Repeater, Paragon ইত্যাদির প্রাণহরণ করবার ক্ষমতার বর্ণনা শুনতাম তখন মনে হত ওঁর মনে কত যুগ-যুগান্তরের বীর যোদ্ধা জেগে আছে। জন্ম জন্মান্তর ধরে ইনিই একদিন

পুরুরাজের হয়ে সেকেন্দারকে বাধা দিয়েছেন, অশোকের সঙ্গে দাক্ষিণাত্য বিজয় করেছেন, মহমুদ গজনীর সঙ্গে সোমনাথ ধ্বংস করেছেন, শের শাহের পক্ষ নিয়ে কলিঙ্কর অবরোধ করেছেন, মাসের পর মাস ঔরঙ্গজেবের বাহিনীর সহায় হয়ে মাহ্‌রাটা মাওলী তাড়িয়েছেন, সিরাজোদ্দৌলা মীরকাসিমের সৌভাগ্যসূর্য্য এঁরই হাতে অস্তমিত হয়েছে, ইনিই মুদকী ফিরোজশাহ্‌ চিলিয়ানওয়ালায় ইংরাজ সৈন্যের বিপক্ষে লক্ষ্যভেদের পাল্লা দিয়েছেন! গত যুদ্ধেও হয়ত কিছু করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তখন কলেজে আইন মুখস্থ করতে রত ছিলেন। হায়! আজ জাতীয় অধোগতি, আর্মস্‌ অ্যাক্ট্‌, সভ্যতা, বার বার জন্ম-পরিগ্রহের পরিবর্ত্তনের কারণে তাঁর অবশিষ্ট উদ্দীপক অগ্নি গগনবিহারী পক্ষীকূল ও বনচারী শ্বাপদের প্রতি বর্ষিত হচ্ছে। কালের তুলনায় আর কেউ কি এত বড় উপহাস করতে পারে!!

বাড়ীতে একটা গাড়ী আছে তাতে চড়লে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে; মনে হয় সেটা সহস্র নিরীহ পাখীর শেষ নিশ্বাসের তাপে উত্তপ্ত। তার পিছনে বিরাট একটা ভারবাহী ক্যারিয়র, কোন কল্পিত দিনে তাতে মৃত শার্দ্দূল বা ভল্লুক বা বরাহ বাহিত হয়ে আসবে। ভিতরে অসংখ্য চামড়ার-তৈরী বাঁধবার পেটি বন্দুক বাঁধার; কতকি ঝোলাবার। এ সকল ধারণা নূতন, বাঁতুজ্যে মশায়ের টিকারীরাজের হাণ্টিং কেবিনে শিকারগাড়ী দেখে আসার ফল। পঞ্চাশ হাজারী গাড়ীর অভাব শ্রীরামচন্দ্রের যুগের শ্রীফোর্ডই পূর্ণ করেছে। হায়রে গাড়ী। তবুও গাড়ীটার দয়ামায়া আছে; আপনার জীর্ণ দেহ নিঃসারিত বিপুল শব্দে খগকুলকে উচ্চ শূন্যে ও শ্বাপদকুলকে গভীরতর অরণ্যে প্রেরণ করে নিরাপদ করে।

শিকার, শিকার, শিকার!! ছুটিতে শিকার, কামাইয়ে শিকার, ক্রেঞ্চ-লীভে শিকার, বান্ধবালয়ে শ্বশুরালয়ে সর্ব্বত্র শিকার। কেবল কোলকাতায় ও বাতিক পূর্ণ করবার উপায় নাই। স্বামী ট্রামকে ডিনোসর, বাসকে ম্যাষ্টোডন, আর গরীব রিকশ'কে প্রাগৈতিহাসিক গণ্ডার বলে শিকার করেন না, কারণ অত মোটা কাঁচের চশমাতেও ট্রামকে ট্রাম, বাসকে বাস ও রিকশ'কে রিকশ' বলেই মনে হয়। কোলকাতার বিষয়ে আমি একান্ত অজ্ঞ, একদিন বোকার মত বলে ফেলেছিলাম—একবার Winchesterটা নিয়ে গড়ের মাঠে গেলেও ত' পার, ট্যাক্সিডারমিষ্ট বেচারী মাসে মাসে এসে ফিরে যায়! আমার ধারণা ছিল সুন্দরবন পার হলেই গড়ের মাঠ, বাঘ বাইসন নিশ্চয়ই সেখানে বায়ু সেবন করতে আসে। আর ধারণা ছিল ফোর্টবিলিয়মের পরিখায় আদিগঙ্গায় ঘড়িয়াল ভর্ত্তি। টিনের বাক্সও ওখানকার জলে ডোবালে আপনা-আপনি ক্রোকোডাইল চামড়ার পোর্টম্যাণ্টো হয়ে ওঠে—সেখানে কুমীর মারা কি কষ্টসাধ্য? স্বামী সেদিন আমার অজ্ঞতার কোন সম্মান করেননি। বড্ড রাগ করেছিলেন, শিকারীর নীরব রাগ।

আমাদের গাড়ীতে সহস্র মরণশীল পাখীর শেষ নিশ্বাসের যে তাপের কথা বলেছি তা আমার কল্পনা। নিত্যকারের সজেশ্চন্‌ ওটাকে আমার কম্‌প্লেক্সে দাঁড় করিয়েছে। সত্য কথা এই যে আজ পর্য্যন্ত অসংখ্যবার স্বামীর শীকার যাত্রার আয়োজন আমিই করে দিয়েছি, কিন্তু কোনদিন তাঁকে পক্ষ বা রোম বিশিষ্ট কোন জীবিত বা মৃত প্রাণী আনতে দেখিনি। যা আসত তা ওঁর অধিকতর ভাগ্যবান বন্ধু-বান্ধবের উপহার। ভক্তিমতী স্ত্রীর হাসা অনুচিত, কোনদিন আমি হাসিনি; বরং চাকরকে সরিয়ে দিয়ে নিজে ওঁর গেটার্স মার্চ্চিং বুট খুলে দিয়েছি, বন্দুক খুলে গানকেসে ভরেছি, কার্ত্তুজ গুণেগেঁথে তুলে রেখেছি। কিন্তু তবুও আমি অপরাধ করেই ফেলতাম।

নূতন বিবাহের পর স্বামী উৎসাহ করে আমাকে বন্দুক চালাতে শিখিয়েছিলেন, সে বিদ্যা একদা কাজে লাগাবার সুযোগ হল। শাশুড়ী বড়ি দিয়ে কাকের উপদ্রব বাড়িয়ে ছিলেন; আমাকে বল্লেন—বৌমা কাছাকাছি বসে চুল শুকোও। আমি নিজে কালো বলেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক—কাকগুলো ছিল আমার দু'চোখের বিষ। একনলা একটা ছোট বন্দুক আর ওঁর একটা ফ্ল্যাশ্‌ লাইট নিয়ে আমি পাহারা দিতে বসলাম। হোক দুপুর, যদি কাক মারতে হয় ফ্ল্যাশ্‌ লাইট ফেলেই মারব; কারণ উনি বলেন ও তীব্র আলোয় জানোয়ার হকচকিয়ে গিয়ে খানিকক্ষণের জন্য স্থির হয়ে থেকে নির্ভুল নিশানা দেয়। পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে দেখি স্বামী; কোন বিশেষ রন্ধনপাত্রের মত মুখ করে বন্দুক ও নিশানী আলো দুইই কেড়ে নিয়ে গেলেন।

কোন মহিলা পল ডি কক্ পড়েছেন একথা আজকের বে-পরোয়া যুগেও স্বীকার করা অন্যায়। আমি কিন্তু পড়েছিলাম। একদিন একটা গল্প পড়ে মুগ্ধ হয়ে ওঁকে পড়তে দিছলাম; ফলে একমাস আমার নিঃসঙ্গ অবস্থায় কেটেছিল; গল্পটা এই—কোন এক ব্যক্তির শিকারের খুবই সখ ছিল। ফ্রান্সে শিকার করা মানে, হয় পাখী, খরগোস, নয়ত শিয়াল মারা। ভদ্রলোকের আবার কুকুর পোষার সখও ছিল অনন্যসাধারণ। শিকার করতে গিয়ে সে কখনো শুধু হাতে ফিরত না, তার কাঁধে ঝুলত তারই গুলিতে মৃত তারই কুকুরটি। আবার সে কুকুর কিনত এবং আবার সে সেই কুকুরের মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে শিকার থেকে বাড়ী ফিরত।

ওঁর বন্ধু-সভার আলোচনা কাণে আস্ত—এবারকার অভিযানে পাখীগুলো শিকারের সময়ের পূর্ব্বেই ভোর না হতেই পালিয়েছে। অন্য অভিযানে পাখী-নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে রৌদ্র ওঠার পরও জলে নেমেছে। একবার গুলি খেয়ে আপাতদৃষ্টিতে মৃত এক বুনো হাঁস জলে পড়েছিল, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক কোমর জলে নেমে তার বিস্তৃত ডানার প্রান্তটা ধরবামাত্র সেটা প্রাণবন্ত হয়ে দূর দিগন্তে উড়ে গেল। ওঁর হাতে যে ক্ষুদ্র ময়ূরপঙ্খী রঙের পালকটি রেখে গেল সেটা ওঁর শিকার-হেলমেটের শোভা আজও বর্দ্ধন করছে।

সব শুনে আমার সহানুভূতি হত। মোটের ওপর পাখীগুলোর শিকার ঋতুর বিষয়ে জ্ঞান থাকলেও একেবারেই সময় জ্ঞান ছিল না। তাই সেদিন ফেবর ল্যুভার ঘড়ির সচিত্র মূল্য তালিকা ঘাঁটছিলাম। স্বামী ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন—ও কি করছ? মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—গোটা কয়েক রিষ্ট ওয়াচ কিনে সিরাথু ঝিলের পাখীদের পাঠাবো মনে করছি। পরদিন প্রাতে সিরাথু অভিযানের কথা ছিল। ইতিপূর্ব্বে বসবার ঘরে লিখে টাঙিয়ে রেখেছিলাম—"Birds of Sirathu are warned not to move before both barrels are fired, as any movement prior to that may prove dangerous." চোখে বুঝি আমাদের চটুলতা থাকে? অফিস কামরার পাশের ঘরে বিছানা হোল দেখলাম এবং পরদিন প্রাতে বারান্দায় ঈজি-চেয়ার-শায়িত ওঁকে রৌদ্র-সেবন করতে দেখা গেল।

—কিন্তু যাঁর কপালে বাঘ লেখা আছে পাখী তাঁর গুলিতে পড়তে যাবে কেন? নেপোলিয়নের কি রাস্তায় গুণ্ডার সঙ্গে মারামারি করবার কথা!! বিরাট এক অভিযান ই আই রেল চেপে হাজারিবাগ অভিমুখে ধাবিত হল। আপনারা রেলগাড়ীর সিলিঙে নিরর্থক হুক এবং ঐ ধাবমান গৃহের প্রাচীর গাত্রে Butts ও Muzzles লেখা দেখেন—সেদিন ছ'ছটি রাইফ্ল butts-এর দিকে কুঁদো ও muzzles-এর দিকে নল করে হুকে শোভিত হল। SSG সার লীথল্ যা এই অভিযানের সঙ্গে ছিল তা ব্যবহার করে এই পূণ্য প্রয়াগের আধখানা সাফ করা যেতে পারত।

স্বামী তিনদিন পরে ফিরলেন, সঙ্গে বিকশিতদন্ত হিংসাবদ্ধ প্রস্তরীভূতদৃষ্টি গলায় সংখ্যানির্ণয়কারী অ্যালুমিনম চাকতি পরা এক শার্দ্দূল-প্রবর।

উৎসাহিত স্বামী বল্লেন—নীচে ছাগল বেঁধে আমি মাচানে বসেছিলাম। স্বচ্ছ চাঁদের আলোয় দেখলাম ছাগলটা সন্তুষ্টচিত্তে তৃণ ভক্ষণ করছে। বসে বসে আমার নয়নে এল তন্দ্রা, হঠাৎ বন তোলপাড় করে ছাগনাদে নিনাদিত হল ম্যা ম্যা ম্যা। আমি দেখলাম বাঘ, সামনের পা দুটি হাতের মত বাড়িয়ে ছাগটিকে আলিঙ্গনে টেনে নিয়ে তার ঘাড়ে দাঁত বসালো। ছাগল আবার ডাকল ম্যা ম্যা; আমার Winchester গর্জ্জে উঠ্ল এবং ব্যাঘ্রচন্দ্র পাক খেয়ে উল্টে পড়ল।

বাঘ মৃত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহযুক্ত হয়ে মাচান থেকে নামার কথা চিন্তা করছি। হঠাৎ দেখলাম ছাগলটা তার নবোদ্গত কচি শিং দিয়ে বাঘটাকে গুঁতোচ্ছে। সন্দেহ বিমুক্ত হয়ে আমি নেমে পড়লাম। ছাগলটার গলায় দুটো ছোট ছোট ফুটো হয়েছিল, একটু পোটাসিয়ম পার্মাঙ্গানেট দিতেই সেরে গেল। ওটার শিং আমি পেতল দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছি।

উঠানে বাঘটা পড়েছিল, আর কোণে ছাগলটা ছোলা চর্ব্বণ করছিল। বাঘ দেখলাম, সাড়ে তিন হাতের একটা চিতা।

মুখ দিয়ে কি জানি কেন বেরিয়ে গেল—হ্যাঁগা, বেচারীকে তুমি মেরেছ, না ছাগল মেরেছে? সেদিন উনি রাগ করেন নি।

যাহোক হাজারিবাগের নাম বদলেছে!

ষ্টেশন দেখে জিজ্ঞাসা করলাম—হ্যাঁগা, সেই থেকে?

কম্বল মুড়ি দিতে দিতে মৃদু স্বরে স্বামী বল্লেন—হ্যাঁ।

টাইম-টেব্ল নির্ম্মাতা যদি জানত সেদিনও ছাগলটা শিং-এর গুঁতায় বাড়ীর কুকুরটাকে খোঁড়া করেছে!!

ইতিহাসে কত না অসত্যই এমনি করে জমে উঠেছে। তাই ত আমি ইতিহাস পড়ি না।

ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাগৈতিহাসিক যুগ

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনা করিলে দেখা যায় প্রাচীন যুগেও ভারতবর্ষে সঙ্গীত একটি প্রয়োজনীয় ও আদরণীয় কলারূপে গৃহীত হইয়াছিল। অতি প্রাচীন ঋগ্‌বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, সূত্র, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, এমন কি পরবর্তী কালে লিখিত পাণিনি ব্যাকরণ প্রভৃতি প্রাচীন বহু গ্রন্থেই নানাভাবে নৃত্যগীত ও বাদ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে কোথাও দৃষ্টান্তরূপে কোথাও অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গরূপে তৌর্যত্রিকের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে বীণাদি যন্ত্রের কিরূপ বহুল উল্লেখ আছে নিম্নে তাহা কিঞ্চিৎ বিবৃত করিতেছি।

আমরা "শতপথ ব্রাহ্মণে" দেখিতে পাই—

"অথ দেবা বীণামেব সৃষ্ট্বা বাদয়ন্তো নিগায়ন্তো নিষেদুরিতিবৈ তে বয়ং গাস্যাম ইতিত্বা প্রমোদয়িষ্যামহে।" (শতপথ ব্রাঃ ৩।২।৪।৬)

দেবগণ বীণা সৃষ্টি করিলেন এবং বীণা বাদনসহ গান করিতে করিতে উপবেশন করিলেন; বলিলেন—আমরা গান করিয়া প্রমোদ উপভোগ করিব।

এই শতপথেই স্থানান্তরে আছে—

"যদাবৈ পুরুষঃ শ্রিয়ং গচ্ছতি বীণাংস্মৈ বাদ্যতে। ব্রাহ্মণৌ বীণাগাথিনৌ সংবৎসরং গায়তঃ শ্রিয়ৈ বা এতদ্‌ রূপং যদ্‌ বীণা।" (শতপথ ব্রাঃ ১৩।১।৫।১)

পুরুষ যখন শ্রী (সম্পদ) লাভ করেন তখন তাঁহার নিকট বীণা বাদিত হইয়া থাকে (অর্থাৎ সম্পদ লাভের সহিত বীণার এমনই একটি অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে); অতএব যজ্ঞে সম্পৎকামী হইয়া দুইজন ব্রাহ্মণ এক বৎসর কাল বীণাবাদন সহকারে গান করিবেন। কারণ বীণা বাদনই শ্রী লাভের একটি প্রকৃষ্ট পন্থা।

"তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে"ও বীণাবাদন সহকারে ব্রাহ্মণদ্বয়ের গান করিবার উপদেশ এইভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে। ভাষ্যে ভট্টভাস্কর উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"বীণাবাদন শিল্পজ্ঞৌ ষড়জাদি স্বরবেদিনৌ।
বৃত্তগাথাদি নির্মাণ ত্রিপুণৌ তত্র গায়তঃ॥"

অর্থাৎ বীণাবাদনে অভিজ্ঞ, ষড়জাদি স্বরে ব্যুৎপন্ন, শ্লোক গাথা রচনায় দক্ষ দুইটি ব্রাহ্মণ সেই যজ্ঞস্থলে গান করিয়া থাকেন।

সাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্র শততন্ত্রী (একশত তার বিশিষ্ট) বীণার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"অথৈতাং বীণাং শততন্ত্রীমুপকল্পয়ন্তি তস্যাঃ পালাশী সূনা ভবতি ঔডুম্বরো দণ্ডঃ অপিবৌডুম্বরী সূনা ভবতি পালাশো দণ্ডস্তামান্‌ডহেন সর্বরোহিতেন চর্মণা বাহ্যতোলোম্নাংভিষীব্যন্তি, তস্যৈ মূলে দণ্ডং দশধাংতিবিধ্যন্তি, তা অগ্রে নানা ভবন্তি। দণ্ড সমাসা বীণা শততন্ত্রী ভবতি। বেতসশাখা সপলাশা বাদিন্যুপক্লৃপ্তা ভবতি।" (সাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্র ১৬।১।২৯)

—এইরূপে শততন্ত্রী বীণা নির্মাণ করিবে:—পলাশ কাষ্ঠদ্বারা এই বীণার সূনা (?), ওডুম্বর বা যজ্ঞডুমুর কাষ্ঠে ইহার দণ্ড রচনা করিবে, অথবা ওডুম্বর কাষ্ঠের সূনা ও পলাশ কাষ্ঠে দণ্ড প্রস্তুত করিবে। বৃষের রক্তবর্ণ চর্ম-লোম দ্বারা সেলাই করিয়া এই দণ্ডের বহির্দেশে সংযোজিত করিবে। এই বীণাদণ্ডের মূলদেশে তন্ত্রীগুলি দশ ভাগে সংযোজিত হইয়া অগ্রের দিকে নানাভাবে প্রসারিত হইয়া থাকে। দণ্ড মূলে তন্ত্রীগুলি সংকুচিত থাকিয়া (দণ্ডের মধ্যভাগে) বীণাটিকে শততন্ত্রী করিয়া থাকে। পত্রযুক্ত বেত্রশাখাদ্বারা বীণাবাদিনী প্রস্তুত করিতে হয়।

কেবল ইহাই নহে, লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র যজ্ঞমণ্ডপের বাহিরে পূর্বদ্বারে অলাবু-বীণা, মহাবীণা ও অপিশীলবীণা বাদনের উপদেশ করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন —

"পশ্চিমেনোদ্‌গাতৄন্‌ দ্বে দ্বে একৈকা পত্নী কাণ্ডবীণাং পিচ্ছোরাঞ্চ ব্যত্যাসংবাদয়েৎ।" (লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র ৪।২।১)

অর্থাৎ সামবেদজ্ঞ ঋত্বিক্‌ উদ্‌গাতার পশ্চিম দিকে যজমান-পত্নী, কাণ্ডবীণা ও পিচ্ছোরা (বংশরচিত চক্রবীণা) বাজাইবে। আরও বলিয়াছেন—

"উপমুপং পিচ্ছোরাং বাদনেন কাণ্ডমরীম্।"—

অর্থাৎ পিচ্ছোরা বীণা মুখের নিকটে রাখিয়া (অথবা মুখদ্বারা) বাজাইবে এবং কাণ্ডময়ী বীণা বাদন দণ্ডের সাহায্যে বাজাইবে।

ঐতরেয় আরণ্যকেও যজমান পত্নীর কাণ্ডবীণা বাদনের বিধান আছে। (ঐঃ আঃ ৫।১।৬)

মৈত্রায়নী সংহিতা বলিয়াছেন—

"বাগ্‌ বৈ সৃষ্টা চতুর্ধা ব্যভজৎ ততোঽত্যরিচ্যত সা বনস্পতীন্ প্রাবিশৎ সৈষা যাঽক্ষে যা দুন্দুভৌ যা তূণবে যা বীণায়াম্।"

ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকালে যখন বাক্ বা শব্দের উৎপত্তি হয় তখন পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরীরূপ চারিভাগে উহা বিভক্ত হইয়াছিল। এইরূপে ব্যক্ত শব্দ উৎপন্ন হইবার পরে বাক্ বা শব্দের যে অংশ অব্যক্তরূপে অবশিষ্ট রহিল তাহা (বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করিবার অন্যতম উপাদান স্বরূপ) বনস্পতিসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিল; বীণা, দুন্দুভি, অক্ষ এবং তূণব নামক বাদ্যযন্ত্রে এই প্রচ্ছন্ন 'বাক'ই ধ্বনিরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। তৈত্তিরীয় সংহিতার প্রথম প্রপাঠকের (অধ্যায়ের) চতুর্থ অনুবাকে বা উপ-অধ্যায়ে এই কথাই প্রকারান্তরে কথিত হইয়াছে।

মাধ্যন্দিনীয় সংহিতায় (৯।১২) ও ঐতরেয় আরণ্যকে (৫।১।৪) শততন্ত্রী বীণার উল্লেখ দেখা যায়।

অথর্ববেদে (৪।৩৭।৫) আঘাট ও কর্করী নামক বাদ্যযন্ত্র নৃত্যের তালে তালে বাজাইবার উপদেশ আছে।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় দুন্দুভি বাদনের বিধান করিয়াছেন এবং দুন্দুভিধ্বনিকে পরম বাক্ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ধ্বনি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন—

"দুন্দুভীন্ সমাঘ্নন্তি পরমা বা এষা বাগ্‌ যা দুন্দুভৌ পরমামেব বাচমবরুন্ধতে।"

বেদে এইরূপে নানাস্থলে কেবল যে বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখই রহিয়াছে তাহা নহে; বৈদিক যজ্ঞের উপকরণরূপে বীণাদি যন্ত্র বাদনের বিধিও রহিয়াছে। এতদ্‌ভিন্ন যজ্ঞ নির্বাহে গীতি একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ। যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য বিশেষভাবে চারি বেদের চারিটি ঋত্বিক্ বা পুরোহিত আবশ্যক হইত। ঋগ্বেদীয় ঋত্বিক্ দেবতার আহ্বানকল্পে স্তোত্র পাঠ করিতেন, যজুর্বেদী হোমকার্য্য সম্পাদন করিতেন, সামবেদী সামগান দ্বারা দেবতার প্রসাদন করিতেন, আর অথর্ববেদজ্ঞ ঋত্বিক্ পূর্বোক্ত তিনজন পুরোহিতের কার্য্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিতেন; কোথাও কাহারও ভ্রমপ্রমাদ ঘটিলে তাহা সংশোধন করিতেন। এইরূপে দেখা যায় সামগান যজ্ঞের একটি অপরিহার্য প্রকৃষ্ট উপকরণ। এই সামগান—আমরা পূর্বেও বলিয়াছি—মার্গী সঙ্গীতেরই অন্তর্গত।

উদ্ধৃত বেদাংশসমূহে আমরা কয়েকটি মাত্র বাদ্যযন্ত্র ও তাহার ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ এবং সঙ্গীত বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা দেখিতে পাই। কে বলিতে পারে, বেদের লুপ্ত অসংখ্য শাখাসমূহে অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র ও সঙ্গীতকলা সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা ও তাহার প্রয়োগপদ্ধতি বিধিবদ্ধ ছিল না।

পাঠক উপরিলিখিত আলোচনায় দেখিবেন, যাগযজ্ঞ-বহুল প্রাগৈতিহাসিক যুগে গীতবাদ্য ও নৃত্য ধর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া সভ্যতার একটি অপরিহার্য অঙ্গরূপে পরিণত হইয়াছিল।

বৈদিক যুগের পরে রামায়ণীয় যুগেও সঙ্গীতের যথেষ্ট সমৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। শাস্ত্রানুসারে রামায়ণ ত্রেতা যুগের গ্রন্থ। রামচন্দ্রের রাজত্বকালে মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ প্রণয়ন করেন। ইহার উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীরামচন্দ্র লব-কুশ মুখে রামায়ণ গান শ্রবণ করিবার জন্য যে সভার অধিবেশন করেন তাহাতে শাস্ত্রজ্ঞ রাজন্যমণ্ডলী, নিগমজ্ঞ, পৌরাণিক, বৈয়াকরণ প্রভৃতি বিদ্বন্মণ্ডলী যেমন আহূত হইয়াছিলেন, তেমনই ষড়্জাদি স্বরলক্ষণজ্ঞ, কলা-মাত্রাদি তালবিশেষজ্ঞ, "গীত-বাদ্য-বিশারদ" পণ্ডিতমণ্ডলীও আহূত হইয়াছিলেন। এই সভায় কুশ ও লবকে রামায়ণ গানের প্রণালী নির্দেশ প্রসঙ্গে বাল্মীকি বলিয়াছিলেন—

ইমাস্তন্ত্রীঃ সুমধুরাঃ স্থানং বাহপুর্ব দর্শনম্।
মূর্ছয়িত্বা সুমধুরং গায়তাং বিগতবদ্বরৌ॥

এই অদৃষ্টপূর্ব স্থানে সুমধুর এই তন্ত্রীসমূহে সুমধুর মূর্ছনা যোজনা করিয়া নির্ভয়ে গান করিবে।

প্রথম সভায় লবকুশ বিংশতি অধ্যায় পর্যন্ত গান করিয়াছিলেন। রামায়ণ বলিয়াছেন—

"শুশ্রাব তত্তাল লয়োপপন্নং
সর্গান্বিতং সস্বর শব্দযুক্তম্।
তন্ত্রীলয় ব্যঞ্জন যোগযুক্তং
কুশীলবাভ্যাং পরিগীয়মানম্॥

তিনি তানলয় ও তন্ত্রীলয় সমন্বিত কুশীলবের গীত রামায়ণ শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই রামায়ণ সর্গ নামক পরিচ্ছেদে নিবদ্ধ একখানি কাব্য। ইহাতে বিন্যস্ত শব্দসমূহ ষড়জাদি স্বরযোগে গীতিরূপে পরিণত হইয়াছিল।

বাল্মীকির ন্যায় মহর্ষির পক্ষে সমগ্র রামায়ণগ্রন্থ বীণার সাহায্যে ও তানলয় সংযোগে শিক্ষাদান যে সময়ে সম্ভবপর হইয়াছিল, গীতনৃত্যবিশারদ-পণ্ডিতগণ দ্বারা সুশোভিত সে সময়টি সঙ্গীতের পক্ষে যে সমৃদ্ধ যুগ তৎসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবসর নাই।

মহাভারতীয় যুগেও সঙ্গীতকলার যথেষ্ট সমাদর পরিলক্ষিত হয়। বৃহন্নলা-বেশে আত্মগোপন করিয়া অর্জ্জুন এই যুগেই বিরাট-রাজকুমারী উত্তরাকে নৃত্য-গীতবাদ্য শিক্ষা দিয়াছিলেন।

"বৃহন্নলাং তামভিবীক্ষ্য মৎস্যরাট্
কলাসু নৃত্যেষু তথৈব বাদিতে।
সমন্ত্র্য রাজা বিবিধৈঃ সুমন্ত্রিভিঃ
পরীক্ষ্য চৈনং প্রমদাভিরাশু বৈ॥
অপুংস্ত্বমপ্যস্য নিশম্য চ স্থিরং
ততঃ কুমারীপুর উৎসসর্জ্জতম্।
সশিক্ষয়া মাসচ গীতবাদিতং
সুতাং বিরাটস্য ধনঞ্জয়ঃ প্রভুঃ॥
সখীশ্চ তস্যাঃ পরিচারিকাস্তথা
প্রিয়শ্চ তাসাং প্রবভূব পাণ্ডবঃ॥

বিরাটপর্ব ১১ অঃ ১১-১৩

মৎস্যরাজ বিরাট বৃহন্নলাকে কলাশাস্ত্র, নৃত্য ও বাদ্যে নিপুণ দেখিয়া মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া প্রমদাগণের সাহায্যে বৃহন্নলার ক্লীবত্ব নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে কন্যার অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। ধনঞ্জয় বিরাটকুমারী উত্তরা, তদীয় সখী ও পরিচারিকাগণকে গীতবাদ্য ও নৃত্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

বিরাটপর্ব্বে এই প্রসঙ্গে নর্ত্তনাগারের উল্লেখও রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন বিভিন্ন পুরাণে বহু স্থানে সঙ্গীতের আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। বায়ুপুরাণে ৮৬ অধ্যায়ে মূর্চ্ছনাদির লক্ষণ, ৮৭ অধ্যায়ে সঙ্গীতবিষয়ক তিনশত প্রকার অলঙ্কারের উল্লেখ দেখা যায়। বৃহদ্ধর্মপুরাণে উল্লিখিত আছে, দেবর্ষি নারদের গীতিপদ্ধতির ত্রুটিতে রাগ-রাগিণীসমূহ বিকলাঙ্গ হইয়াছিল; ভগবান মহেশ্বরের সঙ্গীতনৈপুণ্যে উহারা পুনরায় স্বাভাবিক সৌষ্ঠব লাভ করিয়াছিল। পরিশেষে দেবাদিদেবের শ্রীরাগিণী আলাপে শ্রীহরির তৈজস দেহ দ্রবীভূত হইয়া বৈকুণ্ঠ প্লাবিত করিয়াছিল।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেখিতে পাই—কুবলয়াশ্ব নামক রাজপুত্রের পত্নী মদালসা স্বামীর মিথ্যা মরণ-সংবাদে দেহান্তরিত হইলে কুবলয়াশ্ব শোকে মুহ্যমান হন। অশ্বতর নামক জনৈক নাগ কুবলয়াশ্বের বন্ধু স্বীয় পুত্রদ্বয়ের অনুরোধে মদালসার পুনর্জ্জীবন কামনায় কঠোর তপস্যা করেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবতী সরস্বতী আবির্ভূত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন—

সপ্তস্বরা গ্রামরাগাঃ সপ্ত পন্নগসত্তম।
গীতকানি চ সপ্তৈব তাবতীশ্চাপি মূর্চ্ছনাঃ॥
তালাশ্চৈকোন পঞ্চাশৎ তথা গ্রামত্রয়ঞ্চ যৎ।
এতৎ সর্বং ভবান্ গাতা কম্বলশ্চ তথাঽনঘ॥
জ্ঞাস্যসে মৎপ্রসাদেন ভুজগেন্দ্রাপরং তথা।
চতুর্বিধং পরং তালঃ ত্রিপ্রকারং লয়ত্রয়ম্॥
যতিত্রয়ং তথাতোদ্যং ময়াদত্তং চতুর্বিধম্।
এতৎ ভবান্ মৎপ্রসাদাৎ পন্নগেন্দ্রাপরঞ্চ যৎ॥
অস্যান্তর্গতমায়ত্তং স্বরব্যঞ্জন সম্মিতম্।
তদশেষং ময়াদত্তং ভবতঃ কম্বলস্য চ॥

হে সর্পশ্রেষ্ঠ অশ্বতর, সাতটি স্বর, সাত প্রকার গ্রামরাগ, সাত প্রকার গীতি, সাত প্রকার মূর্চ্ছনা, ঊনপঞ্চাশটি তাল, (ষড়জ, মধ্যম ও গান্ধার নামক) তিনটি গ্রাম, এই সকল বিষয়ে আমার অনুগ্রহে তুমি ও কম্বল জ্ঞানলাভ করিবে। এতদভিন্ন চতুর্বিধ (নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত ভেদে) পদ, তিনপ্রকার তাল, তিনপ্রকার লয়, তিনপ্রকার যতি ও চারি প্রকার বাদ্য আমি দান করিতেছি। হে পন্নগবর, ইহা ছাড়া আরও যাহা কিছু সঙ্গীতশাস্ত্রের অন্তর্গত আয়ত্ত করিবার উপযোগী বস্তু আছে, তৎসমস্তই নিঃশেষ করিয়া তোমাকে ও কম্বলকে আমি দান করিলাম।

অশ্বতর এইরূপে দেবী ভারতীর বরে সঙ্গীতে সিদ্ধিলাভ করিয়া তৎসাহায্যে ভগবান মহেশ্বরকে প্রসন্ন করেন এবং

তাঁহারই অনুগ্রহে মদালসাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া কুবলয়াশ্বের করে সমর্পণ করেন।

এইরূপ অন্যান্য পুরাণেও নানা প্রসঙ্গে নৃত্য গীত ও বাদ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; বিস্তৃতি ভয়ে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। যাহা প্রদর্শিত হইল তদ্দ্বারাই বুঝা যাইবে যে সে যুগে সঙ্গীতকলা কেবল চিত্তবিনোদনের জন্যই ব্যবহৃত হইত না, নানাবিধ জনহিতকর অতি-প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদনের জন্যও উহা প্রযুক্ত হইত। আরও বুঝা যায়—তাৎকালিক ভারতীয় সমাজ নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সহিত ওতপ্রোতভাবে সংবদ্ধ ছিল এবং তজ্জন্য নট ও বাদ্যকর নামক তৌর্য্যত্রিক ব্যবসায়ী দুইটি সম্প্রদায় সমাজের অঙ্গে স্থান লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন ভারতীয় সমাজের উচ্চস্তরেও তৌর্য্যত্রিকের প্রভাব বড় কম ছিল না। মহাদেবের নৃত্যে বর্ণমালার উৎপত্তি, মহাকালীর বিলোম-নৃত্যে জগতের বিলয়, বাগ্‌বাদিনীর বীণা বাদন, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে যমুনার উজান প্রবাহ, ঋষিমুখে 'গানাৎ পরতরং নহি' মহাবাক্য প্রভৃতি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায়, প্রাচীন যুগে ভারতীয় মনীষিগণ সঙ্গীতকলাকে চরম উৎকর্ষের স্তরেই পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে অনুভূতি লইয়া সঙ্গীতের এই গৌরবান্বিত স্বরূপটি দর্শন করিয়াছিলেন আমরা সে অনুভূতির অলৌকিক দৃষ্টিতে জন্মান্ধ। তথাপি শাস্ত্রের সাহায্যে যতটুকু হৃদয়ঙ্গম হয় তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

হংস-বলাকা

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

১০

'সুদর্শন' আফিসের বাইরের আবহাওয়ায় বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা না গেলেও লোকচক্ষুর অজ্ঞাতে মাটির নীচে কোথাও যেন উত্তাপ সঞ্চিত হচ্ছে। চোখে না দেখেও জন্তুরা যেমন ক'রে ভূমিকম্পের খবর পূর্ব্বাহ্ণেই টের পায়, এও তেমনি ক'রে সবাই মনে মনে টের পেলে। কিন্তু প্রকাশ্যে কেউ কিছু বলে না। সুকুমার খবরের কাগজে নতুন ঢুকেছে, এখানকার রাজনীতির দুর্গম অরণ্যে সে দিশেহারা হয় ক্ষণে ক্ষণে। তার ভিতরে নাসিকা প্রবেশ করাতে ভয় হয়। সে নিঃশব্দে চোখ চেয়ে দেখে যায়। দেখে যায়, তাদের ঘরের আবহাওয়া আবার সরস হয়ে উঠ্‌ল। হাসিতে গল্পে আবার পূর্ব্বের মত সরগরম। সরিৎ, জ্যোতির্ম্ময় এবং কালীমোহন যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে। কাউকে আর গ্রাহ্য করে না। কিছুতে আর ভয় পায় না। ওদের মুখে চোখে একটা বেপরোয়া ভাব। সুকুমারও ওদের সঙ্গে হাসি গল্প করে বটে, কিন্তু তার মনে হয় এ সব কিছুই যেন আগেকার মত সহজ এবং স্বাভাবিক নয়। থেকে থেকে সবাই কখন অজ্ঞাতে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে—সেই সঙ্গে সুকুমারও। এরই মধ্যে কি ক'রে এদের সঙ্গে সেও যেন নিজের ভাগ্য জড়িয়ে ফেলেছে। অথচ এদের কতটুকুই বা সে জানে! পথের পরিচয় বই তো নয়!

দেবপ্রিয় নিশ্চয়ই কর্ত্তৃপক্ষের কাছে সাব্‌-এডিটারদের বেয়াদবির কথা জানিয়েছে। কারণ পরের দিনই কর্ত্তৃপক্ষের অর্থাৎ অবনীন্দ্রবাবুর কাছ থেকে সেই বিবৃতিরই আর এক কপি এসে উপস্থিত হ'ল। তার এককোণে অবনীন্দ্রবাবুর নিজের হাতে তাঁর স্বাক্ষর-সম্বলিত দুটি কথা লেখা আছে, Kindly publish—Kindlyটা সাধারণ ভদ্রতা। কিন্তু অবনীন্দ্রবাবুকে দোষ দেওয়া যায় না। তিনি বাংলা দেশের 'মুকুটহীন রাজা' এবং মুকুটহীন রাজাগিরির বহু ঝকমারি, যা সত্যিকার রাজাকে পোহাতে হয় না। তাঁকে বহু তাল সামলাতে হয়, ভাবের ঘরে বহু চুরি করতে হয় এবং অনেক গোঁজামিল দিতে হয়। আসলে ওই বিশেষণটাই একটা পরিহাস। কারণ আসল রাজার মুকুট থাকে, যার মুকুট নেই সে রাজাও নয়।

কর্ত্তৃপক্ষের হুকুম পাওয়ামাত্র সরিৎ বিবৃতিটার তর্জ্জমা ক'রে প্রেসে পাঠিয়ে দিলে। কিন্তু সবটা নয়। অনেক কেটে ছেঁটে অবান্তর কথা বাদ দিয়ে এক কলম পরিমিত মাত্র আবশ্যকীয় অংশটারই তর্জ্জমা ক'রে প্রেসে দিলে।

এর ক'দিন পরে একদিন অবনীন্দ্রবাবু এসে সকলকে ডেকে পরস্পর সহযোগিতা করার ও আফিসের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ কথা ব'লে গেলেন। সেই সঙ্গে সর্ব্বপ্রকারে পার্টির স্বার্থরক্ষায় মনোযোগী হবারও অনেক উপদেশ দিলেন।

সেই দিনই জ্যোতির্ম্ময়ের ডাক পড়ল কমলবাবুর ঘরে।

সরিৎ বললে, দুর্গা নাম স্মরণ ক'রে যাও ভাই। রাজপুরুষের ডাক এলেই বুঝবে বিপদ আসন্ন।

জ্যোতির্ম্ময় হাসতে হাসতে গেল বটে, কিন্তু গিয়েই বুঝলে বিপদ আসন্নই বটে। কমলবাবু বললেন, গত ছ'দিনের মধ্যে একদিনও তার লেখা তিন কলম পোজেনি।

জ্যোতির্ম্ময় অবাক হয়ে গেল। বললে, বলেন কি মশাই!

—ওই তো ছ'দিনের কাগজ রয়েছে। আপনি যে-কোন একদিনের লেখা মেপে দেখতে পারেন।

চাকরী এমনই একটা জিনিস যে ছেড়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকা সত্ত্বেও ওর হাত-পা কাঁপতে লাগল, গলা শুকিয়ে গেল। টেবিলের উপরেই ছ'দিনের কাগজ সাজান রয়েছে। সামনের থানায় যে সমস্ত খবর তার লেখা তার উপর নীল পেন্সিলে 'জে' লেখা।

জ্যোতির্ম্ময় সেইগুলোর উপর একবার আলগোছে চোখ বুলিয়ে কোন রকমে বললে, আপনি মেপে দেখেছেন? তিন কলম হয়নি?

—আপনি একবার দেখতে পারেন।

জ্যোতির্ম্ময় আপন মনেই বললে, আশ্চর্য্য! অথচ…

হঠাৎ ওর একটা কথা মনে পড়ল। তাড়াতাড়ি বললে, প্রিণ্টারকে একবার ডাকুন তো! আমার মনে হচ্ছে…

প্রিণ্টার এল।

জ্যোতির্ম্ময় বললে, আমার লেখা কোন কপি আপনার কাছে নেই?

—থাকতে পারে।

—নিয়ে আসুন তো।

একটু পরে প্রিণ্টার ফিরে এসে একটি রাশ কপি টেবিলের উপর রাখলে।

কমলবাবু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এ সব কি?

—ওনার কপি?

—কম্পোজ হয়নি কেন?

—জাইগা সিল না?

জায়গা ছিল না?

প্রিণ্টার মাথা চুলকে বললে, থাক্‌পে না ক্যান, সিল। কিন্তু এই আতের লেখা, সওজে কেউ ধরতি চায় না। আতে যখন নিতান্ত কপি থাকে না, তখনই…

—আচ্ছা যান।

প্রিণ্টার যাবার সময়ও আর একবার জ্যোতির্ম্ময়ের 'আতের লেখার' সম্বন্ধে বিড় বিড় করতে করতে চলে গেল। হাতের লেখাটা ওর সত্যই বড় বিশ্রী। সরু সরু পিঁপড়ের ঠ্যাঙের মত অক্ষর, তার এ-কার, উ-কার, আর ই-কার-গুলো অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ। সে লেখার পাঠোদ্ধার ক'রে কম্পোজ করা সত্যই দুরূহ। কাজেই অন্য কপি পেলে আর কেউ তার কপি ছুঁত না। সেই কপি জ'মে স্তূপ হয়েছে। এদিকে জ্যোতির্ম্ময়ের 'জন্মভূমি' যায়!

একটু চুপ ক'রে থেকে জ্যোতির্ম্ময় সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আমার চাকরী কি তাহ'লে রইল, না গেল?

কমলবাবু হেসে ফেললেন। মুখ তুলে বললেন, আপাতত রইল।

—তাহ'লে আমি আপাতত যেতে পারি?

স্বচ্ছন্দে।

জ্যোতির্ম্ময় ফিরে আসতেই সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, গেলে তো?

—আপাতত রইলাম।

সরিৎ বললে, ব্যস। আর কথাটি নয়। একটি পয়সা কপালে ঠেকিয়ে বাবা তারকেশ্বরের জন্য রেখে দাও।

জ্যোতির্ম্ময় বললে, সেই ভাল। তারপর চাকরীটা গেলে তাই দিয়ে একদিন চানাচুর খাওয়া যাবে—কি বল?

সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপারটা কি?

জ্যোতির্ম্ময় ব্যাপারটা সবিস্তারে বর্ণনা করতেই একটা উচ্চহাসির রোল প'ড়ে গেল। আশ্চর্য্য! ওর লেখা

খারাপ বটে, কিন্তু সে যে এমন খারাপ তা কারও লক্ষ্যই হয়নি।

সরিৎ বললে, তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত জ্যোতির্ম্ময়।

সুকুমার সায় দিলে, বাস্তবিক। একেবারে অভদ্র রকমের বিশ্রী।

জ্যোতির্ম্ময় বেশ মুরুব্বির মত হেসে বললে—ওহে, আমাদের অর্থাৎ বড়লোকদের হাতের লেখা বিশ্রীই হয়। এ লেখা তো কেরাণীগিরি করবার জন্য নয়, একটা জাতকে স্বাধীন করবার জন্য। বুঝলে?

ওরা কিন্তু বুঝতে চাইলে না। জ্যোতির্ম্ময়কে নিয়ে নাস্তানাবুদ করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। বেচারা বিব্রত হয়ে উঠল। ভাবলে এদের কাছে সমস্ত কথা বলা কি অন্যায়ই না হয়েছে!

এমন সময় ঝোড়ো কাকের মত ঘরে ঢুকে কালীমোহন চুপি চুপি বললে, কথাসাগর, এবারে গেলাম!

কলম রেখে সকলে সমস্বরে বললে, কি হ'ল?

—যা হবার তাই হ'ল। একটা চুরুট দাও দেখি॥

সরিৎ চুরুট বের ক'রে বললে, নিশ্চয়। কিন্তু চট-পট খবরটা দিয়ে তাপিত প্রাণ শীতল কর দেখি।

চুরুট ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে কালীমোহন বললে, আর শীতল বন্ধু! লোক এসে গেছে।

—কে লোক?

—তা কি আমি চিনি?

—তবে? কি চায় সে?

ঘাড় দুলিয়ে কালীমোহন বললে, সে নয় তারা। সম্ভবত আমাদের জায়গায় কাজ করতে চায়।

সকলে বিস্মিতভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কালীমোহন তেমনিভাবে ঘাড় দুলিয়ে আবার বললে, কমলবাবুর ঘরে গিয়ে দেখে আসতে পার। কি সুন্দর ছেলে দুটি!

অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে সরিৎ বললে, যাঃ।

কালীমোহন হেসে বললে, যাব তো নিশ্চয়ই। তবে বোধ হয় কিছু দেরী আছে। নিতান্ত বাচ্ছা। আশা হচ্ছে তারা সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত এখানকার ঘাস-জল রইল।

সবাই নিঃশব্দে ব'সে ব'সে কি যেন ভাবতে লাগল।

একটু পরে সুকুমার বললে, দেখেই আসি। মোহনের তো কথা!

সে আর কৌতূহল দমন করতে পারছিল না। একটু পরে ফিরে এসে বললে, সত্যিই বটে।

জ্যোতির্ম্ময় বললে, কমলবাবুর টেবিলে ব'সে আছে?

সুকুমার বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়লে।

সরিৎ জিজ্ঞাসা করলে, ক'জন?

সুকুমার দুটো আঙুল তুলে দেখালে।

—তাহ'লে তো আমি আর জ্যোতির্ম্ময়। কি কথা হচ্ছে?

সুকুমার বললে, কিছু না। তারা টেলিগ্রাম তর্জ্জমা আরম্ভ ক'রে দিয়েছে।

—হুঁ?…জ্যোতির্ম্ময়কে একটা ঠেলা দিয়ে সরিৎ বললে—সতরঞ্চ লণ্ঠন গুটোও ভাই; বাবু বললেন, আজ আর গান হবে না।

জ্যোতির্ম্ময় শুধু একটু ফিকা হাসলে। সে যেন কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে প'ড়েছে। সমস্ত কথা যেন তার কাণে যাচ্ছে না।

সরিৎ তাকে আর একটা ঠেলা দিয়ে বললে, শুনছ না? কাজ আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। আর কেন?

জ্যোতির্ম্ময় ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললে, সেই 'সরল প্রাণে' গানখানা গাই না কেন কথাসাগর? ভাল গান।

কালীমোহন এতক্ষণ ধ'রে চেয়ারে ঠেস দিয়ে আকাশ পানে মুখ ক'রে মুদ্রিত নেত্রে চুরুট টানছিল। হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে ব'সে বললে, এক মিনিট জ্যোতির্ম্ময়—আরও খবর আছে।

সে গম্ভীরভাবে বুকপকেট থেকে একখানা খাম টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে আবার পূর্ব্ববৎ ধূমপান করতে লাগল।

সকলে চিঠিখানার উপরে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ইংরিজিতে লেখা একখানা চিঠি—তাতে আজ কিম্বা কাল সকালে কালীমোহনকে একবার ম্যানেজিং ডিরেক্টারের সঙ্গে দেখা করবার জন্য হরিসাধনবাবু অনুরোধ জানিয়েছেন।

—দেখা করেছ?

কালীমোহন ঘাড় নেড়ে বললে, না। চিঠি যখন দিয়ে

যায় তখন আমি বাসায় ছিলাম না। যখন ফিরলাম তখন আর সকাল নেই। ভাবছি কাল সকালে যাব।

হরিমোহনবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করলে না কেন?

—করলাম। তিনি কিছু জানেন না।

সকলে একসঙ্গে বললে, হুঁ।

কালীমোহন চমকে উঠে বললে, আমিও ভেবেছি হুঁ। তারপরে আফিসে ঢুকেই যখন দেখলাম, দুজন নতুন লোক, তখন আর একবার ভাবলাম—হুঁ। শেষে হরিসাধনবাবু যখন বললেন তিনি এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।

—তখন আর একবার ভাবলে হুঁ।

বিস্মিতভাবে কালীমোহন বললে, Exactly—তোমরা কি ক'রে জানলে? আশ্চর্য্য!

সরিৎ বললে, আশ্চর্য্য আর কি? আমরাও ওই একই প্রণালীতে জেনেছি।

—আচ্ছা, তোমাদের কি মনে হয়?

—আমাদেরও মনে হয় হুঁ।—কথাটা সুকুমার বললে।

—ঠিক। একটু থেমে কালীমোহন হঠাৎ বললে—আচ্ছা কোন দু'জন?

সরিৎ বললে, আমাদের এই তিনজনের মধ্যে যে কোন দুজন, অথবা যে কোন তিনজন। কাল আর একজন নতুন লোক যে আসবে না কে বলতে পারে?

জ্যোতির্ম্ময় হেসে বললে, আর জ্বালিও না সাগর। তুমি এ যাত্রা রইলে। যেতে আমরা দু'জনই যাব।

কালীমোহন একটা ধমক দিয়ে বললে, হয়েছে। 'কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান তারই লাগি তাড়াতাড়ি'? উঁ? ভাব-বিলাসিতা? আচ্ছা সত্যি ক'রে বল তো জ্যোতির্ম্ময়, তোমার মনে কষ্ট হচ্ছে না?

—একটু যেন হচ্ছে।

—আমারও। তাহ'লে মিউনিসিপাল মার্কেট থেকে চানাচুর আনাই? বেয়ারা!

সুকুমার কিন্তু চুপ ক'রে রইল। আর সে এদের পরিহাসে প্রাণ খুলে যোগ দিতে পারলে না। এদের সঙ্গে তার ব্যবধান ঘটেছে। সুকুমার কেমন যেন দ'মে গেল। তার মনে হ'ল, হায়! তারও যদি এই সঙ্গে চাকরী যাওয়ার আশঙ্কা থাকত! বেশ হ'ত তাহ'লে। তাহ'লে এই ক'জন পরম বন্ধুর সঙ্গে তার আর একাত্মতায় কোন বিঘ্ন ঘটত না। তার সমস্ত মন দারুণ অস্বস্তিতে ছটফট করতে লাগল।

সবে সকাল হয়েছে। কিন্তু কতকটা কুয়াশায় কতকটা চারিপাশের বাড়ীর উনানের ধোঁয়ায় আকাশ আচ্ছন্ন। সূর্য্যের প্রকাশ ভাল ক'রে হয়নি। সুকুমারের ভোরে ওঠা অভ্যাস। সে মুখ হাত ধুয়ে এক পেয়ালা চা নিয়ে বিছানায় ব'সে সেদিনের 'সুদর্শন' কাগজখানা দেখছিল। সাংবাদিক জীবন তার বেশী দিনের নয়। মোহও কাটে নি। ছাপার হরপে নিজের হাতে অনুবাদ-করা সংবাদগুলির উপর চোখ বুলোতে বড় ভাল লাগে। কোথাও ছাপার ভুল থাকলে এবং কিছু কিছু ভুল প্রত্যহই থাকে—অত্যন্ত বিরক্ত হয়। বিশেষ জ্যোতির্ম্ময়ের সেদিনের কাণ্ডের পর মনে তার ভয়ও ধ'রেছে। সুকুমার তার তর্জ্জমাকরা খবরগুলো মেপে মেপে একটা আনুমাণিক হিসাব করতে লাগল, তিন কলম হয়েছে কি না। এমন সময় সরিৎ এসে দরজার বাইরে উঁকি দিলে:

—উঠেছ দেখছি যে!

সুকুমার চমকে মাথা তুলে বললে—আরে এস, এস। হঠাৎ এত সকালে যে!

—সকালেই এলাম।—সরিৎ ঘরের চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে।

সুকুমার কাগজখানা একপাশে ঠেলে রেখে বললে, একটু চা খাবে?

—খাব। চল দোকানে গিয়েই খাওয়া যাবে। জামাটা গায়ে দিয়ে নাও দেখি।

—আর কোথাও যাবে না কি?

—একবার মোহনের ওখানে যাব। চল না।

সুকুমার জামা গায়ে দিয়ে ওর সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল। চায়ের দোকান কাছেই। সেখানে ঢুকে চায়ের ফরমাস দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার বল দেখি? তোমার মুখখানা বড় সুবিধা মনে হচ্ছে না।

সরিৎ ফিক ক'রে হেসে পকেট থেকে একখানা খাম বের ক'রে সুকুমারের হাতে দিলে।

—এ আবার কি?

—প'ড়েই দেখ।

পড়তে পড়তে সুকুমারের মুখ কঠিন হয়ে উঠল। বললে, কাল রাত্রে ফেরবার সময় কিছু বললে না তো?

—রাত্রি বারোটার সময় পিওন এসে দিয়ে গেছে।

—তার মানে?

সরিৎ হেসে বললে—মানে অতি সোজা। আজ মাসের পয়লা। কাল রাত্রে নোটিশ না দিলে আরও একমাসের মাইনে দিতে হ'ত।

সরিৎ হাসছিল বটে, কিন্তু মুখ তার শুকিয়ে গেছে। কথা বলতে ঘন ঘন দম নিতে হচ্ছে। চঞ্চল চোখ কোন এক জায়গায় স্থিরভাবে বসছে না। ভিতরে ভিতরে ও বেশ অস্থির হয়ে উঠেছে।

সুকুমার ধীরভাবে বললে, তোমার চাকরী যে যাবে এ তো জানাই কথা। কিন্তু এমনভাবে রাত দুপুরে জবাবী চিঠি আসবে—তা ভাবতে পারা যায় না। যখন পকেট থেকে খামখানা বের করলে, ভাবলাম···

—বৌএর চিঠি, না?—সরিৎ টেনে টেনে হাসতে লাগল।

—সত্যি।

চা খাওয়া হয়ে গেলে সরিৎ বললে, চল। মোহনকে সু-খবরটা দেওয়া যাক।

রাস্তায় জনতার স্রোত চলছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের ক্রমাগত সংঘর্ষ বাধছে। কিন্তু ওরা দুটি বন্ধু এই ভিড়ের মধ্যে চলতে চলতেও নিজেদের ভিড় থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করতে লাগল।

সরিৎ বললে, আমার এক আত্মীয় সুন্দরবনে জমি নিয়ে দিব্যি চাষ-আবাদ আরম্ভ ক'রছে। ওখানে নাকি প্রচুর ফশল হয়। ভাবছি সেইখানেই যাব নাকি?

সরিৎ উৎসাহিত হয়ে উঠল। সুকুমারের কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে আবার বললে—কিন্তু জায়গাটা ভারি অস্বাস্থ্যকর। সেই এক আপত্তি। তার চেয়ে ছোট-খাটো চায়ের দোকানই খুলব নাকি? অ্যাঁ?

সুকুমার দ্বিধাভরে বললে, ব্যবসা জিনিষটা তো ভালই। কিন্তু তুমি কি পারবে?

একটা তুড়ি দিয়ে সরিৎ বললে, পারব না মানে? বলে, গরু পাঁকে পড়লে ছুনো বল ধরে। তা জানো?

সরিতের চীৎকারে সচকিত হয়ে পথচারী এক বৃদ্ধ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলেন। বিরলকেশ মাথাটা নেড়ে আপন মনেই একবার হাসলেন। ভাবটা বোধ হয় এই যে, যৌবনের তপ্তরক্তের তেজে বড় স্ফূর্ত্তি বেড়েছে না? তারপরে আমারই মত লাঠি হাতে ঠুক ঠুক ক'রে বেড়াতে হবে সে তো টের পাচ্ছ না?

কিন্তু ওদের তখন বুড়োমানুষের দিকে চাইবার সময় নেই। চাকরী গেছে, একটা কিছু সরিৎকে করতে হবে। সেই করাটা যে কি সে বিষয়ে এখনও অবশ্য সে মন স্থির করতে পারে নি। সুন্দরবনে আবাদ দেওয়াও হ'তে পারে, চায়ের কিম্বা ডাইং-ক্লিনিঙের দোকানও হতে পারে; আবার অন্য কোন একটা কাগজেও যা কিছু হোক করতে পারে। এই রকম কোন একটা ভবিষ্যতের স্বপ্নে সে উত্তেজিত হয়ে আছে।

ইতিমধ্যে ওরা কালীমোহনের বাড়ীর সামনে এসে উপস্থিত হ'ল। বাড়ী নয়, বাসা। আর তাও কালীমোহনের নয়, ওর দাদার। দাদা কালীমোহনের চেয়ে মাত্র বৎসর দুয়েকের বড় এবং ওর চেয়ে এক বৎসর আগে তৃতীয় বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ক'রে একটা মার্চ্চেণ্ট অফিসে চাকরী নেয়। তখন মাইনে অল্পই ছিল। কিন্তু এই পনেরো বৎসরে বাড়তে বাড়তে দেড়শোয় এসে পৌচেছে। আর কালীমোহন ভাল ছেলে ছিল ব'লে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ক'রেই থামতে পারেনি। এম-এ পর্য্যন্ত বেশ ভাল ক'রে পাশ করতে হয়েছে। ফলে 'সুদর্শন' আফিসে ষাট টাকা মাইনে পাচ্ছে গত পাঁচ বৎসর যাবৎ। অদূর ভবিষ্যতে যে আর একটি টাকাও বাড়বে এমন সম্ভাবনা নেই। বেচারা দাদার সংসারের মাঝখানে একটা উপসর্গ হয়ে রয়েছে। এখনও পর্য্যন্ত বিবাহ করার যোগ্যতাও অর্জ্জন করতে পারল না।

কালীমোহন নীচে বাইরের ঘরে ব'সে ব'সে ঝিমুচ্ছিল—কিম্বা ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গবেষণা কচ্ছিল বোঝা গেল না। ওদের দেখে অবাক হয়ে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চাইলে।

তারপরে একটু ফিকা হেসে বললে—কি বাবা, এরই মধ্যে খবর পৌছে গেছে? বোস, বোস।

সরিৎ দিগ্বিজয়ীর মত বীরদর্পে তার পকেট থেকে কর্ম্মচ্যুতির নোটিশটা বার করছিল। মধ্য পথে থেমে

চকিতভাবে বললে, কি খবর বলতো? তোমারও আবার খবর আছে না কি?

কালীমোহন সে কথার জবাব না দিয়ে পট্‌ ক'রে ওর বুক-পকেট থেকে অর্দ্ধোত্থিত খামখানা তুলে নিয়ে বললে, কি এটা?

—বিয়ের নেমন্তন্ন। পড়ই না।

এক নিশ্বাসে চিঠিখানা প'ড়ে কালীমোহন আশ্বস্ত হয়ে বললে—বাঁচলাম! তাই তো ভাবছিলাম, বড় রকম একটা ওলট-পালট না হ'লে…

—আবার কি ওলট-পালট? ও সুকুমার, মোহন বলছে কি! তুমিও গেলে না কি মোহন?

—এখনও যাইনি। যাব।

—তার মানে?

কালীমোহন টেবিলের ড্রয়ার থেকে ঠিক আর একখানা ওই রকমের খাম বের ক'রে নিঃশব্দে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিলে। ওরা চিলের মতো ছোঁ মেরে খামখানা তুলে নিয়ে রুদ্ধনিশ্বাসে পড়তে লাগল।

তারপরে দুজনেই এক সঙ্গে সোল্লাসে চীৎকার ক'রে উঠল: ব্রাভো! তাহ'লে খাইয়ে দাও মোহন। এ যে আশাতীত! অ্যাঁ? তোমাকে নিউজ-এডিটার করলে? আশ্চর্য্য!

—আশ্চর্য্য আর কি! কমলবাবুকে আর তোমাকে তাড়ালে—আমাকে নিউজ-এডিটার করা ছাড়া উপায় কি।

সুকুমার চীৎকার ক'রে বললে—তাহ'লে কমলবাবুকেও তাড়িয়েছে?

—নইলে আমাকে নিউজ-এডিটার করবে কেন?—ব'লে কালীমোহন হা হা ক'রে হেসে উঠল। বললে, আরও একখানা চিঠি দেখাই তোমাদের।

সুকুমার এবং সরিৎ অধীর আগ্রহে পড়তে লাগল। কিন্তু ওরা যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। তাই বার বার গোড়া থেকে পড়তে লাগল। অত্যন্ত সংযত এবং সংক্ষিপ্ত পত্র। কালীমোহন নিউজ-এডিটার পদে উন্নীত হওয়ার জন্য ম্যানেজিং ডিরেক্টারকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। সেই সঙ্গে অতীব দুঃখের সঙ্গে আরও জানিয়েছে যে নানা কারণে 'সুদর্শনে' কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। সেই জন্য আগামী মাসের পয়লা থেকে সে কর্ম্মত্যাগ করল। ম্যানেজিং ডিরেক্টার এই পত্র এক মাসের নোটিশরূপে গ্রহণ করলে সে বাধিত হবে।

সরিৎ ভীষণ ক্রুদ্ধভাবে বললে, এ আবার কি মোহন! এ সব কিছুতেই চলবে না। তুমি যে আমাদের জন্য চাকরী ছাড়বে সে কিছুতেই হ'তে পারবে না। তুমি যে এত ভাবপ্রবণ তা জানতাম না। আশ্চর্য্য ব্যাপার!

কালীমোহন শান্তভাবে হেসে বললে, তোমাদের জন্য কে বললে! আমি অনেক ভেবে দেখেছি, যারা একজন অসহায় ভদ্রলোকের চাকরী খেতে পারে তাদের কাছে চাকরী করব কোন ভরসায়। তার চেয়ে এখনও বয়স আছে, উদ্যম আছে, জীবনের অবলম্বন হয়তো এখনও খুঁজে নিতে পারব। বেশী দেরী হওয়ার আগেই তাই সতর্ক হচ্ছি।

সুকুমার এবং সরিৎ নীরবে ব'সে রইল।

একটু পরে সরিৎ বললে, যে দেশে বিপিন পালের মত সাংবাদিককেও শেষ জীবনে ভাড়াটে লেখকের পর্য্যায়ে নেমে আসিতে হয়, সে দেশে জার্ণালিজ্‌ম্‌ থেকে তুমি আর কি আশা করতে পার?

চিন্তিতভাবে মাথা নেড়ে কালীমোহন বললে, তাই ভাবছিলাম।

ঘরের সে লঘু-চপল হাওয়া দেখতে দেখতে ভারী হয়ে উঠল। মনের কোণে কোণে জমতে লাগল স্তব্ধতা। যে দুঃখ একান্তই ব্যক্তিগত ভেবে এতক্ষণ হালকা পরিহাসের সঙ্গে নিচ্ছিল, যেই সাধারণভাবে দেখলে আর তা তুচ্ছ ভেবে উড়িয়ে দিতে পারলে না। ওরা ভাবতে বসল।

সুকুমার ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলে, এমন হ'ল কেন?

সরিৎ হেসে ফেললে। বললে, হ'ল কেন? কারণ ধনজীবীর হাতে পড়লে বুদ্ধিজীবীর দুর্গতি অনিবার্য্য ব'লে। যদি বল ধনজীবীর হাতে পড়ল কেন? তার উত্তর, না প'ড়ে উপায় নেই অর্থাৎ এ ভবসমুদ্রে কোন কিছুরই স্বেচ্ছাবিহারের শক্তি নেই। ইচ্ছা থাক বা না থাক, সব কিছুকে ধীরে ধীরে ধনীর ঘাটে এসে ভিড়তেই হবে। সংবাদপত্রের মত আত্মপ্রচারের এবং আত্মপ্রসারের এত বড় যন্ত্রকে ধনী কখনই আপন গৌরবে ভেসে বেড়াতে দিতে পারে না। তাকে কুক্ষীগত করতেই হবে।

সুকুমার মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে বললে—করুক।

কিন্তু যাদের উপর কাগজের সমৃদ্ধি তাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে না কেন?

—কারণ ওরা ভদ্র ব্যবহার করতে পারে না।

বিস্মিতভাবে সুকুমার বললে—পারে না মানে?

—নিশ্চয়ই পারে না। তা ছাড়া আর কি কারণ হ'তে পারে? কাগজ উঠে যাক, এ কথনই ওদের উদ্দেশ্য নয়।

কালীমোহন হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললে, ভাল আলোচনায় আসা গেছে। তাহ'লে আল্‌ডাস্‌ হাক্স্‌লির একটা জায়গা তোমাদের প'ড়ে শোনাই দাঁড়াও।

সে আলমারী থেকে একটা নীল মলাটের বই বের ক'রে পড়তে লাগল:

Men in authority who nag at their subordinates; who are malignant or unjust··· leaders who do not know their underlings' jobs; who are vain and take themselves too seriously; who lack a sense of humour and intelligence—all these can inflict enormous sufferings on the men and women over whom they are set. And they are responsible not only for suffering but for discontent, anger, rebellion, to say nothing of inefficiency. For it is notorious that a bad commander, whether of troops or of work-men, of clerks in an office or childern in a school, gets less work out of their subordinates and of worse quality than a good commander.

কালীমোহন বড় বড় চোখ মেলে ওদের দুজনের দিকে চাইলে। সরিৎ কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কালীমোহন একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে আবার পড়তে লাগল:

The misfit of bad leadership is one of the major causes of individual unhappiness and social inefficiency.

কালীমোহন বইথানা সশব্দে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে বললে—misfit, বুঝলে কথাসাগর, সংসারটা misfitএ ভর্ত্তি হয়ে গেছে। যে কাজ যার নয়, সে সেই কাজের ভার নিয়েছে। তার ফলে সে নিজেও যাবে এবং যাওয়ার আগে জীবনের সেই বিশেষ ক্ষেত্রে অপটুতা স্থায়ী ক'রে দিয়ে যাবে।

সুকুমার কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তার মনে পড়ল, স্কুলের হেডমাষ্টারকে, সেই সঙ্গে আরও অনেক শিক্ষককে। শিক্ষা-জীবনের সঙ্গে ওদের অসঙ্গতির এত-দিনে যেন সে একটা অর্থ খুঁজে পেলে। এখন বুঝলে সেক্রেটারীর ঘাটে ওরা ছাড়া আর কেউ এসে জুটতে পারে না। এই হ'ল সেক্রেটারীর অনধিকারচর্চ্চার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। বস্তুতপক্ষে জমিদারী চালাবার হাত দিয়ে শিক্ষার এমনি সংস্কারই হবে।

সরিৎ বললে—দেখ মোহন, যে কথা তুমি শোনালে সে এমন কিছু নতুন তত্ত্ব নয়। বরং অত্যন্ত পুরোনো কথা, যে কথা সবাই জানে—এমন কি আমাদের কর্ত্তৃপক্ষ পর্য্যন্ত। তবু এমন হয় কেন?

একটু ভেবে কালীমোহন বললে – বোধহয় অত্যন্ত সোজা এবং পুরোনো কথা ব'লেই কারও তা মনে পড়ে না।

মাথা নেড়ে সরিৎ বললে, অসম্ভব নয়।

কালীমোহন বললে, তোমার ঘটনাটাই ধর। আর কোন দিন কোন কাগজে গিয়ে তুমি মনে-প্রাণে খাটতে পারবে?

—অসম্ভব। আমার লেখবার হাতখানাই ওরা ভেঙ্গে দিলে।

কালীমোহন হেসে বললে—শুধু তোমারই নয় বন্ধু, বাঙ্গালার জার্ণালিজমের হাতখানাই গেল ভেঙে। কিন্তু সে ক্ষতি টের পেতে আরও কিছু সময় নেবে।

সুকুমার সবিস্ময়ে কালীমোহনের মুখের দিকে চাইলে।

কালীমোহন বলতে লাগল—এর পরে কি হবে জান? আমি আমাদের আফিসের নতুন রিক্রুট দুটিকে দিয়েই বুঝেছি, ধীরে ধীরে সকল সংবাদপত্রই এদের বাথান হয়ে দাঁড়াবে: একদল মেরুদণ্ডহীন অশিক্ষিত ভাগ্যান্বেষী, প্রভুর ইঙ্গিতে ডাইনে-বাঁয়ে গালাগালি দেবে—নারীর সম্ভ্রম, মানীর মান, কথায় কথায় বিপন্ন হবে। সত্যের মর্য্যাদা, শিষ্টাচারের সীমারেখা, এমন কি সাধারণ ভদ্রতা পর্য্যন্ত মানবে না। বাঙ্গালার সংবাদপত্র হবে এমনি unscrupulous একদল লোকের লীলাভূমি।

কালীমোহন এই পর্য্যন্ত ব'লে থামল। বাঙ্গালার সংবাদ-পত্রের এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য সে বুঝি আর কল্পনাও করতে পারছিল না। সেই ছোট ঘরখানির মধ্যে তিন বন্ধুতে নিঃশব্দে ব'সে আপন আপন পথে কি যে চিন্তা করতে

লাগল সে ওরাই জানে। হয় তো আরও বহুক্ষণ চিন্তা করত। সংবাদপত্রসেবা ওদের কাছে এখনও পেশা হয়ে ওঠেনি। সাংবাদিক জীবনকে ওরা সত্যি সত্যি ভালবেসে ফেলেছে। তাই অনেক চিন্তাই ওদের মনে খেলছিল। কিন্তু পাশের ঘরের ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে এগারোটা বাজল। ওদের এইবার উঠতে হ'ল।

পথে আসতে আসতে সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, আজ একবার আফিসে যাবে না কি?

সরিৎ একটু চিন্তা ক'রে বললে, আজ আর যেতে ইচ্ছা করছে না। তবে মাইনে নিতে একবার যেতে হবে বই কি! কাল পরশু যাব।

সুকুমার চ'লে যাচ্ছিল। সরিৎ ডাকলে, আর শোন। জ্যোতির্ম্ময়কে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে ব'ল তো, কাল সকালে।

—আচ্ছা।

সুকুমার ডানদিকে বেঁকে চ'লে গেল। ক্রমশঃ

মিছে করি সন্দ?

শ্রীঅনুরাধা দেবী

আমি খাব না সে আমার ইচ্ছে;
কেন সাধো মিছে আর?
ওগো না—না ছাড়ো দু'টি পায়ে ধরি
ম'রলে ক্ষতি বা কার!
আমি কি বুঝি না আমায় নিয়েই
তুমি পাও যত দুখ;
বিয়ে হয়ে থেকে নেই ক শান্তি,
তাও বুঝি দেখে মুখ।
হাত নেই আর; করবে কি বলো
সবি কপালের ফের!
আমার মরণ হ'লেই তোমার
ঘুচ্‌বে পাপের জের।
দেরি কেন মিছে? যাও তাড়াতাড়ি;
বসে আছে পথ চেয়ে—
আল্‌ট্রা-মডার্ণ সুরুচি-সুরূপা
কত চেনা জানা মেয়ে!
ইলা, অঞ্জলি, মিলি ও সুলেখা—
তোমার বন্ধু যারা,
প্রহর অবধি তোমায় না দেখে
হয়ে গেল দিশেহারা।
আমি অতি ছাদ্‌! নিরেট মুখ্‌খু
কি হবে আমায় নিয়ে?
ওদের ভিতর দেখে শুনে ফের
কর গে একটা বিয়ে!
মিছে সন্দেহ করি আমি শুধু;
বোকামি নেহাৎ ওটা?
না-হয় পড়িনি কলেজে কখনো,
বুদ্ধি আমার মোটা,
তাই ব'লে কিগো এটাও বুঝি না
বাঙালীর মেয়ে হ'য়ে।
নেই ক উপায় মুখ টিপে তাই
থাকি আমি সব স'য়ে।
আমারি সন্দ বাতিকে তোমার
শান্তি নেইক মোটে?
ব'লতে এ-কথা করে না লজ্জা!
বাধে না তোমার ঠোঁটে?

বিরক্ত আর কর কেন তবে,
আমায় রেহাই দাও।
তুমি তো পুরুষ, ভয় কি তোমার
পাবে যত বউ চাও।
ওকি পাগলামি! চুপ কর ওগো,
ছি ছি এনো না ক মুখে।
হিঁদুর মেয়ের ইহ পরকালে
এক স্বামী সুখে দুখে।
শুনলে তোমার বাজে কথা সব
বুক যেন ভয়ে কাঁপে;
কি জানি কখন ভাঙিবে কপাল
অজানা কিসের পাপে!
থামো থামো ওগো, দিই নাকে খৎ,
আর ক'র্‌বো না সন্দ।
মুখে যা-ই বলি মনেতে কখনো
ভাবি না তোমায় মন্দ।

* * * *

কেটে যাবে ঠোঁট, আহা ছাড়ো ছাড়ো;
উঃ—কি দাঁতের ধার!
হাত দুটো যেন লোহার আগল,
ছাড়াবে সাধ্যি কার?

সঙ্গীত

সিন্ধু—কওআলী

রণ মাঝে কেন তুমি ওগো রণরঙ্গিনি,
সমর সাজে না তব জগত জননি হয়ে,
যাও যাও ফিরে যাও হর মন মোহিনি।
তব পদ ভরে ধরণী কাঁপিছে থর থর,
ভীষণ রূপ ত্যজি শান্ত রূপ ধর,
ক্ষমা চাহে জোড় করে সকল নর অমর,
বারেক ফিরিয়ে দেখ ওগো বিধু-বদনি।
অপার মহিমা তব কে বুঝিবে এ ভবে,
যোগিজন ধ্যানে বসি অন্ত পায় না ভেবে,
অরূপ রাশি তুলনা ভুবনে না পাই খুঁজে,
অসীম গুণ কেমনে বর্ণিব নন্দিনি।
গোপেশ নিয়ত তব গাইতেছে গুণগান,
মরণের পারাবারে দয়া করে কর ত্রাণ,
অবিরত আসা যাওয়া হয় না গো যেন আর,
সম্বল কেবল যে তব পদ তরণি ॥

কথা ও সুর ঃ—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি ঃ—সঙ্গীতবিশারদ শ্রী.নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রেঙ্গুন)

রা ণা ণা ধা | পা পা ধা পা | মা মা পধা মপা | মজ্ঞা মা জ্ঞা রা |
র ণ মা ঝে কে ন তু মি ও গো র• ণ র• • ঙ্গি নি

১´ • ১´ •
সা রা রা ণা | ধা ণা ধা ধা | মা ধা ণা র্সা | ণধা ণা ধা পা |
স ম র সা জে না ত ব জ গ ত জ ন০ নি হ য়ে

১´ • ১´ •
রা মা পধা ণর্সা | ণা ধা পা -া | মা মা পধা মপা | মা জ্ঞা রা -া |
যা ও যা০ •ও ফি রে যা ও হ র ম০ ন মো হি নি -

১´ ০ ১´ ০
{ মা পা না না | না না না না | র্সা র্সা র্সা সা | র্সা র্সা র্সা সা |
ত ব প দ ভ রে ধ র ণী কাঁ পি ছে থ র থ র

১´ ০ ১´ ০
পা ধা র্সা র্রা | -া র্মা র্জ্ঞা র্রা | র্সা -া র্সা ধা | র্স ণা ধা পা } |
ভী ষ ণ রু - প ত্য জি শা - ন্ত রু ০ প ধ র

১´ ০ ১´ ০
মা মা ধা ধা | ধা ণা ধা ধা | মা ধা ণা র্সা | ধা ণা ধা পা |
ক্ষ মা চা হে জো ড় ক রে স ক ল ন র অ ম র

১´ ০ ১´ ০
রা মা পা র্সা | ণা ধা পধা পা | মা মা পধা মপা | মা জ্ঞা রা -া ||
বা রে ক ফি রি য়ে দে খ ও গো বিং দু ব দ নি -

১´ ০ ১´ ০
সা সা রা রা | রা রা রা জ্ঞা | মা মা পা পা | পা -া পা পা |
অ পা র ম হি মা ত ব কে বু ঝি বে এ - ভ বে

১´ ০ ১´ ০
মা মা মা মা | মা মা মধা পা | মা -া মা রা | মা জ্ঞা রা রা |
যো গি জ ন ধ্যা নে ব সি অ - ন্ত পা য় না ভে বে

১´ ০ ১´ ০
সা রা রা ণা | ধা ণা ধা ধা | মা ধা ণা সা | ধর্সা ণা ধা পা |
অ রু প রা শি তু ল না ভু ব নে না পাং ই খু জে

১ ০ ১´ ০
মা পা র্সা ণা | ধা পা ধা পা | মা -া মধা পা | মা জ্ঞা জ্ঞা রা ||
অ সী ম গু ণ কে ম নে ব - র্ণি ব ন ০ ন্দি নি

{ মা পা না না | না না না না | র্সা র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা -া |
গো পে শ নি য় ত-উ ব গা ই তে ছে গু ণ গা ন্

পা ধা র্সা র্রা | র্মা র্জ্ঞা র্রা র্রা | র্সা র্সা ধা র্সা | ণা ধা পা -া }
ম র ণে র পা রা বা রে দ য়া ক রে ক র ত্রা ণ্

মা মা ধা ধা | ধা ণা ধা ধা | মা ধা ণা সা | ণা ধা পা -া |
অ বি র ত আ সা য়া ওয়া হ য় না গো যে ন আ র

১´ • ১´ ০
মা পা র্সা ণা | ধা পা ধা পা | রা মা পা ধা | মা জ্ঞা রা -া ||
স ০ স্ব ল কে ব ল যে ত ব প দ ত র ণি -

তান।

১। সরা মপা ধণা র্সর্রা | র্সণা ধপা মজ্ঞা রসা
আ০ ০০ ০০ ০০ আ০ ০০ ০০ ০০

১´ •
২। ধণা র্সর্রা র্জ্ঞর্মা র্জ্ঞর্রা | র্সণা ধর্সা ণধা পমা
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

রমা পধা ণর্সা ণধা | পমা ধপা মজ্ঞা রসা |
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০





একটা নেংটী ইঁদুর একদিন তার বন্ধুকে বল্‌লে "ভাই মানুষে শুনেছি ঝগড়া করে মুখে মুখে, মারামারি করে হাতে হাতে—কিন্তু পায়ে পায়ে তাদের কি ভাব!" বন্ধু হ'ল অবাক—শেষে নেংটী তার কথা প্রমাণ করতে নিয়ে গেল তাকে এক সজ্জিত কক্ষে। গর্ত্ত থেকে মুখ তুলেই বন্ধু বুঝ্‌লে—এক সঙ্গে কয়েকটী মানুষ চীৎকার কচ্ছে, আর মারামারির মত হাতে শব্দ করছে। নেংটী তাকে নিয়ে বসালে টেবিলের পায়াটীর কাছে। সত্যই সে দেখলে চার জোড়া সবুট মানব-পদ কেমন পাশাপাশি গলাগলি করে রয়েছে। এর থেকে অভিন্ন সৌহার্দ্দ্যের লক্ষণ আর কি হ'তে পারে? বিস্মিত হয়ে সে স্বপ্ন বাস্তবের দ্বন্দ্ব ঘোচাচ্ছে চক্ষু মর্দ্দন ক'রে—এমন সময় গায়ে একটা কি উড়ে এসে পড়লো—চেয়ে দেখে হরতনের সাহেব। তারি সঙ্গে সঙ্গে তার কাণে এলো একটা কথা 'ফোর্‌নেট্রাম্পস্‌'।

আমিও যেদিন টেবিলের উপর হাত দু'টোকে খুঁটী ক'রে মাথার সম্পূর্ণ ভারটী চাপিয়ে নিশ্চিন্ত মনে পোড়া



ব্রীজ টেবিলের নীচে

ক্যাভেণ্ডার সিগারেট খণ্ডের দিকে চেয়ে ছিলুম, সেদিন কেন জানি না তার ধুমায়িত শিখাটী আমার মগজে কোন রন্ধ্রপথ দিয়ে প্রবেশ করলে আর সেথায় এক আবর্ত্তের সৃষ্টি করলে। সেই আবর্ত্তে ঘরের আলো গেল নিভে। বেঙ্গল কেমিকেলের ক্যালেণ্ডারখানা গেল উড়ে। মনে পুলক এলো এই ভেবে—যদি একবার আলাদীনের বাতি জ্বলে ওঠে তাহ'লে নিশ্চয়ই ফুলপরীর দেখা পাবো। আরব্য উপন্যাস যদি একবার ভারতীয় বাস্তব হয়ে যায় তাহলে ত মায় দিয়া—দেড় ডজন বুইক্ গাড়ী করে ঘরের নেংটী ইঁদুরগুলোকে অবধি zoo দেখিয়ে আনি! কিন্তু তা হোল না, আমার বাস্তব আমারই থেকে গেল, স্বইচ্ছায় না হ'লেও করলুম আলাদীনের সিংহাসন এব্‌ডিকেট! বাস্তবের প্রেম, তারও মহত্ব আছে! মাথা বোঁ বোঁ করতে লাগলো—ধন্য ধোঁওয়া, তোমার এত মহিমা? কমলাকান্তের solid আফিং ত আমার জুটলো না—তাই তোমারই সেবা করি। তুমি যেন আমার প্রতি বিরূপ হয়ো না—নিয়ে যাও যেথায় নিয়ে যাবে, কিন্তু এই আকাশ থেকে ফেলে দিও না নীচে—যেথা পোকার মত ট্রাম চলছে বাস চলছে—আর পিঁপড়ের মত সার দিয়ে লোক যাচ্ছে; হয়ত বা গঙ্গার দিকে, নয়ত চিমনি উঁচু ঐ চটকলের দিকে।

চটকলের কথা মনে পড়তে মনটা বিষিয়ে উঠলো—মনে মনে বল্লুম—ঐ যে কয়লা ও পাটের গেঞ্জি তার থেকে হলিউড ঢের ভাল। হলিউড মনে আসতেই একদল কষ্টুমিত তরুণী এসে আমায় বিব্রত করে তুল্‌লে। তাদের সেই হিট্‌লারিয়ান parade dance, তাদের বিলোল কটাক্ষ আমায় ওমর-খৈয়াম রসে ভরে তুললো। 'ইট্ ড্রিঙ্ক এ্যাণ্ড বি মেরী' আওড়ালুম। কিন্তু খাবার ত কিছু ছিলনা, ড্রিঙ্ক ত নয়ই—শুধু ছিল আমার পতিতপাবনী ধূম্রসুন্দরী। তাও প্রাণ ভরে পান করার সঙ্গতি পকেটে ছিল না। মনে মনে ভাবলুম যদি গোল্ডফ্লেকের কি ক্যাভেণ্ডারের কারখানায় কোনদিন আগুন লাগে, আর আমি যদি হই fire brigade এর মালিক—তাহ'লে পাদমেকং ন গচ্ছামি—করে সেই সুরভিত ধোঁয়া পান করাতুম সমস্ত ধরণীর ধূমপিয়াসীদের।

সেদিন ঘরে ঘরে হয়ত উৎসব বসে যেতো। যাক্ হলিউডের কথা বেশীক্ষণ আমায় পেয়ে বস্‌তে পারেনি। ধোঁয়াই আমায় ছুটিয়েছিল জানি না কোন্ পথে—প্রগতির কি অগতির। আমার বসবার উপায় ছিল না। চল্‌ছি—কিন্তু সব সময়েই একটা জিনিষে আমার চোখ ছিল—একটা প্ল্যাকার্ডে লেখা আছে 'বিংশ-শতাব্দী'। একজন স্থায়ী বন্ধু পেয়ে মনটা একটু আশ্বস্ত হোল।

কিন্তু বন্ধুকে পেয়েও নিস্তার ছিল না। তার সাথে সাথে আর যারা ছিল এবং ছিলেন, তাদের সংস্পর্শে আমার যুগপৎ ভয় ও বিস্ময় হ'ল। মনে হ'ল এরা সব বড় বড় গবেষণায় হয়ত ব্যস্ত আছেন। পৃথিবীর বড় বড় রহস্য উদ্‌ঘাটনে এঁরা অমূল্য জীবন ও ততোধিক অমূল্য মুহূর্ত্তগুলি বিলিয়ে দিচ্ছেন; এঁদের disturb করা শোভনও নয়, সঙ্গতও নয়। কিন্তু তাঁরা পেলেন নীরব আমাকে—তাঁদের যেন auditoriumএর একজন, পাজামা ও লম্বা কোট পরা এক ভদ্রলোক তাঁর পাঁসনেখানা বাঁ হাতে তুলে আমায় বললেন 'বুক পরীক্ষা করবো'। আমি ভয় পেয়ে বল্লাম—বুক ঠিক আছে মাথাটা যদি—'না না জ্যাটামো করোনা' বলেই এক যন্ত্র বসালেন বুকে—বল্‌লেন 'The east is slow'. সবিনয়ে বল্লাম—westএর সম্বন্ধে আমার ধারণা ভালই ছিল। খুসী হয়ে বল্‌লেন—মানসিক পরিশ্রম করো না। জিজ্ঞাসা করলাম—'নভেল লিখ্‌তে পারি?' নোট-বুকটা ওল্টাতে ওল্টাতে বল্লেন—'তা পারো, তবে একটা ভাল চশমা নিতে হবে—কারণ নভেল লেখায় মনের চেয়ে চোখের কাজই বেশী।' রাগে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপছিল—হয় ব্যাটা আমায় চোর সাহিত্যিক ভেবেছে, নয় নিশ্চয়ই Occultist চশমার ব্যবসা করে খায়। তিলার্দ্ধ দেরী না করেই ছাড়লুম তাকে। একটা মোড় না পার হতেই দেখি এক মূর্ত্তি দূরে সাবলীলভাবে মিলিয়ে আছে। কাছে না গিয়ে থাকতে পারলুম না—কারণ যাওয়ার পক্ষে আমার কোনই কষ্ট ছিল না। গতি আমার বাহন হয়ে স্ববশেই ছিল। কিছু কাছে যেতে দুটো জিনিষ স্পষ্ট হয়ে আমার চোখে পড়লো, একটী হচ্ছে মুখে তার wheeler wolsey মার্কা অর্দ্ধগজ পরিমাণ এক চুরুট একটী দণ্ডায়মান শলাকার সঙ্গে আঁটা। আর একটী হাতে তার এক মোটা পার্কারের মত কলম। কাছে যেতেই তিনি এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে আমায় ইঙ্গিত করলেন কাছে যেতে। মুখখানা দেখে খুব করুণ মনে হোল—নিত্য সেফ্‌টিরেজারিত মুখ থেকে স্নোএর আভা তখনও মিলিয়ে যায় নি। সাবানিত



বুক পরীক্ষা করবো

খস্‌খসে চুলগুলি থেকে একটা মৃদু ভ্যানিলিনের গন্ধ আসছিল।

বললেন—'আজ আমরা দুজনে বন্ধু।' আমি সম্মতি জানালুম 'তাতে কোন আপত্তি নেই।' কিন্তু তখনি আমায় বাধা দিয়ে বললেন—এক সর্ত্ত আছে। আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি—ততক্ষণ তিনি চুরুটে আর একটী টান দিয়ে, কুণ্ডলীত ধোঁওয়া ডানদিকে ছেড়ে আমার দিকে ফিরে বল্‌লেন—একটী প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তোমায় —উত্তর যদি না পার তবে আমিই দিব যে উত্তর তাতে জানাতে হবে তোমার সম্মতি। দেখ এ ত অতি সহজ কথা—হাঁ বলার ত কোন বাধা আমার সামনে দেখছি না। হলুম রাজি। বললেন—আচ্ছা, বলতে পার মানুষের এমন কোন একটী সময় আছে যখন সে মনে করে নিজেকে সবচেয়ে অসুখী—মাটীর সঙ্গে মেশাতে চায় আপনাকে, অন্ধকারে তলিয়ে দিতে চায় আপনাকে। যখন তার কাছে বিশ্বের সমারোহ হয় একটা মূর্ত্ত বিদ্রূপ, যখন তার কাছে

জীবনের অর্থ হয় একটা অভিশাপ। যখন—বাধা দিয়ে বল্লুম—বুঝেছি, এর উত্তর বোধ হয় আমি দিতে পারবো। এই কলকারখানা এই সভ্যতার যুগে যখন মানুষের পঞ্চাশ বছর পরমায়ুর সাড়ে উনপঞ্চাশ বছর টিকে থাকার সংগ্রামে কেটে যায় তখন তার জীবনে সুখের ক্ষণ খুঁজে পাওয়া শক্ত হ'তে পারে কিন্তু অসুখের নয়। ঈষৎ হেসে আমার Examiner বল্লেন উঁহু। আমি বল্লুম—অন্নাভাবে যখন বেকার মানুষ দেখে তার রুগ্নশিশু ক্ষুধায় রুদ্ধকণ্ঠ হয়ে যায় তখনই ত তার বেদনার চরম মুহূর্ত্ত। গম্ভীরভাবে আবার আমার সদ্য-বন্ধু বল্লেন—না—ভাষা তোমার আছে কিন্তু



সাবলীলভাবে মিলিয়ে আছে

ভাব নেই। সাহিত্য চায় দুইই—এ হচ্ছে হৃদয়ের আর্ট। কিছুদিন কসরৎ করো, তা হলেই হবে। একটু থেমে বল্লেন—চরম মুহূর্ত্ত আসে সেই ক্ষণে যখন মানুষ মারাত্মক ভুল করে বসে। ধরো তুমি নিত্যকার কাজের আবর্ত্তে সকালে হলে বাড়ী-ছাড়া, হয়তো টার্ণার মরিসন্ বা বেগ্ ডানলপ্ কোম্পানিতে জুটের লেজার মিলোচ্ছ। মনে নেই তোমার সেই জামা পরে যেতে যে জামার পকেটে ছিল একখানা পরকীয়া প্রেমপত্র—স্ত্রী তোমার অকারণে পেল সেই চিঠি, পড়্ছে সেটা বালিশে ঠেস দিয়ে—চোখ দুটো জলে জলে উঠছে। এমন সময় তোমার অফিসের ধরো বড় সাহেবের Fareweel, দুপুর একটায় হ'লো ছুটী, ফিরে আস্ছো বাড়ী—কমলালেবু আর একখানা ডুরে সাড়ী কিনে। দালানের দরজা পার হয়েই তোমার চোখে পড়লো প্রিয়া পাঠনিবিষ্টা। ঘরে প্রবেশ করলে—তখন আর স্পষ্ট হ'তে বাকী রইলো না যে সেই প্রলয়ঙ্করী প্যাডের পত্রখানি—যেটী তোমারই পকেটে একটী লেফাফায় মোড়া ছিল সেইখানিই তোমার প্রিয়ার হাতে। সেই হচ্ছে চরম মুহূর্ত্ত—সেই হচ্ছে তোমার জীবনে এক অভিনব বেদনার spark, শিরায় শিরায় যা দিয়ে দেবে Volcanoর শিহরণ। কেমন—এবার স্বীকার কচ্ছ? করতেই হবে—এ আমার মুখের কথা নয়; এই আবিষ্কারের মূলে রয়েছে কি জান—তিনটী বাক্স বর্ম্মার ধোঁওয়া। মাত্র যেটী অবশিষ্ট ছিল সেটী আমার মুখে, এর আয়ুর সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার romantic গবেষণার উপসংহার করবো। বলেই তিনি সামনের কাগজের ফাইলের উপর এক মুষ্ট্যাঘাত কল্লেন। সবল আঘাতে জীর্ণ টেবিল নড়ে উঠ্লো। ফুলের vaseটা মাটীতে পড়ে গেল ভেঙ্গে, চুরুটের stand পড়্লো কাৎ হয়ে। উত্তেজনার সেই চরম মুহূর্ত্তে আমি পড়লুম সরে।

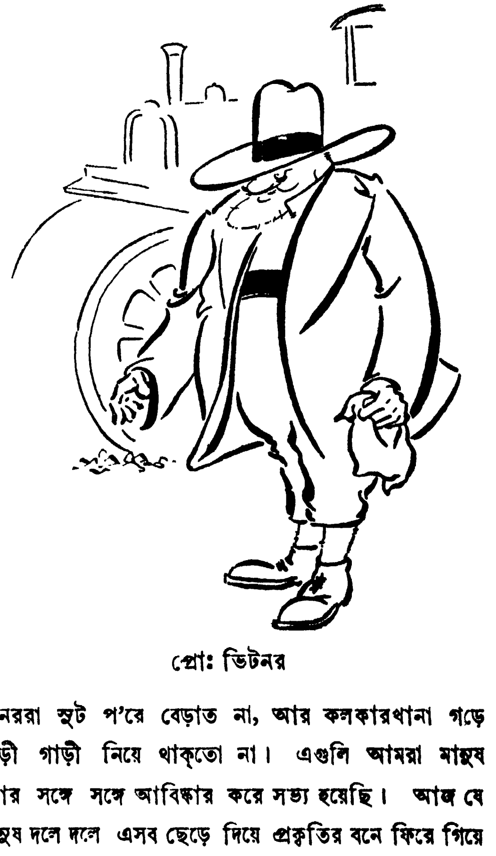
সাহিত্যিক বন্ধুকে পশ্চাৎ করে খানিকটা বেশ জোরেই চল্লুম। ক্রোটনের ঝাড়গুলো পাশ দিয়ে সারি সারি চলে যাচ্ছিল। একটু পরেই একটা ফটকের তলায় এসে পড়লুম। এখানে এসে দাঁড়াতেই একটা শব্দ কাণে এল। ট্রেণের শব্দ বলেই মনে হোল—অথচ রেলের লাইন ত দেখ্ছি না। যাই হোক কৌতূহল নিয়ে দাঁড়ালুম। শব্দ জোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টাধ্বনিও শুনতে পেলুম। কিছুক্ষণ পরেই দেখি কি একটা আসছে খুব মন্থরগতিতে। দেখে দুঃখ হোল, বল্লুম—ভগবান এখনও যারা স্থাবরের মত মন্থর গমনে চলে তাদের ক্ষমা করো। বেগের তত্ত্ব এরা বোঝে না। আমার এই তত্ত্ব বোঝাবার অবকাশে সাম্‌নে সেই নড়ন্ত-জীব যেটী এসে দাঁড়ালো সেটী একটী ষ্টীম-রোলার। সেটীর মালিক বা আরোহী যিনি ছিলেন তাঁকে দেখে একটু সম্ভ্রম হোল। জিজ্ঞাসা করার দরকার হোল না—পরিচয়ে জানলুম গাড়ীর গায়ে একটী ঝোলান কার্ড থেকে। ইনি

প্রোফেসার ভিট্নর—খাঁটী ভারতীয়, তবে সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশে জীবতত্ত্ব অধ্যাপনা করতেন। চোখের ভ্রূগুলি বয়সাধিক্যে ঝরে গেছে—কিঞ্চিৎ দাড়ি গোঁফ এখনও পৌরুষের লক্ষণস্বরূপ সাক্ষ্য দিচ্ছে। কেন জানি না—আমাকে তাঁর গাড়ীতে তুলে বসালেন—আর নিজেই একটা চাকা ঘুরিয়ে ষ্টার্ট দিলেন।

তাঁর প্রথম স্বর শুনেই আমি একটু সচকিত হয়েছিলুম; কারণ যাত্রাদলের ঘন ঘন তামাকুসেবিত নারদের কণ্ঠ হ'তেও তা বার হওয়া সম্ভব নয়। আমায় বল্লেন—বিস্মিত হচ্ছ—আমায় দেখে। কিন্তু জান না কত জীবন্ত বিস্ময় নিয়ে তোমরা অহোরাত্র সংসারে চলে বেড়াও। Evolution কাকে বলে জান? আমি নরম গলায় উত্তর দিলুম—বানর থেকে মানুষ হওয়া, ঘোড়া থেকে জিরাফ হওয়া, মাছ থেকে পাখী হওয়া। বাধা দিয়ে বল্লেন "এ ত সেকেলে কথা, সেই ডারুইন বল্‌তো। আমার চারখানা বই তাহলে পড়নি। আচ্ছা মোটামুটী শোনাচ্ছি তোমায়—তুমি পাইপ খাও। ও, খাও না—তাহলে নস্য নিতে পার—তাও আমার কাছে আছে।" আমি একটিপ নস্য নিলুম, নাকের কাছে নিয়ে যেতেই তিনি লাফিয়ে উঠ্‌লেন—বল্লেন—"আরে ছিঃ, নাকে নস্য দিয়ো না—নাক সম্বন্ধে আমার একটা প্রবন্ধ আছে—আচ্ছা পরে সে সম্বন্ধে বলবো। এই দেখ এই ভাবে নস্য মুখ দিয়েই নিতে হয়।" বলে তিনি একতাল নস্য মুখে ঢেলে দিলেন; পরক্ষণেই একটী দেশলাই কাঠি কচ্‌মচ্‌ করে চিবিয়ে খেলেন। দেশলাই কাঠির তাৎপর্য্য জান? এটা আর কিছুই নয়—ঐ ভক্ষিত নস্যের সঙ্গে অগ্নিসংযোগের ব্যবস্থা। এতে নেশা ত জোর হবেই, তাছাড়া অনর্থক ধোঁয়ার অপচয় হয় না।—হ্যাঁ তোমায় যা বলছিলুম সেটা হচ্ছে evolution নিয়ে। গরুরগাড়ী থেকে মোটরকার বা ষ্টীম-রোলার থেকে এরোপ্লেন—এটা হচ্ছে ডারুইনের কথা। কিন্তু আমি প্রমাণ করেছি যে এরোপ্লেন থেকে আবার ষ্টীম-রোলার হবে। এই যে ষ্টীম-রোলার দেখ্‌ছো, একে অতীতের ছাপ দিয়ে museum-এও রাখ্‌তে পার—আবার সুদূর ভবিষ্যতের অগ্রদূত বলে অভিনন্দনও করতে পার। এইভাবে অতীত ও ভবিষ্যতকে সংযুক্ত করে বর্ত্তমানে এই যে আমি চলছি এই আমার স্বরূপ। কেমন বুঝলে, আমার বাহন কেন টর্পেডো, মোটর, জেপলীন না হয়ে হয়েছে ষ্টীম-রোলার?

হতবুদ্ধির মত আমি বল্লাম—'বুঝেছি বটে, কিন্তু মেনে নিতে পারছি না।'

'আচ্ছা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। এমন প্রমাণ দেবো, যা দিয়ে তুমি নিতে পার।' বলে তিনি আরম্ভ করলেন—"বানর থেকে আমরা যদি হয়ে থাকি বানরেই আবার ফিরে যাবো। দেখ্‌বে কি রকম করে। আচ্ছা উলঙ্গ



প্রোঃ ভিটনর

বানররা সুট প'রে বেড়াত না, আর কলকারখানা গড়ে বাড়ী গাড়ী নিয়ে থাক্‌তো না। এগুলি আমরা মানুষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কার করে সভ্য হয়েছি। আজ যে মানুষ দলে দলে এসব ছেড়ে দিয়ে প্রকৃতির বনে ফিরে গিয়ে শাখায় শাখায় নৃত্য সুরু করে দিয়েছে—এর থেকে কি স্পষ্ট বোঝা যায় না কোনদিকে আমরা যাচ্ছি! তুমি নুডিজম সম্বন্ধে খবর রাখ্‌?"

আমি বল্লাম—কিছু কিছু রাখি, তবে ভারতবর্ষের লোক আমরা নগ্নবাদের বইপড়া আর ছবি দেখা ছাড়া—। বাধা দিয়ে প্রোফেসার বল্লেন—দুঃখ করো না, ভারতবর্ষেও

নগ্ন মানুষ চলবার সময় হোল বলে। পাশ্চাত্যে থাকতে আমিও ছিলাম ঐ Cultএর মেম্বার, তখন আমার যৌবন ছিল। তা যখন ছাড়লুম তখন আমার বিখ্যাত বই 'Animality in Progress' লিখছি—ওর 3rd Volএর prefaceএ আছে—Nudism আর কিছুই নয় Newism-এর নামান্তর। যা New তাই ism আর যা ism, তা ত New হবেই। Nudism ও সেই রকম New বলেই একটা ism হয়েছে আর চলছে। অবাক হয়ে যাচ্ছ! কি এ রকম দামী দামী অনেক কথা ঐ prefaceএই আছে। দুঃখ হয় এসব বইএর কদর করতে জানে না লোক। উদ্ভট গবেষণার জন্য—বলেই তিনি একটী কাঁচকড়ার ডিবে



ভবিষ্যতের মানুষ—প্রোঃ ভিটনরের মতে

বার কল্লেন—উপরে লেখা আছে 'কামাস্কাট্কাবাসীর উপহার।'

এমন সময় আমাদের সরব বাহন এমন এক জায়গায় এসে পড়লো যেখানটাকে সহরের বড় রাস্তা বলা যেতে পারে। নানা লোক, নানা গাড়ী। প্রোফেসার তার বিরাট পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখটা মুছে নিলেন। তারপর আস্তে আস্তে বল্লেন "তোমায় দেখে খুব ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে। আমি কিন্তু ছিলুম ঠিক উল্টো, দুর্দ্ধর্ষরকম দুষ্ট। দুষ্টুমিটা একটু অন্যধরণের ছিল, তোমাদের মত প্রেমে পড়ার ব্যাধি আমার ছিল না। কোন তরুণী আমার বক্তৃতা দু' মিনিটের বেশী সহ্য করতে পারেনি। আমি করতুম কি, প্ল্যানচেট্ করে পৃথিবীর সমস্ত মরা লোককে আনতুম। তাদের কাছে অনেক তথ্য সংগ্রহ ছিল আমার কাজ। ঐ দেখ, সামনে একটী যুবক মোটরের তলায় চাপা পড়লো।"

সত্যই দেখি একটী ছোকরা চাপা পড়েছে আমাদেরই সামনে। আমি বল্লুম, চলুন ড্রাইভারকে পুলিশে দিই—বেটা পাষণ্ড, Careless brute!

প্রোফেসার শান্তস্বরেই বল্লেন—ভুল, ভুল, বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই। এরকম হতে বাধ্য। কেন হবে না? এ সাদা সত্যটা বোঝ না যে মোটরগাড়ীর যে গতিতে উন্নতি হচ্ছে মানুষের দেহে সে হিসাবে কিছুই হচ্ছে না। হ্যাঁ বলতে পার, একটা জিনিষ হয়েছে—এই যে তারা ব্যাক্‌ব্রাস্ করা আরম্ভ করেছে। আচ্ছা এটার কারণ জান, কেন শতকরা ৯০জন ব্যাক্‌ব্রাস্ করে?

আমি বল্লাম,—'ওটা আর কি এমন, আঁচড়াবার সুবিধা, মুখে না চুল এসে পড়ে।'

প্রোফেসার উত্তেজিতভাবেই বলে উঠলেন "হোল না —এর মধ্যে সায়েন্স রয়েছে বন্ধু। ও দিয়ে বাতাসের resistance কমানো হয়। Speedএর যুগ এসেছে—latest মোটরের গড়ন দেখেছ—মোটর শুধু কেন, ট্রেণ্ ট্রাম যাকেই ছুটতে হবে তাকেই সামনেটা করতে হবে ব্যাক্‌ব্রাস করা মাথার মত গোল ও প্লেন। এও Evolution এরই একটা ধারা। এই ধরো যতই মানুষের স্পীড বাড়বে তত তার নাক হবে বড় ও ছুঁচোলো—বাতাসের বাধা আর লাগবে না।—চোখ দুটো ক্রমে ক্রমে যাবে সরে কাণের দিকে, কাণেরও গড়ন বদলে যাবে। অবাক হোচ্ছ? মনে করো দু'শো বছর পরে যদি তোমায় আবার দেখি—দেখবো তোমার চোখ হয়তো সিকি ইঞ্চি কাণ ঘেঁসে গেছে।"

এই রকম আলোচনায় মনে মনে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছিলুম—বিরক্তস্বরেই বল্লুম, 'তা যেন হোল, তাতে সুবিধাই বা কি হবে—আর মোটর চাপা থেকে রেহাই হবেই বা কি করে?'

প্রোফেসর বল্লেন—আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি সাড়ে সাত'শ কি আট'শ বছর পরে, ছোকরারা পথ চলছে, পাশ দিয়ে নানা রকমের গাড়ী চলছে, নানা রঙের সাড়ী গাউন—পাশ দিয়ে যাচ্ছে, ছেলেদের কোন অসুবিধা নেই—মুখ ফিরোবার দরকারই নেই—পার্শ্বচক্ষু দিয়ে দুদিকের জিনিষ দেখছে। কত সুবিধা বলতো? চলায়ও অনেক পরিবর্ত্তন হবে। হাঁটুতে এমন এক গার্টার ফিট করা হবে যাতে ইচ্ছা করলেই পিছন দিকে পা ঘুরিয়ে পিছনে চলা যেতে পারবে। সবই সায়েন্স ভাই, সবই সায়েন্স—গাড়ী চাপা তখনই বন্ধ হবে তার আগে নয়। বলেই প্রোফেসার আমার পিঠ চাপড়াতে লাগলেন। সেই সময় কি রকম Steering wheelটা অন্যদিকে ঘুরে এক খানার মধ্যে পড়লাম সেই হাজারমনি রোলার নিয়ে। ভয়ে আঁৎকে উঠলুম। পায়ের কাছে একটা নেংটী ইঁদুর চলে গেল। মাথা তোলবার চেষ্টা করলুম—দেখি কে মাথায় হাত দিয়ে বলছে—'টেবিলটাকে ভেঙেছিলে আর কি?' যাক্ সেদিন সত্যিই বেঁচে গেছি।

ভারতীয় শর্করা শিল্প

শ্রীললিতমোহন হাজরা

ভারতীয় শর্করা শিল্প দ্রুতগতিতে উন্নতি লাভ করিতেছে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ভারত গভর্ণমেণ্ট শর্করা সংরক্ষণ আইন (Sugar Industry (Protection) Act 1932) প্রণয়ন করিয়া ভারতীয় শর্করা শিল্পকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ইহার ফলে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে ইক্ষুর আবাদ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং অনেকগুলি কল স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৩২-৩৬ খৃষ্টাব্দের সরকারী রিপোর্টে নিম্নলিখিত তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

বৎসর	কার্য্যরত কলের সংখ্যা	কতটন ইক্ষু পেষণ করা হইয়াছে	সরাসরি ইক্ষু হইতে কত টন চিনি প্রস্তুত হইতেছে
১৯৩১—৩২	৩২	১৭৮৩০০	১৫৮৫৮১
১৯৩২—৩৩	৫৭	৩৩৫০২৩১	২৯০১৭৭
১৯৩৩—৩৪	১১২	৫১৫৭৩৭৩	৪৫৩৯৬৫
১৯৩৪—৩৫	১৩০	৬৬৭২০৩০	৫৭৮১১৫
১৯৩৫—৩৬	১৩৯	৭৭১০০০০	৬৮৪০০০

এই তালিকা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে ভারতীয় শর্করা শিল্পের অতি দ্রুত উন্নতি হইতেছে।

ভারতীয় শর্করা তিন প্রকারে প্রস্তুত হয়। (১) আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে সরাসরি ইক্ষুরস হইতে প্রস্তুত হয়। (২) দেশীয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে ইক্ষুরস ফুটাইয়া প্রস্তুত হয়। এই প্রণালীতে প্রস্তুত শর্করা খাণ্ডসারি নামে অভিহিত হয়। (৩) গুড় হইতে প্রস্তুত শর্করা।

এইবার দেখা যাউক আমরা ভারতীয়গণ বৎসরে কি পরিমাণ শর্করা ব্যয় করি। আমাদের দেশে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী শিল্প তুলা। তুলার পরেই ইক্ষু। এই শর্করা-শিল্প বৎসরে কুড়ি লক্ষ কৃষকের অন্ন সংস্থানের উপায় করিয়া দিতেছে এবং প্রতি বৎসরে এই দরিদ্র দেশের প্রায় ১৫ কোটি টাকা বিদেশে চালান হইতে রক্ষা করিতেছি।

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে ভারতীয়গণ বাৎসরিক কত টন শর্করা ব্যবহার করে

বৎসর	কতটন শর্করা ব্যবহার করে
১৯৩১—৩২	৯৮২০০০
১৯৩২—৩৩	৯০০০০০
১৯৩৩—৩৪	৯০০০০০
১৯৩৪—৩৫	৯০০০০০
১৯৩৫—৩৬	৯০০০০০

ভারতীয়গণের ব্যবহৃত শর্করার পরিমাণ ঠিক সমান হয় নাই। পরিমাণের সমতা ও আধিক্য নির্ভর করে মূল্যের তারতম্যের উপর এবং আর্থিক উন্নতির উপর। এখন দেখিতে হইবে ভারতীয় কলগুলি বাৎসরিক কত লক্ষ টন শর্করা উৎপাদন করে।

বৎসর	আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে সরাসরি ইক্ষুরস হইতে কত টন প্রস্তুত	কত টন খাণ্ডসারি প্রস্তুত	গুড় হইতে কত টন	মোট—
১৯৩১—৩২	১৫৮৫৮১	২৫০০০০	৬৯৫৩৮	৪৭৮১১৯
১৯৩২—৩৩	২৯০১৭৭	২৭৫০০০	৮০১০৬	৬৪৫২৮৩
১৯৩৩—৩৪	৪৫৩৯৬৫	২০০০০০	৬১০৯৪	৭১৫০৫৯
১৯৩৪—৩৫	৫৭৮১১৫	১৫০০০০	৪০০০০	৭৬৮১১৫
১৯৩৫—৩৬	৬৮৪০০০	১২৫০০০	৪০০০০	৮৪৯০০০

উল্লিখিত দুই তালিকা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে ভারতীয় কলগুলি দেশের প্রায় প্রয়োজনীয় শর্করা এই সামান্য সময়ের মধ্যে প্রস্তুত করিতে সামর্থ্য লাভ করিয়াছে এবং ইহাও আশা করিতে পারা যাইতেছে যে আগামী ২।১ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় শর্করা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা হইবে। আলোচ্য বর্ষে যতগুলি কল কার্য্যরত রহিয়াছে তাহারা যদি সারা বৎসরব্যাপী কার্য্য করিতে পারে তাহা হইলে ১১০০০০০ লক্ষ টন শর্করা উৎপাদন করিতে পারিবে। কিন্তু বর্ত্তমানে ইক্ষু আবাদের উন্নতি না হওয়ার উহা সম্ভবপর নহে।

ইক্ষু আবাদের ভূমির পরিমাণ প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাইতেছে। সরকারী রিপোর্টে কেবলমাত্র কত লক্ষ একর জমিতে ইক্ষু আবাদ হইয়াছে তাহাই জানিতে পারা যায়। কত লক্ষ টন ইক্ষু উৎপন্ন হইতেছে তাহার কোন সংবাদ নাই। ইহা না থাকায় আমাদিগকে শর্করার সমস্ত বিবরণের জন্য গুড়ের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। ইহাতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় এবং প্রায়ই বিবরণ সঠিক হয় না বা হওয়া সম্ভব নহে। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে গত কয়েক বৎসরে ভারতের প্রদেশসমূহে কত একর ক্ষেত্রে ইক্ষুর আবাদ হইয়াছে এবং কত লক্ষ টন গুড় প্রস্তুত হইয়াছে।

প্রদেশ	জমির পরিমাণ (১০০ একর)		কত টন গুড় প্রস্তুত হয় (১০০০ টন)	
	১৯৩৪—৩৫	১৯৩৫—৩৬	১৯৩৪—৩৫	১৯৩৫—৩৬
যুক্তপ্রদেশ	১৮৪৯	২২৪৯	২৭৫৮	৩৩:৬
পাঞ্জাব	৪৬২	৪০৩	৩২৬	৩৫৮
বিহার উড়িষ্যা	৪৪৫	৪৬৫	৬৭৩	৬৬৮
বাঙ্গালা	২৭৬	৩২৫	৪৯২	৫৬০
মাদ্রাজ	১২২	১৩১	৩২১	৩৬০
বোম্বাই	১১৪	১২১	২৬৬	৩১৩
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৪৩	৫৮	৪১	৬৩
আসাম	৩৫	৩৫	৩৪	৩৫
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	২৯	৩০	৪৭	৪৯

অল্ ইণ্ডিয়া শুগার মিলস্ এসোসিয়েসন তাঁহাদের রিপোর্টে প্রকাশ করেন যে ১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে আনুমানিক ৪১৪১০০০ একর ক্ষেত্রে ইক্ষুর আবাদ হইবে এবং ৬১০০০০০০ টন ইক্ষুর উৎপন্ন হইবে। অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসরে যে পরিমাণ ক্ষেত্রে আবাদ হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা ১৫% ভাগ অধিক ক্ষেত্রে আবাদ হইবে এবং ১৬% ভাগ অধিক টন ইক্ষু উৎপন্ন হইবে; এই ত সাধারণ ইক্ষুর কথা। সম্প্রতি আমাদের দেশে উন্নত ধরণের (Impr oved quality) ইক্ষুর আবাদ আরম্ভ হইয়াছে। উন্নতধরণের ইক্ষুর অভাব আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। এই অভাব পুরণের জন্য আমাদিগকে প্রতি বৎসর জাভা হইতে কয়েক সহস্র টন ইক্ষু আমদানী করিতে হইতেছে। ফলে কয়েক লক্ষ টাকা দেশ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। এই অভাবের পূরণ অতি শীঘ্র হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তবে আশা করা যাইতেছে যে ৪।৫ বৎসরের মধ্যে আমাদের এই অভাব পূরণ হইয়া যাইবে।

আমাদের আলোচ্য শিল্প যেমন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে তেমনি কতকগুলি সমস্যা দ্বারা শিল্পের অন্তরায় বাড়িয়া যাইতেছে। সেই সমস্যাগুলির যথাসম্ভব সত্বর সমাধান না হইলে এই ক্রমবর্দ্ধমান শিল্পের অবনতির যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে। কতকগুলি সমস্যার উল্লেখ এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সেইগুলি যথাক্রমে :—(১) মাতৃত গুড় (Mol1sses) এবং ইক্ষু 'যোয়ার' (Bagasse) ব্যবহার (২) ইক্ষু আবাদের ব্যয়সঙ্কোচ (৩) উন্নতধরণের ইক্ষুর আবাদ (৪) ইক্ষু রোগের দমন (৫) নানা প্রদেশের ইক্ষু ক্রয়কালীন নানা প্রকার অবৈধ প্রতিযোগিতা (৬) মিলের

নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রে উন্নতধরণের ইক্ষু আবাদ (৭) ক্ষেত্রে জল সেচন ও জল নিঃসরণের ব্যবস্থা (৮) কৃষকগণ যাহাতে ক্ষেত্রে উন্নতধরণের 'সার' ব্যবহার করে এবং কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা (৯) ইক্ষু পেষণের সময় ৪ হইতে ৮ মাস পর্য্যন্ত বৃদ্ধিকরা (১০) শর্করা বিক্রয়ের ব্যবস্থা অবলম্বন করা (১১) উন্নতধরণের শর্করা প্রস্তুত করা। এই সমস্যাগুলির আশু সমাধান হইলে আশা করা যায় দুই এক বৎসরের মধ্যেই ভারতীয় শর্করা জাভার শর্করার সহিত প্রবল প্রতিযোগিতা চালাইতে সমর্থ হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বর্ত্তমানে ভারতে ইক্ষু আবাদের উন্নতির বিশেষ প্রয়োজন। ভারতীয় মিলের মালিকগণ এ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন রহিয়াছেন। জাভার মিল-মালিকগণের ন্যায় আমাদের দেশের মালিকগণকে নিজেদের আয়ত্তাধীনে এবং মিলের নিকটবর্ত্তী অনেকখানি স্থান জুড়িয়া ইক্ষু আবাদ করিতে হইবে। জাভার মালিকগণ তাঁহাদের ইক্ষুর আবাদ বৈজ্ঞানিক উপায়ে সম্পন্ন করেন। তাঁহাদের আবাদ বৈজ্ঞানিক উপায়ে এবং উন্নতধরণে সম্পাদিত হওয়ায় দেশের নিরক্ষর কৃষকদিগের মধ্যে চাঞ্চল্য পড়িয়া গিয়াছে। ইহার ফলে জাভায় শ্রেষ্ঠ ইক্ষু উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু আমাদের দেশে এই ব্যবস্থা প্রচলন হয় নাই। আমাদের দেশের মিল-মালিকগণ ইক্ষুর জন্য সম্পূর্ণ-রূপে নির্ভর করেন দেশের কৃষক সম্প্রদায়ের উপর। এই কৃষকগণ একেবারে নিঃস্ব। তাহারা জমিতে উত্তম সার প্রদান করিতে পারে না এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবাদ করিবার অর্থও ইহাদের নাই। এতদ্ব্যতীত কৃষকদিগের আবাদী ক্ষেত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হওয়ায় এবং এক স্থানে অবস্থিত না হওয়ায় তাহাদিগকে আবাদের অনেক ব্যয় বহন করিতে হয়। কিন্তু দরিদ্র ও নিঃস্ব কৃষকেরা কেমন করিয়া এত ব্যয় বহন করিতে পারিবে? সেই জন্য কৃষকেরা যেন তেন প্রকারে আবাদ করে। ফলে ইক্ষুর কোন উন্নতি সাধন হইতেছে না। মধ্যে মধ্যে নানা প্রকার ইক্ষু রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। ফলে কৃষকেরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইতেছে। এই সমস্ত মারাত্মক রোগ যাহাতে ফসলকে আক্রমণ করিতে না পারে তাহার জন্য সরকারী-মহলকে এবং মিলের মালিকগণকে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। আমাদের দেশে জল সেচনের অব্যবস্থায়, বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবাদের অভাবে এবং উত্তম সারের অভাবে কৃষকেরা সেই মামুলী প্রথায় আবাদী কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। তাহার ফলে আমাদের ইক্ষু উৎপাদনের খরচ অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং শর্করার মূল্য অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক বেশী। বর্ত্তমানে ভারতে যাহাতে জাভার ন্যায় উন্নত এবং শ্রেষ্ঠ ইক্ষুর আবাদ হয় তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থার প্রচলন করিতে হইলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবাদের প্রথা প্রচলন, জল সেচন ও জল নিঃসরণের সুব্যবস্থা অবলম্বন, জমিতে উত্তম সার প্রদানের ব্যবস্থা ও কৃষকদিগের ইক্ষু আবাদ সংক্রান্ত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইক্ষু বর্ত্তমানে ভারতের অন্যতম প্রধান ফসল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাৎসরিক ৬০ কোটি টাকা মূল্যেরও অধিক ভারতে ইক্ষু উৎপন্ন হয়। ভারত সরকারের রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে যে আর্থিক দুর্গতির দিনেও ইক্ষু উৎপাদনকারী কৃষকেরা তাহাদের দেয় খাজনা বেশ স্বচ্ছন্দতার সহিত পরিশোধ করিয়াছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে স্বীকার করিতে হইবে যে ভারতীয় ইক্ষু উৎপাদনকারী কৃষকদিগের কৃষিকার্য্য সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারের উন্নতি ভারত সরকারেরই করা উচিত। সুখের বিষয় ভারত সরকারের পল্লী সংস্কার ফাণ্ড হইতে কৃষির উন্নতির জন্য ৩২৮০০০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। ভারতীয় ইক্ষুর উন্নতি-বিধান কল্পে অল্ ইণ্ডিয়া সুগার মিলস্ এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত এম, পি, গান্ধী লিখিয়াছেন:—

"For this purpose it is essential to establish a series of demonstration farms and nurseries in all cane-growing Provinces so that they may devote their energies to the propagation of canes of higher sucrose content, of higher tonnage and of early and late ripening varieitis which will be very helpful to the industry in extending the crushing season and thus reducing cost of production of sugar. These demonstration farms and nurseries should also serve as centres from-where trained agriculturists would tour round the surrounding districts where the best methods of cultivation and manuring suitable

to Indian condition would be demonstrated and made accessible to small-holders and whence the distribution of disease-free seed could be undertaken. One important function of these farms would be to carry on researches as to the methods of combating some diseases and pests. In addition to the establishment of such farms it is also necessary for the Government to undertake such allied work of all-round improvement as provision of better facilities of irrigation by extension of canal system and assistance in tapping the subterranean sources of water-supply." (১) তিনি আরও লিখিয়াছেন যে—"It is the bounden duty of the Government to undertake all measures calculated to improve the condition of the cultivators and to help the stabilisation of the sugar Industry within a short period. It is equally the duty of the mill-owners to take active part in this programme of improvement of cultivation of cane and to render all possible assistance to help the Government. Such an enormous scheme of development would only be got through with the cooperation of all concerned viz, the Government, the Manufacturer, the Zaminder and the Cultivator. (২)

ইক্ষু সরবরাহের সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মিলের মালিকগণ ইক্ষু সরবরাহের জন্ম এমন অবৈধ প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়া থাকেন যে তাহার ফলে শর্করার মূল্য বৃদ্ধি পায়। এই অবৈধ প্রতিযোগিতা প্রত্যাহার করিতে হইলে প্রত্যেক মিলের মালিকদের আপন আপন ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলা বিশেষ প্রয়োজন। মনে করুন বর্দ্ধমান জেলায় কেতুগ্রাম একটি থানা এবং থানাটির পরিমাণ বেশী নয়। এই থানার অধীনে দুইটী কল আছে। কিন্তু এই থানায় অতি সামান্য পরিমাণ ক্ষেত্রে ইক্ষুর আবাদ হয় যাহা দুইটী মিলের পক্ষে অতি নগণ্য। এক্ষেত্রে সাধারণতঃ দেখা যায় একটী মিলের মালিক সমস্ত ইক্ষু ক্রয় করিয়া লইবার জন্ম আপ্রাণ চেষ্টা করিতে থাকে। ফলে যে মিলের মালিকের পুঁজি অতি অল্প তাহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে এবং দুই এক বৎসরের মধ্যেই সেই মিলটি নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে এরূপ করা উচিত যে দুইটি মিলের মালিক সমস্ত ইক্ষুকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া আপনাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইবেন। তাহা হইলে সমস্ত মিলগুলি কার্য্য চালাইতে থাকিবে। গত ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লী সহরে অল্ ইণ্ডিয়া শুগার মিলস্ এসোসিয়েসনের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন হইয়াছিল। সেই সম্মেলনে এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে প্রত্যেক মিলের মালিকগণের একটি 'হোম-ষ্টেশন' থাকিবে। এই ষ্টেশন তাহাদের নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্র হইতে ইক্ষু সরবরাহ করিবে। যুক্তপ্রদেশের কয়েকটি মিল-মালিক এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন যুক্তপ্রদেশের পশ্চিমাংশে এই প্রস্তাবিত নিয়ম খাটিতে পারে না। কারণ ঐ স্থানের মিলগুলি এত নিকটবর্ত্তী যে সেখানে এই নিয়ম সদাসর্ব্বদা ভঙ্গ হইতে পারে। তাঁহাদের এই সমস্ত যুক্তি বিচার করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গৃহীত হইয়াছে।

প্রস্তাবটি এই :—"That in order to minimise the competition in the purchase of cane the Association recommends that in such Districts where factories are agreeable the definition of 'Home Station' as applicable to such districts be extended so as to include any station within eight miles (as the crow flies) of any sugar factory within the definition of its 'Home Station'. In such a station where within 8 miles of more than one factory it should he regarded as a joint "Home Station" of all factories within eight miles radius. Resolved further that such factories who agree to this scheme are strongly recommended to continue the practice of not drawing their supplies of sugarcane from all 'home stations' of other factories as included in the extended definition."

এই প্রস্তাব অনুযায়ী তাহারা যদি কার্য্য করেন তাহা

(১) Mr. M. P. Gandhi—The Indian Sugar Industry (1936 Annual pp 53)

(২) Mr. M. P. Gandhi—The Indian Sugar Industry (1936 Annual pp. 54)

হইলে মিলের মালিকগণ আপনাদের দরজার সম্মুখে ইক্ষু পাইবেন। ইহার জন্ম অতিরিক্ত রেল মাশুল বহন করিতে হইবে না।

মিলে কত শত টন মাহুত গুড় যে নষ্ট হয় তাহার আর ইয়ত্তা নাই। মাহুত গুড় হইতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ইহাতে আছে পটাশ, ফস্‌ফরিক্ এসিড্ এবং নাইট্রোজেন। ইহা হইতে 'পেট্রোল' ও উত্তম 'সার' প্রস্তুত হয়। এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রসায়ন-শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ নীলরতন ধর মহাশয় এবিষয়ে এক সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এবং তাহাতে তিনি 'মাহুত গুড়' হইতে কি কি দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে তাহাই দেখাইয়াছেন। "মাহুত গুড়" হইতে যে পেট্রোল প্রস্তুত হয় তাহা 'পাওয়ার এলকোহল' (Power Alcohol) নামে অভিহিত। এই পেট্রোল প্রস্তুত করিতে অতি অল্পই ব্যয় হয়। নিম্নে ইহার তালিকা দিলাম।

প্রতি গ্যালন পাওয়ার এলকোহল প্রস্তুত করিতে লাগে	॥/০
প্রতি গ্যালনের গভর্ণমেণ্ট এক্সাইজ্ ডিউটি	।৵০
প্রতি গ্যালনে মোট ব্যয় হয়	১৶০

মাত্র একটাকা তিন আনায় এক গ্যালন পেট্রোল পাওয়া গেল। বর্ত্তমানে এক গ্যালন পেট্রোলের মূল্য দিতে হয় ১।৵০ এবং কানপুর, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি সহরে গ্যালন প্রতি মূল্য লাগে ১॥৶০ আনা। এই পাওয়ার এলকোহল প্রস্তুত হইলে দেশের বহু অর্থ বাঁচিয়া যায় এবং একটি নূতন শিল্পের গোড়াপত্তন হয়।

'মাহুত গুড়' আবাদী জমির উত্তম 'সার'রূপে ব্যবহার করিতে পারা যায় একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু কিরূপে ব্যবহার করিতে হইবে সে সম্বন্ধে বিশেষ বলা প্রয়োজন।

১। এক একর জমিতে ৯০ হইতে ২৭০ মণ 'মাহুত গুড়' জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া জমিতে ছিটাইয়া দিতে হইবে।

২। জমিতে ছিটাইয়া দিবার এক সপ্তাহ পরে জমি উপযুক্তরূপে কর্ষণ করিতে হইবে। প্রত্যেক সপ্তাহে দুইবার করিয়া জমি কর্ষণ করিতে হইবে। দুই মাস ধরিয়া সপ্তাহে দুইবার এইরূপ করা বিশেষ প্রয়োজন।

৩। মধ্যে মধ্যে জমিতে জল দিতে হইবে।

ইক্ষুর-খোয়া (Bagasse) সাধারণতঃ আমরা জ্বালানী রূপে ব্যবহার করি। ইহাতে আমাদের বহু লোকসান হয়। ইহাকে কাজে লাগাইতে পারিলে আমাদের শর্করার মূল্য কমিতে পারে। ইহা হইতে মোড়ক কাগজ (packing paper) এবং 'বোর্ড' প্রস্তুত হয়। আমাদের দেশে এ বিষয়ে বিশেষ কোন গবেষণা হয় নাই। গবেষণা করিলে আরও অনেক কিছু আবিষ্কৃত হইতে পারে। এই সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে হইলে সহৃদয় পাঠক মহাশয়কে শ্রীযুক্ত এম. পি. গান্ধী মহাশয়ের পুস্তক—"The Indian Sugar Industry—Its Past, Present and Future." পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

সর্ব্বপ্রধান সমস্যা—মার্কেটিং সমস্যা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভারতীয় মিলগুলি দুই এক বৎসরের মধ্যেই দেশের প্রয়োজনীয় শর্করা প্রস্তুত করিয়াও অনেক বেশী বাড়তি শর্করা প্রস্তুত করিবে। তখন ভারতীয় মিলগুলি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিবে। পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়। এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্ম একটি "কেন্দ্রীয় মার্কেটিং বোর্ড" গঠন করা বিশেষ প্রয়োজন। এই বোর্ডের কার্য্য হইবে দেশীয় মালিকগণের অবৈধ প্রতিযোগিতা নিবারণ করা এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে শর্করা রপ্তানি করা। বিদেশ হইতে যাহাতে দেশের মধ্যে বেশী শর্করা আমদানি না হয় তাহার ব্যবস্থা করা। যাহাতে শর্করার মূল্য প্রায় গুড়ের মূল্যের সমান হয় তাহার জন্ম সর্ব্বপ্রকারের যত্ন লইতে হইবে। এই বোর্ডকে ভারতীয় শর্করার শতকরা ৩০ ভাগ ক্রয় করিতে হইবে এবং দেশ বিদেশের বন্দরে প্রেরণ করিতে হইবে।

শর্করার ষ্টাণ্ডার্ডের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। ষ্টাণ্ডার্ড পরিবর্ত্তন না করিলে কিছুই হইবে না। জাভার চিনি তখন পুনরায় দেশে আমদানি হইবে। দুঃখের বিষয় ভারতীয় মিলগুলি প্রায় সমস্তই ইউরোপীয়গণের অধীনে। ভারতীয়গণের খুব কমই মিল আছে। যতদিন পর্য্যন্ত মিলগুলি মূলধনে পরিপুষ্ট না হয়, যতদিন পর্য্যন্ত ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক পরিচালিত না হয় ততদিন উহার উন্নতিতে আমাদের কিছুই আসিয়া যায় না। ভারতীয়গণ কি এই শিল্পে সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবেন? বঙ্গদেশের ত কথাই নাই। বঙ্গদেশে মোট ১২টী মিল আছে। তাহার মধ্যে ৮টী কার্য্য করিতেছে। এই আটটির মধ্যে বোধ হয় মাত্র ২টী বাঙ্গালীর নিজস্ব। হায়! বঙ্গের বিত্তশালীগণ।—আপনারা কি কেবলমাত্র সুদের লোভেই দিনাতিপাত করিবেন? ব্যবসায়ে কি আপনাদের মর্য্যাদা-হানির আশঙ্কা আছে?

গল্প

পরম-পিপাসা

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(১)

অপরাধের মধ্যে অবিনাশ একটা কবিতা লিখেছিলো এবং কোন এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে সেটা পাঠিয়ে দিয়েছিলো এক মাসিক-পত্রে এবং পাদপূরণের প্রয়োজনীয়তায় সেটা ছাপাও হয়েছিলো শেষ পর্য্যন্ত।

কবিতার বিষয়টা ভালো। বহু প্রত্যাশার পর প্রিয়তমাকে পেয়ে প্রেমিকের অবিমিশ্র প্রগল্‌ভতা। অবিনাশের বিয়ে হয়েছে এই ছ' মাস, অতএব এই কবিতায় সে-ই যে সর্ব্বাঙ্গীন উদ্দিষ্ট হয়েছে এ-কথা ভেবে নিতে মেনকার কোথাও এতোটুকু বাধতো না।

বলতে কি, ভেবেওছিলো সে তা-ই এবং সেই বিশ্বাসে পাড়া-বেপাড়ার অনেক মেয়েকেই সে সেটা সগর্ব্বে দেখিয়ে বেড়িয়েছে। এমন-কি সেদিন তৃপ্তিকে।

তৃপ্তি এখানকার এক ডেপুটির স্ত্রী। পাড়া বেড়াতে এসেছিলো।

বাড়িতে যে কেউ এসেছে এবং সে যে নিঃসন্দেহ মেয়ে, ভারি হাতে মেনকার দ্রুত পরদা টানা থেকেই অবিনাশ বুঝতে পারলো। অবিনাশ তখন বাইরের ঘরে বসে লণ্ঠনের আলোয় ছেলেদের হাফ-ইয়ার্লির কাগজ দেখছে। পরদার পরিধির দিকে চেয়ে সে একটা ছোট অসংলগ্ন নিশ্বাস ফেললে।

কথায়-কথায়, অভ্যাসবশতই, মেনকা কবিতাটা তৃপ্তির কাছে মেলে ধরলে; ঈষৎ সলজ্জ গলায় বললে, 'উনি লিখেছেন।'

'বলেন কি!' অপরিমিত কৌতূহলে তৃপ্তি কাগজটা কোলের কাছে টেনে নিলে, উচ্চকিত আগ্রহে সমস্তটা সে দু'বার পড়লে, বললে, 'ভারি চমৎকার লেখেন তো। দস্তুরমতো এঁর প্রতিভা আছে। এ একদিনের কসরৎ নয়, বহুদিনের সাধনা। সত্যি?'

তৃপ্তি আবার পড়তে লাগলো, এবার মৃদুকণ্ঠে।

প্রশংসাটা মেনকার মনঃপূত হয় নি। আর সবাই তাকেই দিয়েছে মূল্য, যাকে নিয়ে এ কবিতা; কবিতার লেখককে নিয়ে তারা মাথা ঘামায় নি। এ দেখছি উল্টো: যে লিখলে সে-ই যেন সব, যাকে নিয়ে লিখলে সে যেন কিছুই নয়; মেনকা ভারি ছোট মনে করলে নিজেকে।

'আপনার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করতে হয়—আছেন নাকি বাড়িতে?' তৃপ্তি উঠে দাঁড়ালো: 'সত্যিকারের কবির সঙ্গে পরিচিত হওয়াটাও সৌভাগ্য।'

এমন কথা কে কবে শুনেছে! মেনকা সর্ব্বাঙ্গে জমে একেবারে পাথর হ'য়ে গেলো।

কিন্তু তৃপ্তিকে বাধা দিতে যাওয়া বৃথা। দস্তুরমতো সে নির্ভীক পা বাড়িয়েছে।

অথচ ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেটের চতুঃসীমার মধ্যেও ইস্কুল-মাষ্টারের স্থান ছিলো না। মাত্রা যে এমন করে' ছাড়িয়ে যাওয়া যায় এ মেনকার কাছে একটা অঘটন।

আশ্চর্য্য, সত্যি-সত্যিই তৃপ্তি বাইরের ঘরে সোজা ঢুকে পড়েছে।

'নমস্কার।'

চোখ চেয়ে অবিনাশ একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো। কে এই অপরিচিতা! সপ্রতিভ ভঙ্গিতে তার সমস্ত উপস্থিতিটি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। অবিনাশ ঘরের চারদিকে চেয়ে কোথাও এতটুকু আশ্রয় পেলে না। এমন সময় মেনকা কোথায়?

নিরবলম্বের মতো অবিনাশ যেন শূন্যে ঝুলে রইলো।

অকুণ্ঠ, দীপ্ত মুখে তৃপ্তি বললে, 'বসুন্ধরা'তে আপনার কবিতাটি পড়লুম। Excellent হয়েছে। কি language, কি rhythm!'

অবিনাশ ঘোরতর লজ্জা বোধ করলে। বললে, 'জীবনে ও একটা ছেলেমানসি করে ফেলেছি।'

'বলেন কি, অনেক দিনের practice আপনার। আরো অনেক নিশ্চয়ই আপনার storeএ আছে। দেখান না খানকয়েক। জানেন, আমি poetry খুব ভালোবাসি।'

'তাই নাকি?' অবিনাশ নম্র গলায় বললে, 'আশা করি, লেখেনও।'

'তা more or less লিখি ব'লেই তো সাহস করে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলুম। এমনই অদৃষ্ট, তৃপ্তি চোখে-মুখে কাতরতার কৃত্রিম ভাব ফুটিয়ে বললে, 'এ-সবে ওঁর এতোটুকুও encouragement পাই না।'

'কারণ?'

'সাহেবি মানুষের এই হয়তো characteristic। 'S'-মার্ক পেয়ে অবধি ওঁর আর এখন অন্য চিন্তা নেই।' তৃপ্তি সগর্ব্বে একটু হাসলে।

সেটা আবার কি জিনিস অবিনাশ বুঝতে পারলে না।

'উনি শিগগিরই S. D. O. হবেন কিনা, তাই কালেক্টরের খাতায় ওঁর নামের againstএ ঐ দাগ পড়েছে।'

এতক্ষণে অবিনাশ সম্পূর্ণ সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠলো। বললে, 'কি আশ্চর্য্য, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?'

'না, বসবো না। আপনার যদি সময় হয়, আপনাকে আমার কয়েকখানা poetry পাঠিয়ে দেবো, দয়া করে একটু revise করে দেবেন, কেমন?'

'দেবেন পাঠিয়ে। নিশ্চয়।'

'আর দেখুন, যতই কেননা লিখি, ছাপার অক্ষরে দেখতে না পেলে মন ওঠে না। কিন্তু সম্পাদকরা তো qualification দেখে ছাপে না, খাতিরে ছাপে।'

অবিনাশ তরল গলায় বললে, 'আপনাকেই বা তারা কম খাতির করবে কেন?'

'না মশাই, ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেটে চলে না, এর জন্যে দস্তুরমতো আই-সি-এস হ'তে হয়।'

'কিন্তু এস-ডি-ও যখন হ'বেন, আর মাসিক-পত্রের সম্পাদকের ভিটে-মাটি যখন আপনার এলেকায় এসে পড়বে—'

'উনি তো সেই দিনের জন্যেই wait করতে আছেন। কিন্তু ছোকরা আই-সি-এস্‌দের জ্বালায় কি সাব-ডিভিসন পাবার জো আছে? কবে থেকে overdue। যাই হোক, আপনাকে পাঠিয়ে দেবো, দেখবেন কোথাও পারেন কি না push করে দিতে।'

'ও আর দেখতে হ'বে না।'

'আচ্ছা, তবে আসি। গুড্‌বাই।' তৃপ্তি আর অন্তঃপুরে না ঢুকে সোজা রাস্তায় নেমে গেলো। ধারালো মেয়েলি গলায় ডাকলো: 'বেয়ারা।'

ডেপুটি-সাহেবের অর্ডারলি টর্চ টিপে মেমসাহেবকে রাস্তা দেখালে তাড়াতাড়ি।

মুহূর্ত্তে একটা ভোজবাজি হ'য়ে গেলো বলতে হ'বে। কিন্তু এত সবের মধ্যিখানে মেনকা কোথায়? ইংরিজিতে সে অতো রপ্ত না হ'লেও ব্যাপারটার সূক্ষ্ম রসাস্বাদ করতে হয়তো তার বাধতো না।

কিন্তু ভেতরের ঘরে ঢুকেই অবিনাশের চক্ষুস্থির। মেনকা সেই সংখ্যার 'বসুন্ধরা'-খানা কুটি-কুটি করে ছিঁড়ে মেঝেময় ছড়িয়ে দিচ্ছে।

'ও-কবিতা তুমি কা'কে নিয়ে লিখেছ?'

'কাকে নিয়ে!' অবিনাশ যেন জলে পড়লো।

'জানি, জানি, আমার সঙ্গে আর ছেনালি করতে হ'বে না। তাই এত ভাব, গলায়-গলায়!' মেনকা তার তীক্ষ্ণ নখে প্রতি টুকরোকে শতধা করছে: 'তাই কবিতায় ডাক শুনে একেবারে উম্মাদিনী হ'য়ে তোমার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। একেবারে একলা।'

হাসবে না কাঁদবে অবিনাশ ভেবে পেলে না। অপরূপ অভিযোগ ও যুক্তির অপূর্ব্ব সারবত্তা দেখে নিমেষে তার নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে এলো। আসলে তার কি অপরাধ? সে তো আর যেচে ভদ্রমহিলাকে ঘরের মধ্যে ডেকে আনে নি; আর তার কি-ই বা সাহস? উনি একলা যে এলেন, সেটা তো মেনকারই অভদ্রতা। সে কেন তাঁকে অনুসরণ করলে না—অবিনাশ তো আর দরজাটা বন্ধ করে দেয় নি। ঘরে ঢোকবার মতো সরলতাই যখন মেনকার ছিলো না, তখন সে আড়ি পেতে শুনে নিলেই তো পারতো—কি তাদের মধ্যে এমন গূঢ় বা গাঢ় কথাবার্ত্তা হয়েছে! ভদ্রমহিলা নিজে কবিতা লেখেন, যদিও তাঁর লেখা কোথাও ছাপা হচ্ছে না, তাই আরেক কবির কাছে

সহানুভূতি পাবার আশায়ই হয়তো এমনি নিঃসঙ্কোচ হয়েছিলেন—এতে অন্যায়টা কোথায়? হ'লেই বা বাঙালী ঘরের বউ, কিন্তু আজ বাদে কাল তার স্বামী সাবডিভিসনের চার্জ পাচ্ছেন, কত দরবারে ও পার্টিতে তাঁকে যেতে হ'বে—একজন সামান্য ইস্কুল-মাষ্টারের সঙ্গে নিভৃতে একটু কাব্যালাপ করলেই মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে গেলো? আর অন্যায় যদি কোথাও হ'য়ে থাকে—তাতে অবিনাশের কি হাত আছে? সে তো আর সম্মানিতা ভদ্রমহিলাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে না।

'তা দেবে কেন?' মেনকা মুখ বিকৃত করলে: 'এখন কেবল দুয়ে মিলে কবিতা লেখালেখি চলবে। আমি বুঝি নি তোমাদের চালাকি? তাই তো কবিতার নাম 'পরিতৃপ্তি' রেখেছ।'

মেনকার দিব্যদৃষ্টিকে প্রশংসা না করে থাকা যায় না। কিন্তু নামের যদি কোথাও একটা সামঞ্জস্যও থেকে থাকে, সেটা নিতান্তই একটা কাব্যিক দুর্ঘটনা। আর পরস্ত্রীকে নিয়েই যদি লিখতো, তবে তো সেটা একটা চিরন্তন অচরিতার্থতার কবিতা হ'বে। আর এটা হচ্ছে পরিপূর্ণতার কবিতা।

কথায় কেবল কথা বাড়ে। মেনকা এক ইঞ্চিও টলবে না।

'চরিত্র খারাপ না হ'লে কি আর কেউ মেয়েমানুষ নিয়ে কবিতা লেখে?'

এর উত্তরে অবিনাশ অনেক কিছুই বলতে পারতো, কিন্তু সেটাও একান্ত মেয়েমানুষকেই বলা হ'বে মনে করে সে বললে না।

ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী যে নিতান্তই স্ত্রীলোক, অবিনাশ মনে-মনে আলোচনা করে দেখলো, সেটাই তার অপরাধ।

আর, তার অপরাধের শাস্তি কি? এক হীনমন সঙ্কীর্ণদৃষ্টি রমণীর বোঝা বয়ে বেড়ানো!

(২)

বলা বাহুল্য ডেপুটি-পত্নীর কাব্যস্পৃহা অবিনাশের কাছে আর প্রশ্রয় পায় নি। কিন্তু তিনি তো তবু দূরে থাকেন, পাশের বাড়িতেই একটি জলজ্যান্ত মেয়ে আছে।

মেয়েটির ইতিহাস ভারি করুণ, মেনকার মুখেই শোনা। বাপের একমাত্র সন্তান, অনেক জাঁকজমক করে বিয়ে হয়, কিন্তু বিয়ের সপ্তাহখানেক পরেই বিধবা হ'য়ে বাপের বাড়ি ফিরে আসে। সব চেয়ে করুণ, মেয়েটি বৈধব্যের কোনো অনুষ্ঠানই পালন করে না, ঘোরতর একটা দুঃস্বপ্ন থেকে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে সে আবার তার পুরাতন কৌমার্য্যে নেমে এসেছে, তার নির্মুক্ত স্বাভাবিকতায়। দেবতা ছাড়া কোনো স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কৌতূহলী হওয়া অবিনাশের বারণ, তাই উপযাচিকা হ'য়ে যেটুকু খবর মেনকা তাকে দিয়েছে তার বেশি আর তার জিজ্ঞাসা নেই। মেয়েটিকে দেখবার ইচ্ছেটাও হয়তো স্বাভাবিক—বিশেষতো তাদের শোবার ঘরের জানালাটা খুললেই পাশের বাড়ির উঠোনটা যখন দেখা যায়। কিন্তু অবিনাশ ভুলেও সে-জানলা দিয়ে পাশের বাড়ির উঠোন দূরে থাক, দূরের দিগন্তের দিকেও দৃষ্টিপাত করে নি। দেয়ালের চেয়েও ঐ জানলাটা তার দুর্ভেদ্য। তাই বলে চকিতে যে সে মেয়েটিকে দু একবার না দেখেছে এমন নয়। কেননা নিজেই হয়তো সে অসময়ে তাদের বাড়িতে নির্বাধ চলে' এসেছে, কোনো বই চাইতে, সেলাইয়ের প্যাটার্ণ চাইতে, কোনোদিন বা রসকরা তোলবার ছাঁচ চাইতে। সত্যযুগে অবিনাশ লক্ষ্মণ হ'য়ে জন্মেছিলো বলে সন্দেহ হয়, নইলে সামনেই কোনো মেয়ের পায়ের শব্দ হওয়ামাত্রই তার চোখ কি করে অমন অনায়াসে মাটিতে শুয়ে পড়ে? তবু যেটুকু সে দেখেছে, দ্রুত ও অস্পষ্ট—তার মধ্যে তাকে দেখার চেয়ে মেনকাকে না-দেখানো রোমাঞ্চই ছিলো বেশি। হয়তো তারি জন্যে মেয়েটিকে তার অতিরিক্ত করেই অবিনাশ দেখেছিলো।

একদিন সকালে মেয়েটির এক মামাবাবু এসে হাজির এবং সঙ্গে হ'তে-না-হ'তেই একেবারে অবিনাশের বসবার ঘরে।

'বড়ো বিপদে পড়েছি, যদি দয়া করেন।'

'বলুন।'

'ত্রিভুজকে আপনার চতুষ্কোণ করতে হ'বে।'

অবিনাশ ধাঁধা দেখলে।

'ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, আমরা তিনজন আছি, আরেকজন হ'লেই আমাদের ব্রিজের আড্ডাটা সরগরম হ'য়ে ওঠে। আপনার বিশেষ কাজ আছে?'

'কিছু না। যান, যাচ্ছি।'

অবিনাশ স্ত্রীর অভিমত প্রার্থনা করলে।

'যাবে না? একশোবার যাবে।' মেনকা যে এ-রকম মুখ করবে তার সৃষ্টিকর্ত্তাও ভাবতে পারতো না। 'মেয়ে-মানুষের গন্ধ পেয়েছ যে!'

এতটার জন্যে অবিনাশ প্রস্তুত ছিলো না। অথচ মেনকা একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারতো, একা-একা মফস্বলের এই বিশ্রী সন্ধে-কাটানো কি কষ্টকর; তা ছাড়া পাশের বাড়ির ভদ্রলোক, মেয়েটির বাবা একজন রিটায়ার্ড পুলিশ-ইনস্পেক্টর, সঙ্গতিপন্ন প্রতিবেশী—তারা এখানে নতুন মানুষ, সামাজিক একটা সদ্ভাব তো অন্তত রাখা উচিত।

অবিনাশের এই দোষ, স্ত্রীর সঙ্গে তর্কে সে যুক্তিপ্রয়োগ করে।

'যাও যেই শুনেছ ওর বাপ আবার ওর বিয়ের জন্যে চেষ্টা করছে, অমনি একেবারে লেলিয়ে উঠেছ।'

অবিনাশের আপাদমস্তক ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো। কিন্তু ও-বাড়িতে ও-মেয়েটির অস্তিত্ব না থাকলেও তাকে আজ যেতে হ'তো, তাই সে আর দেরি করলে না।

রিটায়ার্ড ভদ্রলোক; মেয়েটির কাকা এখানকারই এমেচার হোমিয়োপ্যাথিক ডাক্তার; মামাবাবু ইন্‌সিয়োরেন্সের কাজে এসেছেন; আর অবিনাশ—চারজন মিলে তাস খেলা সুরু হ'লো।

এমনি উপ্‌রোউপরি দিন তিনেক।

কিন্তু যে যাই বলুক, কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক সাড়ে-আটটা বাজতেই অবিনাশ উঠে পড়েছে। বাড়ি-ফেরার পক্ষে সেটা এমন-কিছু অভদ্র সময় নয়, বিশেষ তো যখন সে ন'টার আগে খায় না। অথচ এই সাড়ে-আটটায় নির্ভুল উঠে আসার দরুণ তার প্রগাঢ় পত্নীব্রতের জন্যে তাকে কম খোঁচা খেতে হয় নি। কিন্তু প্রত্যহই বাড়ি ফিরে সে দেখেছে—ঘর অন্ধকার, রান্নার পাট তোলা, এক কোণে অবিনাশের ভাত ঢাকা—মশারি ফেলে মেনকা দিব্যি ঘুমিয়ে বা ঘুমের ভান করে আছে।

সেটা একটা কম অস্বস্তিকর ব্যাপার নয়। তাই মেনকার এই অকালিক ঘুমটুকুর আশায় অবিনাশ খেলার লোভ ছাড়তে পারছে না।

সেদিনের শেষ বাজিটা ছিল 'রিডাব্‌ল্‌'-এর খেলা। রিটায়ার্ড পুলিশ-ইনস্পেক্টরের কল্ যাচ্ছিলো ফোর নো-ট্রাম্‌প্‌স্‌, তাঁর বাঁ দিক থেকে মামাবাবু ডাব্‌ল্‌ দিয়ে বসলেন—পর-পর অবিনাশ আর কাকাবাবু পাশ্ দিলে—অমনি সগর্জ্জনে পুলিশ-ইনস্পেক্টর 'রিডাব্‌ল্‌' করলেন। এমনি যখন জমজমাট অবস্থা, কাকাবাবুর কাছে এক রুগী এসে উপস্থিত—এখুনি যেতে হ'বে। বিনামেঘে যেন বজ্রপাত হ'লো—মামাবাবু তাঁর পার্টনার হারিয়ে হায়-হায় করে উঠলেন। লীলা সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো, বলা-কওয়া নেই হঠাৎ তাকেই মামাবাবু জিগ্‌গেস করে বসলেন: 'এই হাতটা তুই চালিয়ে দিতে পারবি?'

লীলা একটুও দ্বিধা না করে বললে, 'অনায়াসে।'

'রঙ চিনিস্ তো?'

'কি যে বলো!' লীলা ততক্ষণ পা গুটিয়ে বসে পড়েছে। তাস তুলে নিয়ে হাসিমুখে বললে, 'আমাকে শুধু বলে দাও টেক্কা বড়ো না গোলাম বড়ো?'

'টেক্কা বড়ো।' মামাবাবু বললেন, 'তোকে কিছু ভাবতে হ'বে না—তুই শুধু রঙ চিনে-চিনে তাস দিয়ে যা, সব পিট আমি নেবো।'

'এ-খেলায় পিট নিতে হয়, না ছাড়তে হয়?'

'নিতে হয়।' এবার বললে অবিনাশ।

হাতের দিকে তাকিয়ে লীলা জোরে হেসে উঠলো: 'কি সর্ব্বনাশ! এই খেলায় 'চৌদ্দ' নেই? আচ্ছা, সুরু করে' দিন। কে খেলবে?'

খেলায় লীলা বিন্দুমাত্রও গুরুত্ব আরোপ করতে পারছে না। তাস তো তাসের মতোই সে খেলছে। কেনই যে লোকে একেকখানা তাস ফেলবার আগে দশ মিনিট ধরে মাথা চুলকোয়, লীলার কাছে তা প্রকাণ্ড বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়—তার তো এক সেকেণ্ডও দেরি হয় না। এমন কি, থাকতেও সে পাশিয়ে যাচ্ছে অনায়াসে। যেই ধরা পড়ছে, হেসে উঠছে অনর্গল। তার একেকটা ভুল পর্ব্বত-পরিমিত; ও-পার থেকে যেই মামাবাবু চাপা গলায় অসমর্থক শব্দ করছেন, লীলা অমনি তাস ফিরিয়ে নেবার জন্যে তুমুল আন্দোলন সুরু করছে, দস্তুরমতো তা শারীরিক। তার বাবাও নাছোড়বান্দা, মেয়েও তাঁর হাত থেকে নেবেই নেবে ছিনিয়ে। বারে-বারে মেয়েরই অবিশ্যি জয় হ'ল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মামাবাবু পর্য্যুদস্ত হ'লেন।

'ও তুমি একলা হেরেছ।' লীলা খিলখিলিয়ে হেসে

উঠলো : 'আমি আমার সব ভুল শুধরে নিয়েছি, নিইনি বাবা ?'

মামাবাবু যতই তার প্রতি মূর্খতা আরোপ করতে চান, ততই সে দ্বিগুণতরো উৎসাহে কথায় ও কলহাস্যে বিকীর্ণ হ'তে থাকে। হেরেও তার হার নেই, সমস্ত জীবনের প্রতি তার এই অপূর্ব্ব দৃষ্টিভঙ্গিটি অবিনাশের কাছে ভারি চমৎকার লাগলো।

পালা যখন সাঙ্গ হ'লো, অবিনাশ ঘড়িতে দেখলে ন'টা বেজে দশ মিনিট।

আজ আর ঘর অন্ধকার নয়, বিছানায় নেই আর সেই নিদ্রিত নীরবতা। অবিনাশের বুকের মধ্যটা কেমন ছমছম্ করে উঠলো।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে মেনকা ঠায় বসে আছে, যেন স্তম্ভিত ঝটিকা।

'খুব যে হ্যা-হ্যা করে হেসে গড়িয়ে পড়ছিলে!' মেনকা ফেটে পড়লো : 'দিন-ক্ষণ সব ঠিক হ'য়ে গেলো নাকি ?'

অবিনাশের কেমন অসহায় বোধ হ'ল। বললে, 'রাত আজ একটু বেশি হয়েছে বটে।'

'তা হ'বে না! ফুর্ত্তিতে কি আর রাতের কথা মনে থাকে ? খেলা এখুনি শেষ করলে কেন ? রাতের তো এখনো অনেক বাকি।'

এমনি দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে অসংলগ্ন কথাই বুঝি বেরিয়ে আসে। অবিনাশ বললে, 'ও যদি হাসে তো আমি কি করবো ?'

সত্যিই তো। ও যদি ঠোঁটে করে মুখে বিষ তুলে দেয়, তা-ই বা অবিনাশ নেবে না কেন ?

এই কথাটাই অবিশ্যি মেনকা সবিশেষ প্রাঞ্জল করে বললে।

'জানো, সামনে ওর বাবা আর মামা বসেছিলেন।'

'আর উনি বসেছিলেন ঠিক তোমার বাঁ-পাশে। আমি বুঝি দেখে আসি নি লুকিয়ে ?'

'তা হ'লে তো শেষ পর্য্যন্তই দেখেছ।' অবিনাশ নিশ্চিন্ত বোধ করলে।

'হ্যাঁ, শেষ পর্য্যন্তই তো দেখেছি।'

মেনকার মুখের সে-বীভৎসতা বর্ণনার নয়।

মানুষ যে কেন খুন করে, কেন ব্যভিচারী হয়, কেন বা নিজের গলায় ছুরি বসায়, অবিনাশ হৃদয়ঙ্গম করলে।

সে শুধু বহু বৎসরের রুগীর মতো শুলো এসে তার বিছানায়। আর ওদিকে মেনকার হাত থেকে একে-একে খসে' পড়তে লাগলো সংসারের ভঙ্গুর সরঞ্জাম।

৩

অবিনাশকে সে-বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। এবার যেখানে সে বাসা নিয়েছে সেটা সহরের উপান্তে, তার তিন রশির মধ্যে লোকালয় নেই।

তাই বলে নিশ্চিন্ততাও নেই। কেননা পৃথিবী অনেক বড়ো এবং সেখানে প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই কোনো-না কোনো মেয়েমানুষ আছে।

অবিনাশের এই নাকি দোষ, স্ত্রীলোক দেখলেই তার দিকে তাকাবে, সেটা তার সুমুখই হোক বা পেছনই হোক। স্ত্রীলোক চোখে পড়বে কিন্তু তার দিকে চোখ ফেলা যাবে না—এই মর্ম্মান্তিক অবস্থাটা অবিনাশ অনুধাবন করতে পারে না। অথচ আজকালকার দিনে নিজেদেরকে দেখাবার জন্যে মেয়েদের কি অমানুষিক দুশ্চেষ্টা, খেলায় আর চূড়ায়, সজ্জায় আর নির্লজ্জতায়। মেনকা যখন সেজে-গুজে সিনেমায় যায় বা স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে, তখন তার মনে কি সূক্ষ্ম কোনো লোভ থাকে না যে অন্যে তাকে দেখে ফেলুক এবং সে-ব্যক্তি অবিনাশের চেয়ে অন্ততরো হোক ? অবিনাশ অন্ধ হ'য়ে গেলেও আশা করি মেনকার পরিধান সংক্ষিপ্ত হ'ত না। আজ যদি সমস্ত পুরুষ একজোট হ'য়ে মেয়েদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, তবে যে কি হ'বে ভাবতে অবিনাশ যেন বজ্র বিভীষিকা দেখে। তা ছাড়া, তুমি দেখবে না তোমার সাধ্য কি! রাস্তায় হাণ্ডবিল বিলি করছে, তুমি না নিতে পারো; দেয়ালে প্ল্যাকার্ড ঝুলছে, না তাকালে তোমাকে মারে কে! কিন্তু গায়ে পড়ে তোমাকে যদি কেউ ধাক্কা দেয় বা তোমার বোজা চোখে কেউ যদি খোঁচা মারে, তোমাকে তো অন্তত একবার যন্ত্রণায়ো চেয়ে দেখতে হয়! আর রাস্তায়-ঘাটে, ট্রেনে-জাহাজে, ট্রামে-বাসে একেবারে চোখ বুজে চলাটাও নিরাপদ বলা যায় না। চোখ চেয়েছ কি, অমনি স্ত্রীলোক দেখবে। প্রহ্লাদের ঈশ্বর-দর্শনের চেয়েও ব্যাপক। তোমাকে অত দূরই বা যেতে হ'বে কেন ? ভোরবেলা তোমার ঘরের জানলা খুললেই তুমি তিনটি মেয়েকে ইস্কুলে যেতে দেখবে।

অবিনাশের উপর হুকুম হয়েছে ভোরবেলা তার বসবার ঘরের জানলা সে খুলতে পাবে না। তার প্রতিবেশী নেই, কিন্তু তার বাড়ীর সামনে দিয়ে সহরের রাস্তা আছে এবং সে-রাস্তা দিয়ে কোন ঘুর-পথে কে জানে তিনটি মেয়ে রোজ ইস্কুলে যায়। ইস্কুলটা মুখ্যত ছেলেদের, কিন্তু বিদ্যাভিলাষিণী কয়েকটি মেয়ের জন্যে সকালবেলা ইস্কুলের দরজা খোলা। ভাগ্যিস অবিনাশ সে-ইস্কুলের মাষ্টার নয়। তাই বলে তার দায়িত্ব এতটুকুও কমেছে বলে মনে হয় না। যখন তারা প্রত্যহ অবিনাশেরই জানলার সামনে দিয়ে হেঁটে যায়, তখন নিশ্চয়ই সে দোষী—দোষী তার ঘরের ঐ একটিমাত্র জানলা, দোষী তার ভোরবেলাই ঘুম ভাঙে, দোষী ঈশ্বর তার ললাটের নীচে যুগল চক্ষু দিয়েছেন। স্বদেশী বস্ত্র-বয়ন-শিল্প সূক্ষ্মতায় যে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে সেটাও দোষ অবিনাশের, আর তারা পড়াশুনো দেরিতে সুরু করেছে বলে তাদের বয়েসটা যে বসে নেই, সেটাও তারই ষড়যন্ত্রে।

জানলায় দাঁড়িয়ে অবিনাশ দাঁতন করছিলো, এমন সময় মেয়ে তিনটি এক সারে রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলো। পুরুষের উপস্থিতিতে নিজেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে ওঠাটা যে মেয়েদের শালীনতার একটা লক্ষণ তা কে না জানে।

জানে মেনকাও।

'ওদের অভিভাবকদের খবর পাঠিয়ে দিই,' মেনকা তাই গম্ভীরমুখে বললে, 'মিছিমিছি কষ্ট করে কেন আর ইস্কুলে পাঠানো, রাস্তার পারেই একজন পাণিপ্রার্থী বসে আছেন।'

অবিশ্যি এ-যুগে আগের মতো সেই অর্থও নেই, সামর্থ্যও নেই, তাই সুবিধার জন্য বাধ্য হ'য়েই পুরুষকে একপত্নিত্ব অবলম্বন করতে হয়েছে। ভারতবর্ষের প্রধান যে দুই ধর্ম্ম, দুয়েতেই একাধিক বিবাহ প্রশস্ত: তাই বলে একসঙ্গে তিন-তিনটি মেয়েকেই অক্লেশে বিয়ে করতে হবে —এটা একটা নিদারুণ নির্ম্মমতা।

'আমি না-হয় হাত পেতে আছি', অবিনাশ সবিনয় প্রতিবাদ করলে: 'কিন্তু আর-সবাই তোমারই মতো হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত, এ তুমি কোন সাহসে ভাবতে পারছ?'

অবিনাশেরই সাহস বেশি যে প্রতিবাদ করে। ফলের মধ্যে ঘরের জানলাটা সবলে বন্ধ হয়ে গেলো।

যদি মনে করা যায়, সংসারো আলো নেই—খালি উত্তাপ আছে, নারী নেই—শুধু স্ত্রী আছে, তবে অবিনাশের অবস্থাটা কিছু উপলব্ধি করা যাবে। অবিনাশের বাইরেকার জীবন সময় দিয়ে সীমাবদ্ধ: ঘরেতে সে যতোক্ষণ, ততোক্ষণ সে অন্ধকূপে। বিকেলে যদি কোথাও বেরোতে হয়, মেনকাকে সঙ্গে নিতে হ'বে: অবিনাশ যে আর অবিনাশ নয়, কায়মনোবাক্যে মেনকার স্বামী—এটাই সর্ব্বত্র বিজ্ঞাপিত হওয়া দরকার। মেনকার বাইরে তার যেমন অস্তিত্ব নেই, তেমনি জিজ্ঞাসাও নেই। তাই অবিনাশের কাছে যা-ই কান্না, তা-ই কল্পনা।

ছেলেবেলায় থলের মধ্যে অবিনাশ একটা বেড়াল-ছানা পুরে দড়ি দিয়ে মুখ বেঁধে রেখেছিলো—সে-কথা আজ তার মনে পড়লো, সেই ভয়াবহ স্তব্ধতা ও নিঃসহায় অন্ধকারের কথা। বিবাগী হ'য়ে সে বেরিয়ে যেতে পারে, কিন্তু এত কষ্টের চাকুরিটা ছাড়তে ইচ্ছে করে না: আরেকটা বিয়ে করতে পারে অনায়াসে, কিন্তু তার মধ্যে আর রোমান্স নেই: বয়ে যেতে পারে ইচ্ছে করলে, কিন্তু অবিনাশের অত টাকা কোথায়? আত্মহত্যা—আত্মহত্যা করলে কেমন হয়? কিন্তু আত্মহত্যার কারণের কথা ভেবে তার আর উৎসাহ রইলো না। আরেক উপায় আছে। মেনকাকে সে খুন করতে পারে, বিশেষত কদর্য্য সন্দেহে মুখের চোয়াল দু'টো যখন তার বক্র, শীর্ণ, কুঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। খুন করা তখন কত সহজ, নিশ্বাস-ফেলার মতোই সহজ। কিন্তু হায়, খুন করার পরেও যদি এমনি সহজ হ'ত! আর মেনকার যদি খুব সাঙ্ঘাতিক একটা অসুখ করে! তা হ'লে লাভ নেই, অবিনাশেরই খরচান্ত, আর সংসার একেবারে ছত্রখান। বরং খুন করায় পৌরুষ আছে, কিন্তু অশরীরী ভাগ্যের কাছে কারুর মৃত্যু কামনা করার নীচতা অবিনাশ সহ্য করতে পারে না।

(৪)

ঘরে অপ্রত্যাশিত কেউ ঢুকে পড়লেই অবিনাশের আপাদ-মস্তক শিউরে ওঠে; কিন্তু ভালো করে চোখ চেয়ে দেখলে আগন্তুক পুরুষ, প্রায় তারই সমবয়সী।

অস্বস্তিতে ভঙ্গিটা মোলায়েম করে অবিনাশ জিগ্‌গেস করলো: 'কি চাই?'

'এই বসবার একটু জায়গা, আপনার মিনিট পাঁচেক সময়, আর বড়ো জোর একটা সার্টিফিকেট।' আগন্তুক একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো।

'বুঝতে পারলুম না।" অবিনাশ কাষ্ঠ একটু হাসলে।

'এই বুঝিয়ে দিচ্ছি।' বলে লোকটা দু'হাতে অর্দ্ধেক মুখ ঢেকে অসম্ভব চক্ষু বিকৃতি করে একটা শব্দ করলে: 'বলুন তো এটা কিসের শব্দ ?'

'যেন বোতলের মুখ থেকে টপ্‌ করে ছিপিটা কে টেনে তুললো।'

'আর এটা ?' সামনের টেবিলের তলায় নিচু হ'য়ে ভদ্রলোক অনর্গল কতগুলি শব্দ উদ্গীরণ করলে।

'যেন বোতলের মধ্যে কে জল ঢালছে।'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিক সমঝদার।' রুমালে আরক্ত মুখ মুছে ভদ্রলোক বললে, 'এবার, আমি কে এটাও আশা করি বুঝতে পেরেছেন। আমি হচ্ছি, যাকে চলতি কথায় হরবোলা বলে। মুখে নানান রকম আওয়াজ করতে পারি। আঁতুড়-ঘরে ছেলের কান্না, মোটরের হর্ণ, চায়ের প্লেট ভেঙে ফেলা, টেলিগ্রাফের টরেটক্কা, তবলার চাঁটি—অনেক রকমের আওয়াজ। চাকরি-বাকরি হ'লো না, তাই এই উপজীবিকা হয়েছে। তার উপর বিপিন পাল, রবি ঠাকুর, শিশির ভাদুড়ী, শরৎ চাটুজ্জে—অনেক নামজাদা লোকের ক্যারিকেচারও করে থাকি। সাহিত্যিকেরা রসের চর্চ্চা করে, চিত্রকররা রূপের, আর আমি শব্দের—শব্দরূপরস নিয়েই পৃথিবী। যদি অনুমতি করেন, আপনার ইস্কুলে ছেলেদেরকে কিছু দেখাই। আমার চার্জ অতি সামান্য। আপনাদের থেকে কিছু না-ও নিতে পারি, যদি অন্যত্র কোথাও দু'-চারটে বায়না জোটে। এই ধরুন, ঘুঙুর পায়ে দিয়ে তিনজন বাইজি আসছে, বড়ো মেজ আর ছোট, স্থূলা মধ্যমা আর কৃশা—লক্ষ্য করুন এদের ছন্দ!' ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কোঁচা খুলে মাথায় একটা ঘোমটা বানালে।

রক্ষে নেই, ঘরে যখন রমণীর অবতারণা হয়েছে। অবিনাশ যা আশঙ্কা করেছিলো, পাশের দরজার পরদাটা নিমেষে গেলো সরে, আর কা'র দুই সন্দিগ্ধ তীক্ষ্ণ চক্ষু সে-ঘোমটাটা যেন দগ্ধ করতে লাগলো।

'এ কি, নীরেন-দাদা না ?'

ভদ্রলোকের মুখ থেকে ঘোমটা গেলো সরে: 'তুমি, মেনকা, কোত্থেকে ?'

'কোত্থেকে আবার! এই তো আমার বাড়ি।'

'তোমার বাড়ি! কি আশ্চর্য্য!' নীরেন পূর্ব্ববৎ চেয়ারে বসে পড়লো, অবিনাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, 'আর ইনি ?'

'আপনার কি মনে হয় ?' অবিনাশ জিগ্‌গেস করলে।

'দেখুন, দ্রুত সিদ্ধান্ত করার আমি পক্ষপাতী নই। প্রথম পুরুষও হ'তে পারেন, উত্তম পুরুষও হ'তে পারেন।'

'ও দু'টোর একটাও হয়তো নই। তবে পর-পুরুষ যে নই এ সম্বন্ধে হলপ করে বলতে পারি।'

ইঙ্গিতটা মেনকার পক্ষে স্বভাবতই দুরূহ। কারণ, পরমুহূর্ত্তেই কণ্ঠস্বরে স্নিগ্ধ আতিথেয়তা নিয়ে সে বললে, 'উঠেছ কোথায় ?'

'কোথায় আবার! তোমার বাড়িতে।'

'তাই তো উচিত। কত বছর পরে দেখা। কোথা থেকে কোথায় ?'

অবিনাশ নিঃশব্দে গলাটা পরিষ্কার করে নিলে। স্ত্রীকে ঈষৎ জনান্তিকে জিগ্‌গেস করলে: 'চেনো নাকি এঁকে ?'

'বা, চিনি না ? আমাদের ন'কড়ি-কাকার ছেলে। বাবা যখন গফরগাঁও-তে সবরেজিষ্ট্রার ছিলেন, পাশের বাড়িতে—'

'আমার বাবা ছিলেন সেখানকার সার্কেল-অফিসার।' নীরেন কথাটাকে সমাপ্তি দিলে।

'কোনো আত্মীয়তা ?'

অবিনাশ এটা না জিগ্‌গেস করলেও পারতো। কেননা তার উত্তরে নীরেন উন্মত্ত হেসে উঠলো; আর এমনি আশ্চর্য্য, সে-হাসির ছটা এসে লাগলো মেনকার মুখে।

'আপনি যে দেখছি অবিকল ইস্কুল-মাষ্টারের মতোই কথা বলছেন।' নীরেন একটা নাটকীয় ভঙ্গি করলে: 'রক্তের ক্ষীণাতিক্ষীণ সম্পর্ক না থাকলেই বুঝি আর কোনো আত্মীয়তা হ'তে পারে না। আপনার সঙ্গেই বা ওর রক্তের কি মৌলিক সম্পর্ক ছিলো ?'

'তুমি এখনো তেমনিই ফাজিল রয়েছ দেখছি!' কি অপরূপ নম্রতায় মেনকা বললে!

দ্রুত সিদ্ধান্ত করতে অবিনাশের অবিশ্যি দেরি হ'লো

না। টেবিলের এটা-ওটা নাড়তে-চাড়তে অন্যমনস্কের মতো বললে, 'ওঁকে চা-টা কিছু পাঠিয়ে দাও।'

'সেটা আর তোমাকে বলে দিতে হ'বে না।' শরীরে হালকা কয়েকটা হাসির রেখা এঁকে মেনকা নীরেনকে লক্ষ্য করে বললে, 'বিয়ে করেছ তো?'

'সর্ব্বনাশ! বিয়ে করি নি? বিয়ে করেছি বলেই তো হরবোলা সেজেছি। এই শোন—' বলে অসম্ভব মুখবিকৃতি করে নীরেন সদ্যোজাত শিশুর কয়েকটা অকৃত্রিম আর্ত্তনাদ করলে!

মেনকার উল্লাস তাতে দেখে কে! যেন তার বুকের থেকে বোবা একটা দুঃস্বপ্ন নেমে গেছে—তেমনি তরল নির্ম্মুক্ত হাসি।

এবং অবিনাশও বিয়ে করেছিলো। নির্ব্বাক বিস্ময়ে সে ভাবতে লাগলো, সে কখনো বলতে পারতো কিনা; আমি যখন এখানকার ইস্কুলে সেকেণ্ড মাষ্টার ছিলাম, তখন পাশের বাড়িতে—

বহু বৎসর পরেও কি জীবনে কোনোদিন কারুর সঙ্গে কারুর দেখা হয়?

বলা বাহুল্য নীরেন এ-বাড়িতেই অধিষ্ঠিত হ'লো। নীরেনের যেটুকু বা শিষ্টাচারসঙ্গত কুণ্ঠা ছিলো, অবিনাশ তা দুই হাতে অপসারণ করলে এবং পরোক্ষে মেনকার দ্বিধাগ্রস্ত অতিথিপরায়ণতাকে দিলে একটা প্রবল প্রশ্রয়। অবিনাশের তাই একটা প্রকাণ্ড মুক্তি মনে হ'লো, মেনকার এই বিচিত্র উদ্ঘাটন। মেঘ দেখে ময়ূর পেখম বিস্তার করে করুক, বৃষ্টিতে দিঙ্মণ্ডল সুশীতল হ'লেই শান্তি।

মেনকা তার জীবনে অকস্মাৎ একটি ব্যবধান খুঁজে পেয়েছে। তারই জন্যে আবরণ বুঝি পৃথিবীর আদিমতম রহস্য। খানিকটা আড়াল, খানিকটা উদ্ঘাটন—দু'য়ে মিলে অখণ্ড একটি সঙ্কেত। তাই মেনকাকে যে আজকাল একটু সচেতন প্রসাধন করে, সাড়িতে যে সে এখন বিজ্ঞাপিত না হ'য়ে বিকশিত হবার জন্যে সচেষ্ট, তার গৃহচর্য্যা যে এখন একটা আনন্দের স্বতোচ্ছ্বাস—এই কারুকলাটি অবিনাশকে ভারি মুগ্ধ করে। খাওয়ার বৈঠকে নীরেনের অনুকূলে স্বামীকে বঞ্চনা করবার যে তার অপরোক্ষ লিপ্সা—এটিও পর্য্যন্ত অবিনাশের কাছে গভীর আস্বাদনের জিনিস। অথচ কোথা থেকে এ কেমন করে সম্ভব হ'ল। খালি বৃন্ত হ'লেই বোধকরি ফুলের বিকাশ হয় না, তার জন্যে পল্লব চাই, ছবিতে যেমন চাই পটভূমি, ঘরে যেমন চাই বাহিরের আনাগোনা, বদ্ধ দেয়ালে যেমন জানলার উন্মুক্ততা। কথাটা বিশ্লেষণ করে বললে হয়তো রূঢ় শোনাবে, কিন্তু নীরেন নিতান্ত নিঃসম্পর্ক পরপুরুষ বলেই তো মেনকা এমন রহস্য-শ্রীতে রূপান্তরিত হ'য়ে উঠেছে। নইলে তার স্বাভাবিক প্রত্যক্ষতায় সে তো একটা সমষ্টীকৃত কঙ্কাল! যেমন এখন অবিনাশ। কিন্তু তারো তো মেনকারই মতো সুগোপন সম্ভাবনা ছিলো। ভাবতে অবিনাশের হাসি পেলো। সব চেয়ে হাসি পেলো এই ভেবে—নীরেন এইখানে বেশি দিন থাকতে পারবে না।

নীরেনকে গুণী বলতে হ'বে, বিনয় না করে'ই। দস্তুরমতো সে সেদিন মুখ দিয়ে মোটরের টায়ার-ফাটার শব্দ করলে। সঙ্গে-সঙ্গে তার ফুসফুস দুটোও ফেটে গেলো কিনা দেখবার জন্যে অবিনাশের সঙ্গে মেনকাও তার বুকের জামাটা পরীক্ষা করলে।

দেখতে-দেখতে ছোট সহরটা সরগরম হ'য়ে উঠলো। আজ বার-লাইব্রেরি, কাল মোক্তার-এসোসিয়েশন, পশু অফিসারদের ক্লাব, তশু আঞ্জুমান ইসলামিয়া—প্রত্যহ লেগেই আছে তার খেলা। মেয়েদের মহলেও মেনকা একদিন বন্দোবস্ত করলে। সেদিন সে এমন একটা ভাব দেখালে যেন কৃতিত্বটা তারই একলার! চলে যাবে বলে সে সকালে প্রস্তাব করে, বিকেলেই কোথা থেকে আবার একটা নিমন্ত্রণ জোটে এবং যে পয়সা উপার্জ্জন করছে তার চেয়ে যে ব্যয় করছে তারই হয় বেশি আনন্দ। কিন্তু সহর ছোট, তার চাহিদাও পরিমিত। অতএব একদিন নীরেনের খেলা গেলো ফুরিয়ে।

সেদিন সে কথায় একটা সমাপ্তির রেখা টেনে বললে, 'আজ রাতের গাড়িতেই আমি চললুম।'

ঈষৎ গ্রীবা হেলিয়ে মেনকা বললে, 'ইস্?'

এমন একটা সুন্দর উচ্চারণ মেনকার যোগ্য—অবিনাশের কাছে তা আবিষ্কার।

'আর আমার কি কাজ! আশাতিরিক্ত রোজগার করলুম, এবার ডেপুটি মুন্সেফদের থেকে ক'টা সার্টিফিকেট কুড়িয়ে সোজা বরিশাল যাবো। সেখানে কি একটা স্বদেশী মেলা খুলেছে শুনছি।'

'এরি মধ্যে যেতে দেয়া হ'বে কিনা!' মেনকা স্বামীর দিকে চেয়ে সমর্থন খুঁজলে।

'আরো থেকে যান দিন কতক।' অবিনাশ কষ্টসাধিত উদারতায় বললে, 'কত দূরে পড়ে আছি, কালে-ভদ্রেও কোনো আত্মীয়-স্বজনের দেখা পাই না।'

'তবু যাক, আত্মীয় বলে স্বীকৃত হলুম।' নীরেন সশব্দে হেসে উঠলো।

'তাই তো দাবি করতে পারছি।' মেনকা জোর দিয়ে বললে, 'আমাকে মুখ দিয়ে ঐ হার্মোনিয়াম বাজানোটা না শিখিয়ে তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না। আর ঐ ভেন্‌টো—ভেন্‌ট্রো—ভেন্‌ট্রোলো—কি জানি ওর নামটা ছাই!'

নীরেন হাসির একটা অট্টরোল তুললে।

অবিনাশ স্ত্রীকে সাহায্য করলে: 'ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম্‌।'

নীরেনের সঙ্গে-সঙ্গে মেনকাও হাসিতে এমন অকুণ্ঠ মিশ খেয়ে গেলো যে হয়তো উচ্চারণটা তার আর শেখা হ'লো না।

না হোক, নীরেন তার অধিস্থিতিকে আরো দীর্ঘ করলে এবং দিন যখন সপ্তাহের কিনারে এসে ঠেকছে, নীরেন একদিন বললে, 'তোমার দ্বারা শেখা হ'বে না মেনকা, এতে ফুসফুসের অনেক জোর দরকার, দস্তুরমতো যোগাভ্যাস করতে হয়।'

ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম্‌ না শিখুক, মেনকা ছলনা শিখেছে, রূপচর্চ্চার যা আবশ্যিক অনুসঙ্গ। বললে, 'বা, বেশ শিখেছি, নতুন ছাত্রীর পক্ষে। তা তুমি যদি এখন মন দিয়ে না শেখাও—শেখালে যদি তোমার ব্যবসা মাটি হয়! আর দিনকতক থাকলেই বেশ রপ্ত হ'য়ে যায়। এই দেখ না কেমন ঘুঘুর বাজাই।' বলে স্বামীর কাছে একটা জীবন্ত ব্যাখ্যা দেবার দুশ্চেষ্টায় সে কতগুলি অসম্ভব শব্দ করলে। তাতে বীভৎস খানিকটা মুখবিকৃতি ও কিঞ্চিৎ নিষ্ঠীবন-নিক্ষেপের অধিক সে অগ্রসর হ'তে পারলে না।

নীরেন হাসিতে আলোড়িত হ'য়ে উঠলো, রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'আমার ছাত্রীর দৌড় দেখুন, সাতদিন ছেড়ে সাত মাসেও তুমি একটা হুবহু 'ম্যাও' করতে পারবে না।'

মেনকার ম্লান পীড়িত মুখ দেখে অবিনাশের ভারি দুঃখ হ'লো। স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে সে বললে, 'এতে ছাত্রীর লজ্জার চেয়ে শিক্ষকেরই অগৌরব বেশি। আপনি আরো সাতদিন থাকুন, দেখবেন সহজেই মেনকা সব আয়ত্ত করে নিয়েছে।'

'অসম্ভব।' মেনকার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতে-না-উঠতেই কালো হ'য়ে গেলো। নীরেন বললে, 'আজ চিঠি পেলুম, মেলায় ষ্টল নেয়া হয়েছে, আজ রাতের ট্রেনেই আমাকে বরিশাল রওনা হ'তে হবে।'

মেনকার সঙ্গে-সঙ্গে অবিনাশও অন্ধকার দেখলে।

পরদিন সকালে মেনকা হাতে একটা কাগজের মোড়ক নিয়ে অবিনাশের কাছে এসে বললে, 'এই দেখ এ-সাড়িখানা নীরেনদা আমাকে দিয়েছেন।'

ঝল্‌মল্‌ করে' উঠলো সাড়িটা। অবিনাশ সবিস্ময়ে বললে, 'জর্জ্জেট!'

'বাপের জন্মে কোনোদিন পরি নি।'

'ও তো আজকাল খুব সস্তা হ'য়ে গেছে। পরলেই পারতে আগে!'

'হ্যাঁ—সস্তা! জাপানী নাকি ভেবেছ? দস্তুরমতো বিলিতি, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট থেকে অর্ডার দিয়ে আনানো।'

যুক্তির অকাট্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার উপায় নেই। অবিনাশ বললে, 'হ্যাঁ, পঞ্চাশ ষাট টাকার কম হ'বে না।'

মিনতি সাড়িটা কটিতট থেকে বিলম্ব করে পায়ের তলায় লুটিয়ে দিলে, সস্নেহ স্পর্শে স্তূপীকৃত করে তার ঘ্রাণ নিলে, গভীর স্পর্শানুভব করলে। অবিনাশ অবিচার করবে না, এ তার নিতান্ত সাড়ির প্রতিই নৈর্ব্যক্তিক পক্ষপাত।

কিন্তু কিঞ্চিৎ সে আশ্চর্য্য হ'লো, যখন বিকেলে মেনকা বললে, 'চলো, বায়োস্কোপে চলো।'

আজ তিন সপ্তাহ ধরে একাদিক্রমে একটা রোথো বাঙলা বই চলছে এবং যাচ্ছেতাই বইটা তিন সপ্তাহ ধরে বদলাচ্ছে না বলে মেনকারই অভিযোগ ছিলো অগ্রগণ্য।

'অবিনাশ বললে, 'ও-বই তো তুমি দেখেছ।'

'আহা, তাই বলে বুঝি আর যাওয়া যায় না। তুমিও তো একই বই বছর-বছর একই ক্লাশে পড়াচ্ছ—তাতে তোমার কি ক্ষতি হচ্ছে?'

হেরে গিয়ে অবিনাশ অন্য কথা পাড়লে: 'কিন্তু আজ নীরেনবাবুর যাওয়ার দিন।'

'তাঁর ট্রেন তো সেই রাত্রি বারোটায়।'

যেন অবিনাশ তা জানে না। 'তাই নাকি? তবে তাঁকেও নিয়ে চলো।'

মেনকা শরীরে একটা ঘূর্ণি দিয়ে বললে, 'তিনিই আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন।'

মেনকা আজ কোন সাড়ি পরবে, অবিনাশ তা জানতো। কিন্তু ছবি না দেখে নিজেকে ছবি করে দেখানোই যে আজ তার বিশেষ কর্ত্তব্য হ'য়ে উঠবে—এটা সে জানতো না।

৫

ট্রেন বারোটায়, তাই নীরেন খাওয়া শেষ করে সামান্য বিশ্রাম করতে এসেছে। এ ক'দিন অবিনাশ আর নীরেন একই ঘর অধিকার করে থাকতো—অন্তত রাত্রিটুকু। কথান্তরবর্ত্তিনীর থেকে এই যে একটু বিচ্ছেদ—তারই মোহে মেনকা অবিনাশের কাছে রমণীয় হ'য়ে উঠছিলো ধীরে-ধীরে, প্রায় সূক্ষ্ম অশরীরী একটা আকর্ষণের মতো; কিন্তু আজই রাত্রে সেই যবনিকা উঠে যাবে, আবার সম্মুখে এসে দাঁড়াবে সেই আনগ্ন অন্ধকার! কোথায় বা তখন এই গুণ্ঠন, কোথায় বা এই গোপনতা! মাঠের পরে দেখা দেবে একটা কঠিন, কাঁকর-বিছানো প্ল্যাটফর্ম!

অবিনাশ বললে, 'আপনার যাওয়া আজ কিছুতেই হ'তে পারে না, নীরেনবাবু।'

'কেন?'

'আপনার আরেক খেলা এখনো বাকি আছে।'

'খেলা!' নীরেন যেন কথাটা বুঝলে না।

'হ্যাঁ, শেষ অভিনয়। আর তার পুরস্কার অর্থ নয়, আমার সুখ, আমার শান্তি।'

নীরেন আধো-শোয়া থেকে উঠে বসলো: 'এ আপনি কি বলছেন?'

'হ্যাঁ, আমাকে আপনি বাঁচান।'

'প্রাণ দিয়ে বাঁচাবো।' নীরেন কৌতূহলে ছিঁড়ে পড়তে লাগলো: 'কি হয়েছে বলুন।'

দরজাটা অবিনাশ ভেজিয়ে দিয়ে এলো। তারপর একে-একে সে বললে তার এই রুদ্ধশ্বাস জীবনের ইতিহাস। মেনকার ঘোরতর কুৎসিত সন্দিগ্ধতা—যার যন্ত্রণায় অবিনাশের একেক দিন তাকে খুন করতে প্রবৃত্তি হয়—একটা বন্য কায়িক প্রবৃত্তি।

'বুঝলুম। কিন্তু কি প্ল্যান আপনি ঠাওরেছেন শুনি?'

'সে হয়তো নিতান্ত ছেলেমানসির মত শোনাবে, কিন্তু সেটাই সব চেয়ে ভালো, সহজসাধ্য।'

'শুনি।'

অবিনাশ বললে।

নীরেন উচ্চকিত হেসে উঠলো: 'আপনি পাগল হয়েছেন, অবিনাশবাবু।'

'পাগল হই নি, কিন্তু পাগল হ'য়ে যাবো—যদি না আপনি সাহায্য করেন।'

'কিন্তু এ-কথা আমি তাকে কি করে বলবো?'

'সে-কথা কেবল আপনিই একমাত্র তাকে বলতে পারেন।'

'তাকে যে আমি বোনের মতো স্নেহ করি।'

'অন্তত একদিন আমাকে সন্দেহ করতে দিন যে এ-কথাটা আপনি বানিয়ে বলছেন।'

অবিনাশ মরিয়ার মতো বললে—'একদিন, গ্রহ-নক্ষত্রের আনুকূল্য ঘটলে আপনি ওকে স্বচ্ছন্দে বিয়ে করতে পারতেন—অন্তত সেই অনুভূতিটা রঙ্গমঞ্চের পটভূমিকার কাজ করুক।'

'সে ভারি শক্ত কাজ, অবিনাশবাবু।' কাজটা শক্ত হ'তে পারে, কিন্তু কল্পনায় যে নীরেন ভীষণ মজা পাচ্ছে সেটা তার কণ্ঠস্বরে পরিষ্কার টের পাওয়া গেলো।

উৎসাহিত হয়ে অবিনাশ বললে, 'কিন্তু অভিনয় তো আপনার লাইন! আমি কোনোদিন আবৃত্তি পর্য্যন্ত করিনি, আমারই বরং পরিশিষ্টটুকু ম্যানেজ করা কঠিন ঠেকবে, কখনো অভ্যেস নেই। তা আমি চালিয়ে নিতে পারবো, আমার জীবন-মরণ সমস্যা। আপনি শুধু দয়া করে সুতোটা একবার ধরিয়ে দিন। বাকিটা আমার হাতে।'

বারোটার প্রাক্কালে মেনকা একবার তাড়া দিতে এসেছিলো; অবিনাশ গম্ভীরমুখে বললে, 'নীরেনবাবু আজ যাবেন না।'

'কেন?' মেনকা যেন প্রচ্ছন্ন ভয় পেলো।

'ওঁর অসুখ করেছে।'

মেনকা চম্‌কে এগিয়ে এলো, উদ্বিগ্ন গলায় শুধোলো : 'তোমার অসুখ করেছে, নীরেনদা ?'

নীরেন মনে-মনে হাসলে। সত্যিই অবিনাশ অভিনয়ে নিতান্ত কাঁচা, শেষ পর্য্যন্ত ট্র্যাজেডিটা সে না প্রহসনে নিয়ে আসে।

কণ্ঠস্বরে ঘুমের ভান এনে নীরেন বললে, 'অসুখ নয় দিদি—আরেকটা বায়না পেয়েছি কাল। কালকের খেলাটা দেখিয়েই তবে ফিরবো।'

'আমি দেখতে পাবো তো ?'

'নিশ্চয়। তুমি ছাড়া আমার এত বড়ো সমঝদার আর কে আছে ?'

'তবে', মেনকা অবিনাশের দিকে কুটিল ভ্রূকুটি করলে : 'তবে ওঁর অসুখ বলছিলে যে ?'

'ঠিকই বলেছেন।' নীরেন তার অননুকরণীয় পরিহাস-ভঙ্গিতে বললে, 'সেটা আমার মানসিক অসুখ, মেনকা।'

'সেটা আবার কি জিনিস ?'

নীরেন সস্মিত সরলতায় বললে, 'সেটা কালকের খেলাতেই দেখতে পাবে।'

সেটা যেন কি অদ্ভুত রকমের খেলা, দেখতে পাবে ভেবে মেনকা অগ্রিম রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো।

'তবে ঘুমোও, আমি গাড়োয়ানকে বারণ করে পাঠাই।'

যাই হোক, ভূমিকা নেহাৎ মন্দ হয় নি।

পর দিন শনিবার, হাফ-হলিডে। ইস্কুল থেকে অবিনাশ কলিং-বেলটা চেয়ে নিয়ে এসেছে, তার একটা অস্ফুট আওয়াজই হ'বে অবিনাশের আবির্ভাবের সঙ্কেত। ষ্টেজ নিখুঁত তৈরি, পাশের ঘরে নীরেন মেনকাকে নিয়ে অজস্র গল্প করছে, দরজাটা যথাবিহিত বন্ধ করা। খিল যে লাগানো হয় নি তা দরজার দুই পাটের অসংলগ্নতা থেকেই টের পাওয়া যাচ্ছে। নিঃশব্দে দরজার কাছে এগিয়ে এসে অবিনাশ সূক্ষ্ম কাণ পাতলে। আগের মতো নীরেন আর তার দিগ্বিজয়ের বর্ণনা দিচ্ছে না, তার ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাস বলছে যেগুলো করুণ পরিচ্ছেদ। তার বিবাহিত জীবনের অবিমিশ্র নিরানন্দতার কথা, তার কৈশোর-প্রেমের ব্যর্থতার কথা। সমবেদনায় মেনকা প্রায় মুগ্ধের মতো শুনছে। ঘরের সমস্ত আবহাওয়া ভাবালুতায় গাঢ় করে এনেছে, এবার কলিং-বেল্‌টা টিপ্‌তে কেবল বাকি।

টুং করে ছোট্ট একটা আওয়াজ হ'লো, আর বলবো কি মুহূর্ত্তে যেন দাবানল উঠলো জ্বলে। নীরেন চেয়ারে ছিলো বসে, খাঁচার বাইরে আহার্য্য দেখে ক্ষুধার্ত্ত বাঘের মতো সে উন্মত্ত পাইচারি করতে লাগলো। আর ও-পাশে শ্বাসরোধ করে অবিনাশ রইলো দাঁড়িয়ে, চিত্র-নিক্ষিপ্তের মতো।

'শুধু সেই কথাই তোমাকে এখন বলতে বাকি, মেনকা।' হাঁটতে-হাঁটতে নীরেন তখন ঘরের ও-প্রান্তে চলে গিয়েছে : 'কিন্তু আমি তা বলবো, কিছুতেই লুকোবো না ; পৃথিবীর ছাদ যদি ভেঙে পড়ে তো পড়ুক, তবু সেই কথা বলে আমি হালকা হ'বো। সেটা আমার মরণ কিনা জানি না, তবু আমাকে তা বেঁচে থাকতে-থাকতে বলে যেতে হ'বে।'

ভীত মৃদু গলায় মেনকা বললে, 'বলো।'

'তোমার কাছ থেকে অভয় না পেলেও আমি বলতুম।' নীরেন এবার একেবারে তার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো : 'তোমাকে আমি ভালোবাসি, ভালোবাসি, অগ্নিশিখার মতো সমুদ্রোচ্ছ্বাসের মতো, মৃত্যুর মতো। তোমাকে না পেয়ে আমি শুষ্ক, রিক্ত, শূন্য হ'য়ে গেছি।'

বেতের একটা নিচু চেয়ারে মেনকা বসে ছিলো, দ্বিপ্রহরের বিশ্রামের শিথিলতায়। পিঠের উপর ভিজে চুলগুলি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছিলো, সাড়ির যে-প্রান্তটা ঘোমটায় রূপান্তরিত হবার কথা সেটা উদাসীনতায় বিস্রস্ত হ'য়ে লুটোনো, তার ভঙ্গিতে এতটুকুও প্রস্তুতির অবকাশ ছিলো না। তবু যথাসাধ্য আত্ম-সঙ্কোচনের ত্বরিত ভঙ্গি করে মেনকা এক ঝট্‌কায় উঠে দাঁড়ালো। নীরক্ত নিশ্চেতন গলায় বললে, 'এ সব তুমি কি বলছ, নীরেন-দা ?'

'হ্যাঁ বলছি, বলতে দাও আমাকে।' নীরেন দাউ-দাউ করে' উঠলো : 'শরৎ চাটুজ্জের গৃহদাহ পড়ো নি, পর্দায় দেখ নি সুরেশের অভিনয় ? দেখলুম বলা যায়, ইচ্ছে করলেই বলা যায়, বলতে পারলেই বলাটা তবে শেষ হয়। তেমনি হয়তো সুরেশের নকল শোনাবে, তেমনি আমারো বুকের মধ্যে তুমুল ঝড় বইছে, পাঞ্জাবির বোতামগুলো খুলে ফেলে নীরেন তার গেঞ্জিটা বা'র করে দেখালো : 'তেমনি, তুমি যদি এখানে কাণ পেতে

শোনো, মেনকা, দেখবে কি ভূমিকম্প হচ্ছে, যেন ফেটে পড়ছে একটা ধূমায়িত আগ্নেয়-গিরি।'

'এ কি অন্যায় কথা!' মেনকা অসহায় চোখে ক্ষীণ একটু ভর্ৎসনা করলে।

'তারো চেয়ে শতাধিক অন্যায় অবিনাশের তোমাকে বিয়ে করা। সামাজিক তুলাদণ্ডেই ন্যায়-অন্যায়ের বিচার চলে না, মেনকা। হোক অন্যায়, তবু যে শক্তিধর, তারই তো সংসারে অন্যায় করবার অধিকার আছে।'

মেনকা পায়ের তলায় অতল পাতাল দেখলে; দেয়াল নেই, যেন খানিকটা অকায়িক শুভ্রতা। পাগলের মতো দরজার দিকে সে ছুটে গেলো: 'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে, আমি পালাই।'

'কোথায় পালাবে?' নীরেন ভেজানো দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো: 'কেন ছেড়ে দেবো, কিসের প্রলোভনে? পালাবে যদি চলো, সোজা রাজপথ দিয়ে, প্রেমের বিজয়-ধ্বজা উড়িয়ে—আমিও তোমার সাথী হচ্ছি। ভয় নেই, সাজগোজ করে নিতে পারো স্বচ্ছন্দে—অবিনাশের ফেরবার এখনো অনেক দেরি।'

মেনকা কাঁপছে, ভেঙে পড়ছে। নীরেন অসম্ভব ধমক দিয়ে উঠলো: 'বোসো চুপ করে গিয়ে চেয়ারটায়। যতদূর সম্ভব স্পর্শ বাঁচিয়ে চলো, মেনকা।'

মেনকা চেয়ারে খণ্ড-বিখণ্ড হ'য়ে ভেঙে পড়লো, বাহুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে কেঁদে উঠলো ফুঁপিয়ে।

'জানি তুমি দুঃখী, বাঁদরের গলায় মুক্তোর অবমাননা। সামান্য একটা ইস্কুল-মাষ্টার কি বুঝবে তোমার মর্য্যাদা? তুমি চলো, চলো আমার সঙ্গে—বাহিরের মুক্তিতে, পৃথিবী যেখানে বিশাল, আকাশ যেখানে অপরিসীম। তুমি যাবে, যাবে মেনকা?'

মেনকা যেখানে বসে ছিলো, সেখান থেকে কে যেন ঠিক তারই গলায় বললে, 'যাবো।'

'হ্যাঁ, আমি জানি, তুমি আমাকে ভালোবাসো, বিস্মৃত কোন অতীত কাল থেকেই ভালোবাসো। ঈশ্বরে ও মানুষে মিলে শত আচ্ছাদন উদ্ভাবন করলেও শরীরের রক্ত লুকোনো যায় না। আমি আকস্মিক আঘাত করেছিলুম বলে প্রথমে তুমি অভ্যাসবশতই আর্ত্তনাদ করে উঠেছিলে, কিন্তু আঘাতের মুখে আতপ্ত রক্ত দিয়েছে দেখা। তবে আর ভয় কিসের, মেনকা? বাসো না, বলো, ভালোবাসো না আমাকে?'

চেয়ারে উপবিষ্টা কে বললে, 'বাসি, লুকোবো না, আর কিছুতেই লুকোবো না, ভীষণ ভালোবাসি।'

'আর এখানে তুমি নিশ্চয়ই বিশ্রী আছ, একটা সঙ্কীর্ণ ইস্কুল-মাষ্টারের ঘরে।'

'ভীষণ বিশ্রী আছি।' চেয়ারের থেকে নিরবয়বা কে প্রেতিনী শুভ্র গলায় বললে, 'আমাকে তুমি এখান থেকে নিয়ে চলো এখুনি; আর এক মুহূর্ত্তও আমি এখানে টিকতে পাচ্ছি না।'

'এই তো মহীয়সীর মতো কথা। প্রেমের জন্যে মানুষে রাজত্ব ছেড়ে দিচ্ছে, আর এ তো ইস্কুল-মাষ্টারের সামান্য পঁচাত্তর টাকা মাইনে। তবে আর ভয় কি মেনকা? আমি একটা গাড়ি নিয়ে আসছি।'

এটা কি সত্য না স্বপ্ন—মেনকা নিরবলম্বের মতো শূন্যে ঝুলতে লাগলো।

সমস্ত কুয়াসা তার রূঢ় আঘাতে অপসৃত হ'য়ে গেলো যখন তার হাত ধরে' নীরেন প্রবল আকর্ষণ করলে; বললে, 'তবে আর দ্বিধা কিসের মেনকা? উঠে পড়ো বিজয়িনীর মতো।'

আর সেই মুহূর্ত্তে নিষ্ঠুর বজ্রপাতের মতো ঘরের মধ্যে নির্ভুল ঢুকে পড়লো অবিনাশ।

যেন অকস্মাৎ ধরা পড়ে গেছে তেমনি ভঙ্গি করে নীরেন হাত দিলো ছেড়ে, আর মেনকা ছাইয়ের চেয়েও বিবর্ণ পাংশু হ'য়ে উঠলো।

'তাই, তাই এতদিন ধরে নীরেনদাকে কাছে টেনে রাখা—টেনে-টেনে একের পর এক দিনগুলিকে দীর্ঘ করে তোলা।' অবিনাশ সংযত অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে, 'লুকিয়ে-লুকিয়ে এই লীলা চলছে।'

'না, আমরা লুকোবো না,; নীরেন বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গি করলে: 'সমস্ত সংসারের সামনে দাঁড়িয়ে মুক্তকণ্ঠে প্রচার করবো, আমরা ভালোবাসি।'

অবিনাশ হঠাৎ নির্লজ্জ চীৎকার করে উঠলো: 'বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি ছেড়ে। অকৃতজ্ঞ কাপুরুষ কোথাকার!'

মেনকা যেন আশ্রয় পেলো। কান্না-কাঁপা গলায় সে

আর্তনাদ করলে: 'বার করে' দাও ওটাকে, ঘাড় ধরে বা'র করে দাও এক্ষুণি।'

'তাই বলে তোমাকেও এখানে সতীত্বের তেজ নিয়ে বসে থাকতে দেয়া হবে না।' অবিনাশ তার তর্জ্জনীতে দৃঢ় একটা সঙ্কেত-চালনা করলে: 'তোমাকেও ওটার সঙ্গে যেতে হ'বে, আর তা-ও এক্ষুণিই।'

'এর পর আর বসে থেকো না, মেনকা।' নীরেন সবেদন আবেদন করলে: 'তোমার অপমানে প্রেমের অপমান, আপামর নারীত্বের অপমান। চলে এসো, আর ভয় কিসের, সমস্ত কুয়াসা আজ খসে গেছে, দাঁড়াও আজ তোমার উন্মুক্ত ব্যক্তিত্বে। দেরি কোরো না, চলে এসো।'

'আর তোমার সেই জর্জ্জেট সাড়িখানা পরে নাও গে।' অবিনাশ বললে।

'বা, আমি কি করেছি, আমার কি দোষ!' মিনতি কাঁদতে পর্য্যন্ত সাহস পেলে না।

'মিথ্যে কথা বোলো না, মেনকা।' নীরেন সস্নেহ তিরস্কার করলে।

'আমি সব স্বকর্ণে শুনেছি—তুমি বলেছ, ওকে তুমি ভালোবাসো, এখানে তুমি ভীষণ বিশ্রী আছ, ওর সঙ্গেই তুমি যাবে।' অবিনাশ নিষ্পক্ষপাত বিচারকের ভঙ্গিতে বললে অনুদ্বেলকণ্ঠে, 'নিজের কাণে না শুনলে আমি হয়তো বিশ্বাস করতুম না, কিন্তু নেপথ্য থেকে তোমাদের নর্ম্মলীলার প্রত্যেকটি নিশ্বাস-পতন আমি শুনেছি। কত চোখের জল, কত কাকুতি, কত আরাধনা। সতী-পনার একটা সীমা থাকা উচিত।'

'মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা, ও-সব আমি কিচ্ছু বলি নি, তোমার এই পা ছুঁয়ে আমি দিব্যি গালছি—'

'খবরদার, ছুঁয়ো না আমাকে।' অবিনাশ ধমক দিয়ে উঠলো।

'সত্যি বলছি,' মেনকা কান্নায় গলে যেতে লাগলো: 'যা শুনেছ, ও একটাও আমার মুখের কথা নয়। ও হচ্ছে ওর ভেন্টো—ভেন্ট্রো—ভেন্ট্রোলো '

হায়, উচ্চারণটা মেনকা তখন শিখে রাখে নি।

অবিনাশের কেবলই ভয় হচ্ছিলো, নীরেন না দৈত্যকায় হেসে ওঠে। কিন্তু সে একটুও ভুল করলে না। বরং এগিয়ে এসে তার হাত বাড়িয়ে দিলে, বললে, 'ছেড়ে দাও তোমার ঐ তৃণ-গুল্মের মায়া, এই তোমার সামনে বনস্পতি দাঁড়িয়ে। তোমার পরিত্রাতা।'

কোথা থেকে কি হলো বোঝা গেলো না। মেনকা হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে তার দুই দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হাতে নীরেনের বুকে প্রবল ধাক্কা মারলে—বনস্পতি মেঝের উপর লুটিয়ে পড়লো। মেনকা উঠলো সুতীব্র চেঁচিয়ে: 'বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি ছেড়ে, স্কাউণ্ড্রেল কোথাকার!'

এততেও নীরেন হেসে উঠলো না। গায়ের ধুলো ঝেড়ে স্বচ্ছন্দে সে উঠে দাঁড়ালো। বললে, 'এটা যে তোমার সত্যিকারের বাড়ি নয়, খানিক আগেই তা বলছিলে। যতই ভালোমানুষ সাজো, কথা দিয়ে কথা ফিরিয়ে নেয়াটা মহত্ব নয়। যাক, আমি না-হয় চললুম, আমার বুকে যে মুষ্ট্যাঘাত দিলে তা আমার সমস্ত জীবনের পাথেয় হ'য়ে রইলো। কিন্তু একলা আমাকেই বঞ্চনা করলে না মেনকা, তোমার নিরীহ স্বামীকেও ঠকালে। আমরা কেউই ভুলবো না তোমার এই পট-পরিবর্ত্তন।' নীরেন দরজার সামনে অবিনাশের কাছে এসে দাঁড়ালো; ঈষৎ হাসিমুখে বললে, 'আশা করি আপনাকে আর কষ্ট করে আমার ঘাড় ধরতে হ'বে না।'

'কিন্তু ওকে ফেলে যাচ্ছেন কেন?' অবিনাশ বললে।

'ফেলে যাওয়াটা নিশ্চয়ই পেনাল-কোডের কোথাও পড়ে না। অমন চঞ্চল মেয়ে নিয়ে জীবনধারণ করা বিপজ্জনক। আচ্ছা আসি, নমস্কার।' বলে তার সামান্য যা ক'টা জিনিস কুড়িয়ে নিয়ে নীরেন দুপুরের রোদেই বেরিয়ে পড়লো।

আর সে অন্তর্হিত হ'তেই মেনকা অবিনাশের পায়ের তলায় আলুলায়িত লুটিয়ে পড়লো: 'তুমি বিশ্বাস করো, আমার কোনোই দোষ নেই, ও সব বানিয়ে বলেছে—সব ওর শব্দের ভেলকি ছাড়া কিছু নয়। এই তোমার পায়ে মাথা কুটছি—আমি নিরপরাধ।'

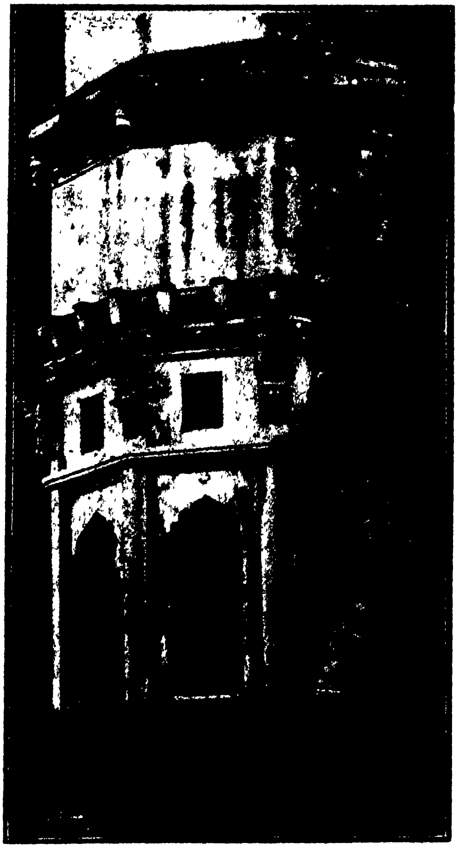
অবিনাশের মায়া করতে পারতো, কিন্তু পা সে সজোরে ছিনিয়ে নিলে। বললে, 'রাখো, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে প্রত্যেক আসামীই নিজেকে নির্দ্দোষ বলে। সত্যের যদি সম্মান রাখতে চাও, এখনো বেরিয়ে পড়ো, নীরেন বেশিদূর নিশ্চয়ই অগ্রসর হয় নি। একটা কলঙ্কিত কঙ্কাল নিয়ে আমি কি করবো?'

মেনকাকে অবিনাশ কাঁদতে দিচ্ছে অজস্র। সে-কান্নায় রাত্রি এলো কালো হয়ে এবং আজ অনেক রাত পর্য্যন্ত জেগে অবিনাশ স্বচ্ছন্দে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখতে পারলে। যে-প্রেম সে চেনে না, যে-প্রেম সে পায় নি, যে-প্রেম সে পেতে পারতো না—সেই অসীম অচরিতার্থতা নিয়ে কবিতা এবং তার নাম রাখলে সে পরম পিপাসা।

শিবনেরি ও জুন্নার

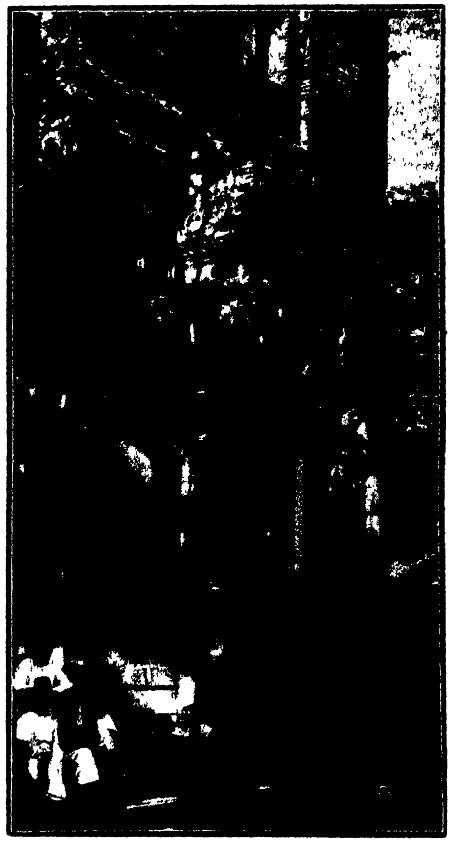
অদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জুন্নার নামের অর্থ পুরাতন সহর। সুদূর অতীতে জুন্নার সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল বলিয়া মনে হয় এবং কেহ কেহ অনুমান করেন যে এক সময়ে ইহা মহারাষ্ট্রের রাজধানী ছিল। স্থানটি রাজধানী হওয়ার সম্পূর্ণ যোগ্য। মহারাষ্ট্র-দেশে সমতল ভূমি বড় একটা দেখা যায় না; কিন্তু এই



প্রাসাদের একটি অলিন্দ, জুন্নার

দেশেও জুন্নারের মত একটা সুরক্ষিত স্থান খুব কম আছে। ইহার চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতশ্রেণী, আর এই পাষাণ প্রাচীরের ঠিক মধ্যস্থলে আরও উচ্চ পাহাড় ঘেরা স্থানটির নাম জুন্নার; তাহার সন্নিকটস্থ উন্নতশীর্ষ পর্ব্বত শিখরটির নাম শিবনেরি বা শিবনগরী। এই পার্ব্বত্য প্রাচীর-বেষ্টিত, শত শত যুগের স্মৃতিবিজড়িত, জুন্নারের অনতিদূরে অবস্থিত বন্ধুর শিবনেরির অসমতল শীর্ষে এক নগণ্য ভূস্বামীর গৃহে মারাঠা জাতির রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ শিবাজীর জন্ম হয়। জুন্নারের অবস্থা আজ বড়ই শোচনীয়। রেলপথ হইতে বহুদূরে অবস্থিতির জন্য বিলাসী



হাবসি ভূস্বামীর প্রাসাদের সম্মুখ ভাগ—জুন্নার

ভারতবাসী কেহ আর এই জঙ্গলাকীর্ণ জনহীন নগরী দর্শন করিতে আসেন না। কিন্তু একদিন যাঁহার প্রচণ্ড বিক্রমে হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ও আরবসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল সেই ছত্রপতি শিবাজী এই জনশূন্য

জুন্নারের কেন্দ্রে অবস্থিত জরাজীর্ণ শিবনেরি দুর্গের শীর্ষ হইতে মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া নবজীবনের প্রথম সূর্য্যকে স্বীয় অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সেইজন্য বিন্ধ্যের দুর্গম বক্ষে অবস্থিত শ্মশানসদৃশ জনশূন্য এই নগরী—আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। জুন্নার যাইবার জন্য দুইটি পথ আছে। প্রথম পথ বোম্বাই প্রদেশের পুণা সহর হইতে গোযানে যাইতে হয়; দ্বিতীয় পথ বোম্বাই ও পুণার মধ্যবর্ত্তী তলেগাঁও নামক ষ্টেশন হইতে। আমরা যখন গিয়াছিলাম তখন তলেগাঁও হইতে জুন্নার পর্য্যন্ত মোটর চলিত। পথে দুইটি গিরিসঙ্কট পার হইতে হয় এবং মহারাষ্ট্রজাতির আরও দুইটি পরম পবিত্র তীর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চাকন দুর্গ। ৺রমেশচন্দ্র দত্তের "শতবর্ষে" চাকন দুর্গের বিবরণ আছে। দ্বিতীয়টি দেওগাঁও, বৈষ্ণব কবি তুকারামের জন্মস্থান।

মহারাষ্ট্রদেশের ইতিহাস ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বিভিন্ন। দিল্লী, আজমীঢ়, কান্যকুব্জ, গৌড় যবনকরস্পৃষ্ট হইলেও মহারাষ্ট্র স্বাধীন ছিল। বিজিত হইয়াও মহারাষ্ট্র তখন হিন্দুস্থানের ন্যায় মুসলমানের অধীন হয় নাই। পাঠান বলিতে আমরা যে সকল মুসলমান রাজগণকে বুঝি তাঁহাদের বিজয় পতাকা কখনও বিন্ধ্যের এই দুরারোহ উপত্যকায় প্রোথিত হয় নাই। কেবলমাত্র অর্দ্ধশতাব্দীর জন্য মহারাষ্ট্র মুঘলের কুক্ষিগত হইয়াছিল। গুলবর্গার বহ্‌মনী রাজগণ মহারাষ্ট্রের ভূস্বামীগণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতেন, কিন্তু পর্ব্বতসঙ্কুল দাক্ষিণাত্যের প্রতি গিরিশিরে অবস্থিত দুর্গস্বামিগণ নিজ নিজ অধিকারে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। অন্তর্বিপ্লবে সুবিশাল বহ্‌মনী সাম্রাজ্য ধ্বংসের পিচ্ছিল পথে যাত্রা করিলে আহমদনগরের নিজামশাহী বংশ ও বিজাপুরের আদিলশাহী বংশ মহারাষ্ট্র দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। অধিকাংশ দুর্গস্বামী তাঁহাদের নিকট মস্তক অবনত করিলেও সমস্ত দেশে হিন্দুপ্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। দুইজন নরপতি আহমদ-নগর, গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের রাষ্ট্রীয় শক্তির অবসান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মুসলমান—ভারতেতিহাসে তিনি মুঘল সম্রাট আলমগীর নামে খ্যাত। দ্বিতীয় ব্যক্তি ছত্রপতি শিবাজী। বন্ধুর শিবনেরি শীর্ষে তাঁহারই জন্মস্থান দর্শন করিতে চলিয়াছিলাম। মহারাষ্ট্র যখন মুসলমানের করতলগত হইয়াছিল তখন বোধ হয় কোন মুসলমান নরপতি তাঁহার এক অজ্ঞাতনামা ভৃত্যের প্রভুপরায়ণতার পুরস্কার-স্বরূপ তাহাকে জুন্নার জায়গীর দিয়াছিলেন। তাহারই ভগ্নপ্রাসাদ সমাধিজীর্ণ বক্ষে অতীতের সেই স্মৃতি বহন করিয়া জনশূন্য নগরের মধ্যে আজও দণ্ডায়মান আছে। এখনকার জুন্নার নগর হইতে এই প্রাসাদ প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। প্রভুভক্ত হাব্‌সী তাহার প্রাসাদ সুসজ্জিত করিতে কোনরূপ কুণ্ঠা-বোধ করে নাই। ঝরণা, ফোয়ারা, বড় বড় ঘর, প্রাসাদের সকল লক্ষণই বর্ত্তমান আছে কিন্তু তাহাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। পাষাণ নির্ম্মিত প্রাসাদের উপরে এখন জীর্ণ পর্ণকুটীরে একটি মারাঠা গৃহস্থ বাস করে এবং জঙ্গলাকীর্ণ বিস্তীর্ণ উদ্যানের মধ্যে প্রস্তরের ফোয়ারা ও পাষাণনির্ম্মিত সিংহাসন জীর্ণদেহে অতীত ঐশ্বর্য্যের সাক্ষী-স্বরূপ এখনও দণ্ডায়মান আছে। প্রাসাদের একটি কোণে কয়েকটি



মসজিদের ধ্বংসাবশেষ—জুন্নার

প্রস্রবণ সমন্বিত একটি হ্রদ আছে। শুনিলাম এই হ্রদের চতুষ্পার্শ্বে একদিন হাব্‌সী ভূস্বামীর বিলাসগৃহ অবস্থিত ছিল এবং হারেমের অসূর্য্যম্পশ্যাগণ গ্রীষ্মের প্রখর দিবসে এই প্রস্রবণযুক্ত হ্রদের চতুর্দ্দিকে সমবেতা হইতেন। সায়াহ্নে সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলে বিলাসী হাব্‌সী এইস্থানে সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া সুরারঞ্জিতনেত্রে সুন্দরী নর্ত্তকীর নৃত্য উপভোগ করিতেন। কিন্তু এখন সেই হ্রদের স্ফটিক-স্বচ্ছ জল তাপদগ্ধা কোনও অবরুদ্ধা রমণীর কোমল অঙ্গুলি স্পর্শে কৃতার্থবোধ করে না এবং এখন তাহার কৃষ্ণবর্ণ বারিতে রাখালগণ নিজ নিজ মহিষের গাত্র মার্জ্জনা করে।

প্রাসাদের অনতিদূরে হাব্‌সীর সমাধি; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর দ্বারা একটি বৃহৎ ঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তাহার চূড়ায় একটি সুউচ্চ গুম্বজ সংযুক্ত করা হইয়াছিল। কোনরূপ ভাস্কর্য্যের আভাস তাহাতে পাওয়া যায় নাই। ইহার অতি নিকটেই হাব্‌সীর প্রভুভক্ত ভৃত্যের জীর্ণ সমাধি অবস্থিত এবং তাহার চতুর্দ্দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর ইষ্টক ও প্রস্তরের স্তূপ প্রাচীন জুন্নার নগরের সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করে।

জুন্নার সহরের চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতগুলির গাত্র খনন করিয়া তখনকার ভারতবাসীরা মন্দির, বিহার ও সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়াছিল। একটি গুহায় গণেশের মূর্ত্তি আছে। গণপতি বা গণেশ মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুর প্রধান উপাস্য দেবতা। সেই-জন্য বোধ হয় প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী অহল্যাবাঈ গণেশ-গুহার সোপান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। উহা এখনও বিদ্যমান আছে। মানমোড়ি পর্ব্বতের গুহাগুলি আয়তনে বৃহৎ ও বহুপ্রকারের। বিভিন্ন দেশের অধিবাসী এই সকল গুহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। গুহার গাত্রে যে সকল ক্ষোদিত লিপি আছে তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে একজন ভরুকচ্ছ দেশের বণিক, দ্বিতীয় জন সৌরাষ্ট্রের শক রাজার মন্ত্রী। তুলজা নামক পর্ব্বতে দশ বারটী গুহার মধ্যে একটি গুহা বড়ই বিস্ময়কর। ইহা বর্ত্তুলাকার এবং ইহার মধ্যে প্রস্তরের স্তম্ভগুলি গোলাকারে সজ্জিত।

শিবনেরি পর্ব্বতটি নিম্ন হইতে সহস্র সহস্র ফিট্‌ উচ্চ প্রাচীরের ন্যায়—একদিক ব্যতীত অপর কোনদিকে উপরে উঠিবার উপায় নাই। পর্ব্বতের উপরে চতুর্দ্দিক পাষাণ নির্ম্মিত প্রাকারে বেষ্টিত, প্রাচীরের নিম্নে অতলস্পর্শী গহ্বর। কেবল যেদিকে উপরে উঠিবার পথ আছে সেই-দিকে গিরিসঙ্কটের উপর নূতন ও পুরাতন বহু তোরণ অতীতের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনীর মূক সাক্ষীরূপে এখনও বিদ্যমান। বন্ধুর গিরিসঙ্কটে তিন চারিজনের অধিক লোক একত্রে পাশাপাশি যাওয়া অসম্ভব। এই পথ অবলম্বন করিয়া অল্পদূর অগ্রসর হইলে প্রথম তোরণে উপস্থিত হওয়া



দুর্গম শিবনেরী শিখরস্থ একটি বৃহৎ খিলান

যায়; এই স্থান হইতে পথের একদিকে প্রাকার ও অন্যদিকে পাষাণপর্ব্বতগাত্র ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে। গিরিপথের উপর সর্ব্বসমেত আট নয়টি তোরণ আছে এবং প্রত্যেক তোরণের পার্শ্বে কামান রাখিবার জন্য মুর্চ্চা ও শত্রু সৈন্যের উপরে তপ্ত তৈল ঢালিয়া দিবার প্রণালী আছে। এই

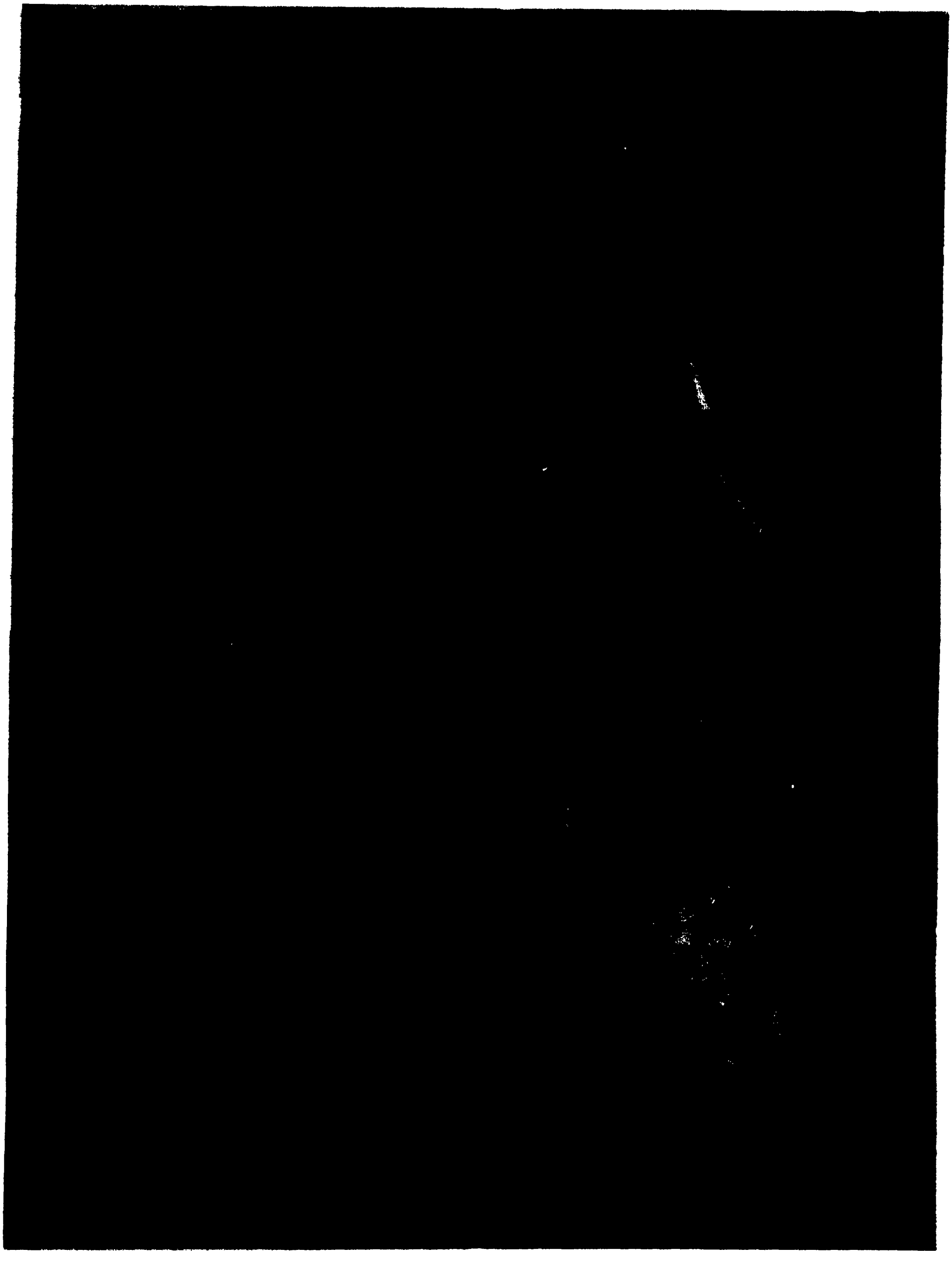
পথ পাহাড়ের প্রায় মধ্যস্থলে শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর কোন সুদূর অতীতে মানুষ দুরারোহ পর্ব্বতে উঠিবার জন্য সোপানশ্রেণী প্রস্তুত করিয়াছিল। কতকাল আগে কোন জাতি—কোন ধর্ম্মাবলম্বী মানুষ বন্ধুর শিবনেরির শিখরস্থ দুর্গ রক্ষার জন্য এই সোপানশ্রেণী প্রস্তুত করিয়াছিল তাহা কে বলিয়া দিবে। অনার্য্য, আর্য্য, হিন্দু, শক, মুঘল, মারাঠাজাতীয় কত বীরের হৃদয়-শোণিত যুগে যুগে এই পার্ব্বত্য পথ ও সোপানশ্রেণীর বক্ষ রঞ্জিত করিয়া দিয়াছে। মূক পাষাণ অন্তরের নিগূঢ় কাহিনী যদি ব্যক্ত করিতে পারিত তাহা হইলে আজ বোধহয় ভারতের ইতিহাসের পাতায় পাতায় বিপর্য্যয় ঘটিত। প্রাচীর শ্রেণী অতিক্রম করিয়া দুর্গে প্রবেশ করিবার পর দক্ষিণ দিকের



মুসলমান আমলের নির্ম্মিত একটি সমাধি—শিবনেরী

পথ অবলম্বন করিলে শিবাজীর ইষ্টদেবী ভবানীর মন্দিরে উপস্থিত হওয়া যায়। মন্দিরের সম্মুখে একটি কাষ্ঠ নির্ম্মিত তোরণ আছে। মন্দিরের প্রাচীর পাষাণনির্ম্মিত কিন্তু ভিতরের সমস্ত কার্য্য কাষ্ঠের। অধিষ্ঠাত্রী দেবীমূর্ত্তি প্রস্তরের, কিন্তু শত শত বৎসরের সঞ্চিত সিন্দূরের জন্য অবয়ব চিনিতে পারা যায় না। দুর্গের প্রবেশপথে যে তোরণ আছে তাহার ঠিক সম্মুখেই সোপানশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। সোপানের পথপ্রদর্শক বলিয়াছিল যে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়। পর্ব্বত শিখরের সর্ব্বোচ্চ স্থানে ইষ্টক প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গস্বামীর আবাসের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। ইহার মধ্যে শস্যের গোলা ও জলাশয় অবস্থিত। নিম্নের দুর্গ হইতে উপরের দুর্গ প্রায় তিনশত ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। সোপানশ্রেণী অত্যন্ত দুরারোহ। প্রথম দুর্গটী প্রায় সমতল হইয়া গিয়াছে। কেবল মুসলমান আমলে নির্ম্মিত অশ্বশূন্য এক অশ্বশালা প্রেতের ন্যায় দণ্ডায়মান আছে। দুর্গমধ্যে মনুষ্যের বাস নাই। দিবসে ইতিহাসবিশ্রুত দুর্দ্ধর্ষ মাওলি জাতির হীনবল বংশধরগণ এখানে গোচারণ করিতে আসে। উপরের দুর্গে কিল্লাদারের বাসভবন ব্যতীত দুই তিনটি জলাশয় ও কতকগুলি সমাধি আছে। জলাশয়গুলির মধ্যে দুইটি খুব গভীর। কূপের ন্যায় বৎসরের সকল সময়েই এই দুইটিতে নির্ম্মল ও সুপেয় পানীয় পাওয়া যায়। তৃতীয়টি একটি প্রস্তরের পুষ্করিণী মাত্র। ইহার উপরে প্রস্তর নির্ম্মিত খিলান আছে; ইহার পার্শ্বে একটি মস্‌জিদ এবং তাহার উপর আর একটি প্রকাণ্ড খিলান আছে। বহুদূর হইতে জনহীন শিবনেরির শূন্য মস্তকে অবস্থিত এই খিলানটি—মানুষের দৃষ্টিগোচর হইয়া অতীতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

দুর্গস্বামীর আবাস অতি ক্ষুদ্র। গৃহটি প্রস্তর নির্ম্মিত ও দ্বিতল। নিম্নতলে একটিমাত্র কক্ষ; দ্বিতলে দুইটি কক্ষের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। বোধহয় এই ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর গৃহের কোন এক অজ্ঞাত কোণে জীজীবাঈ এক শিশুসন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। ভারতের ইতিহাসে তখন সবেমাত্র নবযুগের সূচনা হইতেছিল। বহ্‌মনী সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর তখন বিজাপুর, আহমদনগর ও গোলকুণ্ডার সুলতানগণ প্রেতের নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। দিল্লীর সিংহাসনে তখন নূরউদ্দীন জাহাঙ্গীর সুপ্রতিষ্ঠিত। ঠিক সেই সময়ে শিবনেরির বন্ধুর শিখরে মহারাষ্ট্র-জীবন-প্রভাতের প্রথম সূচনা হইল। আত্মকলহে মগ্ন তুর্কী, শত শত বৎসরের পরাধীনতার পঙ্কে নিমগ্ন হিন্দু তখন স্বপ্নেও ভাবে নাই যে একদিন এই অতি ক্ষুদ্র মারাঠা ভূস্বামীর পুত্রের বিক্রমে দিল্লীশ্বর ঔরঙ্গজীবকে চিন্তান্বিত করিয়া তুলিবে। তাঁহার প্রচলিত সামরিক প্রথায় শিক্ষিত মারাঠা অশ্বারোহীর ক্ষুরোত্থিত ধূলিপটল একদিন শতদ্রু হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত



শিল্পী— শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সাহা

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

উত্তরাপথ ও দাক্ষিণাত্য সমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিবে এবং বাবর ও ঔরঙ্গজীবের বংশধরশূন্য দেওয়ান-ই-আমে বসবাস করিয়া—মারাঠার প্রসাদ-লব্ধ অর্থে জীবনযাপন করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিবে।

এই শিবনেরির প্রতি প্রস্তরকণা মারাঠা মুঘলের ইতিহাসের প্রতি পাতার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে এই জুন্নার ও শিবনেরি কখনও মারাঠা হস্তে কখনও বা মুঘলের কুক্ষীগত হইয়াছে। যখনই শিবনেরি তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছে তখনই শিবাজী যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া তাহা পুনরাধিকার করিয়াছেন। অন্তিম মুহূর্ত্তেও তিনি শিবনেরির তুঙ্গ শিখরকে বিস্মৃত হ'ন নাই। তাঁহার মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র-সেনা মুঘলের কুক্ষীগত শিবনেরি দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে জুন্নার নগর অবরোধ করিয়া তিনশত স্বদেশপ্রেমিক মহারাষ্ট্রবীর নিশাশেষে বন্ধুর পর্ব্বতগাত্র উল্লঙ্ঘন করিয়া রাত্রিযোগে দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। মুঘল কিল্লাদার আব্‌দুল আজিজ খাঁর বীর্য্যে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। আব্‌দুল আজিজ যোদ্ধা ছিলেন—তিনি যুদ্ধাবসানে হতাবশিষ্ট মহারাষ্ট্র বীরদের শিবাজীর নিকট সসম্মানে প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে তিনি যতদিন দুর্গরক্ষক থাকিবেন ততদিন যেন দুর্গ আক্রমণ করিয়া শিবাজী বৃথা লোকক্ষয় না করেন।

অর্থাভাবে লোকাভাবে মহারাষ্ট্রের এই ঐতিহাসিক স্থানটি আজ জরাজীর্ণ ও ধ্বংসোন্মুখ। আশা করি নব শিক্ষায় শিক্ষিত মারাঠা তাহাদের জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থের যথোপযুক্ত আদর করিতে শিখিবে।

বৈদিক-পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক কালের যোগসূত্র

শ্রীহরিদাস পালিত

বৈদিকসমাজ প্রতিষ্ঠাতা বৈবস্বত মনু। তিনি বৈদিক কর্মকাণ্ডের আদি প্রবর্তক। মনু দ্রবিড় দেশের রাজা ছিলেন, সে কাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩৫০০ বৎসরের প্রায় সমসাময়িক। বৈদিক সভ্যতা, সৈন্ধবী সভ্যতার পূর্ববর্তী নহে—মধ্যবর্তী। মনুর জন্মস্থান মহারাঢ়ের অন্তর্গত অংগ জনপদের রাজধানী চম্পা নগর। দ্রবিড় নগরেই প্রথম বৈদিক যজ্ঞ প্রবর্তিত হয়। দ্রবিড়ে ধর্ম্মকলহ, প্রজাবিদ্রোহ, মনুর সদল বলে দ্রবিড় ত্যাগ। সপ্তসিন্ধু ও কাশ্মীর রাজ্যে পলায়ন। ইড়ামুখে অবস্থান। ক্রমে বৈদিকসমাজের উন্নতি—লোকবৃদ্ধি। ভারতের (বর্তমান ভারতের) বহির্ভাগে—যথা চালদিয়া, বাবিলনিয়া, ইজিপ্ত ইত্যাদি দেশে গমন। দলে দলে ভারতে সুদীর্ঘকাল পরে পুনঃ আগমন। মনুর সময়ের জলপ্লাবন উপাখ্যান—কথাপুরুষীয় এবং রূপকাবৃত। ভারতীয় প্রাকৃত-সভ্যতা, বৈদিক আর্য-প্রাকৃত সভ্যতার পরবর্তী। মনুর পূর্বে অবৈদিক সভ্যতার কালে, লিপি-বিদ্যা প্রচলিত ছিল। সেই লিপির আদর্শ বর্তমানে পশ্চিম রাঢ়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সৈন্ধবী-লিপি এবং আবিষ্কৃত রাঢ়ী-লিপি প্রায় একই প্রকার। রাঢ়ী-দ্রবিড়ী-সভ্যতাই ভারতের বৈদিক-আর্য-সভ্যতার পূর্ববর্তী। এই সভ্যতা অবলম্বনেই মনু কর্তৃক দ্রবিড় নগরে বৈদিক যজ্ঞ কর্ম্মকাণ্ডের প্রবর্তন।

এই প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইতেছে—ভারতের আর্য্য (১) উপাধিক যাজ্ঞিক অর্থাৎ বৈদিক সমাজের আদি-কাল এবং প্রতিষ্ঠাতার কাল ও নাম নির্ণয় করা। তথাকথিত কালের ভারতীয় সভ্যতার ঐতিহাসিকতার প্রমাণ দ্বারা বৈদিককালাবির্ভাব এবং তৎপূর্ব্ববর্তী কালের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান। দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে—ভারতেই বৈদিক-আবির্ভাব হইয়াছিল। অভারত হইতে ভারতে বৈদিক-আর্য্য সামাজিকেরা প্রথমে আসেন নাই। প্রত্নতাত্বিক নিদর্শন অবলম্বনে বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিকতার আবির্ভাব হয়। ভারতীয় পৌরাণিক কথাপুরুষীয় উপাখ্যান একেবারে ঐতিহাসিকতা বিহীনও নয়। বর্ত্তমানে একাধিক পৌরাণিক বর্ণিত বিষয় ঐতিহাসিক ব্যাপার বলিয়া সিদ্ধান্তও হইয়াছে। পরেও যে হইবে এ প্রকার আশাও করা যাইতেছে। বৈদিক ব্যাপার কিছু নূতন নয়, ভারতের অবৈদিক কালপ্রচলিত ব্যাপারের—নূতন পরিকল্পিত মত এবং প্রধান সভ্যতার অভিনব অংশ বিশেষ। অবৈদিক সভ্যতা হইতে বৈদিক সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল।

জ্যোতিষিক গণনায় কেহ কেহ দেখাইয়াছেন যে খ্রীঃ পূঃ ৩২৫৮ অব্দে 'কৃতযুগ' (২)। ইহার অব্যবহিত পরে—ভারতীয় ত্রেতাযুগের প্রবর্তন হয়। এই গণনা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে পৌরাণিক ঘটনার সহিত ঐতিহাসিক ঘটনার যোগসূত্রের সুন্দর সামঞ্জস্য হইয়া যায়। ভারতের প্রাচীনেরা কাল বিভাগ করিয়াছেন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং

(১) আর্য্য-বানান—আর্য রূপে লেখাও চলে।

(২) উক্ত গণনা যে নির্ভুল, ইহা আমাদের বিশ্বাস।

কলি—এই চারি প্রকারে। জ্যোতির্বিদগণ—এই কাল নির্ণয়ের উপায়ও নির্দেশ করিয়াছেন। 'ত্রেতা' নামক কালের প্রবর্তনের অব্যবহিত কাল—উপরিলিখিত কাল বলিয়া নিঃসন্দেহে ধরা যাইতে পারে। এই সময়ের কিছু পরে দ্রবিড় দেশের রাজা মনু কর্ত্তৃক—বৈদিক সমাজ গঠিত হয়।

পঞ্জিকায় যে যুগাদির উদয় অস্তের কালপরিমাণ দেখা যায়, ইহা কাল্পনিক। রাঢ়ের খট্টাংশ নগরে (বর্তমান খাটাং) প্রথমে বাংলা-পঞ্জিকা লিখিত হয় লেগকেরা জান' নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা ধর্মপূজক, চিকিৎসক এবং জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তাঁহারাই লাউসেনকে চক্রবর্ত্তী রাজা লিখিয়াছেন। ধর্মপাল রাজার পরে—ধর্ম্মপণ্ডিতেরা প্রথম বাংলা পঞ্জিকা লেখেন। গতাগমুতিকভাবে সেই পাঁজীর কালই চলিতেছে।

ভারতের বৈদিক এবং পৌরাণিক শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে বৈদিক-যজ্ঞ প্রবর্ত্তনকালটি যে ত্রেতায় হইয়াছিল ইহার উক্তি আছে, বিশেষ মতভেদও নাই। দেখা যাক্—এই সকল বিষয় সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেওয়া যায় কিনা।—

সভ্যতার ইতিহাসে (৩) পণ্ডিত শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সূচনা-খণ্ডে বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা বলিয়াছেন—"(১) মনু ভারতীয় আর্য্যগণের আদি পুরুষ। (২) তিনি আদি যজ্ঞকর্ত্তা। (৩) তিনিই আর্য্য সভ্যতার প্রবর্ত্তক। (৪) সেই আর্য্য সভ্যতা জগতে শ্রেষ্ঠ—তাহাই আদর্শ সভ্যতা। প্রথম তিনটি উক্তি সম্বন্ধে—বৈদিক প্রমাণ আছে। চতুর্থ উক্তি সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে—বৈদিক সভ্যতার পূর্বে এবং সমকালে ভারতের যে সভ্যতা বিদ্যমান ছিল উহার আদর্শ—সৈন্ধবী সভ্যতার ইতিহাসে (ইংরেজী)—প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের কৃতিত্বের ফলাফলে বর্ণিত হইয়াছে। আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্বিক নিদর্শনগুলির প্রত্যক্ষ প্রমাণে—ভারতের সুপ্রাচীন অবৈদিক কালোচিত ইতিহাসের একাধিক অধ্যায় রচিত হইতে পারে। বৈদিকপূর্ব এবং বৈদিক কালব্যাপী-কালের সভ্যতার একাধিক আদর্শ উন্মুক্ত হওয়ায় দেখা যাইতেছে যে, আর্য-সভ্যতার পূর্বে যে ভারতীয় সভ্যতা বিদ্যমান ছিল বৈদিক (যাজ্ঞিক) সভ্যতা সেই সভ্যতার কালেই প্রবর্তিত হইয়া ভগবান বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের অব্যবহিত পরেই ভ্রষ্ট হইয়া যায়। বৈদিক সভ্যতার আদ্যকাল ত্রেতায় হইলে উহার প্রকট কালটি খ্রীঃ পূঃ ৩২৫৮ অব্দের কিছু পরবর্তী কালেই আরম্ভ হয়, সুতরাং উহার পূর্ব্ববর্তী নয়। অতএব তথাকথিত কালের পরে আরম্ভ হইয়া খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫০১ অব্দের অব্যবহিত পরেই প্রায় সমাপ্ত হইয়াছিল। ভগবান বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণ কাল—খ্রীঃ পূঃ ৫০১ সালের ১৫ই এপ্রিল—মঙ্গলবার, সেইদিন বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি ছিল।

যিনি (মনু) ভারতের আদি যজ্ঞ প্রবর্তক তিনিই বৈদিক সমাজের আদি প্রবর্তন কর্ত্তা, অতএব তাঁহার সময়েই বৈদিক-সমাজ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বৈদিক সামাজিকগণই—আপনাদিগকে আর্য্য-উপাধিক বলিয়াছেন। অতএব মনুর পূর্বে বৈদিক (নিগমিক) বা আর্য্য সমাজ বিদ্যমান থাকা সম্ভব নয়।

বৈদিক গ্রন্থে যে সকল ঋক্-মন্ত্রাদি বিদ্যমান আছে উহা অপেক্ষা সুপ্রাচীন মন্ত্র বিশেষকে 'নিবিদ্' নামে কথিত হয়। শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল ভাষাতত্ত্বরত্ন মহাশয় প্রণীত—"বৈদিক ও পৌরাণিক আলোচনা" নামক পুস্তিকায় তিনি লিখিয়াছেন (১১শ পৃষ্ঠা)—"বেদের অধিকাংশ মন্ত্র বা স্তোত্র—সপ্তসিন্ধু প্রদেশে যখন নবাগত আর্য্যেরা প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত থাকিতেন তখন দৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এই সময়ের পূর্ব্বে দৃষ্ট কতকগুলি স্তোত্র পাওয়া যায় (৪)। সেগুলি অতি প্রাচীন এবং অনুমান হয় যে, আর্য্যদের সপ্তসিন্ধুপ্রদেশে আসিবার পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছিল; কারণ তাহাদের ভাষা অতি প্রাচীন ও দুর্ব্বোধ্য। তাহারা 'নিবিদ্' নামে প্রসিদ্ধ। অনেক ঋক্-মন্ত্রে এই সকল প্রাচীন নিবিদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ঋক্-রচনাকারী ঋষিরাও ইহাদিগকে প্রাচীন বলিয়া গিয়াছেন। ইহাদের ভাষা গদ্য ও পদ্যের মধ্যবর্ত্তী।" এ উক্তি মৃত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ও করিয়াছেন।

আমরা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (২।৩৪।১) হইতে একটি নিবিদ্ উদ্ধৃত করিলাম—

নিবিদ্ দধাতি

"অগ্নির্দেবেদ্ধঃ অগ্নির্মন্বিদ্ধঃ অগ্নিঃ সুষমিৎ
হোতা দেববৃতঃ হোতা মনুবৃতঃ প্রণীর্যজ্ঞানাম্
রথীরধ্বরাণাম্ অতূর্তো হোতা তূর্ণির্হব্যবাট্
আ দেবো দেবান্ বক্ষৎ যক্ষদগ্নির্দেবো
দেবান্ সো অধ্বরা করতি জাতবেদাঃ"

এই নিবিদ্‌টি উদ্ধৃত করিবার কারণ এই যে ইহাতে 'মনু' এই নামটি আছে বলিয়া এবং ইহা হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, মনু প্রথমে যজ্ঞ (কর্মকাণ্ড) প্রবর্তন করিয়াছিলেন। অগ্নিই যজ্ঞের কারণ এবং হোতাই যজ্ঞ করান। মনু এই হোতার প্রবর্তক। এই হেতু বলা যাইতে পারে যে মনু আদি যজ্ঞপ্রবর্তক এবং আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠাপক। সৈন্ধবী সভ্যতার সময়ে খ্রীঃ পূঃ ৩২৫৮ অব্দের পরে ত্রেতার আদ্যকালে (?)—মনু কর্তৃক যজ্ঞ প্রবর্তিত হয় এবং উক্তকালেই বৈদিক সমাজ মনুর যজ্ঞব্যাপারের দ্বারাই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। সভ্যতার লেখক যজ্ঞেশ্বরবাবু তাঁহার পুস্তকের আশি পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "এই মনুই যে বৈবস্বত মনু, শতপথ ব্রাহ্মণের অন্যান্য স্থানে তাহার উল্লেখ দেখা যায়। ইনিই ভারতের ও আর্য্যগণের প্রথম রাজা। প্রসিদ্ধ

(৩) জগতের সভ্যতার ইতিহাস (সূচনা), সন ১৩২০ সাল। ৭৯-৭৮ পৃষ্ঠা।

(৪) সান্যাল মহাশয়ের মতে—ভারতে আর্য্য আগমনের পূর্বে অর্থাৎ অভারতীয় জনপদে আর্য্যেরা যে সকল স্তোত্রাদি রচনা করিয়াছিলেন, সেইগুলিই নিবিদ (?)।

সূর্য্যবংশ ইঁহা হইতেই উদ্ভূত।" মনু সম্বন্ধে অনেক কথাই মৎস্তপুরাণে পাওয়া যায়।

শাস্ত্র অন্তরে দৃষ্ট হয়, এই মনুর পূর্ব্বেও ভারতে রাজা ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই বৈদিক-রাজা ছিলেন না। বৈদিক আর্য্য সামাজিকগণের মনুই প্রথম রাজা, কিন্তু তিনি ভারতের প্রথম রাজা ছিলেন না। মৎস্য-পুরাণে তাঁহার রাজা উপাধির উল্লেখ আছে। যথা:—

"পুরারাজা মনুর্নাম চীর্ণবান বিপুলন্তপঃ।
পুত্রে রাজ্যং সমারোপ্য ক্ষমাবান্ রবিনন্দনঃ॥
মলয়স্যৈক দেশে তু স সর্ব্বাত্মগুণ সংযুতঃ।
* * *
কদাচিদাশ্রমে তস্য কুর্ব্বতঃ পিতৃতর্পণম্।
পপাত পাণ্যোরুপরি সফরী জলসংযুতা॥"

এই মনু পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া মলয়দেশের কোন স্থানে আশ্রমে অবস্থান করিতেন এবং পিতৃতর্পণ করিতেন। তিনি ছিলেন মলয় পারিপার্শ্বিক দেশের রাজা। বৃদ্ধবয়সে তিনি প্রব্রজ্যা-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মলয়দেশে বাস করিতেন। অতএব তিনি দক্ষিণ-ভারতের রাজা বিশেষ ছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে মনু সম্বন্ধে উক্তি আছে। এখানি দক্ষিণ ভারতে রচিত কাব্য বিশেষ। উক্তির মধ্যে—

"একদা কৃতমালায়াং কুর্ব্বতো জলতর্পণম্।
তস্যাঞ্জল্যুদকে কাচ্ছিফর্য্যেকভ্যপদ্যত॥
সত্যব্রতোঽঞ্জলি গতাং সহ তোয়েন ভারত।
উৎসর্জ্জ নদীতোয়ে সফরীন্দ্র-বিড়েশ্বরঃ॥"

এই উদ্ধৃত শ্লোকে পাইতেছি কৃতমালা নদী, আর পাইতেছি মনু ছিলেন—দ্রবিড়েশ্বর। মহাভারতের বনপর্ব্বের—"চীরিণী তীরমাগম্য মৎস্যোবচনমব্রবীৎ" হইতে চীরিণী নদীর উল্লেখ আছে। উক্ত নদী দুইটিই মলয়দেশের। অগ্নিপুরাণে—

"মনুর্বৈবস্বত স্তেপে তপো বৈভুক্তিমুক্তয়ে।
একদা কৃতমালায়াং কুর্ব্বতো জলতর্পণম্॥"

এই মনুই বৈবস্বত মনু, তিনি কৃতমালা বা চীরিণী তীর সন্নিকটের আশ্রমে বাস করিতেন। শেষজীবনে তিনি তথাকথিত স্থানে বাস করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে তিনি ছিলেন, দ্রবিড় দেশের রাজা। অতএব দ্রবিড়জাতিদের রাজা ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে—দ্রবিড়-সিংহাসন দিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা কথাপুরুষীয় মহা জলপ্লাবনের পূর্ব্বের।

মনুর জলপ্লাবনের কোনই উল্লেখ ঋক্‌বেদে নাই। কিন্তু শতপথ, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-শাস্ত্রে এবং তৈত্তিরীয় সংহিতা, ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ও রামায়ণ, মহাভারত মৎস্য, বিষ্ণু প্রভৃতি পুরাণ-গ্রন্থেও কিছু কিছু পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে 'নিবিদ' স্তোত্রে—মনুর (৫) উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা প্রাচীন উল্লেখ আর পাওয়া যায় না। নিবিদ্-মন্ত্র ঋগ্বেদউক্ত মন্ত্র হইতেও সুপ্রাচীন। শতপথাদি এবং অপরাপর পৌরাণিক গ্রন্থাদি অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের আবির্ভাবপূর্ব্বে মনু—দ্রবিড় দেশেই বাস করিতেন। তাঁহার পুত্রকন্যাদিও হইয়াছিল, তাঁহারা দ্রবিড় রাজধানীতেই লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল ইল বা ঐল। ঐল নামে রাজাও একাধিক ছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ২০০ অব্দে কলিংগ দেশে ঐল নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি উৎকল দেশের খণ্ডগিরিতে গুহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। খোদিত লেখমালায় তাঁহার নাম আছে। এই হেতু বলা যাইতে পারে, দক্ষিণ ভারতে রাজপুত্রের নাম 'ঐল' রাখা হইত। দ্রবিড়-রাজ মনু-পুত্রেরও নামও 'ঐল' দেশপ্রথায় রাখা হইয়া থাকিবে। ঐলের কনিষ্ঠ সহোদরের নাম ছিল 'ইক্ষাকু'। মৎস্য পুরাণে এই নাম ধৃত আছে। তাঁহারা উভয়েই দ্রবিড়রাজ মনুর পুত্র ছিলেন। উক্ত পুরাণ মতে জলপ্লাবনের বিবরণে দেখা যায়, মনু একাকী জলপ্লাবনে রক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রান্তরে দৃষ্ট হয় (ভাগবত) 'সত্যব্রত' নামক রাজার রাজ্য কালে উক্ত মহাপ্লাবন হইয়াছিল। ভারতে একাধিকবার প্লাবনের কথা পাওয়া যায় না। বিশেষ কারণে মনুরই নামান্তর যে 'সত্যব্রত' ছিল ইহা বিজ্ঞাপিত হইতেছে। বিষ্ণুপুরাণে (৩-১ অধ্যায়) দেখা যায়—

"বিবস্বত সুতো বিপ্র শ্রাদ্ধদেবো মহাদ্যুতিঃ।
মনুঃ সংবর্ত্ততে ধীমান্ সাম্প্রতং সপ্তমেহন্তরে॥৩১॥"

অতএব মনুর নামান্তর—শ্রাদ্ধদেব। ভাগবতে মনুর বিশেষণে 'সত্যব্রতো'ও আছে। মনুর তথাকথিত নামগুলি বিশেষণোক্ত শব্দ বা উপাধি বিশেষ। যাহাই হউক মনু একাকী রক্ষা পাইয়াছিলেন এ উক্তি বৈদিক শাস্ত্রেই খণ্ডিত হইয়াছে। ধরিয়া লওয়া হইল—উক্ত প্লাবনে ভারতের জলচর ব্যতীত সকল প্রাণীই মৃত হইয়াছিল। উপাখ্যানে দেখা যায়—মনুর নৌকা উত্তর গিরিতে গিয়াছিল। কাশ্মীরি নীলমত-পুরাণে—নৌবন্ধন স্থান কাশ্মীর। যাহাই হউক—শতপথ ব্রাহ্মণে পাওয়া যায় (১।৪।১৪) যে তথায় মনুর বিরুদ্ধাচারী—

কিলাতাকুলী ইতি হাসুর ব্রহ্মা বাসতুঃ। তোহ উচতুঃ শ্রদ্ধাদেবো বৈ মনুঃ। আবং বেদা বেতি। তৌহ আগত্য উচতুমনো যাজয়াব ত্বেতি।"

শতপথের এই শ্রাদ্ধদেব নামটি বিষ্ণুপুরাণে ধৃত হইয়াছে। সম্ভব বিষ্ণুপুরাণ হইতে ভাগবতে গৃহীত হইয়াছে।

কাঠক ব্রাহ্মণে—ত্রিষ্ঠা এবং বরূত্রি নামক দুই ব্রাহ্মণ অসুরের নাম আছে। যথা—

"অথ তহি ত্রিষ্ঠাবরূত্রী আস্তামসুর ব্রাহ্মণৌ॥"২।৩০।১।

নামের পার্থক্য থাকা বিচিত্র নয়। হয়ত চারজন আসুর ব্রাহ্মণসহ মনুর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মহাপ্লাবনে যদি সকল লোকই মৃত হইয়াছিল, তাহা হইলে উক্ত আসুর ব্রাহ্মণেরা কোথা হইতে দেখা দিলেন? দেখা যাইতেছে আসুর ব্রাহ্মণ মতের সহিত মনুর মত বিরুদ্ধও ছিল। শতপথ

(৫) নিবিদ স্তোত্রে মনুর ও যজ্ঞের উল্লেখ আছে, কিন্তু মহাপ্লাবনের উল্লেখ নাই।

এবং কাঠক ব্রাহ্মণ গ্রন্থের উক্তি হইতে বুঝাইতেছে যে জলপ্লাবনে মনু একাকী রক্ষা পান নাই, অনেকেই রক্ষা পাইয়াছিল। অথবা আদৌ ভারতে প্লাবন হয় নাই। ভাগবতেও বিরুদ্ধ উক্তি আছে। (৬) সত্যব্রত (নামান্তর মনু) রাজার সময় যে প্লাবন হইয়াছিল উহাতে দ্রবিড়রাজ সত্যব্রত মনু সপরিবারে—সহরাজ-কায়স্থ ব্যক্তিগণ, মুনি-ঋষি এবং বিবিধ প্রাণী-মিথুন ও শস্যাদি বীজসহ (মনু) রক্ষা পাইয়াছিলেন। সুতরাং তর্পণকালে আমিক্ষা বা ছানা দিয়া তর্পণ করিয়াছিলেন।

পারসিক কারর্গাদদে রাজা যিম্ (বিবঙ্‌হত অর্থাৎ সংস্কৃতের বৈবস্বত পুত্র) উক্ত প্রকারে রক্ষা পাইয়াছিলেন। চালদিয়ায় আবিষ্কৃত 'ডিলিউজ-ট্যাবলেট' নামক যে মৃৎফলকে লিখিত পুরাবস্তুর আবিষ্কার হইয়াছে, উহাতেও—সত্যব্রত এবং যিম্ (যম?) রাজার অনুরূপ প্লাবনের উল্লেখ আছে। জলপ্লাবনের অবসানে চালদিয় (বাবিলনীয়) রাজা যিযুথ্‌স্—জীবহত্যা করিয়া অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিয়াছিলেন। সত্যব্রত মনুও—প্লাবন অবসানে পাকযজ্ঞ করিয়াছিলেন। সত্যব্রতের মত—পোতে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

জলপ্লাবনের পূর্বে দ্রবিড় দেশে—তর্পণ ও পাকযজ্ঞাদির প্রচলন ছিল। প্লাবনের পরে হয়গ্রীব নামক ভারতের অসুর রাজাবিশেষের মৃত্যুর পরে—মনু 'বেদ' প্রাপ্ত হন। পূর্বে অসুর রাজার নিকট বেদ ছিল। অসুর ব্রাহ্মণেরা যে বেদবিদ্ ছিলেন—ইহা শতপথেও আছে। আগমিক এবং নিগমিক্ ভেদে বেদ দুই প্রকার। ভারতের অসুরেরা আগমিক বৈদিক—এই বেদই সম্ভবতঃ রাজা হয়গ্রীবের নিকট ছিল। বৈদিক পুরাণাদিতে উক্ত হইয়াছে—অবৈদিক অসুর জ্যেষ্ঠ এবং বৈদিক সুর কনিষ্ঠ। অতএব অবৈদিক পূর্ববর্তী, বৈদিক সুর পরবর্তী। উভয়েরই মাতৃ-পিতৃকুল এক।

উপাস্য উপাসক মধ্যে, উপাসকেরা উপাস্য দেবতাদেরই অনুগ্রহ পাইয়া থাকেন। মনু—মৎস্য (মীন) দেবতার অনুগ্রহ পাইয়াছিলেন। দ্রবিড় দেশে—সাধারণত সমুদ্র উপকূলে বহুল পরিমাণে 'মীনাচী' দেবীর পূজার্চনা এবং পর্বাদি হইয়া থাকে। প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ভারতে 'মীনাচী' দেবীর বড় বড় মন্দির আছে এবং প্রতি মন্দিরে 'শিবলিঙ্গ' প্রতীকও আছে। সত্যব্রত মনু দ্রবিড় প্রথায় মীনাচী দেবতার উপাসক ছিলেন, সেই জন্যই মীনদেবতা তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া থাকিবেন। পরে মীন (মীনাচী) বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ভারতের বৈদিক আর্য্য জাতিতত্ত্বের মূল—দ্রবিড়রাজ মনু, ইনি দ্রবিড় দেশের (প্রাচীন) রাজা ছিলেন এবং দক্ষিণ ভারতের মলয় দেশে বৃদ্ধকালে বাস করিতেন, ইহা একাধিক বৈদিক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। বৈদিক আর্য্য সামাজিকগণের জাতিতত্ত্ব সম্পূর্ণ পৃথক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা স্বীকার করিতে হয়। মনুসংহিতায়—দ্রবিড়দিগকে ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে। এই উক্তি দ্রবিড়েশ্বর মনুর যজ্ঞ প্রবর্তনের বহু পরবর্তীকালের কল্পনা। বর্তমানে বৈদিক সামাজিকগণের উৎপত্তি বিষয়ক যে বিবরণ প্রচলিত আছে, ইহা পরবর্তী পরিকল্পনা। মূলতঃ সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপই ছিল।

দ্রবিড় সংস্রব পূর্ণ লোপ সাধন জন্য প্লাবনে মনুকে একাকী রক্ষা করিয়া বৈদিক আর্য্যকুল পঞ্জিকা রচিত হইয়াছে। জলপ্লাবনে মনু একাকী রক্ষা পাইলে—অলৌকিক ঐল রাজার স্ত্রীত্ব প্রাপ্তির কল্পপুরুষীয় উপাখ্যান রচিত হইল কি প্রকারে? ইক্ষাকু ঐলের পুরুষত্ব প্রাপ্তির জন্য শিবারাধনা করিলেন। প্লাবনে মৃত হইলে—এ উপাখ্যানের কোন মূল্যই থাকে না। (৭) ভাগবতের সত্যব্রত মনুর প্লাবন উপাখ্যানই সমর্থন করিতেছে যে মনুর দ্রবিড়ীয়বংশধারার বিলোপ হয় নাই। বৈদিক কুলপঞ্জী—বহু পরবর্তীকালে রচিত হইয়া—দ্রবিড়দিগকে ব্রাত্য করা হইয়াছে। কারণ তাহারা বৈদিক মত গ্রহণ করে নাই। যে কোন কারণেই হউক বা ধর্ম্মাচরণঘটিত রাষ্ট্রবিপ্লবেই হউক। সত্যব্রত রাজা মনু দ্রবিড় রাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে—ইড়ামুখে—কাশ্মীর সারস্বত দেশে ভ্রাতা যমের রাজ্যে (যিমরাজ্যে) সদল বলে পলায়ন করিয়া আত্ম ও নবধর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকিবেন। এই পলায়ন কাহিনী বৈদিক-গ্রন্থে বিক্ষিপ্ত রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। মূলে দ্রবিড়রাজ শ্রাদ্ধদেব মনু, দ্রবিড় রাজ্যেই নবীন যজ্ঞকাণ্ডমূলক বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রবর্তন করিয়া থাকিবেন। মনু কর্তৃক বৈদিক ব্যাপার প্রবর্তিত হয়। এ উক্তি 'নিবিদ' স্তোত্রেই পাওয়া যাইতেছে। এই নিবিদ্ ঋঙ্‌মন্ত্র এবং ঋগ্বেদ মন্ত্র হইতেও সুপ্রাচীন। নিবিদ-মন্ত্র আর্দ্ধ-প্রাকৃত-ভাষা বিশেষে রচিত। ইহা অপেক্ষা মনু যজ্ঞ প্রবর্তক বলিয়া কুত্রাপি প্রাচীন মন্ত্র দৃষ্ট হয় না। এই মনু দক্ষিণ ভারতে মলয় পারিপার্শ্বিক দ্রবিড় রাজ্যের রাজা ছিলেন এবং তাঁহার রাজ্যকাল সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৫৮ বর্ষের কিছু পরবর্তীকালের। ইহার অধিক, সময় নির্দেশ করা সম্ভব হয় না।

নিবিদ্ স্তোত্র—মনুর পরবর্তীকালের রচিত। এই স্তোত্রে মনুর নাম এবং তিনি যে বৈদিক যজ্ঞ প্রবর্তক ইহা উক্ত আছে। দ্রবিড় দেশই—বৈদিক ধর্ম্মপ্রবর্তনের আদি ক্ষেত্র। অতএব দক্ষিণ-ভারত বৈদিকাদ্য স্থান। বর্তমানে বৈদিকশাস্ত্রে দেখা যায়—বৈদিকেরা উত্তর ভারতে প্রাধান্য লাভের পর, মৈত্রীভাবে বিন্ধ্য দক্ষিণে গিয়াছিলেন। ঋষি অগস্ত্য ইহার প্রথম পথপ্রদর্শক। অগস্ত্যের আশ্রম—হিমালয় প্রদেশে এখন দেখান হয়। সেই আশ্রমে প্রাচীন অস্ত্র-শস্ত্রও কিছু রক্ষিত আছে। মনুর সময়েই মনু ধর্ম্মী বৈদিকগণ—দ্রবিড় ও দক্ষিণ ভারত পরিত্যাগ করিয়া, কাশ্মীর সারস্বত দেশে (পরবর্তী নাম) পলায়নপূর্ব্বক বাস করেন। দীর্ঘকাল হিমালয় প্রদেশ এবং উত্তর ও পশ্চিম ভারতে বাসের পর ঋষি অগস্ত্যের সময়ে বিন্ধ্য দক্ষিণে প্রবেশ করেন বৈদিকেরা। যথাকালে মলয় রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া ঘর-

---

(৬) মনু মহারাজ হিমালয়ে (?) যখন জলতর্পণ করিয়াছিলেন তখন আমিক্ষা (ছানা)—"আমিক্ষা সা শৃতোষ্ণে যা ক্ষীরে স্যাদ্দধি যোগতঃ।" এই আমিক্ষা প্লাবনান্তে তিনি কোথায় পেলেন?

(৭) মহাপ্লাবনে ঐল ও ইক্ষাকু কেহই মৃত হন নাই। মরিলে ঐলের নারী প্রাপ্তি এবং চন্দ্রবংশের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব হইত না।

জামাতা রূপে—দক্ষিণ মলয় রাজ্য পাইয়া বাস করেন। এই হইল দক্ষিণ ভারতে প্রথম বৈদিক রাজ্য প্রতিষ্ঠা।

যাঁহারা পরিকল্পিত মতাবলম্বনে বৈদিক আর্য্যদিগকে, অভারতীয় অজ্ঞাত জনপদ বিশেষ হইতে ভারতে আনয়ন করিবার পক্ষপাতী, তাঁহারা ঋগ্বেদ উক্ত মন্ত্রবিশেষ হইতে—পথ নিদর্শন দ্বারা ব্যক্ত করিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে দ্রবিড় হইতে আত্মরক্ষার্থে পলায়ন কালে যে পথে বিভিন্ন স্থানে গমনাগমন এবং অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই সকল পথেরই উল্লেখ করিয়াছেন। দ্রবিড় হইতে পলায়নের বহুকাল পরে—তাহারা সপ্তসিন্ধুদেশে সারস্বত জনপদে—যে বৈদিক ভাষার উন্নতি-বিধান করেন, সেই স্থানের নামই তাঁহারা 'সারস্বত'দেশ রাখিয়াছিলেন। কাশ্মীর রাজ্যের একাংশের প্রাচীন নাম—সারস্বত দেশ। সংস্কৃত-ভাষার আদি জন্মক্ষেত্র।

দ্রবিড়রাজ মনুর সময়ে—সৈন্ধবী সভ্যতা উন্নত ছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের মহেন্‌জোদাড় খননে সেই খ্রীঃপূঃ ৩৫০০ শত—সাড়ে তিন হাজার বৎসরের দ্রবিড়ী-সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং উত্তর-পশ্চিম সপ্তসিন্ধু জনপদের (পঞ্চনদ) হড়প্পা খননে সেই প্রাচীন সভ্যতার স্তরও উন্মুক্ত হইয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দ্বারা তথা কালের সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাণ ভয়ে পলায়িত আর্য বৈদিকগণ তাদৃশ সভ্যতার পরিচায়ক কীর্তি প্রথমে কিছুই রাখিতে পারেন নাই। উত্তরাপথে বৈদিক রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর তাঁহারা প্রাচীন অবৈদিক সভ্যতায় বিলীন হইয়াছিলেন, সেই জন্য হয়ত তাঁহাদের সভ্যতার পরিচায়ক কোন পুরাকীর্তি পাওয়া যায় না।

সৈন্ধবী পুরাকীর্তি মধ্যে বৈদিক-আর্য্য-সভ্যতার নিদর্শন নাই বলিলেই হয়। বোধ হয় প্রথমে বৈদিকগণ—দক্ষিণ-ভারতে ছিলেন না, আত্মরক্ষার্থ বিশাল অবৈদিক সভ্যতার কবল হইতে মুক্তির জন্যই ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা সপ্তসিন্ধুর সিন্ধুনদ তীরস্থ—'হড়প্পা' নগরের মধ্যেও প্রবেশ করেন নাই। তাঁহারা শক্তিমান অবৈদিক সমাজের বাহিরে অবস্থান করিয়া শক্তিসঞ্চয়ে নিযুক্ত ছিলেন। বর্তমান পঞ্জাব প্রদেশের 'হড়প্পা' নামক স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ আবিষ্কৃত পুরাবস্তুর মধ্যে বৈদিক সভ্যতার বিশেষ কোন চিহ্নই উন্মুক্ত হয় নাই। তথাকালে—বৈদিকগণ শিল্প-বাণিজ্য ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করিবার অবসরও পান নাই। তাহাদের নিজের ইমারতও ছিল না।

মহেন্‌জোদাড় খননে পূর্তকর্ম্মের যে উন্নতপ্রণালীবদ্ধ নগর-নির্মাণমূলক স্থাপত্যবিদ্যার পরিচয় প্রাপ্তি ঘটিয়াছে, তদ্রূপ বৈদিকগণের কোন কীর্তি এখন আবিষ্কৃত হয় নাই। এই জন্য বলা চলিতে পারে—তথাকালে বৈদিকগণের কোন নগরাদির পরিচয় তাঁহাদের লিখিত সাহিত্য-কাব্যাদিতেই লিখিত হইয়াছিল। আর্য্যকীর্তির পরিচয় প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া যায় না। এ সকলই সংস্কৃত ব্যাকরণসম্মত পরবর্তী রচনা।

মহাভারতে যে হস্তীনাপুরের সভাগৃহ নির্মাণের প্রসংগ আছে, উহাও আর্য্য-শিল্পকলার পরিচায়কও নহে। ময়দানব শিল্পের পরিচায়ক, অনার্য্য শিল্পের কথা। দেখা যাইতেছে রামায়ণে লঙ্কা ও কিষ্কিন্ধার যে বর্ণনা আছে, উহাও আর্য্য-শিল্প নয়। অযোধ্যার রাজধানীর প্রসংগ—আর্য্য প্রভাবিত বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আর্য্য-শিল্পের প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। এমন কি—বর্ণমালা পর্য্যন্ত তাঁহাদের নিজের ছিল না।

অবৈদিক সভ্যতার আদর্শ এই ভারতে যত আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার তুলনায় প্রাচীন-আর্য্য-কীর্তির পরিচয় কিছুই নয়। সৈন্ধবী সভ্যতার আবিষ্কৃত নগরে একটিও কি আর্য্য-পুরাকীর্তি থাকা সম্ভব হয় না? যদিও সৈন্ধবী-সভ্যতার অন্তকাল (সৈন্ধবী সভ্যতার ইতিহাসে—সার জন মর্শল কৃত) কুষাণ কাল পর্য্যন্ত ধরা হইয়াছে, কিন্তু মুদ্রায় গুপ্তকাল প্রচলিত লিপিও পাওয়া যায়, এমন কি একাধিক কণ্ড়ী অক্ষরও দেখা যায়। অভারতীয় জনপদ বিশেষে যথা—চালদিয়া, বাবিলোনিয়া, উর, ইজিপ্ত ইত্যাদি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে, খনন ব্যাপারে এবং পুরাতাত্ত্বিকগণের অনুসন্ধানে যে সকল পুরাবস্তুর নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে—সে সকলের মধ্যে আর্য্য-নিদর্শন একান্ত দুর্লভই হইয়া রহিয়াছে। একস্থানে মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—ভারতের সৈন্ধবী সভ্যতার কালে তথাকাল ব্যবহৃত যে সকল মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাতে উৎকীর্ণ লিপিগুলিও—অবৈদিক কাল হইতেই প্রচলিত ছিল। বৈদিকেরা আবশ্যক হইলে—সেই অবৈদিক লিপিই ব্যবহার করিতেন। এই লিপি—ইজিপ্ত ও প্রাচীন য়ুরোপের নানা স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বৈদিক সভ্যতায়—"আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাম্ বোধাদপি গরীয়সী" নীতিই সমাদৃত হইত। লিখিত ভাষার উচ্চারণ এবং আবৃত্তি-সম উচ্চারণ নহে। যে কারণেই হউক বৈদিকেরা আবৃত্তির পক্ষপাতীই ছিলেন। কেহ কেহ বলেন—(বৈদিক) হিন্দুরা অন্ধভাবে প্রাচীন নিয়মের অনুসরণ করে না।

ছান্দোগ উপনিষদে 'অক্ষর' শব্দটী পাওয়া যায় এবং ঈ, উ এবং এ বর্ণকে ঈকার, উকার ও একার শব্দের দ্বারা সূচিত করা হইয়াছে।" (৮) দেখা যায় পূর্ববৈদিক কালের সৈন্ধবী মুদ্রায় উক্ত স্বরযোগের চিহ্ন ব্যবহার হইত। উক্ত স্বরবর্ণের বিবরণ—ছান্দোগ উপনিষদের নিজস্ব উক্তি নয়। অবৈদিক প্রণালীরই উক্তি মাত্র। তৈত্তিরী উপনিষদে—বর্ণ এবং মাত্রার উল্লেখ আছে। "ঐতরেয় আরণ্যকে উষ্ম, স্পর্শ, স্বর এবং অন্তস্থের, ব্যঞ্জন ও ঘোষের, ণকার ও যকার হইতে নকার এবং লকারের ভেদের ও সন্ধির বিচার পাওয়া যায়।" "ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—ওঁ অক্ষর, অকার, উকার ও মকার দ্বারা নিৰ্ম্মিত বলা হইয়াছে।" 'শতপথ ব্রাহ্মণে—একবচন, বহুবচন ও তিন লিঙ্গের ভেদের কথা আছে।' যাহাই হউক অবৈদিক কালের সৈন্ধবী মুদ্রায়—তথাকথিত লিপির ব্যবহার হইত। লিপির স্রষ্টা বৈদিকেরা নহেন। তাঁহারা অবৈদিক লিপি অবলম্বনেই বলিয়াছেন। সম্প্রতি আমরা সৈন্ধবী-

(৮) ভারতবর্ষে লিপিবিদ্যার বিকাশ—নলিনীমোহন কৃত, ১৯ পৃঃ।

লিপির আবিষ্কার সমর্থ হইয়াছি, পশ্চিম রাঢ়ে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় পাওয়া যায়—প্রথমে বাণী অস্পষ্ট এবং অনিয়মিত ছিল। সৈন্ধবী মুদ্রার পাঠোদ্ধার ব্যাপারে ইহারও পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সেই কালে বৈদিকেরা ইন্দ্রকে ব্যাকরণ করিয়া দিতে বলেন। ইন্দ্র যে ব্যাকরণ করিয়া দেন—উহাই ঐন্দ্র ব্যাকরণ এবং উহাই বৈদিকাদ্য ব্যাকরণ।

বৈশম্পায়নের দুই ভাগিনেয় শিষ্য তিত্তির এবং যাজ্ঞবল্ক্য—বৈশম্পায়ন জন্মেজয়ের নাগ-যজ্ঞে (৯) উপস্থিত ছিলেন। নাগ-যজ্ঞ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরের ঘটনা। খ্রীষ্টপূর্ব্ব দুই হাজার বৎসরের ব্যাপার। শুক্ল এবং কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ বিভাগ সেই সময়ের। অনুমান তথাকালে ঐন্দ্র-ব্যাকরণ রচিত হয়। সুতরাং উহার পূর্ব্বে বৈদিকগণের ভাষা—অস্পষ্ট এবং অনিয়মিতই ছিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—আর্য-প্রাকৃত-ভাষা বৈদিকগণ ব্যবহার করিতেন। সেই ভাষাই যথাকালে মার্জ্জিত হইয়া সংস্কৃতে পরিবর্তিত হইয়াছে।

এখন বলা যাইতে পারে, তৈত্তিরীয় সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদের রচনাকালে ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল। সেকাল খ্রীঃপূঃ দুই হাজার বৎসর মধ্যের। পাণিনি 'উপনিষদ' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু উহা শাস্ত্রবিশেষ বলিয়া পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন না। পাণিনির পূর্বে সতেরখানি ব্যাকরণের নাম পাওয়া যায়। যাস্কের নিরুক্ত ইহাদের পরবর্তী, তৎপরে 'কলাপ'—বর্তমানে ইহাতে বৈদিক অধ্যায় নাই, তৎপরে পাণিনি। পাণিনি খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকের লোক ছিলেন; কেননা তিনি ভগবান বুদ্ধদেবের পূর্বের লোক। বুদ্ধের আবির্ভাব কাল—খ্রীঃপূঃ ৫৪৬ মার্চমাসের বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। খ্রীষ্ট পূর্ব দুই হাজার বর্ষ পূর্বে বৈদিকদের 'ব্যাকরণ' ছিল না। তাঁহারা প্রথমে আর্য প্রাকৃতে, তৎপরে উহারই উন্নত ধরণের বৈদিক-ভাষায় (ব্যাকরণসম্মত নয়) ব্যবহার যাজ্ঞীয় ব্যাপারে করিতেন। কলাপ (১০) (অন্ধ্র রাজাদের সময়ের?) তখন চলিত, পরে পাণিনি প্রচারিত হইলে বিশুদ্ধ সংস্কৃতের প্রচলন বৈদিক সমাজে চলিতে আরম্ভ করে। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরে বৈদিকগণের কর্ম্মকাণ্ড হীনপ্রভ হইয়া যায়। বৈদিকগণের মধ্যে দুইটি দল দেখা দেয়। পাণিনি-সংস্কৃত ভাষার প্রবর্তনের সংগে সংগে—বৈদিক সভ্যতা, বৌদ্ধ-জৈন প্রভাবে স্তিমিত হইয়া গেল।

একদল যাজ্ঞিক এবং দ্বিতীয় দল ব্রহ্মজ্ঞানী। এই দ্বিতীয় দলের লোকেরা প্রকাশ্যভাবে বৈদিক কর্মকাণ্ডের নিন্দা করিতে আরম্ভ করেন। মুণ্ডকোপনিষৎ প্রথম মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ডে আছে,

"প্লবাহেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি ॥৭॥"

এই দলবিভাগে বৈদিক কর্মকাণ্ডপরায়ণদের শক্তির হ্রাসও হইয়াছিল। তৎপরে বৈদিক কর্মকাণ্ড বিরোধী চারুবাক্ (চার্ব্বাক?) দলের প্রকট হয়। সুতরাং বৈদিক-আর্য্য সমাজ তিন দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। যজ্ঞের (কর্ম্মকাণ্ডের) নিন্দা যে বৌদ্ধেরাই করিত তাহা বলা চলে না। ক্রমে বৌদ্ধপ্রভাবকালে—বৈদিক সমাজ একেবারে নিস্তেজ হইয়া যায়। অতএব বৈদিক প্রভাবকালের পরিমাণ অক্লেশে নির্দ্ধারিত হইতে পারে।

দ্রবিড়রাজ মনুর সময় হইতে আরম্ভ করিয়া দীর্ঘকাল চলিয়া যায় আত্মরক্ষায়; ক্রমে দলপুষ্টি এবং ব্রাত্যস্তোম দ্বারা অবৈদিক বিবিধ জাতি-দিগকে বৈদিকধর্ম্মে দীক্ষা দিয়া দলপুষ্টি করিতে অনেক সময় চলিয়া যায়। উত্তর ভারতে বৈদিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলেও কীকটাদি (গয়া, মগধ, রাঢ) পূর্বভারতে তাঁহারা বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারে সমর্থ হন নাই। এদেশবাসীরা বৈদিক ধর্ম্ম গ্রাহ্যই করিত না। পূর্বপুরুষীয় ধর্মাচরণই করিত। যে ধর্ম মনুর পিতৃকুলে অংগদেশে প্রচলিত ছিল।

ভাগবতাদি পুরাণে দেখা যায়, মহারাঢ়ের অন্তর্গত অংগ জনপদের রাজবংশে মনু (প্রকৃত নাম অজ্ঞাত) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যম-যমী তাঁহারই ভ্রাতা-ভগিনী। পরিণত বয়সে মনু দ্রবিড় সিংহাসন প্রাপ্ত হন। যম ইলাবৃতে বা ইড়ামুখের রাজা হন। দ্রবিড়রাজ মনু যখন দ্রবিড় ত্যাগ করেন, তখন তিনি সপরিবারে অংগদেশে প্রবেশ না করিয়া ভ্রাতা যমের রাজ্যে গমন করেন। ইহাতে ধারণা হয়, তাঁহার নবীন যজ্ঞীয় মত অংগদেশে চলিবে না এবং দ্রবিড়দের মত ইহারাও শত্রুতাচরণ করিবে। তিনি যমের রাজ্যে ইলাবৃত বর্ষের 'ইড়ামুখে' সদলবলে বাস করেন। তিনি এই জন্যই হয়ত 'ইড়া-পতি' ইড়া-রাজ) রূপে কথিত হইয়া থাকিবেন। ইড়া-সহধর্মিণী স্ত্রী নহেন—রাজ্যভূমি।

উপসংহারে বক্তব্য এই, ভারতবর্ষেই বৈদিক-সভ্যতা প্রকটলাভ করে, দ্রবিড়রাজ মনুই বৈদিক সমাজের আদি প্রবর্তক। যাজ্ঞিকেরাই পরে আপনাদিগকে আর্য্য-উপাধিতে ভূষিত করেন। বৈদিক সভ্যতার পূর্বে ভারতে একজাতি-একধর্মমূলক যে উন্নত সভ্যতা ছিল, উহা হইতেই মনুর সময়ে ধর্ম্ম ও জাতি বিভাগ হয়। অবৈদিক ভারতীয় সভ্যতাই বৈদিক সভ্যতার মূল। তখন সমগ্র ভারতে একই প্রকার প্রাকৃত-ভাষা বিদ্যমান ছিল। সেই ভাষাকেই কিছু পরিবর্তন করিয়া বৈদিকদের মধ্যে আর্য প্রাকৃত ভাষার উদয় হয়। অবৈদিক কালের শিল্প এবং লিপি বৈদিকগণের আদি। মনুর জলপ্লাবন একটি কথা-পুরুষীয় উপাখ্যান। মনুর সময়েই প্রণব ধর্মমূলে একতা প্রণষ্ট হয়। বৈদিক এবং অবৈদিক সামাজিক ধর্মকলহের সৃষ্টি হয়। কালে বৈদিক সমাজ ত্রিধা বিভক্ত হয়। সেই সময়ে বৈদিকগণের পৃথক 'কুলপঞ্জী' রচিত হয়। কালক্রমে বৌদ্ধ প্রভাবে জৈন প্রভাবেও) বৈদিক সমাজ অবসন্ন হইয়া পড়ে। অবসন্নতার চরম কাল খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক হইতে খ্রীষ্টীয় ৩য় শতক (অশোক হইতে কুষাণকাল)। তৎপরে তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দ

(৯) মহাভারতের স্থান বিশেষে নাগযজ্ঞ কালের যে সময় পাওয়া যায়, উহা খ্রীঃপূঃ এক হাজার বৎসর বলিয়া বিবেচিত হয়। এ মতটি সত্য বলিয়া বিবেচিত হয় না।

(১০) কোন কোন মতে কলাপ অন্ধ্র রাজাদের সময়ের।

হইতে গুপ্ত প্রভাবকালে, বৈদিক সমাজ কিছু প্রবল হইলেও যে বৈদিক সমাজ পূর্বে ছিল আর সে প্রকার হয় নাই। তৎপরে মুসলমান অধিকার কালে একাধিক ধর্মমতের আবির্ভাব হয়। ইংরেজ শাসনে অভিনব মিশ্র-ধর্মের প্রকট হইয়াছে। বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্ম্ম বলিতে বিশেষ কিছুই নাই।

সম্প্রতি পশ্চিম রাঢ়ে সৈন্ধবী মুদ্রালিপিতুল্য লিপির আবিষ্কারে আমরা সমর্থ হইয়াছি; বর্তমানকালেও সেই লিপির ব্যবহার পশ্চিম রাঢ়ে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে চলিতেছে ষোড়শমাতৃকার প্রতীক চিত্ররূপে। এই জন্য বিবেচিত হয়, রাঢ়, মগধ, অংগ ও বংগে উক্ত লিপি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত ছিল। সৈন্ধবী মুদ্রা এক স্থানের নয়, ভারতের বিভিন্ন জনপদে প্রচলিত ছিল। রাঢ় বা অংগদেশ ইহার আদি উৎপত্তি স্থান। অবৈদিক সভ্যতার সর্বাদি কেন্দ্র অংগ দেশ। এই স্থানেই প্রথম পল্লী নগর সৃষ্ট হয়, কৃষিকার্য্যের প্রচলন প্রথমে অংগদেশেই পৃথুরাজার সময় হয়। ঋগ্বেদিক সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতা এবং অবৈদিক আদ্য সভ্যতা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ভারতের অবৈদিক এবং বৈদিক-গণের অনেকেই ভারত বহির্ভাগে অভিযান করিয়া বাস করে তাহাদেরই অনেকে দীর্ঘকাল পরে ভারতে প্রত্যাগমন করিয়াছিল।

ব্যোমকেশ ও বরদা

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বেশী দিনের কথা নয়, ভূতান্বেষী বরদাবাবুর সহিত সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের একবার সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল। ব্যোমকেশের মনটা স্বভাবতঃ বহির্বিমুখ, ঘরের কোণে মাকড়সার মত জাল পাতিয়া বসিয়া থাকিতেই সে ভালবাসে। কিন্তু সেবার সে পাক্কা তিনশ মাইলের পাড়ি জমাইয়া সকলকে চমকিত করিয়া দিয়াছিল।

ব্যোমকেশের এক বাল্যবন্ধু বেহার প্রদেশে ডি-এস্-পি'র কাজ করিতেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি মুঙ্গেরে বদলি হইয়াছিলেন এবং সেখান হইতে ব্যোমকেশকে নিয়মিত পত্রাঘাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাদর নিমন্ত্রণের অন্তরালে বোধ হয় কোনো গরজ প্রচ্ছন্ন ছিল; নচেৎ পুলিসের ডি-এস্-পি বিনা প্রয়োজনে পুরাতন অর্দ্ধবিস্মৃত বন্ধুত্ব ঝালাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিবেন ইহা কল্পনা করিতেও মনটা নারাজ হইয়া উঠে।

ভাদ্র মাসের শেষাশেষি; আকাশের মেঘগুলো অপব্যয়ের প্রাচুর্য্যে ফ্যাকাশে হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় একদিন ব্যোমকেশ পুলিস-বন্ধুর পত্র পাইয়া এক রকম মরিয়া হইয়াই বলিয়া উঠিল—'চল, মুঙ্গের ঘুরে আসা যাক।'

আমি পা বাড়াইয়াই ছিলাম। পূজার প্রাক্কালে শরতের বাতাসে অমন একটা কিছু আছে যাহা ঘরবাসী বাঙালীকে পশ্চিমের দিকে ও প্রবাসী বাঙালীকে ঘরের দিকে নিরন্তর ঠেলিতে থাকে। সানন্দে বলিলাম—'চল।'

যথাসময় মুঙ্গের ষ্টেশনে উতরিয়া দেখিলাম ডি-এস্-পি সাহেব উপস্থিত আছেন। ভদ্রলোকের নাম শশাঙ্কবাবু; আমাদেরই সমবয়স্ক হইবেন, ত্রিশের কোঠা এখনো পার হন নাই; তবু ইহারি মধ্যে মুখে ও চালচলনে একটা বয়স্থ ভারিক্কি ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। মনে হয়, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে অধিক দায়িত্ব ঘাড়ে পড়িয়া তাঁহাকে প্রবীণ করিয়া তুলিয়াছে। তিনি আমাদের সঙ্গে লইয়া কেল্লার মধ্যে তাঁহার সরকারি কোয়ার্টারে আনিয়া তুলিলেন।

মুঙ্গের সহরে 'কেল্লা' নামে যে স্থানটা পরিচিত তাহার কেল্লাত্ব এখন আর কিছু নাই; তবে এককালে উহা মীরকাশিমের দুর্দ্ধর্ষ দুর্গ ছিল বটে। প্রায় সিকি মাইল পরিমিত বৃত্তাকৃতি স্থান প্রাকার ও গড়খাই দিয়া ঘেরা—পশ্চিম দিকে গঙ্গা। বাহিরে যাইবার তিনটি মাত্র তোরণ দ্বার আছে। বর্ত্তমানে এই কেল্লার মধ্যে আদালত ও সরকারী উচ্চ কর্ম্মচারিদের বাসস্থান, জেলখানা, বিস্তীর্ণ খেলার মাঠ ছাড়া সাধারণ ভদ্রলোকের বাসগৃহও দু'চারিটি আছে। সহর বাজার ও প্রকৃত লোকালয় ইহার বাহিরে; কেল্লাটা যেন রাজপুরুষ ও সম্ভ্রান্ত লোকের জন্য একটু স্বতন্ত্র অভিজাত-পল্লী।

শশাঙ্কবাবুর বাসায় পৌঁছিয়া চা ও প্রাতরাশের সহযোগে তাঁহার সহিত আলাপ হইল। আমাদের আদর অভ্যর্থনা খুবই করিলেন; কিন্তু দেখিলাম লোকটি ভারি চতুর, কথাবার্ত্তায় অতিশয় পটু; নানা অবান্তর আলোচনার

ভিতর দিয়া পুরাতন বন্ধুত্বের স্মৃতির উল্লেখ করিতে করিতে মুঙ্গেরে কি কি দর্শনীয় জিনিষ আছে তাহার ফিরিস্তি দিতে দিতে কখন যে অজ্ঞাতসারে তাঁহার মূল বক্তব্যে পৌঁছিয়াছেন তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য না করিলে ঠাহর করা যায় না। অত্যন্ত কাজের লোক তাহাতে সন্দেহ নাই, বাক্যের মুন্সিয়ানার দ্বারা কাজের কথাটি এমনভাবে উত্থাপন করিতে পারেন যে কাহারো ক্ষোভ বা অসন্তোষের কারণ থাকে না।

বস্তুত আমরা তাঁহার বাসায় পৌঁছিবার আধঘণ্টার মধ্যেই তিনি যে কাজের কথাটি পাড়িয়া ফেলিয়াছেন তাহা আমি প্রথমটা ধরিতেই পারি নাই; কিন্তু ব্যোমকেশের চোখে কৌতুকের একটু আভাস দেখিয়া সচেতন হইয়া উঠিলাম। শশাঙ্কবাবু তখন বলিতেছিলেন—শুধু ঐতিহাসিক ভগ্নস্তূপ বা গরম জলের প্রস্রবণ দেখিয়েই তোমাদের নিরাশ করব না, অতীন্দ্রিয় ব্যাপার যদি দেখতে চাও তাও দেখাতে পারি। সম্প্রতি সহরে একটি রহস্যময় ভূতের আবির্ভাব হয়েছে—তাঁকে নিয়ে কিছু বিব্রত আছি।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল—'ভূতের পেছনে বিব্রত থাকাও কি তোমাদের একটা কর্ত্তব্য নাকি?'

শশাঙ্কবাবু হাসিয়া বলিলেন—'আরে না না। কিন্তু ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে—। হয়েছে কি, মাস ছয়েক আগে এই কেল্লার মধ্যেই একটি ভদ্রলোকের ভারি রহস্যময়-ভাবে মৃত্যু হয়। এখনো সে-মৃত্যুর কিনারা হয়নি, কিন্তু এরি মধ্যে তাঁর প্রেতাত্মা তাঁর পুরোণো বাড়ীতে হানা দিতে আরম্ভ করেছে।'

ব্যোমকেশ শূন্য চায়ের পেয়ালা নামাইয়া রাখিল; দেখিলাম তাহার চোখের ভিতর গভীর কৌতুক ক্রীড়া করিতেছে। সে সযত্নে রুমাল দিয়া মুখ মুছিল, তারপর একটি সিগারেট ধরাইয়া ধীরে ধীরে বলিল—'শশাঙ্ক, তোমার কথা বলবার ভঙ্গীটি আগেকার মতই চমৎকার আছে দেখছি, বরং সদা-ব্যবহারে আরো পরিমার্জ্জিত হয়েছে। এখনো এক ঘণ্টা হয়নি মুঙ্গেরে পা দিয়েছি, কিন্তু এরি মধ্যে তোমার কথা শুনে স্থানীয় ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি।—ঘটনাটা কি, খুলে বল।'

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। শশাঙ্কবাবু ব্যোমকেশের ইঙ্গিতটা বুঝিলেন এবং বোধ করি মনে মনে একটু অপ্রতিভ হইলেন। কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া কিছুই ধরা গেল না। সহজভাবে বলিলেন—'আর এক পেয়ালা চা?—নেবে না? পান নাও। নিন্ অজিতবাবু, জর্দ্দার অভ্যাস নেই বুঝি? আচ্ছা—ঘটনাটা বলি তাহলে; যদিও এমন কিছু রোমাঞ্চকর কাহিনী নয়। ছ'মাস আগেকার ঘটনা—'

শশাঙ্কবাবু জর্দ্দা ও পান মুখে দিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—

'এই কেল্লার মধ্যেই দক্ষিণ ফটকের দিকে একটি বাড়ী আছে। বাড়ীটি ছোট হলেও দোতলা, চারিদিকে একটু ফাঁকা যায়গা আছে। কেল্লার মধ্যে সব বাড়ীই বেশ ফাঁকা—সহরের মত ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি নেই; প্রত্যেক বাড়ীরই কম্পাউণ্ড আছে। এই বাড়ীটির মালিক স্থানীয় একজন 'রইস্'—তিনি বাড়ীটি ভাড়া দিয়ে থাকেন।

'গত পনেরো বছর ধরে এই বাড়ীতে যিনি বাস করছিলেন তাঁর নাম—বৈকুণ্ঠ দাস। লোকটির বয়স হয়েছিল—জাতিতে স্বর্ণকার। বাজারে একটি সোনা রূপার দোকান ছিল; কিন্তু দোকানটা নামমাত্র। তাঁর আসল কারবার ছিল জহরতের। হিসাবের খাতাপত্র থেকে দেখা যায়, মৃত্যুকালে তাঁর কাছে একান্নখানা হীরা মুক্তা চুণী পান্না ছিল—যার দাম প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা।

'এই সব দামী মণি-মুক্তা তিনি বাড়ীতেই রাখতেন—দোকানে রাখতেন না। অথচ আশ্চর্য্য এই যে তাঁর বাড়ীতে একটা লোহার সিন্দুক পর্য্যন্ত ছিল না। কোথায় তিনি তাঁর মূল্যবান মণি-মুক্তা রাখতেন কেউ জানে না। খরিদ্দার হলে তাকে তিনি বাড়ীতে নিয়ে আসতেন, তারপর খরিদ্দারকে বাইরের ঘরে বসিয়ে নিজে ওপরে গিয়ে শোবার ঘর থেকে প্রয়োজন মত জিনিষ এনে দেখাতেন।

'হীরা জহরতের বহর দেখেই বুঝতে পারছ লোকটি বড় মানুষ। কিন্তু তাঁর চাল-চলন দেখে কেউ তা সন্দেহ করতে পারত না। নিতান্ত নিরীহ গোছের আধা বয়সী লোক, দেব-দ্বিজে অসাধারণ ভক্তি, গলায় তুলসী-বীজের কণ্ঠি—সর্ব্বদাই জোড়-হস্ত হয়ে থাকতেন। কিন্তু কোনো সৎকার্য্যের জন্য চাঁদা চাইতে গেলে এত বেশী বিমর্ষ এবং কাতর হয়ে পড়তেন যে সহরের ছেলেরা তাঁর কাছে চাঁদা আদায়ের চেষ্টা ছেড়েই দিয়েছিল। তাঁর নামটাও এই সূত্রে একটু বিকৃত হয়ে পরিহাসচ্ছলে 'ব্যয়-কুণ্ঠ' আকার

ধারণ করেছিল। সহর-সুদ্ধ বাঙালী তাঁকে ব্যয়-কুণ্ঠ জহুরী বলেই উল্লেখ করত।

বাস্তবিক লোকটি অসাধারণ কৃপণ ছিলেন। মাসে সত্তর টাকা তাঁর খরচ ছিল, তার মধ্যে চল্লিশ টাকা বাড়ী ভাড়া। বাকি ত্রিশ টাকায় নিজের, একটি মেয়ের, আর এক হাবাকালা চাকরের গ্রাসাচ্ছাদন চালিয়ে নিতেন; আমি তার দৈনন্দিন খরচের খাতা দেখেছি, কখনও সত্তরের কোটা পেরোয় নি। আশ্চর্য্য নয়?—আমি ভাবি, লোকটি যখন এতবড় কৃপণই ছিল তখন এত বেশী ভাড়া দিয়ে কেল্লার মধ্যে থাকবার কারণ কি? কেল্লার বাইরে থাকলে ত ঢের কম ভাড়ায় থাকতে পারত।

ব্যোমকেশ ডেক-চেয়ারে লম্বা হইয়া অদূরের পাষাণ-নির্ম্মিত দুর্গ-তোরণের পানে তাকাইয়া শুনিতেছিল; বলিল—'কেল্লার ভিতরটা বাইরের চাইতে নিশ্চয় বেশী নিরাপদ, চোর-বদ্‌মায়েসের আনাগোনা কম। সুতরাং যার কাছে আড়াই লক্ষ টাকার জহরৎ আছে সে ত নিরাপদ স্থান দেখেই বাড়ী নেবে। বৈকুণ্ঠবাবু ব্যয়-কুণ্ঠ ছিলেন বটে, কিন্তু অসাবধানী লোক বোধ হয় ছিলেন না।'

শশাঙ্কবাবু বলিলেন—'আমিও তাই আন্দাজ করে-ছিলুম। কিন্তু কেল্লার মধ্যে থেকেও বৈকুণ্ঠবাবু যে চোরের শ্যেনদৃষ্টি এড়াতে পারেন নি সেই গল্পই বলছি। সম্ভবত তাঁর বাড়ীতে চুরি করবার সঙ্কল্প অনেকদিন থেকেই চলছিল।—মুঙ্গের যায়গাটি ছোট বটে, কিন্তু তাই বলে তাকে তুচ্ছ মনে কোরো না—'

ব্যোমকেশ বলিল—'না না, সে কি কথা!'

'এখানে এমন দু' চারিটি মহাপুরুষ আছেন যাঁদের সমকক্ষ চৌকশ চোর দাগাবাজ খুনে তোমাদের কলকাতাতেও পাবে না। বলব কি তোমাকে, গভর্ণমেণ্টকে পর্য্যন্ত ভাবিয়ে তুলেছে হে! এখানে মীরকাশিমের আমলের অনেক দিশী বন্দুকের কারখানা আছে জান ত?—কিন্তু সে-সব কথা পরে হবে, আগে বৈকুণ্ঠ জহুরীর গল্পটাই বলি।'

এইভাবে সামান্য অবান্তর কথার ভিতর দিয়া শশাঙ্ক-বাবু পুলিসের তথা নিজের বিবিধ গুরুতর দায়িত্বের একটা গূঢ় ইঙ্গিত দিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—

'গত ছাব্বিশে এপ্রিল—অর্থাৎ বাংলার ১২ই বৈশাখ—বৈকুণ্ঠবাবু রাত্রি আটটার সময় তাঁর দোকান থেকে বাড়ী ফিরে এলেন। নিতান্তই সহজ মানুষ, মনে আসন্ন দুর্ঘটনার পূর্ব্বাভাস পর্য্যন্ত নেই। আহারাদি করে রাত্রি আন্দাজ ন'টার সময় তিনি দোতালার ঘরে শুতে গেলেন। তাঁর মেয়ে নীচের তলায় ঠাকুর ঘরে শুতো, সেও বাপকে খাইয়ে-দাইয়ে ঠাকুর ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ করে দিল। হাবাকালা চাকরটা রাত্রে দোকান পাহারা দিত, মালিক বাড়ী ফেরবার পরই সে চলে গেল। তারপর বাড়ীতে কি ঘটেছে, কেউ কিছু জানে না।

সকালবেলা যখন দেখা গেল যে বৈকুণ্ঠবাবু ঘরের দোর খুলছেন না, তখন দোর ভেঙে ফেলা হল। পুলিস ঘরে ঢুকে দেখলে বৈকুণ্ঠবাবুর মৃতদেহ দেখালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। কোথাও তাঁর গায়ে আঘাত চিহ্ন নেই, আততায়ী গলা টিপে তাঁকে মেরেছে; তারপর তাঁর সমস্ত জহরৎ নিয়ে খোলা জানালা দিয়ে প্রস্থান করেছে।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল—'আততায়ী তাহলে জানলা দিয়েই ঘরে ঢুকেছিল?'

শশাঙ্কবাবু বলিলেন—'তাই ত মনে হয়। ঘরের একটি মাত্র দরজা বন্ধ ছিল, সুতরাং জানলা ছাড়া ঢোকবার আর পথ কোথায়! আমার বিশ্বাস, বৈকুণ্ঠবাবু রাত্রে জানলা খুলে শুয়েছিলেন; গ্রীষ্মকাল—সে-রাত্রিটা গরমও ছিল খুব। জানলার গরাদ নেই, কাজেই মই লাগিয়ে চোরেরা সহজেই ঘরে ঢুকতে পেরেছিল।'

'বৈকুণ্ঠবাবুর হীরা জহরৎ সবই চুরি গিয়েছিল?'

'সমস্ত। আড়াই লক্ষ টাকার জহরৎ একেবারে লোপাট। একটিও পাওয়া যায় নি। এমন কি তাঁর কাঠের হাত-বাক্সে যে টাকা-পয়সা ছিল তাও চোরেরা ফেলে যায় নি—সমস্ত নিয়ে গিয়েছিল।'

'কাঠের হাত-বাক্সে বৈকুণ্ঠবাবু হীরা জহরৎ রাখতেন?'

'তা ছাড়া রাখবার যায়গা কৈ? অবশ্য হাত বাক্সেই যে রাখতেন তার কোনো প্রমাণ নেই। তাঁর শোবার ঘরে কারু ঢোকবারই হুকুম ছিল না, মেয়ে পর্য্যন্ত জানত না তিনি কোথায় কি রাখেন। কিন্তু আগেই বলেছি, তাঁর একটা লোহার সিন্দুক পর্য্যন্ত ছিল না; অথচ হীরা মুক্তা যা-কিছু সব শোবার ঘরেই রাখতেন। সুতরাং হাত-বাক্সেই সেগুলো থাকত, ধরে নিতে হবে।'

'ঘরে আর কোনো বাক্স-প্যাট্‌রা বা ঐ ধরণের কিছু ছিল না?'

'কিছু না। শুনলে আশ্চর্য্য হবে, ঘরে একটা মাদুর, একটা বালিশ, ঐ হাত-বাক্সটা, পাণের বাটা আর জলের কলসী ছাড়া কিছু ছিল না। দেয়ালে একটা ছবি পর্য্যন্ত না।'

ব্যোমকেশ বলিল—'পাণের বাটা! সেটা ভাল করে দেখেছিলে ত?'

শশাঙ্কবাবু ক্ষুব্ধ ভাবে ঈষৎ হাসিলেন—'ওহে, তোমরা আমাদের যতটা গাধা মনে কর, সত্যিই আমরা ততটা গাধা নই। ঘরের সমস্ত জিনিষই আতি-পাতি করে তল্লাস করা হয়েছিল। পাণের বাটার মধ্যে ছিল একদলা চূণ, খানিকটা করে খয়ের সুপুরি লবঙ্গ—আর পাণের পাতা। বাটাটা পিতলের তৈরী, তাতে চূণ খয়ের সুপুরির জন্য আলাদা আলাদা খুব্‌রি কাটা ছিল। বৈকুণ্ঠবাবু খুব বেশী পাণ খেতেন, অন্যের সাজা পাণ পছন্দ হত না বলে নিজে সেজে খেতেন।—আর কিছু জানতে চাও এ সম্বন্ধে?'

ব্যোমকেশ হাসিতে হাসিতে বলিল—'না না, ওই যথেষ্ট। তোমাদের ধৈর্য্য আর অধ্যবসায় সম্বন্ধে ত কোনো প্রশ্ন নেই; সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে। সেই সঙ্গে যদি একটু বুদ্ধি—কিন্তু সে যাক। মোট কথা দাঁড়াল এই যে বৈকুণ্ঠবাবুকে খুন করে তাঁর আড়াই লক্ষ টাকার জহরৎ নিয়ে চোর কিম্বা চোরেরা চম্পট দিয়েছে। তার পর ছ'মাস কেটে গেছে কিন্তু তোমরা কোনো কিনারা করতে পারোনি। জহরৎগুলো বাজারে চালাবার চেষ্টা হচ্ছে কি না—সে খবর পেয়েছ?'

'এখনো জহরৎ বাজারে আসেনি। এলে আমরা খবর পেতুম। চারিদিকে গোয়েন্দা আছে।'

'বেশ। তারপর?'

'তার পর আর কি—ঐ পর্য্যন্ত। বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হয়ে পড়েছে। তিনি নগদ টাকা কিছুই রেখে যেতে পারেন নি; কোথাও একটি পয়সা পর্য্যন্ত ছিল না। দোকানের সোনা-রূপো বিক্রি করে যা সামান্য দু'-চার টাকা পেয়েছে সেইটুকুই সম্বল। বাঙালী ভদ্রঘরের মেয়ে, বিদেশে পয়সার অভাবে পরের গলগ্রহ হয়ে রয়েছে দেখলেও কষ্ট হয়।'

'কার গলগ্রহ হয়ে আছে?'

'স্থানীয় একজন প্রবীণ উকিল—নাম তারাশঙ্কর বাবু। তিনিই নিজের বাড়ীতে রেখেছেন। লোকটি উকিল হলেও ভাল বলতে হবে। বৈকুণ্ঠবাবুর সঙ্গে প্রণয়ও ছিল, প্রতি রবিবারে দুপুরবেলা দুজনে দাবা খেলতেন—'

'হুঁ। মেয়েটি বিধবা?'

'না সধবা। তবে বিধবা বললেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। কম বয়সে বিয়ে হয়েছিল, স্বামীটা অল্প বয়সে বয়াটে হয়ে যায়। মাতাল দুশ্চরিত্র—থিয়েটার যাত্রা করে বেড়াত, তার পর হঠাৎ নাকি এক সার্কাস পার্টির সঙ্গে দেশ ছেড়ে চলে যায়। সেই থেকে নিরুদ্দেশ। তাই মেয়েকে বৈকুণ্ঠবাবু নিজের কাছেই রেখেছিলেন।'

'মেয়েটির বয়স কত?'

'তেইশ-চব্বিশ হবে।'

'চরিত্র কেমন?'

'যতদূর জানি, ভাল। চেহারাও ভাল থাকার অনুকূল—অর্থাৎ জলার পেত্নী বললেই হয়। স্বামী বেচারাকে নেহাৎ দোষ দেওয়া যায় না—'

'বুঝেছি। দেশে আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই?'

'না-থাকারই মধ্যে। নবদ্বীপে খুড়তুত জাঠতুত ভায়েরা আছে, বৈকুণ্ঠবাবুর মৃত্যুর খবর পেয়ে কয়েকজন ছুটে এসেছিল। কিন্তু যখন দেখলে এক ফোঁটাও রস নেই, সব চোরে নিয়ে গেছে, তখন যে-যার খসে পড়ল।'

ব্যোমকেশ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'ব্যাপারটার মধ্যে অনেকখানি অভিনবত্ব রয়েছে। কিন্তু এত বেশী দেরি হয়ে গেছে যে আর কিছু করতে পারা যাবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া আমি বিদেশী দুদিনের জন্য এসেছি, তোমাদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে চাই না। তুমিও বোধ হয় তা পছন্দ করবে না।'

শশাঙ্কবাবু বলিলেন,—'না না, হস্তক্ষেপ করতে যাবে কেন? আমি অফিশিয়ালি তোমাকে কিছু বলছি না; তবে তুমিও এই কাজের কাজি, যদি দেখেশুনে তোমার মনে কোনো আইডিয়া আসে তাহলে আমাকে ব্যক্তিগত-ভাবে সাহায্য করতে পার। তুমি বেড়াতে এসেছ, তোমার

ওপর কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে তোমাকে বিব্রত করতে আমি চাই না—'

শশাঙ্কবাবুর মনের ভাবটা অজ্ঞাত রহিল না। সাহায্য লইতে তিনি পুরাদস্তুর রাজি, কিন্তু 'অফিশিয়ালি' তাহার কৃতিত্ব স্বীকার করিয়া যশের ভাগ দিতে নারাজ।

ব্যোমকেশও হাসিল, বলিল—বেশ, তাই হবে। দায়িত্ব না নিয়েই তোমাকে সাহায্য করব।—ভাল কথা, ভূতের উপদ্রবের কথা কি বলছিলে?'

শশাঙ্কবাবু বলিলেন—'বৈকুণ্ঠবাবু মারা যাবার কিছুদিন পরে ঐ বাড়ীতে আর একজন বাঙালী ভাড়াটে এসেছেন, তিনি আসার পর থেকেই বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে। সব কথা অবশ্য বিশ্বাস করা যায় না, কিন্তু যেসব ব্যাপার ঘটছে শুনছি তাতে রোমাঞ্চ হয়। পনেরো হাত লম্বা একটি প্রেতাত্মা রাত্রে ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মারে। বাড়ীর লোক ছাড়াও আরো কেউ কেউ দেখেছে।'

'বল কি?'

'হ্যাঁ।—এখানে বরদাবাবু বলে এক ভদ্রলোক আছেন —আরে! নাম করতে না করতেই এসে পড়েছেন যে! অনেকদিন বাঁচবেন। শৈলেনবাবুও আছেন—বেশ বেশ। আসুন। ব্যোমকেশ, বরদাবাবু হচ্ছেন ভূতের একজন বিশেষজ্ঞ। ভুতুড়ে ব্যাপার ওঁর মুখেই শোনো।'

২

প্রাথমিক নমস্কারাদির পর নবাগত দুইজন আসন গ্রহণ করিলেন। বরদাবাবুর চেহারাটি গোল-গাল বেঁটে-খাটো, রং ফরসা, দাড়ি গোঁফ কামানো;—সব মিলাইয়া নৈনিতাল আলুর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাঁহার সঙ্গী শৈলেনবাবু ইহার বিপরীত; লম্বা একহারা গঠন, অথচ ক্ষীণ বলা চলে না। কথায় বার্ত্তায় উভয়ের পরিচয় জানিতে পারিলাম। বরদাবাবু এখানকার বাসিন্দা, পৈতৃক কিছু জমিজমা ও কয়েকখানা বাড়ীর উপস্বত্ব ভোগ করেন এবং অবসরকালে প্রেততত্ত্বের চর্চ্চা করিয়া থাকেন। শৈলেনবাবু ধনী ব্যক্তি—স্বাস্থ্যের জন্য মুঙ্গেরে আসিয়াছিলেন; কিন্তু স্থানটি তাঁহার স্বাস্থ্যের সহিত এমন খাপ খাইয়া গিয়াছে যে বাড়ী কিনিয়া এখানে স্থায়ীভাবে বাস করিতে মনস্থ করিয়াছেন। বয়স উভয়েরই চল্লিশের নীচে।

আমাদের পরিচয়ও তাঁহাদিগকে দিলাম—কিন্তু দেখা গেল ব্যোমকেশের নাম পর্য্যন্ত তাঁহারা শোনেন নাই। খ্যাতি এমনই জিনিষ।

যাহোক, পরিচয় আদান-প্রদানের পর বরদাবাবু বলিলেন—'ব্যয়কুণ্ঠ জহুরীর গল্প শুনছিলেন বুঝি? বড়ই শোচনীয় ব্যাপার—অপঘাত মৃত্যু। আমার বিশ্বাস গয়ায় পিণ্ড না দিলে তাঁর আত্মার সদ্‌গতি হবে না।'

ব্যোমকেশ একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিল। তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বরদাবাবু বলিলেন, 'আপনি প্রেত-যোনি বিশ্বাস করেন না?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল,—'অবিশ্বাসও করি না। প্রেতযোনি আমার হিসেবের বাইরে।'

বরদাবাবু বলিলেন, 'আপনি হিসেবের বাইরে রাখতে চাইলেও তারা যে থাকতে চায় না। ঐখানেই ত মুস্কিল। শৈলেনবাবু, আপনিও ত আগে ভূত বিশ্বাস করতেন না, বুজরুকি বলে হেসে উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু এখন—?'

বরদাবাবুর সঙ্গী বলিলেন—'এখন গোঁড়া ভক্ত বললেও অত্যুক্তি হয় না। বাস্তবিক ব্যোমকেশবাবু, আগে আমিও আপনার মত ছিলুম, ভূত-প্রেত নিয়ে মাথা ঘামাতুম না। কিন্তু এখানে এসে বরদাবাবুর সঙ্গে আলাপ হবার পর যতই এ বিষয়ে আলোচনা করছি ততই আমার ধারণা হচ্ছে যে ভূতকে বাদ দিয়ে এ সংসারে চলা একরকম অসম্ভব।'

ব্যোমকেশ বলিল—'কি জানি। আমাদের ত এখন পর্য্যন্ত বেশ চলে যাচ্ছে। আর দেখুন, এমনিতেই মানুষের জীবন-যাত্রাটা এত জটিল হয়ে উঠেছে যে তার ওপর আবার—'

শশাঙ্কবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—'ওসব যাক। বরদা-বাবু, আপনি ব্যোমকেশকে বৈকুণ্ঠবাবুর ভুতুড়ে কাহিনীটা শুনিয়ে দিন।'

বোমকেশ বলিল,—'হ্যাঁ, সেই ভাল। তত্ত্ব-আলোচনার চেয়ে গল্প শোনা ঢের বেশী আরামের।'

বরদাবাবুর মুখে তৃপ্তির একটা ঝিলিক খেলিয়া গেল। জগতে গল্প বলিবার লোক অনেক আছে—কিন্তু অনুরাগী শ্রোতা সকলের ভাগ্যে জুটে না। অধিকাংশই অবিশ্বাসী ও ছিদ্রান্বেষী, গল্প শোনার চেয়ে তর্ক করতেই অধিক

ভালবাসে। তাই ব্যোমকেশ যখন তত্ত্ব ছাড়িয়া গল্প শুনিতেই সম্মত হইল তখন বরদাবাবু যেন অপ্রত্যাশিতের আবির্ভাবে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। বুঝিলাম, শিষ্ট এবং ধৈর্য্যবান শ্রোতা লাভ করা তাঁহার ভাগ্যে বড় একটা ঘটিয়া উঠে না।

শশাঙ্কবাবুর কৌটা হইতে একটি সিগারেট লইয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগপূর্ব্বক বরদাবাবু ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন। সকলের গল্প বলিবার ভঙ্গী এক নয়; বরদাবাবুর ভঙ্গীটি বেশ চিত্তাকর্ষক। হুড়াহুড়ি তাড়াতাড়ি নাই—ধীরমন্থর তালে চলিয়াছে; ঘটনার বাহুল্যে গল্প কণ্টকিত নয়, অথচ এরূপ নিপুণভাবে ঘটনাগুলি বিন্যস্ত যে শ্রোতার মনকে ধীরে ধীরে শৃঙ্খলিত করিয়া ফেলে। চোখের দৃষ্টি ও মুখের ভঙ্গিমা এমনভাবে গল্পের সহিত সঙ্গত করিয়া চলে যে সব মিশাইয়া একটি অখণ্ড রসবস্তুর আস্বাদ পাইতেছি বলিয়া ভ্রম হয়।

—'বৈকুণ্ঠবাবুর মৃত্যুর কথা আপনারা শুনেছেন। অপঘাত মৃত্যু; পরলোকের জন্য প্রস্তুত হবার অবকাশ তিনি পান নি। আমাদের মধ্যে একটা সংস্কার আছে যে, মানুষের আত্মা সহসা অতর্কিতভাবে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তার দেহাভিমান দূর হয় না—অর্থাৎ সে বুঝতেই পারে না যে তার দেহ নেই। আবার কখনো কখনো বুঝতে পারলেও সংসারের মোহ ভুলতে পারে না, ঘুরে ফিরে তার জীবিতকালের কর্ম্মক্ষেত্রে আনাগোনা করতে থাকে।

'এসব থিয়োরি আপনাদের বিশ্বাস করতে বলছি না। কিন্তু যে অলৌকিক কাহিনী আপনাদের শোনাতে যাচ্ছি—এ ছাড়া তার আর কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। ঘটনা যে সত্য সে বিষয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। আমি আষাঢ়ে গল্প বলি এই রকম একটা অপবাদ আছে; কিন্তু এক্ষেত্রে অতি বড় অবিশ্বাসীকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে আমি একবিন্দু বাড়িয়ে বলছি না। কি বলেন শৈলেনবাবু?'

শৈলেনবাবু বলিলেন—'হ্যাঁ। অমূল্যবাবুকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে ঘটনা মিথ্যে নয়।'

বরদাবাবু বলিতে লাগিলেন—'সুতরাং কারণ যাই হোক, ঘটনাটা নিঃসংশয়। বৈকুণ্ঠবাবু মারা যাবার পর কয়েক হপ্তা তাঁর বাড়ীখানা পুলিসের কবলে রইল; ইতিমধ্যে বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়েকে তারাশঙ্করবাবু নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিলেন। এ কয়দিনের মধ্যে কিছু ঘটেছিল কিনা বলতে পারি না পুলিসের যে দু'জন কনষ্টেবল সেখানে পাহারা দেবার জন্য মোতায়েন হয়েছিল তারা সম্ভবত সন্ধ্যের পর দু'ঘটি ভাঙ্ উড়িয়ে এমন নিদ্রা দিত যে ভূত-প্রেতের মত অশরীরী জীবের গতিবিধি লক্ষ্য করবার মত অবস্থা তাদের থাকত না। যা হোক, পুলিস সেখান থেকে থানা তুলে নেবার পরই একজন নবাগত ভাড়াটে বাড়ীতে এলো। ভদ্রলোকের নাম কৈলাসচন্দ্র মল্লিক—রোগজীর্ণ বৃদ্ধ—স্বাস্থ্যের অন্বেষণে মুঙ্গেরে এসে কেল্লায় একখানা বাড়ী খালি হয়েছে দেখে খোঁজখবর না নিয়েই বাড়ী দখল করে বসলেন—বাড়ীর মালিকও খুনের ইতিহাস তাঁকে জানাবার জন্য বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করলেন না।

'কয়েকদিন নিরুপদ্রবেই কেটে গেল। দোতলায় একটি মাত্র শোবার ঘর—যে-ঘরে বৈকুণ্ঠবাবু মারা গিয়েছিলেন—সেই ঘরটিতেই কৈলাসবাবু শুতে লাগলেন। নীচের তলায় তাঁর চাকর-বামুন সরকার রইল। কৈলাসবাবুর অবস্থা বেশ ভাল, পাড়াগেঁয়ে জমিদার। একমাত্র ছেলের সঙ্গে ঝগড়া চলছে, স্ত্রীও জীবিত নেই—তাই কেবল চাকর-বামুনের ওপর নির্ভর করেই হাওয়া বদলাতে এসেছেন।

ছয় সাত দিন কেটে যাবার পর একদিন ভূতের আবির্ভাব হল। রাত্রি নটার সময় ওষুধ-পত্র খেয়ে তিনি নিদ্রার আয়োজন করছেন, এমন সময় নজর পড়ল জানলার দিকে। গ্রীষ্মকাল, জানলা খোলাই ছিল—দেখলেন, কদাকার একখানা মুখ ঘরের মধ্যে উঁকি মারছে। কৈলাস-বাবু চীৎকার করে উঠলেন, চাকর-বাকর নীচে থেকে ছুটে এল। কিন্তু মুখখানা তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

'তারপর আরো দুই রাত্রি ওই ব্যাপার হল। প্রথম রাত্রির ব্যাপারটা রুগ্ন কৈলাসবাবুর মানসিক ভ্রান্তি বলে সকলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু এখন আর তা সম্ভব হল না। খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের সঙ্গে তখনো কৈলাসবাবুর আলাপ হয়নি, কিন্তু আমরাও জানতে পারলুম।

'ভূত-প্রেত সম্বন্ধে আমার একটা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল

আছে। নেই বলে আমি তাকে উড়িয়ে দিতে পারি না, আবার চোখ বুজে তাকে মেনে নিতেও পারি না। তাই, অন্য সকলে যখন ঘটনাটাকে পরিহাসের একটি সরস উপাদান মনে করে উল্লসিত হয়ে উঠলেন, আমি তখন ভাবলুম—দেখিই না; অপ্রাকৃত বিষয় বলে মিথ্যেই হতে হবে এমন কি মানে আছে?

'একদিন আমি, শৈলেনবাবু এবং আরো কয়েকজন বন্ধু কৈলাসবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। তিনি রোগে পঙ্গু—হার্টের ব্যারাম—নীচে নামা ডাক্তারের নিষেধ; তাঁর শোবার ঘরেই আমাদের ডেকে পাঠালেন। খিটখিটে স্বভাবের লোক হলেও তাঁর বাহ্য আদব-কায়দা বেশ দুরস্ত, আমাদের ভালভাবেই অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর কাছ থেকে ভৌতিক ব্যাপারের সঠিক বিবরণ পাওয়া গেল।

তিনি বললেন—গত পনেরো দিনের মধ্যে চারবার প্রেতমূর্ত্তির আবির্ভাব হয়েছে; চারবারই সে জানলার সামনে এসে ঘরের মধ্যে উঁকি মেরেছে—তারপর মিলিয়ে গেছে। তার আসার সময়ের কিছু ঠিক নেই; কখনো দুপুর রাত্রে এসেছে, কখনো শেষ রাত্রে এসেছে, আবার কখনো বা সন্ধ্যের সময়েও দেখা দিয়েছে। মূর্ত্তিটা সুশ্রী নয়, চোখে একটা লুব্ধ ক্ষুধিত ভাব। যেন ঘরে ঢুকতে চায়, কিন্তু মানুষ আছে দেখে সঙ্কোচে ফিরে চলে যাচ্ছে।

কৈলাসবাবুর গল্প শুনে আমরা স্থির করলুম, স্বচক্ষে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে হবে। কৈলাসবাবুও আমাদের সাগ্রহে আমন্ত্রণ করলেন। পরদিন থেকে আমরা প্রত্যহ তাঁর বাড়ীতে পাহারা আরম্ভ করলুম। সন্ধ্যে থেকে রাত্রি দশটা—কখনো বা এগারোটা বেজে যায়। কিন্তু প্রেতযোনির দেখা নেই। যদি বা কদাচিৎ আসে, আমরা চলে যাবার পর আসে; আমরা দেখতে পাই না।

'দিন দশেক আনাগোনা করবার পর আমার বন্ধুরা একে একে খসে পড়তে লাগলেন; শৈলেনবাবুও ভগ্নোদ্যম হয়ে যাওয়া ছেড়ে দিলেন। আমি কেবল একলা লেগে রইলুম। সন্ধ্যের পর যাই, কৈলাসবাবুর সঙ্গে বসে গল্পগুজব করি, তারপর সাড়ে-দশটা এগারোটা নাগাদ ফিরে আসি।

'এইভাবে আরো এক হপ্তা কেটে গেল। আমিও ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়তে লাগলুম। এ কি রকম প্রেতাত্মা যে কৈলাসবাবু ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না! কৈলাসবাবুর ওপর নানা রকম সন্দেহ হতে লাগল।

'তারপর একদিন হঠাৎ আমার দীর্ঘ অধ্যবসায়ের পুরস্কার পেলুম। কৈলাশবাবুর ওপরে সন্দেহও ঘুচে গেল।'

ব্যোমকেশ এতক্ষণ একাগ্রমনে শুনিতেছিল, বলিল—'আপনি দেখলেন?'

গম্ভীর স্বরে বরদাবাবু বলিলেন—'হ্যাঁ—আমি দেখলুম।'

ব্যোমকেশ চেয়ারে হেলান দিয়া বসিল। 'তাইত!'—তারপর কিয়ৎকাল যেন চিন্তা করিয়া বলিল—'বৈকুণ্ঠবাবুকে চিনতে পারলেন?'

বরদাবাবু মাথা নাড়িলেন—'তা ঠিক বলতে পারি না।—একখানা মুখ, খুব স্পষ্ট নয়—তবু মানুষের মুখ তাতে সন্দেহ নেই। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে আবছায়া ছবির মত ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।'

ব্যোমকেশ বলিল—'ভারি আশ্চর্য্য। প্রত্যক্ষভাবে ভূত দেখা সকলের ভাগ্যে ঘটে ওঠে না; অধিকাংশ স্থলেই ভৌতিক ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়—হয় শোনা কথা, নয় ত রজ্জুতে সর্পভ্রম।—'

ব্যোমকেশের কথার মধ্যে অবিশ্বাসের যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল তাহা বোধ করি শৈলেনবাবুকে বিদ্ধ করিল; তিনি বলিলেন—'শুধু বরদাবাবু নয়, তারপর আরো অনেকে দেখেছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল—'আপনিও দেখেছেন নাকি?'

শৈলেনবাবু বলিলেন—'হ্যাঁ আমিও দেখেছি। হয়ত বরদাবাবুর মত অত স্পষ্টভাবে দেখিনি, তবু দেখেছি।—বরদাবাবু দেখবার পর আমরা কয়েকজন আবার যেতে আরম্ভ করেছিলুম। একদিন আমি নিমেষের জন্য দেখে ফেললুম।'

বরদাবাবু বলিলেন—'সেদিন শৈলেনবাবু উত্তেজিত হয়ে একটু ভুল করে ফেলেছিলেন বলেই ভাল করে দেখতে পান নি। আমরা কয়েকজন—আমি, অমূল্য আর ডাক্তার শচী রায়—কৈলাসবাবুর সঙ্গে কথা কইছিলুম; তাঁকে বাড়ী ছেড়ে দেবার পরামর্শ দিতে দিতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম, কিন্তু শৈলেনবাবু শিকারীর মত জানলার দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন। হঠাৎ উনি 'ঐ—ঐ—' করে চেঁচিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। আমরা ধড়মড় করে ফিরে

চাইলুম, কিন্তু তখন আর কিছু দেখা গেল না। শৈলেনবাবু দেখেছিলেন, একটা কুয়াসার মত বাষ্প যেন ক্রমশ আকার পরিগ্রহণ করছে। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণরূপে materialise করবার আগেই উনি চেঁচিয়ে উঠলেন, তাই সব নষ্ট হয়ে গেল।'

শৈলেনবাবু বলিলেন—'তবু, কৈলাসবাবুও নিশ্চয় দেখতে পেয়েছিলেন। মনে নেই, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন?'

বরদাবাবু বলিলেন—'হ্যাঁ, একে তাঁর হার্ট দুর্ব্বল—; ভাগ্যে শচী ডাক্তার উপস্থিত ছিল, তাই তখনি ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনলে। নইলে হয় ত আর একটা ট্রাজেডি ঘটে যেত।'

অতঃপর প্রায় পাঁচ মিনিট আমরা সকলে নীরবে বসিয়া রহিলাম। প্রত্যক্ষদর্শীর কথা, অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। অন্ততঃ দুইটি বিশিষ্ট ভদ্রসন্তানকে চূড়ান্ত মিথ্যাবাদী বলিয়া ধরিয়া না লইলে বিশ্বাস করিতে হয়। অথচ গল্পটা এতই অপ্রাকৃত যে সহসা মানিয়া লইতেও মন সরে না॥

অবশেষে ব্যোমকেশ বলিল—'তাহলে আপনাদের মতে বৈকুণ্ঠবাবুর প্রেতাত্মাই তাঁর শোবার ঘরের জানলার কাছে দেখা দিচ্ছেন?'

বরদাবাবু বলিলেন—'তাছাড়া আর কি হতে পারে?'

'বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ের এ বিষয়ে মতামত কি?'

তাঁর মতামত ঠিক বোঝা যায় না। গয়ায় পিণ্ড দেবার কথা বলেছিলুম, তা কিছুই করলেন না। বিশেষত তারাশঙ্করবাবু ত এসব কথা কাণেই তোলেন না—ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দেন।' বরদাবাবু একটি ক্ষোভপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল—'বৈকুণ্ঠবাবুর খুনের একটা কিনারা হলে হয়ত তাঁর আত্মার সদ্‌গতি হত। আমি প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জানি না; তবু মনে হয়, পরলোক যদি থাকে, তবে প্রেতযোনির পক্ষে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিটা অস্বাভাবিক নয়।'

বরদাবাবু বলিলেন—'তা ত নয়ই। প্রেতযোনির কেবল দেহটাই নেই, আত্মা ত অটুট আছে। গীতায় আছে—নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি—'

বাধা দিয়া ব্যোমকেশ বলিল—'আচ্ছা, বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ের সঙ্গে আমার একবার দেখা করিয়ে দিতে পারেন? তাঁকে দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতুম।'

বরদাবাবু ভাবিয়া বলিলেন—'চেষ্টা করতে পারি। আপনি ডিটেকটিব শুনলে হয় ত তারাশঙ্করবাবু আপত্তি করবেন না। আজ বার লাইব্রেরীতে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব; যদি তিনি রাজি হন, ওবেলা এসে আপনাকে নিয়ে যাব। তাহলে তাই কথা রইল।'

অতঃপর বরদাবাবু উঠি-উঠি করিতেছেন দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'আচ্ছা, আমরা ভূত দেখতে পাই না?'

বরদাবাবু বলিলেন—'একদিনেই যে দেখতে পাবেন এমন কথা বলি না; তবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে লেগে থাকতে পারলে নিশ্চয় দেখবেন। চলুন না, আজই তারাশঙ্করবাবুর বাড়ী হয়ে আপনাদের কৈলাসবাবুর বাড়ী নিয়ে যাই। কি বলেন ব্যোমকেশবাবু?'

'বেশ কথা। ওটা দেখবার আমারও বিশেষ আগ্রহ আছে। আপনাদের দেশে এসেছি, একটা নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিয়ে যেতে চাই।'

'তাহলে এখন উঠি। দশটা বাজে। ওবেলা পাঁচটা নাগাদ আবার আসব।'

বরদাবাবু ও শৈলেনবাবু প্রস্থান করবার পর শশাঙ্কবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি মনে হল? আশ্চর্য্য নয়?'

ব্যোমকেশ বলিল—'তোমার খুনের গল্প আর বরদাবাবুর ভূতের গল্প—দুটোর মধ্যে কোনটা বেশী আজগুবি বুঝতে পারছি না।'

'আমার খুনের গল্পে আজগুবি কোন্‌খানটা পেলে?'

'ছ-মাসের মধ্যে যে খুনের কিনারা হয় না তাকে আজগুবি ছাড়া আর কি বলব? বৈকুণ্ঠবাবু খুন হয়েছিলেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ত? হার্ট ফেল করে মারা যান নি?'

'কি যে বল—; ডাক্তারের পোষ্ট-মর্টেম রিপোর্ট রয়েছে, গলা টিপে দম বন্ধ করে তাঁকে মারা হয়েছে। গলায় Sub-cutaneous abrasions—'

'অথচ আততায়ীর কোনো চিহ্ন নেই, একটা আঙুলের দাগ পর্য্যন্ত না। আজগুবি আর কাকে বলে? বরদাবাবুর ত তবু একটা প্রত্যক্ষদৃষ্ট ভূত আছে, তোমার তাও নেই।'

—ব্যোমকেশ উঠিয়া আলস্য ভাঙিতে ভাঙিতে বলিল—'অজিত, ওঠো—স্নান করে নেওয়া যাক। ট্রেনে ঘুম হয়নি; দুপুরবেলা দিব্যি একটি নিদ্রা না দিলে শরীর ধাতস্থ হবে না।'

৩

অপরাহ্ণে বরদাবাবু আসিলেন। তারাশঙ্করবাবু রাজি হইয়াছেন; যদিও একটি শোকসন্তপ্তা ভদ্রমহিলার উপর এই সব অযথা উৎপাত তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করেন।

বরদাবাবুর সঙ্গে দুইজনে বাহির হইলাম। শশাঙ্কবাবু যাইতে পারিলেন না, হঠাৎ কি কারণে উপরওয়ালার নিকট তাঁহার ডাক পড়িয়াছে।

পথে যাইতে যাইতে বরদাবাবু জানাইলেন যে, তারাশঙ্কর বাবু লোক নেহাৎ মন্দ নয়; তাঁহার মত আইনজ্ঞ তীক্ষ্ণবুদ্ধি উকিলও জেলায় আর দ্বিতীয় নাই; কিন্তু মুখ বড় খারাপ। হাকিমরা পর্য্যন্ত তাঁহার কটু-তিক্ত ভাষাকে ভয় করিয়া চলেন। হয়ত তিনি আমাদের খুব সাদর সম্বর্দ্ধনা করিবেন না; কিন্তু তাহা যেন আমরা গায়ে না মাখি।

প্রত্যুত্তরে ব্যোমকেশ একটু হাসিল। যেখানে কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে সেখানে তাহার গায়ে গণ্ডারের চামড়া—কেহই তাহাকে অপমান করিতে পারে না। সংসর্গগুণে আমার ত্বক্‌ও বেশ পুরু হইয়া আসিতেছিল।

কেল্লার দক্ষিণ দুয়ার পার হইয়া বেলুনবাজার নামক পাড়ায় উপস্থিত হইলাম। প্রধানত বাঙালী পাড়া, তাহার মধ্যস্থলে তারাশঙ্করবাবুর প্রকাণ্ড ইমারৎ। তারাশঙ্করবাবু যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি উকিল তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

তাঁহার বৈঠকখানায় উপনীত হইয়া দেখিলাম, তক্তপোষে ফরাস পাতা এবং তাহার উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া গৃহস্বামী তাম্রকূট সেবন করিতেছেন। শীর্ণ দীর্ঘাকৃতি লোক, দেহে মাংসের বাহুল্য নাই বরং অভাব; কিন্তু মুখের গঠন ও চোখের দৃষ্টি অতিশয় ধারালো। বয়স ষাটের কাছাকাছি; পরিধানে থান ও শুভ্র পিরাণ। আমাদের আসিতে দেখিয়া তিনি গড়গড়ার নল হাতে উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন—'এস বরদা। এঁরাই বুঝি কলকাতার ডিটেকটিব?'

ইঁহার কণ্ঠস্বর ও কথা বলিবার ভঙ্গীতে এমন একটা কিছু আছে যাহা শ্রোতার মনে অস্বস্তি ও অস্বাচ্ছন্দ্যের সৃষ্টি করে। সম্ভবত বড় উকিলের ইহা একটা লক্ষণ; বিরুদ্ধ পক্ষের সাক্ষী এই কণ্ঠস্বর শুনিয়া যে রীতিমত বিচলিত হইয়া পড়ে তাহা অনুমান করিতে কষ্ট হইল না।

বরদাবাবু সঙ্কুচিতভাবে ব্যোমকেশের পরিচয় দিলেন। ব্যোমকেশ বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া বলিল—'আমি একজন সত্যান্বেষী।'

তারাশঙ্করবাবু বাম ভ্রূর প্রান্ত ঈষৎ উত্থিত হইল—বলিলেন—'সত্যান্বেষী? সেটা কি?'

ব্যোমকেশ কহিল—'সত্য অন্বেষণ করাই আমার পেশা—আপনার যেমন ওকালতি।'

তারাশঙ্করবাবুর অধরোষ্ঠ শ্লেষ-হাস্যে বক্র হইয়া উঠিল; তিনি বলিলেন—'ও—আজকাল ডিটেক্‌টিব কথাটার বুঝি আর ফ্যাশন নেই? তা আপনি কি অন্বেষণ করে থাকেন?'

'সত্য।'

'তা ত আগেই শুনেছি। কোন্ ধরণের সত্য?'

ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে বলিল—'এই ধরুন, বৈকুণ্ঠবাবু আপনার কাছে কত টাকা জমা রেখে গেছেন—এই ধরণের সত্য জানতে পারলেও আপাতত আমার কাজ চলে যাবে।'

নিমেষের মধ্যে শ্লেষ-বিদ্রূপের সমস্ত চিহ্ন তারাশঙ্কর বাবুর মুখ হইতে মুছিয়া গেল। তিনি বিস্ফারিত স্থির নেত্রে ব্যোমকেশের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তারপর মহাবিস্ময়ে বলিলেন—'বৈকুণ্ঠ আমার কাছে টাকা রেখে গেছে, একথা আপনি জানলেন কি করে?'

ব্যোমকেশ বলিল—'আমি সত্যান্বেষী।'

এক মিনিট কাল তারাশঙ্করবাবু নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তারপর যখন কথা কহিলেন তখন তাঁহার কণ্ঠস্বর একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে; সম্ভ্রম-প্রশংসা মিশ্রিত কণ্ঠে কহিলেন—'ভারি আশ্চর্য্য। এরকম ক্ষমতা আমি আজ পর্য্যন্ত কারুর দেখিনি।—বসুন বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?—বোসো বরদা। বলি, ব্যোমকেশবাবুরও কি তোমার মত পোষা ভূত-টুত আছে নাকি?'

আমরা চৌকিতে উপবেশন করিলে তারাশঙ্করবাবু কয়েকবার গড়গড়ার নলে ঘন ঘন টান দিয়া মুখ তুলিলেন,

ব্যোমকেশের মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—'অবশ্য আন্দাজে ঢিল ফেলেছেন, এখন বুঝতে পারছি। কিন্তু আন্দাজটা পেলেন কোত্থেকে? অনুমান করতে হলেও কিছু মাল-মশ্‌লা চাই ত।'

ব্যোমকেশ সহাস্তে বলিল—'কিছু মাল-মশ্‌লা ত ছিল। বৈকুণ্ঠবাবুর মত ধনী ব্যবসায়ী নগদ টাকা কিছুই রেখে যাবেন না, এটা কি বিশ্বাস-যোগ্য? অথচ ব্যাঙ্কে তাঁর টাকা ছিল না। সম্ভবত ব্যাঙ্ক্‌-জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে তিনি সন্দেহের চক্ষে দেখতেন। তবে কোথায় টাকা রাখতেন? নিশ্চয় কোনো বিশ্বাসী বন্ধুর কাছে। বৈকুণ্ঠবাবু প্রতি রবিবারে দুপুরবেলা আপনার সঙ্গে দাবা খেলতে আসতেন। তিনি মারা যাবার পর তাঁর মেয়েকে আপনি নিজের আশ্রয়ে রেখেছেন; সুতরাং বুঝতে হবে, আপনিই তাঁর সবচেয়ে বিশ্বাসী এবং বিশ্বাসভাজন বন্ধু।'

তারাশঙ্করবাবু বলিলেন—'আপনি ঠিক ধরেছেন। ব্যাঙ্কের ওপর বৈকুণ্ঠের বিশ্বাস ছিল না। তার নগদ টাকা যা-কিছু সব আমার কাছেই থাকত এবং এখনো আছে। টাকা বড় কম নয়, প্রায় সতের হাজার। কিন্তু এ টাকার কথা আমি প্রকাশ করিনি; তার মৃত্যুর পর কথাটা জানাজানি হয় আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ব্যোমকেশবাবু যখন ধরে ফেলেছেন তখন স্বীকার না করে উপায় নেই। তবু আমি চাই, যেন বাইরে কথাটা প্রকাশ না হয়। আপনারা তিনজন জানলেন; আর কেউ যেন জানতে না পারে। বুঝলে বরদা?'

বরদাবাবু দ্বিধা-প্রতিবিম্বিত মুখে ঘাড় নাড়িলেন।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল—'কথাটা গোপন রাখবার কোনো বিশেষ কারণ আছে কি?'

তারাশঙ্করবাবু পুনরায় বারকয়েক তামাক টানিয়া বলিলেন—'আছে। আপনারা ভাবতে পারেন আমি বন্ধুর গচ্ছিত টাকা আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করছি, কিন্তু তাতে আমার কিছু আসে যায় না। কথাটা চেপে রাখবার অন্য কারণ আছে।'

'সেই কারণটি জানতে পারি না কি?'

তারাশঙ্করবাবু কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চিন্তা করিলেন; তারপর অন্দরের দিকের পর্দা-ঢাকা দরজার প্রতি একবার কটাক্ষপাত করিয়া খাটো গলায় বলিলেন—'আপনারা বোধ হয় জানেন না, বৈকুণ্ঠর একটা বয়াটে লক্ষ্মীছাড়া জামাই আছে। মেয়েটাকে নেয় না, সার্কাস পার্টির সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। উপস্থিত সে কোথায় আছে জানি না, কিন্তু সে যদি কোনো গতিকে খবর পায় যে তার স্ত্রীর হাতে অনেক টাকা এসেছে তাহলে মেয়েটাকে জোর করে নিয়ে যাবে। দুদিনে টাকাগুলো উড়িয়ে আবার সরে পড়বে। আমি তা হতে দিতে চাই না—বুঝেছেন?'

ব্যোমকেশ ফরাসের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল—'বুঝেছি।'

তারাশঙ্করবাবু বলিতে লাগিলেন—'বৈকুণ্ঠর যথাসর্ব্বস্ব ত চোরে নিয়ে গেছে, বাকি আছে কেবল এই হাজার কয়েক টাকা। এখন জামাই বাবাজী এসে যদি ওগুলোও ফুঁকে দিয়ে যান, তাহলে অভাগিনী মেয়েটা দাঁড়াবে কোথায়? সারা জীবন ওর চলবে কি করে?—আমি ত আর চিরদিন বেঁচে থাকব না।'

ব্যোমকেশ গালে হাত দিয়া শুনিতেছিল, বলিল—'ঠিক কথা।—তাঁকে গোটাকয়েক কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই। তিনি বাড়ীতেই আছেন ত? যদি অসুবিধা না হয়—'

'বেশ। তাকে জেরা করে কোনো লাভ হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু আপনি যখন চান, এইখানেই তাকে নিয়ে আসছি।' বলিয়া তারাশঙ্করবাবু উঠিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

তিনি প্রস্থান করিলে আমি চক্ষু এবং ভ্রূর সাহায্যে ব্যোমকেশকে প্রশ্ন করিলাম—প্রত্যুত্তরে সে ক্ষীণ হাসিল। বরদাবাবুর সম্মুখে খোলাখুলি বাক্যালাপ হয়ত সে পছন্দ করিবে না, তাই স্পষ্টভাবে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগিতে লাগিল—তারাশঙ্করবাবু লোকটি কি রকম?

পাঁচ মিনিট পরে তিনি ফিরিয়া আসিলেন; তাঁহার পশ্চাতে একটি যুবতী নিঃশব্দে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মাথায় একটু আধ-ঘোমটা, মুখ দেখিবার পক্ষে কোনো প্রতিবন্ধক নাই; পরিধানে অতি সাধারণ সধবার সাজ। চেহারা একেবারে জলার পেত্নী না হইলেও সুশ্রী বলা চলে না। তবু চেহারার সর্ব্বাপেক্ষা বড় দোষ বোধ করি মুখের পরিপূর্ণ ভাবহীনতা। এমন ভাবলেশশূন্য মুখ

চীন-জাপানের বাহিরে দেখা যায় কিনা সন্দেহ। মুখাবয়বের এই প্রাণহীনতাই রূপের অভাবকে অধিক স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। যতক্ষণ সে আমাদের সম্মুখে রহিল, একবারও তাহার মুখের একটি পেশী কম্পিত হইল না; চক্ষু পলকের জন্য মাটি হইতে উঠিল না; ব্যঞ্জনাহীন নিষ্প্রাণ কণ্ঠে ব্যোমকেশের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া যন্ত্রচালিতের মত পর্দ্দার আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

যাহোক সে আসিয়া দাঁড়াইতেই ব্যোমকেশ সেইদিকে ফিরিয়া ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে তাহাকে আপাদমস্তক দেখিয়া লইল; তারপর সহজ স্বরে প্রশ্ন করিল—'আপনার বাবার মৃত্যুতে আপনি যে একেবারে নিঃস্ব হননি তা বোধ হয় জানেন?'

'হাঁ।'

'তারাশঙ্করবাবু নিশ্চয় আপনাকে বলেছেন যে আপনার সতের হাজার টাকা তাঁর কাছে জমা আছে?'

'হাঁ।'

ব্যোমকেশ যেন একটু দমিয়া গেল। একটু ভাবিয়া আবার আরম্ভ করিল—'আপনার স্বামী কতদিন নিরুদ্দেশ হয়েছেন?'

'আট বছর।'

'এই আট বছরের মধ্যে আপনি তাঁকে দেখেন নি?'

'না।'

'তাঁর চিঠিপত্রও পান নি?'

'না।'

'তিনি এখন কোথায় আছেন জানেন না?'

'না।'

'আপনি পৈতৃক টাকা পেয়েছেন জানাজানি হলে তিনি ফিরে এসে আপনাকে নিয়ে যেতে চাইবেন—এ সম্ভাবনা আছে কি?'

কিছুক্ষণ নীরব। তারপর—

'হাঁ।'

'আপনি তাঁর কাছে যেতে চান না?'

'না।'

লক্ষ্য করিলাম তারাশঙ্করবাবু নিগূঢ় হাস্য করিলেন।

ব্যোমকেশ আবার অন্য পথ ধরিল।

'আপনার শ্বশুরবাড়ী কোথায়?'

'যশোরে।'

'শ্বশুরবাড়ীতে কে আছে?'

'কেউ না।'

'শ্বশুর-শাশুড়ী?'

'মারা গেছেন।'

'আপনার বিয়ে হয়েছিল কোথা থেকে?'

'নবদ্বীপ থেকে।'

'নবদ্বীপে আপনার খুড়তুত জাঠতুত ভায়েরা আছে, তাদের সংসারে গিয়ে থাকেন না কেন?'

উত্তর নাই।

'তাদের আপনি বিশ্বাস করেন না?'

'না।'

'তারাশঙ্করবাবুকেই সব চেয়ে বড় বন্ধু মনে করেন?'

'হাঁ।'

ব্যোমকেশ ভ্রূকুটি করিয়া কিছুক্ষণ দেয়ালের দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর আবার অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করিল—

'আপনার বাবার মৃত্যুর পর গয়ায় পিণ্ড দেবার প্রস্তাব বরদাবাবু করেছিলেন। রাজি হন নি কেন?'

নিরুত্তর।

'ওসব আপনি বিশ্বাস করেন না?'

তথাপি উত্তর নাই।

'যাক। এখন বলুন দেখি, যে-রাত্রে আপনার বাবা মারা যান, সে-রাত্রে আপনি কোনো শব্দ শুনেছিলেন?'

'না।'

'হীরা জহরৎ তাঁর শোবার ঘরে থাকত?'

'হাঁ।'

'কোথায় থাকত?'

'জানি না।'

'আন্দাজ করতেও পারেন না?'

'না।'

'তাঁর সঙ্গে কোনো লোকের শত্রুতা ছিল?'

'জানি না।'

'আপনার বাবা আপনার সঙ্গে ব্যবসার কথা কখনো কইতেন না?'

'না।'

'রাত্রে আপনার শোয়ার ব্যবস্থা ছিল নীচের তলায়। কোন্ ঘরে শুতেন ?'

'বাবার ঘরের নীচের ঘরে।'

'তাঁর মৃত্যুর রাত্রে আপনার নিদ্রার কোনো ব্যাঘাত হয় নি ?'

'না।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল—'আচ্ছা, আপনি এখন যেতে পারেন।'

অতপর তারাশঙ্করবাবুর বাড়ীতে আমাদের প্রয়োজন শেষ হইয়া গেল। আমরা উঠিলাম। বিদায়কালে তারাশঙ্কর-বাবু সদয়কণ্ঠে ব্যোমকেশকে বলিলেন—'আমার কথা যে আপনি যাচাই করে নিয়েছেন এতে আমি খুশীই হয়েছি। আপনি হুঁসিয়ার লোক; হয়ত বৈকুণ্ঠর খুনের কিনারা করতে পারবেন। যদি কখনো সাহায্য দরকার হয় আমার কাছে আসবেন। আর মনে রাখবেন, গচ্ছিত টাকার কথা যেন চাউর না হয়। চাউর করলে বাধ্য হয়ে আমাকে মিছে কথা বলতে হবে।'

রাস্তায় বাহির হইয়া কেল্লার দিকে ফিরিয়া চলিলাম। দিবালোক তখন মুদিত হইয়া আসিতেছে; পশ্চিম আকাশ সিন্দুর চিহ্নিত আরসীর মত ঝকঝক করিতেছে। তাহার মাঝখানে বাঁকা চাঁদের রেখা—যেন প্রসাধন-রতা রূপসীর হাসির প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে।

ব্যোমকেশের কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি নাই, সে বুকে ঘাড় গুঁজিয়া চলিয়াছে। পাঁচ মিনিট নীরবে চলিবার পর আমি তাহাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলাম—'ব্যোমকেশ, তারাশঙ্করবাবুকে কি রকম বুঝলে ?'

ব্যোমকেশ আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া হঠাৎ হাসিয়া উঠিল; বলিল—'ভারি বিচক্ষণ লোক।'

(৪)

কেল্লায় প্রবেশ করিয়া বাঁ-হাতি যে রাস্তাটা গঙ্গার দিকে গিয়াছে, তাহারি শেষ প্রান্তে কৈলাসবাবুর বাড়ী। স্থানটি বেশ নির্জ্জন। অনুচ্চ প্রাচীর-ঘেরা বাগানের চারিদিকে কয়েকটি ঝাউ ও দেবদারু গাছ, মাঝখানে ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়ী। বৈকুণ্ঠবাবুকে যে ব্যক্তি খুন করিয়াছিল, বাড়ীটির অবস্থিতি দেখিয়া মনে হয় ধরা পড়িবার ভয়ে তাহাকে বিশেষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতে হয় নাই।

বরদাবাবু আমাদের লইয়া একেবারে উপর-তলায় কৈলাসবাবু শয়নকক্ষে উপস্থিত হইলেন। ঘরটি সম্পূর্ণ নিরাভরণ; মধ্যস্থলে একটি লোহার খাট বিরাজ করিতেছে এবং সেই খাটের উপর পিঠে বালিস দিয়া কৈলাসবাবু বসিয়া আছেন।

একজন ভৃত্য কয়েকটা চেয়ার আনিয়া ঘরের আলো জ্বালিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। ছাদ হইতে ঝুলানো কেরাসিন ল্যাম্পের আলোয় প্রায়ান্ধকার ঘরের ধূসর অবসন্নতা কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইল। মুঙ্গেরে তখনো বিদ্যুৎ-বিভার আবির্ভাব হয় নাই।

কৈলাসবাবুর চেহারা দেখিয়া তিনি যে রুগ্ন এ বিষয়ে সংশয় থাকে না। তাঁহার রং বেশ ফর্সা, কিন্তু রোগের প্রভাবে মোমের মত একটা অর্দ্ধ-স্বচ্ছ পাণ্ডুরতা মুখের বর্ণকে যেন নিষ্প্রাণ করিয়া দিয়াছে। মুখে সামান্য ছাঁটা দাড়ি আছে, তাহাতে মুখের শীর্ণতা যেন আরো পরিস্ফুট। চোখের দৃষ্টিতে অশান্ত অনুযোগ উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে, কণ্ঠস্বরও দীর্ঘ রোগভোগের ফলে একটা অপ্রসন্ন তীক্ষ্ণতা লাভ করিয়াছে।

পরিচয় আদান-প্রদান শেষ হইলে আমরা উপবেশন করিলাম; ব্যোমকেশ জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। ঘরের ঐ একটিমাত্র জানালা—পশ্চিমমুখী; নীচে বাগান। দেবদারু গাছের ফাঁকে ফাঁকে দূরে গঙ্গার স্রোত-রেখা দেখা যায়। এদিকে আর লোকালয় নাই, বাগানের পাঁচিল পার হইয়াই গঙ্গার চড়া আরম্ভ হইয়াছে।

ব্যোমকেশ বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া বলিল—'জানলাটা মাটি থেকে প্রায় পনের হাত উঁচু। আশ্চর্য্য বটে।' তারপর ঘরের চারিপাশে কৌতূহলী দৃষ্টি হানিতে হানিতে চেয়ারে আসিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ কৈলাসবাবুর সঙ্গে ভৌতিক ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা হইল; নূতন কিছুই প্রকাশ পাইল না। কিন্তু দেখিলাম কৈলাসবাবু লোকটি অসাধারণ একগুঁয়ে। ভৌতিক কাণ্ড তিনি অবিশ্বাস করেন না; বিলক্ষণ ভয় পাইয়াছেন তাহাও তাঁহার কথার ভাবে প্রকাশ পাইল। কিন্তু তবু কোনো ক্রমেই এই হানা বাড়ী পরিত্যাগ

করিবেন না। ডাক্তার তাঁহার হৃদ্‌-যন্ত্রের অবস্থা বিবেচনা করিয়া এবাড়ী ত্যাগ করিবার উপদেশ দিতেছেন, তাঁহার সহচরেরাও ভীত হইয়া মিনতি করিতেছে, কিন্তু তিনি রুগ্ন শিশুর মত অহেতুক জিদ ধরিয়া এই বাড়ী কামড়াইয়া পড়িয়া আছেন। কিছুতেই এখান হইতে নড়িবেন না।

হঠাৎ কৈলাসবাবু একটা আশ্চর্য্য কথা বলিয়া আমাদের চমকিত করিয়া দিলেন। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ খিটখিটে স্বরে বলিলেন—'সবাই আমাকে এবাড়ী ছেড়ে দিতে বলছে। আরে বাপু, বাড়ী ছাড়লে কি হবে—আমি যেখানে যাব সেখানেই যে এই ব্যাপার হবে। এসব অলৌকিক কাণ্ড কেন ঘটছে তা ত আর কেউ জানে না; সে কেবল আমি জানি। আপনারা ভাবছেন, কোথাকার কোন্ বৈকুণ্ঠবাবুর প্রেতাত্মা এখানে আনাগোনা করছে। মোটেই তা নয়—এর ভেতর অন্য কথা আছে।'

উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—'কি রকম?'

'বৈকুণ্ঠ—বৈকুণ্ঠ সব বাজে কথা—এ হচ্ছে পিশাচ। আমার গুণধর পুত্রের কীর্ত্তি।'

'সে কি?'

কৈলাসবাবুর মোমের মত গণ্ডে ঈষৎ রক্ত সঞ্চার হইল, তিনি সোজা হইয়া বসিয়া উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন, 'হ্যাঁ, লক্ষ্মীছাড়া একেবারে উচ্ছন্ন গেছে। ভদ্রলোকের ছেলে, জমিদারের একমাত্র বংশধর—পিশাচসিদ্ধ হতে চায়! শুনেছেন কথনো? হতভাগাকে আমি ত্যাজ্য-পুত্র করেছি, তাই আমার ওপর রিষ। তার একটা মহাপাষণ্ড গুরু জুটেছে, শুনেছি শ্মশানে বসে বসে মড়ার খুলিতে করে মদ খায়। একদিন আমার ভদ্রাসনে চড়াও হয়েছিল; আমি দরোয়ান দিয়ে চাব্‌কে বার করে দিয়েছিলুম। তাই দুজনে মিলে ষড়্ করে আমার পিছনে পিশাচ লেলিয়ে দিয়েছে।'

'কিন্তু—'

'কুলাঙ্গার সন্তান—তার মৎলবটা বুঝতে পারছেন না? আমার বুকের ব্যামো আছে, পিশাচ দেখে আমি যদি হার্টফেল করে মরি—ব্যাস্! মাণিক আমার নিষ্কণ্টকে প্রেতসিদ্ধ গুরুকে নিয়ে বিষয় ভোগ করবেন। কৈলাসবাবু তিক্তকণ্ঠে হাসিলেন; তারপর সহসা জানালার দিকে তাকাইয়া বিস্ফারিত চক্ষে বলিয়া উঠিলেন—'ঐ—ঐ—'

আমরা জানালার দিকে পিছন ফিরিয়া কৈলাসবাবুর কথা শুনিতেছিলাম, বিদ্যুদ্বেগে জানালার দিকে ফিরিলাম। যাহা দেখিলাম—তাহাতে বুকের রক্ত হিম হইয়া যাওয়া বিচিত্র নয়। বাহিরে তখন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে; ঘরের অনুজ্জ্বল কেরাসিন ল্যাম্পের আলোকে দেখিলাম, জানালার কালো ফ্রেমে আঁটা একটা বীভৎস মুখ! অস্থি-সার মুখের বর্ণ পাণ্ডু-পীত, অধরোষ্ঠের ফাঁকে কয়েকটা পীতবর্ণ দাঁত বাহির হইয়া আছে; কালিমা-বেষ্টিত চক্ষু-কোটর হইতে দুইটা ক্ষুধিত হিংস্র চোখের পৈশাচিক দৃষ্টি যেন ঘরের অভ্যন্তরটাকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছে।

মুহূর্ত্তের জন্য নিশ্চল পক্ষাহত হইয়া গেলাম। তারপর ব্যোমকেশ দুই লাফে জানালার সম্মুখীন হইল। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর মুখ তখন অদৃশ্য হইয়াছে।

আমিও ছুটিয়া ব্যোমকেশের পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। বাহিরের অন্ধকারে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া মনে হইল যেন দেবদারু গাছের ঘন ছায়ার ভিতর দিয়া একটা শীর্ণ অতি দীর্ঘ মূর্ত্তি শূন্যে মিলাইয়া গেল!

ব্যোমকেশ দেশলাই জ্বালিয়া জানালার বাহিরে ধরিল। গলা বাড়াইয়া দেখিলাম নীচে মই বা তজ্জাতীয় আরোহিণী কিছুই নাই। এমন কি, মানুষ দাঁড়াইতে পারে এমন কার্ণিশ পর্য্যন্ত দেয়ালে নাই।

ব্যোমকেশের কাঠি নিঃশেষ হইয়া নিবিয়া গেল। সে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিল।

বরদাবাবু বসিয়াই ছিলেন, উঠেন নাই। এখন ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—'দেখলেন?'

'দেখলুম।'

বরদাবাবু গম্ভীরভাবে একটু হাসিলেন, তাহার চোখে গোপন বিজয়গর্ব্ব স্পষ্ট হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি রকম মনে হল?'

কৈলাসবাবু জবাব দিলেন। তিনি বালিসে ঠেস দিয়া প্রায় শুইয়া পড়িয়াছিলেন, হতাশা-মিশ্রিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন—'কি আর মনে হবে!—এ পিশাচ। আমাকে না নিয়ে ছাড়বে না। ব্যোমকেশবাবু, আমার যাবার সময় ঘনিয়ে এসেছে। পিশাচের হাত থেকে কেউ কখনো উদ্ধার পেয়েছে শুনেছেন কি?' তাঁহার ভয়-বিশীর্ণ মুখের পানে চাহিয়া আমার মনে হইল, সত্যই ইঁহার সময়

আসন্ন হইয়াছে, দুর্ব্বল হৃদ্-যন্ত্রের উপর এরূপ স্নায়বিক ধাক্কা সহ্য করিতে পারিবেন না।

ব্যোমকেশ শান্তস্বরে বলিল—'দেখুন, ভয়টাই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু—প্রেত-পিশাচ নয়। আমি বলি, বাড়ীটা না হয় ছেড়েই দিন না।'

বরদাবাবু বলিলেন—'আমিও তাই বলি। আমার বিশ্বাস, এ বাড়ীতে দোষ লেগেছে—পিশাচ-টিশাচ নয়। বৈকুণ্ঠবাবুর অপঘাত মৃত্যুর পর থেকে—'

ব্যোমকেশ বলিল—'পিশাচই হোক আর বৈকুণ্ঠবাবুই হোন্—মোট কথা, কৈলাসবাবুর শরীরের যেরকম অবস্থা তাতে হঠাৎ ভয় পাওয়া ওঁর পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়। অতএব এ বাড়ী ছাড়াই কর্ত্তব্য।'

'আমি বাড়ী ছাড়ব না'—কৈলাসবাবুর মুখে একটা অন্ধ একগুঁয়েমি দেখা দিল—'কেন বাড়ী ছাড়ব? কি করেছি আমি যে অপরাধীর মত পালিয়ে বেড়াব? আমার নিজের ছেলে যদি আমার মৃত্যু চায়—বেশ, আমি মরব। পিতৃহত্যার পাতকে যে কুসন্তানের ভয় নেই, তার বাপ হয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই না।'

অভিমান ও জিদের বিরুদ্ধে তর্ক করা বৃথা। রাত্রিও হইয়াছিল। আমরা উঠিলাম। পরদিন প্রাতে আবার আসিবার আশ্বাস দিয়া নীচে নামিয়া গেলাম।

পথে কোনো কথা হইল না। বরদাবাবু দু একবার কথা বলিবার উদ্যোগ করিলেন কিন্তু ব্যোমকেশ তাহা শুনিতে পাইল না। বরদাবাবু আমাদের বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন।

শশাঙ্কবাবু ইতিমধ্যে বাড়ী ফিরিয়াছিলেন, আমরা বসিবার ঘরে প্রবেশ করিতেই বলিলেন—'কি হে, কি হল?'

ব্যোমকেশ একটা আরাম কেদারায় শুইয়া পড়িয়া ঊর্দ্ধমুখে বলিল—'প্রেতের আবির্ভাব হল।' তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কতকটা যেন আত্মগতভাবেই বলিল—'কিন্তু বরদাবাবুর প্রেত এবং কৈলাসবাবুর পিশাচ মিলে ব্যাপারটা ক্রমেই বড় জটিল করে তুলছে।'

* * * *

পরদিন রবিবার ছিল। প্রাতঃকালে উঠিয়া ব্যোমকেশ শশাঙ্কবাবুকে বলিল—'চল, কৈলাসবাবুর বাড়ীটা ঘুরে আসা যাক।'

শশাঙ্কবাবু বলিলেন—'আবার ভূত দেখতে চাও নাকি? কিন্তু দিনের বেলা গিয়ে লাভ কি? রাত্রি ছাড়া ত অশরীরীর দর্শন পাওয়া যায় না।'

'কিন্তু যা অশরীরী নয়—অর্থাৎ স্থূল বস্তু—তার ত দর্শন পাওয়া যেতে পারে।'

'বেশ চল।'

সাতটা বাজিতে না বাজিতে উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলাম। কৈলাসবাবুর বাড়ী তখনো সম্পূর্ণ জাগে নাই। একটা চাকর নিদ্রালুভাবে নীচের বারান্দা ঝাঁট দিতেছে; উপরে গৃহস্বামীর কক্ষে দরজা জানালা বন্ধ। ব্যোমকেশ বলিল—'ক্ষতি নেই। বাগানটা ততক্ষণ ঘুরে ফিরে দেখি এস।'

শিশির ভেজা ঘাসে সমস্ত বাগানটি আস্তীর্ণ। সোনালি রৌদ্রে দেওদারের চুনট্-করা পাতা জরীর মত ঝলমল করিতেছে। চারিদিকে শারদ প্রাতের অপূর্ব্ব পরিচ্ছন্নতা। আমরা ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

বাগানটি পরিসরে বিঘা চারেকের কম হইবে না। কিন্তু ফুল-বাগান বলিয়া কিছু নাই। এখানে সেখানে গোটা-কয়েক দোপাটি ও করবীর ঝাড় নিতান্ত অনাদৃতভাবে ফুল ফুটাইয়া রহিয়াছে। মালী নাই, বোধকরি বৈকুণ্ঠবাবুর আমলেও ছিল না। আগাছার জঙ্গল বৃদ্ধি পাইলে সম্ভবতঃ বাড়ীর চাকরেরাই কাটিয়া ফেলিয়া দেয়।

তাহার পরিচয় বাগানের পশ্চিমদিকে একপ্রান্তে পাইলাম। দেয়ালের কোণ ঘেঁষিয়া বিস্তর আবর্জ্জনা জমা হইয়া আছে। উনানের ছাই, কাঠ-কুঠা, ছেঁড়া কাগজ, বাড়ীর জঞ্জাল—সমস্তই এইখানে ফেলা হয়। বহুকালের সঞ্চিত জঞ্জাল রৌদ্রে বৃষ্টিতে জমাট বাঁধিয়া স্থানটাকে স্ফীত করিয়া তুলিয়াছে।

এই আবর্জ্জনার গাদার উপর উঠিয়া ব্যোমকেশ অনুসন্ধিৎসুভাবে এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল। জুতা দিয়া ছাই-মাটি সরাইয়া দেখিতে লাগিল। একবার একটা পুরানো টিনের কৌটা তুলিয়া লইয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া আবার ফেলিয়া দিল। শশাঙ্কবাবু তাহার রকম দেখিয়া বলিলেন—'কি হে, ছাইগাদার মধ্যে কি খুঁজছ?'

ব্যোমকেশ ছাইগাদা হইতে চোখ না তুলিয়াই বলিল, 'আমাদের প্রাচীন কবি বলেছেন—যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলে পাইতে পার—এটা কি?'

একটা চিড়্-ধরা পরিত্যক্ত লণ্ঠনের চিম্‌নি পড়িয়াছিল; সেটা তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ তাহার খোলের ভিতর দেখিতে লাগিল। তারপর সন্তর্পণে তাহার ভিতর আঙুল ঢুকাইয়া একখণ্ড জীর্ণ কাগজ বাহির করিয়া আনিল। সম্ভবতঃ বায়ুতাড়িত হইয়া কাগজের টুকরাটা চিম্‌নির মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল; তারপর দীর্ঘকাল সেইখানেই রহিয়া গিয়াছে। ব্যোমকেশ চিম্‌নি ফেলিয়া দিয়া কাগজখানা নিবিষ্ট-চিত্তে দেখিতে লাগিল। আমিও উৎসুক হইয়া তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম।

কাগজখানা একটা ছাপা ইস্তাহারের অর্দ্ধাংশ; তাহাতে কয়েকটা অস্পষ্ট জন্তু জানোয়ারের ছবি রহিয়াছে মনে হইল। জল-বৃষ্টিতে কাগজের রং বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, ছাপার কালিও এমন অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে পাঠোদ্ধার করা দুঃসাধ্য।

শশাঙ্কবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি দেখছ হে? ওতে কি আছে?'

'কিছু না।' ব্যোমকেশ কাগজখানা উল্টাইয়া তারপর চোখের কাছে আনিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল—'হাতের লেখা রয়েছে।—দ্যাখ ত, পড়তে পার কিনা।' বলিয়া কাগজ আমার হাতে দিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিলাম। হাতের লেখা যে আছে তাহা প্রথমটা ধরাই যায় না। কালির চিহ্ন বিন্দুমাত্র নাই, কেবল মাঝে মাঝে কলমের আঁচড়ের দাগ দেখিয়া দু'একটা শব্দ অনুমান করা যায়—

·বিপদে······হাতে টাক···
বাবা····· ···নচেৎ · · ····মরীয়া
···তোমার স্বাথী······

ব্যোমকেশকে আমার পাঠ জানাইলাম। সে বলিল—'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে। কাগজটা থাক।' বলিয়া ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিল।

আমি বলিলাম—'লেখক বোধ হয় খুব শিক্ষিত নয়—বানান ভুল করেছে। 'স্বাথী' লিখেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল—'শব্দটা 'স্বাথী' নাও হতে পারে।'

শশাঙ্কবাবু ঈষৎ অধীরকণ্ঠে বলিলেন—'চল চল, আস্তাকুড় ঘেঁটে লাভ নেই। এতক্ষণে বোধহয় কৈলাস-বাবু উঠেছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'হ্যাঁ, ঐ যে তাঁর ভৌতিক জানলা খোলা দেখছি। চল।' (ক্রমশঃ)

এপারে-ওপারে

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত এম-এ

ওপারে দেবতা একাকী বাজায় বাঁশী,—
এপারে ধরার আঁখি করে ছল্ ছল্,—
মাঝখানে শুধু লুকায়ে চপল হাসি
কালের যমুনা বয়ে যায় কল্ কল্।
বাতাস বহিছে অনাদি-বিরহ-বাণী,
কাঁপিছে ধরার বন-অঞ্চলখানি,
ওপারে এপারে কত যেন জানাজানি,—
জানে যেন তাহা যমুনার কালো জল।
ওপারের বঁধু একা করে হাতছানি,
হেথা বিরহিণী—আঁখি দু'টি ছল্ ছল্!

ওপারের কূলে ভাসায়ে প্রেমের তরি
ডাকিছে বিদেশী অজানার কোন্ নেয়ে,
যমুনার জলে ভাসাইয়া যে গাগরি
চাহিয়া রয়েছে অ-বোলা কিশোরী মেয়ে।
ওপারের ঢেউ ভাঙে এপারের কূলে,
ওকূল ভরিছে কবরীর কেয়া ফুলে,
ওপারে এপারে নীরবে নয়ন তুলে
যুগযুগান্তে দু'জনে রয়েছে চেয়ে—
বিদেশীর নাও ওপারে উঠিছে দুলে,—
অশ্রু মুছিছে হেথা সুন্দরী মেয়ে!

আদিম জাতি ও আদি রিপু

শ্রীনরেন্দ্র দেব

মানব জাতির ইতিহাসের অনেকটা স্থান অধিকার ক'রে আছে তার যৌন-জীবনের দুর্মদ প্রভাব। নিখিল সৃষ্টির মূলে জীবজগতের যে সহজাত প্রবৃত্তি সৃজনের প্রধান সহায় রূপে সেই অনাদিকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত সকল প্রাণীর ধারা ও পারম্পর্য্য রক্ষা করে আসছে, মানব সমাজের মধ্যে তার প্রথম বিকাশ কিভাবে দেখা দিয়েছিল এ রহস্য জানবার একটা অদম্য কৌতূহল একালের জ্ঞানপিপাসুদের মধ্যে প্রবল হ'য়ে উঠেছে। নানা দেশের যৌনতত্ত্ব বিশারদেরা এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা অনুসন্ধান ও গবেষণা সুরু ক'রে দিয়েছেন। "হাসির মনস্তত্ত্ব" প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা শ্রীযুক্ত র‍্যাল্‌ফ্‌ পিডিংটন এম-এ পি-এইচ্‌-ডি মহোদয় বলেন—নরনারীর মিলনের পরিপূর্ণ আনন্দ শুধু যে সৃষ্টিরই সহায়ক তাই নয়, এ মিলন এনে দেয় তাদের জীবনে পরিপূর্ণতার সঙ্গে একটা চরম পরিতৃপ্তি বোধ, সন্তান-স্নেহ-সঞ্জাত বাৎসল্য রসের এক অপূর্ব আস্বাদ এবং পরম অধ্যাত্ম ভাবসম্ভূত সমাধি অবস্থার এক অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা!

প্রত্যেক নরনারীর জীবনের এই একান্ত প্রয়োজনীয় প্রকৃতিজাত সহজ ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যদি কোথাও সার্থকতালাভে বঞ্চিত হয়, তাহ'লে সেই ব্যর্থতার আক্রোশ মানুষকে যে সেখানে শুধু নৈরাশ্যের অন্ধকারে ম্লান এক নিরানন্দময় অসুস্থ অস্তিত্ব বহন করে চলতে বাধ্য করে তাই নয়, সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা প্রবলভাবে জাগিয়ে তোলে মানব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত অতি নীচ ও কুৎসিৎ হিংস্র প্রবৃত্তিগুলোকে, যার ফলে তারা বিদ্বেষের বহ্নি জ্বেলে ধ্বংসের আগুনে দগ্ধ করে নিজেদের এবং অপরকেও! তাদের প্রচণ্ড প্রতিহিংসার অনলে পুড়িয়ে দিতে চায় তারা আর পাঁচজনের সুখের সংসার! তাদের উন্মত্ত জিঘাংসা মাঝে মাঝে মানবসমাজের বুকের উপর এমন প্রেতের নৃত্য সুরু করে দেয় যে তার বিষময় কুফল বংশপরম্পরায় দীর্ঘকালের জন্য মানবজাতির জীবন ইতিহাসে এক অতি-দুরপনেয় কলঙ্ক চিহ্ন এঁকে রেখে যায়।

এর কারণ আর অন্য কিছুই নয়—মানুষের মধ্যে কোটী কোটী বৎসরের প্রাচীন এক প্রাগৈতিহাসিক পশু ঘুমিয়ে আছে ব'লে। সভ্য মানবরূপে সেই পশুর ক্রম-বিবর্ত্তন আজ সম্ভব হয়েছে শুধু আপনাকে নূতন করে সৃষ্টি করবার এই বিধি-নির্দ্দিষ্ট দুর্বার কামনা থেকেই। সৃষ্টির এই কামনা তাই মানবসমাজে আদিরিপু নামে অভিহিত। এই আদি-রিপুর প্রভাবেই মানুষকে যেমন উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে উঠতে দেখা যায়, তেমনি আবার এই প্রকৃতির একটা সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে ক্রমে মানুষের সমাজ, সভ্যতা, জ্ঞান ও ধর্ম! সমাজ-বন্ধন এই দলগত জীবের দুরন্ত রিপুগুলোকে শাসনাধীনে সংযত ক'রে রাখার ফলে পশুর জাত আজ মানুষ হ'য়ে উঠেছে!

মানব সমাজ এই উদ্দাম প্রবৃত্তিকে শাসন করবার জন্য একদিকে যেমন গম্যাগম্য নির্দেশ ক'রে এর ব্যাপ্তিকে সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করেছেন, নানাবিধি নিষেধের গণ্ডী টেনে, নীতি-ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে, চরিত্রের উচ্চ আদর্শ খাড়া ক'রে, নরনারীর জীবনের প্রথম যৌন আকর্ষণকে 'পবিত্র প্রেম' নামে অভিহিত ক'রে এবং সেই প্রেমের কল্পনার মধ্যে একটা স্বর্গীয় মাধুর্য্য ও মহতী মর্য্যাদা আরোপ করে—তেমনি তাঁরা একে সার্থকতারও সুযোগ দিয়েছেন—সমাজের অনুমোদিত একাধিক সঙ্গত ও সুন্দর মিলন উপায়ের মধ্য দিয়ে। এই সুব্যবস্থার গুণে মানুষ তার ভিতরের পশুকে শুধু শৃঙ্খলিত করেই নিশ্চিন্ত হয়নি তাকে পোষ মানিয়ে—তার কাঁধে সংসার-রথের জোয়াল তুলে দিয়ে মানবজাতির উন্নতি ও প্রসার এবং মানবসমাজের সেবা ও হিতসাধনে নিয়োজিত ক'রে রেখেছে। কারণ, মানুষের অভিজ্ঞতা তাকে বারবার এই সত্যই শিক্ষা দিয়েছে যে এ পশুপ্রবৃত্তির প্রচণ্ড শক্তিকে ভয় দেখিয়ে চোখ রাঙিয়ে ও শাসন ক'রে বেশীদিন দমিয়ে বা দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এর সঙ্গে সন্ধি ক'রে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

মদনভস্মের আদর্শপ্রবর্তক ভারতবর্ষে এই আদি রিপুকে

শান্ত সংযত ও আপন কর্তৃত্বাধীনে রাখবার জন্য শিশুকাল থেকে যৌবনোদ্গম পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েদের কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন শিক্ষা দেওয়া হ'ত। বিবাহ ও দাম্পত্যজীবনের কর্তব্যপালনকে ধর্মের অঙ্গীভূত করা হয়েছিল। কোন কোন তিথিতে ও কোন কোন অবস্থায় মৎস মাংস ইত্যাদি তামসিক আহার ও নারীসঙ্গ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। এত রকমের সাবধানতা ও সতর্ক অনুশাসন সত্ত্বেও বহু ঋষি মুনিরও অধঃপতনের ইতিহাস পুরাণের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করে রেখেছে! এই প্রচণ্ড শক্তিশালী আদি রিপুর দুর্বার প্রভাবকে এদেশ যেমন কঠোর শাসনে সংযত রেখেছিল তেমনি ঋতুদান, পত্যন্তর গ্রহণ এবং ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, আর্ষ, দৈব, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস, পৈশাচ প্রভৃতি অষ্টবিধ বিবাহ প্রথাকে সামাজিক ও ধর্মসংক্রান্ত অনুমোদন দিয়ে তাঁরা এর প্রভাবকে জাতি ও সমাজের কল্যাণের পথে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে পরবর্তি অদূরদর্শী সমাজ-সংস্কারকেরা এই সকল বিধি-নিষেধের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিস্মৃত হ'য়ে, ধর্মের গোঁড়ামি এবং বৈষয়িক স্বার্থ ও বংশমর্য্যাদার মিথ্যা মোহে অন্ধ হ'য়ে কঠোর বৈধব্য বিধান ও অন্যান্য বিবাহ অস্বীকার করার ফলে হিন্দুজাতি ধীরে ধীরে আজ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হ'য়ে চলেছে। সমাজের পবিত্রতা গুপ্ত ব্যাভিচার এসে বিনষ্ট করেছে! চরিত্রের দুর্বলতা ও মনের বিকার দেখা দিয়েছে। ধর্মাচরণ কেবলমাত্র আচারানুষ্ঠানে পর্য্যবসিত হয়েছে। আন্তরিকতা ও সবলতা হারিয়ে এদেশের লোক আজ ছলনা ও কুটীলতার আশ্রয় নিয়েছে। আমাদের জাতীয় অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে তার মূলে রয়েছে এই বৈদিকোত্তর যুগের ব্রাহ্মণ-শাসিত ভারতবর্ষের ধর্মসংক্রান্ত ও সামাজিক সঙ্কীর্ণতা। জার্মানিতে হিট্‌লারিয়ান্ ফ্যাসিজমের পক্ষপাতী নাজী-শাসন আজ যে সঙ্কীর্ণতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, ভারতবর্ষ একদিন ঠিক এই ভুল করেই তার সর্বনাশ ডেকে এনেছিল!

মানুষের সমাজ ধর্ম ও জাতিগঠন সবেরই মূলে দেখা যায় এই আদি রিপুর সুনিয়ন্ত্রণের উপরই তার কল্যাণ, পুণ্য ও উন্নয়ন সম্পূর্ণ নির্ভর করে। মানবজাতির ইতিহাস সকল দেশেই এই সত্য সপ্রমাণিত ক'রেছে। জগতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এই উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক বিধি-বিধান ও ধর্মের অনুশাসন-প্রবর্তিত হয়েছে। দীর্ঘকালের শোচনীয় অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ বুঝেছে যে এর রাশ আল্‌গা থাকলে এ মানুষকে করে তোলে উচ্ছৃঙ্খল দায়িত্বজ্ঞানহীন বর্বর জীব। আবার অতিরিক্ত আটক ক'রে রাখলে এ মানুষকে ক'রে তোলে স্বাস্থ্যহীন দুর্বল ও পঙ্গু! কাজেই সকল দেশের চিন্তাশীল মনীষীরাই এর সম্বন্ধে নানা সুসঙ্গত ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। দেশ-কাল-পাত্র হিসাবে তার নিয়মকানুনও তাই ভিন্ন ভিন্ন রকমের। কিন্তু, মূল উদ্দেশ্য সবেরই এক!—

আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে বটে যে সুসভ্য ইংরাজ সমাজে পরিণয়েচ্ছু তরুণ তরুণীদের মধ্যে যে শান্ত সংযত মেলামেশা তাদের পূর্বরাগকে অপূর্ব সুন্দর ক'রে রেখেছে, তার তুলনায় মধ্য-অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য আদিম জাতিদের সমাজে যে প্রাক্-পরিণয় সম্পর্কীয় অবাধ মদনোৎসবের অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে তার সঙ্গে কি আকাশ পাতালই না প্রভেদ! কিন্তু এই উভয়বিধ সামাজিক বিধানের পার্থক্য সম্বন্ধে গভীরভাবে অনুশীলন করে দেখলে সহজেই বোঝা যাবে যে মূলতঃ তারা একই! অর্থাৎ সেই আদি রিপুর অদম্য প্রভাবজনিত যৌন-আকর্ষণ দুটি তরুণ তরুণীকে যেখানে পরস্পরের অনুরাগী ক'রে তুলেছে, সেখানে তাদের মিলনকে সমাজ অনুমোদন ক'রে নিয়ে জাতির কল্যাণ ও সামাজিক বিধান অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়!

দেহ বিনিময় ক্ষণিকের, কিন্তু অন্তর বিনিময় দীর্ঘস্থায়ী! মাতৃত্ব যেমন নারীর মধ্যে একটা প্রকৃতিদত্ত দায়িত্ব তার এনে দেয়, পিতৃত্বের পশ্চাতে সেরূপ কোনো দাবী-দাওয়া নেই, এইজন্য পুরুষ মানুষরা সাধারণত একটু মুক্ত স্বভাব! ঘর বেঁধে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে পুরুষানুক্রমে এক জায়গায় বসবাস ক'রতে শিখিয়েছে তাকে সামাজিক প্রয়োজন, যার পশ্চাতে রয়েছে ব্যক্তিগত সুখ-স্বার্থ-নিরাপত্তা ও শান্তির লোভ! নারীহরণ-নারীধর্ষণ প্রভৃতি নারী সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব মানবসমাজের নূতন কোনো পাপ নয়; এ আমাদের বহু প্রাচীনকালের কু-অভ্যাস! সীতার জন্য লঙ্কাকাণ্ড বা হেলেনের জন্য ট্রয় ধ্বংস হবার বহু পূর্ব্ব হ'তেই আদিম মানবজাতির মধ্যে এক গোষ্ঠীর সঙ্গে আর এক গোষ্ঠীর বিবাদ লেগেই থাকত এই নারী নিয়ে! 'বীর-ভোগ্যা' বা "জোর যার মুলুক তার" নীতি জীব-জগতের অতি প্রাচীন ও প্রাকৃতিক

স্বধর্ম! প্রাণী-জগতে ও উদ্ভিদ্ জগতে আজও এ রীতি প্রচলিত রয়েছে। মানুষ এর ঊর্দ্ধে উঠতে চায়; তাই আজ যেমন য়ুরোপের টনক নড়েছে—ভবিষ্যতে যাতে আর যুদ্ধ না হয়, যাতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে, অস্ত্রশস্ত্রাদি যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত ও রণসজ্জার বিপুল আয়োজন যাতে বন্ধ থাকে, এই নিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রবল আন্দোলন ও আলোচনা চলেছে, তেমনি একদিন যখন রাষ্ট্র ছিল না—সম্পত্তি ছিল না, সভ্যতা ছিল না, পশুপালের মত মানুষও দলবেঁধে পৃথিবীতে বিচরণ ক'রতো, সেদিন তাদের এই নারীর উপর অধিকার নিয়েই পরস্পরের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হ'তো! আদি-রিপুর প্রভাবই ছিল তার আদি নিদান! তাই, সে এই অধিকারের একটা সামঞ্জস্য সাধনের জন্য "লীগ্ অফ নেশান্সের" অনুরূপ 'পঞ্চায়েৎ' বা গোষ্ঠী-সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিল, যারা সেদিন বিবাহ-বন্ধনের দ্বারা একটি বিশেষ নারীর উপর একটি বিশেষ পুরুষের স্থায়ী অধিকার সাব্যস্ত করে দিয়েছিল। একালের সুসভ্য মানবসমাজেও যার বিরুদ্ধাচরণ দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য!

ক্ষণস্থায়ী দৈহিক মিলন কিভাবে ধীরে ধীরে নরনারীর মধ্যে একটা স্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপনে সক্ষম হয়েছে, যা ছিল ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণের মত নিতান্তই একটা দেহের প্রয়োজনের সাময়িক তাগিদ মাত্র; সেই আদি-রিপুর প্রভাব কেমন ক'রে দেহের সীমা অতিক্রম ক'রে মানবের মনোরাজ্যে প্রেমের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে তার ইতিহাস অনুসন্ধান করতে হ'লে আজকের এই বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য মানবসমাজ পশ্চাতে ফেলে রেখে আমাদের ফিরে যেতে হবে মানবের সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের সামাজিক অবস্থার মধ্যে। যাদের আমরা আজ অসভ্য বর্বর আদিম জাতি বলে তুচ্ছ মনে করি তাদেরই মধ্যে এখনও কতকটা খুঁজে পাওয়া যাবে আমাদের পৌরাণিক যৌন-জীবনের প্রথম অবস্থার রূপ। কিন্তু এই অনুসন্ধানের আগে মনের ভিতর এ ধারণা বদ্ধমূল ক'রে রাখলে চলবে না যে আদি-রিপুর প্রভাব ওদের মধ্যে ইতর প্রাণীদের পশু-প্রবৃত্তির সমানস্তরেই আছে বা ওরা কতকগুলো কুৎসিত কুসংস্কারের বশেই বীভৎস মদনোৎসবের আয়োজন করে, কিম্বা ঋতুমতী নারীকে অশুচি জ্ঞানে ওরা যে স্পর্শ করে না সেটা ওদের অজ্ঞানতা বশতঃ—অথবা—শিক্ষা ও সভ্যতার অভাবেই তারা আজও পর্য্যন্ত এমন কতকগুলো অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যার কোনো অর্থ হয় না এবং যা নিতান্তই বালকোচিত ও হাস্যকর বা অশ্লীল ব্যাপার! বরং আমাদের এই কথাই মনে রাখতে হবে যে, যাই তারা করুক না কেন, তাদের উদ্দেশ্য কিন্তু এই আদি-রিপুর প্রভাবকে সংযত ও শৃঙ্খলিত রাখা, যাতে মানুষের সৃজনী শক্তি জাতির কল্যাণের পথে নিয়োজিত হ'তে পারে। সামাজিক বিধান ও শাসনের মধ্যে এই মঙ্গল প্রচেষ্টাই তাদেরও জীবনের লক্ষ্য! আমাদের চেয়ে তারা এবিষয়ে কিছুমাত্র অসংযমী বা উচ্ছৃঙ্খল নয়, বরং অধিকতর সতর্কতা ও সাবধানতার সঙ্গে তারা এ সম্বন্ধে সকলপ্রকার শৈথিল্য বর্জন করে চলে।

যৌন জীবনের এই যে সুনিয়ন্ত্রিত বিধিনিষেধ আজ সভ্য মানবসমাজে প্রচলিত হয়েছে—এর পশ্চাতে আছে কত যুগ যুগান্তরের প্রয়াস, বংশপরম্পরার ত্যাগ সংযম শিক্ষা ও সংস্কৃতি! মানুষ যে আজ এই অসাধ্য সাধনে এতখানি সফলকাম হ'তে পেরেছে তার একমাত্র কারণ জীবজগতে সকল প্রাণীর মধ্যে সে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে! তার মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার আছে ব'লে! স্নেহ মমতা দয়া মায়া প্রভৃতি কতকগুলি উচ্চস্তরের হৃদয়বৃত্তি বা ভাবমূলক স্নায়বিক অনুভূতি স্থায়ীভাবে তাকে সদাচরণে প্রণোদিত করে বলে এবং বিশেষ ক'রে সে প্রকৃতির মহাদান বাক্‌শক্তি বা আত্মচিন্তা প্রকাশের ক্ষমতাসম্পন্ন বলে!

মানুষের বাসগৃহ, তার সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র, এমন কি তার প্রিয়জনের ব্যবহারের সামান্য কোনো বস্তুটি পর্য্যন্ত মানুষের মনে গভীর একটা অনুরাগ ও আকর্ষণ জাগিয়ে তোলে! তারা যখন প্রেমগদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলে "আমি তোমায় ভালবাসি" বা "তুমি আমারই", তারা যখন "প্রিয়তম" ব'লে পরস্পরকে সম্বোধন করে এবং বিবাহের সময় তারা যে সকল মন্ত্র বা প্রতিশ্রুতি উচ্চারণ করে তা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তাদের মিলনের আদর্শ মহৎ, তারা উভয়ে আজীবন একটা স্থায়ী প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে একান্ত অভিলাষী! একমাত্র মানুষের হৃদয়েই সেই শক্তির বীজ নিহিত আছে যা মধুর ভাবের প্রভাবে একে অপরকে আপন করে নিতে পারে এবং পরস্পর একটা চির নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে, মানব

সমাজের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করে তুলতে পারে। এই দিক থেকে দেখলে ও বিচার করলে সহজেই বোঝা যাবে যে আদি রিপুর আকর্ষণই তার জীবনের উন্নতি বিধান ও গতি-নিয়ন্ত্রণের প্রধান পুরোহিত।

দেহের দিক দিয়েও বিচার করে দেখলে দেখা যায়—আদি রিপু আত্ম-সুখ-সর্বস্ব স্বাবলম্বী ও আপ্তকাম নয়। দেহের উপর এর যে দুরন্ত প্রভাব তার ফলেও মানব-জীবনের একটা অতি বিশিষ্ট ঘটনা ঘটে যায়! সন্তানের জন্ম সম্ভব ক'রে তুলে সে নর-নারীকে জনক জননীতে রূপান্তরিত করে। তখন বাৎসল্যরসের অনির্বচনীয় অনুভূতি তাকে ত্যাগে ও প্রেমে দীক্ষা দিয়ে দেহাতীত এক অতীন্দ্রিয় আনন্দলোকে টেনে নিয়ে যায়। দেহ ও মনের এই দুই বিচিত্র পরিণতি দেখে আদি রিপু সম্বন্ধে শেষ পর্য্যন্ত সকলকে এই সিদ্ধান্তেই এসে পৌছতে হয় যে সৃষ্টি ও স্থিতির বিস্তৃতি এবং অব্যয়তার জন্য এ শুধু জীবজগতের এক অতি অবশ্য প্রয়োজনীয় প্রবৃত্তি নয়, প্রকৃতির অপরিহার্য্য এক প্রজনন বিধিও বটে—যা সমাজ গঠনে মানুষকে প্ররোচিত করেছে। মানুষের এই সমাজ শুধু যে আদি-রিপুকেই শাসনে রাখতে তাকে সাহায্য করে তাই নয়, সেই সঙ্গে অতিরিক্ত বংশবৃদ্ধিকেও সে সংযত রাখে। সমাজানুমোদিত যে ব্যবস্থার দ্বারা নরনারীর যৌন-আকর্ষণকে সুন্দর ও সার্থক হ'য়ে ওঠবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে সেই সুপ্রজনন প্রণালী অনুসারে নরনারীর দৈহিক মিলনানন্দ আজ নির্বিঘ্নে সম্ভোগ করা সম্ভব হয়েছে—যা প্রাক্‌সামাজিক যুগে ছিল না। নরনারীর পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব লাভের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাও এতদ্বারা পূর্ণ হয়েছে। সন্তানের জন্মের পর তার সযত্নে লালন পালনেরও সুব্যবস্থা হয়েছে; তাছাড়া বেঁচে থাকবার পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয় নানা ছোট বড় প্রয়োজনও এই সামাজিক বিধানের গুণে সহজেই সুসিদ্ধ হবার উপায় খুঁজে পেয়েছে। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে—ক্ষুন্নিবৃত্তি! পুরুষ যেমন বহু পরিশ্রমে আহার্য অনুসন্ধান ক'রে নিয়ে আসে, নারী তেমনি অক্লান্ত সেবা-যত্নে তার শ্রম দূর করে এবং তার আনীত ভোজ্যবস্তু সুখাদ্যরূপে পরিবেশন ক'রে তাদের রসনা ও উদর পরিতৃপ্তিতে সাহায্য করে। গৃহের বাহিরে পুরুষের বিশাল কর্মক্ষেত্র কিন্তু সংসার-অভ্যন্তরে নারীই একমাত্র সর্বময়ী কর্ত্রী! আপদে বিপদে রোগে শোকে দুঃখে ও দৈন্যে নরনারী যেমন পরস্পরের সহায় সঙ্গী ও সমান দরদী, আনন্দে উৎসবে সুখে সৌভাগ্যেও তেমনিই তারা দুজনে দুজনার অন্তরঙ্গ!

এই অন্তরঙ্গতা কেবল যে মানব সমাজেরই বিশেষত্ব তাই নয়, প্রাণীজগতে একাধিক জীবের মধ্যেই এটা দেখতে পাওয়া যায়! পশু পক্ষী ও সরীসৃপ জাতীয় যে সকল জীব জোড়ায় জোড়ায় নীড় রচনা ক'রে বা গুহা নির্মাণ ক'রে বাস ক'রছে দেখতে পাওয়া যায়—তাদের পরস্পরের প্রতি



মাতৃত্বের গৌরব। (ত্রোব্রিয়ান্দ্‌ তরুণীদের যখন সর্ব্বপ্রথম গর্ভ সঞ্চারের লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন তাকে একটি শুভ্র শোনের অঙ্গরাখায় ভূষিত করে তার আত্মীয়ারা পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে তার পিত্রালয়ে পৌঁছে দিয়ে আসে।)

অনুরাগ মানব-দম্পতীর চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। তারাও অনেক সময় একে অপরের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত

বিসর্জন দিতে কাতর হয় না! অথচ তারা মূক অবোধ প্রাণী! তাদের ভাষা নেই, শিক্ষা নেই, সমাজ নেই, সংস্কৃতি নেই, সভ্যতা নেই! তারা আদি রিপুর নানা সূক্ষ্ম পার্থক্য বিচার ক'রে কাম ও প্রেম, পাপ ও পুণ্য এবং স্বর্গ ও নরক প্রভৃতি কল্পনা করেনি! তাদের সমাজ নেই, সুতরাং সামাজিক বিধি-নিষেধেরও বালাই নেই; কিন্তু তাদের ভাবপ্রবণ হৃদয় আছে, তারা আনন্দে গান গেয়ে শিস দিয়ে নাচে! শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে! ক্রোধে হিংস্র হ'য়ে ওঠে! সুতরাং তারাও যে ষড়রিপুর অধীন একথা অস্বীকার করা চলে না। তাদের মধ্যে যখন স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি একটা গভীর আকর্ষণ ও আসক্তি দেখা যায়, সেটার মূল যৌন-আকর্ষণ ছাড়া আর কিছু আমরা কল্পনা করতে পারি না! কিন্তু তদতিরিক্তও



সন্তান-সম্ভবার অভিষেক। (প্রথম সন্তান-সম্ভাবনা প্রকাশ হবার পর তরুণীর আত্মীয়া ও প্রতি-বেশিনীরা তাকে কাঁধে ক'রে তুলে নিয়ে গিয়ে সাগর-জলে তার স্নানাভিষেক করে।)

যে কিছু আছে এর মধ্যে একথাও তো সম্পূর্ণ অস্বীকার করা চলে না! এখানেও আদি-রিপুর প্রভাব তাদের জীবনকে উচ্ছৃঙ্খল ক'রে তোলার পরিবর্তে বরং সুনিয়ন্ত্রিত করেছে দেখা যায়। তারাও একত্রে আহার অন্বেষণে ঘুরে বেড়ায়, নীড়-রচনায় পরস্পরকে সাহায্য করে, দেহ-পরিচর্য্যায় উভয়ে উভয়কে সুখী ক'রতে চেষ্টা করে, শাবক প্রতিপালনেও তাদের কর্তব্যের ত্রুটী দেখতে পাওয়া যায় না! মানুষের সঙ্গে তাদের কেবল দু' এক জায়গায় খুব বড় প্রভেদ দেখতে পাওয়া যায়—সেটা হ'চ্ছে একটা ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সম্বন্ধ ও বংশ-গৌরবের অহঙ্কার!

মানব সমাজে এই আদিরিপু-সংশ্লিষ্ট প্রজনন ব্যাপারে সব চেয়ে প্রাধান্যলাভ করেছে তার এই পারিবারিক জীবন। স্বামী-স্ত্রী পুত্র-কন্যা নিয়ে মিলেমিশে সুখে-দুঃখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করাই যেন তাদের চরম সার্থকতা! আবার মানব জীবনের এই সার্থকতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে মানব-দেহ সম্পর্কীয় জীব-বিজ্ঞানের কয়েকটি অপরি-হার্য্য বিধানের উপর। সকল দেশেই সকল কালেই নারী ও পুরুষ তাদের যৌবন সমাগমে আদি-রিপুর প্রভাবে বিচলিত হয় এবং এই সময় তাদের পরস্পরের মধ্যে মিলন-আকাঙ্ক্ষার একটা প্রবল আকর্ষণ তারা অন্তরে অন্তরে অনুভব করে। সেই আকর্ষণ ক্রমে কোনো একটি ব্যক্তি-বিশেষকে অবলম্বন ক'রে কেন্দ্রীভূত হয়ে ওঠে! এর মধ্যেও আবার ভবিষ্যতের ভাবনা, জীবিকা নির্বাহের ব্যাপার, বাসস্থানের প্রশ্ন প্রভৃতি বৈষয়িক বিবেচনাও পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে তাদের অনেকখানি প্রভাবান্বিত করে। যেখানে করে না সেখানে সেটা ব্যতিক্রম বলেই গণ্য! এককালে শক্তিমানের আশ্রয়ই ছিল একমাত্র নিরাপদ স্থান, সেদিন ছিল বসুন্ধরা বীরভোগ্যা! বর্তমানে অর্থবলই সবচেয়ে বড় বল, কাজেই ধনীর মর্য্যাদা হয়ে উঠেছে সকল সম্পদের শ্রেষ্ঠ! তাই বসুন্ধরাও আজ ঐশ্বর্য্যবানের করায়ত্ত। সমাজে, রাষ্ট্রে, নাগরিক জীবনে সকল ব্যাপারেই তাদেরই প্রভাব ও প্রতিপত্তি সকলের উপর!

কিন্তু ঐশ্বর্য্য বা শক্তি কোনোটাই মানুষকে পারিবারিক সুখ শান্তি এনে দিতে পারে না—যদি না নরনারীর মিলনের মূলে তাদের পরস্পরের প্রতি একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা থাকে। এই শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে যেখানে দুটি জীবন মিলিত হয় কেবলমাত্র সেইখানেই আদি-রিপু প্রীতির চন্দন-রসে তাদের ললাটে প্রেমের জয়টিকা অঙ্কিত করে দেয়। সেইখানেই তাদের বন্ধন হয়ে ওঠে অবিচ্ছিন্ন সুখ ও আনন্দের অচ্ছেদ্য নিগড়। তাদেরই সংসার হয়ে ওঠে পারিবারিক সুখশান্তির আদর্শস্থল। নারী সেখানে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে আত্মসুখ বিসর্জন দিতে চায়—তার দয়িতকে সর্বসুখে সুখী করবার জন্য, পুরুষও সেখানে হেলায় তুচ্ছ করে আপন স্বার্থ ও সম্ভোগস্পৃহা—তার প্রিয়তমার প্রীতির

জন্ত। নরনারীর সম্মিলিত এই পারিবারিক জীবনে সকল দেশে ও সকল সমাজেই সার্থকতা বহন করে নিয়ে আসে নারীর অতুলনীয় ত্যাগ ও কষ্টসহিষ্ণুতা। কারণ জননীর গুরুদায়িত্বভার ও অসংখ্য কর্তব্যের বোঝা বইতে হয় তাকেই। দীর্ঘ দশ মাস দশ দিন ধ'রে কুমার সম্ভবা অন্তসত্ত্বা নারীর যা কিছু কষ্ট ও অসুবিধা হাসিমুখেই সে তা সহ্য করে তার গর্ভস্থ সন্তানের মুখ চেয়ে! প্রসব বেদনার নিদারুণ যন্ত্রণা সে বিনা প্রতিবাদেই বারে বারে ভোগ করে। তার পর সন্তান পালনে প্রসূতির যা কিছু কঠিন কর্তব্য সে তা সযত্নে ও সবিশেষ সতর্কতার সঙ্গেই পালন করে। নারীর এই ত্যাগ ও কষ্টসহিষ্ণুতা ক'রে তোলে পুরুষের প্রেমকে আরও গভীর ও নিবিড়। পূর্ণ হ'য়ে ওঠে তাদের মিলিত জীবন বাৎসল্য-রসের উৎসারিত স্নেহধারায়। জেগে ওঠে তাদের অন্তরলোকে মায়া মমতা দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সূক্ষ্ম ও সুন্দর কোমল প্রবৃত্তিগুলি। মানুষ হ'য়ে ওঠে উদার ও মহৎ, প্রেমিক ও পরদুঃখ-কাতর এবং স্বজন ও পরিবার-প্রতিপালক শ্রেষ্ঠ জীব।

তবে বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন সমাজে জীবতত্ত্বের এই দুর্নিবার প্রভাবকে বহু বিভিন্ন উপায়ে সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত করা হ'য়েছে দেখতে পাওয়া যায়। সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেই আদি রিপুর কঠোর শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের একটা বিদ্রোহ ভাব চ'খে পড়ে এবং এই কারণেই সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের ও অন্যান্য প্রাচীন আদিম অধিবাসীদের সমাজে বহু বিবাহ তাদের অনুমোদিত বিধানের মধ্যে পরিগণিত। প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষও ঠিক পশুর ন্যায়ই স্বভাবগত বহুদারাসক্ত। নিজেদের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যাতে অশান্তি ও অকল্যাণের হেতু না হ'য়ে ওঠে এবং এর ফলে স্বগোষ্ঠীর মধ্যে যাতে বিরোধ ও ব্যভিচারের সৃষ্টি না হয় এই জন্য অসভ্য আদিম জাতিদের অনেকের মধ্যেই স্ত্রী-বিনিময় প্রথা প্রচলিত আছে। প্রাচীন তাহিটীদের মধ্যে বিবাহিত বন্ধুরা পরস্পরের সঙ্গে মাঝে মাঝে স্ত্রী-বিনিময় করে তাদের এই বহুদার প্রবৃত্তিকে সংযত রাখে। পলিনেশিয়ায় রাত্রির অতিথিকে ভোজ্য ও পানীয়ের সঙ্গে স্ত্রীদান করা অতিথি সৎকারের একটা অবশ্য পালনীয় বিধি। অষ্ট্রেলিয়ার কোনো কোনো আদিম জাতিদের মধ্যে পারিবারিক উৎসবে সমবেত সমস্ত নিমন্ত্রিত দম্পতীদের পরস্পরের সঙ্গে পত্নী-বিনিময় প্রথা প্রচলিত রয়েছে।



শিশুপালন। (সলোমন দ্বীপের আদিম জাতির মধ্যে পারিবারিক জীবন অনেকটা সুনিয়ন্ত্রিত হয়েছে বলা চলে। কারণ সেখানে স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলে আনন্দে শিশুপালনের কাজে লেগে যায়।)

নারী সম্বন্ধে এই যে একটা পরস্পরের অনুমোদিত সামাজিক শৈথিল্য, এটা কিন্তু আদিম জাতির ভিতরেরও একটা প্রাচীন রীতি অর্থাৎ তখনও ঠিক বিধিবদ্ধ সমাজ কিছু প্রতিষ্ঠিত হয়নি তাদের মধ্যে। পারিবারিক সম্ভ্রম বা বংশ-মর্য্যাদার অহঙ্কার তখনও তাদের মনকে সজাগ করে তোলেনি। তখনও তাদের মধ্যে বহু পতি ও বহু

পত্নীত্ব দোষের বলে বিবেচিত হয়নি। স্ত্রীর উপর স্বামীর একমাত্র অধিকার স্বীকৃত হ'য়েছিল বটে, কিন্তু স্বামীর ইচ্ছা ও অনুমোদনে অপর পুরুষকে আত্মদান করবার রীতি তাদের নারী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং এ ব্যাপার কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই দোষের বলে বিবেচিত হ'ত যেখানে নিবেদিতা স্ত্রীলোকটির স্বামী সেই পরদারভোগী অপর পুরুষের স্ত্রীকে লাভ করবার অধিকার পেত না। সুতরাং এ ব্যবস্থাকে অসভ্য



প্রেমের প্রতিযোগিতা। (দু'টি জুলু যুবক পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রছে—এই একটি জুলু তরুণীর প্রেমাকাঙ্ক্ষায়। এরা অসভ্য আদিম জাতি হ'লেও এরা বীরের জাত। হীনতা বা নীচতা জানে না। নারীর হৃদয় জয় করবার জন্য একে অপরের এই অসাক্ষাতে কোনো চেষ্টা করবে না। যে পারো জিতে নাও সামনা-সামনি! —আড়ালে নয়!—এই তাদের জাতীয় বিধি।)

যুগের বর্বর প্রথা ব'লে ঘৃণা করলে ঠিক সুবিচার করা হবে না, বরং এটাকে আদিম জাতির অপরিণত সামাজিক বিধান বলে মেনে নেওয়াই কর্তব্য। আদিম জাতিদের মধ্যে অনেক স্থলে এমনও অন্ধবিশ্বাস বদ্ধমূল দেখা যায় যে স্ত্রীসহবাসের সঙ্গে সন্তানের জন্মের কোনো সম্বন্ধ নেই! নিউ-গিনির উত্তর-পূর্ব কূলে ত্রোব্রিয়ান্ড্ দ্বীপের আদিম জাতিরা এই বিশ্বাসবশে পিতৃত্বের দায়িত্ব স্বীকার করে না। সেখানে মাতৃ পরিচয়ই সন্তানের একমাত্র পরিচয়—পিতার সন্তানের উপর কোনো অধিকার নেই! পিতার যা কিছু দায়িত্ব ভার, সেখানে তা মাতুলের স্কন্ধে গিয়ে পড়ে! অর্থাৎ ছেলের মাতামহী অথবা মামাকেই তার ভরণপোষণের ভার নিতে হয়। মাতুলের বিষয়-সম্পত্তি আসবাবপত্রের উত্তরাধিকারী সেখানে মাতুল পুত্র নয়, ভাগিনেয়ই সব। কারণ মাতুলের আপন পুত্রের উপর কোনো অধিকার থাকে না; সে আবার তার মামার কাছে মানুষ হয়!

এই বিপরীত সামাজিক বিধির মূলে আছে তাদের সেই ভ্রান্ত ধারণা যে স্ত্রী-সহবাসের সঙ্গে সন্তানের জন্মের কোনো সম্বন্ধ নেই। তারা বলে এবং বিশ্বাস করে যে মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা স্বর্গলোকে যায়। সেখানে জরা মৃত্যু নেই, দুঃখ দৈন্য নেই! সেটা চির-যৌবনের দেশ। কিছুদিন সেখানে সুখে ও আনন্দে যাপন করবার পর মানুষের আত্মা আবার পৃথিবীতে ফিরে এসে যখন কোনো স্ত্রীলোকের শরীরে প্রবেশ করে তখন সেই স্ত্রীলোকটির গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পায়। সম্ভবতঃ বাইবেলোক্ত যীশুর জন্মকাহিনী এই বিশ্বাস বশেই রচিত হয়েছে! এ ব্যাপারে পিতার কোনো সংস্রব নেই। সুতরাং এদের সমাজে পিতার কোনো দায়িত্ব নেই! 'জনক' এ 'সংজ্ঞাই' তাদের মধ্যে অজ্ঞাত! স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে স্থায়ী সম্বন্ধ সেখানে মাত্র দুটি—মাতা ও পুত্র এবং ভ্রাতা ও ভগ্নী। কাজেই স্বামী-নির্বাচন সম্পর্কে নারী সেখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইচ্ছামত যখন যে কোনো পুরুষের সঙ্গিনী হতে পারে তারা! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যৌবনের প্রথম মনোনীত পুরুষকেই তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবলম্বন ক'রে থাকতে চায়, যদি না সে পুরুষ তাকে ত্যাগ করে বা তার উপর অমানুষিক অত্যাচার ও উৎপীড়ন করে।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিম জাতিদের অনেকের মধ্যে পিতা স্বীকৃত হ'য়েছেন বটে এবং সন্তান পালনের সমস্ত দায়িত্ব ভার তার মাতার ভরণপোষণের সঙ্গেই তিনি গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু তাঁরাও মানতে চান না যে স্ত্রী-সহবাসের ফলেই সন্তানের জন্ম হয়। তারাও ওটাকে দৈব ঘটনা বলেই বিশ্বাস করে। পিতা কোনো শিশু আত্মাকে একদা স্বপ্নে দেখে এবং মাতাকে সেই স্বপ্ন বৃত্তান্ত জানায়—তখন সেই শিশু-

আত্মা মায়ের শরীরে প্রবেশ করে ও সন্তান হ'য়ে জন্মায়! কিন্তু বিশ্বাস তাদের যাই থাক না কেন, পিতাকে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেওয়াতে সেখানে একটা পারিবারিক্ সম্বন্ধ স্থাপিত হবার সুযোগ হয়েছে এবং এই থেকেই ক্রমে পরিবার ও সমাজ গড়ে ওঠবার পথ পেয়েছে।

যেখানে বহু বিবাহ প্রচলিত আছে সেখানেও স্বামীর প্রতি তাঁর সেই একাধিক পত্নীর একনিষ্ঠ প্রেমের কোনো



পাণিপ্রার্থী। (কন্যার মনোনীত পাত্র এসে ভাবী শ্বশুরের সঙ্গে বিবাহপণের আলোচনা করছে। পণ হিসাবে এদের কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কার ছাড়া প্রধানত পাত্রপক্ষের দিতে হয় কন্যার পিতাকে প্রচুর গো-ধন।)

অভাব দেখতে পাওয়া যায় না। আবার পতি হিসাবে তিনি যেমন *প্রত্যেক স্ত্রীকেই ভালবাসেন, পিতা হিসাবেও* তেমনি তাদের প্রত্যেকের সন্তানকেই স্নেহ করেন। সুতরাং পারিবারিক সম্বন্ধও তাঁদের অটুট থাকে। অনেকেরই ধারণা এই বহু বিবাহ পুরুষের সেই সনাতন ও প্রকৃতি-গত বহু দার প্রবৃত্তিরই পরিচায়ক। কিন্তু ওটাই একমাত্র কারণ নয়। আদিম-জাতির মধ্যে শৌর্য্যে-বীর্য্যে পরাক্রমে ও পদমর্য্যাদায় যিনি যত বড় তিনি তত গুলি বিবাহ করতে পারেন। বহু পত্নী যার—আদিম জাতির সমাজে সেই লোক কুলে শীলে ধনে মানে শ্রেষ্ঠ ব'লে গণ্য হয়। তার স্ব সমাজের সমস্ত লোক তাকে গোষ্ঠীপতি ব'লে স্বীকার করে নেয়! রাজপদ, রাজমর্য্যাদা ও রাজার উপভোগ্য সম্মান সে লাভ করে। তার বংশের পুত্রকন্যারা রাজপুত্র ও রাজকন্যার তুল্য সমাদরে প্রতিপালিত হয়। তার পুত্রকন্যারা যে কোনো সাধারণ লোকের ঘরে বিবাহ করতে পারে না। অন্ততঃ কোনো সর্দারের ঘরে তাদের বিবাহ হওয়া চাই। এমনি ক'রে ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে বংশ মর্য্যাদা ও পদগৌরবের অহঙ্কার এসে প্রবেশ করেছে। মাতৃ-পরিচয়ে পরিচিত বংশের কন্যাদের সঙ্গে পিতৃ পরিচয়ে গর্বিত ছেলেদের বিবাহ চলে না। কারণ মাতৃ পরিচয়ের কুলে অসবর্ণ বিবাহ দোষের নয়, কিন্তু পিতৃ-পরিচিত সমাজে ওটা নিষিদ্ধ! এমনি ক'রে মানুষের মধ্যে বিবাহের বিধি নিষেধ এসে ক্রমে ক্রমে যে কোনো নরনারীর মধ্যে নির্বিচারে যৌন সম্পর্ক



বিবাহের অঙ্গীকার। (উভয়ে পরস্পরের হাতে হাত রেখে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। আজ থেকে এরা দু'জনে দুজনের কাছে মিলনে বাগ্‌দত্ত বলে গণ্য হবে।)

স্থাপন করাটাকে সংযত সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করে এনেছে। মাতৃসম্পর্কীয়া কোনো নারীর সঙ্গে পুরুষের সহবাস অপরাধ বলে গণ্য! সমস্ত 'অসভ্য বর্বর' আদিম জাতি এরূপ মিলনকে শুধু অন্যায় বলেই মনে করে না, অধর্মাচরণ ও পাপ বলে ঘৃণা করে! অথচ সভ্যতাভিমানী প্রাচীন মিশরে ও বৌদ্ধযুগের ভারতবর্ষে ভ্রাতা ভগ্নী

সম্পর্কীয়দের মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল দেখা যায়। প্রাচীন মিশর রাজবংশে সহোদর ভাই ভগ্নীর মধ্যেও পরিণয় নিষিদ্ধ ছিল না। বর্তমান য়ুরোপের সুসভ্য সমাজেও সহোদর ছাড়া ভ্রাতা ভগ্নী সম্পর্কীয়দের মধ্যে বিবাহে কোনো বাধা নেই। মাতৃস্থানীয়াদের ও কন্যাসম্পর্কীয়াদের সঙ্গেও কোনো কোনো সমাজে পরিণয় প্রচলিত আছে। সুতরাং বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন জাতির মানব সমাজের গঠন ও বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে আদি-রিপুর প্রভাব ও তার নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টাই বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়েছে দেখা যায়! অবশ্য এর সঙ্গে পরে বংশমর্য্যাদা, উত্তরাধিকার ও সম্পত্তি ভোগ-দখলের ব্যাপারটাও জড়িয়ে পড়েছে। যা থেকে বর্তমান সভ্য-জগতের মানব-সমাজ একটা নির্দিষ্ট রূপ নিতে পেরেছে।

সহোদরা, মাতৃস্বরূপিণী ও কন্যাস্থানীয়া নারীর সঙ্গে পুরুষের যৌন-সম্বন্ধ স্থাপন নিষিদ্ধ হওয়ার প্রধান কারণ আর অন্য কিছুই নয়, পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলা ও প্রীতি অটুট রাখা ও সামাজিক জটিলতার সৃষ্টি না করা! কারণ মানুষ তার দীর্ঘকালের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে এ সত্য আবিষ্কার করতে পেরেছিল যে আদিরিপুর প্রভাব মানুষকে পশুর চেয়েও উন্মত্ত ক'রে তোলে! সুতরাং অগম্যাগমনের কঠোর বিধি নিষেধ প্রচলিত না থাকলে একই নারীর জন্য পিতা পুত্রের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। ভগ্নীকে-বিবাহ নিষিদ্ধ না করলে ভায়ে ভায়ে প্রীতি ও সদ্ভাব রক্ষা করা দুঃসাধ্য! পরস্ত্রীগমন নিষিদ্ধ না হ'লে মানুষের সঙ্গে মানুষের পরস্পর বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্পর্ক লোপ পায়! তা ছাড়া, এরূপ অবস্থায় বংশের ধারা রক্ষা করা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। উত্তরাধিকার ও সম্পত্তি বিভাগের নিয়ম ভেঙে যায়। সন্তানের পিতৃ-পরিচয় নিয়ে গোল বাঁধে, একটা ঘোরতর সামাজিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়! এই সমস্ত অসুবিধা ও অকল্যাণ নিবারণের উদ্দেশ্যেই কেবলমাত্র নিঃসম্পর্কীয় নরনারীর মধ্যে যৌনসম্বন্ধ স্থাপন সীমাবদ্ধ হয়েছে এবং তাদের মিলনকে বিবাহ অনুষ্ঠানের দ্বারা—একটা ধর্ম ও সমাজানুমোদিত কার্য্য বলে গ্রহণ করার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে।

এই বিবাহের রীতি বা নরনারীর সমাজানুমোদিত মিলন-প্রথা বিভিন্ন আদিম জাতির মধ্যে বিভিন্ন নিয়মে অনুষ্ঠিত হয়। অধিকাংশ সম্প্রদায়ের মধ্যে বাল্য-বিবাহপ্রথা প্রচলিত। পিতামাতা তাঁদের ইচ্ছা ও অভিরুচিমত বিবাহের অনুকূল ও পছন্দসই পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচন করেন এবং অতি শৈশবেই পুত্রকন্যার বিবাহকার্য্য সম্পাদন করেন। কিন্তু পুত্র কন্যাদের তাঁরা যৌবন প্রাপ্তির পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত পরস্পরের সঙ্গে একত্র বাস করার সুযোগ দেন না। আবার অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে যৌন-বিবাহ রীতি প্রচলিত। বিবাহযোগ্য পরিণত-যৌবন নরনারী পরস্পরকে ভালবেসে মনোনীত ক'রে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। যেমন আধুনিক সভ্যজগতে অর্থাৎ বর্তমান য়ুরোপে এখনও প্রচলিত রয়েছে। তবে জগতের প্রাচীনতম অসভ্য বর্বর আদিম জাতি ও বর্তমান জগতের সভ্য শিক্ষিত ও উন্নত জাতির এই স্বয়ম্বর প্রথার মধ্যে সামান্য কিছু প্রভেদ ও পার্থক্য আছে। অসভ্য বর্বর আদিম জাতির মানুষ যৌবনকে বিশ্বাস করতে পারে না, তাই যুবক যুবতীর নিভৃতে মিলন তারা নিরাপদ নয় জেনে



বিবাহ উৎসব। (সমস্ত জুলুপল্লী সানন্দে সুসজ্জিত হ'য়ে এসে যোগ দেয় গ্রামের যে কোনো বিবাহ উৎসবে।)

সর্বদা একজন অভিভাবকস্থানীয় তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে তাদের একত্র হবার সুযোগ দেয়। কিন্তু য়ুরোপ তাদের নিভৃতেই একত্র হবার সুযোগ দেয়। য়ুরোপের এ উদারতা বিপজ্জনক হ'লেও প্রশংসনীয়। তাদের সাহস আছে। তারা যৌবনকে ভয় করে না। আদিম জাতির কোনো কোনো সম্প্রদায় আবার এ বিষয়ে য়ুরোপকেও পশ্চাতে ফেলে রেখেছে। তারা বাক্‌দানের পর মধ্যে মধ্যে একত্র বাসেরও সুযোগ দেয়, কারণ এর ফলে কন্যা সন্তান-সম্ভবা হ'লেও কোনো ক্ষতি হয় না—যেহেতু সে বিবাহ অনিবার্য্য এবং সে সন্তান বিবাহিত পিতা-মাতার সন্তান বলেই গণ্য হবে। 'জারজ' বলে অভিহিত হবে না।

আদি-রিপুর প্রভাব আদিম জাতির মধ্যে নানা বিচিত্র ভাব-ভঙ্গীর সাহায্যে প্রকাশ পায়। যদিও সভ্য-জাতির ভাবভঙ্গীর সঙ্গে তার আদৌ মিল নেই, তথাপি সর্বত্র তা অশোভন অশ্লীল বা বিসদৃশ বলা চলে না। বরং অনেক স্থলে তা সুন্দর ও কবিত্বময়! যেমন সলোমন দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে প্রণয় নিবেদন ব্যাপারটি অতি চমৎকার। কোনো তরুণ যদি কোনো তরুণীকে ভালোবেসে প্রেম নিবেদন করতে চায় তাহ'লে একদা সুযোগ বুঝে সে তার বাঁশীখানি হাতে করে আসে তার প্রণয়িনীর দ্বারে; অতি আদরে ও সোহাগে তার হাতখানি ধ'রে মুখের পানে চেয়ে থাকে। চারিচক্ষের সম্মিলনে যখন ফুটে ওঠে শুভদৃষ্টির নিবিড় অনুরাগ, সরম সঙ্কোচে মুদে আসে তাদের আঁখি পল্লব। তারা পরস্পরের দিকে পিছু ফিরে দাঁড়ায়; তখন প্রেমগদগদ সুরে তরুণ তোলে তার বাঁশীতে প্রণয়-নিবেদনের মধুর ঝঙ্কার, সে-সুরে উতলা হ'য়ে ওঠে তরুণীর মন! স্থির হয়ে যায় তাদের মিলন-উৎসব, তারা হয় সেদিন থেকে পরস্পরের বাক্‌দত্ত।



প্রেম নিবেদন! (বোর্ণিও দ্বীপের দায়াকদের মধ্যেও তরুণ তরুণীরা পরস্পরের সম্মুখেই পরস্পরের প্রণয়িনীকে প্রেম নিবেদন করে—উভয়ে উভয়ের নাসিকায় নাসিকা স্পর্শ ক'রে। চুম্বন করাকে এরা কুৎসিত প্রথা বলে ঘৃণা করে।)

আদিম জাতিদের মধ্যে চুম্বনপ্রথা নেই। না স্নেহে—না প্রেমে। আদি-রিপুর প্রভাবে তারা পরস্পরের সঙ্গে নাসিকার দ্বারা নাসা পীড়ন করে! সন্তানকে তারা আদর করবার সময় গণ্ডে গণ্ড স্পর্শ করে। প্রিয়তমের অধর পরশ থেকে বঞ্চিত হ'লেও রসনা স্পর্শের দ্বারা তারা সে অভাব পূর্ণ করে নেয়। আঁখি-পল্লবে মৃদু দশনাঘাত তাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সোহাগ! পরস্পরের মনোহরণের জন্য বসনে ভূষণে কেশবিন্যাসে অঙ্গরাগে ও রূপসজ্জায় তারা নিজেদের সুসজ্জিত করতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করে না। অবশ্য তাদের সে আদিম সমাজের টয়লেট্ ও বস্ত্রালঙ্কারের ফ্যাশান একালের সভ্যজগতের ছেলেমেয়েদের হালফ্যাশানের সঙ্গে কিছুমাত্র মেলে না, তাহলেও এটা অস্বীকার করা চলে না যে তাদের সৌন্দর্য্যবোধ নেই! পলিনেশীয়ানদের মধ্যে নারীর রূপ একান্তভাবে পুরুষের সংপ্রশংস দৃষ্টি



গণেশ জননী ! (বেশভূষায় রূপে ঐশ্বর্য্যে দীন হ'লেও মাতৃস্নেহে এই সন্তানবতী জননী যে-কোনো সভ্য-জাতির মায়ের মতই ভাগ্যবতী ! মনে হয় শিশুকে ভোলাবার জন্ত মা যেন ওদের ভাষাতে এই ছড়াই বলছেন—
"ধন ! ধন ! ধন ! বাড়ীতে বাকস বন !
এ ধন যার ঘরে নেই তার বৃথাই জীবন !"

আকর্ষণ করে যখন সর্ব্বপ্রথম তরুণী-প্রিয়ার সর্ব্বাঙ্গে গর্ভসঞ্চারের সুলক্ষণগুলি প্রকাশ হ'য়ে ওঠে। তারা উল্কী পরে, অলঙ্কার পরে, সিঁথিকাটে, কাণে ফুল গোঁজে, অঙ্গে গন্ধদ্রব্যের প্রলেপ দেয়, স্নেহপদার্থের সংযোগে কেশ প্রসাধন করে। আদি-রিপুর আরাধনায় তারাই সভ্যজগতের মহিলাদের প্রথম পথপ্রদর্শন করিয়েছে বলে মনে হয়! আদি-রসাত্মক রঙ্গরস ব্যঙ্গ কৌতুক ও হাস্য-পরিহাসও তাদের মধ্যে খুবই প্রচলিত দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে পাত্র বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সকলের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করার নিয়ম নেই। যৌন-মিলনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সরস আলোচনা তারা প্রকাশ্যভাবেই সকলের সঙ্গে করে—কেবল পিতা ও ভ্রাতার সঙ্গে এরূপ আলোচনা একেবারেই নিষিদ্ধ! মোটের উপর আদিমজাতির মানুষকে আমরা অসভ্যই বলি আর বর্ব্বরই বলি, আদি-রিপুর প্রভাবকে তারা অনেক অনেক সভ্যজাতির অপেক্ষাও অধিকতর সংযত রাখতে পেরেছে দেখা যায়।

নামকরণ

শ্রীবিজয়কুমার বড়াল

রাত্রে আহারে বসিয়াছিলাম—গৃহিণী খানিক তফাতে বসিয়া তদারক করিতেছিলেন।

আমার মাসিক-পত্রিকা ও ছাপাখানা সংক্রান্ত দুই-চারিটা জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনি বলিলেন, "দেখ, আজ একটা নাম ঠিক করে ফেলেছি।"

সহসা কিছু বুঝিতে না পারিয়া চোখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিলাম ; তিনি বলিলেন, "'জুলিয়া' কেমন নাম ? —খুকীর সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে যাবে।"

আমি মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "হঠাৎ এ-রকম অদ্ভুত নাম কি-করে জোটালে—কোনো মাসিক-টাসিকে পড়েছ বুঝি ?"

তিনি ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিলেন, "ইঃ, সবতাতেই সন্দেহ আর জেরা—ভালো লাগে না বাপু।···কেন, আমি নিজে ভেবে-চিন্তে কিছু বার করতে পারি না—না ?"

আহারে মনঃসংযোগ করিয়াছিলাম, থামিয়া বলিলাম, "আচ্ছা, এখন না-হয় ওর জুলজুল্ চাহনির সঙ্গে ওই নামটা পুষিয়ে গেল—কিন্তু পরে ?"

গৃহিণী তিরস্কারের সুরে বলিলেন, "পরে কি ? আমাদের মেয়ে বড় হলে সুন্দরী হবে না—এই বুঝি তুমি বলতে চাও ?"

"রামঃ ! মেয়ের বাপ কখনো তেমন কথা বলতে সাহস করে ?···আমি বলছি কি, ছা-পোষা গেরস্থঘরে ও-সব হাল-ফ্যাসনের নামের জেল্লা ধোপে টিকবে না—বিশেষ করে যাঁদের ঘরে ওর বিয়ে দেব তাঁরা যে ড্রয়িংরুম পিয়ানো মোটর-গাড়ির মালিক থাকবেনই—এমন ত বলা যায় না।"

তিনি ঝঙ্কার তুলিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার ঐ এক কথা—রাম না-জন্মাতেই সাতকাণ্ড রামায়ণ !"

"না-জন্মাতেই ?"—আমি হাসিলাম এবং গৃহিণীরও মুখের ভাব পরিবর্ত্তন হইল।

বলিলেন, "কিন্তু যা-ই বল, নামটা বেশ নতুন ধরণের, নয় ?"

"তা তো নিশ্চয়ই ; কিন্তু ওর চেয়েও নতুন ধরণের নাম আমি বিশ-পঁচিশটা বলে যেতে পারি।"

গৃহিণী উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন—বলিলেন, "কই, বল দেখি গোটা-কতক—তুলনা করে দেখি !"

"থাক্‌গে, সে-সবের আর দরকার নেই।…সোজা কথা, ও-সব চটক্‌দার নাম বাদ দিয়ে সাদাসিধে একটা বাংলা নামই রাখা ভাল।"

প্রস্তাবটা তাঁহার মনঃপূত হইল না, অভিমানভরে দৃষ্টি নত করিয়া আঙুলে আঁচলের খুঁট পাকাইতে পাকাইতে বলিলেন, "আমার কোনোটাই যদি তোমার মনে ধরে !"

একটা সরস উত্তর ঠোঁটে আসিয়াছিল—চাপিয়া গিয়া অপাঙ্গে চাহিয়া শুধু মৃদু হাস্য করিলাম।

কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার পছন্দসই বাংলা নামই না-হয় বল।"

"ঐখানেই তো বিরাট চিন্তার ব্যাপার ! ঠিক নামটি পেতে হলে অনেক খানা ডোবা ডিঙ্গোতে হবে, নয়ত কোন্ দিক থেকে কার মা-মাসী-পিসী চুরীর দায়ে ফেল্‌বে !…"

আহার সমাপ্ত হইয়াছিল—জলের গ্লাসটা মুখের কাছে তুলিয়া লইলাম।

গৃহিণী উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "যা-হোক, তুমি শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর একটা নাম ঠিক করে দাও—আর ক'দিন পরেই তো খুকীর অন্নপ্রাশন।"

তারপর আর একবার স্মরণ করাইয়া দিলেন "কিন্তু নাম খুব আধুনিক হওয়া চাই !"

*

* *

পরদিন রাত্রেই। মাদুরে পড়িয়া বিশ্রাম করিতেছিলাম। গৃহিণীর প্রশ্নের উত্তরে মাথা নাড়িয়া বলিলাম, "দেখ, পরশু দিন আসছে মাসের কাগজখানা বের করে দিয়ে দিনকতক নির্ঝঞ্ঝাটে ভাববার সময় পাবো—তখন নাম একটা ঠিক করে নেব অখন।"

তিনি স্পষ্টই মুখভার করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বলিলাম, "তবে হ্যাঁ, তোমার অনুরোধ যে আমি মোটেই পালন করিনি—তা নয়।…একটা নাম আমার ভারী পছন্দ হয়েছে—কিন্তু তোমার কি-রকম লাগবে সেইটেই আসল প্রশ্ন।"

"বাঃ, নামটা না-শুনেই আমি কেমন করে বলব ?" তাঁর কণ্ঠস্বরে আগ্রহ সুস্পষ্ট।

একটু ইতঃস্তত করিয়া মুখে কিঞ্চিৎ হাসি আনিয়া বলিলাম, "আচ্ছা, 'জুলিয়া' নামটি কেমন ?—বেশ নতুন রকমের, মিষ্টি-মিষ্টি নয় ?"

তিনি সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ, তুমি খুব যা-হোক ! কাল রাত্রে আমিও তো ওই নামটা বলেছিলুম, মনে নেই ?"

মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলাম, "তাই নাকি ?…তবে তো খুবই সুবিধে হল !…তাহলে ঐ নামই রাখা যাক।"

তিনি খুসী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু তোমার হঠাৎ নামটা মনে হল কি-করে শুনি ?"

আমি উঠিয়া বসিয়া আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ, ব্যাপারটা তোমায় বলাই উচিত। দুপুরবেলায় আপিসে বসে বসে একটা গল্প পড়ে দেখছিলুম, কেষ্টধন একটুকরো কাগজ এনে দিয়ে বললে যে একজন মেয়েলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

"আজ বারো বচ্ছর প্রেস চালাচ্ছি—মেয়েলোক কখনো মোলাকাৎ করতে আসেনি, সুতরাং দস্তুরমতন অসাধারণ ব্যাপার !…কাগজটুকু খুলে দেখি—হ্যাঁ, আমার সার্টের পকেটে ওটা আছে, তোমায় দেখাবার জন্য এনেছিলুম, নিয়ে এসো দেখি।……

গৃহিণী উঠিয়া কাগজটুকু লইয়া আসিলেন ; আমি বলিতে লাগিলাম, "হ্যাঁ, এই।…দেখ দেখি কি সুন্দর হাতের লেখা, আর কেমন চমৎকার নামটি !—'মিস্ জুলিয়া জোয়ার্দ্দার, লেখিকা—'সোনার শিকল'।'…আঃ, সে কি মেয়ে—চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আলাপ-আলোচনায় পাকা দুটি ঘণ্টা হাওয়া হয়ে গেল !"

গৃহিণী নড়িয়া সরিয়া বসিলেন, গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি নিয়ে আলাপ হল ?"

"সে-সবের মাথামুণ্ডু কি তুমি বুঝবে—না আমিই বুঝাতে পারবো তেমন করে ?···তবে, তাঁর বড়ই ইচ্ছে যে একদিন এখানে এসে তোমার সঙ্গে আলাপ করে যাবেন—যদি তুমি অনুমতি দাও অবশ্য। আমাকে তো একেবারে নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত করে ফেললেন—তবে যাবো বলে কথা দিতে পারিনি, কেমন একটু—। যাক্‌গে সে-সব, কথা হচ্ছে ঐ নামটি—'জুলিয়া'—খুকীর ঐ নাম রাখা চাই-ই! একটা স্মরণীয় দিনের স্মারক হয়ে থাকবে, কি বল ?"

গৃহিণী কেবল মুখ গম্ভীরতর করিয়া আমার পাতের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

আমি ক্ষান্ত না-হইয়া কণ্ঠস্বরে রীতিমত উৎসাহ প্রকাশ করিয়া বলিলাম, "আচ্ছা, নামটা কেমন মিষ্টি লাগে বল দেখি ?—'মিস্ জু-লি-য়া তলা-পা-ত্র!' যখন ডাকবে, 'জু-লী', 'জু-ল্-লী'! আহা, কাণে যেন মধু ঢালে!"

আমি নিজের উচ্চারণ-বৈচিত্র্যে নিজেই মোহিত হইয়া পরম আবেশে দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ফেলিলাম!···

* *
*

তাহার পর কিছুকাল অতিবাহিত হইয়াছে; আমাদের কন্যা শ্রীমতী নয়নতারা এখন হামাগুড়ি দিয়া দুর্ব্বোধ্য ভাষায় আলাপ করিয়া বেড়াইতেছে।

রূপ-চর্চ্চা

অধ্যাপক শ্রীতারাচরণ মুখোপাধ্যায়

স্নিগ্ধ শ্যাম বনানীর লীলায়িত লাবণ্যে দেখি রূপ আর সৌন্দর্য্যের অজস্র বিলাস। জড় প্রকৃতির রেণুতে রেণুতে হাস্যোজ্জ্বল রূপের ভুবনভুলানো অপরূপ শ্রী। রূপ নর ও নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। বিধাতার সৃষ্ট জগতে মানুষের জন্মগত অধিকার রূপের নির্ম্মল শুচিতা। রূপ অপরূপের আভাস দেয়। তাই রূপ সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠ শিল্প, চিত্র, কবিতা, সাহিত্য, ভাস্কর্য্য ও চারু কলার প্রাণ। বাস্তবে যে রূপের অস্তিত্ব মানুষের মনে আনন্দ দেয়, সেই রূপই মানুষের চৈতন্যে অক্ষয় হবার উদগ্র কামনা সৃষ্টি করে। কামনা থেকেই সৃষ্টি প্রেরণা। তা থেকেই তাবৎ চারুকলার সৃষ্টি। রূপ আকর্ষণ করে মানুষের অন্তরের শিল্পী মনকে। সে আকর্ষণে যুগপৎ ব্যথা আনন্দ ঘনীভূত। ব্যথা হয়, রূপের অন্তরালে অপরূপের ছায়া দেখে। আনন্দ হয়, রূপের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের উজ্জ্বল আবেদনে।

জড় প্রকৃতির সহজ সৃষ্টিতে যে রূপের লীলা দেখা যায় তা মানুষের কাছে যথেষ্ট নয়। মানুষ চায় সৃষ্টি করতে। তাই তরু-বল্লরীর রম্য নিকুঞ্জ সৃষ্টি করে। যেন অনন্ত শান্তির নীড়খানি। মানুষের কাছে কিন্তু মানুষের দেহ ছাড়া অন্য কোনো জড় বস্তু বেশী প্রিয় নয়। এই দেহের সুকুমার লাবণ্য তাই মানুষকে মানুষের ওপর আকর্ষণ এনে দেয়। নর ও নারীর চিরন্তন আকর্ষণ রূপ। রূপ মানুষের চৈতন্যকে শুদ্ধ করে, জীবনকে পবিত্র করে। সৌন্দর্য্যের মধ্যে শুচিতার স্নিগ্ধ আবেদন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

নর ও নারীর প্রয়োজন তাই সুন্দর হওয়া। পুরুষ সুন্দর হয় প্রতিভার গরিমায়। নারী সুন্দরী হয় পুষ্পিত যৌবনের অকুণ্ঠ লাবণ্যে। সকলের ধারণা, নারীর রূপ ভগবানের দেওয়া। কতকটা সত্য 'হলেও কথাটা সর্ব্বতোভাবে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ রূপ-চর্চ্চা করলে উৎকর্ষ লাভ করা যায়। শরীরে শক্তি না থাকলে যেমন ব্যায়ামের দ্বারা শক্তি লাভ করা সম্ভব, তেমনি রূপের বেলাও চর্চ্চার দ্বারা বিশিষ্ট ভাবে উন্নতি লাভ করা সম্ভব। আর সে সম্ভাবনা বিলাস নয়। নারীর প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য রূপ-চর্চ্চা।

কারণ রূপ নারীর প্রধান সম্পদ। পুরুষের যদি প্রতিভা থাকে, তার পাশে দাঁড়াতে পারে রূপ। নারীর পুষ্পিত যৌবনের সুকুমার লাবণ্য অত্যন্ত সহজভাবেই পুরুষের প্রতিভার পাশে দাঁড়িয়ে নিজের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। নারীর রূপের মূল্য গভীর। যুগে যুগে জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পের প্রকৃষ্ট দ্যোতনা নারীর রূপ। শিল্পী বা কবির কাছে গোলাপের মত সুন্দর একখানি নারীমুখে সুনিবিড় সম্মোহন থাকা আশ্চর্য্য নয়। তাঁর কাছে নারীমুখ রক্ত-মাংসের পিণ্ড নয়। কবি দেখেন নারীর চোখের অন্তরালে গহন স্বপ্নের সুনিবিড় অতলতা। তার মুখের অজস্র সুষমায় কবি দেখেন সৌন্দর্য্যের বিপুল আবেদন। শুধু কবি বা শিল্পী নয়, সৌন্দর্য্যে জগৎ মুগ্ধ। ভগবান সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণ আদর্শ। যেখানে আমরা সৌন্দর্য্যের চরম অভিব্যক্তি দেখি, সেখানেই আমরা মনের অজ্ঞাতে একটা গভীর সত্তার সান্নিধ্য লাভ করি। পরিপূর্ণ আনন্দের বন্ধনহীন নির্ম্মল জীবনে আনন্দের প্রত্যক্ষ স্পর্শ পাওয়া যায়। আমরা ভালবাসি সেই আনন্দের জীবন। পূজা করি সেই সৌন্দর্য্যের

বিগ্রহকে, যাঁর রূপের মধ্যে কল্পনার পেলব আদর্শ মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। সে আদর্শ মূর্ত্ত হতে দেখি, উদয়-রবির হিরণ কিরণে, সূর্য্যাস্তের উদাস লালিমায়,কখনো মন্থর প্রকৃতির বল্লরী-বেষ্টিত সুস্নিগ্ধ শান্তিতে, কখনো পূর্ণচন্দ্রের পাগল-করা আলোর জোয়ারে ; দেখি মানুষের সরল বাধা-বন্ধনহীন মুক্ত উদার জীবন-ধারায়, শিশুর অকলঙ্ক মুখের নির্ম্মল শুচিতায় বা অম্লান যৌবনে নারীর লীলায়িত তনু-লাবণ্যে।

জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা বিরাট সৌন্দর্য্যের জীবনে রূপায়িত হওয়া। আমরা সুন্দরকে ভুলেছি। কিন্তু যখনই তার আভাস পাই, অমনি মনে পড়ে হারানো সুন্দরের কথা। যেখানে সৌন্দর্য্যের আভা তীব্র, সেখানে আমাদের আকর্ষণও তীব্র। এ আকর্ষণ চৈতন্যের অনিবার্য আকর্ষণ। প্রকৃতির কোনো বাধা মানে না। দশখানি মুখ দেখলে, তার মধ্যে একখানি সকলের চেয়ে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। মনে হয়, সেই মুখের প্রত্যেকটী সূক্ষ্ম রেখা আমার জন্মান্তরের পরিচিত। তাকে হারিয়েছি। এ আকর্ষণের যেটা রহস্যের দিক—সেইটাই শিল্পে ও সাহিত্যে মিষ্টিসিজ্‌ম্‌। মিষ্টিক আকর্ষণে আছে অনন্তের আভাষ। তাই সে চৈতন্য সীমার বন্ধন লঙ্ঘন করে, অসীমের উল্লাসে আত্মহারা হয়। কিন্তু এটা হ'লো শিল্পীর দৃষ্টি ভঙ্গী। সাধারণ চোখে রূপ প্রকাশ করে উচ্ছল জীবনের পরিপূর্ণ উজ্জ্বলতা। যা সুন্দর তা কল্যাণময়, শুদ্ধ শান্তি-সম্ভ্রমের স্থির দীপ্তিতে অভিনব।

সৌন্দর্য্য বিলাস নয়। মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ অনিবার্য্য প্রয়োজন। সুন্দর হতে হবে দেহে, মনে আত্মায়, চিন্তায়, চেষ্টায়। বাস্তব রূপ-চর্চ্চায় দেখবো মানুষের দেহ কি করে সুন্দর করা যায়। অস্থি-চর্ম্মের শরীরটা আমাদের বাইরের প্রকাশ। অন্তরের নির্ম্মল বিভায় দেহ দীপ্ত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাই কথায় আছে, "মুখ মনের প্রতিচ্ছবি, চক্ষু হৃদয়ের।" এই জড় দেহ নগণ্য নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা ছেলেবেলা থেকে শিখে আসি "শরীরং ব্যাধি মন্দিরম্‌"। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমাদের শরীরটা কি শুধু ব্যাধিরই মন্দির? এই শরীরকে সৌন্দর্য্যের অপরূপ আদর্শে রূপায়িত করলে, প্রেমের বেদীতে এটা যে শুদ্ধ পবিত্র অর্ঘ্য হতে পারে? কামগন্ধহীন নিষ্কলুষ প্রেমের জন্ম হয়—আনন্দ-সুন্দর শুভ্র-সমুজ্জ্বল সৌন্দর্য্যের মহিমায়। যেখানে সৌন্দর্য্যের নিবিড় প্রকাশ সেখানে বিসদৃশ কোনো মনোভাবের অবকাশ থাকে না। তাই জগতের শাশ্বত শিল্প-সাধনার অন্তরালে বিরাট শুচিতার শুভ্র মহিমা। গ্রীক ভাস্কর্য্য আমাদের কামের অবকাশ দেয় না। নর ও নারীর সুঠাম নগ্নরূপে আমরা দেখি প্রকৃতির অজস্র দানের মোহন তুলিকাস্পর্শ। শুনেছি, পৃথিবীতে একটী সুন্দরী নারীর শুভ্র শুচিপরিপূর্ণ নগ্নরূপের চেয়ে অপরূপ আর কিছুই নেই। সেখানে কাম-কলুষ চোখের বীভৎস কুপ্রবৃত্তির কোন অবকাশ নেই। আছে পূত সম্ভ্রম, অনন্ত নিবিড় রহস্য। রক্ত-মাংস এত সুন্দর হতে পারে। আমরা সে সৌন্দর্য্যের দিকে অন্ধ কেন? সে সৌন্দর্য্য আমাদের একান্ত নিজস্ব সম্পদ। সুন্দর হওয়ার দাবী সব মানুষের স্বগত অধিকার। সহস্র অপূর্ণতার মাঝে সৌন্দর্য্য প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ দান। সে দানে বঞ্চিত হওয়া মানে, জীবনের নিবিড় রস থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকা। অন্তরে অন্তরে বুঝতে হবে—সৌন্দর্য্য আমাদের সাধনা, সৌন্দর্য্য আমাদের দাবী।

জড়দেহের সৌন্দর্য্যে নর ও নারীর উভয়েরই সমান প্রয়োজন। পুরুষের সৌন্দর্য্য অটুট স্বাস্থ্যের দীপ্ত আলোয়, নারীর সৌন্দর্য্য পেলব তনুর লীলায়িত লাবণ্যে।

পুরুষের সৌন্দর্য্য-চর্চ্চার জন্য ব্যায়াম প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিয়মনির্দ্দিষ্ট পথে ব্যায়াম অভ্যাসে দেহের প্রত্যেকটী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজের পরিপূর্ণ পরিপুষ্টি লাভ করে। পুষ্ট সবল দেহই স্বাস্থ্যের অমল শ্রীমণ্ডিত হয়ে ওঠে।

কিন্তু নারীর রূপ চর্চ্চা আরো সূক্ষ্ম ও কঠিন। নারীর রূপ-চর্চ্চার প্রয়োজনও নিবিড়। কারণ নারীর কাছে যুগে যুগে নর চেয়ে আসছে তার কল্পলোকের মানসী প্রিয়ার অপরূপ রূপ। মানুষ যেখানে তার কল্পনার মূর্ত্তিকে বাস্তবে রূপ নিতে দেখে, সেখানেই সে মুগ্ধ হয়। সেই সৌন্দর্য্যের চরণে চিরদিনই পুরুষের অজস্র শক্তি ও তীক্ষ্ণ প্রতিভার অকুণ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদিত। নারীর প্রয়োজন সেই আত্মদানের যোগ্য হয়ে ওঠা। তাদের গ্লানিহীন রূপের আলোয় উন্মুখ প্রতিভার চোখে প্রেমের শিখা জ্বালাতে হবে। কিন্তু কৈ সে অপরূপ রূপের আদর্শ? কোথায় আমাদের সাধনা—কোথা তপস্যা?

বিশেষ করে বাঙ্গালার মেয়েদের কথা বলি। তারা রূপকে অবহেলা করে আসছে। নিয়মিত রূপ চর্চ্চা তাদের চোখে গর্হিত। বোঝাতে হবে রূপ-চর্চ্চা মোটেই গর্হিত নয়—তাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। আগে অনুভব করতে হবে রূপ নারীর কত বড় সম্পদ, তবে রূপ-চর্চ্চায় আগ্রহ আসবে। শরীর ধারণের মতই রূপ-চর্চ্চা তাদের অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজন। ছেলেবেলা থেকে মেয়েরা শিবপূজা করে, বারব্রত করে, করে না আসল কাজটী। অন্তর আর বাইরের সৌন্দর্য্যকে তপস্যার দ্বারা উন্মুল করার কোনো চেষ্টাই নেই। অথচ সেইটাই আসল করার বস্তু, আসল কর্ত্তব্য।

এ ক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের অভাব প্রচুর। প্রথম অভাব শিক্ষা নেই। উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া দরকার যে মেয়েদের রূপই হোলো প্রধান সম্পদ—সুতরাং জীবনে বাঁচতে হলে পুরুষের যেমন শক্তি দরকার, নারীর দরকার রূপ। রূপকে অবজ্ঞা করে মেকী গুণ বাড়িয়ে জীবনকে শুষ্ক করে তোলা সভ্যতা নয়। তাবৎ বাঙ্গালী মেয়েদের স্কুল আর কলেজের শিক্ষার ওপর একটা তীব্র আকর্ষণ এসেছে। এর ফলে ঘরও যাচ্ছে, বাইরেও যাচ্ছে। নারীকে আমরা চাই কল্যাণীরূপে, খাঁটী নারী রূপে। যে পুরুষ যে নারীকে বিয়ে করবে, সে কখনোই তার কাছে জ্ঞান বা অর্থ আশা করে বিয়ে করবে না। সে চায় তার মানস লোকের কল্পনার আদর্শকে বাস্তবে দেখতে, বাস্তবে লাভ করতে। কল্পলোকের সুন্দরীর সঙ্গে আগে তার বিয়ে হয়ে যায়, পরে জীবনে সেই প্রিয়াকে সে আবিষ্কার করে লৌকিক বিয়ের ভেতর। কিন্তু জীবনে তাই কি ঘটে? মেয়ের বাবারা ভাবেন সম্প্রদানের সময়

বি-এ বা এম এ ইউনিভারসিটি সার্টিফিকেট বুঝি তার কন্যার সবচেয়ে বড় পাশপোর্ট। কিন্তু তা নয়। বারে বারে বলি, নারীর চাই রূপ ও লাবণ্য।

আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে মেয়েরা যখন কলেজ বা স্কুল থেকে মুক্তি পায়, তখন তাদের দে হ না থাকে লাবণ্য, না থাকে সুষমা। পরে আলোচনা করা যাবে কি ভাবে তাদের শরীর ক্ষয় হয়, কি ভাবে তার প্রতিকার করা যায় এবং স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বজায় রাখা যায়। যে শিক্ষায় মেয়েদের শ্রী হরণ করে নেয়, সে শিক্ষা কখনোই মেয়েদের বাঞ্ছিত হতে পারে না। স্ত্রী শিক্ষার প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত—রূপ-সাধনা। জড় শরীরকে কি করে সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ আদর্শে রূপায়িত করা যায়, তাই হওয়া উচিত নারীর সাধ্য ও সাধনা। ও দেশে মেয়েরা রূপ-সাধনার বৈজ্ঞানিক নিয়ম মেনে চলে। তাই দেখে তরুণীর উচ্ছল যৌবনে প্রাণের কি পরিপূর্ণ পুলক। তাদের মুখের কথায় পায়ের চলায়, চোখের চাওয়ায় সর্ব্বত্র একটা হাস্যোজ্জল জ্যোতির সম্মোহন! মানুষ না মুগ্ধ হয়ে পারে না। কি করে তারা এ সম্পদকে ঘরে বেঁধেছে, কি করে তারা আজ জগতের সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতায় সগর্ব্বে বিজয়িনী হচ্ছে, সে বিষয় আলোচনা হওয়া উচিত। ওদের দেশে, রূপ-লোকের অপরূপ মাধুরী ছিনিয়ে আনবার জন্য প্রত্যহ নব-নব অভিযান। তারা রবির আলো সেবন করে, মুক্ত উদার প্রকৃতির নির্ম্মল বায়ু সেবন করে। তারা সাগরে নদে নদীতে অবগাহন করে। তারা জানে মুক্ত প্রকৃতির সহজ দানে বঞ্চিত করে বিধাতার দেওয়া দেহটাকে ক্লিষ্ট করা সভ্যতা নয়।

দ্রষ্টব্য

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

এগারোটা পাঁচে খুলনা প্যাসেঞ্জার ছাড়িবে।

নিরঞ্জন যখন শিয়ালদা ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সাড়ে দশটার বেশী বেলা হয় নাই।

৬নং প্ল্যাটফর্ম্মে ঢুকিয়া যে ইণ্টার-ক্লাস কামরাখান সে বাছিয়া লইল তাহার ভিতরে অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না।

মনে হইল ওদিকে যেন দুজন বসিয়া আছে, নারীই বোধ হয়।

সে সুট্‌কেশটা রাখিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

একে একে দুয়ে দুয়ে আরো অনেকে আসিয়া পড়িল এবং ট্রেণ ছাড়িবার ঘণ্টাও দিল।

নিরঞ্জন উঠিয়া নিজের জায়গাটিতে গিয়া বসিল। সমস্ত ট্রেণখানা ষ্টেশনের বাহিরে যখন প্রখর রৌদ্র ও আলোকের মাঝখানে আসিয়া পড়িল তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে সহযাত্রীদের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

অনেক রকমেরই লোক উঠিয়াছে বাবুবেশী ও সাহেব-বেশী। কালো কোট গায়ে একজন ষ্টেশনমাষ্টারও বোধকরি উঠিয়াছে।

খুলনায় কি একটা ভ্যারাইটি শোর দরুণ কয়েকজন আর্টিষ্ট চলিয়াছে, তাহাদের ট্রাঙ্কের চাবি আনিতে ভুল হইয়াছে বলিয়া সোরগোল উঠিয়াছে। তালা ভাঙিবার চেষ্টা চলিয়াছে, ব্যাপারটা নাকি এই—যে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের উজানী-বইখানা উহার মধ্যে; তাহা দেখিয়া আবৃত্তির জন্য একটা কবিতা নির্ব্বাচন এবং মুখস্থ করিতে হইবে।

কিন্তু সমস্ত লোকের দৃষ্টি যেখানে আসিয়া শেষ হইয়াছে সেখানে দুটি নারী বসিয়া। একটি বিবাহিতা, আর একটি অনূঢ়া। দুজনকারই একই রংএর শাড়ী—একইভাবে পরা, স্যাণ্ডাল একই প্যাটার্ণের মখমলখচিত মুখশ্রী দেখিয়া মনে হয় দুটি বোন। সঙ্গে একটি কালো চশমা-পরা পুরুষ আছে, ছোট ছেলেমেয়েও আছে।

ও দুটি নারীকে নিরঞ্জন অনেকবার বাসে ট্রামে পথে-ঘাটে দেখিয়াছে। সিনেমায় থিয়েটারে দেখিয়াছে। বিশেষ করিয়া কুমারীর মুখখানা ভারী মিষ্টি বলিয়া তার ভালও লাগিয়াছে—স্মরণও আছে।

সে উহাদের বিশেষ করিয়া মেট্রোয় প্রায় দেখিয়া মনে করিত—হয়ত অ্যারিষ্টোক্র্যাটিক ওদেরই বলে।

যদিও তিনপুরুষ কলিকাতায় কাটাইয়া অভিজাতশ্রেণী সম্বন্ধে তার স্পষ্ট ধারণা এখনো হয় নাই।

মেয়েটির নাম সে জানিত না; পুরুষটি কি এক কথায় ডাকিল, প্রভা!

অতি সাধারণ নাম—সুপ্রভা হইলে একটু তবু নূতন হইত। কিন্তু তার চাপা ঠোঁট, তার পায়ের উপর পা দিয়া বসিবার কায়দা, তার চকিতে ফিরিয়া চাওয়া, তার মৃদুহাসি কাব্যময়।

নিরঞ্জন কবিতা লেখে না—কিন্তু পড়ে, বোঝে এবং রস গ্রহণ করে।

তার মনে হইল 'নাম কি হিমানী?'

বারাসত আসিয়া পড়িল। চেকার আসিয়া টিকিট দেখিল। আর্টিষ্টরা তার চাবি লইয়া আর একজনের কাছ হইতে সাঁড়াশি লইয়া তালা ভাঙিয়া ফেলিল। উজানী বাহির হইল। হৈ হৈ ব্যাপার!

দুধারের মাঠে ধান কাটিয়া তাড়া বাঁধিয়া রাখিয়া গেছে কৃষকেরা। পৌষের শস্যহীন শুষ্ক মাঠে উত্তরের হাওয়ায় ধূলিধূসরিত গাছগুলির পাতা কাঁপিতেছে, কাঁপিতেছে সেই মেয়েটির রুক্ষ চূর্ণকুন্তল। নিরঞ্জন মেয়েটির দিকের জানলা দিয়া বাহিরের দৃশ্য দেখিতেছে, মেয়েটি নিরঞ্জনের দিকের জানলা দিয়া বিস্তীর্ণ মাঠের দিকে চাহিয়া আছে। দুজনেরই চোখে চোখ মিলিয়া যাইতেছে কতক্ষণ, আবার সরিয়া গিয়া আবার মিলিতেছে।

দত্তপুকুর পার হইয়া গেল।

দেখিতে ক্লান্তি নাই, গোবরডাঙ্গা পার হইয়া গেল।

মেয়েটির দিদির মাথার কাপড় খসিয়া গিয়াছে, সে তার স্বামীর পাশে আসিয়া বসিয়া গল্প করিতে সুরু করিল, নিতান্ত ঘরোয়া কথা। তার বন্ধু কেন চশমার দামটা বেশী লইয়াছে, বীণার নাকি আরো কম দাম।

স্বামী বলিল—রও, মজাটি দেখাইমু। অপ্টিক্যাল ডিলুক্স্‌ বুরো নাম ঘুচাইমু।

ছেলেটা কাঁদিতে লাগিল, 'নিবু' খাইতে চায়। মা ভুলায়, খুড়ীমাকে কোথায় ফ্যালায়ে আস্‌লি?

ঘনবৃক্ষশ্রেণীতে ঢাকা যেশোর রোড লাইনের কাছে আসিয়া গেল, বনগাঁওয়ের কাছে লাইন পার হইয়া রাস্তা চলিয়া গেল।

বড় ষ্টেশন বনগাঁও। ভদ্রলোকের ছেলেরা 'অ্যাই খাবার' বলিয়া হাঁক দিয়া বিক্রয় করিতেছে, পান বিড়ি ও বেচিতেছে। হিন্দুস্থানীর বালাই নাই।

ছোট্ট মেয়েটি বলিল—বালীগঞ্জ।

তার বাপ বলিল—নারে পাগ্‌লি বালীগঞ্জ না এডা। বনগ্রাম।

ঝিকরগাছা ঘাটের কাছে তরুতরে নীল জল দেখা গেল একটি ছোট্ট নদীর।

প্রভা বলিয়া উঠিল, কপোতাক্ষ, না জামাইবাবু?

জামাইবাবুও বলিয়া দিল, হ্যাঁ।

প্রভা নমস্কার করিল কেন কে জানে, হয়ত মহাকবি মাইকেলকে স্মরণ করিয়া।

যশোর ষ্টেশন পৌঁছিবার আগেই ভৈরব পার হইতে হইল, দেখা গেল অসংখ্য দ্বিতল বাটি, ভাড়া গাড়ী, ট্যাক্সী।

উজানী হইতে তখন আবৃত্তি চলিতেছে। মাঝের দরজা দিয়া অনেকগুলি থার্ডক্লাসের যাত্রী এ কামরায় বন্ধুদের সহিত আড্ডা জমাইতে আসিতেছে।

তরুণীটি একটি র‍্যাপার বালিশের মত করিয়া বেঞ্চে গা এলাইয়া দিয়াছে। সিঙ্গে অবধি তার ঘুম আর ভাঙিল না।

নিরঞ্জন গাড়ীর অন্য কাহারও সঙ্গেই আলাপ করে নাই, এই পরিবারটির সঙ্গে করিবার অভিপ্রায় ছিল। যে উদ্দেশ্যে তার খুলনা যাত্রা, হয়ত এখানেই তা সাধিত হইত।

ভদ্রলোক ত খুলনায় নিশ্চয় নামিবেন, নামিবার মুখে আলাপ করিলেই হইবে। যে বাড়ীতে সে যাইতেছে তার ঠিকানাটা জিজ্ঞাসা করিলেই পথ সুগম হইয়া যাইতে পারে।

নিরঞ্জন বাহিরের দিকে চাহিয়া 'সিঙ্গে'র সিঙাড়ার সদ্ব্যবহার করিতেছিল; হঠাৎ ফিরিয়া দেখে ওদের পুরুষটি দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে এবং যৎসামান্য মালপত্র দরজার কাছে রাখিয়া চীৎকার করিতেছে—অশ্বিনী, অশ্বিনী...

ট্রেণ থামিতেই মেয়েদের এবং ছেলেদের নামাইয়া দিয়া সে নিজেও লাফাইয়া পড়িল।

নিরঞ্জন দেখিল ছোট্ট একটি দোকান—বেজেরডাঙ্গা।

বেজেরডাঙ্গার গেট্ পার হইয়া নিরঞ্জন দেখিল—চলিয়াছে সেই অতি আধুনিকা তরুণী রাজধানী নগরীর বিলাস-বৈভবে যাকে মানায়। চলিয়াছে হয়ত কোন্ পর্ণকুটীরে মাটির দাওয়ায়, বিরলবসতি গ্রামে। সেখানে তাহাকে দেখিয়া ছেলের দলে হুলুস্থুল জাগিবে না।

মেয়েরা নামিয়া যাইতেই গাড়ীর মধ্যে আসর বেশী করিয়া জমিয়া উঠিল। অজ্ঞাতসারে যে সঙ্কোচ বাধা দিতেছিল সেটা কাটিয়া গিয়া হুল্লোড় এবং অশ্লীল কথার বন্যা ছুটিল।

নিরঞ্জন দেখিল সে দেরী করিয়া সব মাটি করিয়াছে। নিজের জন্য সে পাত্রী দেখিতে খুলনায় চলিয়াছে। যে মেয়েটিকে এতই পছন্দ হইয়া গিয়াছিল তাহার পরিচয় লইতে কি দোষ ছিল?

দৌলতপুর কলেজের কাছে অনেক ছাত্র উঠিল; ভাগ্য ভালো যে মেয়েটি নামিয়া গেছে, নহিলে নিরঞ্জনের অস্বস্তি হইত।

খুলনায় ভৈরবের ধারে তার বাসা, বাজারের কাছে। বিদ্যুৎ-আলোকিত যেশোর রোডএর দুইপাশে ছবির মত ছোট সহরটি তাহার ভালই লাগিল; ভৈরবের অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি, পরপারে শ্যামবনশ্রেণীর অন্তরালে আইস্ ফ্যাক্টরীর প্রতিচ্ছায়া তাহার মনে গভীর রেখাপাত করিল, কিন্তু বেজেরডাঙ্গার সেই মেয়েটিকে সে ভুলিতে পারিল না। তার কথা সে শুনিয়াছে, তার হাসি সে দেখিয়াছে শুভ-দৃষ্টিও যেন হইয়া গেছে।

ইম্পিরীয়াল সিনেমায় সেই রাত্রে উজানীর আবৃত্তি হইয়া গেল; রূপশার ধার দিয়া তখন সে মোটরে করিয়া সহরের দিকে ফিরিতেছে, মনে জাগিতেছে বেজের-ডাঙ্গার কথা।

এই মনোবৃত্তি লইয়া পরদিন সকালে যখন সে মেয়ে দেখিতে গেল, তখন পছন্দ না হইবারই কথা। পরিপাটি করিয়া খোঁপা বাঁধিয়া, সুবিন্যস্ত বেশভূষায় যে সলজ্জ মেয়েটিকে বাহির করা হইল, তার উদাস অগোছালো ভাব ছিল না, রুক্ষ চূর্ণ-কুন্তল ছিল না, প্রখর ব্যক্তিত্বের ভঙ্গী ছিল না। মুগ্ধ করিবার যে অস্ত্র নারীর করায়ত্ব তা প্রয়োগ করিবার সুযোগ এ সরম-জড়িতার কোথায়? চঞ্চল লঘুপদক্ষেপে বেজেরডাঙ্গার মেয়েটি যেন নিরঞ্জনের মনের গহনবনে সাড়া দিয়া গেল। সে মুখের উপর কন্যাকর্ত্তাটিকে জবাব দিয়া আসিল।

সেইদিন অপরাহ্নে নিরঞ্জন খুলনার ঘাটে গিয়াছে, স্ন্যাপ্‌শট্ লইতে। বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, বরিশালের যাত্রীরা ভিড় করিয়া আসিতেছে। অসংখ্য নৌকা এদিকে ওদিকে যাত্রা করিতেছে যাত্রী লইয়া।

বরিশালগামী ষ্টিমার ধোঁয়া ছাড়িতেছে।

কয়েকখানা এক্স্‌পোজার দিয়া নিরঞ্জন পথে উঠিয়া আসিতেছে; হঠাৎ দেখে আগুন রঙা শাড়ী পরিয়া আধুনিকা একটি তন্বী সঙ্গীদের সঙ্গে কলকণ্ঠে বাক্যালাপ করিতে করিতে আসিতেছে। তারা পাশ কাটাইয়া জেটিতে গিয়া উঠিল।

চিনিতে বিলম্ব হইল, কিন্তু চিনিতে পারিল—এখন যাহাকে এত-ভালো-লাগিতেছে, সে মেয়েটি আর কেহই নয়, আজ সকালে যাহাকে অপছন্দ করিয়া আসিয়াছে।

কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরীর মত সে যেন বাতাসের সঙ্গে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে, তরঙ্গায়িত সমুদ্রের মত যেন উচ্ছ্বসিত হইতেছে। সন্ধ্যার ক্লান্ত কিরণে তার দৃপ্ত ভঙ্গী, তার উচ্চ কলহাস্য, লঘু পরিহাস, তীরের মত নিরঞ্জনকে বিঁধিতে লাগিল এবং বেজেরডাঙ্গাকে ছাপাইয়া আজ বরিশাল এক্সপ্রেস তাহাকে ব্যথা দিতে লাগিল। কিন্তু এ মেয়েটিও আজ দূরসুন্দর বনরেখার মতই সুদূর।

কলিকাতাগামী ট্রেণে উঠিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিল, পথে দেখিয়া যে মেয়েকে ভাল লাগিবে, তাহার পরিচয় লইয়া যদি দেখা যায় বিবাহে বাধা নাই, তবে পৃথক করিয়া কনে দেখার হাঙ্গাম সে আর রাখিবে না; কারণ ছেলেদের আধুনিক রুচির যুগে পাত্রী দেখানোর প্রথাটা নিতান্তই পুরাতন, কতকটা বর্ব্বরও বলা যাইতে পারে।

রাত্রি সাড়ে দশটায় হ্যারিসন রোডের উজ্জ্বল আলোকে যখন সে প্রবেশ করিল, তখন পিছনে ফেলিয়া আসা অন্ধকার গ্রামগুলির কথা দারুণ দুঃস্বপ্নের মতই বোধ হইল।

তবু ডায়েরীতে সে লিখিয়া রাখিল—বেজেরডাঙ্গা ষ্টেশনে ও বরিশাল এক্সপ্রেসে জীবনের দুটি দ্রষ্টব্য নারী দেখিলাম, একটিকে কোনোদিন পাইব না, আর-একটিকে হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। সে আপ্‌শোষ ঘুচিবার নয়।

তার জীবনের সঙ্গিনী আসিয়া এ লেখা দেখিয়া কি মনে করিবে আমরা জানি না। হয়তো নূতন কলহের সৃষ্টি করিবে, না নিজের নির্ব্বাচনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিবে! কিন্তু সে অন্য গল্প। তার জন্য আপনাদের অপেক্ষা করিতে হইবে।"

মলয়-যাত্রী

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল

যখন উপবনের বাহিরে এলাম কাণে রেশ রহিল পাহাড়-ঝরা জলস্রোত ও উপলরাশির বিরোধ-সঙ্গীতের। চোখে নেশার মত জড়িয়ে রইল—শৈল-ঘেরা সরোবরের আলো ও ছায়া। বিকচ কমলের শান্ত-হাসির স্মৃতি প্রাণে উল্লাসের অতি-মৃদু হিল্লোল তুলছিল। সহরতলীর এই নির্জ্জন অংশে কি আছে না আছে—লক্ষ্য করলে না অনুভূতি।

হঠাৎ চমক্ ভাঙ্গলো যখন শিখ্ টাক্সি-চালক প্রকাণ্ড একটা রুদ্ধ-দ্বারের বাহিরে গাড়ি থামালে।

—কেয়া ?

—চেটী-মন্দির হুজুর। সব্‌সে বড়া হিন্দু মন্দির।

প্রকাণ্ড মন্দির। তোরণ, গোপুরম, দেউল, সাত থাক্ স্বর্গ—তাদের অধিবাসী দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি—সমস্তই দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের অনুকরণে রচিত। কিন্তু মন্দিরের প্রশস্ত ভূমি জেলখানার মত প্রাচীর-ঘেরা। ব্রহ্ম এবং মলয়ে সর্ব্বত্র শ্রেষ্ঠীদের মন্দির-অঙ্গন ঐ রকম প্রাচীর-বেষ্টিত। রুদ্ধ দ্বার আমাদের ও শিখ ড্রাইভারের সম্মিলিত ধাক্কায় মুক্ত হল। একটি শিখ দ্বারবান অতি সাদরে অভ্যর্থনা করলে আমাদের—যখন শিখ্ ড্রাইভার বুঝিয়ে দিলে—কল্‌কাত্তাদা বাবুজি হুন ইথে আয়া কারাপড়া জাঙ্গমে। সে আবার আমাদের পরিচয় করে দিলে মলয়-ভাষায় মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে—যার মধ্যে কলকাতা, দোয়া আর বাঙ্গালী তিনটে শব্দ বোধগম্য হ'ল। কিন্তু স্বদেশ হ'তে প্রবাসে সদ্য-আগত ভক্তদ্বয়ের কল্যাণ-কামনায় তারা হৃদয়-নেংড়ানো যে সব স্বস্তি-বচন বল্লে—তার বিন্দুমাত্র বুঝলাম না। ভারতের নিবিড় ঐকান্তিক একতা প্রকটিত হল চক্ষের ভাষায়। মাঝে একবার সংস্কৃত ভাষা চেষ্টা ক'রে বলেছিলাম—অত্র পাঁটা বলিং ভবতি ?—কিন্তু তাদের অজ্ঞ বিস্ময়ের চাহনী দেখে বুঝলাম দেব-ভাষা তাদের কাছে নিরর্থক।

বিরাট নাট্য-মন্দির দেখলাম—যার প্রাচীর-গাত্র অনেক পৌরাণিক ঘটনার চিত্র-সম্পদে সম্পন্ন। মন্দিরের দেওয়াল কারু-কার্য্যে পূর্ণ। অনেক দক্ষিণ ভারতের বিধবা দেব-সেবার আয়োজন করছিল—নির্ম্মাল্যের, ভোগের, অর্চ্চনার। ভোগের প্রধান উপকরণ নারিকেল।

আমার মনে হ'ল—সকল রূপের অভিব্যক্তি হ'য়েছে; কিন্তু বাল্মিকীর সময় হ'তে অদ্যাবধি চেড়ীদের চেহারা মোটে বদলায়নি। সে অভিমত বঙ্গ ভাষায় ব্যক্ত করলাম।

—যারা এত যত্ন করছে—বিশেষ হাসছে—তাদের সম্বন্ধে এরকম অপ্রিয় মন্তব্য অযথা।—বল্লেন মিঃ অনিল গুপ্ত এটর্ণী-এট্-ল।

—সত্যের ওপর আস্থা ব্যবহারজীবীদের কম। তবে যখন মহিলারা হাসছে এবং যেহেতু তারা নিত্য দাঁত মাজে—আমি প্রত্যাখ্যান করছি নৃ-তত্ত্বের অভিব্যক্তির উপতত্ত্ব। তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য মনস্তত্ত্বের দিক থেকে যে তাদের অন্তর সুন্দর।

এই সব মহিলারা আজীবন দেব-সেবা করছে। নিজেরা নিষ্ঠাবতী নিত্যস্নায়ী। অপরিষ্কার শূদ্রদের ব্রাহ্মণী ঘৃণা করে দক্ষিণ ভারতে। এরা দেব-প্রীতির সুখ-স্বপ্নে দৈনন্দিন জীবনে হরিজনকে ভাবে অপদার্থ।

সেই শিখ্ দ্বারবানটি ব্যতীত কেহ আমাদের ভাষা বুঝলে না। এ রকম দুর্য্যোগ আমার নিজের দেশে আমার ভাগ্যে অনেকবার ঘটেছে। নাসিকে এক মারাট্টি ব্রাহ্মণ আমাকে অতি যত্নে নিজের বাড়িতে অতিথি ক'রে রেখেছিলেন। তাঁর সহধর্ম্মিণী এমন কি গুজরাটি অবধি জানেন না। কেবল ইঙ্গিতে তাঁর সঙ্গে কথা কহেছিলাম। তবে মহারাষ্ট্র ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ আছে—তাই তাঁর অন্ন-ব্যঞ্জনে পরিতৃপ্তি প্রকাশ করেছিলাম—অমৃত শব্দে। তিনি কতকটা উপলব্ধি করেছিলেন আমার কৃতজ্ঞতা। কারণ যেদিন নাসিক পরিত্যাগ করলাম তিনি রেশমী সাড়ির অঞ্চল দিয়ে স্নেহ-কোমল চোখ মুছলেন এবং গৃহ-দেবতার নির্ম্মাল্যে আমার মস্তক স্পর্শ করলেন।

এই শ্রেষ্ঠী-মন্দিরে এক বিরাট রন্ধন-শালা আছে। উৎসবের সময় মলয়-উপদ্বীপের দেশ-দেশান্তর হ'তে হিন্দু আসে। এখানে তাদের আহার্য্যের ব্যবস্থা হয়। অনেকগুলা

প্রকাণ্ড হাঁড়ি—এক একটাতে এক এক জোড়া পাহারা-ওয়ালা এমন কি ট্যাক্সিওয়ালা সিদ্ধ হ'তে পারে। অবশ্য ট্রাফিক্ পুলিসের পিঠের সাইন-বোর্ড হাড়ির কানায় আট্‌কায়।

যাযাবরদের পক্ষে অধিকক্ষণ এক স্থলে বাস অবিধেয়। বহুকষ্টে পাঞ্জাবী ভাষা ও নীরব-শ্রদ্ধার আন্তরিক আতিথেয়তা এড়িয়ে পথের মানুষ পথে এলাম। মনে ক্ষোভ হ'ল—চলতি ভাষার একটা সাধারণ মিলন-ক্ষেত্র নাই বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুর। উচ্চ-শিক্ষিতদের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা ছিল—এখন সে কৃষ্টিও বৃথা ব'লে সিদ্ধান্ত করেছেন সমাজের প্রধানেরা।

বিভিন্ন প্রদেশের স্ব-ধর্ম্মীর তীর্থস্থলে সাক্ষাৎ পেলে পরস্পরের মনে আনন্দ ও শ্রদ্ধা জন্মে একথা অস্বীকার কর্ব্বার উপায় নাই। তীর্থ-যাত্রার সেটা সুফল—হজ্ করবার ব্যবস্থার মূলে আছে নিশ্চয় কতকটা ঐ যুক্তি—মুস্লিম একতার। কাশ্মীরের গান্ধারবালের সন্নিকটস্থ ক্ষীর-ভবানীর মন্দিরে এক কাবুলী হিন্দু-পরিবার দেখেছিলাম। তারা পুত্রের চূড়াকরণ উৎসবে ব্যস্ত ছিল। আমরা চারজন বাঙ্গালী হিন্দু ছিলাম মন্দিরে। আমাদের ধ'রে তারা হোমাগ্নির চারিদিকে বসালে—পূজার শেষে প্রসাদী লাড্ডু এবং এলাচদানা খাওয়ালে—কাবুলী রুটি খাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করলে।

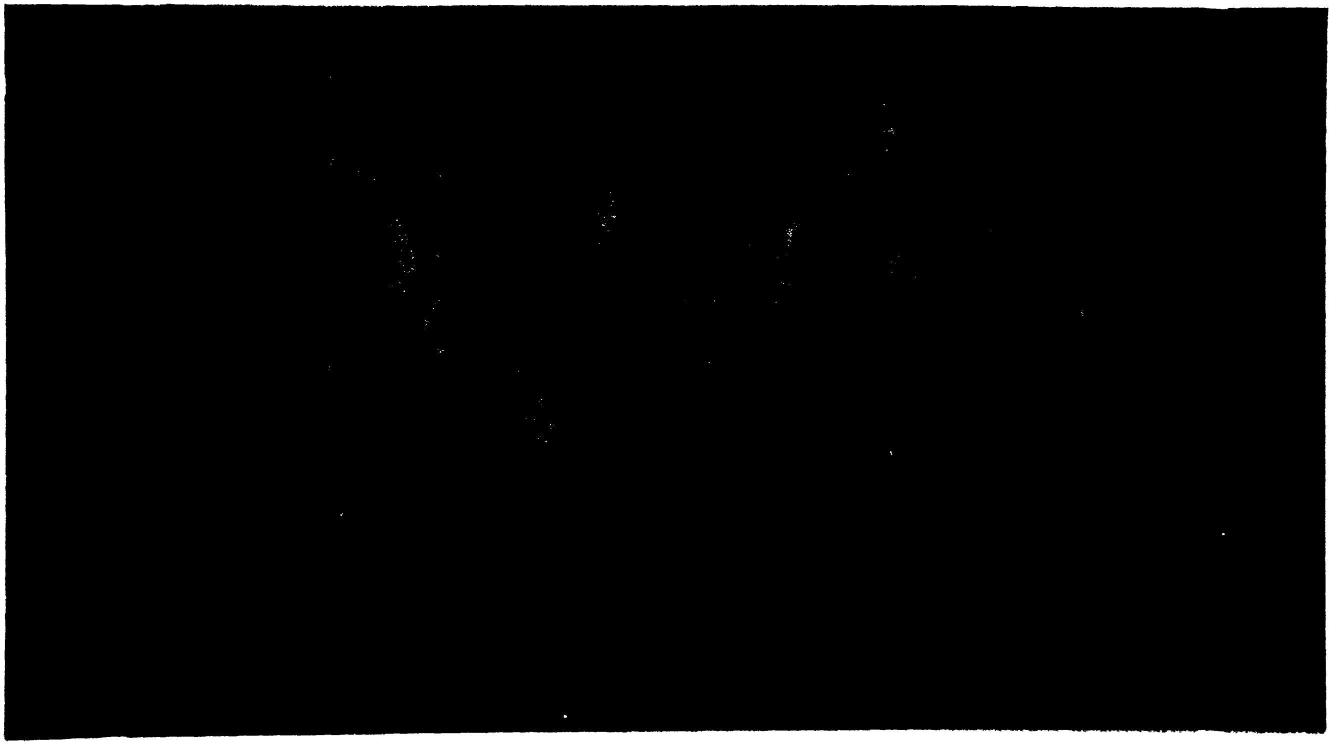
কাশ্মীরে আর একবার এক ক্ষুদ্র গ্রামে এক কুটীরে এক ব্রাহ্মণ জৈমিনী পড়ছিলেন। কুটুম্বের মত আপ্যায়নে নিজ-গৃহে নিয়ে গিয়ে পণ্ডিত আমাদের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা কল্লেন। মোট কথা, বিদেশী স্ব-ধর্ম্মীর উপর হিন্দুর যথেষ্ট প্রেম আছে। আর প্রেম দুর্ব্বল বলেই ভ্রাম্যমান সাধু-সন্ন্যাসী ও ধর্ম্মের ষাঁড় অবলীলাক্রমে সমাজের অঙ্গে বিস্ফোটকের মত গজিয়ে আছে।

পেনাঙের পাহাড়ী রেল-পথ বিচিত্র। অন্যত্র গিরি-পথে দু'হাজার ফুট উঠ্‌তে গেলে রেল-গাড়িকে অন্ততঃ দশ মাইল ভ্রমণ করতে হয় সর্প-গতিতে। এ রেল তেমন নয়, এর পথ একেবারে সোজা গড়ানে। একটা গড়ানে পথের শীর্ষে যদি খুঁটি পুতে একটা দড়ির দুদিকে দু'টা গাড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া যায়—একটা থাকে গড়ানে জমির ওপর আর একটা তার পাদমূলে—তাহলে উপরের গাড়ি নীচে নাম্‌লে নীচের গাড়ির পক্ষে উপরে ওঠা অনিবার্য্য। এ-রেলপথে তেমনি দুটা লাইন আছে। ওপরে একটা গাড়ি—নীচে একটা গাড়ি। ওপরে বিদ্যুতে একটা চাকা ঘোরে কপি-কলের মত—তার ফলে নিচের যাত্রী যায় শৈল-শিরে—পাহাড়ের আরোহী নেমে আসে সমতল ভূমিতে। প্রতি আধ-ঘণ্টা অন্তর গাড়ি ছাড়ে। খুব আমোদের ওঠা-নামা—কারণ ব্যাপারটা অভিনব। যখন মধ্য-পথে দু'টা গাড়ি পাশাপাশি হয়—তখন বিভিন্ন গাড়ির পরিচিতদের মধ্যে অভিবাদনের ধুম পড়ে। যদি অনুগ্রহ ক'রে একবার দড়ি ছেঁড়ে তাহ'লে মাধ্যাকর্ষণ ও গণিত-শাস্ত্রের নিউটনের বিধান অনুসারে কি সব দুর্ঘটনা ঘটবে তার ভাবনা এক একবার কোনো কোনো যাত্রীর মনে নিশ্চয় ওঠে। কিন্তু ওমর খায়ামের উপভোগ্য বিধান মেনে মানুষ বর্ত্তমান সুখের সম্ভাবনাকেই উচ্চাসন দেয় চিরদিন। তাই পেনাঙের গিরি-রেলের আরোহীরা সবাই প্রসন্ন-বদন।

মাঝে মাঝে এই রেলের ব্রেক পরীক্ষা হয়। তখন নাকি দড়ি খুলে তাকে গড়িয়ে দিয়ে যথা ইচ্ছা তার গতিকে রোধ ক'রে দেখা হয়। যারা পরীক্ষা করে তাদের কতবার ডিজিটালিস অন্তর্প্রক্ষেপ করতে হয় সে সংবাদ কেহ দিতে পারলে না।

এই শৈল-শিরে আছে একটা বড় হোটেল। আর পাহাড়ের শিখরকে থাক্ থাক্ ক'রে কেটে তার ওপর রেষ্টোরাঁ করা হ'য়েছে—অবশ্য চৈনিক তত্ত্বাবধানে। চমৎকার সবুজ পাহাড়। সমুদ্র হ'তে সার্দ্ধ দু'হাজার ফিট উচ্চ। মাঝে মাঝে বড় গাছের তলায় টেবিল পাতা—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সেখানে ব'সে কেক্ রুটি চা কফি ভোজন করা আর পাখির চোখে মান-অভিমান স্নেহ-অনুরাগ সাধু-জুয়াচোর-ভরা পেনাঙ্ সহর দেখা—সুখের অনুভূতি। সকাল সন্ধ্যা—যখন সূর্য্যদেবের উদয় ও বিদায় রাঙিয়ে তোলে সারা বিশ্ব—সাগর জঙ্গম—তখন শান্ত উল্লাস সব কথা ভুলিয়ে দেয়—এমন কি মক্কেলের নিকট প্রাপ্য বকেয়া পারিশ্রমিক অবধি।

হিন্দুস্থান তিব্বত রোডে সিমলা হতে ভোজি যাবার পথে ইংরাজদের এমনি একটা পান্থ-নিবাস আছে। তার নাম ওয়াইল্‌ড্ ফ্লাওয়ার হল। সে আরও সুদৃশ্য—আরও সুন্দর—কারণ সে হিমালয়ের ক্রোড়ে। হিমালয়ের বিরাট



ইন্দ্রলোকে অপ্সরা নৃত্য

শিল্পী—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রভূষণ দে

Bhratvarsha Halftone & Printing Works

গাম্ভীর্য্যের মাঝে ব'সে তুষার-রাশির শোভা—বিপুল আনন্দ। পেনাঙ শৈল হতে সমুদ্রের বিশাল নীল রূপ বড়ই উপভোগ্য। ভোরের আলো বিশাখা-পত্তনের ডলফিন্স্ নোজকেও খুব রম্য করে। কিন্তু তার অব্যবহিত নিম্নেই তরঙ্গায়িত সাগর—চপল ক্রীড়া-শীল, তাই মন হয় চঞ্চল।

মানুষ জীবিকার জন্য যে কাজ করে তার ভিতর দিয়ে তাকে ষোলো আনা চিন্‌তে পারা যায় না। এমন কথক আছে যার ঐকান্তিক বাগ্মিতায় শ্রোতা নিজের উচ্ছ্বসিত নয়নজলে ভেসে যায়। কিন্তু কথক ঠাকুর ঘর করেন একটি উপ-পত্নীর সাথে। আবার দেখেছি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বজায় রেখে কুমারী ভগ্নীর বিবাহ দেবার জন্য মানুষ মনিবের টাকা চুরি করেছে। বিরামের সময় মানুষ কি করে তা না জানলে কারও চরিত্র বুঝা যায় না। য়ুরোপীয়েরা ছুটির দিন দেহ-চর্যা করে। দেখলাম দলে দলে চীনা যুবক যুবতী ছুটির দিন পিনাঙ শৈলে চা খেতে আসে। মলয় মুসলমানেরা ইশ্‌লামের কড়া শাসনে হ'ক কিম্বা অর্থাভাবে হ'ক নিজের দেশে আমোদের জায়গায় তেমন ঘোরে না। হিন্দুস্থানী জনকতক কুলি-সর্দ্দার পাহাড়ী রেলে নামা-ওঠার উৎকণ্ঠা উপভোগ কর্চ্ছিল। তারা নিজেদের মধ্যে মলয়-ভাষায় বাক্যালাপ করছিল। পরে আমাদের কলকত্তিয়া বাবু জেনে অনেক গল্প করলে পরতাপগড়ের ভাষায়। এরা মুসলমান। মলয়-রমণীদের এরা বিবাহ করে কিনা জিজ্ঞাসা করলাম।

—কাহে নেহি বাবু। এ্যার কোনে হিন্দুস্থানী মেহেরারু আওত হায়। মুসলমানোয়া তো এলোক হৈবেই হায়—নমাজ-মুসলমান।

ফের-আউঙ্গি—বলে তাদের মিশ্র-বিবাহের সন্ততি ফেলে পালিয়ে তারা ফিরিঙ্গির সৃষ্টি করে কিনা জিজ্ঞাসা করলাম। শুনলাম অনেক মলয়ের মেয়ে ভারতবর্ষে নব-বধূরূপে এসেছে।

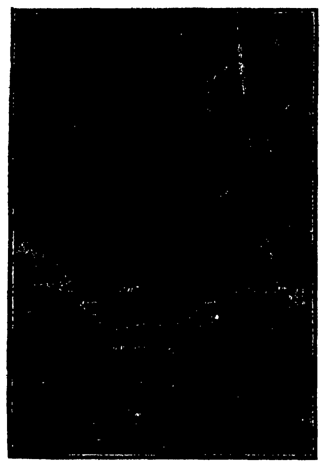
—ওকার হালচাল কৈসন হব্‌ তহাও হো-যব ও হিন্দুস্থান যাবত হয়।

—বহুত আচ্ছা বাবু। আরে হায় তো ও আপনা—মেমোয়া তো নেহি হায়।

অকাট্য যুক্তি। সন্দেহ রহিল না বন্ধু আমার মালাইয়োয়া নিকোয়া করেছেন।

গ্রামে কিন্তু এক একটা মস্ত দোকানের সামনে মালাই হিন্দুস্থানী ষ্টেচটা আর চীনে ব'সে রাজা উজীর মারে অর্থাৎ বোধ হয় ঐ রকম একটা কিছু করে। কারণ এতগুলো অকেজো এক জায়গায় বসে বার্ণাড্‌ সাহ কিম্বা রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করে বলে বোধ হয় না। বার্ণার্ড সাহের না হ'ক, সাহা নামার ভক্ত শুনলাম শিখেরা খুব। তেলেগু কুলীও কম যায় না—তবে তাড়ির আড্ডা মলয়ে দেখলাম না। ঝোঁপের মাঝে আছে নিশ্চয়—তাল-বন-নীল ইত্যাদির দেশে।

পেনাঙে উল্লেখ করবার মত বুদ্ধমন্দির আছে দুটি—একটি বহুদিনের, অন্যটি নবীন। ছোট ছোট মন্দির মস্‌জিদ শিখসঙ্গত অনেক আছে এখানে। নবীন চৈনিক



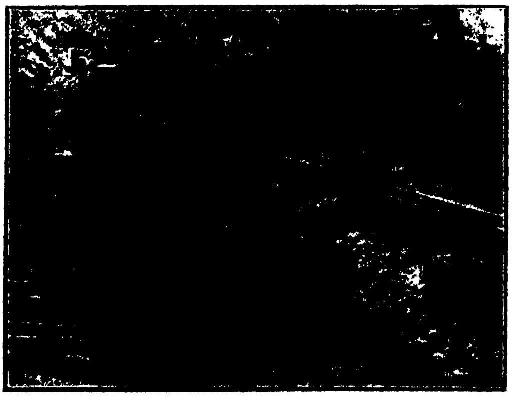
পদ্ম-পুকুর—পেনাঙ্‌ বোটানিকাল গার্ডেন।

মন্দিরটি সহরের ভিতর। সম্মুখে ছোট উদ্যান আছে—ফোয়ারা আছে। বাগান পার হয়ে খুব বড় হল—বাহিরের অংশ ভিন্ন। উজ্জ্বল মারবেলের মেঝে, দেওয়ালে মনোরম মিণ্টন টালির বর্ণ-বৈচিত্র্য। চারিদিকে মোটা কাঠের উপর কারুকার্য্য করা ভারী চেয়ার—যার বসবার আসন পাথরের। মলয়ে এ-রকম চৌকী অনেক বিক্রী হয়—কিন্তু সেগুলা তৈরী হয় চীনদেশে।

মাঝের প্রকাণ্ড হ'লের মাঝখানে কাঠের সোনালী বেদীতে ধ্যানী মুদ্রায় মস্ত কাঠের বুদ্ধ। ধব্‌ধবে মারবেলের মেঝের উপর চীনাকারীগরের খোদাই কাজে পূর্ণ বেদী অতি

সুদৃশ্য। ধূপ জ্বলছে গন্ধ-পুষ্পের সুবাস—মেঝেয় বসে দু একজন ভক্ত নীরবে আরাধনা করছে। দেওয়ালে চীনা ছবি—ওদের দেশের মহাপুরুষদের—তার সঙ্গে রবি বর্ম্মা প্রভৃতির ছবি—শকুন্তলা শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ। কতকগুলি ছবিতে প্রকৃতির দৃশ্য—কুটীর, গাছ, জল এবং অবশ্য সেতু। বুদ্ধদেবের বেদীর চারদিকে চীনের ফানুষ ঝুলছে লাল কাগজে বড় বড় সুবর্ণ অক্ষরে লেখা—বোধ হয় নির্ব্বাণলাভ কর্ব্বার জন্য ভক্তের দরখাস্ত। প্রার্থনা নিশ্চয়, কারণ ও-রকম স্থলে কে আর ক্রিকেট ম্যাচের ফলাফল বা আনারসের চাট্‌নীর বিজ্ঞাপন লিখে রাখবে।

একটা লোক ছিলনা যাকে জিজ্ঞাসা করি মন্দিরের বিবরণ। ফানুষ চুরি করবার মত দুঃসাহসও ছিলনা। অনেক পর্য্যবেক্ষণের ফলে প্রার্থনা কক্ষের বাহিরে একটা ঘরের



পেনাঙ্‌-রেল।

গবাক্ষে এক গম্ভীর চীনাম্যানের দর্শন পেলাম। সেই দিক্‌টা মন্দিরের পুস্তকাগার। পুস্তক পরীক্ষা করবার জন্য লোকটি আমাদের অনুরোধ করলে। পালি ও সংস্কৃত ভাষা হ'তে চীনাভাষায় অনূদিত হয়েছে এমন অনেক পুঁথি সেই গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত। অন্ধ জাগোরে ইত্যাদি প্রাচীন জ্ঞান-সূত্র স্মরণ ক'রে সংগৃহীত চীনা গ্রন্থ পরীক্ষা করবার ধৃষ্টতা দমন করলাম। ভদ্রলোককে আশ্বাস দিয়ে বল্লাম—আগামী জন্মে চীনাভাষা এবং তার সঙ্গে পালি ও সংস্কৃত ভাষা শিখে এসে পুঁথি পরীক্ষা করব।

অল্পে সন্তুষ্ট হয় প্রাচ্যের লোক। এবার তার দাঁত দেখলাম—আফিম তামাক বা কোকেনের ছোপ নাই। বোধ হয় বেঙ্গল কেমিক্যালের দাঁত-মাজন ব্যবহার করে। কারণ মলয়ে ঐ বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত পদার্থ দেখলাম সর্ব্বত্র বিক্রয় হয়।

সারা মলয়দেশে শ্রেষ্ঠ চীনা-মন্দির আয়ার ইতাম। অন্ধ্রদেশে সিংহাচলমে নরসিংহমন্দির যেমন একটা খণ্ড পাহাড়ে—আয়ার ইতাম তেমনি পাহাড়ের একখণ্ডে। পাহাড়ের সমতল শিখরের উপর প্রস্তর-নির্ম্মিত নরসিংহমন্দির। এ মন্দির তেমন নয়। পাহাড়ের স্তরে স্তরে এক একটা ঘর তাদের মধ্যে মূর্ত্তি। বাকী পাহাড়টায় বাগান। সমস্তটা প্রায় ৫০০ ফুট উঁচু। নৃসিংহ মন্দিরের গাম্ভীর্য্য, চারু শিল্প বা বিশালতা এর নাই। কিন্তু ভারত-বাসীর চক্ষে অভিনব।

সটান চারতলা আন্দাজ পাথরের সিঁড়ি ভেঙ্গে পৌছান যায় তার প্রথম কক্ষ-স্তবকে। সেখানে ধর্ম্মশালা আছে। দু চারটে দোকান আছে। দোকানে ছবির পোষ্ট কার্ড পাওয়া যায়, নারিকেলের খোল কেটে গড়া কৌটা পাওয়া যায়—আর সব সাধারণ পদার্থ। তারপর আবার খানিক দূর পাহাড় বেয়ে উঠলে মন্দির-কক্ষ পাওয়া যায়—যার মধ্যে আছে মূর্ত্তি কিম্ভূদ্‌কিমাকার সশস্ত্র দ্বারপাল। আবার দম্‌ নিয়ে গড়ানে রাস্তা আর সিঁড়ি বয়ে উঠ্‌লে পৌছান যায় একটা বাগানে। সেখানে জলাশয় আছে—বড় চৌবাচ্ছা অথবা ছোট পুষ্করিণী। সেই জলাশয়ের অধিবাসী দ্বিতীয় অবতার। পাশে দোকান আছে যেখানে এই পালিত কচ্ছপের মুখরোচক খাদ্য বিক্রয় হয়। উদ্যান পাহাড়ের চিরাচরিত প্রণালীতে রচিত—স্তরে স্তরে উঠেছে। এক এক থাকে এক এক শ্রেণীর বৃক্ষ—আর মাঝে মাঝে লোহার কাঠামকে অবলম্বন ক'রে বৃক্ষ ও লতা জীব-জন্তু হাঁস-ময়ূর প্রভৃতির রূপ-ধারণ করেছে। রেলিঙ্‌ চীনামাটির অমসৃণ বংশ-খণ্ড।

গড়ানে রাস্তায় হাঁফাতে হাঁফাতে উঠ্‌লাম। তার আবর্ত্তন বিবর্ত্তন সাঙ্গ হয়েছে এক কক্ষের সামনে। তার ভেতর অনেক স্মৃতি-ফলক আছে। তাতে দাতাদের নাম লেখা আছে—যাদের বদান্যতায় মন্দির নির্ম্মিত হয়েছে। চীনা-পরিদর্শক সেই বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের নামের তালিকা পাঠ কর্ব্বার উপক্রম করছিল। আমরা অনেক মিষ্টভাবে তাকে তুষ্ট ক'রে তার কঠোর পরিশ্রম লঘু করলাম।

আমাদের চীনা-পরিদর্শকের কথাবার্ত্তা চাল-চলন ও

বাগ্মিতা বিশেষ চিত্তাকর্ষক। বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট দেহ—বড় ডাবা-হুকার খোলের মত মুখ—অবশ্য হরিদ্রাবর্ণ। পাণ্ডার সাহচর্য্য না পেলে তীর্থস্থান বা ঐতিহাসিক দৃশ্যের মহিমা বোঝা অসম্ভব। এদের বর্ণনা অভ্রান্ত নয় সব সময়। কিন্তু এরা তোতাপাখীর মত এক কথা সকলকে বলে—সুতরাং জ্ঞান হয় সকল দর্শকের সমান—জ্ঞান ভ্রমাত্মক হ'ক আর নির্ভুল হ'ক।

এক একটা স্থানে গিয়ে আমাদের গাইড্ আরম্ভ করে - প্লী-ই-জ স্যার। মুস্কিল হয় বেচারাকে মাঝখানে কোনো প্রশ্ন কর্লে। তার গল্পের তখন সে থাই হারিয়ে ফেলে। হাত দেখিয়ে থামিয়ে দিয়ে আবার কেঁচে গোড়া-পত্তন ক'রে আরম্ভ করে—প্লীইজ স্যার।

সোপান এবং গড়ানে রাস্তা ধরে প্রায় তিনশত ফুট ওঠবার পর তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—মিঃ গাইড্, এখানে ডিজিটালিস বা এড্রিন্যালিন আছে কি?

—প্লী-ই জ স্যার, ও-সব তিব্বতের দেবতা—লামাদের দেবতা। চীনদেশের পবিত্র দেবতা ওরা নয়।

—অবশ্য। ধন্যবাদ।

কাজেই বসে দম নিয়ে আবার উঠ্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম। চীনারা নৈসর্গিক জাত হ'লেও—প্রেম ও ঘৃণা বেড়ে ওঠবার বিধান সব দেশে এক—তনি বনত বনত বন যাই। একে তার মনে ঘৃণার অঙ্কুর দেখা গেল—তার ওপর যদি বলা যায় যে চীন-প্রিয় দেবালয়ে উঠ্‌তে গিয়ে বুকে হাঁফ ধরছে—সে অপ্রিয় সত্য তার মনে বাঙ্গালী-বিদ্বেষ গজিয়ে তুল্‌তে পারে। কাজেই ডিপ্লোমেসির দিক থেকে মনের দুঃখ মনেই লুকিয়ে ফেল্‌লাম। দেহ বিদ্রোহী হচ্ছিল। কিন্তু পাণ্ডা ঠাকুরের মনস্তুষ্টি করবার জন্য প্রত্যেক পদার্থ দেখে বল্লাম—আহাঃ!

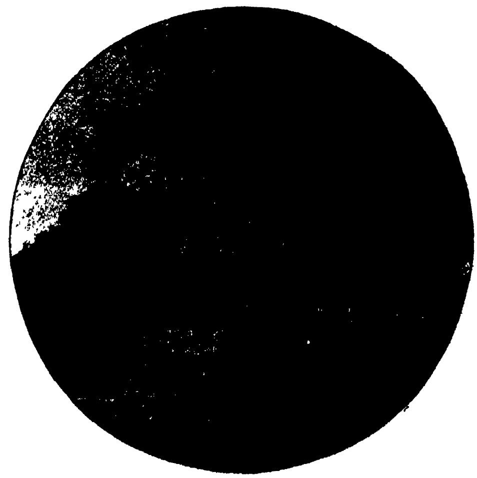
এবার উঠে যেখানে এলাম—সেটা বেশ প্রশস্ত চারচোকা কক্ষ। সুন্দর এক কাঠের বেদীর ওপর প্রায় এক কুড়ি কাঠের মূর্ত্তি। তাদের সামনে বড় বড় চীনামাটির ফুলদানে সুগন্ধ পুষ্প, আর সমস্ত কক্ষটি পবিত্র ধূপের গন্ধে পূর্ণ। বাহিরের গাছে ব'সে কতকগুলা শালিক গাইছিল—রি রি কট্ কট্ ইত্যাদি।

বাঙ্গালাদেশে বারোয়ারিতলার মাচার ওপর যেমন পৌরাণিক বীরদের প্রতিমূর্ত্তি সাজানো থাকে—ব্যাপারটা তেমনি। বেদীর সামনে কাঠের রেলিঙ-ঘেরা যাত্রীদের চলবার পথ। মূর্ত্তিগুলি যেন জীবিত—তাদের পোষাক পরিচ্ছদকে বাস্তবের রূপ দেবার জন্য সোনালী রূপালী পালিস।

আরম্ভ হ'ল—প্লী-ই-জ স্যার।

মোট কথা দেবীত্রয়—করুণা, লক্ষ্মী ও ইন্দ্রাণী—চীনে ভাষায় তাদের সমস্ত নাম কায়দা করতে পারলাম না। মধ্যে অমিতাভের সৌম্য-মূর্ত্তি। তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন সব বিশিষ্ট মহাপুরুষ। অবশ্য দু-দিকে ভীম-দর্শন দ্বারপাল আছে।

ঠিক এইভাবে মন্দির সাজানো চীনদেশের চিরাচরিত পদ্ধতি। বোধিসত্বকে চীনভাষায় বলে পু শাহ। মারকে ভষ্ম ক'রে যখন তিনি বুদ্ধ হলেন তিনি হ'লেন ফো।



রেষ্টোরা—পেনাঙ্ শৈল।

পু-শাহ মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে থাকে তাঁর পার্ষদ—ওয়ান শু এবং পু-হিয়েন। সম্রাট মিঙ-তাই সোনার বুদ্ধ-মূর্ত্তির স্বপ্ন দেখে যে আঠারো জনকে ভারতবর্ষে পাঠিয়েছিলেন বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও গ্রন্থ আনবার জন্য তাদের সব মূর্ত্তি থাকে বুদ্ধের আশে-পাশে। তাঁরা ভারতবর্ষ থেকে কুমারজীব এবং তাঁর সঙ্গে আট শত ভারতীয় পণ্ডিত নিয়ে গিয়েছিলেন চীনদেশে। ঐ দলের মধ্যে কুমারজীব আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করলাম।

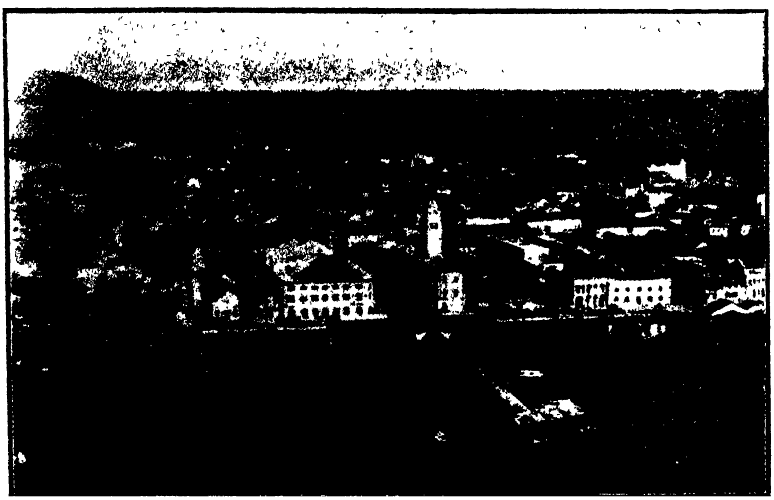
—প্লী-ই-জ স্যার, কুমালজী ইজ্ নট্ হিয়ার।

একটা দুর্ভাবনা গেল। তিনজন দেবীর মধ্যে একজনের নাম কোয়ান-য়িন—তিনি করুণা-রূপিণী ভক্তের সকল শুভ-দায়িনী।

ক্যাণ্টনে এই রকম এক দেবালয়ে ৫০০ দেবতা আছেন। কেহ কাঠের কেহ ধাতুর কেহ পাথরের। ফো-মূর্ত্তি প্রায় সোনার বর্ণের হয়, কারণ সম্রাট মিঙ্-তাই স্বপনে দেখেছিলেন তাঁর সুবর্ণ মূর্ত্তি।

মন্দিরের দ্বারপাল এবং বিশ্ব-কর্ম্মার পরিকল্পনা ভারতেই বোধ হয় উদ্ভব হয়। ইলোরার গিরি-গুহায় তাদের দেখেছি—তাদের অপেক্ষা নবীন মন্দিরের তো কথা নাই।

চীন-দেশের ম্যাণ্ডারিণ প্রভৃতি বিশিষ্ট ভদ্রলোক যারা—তাদের গাল-পাট্টা দাড়ি আবক্ষ-দোদুল্যমান। এই দেব-মঞ্চের মহাপুরুষদের অনেকের চ্যাপ্‌টা মুখ শ্মশ্রু শোভিত। মন্দির গৃহ অতি পরিষ্কার—কারণ অত জল ঢেলে কাদা করার রেওয়াজ প্রাচ্য এসিয়ায় নাই।



সাধারণ দৃশ্য—পেনাঙ্।

তার পর আরো উঠে পৌছিলাম এক কুঞ্জ-বীথিকায়। পাহাড়ের গা বেশ সমতল ক'রে তাতে বাগান করেছে। অনেক সবুজ লতা একটা সরু বাঁধানো পথকে ছায়া-শীতল করেছে। এই বাগানের দুদিকে দুটা কক্ষ। ধবধবে চাদর ঢাকা টেবিল—চারিদিকে চেয়ার। নারী-প্রগতির জোয়ারের জল পৌছেচে মলয়ে। হাস্য-মুখ সবুজ চীনা-মহিলারা তরুণ চীনাদের সঙ্গে ব'সে গল্প করছিল আর চা-পান করছিল।

—প্রী-ই-জ স্যার একটু চা খেয়ে নিন। কেক বিস্কুট।

আবার সিঁড়ি আবার চড়াই। অপর একটা কক্ষে গেলাম। ঐ রকম দেব-সভা। তার পর যে ঘরে গেলাম—ওরে! বাপ্‌রে।

ভীষণ চেহারা—বিরাট পুরুষ—কৃতান্তদেব। দু'হাতে টিপে ধরেছে দুইটি বেচারা—ক্ষীণ দেহ চক্ষে অনুতাপ। পদতলে অমনি দুটি মানুষ—অবশ্য চীনে মানুষ অভাগা—যন্ত্রণা-কাতর, অনুতপ্ত, পীড়িত। কৃতান্তদেবের দেহ তাণ্ডব-নৃত্যের ছন্দে স্পন্দিত—রক্ত আঁখি। কি ব্যাপার! একি বিভীষিকা!

—প্রী-ই-জ স্যার। ইনি মৃত্যুর দেবতা—নিয়তি—

—তা না হয় হ'ল। কিন্তু এ লোকগুলা কে?

—প্রী-ই-জ স্যার—একজন চোর—একজন মিথ্যাবাদী—তৃতীয় ব্যক্তি জুয়াড়ি আর চতুর্থ ব্যক্তি—কঙ্কালসার ঘোলাটে-চোখ অহিফেন-সেবী। যারা ঐসব দুষ্কর্ম্ম করে, নিয়তির দেবতার হাতে তাদের শাস্তি ভোগ করতে হয়। কোল্‌মা।

—ভীষণ শাস্তি!—বল্লে অনিল।

—কিন্তু বাবা এদের কোর্ম্মা বানিয়ে খেয়ে সুবিধে হবে না। আফিম-খোরটার দেহে এক চটাক মাংস নাই—তার ওপর নেশায় এখনও লোকটা বুঁদ হয়ে আছে। যার গা চাট্‌লে নেশা হয়'তাকে কোর্ম্মা বানিয়ে খেয়ে কি হতে কি হয়। যম না হয় মৃত্যুঞ্জয়, নেশা-জয় তো আর—

অনিল শুধ্‌রে দিলে—বল্লে ব্যাপারটা ভুল বুঝেছ। কোল্‌মা মানে কোর্ম্মা নয়—কর্ম্ম ল অফ্ কর্ম্ম—কর্ম্মফল!

তবু ভাল!

এ পুতুল-গুলা নিশ্চয়ই আধুনিক সমাজ-হিতৈষীর পরিকল্পনা। সামাজিক ব্যাধির ঐরকম টোট্‌কা চিকিৎসা আমাদের বারোয়ারি-তলায় প্রায় দেখতে পাওয়া যায়।

তৃতীয় পক্ষের বিবাহ—জুয়ার কুফল—মাতালের নর্দ্দমায় শয়ন, এমন কি ভোট-ভিক্ষা প্রভৃতি।

ইলোরার একটা গুহায় দেখেছি কঙ্কালসারদের নিগ্রহ বিধাতা-পুরুষের হাতে। সে কঙ্কালের ওপর জীবদ্দশায় কার মাংস ছিল—মাতালের, চোরের, লম্পটের, উকীলের কি অত্যাচারী নায়েবের—তা জানবার উপায় নাই।

পৃথিবীটা সত্যই ছোট। মানুষের বাহিরের আবরণ ফেলে দিলে—বিশ্ব-মানবের অন্তরাত্মার মধ্যে একটা যোগ-সূত্র আছে। বিশেষ প্রাচ্যের কৃষ্টির মধ্যে একটা মিলন-ক্ষেত্র আছে।

মন্দিরের আরও উপরে আছে এক প্রতিমূর্ত্তির সভা। এসব মূর্ত্তি মানুষের—দাতাদের। এই মূল্যবান্ মন্দির প্রতিষ্ঠার ব্যয়ভার গ্রহণ করেছিলেন যাঁরা—এসব মূর্ত্তি তাঁদের। যাদের দেখিনি—তাদের মূর্ত্তি দেখে চীনা ভাস্কর-শিল্প সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা অযুক্তিকর। যারা এ সভায় স্থান পেয়েছে দাতা হিসাবে—তারা আবার জীবনের অন্ত কর্ম্ম-কুশলতার ফলে যমরাজের—হাত-পায়ের শোভা বর্দ্ধন করছে কিনা সে সব কূট-তর্ক স্থগিত রাখলাম। কারণ অনিল স্মরণ করিয়ে দিলে যে পুলিশ-কোর্টের অভিজ্ঞতা দিয়ে চরিত্রবান পুরুষদের কোল্‌মা বিচার অবিধেয়। যাক্ —নীচ মন! তবে তার সাফাইয়ে বলতে হয়—বিনা-শুল্কে আফিম আমদানী আর দ্যূত-ক্রীড়া সম্বন্ধে মলয় উপদ্বীপের কোনো কোনো হল্‌দে অধিবাসীর যশের হাওয়া—দখিন-হাওয়া পাগল-হাওয়ারূপে ভারতে পৌঁছায় নি একথা অস্বীকার কর্ব্বার উপায় নাই।

তা হলেও দান—কোল্‌মা হিসাবে শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্ম ক্ষয় হয়। দান উন্নত আবেগের ফল, পরার্থপরতা বিশ্বের একতার অনুভূতির বিকাশ। সুতরাং শ্রদ্ধার সঙ্গে নিশ্চয় দাতাদের স্থান দেওয়া যেতে পারে গণ্য-মান্যদের সভায়।

একটা পাঠাগার আছে পাহাড়ের এই অংশে। টেবিলের ওপর অনেক চৈনিক ও ইংরাজি সংবাদপত্র। জনকয়েক শিষ্ট-শান্ত যুবক সেখানে বসে পাঠ করছিল। হাতীর দাঁতের মত বর্ণ—কাজেই উচ্চশ্রেণীর সবুজ।

আসল মন্দির এই পাহাড়ের একটা সংলগ্ন শিখরে—একই পরিবেষ্টনীর মধ্যে। এ মন্দিরের চূড়া শোয়ে-ডাগনের মত—ছত্রের আকার।

—প্লীজ স্যার, এটি শ্যামরাজের দান।

অভ্রভেদী মন্দির—ভিতরে তথাগতের মূর্ত্তি আছে। চারিদিকে নিস্তব্ধতা বিরাজিত। পাহাড়ের অন্য অন্য চূড়ায় নিবিড় বন। পদতলে মানুষ গড়া নগর—অসংখ্য লোক—বহু বিপণী—কত দ্বেষ দ্বন্দ্ব তীব্র ও তুচ্ছ সুখ-দুঃখের অনুভূতি। ধ্যানী মুদ্রায় তথাগত সুখ-দুঃখের সীমার অতীত—নিষ্কাম, নির্ব্বিরোধ। ভক্তদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন তিনি নির্ব্বাণের পথ—শৈলশিরে অনন্তের আভাস নীল আকাশ—পাহাড়ের পদতলে নীল-সিন্ধু—গভীর অগাধ—দিগন্ত বিস্তৃত।

মন্দির দেখার অবিরাম সুখ শেষে ধাক্কা খেলে যখন পাণ্ডা হাজির করলে এক নির্ব্বাক চীনার কাঠগড়ায়।



আয়ার ইতাম মন্দিরের অংশ।

তার সম্মুখে উন্মুক্ত চাঁদার খাতা—হাতে এক সেণ্ট দামের জাপানী কলম।

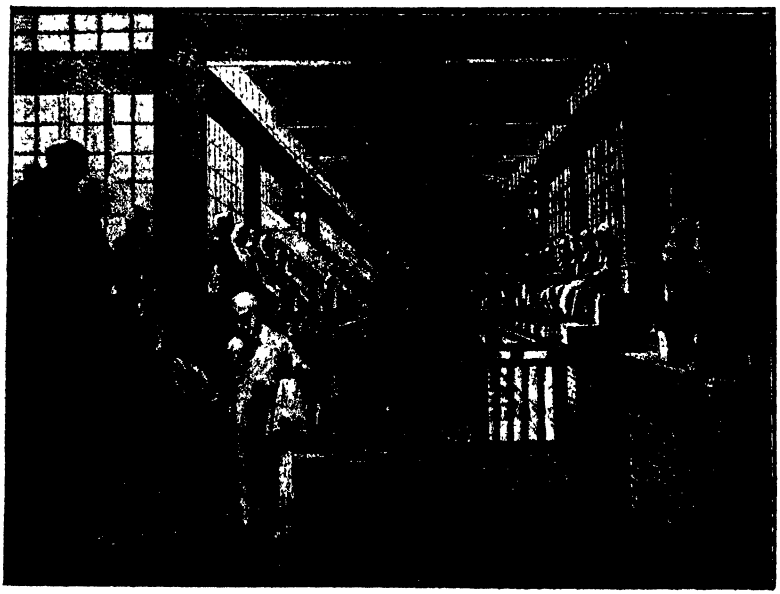
—প্লীজ স্যার। মন্দিরের সাহায্যের জন্য যা কিছু দেবেন—এই ভদ্রলোক কৃতজ্ঞতার সঙ্গে নেবেন।

সোনা ব'লে জ্ঞান ছিল, কাঁষতে পিতল হ'ল। এতক্ষণ অবাধে ফুল্ল মনে—অবশ্য ভ্রমণ-কাতর দেহে—দেবতা ও মহাপুরুষদের যাদুঘর দেখছিলাম বিনা অর্থব্যয়ে—একটা হাত-পাতা পাণ্ডা নাই, পুরোহিত নাই, গলায় গাঁদার মালা দিয়ে হাজরা-রোড্ অবধি তাড়া নাই—অকস্মাৎ চাঁদার খাতা। দুষ্ট দুনিয়া। অসভ্য চীন। মন্দিরে ওঠবার পথে সিঁড়ির ধারে জনকতক পঙ্গু ভিখারী দেখে-

ছিলাম বটে—সম্মুখে ভিক্ষাপাত্র। কিন্তু তারা নির্ব্বাক নিরুপদ্রব।

অগত্যা খাতাখানা নিলাম হাসি-মুখে—যেমন হাসি সাক্ষীর অপ্রিয় জবাব শুনে। সর্ব্বনাশ! পাঁচ ডলারের কমে দান নাই। ভায়া আমার খাজাঞ্চী—জিজ্ঞাসা করলে—অন্ততঃ এক এক ডলার না দিলে মান থাক্‌বে কি?

—দেখ বিদেশীর মান আর অপমান! বিশেষ যে রকম দাতাদের কংগ্রেস দেখা গেছে। অগ্নি-দেবতা যতদিন না রুষ্ট হবেন তাদের দাতব্যের স্মৃতি জগতকে অনুপ্রাণিত করবে। এস্থলে দু ডলার! নিউ কাশলে কয়লা



ক্যাণ্টন মন্দির—দেব-সভা।

আনা। ছিঃ! ঐসব প্রতিমূর্ত্তি-ওয়ালা দাতাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা।

—তবে কি প্রস্তাব করছ? লোকটা প্রতীক্ষা করছে।

—পূর্ব্বেও করেছে, অনাগত কালেও করবে। অবশ্য দান প্রকাণ্ড ধর্ম্ম। যাক্ এক কাজ কর। পয়সা তো হাতের ময়লা—পাঁচ পাঁচ সেণ্ট—নগদ দিয়ে দাও দশ পয়সা—ও আর দেনা রেখে লাভ নেই।

—কি বলছ দাদা! পুলিস কোর্ট মানুষকে—

—থাক ওসব কথা। দিয়ে ফ্যালো!

অনিল-চন্দ্রের বিদ্রোহিতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগলো। কিন্তু সুযুক্তি চিন্তা-প্রবণ মানব-প্রকৃতিকে বাঁকা পথ থেকে ঋজু পথে আনতে কোনো দিন বিফল হয় নি—বিশেষ সুযুক্তির চরম ফল যদি হয় গাঁঠের পয়সা গাঁঠে থাকা। অবশেষে দিলাম তাকে নগদ পাঁচ পাঁচ নিকেলের সেণ্ট—তার সঙ্গে উপরি—অমায়িক জুরী-ভোলানো হাসি।

লোক দুটার ভাব হ'ল বিচিত্র। অনিলের হাতে ক্যামেরা ছিল। বল্লাম—ঠিক্ এই ভঙ্গি। টেপো চাবি। সম্পাদকেরা বাড়ীতে এন্‌ডিওরেন্স হত্যা দেবে এই ছবি নেবার জন্য।

পাণ্ডা ঠাকুরের ভাবান্তর হ'ল। সে হেসে বল্লে—অল্‌রাইট্। প্লী-ইজ স্যার—নাম ঠিকানা লিখুন খাতায়।

নাম ঠিকানা লিখ-লাম: দানের পরিমাণ লিখলাম না। গুপ্ত দান মহাদান।

তীর্থ-শেষে যখন একুনে পঞ্চাশ সেণ্ট বক্‌শিস্ দিলাম পরি-দর্শককে—কৃতজ্ঞতায় তার বাদামী চক্ষু আড়া-আড়ি লম্বা হ'ল।

সন্ধ্যার পর জাহাজে শান্তি-ভঙ্গের উপক্রম হ'ল। তিনজন সাহেব শপথ করছে—গুণ্ডদের জলে ফেলে দেবে।

আঃ! মোলো! লোকগুলা বোধহয় নেশা করেছে। দানশীল গুপ্তরা মালাক্কা প্রণালীর নীল-জলে সাঁতার কাট্‌বার তোয়াক্কা রাখে না। অনিল বল্লে—দাদা সাঁতারের পোষাকটা পরে নাও। সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের নিশানাটা দেখ্‌লে ওরা ভয় পেতে পারে।

—হুঁ! মত বদলে বয়লারে ফেল্‌তে পারে।

আমি-কি-ডরাই-সখি—গোছ ভঙ্গিতে গিয়ে বল্লাম—

দেখ? আঃ তোমরা বড় গোলমাল করছ। বিশেষ এটা যখন আমাদের সান্ধ্য ভজনের সময়।

অনেক বাক্য-খোসার মধ্যে শাঁসটুকু পেলাম। যাদের সঙ্গে একত্র বাস করতে হয় তাদের সেন্টিমেণ্টকে শ্রদ্ধা না দেখানো অভদ্রতা—বিশেষ ধার্ম্মিক অনুভূতি সম্বন্ধে। বুদ্ধদেব সম্বন্ধে তাদের অভিমত উদার—বিশেষ যখন ভারত-মাতা তাদের পোষ্য-(এ্যাডপ্টেড) মা। কিন্তু তা বলে এক এক ডলার প্রণামী তাদের পক্ষে কষ্টকর।

—দিলে কেন সাহেব।

—দিলাম কেন? হিন্দু-সহযাত্রীরা খাতায় নাম দেখে ভাববে আমরা খৃষ্টান বলে তাদের ধর্ম্মকে অশ্রদ্ধা করেছি।

সদ্য অবসর-পাওয়া মুসলমান জজসাহেব মিঃ হাশিমুদ্দীন আহমেদ বল্লেন—কি করি, আমিও এক ডলার দিয়েছি। বুদ্ধদেব আমাদের দেশেরই তো পয়গম্বর।

সাহেবরা অবুঝ। এক ডলারে জাহাজে দু পেগ হুইস্কি পাওয়া যায়। কিন্তু বুঝলাম না—খৃষ্টান ও মুস্লিম দান-শীলতার সঙ্গে গুপ্তদের ধৃষ্টতা কি ক'রে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে।

যে নিত্য জেরা ক'রে জীবিকা অর্জ্জন করে—সত্য তার কাছে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারলে না। সর্ব্বনাশ! আমাদের নামের পাশে চীনেরা খাতায় লিখে দিয়েছে পাঁচ পাঁচ ডলার। সেণ্ট্ নয় ডলার। আর একজন এটর্ণী—একজন প্রফেসার এডভোকেট্ একজন নার্শিং শিশ্টার সাক্ষ্য দিলে। পাঁচ ডলারের সহি দেখিয়ে কারাপারার অন্ত যাত্রীদের নিকট তারা এক এক ডলার আদায় করেছে।

জয় প্রভু বুদ্ধ!

শেষে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে স্থির হ'ল—চার ডলার ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে গিয়ে দশ ডলার দশ সেণ্ট ফেরত আনা হ'বে—তাতে ৬ ডলার দশ সেণ্ট লাভ থাকবে। কিন্তু কাপ্তেন ওয়েলস্ জাহাজের নোঙ্গর তোলবার ব্যবস্থা করেছিল—বিলম্ব করতে সে সম্মত হ'ল না। বিশেষ জাহাজের সবে-ধন নীলমণি ডাঃ পালের পক্ষে অতগুলা ফাটা মাথা ওয়াও ওয়াও মলম দিয়ে সারানো সুবিধা হবে না। কারণ চীনেরা যখন মারে—মাথায় টিপ্ করে মারে—হাতের গোড়ায় যা পায় তাই দিয়ে।

পেনাঙের ডাউনিঙ্ ষ্ট্রীট প্রভৃতি একেবারে আধুনিক। তারা কলিকাতা, ব্রিষ্টল বা কেপটাউনের অংশ—যদি লোক-গুলাকে পথ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। দোকানদার অনেক সিন্ধী আছে। এরা খুব ব্যবসায়ী-এডিস আবাবা থেকে হংকং স্যাংহাই অবধি বাণিজ্য করে রেশমী কাপড় ও বিচিত্র পদার্থের।

বাঙ্গালার সরিষার তেল ব্যবহার হয় মলয় উপদ্বীপে সর্ব্বত্র। হঠাৎ দেখলাম এক স্থলে "শ্রী"ঘৃত। আনন্দ হল—তবু বাঙ্গালীর ব্যবসার একটা নমুনা। বেঙ্গল কেমিক্যালের সকল পদার্থ মলয়ে সমাদৃত। আর কোন জিনিস বাঙ্গালী



চীনা-মন্দির দ্বার-পাল।

ব্যবসায়ীর আমদানী করে মলয়—তা অত সন্ধান করতে পারলাম না—আমার মনে হয় ওদেশে আমাদের দেশ থেকে ঔষধ, গন্ধদ্রব্য, প্রসাধনসামগ্রী প্রভৃতির বাজার পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু এমন জিনিস খুঁজে বার করতে হবে যা বিক্রী করতে গেলে জাপান প্রতিযোগী হবে না। পেনাঙ্ সিঙ্গাপুর প্রভৃতি বন্দরে আমদানী শুল্ক নাই। সুতরাং ওদেশে জাপানী মাল কলিকাতার অর্দ্ধেক দরে পাওয়া যায়। জাপানী রেশমের মোজা—কুড়ি সেণ্টে গেঞ্জি—কুড়ি পঁচিশ সেণ্টে শোবার পোষাক—এক ডলারে পায়জামা ও কোট—ফুজি

সিল্কের কোটের পকেটে ড্রাগন আঁকা। ড্রেসিং গাউন শিল্কের—আড়াই ডলার ইত্যাদি। আমেরিকার জিনিসও সস্তা—তবে সুলভ মূল্যে জাপান সকলকে পরাজিত করেছে।

পেনাঙ্ ম্যালাকা ও সিঙ্গাপুর—খাস ইংরাজের উপনিবেশ। সহরগুলায় স্বায়ত্তশাসন আছে অর্থাৎ সে শাসন গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে অনেক অধিকার পেয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে—কমিশনারও পেয়েছে গবর্ণমেণ্টের মনোনীত—প্রেসিডেণ্ট বা চেয়ারম্যান সিভিলিয়ান এবং নির্ব্বাচনের বালাই নাই বলে—স্বরাজী অরাজী বা যো-হুকুম-রাজীর ঝগড়া নাই।

পেনাঙের ইংরাজি নাম প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ দ্বীপ। সমস্ত মলয় উপদ্বীপ—অর্থাৎ শ্যামের দক্ষিণ হ'তে—



মলয়ের মসজিদ।

৫০,৮৮০ বর্গ মাইল। এর মোট জনসংখ্যা—৪৫,০০,০০০। এই পঁয়তাল্লিশ লক্ষ লোকের মধ্যে—বিশ লক্ষ মলয়-আদিম নিবাসী—ইত্যাদি। ১৭ লক্ষ চীনে। য়ুরোপীয় মাত্র ১৮০০০। তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক থাকে সিঙ্গাপুরে।

সমস্ত মলয় ইংরাজের রক্ষণাধীন—তবে শাসন প্রণালীর রকম ফের আছে ইংরাজের খাস উপনিবেশের বাহিরে। মলয় বহু রাজ্যে বিভক্ত—যেমন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ব্যতীত অনেক রাজত্ব আছে। কতকগুলি রাজ্য মিলে ফেডারেশন করেছে—এদের নাম ফেডারেটেড্ মলয় ষ্টেট্স। এই যুক্তরাষ্ট্রে আছে—পেরাক, শেলেঙ্গর, নেগ্রী সেম্বিলন এবং পহঙ্। অযুক্ত প্রদেশ—জহোর কেদাহ্ কেলান্তন ত্রিংগনু এবং পারলীস। প্রত্যেকের এক একজন সুলতান আছে। পেরাকের সুলতান—হিজ্ হাইনেস্ পাদুকা শ্রীসুলতান ইশকন্দর সাহ। এঁর অনেক উপাধি আছে—পূর্ব্বে ইনি রাজা বাহাদুর ছিলেন—সরকারী চাকুরী করেছেন। সুতরাং কর্ম্মদক্ষ। বাহুল্য ভয়ে প্রত্যেক নৃপতির নাম দিলাম না।

পেনাঙ্ দ্বীপ কেদাহ্‌র সংলগ্ন। সুলতান বোধহয় অসুস্থ তাই রিজেণ্ট আছে। পারলীসের ভূপতি—রাজা—সুলতান নন—অবশ্য মুসলমান।

প্রত্যেক রাজ্যে ইংরাজ মন্ত্রণাদাতা আছে। পুলিস সাহেবরাও অধিকাংশ ইংরাজ। আদালত ও ইংরাজীতে চলে—জজেরা অধিকাংশ ইংরাজ। ব্যরিষ্টার ইংরাজ, চীনা, মলয়বাসী ও ভারতীয়। বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারদের মধ্যে—শ্রীযুক্ত এস্ গুহ শ্রীযুক্ত দুর্গানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত শ্রীযুক্ত মেঘনাদ মিত্র প্রভৃতি আমাদের পরিচিত মিত্র আছেন। শ্রীযুক্ত পি মিত্র মহাশয় বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করে নিয়ে ফিরে এসে এখন কলিকাতায় ব্যারিষ্টারী করছেন। ওদেশের ব্যারিষ্টার মিত্রদের অতিথিসেবা অতি মনোরম ও উপভোগ্য। শ্রীযুক্ত গুহের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সরযূ গুহের অমায়িকতা আমাদের মুগ্ধ করেছিল সিঙ্গাপুরে। সে কথা পরে বলব—আর তাঁর মন্দিরের কথা।

মলয়ের আদিম অধিবাসী—জঙ্গলে থাকে। হিন্দু বৌদ্ধ চীনা মোস্‌লেম এবং ইংরাজ সভ্যতা যথাক্রমে মলয়ও বৃহত্তর মলয় অর্থাৎ সুমাত্রা যব প্রভৃতি দ্বীপ উপদ্বীপে নিজেদের সংস্কৃতির টুক্‌রো ছড়িয়েছে—কিন্তু আমাদের সাঁওতাল গারো মুণ্ডা নাগা প্রভৃতি যেমন যে তিমিরে সেই তিমিরে—আসল আদিম মলয়-নিবাসী সেই রকম। মলয়ের অধুনা মুসলমান অধিবাসীও যে বিশেষ নিজস্ব কিছু কৃষ্টি উদ্ভব করেছে—তা মনে হয় না। না-হিন্দু না-মোস্‌লেম তারা। অন্য দ্বীপের অধিবাসীরা হিন্দু সংস্কৃতি রেখে—নাচ গান শিল্পকে নিজস্ব করেছে—তার ওপর ইস্‌লামের উদারতা ও একেশ্বর-বাদকে বরণ করেছে। একে মলয়-ভাষাকে আরবী অক্ষরে কায়দা করবার যন্ত্রণাও পরিশ্রম—তার ওপর রাজ্যের চীনে আর দ্রাবিড় তার নিজ নিজ সংস্কৃতি নিয়ে তার দেশে অভিযান করে—বিজলীর

আলোয় তার তেলের প্রদীপকে মলিন করেছে। কারণ অভিযান করেছে যারা তাদের সম্পর্ক আছে মাতৃভূমির সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার ও তার পুত্র-কন্যাকে অনুপ্রাণিত করে—চীনের শিল্প বিদেশী চীনেকে পরিমার্জ্জিত করে। কিন্তু মলয় আরবী অক্ষর নিয়েছে মাত্র—আর আরবী নাম। নমাজের মন্ত্রের অর্থ সবাই বোঝে না, কোরাণের উচ্চ শিক্ষা তার মজ্জাগত হয় না। যে শিক্ষিত হয়—সে ইংরাজের সংস্কৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। দেশীয় ভূপতিরা প্রায় সকলেই বিলাতে শিক্ষা পেয়েছেন—ইংরাজ ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে সামাজিকভাবে মেশেন—তাঁদের গৃহসজ্জা একেবারে বিলাতী ধরণের—বিলাতী পদার্থে ভর্ত্তি। মসজিদগুলিও চিরাচরিত সারাসেন স্থাপত্য নয়—বৌদ্ধ মন্দিরের ছত্র-শিরের ডগা কেটে একটা মাঝামাঝি রকমের। মলয়ের স্ত্রী-কন্যার চীনা বা ইংরাজ মহিলার স্বাধীন আত্মবোধ নাই—ভারতীয় পর্দ্দানসীনের সম্ভ্রম ও সৌন্দর্য্য নাই। মলয় স্বভাবতঃ পরিশ্রমী এবং কল-কারখানার কাজ করে দায়িত্বের সঙ্গে—কারণ তার শেখবার ক্ষমতা আছে।

মলয়ের অধিবাসী অর্থাৎ মলয়—আপাততঃ যে অবস্থায় আছে—সে অবস্থা তাকে পরিবর্ত্তন কর্ত্তে হবে। অনাগত কাল তাকে কোন্ পথে নিয়ে যাবে—আর কোন পথ তার উন্নতির সহায়ক হবে—সে দুশ্চিন্তার সমস্যা এ প্রবন্ধে অবান্তর।

(ক্রমশঃ)

মনচোরা

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষাল

এক

"এই খোকা, এই যাস্ নি—এই এদিকে আয়—দেখেচো, এই—দেখো একবার" ব'লে মা দুয়ারের নিকট ছুটিয়া আসিতেই খোকা হাসিতে হাসিতে একদৌড়ে একেবারে মাঠে নামিয়া ধানের ক্ষেতে ঢুকিয়া পড়ে। মা দুয়ারে দাঁড়িয়ে ডাকেন, "ওরে ও বসন, দেখত মা, দৌড়ে যা ত একবার, খোকা ঐ ধানের ক্ষেতে ঢুকল, জ্বালাতন ক'রে মেরেছে বাবা—"

বসন দাসী কি একটা কাজ কর্‌ছিল, তাড়াতাড়ি ফেলে রেখে ক্ষেতের দিকে দৌড়ে যায়।

শরৎকালের শেষ। মাঠময় নূতন ধান ফলিয়াছে—তাহারই সুগন্ধে আকাশ বাতাস ভরপুর, ধানের বনে খোকা একটা শীষ ছিঁড়িয়া লইয়া আপন মনে চিবাইতে থাকে। বসন ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লয়। বসনের কোলে খোকা জোরে হাত পা ছুঁড়ে—আর হি হি ক'রে হাসে।

বসন বলে, "দুষ্টু ছেলে একা আসে, এখ্‌খুনি ধ'রে নিয়ে যেত ছেলেধরা—"

বসন তাহাকে লইয়া পুলের ধারে খানিক বেড়াইতে যায়।

মাঠের ধারে রেল লাইন—ঠিক্ তাহার পাশেই—ষ্টেশন মাষ্টারের ছোট কোয়ার্টার।

খোকা মাষ্টার মহাশয় বিনয়বাবুর ছেলে। বসন তাহারই পরিচারিকা—জাতিতে হাড়ি।

চারি বৎসর পূর্ব্বে খোকার যখন জন্ম হয় তখন আঁতুড়ে থাকিবার জন্য তাহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

সেই সময় খোকার মা কঠিন রোগাক্রান্ত হ'য়ে প্রায় ছমাস শয্যাগত ছিলেন, বসনই তাঁহার সেবাশুশ্রূষা ও খোকার যত্ন করিত। খোকার মা সুস্থ হইলে বিনয়বাবু এই অস্পৃশ্যাকে জবাব দিবার কথা তুলিয়াছিলেন, মাষ্টার-গৃহিণী কিন্তু কি ভাবিয়া বল্লেন—থাক্ ও, বিদেশে অত কেন, জাত ত আর ওর গায়ে লেখা নাই—সেই অবধিই বসন রহিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যার ট্রেণ আসিতে প্রায় আধঘণ্টা দেরী। মাষ্টার-মশাই বাসায় চা খান। বসন খোকাকে লইয়া বাসায়

ফিরে। খোকা দৌড়ে এসে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে। গৃহে গৃহে তখন গৃহস্থবধূ শঙ্খধ্বনি করেন।

খোকা বলে—এখান থেকে মারলাম ধাড়া

ধাড়া গেল সেই বামুনপাড়া ;

কি হয় বাবা বল দেখি—

বিনয়বাবু বলেন—টর্চ্চ।

খোকা বলে—হয় নি, বাবা কিচ্ছু জান না, শাঁথ।

বিনয়বাবু বলেন—দূর, শাঁথ কে বল্‌লে, টর্চ্চই ত।

খোকা বলে—আহা শাঁথ, বসনদিদি বলেছে যে।

বিনয়বাবু বলেন—বসন জানে না।

খোকা বলে—না, জানে না বৈকি? দিদি তোমার চেয়ে কত বড় বলে। তুমি ভারি মিথ্যে কথা কইতে শিখেছ বাবা। মাষ্টার মহাশয় ও মাষ্টার গৃহিণী উভয়েই হাসিতে থাকেন। ষ্টেশনের বেল বাজিয়া উঠে। মাষ্টার মহাশয় ছড়ি লইয়া ষ্টেশনে চলিয়া যান।

নারিকেল গাছের পাতার ফাঁক দিয়া শরতের পূর্ণচন্দ্র উঁকি দিয়া খোকাকে দেখিতে থাকে।

বসন দালানে ব'সে খোকাকে কোলে নিয়ে বলে—আয় চাঁদ আয়, খোকার কপালে এসে টিপ দিয়ে যা—

খোকা হাত বাড়িয়ে ডাকে—আয় চাঁদ আয়—খোকা এদিক্ ওদিক্ দেখে বলে—বারে, দেখ্ দিদি, একটি তারা মোটে, আর নেই।

বসন আকাশের দিকে চাহিতেই শোঁ করিয়া এক উল্কাপাত হয়।

কোন ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় বসনের বুকের ভিতরটা ছ্যাৎ করিয়া উঠে। মনে মনে ঠাকুর দেবতার নামোচ্চারণ করিয়া লয়। একটি তারা দেখার জন্য বসন খোকাকে কোলে লইয়া সাতটী ফুলের নাম করিতে বলে।

সাতটি প্রতিষ্ঠা করা পুকুরের নামও খোকাকে করিতে হয়। বসন বলিয়া দেয়, খোকা শুনিয়া শুনিয়া বলে—তালপুকুর, হাড়িপুকুর, বড়পুকুর ইত্যাদি।

তালপুকুরের কথা বসনের প্রথমেই মনে পড়ে। তার সাত বছর বয়সের সময় তার বিয়ের দিন সে এখানে একবার ডুব দিয়াছিল—এ কথা তার আজও মনে আছে। তালপুকুরের প্রসঙ্গে তার আরও এক কাল-রাত্রির কথা মনে পড়ে।

তার বিয়ের ঠিক্ দুই বৎসর পরে একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরে তারা মায়ে ঝিয়ে শুয়ে ঘুমাচ্ছিল।

সদরের চৌকীদার রোঁদে বেরিয়ে তাদের ঘরের সামনে এসে তার মাকে ডেকে বলেছিল—"ওগো ও বসনের মা, তোর জামাই যে আজ মারা গেছে।"

সেদিন বসনের মায়ের সে কি বুকফাটা কান্না—একটী কেরোসীনের ডিবা জ্বেলে নিয়ে সে তার মায়ের সঙ্গে আর একবার এই তালপুকুরের ঘাটে কাঁদতে কাঁদতে এসেছিল। এইখানেই সে হাতের নোয়াটী খুলে ফেলে দিয়ে—আর একটী ডুব গেলে উঠেছিল। সে আজ বিয়াল্লিশ বৎসরের কথা। সেই দ্বিপ্রহর অন্ধকার রাত্রে ছোটলোক অস্পৃশ্যার কান্না শুনে একটী প্রতিবেশীও জাগে নাই—সে কথা আজও তার মনে পড়ে; আর মনে পড়ে সেই রাত্রির কান্না শুনে বাঁশবনের ওপাশ থেকে একটী শৃগাল ব্যাপারটা কি জানবার জন্য চিৎকার ক'রে ডেকে উঠেছিল—

ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া।

দুই

বিনয়বাবুর বহুদিনের সাধ পূর্ণ হইয়াছে; এই প্রথম তিনি নিজ গ্রামের ষ্টেশনে স্থানান্তরিত হইলেন। যাইবার দিন স্থির হইয়াছে—মালপত্তর সকলই বাঁধাছাঁদা হইতেছে। বসনের কদিন থেকেই মুখভার, আড়ালে যাইয়া কেবলই কাঁদে।

একসময় মাষ্টার গৃহিণীকে একা পাইয়া বসন বলে—মা, দয়া ক'রে আমায় সঙ্গে নিন, মাইনে চাই না, চাড্ডি ক'রে খেতে দেবেন।

মা বলেন—তা কি হয় বাছা, এখানে বিদেশে যা হয় হয়েছে, সেখানে যে আমাদের দেশ বাছা; সেখানে তোকে রাখ্‌লে যে আমাদের শুদ্ধ একঘরে হ'তে হবে। সমাজটা ত মানা চাই।

কথাটা শুনা অবধি বসন আর কিছু বলে নাই। সারাদিন কাঁদে, মনে মনে বলে, "ঠাকুর, এত ছোট ঘরে জন্ম দিলে কেন? এতই কি পাপ করেছিলাম পূর্ব্বজন্মে?"

যাবার সময় বিছানাপত্তরের বোঝা ও পোঁটলা-পুঁটলী সমস্তই গাড়ীতে তুলিয়া বসন খোকাকে কোলে করিয়া গাড়ীতে আনিয়া মায়ের কোলে বসাইয়া দেয়।

আজ সকাল থেকে সে খোকাকে একটীবারও ছাড়ে নাই; নিজের হাতে দুধ খাওয়াইয়াছে, নিজেই কাজল পরাইয়া, মুখ মুছাইয়া, জামা জুতা পরাইয়া দিয়াছে।

মা আঁচল থেকে একটী দশ টাকার নোট লইয়া বসনের হাতে দিতে যান। বসন তাড়াতাড়ি বলে—না মা, থাক্ টাকাকড়ি দেবেন না, কোথায় রাখ্‌ব, শেষে হয়ত চোরেরই পেট ভর্‌বে।

মা শুনেন না, জোর করিয়া নোটখানি তাহার হাতে দেন।

গাড়ীতে বসিয়া খোকার কি আনন্দ! জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া দেয়—হাততালি দিতে থাকে, মুখে গাড়ী চলার শব্দানুকরণ করে—ঝক্, ঝক্, ঝক্।

বসন প্ল্যাট্‌ফরমে দাঁড়াইয়া দেখে। গাড়ী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খোকা কাঁদিয়া উঠে, চিৎকার করিয়া বলে—দিদি আয়, দিদি আয়—

গাড়ী চলার প্রচণ্ড শব্দে সে চিৎকার ঢাকা পড়িয়া যায়।

চোখের জল অঞ্চলে মুছিয়া বসন আপনার ঘরে ফিরিয়া আসে।

তিন

মাঘ মাসের শেষ—শীতের তীব্রতা বাড়া বই একটুও কমে নাই।

প্রত্যেক দিনই বৈকালের দিকে বসনের জ্বর আসে, বসন কিন্তু গ্রাহ্যও করে না। একবেলা চাড্ডি চাল সিদ্ধ করে—তাহা দ্বারা কোনরূপে দিন কাটাইয়া দেয়।

বৈকালের দিকে যখন জ্বর বেশী হয় তখন আপনার শয্যায় ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়া পড়িয়া থাকে।

সেদিন বৈকালে জ্বরটা একটু কম ছিল। তার এক দূরসম্পর্কের বোন্‌ঝি শীতলা আসিয়াছিল তাহার সহিত দেখা করিতে, তাহার কোলে এক রুগ্ন খোকা।

শীতলা কাল শ্বশুরবাড়ী চলিয়া যাইবে, আজ তাই একবার দেখা করিতে আসিয়াছে।

বসন ছেলেটীকে কোলে লয়, তাহার সহিত কত কথা কয়, বহুদিনের সঞ্চিত কথা কহিয়া তাহার মনটা অনেকটা হাল্কা হইয়া যায়।

বিদায়কালে বসন ঘরের কোণে গিয়ে, গোটা দুই তিন হাঁড়ি নামিয়ে একটা নেকড়ার পুঁটলী বাহির করে। পুঁটলী খুলিয়া সেই দশ টাকার নোটটী বাহির ক'রে শীতলাকে বলে—এটা আমার আর কি হবে মা। তোদের ছেলেপিলের ঘর—তুই নে, অনেক কাজ দেখ্‌বে।

শীতলা মাসীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

বসন শীতলার আঁচলখানি টানিয়া লইয়া তাহাতেই নোটখানি বাঁধিয়া দেয়।

মাসীকে প্রণাম ক'রে শীতলা খোকাকে লইয়া বাটী যায়।

যতক্ষণ দৃষ্টি চলে, বসন ছেলেটীর দিকে চাহিয়া থাকে।

তারপর কখন ঘুমাইয়া পড়ে কিছুই জানিতে পারে না।

* * * *

ওমা, কি সর্ব্বনাশ!

ডিস্‌ট্যাণ্ট্ সিগ্‌ন্যাল পড়িয়া গিয়াছে, ডাক্ গাড়ী এই এল ব'লে—খোকা এখনও লাইনের উপর বসিয়া নুড়ি লইয়া খেলা করিতেছে।

বসন ঘুমন্ত আঁৎকে উঠে—ধড়মড়িয়ে বিছানায় ব'সে দেখে সব ফাঁকা—

সাম্‌নের শূন্য মাঠ বিশ্রী এক কদর্য্য মূর্ত্তি ধ'রে পড়ে আছে। মাস দুই পূর্ব্বে ধান কাটা শেষ হইয়াছে, পরিত্যক্ত নাড়াগুলি শূন্য মাঠে থাকিয়া যেন দাঁত খিঁচাইয়া এই অস্পৃশ্যাকে বিদ্রূপ করিতেছে।

বসনের মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করিতে থাকে। একটা হাই তুলিয়া ভাবে—আর বাঁচিয়া থাকায় লাভ কি?

চারটে পঞ্চাশের ট্রেণ হুইসিল্ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

মাষ্টার মহাশয়ের কোয়ার্টারে নবাগত মাষ্টারের বড় কুটুম্ব সিগারেট টানিয়া মনের আনন্দে গলা কাঁপাইয়া একটি টিনের সুট্‌কেশ চাপড়াইয়া কি একটা গান গায়—তারই খানিকটা শুনা যায়—

"মন আমার ক'রে চুরি সে নিঠুর কোথায় গেল।"



পশ্চিমের যাত্রী

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

লণ্ডন

১৬ই জুলাই ১৯৩৫। আজ পারিস থেকে লণ্ডন যাত্রা। Gare Saint Lazare 'গার্ স্যাঁ লাজা.র্' অর্থাৎ সেণ্ট্-লাজারস্-ষ্টেশন থেকে দশটার দিকে গাড়ী ছাড়্ল। Dieppe দিয়েপ্-Newhaven নিউহাভ্ন্-এর পথে যাচ্ছি—এই পথ লণ্ডন-পারিস যাতায়াতের সব চেয়ে সোজা পথ। আমার পূর্ব-পরিচিত। পারিসে ট্রেনে চড়বার সময় এক আমেরিকান দম্পতী সহযাত্রী ছিল, কর্তাটী বিশেষ সৌজন্য দেখিয়ে আমাকে বস্বার জায়গা দিলে। আমাদের কামরায় নিম্নশ্রেণীর কতকগুলি ইংরেজ ছিল; তাদের উচ্চারণে h এর বর্জন, আর day, say 'ডেয়্, সেয়্' প্রভৃতি শব্দকে 'ডাই, সাই'রূপে শুনে কোনও সন্দেহ ছিল না যে এরা শিক্ষিত লোক নয়। কি কাজে এরা পারিসে থাকে তা বুঝতে পারা গেল না—তবে অনুমান ক'রলুম, কোনও ইংরেজ দোকানে চাকর দরওয়ান প্রভৃতির কাজ করে।

আমেরিকান যাত্রী দুটী প্রায় সারা রেল-পথ চুপচাপ রইল। আমিও হয় খবরের কাগজ প'ড়ে, না হয় জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখে কাটালুম। পুরুষটী অতি কাটখোট্টা নীরস চেহারার, লম্বা একহারা চেহারায় কোনও সৌষ্ঠব নেই। দিয়েপ্-বন্দরে, রেল ছেড়ে জাহাজে চড়বার পরে সে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ আরম্ভ ক'রলে। প্রথমেই সে আরম্ভ ক'রলে, অনেক ভারতীয়ের সঙ্গে তার পরিচয় আছে; ভারতবর্ষের লোকেরা যীশুকে ত্রাণকর্তা ব'লে মান্‌ছে না কেন? বুঝলুম, লোকটী খ্রীষ্টান পাদরি। আমি ব'ললুম, ভারতবর্ষের লোকেদের মধ্যে খ্রীষ্টান কিছু কিছু থাক্‌লেও, সাধারণ হিন্দু আর মুসলমান ভারতীয়, যে হিসাবে খ্রীষ্টানরা যীশুর মতন ত্রাণকর্তার আবশ্যকতা আছে ব'লে মনে করে, সে হিসাবে তারা এই আবশ্যকতা স্বীকার করে না। ও তখন আমায় জিজ্ঞাসা ক'রলে, আমি খ্রীষ্টান নই কেন। আমি ব'ললুম, ঈশ্বরের কৃপায় হিন্দু হ'য়ে জন্মেছি, এই ধর্মই আমার পক্ষে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সহায়ক হবে ব'লে মনে হয়, আশা রাখি আর প্রার্থনা করি যেন হিন্দু থেকেই মরি; যীশু একজন নমস্য মহাপুরুষ, কিন্তু ত্রাণকর্তা হিসাবে খ্রীষ্টান সাম্প্রদায়িক মত-বাদ যে ভাবে তাঁকে জগতের সামনে ধ'রেছে, সে ভাবে তাঁকে মানবার কারণ দেখি না। একটু কথা ক'য়ে দেখলুম, লোকটা অত্যন্ত গোঁড়া আর অসহিষ্ণু মতের খ্রীষ্টান। আফ্রিকায় কোথায় নিগ্রোদের মধ্যে মিশনারির কাজ করে। এর বিশ্বাস মতন, মানবজাতি দুটো দলে বিভক্ত—খ্রীষ্টান, আর 'হীদেন্'; হীদেন্ ধর্মে কোনও ভাল জিনিস থাকতে পারে না। যদি নিজেকে বাঁচাতে চাও, যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র ব'লে মানো—এ-কথা ভগবান স্বয়ং বাইবেলে ব'লেছেন। আমি ব'ললুম, বাইবেলে ভগবানই যে এ সব উপদেশ দিচ্ছেন, তার প্রমাণ? অন্য ধর্মের শাস্ত্রেও তো বলে যে স্বয়ং ভগবানই সেই সব ধর্মের শাস্ত্রের উপদেষ্টা। কার কথা সত্য ব'লে মান্‌বো? জবাব দিলে—আমি খ্রীষ্টান, আমার অন্তরাত্মা সায় দিচ্ছে বা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে বাইবেলই সত্য ভগবানের উক্তি, আমি এই বিশ্বাস-মত প্রচার করি। আমি জিজ্ঞাসা ক'রলুম, হিন্দু-হিসাবে যদি আমি বলি যে আমারও অন্তরাত্মা সায় যে ভগবদ্গীতাই ঈশ্বরের উক্তি, আর সেই বিশ্বাসেই যদি আমি বলি—তা হ'লে তাঁর বলবার কি আছে? তখন সে খুব দৃঢ়স্বরে ব'ললে—'না, তা হ'তে পারে না—একমাত্র খ্রীষ্টান ধর্মই ধর্ম, আর সব হ'চ্ছে "হীদেন্"—অপধর্ম। সব হীদেন ধর্মই immoral, দুর্নীতিতে পূর্ণ। আপনি রাগ ক'রবেন না, আমি সত্য কথাই ব'ললুম। 'বেশী বাক্যব্যয় অনাবশ্যক বুঝে' আমি তখন চোখ বুজে দুটী হাত জোড় ক'রে খ্রীষ্টানী পূজার বাক্যভঙ্গী অনুকরণ ক'রে, মিশনারি পুঙ্গবের প্রণিধানের জন্য একটী ইংরেজী প্রার্থনা ক'রলুম—'হে দয়াময় সদাপ্রভু! তোমার অসীম করুণা, যে তুমি আমাকে এ জন্মে হিন্দু

ক'রে পাঠিয়েছ। প্রভু, হিন্দুধর্মে হিন্দুর রীতি-নীতিতে হিন্দু মনোভাবে সারা জীবন ধ'রে যেন আমার আস্থা থাকে। হিন্দুধর্ম ও চিন্তা তোমার সত্য স্বরূপকে যে-ভাবে বুঝেছে, তোমার সত্তার যে মহনীয় প্রকাশ ক'রেছে, দয়াময়, তুমি মানবজাতিকে তা বুঝতে দাও, সত্য-দর্শন সম্বন্ধে তাদের চোখ খুলে দাও, ভ্রান্তকে সত্য জ্যোতিতে নিয়ে এস। তোমার নাম গৌরবান্বিত হোক্। আমেন্ (তথাস্তু)।' তার অভ্যস্ত ভাষায় আমার মনের আস্থা প্রকট করায়, লোকটী একটু ধাঁধায় প'ড়ে গেল। তখন আর কথাবার্তা ক'রলে না—খানিক পরে স'রে গিয়ে জাহাজের অন্য এক ধারে ব'স্‌ল। পাদরির স্ত্রী আমাদের কথা শুন্‌ছিল, কিন্তু কোনও কথা কয় নি; মনে হ'চ্ছিল, তার এ তর্ক ভাল লাগছিল না, কারণ এই সব তর্কে তাদের অভ্যস্ত ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে অপ্রিয় প্রশ্ন উঠে থাকে।

জাহাজে বেশ চমৎকারভাবেই পার হওয়া গেল। বেশ রোদ্দুর ছিল, তবে মেঘও অল্প-স্বল্প হ'চ্ছিল। এ জাহাজখানি ফরাসীদের। ইংলাণ্ড আর ফ্রান্সের মধ্যে, ইংলাণ্ড আর বেলজিয়ম্, ইংলাণ্ড আর হলাণ্ডের মধ্যে যে সব জাহাজ গতায়াত করে, সেগুলি মনে হয় সমান-সমান সংখ্যায় ইংরেজদের আর ফরাসী, বেলজিয়ান আর ডচেদের হ'য়ে থাকে। নিউহাভ্‌ন্ পৌছলে, জাহাজের ফরাসী খালাসীরাই আমাদের মাল নামিয়ে ট্রেনে তুলে দিলে।

জাহাজে একটী লোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। প্রথমটা একে দেখে মনে হ'য়েছিল যে এ ভারতবাসী। আধ-ময়লা রঙ, মুখ চোখ ভারতবাসীরই মত। আমার রীতিমত হিন্দুস্থানীতেই জিজ্ঞাসা ক'রলুম, "ক্যা জী, আপ হিন্দুস্থান সে আতে হৈঁ?" জবাবে ইংরেজীতে ব'ল্‌লে, what's that? অর্থাৎ, কি ক'ন মশায় বুঝি না। তখন ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা ক'রলুম;—ব'ললুম, চেহারায় তাকে Indian বা ভারতবাসী ব'লে মনে হ'য়েছিল—তাই দেশের ভাষায় কথা ক'য়েছিলুম। তখন সে একগাল হেসে ব'ল্‌লে—'আমি Indian বটে, কিন্তু East Indian নই, তোমাদের মত পূবদেশের ইণ্ডিয়ান নই, আমি হ'চ্ছি আমেরিকার ইণ্ডিয়ান।' নিজের পরিচয় দিলে। British Honduras-এ বাড়ী, মেক্সিকোদেশের yucatan য়ুকাতান-উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে আর Guatemala উয়াতেমালা-দেশের লাগোয়া পূবে এই ইংরেজ অধিকৃত হণ্ডুরাস্-প্রদেশ। য়ুকাতান, উয়াতেমালা আর হণ্ডুরাস—এই তিন অঞ্চলে যে আদিম আমেরিকান জাতি বাস করে, তার নাম হ'চ্ছে Maya মায়া। এই মায়া জা'ত এখন বড়ই শোচনীয় অবস্থায় প'ড়েছে, কিন্তু এক সময়ে এই জাতের লোকেরা উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ ক'রেছিল। মায়ারা য়ুকাতান, উয়াতেমালা আর দক্ষিণ-পূর্ব মেক্সিকোতে একটী বিরাট সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছিল। খ্রীষ্ট-জন্মের কাছাকাছি সময় থেকে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধ পর্য্যন্ত (যখন স্পেনীয় লোকেরা মেক্সিকো আর য়ুকাতান দখল করে), এই মায়ারা তাদের বিস্তর শহর, আর এইসব শহরে বিরাট সব পাথরের দেবমন্দির, প্রাসাদ, মানমন্দির বানিয়েছিল। এখন এইসব ইমারতের, আর মায়া জাতির ভাস্কর্য্য আর অন্য শিল্পের নিদর্শনের আলোচনা হ'চ্ছে। কলম্বস্ কর্ত্তৃক আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্বে, লোহার ব্যবহার না জেনেও, কি ক'রে এই বুদ্ধিমান্ সুসভ্য জাতি এরকম একটা বড় সংস্কৃতি গ'ড়ে তুলেছিল, তা চিন্তা ক'রে আধুনিক সুসভ্য জগৎ বিস্মিত হ'চ্ছে। মায়ারা জ্যোতিষ বিদ্যায় আর গণিতে অসাধারণ দক্ষ ছিল—এ বিষয়ে তারা পৃথিবীর তাবৎ প্রাচীন সুসভ্য জাতির সমকক্ষ বা তাদের চেয়ে আরও প্রবীণ ছিল। এরা একরকম চিত্রলিপির উদ্ভাবনা ক'রেছিল—এই লিপিতে এদের পুঁথি-পত্র কিছু কিছু পাওয়া যায়, বহু শিলালেখও এই লিপিতে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু স্পেনীয় পাদরীরা এদের প্রাচীন পুঁথি-পত্র যত সংগ্রহ ক'রতে পেরেছিল সব শয়তানের কারসাজি ব'লে পুড়িয়ে ফেলায়, আর এদের প্রাচীন বিদ্যার আলোচনা নির্মম-ভাবে বন্ধ ক'রে দেওয়ায়, এদের মধ্যে উদ্ভূত লিপির জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে এদের জ্ঞান-বিজ্ঞান আর সাহিত্য লোপ পায়;—আমেরিকা আর ইউরোপের পণ্ডিতেরা এখন অনেক চেষ্টা ক'রেও, এদের দু-চারখানা পুঁথি যা বেঁচে গিয়েছে তার, আর এদের প্রাচীন শিলা-লিপির কোনও কিনারা ক'রতে পারছে না। প্রাচীন মায়া জাতির বংশধরেরা এখন অখ্যাত, অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত হ'য়ে র'য়েছে—প্রাচীন গৌরববোধটুকু তাদের মধ্য থেকে লোপ পেয়েছে। ব্রিটিশ হণ্ডুরাস থেকে আগত এই মায়া জাতীয় লোকটীকে দেখে মনে ভারী আনন্দ হ'ল। কিন্তু হায়; লোকটী ইউরোপীয় ভাবাপন্ন; এর নাম হ'চ্ছে

Meighan—আইরীশ নাম, আয়র্লাণ্ড থেকে আগত হণ্ডুরাসে উপনিবিষ্ট কোনও পাদরির কাছ থেকে নামটী নেওয়া হ'তে পারে। তবে ইংরেজী জানে; লোকটী ব্যবসায়ী; ইংলাণ্ড থেকে হণ্ডুরাসে নানা জিনিস আমদানী করে, বাইরের জগতের একটু খবর রাখে, তাই ইংরেজী আর স্পেনিশ প'ড়ে নিজের পূর্বপুরুষদের কীর্তি সম্বন্ধে কিছুটা কথা জানে। জাতীয় নাম ছেড়ে বিদেশী নাম নিয়েছে কেন জিজ্ঞাসা করায়, একটু লজ্জিত হ'ল—ব'ল্লে, খ্রীষ্টান ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীয় অর্থাৎ স্পানিশ আর অন্য ইউরোপীয় নাম নেওয়ার রেওয়াজ বহুদিন থেকে তাদের মধ্যে চ'লে এসেছে। সুদূর ভারতবর্ষ থেকে আগত একজন লোকের মনে, তার নিজের জাতের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে এতটা আগ্রহ আর শ্রদ্ধা দেখে লোকটী যেমন আশ্চর্য্য হ'ল, তেমনি খুশীও হ'ল। লণ্ডনে কোথায় তার ঠিকানা, লিখে নিলুম; কিন্তু নানা কাজের ভীড়ে লণ্ডনে আর তার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হয় নি।

লণ্ডনে পৌঁছে, গাওয়ার ষ্ট্রীটে ওয়াই-এম্-সী-এ-র ছাত্রাবাসে এসে উঠা গেল। ছাত্রাবস্থায় এই ওয়াই-এম্-সী-এ-র ভারতীয় ছাত্রদের ক্লাবে আমার খুব গতায়াত ছিল। আমাদের আন্তর্জাতিক ধ্বনিতত্ত্ববিদ্‌গণের সম্মিলন হবার কথা ইউনিভার্সিটী-কলেজে, ইউনিভার্সিটী-কলেজ এই গাওয়ার ষ্ট্রীটেই অবস্থিত, ওয়াই-এম্-সী-এ ভারতীয় ছাত্রাবাস আর ইউনিভার্সিটী-কলেজই খুব কাছাকাছি—পাশাপাশি বলাও চলে। এই ওয়াই-এম্-সী-এ-তে, বলা বাহুল্য, আমাদের কালের পরিচিত কাউকে পাওয়া গেল না। তবে জাহাজের সহযাত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী ডাক্তার বর্ধনকে দেখলুম, তিনি এই হস্‌টেলে জমিয়ে নিয়ে ব'সেছেন, এখানে থেকে রোজ ইউনিভার্সিটীর বিজ্ঞান-মন্দিরে গবেষণা ক'রতে যান। ইস্‌লামিয়া কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তাহির জামিল, আমার কাছে কিছুদিন প'ড়েছিলেন, ঐ হস্‌টলেই র'য়েছেন দেখলুম। হস্‌টেলে ভীড় বেশী, আলাদা কামরা পাওয়া গেল না, দুই বিছানাওয়ালা একটী ঘরে যেতে হ'ল, শ্রীযুক্ত জামিলের ঘরে একটী "সীট" খালি ছিল, আগ্রহময় আমন্ত্রণে আপাততঃ সেইটেই দখল ক'রলুম।

এই ওয়াই-এম-সী-এ হস্‌টেলটী ছাত্রদের পক্ষে আর যারা অল্প খরচে থাকতে চান তাঁদের পক্ষে বড়ই সুবিধার। তের শিলিং ছয় পেনী দিয়ে ছয় মাসের জন্য সভ্য হওয়া গেল, তাতে হস্‌টেলে বাস করবার অধিকার লাভ হ'ল। হস্‌টেলের ঘরের ভাড়া তুলনায় খুবই কম—স্নানের ব্যবস্থা খুব সুন্দর, সারা দিন রাত যখন ইচ্ছে প্রচুর গরম জল পাওয়া যায়; দাঁড়িয়ে স্নান ক'রতে হয়, মাথার উপরে একই ঝাঁঝরার ভিতর দিয়ে দুটো নল থেকে গরম জল আর ঠাণ্ডা জল পড়ে, হাতের কাছে পেঁচ-কল ঘুরিয়ে ইচ্ছামত জল বেশী গরম বা বেশী ঠাণ্ডা ক'রে নেওয়া যায়। হস্‌টেলের সঙ্গেই ভোজনাগার আছে, সেখানে দু' তিন জন ভারতীয় রাঁধুনী ডাল-ভাত চাপাটী পরটা ভাজী-তরকারী মাছ মাংস মিঠাই-পায়স সব বানাচ্ছে, ইংরেজী রান্নার খাবারও পাওয়া যায়—সব জিনিসই টাটকা আর খুব শস্তা।

সন্ধ্যায় লণ্ডনে পৌঁছে, ওয়াই-এম্-সী এ-তে আড্ডা নিয়ে, তার পরের দিন ব্যাঙ্কে গেলুম – দেশের চিঠি-পত্র আন্‌তে। বাড়ীর চিঠিপত্রে ছেলেমেয়েদের অসুখের কথা প'ড়লুম, আর প'ড়লুম যে টাকাকড়ির যে বন্দোবস্ত করে এসেছিলুম তার একটা গোলমাল হ'য়েছে। তাতে মনটা একটু বিচলিত হ'ল। সেই দিনই তার ক'রে এতদূর থেকে যা ব্যবস্থা করবার তা ক'রে পাঠালুম। বিচার ক'রে দেখা গেল, যতদিন ইউরোপে থাক্‌বো ভেবে এসেছিলুম, ততদিন থাকা আর হ'য়ে উঠ্‌বে না। যথাসম্ভব শীঘ্র ফির্‌বো স্থির ক'রলুম। লণ্ডনে থাক্‌তে-থাক্‌তে, প্রথম তিন চার দিনের ভিতরই আন্তর্জাতিক রাজ-নৈতিক হাওয়া এমনি ভাবে বইতে লাগ্‌ল, যে মনে হ'ল আবিসিনিয়াকে উপলক্ষ ক'রে ইংরেজদের সঙ্গে ইটালির যুদ্ধ বাধে আর কি। জাহাজের খবর নিয়ে জান্‌লুম, ইটালিয়ান সরকার ইটালী থেকে ভারতবর্ষে যে সব জাহাজ যায়, তার দুখানিকে পর পর দুই হপ্তা সৈন্য বইবার কাজে টেনে নিয়েছে, ভারতগামী যাত্রীরা তার ফলে মুস্কিলে প'ড়েছে। ইংরেজে ইটালিতে তখন খবরের কাগজের মারফৎ চোখ-রাঙানি চ'লেছে, ইটালিয়ান্‌রা দলে-দলে রোমে ইংরেজ রাজদূতের প্রাসাদের সামনে এসে ইংরেজ-বিরোধী হল্লা ক'রেছে, ইটালিতে দু চার জায়গায় ইংরেজদের অপমানও ক'রেছে। এই সব খবর, আর কাগজে চড়া চড়া লেখা (অবশ্য ইটালিয়ানদের তরফ থেকেই বেশী ক'রে), আর ইটালিয়ান যাত্রী-জাহাজকে যাত্রী নিয়ে যাওয়ার কাজ থেকে সরিয়ে নিয়ে ফৌজ নিয়ে যাবার কাজে লাগিয়ে দেওয়া—এ

সমস্ত দেখে, আনাড়ী আমাদের অনেকের মনে আশঙ্কা হ'ল, একটা যুদ্ধ বাধ্‌ল আর কি। আর এ যুদ্ধ একবার বাধ্‌লে, থাম্‌তে কয় বছর লাগ্‌বে তা কে জানে। সুতরাং সময় থাক্‌তে-থাক্‌তে স'রে পড়াই দরকার—বিশেষতঃ যখন বাড়ীতে আমার উপর কত জিনিস নির্ভর ক'র্‌ছে। আমাকে আবার ইটালিয়ান জাহাজেই ফির্‌তে হবে, অন্যথা আমার কিছু লোকসান হবে। সব ভেবে-চিন্তে স্থির ক'র্‌লুম, লণ্ডনে আমার ধ্বনিতত্ত্বের সম্মিলন শেষ হ'লেই দেশের জন্য যাত্রা ক'র্‌বো। এই ভেবে, লণ্ডনে পৌঁছে তিন চার দিনের মধ্যেই ফেরবার জাহাজের সন্ধান নেওয়া গেল। সে সম্বন্ধে যা খবর পেলুম, তাতে উদ্বেগ ক'ম্‌ল না—আগামী দু তিন সপ্তাহের সব যাত্রী-জাহাজের টিকিট বিক্রী হ'য়ে গিয়েছে। যাক্‌, শেষটা ভেনিস থেকে বোম্বাই যাবার জন্য ১০ই আগষ্ট তারিখে ছাড়্‌বে Conte Rosso 'কন্তে-রস্‌সো' জাহাজ, তাতেই একটা বার্থ্‌ পাওয়া গেল।

লণ্ডনের পুরাতন বা আমার পূর্ব-পরিচিত স্থানগুলি—ব্রিটিশ মিউজিয়ম, স্কুল-অভ-ওরিয়েণ্টাল-ষ্টডীজ, সাউথ-কেনসিংটন মিউজিয়ম প্রভৃতি দেখলুম। আমার অধ্যাপক লায়োনেল ডী বার্নেট, অধ্যাপক ডেনিয়েল জোন্স্‌, স্যর ঈ ডেনিসন্‌ রস প্রমুখ অধ্যাপকদের সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হ'ল। ব্রিটিশ মিউ-জিয়ম গ্রন্থশালায় গিয়ে পড়বার জন্য এক সপ্তাহের মেয়াদের প্রবেশ-পত্র সংগ্রহ ক'রে নিলুম।

আমাদের সম্মিলন ছিল ২২শে থেকে ২৬শে জুলাই পর্য্যন্ত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ২৫০ জন প্রতিনিধি এসে সম্মিলিত হ'য়েছিলেন। এ ছাড়া, দর্শক বা শ্রোতা কিছু কিছু ছিলেন। এশিয়া-খণ্ড থেকে জাপানের তিন জন, চীনের একজন, কোরিয়ার একজন, আর ভারতবর্ষের দুজন প্রতিনিধি ছিলেন (ক'লকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত অমলেশচন্দ্র সেন এবং আমি)। প্রথম দিন, অর্থাৎ সোমবার ২২শে তারিখে দশটায় সম্মিলনের কাজ আরম্ভ হ'ল। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের Vice-Chancellor বা উপাধ্যক্ষ, ইউনিভার্সিটী-কলেজের অধ্যক্ষ—এঁরা স্বাগত ক'রলেন। আন্তর্জাতিক-উচ্চারণতত্ত্ববিৎ-পরিষদের সভাপতি বক্তৃতা দিলেন। প্রতিনিধিদের তরফ থেকে পারিসের অধ্যাপক Vendryes ভাঁদ্রিয়েস্‌, বেলিনের অধ্যাপক Horn হর্‌ন্‌, কোপেন-হাগনের অধ্যাপক Jespersen য়েস্‌পেয়্‌সেন্‌, চিলির সান্ত্‌-ইয়াগোর অধ্যাপক Ramirez রামিরেস্‌, আমেরিকার অধ্যাপক Stetson ষ্টেটসন্‌ এবং ভারতবর্ষ থেকে আমি—এই কয়জনের উপর বক্তৃতা দেবার ভার ছিল। আমি সংক্ষেপে কিছু লিখে রেখেছিলুম, সেটী প'ড়ে দিলুম। তাতে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই প্রকার আন্তর্জাতিক সম্মিলনের আবশ্যকতা আর উপকারিতা, আর প্রাচীন শিক্ষা বা উচ্চারণ-তত্ত্বের আবিষ্কর্তা হিসাবে ভারতবর্ষের কৃতিত্ব—এই সকল বিষয়ে দুটো কথা ছিল। তার পরে উপস্থিত প্রতি-নিধিদের ছবি তোলা হ'ল—ইউনিভার্সিটী-কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে ব'সে দেড়শ'র উপর এক বিরাট গ্রুপ-ফোটো।

১১টা থেকে সম্মিলনের রীতিমত কাজ চ'ল্‌ল। বিভাগে উচ্চারণতত্ত্বের বিভিন্ন নানা দিক অবলম্বন ক'রে প্রায় আশীটী প্রবন্ধ। ইংরেজী, ফরাসী, জরমান—তিনটী ভাষার যে কোনও ভাষায় বক্তা ব'লবেন, বিচার চ'লবে তিনটী ভাষার যে কোনওটীতে। সকাল সাড়ে নটা থেকে ১২টা পর্য্যন্ত, আর ওদিকে ২টো থেকে ৪টে পর্য্যন্ত বিভিন্ন শাখার প্রবন্ধ পাঠ আর আলোচনা। এ ছাড়া, নানা রকমের প্রদর্শনী আছে—সব উচ্চারণতত্ত্ব আর ধ্বনিতত্ত্ব অবলম্বন ক'রে। বিকাল আর সন্ধ্যায় নানাস্থানে চায়ের মজলিসে নিমন্ত্রণ, রাত্রে ডিনার বা নাটক দেখা। লণ্ডনের লর্ড মেয়র তাঁর বাড়ীতে একদিন আহ্বান ক'রলেন, ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে রাত্রে একদিন পার্টি হ'ল। এঁরা একদিন দুপুরে ছোট জাহাজে ক'রে, লণ্ডনের বিরাট বন্দর প্রতি-নিধিদের দেখিয়ে আনলেন। সম্মিলনের কাজের সঙ্গে সঙ্গে এই সব অনুষ্ঠান থাকায়, চার পাঁচ দিনে শরীর আর মন দুইয়েরই উপর খুব ধকল প'ড়েছিল।

বুধবার ২৪শে জুলাই দুটো থেকে চারটে পর্য্যন্ত ছিল Indian Session বা ভারতীয় শাখার অধিবেশন—যার সভাপতিত্ব করবার সম্মান আমাকে দেওয়া হয়েছিল। আমার প্রবন্ধ নিয়ে এই অধিবেশনে পাঁচটী প্রবন্ধ পড়া হয়। দিল্লীর মূক-বধির বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়, পোষাপাখীর—যথা ময়নার, টিয়ার—উচ্চারণ সম্পর্কে তাঁর নিজের সমীক্ষা অবলম্বনে লিখিত একটী খুব সুন্দর বৈজ্ঞানিক আলোচনা পাঠিয়ে-ছিলেন, অধ্যাপক ডেনিয়েল জোন্স্‌ (সম্মিলনের মূল সভাপতি) স্বয়ং সেইটী পাঠ ক'রলেন। কাশ্মীরীর

ব্যঞ্জনধ্বনির কতকগুলি উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য নিয়ে অধ্যাপক গ্রাহাম বেইলি ব'ললেন। অধ্যাপক Firth ফার্থ্ আলোচনা ক'রলেন ভারতবর্ষের ভাষাবলীর কতকগুলি সাধারণ উচ্চারণ-রীতি নিয়ে। শ্রীযুক্ত অমলেশচন্দ্র সেন আমেরিকায় একটা উচ্চারণতত্ত্ব-বিষয়ক লাবরেটরীতে কাজ ক'রেছিলেন, তিনি যন্ত্রপাতির সাহায্যে আবিষ্কৃত বাঙলা ভাষার অল্পপ্রাণ আর মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলির সম্বন্ধে একটা মূল্যবান্ নূতন তথ্য আমাদের জানালেন। আমার বক্তৃতার বিষয় ছিল, প্রাচ্যখণ্ডে প্রাচীন ভাষা বা ধর্মের ভাষার উচ্চারণ বজায় রাখবার জন্য যে সমস্ত উপায় এই সব ভাষার আলোচনা-কালে অবলম্বন করা হয়, তারই একটা বর্ণনা। ভারতবর্ষে বৈদিক সংস্কৃতের উদাত্তাদি স্বরধ্বনি ঠিক-মত করবার জন্য মাথা, হাত বা আঙুল নেড়ে যে স্বাধ্যায় করা হয়, তার বর্ণনা; চীনদেশে আর জাপানে সংস্কৃতের উচ্চারণ ধ'রে রাখবার জন্য যে সব চেষ্টা করা হ'য়েছিল, তার আলোচনা; আর কোরান-পাঠের সময়ে আরবীর শুদ্ধ উচ্চারণ শেখাবার উদ্দেশ্যে, তজ্‌বীদ্ ও কিরা'আৎ অর্থাৎ আরবী শিক্ষা-শাস্ত্রের বইয়ে, মুখাভ্যন্তরের চিত্র দিয়ে যে ভাবে উচ্চারণের আলোচনা করা হয়, তার একটু প্রকাশ ক'রেছিলুম। আমার বক্তৃতা বিশদ করবার জন্য আমি আটাশখানি লাণ্টার্ন্-স্লাইড দেখাই। আমার বক্তৃতা কালে একজন জাপানী প্রতিনিধি, তাঁর নিজের আসনে ব'সে-ব'সেই পর্দার উপরে ফেলা আমার ছবি থেকে ছোট পকেট ক্যামেরা দিয়ে আবার ফোটো তুলে নিলেন।

মোটের উপরে, অল্প কয়টা প্রবন্ধ ছিল, তার কিছু আলোচনাও হ'য়েছিল। আমাদের এই ভারতীয় শাখার অধিবেশনটা ভালই হ'য়েছিল।

এইভাবে চার দিনে আমাদের সম্মিলন শেষ হ'ল। সম্মিলনের প্রবন্ধাবলী আর বক্তৃতার সারাংশ সম্প্রতি কেমব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বা'র হ'য়েছে।

উচ্চারণ-বিজ্ঞান নিয়ে নানা মূল্যবান্ প্রবন্ধ পঠিত হ'য়েছিল। নানা দেশের লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় আর সৌহার্দ্য হ'ল। চীনের প্রতিনিধি ছিলেন শ্রীযুক্ত Daw Chyuan Yu ডাও চুআন য়ু। ইনি নিজ পরিচয় দিলেন। পারিসে ব'সে গবেষণা ক'রেছেন। রবীন্দ্রনাথ যখন চীন-ভ্রমণে যান, তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন গিয়েছিলেন, ইনি ক্ষিতিবাবুর কাছে প্রথম সংস্কৃত প'ড়তে আরম্ভ করেন। এখন তিব্বতীও শিখে নিয়েছেন। স্বল্পভাষী চিন্তাশীল যুবক, এঁকে খুব ভাল লাগ্‌ল। ইনি এঁর প্রকাশিত একটা তিব্বতী দলিলের চীনা অনুবাদ সমেত সংস্করণ আমায় উপহার দিলেন; আমার লেখা প্রবন্ধও আমি দিলুম। শ্রীযুক্ত Sun-gi Kim সুন্-গীকিম্ কোরিয়া থেকে আগত। ইনিও পারিসে পড়াশুনা করেন। কোরিয়ার ভাষার বিশিষ্ট লিপি ১৪৪৬ সালে কোরিয়ার রাজা Sejong সেজোঙ্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই রাজা চীনা আর কোরিয়ান ভাষায় এই লিপি সম্বন্ধে Hunmin Jongum 'হুন্‌মিন জোঙ্গুম' অর্থাৎ 'সাধু উচ্চারণ' নামে একখানি বই রচনা ক'রে তার পৃষ্ঠাগুলি কাঠের পাটায় খুঁদে ছাপান, শ্রীযুক্ত কিম্ সেই বইয়ের এক সংস্করণ বার ক'রেছেন তাতে সমগ্র প্রাচীন বইখানির পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ছবি দেওয়া হ'য়েছে, সেই বই আমায় একখণ্ড দিলেন। জাপানের অশীতিবর্ষীয় বৈজ্ঞানিক ডাক্তার Tanakadate তানাকাদাতে এসেছিলেন, ইনি জাপান দেশে রোমান হরফ চালাবার জন্য একজন প্রধান উদ্যোগী। আরও অনেকের সঙ্গে এই কয়দিনে মেলামেশা গেল। উচ্চারণ-তত্ত্ববিদ্যায় নামী লোক অনেকে এসেছিলেন, আমার পূর্ব পরিচিত এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন—সবাইয়ের আর নাম ক'রবো না। Sir Richard Paget স্যর রিচার্ড প্যাজেট ইংলাণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক—একদিকে একটা বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দেখালেন, একটা হাপর, কতকগুলি নল, আর নিজের দুই হাত দিয়ে ফুসফুস, কণ্ঠনালী, নাসারন্ধ্র আর মুখবিবর তৈরী ক'রে, হাতের ভিতর থেকে গলার আওয়াজ বার ক'রে, হাত দিয়ে বা ইংরেজীতে কথা কইলেন—আইর অন্যদিকে তিনি কথা না ব'লে কেবল ইঙ্গিত দ্বারা ভাব-প্রকাশের উপযোগিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে, একটা কেবল ইঙ্গিতময় ধ্বনি-নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক ভাষা গঠনের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে অনুকূল মতপ্রকাশ ক'রে বক্তৃতা দিলেন; একটা সভায় তাঁর শ্রোতাদের কতকগুলি ইঙ্গিতের অর্থ বুঝিয়ে দিয়ে, কেবল ইঙ্গিতেরই সাহায্যে নাতিদীর্ঘ একটা বক্তৃতা দিলেন, শ্রোতৃবর্গ কৌতুক ও আশ্চর্য্য ভাবের সঙ্গে

তাঁর ইঙ্গিত তরজমা ক'রে-ক'রে তাঁর বক্তব্য বুঝে নিলে।

শেষ দিন সমস্ত প্রতিনিধিরা একসঙ্গে নৈশ-ভোজন সমাধা ক'রে, অনেকক্ষণ ধ'রে নানা বিষয়ে বক্তৃতা, গান আর আবৃত্তি দ্বারা "কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সজ্জনৈঃ সহ" ক'রে সম্মিলনটী মধুরের দ্বারা পরিসমাপ্ত ক'রলেন। এই নৈশ-ভোজনের মেনু বা ভোজ্য তালিকা ছিল ফরাসীতে, কিন্তু আন্তর্জাতিক উচ্চারণতত্ত্ব সমিতির শুদ্ধ ধ্বনি-দ্যোতক বর্ণ-মালায় মুদ্রিত। ভোজনানন্তর আমরা একটী সভাগৃহে সমবেত হলুম। একজন ফরাসী প্রতিনিধি অধ্যাপক Grammont গ্রাম', ফরাসী কবি Lafontaine লাফঁতেন রচিত শিয়াল আর পনীর-মুখে কাকের গল্প-বিষয়ক কবিতাটী, বিভিন্ন রসের অবতারণা ক'রে, পাঁচটী বিভিন্ন রীতিতে আবৃত্তি ক'রলেন; শেষটা হ'ল নীরব আবৃত্তি—কেবল মুখের ভাব দিয়ে, আর হাত নেড়ে। বের্লিনের অধ্যাপক হৃর্ন্ ইংরেজ কবি চসারের সময়ের ইংরেজী ভাষায় স্বরচিত এক ব্যঙ্গ-কবিতা চসারের সময়ের উচ্চারণে প'ড়ে শোনালেন; এই কবিতায় সম্মিলনের প্রতি-নিধিদের নিয়ে একটু নির্দোষ রসিকতা ছিল। অধ্যাপক ডেনিয়েল জোন্স্ স্বয়ং চসারের রচিত তিনশ' লাইনের এক সুদীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি ক'রলেন, চসারের সময়ের ইংরেজীর উচ্চারণ ঠিক-মত বজায় রেখে—তাঁর আবৃত্তি অনুধাবন করবার জন্য আমাদের ঐ কবিতার একটী ছাপানো সংস্করণ দেওয়া হ'ল। অধ্যাপক Palmer পামার স্বরচিত এক ব্যঙ্গ-কবিতা গেয়ে শোনালেন—এতে নানা ছলে উচ্চারণ-তত্ত্ব আর উচ্চারণ তত্ত্বের আলোচক কতকগুলি ব্যক্তিকে নিয়ে একটু প্রীতি স্নিগ্ধ রসিকতা ছিল—এই কবিতায় ইংরেজী strategy শব্দের সঙ্গে মিল করবার জন্য আমার নাম Chatterji-ও ঢুকিয়ে দেওয়া হ'য়েছিল। এই প্রকার আমোদে আমাদের শেষ দিনটা বেশ কেটে গেল।

মোটের উপরে, বিচারের দ্বারা বিজ্ঞানের উন্নতির দিক থেকে, আর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত একই বিদ্যার আলোচনাকারীদের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর দিক থেকে এই সম্মিলন সার্থক হ'য়েছিল।

২৫শে জুলাই প্রতিনিধিদের লণ্ডনের ডক বা জাহাজ-ঘাটা দেখাবার ব্যবস্থা ক'রেছিলেন Port of London Authority নামে লণ্ডন-বন্দরের পরিচালক-পরিষৎ। আমরা ৩।৪ খানা দোতালা বাসে ক'রে ইউনিভার্সিটী কলেজ থেকে বেরিয়ে, Tower Bridge সেতুর কাছে এসে লঞ্চে চড়লুম। সমুদ্রের মুখ থেকে লণ্ডন পর্য্যন্ত Thames টেম্স্ নদীর প্রসার প্রায় ৭০ মাইল। এর মধ্যে দশটা ডক আছে। ১৯৩৩ সালে প্রায় ৫৬ হাজার জাহাজ লণ্ডনের এই সব ডকে এসে মাল-খালাস ক'রেছে, মাল নিয়েছে। লণ্ডনে যত মালের আমদানী রপ্তানী হয়, পৃথিবীর আর কোনও বন্দরে তত হয় না। আমাদের লঞ্চখানি King George V Dock আর Royal Albert Dock—এই দুটোর ভিতরটা আমাদের



লণ্ডন ও সেণ্ট কাথারিন ডক-দ্বয়—বিমান হইতে গৃহীত চিত্র

দেখিয়ে আন্‌লে। যেন জাহাজের অরণ্য। বিরাট্ বিরাট্ সব গুদাম—রকমারি মাল, পৃথিবীর দূরতম সব দেশ থেকে এনে, এই সব বিরাট গুদাম-বাড়ীতে জমা হ'চ্ছে, আবার রেলে ক'রে দূরে নীত হ'চ্ছে। এই সব ডকের মারফৎ ইংরেজ জাতির বাণিজ্যগত প্রভাব আর প্রতাপ দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে যেতে হয়। আমাদের পক্ষে এই ডক-দর্শন বেশ একটা নোতুন অভিজ্ঞতা হ'ল। লণ্ডন বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষের আতিথ্য, খালি ডক দেখিয়ে আর লঞ্চে বৈকালী চা আর চায়ের অনুপান খাইয়েই হয় নি—



রয়াল ভিক্‌টোরিয়া ও এলবার্ট এবং রাজা পঞ্চমজর্জ ডকসমূহ—আকাশ হইতে গৃহীত চিত্র

এঁরা আমাদের দর্শনের স্মারক-স্বরূপ লণ্ডন ডক সম্বন্ধে কতকগুলি সচিত্র পুস্তক-পুস্তিকা আর রঙীন মানচিত্রও দিলেন।

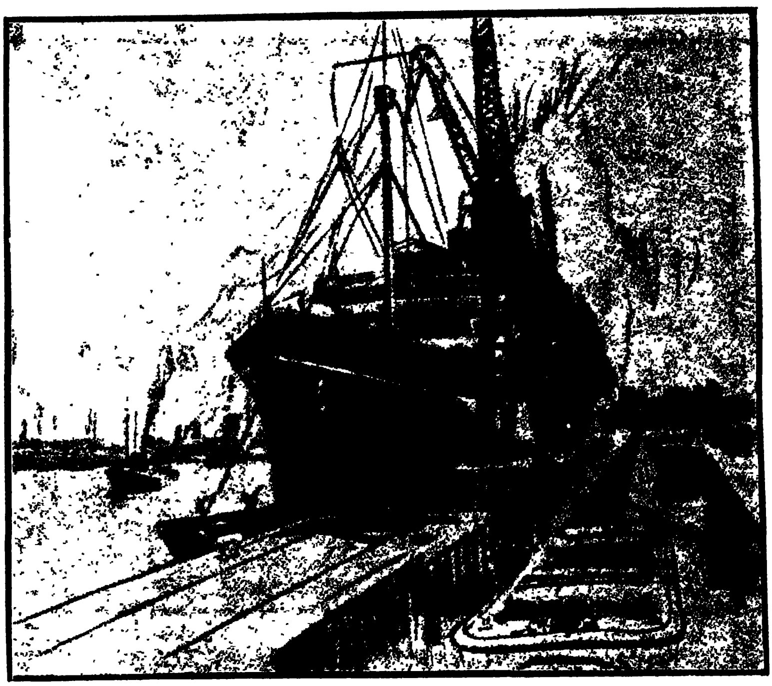
লণ্ডনের পুরাতন আর নূতন ইমারতগুলির মধ্যে, ওয়েস্‌ট্‌মিন্‌সটরের রোমান-কাথলিক গির্জাটী আমার খুব ভাল লাগ্‌ত। এবারও এই গির্জা দেখ্‌তে যাই। বিজাতীয় বাস্তুরীতি অনুসারে গঠিত বিরাট বিশাল এই হালের দেবমন্দিরটী। এখনও এর ভিতরের অলঙ্করণ—রঙীন মার্‌বল, মোসাইক চিত্র—সব সম্পূর্ণ হয় নি, কিন্তু ধীরে ধীরে হ'চ্ছে। মন্দিরের বাইরের রূপের মত, এর ভিতরের সুউচ্চ খিলান আর ছাত, আর উপর থেকে ঝুলানো এক বিশাল যীশুর চিত্রযুক্ত পিতলের ক্রুশ, মন্দিরের অভ্যন্তরের আলো-আঁধারি, লাল ইটের দেয়ালের নগ্ন নিরাভরণ সুষমা—এসবে চিত্তকে অভিভূত করে। এর উপরে, পূজার সময়ে ধূপধুনার বাস আর অর্গান-যন্ত্রের স্বর্গীয় স্বর-সঙ্গতি হ'লে তো কথাই নাই। দেশে ফিরে এসে, ইউরোপের অন্য জিনিসের মধ্যে এই রোমান-কাথলিক দেবমন্দিরের আবেষ্টনীর স্মৃতি মাঝে মাঝে আমায় আকুল করে। ইউরোপের লোকেরা যেমন লণ্ডনের ডক বানিয়েছে, তেমনি শিল্প আর ধর্মভাবের নিকেতন এইরূপ মহনীয় দেউলও তুলেছে।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক, স্কুল-অভ-ওরিয়েণ্টাল-স্টডীজ-এ যিনি পড়ান, আধুনিক ভারতীয় ভাষা-তত্ত্ব সম্বন্ধে অন্যতম একপত্রী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত R. L. Turner রালফ্ লিলে টর্‌নারের সঙ্গে, পত্রে আর প্রবন্ধ-বিনিময়ের দ্বারায় আমার আলাপ ছিল। এবার লণ্ডনে তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হ'ল। অধ্যাপক টর্‌নার, লণ্ডন থেকে কেমব্রিজ যাবার লাইনে মাঝামাঝি-পথে পড়ে Bishop's Stortford নামক ছোট্ট একটী শহরে থাকেন, ট্রেনে লণ্ডনে যাওয়া-আসা করেন। তিনি তাঁর বাড়ীতে আমায় একদিন আমন্ত্রণ ক'রলেন। বিকালে লণ্ডন থেকে বেরিয়ে, ঘণ্টা খানেকের মধ্যে Bishop's Stortford-এ পৌছুলুম। অধ্যাপক টর্‌নারের পত্নী তাঁর দুটী কন্যা নিয়ে লণ্ডনে

এসেছিলেন, আমার সঙ্গে এক ট্রেনেই তিনি ফিরলেন। অধ্যাপকের বাড়ীতে সেদিন রাত্রি-বাস ক'রে, তার পরের দিন প্রাতরাশ সমাধা ক'রে দশটার দিকে লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন হ'ল। এইভাবে একটা-বিকাল ও প্রায় অর্ধ রাত্রি আর তার পরের দিনের প্রাতঃকাল ধ'রে এঁদের সঙ্গলাভ করা গেল। সমধর্মীর সঙ্গে আলোচ্য বিদ্যা নিয়ে অনেক কিছু অন্তরঙ্গ আলাপ করা গেল। এই বিদ্যার বহির্ভূত অন্য নানা কথা নিয়েও আলাপ হ'ল—দু'চারটে ঘরোয়া সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাও হ'ল। এই জন্য এই রকম একই তীর্থের উদ্দেশে যাত্রীদের মেলামেশা বড়ই সুন্দর।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাশগুপ্তকে লণ্ডন-প্রবাসী প্রায় সব বাঙালী আর বহু অন্য ভারতবাসী চিনবেন। ইনি; বহুকাল ধ'রে ওদেশে বসবাস ক'রছেন। ছাত্রাবস্থায় এঁর সঙ্গে লণ্ডনে আলাপ হ'যে ছিল—ইনি রবীন্দ্রনাথের একজন অনুরাগী ভক্ত, কবির কাছে খুব আস্তেন। তখন ইনি Union of East and West নামে একটা সমিতি চালাচ্ছিলেন। এবার দেখলুম, তিনি Union of Faiths and Cultures কিংবা ঐরকম নামে আর একটা সমিতি ক'রেছেন, আমেরিকা আর ইংলাণ্ড দুই দেশেই তার কেন্দ্র হ'য়েছে। আমায় ইংলাণ্ডে দেখে তিনি আমাকে দিয়ে হিন্দু সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটা বক্তৃতার ব্যবস্থা ক'রলেন। দিল্লী রেস্তোরাঁ ব'লে একটী ভারতীয় দ্বারায় পরিচালিত ভোজনাগারে (এটি টর্টেন্‌হাম কোর্ট রোডে বিদ্যমান) আমার বক্তৃতার ব্যবস্থা হ'ল; ৩১শে জুলাই তারিখে। জন চল্লিশেক শ্রোতা, তাঁরা এক সঙ্গে চা-কেক্-রুটী সেবা ক'রতে লাগলেন, আর বক্তব্য শুনলেন। স্তর ফ্রান্সিস্ ইয়ংহজবাণ্ড্, যিনি বিগত মাসে ক'লকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে আহূত সর্বধর্ম-মহাসম্মেলনে এসেছিলেন, তিনি হ'য়েছিলেন সভাপতি। আমার বক্তৃতার শেষে দুই চারিজন ইংরেজ প্রশ্ন ক'রলেন। আমার প্রসঙ্গ ছিল হিন্দু সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, আর তার ঐতিহাসিক কারণ।

লণ্ডনে থাকবার কালে স্তর শ্রীযুক্ত সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনও ওখানে আসেন। তাঁর হোটেলে গিয়ে কদিন খুব কাছাকাছি ভাবে তাঁর সঙ্গে মেশবার সুযোগ হ'য়েছিল। পরে



রাজা পঞ্চম জর্জ ডকের দৃশ্য

এই মনীষীর সঙ্গে একই জাহাজে দেশে ফিরি—এঁর সঙ্গে আমাদের ধর্ম আর সংস্কৃতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা আমার পক্ষে একটা মস্ত বড় আনন্দ আর লাভের বিষয় হ'য়েছিল।

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্তও জুলাই-আগষ্ট মাসে লণ্ডনে ছিলেন। তিনি ব্রতচারীর আদর্শ প্রচারকে জীবনের ব্রত ক'রে নিয়েছেন—লণ্ডনেও এ বিষয় তিনি সকলের গোচরে আনতে উৎসুক ছিলেন—বিশেষতঃ তখন লণ্ডনে এক Folk Dance Congress হ'য়ে গিয়েছে, ইউরোপের প্রায় সব

দেশ থেকে তত্তৎ দেশের লোক-নৃত্যের দল লণ্ডনের সম্মিলনে গিয়ে নিজেদের নাচ দেখিয়েছে। শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয় বাঙলা দেশের ব্রতচারী আন্দোলন ও ব্রতচারীর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে লণ্ডনের একটী সভায় বক্তৃতা দেন—আমি তখন লণ্ডন থেকে চ'লে এসেছি।

ক'লকাতার গৌড়ীয়-মঠের দুজন সন্ন্যাসী লণ্ডনে গিয়েছিলেন, আমাদের দেশের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচার ক'রতে। এঁদের মধ্যে একজন, শ্রীযুক্ত ভক্তিহৃদয় বন তখন লণ্ডনে ছিলেন। (ইনি নিজ নামের 'বন' শব্দ সংস্কৃত উচ্চারণ ধ'রে না লিখে, বাঙলা উচ্চারণ মোতাবেক



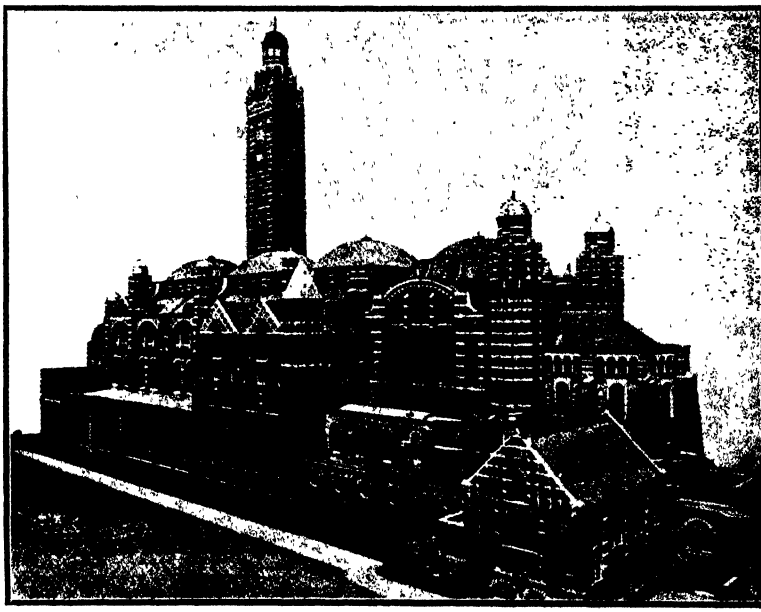
টিলবারি ডক্—যাত্রী নামিবার ঘাট

ইউরোপীয় অক্ষরে Bon লেখেন—ইউরোপের আর ভারতের অন্য প্রদেশের সংস্কৃতবিদ্ দুচারজন এই Bon-টা কি শব্দ, তা বুঝতে না পেরে, আমায় এর অর্থ জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন। আমার ছাত্রকল্প শ্রীযুক্ত সংবিদানন্দ দাস, এম-এ পি-এচ্-ডি গৌড়ীয়-মঠের লণ্ডনস্থ বাসায় থেকে পড়াশুনা ক'রছিলেন, তিনি আমায় ওঁদের কেন্দ্রে আমন্ত্রণ করেন। স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ দিল্লী রেস্তোর্ঁায় আমার বক্তৃতা শুনতে আসেন, তিনি বিশেষ সৌজন্য ক'রে বক্তৃতার পরে সাউথ কেন্‌সিংটনে ওঁদের বাসায় আমার নিয়ে যান। সেখানে সদালাপের সঙ্গে, ওঁদের সহিত একত্র ভোজন করি। ওঁদের বাসায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যাকান্ত রায় মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়—পরে আমরা এক জাহাজেই ভেনিস থেকে ফিরি। কামাখ্যাবাবু রেলবিভাগের হিসাব পরিদর্শক, সদালাপী রসিক ব্যক্তি, ষ্টীমারে তাঁকে সহযাত্রী পেয়ে বিশেষ আনন্দের সঙ্গে আসা গিয়েছিল।

লণ্ডনের রাস্তায় একদিন একটী যুবকের সঙ্গে দেখা—এর নাম শ্রীযুক্ত ওজিত চৌধুরী—আমায় প্রণাম ক'রে পরিচয় দিলেন যে ক'লকাতায় আমার ছাত্র ছিলেন, পালিতে এম-এ প'ড়তেন, আমার পালি ভাষাতত্ত্বের ক্লাসে আসতেন। কথায় কথায় তাঁহার পারিবারিক সংবাদ কিছু জানতে পারলুম। এঁদের নিবাস চট্টগ্রামে, চট্টগ্রামের বাঙ্গালী বৌদ্ধ এরা; তাঁর এক দাদা কলেজে-টলেজে পড়েন নি, পালিয়ে বিলেতে আসেন, অনেক ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের মধ্যে দিয়ে গিয়ে, শেষে লণ্ডনে স্বাবলম্বী হ'তে পেরেছেন—লণ্ডনে একটী ভারতীয় ভোজনাগার খুলেছেন—তাঁর ভাইয়ের এই Indo-Burma Restaurant-টী এখন বেশ ভালই চ'লছে। আমি শুনে সত্য-সত্যই খুব খুশী হ'লুম—ছোকরার নাকি ইচ্ছে ছিল, যে লণ্ডনে থেকে ব্যারিষ্টারী প'ড়বে; কিন্তু আমি ব'ললুম, ব্যারিষ্টারী প'ড়ে কি হবে? ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, ভাইয়ের প্রদর্শিত পথে চলুন—তাতেই যথেষ্ট অর্থ হবে; এই ভাবে স্বাধীন ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা ক'রতে পারলে, দেশেরও পাঁচটা যুবকের পক্ষে আশার আলো জ্ব'লবে। একদিন তাঁর ভাইয়ের রেস্তোর্ঁায় গিয়ে পোলাও-কারী-কোর্মা খেয়ে আস্‌তে হ'ল। ছাত্রের দাদা বিনীত ভাবে আলাপ ক'রলেন। আমার আন্তরিক শুভ কামনা জানিয়ে এলুম।

লণ্ডনের ওয়াই-এম্-সী-এ ছাত্রাবাসে একটী ভদ্রলোকের

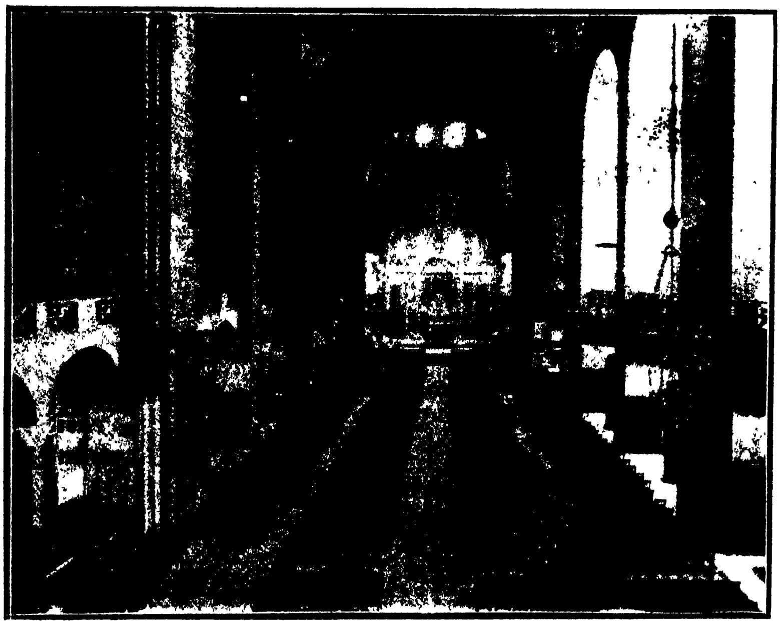
সঙ্গে আলাপ হ'ল, নানাদিক থেকে তাঁর যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল, অন্ততঃ আমার চোখে। আমরা দুজনে একটা কামরায় দুতিন দিন ছিলুম—আমার ভূতপূর্ব ছাত্র অধ্যাপক তাহির জামিল, আর আমি। জামিল পরে অন্যত্র চ'লে গেলেন, ঘরে আমি একাই রইলুম। তারপরে খালি সীটে আর একজন এলেন। রাত্রে ঘরে এসে, পোষাক-টোবাক ছেড়ে, নিদ্রা দেবার পূর্বে শুয়ে-শুয়ে একখানা বই প'ড়ছি, এমন সময়ে ছাত্রাবাসের দরওয়ান স্যুটকেস-সমেত এক ভদ্রলোককে এনে খালি সীটটীতে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দিয়ে গেল। যে ভদ্রলোকটী এলেন তিনি যুবক, বয়স ৩০।৩২ হবে, শ্যামবর্ণ, দোহারা নধর চেহারার মানুষ, বড় বড় চোখ। অ-ভারতীয় উচ্চারণে, কতকটা জাত্ ইংরেজী বলিয়ের ঢঙে, ব্যাকরণ-বিষয়ে একটু আধটু অশুদ্ধ, কিন্তু খাঁটী ইংরেজী-ভাষীর ইংরেজীতে তিনি আত্মপরিচয় দিলেন—'আমি হ'চ্ছি গঙ্গাবিস্নুন মহারাজ, আমি ত্রিনিদাদ থেকে আস্‌ছি।' এখন ত্রিনিদাদ হ'চ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরেই, কলোম্বিয়া দেশের উপকূলের কাছে অবস্থিত একটী ছোট দ্বীপ—ব্রিটিশ-গায়েনা তার কাছেই। এই দ্বীপে প্রায় লাখখানেক ভারতবাসী আছে। এরা অথবা এদের বাপ বা ঠাকুরদাদারা বেশীর ভাগ আখের ক্ষেতে কাজ করবার জন্য কুলী হ'য়ে ভারতবর্ষ থেকে গিয়েছিল। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ত্রিনিদাদে ভারতীয় কুলী চালান যেতে আরম্ভ করে, এখন এরূপ কুলী-চালান বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। বেশীর ভাগ কুলী গিয়েছিল বিহার আর পূর্ব সংযুক্ত-প্রদেশ থেকে। আহীর, কাহার, কুর্মী, চামার, দোসাধ প্রভৃতি শ্রমিক জাতির লোকই ছিল বেশী। দু-দশজন 'মহারাজ' বা ব্রাহ্মণও গিয়েছিল। এই ব্রাহ্মণেরা কুলীদের কাছে তুলসীদাসী রামায়ণ প'ড়্‌ত, তাদের যজমানী ক'র্‌ত—সত্যনারায়ণ কথা, শ্রাদ্ধ-শান্তি, এই সব ব্রাহ্মণেরাই ক'র্‌ত। আর সুবিধামত সুদে টাকা ধার দিত। এইরূপ কতকগুলি 'মহারাজ' ত্রিনিদাদের হিন্দুদের মধ্যে বেশ বর্দ্ধিষ্ণু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। গঙ্গাবিস্নুন মহারাজের অর্থাৎ গঙ্গাবিষ্ণু ব্রাহ্মণের পিতা মাতা, তাঁর জন্মের পূর্বে ত্রিনিদাদে গিয়ে উপনিবিষ্ট হন। গঙ্গাবিস্নুনের জন্ম হয় ত্রিনিদাদে। ইনি মাতা ত্রিনিদাদের সান্‌-ফের্নান্দো শহরের ব্যবসায়ী—চা'ল ডাল, ভারতীয় দ্রব্য তৈজস-মশলা কাপড়-চোপড়—মায় হারমোনিয়ম রুদ্রাক্ষ-কণ্ঠি-মালা, ঠাকুর-দেবতার ছবি, হিন্দী বই—সব বিক্রী করেন। চা'ল-ডাল আটা-ঘী চিনি-গুড় মশলা প্রভৃতির বড় দোকানদার। ইনি লণ্ডন হ'য়ে, ইউরোপ ঘুরে, ভারতবর্ষে যাচ্ছেন। ভারতবর্ষে তাঁর এই প্রথম যাত্রা। দুটী মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে যাচ্ছেন। পিতৃভূমি ব'লে ভারতবর্ষ দর্শন, আর ভারতবর্ষ থেকে সোজা রপ্তানী করবার জন্য ওখানকার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করা—ভারতবর্ষ আর ত্রিনিদাদের ভারতীয়দের মধ্যে বাণিজ্যের দ্বারা যোগ-সূত্র দৃঢ়তর ক'রে যাওয়া। এ ছাড়া আরও উদ্দেশ্য ছিল,



ওয়েস্‌ট্‌মিন্‌স্টর রোমান-কাথলিক গির্জা—বাহ্য দৃশ্য

কতকগুলি 'তীরথ্' দেখে যাবেন, যথা কাশীজী, (কাশীর যে আর একটি নাম হ'চ্ছে বনারস তা কখনও আগে শোনেন নি) গয়াজী, মথ্রাজী, বিন্দ্রাবনজী, জগন্নাথজী; আর গয়াজীতে তাঁর মৃত পিতার উদ্দেশে 'পিণ্ডা' চড়িয়ে যাবেন; 'আরে জিলা'য় তাঁর পিতৃব্য আর পিতৃব্যের বংশের কেউ থাক্‌লে তাদের দেখে যাবেন। কাশীজীতে গঙ্গাস্নান ক'রবেন।

একে পেয়ে ভারী খুশী হ'লুম। এঁর কাছ থেকে এঁদের দেশে উপনিবিষ্ট হিন্দু আর অন্য ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কিছু খবর পেলুম। এঁরা কনোজী ব্রাহ্মণ, কিন্তু এখন ওদেশে সকলে আর উপবীত ধারণ করেন না। আমি হিন্দীতে আলাপ আরম্ভ ক'রলুম—দেখলুম, শুদ্ধ কেতাবী হিন্দী ইনি ভাল জানেন না, ব'লতে পারেন না। যা বলেন, তা হ'চ্ছে ভোজপুরিয়া ভাষা; তাও আবার ইংরেজী উচ্চারণের ছাঁচে যেন ঢেলে নেওয়া হ'য়েছে—'ত' আর 'ট'এর পার্থক্য গোলমাল ক'রে ফেলেন, ইংরেজীর দন্তমূলীয় t-র ধ্বনি এই দুই ভারতীয় ধ্বনির জায়গায় করেন। আর যে ভোজপুরিয়া বলেন, সে ভাষা আমার পরিচিত, ক'লকাতার পথে ঘাটে আর কাশীতে শোনা আধুনিক ভোজপুরিয়া নয়, সে হ'চ্ছে দু পুরুষ পূর্বেকার অতি মিঠে সেকেলে ভাষা—একটু quaint বা অদ্ভুত ঠেক্‌লেও বড় মিষ্টি লাগছিল। আমি অবস্থা বুঝে, খাঁটী বা শুদ্ধ হিন্দী আর না ব'লে, এঁর সঙ্গে ভোজপুরিয়ার নকল মেশানো হিন্দী ব'লতে আরম্ভ ক'রলুম, তাইতেই দেখলুম, চট্ ক'রে এঁর সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ হবার যোগসূত্র বেরিয়ে গেল, আর তার দ্বারা আমার প্রতি এঁর একটা শ্রদ্ধা আর বিশ্বাসও এল। একদিন বেচারী সারাদিন ধ'রে লণ্ডনের রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে—শ্রান্তদেহে ক্লান্তমনে বাসায় ফিরে কাপড় ছেড়ে শোবার ব্যবস্থা ক'রতে-ক'রতে আমায় ব'ল্‌লে—"আরে ভৈয়া, হমার দেহিয়া ঐসন দুখাওঅত বা, তো-সে হম্ কা কহী"—তাঁর এই সেকেলে দেহাতী ধরণের বুলী আমার বেশ লাগ্‌ত। গঙ্গাবিস্নুন মহারাজ ফ্রান্স আর ইটালিতে একটু ঘুরে, ব্রিন্দিসিতে আমাদেরই Conte Rosso জাহাজ ধ'রবেন ঠিক হ'ল—আমরা এক জাহাজেই দেশে ফির্‌বো। আমাকে জাহাজের সঙ্গী পাবেন জেনে গঙ্গাবিস্নুন বিশেষ আশ্বস্ত হলেন। আমি জাহাজে গঙ্গা-বিস্নুনের ভারত-ভ্রমণের জন্য একটী প্রোগ্রাম ছ'কে দিলুম, যাতে বোম্বাইয়ে নেমে রাজপুতানা দিল্লী আগরা মথুরা লখ্‌নৌ প্রয়াগ কাশী গয়া প্রভৃতি হ'য়ে ক'লকাতায় আস্‌তে তাঁর কোনও গোলমাল না হয়। পরে ক'লকাতায় এসে, ভদ্রলোক আমার বাড়ীতে অতিথি হ'য়ে দিন আট-নয় ছিলেন—বেশীর ভাগ সময় তাঁর কেটেছিল জিনিসপত্র সওদা ক'রতে। আমার তৈরী ভ্রমণের প্রোগ্রামে তাঁর কাজ হ'য়েছিল ব'লে কৃতজ্ঞতা জানালেন। গয়াতে বাপের পিণ্ড দিতে পেরেছিলেন ব'লে খুশী। চা'ল, ডা'ল, মশলা, পিতল-কাঁসার লোটা আর থালা, ধুতি, হারমোনিয়ম,



ওয়েস্ট্‌মিন্‌স্টর কাথলিক গির্জার অভ্যন্তর

এসব ক'লকাতায় বিস্তর কিনে রেঙ্গুনে গেলেন। এক ইংরেজ আমদানীর ব্যাপারী ত্রিনিদাদে চা'লের ব্যবসা একচেটে ক'রবার চেষ্টায় আছে, গঙ্গাবিস্নুন রেঙ্গুন থেকে সোজাসুজি চাল আমদানী ক'রবেন ত্রিনিদাদে—ইংরেজের অভিপ্সিত এই একচেটে ব্যবসার অত্যাচার হ'তে দেবেন না। ভদ্রলোক হিন্দুসন্তান, ব্রাহ্মণ—কিন্তু ত্রিনিদাদে গিয়ে দেশের রীতিনীতি ওরা সহজ ক'রে নিয়েছে, অনেক কিছু ভুলে গিয়েছে; তাই মনে হয়, পিতৃভূমিতে এসে, গোঁড়াদের মহলে থেকে ইনি তেমন স্বস্তি অনুভব ক'রতেন না। অভাবে প'ড়ে, ভারতবর্ষের অনেক সাধারণ লোক মনে আর ব্যবহারে ছোট হ'য়ে প'ড়েছে—ত্রিনিদাদে সোনার ভারতের, দেবলোক ভারতের, 'পুরাণা মুলুক'-এর স্বপ্ন দেখতেন; এখানকার নানা ক্ষুদ্রতা এঁকে বহু মনঃকষ্ট দিয়েছিল।

প্রত্যাবর্তন

ইংলণ্ডের কাজ চুকিয়ে দেশে ফেরার জন্য রওনা হ'লুম। পারিস হ'য়ে সোজা একদৌড়ে ভেনিস। সেই পূর্ব-পরিচিত পথে, সুইট্জরলাণ্ড দিয়ে Simplon স্যাঁপ্ল্যঁ সুরঙ্গ হ'য়ে, ফ্রান্স থেকে ইটালি। ট্রেনে একজন বাঙালী সহযাত্রী পেলুম, শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রচন্দ্র বাড়রী। ইনি পারিসে ছিলেন, পরে আমেরিকায় যান, দন্ত-চিকিৎসক হ'য়ে দেশে ফিরছিলেন। ভেনিসে এসে আমরা একই পাঁসিঅঁতে উঠলুম—আগে থাকতে সান্-মার্কো চত্বরের কাছে অবস্থিত এই পাঁসিঅঁটার নাম একজন আমায় ব'লে দিয়েছিল। দু-রাত্রি ভেনিসে কাটিয়ে, ১০ই আগষ্ট জাহাজে চড়লুম। এই দু'দিন ভেনিসের পথে-ঘাটে অনেকগুলি ভারতীয় পুরুষ আর মেয়ের দর্শন লাভ হ'ল—এরা আমাদের মত Conte Rosso জাহাজেরই যাত্রী। একটা দল পাঞ্জাবী মেয়ে ছিল—এরা ইউরোপ ভ্রমণে এসেছিল, পরে জানলুম।

এবারও জাহাজে বাঙালী সহযাত্রী কতকগুলি পাওয়া গেল। শ্রীযুক্ত কামাখ্যাকান্ত রায় মহাশয়ের নাম ক'রেছি। আমার ক্যাবিনে ছিলেন বড়োদা কলেজের গণিতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অজিত মুখোপাধ্যায়, ইনি পারিসে থেকে statistics বিষয়ে গবেষণা ক'রে দেশে ফিরছেন।. চারজনের বার্থ ছিল আমাদের ক্যাবিনে; অজিতবাবু, আমি, নাগপুরের মরিস কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মদনগোপাল, আর নথ্ৄ ব'লে একটা পাঞ্জাবী মুসলমান যুবক। অধ্যাপক মদনগোপাল গোঁড়া বৈষ্ণব ঘরের ছেলে, কিন্তু খুব বৈজ্ঞানিক, সংস্কার-মুক্ত মন এঁর; ধর্ম বিষয়ে ইনি মিস্টিক্ ভাবের বিরোধী, পূর্ণরূপে জ্ঞানেরই আশ্রয় নিতে চান; এইজন্য দক্ষিণী বৌদ্ধধর্ম এঁর প্রিয় ধর্মমত; এঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে তর্ক ক'রে বেশ একটা আধিমানসিক ব্যায়াম হ'ত, এরূপ বুদ্ধিমান বিনয়ী সৌজন্যপূর্ণ লোককে এক ক্যাবিনে যাত্রী পেয়ে বেশ লেগেছিল। পাঞ্জাবী নথ্ৄর কথা অদ্ভুত। লাহোরে তার জরীর কাজের দোকান, সাড়ী আর কিংখাবের কারবার আছে; বংশানুক্রমে জরীকর। নিজের পেশায় উচ্চ শিক্ষার জন্য, দুনিয়ায় কিভাবে এই সুকুমার শিল্পটা উন্নতিলাভ ক'রছে তা স্বচক্ষে দেখে আসবার জন্য, নথ্ৄ মাস কতকের জন্য ইউরোপ ঘুরে এল—জরমনি আর ফ্রান্স। ইংরেজীও জানে না, ফরাসী জরমান তো দূরের কথা। কিন্তু খুব হুঁশিয়ার। বের্লিনে ইণ্ডিয়া-হাউসে এর সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছিল। কোনও রকমে বের্লিনে গিয়ে পড়ে; তারপরে ভারতীয় বন্ধুদের সহায়তায় জরীর কাজের কারখানায় গিয়ে কাজ দেখে, কাজ দেখায়, আর নোতুন জিনিস শিখে নেয়। এইভাবে পারিসেও যায়। অতি ভদ্র, বিনয়ী, সবেতেই খুশী যুবক, হাস্‌তে আর হাসাতে জানে। হিন্দুস্থানীতে এর সঙ্গে আলাপ হ'ত। নথ্ৄ একটা যাকে ব'লে 'খাঁটী মানুষ'।

আরও জন তিনেক বাঙালী ভদ্রলোক ছিলেন। এঁরা ব্যবসায় আর Sport উপলক্ষে ইউরোপে গিয়েছিলেন। একটী মারাঠী মহিলা ছিলেন, এক মেয়ে-ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী। ইনি সপ্তাহ তিনেক রুষদেশে ঘুরে এসেছেন, Communism আর রুষদেশের প্রশংসায় শতমুখ; এঁর সঙ্গে দুচার বার একটু ইউরোপের আর আমাদের দেশের সামাজিক ব্যবস্থা নিয়ে আলাপ-আলোচনা হ'য়েছিল। একটী গুজরাটী মুসলমান তরুণী ছিলেন—ইউরোপে ছবি-আঁকা শিখতে গিয়েছিলেন—যেমন অভিজাত বংশের উপযুক্ত সুন্দর চেহারা, তেমনি ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা স্বরূপ ব্যবহার-মাধুর্য্য অ-ভারতীয়দের মধ্যে চীনা কতকগুলি যাচ্ছিলেন, এঁদের মধ্যে মস্তিষ্কের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, জরমানীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত, নানকিঙ-এর এক ডাক্তারকে আমার বড় ভাল লেগেছিল। ডাক্তারটীর

নামটী ভুলে যাচ্ছি—তাঁর কার্ডখানি সযত্নে কোথায় তুলে রেখে দিয়েছি—কিন্তু এরূপ হৃদয়বান্, সদাপ্রফুল্ল, বৈজ্ঞানিক-মনোভাবযুক্ত অথচ আদর্শবাদী মানুষ খুব কম দেখা যায়। চীন আর ভারতের রকমারি সমস্যা নিয়ে, চীন আর ভারতের প্রাচীন আদর্শ নিয়ে, সমগ্র বিশ্বের ইউরোপীকরণ নিয়ে, ডেকে ব'সে বহু ঘণ্টা ধ'রে তাঁর সঙ্গে কথা ক'য়ে বড় আনন্দ পাওয়া গিয়েছিল।

প্রথম শ্রেণীতে যাচ্ছিলেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণন্। অনেক সময়ে তাঁর ক্যাবিনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'য়ে এসেছি। এঁর সঙ্গে আলাপ করাটা একটী উঁচুদরের মানসিক রসায়ন। আধুনিক হিন্দুজীবনের ধর্ম আর সমাজ-গত সমস্যা নিয়ে এঁর সঙ্গে অনেক কথা হ'ল। ইনি ব'ল্লেন, সাধারণ হিন্দুকে তার ধর্ম আর সংস্কৃতির উচ্চ আদর্শগুলিকে খালি বোঝালে চ'লবেনা, এই ধর্ম আর সংস্কৃতিকে তার জীবনের সব দিকেই ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে। সেজন্য চাই নূতন 'স্মৃতি'—যাতে ক'রে সংক্ষেপে সব হিন্দুর মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে আচার-অনুষ্ঠানে তার সংস্কৃতির আর তার ইতিহাসের যোগটুকু সে ভুল্‌তে না পারে। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ একখানি বই সঙ্কলন করার কথা ব'ললেন—তাতে প্রথম খণ্ডে থাকবে এমন কতকগুলি শাস্ত্রীয় বচন, হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠা যেসব বচনের উপরে; আর দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে সংক্ষেপে যুগোপযোগী ক'রে নিয়ে কতকগুলি হিন্দু অনুষ্ঠান—যা সকল হিন্দুর পক্ষে পালন করা সহজ। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ চান যে হিন্দুমাত্রই যেন গায়ত্রী আর তার অনুরূপ অন্য কতকগুলি মন্ত্র বা মহাবাক্য অবলম্বন ক'রে তার দৈনন্দিন উপাসনা করে, আর এই গায়ত্রী আর অন্য মহাবাক্য আপামর-সাধারণ সব হিন্দুর মধ্যে যেন সব চেয়ে বড় যোগসূত্র হয়।

আমাদের জাহাজে কতকগুলি বাঙালী মুসলমান আসছিলেন। এঁরা সব হুগলী জেলার লোক। আমি শুনে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলুম, হুগলী জেলার এই সব অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত মুসলমান কেমন আস্তে-আস্তে মধ্য-আমেরিকায় আর দক্ষিণ-আমেরিকায় একটী বৃহত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠা ক'রতে সাহায্য ক'রছে। হুগলী জেলার মুসলমান দরজী আর ফেরিওয়ালা চিকনের কাজ নিয়ে আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্ট্রে ঘুরে বেড়ায়, আমার তা জানা ছিল। এদের কাছে শুনলুম, পানামাকে কেন্দ্র ক'রে প্রায় ১৫০।২০০ বাঙালী মুসলমান, মধ্য-আমেরিকায় রেশমের কাপড়, শাল, চিকনের কাজ, কাপড়-চোপড় এই সবের ব্যবসাযে লিপ্ত আছে। এরা প্রায় সবই হুগলী আর ক'লকাতার লোক। পানামা থেকে ওদিকে Costa Rica কস্তা-রিকা, Nicaragua নিকারাগুয়া, Honduras হণ্ডুরাস, Salvador সালভাডোর, Guatemala উআতে-মালা, ইস্তক মেক্সিকো পর্য্যন্ত, আর এদিকে দক্ষিণে কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, ইকোয়েডোর, ইস্তক পেরু পর্য্যন্ত, এদের যাওয়া আসা আছে। কলোন, ক্রিস্তোবাল, পানামা—এই সব জায়গায় এদের দোকানপাট—এদের স্থায়ী বসতি। কাপড়-চোপড় ঘাড়ে ক'রে বা বাক্সে ক'রে নিয়ে দেহাতী-অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে দূরদেশ পর্য্যন্ত যায়—আর লাভও করে বেশ। বেশীর ভাগ জাপানী রেশম বিক্রী করে। দুই পাঁচ দশ বছর অন্তর দেশে আসে। বাধ্য হ'য়ে সকলেই স্পেনিশ শেখে। আমাদের এই দল পানামা থেকে জেনোয়া আসে, তার পরে জেনোয়া থেকে ভেনিস পর্য্যন্ত রেলে এসে, ভেনিসে দেশের জন্য জাহাজ ধরে।

আমাদের জাহাজে স্বদেশীয় এই মুসলমান দলটীর মধ্যে শুকুরমিয়াঁ ব'লে একটী যুবক ছিল—সেটী একটী যাকে বলে character; বয়স হবে ৩০।৩১; দশ বছর পরে বাড়ী ফিরছে। কুড়ি বছর বয়সে বিদেশে যায়, তার এক মামার কাছে, পানামায়। দেশে বিয়ে ক'রে বউ রেখে গিয়েছিল। ও-দিকে পানামাতে একটী স্পেনিশ মেয়েকে বিয়ে ক'রে, গত ছ সাত বছর ধরে তার সঙ্গে বসবাস ক'রছিল। "কি করি মোসাই—মুসলমানের ছেলে হ'লেও, ওদের চর্চ গিয়ে পাদরির সামনে দাঁড়িয়ে বিয়ে ক'রতে হ'ল—ওদের-ঘরে খ্রীষ্টানী কবুল না ক'রলে পরে মেয়ের বে-জাতে বিয়েই করে না।" অবশ্য শুকুরমিয়াঁ তার 'চর্চ গিয়ে বিয়ে করাটাকে বিয়ে ব'লেই গণ্য করে না। আমি তাকে ব'ললুম, "মুসল-মানের ছেলে—এমন ক'রে জাত ধর্ম্ম ভাঁড়িয়ে বিয়ে না ক'রলেই নয়?"—জবাব হ'ল—"কি ক'রি মোশাই, পুরুষ মানুষ, অত দিন বিদেশে আছি, তাই।" দেশে ফিরে আসবার সময় মনটা তার স্পেনিশ বউয়ের জন্য বড়ই ব্যাকুল হ'য়েছিল, তাকে ফেলে আস্‌তে (বোধ হয় চিরতরে ফেলে আস্‌তে) মন সরছিল না; কিন্তু তার সাথীরা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে,

একরকম জোর ক'রেই তাকে নিয়ে এসেছে। "ক'দিন খেতে-দেতে মন সয়েনি মোসাই, ব'সে ব'সে কেঁদেওছি—তবে এখন আপনাদের-ঘরে পেয়ে, বাঙলায় কথা ব'লে মনটা একটু হাল্কা হ'চ্ছে—দেশের টানটা বোঝা যাচ্ছে।" দশ দিনের মধ্যেই কাপড় কিনে আবার পানামায় ফিরবে, স্পেনিশ স্ত্রীকে এই আশ্বাস দিয়ে, তাকে ফেলে পালিয়ে আস্ছে। এখন সে দেশের স্ত্রীর কথা মনে ক'রে, জেনোয়া থেকে তার সাড়ীর জন্য রেশমের কাপড় কিনেছে, আমায় শোনালে; যেন কত দরদী স্বামী। দেখা যাচ্ছে, শরৎ-বাবুর বর্ণিত সেই আকিয়াবের চাটগেঁয়ে হিন্দু ছেলেটী, যে তামাক কিন্‌তে ভারতবর্ষে আস্ছে এই ভুজং দেখিয়ে তার বর্মী স্ত্রীকে ছেড়ে, জাহাজে চড়বার সময়ে তার স্ত্রীর হাতের দামী চুনীর আঙটীটা পর্য্যন্ত খুলে নিয়ে, দাদার সঙ্গে পালিয়ে আসে—তার জুড়ি অন্য সমাজেও আছে। শুকুরমিয়া এদিকে বেশ নিষ্ঠাবান্ মুসলমান। যে কয়জন বাঙালী মুসলমান ভেনিসে জাহাজে উঠ্‌ল, তারা কেউই শূওর-গোরু খায় না; তাই তাদের অনুরোধ-মতন নিরামিষাশীদের টেবিলে তাদের বসবার ব্যবস্থা আমরা ষ্টুয়ার্ডদের ব'লে ক'রে দিলুম। "ভাত, আলু, তরকারী, রুটী, তোস্, মাখন, আণ্ডা, —এই হ'লেই মোসাই আমাদের চ'লবে, আমরা শোর-গোরু ওসব অখাদ্য খাই না।" বোম্বাই পৌঁছুবার দুদিন আগে শুকুরমিয়া কামাখ্যাবাবুকে বলে, "মোসাই, কাল রাতে লোভে প'ড়ে জাত ধর্ম্ম সব নষ্ট ক'রেছিলুম আর কি! খাবার সময়ে দেখি, পাশের টেবিলে খাসা রোষ্ট-ফাউল দিয়েছে; লোভ হ'ল; বয়কে আনতে ব'লতে যাবো—কিন্তু আমাদের সঙ্গের আব্দুল গফুর মিয়া [ইনি গম্ভীর প্রকৃতির ব্যক্তি, বেশ বড় দাড়ী, বয়স্থ ব্যক্তি, দলের মধ্যে সম্মানিত] আমায় ব'ল্লে, কেন আর দুটো দিনের জন্য জাত-ধর্ম্ম সব খোয়াবে—বোম্বাইয়ে নেমে মোসলমান হোটেলে যত পারো মুর্গী-পোলাও খেও—জাহাজে খ্রীষ্টানের মারা মুর্গী, ওতো আর হালাল নয়। তাই মোসাই একটু লোভ সামলে জাতটা বাঁচিয়েছি।" বোম্বাই পৌঁছতে-পৌঁছতে বোধ হয় তার স্পেনিশ বউয়ের স্মৃতি মন থেকে একেবারে মুছে গিয়েছিল।

এই ভাবে আমাদের জাহাজের মধ্যে অবস্থিত ক্ষুদ্র কিন্তু অতি বিচিত্র মানব-জগতের লীলা দর্শন ক'রতে-ক'রতে আমরা ২২শে ১৯৩৫এ আগষ্ট বোম্বাইয়ে পৌঁছুলুম। এবারের মত আমার পশ্চিম-ভ্রমণ সমাপ্ত হ'ল।

(সমাপ্ত)

মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়

পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় মাতুলালয়ে কলিকাতার ৬০নং বেচু চাটুয্যের ষ্ট্রীটের বাড়ীতে ২৩শে অগ্রহায়ণ ১২৬৪ সালে ইংরাজী ৭ই ডিসেম্বর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সোমবার সপ্তমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন।

হুগলী কলেজিয়েট স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে হুগলী কলেজে প্রবেশ করেন এবং ১৮৭৯ অব্দে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১লা ফেব্রুয়ারী পরীক্ষার ফল বাহির হইলে সেইদিনই তিনি হুগলী নর্ম্মাল স্কুলে অঙ্কশাস্ত্রের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন। ভূদেববাবু বলিয়াছিলেন, অঙ্কটা তোমার পছন্দসই জিনিষ নয়, বেশী মন দাও না, এই উপলক্ষেই বিষয়টা ভাল করিয়াই আয়ত্ত হইয়া যাইবে—আর এতদিন ছাত্র ছিলে—ভরণ-ভার অন্যে লইয়াছে; কৃতবিদ্যের অন্যের অর্জ্জিত অন্নগ্রহণ সঙ্গত নয়। সে অভ্যাস একবার হইয়া গেলে ছাড়া শক্ত হয়। পিতার এই উপদেশে প্রথমে সামান্য চাকরী বলিয়া যেটুকু ক্ষোভ হইয়াছিল তাহা দূর হইয়া গেল। ইহার প্রায় দেড় বৎসর পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম-এ পরীক্ষা দিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটপদ প্রাপ্ত হইয়া নোয়াখালি গমন করেন ও ২৭শে অক্টোবর ১৮৮০ তারিখে কার্য্যভার গ্রহণ করেন। কার্য্যে যোগ দিবার জন্য বাড়ী হইতে যাত্রার প্রাক্কালে তাঁহার পিতৃদেব মুকুন্দদেবকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন—"এই বংশ অধ্যাপকের বংশ, তুমিও শিক্ষকতা করিতেছিলে। এক্ষণে

তোমায় ফৌজদারীতে যাইতে হইল। একটা পেয়াদার চাকরীতে লোক নির্ব্বাচনই হউক, আর খুনী মোকদ্দমাই হউক—যেখানে 'তোমাকে' মত স্থির করিতে হইবে, তাহা তোমার ও তোমার ঈশ্বরের মধ্যে কথা; সেখানে তৃতীয় ব্যক্তির স্থান নাই।" এই উপদেশ তিনি কিরূপ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া চলিয়াছিলেন তাহা তাঁহার সংস্রবে যে কেহ আসিয়াছিলেন তিনিই অবগত আছেন।

মুকুন্দবাবুর চরিত্রের বিশেষত্বই এই ছিল যে যখনই কোন বিষয়ে তাঁহাকে মত স্থির করিতে হইত তখনই সেইরূপ অবস্থায় তাঁহার পিতৃদেব কি করিতেন বা কি বলিতেন যেন ধ্যানে সেইটি জানিবার চেষ্টা করিতেন। একবার একজন অধ্যাপক কোন বিষয়ে তাঁহার স্বাধীন মত জানিতে চাওয়ায় মুকুন্দদেব স্বীয় পিতৃদেব বিরচিত "বিবিধ প্রবন্ধ" দ্বিতীয় ভাগ হইতে সে সম্বন্ধে পড়িয়া শুনাইতে তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে আদেশ করেন। অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন "উহা ত আমার পড়া ছিল। আপনার স্বাধীন মত আমি জানিতে চাই।" তাহার উত্তরে মুকুন্দবাবু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'স্বাধীন' মানে ত স্ব + অধীন। তা বাবার মত যদি আমার স্ব মত না হয়, তবে অপর কাহার মত আমার আপন মত হইবে বলুন ?

নিজ জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়া লইবার কথা উঠিলে ভূদেববাবু বলিয়াছিলেন, "আমার পিতৃদেব হইতেই আমার সব – যদি ইহা দেখাইবার জন্য আমার জীবনী লেখ তবেই তাহা সার্থক হইবে। নচেৎ বৃথা হইবে।" মুকুন্দদেব সম্বন্ধেও এই কথা সমভাবে প্রযুজ্য। তিনি তাঁহার পিতার ছায়াস্বরূপ ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও পিতাকে স্মরণ করিয়া রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে বলিয়াছিলেন, "বাবা, যদি আমার জীবনের কাজ শেষ হয়ে থাকে তবে তুমি এসে আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও। আর যদি কাজ বাকী থাকে তাহলে একটু কষ্ট করেই থাকি।" অল্পবয়সে আরারিয়ার কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালে নেপাল তরাইএর দুরারোগ্য কালাজ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় বহু চিকিৎসার পর ডাক্তারদিগের পরামর্শে ভূদেববাবু তাঁহাকে লইয়া জাহাজে করিয়া সমুদ্রে কয়েক মাস ধরিয়া পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেই সময় বহু দেশভ্রমণের সুযোগ তিনি পান। তাহার পরেও উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের বহুলাংশ তিনি ভ্রমণ ও তাহা হইতে বহুতর তথ্য সংগ্রহ করেন। প্রাচীন রীতি-নীতি ঐতিহ্য যেখানেই গিয়াছেন জানিয়াছেন বুঝিয়াছেন, চিত্র ও শিল্প সংগ্রহ করিয়াছেন; এইরূপে তাঁহার জীবন সর্ব্বদিক দিয়াই সুগঠিত ও অভিজ্ঞতার সুযোগপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সকল দিক দিয়াই তিনি তাই ভূদেব-নন্দনের যোগ্যতা প্রাপ্ত হইতে পারিয়াছিলেন।

মুকুন্দবাবু বরাবরই সুলেখক ছিলেন। অর্দ্ধ শতাব্দী কাল যাবৎ "এডুকেশন গেজেট" পত্রে তাঁহার রাশি রাশি রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। পারিবারিক উক্ত পত্র ভিন্ন তিনি অপর কোনখানেই কখনও কিছু লেখেন নাই। তদ্ভিন্ন অপর সকল বিষয়ে যেমন তিনি নিজেকে প্রকাশিত করিতে ভালবাসিতেন না সেইরূপ তাঁহার লেখাগুলিতেও তিনি কখনও নিজ নাম দিয়া বাহির করিতেন না। সে জন্য বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার দান যেরূপ সর্ব্বজনপরিচিত হওয়া উচিত ছিল তাহা হইতে পারে নাই। তাঁহার লিখিত সুচিন্তিত পুস্তকগুলির মধ্যে চারি খণ্ড "সদালাপ", "নেপালী ছত্রি", "ভূদেব চরিত তিন খণ্ড" "আমার দেখা লোক" এবং "অনাথবন্ধু" (উপন্যাস) সমধিক উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত উপন্যাসটি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন ইংরাজী ও বাঙ্গালা সকল সংবাদপত্রেই তাহা উচ্চপ্রশংসিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে তিনি দেশহিতৈষিতা প্রচারের এবং আদর্শ হিন্দু গৃহের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন নিজের চিরজীবনের কার্য্যে তাহাই সুপরিস্ফুট করিয়া গিয়াছেন। স্বদেশী প্রচার যে ভাবে হইলে নির্দ্দোষ এবং দেশের মঙ্গলের হেতু হইবে তাহা তিনি বহুকাল পূর্ব্বে "অনাথবন্ধু"তে দেশবাসীকে জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লিখিত "সদালাপ" গ্রন্থের চারি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে; তদ্ভিন্ন আরও কয়েক খণ্ড লিখিত আছে। বহু সুতথ্যপূর্ণ পুণ্যকাহিনী ও জীবনী দেশ কাল জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিচারে এই সংগ্রহে স্থানলাভ করিয়াছে। মুখবন্ধে গ্রন্থকার পুস্তক-পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"সদালাপে সংগৃহীত রত্নগুলির অধিকাংশই প্রাচীনকাল হইতে মানবের সাধারণ সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে এবং অল্পাধিক পরিবর্ত্তিত আকারে তৃণগুলের একাধিক ভাষায় মুদ্রিত আছে; তবে এই সংগ্রহে সকল কথাই যথাসম্ভব সংক্ষেপে বলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

এগুলি পরিবারবর্গের এবং বন্ধুবান্ধবের সহিত পড়ায় খানিকটা সময় আনন্দে কাটিতে পারে। প্রবন্ধগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ; সেইজন্য রেলে, ট্রামে, নৌকায় এবং ঘোড়ার গাড়ীতেও পড়া চলিতে পারে। এই গ্রন্থে সকল জাতির এবং সকল ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি প্রীতি-পোষণ করিয়া সর্ব্বপ্রকার ভাল কথা প্রচারের চেষ্টা হইয়াছে।

আমার মনে হয় যে পাঠকগণ প্রথমে একবার সমস্তটা তাড়াতাড়ি পড়িবার সময় যেগুলি ভাল না লাগে সেগুলি যদি পেন্সিলের দাগ দিয়া কাটিয়া দেন এবং দ্বিতীয়বারে সেগুলি না পড়েন, তাহা হইলে এই সংগ্রহ হইতে সকলেরই নির্ম্মল আনন্দ লাভ ঘটিতে পারে। যেটা একজন কাটিয়া দিবেন সেইটাই হয়ত আর একজনের খুব ভাল লাগিবে। ফলতঃ এই পুস্তক সম্বন্ধে যে ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিতেছি সমস্ত জীবনে সকলের সহিত ব্যবহারেই সেই প্রকার উপায় অবলম্বন করিলে সকলেরই মনে শান্তি এবং আনন্দ অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে।

বাস্তবিক "সদালাপের" মত চরিত্র-গঠনের সহায়ক এবং জাতীয় জীবনীশক্তির সম্বর্দ্ধক পুস্তক বঙ্গসাহিত্যে অতি অল্পই আছে। আবার এই সংগ্রহেও যেমন, কার্য্য-জগতেও ঠিক সেইমত তাঁহার ব্যবহার অত্যুদার ছিল। নিষ্ঠার সহিত ন্যায়ের পূর্ণ মিশ্রণ থাকায় ভেদ-বুদ্ধির যে হানিকরতা তাহা তাঁহাকে স্পর্শ মাত্র করে নাই। হিন্দুর তুলনায় মুসলমান বন্ধু তাঁহার অধিক ভিন্ন অল্প ছিল না। গৃহে অব্রাহ্মণ—এমন কি সমাজচ্যুত দুষ্ট বালকগণ ও পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইতে পারিয়াছে। স্বপাকে ও ব্রাহ্মণে তাঁর কাছে প্রভেদ অল্পই ছিল। বাড়ীর চাকরের কলেরা রোগে তিনি স্বহস্তে সেবা করিয়াছেন। হাসপাতালে দেন নাই।

মুকুন্দদেবের "নেপালী ছত্রি" স্বাধীন হিন্দুরাজ্য নেপালের সুন্দর ইতিহাসসংগ্রহ। বহু দুষ্প্রাপ্য পুস্তক এবং সরকারী কাগজপত্রাদি অবলম্বনে ইহা রচিত। "শ্রীরাম-চরিত্রের আলোচনা" নামে তিনি একটি ক্ষুদ্র সন্দর্ভও লিখিয়াছিলেন। "আমার দেখা লোক" নামে তিনি তাঁহার সমসাময়িক পরিচিত বহু ব্যক্তি সম্বন্ধে বিবিধ বিচিত্র তথ্যসমন্বিত এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই পুস্তক তাঁহার দেহান্তের পরে প্রকাশিত হইয়াছে! মুকুন্দ-দেবের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য তিন খণ্ডে রচিত তাঁহার পিতৃদেবের জীবনী "ভূদেব-চরিত"। ইহার প্রথম খণ্ড মাত্র তাঁহার জীবদ্দশায় ১৩২৪ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। একান্ত ভগ্নশরীরে সুবিপুল পরিশ্রমের পর ঐ বইখানির রচনাকার্য্য সবেমাত্র সমাধা করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন "আমার জীবনের ব্রত আজ সাঙ্গ হইল। আমার পিতৃদেবের জীবনী আমার স্বদেশবাসীকে যদি আমি না দিয়া যাইতাম তবে আমায় তাঁহাদের নিকট অপরাধী হইয়া যাইতে হইত।" বড়ই পরিতাপের বিষয় গ্রন্থখানির সম্পূর্ণ মুদ্রণ কার্য্য তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মোক্ষলাভের পর অবশিষ্ট-খণ্ডদ্বয় তাঁহার পুত্রকন্যাগণের উদ্যোগে প্রকাশিত হইয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করান যেন ঐ গ্রন্থদ্বয় নিশ্চিত ছাপা হয়। তিনি ঐ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিলে মুকুন্দবাবু নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

মুকুন্দদেব ধনীগৃহে জন্মিয়াও কোনদিন বিলাসসুখে মগ্ন হন নাই। তিনি চিরদিনই ত্যাগী, সংযমী ও অনাসক্ত পুরুষ ছিলেন। যৌবন হইতেই তিনি পিতৃ-প্রদর্শিত পথে স্বদেশী শিল্পের রক্ষণ ও প্রচারে কায়মনোবাক্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী যে অসহযোগ আন্দোলন, স্বদেশী প্রচার এবং স্বদেশ সেবার উপদেশ দিয়াছেন, বহুকাল পূর্ব্বেই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মনীষী ভূদেব স্বীয় "পুষ্পাঞ্জলি"তে সেই কর্ম্মনীতির উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। মুকুন্দদেবও পিতৃদত্ত উপদেশ সমস্ত জীবন ধরিয়াই নীরব সাধনায় অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশী সাধন অকৃত্রিম, উদার এবং অচঞ্চল ছিল। বঙ্গবিচ্ছেদের বহুবর্ষ পূর্ব্বে অত্যন্ত ক্লেশসাধ্য দুষ্প্রাপ্য স্বদেশজাত দ্রব্যের ব্যবহার তাঁহার পরিবারমধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রচলিত ছিল। ইহার জন্য আত্মীয়-কুটুম্বরা অনেক সময় বিরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, দুঃখিত হইয়াছেন, পরিজনগণের মধ্য হইতেও অসন্তোষ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। কিছুতেই তাঁহাকে সঙ্কল্পবিচ্যুত করিতে সমর্থ হয় নাই। কাপড়ের পাড় উঠিয়া গিয়াছে, ছাতার কালি জলে ধুইয়াছে তবু দ্বিগুণ চতুর্গুণ মূল্যে সেই সমস্ত বস্তু সংগ্রহ করিয়াছেন। কানপুর হইতে ফ্লানেলের থান বোম্বাই হইতে চাদর আনাইয়া, তাঁতি দ্বারা জামার কাপ বুনাইয়া এই বৃহৎ পরিবারে ব্যবহার করাইয়াছেন। খদ

পরা তাঁহার বাড়ীতে আজ নূতন নয়। যখন যেখানে স্বদেশী শিল্পের উৎপত্তি বা প্রচার বৃদ্ধির জন্য যে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে দ্বিধাহীনভাবে শেয়ার কিনিয়া বা প্রয়োজনমত আর্থিক সাহায্য প্রদানে তিনি কখনও বিরত হন নাই। এইরূপ কয়েকটী ব্যাপারে বহু আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও তিনি পুনরায় নূতন কার্য্যে অর্থনিয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; বলিতেন, "দেশের কাজে দেশের লোক ক্ষতির ভয় পাইলে কাজ হইবে কিরূপে? দশটা গেলেও দুইটা ত টিঁকিবে।"

তিনি নিজে স্বদেশী মোটা সুতার আট হাতি খাটো ধুতি পরিয়া ও চটি পায়ে দিয়া সর্ব্বত্র গমন করিতে কখনও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। বাড়ীর লোক কেহ আপত্তি করিলে বলিতেন, "আমি যদি লম্বা কোঁচা ঝুলাইয়া বেড়াই সে কিছুই বিচিত্র নয়। ইহাতেই বরং কেহ কেহ বলে—আপনি যদি পারেন তবে আমরাই বা না পারিব কেন?" সকল সম্প্রদায়ের ইতর অথবা ভদ্র যে কোন ব্যক্তি তাঁহার সংস্রবে আসিত সে-ই তাঁহার নিতান্ত অমায়িক, সহৃদয় ও সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি একান্ত শ্রদ্ধান্বিত ও ভক্তিমান না হইয়া পারিত না। পথে ঘাটে মাথায় মোট তুলিতে অসমর্থ মুটে দেখিলে তিনি স্বহস্তে তাহার মোট তুলিয়া দিয়াছেন, অন্ধ ভিখারীকে হাতে ধরিয়া নিজের লাঠি তাহাকে দিয়া ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। ইহা তাঁহার পক্ষে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। কাহারও যাচ্ঞা বা অনুরোধ তিনি অবহেলা করিতে পারিতেন না। সেইজন্য কেহই তাঁহার দ্বারে সাহায্যপ্রার্থীরূপে আসিয়া প্রবেশ করিতে বাধা পায় নাই। দুঃস্থ ব্যক্তি সাহায্যের জন্য যখনই তাঁহার নিকট হাত পাতিয়াছে তখনই তাহার আশা সম্পূরণ হইয়াছে। বিপন্ন আর্ত্তরোগী চিরদিন তাঁহার নিকট হইতে অর্থ, ঔষধ ও নানা সাহায্য লাভে বঞ্চিত হয় নাই। জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে আর্ত্তজনের সেবার জন্য তাঁহার ভাণ্ডার সদাই উন্মুক্ত ছিল। কোথাও কেহ অর্থাভাবে লেখাপড়া করিতে পারিতেছে না, মুকুন্দবাবু জানিতে পারিলে তখনই তাহাকে যথোচিত সাহায্য দান করিয়াছেন। ফলতঃ অবস্থার তুলনায় তাঁহার দান অপরিমিতই ছিল। তিনি বরাবরই গুপ্তদানের পক্ষপাতী ছিলেন, নিজেকে প্রকাশ তিনি কোনদিক দিয়াই করিতে চাহিতেন না। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় তৃতীয় পুত্র সোমদেবের অকাল বিয়োগের পর তিনি তাহার প্রাপ্য অর্থ দ্বারা "সোমদেব সৎকর্ম্মভাণ্ডার" নামে একটী স্থায়ী ধন-ভাণ্ডার স্থাপন করেন। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে দরিদ্র, বিপন্ন ও আর্ত্তের সাহায্য এবং অন্যান্য সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যের যথাসম্ভব সহায়তা করার মুখ্য উদ্দেশ্যেই ঐ দান ভাণ্ডারটী স্থাপিত হইয়াছিল। বিগত বাইশ বৎসর-কাল ধরিয়াই এই সমিতি নানা পুণ্যানুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। তাঁহার পিতার অক্ষয়কীর্ত্তি "বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ডে"র নাম সকলেই জানেন। মুকুন্দদেবের সুপরিচালনে এই ফণ্ডের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল এবং ইহার মূলধন দেড় লক্ষ টাকা হইতে প্রায় তিন লক্ষ টাকায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। দেশে সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতিকল্পে বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ডের কৃত সাহায্য দেশবাসী কখনও বিস্মৃত হইবে না। বিশ্বনাথ বৃত্তি বঙ্গবিহার উড়িষ্যা ও আসামপ্রদেশ মধ্যে সীমাবদ্ধ। এজন্য কাশীধামে মুকুন্দদেব নিজ পিতৃদেবের নামে কয়েকটী "ভূদেববৃত্তি" স্থাপন করিয়াছিলেন। "কান্যকুব্জ চতুষ্পাঠী" স্থাপন এবং গো-সেবার্থ "গোকুণ্ড সমিতি" প্রতিষ্ঠা তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। বিহার এবং যুক্তপ্রদেশে তিনি পিতার নামে "ভূদেব হিন্দি মেডাল" দানের ব্যবস্থা করেন। ভূদেববাবুর চেষ্টাতেই বিহারপ্রদেশের আদালতসমূহে ফারসীর পরিবর্ত্তে নাগরী অক্ষর ও হিন্দি ভাষার প্রচলন সম্ভবপর হইয়াছিল। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীবৃন্দের মধ্যে হিন্দি ভাষায় প্রথম স্থানাধিকারী বালককে ভূদেববাবুর কীর্ত্তির স্মারক এই পদক প্রদত্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ পিতার কীর্ত্তি রক্ষা এবং বৃদ্ধিই মুকুন্দদেবের জীবনের প্রধানতম কর্ত্তব্য ছিল এবং পিতৃভক্তিই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম উপাদান ছিল। তিনি প্রায়ই বলিতেন, ঈদৃশ পিতার পুত্র হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এ জীবনে ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য। সকল বিষয়ে তিনি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন; এখন তাঁহার শিক্ষা যদি ফলোপদায়িনী হয় তবেই আমার জীবন সার্থক।

মুকুন্দদেব যে তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয় পিতার প্রাতঃস্মরণীয় পুত্র ছিলেন সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। তিনি আত্ম-প্রচার কখনও করেন নাই বটে, কিন্তু নিজ ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যপূত, দূরদৃষ্টিযুক্ত নির্ভীকমত জীবনের সকল অবস্থাতেই

স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সকলকার কাছেই অকুণ্ঠিতভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কর্ম্মজগতে উচ্চপদস্থ অনেক প্রধান প্রধান রাজপুরুষ তাঁহার সদ্‌গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারী তাঁহার পরামর্শ ব্যতিরেকে কাজ করিতেন না। অধস্তন কর্ম্মচারীবৃন্দ তাঁহাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন।

তাঁহার দানশীলতার মতই তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সত্যানুরাগের সীমা ছিল না। যাহা তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন কিছুতেই তাহার অনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত হইতেন না। সহস্র বিঘ্ন-বিপত্তি, ভগ্নশরীর, শোকের-জ্বালা, কার্য্যাধিক্য, কাহারও বিরাগ বা ভ্রূকুটি কোন কিছুরই তাঁহাকে প্রতিরোধ করিবার সাধ্য ছিল না। যাহা দুর্নীতি, যাহা অন্যায়, যাহা পাপ বা যাহা মিথ্যাচরণ—তাহার বিরুদ্ধে তাঁহার কঠিন শাসনদণ্ড সর্ব্বদা সমুদ্যত থাকিত। তাহা তিনি সর্ব্বথা পরিহার করিতেন। তাহাতে যদি বুকের অস্থিপঞ্জরও চূর্ণ হইয়া যাইত তথাপি সে বেদনা তিনি অগ্রাহ্য করিতেন। বিপদে এমন অচপল ধৈর্য্যও জগতে সুদুর্ল্লভ ছিল। ফলতঃ তদীয় চরিত্রে মহাপুরুষজনোচিত কোমলতা ও কাঠিন্যের সমাবেশ দেখা যাইত। উত্তররাম-চরিতের ভাষায় বলিতে—

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।

লোকত্তরাণাং চেতাংসি কোহু হি বিজ্ঞাতুর্হতি॥"

সুদীর্ঘ ৩৪ বৎসর সরকারী চাকুরী করিবার পর ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দদেব কর্ম্মজীবন হইতে অবসর লন। শেষ কয়েক বৎসর তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দে দিল্লী দরবার উপলক্ষে "রায় বাহাদুর" উপাধি পাইয়াছিলেন। চাকরীতে তাঁহার গুণের ও প্রতিভার সম্যক্ আদর হইয়াছিল এমন কথা আদৌ বলা চলে না। অবসরগ্রহণের পর মুকুন্দদেব অবিমুক্তপুরী বারাণসী ধামে অবশিষ্ট জীপনযাপন করেন। এতদভিপ্রায়ে তিনি পূর্ব্ব হইতেই তথায় অসিঘাটের সন্নিকটে একটী বাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কিঞ্চিদধিক সাত বৎসর কাল কাশীধামে বাস করিবার পর ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে তারিখে তিনি হিন্দুর কাম্য সুপবিত্র তীর্থধামে সহজ সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিয়া জীবন্মুক্তি লাভ করেন।

মুকুন্দদেব জীবনে অনেক শোক দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন। পিতৃবিয়োগ শোকের আঘাত সহনীয় হইবার পূর্ব্বেই তিনি স্নেহময় জ্যেষ্ঠভ্রাতা গোবিন্দদেবকে হারান। মুকুন্দদেব পিতার প্রতি যেরূপ ভক্তিমান ছিলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপরও সেইরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার অকাল-বিয়োগে কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি মৃতবৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভ্রাতার মৃতদেহের সাক্ষাতে নিজের কাছে নিজেই প্রতিজ্ঞা করেন যে নিজের পুত্রে ও ভ্রাতুষ্পুত্রে তাঁহার বিন্দুমাত্রও প্রভেদ থাকিবে না। সাংসারিক সকল কার্য্যে সে প্রতিজ্ঞা তিনি চিরজীবন অক্ষুণ্ণভাবে পালন করিয়াছিলেন। অতি বৃহৎ বা অতি ক্ষুদ্র বিষয়েও কখনও তাঁহার এ প্রতিজ্ঞা বিন্দুমাত্র লঙ্ঘন হয় নাই। জীবনের শেষভাগে উপর্য্যুপরি কতকগুলি বড় বড় শোকের আঘাতে তাঁহার শরীর মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। পেন্‌সন লওয়ার মাস কয়েক পরেই জ্যেষ্ঠপুত্র সৌম্যদর্শন গণদেবের ও তৃতীয় বৎসরে পুত্রপ্রতিম ভ্রাতুষ্পুত্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রামদেবের আকস্মিক ও অকাল বিয়োগ তাঁহাকে বজ্রাহতপ্রায় করিয়াছিল। মুকুন্দবাবুর পাঁচ কন্যা ও চারিটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। দুইটী পুত্র গণদেব ও সোমদেব তাঁহার জীবৎকালে এবং কন্যা ইন্দিরা তাঁহার মৃত্যুর পাঁচ মাস মাত্র পরে পরলোকগমন করেন। একটী কন্যার অকালবিয়োগ ঘটে। এই সকল পারিবারিক দুর্ঘটনায় তাঁহার বলিষ্ঠ শরীর ও দৃঢ়চিত্ত অত্যন্ত দ্রুত ভগ্ন হইতে থাকে। বাহিরের লোকের কাছে তিনি কখনও শরীর বা মনের কোন প্রকার দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিতেন না, সমস্তই নিজের হৃদয়ে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেন। ইহার ফলে কঠিন হৃদ্‌রোগে তিনি আক্রান্ত হইলেন। পৈতৃক বাতব্যাধিও কয়েক বৎসর যাবৎ বিশেষ ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছিল। তদ্ভিন্ন অনিদ্রা রোগও শেষ দেড় বৎসর বিশেষ যন্ত্রণার কারণ হয়। এরূপ অবস্থাতেও তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যাকে লইয়া ভূদেব-চরিত লেখায় সবিশেষ পরিশ্রম করিতেছিলেন। পিতার জীবনচরিত লেখায় বা শোনায় তাঁহার সকল কষ্ট বিদূরিত হইত। কোন বাহিরের লোক আসিলে তাঁহার চিরাভ্যস্ত সহজ ও আনন্দমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার ভিতরের কষ্ট কিছুই বুঝিতে পারিত না। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, "লোকের মুখে আহা শুনিতে যেন

আমার মাথা কাটা যায়।" এই সময় তাঁহার প্রথমা কন্যা বিখ্যাত উপন্যাসলেখিকা ৺ইন্দিরা (সুরূপা) দেবী কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার ভগ্নহৃদয় অধিকতর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

তাঁহার মৃত্যুকে ভীষ্মদেবের ন্যায় ইচ্ছামৃত্যু বলা যায়। কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী অনুরূপা দেবী মজঃফরপুর হইতে আসিলে তাঁহাকে বলেন "আমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে, আমি তোমার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আর এক মাসের মধ্যেই আমার শেষ হইবে। আমার বাবার শ্রাদ্ধের দিন বৈকালে আমি যাইতে চাই। আমি আমার বাবা ছাড়া আর কিছুই জানি নাই। লোকে আমায় সুপুত্র বলিয়া জানিবে।" শারীরিক অসুস্থতার জন্য সে বৎসর প্রতি বৎসরের মত চুঁচুড়ায় যাইতে পারেন নাই। ২৪শে বৈশাখ শ্রাদ্ধের দিন গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া শ্রাদ্ধ সমাপনান্তে যথারীতি ব্রাহ্মণভোজন ও অধ্যাপকবিদায়ের বন্দোবস্ত সমস্তই স্বচক্ষে দর্শন করেন। অপরাহ্নে পরিজনবর্গকে বলেন, "একাদশীতে গেলে বাড়ীর ও বাহিরের বিধবাদের বড় কষ্ট হয়; দ্বাদশী তিথি ভাল নয়; সর্ব্বসিদ্ধা ত্রয়োদশী—ত্রয়োদশীই ভাল। যদিও দক্ষিণে যোগিনী—কাশীতে দক্ষিণে যাইবার আশঙ্কা ত আর নাই!" ২৬শে বৈশাখ দিবা দশ ঘটিকার সময় ঠিক সেই শুক্লা-ত্রয়োদশী তিথিতে অবিমুক্ত বারাণসীক্ষেত্রে গঙ্গাতীরে সেই ভীষ্মতুল্য সত্যসিদ্ধ মহাপুরুষের নশ্বরদেহ বিশ্বনাথের পদপ্রান্তে বিলীন হইয়া গেল। তাঁহার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলিল। জীবনে যিনি মিথ্যাচরণ করেন নাই, অন্যে করিলে কখন সহিতে পারেন নাই, তাঁহার ইচ্ছাশক্তির বল কত বড় দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে গৃহদেবতাকে চুঁচুড়ার বাটী হইতে কাশীধামে লইয়া আসিয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়; সেই উপলক্ষে সমুদয় আত্মজনকে পত্র দ্বারা আনয়ন করেন। লিখিতে বলেন, ঠাকুর প্রতিষ্ঠা ও পিতৃ-শ্রাদ্ধ এই আমার শেষ কার্য্য—তোমরা একবার শেষ দেখা দেখিয়া যাইতেও পারিবে।

তাঁহার লিখিত "সংক্ষিপ্ত ভূদেব জীবনী"র প্রারম্ভে উদ্ধৃত ভগবদ্বাক্য—

"রাজানো যং প্রশংসন্তি যং প্রশংসন্তি পণ্ডিতাঃ
সাধবো যং প্রশংসন্তি স পার্থ পুরুষোত্তমঃ।"

তাঁহার নিজের সম্বন্ধে উল্লেখ করিলেই মুকুন্দদেব সম্বন্ধে সকল কথাই বলা হইয়া যায়।

কর্ম্মী রবীন্দ্রনাথ

ডাঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি-এ, এল-এম-এস

বোলপুর শান্তিনিকেতন দেখিবার ইচ্ছা অন্তরে ছিল অনেক কালের। বিশ্রবিশ্রুত এই আশ্রমের কথা বহুভাবে বহুরূপে আমাদের কাছে আসিয়াছে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথের সাধনক্ষেত্র সেই ত এক মহা আকর্ষণ, তার উপর বিশ্বভারতীর কর্ম্মস্থল, সমস্ত জগতের সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট কেন্দ্র, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের লোভনীয় শান্তিনীড় এবং সকলের চেয়ে বড় কথা বাংলার বিনষ্টপ্রায় গ্রাম সংস্কার ও পল্লী উন্নয়নের প্রথম চেষ্টার মহান বিকাশ ইহারই পক্ষাশ্রয়ে সুরুল শ্রীনিকেতনে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে।

কবি সত্যই বলিয়াছেন—বাঙ্গালী জাতি সকল বিষয়েই শ্রদ্ধাপরায়ণ। নতুবা ঘরের কাছে এমন বিরাট কর্ম্মকেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও একবার যাইয়া উহা দেখিবার ও শিক্ষা লাভের সুযোগ লইবার বাঙ্গালীর আগ্রহ কই? যাইবার ইচ্ছা করিয়াছি অনেকবার—কিন্তু যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই কিছুতেই। তাই কবির আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনে যখন রবিবাসরের মিলন সম্ভবপর হইল তখন নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও একদিনের জন্য বাঙ্গালীর এই পুণ্যতীর্থে যাওয়ার স্বর্ণ সুযোগ ছাড়িতে পারিলাম না। যদিও পরমায়ু আমাদের সামান্য একদিনের—কবির ভাষায় বলা চলে—

"..............শুধু একবেলা
পরমায়ু, তারি মাঝে শুনে নিতে হবে
ভ্রমরগুঞ্জন গীতি, বন বনান্তের

কিন্তু ইহারই মধ্যে দেখিবার ও শিখিবার যথেষ্ট না হইলেই যেটুকু অবসর হইয়াছে সমস্ত জীবনে তাহার স্মৃতি অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

প্রথমেই লক্ষ্য হইল কর্ম্মীদের আন্তরিকতা ও আত্মীয়তা। কতক পরিচিত ছিলেন—কিন্তু অধিকাংশই অপরিচিত। ইহাদের সরল সশ্রদ্ধ ব্যবহার মুহূর্ত্তেই পরকে আপনার করিয়া লয়। যে কয়েক ঘণ্টা ছিলাম ইহাদের মধুর অমায়িক আদর আপ্যায়নে মুগ্ধ হইয়াছি। যে কোন বিষয় জানিতে ঔৎসুক্য হইয়াছে তন্মুহূর্ত্তেই তাহা সরল ও বিশদভাবে বুঝাইয়া দিতে তাঁহাদের উৎসাহের অন্ত নাই। সঙ্গে করিয়া লইয়া সমস্ত দর্শনীয় স্থান দেখান এবং কোন কাজের কি উদ্দেশ্য, কি ভাবে কাজ হইতেছে, উহার বর্ত্তমান অবস্থা কি, ভবিষ্যতে কি আশা করা যায়, উহাতে দেশের ও দশের কি কল্যাণ হইবে—সমস্তই ধৈর্য্যের সহিত আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

এবারকার রবিবাসরের বৈঠকে কবি কাব্য বা সাহিত্য সম্বন্ধে কোন আলোচনা না করিয়া দেশের দুঃখদুর্দ্দশার কথাই শুনাইয়াছেন। নদীপথে যাইতে যাইতে একদা যৌবনে তাঁহার সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিতে পল্লীবাসীদের দুঃখ দুর্দ্দশা ও অসহায় অবস্থার সকরুণ চিত্র প্রতিভাত হইয়াছিল, দেশবাসীর সেই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে তিনি যে গভীর বেদনা ও মনঃপীড়া অনুভব করিয়াছিলেন এবং যাহার স্মৃতি কবি আজও ভুলিতে পারেন নাই এবং যাহার প্রতিকারার্থে তিনি ধীরে ধীরে এই বিশাল কর্ম্মকেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়াছেন, অল্প কথায়—তাহারই পরিচয় দিলেন। পল্লীই যে দেশের প্রাণ ও মেরুদণ্ড তিনি বহু পূর্ব্বে উহা অনুভব করিয়াছিলেন এবং পল্লী সজীব হইলেই যে দেশ সজীব হইবে এ সম্বন্ধে বহু পূর্ব্বেই তিনি নিঃসংশয় হইয়াছিলেন। পল্লীকে উপবাসী রাখিয়া যে আমাদের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক বা শিক্ষাপ্রসার প্রভৃতি কোনো প্রচেষ্টাই সফল হইতে পারে না—কবির ইহা দৃঢ় বিশ্বাস! তাই তিনি পল্লী সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইলাম শ্রীনিকেতনে। গ্রামের উন্নতিকল্পে সেখানে যে সব কাজ আরম্ভ হইয়াছে তাহার সমস্ত পরিচয় দেওয়া এ ক্ষুদ্র নিবন্ধে অসম্ভব। গ্রামের উন্নতির বিষয়গুলি পরস্পর এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত যে একটিকে ছাড়িয়া অন্যটিকে গ্রহণ করা চলে না, সুতরাং সমস্ত বিষয়ের পরিকল্পনা লইয়া কাজে নামিতে হয়। পল্লীর উন্নতির প্রধান অন্তরায় উহাদের স্বাস্থ্যহীনতা। এই স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ব্যাপকভাবে চেষ্টা চলিতেছে। কেন্দ্রীয় একজন ডাক্তার, একটি ডিস্পেন্সারী, একটী ল্যাবোরেটোরী ও একটি পরিচালন সমিতি আছে। ইহারই অন্তর্গত কতকগুলি গ্রামকে এক 'ইউনিট' ধরিয়া তথায় স্থানীয় পরিচালনা সমিতি বা পঞ্চায়েত গঠন করিয়া উহার অধীনে অনুরূপ ডাক্তারাদি লইয়া সংঘবদ্ধভাবে কার্য্য চলিতেছে। বর্ত্তমানে এইরূপ ৯টি কেন্দ্র আছে। উহারা ম্যালেরিয়াগ্রস্তদের বর্দ্ধিত প্লীহার তালিকা সংগ্রহ করেন, ড্রেণ কাটিয়া জল নিষ্কাষণ, ডোবা ভরাট, পুষ্করিণী পরিষ্কার, জঙ্গল কাটা, ম্যালেরিয়ার সময় কুইনাইন বিতরণ, বর্ষায় ডোবা ও পুষ্করিণীতে কেরোসিন দেওয়া এবং স্বাস্থ্যোন্নতির অন্যান্য সকল উপায়ই অবলম্বন করেন। যাহাতে প্রত্যেক কেন্দ্র আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং এইভাবে যদি সমগ্র দেশময় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তবে স্বাস্থ্যোন্নতি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এই সম্পর্কে কলিকাতা এণ্টিম্যালেরিয়াল সমিতির প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য; কিন্তু কি কারণে উহারা ইহাদের মত সম্যক সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই তাহা পরে বলিব। অল্পদিন হইল কংগ্রেসের দৃষ্টিও এদিকে পড়িয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর গ্রাম উদ্যোগ সংঘ পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে চেষ্টা করিতেছ। সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টও এদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছেন। গত বৎসর বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট ১৬ লক্ষ টাকা এই কাজের দরুণ পাইয়াছিলেন, এ বৎসর ১৮ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন। সমস্ত দেশব্যাপী কাজ করার প্রলোভনে কোন স্থানেই সেরূপ সুফল ফলে নাই। কোন একটা বিশেষ কেন্দ্রে যদি একাগ্র ও নিবিড়ভাবে কাজ করা যায় তবেই সুফল পাইবার সম্ভাবনা। মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় সমিতির কার্য্যের সহায়তার জন্য বিশ্বভারতীর হস্তে ১১০০৲ টাকা দিয়াছেন, সেজন্য তাহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

শ্রীনিকেতনের অন্তর্গত বাঁধগোড়া সমিতি স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যে কার্য্য করিয়াছেন নিম্নে তাহা উল্লেখ করা গেল।

নূতন রাস্তা তৈয়ারী	৩৬৪৩ গজ
রাস্তা মেরামত	৮৫৪৪ গজ
নূতন ড্রেণ তৈয়ারী	১৭০২ গজ
ড্রেণ মেরামত	১১৮৬৬ গজ
ডোবা ভরাট	২৬টি
জঙ্গল পরিষ্কার	৪৭½ বিঘা
কুইনাইন বিতরণ	৭৪৬৬৬ গ্রেণ

এখন অধিকাংশ কেন্দ্রেই স্বাস্থ্যের এত উন্নতি হইয়াছে যে বর্দ্ধিত প্লীহা আর প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বাস্থ্যবিভাগের ম্যালেরিয়া বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এস্ এন্ সুর এই সব সমিতি পরিদর্শন করিয়া ও স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই সব কার্য্য সম্ভব হইত না যদি না কবির প্রেরণায় ডাক্তার হ্যারী টিম্বার্স ও মিঃ এল্মহার্ষ্ট প্রথম দিনে এ সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা না করিতেন!

কেবল স্বাস্থ্যের উন্নতি হইলেই গ্রামের উন্নতি হইতে পারে না—সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত ভাল খাদ্যের সংস্থান চাই এবং খাদ্য কিনিবার অর্থ থাকা চাই। সুতরাং প্রত্যেকের যাহাতে

জীবিকা উপায়ের সুব্যবস্থা হয় তাহাই সর্ব্বাগ্রে করা দরকার।

ইহা না হইলে গ্রামে বাস করা সম্ভবপর নহে। ইহারই প্রতিকারের জন্য শ্রীনিকেতনে নানাবিধ গৃহ শিল্পের অনুষ্ঠান হইয়াছে যাহাতে এই সব শিক্ষা করিয়া লোকেরা উপার্জ্জন-ক্ষম ও আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে। এই সকলের মধ্যে তাঁতের কাজ, চামড়ার কাজ, মৃৎশিল্প প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। আবার এই সব কাজের আংশিক যাহাতে গ্রামে হইতে পারে তাহার চেষ্টা চলিতেছে এবং উহাতে অনেকটা কৃতকার্য্যও হওয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে এই কৃষিপ্রধান দেশের কৃষিরও উন্নতি হইতেছে। যাহাতে এক ফসলের স্থানে দুই ফসল জন্মিতে পারে, যে সব ফসল জন্মে না চেষ্টা করিলে তাহার মধ্যে কি কি উৎপন্ন হইতে পারে, কেন্দ্রীয় কৃষিক্ষেত্রে প্রথমে তাহার পরীক্ষা হয় এবং পরে ঐ সব পরীক্ষা গ্রামে গ্রামে হয়। এই সব দেখিয়া ও উহা গ্রহণ করিয়া কৃষকেরা লাভবান হইতেছে। গ্রামোন্নতিকল্পে এমনি করিয়াই এখানে নানা বিষয়ের পরীক্ষা হইতেছে।

শ্রীনিকেতন কেন্দ্রে একটী সমবায় ব্যাঙ্ক আছে। আশা করি পরে প্রতি গ্রাম্য-কেন্দ্রে একটী করিয়া ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবে। দুগ্ধশালা (ডেয়ারী) হইতে নির্দ্দোষ খাঁটি দুগ্ধ যোগান দেওয়া হয়—গোজাতির উৎকর্ষের চেষ্টা চলিতেছে—পশুখাদ্যের জন্য নানাবিধ উদ্ভিদ্ উৎপাদিত হইতেছে। একটি জীবনবীমা কোম্পানীর অভাব অনুভব করিলাম—উহা যেমন প্রত্যেক পরিবারের ভবিষ্যৎ সংস্থানের হেতু, তেমনি ঐ তহবিলের সঞ্চিত টাকা নানাবিধ জনহিতকর কাজে লাগান যাইতে পারে। আশা করি কর্ম্মীদের দৃষ্টি এদিকে পড়িবে। শ্রীনিকেতনে ও গ্রামিক কেন্দ্রে প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে—উচ্চ শিক্ষার স্থান বিশ্ব-ভারতীতে। প্রত্যেক গ্রামের শস্যসম্পদ, বৃক্ষসম্পদ ও অন্যান্য সম্পদের তালিকা সংগৃহীত হইতেছে। কোথায় কত ডোবা, কোথায় ভরাট নদী ও পুকুর, কোথায় জঙ্গল, কোথায় কোন শিল্প, কোন স্থান কি কারণে প্রসিদ্ধ—এবম্বিধ সকল তালিকা সংগ্রহ হইতেছে। গ্রামের কতজন শিক্ষিত—কোন জাতির কত লোক—এইরূপ আবশ্যকীয় বহু তথ্য সংগ্রহ হইতেছে—উহার সকল বিষয়ের আলোচনা এখানে সম্ভব নহে।

এই সব দেখিবার ও জানিবার জন্য প্রত্যেক সমর্থ বাঙ্গালীর শ্রীনিকেতন পরিদর্শন করা উচিত এবং বিশ্ব-ভারতীর সদস্য হইয়া উহাকে সাহায্য করা সঙ্গত। এই সব কার্য্যের জন্য কবি যে বিপুল আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, মানসিক কত চিন্তাই যে ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে এবং সুদূর-প্রসারী যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লইয়া দীর্ঘকাল তাঁহাকে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে তাহা কল্পনাতীত। এ বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রের পরিচালনা কখনও একার সাধ্যায়ত্ত নহে কিন্তু কবি অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। আজ বার্দ্ধক্যে পৌছিয়া যদিও দেহ অপটু হইয়াছে মনটি তার এখনও চিরতরুণ রহিয়াছে—ইহার বেগ বহন করিবার শক্তি সত্য সত্যই দেহের আর নাই। কবি বিদেশীয়ের নিকট যে সাহায্য পাইয়াছেন বাঙ্গালীর নিকট তাহা পান নাই। তাহার এই যে বৃহৎ কর্ম্মপ্রচেষ্টা তাহা কি আজও বাঙ্গালীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে না? যদিও একদল দরদী কর্ম্মীকে তিনি সহায়রূপে পাইয়াছেন কিন্তু উহা পর্য্যাপ্ত নহে। আরও কর্ম্মী চাই, অর্থ চাই, দেশের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে অনেক অর্থের প্রয়োজন। বাঙ্গালী কি চিরদিন মুষ্টিবদ্ধ করিয়া একান্ত নির্লিপ্তভাবে দিনযাপন করিবে? বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকেও তাহার কার্য্যকুশলতার প্রমাণস্বরূপ স্যার জন রাসেলের প্রশংসাপত্র দাখিল করিতে হয়। কিছুদিন পূর্ব্বেও যখন কবি এই বৃদ্ধ বয়সেও অর্থের দরুণ শান্তিনিকেতনের দল লইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বাহির হইয়াছিলেন—বাঙ্গালার বাহিরের লোকই তাঁহাকে সে শ্রম ও কষ্ট হইতে মুক্তি দিয়াছিল। বাঙ্গালীর বোধ করি লজ্জা বলিয়া কোন বালাই নাই!

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গ-সাহিত্যকে বিশ্বের সভায় সম্মানিত আসনে স্থান দিয়াছেন, নিখিল বিশ্বে সার্ব্বজনীন সাম্য মৈত্রী সংস্থাপনের মহৎ কল্পনা পরিস্ফুট করিয়াছেন, একটী বৃহৎ গ্রন্থাগারের রূপ দিয়াছেন ও একটি বিশিষ্ট চিত্রকলা গড়িয়া তুলিয়াছেন। ভারতীয় সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয় প্রভৃতিতে তাহার দানের তুলনা নাই।

দেশের নানা অবস্থায়, বিপদে সম্পদে দেশবাসীকে তিনি বহুভাবে প্রেরণা দিয়াছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির পুনর্গঠনে তাহার দাম সহজ নহে। যে কেহ ইহার একটি করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট-চিত্তে দিনযাপন করিত এবং প্রকৃতির লীলা-নিকেতন এই শান্তিপূর্ণ মনোরম আশ্রমে বাকী দিনগুলি নীরবে অতিবাহিত করিত। কিন্তু কবির কর্ম্মস্পৃহা অসীম, অদম্য ইহাঁর উৎসাহ, লোককে প্রেরণা দিতে ইনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এমন যে কর্ম্মবীর তাঁহাকে আমি সশ্রদ্ধ অভিবাদন করি ও প্রণাম জানাই। হে আমার দেশবাসী ভাইবোনগণ, তোমরা উহার কার্য্যে সহায় হও, দলে দলে যাইয়া সেখানকার কর্ম্মপদ্ধতি দেখিয়া আইস, কর্ম্মী রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবার চেষ্টা কর এবং আন্তরিকতার সহিত অর্থ দিয়া, চিন্তা দিয়া, কর্ম্ম দিয়া, প্রেম দিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য কর। উহাতে নিজেদেরই সাহায্য করা হইবে, দেশমাতৃকার মুখ উজ্জল হইবে, আত্মশক্তি দ্বারা জগতে আবার নিজের আসন স্থাপন করিতে পারিবে।

প্রসঙ্গিকী

নূতন শাসনতন্ত্র—

কয়েক বৎসর ধরিয়া আলোচনা ও বিবেচনার পর মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার পরিবর্ত্তিত হইয়া গত ১লা এপ্রিল (১৯৩৭) হইতে ভারতের সর্ব্বত্র নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ব্যবস্থা যে ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসনের পথে অন্ততপক্ষে কিয়ৎপরিমাণেও অগ্রসর করিয়া দিবে—ইহা অনেকের ধারণা হইলেও নূতন ব্যবস্থা ভারতবাসী কাহারও আশানুরূপ হয় নাই। এই নূতন ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিয়া লইয়া ইহার স্থলে অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ শাসনতন্ত্র প্রদানের জন্য বৃটীশ মন্ত্রিসভাকে ভারতবাসীবৃন্দ বার বার অনুরোধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা আদৌ ফলপ্রদ হয় নাই। সে জন্য এই শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের দিন উহার প্রতিবাদে ভারতের সর্ব্বত্র হরতাল পালিত হইয়াছে।

বাঙ্গালার মন্ত্রিমণ্ডল—

নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশে গভর্ণরের শাসন পরিষদের ৪ জন সদস্য ও মন্ত্রিমণ্ডলের তিন জন সদস্য এই ৭ জনের দ্বারাই দেশের শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। কিন্তু নূতন শাসনতন্ত্রে মন্ত্রিমণ্ডলকে তাঁহাদের কার্য্যের জন্য ব্যবস্থা পরিষদের নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে বলিয়া গভর্ণর যাঁহার উপর মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের ভার প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি ১১ জনের কম মন্ত্রী লইয়া মন্ত্রিমণ্ডল রচনা করিতে সমর্থ হন নাই। বাঙ্গালা দেশে ব্যবস্থাপরিষদে কোন দলের সদস্য সংখ্যাই মোট সদস্যসংখ্যার অর্দ্ধেকের অধিক না হওয়ায় কোন দলের নেতাই অপর দলের সদস্যগণের সাহায্য ব্যতীত মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে পারেন না। কংগ্রেস দলের সদস্য সংখ্যা দল হিসাবে প্রথম হইলেও কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে সম্মত হন নাই; সে জন্য গভর্ণর সংখ্যাগরিষ্ট দ্বিতীয় দলের নেতা মৌলবী এ, কে, ফজলল হকের উপর মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের ভার দিয়াছিলেন।

মন্ত্রীগণের নাম ও বেতন—

অনেক বিচারবিবেচনা ও পরামর্শের পর মৌলবী এ, কে, ফজলল হক কর্ত্তৃক উপস্থাপিত নিম্নলিখিত ১১ জন সদস্যকে গভর্ণর মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিতে সম্মত হইয়াছেন—(১) মৌলবী এ, কে, ফজলল হক—প্রধান মন্ত্রী, মাসিক বেতন ৩ হাজার টাকা। (২) শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার। (৩) সার খাওজা নাজিমুদ্দীন। (৪) সার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়। (৫) ঢাকার নবাব হবিবুল্লা বাহাদুর। (৬) কাশীমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী। (৭) মিঃ এচ, এস, সুরাবর্দ্দী—এই ৬ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্ত্রী—ইঁহাদের প্রত্যেকের মাসিক বেতন আড়াই হাজার টাকা। (৮) নবাব মশারফ হোসেন। (৯) মৌলবী নওসের আলি। (১০) শ্রীযুত প্রসন্নদেব রায়কত ও (১১) শ্রীযুত মুকুন্দবিহারী মল্লিক—এই ৪ জন তৃতীয় শ্রেণীর মন্ত্রী—ইঁহাদের প্রত্যেকের মাসিক বেতন ২ হাজার টাকা।

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা—

প্রধান মন্ত্রীকে বাদ দিয়া মন্ত্রিমণ্ডলে ৫ জন হিন্দু ও ৫ জন মুসলমানকে গ্রহণ করা হইয়াছে। হিন্দুদের মধ্যে আবার শেষোক্ত দুইজন নিম্নজাতীয়। মন্ত্রীরা যাহাতে দেশের লোকের বিশ্বাসভাজন হন, মৌলবী ফজলল হক সাহেব সে বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই বটে, কিন্তু তথাপি এই মন্ত্রিমণ্ডল স্থায়ী হইবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থাকিয়া গিয়াছে। শুনা যায়, মুসলমান মন্ত্রীরা শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মত ব্যক্তিকে মন্ত্রিমণ্ডলে লইতে অসম্মত হইয়াছিলেন এবং কুমার শ্রীযুত শিবশেখরেশ্বর রায়ের মত তেজস্বী ব্যক্তি এই ভাবে গঠিত মন্ত্রিমণ্ডলে যোগদান করিতে সম্মত হন নাই। গভর্ণর মন্ত্রীদিগের যে বেতন স্থির করিয়া দিয়াছেন,

তাহাও স্থায়ী হইবে না। নূতন ব্যবস্থায় গভর্ণরের মাত্র প্রথম ৬ মাসের জন্য বেতন স্থির করিয়া দিবার অধিকার আছে। ইতিমধ্যে ব্যবস্থাপরিষদের সদস্যগণ মন্ত্রী-বেতন স্থির করিয়া দিবেন।

কার্য্য বিভাগ—

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগগুলির কার্য্যভার নিম্নলিখিতভাবে মন্ত্রীগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী—শিক্ষা-বিভাগ। নলিনীবাবু—অর্থ-বিভাগ, সার বিজয়প্রসাদ—রাজস্ব-বিভাগ, নাজিমুদ্দীন সাহেব—স্বরাষ্ট্র-বিভাগ (আইন ও শৃঙ্খলা), ঢাকার নবাব—কৃষি ও শিল্প বিভাগ, কাশিমবাজারের মহারাজা—যান বাহন ও পূর্ত্ত-বিভাগ, সুরাবর্দ্দী সাহেব—বাণিজ্য ও শ্রম-বিভাগ, নবাব মশারফ হোসেন—বিচার ও ব্যবস্থা-বিভাগ, নওসের আলি—স্বায়ত্তশাসন বিভাগ, রায়কত মহাশয়—আবগারী ও বন-বিভাগ এবং মল্লিক মহাশয়—সমবায় ও কৃষিঋণ।

অন্যান্য প্রদেশ—

প্রধান মন্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের ফলে বাঙ্গালার মত পাঞ্জাবেও কংগ্রেস দল ব্যবস্থাপরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইতে পারেন নাই। সে জন্য বাঙ্গালার মত পাঞ্জাবেও নানা দলের লোক লইয়া পূর্ব্বেই মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হয়। পাঞ্জাবে সার সিকান্দার হায়াৎ খাঁ (প্রধান মন্ত্রী), সার সুন্দর সিং মাজিথিয়া, ছোটুরাম, লালা মনোহরলাল, মেজর কিজার হায়াৎ খাঁ ও মিঃ আবদুল হাই এই ৬ জনকে লইয়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছে। পাঞ্জাবের মন্ত্রিমণ্ডলের অবস্থা ও বাঙ্গালার অনুরূপ—এই মন্ত্রিমণ্ডল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা খুবই কম। উত্তরপশ্চিমসীমান্ত-প্রদেশ ও আসামপ্রদেশে কংগ্রেস দলের অধিক সদস্য নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিতে পারেন নাই—কাজেই উক্ত দুই প্রদেশে গভর্ণমেণ্টকে মন্ত্রিমণ্ডল রচনা করিতে বেগ পাইতে হয় নাই। নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া উক্ত দুইটি প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। আসাম প্রদেশ—(১) সার মহম্মদ সৈয়দ সায়েদউল্লা—প্রধান মন্ত্রী (২) শ্রীযুত রোহিণীকুমার চৌধুরী (৩) রেভাঃ জে, জে, এম, নিকোলাস রায় (৪) সামসুল উলেমা মৌলানা আবুনাসের মহম্মদ ওয়াহিদ—এই ৪ জন। উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ—(১) নবাব সাহেবজাদা সার আবদুল কুইয়াম খাঁ—প্রধান মন্ত্রী (২) রায় বাহাদুর মেহেরচাঁদ খান্না (৩) খাঁ বাহাদুর সাদাউল্লা খাঁ—এই ৩ জন।

কংগ্রেস প্রাধান্যের ফল—

মাদ্রাজ, বোম্বাই, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ এই ৬টি প্রদেশের ব্যবস্থাপরিষদে কংগ্রেস দলের সদস্য সংখ্যা মোট সদস্যসংখ্যার অর্দ্ধেকের অধিক হইয়াছে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী ঐ সকল প্রদেশের কংগ্রেস-নেতাদিগকে কয়েকটি সর্ত্তে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। গভর্ণর ঐ সকল প্রদেশের কংগ্রেসনেতৃবৃন্দকে সে জন্য আহ্বান করিলে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বলেন—"গভর্ণর যদি তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার হইতে বিরত থাকেন, তবেই কংগ্রেস দল মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিবেন।" দুঃখের বিষয় কোন প্রদেশেই গভর্ণরগণ ঐ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। অথচ বিলাতেও সম্রাটের ঐরূপ বহু বিশেষ ক্ষমতা আছে, কিন্তু সম্রাট কখনও সেগুলি ব্যবহার করেন না। এ অবস্থায় উক্ত ৬টি প্রদেশে মন্ত্রিমণ্ডল রচনা একরূপ অসম্ভবই হইয়াছে। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় অধিকাংশ সদস্যের ভোটের বলেই মন্ত্রিদিগকে শাসনকার্য্য পরিচালন করিতে হইবে; এখন যে সকল লোক মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন তাঁহাদের কোনরূপ কার্য্য করাই অসম্ভব হইবে। কিন্তু তথাপি লোকমত অমান্য করিয়া সকল প্রদেশেই মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছে; পরে দেখা যাইবে, ইহার ফল কি হয়।

অন্যান্য প্রদেশে মন্ত্রিসভা—

কংগ্রেস দল মন্ত্রিমণ্ডল গঠন না করায় কোন দায়িত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন সদস্যই ঐ কার্য্যে অগ্রসর হন নাই। মাদ্রাজে মাননীয় শ্রীযুক্ত ভি, এস, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, বিহারে সার গণেশ দত্ত সিংহ (ইনি গত ১৭ বৎসর কাল মন্ত্রী ছিলেন), যুক্তপ্রদেশে ছুনোয়ার সার মহারাজা সিং প্রভৃতির মত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ গভর্ণর কর্ত্তৃক আহূত হইয়া মন্ত্রিমণ্ডল

গঠনে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাহার পর নিম্নলিখিতরূপ মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছে :—

বিহার প্রদেশ—(১) মিঃ মহম্মদ ইউনাস (প্রধান মন্ত্রী) (২) কুমার অজিতপ্রসাদ সিং দেও (৩) মিঃ গুরুসাহালাল ও (৪) নবাব আবদুল ওয়াহেদ খাঁ।

মধ্যপ্রদেশ—(১) শ্রীযুত ই, রাঘবেন্দ্র রাও (প্রধান মন্ত্রী) (২) শ্রীযুত বি, জি, থাপার্দে (৩) মিঃ এস, ডবলিউ, এ, রিজভী ও (৪) মিঃ ধর্ম্মরাও ভুজঙ্গরাও।

বোম্বাই প্রদেশ—(১) সার ডি, বি, কুপার (প্রধান মন্ত্রী) (২) সার এস, টি, কাম্বলি (৩) মিঃ হোসেন আলি রহিমকুল্লা (৪) শ্রীযুত যমুনাদাস মেহটা।

উড়িষ্যা প্রদেশ—(১) পারলাকিমিদির মহারাজা (প্রধান মন্ত্রী) (২) মিঃ এম, জি, পট্টনায়ক (৩) মৌলবী লতিফর রহমন।

মাদ্রাজ প্রদেশ—(১) সার কৃষ্মা ভি, রেড্ডী (প্রধান মন্ত্রী) (২) রাও বাহাদুর এ, টি, পামির সেলবাম (৩) কুমার রাজা এম, এ, মুটিয়া চেটিয়ার (৪) বি, এম, পালাট (৫) রাও বাহাদুর এম, সি, রাজা ও (৬) খাঁ বাহাদুর পি, কামিকুল্লা সাহেব।

সিন্ধুপ্রদেশ—(১) সার গোলাম হোসেন হিদায়েতুল্লা (প্রধান মন্ত্রী) (২) তালপুরের সার মীর বন্দে আলি খাঁ ও (৩) মুখী গোবিন্দরাম।

যুক্তপ্রদেশ—

যুক্ত প্রদেশে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করা বিশেষ কঠিন হইয়াছিল। ছত্রীর নবাবের উপর গভর্ণর কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ৫।৬ দিন চেষ্টার পর ২রা এপ্রিল তথায় নিম্নলিখিত কয়জনকে লইয়া মন্ত্রি-সভা গঠিত হইয়াছে—(১) ছত্রীর নবাব—প্রধান মন্ত্রী (২) সার আহম্মদ ইউসুফ (৩) সার জে, পি, শ্রীবাস্তব (৪) সালিমপুরের রাজা (৫) ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজকুমার (৬) তিরওয়ার রাজা (৭) রাজা মহেশ্বর দয়াল শেঠ। সকল মন্ত্রীই মাসিক আড়াই হাজার টাকা করিয়া বেতন পাইবেন।

সুভাষচন্দ্রের কারামুক্তি—

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস হইতে সুদীর্ঘ ৫ বৎসর কাল ৩নং রেগুলেশনে বন্দী থাকার পর শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় গত ১৭ই মার্চ্চ কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিয়াছেন ইহা বাঙ্গালা দেশবাসীর পক্ষে আনন্দের সংবাদ সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি দারুণ ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন; কাজেই সুভাষচন্দ্রের মুক্তির ও পীড়ার সংবাদ আমাদিগের 'হরিষে বিষাদ' আনয়ন করিয়াছে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে গ্রেপ্তারের পরই সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যহানি হয় এবং চিকিৎসার জন্য সে সময়ে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ইউরোপে যাইতে অনুমতি প্রদান করেন। সুভাষচন্দ্র ভিয়েনায় যাইয়া বাস করেন ও তথায় দীর্ঘকাল চিকিৎসিত হইয়াছিলেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তিনি বিমানযোগে কলিকাতায় আসেন, কিন্তু তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। এক মাস কাল পুলিসের হেফাজতে থাকিয়া তিনি পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পাদন করেন ও পুনরায় ইউরোপে ফিরিয়া যান। কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য তিনি পুনরায় ভারতে আগমন করেন; কিন্তু তাঁহার উপস্থিতি মাত্রই গত ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল পুলিস তাঁহাকে বোম্বায়ে ৩নং রেগুলেসনে বন্দী করে। বন্দী অবস্থায় ২০শে মে তাঁহাকে যারবেদা জেল হইতে কার্সিয়ংএ তাঁহার অগ্রজের বাটীতে স্থানান্তরিত করা হয়। গত ১৭ই ডিসেম্বর চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হইয়াছিল এবং ৩ মাস পরে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। মুক্তিলাভের পর চিকিৎসকগণের পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে সুভাষচন্দ্র নিদারুণ ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। সুভাষচন্দ্র ধনীর পুত্র—যৌবনে আই-সি-এস এর চাকরী ত্যাগ করিয়া দেশসেবাব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করেন; গত ১৭ বৎসর কাল তাঁহাকে যে কঠোর জীবন যাপন করিতে হইয়াছে, তাহারই ফলে তাঁহার আজ এই অবস্থা। যাহা হউক—এত বিলম্বেও যে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছেন, নিরাশার মধ্যে ইহাই একমাত্র আশার কথা। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার রোগ মুক্তির জন্য দেশবাসী সকলে নিয়ত শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে।

বিশ্ব সভ্যতায় বাঙ্গালার স্থান—

সার ফ্রান্সিস ইয়ংহাসবেণ্ড একজন খ্যাতনামা দার্শনিক পণ্ডিত; তিনি বিশ্বধর্ম্মসম্মিলন উপলক্ষে সম্প্রতি কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনিষ্টিটিউটে গত ১২ই মার্চ্চ শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিক উৎসবের একটি সভায় সার ফ্রান্সিস বলিয়াছিলেন—"জগতবাসী সকলেই জানেন যে বাঙ্গালা দেশ জগতের মধ্যে একটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সভ্য দেশ।" তিনি বলিয়াছিলেন, এই সংস্কৃতির অর্থ শুধু বিদ্যা বা শিক্ষা নহে। সকল দিক দিয়াই বাঙ্গালা দেশের গর্ব্ব করিবার জিনিষ আছে। যে দেশে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতির মত লোক জন্মগ্রহণ করে, সে দেশ সম্বন্ধে লোকের উপরোক্ত ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। সার ফ্রান্সিসের কথাগুলি আমাদের পক্ষে গৌরবজনক হইলেও একথা আমরা বলিতে বাধ্য যে বাঙ্গালা দেশ ক্রমশই সকল বিষয়ে অধঃপতিত হইতেছে। বিশ্বধর্ম্ম সম্মিলনের বাণী যদি বাঙ্গালা দেশকে পুনর্জ্জীবন দান করিয়া উদ্বুদ্ধ করিতে পারে, তবেই তাহার সার্থকতা।

কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলন—

কলিকাতার তালতলা পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে গত ৫ বৎসর যাবৎ গুড ফ্রাইডের ছুটীতে তালতলা পল্লীতে কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হইতেছে। এবারও গত ২৪শে মার্চ্চ হইতে কয়দিন উক্ত সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশন হইয়া গেল। কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী মূল সভাপতি এবং শ্রীযুত কেশবচন্দ্র গুপ্ত সাহিত্যশাখা, শ্রীযুত প্রিয়দারঞ্জন রায় বিজ্ঞানশাখা, শ্রীযুত দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার শিশুসাহিত্যশাখা ও শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী মহিলা শাখায় সভাপতি হইয়াছিলেন। এই অনুষ্ঠানটি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার উদ্যোক্তারা সম্মিলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন না। সম্মিলনে বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ পঠিত হইয়া থাকে এবং সম্মিলনের সঙ্গে সঙ্গীতাদির ব্যবস্থা থাকে। এই ধরণের সম্মিলনের দ্বারা একদিকে যেমন সাহিত্যের ও জ্ঞানের প্রচার হয়, অন্যদিকে তেমনই সাহিত্যিকগণের পরস্পরের সহিত পরিচয়ের সুযোগ ঘটে।

কংগ্রেস সদস্যগণের প্রতিশ্রুতিদান—

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবস্থাপরিষদ ও ব্যবস্থাপক-সভাগুলিতে কংগ্রেস পক্ষীয় যে সকল সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সভায় প্রবেশের পূর্ব্বে একটি প্রতিশ্রুতি দান করিতে হইবে। সেজন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর গত অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রতিশ্রুতিটি স্থির হইয়াছে—"নিখিল ভারত কংগ্রেসের সদস্যস্বরূপ আমি শপথ করিতেছি যে আমি ভারতবর্ষের সেবা করিবার জন্য এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভ ও ভারতীয় জনগণের শোষণ নিবারণ ও তাহাদের দারিদ্র্য মোচনের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা পরিষদের ভিতরে ও বাহিরে কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিব। ভারতবর্ষ যাহাতে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে এবং কোটি কোটি ভারতবাসীর অসহ্য দুঃখদারিদ্র্য যাহাতে দূর হইতে পারে, তজ্জন্য কংগ্রেসের নিয়ম শৃঙ্খলা মানিয়া কংগ্রেসের আদর্শ ও উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিব বলিয়া আমি শপথ গ্রহণ করিতেছি।" কংগ্রেস সদস্যগণ এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য যদি সাধ্যমত চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ভারতের মুক্তির পথ যে অনেকটা সুগম হইবে, তাহা অনায়াসেই বলা যায়। তবে আমরা যেরূপ "প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু" তাহাতে অধিক বিশ্বাস করিতে আশঙ্কা হয়।

কংগ্রেস ও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ—

কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষগণ যখন ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস-দলের সদস্যদিগকে কয়েকটি সর্ত্তে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার অনুমতি দিলেন, তখন দেশের অধিকাংশ লোকই কংগ্রেসের এই কার্য্যে বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী ঐ অনুমতি দানের পক্ষে বক্তৃতা করায় তাঁহার উপর জনগণের শ্রদ্ধাও কমিয়া গিয়াছিল। এমন কি পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর মত লোকও গান্ধীজির প্রস্তাবের তাৎপর্য্য সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন —"আমার বিশ্বাস, মন্ত্রিত্ব গ্রহণে কংগ্রেসের অনুসৃত আদর্শ অনেকটা নীচে নামিয়া আসিবে।" কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল—গান্ধীজির ঐ একটি মাত্র প্রস্তাবে এই শাসন সংস্কারের আসল রূপ ধরা পড়িয়া গিয়াছে। কংগ্রেস নেতারা মন্ত্রিত্ব গ্রহণের যে সর্ত্ত দিয়াছিলেন, তাহার গুরুত্ব

প্রকৃত পক্ষে কিছুই ছিল না। বরং প্রাদেশিক গভর্ণরগণ কংগ্রেসের সর্ত্তে সম্মত হইলে কংগ্রেস নেতাদিগের পক্ষেই আত্ম-সম্মান বজায় রাখিয়া মন্ত্রীর কার্য্য করাই দুঃসাধ্য হইত।

বাঙ্গালার নূতন গভর্ণর—

বাঙ্গালার গভর্ণর সার জন এণ্ডারসনের কার্য্যকাল আগামী ২৫শে নভেম্বর তারিখে শেষ হইবে বলিয়া মহামান্য সম্রাট লর্ড ব্রাবোর্ণকে বাঙ্গালার গভর্ণরপদে নিযুক্ত করিয়াছেন; লর্ড ব্রাবোর্ণ বর্ত্তমানে বোম্বায়ের গভর্ণরপদে নিযুক্ত আছেন এবং সার জন এণ্ডারসনের কার্য্যকাল শেষ হইলে বাঙ্গালায় আগমন করিবেন। আমরা নূতন গভর্ণরকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি।

নিখিল বঙ্গ মিউনিসিপাল সম্মিলন—

গত ১২ই মার্চ্চ কলিকাতা টাউন হলে নিখিল বঙ্গ মিউনিসিপাল সম্মিলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার মিউনিসিপালিটীসমূহের কমিশনারগণ এই সম্মিলনে সমবেত হইয়া মিউনিসিপালিটীর কার্য্য পরিচালনার সুবিধা অসুবিধার কথা আলোচনা করিয়া থাকেন। এবার সার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় সম্মিলনের উদ্বোধন করিয়াছিলেন এবং প্রবীণ এডভোকেট শ্রীযুত নরেন্দ্রকুমার বসু সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সম্মিলনে অধিক সংখ্যক মিউনিসিপালিটীর প্রতিনিধি যোগদান করেন নাই। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে অন্যান্য সকল সভ্য দেশের মত এ দেশেও গভর্ণমেণ্টকে "স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনবোর্ড" গঠন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন বটে, কিন্তু যাঁহাদের জন্য এই বোর্ড গঠন করা হইবে তাঁহারাই যদি এ বিষয়ে আবশ্যক উৎসাহ প্রকাশ না করেন, তবে এই সম্মিলন আহ্বানের সার্থকতা কোথায়?

বাঙ্গালার ম্যালেরিয়া—

সেদিন বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টার কর্ণেল এ, সি, চট্টোপাধ্যায় এক সভায় বলিয়াছেন—বাঙ্গালা দেশে প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়া রোগে ৪ লক্ষ লোক মারা যায়। তিনি ঐ সভায় ম্যালেরিয়ার বহু কারণের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু আমাদের মনে হয়—যিনি সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ত্তার পদে কার্য্য করেন, তিনি কি ইচ্ছা করিলে ইহার আংশিক প্রতীকারেরও কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন না? গভর্ণমেণ্ট যে কিছুদিন পূর্ব্বে "প্যারিস গ্রীণে"র সাহায্যে মশা কমাইবার কথা বলিয়াছিলেন, সে বাবদে গভর্ণমেণ্ট কত টাকা ব্যয় করিয়াছেন এবং তাহার ফল কি হইয়াছে দেশবাসীকে কি তাহা জানান হইয়াছে? চট্টোপাধ্যায় মহাশয় খাঁটি বাঙ্গালী—তিনি এই উচ্চপদ লাভ করিয়া এ বিষয়ে কি করিতেছেন, তাহাও সকলেই জানিতে চাহে।

টেলিফোনের খরচ কমিল—

গত কয় বৎসর যাবৎ ক্রমাগত আন্দোলনের ফলে কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন তাঁহাদের চার্জ্জ কমাইতে বাধ্য হইয়াছেন, এখন আবার বেঙ্গল টেলিফোন কোম্পানীও ১লা এপ্রিল হইতে তাঁহাদের চার্জ্জ কমাইয়াছেন। তবে এ নামমাত্র হ্রাসের ব্যবস্থা; এ ব্যবস্থায় কেহই সন্তুষ্ট হইবেন না। নূতন টেলিফোন লইতে হইলে পূর্ব্বে এককালীন ৩০ টাকা দিতে হইত, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ২০ টাকা দিতে হয়; এখন তাহা কমাইয়া ১৫ টাকা করা হইয়াছে। টেলিফোন রাখার জন্য যন্ত্রের ভাড়াও মাসিক ১ টাকা মাত্র কমাইয়া ১২ ও ১০ টাকার স্থলে ১১ ও ৯ টাকা করা হইয়াছে। কিন্তু টেলিফোন 'কলে'র দর আদৌ কমে নাই। আমাদের মনে হয়, টেলিফোন যখন একচেটিয়া ব্যবসা এবং ইহাতে যখন প্রচুর লাভ হয়, তখন টেলিফোন লইবার প্রাথমিক খরচ ১০ টাকা করিয়া যন্ত্রের মাসিক ভাড়া ৫ ও ৬ টাকা করিলে কোম্পানী অধিক লাভবান হইতে পারিবেন। খরচের হার যত কমিবে, তত অধিক লোক টেলিফোন লইবেন এবং তদ্দ্বারা প্রকারান্তরে কোম্পানী অধিক লাভবান হইবেন। ইলেকট্রিকের বেলায় ত ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ইলেকট্রিকের দাম যত কমিতেছে, ইলেকট্রিক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ততই বাড়িয়া যাইতেছে। ইলেকট্রিক মিটারের মাসিক ভাড়া যখন চার আনা, তখন টেলিফোনের মাসিক ভাড়া ১০৲ টাকা হইতে ৯৲ টাকা করা উপহাস ভিন্ন আর কি হইতে পারে।

চিফ্ একজিকিউটিভ অফিসারের ছুটী—

কলিকাতা কর্পোরেশনের চিফ একজিকিউটিভ অফিসার শ্রীযুত জে, সি, মুখোপাধ্যায় গত ১৮ বৎসর কাল কর্পোরেশনে চাকরী করিতেছেন, কিন্তু তিনি ইহার মধ্যে কখনও সুদীর্ঘকাল ছুটী ভোগ করেন নাই। সম্প্রতি তিনি ৬ মাসের ছুটী লইয়া (১৫ই মার্চ্চ) বিলাত যাইতেছেন; তাঁহার স্থানে প্রথম ডেপুটী একজিকিউটিভ অফিসার শ্রীযুত শৈলপতি চট্টোপাধ্যায় চিফের কাজ করিবেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইউরোপে বিভিন্ন মিউনিসিপালিটীর কার্য্যও দেখিয়া আসিবেন। কিন্তু তাহা দ্বারা কলিকাতার করদাতারা কোন প্রকার লাভবান হইবে কি?

বাঙ্গালা ভাষা ও নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়—

বহুদিন হইতে নানা কার্য্য উপলক্ষে মধ্যপ্রদেশে যাইয়া অনেক বাঙ্গালী এখন উক্ত প্রদেশের স্থায়ী অধিবাসী হইয়া গিয়াছেন। সেজন্য নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষায় পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু আই-এ বা বি-এ পরীক্ষার্থী বাঙ্গালী ছাত্রগণকে বাঙ্গালা ভাষা পড়াইবার কোন ব্যবস্থা না থাকায় তাহাদিগকে তথায় দারুণ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। তাঁহাদিগকে কলেজে উর্দ্দু, হিন্দী বা মারাঠী পড়িতে হয়। উক্ত প্রদেশে বাঙ্গালী ছাত্রের সংখ্যা এত অধিক যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে একটু মনোযোগী হইলেই ছাত্রগণের এই অসুবিধা দূর করিতে পারেন। মধ্যপ্রদেশবাসী বাঙ্গালী-প্রধানদিগের এজন্য চেষ্টা করা উচিত।

স্বেচ্ছা-শ্রমিকের দ্বারা খাল খনন—

দেশে যে গণ-জাগরণ দেখা দিয়াছে, তাহা দেশবাসীর অনেক কাজ দেখিয়াই এখন বুঝিতে পারা যায়। সম্প্রতি স্বেচ্ছা-শ্রমিকের দ্বারা দুইটি স্থানে দুইটি খাল কাটার যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেশবাসীর সমবেত চেষ্টার দৃষ্টান্ত দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। (১) ত্রিপুরা জেলার চরভৈরবী খাল মজিয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি স্থানীয় খাসমহল কর্ম্মচারীর উদ্যোগে সেখানকার লোকগণ সাড়ে ৪ মাইল দীর্ঘ খালের পঙ্কোদ্ধার করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে ঐ মাটি দিয়া খালের পাশে পাশে একটি আড়াই মাইল দীর্ঘ পথও প্রস্তুত হইয়াছে। শ্রমিক দ্বারা ঐ কাজ করাইতে অন্ততঃ পক্ষে ১০ হাজার টাকা খরচ পড়িত, কিন্তু কোদাল প্রভৃতি কিনিতে ঐ কাজের জন্য মাত্র ৪৫০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। (২) মৈমনসিংহ সদরেও সমবায় বিভাগের ঢাকা অঞ্চলের সহকারী রেজিষ্ট্রার খাঁ সাহেব চৌধুরী আফসার আলির উদ্যোগে মসাখালি পল্লী সংস্কার সমিতি কর্ত্তৃক এক মাইল দীর্ঘ তালতলা খালটির পঙ্কোদ্ধার করা হইয়াছে। সকল শ্রেণীর লোক কোদাল লইয়া গিয়া নিজেরাই ঐ খালের মাটি কাটিয়াছিলেন। এই সকল কাজ দেখিয়া বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত না হইয়া থাকা যায় না। অথচ খুলনা জেলায় মৌখালি নদী মজিয়া যাওয়ায় তাহার পঙ্কোদ্ধারের জন্য গভর্ণমেণ্ট ও জিলা বোর্ডকে ৪০ হাজার টাকা ব্যয় করিতে হইতেছে। সেখানে কি অন্যান্য স্থানের মত স্থানীয় লোকদিগের উৎসাহ ছিল না?

বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ—

চিনির উপর যে স্বদেশী শুল্ক আছে, তাহা কমাইবার জন্য এবার ব্যবস্থাপরিষদে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। ঐ প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করা হইলে দেশী চিনির মূল্য আরও কমিয়া যাইত; তাহা ছাড়া পোষ্টকার্ডের মূল্য কমাইয়া ৩ পয়সার স্থলে ২ পয়সা করিবার জন্য ব্যবস্থাপরিষদে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। বড়লাট তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া উভয় প্রস্তাবই নাকচ করিয়া দিয়াছেন।

কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ—

সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় গত ৪ঠা মার্চ্চ বৃহস্পতিবার কাশীধামে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি বারাণসীস্থ ভূদেব চতুষ্পাঠীর স্মৃতির অধ্যাপক এবং সর্ব্বমঙ্গলা চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন। বহুকাল যাবৎ তিনি পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের সহিতও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি কাব্য, বেদান্ত, দর্শন, পাণিনি, কলাপ, মীমাংসা প্রভৃতি বিষয়ে অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। কাশীধামে তিনি বহু ছাত্রকে অন্নদান করিতেন।

বালীগঞ্জ সঙ্গীত সংসদ—

কলিকাতা বালীগঞ্জ সঙ্গীত সংসদের ৪টি বালিকা এবার বেঙ্গল মিউজিক এসোসিয়েসনের অনুষ্ঠিত সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আমরা এই সঙ্গে উক্ত বালিকাগণের চিত্র ও পরিচয় (বামদিক হইতে) প্রকাশ করিলাম—(১) কুমারী লতিকা পাল (এফ-এ) আধুনিক সঙ্গীতে তৃতীয় স্থান ও খেয়ালে সার্টিফিকেট (২) কুমারী কবিতা রায় (এফ-এ) বাউল ও আধুনিক সঙ্গীতে বিশেষ প্রথম (৩) কুমারী রেণুকণা সুর (এফ-বি) আধুনিক সঙ্গীতে তৃতীয় (৪) কুমারী মঞ্জুলিকা সুর (এফ-এ) কীর্ত্তনে প্রথম, খেয়ালে তৃতীয় ও আধুনিক সঙ্গীতে তৃতীয়।



বালীগঞ্জ সঙ্গীত সংসদ

প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণকে শিক্ষাদান—

পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই প্রাপ্তবয়স্ক অশিক্ষিত কৃষক-শ্রমিক প্রভৃতিদিগকে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা আছে। এদেশে এখন পর্য্যন্ত বালকবালিকাগণের প্রাথমিক শিক্ষাই অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয় নাই—অন্যে পরে কা কথা। যাহা হউক সম্প্রতি সমবায় বিভাগের যে সকল সাব্‌রেজিষ্টার গ্রামে যাইয়া কাজ করেন, তাঁহাদিগকে প্রাপ্তবয়স্কদিগের শিক্ষাদান ব্যবস্থায় মনোযোগী হইতে বলা হইয়াছে। গ্রাম্য সাব্‌রেজিষ্ট্রারদিগকে নাকি কার্য্যাভাবে অনেক সময়ই বসিয়া থাকিতে হয়। তাঁহারা গ্রামে গ্রামে কমিটী নিযুক্ত করিয়া প্রাপ্তবয়স্কদিগকে নিম্নলিখিত কয়টি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবেন—(ক) কৃষি (খ) পশুপালন (গ) স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ-নিবারণ (ঘ) সমবায়-সমিতি গঠন (ঙ) কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় ব্যবস্থা। কিন্তু এ ব্যবস্থায় সত্যই কি কোন ফল হইবে? যাহা হউক, গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতেই যে এরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের আয়োজন হইয়াছে, ইহা অবশ্যই আশাপ্রদ।

শান্তিনিকেতনে রবিবাসর—

গত ৩০শে ফাল্গুন রবিবাসরের 'অধিনায়ক' কবিবর শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বানে বাসরের সদস্যগণ রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী ও সুরুল পল্লী-সংগঠনকেন্দ্র পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সদস্যগণকে পূর্ব্বদিন তথায় যাইয়া রাত্রিযাপন করিতে হইয়াছিল এবং পরদিন সকালে রবীন্দ্রনাথের বাসভবন "উত্তরায়ণে"ই রবিবাসরের অধিবেশন হইয়াছিল। সেদিন রবিবাসরের সদস্যগণকে লক্ষ্য করিয়া কবি যে বাণী প্রদান করিয়াছিলেন তাহা দেশবাসী সকলেরই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আমরা নিম্নে তাঁহার কয়েকটি মাত্র কথা উদ্ধৃত করিলাম—

"আপনাদের এখানে আমি আহ্বান করেছি, দেখবার জন্য, বোঝবার জন্য, যে আমি কি ভাবে এখানে দিন কাটাই। আমি এখানে কবি নই। এ কবির ক্ষেত্র নয়। সাহিত্য নিয়ে এখানে আমি কারবার করি নে। আমার এই কার্য্যক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে যে বাণী এখানে প্রকাশ পেয়েছে, যে আলোর ছটা এখানে দীপ্তি দিয়েছে, তার ভিতর সমস্ত দেশের ভাব ও ভাবনার উত্তর রয়েছে। * * * আজ আপনারা সাহিত্যিকরা সব এসেছেন, আপনাদের সহজে ছাড়ছি নে—আপনাদের দেখে যেতে হবে আমাদের

এই অনুষ্ঠান। দেখে যেতে হবে এই গ্রাম—দেশের উপেক্ষিত বাপ মায়ের তাড়ান সন্তানের মত এই গ্রামবাসীদের। এই উপেক্ষিত হতভাগারা কেমন করে ছিন্ন বস্ত্র নিয়ে অর্দ্ধাশনে দিন কাটায়। আপনাদের নিজের চোখে দেখতে হবে—কত বড় কর্ত্তব্যের গুরুভার আমাদের ও আপনাদের উপর রয়েছে। এদের দাবী পূর্ণ করবার শক্তি নেই—আমাদের এর চেয়ে লজ্জা ও অপমানের কথা আর কি আছে। * * * আমি ধনীর সন্তান, দরিদ্রের অভাব জানি না, বুঝতে পারি না—এ অভিযোগ যে কত বড় মিথ্যা তা আপনারা আজ উপলব্ধি করুন। * * * আমি ধনী নই, আমার যা সাধ্য ছিল, আমার যে সম্পত্তি ছিল, যে সামান্য সম্বল ছিল, আমি এই অপমানিতদের জন্য তা দিয়েছি। একদিন নদী পথে যেতে যেতে অসহায় গ্রামবাসীদের যে চেহারা দেখেছি, তা আমি ভুলতে পারি নি—তাই আজ এখানে এই মহাব্রতের অনুষ্ঠান করেছি। একাজ একার নয়। এ কর্ম্ম বহু লোককে নিয়ে। একে দরদ দিয়ে দেখতে হয়, অনুভব করতে হয়। আজ আপনারা কবি রবীন্দ্রনাথকে নয়, তার কর্ম্মের অনুষ্ঠানকে প্রত্যক্ষ করুন, দেখে লিখুন, সকলকে জানিয়ে দিন—কত বড় দুঃসাধ্য কাজের ভিতর আমাকে জড়িয়ে ফেলতে হয়েছে।"

উচ্চতর পরিষদের সদস্য

মনোনয়ন—

আমরা গত মাসে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের (উচ্চতর পরিষদ) সদস্যগণের নাম প্রকাশের সময় জানাইয়াছিলাম যে গভর্ণর উক্ত পরিষদের কয়েকজন সদস্য মনোনয়ন করিবেন। সম্প্রতি নিম্নলিখিত ৬ জনকে উচ্চতর পরিষদের সদস্য মনোনীত করা হইয়াছে—(১) বেগম হামিদা—আবদুল মোমিনের পত্নী। (২) মিসেস ডি' রোজারিও (৩) শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী (৪) মৌলবী লতাফত হোসেন (৫) ডাক্তার অরবিন্দ বড়ুয়া ও (৬) মিঃ ডি, জে, কোহেন।

ডাক্তার এস, কে, নাগ—

গত ৮ই চৈত্র সোমবার সকালে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার সুশীলকুমার নাগ ৫৭ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসরোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বারদীর সুপ্রসিদ্ধ নাগবংশে তাঁহার জন্ম হয়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

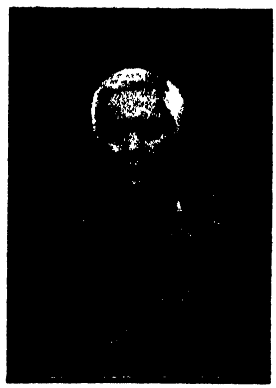


ডাক্তার এস, কে, নাগ

এল-এম-এস পরীক্ষা পাশ করিয়া তিনি হোমিওপ্যাথি শিক্ষার জন্য আমেরিকায় গমন করেন। চিকাগো হইতে এম-ডি পাশ করিয়া আসিয়া তিনি কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন। তিনি দরিদ্রের এবং অসহায়ের বন্ধু ছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধা পিতা (৮৬ বৎসর) ও মাতা (৭৬ বৎসর) এখনও জীবিত; তাঁহাদিগের এই শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই। ডাক্তার নাগের প্রথম দুই পুত্র সুপ্রিয়কুমার ও সুব্রতকুমার বিলাতে যথাক্রমে ডাক্তারি ও ব্যারিষ্টারী পড়িতেছেন।

কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ—

বাঙ্গালার নব্য ন্যায়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় গত ১০ই মার্চ্চ শ্রীধাম নবদ্বীপে ৯৩ বৎসর বয়সে গঙ্গালাভ করিয়াছেন।



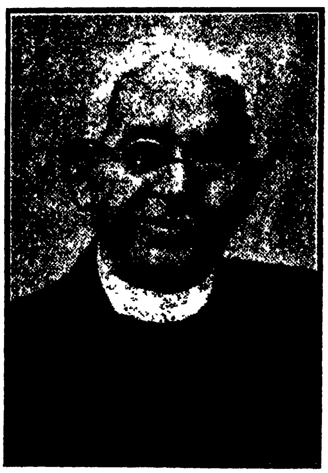
কামাখ্যা তর্কবাগীশ

বর্ত্তমান যুগের প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতই তাঁহার নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় ভাগবতকুমার শাস্ত্রী ও স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ শাস্ত্রীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তর্কবাগীশ মহাশয় বহুদিন কলিকাতার গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ছিলেন; তিনি বঙ্গীয় রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর সম্মানিত সদস্য এবং কলিকাতা

পণ্ডিতসভার সভাপতি ছিলেন। এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত তাঁহার রচিত কুসুমাঞ্জলি ও তত্ত্বচিন্তামণি নামক পুস্তকদ্বয় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করে। অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি নবদ্বীপে বাস করিতেন এবং তথায় ন্যায়ের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। এত অধিক বয়সেও তাঁহার বুদ্ধির প্রখরতা সম্পূর্ণভাবেই বিদ্যমান ছিল; তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহা আর পূর্ণ হইবার নহে।

রেভারেণ্ড বিমলানন্দ নাগ—

কলিকাতাস্থ ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়ের নেতা, কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার রেভারেণ্ড বিমলানন্দ নাগ সম্প্রতি তাঁহার কলিকাতা পার্ক সার্কাসের বাটীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ৯ বৎসর কাল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন এবং তাঁহার বক্তৃতা ও তর্ক সকলকে মুগ্ধ করিত। তিনি নিখিল ভারত খৃষ্টান সম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন এবং বাঙ্গালার ভারতীয় খৃষ্টান সমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে সুনীতি শিক্ষা দান এবং মাদকনিবারণ ব্যাপারে



রেভারেণ্ড বিমলানন্দ নাগ

যথেষ্ট সময় ব্যয় করিতেন এবং ছাত্র-সমাজ তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বার্লিনে জগতের ব্যাপ্‌টিষ্ট কংগ্রেসে সহ-সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রেও বহুদিন কার্য্য করিয়াছিলেন এবং তিনি উদারনীতিক দলভুক্ত ছিলেন। তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই যুগের কর্ম্মীগণের সকল গুণই তাহাতে বিদ্যমান ছিল এবং সেজন্য তিনি প্রথম জীবন হইতেই বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিলেন।

অম্বিকাকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—

কলিকাতা বড়বাজার ১১নং গাঙ্গুলী লেন নিবাসী জমিদার অম্বিকাকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি ৬১ বৎসর বয়সে তিন কন্যা ও একমাত্র পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। অম্বিকাবাবু সারা জীবন ধর্ম্মালোচনা ও জ্ঞানার্জ্জনে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন এবং তিনি একটি প্রাইভেট লাইব্রেরী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার মত সচ্চরিত্র, সদাচারী ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি আজকাল অতি অল্পই দেখা যায়। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।



অম্বিকাকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীপ্রণবকুমার ভট্টাচার্য্য—

শ্রীমান প্রণবকুমার ভট্টাচার্য্যের বয়স বর্ত্তমানে মাত্র ৩ বৎসর। বেঙ্গল মিউজিক এসোসিয়েসনের গত বার্ষিক



শ্রীপ্রণবকুমার ভট্টাচার্য্য

সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় এই দুগ্ধপোষ্য শিশু স্পেশাল গ্রুপে খেয়াল ও ভজন গানে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাহার তাল লয় সহ সঙ্গীতের আলাপ সত্যই উপভোগ্য। আমরা এই শিশুর দীর্ঘজীবন ও ভবিষ্যত উন্নতি কামনা করি।

প্রকাশচন্দ্র রায়—

কলিকাতা বালীগঞ্জ রাসবিহারী এভিনিউ নিবাসী শ্রীযুক্ত বৃজকিশোর রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রকাশচন্দ্র রায় সম্প্রতি অকালে দারুণ ক্ষয়রোগে পরলোকগত হইয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। তাঁহারা নদীয়ার মহারাজার জ্ঞাতিবংশ; প্রকাশচন্দ্র বিলাতে যাইয়া তথায় বি-এ পাশ করেন; ২ মাসের ছুটীতে তিনি দেশে ফিরিয়াছিলেন।



প্রকাশচন্দ্র রায়

কিন্তু দারুণ ব্যাধি তাঁহাকে আর বিলাত যাইতে দেয় নাই। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ২৫ বৎসর হইয়াছিল। শ্রীভগবান তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবার-বর্গকে সান্ত্বনা প্রদান করুন, ইহাই আমাদের একমাত্র কামনা।

হেমনলিনী রায় চৌধুরাণী—

আমরা জানিয়া ব্যথিত হইলাম সন্তোষের জমীদার সুকবি শ্রীযুত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী হেমনলিনী রায় চৌধুরাণী গত ৩০শে মার্চ্চ ৫৩ বৎসর বয়সে কলিকাতা ৯নং হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। হেমনলিনীর দুই (ব্যারিষ্টার) পুত্র শচীন্দ্রনাথ ও অজয়নাথ, এক কন্যা ও বৃদ্ধা মাতা বর্ত্তমান। তিনি দানশীলা ও পুণ্যবতী ছিলেন। আমরা তাঁহার



হেমনলিনী রায় চৌধুরাণী

শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ব্রহ্মের ডাক মাশুল বৃদ্ধি—

গত ১লা এপ্রিল হইতে ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে পৃথক হইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি উপনিবেশে পরিণত হইয়াছে। এখন ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশে পত্র ও পুস্তকাদি প্রেরণ করিতে হইলে বিলাতী ডাক মাশুলের হারে ডাক মাশুল প্রদান করিতে হইবে। ব্রহ্মদেশ প্রকৃতই ভারতবর্ষের অন্তর্গত একটি প্রদেশ এবং বহু ভারতবাসী (শুধু বাঙ্গালী নহে, মাদ্রাজী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী প্রভৃতিও) ব্রহ্মদেশে বাস করেন। এই ডাক মাশুল বৃদ্ধির ফলে ভারতবাসীরা তাঁহাদের ব্রহ্মবাসী আত্মীয়-স্বজনগণের সহিত পত্র ব্যবহারে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিবেন। ঐ ডাক মাশুল বৃদ্ধির জন্য সকল সংবাদ ও সাময়িক পত্রে এবং বিবিধ প্রতিষ্ঠানে বহু প্রতিবাদ হইলেও কোন ফল হয় নাই। "ভারতবর্ষে"র গ্রাহকগণকেও এই ডাক মাশুল বৃদ্ধির জন্য অধিক ব্যয়ে 'ভারতবর্ষ' ক্রয় করিতে হইবে। আমরা আগামী বর্ষ হইতে ভারতবর্ষের বার্ষিক মূল্য (ব্রহ্মবাসীদিগের জন্য) বাড়াইয়া ৬।৶০ স্থলে ১০৲ টাকা করিতে বাধ্য হইলাম। কয়েকজন ব্রহ্মদেশীয় পুস্তক-বিক্রেতা একসঙ্গে বিবিধ সাময়িক পত্রাদি ষ্টীমারযোগে লইয়া গিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেছেন; যাঁহারা তাঁহাদের নিকট পুস্তক ও পত্রিকাদি ক্রয় করিবেন তাঁহাদের পক্ষে ঐগুলি কিছু কম মূল্যে পাওয়া সম্ভব হইতে পারে।

স্মরণব্রতী

দিলীপকুমার

এ-প্রার্থনা জাগে দীর্ঘকাল পরে স্বদেশের কোলে
ফিরি' আজ :

"যত রূপ-রাখী-হাসি-গন্ধরাগ সাধে
ঘিরে রাখে মোরে, তার মদির-চঞ্চল কলদোলে
মনে রাখি যেন প্রিয় : সব আলো তোমারি প্রসাদে
আঁধার-সৈকতে বাজে। সুদূরের ঢেউ যথা নিতি
এ-পারে আদর করে অপারের সমীর-দোলায়,
বেলা ভাবে তারে চায় লক্ষ ফেন-কিরীটিনী গীতি ;
হেন ভ্রান্তি যেন মোর উদ্দীপ্ত অন্তরে না বিছায়
অলীক আলেয়া-তালে। রাখি যেন নিরত স্মরণে :
তোমারি অলোক ত্রিলোচনী দৃষ্টিভাতি অনুদিন
সখার নয়নে জাগে, তব আভা সখীর আননে,
তব ছন্দ কান্তি মন্ত্রে হ'য়ে আনন্দের শঙ্খবীণ।
করি যেন অঙ্গীকার : লভি আজ যত মুক্তামণি—
সবি তব সিন্ধুবরে, গানে ঘোষি তারি জয়ধ্বনি।"

বর্ষ-বিদায়

শ্রীমতী মীরা দেবী

বর্ষ আজিকে শেষ হ'য়ে এল,
নেমেছে চৈত্র-সন্ধ্যাছায়া।
ভেসে আসে ঐ দখিনা পবনে
মালতী রজনীগন্ধা-মায়া।
সজল নয়নে দুয়ারে দাঁড়ায়ে
বিদায় মাগিছে বর্ষরাণি।
কী তাহারে দিব বিদায়ের খণে
পাথেয় বলিয়া কী দিব আনি' ?
কালের নিতল নিদিশা পছে
যাত্রা তাহার হ'ল যে সুরু।
না জানি সে-কোন্ অজানার ভয়ে
বুক তার করে-যে দুরু দুরু !

শুভ বৈশাখ-প্রথম-দিবসে
জন্ম লভিল নব বরষ।
বহিয়া চলিল সাথে ল'য়ে তার
কত না বেদনা, কত হরষ।
কারো পরাণের আঁধার-কান্নায়
আনিল দীপ্তি নব উষার।
কারো জীবনে এ-বরষ শুধুই
বহিয়া আনিল হিম-তুষার।
যাহা কিছু ব্যথা, যাহা কিছু সুখ,
দানিল সে এই ধরণীমাঝে
সবই যেন সাথে ল'য়ে যেতে চায়
চরণে বিদায়-রাগিণী বাজে।

তারি সাথে সাথে দূর হ'য়ে যাক্
যা কিছু বেদনা ক্লান্তি যত
নবীন বরষে আহ্বান করি
এসো যাচি আজ শান্তি-ব্রত।

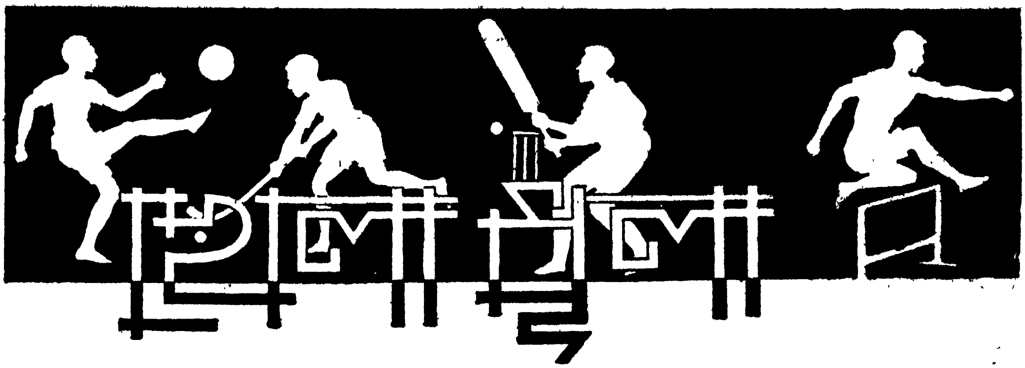
বাঙ্গালীর নাম 'শ্রী'হীন হবে কি না?

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

কলকাতায় এসে শুনলুম—রবিবাসর সভার অধিবেশন হয়েছিল এবার পূজনীয় কবি রবীন্দ্রনাথের আশ্রমে শান্তিনিকেতনে গত ৩০শে ফাল্গুন রবিবারে। আমি তার সদস্য না-হলেও সভ্যদের সৌহৃদ্য লাভের সুযোগ থেকে কখনো বঞ্চিত হই নি এবং এক্ষেত্রেও হয়ত হতাম না—যদি তাঁরা জানতেন আমি কলকাতায় এসেছি। এ ক্ষেত্রে কবি যে-সকল বিষয় সভ্যদের নিকট আলোচনা করেছেন তাঁদের কাছে জেনে অনেক শিক্ষালাভ করতে পারলুম। কিন্তু একটি বিষয় যা নিয়ে অনেকদিন থেকেই আমার মনে একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে, আজ সে বিষয় কিছু না-বলে থাকতে পারছি না। অবশ্য বাণীর বর-পুত্রের মতামতের উপর কোনো কথা বলা 'খোদার উপর খোদকারী' করা ছাড়া আর কিছু নয়। তবুও তাঁরই কাছে পুনরায় সন্দেহ দূর করার উদ্দেশ্যেই প্রস্তাবটির অবতারণা করলুম।

শুনলাম কবির মতে 'শ্রী' নামের গোড়ায় না-লিখলে 'শ্রী'-হীন বাঙ্গালীর নাম বিশ্রী হয় না—বরং ভালই হয়, কেন না 'শ্রী' একমাত্র দেবতার কথাই মনে আনে—মানুষকে দেবতা বানানোর আস্পর্দ্ধা একমাত্র বঙ্গদেশেই আছে এবং তা না থাকলেও ক্ষতি হ'ত না। আমার মনে পড়ে—যখন ছেলেবেলায় মহীশূর থেকে দ্রাবিড়ী বন্ধু ভেঙ্কাটাপ্পা এলেন কলকাতায় আমাদের দলে পূজনীয় গুরু অবনীন্দ্রনাথের নিকট ছবি আঁকা শিখতে—তখন তিনি আমাকে আমার নামের গোড়ায় 'শ্রী' লিখতে দেখে বেজায় রেগে গিয়েছিলেন আমার ধৃষ্টতায়। আমি তখন তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলুম এই ব'লে যে, একমাত্র বাঙ্গালা দেশ মানুষের মধ্যে 'ঠাকুরালী' মেনে নিয়েছে। তাই মানুষকে দেবতার মতই শ্রী দিয়ে সজ্জিত করতে সঙ্কোচবোধ করেনি। কিন্তু আরো একটু গভীরভাবে দেখলে বোঝা যাবে যে 'শ্রী' যখন নামের গোড়ায় দেবার নিয়ম—শেষের দিকে দেবার প্রথা নয়, তা থেকে বেশ বোঝা যায় যে মানুষের নাম লেখবার বা বলবার সময় 'শ্রী' শব্দটি লাগানোর দ্বারা শ্রীভগবানেরই নাম স্মরণ ক'রে নেবার সুযোগ পায় বাঙ্গালীরা। মানুষকে অহরহ মানুষের নাম আবৃত্তি করতে হয় বা লিখতে হয় এবং সেই কারণে শ্রীও সেই সঙ্গে বলবার অবকাশ পায়। আমরা যখন কোনো লোককে নমস্কার বা প্রণাম করি তখন সাধারণতঃ তার দেহ মন্দিরের দেবতাই হয় উদ্দেশ্য। আমরা তার বেলা প্রত্যেক মানুষের গুণাগুণ বিচার করে নমস্য ব্যক্তিটিকে স্থির করি না। তেমনি মানুষের মধ্যে 'শ্রী' কেবল পরমহংস জাতীয় ব্যক্তির নামেই আরোপ করি না। তার বেলায় শ্রীর উপর আরো শ্রী যদি যুক্ত করি তো চুকে যায়। যথা—শ্রীশ্রীপরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী।

এখন আমাদের নামের শ্রীরক্ষা করার পক্ষে আরো একটি যুক্তির অবতারণা করতে পারি। আমাদের দেশে 'মিষ্টার' বা 'মুশিও'র মত অন্য কোনো শব্দ নামের গোড়ায় বা শেষে না থাকায় আমাদের পক্ষে দেশ-বিদেশে ঘোরা-ফেরারও অসুবিধা আছে অনেক। কেননা ব্যক্তিটি 'স্ত্রী' বা 'পুরুষ' তা জানবার সুযোগ বিদেশীয়দের পক্ষে পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেই জন্য ইংরাজেরা এমন কি তাঁদের ভিজিটিঙ্ কার্ডেও 'মিষ্টার', 'মিসেস' বা 'মিস' লিখতে বাধ্য হন। আমার পুত্র শ্রীমান অতীশ সেদিন বাঙ্গালায় লেখা জাপানী একটি গল্পের ইংরাজী তর্জ্জমা করতে গিয়ে দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন 'তয়োতামা' মেয়ে কি পুরুষ—সুতরাং তার বেলা ইংরাজীতে he কিম্বা she লিখবে সে। এই কারণেই আমরা যদি 'শ্রী'টিকে রক্ষা করে চলি তো পুরুষ বোঝাবার পক্ষে সহজ হয় এবং 'শ্রীমতী' লিখি মেয়েদের নামের গোড়ায় তো গণ্ডগোল যায় চুকে। তাছাড়া 'শ্রীযুক্ত' বা 'শ্রীযুত' কথাটা যুতসই লাগে না মোটেই। শ্রীকে নামের গোড়ায় যখন যুক্ত করাই হচ্চে তখন আবার 'যুক্ত' বলবার বা লেখবার দরকার কি? তবে মেয়েরা আজকাল যেমন ভাবে 'শ্রী' লিখছেন নামের গোড়ায়—তাতে 'শ্রীরজনী রায়' মেয়ে কি পুরুষ বোঝা হয় দায়। তাই বলি সোজাসুজি যদি 'শ্রী'-পুরুষ (mr) 'শ্রীমতী'—স্ত্রী (mrs) এবং কুমারী (miss) অবিবাহিতার নামের গোড়ায় লেখা যায় ত জগতের হাটে কেটে যাবার পক্ষে অসুবিধাও হবে না এবং বাঙ্গালীর নামের একমাত্র সনাতন 'শ্রী' যা আছে তাও যাবে থেকে।



মহিলা ইণ্টার-কলেজ স্পোর্টস ঃ

মহিলা ইণ্টার কলেজ স্পোর্টসের দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। প্রত্যেক বিষয়ই প্রতিযোগিতামূলক হয়েছিল। অধিকাংশ বিচারকই মহিলা ছিলেন এবং তাঁদের সিদ্ধান্ত সন্তোষজনক হয়েছিল। প্রাথমিক শুশ্রূষার জন্য সেণ্ট জন্ এম্বুলেন্সের মহিলা শুশ্রূষাকারিণীগণ মোতায়েন ছিলেন। সকল ব্যবস্থা বেশ ভাল হয়েছে। ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউশন্ ১৪১ পয়েণ্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়নসিপ্ পেয়েছে; আশুতোষ কলেজ ৮৫ পয়েণ্ট করেছে। ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউশনের কুমারী শোভনা গুপ্তা বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে, ৩০ পয়েণ্ট পেয়ে নিজস্ব চ্যাম্পিয়নসিপ্



মহিলাদের ইণ্টার-কলেজ স্পোর্টসে ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন টীম চ্যাম্পিয়নসিপ্ লাভ করেছেন

ছবি—তারক দাস

লাভ করেছেন। আশুতোষ কলেজের কুমারী অর্পিতা দাসের কৃতিত্বও প্রশংসনীয়।

রীলে রেসে (১০০×৪ মিটার) আশুতোষ কলেজ প্রথম হয়েছে। দলে ছিলেন, কুমারী অরুণা নাগ, অর্পিতা দাস, আইলিন পিকক্ ও মেরী পেরেরা। ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন দ্বিতীয় হয়েছে।

মহিলাদের ব্যায়াম ঃ

গত বৎসর থেকে কলিকাতা ওয়াই ডব্লিউ সি এ মহিলা ব্যায়াম শিক্ষা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিছুদিন থেকে ভারতের নারীগণ স্পোর্টস্ ও ব্যায়াম শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করছেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে ষোলটি মহিলা এই কলেজে যোগ দিয়েছেন। দু'জন বৈদেশিক মহিলাকে ব্যায়াম শিক্ষার ভার দেওয়া হয়েছে। মাত্র আট মাসে মহিলারা কতখানি শিক্ষা লাভ করেছেন, উহা প্রদর্শন করবার জন্য ওয়াই ডব্লিউ সি এর মাঠে এই ব্যায়াম অনুষ্ঠানটি হয়েছিল।



ভারত স্ত্রীশিক্ষা সাধন স্পোর্টসে ৭৫ গজ তিন-পা রেস বিজয়িনী কুমারী শান্তি মুখার্জ্জি ও আভা সেন

ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় মহিলারাও যে উপযুক্ত শিক্ষা ও সুযোগ পেলে পাশ্চাত্য মহিলাদের সমকক্ষ ব্যায়াম কৌশল দেখাতে পারেন তা' উপলব্ধি হয়েছে। শিশু ও বয়স্কাদের বিভিন্ন ব্যায়াম, পেটের ব্যায়াম, ডিগবাজির নানা কৌশল, তীর ধনুক ছোঁড়ার কৌশল, পাশ্চাত্য গ্রাম্য নৃত্য প্রভৃতি বেশ উপভোগ্য ও দর্শনীয় হয়েছিল। তবে ভারতীয়দের ভারতীয় নৃত্য শিক্ষা দেওয়াই উচিত বলে মনে হয়। প্রদর্শনী দেখে মনে হয় যে এই প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে আরো সাফল্য মণ্ডিত হবে।

অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ নৌকা-বাচ ঃ

২৪শে মার্চ্চ অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ বাচ্ খেলায় অক্সফোর্ড তিন লেংথে ২২ মিনিট ৩৯ সেকেণ্ডে জয়লাভ করেছে। ১৯২৩ সালে অক্সফোর্ড শেষ জয়ী হয়েছিল। গত তের বৎসর উপর্য্যুপরী কেম্ব্রিজ জয়ী হয়েছে। প্রথমে কোন দলই বিশেষ অগ্রগামী হতে পারে না। প্রতিযোগিতা ক্রমশই তীব্র হ'তে তীব্রতর হয়ে ওঠে। শেষ সীমানার মাত্র ৩০০ গজ দূরে অক্সফোর্ড অগ্রগামী হতে আরম্ভ করে এবং ঐ অল্প দূরত্বের মধ্যেই তিন লেংথে জয়ী হয়। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এবার নিয়ে মাত্র পাঁচবার ২২ মিনিটের অধিক সময় লেগেছে এবং ঐ কয়বারই অক্সফোর্ড জয়ী হয়েছে। কেম্ব্রিজ ৫৭ বার এবং অক্সফোর্ড ৪১ বার জয়ী হয়েছে এবং ১৮৭৭ সালের রেসটি সমান সমান হয়। মহাযুদ্ধের জন্য প্রতিযোগিতা ১৯১৫ থেকে ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত হয় নি।

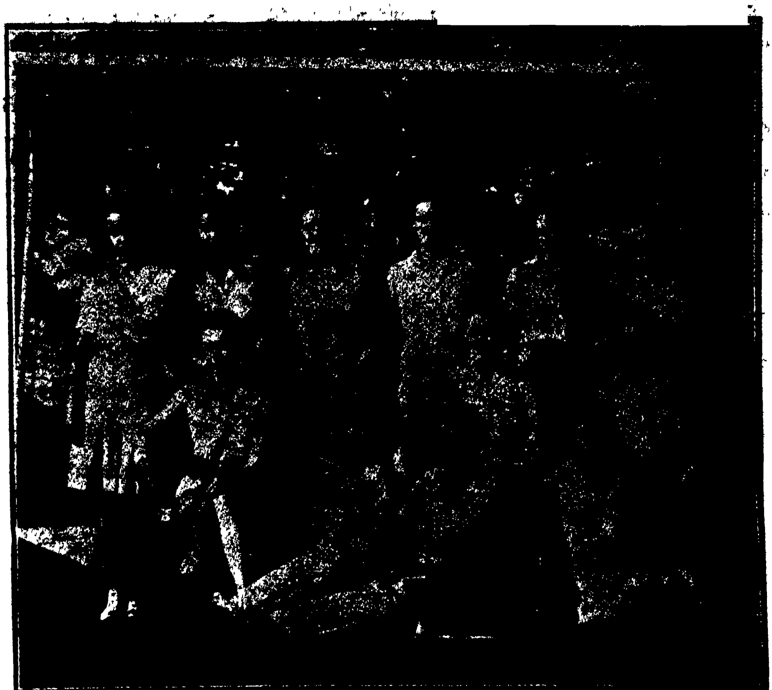
কিংস কলেজে বাঙ্গালী দাঁড়ী ঃ

কলিকাতা ইউনিভারসিটি রোয়িং ক্লাবের দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায় কিংস কলেজের দাঁড়ী নির্ব্বাচিত হয়েছেন। ইণ্টার-কলেজ রিগেটায় এই কলেজ প্রেসিডেন্ট কাপ্ বিজয়ী হয়েছে। দ্বারকানাথ ৫নং হয়ে দাঁড় টেনেছিলেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই ইউনিভারসিটির সুব্রত নাগ লণ্ডন স্কুল অফ্ ইকনমিক্সের ক্যাপটেন হয়েছিলেন।

লেডী টেগার্ট কাপ ঃ

মেয়েদের লেডী টেগার্ট কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা তিনবার ড্র হবার পরে ব্লু বার্ডস্ দল ১ গোলে ওয়াণ্ডারার্স দলকে হারিয়ে বিজয়িনী হয়েছে। মিস্ নরিন এজরা প্রথমার্দ্ধে ঐ গোলটি করেন। ওয়াণ্ডারার্স দলের মিস্ বেটি এড্ওয়ার্ডস্ পূর্ব্ব খেলায় আম্পায়ার এ জেমসের প্রতি অশিষ্ট আচরণ করায় এই দিন তাকে খেলতে দেওয়া হয় নি। ইহাতে বিজিত দলের বিশেষ অসুবিধা হয়েছিল।



লেডী টেগার্ড কাপ বিজয়িনী ব্লু বার্ডস্ দল। এক গোলে গতবৎসরের বিজয়িনী ওয়াণ্ডারার্স দলকে পরাজিত করেছেন

ছবি—জে কে সান্যাল

জুনিয়র নক-আউট টুর্ণামেণ্ট ঃ

মেয়েদের জুনিয়র নক-আউট হকি প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় হর্ণেটস 'এ' ২-০ গোলে হর্ণেটস 'বি' দলকে পরাজিত করেছে। মিস্ ই ম্যাগ্রাথ ও মিস্ টি ডি কষ্টা গোল দিয়েছিল। প্রত্যেক দলেই একজন করে কম খেলোয়াড় খেলেছিল।

ইণ্টার-রেলওয়ে স্পোর্টস ঃ

ইণ্টার-রেলওয়ে এথেলেটিক টুর্ণামেণ্টের চ্যাম্পিয়নসিপ এবারও নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে পেয়েছে। এবার নিয়ে উপর্য্যুপরী ন'বার তারা চ্যাম্পিয়ন হলো। প্রথম—এন ডব্লিউ আর—৩৬ পয়েন্ট, দ্বিতীয়—ই বি আর ৪৫, তৃতীয়—জি আই পি ৪৯, চতুর্থ—বি বি এণ্ড সি আই ৫৪, পঞ্চম—যোধপুর রেলওয়ে ৫৯, ষষ্ঠ—বিকানীর রেলওয়ে ৬১, সপ্তম—এস আই আর ৬৫, অষ্টম—ই আই আর ৭২, নবম—এম এণ্ড এস এম ৮৯ এবং দশম—রেলওয়ে বোর্ড ১১৪ পয়েণ্ট।

জাতীয় যুব-সঙ্ঘের অনুষ্ঠান ঃ

জাতীয় যুব-সঙ্ঘের স্পোর্টসের উদ্বোধনে অলিম্পিকের অনুকরণে মশাল দৌড়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। সকাল ৭-৩২ মিনিটে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির থেকে মশাল দৌড় আরম্ভ হয়। মন্দিরের পুরোহিতের নিকট থেকে উৎসর্গিত প্রজ্বলিত মশাল নিয়ে কুমারী পূর্ণা ঘোষ প্রথম যাত্রা সুরু করে। কিছুদূর গিয়ে অন্য বালিকা মশাল নিয়ে দৌড়ায়। এইরূপে চল্লিশটি বালিকা বাহিত হয়ে ঐ মশাল ময়দানের ক্রীড়ার মাঠে পৌছুলে সেখানে রক্ষিত অগ্নিকুণ্ড ঐ মশালের অগ্নি দ্বারা প্রজ্বলিত করা হয়।

অনুকরণ স্পৃহা আমাদের দিন দিন বর্দ্ধিত হচ্ছে।

স্থান কাল না ভেবেই আমরা অনুকরণ করে থাকি। অলিম্পিক অনুকরণে, কংগ্রেস অনুষ্ঠান থেকে, যেখানে যে



যুব-সঙ্ঘের মশাল-দৌড়ে কুমারী গীতাপাল কুমারী রমা সেনগুপ্তকে মশাল দিচ্ছে
ছবি—তারক দাস

স্পোর্টস হবে, সেখানেই যদি মশাল দৌড় আরম্ভ হয়, তবে মশালে যে দেশ ছেয়ে যাবে।

হকি লীগ চ্যাম্পিয়ন ঃ

১৯৩৭ সালেও কাষ্টমস লীগ চ্যাম্পিয়ন হলো। এবারও রেঞ্জার্স রানার্সআপ হয়েছে। উভয়েরই পয়েন্ট সমান হয়েছে, কিন্তু গোল এভারেজে কাষ্টমসই গতবারের মতন চ্যাম্পিয়নসিপ্ পেলে। আরো দু'টি দলের—পুলিস ও জেভেরিয়ান্সের পয়েন্টও সমান হয়েছে—অর্থাৎ এবার ৪টি দলের একই পয়েন্ট ১৭ হয়েছে। পুলিস মাত্র একটি খেলায় হেরেছে। বি জি প্রেস শেষ খেলায় আর্মেনিয়ানদের সঙ্গে পরাজিত হওয়ায় চ্যাম্পিয়নসিপ লাভে বঞ্চিত হলো, নইলে তারাই প্রথম হতো। মোহনবাগান অষ্টম স্থানে আছে। ডালহৌসী সর্ব্বনিম্নে এবং তারই উপরে ক্যালকাটা স্থান পেয়েছে। এই দুই দলের আগত বছরে দ্বিতীয় বিভাগে খেলবার কথা। কিন্তু ক্যালকাটা-ডালহৌসীর ব্যাপারে সর্ব্বদাই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। এবারও সেইরূপ হলে আমরা আশ্চর্য্য হবো না। নবাগত গ্রীয়ার বিশেষ উন্নতি দেখাতে পারে নি। তারা শেষ দিক থেকে তৃতীয় হয়েছে।

দ্বিতীয় ডিভিসনে ইষ্টবেঙ্গল ২৫ পয়েণ্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তারা একটি খেলাতেও হারে নি। মহমেডান স্পোর্টিং ২১ পয়েণ্ট করে দ্বিতীয় হয়েছে। এই দুই দল আগামী বৎসর প্রথম বিভাগে খেলবে।

তৃতীয় ডিভিসনে ওয়াই এম ইউনিয়ন, পাঞ্জাব স্পোর্টস্ ও বি ই কলেজ প্রত্যেকে ১৮ পয়েণ্ট করেছে; ওয়াই এম ইউনিয়ন সম্ভবত গোল এভায়েজে চ্যাম্পিয়ান হবে।

চতুর্থ ডিভিসনে সেণ্ট থমাস্ প্রথম হয়েছে ২৫ পয়েণ্ট করে এবং দ্বিতীয় হিবারনিয়ান্স ২০।

দ্বিতীয় ডিভিসন 'বি'এ রেঞ্জার্স ২৮ পয়েণ্টে প্রথম, আর্ম্মোনিয়ান্স ২৫ দ্বিতীয়।

পেরী বনাম টিল্‌ডেন ঃ

টিলডেনের বয়স ৪৪ বৎসর, পেরীর মাত্র ২৮ বৎসর;



হেলেন জ্যাকব ও ফ্রেড পেরী

ইংলণ্ডে এ পর্য্যন্ত চার বার খেলা হয়েছে, তাতে পেরী তিন বার টিলডেনকে পরাজিত করেছে। তৃতীয় খেলাটি টিলডেন জিতেছে—৬-২, ৮-১০, ৬-৩ গেমে।

পেরী জিতেছে—(১) ৬-১, ৬-৩, ৪ ৬, ৬-০ গেমে; (২) ৪-৬, ৬-৪, ১১-৯ গেমে; (৩) ৩-৬, ৬-২, ৮-৬, ৬-৩ গেমে। অর্থাৎ—পেরী ৮১ গেম ও টিলডেন ৬৬ গেম জিতেছেন।

মহম্মদ জাফরের মৃত্যু ঃ

১৯৩২ ও ১৯৩৬ সালের ভারতীয় অলিম্পিক হকি দলের প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় সৈয়দ মহম্মদ জাফর সার রাবির জলে শোচনীয় মৃত্যু ঘটেছে। জাফর সা ইষ্টারের ছুটিতে হাঁস শিকারে গিয়েছিলেন। গুলি-বিদ্ধ হাঁস জলে পড়লে, সেখানের জল অল্প মনে করে এগিয়ে যেতে তিনি গভীর জলে ডুবে যান।

অষ্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট ঃ

এম সি সি—২১২ (৯ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

সম্মিলিত ইউনিভারসিটি—১৬৯ (৭ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়ার শেষ খেলা সিডনেতে হয়েছে। বারিপাত দু'বার খেলা বন্ধ রাখবার কারণ হয়েছিল। হ্যামণ্ড ১০৩, সিমস্ ৩০, ফিস্‌লক ২৬। ইউনিভারসিটির ক্যাপটেন্ চ্যাপমান বেপরোয়া পিটিয়ে ২০ মিনিটে ৫৭, ২টা ছয় ও ৭টা চার, লক্ষটন ৩৯, ম্যাকমিলন ২১।

অষ্ট্রেলিয়াভিযানের

এম সি সি অষ্ট্রেলিয়ায় সর্ব্বসমেত ২৫টি ম্যাচ খেলেছেন। সাতটিতে জয়ী, পাঁচটিতে পরাজিত, এবং তেরটি খেলা সমান-সমান হয়েছে। তাঁদের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ স্কোর হয়েছে ৫২৮ (৮ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) কুইন্সল্যাণ্ডের বিপক্ষে ব্রিস্‌বেনেতে। বিপক্ষে সর্ব্বোচ্চ স্কোর [illegible], অষ্ট্রেলিয়া করেছে তৃতীয় টেষ্টে মেলবোর্ণের মাঠে। সর্ব্বনিম্ন স্কোর তাঁদের পক্ষে ৭৩ নিউ সাউথ ওয়েলসের বিপক্ষে সিডনেতে। বিপক্ষে ৫৮ অষ্ট্রেলিয়া করেছে প্রথম টেষ্টে ব্রিসবেনে।



কুচবিহার কাপ বিজয়ী এরিয়ান ক্রিকেট ক্লাব—মধ্যে, কুচবিহার মহারাজা ও ব্যারিষ্টার শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবি—তারক দা

এম সি সি ২০টি সেঞ্চুরী বা ততোধিক রান করেছেন, আর তাঁদের বিপক্ষে ১৪টি হয়েছে।



মহারাজা কুচবিহার এরিয়ানের এস বোসের হাতে কুচবিহার কাপ প্রদান করছেন

ছবি—তারক দাস

নিউজিল্যাণ্ডে এম সি সি ঃ

অষ্ট্রেলিয়ার অভিযান শেষ করে এম সি সি ১২ই মার্চ্চ তারিখে নিউজিল্যাণ্ডাভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে কয়েকটি ম্যাচ খেলে ঘরে ফিরবেন। সম্মিলিত ক্যাণ্টারবারী ও ওটাগো দলের সঙ্গে তাঁদের প্রথম ম্যাচ খেলা হয় ক্রাইষ্ট চার্চ্চে। বৃষ্টির জন্য শেষদিন খেলা বন্ধ থাকায় খেলাটি অমীমাংসিত বলে গণ্য হয়েছে।

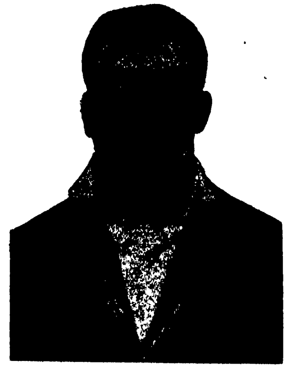


আর ই এস ওয়্যাট

এম সি সি—২১৭ ও ২৫০ (৮ উইকেট)

সম্মিলিত ক্যাণ্টারবারী-ওটাগো—১৫৭

ওয়্যাট ৬৩, সিমস্ ৪৩, ভোস (নট-আউট) ২৪; দ্বিতীয় ইনিংসে—ওয়্যাট ১০০, ওয়ার্দ্দিংটন ৭৯, এইমস ২৫। ক্যাণ্টারবারী ও ওটাগো—হাড্‌লী (রান আউট) ৪৮, উ লে ২১, ও'ব্রায়েন ১৯।



ওয়ার্দ্দিংটন (ডার্বিসায়ার)

এম সি সি—৪২৭

নিউজিল্যাণ্ড একাদশ—২৬৫ ও ১৬৩

তৃতীয় দিনে বৃষ্টির জন্য খেলা ১২-২৫ মিনিটে আরম্ভ হয়। নিউজিল্যাণ্ডের ফলো-অন্ করতে হয় এবং সামান্যর জন্য পরাজয় থেকে বাঁচে। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে রেস দিয়ে এম সি সি পেরে উঠে না। নিউজিল্যাণ্ড দু' ইনিংসে মাত্র ১ রান অগ্রগামী হয়। দু'রান আগে তাদের আউট করতে পারলেই এম সি সি জয়ী হতো।

ওয়্যাট ১৪৪, এইমস ৯৭, এলেন ৮৮।



এইমস

নিউজিল্যাণ্ড—ভিভিয়ান ৮৮, পেজ ৫০, মলোনী (নট আউট) ৪২ ; দ্বিতীয় ইনিংসে—হাডলী ৮২, মলোনী ১৮, টিন্‌ডিল্ (নট আউট) ২৪।

এম সি সি—২০৫ ও ১০২ (৩ উইকেট)

অকল্যাণ্ড-ওয়েলিংটন—১৮৩ ও ১২৩

এম সি সি ৭ উইকেটে জয়ী হয়েছে। মাত্র ১০২ রান করলে জয়ী হবে, এম সি সি দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করে ওয়্যাট ও হার্ডষ্টাফকে দিয়ে। তাদের বিশেষ তাড়া ছিল ৬টায় মেল বোট ধরতে হবে। ওয়্যাট ৫৬, হার্ডষ্টাফ ৫১, ওয়ার্দ্দিংটন ৩৮; দ্বিতীয় ইনিংসে—লেল্যাণ্ড (নট আউট) ৩৮, ওয়ার্দ্দিংটন ২৭। অকল্যাণ্ড ওয়েলিংটন—হোয়াইটল (নট আউট) ৯৯, সেল ৩৬। ব্ল্যানফোর্ড (নট আউট) ২৮, পোষ্টল্‌স্ (রান আউট) ২৪। ভেরিটি ২৪ রানে ৫ উইকেট নিয়েছে।



জে হার্ডষ্টাফ (নটিং)

রেঙ্গুনে কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেট ঃ

রেঙ্গুনে কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা এবার প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতা হয় হিন্দু, মুসলমান, ইউরোপীয়ান ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দলের মধ্যে। প্রথম খেলা ইউরোপীয় ও মুসলমান দলের মধ্যে হয় এবং মুসলমান দল এক উইকেটে পরাজিত হয়। দ্বিতীয় খেলায় হিন্দুরা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে খেলে জয়ী হয়। হিন্দু—২৩৩ ও ১৪৬ (৪ উইকেটে) এবং এ্যাংলো-ইণ্ডিয়া ৭৯ ও ১৫৭ (৫ উইকেটে) করে।

ফাইনাল খেলা সময়াভাবে শেষ হয় না ; কিন্তু হিন্দু দল প্রথম ইনিংসের স্কোরের জোরে বিজয়ী বলে ঘোষিত হয়। হিন্দু—২০১ ও ১৩৬ (৬ উইকেটে) ; ইউরোপীয়ান—১৬৫।

হিন্দুদলের অধিনায়ক ডাঃ হংসরাজ ১০৫, এম দাসগুপ্ত (ইষ্টবেঙ্গল) ২৮ ; দ্বিতীয় ইনিংসের প্রথমে হিন্দুদের অবস্থা বিশেষ কাহিল হয়। মাত্র ২৩ রানে ৩টি উইকেট পড়ে যায়। কিন্তু হংসরাজ ও এম দাসগুপ্ত খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে ৬৩ ও ৫০ রান করে নট আউট রইলেন। মোহনলাল ৬১ রানে ৫, বুসমান ৩৪ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন।

ভাড়াটে খেলোয়াড় আমদানী ঃ

বিভিন্ন ক্লাব বাঙ্গলার বাহিরের খেলোয়াড় আনিয়ে নিজেদের দল পুষ্ট করেন। এই প্রথা বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে আই এফ এ নিয়ম করেছেন যে, আফিস কলেজ ও স্কুল ব্যতীত সমস্ত ক্লাবকে ফুটবল খেলার মরসুমের পূর্ব্বেই সমস্ত খেলোয়াড়ের নাম আই এফ এর যুগ্ম-সম্পাদকের নিকট রেজেষ্ট্রী করতে হবে। নাম রেজেষ্ট্রী নাই এমন খেলোয়াড়কে কোন দল খেলাতে পারবে না। তবে খেলার মরসুমের মাঝেও নূতন খেলোয়াড় খেলাতে পারবে, যদি যুগ্ম সম্পাদক অনুমতি দেন। কিন্তু এই অনুমতি পাবার চব্বিশ ঘণ্টার পরে ঐ খেলোয়াড় খেলতে পারবে। প্রত্যেক খেলোয়াড়কেই প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করতে হবে, যে সে স্থানীয় খেলোয়াড়, সে সেই প্রদেশে বাস করে অথবা চাকুরীর খাতিরে বাস করতে বাধ্য হয়েছে এবং সে আই এফ এর সকল নিয়ম মেনে চলতে প্রস্তুত আছে।



ভেরিটি

এই নিয়ম প্রবর্ত্তনে বাইরের ভাড়া করা খেলোয়াড় আমদানী একেবারে যে বন্ধ হবে তা আমাদের মনে হয় না, তবে নিয়মের কড়াকড়িতে কিছু কম হতে পারে। মরসুমের মাঝেও নূতন খেলোয়াড় আমদানী যুগ্ম-সম্পাদকের অনুমতি পেলে হবে—এই নিয়ম না করাই উচিত ছিল, ইহাতে আরো গণ্ডগোলের সৃষ্টি হবে। জুয়াড়িদের জোর যাদের আছে, তারা নূতন খেলোয়াড় সকল সময়ই আমদানি করবে।

টেষ্টম্যাচের সময় নির্দ্ধারণ ঃ

এম সি সি দলের ক্যাপটেন এলেন টেষ্ট ম্যাচের সময়

নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে বলেছেন,—অষ্ট্রেলিয়ায় টেষ্ট ম্যাচে সময় নির্দ্ধারিত না থাকায় খেলা অনেক সময় একঘেয়ে ও বিরক্তিজনক হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় টেষ্টে ইংলণ্ডকে ধীর ও মন্থর গতিতে খেলতে হয়েছে। টসে যে দল জয়ী হয়, তারা চেষ্টা করে যে উইকেটে তারা কত বেশীক্ষণ থাকতে পারে; কারণ, যত বেশী জীর্ণ উইকেটে বিপক্ষ খেলতে পারে। ইহাতে সুদীর্ঘকাল কোন পক্ষ উইকেট দখল করতে পারে তারই পাল্লা হয়—খেলার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের অন্তরায় ঘটে। যদিও জয়-পরাজয়ের নিশ্চিত একটা মীমাংসা হয়, তথাপি তিনি এরূপ খেলার পক্ষপাতী নন।

অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব্ব অধিনায়ক উড্‌ফুলও এলেনকে সমর্থন করে বলেছেন, তাঁর মতে টেষ্ট ম্যাচ অষ্ট্রেলিয়ায় ছ'দিন ব্যাপী এবং ইংলণ্ডে পাঁচ দিন ব্যাপী সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত; কারণ, ইংলণ্ডে অধিকক্ষণ সময় খেলা হয়। এইরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হলে খেলার উৎকর্ষতা আরো বর্দ্ধিত হবে।



বিজয় মার্চ্চেণ্ট

খেলোয়াড়ের সম্মান ঃ

উইস্‌ডেনের ক্রিকেট তালিকায় ঐ বৎসর ভারতীয় খেলোয়াড় বিজয় মার্চ্চেণ্টের নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। মার্চ্চেণ্ট ব্যতীত ওয়ার্দ্দিংটন, কপ্‌সন্, গোভার ও বার্ণেটের নামও এবার ঐ তালিকায় আছে। প্রতি বৎসর উইস্‌ডেনের ক্রিকেট তালিকায় পাঁচ জন বিশিষ্ট খেলোয়াড়ের নাম প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্ব্বে আরো চার জন ভারতীয় খেলোয়াড়দের এই সৌভাগ্যলাভ ঘটেছে। ১৮৯৭ সালে রণজিৎ সিংহের নাম প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৩১ সালে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র দলীপ সিংহজি, ১৯৩২ সালে পতৌদীর নবাব এবং ১৯৩৩ সালে সি কে নাইডুর নাম প্রকাশিত হয়েছিল।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভা ঃ

অমরনাথকে সকল প্রতিযোগিতায় খেলতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বেতনভুক্ত খেলোয়াড় প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে বহু তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হয় যে, যে পর্য্যন্ত কোন স্থির উপায়ের পথ নির্দ্দেশিত না হয় সে পর্য্যন্ত হঠাৎ কিছু সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নয়। রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অর্থাভাবে পরিচালনা সম্ভব হবে না বলে বহু প্রদেশ মত প্রকাশ করেন, তাঁরা উল্লেখ করেন ঐ প্রতিযোগিতা পরিচালনের জন্য তাঁদের দেনাদার হতে হয়েছে। স্থির হয় যে, অর্থের জন্য সমগ্র ভারতে আবেদন প্রকাশিত করা হবে এবং সংগৃহিত অর্থ থেকে বিভিন্ন প্রদেশের ঘাটতি পূরণ করা হবে। এক বৎসর সেই প্রদেশে বাস করলে তবে তার হ'য়ে খেলবার অধিকারী হবে। পূর্ব্বে তিন মাসেই অধিকার জন্মাতো।

মুষ্টি যুদ্ধ ঃ

ফোর্ট উইলিয়মের ষ্টেডিয়মে সাউথ কলিকাতা বক্সিং এসোসিয়েশনের সঙ্গে কে ও এস বি দলের টীম চ্যাম্পিয়ন-সিপ্ প্রথায় মুষ্টি যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। উভয় দলেরই ১২ পয়েণ্ট হওয়ায় জয়-পরাজয় অমীমাংসিত হয়েছে।

বেতনভুক মেয়ে খেলোয়াড় ঃ

আমেরিকার বিখ্যাত মেয়ে খেলোয়াড় মিসেস উইল্‌স্‌-মুডি বেতনভুক খেলোয়াড় হবেন বলে জানা গেছে। তিনি টেনিস খেলা সম্বন্ধে ফক্স ফিলিমের একটি ছবিতে অভিনয় করবেন।



মিসেস উইল্‌স্‌ মুডি

বিলাতে ইণ্টার-ভার্সিটি স্পোর্টস্‌ ঃ

হোয়াইট সিটিতে ইণ্টার-ভার্সিটি এথ্‌লেটিক্‌ প্রতিযোগিতায় কেম্ব্রিজ ন'টি বিষয়ে এবং অক্সফোর্ড দু'টি বিষয়ে জয়ী হয়েছে।

ওয়েট-পুট :—ইর্‌ফান (কেম্ব্রিজ), ৪৯ ফিট্‌ ৩¾ ইঞ্চি (নূতন রেকর্ড)—পূর্ব্বের রেকর্ড ৪৫ ফিট ৯½ ইঞ্চি—ইর্‌ফানই করেছিল।

৪৪০ গজ দৌড় :—ব্রাউন (কেম্ব্রিজ), ৪৮৬/১০ সেকেণ্ড (নূতন রেকর্ড)—পূর্ব্বের রেকর্ড ব্রাউনই করেছিল ৪৯ সেকেণ্ডে।

বিলাতে কাউণ্টিদলে ভারতীয় ঃ

পি এস নাইডু ও ডি আর পুরী সারে কাউণ্টিদলের সভ্য হয়েছেন। জাগদল মিডলসেক্স দলে যোগ দিয়েছেন।

ভারতীয় জিমখানা দল ঃ

লণ্ডনের ভারতীয় জিমখানা ক্রিকেট দল এ বৎসর বিশেষ পুষ্ট হবে বলে মনে হয়। এবার এঁরা সি এস নাইডু, এম এম জাগদেল, ডি আর পুরী ও বরোদার প্রিন্স য়াও উদয়জিকে পাবেন। পুরাতন খেলোয়াড়—জাহাঙ্গীর খাঁ, দিলওয়ার হোসেন, আব্বাস সালাম, ভারতচাঁদ খান্না, আলগর আলি, ডাঃ এ ডি ষ্টাউট, এফ আর ডি সারাম, গৌতম নারায়ণ, আর মেটা ও এন কে কণ্ট্রাক্টর নিয়মিত খেলবেন।

ফুটবল খেলার হুজুগ ঃ

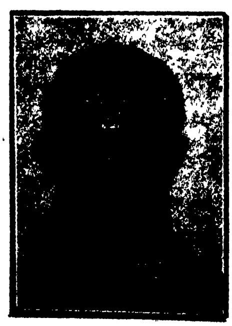
ফুটবল খেলা এবার পৃথিবীর অলিম্পিক প্রতিযোগিতার তালিকাভুক্ত হওয়ায় সকল দেশেই ফুটবল খেলার হুজুগ দেখা দিয়াছে। ইংলণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশনের খেলার যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তাতে বহু দেশ থেকে আমন্ত্রণ এসেছে দেখা যায়, যথা—রুশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা, ক্যানাডা, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, নিউজিল্যাণ্ড ও আর্জেণ্টাইন।

বাইটন কাপ্‌ ঃ

বাইটন কাপ্‌ প্রতিযোগিতায় এবার ৩৮টি দল যোগ দিয়েছে। ১২ই এপ্রিল থেকে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে। উপরার্দ্ধে পড়েছে, গত বৎসরের বিজয়ী বোম্বাই কাষ্টমস, কলিকাতা কাষ্টমস্‌, রেঞ্জার্স, ঝাঁন্সি হিরোজ, বি এন আর ও মানভাদার। ইহাদের মধ্যে কে যে ফাইনালে উঠবে বলা দুরূহ। মনে হয়, ঝাঁন্সি ও বোম্বাই কাষ্টমসের খেলায় যে জয়ী হবে সেই কাপ-বিজয়ী হবে। নিম্নার্দ্ধে আছে, নিখিল ভারত রেলওয়ে চ্যাম্পিয়ন নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে, ই আই আর, ভূপাল ওয়াণ্ডারার্স, রেঙ্গুন কম্বাইণ্ড। এন্‌ ডব্‌লিউ আর ফাইনালে উঠবে বলে মনে হয়। তবে যোগ্য দলই যে সর্ব্বশেষে বিজয়ী হবে এবং শেষের খেলাগুলি যে খুব প্রতিযোগিতা-মূলক হবে ইহা আশা করা বোধ করি অন্যায় হবে না।

বিদেশী বিশিষ্ট টেনিস ও ক্রিকেট খেলোয়াড়দের ভারতে আগমন ঃ

আগামী শীত ঋতুতে কলিকাতা সাউথ ক্লাবের উদ্যোগে জার্ম্মাণীর বিশিষ্ট টেনিস খেলোয়াড় দল খুব সম্ভবতঃ কলিকাতা আসবেন। এ দলে থাকবেন, বিখ্যাত খেলোয়াড় ব্যারন জি ভন্‌ ক্রাম (জার্ম্মাণীর ১নং) বয়স ২৭, হাইনার হেঙ্কেল (২নং) বয়স ২১, ডাঃ ক্লিনরথ (ক্যাপটেন) ও এফ্‌ ভনক্রাম।



ব্যারন জি ভন্‌ ক্রাম

বোম্বাইয়ের ভারতীয় ক্রিকেট ক্লাবের ষ্টেডিয়াম উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষে লর্ড টেনিসনের দলের ভারতে আসবার খুব

সম্ভাবনা আছে। এ দলে আসতে পারেন,—লর্ড টেনিসন (ক্যাপটেন); বি এইচ লায়ন, এম লেল্যাণ্ড, এন্ ম্যাক্‌কর্কেল, আর এইচ মুর, পি জি এইচ ফিণ্ডার, এ ফ্যাগ, এ আর গোভার, জি ও এলেন, ডব্‌লিউ আর হ্যামণ্ড, টি এস ওয়ার্দিংটন, ডব্‌লিউ এল ক্রীজ অথবা ডবলিউ ভোস, হেডলি ভেরিটি, এ এস একলস্-ডগ্‌লাস্ ও সি জে বার্ণেট। প্যাটসী হেন্‌ড্রেন ও ফ্র্যাঙ্ক উলিও আসতে পারেন।

আবার ফ্র্যাঙ্ক টেরাণ্ট ক্রিকেট ক্লাবকে জানিয়েছেন, যদি অনুমতি দেওয়া হয়, তবে অষ্ট্রেলিয়া থেকে একটি বিশেষ আকর্ষণীয় ক্রিকেট দল তিনি আনাতে পারেন। সে দলভুক্ত হতে পারেন এই খেলোয়াড়রা—ভি ওয়াই রিচার্ডসন, সি ভি গ্রিমেট, ডবলিউ এম উডফুল, এল ফ্লিটউড-স্মিথ, এল ম্যাক্‌কর্মিক, ই এইচ ব্রম্‌লে, বি এ বার্ণেট, এ এফ কিপ্যাক্স, এইচ সি সিল্‌ভার্স, জে এইচ ফিঙ্গলটন, এ জি চিপারফিল্ড, এস জে ম্যাক্‌ক্যাব, ডি ট্যালোন, সি আর ব্রাউন এবং ও ওয়েণ্ডেলবিল।

এখন দেখা যাক শেষ পর্য্যন্ত কোন দল ভারতে সত্যই এসে পৌছান। 'না আঁচালে বিশ্বাস নেই'। তবে বাঙলার রাজধানী কলিকাতার মতন জায়গায় যে দলই আসুন, অন্ততঃ দু'টো খেলা যাতে খেলা হয় সেদিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

শরীর চর্চ্চায় বাঙ্গালী ঃ

উমেশচরণ মল্লিক—

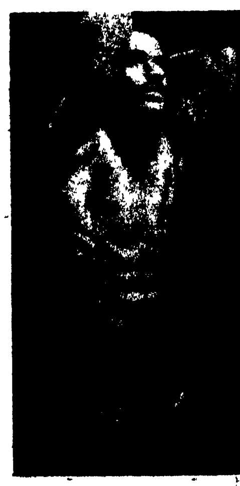
হুগলী জেলার অন্তর্গত সেমরা গ্রামের সম্ভ্রান্ত মল্লিক বংশের রায় সাহেব অভয়চরণ মল্লিক অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী কণ্ট্রোলার অফ্ আর্মি ফ্যাক্টরী একাউণ্টস্ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ও রেলওয়ের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু বিমলাচরণ মল্লিক মহাশয়ের পুত্র।

শ্রীমান দশ বৎসর বয়সে মীরাটে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন এবং ইঁহার শরীর একেবারে নষ্ট হয়ে পড়ে। শৈশবকাল থেকেই ইনি ব্যায়ামে বিশেষ অনুরক্ত। ১৫ বৎসর বয়সে আসানসোলে ই, আই, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত Athletic clubএর সভ্য হয়ে প্রথম ব্যায়াম চর্চ্চা আরম্ভ করেন। কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ব্যায়ামবীর প্রফেসর বিষ্ণুচরণ ঘোষ Good Physiqueএর জন্য ইঁহার প্রশংসা করেন এবং তাঁর পরিচালিত Ghosh's College of Physical Educationএর সভ্য হয়ে ব্যায়াম চর্চ্চা করবার উপদেশ দেন। ইনি উর্দ্ধ-



উমেশচরণ মল্লিক

নিক্ষিপ্ত লৌহ গোলকের গতি পেটের মাংসপেশীর দ্বারা গতিরোধ করতে, লৌহদণ্ড কণ্ঠনালীর দ্বারা বক্র করতে, লোহপেটী হস্তদ্বারা coil করতে, মাংসপেশী সঞ্চালন করতে, গুরুভার উত্তোলন করতে এবং যুযুৎসু কৌশলে ও মুষ্টি যোদ্ধায় পারদর্শী। ইহা ব্যতীত ইনি লোহার কড়ি ও র‍্যাফ্টার স্কন্ধের সাহায্যে বক্র করতে বিশেষ সিদ্ধ হস্ত। ইনি সেণ্টপল্‌স কলেজে অধ্যয়ন করেন।



শ্রীমান যোগেন্দ্রলাল মালাকার

শ্রীমান যোগেন্দ্রলাল মালাকার—

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের একজন সভ্য। বাঙলার বিখ্যাত ব্যায়ামবিদ্ রাজেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতার

শিষ্য মতিলাল রায়ের তত্ত্বাবধানে ইনি ব্যায়াম শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন ও সুগঠিত পেশীবহুল স্বাস্থ্য লাভ করেন। ইনি কণ্ঠনালীর দ্বারা লৌহদণ্ড বক্র, হস্ত ও দন্ত দ্বারা লৌহপাটি পাকাইতে, হস্তের পেশীর সাহায্যে লৌহদণ্ড বক্র, শরশয্যায় ভার গ্রহণ, পেশী সঞ্চালন ও সঙ্কোচন প্রভৃতিতে বিশেষ পারদর্শী। লাঠি খেলা, ছোরা খেলা এবং যুযুৎসু প্রভৃতি খেলাতেও বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছেন। বয়স বাইশ বৎসর মাত্র।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—

ইনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। প্রথমে ইঁহার শরীর খুব খারাপ ছিল, কিন্তু নিজের ঐকান্তিক চেষ্টায় এইরূপ সুন্দর শরীর গঠনে সমর্থ হয়েছেন। ইনি বহু কঠিন ক্রীড়ায় পারদর্শী।



শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

শেষ বেলায়

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

নদীর ধারে দাঁড়িয়ে দেখি নয়ন মেলিয়ে
লুকানো কোন্ ঝরণা ছুটে পাথর ঠেলিয়ে।
ডাকে সিঁদুর মেঘের মায়া,
সাথী-হারা তরুর ছায়া,—
শিউরে উঠি আপনাকে মোর হারিয়ে ফেলিয়ে।

পাহাড়-শিরে মেঘের পাহাড়, তার উপরে কালো
কিনারাতে কে জ্বালিল পুরানো সেই আলো?
ভুলিয়ে দিল দুখের জ্বালা,
দুলিয়ে দিল মুক্ত মালা,
তেম্‌নিতর আগের মত লাগ্‌ছে আবার ভালো।

কাছের পাহাড় সবুজ-রঙা, দূরেরগুলি নীল,
বুনো হাসে উড়ে আসে, মেল্‌ছে পাখা চিল;
জাগ্‌ছে চূড়া রৌদ্র লেগে
খেল্‌ছে আলো ভাঙা মেঘে,
সাঁঝ্-তারকার ডাক শোনে গো এই দরদী দিল।

বড় বড় গাছের সারি দেখায় সরু, ছোট;—
ওরে পথিক পদ্ম-দেশীয়া, উপর পানে ওঠো।
এই দুনিয়া বদ্‌লে যাবে,
নতুন ছবি দেখতে পাবে,
রঙের রসে ডুবিয়ে তুলি এঁকেছে কোন্ পোটো।

শুনি গোপন কলধ্বনি নীরবতার গানে,
এক-টানা সে ঝিল্লী-সুরে চলেছি তার পানে;
বনপাখীর নিমন্ত্রণে
চলেছি আজ কোন্ বিজনে?
কাকলিতে কি আকুতি, বুঝি নে তার মানে।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস—"প্রাগৈতিহাসিক" ১॥০
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস—"মরুর পথে" ২৲
শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত উপন্যাস—"আগ্নেয় গিরি" ১॥০
শ্রীঅরবিন্দ দত্ত প্রণীত উপন্যাস—"পিপাসা" ২৲
শ্রীপ্রমথনাথ পাল প্রণীত সমালোচনা গ্রন্থ—"শরৎ সাহিত্যে নারী" ১৲
শ্রীনিত্যহরি ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস—"ম্যারিংক্রেসী" ১॥০
শ্রীঅরবিন্দ হালদার প্রণীত উপদেশ গ্রন্থ—"গুরুবাণী" ।০
শ্রীচরণ দাস প্রণীত উপন্যাস—"আলেয়া বা ভৌতিক রহস্য" ১৲
শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু প্রণীত উপন্যাস—"অতসুর তীর" ২৲
শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য এম-এ প্রণীত—"শব্দ উচ্চারণ" ১৲
ঐ "কাব্য মধুমালা" ১৲
শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত ডিটেকটিভ উপন্যাস—"শয়তানে আর সুন্দরীতে" ।৵০

নিবেদন

আগামী আষাঢ় মাসে 'ভারতবর্ষে'র পঞ্চবিংশ বর্ষ আরম্ভ হইবে

সুদীর্ঘ চতুর্বিংশ বর্ষকাল যে 'ভারতবর্ষ' গ্রাহক, পাঠক ও অনুগ্রাহকগণের পরিচিত, তাহার পরিচয় আর নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন আছে কি? এই চতুর্বিংশ বর্ষকাল 'ভারতবর্ষ' যে ভাবে বাঙ্গালা-সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই সুদীর্ঘ কাল 'ভারতবর্ষ' প্রতি বৎসরে ২০০০ পৃষ্ঠা পঠিতব্য বিষয়, ৬০খানি ত্রিবর্ণ চিত্র ও অন্যাধিক ১৫০০ এক বর্ণ চিত্র উপহার দিয়াছে; প্রতি মাসে পরলোকগত মনীষীবৃন্দের ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত প্রতিকৃতি ও সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা দিয়াছে; এতদ্ভিন্ন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিশেষজ্ঞগণের গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধরাজি 'ভারতবর্ষ'কে সমৃদ্ধ করিয়াছে; আগামী বৎসরের প্রথম সংখ্যাকে আমরা ভারতবর্ষের 'রজত-উৎসব' সংখ্যারূপে প্রকাশ করিবার আয়োজন করিয়াছি। বঙ্গের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণের রচনা সম্ভারে এই সংখ্যা অপরূপ হইবে। 'ভারতবর্ষ' এই চতুর্বিংশ বর্ষকাল যে উচ্চতম আসন অধিকার করিয়া আছে, তাহাকে আরও মনোরম করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষের মূল্য মণিঅর্ডারে বার্ষিক ৬।৵০, ভি, পিতে ৬॥৶০, ষাণ্মাসিক ৩৶০ আনা, ভি, পিতে ৩॥০। এই জন্য ভি, পিতে ভারতবর্ষ লওয়া অপেক্ষা **মণিঅর্ডারে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধাজনক।** ভি, পির টাকা বিলম্বে পাওয়া যায়; সুতরাং পরবর্ত্তী সংখ্যার কাগজ পাইতে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। **২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে টাকা না পাওয়া গেলে আষাঢ় সংখ্যা ভি, পি করা হইবে।** পুরাতন ও নূতন গ্রাহকগণ কুপনে কাগজ পাঠাইবার পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ কুপনে **গ্রাহক নম্বর** দিবেন। নূতন গ্রাহকগণ **নূতন** বলিয়া উল্লেখ করিবেন; নতুবা টাকা জমা করিবার বিশেষ অসুবিধা হয়।

ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। সেই জন্য ব্রহ্মদেশে আমাদের যে সকল গ্রাহক আছেন, তাঁহাদের **বিলাতি হারে ডাকমাশুল দিতে হইবে।**

Editor ;—
RAI JALADHAR SEN BAHADUR

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjee & Sons, at the Bharatvarsha Ptg. Works 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta



দ্বিতীয় খণ্ড | চতুর্বিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

সংস্কৃত সাহিত্যের দু'জন নারী কবি

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী পি-এইচ্-ডি (অধ্যাপক, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়)

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে কবিশেখর রাজশেখর তাঁর কাব্য-মীমাংসা নামক গ্রন্থে (১) উদাত্ত স্বরে বলেছেন—সংস্কার আত্মার ধর্ম্ম—সুতরাং কবিত্ব বা পুরুষত্বের ভেদ মেনে চলে না। পুরুষদের মতো নারীরাও কবি হ'তে পারেন; শোনাও যায়, দেখাও যায়—রাজকন্যা অমাত্যদুহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রগাঢ়ব্যুৎপত্তিসম্পন্না ও কবিত্বে সুদক্ষা হ'য়েছেন। একই গ্রন্থে তিনি জটিল অলঙ্কারশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর পত্নী অবন্তিসুন্দরীর মতামত তিনবার (২) উল্লেখ করেছেন এবং তাঁহার কর্পূরমঞ্জরী (৩) নামক গ্রন্থে দেখা যায়—পত্নীর আদেশে উক্ত নাটকের প্রথম অভিনয় হবে; বলা বাহুল্য, পত্নীর আনন্দ উদ্বেলতর কর্ব্বার জন্যই আদর করে রাজশেখর স্বনামধন্যা পত্নীর নাম গ্রন্থের প্রথমে জুড়ে দিয়েছেন। পাইয়লচ্ছী (প্রাকৃত-লক্ষ্মী) নাম-মালা (৪) নামক প্রাকৃত গ্রন্থে ধনপাল পরিসমাপ্তি সময়ে বলেছেন—তাঁহার ভগ্নী সুন্দরীর জন্য এ গ্রন্থ নির্ম্মিত হয় ১০২৯ বিক্রমাব্দে অর্থাৎ ৯৭২-৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং ধনপাল ও সুন্দরী যে রাজশেখরের সমসাময়িক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অবন্তিসুন্দরীও কবি। আমাদের বিশ্বাস—ধনপালের ভগ্নী সুন্দরীই রাজশেখর-পত্নী অবন্তিসুন্দরী। সুতরাং রাজশেখরের পূর্ব্বোক্ত উক্তির "দেখা যায়"—এ কথাটার সার্থকতা পরিদর্শনার্থ আমাদের আর কষ্ট কর্ত্তে হয় না—কবিবরের অন্তঃপুরেই তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত দেখ্‌তে পাই।

কিন্তু "শোনা যায়" এ কথা দ্বারা তিনি কাঁদের লক্ষ্য করেছিলেন?

---

(১) পুরুষবৎ যোষিতোহপি কবীভবেয়ুঃ, ইত্যাদি। বরোদা সংস্করণ, ৫৩ পৃঃ।

(২) উক্ত সংস্করণ, ২০, ৪৬, ৫৭ পৃঃ।

(৩) হার্ভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরীজ, গ্রন্থাঙ্ক ৪, ৬-৭ পৃঃ।

(৪) ডাঃ ওয়েবারের জার্ম্মাণ সংস্করণ, ৭৩ পৃঃ, কবিতা সংখ্যা ২৭৬-৭৭।

বিজ্জা নিশ্চয়ই তাঁদের একজন।

সুভাষিতহারাবলী (৫) নামক ডক্টর ভাণ্ডারকর সংগৃহীত একখানা হস্তলিখিত পুঁথিতে একটী কবিতা রয়েছে বিজ্জার নিজেরই। তাতে বলা হচ্ছে—আমার নাম বিজ্জকা, আমার গায়ের রং নীল পদ্মের মত শ্যাম—আমার সম্বন্ধে না জেনেই কবি দণ্ডী (৬) বলেছেন—সরস্বতী সর্ব্বশুক্লা। এ কবিতায় দণ্ডীর নাম যখন তিনি উল্লেখ করেছেন, তখন তিনি দণ্ডীর সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী, এ বিষয়ে সন্দেহ হ'তে পারে না। ধন্যা'সি যা কথয়সি (৭) প্রভৃতি যে কবিতা তাঁর আছে, সেটী মুকুল ভট্টের অভিধা-বৃত্তি-মাতৃকা (৮) নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত হ'য়েছে। মুকুলভট্ট ভট্টকল্লটের পুত্র। ভট্টকল্লট কাশ্মীররাজ অবন্তিবর্ম্মার সমসাময়িক ছিলেন। অবন্তিবর্ম্মা খ্রীষ্টীয় ৮৫৫—৮৮৩ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং বিজ্জা উক্ত সময়ের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিজ্জার জীবিতকাল আনুমানিক খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্য-ভাগ। (৯)

সুভাষিতহারাবলীর বিশিষ্ট কবি-প্রশংসা নামক অংশে (১০) দেখা যায়—রাজশেখর বল্লেন—বিজয়াঙ্কা সরস্বতীর মত ও কর্ণাট দেশবাসিনী—বৈদর্ভ-রীতিতে (১১) তাঁর স্থান কালিদাসের মত। খুব সম্ভবতঃ—এই বিজয়াঙ্কা ও বিজ্জা বা বিজ্জকা একই নারী কবি। স্থানান্তরে (১২) তাঁর নাম বিন্তা ও বিজ্জকাও পেয়েছি।

বিজ্জার কবিতাগুলো তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—মানব-সম্বন্ধীয়, প্রেম-সম্বন্ধীয় ও প্রকৃতি-সম্বন্ধীয়। প্রথম শ্রেণীর কবিতাগুলো থেকে দেখা যায়, কবির মতে দৈবকে আট্‌কানো চলে না, অতি উচু জনও নিতান্ত দীন ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হ'য়ে যেতে পারে—কালের গতি অব্যাহত। ঐ যে অদূরস্থ সরোবর, ওখানে এককালে মদমত্ত হস্তীরা স্নান কর্‌তো, তারা পর্ব্বত প্রমাণ ঢেউ তুল্‌তো, সেগুলো আকাশের কোল ঘেঁষে পুনঃ সরোবরের বুকে ফিরে আস্‌তো; আর আজ ঐ সরোবরের এমন দশা—একটি বক চর্‌তে পারে তেমন জলও ওখানে নেই। (১৩) অন্যত্র (১৪) তিনি বল্‌ছেন—নিয়তির চক্রে আমাদের সমস্ত চিন্তা জড় হ'য়ে যায়, বিপদ্-রূপ মন্থন-দণ্ড সেগুলো গুলিয়ে দেয়—নিয়তি আপন পথে চল্‌বেই—মানুষ কি কর্ত্তে পারে? তবে তিনি এও বল্‌ছেন—নিয়তি পাশে বদ্ধ বলে মানুষের শ্বাস-জর্জ্জরিত হওয়ার কোনও কারণ নেই—সমুদ্র পর্ব্বত কেউ নিয়তির উল্লঙ্ঘনে সমর্থ নয়, তা বলে তারা ছোট নয়। (১৫)

মানুষ যে যেখানে যে রকম ভাবেই থাকুক, সেখানেই কোনও রকমে কথঞ্চিৎ শান্তি পেতে চেষ্টা করে; যেমন ঐ যে চম্পক-তরু—কুগ্রামে কুজনের বাড়ীর পাশের উদ্যানে রোপিত হ'য়েছে, সে স্থান ছেড়ে সে পালাতে পার্চ্ছে না, ডাল-পালা ভেঙ্গে গেছে; তবু গাছ নিজের মনকে কথঞ্চিৎ এ বলে সান্ত্বনা দিচ্ছে—তবু যা হোক, আমার পাদদেশস্থ ঘাসগুলো যে বড় হচ্ছে সে তো আমার এই ডাল-পালা না থাকার দরুণই। (১৬)

---

(৫) পুনা, ১৮৮৩-৮৪ সাল, ৯২ নং পুঁথি, ফলিও পৃঃ ৫৫ (খ।

(৬) কাব্যাদর্শের প্রথম শ্লোক দেখুন।

(৭) শার্ঙ্গধর পদ্ধতি, ৩৭৪৬ নং কবিতা।

(৮) নির্ণয়সাগর সংস্করণ, ১২ পৃঃ।

(৯) ধারেশ্বর ভোজরাজ তাঁহার সরস্বতীকণ্ঠাভরণ নামক গ্রন্থে বিজ্জার "উন্নমধ্য সকচগ্রহমাস্তং" প্রভৃতি কবিতা দু'বার ও "বিলাস-মসৃণোল্লসৎ" প্রভৃতি কবিতা একবার উদ্ধৃত ক'রেছেন। এ গ্রন্থের কাব্য-মালা (গ্রন্থাঙ্ক ৯৪) সংস্করণের ৭৪—৫১৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ভোজরাজ খ্রীষ্টীয় ১০১৮ সালের কাছাকাছি সময়ে সিংহাসনাধিরোহণ করেন ও চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন।

(১০) ২ নং কবিতা দেখুন।

(১১) গৌড়ী ও বৈদর্ভী রীতির পার্থক্যের জন্য কাব্যাদর্শের ১ম সর্গ দেখুন। বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী ও লাটী রীতির জন্য সাহিত্য-দর্পণের নবম অধ্যায় (নির্ণয়-সাগর সংস্করণ ৪৬৬ পৃঃ থেকে) দেখুন।

(১২) যথা, সদুক্তিকর্ণামৃত, ইণ্ডিয়া অফিসে সংরক্ষিত আউফ্রেক্ট হস্তলিখিত পুঁথি ৫৭ নং, প্রথম প্রবাহ ৮ নং শ্লোক; দ্বিতীয় প্রবাহ ৫৬ নং, ৬৬ নং ও ১০৪ নং শ্লোক।

(১৩) জহলনের সূক্তিমুক্তাবলী, ভাণ্ডারকর সংগৃহীত হস্ত-লিখিত পুঁথি, ৩ নং রিপোর্ট, ৩৭০ সংখ্যক পুঁথি (পুনা, ১৮৮৪-৮৫), ৪৭ পৃঃ।

(১৪) (খ) হরি কবি কৃত সুভাষিতহারাবলী, পিটার্সন সংগৃহীত হস্তলিখিত ৯২ নং পুঁথি, (পুনা ১৮৮৩-৮৪) ৬৪ পৃঃ (ক)।

(১৫) বল্লভদেবের সুভাষিতাবলী, কবিতাসংখ্যা ৩১৩৮।

(১৬) ভাণ্ডারকর সংগৃহীত জহলনের সূক্তিমুক্তাবলী, পুঁথির ৫১ পৃঃ (ক)।

আমাদের কবির নিপুণ অঙ্কনে অসতী-চরিত্র অতি সুন্দর ফুটে উঠেছে। মনোবাসনার পরিতৃপ্তি নিমিত্ত অসতী নারীর ফন্দির আর অভাব নেই। প্রতিবেশিনী নারীকে ডেকে বলছে (১৭)—ভাই! সন্ধ্যা হ'য়ে এলো, কাজে কাজে দিন থাকতে জল আনা হ'লো না। আমার তিনি কূপের জল খান না, অথচ অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, হয়ত: অন্ধকারে জীর্ণ গাছের ডালে ঘষা লেগে আমার চর্ম্ম উপড়িয়ে যাবে, তবু ভাই! যেতেই হ'বে, জল আন্‌তেই হ'বে। প্রেম-বিহ্বল স্বামী বেচারা প্রতিবেশিনীর কাছ থেকে স্ত্রীর গদ-গদ বাণী শুনবে, ভাববে আমার আহা আহারে! আমার মত এমনটী আর কার আছে—সন্ধ্যা মানে না, অন্ধকার মানে না, চর্ম্ম উপড়ানোটাও মানে না—জলকে চল্‌তেই হবে, বুকে আঙ্গুল ঠেকিয়ে বল্‌লে—এ আমারি জন্য। হায় রে বেচারা!

অনাচারের দিকে যেমন কবি বিজ্জকার বিষ-দৃষ্টি, সত্যিকার প্রেম-বিহ্বলাদের জন্য তেম্‌নি তাঁর মায়া-মমতার তুলনা নেই। এককালে যে সোণা-মণি একটু মুখ ভার কর্ল্লে সোণা-মণি-ধনের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব লোপ পাওয়ার উপক্রম হতো, ক্ষুদ্র অশ্রু-কণাকে চেরাপুঞ্জির সের-ওজনের বড় বড় ফোঁটা দিয়ে প্রতিরোধ করা হ'তো, অসময়ে ছল করে ও সময়কে সাম্‌নে যথাসাধ্য এগিয়ে দিয়ে যার দেখাশুনা কালিদাসী মন্দাক্রান্তাকে বাহন করে ঘুরে বেড়াতো—কার অভিশাপে আজ সে সোণা-মণি-ধনের সব বদ্‌লে গেছে, সোণা-মণি মাটিতে লুটিয়ে পড়্‌লেও সে গঠ্ গঠ্ করে চলে যায়, কেঁদে কর্ণফুলী বহিয়ে দিলেও তার সাহারা বাষ্পটুকুর দর্শন মেলে না, অলকা পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও ইন্দ্রবজ্রাকে পর্য্যন্ত আশ্রয় করার আর নামটী করে না। অথচ সোণা মণির কিছুই দোষ নেই, তিলমাত্র না। নারী-হৃদয় পরিবর্ত্তন জানে না, সোণা-মণি-ধনের কথা কিছুতেই ভুল্‌তে পারে না। (১৮) মেঘের গুরু গুরু গর্জ্জন, কদম্ব-রেণু-সমন্বিত সমীরণ, চপলা চমক সবি মিলে তার হৃদয় দাবানল আরো দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে তোলে। (১৯) বুক জলে পুড়ে খাক হ'য়ে যাচ্ছে, তবু ভাবছে, নৃশংস প্রেম-দেবতা কেন তার হৃদয়-সর্ব্বস্বের কাছে তৃতীয় বারের বার আবার পরাজয় স্বীকার কর্ব্বে—প্রথমবার শিব, দ্বিতীয়বার বুদ্ধ তাকে তো পরাজয়ের ধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়ে দিয়েছে; আবার কেন তবে তৃতীয়বার এম্‌নি করে তার প্রিয়তমের পায়ে সাষ্টাঙ্গ লুটিয়ে পড়া? (২০)

কবি এও ভুলেননি যে রামধনুর মত যুবতীর হৃদয়ও চঞ্চল, অনেক-রাগ—(২১) রঞ্জিত, নির্গুণ—(২২), বক্র ও দুষ্প্রাপ্য হ'তে পারে। (২৩)

কবির মতে যে নারীর হৃদয় আদর-সোহাগের চেয়ে বেশী প্রার্থনা করে, স্নেহের বাজারে সে ঘষা মুদ্রা—প্রায় চলার বাইরে। (২৪) স্নেহশীলার চিত্ত-সংযম সাধনীয়তম বস্তু। সর্ব্ববিধ জয় তার নিজস্ব হওয়া চাই—চিত্তের উপর, দেহের উপর,—নিজের উপর জয় স্নেহ-সর্ব্বস্ব-বিজয়ে আত্মপ্রকাশ কর্ত্তে আকাশের অপেক্ষা রাখে না।

বিজ্জকার প্রকৃতি-বর্ণন অতি নিখুঁত, পরম হৃদয়গ্রাহী। প্রভাত-বর্ণনে মধুকরের গুন্ গুন্ রবের মনোহারিত্ব বেড়েছে—মধুপের পদ্ম-বুকে লীলা-বিহার-প্রসঙ্গে অঙ্গে রেণু-ভূষণ পরিধান হেতু; সূর্য্য-কিরণের গৌরব আকাশ-ভুবন ছেয়ে গেছে উদয়াচলের চুম্বন হেতু। (২৫) বসন্ত-বর্ণনে পলাশ-কলির বুকে কেশরের ইন্দু-কলা-বিজয়িনী শোভা মদনের রক্ত-বিভূষণ-ভূষিত জতু-মুদ্রিত ধনুর রমণীয়তায় সঙ্গে তুল্য আসন লাভ করে চমকে ও ঠমকে উভয়ে মিলে যে অ-বলা অবলাদের সংহারে উদ্যত হয়েছে, তাতে তুলনায় অলঙ্কার চাতুর্য্যের থেকে ভাব-মাধুর্য্য-প্রকট হ'য়েছে শতগুণ বেশী—কাব্য-রসিকের মন যুগপৎ শ্রীহর্ষদেবের (২৬) ও

---

(১৭) শাঙ্গধর পদ্ধতি, ৩৭৬৯ নং কবিতা।

(১৮) বল্লভদেবের সুভাষিতাবলী, বিরহিণী-প্রলাপ-প্রজ্যা।

(১৯) জহলনের সূক্তি-মুক্তাবলী সংগ্রহ, ভাণ্ডারকর সংগৃহীত হস্ত-লিখিত ৩৭০ নং পুঁথি, (পুনা, ১৮৮৪-৮৫), ১২৪ (খ)।

(২০) শ্রীধর দাসের সদুক্তিকর্ণামৃত, ইণ্ডিয়া অফিস্ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আউফ্রেক্ট মেনাস্ক্রিপ্ট, ৫৭ নং, দ্বিতীয় প্রজ্যা, ৫১২ নং কবিতা।

(২১) রাগ-অনুরাগ। ধনুঃপক্ষে রং।

(২২) ধনুঃপক্ষে—ধনুর ছিলা।

(২৩) পূর্ব্বোক্ত জহলন-কৃত সূক্তিমুক্তাবলী-সংগ্রহ, ৯৬ (খ) পৃঃ।

(২৪) বল্লভদেবের সুভাষিতাবলী, ১১৭৫নং কবিতা।

(২৫) শ্রীধরদাস কৃত সদুক্তি-কর্ণামৃত, ইণ্ডিয়া অফিসে সংরক্ষিত হস্তলিখিত পুঁথি [Aufrecht Ms. 57], তৃতীয় প্রজ্যার ৪১নং কবিতা।

(২৬) রত্নাবলী, বসন্ত-বর্ণন।

বিশ্বনাথ (২৭) কবিরাজের কীর্ত্তি-দ্রুমের পল্লবে পল্লবে ঘুরে বেড়ায়। (২৮)

আমাদের দ্বিতীয় কবি মোরিকা বিজ্জকার সমগোত্র—অতুল বিদ্যা-বৈভব ও তর্ক-সভায় শত্রু পরাজয়ে অদ্বিতীয় বলে তাঁরা কবি ধনদেবের বন্দনার্হ হয়েছেন। (২৯)

কবির প্রেম-দূতী গো-বেচারা, অবলা সরলা বালা, নিতান্ত সাদাসিদে—বাক্যাড়ম্বরে তার বিশ্বাস নেই। এসে পড়ো বাছাধন; শোভা পেতে চাও যদি, তাকে ছাড়া তোমার উপায় নেই যেমন তোমাকে ছাড়া তার উপায় নেই—খিল খিল করে হাস্‌ছে ঐ চাঁদ, সে কি শর্ব্বরী বিহনে, আর চাঁদ বিনা রাতেরও বা কি শোভা—এসে পড়ো বাছা আমার—কিবা ফল অভিমানে, মিথ্যা এই সময়-যাপনে—গোঁ ধরো না, এসে পড়ো, এসে পড়ো, জানোই তো—এ বলে হিড় হিড় করে নায়ককে টেনে নিয়ে আস্‌ছে যেন সে। (৩০) ধারেও কাটে, ভারেও কাটে—দূতীর স্বল্প কথা নায়কের হৃদয় ধারেই কাট্‌ছে; বুকের ক্ষত নিয়ে কে বাড়াবাড়ি কর্ত্তে সাহস পায়?

মোরিকার নায়িকার হৃদয় স্নেহের স্বতঃউচ্ছ্বসিত উৎস—বাধা নেই, বিঘ্ন নেই—আপন বেগে আপনি ভেতর থেকে উপচিয়ে পড়্‌ছে। স্নেহের গোমুখী-ধারা আপন গতিতে বয়ে চলেছে, কথার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপল খণ্ড তার ঝিম্ ঝিম্ গতির সম্মুখে মাথা নুইয়ে নুইয়ে দিচ্ছে। এসেছ যদি প্রিয়! যেয়ো না; আমার চরম দুর্দ্দশা যদি তোমার অভিলাষ, প্রাঙ্গণে পদার্পণ করেই তো তা সেরে রেখেছো—পেছন ফিরে আমায় শমন-ভবনে পাঠিয়ে তোমার কি লাভ? দীন আমি, দরিদ্র আমি, ঘরে সুতোটী পর্য্যন্ত নেই, যা ছিল সব গেছে, শরীরটাও গেল বলে। (৩১) তবু প্রিয়! ফিরে যেয়ো না, আমার অটুট হৃদয়-দলে হে আমার জগদ্-যোনি! তুমি বিহার কর, বিখণ্ডিতার অখণ্ড প্রাণ তোমারই তো লীলা-কমল—সত্যি মধুর নায়িকার এই ভাব-নিবেদন।

বিরহ-কাল প্রাণের বর্ষা ঋতু—অশনি সম্পাত, সৌদামিনী-চমক, প্রলয়-বিপ্লাবন- জগৎ বিভীষিকাময় করে তোলে। অঝোরে ঝরে বারি-ধারা—ভাষা এক, ছন্দঃ এক, সুর-তাল সব এক। কবে এর অবসান? প্রিয়তমের হাসির রেখা আবার কবে দেখা যাবে? হৃদয় দুলে উঠে—ফিরে এসো প্রিয়! স্মৃতির চিহ্ন যথাস্থানে থাক্, মাটির দাগ মাটিতেই থাক্—কি হবে আর সংখ্যা-নির্দ্দেশের চেষ্টায়—ঘষাঘষিতে ক্ষত হয়ত বাড়্‌বে, গোণাগুণিতে দাগ হয়ত যাবে বেড়ে—ফিরে এসো—আরো কতদিন পরে তোমার হাসি দেখ্‌তে পাবো—নায়িকার হৃদয়ে আশঙ্কার মেঘ আরো কাল হয়ে ঘনিয়ে আসে—দর দর বিগলিত ধারার আর বিরতি নেই। (৩২)

মোরিকার নায়ক-চরিত্রও অতি মধুর। নায়িকার প্রাণ যখন ওষ্ঠাধরে সোহাগভরে স্থান পরিগ্রহ ক'রে নিজকে উজাড় করে নিঙ্‌ড়িয়ে দিতে চায়, আধ-ফোটা নয়ন-পদ্ম যখন আরো মুদে আসে, তখন তাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবাই আশ্চর্য্য; তার সমক্ষে কি করে বলা যায়, আমি তবে আসি, প্রাণ ছেড়ে কে কবে বাঁচ্‌তে পারে? প্রিয়ার মিনতি-ভরা দুটো ছল্ ছল্ আঁখি দেখ্‌লেই প্রাণ স্থির থাকৃতে পারে না, বন্যা-বিপ্লাবিত ধৌতগণ্ডতট নিরীক্ষণ করেও কেউ ঐ একমাত্র প্রাণধনের প্রাপ্তি ছাড়া অন্য ধন-প্রাপ্তির আশা কর্ত্তে পারে—নায়ক এ ভাবতেই পারে না। (৩৩)

মোরিকার যে স্বল্পসংখ্যক কবিতা আমরা পেয়েছি, তা সব প্রেম-মূলক—বিজ্জার লেখার মত বিষয়-ভেদ তাতে পাইনি।

বিজ্জার ওজোগুণ অর্থাৎ সমাস-বাহুল্যের দিকে আসক্তি মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। (৩৪) মোরিকা প্রসাদগুণ বা

(২৭) সাহিত্য-দর্পণ, দশম অধ্যায়।

(২৮) পূর্ব্বোক্ত ভাণ্ডারকর সংগৃহীত হস্তলিখিত সূক্তি-মুক্তাবলী, ১১১ (খ) পৃঃ।

(২৯) শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি, ১৬৩নং কবিতা।

(৩০) বল্লভদেবের সুভাষিতাবলী, ১৩৯৬নং কবিতা।

(৩১) বল্লভদেবের সুভাষিতাবলী, ১০৫৩নং কবিতা।

(৩২) পূর্ব্বলিখিত পুস্তক, ১০৭২নং কবিতা।

(৩৩) বল্লভদেবের সুভাষিতাবলী, ১০৫০নং কবিতা।

(৩৪) যথা, শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি, ৫০২ ও ১১৩১নং কবিতা; ভাণ্ডারকর সংগৃহীত জহলনের সূক্তিমুক্তাবলী, ৫৭ পৃঃ (ক)

প্রাঞ্জলতার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। মাধুর্য্য গুণে উভয়েই সমতুল। শ্লেষ (৩৫) ও উপমায় (৩৬) বিজ্জা বেশ কৃতী; মোরিকার এ বিষয়ে প্রচেষ্টা নেই।

বিজ্জা ও মোরিকায় দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-সমাধানের কোনও ইঙ্গিত বা চেষ্টা নেই—যে জীবন-দেবতা আছে তার বাইরে অন্য জীবন-দেবতার, স্নেহ ও মায়া-মমতার ধর্ম্ম ছাড়া অন্য ধর্ম্মের অনুসন্ধান বা আশ্রয়ে তাঁরা প্রয়োজন মনে করেন নি। নিত্য নৈমিত্তিক পূজার ফুল তাঁদের কবিতা-নিচয়, পার্ব্বণের ঘটাপটার কোনও অপেক্ষা রাখে না। সেই হাসি, সেই কান্না—নিজের জন্য মোটেই নয়, যার জন্য, যাদের জন্য বেঁচে থাকা, তাদের জন্য। "মাই-ডিয়ারী" আস্ফালন তাঁদের উভয়ের কারো নেই—আছে ঘোমটার আড়ালে ঈষৎ হাসি, উভয়ে সর্ব্বত্র সংযত ও উদার। ধরিত্রীর অশেষ কল্যাণ কামনা ছাড়া তাঁদের আর কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই।

(৩৫) যথা, জহলনের সূক্তি-মুক্তাবলী, ৯৬ পৃঃ (খ)। (৩৬) উক্ত পুঁথি ৯০ (খ)

অনুরোধ

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

হোক্ না যতই দামী, আকিঞ্চন
নাহিক কাঞ্চনে,
নীহারের শোভা লাগি, নাহি লোভ
গিরি-বিহারের,
আমি কবি, প্রেম-ছবি বিমোহন
আঁকি এ ভুবনে
কিছুরি অভাব ভাবি, কোনো ক্ষোভ
নাহি হৃদয়ের।

চাহিনাকো যশোরাশি, সিংহাস
চাহিনা রাজার
প'ড়ে থাক্ পদতলে, হেলাভরে
সম্পদ, বিভব—
আমি কবি, গরবী যে অনুক্ষণ
দরদী হিয়ার
ভালোবাসা শুধু আশা, ধরা'প
প্রেম মোর সব।

* * * * * * * *

আর কিছু দিওনাকো, ঠোঁট-ঝরা
মধু বরিষণে
অবিরাম কহে কথা যেন প্রিয়া
আসি অনুরাগে,
হোলো মনো-বিনিময়, বুকভরা
সুখে যার সনে,
বেঁধো তারি পুষ্পডোরে, প্রবাহিয়া
সুধা—হৃদি-ভাগে।

উপন্যাস

দ্বৈরথ

বনফুল

(২৮)

যখন সকলে চলিয়া গেল তখন চন্দ্রকান্ত নিতান্ত নিঃসঙ্গভাবে একা বসিয়া রহিলেন। বাণী আজ রাত্রে এখানে খাইয়া গেলে ক্ষতি ছিল কি! কিন্তু সে থাকিল না। থাকিবেই বা কেন? বাণী তাহার কে? তাহার সহিত কতটুকু অন্তরঙ্গতা চন্দ্রকান্তের আছে? কিছুই ত নাই। রক্তের সম্পর্ক অবশ্যই আছে—তাহারা ভাই বোন। কিন্তু আত্মার সম্পর্ক ত নাই! একই মাতৃগর্ভে তাহারা জন্মলাভ করিয়াছে—শৈশবে একসঙ্গে কিছুকাল কাটিয়েছে—কিন্তু ওই পর্য্যন্ত। বিবাহের পর বাণী বহ্নিকুমারী হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রকান্তও নিজের খুসীমত নিজের জীবন-যাপন করিয়াছে। নিজ নিজ কক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে। বুধের সহিত নেপচুনের এখন আর কোন সম্পর্ক নাই—যেটুকু আছে তাহা নিতান্তই বাহ্যিক। অন্তরঙ্গতার লেশমাত্র নাই। যাহা আছে তাহা স্মৃতি—জীবন্ত কিছু নয়।

গঙ্গাগোবিন্দও ছাড়িয়া চলিল। সকলেই একে একে চন্দ্রকান্তঁকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। অথচ সমস্ত জীবনটাই ত এখনও বাকী। এখনও যৌবন শেষ হয় নাই। এই দীর্ঘ জীবন একাই যাপন করিতে হইবে না কি!

থাকিবার মধ্যে আছে এক উগ্রমোহন। বাণীর অপেক্ষা উগ্রমোহন চন্দ্রকান্তের বেশী আত্মীয়। এই উগ্রমোহনকে কেন্দ্র করিয়াই চন্দ্রকান্তের সমস্ত জীবনটা আবর্ত্তিত হইতেছে। চন্দ্রকান্তের আশা, নিরাশা, সুখ, দুঃখ, সমস্তই উগ্রমোহনকে অবলম্বন করিয়া। উগ্রমোহনের সহিত অহরহ সংঘর্ষে তাহার বুদ্ধি, শক্তিও অর্থ সার্থক হইয়াছে। উগ্রমোহন না থাকিলে চন্দ্রকান্ত করিত কি! উগ্রমোহন কয়েকদিন হইল বৃন্দাবন গিয়াছে—কবে ফিরিবে কে জানে। উগ্রমোহনের বিরহে চন্দ্রকান্ত মনে মনে পীড়িত হইতেছিল। তাহার সহিত আবার বসিয়া দাবা না খেলা পর্য্যন্ত সে স্বস্তি পাইতেছিল না। কবে ফিরিবে সে!

একটা কথা সহসা বিদ্যুৎ ঝলকের মত চন্দ্রকান্তের মনে ঝলসিয়া উঠিল! কমলাক্ষকে ত সে থানায় নালিস করিবার হুকুম দিয়া দিল। কিন্তু ইহার ফল যে কতদূর শোচনীয় হইতে পারে তাহা ত সে ভাবিয়া দেখে নাই।

গোলক সা যদি সত্যই মরিয়া গিয়া থাকে এবং যম-ঘরে সেই মৃতদেহ যদি পাওয়া যায়! তাহা হইলে আইনের চক্ষে উগ্রমোহন খুনী বলিয়া প্রমাণিত হইবে ত! খুনীর শাস্তি যে ফাঁসি! উগ্রমোহনের ফাঁসি হইবে? চন্দ্রকান্তের চক্রান্তে? অসম্ভব! কিছুতেই তাহা হইতে পারে না।

চন্দ্রকান্ত উঠিয়া পড়িলেন। ইহার একটা প্রতিবিধান এখনি করিয়া ফেলিতে হইবে। মূর্খের মত এ কি করিয়া বসিয়াছে সে! তাহার জীবনের একমাত্র বন্ধনটি ছিন্ন করিবার আয়োজন করিল সে কি বলিয়া! কমলাক্ষ কি থানায় গিয়াছে?

চন্দ্রকান্ত হাঁকিলেন—"ভজনা"

ভজনা আসিল।

"ম্যানেজারবাবু আছেন কি না দেখ ত!"

ভজনা চলিয়া গেল। চন্দ্রকান্ত অস্থিরভাবে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার মুখের ভাব বদলাইয়া গেল। গভীর আঁধারে একটু যেন আলোর রেখা দেখা দিল। তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন উগ্রমোহন সিংহকে যেমন করিয়া হউক বাঁচাইতে হইবে।

উগ্রমোহন-বিহীন চন্দ্রকান্তের অস্তিত্ব একান্ত শূন্য ও একান্ত নিরর্থক।

একটু পরেই কমলাক্ষবাবু আসিয়া নমস্কার করিলেন।

"আমাকে ডেকেছেন আপনি ?"

"হ্যাঁ ! থানায় খবর দিয়েছ নাকি ?"

"হ্যাঁ এইমাত্র ত দিয়ে এলাম—"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন—"তাহলে এখুনি একবার থানায় যাও আবার। যম-জঙ্গল খোঁজবার আর দরকার নেই ! গোলক সা এখনি এসেছিল আমার কাছে। এইমাত্র গেল ! উগ্রমোহন তাকে মার-ধোর করে ছেড়ে দিয়েছিল। তোমার মাণিক মণ্ডলের খবর ভুল !"

সমস্ত পৃথিবীটা উল্টাইয়া গেলেও বোধ করি কমলাক্ষ সরকার এত আশ্চর্য্য হইত না। সে নির্ব্বাক বিস্ময়ে প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন—"যাও তাহলে—আর দেরী কোরো না !"

কমলাক্ষ চলিয়া গেল।

চন্দ্রকান্ত একাকী দীর্ঘ বারাণ্ডাটার এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে লাগিলেন !

একটু পরে কমলাক্ষ আসিয়া বলিল—"দারোগাবাবু বল্লেন যে গোলক সা যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে যায় একবার। কেসটা তিনি ডায়েরিতে টুকে ফেলেছেন কি না—"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন—"আচ্ছা ! কটা বেজেছে বল ত !"

কমলাক্ষ বলিলেন—"তা প্রায় এগারটা হবে।"

"এখুনি হাতী কসতে বল। কোলকাতা যাব আজ রাত্রে। ট্রেণ ত রাত দেড়টায় ?"

বিস্মিত কমলাক্ষ শুধু বলিল—"আজ্ঞে হাঁ—" বলিয়া বাহির হইয়া গেল। গোলক সার যমজ ভাই এর সন্ধানে কমলাক্ষ সেইদিন কলিকাতা রওনা হইলেন। তাহার ঠিকানা তিনি জানিতেন।

(২৯)

সেইদিনই রাত্রে অঘোরবাবুও খবর পাইলেন যে চন্দ্রকান্তবাবুর ম্যানেজার দুই দুইবার থানায় গিয়াছেন এবং দারোগাবাবুর সহিত গোপনে কি সব পরামর্শ করিয়াছেন। সেইদিন রাত্রেই কোন রহস্যময় উপায়ে কমলাক্ষের নালিশের মর্ম্মটিও অঘোরবাবুর কর্ণগোচর হইল। নালিশের মর্ম্ম এই যে জমিদার উগ্রমোহন সিংহ তাঁহাদের আশ্রিত প্রজা গোলক চন্দ্র সাহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন এবং যম-জঙ্গলের যম-ঘরে আটকাইয়া রাখিয়াছেন। পুলিশ অবিলম্বে সাহায্য না করিলে গোলক সাহার মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নহে। পরদিন যম-জঙ্গল ঘেরাও করিয়া যম-ঘর খানাতল্লাসী করা হইবে—এ খবরও অঘোরবাবু পাইলেন। কিন্তু কমলাক্ষবাবু দ্বিতীয়বার থানায় গমন করিয়া যে খানাতল্লাসী বন্ধ করিয়া আসিয়াছেন এ খবরটুকু অঘোর-বাবু পাইলেন না। সুতরাং তিনি যথারীতি সাবধান হইলেন। তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন যে কালীপূজার পর দশদিন কাটিয়া গিয়াছে—সুতরাং পুলিশ যম-ঘরে গিয়া বিশেষ কিছু সুবিধা করিতে পারিবেন না। যম-জঙ্গল কাছারিতে ভিখন তেওয়ারি আছে। পুলিশ গিয়া তাহার উপর অত্যাচার করিতে পারে এবং পুলিশের চাপে ভিখন তেওয়ারি হয়ত ভিতরের কথা প্রকাশ করিয়াও দিতে পারে। ভিখন তেওয়ারি লোকটির উপর অঘোরবাবুর তাদৃশ আস্থা নাই। কিন্তু যেহেতু সে লোকটি কুস্তি করিতে পারে মালিকের সেজন্য তাহার উপর অসীম অনুগ্রহ।

পুলিশ যখন সেখানে যাইবে তখন ভিখন তেওয়ারির সেখানে থাকিবার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে ?

তাহাকে যম-জঙ্গল হইতে সরাইয়া দেওয়া ভাল বিবেচনা করিয়া অঘোরবাবু একটি সিপাহী পাঠাইয়া দিলেন যে ভিখন তেওয়ারি যম-জঙ্গল কাছারিতে তালা লাগাইয়া দিয়া অবিলম্বে যেন সদরে চলিয়া আসে। যম-জঙ্গলে কাহারও থাকিবার প্রয়োজন নাই। এই ব্যবস্থা করিয়া অঘোরবাবু ভাবিতে লাগিলেন যে এখন তাঁহার থানার দারোগার সহিত দেখা করা সমীচীন হইবে কি না। ভাবিতেছিলেন এমন সময় হাবেলির জমাদার আসিয়া সেলাম করিয়া নিবেদন করিল যে "রাণীজি তাঁহার সহিত কথা কহিতে চান !"

"রাণীজি ?"

"হাঁ, হুজুর !"

"বল গিয়ে—আসছি এখনি !"

অঘোরবাবু বিস্মিত হইয়া গেলেন! রাণীজি সহসা তাঁহার সহিত কি কথা বলিবেন এত রাত্রে।

পরদার অন্তরাল হইতে বহ্নিকুমারী প্রশ্ন করিলেন, "যম-জঙ্গলের যম-ঘর সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন ?"

অঘোরবাবুর পাথরের মত মুখ আরও শক্ত হইয়া গেল। তিনি অবিকম্পিত স্বরে মিথ্যা কথা বলিলেন—"না"!

"সেখানে গোলক সা বলে কাউকে কি আটকে রাখা হয়েছে ?"

"না—জানিনা।"

"চারিদিকে তাহলে যে রব উঠেছে—"

অঘোরবাবু বলিলেন—"মিথ্যে গুজব!"

নারীজাতির নিকট—তা হউন না তিনি রাণী বহ্নিকুমারী—এসব গুহ্য ব্যাপার প্রকাশ করার কোন অর্থ হয় না—অঘোর চক্রবর্ত্তী তাহা বুঝিতেন এবং বুঝিতেন বলিয়াই বোধ হয় অসঙ্কোচে মিথ্যা কথাগুলি বলিয়া গেলেন। বহ্নিকুমারী আবার প্রশ্ন করিলেন—"যম-জঙ্গলে কে আছে এখন ?"

"এখন কেউ নেই সেখানে। ভিখন তেওয়ারি ছিল—তাকেও ডেকে পাঠিয়েছি।"

"কেন ?"

"কাল সেখানে পুলিশ যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।"

বহ্নিকুমারী নীরব হইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন "আচ্ছা আপনি যেতে পারেন এখন। নানা রকম গুজব আমার কাণে এসেছিল বলে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।"

অঘোরবাবু বিদায় লইলেন।

বহ্নিকুমারী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তাহা হইলে তিনি যাহা শুনিয়াছেন সব সত্য! তাঁহাদের ম্যানেজারও পুলিশের আগমনবার্ত্তা শুনিয়াছেন এবং সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন! নির্দোষ হইলে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন হইত না। অঘোরবাবু মিথ্যা-কথা বলিয়াও বহ্নিকুমারীকে ঠকাইতে পারেন নাই। গোলক সা নিশ্চয়ই তাহা হইলে যম-ঘরে বন্দী আছে। এ বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ রহিল না। পুলিশের আগমনবার্ত্তা পাইয়া অঘোরবাবু হয়ত গোলক সাকে ছাড়িয়াও দিয়াছেন কিম্বা মালিকের হুকুম ব্যতীত হয়ত তিনি তাহাও পারিতেছেন না। বহ্নিকুমারী মনে মনে স্থির করিলেন—"আমি নিজে গিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিব। উগ্রমোহন সিংহের পত্নী আমি!" কাল সকালে পুলিশ গিয়া দেখিবে—কেহ নাই। কমলাক্ষ ম্যানেজারের সমস্ত কৌশল পণ্ড হইয়া যাইবে। কথাটা যখন আমার কাণে আসিয়াছে তখন স্বামীর অপমান আমি কিছুতে হইতে দিব না! তাহা ছাড়া স্বামীর ক্রোধে পড়িয়া একটি নিরীহ লোক অনর্থক কষ্ট পাইতেছে—তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়াই ত উচিত। গোলক সাকে যদি যম-ঘরে পুলিশেরা পায়—তাহা হইলে উগ্রমোহনের শুধু যে পরাজয় তাহা নয়—ঘোরতর অসম্মান! শত্রু মিত্র সকলে হাসিবে। তাহা সহ্য করা বহ্নিকুমারীর পক্ষে অসম্ভব। নাঃ—নিজ হস্তে বহ্নিকুমারী ইহার প্রতিকার আজই করিবেন। বহ্নিকুমারী ডাকিলেন—"কুসুম—"

কুসুম আসিলে তিনি বলিলেন—"বিহঙ্গিনীকে ডেকে দে ত!" বিহঙ্গিনী বহ্নিকুমারীর সহচরী-প্রধানা। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য বহ্নিকুমারী তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। বিহঙ্গিনী আসিয়া উপস্থিত হইল। পাত্‌লা ছিপ্‌ছিপে গড়নের শ্যামবর্ণা একটি যুবতী। চক্ষু দুটি বেশ বড় বড়—হাসিতে ও বুদ্ধিতে সমুদ্ভাসিত। বহ্নিকুমারী বলিলেন—"বিহঙ্গ একটা কাজ করতে হবে তোমাকে!"

"কি, বলুন।"

"আজ রাত্রে সবাই যখন ঘুমুবে তখন পাল্‌কি করে তুমি ও আমি একবার বেরুতে চাই। যম-জঙ্গলে যাব। লুকিয়ে যাব এবং লুকিয়ে ফিরে আসব। বাগানের দিকের খিড়কি দরজাটা খুলে রেখো। পাল্‌কি-বেয়ারা খিড়কি দরজার সামনে যে জামগাছটা আছে—তারই তলায় যেন আমার অপেক্ষা করে। বাগানের ভেতর দিয়ে গাছের ছায়ায় ছায়ায় বেরিয়ে যেতে চাই। কথাটা গোপনীয়। বেয়ারাদের সে কথা বলে দিও।" বলিয়া বাক্স খুলিয়া কিছু অর্থ তিনি বিহঙ্গিনীকে দিলেন। বলিলেন—"তোমার অনেক দিন থেকে পার্সি সাড়ির সখ। ওতেই হবে বোধ হয়। আর এই কটা টাকা বেয়ারাদের দিও!"

বিহঙ্গিনী একটু হাসিয়া চলিয়া গেল। রাণীজির এই অদ্ভুত খেয়ালে মনে মনে একটু যে বিস্মিত হইল না তাহা

নয়। রাণীজির নানারূপ বিচিত্র খেয়ালের সহিত অবশ্য তাহার পরিচয় আছে। কিন্তু অদ্যকার এই নৈশ-অভিযানটা একটু বেশী রকম খাপছাড়া বলিয়া তাহার ঠেকিল। বিস্ময়কে সে অবশ্য মাত্রা ছাড়াইতে দিল না, কারণ হাতে অনেকগুলা টাকা পাওয়া গিয়াছে এবং রাণীজির খেয়ালটা চরিতার্থ করিতে পারিলে আর একখানা বেনারসী সাড়ি বখশিস্ পাওয়াও অসম্ভব নয়। সুতরাং মনের বিস্ময় মনেই চাপিয়া বহ্নিকুমারীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে সে তৎপর হইয়া উঠিল।

বহ্নিকুমারীর শয়নকক্ষে উগ্রমোহনের একটি তৈলচিত্র টাঙান ছিল। নির্নিমেষনেত্রে বহ্নিকুমারী তাহার দিকে চাহিয়াছিলেন। গর্ব্বিত উগ্রমোহন কোষ-নিবদ্ধ তরবারিতে হস্তার্পণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন! অদম্য পুরুষ সিংহ! বহ্নিকুমারী ধীরে ধীরে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া গেলেন!

পূর্ব্ব নির্দ্দেশ অনুসারে বাগানের খিড়কিদ্বারে পাল্‌কি-বেয়ারা ও বিহঙ্গিনী অপেক্ষা করিতেছিল। বহ্নিকুমারী সন্তর্পণে গিয়া পাল্‌কিতে উঠিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ একখানি কালো শালে আপাদ-মস্তক ঢাকা।

পাল্‌কি নিঃশব্দে যম-জঙ্গল অভিমুখে যাত্রা করিল। শুক্লা একাদশীর জ্যোৎস্নায় চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত।

যম-জঙ্গল কাছারীতে যখন বহ্নিকুমারীর পাল্‌কি পৌছিল তখন সেখানে কেহ নাই। শুক্লা একাদশীর চন্দ্র পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে। দুইটি "চোখ গেল" পাখী পাল্লা দিয়া সুর চড়াইয়া ডাকিতেছে। বহ্নিকুমারী পাল্‌কি হইতে অবতরণ করিলেন। বিহঙ্গিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"তোমরা এখানে থাকো আমি এখনি ফিরে আসছি। ঘটিটা আমাকে দাও।"

"একা যেতে ভয় করবে না আপনার? আমি না হয় আপনার সঙ্গে যাই।"

"কিছু দরকার হবে না। আমার মানত হচ্ছে যে একা রাত্রে বাহিনীর জল নিয়ে সিংহবাহিনীর পূজো দেব।"

পাল্‌কিতে আসিতে আসিতে বহ্নিকুমারী বিহঙ্গিনীকে একটি গল্প বানাইয়া বলিয়াছিলেন। গল্পটি এই যে তিনি সন্তান-কামনায় সিংহবাহিনীর একদিন পূজা দিয়াছিলেন। তাহার পর স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে সিংহবাহিনী যেন তাঁহাকে বলিতেছেন—"একা রাত্রে বাহিনী নদীর জল যম-জঙ্গল থেকে এনে যদি আমার পূজো করতে পারিস্ তাহলে তোর কামনা সিদ্ধ হবে।"

সুতরাং বিহঙ্গিনী আর কিছু বলিল না। বহ্নিকুমারী একাকিনী বন-পথে চলিয়া গেলেন।

কিছুদূর গিয়া সত্যই কিন্তু তাঁহার ভয় করিতে লাগিল। যদিও বনের মধ্যে পথ আছে এবং জ্যোৎস্নায় পথ দেখিতে কোন অসুবিধা নাই, কিন্তু বনের বিরাট গাম্ভীর্য্য বহ্নিকুমারীর মনে ভীতির সঞ্চার করিতে লাগিল।

পাশের একটা ঝোপের মধ্যে সর সর করিয়া কি যেন সরিয়া গেল। বহ্নিকুমারীর গাটা ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল।

কিছুদূর গিয়া তিনি দেখিলেন অল্প দূরে একটা ফাঁকা জায়গায় কতকগুলি শৃগাল কোলাহল করিতেছে। তিনি সেদিকে না গিয়া অন্যদিকে অগ্রসর হইলেন। যম-ঘরটা যে ঠিক কোথায় অবস্থিত তাহার সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাও খুব স্পষ্ট নয়। কতদিন আগে দিবালোকে একবার যম-ঘরটা তিনি দেখিয়াছিলেন। দেখিলে তিনি চিনিতে পারিবেন, কিন্তু এই বিস্তীর্ণ বনভূমির মধ্যে কোথায় যে ঘরটা আছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত! কিন্তু বাহির তিনি করিবেনই—তাঁহাকে করিতেই হইবে। যম-ঘরের চাবিটা তিনি শক্ত করিয়া হাতের মুঠার মধ্যে ধরিয়া আরও খানিকটা দূর অগ্রসর হইলেন। হঠাৎ আবার তাঁহাকে থামিয়া যাইতে হইল। কাহার যেন ক্রন্দন ভাসিয়া আসিতেছে! শিশুর ক্রন্দন! বহ্নিকুমারীর বুকের ভিতরটা সহসা কাঁপিয়া উঠিল। একটু স্থির হইয়া তিনি লক্ষ্য করিলেন যে শব্দটা সম্মুখবর্ত্তী বৃহৎ দেবদারু বৃক্ষ হইতে আসিতেছে। তখন তাঁহার মনে পড়িল কোথায় যেন পড়িয়াছিলেন শকুনি-শাবকরা ওইরূপ শব্দ করে বটে।

আবার তিনি কিছুদূর অগ্রসর হইলেন। সামনের একটা ঝোপ পার হইয়া তিনি দেখিলেন যে তিনি বাহিনী নদীর তীরে আসিয়া পড়িয়াছেন। বাহিনীর দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। বাহিনী নদী আঁকিয়া

বাঁকিয়া বিসর্পিত-গতিতে যম-জঙ্গলের ভিতর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। তাহার একটা বাঁকের মুখে একটা গাছ হেলিয়া নদীর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তাহাতে অসংখ্য খদ্যোত জ্বলিতেছে। যেন নক্ষত্রখচিত একটুকরা অমাবস্থার আকাশ কেহ জ্যোৎস্নার মধ্যে টাঙাইয়া দিয়াছে। বহ্নিকুমারী তাহার দিকে চাহিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"টি ট্টি হি—টি ট্টি হি—টি ট্টি হি—"

একটি টিট্টিভ পক্ষী ডাকিয়া উঠিল। বহ্নিকুমারী চমকাইয়া উঠিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল যম-ঘর ত বাহিনীর তীরে নয়—যমঘর জঙ্গলের মধ্যে। বুঝিলেন তিনি পথভুল করিয়াছেন। বাহিনীর তীর ত্যাগ করিয়া তিনি আবার বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যম-ঘরে তাঁহাকে যাইতেই হইবে। গোলক সা যদি সেখানে থাকে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। গঙ্গা-গোবিন্দকে কিছুতে বুঝিতে দেওয়া হইবে না যে উগ্রমোহন সিংহ একটা নরঘাতক দস্যু।

বনের মধ্যে একাকিনী বহ্নিকুমারী চলিয়াছেন। চরণ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। ভয়ও তাঁহার আর করিতেছে না। যমঘরের চাবিটা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া নির্ভীকচিত্তে তিনি চলিয়াছেন।

মণিকর্ণিকার ঘাট।

চিতা জ্বলিতেছে। গঙ্গা গোবিন্দ স্তব্ধ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছেন। চিতার লেলিহান শিখা কাহার নশ্বর দেহটাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছে। কুণ্ডলীকৃত ধূমজালে আকাশ সমাচ্ছন্ন।

গঙ্গা-গোবিন্দ ভাবিতেছেন "একি সত্য? বাণী আর বাঁচিয়া নাই? চন্দ্রকান্তের পত্রখানা আর একবার বাহির করিয়া তিনি দেখিলেন। সত্যই ত! স্বপ্ন নয়। যম-ঘরের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। যমঘরের মধ্যে দুইটি ভীষণ ময়াল সাপ ছিল। বাণী ও গোলকসাকে তাহারা গ্রাস করিয়াছে। তেজস্বিনী রাণী বহ্নিকুমারী অজগরের করাল আলিঙ্গনে নিষ্পিষ্ট হইয়া মরিয়াছে। ইহা স্বপ্ন নহে—নিদারুণ সত্য—বজ্রপাতের মত সত্য। চন্দ্রকান্ত লিখিয়াছে—"অন্তরলোকে আমি চিরকালই সঙ্গীহীন। ভাবিয়াছিলাম উগ্রমোহনকে কেন্দ্র করিয়া আমার বাহিরের জীবনটা অন্ততঃ আনন্দে কাটিয়া যাইবে। কিন্তু উগ্রমোহনও আর সে উগ্রমোহন নাই—তাহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তীরবেগে আসিতে আসিতে আকস্মিক ঝঞ্ঝাবাতে একটা বিরাট বজরা যেন ভগ্নহাল ছিন্নপাল হইয়া বিশাল একটা বালুচরে আটকাইয়া গিয়াছে।

গঙ্গা-গোবিন্দ উগ্রমোহনকে কোনদিনই মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। আজ যেন তাঁহার মনে হইতেছে বহ্নি-বিরহিত দুঃখী উগ্রমোহন তাঁহার মনের নিভৃততম প্রদেশ অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। সমুদ্রের মধ্যে ভরা-ডুবি হইয়া তাঁহারা দুইজনে যেন একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

বহ্নিকুমারী মরিয়াছে? বহ্নি কি কখনও নেভে?

গঙ্গা-গোবিন্দ একদৃষ্টে জ্বলন্ত চিতাটার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দাবা খেলা বন্ধ হয় নাই।

চন্দ্রকান্ত ছাড়িবার পাত্র নহেন। একটা বড়ে আগাইয়া দিয়া তিনি বলিলেন—"মন্ত্রী সামলাও—"

অন্যমনস্ক উগ্রমোহন একটা ঘোড়া আগাইয়া দিতেই চন্দ্রকান্ত হাসিয়া বলিলেন—"ওতেও তোমার গজ মারা যায়!"

উগ্রমোহন আবার দাবার ছকে মন দিলেন। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একটা নৌকা সরাইতেই চন্দ্রকান্ত আবার বলিলেন —"আহা, ওকি করছ তুমি। নৌকো সরালেই যে কিস্তি!"

উগ্রমোহনের খেলায় মন নাই। চন্দ্রকান্তও কিন্তু ছাড়িবেন না। তিনি আবার বলিলেন—"মন্ত্রী সামলাও আগে।"

উগ্রমোহন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

শেষ

ইউরোপের চিঠি

অধ্যাপক শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার এম-এ, পি এচ-ডি

রোমে যেদিন পৌঁছিলাম, সেদিনই সন্ধ্যায় অধ্যাপক Gentileএর সহিত দেখা হবে ঠিক হল। অধ্যাপক রায় প্রথম দিন আমার যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য তিন চার বার আমাকে দেখতে এলেন।

অধ্যাপক রায়ের সাহায্যে ও সহৃদয়তায় রোমে আমার কোন কষ্ট হয় নি। ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে এম-এ পাশ করে দিনকয়েক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতালীয় ভাষার অধ্যাপনা করে রোমে এসেছেন—এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে Danteএর উপর নিবন্ধ লিখে ডক্টরেট পাবার জন্য। লোকটী শান্ত, সরল, বিনয়ী; অল্প অল্প হাসি মুখে লেগেই থাকৃত। পাইপ ছাড়া বড় থাকৃতেন না; কখনও বা পাইপটী বিরাজ করত মুখে, কখনও বা হাতে। রায় মহাশয়কে পেয়ে আমার অনেক সুবিধা হয়েছিল—আমাকে ওদেশের আদবকায়দায় শিক্ষা দিতেন এবং যখনই আবশ্যক হত তিনি হতেন ইনটারপ্রেটার (interpretor). আমাকে পেয়ে রায় মহাশয় একটু দেশের কথা বলে দেশের বিষয় আলোচনা করে অনেক সময় হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেন—কারণ তিনি ছিলেন সমস্ত রোম সহরে প্রায় নিসঙ্গ। আর দুটী বাঙ্গালী ছাত্র যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সহিত তাঁর বড় একটা পরিচয় হয় নি। তাঁর বন্ধু ছিলেন অধ্যাপক Tucci ও Scorpa (যিনি এক সময়ে ভারতে Consul ছিলেন)। রায় মহাশয় আমাকে খুটিনাটি ব্যাপারেও উপদেশ দিতেন। কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করতে হবে, কে কি ধরণের লোক—সব তিনি আমাকে বলিয়া দিতেন। লোকটীর ভেতর একটা স্বদেশপ্রীতি ছিল এবং অনেক দিন ইউরোপে থাকৃলেও ভারতের উপর মমতাশূন্য হন নি। বরং পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে ভারতের সভ্যতার বিশেষত্ব ও মর্য্যাদা যাহাতে বিশেষভাবে প্রচলিত হয় তাহার জন্য তিনি ছিলেন চেষ্টিত। ভারতের সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থা ও ধর্ম্মানুভূতির সম্বন্ধে ইউরোপ এত অজ্ঞ, তাহাতে রায় মহাশয় মনে কত্তেন যে ইউরোপে গিয়ে ভারতীয়দের প্রায়শই নানা বিষয় বক্তৃতা দেবার প্রয়োজন আছে। তিনি বলেন, ইউরোপে একটা ভারতীয় সংঘ গঠিত হওয়া উচিত—সে সংঘ হবে বিশেষতঃ ভারতীয় শিক্ষা-দীক্ষা প্রচারের জন্য। রামকৃষ্ণ মিশন আমেরিকায় অনেক কাজ করলেও ইউরোপে এখনও বিশেষ কিছুই করেন নাই—তাঁদের দৃষ্টি ইউরোপের দিকে আকৃষ্ট হলে ভাল হয়। কারণ ইউরোপ এখনও সভ্যতার শিখরে স্থাপিত।

মানুষের দেশ মানুষের কত প্রিয়, তাহা রায় মহাশয়ের আচরণে প্রকাশ পেত। দেশের স্মৃতিকণাটুকু স্পর্শে বিদেশে যেন নবীন জীবন পাওয়া যায়। রায় মহাশয় এসে খোঁজ করলেন—দেশ থেকে ঘি নিয়ে এসেছি কিনা। বিশেষতঃ কোন খাওয়ার জিনিষ আছে কিনা। আমি যখন বিদেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হই, তখন তাহারা আমাকে দিয়েছিল—আমসত্ত্ব ও মুড়ি—এ দুটি জিনিষই আমার খুব প্রিয় বলে। দেশে ইহার কোন মূল্য নেই—কিন্তু বিদেশে ইহা হইল অমূল্য। রায় মহাশয় এই দুটী জিনিসকে পেয়ে কি না আনন্দ করে ইহাদের সৎব্যবহার করলেন এবং তাঁহার হাসি ও আনন্দ দেখে মনে হল তিনি অমৃত খেয়েছেন। মানুষের দেশ-মাতৃকার প্রভাব মানুষের হৃদয়ে কত বড়, দেশের প্রত্যেক জিনিষটীর ভিতর আছে যে কত বড় শক্তি, তাহা বিদেশে বোঝবার খুব সুযোগ আসে।

কোন পদার্থেরই কোন স্থির মূল্য নাই—জিনিষটা কিছু নয়, কিন্তু তাহার সহিত হয় যখন হৃদয়ের সম্বন্ধ, তখনি তাহা হয় অমূল্য। মানুষ সব জিনিষের ভিতর খোঁজে আপনাকে—এই তাহার চিরাভ্যস্ত স্বভাব। আপনার সহিত সম্বন্ধ করেই সে বস্তুর মর্য্যাদা অনুভব করে। এই সম্বন্ধটী দেয় বস্তুকে এক অপরূপ রূপ। নিজের বাগানে যে ফুলটী ফোটে, সেটী রাস্তায় লোকের হাতের ফুলটীর চেয়ে দেয় বেশী আনন্দ। কারণ, প্রথমটীর ভেতর আনে আমির স্পর্শ, দ্বিতীয়টীর ভিতর সেটা নেই। মানুষের জীবন এই আমির কেন্দ্রেই প্রতিষ্ঠিত, সেই জন্য আমার দেশ তাহার স্মৃতির ভিতর দিয়ে সৃষ্টি করে কত আনন্দের স্বপ্ন, জাগাইয়া তোলে তাহার কত উচ্ছ্বসিত প্রবাহ। জীবনের উচ্চতর

শক্তি যাহাই হউক না কেন, জীবনকে কিন্তু আমরা উপভোগ করি এই বেদনা দিয়ে, এই মমত্ব বুদ্ধি দিয়ে। এই মমত্ব-বুদ্ধি আছে বলেই বোধ হয় সৃষ্টি শৃঙ্খলা নিয়ে চলছে—নতুবা বোধ হয় সমস্ত সৃষ্টিটা একটা এলোমেলো ব্যাপার হয়ে যেত। এই মমত্ব বুদ্ধি সুখও দেয়, দুঃখও দেয়—কিন্তু যতই আমরা চেষ্টা করি না কেন এদের এড়াইতে, এই সুখ দুঃখ করেছে জীবনকে এত সমৃদ্ধ।

যাহা হউক, আমাদের ঠিক হ'ল বিকালবেলা যতটা সম্ভব সহরটীতে বেড়াইয়া আসা যাবে। অধ্যাপক রায় * বেলা ৪টার সময় এলেন; আমরা সহর দেখ্‌তে বেরিয়ে পড়লেম।

আমি যখন রোমে আসি, তখন একদিন বাংলার Accountant General Mr. Nixonএর সহিত আলাপ হয় কোন কারণে। তিনি ছিলেন দর্শনশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন এবং অধ্যাত্মবিদ্যায় আকৃষ্ট। তিনি যখন শুন্‌লেন, আমি শীঘ্রই রোমে যাচ্ছি তখন আমাকে বল্‌লেন "অধ্যাপক, তুমি সমস্ত বিশ্বে আমার প্রিয়তম স্থানে যাচ্ছ—আমি পৃথিবীর বহুস্থান দেখেছি—রোম ও নেপ্‌লসের মত স্থান দেখি নাই—রোম আমার অত্যন্ত প্রিয়"—বস্তুতঃ আমার মনে হয়, তিনি অতি সত্য কথা বলেছেন। রোম সহরটী London বা Parisএর মত বড় না হলেও দেখতে অতি সুন্দর। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তাগুলির উপর বাড়ীগুলি দেখ্‌তে অতি মনোরম, যেন এক একটা ছবি। রোম সহরটী ছোট ছোট পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ভাস্করের কীর্ত্তির নিদর্শন সর্ব্বত্র দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

রোমে প্রাচীনকালের স্মৃতি এখনও অনেক আছে। মুসোলিনী প্রাচীন স্মৃতিকে সর্ব্বত্র রক্ষা করিতেছেন। তিনি রোমের অনেক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া নূতন সহরও সৃষ্টি করছেন। মধ্যে মধ্যে সহরে ভগ্ন প্রাচীর ও স্তূপ দেখতে পাওয়া যায়। রোমে দেখবার মত শিল্প—তাহার মধ্যে আমাকে আকৃষ্ট করেছিল St. Peter's, St. Paul's, St. Sebastian চার্চ্চগুলি। Vatican বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে একটা বিশেষ করে দেখবার মত স্থান। রোমে ভ্রমণকালে সব দেশের মনস্বীরা ধার্ম্মিকেরা আশ্রয় নিতেন—কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে রোম ও রোম্যানজাতির একটা বড় স্থান আছে। ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র ছিল রোম। প্রত্যেক বড় সভ্যতার একটা মূর্ত্তি আছে; তাহা আমাদের মানস প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। রোমে পৌঁছিয়াই আমি তাহার প্রাণের স্পন্দন অনুভব করবার চেষ্টা করেছিলাম। রোমের সভ্যতায় একটা বাস্তবীয় মূর্ত্তি আছে এবং এই বাস্তবতার ভেতর দিয়ে একটা আদর্শও পরিস্ফুট হয়। সমস্ত সহরটী ও তাহার সব কর্ম্মকেন্দ্র দেখে এই সত্যটা যেন অবধারিতরূপে আমার চিত্তকে আশ্রয় করিল।

রোম প্রাচীন সভ্যতার সহিত খৃষ্ট-সভ্যতার মিলন-কেন্দ্র; কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন করলেও জাতির প্রাণ ও শক্তি এই বাস্তবতাকে নিয়ে নানাবিধ রূপ নিচ্ছে। বিশেষতঃ মুসোলিনী এই বাস্তবতাকে দিচ্ছেন মূর্ত্তি নানাবিধ রূপে। এ জাতি শক্তির উপাসক—এই জন্যই এদের সভ্যতার বিকাশ পেয়েছে শক্তির নানাবিধ বিকাশে। নবীন রোমে আজ সর্ব্বত্র নিজেদের গঠন করবার জন্য দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে চেষ্টা, তাহা এমন কিছু নূতন নহে। এটা সুধু প্রাচীনেরই একটা বিশেষ বিকাশ ও উদ্বোধন। মুসোলিনী রোম্যানজাতির মনস্তত্ত্ব বেশ করেই জানেন বলে, তিনি দেশের কাছ থেকে পেয়েছেন একটা বড় অধিকার। নবীন রোম-সাম্রাজ্য সৃষ্টি করবার জন্য তিনি উদ্‌বুদ্ধ করেছেন সমস্ত দেশটাকে। রোম্যান সভ্যতার গৌরবে তিনি আকৃষ্ট হয়ে দেশের অন্তরকেও আকৃষ্ট করছেন।

Goethe গিয়ে রোমে যে বাড়ীতে বাস করতেন তাহাকে অতি যত্নে রক্ষা করা হয়েছে। ঐ বাড়ীটার নাম Goethe house। Keats ও Shellyর দেহাবশেষ রোমই বক্ষে ধারণ করে আছে। Victor Hugoর একটী সুন্দর মর্ম্মরমূর্ত্তি আজিও তাঁহার রোম্যান সভ্যতার প্রীতির নিদর্শনরূপে রোমে বিরাজ করছে। Romeএর বিশ্ব-বিদ্যালয় বাড়ীঘর এমন কিছু আকর্ষণের নয়। বিশ্ববিদ্যালয় বিস্তৃত ও নবীন ভাবে গঠন করবার জন্য মুসোলিনী প্রস্তুত হইতেছেন। কিন্তু Italian Academyটি দেখতে অত্যন্ত সুন্দর। এখানে রোম্যান জাতির স্বাভাবিক সুন্দরবোধ প্রকাশ পেয়েছে। দেওয়ালে নানাবিধ চিত্রাবলী যেমন

* ইনি এখন ইতালী হতে Doctor of Literature হয়ে দেশে গিয়েছেন এবং বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ করছেন।

সুন্দর, বাড়ীটি তেমনি সুন্দর। চতুর্দ্দিকে উদ্যানগুলিও সুন্দর। কিন্তু রোমে Vaticanএর মত সুন্দর আর কিছু নেই। Vaticanএর সংলগ্ন St Peter's, Vaticanএর Library, Vaticanএর চিত্রশালা, Vaticanএর সংগৃহীত ভাস্কর্য্য, Vaticanএর উদ্যান-বর্ত্তিকা ইত্যাদি দেখবার জন্য নানা দেশ হতে বিশিষ্ট বিশিষ্ট মনস্বীরা এসে থাকেন। এ সব কথা রায়ের মুখে শুনলেম; কিন্তু এদিন আর আমাদের Vaticanএ যাওয়া হইল না। রোম সহরটা একদিনে কেন, বহুদিনে সব দেখা হয় না। ক্রমশই সব লিখ্‌ব। আজ এসব কিছু বড় দেখা হল না। Academy ও University দেখ্‌লাম। আর সহরটীতে বেড়িয়ে এলেম।

বেড়িয়ে আমরা পথে অধ্যাপক জেনিটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম।

তথন ঠিক সন্ধ্যা হয়েছে। ঘরে ঢুকে যখন আমরা over-coat খুল্‌ছি, তখন অধ্যাপক Tucci সাহেব প্রবেশ করলেন তার এক বন্ধুর সহিত। Gentile, Tucci ও তাঁহার বন্ধু মিলে—অবশ্য মুসোলিনীর অভিপ্রায় অনুসারে—একটী নবীন সংঘ প্রস্তুত করেছেন। ইহার নাম Istituto Italiano; ইহার উদ্দেশ্য Middle ও Far Eastএর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা, প্রধানতঃ সংস্কৃতির ভেতর দিয়ে। ইহার জন্য এবার এশিয়ার, অ্যারেবিয়ার, বিশেষতঃ ভারতীয় ছাত্রদের খরচ দিয়া রোমে ও নানাস্থানে শিক্ষার সুন্দোবস্ত করে দেন। এতৎভিন্ন এই প্রতিষ্ঠানে ভারত ও এশিয়ার প্রধান প্রধান স্থান হতে অধ্যাপকদিগকে আমন্ত্রিত করে আনা হয়—প্রত্যেক দেশের সংস্কৃতির উপর বক্তৃতা করতে।

আমার সহিত সকলের সাক্ষাৎ হবার জন্য একই সময়ে এবার একত্রিত হয়েছিলেন। অধ্যাপক Gentile রোম-বিশ্ববিদ্যালয়ে Metaphysicsএর অধ্যাপক। ইনি এক সময়ে Minister of Education ছিলেন। তিনি রোমের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করেছেন। লোকটীর বয়স হবে ৬০ (ষাট) বৎসরের উপর। ইতালীর Encyclopaedia প্রস্তুত হইতেছে। Gentile তাহা edit করছেন। ইনি একজন প্রধান দার্শনিক সমস্ত পৃথিবীর ভিতরে। ইতালীতে আর একজন দার্শনিক আছেন। তাহার নাম Croce। দু'জনে খুব বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। এখানে এসে শুন্‌ছি—সেই বন্ধুত্ব শিথিল হয়েছে। Gentile মুসোলিনীর প্রিয়, Croce মুসোলিনীর সহিত বহুবিষয়ে এক মত নন। তাই বর্ত্তমান রাষ্ট্রে তাঁহার কোন স্থান নেই। তিনি ধনী লোক, পুস্তক লেখক, নেপল্‌সে নিজের বাড়ীতেই বাস করেন। Gentile অনেক পুস্তক লিখেছেন; সব পুস্তকের ইংরাজীতে অনুবাদ এখনও হয় নি। বিস্ময়ের বিষয় তিনি ইংরাজী জানেন না। নিজের ভাষাকে তিনি নানারূপে সমৃদ্ধ করেছেন। আমাদের দেশে যাঁরা ইংরাজী ভাষা ব্যবহার না হলে চলবে না মনে করেন, তাঁরা এদেশের বড় মনস্বীদের কথা জানেন না। তাঁরা বিদেশী ভাষা শেখেন না—অবশ্য Frenchটা প্রায় সকলেই জানেন। কারণ বোধহয় যাঁরা চিন্তাশীল তারা ভাষা শেখবার অবসরও পান কম এবং ও জিনিষটা একটা ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা। অধ্যাপক Tucci কিন্তু অনেক ভাষা জানেন—বিশেষতঃ সংস্কৃত আর তিব্বতী। তিনি ভাষাবিৎ। এত ভাষা জেনেও তিনি Gentileএর ন্যায় অতটা চিন্তাশীল হতে পারেন নি। Tucciকে দেখ্‌তে অতি সুন্দর। ইনি প্রখর বুদ্ধিমান, চোখ মুখের ভেতর দিয়ে যেন তাহার বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ পাইতেছে। ইহার সহিত আমার কলিকাতায় পরিচয় হয়েছিল।

আমরা Gentileএর সঙ্গে দেখা করলাম Instituteএর officeএ। আমাদের Gentileএর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। Gentile আমাদের হাসিমুখে গ্রহণ করে সামনের দু'খানি চেয়ারে বস্‌তে বললেন। তিনি আমাকে "স্বাগতম" জানাইলেন এবং আমায় পাঁচটী বক্তৃতা কর্‌তে হবে বল্‌লেন। তিনটী প্রাচীন ভারতের সাধনার ও সৃষ্টির দিক দিয়ে; আর দুটী ভারতের—বিশেষতঃ বাংলার—হিন্দুধর্ম্মের বর্ত্তমান আচার্য্যদের শিক্ষার উপর। অবশ্য Gentile আমাকে যে আহ্বান-পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে এই কথা ছিল। আমি বল্‌লাম, "আমি প্রস্তুত।" তিনি বললেন, "আপনি প্রস্তুত হলেও আমাদের প্রস্তুত হতে প্রায় পনর দিন সময় লাগবে। আমাদের নিমন্ত্রণ লিপি মুদ্রিত করতে হবে এবং মাঝখানে ছুটী আছে। একমাস পরেই Easterএর

ছুটী আরম্ভ হবে। এর পূর্ব্বে বক্তৃতাগুলি শেষ করতে হবে।"

এই বক্তৃতায় তাঁরা চাইলেন প্রাচীন ভারতের দর্শন ও ধর্ম্মের একটা সুচিন্তিত সৃষ্টি—বিশেষতঃ যে চিন্তারাশি ও যে প্রেরণা ভারতীয় জীবনের প্রকাশকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে, তারই একটা জীবন্ত মূর্ত্তি। বাধ্য হয়ে আমাকে দর্শনের সূক্ষ্ম বাদানুবাদ বাদ দিতে হবে এবং আমাকে প্রধানরূপে গ্রহণ করতে হবে উপনিষদ, গীতা ও তন্ত্রকে। এদের ভিতর দিয়ে ভারত এখনও উদ্‌জীবিত। উপনিষদের গভীর প্রজ্ঞা, গীতার অম্লান শ্রদ্ধা ও বুদ্ধি এবং তন্ত্রের শক্তিপ্রতিষ্ঠা ভারতীয় সভ্যতাকে করেছে এত মহিমান্বিত। কিন্তু এই সব জীবন্ত শ্রুতির রূপ ও শিক্ষা কিরূপে ভারতের জীবনে এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে, তাহা দেখাইবার জন্য গ্রহণ করলেম—ভারতের যোগমগ্ন ও জ্ঞান-প্রতিষ্ঠ জীবনের তিনটী জীবন্ত দীপ-শিখা - রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ।

Gentileকে এ বিষয় জ্ঞাপন করলে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করলেন। বিশেষতঃ তিনি বল্‌লেন "বর্ত্তমান ভারতের অধ্যাত্ম-দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের বাণী শুন্‌তে আমরা সকলেই উদ্‌গ্রীব।" Gentileএর সহিত আরও কথাবার্ত্তা হল—বর্ত্তমান ইতালীকে নিয়ে। প্রায় একঘণ্টা কথাবার্ত্তা বলবার পর আমরা বিদায় নিলেম, কারণ তখন dinner time প্রায় হয়েছিল। অধ্যাপক Tucciও ওঠ্‌লেন এবং তারপর দিন আমাকে ও অধ্যাপক রায়কে তাঁর বাড়ীতে সান্ধ্যভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন।

Gentileএর সহিত আলাপ করে বুঝলাম, তাঁর ভেতর একটা শান্তভাব আছে। অথচ তিনি খুব সজাগ—জীবনের সব ব্যাপারের প্রতি। খুব গম্ভীর লোক, অল্পভাষী। এ বিষয়ে Tucci Gentileএর ঠিক বিপরীত। খুব খোলা প্রাণ, খোলা স্বভাব। একটা কথা বল্‌তে না বল্‌তে দশটা কথা বলেন। বেশ সরল এবং সোজাসুজি ভাবে কথা বলেন। বর্ত্তমান ইতালীতে ইহারা দুই জনই বড় লোক। Tucciর ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল—তিনি সকলের প্রিয়। কিন্তু রোমে Mussoliniর প্রিয় না হলে বড় একটা কিছু হয় না। শুনেছি Tucci তাঁহারও প্রিয়।

আজ এই পর্য্যন্ত।

১১ই মার্চ্চ। রোম।

প্রকৃত অন্ধ

শ্রীগৌরদাস কাব্যব্যাকরণভক্তিতীর্থ

অন্ধ দুঃখ ক'রে বলে—এ জগতে ভাই,
আমা হ'তে দুঃখী আর প্রাণী কেহ নাই।
কবি বলে, "তোমা হ'তে আছে দীন-হীন,
চক্ষু আছে, সব আছে—জ্ঞানে মাত্র হীন।"

বিপর্য্যয়

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

কুহু কুহু গাইত যদি নিখিল পাখী,
গাইত যদি শীতে গ্রীষ্মে বারো মাসে।
উত্তমাধম প্রভেদ তবে হইত ফাঁকি,
দুঃখ কষ্ট শোক যাইত বনবাসে।



অন্ত্যেষ্টি

শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

দশ

পরদিন হইতে সুরু হইল মঞ্জুলীর চিকিৎসা। বড় ডাক্তার দেখান হইল। দিন পনেরর মধ্যেই তাহারা পুরী রওয়ানা হইবে। কলিকাতায় শেষ চেষ্টা দেখিয়া যাওয়া চাই। যত টাকা লাগে, তপেশ মঞ্জুলীকে বাঁচাইয়া রাখিবে।

আর যদি সে না বাঁচে, শেষের ক'টা দিন তপেশ তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া মঞ্জুলীকে প্রেমে সেবায় আনন্দে ঢাকিয়া দিবে। ঔষধ-পথ্য, বিধিনিষেধ—চিকিৎসকগণের সর্ব্ব-প্রকার নির্দ্দেশের কোনটাই বাদ পড়িতেছে না।

আবার একটা এস্রাজ ও হারমোনিয়ম ঘরে আসিয়াছে। গ্রামোফন কেনা হইল। রেডিও বসান হইল। মঞ্জুলীকে ভুলিতে হইবে, সে মরিতে চলিয়াছে। যক্ষ্মা তাহার না সারুক, বাঁচিবার আশা যেন সে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত না হারায়।

ঠাকুর আছে, চাকর আছে। প্রয়োজন হইলে আর একটা ঝি আসিবে। কিছুকাল মঞ্জুলীই তপেশের সমস্ত চিন্তা জুড়িয়া থাকুক। দুনিয়ায় কে মরে, কে বাঁচে, কে বাঁচিয়াও মরিয়া থাকে—আপাততঃ সে-সব খবরে তপেশের প্রয়োজন নাই। পরের কথা লইয়া মাথা ঘামান দু'দিন বন্ধ থাক্। তপেশ তেতলার এই ছোট ফ্ল্যাটটির চারিধারে একখানি যবনিকা টানিয়া বাহিরের জীবন হইতে কিছুকাল বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে চায়।

রোজ সকালে তপেশ মঞ্জুলীকে গানের পর গান শোনায়। এক এক দিন দুপুর বেলাই সারা পাড়াটাকে বিরক্ত করিয়া গ্রামোফনে চলে রেকর্ডের পর রেকর্ড। কখনো শোনে রেডিওতে 'বিষ্ণুশর্ম্মার' বক্তৃতা।

সন্ধ্যাবেলা ময়দান। কোন কোন দিন গঙ্গার ধার। এক এক দিন লেক্, কি সিনেমা বা ইডেন গার্ডেন। রাত্রি বেলা শুইবার আগে তপেশ বাজায় এস্রাজের সুরে সুরে মঞ্জুলীর ডাগর চোখের ঘুমের আবাহন। ভোর বেলা চোখ মেলিয়া মঞ্জুলী শোনে, স্বামী তাহার আগেভাগেই জাগিয়া বসিয়া তারে তারে আলাপ তুলিয়াছে—ভৈরবী কি আশোয়ারী, না হয় জৌনপুরী।

অতীতকে আবার তাহারা দুজন বর্ত্তমানে ফিরাইয়া আনিতে চায়। মঞ্জুলীও সাড়া দিতে চায় সেদিনের ছন্দে সুরে। কিন্তু নিদাঘের শোষণশুষ্ক লতায়-পাতায় আজ ফাল্গুনের সেই সবুজ-বিলাস জাগি-জাগি করিয়াও জাগিতে চায় না!

কোন কোন দিন স্বামীর প্রভাতী পালার মাঝখানে এস্রাজটা টানিয়া নিয়া মঞ্জুলী সুর-সাধনা বন্ধ করে। হাতে ফাউণ্টেন পেন গুঁজিয়া দিয়া বলে, "এবার লেখা নিয়ে বস দিকিনি—এ বইটা হবে তোমার মাষ্টার পিস্। আমি যে টেবিল ক্লথখানা ধরেছি না?—ওর সঙ্গে তোমায় পাল্লা দিয়ে লিখতে হবে। তোমার এ বইয়ের শেষ অধ্যায় লিখবে আমার এই টেবিল ক্লথের উপর। সাত আট দিন—দেখি কার আগে শেষ হয়।"

তপেশ লিখিতে বসে। খানিকক্ষণ হাত কাঁপে, খানিকটা আনমনা হয়। পরে অজানিতেই কখন তরতর করিয়া লিখিয়া চলিয়াছে। এই উপন্যাসের নাম দিবে সে 'দেখা-অদেখা'—তাহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। এত অনায়াস-তন্ময়তা তার জীবনে কখনো ঘটে নাই। আন্দাজ শ'দুই পৃষ্ঠার এই বইখানিতে থাকিবে দুঃখ-কষ্ট, সংশয়, নৈরাশ্য—তবু এ জীবন কুশ্রী নয়—এ-সকলকে অতিক্রম করিয়া সুখের বেদনা, আনন্দের মধুক্রন্দন। অধ্যায়ে অধ্যায়ে থাকিবে বেনামী তপেশ ও পরস্ত্রী মঞ্জুলী। মঞ্জুলী যদি মরেও, বাঁচিয়া থাকিবে সে তপেশের সৃষ্টিতে চিরকালের জন্য।

দুপুর রাতে একদিন মঞ্জুলীর ঘুম ভাঙ্গে। চাহিয়া দেখে, ও-চৌকিতে বিছানার উপর স্বামী অন্ধকারে বসিয়া আছে। জানালার বাহিরে নিষ্প্রভ আকাশের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টি। ভীষণভাবে কি একটা ভাবিতেছে। মিনিটের পর মিনিট যায়, তপেশ ঠায় তেমনি বসিয়া আছে।

মঞ্জুলী বেড্ সুইচটা টিপিয়া দিয়া উঠিয়া বসে। তপেশ

আঁতকাইয়া উঠে। ও বিছানায় যাইয়া মঞ্জুলী সুধায়, "এত রাত্রে জেগে বসে বসে কি ভাবছ ?"

"তুমিও বা এত রাত্রে জেগে শুয়ে-শুয়ে কি করছ ?"

"ভাবছি—তোমার কিসের এত ভাবনা ?"

তপেশ চুপ করিয়া থাকে। মঞ্জুলী তাহার একখানি হাত তুলিয়া নেয়, "তোমায় অমন করে ভাবতে দেখলে আমার কেমন ভয় করে। ছাইভস্ম মাথামুণ্ডু কি সব ভাবো তুমি ?"

"কি ভাবি—শুনবে ? অতি সাধারণ, বড় সহজ—অথচ কি অসীম রহস্য। চিরকালের পুরাতন কথা। এই যে আকাশ, এর শেষ আছে ভাবতে পারছি না, আর অশেষ কথাটা ভাবতেও মাথা ঘোরে—মনে হয় পাগল হব।"

"তোমার পাগল হ'তে বাকী আছে নাকি ?" মঞ্জুলী হাসিয়া ওঠে।

তপেশ তাহাকে কাছে টানিতে চায়। মঞ্জুলী সাড়া দিয়াও ধরা দেয় না। কাষ্ঠ হাসি হাসে।

"আর ভাবি, মঞ্জু, ঐ যে ঘড়িটায় এখন তিনটে বাজে—এই তিনটে বাজার মুহূর্ত্তই তো মহাকাল। এই ক্ষণিকের মহাকালকে ধরে রাখতে চাই—আদি-অন্তহীনের মনের কথা বুঝতে চাই—এই সদ্য মুহূর্ত্তের দুর্ব্বল অনুভূতি দিয়ে। কেন পারি নে মঞ্জু ?"

"তুমি একেবারে পাগল—"

"এই মুহূর্ত্তেই না—অন্ততঃ এই হাতের কাছে মহানগরী ক'লকাতার নিশ্চিন্ত বুকে ঘুমিয়ে আছে প্রাসাদ, ঘুমিয়ে আছে বস্তি, নীরব এখন ফুটপাতে ফুটপাতে গৃহহীনদের আস্তানা। কত সুখ, কত শান্তি। ভোর হ'তেই আবার কোলাহল—আবার হলাহল। একেবারে বিষ হ'লে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতুম মঞ্জু! কিন্তু এর মধ্যে মধুও যে বড় কম নয়, সে-ই তো বিপদ! এ বিষের প্রয়োজন কি অনিবার্য্য ?—এ হলাহল বুঝি অমরত্ব নিয়ে এসেছে ?—বসে বসে তো সে রহস্যও ভাবছি!"

"তোমার ও ধোঁয়াটে কথার মানে বুঝি নে"

"—অতি সাদা কথা মঞ্জু। ওরা বলে, প্রদীপের আলো পেতে হ'লে নাকি তার নিচের অন্ধকারকে অস্বীকার করলে চলে না। তাই তো ভাবছি, এই আকাশ—আর এই মহাকালের মত ঐ উপমার সত্যটাও চিরনিত্য কিনা।"

"ঢের লেকচার হয়েছে। এবার ঘুমাও।"

তপেশ সহসা প্রশ্ন করে, "সুমতিরা সেদিন আমাদের এখানে এসে গেল, ওদের বাসায় কবে যাবে ?"

"চল না কালই যাই।"

"বেশ তো।—আচ্ছা মঞ্জু, ওদের জন্য তোমার কষ্ট হয় না ?"

"হুঁ"

"সে কষ্ট নয়।"

"তবে আবার কোন কষ্ট ?"

"ওরা কেন সেই স্যাঁৎসেঁতে নরকে পড়ে রইল, আর আমরা উঠে এলাম এই তেতলায়।"

মঞ্জুলী চুপ করিয়া থাকে। তাহাদের বাসা পরিবর্ত্তন অন্যায় কিছু নয়—তবু কেমন যেন খট্‌কা লাগে মনে; অথচ কি হইলে সব দিক বজায় থাকে তা-ও স্পষ্ট নয়।

"আচ্ছা, মঞ্জু, ধর তোমার যদি আজ অনেক টাকা থাকে ওদের কিছু দাও না কি ?"

তপেশের ছেলেমানুষি প্রশ্নের জবাবে মঞ্জুলীও মৃদু হাসিয়া জানায়, "সে আর বলতে!"

"আরো বেশী যদি টাকা থাকে ?"

মঞ্জুলীও হাসি চাপিয়া গম্ভীর হইতে চেষ্টা করে।

"বলো—যদি·"

"—আমাদের আগেকার বাসার গলি থেকে বেরুতে খোলার বাড়ীগুলো আছে না ?—রাতদিন ছেলেপেলেগুলো ট্যাঁ ট্যাঁ করে ?—ওদের দিয়ে দিই।"

"ওদের চেয়ে ঢের বেশী দুঃখে আছে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ—যাদের তুমি দ্যাখ নি—"

"তাদেরও দেই"—মঞ্জুলী হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে।

"অত টাকা পাবে কোথায় ?"

"ধরই না, যদি পাই।"

"অত পেয়ে যদি তোমার শেষে দেবার মনটা না থাকে ?"

"কেন থাকবে না ?"

"সেখানেই না যত গলদ!—আচ্ছা, মনে কর মঞ্জু, এ দুনিয়ার সমস্ত টাকা পয়সা কেবল তোমার—আর কারু

নয়, কেবল তোমার। তা হ'লে তো কারু কোন দুঃখ থাকে না।"

"নিশ্চয়।"

"সে কথাই তো লিখছি আমার বইখানিতে। তোমার মতই একজন—তবে সে বিশেষ একজন মানুষ নয়—না, তারা ব্যক্তি হয়েও নৈর্ব্যক্তিক।—সবার জন্য সবার হয়ে সমদর্শী সহযোগিতা—তারই প্রতীক যা—তার নামই হবে রাষ্ট্র।"

মঞ্জুলী এবার উঠিয়া গিয়া আলো নিভায়। "অমন রাত জাগলে, তোমাকেও শেষটায় বিছানা নিতে হবে। কেবল কাব্যিয়ানা। রবি ঠাকুর তোমার মাথা খেয়েছে।"

"এর মধ্যে আবার রবি ঠাকুর কোথায় পেলে গো?"

"থাক্—আর বলতে হবে না—ঐ শোন কাশীপুরের চটকলের বাঁশী বাজে। রাত কি আর আছে! তুমি বদ্ধ পাগল।"

এমনি করিয়া মাঝেমাঝে তপেশের মনের কোণের জমাট-বাঁধা গুরুভার হালকা কথায় একে একে ছাড়া পায়। মঞ্জুলীর অসংলগ্ন কথাবার্ত্তার মধ্যেও তাহার কত জিজ্ঞাসার সুস্পষ্ট জবাব মেলে। সূক্ষ্ম বুদ্ধির চুলচেরা বিচারে যে-কথা থাকে অস্পষ্ট, সহজ দৃষ্টির শুদ্ধ আলোকে তাহা পরিস্কার হইয়া ওঠে। যা গভীর, তা হয় ব্যাপক। অহঙ্কার নামিয়া আসে অনুভূতির কোলে।

কোন দিন বা তপেশ হাসিতে হাসিতে বিছানা হইতে মঞ্জুলীকে কোলে তুলিয়া আনিয়া টেবিলের উপর পা নামাইয়া বসাইয়া দেয়। কাছেই একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া তপেশ বলে, "ভা-রী তুমি বোঝালে সেদিন। ভাত কাপড়ের কষ্টই বুঝি কষ্ট? তা দূর হ'লেই বুঝি হ'ল? সে তো অতি সহজ। কিন্তু মঞ্জু, আমাদের রমানাথ কবিরাজ লেনের তেতলার বিভূতিবাবুর ছেলেটা জন্ম থেকেই অন্ধ, তার দুঃখ দূর করবে কি দিয়ে?—কাল আমাদের বাসার দোরে যে খোঁড়াটা এসেছিল তার কি ব্যবস্থা করবে? শ্যামবাজারের বাসার বৈদ্যনাথবাবুর কুশ্রী কালো মেয়েটার সারা মুখে বসন্তের দাগ—অমন ভালো মেয়ে, কত ছেলে এসে দেখে গেল, তবু তার বিয়ে হয় না। তার মনের কোন দাওয়াই আছে তোমার?"

"অমন করে টেনে-হিঁচড়ে বুঝি আনতে হয়। আমার এখনো বুক ধড়ফড় করছে।"

"আঃ। আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও।"

"কিসের জবাব?"

"ঐ যে বললাম।"

মঞ্জুলী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বক্তৃতা সুরু করে। কাল দুপুরে তপেশ মঞ্জুলীর কাছে এক ঘণ্টা অনর্গল এই প্রশ্নের জবাব বকিয়াছে। আজ এখন বক্তা হইয়াছে শ্রোতা। মঞ্জুলীও শেখানো বুলির মর্ম্মার্থ কৃতিত্বের সহিত বলিয়া যায়।

"বলো—ওদের দুঃখ-কষ্টের কোন উপায়—"

"সে তো মানুষের হাতে নয়—বিধাতার হাতে। মানুষের ভাত-কাপড়ের দুঃখ দূর করার ভার যে মানুষের নিজেরই হাতে··"

"Hear, hear! Loud applause!" তপেশ অট্টহাস্য করে। কালকের গৃহকোণের বাক্যবর্ষণ শুষ্ক উলুবনে ছড়ান হয় নাই। মঞ্জুলী বলিয়া চলে, "বিধাতা তো নিজে এসে বলে যান নি যে ·"

"বিধাতা-ফিধাতা রেখে দাও। ওর সমাধানও মানুষই করবে—"

"তা কি হয়।"

"তা-ও হয়। শোন তবে—"

কেমন করিয়া সমাধান হইতে পারে তাহা বলিবার প্রারম্ভেই নারায়ণ আসিয়া হাজির। অতএব আলোচনা সেদিনের মত মুলতবী থাকে।

মঞ্জুলী কখন আসিয়া তপেশের হাতে কলম গুঁজিয়া দেয়। বলে, "আর কত বাকী?" তপেশ ও সুধায়, "তোমার কতদূর?"

পাশাপাশি প্রতিযোগিতা। তপেশ চেয়ার-টেবিলে, মঞ্জুলী চৌকির উপর। ফাউণ্টেন পেন বড় মনোযোগী। কুর্শিকাঁটা কিন্তু বিমনা।

মঞ্জুলী ভাবে অনেক কথা। বোঝে সে সবই। তাহাকে খুশী রাখিবার জন্য স্বামীর প্রাণান্ত চেষ্টা ভালই লাগে। তাহার এই সদাহাস্য আনন্দের মধ্যে অভিনয়ও আছে কিছু কিছু। থাকুক। তবু বড় সুন্দর। কি মায়া-মধুর। নৌকা ছাড়িয়া দিলে তীরকে যেমন ভাল লাগে—ক্রমে-

আঁটা ছবির মত গাছের সারি যতই যায় দূরে, কাছের মায়া চোখ হইতে বুকে আসিয়া জমে। মঞ্জুলী ভাবিতে বড় ভয় পায়, ব্যবধানের বৈতরিণীর তীর ছাড়িয়া তাহার ভরা তরীখানিও অলক্ষে ধীরে ধীরে যাত্রা সুরু করিয়াছে অজানা ওপারে।

তপেশ এক সময় লেখা হইতে মুখ তুলিয়া দেখে, মঞ্জুলী জোড়া হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া অন্যমনা। দেখিয়া উঠিয়া আসে কাছে।

"কি এত ভাব্‌ছ মঞ্জু ?"

মঞ্জুলী তাহার মাথা হইতে স্বামীর হাতখানি ঠেলিয়া দিয়া খিট্‌খিট করিয়া ওঠে, "তোমার জন্য কি আমি একটু নিরালা থাকতেও পাব না ?"

তপেশ হাসে, "বাবা! এতেই ফোঁস করে উঠ্‌লে ?"—

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ!—আমি গোখরো। রাতদিন তাই ছোবলের ভয় কর। আমি কি সে-সব বুঝি নে ? কচি খুকী ?" এক নিশ্বাসে কথা শেষ করিয়া মঞ্জুলীর মুখচোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে।

আর না ঘাঁটাইয়া তপেশ স্বস্থানে ফিরিয়া আসে। বোঝে সব। উপায় কি। সে তো মঞ্জুলীকে বিগত জীবন ফিরাইয়া দিতে চায়। মঞ্জুলীও সাড়া দিতে আসে সেদিনের মন লইয়াই। কিন্তু বাঁশীতে আজ ঘুণ ধরিয়াছে; সঙ্গীত বড় বেসুর। সে যে বাঁচিবে না এ-কথা তপেশ বুঝিয়াছে। তপেশের চোখে আসে জল। শুধু দুঃখের অশ্রু নয়—দুঃখ বলিতে লোকে যা বোঝে। মঞ্জুলী একদিন থাকিবে না —এই অসহ্য ভাবনার তলে তলে কেমন যেন একটু আনন্দের রেশ। এ অনুভূতি কাহাকেও বোঝান যায় না। সুখ-দুঃখের একাকার—জীবনের এই বিশেষ মুহূর্ত্তগুলি এত নিজস্ব, এতই গোপন যে তাহাদের বাহিরের অক্ষম রূপ তার্কিকের রূঢ় বিদ্রূপে মর্য্যাদা হারায়। মঞ্জুলী মরিবে। বাঃ! তপেশ বুকভাঙ্গা এক দীর্ঘনিঃশ্বাস টানিয়া অমনি টেবিলে ঝুঁকিয়া পড়ে, তাহার দুর্ব্বোধ্য সুখের রহস্যকে 'দেখা-অদেখা'র পাতায় খানিকটাও ধরা যায় কিনা।

খানিক পরে তপেশ উঠিয়া পড়ে।·· মঞ্জুলী রাগিতে পারে, তাহার চুপ থাকা চলিবে কেন। এখনই মঞ্জুলীর অভিমান জল হইয়া যাইবে।

তপেশ এস্রাজ লইয়া বসে। এ-সুর, সে-সুর, নানা সুর বাজায়। তবু মঞ্জুলী ঠায় তেমনি বসিয়া আছে। তপেশ ভাবে অভিমান কাটিয়াছে, এখন কথা কয় না সে মানের দায়ে। এবার তপেশ তাহার লজ্জা ভাঙ্গাইবার পাশুপত অস্ত্র ছাড়ে—তাহার চির-প্রিয় সেই গানটি। তপেশ বাজায়: আজি কি সব-ই ফাঁকি ? সে কথা কি গেছ ভুলে ?······

মঞ্জুলী এবার মুখ তুলিয়াছে। স্বামীর দিকে একবার তাকাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়ে। তপেশ মনে মনে হাসে। ঐ দৃষ্টির অর্থ কাছে যাইয়া একবার শুধু সাধা। তপেশ উঠিয়া যায়। আদর করিয়া স্ত্রীর গায় হাত দিতেই তপেশের মনটা ছ্যাক্ করিয়া ওঠে। জ্বর আসিয়াছে। কাল একটুও গা গরম হয় নাই। তপেশ ভাবিয়াছিল, আর বুঝি হইবে না!

এমনি করিয়া দিনগুলি চলিতেছে। তবু তপেশ লিখে! এই ছোট্ট অধ্যায়টিকে সে সুন্দর করিয়া দেখাইবে তাহার 'দেখা-অদেখায়'। বাণী তার দুঃখের নয়—আনন্দের। —সুখের অধিকারে. দাবীর আশা। লিখিবে সে—প্রাণপণে লিখিবে। তবু সে মাঝে মাঝে একদৃষ্টে মঞ্জুলীর দিকে তাকাইয়া থাকে। সম্মুখের ঐ মঞ্জুলীর মধ্যে ভীড় করিয়া দাঁড়ায় চোখের আড়ালের কত কে! ক্ষীয়মানা মঞ্জুলী যেন কত ক্ষয়িষ্ণু জীবনের শারীর উপমা—কত বঞ্চিত মনের বাহিরের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। তপেশ দেখে, হাসে, ভাবে। মঞ্জুলীর আসন্ন মৃত্যু তাহার নিকট কি জটিল অর্থভরা! মঞ্জুলীর মৃত্যু তপেশের সংশয়েরই মৃত্যু। মঞ্জুলীর ক্রমিক নিঃসরণ তপেশ স্তরে স্তরে শেষ অবধি খুঁটাইয়া বিচার করিয়া দেখিবে। সে যেন কত বড় এক নিষ্ঠুর সত্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ! তাই তপেশ লেখে, কেবলি লেখে, অশ্রান্ত লেখে।

মঞ্জুলীও মাঝে মাঝে উঠিয়া গিয়া নারায়ণকে ডাকে। কখনো তপেশকে চা দিতে বলে, কখনো পান। তপেশ কি-কি খাইতে ভালবাসে নারায়ণের সে-সব মুখস্থ হইয়া গেছে—কারণ তাহাকে রোজ বাজারে যাইতে হয়। কোন দ্রব্য কতখানি দিলে কতটুকু পাতে পড়িয়া থাকে, উড়ে-ঠাকুরও তাহা সবিশেষ শিখিয়া ফেলিয়াছে। তবু মঞ্জুলী তপেশের খাইবার সময় সেলাইয়ের কাজ হাতে লইয়া অদূরে মেঝের উপর বসে। কখনো ঠাকুরকে করে খিচখিচ, কখনো নারায়ণকে করে গিজগিজ। সব দিকে সব ঠিক।

তবুও কোথায় যেন কি একটা বেঠিক আছে, অথবা কোন কিছুর ত্রুটি থাকাটা এখন নিতান্তই অত্যাবশ্যক।

কোন দিন তপেশের খাওয়া শেষ না হইতেই মঞ্জুলী গা-ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। চোখ ছল-ছল। হাই তোলে। জ্বর আসিতেছে। খুক্-খুক্ কাশি। আঁচলে মুখ ঢাকিয়া মঞ্জুলী শোবার ঘরে যায়।

দেখিতে দেখিতে পনের দিনের কাছে এক মাস চলিয়া গেল। আজ তপেশরা পুরী যাইবে। কলিকাতার প্রয়োজন শেষ।

আজ তপেশ ভোর হইতেই সুরু করিয়াছে খুশীর উৎসব। মঞ্জুলীকে জোর করিয়া সামনে বসাইয়া কেবলি গানের পর গান—কখনো এস্রাজে, কখনো হারমোনিয়মে, কখনো খালি গলায়। কোন গানই পুরাপুরি গাওয়া হইয়া ওঠে না। কোনটা অর্দ্ধেক, কোনটা এক লাইন, কখনো শুধু গুনগুন করিয়া অনির্দ্দিষ্ট একটা সুর ভাঁজে। মঞ্জুলী নারায়ণকে দিয়া বাক্স বিছানা জিনিষ-পত্তর গোছাইতে ব্যস্ত। তপেশ থাকিয়া থাকিয়া স্ত্রীর কাজে বাধা জন্মাইয়া তাহাকে বিরক্ত করিয়া সারাক্ষণ কেবলি খুশী রাখিল।

আজ কলিকাতা ছাড়িবে। কলিকাতা! ভবানীপুর, শ্যামবাজার, রমানাথ কবিরাজ লেন, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।...

বিকালে তপেশ ও মঞ্জুলী মুখোমুখী বসিয়া আছে। টেবিলের উপর 'সঞ্চয়িতা'। মঞ্জুলীর হাতে টেবিল-ক্লথ—শেষ হইতে কিছু বাকী।

"তোমার 'সংসার সমুদ্রে'র ছবি তোলার কাজ নাকি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে?"

"তাই তো শুনছি।"

"আমরা পুরী থেকে ফিরে এলে ছবি দেখান আরম্ভ হবে, না?"

"রিলিজড্ হ'তে আরো মাস দুই সময় নেবে।"

"ফার্ষ্ট শো-তে তুমি একখানি বক্স পাবে তো?"

"নিশ্চয়।"

তপেশ তাহার একখানি হাত তুলিয়া লইল। তারপর, একটুখানি টান। মঞ্জুলী কিন্তু স্বামীর হাতে হাত রাখিয়া কাছে থাকিয়াও দূরে আছে। তপেশ তাকায়। উভয়ে হয় চোখাচোখি। মঞ্জুলী অমনি মুখ নামাইয়া কহিল, "সুমতি, মনোরমাদি, লবঙ্গদি ওদের সবাইকে সঙ্গে নেওয়া যাবে?"

"সে ব্যবস্থা করব।"

"তা হ'লে কমলাক্ষবাবুকেও বলবে।"

"আচ্ছা।"

তপেশ টেবিলের উপর একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। মঞ্জুলী চেয়ারটা একটু সরাইয়া নিয়া সতর্ক দূরত্ব রাখিয়া বসিল। মন ভরিল খুশীতে। এতদিনের প্রকৃতিস্থ আবহাওয়ায় আজ ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ। কিন্তু ঐ আসন্ন ঝঞ্ঝাকে সে কোন মতেই আসিতে দিবে না। সূচনাতেই তাহার আবির্ভাবের ফললাভ।

সুতরাং মঞ্জুলীর সহসা কাব্য-প্রীতি জাগিল।

"'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটা পড়বে বলেছিলে, তা-ই পড় এখন। চোখে দেখার আগে একবার কাব্যে দেখে নিই।"

"বুঝবে তো?"

"খুব। আজকাল আমি কবিতা বুঝি গো। তোমাদের বোঝা আর আমার বোঝা এক না হ'তে পারে।—তুমি সুর করে যখন পড়, তখন যেন আরো বেশী করে বুঝতে পারি।"

"তুমি যে আজকাল হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের ভক্ত হয়ে উঠলে গো। তার উপর তোমার রাগ কেটেছে তা হলে?"

"মোটেই নয়।—পুরী থেকে ফিরে এসে চল একবার শান্তিনিকেতনে যাই। তোমার রবীন্দ্রনাথকে আচ্ছা বকুনি দিয়ে আসব।"

"অপরাধ?"

"—তোমার কবিকে বলব তোমার কবিতার মালিক তুমি নও—আমরা। তুমি জন্ম দিয়েই খালাশ, লালন-পালনের ভার আমাদের হাতে। তোমার কি অধিকার আছে অপরের সম্পত্তির উপর এমন জুলুম চালাতে?"

"কি করেছেন তিনি?" তপেশ হাসিতে থাকে।

"'পতিতা', 'প্রকাশ', 'বৈষ্ণব কবিতা'—আর ঐ কি নাম?—'গভীর সুরে গভীর কথা শুনিয়ে দিতে তোরে'—এগুলি বাদ দিতে তাকে কে অধিকার দিয়েছে? নিজের কবিতার সে বোঝে কিছু।—মাথা ঘামাতে হয়, পরের লেখা নিয়ে ঘামাক। এবার ভার দিয়ে আমরা ঠকেছি—আর কস্মিন-

কালেও নিজের কবিতা সিলেক্‌ট করার ভার তার উপর দেব না।—ছাখ, 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গকে' কেটেকুটে কি করে দিয়েছে।" মঞ্জুলি সঞ্চয়িতার পাতাগুলি উল্টাইতে লাগিল।

তপেশ হাসিয়া কহিল, "প্রথম বয়সের কাঁচা লেখার উপর তিনি কাঁচি চালাচ্ছেন।"

"কবিতা সে বোঝে ছাই—লিখতে জানলেই হল, না?"

উভয়ের মিলিত অট্টহাসি থামিলে মঞ্জুলী কহিল, "এবার পড়।"

আবৃত্তি আরম্ভ হইল। মঞ্জুলী উৎকর্ণ হইয়া প্রতিটি লাইন শুনিয়া গেল। তপেশ পড়িতে পড়িতে আন্‌মনা হইয়া পড়ে। মনে জাগে, কয়েকখানি কাঁথার অষ্ঠেপৃষ্ঠে লাল-নীল-কালো সূতার ঘর-আঁকা ফোঁড়। ঘরের বিষণ্ণ স্তব্ধতায় ভাসে যেন এক শব্দহীন সান্ত্বনা—কেঁদোনা, আবার হবে।

আদি-জননী সিন্ধুর প্রথম সন্তানের জন্মকথা শেষ হইল। মঞ্জুলী হাসে। নীরস হাসি। তপেশও নীরব।

খানিক বাদে মঞ্জুলী উঠিয়া দাঁড়াইল।

"আজ যাবার আগে একবার সুমতিদের বাসায় নিয়ে যাবে?"

"আজ আর সময় কোথায়?—কাল বলোনি কেন?"

"কেন সময় হবে না। আমি এখনি তৈরী হয়ে নিচ্ছি।—ওদের সঙ্গে দেখা না করে যাওয়াটা কি ভাল দ্যাখায়?"

"সাতটার মধ্যে কিন্তু বাসায় ফেরা চাই—সাড়ে নটার আগেই ষ্টেসনে পৌছতে হবে।"

"সে হবে'খন।—তুমি নারায়ণকে একটা গাড়ি ডাকতে বল।"

মঞ্জুলী উঠিয়া গেল আয়নার কাছে। অনেকদিন পরে আজ সে একটু ঘটা করিয়া চুল বাঁধিতে বসিল। আজ বিদায়ের দিন। তপেশ এস্রাজটা কাঁধে টানিয়া নিল। কি সুর বাজাইবে ভাবিয়া পায় না। এমন একটা সুর যার সঙ্গে মঞ্জুলীর এই প্রসাধনের একটি সুন্দর মিল থাকিবে—একটা সুষ্ঠু যতি। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এত সুর থাকিতে তপেশ ধরিল 'পিলু'।

মঞ্জুলী সুদীর্ঘ বিননী রচিয়া সযত্নে খোঁপা বাঁধিল। তার পর সিঁথিমূলে আঁকিয়া দিল এয়োতির গর্ব্বচিহ্ন। কপালে সিঁদুরের ফোঁটাটি আজ বেশ সুগোল। হাতের নোয়ায় আবার একটু সিঁদুরও ছোঁয়াইল। আঁচলে মুখ মুছিয়া আবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল পাণ্ডুর মুখখানি।

মুর্শিদাবাদী সিল্কের নীল শাড়িখানার সারা গায় শিশু-বলাকার ভীড়। কোমল ক্ষীণাঙ্গে জরির আঁচ-দেওয়া আঁচলখানি যেন কথা কহিয়া উঠিল। আলতা পরিতে পরিতে কাণের দুলজোড়া নাচিতেছে বেশ! গলার সরু চেন কণ্ঠাস্থির কাছে একটু খাঁজ খাইয়া লাল টক্‌টকে ব্লাউসের উপর দিয়া বুকের শাড়ির ভাঁজে গিয়া লুকাইয়াছে। হাতের চুড়ি ক'গাছা থাকিয়া থাকিয়া সুর তোলে। তপেশ তখন 'পিলু' ছাড়িয়া 'সাহানা' ধরিয়াছে। তাহাদের কত দিনের কত রাতের নানান রঙের ফুলগুলি আজ যেন একসঙ্গে মালা হইয়া হঠাৎ এই ক্ষণকালের গলায় আসিয়া দুলিতেছে।

মঞ্জুলীর নাকের ডগাটি একটু ঘামিয়া উঠিয়াছে। কপালের উপরে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম। ঐ ফ্যাকাসে মুখেও কি অপূর্ব্ব আভা! মঞ্জুলীর প্রসাধনের সৌরভে সারা ঘর থৈ থৈ করে। তপেশের এস্রাজ এখন 'সাহানা' ছাড়িয়া রেকর্ডের এক সস্তা গজল বাজাইতেছে। তারে তারে বিমুগ্ধ ছড়িটা মঞ্জুলীর ঐ উষ্ণ শ্রীকে বিশ্লেষণ করিয়া চলিয়াছে হাল্‌কা সুরে।

এবার মঞ্জুলী পরিল ভেলভেটের স্লিপার জোড়া। তারপর মুখে চোখে এক ঝলক হাসি ফুটাইয়া কহিল, "আমার তো হয়ে গেছে—শুন্‌ছ, নারায়ণকে এবার একটা গাড়ি ডাকতে বল।"

তপেশ বিহ্বল আঁখি দুটি পাতিয়া ধরিয়াছে। এতদিনের নিষেধের পাতলা আবরণে তপেশের ক্ষণে ক্ষণের রেণুর কুঙ্কুম সদ্য মুহূর্ত্তের গায় আঘাত খাইয়া রাঙিয়া ফাটিয়া পড়িল ছড়াইয়া। মঞ্জুলী স্বামীর ঐ চির-চেনা মুখের ভাষা জানে। তাই সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল, তপেশ আগাইয়া আসিল এদিকে। মঞ্জুলী সরিয়া গেল চৌকির ওপারে।

"ও কি মঞ্জু?"

"না।"

"না কেন?"

মঞ্জুলী নীরব। শুধু সে সন্ত্রস্তা হরিণীর ন্যায় স্বামীর দিকে চাহিয়া আছে।

তপেশ ঘুরিয়া গেল চৌকির ওপারে। মঞ্জুলী অমনি ফিরিল এদিকে।

"ছি মঞ্জু! অবাধ্য হয়ো না।"

"ওগো! না-না-না।—তোমার দুটি পায়ে পড়ি···"

তপেশ ধাঁ করিয়া চৌকির উপর আড়াআড়ি ভাবে উপুড় হইয়া মঞ্জুলীর হাত ধরিয়া ফেলিয়াছে।

স্বামীর বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনে মঞ্জুলী ছাড়া পাইবার জন্য ছটফট করিল। নিষ্ফল চেষ্টা।

"তুমি কি আজ পাগল হয়েছ?···" নিরুপায় মঞ্জুলী হাতের মুঠিতে ঠোঁট দুটি শক্ত করিয়া ঢাকিয়া রাখিল। তপেশ তাহার ললাটে দিল পুলক স্পর্শ। দুটি আঁখির পাতায় আলগোচে রাখিল শিথিল চুম্বন। মঞ্জুলীর সারা দেহ রিম্‌ঝিম্ করে। কতদিন পরে আজ সেই উত্তপ্ত আস্বাদ। অসহ আবেশে মুখ হইতে তাহার শিথিল হাতের মুঠি আপনি নামিয়া পড়িল। এবার তপেশ মঞ্জুলীর কম্পিত অধরে আঁকিয়া দিল চুম্বনের পর চুম্বন। নিদাঘের দীর্ঘ উপবাসের উপর আজ যেন আষাঢ়ের অশ্রান্ত পারণ নামিয়াছে।

মঞ্জুলী বাধা দিল না। ক্ষীণ দুটি বাহুলতা দিয়া স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া আছে। শির-শির করে তার সর্ব্বাঙ্গ। আচ্ছন্নের মত তপেশের কাঁধে মাথা এলাইয়া দিয়া লাগিয়া আছে।

পরক্ষণেই মঞ্জুলীর মন কিসের শঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল। ঐ সুপুষ্ট মণিবন্ধ, এই প্রশস্ত বক্ষ—সুডৌল বলিষ্ঠ বাহু। সে এ কি করিল! এ কি করিল!

তপেশ তাহার আনত মুখখানি তুলিয়া ধরিল। মঞ্জুলীর ডাগর চোখের কোণে টলমল করে দু ফোঁটা চোখের জল। যে-অশ্রু জন্ম নিল আনন্দে—তা এখন বিষণ্ণ ধারায় কপোল-তলে গড়াইয়া নামিয়াছে।

তপেশ তাহাকে সান্ত্বনা দিবে কি দিয়া? আর আছে কি তাহার? সব কিছু দিলেও যে আজ মঞ্জুলীর শূন্যতা ভরিয়া উঠিতে চায় না!

অসহায় তপেশ নিজের অধরোষ্ঠ দিয়া মঞ্জুলীর নয়নাশ্রু শুষিয়া নিতে লাগিল: যেন সে অগস্ত্যের মত ঐ জল ধারার অ-দেখা উৎস মুখ অবধি টানিয়া লইতে চায় এক গণ্ডূষে।

এগার

পুরী এক্সপ্রেস্ ফুঁসিয়া রুষিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

ইণ্টার ক্লাস। জানালার দিকের একটা বেঞ্চের অর্দ্ধেক লইয়া মঞ্জুলী ঘুমাইয়া আছে। পাশে বসিয়া তপেশ। গাড়ীতে আজ ভিড় নাই। তপেশরা বাদে আর জন সাতেক সহযাত্রী।

মঞ্জুলীর কাছের জানালাটার কাচ তোলা। তপেশ তাহার কপালের ঘাম মুছাইয়া দিয়া আবার নিজের আসনে আসিয়া বসিল। খোলা জানালার বাহিরে তাকাইয়া বুঝিল, রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

তপেশ বাহিরে চাহিয়া আছে। ভাবনার তাহার অন্ত নাই।

বাহিরে এখনো অন্ধকারের ভাগ-ই বেশী। প্রকৃতি সবে তাহার বোরকাখানি খুলিয়া ফেলিয়াছে। ঘোমটা খুলিতে এখনো একটু বাকী। পূবের ওড়নাখানি ক্রমেই পান্‌সে হইয়া আসিতেছে।

হুস্-হুস্ শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে পুরী এক্সপ্রেস্।

তপেশ চাহিয়া আছে। দিগন্ত-ছোঁয়া প্রসারিত মাঠের পারে আলো-আঁধারের গলাগলি। গাছপালা, বাড়ীঘর, নালা-ডোবা, তৃণগুল্ম, রাস্তা-ঘাট দু'চোখ ভরিয়া দেখিতেছে তপেশ। দু'চোখ ভরিয়া দেখিতেছে ঐ মায়াময়ী মৃত্তিকার বিচিত্র রূপ।

কে চায় এই সুন্দরী পৃথ্বীর কোমল-কঠিন কোলখানি ছাড়িয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে! স্বর্গ তো কবির কল্পনায়, ঋষির ধ্যানালোকে, দার্শনিকের মগ্ন-অনুভূতির মধ্যে, বিশ্বাসের নিরুদ্বিগ্নতায়। চিরদিন চলিয়াছে, আজও চলিতে থাকুক, ওপারের রহস্য লইয়া এপারে নিরন্তর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা। তপেশ আপত্তি জানাইবে না। না বুঝুক, বিশ্বাসের জোরে মানিয়া লইতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু চোখের সম্মুখে এই জীবন্ত পরিবেশ, এই পরি দৃশ্যমান জড়ের জগৎ, ইহাই তাহার কাছে সব চেয়ে বড় সত্য। এই বাঁচিয়া থাকিবার আনন্দ, সকল দুঃখ কষ্টে পতনে-পীড়নে একমাত্র অনুভূতি 'আমি আছি'—ইহাই তপেশের জীবন-গীতা। এই পরিমিত নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, প্রাণান্ত প্রাত্যহিকতা, অবিচারিত মনের কত রকমের বিক্ষোভ-

বেদনা—তবু এই রুদ্রাক্ষ মালার মাঝে মাঝে আছে সুখ-শান্তি-পরিতৃপ্তির পান্না-মোতি। ঠিক রমানাথ কবিরাজ লেনে স্যাঁৎসেঁতে একতলা ঘরে মাঝে মাঝে মঞ্জুলীর অম্লান হাসিটুকুর মতই। আর এই মালা গাঁথিয়া চলিয়াছে কে? —এক অন্তর্গূঢ় আনন্দের অদৃশ্য সূত্রে সব লইয়া এই সহজ প্রবাহ! কি বিচিত্র! কি বিরাট! এই তো জীবন!···

তপেশের মনে হইল, এতকাল সে শুধু জীবনের আনাচ-কানাচ পথ-ঘাট চিনিতেই কাটাইয়াছে। বুঝি বুঝিয়াছে জীবনের সব-ই—শুধু বোঝে নাই এই জীবনকেই! নানা তর্ক, নানা সমস্যায় আসল কথা ছিল চাপা। আজ সে যেন জীবনের নিগূঢ় মর্ম্মস্থলের সন্ধান পাইয়াছে।

জীবন-যাত্রা! নিত্য-বহমান অস্তিত্বের ধারা! সে তো অশ্রু হাসিরই খেলা। পাইতে পাইতে আর না-পাইতে না-পাইতে অবারিত পথ চলা। অজানিত সম্মুখ! সকাল-সন্ধ্যা প্রাণের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কামনার কানাকানি। কতক তাহার বন্ধ্যা, কতক ওঠে সাফল্যে রাঙিয়া। সব পাওয়ার সুখ সে যে মহা দুঃখ! সে যে অতি-তৃপ্তির অপরিতৃপ্তি! সে যে বিরতি! অনন্ত বিশ্রাম!·····

তাহার নিজেকে জানিতে আজও কত বাকী। সব যে জানা যায় না। যতটুকু জানে তাহা-ও যে ছাই মাথা খুঁড়িয়া ভাষা খুঁজিয়া পায় না। আবার মসীর আখরে যতটুকু ঝরে তার চেয়ে কত বেশী চেতনার তলে অপমানে মিলাইয়া যায়!······

জীবন তো নয়, যেন বিষামৃত!

তাই না প্রিয়ার অধরে আবেশ-মরণেও তৃষ্ণা মিটে না। দিনে দিনে চিনিয়াও তাহাকে আরো জানিতে চায়। সব যে জানা যায় না! আধেক কথা তাহার আঁখিতে জাগে, আধেকই থাকে অন্তরালে। লুকোনো হাসির বাঁকানো রেখায় একদিনে সবটুকু ধরা পড়িলে প্রিয়ার সঙ্গে যে বোঝাপড়া শেষ হইয়া যায়। আরম্ভ হয় বিচ্ছেদ।··· মঞ্জুলীকে তপেশ আজ-ও যে ভাল করিয়া চিনিয়া উঠিতে পারিল না। এই তো ভাল। এই তো আনন্দ! এই আলো আঁধারের ওতঃপ্রোত মিতালি!······

ঘরে-বাহিরে নিকটে-দূরে এই পাওয়া-না-পাওয়া দেখা-অদেখার অব্যাহত ধারাই যে জীবন। এই মেঘ-ও-রৌদ্র বর্ত্তমান! কোটি কোটি স্পন্দমান সন্ত মুহূর্ত্তের সমবায়ে গঠিত এই পরিমিত জীবন! ইহার-ও অতীত যদি কিছু থাকে থাক্—যদি কোন সত্য থাকে, মিথ্যা নয় সে। কিন্তু তপেশের কাছে তাহা নিতান্ত গৌণ। তাহার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সত্য এই শত লক্ষ ঘটনার আলোছায়া-মায়াময় সংসার-সমুদ্র! ইহাকে ছাড়িয়া কে চায় চলিয়া যাইতে বধির যবনিকার অন্তরালে অজানা স্বর্গে!

তপেশ বাহিরে চাহিয়া আছে। মাতা মৃত্তিকা মিনিটে মিনিটে নূতন রূপ লইয়া দেখা দিতেছে। ঐ গাছপালা হইতে আরম্ভ করিয়া অণু-পরমাণু পর্য্যন্ত সবই সত্য।— একমাত্র সত্য। জীবন্ত আনন্দ!···মঞ্জুলী! মঞ্জুলী! শেষ সময় এই মমতাময়ী পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার প্রাক্কালে যদি বোঝ—সব ফাঁকি, সব-ই ফাঁকা, তবু—তবু তুমি এই ধূলিধাত্রী বসুন্ধরাকে অভিসম্পাত করিয়ো না, বড় সুন্দর সে—অভিযোগ জানাইয়ো না, নিরুপায় সে। ভুলিয়ো না তাহার অবিরল স্নেহ, শুশ্রূষা, আশীর্ব্বাদ। শুধু একটু করুণা করিয়ো, তাহাকে অশ্রু জলের আশিষ দিয়া যাইয়ো। বড় সুখী সে, বড় দুঃখী!

মঞ্জুলীর ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। উঠিয়া বসিয়া কাচের মধ্য দিয়া ভোরের আলোয় বাহিরের দৃশ্য দেখিতে লাগিল। মঞ্জুলীর সিঁথিমূলের আধেক-মুছে-যাওয়া সিঁদূরের মত পূবের দিগন্ত রেখায় অস্পষ্ট রক্তাভা।

কিছুক্ষণ বাদে সে তপেশকে কাচের শার্সীটা নামাইয়া দিতে কহিল। তপেশ তাহার পাশে খোলা জানালার কাছে বসিয়া পড়িল। বাতাসে মঞ্জুলীর সামনের চুলগুলি উড়িয়া উড়িয়া নাচিতেছে। তপেশ ওগুলি লইয়া বেশ সুন্দর খেলা পাইল। হাত ও বাতাসে যেন কোঁদল বাধিয়াছে।······

কি সুন্দর পৃথিবী। কি আনন্দ 'বাঁচিয়া-আছি'-বোধ। আছে মঞ্জুলী। আছে সে। আছে ঐ আকাশ-আলো-বাতাস। এই গাড়ী। গাড়ীর এ ঝাকুনি!

মঞ্জুলী স্বামীর একখানা হাত কোলের উপর টানিয়া নিয়া কহিল, "একটা গান গাও না।"

"তোমার প্রিয় সেই গানখানা?"

"না গো, রবীন্দ্রনাথের একটা ভোরবেলাকার গান।"

তপেশ খানিক ইতস্তত করিল। তারপর ঘুমন্ত যাত্রীদের দিকে একবার চাহিয়া গান ধরিল—

"রাত্রি এসে যেথায় মিশে
দিনের পারাবারে
তোমায় আমায় দেখা হ'ল
সেই মোহনার ধারে।"

মঞ্জুলী বাধা দিয়া থামাইল, "না-না, এ গান নয়।"

"তবে কোন গান? 'আলোকের এই ঝরণা ধারায় ধুইয়ে দাও'?"

"না-না।"

"তবে কি গাইব তুমি-ই বল না।"

মঞ্জুলী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "ঐ গানটা গাও—'যাবার বেলায় পিছু ডাকে'।"

তপেশ তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকাইয়া রহিল। এ গান মঞ্জুলী এখনই শুনিতে চায় কেন!

"গাও।"

"ওরা সব ঘুমুচ্ছে। বিরক্ত হ'বে। কি মনে করবে।"

"এই যে গাইলে—তখন বুঝি আপত্তি করেছ?"

"খেয়াল ছিল না—তুমি পাগল না ক্ষ্যাপা?—গাড়ী ভর্ত্তি লোক—"

"গাও গো গাও, আর তো আমি শুন্‌তে আসব না!" মঞ্জুলীর কণ্ঠস্বরে ব্যাকুল মিনতি।

তপেশ শিহরিয়া উঠিল।

"গাও। শুন্‌লেই বা ওরা, হ'লই বা বিরক্ত—তাতে আমাদের কি?"

তপেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া গিয়া গান ধরিল—

"আমায় যাবার বেলায় পিছু ডাকে।
ভোরের আলো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে,
পিছু ডাকে, পিছু ডাকে"—

ট্রেণ গর্জ্জিয়া ছুটিয়াছে—ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ। মঞ্জুলী গাড়ীর জানালায় মাথা রাখিয়া উদয়াচলের পানে দৃষ্টি মেলিয়া গান শুনিতেছে। ভৈরবীর করুণ সুরে আজ যেন নিখিলবিশ্বের পুঞ্জীভূত বেদনাভার নিমেষে কাঁদিয়া উঠিয়াছে।

—বাদল প্রাতের উদাস পাখী
উঠে ডাকি
বনের গোপন শাখে শাখে।
পিছু ডাকে
পিছু ডাকে"

মঞ্জুলী তাহার সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিখানি এবার গুটাইয়া ভিতরে আনিল। বর্ষণোন্মুখ চোখ দু'টি তাহার আড়াল চায়।

মঞ্জুলীর দুচোখ বহিয়া নিঃশব্দ জলধারা জানালা গড়াইয়া বাহিরে পড়িতে লাগিল।

আমার প্রাণের মাঝে সে কে
থেকে থেকে
বিদায় প্রাতের······

তপেশ সহসা গান থামাইয়া উচ্ছ্বসিত বেগ মঞ্জুলীর নিকট হইতে গোপন করিবার উদ্দেশ্যে ওদিকের জানালার কাছে গেল।

মঞ্জুলী কাঁদিতেছে। তাহাকে শতসহস্র হাতছানি দিয়া আজ পিছু ডাকিতেছে মাতা বসুন্ধরা। দু'চোখ বহিয়া নামিয়াছে তাহার বিদায়-অশ্রু।

গাড়ী বাঁশী ফুঁকিল। চম্‌কাইয়া উঠিল তপেশ।

তবে কি গন্তব্যস্থলে পৌঁছিল! না-না—এখনো কতকটা বাকী। সিগ্‌নাল ডাউন না পাইয়া ট্রেণ খানিকক্ষণের জন্ম দাঁড়াইয়াছে মাত্র।

তপেশ ফিরিয়া গেল মঞ্জুলীর কাছে।

মঞ্জুলী এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া সে শুইয়া পড়িল। তপেশ তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে।

মঞ্জুলী কহিল, "আমার বড় সাধ ছিল তুমি-আমি কোনও দূরদেশে বেড়াতে যাব। ভেবেছিলাম সে বুঝি আর হবে না। কিন্তু আজ আমরা সুদিনের মুখ দেখেছি। আমার সে আশা আজ পূর্ণ হ'ল।"

তপেশ নীরব। নির্ব্বিকার তাহার মুখের ভাব।

মঞ্জুলী কহিল, "চুপ করে আছ যে?"

"এমনি।"

একটু পরে মঞ্জুলী জিজ্ঞাসা করিল, "রাত্রে ঠাকুর ও নারায়ণের কোন খবর নিয়েছিলে ?"

"নিয়েছি। দিব্বি আরামে ঘুমুচ্ছে ওরা।"

মঞ্জুলী স্বামীর একখানি হাত বুকের উপর টানিয়া নিয়া কহিল—"ঠাকুরটার এলোপাতাড়ি কাজ। তবু বড় ভাল গো সে। নারায়ণ তো আমার খাসা ছেলে। ওদের যেন কোনদিন বিদায় করে দিয়ো না।"

"এ-কথা কেন মঞ্জু ?"

"এমনি।" মঞ্জুলী স্বামীর হাতের আঙুলগুলি এক এক করিয়া মট্‌কাইতে লাগিল।

ওদিকের বেঞ্চের বর্ষীয়সী মহিলাটী তাহাদের দিকে এক বিরক্তিভরা দৃষ্টি হানিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল।

মঞ্জুলী হাসিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিল, "উনি কি ভাব্‌ছেন শুন্‌বে ? মনে মনে রেগে উঠ্‌ছেন—কি বেহায়া মা-গো! আমাদেরও একদিন বয়স ছিল। কিন্তু রাস্তাঘাটে এমনধারা ঢলাঢলি জানিনি কখনো।"

আন্‌মনা তপেশের এ-কথায় কাণ নাই। সে ভাবিতেছে, গাড়ী যেন আর থামে না—দিনের পর দিন যেন এমনি চলে।···এমন কেন হয় না, যুগের পর যুগ গাড়ী একটানা ছুটিয়া চলিয়াছে; মঞ্জুলী শুইয়া আছে স্বামীর কোলে। মাঠ গেল, ঘাট গেল, গ্রাম গেল, নদী গেল, তবু পথ ফুরায় না, গাড়ী তাই থামে না—জীবন-মরণের মোহানায় মঞ্জুলী এমন করিয়া স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া শুধুই কথা বলিয়া চলিয়াছে অনর্গল। বাঃ!

"আঃ কথা কও না। মুখভার করে থেকো না। আমি যে তা সইতে পারি না।" মঞ্জুলী স্বামীর হাত ধরিয়া মৃদু ঝাঁকুনি দিল।

"কি বল্‌ছ ?"

"তুমি একটু হাস। আমি একবার দেখব।"

তপেশ জানালার দিকে বাহিরে মুখ ফিরাইয়া রহিল।

পুরী এক্সপ্রেস আবার রুষিয়া ফুঁসিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

বার

তিনমাস পর।

হাওড়া ষ্টেসন্। একটা সেকেণ্ড্ ক্লাস ঘোড়ার গাড়ীর ছাদে ঠাকুর ও নারায়ণ মালপত্তর তুলিয়া দিতেছে। তপেশ গাড়ীতে উঠিল।

বড়বাজারের প্রবহমান যানবাহনের মাঝে ছ্যাক্‌রা গাড়ী পথ করিয়া চলিয়াছে। তপেশ চাহিয়া আছে বাহিরে।···

শরতের কাঁচা রোদে রাস্তাঘাট আজ হাসিতেছে। আর সেদিন তপেশ সারারাত এত করিয়া বিধাতার কাছে মিনতি জানাইল, ভগবান! কাল যেন আমার মঞ্জুলীর বিদায় অভিনন্দন লেখা হয় ভুবন-ছাওয়া সোনালী আলোয়। সে প্রার্থনা শোনে নাই কেহ। পরদিন সারা সকাল আকাশ মেঘে ঢাকাই রহিল! দুপুরে শ্মশানেও এককণা রূপা বর্ষিল না নির্দ্দয় আলোর দেবতা। আর আজ সোনালী রোদের অকৃপণ ছড়াছড়ি! আলোয় আলোয় খিলখিল করিয়া হাসে ইটপাথরের কলিকাতাও!

মঞ্জুলী চোখের জলে বিদায় নিয়াছে। সে কি অভিযোগ, না অভিশাপ, না করুণা—তপেশ তাহা বিশ্লেষণ করিবে না। শুধু সে এইটুকু জানিয়াছে, মঞ্জুলী মরিতে চাহে নাই। একদা বৈধব্যকে-ও যে কামনা করিতে ডরায় নাই, এত শীঘ্র সে যে বিদায় লইতে পারে না! এই মাটি, এই আলো, ঐ আকাশ! বিদায় সে লয় নাই। তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছে!

রাস্তায় রাস্তায় ওয়াল-পোষ্টার—নব নাট্যায়তন······ আগামী ১৩ই আশ্বিন শুভ উদ্বোধন···অপরাজেয় কথা-সাহিত্যিক তপেশ লাহিড়ীর অমর লেখনী-প্রসূত উপন্যাস "আঁধারে আলোর" নাট্যরূপ 'জীবন-বেদী'। দেয়ালে দেয়ালে —'সংসার সমুদ্রে' আসিতেছে কবে ? · কোথায় ?······

নিরেট ব্যঙ্গ!

তপেশ মুখ ফিরায়। গত পরশু তারিখের 'বিশ্ব-বাণীর' একটা 'শিট্' মেলিয়া পড়িতে বসে। সাপ্তাহিক রঙ্গজগৎ! 'সংসার সমুদ্রে'র আগমনী গাহিয়া প্রায় এক 'কলাম্।' নিদর্শন-স্বরূপ সুটিংএর তিনটী দৃশ্য ছাপা হইয়াছে। দুইটী নায়ক-নায়িকার প্রণয়ালাপের উত্তপ্ত সান্নিধ্য। তৃতীয়টী মৃত্যুশয্যায় নায়িকার শিয়রে নায়ক।

তপেশ মনে মনে হিসাব করিল। এই দৃশ্য তিনটী ব্লক করিতে ও ছাপাইতে কম পক্ষেও গোটা পাঁচেক টাকা খরচ পড়িয়াছে নিশ্চয়ই। এক বোতল ভাইব্রোনার দাম!···

গাড়ী চলিতেছে। আবার সেই কলিকাতা। কোনও

পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। তেমনি কর্ম্মচঞ্চল প্রশস্ত রাজপথ। রমানাথ কবিরাজ লেনও নিশ্চয়ই তেমনি আঁকিয়া বাঁকিয়া নেবুতলায় আসিয়া পড়িয়াছে। আজ তপেশ একটীবার সেখানে যাইতে চায়।—সেই দক্ষিণ-বন্ধ স্যাৎসেঁতে ঘরটায়। সেখানে আছে তাহার মঞ্জুলীর বন্ধু সুমতি। সেই দুঃখ-দৈন্যে অনমনীয়া স্বামী-সোহাগীর স্মৃতি-তীর্থ। সে আর হয় না! সেখানে আজ অপর একটী ছোট্ট ভাড়াটে পরিবার। বোধ করি কোন নবদম্পতি নূতন করিয়া সংসার পাতিয়াছে অথবা এক পরিণত প্রেম পুরাতনের জের টানিয়া চলিয়াছে। ইচ্ছা থাকিলেও সেখানে আজ যাওয়া যায় না আর।… ‥

এই যে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। ঐ যে দূরে বাসা দেখা যায়। আজ নূতন জীবনের প্রথম দিনে একাই সে গৃহপ্রবেশ করিবে। দুঃখ কি তাহাতে! একাই সে এ জগতে আসিয়াছিল। মঞ্জুলীও তো একাই চলিয়া গেল। হঠাৎ তপেশ এক জ্ঞান-সুস্থির দার্শনিক সাজিয়া বসিল।

তপেশ ঘরে ঢুকিয়াই বেতের আরাম কেদারাটায় হেলান দিয়া পড়িল। পাশেই তাহার লিখিবার সেই ছোট টেবিলটা।

তপেশ সিগারেট ধরাইল। সিগারেট খাইতে সে নূতন শিখিয়াছে। দিনে দুই প্যাকেটের কম হয় না।…

ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঊর্দ্ধে উঠিয়া মেঘায়িত হইয়া জানালা দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। স্মৃতির ধোঁয়াও একদিন অমনি করিয়া ফিকা হইয়া বিস্মৃতি-বিস্তারে মিশাইয়া যাইবে। তাই না মানুষ বাঁচে! তাই তো জীবন সুন্দর।

কিন্তু বড় সুন্দর আজিকার এই সহিতে না-পারা! সদ্য ক্ষতির এই অসহ্য শোক! আরো সুন্দর, ব্যথারও মৃত্যু আছে মঞ্জুলীরই মত। ক্ষতির ক্ষতও শুকায়! দাগও যে মিলায়!…

আজিকার এই ভুলিতে না চাওয়ার এতটুকুও কি তপেশ কোন মতে কোন ছলে চিরদিনের জন্য ধরিয়া রাখিতে পারে না?—এমন একটা কিছু, অন্ততঃ এমন একটা ব্যক্তিগত অপচয় বা অপরাধ বা অভিমান—যাহাতে জীবনের সুদীর্ঘ পথ চলার সে-কথা যেন ভুলিয়া থাকায় নিশ্চিন্ত গোলাপ গুচ্ছে মাঝে মাঝে কাঁটা হইয়া ফুটিয়া ওঠে—যেন স্মরণের আনন্দকে দেয় এক নিমেষে ব্যথায় রাঙিয়া—হ'ক না সেই মনে-করা ক্ষণিকের কণিকা, হইল-ই বা তা সহজ বিস্মৃতির বুক ছেঁড়া একটুখানি দয়ার অনাদর! ‥

কি সে করিতে পারে? আছে তার কি?…

আছে ঐ ঘরের কোণে স্পিরিটের বোতলটা। আর খাড়া আছে পাশেই ঐ ষ্টোভটা।

দেয়ালে টাঙানো ঐ স্বামী-স্ত্রীর 'পেয়ার'-ফটো। খাসা ব্যাক্-গ্রাউণ্ড। পিছনে সমুদ্রের বুকে পশ্চিমের সোনার থালাখানি ডুবুডুবু। উপকূলে শিলাতলে বসিয়া আছে তপেশ, মঞ্জুলী স্বামীর কোলে একখানি হাত রাখিয়া দেহভার এলাইয়া দিয়াছে। শিথিল পা'দুখানি পিছনে গুটানো ঈষৎ তির্য্যক ভঙ্গীতে—ঠিক যেমনি করিয়া কোন তন্বী বসে পা-ভাঙ্গিয়া চুল ছাড়িয়া এস্রাজে সুর তুলিতে। ষ্টুডিয়োতে তোলা স্বামী-স্ত্রীর সেই ছবিখানি। তপেশ একবার চাহিয়াই চোখ নামাইয়া নিল। ও যেন নাস্তিকের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ! নিষ্ঠুর, উলঙ্গ, অকপট! ‥

লেটার-বক্স খুলিয়া নারায়ণ একতাড়া চিঠিপত্র আনিয়া তপেশের কাছে টেবিলের উপর রাখিল। চিঠিগুলির শিরোনামায় চোখ বুলাইয়া সে একখানি এনভেলপ বাদে আর সবগুলি ফেলিয়া রাখিল।

কমলাক্ষের চিঠি। পাটনা হইতে লিখিয়াছে—

প্রিয় তপেশ,

বিহার ভূমিকম্পের সেবাকার্য্যে ভলান্টিয়ার হ'য়ে এসেছি এখানে। আসার দিন সন্ধ্যার পর তোর বাসায় গিয়ে-ছিলাম। দেখা হ'ল না। শুনলাম তোরা দু'জনে পুরী গেছিস্। এদ্দিনে নিশ্চয় ফিরে এসেছিস। আশা করি, মিসেস্ লাহিড়ী ভাল হ'য়ে উঠেছেন।

তোকে একটা সুসংবাদ দিচ্ছি। আজ এই দু'মাস হ'ল মা আমার মরেছে। বেঁচেছে সে, বাঁচলুম আমি। মানুষ অমর নয়। দুঃখও জীবনে কাম্য নয়। সুতরাং ভোগার চেয়ে মরা ভাল। বেঁচে গেল মা।

'তার' পেয়ে বাড়ী যাই। কয়েক ঘণ্টার জন্য ছেলের মুখ দেখে যেতে পারে নি। মৃত্যুকালে বিধাতার নাম না নিয়ে সে জপমালা করেছিল ছেলের নাম।

গ্রামের প্রবীণ, বিজ্ঞ, বিচক্ষণেরা আসিয়া পরামর্শ

দিলেন—তুমি একমাত্র পুত্র, বোনেরাও তো কেউ সামনে নেই, 'ষোড়শ' করতে হবে। 'ষোড়শ' জানিস্ তো? আমি বল্লাম, "আমার ক'লকাতা ফিরবার টাকা ছাড়া একটা পয়সাও নেই।" শুনে খানিকক্ষণ সবাই রইল চুপ করে। তারপর কেউ বললে, টাকার দরকার হয় আমরা ব্যবস্থা করছি, সমাজের সমস্ত ব্রাহ্মণদের না খাওয়ালে মায়ের প্রতি তোমার কর্ত্তব্যের ত্রুটি হবে। মুখুজ্যে খুড়ো টাকা দিতে চাইলে, দেড় শ, দু'শ, যত চাই—অবশ্য আমায় বাড়ী বন্ধক রাখতে হবে। আমি গররাজী। অগত্যা তাহারা যেন-তেন-প্রকারেণ দ্বাদশজন ব্রাহ্মণ-ভোজনে নেমে এল। আমি তাতেও নারাজ। শুনে সবাই চোক তুলল কপালে।

তপেশ, আমি মায়ের শ্রাদ্ধ করি নি। মাথাটাও ন্যাড়া করি নি। এজন্য আমার অনুতম অনুশোচনা নেই। রোগ-শয্যায় যার ডাক্তার ডাকতে দু'ট টাকা জোটে নি মৃত্যুর পরে তার শ্রাদ্ধের লৌকিক অনুষ্ঠানে নিতান্ত কম করেও কুড়ি-পঁচিশ টাকাই বা কেন খরচ করতে যাব? আজও গ্রামের লোক সকাল-সন্ধ্যা আমার মুণ্ডপাত করছে। করুক। দুদিনেই জিভ তাদের ব্যথা হয়ে যাবে। সারা দুনিয়া আজ কোটিকণ্ঠে ছি-ছি বলে ধিক্কার দিলেও মা আমার ওপার থেকে ছেলেকে তার আশীর্ব্বাদই করবে। মায়ের মৃত্যুর জন্য শোক করি না—আমি মানুষ। কিন্তু তপেশ, মা আমার বেঁচে থেকেও বড় কষ্ট পেয়ে গেছে।

ঘরখানি বিক্রি করে দিলাম। এ সস্তার বাজারেও আড়াই শ টাকা পেয়েছি। বাবার আমলের ঘর।

এখন কিছুদিন নিশ্চিন্ত! মা মরে গিয়ে আমাকে আড়াই শ টাকা দিয়ে গেছে। একটা ছোটখাট দোকান খুল্‌বার ক্যাপিটাল।

আপাততঃ বিহার ভূমিকম্পে। এর পর কোথাও বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী হ'লে আবার কিছুদিন নিশ্চিন্তে কাটান যাবে। হাতে আছে আড়াই শ !!

ভাল আছি। কেমন আছিস? তোর বৌকে আমার নমস্কার জানাস্—আর বলিস্ সেবার শুধু চা খেয়ে এসেছি ব'লে তিনি দুঃখ করেছেন, এবার কলকাতা গিয়ে তোদের ওখানে উঠব—অবশ্য দু'চারদিনের জন্য। হজমশক্তি এখনো পুরোপুরি আছে।

ইতি—তোমাদের প্রীতিমুগ্ধ কমলাক্ষ

চিঠি শেষ করিয়া তপেশ আর একটা সিগারেট ধরাইল।

নারায়ণ ঘরে ঢুকিয়া কহিল, "বাবু, মুখ-হাত ধোবেন না?—খাবার তৈরী হয়েছে।"

'খাব'খন। তুই আগে ঐ বিছানাটা চৌকির উপর পেতে দে।"

"ওটা—ও যে—"

তপেশ রুক্ষস্বরে কহিল, "পেতে দে। ও-বিছানা পুরী থেকে কলকাতা এনেছি বুঝি একজিবিসানে পাঠাতে?"

নারায়ণ বিছানা পাতিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

তপেশ ঘড়ি দেখিল। আটটা পনের। আর পনের মিনিট। আজ সোমবার। গেল সোমবার সাড়ে আটটায় মঞ্জুলী এই পৃথিবীর বুকে তাহার শেষ নিঃশাসটুকু রাখিয়া গেছে।

তপেশ উঠিয়া সুটকেস্ খুলিল। বাহির করিল তাহার অসমাপ্ত "দেখা-অদেখা"—বাহির করিল মঞ্জুলীর শেষ-না-হওয়া টেবিল-ক্লথ।

কোণ হইতে স্পিরিটের বোতলটা লইয়া আসিল। তার পর মেঝেতে মঞ্জুলীর টেবিল-ক্লথ পাতিয়া তাহার উপর "দেখা-অদেখার" পাতাগুলি ছিঁড়িয়া ছড়াইয়া দিল। তাহার শেষ অধ্যায় লেখা যে এখনো বাকী!

এ কি করিতেছে তপেশ! তাহার মাথায় চাপিয়াছে খুনীর নিষ্ঠুর উন্মাদনা, আত্মহত্যাকারীর সজ্ঞান নির্ব্বুদ্ধিতা।

মঞ্জুলী তো মরে নাই! তপেশকে এখন বুঝাইবে কে? —সে নিজেই তো জানে, মঞ্জুলীর নশ্বর যা সে ভস্ম হইয়া গেছে পুরীর সমুদ্র-সৈকতে, আর তাহার শাশ্বতকে তপেশ ধরিয়া রাখিয়াছে ঐ 'দেখা-অদেখা'র পাতায় পাতায়—অক্ষয় অক্ষরে চিরকালের জন্য। তপেশ দিনে দিনে রূপ দিয়াছে তাহার অনশ্বরী প্রেয়সীর। মঞ্জুলীর আথাল-পাথাল আঁখির পাথারে কতদিনই না কবি তপেশ ডুবুরী হইয়া ডুব দিয়াছে রহস্য সন্ধানে। তুলিয়া আনিয়াছে কত না মুক্তা, গাঁথিয়াছে সে বাণীর বেণীর এক একটি অম্লান মালিকা। 'দেখা-অদেখা'র গায়ে মাখান মঞ্জুলীর তনু-সুধার অনুলেপন, আছে তার গহিন মনের গোপন সুরের অনুরণন। মঞ্জুলী কি মরে? ও-সুরের যে সমাধি নাই!

পাশের বাসার বৌ-টি রোজ এ-সময় গান গায়। সম্মুখের ঐ জানালা হইতে সুর উঠুক আজ :

আজি কি সব-ই ফাঁকি ?
সে কথা কি গেছ ভুলে ?

ভোলে নাই। তপেশ-ও পাল্টা জবাবে গাহিয়া উঠিবে :

মোর সুন্দর কারাগারে বন্দী,
তাই বাঁশী মোর হ'ল বিষরন্ধ্রী।

গাহিবে সে। চীৎকার করিয়া গাহিবে। এমন ভয়াল ভীষণ সঙ্গীত যেন সামনে একটা মাইক্রোফোন থাকিলে সে চীৎকারে সারা দুনিয়ার কাণে তালা লাগে।

অভিমানী আজ নিজের উপর প্রতিশোধ লইতে চলিয়াছে। কুটীল হিংস্র অভিযোগ। আজ বুঝিয়াছে, চোখে-দেখা বাহিরকে অতিক্রম করিয়া যে অতৃপ্ত মন ইহার অন্তর্লীন সুরের সন্ধানী, তাহার পথ আটকাইয়া থাকে কঠিন বস্তুর স্তূপ। সত্যকে ধরিতে সময় দেয় না। সুন্দরকে ডাকিতে সুযোগ হয় না। শিব তাই আজ উন্মাদ। ধূর্জ্জটির মত অকালমৃত্যু আজ সতীদেহ স্কন্ধে লইয়াছে। বিষ্ণুর মত তপেশ-ও মঞ্জুলীকে খান খান করিয়া কাটিয়া কাটিয়া ফেলিয়া দিবে গ্রামে, নগরে, কুটীরে কুটীরে। ছড়াইয়া দিবে লক্ষ কোটি পীঠস্থানে—সিমলা ষ্ট্রীটের খোলার ঘরে, বস্তিতে বস্তিতে, বিশুষ্ক মাতৃস্তন্যে, ফুটপাতের ক্ষুধিত আস্তানাগুলির রোরুদ্যমান শিশুদের মুখে। আর নিজেকে তপেশ ঐ—

রা—ম রাম, নারা—য়ণ, রাম, রা—ম, না······

তপেশদের তেতলা বাড়ীটার সম্মুখের প্রশস্ত রাস্তায় গুটিকয়েক অ-বাঙ্গালী বিকলাঙ্গ সমস্বরে ভিক্ষা-গীতি গাহিয়া চলিয়াছে। তপেশ বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। দ্বিতল ও ত্রিতলের দিকে তাহারা কাতর দৃষ্টি মেলিয়া মন মন হাত নাড়িতেছে। অভিনয়ে তাহারা পাকাপোক্ত। দর্শক-দেরও অশ্রুধারা কার্পণ্য দেখিয়া দেখিয়া গা-সওয়া হইয়া গেছে।

ঘরে ফিরিয়া তপেশ ডাকিল, "নারায়ণ!"

খানিক পরে নারায়ণ আসিল।

"ওরা কি চায়?"

"পয়সা।"

"ঝুটে!"

"চাল দিলেও নেয়।"

"বলে দে—এখানে কিছু মিলবে না। হতচ্ছাড়ারা! কেঁদে কেঁদে চায় কেন? দাবী করতে জানে না? চীৎকার করতে?—হাঁকিয়ে দে।"

নারায়ণ চুপ করিয়া চলিয়া গেল। ভিখারীদের কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে মিলাইতেছে—রাম—রাম—নারায়ণ!

'দেখা-অদেখা'র পাতাগুলি আর একবার ইতস্ততঃ ছড়াইয়া তপেশ বোতল হইতে ঢালিল আর একটু স্পিরিট। তারপর বিছানায় আসিয়া সিগারেট টানিতে লাগিল।

কবি তপেশ মরিতেছে!

আজ হইতে তপেশ বীণা ফেলিয়া হাতে লইবে দূরবীণ। সুদূর অতীত হইতে অদূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত দৃষ্টির তীব্র আলোপাত করিবে। বর্ত্তমানের বুকে লাগাইবে অনুবীক্ষণ। এত সাধের সাজান সংসারের নাড়ী-নক্ষত্র তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিবে। যদি জানে, এই কায়েমী সর্ত্ত এক অলঙ্ঘ্য সত্য, তবে সে নিজেরই বাষ্পবেগে বেলুনের মত উর্দ্ধে উঠিয়া ফাটিয়া লুটিয়া মাটিতে পড়িবে। তবু সে মানিয়া লইবে না, —আপোষ করিবে না। শেষ পর্য্যন্তও বলিয়া যাইবে, এ জগৎ তার যোগ্য নয়। সে ইহার চেয়ে অনেক সুন্দর—অনেক!

বিদায়! কবি তপেশ লাহিড়ীর বিদায়। উদয় আজ আর এক তপেশের। কমলাক্ষর সঙ্গে ঝগড়া করিতে যাইয়া একদিন মনের কোণে যে একটু চিড় ধরিয়াছিল আজ তাহা ফাটিয়া দু'ভাগ হইয়া গেছে। ওপারের অন্ত্যেষ্টি করিবে আজ 'দেখা-অদেখা'র শেষ অধ্যায়ে! সাহিত্যের জন্যই সাহিত্যিক তপেশের মৃত্যু! সম্মুখে পুনর্জন্ম। লিখিবে সে, আবার লিখিবে, আরো লিখিবে। কিন্তু আর ফসলের গান নয়, পলিমাটির কথা। আসন্ন ভবিষ্যতের বর্ত্তমানের কঙ্কালে সে আজ একটি প্রয়োজনের পাঁজর।

তপেশ মুখ হইতে ধোঁয়া ছাড়ে আর ভাবে, মঞ্জুলীর

মৃত্যু কি সুন্দর। সে যে এখন বিশ্বগ্রাসী! অভিশাপ আজ আশীর্ব্বাদ!……

আট্‌টা কুড়ি! আর দশ মিনিট! সকাল সাড়ে আটটায় মঞ্জুলীর প্রাণত্যাগ হইয়াছে।…সেদিনের প্রভাতখানি যদি এমনি আলোয় আলোয় হাসিয়া উঠিত দিক-দিগন্তে। মঞ্জুলী দু চোখ ভরিয়া শেষ দেখা দেখিয়া লইত, মাতা মৃত্তিকার ঐ হাস্যোজ্জ্বল মূর্ত্তিখানি। জল, কত জলই না সেদিন আকাশ ভাঙিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িল সারা সকালটা।

সিগারেট ফেলিয়া দিয়া তপেশ পাশ ফিরিয়া শুইল। মঞ্জুলীর বালিশ!… ঐ যে মাঝখানে তাহার মাথার দাগ এখনো স্পষ্ট! তপেশ বালিশটায় খানিকক্ষণ মুখ গুঁজিয়া রহিল।…তাহার চুলের এতটুকু গন্ধও কি থাকিতে নাই!

তপেশ বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। চোখে পড়িল, আলনার উপর মঞ্জুলীর একটা ছেঁড়া পুরানো ব্লাউস্। …পুরী যাইবার সময় ভুল করিয়া সে ফেলিয়া গেছে, অথবা হয়তো ছেঁড়া বলিয়াই রাখিয়া দিয়াছে।

তপেশ ব্লাউসটায় মুখ মুছিল। আঃ! দেহের একটুখানি স্বাদ-ও যে অবশিষ্ট নাই!…

না—না, ও-সব আর না। সংসারত্যাগীর মত সে-ও হইবে নির্ম্মম সুন্দর! পিছনের কোন চিহ্ন সঙ্গে লইবে না।

ঘড়ি দেখিল তপেশ। সাড়ে আট্‌টা বাজিতে কয়েক সেকেণ্ড বাকী আছে। তাহার গ্রন্থের শেষ অধ্যায় লেখাও বাকী!

টেবিলের উপর হইতে দেশলাই লইয়া তপেশ ঘড়ির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।…

সাড়ে আট্‌টা !!

দপ্ করিয়া পাতাগুলি জ্বলিয়া উঠিল!

তপেশ চেয়ারটা একটু দূরে টানিয়া নিল। বসিয়া পড়িয়া নিষ্পলক চোখে লেলিহান অগ্নি-শিখার দিকে তাকাইয়া আছে। দৃষ্টি তাহার চলিয়া গেছে ৩১০ মাইল দূরে পুরীর সমুদ্র-সৈকতে।… বালুতটে ঐ যে একখানি চিতা জ্বলিয়া উঠিয়াছে।… লক্‌লক্ করে দংশন-লোলুপ অগ্নি-নাগিনীরা!…শেষকালে মঞ্জুলীর ঐ সব-ভোলানো চোখ-দুটীতেও যে আগুন ধরিয়া গেল !!

শেষ

আশ্রয় ও আশ্রিত

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

হুজুগে নাচন বানের জল,
দু'দিনের পরে হারায় বল।

হাতী ভেসে যায় বানের জলে,
পুঁঠি চিরকাল উজান চলে।



নমস্কার

রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

আমার নমস্কার জানাতে চাই আপনাদের। সেটা শুধু একটি কথা বল্লেই অবশ্য হ'তে পারে। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালীর স্বভাব একটু বেশী কথা কওয়া। আপনারা সভা সমিতিতেও হয়ত লক্ষ্য ক'রে থাকবেন যে অনেক সময় বক্তৃতার সূত্র দ্রৌপদীর বস্ত্রের মত অফুরন্ত মনে হয়।

এইটুকু ভূমিকা করেই আপনাদের নিষ্কৃতি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু শুধু যদি বলি 'নমস্কার', তা হ'লেই কি আপনারা খুসী হবেন? কারণ—বাক্যের সঙ্গে কার্য্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না থাক্‌লে আপনারাই আমাকে হয়ত বাক্য-বাগীশ বলে মনে করবেন। যদি বলেন যে শুধু কথা কেন? —দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে দিন, লেঠা চুকে যাক। কিন্তু আমি একটু আধটু বৈষ্ণব ভাবাপন্ন, আমার মনে হয় হাত কপালে ঠেকানোতে ঠিক 'নমস্কার' হয় না। মাথা নোয়ানো যদি না হ'লো, তবে নমস্কারের নমনীয়তা গেল দূরে, রইল একটা বৃথা কাবের ঘটা। এই কারবারের মধ্যে কিছু কারিগরি থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু তেমন কারিগর হওয়া চাই। এর মধ্যে কারও যদি আবার কারসাজি থাকে, ত নমস্কারের অর্থ একেবারেই পরিষ্কার হয় না। বৈষ্ণবের মতে দেহ কেন, সমস্ত শরীরকে অবনত করে প্রণাম করতে হয়। তার নাম দণ্ডবৎ। দণ্ডবৎ শব্দের মূলগত অর্থ যষ্টিব মত। সুতরাং আমি যদি এখন আপনাদের সামনে 'পপাত ধরণীতলে' হই, তাহলে আপনারা মুখে আমার 'বিনয়তা'র প্রশংসা করলেও মনে মনে আমার সুনীতি বা sanityর সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারবেন না। কেউ কেউ হয়ত ভাবচেন যে আমি নমস্কার ও প্রণামের মধ্যে অনর্থক গোলযোগ পাকিয়ে জলযোগে বিলম্ব ঘটাচ্ছি। কিন্তু মোটেই তা নয়।

প্রণাম বলতে প্রকৃষ্টভাবে নমস্কার—সেটা আমার মাথায় প্রবেশ করতে দ্বিধা করচে না। কিন্তু নমস্কার বলতে যে আমরা প্রণামের একটা dilution বুঝি, তা নয়। বরং শাস্ত্র প্রমাণ অনুসারে নমস্ক্রিয়াকেই mother tincture বলে মনে করা যেতে পারে। কেন না সংস্কৃতে আমরা নমো নমঃ কথাই ব্যবহার করি। 'নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।' 'নমো নমস্তেহস্তু সহস্রকৃত্বঃ'—আপনাদের কাছে চণ্ডী এবং গীতা পাঠ করে আমি প্রমাণ করতে চাই যে প্রণাম অপেক্ষা নমস্কার কোনও অংশে কুল-মর্য্যাদায় হীন নহে। কিন্তু ব্যবহারে অবশ্য অন্যরূপ; আমরা গুরুদেবকে প্রণামী দিয়ে প্রণাম করি—আর অন্য সকলকে শুধু নমস্কার করে বিদায় করি। কেউ কেউ যখন তাতেও না সন্তুষ্ট হয়ে মুক্ত দরজার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে প্রস্তুত হন, তখন মুখে না বললেও অন্তরে অন্তরে অর্দ্ধচন্দ্রের চিত্র চিন্তা করি। একবার বল্‌লাম নমস্কার, আবার বললাম নমস্কার, তাতেও যদি কেউ গমন করতে পরাঙ্মুখ হন, তাহলে অর্দ্ধচন্দ্র ব্যতীত আর কি কল্পনা করা যায়?

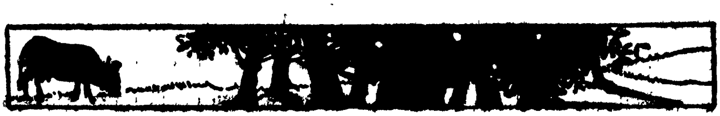
তাহলে দাঁড়াচ্চে এই যে পদস্থ অ-পদস্থ উভয়পক্ষেই নমস্কার প্রযুক্ত হতে পারে। কাজেই নমস্কার ব্যাপারটি একটি জটিল রহস্য হয়ে দাঁড়াচ্চে। সুতরাং চট্ করে এর একটা ব্যবস্থাপত্র দিয়ে দেওয়া চলে না। কেউ নমস্কার বললেই হ'ল না, একবার একটু তাকিয়ে দেখা দরকার, একটু চক্ষুকর্ণ খুলে সমঝে বুঝে চলা আবশ্যক—কি ভাবে কে নমস্কার করে ফেলচে সেইটে জিজ্ঞাস্য হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের বন্ধুবর হয়ত বলবেন বাপু, ওসব হাঙ্গামা কেন করো। একবার হাতখানা বাড়িয়ে দেও, মর্দ্দন করে চলে যাই। ইংরেজদের আমরা অনুকরণ করেই মানুষ হয়েচি সত্য, সুতরাং এ শুভ প্রস্তাবে আমার কোনই আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু ঐ মর্দ্দন কথাটা একটু আশঙ্কাজনক। হস্তে যদি ওটা বরাবর নিবদ্ধ থাকে, ত ভাবনার কারণ নেই। কিন্তু একটু উপরে উঠ্‌লেই যে বিপদ্—কর্ণযুগল বাঁচানো যে কত কঠিন, সেকথা ত সংসারে অস্বীকার করা যায় না। আর ভেবে দেখুন, ইংরেজি কথাটা Hand shakeএ কি করে মর্দ্দনের আমদানী হলো, সেইটেই আশ্চর্য্যের বিষয়। বিশেষতঃ ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের

যেরূপ ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্পর্ক তাতে আরো ঐ আশঙ্কাটা ঘনীভূত হয়ে ওঠে।

কর-মর্দ্দনে যে কোনও পরোয়া নেই, আপনারা তা মনে করবেন না। স্নেহের আধিক্যের অনুপাতে মর্দ্দনের দৃঢ়তা বাড়ে। আমাদের মত হাত যাদের তত দৃঢ় নয়, তাদের করমর্দ্দন থেকে শত হস্ত দূরে থাকা ভাল। কারণ দেখেছি কখনও এই মর্দ্দন রীতিমত পীড়নে পরিণত হয়—বলা বাহুল্য পাণি-পীড়ন বলতে যে স্নেহের সম্পর্ক বুঝায়, তার সঙ্গে কর-পীড়নের কোনও সুদূর কুটুম্বিতাও নাই। তারপর ওদের মধ্যেও নত হওয়ার প্রথা বড় কম নয়। ওরা অবশ্য তাকে নমস্কার বলে না, বলে 'Bow' করা। Bow করা ইচ্ছা মাত্রেই হয় না। এর মধ্যে যথেষ্ট art আছে এবং শিক্ষা করতে রীতিমত বেগ পেতে হয়। শরীর হয়ত নোয়ানো গেল, কিন্তু মাথা যত degree হেলানো উচিত, তা হয়ত হলো না। একটু বেশী যদি নুয়ে যায়, তাহলে লোকে বলবে আপনার মেরুদণ্ড নেই। আপনি Back-boneless invertebrate জীব; এরূপ সুযশ কেউ প্রার্থনা করেন না নিশ্চয়ই। কবি বোধ হয় সেই লজ্জায় বলে ফেলেছেন—আমার মাথা নত করে দাও ইত্যাদি। নিজের চেষ্টায় ত হলো না, এখন আর কারও শরণ গ্রহণ করে যদি মাথাটা একটু নীচু হয়। Bow করাটা সাধারণতঃ রমণীর কাছেই হয়ে থাকে—সেখানে মাথা হেঁট করতে কারও কোনও আপত্তি হতে পারে না।

ইটালীর প্রথাটি আমার মন্দ লাগে না—তারা ডান হাতটি তুলে সম্ভ্রম দেখায়। ঐ হলো তাদের নমস্কার। ফাসিষ্ট আমলে হাতখানাকে বোধহয় কিছুটা নামিয়ে এনেছে। আমাদের দেশে হাত ঊর্দ্ধে তুলে আশীর্ব্বাদ করা হয়। এমন কি কাদম্বরীতে শুকপাখী ডান পা-টা তুলে রাজা শূদ্রককে আশীর্ব্বাদ করেছিল সেকথা বোধহয় আপনাদের স্মরণ আছে। বেচারীর হাত নেই বলে পা তুলেছিল—আমরা সে রকম করলে দণ্ডবিধির অধিকারে পড়বো। যা হোক ইটালীর নমস্কারের ধারাটা জার্ম্মাণীও অনুকরণ করেছে। তারাও দেখি হাত তোলে। ইটালী আর জার্ম্মাণী সকলকেই হাত তোলে—অর্থাৎ এই মারে ত এই মারে! আমাদের দেশে হাত তোলাটা বড় ভাল না। আর আমরাও সে বিষয়ে সতর্ক—চট্ করে কারও গায়ে হাত তুলি নে। বরঞ্চ আবশ্যক হলে পা দুটো তাড়াতাড়ি তুলে চম্পট দিতে পারাই সারনীতি বলে মনে করি। তবে একটি কথা এই—ওদেশে হাত তোলাটা এত রপ্ত হয়ে গেছে যে এজন্য ওদের আর ভাবতে হয় না। ইটালী হাত তুলতে তুলতে মারলে ছোঁ—আর আবিসিনিয়া মুছে গেল পৃথিবীর ম্যাপ থেকে। জার্ম্মাণীও অমনিতরো একটা দাঁও খুঁজছে। সেই জন্য হাত তোলার কুচ-কাওয়াজটা জোর চলছে। জার্ম্মাণীতে আর একটু নতুনত্ব এই যে তারা 'হাইল হিটলার' বলে হাত তোলে। এটা অবশ্য হিটলারের প্রতি সম্মানের জন্যই। আমরাও ওরকম করে থাকি—বলি মহাত্মা গান্ধীজিকি জয়, সুভাষজিকি জয়। কিন্তু তফাৎ এই—গান্ধীজি অথবা সুভাষজি কখনও বলবেন না যে মহাত্মা গান্ধীজিকি জয়, কি সুভাষজিকি জয়। হিটলার নিজে বলেন 'হাইল হিটলার'। এই হচ্চে ওদেশের বাহাদুরি। একে নমস্কারই বলুন—আর বন্দনাই বলুন, আমাদের অতি ভক্তির সন্দেহসঙ্কুল পন্থা থেকে অনেক ভাল। আর ওদের একটা সুবিধে এই যে আমাদের যেমন সম্ভাষণের সারিগামা সাধ্‌তে হয়, ওদের তেমন কিছু নেই। এই ধরুন না আমরা ছোটকে করি আশীর্ব্বাদ, সমানকে করি নমস্কার—আর বড়কে করি প্রণাম। এ সারিগম ওদের মধ্যে নেই। ওরা সকলকেই এক ঢিলে সাবাড় করে দেয়। বিলেতে কারও সঙ্গে দেখা হলে তেড়েমেড়ে হাতটা কসে ধরলেই হ'য়ে গেল। আমাদের মতো পৈতে ধরে আশীর্ব্বাদও নেই, মাথায় হাত দিয়ে রক্ষামন্ত্র পড়াও নেই। কখনও কখনও ওদের দেশে ললাট চুম্বনের যে আয়োজন দেখা যায়, সে আমাদের আলিঙ্গনের মত। স্নেহের একটু মাত্রা বুঝায় মাত্র।



দৃষ্টিহীনতার প্রাকৃতিক চিকিৎসা

শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

কিছুদিন পূর্ব্বে চশমা এ দেশের ছেলেদের একটা অলঙ্কার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বর্ত্তমানে অলঙ্কার হিসাবে চশমার ব্যবহার প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু দৃষ্টিহীনতার অপরিহার্য্য প্রতিকার হিসাবে চশমার ব্যবহার এখনও সর্ব্বত্র সমান প্রচলিত রহিয়াছে। আমরা অনেক সময় দেখি, ষোল বছরের ছেলে-মেয়েরা চশমা ব্যবহার করে। কখন কখন তাহা অপেক্ষাও কম বয়সের ছেলে-মেয়েদের চোখে চশমা দেখা যায়।

যাহারা চশমা ব্যবহার করে, চশমার ব্যবহারের জন্য তাহাদের দৃষ্টি যে অক্ষুণ্ণ থাকে, তা নয়। অনেক সময়েই আমরা দেখি কিছু দিন চশমা ব্যবহার করার পর সেই শক্তির কাচে আর সে ভাল দেখিতে পায় না। তখন সে আবার চশমা বিক্রেতার কাছে যায়। তিনি তাহাকে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন কাচ পরাইয়া দেন। ক্রমশঃ এই ভাবে বেশী শক্তির কাচ আবশ্যক হয়। শেষে কোন কোন সময় এমন অবস্থা হয় যে কোন শক্তিসম্পন্ন কাচখণ্ডেই রোগী আর দেখিতে পায় না।

প্রকৃতপক্ষে বহু ডাক্তারের ইহাই সুদৃঢ় অভিমত যে চশমার দ্বারা দৃষ্টিশক্তির স্থায়ী উন্নতি হয় না। চশমার সাহায্যে লোক কিছুদিনের জন্য হয়তো অপেক্ষাকৃত ভাল দেখিতে পায়, কিন্তু পরিণামে ইহার দ্বারা বিশেষ ক্ষতি হয়।

এই জন্য চশমা ব্যতীত দৃষ্টিশক্তির উন্নতি সম্ভব কিনা, সে সম্বন্ধে পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে বহু লোক অনেক দিন পর্য্যন্ত যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের দীর্ঘদিনের গবেষণার ফলে দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করিবার বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সকল পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া বহুলোক দৃষ্টিহীনতা ও চক্ষুরোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

আমেরিকার একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার এই নূতন পদ্ধতিতে সহস্র সহস্র লোকের দৃষ্টিহীনতা আরোগ্য করিয়াছেন। যাঁহারা বৎসরের পর বৎসর চশমা ব্যবহার করিয়াছেন এবং যাঁহাদের বদ্ধমূল ধারণা হইয়া গিয়াছিল যে চশমা ব্যতীত জীবনে তাঁহারা আর কখনো দেখিবেন না, তাঁহারাও ঐ পদ্ধতি অল্প কয়েকদিন মাত্র অনুসরণ করিয়া চশমা ব্যতিরেকে অতি সূক্ষ্ম অক্ষর পড়িতে সমর্থ হইয়াছেন।

এই পদ্ধতিগুলির ভিতর চক্ষুর বিশেষ কয়েক প্রকার ব্যায়াম অন্যতম। যেমন দেহের অন্যান্য অঙ্গের জন্য ব্যায়াম আবশ্যক এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যায়ামের দ্বারা সবল হয়, তেমনি চক্ষুরও ব্যায়ামের আবশ্যকতা আছে এবং যখন নিয়মিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চক্ষুর ব্যায়াম করা যায়, তখন চক্ষুও যথেষ্ট সবল হয় এবং চক্ষু সবল হইলে দৃষ্টিহীনতা আপনি অন্তর্হিত হইয়া যায়।

এই সকল ব্যায়াম সকালে ও সন্ধ্যায় এবং সম্ভব হইলে মধ্যাহ্নেও নিতে হয়। ইহাতে বিশেষ সময়ের আবশ্যক হয় না এবং পরিশ্রমও কিছুই নাই। দাঁড়াইয়া বা বসিয়া এই ব্যায়াম গ্রহণ করিতে হয়। ঘরের দেয়ালের সঙ্গে পিঠ লাগাইয়া লইলে খুব ভালভাবে চক্ষুর ব্যায়াম নেওয়া যাইতে পারে।

মাথা না নড়ে এই ভাবে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া বাঁ দিকে চক্ষুর দৃষ্টি কতকদূর বামদিকে প্রসারিত করিয়া আবার ডান দিকে প্রসারিত করিতে হয়। এই ভাবে ১২ বার দ্রুত ব্যায়াম করা আবশ্যক।

ইহার পর যতদূর ঊর্দ্ধে ও নিম্নে সম্ভব, মাথা স্থির রাখিয়া ১২ বার দৃষ্টি চালিত করিতে হয়।

তৎপর চক্ষুকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া বামদিকে তির্য্যক্‌ভাবে চালিত করিয়া দৃষ্টি নামাইয়া আনিয়া আবার ডানদিগের নিম্নকোণে প্রসারিত করিতে হইবে। ইহা ১২ বার করিয়া আবার ঠিক বিপরীত ভাবে দেয়ালের দক্ষিণ কোণ হইতে বাম কোণে ১২ বার দৃষ্টি পরিচালিত করিতে হয়।

ইহার পর ১২ বার চক্ষু জোরে বন্ধ করিয়া আবার জোরে খুলিতে হইবে।

কিছুদিন এই ব্যায়াম করার পর চক্ষুর মাংসপেশীগুলির নমনীয়তা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এই ব্যায়াম কিছুদিন করিলেই চক্ষুর বিভিন্ন অংশ যথেষ্ট সবল হইবে এবং প্রণষ্ট দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিবে।

যাহাদের বয়স আটত্রিশ অতিক্রম করিয়াছে, তাহাদের প্রতিদিন এই ব্যায়াম করা উচিত। যাহাদের দৃষ্টিশক্তি খারাপ, তাহারাও অবশ্যই প্রতিদিন এই ব্যায়াম গ্রহণ করিবেন। তাহা হইলে তাহাদিগকে আর কখনও চশমা ব্যবহার করিতে হইবে না।

কিন্তু যাহাদের দৃষ্টিশক্তি সত্য সত্য খারাপ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের রীতিমত চিকিৎসা করা প্রয়োজন। প্রণষ্ট দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া আনিতে ঔষধ ব্যবহারের আবশ্যক হয় না। চক্ষুরোগের কতকগুলি ঔষধ চক্ষুর স্নায়ু ও মাংসপেশীগুলিকে কিছু সময়ের জন্য উত্তেজিত করিয়া অতি অল্প সময়ের জন্য দৃষ্টিশক্তিকে ভাল করিতে পারে, কিন্তু তাহার পরই উহাদের ভিতর অবসাদ নামিয়া আসে এবং রোগীর দৃষ্টিশক্তি অপেক্ষাকৃত খারাপ হইয়া যায়।

দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া আনিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক উপায় সূর্য্যকর চিকিৎসা। প্রতিদিন সকাল বেলা যখন সূর্য্যের তেজ কম থাকে, তখন চক্ষু বন্ধ করিয়া সূর্য্যকর যাহাতে চোখের উপর সোজাসুজি ভাবে পড়ে, এই ভাবে বসিতে হয়। এই ভাবে দশ মিনিট হইতে ত্রিশ মিনিট বসা চলে। বসিবার পূর্ব্বে মাথাটা একবার ধুইয়া লইতে হয়। দশ মিনিটের অতিরিক্ত সময় থাকিলে দশ মিনিটের পর মাথার একটা

ভিজা গামছা জড়াইয়া লওয়া উচিত। তাহা হইলে সূর্য্যকরে কোনরূপ অনিষ্ট হয় না। কিন্তু সূর্য্যকর গ্রহণ করিবার সময় যদি কোনরূপ কষ্ট বোধ হয়, তাহা হইলে সেই দিনের জন্য তাপ বন্ধ করিয়া দিতে হয় এবং পরের দিন হইতে অপেক্ষাকৃত কম সময় তাপ লইয়া ক্রমশঃ সময় বর্দ্ধিত করিতে হয়।

ইহার পরই চক্ষু ধৌত করা আবশ্যক। চক্ষু মেলিয়া রাখিয়া হাতে জল লইয়া বার বার চক্ষু ধোয়া যাইতে পারে; কিন্তু চক্ষু-ধৌতি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয় আই-কাপ (E\e-cup) দ্বারা। সকল ডাক্তার-খানাতেই ইহা পাওয়া যায় এবং মূল্যও আট দশ পয়সা মাত্র। আই-কাপে শীতল জল ভরিয়া চক্ষুর সঙ্গে লাগাইয়া কুড়ি হইতে ত্রিশ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত বার বার তাহার ভিতর চক্ষু খুলিতে ও বন্ধ করিতে হয়। সূর্য্যকর গ্রহণ করিবার পর সর্ব্বদাই শীতল জলে এইরূপে চক্ষু ধৌত করা কর্ত্তব্য।

যখন সূর্য্যকর নিমীলিত চক্ষুর উপর পতিত হয়, তখন চক্ষুর রক্তবাহী শিরাগুলি প্রসারিত হয়—তখন ঐ দুর্ব্বল শিরাগুলির ভিতর রক্ত ছুটিয়া আসে। রক্ত যেখানে যায়, সেখানেই দেহ গঠনের মশলা লইয়া যায়। তাহার পরই যখন চোখে শীতল জল প্রয়োগ করা হয়, তখন ঐ রক্তবাহী শিরাগুলি সঙ্কুচিত হয়। কারণ উত্তাপ প্রসারিত করে এবং শৈত্য সঙ্কোচিত করে। যখন ঐ শিরাগুলি সঙ্কুচিত হয়, তখন রক্ত চক্ষু-গোলকের ভিতর হইতে অনেক দূষিত পদার্থ বহন করিয়া লইয়া যায়। এই জন্যই এই পদ্ধতিতে অল্প দিনেই চক্ষু আবার চিরস্থায়ীভাবে সতেজ হইয়া উঠে।

চক্ষু ধৌত করিবার পর, দুই মিনিট হইতে পাঁচ মিনিট পর্য্যন্ত হাতের তালুর দ্বারা চক্ষু-গোলক দুইটি ঢাকিয়া রাখিতে হয়। এমনভাবে ঢাকা আবশ্যক যেন চক্ষুতে কোনরূপ ব্যথা না লাগে এবং কোনরূপ আলো না দেখা যায়। হাতের আঙুল দিয়া চক্ষু ঢাকিলে চক্ষুতে বেদনা লাগিবে। কিন্তু হাতের তালু দ্বারা চক্ষু আবৃত করিলে চক্ষুতে কোনরূপ বেদনা বোধ হয় না। আমাদের যখন চোখে কোনরূপ অস্বস্তি বোধ হয়, তখন স্বভাবতঃই আমরা হাত দ্বারা চক্ষু আবৃত করি। ইহা করিলে চক্ষু একটু বিশ্রাম পায় এবং তখনই আমরা আরাম বোধ করি। এই প্রক্রিয়া কিছুদিন করিলে দৃষ্টিশক্তি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে!

চোখ বন্ধ করিয়া পাঁচ মিনিট বসিয়া থাকিতে যদি কেহ অসুবিধা বোধ করেন, তবে একটা টেবিলের উপর একটা বালিশ রাখিয়া চক্ষু হাতের তালুর দ্বারা চাপিয়া তাহার উপর মাথা রাখিতে পারেন। এই সময় রোগী মনকে সম্পূর্ণ চিন্তাশূন্য করিয়া যদি কোন গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ চিন্তা করিতে পারেন তবে খুব ভাল হয়।

যাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা প্রতিদিন এই সকল প্রক্রিয়া করিয়া কতক্ষণ পর্য্যন্ত দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা করিবেন। চোখে দেখিতে বার বার চেষ্টা করিয়াই রোগী দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইবেন। যাঁহাদের খর্ব্বদৃষ্টি (Myopia) তাঁহারা দশ পনের ফিট দূরের জিনিস দেখিতে চেষ্টা করিবেন এবং যাহাদের দূরদৃষ্টি (Hypermetropia) তাঁহারা পুস্তকের অক্ষর স্বাভাবিক ভাবে পড়িতে চেষ্টা করিবেন।

এই প্রক্রিয়ায় ক্ষীণ দৃষ্টি, আংশিক দৃষ্টি, দূর দৃষ্টি বয়োবৃদ্ধি-জনিত দৃষ্টিদোষ, খর্ব্বদৃষ্টি, দ্বিদৃষ্টি এবং দিনকাণা ও রাতকাণা রোগও শতকরা ৯০টি ক্ষেত্রেই সাত আট দিনে আরোগ্য হইতে পারে। যাহাদের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এমন বহুলোকও এই চিকিৎসায় দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছেন।

কিন্তু রোগ আরোগ্য অপেক্ষা রোগ যাহাতে না হইতে পারে, তাহা করাই অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবস্থা। চক্ষুর স্বাস্থ্যনীতি মানিয়া চলিলে বহু প্রকার চক্ষুরোগ হইতে মুক্ত থাকা যাইতে পারে।

নিদ্রাত্যাগের পর প্রতিদিন চক্ষে যে ময়লা সঞ্চিত হয়, নিদ্রাত্যাগ করিয়া প্রথমেই তাহা শীতল জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলা উচিত।

প্রতিবার মল ত্যাগের পর এবং দীর্ঘ সময় লিখিয়া ও পড়িয়া চক্ষু ধুইয়া ফেলা উচিত। তাহাতে চক্ষুর উপর চাপ পড়িবার জন্য কোন অনিষ্ট হইতে পারে না।

কখনো হঠাৎ তীব্র আলোর দিকে তাকাইতে নাই। উহাতে দৃষ্টি-শক্তি অত্যন্ত খারাপ হয়।

অতি তীব্র বৈদ্যুতিক আলোকে অথবা রৌদ্রের ভিতর পুস্তক রাখিয়া পড়াও অবিধি। গাড়ীতে চলিবার সময়, হাঁটিবার সময় অথবা শায়িত অবস্থাতেও পুস্তক পড়া অনুচিত। পড়িবার সময় কখনও চক্ষুর উপর অতিরিক্ত চাপ দিতে নাই। এ জন্য অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে ছাপা পুস্তক সর্ব্বদা বর্জ্জন করা উচিত। যেমন অতিরিক্ত তীব্র আলো পাঠের পক্ষে অবিধেয়, তেমনি মিট্‌মিটে আলোও সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়।

সিনেমা প্রভৃতি দেখিবার সময় আমরা সাধারণতঃ চক্ষু তুলিয়া দেখি; কিন্তু সিনেমা দেখিবার সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ উপায়, চক্ষু না তুলিয়া মাথাটাই তুলিয়া দেখা। তাহাতে চক্ষু খারাপ হইতে পারে না।

যেমন পরিশ্রম করিয়া আমরা সর্ব্বদাই বিশ্রাম করি এবং তাহাতে শরীর ভাল থাকে, তেমনি চক্ষুকে খাটাইলেও মধ্যে মধ্যে তাহাকে বিশ্রাম দেওয়া উচিত। হাতের তালুর দ্বারা চক্ষুদ্বয় মিনিট দুই চাপিয়া রাখিলেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ভাবে চক্ষুকে বিশ্রাম দেওয়া হয়।

চক্ষুতে যাহাতে ধূলা ও বালি প্রবেশ করিতে না পারে এবং ধূম না লাগে তাহার জন্য যথাসম্ভব সতর্ক থাকা উচিত।

কিন্তু চক্ষুরোগকে বিশেষ একটি অঙ্গের রোগ বলিয়া মনে করা একান্ত ভ্রম। চক্ষু দেহের একটা অংশ বিশেষ। আমাদের যে কোন অসুখই হউক তাহা দেহে বিজাতীয় ও বিষাক্ত পদার্থের সঞ্চয় দ্বারাই উৎপন্ন হয়। দেহের রক্ত যখন বিষাক্ত হইয়া উঠে, তখন আমাদের যে কোন অঙ্গই অসুস্থ হইতে পারে। এই জন্য চক্ষু রোগ হইলেও প্রাকৃতিক উপায়ে টিকিৎসা প্রভৃতির দ্বারা দেহের সমস্ত বিজাতীয় পদার্থ দেহ হইতে ঝাঁটাইয়া বাহির করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। যখন দেহ ও দেহের রক্ত-স্রোত দোষ-শূন্য হয়, তখন চক্ষু-রোগ কেন, সমস্ত রোগই অতি সহজে আরোগ্য লাভ করে।

ব্যোমকেশ ও বরদা

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

(৫)

বাড়ীর নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম, জানালা দিয়া কৈলাশবাবু মুখ বাড়াইয়া আছেন। শীর্ণ ফ্যাকাশে মুখ—প্রাতঃকাল না হইয়া রাত্রি হইলে তাঁহাকে সহসা ঐ জানালার সম্মুখে দেখিয়া প্রেত বলিয়া বিশ্বাস করিতে কাহারো সংশয় হইত না।

তিনি আমাদের উপরে আহ্বান করিলেন। ব্যোমকেশ একবার নীচের মাটির উপর ক্ষিপ্রদৃষ্টি বুলাইয়া লইল। সবুজ ঘাসের পুরু গালিচা বাড়ীর দেয়াল পর্য্যন্ত গিয়া ঠেকিয়াছে; তাহার উপর কোনো প্রকার চিহ্ন নাই।

উপরে কৈলাসবাবুর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—চায়ের সরঞ্জাম প্রস্তুত। চা যদিও আমাদের একদফা হইয়া গিয়াছিল, তবু দ্বিতীয়বার সেবন করিতে আপত্তি হইল না।

চায়ের সহিত নানাবিধ আলোচনা চলিতে লাগিল। স্থানীয় জলহাওয়ার ক্রমিক অধঃপতন, ডাক্তারদের চিকিৎসা-প্রণালীর ক্রমিক উর্দ্ধগতি, টোটকা ঔষধের গুণ, মারণ উচাটন, ভূতের রোজা ইত্যাদি কোনো প্রসঙ্গই বাদ পড়িল না। ব্যোমকেশ তাহার মাঝখানে একবার জিজ্ঞাসা করিল—'রাত্রে আপনি জানালা বন্ধ করে শুচ্ছেন ত?'

কৈলাসবাবু বলিলেন—'হাঁ—তিনি দেখা দিতে আরম্ভ করে অবধি জানালা দরজা বন্ধ করেই শুতে হচ্ছে—যদিও সেটা ডাক্তারের বারণ। ডাক্তার চান আমি অপর্য্যাপ্ত বায়ু সেবন করি—কিন্তু আমার যে হয়েছে উভয় সঙ্কট। কি করি বলুন?'

'জানালা বন্ধ করে কোন ফল পেয়েছেন কি?'

'বড় বেশী নয়। তবে দর্শনটা পাওয়া যায় না, এই পর্য্যন্ত। নিশুতি রাত্রে যখন তিনি আসেন, জানালায় সজোরে ঝাঁকানি দিয়ে যান।—একলা শুতে পারি না; রাত্রে একজন চাকর ঘরের মেঝেয় বিছানা পেতে শোয়।'

চা সমাপনান্তে ব্যোমকেশ উঠিয়া বলিল—'এইবার আমি ঘরটা ভাল করে দেখব। শশাঙ্ক, কিছু মনে কোরো না; তোমাদের—অর্থাৎ পুলিশের—কর্ম্মদক্ষতা সম্বন্ধে আমি কটাক্ষ করছি না। কিন্তু মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। যদি তোমাদের কিছু বাদ পড়ে থাকে তাই আর একবার দেখে নিচ্ছি।'

শশাঙ্কবাবু একটু বাঁকা-সুরে বলিলেন—'তা বেশ—নাও। কিন্তু এতদিন পরে যদি বৈকুণ্ঠবাবুর হত্যাকারীর কোনো চিহ্ন বার করতে পার, তাহলে বুঝব তুমি যাদুকর।'

ব্যোমকেশ হাসিল—'তাই বুঝো। কিন্তু সে যাক। বৈকুণ্ঠবাবুর মৃত্যুর দিন এ ঘরে কোন আস্‌বাবই ছিল না?'

'বলেছি ত, মাটিতে-পাতা বিছানা, জলের ঘড়া আর পানের বাটা ছাড়া আর কিছু ছিল না।—হাঁ, একটা তামার কাণখুস্কিও পাওয়া গিয়েছিল।'

'বেশ।—আপনারা তাহলে গল্প করুন কৈলাসবাবু, আমি আপনাদের কোনো বিঘ্ন করব না। কেবল ঘরময় ঘুরে বেড়াব মাত্র।'

অতঃপর ব্যোমকেশ ঘরের চারিদিকে পরিক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। কখনো উর্দ্ধমুখে ছাদের দিকে তাকাইয়া, কখনো হেঁটমুণ্ডে মেঝের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চিন্তাক্রান্ত মুখে নিঃশব্দে ঘুরিতে লাগিল। একবার জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া জানালার কাঠ শার্সি প্রভৃতি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল; দরজার হুড়্‌কা ও ছিট্‌কিনি লাগাইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল। তারপর আবার পরিক্রমণ সুরু করিল।

কৈলাশ ও শশাঙ্কবাবু স-কৌতূহলে তাহার গতিবিধি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। আমি তখন জোর করিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলাম। কারণ ব্যোমকেশের মন যতই বহির্নিরপেক্ষ হোক, তিন জোড়া কুতূহলী চক্ষু অনুক্ষণ

তাহার অনুসরণ করিতে থাকিলে সে যে বিক্ষিপ্তচিত্ত ও আত্মসচেতন হইয়া পড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই, যাহোক একটা কথা আরম্ভ করিয়া দিয়া ইঁহাদের দুইজনের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লইবার চেষ্টা করিলাম। তবু, নানা অসংলগ্ন চর্চ্চার মধ্যেও আমাদের মন ও চক্ষু তাহার দিকেই পড়িয়া রহিল।

পনেরো মিনিট এইভাবে কাটিল। তারপর শশাঙ্কবাবুর একটা পুলিশ-ঘটিত কাহিনী শুনিতে শুনিতে অলক্ষিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম, ব্যোমকেশের দিকে নজর ছিল না; হঠাৎ ছোট্ট একটি হাসির শব্দে সচকিতে ঘাড় ফিরাইলাম। দেখিলাম ব্যোমকেশ দক্ষিণ দিকের দেয়ালের খুব কাছে দাঁড়াইয়া দেওয়ালের দিকে তাকাইয়া আছে ও মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

শশাঙ্কবাবু বলিলেন—'কি হল আবার! হাসছ যে?'

ব্যোমকেশ বলিল—'যাদু। দেখে যাও। এটা নিশ্চয় তোমরা আগে ছ্যাখ নি।' বলিয়া দেয়ালের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

আমরা আগ্রহে উঠিয়া গেলাম। প্রথমটা চুণকাম করা দেওয়ালের গায়ে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তারপর ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, মেঝে হইতে আন্দাজ পাঁচ ফুট উচ্চে শাদা চুণের উপর পরিষ্কার অঙ্গুষ্ঠের ছাপ অঙ্কিত রহিয়াছে। যেন কাঁচা চুণের উপর আঙুল টিপিয়া কেহ চিহ্নটি রাখিয়া গিয়াছে।

শশাঙ্কবাবু ভ্রূকুটি সহকারে চিহ্নটি দেখিয়া বলিলেন—'একটা বুড়ো-আঙুলের ছাপ দেখছি। এর অর্থ কি?'

ব্যোমকেশ বলিল—'অর্থ—মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। হত্যাকারীর এই পরিচয় চিহ্নটি তোমরা দেখতে পাওনি।'

বিস্ময়ে ভ্রূ তুলিয়া শশাঙ্কবাবু বলিলেন—'হত্যাকারীর! এ আঙুলের দাগ যে হত্যাকারীর তা তুমি কি করে বুঝলে?'

'আমরা আগে ওটা লক্ষ্য করিনি বটে কিন্তু তাই বলে ওটা হত্যাকারীর আঙুলের দাগ যে কেন হবে—তাও ত বুঝতে পারছি না। যে রাজমিস্ত্রি ঘর চুণকাম করেছিল তার হতে পারে; অন্য যে-কোনো লোকের হতে পারে।'

'একেবারে অসম্ভব নয়। তবে কথা হচ্ছে, রাজমিস্ত্রি দেয়ালে নিজের আঙুলের টিপ রেখে যাবে কেন?'

'তা যদি বল, হত্যাকারীই বা রেখে যাবে কেন?'

ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার শশাঙ্কবাবুর দিকে তাকাইল; তারপর বলিল—'তাও ত বটে। তাহলে তোমার মতে ওটা কিছু নয়?'

'আমি বলতে চাই, ওটা যে খুব জরুরী তার কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।'

ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া ব্যোমকেশ বলিল—'তোমার যুক্তি অকাট্য। প্রমাণের অভাবে কোন জিনিষকেই জরুরী বলে স্বীকার করা যেতে পারে না।—পকেটে ছুরি আছে? কিম্বা কাণখুস্কি?'

'ছুরি আছে। কেন?'

অপ্রসন্ন মুখে শশাঙ্কবাবু ছুরি বাহির করিয়া দিলেন। ব্যোমকেশের আবিষ্কারে তিনি সুখী হইতে পারেন নাই, তাই বোধ হয় সেটাকে তুচ্ছ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তবু তাঁহার মনোভাব নেহাৎ অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হইল না। দেয়ালের গায়ে একটা আঙুলের চিহ্ন—কবে কাহার দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছে কিছুই জানা নাই—হত্যাকাণ্ডের রহস্য-সমাধানে ইহার মূল্য কি এবং যদি উহা হত্যাকারীরই হয় তাহা হইলেই বা লাভ কি হইবে? কে হত্যাকারী তাহাই যখন জানা নাই তখন এই আঙুলের টিপ্ কোন কাজে লাগিবে তাহা আমিও বুঝিতে পারিলাম না।

ব্যোমকেশ কিন্তু ছুরি দিয়া চিহ্নটির চারিধারে দাগ কাটিতে আরম্ভ করিল। অতি সন্তর্পণে চুণ-বালি আল্‌গা করিয়া ছুরির নখ দিয়া একটু চাড় দিতেই টিপ-চিহ্ন সমেত খানিকটা প্ল্যাষ্টার বাহির হইয়া আসিল। ব্যোমকেশ সেটি সযত্নে রুমালে জড়াইয়া পকেটে রাখিয়া কৈলাসবাবুকে বলিল—'আপনার ঘরের দেয়াল কুশ্রী করে দিলুম। দয়া করে একটু চুণ দিয়ে গর্ত্তটা ভরাট করিয়ে নেবেন।' তারপর শশাঙ্কবাবুকে বলিল—'চল শশাঙ্ক, এখানকার কাজ আপাততঃ আমাদের শেষ হয়েছে। এদিকে দেখছি ন'টা বাজে; কৈলাসবাবুকে আর কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।

—ভাল কথা, কৈলাসবাবু, আপনি বাড়ী থেকে নিয়মিত চিঠিপত্র পান ত?'

কৈলাশবাবু বলিলেন—'আমাকে চিঠি দেবে? এক

ঐ ছেলে—তার গুণের কথা ত শুনেছেন। চিঠি দেবার আত্মীয় আমার কেউ নেই।'

প্রফুল্লস্বরে ব্যোমকেশ বলিল—'বড়ই দুঃখের বিষয়। আচ্ছা আজ তাহলে চললুম; মাঝে মাঝে আপনাকে বিরক্ত করতে আসব।—আর দেখুন, এটার কথা কাউকে বলে দরকার নেই।' বলিয়া দেয়ালের ছিদ্রের দিকে নির্দ্দেশ করিল।

কৈলাসবাবু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন।

রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। রৌদ্র তখন কড়া হইতে আরম্ভ করিয়াছে। দ্রুতপদে বাসার দিকে চলিলাম।

হঠাৎ শশাঙ্কবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—'ব্যোমকেশ, ওই আঙুলের দাগটা সম্বন্ধে তোমার সত্যিকার ধারণা কি?'

ব্যোমকেশ বলিল—'আমার ধারণা ত বলেছি, ওটা হত্যাকারীর আঙুলের দাগ।'

অধীরভাবে শশাঙ্কবাবু বলিলেন—'কিন্তু এ যে তোমার জবরদস্তি। হত্যাকারী কে তার নামগন্ধও জানা নেই—অথচ তুমি বলে বসলে ওটা হত্যাকারীর। একটা সঙ্গত কারণ দেখান চাই ত।'

'কি রকম সঙ্গত কারণ তুমি দেখতে চাও।'

শশাঙ্কবাবুর কণ্ঠের বিরক্তি আর চাপা রহিল না, তিনি বলিয়া উঠিলেন—'আমি কিছুই দেখতে চাই না। আমার মনে হয় তুমি নিছক ছেলেমানুষী করছ। অবশ্য তোমার দোষ নেই; তুমি ভাবছ বাঙলা দেশে যে-প্রথায় অনুসন্ধান চলে এদেশেও বুঝি তাই চলবে। সেটা তোমার ভুল। ও ধরণের ডিটেক্‌টিবগিরিতে এখানে কোন কাজ হবে না।'

ব্যোমকেশ বলিল—'ভাই, আমার ডিটেক্‌টিব বিদ্যে কাজে লাগাবার জন্য ত আমি তোমার কাছে আসিনি, বরং ওটাকে একটু বিশ্রাম দেবার জন্যই এসেছি। তুমি যদি মনে কর এ ব্যাপারে আমার হস্তক্ষেপ করবার দরকার নেই তাহলে ত আমি নিষ্কৃতি পেয়ে বেঁচে যাই।'

শশাঙ্কবাবু সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—'না, আমি তা বলছি না। আমার বলার উদ্দেশ্য, ওপথে চললে কস্মিন কালেও কিছু করতে পারবে না—এ ব্যাপার অত সহজ নয়।'

'তা ত দেখতেই পাচ্ছি।'

'ছমাস ধরে আমরা যে-ব্যাপারের একটা হদিস বার করতে পারলুম না, তুমি একটা আঙুলের টিপ্ দেখেই যদি মনে কর তার সমাধান করে ফেলেছ, তাহলে বুঝতে হবে এ কেসের গুরুত্ব তুমি এখনো ঠিক ধরতে পার নি। আঙুলের দাগ কিম্বা আঁস্তাকুড়ে কুড়িয়ে পাওয়া ছেঁড়া কাগজে দুটো হাতের অক্ষর—এসব দিয়ে লোমহর্ষণ উপন্যাস লেখা চলে, পুলিশের কাজ চলে না। তাই বলছি, ওসব আঙুলের টিপ্-ফিপ্ ছেড়ে—'

'থামো।'

পাশ দিয়া একখানা ফীটন গাড়ী যাইতেছিল, তাহার আরোহী আমাদের দেখিয়া গাড়ী থামাইলেন; গলা বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি ব্যোমকেশবাবু, কদ্দূর?'

তারাশঙ্করবাবু গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিতেছেন; কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ, গায়ে নামাবলী, মুখে একটু ব্যঙ্গ-হাস্য।

ব্যোমকেশ তাঁহার প্রশ্নে ভালমানুষের মত প্রতিপ্রশ্ন করিল—'কিসের?'

'কিসের আবার—বৈকুণ্ঠের খুনের। কিছু পেলেন?'

ব্যোমকেশ বলিল—'এ বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছেন কেন? আমার ত কিছু জানবার কথা নয়। বরং শশাঙ্ককে জিজ্ঞাসা করুন।'

তারাশঙ্করবাবু বাম ভ্রূ ঈষৎ তুলিয়া বলিলেন—'কিন্তু শুনেছিলুম যেন, আপনিই নূতন করে এ কেসের তদন্ত করবার ভার পেয়েছেন!—তা সে যা হোক, শশাঙ্কবাবু খবর কি? নূতন কিছু আবিষ্কার হল?'

শশাঙ্কবাবু নীরসকণ্ঠে বলিলেন—'আবিষ্কার হলেও পুলিশের গোপন কথা সাধারণে প্রকাশ করবার আমার অধিকার নেই। আর, ওটা আপনি ভুল শুনেছেন—ব্যোমকেশ আমার বন্ধু, মুঙ্গেরে বেড়াতে এসেছে; তদন্তের সঙ্গে তার কোন সংস্রব নেই।'

পুলিশের সহিত উকিলের প্রণয় এ জগতে বড়ই দুর্লভ। দেখিলাম, তারাশঙ্করবাবু ও শশাঙ্কবাবুর মধ্যে ভালবাসা নাই। তারাশঙ্কর কণ্ঠস্বরে অনেকখানি মধু ঢালিয়া দিয়া বলিলেন—'বেশ বেশ। তাহলে কিছুই পারেন নি। আপনাদের দ্বারা যে এর বেশী হবে না তা আগেই আন্দাজ করেছিলুম।—হাঁকো।'

তারাশঙ্করবাবুর ফীটন বাহির হইয়া গেল।

শশাঙ্কবাবু কটমট্ চক্ষে সেইদিকে তাকাইয়া থাকিয়া অস্ফুটস্বরে যাহা বলিলেন তাহা প্রিয়-সম্ভাষণ নয়। ভিতরে ভিতরে সকলেরই মেজাজ রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। পথে আর কোন কথা হইল না, নীরবে তিনজনে বাসায় গিয়া পৌঁছিলাম।

৬

দুপুর বেলাটা ব্যোমকেশ অলসভাবে কাটাইয়া দিল। একবার ছেঁড়া কাগজখানা ও আঙুলের টিপ্ বাহির করিয়া অবহেলাভরে দেখিল; আবার সরাইয়া রাখিয়া দিল। তাহার মনের ক্রিয়া ঠিক বুঝিলাম না; কিন্তু বোধ হইল, এই হত্যার ব্যাপারে এতাবৎকাল সে যেটুকু আকর্ষণ অনুভব করিতেছিল তাহাও যেন নিবিয়া গিয়াছে।

অপরাহ্ণে বরদাবাবু আসিলেন। বলিলেন, 'এখানে আমাদের বাঙালীদের একটা ক্লাব আছে, চলুন আজ আপনাদের সেখানে নিয়ে যাই।'

'চলুন।'

দুইদিন এখানে আসিয়াছি কিন্তু এখনো স্থানীয় দ্রষ্টব্য বস্তু কিছুই দেখি নাই; তাই বরদাবাবু আমাদের কষ্টহারিণীর ঘাট, পীর-শানফার কবর ইত্যাদি কয়েকটা স্থান ঘুরাইয়া দেখাইলেন। তারপর সূর্য্যাস্ত হইলে তাঁহাদের ক্লাবে লইয়া চলিলেন।

কেল্লার বাহিরে ক্লাব। পথে যাইতে দেখিলাম—একটা মাঠের মাঝখানে প্রকাণ্ড তাঁবু পড়িয়াছে; তাহার চারিদিকে মানুষের ভিড়—তাঁবুর ভিতর হইতে উজ্জ্বল আলো এবং ইংরাজী বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ আসিতেছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—'ওটা কি?'

'একটা সার্কাস-পার্টি এসেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল—'এখানে সার্কাস পার্টিও আসে নাকি?'

বরদাবাবু বলিলেন—'আসে বৈকি। বিলক্ষণ দু'পয়সা রোজগার করে নিয়ে যায়।—এই ত গত বছর একদল এসেছিল—না গত বছর নয়, তার আগের বছর।'

'এরা কতদিন হল এসেছে?'

'কাল শনিবার ছিল, কাল থেকে এরা খেলা দেখাতে সুরু করেছে।'

প্রসঙ্গত সহরের আমোদ-প্রমোদের অভাব সম্বন্ধে বরদাবাবু অভিযোগ করিলেন। মুষ্টিমেয় বাঙালীর মধ্যে চিরন্তন দলাদলি, তাই থিয়েটারের একটা সখের দল থাকা সত্ত্বেও অভিনয় বড় একটা ঘটিয়া ওঠে না; বাহির হইতে এক আধটা সার্কাস কার্ণিভালের দল যাহা আসে তাহাই ভরসা। শুনিয়া খুব বেশী বিস্মিত হইলাম না। বাঙালীর বাস্তব জীবনে যে জাঁকজমক ও বৈচিত্র্যের অসদ্ভাব, তাহা সে থিয়েটারের রাজা বা সেনাপতি সাজিয়া মিটাইয়া লইতে চায়। তাই যেখানে দুইজন বাঙালী আছে সেইখানেই থিয়েটার ক্লাব থাকিতে বাধ্য এবং যেখানে থিয়েটার ক্লাব আছে সেখানে দলাদলি অবশ্যম্ভাবী। আমোদ প্রমোদের জন্য চালানি মালের উপর নির্ভর করিতে হইবে ইহা আর বিচিত্র কি?

শুনিতে শুনিতে ক্লাবে আসিয়া পৌঁছিলাম।

ক্লাবের প্রবেশ পথটি সঙ্কীর্ণ হইলেও ভিতরে বেশ সুপ্রসর। খানিকটা খোলা যাযগার উপর কয়েকখানি ঘর। আমরা প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একটি ঘরে ফরাস পাতা, তাহার উপর বসিয়া কয়েকজন সভ্য বৃজ্ খেলিতেছেন; প্রতি হাত খেলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠিতেছেন, আবার খেলা আরম্ভ হইবামাত্র সকলে গম্ভীর ও স্বল্পবাক হইয়া পড়িতেছেন। ক্রীড়াচক্রের বাহিরে তাঁহাদের চিত্ত কোন অবস্থাতেই সঞ্চারিত হইতেছে না; আমরা দুইজন আগন্তুক আসিলাম তাহা কেহ লক্ষ্যই করিলেন না। ঘরের এক কোণে দুইটি সভ্য দাবার ছক মধ্যস্থলে লইয়া তুরীয় সমাধির অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, সুতরাং বাজি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের কঠোর তপস্যা অপ্সরার ঝাঁক আসিয়াও ভাঙিতে পারিবে না।

পাশের ঘর হইতে কয়েকজন উত্তেজিত সভ্যের গলার আওয়াজ আসিতেছিল, বরদাবাবু আমাদের সেই ঘরে লইয়া গেলেন। দেখিলাম, একটি টেবিল বেষ্টন করিয়া কয়েকজন যুবক বসিয়া আছেন—তন্মধ্যে আমাদের পূর্ব্বপরিচিত শৈলেনবাবুও বর্ত্তমান। তাঁহাকে বাকি সকলে সপ্তরথীর মত ঘিরিয়া ফেলিয়াছেন এবং ভূতযোনি সম্বন্ধে নানাবিধ সুতীক্ষ্ণ ও সন্দেহমূলক বাক্যজালে বিদ্ধ করিয়া প্রায় ধরাশায়ী করিবার উপক্রম করিয়াছেন।

বরদাবাবুকে দেখিয়া শৈলেনবাবুর চোখে পরিত্রাণের আশা ফুটিয়া উঠিল, তিনি হাত বাড়াইয়া বলিলেন—'আসুন বরদাবাবু, এঁরা আমাকে একেবারে;—এই যে, ব্যোমকেশবাবু, আপনারাও এসেছেন। আসতে আজ্ঞা হোক।—'

নবাগত দুইজনকে দেখিয়া তর্ক বন্ধ হইল। বরদাবাবু আমাদের পরিচয় দিয়া, আমরা উপবিষ্ট হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমরা এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলে কেন? কি হয়েছে?'

শৈলেনবাবু বলিলেন—'ওঁরা আমার ভূত দেখার কথা বিশ্বাস করছেন না, বলছেন ওটা আমারই মস্তিষ্কপ্রসূত একটা বায়বীয় মূর্ত্তি।'

পৃথ্বীশবাবু নামক একটি ভদ্রলোক বলিলেন—'আমরা বলতে চাই, বরদার আষাঢ়ে গল্প শুনে শুনে ওঁর মনের অবস্থা এমন হয়েছে যে উনি ঝোপে ঝোপে বাঘ দেখছেন। বস্তুত যেটাকে উনি ভূত মনে করছেন সেটা হয়ত একটা বাদুড় কিম্বা ঐ জাতীয় কিছু।'

শৈলেনবাবু বলিলেন—'আমি স্বীকার করছি যে আমি স্পষ্টভাবে কিছু দেখি নি। তবু বাদুড় যে নয় একথা আমি হলফ্ নিয়ে বলতে পারি। আর বরদাবাবুর গল্প শুনে আমি চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছি এ অপবাদ যদি দেন—'

বরদাবাবু আমাদের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন—'এঁরা দুজন কাল সকালে এখানে এসেছেন। এঁদেরও আমি গল্প শুনিয়ে বশীভূত করে ফেলেছি বলে সন্দেহ হয় কি?'

একজন প্রতিদ্বন্দ্বী বলিলেন—'না, তা হয় না। তবে সময় পেলে—'

বরদাবাবু বলিলেন—'ওঁরা কাল রাত্রে দেখেছেন।'

সকলে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন। তার পর পৃথ্বীশবাবু ব্যোমকেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'সত্যি দেখেছেন?'

ব্যোমকেশ স্বীকার করিল—'হ্যাঁ।'

'কি দেখেছেন?'

'একটা মুখ।'

প্রতিদ্বন্দ্বীপক্ষ পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করিতে লাগিলেন। তখন ব্যোমকেশ যে অবস্থায় ঐ মুখ দেখিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিয়া বলিল। শুনিয়া সকলে নীরব হইয়া রহিলেন। বরদাবাবু ও শৈলেনবাবুর মুখে বিজয়ীর গর্ব্বোল্লাস ফুটিয়া উঠিল।

অমূল্যবাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, তর্কে যোগ দেন নাই। তাঁহার মুখমণ্ডলে অনিচ্ছা পীড়িত প্রত্যয় এবং অবরুদ্ধ অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। যাহা বিশ্বাস করিতে চাহি না তাহাই অনন্যোপায় হইয়া বিশ্বাস করিতে হইলে মানুষের মনের অবস্থা যেরূপ হয় তাঁহার মনের অবস্থাও সেইরূপ—কোন প্রকারে এই অনীপ্সিত বিশ্বাসের মূল ছেদন করিতে পারিলে তিনি বাঁচেন। এইবার তিনি কথা কহিলেন, বিরুদ্ধতার শ্লেষ কণ্ঠ হইতে যথাসম্ভব অপসারিত করিয়া বলিলেন—'তা যেন হল, অনেকেই যখন দেখেছেন বলছেন—তখন না হয় ঘটনাটা সত্যি বলেই মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু কেন? বৈকুণ্ঠ জহুরী যদি ভূতই হয়ে থাকে তাহলে কৈলাসবাবুকে বিরক্ত করে তার কি লাভ হচ্চে? এই কথাটা আমায় কেউ বুঝিয়ে দিতে পার?'

বরদাবাবু বলিলেন—'প্রেতযোনির উদ্দেশ্য সব সময় বোঝা যায় না। তবে আমার মনে হয় বৈকুণ্ঠবাবু কিছু বলতে চান।'

অমূল্যবাবু বিরক্তভাবে বলিলেন—'বলতে চান ত বলছেন না কেন?'

'সুযোগ পাচ্ছেন না। তাঁকে দেখেই আমরা এত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠ্‌ছি যে তাঁকে চলে যেতে হচ্চে। তাছাড়া, প্রেতাত্মার মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করবার ক্ষমতা থাকলেও কথা কইবার ক্ষমতা সর্ব্বত্র থাকে না। এক্টোপ্লাজ্‌ম্ নামক যে-বস্তুটা মূর্ত্তি-গ্রহণের উপাদান—'

'পাণ্ডিত্য ফলিও না বরদা। Spiritualismএর বই-গুলো যে ঝাড়া মুখস্থ করে রেখেছ তা আমরা জানি। কিন্তু তোমার বৈকুণ্ঠবাবু যদি কথাই না বলতে পারবেন তবে নিরীহ একটি ভদ্রলোককে নাহক জ্বালাতন করছেন কেন?'

'মুখে কথা বলতে না পারলেও তাঁকে কথা বলাবার উপায় আছে।'

'কি উপায়?'

'প্ল্যাঞ্চেট।'

'ও—সেই তেপায়া টেবিল ? সে ত জুচ্চুরি।'

'কি করে জানলে ? কখনো পরীক্ষা করে দেখেছ ?'

অমূল্যবাবুকে নীরব হইতে হইল। তখন বরদাবাবু আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'দেখুন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস বৈকুণ্ঠবাবুর কিছু বক্তব্য আছে ; হয় ত তিনি হত্যা-কারীর নাম বলতে চান। আমাদের উচিত তাঁকে সাহায্য করা। প্ল্যাঞ্চেটে তাঁকে ডাকলে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে পারেন।—করবেন প্ল্যাঞ্চেট ?'

ভূত নামানো কখনও দেখি নাই ; ভারি আগ্রহ হইল। বলিলাম—'বেশ ত, করুন না। এখনি করবেন ?'

বরদাবাবু বলিলেন—'দোষ কি ? এইখানেই করা যাক—কি বল তোমরা ? ভূত যদি নামে, তোমাদের সকলেরই সন্দেহ ভঞ্জন হবে।'

সকলেই সোৎসাহে রাজি হইলেন।

একটা ছোট টিপাই তৎক্ষণাৎ আনানো হইল। বরদা-বাবু বলিলেন বেশী লোক থাকিলে চক্র ভাল হইবে না, তাই পাঁচজনকে বাছিয়া লওয়া হইল। বরদাবাবু, ব্যোমকেশ, শৈলেনবাবু, অমূল্যবাবু ও আমি রহিলাম। বাকি সকলে পাশের ঘরে গিয়া বসিলেন।

আলো কমাইয়া দিয়া আমরা পাঁচজন টিপাইয়ের চারিদিকে চেয়ার টানিয়া বসিলাম। কি করিতে হইবে বরদাবাবু সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলেন। তখন টিপাইয়ের উপর আল্‌গোছে হাত রাখিয়া পরস্পর আঙুলে আঙুল ঠেকাইয়া মুদিত চক্ষে বৈকুণ্ঠবাবুর ধ্যান সুরু করিয়া দিলাম। ঘরের মধ্যে আবছায়া অন্ধকার ও অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল।

পাঁচ মিনিট এইভাবে কাটিল। ভূতের দেখা নাই। মনে আবল-তাবল চিন্তা আসিতে লাগিল ; জোর করিয়া মনকে বৈকুণ্ঠবাবুর ধ্যানে জুড়িয়া দিতে লাগিলাম। এইরূপ টানাটানিতে বেশ অধীর হইয়া উঠিয়াছি, এমন সময় মনে হইল টিপাইটা যেন একটু নড়িল। হঠাৎ দেহে কাঁটা দিয়া উঠিল। স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম, আঙুলের স্নায়ুগুলা নিরতিশয় সচেতন হইয়া রহিল।

আবার টিপাই একটু নড়িল, যেন ধীরে ধীরে আমার হাতের নীচে ঘুরিয়া যাইতেছে।

বরদাবাবুর গম্ভীর স্বর শুনিলাম—'বৈকুণ্ঠবাবু এসেছেন কি ? যদি এসে থাকেন একবার টোকা দিন।'

কিছুক্ষণ কোন সাড়া নাই। তারপর টিপাইয়ের একটা পায়া ধীরে ধীরে শূন্যে উঠিয়া ঠক্ করিয়া মাটিতে পড়িল।

বরদাবাবু গভীর অথচ অনুচ্চ স্বরে কহিলেন—'আবির্ভাব হয়েছে।'

স্নায়ুর উত্তেজনা আরো বাড়িয়া গেল ; কাণ ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। চক্ষু মেলিয়া কিন্তু একটা বিস্ময়ের ধাক্কা অনুভব করিলাম। কি দেখিব আশা করিয়াছিলাম জানি না, কিন্তু দেখিলাম যেমন পাঁচ জনে আধা-অন্ধকারে বসিয়া-ছিলাম তেমনি বসিয়া আছি, কোথাও কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইতিমধ্যে যে একটা গুরুতর রকম অবস্থান্তর ঘটিয়াছে—এই ঘরে আমাদেরই আশেপাশে কোথাও এক অশরীরী আত্মা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

বরদাবাবু নিম্নস্বরে আমাদের বলিলেন—'আমিই প্রশ্ন করি—কি বলেন ?'

আমরা শিরঃসঞ্চালনে সম্মতি জানাইলাম। তখন তিনি ধীর গম্ভীরকণ্ঠে প্রেতযোনিকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন—

'আপনি কি চান ?'

কোনো উত্তর নাই। টিপাই অচল হইয়া রহিল।

'আপনি বারবার দেখা দিচ্ছেন কেন ?'

মনে হইল টিপাই একটু নড়িল। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও স্পষ্ট কিছু বুঝিতে পারা গেল না।

'আপনার কি কিছু বক্তব্য আছে ?'

এবার টিপাইয়ের পায়া স্পষ্টতঃ উঠিতে লাগিল। কয়েকবার ধক্ ধক্ শব্দ হইল—অর্থ কিছু বোধগম্য হইল না।

বরদাবাবু কহিলেন—'যদি হ্যাঁ বলতে চান একবার টোকা দিন, যদি না বলতে চান দুবার টোকা দিন।'

একবার টোকা পড়িল।

দেখিলাম, পরলোকের সহিত ভাব বিনিময়ের প্রণালী খুব সরল নয়। 'হাঁ' বা 'না' কোনোক্রমে বোঝানো যায় ; কিন্তু বিস্তারিতভাবে মনের কথা প্রকাশ করা অশরীরীর

পক্ষে বড় কঠিন। কিন্তু তবু মানুষের বুদ্ধি দ্বারা সে বাধাও কিয়ৎপরিমাণে উল্লঙ্ঘিত হইয়াছে—সংখ্যার দ্বারা অক্ষর বুঝাইবার রীতি আছে। বরদাবাবু সেই রীতি অবলম্বন করিলেন; প্রেতযোনিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'আপনি যা বলতে চান, অক্ষর গুণে গুণে টোকা দিন, তাহলে আমরা বুঝতে পারব।'

তখন টেলিগ্রাফে কথা আরম্ভ হইল। টিপাইয়ের পায়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কয়েকবার নড়ে, আবার স্তব্ধ হয়; আবার নড়ে—আবার স্তব্ধ হয়। এইভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে কথাগুলি অতি কষ্টে বাহির হইয়া আসিল তাহা এই—

বাড়ী—ছেড়ে—যাও—নচেৎ—অমঙ্গল—

টিপাইয়ের শেষ শব্দ থামিয়া যাইবার পর আমরা কিছুক্ষণ ভয়-স্তম্ভিতবৎ বসিয়া রহিলাম। তারপর বরদাবাবু গলাটা একবার ঝাড়িয়া লইয়া বলিলেন—'আপনার বাড়ী যাতে ছেড়ে দেওয়া হয় আমরা তার চেষ্টা করব। আর কিছু বলতে চান কি?'

টিপাই স্থির।

আমার হঠাৎ একটা কথা মনে হইল, বরদাবাবুকে চুপি চুপি বলিলাম—'হত্যাকারী কে জিজ্ঞাসা করুন।'

বরদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন। খানিকক্ষণ কোন উত্তর আসিল না; তারপর পায়া উঠিতে আরম্ভ করিল।

তা—রা—তা রা—তা—রা—

হঠাৎ টিপাই কয়েকবার সজোরে নড়িয়া উঠিয়া থামিয়া গেল। বরদাবাবু কম্পিতস্বরে প্রশ্ন করিলেন,—কি বললেন বুঝতে পারলুম না। 'তারা'—কি? কারুর নাম?'

টিপাইয়ে সাড়া নাই।

আবার প্রশ্ন করিলেন—'আপনি কি আছেন?'

কোনো উত্তর আসিল না, টিপাই আবার জড় বস্তুতে পরিণত হইয়াছে।

তখন বরদাবাবু দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—'চলে গেছেন।'

ব্যোমকেশ হাত বাড়াইয়া আলোটা উজ্জ্বল করিয়া দিল; তারপর সকলের হাতের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া নেহাৎ অরসিকের মত বলিল—'মাফ্ করবেন, এখন কেউ টিপাই থেকে হাত তুলবেন না। আপনাদের হাত আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই।'

বরদাবাবু ঈষৎ হাসিলেন—'আমরা কেউ হাতে আঠা লাগিয়ে রেখেছি কিনা দেখতে চান? বেশ—দেখুন।'

ব্যোমকেশের ব্যবহারে আমি বড় লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। এমন খোলাখুলিভাবে এতগুলি ভদ্রলোককে প্রবঞ্চক মনে করা নিতান্তই শিষ্টতাবিগর্হিত। তাহার মনে একটা প্রবল সংশয় জাগিয়াছে সত্য—কিন্তু তাই বলিয়া এমন কঠোরভাবে সত্য পরীক্ষা করিবার তাহার কোন অধিকার নাই। সকলেই হয়ত মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন; কিন্তু ব্যোমকেশ নির্লজ্জভাবে প্রত্যেকের হাত পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। এমন কি, আমাকেও বাদ দিল না।

কিন্তু কাহারো হাতেই কিছু পাওয়া গেল না। ব্যোমকেশ তখন দুই করতলে গণ্ড রাখিয়া টিপাইয়ের উপর কনুই স্থাপন পূর্ব্বক শূন্যদৃষ্টিতে আলোর দিকে তাকাইয়া রহিল।

বরদাবাবু খোঁচা দিয়া বলিলেন—'কিছু পেলেন না?'

ব্যোমকেশ বলিল—'আশ্চর্য্য। এ যেন কল্পনা করাও যায় না।'

বরদাবাবু প্রসন্নস্বরে বলিলেন—'There are more things '

অমূল্যবাবুর বিরুদ্ধতা একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তিনি অসংযতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—'কিন্তু—তারা তারা কথার মানে কেউ বুঝতে পারলে?'

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলেন। আমার মাথায় হঠাৎ বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল—তারাশঙ্কর। আমি ঐ নামটাই উচ্চারণ করিতে যাইতেছিলাম, ব্যোমকেশ আমার মুখে থাবা দিয়া বলিল—'ও আলোচনা না হওয়াই ভাল।'

বরদাবাবু বলিলেন—'হ্যাঁ, আমরা যা জানতে পেরেছি তা আমাদের মনেই থাক।' সকলে তাঁহার কথায় গম্ভীর উদ্বিগ্নমুখে সায় দিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল—'আজকের অভিজ্ঞতা বড় অদ্ভুত—এখনো যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। কিন্তু না করেও

উপায় নেই। বরদাবাবু এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ।' বলিয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাড়ী ফিরিবার পথে বরদাবাবুর সহিত শৈলেনবাবু এবং অমূল্যবাবু আমাদের সাথী হইলেন। তাঁহাদেরও বাসা কেল্লার মধ্যে।

আমাদের বাসা নিকটবর্ত্তী হইলে শৈলেনবাবু বলিলেন —'একলা বাসায় থাকি, আজ রাত্রে দেখছি ভাল ঘুম হবে না।'

বরদাবাবু বলিলেন—'আপনার আর ভয় কি? ভয় শৈলেনবাবুর।—আচ্ছা, ওঁকে বাড়ী ছাড়াবার কি করা যায় বলুন ত?'

ব্যোমকেশ বলিল—'ওঁকে ও-বাড়ী ছাড়াতেই হবে। আপনারা ত চেষ্টা করছেনই, আমিও করব। কৈলাসবাবু অবুঝ লোক, তবু ওঁর ভালর জন্যই আমাদের চেষ্টা করতে হবে।—কিন্তু বাড়ী পৌছে যাওয়া গেছে, আর আপনারা কষ্ট করবেন না। নমস্কার।'—

তিনজনে শুভনিশি জ্ঞাপন করিয়া ফিরিয়া চলিলেন। অমূল্যবাবুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম—'শৈলেনবাবু, আপনি বরং আজকের রাতটা আমার বাসাতেই থাকবেন চলুন। আপনিও একলা থাকেন, আমার বাসাতেও উপস্থিত আমি ছাড়া আর কেউ নেই—'

বুঝিলাম, প্ল্যাঞ্চেটের ব্যাপার সকলের মনের উপরেই আতঙ্কের ছায়া ফেলিয়াছে।

(৭)

শশাঙ্কবাবু বোধহয় মনে মনে ব্যোমকেশ সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাই সেদিন কৈলাসবাবুর বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে হত্যার প্রসঙ্গ আর ব্যোমকেশের সম্মুখে উত্থাপিত করেন নাই। তাছাড়া হঠাৎ তাঁহার অফিসে কাজের চাপ পড়িয়াছিল, পূজার ছুটির প্রাক্কালে অবকাশেরও অভাব ঘটিয়াছিল।

অতঃপর দুই তিনদিন আমরা সহরে ও সহরের বাহিরে যত্র তত্র পরিভ্রমণ করিয়া কাটাইয়া দিলাম। স্থানটা অতি প্রাচীন, জরাসন্ধের আমল হইতে ক্লাইভের সময় পর্য্যন্ত বহু কিম্বদন্তী ও ইতিবৃত্ত তাহাকে কেন্দ্র করিয়া জমা হইয়াছে। পুরাবৃত্তের দিকে যাঁহাদের ঝোঁক আছে তাঁহাদের কাছে স্থানটি পরম লোভনীয়।

এই সব দেখিতে দেখিতে ব্যোমকেশ যেন হত্যাকাণ্ডের কথা ভুলিয়াই গিয়াছিল। শুধু প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে সে কৈলাসবাবুর বাসায় গিয়া জুটিত এবং নানাভাবে তাঁহাকে বাড়ী ছাড়িবার জন্য প্ররোচিত করিত। তাহার সুকৌশল বাক্য-বিন্যাসের ফলও ফলিয়াছিল, কৈলাসবাবু নিমরাজি হইয়া আসিয়াছিলেন।

শেষে হপ্তাখানেক পরে তিনি সম্মত হইয়া গেলেন। কেল্লার বাহিরে একখানা ভাল বাড়ী পাওয়া গিয়াছিল, আগামী রবিবারে তিনি সেখানে উঠিয়া যাইবেন স্থির হইল।

রবিবার প্রভাতে চা খাইতে খাইতে ব্যোমকেশ বলিল —'শশাঙ্ক, এবার আমাদের তল্পি তুলতে হবে। অনেক-দিন হয়ে গেল।'

শশাঙ্কবাবু বলিলেন—'এরি মধ্যে! আর দুদিন থেকে যাও না। কলকাতায় তোমার কোনো জরুরী কাজ নেই ত। তাঁহার কথাগুলি শিষ্টতাসম্মত হইলেও কণ্ঠস্বর নিরুৎসুক হইয়া রহিল।

ব্যোমকেশ উত্তরে বলিল—'তা হয়ত নেই। কিন্তু তবু কাজের প্রত্যাশায় দোকান সাজিয়ে বসে থাকতে হবে ত।'

'তা বটে। কবে যাবে মনে করছ?'

'আজই।—তোমার এখানে ক'দিন ভারি আনন্দে কাটল—অনেকদিন মনে থাকবে।'

'আজই' তা—তোমাদের যাতে সুবিধা হয়—' শশাঙ্ক বাবু কিয়ৎকাল বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর একটু বিরস স্বরে কহিলেন—'সে ব্যাপারটার কিছুই হল না। জটিল ব্যাপার তাতে সন্দেহ নেই; তবু ভেবে-ছিলুম, তোমার যে রকম নাম-ডাক, হয়ত কিছু করতে পারবে।'

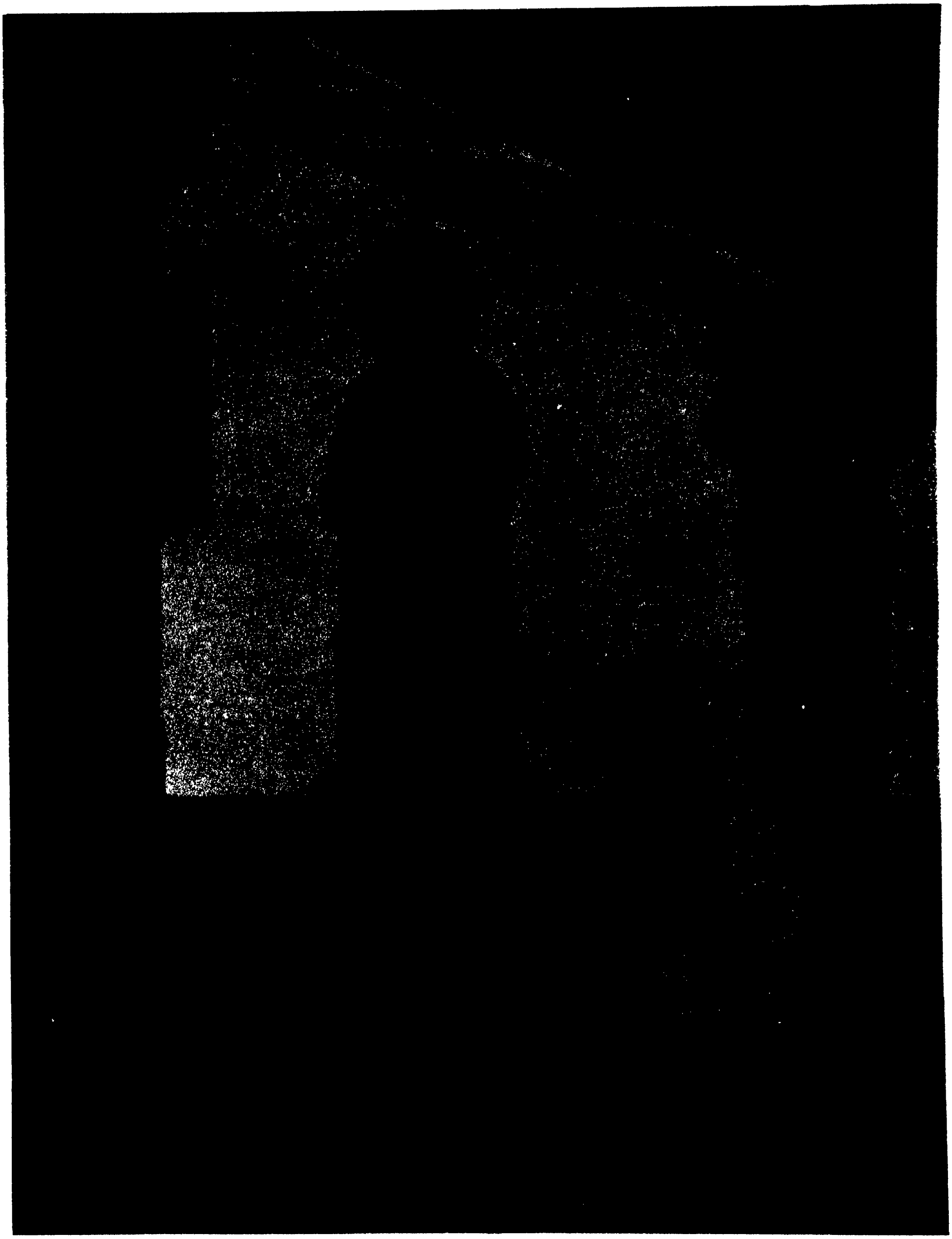
'কোন্ ব্যাপারের কথা বলছ?'

'বৈকুণ্ঠবাবুর খুনের ব্যাপার। কথাটা ভুলেই গেলে নাকি?'

'ও—না ভুলিনি। কিন্তু তাতে জানবার ত কিছু নেই।'

'কিছু নেই! তার মানে? তুমি সব জেনে ফেলেছ নাকি?'

'তা—একরকম জেনেছে বৈ কি!'



উপাসক

শিল্পী—শ্রীযুত মন্মথনাথ সেনগুপ্ত

Bharatvarsha Printing Works

'সে কি! তোমার কথা ত ঠিক বুঝতে পারছি না।' শশাঙ্কবাবু ঘুরিয়া বসিলেন।

ব্যোমকেশ ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত বলিল—'কেন—বৈকুণ্ঠবাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে যা-কিছু জানবার ছিল তা ত অনেকদিন আগেই জানতে পেরেছি—তা নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কি?'

শশাঙ্কবাবু স্তম্ভিতভাবে তাকাইয়া রহিলেন—'কিন্তু—অনেকদিন আগেই জানতে পেরেছ—কি বলছ তুমি? বৈকুণ্ঠবাবুর হত্যাকারী কে তা জানতে পেরেছ?'

'সে ত গত রবিবারেই জানা গেছে।'

'তবে—তবে—এতদিন আমায় বল নি কেন?'

ব্যোমকেশ একটু হাসিল—'ভাই, তোমার ভাবগতিক দেখে আমার মনে হয়েছিল যে পুলিস আমার সাহায্য নিতে চায় না; বাংলাদেশে আমরা যে-প্রথায় কাজ করি সে-প্রথা তোমাদের কাছে একেবারে হাস্যকর, আঙুলের টিপ এবং ছেঁড়া কাগজের প্রতি তোমাদের অশ্রদ্ধার অন্ত নেই। তাই আর আমি উপযাচক হয়ে কিছু বলতে চাই নি। লোমহর্ষণ উপন্যাস মনে করে তোমরা সমস্ত পুলিস-সম্প্রদায় যদি একসঙ্গে অট্টহাস্য সুরু করে দাও—তাহলে আমার পক্ষে সেটা কিরকম সাংঘাতিক হয়ে উঠবে একবার ভেবে ছাখো।'

শশাঙ্কবাবু ঢোক গিলিলেন—'কিন্তু—আমাকে ত ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারতে। আমি ত তোমার বন্ধু! —সে যাক, এখন কি জানতে পেরেছ শুনি।' বলিয়া তিনি ব্যোমকেশের সম্মুখে চেয়ার টানিয়া বসিলেন।

ব্যোমকেশ চুপ করিয়া রহিল।

'কে খুন করেছে? তাকে আমরা চিনি?'

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিল।

তাহার উরুর উপর হাত রাখিয়া প্রায় অনুনয়ের কণ্ঠে শশাঙ্কবাবু বলিলেন—'সত্যি বল ব্যোমকেশ, কে করেছে?'

'ভূত।'

শশাঙ্কবাবু বিমূঢ় হইয়া গেলেন, কিছুক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন—'ঠাট্টা করছ নাকি! ভূতে খুন করেছে?'

'অর্থাৎ—হ্যাঁ, তাই বটে।'

অধীর স্বরে শশাঙ্কবাবু বলিলেন—'যা বলতে চাও পরিষ্কার করে বল ব্যোমকেশ। যদি তোমার সত্যিসত্যি বিশ্বাস হয়ে থাকে যে ভূতে খুন করেছে—তাহলে—' তিনি হতাশভাবে হাত উল্টাইলেন।

ব্যোমকেশ হাসিয়া ফেলিল। তারপর উঠিয়া বারান্দায় একবার পায়চারি করিয়া বলিল—'সব কথা তোমাকে পরিষ্কারভাবে বোঝাতে হলে আজ আমার যাওয়া হয় না—রাত্রিটা থাকতে হয়। আসামীকে তোমার হাতে সমর্পণ না করে দিলে তুমি বুঝবে না। আজ কৈলাসবাবু বাড়ী বদল করবেন; সুতরাং আশা করা যায় আজ রাত্রেই আসামী ধরা পড়বে।' একটু থামিয়া বলিল—'আর কিছু নয়, বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ের জন্যই দুঃখ হয়।—যাক, এখন কি করতে হবে বলি শোনো।'

*   *   *   *

আশ্বিন মাস, দিন ছোট হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ছটার মধ্যে সন্ধ্যা হয় এবং নয়টা বাজিতে না বাজিতে কেল্লার অধিবাসীবৃন্দ নিদ্রালু হইয়া শয্যা আশ্রয় করে। গত কয়েকদিনেই তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

সে রাত্রে ন'টা বাজিবার কিছু পূর্ব্বে আমরা তিনজনে বাহির হইলাম। ব্যোমকেশ একটা টর্চ্চ সঙ্গে লইল, শশাঙ্কবাবু একযোড়া হাতকড়া পকেটে পুরিয়া লইলেন।

পথ নির্জ্জন; আকাশে মেঘের সঞ্চার হইয়া ক্ষীণ চন্দ্রকে ঢাকিয়া দিয়াছে। রাস্তার ধারে বহুদূর ব্যবধানে যে নিষ্প্রভ কেরাসিন-বাতি ল্যাম্পপোষ্টের মাথায় জ্বলিতেছে তাহা রাত্রির ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারকে ঘোলাটে করিয়া দিয়াছে মাত্র। পথে জনমানবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না।

কৈলাসবাবুর পরিত্যক্ত বাসার সম্মুখে গিয়া যখন পৌঁছিলাম তখন সরকারি খাজনাখানা হইতে নয়টার ঘণ্টা বাজিতেছে। শশাঙ্কবাবু এদিক ওদিক তাকাইয়া মৃদু শিষ্ দিলেন; অন্ধকারের ভিতর হইতে একটা লোক বাহির হইয়া আসিল—তাহাকে দেখিতে পাইলাম না, অস্পষ্ট পদশব্দে বুঝিলাম। ব্যোমকেশ তাহাকে চুপি চুপি কি বলিল, সে আবার অন্তর্হিত হইয়া গেল।

আমরা সন্তর্পণে বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। শূন্য বাড়ী, দরজা জানালা সব খোলা—কোথাও একটা আলো জ্বলিতেছে না। প্রাণহীন শবের মত বাড়ীখানা যেন নিস্পন্দ হইয়া আছে।

পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে উঠিয়া গেলাম। কৈলাসবাবুর ঘরের সম্মুখে ব্যোমকেশ একবার দাঁড়াইল, তারপর ঘরে প্রবেশ করিয়া টর্চ্চ জ্বালিয়া ঘরের চারিদিকে ফিরাইল। ঘর শূন্য—খাট বিছানা যাহা ছিল কৈলাসবাবুর সঙ্গে সমস্তই স্থানান্তরিত হইয়াছে। খোলা জানালা পথে গঙ্গার ঠাণ্ডা বাতাস নিরাভরণ ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

দরজা ভেজাইয়া ব্যোমকেশ টর্চ্চ নিবাইয়া দিল। তারপর মেঝেয় উপবেশন করিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল—'বোসো তোমরা। কতক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হবে কিছু ঠিক নেই, হয়ত রাত্রি তিনটে পর্য্যন্ত এইভাবে বসে থাকতে হবে।—অজিত, আমি টর্চ্চ জ্বাললেই তুমি গিয়ে জানলা আগ্‌লে দাঁড়াবে; আর শশাঙ্ক তুমি পুলিসের কর্ত্তব্য করবে—অর্থাৎ প্রেতকে প্রাণপণে চেপে ধরবে।'

অতঃপর অন্ধকারে বসিয়া আমাদের পাহারা আরম্ভ হইল। চুপচাপ তিনজনে বসিয়া আছি, নড়ন-চড়ন নাই; নড়িলে বা একটু শব্দ করিলে ব্যোমকেশ বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে। সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিয়া যে সময়ের অন্ত্যেষ্টি করিব তাহারও উপায় নাই, গন্ধ পাইলে শিকার ভড়কাইয়া যাইবে। বসিয়া বসিয়া আর এক রাত্রির দীর্ঘ প্রতীক্ষা মনে পড়িল, চোরাবালির ভাঙা কুঁড়ে ঘরে অজানার উদ্দেশ্যে সেই সংশয়পূর্ণ জাগরণ। আজিকার রাত্রিও কি তেমনই অভাবনীয় পরিসমাপ্তির দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে?

খাজনাখানার ঘড়ি দুইবার প্রহর জানাইল—এগারোটা বাজিয়া গেল। তিনি কখন আসিবেন তাহার স্থিরতা নাই; এদিকে চোখের পাতা ভারি হইয়া আসিতেছে।

এই ত কলির সন্ধ্যা—ভাবিতে ভাবিতে একটা অদম্য হাই তুলিবার জন্য হাঁ করিয়াছি, হঠাৎ ব্যোমকেশ সাঁড়াশির মত আঙুল দিয়া আমার উরু চাপিয়া ধরিল। হাই অর্দ্ধপথে হেঁচ্‌কা লাগিয়া থামিয়া গেল।

জানালার কাছে শব্দ। চোখে কিছুই দেখিলাম না, কেবল একটা অস্পষ্ট অতি লঘু শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়কে স্পর্শ করিয়া গেল। তারপর আর কোনো সাড়া নাই। নিশ্বাস রোধ করিয়া শুনিতে চেষ্টা করিলাম, বাহিরে কিছুই শুনিতে পাইলাম না—শুধু নিজের বুকের মধ্যে দুন্দুভির মত একটা আওয়াজ ক্রমে প্রবলতর হইয়া উঠিতে লাগিল।

সহসা আমাদের খুব কাছে, ঘরের মেঝের উপর পা ঘষিয়া চলার মত খস্ খস্ শব্দ শুনিয়া চম্‌কাইয়া উঠিলাম। একজন ঘরে প্রবেশ করিয়াছে, আমাদের দুই হাত অন্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—অথচ তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না। সে কি আমাদের অস্তিত্ব জানিতে পারিয়াছে? কে সে? এবার কি করিবে?—আমার মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া একটা ঠাণ্ডা শিহরণ বহিয়া গেল।

প্রভাতের সূর্য্যরশ্মি যেমন ছিদ্র পথে বদ্ধদ্বার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, তেমনি সূক্ষ্ম আলোর রেখা ঘরের মধ্যস্থলে জন্মলাভ করিয়া আমাদের সম্মুখের দেয়াল স্পর্শ করিল। অতি ক্ষীণ আলো কিন্তু তাহাতেই মনে হইল যেন ঘর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দেখিলাম একটা দীর্ঘাকৃতি কালো মূর্ত্তি আমাদের দিকে পিছন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহারই হস্তস্থিত ক্ষুদ্র টর্চ্চের আলো যেন দেয়ালের গায়ে কি অন্বেষণ করিতেছে।

কৃষ্ণ মূর্ত্তিটা ক্রমে দেয়ালের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল; অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে দেয়ালের শাদা চুণকাম পরীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার গলা দিয়া একটা অব্যক্ত আওয়াজ বাহির হইল, যেন যাহা খুঁজিতেছিল তাহা সে পাইয়াছে।

এই সময় ব্যোমকেশের হাতের টর্চ্চ জ্বলিয়া উঠিল। তীব্র আলোকে ক্ষণকালের জন্য চক্ষু ধাঁধিয়া গেল। তারপর আমি ছুটিয়া জানালার সম্মুখে দাঁড়াইলাম।

আগন্তুকও তড়িৎবেগে ফিরিয়া চোখের সম্মুখে হাত তুলিয়া ধরিয়াছিল, তাহার মুখখানা প্রথমে দেখিতে পাইলাম না। তারপর মুহূর্ত্ত মধ্যে অনেকগুলা ঘটনা প্রায় একসঙ্গে ঘটিয়া গেল। আগন্তুক বাঘের মত আমার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল, শশাঙ্কবাবু তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনজনে জাপ্‌টা-জাপ্‌টি করিয়া ভূমিসাৎ হইলাম।

ঝুটোপুটি ধস্তাধস্তি কিন্তু থামিল না। শশাঙ্কবাবু আগন্তুককে কুস্তিগিরের মত মাটিতে চিৎ করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন; আগন্তুক তাঁহার স্কন্ধে সজোরে কামড়াইয়া দিয়া এক লাফে উঠিয়া দাঁড়াইল। শশাঙ্কবাবু কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নয়, তিনি তাহার পা জড়াইয়া ধরিলেন। আগন্তুক তাঁহাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিল না; তদবস্থায়

টানিতে টানিতে জানালার দিকে অগ্রসর হইল। এই সময় টর্চ্চের আলোয় তাহার বিকৃত বীভৎস রং-করা মুখখানা দেখিতে পাইলাম। প্রেতাত্মাই বটে।

ব্যোমকেশ শান্ত সহজ সুরে বলিল—'শৈলেনবাবু, জানালা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে কেবল দুঃখই পাবেন। আপনার 'রণ-পা' ওখানে নেই, তার বদলে জমাদার ভানুপ্রতাপ সিং সদলবলে জানলার নীচে অপেক্ষা করছেন।' তারপর গলা চড়াইয়া হাঁকিল—'জমাদার সাহেব, উপর আইয়ে।'

সেই বিকট মুখ আবার ঘরের দিকে ফিরিল। শৈলেন-বাবু! আমাদের নিরীহ শৈলেনবাবু—এই! বিস্ময়ে মনটা যেন অসাড় হইয়া গেল।

শৈলেনবাবুর বিকৃত মুখের পৈশাচিক ক্ষুধিত চক্ষু দুটা ব্যোমকেশের দিকে ক্ষণেক বিস্ফারিত হইয়া রহিল, সেগুলা একবার হিংস্র শ্বাপদের মত বাহির করিলেন, যেন কি বলিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু মুখ দিয়া একটা গোঙানির মত শব্দ বাহির হইল মাত্র। তারপর সহসা শিথিল দেহে তিনি সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন।

শশাঙ্কবাবু তাঁহার পা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে ব্যোমকেশ বলিল—'শশাঙ্ক, শৈলেনবাবুকে তুমি চেনো বটে কিন্তু ওঁর সব পরিচয় বোধহয় জান না।—কাঁধ দিয়ে রক্ত পড়ছে দেখছি; ও কিছু নয়, টিঞ্চার আয়োডিন লাগালেই সেরে যাবে। তাছাড়া, পুলিসের অধিকার যখন গ্রহণ করেছ তখন তার আনুসঙ্গিক ফলভোগও করতে হবে বই কি।—সে যাক, শৈলেনবাবুর আসল পরিচয়টা দিই। উনি হচ্চেন সার্কাসের একজন নামজাদা জিমন্যাষ্টিক খেলোয়াড় এবং ৺বৈকুণ্ঠবাবুর নিরুদ্দিষ্ট জামাতা। সুতরাং উনি যদি তোমার ঘাড়ে কামড়ে দিয়েই থাকেন তাহলে তুমি সেটাকে জামাইবাবুর রসিকতা বলে ধরে নিতে পার।'

শশাঙ্কবাবু কিন্তু রসিকতা বলিয়া মনে করিলেন না; গলার মধ্যে একটা নাতি-উচ্চ গর্জ্জন করিয়া জামাই-বাবুর প্রকোষ্ঠে হাতকড়া পরাইলেন এবং জমাদার ভানুপ্রতাপ সিং সেই সঙ্গে তাহার বিরাট গালপাট্টা ও চোগোঁফা লইয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া স্যালুট করিয়া দাঁড়াইল।

(৮)

ব্যোমকেশ হাতের ঘড়ি দেখিয়া বলিল—'সতেরো মিনিট রয়েছে মাত্র। অতএব চটপট আমার কৈফিয়ৎ দাখিল করে ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করব।'

বৈকুণ্ঠবাবুর হত্যাকারীর অ্যারেষ্টের ফলে সহরে বিরাট উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, বলাই বাহুল্য। ব্যোমকেশই যে এই অঘটন সম্ভব করিয়াছে তাহাও কি জানি কেমন করিয়া চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। শশাঙ্কবাবু প্রীতি ও সন্তোষের ভাব চেষ্টা করিয়াও আর রাখিতে পারিতেছিলেন না। তাই আমরা আর অযথা বিলম্ব না করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যাওয়াই মনস্থ করিয়াছিলাম।

কৈলাসবাবু তাঁহার পূর্ব্বতন বাসায় ফিরিয়া আসিয়া-ছিলেন। তাঁহার শয়নকক্ষে বিদায়ের পূর্ব্বে আমরা সমবেত হইয়াছিলাম। শশাঙ্কবাবু, বরদাবাবু, অমূল্যবাবু উপস্থিত ছিলেন, কৈলাসবাবু শয্যায় অর্দ্ধশয়ান থাকিয়া মুখে অনভ্যস্ত প্রসন্নতা আনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। পুত্রের উপর মিথ্যা সন্দেহ করিয়া তিনি যে অনুতপ্ত হইয়াছেন তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছিল।

তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—'এখন বুঝতে পারছি ভূত নয় পিশাচ নয়—শৈলেনবাবু। উঃ—লোকটা কি ধড়িবাজ! মনে আছে—একবার এই ঘরে বসে 'ঐ ঐ' করে চেঁচিয়ে উঠেছিল? আগাগোড়া ধাপ্পাবাজি। কিছুই দেখেনি—শুধু আমাদের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা;—সে নিজেই যে ভূত এটা যাতে আমরা কোন মতেই না বুঝতে পারি। যাহোক ব্যোমকেশবাবু, এবার কৈফিয়ৎ পেশ করুন—আপনি বুঝলেন কি করে?'

সকলে উৎসুক নেত্রে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিল।

ব্যোমকেশ একটু হাসিয়া আরম্ভ করিল—'বরদাবাবু, আপনি কিছু মনে করবেন না, কিন্তু প্রেতযোনি সম্বন্ধে আমার মনটা গোড়া থেকেই নাস্তিক হয়েছিল। ভূত পিশাচ আছে কিনা এ প্রশ্ন আমি তুলছি না; কিন্তু যিনি কৈলাসবাবুকে দেখা দিচ্ছেন তিনি যে ভূত-প্রেত নন—জলজ্যান্ত মানুষ—এ সন্দেহ আমার সুরুতেই হয়েছিল। আমি নেহাৎ বস্তুতান্ত্রিক মানুষ, নিরেট বস্তু নিয়েই আমার

কারবার করতে হয়; তাই অতীন্দ্রিয় জিনিষকে আমি সচরাচর হিসেবের বাইরে রাখি।

'এখন মনে করুন, যদি ঐ ভূতটা সত্যিই মানুষ হয়, তবে সে কে এবং কেন এমন কাজ করছে—এ প্রশ্নটা স্বতঃই মনে আসে। একটা লোক খামকা ভূত সেজে বাড়ীর লোককে ভয় দেখাচ্ছে কেন?—এর একমাত্র উত্তর, সে বাড়ীর লোককে বাড়ী-ছাড়া করতে চায়। ভেবে দেখুন, এছাড়া আর অন্য কোন সদুত্তর থাকতে পারে না।

'বেশ। এখন প্রশ্ন উঠ্‌ছে—কেন বাড়ী-ছাড়া করতে চায়? নিশ্চয় তার কোন স্বার্থ আছে। কি সে স্বার্থ?'

'আপনারা সকলেই জানেন, বৈকুণ্ঠবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর মূল্যবান হীরা জহরৎ কিছুই পাওয়া যায়নি। পুলিস সন্দেহ করেন যে তিনি একটা কাঠের হাতবাক্সে তাঁর অমূল্য সম্পত্তি রাখতেন এবং তাঁর হত্যাকারী সেগুলো নিয়ে গিয়েছে। আমি কিন্তু এটা এত সহজে বিশ্বাস করতে পারিনি। 'ব্যয়কুণ্ঠ' বৈকুণ্ঠবাবুর চরিত্র যতদূর বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হয় তিনি মূল্যবান হীরে-মুক্তো কাঠের বাক্সে ফেলে রাখবার লোক ছিলেন না। কোথায় যে তিনি সেগুলোকে রাখতেন তাই কেউ জানে না। অথচ এই ঘরেই সেগুলো থাকত। প্রশ্ন—কোথায় থাকত।

'কিন্তু এ প্রশ্নটা এখন চাপা থাক। এই ভৌতিক উৎপাতের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত কারণ হতে পারে এই যে, বৈকুণ্ঠবাবুর হত্যাকারী তাঁর জহরৎগুলো নিয়ে যাবার সুযোগ পায়নি, অথচ কোথায় সেগুলো আছে তা সে জানে। তাই সে এ বাড়ীর নূতন বাসিন্দাদের তাড়াবার চেষ্টা করছে; যাতে সে নিরুপদ্রবে জিনিষগুলো সরাতে পারে।

'সুতরাং বুঝতে পারা যাচ্ছে যে ভূতই বৈকুণ্ঠবাবুর হত্যাকারী।

'বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়েকে প্রশ্ন করে আমার দুটো বিষয়ে খট্‌কা লেগেছিল। প্রথম, তিনি সে-রাত্রে কোন শব্দ শুনতে পাননি। এটা আমার অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। তিনি এই ঘরের নীচের ঘরেই শুতেন, অথচ তাঁর বাপকে গলা টিপে মারবার সময় যে ভীষণ ধস্তাধস্তি হয়েছিল তার শব্দ কিছুই শুনতে পাননি। আততায়ী বৈকুণ্ঠবাবুর গলা টিপে কোথায় তিনি হীরে জহরৎ রাখেন সে-খবর বার করে নিয়েছিল—অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে বাক্য-বিনিময় হয়েছিল। হয়ত বৈকুণ্ঠবাবু চীৎকারও করেছিলেন—অথচ তাঁর মেয়ে কিছুই শুনতে পাননি। এ কি সম্ভব?

'দ্বিতীয় কথা। বাপের আত্মার সদ্গতির জন্য তিনি গয়ায় পিণ্ড দিতে অনিচ্ছুক। আসল কথা, তিনি জানেন তাঁর বাপ প্রেতযোনি প্রাপ্ত হননি, তাই তিনি নিশ্চিন্ত আছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রেতযোনি যে কে তাও সম্ভবত তিনি জানেন। নচেৎ একজন অল্পশিক্ষিত স্ত্রীলোক জেনে শুনে বাপের পারলৌকিক ক্রিয়া করবে না—এ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

'বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ে সম্বন্ধে অনেকগুলো সম্ভাবনার অবকাশ রয়েছে—সবগুলো তলিয়ে দেখার দরকার নেই। তার মধ্যে প্রধান এই যে, তিনি জানেন কে হত্যা করেছে এবং তাকে আড়াল করবার চেষ্টা করছেন। স্ত্রীলোকের এমন কে আত্মীয় থাকতে পারে যে বাপের চেয়েও প্রিয়? উত্তর নিষ্প্রোজন। বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ে যে সুচরিত্রা সে খবর আমি প্রথমদিনই পেয়েছিলুম। সুতরাং স্বামী ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

'বৈকুণ্ঠবাবুর জামাই যে হত্যাকারী তার আর একটা ইঙ্গিত গোড়াগুড়ি পেয়েছিলুম। প্রেতাত্মাটা পনেরো হাত লম্বা, দোতলার জানালা দিয়ে অবলীলাক্রমে উঁকি মারে। সহজ মানুষের পক্ষে এটা কি করে সম্ভব হয়? মইও ব্যবহার করে না—মই ঘাড়ে করে অত শীঘ্র অন্তর্ধানও সম্ভব নয়। তবে? এর উত্তর—রণ-পা। নাম শুনেছেন নিশ্চয়। দুটো লম্বা লাঠি, তার ওপর চড়ে সেকালে ডাকাতেরা বিশ-ত্রিশ কোশ দূরে ডাকাতি করে আবার রাতারাতি ফিরে আসত। বর্ত্তমান কালে সার্কাসে রণ-পা চড়ে অনেক খেলোয়াড় খেলা দেখায়। রীতিমত অভ্যাস না থাকলে কেউ রণ-পা চড়ে ঘুরে বেড়াতে পারে না। কাজেই হত্যাকারী যে সার্কাস-সম্পর্কিত লোক হতে পারে এ অনুমান নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় নয়। বৈকুণ্ঠবাবুর বয়াটে জামাই সার্কাসদলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, নিশ্চয় ভাল খেলোয়াড়—সুতরাং অনুমানটা আপনা থেকেই দৃঢ় হয়ে ওঠে।

'কিন্তু সবাই জানে—জামাই দেশে নেই—আট বছর নিরুদ্দেশ। সে হঠাৎ এসে জুটল কোথা থেকে?

সেদিন এই বাড়ীর আস্তাকুড়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একটা কাগজের টুক্‌রো কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। অনেকদিনের জীর্ণ একটা সার্কাসের ইস্তাহার, তাতে বাঘ সিংহের ছবি তখনো সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। তার উল্টো পিঠে হাতের অক্ষরে কয়েকটা বাংলা শব্দ লেখা ছিল। মনে হয় যেন কেউ চিঠির কাগজের অভাবে এই ইস্তাহারের পিঠে চিঠি লিখেছে। চিঠির কথাগুলো অসংলগ্ন, তবু তা থেকে একটা অর্থ উদ্ধার করা যায়। যেন স্বামী অর্থাভাবে পড়ে স্ত্রীর কাছে টাকা চাইছে।—অজিত, তুমি যে শব্দটা 'স্বাথা' পড়েছিলে সেটা প্রকৃতপক্ষে 'স্বামী'।

'বোঝা যাচ্ছে, স্বামী সুদূর প্রবাস থেকে অর্থাভাবে মরীয়া হয়ে স্ত্রীকে চিঠি লিখেছিল। বলা বাহুল্য, অর্থ সাহায্য সে পায়নি। বৈকুণ্ঠবাবু একটা লক্ষীছাড়া পত্নীত্যাগী জামাইকে টাকা দেবেন একথা বিশ্বাস্য নয়।

'এই গেল বছরখানেক আগেকার ঘটনা। দু'বছরের মধ্যে এ সহরে কোনো সার্কাস পার্টি আসেনি; অতএব বুঝতে হবে যে প্রবাস থেকেই স্বামী এই চিঠি লিখেছিলেন এবং তখনো তিনি সার্কাসের দলে ছিলেন—শাদা কাগজের অভাবে ইস্তাহারের পিঠে চিঠি লিখেছিলেন।

'কয়েকমাস পরে স্বামী একদা মুঙ্গেরে এসে হাজির হলেন। ইতিমধ্যে কোথা থেকে টাকা যোগাড় করেছিলেন জানি না; তিনি এসে স্বাস্থ্যান্বেষী ভদ্রলোকের মত বাস করতে লাগলেন। মুঙ্গেরে কেউ তাঁকে চেনে না—তাঁর বাড়ী যশোরে আর বিয়ে হয়েছিল নবদ্বীপে—তাই বৈকুণ্ঠবাবুর জামাই বলে ধরা পড়বার ভয় তাঁর ছিল না।

বৈকুণ্ঠবাবু বোধ হয় জামায়ের আগমনবার্ত্তা শেষ পর্য্যন্ত জানতেই পারেন নি, তিনি বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন। জামাইটি কিন্তু আড়ালে থেকে শ্বশুর সম্বন্ধে সমস্ত খোঁজ খবর নিয়ে তৈরী হলেন; শ্বশুর যখন স্বেচ্ছায় কিছু দেবেন না তখন জোর করেই তাঁর উত্তরাধিকারী হবার সঙ্কল্প করলেন।

'তার পর সেই রাত্রে তিনি রণ-পা'য়ে চড়ে শ্বশুরবাড়ী উপস্থিত হলেন; জানালা দিয়ে একেবারে শ্বশুর মশায়ের শোবার ঘরে অবতীর্ণ হলেন। এই আকস্মিক আবির্ভাবে শ্বশুর বড়ই বিব্রত হয়ে পড়লেন, জামাই কিন্তু নাছোড়বান্দা। কথায় বলে জামাতা দশমগ্রহ। বাবাজী প্রথমে শ্বশুরের গলা টিপে তাঁর হীরা জহরতের গুপ্ত-স্থান জেনে নিলেন, তারপর তাঁকে নিপাত করে ফেললেন। তিনি বেঁচে থাকলে অনেক ঝঞ্ঝাট, তাই তাঁকে শেষ করে ফেলবার জন্যই জামাই তৈরী হয়ে এসেছিলেন।

'কিন্তু নিশ্চিন্তভাবে হীরা জহরতগুলো আত্মসাৎ করবার ফুরসৎ হল না। ইতিমধ্যে নীচে স্ত্রীর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, তিনি এসে দোর ঠেলাঠেলি করছিলেন।

'তাড়াতাড়িতে জামাইবাবু একটিমাত্র জহরৎ বার করে নিয়ে সে-রাত্রির মত প্রস্থান করিলেন। বাকিগুলো যথাস্থানেই রয়ে গেল।

'বৈকুণ্ঠবাবু তাঁর জহরৎগুলি রাখতেন বড় অদ্ভুত যায়গায় অর্থাৎ ঘরের দেয়ালে। দেয়ালের চূণ-সুরকি খুঁড়ে সামান্য গর্ত্ত করে, তাইতে মণিটা রেখে, আবার চূণ দিয়ে গর্ত্ত ভরাট করে দিতেন। তাঁর পাণের বাটায় যথেষ্ট চূণ থাকত, কোন হাঙ্গামা ছিল না। বার করবার প্রয়োজন হলে কাণখুস্কির সাহায্যে চূণ খুঁড়ে বার করে নিতেন।'

'জামাইবাবু একটি জহরৎ দেয়াল থেকে বার করে নিয়ে যাবার আগে গর্ত্তটা তাড়াতাড়ি চূণ দিয়ে ভর্ত্তি করে দিলেন। কিন্তু তাড়াতাড়িতে কাজ ভাল হয় না, তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ চূণের ওপর আঁকা রয়ে গেল।'

'বৈকুণ্ঠবাবু তাঁর মণি-মুক্তা কোথায় রাখেন, এ প্রশ্নটা প্রথমে আমাকেও ভাবিয়ে তুলেছিল। তারপর সেদিন এঘরে পায়চারি করতে করতে যখন ঐ আঙুলের টিপ্ চোখে পড়ল, তখন একমুহূর্ত্তে সমস্ত বুঝতে পারলুম। এই ঘরের দেয়ালে যত্রতত্র চূণের প্রলেপের আড়ালে আড়াই লক্ষ টাকার জহরৎ লুকোনো আছে। এমনভাবে লুকোনো আছে যে খুব ভাল করে দেয়াল পরীক্ষা না করলে কেউ ধরতে পারবে না। শশাঙ্ক তোমাকে মেহনৎ করে এই পঞ্চাশটি জহরৎ বার করতে হবে। আমার আর সময়

নেই, নইলে আমিই বার করে দিতুম। তবু পেন্সিল দিয়ে দেয়ালে ঢ্যারা দিয়ে রেখেছি, তোমার কোনো কষ্ট হবে না।'

'যাক। তাহলে আমরা জানতে পারলুম যে, জামাই বৈকুণ্ঠবাবুকে খুন করে একটা জহরৎ নিয়ে গেছে এবং অন্যগুলো হস্তগত করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু জামাই লোকটা কে? নিশ্চয় সে এই সহরেই থাকে এবং সম্ভবত আমাদের পরিচিত। তার আঙুলের ছাপ আমরা পেয়েছি বটে কিন্তু কেবলমাত্র আঙুলের ছাপ দেখে সহর-সুদ্ধ লোকের ভিতর থেকে একজনকে খুঁজে বার করা যায় না। তবে উপায়?'

'সেদিন প্ল্যাঞ্চেট টেবিলে সুযোগ পেলুম। টেবিলে ভূতের আবির্ভাব হল। আমি বুঝলুম আমাদেরই মধ্যে একজন টেবল নাড়ছেন এবং তিনিই হত্যাকারী; ভূতের কথাগুলোই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। একটা ছুতো করে আমি আপনাদের সকলের হাত পরীক্ষা করে দেখলুম। শৈলেন বাবুর সঙ্গে আঙুলের দাগ মিলে গেল।'

'সুতরাং শৈলেনবাবুই যে হত্যাকারী তাতে আর সন্দেহ রইল না। আপনাদেরও বোধহয় আর সন্দেহ নেই। বরদাবাবুর শিষ্য হয়ে শৈলেনবাবুর কাজ হাসিল করবার খুব সুবিধা হয়েছিল। লোকটি বাইরে বেশ নিরীহ আর মিষ্টভাষী, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বাঘের মত ক্রূর আর নিষ্ঠুর। দয়ামায়ার স্থান ওর হৃদয়ে নেই।'

ব্যোমকেশ চুপ করিল। সকলে কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিলেন। তারপর অমূল্যবাবু প্রকাণ্ড একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন—'আঃ—বাঁচলুম। ব্যোমকেশবাবু, আর কিছু না হোক বরদার ভূতের হাত থেকে আপনি আমাদের উদ্ধার করেছেন। যে রকম করে তুলেছিল—আর একটু হলে আমিও ভূত বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলাম আর কি। আপনি বরদার ভূতের রোজা, আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।'

সকলে হাসিলেন। বরদাবাবু বিড়বিড় করিয়া গলার মধ্যে কি বলিলেন; শুনিয়া অমূল্যবাবু বলিলেন—'ওটা কি বললে? সংস্কৃত বুলি আওড়াচ্ছ মনে হল।'

বরদাবাবু বলিলেন—'মৌক্তিকং ন গজে গজে। একটা হাতীর মাথায় গজমুক্তা পাওয়া গেল না বলে গজমুক্তা নেই একথা সিদ্ধ হয় না।'

অমূল্যবাবু বলিলেন—'গজের মাথায় কি আছে কখনো তল্লাস করিনি, কিন্তু তোমার মাথায় যা আছে তা আমরা সবাই জানি।

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'সতেরো মিনিট উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এবার তাহলে উঠলুম—নমস্কার! তারাশঙ্কর বাবুর কাছে আগেই বিদায় নিয়ে এসেছি—মহাপ্রাণ লোক। তাঁকে আবার আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানাবেন। এস অজিত।'



সঙ্গীত

ভজন—দাদ্‌রা

নীল যমুনা-সলিল-কান্তি
চিকণ ঘন-শ্যাম।
তব শ্যামরূপে শ্যামল হ'ল
সংসার ব্রজধাম॥
রৌদ্রে পুড়িয়া তাপিতা অবনী
চেয়েছিল শ্যাম-স্নিগ্ধ-লাবনী,
আসিলে অমনি নবনীত-তনু
ঢল ঢল অভিরাম॥
আধেক বিন্দুরূপ তব ঢুলে
ধরায় সিন্ধুজল,
তব ছায়া বুকে ধরিয়া সুনীল
হইল গগন তল।
তব বেণু শুনি, ওগো বাঁশুরিয়া,
প্রথম গাহিল কোকিল-পাপিয়া,
(হেরি) কান্তার-বন-ভুবন-ব্যাপিয়া—
বিজড়িত তব নাম॥

কথা ও সুর ঃ—কাজী নজরুল ইস্‌লাম

স্বরলিপি ঃ—জগৎ ঘটক

II { সা -া -রা | মা মা মা I পা ধা মা | পা -ধা র্সা র্রা I
নী ০ ল য মু না স লি ল কা ন্ তি

I র্সণা -া ধা | পমা পা ধণধা I পমা -া -া | -া -া -া } I
চি ০ ক ণ ঘ ন ০ শ্যা ০ ম্ ০ ০ ০

I গা মা গমা | -রজ্ঞা রা সা I ধ্‌ণ্‌া -সরা মা | মা মা মা I
ত ব শ্যা০ ০ম্ রূ পে শ্যা০ ০০ ম ল হ' ল

I মা -পা ধা | -র্সা র্রা র্গা I র্রর্গা র্সা -া | -া -া -া I
স ঙ্ সা র্ ব্র জ ধা • • ম্ • • •

I র্সণা -ধা ধণধা | পমা পা ধণধা I পমা -া -া | -া -া -া II II
চি • ক • ণ ঘ ন • শ্যা • ম্ • • •

II { মপা -ধা ধা | ধণধা পমা পা I ধা ধর্সা র্সা | র্সা র্সা র্সধা I
রৌ• • দ্রে পু • ড়ি য়া তা পি তা অ ব নী

I -ধর্সা -া -া | -া -া -া I র্সা র্সর্রা র্রা | র্রা র্রা -া I
• • • • • • • চে য়ে • ছি ল শ্যা ম্

I (-া -া -া | -া -া -া) I র্সা র্গা র্রা | র্সা র্রা র্সনধা I
• • • • • • স্নি গ্ ধ লা ব নী • •

I (-া -া পধা | -ণধা -পা -মা) } I মা মা মা | মা মা পা I
• • • • • • • আ সি লে অ ম নি

I গা মা গা | রা সা সা I সা রা মা | পা ধা ধর্রা I
ন ব নী ত ত নু ঢ ল ঢ ল অ ভি•

I র্সা -া -া | -া -া -র্সার I র্সণা -া ধা | মা পা ধণধা I
রা • • • • ম্ চি • ক ণ ঘ ন •

I পমা -া -া | -া -া -া II
শ্যা • ম্ • • •

II { সা সমা গমা | রজ্ঞা -রসা ণ্ধ্ণ্ I সমা -গমা জ্ঞা | রসা সা সা I
আ ধে ক• বি • • ন্ দু • • রূ • • প্ ত ব • দু লে

I সা রা সা | ধ্ণ্ -সমা মা I গজ্ঞা গা -া | -া -া -া I
ধ রা য়্ সি • • ন্ ধু জ • • • • • ন্

I মা মা মা | মা মা পা I গা মা গা | রা সা -া I
তবছা য়া বুকে ধরিয়া সুনীল্

I সা রমা মা | মপা পধা ধণধা I পমা -া -া | -া -া -া } I
হ ই০ ল গ০ গ০ ন০ ত ০ ল্ ০ ০ ০

I { মপা পধা ধর্সা | র্সা র্সা সধর্সা I -া -া -া | -া -া -া I
ত০ ব০ বে০ ণু শু নি০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I র্সর্রা র্সর্রা -া | -া -া -া I -র্সর্সা -ধা -পা | -া -া -া I
ও০ গো০ ০ ০ ০ ০ ০০০ ০ ০ ০ ০ ০

I ধা ধর্সা র্সা | র্সধা র্সা -া I (-া -া -া | -া -া -া) I
বাঁ শু রি য়া ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I র্সগা র্গা র্গা | র্রা র্গা র্রর্গা I -া -া -া | -র্রা -র্সা -া I
প্র থ ম গা হি ল০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I র্সর্রা র্সা -র্রা | -র্সা -ধা -পা I ধা র্সা র্সধর্সা | -া (-া -া) } I
কো০ কি ০ ০ ০ ল্ পা পি য়া০ ০ ০ ০

I র্সা র্সা I না -র্সা র্সা | -া ধা ধপা I ধপা গরা রা | গরা সা সা I
হে রি কা ন্ তা র্ ব ন০ ভু০ ব০ ন ব্যা০ পি য়া

I সা রা মা | পা ধা মপা I ধা র্সা -া | -া -া -া I
বি জ ড়ি ত ত ব০ না ০ ম্ ০ ০ ০

I ণা -া ধণধা | পমা পা ধণধা I পমা -া -া | -া -া -া II II
চি ০ ক০ ণ ঘ ন০ শ্যা ০ ম্ ০ ০ ০



ভারতীয় সঙ্গীত

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

পৌরাণিক যুগের অবসান হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান যুগের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘকালকে আমরা হিন্দু রাজত্বকাল বা মধ্যযুগ নামে ইতিপূর্বে অভিহিত করিয়াছি। বৌদ্ধযুগকেও হিন্দুরাজত্ব কালেরই অন্তর্গতরূপে ব্যবহার করিয়াছি। প্রাচীন ঋষিগণ ও বরেণ্য রাজন্যমণ্ডলীর তিরোভাববশতঃ এই যুগটি একদিকে যেমন অলৌকিক জ্ঞানালোক হইতে বঞ্চিত—অপরদিকে ধারাবাহিক দুর্ভাগ্য সম্পাতে তেমনি উৎপীড়িত ও বিপর্য্যস্ত। আর্য-প্রতিভা অস্তমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জীবজগতের নানাবিধ কল্যাণসাধন বিষয়ে প্রত্যক্ষফলপ্রদ সঙ্গীত কলা যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ডাদি দৈবানুষ্ঠানের সহিত গৌরবান্বিত সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং ক্রমে ক্রমে কেবল জনসাধারণের চিত্ত বিনোদনের উপকরণরূপেই ব্যবহৃত হইতে লাগিল। জ্ঞানমূলক যে শ্রদ্ধা এবং দৈহিক ও মানসিক বিশুদ্ধির ফলে মার্গী সঙ্গীত এতদিন জন-সমাজের রুচিকর ও অসাধ্যসাধনে উপযোগী হইয়াছিল, কাল-প্রভাবে মানব-সমাজের ক্রমিক অধঃপতনের ফলে সেই মার্গী সঙ্গীত ধীরে ধীরে লোপের পথে অগ্রসর হইতেছিল। এদিকে মার্গীর অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া দেশী সঙ্গীতও পরিবর্ত্তিত রুচির আবাহনে দেশে আত্মস্থাপন করিতেছিল। তবু এই দুঃসময়েও তদানীন্তন দেশীয় নৃপতিবৃন্দের সাহায্যে পণ্ডিতমণ্ডলী অল্পাধিক পরিমাণে মার্গী সঙ্গীতের আলোচনা করিতেন, নট ও বাদক সম্প্রদায়ও পণ্ডিতগণের শিক্ষায় সঙ্গীতের প্রাচীন সম্প্রদায়টিকে কিয়ৎপরিমাণে অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াছিলেন। আমরা ইতিপূর্বে রাজতরঙ্গিণীর যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই যুগের বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গুণগ্রাহী নরপতিগণের আশ্রয়ে থাকিয়া বিদ্বন্মণ্ডলী ঋষি প্রণীত শাস্ত্র অবলম্বনে নানা বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় নিরত ছিলেন। ঋষিগণের যোগলব্ধ অলৌকিক প্রতিভা তখন অস্তমিত হইলেও তদানীন্তন মনীষীগণের পাণ্ডিত্যের প্রতিভা নিতান্ত কম ছিল না। ঋষিকৃত গ্রন্থ ভিন্ন বিবিধ বিদ্যাস্থানের যে সকল মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থ আমরা অদ্যাপি দেখিতে পাইয়া থাকি সে সমস্তই এই মধ্যযুগে রচিত। হয়তো এসময়ে সঙ্গীত সম্বন্ধেও বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল; কিন্তু কালের প্রকোপে সে সমুদয় এখন লুপ্ত বা দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। ইহাও অসম্ভব নহে যে বিজয়দৃপ্ত অশিক্ষিত সেনাগণের নির্মম উৎপীড়নকালে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সেই অমূল্য ভাণ্ডার ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে। অথবা ইহাও অসম্ভব নয় যে বড় আদরের পবিত্র বস্তুটি অ-গুণজ্ঞ বিধর্মীর হাতে কলুষিত হইবে মনে করিয়া গুণীগণ নিজেরাই তাহা নষ্ট করিয়া গিয়াছেন। মিঃ পপ্‌লি বলিয়াছেন—বিজেতৃগণের অত্যাচারে ভীত বা প্রপীড়িত গুণীগণ উত্তরাখণ্ডে তিষ্ঠিতে না পারিয়া দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড়গণের আশ্রয় লইয়াছিলেন; তৎপর উত্তর ভারতের সে দুরবস্থা কিঞ্চিত প্রশমিত হইলে পরবর্ত্তী নরপতিগণ দক্ষিণাপথ হইতে আবার সুযোগ্য স্থপতি, ভাস্কর, চিত্র-শিল্পী ও সঙ্গীত-কলাবিৎ প্রভৃতি গুণীগণকে পুনরানয়ন করিয়া নানাবিধ বিদ্যা ও কারুকলায় উত্তরাখণ্ড সুশোভিত করিয়াছিলেন।

কারণ যাহাই হউক, আমরা দেখিতেছি—বেদাদি বহু শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ এখন সুদুর্লভ। সহস্রশাখাবিশিষ্ট সামবেদের কেবল দুইটি মাত্র শাখা এখন দেখিতে পাওয়া যায়, অবশিষ্ট শাখাসমূহ লুপ্ত। অপর তিনটি বেদেরও প্রত্যেকের দুই তিনটির অধিক শাখা দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল বেদ নহে—কি ব্যাকরণশাস্ত্র, কি দর্শনশাস্ত্র, কি আয়ুর্বেদ, কি ধনুর্বেদ, কি চতুঃষষ্টিকলা, সকল শাস্ত্রেরই তালিকায় বহু গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়; কিন্তু আজকাল সে সকল গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য বা লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপে সঙ্গীতশাস্ত্রের ও গন্ধর্ববেদ প্রভৃতির অমূল্য গ্রন্থরাজি নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। যাহা হউক, এই যুগের শেষভাগে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আমরা ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ দুই প্রান্তে দুইজন প্রবীণ পণ্ডিতকে গান্ধর্ব কলার

আলোচনায় নিরত দেখিতে পাই। প্রথম—বাংলার কেন্দুবিল্বনিবাসী কবিকুলশিরোমণি জয়দেব; দ্বিতীয়—সিঙ্ঘন নরপতির আশ্রিত পণ্ডিতাগ্রণী নিঃশঙ্ক শার্ঙ্গদেব।

জয়দেব তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত গীতিকাব্য "গীতগোবিন্দে" বহুবিধ রাগ ও তালের ব্যবহার করিয়াছেন। যে সময়ে সমগ্র উত্তর ভারত সঙ্গীতালোচনায় নিস্তব্ধ—নীরব, ইতিহাস একটি সঙ্গীতবিদের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দানেও অক্ষম, সেই কুহেলিকাচ্ছন্ন যুগেও এই মহাপুরুষ শাস্ত্রীয় রাগতালমণ্ডিত তাঁহার 'মধুর কোমলকান্ত পদাবলী'র এমনই স্বর-ঝঙ্কারে এদেশ মুখরিত করিয়াছিলেন যে তাহার অনুরণন আজ পর্য্যন্ত ভারতের আকাশে বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

আর দ্বিতীয়—নিঃশঙ্ক শার্ঙ্গদেব। ইনি কাশ্মীরীয় ব্রাহ্মণ, স্বস্তিগৃহ নামক প্রখ্যাত বংশে উদ্ভূত। আত্ম-পরিচয় প্রদানে ইনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে দেখিতে পাই—ইঁহার পিতামহ পণ্ডিতপ্রবর ভাস্কর স্বীয় জ্ঞানের প্রভায় দক্ষিণাপথ উদ্ভাসিত করিবার নিমিত্ত দক্ষিণায়ন নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

তত্রাভূদ্ ভাস্কর-প্রখ্যো ভাস্করস্তেজসাংনিধিঃ।
অলঙ্কর্তুং দক্ষিণাশাং ষশ্চক্রে দক্ষিণায়নম্॥

ইহাতে বোধহয় ভাস্করও দুর্বৃত্তগণের উপদ্রবে উত্তরাখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাপথের শরণাগত হইয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র 'সোঢ়ল' একজন অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন পণ্ডিত ছিলেন। ইনি যাদববংশীয় 'ভিল্লম্' নামক নৃপতির আশ্রয়ে অখিল-লোক-শোক-নিবারণী কীর্তি লাভ করেন। কালক্রমে ইনিই ভিল্লম-বংশধর সিঙ্ঘন নৃপতির বিজয়-গৌরবের প্রধান সহায়ক হইয়াছিলেন এবং গুণানুরক্ত নৃপতিকে স্বীয় অসাধারণ গুণগ্রামে আপ্যায়িত করিয়া প্রভূত সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন। আমাদের আলোচ্য শার্ঙ্গদেব এই সোঢ়লেরই যোগ্যতম সন্ততি। "তস্মাদ্দুগ্ধাম্বুধের্জাতঃ সাক্ষ্যদেব সুধাকরঃ।"—ক্ষীরোদসাগর হইতে চন্দ্রমার ন্যায় এই সোঢ়ল হইতে শার্ঙ্গদেব জন্মগ্রহণ করেন। সঙ্গীত-রত্নাকরে শার্ঙ্গদেবের স্বরূপ-পরিচয় কল্পে নিম্নলিখিত কথাগুলির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

কৃত-গুরুপদ-সেবঃ প্রীণিতা শেষ দেবঃ,
কলিত সকল শাস্ত্রঃ পূজিতা শেষ পাত্রঃ।
জগতি বিততকীর্তির্মন্মথোদার মূর্তিঃ,
প্রচুরতর বিবেকঃ শার্ঙ্গদেবোঽয়মেকঃ॥
নানা স্থানেষু সম্ভ্রান্তা পরিশ্রান্তা সরস্বতী।
সমবাস প্রিয়া শশ্বদ বিশ্রাম্যতি তদালয়ে॥
স্ববিনোদৈক রসিকো ভাগ্য-বৈদগ্ধ্যভাজনম্।
ধনদানেন বিপ্রাণামার্তিং সংহৃত্য শাশ্বতীম্॥
জিজ্ঞাসুনাঞ্চ বিদ্যাভির্গদিনাঞ্চ রসায়নৈঃ।
অধুনাখিল লোকানাং তাপত্রয়-জিহীর্ষয়া॥
শাশ্বতায়চ ধর্মায় কীর্ত্যৈ নিঃশ্রেয়সায়চ।
আবিষ্করোতি সঙ্গীত-রত্নাকরমনন্যধীঃ॥

অর্থাৎ শার্ঙ্গদেব গুরুগণের ও সকল দেবতার আরাধনা করিয়া সকল শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করেন। ইনি সৎপাত্রগণকে দানে আপ্যায়িত করিয়া জগৎবিস্তৃত কীর্তি অর্জন করেন। ইঁহার মূর্তি কন্দর্পের ন্যায় সুন্দর ছিল, তৎকালে একমাত্র শার্ঙ্গদেবই অসাধারণ বিবেকসম্পন্ন পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত—দেবী সরস্বতী নানা স্থান পরিভ্রমণে পরিশ্রান্তিবশতঃ সাহচর্যানুরাগিণী হইয়া ইঁহার আলয়ে বিশ্রাম করিতেছেন। ইনি চিত্তবিনোদনে অতিমাত্র রসিক এবং একাধারে সৌভাগ্য ও পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ছিলেন। এই মহামতি ধনদানে ব্রাহ্মণগণের চিরন্তন আর্তি, জ্ঞানদানে জিজ্ঞাসুগণের অজ্ঞান ও রসায়ন প্রয়োগে রোগার্তগণের রোগ বিনাশ করিয়া অধুনা সকল লোকের তাপত্রয় হরণ, শাশ্বত ধর্ম, কীর্তি ও মুক্তিলাভের জন্য সঙ্গীত-রত্নাকর রচনা করিতেছেন। (প্রাচীন পণ্ডিতগণ মধ্যে অনেকেই আত্ম-পরিচয় প্রসঙ্গে স্বভাবসুলভ সরলতায় আত্ম-প্রশংসা করিয়া ফেলিতেন; সে যুগে ইহা নিন্দনীয় ছিল না!)।

এই পরিচয়ে অন্য কথা যাহাই হউক, শার্ঙ্গদেবের সর্বতোমুখী জ্ঞান-প্রতিভা রত্নাকর-পাঠকমাত্রকেই অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। বস্তুতঃ বর্তমান সময়ে প্রাচীন ও পরবর্তীকালে লিখিত সঙ্গীত-গ্রন্থ যাহা পাওয়া যায় তন্মধ্যে সঙ্গীতোপযোগী বিবিধ বিষয়সমূহের প্রাঞ্জলভাবে একত্র সমাবেশনিবন্ধন সঙ্গীত-রত্নাকরের সর্বশ্রেষ্ঠতা সর্ববাদি-সম্মত। যাঁহারা সঙ্গীত-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কোন কারণে রত্নাকরকে অনুসরণ করিতে পারেন নাই তাঁহারাও ইহার শ্রেষ্ঠতা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ইহার শ্রেষ্ঠতার অপর একটি কারণ এই যে ইহাতে

দেশী-সঙ্গীতের ন্যায় মার্গী-সঙ্গীতও বিস্তৃত উপপত্তির সহিত আলোচিত হইয়াছে। দেশী-সঙ্গীত পদ্ধতির আলোচনা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের কার্য্য অপেক্ষাকৃত অনায়াস-সাধ্য; কারণ ইহা তৎকালপ্রচলিত পদ্ধতি—তাৎকালিক গায়কমণ্ডলীর অনুশীলনে এই পদ্ধতিটি স্পষ্টতর। কিন্তু মার্গী-সঙ্গীত ঐরূপ নহে। ইহা কেবল সম্প্রতি নহে, তৎকালেও অপ্রচলিত ছিল। শুধু অপ্রচলিত নহে—সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। গন্ধর্বগণ কিরূপ পদ্ধতি অনুসরণে এই গীতির অনুশীলন করিতেন, সম্প্রদায় বিলোপে তাহা জনসমাজের পক্ষে একপ্রকার অনধিগম্য। যে মনীষী এই দুর্বোধ্য পদ্ধতিটিকে গানোপযোগী পদ্ধতিতে পরিণত করিয়াছেন তাঁহার কার্য্য যে অনন্যসাধারণ সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই। সঙ্গীত-রত্নাকরের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াই প্রাচীন ও অর্বাচীন সকল গ্রন্থকারই এই গ্রন্থখানিকে প্রমাণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। অনেক গ্রন্থকার আবার স্বীয় গ্রন্থখানি নারদ-কৃত বলিয়া পরিচয় দিবার পরে গ্রন্থের গাম্ভীর্য্য রক্ষার জন্য 'তথাচ রত্নাকরে' উল্লেখ করিয়া একদিকে যেমন উপহাসাস্পদ হইয়াছেন—অপর দিকে তেমনি রত্নাকরের মহিমা প্রচার করিয়াছেন।

যাহা হউক, শার্ঙ্গদেব রত্নাকরের প্রারম্ভে—'সদাশিবঃ *শিবা ব্রহ্মা'—ইত্যাদি শ্লোকনিচয়ে* সঙ্গীত মত প্রবর্তক প্রাচীন আচার্য্যগণের নাম উল্লেখ করিবার পরে বলিয়াছেন—

অন্যেচ বহবঃ পূর্বে যে সঙ্গীত বিশারদাঃ।
অগাধং বোধমন্থেন তেষাং মত-পয়োনিধিম্।
নির্মথ্য শ্রীশার্ঙ্গদেবঃ সারোদ্ধারমিমংব্যধাৎ॥

অর্থাৎ—প্রাচীন আরও যে সকল সঙ্গীতাচার্য্য ছিলেন, শার্ঙ্গদেব স্বীয় জ্ঞানরূপ মন্থন-দণ্ডে তাঁহাদের অগাধ মত-সাগর মন্থন করিয়া এই সার-সঙ্কলন করিয়াছেন। শার্ঙ্গদেবের এই উক্তি পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়—তৎকালেও সদাশিব শিবা ব্রহ্মা ভরত কশ্যপ প্রভৃতি সঙ্গীত-গুরু-পরম্পরার মত লুপ্ত হয় নাই। লুপ্ত হইলে শার্ঙ্গদেবের পক্ষে মার্গী-গীত মার্গতাল প্রভৃতির উপপত্তিযুক্ত বিস্তৃত আলোচনা করা কিছুতেই সম্ভবপর হইত না। শার্ঙ্গদেবের মতে মার্গী-সঙ্গীত অনাদিকাল হইতে একই পদ্ধতিতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইহা বেদের ন্যায় অপৌরুষেয়; এই পদ্ধতির গঠনপ্রণালী অপরিবর্তনীয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও ইহা যেরূপ ছিল অধুনাতন গ্রন্থেও অবিকল তাহাই উদ্ধৃত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং প্রাগৈতিহাসিক যুগে সঙ্গীত-পদ্ধতি কিরূপ ছিল তাহা আমরা রত্নাকর বর্ণিত মার্গী-সঙ্গীত আলোচনা করিলেই সম্যক বুঝিতে পারিব, ইহা মনে করিয়াই আমরা প্রাগৈতিহাসিক যুগের আলোচনায় সঙ্গীত-পদ্ধতির কোন কথাই উল্লেখ করি নাই।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—প্রাচীন অন্যান্য গ্রন্থ পরিত্যাগ করিয়া কেন আমরা রত্নাকরেরই এত পক্ষপাতী হইলাম?—মতঙ্গ প্রণীত বৃহদ্দেশী, নারদ রচিত সঙ্গীত-মকরন্দ, পার্শ্বদেবকৃত সঙ্গীতসময়সার, লোচন কবি প্রণীত রাগতরঙ্গিণী প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ পরিত্যাগ পূর্বক আমরা সঙ্গীত-রত্নাকরেরই অনুসরণে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সঙ্গীত পদ্ধতি বুঝিতে প্রয়াস করিতেছি কেন? তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ প্রাচীন হইলেও উহাতে প্রাগৈতিহাসীয় মার্গী সঙ্গীত রত্নাকরের ন্যায় বিস্তৃত উপপত্তির সহিত আলোচিত হয় নাই। আর আমাদের রত্নাকর-পক্ষপাতের দ্বিতীয় কারণ—ইহা ভরত মতানুগ। তৃতীয় কারণ—কল্লিনাথের ন্যায় একজন প্রবীণ টীকাকারের চেষ্টায় সঙ্গীত-রত্নাকরের বিস্তৃত উপপত্তির আলোচনা যেমন একটি সুস্পষ্ট পদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছে এমন একটি পদ্ধতি আমরা কোন গ্রন্থেই পাই নাই।

যাহা হউক, এইবার আমরা সঙ্গীত-রত্নাকর বর্ণিত নাদ, শ্রুতি, স্বর প্রভৃতি রাগোপযোগী উপকরণসমূহের বিস্তৃত আলোচনায় বুঝিতে প্রয়াস করিব—প্রাগৈতিহাসিক যুগে ও মধ্যযুগে সঙ্গীতপদ্ধতি কিরূপ ছিল।



হিমালয় ও সমতল-দুহিতা

শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার এম-এ

মনে প্রাণে আমি পাহাড়-অঞ্চলের লোক। ভেবে ভেবে অবাক্ হ'য়ে যাই, কেন আমি পাহাড়ে জন্মালাম না। যদি এই ভারতবর্ষেই জন্মালাম—অবশ্য ভারতবর্ষে জন্মাতে আমি বিশেষ আপত্তি অনুভব ক'রেছি ব'লে মনে পড়ে না—যদিও ব্যাকরণগত একটু অসুবিধে বরাবরই আছে; যথা—'জননী ভারত' না 'জনক ভারত'? বাংলাকে এক নিমেষে মা ব'লে চিনে নেওয়া যায়, কিন্তু ভারতবর্ষের বেলা কেন জানি না, আমার কেবলই গোল বেধে যায়!—সে যাই হোক্—যা বল্‌ছিলাম; যদি এই ভারতবর্ষেই জন্মালাম, তবে সিম্‌লে ছিল, মুসৌরী ছিল, দার্জ্জিলিং ছিল, এমন কি বিন্ধ্যাচল এবং পরেশনাথের পাহাড় ও ছিল—সেই সব উন্নত স্থানে না জন্মে এই গ্রীষ্মপীড়িত কল্‌কাতার এক নীচ ধুলি-লীন গলিতে জন্মে আমি জানি আমি মোটেই সুরুচির পরিচয় দিতে পারিনি। যে রাস্তায় জন্মেছি তার নাম সিম্‌লা ষ্ট্রীট। এমনও এক একবার মনে হয়, গোড়াতেই কোন গলদ হয় নি তো? বৃহৎ ব্যাপারে একটু আধটু ভুলচুক্ হওয়া আশ্চর্য্য নয়। ঠিকানার গণ্ডগোল হলে কে আর দেখ্‌তে যাচ্ছে! নইলে সিম্‌লা ষ্ট্রীট্ আর সিম্‌লা—যাক্, যা হ'য়ে গেছে তা নিয়ে মাথা ঘামানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

অতএব মেনে নেওয়া গেল আমি পাহাড়ে লোক। একটু মুস্কিল এই যে এখন পর্য্যন্ত পাহাড় কেন, এক-তলা দোতলা উঁচু কোন মাটির ঢিবি পর্য্যন্ত দেখি নি। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে আমার ধাত পাহাড়িয়া। গ্রীষ্মের দুপুরে যখন ঘর অন্ধকার ক'রে আমি বরফের কথা ও 'হিমালয়্যান্ উচ্চতা সকলে'র কথা বলি, তখন আমার বন্ধুরা বিশেষ উপকার বোধ করেন। বরফের ধোঁয়া দেখেছেন সকলেই—আমার এক বন্ধু বলেন, আমি যখন ঐ বিষয়ে বলি, আমার গলার আওয়াজ যেন বরফের ঠাণ্ডা প্রায়—অদৃশ্য ধোঁয়ায় জড়ানো ব'লে বোধ হয়। আমার ঘরের দেওয়ালে পাহাড় ও বরফের যে 'ভিউ'-গুলো রয়েছে তা দেখ্‌লে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন—এ ভদ্রলোক এক নির্ব্বাসিত যক্ষ ব্যতীত আর কিছুই নন্। কয়েক মাস আগে ঝুরো ঝুরো সামান্য গোঁফ ও পাতলা লতানো গোছের ঈষৎ দাড়ি রেখে বেশ একটু 'যক্ষ যক্ষ' এফেক্ট্ হ'য়েছিল, কিন্তু মিনু—আমার স্ত্রী—যাক্, তা'র কথা আর এখানে কেন।

এই সমতল-ভূমির লোকদের আমি ঘৃণা করি। পায়ের তলায় বরাবর একটানা সমান পথ পায় কিনা, কাজেই কি হাস্যকর দেখুন ওদের চলন বলনের ভঙ্গী! হাঁসের মত। দুল্‌তে দুল্‌তে কোঁচা লোটাতে লোটাতে পান চিবোতে চিবোতে চলেছেন। হড়্‌কা গোল গোল কথাগুলি ভুঁড়িতে একটু নাড়া দিলেই অবলীলাক্রমে মসৃণভাবে বেরিয়ে আসে; friction প্রায় nil! সংস্কৃত ভাষায় 'সিংহ' 'ব্যাঘ্র' প্রভৃতি উপমায় অলঙ্কৃত ক'রে শ্রেষ্ঠ লোকদের সমাদর করার রীতি আছে। এই সব লোকদের ঘোরতর অনাদর ক'রে আমার বল্‌বার ইচ্ছে হয় 'নর-হংস'! যথেষ্ট অপমান করা হয় কি? বাস্তবিক্ বল্‌ছি—অতটা মসৃণতা আমার ভালো লাগে না। গোল হ'চ্ছে এদের সম্পূর্ণতার আদর্শ। এদের উদরের পরিধির দিকে লক্ষ্য করুন, সেই আদর্শের ইঙ্গিত পাবেন। এরা চায় এমন 'গোল'—যা অল্প চেষ্টায় অনেক দূর গড়ায়। অতএব চিরকাল ঐ গোলমালই ওদের goal হ'য়ে রইল। (দেখেছেন একবার ইংরাজি বাংলা মিশোনো punএর ছড়াছড়ি! shakespeare এমন পারতো?) এরা জীবনের সেই অংশটা একেবারেই দেখে নি যেখানে চলার মধ্যে আছে শৌর্য্য, বাঁচার মধ্যে আছে সাধনা; যেখানে পথ দুরূহ চড়াই ভেঙে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে উঠে আবার ঢ'লে প'ড়েছে ঢালু ওৎরাই বেয়ে সেই গভীর—গভীর উপত্যকায়—যেখানে টিং টিং ক'রে বাজ্‌ছে সেতারের তারের মত একটি ঝরণা! (আমার এই উপমাটি শুনে—অবশ্য নিজের প্রশংসা নিজে করা উচিত নয়—আমার স্ত্রী আমায়

—আমায় কিছু একটু করেছিল।) ভাল কথা—এদেশের লোকের ব্যবহারটা একবার শুনবেন? আমি প্রতিদিন সকালে আমাদের সিঁড়িতে ওঠা নামা ক'রে একটু চড়াই ওৎরাই প্র্যাক্‌টিস্ রাখি—তাইতে মিনু—আমার স্ত্রী—সে তো এই কল্‌কাতারই মেয়ে—ওহো, কি ভুল দেখ। পাহাড়ের কথার সঙ্গে স্ত্রীর কথা কখনো খাপ খায়। ঝরণার স্বচ্ছ জলে সমতলদেশের কাদা মিশতে পারে কি?

তা'ছাড়া এই অসহ্য গরমে স্ত্রীর কথা না তোলাই ভাল। বাংলা দেশের মেয়েদের স্নিগ্ধতার কথা এবং তাদের গুণগরিমায় মুখর কবিতা সেই দাঁত ওঠ্‌বার আগে থাকৃতে শুনে এবং প'ড়ে আস্‌ছি। তারপর দাঁত উঠ্‌লো, তথাপি এই বাঙ্গালী মেয়ে সাব্‌জেক্টে এখনো দন্তস্ফুট ক'রতে পারি নি। স্নিগ্ধ—না, ভিজে বলুন! একটা air-tight ঘরে খানিকক্ষণের জন্যে কয়েকটি বঙ্গবালাকে আট্‌কে রাখুন তো—দেখ্‌বেন ঘরের হিউমিডিটি দু'গুণ বেড়ে গিয়েছে। পাহাড়ে ধাতের লোক আমি—ও জব্‌জবীয়তা আমার ভাল লাগে না মশাই। বাঙ্গালী মেয়ের সান্নিধ্য একটু বেশী পরিমাণ সেবন করা হলেই ভয়ে বুক শুকিয়ে যায়—স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সকলেরই সাবধান হওয়া উচিত তো! অবশ্য মিনু বলে আমার পায়ের কব্জির বাতটা অতিরিক্ত মাংস খাবার ফল—ছেলেমানুষ, বলে বলুক—কিন্তু এ বাত কিসের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম সে কথা আমার জানা আছে।

গরম—গরম! সকলেই বলছে। কিন্তু আমার মত অনুভব ক'রছে কে? কল্‌কাতার লোক সেদ্ধ হ'য়ে আরও একটু মসৃণ ও নরম হ'য়ে উঠ্‌বে আশা করি। কিন্তু আমার এ দুর্ভোগ কেন? আমি সেদ্ধ হ'তে রাজি নই। বরং ভাজা হ'তে প্রস্তুত আছি। আরব বেদুইন যেমন মরুভূমির শুক্‌নো তাতে ভাজা হ'য়ে লাল্‌চে ধরণের কালো হ'য়ে ওঠে। বাঙ্গালীরা সরষের তেল মাখে খুব এবং কল্‌কাতার রাস্তাও ভাজ্‌বার পক্ষে চমৎকার। কিন্তু বাঙ্গালী স্বভাব-রসিক জাতি। কড়ায় (অর্থাৎ শান-বাঁধানো পথে) চাপালেই বাঙ্গালী থেকে অসম্ভব রস নির্গত হয়। ফলে, এখানে হাফ্‌-বয়েল্ট্‌ বা ফুল-বয়েল্ট্‌ লোক বিস্তর পাবেন—ভাজা ব্যক্তি যদি দু'শোয় একটা মেলে।

এই তো আজও দুপুরে ঘরে ব'সে আছি। বন্ধ ঘর; শুধু দক্ষিণের দরজা ও উত্তরের জানলাকে পরস্পর কথোপকথনের সুবিধে দিয়েছি। তাদের মুখ ফাঁক আছে—খুব অল্প—পাছে মুহূর্ত্তের অনবধানতায় আলোচনা উত্তপ্ত হ'যে ওঠে। বাইরে চিল উড়্‌ছে—জান্‌লার ঈষৎ ফাঁক দিয়ে ঘরের অন্ধকারের ব্যাক্ গ্রাউণ্ডে তা'র ছায়া দুলছে। তেমন উৎসাহ বোধ হ'চ্ছে না, নইলে মিনুকে এই সুযোগে 'পন্‌হোল্ ক্যামেরা'র প্রিন্সিপল্‌টা বুঝিয়ে দিলে হ'ত। মনে মনে গ্রীষ্ম-বর্ণনার একটা রাফ্‌ খস্‌ড়া তৈরী ক'রছি। বাইরেটা চোখের ওপর নেই, তাই মনের ওপর আছে। দেখ্‌তে লাগ্‌লাম—একটা রোগা কাদামাখা কুকুরের হাঁ-করা মুখ; কালো ঘোলাটে চোখ মোষ—মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙ্‌ছে-পথের মধ্যে গাড়ী ঘোড়া আট্‌কে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোধ হয় 'আত্মানং বিদ্ধি' অভ্যাস ক'রছে। হিন্দুস্থানী খাবার-ওয়ালা, তা'র দোকানে একেবারে ফুট্‌পাথের ওপর এক বিশাল চুল্লী—গন্‌গনে তার আঁচ—তাইতে এককড়া তেল চাপিয়ে গরম গরম পুরী কচৌরি ভেজে তুলছে; বাস থেকে নাম্‌লো একটি মেয়ে—যেন রাজরাণী আজ পথের ভিক্ষুক এমনি মুখের অবস্থা—সে আত্মপ্রত্যয় নেই, পথচারীর দৃষ্টির প্রতি জয়ের আস্বাদন-মিশ্রিত সেই গর্ব্বিত উপেক্ষা নেই—সেই ভুবনমোহিনী গতিলীলা আজ কোথায়!—মাথা হেঁট ক'রে যথাসম্ভব দ্রুত চ'লেছে—পথিকের দৃষ্টিতে সঙ্কুচিত, ভীত, ক্ষমাপ্রার্থী! ওর এই শুক্‌নো বিপর্য্যস্ত চেহারার 'স্ন্যাপ্‌শট্' নেবার জন্য যে সকল উৎসুক মন 'এক্‌সপোজার' দিলে, তাঁদের এই অনুরোধ, 'নেগেটিভ্' তাঁরা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য রেখে দিতে পারেন, কেউ আপত্তি ক'রবে না—কিন্তু সাবধান! কখনো যেন সেই ছবি কাগজে প্রকাশ না করেন। অন্ততঃ একটা ঋতু ওদের দেমাককে একটু শুকোবার অবসর দেওয়া যাক্—নইলে সারা-বৎসর এভার্-গ্রীন্ থেকে যে ওদের দেমাক উত্তরোত্তর বেড়েই যাবে—সে কোন কাজের কথা নয়। (স্বামীরা পরস্পরকে বিশ্বাস ক'রতে পারে তো? এ সব কথা আশা করি স্বামী সমাজের বাইরে যাবে না?) আমি এই সীজ্‌নটা মিনুর দিকে এমন ভাবে চাই—যেন দিনে দিনে সে একটি পেত্নী হ'য়ে উঠ্‌ছে। ফলে বৈশাখ আর জ্যৈষ্ঠ এই দু'টি মাস

বাধ্যতা, নীরবসেবা, পাতিব্রত্য প্রভৃতি কম্পাল্সারি সাব্জেক্টে মিনু আশ্চর্য্য উন্নতি লাভ করে।

সর্ব্বনাশ, খানিকক্ষণের জন্য এ আলোচনা বন্ধ রাখ্তে হবে, মিনু ঘরে এসে ঢুকেছে। দেখুন, আমার দোষ নেই। আমি ওদের এড়াতে চাইলে কি হবে, ওরা আপনা থেকে এসে হাজির হবে দু'হাজার লোকের সাম্নে। ওপরের প্যারাগ্রাফ্টায় বাঁ হাতটা চাপা দিয়ে রেখেছি বটে, কিন্তু মেয়েদের কৌতূহল—বলা যায় না। নিস্পৃহ চোখে চেয়ে গলা একেবারে absolute zeroতে নামিয়ে এনে বল্লাম—বাঃ বাঃ চমৎকার দেখাচ্ছে দেখ্ছি যে!

—যাও বল্তে হবে না। আমি দেখতে খারাপ আছি-আছি। তুমি তো খুব ভাল দেখ্তে—তাহ'লেই হ'ল—

যেন আপনমনেই বল্লাম—ওরই বা আর দোষ কি। জন্মেছে সমতল-ভূমিতে। এর চেয়ে আর কত ভাল হবে!

—একটা পাহাড়ী মেয়ে বিয়ে করে আন্লেই পার্তে। করো না এখনো! ঐ তো সুরেশবাবুদের সঙ্গে একটা খাসিয়া ঝি এসেছে—ওর কোন স্বজাতকে—

—বড় ফাজিল হ'চ্ছ মিনু। বাঙ্গালী বাপের সন্তান তুমি—বাঙ্গালী খুড়োর ভাইঝি—জানাই ছিল যে শেষ পর্য্যন্ত—

—বাজে কথা যাক্—আমার বাঙ্গালী খুড়ো—

উত্তেজিত হয়ে উঠে বল্লাম। 'আবার তাই নিয়ে গর্ব্ব করা হচ্ছে?' চোখে একটা একশ ক্যাণ্ড্ল্-পাওয়ারের ধমক পূরে নিয়ে ওর দিকে চাইলুম। থতমত খেয়ে গেল। কিন্তু তাতেও আমার মন উঠ্লো না। সেই কথাটা—যা শুন্লে জানি ও একেবারে নিঃস্ব নিষ্কিঞ্চু—মিল্টনের void abrupt হয়ে যাবে——বলে দিলুম সেই কথাটা।—'জানো, তোমার খুড়োর—(সেই ভীষণ কথাটা উচ্চারণ করা শক্ত)—তোমার খুড়োর ভুঁড়ি আছে?'

কিন্তু প্রতিক্রিয়াটা বিপরীত হল। কোথায় থেমে যাবে, নিভে যাবে, তা নয় ব্যতিব্যস্ত হয়ে তীক্ষ্ণ চাপা স্বরে বল্লে—চুপ করো, শুন্তে পাবেন—

—কে?

—কাকাবাবু—

ঠাট্টা নয়—অকৃত্রিম উৎকণ্ঠা। মুখটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন ক'রে তা বোঝা গেল। বল্লাম, বলো তো—পুঙ্খানুপুঙ্খ! ফের অবাধ্যতা কর্‌ছো—বল বল্‌ছি—পুঙ্খানুপুঙ্খ—

ভয়ে ভয়ে ও বল্লে, পুঙ্খানুপুঙ্খ!

বেশ খুসী বোধ হল। বল্লাম, বেশ, বেশ! কথাটা ভাল। গরমকালের উপযোগী। রাঁধ্তে রাঁধ্তে যখন ভয়ানক গরম বোধ হবে তখন বলো—পুঙ্খানুপুঙ্খ! ঠাণ্ডা বোধ হবে। আর কিছুই নয়—ঐ উভয় খয়ের জন্তই। যেমন মনে করো পঙ্খা! বাঃ—ঠিক্ যেন গায়ে এক ঝলক্ মিঠে হাওয়া লাগ্‌ল। বাঙ্গালীর পাখা শুক্‌নো খড়্খড়ে। চাই পঙ্খা। গঙ্গায় ময়ূরপঙ্খী চেপে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পঙ্খার হাওয়া খাও! হা হা! হ্যাঁ, কি বল্‌ছিলে, তোমার ভয় হয়েছে যে আমার গলার আওয়াজ তোমার কাকা সেই ভবানীপুর থেকে শুন্‌তে পাবেন? শঙ্কা কি? আমার গলা কি পাঞ্চজন্য শঙ্খ? তোমার কাকার ভুঁড়ির কথা—

—আঃ, কি কর্‌ছো—কাকাবাবু এসেছেন—নীচের ঘরে বসে আছেন। আবার উঠ্তে হল।—কি বল্লে, তোমার কাকাবাবু এসেছেন?

—হুঁ—

—মিনু, ভাল করে ভেবে দেখ। গ্রীষ্মের দুপুর ঠাট্টার পক্ষে আদর্শ সময় নয়। যতটা আমি বুঝ্তে পেরেছি তাতে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায় যে তুমি আমায় বিশ্বাস করাতে চাও যে তোমার কাকা এসেছেন। কেমন কি না?

—হুঁ—

—কিন্তু তারপর তুমি যখন দেখ্‌লে এই নিদারুণ গরমে এ সব ঠাট্টা ওঁর বরদাস্ত হচ্ছে না তখন অনুতপ্ত হয়ে তাড়াতাড়ি তুমি কি বলে ফেল্লে?

এ-ধারে ভালমানুষ আছে, কিন্তু কোন একটা জেদ ধর্‌লে মিনু একেবারে নাছোড়বান্দা। ঘাড়গুঁজে, একগুঁয়ে-ভাবে সেই invertible কথা—ব'ল্‌ছি, কাকা এসেছেন।

বেশী ইমোশন হলেই আমার গলাটা কেমন কাঁপতে থাকে। বল্লাম—মিনু, ঘরে কত চাল আছে?

—চাল কি হবে?

—বল মিনু, এ কথা কাটাকাটির সময় নয়—

—তা সের পাঁচেক হবে!

সন্দেহে আমার মন ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলতে

লাগ্‌লো। 'হবে তো?—শেষ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা ক'রেই ফেল্‌লাম, পাঁচ সের হবে তো?'

—কিসের কথা বল্‌ছো?

হায় নারী। এই ভীষণ সঙ্কটেও ছলনা প্রবৃত্তি যায় না। ওকে আশ্বাস দিয়ে গলা খুব মিঠে করে বল্‌লাম, আমি তোমার সহধর্ম্মী। তোমার বিপদে আমি বুক দিয়ে পড়্‌বো না তো কে পড়্‌বে। কষ্ট হবে—হ্যাঁ, এই রোদ্দুরে মুদীর দোকানে যেতে অসম্ভব কষ্ট হবে—কিন্তু তুমি বলো, লজ্জা ক'রো না—সকলেই কিছু তোমার আমার মত নয়? পাঁচসেরে যদি না হয়—

—ও, তুমি কাকার খাওয়ার কথা বল্‌ছো? কাকা তো খেয়ে এসেছেন। আর কাকা একলা পাঁচ সের চালের ভাত খেতে যাবেন কেন? তুমি কি মনে কর কাকাকে?

কাকা সম্বন্ধে বাঙ্গালী মেয়ের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা।—যেতে দাও মিনু, যেতে দাও ও কথা। তাহলে নীচের ঘরেই তোমার কাকা আছেন, কি বলো! ভাল ভাল। ঘরটা ঠাণ্ডা আছে।

—তুমি একবার দেখা কর্‌বে না?

—'আমি! হ্যাঁ—তা—কি জানো মিনু, তোমাকেই হয়তো উনি একলা পেতে চাইছেন। আশ্চর্য্য, একথা তো একবারও তোমার মনে হয় নি? বড় মধুর এই সম্পর্কটি—কাকা আর ভাইঝি!'—মিনুর পিঠে মৃদু স্পর্শ ক'রে গলায় কোমল গান্ধার লাগিয়ে বল্‌লাম, 'যাও যাও, কাকার সঙ্গে গল্প করগে যাও—কতদিন পরে দেখা!'—বালিশটায় আড় হয়ে পড়া গেল।

খুড়-শ্বশুরকে কত সম্ভ্রম করে চল্‌তে হয় সে কি আর আমি জানি না! শুধু নিছক্‌ রসিকতার খাতিরেই ব'ল্‌ছি—আমার গ্রীষ্মবর্ণনার আর একটা উপকরণ জুটে গেল—ঘর্ম্মাক্ত খুড়্‌শ্বশুর। উত্তাপের পরিমাণ এবং খুড়্‌শ্বশুরের দেহের ওজন—এই থেকে স্বচ্ছন্দে ইকোয়েসন ক'সে 'এক্‌স্‌' অর্থাৎ ঘামের পরিমাণ বার ক'রে দেওয়া যায়।

মনে মনে অঙ্কটা কস্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি, এমন সময় মিনুর পুনঃপ্রবেশ। জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—মিনু, তোমার কাকার ওজন দু'মণ হবে নিশ্চয়? তাহলে তাপ যদি ১০৩ ডিগ্রী ফারেন্‌হিট্‌ হয় এবং দেহের ওজন যদি দু মণ হয়—

—কি যে সব আবোল-তাবোল বক্‌ছো? একবার নীচে চল। এতটা পথ এই রোদ্দুরে এসে কাকা কি রকম ক'র্‌ছেন—

—কি কর্‌ছেন?

—ভয়ানক ঘাম্‌ছেন—আর—

—ঘাম্‌ছেন! তা'তো জানি। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই যে কত ঘাম্‌ছেন? তাঁর কোন মাপ আছে কি?

হঠাৎ চম্‌কে উঠ্‌লাম।—'মিনু, সত্যি বলো, কোথায় তাঁকে বসিয়েছ?'

—কেন, তোমার চেয়ারে—

—টেবিলের ওপর নিশ্চয় পা তুলে বসেছেন?

—হ্যাঁ, তা—

—থাক্‌, বুঝে নিয়েছি। একতাড়া কাগজ ফেয়ার কপি করে রেখেছিলাম—রোদ্দুরে শুকিয়ে নিয়ে তাই দিয়ে উনুন ধরিও। যাও মিনু সকালে যে ছবিটা এনে টেবিলের ওপর রেখেছিলাম—সেটা হরিদাস চেয়েছিল, তখন তা'কে দিইনি—এবারে পাঠিয়ে দওগে যাও। ভাল কথা—দৌড়োও, দৌড়োও মিনু, মাটীর তৈরী মূর্ত্তিগুলো দেরী ক'রো না, এখনি যাও—

মিনু দ্রুতপদে নীচে নেমে গিয়ে ঐ জিনিষগুলি উদ্ধার ক'রে আন্‌লে। কতকটা সুস্থবোধ ক'র্‌লাম, মাঝে মাঝে মূর্ত্তিগুলির রং একটু আধটু উঠে গিয়েছে—সে মেরামত কর্‌তে আমার বিশেষ বেগ পেতে হবে না।

বালিশে কাত হয়ে পরপর দুটো গভীর নিশ্বেস ফেল্‌লাম।

—তাহ'লে তুমি আর উঠ্‌বে না?

—আহা, উঠ্‌বো বই কি, উঠ্‌বো বই কি। বেশী ব্যস্ত হচ্ছ কেন মিনু? মোটা মানুষ—এই দারুণ গরম—একটু সুস্থভাবে খানিকক্ষণ ঘাম্‌তে দাও না—বিশেষতঃ টেবিলের ওপর যখন আর কোন মাটির জিনিষ নেই—

ভারী অভিমানী মেয়ে এই মিনু। প্রায় কাঁদোকাঁদো সুরে বল্লে, এ কি সুস্থভাবে ঘামা! তাহ'লে তোমাকে আমি বিরক্ত করি? কাকার সর্দ্দিগর্ম্মি হয়েছে। তিনি বোধ হয় এবার—

—বটে, বটে? বাস্তবিক, কিছু করা দরকার—উঠে

প'ড়লাম। বললাম, মিনু, এই নাও, এই প্যাডে পাঁচখানা ব্লটিং-পেপার আছে, নিয়ে যাও। আমি আর যাবো না বুঝলে, এ সময় আমায় দেখে যদি অনর্থক উত্তেজিত হ'য়ে ওঠেন সেটা ভাল হবে না। বুকে পিঠে দু'খানা, দুই পায়ে দুইখানা মুড়ে দিতে হবে, আর—আর—এ সময়ে ছেলিকেসি ক'রতে গেলে বোকামি হবে—তাই বল্‌ছি—এই—ইয়ে ভুঁড়ির ওপর একখানা সেঁটে দিও—

কোথায় আমার এই উদ্ভাবনী শক্তিতে উৎসাহিত হ'য়ে উঠ্‌বে, তা নয়, দেখি মিনু দাঁড়িয়ে আছে যেন একেবারে মূর্ত্তিমতী অপ্রত্যয়! হঠাৎ রাগ হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সাম্‌লে গেলাম। রাগে মীমাংসা নেই, মীমাংসা আছে সহানুভূতির মধ্যে! আধুনিক যুগের সব সমস্যার মীমাংসা হ'য়ে যায় যদি সকলে কল্পনার প্রসার দ্বারা পরস্পরকে বোঝবার চেষ্টা করে। মিনুকে বুঝে নিলাম। ওর অনিশ্চিত দাঁড়াবার ভঙ্গী, ওর সংশয়চঞ্চল চোখ দু'টি, আর ওর ঠোঁটের দু-পাশে অল্প অল্প কম্পন—এর মানে বুঝতে কি আমার এক সেকেণ্ডের বেশী দু সেকেণ্ড লাগ্‌তে পারে? এই সব ব্যাপারের একমাত্র সহজ সরল অর্থ—ওতে হবে না। মিনু ব্লটিং পেপারের পক্ষপাতী নয় এবং মিনুই অবশ্য এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বিচারক। তার কাকাকে আমার চেয়ে বেশীদিন সে দেখেছে তো। বল্‌লাম, ঠিক মিনু, তুমি যা ভাব্‌ছো কিন্তু বলতে পার্‌ছো না, তাই ঠিক্ বটে। বুদ্ধি আমার আছে, কিন্তু এ বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমি তোমার সঙ্গে পার্‌বো কেন? ও 'কাকা' সাব্‌জেক্টে আমি ছেলেবেলা থেকেই কিছু কাঁচা আছি। ঠিক্ বলেছ মানে—ইয়ে ঠিক্ ভেবেছ। ও ব্লটিং-ফ্লটিংএর কর্ম্ম নয়। পাকা গাঁথুনী না হ'লে ঐ ভীষণ বন্যা থাম্‌বে কি? মিনু যাও আর দেরী করো না। রান্নাঘরের মেঝে মেরামতের জন্যে যে সিমেণ্ট এসেছিল, তা'রি খানিকটা সিঁড়ির নীচের অন্ধকার খুপ্‌রিতে বস্তাবন্দী করা আছে। আর ভয় নেই, মন প্রফুল্ল ক'রে চলে যাও, সেই সিমেণ্ট—

অসমাপ্ত কথাই বলুন, আর কাব্যই বলুন—আমার কাছে চিরকালই তা'র একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। মুমূর্ষু বৃদ্ধ ধনকুবের যখন শেষ কথাটি উচ্চারণ না ক'রেই ইহলীলা সংবরণ করেন, সে তো এক পরম রোমাঞ্চকর উপন্যাস। কিম্বা চিরকুমারসভার অক্ষয়ের গানগুলো। কিম্বা মনে করুন কীট্‌সের অসমাপ্ত কাব্য হাই-হাই—না, এই গরমে অত বড় বিজাতীয় নামটা উচ্চারণ করবার ক্ষমতা নেই। হাই পর্য্যন্ত ব'লেই হাই উঠে আস্‌ছে। যাঁরা প'ড়েছেন, নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন এতক্ষণে! যাই হোক্, আমার বেলা ঐ সিমেণ্ট পর্য্যন্ত এসে আমার যে বাক্যটি থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল, তা'কে নিয়ে কোন রকম কাব্য করবার বিন্দুমাত্র উপায় রইল না। দু' তিনবার ঢোক গিলে ঐ সর্ব্বনেশে বাক্যটাকে উদরস্থ করবার চেষ্টা ক'রলাম, কিন্তু জানি তো, নিক্ষিপ্ত তীর, মুখ থেকে নির্গত কথা প্রভৃতিতে বৃত্তান্ত। এদিকে মিনুর ঠোঁটের দু'পাশ ঘন ঘন কুঞ্চন ও প্রসারণে স্থানীয় ভূমিকম্পের মত বিপজ্জনক হ'য়ে উঠ্‌ল এবং তার চোখে দারুণ দুর্য্যোগের সূচনা দেখা দিল।

তাড়াতাড়ি বল্‌লাম, কি যে সব বাজে বক্‌ছি। ব্লটিং পেপার আর সিমেণ্ট্, আমার মাথা আর মুণ্ডু, ছাই আর ভস্ম! এতক্ষণে কোথায় দৌড়ে একজন Tropical Medicine পাশ করা অভিজ্ঞ ডাক্তার ডেকে নিয়ে আস্‌বো, তা নয় যত সব—। তোমারও দোষ আছে মিনু, জানো আমি আজে বাজে বকতে সুরু করলে সহজে থামি না—আমাকে তো তোমার একটু তাড়া দেওয়া উচিত ছিল! দেখ তো—এখন যদি তোমার কাকার ভালমন্দ একটা কিছু—

এই! আবার একটা অসমাপ্ত বাক্য অপ্রস্তুতভাবে শূন্যে ঝুলে রইল। যেন কে নারকেল বাগানে নারকেল চুরি করতে এসে ধরা পড়ে গিয়েছে—আর নাম্‌তে পার্‌ছে না।

নীচে থেকে একটা গম্ভীর-আওয়াজ বল্‌বো না—বরং বলা যাক্ কোলাহল শোনা গেল—'ওরে মিনু, কাজ আছে এখন আর ব'স্‌তে পার্‌বো না। আর একদিন আস্‌বো অখন। দোরটা দিয়ে যা—

পাঞ্জাবিটা মাথায় গলিয়েছিলাম, খুলে ফেলে তাড়াতাড়ি হাত বাড়ালাম অভিমানিনীর হাতটা ধরবার জন্য এবং পরমুহূর্ত্তেই হাতটাকে ফিরিয়ে নিয়ে গভীর ক্লান্তিভরে ডেক্-চেয়ার আশ্রয় করলাম। একথা কি কোনদিন স্বপ্নেও ভেবেছিলাম যে একজন মেয়ে—তাও বাঙালী

মেয়ে—এত সামান্ত কারণে আমাকে এক নিদারুণ থাক্-চিনে-নিয়েছি-ভাবের ভ্রূকুটি-বিদ্ধ করে দপদপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে যাবে!

বেশ গল্পটা আরম্ভ ক'রেছিলাম, কিন্তু শেষ হ'ল এক বিরক্তিকর গোলমালে। আমার দোষ কি বলুন? মৈনাক পাহাড় যেমন সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পাহাড়ত্ব ঘুচিয়েছিল, আমি নিজেও সেই রকম সমতলভূমিতে বাসা বেঁধে একেবারে 'সী-লেভেল' হয়ে আছি। আমার গল্প আর কত ভাল হবে!

হিমালয়! হিমালয়! আহা, নামটার মধ্যেই যেন কি ইন্দ্রজাল আছে। হে হিমালয়, হে সমতল-নিগৃহীতের জপমন্ত্র, আমার মধ্য গ্রীষ্মদিনের স্বপ্ন! এই সুদূর কল্‌কাতা নগরী থেকে আমার দীর্ঘশ্বাস কি কখনো ভেসে গেছে কোন দক্ষিণা হাওয়ায় (হিমালয়কে 'আপনি' বল্‌বো, না 'তুমি' বল্‌বো? 'তুমি'ই বলি।) তোমার প্রাচীন বুকে যদি গিয়ে থাকে তবেই বুঝ্‌বে এ কি সমস্যা। আমি তোমার সঙ্গে ঐ সামান্ত মেয়েটার তুলনাই হয় না। কিন্তু মনের পাপ ব্যক্ত করেই বলি, এই ক'দিন যতই দেখছি ওর মুখ ভার, ততই থেকে থেকে মনে হ'চ্ছে—'দূর হোক্ আমার পাহাড়িয়া ধাত—আর আমার লম্বা চওড়া কাণ্ডজ্ঞানহীন কথাবার্ত্তা, আর দূর হোক্ গে যাক্ হিমালয়, উত্তরদিকে একলা প'ড়ে প'ড়ে শীতে হিহি করুক্ গে যাক্—আপাতত, এই সমতলের মেয়েগুলোর মুখে হাসি ফুটিয়ে বাঁচি। এই তো এই ক'দিন ধরে স্বামীজনোচিত কলা-কৌশল বন্ধ রেখে ওকে যা নয় তাই বলে এবং ক'রে খোসামোদ ক'রেছি—লজ্জায় সে সব কথা কাগজে লিখ্‌তে পারবো না—কিন্তু তবু ওর মুখে হাসি নেই।

বলে, তুমি সিম্‌লে দার্জ্জিলিং গিয়ে থাক না। আমাকে পাঠিয়ে দাও আমার বাঙ্গালী বাপের কাছে!

চিত্রকলার নবরূপ

শ্রীঅনন্তকুমার সান্যাল

অধিকদিনের কথা নহে, একজন সহকর্মী বন্ধু একখানি ছবি দেখাইয়া প্রশ্ন করিলেন—দেখুন, আজকালকার আর্টিষ্ট্‌দের কি কিছুমাত্র সৌন্দর্য্য-বোধ নাই? এই কদাকার কাল চেহারার মানুষটা ছাড়া কি জগতে আর কোনও সুন্দর জিনিষ ইহার চোখে পড়ে নাই? এই ছবিখানি আঁকিবার কি প্রয়োজন ছিল।

ছবিখানি যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি উপস্থিত থাকিলে কি উত্তর দিতেন জানি না—তাঁহার অভাবে আমাকে একটু দ্বিধায় পড়িতে হইল। ক্ষণকাল মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলাম—মানুষ যতদিন আছে তাহার রুচিগত পার্থক্যও ততদিন থাকিবেই; ইহা লইয়া তর্ক করা বৃথা।

কুৎসিত চেহারার একটা বুনো সাঁওতাল না আঁকিয়া সম্ভ্রান্ত ঘরের সুসজ্জিতা একটি ভদ্র মহিলা কেন শিল্পীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলনা, ভারতের বাহিরে অন্য দেশে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আর আবশ্যক হয় না। শিল্পীসমাজ ও শিল্পানুরাগী জন-সাধারণ তাহার সহজ ও স্বাভাবিক মীমাংসা করিয়া লইয়াছে। সম্ভবতঃ বাঙ্গালা দেশে যে শিল্পী-গোষ্ঠীর উদ্ভব হইয়াছে তাহার প্রভাবে এদেশেও উহার আবশ্যক হইবে না এবং সেদিন অতি দূরে নহে।

রুচিগত পার্থক্যের আঘাতে আমার তরুণ বন্ধুটিকে আপাততঃ ধরাশায়ী করিলাম সত্য, কিন্তু বাস্তবিকই কি ব্যাপারটা শুধু রুচির উপরই নির্ভর করিতেছে? দাঁড়াইবার মত আর কোনও ভিত্তিভূমিই কি ইহার নাই? তোমার চক্ষে যাহা ভাল লাগে, আমার চক্ষে তাহা ভাল নাও লাগিতে পারে—এইখানেই কি কথার শেষ?

যাহা শিল্পীর চক্ষে সুন্দর বোধ হইয়াছে তাহা অপরের চক্ষেই বা সুন্দর না লাগিবে কেন? যাহা সত্য, যাহা কল্যাণময়, যাহা সুন্দর—তাহা সেই চিরসুন্দরেরই ছায়া মাত্র; তাহার গণ্ডী রচনা করা সম্ভব নহে। যাহা একের তাহাই বিশ্বের; সত্য-সুন্দরের সহিত এই সার্ব্বজনীনতা চিরসংশ্লিষ্ট। ইহার জাতি নাই, স্থান নাই, কাল নাই। ইহা সর্ব্বকালের সর্ব্বজনের। সুতরাং সমাজের বাহিরের রসাশ্রয়, এই হিরণপ্রাণ সাঁওতাল সন্তানটী কোনও এক নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির সৌন্দর্য্য পিপাসা মিটাইতে না পারিলেও ইহার সকল ব্যর্থ হয় নাই। তুলিকার সর্পিল স্পর্শে যে সাড়া

[illegible] দান করিয়াছে একটীমাত্র মনপ্রাণকেও তৃপ্তি দান করিতে পারিলেও তাহা সার্থক। তোমার কাছে যাহা নিরর্থক, এমন কয়জন আছে যাহাদের কাছে উহা দুর্লভ সম্পদ। স্বতঃ-উৎসারিত মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়া শিল্পী রূপ রচনা করিয়া চলিয়াছে। তাহাতেই তাহার তৃপ্তি। সে সৃষ্টি কালজয়ী হইলে তাহাতেই তাহার অমরতা; ইহার অধিক সে প্রত্যাশা করে না। যাহা কালের সর্ব্বগ্রাসী ধ্বংস-শক্তিকেও পরাজয় করিয়াছে, জগতের বিশিষ্ট এবং শ্রেষ্ঠ জনসমাজের হৃদয় মর্ম্ম আকৃষ্ট করিয়াছে, তাহা যদি তোমার অন্তরকোণের সূক্ষ্মসৌন্দর্য্যানুভূতির উদ্রেক না করিয়া থাকে, তবে সে দোষ শিল্পেরও নহে শিল্পীরও নহে, সে দোষ খুঁজিতে অন্যত্র যাইতে হইবে। বুঝিতে হইবে, তুমি যে কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছ তোমার অগোচরে তাহা অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, তুমি পিছনে পড়িয়া আছে।

কথাটা একটু খুলিয়া বলা দরকার। বিশ্বের যেদিকেই চোখ খুলিয়া তাকান যায় সেইদিকেই দেখিতে পাওয়া যাইবে সর্ব্বত্র একটা অব্যাহত প্রাণশক্তি স্পন্দিত হইতেছে। নিখিল বস্তু-বিশ্বের এই স্পন্দন বা গতি বা প্রবাহই ধর্ম্ম। যেখানে এই স্পন্দনের শেষ সেখানেই মৃত্যুর আরম্ভ। কেবল যে জীবজগতের মধ্যেই এই জীবন-ধর্ম্ম নিবদ্ধ, তাহা নহে। কি জাতি, কি সমাজ, কি শিল্প, কি সাহিত্য, দর্শন-বিজ্ঞান-ধর্ম্ম সকলেরই মধ্যে এই বিকাশ চেষ্টা, এই সম্প্রসারণ, এই পরিণতির অভিমুখে গতি অবশ্যম্ভাবী। বীজটি যে শুভ মুহূর্ত্তে আপনার কঠিন আবরণ খুলিয়া আলোর দিকে চক্ষু মেলিল সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাহার প্রকাশ চেষ্টার অন্ত নাই। ধরার গাত্র স্পর্শ করিবারও বহু পূর্ব্ব হইতে শিশু আপনার পরিণতির জয়যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে। ক্রন্দনের মধ্য দিয়া যেদিন সে প্রথমে আপনাকে বিশ্বে জানাইল সেই দিন হইতে তাহার জীবনপ্রবাহ ঘাটে ঘাটে ঘুরিয়া বার্দ্ধক্যে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং গতির ক্ষীণতার মধ্যেই ওপারের আলোর আভাস তাহার চক্ষে পড়ে। তেমনি করিয়া জীবন্ত জাতি, জীবন্ত সমাজ, জীবন্ত ধর্ম্ম, অগ্রগতির দিকেই দিন দিন ঝুঁকিয়া চলিবে। সমগ্র বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া তাহা আপন গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌঁছিবে। কোনও কিছুই তাহার গতিপথ রুদ্ধ করিতে পারিবে না। কাব্য সঙ্গীত স্থাপত্য ভাস্কর্য্য, যাহা কিছু মানুষ সভ্যতার অংশরূপে বা অলঙ্কাররূপে পাইয়াছে তাহার ইতিহাসও ঐ একই ইতিহাস। ধর্ম্ম যদি আপনার সম্মুখের সুস্পষ্ট পথ ছাড়িয়া অর্থহীন অনুষ্ঠানেই পর্য্যবসিত হয়, তবে তাহার মৃত্যু আরম্ভ হইয়াছে জানিতে হইবে। সমাজ, সাহিত্য ও শিল্প যদি তেমনি করিয়া প্রাচীনতার কঙ্কাল আশ্রয় করিয়াই মুখ বুজিয়া পড়িয়া থাকিতে চায়, ধরিয়া লইতে হইবে তাহার বিনাশের রাস্তা সুপ্রশস্ত হইয়াছে।

ইতিহাসই সাক্ষ্য দিতেছে যে, কাব্যই বল, শিল্পই বল, আর বিবিধ কলাই বল, তাহার যে রূপটা আজ আমাদের চক্ষে পড়িতেছে তাহার প্রাচীনরূপ হইতে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক। সহস্র সহস্র বৎসরের বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া, নানা স্তরের বিকাশের মধ্য দিয়া আজ তাহাকে বর্ত্তমানে আসিয়া পৌঁছিতে হইয়াছে; আর কেবল বর্ত্তমানের মধ্যেই ইহা নিয়ন্ত্রিত হইয়া রয় নাই। সুদূর অতীতের ইতিহাসও ইহার মধ্যে [illegible] অন্য দেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদের ভারতের কাব্য ও সঙ্গীতের জন্ম অতীব বিচিত্র। পণ্ডিতেরা ধরিয়া লইয়াছে সকল দেশেরই ইতিহাসে একই রূপ। প্রথম মানব যেদিন বিপুল বিশ্বের সৃষ্টিরচনার দিকে বিস্ময়বিমুগ্ধনেত্রে দৃষ্টিপাত করিল সেদিন তাহার অন্তর উদ্‌ঘাটিত করিয়া যে আনন্দ ধ্বনি বাহির হইয়া আসিল তাহাই তাহার প্রথম কাব্য। ছন্দময় সুরময় সেই ধ্বনিই বিশ্ব-কাব্যের প্রথম উদ্ভব। তার পর সুর যাহাকে স্পর্শ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল, আত্মহারা হইতে লাগিল, ছন্দও তাহাকেই বুকে লইবার জন্য নৃত্যচপল হইয়া উঠিল। তাহাই ক্রমে রেখার ভঙ্গীমায়, বর্ণসম্পাতে, নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া নিজেকে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইল। এই অধ্যাত্ম-চেতনাই কালক্রমে দারুদেহে, শিলাগাত্রে, লৌহস্তূপে অপরূপ রূপে বিকসিত হইয়া উঠিল। এইভাবে মানব মনের গোপনপুরে যে আনন্দময় সত্তাটির সন্ধান মানুষ পাইল তাহাই হইল কাব্য-সঙ্গীত-শিল্পের ভিত্তিভূমি। প্রাচ্যে যখন তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য গাহিয়া উঠিল—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" তখন তাহার শিল্প সাধনাও সেই বাক্যমনের অতীত অতীন্দ্রিয় সত্তারই ইঙ্গিত প্রকাশ করিতেছিল। সেই যুগ হইতে ইতিহাসের যুগে আসিতে তাহাকে প্রধানতঃ আধ্যাত্মিকতারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইউরোপের কাব্য, নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য—বিবিধ কলাও ঠিক এই পথেই বহুকাল চালিত হইয়াছে। গ্রীসে ডায়নিসসের প্রভুত্ব অনেককাল ছিল। তাহার প্রাচীন কাব্য নাটক এখনও জ্বলন্ত অক্ষরে সে সাক্ষ্য চক্ষের সম্মুখে ধরিতেছে। সাগরের ও পারে যে পদক্ষেপ করিয়াছে তাহার কাছে আধ্যাত্মিকতার এই প্রভাব চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে সর্ব্বত্রই আকর্ষণের বস্তু বলিয়া প্রতিভাত হয়।

ধর্ম্ম-ভাবই প্রধান ভাব হইলেও শিল্প চিরদিনই তাহা আঁকড়াইয়া থাকিতে পারিল না। ধর্ম্মাচরণ রীতির, ধর্ম্মভাবের আদর্শ চিরকালই ঠিক একরূপ থাকে না। জীবনযাত্রার আদর্শ ও কাল ভেদে বিভিন্ন হইয়া থাকে। একের কাছে যাহা ধর্ম্ম অন্যের কাছে তাহা ধর্ম্ম ত নয়ই, হয়ত অধর্ম্ম—এরূপ অবস্থা-বিপর্য্যয় পাশ্চাত্যের ইতিহাস অনেক নর-শোণিতে কলঙ্কিত করিয়াছে। শুধু কি পাশ্চাত্যেই? আর কোনও দেশে নহে? যাউক, সে অন্য কথা। যতদিন ধর্ম্মভাব অনুসরণ করা সম্ভব ছিল ততদিন তাহার অন্যথা হয় নাই। কিন্তু যখন ধর্ম্মের মূলগত ঐক্য আর রহিল না, সেই পরবর্ত্তী যুগে শিল্পকেও সে পথ ত্যাগ করিতে হইল। ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ, ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ, ভিন্ন ভিন্ন রুচির জটিল পথে না গিয়া সে একটা সর্ব্বজনগ্রাহ্য সুগম পন্থার সন্ধান করিতে লাগিল এবং এইটী সহজ হইল আর একটা নূতন প্রভাবে।

ধনী-জমিদার, রাজামহারাজা ও তাহাদের সাজ-সজ্জা, চাল-চলন একসময়ে লোকের মনকে যেরূপ আকৃষ্ট করে চিরকালই সেইরূপ করিবে এমন সম্ভব নয়। নগরের আড়ম্বরপূর্ণ প্রাসাদ, অট্টালিকা, উদ্যান-বাটিকা, বিলাসোপকরণ, ধনী ও ধন-সম্পর্কিত যাহা কিছু তাহা

এক সময় এমন চমকপ্রদভাবে আকর্ষণের বস্তু হয় যে তখন প্রকৃতির মূক বিকাশের দিকে, তাহার অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্যটী উদ্ভেদের দিকে —হয়ত মানুষের দৃষ্টি তেমন সজাগ থাকেনা। আজ যে সম্ভ্রান্ত কুল বংশ-মর্য্যাদা, পদগৌরব লইয়া আলোচনা করা এবং তাহাই সৌন্দর্য্য-চর্চ্চার বিষয়ীভূত করাকে শ্রেয় মনে করিতেছে, হয়ত কালধর্ম্মে কাল সে তাহা ত্যাগ করিয়া প্রকৃতির বিবিধবৈচিত্র্যের মধ্যে আপনার অন্তরের কাম্য বস্তুটি খুঁজিয়া পায়। প্রাচীন যুগ ছাড়িয়া তাহার পরবর্ত্তী যুগে ক্রমশঃ সমাজের রুচির এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং এই পরিবর্ত্তনের ফলেই শিল্পীও তাহার সাধন পথ আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে। যে কাব্যে সাহিত্যে কেবল ধনী সম্প্রদায়েরই একাধিপত্য ছিল, আধ্যাত্মিকতার আশ্রয় হারাইয়া তাহা এখন ঘরের দ্বারের কাছে প্রকৃতির অকৃত্রিম আলো বাতাস ও সহজ মানুষের সুখ-দুঃখময় জীবনের দিকে ফিরিয়া আসিল। যে কবি, যে কলাবিৎ, কেবল রাজার অন্তঃপুরে ও ধনীর প্রাসাদকক্ষে যাতায়াত করিত সুন্দরের সন্ধানে, সে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল—বিশ্বপ্রকৃতির অনাবিল সুষমাসম্ভার যুগ যুগ ধরিয়া তাহারই জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে। কলালক্ষ্মী সেদিন ধনীর অট্টালিকা হইতে ধীর পদক্ষেপে দীনের কুটীরে পদার্পণ করিলেন। সুকুমারকলা স্বভাব-পন্থাকেই শ্রেষ্ঠ পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিল।

একশত বৎসরেরও অধিককাল হইতে চলিল ইউরোপের সুকুমার-কলার এই নবযুগের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। মাইকেল এঞ্জেলো টিসিয়ানের যুগের পর রেমব্রাণ্ট ও তাহার শিষ্যগণ এবং অবশেষে সিলেষ্ট, মানেট ও তাহাদের অনুকারীগণ এই শিল্পের ধারা বহিয়া চলিয়াছেন। এখন দিনের গৃহমাঝে উলঙ্গ দারিদ্র্য, পথের শ্রমিকের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ ব্যথা, কৃষিক্ষেত্রের সাধারণ মজুরের শ্রম কঠোরতা, ছোট বুকের ছোট হাসি, ছোট সুখ—ইহার কোনটিতেই আর কলাধিষ্ঠাত্রী দেবীর লজ্জার কারণ নাই। শিল্পচর্চ্চার অযোগ্য বিষয় ত ইহারা নহেই, বরং অনেক প্রতিভাবান শিল্পীই ইহাতে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। মর্ম্মর-মণ্ডিত বিলাসোদ্যান তাহার কাছে যেমন মনোহর—ভগ্নগৃহের মৃৎপ্রদীপটী তাহা অপেক্ষা একটুও কম চিত্তহারী নয়। দিনান্তরণী পল্লী কন্যার মধ্যে সে রাজাধিরাজের অন্তঃপুরের রূপসী অপেক্ষাও অধিক মাধুর্য্য দেখিতে পায়। যেখানে স্বভাবসরল বিকাশ-ভঙ্গী যেখানে সে অন্তরটা মনোহারীরূপে বাহিরে প্রস্ফুটিত দেখিতে পায়, ভালয় মন্দয় মিশান অকৃত্রিম মনোভাবটী যেখানে সহজে ধরা দিয়াছে, শিল্পী সেখানেই তাহার তুলি ধরিয়া বসিয়াছে, তাহার সাধনা জয়যুক্ত হইয়াছে।

ললিতকলার এই নূতন রূপটী ওপার হইতে এপারে আসিয়াও পৌঁছিয়াছে। ভারতের চিত্রকলাতেও স্বভাবপন্থার অনুসরণ আরম্ভ হইয়াছে এবং স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবণতাবশতঃই হউক, আর ভারতের প্রাচীন ধর্ম্মের একটা উৎকট ও সর্ব্বব্যাপী বিপর্য্যয় স্থায়ী হয় নাই বলিয়াই হউক, অথবা গতানুগতিকতার মোহবশতঃই হউক, একালের নবীন শিল্পীর নিকট আধ্যাত্মিকতা এখনও একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু শিল্পজগতের এই ক্রমপরিণতির মূল সূত্রটীর সহিত যাহাদের পরিচয় নাই তাহাদের নিকট কলালক্ষ্মী যে পদে পদে বিড়ম্বিত হইবেন তাহা আর বিচিত্র কি?

উদয়পুর ও চিতোরগড়

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

আজমীরে আমরা আশ্রয় পেয়েছিলুম ভালই। সুদূর প্রবাসে তীর্থযাত্রী বাঙ্গালীর আশ্রয়ের জন্য যাঁরা এই বাঙ্গালী ধর্ম্মশালা তৈরী ক'রে দিয়েছেন, তাঁদের চেষ্টা সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে। বিশেষ ক'রে এখন যে ভদ্রলোক ধর্ম্মশালাটীর ভার নিয়ে আছেন—অমৃতবাবু—তাঁর মত লোকের আশ্রয়ে গিয়ে পড়া—সে-ত রীতিমত ভাগ্যের কথা!

সুতরাং স্থির হল যে আমরা অধিকাংশ জিনিষ আজমীরেই রেখে শুধু দু'দিন চালাবার মত অল্প কিছু জিনিষ নিয়ে উদয়পুর থেকে ঘুরে আসব। বাড়ী থেকে টাকা পাঠাবার ব্যবস্থাও আজমীরেই করা হবে স্থির হোল কারণ সেখানে অমৃতবাবু আছেন, তাঁর কেয়ারে টাকা আসাই সুবিধা; দ্বারকার পথে আর কোথাও অমন অভিভাবক পাব কি-না তার ঠিক কি?

পুষ্কর থেকে ক্লান্তদেহে ধর্ম্মশালায় ফিরলুম সন্ধ্যার কিছু আগে। পুণ্যার্জ্জনের ক্লান্তি আমার সঙ্গিনীদেরও বেশ জখম ক'রে ফেলেছিল; রন্ধনাদির দিকে তাঁরা কেউই এগোলেন না। দুধ, মিষ্টি ও গরম পুরীর ওপর দিয়ে নৈশ-ভোজন শেষ ক'রে আমরা তখনই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলুম। গাড়ী প্রায় এগারোটায়—কিন্তু পাছে আমরা গাড়ী ফেল করি এই আশঙ্কায় অমৃতবাবু রাত ন'টার আগেই কুলী ডেকে আমাদের বিছানা ও অন্যান্য দরকারী যা-কিছু জিনিষ ছিল তাদের মাথায় চাপিয়ে দিলেন।

ফলে আমাদেরও তখনই বেরিয়ে পড়তে হ'ল এবং ষ্টেশনে গিয়ে দু-ঘণ্টা ধ'রে ব'সে ব'সে বৃদ্ধদের সময় সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব নিয়ে আলোচনা করা ছাড়া আর কোনও কাজ রইল না।

আজমীর থেকে চিতোরগড় পর্য্যন্ত বি-বি সি-আই'এর ব্রাঞ্চ লাইন গেছে কিন্তু সেখান থেকে উদয়পুর যেতে গেলে গাড়ী বদলী ক'রে মহারাণার খাস্ লাইনে চড়তে হয়। যাত্রীদের গাড়ী বদল করার সেই 'ভীষণ' কষ্ট থেকে রক্ষা-করার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ এক অত্যন্ত সুবিধাজনক ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন এবং সেটা আর কিছুই নয়—থ ক্যারেজ সার্ভিস্ অর্থাৎ একখানা ক'রে গাড়ী ট্রেণের সঙ্গে এমন ভাবে জোড়া থাকে, যাতে ক'রে তাকে চিতোরগড়ে কেটে উদয়পুরের ট্রেণের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায়। অবশ্য প্রত্যেক ট্রেণে সে ব্যবস্থা আছে কি-না ঠিক মনে পড়ছে না তবে রাত্রের ঐ ট্রেণটাতে থাকেই সেটা জানি।

আমাদের কুলিপুঙ্গবরা বল্লে—বাবু, ভোর রাত্রে গাড়ী বদল করার কষ্ট আপনাদের কিচ্ছু পেতে হবে না, আপনাদের একেবারে উদয়পুরের 'ডাব্বায়' তুলে দেব।

যাই হোক্, সেদিন সাবিত্রী দর্শন ও পুষ্কর স্নানরূপ মহাপুণ্যের প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া আমাদের অদৃষ্টে ছিল; তাই আমরা কুলীদের কথায় রাজী হ'লুম এবং অসংখ্য খালি গাড়ী পার হ'য়ে গিয়ে আমরা সেই বিখ্যাত ডাব্বার একখানি ছোট কামরায় উঠলুম। সে ডাব্বা বা বগি গাড়ীতে একখানা ফাষ্ট ক্লাশ, একখানা সেকেণ্ড ক্লাশ ও দু'পাশে দুখানি স্বল্প পরিসর থার্ড ক্লাশ ছিল। আমরা যে কামরাতে উঠলুম তার তিনখানি বেঞ্চের মধ্যে দু'খানি বেঞ্চে ইতিমধ্যেই এক ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী, তাঁর মাসী ও গুটি তিনেক ছেলেমেয়ে বিছানা বিছিয়ে জোড়া ক'রে শুয়ে প'ড়েছিলেন। তাঁরা কোথা দিয়ে প্লাটফর্ম্মে আগে ঢুকেছিলেন তা তাঁরাই বলতে পারেন। আমাদের সঙ্গে-সঙ্গেই এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক উঠ্‌লেন, আমরা চারজন আর তিনি—অতি কষ্টে সেই ছোট্ট বেঞ্চিটাতে বসলুম এবং ঘুমের আশা একেবারেই রইল না এই ভেবে অত্যন্ত কাতর হ'য়ে পড়লুম।

কিন্তু এই শোচনীয় নাট্যের এইখানেই যবনিকা পড়ল না। আমরা বসবার মিনিট তিনেকের মধ্যেই আরও প্রায় জন-আষ্টেক লোক সেই কামরাতে এসে উঠলেন এবং আনাগোনার সঙ্কীর্ণ রাস্তাকে জিনিষপত্র ও নিজেদের উপস্থিতিতে এমনই ভরিয়ে ফেললেন যে তখন আর সে-গাড়ী হ'তে নাম্‌বার চেষ্টামাত্র করাও বাতুলতা হ'য়ে দাঁড়াল। এক কথায় তখন আমাদের চক্রব্যূহাবদ্ধ অভিমন্যুর অবস্থা। যদি বা প্রবেশ করলুম, নির্গমনের পথ আর রইল না।

চিতোরগড়ে যখন গাড়ী এল, তখনো অন্ধকার। প্রথম উষার অস্পষ্ট আলোতে দূরে চিতোরগড়ের আবছায়া মাত্র একটা নজরে পড়ল, তার মধ্যে কুম্ভের বিজয়স্তম্ভটাই অনেক উঁচুতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে—এইটুকু শুধু বুঝতে পারলুম। ওখানে অনেকক্ষণ গাড়ী দাঁড়াল, একটা ট্রেণ থেকে কেটে আমাদের 'ডাব্বা' আর একটা ট্রেণে জুড়ে দিলে, দেরী হওয়া সেখানে উচিত। আমাদের কিন্তু সে-দিকে খেয়াল ছিল না, আমরা সশ্রদ্ধ ও বিস্মিত দৃষ্টিতে শুধু সেই অতি বিখ্যাত পাহাড়ের দিকে চেয়েছিলুম।

এই তাহ'লে চিতোরগড়! ছেলেবেলায় যজ্ঞেশ্বরবাবুর অনুবাদিত টডের রাজস্থান প'ড়েছিলুম। সেই সময়কার কল্পনাপ্রবণ রঙীন মনে তার যে ছাপ প'ড়েছিল সে ছাপ ইহজীবনে আর মুছবে না। বইখানি বার বার প'ড়েছিলুম, ছেঁড়া বইখানি এখনও আমার বাল্যকালের অত্যাচার বুকে নিয়ে টিকে আছে, কত কথা হয়ত বুঝিনি, কতক-বা বহুবার পড়ার পর মাথায় গিয়েছিল। কিন্তু বাপ্পারাওলের কৈশোর লীলা থেকে সুরু ক'রে পৃথ্বীরাজ, সঙ্গ, সমরসিংহ, কুম্ভ, প্রতাপ পর্য্যন্ত সকলের অদ্ভুত শৌর্য্য-কাহিনী আমার চোখের সামনে ছবির মত ফুটে উঠ্‌ত, কখনও মনে হ'ত সে-সব ঘটনা যেন আমার অন্তর্দৃষ্টির সামনেই ঘট্‌ছে। তারপর কাব্য, উপন্যাস, নাটক এবং পাঠ্যপুস্তকে বার বার সে-সব কথা প'ড়েছি; আসল টডের রাজস্থানও একাধিকবার পড়েছি। কিন্তু সে-সব পূর্ব্বের ছবিকেই একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মেজে ঘষে দেখিয়েছে মাত্র—যজ্ঞেশ্বরবাবুর ছবিই আজ পর্য্যন্ত মনে আঁকা রয়েছে।

মা দ্বিজেন্দ্রলালের অমর সঙ্গীত "মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড়" আবৃত্তি করতে লাগলেন, আমরা ভক্তি-তদ্গত মনে শুন্‌তে শুন্‌তে সেই দিকে চেয়ে রইলুম। সেই অবস্থায় ট্রেণ ছেড়ে দিলে এবং পবিত্র মেবার-ভূমির বুকের

ওপর দিয়ে অপরূপ ঝাঁকানি দিতে দিতে ছুটে চল্‌ল। বাংলাদেশের মাঠের ও আলের ওপর দিয়ে গরুর গাড়ী ক'রে যেতে-যেতে অনেকবার ভেবেছি যে হাড়ভাঙা ঝাঁকানিতে গো-যানই সর্ব্বপ্রথম যায় কিন্তু সে ধারণা যে ভুল, তা বুঝতে পারলুম বি বি-সি-আই-আরের ছোট লাইনে চ'ড়ে।

মাওলী জংশনে গিয়ে গাড়ী পৌছল বেলা আটটার সময় এবং এইখানে গিয়ে গাড়ীর প্রায় সমস্ত লোক নেমে গেল। আজমীর থেকে যে-অবস্থায় ছেড়েছিল তার পর বরং ভীড় বেড়েই গিয়েছিল, বিন্দুমাত্র কমেনি; কিন্তু মাওলীতে পৌছে শুধু আমরা চারজন ও সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটী গাড়ীতে রইলেন। তিনিও উদয়পুরের যাত্রী, শুনলুম মহারাণার আদেশে তিনি উদয়পুরে যাচ্ছেন। তিনি কোন এক বিখ্যাত মণিকারের কর্ম্মচারী, গয়নার মাপ ও অর্ডার নেবার জন্য তাঁকে ডাকা হয়েছে।

মাওলী জংশনে নেমে একটী ব্রাঞ্চ লাইন ধ'রে যেতে হয় নাথদ্বারে। নাথদ্বারে নাথজী নামে এক বিখ্যাত বিষ্ণুমূর্ত্তি আছেন। এই নাথদ্বারই রাজপুতানার সবচেয়ে বড় তীর্থ। এমন কি রাজপুতদের মধ্যে অনেকে পুষ্করের স্নানের চেয়েও নাথজীর দর্শন অধিকতর কাম্য ব'লে মনে করেন। আমরা তখন আর নাথদ্বারে গেলুম না, ফেরবার সময় যাব আগে থাকতেই ঠিক ক'রে রেখেছিলুম।

উদয়পুরে গাড়ী গেল দশটার পর। ষ্টেশনে পৌছে কুলীর মাথায় জিনিষ চাপিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে এলুম এবং একটা টাঙ্গার ওপর জিনিষপত্র চাপিয়ে সহরের দিকে যাত্রা করলুম। আমরা আগেই শুনেছিলুম যে উদয়পুরের টাঙ্গাওয়ালারা পশ্চিমের অন্যান্য সহরের মত দর করে না অর্থাৎ চার আনার ভাড়াকে আড়াই টাকা ব'লে বসে না। প্রথম যখন আমি দিল্লী যাই তখন দিল্লীর দ্রষ্টব্য স্থানগুলি ঘোরার জন্য আমার ছত্রিশ টাকা খরচ করতে হ'য়েছিল। চতুর্থবার দিল্লী গিয়ে সেই সব স্থানই মাত্র তিন টাকা খরচে ঘুরে এসেছিলুম। যাই হোক্—উদয়পুর ষ্টেশন থেকে মহারাণার ধর্ম্মশালায় যাওয়ার জন্য বেচারা চাইলেই মাত্র আট আনা এবং গেল ছয় আনায়। অবশ্য পরে জেনেছিলুম যে চার আনা পাঁচ আনাই ওদের ধার্য্য প্রাপ্য।

অনেকখানি—প্রায় মাইল দুই চলার পর আমরা খাস উদয়পুরের প্রান্তে পৌছলুম এবং সেইখানেই মহারাণার নতুন ধর্ম্মশালা। যখন গাড়োয়ান বললে এইটাই ধর্ম্মশালা—তখন আমরা কিছুক্ষণ অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলুম; মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। বিরাট প্রাসাদোপম অট্টালিকা, সেটা মহারাণার প্রাসাদ বললেও আমরা বিস্মিত হতুম না। বড় ধর্ম্মশালা আমি অনেক দেখেছি—কিন্তু এমন প্রশস্ত, এত উঁচু এবং এত পরিষ্কার ধর্ম্মশালা আর কোথাও নজরে পড়ে নি। দোতালা বাড়ী, সামনেই আরও উঁচু গম্বুজের ওপর বিরাট এক ঘড়ি। বাড়ীর ভেতরের কাষ তখনও শেষ হয় নি কিন্তু মূল বাড়ীটার কাষ ভেতরে ও বাইরে সম্পূর্ণ হয়েছে দেখলুম। সদ্য চূণকাম-করা দেওয়ালের ওপর মধ্যাহ্নের সূর্য্য-কিরণ প'ড়ে এমন এক অপরূপ শুভ্রতার সৃষ্টি ক'রেছিল যে সেদিকে চেয়ে তখনই চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হলুম।

ফটক দিয়ে ঢুকেই সামনে একটা দালানের মত ব্যাপার এবং তার ঠিক মধ্যস্থলে মেবার-সূর্য্য প্রতাপ সিংহের মূর্ত্তি বিরাজমান। প্রতাপের একপাশে স্বর্গীয় মহারাণা ফতে সিংহের ও অপর পাশে বর্ত্তমান মহারাণা ভূপাল সিংহের মর্ম্মর-মূর্ত্তি রয়েছে। সে-দিকে চেয়ে প্রথমেই যে জিনিষটা আমাদের বিস্মিত করলে সেটা হচ্ছে বর্ত্তমান মহারাণার শ্মশ্রুবিহীন মুখ। প্রতাপ তাঁর পুত্রকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যে যতদিন না মেবারের স্বাধীনতা ফিরে পাওয়া যায় মেবারের অধিকারীরা ক্ষৌর কার্য্য করবেন না, তৃণশয্যায় শয়ন করবেন এবং পাতায় ক'রে খাবার খাবেন। শুনেছি সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত মেবারের মহারাণারা সোণার থালার নীচে একটী শুক্‌নো পাতা রেখে খাবার খান। বিছানার নীচে রাখেন এক গাছি খড় এবং কখনও দাড়ী কামান না। মহারাণা ফতেসিংহ পর্য্যন্ত সকলে আযত্ন দু'ধারে ভাগ-করা বিরাট দাড়ী বহন ক'রে এসেছিলেন; কিন্তু ইনি সেই কুলপ্রথাকে অনায়াসে লঙ্ঘন করলেন কি ক'রে? অবশ্য আত্ম-প্রবঞ্চনাকে আমরা কুলপ্রথার খাতিরে বড় ক'রে তুলতে চাই না—কিন্তু বিস্মিত হলুম তখন—তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আমাদের সমস্ত আচারটাই-ও চিরকাল নিজেকে ঠকিয়ে আসছে; সুতরাং সেইটেই আমরা আশা করি। মহারাণা ভূপালসিংহের ব্যাপারটা [illegible]

বুঝতে পেরেছিলুম ; তিনি বিকলাঙ্গ এবং বেঁটে, কাজেই তিনি যদি আবক্ষ দাড়ী রাখেন তাহ'লে তাঁকে সত্যিই বিশ্রী দেখাবে। ওখানের অধিবাসীদের মধ্যেও অনেকে ঐ কারণটাকেই সত্য ব'লে স্বীকার করলেন।

যাক্—এইবার আসল কথা। প্রবেশ পথের সামনেই ফতেসিংহ-ক্যাসানের দাড়ীওয়ালা চৌকীদার আমাদের জানালে যে ধর্ম্মশালায় মধ্যে তিন রকম আশ্রয়ের ব্যবস্থা আছে। এক রকম হ'ল একেবারে নি-খরচায়, আর এক রকম হোল আট আনায় এবং সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী হ'ল এক টাকায়। আট আনায় যা'কে বলে furnished room তাই পাওয়া যাবে—আর ফার্ষ্ট ক্লাশ অর্থাৎ এক টাকার ব্যবস্থায় ফ্ল্যাট্ বা তিন-চারখানা ঘরের একটা মহল। ওর মধ্যেই শোবার ঘর, ডাইনিং রুম, ড্রয়িং রুম প্রভৃতি সব ব্যবস্থা আছে। আমি প্রথমে সেকেণ্ড ক্লাশের ব্যবস্থাই করছিলুম কিন্তু যা-ই শোনা গেল যে সে ঘরের মেঝে ম্যাটীং করা তা-ই মা একেবারে প্রবল আপত্তি জানালেন। ম্যাটীং করা ঘরে কোথায় ব'সে খাওয়া-দাওয়া হবে? সে হ'তেই পারে না।

অগত্যা আমরা সেই বিনা দক্ষিণার ঘরই একটা অধিকার করলুম, কিন্তু পরে দেখলুম যে আমাদের ঐ আট আনা পয়সাই লাভ হ'ল ; কারণ সেই বিনা দক্ষিণার ঘরই এমন চমৎকার যে অকারণ সেকেণ্ড ক্লাস ঘরে একটা খাটিয়ার লোভে যাওয়ায় কোনও দরকার নেই। প্রশস্ত ঘর, জানলা ও দরজা প্রচুর এবং পেটেণ্ট ষ্টোনের মেঝে। তা-ছাড়া বাথ্ রুম ও পাইখানা কাছেই। যাত্রীদের জন্ত অসংখ্য পাইখানা ও দিনরাত জল পাবার ব্যবস্থা আছে। কল-ঘরও একাধিক বটেই, তা-ছাড়া আবার বাইরেও কল আছে অনেকগুলি ; আর তা'তে সবসময়েই প্রচুর জল থাকে। পাইখানাগুলিও ভাল—তবে ওদেশের লোকের মাঠে যাওয়াই অভ্যাস, তারা অজ্ঞানতাবশতঃ প্রায়ই সেগুলির অপব্যবহার করে, এই যা অসুবিধা।

তখনও ধর্ম্মশালায় রান্নামহল তৈরী শেষ হয়নি। ওদেশের যাত্রীরা উঠানে এবং মাঠে ইঁট পেতেই সে-কায সেরে নিচ্ছেন—কিন্তু আমাদের তা'তে বেন কেমন বাধ-বাধ ঠেকে। যাই হোক্—আমাদের তখন এমনই শরীরের অবস্থা যে কোনও রকমে বাবা-মা'র তরে প'ড়তে পারলে বাঁচি। আমি শহরের মধ্যে থেকে টক্ দই, খরমুজ ও পুরী মিঠাই কিনে আনলুম। সরবৎ, খরমুজ ও সেই খাবার খেয়েই মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করলুম। দুধ ওখানে একেবারেই ভাল পাওয়া যায় না, কারণ গোমাতাদের খাদ্য বিশেষ কিছু ওখানে জন্মায় না ; তাই দুগ্ধজাত যা কিছু খাবার অর্থাৎ রাবড়ী বা দই একেবারেই তৃতীয় শ্রেণীর ; মানে পশ্চিমে ত নয়ই, আমাদের দেশেও ওরকম দুর্দ্দশার কথা আমরা ভাবতে পারি না। বাস্তবিক গরুদের কি অবস্থা ; সেই মরুভূমির মধ্যে তারা টিঁকে আছে যে এই আশ্চর্য্য !

যজ্ঞেশ্বরবাবু লিখেছিলেন 'স্বর্ণপ্রসূ মিবারভূমি' কিন্তু গিয়ে দেখলুম মেবার শুধু মাত্র রসুনপ্রসূ। হাটে বাজারে অন্ত আনাজের সঙ্গে বিশেষ দেখাসাক্ষাৎ ঘটে না, কেবল রসুন, প্রচুর রসুন! বীর মেবারীরা সে প্রাচুর্য্যের যে বিশেষ সদ্ব্যবহার করেন তার পরিচয় পাওয়া যায় কাছে গেলেই। এমন কি টাঙ্গাওয়ালাদের পাশে ব'সে যাওয়া রীতিমত বিপজ্জনক, প্রতি মুহূর্ত্তেই বমি হবার আশঙ্কা থাকে! আর একটা সীম ও কড়াইশুঁটীর মাঝামাঝি রকমের আনাজ পাওয়া যায়, সেটা খুব সস্তা ; ফলে বাজারে খাবার কিনতে গেলে সেই বস্তুটারই তরকারী বারবার অদৃষ্টে জোটে।

উদয়পুরের দেওয়ান, সুদূর রাজপুতানার মধ্যস্থলে অতি বিখ্যাৎ মেবার—তার দেওয়ান—শক্তাবতও নয়, চন্দ্রাবতও নয়—নিছাৎই একজন বাঙালী। তাঁর নাম শ্রীযুত ভূপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। একথা শুনে সত্যি-সত্যিই আমি যথেষ্ট গৌরব অনুভব করলুম। জীবন-যুদ্ধে বাঙালী আজ হেরে যাচ্ছে, সমস্ত প্রদেশ থেকে সে বিতাড়িত হ'চ্ছে, সে ঘরকুণো এমনি বহু কুৎসা প্রত্যহ শুনতে হয়, তারই মাঝে এইরকম দু' একটা সংবাদ যেন পিপাসার্ত্ত হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ করে। পশ্চিমেই যান্ আর দক্ষিণেই যান্, শিক্ষা-বিভাগে এখনও বাঙালীর যথেষ্ট আধিপত্য আছে দেখ্তে পাবেন। কিন্তু শাসন বিভাগে তার কর্ত্তৃত্ব ক্রমশঃই কমে আস্ছে। শুনলুম ভূপালবাবু স্বর্গীয় মহারাণার প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাঁরই স্নেহের বর্ম এখনও তাঁকে বহু লোকের বাঙালী-বিদ্বেষ থেকে রক্ষা করছে।

আমি যখন গেলুম তখন আমপুর থেকে তাঁর বাড়ীতে

কয়েকজন আত্মীয় এসেছিলেন সুতরাং আমায় একটু বসতে হ'ল। খানিকটা পরেই তিনি বেরিয়ে এলেন এবং আমরা উদয়পুর বেড়াতে এসেছি—সে-বিষয়ে তাঁর সাহায্য চাই—এই কথা শুনেই তিনি পুনরায় ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। একটু পরেই আবার যখন বেরিয়ে এলেন তখন তাঁর হাতে একগোছা অনুমতিপত্র রয়েছে দেখলুম। উদয়পুরের রাজকীয় ব্যাপার যা-কিছু আছে সমস্ত জায়গাকারই ছাপানো ছাড়পত্র তাঁর কাছে তৈরী থাকে, শুধু সই ক'রে দেওয়ার অপেক্ষা। তিনি তখনই ব'সে সেগুলিতে সই ক'রে দিলেন ও তারই অবসরে মেবারের যাবতীয় দ্রষ্টব্য স্থানের তালিকা ও বর্ণনা আমায় শুনিয়ে দিলেন। তাঁরই মুখে শুনলুম রাজসমন্দর ও একলিঙ্গের মন্দির সেখান থেকে অনেক দূর, তবে কয়েকজন যাত্রীর ভরসা পেলে বাস ছাড়ে। আর জয়সমন্দর অর্থাৎ জয়সমুদ্র প্রায় বাট মাইল দূরে। আমার মনে বঙ্কিমবাবুর রাজসিংহ পড়ার পর থেকেই (রূপকুমারীর সেই ভয় দেখান আপনারা ভোলেন নি নিশ্চয়? 'রাজসমন্দার ডুবিয়া মরিব') রাজসমন্দর দেখার একটা বাসনা বরাবর লুকিয়েছিল—কিন্তু ভূপালবাবুর মুখে শুনলুম যে মানুষের কীর্ত্তি হিসাবে জয়সমুন্দরই বেশী দেখবার জিনিষ। দেশের দুর্ভিক্ষের সময় দেশবাসীর অন্নসংস্থানের জন্য মহারাণা জয়সিংহ ঐ বিরাট হ্রদ খনন করান। হ্রদটার পাড় দিয়ে হাঁটলে বরাবর প্রায় নব্বই মাইল হাঁটতে হয় এবং শুনলুম যে যদি কখনও ঐ জয়সমুন্দরের কোন পাড় ভেঙে পড়া সম্ভব হয় তাহ'লে তার জলে সমস্ত মেবার ভেসে যাবে।

যথারীতি নমস্কারাদির পর ভূপালবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় নেমে এলুম। বাঙালী উচ্চপদ পেয়েও যে নিজের স্বদেশবাসীকে ভুলে যাননি, এতে প্রাণে বড় আনন্দ হ'ল। বেরিয়ে এসে দেখলুম সব জায়গার পাশ ত দিয়েছেনই, এমন কি উদয়সাগরের মাঝে জগনিবাস বা জগমন্দির দেখতে যাবার যে রাজকীয় নৌকার ব্যবস্থা আছে তার দেয় চারটে পয়সা পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে দিয়েছেন। "শ্রী নাও ডুঙা কে কারখানা" কে আদেশ দিয়েছেন আমাদের বিনা দক্ষিণায় পার করতে। এ-টুকু না হ'লেও হয়ত বিশেষ ক্ষতি ছিল না কিন্তু এতে তাঁর মহৎ মনেরই পরিচয় পেলুম। সব ছাড়পত্রেরই একগৎ, খালি স্থানগুলির নাম বিভিন্ন। যেমন "সহেলাবাড়ী"র বেলায় লেখা হয়েছে, 'হামিল হাজাকো শ্রীসহেলিয়া বাড়ী দেখায় দেগা' জগমন্দিরের বেলায়ও তাই, শুধু শ্রীসহেলিয়া বাড়ীর জায়গায় শ্রীজগমন্দির বা জগনিবাস এইটুকু তফাৎ! হামিল হাজা শব্দের অর্থ বোধ হয় পত্রবাহক।

ওখান থেকে বেরিয়ে আর শেয়ারে টাঙা পেলুম না, দু' আনা দিয়ে একটা পুরো টাঙাই নিতে হোল। টাঙাতে করে চল্‌তে চল্‌তে প্রায় ধর্ম্মশালার কাছাকাছি এসেই এক হাস্যকর ব্যাপার ঘটল এবং অভাবনীয়ভাবে আমার রাজদর্শন হ'ল। কেমন ক'রে তাই বলছি।

টাঙাওয়ালা মনের উৎসাহে গাড়ী হাঁকাচ্ছে এবং আমার সঙ্গে আলাপ ক'রে কলকাতা কতবড় সহর সেই সম্বন্ধে মনে মনে ধারণা করবার চেষ্টা করছে, এমন সময় সহসা তার বিষম ভাবান্তর ঘট্‌ল। আমাদের ধর্ম্মশালার ঠিক পিছনে এসে সে অকস্মাৎ টাঙাশুদ্ধ হুড়মুড় ক'রে নেমে পড়ল রাস্তা ছেড়ে পাশে খানার মধ্যে এবং আমার বিস্মিত প্রশ্নের কোনরকম জবাব না দিয়ে অস্ফুটস্বরে শুধু "উতারিয়ে বাবু, উতারিয়ে" ব'লে নিজেই নেমে প'ড়ে মাথার পাগড়ী খুলে হেঁট হ'য়ে দাঁড়াল। চেয়ে দেখি মোড়ের কন্‌ষ্টেবলও আমার টাঙাওয়ালার মত কোমর পর্য্যন্ত হেলিয়ে অভিবাদনের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, টাঙাওয়ালার পা-দুটো বোধ করি ভয়েই ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে।

তখন রাস্তার দিকে চেয়ে দেখি দূরে নগরতোরণের মধ্যে থেকে সার সার তিন চারখানা মোটর বেরিয়ে আসছে; ব্যাপারটা বুঝতেই পারলুম—স্বয়ং মহারাণা আসছেন সান্ধ্যভ্রমণে। পরে শুনেছিলুম যে তিনি প্রায়ই সর্দ্দারদের সঙ্গে ক'রে ফতেসাগরের ধারে বেড়াতে যান।

যাই হোক—আমি কিন্তু গাড়ীতেই ব'সে রইলুম। 'শির'-ত আমার 'নাঙা'ই আছে, আর অভিবাদন? কি দরকার খামকা আমার অভিবাদন করায়? তাঁর সঙ্গে ত পরিচয় ঘটবার কোনও সম্ভাবনা নেই!

মহারাণার গাড়ী আস্তেই আসছিল; কিন্তু আমার টাঙার কাছাকাছি এসে একেবারে দাঁড়িয়ে গেল। মহারাণা একবার আমার দিকে চাইলেন তারপর ফিরে ধর্ম্মশালার বস্তাবরদারকে ভাল ক'রে দেখে সে সম্বন্ধে কিসব

আলোচনা সুরু করলেন। মহারাণার খাস মোটরেও জন দুই সর্দ্দার ও অন্যান্য পরিজন কেউ-কেউ ছিলেন—তাঁরা আমার দিকে ভ্রূকুটীসহ বার বার তাকাতে লাগ্‌লেন; কারণ আমি তখনও টাঙ্গাতেই ব'সে এবং তাঁদের অভিবাদন জানাবার চেষ্টামাত্রও করলুম না। একবার ইচ্ছা হ'য়েছিল নেমে গিয়ে সম্মান জানাবার—কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল, রাজামহারাজাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার চেষ্টা করায় অপমানিত হবার ভয় আছে; তার চেয়ে বিদেশী লোক, অপরিচয়ের দোহাই দিয়ে ব'সে থাকাই ভাল।

আমি সর্দ্দারদের ভাল ক'রে দেখে নিলুম, কিন্তু কে-কি তা জানার সুবিধা হ'ল না। চন্দ্রাবৎ, শক্তাবৎ, ঝালাপতি কত নামই বার বার রাজস্থানে পড়েছি; এঁরা তাঁদেরই বংশধর—কিন্তু সে-সব কথা আজ এঁদের কাছেও কাহিনী। অনুমান করলুম যে চন্দ্রাবৎ ও শক্তাবৎ যদি থাকেন কেউ এঁদের মধ্যে—তাহ'লে মহারাণার খাস্ মোটরের ঐ দু'জনই হবেন। টাঙ্গাওয়ালা আন্দাজে ঢিল মেরে সেই রকম পরিচয়ই দিলে বটে কিন্তু তার চেনবার কথা নয়।

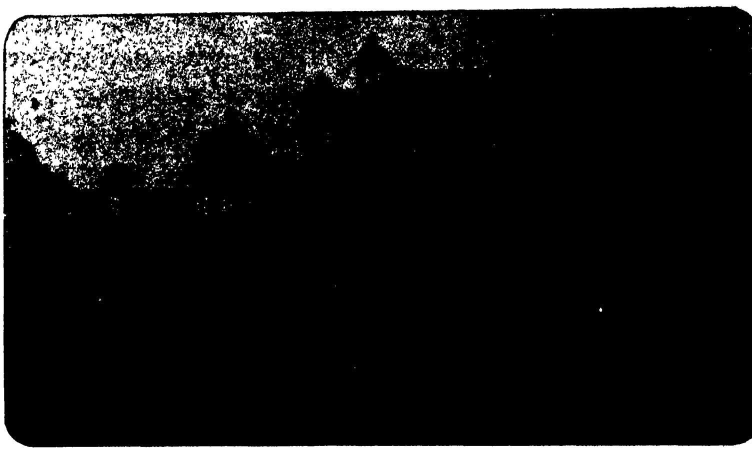
যাই হোক, মিনিট তিনেক পরেই আবার ওঁদের মোটরগুলি চল্‌তে সুরু করলে এবং আমার টাঙ্গাওয়ালারও পিঠ সোজা হ'তে সুরু করলে। সে বেচারা কিন্তু একটীও কথা বলার আগে মোড়ের পাহারাওয়ালা পুঙ্গব মার্-মার্ শব্দে তেড়ে এল তার দিকে; তার বক্তব্যের বঙ্গানুবাদ দিলে এই রকম দাঁড়ায়; হতভাগা, তুই বাবুকে পরিচয় দিলিনি কেন যে মহারাণা আসছেন। বাবু বিদেশী লোক, চিন্‌বে কি ক'রে?

আমি তখন তাকে বুঝিয়ে বললুম যে মূর্ত্তি ও ছবি মহারাণার আমি ঢের দেখেছি, তা'তে ক'রে তাঁকে চিনে নিতে দেরী হয়নি।

সে তখন অতিমাত্রায় বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করলে—তবে আপনি নেমে গিয়ে রাজদর্শন ক'রে এলেন না কেন? চাই কি হয়ত মহারাণা আলাপও করতে পারতেন আপনার সঙ্গে!

আমি হেসে বললুম—বাপু, দর্শন ত এখান থেকেই হ'ল, নেমে গেলে কি বেশী সুবিধে হ'ত কিছু?

সে বিশেষ কোনও জবাব দিলে না বটে কিন্তু বেশ বুঝলুম যে বাঙ্গালীদের নাস্তিকতায় সে দারুণ চটে গেল। মহারাণা ঘড়িঘরের সামনে গাড়ী দাঁড় করালেন কেন জিজ্ঞাসা করায় সে জবাব দিলে—মহারাণা অনেকদিন এ পথ দিয়ে ফতেসাগরের তীরে যান্ নি; বোধ হয় ঘড়িঘর বসবার পর আর দেখেন নি, সেইজন্যই গাড়ী থামিয়ে ভাল ক'রে দেখে নিলেন।



প্রাসাদ তোরণ—উদয়পুর

আবার আমাদের টাঙ্গা ছেড়ে দিলে। এবার দু মিনিটের পথ শিগ্‌গিরই পৌছে গেলুম। টাঙ্গাওয়ালাকে প্রশ্ন ক'রে জানলুম মহারাণার গাড়ী যখন রাস্তায় বেরোবে তখন তার সাম্‌নে অন্য গাড়ী থাকার নিয়ম নেই। সেই জন্যই তা'কে গাড়ী নিয়ে থানায় নেমে আস্‌তে হ'য়েছিল। যাক্—ধর্ম্মশালায় ফিরে রাজদর্শনের শুভ খবরটা মা'কে আর বৌদিকে দিলুম; তাঁরা শুনেই ছুটে ধর্ম্মশালার ছাদে গিয়ে উঠলেন, যদি মহারাণা সেই পথ দিয়ে ফেরেন তাহ'লে ভাল ক'রে দেখবেন, এই ভরসায়! কিন্তু তাঁদের দুর্ভাগ্যবশতঃ মহারাণা সে-পথ দিয়ে ফিরলেন না। অনেকক্ষণ রাস্তা চেয়ে ব'সে থেকে-থেকে শেষকালে

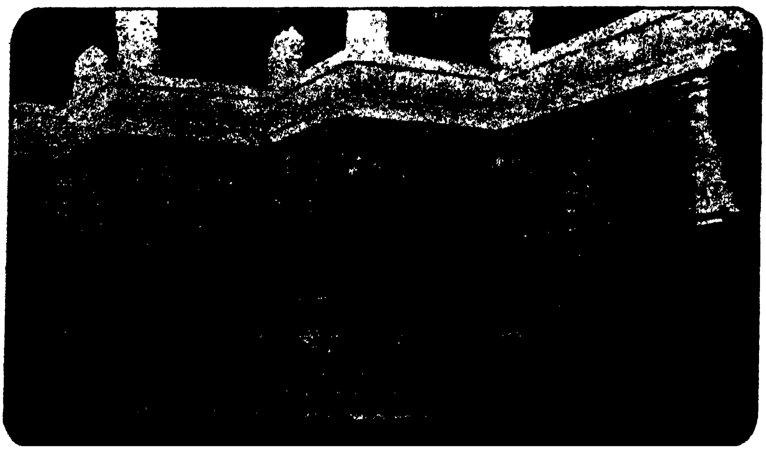
ওপরতলাটা ভাল ক'রে ঘুরে দেখে আমরা নিজেদের ঘরে ফিরে এলুম। আজিমগঞ্জের 'খানিকটা বাঙ্গালী' এক জমিদার মকদ্দমা উপলক্ষে প্রায় মাসখানেক এসে ঐ ধর্ম্মশালায় সেকেণ্ড ক্লাসে আছেন। বাঙ্গালা কথা না বল্‌তে পেয়ে তাঁরও অবস্থা শোচনীয় হ'য়ে উঠেছিল; তিনি ওপরতলায় আমাদের দেখতে পেয়ে আমাদের ডেকে খানিকটা আলাপ করলেন।

সেদিন সন্ধ্যার কিছু পরেই আমরা শুয়ে পড়লুম। স্থির হোল পরের দিন খুব সকাল ক'রে উঠেই আমরা নগর ভ্রমণে বাহির হবো। বিভিন্ন জাতের লোকদের ঝগড়া, গান ও আলাপের কোলাহলের মধ্যে আমরা অনায়াসেই ঘুমিয়ে পড়লুম এবং পরের দিন সকাল সকাল ওঠার প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও উঠ্‌তে একটু বেলাই হ'ল।

যাই হ'ক্—পরস্পরকে অতি মাত্রায় তাড়া লাগাতে লাগাতে আমরা স্নানাদি সেরে—কেবলমাত্র একটু সরবৎ পান ক'রে বেরিয়ে পড়লুম নগর ভ্রমণে—টাঙ্গা দোরের কাছেই কয়েকটা ছিল—তাদেরই একজনের সঙ্গে কিছুক্ষণ বচসা করার পর দুই টাকায় ভাড়া রফা হোল। সে ভাড়া ঠিক করার পর আর একটী বালককে সঙ্গে ডেকে নিলে এবং ভরসা (?) দিলে খানিকটা পরে ঐ বালকের হাতেই আমাদের সমর্পণ ক'রে সে স'রে পড়বে।

ধর্ম্মশালার মাঠ পেরিয়ে, নগর-তোরণের মধ্য দিয়ে আমরা খাস্ উদয়পুরের মধ্যে ঢুকলুম। ফটকের কাছে জন-কয়েক উদয়পুরী ব'সে তামাক খাচ্ছিল ও আলাপ করছিল; তারা বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে বৌদির শাড়ী কিম্বা শাড়ী পড়ার ধরণ নিরীক্ষণ করতে লাগল এবং আঙুল দিয়ে কি-সব দেখাতে লাগল। দেখলুম মনোযোগটা তাদের স্বজাতীয়ার প্রতিই বেশী। অবিশ্যি তা'তে আমার পুরুষত্ব ক্ষুণ্ণ হয়নি।

প্রথমেই বাঁ হাতি রাস্তা ধ'রে সোজা গেলুম 'আজায়ব্ ঘর' বা মিউজিয়মে। জয়পুরের মহারাজার মিউজিয়ম দেখে যে পরিমাণ আনন্দিত ও বিস্মিত হয়েছিলুম্ সেই পরিমাণ হতাশ হলুম রাজপুতশ্রেষ্ঠ মহারাণার মিউজিয়মের এই ব্যর্থ প্রয়াস দেখে। জয়পুরের দ্রষ্টব্য জিনিষ, জগতের শিল্প-চাতুর্য্যের এক অভিনব সংগ্রহ, দু'দিন ধ'রে দেখেও শেষ হয়নি। আর সে বাগানই বা কি সুন্দর! কিন্তু উদয়পুরের বাগানও যেমন হত-শ্রী, তার ভেতরের ছোট হলটা (মিউ-জিয়ম-ঘর) ও তেম্‌নি অনু-করণের ব্যর্থ চেষ্টায় ভরা। গোটা কতক শিলালিপি, দু'-একটা পুতুল (নানা জাতীয় লোকের মৃৎমূর্ত্তি—তা-ও বেশী নয়) দু-একটা অস্ত্র-শস্ত্র, ব্যস্! মহারাজা প্রতাপের দু-একটী মাত্র স্মৃতি-চিহ্ন আছে; সমস্ত জিনিষের মধ্যে সেইগুলিই যা কিছু দ্রষ্টব্য।



রণছোড়জীর মন্দিরের চারুকলা—উদয়পুর

ঐ বাগানেরই মধ্যে গোটা কতক কুকুর, একটা জীর্ণ শীর্ণ হাতি এবং দু-চারটে পাখী, এই নিয়ে মহারাণা পশু-শালার সখ মিটিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আর একবার অম্বর পতির উল্লেখ না ক'রে পারছি না; তাঁর পশুশালায় যে কুকুরের অদ্ভুত কলেক্‌শান দেখেছি তা বোধহয় ভারতবর্ষে আর কোথাও নেই। এত রকম যে কুকুর আছে তা এর আগে লাহা মহাশয়ের প্রবন্ধ প'ড়েও জানতুম না!

বাগান ছেড়ে আমরা আমাদের টাঙার একদফা সারথি-বদল ক'রে যাত্রা করলুম প্রাসাদের উদ্দেশে। প্রাসাদের বাইরে আমাদের টাঙা রেখে রাজপ্রাসাদের মধ্যে ঢুকলুম। বোধহয় চার পা গেছি কি-না সন্দেহ, একজন ফতেসিংহ-প্যাটার্ণের দাড়ী-ওয়ালা সিপাহী হৈ-হৈ ক'রে এসে প'ড়ে আমায় জানালে যে মাথায় পাগড়ী বেঁধে তবে ভেতরে ঢুকতে হবে। একটু ক্ষীণ প্রতিবাদ করলুম—আমরা বাঙ্গালী, আমাদের মাথায় বুদ্ধি আছে ব'লে পাগড়ী বেঁধে তাকে অধিক ভারাক্রান্ত করতে চাই না; এসব কথা তাকে যথাসাধ্য বোঝাবার চেষ্টা করলুম কিন্তু সে অটল—বললে, 'ইহাই নিয়ম।' কি আর করা যাবে, ভাগ্যিস্ সিল্কের চাদরটা নিয়ে বেরিয়েছিলুম, কোনও রকমে সেইটেই মাথায় চাপিয়ে বললুম, চল বাবা—এইবার কোথায় নিয়ে যাবে; এর চেয়ে ভাল-রকম পাগড়ী বাঁধা আমার দ্বারা আর সম্ভব হবে না।

ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই বাঁহাতি শিউনিবাসের দেউড়ী; আমাদের যদিচ শিউনিবাসেরও পাশ ছিল কিন্তু সিপাইরা ভ্রুকুটী ক'রে জানালে যে মহারাণার ভগ্নী এসেছেন এবং তিনি শিউনিবাসেই অবস্থান করছেন, অতএব সেখানে যাওয়ার চেষ্টা যেন আমরা না করি। শুনে একটু আশ্চর্য্য হলুম, কারণ রাজা-মহারাজা এমন কি আমাদের দেশের জমীদার বাড়ীতেও সেকালে আইন ছিল যে কন্যারা বিবাহ ক'রে এসে সেই যে শ্বশুরবাড়ী ঢুকবেন একেবারে ম'রে বেরিয়ে যাবেন। যদিও-বা তীর্থযাত্রার অনুমতি পাওয়া যায়, পিত্রালয়-যাত্রার কখনও না। মহারাণা এতদিনের সংস্কারকে এ-ভাবে পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছেন—তাতে বিস্মিত না হ'য়ে পারলুম না।

মহারাণার বহির্ব্বাটীর দেউড়ীতে জনদশেক সিপাহী ব'সে খোস-গল্প করছিল, তারা হৈ-হৈ ক'রে এসে প'ড়ে আমাদের পাশ দেখলে; তারপর তাদেরই একজন গাইড্-রূপে আমাদের সঙ্গে চলল। আমাদের সকলেরই পায়ে জুতো ছিল, তা নিয়ে প্রত্যেক বারেই বিব্রত হ'তে হোল। কারণ গায়ের চামড়া যা'দের মহারাণার মত—তাদের জুতো পায়ে দিয়ে কোথাও যাওয়া নিষেধ। অবিশ্যি সাহেবদের কোনও বাধা নেই, তাঁরা সবুট সর্ব্বত্র যেতে পারেন।... আইনটী বেশ! দিল্লী-আগ্রাতে সব শাহী গোরস্থানেও দেখেছি এই ব্যবস্থা। সাহেবরা কালো চামড়াকে ঘেন্না করে ব'লে আমাদের ক্ষোভের আর সীমা নেই, কিন্তু কেন? তাদের গায়ের রঙ্ আমাদের চেয়ে অনেকখানিই সাদা, তারা-ত ঘৃণা করতেই পারে, কিন্তু আমাদের অবজ্ঞা কি তাদের চেয়ে কিছু কম? ঐ যে আবু-পাহাড়ের ওপর



কুম্ভের বিজয়স্তম্ভ—উদয়পুর

দিলওয়ারা মন্দির, সাহেব এমন কি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের পর্য্যন্ত সেখানে অবারিত-দ্বার, শুধু দুর্ভাগ্য-ক্রমে যারা শিরোহীপতির স্বদেশবাসী, তাদেরই পাঁচ সিকে ক'রে দর্শনী দিতে হয়!...

মহারাণার বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হ'য়ে রীতিমত হতাশ

হলুম। এই কি মহারাণা প্রতাপের রাজপ্রাসাদ? মহারাণা উদয়সিংহ উদয়পুরে প্রাসাদ স্থাপন করেন; সুতরাং মহারাণা প্রতাপের এটা জন্মস্থান না হ'লেও তাঁর বাল্যকাল নিশ্চয়ই এখানে কেটেছে, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই উদয়পুর প্রাসাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শুধু বিলাতী-বিলাস-সম্ভার জ'মে উঠেছে। মহারাণার বহির্ব্বাটী যেন রাধাবাজারের কাঁচের দোকান! তার কি দেখ্‌ব? কতকগুলো বিলাতী ঝাড় আর আয়না। নীচে দু' চারখানা কৌচ-কেদারা ইত্যাদি। কোথাও রুচিবোধ বা সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের পরিচয় নেই, শিল্পকলার প্রতি এতটুকু মর্য্যাদা দেওয়ার চেষ্টা নেই, নেহাৎই কতকগুলো সাধারণ বিলিতী জিনিষ, মোটা!…মহারাণা সজ্জ্‌—মহারাণা প্রতাপের



পেশোলার বুকে জগমন্দির—উদয়পুর

বংশধর এক মনে শুধু বিলাতী কাচের দোকান উজাড় ক'রেছেন, তাঁদের দেশপ্রীতির আদ্যশ্রাদ্ধ ক'রেছেন!

জয়পুর মহারাজের প্রাসাদের মধ্যে আমরা যাইনি, তবে বিখ্যাত সাহিত্যিক আলডুস্‌ হাক্সলী যে-ভাবে এঁদের সকলের সম্বন্ধে কটাক্ষ ক'রেছেন, তাতে মনে হয় যে সকলেরই সমান অবস্থা। অবশ্য জয়পুরের মিউজিয়াম বা অন্যান্য জিনিষ দেখ্‌লে মনে হয় যে দেশীয় শিল্পকলার প্রতি টান তাঁর আছে; কিন্তু উদয়পুরের সর্ব্বত্র, কি মহারাণার খাস প্রাসাদ, কি তাঁর জগমন্দির আর জগনিবাস—ঐ এক ব্যাপার! একখানা ভাল ছবিও কি রাখ্‌তে নেই? ছবির মধ্যে বর্ত্তমান মহারাণা ও স্বর্গীয় কর্ত্তেসিংহের রকমারী ছবি সাজানো; একখানা বোধ হয় হেমেন মজুমদারের ছবি দেখেছিলুম! বিকৃত রুচির এই নিঃসংশয় পরিচয় পেয়ে ভাব্‌তে লাগলুম যে স্বদেশ-প্রেমের কি এটা রি-এ্যাক্‌সন্‌?

কাযেই প্রাসাদ দেখা আমাদের মিনিট দশেকের মধ্যেই শেষ হ'য়ে গেল। তারপর আমরা প্রাসাদেরই মধ্যের সংকীর্ণ পথ দিয়ে অনেকখানি গিয়ে পেশোলার ধারে একেবারে ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হলুম। প্রাসাদটী পেশোলার জল থেকেই সোজা উঠেছে, সুতরাং পেশোলার বুকের ওপর থেকে মন্দ দেখায় না। যদি-চ প্রাসাদের কোনওখানেই স্থাপত্য-বিদ্যার বিন্দুমাত্র পরিচয় নেই, নেহাৎই সাবেক-কালের একটা বাড়ী, একটু বড়—এই যা'!

প্রাসাদের ঘাটে দাঁড়িয়ে কিন্তু দূরের জগমন্দির ও জগনিবাস বড় সুন্দর দেখায়—যেন দুটী সাদা হাঁস পেশোলার জলে খেলা করছে। একজন সাহেব দেখলুম মাটীতে ব'সে এক মনে জগমন্দিরের ছবি এঁকে নিচ্ছেন, আর চারদিকে কতকগুলো মাওলাদের ছেলে অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছে। ভদ্রলোকের অধ্যবসায়ের পরিচয় পেয়েছিলুম ঘণ্টা দুই বাদে ফিরে এসে, কারণ তখনও তিনি ছবিই আঁকছিলেন।

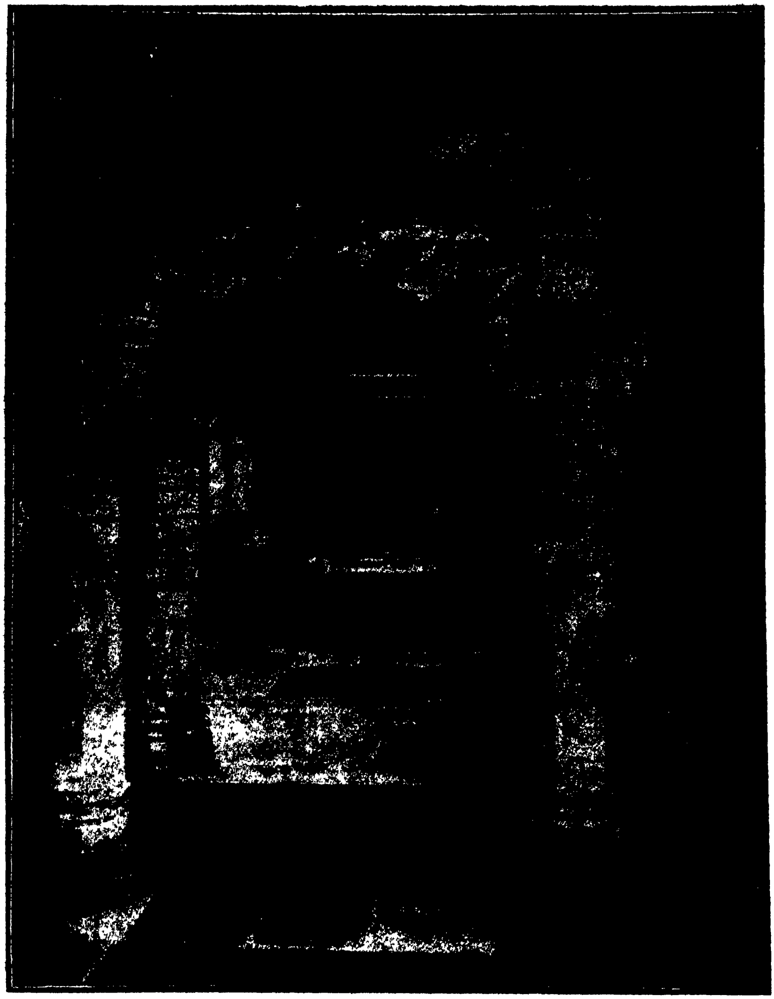
আমাদের নৌকার পারাণী-পয়সারও ছাড়পত্র দেওয়া ছিল সুতরাং আমরা নিশ্চিন্ত মনে নৌকায় গিয়ে উঠ্‌লুম; বাকী কতকগুলি মাড়োয়ারী ও মান্দ্রাজী যাত্রী ছিল তাদের কাছ থেকে এক আনা ক'রে ভাড়া নিয়ে পার করলে। এ-ক্ষেত্রে একটা কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না, উদয়পুরের মুদ্রা আমাদের মুদ্রার চেয়ে কম মূল্যবান, বোধ হয় আমাদের দশ আনাতে ওদের এক টাকা হয়। প্রত্যেক জিনিষের দাম বল্‌বার সময় কোন্‌ মুদ্রা, তার উল্লেখ করতে হয়; যথা—'মিউকা ভাও এক রূপেয়া কল্‌দারী।'

কাল্‌দারীটা হ'ল ব্রিটিশ ভারতের মুদ্রা, উদয়পুরী হোল ওখানকার। টাকা, সিকি, দোয়ানী, আনি—এমন কি পয়সা পর্য্যন্ত উল্লেখ করার সময় 'কাল্‌দারী' কি 'উদয়পুরী' তা ব'লে দিতে হয়।

পয়সার খাঁইটা দেখলুম উদয়পুরে একটু যেন বেশী। রাজার সিপাই থেকে সুরু ক'রে নৌকার মাল্লা পর্য্যন্ত বখ্‌শীষটা বেশ বোঝে; এমন কি খাস্‌মহলের সিপাইরা পর্য্যন্ত বখ্‌শীষ চাইতে ইতস্ততঃ করে না এবং চাইবার সময় যদিচ এক টাকা চায়, পাবার সময় আনী পেলেও তাদের আপত্তি নেই। অবিশ্যি এই চাওয়ার ব্যাপারটা বাঙ্গালী দেখ্‌লেই বেশী হয়।

পেশোলার জলটা বেশ। খুব নির্ম্মল, ওপর থেকে যেন কালো ব'লে মনে হয়। দোষের মধ্যে সামান্য একটু গন্ধ আছে এবং সে গন্ধ রিফাইন হ'য়ে যখন পাইপে যায় তখনও তার আভাষ পাওয়া যায়। তবে আজমীরের পাইপে আসা বৃদ্ধ পুষ্করের জলের মত নয়।...

প্রায় মিনিট দশেক চলবার পরই আমাদের নৌকা জগনিবাসে গিয়ে পৌঁছল। জগনিবাস হ'ল মহারাণাদের গ্রীষ্মাবাস, মহারাণা প্রতাপের প্রপৌত্র মহারাণা জগৎসিংহ এটা তৈরী ক'রেছিলেন। আর একটী অপেক্ষাকৃত ছোট দ্বীপের ওপর জগমন্দির নির্ম্মিত হ'য়েছিল। এইখানেই শাহ্‌জাদা খুরম, যিনি পরে সাহজাহান হ'য়েছিলেন—বিদ্রোহী অবস্থায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং তাঁরই জন্য এইখানে একটী ছোট মস্‌জিদ্‌ তৈরী করা হ'য়েছিল। আমাদের কর্ণধার বালক মাল্লাটী কিছুতেই আমাদের নৌকা জগমন্দিরে নিয়ে গেল না, নানা-রকম যুক্তি দেখিয়ে প্রমাণ ক'রে দিলে যে ওখানে দেখবার কিছু নেই।



সতী মন্দির—চিতোরগড়

জগনিবাসেও এমন কিছু নেই। মহারাণা ও মহিষীদের ঘরগুলি সেই বিলিতী আসবাবে সাজানো; মহিষীদের স্নানের মহলে একটী ছোট পুকুরের মত আছে, তা'তে জল অবিশ্যি পেশোলা থেকেই আসে, কিন্তু তখন মহিষীদের

আসার সময় নয় ব'লে সে জল প'চে আছে। খানিকটা ঘুরেই বুঝতে পারলুম যে এ দূর থেকে দেখেই ফিরে যাওয়া চলত, আসার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

আবার নৌকা ক'রে প্রাসাদে ফিরে এলুম এবং প্রাসাদেরও বাইরে এসে আবার আমাদের সেই দ্বিচক্র যানে চড়লুম। বেলা তখন বেশ বেড়ে উঠেছে, তবে শেষ শীতের বেলা ব'লে তত কষ্ট আমরা পাইনি।

ওখান থেকে বেরিয়ে আমাদের সহেল্লা বাড়ী ও ফতে-সাগরে যাবার কথা। কিন্তু পথেই পড়ে প্রসিদ্ধ রণছোড়জীর মন্দির। এই মন্দিরে আছেন বিষ্ণুমূর্ত্তি, কিন্তু সেজন্য নয়; অতি সুন্দর কারুকার্য্যের জন্যই মন্দিরটী বিখ্যাত। বস্তুতঃ



গোপাল মন্দির (মীরাবাই:)—চিতোরগড়

উদয়পুরে এসে পর্য্যন্ত এই প্রথম আমরা একটা দেখবার মত জিনিষ পেলুম। উদয়পুরের বিশাল হ্রদগুলি ও রণছোড়জীর মন্দির ছাড়া আর কিছু আছে ব'লে মনেও হয় না।

রণছোড়জীর মন্দির থেকে বেরিয়ে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে কিছু খাইয়ে নিয়ে আবার রথে চড়লুম। এইবার যাত্রাটা কিছু মৃদু চালেই হোল; কারণ সেদিন দরবার ছিল বলে সর্দ্দাররা সব মোটরে ও ঘোড়ার গাড়ীতে দলে-দলে যাচ্ছিলেন। সুতরাং সেই সংকীর্ণ-পথে আমাদের টাঙ্গা যাবার রাস্তা কোথায়?

প্রাসাদ থেকে অনেকটা দূরে ফতেসাগর। স্বর্গীয় মহারাণা ফতেসিংহেরই কীর্ত্তি এটী। জলবিরল মরুভূমির মধ্যে এত বড় হ্রদ দেখ্‌লে সত্যিই আশ্চর্য্য হ'তে হয়। জয়সমুদ্র যেমন মহারাণা জয়সিংহ ভীষণ দুর্ভিক্ষের দিনে করিয়েছিলেন, ফতেসাগরও অত না হয় একটা ছোটখাট দুর্ভিক্ষের সময় করা হ'য়েছিল। এতে সখও মেটে এবং রিলিফওয়ার্কও চলে। এই সব হ্রদগুলির জন্যই উদয়পুরের সাহেবী নাম হ'চ্ছে City of Lakes!

তার মধ্যে জয়সমুদ্র ত শুনেছি মানুষের হাতে গড়া রীতিমত বিস্ময়! কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের তা দেখা হ'ল না, তার কারণ পরে বল্‌ছি।

ফতেসাগর খুব বেশী বড় নয়, আমাদের ঢাকুরিয়া লেকের আড়াই গুণ হবে। চার পাশ বাঁধানো এবং পাড়ে বেড়াবার জন্য পাকা রাস্তা। মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঘাটও আছে। মোটের ওপর এই নির্ম্মলতোয়া হ্রদটীর তীরে গেলে বেশ একটু আনন্দ হয়—

শ্রীসহেল্লা-বাড়ী এই ফতে-সাগরেরই পাশে। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, মহারাণার বাগান-বাড়ী। বিরাট একটা বাগানের মধ্যে বিশ্রাম করার মত, ভোজ দেবার মত একটা বাড়ী ক'রে রাখা হয়েছে—মহারাণার চিত্ত-বিশ্রাম বলা যেতে পারে। বাগানটী সাধারণ লেবেল থেকে একটু নীচে, তার ফলে গাছে জল দেওয়ার কাষটা খুব অনায়াসে মিটে যায় অর্থাৎ ফতেসাগর থেকে পাইপে ক'রে জল আসে।

বাগানটী মন্দ নয়—গোলাপ ও চামেলীরই প্রাচুর্য্য। বৌদি চারিদিকে গোলাপ-ফুল দেখে চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লেন; আমি তাঁকে মহারাণার সিপাইদের ভয় দেখিয়েও নিরস্ত করতে পারলুম না; শেষকালে আমি জননী হবাকে স্মরণ ক'রে আমি তাঁকে একটী ফুল তুলেই দিলুম। অবিশ্যি তার বিশেষ কিছু প্রয়োজন ছিল না; কারণ রাজপ্রাসাদের যে মালিনীরা মহারাণীদের জন্য ফুল তুলতে এসেছিল তাদের

একজনকে একটা উদয়পুরী পয়সা দিতেই সে চারটে গোলাপ ফুল আর একমুঠো চামেলী আমাদের দিয়ে দিলে। তবে তার অন্য কারণ থাকতে পারে—মালিনীটী ফুল দিতে-দিতে তার সঙ্গিনীকে বলছিল, যে ছেলেটী ঠিক আমার ছোট ভায়ের মত দেখতে, না ?···বলা বাহুল্য যে সেটা আমাকেই ইঙ্গিত ক'রে বলা হ'য়েছিল।

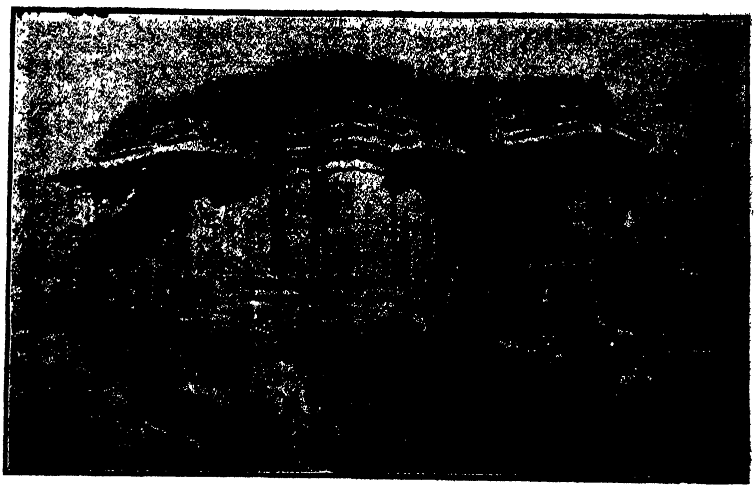
সাহেল্লা-বাড়ী থেকে বেরিয়ে ক্লান্ত-দেহে সোজা আমরা ধর্ম্মশালায় ফিরে এলুম এবং পুনরায় স্নান ক'রে সামান্য কিছু জলযোগ ক'রেই শুয়ে পড়লুম—একেবারে তিনটে পর্য্যন্ত। শুয়ে পড়লুম কিন্তু ঘুম হ'ল না, কারণ মা একলিঙ্গ ও রাজসমন্দরের জন্য অনবরত তাগাদা দিতে লাগলেন।

কিন্তু হায়! সে বাসনা আমাদের অপূর্ণ রেখেই আসতে হ'ল। অন্য কোনও যাত্রীই অতদূর যেতে রাজী হ'ল না এবং শুধু আমাদের নিয়ে সেখানে যাওয়া ও ফিরে আসার জন্য বাসওলা চাইলে ত্রিশ টাকা। তখন ট্রেণ ভাড়া ছাড়া মোটে আমাদের হাতে আছে গোটা কুড়ি-পঁচিশ টাকা। তারই ভেতর রাজপুতানার শ্রেষ্ঠ তীর্থ নাথদ্বার ও চিতোরগড় সেরে আজমীরে ফিরতে হবে।···মা ক্রুদ্ধ হ'য়ে অনুযোগ করতে লাগলেন, একটু আগে টাকার ব্যবস্থা করলেই হ'ত, নয়ত আরও দু'দিন আজমীরে অপেক্ষা করলেই হ'ত—ইত্যাদি।

কিন্তু সে-সবই তখন 'গতস্য'—। আমাদের জয়সমন্দর ও রাজসমন্দর উভয়েরই আশা একটী দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে ত্যাগ করতে হ'ল। ফলে মন এতই খারাপ হ'য়ে গেল যে চারটের সময় মহারাণার শূকর ভোজন দেখতে যাবার যে বাসনা ছিল তা ত্যাগ ক'রেই আমরা নাথদ্বার যাবার জন্য প্রস্তুত হলুম। এই শূকর-ভোজনটী নাকি একটী দেখবার জিনিষ। ঠিক ঐ সময় প্রত্যহ মহারাণার অনুচরেরা প্রাসাদের প্রাচীর থেকে খাবার নীচে ফেলে দিতে সুরু করে এবং দেখ্‌তে-দেখ্‌তে জঙ্গলের ভিতর থেকে হাজার-হাজার শুয়ার এসে জড় হয়। সেই সময় মহারাণা নিজেও উপস্থিত থাকেন এবং আরও অনেকে সেই দৃশ্য দেখ্‌তে যায়।

ট্রেণ আমাদের প্রায় ছটায়। আমরা পাঁচটা নাগাদ বিছানাপত্র বেঁধে, যথারীতি বখ্‌শীষাদির ব্যবস্থা ক'রে ধর্ম্মশালা ও উদয়পুর ত্যাগ করলুম। একে আহার্য্য বিশেষ কিছু পাওয়াই যায় না—তার ওপর রন্ধনাদির এত অসুবিধা যে বৃথা আর একটা দিন ওখানে কাটাতে আমাদের কারুরই ইচ্ছা হ'ল না।

ট্রেণ অল্প কিছুক্ষণ লেট ক'রে উদয়পুর ছাড়ল এবং



শাস বহু মন্দির—একলিঙ্গ

ঘণ্টা ছয়েকের মধ্যেই মাওলী জংশনে গিয়ে পৌঁছল। এইখানে বদল ক'রে আমাদের গাড়ী নাথদ্বারে পৌঁছল। এই নাথদ্বারই রাজপুতদের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। ভগবান শ্রীনাথজীকে দর্শন করার জন্য ওদের যা আকুলতা এবং তাঁর ওপর যা ওদের বিশ্বাস—তা দেখবার জিনিষ।

মাওলী থেকে নাথদ্বার ষ্টেশন অল্পই দূর। কিন্তু নাথদ্বার ষ্টেশন থেকে নাথদ্বার সহর আরও সাত মাইল দূরে। এই পথ যাবার জন্য টাঙ্গা এবং একখানা বাসও পাওয়া যায়, যদি খারাপ হ'য়ে গারাজে প'ড়ে না থাকে! নাথদ্বার ষ্টেশনটী অন্ধকার এবং কুলী বিরল। অতি কষ্টে আমরা ট্রেণ থেকে জিনিষপত্র নিয়ে নামলুম এবং শুনলুম

যে আমাদের সৌভাগ্যক্রমে বাসও আছে। অচেনা জায়গায় এই অন্ধকার রাত্রিতে টাঙ্গা নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয় সুতরাং আমরা সকলে বাসে গিয়েই উঠলুম। যদিচ বাস রাত্রিবেলা মাথাপিছু ভাড়া অনেক বেশী নেয় তবুও পূর্ব্বোক্ত কারণে সে বাস দেখ্‌তে-দেখ্‌তে বালিসে তুলো ঠাসার মত বোঝাই হ'য়ে উঠ্‌ল। শেষকালে যখন তারা বুঝলে যে আর কোনও রকমেই তা'তে লোকভরা সম্ভব নয়, তখন তারা বাস্ ছাড়লে এবং ধূলোয় স্নান করাতে-করাতে ঘণ্টাখানেক বাদে ধর্ম্মশালার সাম্‌নে আমাদের নামিয়ে দিলে।

নামিয়ে যখন দিলে তখন ন'টা বাজে নি—কিন্তু তারই মধ্যে সেখানকার দোকানপাট বন্ধ হ'য়ে এসেছে এবং ধর্ম্মশালার দোরও বন্ধ হয়-হয়। একটা জানলা-দরজা-হীন ঘরে জিনিষ পত্র রেখে ধর্ম্মশালার মুন্সী বা চৌকীদারকেই পয়সা কবুল ক'রে জল আনিয়ে মুখ হাত ধোওয়া হোল; তারপর বেরিয়ে পড়লুম খাদ্যদ্রব্যের খোঁজে। একটী মাত্র দুধের দোকান তখনও খদ্দেরের মায়া কাটাতে পারে নি, আর সবই বন্ধ হ'য়ে গেছে তখন। দুধওয়ালার কাছ থেকে কিছু দুধ আর ক্ষীরের কালাকান্দ সংগ্রহ করলুম কিন্তু দাম দিতে গিয়ে তার দাবী শুনে অবাক হ'য়ে গেলুম। দুধ চার পয়সা সের, রাব্‌ড়ী দু' আনা এবং পেঁড়া ও বর্‌ফি তিন আনা সের!

পরের দিন অন্ধকার থাকতেই শয্যাত্যাগ ক'রে স্নানের জন্য তৈরী হওয়া গেল। কারণ শ্রীনাথজীর দর্শন শুনলুম বড়ই দুর্ল্লভ। ভোরবেলা মঙ্গল-আরতির সময় একবার দর্শন হয়, তার পরেই একেবারে বেলা এগারটা। অথচ আমাদের তখন আর ট্রেণ নেই, মানে আরও একদিন অবস্থান; কিন্তু তা'তে তখন আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলুম না। যা-ই হোক্ কোনও রকমে স্নানাদি সেরে (ধর্ম্মশালার সে-সব ব্যবস্থার উল্লেখ না করাই ভাল)



তেজপাল মন্দির—আবু পাহাড়

আমরা সূর্য্য-অভ্যুদয়েই মন্দিরে পৌছলুম। কিন্তু তখনই কি অসম্ভব ভীড়! শিবরাত্রির দিন কাশীর মন্দিরে যেমন মারামারি হয় তেম্‌নিই পেষাপিশি, কি আকুলতা ওদের! সে আগ্রহ চোখে দেখে তবে বোঝা যায় যে ভক্তি কাকে বলে!

জয় শ্রীনাথজী! নাথোজী কি জয়! হে প্রভু, হে দয়াল, কৃপা রেখ হে স্বামী, হে নাথোজী!

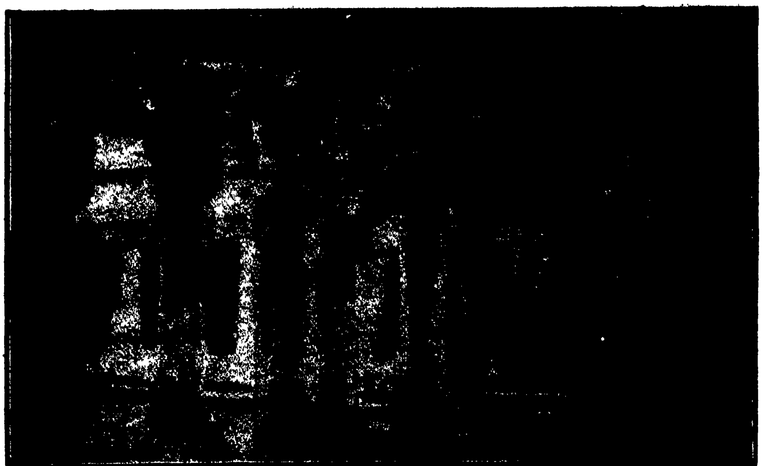
সকলেরই মুখে চোখে বাক্যে এই আকুতি তখন ভাষা নিয়েছে, হে প্রভু, হে স্বামী, কৃপা রেখ!

কালো পাথরের মূর্ত্তি, অধিকাংশই তখন কাপড়ে ঢাকা, শুধু অনুভবে বোঝা যায় যে বিষ্ণুমূর্ত্তি। কোনও রকমে সেই ভীড়ের মধ্যে একবার চকিতে দর্শন শেষ ক'রে বেরিয়ে এলুম; মা-কে নিয়ে বেরিয়ে আসাই দায়!

ফুল নিজে হাতে ক'রে দেবার হুকুম নেই, গদীতে গিয়ে জমা দিতে হয়, পূজারীরা নিজেদের ইচ্ছামত তার ব্যবহার করবে। আমরাও প্রত্যেকে এক-একটী ডালা কিনে যথাস্থানে জমা দিলুম। তারপর ভগবানের উদ্দেশে আর একবার প্রণাম ক'রে বেরিয়ে এলুম।

পুরীর মত নাথোজীর প্রসাদও নানা রকমের, সস্তা এবং পুরীর মতই তা বিক্রী করার জন্য অসংখ্য দোকান-যুক্ত বাজার আছে। এখানকার প্রসাদের সুলভতা ও উৎকৃষ্টতার খ্যাতি শুনছি বহুদিন থেকে। সুতরাং অবিলম্বে কিছু প্রসাদ কিনে নেওয়া গেল। খেয়ে দেখলুম সস্তা তা নিশ্চয়ই, কিন্তু উৎকৃষ্ট কিছুতেই নয়। বরং নাথোজীর মার্জ্জনা ভিক্ষা ক'রে এই কথা বলা যায় যে তার অধিকাংশই অখাদ্য।

নাথোজীর মন্দির থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি ধর্ম্মশালাতে ফিরেই বিছানা মাদুর বেঁধে নিয়ে আমরা ষ্টেশনের দিকে রওনা হলুম। ট্রেণ হোল সকাল সাড়ে আটটায়, আমাদের বেরোতে সাড়ে সাতটা বেজে গেল। খাবার সময় বাসে কিছুতেই যাব না এই প্রতিজ্ঞা ছিল; সুতরাং টাঙ্গা ক'রে একঘণ্টায় সাত মাইল পথ যেতে পারব কি-না অত্যন্ত ভয় হোল; কিন্তু দেখলুম যে পক্ষীরাজ আমাদের যথাসময়েই নাথদোয়ারা ষ্টেশনে পৌছে দিলে। ভাড়াও হিসেব মত আমাদের কম পড়ল, কারণ টাঙ্গা ঐ-পথের জন্য মাত্র চৌদ্দ আনা পয়সা নিলে। নাথ-দোয়ারায় একটা জিনিষ খুব সস্তা দেখলুম সে-কথা এখানে উল্লেখ না ক'রে যবনিকা টানব না—সেটা হ'চ্ছে পেঁপে। চার পয়সায় যে পেঁপে সেখানে কিনলুম তা খুব কম হ'লেও কলকাতায় পাঁচ-আনা বা ছ' আনায় কম বিক্রী হয় না।



দিলওয়ারা—আবু পাহাড়

এইবার চিতোরগড়!

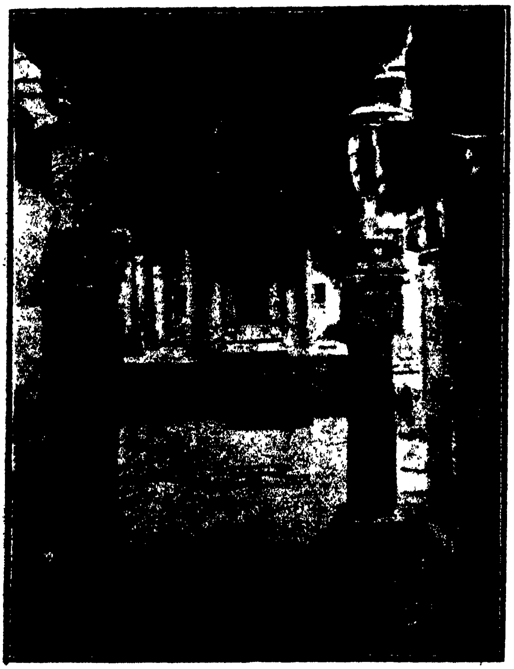
চিতোরগড় ষ্টেশনে যখন এসে পৌছলুম তখন বেলা একটা বেজেছে।

ষ্টেশনে পৌছে কুলীপুঙ্গবকে প্রশ্ন করলুম, বাপু হে, ধর্ম্মশালা আছে?

সে মহা উৎসাহে বল্লে, এই যে ষ্টেশনের কাছেই আছে বাবু, চলিয়ে না—

আশ্বস্ত হ'য়ে ওর পিছু-পিছু চললুম। কিন্তু ষ্টেশনের রাস্তাটা পেরিয়েই যে দৃশ্য নজরে পড়ল তা'তে বুকের রক্ত হিম হ'য়ে এল। শরৎবাবু গৃহদাহে "শেরশাহের আমলের যে ধর্ম্মশালার" বর্ণনা দিয়েছেন সে ধর্ম্মশালাও এর কাছে

লাগে না। ফটকহীন ভাঙ্গা পাচীল-ঘেরা প্রকাণ্ড একটা মাঠের মধ্যে সেই কঙ্কালসার ধর্ম্মশালা দাঁড়িয়ে আছে। খুব যে প্রাচীন তা নয়, তবে দেখ্‌লে মনে হয় যে ইঁটের গাঁথুনীর পর আর নির্ম্মাতাদের সামর্থ্যে কুলোয় নি। ভেতরে বা বাইরে কোথাও বালীর কাজ করার চেষ্টা মাত্র করা হয় নি। খান চার-পাঁচ ঘর, একটা জরাজীর্ণ কুয়া, অত্যন্ত নোংরা ও প্রাচীন পাইখানা এবং খানিকটা কি রাঁধবার জায়গা—এই সব! হয়ত ধর্ম্মশালার কেউ রক্ষক আছে, কিন্তু তার চিহ্নমাত্র কোথাও দেখ্‌তে পেলুম না।



দিলওয়ারা—আবু পাহাড়

যাত্রীরা যে ঘর খালি পায় তাইতে মালপত্র নিয়ে ঢুকে পড়ে, খালি না পেলে ফিরে যায়, অন্য ব্যবস্থা দেখে।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তখনই একখানা ঘর খালি হল; আমরা সঙ্গে-সঙ্গে মালপত্র ভেতরে পুরে ফেললুম। ঠিক দুই-তিন মিনিট পরে আর একদল যাত্রী এলেন, তাঁদের অদৃষ্টে আর স্থান মিল্‌ল না; তাঁরা দালানেই মালপত্র নিয়ে মাথা গুঁজে রইলেন। ভদ্রলোকরা গুজরাটী বণিক্—কি কাযে এসেছেন, কিন্তু সপরিবারেই এসেছেন। তাঁরা পরে রাঁধবার জায়গা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে রান্নাবান্নাও ক'রেছিলেন—এমন কি আমাকে নিমন্ত্রণও ক'রেছিলেন খাবার জন্য; কিন্তু পাইখানার অবস্থা দেখে এবং সেই নোংরামীর মধ্যে আমার খেতে প্রবৃত্তি হোল না। সেদিন আহারাদির ব্যবস্থা একরকম স্থগিত রাখলুম, মেয়েদের পূর্ণিমা ছিল, সুতরাং কিছু খরমুজ, কাঁকড়ী ও জঘন্য দইএর ওপর দিয়েই আমরা দিনটা কাটিয়ে দিলুম।

যাই-হোক্—ঘরে জিনিষপত্র রেখে মুখে চোখে জল দিয়েই আমরা বেরিয়ে পড়লুম চিতোরগড়ের উদ্দেশে। খান দুই টাঙ্গা ধর্ম্মশালার বাইরেই দাঁড়িয়েছিল; উদয়পুরের মতই জরাজীর্ণ ঘোড়া এবং দড়ীর সাজ। তাদেরই একখানাকে যাওয়া আসা ভাড়া ক'রে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। রসুনের দুর্গন্ধে টাঙ্গাওয়ালার পাশে বসা ভার, তবুও কোনও রকমে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ব'সে রইলুম।

ধূ-ধূ করছে মাঠ চারিদিকে; প্রখর সূর্য্য-কিরণে তা যেন নিঃশব্দে পুড়ছে, আর তারই গরম হাওয়া আমাদের মুখে-চোখে এসে লাগ্‌ছে; যেন দেহের রক্ত শুধু এই উষ্ণতায় শুকিয়ে উঠ্‌ছে! ভিজে গামছা মাথায় দিয়েছিলুম, নিমেষের মধ্যে তা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে উঠ্‌ল। চারিদিকে শুধু আগুন্!

মাঠ পেরিয়ে রেলের লাইন পার হ'য়ে টাঙ্গা চল্‌ল পাহাড়ের দিকে—একটু একটু ক'রে চিতোরগড়ের পাহাড় আমাদের নিকটবর্ত্তী হ'তে লাগল। এই সেই চিতোরগড়, সেখানকার আশপাশে বাপ্পা, কুম্ভ, হামিরের স্মৃতি আজও মিশে রয়েছে—

পাহাড়ের পাদদেশে এবং গায়ে একটা গ্রাম আছে, বস্তুতঃ এইটেই আসল চিতোর। এখানে জনবসতি খুব বেশী, দোকানপাট যা কিছু সবই এখানে। এরই সংকীর্ণ রাস্তার মধ্য দিয়ে বিস্তর রাজপুতের বিস্মিত দৃষ্টি অতিক্রম ক'রে আমরা এঁকে বেঁকে একটু-একটু ক'রে পাহাড়ের ওপর উঠলুম। ক্রমে এগিয়ে এল গড়ের তোরণ!

প্রথম তোরণ পার হ'য়ে দুদিকে 'র‍্যাম্‌পার্টের' মধ্য দিয়ে অনেকটা গেলে আবার একটা তোরণ পড়ে এইখানে জয়মল্ল স্মৃতিস্তম্ভ আছে। অহোরাত্র জেগে এই বীর একদা চিতোরের তোরণ রক্ষা ক'রেছিলেন; শেষকালে সম্রাট

আকবরের গুলিতে এঁকে প্রাণ হারাতে হয়। যেখানে তিনি আহত হ'য়ে প'ড়েছিলেন সেইখানেই স্মৃতিস্তম্ভ একটী স্থাপন করা হ'য়েছে।

দুদিকের প্রাচীরের দিকে চাইতে চাইতে যখন এগোচ্ছিলুম, তখন বার বার মনে হচ্ছিল যে এর প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ডটী যেন আমার বিশেষ পরিচিত। যে-সব লোক-দুর্ল্লভ কীর্ত্তি এর অনুতে-অনুতে জড়িত হ'য়ে রয়েছে, তার প্রত্যেকটাই আমার চোখের সাম্‌নে পরিস্কার হ'য়ে ফুটে উঠ্‌ছে যেন।···এর জন্য দায়ী অবশ্য সেই যজ্ঞেশ্বরবাবু—

জয়মল্লর স্মৃতিস্তম্ভ পেরিয়ে আরও অনেকটা দুর্গ-প্রাচীরের পাশ দিয়ে ওঠবার পর টাঙ্গাওয়ালা বল্‌লে—এইবার নাম্‌তে হবে। যা কিছু দেখবার পায়ে হেঁটে দেখতে হবে—তার পর আবার আমি নামিয়ে নিয়ে যাব।

অগত্যা নামলুম। সেইখানেই একজন গাইড্ এসে জুট্‌ল। গাইড্‌টীকে আমাদের টাঙ্গাওয়ালা আমাদের সঙ্গে পরিচিত ক'রে দিলে, হয়ত ওদের কিছু বন্দোবস্ত আছে।

কিন্তু সে যাই হোক্, আমরা গাইড্ পেয়েছিলুম ভালই; ছেলেমানুষ, বয়স বোধ হয় চব্বিশ হবে, কিন্তু নিরক্ষর নয়। টডের রাজস্থান আর গৌরীশঙ্কর ওঝার ইতিহাস তার মুখস্থ। টডের ইতিহাস অনেকস্থলেই গোল-মেলে, অসম্বদ্ধ, একথা আজকাল বহু ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন। টডের এম্‌নি বহু অসঙ্গতি ডাঃ ওঝা প্রমাণ-প্রয়োগের সঙ্গে দেখিয়ে দিয়েছেন। টডের উক্তি যেখানে-যেখানে ডাঃ ওঝা খণ্ডন ক'রেছেন সবগুলিই আমাদের গাইডের কণ্ঠস্থ দেখলুম, যুক্তিগুলি শুদ্ধ। খুব ভদ্র, বেশী লোভ নেই। সে বেচারা আমাকে তার কার্ড দিয়েছিল কিন্তু সেটা হারিয়ে ফেলেছি ব'লে তার নামটা আপনাদের জানাতে পারলুম না।

টাঙ্গা থেকে নেমেই যে পথ দিয়ে আমরা চল্‌তে সুরু করলুম তা'র প্রথমেই পড়ে মহারাণা কুম্ভের ও পদ্মিনীর মহল। এইখানে খানিকটা ঐতিহাসিক অসঙ্গতি আছে, তবে তা'র কচকচিতে আপনাদের অযথা ভারাক্রান্ত ক'রতে চাই না।

সেই ভগ্নস্তূপের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললুম। এককালে এই প্রাসাদ সত্যিই দেখবার জিনিষ ছিল তা আজও বোঝা যায়; লোকজন, দাস-দাসীতে, কোলাহলে যখন সেই মহল দিনরাত মুখরিত হ'য়ে থাকত, সূর্য্যবংশধরের প্রতাপ যখনও ম্লান হয়নি, তাঁদের শৌর্য্য যখন পৃথিবীর ভয় এবং হিন্দুস্থানের গৌরবের ছিল—তখনকার দিনের খানিকটা স্মৃতি শুধু খ'সে পড়া মিনারে এবং ভাঙ্গা দেওয়ালে আজও লেগে র'য়েছে। মহিষীদের ঘোড়াশাল দেখে মনে হোল—হায় আজ কোথায় সেই আর্য্যনারীরা, যাঁরা তেজস্বী আরবী-ঘোড়াকে সংযত ক'রে সওয়ার হ'তেন; দেশমাতৃকাকে স্বাধীনা রাখার জন্য সেই অশ্বপৃষ্ঠে চ'ড়ে যাঁরা যুদ্ধযাত্রা করতেন।

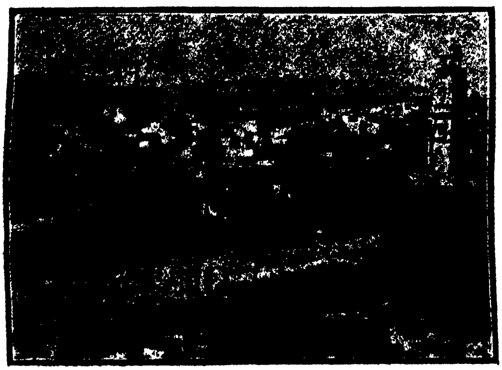


ভগবান একলিঙ্গের মন্দির—মেবার

কারুকার্য্য আজও বিলুপ্ত হয় নি, স্থাপত্যের গৌরব নিয়ে আজও তার সৌধের খণ্ডাংশ দাঁড়িয়ে আছে—তা' থেকে কি ছিল তা সবটা না হোক্ খানিকটা আমরা বুঝতে পারি; বুঝতে পেরে শুধু দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি, আর কি করব?

এইখানেই টড-উল্লিখিত সেই বিখ্যাত সুড়ঙ্গ বর্ত্তমান। টডসাহেবের মতে এই সুড়ঙ্গতেই আগুন জেলে পদ্মিনীর দল ঝাঁপ দিয়েছিলেন। এই সুড়ঙ্গতে তার পর বহুদিন

পর্য্যন্ত নাকি বিষাক্ত গ্যাস জমেছিল, যে ওর ভেতর ঢোকবার চেষ্টা করেছে সেই মরেছে। অবশেষে ঝালোরের শনিগুরু সর্দ্দার মালদেব ওর ভেতর ঢুকে দেখেছিলেন এক বিরাটকায় অজগর সর্প সেই সুড়ঙ্গ পাহারা দিচ্ছে এবং অলৌকিক এক নীল আলো সেখানে এখনও জ্বলছে। কিন্তু ডাঃ ওঝা তাঁর বই-এ প্রমাণ করেছেন যে জহর-ব্রতটা মোটে ওখানে হয়ই নি—কুম্ভের বিখ্যাত বিজয়স্তম্ভের পাশে যে শ্মশানভূমি আছে, সেইখানে হ'য়েছিল। সে যাই-হোক, কিন্তু সেদিনও দু-চার জন যাঁরা ঐ সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করেছেন তাঁরা কেউই ফিরে আসেন নি, সেই জন্ত সরকার বাহাদুর ওর মুখ একেবারে বন্ধ ক'রে দিয়েছেন।·· তবে কেউ-কেউ অনুমান করেন যে চিতোরগড় থেকে আবু-পর্ব্বত পর্য্যন্ত যে সুড়ঙ্গ মহারাণাদের আমলে বর্ত্তমান ছিল ঐটেই সেই সুড়ঙ্গ।



আজমীরের দৃশ্য

মহারাণা কুম্ভের মহল পেরিয়ে আমরা বিখ্যাত জৈন-মন্দিরের কাছে এসে পড়লুম। মেবারে এক সময় জৈনদের প্রতিপত্তি খুব বেড়েছিল তার সাক্ষ্য নিয়ে আবু পর্ব্বতের দিলওয়ারা আজও দাঁড়িয়ে আছে। মহারাণার মন্ত্রীবংশ ও জৈন—তাঁদেরই প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির। মহারাণা প্রতাপের সেই বিখ্যাত মন্ত্রী ভামশা—যিনি এককালে প্রচুর অর্থ দিয়ে প্রভুবংশের মান রক্ষা করেছিলেন তিনিও জৈন ছিলেন। মন্দিরের কারুকার্য্য সত্যই অপূর্ব্ব! ছোট-মন্দির, কিন্তু কারুকার্য্যে দিলওয়ারার কাছাকাছি যায়।

ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা মহারাণাদের অস্ত্রাগারে গেলুম। সৈন্ত-ব্যারাকের চিহ্ন প্রায় বিলুপ্ত হ'য়ে এসেছে, কিন্তু অস্ত্রাগারটা এখনও আছে। এইবার সেই বিখ্যাত জয়স্তম্ভটার কাছে আমরা এসে পড়লুম। মহারাণা কুম্ভের অপূর্ব্ব বীরত্বের এবং তৎকালীন রাজপুত স্থাপত্যের চিহ্ন-স্বরূপ এই স্তম্ভটী আজও সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। স্তম্ভটী বিরাট এবং নির্ম্মাণ-কৌশল অননুকরণীয়। টড্ সাহেব এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতার যা বিবরণ দিয়েছেন ডাঃ ওঝা মেপে দেখিয়ে দিয়েছেন তা ভুল। যাক্ গে—ও দু' ফুট উঁচু নীচু নিয়ে আমাদের কিছু এসে যায় না, আমাদের বিস্মিত হবার কারণও তাতে চ'লে যায় না। এই জয়স্তম্ভটী বহুদূর থেকে দেখা যায়। এত বড় 'টাওয়ার', কিন্তু নির্ম্মাণকৌশলে দূর থেকে একে একটী সুদৃশ্য থামের মতই দেখায়।

এই জয়স্তম্ভের কাছেই চিতোরগড়ের শ্মশান ছিল এবং ডাঃ ওঝার মতে এইখানেই জহরব্রত পালন করা হ'য়েছিল। ···কোন-কোন ঐতিহাসিক আবার পদ্মিনীর জহরব্রতকে একেবারে কল্পনা ব'লেই উড়িয়ে দিতে চাইছেন—

এইখানে অর্থাৎ জয়স্তম্ভ থেকে একটু দূরে একটী ছোট্ট পার্ব্বত্য ঝরণা আছে। ঝরণার জল সামান্য, টিউবওয়েলের দেড় ইঞ্চি পাইপ থেকে যতটা জল একবারে পড়ে ততটা। এর জল খুব মিষ্টি এবং এখানকার লোকরা বলে খুব হজমীও। এর একটা বিশেষত্ব এই যে এর জল যেখান দিয়ে পড়ছে, পড়ছে একেবারে একটী শিবলিঙ্গের ওপর। এই শিবলিঙ্গ নাকি মহারাণী পদ্মিনী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তিনি প্রত্যহ এখানে এসে ঝরণার জলে স্নান করতেন এবং শিবপূজা করতেন (সেই জন্তই বোধ হয় মহাদেব তাঁকে শিবপূজার ফল হাতে-হাতে দিয়েছিলেন!)।

যে সিঁড়ি বেয়ে পদ্মিনী নামতেন, সেই সিঁড়ি-বেয়েই আমরা নেমে গেলুম এবং ঝরণার জল পান ক'রে মুখ-হাত ধুয়ে গামছা ভিজিয়ে নিয়ে ওপরে উঠে এলুম। এক রাজপুতানী এসেছিল জল নিতে, সে যাত্রী দেখেই বাবার প্রণামী দাবী করলে এবং বলা বাহুল্য আমরা পয়সা দেওয়া-মাত্র আঁচলে পুরলে।

এই প্রসঙ্গে একটা মজার ব্যাপার উল্লেখ করি। আমাদের সঙ্গেই একদল মাড়োয়ারীও চিতোরগড় দেখতে গিয়েছিলেন। আমাদের সঙ্গেই বলবার অর্থ এই যে তাঁরাও আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে ওখানে পৌছান। যাই

হোক্—গাইড্ একটা তাঁদেরও ধরেছিল এবং যথারীতি ঐতিহাসিক মহিমা সব বোঝাবার চেষ্টা করছিল। কিছুক্ষণ বিমূঢ়ভাবে তার সঙ্গে ঘুরে শেষকালে ঈষৎ বিরক্তভাবেই তাঁরা বললেন, খামকা সময় নষ্ট করছ কেন বাবু? কোথায় মন্দির-টন্দির আছে সেইখানে নিয়ে চল। কালীমায়ী কি মন্দির!

ব্যাপারগতিক দেখে তাঁদের গাইড্ তাড়াতাড়ি চিতোরেশ্বরীর মন্দিরে নিয়ে গেল। আমাদের গাইড্ একটু হেসে বললে—বাবু, এসব জিনিষের মহিমা কি সবাই বোঝে? সাহেবদের মধ্যে আমেরিকান, আর ভারতবাসীর মধ্যে বাঙ্গালী—এরাই ঐতিহাসিক জিনিষের মর্য্যাদা বোঝে এবং দেখবার জন্য পয়সা খরচ করে; আর কেউ না। বাঙ্গালীরা আছে, তাই আমাদের অন্ন হ'চ্ছে!

কথাটা শুনে আমার বহুদিনের একটা কথা মনে প'ড়ে গেল। তখন আমি ছেলেমানুষ—একলা আগ্রায় বেড়াতে গেছি। পাথরওয়ালা হোটেলে এসে হাজির হোল নানাবিধ পাথরের জিনিষপত্র নিয়ে। তার মধ্যে একজোড়া পাথরের বড় হাতী আমার পছন্দ হ'য়েছিল, সেইটেরই দাম জিজ্ঞাসা করলুম; বললে—আড়াই টাকা। আমি যখন বার আনা জোড়া দিতে চাইলুম তখন সে মাথায় হাত ঠেকিয়ে বললে, বাবু এটা আষাঢ়মাস তাই আড়াই টাকা চাইলুম, পুজো কি বড়দিনের সময় হ'লে দশ টাকা বলতুম।

কৌতূহল হোল, বললুম—কেন বাপু? সে বললে—ঐ সময়ই যে বাঙ্গালীবাবুরা বেড়াতে আসে। বাঙ্গালীবাবু ছাড়া এত দাম দিয়ে এ-সব জিনিষ কে কিনবে বাবু? আমাদের অন্ন ত আপনাদেরই ঘরে!

যাই হোক্ শেষ পর্য্যন্ত সে বোধ হয় এক টাকাতে হাতী দুটো দিয়ে গিয়েছিল।

চিতোরেশ্বরীর মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে থমকে দাঁড়ালুম। নীচে বলি হয়েছে, তারপর বোধ হয় তারই ছিন্নমুণ্ড নিয়ে কেউ মন্দিরে উঠেছে, সিঁড়ির ধাপে-ধাপে রক্ত পড়তে-পড়তে গেছে এবং সেই রক্ত তখনও কালো হ'য়ে শুকিয়ে রয়েছে। মনে পড়ল সেই রাক্ষসীর অদ্ভুত শোণিত তৃষার কথা, মৈ ভুখা হুঁ!



উদয়পুর প্রাসাদ

শত্রু দ্বারে উপস্থিত, প্রত্যহ শত শত রাজপুতবীরের রক্তে চিতোরগড়ের মাটী লাল হ'য়ে উঠ্ছে, জননীর সন্তান, প্রেয়সীর স্বামী, ভগ্নীর ভাই এবং কন্যার পিতা—কত দুর্দ্ধর্ষ বীর নিত্য তা'র আত্মীয়াদের বুকে হাহাকার এবং চোখে জল সম্বলমাত্র রেখে নিজেদের শোণিত ঢেলে দিচ্ছে জননী জন্মভূমির জন্য—তবুও 'ভুখা' তুমি এখনও?

এই প্রশ্নই মহারাণা লক্ষ্মণ সিংহ ক'রেছিলেন এবং তার জবাব পেয়েছিলেন, রাজরক্ত চাই, ও সব শোণিতে আমার তৃষ্ণা মিটবে না।

রাজরক্ত দেওয়া হোল; রাজা এবং তাঁর একাদশ পুত্র নিজেদের বক্ষ শোণিত ঢেলে দিলে; চিতোরেশ্বরীর পিপাসা বোধ হয় তবুও মিটল না; চিতোর যবনদের করতলগত হোল!

কে জানে সেদিন কিসের ক্ষুধা জানিয়েছিলেন চেতোরের জননী, সে ক্ষুধা তাঁর কি ক'রে মিটবে। কিন্তু আজও বোধ হয় সেই তৃষ্ণা মিটাবার জন্যই প্রত্যহ তাঁর সাম্নে বলি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু চিতোরের মহারাণার অপরাধ কি রাজরক্তে, কি পশুর রক্তে কিছুতেই ধুয়ে গেল না; চিতোরের রক্তপতাকা বার বার বিধর্ম্মী ও বিজাতীয়দের কাছে মাথা নত করলে, আজও ক'রে র'য়েছে!

চিতোরের মহারাণারা বাপ্পারাওদের সময় থেকেই প্রধানতঃ শৈব। তাঁরা মহারাজা নন্—ভগবান্ 'একলিঙ্গ



জগমন্দির (কাছের ছবি)

কি দেওয়ান' মাত্র। কি ক'রে যে তাঁরা শাক্ত হ'য়ে উঠ্লেন ভগবান জানেন—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কালীই হ'লেন চিতোরেশ্বরী। সেই চিতোরেশ্বরীর শোণিত-চিহ্নিত রক্তপ্রস্তরের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে-উঠতে বার-বার এই কথাই মনে হোল যে কিজন্য আজও চিতোরেশ্বরী ব'লে এঁর পূজো দেওয়া, কেনই বা কতকগুলো অসহায় পশুর রক্ত এঁর জন্য আজও ঢালা হ'চ্ছে? পাঠান এসেছে, মোগল এসেছে, ইংরেজ এসেছে—তাদের হাত থেকেই ইনি চিতোরকে রক্ষা করতে পারেন নি, তবে ইনি কিসের অধিশ্বরী?

চিতোরেশ্বরী দর্শন ক'রে আমরা পদ্মিনী সরোবর ও পদ্মিনীমহাল দেখলুম। পদ্মিনীমহালটী এখনও ভাল অবস্থায় আছে এবং এরই বহির্ব্বাটীতে লাট সাহেবরা বেড়াতে এলে মহারাণা ভোজের আয়োজন ক'রে থাকেন।

চিতোরেশ্বরীর মন্দির ছাড়া গড়ের মধ্যে আর একটী উল্লেখযোগ্য মন্দির আছে সেটী হ'চ্ছে ভক্তিমতী মীরাবাই-এর গিরিধারী গোপালের মন্দির। এই গোপালের জন্যই একদিন মীরা তাঁর সব সুখ ছেড়েছিলেন, এই গোপালই তাঁর জনম-মরণের সাথী, এঁরই উদ্দেশ্যে তাঁর ব্যাকুল কণ্ঠে বার-বার সেই প্রার্থনা জেগেছিল,

"মীরা দাসী জনম-জনমকী অঙ্গকো অঙ্গ
লাগাও, প্রভুজী, চিত্তসু চিত্ত লাগাও—"

কয়েকটী সিঁড়ি ভেঙ্গে তবে মন্দিরে উঠতে হয়। চিতোর-গড়ের সব মন্দিরই প্রায় এই রকম। নলহাটীর পীঠস্থান তারাদেবীর মন্দির যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। মন্দির প্রাঙ্গণে একটী তুলসীমঞ্চ—তার মধ্যে ছোট একটী তুলসীগাছ। এই তুলসীবিরল দেশে তুলসী গাছটী দেখে বড় আনন্দ হোল; কে জানে কেন, বোধ হয় বাংলা দেশের কথা মনে পড়ল। নাটমন্দিরের পাথর বাঁধানো চত্বরটীও বড় ঠাণ্ডা, প্রেমময়ের স্নিগ্ধ অন্তরের আভাষ যেন সেই শীতল নাটমন্দিরের বাতাসে লেগে রয়েছে ব'লে মনে হয়। আমরা একটুখানি সেইখানেই স্থির হ'য়ে বসলুম। তারপর প্রদক্ষিণ ক'রে নেমে এলুম আবার চিতোরগড়ের কঠিন কঙ্করময় পথে—

চিতোরগড় দুর্গের মধ্যেই চাষ-বাস করার যথেষ্ট জমি জায়গা রয়েছে দেখলুম এবং সেখানে চাষ-বাস হচ্ছেও। শত্রুপক্ষ এসে দুর্গ অবরোধ করলে অন্ততঃ কিছুদিনের খাদ্য দুর্গের মধ্যেই জন্মাবে, বোধ হয় এই ছিল স্বর্গীয় মহারাণাদের কল্পনা। এখন ঐখানকার লোকজন, তারাই সেই চাষের ফসল উপভোগ করে।

আমরা আরও কিছুক্ষণ ঘুরে এটা-ওটা দেখলুম তারপর গাইডকে বিদায় দিয়ে আবার টাঙ্গায় চড়লুম।

এবার অবতরণের পালা। আবার সেই টাঙ্গাওয়ালার পাশে ব'সে 'রসুন সৌরভের' ঘ্রাণ নেওয়া এবং চারিদিকের সেই অগ্নিবৃষ্টি! নামতে নামতে আমরা বার বার ফিরে চাইতে লাগলুম বাপ্পা-হামির-কুম্ভ-সংগ্রামের চিতোরগড়ের দিকে, মন যেন অকারণে ভারী হ'য়ে উঠল, চোখে যেন বাষ্পেরও আভাষ দেখা দিলে। কত মহাবীরের বুকের রক্ত ঐ রক্তপ্রস্তরগঠিত দুর্গের মাটীতে মিশে রয়েছে, তা মনে করলেও গা শিউরে ওঠে; কিন্তু হায়, বৃথা, সব বৃথা!

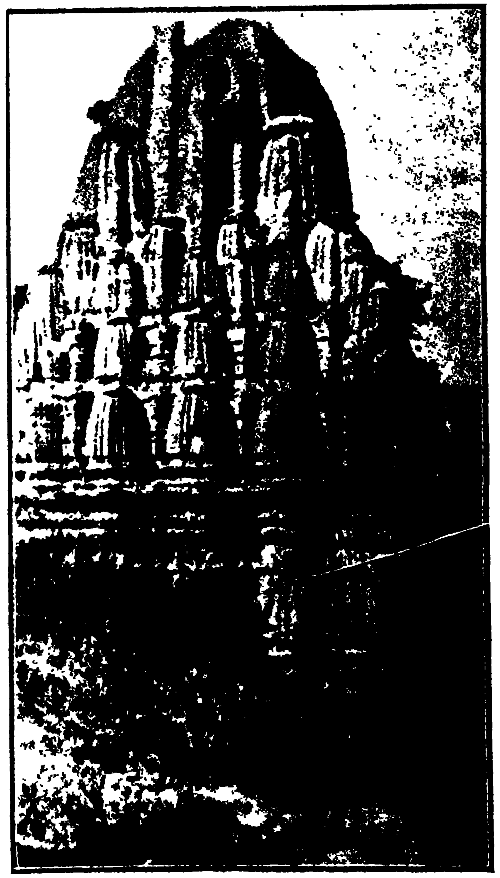
এইখানে এলেই মনে হয়—দৈব বুঝি পুরুষকারের চেয়ে অনেকখানিই বড়, নিয়তি বোধ হয় সত্যই দুর্ল্লঙ্ঘ্য, নইলে এমন কি ক'রে সম্ভব হয়? চেষ্টারও ত্রুটী কিছুই ছিল না, স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগেরও ত কোনও অভাব ছিল না, তবে?

ধর্ম্মশালার জঘন্য ঘরে ফিরে এসে আমরা স্নানাহারের যোগাড় দেখলুম। মা ও বৌদি কিছুই খেলেন না প্রায়, আমি ও খোকা পুরী ও দই এনে খাওয়া সারলুম। পুরী আর জিলাপী, এ-ছাড়া বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। তবে আহার্য্য যে এখানে সুলভ তা মানতে হোল। আহার করতে-করতেই সন্ধ্যে হ'য়ে এল, আমাদের ট্রেণ কিন্তু রাত্রি প্রায় দশটায়। বিশ্রাম আমরা নটা পর্য্যন্তই করতে পারতুম। কিন্তু বহু যাত্রী স্থানাভাবে তখনও বাইরে ব'সেছিল তাদের লোলুপ-দৃষ্টি প্রতিনিয়ত যেন আমাদের বিঁধছিল। বেশীক্ষণ তাদের বঞ্চিত না করে ঘণ্টাখানেক পরেই আমরা বেরিয়ে পড়লুম ষ্টেশনের দিকে। সত্যি কথা বল্‌তে কি ধর্ম্মশালার ঘরের চেয়ে খোলা প্লাটফর্ম্মে বিশ্রাম করাই আমার কাছে শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে হোল। আর যাত্রীদেরও তাগাদা যে কি ভীষণ ছিল তা এইতেই বোঝা যাবে যে তাঁরা আমাদের যাত্রার ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র একদল জিনিষ-পত্র নিয়ে হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়লেন, আমাদের বেরিয়ে যাওয়া বা ঘর পরিষ্কার করার বিলম্বও তাঁদের সইল না।

ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্ম তখন অন্ধকার; ট্রেণের সময় ব্যতীত তৈলের অপব্যয় বোধ হয় রেল কোম্পানীর (?) আইনে নেই। আমরা সেই অন্ধকারেই জিনিষপত্র রেখে একটা শতরঞ্চী বিছিয়ে মেয়েদের বসার জায়গা ক'রে দিলুম; আমার ঠিক বসার ইচ্ছা ছিল না, আমি সেই অন্ধকার প্লাটফর্ম্মের উপরেই যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে পায়চারী করতে লাগলুম।

দুই-একটী যাত্রী তখন থেকেই এসে জুটতে লাগল। তারা নিঃশব্দে চলা-ফেরা করছিল, প্রেতাত্মার মতই; আলো নেই, বাতাস নেই, কোলাহল নেই; সমস্তটা জড়িয়ে যেন একটা থমথমে ভাব। অফিসঘরের ক্ষীণ আলো একটা জানালা দিয়ে এসে ওভারব্রীজের সিঁড়ির গায়ে প'ড়েছিল, আর ওপরে আকাশে নক্ষত্রের মৃদু আলোক, সেই গাঢ়ীর তমিস্রার মধ্যে এইটুকু শুধু ফাঁক ছিল।

আমরা চুপচাপ ব'সে অপেক্ষা করতে লাগলুম ট্রেণের। আমাদের উত্তরে-দক্ষিণে-পূবে-পশ্চিমে শুধু জমাট অন্ধকার এবং অনেকটা দূরে আরও জমাট খানিকটা অন্ধকারের মত দাঁড়িয়ে চিতোরগড়ের পাহাড়। নিঃশব্দে ঘরে যাওয়া অনেক বাসনা বুকে পুঞ্জীভূত ক'রে দাঁড়িয়ে আছে ঐ পাহাড়, ওকে অন্ধকারেই বোধহয় মানায় ভাল। আর ঐ কুম্ভের বিজয়স্তম্ভ? দিবালোকে ও যেন বিজয়লক্ষ্মীকে উপহাস ক'রতে থাকে;



সখিদেশ্বর মন্দির—চিতোরগড়

ভালই হ'য়েছে, এখন ও মুখ লুকোবার মত অন্ধকার পেয়েছে—

মধ্যে-মধ্যে প্ল্যাটফর্ম্মের ডালপালা কাঁপিয়ে একটা ক'রে দম্‌কা গরম হাওয়া ভেসে আস্‌ছিল; দূরের ঐ চিতোর-গড়ের দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হ'তে লাগল স্বর্গীয় মহারাণাদের অতৃপ্ত আত্মারা লজ্জার উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছেন—

বাঙ্গালা মাসের দিন-সংখ্যা নির্দ্দিষ্টীকরণ

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র লাহিড়ী এম-এ

কাল-বিভাগ নির্দ্দেশ করিবার জন্যই বৎসর মাস ইত্যাদির প্রয়োজন। অতি প্রাচীনকাল হইতেই সকল সভ্যদেশে বর্ষমাসাদির ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। সূর্য্য একবার আবর্ত্তনকালে বিষুববৃত্তের উত্তরে ও দক্ষিণে অবস্থিতি দ্বারা ঋতুভেদ ঘটাইয়া থাকে, সেইজন্য উক্ত আবর্ত্তনকালকে বর্ষ বা বৎসর আখ্যা দেওয়া হইয়া আসিতেছে। পূর্ণিমা হইতে অপর পূর্ণিমা পর্য্যন্ত বা অমাবস্যা হইতে পরবর্ত্তী অমাবস্যা পর্য্যন্ত সময় এক চান্দ্রমাস। ১২ চান্দ্রমাসের কিছু অধিককালে এক বৎসর পূর্ণ হয়। পুরাকালে চান্দ্রমাসেরই প্রচলন ছিল এবং অদ্যাপি ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে এবং মুসলমান সমাজে চান্দ্র হিসাবেই মাস গণনা করা হইয়া থাকে। পরবর্ত্তীকালে ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারে উক্ত বার ভাগেই বৎসরকে বিভক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে।

বর্ষমাসাদি গণনা-প্রথা প্রবর্ত্তনের এক প্রধান উদ্দেশ্য বিষয় কর্ম্মের সুবিধা। যে কোনও কাল্পনিক বৎসর ও মাস হইলেই এই উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে : যেমন ৩০ দিনে মাস ও ৩৬০ দিনে বৎসর গণনার ব্যবস্থা করিলে প্রকৃতপক্ষে লোক-ব্যবহারের বিশেষ কোন অসুবিধাই হইবে না। অধিকন্তু যদি গ্রীষ্মবর্ষাদি ঋতুকাল উক্তপ্রকার বৎসরের বিভিন্ন অংশ দ্বারা নির্দ্দেশিত হয়, তবে সকলের পক্ষে সেই প্রকার বৎসরই অধিকতর সুবিধাজনক। এই প্রকার ঋতুর সম্বন্ধবিশিষ্ট বৎসরকে সায়ন বৎসর (Tropical year) বলে। এই সায়ন বৎসরের মানকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া ইংরাজী বৎসরের দিনসংখ্যা স্থিরীকৃত। সেইজন্য ইংরাজী বৎসরের এক বিশেষ সুবিধা এই যে, চিরকালই ডিসেম্বর মাসে শীতকাল ও জুন মাসে গ্রীষ্মকাল হইয়া থাকে। ইংরাজী বৎসরের বর্ষমান সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত হইলেও ইহার মাসমান নিরূপণে কিন্তু কোনও প্রকার বৈজ্ঞানিক তথ্যের সহায়তা লওয়া হয় নাই, প্রয়োজন ও সুবিধা অনুসারেই মাসের দিন সংখ্যা স্থির করা হইয়াছে।

আমাদের ভারতবর্ষে যে সকল বৎসরের ব্যবহার প্রচলিত, তাহা উক্ত প্রকার ঋতুর সম্বন্ধে বিশিষ্ট সায়ন বৎসর নহে, সেগুলি বস্তুতঃ নিরয়ণ বৎসর (Sidereal year)। সূর্য্য আকাশস্থ কোনও স্থির তারকা হইতে যাত্রা করিয়া যতকাল পরে পুনরায় সেই তারকাতে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাই এক নিরয়ণ বৎসর। নিরয়ণ বর্ষমান সায়ন বর্ষের মান অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক, প্রায় ৭১ বৎসরে দুই গণনায় একদিন পার্থক্য দাঁড়াইয়া যায়। নিরয়ণ বর্ষের সহিত ঋতুসমূহের চিরস্থায়ী কোনও সম্বন্ধ নাই। সম্প্রতি পৌষ মাঘ মাস যেমন শীতকাল, ৬ হাজার বৎসর পরে উক্ত শীতকাল আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে সংঘটিত হইবে এবং আরও ৬ হাজার বৎসর পরে উহা আষাঢ় শ্রাবণ মাসে আসিয়া পড়িবে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে নিরয়ণ বৎসরের পরিবর্ত্তে সায়ন বৎসর গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র নিরয়ণ গণনার উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং বহুকাল ধরিয়া ভারতে নিরয়ণ মতেই বৎসর গণনা করা হইয়া আসিতেছে। এই সকল কারণে বর্ত্তমানে এদেশে সায়ন গণনা প্রচলন-চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবার সম্ভাবনা অতি সামান্য। সে যাহা হউক, ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই এই নিরয়ণ বর্ষকে বিভিন্ন প্রকারে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতিভাগকে মাস বলা হয়। উত্তর ভারতে চান্দ্রমাস প্রচলিত। তথায় তিথিসংখ্যা অনুসারে তারিখ হয় এবং বিষয়কর্ম্মে ও চিঠিপত্রাদিতেও সেই প্রকার তারিখই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বাঙ্গালা দেশে উক্ত প্রকার চান্দ্রমাস ব্যবহৃত না হইয়া সৌর মাসের ব্যবহার হয়। সূর্য্যের এক এক রাশিভোগকাল এক এক সৌরমাস। সূর্য্য মেষ রাশিতে প্রবেশ করিলে সৌর বৈশাখের আরম্ভ, বৃষ রাশিতে প্রবেশ করিলে বৈশাখ শেষ হইয়া জ্যৈষ্ঠ আরম্ভ হয় ; এই প্রকারে সকল মাসই হইয়া থাকে। এই সকল মাসকে সৌর মাস বলে। সূর্য্য সর্ব্বদা সমগতিতে ভ্রমণ করে না, তজ্জন্য প্রতি মাসের মান সমান নহে। তাহা ব্যতীত দ্বাদশ মাসের মধ্যে কোনও মাসই পূর্ণদিনসংখ্যক নহে, প্রতি মাসই ভগ্নদিবস-সম্বলিত। এই সকল কারণে সংক্রান্তিকাল অর্থাৎ সূর্য্যের রাশি প্রবেশকাল দিবস মধ্যে যে কোন সময়েই হইতে পারে। প্রকৃত সৌরমাস দিবস মধ্যে যে কোনও সময়ে আরম্ভ হইয়া আবার যে কোনও সময়েই শেষ হইতে পারে। সেইজন্য এই সৌরমাসের জ্যোতিষিক প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট থাকিলেও ইহার ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা অধিক নহে। বিষয়কর্ম্মে এই প্রকার ভগ্নদিবস-সম্বলিত মাসের ব্যবহার চলে না, তথায় পূর্ণদিনসংখ্যক মাস আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে যেদিনে রবির রাশি সংক্রমণ ঘটে, সাধারণতঃ সেই দিনকে মাসান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়া তৎপরদিবস হইতে পরবর্ত্তী মাসের আরম্ভ গণনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এত সরল নিয়মে মাসান্ত গণনা করা হয় না ; বাঙ্গালা দেশে সংক্রান্তিকাল অনুসারে মাসের অন্তদিন নির্ণয়ের এক বিশেষ নিয়ম আছে, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

দিবামানের সহিত রাত্রিমানের অর্দ্ধ যোগ করিলে অর্দ্ধরাত্রিকাল পাওয়া যায়। এই অর্দ্ধরাত্রির পূর্ব্বে ১ দণ্ড ও পরে ১ দণ্ড লইয়া যে সময় তাহাকে দ্বিদণ্ডাত্মক অর্দ্ধরাত্রি বলে। এই দ্বিদণ্ডাত্মক অর্দ্ধরাত্রির পূর্ব্বে যদি রবিসংক্রমণ হয়, তবে সেইদিনই মাসের শেষদিন এবং তৎপরদিবস হইতে পরমাস আরম্ভ। এই দ্বিদণ্ডাত্মক অর্দ্ধরাত্রির পরে যদি রবিসংক্রমণ হয়, তবে সেদিনে মাসান্ত না হইয়া তৎপরদিবস মাসান্ত হইয়া থাকে। ইহাকে কূট সংক্রান্তি বলে। কিন্তু যদি ঐ দ্বিদণ্ডাত্মক অর্দ্ধরাত্রিকালের মধ্যে রবির সংক্রমণ ঘটে, তখন দেখিতে হইবে যে,

সেইদিন সূর্য্যোদয়কালে যে তিথি ছিল রবিসংক্রমণের পূর্ব্বে সেই তিথির অন্ত হইয়াছে কিনা। যদি সংক্রমণকাল পর্য্যন্তও সেই তিথিই থাকে, তবে সেই দিবসই মাসান্ত, আর যদি সংক্রমণের পূর্ব্বে তিথ্যন্ত হয়, তবে পরদিবস মাসান্ত। কিন্তু আষাঢ় ও পৌষের শেষ সংক্রান্তিতে বিশেষত্ব আছে, সে ক্ষেত্রে তিথি-ভেদ হইল কিনা তাহা দেখিতে হয় না। উক্ত প্রকার দ্বিদণ্ডাত্মক অর্দ্ধরাত্রিকালে যদি আষাঢ় মাসের শেষ সংক্রান্তি ঘটে, তবে সেইদিনই মাসান্ত এবং পৌষ মাসের শেষ সংক্রান্তি উক্ত কালের মধ্যে ঘটিলে সেক্ষেত্রে পরদিবস মাসান্ত হইয়া থাকে।

এই নিয়মানুসারে বঙ্গদেশে ও তৎসন্নিহিত কয়েক স্থানে মাসান্ত নিরূপিত হইয়া থাকে। সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে বা জ্যোতিষ গ্রন্থে এই নিয়মের সমর্থনে কোনও বিধান নাই। তাহার কারণ আমাদের মধ্যে প্রচলিত যে মাস, তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যবহারিক মাস. জ্যোতিষ শাস্ত্রে এই প্রকার ব্যবহারিক মাসের পরিবর্ত্তে প্রকৃত সৌরমাসের প্রয়োজন। পূর্ণদিন সংখ্যার অনুরোধেই এই প্রকারে সৌরমাস হইতে ব্যবহারিক মাসের অন্ত্যদিন নির্ণয়ের নিয়ম অনুসৃত হইতেছে। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু সংক্রান্তি দিনে পুণ্যকাল নির্ণয়ের জন্যই উক্ত নিয়ম। সংক্রান্তির পুণ্যকালে স্নান-দানের ব্যবস্থা আছে, যাহাতে সেই পুণ্যকাল সর্ব্বদাই মাসের শেষ দিনে ঘটে, তাহার জন্য মাসান্ত নির্ণয়ের উক্ত প্রকার নিয়ম করা হইয়াছে। উড়িষ্যাতেও (এবং দাক্ষিণাত্যে অনেক স্থানে) প্রায় অনুরূপ নিয়মে মাস গণনা করা হয়, তবে আমাদের যেদিন মাসান্ত উড়িষ্যায় সেইদিন হইতে মাসের আরম্ভ, এইমাত্র প্রভেদ।

আমাদের এই মাসান্তের সহিত ধর্ম্মকৃত্যের বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নাই। সংক্রান্তির পুণ্যকালে যে স্নানদানের ব্যবস্থা আছে, তাহা যে মাসান্তেই করিতে হইবে তাহার কোনও নির্দ্দেশ নাই। পুণ্যকাল যেদিনে ঘটিল তাহাকে মাসান্ত না বলিয়া যদি মাসান্তের পূর্ব্বদিবস বলি অথবা পরমাসের প্রথম দিবস বলি, তাহা হইলেও কোন দোষের হয় না বা স্নানদানাদি কার্য্য অশাস্ত্রীয় হয় না। ভারতের যে সব স্থানে সংক্রমণ দিবসে মাসারম্ভ গণনার নিয়ম, সে সব স্থানে তাহাদের মাস-গণনা ধর্ম্মকার্য্যের ব্যাঘাতজনক নহে। বাস্তবপক্ষে উক্তপ্রকার মাসান্ত গণনার নিয়ম পূর্ব্বতন পঞ্জিকাকারগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়াই আমাদের ব্যবহারিক মাসে উহার প্রয়োগ চলিতেছে। উহা অপেক্ষা কোনও উন্নততর নিয়ম মানিয়া লইয়া তদনুসারে মাস গণনা করিলে তাহা দোষণীয় হইবে না, বিশেষতঃ তাহাতে ধর্ম্মহানির কোনও আশঙ্কা থাকিবে না। ধর্ম্মের ব্যবস্থাসকল সৌর মাসের ও চান্দ্র মাসের সমবায়ে হইতে থাকুক, তাহাতে কাহারও কোন কথা বলিবার নাই; কিন্তু ব্যবহারিক মাস যাহাতে সরল ও উন্নততর উপায়ে গণিত হয় ও সেই গণনা প্রণালী যাহাতে সর্ব্ব-সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য হয়, তাহার ব্যবস্থা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

আমাদের মাসান্ত গণনার নিয়মটি এতাধিক জটিল যে, সুদক্ষ জ্যোতির্ব্বিদ ব্যতীত অপর কাহারও পক্ষে পূর্ব্ব হইতে মাসান্ত বা মাসের দিন সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। এই উদ্দেশ্যে সকলকেই পঞ্জিকাকারগণের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। বিভিন্ন পঞ্জিকার তিথি ও সূর্য্যোদয়াদি বিভিন্ন গ্রন্থানুসারে গণিত, হয়ত বহু-প্রচার বিশিষ্ট এক পঞ্জিকার গণনা অপর পঞ্জিকা অপেক্ষা অধিকতর সূক্ষ্ম। এরূপ ক্ষেত্রে কখন ইহাও ঘটিতে পারে যে, দুই পঞ্জিকার গণনায় মাসের দিন সংখ্যা দুই রকম হইল। সে ক্ষেত্রে জনসাধারণ কোন্ মত অনুসরণ করিবে, ইহা বিষম সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে। এইজন্যও মাস গণনার এই প্রকার নিয়ম স্থির করিয়া দেওয়া উচিত যাহাতে কোনদিন কোনও প্রকার মতদ্বৈধ উপস্থিত হইতে না পারে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালা ভাষার সমাদরবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা মাস তারিখেরও ব্যবহার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইতেছে, সুতরাং সুবিধাজনক কোনও উপায়ে বাঙ্গালা মাসের দিন সংখ্যা নির্ণয়ের ব্যবস্থা করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট সময়। এক্ষণে দেখা যাউক, বর্ত্তমান সংক্রান্তির সহিত যতদূর সম্ভব সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কি উপায়ে মাসান্ত নির্ণয়ের প্রচলিত প্রথার সংস্কার করা যাইতে পারে।

বাঙ্গালা মাসের সংস্কার করিতে গেলে প্রথমেই মাসের অস্থির দিন-সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। আমাদের মাসের দিন-সংখ্যার কোনও স্থিরতা নাই ; জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় প্রভৃতি মাস কোনও বৎসর ৩১ দিন সংখ্যক, আবার কোনও বৎসর উহা ৩২ দিন সংখ্যক। এই প্রকার সকল মাসেরই দিন সংখ্যা অনির্দ্দিষ্ট। স্থির দিনসংখ্যাসম্পন্ন মাসেরই ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইংরাজী মাসের দিন-সংখ্যার স্থিরতা ও মাসারম্ভ দিবস নির্ণয়ের সারল্যই উহার সার্ব্বজনীনতার অন্যতম কারণ। আমাদের মাস গণনা পদ্ধতির সংস্কার করিতে হইলে স্থির-দিন-সংখ্যক মাসের প্রবর্ত্তন করিতে হইবে এবং উহা করিতে গেলে তৎসহ অতিবর্ষ (leap year) গণনারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেননা ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টারও কিছু অধিককালে বৎসর পূর্ণ হয়, সুতরাং ৩ বৎসর ৩৬৫ দিন করিয়া হইলে চতুর্থ বৎসর ৩৬৬ দিন সংখ্যক গ্রহণ করিতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে বৎসরের শেষ মাসের দিন সংখ্যা একদিন বর্দ্ধিত করিয়া ৩৬৬ দিন পূর্ণ করা যাইতে পারে।

এক্ষণে দেখা যাউক বর্ত্তমানে যে ভাবে মাসান্ত দিবস নিরূপিত হয়, তাহার সহিত যতদূর সম্ভব ঐক্য রাখিয়া মাসের দিন-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিতে হইলে কোন্ মাস কতদিন-সংখ্যক বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। ইহার জন্য কোন্ মাস কতদিনে ও কত দণ্ড পলে পূর্ণ হয়, তাহা বিশুদ্ধ ও সূক্ষ্মরূপে জানা আবশ্যক। বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে সাধারণ চলিত পঞ্জিকা সকল যে আদ্যোপান্ত ভ্রমপূর্ণ তাহা এক প্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত। সেইজন্য নিম্নোক্ত মাসমানসকল উক্ত পঞ্জিকা হইতে গ্রহণ না করিয়া পাশ্চাত্য জ্যোতিঃশাস্ত্র হইতে সূক্ষ্মরূপে গণিত হইল। গৃহীত আদিবিন্দু চিত্রাতারকার ষড়ভান্তরস্থ বিন্দু। নিম্ন তালিকায় মাসের নামের পরেই যে সংখ্যা তাহা বৎসর আরম্ভ হইবার কতদিনাদি (দিন, দণ্ড ও পল) পরে সেই মাসের অন্ত তাহাই। তৎপরবর্ত্তী সংখ্যা দ্বারা উক্ত দিনাদিকে পূর্ণ দিন-সংখ্যায় প্রদর্শিত। পূর্ণ দিন-সংখ্যা নির্ণয়ে গণিতের সাধারণ নিয়ম অনুসারে ৩০ দণ্ডের অধিক স্থলে একদিন অধিক গ্রহণ করা

হইয়াছে। এই প্রকার পূর্ণ দিন-সংখ্যা গ্রহণ করিলে প্রতিমাস কতদিনে হয় তাহাই শেষস্থ সংখ্যা দ্বারা দর্শিত হইল।

মাসান্ত	দিনাদি	পূর্ণ দিন	মাসের দিন-সংখ্যা
বৈশাখ	৩০।৫২।২৭	৩১	৩১
জ্যৈষ্ঠ	৬২।০৯।১৩	৬২	৩১
আষাঢ়	৯৩।৩৬।৩২	৯৪	৩২
শ্রাবণ	১২৪।৫৭।৩১	১২৫	৩১
ভাদ্র	১৫৫।৫৭।১২	১৫৬	৩১
আশ্বিন	১৮৬।২৬।৪৮	১৮৬	৩০
কার্ত্তিক	২১৬।২৬।০১	২১৬	৩০
অগ্রহায়ণ	২৪৬।০২।২২	২৪৬	৩০
পৌষ	২৭৫।২৯।০৪	২৭৫	২৯
মাঘ	৩০৫।০১।৩১	৩০৫	৩০
ফাল্গুন	৩৩৪।৫৩।৫৪	৩৩৫	৩০
চৈত্র	৩৬৫।১৫।২৩	৩৬৫	৩০

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সংক্রান্তি দিবসের সহিত যথাসম্ভব সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে বৈশাখাদি মাসের দিন-সংখ্যা যথাক্রমে ৩১, ৩১, ৩২, ৩১, ৩১, ৩০, ৩০, ৩০, ২৯, ৩০, ৩০ ও ৩০ গ্রহণ করিতে হয়।

প্রকৃত মাসমান হইতে দিন-সংখ্যা স্থির করিলে কিরূপ দাঁড়ায় এক্ষণে দেখা যাউক। পৃথিবীর কক্ষার পরিবর্ত্তন ইত্যাদি কারণে মাসমান নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল; কিন্তু এই পরিবর্ত্তন খুবই সামান্য, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিবর্ত্তন সহস্র বৎসরে কিঞ্চিদধিক সাড়ে তিন দণ্ড মাত্র। বৈশাখাদি মাসের সাম্প্রত মান দিন দণ্ডাদি নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

মাস	মাসমান	মাসের দিন-সংখ্যা	মাস	মাসমান	মাসের দিন-সংখ্যা
বৈশাখ	৩০।৫২।২৭	৩১	কার্ত্তিক	২৯।৫৯।১৩	৩০
জ্যৈষ্ঠ	৩১'১৬।৪৬	৩১	অগ্রহায়ণ	২৯।৩৬।২১	৩০
আষাঢ়	৩১।২৭।১৯	৩১(৩২)	পৌষ	২৯।২৬।৪২	২৯
শ্রাবণ	৩১।২০।৫৯	৩১	মাঘ	২৯।৩২।২৯	৩০
ভাদ্র	৩০।৫৯।৪১	৩১	ফাল্গুন	২৯।৫২।২১	৩০
আশ্বিন	৩০।২৯।৩৬	৩০	চৈত্র	৩০।২১।২৯	৩০

এক্ষেত্রেও পূর্ব্ববৎ মাসের দিন-সংখ্যাগুলি লব্ধ হইল, কেবলমাত্র আষাঢ় মাসে এস্থলে ৩১ দিন পাওয়া যায়। কিন্তু ৩১ দিনে আষাঢ় মাস গ্রহণ করিলে বৎসরে ৩৬৫ দিন পূর্ণ হয় না, সেইজন্য এবং পূর্ব্বলব্ধফলের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য আষাঢ় মাসকে ৩২ দিন-সংখ্যক বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইতেছে।

এখন অতিবর্ষের (leap year) কিরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, এবং সে বৎসরে কোন্ মাসের দিন-সংখ্যা বর্দ্ধিত হইবে তাহাই বিবেচনা করা যাউক। সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে লঘিষ্ঠদিন-সংখ্যক পৌষ মাসকে অথবা আশ্বিন মাসকে সে বৎসরে একদিন বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু নানাদিক বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, সে বৎসরে চৈত্র মাসেই একদিন অধিক গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করা সঙ্গত; কেননা বৎসরের মধ্যস্থ কোনও মাসের দিন-সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া দিলে বার-গণনার নিয়মে ও পঞ্জিকাদি গণনার সারণী (table) রচনায় বিবিধ প্রকার জটিলতা উপস্থিত হয়। ইংরাজী বৎসর যে সময়ে ফেব্রুয়ারী মাসে শেষ হইত, তৎকালে উক্ত শেষ মাসেই একদিন অধিক প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং তদবধি উক্ত নিয়ম চলিয়া আসিতেছে।

আমাদের বাঙ্গালা বৎসরে লিপ্-ইয়ারের ব্যবস্থা করিলে, তাহা এরূপভাবে করিতে হইবে যে বৎসরের প্রথম দিন বর্ত্তমানে যে ভাবে নির্ণীত হইতেছে তাহার সহিত যেন নূতন নিয়মে প্রাপ্ত বর্ষারম্ভদিনের চিরকালই মিল থাকে। আমাদের মাসান্ত গণনার নিয়মের জটিলতার জন্য চিরকাল উক্ত প্রকার ঐক্য থাকা সম্ভবপর নহে, তথাপি যতদূর সম্ভব সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নূতন নিয়ম গঠন করিতে হইবে। বর্ত্তমান নিয়মকে একটু সরল করিয়া এবং তিথিভেদে যে মাসান্ত-ভেদের ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা রহিত করিয়া এই প্রকার নিয়ম রচনা করা যাইতে পারে যে কলিকাতার সময়ে রাত্রি ১২ ঘটিকার (অর্থাৎ মধ্যম সূর্য্যোদয় হইতে ৪৫ দণ্ড) পূর্ব্বে সংক্রমণ ঘটিলে সেই দিনই মাসান্ত এবং উক্তকালের পরে ঘটিলে পরদিবস মাসান্ত। বর্ষারম্ভকালে যাহাতে চিরকাল এই নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে তাহার ব্যবস্থা করিয়া লিপ্-ইয়ার গণনার নিয়ম করিতে হইবে। আমাদের গ্রহীতব্য বিশুদ্ধ নিরয়ণ বর্ষমান ৩৬৫'২৫৬৩৬১ দিন। সাধারণ বর্ষ ৩৬৫ দিনে ধরিলে প্রতি বৎসরে '২৫৬৩৬১ দিন অধিক রহিয়া যায়। এই সংখ্যার আসন্ন ভগ্নাংশমান ১/৪, ১০/৩৯, ১৩১/৫১১ ইত্যাদি। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, স্থূলমানে প্রতি ৪ বৎসরে উক্ত সংখ্যা ১ দিনে পরিণত হয় তদপেক্ষা সূক্ষ্মমতে ৩৯ বৎসরে উক্ত সংখ্যা ১০ দিনে পরিণত হয় এবং আরও অধিক সূক্ষ্ম হিসাব ধরিলে ৫১১ বৎসরে উক্ত সংখ্যায় ১৩১ দিন পাওয়া যায়। গণনার সুবিধার জন্য আমরা ৩৯ বৎসরে ১০ দিন অধিক গ্রহণ করিয়াই লিপ্-ইয়ার গণনার নিয়ম রচনা করিব। অন্যপ্রকারেও এই ৩৯ সংখ্যাটি লাভ করা যাইতে পারে—প্রতি ৪ বৎসরে সাধারণতঃ একদিন অধিক গ্রহণ করিলে প্রতি বৎসরে '০০৬৩৯১ দিন বেশী রহিয়া যায়, এই সংখ্যা ৩৯'৩ বৎসরে ১৫ দণ্ডে অর্থাৎ '২৫ দিনে পরিণত হয়। এই ৩৯'৩ হইতে দশমিকাংশ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ-সংখ্যার অনুরোধে ৩৯ গ্রহণ করা হইল। এই প্রকার ৩৯ বৎসরে ১০ দিন অধিক গ্রহণ করিলে গৃহীত বর্ষমান ৩৬৫'২৫৬৪১০ দিনাদি দাঁড়ায়। ইহার সহিত বাস্তব ফলের পার্থক্য সহস্র বৎসরে কিঞ্চিন্নূ্যন তিন দণ্ড মাত্র। পৃথিবীর কক্ষার পরিবর্ত্তন ইত্যাদি বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, সহস্র বৎসরে উক্ত পার্থক্য মাত্র কিঞ্চিদধিক দুই দণ্ড অর্থাৎ ১ ঘণ্টারও কম। সুতরাং বিনা আপত্তিতেই ৩৯ সংখ্যাটি গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রকৃত সায়ন-বর্ষের সহিত ব্যবহৃত ইংরাজী বৎসরের পার্থক্য সহস্রবর্ষে প্রায় ৭।০ ঘণ্টা, তাহার তুলনায় আমাদের এই পার্থক্য নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

লিপ্-ইয়ার গণনার নিয়ম গঠন করিতে যাইয়া বর্ত্তমানে যাহাতে

বাস্তবের সহিত গণিত ফলের সামঞ্জস্য থাকে তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। গণনার মূল হিসাবে আমরা ১৩৪১ সালটি গ্রহণ করিলাম। এই বৎসরের প্রারম্ভে মধ্যমমানে (কেন্দ্রফল মাত্র গ্রহণ করিয়া) গণনা করিলে দেখা যায় যে, সংক্রান্তিকাল কলিকাতার সময়ে রাত্রি দ্বাদশ ঘটিকা হইতে ঘঃ ১৯।২৪ মিনিট পরে এবং এই বৎসর ৩৬৬ দিন সংখ্যক বলিয়া ইহা একটি অতিবর্ষ বা লিপ্-ইয়ার।

৩৯ বৎসরে ১০ দিন অধিক গ্রহণ করিলে প্রতি ৪ বৎসর পর পর একটি করিয়া লিপ্-ইয়ার গ্রহণ করিতে হয় এবং একবার তিন বৎসর পর একটি লিপ্-ইয়ার গণনা করিতে হয়। মধ্যমমানে গণনা করিয়া দেখা যায় যে ১৩৩০ সাল ও ১৩৩৩ সালের প্রারম্ভে সংক্রান্তিকাল কলিকাতার সময়ে যথাক্রমে ঘঃ ২৩।৪৩ মিঃ এবং ঘঃ ১৮।১১ মিঃ। অতএব আমরা যে রাত্রি ১২টার পূর্ব্বাপর অনুসারে সংক্রান্তি ভেদের নিয়ম গ্রহণ করিয়াছি, তদনুসারে উক্ত ১৩৩০ ও ১৩৩৩ উভয় বৎসরই লিপ্-ইয়ার।

এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিম্নোক্তরূপে অতিবর্ষ নির্ণয়ের নিয়ম রচনা করা যাইতে পারে :—

(বঙ্গাব্দ—৭) + ৩৯, ভাগাবশিষ্ট যদি শূন্য থাকে, কিম্বা যদি ভাগাবশিষ্ট ৪ দ্বারা বিভাজ্য হয়, তবে সেই বৎসর একটি অতিবর্ষ অর্থাৎ সে বৎসরে চৈত্র মাস ৩১ দিন সংখ্যক। এই নিয়মানুসারে গণনা করিলে ১৩৪১ সালের প্রারম্ভে সংক্রান্তিকাল ঘঃ ১৮।০এর ঘঃ ১।১৪ কাল পরে লব্ধ হয়। ইহা প্রকৃতকালের মাত্র ১০ মিনিট পূর্ব্বে। আমাদের গৃহীত বর্ষমান কিঞ্চিৎ দীর্ঘতর জন্য এই প্রভেদ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকিবে। উপরি উক্ত সূত্রানুসারে গণনা করিলে দেখা যায় যে ১৩৩০ ও ১৩৩৩ এবং ১৩৪১ সাল এ কয়েক বৎসরই লিপ্-ইয়ার। সুতরাং অতিবর্ষ বা লিপ্-ইয়ার নির্ণয়ের জন্য এই নিয়মই গ্রহণীয়।

আমরা যে ৩৯ বৎসর কাল গ্রহণ করিয়াছি তাহার সহিত বারের এক বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। ৩৯ বৎসরে প্রকৃত গণনায় ১৪২৪৪·৯৯৮ দিন হয় এবং আমাদের গৃহীত বর্ষমানানুসারে ১৪২৪৫ দিন হয়। এই ১৪২৪৫ সংখ্যাটি ৭ দ্বারা বিভাজ্য। সুতরাং ৩৯ বৎসর পর পর বার সকলের পুনরাবৃত্তি হইবে। ইহা হইতে বার নির্ণয়ের নিম্নরূপ নিয়ম হইতে পারে :—

(বঙ্গাব্দ—৭) + ৩৯, ভাগাবশিষ্ট গ্রহণ করিতে হইবে।

(অবশিষ্ট + ৩) + ৪ = ক (ভাগফল মাত্র গ্রহণীয়)

(অবশিষ্ট + ক) + ৭, অবশিষ্ট ১ থাকিলে বৎসরের প্রথম দিন বৃহস্পতিবার, ২ থাকিলে শুক্রবার ইত্যাদি।

বঙ্গাব্দ হইতে ৭ বাদ দেওয়ার পর ৩৯ দ্বারা ভাগ করিয়া যে অবশিষ্ট রহিল তাহা হইতে নিম্ন প্রকারেও বার জানা যাইতে পারে। অবশিষ্ট ০ থাকিলে ১লা বৈশাখ তারিখে এবং আষাঢ়, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ও চৈত্রের ২রা তারিখে বুধবার, অবশিষ্ট ১ থাকিলে উক্ত দিন সমূহে শুক্রবার, এই প্রকারে ২ শনি, ৩ রবি, ৪ সোম, ৫ বুধ, ৬ বৃহঃ, ৭ শুক্র, ৮ শনি, ৯ সোম, ১০ মঙ্গল, ১১ বুধ, ১২ বৃহঃ, ১৩ শনি, ১৪ রবি, ১৫ সোম, ১৬ মঙ্গল, ১৭ বৃহঃ, ১৮ শুক্র, ১৯ শনি, ২০ রবি, ২১ মঙ্গল, ২২ বুধ, ২৩ বৃহঃ, ২৪ শুক্র, ২৫ রবি, ২৬ সোম, ২৭ মঙ্গল, ২৮ বুধ, ২৯ শুক্র, ৩০ শনি, ৩১ রবি, ৩২ সোম, ৩৩ বুধ, ৩৪ বৃহঃ, ৩৫ শুক্র, ৩৬ শনি, ৩৭ সোম, ও ৩৮ মঙ্গল।

এই প্রকারের স্থিরদিনসংখ্যাসম্পন্ন মাসের প্রবর্ত্তন করিতে পারিলে বাঙ্গালা বৎসর ও মাস সাধারণের ব্যবহারের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইবে, বিশেষতঃ যাঁহারা গণিত জ্যোতিষের চর্চ্চা করেন তাঁহাদের পক্ষে তারিখ নির্ণয়ের শ্রম বহুল পরিমাণে লাঘব হইবে। কোন্ দিনে মাসারম্ভ এবং কোন্ মাস কতদিন সংখ্যক তাহা জানিবার জন্য পঞ্জিকার আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত বর্ত্তমানে আর উপায়ান্তর নাই। এই প্রকারে মাসের দিন-সংখ্যা স্থির করিয়া দিতে পারিলে ইংরাজী বৎসরের ন্যায় অতি সহজেই মাসান্ত বা মাসারম্ভ দিবস নির্ণয় করা যাইবে। বিগত বা আগামী কোন বৎসরে কোন দিবসের বাঙ্গালা তারিখ জানিতে হইলে, বর্ত্তমানে বিশেষ অবধানতার সহিত বহু পরিশ্রম করিলে তবে তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রস্তাবিত এই নির্দ্দিষ্ট দিন-সংখ্যক মাসে উক্ত প্রকার শ্রম স্বীকার করিতে হইবে না। তাহা ব্যতীত বর্ত্তমানে যে নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে তাহাতে কখনও দুই পঞ্জিকার গণনায় তারিখের বিভিন্নতা উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু স্থিরদিনসংখ্যার নিয়ম গ্রহণ করিলে সে প্রকারের সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে লোপ পাইবে।

আমাদের দেশে সকল প্রকার সংস্কার কার্য্যের পূর্ব্বে তৎসংক্রান্ত ধর্ম্মের ব্যবস্থাসমূহ বিবেচনীয় ; সেইজন্য এক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে প্রস্তাবিত নিয়মটি ধর্ম্ম ব্যবস্থার বিরোধী নহে এবং প্রচলিত নিয়মের সহিত এই প্রস্তাবিত নিয়মের যথেষ্ট সামঞ্জস্যও রহিয়াছে। এই নিয়মে মাসান্তসমূহ অধিকাংশ স্থানেই বর্ত্তমান নিয়মে গণিত মাসান্তের সহিত মিলিয়া যাইবে, দুই এক ক্ষেত্রে একদিন পূর্ব্বে বা একদিন পরে হইতে পারে মাত্র ; সেই প্রকার সংক্রান্তিকালও দুই এক ক্ষেত্রে মাসান্তের পূর্ব্ব দিবসে বা পর মাসের প্রথম দিবসে ঘটিতে পারে, মাসান্তের পূর্ব্ব দিবসে হইলে অপরাহ্ণ ২১।০ ঘটিকার পরে এবং মাসের প্রথম দিবসে হইলে পূর্ব্বাহ্ণ ১১।০ ঘটিকার পূর্ব্বে সংক্রমণ হইবে। তাহাতেও স্মৃতির বা জ্যোতিষের ব্যবস্থায় কোনও প্রকার বিপর্য্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা নাই ; কেননা স্মৃত্যাদির ব্যবস্থা এই প্রকার ব্যবহারিক মাস অনুসারে হয় না, প্রকৃত সৌরমাস অনুসারেই তাহা হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থানে এবং উড়িষ্যায় চিরকালই মাসের প্রথম তারিখে সংক্রমণ ঘটিয়া থাকে, তাহাতে তথায় ধর্ম্ম কৃত্যের কোনও প্রকার ব্যাঘাত হয় না। ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, ধর্ম্মশাস্ত্র বা জ্যোতিষের পক্ষ হইতে প্রকৃত কোনও প্রকার বাধা ইহার বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইবার নাই। কেহ যদি প্রচলিত কোনও প্রথার যে কোনও প্রকার পরিবর্ত্তনই অবাঞ্ছনীয় মনে করেন, তাহা হইলে ভারতে কোন প্রকার সংস্কারই আসিতে পারে না, তাহা হইলে পঞ্জিকা সংস্কারের আন্দোলনও চিরতরে বন্ধ করিয়া দিতে হয়। সে যাহা হউক, পশ্চিম ভারতে যে চান্দ্রমাসের

প্রচলন আছে, তাহা নানা প্রকার অসুবিধাপূর্ণ। আমাদের বাঙ্গালা মাস-গণনা প্রথার সংস্কার হইলে ভবিষ্যতে হয়ত ভারতের সর্ব্বত্রই এই নিয়ম গৃহীত হইতে পারে।

আমাদের সংক্রান্তি গণনার প্রচলিত পদ্ধতির বিপক্ষে অন্য একটি ত্রুটী বিশেষরূপে বিবেচ্য। আমাদের পঞ্জিকাসকল এক নির্দ্দিষ্ট স্থানের জন্য গণিত হইয়া থাকে এবং সেই স্থানের জন্য পূজা, শ্রাদ্ধ, স্নানদানাদি এবং যাত্রা, বিবাহাদির ব্যবস্থা ও তজ্জন্য প্রশস্তকাল নির্ণয় করিয়া দেওয়া থাকে এবং তৎসহ সংক্রান্তিক্ষণ অনুসারে মাসের দিন-সংখ্যা নির্ণয় ও সংক্রান্তিকৃত্য স্নানদানাদির দিবস নির্ণয়ও সেইস্থান অনুসারেই হইয়া থাকে। অবশ্য পঞ্জিকাতেই এ উপদেশও দেওয়া থাকে যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দেশান্তর ও অক্ষাংশভেদের জন্য যে তিথ্যাদির পরিবর্ত্তন হয় সে সকল বিবেচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শুভকার্য্যাদির অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা প্রকৃত শাস্ত্রানুসারে কার্য্য করেন তাঁহারা অবশ্য তাহাই করিয়া থাকেন। সংক্রান্তিকালেও যদি এই দেশান্তরভেদ প্রয়োগ করা যায়, তবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার মাসের দিন-সংখ্যা পাওয়া যাইবে। যেদিন কলিকাতায় ১লা বৈশাখ, কাশীতে হয়ত দেশান্তরভেদের জন্য সেইদিনকে ২রা বৈশাখ বলিতে হইবে। কাশী অনেক দূরে, তাহার কথা ছাড়িয়া দিলেও যদি কেহ ঢাকার দেশান্তর ও অক্ষাংশ লইয়া ঢাকা হইতে কোনও পঞ্জিকা প্রকাশ করেন, তখন মধ্যে মধ্যে দেখা যাইবে যে মাসের দিন-সংখ্যাগুলি কলিকাতার ও ঢাকার পঞ্জিকাতে এক প্রকার হইতেছে না। এই বৈষম্য নিরাকরণের জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যাইবে? বর্ত্তমানে যে প্রকার যুগ আসিয়াছে এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে স্থানের প্রভেদকে যে প্রকারে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালা দেশের, এমনকি ভারতবর্ষের, দুইস্থানে দুই প্রকার বাঙ্গালা তারিখ হইতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। তাহা না করিয়া যদি কোন এক বিশিষ্টস্থানের জন্য নির্ণীত তারিখকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দেশান্তর ভেদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দিনে সংক্রান্তিকৃত্য স্নান-দানাদি কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে, কোথাও বা মাসান্তের পূর্ব্বদিনে কোথাও বা পর মাসের প্রথমদিনে স্নান দানাদি করিতে হইবে। তাহাই যদি করিতে হয় তবে অসুবিধাপূর্ণ প্রচলিত মাস গণনার পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া প্রস্তাবিত এই নির্দ্দিষ্ট-দিনসংখ্যক মাসের নিয়ম গ্রহণ করিতে আপত্তির আর কি কারণ থাকিতে পারে?

পরিশেষে সুধীবৃন্দের নিকট নিবেদন তাঁহারা যদি প্রস্তাবটিকে গ্রহণীয় বলিয়া মনে করেন, তবে যাহাতে ইহা বঙ্গের পঞ্জিকাকারগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য যেন যত্নবান হয়েন। প্রস্তাবিত এই সংস্কার ধর্ম্মব্যবস্থায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে না, সুতরাং পঞ্জিকাকারগণের ইহাতে আপত্তি করিবার বিশেষ কোনও কারণ নাই। সাহিত্য-পরিষদ্, জ্যোতিষ-পরিষদ্ অথবা অন্য কোনও সুগঠিত প্রতিষ্ঠান যদি এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া বাঙ্গালা মাস গণনা পদ্ধতির সংস্কার সাধনে ব্রতী হন এবং এই প্রস্তাব সম্বন্ধে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের অভিমত সংগ্রহ করিয়া তৎপরে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে আশা করা যায়, অচিরেই আমাদের মাস গণনা পদ্ধতির সংস্কার সাধিত হইতে পারে।

বিচার

শ্রীশ্রীশচন্দ্র বসু

পেশ্‌কার বাবুর হুকুমে এজলাস ঘরের দ্বার বন্ধ হল। তবুও ভিতরে লোকে লোকারণ্য, বিপুল ভীড়। আজ জেলার জজ-আদালতে ভারি গোলমাল, দায়রা বস্‌বে। দায়রা প্রায়ই বসে কিন্তু যে-মামলার আজ শুনানী হবে সেটি জেলার একটি Cause celebre। এই মকদ্দমার কথা নিয়ে পথে, ঘাটে, হাটে, মাঠে, সহরের সর্ব্বত্র তুমুল তর্ক আলোচনা হয়ে গেছে। তাই আজ মামলা শোনবার জন্য আদালতের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে, আমতলায় জামতলায় পান-বিড়ীর দোকানে, কলের টলে, উকিল মোক্তার মহলে মহা হুলুস্থুল।

ঘড়ীতে টং টং করে ১১টা বাজল; পেয়াদা জজসাহেবের খাস-কামরা থেকে নথীপত্র এনে সাহেবের টেবিলের উপর রাখ্‌ল।

এইবার জজসাহেব আসবেন।

পাহারাওয়ালারা "চুপ" "চুপ" ধ্বনি করতে লাগ্‌ল; সেই কোলাহল-মুখরিত বিচারকক্ষ মুহূর্ত্তের মধ্যে নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এক দিককার দরজা দিয়ে পাহারা-ওয়ালা পরিবেষ্টিত আসামীদের এনে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হ'ল। অপর দিকের দরজা দিয়ে জজসাহেব প্রবেশ করে গম্ভীর মূর্ত্তিতে বিচারাসন গ্রহণ করলেন। জজসাহেব— শ্বেতাঙ্গ।

আসামী দু'জন। প্রথম আসামী অর্দ্ধাবগুন্ঠিতা, প্রায় ২২ বৎসরের একটি নারী, নাম প্রভাবতী। তার চোখের কোলে জল; ভয়ে বিস্ময়ে সে একবার আদালতের চারিধার তাকিয়ে নিয়ে তার মুখ অবগুণ্ঠনে আরও আবৃত করলে। অপর আসামী একজন শুভ্রকেশ পঁচাত্তর বৎসরের জরাজীর্ণ বৃদ্ধ। সহরের উপকণ্ঠে তাঁর বাস; সামান্য পেন্‌সন্ পান এবং তাইতেই তাঁর সংসার গুজরাণ হয়। প্রথমা আসামী তাঁর ভাগিনেয়ী। অতি শৈশব কালেই বালিকার পিতামাতার মৃত্যু হয়; তার পালন ভার বহন করবার তার পিতৃগৃহে আর কেহই ছিল না। তাই তার মাতুল, এই দ্বিতীয় আসামী, তাকে আপনার গৃহে এনে সেই শিশুকাল থেকেই বালিকাকে মানুষ করেন। নিজে নিঃসন্তান, সুতরাং শীঘ্রই বৃদ্ধের সকল স্নেহ সকল কোমলতা ঐ বালিকার উপর স্থাপিত হয়েছিল; এমন কি বালিকা বৃদ্ধের নিজের সন্তান হলে তিনি তাকে এত ভাল বাসতেন কিনা সন্দেহ। বৃদ্ধ দরিদ্র হলেও আজীবন ধর্ম্মপথই অনুসরণ করে এসেছেন, জগতে মাথা নীচু করবার তাঁর জীবনে কখনও কারণ হয়নি। কিন্তু আজ তিনি একটি গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত; তাঁর উঁচু মাথা হেঁট হয়েচে, শরীর লজ্জাভারে ভগ্ন, তাই চোর ডাকাতের মত জোড়করে, নত-শিরে, কাটগড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

দায়রার বিচার, সুতরাং প্রথমেই জুরী নয় জন নির্ব্বাচিত হলেন। এঁরাই সাক্ষ্য-প্রমাণাদি শুনে সাব্যস্ত করবেন আসামিগণ দোষী কি না। নির্ব্বাচনের পর জুরিগণ গম্ভীরভাবে একে একে তাঁদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করলেন।

প্রথমে এলেন সহরের একজন মুদী; আজকালের এই কর্ম্মাভাব যুগের বি-এ পাস করা মুদী নন্—যাঁরা পাল্লা ধরে কেনা-বেচা করেন না, কেবল টেবিলে বসে হিসাব লেখেন এবং বন্ধু-বান্ধব এলে গল্প করেন। এ মুদী—মুদী। তাঁর পর এলেন সহরের এক দীন গৃহস্থ ঘরের একটি কর্ম্মহীন ডেঁপো ছেলে। লেখাপড়ার সঙ্গে সম্বন্ধ কম, কিন্তু সব কথায় সব কাজে তিনি সব-জান্তা। নিষ্কর্ম্মার পরচর্চ্চাই কাজ; আজ জেলায় জজসাহেব তাঁকে আহ্বান করে বিচার-ভার অর্পণ করেচেন এই অভিমানেই তিনি স্ফীত। তৃতীয় ব্যক্তি বি-এ ফেল, একটি গ্রাম্য মাইনর স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার। তাঁর শরীর শীর্ণ, কেশ দীর্ঘ, বেতন খুবই কম, তাও মাসে মাসে পান কি না সন্দেহ। তবে যেহেতু তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটী পরীক্ষা পাশ করেছেন তাঁর বিশ্বাস তিনি একজন পণ্ডিত, গ্রামে তাঁর মত বোঝদার আর নাই। চতুর্থ এলেন একজন গ্রাম্য জমীদার; তাঁর আগমনে সকলেই একটু ব্যস্ত একটু শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি প্রৌঢ়ত্ব পার হয়ে বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করেচেন। দীর্ঘকায়, অতি স্থূল দেহ, স্থূল ওষ্ঠ, স্থূল নাসা, স্থূল বুদ্ধি। পরিধানে একটি ফিন্‌ফিনে মলমলের ধোপ-দোরস্ত পাঞ্জাবি, চুনট করা আস্তিন এবং তদুপযুক্ত পাকিয়ে দড়ির মত সরু করা, গলদেশে দোদুল্যমান একখানি উড়ানী। আশৈশব সরস্বতীর মন্দির-দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েচেন মাত্র, প্রবেশ লাভ হয়নি। ভাগ-বাটোয়ারার পর তাঁর ভাগে জমিদারীর অল্প অংশই পড়েছিল; তার উপর আজকালকার দিনে প্রজা খাজনা দেয় না, সুতরাং মালগুজারীর সময় প্রায় প্রতি বৎসরেই ঋণ করতে হয়। তালপুকুরের এখন আর পুকুর নাই, আছে মাত্র তালগাছ এবং বিত্তহীন আভি-জাত্যের প্রতীক স্বরূপ সেই তালগাছেরই মত দীর্ঘকায়ার স্থূলত্বকে অতি কষ্টে সংযত করে জমীদারবাবু তাঁর সঙ্কীর্ণ বিচারাসনে উপবিষ্ট হলেন। তাঁর পার্শ্বে এলেন একজন খর্ব্বাকার ব্রাহ্মণ, গৌরবর্ণ, মুণ্ডিতমস্তকে দীর্ঘ শিখা, নগ্নদেহ একখানি উত্তরীয়ে আবৃত। তিনি স্থানীয় ইংরাজী হাই-স্কুলের হেড্ পণ্ডিত। তাঁর অভিমান শাস্ত্রাদিতে তাঁর ভারি জ্ঞান, দেশের লোক তাঁর কাছে আসে বিধান নিতে। বাকি জুরিগণের মধ্যে মাত্র এক জনই উল্লেখ-যোগ্য। বয়সে তিনি প্রৌঢ়ত্ব অতিক্রম করলেও তাঁকে ঠিক বৃদ্ধ বলা যায় না। বলিষ্ঠ দেহ, মাজা মাজা রঙ্, মাথার চুল শুষ্ক ও একটু বড় বড়; কিন্তু কৃত্রিম পারিপাট্য না থাকলেও সে চুল মুখে তাঁর বেশ একটি ভাবুকতার ভাব এনেচে। তার তীব্র দৃষ্টিতে, পলিত কেশ ও ললাটের বলিত চর্ম্মে মনে হয় মানুষটি জীবনে অনেক চিন্তাই করেছে। তিনি বহুবর্ষ যাবৎ ইয়োরোপে ছিলেন ও সেখানকার বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে দর্শন ও বিজ্ঞান আলোচনা করেন। দেশে ফিরে কোন পেশা বা চাকুরী গ্রহণ করেন নি এবং তার আবশ্যকও ছিল না। পিতৃপরিত্যক্ত কিঞ্চিৎ অর্থ ছিল এবং যেহেতু তিনি চিরকুমার, তাঁর সংসারও ছোট,

—তিনি নিজে ও একটি পুরাতন পরিচারক। জনসমাজে তিনি খুব কমই মিশতেন—কারণ কারও সঙ্গে তাঁর মতে মিল্‌ত না। লোকে বলে তাঁর ছোট মাথায় বেশী বিদ্যা ঢুকে পরিপাক হয় নি, তাঁর মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেচে। তৎসত্ত্বেও যেহেতু সমবেত জুরিগণের মধ্যে তিনি বয়সে ও বিদ্যায় বড়—সকলে মিলে তাঁকেই তাঁদের ফোরম্যান (foreman) অর্থাৎ মুখপাত্র নিযুক্ত করলেন।

বিচার আরম্ভ হ'ল।

পেশ্‌কারবাবু প্রথম আসামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—

—এই প্রভাবতী! তোমার নামে অভিযোগ গত ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে রাত্রি প্রায় ১১টার সময় তোমার ১০।১২ দিনের একটি ছেলে অসহায় অবস্থায় রেলগাড়ীতে ফেলে পালিয়েছিলে। তুমি "দোষী"—না বিচার চাও?

এতক্ষণ প্রভাবতীর বক্ষঃস্থল অশ্রুজলে ভাসছিল। এখন তার সন্তানের কথা, তাকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগের কথা শুনে সে ডুক্‌রে কেঁদে উঠল, উত্তর দিতে পারলে না। জজসাহেব্‌ বল্‌লেন—

—উত্তর দাও।

তথাপি আসামী নিরুত্তর, কাঁদতেই লাগ্‌ল। জজ-সাহেব লিখে নিলেন 'প্রথমা আসামী উত্তর দিতে নারাজ।'

পেশ্‌কারবাবু দ্বিতীয় আসামীকে সম্বোধন করলেন—

—ওহে প্রিয়নাথ সরকার, তোমার নামে অভিযোগ তুমি প্রথমা আসামীকে উক্ত অপরাধে সাহায্য করেচ। তুমি "দোষী"—না বিচার চাও?

ধর্ম্মাবতার, আমি কোন দোষ করিনি। প্রভাবতীও নির্দ্দোষ, হুজুর।

বৃদ্ধের চোখে জল এল।

—থামো! প্রভাবতীর কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

কথাটা পেশ্‌কারমশাই অতি রুক্ষভাবেই বল্‌লেন। দর্শকবৃন্দ হেসে উঠ্‌ল, তিরস্কারটা খুব উপভোগ করল। বৃদ্ধের অবনত মস্তক আরও হেঁট হয়ে গেল।

(২)

একটির পর একটি করে সরকারী তরফের সাক্ষী আস্‌ছে এবং তাদের জবানবন্দির পর আসামী পক্ষের উকিলবাবু জেরা করচেন। মে মাস, গরম খুব। দু'চার জন সাক্ষী শেষ হতে না হতেই নিদ্রাদেবী এসে এজলাস-কক্ষ অধিকার করে বস্‌লেন। অলস দর্শকবৃন্দের আর মামলায় মন নাই, সকলেই ঝিমুচ্ছেন। টানা পাখার একঘেয়ে টানে কেহই নিদ্রা সম্বরণ করতে পারচেন না। পাখা মাঝে মাঝে থামচে, কেউ বা পাখা টেনে দিচ্চে, পাখাওলা নিদ্রাবেশ থেকে চম্‌কে উঠ্‌চে। পেয়াদা চাচা সাহেবের উচ্চ বেদীর পার্শ্বে বসে, দেওয়ালে ঠেশ্‌ দিয়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন, তার ঘুম ভাঙ্গবে ঠিক টিফিনের আগে। পেশ্‌কার-বাবুরও অবস্থা তদ্বৎ। নিষ্কর্ম্মা উকিল বাবুদের মামলায় আর কাণ নাই; কেহ বা নিদ্রিত, কেহ বা অর্দ্ধ-নিদ্রিত, ঢুলচেন্‌। জুরীমহলে অনেকেরই চক্ষে নিদ্রা ও জাগরণের কুরুক্ষেত্র উপস্থিত। অনেকে বহু চেষ্টায় দুর্জ্জয় নিদ্রাবেশকে জয় করবার চেষ্টা করচেন, কেহ বা তাঁদের আসন-নিবাসী বুভুক্ষু কীটরাশির দংশনে অথবা নিজের নাসিকা গর্জ্জনে নিজেই থেকে থেকে চম্‌কে উঠ্‌চেন। উভয় পক্ষের উকিল ব্যতীত সজাগ কেবল জজসাহেব এবং 'ফোরম্যান' এবং এরা দুজনেই সাক্ষীদের উক্তিগুলি খুব মনোযোগের সহিত লিখে নিচ্ছিলেন।

এই রকমে সারাদিন কেটে গেল; সাক্ষী শেষ হ'ল তার পরদিন। তখন জজসাহেব প্রভাবতীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—সাক্ষ্য প্রমাণাদি শুনে তার কিছু বলবার আছে কিনা। প্রভাবতীর মাথায় বজ্রাঘাত হ'ল। তার আর কি বলবার থাকবে? সে কি বল্‌বে? সে কি বল্‌বে সরকারী সাক্ষ্য প্রমাণাদি সব মিথ্যা? সেটা যে একটা বড় ভয়ানক মিথ্যা হবে। বালিকা আর কত মিথ্যা কইবে? সে যে আজ এক বৎসরের উপর কেবল মিথ্যারই অভিনয় করে এসেচে। এত অভিনয় করে, এত সাবধানের এত গোপনের কি ফল হয়েচে? সমাজের তিরস্কার, পুলিশ হস্তে গ্রেপ্তার, শেষে রাজদ্বার যেখানে কারাগার তার করাল বদন ব্যাদন করে তাকে গ্রাস করবার জন্য অপেক্ষা করচে! মিথ্যার ত এই ফল। এর উপর আবার মিথ্যা, ধর্ম্মাধিকরণে দাঁড়িয়ে মিথ্যা! প্রভাবতীর আর মিথ্যা বলবার সাহস হ'ল না, শক্তি যোগাল না, তাই সে বলে ফেল্‌লে…

—সবাই সত্য বলেচে, আমি দোষ করেচি, মামাবাবুর কোন দোষ নেই।

প্রভাবতীর উকিলের গম্ভীর মুখ একটু কুঞ্চিত হয়ে উঠ্‌লো। সরকারী উকিলবাবু একটু হাসলেন। তাঁর পেছনে বসেছিলেন রেল পুলিশের সব-ইন্‌স্পেকটার, তিনি এই মামলার তদন্ত করেচেন্। তিনি মাথা নেড়ে আপন মনে বললেন—"আর মামলার রইল কি ?"

জজসাহেব প্রভাবতীর উক্তি লিখে নিয়ে দ্বিতীয় আসামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—তাঁর কিছু বলবার আছে কিনা। বৃদ্ধ উত্তরে আবার বল্‌লেন—হুজুর, আমি বলেছি আমি নির্দ্দোষ। প্রভাবতী যাই বলুক ও কোনও অপরাধ করেনি ধর্ম্মাবতার।

সরকারী উকিলবাবু তখন দাঁড়ালেন জুরীবাবুদের মামলা বোঝাতে। তিনি সাক্ষিগণের উক্তি আলোচনা করে উপসংহারে বল্‌লেন—আপনারা প্রমাণ পেয়েচেন যে আলোচ্য ঘটনার প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে বৃদ্ধের পত্নীবিয়োগ হয় এবং সেই শোকে বৃদ্ধ শয্যাশায়ী হয়। তার গৃহে আর কেহই ছিল না, ছিল মাত্র প্রথমা আসামী প্রভাবতী। তার বয়স তখন প্রায় বিশ বৎসর এবং তখনও সে অবিবাহিতা ; শূন্য গৃহের সেই সুযোগে ঐ ব্যভিচারিণী প্রথমা আসামী তার আশ্রয়দাতা, তার অন্নদাতা, তার পিতৃ-তুল্য মাতুলের অকলঙ্ক সংসারে কলঙ্ক কালিমা সঞ্চার করে এবং সমাজ সে ইতিহাস অবগত হবার পূর্ব্বেই স্বৈরিণীর দণ্ডবিধান করলেন ভগবান, তার জঠরে দিলেন একটি পিতৃহীন অবৈধ সন্তান। কিন্তু সেই শয়নশায়ী মাতুল, তার কলঙ্কিনী ভাগিনেয়ীকে তার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ—তাকে পদাঘাতে গৃহ হতে বহিষ্কৃত করলেন না, বরং নিজের বায়ু পরিবর্ত্তনের ভান করে যথাকালে তাকে কলকাতার একটি প্রতিষ্ঠানে রেখে এলেন যেখানে সেইরূপ ব্যভিচারী কুমারী মাতারাই গোপনে গিয়ে তাদের পাপের ভার হতে মুক্তি পায়। সেই স্থানে প্রথমা আসামীর আলোচ্য সন্তান প্রসূত হয় এবং দশদিন পরে ঐ বৃদ্ধের সমভিব্যাহারে সে সেই সন্তান নিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করে। তখন অপরাহ্ণ। সেই রাত্রে প্রায় ১১টার সময় যে ট্রেণ হাওড়া থেকে এই সহর পর্য্যন্ত আসে, সেই ট্রেণের একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে সেই পৌষ মাসের শীতে ১০।২২ দিনের পরিত্যক্ত শিশু পাওয়া যায়। ষ্টেশন মাষ্টার পুলিশ-দারোগাবাবুকে রিপোর্ট করেন ও শিশুটিকে জমা দেন। এই মামলার নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত তাঁর উপরওয়ালা সাহেব শিশুটিকে তাঁরই গৃহে রেখেচেন। এখন আপনাদের বিবেচ্য এই যে ঐ শিশুটিকে আসামী প্রভাবতী পরিত্যাগ করে গিয়াছিল কিনা এবং সে সময় ঐ বৃদ্ধ দ্বিতীয় আসামী তার সঙ্গে ছিল কিনা। এ প্রশ্নের মীমাংসা করে গেছেন এই সহরের ঠিক পূর্ব্বেকার ষ্টেশনের টিকিটবাবু। তিনি বলে গেছেন যে সেই রাত্রে এই দুই আসামী সেই ট্রেণ থেকে দুখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট দিয়ে বিনা সন্তানে নেমে গিয়েছিল। সুতরাং যে অপরাধে আসামীরা অভিযুক্ত তাহা সাক্ষ্য প্রমাণাদির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হয়েচে। তথাপি যদি কোনও সন্দেহের ছায়া আপনাদের বিচার-শক্তিকে আচ্ছন্ন করে, সে ছায়া সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করেচে আসামী তার নিজের উক্তিতে। সুতরাং আপনাদের পথ খুবই সোজা, সে পথ প্রথমা আসামী নিজেই নির্দ্দেশ করেচে। আপনাদের গত্যন্তর নাই, তাই আমার নিবেদন যে আপনারা এক মত হয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হউন যে আসামীগণ উভয়েই দোষী।

উকিলবাবু বসলেন।

দর্শকবৃন্দের মধ্য হতে একটা সংযত অস্পষ্ট আনন্দধ্বনি শ্রুত হ'ল—"আসামী দোষী!" জজ সাহেব আসামীপক্ষের উকিলবাবুর দিকে চাহিলেন। উকিলবাবু ধীরে ধীরে উঠে জুরীবাবুদের সম্বোধন করতে আরম্ভ করলেন। তিনি অল্প কথার মানুষ এবং দুই এক কথায় তাঁর ভূমিকা সমাপ্ত করে বললেন—"প্রথমা আসামী প্রভাবতীর বিপক্ষে অভিযোগ এই যে সে উক্ত রাত্রে তার দশদিনের একটি পুত্র সন্তানকে অসহায় অবস্থায় রেলগাড়ীতে ফেলে পালিয়েছিল এবং দ্বিতীয় আসামী সেই অপরাধে প্রথমা আসামীর সহায়তা করেছিল। আমার নিবেদন—অপরাধ সরকারী সাক্ষ্য প্রমাণে প্রতিপন্ন হয়নি। স্বীকার করি প্রথমা আসামী কুমারী অবস্থায় গর্ভিণী হয়েছিল, স্বীকার করি তার একটি পুত্র সন্তান উক্ত তারিখে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রসূত হয়েছিল এবং ইহাও স্বীকার করি আসামীদ্বয় সেই শিশুটিকে নিয়ে ঘটনার দিনে সেই প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করে। কিন্তু তাহাতেই আসামীদের অপরাধ প্রমাণ হয় না। প্রথমতঃ সরকারী তরফের গোড়ায় একটি গলদ ঘটেচে। তাঁরা অপরাধের মূল উপাদান অর্থাৎ পরিত্যক্ত

শিশুটি যে প্রভাবতীর প্রসূত সন্তান, তা প্রমাণ করতে পারেন নি। তার পর, ইহাও প্রমাণ হয়নি যে আসামীরা সেই সন্ধ্যায় সন্তানটিকে নিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়েছিল বা দুখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনেছিল। হাওড়া ষ্টেশন থেকে গাড়ী এখানে আসতে প্রায় দুঘণ্টা লাগে। এই দুঘণ্টা কাল শত শত যাত্রীর মধ্যে কেহই তাদের গাড়ীতে দেখেনি।"

এইরূপ তর্ক যুক্তির দ্বারা উকিলবাবু বোঝালেন যে যে-টিকিট বাবু আসামীদের ট্রেণ থেকে নেমে যেতে দেখেছেন তাঁর সাক্ষ্য মিথ্যা, সনাক্ত মিথ্যা—তিনি সরকারী চাকর, পুলিশের খাতিরে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন।

—সুতরাং সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা আসামীদের অপরাধ প্রতিপাদিত হয়নি। বাকি মাত্র একটি কথা, প্রথমা আসামী তার দোষ স্বীকার করেছে। আপনাদের মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন উদয় হতে পারে যে যদি আসামী নির্দ্দোষই হবে তবে সে স্বীকারোক্তি করে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুবই সোজা, কিন্তু সে উত্তর উপলব্ধি করতে হ'লে একটু কল্পনার আবশ্যক। প্রাপ্ত-যৌবনা ঐ প্রথমা আসামী, তার যৌবনের যৌন-প্রবৃত্তিবশে হিন্দুশাস্ত্রের হিন্দুসমাজের একটি কঠোর অনুশাসন গোপনে লঙ্ঘন করেছিল। সে পাপের প্রচার স্ত্রীজাতির পক্ষে অতি লজ্জার কথা, তদপেক্ষা বড় লজ্জার কথা হিন্দুনারীর আর নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ তার মাতৃত্বই সেই লজ্জার কথা জনসমাজে প্রচার করে। দিন দিন বর্দ্ধনশীল মাতৃত্বের লক্ষণ শরীরে বহন করে লজ্জাবনত শিরে সমাজের ও সেই শয্যাশায়ী মাতুলের অব্যক্ত তিরস্কার তাকে প্রতিদিন সহ্য করতে হয়েচে, প্রতি রাত্র বীতনিদ্র হয়ে বালিকা মৃত্যু-কামনা করেচে; ভ্রূণহত্যা, আত্মহত্যা কিছুতেই হয়ত সে পরাঙ্মুখ হ'ত না যদি তার একজন সহায় থাকৃত। সে সহায় তার ছিল না। যে পাপিষ্ঠ তাকে এই মহাপাপে প্রবৃত্ত করেছিল সে বিপদের প্রথম লক্ষণেই বালিকার জীবনাকাশ হতে অপসারিত হয়েছিল; সুতরাং সে তখন নিরুপায়। তার পর তার গ্রেপ্তার তার লজ্জার কথা দেশে দেশে প্রচার করে এবং এই রাজদ্বারে আজ তিন দিন ধরে তার লজ্জার কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তারই সম্মুখে আলোচিত হচ্চে, বালিকা প্রার্থনা করচে—'মা ধরিত্রী, দ্বিধা হও, আমার কলঙ্কিত মুখ লুক্কায়িত করি!' বালিকা আর সংসারে ফিরতে চায় না, সমাজে আর মুখ দেখাতে পারবে না, তাই সে কারাগারের ঘনান্ধকারে, রুদ্ধদ্বারে আপনাকে লুপ্ত করতে চায়, তার স্বীকারোক্তির এই মনস্তত্ব! তবে সে-স্বীকারোক্তি, সে-অনুতাপ, সে-আত্মগ্লানি তার সামাজিক প্রত্যবায়ের জন্য, যে-অপরাধের অনুসন্ধানে আপনারা ব্রতী তার জন্য নয়। সে-অপরাধের কোনও প্রমাণ নাই এবং নাই বলেই 'ব্যভিচারিণী' 'স্বৈরিণী' ইত্যাদি নানা অভিধানে বালিকাকে অভিহিত করে সরকারী উকিলবাবু আপনাদের অন্তরে তার প্রতি একটা বিরুদ্ধ ভাবের সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেচেন। সে সব কথা অবান্তর, তাতে কর্ণপাতও করবেন না। অতি গুরুতর দায়িত্বভার স্কন্ধে নিয়ে আজ আপনারা বিচারাসন গ্রহণ করেচেন। কিন্তু সে উচ্চাসন অধিকার করবার পূর্ব্বে আপনারা ধর্ম্মসাক্ষ্য করে প্রতিশ্রুত হয়েচেন যে সুধু প্রমাণের উপর নির্ভর করে আপনাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। আসামীদের বিপক্ষে যে কোনও প্রমাণ নাই তা সম্পূর্ণরূপে প্রতীয়মান হয়েচে। সুতরাং আমারও নিবেদন যে আপনাদের গত্যন্তর নাই এবং আপনারা একবাক্যে আসামীদের অব্যাহতি দিন ইহাই আমার প্রার্থনা।

(৩)

নিভৃত কক্ষ, রুদ্ধদ্বার; এই মন্ত্রণাগারে জুরিগণ গম্ভীর-ভাবে যুক্তি করচেন কি রায় দেবেন—'দোষী' না 'নির্দ্দোষ'। তাঁদের এই একটি কথায় হতভাগ্য আসামীদের ভবিষ্যৎ নির্দ্দিষ্ট হবে—'দোষী' না 'নির্দ্দোষ', খালাস না কারাবাস। সাক্ষীদের উক্তি এখন আর অনেক জুরীরই মনে নাই। যখন তাঁরা সরকারী উকিলের বক্তৃতা শুনেছিলেন তখন মনে হয়েছিল নিশ্চয় 'দোষী'। যখন আবার অপর পক্ষের বক্তব্য শুনলেন তখন মনে একটা খট্‌কা বাধ্‌লো—দু'নৌকায় পা পড়্‌লো। জজ সাহেবের নিরপেক্ষ অভিভাষণ তাঁদের সেই নৌকা দুখানিকে আরও ফাঁক করে দিল এবং সেই থেকে জুরিগণ সংশয় সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্চেন। বস্তুতঃ একা ফোরম্যান ব্যতীত অপর কেহই মকদ্দমার কিছুই বোঝেন নি। কিন্তু সে কথা মানবার পাত্র তাঁরা নন্—সুতরাং ফোরম্যান যখন জিজ্ঞাসা করলেন—"এ স্থলে আপনাদের কার কি মত?"

জমীদারবাবু খুব বিজ্ঞতার আড়ম্বর করে গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন—"কার কি মত! দোষী! এ সম্বন্ধে আবার মতভেদ আছে না কি?"

এই জমীদারবাবু একবার ভেবেছিলেন 'নির্দ্দোষ' বলবেন এবং অন্য জুরী দ্বারা বলাবার চেষ্টা করবেন। কারণ তিনি মনে করেছিলেন মামলা নিষ্পত্তি হয়ে গেলে আসামী খালাস পেলে ঐ সমাজচ্যুতা পরিত্যক্তা, এ সংসারে সহায়সম্বল-বিরহিতা বালিকাকে তার আবাস ও গ্রাসাচ্ছাদন দান করে তাকে আশ্রয় দিয়ে পতিতার ধর্ম্ম রক্ষা করবেন এবং তাঁরও নিজের পরকালের সঙ্কীর্ণ পথটা একটু প্রশস্ত করে নেবেন। কিন্তু যৌবন মনের মধ্যে মাঝে মাঝে উৎপাত করলেও এখন তিনি স্থবীর, শরীর অপটু, সুতরাং সে প্রস্তাব পরিত্যাগ করে একজন সমাজনেতার ভূমিকা গ্রহণ করাই সমীচীন মনে করলেন। তাঁর উত্তরে মুদীবাবু বললেন—

—কথাই ত।

সেই ডেঁপো বাবুটি যিনি এইরূপ দায়িত্বহীন পিতৃত্বের অনেক অনুসন্ধানে ফিরে বেড়ান এবং স্থলবিশেষে সফল-মনোরথও হয়ে থাকেন তিনি হঠাৎ এই জুরী সমাজে সাধু সেজে ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলেন—

—এরূপ স্ত্রীলোক দেশে থাকলে ছেলেপিলে গুলোর আস্ত মাথা চিবিয়ে খাবে।

মুদীবাবু মাথা নেড়ে—

—কথাই ত।

এবং এই প্রস্তাবের সমর্থনে গ্রাম্য স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার মহাশয় বললেন—

—সমাজ এরূপ ব্যভিচারিণীকে স্থান দিতে বাধ্য নয়। সুতরাং কারাবাসই তার একমাত্র আবাস।

মুদী মনে মনে—

—কথাই ত।

আর একজন জুরী যাঁর বর্ণনা ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হয়নি—

—আমার কপাল জোর, মশাই! বুড়ো এসেছিল আমার ছেলের সঙ্গে ঐ মেয়ের সম্বন্ধ করতে। উদ্ খেতে খুদ নেই, বাতাসে নড়ে হাঁড়ী! দূর করে দিলুম। ভাগ্যিস রাজী হইনি! ধর্ম্ম রক্ষা করেছেন!

জমীদারবাবু হাসতে হাসতে—

—আমার ওখানে যে গেছলো বাড়ী বেচতে! কে বুড়োর ঐ পচা বাড়ী কেনে মশাই! বিদায় করে দিলুম।

ফোরম্যান—পণ্ডিত মশাই, আপনি যে নীরব।

পণ্ডিত—কি আর বল্‌ব বলুন; আমি ত ঘটনা শুনে অবাক! শাস্ত্রানুশাসনের এরূপ ব্যতিক্রম অমার্জ্জনীয়।

ফোরম্যান—পণ্ডিত মশাই, আপনাদের শাস্ত্রে কন্যার কোন একটি অবস্থাবিশেষ প্রাপ্ত হবার পূর্ব্বেই বিবাহের বিধান আছে না?

পণ্ডিত—আছে বৈকি! রঘুনন্দনে রাশি রাশি বিধান পাবেন—

"প্রাপ্তেতু দ্বাদশে বর্ষে কন্যাং যো ন প্রযচ্ছতি
মাসি মাসি রজস্তস্যাৎ পিতা পিবতি শোণিতম্"

ফোরম্যান—আরও আছে না?

"কন্যা দ্বাদশ বর্ষাণি যা প্রদত্তা গৃহে বসেৎ
ব্রহ্মহত্যা পিতুস্তস্যা সা কন্যা বরয়েৎ স্বয়ম্"

আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম, সমাজ কি শাস্ত্রের এই সকল অনুশাসন পালন করচেন—না লঙ্ঘন করচেন?

পণ্ডিত—পালন কি করে করা যায়? বিজাতীয় রাজা! ১৪ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ ত আইন করে বন্ধ করা হয়েচে…

ফোরম্যান—(হাসিয়া) বিদেশীয় রাজা নয় পণ্ডিত মশাই, রঘুনন্দনের উপর কলম চালিয়েচেন সারদানন্দন…

জমীদার—সুধু আইন কেন পণ্ডিত মশাই? বিয়ে হচ্চে না অভাবে। দেশের অবস্থা কি? প্রজা খাজনা দিতে পারে না। অন্নদায়ের চেয়ে এখন কন্যাদায় বেশী হয়ে পড়েচে। ২২।২৪ বছরের মেয়ে এখন অনেক ঘরে।

এমন একটা সমাজতত্ত্বের আলোচনায় মাষ্টারবাবু চুপ করে থাকৃতে পারলেন না—তিনি তাঁর সূক্ষ্ম শরীর থেকে একটি বেশ তীক্ষ্ম আয়োয়াজ বার করে—

—আপনারা মূল কথাটাই ভুলে যাচ্চেন। হিন্দু সমাজের এখন যুগান্তর উপস্থিত। হিন্দু নারী, সুধু হিন্দু নারী কেন, ভারতনারী আর পর্দ্দার পশ্চাতে পুরুষের পদানত হয়ে থাকতে চায় না। দেখচেন না—দেশে বিদেশে অসূর্য্যম্পশ্যা হিন্দু মুসলমান নারী তাঁদের অবগুণ্ঠন প্রত্যাখ্যান করে অনাবৃতমুখে জগৎ সম্মুখে বেরিয়েচেন এবং আত্মাশ্রয়ী হয়ে সভা সমিতিতে বক্তৃতা করে তাঁদের নিজের কর্ত্তব্য নিরূপণ করচেন। চারিদিকে স্ত্রী-শিক্ষার সাড়া পড়ে গেছে;

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় নারীজাতি সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হচ্চে। নারী-প্রগতির এই প্রবল বন্যায় আপনাদের সনাতন বাল্যবিবাহ প্রথা কোথায় ভেসে গেছে, সুধু আইন বা অভাবের দোষ দিলে চলবে কেন, মশাই!

—মুদিবাবু এসব কথার কিছুই বোঝেন না, তথাপি—কথাই ত।

ফোরম্যান—কথাটা তাহ'লে এই ত যে আইন বা অভাব বা নারী-জাগরণ অথবা যে কোন কারণেই হোক আপনাদের গৌরবান্বিত হিন্দু সমাজের একটি গুরুতর অনুশাসনের আপনারা ব্যতিক্রম করচেন। সেটাও ত আপনাদের একটা মহৎ অপরাধ, প্রভাবতীর অপরাধে যার পরিণতি!

একথায় সকলেই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন; কেহ বা বললেন 'জানাই ত আছে লোকটার মাথা খারাপ।' মাষ্টার মশাই তার সেই সূক্ষ্ম শরীরের তীক্ষ্ন সুরে—আপনি ত দেখছি সমাজ-শৃঙ্খলা উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত করতে চান। বড় মেয়ে আইবুড়ো থাকলে ব্যভিচারী হবে এ কোন ধর্ম্মের নীতি?

ফোরম্যান—মানবধর্ম্মের মশাই, মানব ধর্ম্মের; তবে ব্যভিচারী যে হবেই একথা বলিনি। দেখুন, হয় আপনারা শাস্ত্র আঁকড়ে বসে থাকুন, বাল্যে বালিকাদের বিয়ে দিন, এসব রোগের একেবারে টীকে হয়ে যাক এবং তখন যদি কোন প্রভাবতীর এরূপ কুমতি হয় তাকে ফাঁসী দিন, খুন করুন, 'সীট্' করুন—আমার কোন আপত্তি থাকবে না। কিন্তু যদি বাল্যবিবাহ উঠিয়ে দেন ত প্রস্তুত থাকুন, অন্য দেশে যা হয়ে থাকে এ দেশেও তাই ঘটবে, ভারতের শিকল বাঁধা সতীত্বের বাঁধন ছিঁড়বে, মেয়েরা শিক্ষা পেয়ে স্বাধীন হবে, সেই সব নব নারীতে নূতন সতীত্বের অভ্যুদয় হবে; তখন তারা বাপের কথায় বিয়ে করবে না, নিজেই স্বয়ম্বরা হবে এবং অবস্থা বিপর্য্যয়ে হয়ত কখনও কখনও দু'একজন কুমারী প্রভাবতীর অবস্থাও প্রাপ্ত হবে। সে সব আপনাদের নত শিরে দেখতে হবে, সইতে হবে এবং তখন যদি তাদের শাস্ত্রের বেড়া দিয়ে রুখতে যান তারা বিদ্রোহী হবে, কেরোসিনের শরণ নেবে, নয় প্রেমিক প্রেমিকা মিলে লেকের জলে ডুবে মরবে। দু নৌকোয় পা রাখা আর চলবে না।

পণ্ডিত—এসব আপনার বিদেশীয় মনোভাব, আমাদের হিন্দু সমাজে প্রযোজ্য নয়। প্রভাবতীর যে মহাপাপ আমাদের শাস্ত্রমতে তার প্রায়শ্চিত্ত ইহকালপরকালব্যাপী!

পণ্ডিত মশাই আবার কি এক শ্লোক আওড়াতে যাচ্ছিলেন। ফোরম্যান মশাই তাঁকে থামিয়ে—

—দাঁড়ান, দাঁড়ান পণ্ডিত মশাই, আপনি পরকাল মানেন নাকি? সাবধান, মানেন ত অন্তত আপনাদের অভিযোগ থেকে আসামীকে খালাস দিতে হবে।

পণ্ডিত—কেন? কোন কারণে? কোন হিন্দু সন্তান পরকাল পরজন্ম মানে না। আপনি মানেন না নাকি?

ফোরম্যান—না, আপনাদের পরকাল পরজন্ম মানি না। আমার মতে মৃত্যুই মানুষের শেষ, আপনাদের পরকাল ভাবপ্রবণ ভারতের কবি-কল্পনা মাত্র।

মাষ্টার—আপনি নাস্তিক!

ফোরম্যান—(হাসিয়া) হলাম। কিন্তু আমি যে পরজন্ম মানি আপনারা তার কাছেও যান না। আপনারা জন্তু জানোয়ারের পরজন্ম মানেন? গাছ-পালার? মানেন না ত? আমি মানি···

জুরীমণ্ডল ভাবলেন—এইবার পাগল ক্ষেপ্‌লো।

মাষ্টার—(বিদ্রূপের সহিত) গাছ পালা জন্তু জানোয়ারের পরজন্ম আছে!

মাষ্টার মশাই হাসলেন। সে হাসিতে সকলেই যোগ দিলেন।

ফোরম্যান—হাসবেন না মশাই, হাসবেন না আছে। তাই বসন্তে ফুল ফোটে, বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হয়ে তার প্রণয়ীকে ডাকে, ভ্রমর আসে, ফুল ফলে পরিণত হয়, বীজ তার মাতা ধরিত্রীর গর্ভে অঙ্কুরিত হয়, সন্তান জন্মে—সেই বৃক্ষলতার পরজন্ম। জীব জগতেও পশু এবং মানুষেও সেই ইতিহাস। যৌবন সমাগমে, পুরুষ ও নারী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, সঙ্গমে মিলিত হয়, সন্তান প্রসূত হয়, সেই সন্তান পিতামাতার পরজন্ম। কালে জন্মদাতা ক্ষয় হয়, মরে যায়, সন্তান তার বড় হয়, সন্তান উৎপাদন করে, নিজে মরে যায়। এইরূপ জন্ম ও মৃত্যু, মৃত্যু ও জন্ম পরম্পরায় এই বিশ্বব্যাপী সৃষ্টি স্রোত আদিকাল হ'তে অনন্তের পানে প্রবাহিত হয়েচে। এইতেই সৃষ্টির স্থিতি। মাত্র এক পুরুষ এই প্রক্রিয়া বন্ধ হোক, সৃষ্টি নাশ হবে। তাই এই উৎপাদন পরম্পরার পশ্চাতে রয়েচেন বিশ্ব-জননী

শক্তি, প্রকৃতির এক অদম্য উৎপাদনী প্রেরণা। সে প্রেরণা প্রবল—অতীব প্রবল, আমি চিরকুমার আমি জানি…

ফোরম্যানবাবু শেষের এই কথাগুলি যেন আপন মনেই বল্‌লেন। মন্ত্রণা কক্ষের ক্ষুদ্র বাতায়ন দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছিল। বৈশাখের মধ্যাহ্ণ আকাশে যেন অগ্নি-বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃদ্ধ দেখ্‌লেন যেন তাঁর অন্তরের বহ্নি দিগন্তে প্রতিফলিত হয়েচে। বৃদ্ধ আবার বলতে লাগলেন—

—"সে প্রেরণা, আমাদের সেই পর্ব্বতগুহাবাসী, বননিবাসী, নগ্ন বা লতাপত্রপরিহিত আদিপুরুষদের যুগে, যখন পশু ও মানুষে বিশেষ প্রভেদ ছিলনা, তখনও যেমন প্রবল ছিল, আজ মানব জাতির রূপান্তর ঘটেচে, এখন আমরা রেল চড়ি, মোটর চড়ি—এখন আমরা নীলাম্বু-বিহারী, ব্যোমচারী, মর্ম্মর-মণ্ডিত বিজলী-বিভাসিত—অট্টালিকায় বাস করি, বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত, নানা শিল্পে শোভিত বিলাস কক্ষে অপূর্ব্ব কৌশেয় বেশ পরিহিত স্ত্রী-কন্যা-পুত্র-পরিবেষ্টিত হয়ে গৃহে বসে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বার্ত্তা চোখে দেখি, কাণে শুনি। আমরা এখন সভ্য হয়েচি। কিন্তু অন্তরে আমরা সেই বর্ব্বর, সে প্রেরণা সেই জনন-প্রবৃত্তি আমাদের আজও সমশক্তিতেই তার প্রভাব বিস্তার করে।"

সকলে নীরব। মাষ্টার মশাই ধীরে ধীরে বল্‌লেন—

—"আপনি মানুষ ও পশুতে এক করচেন। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। মনুষ্যসমাজ ঐ পশুপ্রবৃত্তিকে দমন করেছে, অন্ততঃ নিয়ন্ত্রিত করেছে শিক্ষায়, সংযমে, বিবাহ-প্রতিষ্ঠানে। আমাদের বিচার বিবেক আছে, জ্ঞান বুদ্ধি আছে…" ফোরম্যান্—জ্ঞান বুদ্ধি (বৃদ্ধ একটু হাসলেন) দেখুন, আপনার কথা শুনে একটা কথা মনে পড়ে গেল ; রূপকথা হিসাবে কথাটি আমার বড় ভাল লাগে। ভগবান আদম্ ও ইভকে বল্‌লেন—'এই স্বর্গোদ্যানে নানা উপাদেয় ফল আছে তোমরা সব উপভোগ করতে পার, কেবল এই বৃক্ষটির ফল তোমাদের নিষিদ্ধ ; সেটি জ্ঞান বৃক্ষ। ভগবান ভারি বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলেন ; কিন্তু সয়তানী করলে সেই বেটা সয়তান এবং তাই আপনাদের এত জ্ঞান বুদ্ধির অভিমান। বলতে চান জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে প্রবৃত্তির পীড়ন দমন করেছেন, বিবাহপ্রতিষ্ঠান প্রবর্ত্তন করে প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করেচেন? ভ্রম! পারেন নি। পুরাতন উপাখ্যান আলোচনা করবো না, সে সব বলবেন গল্প কথা। আসুন দেখি বাস্তব জগতে, তুলুন দেখি নৈশ-তিমিরের মসী-কৃষ্ণ যবনিকাখানি। দেখতে পাবেন কত শত বিবাহিত পুরুষ পরস্ত্রীগমনে বহুস্ত্রীগমনে রত হয়েচে, কত শত নারী পতির সুখ-তপ্ত শয্যা প্রত্যাখান করে উপ-পতিকে আলিঙ্গন করচে, দিবালোকের কত শত শিক্ষিত, সংযমী, সাধু সন্ধ্যা-সমাগমে রাত্রির আবরণে সয়তানে পরিণত হয়েচে, দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে নারীর প্রতি নৃশংস অত্যাচার, দুগ্ধ-পোষ্য বালিকার প্রতি বীভৎস বলাৎকার, ব্যভিচার, ব্যভিচার। চারিদিকে ব্যভিচার, আর সয়তান হাসচে, বলচে চমৎকার! ফল খাওয়ার ফল ফলেচে! না, না, মহাশয়, পশুপক্ষীতে, বৃক্ষলতায় এত নৃশংসতা এত বীভৎসতা নাই। তাদের কাছে বরং আপনার 'পশু' প্রবৃত্তি নিয়মিত, নিয়ন্ত্রিত এবং আপনার বিচার, বিবেক, জ্ঞান, বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেই সে প্রবৃত্তি আরও জাগ্রত, তীব্রতর, উগ্রতর হয়ে উঠেচে, ঘোর উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হয়েচে। ক্রীড়াপুত্তলীর মত মানুষ তার প্রবৃত্তির দাস। এই অবস্থায়, ঐ প্রাপ্তযৌবনা প্রভাবতী, প্রকৃতি মাতার একটি দুর্ব্বলা সন্তান, বিবাহে বঞ্চিতা হয়ে তার প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির প্রবল পীড়নে যদি আপনাদের কোন একটি সামাজিক বিধান লঙ্ঘন করে থাকে, এই বন্ধুর জীবন পথে যদি বালিকার একবার পদস্খলন হয়ে থাকে ত আমাদের কি কর্ত্তব্য নয় পতিতাকে উদ্ধার করা, তাকে হাত ধরে নিরাপদে এনে জীবনের একটি সরল পথ প্রদর্শন করা। দণ্ডবিধানই কি সমাজের একমাত্র উদ্দেশ্য? ক্ষমা সহানুভূতি সহায়তা নয়! এই উদ্দেশেই ত বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত মানব সঙ্ঘবদ্ধ হয়েচে, সমাজের সৃষ্টি করেচে। আমরা যদি একটু সহায়তা করতাম, যে অর্থ আমরা বিলাস ব্যসনে অপচয় করি তার সহস্রাংশের একাংশ দিতাম তা হলে ত ঐ প্রভাবতীর এ দুর্গতি হত না। একটু ভেবে দেখুন, শুষ্ক শাস্ত্র দিয়ে নয়, প্রাণ দিয়ে—বুঝতে পারবেন। এখন না বোঝেন—ঈশ্বর না করুন যদি কখনও নিজের গায়ে হাত পড়ে তখন বুঝবেন। বৃদ্ধ প্রিয়নাথ সরকার আজ প্রাণে প্রাণে বুঝচে। আমার বক্তব্য শেষ হয়েচে। বালিকার সামাজিক ব্যভিচারে আপনারা যেরূপ ক্রুদ্ধ তাতে আদালতের অভিযোগ সম্বন্ধে আপনাদের নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তে আসা অসম্ভব, তাই এই দীর্ঘ আলোচনা।

মকদ্দমার সাক্ষ্য প্রমাণাদির বিচার আমাদের প্রথমেই হয়ে গেছে। টিফিনের সময়ও শেষ হ'ল, জজ সাহেব ফেরবার সময় হয়েচে। এইবার আপনারা আপন আপন অভিমত জ্ঞাপন করুন, আমি লিপিবদ্ধ করেনি।

—প্রথম ?

একজন জুরী—নির্দোষ।

ফোরম্যান (ফোরম্যান একটু আশ্চর্য্য হয়ে তার দিকে চাইলেন।) দ্বিতীয়,—আমি নিজে নির্দোষ।

—তৃতীয়, আপনার কি রায় ?

—দোষী।

—চতুর্থ, আপনার কি ?

—দোষী।

—পঞ্চম আপনার ?

—দোষী।

* * * *

(৪)

হঠাৎ এজলাস ঘরে একটা ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল, জুরী ফিরচে। পিয়াদা ছুটে সাহেবকে খাস্ কাম্‌রায় খবর দিয়ে এল জুরী ফিরেচে। সাহেব ব্যস্ত হয়ে এজলাসে এলেন। জুরিগণ গম্ভীরভাবে নতশীরে ধীরে ধীরে স্ব স্ব আসন গ্রহণ করলেন; দাঁড়িয়ে রইলেন কেবল 'ফোরম্যান'; তাঁর হাতে একখানি কাগজ, তাইতে নয় জন জুরীর রায় লেখা। সেই স্তব্ধ বিচার কক্ষে সকলেই উৎকণ্ঠিত, উদ্‌গ্রীব—কি হয় কি হয় রণে জয় পরাজয়, 'দোষী না নির্দ্দোষ', খালাস না কারাবাস। সংশয়-পীড়িত আসামী-দের ততক্ষণ হৃৎকম্প হচ্ছিল; এখন চরম মূহূর্ত্ত উপস্থিত, হয় খালাস, নয় কারাবাস! এই সঙ্কটকালে বৃদ্ধ একবার তাঁর ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করলেন এবং প্রভাবতীর দিকে চাহিলেন যদি তাঁর দৃষ্টিতে ত্রস্ত বালিকা মনে একটু বল পায়। তাঁর ওষ্ঠ একটু কম্পিত হল যেন কিছু বলবেন, কিন্তু কণ্ঠ রুদ্ধ, বাক্য স্ফুর্ত্তি হল না। প্রভাবতী কিন্তু নিজের ভবিষ্যত সম্বন্ধে নির্ভীক। কি করে সে সমাজে ফিরবে, কি মুখ নিয়ে সে লোকের কাছে মুখ দেখাবে—এ সব কথা সে [illegible] খুবই ভেবেছে। এখন সে বুঝেছে যে [illegible] তাঁর উপযুক্ত সাজা; এ বিচারে [illegible]

আশ্রয় স্থল। কিন্তু তার মামাবাবু? তিনি যে বালিকাকে আশৈশব তাঁর যত্ন ভালবাসায় আবৃত করে রেখেছিলেন, তার পিতামাতার অভাব একদিনের জন্য অনুভব করতে দেননি—সেই বৃদ্ধ শোকার্ত্ত মাতুল আজ তারই অপরাধে বিপন্ন, কারাবাস আসন্নপ্রায়, এই ভয়েই বালিকা ব্যাকুল হৃদয়ে জুরিগণের রায় প্রতীক্ষা করতে লাগল।

জজ সাহেব ফোরম্যানকে জিজ্ঞাসা করলেন—

—আপনারা কি একমত হয়েচেন ?

—না।

—একমত হবার কোন সম্ভাবনা আছে।

—না।

—আপনারা কিরূপ ভাবে বিভক্ত ?

—একদিকে ৭ জন, অপরদিকে ২ জন।

—সাতজনের কি রায় ?

সেই মুহূর্ত্তে আসামী পক্ষের উকিলবাবু ব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেন এবং ইঙ্গিতে 'ফোরম্যান' বাবুকে রায় ব্যক্ত করতে নিষেধ করে জজ সাহেবকে নিবেদন করলেন যে সেই মাত্র তিনি সংবাদ পেয়েছেন যে আদালতে একজন সাক্ষী উপস্থিত —যার উক্তিতে মামলার সকল সত্যই প্রকটিত হবে এবং তার জবানবন্দি নিতে হুকুম দেওয়া হোক। সরকারী উকিলবাবু অনেক আপত্তি করলেন; জজ সাহেব সে আপত্তি অগ্রাহ্য করলেন। জুরীর মধ্য হতে একজন জুরী তাড়াতাড়ি সাক্ষ্য দিতে এলেন, দর্শকবৃন্দ অবাক; সরকারী উকিলবাবু ক্রুদ্ধ হয়ে দারোগাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কে?' দারোগাবাবু তখন বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত, নিষ্পন্দ, নীরব।

সাক্ষী তার জবানবন্দীতে বল্লে যে—যে-দারোগাবাবু এই মামলার তদন্ত করেচেন এবং সরকারী উকিলবাবুর কাছে বসে আছেন তিনিই সাক্ষীর পিতা। যে-শিশু সম্বন্ধে এই মকদ্দমা, সেটী সাক্ষীরই সন্তান। প্রভাবতী যখন সন্তান-সম্ভাবিতা হয় তখন সাক্ষী লজ্জায় ও ভয়ে তার সঙ্গ পরিত্যাগ করে। কিন্তু যখন ক্রমে প্রভাবতীর পাপ প্রচার হবার উপক্রম হয় যখন রোগে শোকে শয্যাগত প্রিয়নাথ সরকার দারুণ বিপন্ন হন্ তখন সাক্ষী গোপনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তার অপরাধ স্বীকার করে, কলিকাতার একটি মাতৃসদনে প্রভাবতীকে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে এবং ঘটনার দিন সদ্যপ্রসূত শিশুটিকে [illegible] আসামীদের [illegible]

থেকে নিয়ে আসে। আসামীরা সাক্ষীরই হাতে শিশুটাকে সমর্পণ করে পূর্ব্বেকার ষ্টেশনে নেমে যায় এবং সাক্ষী সহরের ষ্টেশনে এসে শিশুকে গাড়ীতে রেখে নিজে নেমে যায় ও গাড়ীর সম্মুখেই অপেক্ষা করে। খাতুওয়ালা শিশুকে পায় ও সাক্ষীকে দেখায় এবং তারই কথায় ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে নিয়ে যায়। মাষ্টারবাবু সাক্ষীর পিতার কাছে রিপোর্ট করেন এবং শিশুটীকে জমা দেন। তখন শীতকাল ও অনেক রাত এবং সাক্ষীরই প্রস্তাবে শিশুটাকে তার মার কাছে রাখা হয় যে মামলার নিষ্পত্তি অবধি শিশু তাঁরই কাছে থাকবে। প্রভাবতীর গ্রেপ্তারের পরেও সাক্ষী তার পিতার ভয়ে সত্য প্রকাশ করতে সাহস পায়নি। কিন্তু যখন দেখ্‌লে যে নিরপরাধী প্রভাবতী এবং তার বৃদ্ধ মাতুলের কারাবাস অনিবার্য্য, আসন্নপ্রায়—তখন সে লজ্জা ভয় পরিত্যাগ করে সত্য প্রকাশ করতে প্রস্তুত হয়েচে। হিন্দু মতে হোক, ব্রাহ্ম মতে হোক, যে কোন মতে হোক—সে প্রভাবতীকে বিবাহ করতে এবং প্রসূতি ও সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

সরকারী উকিলবাবু জেরা করলেন না। জজ সাহেব জুরীদের বোঝালেন যে তাঁরা যদি এই সাক্ষ্য বিশ্বাস করেন (এবং তাঁর মতে অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই) তা হ'লে তাঁর নির্দ্দেশ যে জুরীরা এক বাক্যে নির্দ্দোষ রায় দেন। জুরীরা রায় দিলেন—"নির্দ্দোষ।"

জজ সাহেব হুকুম দিলেন 'খালাস'।

আদালতে হৈ হৈ পড়ে গেল। পাহারওলা চীৎকার করলো চুপ চুপ। আসামীপক্ষের উকিলবাবু শিশুটি সম্বন্ধে জজসাহেবের হুকুম প্রার্থনা করলেন। জজ সাহেব প্রিয়নাথ সরকারকে জিজ্ঞাসা করলেন—তিনি কি প্রভাবতীকে গৃহে স্থান দিবেন—না, সে তার ব্যভিচারের জন্য সমাজচ্যুতা পরিত্যক্তা হবে।

খালাসের খবর শুনে প্রিয়নাথের হৃদয় তখন আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ, তিনি তখন নির্ব্বাক। কয়দিন যাবৎ বৃদ্ধ নিজের সম্বন্ধে, প্রভাবতীর সম্বন্ধে, সমাজের সম্বন্ধে অনেক চিন্তাই করেছেন; কখনও লজ্জাভারে অবনত, কখনও রোষে উত্তেজিত ক্রুদ্ধ, এইরূপভাবেই তাঁর দিন কেটেচে। এখন জজ সাহেবের প্রশ্নে তাঁর মনের সকল কথা একত্র ব্যথা একসঙ্গে উথলে উঠলো। সব কথাই শোনাবেন, সব ব্যথাই জানাবেন কিন্তু কোনটা আগে কোনটা পরে বল্‌বেন তার ঠিক পেলেন না, তাই ধারাবিহীন অসংলগ্নভাবে বল্‌তে লাগ্‌লেন—

—ধর্ম্মাবতার, প্রভাবতাকে সমাজে নেবে কি জাতে ঠেলবে তা জানি না। হয়তো ঠেলবে, ওকেও ঠেলবে, আমাকেও ঠেলবে। আমার বাড়ী কেউ আর পাত পাড়বে না। আমাদের হাতে জল খাবে না। আমার ক্ষতি নাই হুজুর, আমি আর ক'দিন। দোষ তো আমারই; মেয়ে বড় হল, ২১ বৎসর উত্তীর্ণ হল, তবুও বিয়ে দিতে পারিনি। চেষ্টা করতে কসুর করিনি হুজুর, দশ বচ্ছর ধরে ঘুরিচি। যেখানে পাত্রের খবর পেয়েচি, ছুটে গেচি। গ্রামে গ্রামে ঘুরেচি, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরেচি, যতুক দেবার ক্ষমতা নেই, যেখানে গেচি কুকুর শিয়ালের মত আমায় তাড়িয়ে দিয়েচে। ক্রমে আমাকে দেখলে লোকে মুখ ফিরুতো, যেন সত্যই আমি একটা হচ্চে কুকুর—সমাজের একটা ব্যাধি। বাড়ীটুকু বন্দক দিয়ে, বিক্রী করে টাকার চেষ্টায় ফিরেচি, কোথাও পাইনি, সকলেই দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েচে—জলের দর বলেচে, তাতে বিয়ে হয় না। কি করি, কাকে ধরি, কেউ মুখ চায়নি, একজনও না। এদিকে মেয়ে বড় হয়ে উঠ্‌লো, বাড়ীতে কেউ নেই, বয়স দোষে একটা দোষ করে ফেললে, খুবই ভারি দোষ কিন্তু তার ফল ভুগেচে। আমরাও ত বয়সকালে কত দোষ করেছি হুজুর, কিন্তু তখন কে কার দোষ ধরেচে? কিন্তু ধর্ম্মাবতার, ও ভুগেচে, খুবই ভুগেচে। তবুও যদি ওকে না নেয়, জাতে ঠেলে ঠেলুক, আমি ওকে ঘরে নিয়ে যাবো। যারা আজ দশ বচ্ছর আমার মুখ চায়নি, আমি তাদের মুখ চাইব, তাদের হুকুম মানবো! না হুজুর, আমি ড্যাং ড্যেঙিয়ে মেয়ে নিয়ে ঘরে যাবো। আমার মেয়ে, আমি না নিলে ঐ সমর্থ্য মেয়ে যাবে কোথা হুজুর? বলুন—কসবী হবে! (বৃদ্ধের চক্ষুদ্বয় অশ্রুজলে পূর্ণ হলো) না, না, ধর্ম্মাবতার, প্রিয়নাথ সরকার বেঁচে থাকতে তা হতে দেবে না। আমি মেয়ে ঘরে নিয়ে যাবো, বিয়ে দেবো, ছেলের বাপ বিয়ে করবে আমি জানি, তার বাপ তাকে ঠাঁই না দেয়, আমার কুঁড়ে ত আছে, আর ত বিয়ের জন্যে আমার বাড়ী বেচতে হবে না, হুজুর। আমি মেয়ে ঘরে নিয়ে যাবো।

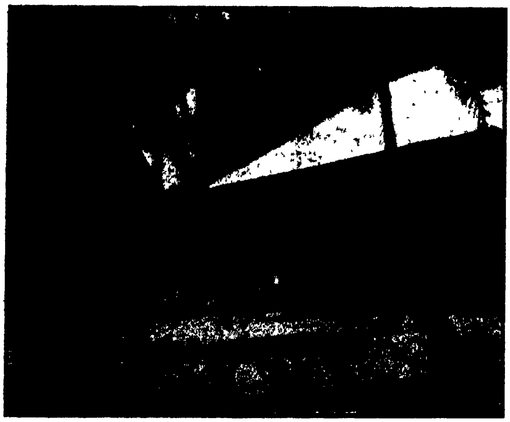
জজ হুকুম দিলেন—

—পরিত্যক্ত শিশু প্রভাবতীকে প্রত্যর্পিত হোক্‌।

মলয়-যাত্রী

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল

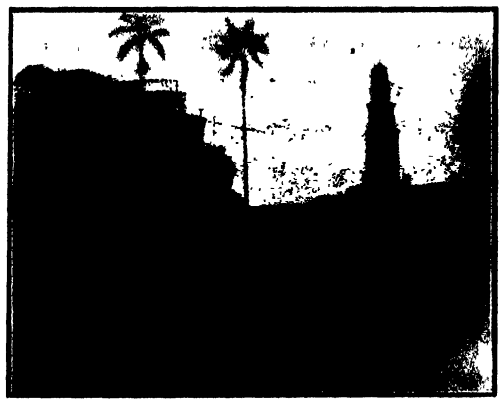
মলয়দেশের রেল-পথ, সংযুক্ত মলয়, ঔপনিবেশিক মলয় এবং ঐদেশের অ-যুক্ত রাষ্ট্রগুলির সংযোজক। শ্যাম-দেশের রেল-পথের সঙ্গে এ রেলের যোগ আছে। আবার ইন্দো-চীন ও ব্রহ্মের রেল-পথের সঙ্গে শ্যামের রেল-পথ সংযুক্ত। সুতরাং স্থল-পথে এই সব দেশে ভ্রমণ কর্বার সুবিধা আছে যথেষ্ট। পথও প্রকৃতির লীলা-ভূমির বক্ষ-ভেদ ক'রে রচিত। পেনাঙ্ হ'তে সাত দিনে ব্যাঙ্কক, অযোধ্যা, অরণ্য, অংকর এবং সাইগন দেখে আবার ফিরে আসা যায়। সোজা এক দিনের পথ ব্যাঙ্কক।



মলয়-পল্লী।

কোয়ালা লামপুর স্টেশন ভারি চমৎকার। স্থানটিও মনোরম। কোয়ালা লামপুর যুক্ত-মলয়ের রাজধানী, সমুদ্র-তীরের বন্দর পোর্ট সোয়েটেনহাম হ'তে সাতাশ মাইল দূরে অবস্থিত। মধ্য-পথে পড়ে কেলাঙ। সমস্তটা সিলঙ্গর রাজ্যের মধ্যে। পেনাঙ্ ছেড়ে জাহাজ নঙ্গর করলে সোয়েটনহাম বন্দরে—সারা রাত ছুটে।

কোয়ালা মানে মোহানা—মলয়-শব্দ। কিন্তু সিলঙ্গর যে শ্রীনগর, লামপুর—রামপুর, কেলাঙ্গ—কলিঙ্গ, পেরাক—প্রাক্ লিঙ্গ—শিবলিঙ্গ, ত্রিংগনু—ত্রিগুণ প্রভৃতি শব্দের অপভ্রংশ—আমাদের প্রত্নতত্ত্ব সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'ন। বৃহত্তর ভারতের অংশ মলয় হিন্দুধর্ম্মকে বর্জ্জন করেছে তবু, সে কৃষ্টির অফুরন্ত টুকরা—তার ভারত-প্রীতির নিশানারূপে বক্ষে ধারণ করে আছে। কিন্তু সকল চরম সিদ্ধান্তের অন্তিম দিন আসে—অপরের চরম সিদ্ধান্তের চরম অস্ত্রাঘাতে। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা ক'রে—আমার মুখ-রোচক চরম সিদ্ধান্ত-গুলা মর্ম-বেদনায় গুমরে উঠ্‌লো। কারণ বুঝলাম শব্দগুলা সবই স্থানীয়—সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশ নয়। শিবাস্তবল—যেমন শিবের আস্তাবল অর্থাৎ বলীবর্দ্দের বিশ্রাম-স্থল নয়, লামপুরও তেমনি রামপুর নয়—মলয় কথা লুম্পুর। সিঙ্গাপুর



কোয়ালা লামপুর যাদুঘর।

যে সিংহপুর প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্ তা অস্বীকার কর্তে পারবেন না। যাদের বদ্ধ-ধারণা—আয়ারল্যাণ্ড মাদ্রাজী আয়ারদের আদিম জন্মভূমি—মিশর, মিশ্র ব্রাহ্মণদের উপ-নিবেশ—মঙ্গোলিয়া—সর্ব-মঙ্গলাদেবীর পীঠস্থান এবং স্থানসেন, জোহানসেন ও সান ইয়েট সেন জবাকুসুম-আবিষ্কর্ত্তা স্বর্গীয় সি কে সেন মহাশয়ের আত্মীয়—তারা যেন উপরোক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সান্নিধ্যে নিজ নিজ বদ্ধ ধারণা যাচাই করবার জন্য ঘরের পয়সা খরচ ক'রে না যান—এই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ।

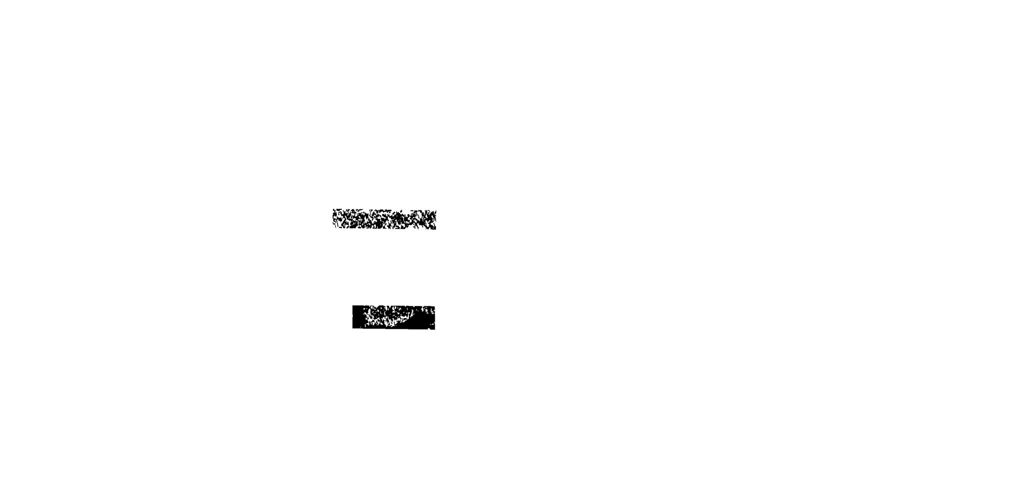
এত রকম বিপ্লব ও এত ভিন্ন-জাতির সমাগম হ'য়েছে মলয়ে—যে তার পক্ষে কোন সংস্কৃতি শুদ্ধ রাখা সম্ভবপর

হয়নি। মুসলমান মলয়—সভ্য মলয়—পাঁচ ফুলের সাজি। আদিম মলয় আমাদের কোল ভীল সাঁওতালদের মত বন্য-জাতিরূপে আজিও বিদ্যমান। তারা এখনও চোদ্দ আনা নগ্ন অবস্থায় গিরি-জংগলে বাস করে। বন্দরের ধীবরদের ছেলে যারা সে-ণ্ট কুড়তে জলে ডুব দেয় তারা ওরাঙ্ লৌত—সাগরের মানুষ।

পোর্ট সোয়েটেনহামের যে সাহেব সোয়েটেনহামের স্মৃতিতে নামকরণ হ'য়েছে—সুনীতিবাবু না ব'লে দিলেও আমরা বুঝে নিয়েছিলাম—যদিও ছুটির দিনে এমন তার্কিক কারাপারায় ছিল যে সোয়ে ডাগনের সোয়ে বরতনুর টন এবং অহমের হাম যোগ ক'রে প্রত্নতত্ত্বের হাম্‌জুল্লির আভাষ দিয়েছিল।

পাতলুন পরা—মুখে সিগারেট এক চীনে যুবক পাঁচ ডলারে আমাদের নিয়ে যেতে রাজি হ'ল। সে পিতৃহীন—বিধবা-জননীর একমাত্র সন্তান—এখনও অনূঢ়। সে অপর দুখানা গাড়ী জুটিয়ে দিলে। কাজেই তিন গাড়ী বাঙালী যাত্রা করলাম রাজধানী অভিমুখে। সঙ্গে তিন জন মহিলা ছিলেন।

সোয়েটনহাম থেকে কিলাঙ্গ সহর অবধি পথ ছোট-নাগপুরের পথের মত। পথ সেই রকম কিন্তু বর্ণ বিভিন্ন। ধারের পাহাড়গুলা সবুজ—অনেক বন-ফুলে মনোরম-দর্শন আর মলয়ের সূর্য্য-কিরণে চমৎকার আলো ও ছায়ায় চিত্রিত। রাজপথ চলেছে প্রধানতঃ রবারের বাগান ভেদ ক'রে—সারি দিয়ে রোপিত গাছ ঘোষণা করছে মানুষের



কোয়ালা লামপুর স্টেশন ও সমর-স্মৃতি

বন্দরটি জাহাজ থেকে দেখলে ভ্রম হয় খিদিরপুর ইত্যাদি; কারণ নবীন জগতের সকল বন্দরের আকৃতি এক—ডেরিক, ক্রেণ, রেল, করগেট টিনের গুদাম। নবীনতার নাগপাশ ভেদ ক'রে যে সহরে পৌছান যায় সেটি বিশেষত্বহীন। একটা বড় গঞ্জ যেমন। পাকা বাড়ীর সঙ্গে মাচায়-তোলা বাড়ী—আর মলয় ও ভারতীয়ের সঙ্গে চীনে মিশে আন্ত-র্জাতিক মলয়ের সাধারণ চিত্রের প্রতিরূপ সম্পাদন করেছে।

সত্তর মাইল পরিভ্রমণ করলে তবে কোয়ালা লামপুর দেখে আবার জাহাজে ফেরা যায়। শিখের ট্যাক্সির দর বেশী। রেশমী হাতকাটা খেলবার কামিজ ও শাদা

জ্যামিতি সরল-রেখা ও শ্রম-শিল্পের সাধনা। যেখানে মলয় গ্রাম আছে সেখানে জমি বাঙ্‌লা দেশের মত—সবুজ জমি—বালির রঙের বা রাঙা মাটি নয়—কাদার রঙের জমি। মাঝে মাঝে ক্ষিপ্র ছোট নদী—যার কূলে গাছের ডালে বসে চীৎকার করছে মাছরাঙা। এরা মাঝে মাঝে জলে ছোঁ মারছে। হাঁড়িচাঁচা—ঢেঁকির মত ল্যাজের বাহার দেখিয়ে উড়ছে গাছ থেকে গাছে—আর করুণ প্রেমের বুক-ভাঙা বিরহ-সঙ্গীত গাইছে ঘুঘু। সেদিন মেঘ ছিল—পাতলা কালো মেঘ যাদের পিছনে দুপুরে সূর্য মুখ লুকাচ্ছিলেন। তারা যখন রবিকে ছেড়ে উত্তরদিকে যাত্রা

করবার উপক্রম করছিল কৃতজ্ঞ ভাস্কর মেঘের জলভরা কালো আঁচলে চক্‌চকে শাদা পাড় এঁকে দিচ্ছিল। আলো-ছায়া নীল-সবুজের খেলা চল্‌ছিল বাঙলা দেশের চিরাচরিত ধারায়। নূতনত্বের মধ্যে উঁচু-নীচু পথ—রবারের বাগান আমবাগানের পরিবর্তে। মাঝে মাঝে দৃষ্টিপথে পড়ছিল তালগাছের কাণ্ড ও কলাগাছের পাতার একত্র সমাবেশ—পান্থ-পাদপ।

বিদেশে আমরা যে সব পদার্থ দেখে পুলক অনুভব করি—দেশে তাদের প্রতি চক্ষু মেলে তাকাই না। পান্থ-পাদপ ইডন উদ্যানে আছে—বোটানিকাল গার্ডেনে আছে।



ফ্রেজার শৈলের পথ

অনেক সহযাত্রী কিন্তু রোমাঞ্চিত হলেন প্রথমে এই দুর্লভ দর্শনের সাক্ষাৎলাভ ক'রে মলয়-দেশে। একবার কলিকাতার এক বন্ধু বর্দ্ধমানে রাজ-গৃধ্র দেখে বলেছিল—আহাঃ কি সুন্দর পাখী? আমি বলেছিলাম—শাল-হাঁস। তার সুন্দরের তালিকার মধ্যে শাল-হাঁস এখনও বোধ হয় স্থান অধিকার ক'রে আছে।

কিলাঙ ছোট সহর। দোকান পাট আছে—মজলিসী লোক আছে—দুঃখী আছে—দোকানে শুঁটকী মাছ আছে।

এই সহরের পর আরম্ভ হ'ল টিনের খনি—রাণীগঞ্জ পার হ'লে যেমন কয়লা ও লোহার খনির রাজ্য। দেশের লোক ও খনিজ লাভ সম্বন্ধে অবস্থা বাঙ্‌লা-দেশ অপেক্ষা শোচনীয়। কারণ বাঙ্‌লাদেশে কতকগুলা খনির বাঙালী স্বত্বাধিকারী আছে—মলয় অধিকৃত টিনের খনির কিন্তু সন্ধান পেলাম না। মালিক সব চীনা এবং ইউরোপীয়।

মলয়ে টিনের কাজ করে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্টেট্‌স ট্রেডিং কোং। এদের মূলধন এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ডলার। এরা বছরে ৮০,০০০ টন টিন বাজারে বিক্রয় করে।

মলয়ের সমস্ত রাস্তাই চমৎকার। টিন, রবার, নারিকেল-দড়ি, কিছু পেট্রোলিয়ম, সুপারী মসলা প্রভৃতি বিক্রয় ক'রে মলয় যে অর্থ উপার্জ্জন করেছে—তার কতক অংশে পথ-নির্ম্মাণ ক'রে বাণিজ্যের প্রসার করেছে। মান্ধাতার আমলে তৈরী মাটির রাস্তায় মহিষ ও বলীবর্দ্দের বেগহীন শক্তির ওপর নির্ভর ক'রে কোনো দেশ ব্যবসা বাণিজ্যে সাফল্যলাভ কর্তে পারে না এই প্রতিযোগিতার দিনে। মোটর লরিও চল্‌তে পারে না উত্তম রাজপথ না পেলে। মলয় এ সত্য উপলব্ধি করেছে—সে সত্য কাগজে কলমে ভারতবর্ষে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু শাশ্বত সত্যকে দৈনন্দিন কাজে লাগাবার চেষ্টা যেহেতু অসংখ্য কাজে হয়নি—ভারতের পথ-ঘাট ধুলা-কাদার আকররূপে বিরাজমান। বহু নীতিসূত্রের সঙ্গে পথ-রচনার নীতি নীতি-পুস্তকের বিরাম শয্যায় কুম্ভকর্ণ-নিদ্রায় সুপ্ত।

একটা নদী পার হ'য়ে পৌছালাম কোয়ালা লামপুর। প্রথমেই নজরে পড়ে অতি সুনির্ম্মিত রেল-স্টেশন, মসজিদ এবং যাদুঘর। যাদুঘর নূতন। এ-প্রতিষ্ঠান মলয় দেশের জীবজন্তু, মাছ, পাখী, অস্ত্র-শস্ত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে

পূর্ণ। অবশ্য কলিকাতার যাদুঘরের তুলনায় এ যাদুঘর নগণ্য। কিন্তু মলয় দেশকে বুঝতে গেলে এ প্রদর্শনীর পদার্থগুলি অধ্যয়ন করা বিশেষ আবশ্যক। সোণা, রূপা, পিতল, তাঁবা প্রভৃতি ধাতুর শিল্প পর্য্যালোচনা করলে মলয়ে ভারতবর্ষের কৃষ্টির প্রভাবের মাত্রা বুঝতে পারা যায়। মল-বালা চন্দ্রহার প্রভৃতি একেবারে দক্ষিণ ভারতের অলঙ্কারের অনুরূপ—কেবল দেশের তদানীন্তন দারিদ্র্য প্রতিফলিত তাদের লঘুতায়। অস্ত্র নানা জাতীয়। প্রস্তর যুগের আয়ুধ—তার সঙ্গে ভারতবর্ষের খড়্গ-তরবারি বরশা-কুঠার কিরীচ—তার উপর চীনেদের মারাত্মক অসি এবং অবশেষে আরবী খন্‌জর প্রভৃতি প্রমাণ করে দেয় এদেশের রাজ-নীতির ইতিহাস। বেতের কাজ, চ্যাটাই-মাদুর, মাছ ধরবার বেত ও বাঁশের খাঁচা আর বড় বড় জাল দেখে মনে হয় ভারতের দুলিয়াদের সঙ্গে ওদেশের ধীবরদের জ্ঞাতিত্ব আছে। অবশ্য মাত্র অস্ত্রের প্রকার পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত যুক্তিমূলক হয় না। কারণ জলের মাছকে বন্দী ক'রে ডাঙায় তোলবার একই উপায় মানুষের মতি ভিন্ন দেশে ব'সে উদ্ভাবন কর্তে পারে।

কোয়ালা লামপুর যুক্ত মলয়ের রাজধানী, পোস্ট অফিস, পরিষদ ইংরাজদের ব্যাঙ্ক ও দফ্‌তর প্রভৃতি বৃহৎ প্রাসাদ-তুল্য ইমারতে পূর্ণ। তার উপর মলয়ের পরিচ্ছন্নতা। এখানে সাক্ষাৎ পেলাম কারাপারার আরও অনেক যাত্রীদের। স্ট্যাম্প এখানে বিভিন্ন—ইংরাজ-রাজের মূর্তি চিত্রিত নয়।

কোয়ালা লামপুরের বোটানিকাল গার্ডেন পাহাড়ের ধারে। সেই পাহাড়ের মাথার ওপর উঠ্‌লে সমস্ত সহর দেখা যায়। ব্যাপার একই রকম—বড় বড় প্রাসাদ গবর্ণমেণ্ট ও বিলাতী বাণিজ্যের অর্থে নির্ম্মিত। বড় দোকানদার সব চীনে। দুএকটা দোকানের মালিক মলয় কিম্বা ভারতবাসী, মাদ্রাজী বা সিন্ধী। বড় বড় ক্লাব আছে ইউরোপীয়দের।

দশম তুয়া—কোয়ালা লামপুরের ১৩ মাইল দূরে। এখানে গরম জলের প্রস্রবণ আছে। বাটু গিরি-গুহা ভীম দর্শন চুণো-পাথরের পাহাড়ে অবস্থিত।

কোয়ালা লামপুর হ'তে ৪০ মাইল দূরে ফ্রেজার হিল। নূতন পাহাড়ে সহর। কার্শিয়ঙের মত উঁচু। কিন্তু এই ৪০ মাইল পথ স্মরণ করিয়ে দেয় তরাইয়ের জংগল। আসামের লামডিং প্রভৃতি গিরিবর্ত্ম যেমন—তেমনি পথ ফ্রেজার শৈলের। অতি মনোরম গাছের ছায়া—আঁকা-বাঁকা উঁচু নীচু রাস্তা।

হিন্দু সভ্যতার দিনে সকল মনোরম স্থানে পৌঁছেই রাজারা এক একটি মন্দির নির্ম্মাণ করত। ধর্ম্মশালা মঠ বিহার প্রতিষ্ঠা ক'রে আধ্যাত্মিকতার শ্রেষ্ঠতা প্রচার কর্ত। তারা স্বর্গ খুঁজে দিন কাটাতো—মনোরম স্থান মাত্রেই স্বর্গের ছায়া দর্শন কর্ত। ইউরোপে মধ্য যুগের সভ্যতা গজিয়েছিল রোম-সাম্রাজ্যের ধ্বংস স্তূপ থেকে মাল-মশলা আহরণ ক'রে। কাজেই বীরতা ছিল তাদের কামনার বস্তু। তারা শৈল-শিখর, নিভৃত কানন বা নদীর কূলে



মালাক্কার কেল্লার ধ্বংসাবশেষ

দুর্গ ও প্রাসাদ রচনা ক'রে ক্ষাত্র-ধর্মকে প্রাধান্য দিয়েছিল। ইসলাম মূর্তি-পূজা বন্ধ ক'রেছিল। কিন্তু অতি-মানবের সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ ক'রে প্রিয়ের স্মৃতি ও স্থাপত্য-শিল্পকে অমরত্ব দান করবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করত মুস্‌লিম। আধুনিক সভ্যতা বোঝে—চক্ষু মুদ্‌লে সব অন্ধকার। সুতরাং ভগবান যে সৌন্দর্য করুণ করে বিলিয়েছেন তাকে উপভোগ করা বুদ্ধিমানের কাজ। জগতটা যদি হয় তাঁর খেলাঘর তাহ'লে সেই খেলাঘরে আমরা খেলব না কেন? তাতে শরীর পুষ্ট হয়—সৌন্দর্য উপভোগ করবার সামর্থ্য বাড়ে। তাই ফ্রেজার শৈলে, গুলমার্গে, সিমলায়, উটীতে ইউরোপ খেলার মাঠের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু খেলতে গেলে ক্ষুধা পায়—ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে গেলে অর্থ চাই।

তাই প্রতীচ্য ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার করে বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করে। পৃথিবীর সকল রম্য স্থানে আজ মনোরম পান-ভোজনের বিরামাগার খেলার মাঠ ও ক্লাব গজিয়ে উঠেছে। পার্শী ও হিন্দু সূর্যকে মনে মনে ভজনা করে। ইউরোপ তার প্রখর কিরণে শাদা অঙ্গকে ধূসরবর্ণ করে। সূর্য-দেবতার সাক্ষাৎ প্রসাদলাভের আকাঙ্ক্ষায় তারা সাগর বেলায় শৈল-শিরে ও সহরের উপবনে রশ্মি-স্নান করে।

সান্ধ্য-ভোজের পর সোয়েটানহাম বন্দর ছেড়ে কারা-পারা মলকায় নজর করলে তার পরদিন প্রভাতে। মলক্কায় পৌছাবার পূর্ব্বে মলক্কা উপসাগরের যে অংশে আমরা এলাম চীন বিজেতা—তারপর শ্যাম—তারপর পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ ইংরাজ। বিধ্বস্ত জর্জরিত মলাক্কা তার বুকে অনেক অস্ত্রের লেখা নিয়ে অর্ধ-মৃত অবস্থায় ধুঁকচে। সকল সমৃদ্ধি সিঙ্গাপুর প্রভৃতিতে স্থানান্তরিত হয়েছে।

মলক্কার পাদমূলে সাগরও শুকিয়ে গেছে। প্রায় দুই মাইল দূরে আমাদের জাহাজ নোঙ্গর করলে। আমরা লাঞ্চে আরোহণ করলাম। মলক্কা-নদী এসে মিশেছে সাগরে। বেচারা ক্ষীণস্রোতা স্বল্পতোয়া—যেন বেলেঘাটার খাল। নীল-সাগরের মাঝে কর্দম-ধূসর নদীর জল প্রায় আধ মাইল নিজের বিশিষ্টতা রক্ষা করেছে। তার রেখা ধ'রে অগ্র-গমন করলে আমাদের মোটর জাহাজ। নদীর মুখেই সহর। বামপার্শ্বে অনেক সিঁড়ি আছে তার পার্শ্বে প্রকাণ্ড টিনের তৈরী গুদাম। যার মাঝে চীনের মেয়েরা বসে ক্রেপ রবার প্যাক করছে। অদূরে সেতু—সহরের দুই অংশকে এক করেছে।



সেণ্ট জেভিয়ারের কবর—মালাক্কা

ছোট সহর মলাক্কা। প্রাসাদ নাই—অপ্রশস্ত পথ। মোটরগাড়ী মাত্র দুখানা ছিল—মেয়েদের চড়িয়ে দিয়ে আমরা দু'জন দু'জন ক'রে রিকসায় উঠলাম। একজন সাঁতার-কাটা মেমও রিকসায় বসলেন স্বামীর ডানদিকে।

তার জল নীল দুই কূলে বেত গাছ মলয়ের হাওয়ায় স্পন্দিত নাচের ছন্দে বিভোর। বেত-গাছের পাতায় ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্য-কিরণ সাগরের শান্ত নীল জলে অনেক বিচিত্র চিত্র আঁকছিল। ধীবরদের নৌকা পাল-ভরে চলে যায়—কোন দিকে নাহি চায়। মাঝে মাঝে ওরাঙ্‌ লৌত-দের গ্রাম—মাচায় তোলা কুটীর।

মলক্কা পুরাতন সহর—পর্ত্তুগীজদের দুর্গ ছিল এখানে। ইংরাজ ওলন্দাজের নিকট ক্রয় করেছিল মলক্কা। মলক্কাকে ঘিরে মলয়ের ইতিহাস। শ্রীবিজয় রাজ-বংশ—তারপর

আমাদের দেখবার উদ্দেশ্য ছিল—মলাক্কার প্রাচীন দুর্গ আর ভাঙা গির্জা যার মধ্যে এক সময় ছিল সেণ্ট ফ্রান্সিজ জেভিয়ারের কবর।

রিক্স কুলীগুলা আকাট চীনে—কোন ভাষা বোঝে না। যে বাজারে সিদ্ধ হাঁস ঝুলছে আর ঝলসানো শূকর—তার মাঝখান দিয়ে নিয়ে গেল এক মদের দোকানে। চীনে দোকানদারকে বল্লাম—এদের বুঝিয়ে

দিন কেল্লার ভগ্নাবশেষ আর সেণ্ট জেভিয়ারের সমাধি দেখব।

দুই পক্ষই সবেগে চীনা ভাষা বলতে লাগলো। অবশেষে চীনা ভদ্রলোক বল্লে—এরা যে ভাষা বলে আমি বুঝি না এবং মলয় ভাষা বোধহয় বোঝে এরা—কিন্তু আমি তা বুঝি না। শুনতে পাই ভারত স্বরাজ পেতে পারে না—কারণ তথায় নানা ভাষা প্রচলিত! চুলোয় যাক রাজনীতি!

তারপর ভদ্রলোক আমাদের বসবার চৌকী দিলেন। আমরা বুঝিয়ে দিলাম যে খরিদদার হিসাবে আমরা অপদার্থ, কারণ আমরা সুরা-রসে বঞ্চিত। সে বল্লে—অতিথি হিসাবে কিছু পান করুন নিদেন সোডা লেমনেড।

বিনয়ে বিনয়ে লড়াই হ'বার পর শেষে আমাদের প্রত্যাখ্যান জয়ী হ'ল। সে ডাকতে গেল এমন ভাষাতত্ত্ববিদ যে কুলীর ভাষা বোঝে। ইত্যবসরে একটা রিক্স-কুলী আমাদের পাশের চেয়ারে বসে কাগজের হাত-পাখায় বাতাস খেতে লাগলো। আর চীনে ভাষায় কইতে আরম্ভ করলে।

তারপর আরম্ভ হল ভাষার মল্ল-যুদ্ধ—হনুমানে কুম্ভকর্ণে হইল হুড়াহুড়ি। শেষে আগন্তুক ভাষাতত্ত্ববিদ্ বল্লেন——ঠিক্ হ'য়েছে। গাড়ীতে উঠুন। এরা সটান নিয়ে যাবে আপনাদের গন্তব্য স্থলে।

তারপর ধন্যবাদ; আবার চীনা-সাহার অনুরোধ তারপর টুঙ্ টুঙ্ ক'রে গাড়ী ছুট্লো কদম্বাজ মানুষের শক্তিতে।

কেল্লা বিশেষ কিছু না—ঢিপির ওপর ভাঙা প্রাচীর। একজন মলয় ভদ্রলোক বল্লে—এর নীচে সুড়ঙ্গ আছে, যার ভিতর দিয়ে সেণ্ট জেভিয়ারের কবরে যাওয়া যায়। এক মাইল দূরে। অবশ্য অলীক কথা।

মুস্কিল হ'য়েছিল গাড়ী থামাতে। থামো, স্টপ্ হেই হোই—কোন শব্দ গায়ে মাখে না বেগমান চৈনিক শ্রমিক।

জজসাহেব বল্লেন—একবার চীনাভাষা চেষ্টা কর না ভায়া—পুলিস কোর্টের অভিজ্ঞতা।

ওঃ! তখন স্যানকীন্ পিকিন্, চাঙ্ওয়াহ্ ডিসিন, আচীন সব চেষ্টা করলাম। ভ্রূক্ষেপ নাই। শেষে বল্লাম—ইয়াংসিকিয়াঙ। ফল পূর্ব্ববৎ। তখন চীৎকার ক'রে বল্লাম চিচিঙ্ ফাক হোয়াঙ্ হো!

একেবারে গাড়ী থামিয়ে তারা হাঁসলে।

সকলকে শিখিয়ে দিলাম—হোয়াঙ হো—চিচিঙ্ ফাক। ঐ কথা বল্লেই গাড়ী থামে।

সেণ্ট জেভিয়ারের খোলা সমাধি। একটি খৃষ্টান বসে আছে। সে সব বোঝালে। পরে তাঁর কফিন মালাক্কা থেকে নিয়ে পর্ত্তুগীজরা গোয়ায় সমাধি দিয়েছে। মাঝে মাঝে কফিন খোলা হয় গোয়া সহরে।

আসিয়ার নানাস্থান থেকে তীর্থযাত্রী আসে গোয়ায়। আমার এক বন্ধু বলেন এতদিনে সেণ্ট জেভিয়ারের দেহ বিকৃত হয়নি। তিনি শান্ত মূর্তিতে শুয়ে আছেন ব'লে বোধ হয়। তাঁর প্রচার কার্যের জন্য তাঁকে বলা হয়—এপসেল অব দি ইস্ট।

শান্ত মালাক্কা ছেড়ে অবশেষে আমরা সিঙ্গাপুরে পৌঁছিলাম। জাহাজ নোঙ্গর করলে কেপেল ডকে—যা



মালাক্কা নদী

কলিকাতার কিং জর্জেস ডকের অনুরূপ। বড় বড় টিনের গুদাম—ঘড়-ঘড় শব্দ ক্রেনের—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব দেশের জাহাজ বাঁধা সারি দিয়ে এক একটা জেটিতে। আমাদের নিকটে ছিল জার্মাণ বড় জাহাজ পট্সডাম।

আমাদের কাপ্তেনের অনুরোধে পট্সডামের কাপ্তেন আমাদের দেখ্তে দিলে তার জাহাজ। একটা যেন পল্লী। নাচের-ঘর, স্নানাগার, ছেলেদের খেলাঘর, ব্যায়াম-শালা, ক্রীড়া ভূমি, লীলা-ভূমি, পাঠাগার, ধূমপান করবার ঘর সব অতি পরিপাটি। চাকর মাঝি-মাল্লা সব জার্মাণ। অনেকে ইংরাজি বলে। ইংরাজি-জানা একজন নাবিক আমাদের সর্বত্র নিয়ে গেল।

ডকে চীনে খাবারওয়ালা, হিন্দু খাবারওয়ালা, মুসলমান খাবারওয়ালা—চীনা মাটির বাসন বিক্রীওয়ালা, পোস্ট

কার্ডওয়ালা ওলন্দাজ নাবিক ফিলিপিনো মাল্লা নানারকম লোকের ভিড়। একেবারে জেনিভা। সবারই সদেচ্ছা আমাদের কাছ থেকে কিছু উপার্জন করবে।

সিঙ্গাপুর দ্বীপ। সে জহোর রাজ্যের রাজধানী হ'তে সংকীর্ণ এক প্রণালীর দ্বারা পৃথক। এই প্রণালীর উপর রচিত এক পাকা পাথরের সেতু জহোর এবং সিঙ্গাপুর দ্বীপকে সংযুক্ত করেছে। তার নাম কজ্‌ওয়ে।

সিঙ্গাপুর সহর হ'তে জহোর ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত। এইদিকে নৌ-ঘাঁটি। বৃহৎ ব্যাপার। কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে তার ভেতর মোটরে ঘোরা যায়। কিন্তু ঘাঁটির বর্ণনা নিষিদ্ধ—সুতরাং আলোচনা অবিধেয়।

জহোর সহরে বাজার ব্যতীত দেখবার স্থান সুলতানের প্রাসাদ এবং মসজিদ। মসজিদটি বিশেষ



জহোর সুলতানের প্রাসাদ

কোন এক স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন নয়। প্রাসাদও প্রাচ্য-শিল্পে নির্মিত নয়। প্রাসাদ সংলগ্ন উপবনে আমাদের মোটর অবাধে চল্‌লো। প্রাসাদের রক্ষকেরা অতি সমাদরে আহ্বান কর্লে আমাদের প্রাসাদ দেখবার জন্য।

এখানে একটি পশুশালা আছে। তাতে এক জোড়া বনমানুষ আছে। আমাদের গাড়ীর মলয় ড্রাইভার তাদের বল্লে—কিং কং। ওরাঙ্‌ওটাঙ যবদ্বীপের কথা কিং কঙ্‌ বনমানুষের মলয় নাম। পুরুষ কিং কংটি বেশ সম্ভ্রান্ত—তার দাড়ি আছে। ও রকম বনমানুষ আমি পূর্ব্বে দেখিনি। আমাদের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য উদ্যান-রক্ষক বিধি-মতে তাকে খোঁচাখুঁচি করতে লাগলো, কিন্তু ভদ্রলোক ভীষণ লাজুক—কোণ ছাড়বার কোন লক্ষণ দেখালে না। মহিলা কিঙ্‌কঙের অতিথি-সেবা সম্বন্ধে মতামত উদার। সে কর-মর্দন করলে—দাঁত দেখালে—শেষে একটা ডিগ্‌বাজি খেয়ে দোদুল-দোলায় বসে দোল খেলে। কর্তা কিন্তু আমাদের গ্রাহ্য করলে না।

জহোরে চীনার নিবাস কম। লোক অধিকাংশ মলয়। বাজারে ঘুরে একটা পার্কারের কলম খরিদ কর্‌লাম। এখন এ প্রবন্ধ সেই কলমেই লিখছি। আশ্চর্য যোগাযোগ—এখন গায়ে যে জামা ও গেঞ্জি রয়েছে—তাদেরও কিনেছিলাম সিঙ্গাপুরে।

জহোর সহরের লোকসংখ্যা ২২,০০০। জহোরাধিপতি সুলতান ইব্রাহিম এবং তাঁর মহিষী বহুবার ইউরোপ আমেরিকায় ভ্রমণ করেছেন। সিঙ্গাপুর ঘাঁটি নির্মাণের জন্য সম্রাট পঞ্চম জর্জের রজত জুবিলির সময় জহোর সুলতান অর্দ্ধ মিলিয়ন পাউণ্ড দান করেছেন।

সিঙ্গাপুর ডকের বাহিরেই রেল-স্টেশন। সহর বেশ বড় আর পরিষ্কার ও সুশৃঙ্খল। বড় বড় অট্টালিকা—চমৎকার বাড়ী-ঘর আর অসংখ্য দোকান। পাখা ও আলোর জন্য বিদ্যুতের শক্তি পাওয়া যায় ১৭ পয়সা ইউনিট ৩৫০০ ইউনিট অবধি—তারপর ৮ পয়সা। রাঁধবার বিদ্যুৎ-শক্তি ৫ পয়সা ইউনিট। গৃহস্থের জল—হাজার গ্যালন ৩৫ পয়সা। আমরা যে সময়ে মলয় গিয়াছিলাম তখন ওখানে বর্ষাকাল—সর্বোচ্চ তাপ ৭৫ ডিগ্রি।

মোটর গাড়ী, মোটর বাস, ট্রলি বাস, ট্রাম প্রভৃতি প্রচুর—অবশ্য তার সঙ্গে রিক্স। ফলের মধ্যে নারিকেল আনারস কলা প্রভৃতি বৃহদাকার।

সিঙ্গাপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেন সুদৃশ্য—কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। পশুশালাতে অনেক জন্তু আছে—কিন্তু কলিকাতার পশুশালার অনুরূপ পশুশালা প্রাচ্যে কোথাও বোধ হয় নাই।

সিঙ্গাপুরের চেঞ্জএলি এক প্রসিদ্ধ বাজার। দুটো প্রকাণ্ড অট্টালিকার মাঝে ছোট গলি। তার ভিতর দিয়ে দুটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্রে যাওয়া যায়। সমুদ্রের তীরে কলীয়র কি এক কেন্দ্র—অপর কেন্দ্র প্রসিদ্ধ র‍্যাফল প্লেস। এস্থলের অপর নাম—পেটিকোট লেন।

চেঞ্জএলিতে অনেক ছোট ছোট দোকান মলয়দের—যেমন চাঁদনীর দোকান। বাঙালীর দোকান আছে মাত্র

একখানা। প্রাচ্যে কোন স্থলে এত শস্তায় জাপানী, মার্কিণ, ইউরোপীয় সাধারণ মাল পাওয়া যায় না। কারণ সিংহপুরে মাল আমদানী করতে শুল্ক লাগে না। গেঞ্জি মোজা পায়জামা সার্ট হাজার হাজার বিক্রী হচ্চে এখানে। মলয় দেশে কোলাহল নাই—কিন্তু সে বর্ণনা চেঞ্জএলি সম্বন্ধে প্রযুজ্য নয়। জাহাজে সকলে ভয় পেলে—দেশে গেলে কাস্টম্স্ওয়ালা আদায় করবে ডিউটি। অবশ্য ভয়



জহোর মস্জিদ্

অলীক—কারণ নিজের ব্যবহারের পদার্থে শুল্ক লাগে না। লোভ সম্বরণ করা শক্ত। কাজেই সবাই জিনিস কিন্তে আরম্ভ করলে।

শস্তার ধুয়ো উঠেছে যখন তখন মানুষ ভাব্লে সবই শস্তা। সাহেবরা এক এক ডলার দাম দিয়ে নীল বজ্রিগার পাখী কিনলে। একজন সগর্ব্বে বল্লে—গাপ্টা কলকাতায় এ রঙের বজরীগর পাওয়া যায়? আর পাওয়া গেলে কত দাম।

—আমার বাড়ীতেও পাখি আছে। রথের বাজারে পাঁচ সিকা করে কিনেছি।

—ননসেন্স। ভুলে গেছ দাম।

আমারও নিজের সন্দেহ হয়েছিল। কলকাতায় এসে হাতিবাগানের হাট থেকে দর যাচাই করলাম আড়াই টাকা জোড়া।

লেমার বাঁদর শস্তা। এক সাহেব একটা দু ডলারে কিনে আনলে। মর্কট বেয়াদব—তার হাতে কামড়ে দিলে। তখন সাহেব আবার এক ডলারে তাকে বেচে দিয়ে এলো। চিনের ধাঁধা—জাপানী কিমানো, চীনা-মাটির চায়ের বাসন—রবারের মণিব্যাগ, মোজা, গেঞ্জি, বেতের বাক্স, কর্পূর, কাঠের সিন্দুক প্রভৃতি মালে জাহাজ বোঝাই হ'ল। প্রত্যেকে অপরকে সগর্ব্বে দেখাতে লাগলো তার সওদা। লীলার পিতা—সাহেব দু'খানা বেতের চৌকী কিনে ফেল্লে। আর বেতের লাঠি এত জড় হল—যাদের গুছিয়ে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করা যায়।

একদিন প্রভাত-ভ্রমণের পর জাহাজে শুনলাম—দু'জন বাঙ্গালী ভদ্রমহিলা আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। তাড়াতাড়ি চেহারাটাকে ভদ্রলোকের মত ক'রে তাঁদের সম্মুখীন হ'লাম। মিসেস গুহ নিজের পরিচয় দিলেন—মিঃ গুহ বিদেশে অর্থোপার্জ্জন করতে গেছেন—তাঁর অনুরোধ আমরা তাঁর আতিথ্য-গ্রহণ করি। মৌখিক প্রত্যাখ্যান—আন্তরিক লোভ—লুচি-তরকারির দারুণ আকাঙ্ক্ষা—শেষে পর্য্যবসিত হ'ল তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণে।

—তা' হ'লে দু'খানা গাড়ী পাঠিয়ে দে'ব বিকেলে। আপনারা সহর ভ্রমণ ক'রে রাত্রে ভোজে আসবেন।



জহোর সিঙ্গাপুর সেতু

পাপী মন হিসেব ক'রে ফেল্লে ক ডলার ট্যাক্সি ভাড়া বাঁচবে এবং সেই বাঁচা ডলারদের ক্রয়-শক্তি।

—আজ্ঞে বিলক্ষণ। এত দয়া। তা ওর নাম কি—মানে।

—না আমার এই ড্রাইভার আসবে এখন।

—হাঁ তার আমি চারটের সময় গাড়ী আনব।

কে রে বাবা! এমন বাঙলা বলে—চেহারা মালাই।

—আজ্ঞে স্তার আমি মালাই। মার কাছে বাঙ্‌লা শিখেছি।

শিক্ষয়িত্রীর কৃতিত্ব আরও দেখ্‌লাম; ভোজের সময় চীনা পাচকের হলদে হাতে রাঁধা লুচি, তরকারী, পান্তুয়া, নিমকী প্রভৃতি যখন পাতে বরষার ধারার মত ঝরে পড়তে লাগ্‌লো। তার ওপর বাঙ্‌লা কথা—ঝাল একটু দোবো!

পরদিন ফিরে এলেন গুহ মশায়। কাজেই আবার ভোজ। মন্দ কি? মধ্য রাত্রি অবধি বিদেশে বাঙালী পরিবারের সঙ্গে গল্প-গুজব মনোরম। রবীন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র—তাঁদের সঙ্গে ধ্যানচাঁদ ও সাঁতারু বোকা ঘোষ এবং অবশ্য কংগ্রেস, রিফরম, রাজা ও বাঁধা-কপি—সব হ'ল প্রসঙ্গের অঙ্গ।

হঠাৎ দেখলাম বাড়ীর একদিকে একটি মন্দির। শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি আছে। বাঃ!

—চীনে পুরোহিতকে সংস্কৃত শিখিয়ে নিত্য-সেবার ব্যবস্থা ভারী স্মরণীয় ব্যাপার।

—আজ্ঞে না।—বল্লেন শ্রীমতী গুহ জায়া।—ও কাজটা আমি নিজে করি। গৃহ-দেবতার নিত্য-সেবা।

তাঁর ভক্তি ও গৃহস্থালীর প্রতি শ্রদ্ধা হ'ল। কিন্তু চীনে পুরোহিতের মুখে—হা ক্লিষ্ট কলুণা-সিন্ধু তিলবন্ধু জোগতবতী—শুনলে যে আনন্দ হ'ত যে হর্ষটুকু হ'তে বঞ্চিত হওয়া গেল।

বৈশেষিক দর্শন

শ্রীগুণমণি দাস বি-এস-সি

ভারতীয় সভ্যতার চক্রবিন্দু বর্ত্তমান সময়ে অতি নিম্নে আসিয়া আবার ধীরে ধীরে উঠিতেছে। কিন্তু একদিন ছিল যখন এই বিন্দু সর্ব্বোচ্চ-স্থানে অবস্থান করিত। ইহাই চক্রের নিয়ম। একথা বলিলে মিথ্যা বলা হইবে যে, ভারতীয় সভ্যতা মাত্র তৎকালের অন্যান্য অনুন্নত সভ্যতার অনুপাতে উচ্চে অবস্থান করিত। ইহা সকলেই জানিতেন যে, আত্মজ্ঞানে ভারতের স্থান সকলের উচ্চে। কিন্তু বিজ্ঞান ব্যতিরেকে এই আত্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর নয়। যে জগতে বাস করিতেছি সেই জগতের নিয়মকানুনগুলিই যদি অজ্ঞাত থাকিল তবে জ্ঞান আসিবে কোথা হইতে? আধুনিক ভারতীয় ধর্ম্মবাদে যেমন জ্ঞানশূন্য ভক্তিবাদের প্রাবল্য দেখা যায়—দর্শনের যুগে সে প্রকার প্রায়ই ছিল না। দার্শনিক জোর গলায় বলিতে সাহস পাইয়াছিলেন যে, অন্ধ ভক্তির দ্বারা মোক্ষ-লাভ হয় না। মোক্ষ কাহাকে বলে? আত্মাকে জানিতে পারিলে যে প্রকার মানসিক অবস্থা হয় তাহাই মোক্ষ। কেমন করিয়া আত্মাকে জানিব? মহর্ষি কণাদ আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন, এই বস্তু-জগৎকে বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিলেই সেই অবস্তু আত্মাকে জানা যায় না, তাহাতে অধ্যয়নকারী আত্মহত্যাই করে। সেই আত্মহত্যা করিয়াই আমরা আজ এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছি।

যদিও বা কোন প্রকারে বস্তুজ্ঞানের 'ডিগ্রি' লাভ করিয়া দুর্ব্বার ও মারাত্মক পরীক্ষাভীতির হাত হইতে অব্যাহতি পাইলাম, কিন্তু পাশ করিয়া আর এক ভীতি আসিল, তাহা 'চমৎকার অন্নচিন্তা।' হা চাকরী—করিয়া যাহা শিখিয়াছিলাম তাহা ভুলিয়া গেলাম। বস্তু জ্ঞানের সাহায্যে আত্মাকে অন্বেষণ করা হইল না। ভারতবাসী একে একে আত্মঘাতী হইল। ভারত ডুবিয়া গেল।

ইউরোপ বিজ্ঞান শিখাইল; শিখাইয়া বলিল, ইহার উদ্দেশ্য জ্যান্ত মানুষকে মারিবার ও মরা মানুষকে বাঁচাইবার।" কিন্তু ভারত জানিয়াছিল, যদি বাঁচাইতেই হইবে মারিয়া লাভ কি? ইহা ক্ষণিক প্রবৃত্তি-চাপল্য মাত্র। ইহা অস্থায়ী। ইহার অপগমন হইলে তরঙ্গহীন শান্তি আসিয়া পড়িবে। তখন মানুষ জানিবে যে শারীরিকভাবে কাহাকেও মারিবার বা বাঁচাইবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। তখন মানুষ জানিবে যে অজ্ঞানই মানুষের মৃত্যু, আত্মজ্ঞানই মানুষকে অমর করে। আত্মজ্ঞানই মানুষের চরম কর্ত্তব্য। সেই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে বস্তুজ্ঞান গৌণভাবে প্রয়োজন হয়। যদি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই না থাকিবে তাহা হইলে এই জগতের বিচিত্র বাধা বিলোপ করিয়া দিতে কে সাহায্য করিবে? তাই ভারতের বিজ্ঞান-সাধনা।

আধুনিক বিজ্ঞান ভোগের রাজসিকতার আশ্রয়ে চটক্‌দার হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান ত্যাগের সাত্ত্বিকতার কোলে থাকিয়া খেলোয়াড়ী মনোভাব অর্জ্জন করিতে পারে নাই।

সেই প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানসাধনা কতদূর উন্নত ছিল তাহাই আলোচনা করিব।

যখন আওরঙ্গজেব দিল্লীর সম্রাট সেই সময়ে ইউরোপে মহামতি নিউটন্ গতি-সম্বন্ধীয় তিনটী নিয়ম ঘোষণা করিয়া গতি ও স্থিতি বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব উৎঘাটিত করেন। সেই নিয়মগুলি

বিজ্ঞানের প্রথম শিক্ষার্থী মাত্রেই অবগত আছেন। নিউটনের গতি নিয়মগুলি :—

প্রথম—"A body continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line, except in so far as it is not compelled by impressed forces to change that motion."

বঙ্গানুবাদ :—অচল বা একাগ্র সচল যে কোনও দ্রব্য যদি অন্য কোনও বহি:কারণে কক্ষচ্যুত না হয়, তবে স্বীয় অবস্থাতেই বরাবর বিদ্যমান থাকিবে।

দ্বিতীয়—Change of motion is proportional to the impressed force and takes place along the straight line in which that force is impressed.

বঙ্গানুবাদ :—কারণের প্রেরণার অভিমুখেই দ্রব্যগতির কার্য্যকারিতা তদনুপাতে পরিবর্ত্তিত হয়।

তৃতীয়—To every action there is an equal and opposite reaction.

বঙ্গানুবাদ :—প্রতি কর্ম্মই সমপরিমাণ কর্ম্ম-বিরোধিতা পাইয়া থাকে।

মহামতি নিউটনের পিতৃপুরুষের ইহজগতে তনুধারণের বহুপূর্ব্বে ভারতবর্ষে মহর্ষি কণাদ বৈশেষিকদর্শনে গতি ও স্থিতি বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় মূলতত্ত্বের তিনটীই উৎঘাটিত করিয়াছিলেন। বৈশেষিকদর্শনপাঠকের তাহা জানা থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বৈশেষিক দর্শনের বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলি প্রায়ই 'দুর্ব্ব্যাখ্যাবিষমূর্চ্ছিত'। তাহাতে মৃতসঞ্জীবনী প্রয়োগ করা যাইতেছে।

কণাদের নিয়মগুলি :—

প্রথম— কর্ম্ম কর্ম্মসাধ্যং ন বিদ্যতে ।১১।

বঙ্গানুবাদ :—বিদ্যমান কর্ম্মের পরিবর্ত্তন স্বয়ংসাধ্য নহে।

দ্বিতীয়—ন দ্রব্যং কার্য্যং কারণঞ্চ বধতি ।১২।

বঙ্গানুবাদ :—কার্য্য ও কারণ দ্বারা প্রবোধিত দ্রব্য উহাদিগকে নাশ করেনা, (উহাদের অনুসারেই চলে)।

তৃতীয়—কার্য্যবিরোধি কর্ম্ম ।১৪।

বঙ্গানুবাদ :—কর্ম্ম কার্য্যের বিরোধী।

নিউটনের সূত্রগুলি নিঙড়াইলে কণাদের সূত্রগুলিই বাহির হইয়া পড়ে। কণাদ আপনার সূত্রগুলিকে একেবারে সারাংশে পরিণত করিয়াছেন।

কণাদের সূত্রগুলির ব্যাখ্যা :—

প্রথম সূত্র—কর্ম্ম কর্ম্ম করিতে পারে না। যে কর্ম্ম হইয়া চলিতেছে তাহা আপনা হইতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। অচল কর্ম্মানুষ্ঠান স্বেচ্ছায় সচল কর্ম্মানুষ্ঠানে পরিবর্ত্তিত হইবে না। সচল কর্ম্মানুষ্ঠান স্বেচ্ছায় আপনাকে অচল করিতে অপারগ। সূর্য্য যদি এক জায়গায় বসিয়া থাকে তবে সে আপনা হইতে স্থানচ্যুত হইবে না। পৃথিবী যদি সূর্য্যের চারিপাশে অনবরতই ঘুরিতেছে, তবে সে ঘোরা সে স্বেচ্ছায় বন্ধ করিতে অক্ষম। আমের বীজ হইতে যখন আমই পূর্ব্বপরম্পরায় হইয়া আসিতেছে তখন তাহা স্বেচ্ছায় অন্যথা হইবে না। যাহা নিয়ম তাহা অনিয়মে পরিণত হইবার উপায় নাই। কর্ম্ম যদি স্বেচ্ছায় পরিবর্ত্তিত হইতে না পারে তবে নিশ্চয় সে পরেচ্ছাধীন। এই পরেচ্ছাই তাহার পরিবর্ত্তনের কারণ। কিন্তু জিজ্ঞাসা আসিতে পারে যে, কারণ ব্যতিরেকে কেন কর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইবে না? তাহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে গুণবৈধর্ম্ম্যাৎ ন কর্ম্মণাং কর্ম্ম।১৪। কর্ম্মের ধর্ম্মের একাগ্রতা নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া। ধর্ম্মগতি যে ধর্ম্মে চলিতেছে তাহা স্বেচ্ছায় পরিবর্ত্তিত হওয়া অস্বাভাবিক। সেই জন্য কারণ ভিন্ন কর্ম্মের নিজের কাজ নাই।

দ্বিতীয় সূত্র। দ্রব্যের বিদ্যমান কর্ম্মের পরিবর্ত্তন-বিধাতা কারণ দ্রব্যকে স্বপ্রেরণানুযায়ী কর্ম্মদান করে। কোনও অচল দ্রব্যকে যদি দক্ষিণদিকে গতিদাতা কারণ প্রদান করা যায়, তাহা হইলে সেই দ্রব্য দক্ষিণদিকেই গমন করিবে। দ্রব্য কারণের বিরুদ্ধমতাবলম্বী হইয়া তাহার বধকর্ত্তা হয় না।

এই সূত্র হইতে শক্তির অনশ্বরতা (Law of conservation of energy) ও প্রমাণিত হয়। দ্রব্য কার্য্যকে বধ করে না। কোন দ্রব্যকে যদি উচ্চস্থানে তুলিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে সেই তুলিয়া রাখা রূপ কার্য্য বধপ্রাপ্ত হয় না, তাহা Potential en rgy-তে পরিবর্ত্তিত হইয়া রহে। যদি কোনও দ্রব্যকে ছুড়িয়া ফেলিতে কার্য্য করা হয়, তবে তাহা Kinetic energy তে পরিবর্ত্তিত হইয়া সমপরিমাণ অন্যকার্য্যের উৎপাদক হয়।

দ্রব্য কার্য্য বা কারণকে বধ করে না। যে পরিমাণ কারণ বা কারণজাত কার্য্য তাহার প্রতি নিয়োজিত হয়, সেই পরিমাণ কারণ বা কারণজাত কার্য্যই পুনরুৎপাদিত হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বদাই অনুপাত রক্ষিত হইয়া থাকে। নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রের Proportional কথাটীর অর্থ এই।

তৃতীয় সূত্র। বিদ্যমান কর্ম্ম তাহার পরিবর্ত্তনসাধক কার্য্যের সর্ব্বদাই বিরোধিতা করিয়া থাকে। কোন দ্রব্য মাটি হইতে কুড়াইয়া লইতে যাইলে সেই দ্রব্য তাহার গুরুত্বানুযায়ী উত্তোলন বিরোধিতা করিবে। তবে যে দ্রব্যটী উত্তোলন করিয়া লই, তাহার কারণ দ্রব্যের গুরুত্বের সমপরিমাণ জোর ব্যয় করিয়াও উত্তোলনকারী হস্তে জোর অবশিষ্ট থাকে, তাহাই উত্তোলন করে। রাম উত্তোলন করিলে যেটুকু উত্তোলন বিরোধিতা দ্রব্য করিবে, শ্যাম উত্তোলন করিলেও তাহাই করিবে। অতএব বিরোধিতা প্রত্যেক বারেই সমান। পক্ষান্তরে হস্তের বিরোধিতাও প্রত্যেকবারে সমান। অতএব পরস্পরের বিরোধিতাও প্রতিবারে সমান।

অতএব দেখা গেল যে, নিউটনের বিশ্ববিখ্যাত সূত্রগুলি কণাদের সূত্রগুলি হইতে অভিন্ন। তবে কেন একজন বিশ্ববিখ্যাত অন্যজন অজ্ঞাত? মহামুণি কণাদের মৌনতার অন্তরালে অনেক বৈজ্ঞানিক মুখরতা যেহেন্ জো দড়োর রত্নরাজির মত মাটি ঢাকা অবস্থায় পুঞ্জীভূত হইয়া আছে।

এস্থলে, কারণ = Force.

কার্য্য = Work.

কর্ম্ম = Any action (rest or motion).

হংস-বলাকা

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

(১১)

বিকেলে যথারীতি নিজের ঘরে ঢুকেই সুকুমার ভড়কে গেল। ঘরের চেয়ার-টেবিলগুলো আর এক রকমে সাজানো হয়েছে। তাদের সেই সাবেককালের ঘর ব'লে চেনাই যায় না। আর চেয়ারে ব'সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কাজ করছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ক'টি ছেলে। কালকের সেই দুটির সঙ্গে আরও দুটি জুটেছে। দেখলেই বোঝা যায়—এরা সবে কলেজ থেকে পাশ ক'রে বেরিয়েছে।

—কাকে চান মশাই?—একটি ছেলে মুখ তুলে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

ছেলেটির দোষ নেই। সুকুমার যেভাবে অবাক হয়ে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়েছে তাতে তাকে এই অফিসেরই পুরোনো পাপী ব'লে চেনা কঠিন।

সুকুমার ঠোঁট টিপে হাসি গোপন করলে। বললে, বলছি।

সেখানে আর না দাঁড়িয়ে সুকুমার কমলবাবুর ঘরে চলল। সে ঘরের আসবাবপত্রের এখনও কোন অদল-বদল হয়নি। বরং টেবিলের উপর দোয়াত-কলম, টেলিগ্রামের স্তূপ, খবরের কাগজের কাটিং—কাল রাত্রে যাওয়ার সময় কমলেশবাবু যেখানে যা রেখে গেছেন সব ঠিক সেইখানেই আছে। দেখলে মনে হয়, এইমাত্র কোথাও বোধ হয় গেছেন, এখনই ফিরবেন। কিন্তু সুকুমার জানে, তিনি এখানে আর ফিরবেন না।

সুকুমার জ্যোতির্ম্ময়কে খুঁজতে লাগল। সেই বা গেল কোথায়? কালীমোহনই বা এখনও এল না কেন? সুকুমার অস্বস্তিতে চঞ্চল হয়ে উঠল। ভাবলে, হয়তো ওরা হরিসাধনবাবুর ঘরে গেছে। সেও সেইদিকে চলল।

পর্দ্দাটা একটু সরিয়ে দেখলে হরিসাধনবাবুর সামনে, টেবিলের এদিকে কালীমোহন উত্তেজিতভাবে কথা ব'লে চলেছে এবং বোধ হয় তার উত্তাপের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে হরিসাধনবাবু নিজের চারদিকে সিগারের ধোঁয়ার দুর্গ তৈরি ক'রে ফেলেছেন।

হরিসাধনবাবু সুকুমারকে ডাকলেন, আসুন।

সুকুমার ভিতরে গিয়ে কালীমোহনের পাশের চেয়ারটি টেনে বসল।

কালীমোহন এতক্ষণ নিজের ঝোঁকেই ব'কে চলছিল। সুকুমারকে দেখেই সে-আলোচনা স্থগিত রেখে বললে, জান সুকুমার, জ্যোতির্ম্ময়েরও চাকরী গেছে?

সুকুমার বিবর্ণমুখে বললে, জ্যোতির্ম্ময়েরও?

—হ্যাঁ জ্যোতির্ম্ময়েরও। দিনের ষ্টাফে পুরোনোর মধ্যে রইলে শুধু তুমি।

হরিসাধনবাবু হেসে বললেন—আর আপনি?

—না, আমি রইলাম না। আমি রিজাইন দিচ্ছি। এই নিন।

কালীমোহন চিঠিখানা ওঁর দিকে এগিয়ে দিলে।

হরিসাধনবাবু চিঠিখানা ছুঁলেনও না। বিব্রতভাবে বললেন, তাহ'লে আমি কাজ করব কি ক'রে? সবাই যদি···

কালীমোহন হেসে বললে, লোকের কি অভাব আছে নাকি? এক জন গেলে দশ জন আসবে।

হরিসাধনবাবু কিন্তু হাসতে পারলেন না। শুষ্কমুখে বললেন, তা আসবে। কিন্তু তাদের দিয়ে আমার কাগজ চলবে না।

—চলবে ব'লেই তো আনিয়েছেন।

—আমি?—হরিসাধনবাবু বিব্রত বিস্ময়ে বললেন—ঘণ্টাকয়েক আগে পর্য্যন্ত এর বিন্দুবিসর্গও আমি জানতাম না।

হরিসাধনবাবুকে ওরা চেনে। তাঁর কথায় কেউ অবিশ্বাস করতে পারলে না। বরং ওদের মনে হ'ল, মনের ভাব যথাসাধ্য গোপন করবার চেষ্টা ক'রেও ভদ্রলোক কিছুতেই মুখ থেকে অসন্তোষের চিহ্ন মুছে ফেলতে পারছেন না। কিন্তু তিনিও আর সকলের মতই অসহায়।

কেবল বললেন, আজ সন্ধ্যের আগে ম্যানেজিং ডিরেক্টারের আসবার কথা আছে। আপনি রেজিগ্নেশন

লেটার আমাকে না দিয়ে বরং তাঁকেই দেবেন। আমার মনে হয়, আপনাদের তরফের সকল কথা তাঁর শোনাও প্রয়োজন।

ব'লে একটু ইঙ্গিতপূর্ণ হাসলেন।

কালীমোহন ব'সে রইল। সুকুমার উঠে কাজ করতে গেল নিজের ঘরে। এবারে সে এমনভাবে ঘরে ঢুকল যে কেউ আর কোন প্রশ্ন করতে সাহস করল না। সে তার ড্রয়ার খুলে খাতা-কলম বের ক'রে অবিলম্বে সংবাদ তর্জ্জমায় মন দিলে। পাশের লোকদের দিকে চেয়েও দেখলে না। কিন্তু মন তার আজ ভারাক্রান্ত। সংবাদ-তর্জ্জমা মন্দ-গতিতেই অগ্রসর হ'তে লাগল। আর সব সময় কাণ রইল বাইরের দিকে, কখন ম্যানেজিং ডিরেক্টার আসেন।

ওঘরে কালীমোহন তখন প্রশ্ন করছে—আচ্ছা, কমল-বাবুর চাকরী কেন গেল জানেন? সরিৎ জ্যোতির্ম্ময়ের চাকরী যাওয়ার কারণ কতকটা অনুমান করতে পারি। কিন্তু কমলবাবুর···

হরিসাধনবাবু নিঃশব্দে কি যেন ভাবছিলেন। ধীরে ধীরে বললেন, ওই একই কারণে। ক্রমাগত আপনাদের বাঁচাতে চেষ্টা করার ফলে উনি নিজে ম্যানেজিং ডিরেক্টারের অপ্রীতিভাজন হয়ে পড়লেন। তাঁর শেষ পর্য্যন্ত বদ্ধমূল ধারণা হ'ল, উনিও আপনাদেরই দলে।

—তাহ'লে আমি? আমার উন্নতি হ'ল কেন?

—আপনারও হঠাৎ থেমে গিয়ে হরিসাধনবাবু বললেন, কি জানি।

কালীমোহন হেসে বললে, বুঝতে পেরেছি। আমিও দু'দিন পরে যেতাম। আপাততঃ আমাকে না রেখে উপায় ছিল না। কি বলেন?

হরিসাধনবাবু গম্ভীরভাবে একখানা খবরের কাগজে চোখ বুলোতে বুলোতে নিস্পৃহভাবে বললেন, জানি না।

তারপর অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, একটু আস্তে কথা কইবেন। The walls have ears. আমি ছা-পোষা মানুষ। আমাকে আর আপনাদের সঙ্গে টানবেন না।

ওঁর ভয় দেখে কালীমোহন হেসে উঠল। বললে—আচ্ছা, আমি চুপ করলাম।

বেয়ারা এসে চা দিয়ে গেল। হরিসাধনবাবু সম্পাদকীয় লেখার আয়োজন করতে লাগলেন। আর কর্ম্মাভাবে কালীমোহন অন্যমনস্কভাবে একখানা বিলিতি মাসিকপত্রের পাতা উল্টাতে লাগল।

সন্ধ্যার আগে ম্যানেজিং ডিরেক্টার এলেন। কালী-মোহনকে দেখেই সহাস্যে বললেন, কি রকম! দেখি আপনার হাতে কাগজের কতখানি উন্নতি হয়। আপনার উপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। আপনি পারবেন।

তাঁর মনে অবশ্য কোন সন্দেহই রইল না যে, প্রথম কর্ম্মোন্নতি, দ্বিতীয় এই প্রীতিসম্ভাষণের পর কালীমোহন সপ্তম স্বর্গে উঠে গেছে। কালীমোহন সপ্তম স্বর্গে উঠল কি না বোঝা গেল না। কিন্তু যে সমস্ত ধারালো কথা শোনাবার জন্যে এতক্ষণ সে মনে মনে প্যাঁচ কষছিল, তার একটাও মুখ দিয়ে বার হ'ল না।

ম্যানেজিং ডিরেক্টারও সেজন্যে অপেক্ষা করলেন না। তিনি হরিসাধনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—আজ কি নিয়ে এডিটোরিয়াল লিখছেন?

তাঁকে দেখামাত্র হরিসাধনবাবুর মুখখানি ডিমের মত শক্ত এবং ছোট হয়ে উঠল। কে বলবে ইনিই 'সুদর্শনের' নির্ভীক তেজস্বী সম্পাদক, দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সেবক হরিসাধনবাবু—দেশের জন্য যিনি মৃত্যুকেও ভয় করেন না। এই দেশবরেণ্য অগ্নিসম তেজস্বী বাগ্মীকে অকস্মাৎ নিরীহ মেষশাবকে পরিণত হ'তে দেখে কালীমোহন কৌতুক বোধ করলে। সঙ্গে সঙ্গে এই ভেবে অবাক হয়ে গেল যে, অমিত-শক্তিশালী ইংরাজ সরকার এবং তাদের ফাঁসীর মঞ্চ এবং মেশিনগানের গুলিকে যে ভয় করে না, সে সামান্য একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টারকে দেখে ভয়ে কাঁপে কেন?

হরিসাধনবাবু চতুর লোক। ম্যানেজিং ডিরেক্টারের আগ্রহ কোথায় তা বেশ ভাল ক'রেই জানেন। বললেন, শ্রীহর্ষবাবুর বক্তৃতাটার একটা জবাব বেশ কড়া রকমই দিতে হবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। বললেন, নিশ্চয়ই। অত বড় দাম্ভিক আমি জীবনে দেখিনি। লিখবেন, শ্রীহর্ষবাবু কি কংগ্রেসকে তাঁর পৈতৃক জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত মনে ক'রেছেন? এক কাজ করবেন বরং। আপনার লেখা শেষ হ'তে কতক্ষণ লাগবে? আটটা?

—তার মধ্যে হয়ে যাবে।

—Right. আপনি আটটার সময় আমাকে টেলি-

ফোনে লেখাটা শুনিয়ে তার পর প্রেসে দেবেন। আচ্ছা, আমি উঠলাম।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার যাবার জন্তে প্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কালীমোহনও সমস্ত শক্তি সংগ্রহ ক'রে উঠে দাঁড়াল। বললে, আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।

—বলুন।

কালীমোহন পদত্যাগপত্র তাঁর হাতে দিলে। সেটায় একবার চোখ বুলিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টার বিস্মিতভাবে বললেন, অন্ত কোথাও চাকরী পেয়েছেন?

—না।

—তবে? বন্ধুদের প্রতি সহানুভূতি?

—তাও না।

—তবে?

সে প্রশ্ন এড়িয়ে কালীমোহন পাল্টা প্রশ্ন করলে, কমলবাবু, সরিৎ আর জ্যোতির্ম্ময় কি অপরাধে কর্ম্মচ্যুত হ'ল জানতে পারি?

—জানবার অধিকার নেই। তবু দয়া ক'রে জানাচ্ছি, তাঁদের অপরাধ বিশ্বস্ততার অভাব।

—তাঁদের কি দোষস্খালনের কোন সুযোগ দেওয়া হয়েছিল?

—কোন প্রয়োজন নেই। আমি জানি আমার সংবাদ নির্ভুল।

কালীমোহন হেসে ফেললে। বললে—আপনি বহু-নিন্দিত ইংরেজ সরকারের মত কথা বললেন। তাঁরাও রাজবন্দীদের সম্বন্ধে কি এই রকমই বলেন না?

ম্যানেজিং ডিরেক্টার কটমট ক'রে তার দিকে চাইলেন। বললেন—আপনি এক মাসের নোটিস দিয়েছেন? কিছু প্রয়োজন নেই। কাল থেকেই আপনার ছুটি। আপনি এখন যেতে পারেন।

কালীমোহন নমস্কার ক'রে বেরিয়ে গেল।

রাগে ম্যানেজিং ডিরেক্টারের ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত জ্বালা করছিল। এত বড় কথা এ পর্য্যন্ত কেউ তাঁকে বলতে সাহস করেনি। রাগ সামলাতে তাঁর একটু সময় লাগল। তার পর সম্পাদকের দিকে চাইলেন। হরিসাধনবাবুই এই দুর্ঘটনার ঘটক। কিন্তু তিনি এমন ভাবেননি। তথাপি কালীমোহন কথা আছে ব'লে যেই দাঁড়াল—অমনি অজানিত আশঙ্কায় তাঁর বুক ঢিপ ঢিপ ক'রে উঠল। ঘাড় টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ল। সে ঘাড় এখনও তুলতে পারেন নি।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার হঠাৎ হেসে ফেললেন। তাঁর হাসির শব্দে আশ্বস্ত হয়ে হরিসাধনবাবু স্কুলের ছেলের মত মিট মিট ক'রে অপাঙ্গে তাঁর দিকে চাইলেন।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন, এ ছোকরা চালাক আছে। বুঝেছে এখানে তারও পরমায়ু বেশীদিন নয়। তাই আগে থাকতেই স'রে পড়ল।

আকাশে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, এখন কি করা যায়?

হরিসাধনবাবু দ্বিধাভরে বললেন, সুকুমারবাবুকে বলা যেতে পারে।

—তিনি তো নতুন এসেছেন! নিউজ-এডিটারের কাজ…

—তা ছাড়া উপায় কি?

একটুক্ষণ চিন্তা ক'রে ম্যানেজিং ডিরেক্টার বললেন, তাই হোক। তাঁকে ডাকুন একবার। কিন্তু আমার সংবাদ এই যে, তিনিও এদেরই দলের।

—কি জানি।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার হেসে বললেন—এই দেখুন! আপনি পাশের ঘরে থেকে খবর রাখেন না। আর আমি কোথা থেকে প্রত্যেকের ঠিকুজির খবর রাখি। রাখতে হয়। প্রত্যেক মানুষের সম্বন্ধে সতর্ক থাকা দরকার।

হরিসাধনবাবু নতমুখে ব'সে রইলেন। বলতে পারলেন না, এই গোয়েন্দাগিরির উৎপাতেই আফিসে এত অসন্তোষ।

সুকুমার এল।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার একটি ছোট্ট ভূমিকা ক'রে বললেন, আপনি যদিচ নতুন এসেছেন, তবু আপনার কাজ দেখে আমি খুব খুশী হয়েছি। আপনার মত বিশ্বস্ত এবং পরিশ্রমী আর দু'জন যদি পাই 'সুদর্শনের' জন্তে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি। কিন্তু ভাল লোক সংসারে বেশী মেলে না। সে যাক। কমলবাবুর পরে আপনাকে নিউজ-এডিটার করাই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কালীমোহনবাবু এ আফিসে আপনার চেয়ে পুরোনো লোক। শৃঙ্খলার খাতিরে তাঁর দাবী উপেক্ষা করতে না পেরে তাঁকেই সুযোগ দিয়েছিলাম। ভগবান আমাকে রক্ষা ক'রেছেন,

তিনি এ সুযোগের মর্য্যাদা বুঝলেন না এবং আমি মনে মনে যা চেয়েছিলাম তাই হ'ল।

ভদ্রলোক হা হা ক'রে প্রাণখোলা লোকের মত হাসলেন। সে হাসিতে সুকুমারের ধমনীর রক্ত পর্য্যন্ত শিউরে উঠল। ম্যানেজিং ডিরেক্টারও সাধারণ লোকের মত হাসে! বিস্ময়ে সুকুমারের দেহ কাঠের মত শক্ত হয়ে উঠল।

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে। আপনি আজ থেকে নিউজ-এডিটারের চার্জ্জ নিন। এই মাস থেকেই আপনার পনেরো টাকা বেতন বৃদ্ধি হ'ল। আপত্তি আছে?

সুকুমার ঘাড় নেড়ে জানালে—নেই।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার হেসে বললেন, দেখবেন। শেষে আমাকে ডোবাবেন না।

সুকুমার শক্ত হয়ে বললে, না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার যতটুকু শক্তি আমি কাগজের জন্যে নিয়োগ করব।

—তাহ'লেই হবে। কিছু না মশাই, চাই খানিকটা সাধারণ বুদ্ধি, আর পার্টির পলিসি বোঝা। তাহ'লেই বুঝতে পারবেন কোন খবরটা চাপতে হবে, আর কোনটা মাথায় দিতে হবে। যদি কোথাও খট্‌কা বাধে, হরিসাধন-বাবুকে জিগ্যেস ক'রে নেবেন। ব্যস।

সুকুমার নমস্কার ক'রে চলে গেল।

ম্যানেজিং ডিরেক্টারও উঠলেন। যাওয়ার আগে হরিসাধনবাবুকে চুপি চুপি ব'লে গেলেন সুকুমারের দিকে দৃষ্টি রাখতে। ও না যেন পার্টিকে ডোবায়। ওরা সব পারে।

হরিসাধনবাবু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন।

পরের দিন সকালেই সুকুমার মণিমালাকে চিঠি লিখে সকল কথা জানালে। এটা তার অনেকদিনের অভ্যাস। যখনই বহু ভাবের প্রাবল্যে চিত্ত তার উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে তখনই সে অক্ষরের মালায় সেই পরস্পর-বিরোধী ভাবধারাকে সুশৃঙ্খলে সাজাতে বসে। আসলে ক'লকাতার ঘটনার সঙ্গে মণিমালাকে পরিচিত করা তার উদ্দেশ্য নয়। সে বিষয়ে তার যে বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই এ কথাও সে জানে। লেখে সে নিজের জন্যে। মনে মনে চিন্তা করতে গেলে ভাবের ঘোড়া এত দ্রুত এবং এলোমেলো চলে যে, সে না পারে তার গতি সংযত করতে, না পারে তাকে ঠিক পথে চালাতে। চিন্তাকে সংযত করতে লেখার মত বড় বল্‌গা আর নেই। সুকুমার তাই লিখতে বসল।

লিখলে:

জান মণিমালা, তোমাকে শেষ চিঠি দেওয়ার পর এই ক'দিনে আমার জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটল—আমার ব্যক্তিগত জীবনেও বটে, কর্ম্ম-জীবনেও বটে। স্কুল-মাষ্টারী ছেড়ে যখন এলাম তখন যে বৃহত্তর জীবনের আস্বাদে পুলকিত হয়েছিলাম তা ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। দম বন্ধ হবার উপক্রম। কি জানি কি হবে!

প্রথম যেদিন এসেছিলাম, এই জীবনের প্রতি কত বড় শ্রদ্ধা নিয়ে এসেছিলাম সে তো তুমি জান। ভেবেছিলাম জীবনের সর্পিল রাজপথে সাংবাদিক হ'ল পথ-দেখান আলো। তাদেরই একটি পাশে যদি আমার হ'ল ঠাঁই তো নিজেকে নিঃশেষ ক'রে জ্বালতেই হবে। এসে দেখি কোথায় আলো! কোথায় পথ দেখানর দায়িত্ববোধ! অসংখ্য আলোয় অসতর্ক জনতাকে কেবলই হাতছানি দিয়ে ভুল পথে ডাকছে। স্বার্থ? কিন্তু স্বার্থ তাদের নিজের নয়, মনিবের। এই মনিবদের কেউ বা পাটের ব্যাপারী, তাঁর স্বল্পাবশিষ্ট অবসরটুকু কর্পোরেশনের হিতব্রতে উৎসর্গ করেছেন। সুতরাং আগামীবারে মেয়রের আসন তাঁর চাই। খবরের কাগজে জনগণের মন তাই এখন থেকেই তৈরি ক'রে রাখতে হবে। সুদীর্ঘকাল ওকালতির পরে কারও পাওনা হয়েছে মন্ত্রিত্ব। সে কথাটা বোঝাতে গেলে খবরের কাগজ একখানা নিশ্চয়ই চাই। চাই রাষ্ট্রনেতারও, দল রাখার প্রয়োজন। মালিকের চাই শ্রমিকদলের জন্যে, শ্রমিকের দরকার মালিকদলের জন্যে। আবার ওরই মধ্যে কেউ যে নিছক ব্যবসার জন্যে কাগজ বার করেনি তাও নয়। কেউ করেছে পাঁচজনকে ছুটো গালাগালি দিয়ে দু'পয়সা আদায় করতে। মোট কথা এই গণতন্ত্রের যুগে মানুষ আর শুধু নিজের শক্তির উপর নির্ভর ক'রে বেঁচে থাকতে পারে না। সে জানে যেমন নিজের জীবনে—তেমনি জাতির জীবনে সর্ব্বাঙ্গে পচন ধ'রেছে। তার জটিল

জীবনযাত্রায় কেবলই আসছে সংঘর্ষের পর সংঘর্ষ। ফলে নিজের জন্যে নিজে চিন্তা করার প্রথমে অবসর—পরে শক্তিও এল ক'মে। এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে খবরের কাগজ অক্টোপাসের মত বাড়িয়ে দিলে বহুবাহু, টেনে নিলে কুক্ষির মধ্যে। দেখতে দেখতে আপন স্বার্থে আচ্ছন্ন ক'রে দিলে জনতার সহজ রুচিবোধকে। আজ তাই জনতার বিশ্বাসের সীমা স্বাভাবিক ভদ্রতাকেও অতিক্রম ক'রে চ'লেছে। মহাপুরুষের সম্বন্ধেও অত্যন্ত কদর্য্য মিথ্যাভাষণ বিশ্বাস ক'রতে মানুষের আজ দ্বিধা নেই। আর এই বিকৃতরুচি উন্মত্ত জনতার মুখে মুহুর্মুহু সুরাপাত্র তুলে ধরবার জন্যে রয়েছি আমরা—অর্থাৎ বেতনভোগী সাংবাদিকের দল। না ক'রে আমাদের উপায়ই বা কি!

তুমি হয়তো শুনে অবাক হবে, কিন্তু এ একেবারে পাকাপাকি স্থিরই হয়ে গেছে যে—নগ্ন নারীর ছবি না দিলে কাগজ চলবে না। ফলে যে কোন কাগজ খুললেই দেখবে পাতায় পাতায় মহাসমারোহে বিরাজ করছে সিনেমা-অভিনেত্রীদের নানা ভাবের নানা ঢঙের ছবি। যাঁরা এখনও এতদূরে উঠতে পারেননি, তাঁরা মহাত্মা গান্ধী আর মীর্ণলয়, সুভাষচন্দ্র আর রুডেট কোলবার্ট, জহরলাল আর জীন চ্যাটবার্ণ—পাশাপাশি ছাপছেন। কিন্তু এ দুর্ব্বলতা নিশ্চয়ই বেশীদিন প্রশ্রয় পাবে না। তখন অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা এবং সুভাষচন্দ্র, অবনী ঠাকুর আর নন্দলাল মানুষের মন থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাবেন। কিন্তু এর চেয়েও বড় দুর্ভাবনা হয়েছে এই যে, সিনেমা অভিনেত্রীর ছবিতে যখন আর পাঠকের নেশা জমবে না তখন দোব কি?

কিন্তু এসব দুর্ভাবনার কথা। তোমাকে একটা সুখবর দিই। কাল থেকে আমি নিউজ-এডিটারের পদে উন্নীত হয়েছি। পনেরো টাকা বেতনও বৃদ্ধি হয়েছে। স্থায়ী কাজ কি না জিজ্ঞাসা করছ? না। এ সংসারে চিরস্থায়ী কিছুই নয়, খবরের কাগজের চাকরী তো আরও নয়। আমার মনে হয়, যাদের ভাল ক'রে বৈরাগ্যশতক পড়া নেই, তাদের এ লাইনে আসাই উচিত নয়। সুতরাং এই মায়াময় সংসারে কোন কিছুরই অনিত্যতার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ো না।

এর পরে নিতান্ত পারিবারিক কতকগুলো কথা লিখে সুকুমার চিঠি শেষ ক'রে ডাকে ফেলতে দিলে।

(১২)

সকল কাজেই গোড়ার দিকে একটু অসুবিধা হয়ই। কিন্তু নিউজ-এডিটারের কাজ সুকুমারের একেবারে অপরিচিত নয়। সুতরাং মাসখানেকের মধ্যেই সে নিজের কাজ বেশ বুঝে নিলে। মুস্কিল হ'ল দিনেরবেলার নতুন সাব-এডিটার ক'জনকে নিয়ে। মাঝে মাঝে তারা সংবাদ তর্জ্জমায় এমন ভুল ক'রে বসে যে, সমস্ত সংবাদটাই হাস্যকর হয়ে ওঠে। কিন্তু সুকুমার তখন কাজে রস পেয়ে গেছে। কাগজখানিকে নতুন রূপ দেবার জন্যে তার কল্পনা উদ্দাম হয়ে উঠেছে। তার মনে তখন 'সুদর্শন' ছাড়া আর কোন কিছুর চিন্তা নেই। সুদর্শনকে সত্যকারের সু-দর্শন করতে হবে, বাঙ্গালা দেশের সামনে এমন একখানি চমৎকার কাজ তুলে ধরতে হবে যার রূপ ইতিপূর্ব্বে কেউ কখনও কল্পনা করেনি, এই চিন্তায় সে সমস্ত সময় বিভোর থাকে। সে নিয়ম করলে নতুন সাব-এডিটারদের সকল লেখা তার কাছ হয়ে তবে প্রেসে যাবে। সমস্ত লেখা সে নিজের চোখে দেখবে, যাতে কোথাও বিন্দুমাত্র ভুল না থাকে। এমনি ক'রে তার খাটুনি গেছে অনেক বেড়ে। সকাল এগারোটায় খেয়ে-দেয়ে সে অফিসে আসে, ফেরে রাত বারোটায়, একটায়—কোনো দিন হয়তো একেবারে ফেরেই না। তার উৎসাহ দেখে স্বয়ং হরিসাধনবাবু পর্য্যন্ত মনে মনে না হেসে থাকতে পারলেন না। কিন্তু তিনি ভুল ভাবলেন। ভাবলেন, চাকরি এমনই জিনিস! প্রভুকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে মানুষ কি না করতে পারে!

সকল মানুষের মধ্যেই অল্পবিস্তর কবি-মন আছে, যদিচ কবিতা লেখার শক্তি সকলের নেই। অশিক্ষিত মালী আপনার কবিতাকে রূপ দেয় ফুলবাগানে, ছুতোর মিস্ত্রী তার কাঠের কাজে, এঞ্জিনিয়ার তাজমহলে। কারও হয়, কারও হয় না। কিন্তু চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। সুকুমারের কবি-মন মেতেছে খবরের কাগজ নিয়ে। এ যেন নেশার মত তাকে পেয়ে ব'সেছে। কিন্তু হরিসাধনবাবুরও দোষ নেই। দিন-কাল বিবেচনা করলে শুধু নেশার খেয়ালে কেউ যে এমন অবিশ্রান্ত খাটতে পারে এ কথা অনুমান করা সত্যই কঠিন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় সুকুমার অনেকগুলো তর্জ্জমা শুদ্ধ করতে ব্যস্ত ছিল। এমন সময় বেয়ারা এসে একটা চিরকুট

দিলে। জ্যোতির্ম্ময়ের লেখা। সে নীচে অফিসের বাইরে অপেক্ষা করছে। তার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়।

সুকুমার লাফিয়ে উঠল। আশ্চর্য্য! এই একটা মাসের মধ্যে সে এমনই কাজে নিমগ্ন ছিল যে, ওদের কথা একবার তার মনেও পড়েনি! সুকুমার লজ্জিত হ'ল। নিজেকে সে বার বার মনে মনে ধিক্কার দিতে দিতে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল।

বাইরে গিয়ে দেখলে কেউ কোথাও নেই। কি হ'ল? চ'লে গেল নাকি? সুকুমার বড় রাস্তার মোড়ের দিকে এগিয়ে গেল। ঠিক! জ্যোতির্ম্ময় কারও চোখে পড়বার ভয়ে সুকুমারের কাছে চিঠি পাঠিয়েই এত দূরে স'রে এসেছে। সুকুমারকে দেখেই সে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল। কিন্তু সুকুমার হাসতে পারলে না। ওকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল!

গভীর বিস্ময়ে সুকুমার বললে, এ কি হে?

কর্কশ গণ্ডস্থলে হাত বুলিয়ে জ্যোতির্ম্ময় বললে, দাড়িটা ক'দিন কামান হয়নি। তার পরে? চিনতে পারছ না নাকি?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুকুমার বললে, না পারবারই কথা।

ওর সর্ব্বাঙ্গে একবার সে ব্যথিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে। মাথার রুক্ষ চুল হাওয়ায় এলোমেলো উড়ছে। শীর্ণ মুখে কোটরপ্রবিষ্ট চোখ নেকড়ে বাঘের মত জ্বল জ্বল করছে। গায়ে একটিমাত্র মলিন খদ্দরের পাঞ্জাবী, তারও অর্দ্ধেক বোতাম নেই।

জ্যোতির্ম্ময় তাড়াতাড়ি বললে, খেতে পাই না ভাই। বড় কষ্ট। কিন্তু তার চেয়ে বেশী লজ্জার কারণ হয়েছে এই ময়লা জামা-কাপড়গুলো—অথচ দিন-রাত্তির টো টো ক'রে ঘুরছি। এমন সময় নেই যে···

জ্যোতির্ম্ময় হাসবার চেষ্টা করলে।

সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, কোথাও সুবিধা হ'ল না?

—পাগল!

সুকুমার চুপ ক'রে রইল।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করলে, কথাসাগরের সঙ্গে দেখা হয়?

—মাঝে মাঝে।

—এখানেই আছে?

—তা ছাড়া আর যাবে কোথায়?

—সুন্দরবন না কোথায় যাওয়ার কথা ছিল যে?

—তুমিও যেমন! বাড়ী থেকে টাকা আসছে, আর স্ফূর্ত্তি ক'রে থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখছে।

—আর কালীমোহন?

—তার কি বল? দাদার বাসা আছে, দু'বেলা দু'মুঠো খাওয়ার ভাবনা তো নেই। বেশ আছে!

—এর মধ্যে দেখা হয়েছে নাকি?

—দিন সাত-আট আগে হয়েছিল। রাস্তায় একটা রেষ্টুরেণ্টে নিয়ে গিয়ে খুব এক পেট খাইয়ে দিলে।

খাওয়ার কথাটা জ্যোতির্ম্ময় এমনভাবে বললে যে, সুকুমার অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চাইলে। জিজ্ঞাসা করলে, তুমি এখন রয়েছ কোথায়?

—রয়েছি?—জ্যোতির্ম্ময় ফিক্ ক'রে একটু হাসলে। বললে, সে কথা আর ব'ল না।

—পুরোনো মেস তো ছেড়েছ?

—ছেড়েছি মানে, তা ছাড়তে হ'ল বই কি।

—এখনকার ঠিকানা কি? একটা ঠিকানা তো আছে?

জ্যোতির্ম্ময় হো হো ক'রে হেসে উ'ঠল। বললে, বিলক্ষণ! ঠিকানা না থাকলে কি চলে? যাকগে। শোন, গোটাকয়েক টাকা দিতে পার? অবশ্য শোধ দিতে একটু দেরী হবে। তবে দোব নিশ্চয়ই।

—আচ্ছা। হয়েছে! ক'টা টাকা?

—দুটো, তিনটে, যা পার।

সুকুমার পকেট থেকে খানকয়েক নোট বের করলে। তার মধ্যে থেকে একখানা পাঁচ টাকার নোট জ্যোতির্ম্ময়ের হাতে দিলে।

জ্যোতির্ম্ময়ের চোখটা হঠাৎ চকচক্ ক'রে উঠল। হেসে বললে, আজকে মাইনে পেলে বুঝি?

সুকুমার অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবছিল। জবাব দিলে না।

জ্যোতির্ম্ময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপন মনেই বললে—হুঁ। মাইনের দিনই তো বটে। আজ সাত তারিখ। মনে ছিল না। বার, তারিখ, সব ভুল হয়ে গেল হে! অ্যাঁ? একেবারে eternityর রাজত্বে বাস করছি!

সে হো হো ক'রে হেসে উঠল।

জ্যোতির্ম্ময়কে দেখার পর থেকেই সুকুমারের মন ভারি হয়ে উঠেছে। কেমন একটা সঙ্কোচ তার কণ্ঠরোধ ক'রে বসেছে। তার কেবলই মনে হচ্ছে ওদের কাছে সে যেন একটা মস্ত বড় অপরাধ ক'রে বসেছে। ওদের যে আজ মাথায় তেল নেই, পরিধেয় মলিন—এর জন্তেও যেন আংশিকভাবে সেও দায়ী। ওদের সামনে দাঁড়াতে তার লজ্জা বোধ করা উচিত।

সে জ্যোতির্ম্ময়ের হাসিতে যোগ দিতে পারলে না। বললে, তোমার ঠিকানা তো দিলে না। নাই দিলে, কিন্তু আমার ঠিকানা তো জান। এর মধ্যে একদিন এসনা কেন?

মুখ টিপে হেসে জ্যোতির্ম্ময় বললে, আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তাতে তোমার কোন ক্ষতি হবেনা তো? মনে কর, ঘুণাক্ষরেও কর্ত্তৃপক্ষ যদি জানতে পারেন?

সুকুমার বারুদের মত ফেটে পড়ল।

—ক্ষতি? কর্ত্তৃপক্ষ? আমি কি তাদের গ্রাহ্য করি? তুমি কি মনে কর জ্যোতির্ম্ময়, চাকরি শুধু তোমরাই ছাড়তে পার, আমি পারি না?

উত্তরে জ্যোতির্ম্ময় একটু হাসলে।

সুকুমার আঘাত পেলে। ওর হাসি চাবুকের মত তার বুকে বাজল। ব্যথিত দৃষ্টি মেলে একবার সে জ্যোতির্ম্ময়ের দিকে চাইলে। শান্তভাবে বললে, দুঃখ আমিও কম সইনি জ্যোতির্ম্ময়। দুঃখ সইতে ভয়ও পাই না। কিন্তু সেই সঙ্গে অকারণে দুঃখের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়াটাকেও পৌরুষ ব'লে মনে করি না। আমি কি মনে করি জান?

জ্যোতির্ম্ময় তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে, আমার কথায় কি আঘাত পেলে সুকুমার? আমি কিন্তু সে ভেবে বলিনি।

সুকুমার শান্তভাবে বললে, না। কিন্তু তার পর শোন। আমি মনে করি, তোমাদের জন্তে আমিও চাকরি ছেড়ে দোব এর কোন মানেই হয় না। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে দেখা করার, কি বন্ধুত্ব রাখার ফলে যদি আমার চাকরি যায় তার জন্তেও দুঃখিত হব না।

জ্যোতির্ম্ময় নিঃশব্দে শুনে গেল। সুকুমারের গোড়ার কথাটা তার মনঃপূত হয়নি। কিন্তু সুকুমারকে সে ভালবাসে। তর্ক করতে গিয়ে পাছে তাকে আবার আঘাত দিয়ে ফেলে এই ভয়ে কোন কথা কইলে না। চুপ ক'রে রইল।

এমন সময় একখানা মোটর গাড়ী একেবারে ওদের পাশ ঘেঁষে চ'লে গেল। ওরা চমকে চোখ তুলেই দেখে—তার ভিতর থেকে ম্যানেজিং ডিরেক্টারের এক জোড়া চোখ তাদের দিকে চেয়ে।

জ্যোতির্ম্ময় বিব্রতভাবে বললে—এই দেখ! আমি যাই ভাই।

সুকুমার ওর হাত চেপে ধরলে। হেসে বললে, বেশ তো। তোমার কথার সত্যতার আজই পরীক্ষা হয়ে যাক। চল একটু চা-খেয়ে আসি।

সুকুমার হাসলে বটে। কিন্তু আসলে তার ম্যানেজিং ডিরেক্টারের সামনে যেতে ভয় করছিল। তিনি আফিস থেকে বেরিয়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত ও আফিসে ঢুকতে চায় না।

জ্যোতির্ম্ময় একবার বললে, তোমার হাতে কাজ নেই তো?

সুকুমার চলতে চলতে বললে—কাজ কি আর নেই? কিন্তু সে তো আমারই কাজ। ফিরে এসে করলেও চলবে। চল। কিছু খাওয়া যাক। বড় ক্ষিধেও পেয়েছে।

জ্যোতির্ম্ময় অবাক হয়ে দেখলে সুকুমার অকস্মাৎ যেন খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছে।

ক'দিন পরেই মণিমালার চিঠি এল।

তত্ত্ববিচারের মধ্যে মণিমালা বড় একটা যায় না। সে অবসরও তার নেই। বিশেষ খোকার উৎপাতে চিঠি লেখাই তার পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হয়ে উঠেছে। তাকে ঘুম না পাড়িয়ে কিছু করার উপায় নেই। হয় কলমটা কেড়ে নেবে। নয় দোয়াতটা উলটে দেবে। আর নয় তো কাগজ নিয়ে টানাটানি করবে। বাধা দিলে এমন কান্না জুড়ে দেয় যে সে আর এক হাঙ্গাম।

মণিমালা ছোট চিঠি লিখেছে। মাইনে বৃদ্ধিতে আনন্দ জানিয়েছে আর জানিয়েছে খোকার সম্বন্ধে টুকি-টাকি ক'টা কথা। আর কাজের কথার মধ্যে এই যে, তার ছোট মামা সম্প্রতি বম্বে থেকে ক'লকাতার আফিসে বদলী হয়েছেন এবং সুকুমারের সঙ্গে দেখা করতে চান। মণিমালা তাঁকে সুকুমারের ঠিকানা পাঠিয়েছে এবং সুকুমারকেও তাঁর ঠিকানা পাঠাল। সে যেন একবার নিশ্চয় ক'রে তাঁর সঙ্গে দেখা করে। তিনি তাহ'লে খুবই খুসি হবেন।

মণিমালার ছোট মামা গিরিশবাবুকে সুকুমার ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখেনি। ভদ্রলোক বিবাহ করেননি এবং তাঁর জীবনেতিহাসেরও একটু বৈচিত্র্য আছে। ইণ্টার-মিডিয়েট পাশ করার পর তাঁর ইচ্ছা ছিল ডাক্তারি পড়া। কিন্তু বাড়ীর সকলের ইচ্ছা সে উকিল হবে। তর্ক-বিতর্ক, অনুনয়-বিনয়, ঝগড়া-ঝাঁটি কোন প্রকারেই যখন তিনি পারিবারিক কর্ত্তৃপক্ষকে স্বমতে আনতে পারলেন না তখন একদিন ভোরে কোথায় যে নিরুদ্দেশ হলেন কেউ আর দু বৎসরে মধ্যে তাঁর খবর পেলে না। বছর দুই পরে তাঁর একখানা চিঠি এল—তিনি একটা লাইফ-ইন্সিওর্যান্স কোম্পানীতে চাকরি করছেন। তার পর যা হয়, অনেক দূরে থাকার জন্তে ধীরে ধীরে বাড়ীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ক'মে এল। ধীরে ধীরে তিনিও এদের ভুলে গেলেন, এরাও তাঁকে ভুলে গেল। তাঁর সম্বন্ধে মণিমালার মুখে কখনও কখনও শুধু এইটুকু কথাই সুকুমার শুনেছে যে তিনি নাকি খুব বড়লোক হয়েছেন। কিন্তু এ কথায় সে বিশেষ মনোযোগ দেয়নি। কারণ তার ধারণা—বাইরে দূরে যে থাকে, তার সম্বন্ধে মানুষ এই রকম অনুমানই করে।

সে যাই হোক, এই ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে সুকুমারের মনে মনে যথেষ্ট কৌতূহল আছে। বড়লোক হওয়ার জন্তে নয়—অত্যন্ত অল্প বয়সে দূর বিদেশে যিনি পালিয়ে যান, তাঁর আত্মীয়-স্বজনহীন দিনগুলি কেমন কেটেছে জানবার জন্তে। আজ আর সময় নেই। কাল সকালে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবে স্থির করলে। আত্মীয়দের সম্বন্ধে এ প্রকার প্রীতি তার জীবনে বোধ হয় এই প্রথম প্রকাশ পেলে। কিন্তু একে ঠিক প্রীতি বলা চলেনা। এ নিছক কৌতূহল।

সুকুমার তাড়াতাড়ি সুটকেস খুললে, দেখা করতে যাবার মত পরিষ্কার জামা-কাপড় আছে কিনা দেখবার জন্তে। তার জীবনে এইটে প্রায়ই ঘটে। কোথাও যাওয়ার আগেই দেখা যায়, জামা আছে তো কাপড় নেই, কাপড় আছে তো জামা নেই। আর নয়তো দুটোই এমন ছেঁড়া যে একেবারে অব্যবহার্য্য। সুকুমার দেখে আশ্বস্ত হ'ল যে জামা-কাপড় আছে।

সে সুটকেসটা বন্ধ ক'রে নিজের মলিন মাদুরখানার উপর নিশ্চিন্ত হয়ে বসল। এমন সময়—

—এ ঘরে সুকুমারবাবু থাকেন ?

সুকুমার শশব্যস্তে উঠে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। দেখলে, মিশকালো রঙের দীর্ঘকায় এক ভদ্রলোক দামী সাহেবী পোষাক প'রে পাশের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে।

সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, কাকে চান ?

—সুকুমারবাবু এখানে থাকেন ?

—আমিই। আপনি···

ভদ্রলোক আশ্বস্তভাবে হেসে বললেন, বিলক্ষণ! মণির কাছ থেকে বহু কষ্টে যদি তোমার ঠিকানাটা সংগ্রহ করলাম, তো বাড়ী খোঁজাই একটা সমস্যা। এমন এঁদো গলির ভেতর আমায় চিনতে পারছ না? আমি ছোট মামা, মানে বম্বে থেকে আসছি। মণি কি...

—জানিয়েছে। আসুন, আসুন।

ইংরেজি পোষাকে মাদুরে বসা অসুবিধাজনক। কিন্তু সুকুমারের ঘরে একখানা ভাঙা চেয়ারও নেই। এতদিন চৌকি ছিল। কিন্তু ছারপোকার উপদ্রবে সে দুটো ছাদে ফেলে দেওয়া হয়েছে। উপায়ান্তর নেই দেখে এই অসুবিধা সুকুমার দেখেও দেখলে না।

জিজ্ঞাসা করলে, কবে এসেছেন ?

—তা দশ-বারো দিন হবে।—ছোট মামা ঘরের চারিদিক দেখতে দেখতে অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন।

—কোথায় উঠেছেন ?

ছোটমামার ঘর পর্য্যবেক্ষণ হয়ে গেল। এইবার তিনি সোজা হয়ে উঠে বসলেন এবং পনেরো মিনিট যাবৎ অনর্গল ব'কে গেলেন :

—কি বলছিলে? কোথায় উঠেছি? ক্যালকাটা হোটেলে। এখানে আবার আমাদের কোম্পানীর একটা ব্রাঞ্চ খোলা হচ্ছে। তারই ব্যবস্থা করতে আসা। বোধ

হয় মাস দুই থাকতে হবে। So glad to meet you. মণিকে যে কতদিন দেখিনি তার ঠিক নেই। বড় দেখতে ইচ্ছা করে। শোন, কাল দুপুরে তুমি আমার ওখানে যাবে। তোমার আফিস কখন? তিনটেয়? Right. আমি বরং গাড়ীতে তোমায় পৌঁছে দিয়ে যাব। তার পরে? কাজকর্ম্ম কেমন চলছে? ভাল? মন্দ নয়? তাহ'লেই হ'ল। ব্যবসা-বাণিজ্যের কি যে দিনকাল পড়েছে! এই আমাদের···কিন্তু তুমি এ রকম একটা লক্ষ্মীছাড়া মেসে রয়েছ কেন? আত্মাকে কষ্ট দিয়ে···উঁ? তার চেয়ে বাসা করলে কি···ন'টা বাজে? আচ্ছা তাহ'লে···নীচে আবার ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছি। কাল আসছ তো? হাঁ, বারোটায়, punctually, আচ্ছা···

ছোটমামা চ'লে গেলেন।

সুকুমার ফিরে এসে জরাজীর্ণ মাদুরখানার দিকে একবার সকৌতুকে চাইলে। আপন-মনে হাসলে। তার পর তেল মেখে শিস্ দিতে দিতে স্নান করতে গেল।

আহারান্তে বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা পুরাতন কথা স্মরণ ক'রে তার হাসি এল। ছোটমামার প্রসঙ্গে মণিমালা একদিন ব'লেছিল—তাঁর রঙ ময়লা বটে, কিন্তু মুখশ্রী এবং গড়ন এত সুন্দর! নাক, চোখ, কপাল···

সুকুমারেরও তাই ধারণা ছিল যে, রঙ ময়লা। কিন্তু সে যে এমন মিশমিশে ময়লা তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

তা হোক। কিন্তু ওঁর কথায় বার্ত্তায় এমন একটা চমৎকার আত্মপ্রত্যয়ের ভাব! সমস্ত সময়ে ওঁর মনে-মনে একটা গভীর বিশ্বাস আছে যে, যা কেন না বলুন, যত তুচ্ছ কথাই হোক, মানুষ ওঁর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনতে বাধ্য। এইটে সুকুমারের বড় ভাল লাগল।

পরদিন দুপুরে ওঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে সে খুশিই হ'ল। ছোটমামা কেন জানি না বিলেতি কেতায় লাঞ্চের আয়োজন ক'রেছিলেন। খাবার টেবিলে ব'সে সুকুমারের জ্যোতির্ম্ময়কে মনে প'ড়ে গেল। জ্যোতির্ম্ময় সেই যে সেদিন পাঁচটি টাকা নিয়ে চ'লে গেল তার পরে আসবার কথা থাকা সত্ত্বেও আর আসে নি। কেন আসে নি কে জানে। পরিচিত বন্ধুসমাজকে সে যেন কেমন এড়িয়ে চলছে। সে কি দারিদ্র্যের সঙ্কোচে? কে জানে! কিন্তু সকল দিন দু'বেলা যে ওর খাওয়া হয় না, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেদিন রেষ্টুরেণ্টে সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও তার লোলুপতা যেন মাঝে মাঝে ঝিলিক দিয়ে উঠছিল। বহুতর সুখাদ্যের সম্মুখে ব'সে সুকুমারের চিত্ত জ্যোতির্ম্ময়ের সেদিনের কৃশ মুখখানির কথা স্মরণ ক'রে বিষণ্ণ হয়ে উঠল।

ছোটমামা তাঁর জীবনেতিহাসের অনেক অতীত কথা ব'লে চলছিলেন। কত জায়গায় তাঁর দেহ এবং মন কত ভাবে কত আঘাত পেয়েছে। নিষ্ঠুর স্বার্থপর পৃথিবীতে কত সংগ্রাম ক'রে তাঁকে বড় হ'তে হয়েছে। শুনতে শুনতে সুকুমারের মনের মধ্যে চমৎকার একটি ভাবালুতার সৃষ্টি হচ্ছিল। কিন্তু এ অভিজ্ঞতা তার হয়েছে যে বর্ত্তমানের কঠোর দুঃখ আর বিগত দুঃখের স্মৃতিকথা এক নয়। জ্যোতির্ম্ময় প্রতি মুহূর্ত্তে যে দুঃখ ভোগ করছে তার সঙ্গে ছোটমামার এই দুঃখকাহিনী সুরে মেলে না। মনে হয় যেন, একটা বাস্তব—আর একটা স্বপ্ন, কবিতা।

ছোটমামা বললেন রুটি, বুঝলে বাবাজি, দুনিয়ায় মানুষের দরকার এখন রুটির। তার পরে ভরা পেটে পড়বে তোমার 'সুদর্শন', গল্প-কবিতা-উপন্যাস। খালি পেটে স্বর্গসুখও ভাল লাগে না। কবি দিচ্ছেন 'কাল্চার', আমি দিচ্ছি রুটি। চল ফুটপাথে দাঁড়াইগে, কার কাছে লোক ছুটে আসে দেখিগে।

সুকুমার হেসে বললে, ফুটপাথে দাঁড়াবার দরকার নেই, আমি জানি লোক আপনার কাছেই ছুটে আসবে। তবু রুটি, রুটি। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা ফুরিয়ে যায়। আর কবিতার রস কোন কালে শেষ হবে না। মধুসূদনদাদার দধিভাণ্ডের মত সে থাকবে অক্ষয় হয়ে।

—সত্যি। কিন্তু সে রস কি খালিপেটে পাওয়া যায়?

—হয়তো যায় না। কিন্তু সে দায়িত্ব কবির নয়। সংসারে সকলের দায়িত্ব এক নয়। কারও দায়িত্ব ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দেবার। তাঁদের বিরুদ্ধে কবিতা না লেখার অভিযোগ করা ভুল। কেউ করেও না। তেমনি কবিরা কেন চটকল তৈরি করলেন না এ অভিযোগ করাও ভুল।

ছোটমামা খুশি হয়ে উঠলেন। বললেন, বাঃ! কথাটা তো বড় গুছিয়ে বলেছ হে! চমৎকার! তোমার নিজের সম্বন্ধেও কি তুমি এই কথা অনুভব কর?

—না। কারণ আমি কবি নই।

—তবে ?

—আমি খবরের কাগজে চাকরি করি। স্রেফ চাকরি।

—বাস্ ?

—আজ্ঞে হাঁ।

ছোটমামা স্যুপে আপনমনে উপর্য্যুপরি ক'টা চুমুক দিলেন। কি যেন ভাবলেন। তার পর হঠাৎ বললেন, তুমি আমার আফিসে চাকরি নেবে ?

সুকুমার এত অকস্মাৎ মনঃস্থির করতে পারলে না। শুধু পুরাতন তর্কের সুর টেনে বললে, না নেবার কি কারণ থাকতে পারে ?

—কিন্তু এখনই-এখনই খুব বেশী মাইনে দিতে পারব না। ধর যদি দুশো দিই, কিম্বা বড় জোর আড়াই শো ?

দুশো কিম্বা আড়াই শো এবং তার জন্য এত কুণ্ঠা! সুকুমারের জীবনে এত বড় বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা আর কখনও হয়নি। তার চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। কি যে বলবে ভেবে পেলে না।

ছোটমামা বললেন, কি ? আপত্তি আছে ?

কোনক্রমে সুকুমার বললে, না। আপত্তি কি ?

—তা'হ'লে এই কথা রইল। কবে থেকে যোগ দিচ্ছ বল।

সুকুমার হেসে বললে, এই মুহূর্ত্ত থেকে পারি।

ছোটমামা হেসে বললেন, আমাদের আফিস খুলতে এখনও মাসখানেক দেরী। কিন্তু কয়েকজনের service এখন থেকেই দরকার। বেশ, তুমি যেদিন থেকে খুশী আসতে পার।

সুকুমার 'সুদর্শন' আফিসে চলল স্বপ্ন দেখতে দেখতে। সে মনে-মনে স্থির ক'রে ফেললে জ্যোতির্ম্ময়কে নিতে হবে। তারপরে কালীমোহন এবং সম্বিৎকেও। 'সুদর্শনের' মত সেখানেও একটা হৃদ্যতার সুমধুর আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে। নিজে সে অনেক দুঃখ পেয়েছে। কি ক'রে অধীনস্থ কর্ম্মচারীর সঙ্গে ব্যবহার করতে হয় সে অভিজ্ঞতাও হয়েছে। সে মনে মনে তারই খসড়া তৈরি করতে করতে চলল।

প্রথমেই গেল হরিসাধনবাবুর ঘরে। শুভ কাজে দেরী ক'রে লাভ নেই। আর মমতাই বা কিসের! আজই সে পদত্যাগ করবে। কিন্তু হরিসাধনবাবু তখনও আসেননি। সেখান থেকে সে নিজের ঘরে গেল। দেখলে, টেবিলের উপর স্তূপীকৃত হয়ে আছে টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম—কোনটা নিউইয়র্ক থেকে, কোনটা বার্সিলোনা থেকে, কোনটা বা করাচী থেকে। কিন্তু এরই মধ্যে সেগুলোর সম্বন্ধে তার সমস্ত আগ্রহ যেন কোথায় উড়ে গেছে। একবার উলটে-পালটে দেখে আবার সেগুলো যথাস্থানে রেখে দিলে। ঘরের হাওয়াও যেন ভারী বোধ হ'তে লাগল। সে বাইরের বারান্দায় গিয়ে পায়চারি করতে লাগল।

এমন সময় বেয়ারা এসে খবর দিলে—হরিসাধনবাবু ডাকছেন।

তাঁর ঘরে যেতেই তিনি তার মুখের দিকে না চেয়েই একখানা খাম এগিয়ে দিলেন। সুকুমার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অপাঙ্গে চেয়ে দেখলে, তাঁর মুখখানা কেমন যেন লম্বা হয়ে গেছে। সে খামখানা খুলে পড়ল।

সেই পুরাতন চিঠি, যে চিঠি কিছুকাল আগে সম্বিৎকে দেওয়া হয়েছিল। সেই চিঠির কাগজ, সেই ভাষা, সেই স্বাক্ষর এবং তেমনি টাইপকরা। একটা কঠিন সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ যেমন আনন্দে হেসে ফেলে—সুকুমার তেমনি উচ্ছ্বসিতভাবে হেসে ফেললে। ছোটমামাকে সে এখন থেকে কাজে যোগ দেবার কথা ব'লে এসেছে। তার মনে একটা খট্‌কা ছিল, একমাসের নোটিস না দিয়ে 'সুদর্শন' ছেড়ে দেওয়া সঙ্গত হবে কি না। যাক্, সে দুর্ভাবনা আর রইল না।

বললে, আমি নিজেই আজ পদত্যাগ করতাম হরিসাধনবাবু। কিন্তু তা'হ'লেও আমাকে আরও একমাস থাকতে হ'ত। ম্যানেজিং ডিরেক্টার আমাকে সেই ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। তাঁকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ দেবেন।

হরিসাধনবাবু চোখ থেকে পট্ ক'রে চশমাটা খুলে ফেলে বললেন, সে আবার কি!

—আমি একটা চাকরি পেয়েছি।

—তাই নাকি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

বেয়ারা এসে সুকুমারকে জিজ্ঞাসা করলে—তার চা এইখানে এনে দেবে কি না।

—তাই দে। শেষ পেয়ালা খেয়ে নিই।

সুকুমার চায়ের পেয়ালা মুখের কাছে তুলে নিলে। যে কারণেই হোক, নিতান্ত খোর না হ'লে এ আফিসের চা মুখে দেওয়া যায় না। এমনই বিস্বাদ। কিন্তু আজ সর্ব্বপ্রথম এই কদর্য্য চা'ই সুকুমারের আশ্চর্য্য রকম মধুর মনে হ'ল। সে পা নাচিয়ে নাচিয়ে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে চা পান করতে লাগল।

শেষ



মাদ্রাজ শিল্প-বিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রদর্শনী

গত জানুয়ারী মাসের ২৮শে তারিখে মাদ্রাজে গভর্ণমেণ্টের শিল্প ও কলা বিদ্যালয়ের যে বার্ষিক প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল তাহার বিবরণ আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম। এত বিলম্বে হইলেও ইহা বাঙ্গালার জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করার সার্থকতা আছে; খ্যাতনামা বাঙ্গালী শিল্পী শ্রীযুত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী মহাশয় মাদ্রাজস্থ গভর্ণমেণ্ট শিল্প কলা বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল। দেবীপ্রসাদ শুধু ছবি



সার সি, পি, রামস্বামী আয়ারের আবক্ষ-মূর্ত্তি
—শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

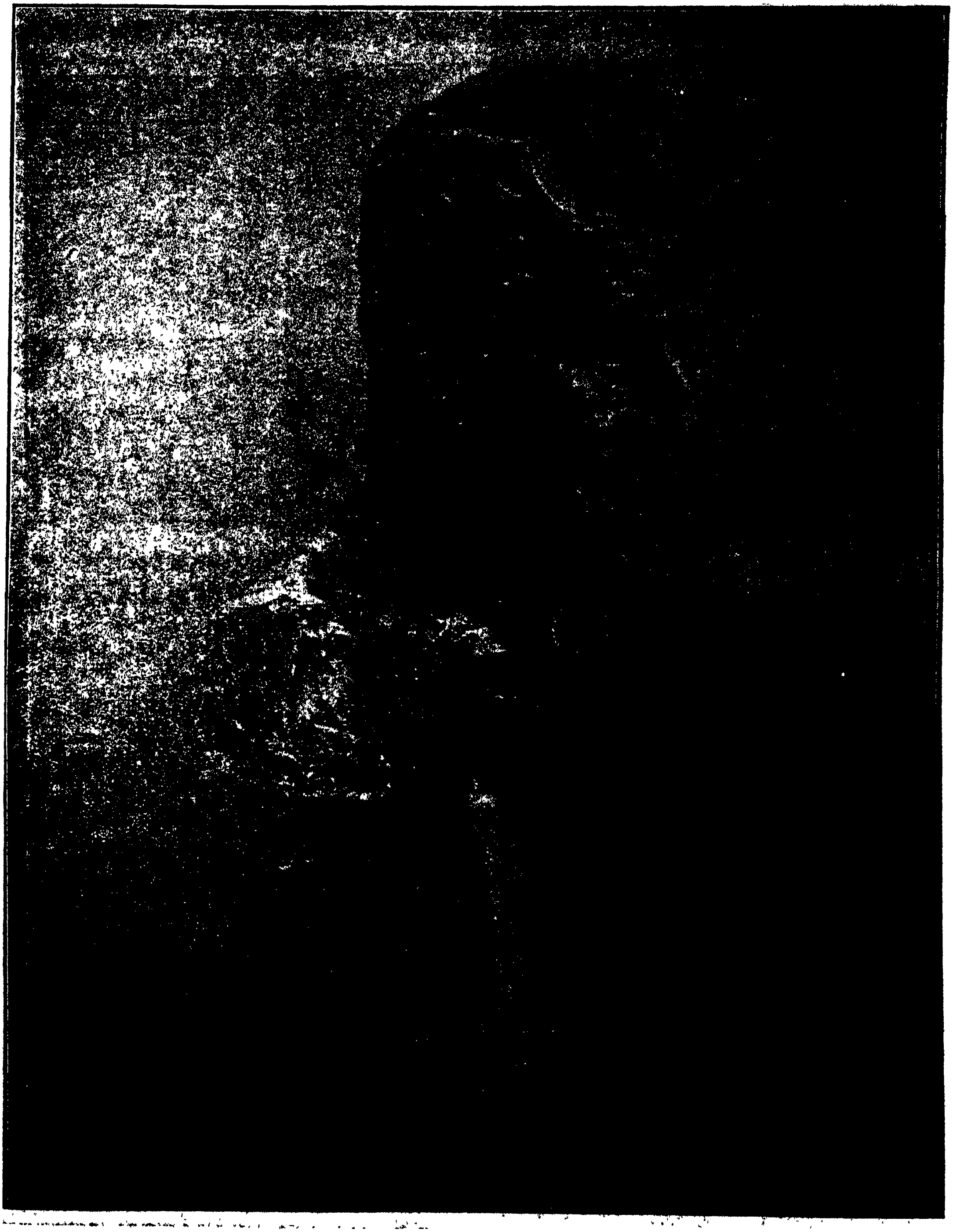
আঁকেন না—তিনি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ শিল্পেও যথেষ্ট যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। বাঙ্গালী মাত্রই অবগত আছেন, কলিকাতায় চৌরঙ্গীর মোড়ে পরলোকগত পুরুষসিংহ সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যে বিরাট মূর্ত্তি স্থাপিত আছে তাহা দেবীপ্রসাদেরই নির্ম্মিত। এই বিবরণের সহিত প্রকাশিত ১১খানি চিত্রের তিনখানি দেবীপ্রসাদের। 'কাল' নামক চিত্রখানি এবার দেবীপ্রসাদের সুনাম বহুগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে। আর একখানিতে মাদ্রাজের স্বনামখ্যাত রাষ্ট্রনেতা সার সি, পি, রামস্বামী আয়ারের একটি আবক্ষ মূর্ত্তি—ইহাও দেবীপ্রসাদের নির্ম্মিত। তৃতীয়খানি দেবীপ্রসাদ কর্ত্তৃক অঙ্কিত কুমারী ম্যাকডুগালের তৈলচিত্রের প্রতিলিপি।

মাদ্রাজে এবারের প্রদর্শনী অন্যান্য বারের অপেক্ষা নানা



রাগ রাগিণী
—শিল্পী এম, ভেঙ্কটনারায়ণ রাও

দিক দিয়াই উন্নততর হইয়াছিল। পূর্ব্বে কোন প্রদর্শনীতেই এত অধিক দ্রষ্টব্য ছিল না। দ্রষ্টব্যগুলিও অপেক্ষাকৃত ভালই ছিল। এবার বহু পুরাতন ও বর্ত্তমান ছাত্র ছবি প্রভৃতি প্রদর্শনীতে পাঠাইয়াছিলেন। চিত্রসমূহের মধ্যে বিদ্যালয়ের ছাত্র সৈয়দ আহমদের অঙ্কিত একখানি চিত্র সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল। শ্রীযুত এম-ভি নারায়ণ রাও শ্রীযুত



কাল —শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী



ভীত —শিল্পী থানিকাচলম্

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি আবক্ষ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া প্রদর্শনীতে দিয়াছিলেন—তাহা অতি চমৎকার হইয়াছিল।



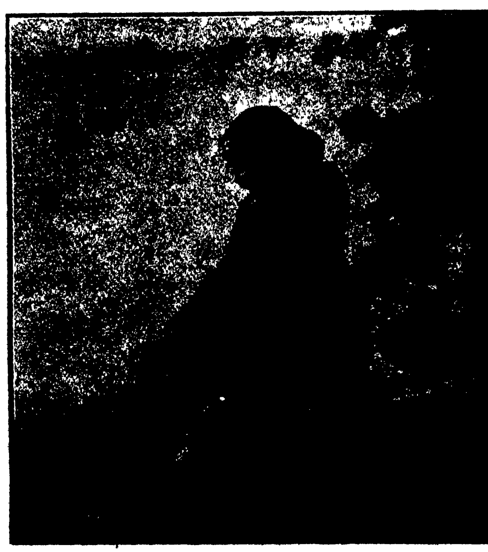
কুমারী ম্যাকডুগালের তৈলচিত্র
—শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী



শাদা ও কালো —শিল্পী এ-আর-দীনম্

তাঁহার অঙ্কিত রাগ-রাগিণীর চিত্র আমরা এই সঙ্গে প্রকাশ করিলাম।

শিল্প বিভাগে চামড়ার কাজ, কাপড়ের উপর চিত্রাঙ্কণ



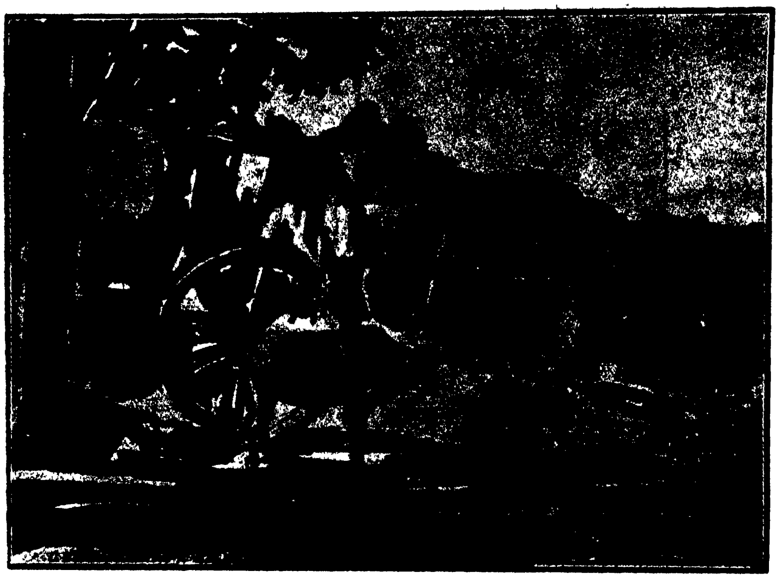
স্নান —শিল্পী আশীর্ব্বাদম্

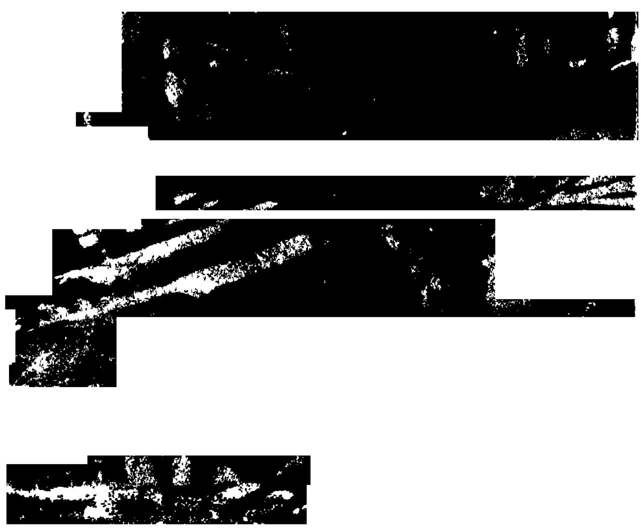
প্রভৃতি বেশ ভালই হইয়াছে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপর এনামেলের কাজ বা মীনার কাজ ছাত্রগণ অতি নিপুণতার সহিত শিক্ষা করিয়াছে। একদিনে ঐরূপ শিল্পদ্রব্য ৭ শত টাকা মূল্যের বিক্রীত হইয়াছিল।

শ্রীযুত ভি, আর, চিত্রের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়ে চীনা-মাটির কাজ শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার রচিত বহু তৈজসপত্র ও তদুপরি অঙ্কিত বহু চিত্র সত্যই এদেশে নূতন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

মুকুন্দ দেব ঘোষ, গোপাল ঘোষ, খগেন রায় প্রভৃতি বহু বাঙ্গালী শিল্পীর চিত্র প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছে। সেগুলি মাদ্রাজের নানা সংবাদপত্রেও প্রশংসিত হইয়াছে। ইহা অবশ্যই বাঙ্গালীর পক্ষে গৌরবের বিষয়।

প্রদর্শনীটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই বটে, কিন্তু কমার্সিয়াল আর্টের জন্য তথায় উপযুক্ত স্থান দেওয়া হয় নাই। বহু শিল্পী-ছাত্রকেই পরবর্ত্তী জীবনে পোষ্টার-অঙ্কন প্রভৃতি দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতে হইবে—এখন হইতে তাঁহাদের অঙ্কিত চিত্রগুলি যাহাতে সাধারণ ব্যবসায়ীদের নিকট পরিচিত হইয়া থাকে, সকল প্রদর্শনীতেই তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।


বিশ্রাম —শিল্পী কে-সি-এস পানিকর


পথ-হারা—

চিত্র বিভার সহিত শিল্প বিভাগ সংযুক্ত করায় বিদ্যালয়ের দ্বারা দেশের লোকের কিরূপ উপকার হইতেছে তৎপ্রসঙ্গে মাদ্রাজের গভর্ণর লর্ড আর্সকিন একস্থানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক প্রস্তুত

শিল্পকার্য্যের দ্বারা মাদ্রাজ অঞ্চলে লোকের সৌন্দর্য্যবোধ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন পারিবারিক নিত্য ব্যবহার্য্য



মূর্ত্তি—শিল্পী পি দাশগুপ্ত

জিনিষগুলিও ঐ অঞ্চলের লোকেরা চিত্র-বিচিত্র ও কারুকার্য্যপূর্ণ হইলেই অধিক পছন্দ করেন। বাজারের পিতল কাঁসার কারিকরগণও এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-গণের কার্য্যের অনুকরণ আরম্ভ করিয়াছেন।" ইহা যে বিদ্যালয়ের ও তাহার পরিচালকগণের পক্ষে কিরূপ



স্বর্গের আলো

—শিল্পী কে-সি-এস পানিকর

গৌরবের কথা—তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

শক্তি-সাধনা

শ্রীকালিদাস রায়

(রজ্জব হইতে)

সমরথ মারি হিজড়া বনে দোষ সাধন সেঁ জান
বিফল সাধনা, পৌরুষে হরি বানায় যাহাতে ক্লীব,
জীবন-ধর্ম্ম গেলে হয় জড়, আর থাকে নাক জীব।
দয়ার ধর্ম্ম-সাধন করিতে পৌরুষে যেবা মারে
ঘাতকধর্ম্ম পালে সেই জন, দয়াল বলি না তারে।

একটি শাবকে মারিয়া ফেলিয়া তাহার অংশ দিয়া,
বাঘ বিড়ালেরা অন্য শাবকে রাখে বটে বাঁচাইয়া।

পশুর এ রীতি, সাধকের রীতি চির অহিংসাময়,
এক ভাব মেরে অন্য ভাবের পোষণ সাধনা নয়।

জীবনের ক্রমবিকাশে মনোবৃত্তির স্থান

ডাক্তার শ্রীনরেন্দ্রনাথ পাল এম-বি

(৩)

জীবনের ক্রমবিকাশ অর্থে জীবনের অগ্রগতি বুঝায়। ইহারই মধ্যে প্রগতি (progress) অন্তর্নিহিত। মনীষীদের অভিমত—প্রগতি সরল রেখাকারে প্রতীয়মান হয় বটে কিন্তু বস্তুতঃ ইহা বৃত্তাকার। বৃত্তের কোন অংশ আগে এবং পরে তাহার কিছু ঠিক নাই। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যদি বীজ ও বৃক্ষ লইয়া বৃত্তের ধারণা করা যায় তাহা হইলে বীজ পরে কি বৃক্ষ পরে তাহার কিছু ঠিক হয় না। তবে উদ্ভিদ্-জীবনের কথায় বীজ হইতে আরম্ভ করিবার সুবিধা হয় বলিয়া বীজকেই অগ্রে ধরা হয়। দার্শনিকের কথায় উক্ত বৃত্তকে কুহেলিকাময় গতিচক্র বলা হয়। মনোজ্ঞানবিদ্‌গণ বীজ-তত্ত্বের রসধারা কিরূপে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিল তাহারই আলোচনা করিব। ইহাকে প্রজনন তত্ত্ব বা জনন-শাস্ত্র (Sex-Psychology) বলে।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন—জলকণা হাইড্রোজেন ও ও অক্সিজেন লইয়া গঠিত। বৈজ্ঞানিক জড়কণাকে ক্রমশই বিশ্লেষণ করিয়া অনন্ত-শক্তিময় একটি মাত্র ইলেক্‌ট্রণ বা ডয়টিরণে রূপান্তরিত করিলেন। "Matter is volatalized and electrified into protons, electrons, neutrons, deuterons and neutrinos or onetamorphosed into puzzling quanta." (১) মনস্তত্ত্ববিদ্ তেমনি মানস-সুন্দরীকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার সংজ্ঞাত ও অসংজ্ঞাত রাজ্যের স্বয়সাধনী রহস্য চাতুরী উন্মোচন করিলেন। "When a variety of effort is spent upon the elaboration of some bifunctional theory concerning mind and matter the whole face of the problem is altered" (২) অন্তর্জগতের রংগুলি সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হইল যখন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বলিলেন—জড় ও জীবনে পার্থক্য নাই; জড় ছাড়া মনন-শক্তির অস্তিত্ব নাই, মনন শক্তি ছাড়া জড়েরও অস্তিত্ব নাই। দার্শনিক Dewey সাহেবের দর্শনের একটা মোটা কথা হইতেছে যে, H_2O, জলকণা হইতে পারে কিন্তু আরও কিছু; এই আরও কিছু-অংশ ঠিক হইল, রাসায়নিক খেয়াল ('chemical planning') মাত্র।

আমরা যে সমস্ত জটীল-সমস্যার (Complexes) কথা পরে বলিব, ইহার অনুরূপ (Sister) theory হইতে ঐ সমস্যাগুলি সমাধান লাভ করিতে পারে কিনা দেখিব। মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের উপর দোষারোপ করা হয় তাঁহারা প্রকৃতির অন্তর্নিহিত রসধারায় লিঙ্গমূর্ত্তি (Phallus) বা তাহারই রূপান্তর (phallic symbol) ছাড়া অন্য কিছু দেখিতে পান না। উহা সত্য এবং ইহাই চিন্ময়। আমরা বলিয়াছি বিন্দুই ব্রহ্ম। আমরা বলিব ইহাই চিন্ময়। শিবলিঙ্গের পূজা Phallusএর বেদীমূলে আত্ম সমর্পণ। একদিন সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে গঙ্গার বেলাভূমিতে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল, সেইখানেই একদিন আমরা জানিতাম এই শিবলিঙ্গের বেদীমূলে কেমন করিয়া পৌঁছিতে হয়, আর কেমন করিয়া এই Life's parents ও patterns'কে বিভিন্ন ও বিশিষ্ট রূপ দিতে হয়। এখনো তাই সেই দেশের জগদীশ-চন্দ্র বলিতে পারিয়াছেন "No matter without mind, no mind without matter." কিন্তু Naked Fakir p 116 'এ রবার্ট বার্ণ যাহা বলিয়াছেন তাহা শ্রুতিকটু হইলেও বহুলাংশে সত্য (৩) আমাদের বলিবার কথা ধর্ম্মাচরণের নামে 'অপরের ও নিজের উপর পীড়া দেওয়ার প্রচেষ্টা' (৪)—বিষয়-পীড়ন রতি (masochism) ও স্ব-নিপীড়ন-রতি (Sadism), সমাজহিতের নামে প্রবঞ্চনা, দেশসেবার নামে মেকী-বৃত্তি (৫) (Counterfeit) মনঃবিশ্লেষণে (৬) আমাদের চরিত্রগত ভাব-প্রবণতা (emotional bias') তমিস্র (gloom) ও স্ব রূপ-প্রদর্শন (exhibitionism or ostentation) কেন এত বেশী লক্ষীভূত হয়? জড়-জীবন সত্যই জটীলতাময় (Compound of complexes)। মনঃবিশ্লেষক লক্ষ্য করিয়া থাকেন সভ্য ও আদিম মানুষ আলাদা নয়। জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া আমরা নানারূপে নানা যোনি ঘুরিয়া মানবত্ব লাভ করিয়াছি; বিবর্ত্তনের এই আগমন ও প্রস্থান, রূপ হইতে রূপান্তর, জড় জীবনের ধ্বংস-সূচক শ্বাসপ্রশ্বাস ও গঠন-মূলক সমীকরণ (assimilation), যেন মানসিক জীবনের আকাঙ্ক্ষামূলক শূন্যতা ও পূর্ণতার একই পর্য্যায়ভুক্ত। প্রকৃতি-জীবনেও (Cosmos) যে বাষ্পীকরণ (evaporation) ও বারিপাত লক্ষীভূত হয় তাহা ইহারই বিস্তৃত অধ্যায়-ভুক্ত। বাষ্পীকরণ প্রাণী-জীবনের শ্বাসপ্রশ্বাসের অনুরূপ; বারিপাত শস্যশ্যামলা প্রকৃতিতে জীবন বর্দ্ধন করে। প্রকৃতই জীবন-গতি সর্ব্বত্রই সমান। আকাঙ্ক্ষা মূলতঃ দ্বিবিধ। আদিম মনের আকাঙ্ক্ষা সভ্যতাজন্ত

---

(১) (২) John Laird—Recent philosophy.

(৩) ও (৪) শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত—'মলয়যাত্রী' ভারতবর্ষ—২৪ বর্ষ ২ স ৩ খ পৃ ৫০২

(৫) বর্ত্তমান লেখক—'About our Society'—Amrita bazar Patrika 4. 1 37 p 5.

(৬) বর্ত্তমান লেখক—'The character sketches of our country'. J. 1. P, 6.

যে মন—তাহার প্রতিকূলে কাজ করে। অথচ এই সভ্য মানুষকে আদিম মানুষের সঙ্গেই ঘর করিতে হইবে। উহারা বিভিন্নমুখী বলিয়াই তো পরস্পরের মধ্যে প্রেম নিবিড়। এই আদিম মানুষের মনোদ্ঘাটনই মনঃবিশ্লেষকের কাজ, কারণ মানুষ সভ্য হইতে গিয়া যে আদিম মানুষ পীড়াদায়ক তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে কিন্তু ভবী (potentiality) ভুলিবার নয়। অন্তর্জ্ঞাত মনই (Unconscious mind) যে, সকল আশা, আকাঙ্ক্ষা ও কার্য্যসিদ্ধির গোড়ার কথা একথা ভুলিলে চলিবে না। বিখ্যাত সাইকো-এনালিষ্ট Jung সাহেব একবার তাঁহার রোগীর কথায় একটি ভুল লক্ষ্য করিয়াছিলেন—monogamy না বলিয়া ভদ্রলোক বলিয়া ছলেন monotony। Jung বুঝাইলেন সভ্য মানুষ দাবী করে—শান্তি বজায় রাখিতে হইলে monogamy আবশ্যক; যাহা সাধারণের চক্ষে একটি মাত্র ভুল, Jung বুঝাইলেন ইহাই আদিম মানুষের নালিশ; তাই তাহার রোগীর পক্ষে একের সঙ্গে বিবাহ বা monogamy হইল monotony অর্থাৎ একঘেয়ে। একটি কথা উঠিতে পারে যে জগতে সর্ব্বত্রই যখন জটীল-প্রবণতা ('Complex-bias') প্রবল অর্থাৎ দেশে "political-bias', সমাজে class bias বা rank bias, জীবনে 'emotional-bias' তখন সাইকো এনালিষ্টদেরও আছে professional bias (৭) ; অর্থাৎ সকলই তাহাদের কামানুভূতির (sexual feeling) প্রতিফলিত ছায়া মাত্র; তাহাদের স্বীকৃত সত্যের তাৎপর্য্যের বিশেষ অর্থ কি? আমরা বলি যে সত্য ব্যাপকতর স্থান কাল-পাত্র অধিকার করে তাহাই আপেক্ষিকভাবে প্রকাণ্ড সত্য। দার্শনিকের সত্য ব্যাপকতর এবং মনোবৃত্তির যৌন সত্য এই ব্যাপকতার পরিপোষক।

"দর্শনশাস্ত্র বহুকাল হইতে একটা সদ্বস্তুর (Noumenon) বা সত্য পদার্থের অন্বেষণে ব্যাপৃত আছে" (৮)। দার্শনিকের ভাষায় ইহা অব্যক্তম্ (Unmanifested) কিন্তু ইহারই কাছাকাছি যাহা তাহা এই চৈতন্ত-জগৎ বাচিত পুরুষের (mind-staff (৯)) অসংজ্ঞাত-আত্মা (Unconscious Soul) বা (Unconscious mind)—ইহাই প্রকাশমানা সত্তাব্যশক্তি—আত্মাশক্তি বা মহামায়া। "Unconscious Soul is the relatively greater genius"—অন্তর্জগতের ইহাই অসংজ্ঞাত মন এবং ইহা রুদ্ধ ইচ্ছার সমবায়ে পরিপুষ্ট। নিরুদ্ধ ইচ্ছা, কামনার বা কামচেষ্টার অন্তরায় হইতে উদ্ভূত। শৈশবকালীন আদিম মানুষই ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করে। ইহার কারণ খুঁজিতে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় অনুধাবনযোগ্য।

(১) আমরা প্রত্যাকাশগত সুখ (Pleasure of perception) লাভ করি। ইহা আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির পরিপোষক; ইহাও শৈশব-জাত। সকলেই জানেন আপনার মায়ের হাতে রন্ধন সামগ্রী যেমন মিষ্ট লাগে এমন আর কাহারো হাতের খাওয়া মিষ্ট লাগে না। ইহার অর্থ এই যে আমরা শৈশবে মায়ের হাতে খাওয়ায় যেমন ভাবে সুখ লাভ করিয়াছি এই সুখের আস্বাদ প্রাপ্তবয়সে প্রায়ই বদলাইবার নয়। কিন্তু ইহাতে রুদ্ধ ইচ্ছার অংশ নাই বলিয়া ইহা অপেক্ষা (২) অনুমানগত সুখ (pleasure of inference) অপেক্ষাকৃত সুখকর। যাহাকে দেখি নাই সে নাকি কত সুন্দর! যাহাকে চিনি নাই সে নাকি কত সাধু! যাহা খাই নাই তাহা 'দিল্লিকা লাড্ডু'! নিভৃতাংশকে রক্ষা কাচ স্বরূপ গোপন করিয়া যে অনুমানকৃত সুখ লাভে আমরা সমর্থ হই তাহাও আমাদের শৈশবকালীন একটিমাত্র অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই বলিয়া। সেটি হইতেছে আমরা শৈশবকালে অনুসন্ধানে সকল দ্রব্যেরই খোঁজ পাইয়াছি, মাত্র জানিতে পাই নাই বিষম লৈঙ্গিক (hetero-sexual) ব্যক্তিবিশেষের তা বাপই হউক আর নাই হউক) কামাঙ্গ (Sex) কিরূপ (১০)? আমাদের ইহা প্রায়শই অনুমান করিতে হইয়াছে। এইখানেই শৈশবকালীন সমস্তারাজির (infantile complexes) গোড়াপত্তন। (৩) এই অনুমানগত সুখ হইতেও যাহা সুখকর তাহা হইতেছে কাম-রতি (Pleasure of Sex)। শৈশবে এই জাতীয় অন্বেষণে বাধা পাইয়া আমরা উন্নতির শিখরে তথা জ্ঞান গিরি আরোহণে (conquest of knowledge) সচেষ্ট হইয়াছি। ইহারই ব্যভিচারে (perversion) আমাদের Œdipus-Complex, Castration-Complex ইত্যাদি। পরে ইহাদের আলোচনা করা হইবে। আবার এই কাম-রতির জ্ঞান সমীকরণে আমাদের নির্জ্জলা (১১) বা বিশুদ্ধ বিষয়—রতির (Sublimation) উৎপত্তি—তাহাই একমাত্র সভ্যতার যুগান্তর আনিতে পারে। এই sublimation বলিতে Sigmond Freud—যাহা বলিয়াছেন তাহা এই 'the capacity to exchange an originally sexual aim for another—one which is no longer sexual though it is psychically related to the first." বিশুদ্ধ বিষয় রতি বলিতে এই অর্থবোধ হয় যে শেষোক্ত আনন্দই সর্ব্বাপেক্ষা স্থায়ী কারণ ঈদৃশ সুখ কামানুভূতি (sexual feeling) হইতে জাত হইলেও উহা কাম-চেষ্টায় (sexual aim) পরিণত হয় না। এই আনন্দই ব্রহ্মের রূপ। ইহাই Symbolic signification of phallus। এখন বলিতে চাই অশ্লীল (unclean) কে? না যে অসংযত; আর শ্লীলতা বা সংযম অর্থে সমীকরণ চেষ্টা বা দুঃখ ভোগের আগে কষ্ট ক্ষমতাই বুঝায় ইহাই আমাদের ধর্ম্মের অকিঞ্চনতা। তপোবনবাসী ঋষির নিঃস্বতায় লজ্জা নাই কারণ আবশ্যক হইলে তাঁহারই নির্দ্দেশমত দেশের অরাজকতা বা

(৭) এই কারণেই psycho-analystদের analysed হইতে হয়। Earnest Jones, Essays on applied psycho-analysis

(৮) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—জিজ্ঞাসা

(৯) Prof. Clifford.

(১০) 'Œdipus Complex.'

(১১) নির্জ্জলা বলিবার কারণ Sublimation has been defined in physical science as the evaporation of solid into gaseons state without the intermediary liquid through the agency of heat.

বা বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হইত। তপোবনের এই ঋষির সত্তা একাধারে শূন্যতায় ও পূর্ণতায় তথা পবিত্রতায় অনবদ্য। আর পরবর্ত্তীকালে যখন সংযম হইল মাত্র ব্যর্থ-কামের আড়ম্বর তখন হইতে মানবত্ব পরিহার করিয়া মানুষ হইল যন্ত্রবৎ। আর আজকাল আমরা হইয়াছি "মরা আর্যামীর গ্রামোফন"। আমাদের পেশা হইল মুখোস পরিধান করা বা মেকীভাবে চলা (Counterfeits pass as real coins) ও পুরাতন রেকর্ড বাজিয়ে যাওয়া। এখন শক্তির বহুলাংশ হইতেছে অপব্যয় কাম চেষ্টার ব্যতিরোধে বা ব্যভিচারে। পুরুষের গুম্ফশ্মশ্রু মুণ্ডিত স্ত্রীজনোচিত মোলায়েমত্ব নপুংসকতার (Castration Complex) পরিচয় দিতেছে। বংশপরম্পরায় সন্ততিদের মধ্যে এই ছদ্মতার আবরণ হইতেছে কায়েম। ঘৃণা, সহনশীলতার অভাব ও জাতীয় জীবনে তমিস্র-ভাব (melancholy বা gloom) হইতেছে প্রবল। দাম্পত্য-জীবনে প্রেমাস্পদের পীড়ার কারণ (Sadism) এবং তাহার দ্বারা নিপীড়ন সমস্যা (masochism) সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। যেখানে ভণ্ডামি আছে সেখানে কথাই নাই যে কি না আছে; যেখানে ভণ্ডামি নাই সেখানেও নানাপ্রকারের ব্যাধি ও দুষ্ট স্বভাব প্রবলবেগে বাড়িয়া চলিয়াছে। একমাত্র যে সত্বগুণের কথা আমরা এখনো বলি নাই যাহা বিশুদ্ধ-বিষয় রতিজাত—যাহা প্রতীচোর 'Super-Ego-Complex'-এ রূপ লইয়াছে; তাহাকে আমরা স্বতঃ রতি (auto-erolicism) বলিতে পারি। যিনি কেবল ভালবাসিব বলিয়া ভালবাসিতেন, (auto-erolicism—a kind of reflex action ?) যাহার বিশুদ্ধ বিষয় রতি উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত সেই নব্য-ভারতের প্রাণদাতা বিবেকানন্দের কথায় বলি—এই দেশই

> "নহে দ্বৈত নহে বহু অদ্বৈতের ভূমি
> একত্ব মিলিত তাই সকলই আমার
> ভেদ ঘৃণা নাহি মোর নহি ভিন্ন আমি
> থাকি আমি মগ্নমাত্র প্রেমের চিন্তায়"।

Ruskin বলেন All true science brings in the love, not the dissection of your fellow creatures ; and it ends in the love, not the analysis of God.

তাঁহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া আমরা বলিতে পারি মনোবৃত্তির ও কাজ শুধু মনঃবিশ্লেষণ নয়; দার্শনিকের মত তত্ত্বের মধ্যে সেই অনুসন্ধানে

"রসো বৈ সঃ।"

রাজা হৃষীকেশ লাহা সি-আই-ই

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

রাজা হৃষীকেশ লাহা মহারাজা দুর্গাচরণের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে চুঁচড়ায় রাজা হৃষীকেশ জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পর কলিকাতায় আসিয়া তিনি তাঁহার অগ্রজ রাজা কৃষ্ণদাস লাহা মহাশয়ের সহিত হিন্দু স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেন। সে সময়ে স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দু স্কুলের প্রধানশিক্ষক ছিলেন। তৎকালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করা খুবই কঠিন কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও রাজা হৃষীকেশ ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। বৎসরাধিক কাল কলেজে শিক্ষালাভের পর তাঁহার পিতা তাঁহাকে মেসার্স কেলী কোম্পানীতে ব্যবসা-শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। লাহা মহাশয়গণের নিজেদের বাণিজ্য-ফার্ম্মের নাম মেসার্স প্রাণকিষণ লাহা এণ্ড কোম্পানী। উক্ত কোম্পানী তৎকালে মেসার্স কেলী এণ্ড কোম্পানীর বেনিয়ান ছিল; কেলী কোম্পানীর বিস্তীর্ণ কারবারে যোগদান করিয়া রাজা হৃষীকেশকে ব্যবসায়ের সকল বিভাগে শিক্ষিত করাই তাঁহাকে তথায় প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল। মহারাজা দুর্গাচরণ বিশেষ বিবেচনা-শক্তিসম্পন্ন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি পুত্রদ্বয়কে উপযুক্তভাবে ব্যবসা শিক্ষাদানের পর তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিতে মনস্থ করিলেন। সেজন্য তাঁহাদিগকে নিজেদের ব্যবসায়ে গ্রহণ না করিয়া মেসার্স কৃষ্ণদাস লাহা এণ্ড কোম্পানী নামে একটি নূতন কারবার খুলিয়া দিলেন এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে পুত্রদ্বয়কে উক্ত কারবার দেখিবার ভার দিলেন। রাজা কৃষ্ণদাস ও রাজা হৃষীকেশের কার্য্য-তৎপরতায় ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির জোরে উক্ত নূতন কারবারও অচিরকাল-মধ্যে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল।

মহারাজা দুর্গাচরণের মৃত্যুর পর যখন রাজা হৃষীকেশের উপর তাঁহাদের পুরাতন কারবার মেসার্স প্রাণকিষণ লাহা কোম্পানীর কার্য্যভার আসিয়া পড়িল, তখন তিনি

পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের উপর নূতন কারবারের ভার অর্পণ করিলেন। তদবধি ঐ নূতন কারবারটি লাহা পরিবারের যুবকগণের শিক্ষাগ্রহণক্ষেত্ররূপেই পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। রাজা হৃষীকেশ কিন্তু অল্প কাজ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবার লোক ছিলেন না। তাঁহার খুল্লতাত শ্যামাচরণ লাহা মহাশয় সে সময়ে লাহা পরিবারের সকল জমীদারীর কার্য্যপর্য্যবেক্ষণ করিতেন। শ্যামাচরণের স্বাস্থ্য ও যেমন ক্রমে ক্রমে ক্ষুণ্ণ হইতে লাগিল, রাজা হৃষীকেশও তেমনই সঙ্গে সঙ্গে জমীদারী পরিচালনার কার্য্য শিক্ষা করিতে লাগিলেন ও ক্রমে ক্রমে সেগুলি দেখাশুনার ভার গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের জমীদারী ২৪পরগণা, যশোহর, খুলনা, মেদিনীপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় বিস্তৃত ছিল। রাজা হৃষীকেশ তাঁহার অসাধারণ কর্ম্মশক্তি দ্বারা অতি অল্পদিনের মধ্যে সকল স্থানের সকল জমীদারী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন ও ঐ সকল জমীদারী পরিচালন কার্য্যে কর্ম্মচারীদিগকে এমন ভাবে উপদেশ দান করিতে লাগিলেন যে তাহাতে সকলকে বিস্মিত হইতে হইল। মফঃস্বলের কাছারীগুলি হইতে প্রত্যহ যে সকল পত্র আসিত, তাহার সকলগুলিই তাঁহার নিকট পড়িয়া শুনাইতে হইত এবং তিনি নিজে প্রত্যেক পত্রের উত্তর প্রদানের ব্যবস্থা করিতেন। রাজা হৃষীকেশের সুব্যবস্থার ফলে প্রজাগণ সুখে বাস করিতে লাগিল এবং তিনি স্বয়ং প্রত্যেক প্রজার সুখ দুঃখের খবর লইয়া তাহাদের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টায় তাঁহাদের জমীদারীর মধ্যে বহু বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে; যখনই প্রয়োজন হইয়াছে তখনই তিনি প্রজাগণের খাজনা মাপ করিয়াছেন ও তাহাদিগকে কৃষি-ঋণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি নিজে সকল সময়ে সকল স্থানে যাইতে পারিতেন না বলিয়া একদল বিশ্বস্ত পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারাই সকল সময়ে মফঃস্বলের কর্ম্মচারীদিগের কার্য্য পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেন। রাজা হৃষীকেশ কখনও কোন কার্য্য অসম্পূর্ণভাবে করিয়া ছাড়িতেন না—সেজন্য তাঁহার দক্ষতার বিষয় অল্পদিনের মধ্যেই সকলে জানিতে পারিত ও সকলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইত।

কলেজের পাঠ অসমাপ্ত রাখিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল বলিয়া রাজা হৃষীকেশের জ্ঞানস্পৃহা কখনও কমে নাই। তিনি প্রত্যহ সারাদিন কারবার ও অন্যান্য বিষয়-কর্ম্ম দেখিবার পর সন্ধ্যায় বাড়ীতে ফিরিয়া ৩।৪ ঘণ্টাকাল লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় তাঁহাকে ছাত্রের মত অধ্যয়নে রত দেখা যাইত। তিনি ধর্ম্ম, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ক পুস্তকাদি পাঠ করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার সংগৃহীত পুস্তকাদি দেখিলে বুঝা যায়—তাঁহার জ্ঞানলাভস্পৃহা কিরূপ প্রবল ছিল। কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া তিনি সংস্কৃত ভাষা ও তাহার সাহিত্য পাঠ করিতেন।

শুধু লেখাপড়া নহে, গান বাজনাতেও তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল; রাত্রিতে তিনি প্রত্যহ কিছুক্ষণ গান বাজনার আলোচনা করিতেন। তিনি তবলা বাজাইতে ও তবলা বাজান শুনিতে বিশেষ ভালবাসিতেন।

ব্যবসা পরিচালন ও বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশসেবার জন্যও তাঁহার মনে আগ্রহ জন্মিয়াছিল। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার অবৈতনিক প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছিলেন; ক্রমে ক্রমে তিনি ২৪পরগণার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, মেয়ো হাসপাতালের গভর্ণর, বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ও ইম্পিরিয়াল লীগের সদস্য, ফিজিসিয়ান্স ও সার্জ্জেন্স কলেজের ট্রাষ্টি প্রভৃতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সকল কার্য্য গতানুগতিক বলিয়া তাঁহার কর্ম্ম প্রতিভার স্ফুরণ হয় নাই।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি এক নূতন কর্ম্মক্ষেত্র পাইলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার ভারতীয় ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য বেঙ্গল ন্যাশান্যাল চেম্বার অফ কমার্স প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—রায় বদ্রীদাস উহার প্রথম সভাপতি এবং সীতানাথ রায় মহাশয় উহার প্রথম সম্পাদক হইয়াছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে রাজা হৃষীকেশকে উক্ত চেম্বারের সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইলে তিনি অতি আগ্রহের সহিত সেই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। সে সময়ে মণ্টি-মিন্টো শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তনের কথা চলিতেছিল; তাহার ফলে গভর্ণমেণ্ট রেলওয়ে, পোর্টট্রাষ্ট প্রভৃতিতে বেসরকারী পরামর্শদাতা গ্রহণের চেষ্টা করিতেছিলেন; যাহাতে চেম্বারের প্রতিনিধিরা সকল স্থানে প্রবেশাধিকার লাভ করেন, রাজা হৃষীকেশ সে বিষয়ে বিশেষ অবহিত

হইলেন। রাজার সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও যশ ছিল। রাজার বহু শ্বেতাঙ্গ বণিক বন্ধু ছিলেন। এই সকলের সুযোগে সে সময়ে চেম্বারের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বাড়িয়া যাইতে লাগিল। গভর্ণমেণ্ট সকল কার্য্যে চেম্বারের অভিমত গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

রাজা হৃষীকেশ ১৯০৬ হইতে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর কাল চেম্বারের সভাপতিরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন এবং সেই ২৫ বৎসরে চেম্বারের কার্য্যক্ষেত্র কিরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তাহার ইতিহাস লিখিতে গেলে এক প্রকাণ্ড পুস্তক লিখিতে হয়। এই ২৫ বৎসরে রাজার সহিত চেম্বারের সম্বন্ধ নিবিড় হইয়াছিল এবং রাজা প্রতি বৎসর চেম্বারের বার্ষিক সভায় যে বক্তৃতা করিতেন, সেগুলি একত্র করিলে দেশের বাণিজ্য ও রাজনীতির একখানি ইতিহাস বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষাবিস্তার বিষয়েও রাজার আগ্রহের অবধি ছিল না। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে চেম্বার হইতে বড়লাটকে যে অভিনন্দন প্রদান করা হইয়াছিল, তাহাতে রাজা হৃষীকেশ এদেশে কারিগরি শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিতে গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই প্রস্তাব যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, সেজন্য সে সময়ে দেশে তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল।

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারেও রাজা বিশেষ অবহিত ছিলেন। ২৪ পরগণা জেলা-বোর্ডের প্রথম বেসরকারী চেয়ারম্যানরূপে তিনি দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার কথা সকলকে জানাইয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট যাহাতে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া দেন সেজন্য তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রতি বৎসর বাজেট আলোচনার সময় গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেন।

দেশের কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠান ও তাহার উন্নতি বিধানে রাজা হৃষীকেশের বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইত। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে খুলনায় একটি কৃষি শিল্প প্রদর্শনীতে সভাপতিত্ব করিতে যাইয়া রাজা ঐ বিষয়ের কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। পর বৎসর ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় বেঙ্গল হোম ইণ্ডাষ্ট্রিজ এসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠা উৎসবেও তিনি ঐ কথাই বলিয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী জীবনে রাজা হৃষীকেশ লাহা মহাশয়ের কর্ম্মক্ষেত্র কিরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার কথা চিন্তা করিলে তাঁহার অসাধারণ কর্ম্মশক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন নামক জমীদার সভার সহিত রাজার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল; তিনি ১৩ বৎসর কাল উহার অবৈতনিক সম্পাদক থাকিয়া উহার কার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন এবং পরে উহার সহ-সভাপতি ও ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে উহার সভাপতি হইয়াছিলেন। ৩৭ বৎসর কাল তিনি ২৪ পরগণা জেলা বোর্ডের সদস্য ছিলেন; সে সময়ে তিনি ম্যালেরিয়া দূরীকরণ, গ্রামের জলসেচের ব্যবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার, কারিগরি ও কৃষি-শিল্প শিক্ষাদান-ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্টের নূতন ব্যবস্থায় তাঁহাকে জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হইতে হইয়াছিল। জেলা বোর্ডের কার্য্য ব্যপদেশে তাঁহাকে প্রায়ই গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫ বৎসর কাল তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন; বেঙ্গল ন্যাশান্যাল চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতিরূপে এবং বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সম্পাদকরূপে তিনি বাণিজ্য ও জমীদারী সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তিনি বহু জনহিতকর ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ২০ বৎসর কাল তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে ও নানা প্রকার কার্য্য করিয়াছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ প্রভৃতির সহকর্ম্মীরূপে তিনি দেশের সকল রাজনীতিক আন্দোলনের সহিত যোগ রাখিতেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "ইম্পিরিয়াল লেজিস্‌-লেটিভ কাউন্সিলের" সদস্য করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্র কলিকাতা ত্যাগ করিয়া দিল্লী সিমলায় যাইয়া বাস করিতে হইবে বলিয়া রাজা সে সম্মান প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় ২০ বৎসর কাল তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। রাজা যেখানেই যাইতেন, সেখানেই অতি যত্নের সহিত সকল কার্য্য বুঝিয়া লইতেন; কর্পোরেশনের কার্য্যে তাঁহাকে এরূপ অভিজ্ঞ বলিয়া জানা গিয়াছিল যে কর্পোরেশনের কর্ম্মসচিব নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় বা রায় বাহাদুর প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের মত ব্যক্তিরাও প্রায়ই

কর্পোরেশনের কার্য্যসম্পর্কে পরামর্শ করিবার জন্য রাজা হৃষীকেশের নিকট গমন করিতেন।

রাজা হৃষীকেশের কর্ম্মপ্রচেষ্টা শুধু এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না—নানা ক্ষেত্রে সর্ব্বদাই তাঁহাকে কাজ করিতে দেখা যাইত। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান বিভাগে ভীষণ বন্যা হইলে লর্ড কারমাইকেলের সভাপতিত্বে এক জনসভায় রাজাকেই বন্যা সাহায্য সমিতির সম্পাদকের কার্য্যভার প্রদান করা হইয়াছিল। রামকৃষ্ণ সমিতির অনাথ ভাণ্ডারের কার্য্যেও তিনি বহু সময় অতিবাহিত করিতেন। বহু দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহাকে বহু সময়ে সংশ্লিষ্ট থাকিতে দেখা গিয়াছে এবং তিনি যেখানেই যাইতেন সেখানেই সকলে তাঁহার পরামর্শ লাভ করিয়া ধন্য হইতেন।

কলিকাতায় রামমোহন লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠায় রাজা হৃষীকেশকে কিরূপ কার্য্য করিতে হইয়াছিল, তাহা সে সময়ের সংবাদপত্রাদিতে সবিশেষ অবগত হওয়া যায়। তিনি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, বসু বিজ্ঞান-মন্দির প্রভৃতি বহু সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রাণ স্বরূপ ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তাঁহার এই সকল জনহিতকর কার্য্য দেখিয়া ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে একই সময়ে রাজা ও সি-আই-ই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন এবং ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে কলিকাতার সেরিফ পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

রাজা হৃষীকেশের দানও বড় অল্প ছিল। তাঁহার সময়ে কলিকাতা সহরে ও বাঙ্গালা দেশে যে সকল সৎকার্য্যের জন্য সাধারণের অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতে তাঁহাকে অর্থ সাহায্য দান করিতে দেখা গিয়াছে। তিনি নিজের সমাজ—সুবর্ণ বণিকদিগের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য সমাজের মারফত বহু অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। চুঁচড়া তাঁহার জন্মভূমি বলিয়া তিনি চুঁচড়ায় কলের জল প্রতিষ্ঠার জন্য এককালীন এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কলিকাতায় অর্থ সংগ্রহ করিতে আসিলে তিনি তাঁহাকে ৭৫ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন।

জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ছাড়াও তাঁহার গুপ্ত দান প্রচুর ছিল। তিনি নিজের কর্ম্মচারীবর্গকে স্বজনের মতই দেখিতেন এবং তাহাদের সকল প্রকার আপদ-বিপদে তাহাদিগকে সাহায্য করিতেন। কর্ম্মচারীবর্গের প্রতি এরূপ পুত্রাধিক স্নেহ ও মমতা লাহা পরিবার ছাড়া অন্যত্র কচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সুদীর্ঘকাল কর্ম্মময় জীবন অতিবাহিত করিয়া রাজা হৃষীকেশ লাহা গত ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখে ৮৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই কৃতী পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন—তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই পরলোকগত হইয়াছেন। দ্বিতীয় পুত্র ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ লাহা এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস, পি-এচ-ডি বাঙ্গালা দেশে সুপরিচিত।

নিদাঘ

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

মাধবীর লতাকুঞ্জে হে তরুণ জাগ্রত অতিথি,
তোমারে জানাই নমস্কার।
অতীতের দুঃখক্লেশ পুঞ্জীভূত স্মৃতির বেদনা
গৈরিক অঞ্চলে বাঁধি চৈত্রসন্ধ্যা নিয়েছে বিদায়;
স্তনভারে আনতা রূপসী
কাঁদিছে পলাশবনে; শিমুল ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস।
অশত্থের সোনালি পাতায়
লেগেছে সবুজ-ছোঁয়া বৈশাখের প্রদীপ্ত প্রভাতে;
মালঞ্চের শ্যাম-মঞ্চে মিলনের চুম্বন-স্তবক
তুলিয়েছে হাস্যমুখে।

আমারে টানিয়া লও সম্মুখের ছায়াময় পথে,
যেখানে শ্রাবণ সাঁঝে চকিতা বরষা-বধূ বসি
উছল গভীর স্রোতে ছড়াইছে স্বপ্নজাল ধীরে;
শ্যামল ধানের বুকে উতরোল দখিনা বাতাস
লুটাইয়া পড়ে যেথা মাতৃহারা বালিকার মত;
সুন্দরীর সিক্ত-কেশে কেতকী ছড়ায় পরিমল।
বনানী শিখরে শুভ্র বলাকার চঞ্চল পতাকা
ধূসর সজল মেঘে আঁকে শ্বেত মন্দারের মালা।

কালের প্রবাহ

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১

বাদড়ার বনমালী রায় স্বনামধন্য পুরুষ। যদিও শৈশবে পিতৃহীন অবস্থায় মাতার সহিত মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন তিনি হইয়াছেন—আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ! বাদড়ার জুটমিলে মাসিক দশ টাকা বেতনে টাইম-কীপারের কাজে ঢুকিয়াছিলেন, আজ তিনি যোগাড় ও যোগ্যতার প্রভাবে সেই মিলের প্রায় আড়াই হাজার মজুরের মুরুব্বী হইয়া বসিয়াছেন। সকল বিভাগেই তাঁহার কর্ত্তৃত্বের প্রভাব, বাবু বা সর্দ্দারদের টুঁ শব্দটি করিবার যো নাই। সিনিয়র পার্টনার ও ম্যানেজার ম্যাকমিলান্ সাহেব পর্য্যন্ত বনমালী-অন্ত প্রাণ! বিশাল মিলের পিন্‌টি হইতে পাটের হাজার হাজার গাঁট এবং সাহেবের সংসারের পিয়াঁজটি হইতে মেমসাহেবের গাউনটি পর্য্যন্ত—যাহা কিছু কিনিবার প্রয়োজন হয়—তাহার সর্ব্বময় ভার বনমালীবাবুর উপর। সাহেবের ব্যবস্থায় বড়বাবু ও গুদামবাবুর উভয় পায়াই বনমালীবাবুর আয়ত্তে। স্থতরাং তিনি যে সহজেই আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইবেন—তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

বাদড়া সহরতলীর অন্তর্গত সমৃদ্ধ গণ্ডগ্রাম। প্রকাণ্ড বাড়ী, বাগান, ভূসম্পত্তি এখানে বনমালীবাবুর ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দেয়। কমলা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বিপুল বিত্ত দিয়াছেন, মা ষষ্ঠী সেই বিত্ত স্থায়ী করিতে এখানে যেন হিসাব করিয়াই একটি মাত্র বংশধর যোগাইয়াছেন। পুত্র শিবকালী ডবল অনার্স লইয়া বি-এ পাস করিয়াছে, এম-এ পড়িতেছে। এই পুত্র এবং সহধর্ম্মিণী সৌদামিনী দেবীকে লইয়াই বনমালীবাবুর সংসার। ব্যয় অল্প, আয় প্রচুর।

কিন্তু অত অর্থ থাকিতেও বনমালীবাবু একমাত্র পুত্রের বিবাহসূত্রে অর্থাগমের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহার কাহিনী শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। কন্যাদায়গ্রস্ত বুভুক্ষুর দল—যাহারা বিপুল আশা ও উৎসাহ লইয়া রায় মহাশয়ের আবাসে ধর্ণা দিতে উপস্থিত হন, তাঁহারা এই পাস করা ছেলেটির দর শুনিয়া ও ছেলের বাবার নীরস ব্যবহারে আপ্যায়িত হইয়া পলাইবার পথ পান না।

রায় মহাশয় দৃঢ়তার সহিত ছেলের দর বাঁধিয়া দিয়াছেন, পুরোপুরি দশটি হাজার টাকা। ইহার একটি কপর্দ্দকও এদিক ওদিক হইবে না—ইহাই তাঁহার ধনুর্ভঙ্গ পণ।

২

বাদড়া গ্রামখানি সবদিক দিয়াই নিখুঁত। গুটিকয়েক পয়সা ব্যয় করিলেই বাসে চড়িয়া ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই কলিকাতা সহরের কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হইতে পারা যায়। গ্রামে মিউনিসিপালিটি আছে, রাস্তা-ঘাট পাকা; সম্প্রতি ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী বিজলীর আলোকও সরবরাহ করিয়াছেন; হাই স্কুল, লাইব্রেরী, হাসপাতাল কিছুরই অভাব নাই। নিকটেই চট-কল থাকায় নিম্নশ্রেণীদের মধ্যে বেকার সমস্যা এখনও আতঙ্ক তুলে নাই। প্রতি বৎসরই গ্রামের হাইস্কুল হইতে আট দশটি ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দরজাটি অতিক্রম করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া থাকে; উচ্চ শিক্ষিতের সংখ্যাও সেই অনুসারে ক্রমশঃই বাড়িতেছে। সম্প্রতি গ্রামের চারিটি বিশিষ্ট বংশের চারিটি ছেলে এম এ হইয়া গ্রামে স্থায়ী হইয়া বসিয়াছে। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে কেহই এখনও কোনও কাজে পাকা হইয়া বসিবার অবকাশ পায় নাই বা কোনও রূপ অর্থাগমের উপায় আবিষ্কার করিতে পারে নাই। কিন্তু ইহাদিগকে উপলক্ষ করিয়া ইহাদের অভিভাবকদের ম্যারেজ-মার্কেটে দর কসাকসির অন্ত নাই। ছেলেদের এই প্রসঙ্গে কিরূপ মনোবৃত্তি, তাহাদের কথোপকথনেই তাহা প্রকাশ পাইবে।

বলিতে ভুলিয়াছি গ্রামখানিকে গৌরবান্বিত ও পূত-পবিত্র করিয়া রাখিয়াছেন পুণ্যতোয়া ভাগীরথী। কিন্তু কালপ্রবাহে সন্নিহিত পাটকলগুলির পুরীষ-প্রবাহ ভাগীরথী-প্রবাহে মিলিত হওয়ায় নিত্যস্নানে-অভ্যস্ত অধিবাসীদের মনের মালিন্য এখনও দূর করিতে পারে নাই। তাই পূর্ব্বাহ্ণে মন্দিরসমন্বিত সুপ্রশস্ত ঘাটের চত্বরে স্নানার্থিনীদের

পরনিন্দা ও পরচর্চ্চার বৈঠক বসে এবং অপরাহ্ণে গ্রামের প্রবীণ মাতব্বরেরাই ঘাটখানি অধিকার করিয়া সমাজ-শাসনের নিত্য নূতন নানাবিধ আইন রচনা করিতে ব্যস্ত থাকেন।

সেদিন গ্রাম্য হরিসভার এক অধিবেশন ছিল, প্রবীণগণ সকলেই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। আমাদের পূর্ব্বোক্ত এম-এ পাস তরুণচতুষ্টয়ও চক্ষুলজ্জার খাতিরে এই সভায় যোগদানে বাধ্য হইয়াছিল; কিন্তু ভীড় একটু গাঢ় হইতেই তাহারা চারিজনেই উঠিয়া পড়ে ও গঙ্গার ঘাটে আসিয়া তাহাদের বৈঠক বসায়। ঘাটের ত্রিসীমায় প্রবীণদের কেহই এদিন ছিলেন না; সুতরাং মন খুলিয়া তাহাদের মনের কথা ব্যক্ত করিবার এমন সুযোগ সচরাচর উপস্থিত হয় না।

অন্যান্য কথার পর শশধর কহিল—ভাই, আমার একান্ত দুর্ভাগ্য, মাথার ওপর বাবাও নেই, দাদাও নেই; মামারা পুষছেন, আর দুটি বেলা ক'সছেন—স্যাকরায় যেমন সোণা কসে।

একাধিক কণ্ঠের সাগ্রহ প্রশ্ন উঠিল--কি রকম? কি রকম?

শশধর উত্তর দিল—এই যে মানুষ করেছে এতদিন, পড়িয়েছে এম-এ পর্য্যন্ত—অবশ্য আমার মা এর মধ্যে খান তিনেক কোম্পানীর কাগজ ঘুষ দিয়েছেন, কিন্তু সে সব ভেসে গেছে; এখন শুধু মামাদের টাঁক—একটি সালঙ্কারা কন্যার দিকে, নেহাৎ সুন্দরী না হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে চাই—অন্তত সাতটি হাজার থোক্, বুঝিছিস্? একে কসা বলে না ত কি?

একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া অবনী কহিল—আরে দাদা, আমার মাথার ওপর ত রীতিমত রোজগেরে বাবা রয়েছে, আর দাদা—সেও ডবল, টাকারও অভাব নেই; আমি যদি উপায় না করতেও পারি, কিছু আসে যায় না; তথাপি দুটি বেলা খোঁটা, আর পড়াবার খরচটা ইণ্টারেষ্ট সুদ্ধ তোলবার জন্য কনে ধরবার যে কত রকমের ফাঁদ পাতা হ'চ্ছে, তার কথা আর কি বলব!

নির্ম্মল কহিল—তোরা হয় ত ভাবিস, আমি খুব সুখে আছি; কিন্তু আমাকে সাজিয়ে গুজিয়ে খোদার খাসী বানিয়ে—দাদারা যে ভেতরে ভেতরে কি রকম দাঁও কসছে, তা অন্তর্য্যামীই জানেন; তোরাও জানবি, যেদিন মাথা মুড়ুবো—

বেণী হতাশের সুরে কহিল—সবারই অবস্থা দেখছি সমান—All tarred with the same brush. কাযেই ভাই, আমি এবার অদৃষ্টের চাকাখানা চালিয়ে দিয়েছি আলাদা রাস্তায়।

বেণীর শেষের কথাটা তিন বন্ধুকেই সচকিত করিয়া তুলিল। শশধর তৎপর হইয়া কহিল—কথাটা খুলেই বল, শুনি।

বেণী বার দুই কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া কহিল, —ওতরপাড়া হাইস্কুলে থার্ড মাষ্টারের পোষ্টটা খালি হয়েছে শুনে এক দরখাস্ত ঝেড়ে দিয়েছি।

অবনী। তারপর?

বেণী। যেমন দরখাস্তখানা ডাকে ছাড়া, অমনি পাণ্টা ডাকে হবু ক'নের ফটোর সঙ্গে একটা লোভনীয় অফার।

নির্ম্মল। হুররে! অতঃপর?

বেণী। মা চিঠি আর ফটোখানা সামনে এনে ধরলেন; জানতে চাইলেন—কি আমার মত।

শশধর। মতটা কি প্রকাশ হল?

বেণী Counting the chickens before they are hatched. অর্থাৎ, মনে মনে লঙ্কা ভাগ করে রায় দিলুম,—একখানা পাকা বৈঠকখানা, একটি বিলিতী বীণা আর অন্ততঃ পাঁচটি অঙ্কের ইম্পীরিয়েল ব্যাঙ্কের ওপর একখানা চেক—ব্যস্। যদি রাজী হয়, ছাঁদনাতলায় দাঁড়াতে আমিও রাজী আছি।

নির্ম্মল। এর মানে?

বেণী। তুই দেখছি নিমু, এখনও সেই খোকাটিই আছিস্; আবার পাঠশালা থেকে সুরু কর্। আরে গাধা, আমার এখন মটো—মারি ত গণ্ডার, আর লুঠি ত ভাণ্ডার! পাস করা ছেলে দেখে ওপক্ষ যখন অমন হেদিয়ে উঠেছে, আমিই বা সুযোগ ছাড়ব কেন? বধুর সঙ্গে পাকা বাড়ী, পিয়োনো একটি—আর বসে বসে কিছুকাল খাবার মত দক্ষিণা—আমার দাবীর এই মানে।

নির্ম্মল। য়্যাঁ, তোর পেটে পেটে এত বুদ্ধি!

শশধর। তারপর ফিনিসিং টাচ্‌টাও শুনিয়ে দে বেণী—এগুলো, না পেছুলো!

বেণী। আরে দাদা, শেষটায় বেড়ালের অদৃষ্টেই সিকে ছিঁড়ে পড়ল ; ওতেই তারা রাজী ; এখন ভাবছি, ফিগার কটা পাঁচ না করে সাত করলেই ভাল হত ! আবার এমনি মজা, মাষ্টারীটাও লেগে গেছে।

অবনী। বাহোবা—দাদা !

নির্ম্মল। থাম্ তুই, এতে বাহোবা দেবার মত কিছু নেই, বরং আফ্‌শোষ করবার অনেক কিছুই আছে।

শশধর। তোর বুঝি এবার হিংসে হচ্ছে নির্ম্মল ?

নির্ম্মল। সে ত হবারই কথা ; এক গোয়ালের চার চারটে বলদ—আমরা পরস্পর মুখ-সোঁকাসুঁকি করে দিন কাটাচ্ছি কোনো রকমে, আর এখন কিনা তার একটা খসে যাবে, দল ছেড়ে একবারে পগার পার।

অবনী। নেভার, এ হতেই পারে না ; নিমু ঠিক বলেছে—আমরা এখানে ভ্যারেণ্ডা ভাজব, আর তুমি বৌয়ের আঁচোলে চোখ বেঁধে ঘানি টানবে ! তা হবে না ; তার চেয়ে বরং চার বন্ধুই একসঙ্গে আগড়পাড়ায় আশ্রয় নেব।

নির্ম্মল। সত্যি ভাই বেণী, তুই দলছাড়া হলেই লোকে আমাদের দিকে আঙ্গুল হেলিয়ে বলবে—তেরোস্পর্শ !

শশধর। আর, ছেলেদের সেই ছেলে হারানো ছড়াটা তখন আমাদের ওপরেই হুবহু খেটে যাবে—

হারাধনের চারটি ছেলে, নাচে ধিন্ ধিন্
একটি মলো আছাড় খেয়ে, রইলো বাকি তিন্।

বেণীর চক্ষু এই সময় ঘাটের সঙ্কীর্ণ রাস্তাটির দিকে পড়িয়াছিল ; সহসা দৃষ্টি ফিরাইয়া আশু বিরহ-ব্যথাতুর বন্ধুদের মুখের উপর স্থাপন করিয়া আশ্বাস দিল—তার জন্যে ভাবনা কি—শূন্য স্থানটুকু ভরাবে বলে ঐ দেখ্ আসছে শিবু—শীগ্‌গীরই ও এম-এ হবে, এখনি দলে টেনে নে।

বেণী কহিল—পরামর্শ নিতে এসেছ আমাদের কাছে ! কি ব্যাপার হে শিবু ? ম্যারেজ-মার্কেট সংক্রান্ত কোনো মার্কেটিং নয় ত হে ?

নির্ম্মল বিদ্রূপের ভঙ্গীতে কহিল—Birds of a feather flock together—তোরও দেখছি সেই দশা হয়ে দাঁড়াচ্ছে বেণী, সবাইকে নিজের দলে টানতে ব্যস্ত, যেন ঐ মার্কেটটি ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু দ্রষ্টব্য নেই।

শশধর কহিল—আচ্ছা, বেচারীকে কথাটা বলতেই দে ; এলো ছুটে আমাদের পরামর্শ নিতে, তোরা দুজনে অমনি তাই নিয়ে ডিবেটিং ক্লাব বসালি।—কি কথা রে শিবু ?

শিবকালী কহিল—কলেজ অঞ্চলের খবর ত তোমরা কিছু রাখতে চাও না ; মেয়েরা ইদানীং যে রকম বাড়াবাড়ি আরম্ভ করে তুলেছে—

নির্ম্মল যেন কথাটা শুনিয়াই আকাশ হইতে পড়িল। দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল—মেয়েরা ! আরে, আমাদের সময় ত তাদের কোণঠাসা করে রেখেছিলুম।

শিবকালী কহিল—এখন তারাই ছেলেদের কোণঠাসা করে রাখতে চায়। গড়পাড়ের সেই য়্যাক্‌সিডেণ্টের পর কলেজের মেয়েরা দল বেঁধে এক সমিতি খুলেছে ; উদ্দেশ্য হচ্ছে—ছেলেরা যাতে বিয়েতে একটা পয়সা পণ বলে নিতে না পারে। এই সূত্রে কত রকমের প্রোপ্যাগাণ্ডা যে চালাচ্ছে আর গানে ছড়ায় বক্তৃতায় যেভাবে য়্যাটাক্ করছে ছেলেদের, তা ত আর বরদাস্ত হয় না।

কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব আর্ত্ত করিয়া শিবকালী তাহার দুঃখের কাহিনী সিনিয়রদের শুনাইয়া দিল। সে কাহিনীর আখ্যানভাগ যেমন মর্ম্মন্তুদ—তেমনই পণপ্রথার উচ্ছেদ ব্রত-ধারিণী প্রগতিবাদিনীদের অস্বাভাবিক উৎকট অবদানে রোমাঞ্চকর !

৩

এই রোমাঞ্চকর উপাখ্যান হইতে চার বন্ধু সহজেই যাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল এবং এই উপাখ্যানের অন্তরালে যে তথ্য তাহাদের অজ্ঞাত ছিল, তাহার আখ্যান-বস্তু এইরূপ :—

পণপ্রথার উদ্দাম গতির প্রতিরোধে সমাজের মাতব্বরদের কোনো প্রচেষ্টার পরিচয় না পাইয়া, কতকগুলি ছাত্রী সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে এই সর্ব্বনাশকর অনাচারের স্রোত ফিরাইতে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে। সংস্থার নামকরণ হইয়াছে—কুমারী-সংসদ। এই নামের কিঞ্চিৎ সার্থকতাও আছে। যথা—নাম লিখাইবার সময় প্রত্যেক ছাত্রীকে এই মর্ম্মে প্রতিজ্ঞা করিতে হয়, তাহারা চিরকুমারী থাকিবে এবং যতই প্রলোভন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়া যে কোনও পীড়ন বা প্রযোজন আসুক না কেন, ইহারা থাকিবে অটল। ছেলের বাপেরা এতদিন ধরিয়া মেয়ের বাপেদের উপর যে

বেপরোয়া অত্যাচার করিয়া আসিতেছে—কসাইসুলভ নৃশংস মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়া মেয়েদের মুখ নীচু করিয়া রাখিয়াছে, ইহারা মুখ তুলিয়া তাহার প্রতীকার করিবে—সমস্ত অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়া ছেলের বাপেদের ধারালো মুখ ভোঁতা করিয়া দিবে। এজন্য ছল, চাতুরী, কৌশল বা রীতিমত আন্দোলন চালাইতে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিতে কেহই পেছপাও হইবে না।

প্রথমে মিশন কলেজের সতেরোটি মেয়ে সংসদে নাম লেখায়; এখন বিভিন্ন কলেজের বহু ছাত্রীই গভীর উৎসাহ সহকারে সংসদে যোগ দিয়াছে। সংসদের প্রধান ব্রতই হইয়াছে—পণপাহাড়দের পণ ভাঙ্গিয়া দেওয়া। ছেলের বিয়ের ব্যাপারে যাহাদের পণস্পৃহা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, এই সংসদের কুমারীরা তাহাদের নাম দিয়াছে—পণপাহাড়। শুধু নামকরণ করিয়াই ইহারা নিরস্ত নহে—তলে তলে পণপাহাড়দের সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করে, তাহাদের ছেলেরাও বাদ পড়ে না। কে কোন্ কলেজে বিদ্যাচর্চ্চা করে কিম্বা কোন্ আফিসে কেরাণীগিরিসূত্রে কলম পেসে, সে সবের ফিরিস্তি ইহাদের নখদর্পণে। আটঘাট বাঁধিয়া সংসদ যাহাকে সহসা আক্রমণ করে, তাহার নিষ্কৃতির কোনো উপায়ই থাকে না।

বাদড়ার বনমালী রায় কলুটোলায় এক গৃহস্থের কন্যাকে দেখিতে আসিয়া বিষম কাণ্ড বাধাইয়া যান। কন্যাপক্ষই বিবাহের প্রস্তাব তুলিয়াছিলেন। কিন্তু পাত্রপক্ষ তাহাতে ধোঁকায় পড়িয়াছিলেন। কলিকাতায় বাড়ী, মেয়ে লেখাপড়া জানে, বিশেষ সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী এবং কন্যার পিতার চিঠির কায়দা দেখিয়া বনমালী রায় ভাবিয়াছিলেন, শাঁসালো ব্যক্তি; তাঁহার পণ হয়ত রক্ষা করিতে পারিবে। কিন্তু কন্যা দেখিতে আসিয়া যখন শুনিলেন, তাঁহার ভাবী বৈবাহিক ভাড়াটিয়া বাড়ীর বাসিন্দা—আশী টাকা মাহিনার কেরাণী—সুন্দরী ও শিক্ষিতা কন্যার দোহাই দিয়া হাজার খানেক টাকার মধ্যেই দায় উদ্ধার করিতে চান—তখনই তিনি একেবারে ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিলেন। ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া দায়গ্রস্ত ভদ্রলোককে রূঢ়স্বরে এমন কতকগুলি কথা শুনাইয়া দিলেন, ছেলের বাপের পক্ষেই যাহার প্রয়োগ সম্ভব এবং মেয়ের বাপই শুধু নিরুত্তরে তাহা শুনিতে অভ্যস্ত! তথাপি এই দুর্ম্মুখ অভ্যাগতকে মেয়ে দেখাইতে ও মিষ্টমুখ করাইতে ভদ্রলোক আগ্রহান্বিত ছিলেন! কিন্তু উদ্ধত রায় মহাশয় স্পর্দ্ধাকে চরমে তুলিয়া এই বলিয়া সগর্ব্বে চলিয়া গেলেন যে—দশ হাজারের প্রতিশ্রুতি না পেলে বনমালী রায় সেখানে পানটি পর্য্যন্তও স্পর্শ করে না!

এই ভদ্রলোকের নাম নিবারণ ভট্টাচার্য্য; কন্যার নাম অনুরূপা। সতেরো বৎসরের সুরূপা নিখুঁত সুন্দরী। ম্যাট্রিক পাস করিয়াছে, সেকেণ্ড ইয়ারে পড়িতেছে। বাপের বরাবর ধারণা রূপ ও শিক্ষার জোরে মেয়ে সহজেই পার হইয়া যাইবে, বিশেষ খাঁই কেহ করিবে না। কিন্তু ক্রমশই তাঁহার সে ভুল ভাঙ্গিতে থাকে। মেয়েও বাবার অসহায় অবস্থা এবং সেই সঙ্গে মেয়েদের রূপ ও শিক্ষার ব্যর্থতা মর্ম্মে মর্ম্মেই অনুভব করে। কিন্তু বাদড়ার এই বনমালী রায়ের স্পর্দ্ধা অনুরূপাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলে। বাবার এ অবমাননা সে সহ্য করিবে না, প্রতিশোধ লইবে—ইহাই তাহার মনে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়া উঠে। পরদিনই সে কুমারী সংসদের সভানেত্রী অনীতা দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল বিষয় ও নিজের সঙ্কল্পের কথা জানাইয়া দেয়। ইতিমধ্যেই কুমারী সংসদের খাতায় বাদড়ার বনমালী রায়ের নাম পণ-পাহাড় আখ্যার সহিত পাকা হইয়াই উঠিয়াছিল; সুতরাং সংসদের বিশেষ অধিবেশনে এ সম্বন্ধে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়া গেল যে—এই পণ-পাহাড়ের দুর্জ্জয় পণ ভঙ্গ করিয়া শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর সহিত তাহার পুত্র শিবকালী রায়ের বিবাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

একদা শিবকালী ক্লাসের বাহিরে আসিয়াছে, এমন সময় তাহার ক্লাসেরই এক তরুণী পিছন হইতে তাহাকে ডাকিয়া মিনতির ভঙ্গীতে কহিল—দেখুন, একটা কথা আপনাকে বলব।

শিবকালী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে চাহিল; চেনা মুখ, সহপাঠিনী, কিন্তু অত্যন্ত গম্ভীর-প্রকৃতি এই মেয়েটি; কোনও দিন তাহাকে কাহারও সহিত আলাপ করিতে দেখা যায় নাই; আজ সে শিবকালীকে স্বেচ্ছায় ডাকিয়া কথা বলিতে চাহে! এক্ষেত্রে বিস্ময়ের রেখা যে তাহার মুখে সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিবে, ইহা স্বাভাবিক।

কিন্তু মেয়েটি কোনওরূপ ভূমিকা না করিয়াই একে-



নিদাঘ মধ্যাহ্নে

বারেই তাহার বক্তব্য বিষয়টি প্রকাশ করিল। কহিল—আমার পরিচিতা একটি মেয়ে আছে, সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে; কাছেই থাকে। পাস করবার খুবই তার ইচ্ছা; কিন্তু হলে কি হয়—ইংরিজীতে একেবারে কাঁচা, আর বুদ্ধিটাও মোটা। আপনি যদি দয়া করে কলেজের পর ঘণ্টাখানেক তাকে পড়াবার ভার নেন, তাহলে তার উচ্চ শিক্ষার সাধটুকু মেটে, আর তার গরীব অভিভাবককে বিশেষ অনুগ্রহ করা হয়।

শিবকালী অবাক। এত ছেলে থাকিতে বাছিয়া বাছিয়া তাহাকেই আহ্বান করিবার কি কারণ? এই মেয়েটিও ত "তাহার সেই পরিচিতা—ইংলিসে কাঁচা ও বুদ্ধিতে বোকা মেয়েটিকে" পড়াশুনায় পাকা করিবার ভার লইতে পারে!

কিন্তু বুদ্ধিমতী মেয়েটি শিবকালীর এই সংশয়টুকু যেন তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করিয়াই নিজেই ব্যক্ত করিল—বিশেষ ভাবেই সে লক্ষ্য করিয়াছে, শিবকালীবাবুর ইংরিজীতে অসামান্য অধিকার; ক্লাসের কেহই ইংরিজী-সাহিত্যে তার সমকক্ষ নয়; আর সে নিজে কোনও রকমে পাস করিয়াছে এই পর্য্যন্ত; এখনও কথায় কথায় তাহার স্পেলিং মিস্‌টেক হয় এবং মোড্ অফ টিচিং তার মোটেই জানা নাই। সেই জন্যই সে উপযুক্ত ব্যক্তিকেই নির্ব্বাচন করিয়াছে।

যে বোকা মেয়েটিকে ইংরিজীতে পাকা করিবার ভার লইয়া শিবকালী আসিয়াছিল, তাহার প্রখর রূপের প্রভা ও অসামান্য প্রতিভার আভা দুই দিনেই শিক্ষকের চক্ষুতে রীতিমত ধাঁধা লাগাইয়া দিল। অনুরূপার পাকা পাকা কথা শুনিয়া তাহারই মনে হইত, নিজের মরিচা-ধরা বুদ্ধিটুকু তাহার সাহায্যে শানাইয়া লয়। য়ুনিভার্সিটি কলেজে নিয়মিত হাজিরা দেওয়া অপেক্ষা কলুটোলার এই ক্ষুদ্র বাড়ীখানির বাহিরের ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া ছাত্রীকে ইংরাজীতে পাকা করিবার স্পৃহাই তাহার ক্রমশ প্রবল হইতে থাকে। সংসদের কুমারীরা নিত্যই একান্তে অনুরূপাকে তামিল দেয় এবং সেও সেইভাবে তাহার এই নির্ব্বোধ শিক্ষকটিকে খেলাইতে থাকে।

একদিন অনুরূপা আবদার ধরিল—মাষ্টার মশাই, আমাদের কলেজে হ্যামলেট প্লে হবে, আমাকে দিয়েছে হ্যামলেটের পার্ট; অবশ্য প্লে হবে মাত্র তিনটে সীন—তবে তিনটে সীনেই হ্যামলেট আছে। একটায় 'ঘোষ্টের' সঙ্গে, একটায় তার প্রেয়সী ওফেলিয়ার সঙ্গে, আর একটা সীনে মায়ের সঙ্গে কথা—আপনাকে দেখিয়ে দিতে হবে।

ছাত্রীর অনুরোধ, অভিনয় সম্বন্ধে শিবকালীর কৃতিত্ব না থাকিলেও এক্ষেত্রে না বলিবার উপায় নাই। প্রথমেই ঘোষ্টের দৃশ্যটির মহলা হইল—প্রেতমূর্ত্তিতে পিতা যখন পুত্র হ্যামলেটকে দর্শন দেন। অনুরূপা প্রেতের ভূমিকার পাঠ আবৃত্তি করিল, শিবকালী হ্যাম্‌লেটের উক্তিগুলি বলিল।

পরমোল্লাসে ছাত্রী করতালি দিয়া কহিল—ভেরি নাইস! তিনটে দিন আপনার এইভাবে য়্যাক্‌টিং দেখলেই আমি ঐ পার্টটা ঠিক আয়ত্ত করে নেব।

অতঃপর হ্যামলেট ও ওফেলিয়ার প্রেমাভিনয়ের দৃশ্য। অনুরূপাকে হ্যামলেট-প্রেয়সীর প্রক্সী দিতে হইল, হ্যামলেটের আবৃত্তি করিল শিবকালী। এই দৃশ্যটির মহলাসূত্রে শিক্ষক ভাবাবেশে ছাত্রীর হাত দুইখানি ধরিয়া প্রেমানুরাগের ভঙ্গীটুকুও প্রদর্শন করিতে ভুল করিল না।

সর্ব্বশেষে মাতাপুত্রের সাক্ষাৎকারের সেই সাংঘাতিক দৃশ্য।

অনুরূপা কহিল—আজ থাক মাষ্টার মশাই, হাঁফিয়ে উঠেছি; ও সীনটার য়্যাক্‌টিং কাল হবে।

কিন্তু পরদিন যথাসময় মাষ্টার মহাশয় ছাত্রীর পাঠাগারে প্রবেশ করিয়া সবিস্ময়ে দেখিল—যুক্তকরপল্লবে সুন্দর মুখখানি চাপিয়া টেবলের উপর ঝুঁকিয়া ছাত্রী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

ভগ্নকণ্ঠে মাষ্টারের প্রশ্ন—কি হয়েছে অনু?

প্রথম প্রথম মাষ্টার ছাত্রীকে আপনি বলিয়া সম্বোধন করিত, নাম ধরিবার প্রয়োজন হইলে বলিত, অনুরূপা দেবী। এখন তাহা 'অনু'তে নামিয়াছে।

মাষ্টারের প্রশ্নে ছাত্রী টেবিলের উপর হইতে মুখখানি তুলিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল; দেখা গেল, অবিশ্রান্ত রোদনে দুই চক্ষু স্ফীত, মুখখানি আরক্ত; যেন অপরাহ্লের স্থলপদ্ম রৌদ্রতাপে বিবর্ণ হইয়াছে! মাষ্টারকে দেখিয়াই ছাত্রীর মর্ম্মব্যথা আরও গাঢ় হইয়া উঠিল, আর্ত্তস্বরে কহিল, —মাষ্টার মশাই, সর্ব্বনাশ হয়েছে আমাদের; মুখ দেখাবার পথ আর রইল না!

মাষ্টার স্তব্ধবিস্ময়ে ক্ষণকাল ছাত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া গাঢ়স্বরে কহিল—কথাটা আমাকে খুলে বল অনু, দেখছ না আমার অবস্থা!

ছাত্রী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—কি কুক্ষণেই কাল আপনি হ্যামলেটের লভ্ সীন্‌টার আবৃত্তির সময় আমার হাত দুখানা চেপে ধরেছিলেন, মাষ্টার মশাই!

মাষ্টার মশায়ের বুকের ভিতরটা অমনি ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল; শুষ্ককণ্ঠে কহিল—কেন, কেন অনু? তাতে—তাতে—কথাগুলি সমস্ত আর মাষ্টারের মুখ দিয়া বাহির হইল না।

ছাত্রী তৎক্ষণাৎ সমস্যাটির সমাধান করিয়া দিল—ঠিক ঐ সময়কার ফটো আমাদের—কারা চুরি করে তুলে নিয়েছে মাষ্টার মশাই!

—বল কি, এ হতেই পারে না, অসম্ভব!

—অসম্ভব বলে দুনিয়ায় কিছু নেই মাষ্টার মশাই, এই দেখুন; ফটোর একখানা প্রিণ্ট পাঠিয়েছে আমাকে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে খাতার ভিতর হইতে সদ্য তোলা একখানা ছবি বাহির করিয়া অনুরূপা মাষ্টারের মুখের উপর তুলিয়া ধরিল। দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া মাষ্টার দেখিল, তাহার ছাত্রীর হাত দুইখানি ধরিয়া যেরূপ বিসদৃশ ভঙ্গী ও চটুল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে সে চাহিয়া আছে, সে দৃশ্য তাহার নিজের চক্ষুতেই যেন সূচের মত বিঁধিতেছে! দুই হাতে মাথাটি টিপিয়া ধরিয়া সে চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

এখন বুঝতে পারছেন মাষ্টার মশাই, খেলার ছলে কি সর্ব্বনাশ আমরা করেছি!

—তা বুঝেছি, কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না—কি ক'রে এ ফটো তোলা হল! আমরা কেউ জানলুম না, শুনলুম না, দেখতে পেলুম না—

—বুঝুন! কত বড় হুঁসিয়ার ওরা!

—কাদের তুমি সন্দেহ করছ?

—সন্দেহ আবার কি, স্পষ্টই ত জানিয়ে গেছে; এ কাজ কুমারী-সংসদের; নাম শোনেন নি ওদের?

কি সর্ব্বনাশ! শিবকালীর মনে হইল, যেন একটা বেঙ্গল টাইগার সুন্দরবন হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে থাবা পাতিয়া বসিয়াছে! কিছুক্ষণ তাহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া সে সভয়-বিস্ময়ে কহিল—ওরা সব পারে, ওদের অসাধ্য কিছু নেই; কিন্তু আমাদের এই ব্যাপারে—

অনুরূপা কহিল—এর কারণ হচ্ছি আমি। কেন, তা শুনলেই বুঝতে পারবেন। আমাকে ওঁদের দলে ভেড়াতে চেয়েছিলেন। ইচ্ছা ওঁদের, আমিও চিরকুমারী হব বলে নাম লেখাই। সে কি সোজা কথা মাষ্টার মশাই, কাযেই রাজী হই নি। তাই আমাকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টায় ছিলেন। কাল সুযোগ পেয়ে ঐ জানলাটার বাইরে থেকে কি রকম করে আপনার ঠিক ঐ পোজটার সময়েই ফটোটা নিয়েছে। একটু আগে এই প্রুফটা নিয়ে একটি মেয়ে এসেছিল, সেই সব বলে গেল। ওয়ার্ণিং দিয়েছে, আজ থেকে একটি মাসের মধ্যে ওদের সংসদে নাম যদি না লেখাই, এই ছবির ব্লক তুলে ছাপিয়ে হাতে হাতে বিলি করবে, খবরের কাগজে বার করবে। রাষ্ট্র করবে—সে কথা আপনার সামনে বলতে পারব না, মাপ করবেন। এখন আপনিই বলুন, আমার উপায় কি! বাবাকে কেমন করে মুখ দেখাব? ওদের সংসদে নাম লেখান ছাড়া আর ত নিষ্কৃতির কোনও পথই দেখছি না মাষ্টার মশাই!

দৃঢ়স্বরে শিবকালী কহিল—না, তা হতে পারে না; ওদের সংসদে কিছুতেই তুমি নাম লেখাতে পারবে না, অনু।

অশ্রুসিক্ত দুই চক্ষুর অপূর্ব্ব দৃষ্টি শিবকালীর মুখের উপর স্থাপন করিয়া অনুরূপা প্রশ্ন করিল—তা যেন পারলুম না, কিন্তু এক মাস পরে এই ছবির নীচে আমাদের দুজনের নাম ছাপিয়ে ওরা যখন যাচ্ছে তাই করবে, তখন কি কৈফিয়ৎ আমরা দেব বলুন ত! আর দিলেও লোকে তা বিশ্বাস করবে?

শিবকালী পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে অনুরূপার মুখের দিকে চাহিয়া একটু গম্ভীরভাবেই কহিল—কিন্তু এক মাসের মধ্যেই যদি এমন কোন আশ্চর্য্য রকমের ঘটনা উপস্থিত হয়, যাতে এখনকার এই বিসদৃশ ছবিটা তারই পোষকতা করে—তাহলে?

অস্বাভাবিক স্বরে অনুরূপা সজোরে কহিল—মাষ্টার মশাই!

স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে অনুরূপার দিকে চাহিয়া গাঢ়স্বরে শিবকালী কহিল—এ ভিন্ন আর আমাদের নিষ্কৃতির পথ নেই

অনু! আমি যদি তোমার বাবার কাছে তোমাকে প্রার্থনা করি, তিনি বোধ হয় বিমুখ করবেন না আমাকে।

—তা না করতে পারেন, কিন্তু আমার বাবা অর্থহীন, আপনার মত কৃতবিদ্য পাত্রকে কেনবার মত অর্থ তাঁর নেই। তা ছাড়া আমারও প্রতিজ্ঞা, আমার বিবাহে আমি তাঁকে একটি কপর্দ্দকও পণ বলে অপব্যয় করতে দেব না।

—আমারও প্রতিজ্ঞা অনু, বিনা-পণেই তোমাকে গ্রহণ করব। এর জন্য হয়ত আমাকে মহাসাধনায় বসতে হবে, কিন্তু সিদ্ধিলাভ আমি করবই।

অনুকে আশ্বাস দিয়া শিবকালী বাহিরে আসিয়া বুঝিতে পারিয়াছে—সাধনার পথ কুসুমাস্তৃত নহে। এ পথে রাসভারী পিতার দশ হাজার টাকা প্রাপ্তির 'ধনুর্ভঙ্গ পণ' বিরাট অন্তরায়; অথচ মুখরক্ষার অন্য পথও নাই। অগত্যা বাধ্য হইয়াই তাহাকে সিনিয়ারদের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে।

জুনিয়ারের এই অপূর্ব্ব বিপত্তি সিনিয়ারদের চিত্তেও রীতিমত দোলা দিল। তৎক্ষণাৎ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সাব্যস্ত হইল, বেণীদের বাড়ীতে বসিয়া এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে হইবে—কিভাবে শিবকালীর বাবার ধনুর্ভঙ্গ পণ ভাঙ্গিয়া শিবকালীর তরুণ জীবনটি শীঘ্রই মধুময় করিতে পারা যায়।

নির্ম্মল, অবনী, শশধর ক্ষোভের নিশ্বাস ফেলিয়া বিষাদের সুরে কহিল—শিবুও তাহলে তোমার দলেই ভীড়ল বেণী—আমরা তেরোস্পর্শ হয়েই তোমাদের সংস্পর্শের বাইরে রইলুম!

বেণী গম্ভীর হইয়া কহিল—ধীরে বন্ধু ধীরে—প্রজাপতি যখন বাদড়ায় এসে পাখা মেলেছে—তোমাদের কাঁধেও উড়ে বসল বলে!

৪

বাহিরের ঘরখানি বেশ কেতাদুরস্তভাবেই সাজানো। একদিকে তক্তোপোষের উপর ঢালা বিছানা, ধবধবে সাদা যাজিম পাতা, পরিষ্কার ওয়াড় দেওয়া কয়েকটি তাকিয়া। অন্যদিকে একখানা টেবিল, তাহার চারিধারে কয়েকখানি কেদারা। ঘরের একটি দরজা বাহিরের চত্বরের দিকে, অন্যটি অন্দরের সহিত সংলগ্ন, তাহাতে একখানি ছিটের পরদা ঝুলিতেছে।

সেদিন রবিবার। সময়টা অপরাহ্ণ। বনমালী রায় মহাশয় বাহিরের ঘরে ফরাসের উপর একটি তাকিয়ার অঙ্গে দেহভার ন্যস্ত করিয়া অদূরবর্ত্তিণী গৃহিণী সৌদামিনী দেবীকে শুনাইয়া একখানি চিঠি পড়িতেছিলেন—

"আর একটা কথা, আমরা দুজনেই যে এক হাটের ফোড়ে, তা কেউ অস্বীকার করতে পারি না। আপনি যেমন মিলের বড়বাবু ও ষ্টোর-কীপার এক সঙ্গে, আমিও তেমনি ইউল মিলের ষ্টোর-কীপারি করি, আবার উড্‌মণ্ড ষ্ট্রীটে লোহা-লক্কড়ের একটা কারবারও চালাই। কোম্পানীকে ডবল-ক্রশ্‌ করবার কায়দায় দুজনেই ওস্তাদ। এর ওপর যদি প্রজাপতি নির্ব্বন্ধে আমাদের যোগাযোগ হয়—আমার কন্যাটিকে আপনি গ্রহণ করেন, কর্ম্মক্ষেত্রেও সহযোগিতা-সূত্রে পরস্পর লাভবান হব। দেনাপাওনা সম্বন্ধে আমার কথা এই যে, এ বিবাহে হাজার সাতেক ব্যয় করতে আমি কুণ্ঠিত হব না। তা ছাড়া আপনি বোধ হয় জ্ঞাত আছেন, আমার এই কন্যাটিই সর্ব্বস্ব, একমাত্র সন্তান, দেখতে শুনতেও মন্দ নয়। আপনার মত হলে এ মাসেই আমি শুভ কাজ সম্পন্ন করতে প্রস্তুত আছি।"

বিনীত—শ্রীনিতাইচরণ চক্রবর্ত্তী

চিঠিখানি পড়িয়া খামের মধ্যে পুনরায় ভরিয়া রায় মহাশয় গৃহিণীর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—শুনলে ত সব! কেমন, পছন্দ হয় এখানে?

গৃহিণী সৌদামিনী দেবী মুখখানি একটু ভারী করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—তুমি যা পড়লে, আর আমি তার যতটুকু বুঝলুম, তাতে আর সবই ভাল ত মনে হচ্ছে, তবে মেয়ে তোমার আহামরি গোছের হবে না কিন্তু!

কর্ত্তা গম্ভীরভাবেই কহিলেন—তা হবে না, একথা আমিও মানছি; তবে যে একবারে থ্যাক্-থু হবে তাও নয়।

গৃহিণী। কিন্তু আমার বরাবরের সাধ বাপু, শিবুর একটি টুকটুকে বউ হয়। আর, শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে সবে ধন নীলমণি ঐ ত একটি!

কর্ত্তা। সব সাধ কি সব সময় সকলের মেটে! চেষ্টার ত কসুর করছি না; কিন্তু মিলছে কই? টাকার টানাটানিতে সমস্ত বাজারেই যে হাহাকার পড়েছে; সে হিসেবে এ খদ্দের নেহাৎ নিন্দের নয়! সাতের কোটায় নিজেই যখন পা দিয়েছে, দশের কোটায় শেষ পর্য্যন্ত উঠবেই।

গৃহিণী। তা ছাড়া মিন্‌সের ছেলে-পুলে নেই—আখেরে আমার শিবুই ত সর্ব্বস্ব পাবে।

কর্ত্তা। খুলে না লিখলেও, চিঠিতেই ত তার আভাস দিয়েছে। আর, এ ত জানা কথা। মানুষটাও দিব্যি শাঁসালো।

গৃহিণী। আর দুই বেয়ায়ে মিলবেও ভাল।

কর্ত্তা। সে কথাও ত ব্যেই খুলেই লিখেছে গো!—দুজনেই আমরা এক হাটের ফোড়ে! হাঃ হাঃ হাঃ, ব্যেই আমার রসিক আছে।

গৃহিণী। রস না থাকলে যোড়ের মাণিক খুঁজে বার করে! হাঁ, গা! ঐ চিঠিখানার এক জায়গায় যে পড়লে—ঐ যে মিন্‌সে লিখেছে গো—কি দোঁয়াশ মাটির কথা; তা, চাষ-বাসও বুঝি করে, জমী-জেরাতও আছে তাহলে?

কর্ত্তা। কোথা থেকে আবার কি কথা টেনে আনলে তুমি! জমী-জেরাত, চাষ-বাস, দোঁয়াশ মাটি; ওহো—হাঃ হাঃ হাঃ—বুঝতে পেরেছি, ব্যেই একটু খোলসা করে লিখেছে; কথাটা হচ্ছে—ডবল্ ক্রশ্!

গৃহিণী। ওমা, সে আবার কি!

কর্ত্তা। ওটা হচ্ছে চালাকীর কায়দা, অর্থাৎ শাঁখের করাতের মতন যেতে আসতে কাটা—সোজা কথায় যাকে বলে—গাছ থেকে পাড়া—আবার তলা থেকে কুড়ুনো।

গৃহিণী। বুঝিয়াছি; এই ধর না, তুমি যেমন উপরি পাওনার বখরার সময় বড়বাবুর বড় ভাগটুকু বুঝে নিয়েই আবার ভাঁড়ারীর ভাগটুকু আদায় করতে আলাদা মানুষ হয়ে যাও!

কর্ত্তা। ঠিক ধরেছ, একবারে রগটি ঘেঁসেই ঢিলটি ছুঁড়েছ। যাক্, তাহলে তোমার মত ত?

গৃহিণী। না কি করেই বা বলি বাপু!

কর্ত্তা। তুমি রাজী হবে জেনেই আমি চিঠির জবাব দিয়েছি, লিখেছি—সাতের অঙ্কটা ভারি বে-খাপ্পা—ওটা ছেড়ে দশে উঠুন, সব দিক দিয়েই মানানসই হবে।

এই সময় বাহিরের চত্বরের দিকে গৃহিণীর সহসা দৃষ্টি পড়িতেই তিনি ব্যস্তভাবে মাথার কাপড়খানি আরও খানিকটা টানিয়া দিয়া কহিলেন—ওমা, কারা আসছে না!

কর্ত্তা বাহিরের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিলেন—ভয় নেই তোমার, পালাতে হবে না—ও-পাড়ার ছেলেরা আসছে গো—বেণী, অবনী, নির্ম্মল আর শশধর, বুঝি শিবুকেই খুঁজতে এসেছে—শিবু কোথায়?

গৃহিণী চাপা কণ্ঠে কহিলেন—এই যে একটু আগে কোথায় বেরুল, আমি ভেতরে যাই বাপু!

কর্ত্তা বাধা দিয়া কহিলেন—থাকই না তুমি, পাড়ার ছেলে ওরা, ওদের দেখে আবার লজ্জা!—এস হে এস, তোমরা আবার বাইরে দাঁড়িয়ে পায়চারি করছ যে, ঘরের ছেলে তোমাদের অত লজ্জা কিসের!

ছেলেরা সঙ্কোচের সহিত ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল। সৌদামিনী দেবী মাথার কাপড় একটু তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—ব'স বাবা, ব'স তোমরা।

টেবিলের পার্শ্বের কেদারাগুলি ঘুরাইয়া গৃহস্বামীর দিকে মুখ রাখিয়া ছেলেরা একে একে বসিয়া পড়িল।

অতঃপর এইভাবে কথোপকথন আরম্ভ হইল :—

কর্ত্তা। শিবু একটু আগেই বেরিয়েছে শুনছি; তোমাদের ওদিকেই কি যায়নি?

নির্ম্মল। আমরা আপনার কাছেই এসেছি, একটা বিশেষ প্রার্থনা নিয়ে।

কর্ত্তা। বটে!

বেণী। যদি সাহস দেন, তাহলে নিবেদন করি।

কর্ত্তা। আমি ত বাপু অন্ধকারেই রয়েছি, কিছুই বুঝছি না। ভাল, কি তোমরা বলতে চাও বল; তোমরা যখন শিবুর বন্ধু, বলবার অধিকার অবশ্যই আছে বই কি।

অবনী। প্রার্থনাটুকু আমাদের শিবুর বিয়ের সম্বন্ধেই।

কর্ত্তা। শিবুর বিয়ের সম্বন্ধে! অর্থাৎ—

শশধর। আপনাদেরই পালটি ঘরের এক সর্ব্বগুণান্বিতা কন্যা শিবু বিনাপণে বিবাহ করতে চায়।

কর্ত্তা। কি বললে!

গৃহিণী। ও—মা!

নির্ম্মল। এই বিবাহের ওপর তার সর্ব্বস্ব নির্ভর করছে।

বেণী। শিবু কোনদিন আপনার কাছে কোন ভিক্ষাই চায়নি—

কর্ত্তা। হুঁ! তাই আজ চেয়েছে আমার বুকের ওপর ছোরা বসাতে! বাঃ! ভ্যাগা মোর পোলা রে!

বেণী। তার হয়ে আমরাও ভিক্ষা চাইছি আপনার কাছে, এই ভিক্ষাটুকু তাকে প্রসন্ন হয়েই দিন।

কর্ত্তা। তোমরা কি তামাসা করতে এসেছ আমার সঙ্গে ?

নির্ম্মল। অমন কথা বলবেন না, আমরা আপনাকে পিতার মত শ্রদ্ধা করি।

কর্ত্তা। এই তার নমুনা বটে! আমাকে ছেঁটে ফেলে, আমার ছেলে নিজেই স্বাধীন হয়ে বিয়ে করতে চলেছে, আর তোমরা এসেছ সেই সুখবর শুনিয়ে—কাটা ঘায়ে নূনের ছিটে দিতে!

শশধর। আপনি কথাটা ওভাবে নেবেন না!

কর্ত্তা। কি ভাবে নেব? কি বলতে চাও তোমরা?

চারিজনেই কৃতাঞ্জলিপুটে সমস্বরে কহিল—আমরা ভিক্ষা চাই।

জ্বলন্তদৃষ্টিতে ছেলেদের দিকে চাহিয়া তীক্ষ্নস্বরে কর্ত্তা কহিলেন—আমি ও ভিক্ষা দেব না, কিছুতেই না। আমি ওর বাবা, ওর বিয়ে দেবার কর্ত্তা আমি; ঘাড় হেঁট করে আমার কথা ওকে মেনে চলতে হবে চিরদিন। শিবুর বিয়ের কথা পাকা হয়ে গিয়েছে, এই তার ডকুমেণ্ট; নগদ দশ হাজার টাকা এরা খরচ করবে। এ কথার নড়চড় হতে পারে না।

বেণী কহিল—গোল ত ঐখানেই কাকাবাবু! সাধে কি শিবু গোল পাকিয়ে বসেছে! আপনি ত কলকেতার খবর রাখেন না—কলেজে কলেজে মেয়েরা ঘোঁট পাকিয়ে সমিতি খুলেছে, পাসকরা ছেলেদের ফিরিস্তি নিয়ে তারা মুভ্মেণ্টস্ চালিয়েছে—বিয়েতে তারা যাতে পণ না নিতে পারে।

গৃহিণী আর্ত্তস্বরে কহিলেন—ওমা, বলে কি গো!

কর্ত্তা কিন্তু কথাটা গায়ে না মাখিয়া উপেক্ষার ভঙ্গীতে কহিলেন—তারা যা করে করুক, শিবুর তাতে হয়েছে কি?

নির্ম্মল কহিল—তারা শিবুকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে যে, বিয়েতে সে একটি পয়সাও পণ ব'লে নেবে না।

মুখখানা বিকৃত করিয়া অস্বাভাবিক কণ্ঠে কর্ত্তা কহিলেন—তাহলেই শিবুর মাথা কিনে রেখেছে আর কি!

অবনী কহিল—মাথা কেনার চেয়েও এর গুরুত্ব আরও বেশী কাকাবাবু! আজকাল মেয়েদের ডেস্প্যারেট য়্যাটেম্‌ট্ ত দেখছেন! কিছুতেই ওরা পেছপাও নয়।

শশধর কহিল—কোন ছেলে পণ নেবে না বলে একবার প্রতিজ্ঞা ক'রে শেষে যদি পণ নেয়—এরা কি অমনি অমনি রেহাই দেবে ভেবেছেন?

বেণী কহিল—তাই ত, কত রকমের প্রোপ্যাগাণ্ডা চালাবে, হয় ত বিয়ের রাতে আসরে দলবেঁধে এসেই একটা যাচ্ছেতাই সীন্ ক্রীয়েট করবে—

নির্ম্মল কহিল—নয় ত, চুপি চুপি বাসরে ঢুকে বরের বুকেই ছুরি বসিয়ে দেবে।

শেষের কথাটা কাণে প্রবেশ করিতেই গৃহিণীর মনে হইল, সত্যই বুঝি শিবুর বুকে কেহ ছুরি বসাইয়া দিয়াছে! তিনি আর্ত্তস্বরে চীৎকার তুলিলেন—ও মাগো—একি সর্ব্বনেশে কাণ্ডগো! ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি এতে আর অমত ক'র না; বাবারা মিছে বলেন নি, ও খাণ্ডাত্নীরা সব পারে!

কর্ত্তা কঠোরকণ্ঠে কহিলেন—হাঁ, মগের মুল্লুক কি না! গোটাকতক ডেঁপো ছুঁড়ীর চোখ্রাঙ্গাণী দেখে ছেলের বাবারা ভীর্মি যাবে! তারা ত আর মানুষ নয়! পুলিস নেই, আইন-আদালত নেই—

বেণী কহিল—কাকাবাবু, আছে সবই—স্বীকার করছি; কিন্তু হঠাৎ একটা বিভ্রাট যদি ওরা বাধিয়ে বসে, তখন পুলিস আর আইন-আদালত নিয়ে কি করবেন? না হয় ওদের শাস্তিই দেওয়াবেন, কিন্তু মান প্রাণ যদি যায়, ফিরে ত পাবেন না!

কথাটা গৃহিণীর মনে ধরিল, বেণীর যুক্তিতে সায় দিয়া গাঢ়স্বরে কহিলেন—তুমি ঠিক বলেছ বাবা! বেঁচে থাক। পয়সাই কি সব? শিবুর আমার কিসের অভাব! বেঁচে থাকলে কত পয়সা দু'হাতে উপায় করবে তখন।

কর্ত্তার সুর এতক্ষণে একটু নরম হইয়াছে বুঝা গেল। বেণীর যুক্তিপূর্ণ উক্তি তাঁহার মনের দৃঢ়তা শিথিল করিয়া দিল। গৃহিণীর কথার উত্তরে হাতের চিঠিখানি তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন—কিন্তু এদের আমি কি বলব? কথা প্রায় এক রকম পাকা, তার ওপর অতগুলো টাকা, আরও একটা আশা—উঃ! না, হবে না; পারব না আমি—

বেণী কহিল—কিন্তু কাকাবাবু, আর পাঁচজনের এক্জ্যাম্পল্ নিয়ে যদি আপনি এ ত্যাগ করেন, তখন মনে আর আফশোস্ উঠতে পারে না। জানেন ত, আমরা চারজনেই এম-এ পাশ করেছি, আমাদের অভিভাবকরাও

বিয়ের দিক দিয়ে আমাদের সম্বন্ধে অনেক কিছুই আশা করে আছেন—কিন্তু আজ তাঁদের অবস্থাও আপনার মত; কেন না আমরা কেউ বিয়েতে পণ বলে কিছুই নিতে পারব না।

বিস্ময়ের সুরে কর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন—তোমরাও?

সকলেই ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়া দিল—আজ্ঞে হাঁ।

বেণী কহিল—এই আমার কথাই ধরুন না, আমার বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে—আর তাতে সব রকমে দশ হাজারেরও বেশী সর্ব্বরকমে পাব বলে স্থির হয়ে আছে, কিন্তু সহসা সব পাল্টে গেছে কাকাবাবু! আমার পণ শুনে আমার মা আজই কন্যাপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন—বিয়ে আটকাবে না, কিন্তু তাদের এক পয়সাও পণ বলে দিতে হবে না।

অভিভূতের মত কর্ত্তার মুখ দিয়া তাঁহার অজ্ঞাতেই যেন অস্ফুটস্বর বাহির হইল—বল কি!

নির্ম্মল কহিল—দেখুন, আফিন গিলে, কেরোসিন জ্বেলে দেশের সোণার প্রতিমাগুলো জীবন আহুতি দিচ্ছে—এই পাপ প্রথার দায়ে; আর, য়ুনিভারসিটির চাপরাস পরে আমরাই তাদের সামনে দাঁড়িয়েছি যমদূত হয়ে!

অবনী কহিল—এখন আপনিই বলুন কাকাবাবু, এই মারাত্মক পণপ্রথা তুলে দিতে আমরা পণ নেব না বলে এই যে পণ করিছি—সেটা কি দোষের হয়েছে?

বেণী কহিল—আর, এই সূত্রে শিবুর তরফ থেকে যে ভিক্ষাটুকু চাইতে এসেছি আপনার কাছে, সেও কি আমাদের অন্যায় হয়েছে কাকাবাবু?

কাকাবাবু অবিচলিত কণ্ঠেই এবার উত্তর দিলেন—না।—তাহার পর হাতের চিঠিখানি মিরজায়ের পকেটে পুরিয়া কহিলেন—দশ হাজার টাকা আর সেই সঙ্গে মেয়ের বাপের সোল্ প্রপার্টির ওয়ারিস্তান হবার এই চান্স আমি প্রত্যাখ্যান করলুম।

কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই চারিখানি চিত্তে বিপুল উল্লাসের প্রবাহ ছুটিল। চারিজনেই এক সঙ্গে আনন্দের আবেগে কর্ত্তার পদধূলি মাথায় তুলিতে হুড়াহুড়ি লাগাইয়া দিল।

এ পর্ব্ব সমাধা হইলে বেণী উৎসাহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—তাহলে মেয়ে দেখবার ব্যবস্থা আমরা করি?

কর্ত্তা সুস্পষ্টস্বরে কহিলেন—না বলবার আর ত কোন কথাই রইল না, দেনা-পাওনা যখন নেই এবং শিবু নিজেই মেয়ে দেখে পছন্দ করেছে। এখন তোমরা আমার স্থানে দাঁড়িয়ে যা করবার করতে পার, আমাকে আর ওর মধ্যে জড়িয়ো না।

শেষের কথাটায় ছেলেদের মন মুসড়াইয়া গেল। নির্ম্মল কর্ত্তার মুখের দিকে চাহিয়া অভিমানের সুরে কহিল—কিন্তু আপনি নিজে এ কার্য্যে যোগ না দিলে আমরা যে নিরুৎসাহ হব কাকাবাবু! মত যখন দিলেন, আপনাকেই মাথা হয়ে সব করতে হবে, আমরা থাকব নীচে।

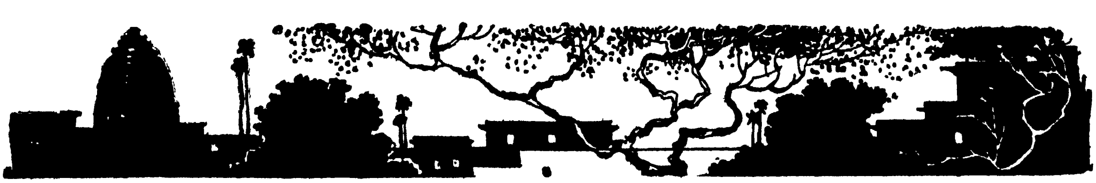
কণ্ঠস্বর গাঢ় করিয়া বনমালী রায় কহিলেন—না বাবা, তা আর হয় না; বিয়ের ব্যাপারে পণ আমার যখন ভেঙ্গে গিয়েছে, তখন আমি আর এতে কোমর বেঁধে দাঁড়াতে পারি না। আমি প্রসন্ন হয়েই তোমাদের ওপর সব ভার দিচ্ছি; আমার গৃহলক্ষ্মীকে তোমরাই নিয়ে এস, আমাদের পক্ষ থেকে তাঁর কোন অমর্য্যাদা হবেনা—এ তোমরা স্থির জেনো।

চারিজনেই পুনরায় যুগপৎ নত হইয়া কর্ত্তা ও গৃহিণীর পদধূলি গ্রহণ করিল।

* * * *

তিনদিন পরে বনমালী রায় মহাশয় ডাক যোগে একখানি পত্র পাইলেন। মুক্তার মত পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে অক্ষরে কয়েকটি ছত্রে তাহাতে লেখা ছিল—

কালের প্রবাহে সবই ভাসিয়া যায়, স্থায়ী থাকে শুধু মানবতার কীর্ত্তি। আমরা শ্রদ্ধাসহকারে আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি।····· কুমারী সংসদ।



পল্লীর ঋণ-সমস্যা ও আইন

শ্রীঅনিলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (এড্‌ভোকেট হাইকোর্ট)

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে সমগ্র ভারতবর্ষে চাষীর ঋণ ছিল ৩০০ কোটি টাকা, আর এখন ৯০০ কোটি টাকা। বাঙ্গালা দেশে চাষীদের মধ্যে পরিবার-পিছু দেনা ১৬০৲, আসামে ২৪২৲, অন্যান্য প্রদেশেও অবস্থা শোচনীয়। সমস্ত ভারতবর্ষের হিসেব নিয়ে দেখা যায় প্রায় শতকরা ৭৫ জন চাষী ঋণগ্রস্ত—দেশটা যেন মহাজনের কবলে র'য়েছে। পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর মতে, এই দেশব্যাপী দারুণ সমস্যা-সমাধানের একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র—সমাজতন্ত্রবাদ। সে-মতের দোষ-গুণ বিচার না ক'রে আপাততঃ দেখা যাক—পল্লীর ঋণ সমস্যা সমাধানে আইন কতটুকু কাজ করেছে।

সমাজে যখন থেকে টাকা চলতে আরম্ভ করেছে, টাকা-ধার-দেওয়াও তখন থেকেই চলে আসছে। কিন্তু কুসীদ-বৃত্তি বা সুদি-কারবার জিনিসটার জন্ম অনেক পরে। আরিস্‌তত্‌ল্‌ বলতেন—টাকা থেকে তো আর টাকা গজায় না, সুতরাং টাকা ধার দিয়ে সুদ আদায় করা ঠিক নয়। খৃষ্টান ও মুসলমান শাস্ত্রেও সুদের স্থান ছিল না। কিন্তু সে-দিন আর নেই। বর্তমানে প্রত্যেক সভ্য সমাজেই সুদি-কারবার কেবল যে প্রচলিত তা নয়, বিশেষ প্রয়োজনীয়—মহাজন ও খাতক দু'জনেরই এতে বিশেষ উপকার। অবশ্য মাত্রা অতিক্রম করলে, এই জিনিসই কঠিন সমস্যার আকার ধারণ করে। এখন উপযুক্ত মাত্রার ব্যবস্থা করাই হচ্ছে আইনের কাজ। স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে—আমাদের দেশের আইন এ-বিষয়ে কতটুকু সফলকাম হয়েছে ?

ইংরেজ-শাসনের পূর্ব্বে ব্যাপারটি বেশ সহজ এবং স্বাভাবিক ছিল। খাতক প্রয়োজন-মত টাকা ধার করত, মহাজন সাধ্য-মত ধার দিত। ঘটা ক'রে কাগজে কলমে আইন পেশ করার নাটক ছিল না বটে কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রের বিধান অনুসারে সুদ চলত—শতকরা ১৫৲ পর্য্যন্ত, সম্পত্তি বন্ধক না থাকলে ২৪৲ পর্য্যন্ত। তা'ছাড়া প্রচলিত দামদুপৎ আইন অনুসারে, কোনও ক্ষেত্রেই মহাজন আসলের-চেয়ে-বেশী সুদ একবারে আদায় করতে পারত না। এই সব দেশাচারের ব্যতিক্রম ঘটলে কা'রও আদালতের দ্বারস্থ হবার প্রয়োজন ছিল না। পল্লী-সমাজে তখন প্রাণ ছিল, পঞ্চায়েতের শাসনে মহাজন-খাতক উভয়ই সুবিচার লাভ করত।

কিন্তু গোল বাধল ইংরেজ-শাসনের প্রথম যুগে। তখন সমাজের বন্ধন শিথিল হয়ে এসেছে এবং সুদের হার চ'ড়ে গেছে শতকরা ৫০৲ পর্য্যন্ত। তার উপর সাহেবরা নিয়ম করলেন যে দামদুপৎ আইন কলকাতা, বোম্বাই ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট সীমানার বাইরে কোথাও গ্রাহ্য হবে না এবং সুদের হার সম্বন্ধে মহাজন-খাতকের চুক্তিটাকেই বড় ক'রে দেখা হবে; কারণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা আইনের পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত—এই ছিল তখনকার মত।

কিছুদিন এই "যা'-খুশী-তাই-করো"—নীতি (policy of baissez faire) চল্‌ল; কিন্তু বিপদ হল সাহেবদেরই বেশী। টাকা ধার না করলে তাঁদের চলে না, অথচ সুদের দায়ে সর্ব্বস্বান্ত হবার অবস্থা। তখন মহাজন-দমনের জন্য ১৭৭২ সালের আইনে সুদ নির্দ্দিষ্ট হ'ল—১০০৲-রকম আসলের উপর মাসিক শতকরা ৩৵০ হারে এবং ১০০৲-র বেশী হ'লে মাসিক শতকরা ২৲ হারে। উত্তরোত্তর বাঙ্গালা এবং অন্যান্য প্রদেশে সুদের হার সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা হ'তে লাগল এবং কয়েক বছরের মধ্যে সর্ব্বত্র শতকরা বার্ষিক ১২৲ সুদই ধার্য্য হয়ে গেল।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আবার মহাজনের পড়তা পড়ল। সে-যুগে এ দেশের ব্যবস্থাপক-সভার (legislature) কর্ণধার ছিলেন মুষ্টিমেয় "জবরদস্ত" শ্বেতাঙ্গ শাসক। দেশবাসীর আসল ব্যথা কোথায়, সে-বিষয়ে তাঁদের না ছিল খবরদারী—না ছিল দরদ। বরং কর্ত্তাদের স্বার্থজড়িত ছিল মহাজনের সঙ্গে এবং তাঁদের মন্ত্রণাদাতা ছিলেন সেই জমিদার শ্রেণী—যাকে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন "জোঁক এবং প্যারাসাইট্‌"। খাতকের বিরুদ্ধে মহাজন-জমিদারের ষড়যন্ত্র জয়যুক্ত হ'ল—১৮৫৫ সালের ইউশারি ল'জ্‌ রিপীল্‌ এক্‌ট্‌ (Usury Laws Repeal Act of

1855) প্রচার করল যে সুদের মামলাতে আদালতকে চুক্তির বশে-ই চলতে হবে ; হার সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আইনের যা'-কিছু বাঁধাবাঁধি ছিল, এইখানেই সব ইতি।

খাতকের হ'ল "পুনর্মূষিকোভব" অবস্থা। সুযোগ পেয়ে মহাজন উঠল ফুলে। সুদের হার চড়ে গেল শতকরা ৭৲ থেকে ১৫০৲ পর্য্যন্ত—একটা নজির পাওয়া যায় শতকরা ১,৩৪০৲ পর্য্যন্ত। শোষণের চরম সীমা উপস্থিত হ'ল, তখনও আইন নীরব। কিন্তু প্রকৃতির পরিশোধ তো আছে। সমাজ-জীবনে ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান আইনের কাজ এবং আইন যেখানে অপটু, সেইখানেই বিশৃঙ্খলার রাজত্ব। এ-দেশেও হ'ল তাই। মহাজনের বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষের ভাব দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। কোথাও কোথাও মারামারি কাটাকাটি পর্য্যন্ত গড়াল। ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৭৪ সালের দাক্ষিণাত্যবিদ্রোহ এবং ১৮৯১ সালের আজমীর দাঙ্গা তার দৃষ্টান্ত।

এতদিনে শাসন-কর্ত্তাদের চোখ ফুটল যে আইন ক'রে শোষণের প্রতিকার প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রদেশে কমিশন বস্‌ল, মহাজন-খাতকের অবস্থা অনুসন্ধান করা হল এবং খাতককে রক্ষা করার জন্য কতকগুলি নতুন আইন তৈরী হল—যথা টাকাভি লোন্‌স্ এ্যাক্ট্ (Taccavi Loans Act), কো-অপারেটিভ্ ক্রেডিট্ সোসাইটীজ্ এ্যাক্ট্ (Co-operative Credit Soceities Act) ইত্যাদি। কেবল তাই নয়, দেশের সাধারণ আইনেরও অনেক-কিছু পরিবর্ত্তন হ'ল। কন্‌ট্র্যাক্ট এ্যাক্ট্ (Indian Contract Act) দ্বারা নতুন ব্যবস্থা হল যে অনুচিত প্রভাবের (undue influence) প্রমাণ পেলেই আদালত সুদের হারের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে। তা ছাড়া নতুন সিভিল প্রোসিডিওর কোড্ (Code of Civil Procedure) অনুসারে চাষীর যন্ত্রপাতি, চাষের গোরু ইত্যাদি সব মহাজনের নাগালের বাইরে চ'লে গেল ; চাষীর দেনার দায়ে এই সব নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিস মহাজনের দ্বারা ক্রোক বা বিক্রী করার পথ বন্ধ হ'ল। চাষীকে গ্রেপ্তার করাও নিষিদ্ধ হ'ল—খাতককে কিস্তি-হিসাবে দেনাশোধের অধিকার দেওয়া হ'ল।

এই ভাবে আইনের অনেক পরিবর্ত্তন হ'ল বটে কিন্তু তবু চাষীর দুর্দ্দশা ঘোচে না। খাতকের অভাব-অভিযোগ নিয়ে মহাজনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চলতে লাগল। অবশেষে ১৯১৮ সালে এই চেষ্টা ফলবতী হ'ল—ইউশারিয়াস্ লোন্‌স্ এ্যাক্ট্ (Usurious Loans Act)-রূপে। এই আইন অনুসারে বিলাতের মত এ-দেশেও আদালতকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হ'ল, যাতে অসঙ্গত সুদের হার এবং অন্যান্য চুক্তির কবল থেকে খাতককে বাঁচান যেতে পারে। ১৮৫৫ সালের ইউশারি ল'জ্ রিপীল এ্যাক্ট্ (Usury Laws Repeat Act of 185৫) যে অনিষ্ট করেছিল, এতদিনে তার কতকটা প্রতিকারের ব্যবস্থা হল। কিন্তু আইনের ত্রুটি সংশোধন হওয়া সত্ত্বেও দেশবাসীসাধারণ আশানুরূপ উপকার লাভ করল না। আদালত পর্য্যন্ত যেতে পারলে তবে তো খাতক সু-ব্যবস্থা পাবে! কিন্তু কয়জনের সে-সামর্থ্য আছে? সম্প্রতি যে-এগ্রিকাল্‌চারাল্ কমিশন ও ব্যাঙ্কিং এন্‌কোয়ারি কমিটি বসেছিল, তাদের মতে ইউশারিয়াস্ লোন্‌স্ এ্যাক্ট্ (১৯১৮) দেশে বিশেষ কার্য্যকরী হয়নি—"a dead letter in all provinces"। তারপর কয়েক বছর পূর্ব্বে যে-বিশ্বব্যাপী অর্থ-সঙ্কট দেখা দিয়েছিল, তখন স্পষ্টই বোঝা গেল যে এ দেশে কুসীদ-বৃত্তি সম্বন্ধে আইনের পরিবর্ত্তন না হ'লে আর চলে না।

মহাজনের অত্যাচারে খাতক জীর্ণ শীর্ণ, কৃষকসম্প্রদায় ধ্বংসোন্মুখ, তখনও আইন-কর্ত্তারা নিশ্চেষ্ট। প্রত্যেক প্রদেশেই আন্দোলন চলতে লাগল। পাঞ্জাবে প্রয়োজন-মত আইনও পেশ হল। বাঙ্গালা দেশেও অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠাতে ১৯৩৩ সালে বেঙ্গল মণি লেণ্ডার্স এ্যাক্ট্ (Bengal moneylender's Act of 1933) দ্বারা সময়োপযোগী ব্যবস্থা হল। সুদের একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট হ'ল—সাধারণতঃ শতকরা ১৫৲, সম্পত্তি বন্ধক না থাকলে শতকরা ২৫৲ পর্য্যন্ত। যে-মামুলী দাম্‌দুপৎ আইনের বলে এককালে আসলের-চেয়ে-বেশী সুদ আদায় করা নিষিদ্ধ ছিল, তাকে দেশে আবার নতুন ক'রে চালান হ'ল এবং অবস্থা-বুঝে-ব্যবস্থার জন্য আদালতের হাতে অনেক ক্ষমতা দেওয়া হল।

বেঙ্গল মণি লেণ্ডার্স এ্যাক্ট্ দেশের যথেষ্ট উপকার করেছে এবং তার বিধানগুলির মধ্যে সকল দিক রক্ষা করার একটা চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু দু' বছরের মধ্যে

বেশ বোঝা গেল যে খাতক-সম্প্রদায় এতই নিঃসহায় যে আইনের আরও পরিবর্ত্তন না করিলে তাহাদের রক্ষা করা সম্ভব নয়। যুগের হাওয়াও তখন গরীবের অনুকূল। অতএব সহজেই ১৯৩৬ সালে পেশ হ'ল বেঙ্গল এগ্রিকাল্‌চারাল্ ডেটর্স এ্যাক্‌ট্ (Bengal Agricultural debtors' Act of 1936); অনেকে মনে করিলেন এতদিনে দেশে বুঝি "কামধেনু" পাওয়া গেল। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে এই "কামধেনু" এক পক্ষেরই কেঁড়ে ভরাবেন, আর অন্য পক্ষকে মারবেন গুঁতো।

দেশকে যে-কেউ ভালবাসেন, তাঁরই কাছে সমগ্র পল্লীর ঋণ একটা বড় সমস্যা। কিন্তু আইনের যাঁরা পাণ্ডা, তাঁদের দরদ উথ্‌লে উঠল শ্রেণী-বিশেষের জন্য। সংজ্ঞার মধ্যে স্পষ্ট ক'রে বলা হ'ল যে এই আইনের "debtor" বা "খাতক" কৃষিজীবী হওয়া চাই-ই। কেন? পল্লীর ঋণ-সমস্যা তো আর কেবল কৃষক সম্প্রদায়কে নিয়ে নয়! অথচ এই অসঙ্গত পক্ষপাতের উদ্দেশ্য কি? প্রত্যেক পল্লীতে যে-অগণিত মধ্যবিত্ত পরিবার ঋণের দায়ে সর্ব্বনাশের পথে ব'সে আছে, আইন-কমণ্ডলুর করুণা-বারি থেকে তাদের বঞ্চিত করার অর্থ কি?

বেঙ্গল এগ্রিকাল্‌চারাল্ ডেটর্স এ্যাক্‌ট্ কৃষিজীবী খাতককে মহাজনের কবল থেকে বাঁচাতে চায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তার প্রতি অন্ধ-সহানুভূতির আতিশয্যে আমাদের আইন-কর্ত্তারা ভুলে যান, সব-দেশেই—বিশেষতঃ কৃষিপ্রধান দরিদ্র দেশে—মহাজন কত বড় বিপদ-বন্ধু। একজন সূক্ষ্ম-দর্শী ইংরেজ বলেছেন "ভারতবর্ষের চাষীকে রৌদ্রবৃষ্টির উপর যতখানি নির্ভর করতে হয়, মহাজনের উপর তার চেয়ে কম নির্ভর করতে হয় না।" বাস্তবিক চাষীর স্বার্থের সঙ্গে মহাজন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, মহাজন তার একান্ত অবলম্বন। অবশ্য, অনেক সময়ে এই মহাজনই রক্ষক না হয়ে ভক্ষক হ'য়ে ওঠে সেকথা ঠিক এবং তার অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে আইনের প্রতিবিধান প্রয়োজন সে বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকতে পারে না। কিন্তু সব জিনিসেরই সীমা আছে। "মহাজনকে লাগাও বাড়ি, জমিদারকে ফেলো পিষে" এই যে ধুয়োউঠেছে—এরপরিণাম বিষময়। খাতককে অযথা প্রশ্রয় দিয়ে, আইনের অস্ত্রে মহাজনকে ক্ষতিগ্রস্ত করা খুবই সহজ, তার অস্তিত্ব লোপ করাও অ-সাধ্য নয়। কিন্তু মহাজনের গলায় ফাঁসি দিলে, সঙ্গে সঙ্গে পল্লীসমাজেরও যে অপমৃত্যু ঘটবে, সে-কথা ভুললে তো চলবে না।

আর এক কথা। নতুন আইনের নতুন ব্যবস্থা অনুসারে বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে সালিস-সমিতি গঠিত হবে—মহাজন-খাতকের দেনা-পাওনার বিচার করবার জন্য। কিন্তু তার পরিণাম কি? বর্ত্তমান জুরি-বিচারের বহর থেকেই তো বোঝা উচিত—মফঃস্বলের সালিস্-সমিতির কতদূর দৌড় হবে। এই সব দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য যে বিদ্যা, বুদ্ধি এবং সব-চেয়ে-বড় যা—চরিত্র দরকার, তা' আমাদের দেশে কোথায়? গ্রামের মহাজন-খাতকের ভাগ্য-বিধাতাদের মধ্যে ক'জন পাওয়া যাবে যাঁরা এগ্রিকাল্‌চারাল্ ডেটর্স এ্যাক্‌টের মতন সূক্ষ্ম ও জটিল আইনের মর্ম্ম বুঝে তা' কাজে পরিণত করতে পারবেন; যাঁরা নিরপেক্ষ ভাবে ন্যায়পথে চলবেন; যাঁরা উৎকোচের প্রলোভন ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের উর্দ্ধে থাকবেন! র‍্যামজে ম্যাকডনাল্ড সাহেব এ-দেশে যে-আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন, তারপর সালিস্-সমিতির কথা শুনলেই আশঙ্কা হয়, দেশ-ব্যাপী লঙ্কা-কাণ্ডের আয়োজন হচ্ছে।

সোজা কথা—দেশের বর্ত্তমান অবস্থাতে সালিস্-সমিতির কাছে সুবিচারের আশা দুরাশা মাত্র। যদি আইনের উদ্দেশ্য হয় সমাজের কল্যাণসাধন, তাহলে সালিস্-সমিতিকে বিদায় ক'রে, মহাজন-খাতকের অভাব-অভিযোগের বিচার ভার দিতে হবে মুন্‌সিফ্-সাবজজদের হাতে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে অবস্থানুরূপ ব্যবস্থার জন্য বিচারপতিকে যথেষ্ট ক্ষমতা দিতে হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা—আইন ফাঁকি দেবার মতলব ধরা পড়লেই কি মহাজন কি খাতক প্রত্যেকেরই দণ্ডআইনবিধি অনুসারে সমুচিত দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা চাই। দণ্ডভয় না থাকলে সকলেই যথেচ্ছভাবে আইন অমান্য করবে এবং ভবিষ্যতে আইনটা হ'য়ে উঠবে অর্থহীন আড়ম্বর মাত্র।

মহাজন ও খাতকের আপাতবিরোধী স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানই আইনের উদ্দেশ্য। জনমত—বিশেষতঃ আইন-কর্তাদের মনোবৃত্তি—এই আদর্শে অনুপ্রাণিত না হ'লে, আইনের ফল হিতে-বিপরীত হওয়ার আশঙ্কাই বেশী। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের তথা-কথিত দেশ-নায়কদের চোখ এ-বিষয়ে ফুটবে কবে?

নূতন মেয়র নির্ব্বাচন—

গত ২৮শে এপ্রিল কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় শ্রীযুত সনৎকুমার রায়চৌধুরী কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও শ্রীযুত এ, কে, এম, জ্যাকেরিয়া ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। উভয়েই কংগ্রেস দলের প্রার্থী ছিলেন এবং তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে কোন প্রার্থী দণ্ডায়মান হন নাই। বহু দিন পরে কর্পোরেশনে কংগ্রেস দলের এই



নূতন মেয়র শ্রীযুত সনৎকুমার রায় চৌধুরী

প্রকার জয়লাভে কলিকাতাবাসী সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। সনৎবাবু ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে কর্পোরেশনের কাউন্সিলার আছেন এবং ১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে ডেপুটী মেয়রের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অল্প দিন পরেই কংগ্রেসের নির্দ্দেশ মত তাঁহাকে সে পদ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস, মেয়র হইয়া তিনি এমন কোন কাজ করিয়া যাইবেন যাহার জন্য কলিকাতা-বাসীরা চিরদিন তাঁহার নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। নবনির্ব্বাচিত ডেপুটী মেয়র ও কলিকাতার খ্যাতনামা ব্যবসায়ী। তিনি ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে কাউন্সিলার পদে কার্য্য করিতেছেন। তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার সালারের অধিবাসী এবং দেশের উন্নতির জন্য সর্ব্বদা অবহিত। এবার মেয়র নির্ব্বাচনের দিন মেয়রকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া কাউন্সিলায় শ্রীযুক্ত নটবর দত্ত বাঙ্গালা ভাষায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা নিম্নে উক্ত বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—"হে মেয়র মহোদয়, আপনার নামের সহিত ব্রহ্মার মানসপুত্র সনৎকুমারের নামের চমৎকার সাদৃশ্য আছে। সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া ব্রহ্মার একটি সুনাম আছে এবং "পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্য লক্ষণম্"—একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সনৎকুমারেরও সৃষ্টিশক্তি থাকিবারই কথা। আমরা আপনাতে সেই সৃষ্টিশক্তির বিকাশ দেখিতে চাই। আপনাকে সৃষ্টি করিতে হইবে—বিশৃঙ্খলার স্থানে শৃঙ্খলার, যেখানে নিয়ম লঙ্ঘিত হইতেছে সেখানে নিয়মানুবর্ত্তিতার এবং যে স্থলে করদাতাগণের অসন্তোষের উৎপত্তি হইয়াছে সে স্থলে তাঁহাদের সন্তোষ বিধানের। পুরাণের সনৎকুমারের ঘোর তপস্বী বলিয়া খ্যাতি ছিল। আপনি করদাতাগণের প্রতিনিধিরূপে তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য চিরদিনই সাধনা



নূতন ডেপুটী মেয়র মিঃ এ, কে, এম, জ্যাকেরিয়া

করিয়া আসিয়াছেন। আজ আপনি মেয়রের আসনে বসিলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহাদের মঙ্গল চিন্তাই আপনার একমাত্র তপস্যা হইবে। ব্রহ্মার তনয় সনৎকুমার মহা ধার্ম্মিক ছিলেন। একটু 'বড় বেশী হিন্দু' বলিয়া আপনার দুর্নাম আছে সত্য, কিন্তু কাহাকে খাঁটি হিন্দু ও প্রকৃত ধার্ম্মিক বলিতে আমি এই বুঝি যে, তিনি অন্যান্য সকল ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি সমান শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইবেন। আমি স্থির জানি যে আপনার উদার হৃদয়ে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা কোনদিনই স্থান পাইবে না।"

জে, সি, বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু—

কলিকাতার খ্যাতনামা এঞ্জিনিয়ার, রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য জে, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ১০ই এপ্রিল দিল্লীতে মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ার নিকটস্থ দমদমা গ্রামের অধিবাসী; শিবপুর কলেজে কিছুকাল এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার পর তিনি ঠিকাদারী কার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহার কর্ম্মনিষ্ঠা ও সততার গুণে এই ব্যবসায়ে তিনি শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন এবং যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ঠিকাদারী ছাড়াও তিনি কয়লার খনি, চা-বাগান, গালার কারখানা, ইস্পাত আমদানী-রপ্তানী প্রভৃতি বহু ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। কলিকাতা কর্পোরেশন, কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট, বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অব কমার্স প্রভৃতি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তিনি দেশসেবা করিয়াছিলেন এবং নিজের চেষ্টা ও অর্থব্যয়ে বাস-গ্রামের নানাবিধ উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় কর্ম্মী পুরুষের অকাল-মৃত্যুতে দেশ প্রকৃতই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

একটি চাঞ্চল্যকর মামলা—

কলিকাতা হাইকোর্টে সম্প্রতি একটি চাঞ্চল্যকর মামলা হইয়া গিয়াছে। বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এসেম্বলীর সদস্য শ্রীযুত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী গত ১৯শে এপ্রিল এই বলিয়া হাইকোর্টে মামলা করেন যে—খাঁ বাহাদুর আজিজল হকের লেজিসলেটিভ এসেম্বলীর সভাপতি পদে নির্ব্বাচন বৈধ হয় নাই। গোস্বামী মহাশয়ের পক্ষ হইতে আইনের নজীর দেখান হইয়াছিল যে সার জন এণ্ডারসন বাঙ্গালার গবর্ণর পদে কাজ করিতেছেন বটে, কিন্তু ভারত শাসন আইন অনুসারে তিনি গভর্ণর নিযুক্ত হন নাই কাজেই তিনি এসেম্বলীর সভাপতি নির্ব্বাচনের যে আদেশ দিয়াছিলেন তাহাও অবৈধ। কিন্তু গত ২৯শে এপ্রিল ঐ মামলার রায় প্রকাশিত হইয়াছে। হাইকোর্টের বিচারপতি উক্ত মামলা ডিস্‌মিস করিয়া দিয়াছেন—বাদী এখন বিবাদী পক্ষকে মামলার খরচ দিবেন। এরূপ মামলায় জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু আইনের জ্ঞান প্রদর্শন ভিন্ন ইহার আর কোন সার্থকতা দেখা যায় না।

বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ এসেম্ব্লি—

গত ৭ই ও ৮ই এপ্রিল বাঙ্গালার নিম্নতর ব্যবস্থা পরিষদ বা বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ এসেম্ব্লির সভাপতি ও সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। ৭ই কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় ও মৌলবী তমিজুদ্দীন খাঁকে পরাজিত করিয়া ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী খাঁ



বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এসেম্ব্লির সভাপতি খাঁ বাহাদুর এম, আজিজল হক

বাহাদুর আজিজল হক সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। পরদিন শ্রীযুত পুলিনবিহারী মল্লিককে পরাজিত হইয়া মৌলবী আসরফ আলি খাঁ চৌধুরী সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। প্রথমদিন কংগ্রেস দলের সদস্যগণ কুমার সাহেবের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন—কিন্তু দ্বিতীয় দিন গভর্ণমেণ্ট পক্ষ পুলিনবাবুকে সমর্থন করায় কংগ্রেস পক্ষ কাহাকেও ভোট দেন নাই।

কয়েকজনের চিত্র

আমরা নিম্নে বাঙ্গালার ৫জন মন্ত্রী, উচ্চতর পরিষদের একজন সদস্য এবং নিম্নতর পরিষদের ৪জন সদস্যের চিত্র প্রকাশ করিলাম।



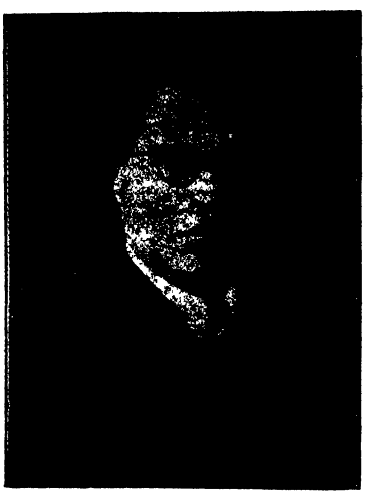
বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এসেম্ব্লির সদস্য
শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত



বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী
মৌলবী এ. কে. ফজলল হক



বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এসেম্ব্লির সদস্য
শ্রীযুক্ত গৌরহরি সোম



মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার



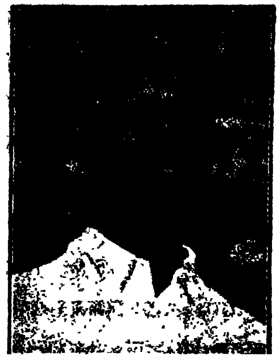
মন্ত্রী সার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়



মন্ত্রী মহারাজা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী



মন্ত্রী নবাব মশারফ হোসেন খাঁ বাহাদুর



বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এসেম্ব্লির সদস্য
শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মণ্ডল



বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এসেম্ব্লির সদস্য
মির্জা আবদুল হাফিজ



বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য
রায় বাহাদুর রাধিকাভূষণ রায়

ভারত-জাপান বাণিজ্য-চুক্তি—

গত ১২ই এপ্রিল ভারত সরকার ও জাপান সরকারের প্রতিনিধিগণ নূতন বাণিজ্য-চুক্তি স্থির করিয়া দিয়াছেন। ঐ চুক্তি ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী থাকিবে। এই নূতন চুক্তিতে নিম্নলিখিতরূপ সর্ত্ত প্রদত্ত হইয়াছে—জাপান যদি ১০ লক্ষ গাঁট ভারতীয় তুলা ক্রয় করে, তাহা হইলে জাপান প্রতি বৎসরে ২৮৩০ লক্ষ গজ তুলার কাপড় ভারতে আমদানী করিতে পারিবে। তাহারা যদি ১৫ লক্ষ মণ ভারতীয় তুলা ক্রয় করে, তাহা হইলে তাহারা ৩৫৮০ লক্ষ গজ কাপড় আমদানী করিতে পারিবে। এইভাবে ভারতের সহিত আদান-প্রদানের ব্যবস্থা হওয়ায় ভারতীয় তুলার বাজারে সুবিধা হইতে পারে।

আফিমের চোরাই ব্যবসা—

শুনা যায় ৮৫০ বৎসর পূর্ব্বে আরব দেশ হইতে প্রথম ভারতবর্ষে আফিম আনা হইয়াছিল। তখন শুধু ঔষধের জন্য আফিম ব্যবহৃত হইত। ক্রমে উহার ব্যবহার এত বাড়িয়া যায় যে আইন করিয়া উহার ব্যবহার হ্রাস করিতে হইয়াছে। ফলে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে যে আফিম ১০ টাকা সের দরে বিক্রীত হইত, এখন তাহা প্রতি সের ১৫০ টাকায় বিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি চুরি করিয়া আফিম বিদেশ হইতে আনিয়া সস্তায় এখানে বিক্রয়ের ব্যবসা এখনও জোর চলিতেছে। পুলিস ঐরূপ চুরি প্রায়ই ধরিয়া থাকে বটে, কিন্তু কত লোক যে ধরা না পড়িয়া ঐ চোরাই ব্যবসা চালাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সমগ্র সভ্য জগতে আফিম ব্যবহার কমাইবার চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু—চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।

শর্করা শিল্পের বিপদ—

পূর্ব্বে এদেশে প্রস্তুত চিনির উপর প্রতি হন্দরে ১ টাকা ৫ আনা উৎপাদন-শুল্ক দিতে হইত—গত ১লা এপ্রিল হইতে ভারত গভর্ণমেণ্ট উক্ত শুল্ক বাড়াইয়া প্রতি হন্দরে দুই টাকা শুল্ক ধার্য্য করিয়াছেন। ইহার ফলে ভারত গভর্ণমেণ্টের ১১৫ লক্ষ টাকা আয় বাড়িবে বটে, কিন্তু দেশের জনসাধারণের—বিশেষতঃ ইক্ষুর চাষীদিগের ও চিনির কলওয়ালাদিগের বিশেষ ক্ষতি হইবে। আজকাল বহু কৃষক ইক্ষুর চাষ বাড়াইয়া দিয়াছে; যদি এই উৎপাদন-শুল্ক বৃদ্ধির ফলে কোন কোন চিনির কল বন্ধ হইয়া যায়, তবে চাষীরা উপযুক্ত লাভে ইক্ষু বিক্রয় করিতে পারিবেন না। অধিক লাভের আশায় ভারতে গত কয় বৎসরে বহু নূতন চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাতে প্রচুর ভারতীয় মূলধন নিয়োজিত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের নূতন ব্যবস্থায় চিনির কল দ্বারা লাভের আর কোন সম্ভাবনা রহিল না। জনসাধারণের স্বার্থের দিক লক্ষ্য করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের চিনির উপর উৎপাদন-শুল্ক একেবারে উঠাইয়া দেওয়া উচিত ছিল।

কলিকাতায় কংগ্রেসের গৃহ নির্ম্মাণ—

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু মুক্তিলাভ করার পর তাঁহার সহকর্ম্মীরা বাঙ্গালার একটি বড় অভাব দূরীকরণে ব্রতী হইয়াছেন দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। অন্যান্য প্রদেশের বড় বড় সহরে কংগ্রেসের নিজস্ব গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে বটে, কিন্তু কলিকাতায় এখনও কংগ্রেসের নিজস্ব কোনও গৃহ নাই। কলিকাতার ঐ অভাব দূর করিবার জন্য বাঙ্গালার কংগ্রেসকর্ম্মীরা বিশেষ অবহিত হইয়াছেন এবং তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে শীঘ্রই ঐজন্য এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া সুভাষচন্দ্রকে প্রদান করিবেন। কলিকাতার কেন্দ্রস্থলে ঐ টাকায় একটি গৃহ নির্ম্মিত হইবে। আমাদের বিশ্বাস কর্ম্মীরা শীঘ্রই এ কার্য্যে সাফল্য লাভ করিবেন এবং কলিকাতায় কংগ্রেসের গৃহের অভাব দূরীভূত হইবে।

জীবিকার্জ্জনের নূতন উপায়—

বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর লক্ষাধিক টাকা মূল্যের ঝিনুকের বোতাম এদেশে আমদানী করা হইয়া থাকে। অথচ বাঙ্গালায় ঝিনুকের বোতাম তৈয়ারীর সুযোগ সুবিধা ও উপকরণের অভাব নাই। একমাত্র ঢাকা জেলায় ঝিনুকের বোতাম তৈয়ারীর কারখানা আছে; সেখানে যে বোতাম তৈয়ারী হয়, তাহাও সুন্দর নহে। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগের দৃষ্টি সম্প্রতি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে দেখা গিয়াছে। ৩০ জন রাজবন্দীকে ঝিনুকের বোতাম তৈয়ারী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। শিক্ষালাভের পর যদি তাহাদিগকে উপযুক্ত মূলধন দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা স্বল্পমূল্যে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এই শিল্প দ্বারা অবশ্যই দেশের ধনবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবে।

পাবলিক সার্ভিস কমিশন—

গত ১লা এপ্রিল হইতে দেশে যে নূতন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাতে সরকারী চাকরীতে লোক-গ্রহণের জন্য প্রতি প্রদেশে একটি করিয়া পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠনের প্রস্তাব আছে। বাঙ্গালা দেশে নিম্নলিখিত ৩ জনকে লইয়া কমিশন গঠিত হইয়াছে—(১) অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান মিঃ এফ, ডবলিউ, রবার্টসন—মাসিক বেতন তিন হাজার টাকা। (২) ও (৩) সার হাসান সুরাবর্দ্দী ও ব্যারিষ্টার সুধাংশুমোহন বসু—মাসিক বেতন দুই হাজার টাকা। সার হাসান ই, আই, রেলের চিফ মেডিকেল অফিসার ছিলেন; সুধাংশুমোহন স্বর্গীয় দেশ-নেতা আনন্দমোহন বসুর পুত্র এবং বহুদিন নিজে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন।

সাহিত্যিক বৈঠকে উপাধিদান—

গত ১৮ই এপ্রিল রবিবার প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নারিকেলডাঙ্গা মেন-রোডস্থ বাটীতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সাহিত্যিক বৈঠকে মেদিনীপুর মনোহরপুর-গড়ের রাজশ্রী সুরেশচন্দ্র রায় বীরবরকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া "সাহিত্যভূষণ" উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। রাজশ্রী বীরবর মহাশয় গত কয়েক বৎসর যাবৎ স্বীয় পুত্রগণ ও কর্ম্মচারীগণের সহিত নিজ প্রাসাদে স্বরচিত পৌরাণিক নাটক অভিনয় করিয়া গ্রামবাসীদের মধ্যে সুনীতি ও ধর্ম্মভাব প্রচারের চেষ্টা করিতেছেন। ঐ বৈঠকে কলিকাতার প্রায় দুই শতাধিক খ্যাতনামা ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন।

বাঙ্গালায় বেকারের সংখ্যা—

গত আদম সুমারীর (সেন্সাস) বিবরণে প্রকাশ, বাঙ্গালা দেশের লোক সংখ্যা ৫ কোটী। তাহার মধ্যে ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোক নিজ নিজ জীবিকা অর্জ্জন করে এবং ৩ কোটি ৬০ লক্ষ লোক পরের আয়ের উপর নির্ভর করে। ইহাতে দেখা যায় এদেশে হাজারকরা মাত্র ২৮৮ জন কাজ করে। বৃদ্ধ, শিশু ও বালক বাদ দিলেও নিষ্কর্ম্মা লোকের সংখ্যা নিহাত অল্প নহে। বাঙ্গালার শতকরা ৭৫ জন লোক কৃষিজীবী; তাহাদের আবার বৎসরে ৬ মাসের অধিককাল কাজ করিতে হয় না। নবনিযুক্ত মন্ত্রীরা নিয়োগের পর হইতেই সভা-সমিতিতে যাইয়া আমাদিগকে বড় বড় কথা শুনাইতেছেন; তাঁহারা যদি এই বেকারের সংখ্যা স্থির করিয়া তাহাদের জীবিকার্জ্জনের কয়েকটি পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তাহাই এই দরিদ্র দেশে মহদুপকার বলিয়া বিবেচিত হইবে। প্রধান মন্ত্রী ত আমাদের "ডাল ভাতে"র সমস্যা মিটাইতে সম্মত হইয়াছেন—দেখা যাউক, তিনি কি করেন?

মুকুটোৎসবে ব্যয়—

১২ই মে তারিখে বিলাতে সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ ও সাম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের মুকুটোৎসবে ৪ লক্ষ ৫৪ হাজার পাউণ্ড ব্যয় করা হইবে বলিয়া বৃটীশ মন্ত্রিসভা পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়াছিলেন। মুকুটোৎসবের ব্যয় দিন দিন কিরূপ বাড়িয়া যাইতেছে তাহা ইহার পূর্ব্বের তিন বারের ব্যয়ের হিসাব দেখিলে বুঝা যায়—(১) ১৮২১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট চতুর্থ জর্জ্জের মুকুটোৎসবে ২ লক্ষ ৩৮ হাজার পাউণ্ড খরচ হইয়াছিল (২) সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মুকুটোৎসবে ৬৯ হাজার পাউণ্ড এবং (৩) সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের মুকুটোৎসবের সময়ে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার পাউণ্ড ব্যয়িত হয়। এবার সহসা কেন ব্যয় এত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। এইব্যয় দ্বারা দেশের কোন স্থায়ী উপকার সাধিত হয় না। সেইজন্য এই ব্যয়ের পরিমাণ দেখিয়া বিলাতের একদল লোক চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছে।

উচ্চতর পরিষদে নির্ব্বাচন—

গত ৯ই এপ্রিল বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের (উচ্চতর পরিষদ) সদস্যগণ এক সভায় সমবেত হইয়া সভার সভাপতি ও ডেপুটী সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়াছেন। সন্তোষের মহারাজা সার মন্মথনাথ রায়চৌধুরীকে মাত্র এক ভোটে পরাজিত করিয়া শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র সভাপতি



বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র

নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সত্যেন্দ্রবাবু পুরাতন কংগ্রেস-সেবক ; কংগ্রেসদল তাঁহাকে পূর্ণভাবে এই নির্ব্বাচনে সমর্থন



বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ডেপুটী-প্রেসিডেণ্ট হামিদুল হক চৌধুরী

করিয়াছেন। শ্রীযুত হামিদল হক চৌধুরী ডেপুটী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বাঙ্গালার মাছ—

বাঙ্গালা দেশের নদ, নদী, খাল, বিল, পুষ্করিণী, ডোবা প্রভৃতিতে প্রচুর মাছ পাওয়া যাইত বলিয়াই বোধ হয় বাঙ্গালা দেশে মাছ খাওয়ার প্রথার প্রচলনও অধিক ছিল। কিন্তু কি কারণে জানি না—হয় ত উপযুক্ত চাষের অভাবেই বাঙ্গালা দেশে এখন মাছ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়াছে এবং তাহার ফলেই সাধারণ বাঙ্গালীর পক্ষে আর নিত্য মাছ-ভাত খাওয়া সম্ভব হইতেছে না। এই সংবাদ পাইয়া জাপানী ব্যবসায়ীরা নাকি বিরাট তোড়-জড় করিয়া বাঙ্গালার বাজারে বিদেশী মাছ সরবরাহের ব্যবস্থায় মনোযোগী হইয়াছেন। তাহার ফলে বাঙ্গালীর মাছের অভাব হয় ত আপাততঃ দূর হইবে—কিন্তু এদেশে যদি মাছের ব্যবসা নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে চিরকাল বাঙ্গালীকে মাছের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে। জাপানীদের মাছের ব্যবসার সংবাদ পাইয়া শ্বেতাঙ্গ বণিকগণও নাকি ৫০ লক্ষ টাকা মূলধন করিয়া সুন্দরবন অঞ্চলে মাছ সরবরাহের একটি ব্যবসা খুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। বাঙ্গালার তাঁতির অন্ন গিয়াছে, কুম্ভকার আর খাইতে পায় না, কর্ম্মকারের কর্ম্ম নাই—এইবার জেলের ব্যবসাও নষ্ট হইতে চলিল। আরও কত কি দুর্ভাগ্য বাঙ্গালীর অদৃষ্টে আছে তাহা কে জানে ?

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার সেন—

কলিকাতার খ্যাতনামা এটর্ণী ও নোটারী-পাবলিক শ্রীযুত সুশীলচন্দ্র সেন সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাঙ্গালা দেশের গভর্ণমেণ্ট-সলিসিটার নিযুক্ত হইয়াছেন। সুশীলবাবু স্বনামখ্যাত এটর্ণী—দত্ত এণ্ড সেন কোম্পানীর শ্রীযুত সতীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুত্র। সুশীলবাবু ইতিপূর্ব্বে ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষ-অফিসার নিযুক্ত হইয়া কোম্পানী আইন এবং ভারতীয় বীমা আইন সংশোধন ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়াছিলেন। আমরা সুশীলচন্দ্রের দিন দিন উন্নতি কামনা করি।

অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়—

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান ডাক্তার রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্যারিসে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্র কংগ্রেস, আন্তর্জাতিক সমাজ বিজ্ঞান সম্মিলন ও গণ-কংগ্রেসে আমন্ত্রিত হইয়া গত ১৫ এপ্রিল ইউরোপ যাত্রা করিয়াছেন। তিনি ইউরোপের বহু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমন্ত্রণ লাভ করিয়াছেন এবং সম্ভবত প্রায় সকল প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করিবেন ও সর্ব্বত্র বক্তৃতা করিবেন। তাঁহার জয়যাত্রা শুভ হউক এবং তিনি স্বীয় জ্ঞান-ভাণ্ডার বর্দ্ধিত করিয়া দেশকে সমৃদ্ধ করুন, ইহাই আমাদের কামনা।

বেকার সমস্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নব প্রচেষ্টা—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রগণ যাহাতে উপাধি লাভের পর কোন বড় শিল্প বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিয়া শিল্প বাণিজ্য শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন, ভাইস্‌চ্যান্সেলার শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। বাঙ্গালার শ্বেতাঙ্গ বণিক সভার (বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স) সভাপতি স্যার এডোয়ার্ড বেন্থল, বাঙ্গালী বণিক সভার (বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অফ কমার্স) সভাপতি স্যার হরিশঙ্কর পাল এবং অবাঙ্গালী বণিক সভার (ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স) সভাপতি শ্রীযুত

দেবীপ্রসাদ খৈতান—প্রধানতঃ এই তিন জন শ্যামাপ্রসাদ-বাবুর প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করার পর ছাত্রদিগকে কোন না কোন শিল্প বা বাণিজ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে এবং যাহাতে পরে তাঁহারা স্বাধীনভাবে শিল্প বাণিজ্য চালাইতে পারেন, সে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ একটি নিয়োগ-বোর্ড গঠন করিয়াছেন এবং অধ্যাপক শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রকুমার সান্যালকে উক্ত বোর্ডের সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রকুমার গত কয় বৎসর ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশনের সেক্রেটারীরূপে বহু শিল্প বাণিজ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। আমাদের বিশ্বাস তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নূতন প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

কলিকাতায় পণ্ডিত জহরলাল—

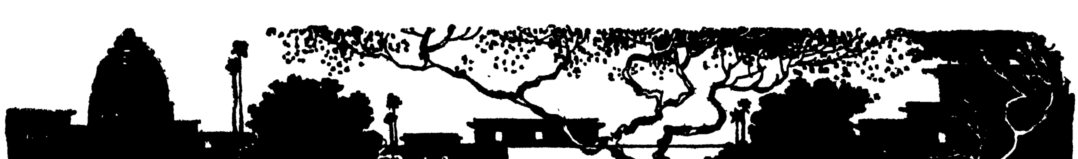
কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহরু রেঙ্গুনের পথে মাত্র একদিনের জন্য গত ৩রা মে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন—পরদিন ৪ঠা সকালে তিনি রেঙ্গুন যাত্রা করেন। তাঁহার কন্যা কুমারী ইন্দিরা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। জহরলালের সম্বর্দ্ধনার জন্য হাওড়ায় যে বিরাট জনতা সমবেত হইয়াছিল, ৩রা সকালে তাহাতে একটি যুবক সাংঘাতিক আহত হইয়াছিলেন। এই ঘটনায় জহরলাল এত দুঃখিত হইয়াছিলেন যে তাহা প্রকাশ করা যায় না। যুবকটির একটি পা কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছে। জহরলাল সোমবারে দুইবার হাসপাতালে যাইয়া আহত যুবকটির খোঁজ লইয়াছিলেন এবং মঙ্গলবার সকালে রেঙ্গুন যাত্রার সময় যুবকটির জন্য হাসপাতালে ফল ও ফুল পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সুখের বিষয় যুবকটি এখন ভাল আছে। জহরলাল এবার কলিকাতায় আসিয়া শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন এবং টাউন হলে এক সভায় "শ্রমিক ধর্ম্মঘট" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

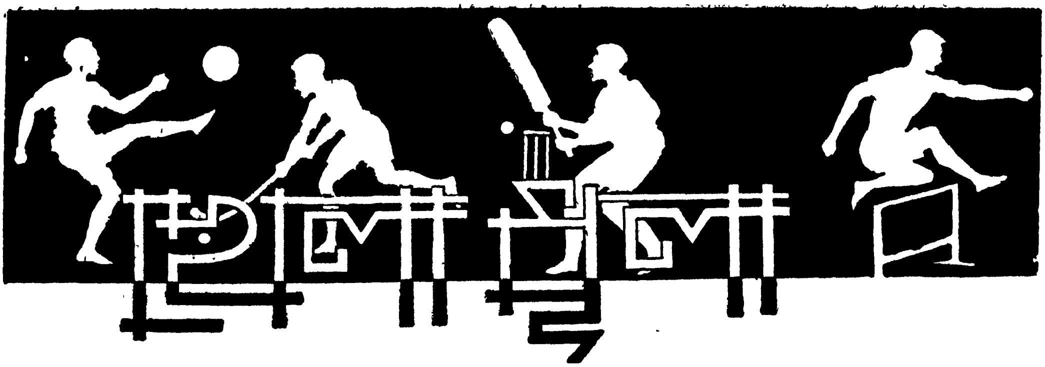
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ায় এবার তিনি নিদাঘ-যাপনের জন্য আলমোড়ায় গমন করিয়াছেন। পার্ব্বত্য প্রদেশের শৈত্য সম্ভোগ করিয়া তিনি পুনরায় সুস্থ হউন এবং দেশের ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ব্রহ্মদেশবাসী গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন—

গত ১লা এপ্রিল হইতে ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে পৃথক হইয়া বৃটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি স্বতন্ত্র দেশে পরিণত হইয়াছে। এখন ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশে পত্র ও পুস্তকাদি প্রেরণ করিতে হইলে বর্দ্ধিত হারে ডাকমাশুল প্রদান করিতে হইবে। ভারতবর্ষের গ্রাহকগণকেও এই ডাক মাশুল বৃদ্ধির জন্য অধিক ব্যয়ে ভারতবর্ষ ক্রয় করিতে হইবে। আমরা ১৩৪৪ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ দুই মাসের ভারতবর্ষ ব্রহ্মদেশীয় গ্রাহকগণের নিকট অতিরিক্ত মাশুল দাবী না করিয়াই প্রেরণ করিয়াছি। প্রতিসংখ্যা ভারতবর্ষ পাঠাইতে /০ একআনা স্থলে বর্ত্তমানে।১০ সাড়ে চার আনা ডাক-মাশুল লাগিতেছে। সে জন্য আগামী বর্ষ হইতে ভারতবর্ষের বার্ষিক মূল্য মাত্র ১৷৵০ বাড়াইয়া ৬৷৵০ স্থলে ৮৲ (আট টাকা) করিতে আমরা বাধ্য হইলাম। যে সকল গ্রাহক আমাদের নিকট হইতে ভারতবর্ষ লইবেন, তাঁহাদিগকে উক্ত বার্ষিক মূল্য ৮৲ মণিঅর্ডারে পাঠাইতে হইবে। (ব্রহ্ম হইতে ভারতবর্ষে মণিঅর্ডারে ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত পাঠাইতে তিন আনা ফি লাগে)। ব্রহ্মদেশীয় কয়েকজন পুস্তক-বিক্রেতা তাঁহাদের দোকানে নগদ বিক্রয়ের জন্য ভারতের বহু সাময়িকপত্র ও পুস্তকাদি রাখার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে সাময়িক পত্র ও পুস্তকাদি পাওয়া যাইবে। রেঙ্গুন সহরের ২২২ লুইস ষ্ট্রীটের বেঙ্গল-বার্ম্মা ষ্টোর্সে ভারতবর্ষ পাওয়া যায়।





খেলাধুলা

বাইটন কাপ ঃ

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে দল অবশেষে বাইটন কাপ বিজয়ী হলো। ফাইনাল খেলায় প্রায় শেষ মুহূর্ত্তে ভূপাল 'ওয়াণ্ডারার্স' দলকে একটি গোল দিয়ে হারিয়েছে। ভূপাল ওয়াণ্ডারার্স প্রথমার্দ্ধে বিজয়ী দলের চেয়ে সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট খেলেছিল। আক্রমণ বিভাগে সাকুর, সুভান ও মুনিরের চতুরতা ও নিখুঁত আদান-প্রদান দর্শকদের বিশেষ আনন্দিত করেছিল। বিপক্ষ দলের না ছিল দলগত ঐক্য, নিপুণ মার বা নিখুঁত আদান-প্রদান। তারা সবাই এলোপাতাড়ি খেল্‌ছিল। তাদের রাইট হাফ এণ্টনির প্রাণপাত চেষ্টা ও ব্যাক সি ট্যাপ্‌সেলের বিপুল প্রতিরোধ শক্তির জন্য ভূপাল দল গোল করতে পারে নি। ভূপাল দলের লেফ্‌ট ব্যাক ফারুক ও সেণ্টার হাফ বাম্নী খাঁকে খেলোয়াড়দের মধ্যে সেদিন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বললে অত্যুক্তি হয় না। ফারুকের পূর্ব্বানুভূতি, বিপক্ষের বলের গতিরোধ ও অব্যর্থ মার অপূর্ব্ব। বাম্নী খাঁর ক্ষিপ্র গতি, বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিবন্ধক দানের বিপুল ক্ষমতা আক্রমণ-বিভাগ ও রক্ষণ-বিভাগকে প্রচুর সহায়তা এবং বিপক্ষদের দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করেছিল।



বাইটন কাপ ফাইনালে দু'পক্ষের ক্যাপটেন ও আম্পায়ার দ্বয়
ছবি—জে কে সান্যাল

দ্বিতীয়ার্দ্ধে বি এন আর আশাতীত উন্নত খেলেছিল। খেলা শেষের দু' মিনিট পূর্ব্বে সট্‌ট্‌ কর্ণার থেকে সি ট্যাপ্‌সেলের প্রচণ্ড মারে গোল হয়। ভূপাল 'পেনালটি বুলি' পেয়েও গোল করতে পারে নি। খেলাটি খুব উচ্চাঙ্গের হয় নি। বিজিত দলকে শেষ মুহূর্ত্তে গৌরবময় পরাজয় মেনে নিতে হয়েছে। তারাই কিন্তু চতুরতা, ক্ষিপ্রতা ও নিপুণতায় শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছিল।

মানভাদার ও এন্ ডব্‌লিউ আর দলের চতুর্থ রাউণ্ডের খেলাটিই এবারের বাইটন কাপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীব্র প্রতিযোগিতা বলে গণ্য হয়েছে। ধারণা হয়েছিল যে এদের বিজয়ী দলই এবার বাইটন বিজয়ী হবে। উভয় দলের সকল খেলোয়াড়রাই সুন্দর খেলেছিল। বল দ্রুতগতিতে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বিচরণ করছিল এবং উভয় গোলই পর্য্যায়ক্রমে আক্রান্ত হচ্ছিল। উত্তেজনার অভাব মোটেই ছিল না বরং প্রাচুর্য্যই ছিল অধিক। মানভাদার রক্ষণ-বিভাগের উৎকৃষ্টতার জন্যই শেষে জয়ী হয়। তাদের ফার্ণাণ্ডেজের খেলা একেবারে অভিনব হয়েছিল। সাহাবুদ্দিন ও আব্বাসও চমৎকার খেলেছে। ফিলিপ, মহম্মদ হুসেন ও সা মুর রক্ষণ-ভাগে কৃতিত্ব



বাইটন কাপ বিজয়ী: বি-এন আর-দল ছবি—জে কে সান্যাল



বাইটন কাপে বিজিত ভূপাল ওয়াণ্ডারার্স ছবি—জে কে সান্যাল

বসন্ত ঃসুন্দর ক্রীড়া প্রদর্শন করলেও কয়েকটি বিশেষ সুযোগ নষ্ট করেছে।

বিজয়ী মানভাদার দল পরের দিন বি এন আরের সঙ্গে পূর্ব্বদিনের ন্যায় খেলায় নিপুণতা ও উৎকর্ষতা প্রদর্শন করতে না পারায় ৩-১ গোলে পরাজিত হয়। বি এন আর গত আট বৎসরের মধ্যে পাঁচ বার ফাইনালে ওঠে এবং চার বার তারা কলিকাতা কাষ্টমসের নিকট পরাজিত হয়। এবার তৃতীয় রাউণ্ডে কাষ্টমসকে ২-০ গোলে হারিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছিল।

দেখিয়েছে। রেলওয়ে দলের যোগীন্দর সর্ব্বোৎকৃষ্ট খেলেছে এবং একাই তিনটি গোল দেবার সৌভাগ্য লাভ করেছে।



রেলওয়ে চ্যাম্পিয়ন এন ডবলিউ রেলওয়ে দল—ইহারা মানভাদারের কাছে পরাজিত হয়েছে ছবি—জে কে সান্যাল



ঝান্সি হিরোজ দল। উপর্য্যুপরি তিনবার লক্ষ্মীবিলাস কাপ বিজয়ী হয়েছে ছবি—জে কে সান্যাল

ঝান্সি হিরোজ নীচের দিক থেকে শক্তিহীন দলগুলিকে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে ভূপালের কাছে ২-১ গোলে হেরে গেছে। খেলাটি অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরণের হয়েছিল। ঝান্সির রক্ষণ-ভাগ একেবারেই বাজে। যা' করে ধ্যান ও রূপ, কিন্তু এঁরাও এদিন এঁদের সুনামানুযায়ী খেলতে পারেন নি। অতিরিক্ত সময় খেলবার পরে ভূপাল জয়ী হয়।

বি এন আর ফাইনালে ওঠে,—কায়স্থ পাঠশালাকে ৪-০, কলিকাতা কাষ্টমসকে ২-০, কলিকাতা রেঞ্জার্স'কে ২ ০ ও মানভাদারকে ৩-১ গোলে হারিয়ে।

ভূপাল ফাইনালে পৌছায়,—বি জি প্রেসকে ৩-১, কলিকাতা পুলিসকে ৩-১, মোহনবাগানকে ২-১ ও ঝান্সি হিরোজকে ২-১ গোলে পরাজিত করে।

ফাইনাল খেলায় টিকিট বিক্রয় করে আনুমানিক সাত হাজার টাকা পাওয়া গেছে।

লক্ষ্মী বিলাস কাপ ঃ

ঝান্সি হিরোজ ৩-০ গোলে এলাহাবাদের কায়স্থ পাঠশালা কলেজকে হারিয়ে এই কাপ্ এবারও বিজয়ী হয়েছে। ঝান্সি উপর্য্যুপরি তিনবার বিজয়ী হলো। ঝান্সির পক্ষে ধ্যানচাঁদ ও রূপসিং খেলে নি। তথাপি তারা

যেরূপ খেলেছিল, তাতে তারা আরো অধিক গোলে জয়ী হতে পারতো। ঝান্সি ২-০ গোলে ঢাকা ওয়ারী দলকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। কায়স্থ পাঠশালা দল ঢাকার আর্ম্মেনীটোলাকে ৫-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে পৌছায়।

আগা খাঁ কাপ্‌ঃ

ওয়াই এম সি এ (লাহোর) ১-০ গোলে বাঙ্গালোরের ভারতীয় দলকে হারিয়ে আগা খাঁ কাপ বিজয়ী হয়েছে। খেলা শেষের দশ মিনিট পূর্ব্বে লেফ্‌ট আউট আসগর বিপক্ষদের সুন্দর কাটিয়ে লেফ্‌ট ইন্‌ এ লতিফকে পাশ করলে সে 'স্কুপ' করে গোলের কোনে বল ঢুকিয়ে দিলে। বিজিত দলের বামপার্শ্ব সেল্‌ভামুথু ও মুথ্‌রাজ অত্যাশ্চর্য্য খেলেছিল, সেণ্টার হেজ মোটেই খেলতে পারে নি। এই বাঙ্গালোর দলই গত তিন বৎসরের বিজয়ী বোম্বাই কাষ্টমস্‌কে পরাজিত করেছিল।



গতবারের বিজয়ী বোম্বাই কাষ্টমস রেঞ্জার্সের নিকট পরাজিত হয়েছে

ছবি—জে কে সান্যাল

কাইভান কাপ্‌ঃ

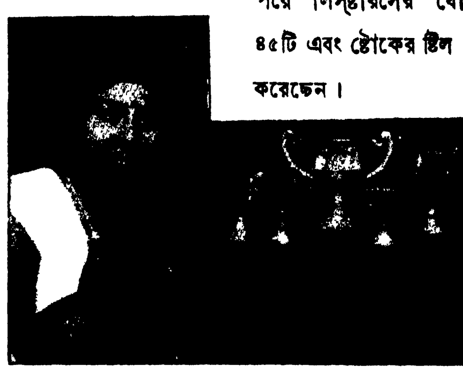
গত বৎসরের বিজয়ী বি এন আর. (বি) ১-০ গোলে চক্রধরপুরকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে। তাদের পক্ষে হার্ব্বিন গোলটি দিয়েছে। একদিন খেলাটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছিল

বিলাতের লীগ চ্যাম্পিয়ন ঃ

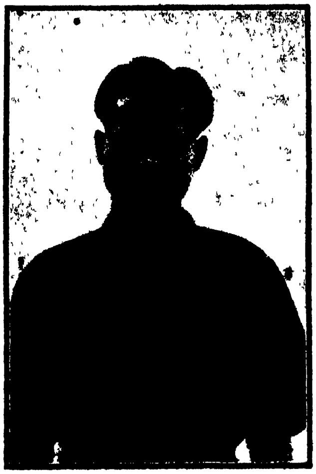
ম্যানচেষ্টার সিটি প্রথম ডিভিসন লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তারা শেষ খেলায় শেফিল্ড ওয়েডনেসডেকে ৪-১ গোলে হারিয়ে দিয়েছে। গত বারের লীগ চ্যাম্পিয়ন সাণ্ডারল্যাণ্ড লীড্‌সের কাছে ৩-০ গোলে হেরে গেছে। চার্লটন্‌ রানার্স-আপ হয়েছে। ম্যানচেষ্টার ইউনাইটেড ও শেফিল্ড ওয়েডনেসডে দ্বিতীয় ডিভিসনে নেমে যাবে।

দ্বিতীয় ডিভিসনে লিস্‌ষ্টারস্‌ ৪-১ গোলে টটেন্‌হামকে হারিয়ে ব্ল্যাকপুলের মুখ থেকে চ্যাম্পিয়নসিপ্‌ কেড়ে নিয়েছে। এরা মাত্র গত বৎসরে দ্বিতীয় ডিভিসনে উঠেছিল।

গোল দানের কৃতিত্ব—ম্যানফিল্ডের হাম্পষ্টন ও লুটনের পেইনের, ইঁহারা প্রত্যেকে ৫৫টি গোল করেছেন। তার পরে লিস্‌ষ্টারসের বোয়ার্স ৪৫টি এবং ষ্টোকের ষ্টিল ৩৩টি করেছেন।

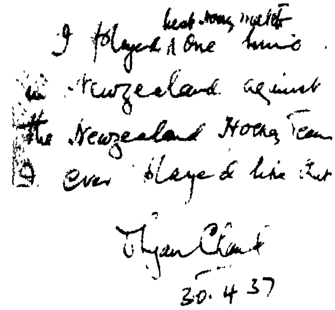


কুমারী শোভনা গুপ্তা (ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউশন)
ইনি ইণ্টার-কলেজ স্পোর্টসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন

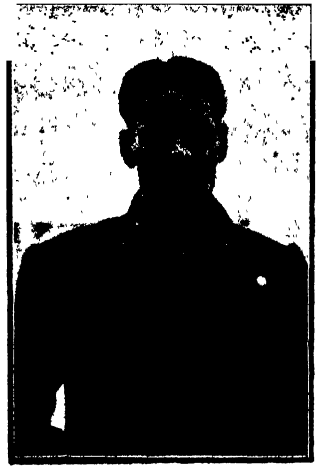


ধ্যানচাঁদ

যাদুকর ধ্যানচাঁদের হস্তাক্ষর :



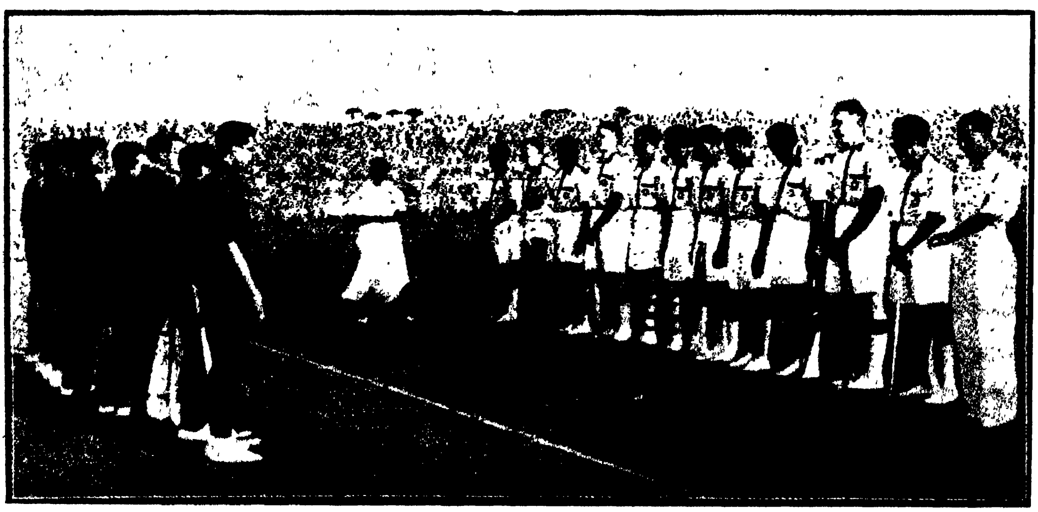
শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়ের 'অটোগ্রাফ' হ'তে গৃহীত



রূপসিং

অলিম্পিক দলের ক্রীড়া ঃ

অলিম্পিক হকিদলের সঙ্গে ভারতের বাছাই অবশিষ্ট দলের প্রদর্শনী খেলা হয়। অলিম্পিক দল যদিও অবশেষে ৩-২ গোলে বিজয়ী হয়েছে, কিন্তু গৌরবান্বিত হতে পারে নি। অবশিষ্ট দল তাদের অপেক্ষা সর্ব্ব বিভাগে উন্নত ক্রীড়া প্রদর্শন করেছিল। খেলারম্ভের পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব অলিম্পিক খেলোয়াড় জাফরের স্মৃতির উদ্দেশে খেলোয়াড়দের এক মিনিট কাল মৌন শ্রদ্ধা নিবেদনে সমগ্র দর্শকমণ্ডলীও যোগদান করেছিল। সর্ব্ববাদীসম্মত যে, উৎকৃষ্ট দলই এদিন দুর্ভাগ্য বশতঃ পরাজয় বরণ করেছে। গোলরক্ষক বোস্তন খাঁই তাদের পরাজয়ের জন্য একমাত্র দায়ী। সে বল মারতে গিয়ে নিজের গোলে বল ঢুকিয়ে দেয়। বিজিত দলের গর্ডনের সমতুল্য ব্যাক এদিন কেহ ছিল না, যদিও সে মধ্যে মধ্যে ধাক্কাধাক্কি ও অবৈধ বাধা দান করেছে। হাফব্যাক



অলিম্পিক ও নির্ব্বাচিত খেলোয়াড়দের প্রদর্শনী খেলারম্ভের পূর্ব্বে
মৃত সহকর্ম্মী জাফরের স্মৃতির উদ্দেশে মৌন শ্রদ্ধা নিবেদন ছবি—মনি সেন

ভাল্লা উদ্দামতার সঙ্গে খেলেছে। তার অবৈধতার আশ্রয় কার্য্যকরী হলেও প্রশংসনীয় নহে। তিনি রূপসিংকে অন্যায় ভাবে ভূতলশায়ী না করলে রূপসিং গোল করতে পারতেন। ফার্ণাণ্ডেজও তার নিকট নিগৃহীত হয়েছিল। ক্যাপটেন পিনিজার সেণ্টার হাফে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খেলেছেন, তাঁর সুন্দর বাধাদান ও জোগানদান নিখুঁত হয়েছে। ফরওয়ার্ডে আর কার সকল বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করে আক্রমণ করেছেন, হেণ্ডারসন ও যোগীন্দর খুব খেটেছেন। নিস্ ঝড়ের গতিতে দৌড়ে বহুবার বল সেণ্টার করেছেন। এ দেব সঙ্গে বল নিয়ে বিপক্ষ ব্যূহ ভেদ করে এই দর্শনীয় গোলটি করেছেন।

এই প্রদর্শনী খেলাটিতে টিকিট বিক্রয় করে পাওয়া গেছে আট হাজার টাকার কিছু উপরে।

অলিম্পিক দল :

গোল—আর জি এলেন (বাঙ্গলা)

ব্যাক—সি ট্যাপসেল (বাঙ্গলা), মহম্মদ হোসেন (মানভাদার)



অলিম্পিক ও নির্ব্বাচিত অবশিষ্ট হকি খেলোয়াড়গণ ছবি—মনি সেন

অনভ্যস্ত স্থান আউটে সুবিধা করতে পারে নি।

বিজয়ীদলের কেহই আশানুরূপ ও বিশ্ববিজয়ী অলিম্পিকের সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেন নি। এমন কি যাদুকর ধ্যানচাঁদের মোহিনীশক্তিও যেন অপহৃত হয়েছিল। রূপসিং মোটেই খেলতে পারেন নি। তাদের হাফব্যাক ত্রয়ী বিপক্ষদের তুলনায় বিশেষ নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন হয়েছে। ব্যাকদ্বয় সি ট্যাপসেল ও মহম্মদ হোসেনের খেলা হতাশজনক হয়েছে। এলেন তার সুনাম রক্ষা করতে পারেন নি। শেষ গোলটিতে ধ্যানচাঁদ তাঁর অলিম্পিক যশের ও যাদুবিদ্যার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়েছেন। তিনি মধ্য মাঠ থেকে ষ্টিকের অগ্রভাগ সাহায্যে অতি সুনিপুণতার

হাফব্যাক—আসান খাঁ (ভূপাল), বি নির্ম্মল (বোম্বাই), জে ফিলিপস্ (বোম্বাই)

ফরোয়ার্ড—সাহাবুদ্দিন (মানভাদার), এল সি এমেট (বাঙ্গলা), ধ্যানচাঁদ (ক্যাপ্টেন) (আর্ম্মি), রূপসিং (যুক্তপ্রদেশ), পি পি ফার্ণাণ্ডেজ (সিন্ধুপ্রদেশ)

অবশিষ্ট নির্ব্বাচিত দল :

গোল—বোস্তন খাঁ (দিল্লী)

ব্যাক—এ গর্ডন (এন ডবলিউ আর), সি হজেস্ (কলিকাতা কাষ্টমস্)

হাফব্যাক—জি ভি ভাল্লা (এন্ ডবলিউ আর),

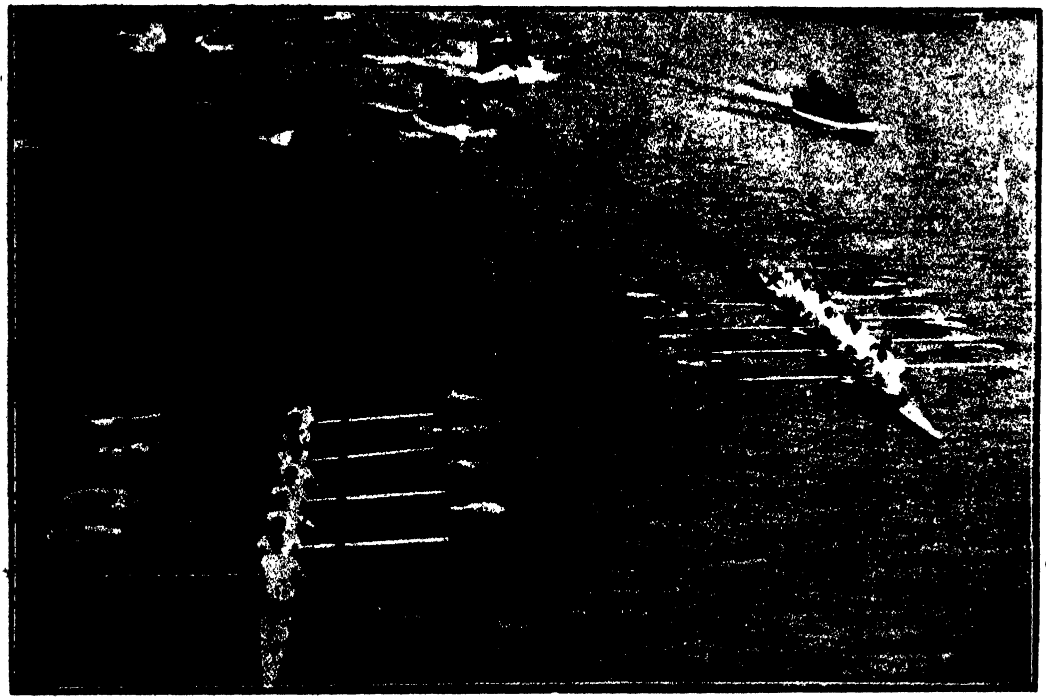
পিলিজার (ক্যাপ্টেন) (এন ডবলিউ আর), শাহ নূর (মানভাদার)

ফরোয়ার্ড—এ দেব (মোহনবাগান), ই হেণ্ডারসন (কলিকাতা কাষ্টমস্), আর জি কার (বি এন রেলওয়ে), যোগীন্দর (এন ডবলিউ রেলওয়ে), জি নিস্ (জেভেরিয়ান্স)

আম্পায়ার—এস দত্ত (বাঙ্গলা), বি এন ঘোষ (দিল্লী)

এফ্ এ কাপ্ ঃ

বিলাতের বিখ্যাত এফ্ এ কাপ্ বিজয়ী হয়েছে এবার সাণ্ডারল্যাণ্ড ৩-১ গোলে প্রেষ্টন দলকে পরাজিত করে। সাণ্ডারল্যাণ্ড এই প্রথম কাপ-বিজয়ী হ'লো।



কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ডের বাচখেলা। অক্সফোর্ড অগ্রগামী হয়েছে। চোদ্দ বৎসর পরে অক্সফোর্ড বিজয়ী

প্রেষ্টন টস জেতে এবং প্রথমার্দ্ধে এক গোলে অগ্রগামী থাকে। গত বৎসর আর্সেনাল কাপ্-বিজয়ী হয়েছিল। ফাইনাল খেলা দেখতে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী উপস্থিত ছিলেন এবং খেলা শেষে বিজয়ী দলকে কাপ্ ও মেডেল বিতরণ করেছিলেন। চোদ্দ শত রক্তবর্ণ গোলাপে রাজকীয় বক্স সজ্জিত ছিল। বহু লর্ড ও গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে মিষ্টার রাম্সে ম্যাক্ডোনাল্ড, স্তর জন্ সাইমন ও ভারতীয় রাজারাজড়া প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। তিরেনব্বই হাজার দর্শক জড়ো হয়েছিল। এবারের বিশেষত্ব—কোন ফিল্ম কোম্পানী অত্যধিক দাবী দিতে রাজী না হওয়ায় ফিল্ম তোলে নি এবং বাস ধর্ম্মঘটের জন্য দর্শকদের অন্য উপায়ে আসতে হয়েছিল। উভয় দলই উত্তরাঞ্চল বাসী। ১৪৬টি ট্রেণ সত্তর হাজার দর্শক শুধু উত্তর থেকে বহে এনেছে ওয়েমব্লেতে।

অল্ ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ঃ

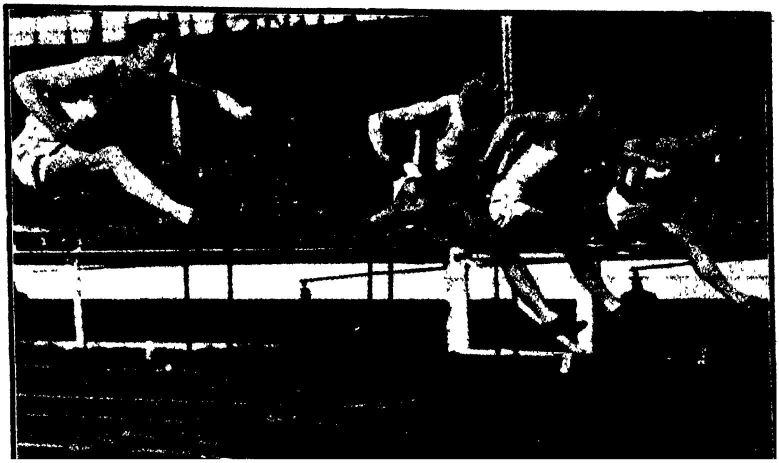
আর্ম্মি স্পোর্টস্ কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতিত্বে দিল্লীতে আই এফ এ ও এ আই এফ এর সদস্যদের সভায় স্থিরীকৃত হয়েছে যে ভারতের ফুটবল খেলা পরিচালনের জন্য অল্ ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন নামে নূতন সংঙ্ঘ গঠিত হবে। নব গঠিত ফেডারেশনের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির মধ্যে একমাত্র বাঙ্গলা প্রদেশের দু'জন সদস্য থাকবে, অন্যান্য প্রদেশের একজন করে সদস্য নির্ব্বাচিত হবে।

আর্ম্মি স্পোর্টস্ কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি ব্রিগেডিয়ার

আগামী ২১শে মে ফেডারেশনের প্রথম সভা আহ্বান করেছেন, তাতে নিয়মাবলী রচিত হবে চারেশনকে কোম্পানী আইনানুসারে রেজেষ্ট্রী …মিটেড কোম্পানী …ব। এই সভায় …ার ম্যাজেণ্ডির …সরের সভাপতিত্ব হবে এবং অবৈ- সেক্রেটারী ও …ধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত …।

… এফ এ অন্ততঃ …সরের জন্য ফেডা- …র কেন্দ্র কলি- করতে অনুরোধ …ছেন। এ অনুরোধ …রা উচিত মনে কারণ কলিকাতাই …ল ধরে ভারতের …শের বিশিষ্ট কেন্দ্র বলে … হয়েছে—এ জন্য … একটা দাবী আছে। …পর আই এফ এ …শিক সঙ্ঘে পরিণত …। ইস্‌লিংটন কোরি- …ন্স দলের ভারতাগমন …ন্ধে সমস্ত কাগজপত্র আই …এ ফেডারেশনের নিকট …র্পণ করা স্থির করেছেন, …রণ তাদের আগমন …ম্পর্কে অর্থের গ্যারাণ্টি …ভৃতি ব্যবস্থাদি এখন …ডারেশন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত …ওয়াই উচিত।

সভ্য সংখ্যা হবে দু'হাজার। উপস্থিত সভ্য সংখ্যা আরো ষোলশো। বাকী চারশোর মধ্যে একশো লাইফ্ মেম্বার … তিনশো সাধারণ সভ্য নেওয়া হবে।



অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের মধ্যে ইণ্টার-ইউনিভারসিটি স্পোর্টসের ১২০ গজ উঁচু বেড়া দৌড় বাম থেকে দ্বিতীয় জে পি নাইট (অক্সফোর্ড) বিজয়ী—সময়, ১৫⅘ সেকেণ্ড



মানভাদার ষ্টেট হকি দল। বি এন আরের নিকট হেরেছে ছবি—জে কে সান্যাল

ভারত ক্রিকেট ক্লাব ঃ

ভারত ক্রিকেট ক্লাবের কমিটি স্থির করেছেন যে

পোল-ভল্ট রেকর্ড ঃ

লস্ এঞ্জেলসের খবর যে বিল সেফ্‌টন ১৪ ফিট ৭½ ই…

লাফিয়ে পোল-ভল্টে বিশ্বের রেকর্ড স্থাপন করেছেন। পূর্ব্ব রেকর্ড ছিল ১৪ ফিট ৬½ ইঞ্চি জর্জ ভ্যারফ্ করেছিল।

বৃটিশ হার্ড কোর্ট চ্যাম্পিয়ন ঃ

বোর্ণমাউথের এই প্রতিযোগিতায় অনেক ডেভিস্ কাপ প্রতিযোগিগণ যোগদান করেছেন।

এইচ্ ডব্লিউ অষ্টিন ৬-২, ৬-২, ৬-০ গেমে লীকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

সেনোরিটা লিজানা ৭-৫, ৬-৩ গেমে মিস্ পেগে ক্রি-ভনকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। পুরুষদের ডবলে—হেয়ার ও ওয়াইল্ড ৬-২, ৬-৪, ৭-৯, ৬-৪ গেমে টাকে ও হিউজেস্‌কে হারিয়েছেন। মেয়েদের ডবলে—ডিয়ারম্যান ও জোন্ ইন্‌গ্রাম ৬-০, ৬-০ গেমে স্কট ও হোয়াইট্‌মার্স'কে পরাজিত করেছেন।

মিক্সড ডবলে—ওয়াইল্ড ও মেরী হোয়াইট্‌মার্স' ৬-৪, ৭-৫ গেমে স্যারেস ও জীন সণ্ডারর্সকে পরাজিত করেছেন।

মেয়ে টেনিস খেলোয়াড়দের পর্য্যায় ক্রম ঃ

বিল টিল্‌ডেনের মতে এইরূপ পর্য্যায়ক্রম হবে—(১) মিস্ হেলেন জ্যাকব, (২) মিসেস স্পার্লিং, (৩) মিস্ এ মার্বেল, (৪) মিস্ ডি ই রাউণ্ড, (৫) মিস্ কে ষ্ট্যামারস্।

আই এফ এর কর্ম্মকর্ত্তা ঃ

পূর্ব্ব সভাপতি মহারাজা স্যর মন্মথ নাথ রায় চৌধুরী এবারও নির্ব্বাচিত হয়েছেন। ভারতীয় সেক্রেটারী বদল হয়েছে—মিষ্টার পঙ্কজ গুপ্ত নূতন সেক্রেটারী হয়েছেন। ইনি বহুদিন থেকে এদেশের স্পোর্টসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন এবং অলিম্পিক হকিদলের সঙ্গে দু'বার ভারতের বাইরে যাবার সৌভাগ্য হওয়ায় ইউরোপের নানা জাতির খেলাধুলা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছেন। আশা করা যায়, এঁর সহায়তায় আই এফ এ বিশেষ উন্নতি লাভ করতে পারবে—ভারতীয়দলের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হবে,



প্রথম ডিভিসন লীগ বিজয়ী কলিকাতা কাষ্টমস্। ইহারা বি এন আরের কাছে এই প্রথমবার বাইটন কাপ প্রতিযোগিতায় পরাজিত হলো ছবি—জে কে সান্যাল

তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে স্বজাতির উন্নতি ও সম্মান বৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি দেবেন।

ফুটবল লীগ ঃ

লীগ খেলা আরম্ভ হয়েছে ৩রা মে থেকে। চ্যাম্পিয়ন মহমেডান প্রথম খেলায় কাষ্টমসকে ছু' গোলে হারিয়েছে। তাদের দল এবারও বেশ পুষ্ট। যদিও তাদের বিখ্যাত সেণ্টার ফরওয়ার্ড রসিদ গত বছরের আঘাত হেতু এবারও খেলতে পারছে না। কিন্তু তারা তাদের কৃতবিদ্য লেফট-ইন্ রহমতকে ফিরে পেয়েছে এবং গত বারের সকল পুরাতন খেলোয়াড়ই খেলবে। পুনরায় লীগ জয়ী হতে যে তারা প্রাণপাত করবে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

মোহনবাগান দলে পূর্ব্বের প্রায় সকল নামকরা খেলোয়াড়ই আছেন। তা' ছাড়া হাওড়ার দেবী ঘোষ, পূর্ব্বে যাকে পেতে মোহনবাগানের সকল প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়েছিল, এবার তিনিও দলভুক্ত হয়েছেন। কিন্তু দেবীর সে খেলা আর নেই বলে মনে হলো। প্রেমলালকে হারিয়ে আবার ফিরে পেয়েছে। সেণ্টার হাফ্ সমস্যা মোহনবাগানের এবারও ঘোচে নি। ফরওয়ার্ড লাইনে নাম করবার মতো অনেকগুলি খেলোয়াড়ই আছেন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কেহই সফলকাম হন না। সঙ্ঘবদ্ধতা, আদানপ্রদানের ঐক্যতা, সময়মত বল-পাশ করা ও নিপুণভাবে বল গ্রহণের শক্তির অভাবে সকল প্রচেষ্টা পণ্ড হচ্ছে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের খেলার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত না থাকলে উন্নত খেলা সম্ভব হয় না। গোলের সুমুখে বল পেয়েও অনায়াসে ও ত্বরায় আয়ত্ত করবার অক্ষমতার জন্য বহু সুযোগ নষ্ট হচ্ছে। সুযোগ-সন্ধানী ফরওয়ার্ডের নিতান্ত অভাব অনুভূত হয়। হাফ্‌ব্যাক লাইন আরো শক্তিশালী করা দরকার। প্রথম খেলায় মোহনবাগান কে ও এস্ বির কাছে ২-১ গোলে হেরে গেছে। দ্বিতীয় খেলায় কিঞ্চিৎ ভালো খেলে ক্যামারোনিয়নদের ১-০ গোলে হারিয়েছে। কালীঘাটের সঙ্গে গোল শূন্য ড্র করেছে, গোল দেবার অনেক সুবর্ণ সুযোগ হারিয়ে।

ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাব এবার আর বাঙ্গলার বাহিরের খেলোয়াড় আমদানী করে নি। বাঙ্গলা থেকে খেলোয়াড় সংগ্রহের চেষ্টা করেছে। আশা করি, এ সাধু প্রচেষ্টায় তারা সফলকাম হবে। তারা কে ও এস বির কাছে ছু'গোল খেয়েও শোধ দিয়েছে এবং ক্যালকাটাকে এক গোলে হারিয়েছে।



মেয়েদের প্রথম ডিভিসন হকি লীগ চ্যাম্পিয়ন খড়্গপুর দল।
ইঁহারা ছ'বার উপর্য্যুপরি বিজয়িনী হয়েছেন

কালীঘাট চিরাচরিত প্রথানুযায়ী ভারতের বাইরে থেকে এবারও খেলোয়াড় আনিয়ে দল পুষ্ট করেছে। রেঙ্গুনবাসী ছু'জন নামজাদা খেলোয়াড় হ্যারিস ও ডি লা টৈষ্ট ফরওয়ার্ডে ভালই খেলছেন। কিন্তু ই বি আরের সঙ্গে এক গোলে হেরে যাওয়ায় সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছে।

ভবানীপুর এবার থেকে প্রথম ডিভিসনে খেলতে আরম্ভ করলে। মহমেডানের সেণ্টার হাফ অখিল আমেদকে, এরিয়ানের রহমনকে পেয়ে তারা ভালো ফল দেখিয়েছে। আশা

করি, লীগে বেশ উচ্চস্থানই অধিকার করে তারা প্রথম ডিভিসনে স্থায়ী হবে। এরিয়ানকে ৩-১ ও ডালহৌসীকে ২-১ গোলে হারিয়েছে এবং ক্যামারোনিয়নের কাছে ৩-২ গোলে হেরেছে।

নুরমহম্মদ থাকায় অখিল আমেদের মহমেডান স্পোর্টিংএ আর স্থান হয় নি। আমরা পূর্ব্বেই লিখেছিলাম যে মুসলমানদের আরো দু' একটি দল গঠন করা আবশ্যক।



এইচ্ ডবলিউ অষ্টিন, উপস্থিত বৃটেনের এক নম্বর খেলোয়াড়, নূতন ধরণের র‍্যাকেট নিয়ে খেল্‌ছেন

কারণ, সকল উদীয়মান মুসলমান খেলোয়াড়কে এক মহমেডান স্পোর্টিং স্থান দিতে পারে না। এজন্য নবীন ও প্রবীন উপযুক্ত বহু খেলোয়াড়দের অন্যান্য হিন্দুদলে অনিচ্ছায় যোগ দিতে হয়।

দুটি মিলিটারী দলের কোন্‌টি যে বিশেষ শক্তিশালী তা এখনও বোঝা যায় নি। এ পর্য্যন্ত কোন দলই বিশেষ শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে পারে নি। কোনটি যে চ্যাম্পিয়নদের হঠাতে চেষ্টা করবে এখন থেকে তা বলা যায় না।

ক্যালকাটা, ডালহৌসী প্রভৃতি অন্যান্য দলের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলাই ভালো। সামাদ আরোগ্য হ'য়ে ই বি আরে খেলছে। মনা দত্ত শক্তিহীন, অবসর নেওয়াই দরকার। এরিয়ানের অবস্থা খারাপ। প্রথম থেকে বিশেষ চেষ্টা না করলে দ্বিতীয় বিভাগে নাম্‌বার সম্ভাবনাই বেশী। ক্যালকাটার কাছেও দু' গোলে হেরেছে।

রেফারিং ঃ

মাত্র এক সপ্তাহ ফুটবল খেলা আরম্ভ হয়েছে। ইতি-মধ্যেই রেফারিংয়ে বহু গলদ দৃষ্ট হচ্ছে। মোহনবাগান ও কে ও এস্ বির খেলায় মিলিটারী রেফারির পরিচালনায় অনেক ছোটখাট ত্রুটি তো হয়েছিল ঘটেছিল। মোহনবাগানের বিপক্ষে হ্যাণ্ডবলের জন্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দিয়ে বল সরিয়ে দেয়, অন্য কেউ দেয়

ইষ্টবেঙ্গল ও কে ও এস্ বির খেলা বহু ত্রুটি দৃষ্ট হয়েছে। অনেক অহেতু হয়েছে ও রেফারিংয়ে দৃঢ়তা এবং উভয় পক্ষই বিস্তর ফাউল করেছে।

ভবানীপুর ও এরিয়ানের খেলাটি পুরা এক ঘণ্টা খেলিয়েছেন। রেফ এখানে কতক্ষণ খেলা হয় সে বিষয়ে এরিয়ানরা নাকি প্রতিবাদ করেছে। হলে জিততে পারবে তো ?

ফুটবলের নুতন নিয়ম ঃ

গত বছর থেকে বিলাতে নিম্নলিখি প্রবর্ত্তিত হয়েছে। এ বছর কলিক হলো :—

Laws 7—Goal-kick.—W played behind the goal-line the opposite side, it shall b into play beyond the penalt one of the players behind w went, within that half of the g the point where the ball left th

It is not permissible for th receive the ball into his ha kick by another player in orde therafter kick it into play ; kicked direct from the goal and if not kicked beyond t the kick be re-taken.

Laws 8—Charging

Although a player is entitled tc keeper when the latter is in p ball in holding the balls it is nc him (the attacker) to kick kick the ball under such circ use of the foot amounts tc conduct.

Punishment for kicking to kick the ball when it is keeper shall be a free kick fro cannot be scored direct.

ফিডার সার্ভিসের যাত্রী

শ্রীসুরসকুসুম সেন

সত্যিকারের ব্যস্ততা ওটা আমাদের ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়। শ্রীরামচন্দ্র হনুমানের দীর্ঘ লেজের সাহায্যে অনায়াসে দ্রুত কটক পাল্লাপারের বন্দোবস্ত করতে পারতেন কিন্তু তা করেননি। ধীরে সুস্থে কাঠ পাথর দিয়েই সেতু গড়েছিলেন। বস্তুত দ্রুততার উপর কার্য্যসিদ্ধি নির্ভর করেনা তাই আমাদের সিদ্ধিদাতার রূপ কল্পনার দ্রুততার পরিপন্থী অবয়বের পরিচয়-ই পাওয়া যায়। প্রশান্ত, আত্মসমাহিত, সৌম্যমূর্ত্তি—কুৎসিৎ ব্যস্ততার কোন পরিচয় ওতে নেই।

রেকর্ড! রেকর্ড! রেকর্ড! কি বিশ্রী দিনকালই পড়েছে! চারিদিকে শুধু রেকর্ড গড়া, আর রেকর্ড ভাঙ্গার হুজুগ। তাও আবার প্রায়ই মারাত্মক 'স্পীড' নিয়ে রেকর্ড! বলুন দেখি, এসব কি ভগবানের বিরুদ্ধে রীতিমত বিদ্রোহ নয়? ভগবান এত জিনিস দিয়েছেন, আর পায়ে দুটো পাখা বেঁধে দিতে পারেননি? এই থেকেই বুঝা উচিত—আর যাই হোক, 'স্পীড' কখনো মানুষের চরম লক্ষ্য হতে পারেনা। দশগজ যেয়ে হাঁফিয়ে পড়েন—বলীবর্দ্দবাহিত সনাতন রথই রয়েছে। এই সেদিনও পল্লীভারতের অধিবাসীরা পণ্ডিত জওহরলালের জন্য যার ব্যবস্থা করেছিলেন। বস্তুবিক, এখনো ভারতীয় কৃষ্টির ভেজালহীন ছিটেফোঁটার সন্ধান মিলে তা শুধু পল্লীবাসীর কাছেই। আমরা সব পড়েছি সহুরে, আর যত সব অভারতীয় রুচি নিয়ে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করছি। আমাদের কপালেও জুটেছে তেমনি অনাবশ্যক কলরবকারী ষ্টীমার ট্রেণ—ব্যস্তবাগীশ মোটর বাস, আবার গণ্ডের উপর বিস্ফোটকের মত এরোপ্লেন।

'ষ্টেশন'! কি কুৎসিৎ ভিড় আর তাড়াহুড়ো! অতি কষ্টে টিকিট কিনে বেড়িয়ে এসে দেখুন জামাটি ছিন্ন আর পকেটটি অদৃশ্য। একটা শোকগাথা রচনা করে বিরহিণী পকেটটির যে উপযুক্ত মর্য্যাদা দেবেন তারও যো নেই—দিকে গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা পড়ে গেছে। দৌড়! দৌড়! গাড়ী ছাড়লে হয়তো দেখতে পাবেন, ফলের ঝুড়িটি আপনার মায়া কাটিয়েছে। এরকম বিচ্ছেদের জের টানতে টানতে অর্দ্ধমাসের পথ অর্দ্ধদিনে মেরে দিয়ে আপনার অশ্বমনোরথ সুখী হলেও স্বস্তি পায়নি নিশ্চয়।

অভিযোগ করে লাভ নেই। বর্ত্তমান যুগে অনেকের কাছেই এগুলো অভিশাপ বলে মনে হলেও অপরিহার্য্য। কিন্তু এই অমানুষিক স্পীডের যুগেও মনুষ্যত্ব বজায় রেখে চলেছে—ফিডার সার্ভিসের ষ্টীমার। গরুর গাড়ীর গতি আর এরোপ্লেনের ইঞ্জিনের সমন্বয় করে—'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন অসম্ভব'—কিপ্‌লিঙের এই বাণী যে কতবড় একটা ভুলের হিমালয়, তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। গৃহিণীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বের হতে দেরী হয়ে গেছে? হতাশ হবেন না। ওদের-ও শিরায় শিরায় আভিজাত্যের রক্ত—ধীর, স্থির, কর্ম্মবিমুখ। দেখা মিলবেই। যদি দেখা না-ই মিলে, ক্ষতি নেই—সোজা চলে যান পরের ষ্টেশনে। দেখবেন, অন্যায় প্রতিযোগিতা করে আপনাকে পেছনে ফেলবার হীন মনোবৃত্তি ওদের নেই।

যাঁরা অনন্যোপায় হয়ে ষ্টীমার ট্রেণে উঠতে বাধ্য হন তাঁরা যদি কোনদিন ফিডার সার্ভিসের ষ্টীমারে যাতায়াত করার সৌভাগ্য লাভ করেন, তাহলে জন্মান্তরে বিশ্বাসী তাঁদের হতেই হবে। অকারণ এরূপ স্বর্গসুখভোগ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যফল ছাড়া আর কি হতে পারে?

ষ্টীমারটি যখন মন্দাক্রান্তা ছন্দে চলে, যাত্রীদের তখন সুখসুবিধা মিলে অনেক। যদি আপনার মধ্যে বিন্দুমাত্র কাব্যও থাকে তবে চারিদিকের নৈসর্গিক দৃশ্য আপনাকে একটা মহাকাব্য লিখবার স্নায়বিক উত্তেজনা অনায়াসে যোগাতে পারে। তীরবর্ত্তী একএকটি প্রাকৃতিক দৃশ্য চোখের সামনে প্রায় স্থায়ী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নিতান্ত আপনার জনের মত তার ব্যবহার—কিছুতেই ছেড়ে দিতে চায়না। যদি অকবি হন, তাহলে যাত্রীদের থেকে মনোমত সঙ্গী বেছে নিতে পারেন। দেখতে পাবেন, মিরজাফরের

মত রাজনীতিক, কালাপাহাড়ের মত সমাজসংস্কারক সবই সেখানে রয়েছে—শুধু খুঁজে নেওয়ার অপেক্ষা। আর যদি কৈবল্য-দায়িনী নিষ্কাম অলসতাই আপনার শ্রেয় হয়—চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ুন। ইন্দ্রিয় নিরোধের দরুণ আপনার কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হোক না হোক, গন্তব্যে পৌঁছানোর পূর্ব্বে অন্তত তিনটি সুদীর্ঘ সাত্ত্বিক নিদ্রা যে উপভোগ করে নিতে পারবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দ্বাপরে শ্যামের বাঁশি যে শুনেছিল সেই মজেছিল। কলিতে এমন ব্যস্ততাহীন নিশ্চিন্ত যাত্রার অভিজ্ঞতাও যে একবার লাভ করেছে সে আর ভুলতে পারবে না।

অনেকদিন পর দেশে যাচ্ছি। আবার সেই ফিডার সার্ভিসের সাথে পরিচয়। মহাযুদ্ধের পর এ কয়বৎসরে জগতে কত পরিবর্তন হয়ে গেছে কিন্তু ওর গতিপ্রকৃতি একটুও বদলায়নি। বসবার জায়গা করে দৈনিকটা খুলে নিয়ে দেখতে লাগলাম।

'ঢাকায় সাহিত্য-শার্দ্দূল শ্রীযুত আচার্য্য প্রীতিভোজে সম্বর্দ্ধিত'। খ্যাতির বিড়ম্বনা! ঘন ঘন নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ ফলে নিশ্চিত অম্ল এবং অকাল বার্দ্ধক্য। অথচ প্রত্যাখ্যান করারও উপায় নেই!

'নানাস্থানে দুর্ভিক্ষ'। সংবাদেরও দুর্ভিক্ষ দেখছি। আবিসিনিয়া-যুদ্ধ আর ভাওয়াল-সন্ন্যাসীর মামলা ফয়সালা হয়ে গেছে অনেকদিন। ইলেক্‌শনের হাঙ্গামাও চুকে গেছে। পড়বার মত চিত্তোন্মাদনাকারী খবর সত্যি কিছু নেই।

ষ্টীমারের উপর-নীচটা একবার ঘুরে আসা যাক। এমন সঙ্গীর সন্ধান মিলে যেতে পারে যার সঙ্গে সারাটি দিন গল্প করেও মনে হবে একমুহূর্ত্ত! আইন-ষ্টাইনের 'ল অব্ রিলেটিভিটি'-র মূর্ত্তিমান ব্যাখ্যা!

উপর তলায় প্রার্থিতের দেখা পেলাম। বৃদ্ধ একটা ঝুড়ির ভিতর হাত চালিয়ে কি যেন খুঁজছিলেন। অনুসন্ধান কার্য্যে তাঁর অখণ্ড মনোনিবেশ এবং উদ্বিগ্ন ভাব দেখে মনে হচ্ছিল—সমস্ত বিশ্ব সংসারের মঙ্গলামঙ্গল যেন জিনিসটা পাওয়া না পাওয়ার উপরই নির্ভর করছে।

কৌতূহলবশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। খানিকপরে ভদ্রলোক হতাশভরা চোখে আমার দিকে চাইলেন। সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম, কিছু হারিয়েছে?

ভদ্রলোক বৈরাগ্যের সুরে বললেন, হারায়নি, দিতে ভুলে গেছে হয়তো! অথচ জানে লঙ্কা ছাড়া একটি গ্রাস আমি খেতে পারিনে। এই যে পিণ্ডি চটকিয়ে বসে আছি লঙ্কা ছাড়া এগুলো গিলবে কে?

বাঁচা গেল। নীচে নেমে গিয়ে খা[illegible] একটা পয়সা দিয়ে আমি গোটাকয়েক লঙ্কা নিয়ে এলাম। ভদ্রলোক পেয়ে কি খুশি! লঙ্কা কয়টি হাতে করে স্ব[illegible] পাওয়া মাদুলীর মত আগ্রহভরে দেখতে লাগলেন।

পিণ্ডিই বটে! বিড়াল ডিঙ্গাতে পারেনা যাকে বলে অথচ বিনা দুর্ঘটনায়-ই বৃদ্ধের আহার পর্ব্ব সমাধা হল।

বৃদ্ধের আদর আপ্যায়নে অগত্যা সেখানেই বসতে হ[illegible] পরিচয়ে জানতে পারলাম তিনি পশ্চিমের এক দেশীয় রা[illegible] মাষ্টারী করতেন। বর্ত্তমানে দেশে থাকেন। এক[illegible] সবজান্তা গুণীলোক। আমার কপাল ভাল, গাই ধ[illegible] গিয়ে বলদ ধরে বসিনি। একেবারে সুরভি শ্রেণীর অবিচ্ছেদে দোহন করতে করতে গন্তব্য পর্য্যন্ত পৌঁছা যাবে।

বললাম, মাষ্টার মশাই, লঙ্কার উপর আপনার আসক্তি, এ দেখছি ভরতের মত মোক্ষের পথে এক কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে।

মাষ্টার মশাই হেসে বললেন, জিনিসটি দেখতে যে সুন্দর তেমনি হিতকারী আর অকৃত্রিম। এক কথায় যেতে পারে সত্যম-শিবম-সুন্দরম। এর প্রতি মোহ ক[illegible] মুক্তির প্রতিবন্ধক হতে পারেনা। 'মোহ মোর মুক্তি উঠিবে জ্বলিয়া—প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া'।

আমি হেসে বললাম, লঙ্কা গাছে ফলে থাকবে বোধহ[illegible]

—তাতেই বা কি ক্ষতি! লোকসেবার দাম এ[illegible] মিলবেই।

—লঙ্কার আবার কোন লোক-সেবা হচ্ছে!

মাষ্টার মশাই ক্ষুণ্ণস্বরে বললেন, অশ্রদ্ধার ভাব কারুর দোষগুণ বিচার চলেনা। আমাদের গ্রামে [illegible] সখের যাত্রাপার্টি ছিল। একদিন বড়রাণীর পার্ট [illegible] যে ছোকরা ও একেবারে ঘুমে অবসন্ন। কি ছাই মা[illegible] বলে যাচ্ছিল—অভিনয় মোটেই জমছিল না। খানিকটা লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে দিলাম ওর চোখে। [illegible] চোখের জলে বুক ভাসিয়ে যে পার্টটি করলে সেদিন ত[illegible]

...পল্লীবাসিনীকেই কাঁদতে হয়েছিল। লঙ্কার এসব ...াগ একস্ট্রা-কার্সাকোপিয়া। কিন্তু এর শাস্ত্রীয় প্রয়োগও ...্যাতীত। আয়ুর্ব্বেদে লঙ্কার যথেষ্ট গুণ বর্ণনা রয়েছে।

হাসি চেপে বললাম, আয়ুর্ব্বেদে যা-ই বলুক, খেতে কিন্তু ...বিস্তর অসুবিধা ভোগ করতে হয়।

—তেজস্কর জিনিস খাবে অথচ অসুবিধা ভোগ করতে রাজি নও—এ কি হয় কখনো? মহাতপা অগস্ত্য রাক্ষসের মাংস্ খেয়ে হজম করেছিলেন কিন্তু একটা ঢেঁকুর তাঁকেও তুলতে হয়েছিল। স্বামী-জি স্পষ্টই বলেছেন—'চালাকি করে মহৎ কাজ করা চলেনা'। বাংলাদেশ ম্যালেরিয়ায় উচ্ছন্ন যেতে বসেছে—কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে এর প্রকোপ পশ্চিম-বঙ্গের চেয়ে অনেক কম। একই আবেষ্টনী, একই খাদ্য—পার্থক্য শুধু ঐ লঙ্কা! এর পরেও লঙ্কার মাহাত্ম্য অস্বীকার ...তে চাও?

মাষ্টার মশাইএর অকাট্য যুক্তির কি প্রতিবাদ করব ভাবছিলাম।

গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন—লঙ্কা বার বার ভারতের ...গ্য-নিয়ন্ত্রণ করেছে।

চমকে উঠ্‌লাম—"ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ"!

বিস্মিত কণ্ঠে বললাম, লঙ্কা ভারতের নিয়ন্তা—কথাটা ...খুবই নতুন ঠেকছে।

—নতুন একটুও নয়, খুবই পুরোনো। সভ্যতা যতই ... হোক না কেন, বাইরের কোন নতুন সভ্যতার সঙ্গে ...ঘর্ষ না হলে একদা মৃত্যু তার অবশ্যম্ভাবী। ব্যাবিলনীয় ...ভ্যতাই বল আর মিশরীয় সভ্যতাই বল—ওদের মৃত্যুর ...রণ এই বিচ্ছিন্নতা। লঙ্কা এই বিচ্ছিন্নতা ঘটতে দেয়নি ...ই ভারতীয় সভ্যতা আজো টিঁকে আছে। প্রথম ...ঘর্ষ লঙ্কার রাজা ও অযোধ্যার যুবরাজের মধ্যে। যার ...ল অনার্য্য কপি ও রাক্ষস সভ্যতা প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার ...বুর্ দেহে প্রাণ সঞ্চার করেছিল।

কিন্তু সে-তো গাছের লঙ্কা নয়!

তা না হোক্, কিন্তু নাম মাহাত্ম্য যাবে কোথায়? নিজ মুখেই বলেছেন—তাঁর চাইতে তাঁর নাম বড়।

...ছেন বটে! অস্বীকার করার উপায় নেই!

...র মশাই বললেন, দ্বিতীয় সংঘর্ষ আধুনিক যুগের। ...পাশ্চাত্যের—ভারতীয় ও ইউরোপীয় সভ্যতার সংঘর্ষ, যার ফলে বর্ত্তমান নবযুগের সূচনা। এর মূলেও যে লঙ্কা, তাতো জানই।

বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম, কি রকম?

অবজ্ঞার হাসি হেসে মাষ্টার-মশাই বললেন, কি সূত্রে বিদেশীদের এদেশে আগমন—ছেলেবেলা স্কুলেও পড়েছ?

—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসায়ের কথাই তো শুনেছি।

—কিসের ব্যবসায়ে? লঙ্কার নয়?

ইতস্তত করে বললাম, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মশলা ব্যবসায়ের দিকে কোম্পানীর প্রথমটায় নজর ছিল শুনেছি।

মাষ্টার মশাই হেসে বললেন, মশলা মানে লঙ্কা। তুমি ভেবেছ গোলমরিচ? এককালে আমারও তাই ধারণা ছিল। কিন্তু ও জিনিষটি তা নয়। এ-সেই লঙ্কা, পূর্ব্ববঙ্গবাসী যাকে বলে মরিচ—আর অবাঙ্গালী অনেকেই বলে থাকে মির্চা। মশলা বলতে যে ঐ লঙ্কাকেই বুঝায় ভারতের নানা দেশ ঘুরে এ ধারণা আমার বদ্ধমূল হয়েছে। বিহারে যাও দেখতে পাবে—পাঁচ পোয়া ছাতু ছোট্ট দুটি লঙ্কার সাহায্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এক ঠোঙা ছাতু কিনতে যাও দোকানী দুটি লঙ্কা অমনি দিয়ে দেবে। ও ঠিক জানে ঐ চিজ্ ছাড়া এক পা চলবার সাধ্যি কারুর নেই। মদ্রবাসীর লঙ্কাপ্রীতি ভগবদ্-ভক্তিরই নামান্তর! ভারতে প্রচলিত মশলার মধ্যে সার্ব্বজনীন গৌরবের দাবী এক লঙ্কাই করতে পারে। তোমাদের আধুনিক কবি 'মানময়ী গার্লস স্কুলে' কি বলেছেন? পাকপ্রণালীর সেই গানটা? দিওনা, দিওনার বেলায় মেথির গুঁড়ো আর আদা—দিও, দিও-র বেলায়, লঙ্কাবাটা। একেই বলে কবি। প্রাণের গোপনতম কথাটি কেমন টেনে বার করেছেন।

একটা ষ্টেশনে জাহাজ ভীড়ছে। মাষ্টার মশাই এখানেই নামবেন শুনলাম। প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস ছেড়ে আধুনিক সাহিত্যের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম মাত্র—তার মধ্যে—এই রসভঙ্গ! বিদায় দিতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। মাষ্টার মশাই আশ্বাস দিয়ে বললেন, পৃথিবী গোল আর আমরাও ভবঘুরে। দেখা আবার হয়ে যাবে নিশ্চয়।

সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম—ষ্টেশন পেরিয়ে একটা ঝোপের অন্তরালে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমিও একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে নতুন শিকারের সন্ধানে আর একবার উপর তলায় উঠলাম।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

হেমেন্দ্রলাল রায় প্রণীত গল্প-পুস্তক "শিল্পীর খেয়াল"—১॥০

তারকদাস গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "বিশ্বজ্ঞান"—।৶০

সুবোধ বসু প্রণীত কৌতুক নাটিকা সংগ্রহ "কলেবর"—১।০

কৃষ্ণকুমার মিত্রের "আত্মচরিত"—২৲

শ্রীবিমলানন্দ রায় প্রণীত ভ্রমণ কাহিনী "পাহাড়ের

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "অ

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার প্রণীত উপন্যাস "প্রলয়ের প

শ্রীকাত্যায়নী দেবী প্রণীত ছেলেদের গল্প-পুস্তক "স

নিবেদন

আগামী আষাঢ় মাসে 'ভারতবর্ষে'র পঞ্চবিংশ বর্ষ আরম্ভ

সুদীর্ঘ চতুর্বিংশ বর্ষকাল যে 'ভারতবর্ষ' গ্রাহক, পাঠক ও অনুগ্রাহকগণের পরিচিত, তাহার করিয়া দিবার প্রয়োজন আছে কি? এই চতুর্বিংশ বর্ষকাল 'ভারতবর্ষ' যে ভাবে বাঙ্গালা-সাহিতে আসিয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই সুদীর্ঘ কাল 'ভারতবর্ষ' প্রতি বৎসরে ২০০০ প ৬০খানি ত্রিবর্ণ চিত্র ও অল্লাধিক ১৫০০ এক বর্ণ চিত্র উপহার দিয়াছে; প্রতি মাসে পরলোকগত ম রঞ্জিত প্রতিকৃতি ও সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা দিয়াছে; এতদ্ভিন্ন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিশেষজ্ঞগণের গবেষ 'ভারতবর্ষ'কে সমৃদ্ধ করিয়াছে; আগামী বৎসরের প্রথম সংখ্যাকে আমরা ভারতবর্ষের 'রজত- প্রকাশ করিবার আয়োজন করিয়াছি। বঙ্গের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণের রচনা সম্ভারে এই সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' এই চতুর্বিংশ বর্ষকাল যে উচ্চতম আসন অধিকার করিয়া আছে, তাহাকে আরও মে বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষের মূল্য মণিঅর্ডারে বার্ষিক ৬।৶০, ভি, পিতে ৬॥৶০, ষাণ্মাসিক ৩৶০ আনা, ভি, পিে ভি, পিতে ভারতবর্ষ লওয়া অপেক্ষা **মণিঅর্ডারে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধাজন** টাকা বিলম্বে পাওয়া যায়; সুতরাং পরবর্ত্তী সংখ্যার কাগজ পাইতে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। **২০শ মধ্যে টাকা না পাওয়া গেলে আষাঢ় সংখ্যা ভি, পি করা হইবে।** গ্রাহকগণ কুপনে কাগজ পাঠাইবার পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ **নম্বর** দিবেন। নূতন গ্রাহকগণ **নূতন** বলিয়া উল্লেখ করিবেন; নতুবা টাকা জমা করিবার বিশে

ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। সেই জন্য ব্রহ্মদেশে আমাদের যে সক তাঁহাদের স্থানীয় পুস্তক বিক্রেতাদের নিকট হইতে 'ভারতবর্ষ' গ্রহণ করিলে কিছু কম মূল্যে পাইবে লুইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন, বেঙ্গল বর্মা ষ্টোরে ভারতবর্ষ পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ প্রতি সংখ্যার ডা স্থলে সাড়ে চারি আনা লাগিতেছে, ব্রহ্মদেশস্থ পুরাতন গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা মাত্র ১॥৶ করিয়া ৬।৶০ আনা স্থলে ৮৲ টাকা মূল্য ধার্য্য করিলাম। যে সকল গ্রাহক আমাদের নিকট হইতে করিবেন, আগামী ২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে মণিঅর্ডারে ৮৲ টাকা পাঠাইয়া দিলে এক বৎসর 'ভ ভি, পিতে ৮।৶০ আনা। **২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে টাকা না পাওয়া গেলে ভ ভি, পি করা হইবে।**

Editor :—
RAI JALADHAR SEN BAHADUR

Printed & Published by Gu
Gurudas Chatterjee

বহুবর্ণ চিত্র

কার্ত্তিক—১৩৪৩

বহুবর্ণ চিত্র

মহারাজাধিরাজ মহ তাবচন্দ বাহাদুর চাঁদিনী রাতের স্বপ্ন
উন্মাদিনী কমলমুখী দেখলে দশা তোর কুলটারাও হাসবে সখী আজ—
বিজয়া—

অগ্রহায়ণ—১৩৪৩

বহুবর্ণ চিত্র

১। জয়গোবিন্দ লাহা সি-আই-ই   ২। অগ্নি-স্বাহা
৩। গোষ্ঠ বিহার   ৪। সীবনরতা



Bharatvarsha Halftone & Printing Works

ভারতবর্ষ

সূচিপত্র

তুর্বিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ ১৩৪৩—জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৪

লেখ সূচি—বর্ণানুক্রমিক

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত

ভারতবর্ষ

সচিত্র মাসিক পত্র

চতুর্বিংশ বর্ষ

দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ ১৩৪৩—জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৪

সম্পাদক—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
—২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—